১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪১ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 18th February, 1972 শুক্রবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৮ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

এক নজরে

ফ্যাশান ও পশুজীবন ঃ নগরসভ্যতার বিস্তৃতি, জ্যামিতিক হারে মনুষ্যবৃদ্ধি ও তার প্রয়োজনে কৃষিক্ষেত্রের দুর্নিবার প্রসার বিশ্বের অরণ্য অঞ্চলকে দিনে দিনেই সঙ্কুচিত করছে আর তারই ফলে নিরাশ্রয় ও ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে পশুজীবন। কিন্তু বাঘ, নেকড়ে বা চিতার দল যদি কথা বলতে পারতো তাহলে ঐ হিংস্র পশুর দল বোধহয় তাদের মৃত্যুর জন্য সর্বাধিক দায়ী করতো কোমলহৃদয়া নারীকুলকে। একটি নারীর মনের মতো আবরণ-সজ্জা যোগাতে চারটি বাঘকে প্রাণ দিতে হয়, আর এই একের-জন্য-চার হার এতদিন অব্যাহত ছিল বলেই সারা পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা এখন মাত্র আড়াই হাজারে নেমে এসেছে। চিতা নিশ্চিহ্ন হয়েছে জগৎ থেকে এবং বিভার অদৃশ্য হয়েছে আমেরিকার অরণ্যে। আরও বহু প্রাণীই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত এইভাবে, যদি না ইতিমধ্যে মানুষের শুভবুদ্ধি সংযত করত তার সর্বসংহর মৃত্যু আয়ুধকে।

পঞ্চাশ বছর আগেও সারা পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা ছিল চাল্লিশ হাজার। আজ যে সে সংখ্যা আড়াই হাজারে নেমে এসেছে তার প্রধান কারণ ফারের কোট নির্মাণে বাঘের চামড়ার ব্যাপক চাহিদা। একটি ভাল ফারের কোটের জন্য চারটি বাঘের চামড়ার দরকার হয়। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে বলা যেতে পারে যে, আর মাত্র ছয়শত বাঘের চামড়ার ফারের কোট নির্মিত হলেই শুধু ছবিতে ছাড়া আর কোথাও বাঘের অস্তিত্ব থাকবে না। যেমন মানুষের রসনা পরিতৃপ্ত করতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে ডোডো পাখি, তেমনই মানুষের অপরিবর্তনীয় সৌন্দর্যতৃষ্ণার ইন্ধন যোগাতে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর সব সুন্দর প্রাণী যদি না অনতিবিলম্বে অতি কঠোর আইন করে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হয়।

সম্প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থার উদ্যোগে এ ব্যাপারে একটা বড় রকমের সাফল্য অর্জন করা গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। 'ইণ্টারন্যাশনাল ফার ট্রেড ফেডারেশন'-এর সঙ্গে তাদের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার শর্তানুসারে ঐ আন্তর্জাতিক ফার বাণিজ্য ফেডারেশনের ২৩টি সদস্য-রাষ্ট্রে বাঘ, তিন ধরনের নেকড়ে, দুই ধরনের অটার এবং চিতার লোমশ চর্মে পোশাক তৈরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়েছে। ঐ কটি প্রায় বিলুপ্ত প্রাণীর ফারের পোশাক প্রস্তুত নিষিদ্ধ হলে তারা যে আবার নতুন করে বাঁচার সুযোগ পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থাগুলির ব্যাপক প্রচার ও মানবিক আবেদনের ফলে ইতিমধ্যেই ফ্যাশানের রীতিনীতি সম্পর্কে নারী-জগতের রুচি ও চিন্তাধারায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে প্রায়-বিলুপ্ত প্রাণীর ফারের পোশাক বিক্রয়ের বিরুদ্ধে নারীকণ্ঠই এখন সর্বাধিক সোচ্চার। বৃটেনে এখন বিভিন্ন ফ্যাশান বিপণিতে যত কোট বিক্রয় হয় তার দশ শতাংশও ফার নির্মিত নয়।

মানুষের জঠরাগ্নির ইন্ধন হয়ে যেসব প্রাণী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, সেগুলির কয়েকটিকে রক্ষার ব্যাপারেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থাগুলি প্রশংসনীয় পারদর্শিতা দেখিয়েছে। জাভার গণ্ডার সংখ্যায় কমতে কমতে ত্রিশের নীচে নেমে গিয়েছিল, কিন্তু ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড পশ্চিম জাভায় একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের জন্য সংরক্ষিত করে এবং তাদের অবাধে বংশবৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করেছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের শেষ ত্রিশটি বিচিত্র রাজহাঁসকে ধরে নিয়ে গিয়ে বৃটেনের এক সংরক্ষিত অঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পর একাংশকে আবার হাওয়াইতে নিয়ে এসে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আরব মরুর এক ধরনের হরিণ শিকারির হাতে প্রাণ হারাতে হারাতে মাত্র তিনটি অবশিষ্ট ছিল। বন্যপ্রাণী সংরক্ষক সংস্থা সেই তিনটিকে ধরে আমেরিকার এরিজোনা রাজ্যের ফিনিক্স পশুশালায় নিয়ে যান। বংশবৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে ঐ হরিণকুল বিলুপ্তির আশঙ্কা মুক্ত হয়েছে। পশু সংরক্ষণ সমিতির এইসব কাজ কম ব্যয়সাপেক্ষ নয়। এর জন্য '৬১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ষাট লক্ষ ডলার অর্থাৎ সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে অর্থ সামান্য।

দাম্পত্য বন্ধন ঃ পশ্চিম জার্মানির 'জার্মান নিউজ' পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্প্রতি তার পাঠকপাঠিকাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, সুযোগ পেলে তাঁরা আবার একবার বিয়ের বাসরে বসতে রাজি আছেন কিনা। উত্তরে পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন বলেছেন, তাঁরা দ্বিতীয় সুযোগ পেলেও তাঁদের বর্তমান জীবনসঙ্গিনীকেই আর একবার বরণ করে ঘরে তুলে আনবেন। শতকরা ৮৩ জন স্বামী বলেছেন, তাঁদের স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ নেই।

জীবনসঙ্গিনীদের উত্তরে কিন্তু অত উত্তাপ ও উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়নি। তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯২ জন বলেছেন, তাঁরা দ্বিতীয় সুযোগেও প্রথমজনকেই বেছে নেবেন। আর শতকরা মাত্র ৬৪ জন বলেছেন যে, তাঁদের স্বামীদের তাঁরা মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন বলে মনে করেন।

ঈনিয়াস ইতিহাস পুরুষ ঃ গ্রীস ও রোমের পুরাণ কাহিনীর নায়ক, ট্রয়ের বীর যোদ্ধা এবং রোমনগরীর প্রতিষ্ঠাতাদের পিতৃপুরুষরূপে বর্ণিত ঈনিয়াস সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, রোমের প্রায় ২৬ শত বছরের পুরনো একটি সমাধি থেকে উৎখনিত প্রত্নসামগ্রীদৃষ্টে ঐতিহাসিকরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পুরাণ কাহিনীতে আছে—এক্রোইসজ ও আফ্রোদিতের পুত্র ঈনিয়াস ট্রয়ের পতনের পর বহু দেশ ঘুরে টাইবার রাজ্যে উপনীত হন; তারপর তিনি রাজা লাতিনাসের কন্যাকে বিবাহ করেন ও পরে লাতিনদের রাজা হন। এবং তাঁরই বংশধরগণ রোমনগরীর প্রতিষ্ঠাতা। রোমের প্রথম সম্রাট অগাস্টাস নিজেকে ঈনিয়াসের বংশধর বলে ঘোষণা করেন।

সম্প্রতি রোম নগরী থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রাতিসা দ্য মারে গ্রামে ২৬ শতাব্দী পূর্বের, অর্থাৎ প্রাক-রোমান সভ্যতা যুগের একটি মন্দির-সংলগ্ন সমাধি উন্মুক্ত করে সেখানে পাওয়া নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিক পাওলো সোমেলো দাবি করেছেন, রোমের জনক ঈনিয়াসের মরদেহের উপর ঐ সমাধি নির্মিত হয় এবং সংলগ্ন মন্দিরটিও নির্মিত হয় তাঁর সম্মানে। এই আবিষ্কৃতি ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে চাঞ্চল্য এনেছে।

স্পেস নার্ক ঃ মারিজুয়ানা ও পপির বেআইনি চাষের সন্ধানের উদ্দেশ্যে মার্কিন সরকার শেষ পর্যন্ত 'স্পেস নার্ক' নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা নিয়েছে। মহাকাশে পরিক্রমাকালে উপগ্রহটি ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৃথিবীর সান্নিধ্যে আসবে এবং তাতেই তার পক্ষে মারিজুয়ানা ও পপির চাষ পৃথিবীর কোন অঞ্চলে কতটা হচ্ছে তা সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে মার্কিন সরকার সে ব্যয়ের দায়িত্ব বহন করবেন। তাছাড়া ঐসব ভয়ংকর নেশার রাহুগ্রাস থেকে জাতিকে বাঁচাতে এখনই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি বছর প্রায় বিশ লক্ষ ডলার, অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। সন্ধানী উপগ্রহের জন্য ব্যয় তার তুলনায় খুব বেশি হবে না।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

ভয় বা তোষামোদের দ্বারা নয়

পশ্চিমী রাজনীতিকরা এখন ভারত সম্পর্কে একটি নতুন বিশেষণ ব্যবহার করছেন 'দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ'। গত সপ্তাহে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার অ্যালেক ডগলাস হিউম দিল্লিতে তাঁর সাংবাদিক সভায় ভাষণে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন কংগ্রেসের ভাষণে এই অভিধাটি প্রয়োগ করেছেন ভারতের ক্ষেত্রে। এতে আমরা উল্লসিত হব কিনা, কিংবা হবার কোনো কারণ আছে কিনা তা আমাদের নেতারা ঠান্ডা মাথায় পরে বিচার করে দেখবেন। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ভারত সম্পর্কে আগে যে একটা উপেক্ষার ভাব ছিল পশ্চিমী মহলে সেটা আর তাঁরা প্রকাশ করতে ভরসা পাচ্ছেন না। বরং একটা তোষামোদের ভাব দেখা দিয়েছে। উপেক্ষা কিংবা তোষামোদ কোনটাই একটি পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত জাতি ভালো চোখে গ্রহণ করতে পারে না। ভারতবর্ষ গত চব্বিশ বছর ধরে সকল ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে-সংগ্রাম করে আসছে, অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার সাফল্য আজ পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা আমাদের ন্যায়সঙ্গত আত্মপ্রসাদের বিষয়। কারো তিরস্কার বা পিঠচাপড়ানিতে এই গৌরবের হানি ঘটবে না।

বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার অ্যালেক এসে বললেন, ভারত মহাসাগরে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির নৌবহরের আনাগোনা বড় বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের উচিত হবে এ বিষয়ে নজর দেওয়া। ভারত মহসাগরকে স্নায়ুযুদ্ধের একটা কেন্দ্রে পরিণত করার কোনো ইচ্ছা ভারতের নেই। কিন্তু একটি খোলা সমুদ্রে বিভিন্ন দেশের নৌবহরের অবাধ চলাচলে বাধা দেবারও ক্ষমতা বা অধিকার আমাদের আছে কি? ভারতকে বাধ্য হয়ে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। সেই যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত ও বাংলাদেশ মুক্ত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারত বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে কিংবা তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে হঠকারী ব্যবহার করবে। ভারত 'পঞ্চশীল'-এ বিশ্বাসী। সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণেরও অন্যতম উদ্যোক্তা ভারত। সুতরাং হাতে অস্ত্র নিয়ে ভারত চারদিকে খবরদারী করে বেড়াবে, একথা যারা চিন্তা করছেন তাঁরা ভুল করছেন।

ভারত তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্ভাব বজায় রাখতে চায়, কারো অভিভাবক হতে চায় না। এই মনোভাবকে দুর্বলতা মনে করে পাকিস্তান বারবার ভারতকে আঘাত করার চেষ্টা করেছে। প্রত্যাঘাতে তাই আজ তার এই দুর্দশা। দুঃখের বিষয় এই যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন সাম্প্রতিক যুদ্ধে ভারত ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছেন। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বিরোধের কোনো কারণই ছিল না। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানের পরাজয় আশংকায় এতটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে দিয়েছিল বঙ্গোপসাগরে ভারতকে শায়েস্তা করার জন্য। এই ভীতিপ্রদর্শনে কোনো কাজ হল না। ভারতকে আক্রমণকারী আখ্যা দিলেও মার্কিন জনসাধারণ তা বিশ্বাস করল না। আমরা আশা করেছিলাম বাংলাদেশের মুক্তির পর মার্কিন প্রশাসনের ভুল ভাঙবে, ভারত-বিরোধী সংস্কার দূর হবে। গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষণে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র বলে ভারতকে উল্লেখ করে তিনি বললেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারত এর পর কীরূপ আচরণ করে তা দেখেই ভারত-মার্কিন আলোচনার ধরন ঠিক করা হবে। এখনও তিনি মনে করেন এই যুদ্ধে ভারতই আক্রমণকারী এবং নেহাৎ অস্ত্রশস্ত্র কম ছিল বলে পাকিস্তান পেরে উঠল না। অর্থাৎ পাকিস্তানকে আরও অস্ত্র দেবার যৌক্তিকতাই পরোক্ষে স্বীকার করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই উপমহাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েও মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেই ভুল আঁকড়ে রয়েছেন, এটা বাস্তবিকই খুব দুঃখের বিষয়।

আমরা কঠোর কথা ব্যবহার করতে চাই না। কিন্তু এটা বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে, পাকিস্তানকে দিয়ে ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখে এবং তার দারিদ্র্য, অশিক্ষা প্রভৃতি সমস্যার সুযোগ নিয়ে এই দেশের ওপর অশুভ প্রভাব বজায় রাখার দিন চলে গেছে। ভারতের মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পেয়েছে। বৃহৎ শক্তির ভীতিপ্রদর্শন, উপেক্ষা বা পিঠচাপড়ানিতে আর বিভ্রান্ত হবে না ভারত। এশিয়ার শক্তিসাম্য নিশ্চিতই ওলটপালট হয়ে গেছে ভারতের নতুন শক্তি অর্জনে। এই উপমহাদেশে এবং গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তিরক্ষার জন্য ভারতের বক্তব্যকে আজ মর্যাদা দিতে হবে। গত দুই দশক ধরে ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি প্রচার করে আসছে। তাকে উপেক্ষা করে সামরিক জোটবদ্ধতার রাজনীতি যাঁরা করছিলেন তাঁদের এখনও কোনো অনুতাপের লক্ষণ দেখা গেল না। এতেই মনে হয়, ভারতকে **এখন আরও সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে—তার নিজের এবং মিত্র প্রতিবেশীর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।**

ইন্দিরা দূরদর্শিনী ॥

রাধারাণী দেবী

প্রিয়দর্শিনি! দূরদর্শিনী হয়ে
নিমজ্জমান মহাপোত টেনে তুলে
ভাসিয়ে চলেছো ভবিষ্যতের কূলে
ঝঞ্ঝা অশনি চলেছো মাথায় বয়ে।
ধ্রুব নিশানায় কখনো বা নির্ভয়ে
দড়রশি ধরে ঝাঁপাও শূন্যে ঝুলে,
কখনো আঁধার নিশীথে নোঙর খুলে
গম্ভীর ভেঁপু রব তোলো নির্ভয়ে।
দূরদর্শিনি! দৃষ্টি রেখেছো স্থির
অতীতে এবং সুদূর ভবিষ্যতে:
মানবতাবাদ রচনায় পৃথিবীর
দিতেছ পাবক ভারত যজ্ঞ হতে।

ইতিহাস পথে পেয়েছ জন্মভূমি।
—নিজে দ্রুত হয়ে গেলে ইতিহাস তুমি।

জাল ॥

শামসুর রাহমান

খুব কালো জাল পড়েছিলো ঠিকই চতুর্দিকে, আমি
আটকা পড়ি নি ভাগ্যবলে। বোকা হাবার মতন
বেঁচে আছি অপ্রস্তুত। মৃত্যুর প্রতীক্ষা সর্বক্ষণ
[illegible] রয় চেতনায়। মৃত্যু আতংকেরই অনুগামী।

এখন তো বেঁচে থাকাটাই হাস্যকর ভয়ানক।
কখন যে দৃষ্টি থেকে পৃথিবীর সমস্ত আলোক
মুছে যাবে, দেহ থেকে তাপ। কাকের মতোই চোখ
বন্ধ ক'রে জীবন গচ্ছিত রাখি ফাটলে নিছক।
৩০।৯।৭১

কী ক'রে লুকাবে? ॥

শামসুর রাহমান

কী করে লুকাবে বলো এই সব লাশ?
এই সব বেয়নেট-চেরা
বিষম নাপাম-পোড়া লাশ?
এ তো নয় বালকের অস্থির হাতের
অত্যন্ত প্রমাদময় বানানের লিপি,
রবারে তুমুল ঘ'ষে তুললেই নিশ্চিত
মুছে যাবে। অথবা উজাড় ঠোঙা নয় মিষ্টান্নের,
কিংবা খুব ক্ষ'য়ে-যাওয়া সাবানের টুকরো,
অথবা বাতিল স্পঞ্জ, দূরে
ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই বেবাক
চুকে-বুকে যাবে।
কী করে লুকাবে বলো এত বেশী লাশ?

জানতে কি তোমরা
এত লাশ আপাদমস্তক মুড়ে ফেলবার জন্যে
ক' হাজার গজ
লাগবে মার্কিন
পোড়াতে ক' মণ কাঠ? তুখোড় চাতুর্যে
ভেবেছিলে এই সব লাশ গাদাগাদি
মাটিতে পুঁতে রাখলেই
অথবা নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিলেই বেপরোয়া
তোমাদের হত্যাপরায়ণ
দিনরাত্রি মুছে যাবে বিশ্বস্মৃতি থেকে।

যখন রাস্তায় জঙ্গী জীপ ছুটে যায়,
আগলে দাঁড়ায় পথ মৃতদের ভিড় সবখানে—
নিরস্ত্র নিরীহ যারা হয়েছে শিকার
মেশিনগানের, মর্টারের। অশ্বারোহী
যেন ওরা, হাওয়ায় সওয়ার,
আবৃত সুনীল বর্মে, পেতে চায় করোটির ট্রফি।
আদালতে, সরকারী দপ্তরে
বেরোয় দেয়াল ফুঁড়ে অবিরল গুলিবিদ্ধ লাশ,
ঝুলে থাকে গলায় গলায়।

দোকানী সম্মুখে মেলে দিলে
কাপড়ের থান,
আলোকিত পরিপাটি মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে লাশ;
যেন বা লুকিয়েছিল কাপড়ের ভাঁজে।

অথবা বিদেশী প্রতিনিধিদের ভোজসভায় হঠাৎ
প্লেটে ডিশে চিকেন সুপের পেয়ালায়
ন্যাপকিনে নিহত পুরুষ, নারী, শিশু
উদ্ভিদের মতো লেগে থাকে সারাক্ষণ,
রক্তাক্ত নাছোড়।

কী করে লুকাবে বলো এত বেশী লাশ
শোকার্ত মাটির নিচে, গহন নদীতে?
২।১০।৭১

এই উপমহাদেশের একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, শত শত বছরের সহ-অবস্থানও এ-দেশের দুটি প্রধান অধিবাসী, হিন্দু এবং মুসলমানকে মিলিত করতে পারেনি। তারা কাছাকাছি বসবাস করেছে, অভিন্ন আলো-বাতাস খাদ্য সংগ্রহ করেছে প্রাণ-ধারণের গাঢ় প্রয়োজনে, তবু পরস্পরের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেনি। বিভিন্ন বিরোধী বাতাস এসে তাদের পৃথক, দুর্বল করে গেছে। রবীন্দ্রনাথের বহুকথিত ভারততত্ত্বের সারবাণী হলো, বৈচিত্র্য এবং অনৈক্যের মধ্যে সমন্বয়-সাধন। এই তত্ত্ব লাভ করেছেন তিনি ভারতের ইতিহাস পাঠ করে এবং স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মতোই তিনি এই তত্ত্বে বিশ্বাসবান ছিলেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের চিরবৈরিতা তাঁর এই তত্ত্বকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। মুসলমান সম্বন্ধে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে দুটি দিক লভ্য।

ক। মুসলমান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা,

খ। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, তার কারণসমূহ এবং সমাধান।

তাঁর চিন্তাধারার কালানুক্রমিক পরিচয় নেয়া যাক।

ক। মুলমান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা :

'কালান্তর' গ্রন্থের 'কালান্তর' প্রবন্ধে (১৩৪০, ১৯৩৩) তিনি ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের স্তর বদলের হিসেব নেন এবং এ-দেশের জীবনে ও ইতিহাসে মুসলমান বিজয়ের অভিঘাত বর্ণনা করেন। এটি তাঁর অতি-পরিণত বয়সের রচনা, সেহেতু মূল্যবান। মুসলমানদের আগমন-পূর্ব ভারতবর্ষ সীমাবদ্ধ ছিলো চণ্ডীমণ্ডপ, যাত্রা-সংকীর্তন, রামায়ণ-পাঠ এবং কবিগানের আসরে। বহির্বিশ্ব-অচেতন এই দেশে প্রথম আঘাত হানে মুসলমান। সেই মুসলমান অনাধুনিক :

> কিন্তু সে-মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্য সংগঠন করেছে, কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এই জন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে-সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের। রাষ্ট্র-প্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয়নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে।১

প্রভাবটাও তিনি লক্ষ্য করলেন। তাঁর মত : ভদ্রসমাজ ফার্সির চর্চা করলেও 'বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে' ফার্সির স্বাক্ষর পড়েনি।২ প্রভাব যেটুকু পড়েছে, তা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে। বৈষ্ণব পদে কোনো প্রভাব পড়েনি, যদিও বাংলা-ভাষায় ফার্সি শব্দ অকিঞ্চন নয়। মঙ্গল-কাব্যে 'মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে, কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিম্বা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখিনে।৩ তিনি দুটি বন্ধ্যা সভ্যতার স্বরূপ তুলে ধরে দেখান, উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে নতুন কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়নি, যাতে পূর্বতন সীমা ভেঙে যেতে পারে। তারা পরস্পরের পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। তাই ভারতবর্ষীয় চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙে গেলো না, বিস্তৃত হলো না।৪ অর্থাৎ মুসলমান কালান্তর সাধন করতে পারেনি, এর কারণ উভয় সম্প্রদায়ের মানসিক শক্তির দুর্বল সমকক্ষতা। ইংরেজ এবং মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে, তিনি ১৮৯৩ (১৩০০) সালে বলেছেন :

> মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য, আমাদের কলাবিদ্যা, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায়-প্রজায় আদান-প্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত, কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোন লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।৫

তাঁর কাম্য ছিলো রাজা-প্রজার হৃদয়-সম্মিলন, ইংরেজ আমলে তা ঘটেনি। অত্যাচার সত্ত্বেও মুসলমান আমলে তা অনেকটা সাধিত হয়েছিল। তাই, হিন্দু-মুসলমানের মিলন নিমিত্তে আকবরের প্রচেষ্টা স্মরণ করে তিনি উচ্ছ্বসিত :

> আকবর সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয়-মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।...তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন।৬

---

১ কালান্তর : 'কালান্তর' রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪) ১৩৫৪, পৃঃ ২৪৩

২ ঐ ঐ ২৪৩।

৩ ঐ ঐ ২৪৪।

৪ ঐ ঐ ২৪৪।

৫ ইংরেজ ও ভারতবাসী (১৩০০) : 'রাজাপ্রজা' রবীন্দ্র রচনাবলী (১০) ১৮৫৭, ৩৮৮।

৬ ঐ ঐ ৩৯১—৯২।

আকবরকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মিলন লক্ষ্য করলেন, ১৮৯৮ সালে চাপকানকে কেন্দ্র করে সেই মিলনই দেখলেন। 'কোট বা চাপকান' (১৩০৫) প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে ঐক্য লক্ষ্য করলেন। দেখলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পসাহিত্য প্রভৃতিতে উভয় সম্প্রদায়ের আদান-প্রদান এতো ঘনিষ্ঠ যে, সেখানে কার কতোখানি দান, তা স্পষ্ট নির্ণয় দুঃসাধ্য। চাপকান বস্ত্রটি কার? তাঁর মত :

> চাপকান হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে-সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সহায়তা করিয়াছে।৭

শুধু বস্ত্র নয়, সঙ্গীত এবং অন্যান্য শিল্পও উভয়ের মিলিত সৃষ্টি। এর কারণ—উভয়ের পারস্পরিক আদান-প্রদান :

> কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই, এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল।৮

উভয় সম্প্রদায়ের মিলনচিহ্ন রয়ে গেছে এ-দেশের চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্র, সূচীশিল্প, নৃত্যগীতে। তাঁর মনে হলো, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান একই অঙ্গের দুই বাহু। এদের মিলনই দেশের শক্তি। তাই মনে করলেন :

> এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটি জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না।৯

ভারতবর্ষীয় জাতি গঠনে তিনি মুসলমানকে ত্যাগ করতে পারেননি, বরং প্রবলভাবে কামনা করেছেন। কিন্তু ১৮৯৮ সালে মিলনের কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি। এই সম্মিলন কোন্ কোন্ দিকে ঘটবে তাও তিনি নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, ধর্মে উভয়ে মিলবে না, মিলবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং উভয়ের পোশাক হবে অভিন্ন। তাঁর মত :

> হিন্দু-মুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে,—আমাদের শিক্ষা, আমাদের চেষ্টা, আমাদের মহৎ স্বার্থ সেইদিকেই অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে-বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দু-মুসলমানের বেশ।১০

১৯১২ সালে 'আত্মপরিচয়' (১৩১৯) প্রবন্ধে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। তাঁর মতে, মানব-প্রকৃতিতে দুটি অংশ বিদ্যমান—একটি, অতীতের চিরন্তন চির-প্রবহমান ধারা, অপরটি ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা।১১ এই তত্ত্বালোকে দেখলেন, তাঁদের ব্রাহ্ম পরিচয়টি নবপরিচয়, চিরকালীন, পরিচিতিতে তাঁরা হিন্দু। বললেন :

> অতএব, আমি হিন্দু একথা বলিলে যদি নিতান্তই কোন লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে।১২

তিনি অবশ্য তাঁর সমসাময়িক হিন্দু-ধর্মের লক্ষণগুলোকে হিন্দু সমাজের 'নিত্য লক্ষণ' বলে মানেন নি। ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর কাছে হিন্দু সমাজের ইতিহাসেরই একটি অঙ্গ, তা হিন্দু সমাজ-বিরোধী নয়, বরং তার পরিণতি।১৩ 'হিন্দু' বলতে বোঝেন তিনি একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থা, 'ব্রাহ্ম' বলতে একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্ম। তাঁর এই চিন্তার উন্মেষ ঘটে ১৮৯০ সালের দিকে। ১৮৯১ সালের আদম-সুমারিতে ব্রাহ্মরা পৃথকভাবে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত এবং গণিত হবার দাবী জানায়। রবীন্দ্রনাথ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের তদানীন্তন সম্পাদক, সেন্সাস-প্রধানকে আদিব্রাহ্ম সমাজভুক্তদের 'হিন্দুব্রাহ্ম' বলে চিহ্নিত করার জন্য অনুরোধ করেন, ব্রাহ্মদের উদ্দেশ্যে তাঁর মত পত্রিকায় বিজ্ঞাপিতও করেন। ১৩১৯ সালে তাঁর এ-মত প্রাবল্য লাভ করলো :

> তবে কি মুসলমান অথবা খৃষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয় পারি।১৪

এই জাতি ও ধর্মে পার্থক্যনির্দেশক সূত্রাবলম্বন করে মুসলমানদের সম্বন্ধে বললেন :

> বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও, হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই, হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খৃষ্টান, এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত, অসঙ্গত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধে।১৫

এই মন্তব্যের কাল ১৯১২, বিশ্ববিজয়ার্থে ভ্রমণ তখনও তাঁর শুরু হয়নি। 'হিন্দু-সমাজ'-বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ এসময়ে তপোবন এবং ভারততীর্থের আদর্শে উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত। তাই 'হিন্দু' শব্দটি তার কাছে সমাজ বা জাতির ব্যঞ্জনা দিলো, অন্য সমস্ত ধর্মই শুধু ধর্ম। 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' শব্দদ্বয়ের ব্যঞ্জিত অর্থের পার্থক্য নির্দেশ করলেন নিম্নরূপে :

> হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত-পরিণাম।১৬

তিনি তাঁর মত-সহায়ক উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। দেখিয়েছে চীন, পারস্য, আফ্রিকা, বাংলাদেশে মুসলমান বসবাস করছে। তাদের মধ্যে মিল কেবল ধর্মমতে, জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে নয়। অর্থাৎ দেশে-দেশে ধর্মমত অভিন্ন হতে পারে কিন্তু জীবন-ধারণ পদ্ধতি বিভিন্ন, আর এই জীবন-ধারণ পদ্ধতির উপর ধর্মের প্রভাব খুবই কম।১৭

খ : হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, তার কারণ-সমূহ এবং সমাধান :

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল চিন্তা করেছেন। এই চিন্তা অত্যন্ত গভীর, আন্তরিক, সদিচ্ছায় পরিপূর্ণ। তিনি প্রখর দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের মিলন না হবার কারণ-সমূহ তীক্ষ্ণ চোখে অবলোকন করেছেন এবং সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কেও তাঁর সৎ মন্তব্য ছিলো। তাঁর মতাবলীর কালানুক্রমিক পরিচয় নেওয়া যাক।

১৮৯৩ সালে লক্ষ্য করলেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ক্রমবর্ধমান। এই বিরোধের মূলে দেখলেন সরকারকে, সরকারের নিস্প্রেম নীতি বিরোধ বাড়িয়ে তুলছে। এটি

---

৭ কোট বা চাপকান : 'সমাজ', রবীন্দ্র রচনাবলী (১২), ১৩৫৮, ২২৮
৮ কোট চাপকান : ঐ ২২৮।
৯ ঐ ঐ ২২৮।
১০ ঐ ঐ ২২৯।
১১ আত্মপরিচয় : 'পরিচয়' রবীন্দ্র রচনাবলী (১৮), ৪৫২।
১২ ঐ ঐ ৪১৪।
১৩ ঐ ঐ ৪৬০।
১৪ ঐ ঐ ৪৬৪।
১৫ ঐ : ঐ রবীন্দ্র রচনাবলী (১৮), ৪৬৪।
১৬ ঐ ঐ ৪৬৪।
১৭ ঐ ঐ ৪৬৪।

উভয় সম্প্রদায়ের অতিসচেতন বিরোধের উন্মেষকাল। তিনি দায়ী করলেন সরকারকে :

> ভারতবর্ষে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশী করিয়া বপন করিয়াছে।১৮

'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১, ১৮৯৪) প্রবন্ধে বিরোধের চাষ যে সরকারই করে যাচ্ছেন, একথা স্পষ্ট বললেন। সরকারী 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' নীতিকে দায়ী করলেন :

> অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেন্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান ক্রমশঃ ঐক্য-পথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।১৯

তাঁর মনে হলো, সরকার যেন অনেকটা মুসলমানের পক্ষাবলম্বী।২০

'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৩০০) প্রবন্ধে লক্ষ্য করলেন, সরকার কংগ্রেসকে আঘাত করছেন না, তবে চেষ্টা করছেন যাতে মুসলমান কংগ্রেসে যোগ না দেয়।২১ উভয়ের ঐক্যই সরকারের আতঙ্ক। রাজনীতি এবং ঐক্য-ক্ষেত্রে মুসলমানের অধিকার আছে বলে তাঁর মনে হলো :

> আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটি-কাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনো-কালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্সও তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কংগ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।২২

এ-পর্যন্ত তিনি বিরোধের জন্য দায়ী করেছেন সরকারকে। ১৯০৭ সালে তাঁর মতবদল ঘটলো। বিরোধের কারণ, সরকার নয়, আবিষ্কার করলেন নিজেদের মধ্যে। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১৪) প্রবন্ধে বুঝালেন, ইংরেজ যদি মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তবে ইংরেজের উপর রাগ করে ফল হবে না। ইংরেজ শত্রু, সে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করবে। তাই তিনি মূল কারণ অনুসন্ধানে মনোযোগ দিলেন :

> মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নহে। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব, শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে--অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।২৩

তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো পাপের মূল বিন্দুতে। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে যেটি বিদ্যমান, তিনি একে নৈতিক দিক দিয়ে দেখে বললেন, 'পাপ' আর এই পাপ অনেক দিনের। তখন বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়েছে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের যথার্থ সম্পর্কটি তুলে ধরলেন :

> আর মিথ্যা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝ-খানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।২৪

এই বিরুদ্ধতার জন্যেই তারা শত শত বছর ধরে অশান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান করেছে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। এই সম্পর্কবিপর্যয়ের জন্যে তিনি দায়ী করলেন হিন্দুকে এবং নিজে সাক্ষ্য দিলেন:

> আমরা জানি বাংলাদেশের অনেকস্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমান বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।২৫

হিন্দুরা এসব কাজের দোষক্ষালনার্থে দোহাই দেয় শাস্ত্রের। তিনি দৃঢ়মত পোষণ করলেন যে, এমন শাস্ত্র নিয়ে কোনদিন স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হবে না।২৬ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর 'সভা-পতির অভিভাষণ'-এ (১৩১৪, ১৯০৭) তিনি উভয়ের বিরোধের কারণগুলি বস্তুগত দৃষ্টিতে দেখালেন এবং সমাধান দানের চেষ্টা করলেন। দেখালেন হিন্দু-মুসলমানের অন্য নানাবিধ পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত অসামঞ্জস্যজাত পার্থক্য। হিন্দু লেখাপড়া শিখেছে আগে থেকেই, সরকারী চাকুরী পেয়েছে, ফলতঃ পার্থক্য জন্মেছে। তিনি মনে করলেন, এই পার্থক্য দূরীভূত না হলে মনের মিল হবে না।২৭ তিনি এই অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত এবং অন্যান্য পার্থক্যের আশু বিলোপ কামনা করলেন :

> মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন-মনে প্রার্থনা করি।২৮

ভারতবর্ষের সমস্যা বিপুল। এতো ভাষা জাতি আচার অন্যত্র কোথাও নেই, অথচ তিনি এদের নিয়ে একটি মহাজাতি গঠনের দরকার বোধ করেন। এই মহাজাতি গঠনে হিন্দু-মুসলমানের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্ব-পূর্ণ। কিন্তু কোনো মিলনলক্ষণই এদের মধ্যে দেখলেন না, বরং বঙ্গভঙ্গের সময়ে দেখালেন :

> হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।২৯

---

১৮ ইংরেজ ও ভারতবাসী : 'রাজা-প্রজা' রবীন্দ্র রচনাবলী (১০) ১৩৫৭, ৩৯২।
১৯ 'সুবিচারের অধিকার' : ঐ ৪৮১-'৯১।
২০ ঐ ঐ ৪২০।
২১ ইংরেজের আতঙ্ক 'পরিশিষ্ট', রবীন্দ্র রচনাবলী (১০), ১৩৫৭, ৫৩৮।
২২ ঐ ঐ ৫৩৮।
২৩ ব্যাধি ও প্রতিকার : ঐ ৬২৭।
২৪ : পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র রচনাবলী (১০) ৬২৮।
২৫ ঐ ঐ ৬২৮।
২৬ ঐ ঐ ৬২৮।
২৭ সভাপতির অভিভাষণ : 'সমূহ' রবীন্দ্র রচনাবলী (১০), ১৩৫৭, ৫০১।
২৮ ঐ ঐ ৫০১।
২৯ সমস্যা : 'রাজা-প্রজা', রবীন্দ্র রচনাবলী (১০), ১৩৫৭, ৪৮০।

মুসলমান বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে যোগ দেয়নি, তার জন্য তিনি সরকারকে নয়, দায়ী করলেন নিজেদের। নিজেদের অন্তর্গত পাপরাশির অশুভ ক্রিয়ার কথা পুনরায় বললেন। তার মনে হলো, সরকার যদি মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগিয়েই থাকে, তবে সে বরং একটি বাস্তব সত্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ করে উপকার করেছে। ৩০ 'সদুপায়' (১৩১৫, ১৯০৮) প্রবন্ধে লক্ষ্য করেন, পূর্ববঙ্গ মুসলমানগরিষ্ঠ দেশ, আর তাদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। ভাষা, সাহিত্য এবং অন্য কতিপয় ক্ষেত্রে হিন্দুর সঙ্গে তাদের বন্ধনও আছে। তিনি বোধ করলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ এই বন্ধনকে শিথিল করবে। এর কারণ উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য :

> ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ, বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছা-কাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই; দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।৩১

এই মিলন যান্ত্রিক, স্বাভাবিক নয়। বঙ্গ-ভঙ্গ এই মিলনকেও উচ্ছেদ করবে। এই বিচ্ছেদ এড়ানোর জন্যে তিনি নিজেদের মিলন-প্রচেষ্টা দরকার বলে বোধ করলেন। কিন্তু রাজনীতিবিদগণ আশ্রয় নিলেন বয়-কটের, বিলাতি লবণ ও বস্ত্র বহিষ্কারকেই তাঁরা সমস্যা সমাধানের উপায় জ্ঞান করলেন। হিন্দুরা মুসলমানদেরও আন্দোলনে, অংশ নেবার আহ্বান জানালো। তাঁর মতে, এই আহ্বান গরজের, হৃদয়ের নয়, তাই মুসল-মান সাড়া দেয়নি। তিনি মুসলমানদের সাড়া না দেবার কারণ এবং আন্দোলকদের ত্রুটি তুলে ধরলেন :

> ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। একথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতিস্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামাখা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না।৩২

এই প্রবন্ধেও তিনি স্বীকার করেন, মুসল-মানদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু কদাচ ভালো ব্যবহার করেনি, এবং সামাজিক ব্যবহারে হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের পশুর অধিক ঘৃণা করে।৩৩ 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯১১) প্রবন্ধেও মুসলমানদের প্রতি হিন্দুর আহ্বানের কারণস্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। দেখালেন, তাদের আহ্বান রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্তে। দেশে যখন রাজনৈতিক ঐক্যলাভের প্রয়োজন দেখা দিলো, তখনই হিন্দু আহ্বান করলো মুসলমানকে।৩৪ এ ডাক প্রয়োজনের, ভালোবাসার নয়। তাই আহ্বান সাড়া পায়নি। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যবর্তী একটি 'সত্য পার্থক্য' স্বীকার করে হিন্দুর আহ্বানের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটন করলেন :

> হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহা-দিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনা-বশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।৩৫

তিনি দেখতে চাইলেন, উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যানুভূতি কোন্ সময় থেকে তীব্রতা লাভ করলো। দেখলেন, হিন্দু যখন 'হিন্দুত্ব' নিয়ে গৌরব গান শুরু করলো, মুসল-মানের মুসলমানিত্বও তখনি মাথাচাড়া দিলো। এর ফলাফল :

> এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।৩৬

মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রয়াসকে তিনি অভিনন্দিত করলেন এবং প্রয়াসের মধ্যেও উভয়ের মিলনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করলেন।৩৭ ১৯০৭ সালে তিনি মুসলমানদের অর্থ-নৈতিক উন্নতি কামনা করেছেন, ১৯১১ সালে 'পদমানের রাস্তায় তাদের দ্রুতগতি' কামনা করলেন।৩৮ এ সময়ে মুসলমানরা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় দাবী করে। এর মধ্যে তিনি প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ্য করলেন, তাকে 'সত্য ও স্থায়ী' পদার্থ ভাবলেন না। এর মধ্যে যা সত্য পদার্থ আবিষ্কার করলেন তা মুসলমানের আত্মোপলব্ধি :

> ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।৩৯

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান যোগ দেয়নি রাজনৈতিক কারণে। তিনি এই রাজনৈতিক কারণ স্বীকার করেও অনৈক্যের সামাজিক কারণ লক্ষ্য করে এসেছেন। যাদের সামাজিক ঐক্য নেই, তাদের মধ্যে রাজ-নৈতিক ঐক্য সৃষ্টি দুঃসাধ্য। কেবল আবেদন যথেষ্ট নয়। পূর্বের মতো 'লোকহিত' (১৩২১, ১৯১৪) প্রবন্ধে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর আহ্বানের প্রকৃত বিশ্লেষণ করলেন :

> একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই; যদি বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্য-ভঙ্গি

---

৩০ সমস্যা : 'রাজা-প্রজা' রবীন্দ্র রচনাবলী (১০), ১৩৫৭, ৪৮৯।
৩১ সদুপায় : 'সমূহ' রবীন্দ্ররচনাবলী (১০), ১৩৫৭, ৫২৩
৩২ ঐ ঐ ৫২৬।
৩৩ ঐ ঐ ৫২৮।
৩৪ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় : 'পরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী (১৮), ১৩৬১, ৪৭৪।
৩৫ ঐ ঐ ৪৭৪।
৩৬ ঐ ঐ ৪৭৫।
৩৭ ঐ ঐ ৪৭৫।
৩৮ ঐ ঐ ৪৭৬।
৩৯ ঐ ঐ ৪৭৬।

> করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।৪০

তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক হৃদয় সম্পর্ক। কিন্তু লক্ষ্য করলেন, স্বদেশী প্রচারকও মুসলমান সহকর্মীর সঙ্গে এক দাওয়ায় দাঁড়িয়ে জল খায় না।৪১ তাঁর মতে, অফিস, বিদ্যালয় ইত্যাদিতে মুসলমান পশ্চাৎপদ, সেখানে ঠেলাঠেলি গায়ে লাগে, 'কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে।'৪২ এ সমস্ত কারণে মুসলমান আন্দোলনে যোগ দেয়নি। এজন্যে তিনি দোষী করলেন নিজেদের, হিন্দুদের।৪৩ ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্টে বিলাতের পার্লামেন্টের সামনে ভারতসচিব মন্টেগু ভারতের ভাবী শাসনের আভাস দেন। তিনি বলেন, ভারতীয়দের হাতে শাসনভার দেয়া হবে by successive stages. ৪৪ সেপ্টেম্বর মাসে (১৯১৭) বিহারে হিন্দুরা গরু কোরবানি উপলক্ষ্যে মুসলমানদের উপরে জুলুম করে। ২৮শে সেপ্টেম্বরে শাহাবাদ জেলায় দাঙ্গা শুরু হয়, ২রা অক্টোবরের মধ্যে জেলার সর্বত্র দাঙ্গা বিস্তৃত হয়। ৯ই অক্টোবরে গয়া জেলার ত্রিশটি গ্রাম লুণ্ঠিত হয়। তাতে প্রায় ১০০০ লোক ধরা পড়ে এবং শাস্তি পায়।৪৫ এই দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত 'ছোট ও বড়ো' (১৩২৪, ১৯১৭) প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের মূলে দেখলেন দুটি বস্তু—ধর্ম ও সরকার। মত দিলেন যে, এদেশের ধর্ম আচারসর্বস্ব অসহনশীল, নিজের আচার অপরের উপর আরোপ করতে যেয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে। হিন্দুকে দোষী করলেন :

> নিজে ধর্মের নামে পশু হত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশু হত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না।৪৬

ধর্ম যতোদিন আচার-সর্বস্ব থাকবে, ততোদিন মিল হওয়া তাঁর কাছে অসম্ভব বোধ হলো। মিলনের উপায় হিসেবে নির্দেশ করলেন 'দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল'কে।৪৭ দেশবাসীর বোধ দায়িত্বহীনতাও মিলনের প্রতিবন্ধক বলে তাঁর বোধ হলো।৪৮

১৯১৭ থেকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদের জন্যে একটি বস্তুকেই প্রধানত দায়ী করতে থাকলেন, সেটি ধর্ম। এদের বিচ্ছেদের মূলে ধর্মের প্রভাব কতোখানি, কোন্ ধর্ম এর জন্য কতোটা দায়ী, ধর্মের ছোবল এড়িয়ে তারা কোনদিন মিলিত হতে পারবে কিনা—১৯১৭ থেকে মৃত্যু অবধি তিনি এ-বিষয়ে বারংবার চিন্তা করেছেন। ১৩২৯ সালে (১৯২২) কালিদাস নাগের কাছে লিখিত পত্রে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হলো, 'কালান্তর' গ্রন্থে পত্রটি 'হিন্দু-মুসলমান' নামে মুদ্রিত। প্রবন্ধে দুটি ধর্মের স্বপ্রকৃতি উদ্ঘাটন করে দেখলেন, এদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা অত্যল্প। এই বিশ্লেষণে খৃস্টধর্মকে এনে দেখালেন, পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় বিদ্যমান, যাদের সঙ্গে অন্য ধর্মমতের বিরোধ অত্যুগ্র। এই ধর্মদ্বয়—'খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম'। এরা স্বধর্ম পালন করেই তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে প্রতিহত করতেও এরা উদ্যত। তাই এদের সঙ্গে মেলার উপায় ঐ ধর্মাবলম্বন। হিন্দুধর্মও তেমনি, তবে পার্থক্য এখানে যে, অন্য ধর্মের সঙ্গে তাদের বিরোধ সকর্মক নয়, অনেকটা অসহযোগিতামূলক। এই ধর্মের বড় ত্রুটি আচারসর্বস্বতা।৪৯ তাই, তাঁর মতে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে মুসলমানের সঙ্গে সহজে মেলা যায়, কিন্তু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুর সঙ্গে সহজে মেলা যায় না। কেননা, আহারে-বিহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দুধর্ম সারাক্ষণ নিষেধ করে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, খিলাফত আন্দোলনের সময় মুসলমান হিন্দুকে মসজিদ বা অন্যত্র যতোখানি টেনেছে, হিন্দু ততোখানি টানতে পারেনি। তিনি নিজের কাছারিতেই দেখেছেন, মুসলমান প্রজাদের বসতে দেয়া হয় জাজিমের একপ্রান্ত তুলে।৫০ তিনি এদের মিলন সম্পর্কে যেন অনেকটা হতাশ :

> ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে, ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। একপক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কি করে মিলবে।৫১

বললেন, 'হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ', এর প্রকৃতি নিষেধ ও প্রত্যাখ্যান।৫২ রবীন্দ্রনাথের মতোই কাজী আবদুল ওদুদ মুসলমানদের সম্বন্ধে বলেছেন :

> আচারে হিন্দু অনুদার হলেও অপরের ধর্মের প্রতি সে চিরাদিন শ্রদ্ধাবান, কিন্তু আচারে যথেষ্ট উদার হয়েও ধর্মমতে মুসলমান অনেক বেশি গোঁড়া। বিধর্মীর ভাষা, আচার এসব সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাইরে।৫৩

রবীন্দ্রনাথের কাছে এদের মিলন, তাঁর সমকালে, অসম্ভব বোধ হয়েছে। তিনি সমস্যা সমাধানের জন্যে দরকারবোধ করলেন 'মনের পরিবর্তন, যুগের পরিবর্তন', 'সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির' এবং ইউরোপের মতো উত্তরের মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে আগমন।৫৪ এসকলের জন্যে প্রয়োজনবোধ করলেন শিক্ষার, সমস্যা সমাধানের জন্যে দরকারবোধ করলেন কালান্তরের :

> হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ-কথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই, কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব, যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।৫৫

---

৪০ লোকহিত : 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪), ১৩৫৪, ২৬১—'৬২।
৪১ ঐ ঐ ২৬২।
৪২ ঐ ঐ ২৬২।
৪৩ ঐ ঐ ২৬২।

৪৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক' (২য় খণ্ড) তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮, বিশ্ব-ভারতী, পৃ ৪১১।
৪৫ ঐ ঐ পাদটীকা, ৫০৩।

৪৬ ছোটো ও বড়ো : 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪), ২৭৪।
৪৭ ঐ ঐ ২৭৪।
৪৮ ঐ ঐ ২৭৫।

৪৯ হিন্দুমুসলমান : 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, (২৪), ৩৭৫।
৫০ ঐ ঐ ৩৭৬।
৫১ ঐ ঐ ৩৭৬।
৫২ ঐ ঐ ৩৭৬।

৫৩ বাংলার জাগরণ : ১৩৬৩; ১১৭।

৫৪ হিন্দুমুসলমান : 'কালান্তর' রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪); ৩৭৬।
৫৫ ঐ ঐ ৩৭৭।

এদের মিলন সম্পর্কে ১৯২১ সালের মত পুনরুত্থাপিত করলেন ১৩৩০-এ (১৯২৩) 'সমস্যা' (১৩০০) প্রবন্ধে দেখালেন, এ-দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর উভয় সম্প্রদায়কে মিলিত করার প্রয়াসের ভিত্তিই অবাস্তব। এর প্রমাণ খিলাফত আন্দোলন, ঐ মিলনের পরেও উভয়ের মধ্যে বিরোধ রেখেছে। এই বিরোধের জন্য রাজনীতি-বিদরা দোষী করেন সরকারকে, আর তিনি করেন আত্মমধ্যস্থ 'পাপ'কে।৫৬ ধর্মই দায়ী :

> ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজার ভিতর দিক থেকে আগল দেওয়া।৫৭

তিনি দেখলেন, উভয় সম্প্রদায় ধর্ম-রজ্জুতে বাঁধা, মানুষের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক যোগের দিকে তাদের দৃষ্টি নেই।৫৮ এই ধর্ম যতখানি আচার-চালিত, ততোখানি শাস্ত্রনির্ভর নয়। উভয়ের বিরোধিতার চিত্র উন্মোচন করলেন :

> আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে. আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।৫৯

লক্ষ্য করলেন তাদের মিল হয় এক-মাত্র 'তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে'। দেখালেন, এ-মিলন অসত্য এজন্যেই বঙ্গভঙ্গের সময়ে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে মেলেনি, কেননা বঙ্গভঙ্গে তাদের দুঃখ ছিল না। কিন্তু 'অসহযোগ-আন্দোলনে' সে হিন্দুর সঙ্গে মিলেছে, কেননা রুম-সাম্রাজ্যের দুঃখ মুসলমানের কাছে বাস্তব। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বলেই এ-মিলন অস্থায়ী।৬০ কিন্তু এদের মিলন তাঁর নানা কারণে কাম্য। বললেন :

> ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তাহলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালো-য়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সম-কক্ষতা।৬১

১৩৩২ সালে (১৯২৫) 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধেও উভয়ের মিলনের বাধা হিসেবে দেখলেন উভয়ের চিরাগত মানসিক সংস্কারকে।৬২ এই সংস্কারবশতঃই তারা স্বরাজলাভের লোভের মধ্যেও ভুলতে পারে না যে, তারা পরস্পরের কাছে কাফের ও ম্লেচ্ছ। খিলাফৎ আন্দোলন ও তাদের মানসিক কুসংস্কার নিষ্কাশিত করতে পারেনি। কিন্তু ভারতের উন্নতির জন্যে তিনি উভয়ের সম্মিলনকে জরুরী ভেবেছেন :

> ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তাহলে বড়োই ভুল করবো।৬৩

যত দিনের সামাজিক ভেদ পেরিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য অসম্ভব।৬৪ এই মিলন সূত্র আবিষ্কারার্থে তিনি ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেন। 'বৃহত্তর ভারত' (১৩৩৪, ১৯২৭) প্রবন্ধে দেখালেন, মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম-বিরোধের সময়ে জন্ম নেন সাধুসন্তগণ। তাঁরা 'আত্মীয়তার সত্যে'র দ্বারা উভয়কে বাঁধতে চেয়েছেন। এই সাধকদের অনেকেই মুসলমান। তাঁদের কথন পদ্ধতি :

> তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনমূলক পোলিটিক্যাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য বলে কল্পনাও করেন নি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে-ছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব।৬৫

'হিন্দু-মুসলমান' (১৩০৮, ১৯০১) প্রবন্ধে ধর্মকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। ধর্মই মিলনের বাধা—এ বিশ্বাসে তিনি দৃঢ়। ভারতের মহাজাতি গঠনে ধর্মের বাধাটা তাঁর দুর্লঙ্ঘ্য বোধ হলো। তাই 'বিকৃত' ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও প্রচার করলেন। রুশ বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, স্পেনের বিপ্লব, মেকসিকোর বিদ্রোহের ইতিহাসের কারণ নিয়ে দেখালেন, ঐ সমস্ত ভূখণ্ডে নবজীবনের আহ্বানে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো।৬৬ তাঁর বিদ্রোহ অবশ্য আদি প্রবর্তকদের মিলনকামী ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। বিকৃত ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ. ঐ বিকৃত ধর্মের স্বরূপ :

> তারপরে সম্প্রদায়ের লোক মহা-পুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সঙ্কীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম নিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয় বুদ্ধি দিয়েও নয়,...৬৭

তিনি সমকালে দেশান্তরে ধর্মবিদ্বেষ দেখেছেন, কিন্তু, আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান।৬৮ সামাজিক কক্ষ রেখে রাজনৈতিক রাজপথের দিকেও তিনি দৃষ্টি দিলেন। তখন রাজনৈতিক আন্দো-লনে মুসলমান সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ, তারা পৃথক নির্বাচন দাবী করছে। তিনি তাদের দাবী মেনে নিলেন।৬৯ তাঁর বিশ্বাস, এতে মিল হবে। তবে ধর্মের সমস্যাটি রয়ে যাবে। এক দলের মসজিদের সামনে ঢাক বাজানোর উৎসাহ এবং অপর দলের কোর-বানির সংখ্যা বৃদ্ধির আনন্দটা, তাঁর মতে, পরস্পর নিঃসম্পর্কিত শহরেই বেশী। মিলনের জন্য কামনা করলেন পরস্পরের মধ্যে আলাপ ও কাছাকাছি আগমন।৭০ কিন্তু এদের মিলন ঘটে নি। রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই এরা পৃথক হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ১৩১২ সালে (১৯০৫) তিনি গভীর আবেগে বলেছিলেন :

> কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন, এই পূর্ব-পশ্চিম হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্ত-স্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপ-শিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায়, চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে।৭১

এতোখানি প্রগাঢ় আবেগ যে ব্যর্থ হলো তার অমোঘ বীজ নিহিত ছিলো এদেশ-বাসীর ইতিহাসের মধ্যেই। সে-বিষয়ে রবীন্দ্রবাণী উদ্ধার করা যায় :

> আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না।৭২

---

৫৬ সমস্যা ঐ ৩৪৬।
৫৭ ঐ ঐ ৩৪৮।
৫৮ ঐ ঐ ৩৫০।
৫৯ ঐ ঐ ৩৫৪।
৬০ ঐ ঐ ৩৫৪।
৬১ ঐ ঐ ৩৫৬।
৬২ স্বরাজ সাধন : 'কালান্তর', সংযোজন, রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪); ৪১৭।
৬৩ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (১৩৩০) : 'কালান্তর' সংযোজন, ঐ, ৪০০।
৬৪ ঐ ঐ ৪০৪।
৬৫ বৃহত্তর ভারত : ঐ ৩৭২।
৬৬ হিন্দু-মুসলমান 'কালান্তর' সংযোজন, রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪) ৪৪৫-৪৬।
৬৭ ঐ ঐ ৪৪৬।
৬৮ ঐ ঐ ৪৪৬।
৬৯ ঐ ঐ ৪৪৮।
৭০ ঐ ঐ ৪৫০।
৭১ অবস্থা ও ব্যবস্থা : 'আত্মশক্তি', রবীন্দ্র রচনাবলী (৩), ৬১৯।
৭২ ঐ ঐ ৬১৯।

উপরে আমরা মুসলমান সম্পর্কিত সমগ্র রবীন্দ্র-প্রবন্ধাবলী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পাঠ করতে চেয়েছি। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের পরিচয় নিয়েছি কালানুক্রমিকভাবে, বিস্তৃত উদ্ধৃতি এবং ব্যাখ্যাসহ। তাই তাঁর চিন্তা-ধারার আর বিস্তৃততর বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন, বোধহয়, নেই। আমরা যে-দুটি শ্রেণীতে তাঁর চিন্তাধারাকে বিভক্ত করেছি, তার প্রথমাংশে তিনি যে-কটি বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত সেগুলো—সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য; মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং মুসলমানদের ধর্মের দিক।

মুসলমান ভারতবর্ষে আসে ত্রয়োদশ শতকে, বিজয়ীর বেশে। সময়টা এ-দেশের ইতিহাসের মধ্যযুগের ভূমিকা-পর্ব। তিনি লক্ষ্য করেছেন, মুসলমান এদেশের মানসিক-মণ্ডলে বিস্তৃতি সাধন করতে পারেনি, যেমন পেরেছে সাদা ইংরেজ। এর কারণ মুসলমান আধুনিক ছিলো না। মুসলমানের অবদানের কথা ভাবতেই রবীন্দ্রমানসে সর্বদা জ্বলেছে ইংরেজদের অবদানের উজ্জ্বল চিত্রগুলো। মুসলমান এদেশের চিত্তের প্রসার একেবারে সাধন করেনি, একথা তিনি বলেননি। তবে তাঁর প্রত্যাশার তুলনায় ঐ প্রসারণ সামান্য। তিনি বাংলা সাহিত্যে ফার্সির প্রভাব বিশেষ দেখেন নি। একমাত্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এবং বঙ্গশব্দভাণ্ডারে ফার্সির প্রভাব দেখেছেন। বাংলা সাহিত্যে ফার্সির প্রভাব পড়েনি, এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের রচিত রোমান্সময় প্রণয়োপাখ্যানগুলো অনেকটা ফার্সির অনুসরণ। দেবনির্ভর বাংলা কাব্যে মানবনির্ভরতা আনয়নের কৃতিত্ব মুসলমান কবিদের[৭২ক] তবে এই দান ইংরেজি সাহিত্যের দানের তুলনায় সামান্য। বাংলা শব্দভাণ্ডারই সবচেয়ে ফার্সি-প্রভাবিত। বাংলা ব্যাকরণেও ফার্সির প্রভাব আছে।

'আত্মপরিচয়' (১৩১১) প্রবন্ধের কতিপয় মন্তব্য মুসলমানদের কাছে আপত্তিকর মনে হতে পারে। প্রবন্ধটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে বিমুগ্ধ এবং প্রাচীন ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথার উচ্ছ্বসিত সমর্থক। পূর্বোল্লিখিত তত্ত্বানুসারে, তিনি নিজেকে বললেন 'হিন্দু' এবং মুসলমান-দের 'হিন্দু-মুসলমান'। ভারতবর্ষের অধি-কাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ বা হিন্দু, এ-সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত। তবু মুসল-মানেরা নিজেদের হিন্দু-মুসলমান বলতে স্বীকৃত হবে না, ভারতীয় মুসলমান বলে পরিচয় দেবে। তবে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু' বলতে কি বুঝতেন, তাও জানা দরকার। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা এবং রূপোদ্ভাবনী শক্তির মিশ্রণে যে-সামগ্রী গঠিত, তাই, তাঁর কাছে হিন্দু।[৭৩] তাঁর সমকালীন হিন্দু সমাজ কর্তৃক গৃহীত ধর্মকে তিনি হিন্দু ধর্মের 'নিত্য লক্ষণ' বলে মানেননি।[৭৪] সমাজতান্ত্রিক কল্পনায় তিনি অমিত উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। একই পরিবারে এক পিতামাতার সন্তানকে বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে সুখে বসবাসের কল্পনা তিনি করেছেন।

আমরা তাঁর চিন্তাধারাকে যে-দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি, তার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী বিস্তৃততর, গভীরতর এবং স্পষ্ট-তর। মস্কোতে কৃষিভবন দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা কেন বাধে? তাঁর উত্তরটি ছিলো :

> যখন আমার বয়স অল্প ছিল, কখনো এ-রকম বর্বরতা দেখিনি। তখন গ্রামে ও শহরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না।...এমন সব কুৎসিত কাণ্ড দেখতে পাচ্ছি যখন থেকে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রতি-বেশীদের মধ্যে এই রকম অমানুষিক দুর্ব্যবহারের আশু কারণ যাই হোক এর মূল কারণ হচ্ছে, আমাদের জন-সাধারণের মধ্যে অশিক্ষা। যে পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এই রকম দুর্বুদ্ধি দূর হয়, আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে তার প্রচলন করা আজ পর্যন্ত হয়নি।[৭৫]

১৯৩০ সালে তাঁর নির্ণীত দাঙ্গার দুটি কারণ—রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং অশিক্ষা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি তাঁর মতে মূল কারণ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'A nation in the making' গ্রন্থে বলেছেন, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সূচনা স্বদেশী আন্দোলন থেকে, এর পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক মধুর ছিলো।[৭৬] এই ধারণা ইতিহাসের স্বপক্ষে নয়। বর্তমান শতকের সূচনায় ফরিদপুর ও যশোরে মুসলমান চাষী এবং নমশূদ্রে-দের মধ্যে এক দীর্ঘকালীন দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। মোগল শাসনের শেষভাগে গুজরাট ও কাশ্মীরে দুটি দাঙ্গা বাধে। 'সিয়ারুল মোতা আখেরীন' গ্রন্থ থেকে জনাব ওদুদ দাঙ্গার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন (বঙ্গানুবাদ তাঁরই) :

> সম্রাট ফরোখশিয়রের সিংহাসনা-রোহণের বৎসরে আহমদাবাদে এক হিন্দু গৃহস্থ হোলির সময়ে তার বাড়ীর উঠানে হোলি জ্বালালে। তখন হোলির সময়ে বিষম মাতামাতি হতো। আঙিনা-সংলগ্ন ও আঙিনার অতি অল্প অংশের অধিকারী মুসল-মান গৃহস্থেরা তাতে আপত্তি করলে। হিন্দু গৃহস্থ সে-আপত্তি শুনলে না, বললে, প্রত্যেকের তার নিজের বাড়ীতে সর্বময় কর্তৃত্ব আছে। পরের দিন পড়লো হজরৎ মোহাম্মদের মৃত্যু-বার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে মুসলমান গৃহস্থেরা একটি গরু কিনে এনে সেই আঙিনায় জবাই করলে। এতে সেই অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু উৎক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করলে, মুসল-মানেরা পালিয়ে যে-যার বাড়ীতে আশ্রয় নিলে। তখন সেই উৎক্ষিপ্ত হিন্দু-জনতা গোহত্যাকারী কসাইদের সন্ধান করলে, তাকে না পেয়ে তার চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলেকে এনে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই গোহত্যার স্থানে বলি দিলে।[৭৭]

অর্থাৎ এদের বিরোধ বহুদিনের। এর জন্যে প্রথমত দায়ী ধর্মের অসহনশীলতা। তাই বিরোধের জন্যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে সর্বতোভাবে দায়ী করা চলে না। তবে আন্দোলনসমূহ বিরোধকে বহুগুণে বর্ধিত করেছে, ধর্মবিদ্বেষের সঙ্গে যুক্ত করেছে স্বার্থগত বিদ্বেষ। আর রবীন্দ্রনির্দেশিত শিক্ষাহীনতা মূল কারণ নয়। শিক্ষিত বাহিরবিশেষ দাঙ্গা যে-স্বার্থিক কারণে বাধে, এদেশে সে-কারণেই। অশিক্ষা গৌণ কারণ। তবে দাঙ্গাই একমাত্র সমস্যা সার বা সংবাদ নয়। মূল কথা হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ অবস্থায়ও এদের সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না। মধ্যযুগের হিন্দু-কবিদের রচনায় মুসলমানদের জীবন-বর্ণনা কিছু কিছু আছে। যেমন, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডী-মঙ্গলকাব্যের 'মুসলমানগণের আগমন' অধ্যায়।[৭৮] এখানে বর্ণিত জীবনধারা পাঠ করলে বোঝা যায় কবি ঘনিষ্ঠভাবে বিষয়-বস্তুকে দেখেননি। আধুনিক ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি একটি জটিল প্রশ্ন। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা পর্যবেক্ষণ এবং

৭২ক এটি বর্তমানের একটি বহু উচ্চারিত মত। এর অনেকটা মধ্যমপর্যায়ে সাহিত্য আলোচনার সময়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই মত নিয়ে অতিউচ্ছ্বসিত হবার সমীচীন কারণ সম্ভবত নেই। কেননা, হিন্দুদের দেবনির্ভর মঙ্গলকাব্য পড়লেও আনাই বাস্তব, অপরদিকে মুসলমান কবিদের মানব নির্ভর কাব্য যোজ আনাই অবাস্তব।

৭৩ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা : 'পরিচয়' রবীন্দ্র রচনাবলী (১৮); ৪২৯।

৭৪ আত্মপরিচয় : ঐ; ৪৫৫—'৫৬।

৭৫ রাশিয়ার চিঠি : রবীন্দ্র রচনাবলী (২০), ১৯৬১; ২৯০।

৭৬ কাজী আবদুল ওদুদ : 'শাশ্বত বঙ্গ' ১৩৫৮; ১৬০।

৭৭ ঐ ঐ ১৩৫৮; ১৬০—'৬৪।

৭৮ কবি কঙ্কন চণ্ডী (প্রথম ভাগ)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮; ৩৪৩।

বিশ্লেষণ-দৃষ্টি মূলত সামাজিক, গৌণত রাজনৈতিক। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি এই সমস্যার কারণগুলো দেখেছেন, রাজনৈতিক কোণ থেকে যে দেখেননি এমন নয়, তবে রাজনৈতিক প্রশ্নটি তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠেনি। তিনি চেয়েছিলেন, উভয়ের সামাজিক সৌহার্দ্য। পরস্পরের মধ্যে মানবিক যোগাযোগ। যে-সম্পর্ক যান্ত্রিক, তাকে তিনি কদাচ মূল্য দেননি। হিন্দু-মুসলমানের বেলাতেও তাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমস্ত ভেদাভেদ তুচ্ছকারী একটি জৈবিক সম্পর্ক তাঁর কাম্য ছিলো। উভয়ের সম্পর্ক-তিক্ততার যে-কটি কারণ তিনি দেখিয়েছেন, সেগুলো মোটামুটিভাবে :

ক। সরকারী ভেদনীতি,
খ। অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও অন্যান্য বৈষম্য,
গ। ধর্মের উগ্রতা ও আচারসর্বস্বতা,
ঘ। রাজনৈতিক আন্দোলন।

হিন্দু - মুসলমানের সম্পর্কবিপর্যয় প্রদর্শক, উনবিংশ শতকের রচিত তাঁর প্রবন্ধ পেয়েছি আমরা তিনটি—'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৩০০), 'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৩০০), 'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১)। উনবিংশ শতকে তিনি বিরোধের মূলে দেখেছেন সরকারকে। সরকারই বিভেদ বাড়িয়ে তুলেছে। সরকারের নীতি 'ডিভাইড য়্যাণ্ড রুল'। তিনি এমনও বলেছেন যে, সরকার যেন মুসলমানদের অনেকটা সহায়তা করছে, হিন্দুদের দমন করতে চাচ্ছে। সরকারী নীতিটি তিনি যথার্থ ধরেছেন। ১৮৭০ থেকে সরকার মুসলমানের আনুকূল্য শুরু করেন। অবশ্য এই আনুকূল্য কথা-বার্তা, বক্তৃতাতেই বেশীর ভাগ সীমাবদ্ধ থাকতো। এই মৌখিক পক্ষপাত বঙ্গ-ভঙ্গের পরে চরম আকার পরিগ্রহ করে ব্যামফিল্ড ফুলারের উৎকট মন্তব্যে, 'হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর দুই স্ত্রীর মতো : এর মধ্যে মুসলমানই প্রিয়তর'।৭৯

রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতকে বিরোধের মূলে দেখেছেন বিদেশী সরকারকে। ১৯০৭ সালে তিনি বিরোধের কারণসমূহ দেখতে চাইলেন আরো নিপুণভাবে, গভীর দৃষ্টিতে এবং বিরোধের বীজ আবিষ্কার করলেন নিজেদের মধ্যে। দেখলেন 'পাপে'র বসবাস নিজেদেরই মধ্যে, তাই সরকারকে দোষী করে লাভ নেই, ধিক্কার দিলেন নিজেদের অন্তর্গত পাপকে। স্বীকার করেছেন, এরা কেবল স্বতন্ত্র নয়, বিরুদ্ধ। উভয়ের বিরোধের কারণস্বরূপ অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য অসাম্য দেখিয়েছেন। সামাজিক সৌহার্দ্য যে সংস্থাপিত হয়নি, এর জন্য বারংবার তিনি হিন্দুকেই দায়ী করেছেন। মিলনের জন্য সমস্ত অসাম্য বিদূরণের তীব্র বাসনা তিনি পোষণ করেছেন। এখানে দেখা যাবে, মিলনার্থে তাঁর মধ্যে মানবিক উৎকণ্ঠা প্রবল। তাই বারংবার বঙ্গভঙ্গকালীন হিন্দুর আহ্বানের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। হিন্দুর ত্রুটি প্রদর্শনে তিনি অস্বাভাবিক নির্মম, মুসলমানের ত্রুটি বিশেষ তিনি দেখাননি। ১৯১১ সালে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধের তীব্রতা লাভের কারণ ব্যাখ্যা করেন। 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, হিন্দু যেদিন হিন্দুত্বের গৌরব গাথা শুরু করলো, মুসলমানও সেদিন মুসলমানিত্বের গর্ব বোধ করতে লাগলো। মুসলমানের আত্মোন্নতি চেষ্টাকে তিনি মিলনের সিঁড়ি জ্ঞান করেছেন। বলেছেন :

> মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।৮০

১৯১১ সালে তিনি মুসলমানের আত্মশক্তিসাধনাকে অভিনন্দিত করেন। ১৯৪২ সালের ১১ এপ্রিলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নের প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন :

> পাঁচশ' বছর ধরে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন স্থাপন করবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার পর এবং এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, মুসলমানরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, ব্রিটিশ সরকারের খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দুটি প্রধান জাতিকে এক অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র গঠন করতে বাধ্য করা তাদের পারস্পরিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নহে।...মুসলিম লীগের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ভারত বিভক্ত করে স্বতন্ত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।৮১

জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী মুসলিম লীগের এই প্রস্তাব এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে একার্থবোধক মনে করেন।৮২ আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। কেননা, তিনি মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্র কল্পনা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন একই মঙ্গলমূলক রাষ্ট্রে সুখে, শান্তিতে, গাঢ় বন্ধনে উভয়ের বসবাস। ১৯৩৫ সালে ২৭শে মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছেন, হিন্দু-মুসলমান যদি না মেলে তবে 'ভারতে স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসীতে জল-ভরা।'৮৩ ১৯১৪ সালে দেখালেন, সামাজিক মিলন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রনৈতিক মিলন অসম্ভব। ১৯১৭ সালে বিরোধের জন্যে মূলত দায়ী করলেন ধর্মকে। ধর্ম উভয়ের মধ্যবর্তী মিলনবিরোধী রূঢ় দেওয়াল, এবোধ দৃঢ় হলো ১৯১৭তে এবং পরবর্তী সমগ্র জীবন বিরোধের জন্য ধর্মকে নিন্দা করলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর কাম্য ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। গান্ধীজীর সঙ্গে এখানে তাঁর অমিল। গান্ধীজী বুঝেছিলেন, মানুষ যদি স্বধর্মনিষ্ঠ হয় তবে মিলন সম্ভব হবে। তিনি ভুল বুঝেছিলেন এবং জনসাধারণ তাঁকে আরো ভুল বুঝেছিলো। এজন্যে ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ততার জন্যে সমালোচক তাঁকে দায়ী করেছেন।৮৪

ধর্মকে যে তিনি এতো বেশী দায়ী করলেন, তার কারণ বোঝা দরকার। কারণ বুঝতে পারলেই বুঝবো উভয় সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর কি প্রত্যাশা ছিলো। রাষ্ট্র-চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবিমুখ, কল্যাণ ও প্রেমধর্মী সমাজমুখী। যে সমাজে রয়েছে গতি-স্থিতি, যার অধিবাসীরা সামাজিক বন্ধনে যুক্ত, পরস্পরের স্বার্থবন্ধনে নয়, হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ, সে-সমাজ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সমাজ। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে মিলনতীর্থ, এখানে সবার মিলন ঘটবে, এই ছিলো তাঁর কামনা। কিন্তু ধর্ম তা হতে দেয় নি। এ-কারণেই ধর্মকে নিন্দিত, দায়ী করলেন সর্বাধিক, কেননা তা সামাজিক মিলনের পরিপন্থী। যে-মিলন সামাজিক এবং হৃদয়ধর্মবশত নয়, তাতে তিনি আস্থাহীন। তিনি বুঝেছিলেন, সমাজে যদি উভয়ের মিলন সংসাধিত হয়, তবে সাধিত হবে রাষ্ট্রেও। সমস্যার সমাধান হিসেবে তিনি শিক্ষা, সর্ববিষয়ে উভয়ের কাম্য এবং সামাজিক দেয়া-নেয়াকে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সমস্যাকে যুগপরিবর্তনের হাতে ছেড়ে দেন ১৯২২-এ। তিনি বোধ করেছেন, বিংশ শতকেও আমরা মধ্যযুগের অন্ধতায় ভুগছি, তাই আধুনিক যুগের আলো চেয়েছেন।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটিকে রাষ্ট্র-নৈতিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দেখেন নি। তিনি উভয়ের সামাজিক বিরোধের কারণগুলো অভিনিবেশসহকারে পাঠ করেছিলেন এবং মিলনের পথ সন্ধান করেছিলেন নিশীথের পথযাত্রীদের মতো।

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা : (কার্তিক-পৌষ) সৌজন্যে।

৭৯ ডক্টর আনিসুজ্জামান : 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য,' অক্টোবর, ১৯৬৪; ১৬—১৭।

৮০ হিন্দু বিদ্যালয় : 'পরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী (১৮), ১৩৬১; ৪৭৬।

৮১ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ : মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক', 'সমকাল', বৈশাখ, ১৩৬৮, ৬৫৯।

৮২ ঐ ঐ; ৬৫৯।

৮৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক' (৪র্থ খণ্ড), ১৩৬৩; ৭।

৮৪ কাজী আবদুল ওদুদ : 'শাশ্বত বঙ্গ', ১৩৫৮; ১৯৬।

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে তাঁকে প্রায়ই দেখতে পেতুম। আমার তো ধারণা ছিল তিনিও আমার আর-একটি কাকা। চার পাঁচ বছর বয়সে তোলা আমার যে দুটি ফোটোতে তাঁকে দেখেছি তার একটিতে তিনি আমাকে কোলে নিয়ে বসেছেন, অন্যটিতে কাকাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন। পরনে ধুতী চাদর, পিরান বা কোট। মুখে দাড়ি নেই, গোঁফ আছে।

হ্যাঁ, তিনিই আমাদের স্কুলের পাঠান-মাস্টার। মুসলমান কথাটা তত বেশী শোনা যেত না। হিন্দু কথাটাও না। শোনা যেত ওড়িয়া বাঙালী হিন্দুস্থানী পাঠান এইসব শব্দ। মাস্টার যদি পাঠান না হয়ে মুসলমান হতেন তা হলে সেকথা আমার মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনত। আমি যে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেছি তার কারণ তিনি ছিলেন পাঠান। পাঠান তুর্ক মোগল, ইংরেজ এসব শব্দ সাম্প্রদায়িক নয়।

আসলে তিনি বাঙালী মুসলমান। অন্যান্য বাঙালীদের মতো তাঁর কথাবার্তা চালচলন। বংশপদবী খোন্দকার। নাম কী তা ছেলেবেলায় শুনিনি, পরে শুনেছি, মনে রাখিনি। পাঠান কাকা আমাদের কাছাকাছি আরেকটি বাড়ীতে বাস করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে যেতুম। মাস্টারনী খেতে দিতেন সিদ্ধ ডিম। হাঁ, মুরগীর ডিম। সেটা আমাদের বাড়ীতে বারণ। তাঁদের বাড়ীতে নয়। বোঝা গেল এইখানেই অমিল। নয়তো আর সব বিষয়ে মিল। আমাদের বাড়ীতে মাস্টারনীকে আসতে দেখিনি। তিনি ছিলেন উর্দুভাষিণী। এখানেও আবার অমিল।

পরে একদিন শোনা গেল মাস্টারনী ইলোপ করেছেন। যার সঙ্গে সে একটি ওড়িয়া হিন্দু ছাত্র। তখনো বোঝবার বয়স হয়নি যে ধর্মের অমিল ভাষার অমিল থাকলেও মনের মিল হতে পারে। হতে পারে দেহের মিল। সেখানে আবার মিল। মাস্টার সাহেব মুখ দেখাতে না পেরে স্থানত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন খুলনা জেলার লোক। আর সেখানকার কথা বলছি সেটা হলো ওড়িশার একটি দেশীয় রাজ্যের রাজধানী।

এর বছর-কয় বাদে একবার ঠাকুমা নিয়ে যান তাঁর দাদার বাড়ীতে। সেখানে দেখি ইউরোপীয় পোশাক পরা এক নবীন ডাক্তার আত্মীয়কে। চমৎকার চেহারা। পরে শুনি তিনি শহরের মাঝখানে ধরা পড়েছেন এক বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে। সঙ্গে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলিম মহিলা। হাঁ, আবার ইলোপমেন্ট। এবারেও নায়ক হিন্দু, নায়িকা মুসলমান। এক্ষেত্রে আবার মিল। প্রেমের শ্রীক্ষেত্রে।

আমাদের বাড়ীর পেছনে একঘর মুসলমান থাকতেন। তাঁরা উর্দুভাষী। হিন্দুদের পাড়ায় মুসলমানের বাস আমাদের চোখে কখনো বিসদৃশ বোধ হয়নি। কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে তাঁরা অন্য ধর্মের লোক বলে আমাদের কেউ নন বা আমাদের দুশমন। তাঁদের ধর্ম নিয়ে তাঁরা থাকতেন, আমাদের ধর্ম নিয়ে আমরা। সমাজও যার যার তার তার। বাদবাকী বিষয়ে কে হিন্দু ও কে মুসলিম এ গণনা ছিল না। খেলার মাঠে তো নয়ই। খেলোয়াড়দের মধ্যে মুসলমান দেখেছি, তাঁরাও সমান প্রিয়, কখনো কখনো আরো প্রিয়। স্কুলে আমার সহপাঠীদের মধ্যে মুসলমান যারা ছিল তাদের সঙ্গেও আমার ভাব ছিল। কলেজেও তাই। শেষের দিকে আমি মুসলিম হস্টেলেই থাকতুম। সেটা পাটনায়। আমার উপর কে জানে কেন তাদের একটা অহেতুক টান ছিল।

অবিভক্ত বঙ্গের নানান জেলায় কর্ম উপলক্ষে বাস করেছি। গ্রাম্য চৌকিদার থেকে আরম্ভ করে গভর্ণরের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলার ও মিনিস্টারদের সঙ্গেও মিশেছি। কোনো স্বতন্ত্রই হিন্দু মুসলিম ভেদ মানিনি। তাঁরাও যে মানতেন তা নয়। হাওয়া বদলাতে শুরু করে ১৯৩৭ সালের পর থেকে। একদিনে নয় একটু একটু করে। ঠিক দশটি বছর পরে বঙ্গ-বিভাগ ও ভারত বিভাগ। ঘটনাটা রাতারাতি ঘটলেও তার মানসিক প্রস্তুতি চলেছিল দশ বছর ধরে। না, তারও বেশী। তবে আমার নিজের জীবনে তার ছায়া পড়েনি। পড়লেও আমি চোখ বুজে রয়েছি।

পার্টিশনের আগে আমি যখন ময়মনসিংহের জেলা জজ তখন আমার কোর্টে একদিন শেরে বঙ্গাল ফজলুল হক সাহেবের পদার্পণ ঘটে। এবার নায়ক মুসলমান, নায়িকা হিন্দু। ততদিনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে। হক সাহেব তখন তাঁর নিজের সম্প্রদায়েই অপ্রিয়। তাঁর মুখ্যমন্ত্রী পদ ঘুচে গেছে। না, তখনকার দিনে বলা হতো প্রধানমন্ত্রী। সেই জাঁকালো চেহারার ঐতিহাসিক পুরুষটি আদালতকে সম্বোধন করে কারুণ্যভরা কণ্ঠে নিবেদন করেন, 'ওকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হোক। আফটার অল হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলিমস উইল হ্যাভ টু লিভ টুগেদার।' যে যাই বলুক, হিন্দুদের আর মুসলমানদের একসঙ্গে থাকতে হবেই।

এর অনুরূপ উক্তি আমি ইউরোপীয়দের মুখেও শুনেছি। পার্টিশনের প্রাক্মুহূর্তে কায়দে আজম জিন্না সাহেবও তো এই কথাই শুনিয়েছিলেন। উজীরে আজম লিয়াকৎ আলী খান সাহেবেরও মনের কথা ছিল তাই। হিন্দু মুসলমান যাতে একসঙ্গে থাকতে পারে তার জন্যে কে না চেষ্টা করেছেন! কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এই সেদিন পূর্ববঙ্গ থেকে এক কোটি শরণার্থী ছুটে এল। তাদের অধিকাংশই হিন্দু। যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে যাবার পর আবার সবাই যে যার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। যুদ্ধ না বাধলে, পাকিস্তান না হারলে তারা ফিরত না। পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ সারা হলেও পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ এখনো অসমাপ্ত। একভাবে না একভাবে তারও সমাপ্তি ঘটবে। তার পরে হয়তো দেখা যাবে যে পার্টিশনের সময় পালিয়ে আসা পাঞ্জাবী ও সিন্ধীরাও যথাস্থানে ফিরে যাচ্ছে। বাস্তু অমনি করেই শেষ হবে। আফটার অল, হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলিমস উইল হ্যাভ টু লিভ টুগেদার।

রাষ্ট্র একটা না হয়ে দুটো হতে পারে, দুটো না হয়ে তিনটে হতে পারে, কিন্তু জনগণ দু-ভাগ বা তিন ভাগ হয়ে বাঁচতে পারে না। একসঙ্গে যারা থাকে তাদের কারো কারো ঘরও ভাঙে, মুখও পোড়ে। যেমন আমাদের পাঠানমাস্টারের। কিংবা হক সাহেব যে মামলাটিতে সওয়াল করেছিলেন তার নায়িকার স্বামী এক গো-বেচারা ব্রাহ্মণের। অতীতেও এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে, ভবিষ্যতেও যে ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে! তা সত্বেও একসঙ্গে থাকতে হবে ও রাষ্ট্রের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সে বিশ্বাস ইংরেজদের আইন আদালতের উপর ছিল। পরবর্তী আমলের আইন আদালতের উপর ছিল না, থাকলে এত লোক পালিয়ে আসত না। পালিয়ে কেবল আসেনি, গেছেও। হাঁ, এটাও একটা তথ্য। যেখানে নারীর উপর অত্যাচার হয়নি সেখানে লুটপাট ঘর জ্বালানী হয়েছে, খুনখারাপি হয়েছে।

এখন এই লজ্জাকর অধ্যায়ের উপর যবনিকা পড়লেই বাঁচি। যারা পালিয়ে গেছে তারাও ফিরে আসুক। আবার সেইখান থেকে শুরু করুক যেখান থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। মাঝখানকার চব্বিশটা বছর যেন একটা নির্বাসন। প্রাক্তন প্রতিবেশীদের কেউ কেউ পরস্ব অপহরণ করে লাভবান হয়েছে, কিন্তু সকলে কিছু লাভবান হয়নি। অনেকেই বরণ্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। ভারতবর্ষ হয়তো আর অখন্ড হবে না, বাংলাও হয়তো আর অখন্ডতা ফিরে পাবে না, কিন্তু অবিভক্ত ভারতের তথা বাংলার লোকসমষ্টি আবার সুখে দুঃখে যেমনাকে তেমন হতে পারে। তফাতের মধ্যে এই হবে যে কেউ কাউকে শোষণ করবে না। ইতিমধ্যে ওরা শিখেছে যে হিন্দুও হিন্দুকে শোষণ করতে পারে, মুসলমানও মুসলমানকে। তাই যদি না হতো তবে বাংলাদেশের মুসলমানরা পাঞ্জাবী বা পশ্চিমা স্বধর্মীদের কবল থেকে মুক্তির জন্যে অপরিমেয় রক্তমূল্য দিত কেন? আর এপারেই বা বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিত কেন?

হিন্দুতে মুসলমানে অমিল ছিল বইকি, কিন্তু মিলও ছিল। যতদিন পর্যন্ত তারা মিল সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন ছিল ততদিন মুসলমান পক্ষ থেকে ভারত বিভাগের দাবী ওঠেনি, হিন্দুপক্ষ থেকে পাঞ্জাব বিভাগের বাংলা বিভাগের দাবী ওঠেনি। এসব দাবী যারা তুলেছে তারাও ভেবে দেখেনি যে তার পরিণাম হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশত্যাগ। দেশত্যাগ যখন কোটির পর্যায়ে উঠবে তখন তার পরিণাম হবে যুদ্ধবিগ্রহ। এই হলো ঐতিহাসিক নিয়তি, কেউ একে খন্ডাতে পারে না। আমরা এই প্রবল স্রোতের মুখে বাঁধ দিতে চেষ্টা করেছি। আমরা ব্যর্থ হয়েছি। যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখা গেল, কিন্তু নিবারণ করা গেল না। যেটা ঘটবার সেটা ঘটবেই। এরই নাম বুঝি হিস্টোরিকাল ডিটারমিনিজম।

হিন্দু মুসলমান যদিন মিল সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন ছিল ততদিন দেশ বিভাগ প্রদেশ বিভাগ চায়নি। অমিল সম্বন্ধে যখন অধিকতর সচেতন হলো তখনি চাইল। তার ফল শেষপর্যন্ত যা হলো তা যুদ্ধবিগ্রহ। সেইভাবে যুদ্ধ সমাপ্ত হলো। এখন আবার যে যার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে। মিল সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হবে। অমিলটাকেই বড়ো করে দেখবে না। একবার যদি একসঙ্গে বাস করার সিদ্ধান্ত নেয় তো হলে সেইটেই শান্তি ও শৃঙ্খলার সবচেয়ে জোরালো নিশ্চয়তা। হিন্দু রাখবে, মুসলমানকে, মুসলমান রাখবে হিন্দুকে। কোথাও হিন্দুরা হয়তো সংখ্যাগুরু, কোথাও মুসলমানরা হয়তো সংখ্যাগুরু। অমন তো আগেও ছিল। কিন্তু কেউ কোনোদিন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি তো। প্রতিবেশীর উপর আস্থা হারিয়ে না ফেললে পালাত না। রাষ্ট্রের উপর আস্থা থাকলেও পালাত না। এখন আস্থা ফিরিয়ে আনার পালা।

পার্টিশনের দশ বিশ বছর আগে থেকে যেমন হিন্দু-মুসলমান তাদের অমিল সম্বন্ধে আরো বেশী সচেতন হয় ও শেষকালে দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগের ধুয়ো ধরে তারই রকমফের দেখা গেল পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায়। যার নাম এখন বাংলাদেশ। মুসলমানদের মধ্যে যারা বাঙালী ও যারা তা নয় তাদের মধ্যেই এল ভাষাভিত্তিক জাতি-চেতনা। এটাও একপ্রকার দ্বিজাতিতত্ত্ব। সবাইকার উপর উর্দু চাপিয়ে মুসলিম লীগ পন্থীরা চেয়েছিলেন এটাকে ধামা-চাপা দিতে। কিন্তু ঘটল ঠিক তার বিপরীত। ভাষার জন্যে ছেলেরা প্রাণ দিল। তার পর থেকে এত স্পর্শকাতর হয়েছে যে বাংলাভাষায় একটিও আরবী ফারসী শব্দ রাখবে না। এপারের আমরাও ওদের চেয়ে বেশী আরবী ফারসী ব্যবহার করি। ওরা যেন প্রমাণ করতে চায় যে পশ্চিমাদের সঙ্গে ওদের কোথাও কিছু মিল নেই, ধর্ম বাদে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ওরা সেকুলার হয়ে গেছে। অর্থাৎ ধর্ম ওদের কাছে ব্যক্তিগত ব্যাপার; সমষ্টিগত ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নয়। এত বড়ো একটা পরিবর্তন মাত্র চব্বিশ বছরের মধ্যে ঘটেছে। এটা যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। এটা ওরা অন্তর থেকেই পেয়েছে। অনুকরণ থেকে নয়।

এমনি করে এক রাষ্ট্র থেকে দুই রাষ্ট্র হলো, দুই রাষ্ট্র থেকে তিন রাষ্ট্র। এক দুই তিন। তিন পরে একদিন মিলে মিশে এক হবে কিনা ইতিহাস জানে। হতে পারে এটা যেমন অসম্ভব নয়, হবেই এটা তেমন অবধারিত নয়। সবকিছু নির্ভর করছে আমাদের অন্যনিরপেক্ষ ব্যবহারের উপরে। আমরা যদি অমিলটাকেই বড়ো করতেই থাকি তো তিন থেকে একে উপনীত হওয়া সুদূরপরাহত।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ বহু তপস্যার পরে স্বাধীন হয়েছে, সে তার স্বাধীনতা নিছক একত্বের খাতিরে বিসর্জন দেবে না। পাকিস্তানের কাছেও না, ভারতের কাছেও না। বাংলাদেশ থাকতে এসেছে। থাকবেই। ভারতকেও সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, সে যেন বাংলাদেশের উপর ভুলেও চাপ না দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদেরও সতর্ক থাকতে হবে। তারাও যেন তেমন কোনো প্রত্যাশা না করে। বাংলাদেশ স্বাধীন। যে স্বাধীন সে ভালোর জন্যেও স্বাধীন, মন্দের জন্যেও স্বাধীন। ইচ্ছা করলে সে মন্দও করতে পারে। যদি করে তবে পাল্টা দেবার স্বপ্ন যেন কেউ না দেখে। কোনো অবস্থাতেই আমরা পাল্টা দেব না। তেমন কথা মুখেও আনব না, মনেও না। ইচ্ছা করে কেউ মন্দ করে না; বাংলাদেশও করবে না। বিশেষত ভারতের মন্দ। তবে এটাও মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বামদিকে যাবে, আমাদের চাইতেও বেশী। পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারলে সম্পর্কটা মধুর থাকবে না। একদিন মুসলমান বলে যাদের উপর চটেছি আরেকদিন সাম্যবাদী বলে তাদের ছেলেদের উপর চটব। তা বলে সংযম হারাব না। সহ-অবস্থানের জন্যে প্রস্তুত থাকব।

বলাই বাহুল্য যে পাকিস্তানও থাকতে এসেছে। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও বাকী স্থান থাকবে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি অটোনমির ভিত্তিতে তার পুনর্বিন্যাস হবে। সে তার আপনাকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে ভারতকে জ্বালাতন করবার সময় পাবে না। বাংলাদেশকে তো নয়ই। বাধ্য হয়ে মিটমাট করবে। তবে তার রাগ পড়তে আরো অনেকদিন লাগবে। আর তার প্যান-ইসলামিক মোহভঙ্গ হবে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল শৃঙ্খলের সে অঙ্গ। এর থেকে সে যে শক্তি পায় তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ থেকে পায় না। পেলে পৃথক হয়ে যেত না। যেদিন আর পাবে না সেদিন ভারতের দিকে হাত বাড়াবে। আমাদের চোখে পাকিস্তান ভারতীয় ইতিহাসের একটি ফসল। পাকিস্তানীদের কাছে ইসলামের ইতিহাসের। ইতিহাস যখন ওরা পড়ে তখন ইসলামের আদিপর্ব থেকেই শুরু করে।

ভারতের জাতীয়তাবাদ দেশভিত্তিক। পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদ ধর্মভিত্তিক। আর বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক। এই যে তিনপ্রকার জাতীয়তাবাদ এর বীজ গত শতাব্দীতে ইউরোপ থেকে আসে। আমার ছেলেবেলায় আমি তিনটিরই প্রভাব দেখেছি। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা হিন্দু, মুসলিম শিখ, খৃষ্টান পার্শী, নির্বিশেষে সব ভারতীয়কেই আহ্বান জানিয়েছিলেন, কংগ্রেস ছিল সকলের মিলন-ক্ষেত্র। কথা ছিল কংগ্রেস হবে ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকারের বেসরকারী সমালোচক-মণ্ডলী। সংবিধানসিদ্ধ প্রথায় শাসন সংস্কার চাইবে। কিন্তু মণ্ডলী ক্রমে ক্রমে আকারে ও সংখ্যায় লোকসভায় পরিণত হয়। কংগ্রেস সভাপতি হয়ে ওঠেন বড়লাটের বেসরকারী প্রতিনায়ক। তখন শাসকদের টনক নড়ে। তাহলে কি কংগ্রেসই ব্রিটিশ সরকারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়ে এত বড়ো দেশ একাই শাসন করবে? তার হাতে ব্রিটিশ স্বার্থের কী দশা হবে?

এই চিন্তা থেকেই বঙ্গভঙ্গ, এর থেকেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসকে ব্রিটিশ সরকারের একমাত্র প্রতিপক্ষ হতে না দেওয়ার জন্যে মুসলিম সম্প্রদায়কে তার প্রতিপক্ষ রূপে খাড়া করা হয় বা খাড়া হতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তার আগে তৎকালীন বেঙ্গলকে দুভাগ করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি মুসলিমপ্রধান প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের প্রতিযোগী বলে গণ্য করা হয়। কংগ্রেস যখনি যা চাইবে লীগ তখনি তার পাল্টা চাইবে। কর্তারা যা দেবার তা দুভাগ করে দেবেন। লীগকে অংশ না দিলে কংগ্রেস তার পাওনা পাবে না। আর লীগকে তার অংশ দিলে কংগ্রেস আর বলতে পারবে না যে সেই ভারতীয়দের সকলের একমাত্র প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান।

পরিস্থিতি জটিল তাতে সন্দেহ নেই। তাকে জটিলতর করেন কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে কর্মরত চরমপন্থী নেতারা। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের স্বাধীনতা অস্ত যায় পলাশীতে নয়, তার অনেক আগে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ে। হিন্দু ভারতটাই ছিল তাদের মতে স্বাধীন ভারত। সুতরাং কেবল-মাত্র ইংরেজ শাসনের অবসান নয়, হিন্দু ভারতের পুনরুজ্জীবন ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এঁরা যদি হিন্দু ভারত ফিরিয়ে আনতেন তাহলে সেখানে মুসলমানদের স্থান হতো কী করে? তাদের স্বার্থ রক্ষা করত কে?

ইংরেজ চলে গেলে যদি মুসলমানকেও চলে যেতে হয় তবে মুসলমান তো ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে যাবে না, ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে চাইবে।

ইংরেজের বেলা যাঁরা চরমপন্থী মুসলমানের বেলা তাঁরা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী। আর ইংরেজের বেলা যাঁরা নরমপন্থী মুসলমানের বেলা তাঁরা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাসী। হিন্দু বা মুসলিম কোনো আমলেই গণতন্ত্র ছিল না। সেটা যদি মূল্যবান হয়ে থাকে তবে ইংরেজের কাছ থেকেই শিক্ষা করতে হবে, ইংলন্ডের ইতিহাস থেকে। ইংরেজ শাসনের অবসানে যখন কংগ্রেস শাসনের সূত্রপাত হবে তখন সেটাও হবে ইংলন্ডের মতো গণতান্ত্রিক শাসন। পৃথ্বীরাজের মতো স্বৈরাচারী শাসন নয়।

নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের ছাড়াছাড়ি ঘটে যায়। কংগ্রেস পরিচালনা করেন নরমপন্থীরা। তাই তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন ঝীণা। ইংরেজী কেতায় জিনা। দেশী উচ্চারণে জিন্না। ভুল আরবীতে জিন্নাহ্। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেকুলার সংজ্ঞায় তাঁর সমর্থন ছিল। তিনিও ছিলেন একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী। তবে তিনি সেইসঙ্গে মুসলিম লীগের সদস্যও ছিলেন। কারণ তাঁর মতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিশেষ স্বার্থ ছিল যার জন্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান না হলে চলে না। যেমন চাকরিবাকরিতে সংখ্যানুপাতিক ভাগ, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলিতে যথোপযুক্ত সংখ্যায় আসন। কংগ্রেস তো কোনো একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করবে না, তবে সে কাজ করতে উদ্যোগী হবে কে? মুসলিম লীগ, আর কে?

তা বলে ঝীণা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। হয়ে দাঁড়ান কালক্রমে। প্রায় চল্লিশ বছর রাজনীতিতে অংশ নিয়ে। তাঁর এই মোড় একদিনে সম্ভব হয়নি। তাঁর আগে যাঁরা মুসলিম সম্প্রদায়ের কংগ্রেসবহির্ভূত নেতা ছিলেন তাঁরা ছিলেন ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী নরমপন্থী অথবা তার বিরুদ্ধবাদী চরমপন্থী। নরমপন্থীরা মুসলিম লীগের নেতা। চরমপন্থীরা মোল্লা মৌলবী মৌলানাদের নেতা। নরমপন্থীরা মোগল আমল ফিরিয়ে আনতে চান না। গণতন্ত্রে যথোপযুক্ত স্থান পেলেই খুশি। চরমপন্থীরা চান শরিয়তী শাসনের প্রত্যাবর্তন। ইসলামের পুনরুজ্জীবন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণ নয়, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের অনুরূপ মুসলিম রাষ্ট্র। সারা ভারতে কী করে সেটা বাস্তব রূপ নিতে পারে, এই ছিল তাঁদের সমস্যা। পরবর্তীকালে তাঁরা তাঁদের সমস্যার সমাধান পেয়ে যান। পাকিস্থান সেই বাস্তব রূপ। সারা ভারতে নয়, ভারতের দুই প্রান্তে। একভাগ উত্তর-পশ্চিমে, অপরভাগ উত্তর-পূর্বে। কাশ্মীর তো তাঁদের দাবীর তালিকায় ছিলই, আসামও ছিল। ইতিহাস তাঁদের মনস্কামনা বহুলাংশে পূরণ করে। অথচ হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বেলা করে না।

ইংরেজরা শেষপর্যন্ত দুটি উত্তরাধিকারীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। কংগ্রেসের হাতে দেশভিত্তিক ভারত। লীগের হাতে ধর্মভিত্তিক পাকিস্থান। লীগ ততোদিন মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের দল হয়ে তার ভারতীয়ত্ব বিসর্জন দিয়েছিল। অনায়াসেই দিল্লী আগ্রার উপর দাবী ছেড়ে দিয়ে করাচীতে প্রস্থান করল। তখন থেকে সে আর নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নয়। নিখিল পাকিস্থানী প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস কিন্তু নিখিল ভারতীয় থেকে যায়। যদিও তার এলাকা আগের মতো ব্যাপক নয়।

দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বহুপরিমাণে সফল হলো। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদও হিন্দুদের বেলা না হোক মুসলমানদের বেলা বহু পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করল। কিন্তু আমার ছেলেবেলায় যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দেখেছিলুম তার ফলশ্রুতি কী হলো? সে কি তাহলে বঙ্গবিভাগ দূর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হলো?

লর্ড কার্জনের কার্যের প্রতিবাদে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। বাঙালী বলে একটি জাতি হঠাৎ আপনাকে আবিষ্কার করে ও আপনার প্রকাশ চায়। স্বদেশী আন্দোলন কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকে না। ভাষায় সাহিত্যে চিত্রকলায় সংগীতে শিল্পকর্মে শিক্ষাদীক্ষায় সঞ্চারিত হয়। ধর্মও তাতে একটা বৃহৎ অংশ নেয়। ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা না পেলে তরুণেরা হাসিমুখে ফাঁসী বরণ করত না। কিন্তু ধর্ম সেক্ষেত্রে ইসলাম নয়। ইসলাম থেকে প্রেরণা পেয়ে কেউ ফাঁসীও যায়নি, গুলীর সামনেও দাঁড়ায়নি। সেই আন্দোলনে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল. কিন্তু মুসলমানদের অধিকাংশকেই ভোলানো হয়েছিল এই বলে যে পূর্ববঙ্গ ও আসামে তারাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের স্বার্থেই তো বঙ্গভঙ্গ হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে তারাই তো হবে সংখ্যালঘু। তাই মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়।

অবশেষে এমন একটা সূত্র পাওয়া যায় যাতে বঙ্গভঙ্গ রদও হয়, মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠও হয়। বিহার ওড়িশা মিলে আলাদা প্রদেশ হয়। আসামও আলাদা হয়ে যায়। অবশিষ্ট যা থাকে তাকেই বলা হয় বঙ্গ। তাতে হিন্দুরা বনে যায় সংখ্যালঘু। সিংহভূম মানভূম যদি তার সামিল হতো তাহলে হিন্দু মুসলমান সমসংখ্যক হতো। তবে হিন্দু মেজরিটি আর কিছুতেই হবার নয়। বাঙালী হিন্দুরা সেই প্রথম অনুভব করে যে বঙ্গ আর পূর্বেকার বঙ্গ নয়, তারাই সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নয়। অবশ্য তাদের সংখ্যাগুরুত্বও অনন্যনিরপেক্ষ ছিল

না। ছিল বিহারী ওড়িয়া হিন্দুদের কল্যাণে।

বঙ্গদেশের পুনর্বিন্যাসের কিছুকাল পরে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের যে চুক্তি হয় ঝীণা সাহেব ছিলেন তাতে বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী। প্রধানত তাঁরই মধ্যস্থতায় স্থির হয়ে যায় যে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানরা তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী আসন পাবে প্রাদেশিক আইন-সভায়। তেমনি মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে হিন্দুরা ও শিখরা পাবে তাদের প্রাপ্যের অধিক আসন। এর ফলে পুনর্বিন্যস্ত বঙ্গে হিন্দুদের আসনসংখ্যা প্রাপ্যের অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুরা ভুলে যায় যে তারা মাইনরিটি। বাংলার মুসলমানরা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের মুখ চেয়ে নিজেদের স্বার্থ কিছুটা ছেড়ে দেয়। তারাই যে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এটা কিন্তু ভোলে না। পূর্ববঙ্গে তারা যা ছিল যুক্তবঙ্গেও তারা তাই। গণতন্ত্রে এর একটা প্রতিফলন পড়বেই। চাকরিবাকরির বেলা তাদের সংখ্যানুপাত মানতে হবেই।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এর পরেও যথেষ্ট তীব্র ছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় নেতারা ঘোষণা করেছিলেন যে বাঙালীরা একটি নেশন, সেই নেশনের যে বাসভূমি তাকে দুভাগ করলে নেশনকেই দুভাগ করা হয়। নেশন কথাটি যে বাঙালীদের বেলা ব্যবহার করা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সেকালের দলিলে। বাঙালীরা অবশ্য ভারতের বাইরে যেতে চায়নি। ভারতের ভিতরে থেকেই নেশন হতে চেয়েছে। ভারতবর্ষ তাহলে কী? নেশন না মহানেশন? এসব চিন্তা অনেকদিন পর্যন্ত অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন নাম রাখেন 'মহাজাতিসদন' তখন ভারতবর্ষকে একটি মহানেশন রূপেই কল্পনা করেছিলেন। তার মানে বাংলাকে একটি নেশনরূপে। জবাহরলালও একবার বলেছিলেন ভারতবর্ষ হবে একটি মাল্টিন্যাশনাল স্টেট। কমিউনিস্টরা তো চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে চোদ্দ পনেরোটি নেশন স্টেট প্রতিষ্ঠা করতে। প্রত্যেকটি হতো ভাষাভিত্তিক।

মাউন্টব্যাটেনও একটা বিকল্প পরিকল্পনা করেছিলেন। কংগ্রেস লীগ একমত না হ'লে তিনি প্রদেশওয়ারি ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন। অবিভক্ত বঙ্গ ১৯৪৭ সালেই স্বাধীন দেশ হতো। বলাবাহুল্য সেটা হতো মুসলিমপ্রধান দেশ। ইতিমধ্যে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ কংগ্রেস লীগ চুক্তির উপর খোদকারী করে মুসলমানদের আসনসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল আর হিন্দুদের আসনসংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল। পরিবর্তিত অবস্থায় হিন্দুরা স্বাধীন বঙ্গে নিরাপদ বোধ করে না। তার চেয়ে দ্বিতীয়বার বঙ্গ বিভাগ দাবী করে। ভুলে যায় যে একদা তাদেরি মতে বাঙালীরা একটি নেশন ও বাংলাদেশকে ভাগ করলে নেশনকেও ভাগ করা হয়।

তাছাড়া ইতিমধ্যে বাঙালীদের মানসিক বিবর্তনও হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম' গাইতে গিয়ে তারা আর 'সপ্তকোটি' বলত না। বলত 'ত্রিংশকোটি'। আবার তাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যেত না। এমনকি হিন্দুদের সংখ্যাগুরু করে দিলেও। ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বাঙালী হিন্দুরা বাংলাদেশকে সমান ভালোবাসলেও তাকে ভারতের বাইরে যেতে দেবার পক্ষপাতী ছিল না। অন্যান্য প্রদেশ মিলে ভারত গঠন করতই। বাদ পড়ত শুধু বাংলার মতো কয়েকটি প্রদেশ যেখানে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন নয়। তার চেয়ে দুভাগ হয়ে যাওয়া শ্রেয়।

এতদিন বাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটাও একটি মনস্কামনার পরিপূর্তি। যদিও এর আয়তন পূর্ণাঙ্গ নয় তবু এর সত্তা খণ্ডিত নয়। এ কেবল মুসলমানদের দেশ নয়। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলেই এদেশে সম অধিকারী। বিশেষ সুবিধা কেউ দাবী করছে না, কাউকে দেওয়া হচ্ছে না। এর জাতীয় সঙ্গীত স্বদেশী যুগের প্রিয় সংগীত। স্বদেশী যুগই আবার অন্য নামে ফিরে এসেছে। স্বদেশী ভাষাকেই সবার উপরে স্থান দিচ্ছে। স্বদেশী সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কার করছে। পাকিস্থান থেকে বেরিয়ে না এলে এসব সম্ভব হতো না। মুসলিম জাতীয়তাবাদের ছায়া থেকে সরে না এলে এই চারাগাছটি বাঁচত না, বাড়ত না। এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দেশ-ভিত্তিকও বটে। এর প্রতিষ্ঠাতারা দেশানুরাগী।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই ত্রয়ীকে নিয়েই আমাদের উপমহাদেশ। এই ত্রয়ী দীর্ঘজীবী হোক। এখন থেকে আমাদের আদর্শ হবে একে তিন, তিনে এক।

মাতৃভাষার অধিকার নিয়ে যে একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন সুরু হয়, তা শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পাকিস্তানকে ফাটিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ছাড়লো—এতটা বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বাংলাভাষার জন্য আন্দোলনের মধ্যে ছিল, একথা হয়তো কেউ ভাবতে পারেনি। বস্তুত বাংলাভাষাকে উর্দুর সঙ্গে অন্যতর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েও ছিল পাকিস্থান, প্রচণ্ড চাপের মুখে। তা সত্ত্বেও এই স্বীকৃতিতেই পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক যাত্রাপথ ক্ষান্ত হয় নি। ভাষা ছাড়াও বহু বিষয় ভাষার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বহুবিধ বিষয় ইতিহাসের অন্ধকক্ষে তাদের স্বাভাবিক মুক্তির জন্য দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছিল। বহু বিলম্বিত ও অবরুদ্ধ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধাপগুলিকে মুসলিম সমাজ তার রক্ষণশীলতা দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল। ভাষা সেই বিলম্বিত বিপ্লবেরও মুখপাত্র হয়ে ওঠে। ভাষার মধ্যে যে এত ভয়ংকর সম্ভাবনা আছে তা কেউ ভাবতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গেও তো মাতৃভাষার জন্য দাবিদাওয়া আছে, ক্ষোভ আছে, আন্দোলন আছে, কৈ সেখানে তো এত কাণ্ড হয় না, 'হিন্দি সাম্রাজ্যের' বিরুদ্ধে মত নালিশই থাকুক, হিন্দির বিরুদ্ধে উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলনের শক্তিস্ফুরণের এক কণাও দেখা যায় না। ভাষা আন্দোলন এদেশে খুবই ভাসাভাসা। পশ্চিমবাংলার বাঙালীরা কম মাতৃভাষাভক্ত, পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা ঢের বেশী মাতৃভাষাভক্ত—এযুক্তি খুব বেশী গ্রাহ্য নয়। এমনকি পূর্ববাংলার যাঁরা শিক্ষিতসমাজ, তাঁদের মধ্যে আমাদের চেয়ে কম ইংরেজীয়ানা, একথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হয় নি, বরং দেখেছি তাঁরা বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী মধ্যবিত্তদের চেয়েও ঢের বেশী সাহেবীয়ানা রপ্ত করেছিলেন, অথচ তাঁরাও এই আন্দোলনের সম্মুখের সারিতেই ছিলেন। অতএব আমরা যদি মনে করি পশ্চিমবাংলাতেও বাংলাভাষা বিপ্লবের বাহন হবে, তবে হয়তো নিরাশ হয়ে পড়তে হবে। এই পূর্ববাংলার অনুকরণে এখানেও একটা বিপ্লব ঘটে যাবে—এমন মনে করা যায় না।

অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক বঞ্চনা এদেশেও অনেক আছে, অন্যান্য দেশেও আছে। এইসব কারণের জন্যও বিদ্রোহ, বিপ্লব ঘটে এবং সব দেশেই, আমাদের দেশেও, বিপ্লবী আন্দোলন তারই উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছে ও করবে। তথাপি সেই বহু প্রতীক্ষিত বিপ্লব আজও এদেশে কিম্বা বিশ্বের ব্যাপারেই চলেছে। কিন্তু সহসা বাংলাদেশেই বা তা এত দ্রুততালে ফেটে পড়লো কেন? বুঝতে হবে এই শোষণ ও শাসন ছাড়াও বাংলাদেশে অতিরিক্ত এমন কিছু কারণ ছিল যার জন্য অতবড় রক্ষণশীল সমাজের মধ্যেও সহসা এতবড় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে। এমনকি, সে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের জন্য সেখানে কেউ হয়তো মনের দিক থেকে প্রস্তুত বা সচেতনও ছিলেন না। সেখানে অতবড় বিপ্লবী বা প্রগতিবাদীরাও এত কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি ঘটলো, এতটা না চাইলেও ঘটলো। এর কারণ খুঁজতে হবে মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতার মধ্যেই।

ধর্মান্ধতার নিগড়

ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা মুসলিম জগতটাকে দীর্ঘকাল ধরে এক অচলায়তনে পরিণত করে রেখেছিল—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। খৃস্টধর্মের সঙ্গে তার সংগ্রাম তাকে আরও বেশী রক্ষণশীল করে। ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব সেই সমাজে কোন বৃহৎ কম্পন সৃষ্টি করতে পারে নি। ঐশ্লামিক গণতন্ত্র আধুনিক জগতের গণতন্ত্রের সঙ্গে কোন সঙ্গতি রেখে একপাও অগ্রসর হতে পারে নি। উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক রূপে এদেশে প্রগতিবিরোধী স্বাতন্ত্র্য

কর্মে সহায়তা করে। এর ফলে শেষপর্যন্ত এই সমাজ নিজেই সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হয়। এই আত্মবঞ্চনা শেষপর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমানদের মনে একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করে, তার পার্সোনালিটি বা আইডেন্টিটির ঐতিহাসিক স্থানটি খুঁজে বের করতে গিয়েই ভাষাকে তার আশ্রয় করতে হয়, যে ভাষা তার বুকের ভাষা, মুখের ভাষা ছাড়াও। জাতিগত অপমান ও হীনমন্যতা শোষণ ও শাসনগত অত্যাচারের সঙ্গে একাকার হয়ে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়—যে বিস্ফোরণের মধ্যে একাধারে ফরাসীবিপ্লব, রুশবিপ্লব ও সকলরকম বিপ্লবের যুগপৎ প্রকাশ দেখা যায় একটার পর একটার ক্রমান্বয়ে নয়, একত্রে ওতপ্রোতভাবে বহুবিধ শক্তির তাড়নাতে।

ফলে বিপ্লবের চেয়েও বড় বিস্ফোরণ ঘটে। বস্তুতঃ বলা যায়, যতবড় বিস্ফোরণ ঘটেছে, বিপ্লবটা যেন তত বড় নয়—আজও। বিস্ফোরণের পরেই হয়তো বিপ্লবের পল্লবগুলি খুলতে থাকবে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র—এতসব ব্যাপার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত পাকিস্থানের বৃহত্তম অন্ধকূপের মধ্যে যতটা আশ্চর্যজনক ও চমকপ্রদ হতে বাধ্য, ততটা আমাদের দেশে নয়। আমাদের দেশে এসব কথা জলভাত, অত্যন্ত সহজগ্রাহ্য শ্লোগান। কিন্তু মুসলীম সমাজে এগুলি সত্যি সত্যিই তোবা তোবা বা গুনাহ্‌গারীর বিষয়—একদম না-পাক বস্তু। একথাও বোধহয় বলা যায়, মুসলীম জগতে বাংলাদেশের বিপ্লবই বোধহয় প্রথম সিরিয়াস বিপ্লব—যার জন্য অন্যান্য মুসলীম দেশগুলি বাংলাদেশের উপরে বাংলাদেশের মুসলমানদের উপরে পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম নরকলীলা মুখ বুজে চোখ বুজে অস্বীকার করে চলেছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

অতএব একথা বোধহয় বলা যায় যে, যদি পৃথিবীতে কোথাও কোন সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা কালচারেল রেভল্যুশানের প্রয়োজন থেকে থাকে—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবেরই পুরোগামী হিসেবে, সে মুসলীম জগতেই। সব দেশের বিপ্লবেরই প্রারম্ভে একটা করে ছোটবড় সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে, কেননা মানুষ প্রথমত মানসিক জীব, তার যা কিছু ঘটে, প্রথমে মনেই ঘটে—অতএব সকল প্রকার বিপ্লবের প্রথমেই দেখা দেয়, সাংস্কৃতিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বিপ্লব। কিন্তু মুসলীম সমাজমানস যেহেতু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনড়বন্ধনে রক্ষণশীলতার অচলায়তন দুর্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল, সেহেতু সেখানকার অসহ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ-বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথমস্তরে যে সাংস্কৃতিক বা মানসিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয় তা বিস্ফোরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবটাও সশস্ত্র হয়ে পড়ে। কৃষি-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব ইত্যাদির চেয়েও ভাষা-বিপ্লব সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আওয়াজটা এমন প্রাণান্তকারী বিস্ফোরণ ঘটায়।

কিন্তু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবটা এতবড় বিস্ফোরণের ফলেও তার পরিপূর্ণ রূপ ও আকার এখনও নিতে পারেনি। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার সমাজ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বৈপ্লবিক ফলশ্রুতিগুলি এখনও তার পূর্ণাবয়ব পায়নি, কিন্তু পাবে। আজ বাংলাদেশের যুবকদের সকলেরই হাতে নাকি অস্ত্র আছে। অস্ত্র তারা ২৫এ মার্চের পূর্বে কখনই ধরতে যায় নি, নিরস্ত্র সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধনাই তারা করতে যাচ্ছিল। সহসা এমন কাণ্ড ঘটলো যে সকলকেই বলতে হলো অস্ত্র ধরো, অস্ত্র কৈ—টু আর্মস, টু আর্মস। আজ তাদের হাতে এত অস্ত্র, সে-অস্ত্র আত্মঘাতী না হয়ে ওঠে এই ভয়ে তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা চলেছে। নিরস্ত্র হলেই তারা নির্বিপ্লবী হবে, হয়তো এমন নয়। তাদের অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব অথবা আরব্ধ-বিপ্লব পরম সার্থকতা লাভ করতে পারবে সত্যিকার গণতান্ত্রিক আবহাওয়া বা চিন্তা ও চেতনার স্বাধীনতা বা চিত্ত ও বুদ্ধি-শক্তির মুক্তির মধ্য দিয়েই। সেই কাজই হবে একুশে ফেব্রুয়ারীর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারানুসরণ করে। পঁচিশে মার্চ ও তৎপরবর্তী প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী বিপ্লবও একুশে ফেব্রুয়ারীর আরব্ধ যাত্রাপথকে সমাপ্ত করে নি, বরং সে যাত্রাপথকে আরও প্রশস্ত ও দিগন্ত-প্রসারী করে দিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রকৃত তাৎপর্য তাই ফুরিয়ে যায়নি, স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও। একুশে ফেব্রুয়ারীর মানবিকতা সমানাধিকার, গণতন্ত্র, সত্যসন্ধান, ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে অভিযান প্রভৃতি দাবিদাওয়ার গতিপথ যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আরও দ্রুতগামী করে না-দিতে পারে তবে এত রক্তক্ষয় এত কাণ্ড ইতিহাসের খতিয়ানে ও মূল্যায়নে যথার্থ বলে স্বীকৃত হবে না—বাংলাদেশ কেন, সারা পৃথিবী আজ যা বাংলাদেশের কাছে আশা করে তা মিলবে না। অথচ পৃথিবীর অতীত অন্যান্য বিপ্লবের মত বাংলাদেশের বিপ্লবও একদিন সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে—যদি একুশে ফেব্রুয়ারীর ক্রমবর্ধমান তাৎপর্য বা পূর্ণপল্লবিত ও প্রস্ফুটিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে গ্রহণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক কাজ আজও শেষ হয় নি এবং বাংলাদেশের সীমান্তে এসেই তার ডাক শেষ হয় না, তার আসল সাংস্কৃতিক বৈপ্লবিক তাৎপর্য পৃথিবীর বা সারা মুসলিম জাহানের বুকে বহুবিলম্বিত বিপ্লবের নৈতিক শক্তি ও প্রেরণা ও চেতনা জুগিয়ে যাবে।

মুক্তি-মৈত্রী [illegible]কুমার সেনগুপ্ত

তুমি মুক্তি, আমি মৈত্রী
তুমি ধাবিত মুক্তিতে, আমি প্রেরিত বন্ধুতায়,
আমি বলিষ্ঠ স্থৈর্য আর তুমি
উত্তাল প্রাণবন্যার উন্মাদনা।
প্রতিজ্ঞা আর প্রত্যয়—
তোমার অটল প্রতিজ্ঞা আর আমার প্রদীপ্ত প্রত্যয়।
তুমি বিদ্যুৎবেষ্টিত নিবিড় মেঘপুঞ্জ
আর আমি দুর্বার বজ্রের বিদারণ।
তুমি সঞ্চিত শুষ্ক বারুদের স্তূপ
আর আমি নিপুণ স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার।
বেগ আর বীর্য, শৌর্য আর সাহসের সমাবেশ
আমি উদ্যত যোদ্ধা আর তুমি বিনিদ্র প্রহরী,
আবার তুমি জাগ্রত সৈনিক
আমি তোমার অচ্ছিদ্র আচ্ছাদন,
আমরা একতীর্থী, এক পথের সারণিক,
একে অন্যের পরিচায়ক—
আমার স্বার্থহীন আত্মাহুতি
আর তোমার স্বার্থহীন অভ্যুদয়
দুয়ে মিলে স্বাধীনতা অমূল্যরতন।

ওরা ভেবেছিল নরম পলিমাটির দেশ
সবুজ গাছপালার জঙ্গলে হিজিবিজি
নদীনালায় কাদাটে ঘোলাটে,
লোকগুলো সব ক্ষীণ-কৃশ, ভাবের ঘরের বাসিন্দে,
ভীরু আর ভেতো বাঙালির দল—
তাই বলেছিল জাঁক করে, গোঁফে চাড়া দিয়ে,
আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সব সাবাড় করে দেব
নিয়ে আসব কবজার মধ্যে, বুটের তলায়,
ঝুলন্ত খড়্গের নিচে—
কিন্তু কী দেখল ওরা?
দেখল কোমল মাটির তলে সে কী ইস্পাত কঠিন তপস্যা
কী সে বিস্তীর্ণ অনন্যচিত্ততা!
দেখল প্রত্যেক ঘরই প্রতিঘাতের দুর্গ
প্রত্যেক বুকেই প্রতিরোধের বর্ম আঁটা,
যে যা পেয়েছে তাই হাতের হাতিয়ার করেছে,
যার হাত রিক্ত তারও আছে অন্তত বদ্ধমুষ্টির ক্রোধ
প্রতি প্রহরের প্রহরণ—
যেখানে যেটুকু অভাব দেখেছে
ভরে নিয়েছে দেশপ্রেমে
যা সব ভরিয়ে দিয়েও অনেক আবার উদ্বৃত্ত রাখে।
দেখল, এদের ভাবের ঘরে
শুধু ঊর্ণনাভের তন্তুরচনা নয়,
বসে আছে বিদ্রোহের বিষুবিরস
বুভুক্ষুর বিক্ষোভ—
আরো দেখল শুধু মানুষ নয়,
এখানকার নদী নালাও যুদ্ধ করে,
যুদ্ধ করে গাছগাছালি পাখিপাখালি
ধানখেত বনবনানী,
যুদ্ধ করে প্রতিটি তৃণকণা, প্রতিটি ধূলিরেণু,
প্রতিটি ধানের শিষের উপর আর শিশিরের বিন্দু নয়,
টলটল করছে শোণিতের বিন্দু,
যুদ্ধ করে প্রতিটি শিশু,
মায়ের কোলে জন্ম নিয়েই যার প্রথম কান্না—জয় বাংলা।

ওরা পারবে কেন?
ওরা তো সৈনিক নয়, ওরা নরখাদক [illegible] বাহিনী
পাতালতলের দানবের দল,
ওদের তো কোনো আদর্শ নেই
উদার-উড্ডীন পতাকা নেই,
ওদের শুধু গণহত্যা ক'রে
তাড়িত ত্রাসিত বহিষ্কৃত ক'রে দিয়ে
গণনায় সংখ্যা-কমানো।
ওদের তো সংগ্রাম নয়, শুধু পৈশাচ দৌরাত্ম্য,
ওরা সভ্যতার শস্যনাশা উলঙ্গ পঙ্গপাল
লুটে আর লাম্পট্যেই ওদের লুব্ধতা,
'নৃশংসতা'—শব্দও ওদের অভিধানের
পৃষ্ঠা থেকে লজ্জায় পলাতক,
বীভৎসতাই ওদের একমাত্র অভিধান।
ওরা ভেবেছিল ওদের হয়ে যুদ্ধ জিতিয়ে দেবে
মামু আর চাচার দল
আর ওরা নির্বিবাদে নারীধর্ষণ করবে
পরস্ব চুরি করে ফুলবে ফাঁপবে ফুর্তির লহর ছোটাবে,
কোথাও কখনো ধরা পড়বে না
দণ্ডধারী বিচারের সম্মুখীন হবে না কোনোদিন,
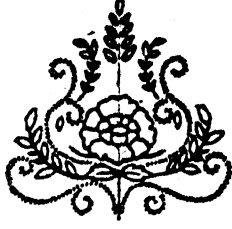
অবাধে চালিয়ে যাবে চণ্ডাচার।
কিন্তু কী হল চরম চমৎকার,
চাচা আপন বাঁচা বলে লেজ গুটোলো
মামু হামি হবার তাকৎ পেল না।
চোদ্দ দিনে যুদ্ধ শেষ
মন্দ্য শেষ।
স্তব্ধ সব আস্ফাল-আস্ফোট।
সেই রমনার মাঠে
যেখানে উঠেছিল মুজিবের সজীব কণ্ঠে
স্বাধীনতার বজ্রঘোষ,
সেই মাঠে পরাস্ত নিয়াজি
ইউনিফর্মের ব্যাজ খুলে ফেলে
হেঁটমুণ্ডে আত্মসমর্পণের দলিলে
দিল সই করে।
আমাদের রক্তাক্ত পোস্টারের উত্তরে
ওদের ওই পরাভবের দস্তখৎ।

উপায় কী তা ছাড়া?
আমরা যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছি পাশাপাশি,
আমি নৈরাশ্যবিজয়ী ধৈর্য
আর তুমি আঘাতসহিষ্ণু নিষ্ঠা,
তুমি দয়িত আগুন, আমি বিপ্লবিক্রম প্রভঞ্জন,
তুমি স্থলে-জলে পথ দেখিয়েছ
আর আমি অভ্রান্ত লক্ষ্যে আকাশপথে পড়েছি ঝাঁপিয়ে—
তুমি চারুতা আমি নৈপুণ্য
তুমি প্রয়াস আমি পদ্ধতি
তুমি প্রেয়তা আমি শ্রেয়বোধ
আমি সংহতি তুমি সঙ্ঘাত
দুঃসাধ্য ক্লেশ আর অদম্য ব্যাকুলতা

আমাদের যে সমর্থ মিলন
একত্বের অনুভবে আমরা পরস্পরের পরিপোষক—
আমি বল তুমি সম্বল
তুমি আমার সম্বলের বল, আমি তোমার বলের সম্বল,
আমি প্রাণের রসায়ন, তুমি প্রাণের রূপায়ন।
কী করে পারবে ওরা?
ওদের যে দেশ নেই, বিশ্বাস নেই, কল্যাণবোধ নেই,
ওরা যে মানবতার শাশ্বত ভূমি
মমতাকে চেনে না।
ওদের তিন জিনিসের ভয়
বাঙালির বুদ্ধি
বাঙালির ভাষা
বাঙালির হৃদয়াবেগ।
তাই ওরা চেয়েছিল জাত-কে-জাত
বাঙালিকে লোপাট করতে।
কিন্তু কী করে ম্লান করবে সেই নিরিন্ধন দীপ্তি
যা সাধারণ মানুষের সামান্য বৃত্তিতেও বিকীর্যমান!
মনুষ্যত্বই সব চেয়ে বিস্তীর্ণ আয়তন
সেই আয়তনে বাঙালির হৃদয় আরূঢ়
কে তাকে সঙ্কুচিত করে
কে তার অবনমন ঘটায়?.
আর আন্তরিকতাই অস্তিত্বের একমাত্র শর্ত
একমাত্র পবিত্রতা,
যাদের ভাষা এমনি স্রোতশক্তিমান
বিশাল মহান
তাকে কে শৃঙ্খল পরাবে?

আরো দেখ চরম চমৎকার—
প্রতিবেশী রাষ্ট্র সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে
অভ্যন্তরে ঢুকে প'ড়ে শত্রুজয় ক'রে
বিজিত রাজ্য প্রতিবেশীর হাতেই ছেড়ে দিয়ে এসেছে
তারই অধিকার প্রতিষ্ঠার পুণ্যব্রতে।
আরো দেখ—উদার বাহু মেলে
বিতাড়িত উদ্বাস্তুদের দলে-দলে ফিরিয়ে নিচ্ছে
ফেলে-আসা গ্রামে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে
যা কিনা আজ শ্মশান, কঙ্কাল-কবর।
কে কবে দেখেছে সকল জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও
নিশ্চিহ্ন হয় না মানবমমতা
প্রাণঢালা শুশ্রূষার সুধা,
আমরা যে মানুষে বিশ্বাস করি
আমরা যে প্রতিষ্ঠিত করেছি
মানুষের সর্বপদবীমুক্ত নিরঞ্জন অধিষ্ঠান।
আমাদের দুয়ের কাছে দেশ অর্থই দেশের মানুষ
সেই দেশই আমাদের সাধ্যশিরোমণি।
আমরা দুয়ে মিলে এক অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বলন্ত ইতিহাস,
আমরা একে-অন্যের পরিপূরক—
জনগণমন অধিনায়ক আর আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।।

ভূমিকা •

আমি বরাবর তথ্য-সমর্থিত এই ধারনা পোষণ করে এসেছি যে, বিশ্বপটভূমিকায় রামমোহনের আবির্ভাব-ক্ষণ থেকে বাঙালী সত্তার যে অগ্নিস্ফুরণ হয়েছিল তাই তিমিরবিদারী দীপ্ত বর্শাগ্রের মত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং নবজাগৃতির পরিব্যাপ্ত তাপ সঞ্চারের ফলে তারই চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটেছিল অবিচ্ছিন্ন বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের ১৯০৫-এ। উপলক্ষ্য ছিল কার্জনী প্রশাসনিক বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিরোধ। একান্ত-ভাবে বাঙালীচেতনার এক অভূতপূর্ব উন্মেষ। আশা জেগেছিল, বাঙ্গালী-সত্তার পূর্ণায়ত বৃত্তাঙ্কন সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু ইতিহাসের দুর্জ্ঞেয় ঘটনাচক্রে ১৯১১-তে বিভক্ত বঙ্গ সংযুক্ত হলে ঐ বৃত্তাঙ্কন যে শুধু অসমাপ্ত রইল তাই নয়, এক অকারণ ভ্রান্তির আঘাতে তার গতিমুখও গেল ঘুরে। ঠিক এক যুগ পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চিরশান্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-দিগন্তের শেষ সম্ভাবনা-সূর্য যেন অস্তে গেল। নেতৃস্থানীয় চিত্তরঞ্জনই ছিলেন কায়মনোবাক্যে শেষ বাঙ্গালী। এর পর কান্ডারীহীন বাংলা সর্বভারত আন্ত-র্জাতিকমুখীন দুটি ধারা থেকে উৎসারিত শাখা-প্রশাখায় আপন সত্তা হারিয়ে ফেলে।

আজ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশে সেই অসমাপ্ত বৃত্তাঙ্কনের সূত্রটি বিধৃত দেখে বাঙ্গালী-সত্তার প্রাণ-প্রাচুর্যে আস্বস্ত হচ্ছি, হয়তো বা দুর্জ্ঞেয় ইতিহাস এবার বিশ্ব-পটভূমিকায় পূর্ণায়ত বাঙ্গালী-সত্তার ভূমিকা-পালনে পথ ছেড়ে দেবে। বিস্ময়-বিমুগ্ধ আশান্বিত চিত্তে লক্ষ্য করছি, মুজিবের বাংলাদেশ মাতৃভাষার সংস্থাপনে আত্মোপলব্ধির অন্তরাঙ্গনে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯১১-তে ভুলে-যাওয়া বা ফেলে-আসা ১৯০৫-এর হৃদয়-সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' মৌলিক তাৎপর্যময় সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্গীত হচ্ছে বাংলাদেশে; বাঙ্গালীর রক্ত-লিপিত জাতীয় সঙ্গীতের রূপ-মর্যাদায় সে-সঙ্গীত আজ প্রাণময়।

তুলনা :

প্রতিবাদ সত্ত্বেও লর্ড কার্জন ঘোষণা করেছিলেন, এই বঙ্গ ভঙ্গ হল। ১৯০৩ থেকে অবিচ্ছিন্ন প্রতিবাদে কঠিন বাংলার অন্তরাত্মা ১৯০৫-এ বজ্রনিনাদে বলল : 'না'।

পাকিস্থানের জনক স্বয়ং মহম্মদ আলি জিন্না ঘোষণা করেছিলেন, উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্থানের ভাষা। ১৯৪৮-এ বাংলার অন্তরাত্মা আর একবার বজ্রকণ্ঠে বলল : 'না'।

১৯০৩ থেকে যে-প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল তার মর্মকেন্দ্র যেমন ছিল বঙ্গ-ভাষী বাঙ্গালীর একাত্মতা, ১৯৪৮-এ পূর্ব পাকিস্থানে যে-প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল তারও মর্মকেন্দ্র ছিল বঙ্গভাষী বাঙ্গালীর একাত্মতা।

বিদেশী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় বাঙ্গালীরা নিয়েছিল বিদেশী পণ্য বর্জনের বয়কট ও দেশী পণ্য সমাদরের 'স্বদেশী' সঙ্কল্প। ইংরাজের চোখে তাই ছিল সিডিসান। ভয় পেত ওরা মাতৃবন্দনার ধ্বনি 'বন্দেমাতরম্'-কে রণধ্বনি মনে করে।

অমর শহীদ বরকত

মুজিবের আন্দোলনেও ছিল পশ্চিম পাকিস্থানী পণ্যের বয়কট, বাঙ্গালীর পণ্য সমাদরের শপথ, তাঁত শিল্পের আয়োজন ও অসহযোগের হাতিয়ার।

১৯০৫-এও মূলত অহিংস প্রতিরোধ অসহযোগিতায় এসেছিল আগ্নেয়াস্ত্রের মিশ্রণ, মুজিব-আন্দোলনেও এসেছে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর জোয়ার।

বাংলায় ১৯০৫-এর আন্দোলন একান্ত-ভাবে বাঙ্গালী-নেতৃত্বে হলেও ভারতবর্ষের মুগ্ধ বিদগ্ধ ভিনপ্রান্তীয়দের সহানুভূতি-সমর্থন ছিল; ১৯৭১-এ বাংলাদেশে সংগ্রামেও একান্তভাবে বাঙ্গালী নেতৃত্ব সত্ত্বেও সমগ্র সজাগ ভারতবর্ষ সক্রিয় সাহায্য দিয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের বিরোধিতা ঢাকার নবাববাড়ী সলিমুল্লা গয়রহকে কেন্দ্র করে হয়েছে, পূর্ব পাকি-স্থানের বাংলাভাষা ও বাংলাদেশ আন্দো-লনের বিরোধিতাও খাজা নাজিমুদ্দিন-নুরুল আমিন গয়রহকে কেন্দ্র করে হয়েছে। প্রথম আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা প্রকাশ্য মদদ দিয়েছে সাম্প্রদায়িক কসাই মুসলমানদের, দ্বিতীয় আন্দোলনে পশ্চিমা পাকিস্থানীরা নগ্ন সাহায্য জুগিয়েছে আল বদর-রাজাকারদের। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, বৃটিশ কূটনীতি বা ভেদনীতি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রগাঢ় সন্দেহ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্থানে মুসলিম সংখ্যাধিক্য হেতু সূচনায় কিছুকাল চিরাচরিত সংস্কারবশতঃ হিন্দু নিধন অব্যাহত থাকলেও শেষ পর্যন্ত সাম্প্র-দায়িক বোধমুক্ত বাঙ্গালী মুসলমান ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু দেখা দিয়েছে।

অখণ্ড বঙ্গের সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ মুসলিমদের মতে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সবটাই ছিল হিন্দু, যেহেতু হিন্দু জমিদাররাই প্রধানতঃ এর নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং হিন্দু শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাই এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। দুর্বলতা ছিল তিনটি। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন যে-নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তার

লক্ষ্য ছিল চাপ সৃষ্টি করে বৈধ উপায়ে কার্জনী প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ, বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা। যাদের ইংরাজরা বলতেন, এন্যার্কিস্ট, আন্তর্জাতিকতাবাদীরা বলতেন টেরারিস্ট, আসলে যাঁরা ছিলেন বিপ্লবী তাঁরা চাইছিলেন ইংরাজ রাজত্বের অবসানে বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের স্থলাভিষেক। সে রাজত্বের কি রূপ হবে তার বিশেষ স্পষ্ট ধারণা সাধারণ বিপ্লবীদের ছিল না। এই এনার্কিজম, সন্ত্রাসবাদ বিপ্লববাদের প্রতি বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ মুখ্য নেতৃত্বের সমর্থন ছিল না। তাই ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে বিগলিত-চিত্ত সামন্ত-বুর্জোয়া বাঙ্গালীরা হাত গুটোতেই বিপ্লবীরাও নিরবলম্ব হয়ে পড়লেন; কেননা, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ পাদের নীল চাষী ও প্রজা-বিদ্রোহের শিক্ষা না নেওয়ায় ভদ্রলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ অকুতোভয় প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার বিপ্লববাদ সাধারণ্যে বিস্তারিত মুক্তিবাহিনীর উদ্ভব ঘটাতে পারল না। ১৯২১ অকস্মাৎ গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগী গণআন্দোলনে গা ভাসিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পরে যখন চেতনা ফিরে দেখা গেল, এত অবধগুলি তখন বাংলার ভৌগোলিক সীমায়ও নেতৃত্ব স্খলিত হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে, মুজিব-আন্দোলন এমনি কয়েকটি বিঘ্ন থেকে মুক্ত ছিল। শতকরা যে দুজন হিন্দু পূর্ব পাকিস্থানে ছিলেন মুজিব তাঁদের সঙ্গে পেয়েছেন, বরং, সঙ্গে পান নি মুসলিম লীগপন্থী পাকিস্থানী ও ধর্মান্ধ মুসলমানদের। এই সামান্য বাধা আওয়ামী লীগ অতিক্রম করতে পেরেছিল এবং এইজন্যই তার আন্দোলনও প্রথমাবধি গণআন্দোলনের পথ নিয়েছে। ভাষা, রাজনীতি, প্রশাসন ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্থানীদের বৈষম্যমূলক নীতি পূর্ব পাকিস্থানের মুসলমানদের মোহমুক্ত করে বাঙ্গালী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। পাকিস্থানীদের এইখানে হয়েছে হার। এবং তাই আওয়ামী লীগের গণ-আন্দোলন সোজাসুজি গণ-বাহিনী সৃষ্টি করেছে। এই গণবাহিনীর ভূমিকা ভারতীয় বাহিনীরও প্রশংসালাভ করেছে। অখন্ড বঙ্গের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে সংযুক্ত বিপ্লবী আন্দোলন এই উপসংহারে যেতে পারে নি।

আরও একটি মৌলিক পার্থক্য এই যে, অখন্ড বঙ্গে বাংলার স্বকীয়তা, বাংলা-ভাষার বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালী সত্তা সম্পর্কে যে অভিমান তাও অবক্ষয়িত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষার প্রতি যে নিষ্ঠা ১৯০৫ থেকে ১৯১১-তেও ছিল, ১৯৭১-এর পরবর্তীকালে তা স্তিমিত কোথাও কোথাও নিন্দিত হয়েছে। বাংলা-ভাষা মাধ্যম করা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে, পণ্ডিতমহলে, এমন কি বাঙ্গালী সাহিত্যিক মহলে যে কলহ তার গোড়ার আছে ঐ বর্ণসংকর মানসিকতা। ১৯২১এর পরবর্তী বাংলাসাহিত্যে তাঁরাই অগ্রণী যাঁরা ইংরাজী বা ইউরোপীয় সাহিত্যে অনুরাগী বা আচ্ছন্ন হয়েছেন, সমস্ত দৃষ্টান্ত তুলনা ঐ বিদেশী সাহিত্য থেকে আহরণ করেছেন, যতনা বাংলা বই পড়েছেন বা তাদের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন তার চাইতে অনেক বেশী পড়েছেন ইংরাজীর মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্য। শেষ পর্যন্ত এই সর্বনেশে ফ্যাসান দেখা দিল অভিজাতমহলে যে, তাঁরা বাংলা পড়তে লিখতে পারে না, ইংরাজী নাকি তাদের রক্তে এবং কিছুতেই মনের ভাব বাংলায় ব্যক্ত করা যাবে না। ফলে, এই হয়েছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমরা ইংরাজীও হারিয়েছি, বাংলাও হারিয়েছি; যে-সাহিত্য হয়েছে তা যৌনাচ্ছন্ন বলে লজ্জার নয়, তা অতি নিম্নস্তরের বর্ণসংকর। বাংলাভাষাকে আমরা অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি বলেই, বাংলা হলে ইংরাজী আভিজাত্য হেয় হবে আশঙ্কায়ই আমরা বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুকে লাঞ্ছিত করার দুঃসাহস দেখিয়েছি।

কিন্তু মুজিবরের পথ পরিষ্কার। তাই বাংলাদেশ যখন পূর্ব প্যাকিস্থান ছিল তখনও বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছে, দোকানের সাইনবোর্ড, হোস্টেলের নাম, মোটরগাড়ীর নম্বর, পোস্টকার্ড, টেলিগ্রাম বাংলায় হয়েছে। কোন হীনমন্যতায় ভুগছেন না বলে তিনি স্বাধীন বাংলা-দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন বাংলাভাষাকে। সকল সরকারী কাজ বাংলায় হবার সূচনা হিসেবে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ বাংলায় শপথ নিয়েছেন: হুকুম হয়েছে সর্বাত্মক বাংলা প্রয়োগ চলবে।

এবং সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে : আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি।

এক সঙ্গীত—দুই পরিণতি :

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত ১৯০৫ ও পরবর্তী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেরণাসূত্র ছিল সেই সঙ্গীতগুলোই বাংলাদেশ সংগ্রামীদের প্রেরণাসূত্র ছিল এবং আজও আছে। একক গীতিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সংখ্যাই বেশী এবং এই রবীন্দ্রসঙ্গীতই মুখ্য স্থান অধিকার করে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুলের যে স্বদেশী সঙ্গীত অবিভক্ত বঙ্গকে পরবর্তীকালে অনুপ্রাণিত করেছে তাদেরও সমান্তরাল সমাদর হয়েছে ও হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থান বা বাংলাদেশে বহু তরুণ অনুপ্রাণিত কবির অতি চমৎকার গীতিরচনা প্রকাশ পেয়েছে এবং অন্য প্রত্যেকটি সেই মৌলিক সুর—আমার সোনার বাঙলাকে ভালবাসার প্রসঙ্গ আবেগ, মাকে সর্বতোভাবে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী করবার আন্তরিক আকুতি। পশ্চিম বাংলার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র, কিন্তু আমরা যাত্রা করেছিলাম একই জায়গা থেকে।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' সঙ্গীতের প্রথমটিই—

'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।'

দ্বিতীয় গান—

'ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।'

তৃতীয় গান—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে
একলা চলরে'

তার পর পর—

'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চলবে না'
'নিশিদিন ভরসা রাখিস,
ওরে মন, হবেই হবে'
'আমি ভয় করব না ভয় করব না'
'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'
'নাই নাই ভয় হবে হবে জয়,
খুলে যাবে এই দ্বার—'

"স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো চার কোটি পরিবার—"

—আলাউদ্দিন আল আজাদ
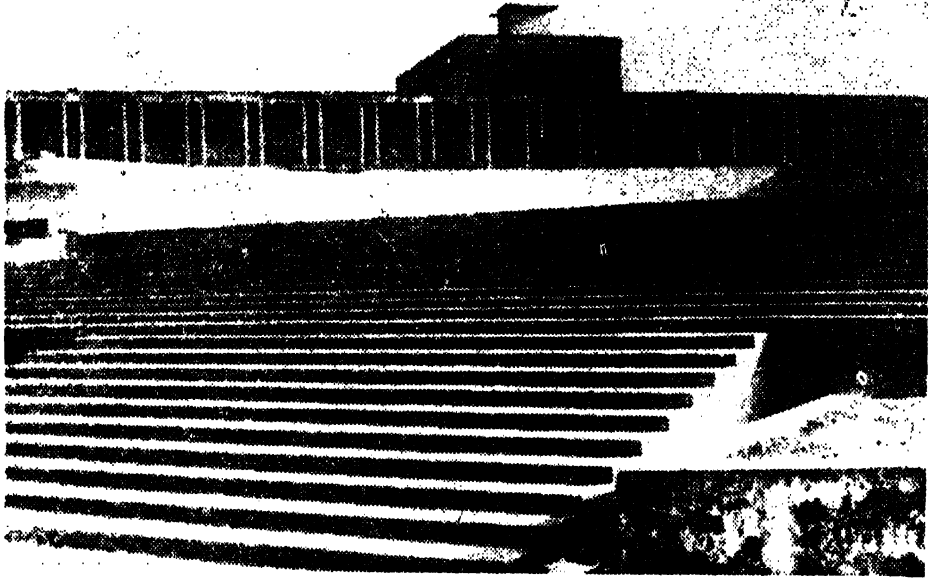
'আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন,
ওগো কর্ণধার'
'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'
'বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল'
'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি'
'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'
'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়ব না'

এমনি আরও। এই সংগীত ওঁরা যখন গান তখন কত প্রাণময়, কেমন জীবন্ত। কারণ ওঁদের জীবনে এটি সত্য, এটি জাগ্রত, এটি বাস্তব, নাড়ীতে নাড়ীতে জড়ানো, রক্তে রক্তে মেশানো। আমাদের কাছে? রসগন্ধহীন, কেননা, আমাদের কাছে পটভূমি হারিয়ে গেছে, ও নিছক গান, আর কিছু নয়; ওঁদের কাছে এগুলো গান ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ' অথবা 'ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা'। সে কোন্ দেশ? আমাদের এই বাংলাদেশ। আমাদের নয়, ওঁদের।

তেমনি, সংগ্রামকালে নজরুলের 'কারার ঐ লোহ কবাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' 'খাঁটির চেয়ে আরও খাঁটি আমার দেশের মাটি' ওঁদের রক্তে দোলা দিয়েছে। আমাদের দেয় না। আমাদের ছেলেরা শিষ দেয়, তাসা বাজায়, টুইস্ট নাচে, হিন্দীগান গায়। বাংলা, বাংলাদেশ দেশে অনেক অভাব অনটন নিক্ষিপ্ত কিন্তু আত্মাভিমানে গগনস্পর্শী। আমাদের পাঁচিলেনো তাই আধুনিক, ওঁদের?—

প্রচুর গান লিখেছেন ওঁরা, কান পেতে শুনেছি, প্রতিধ্বনি পেয়েছি তরুণ রবীন্দ্রনাথের, দ্বিজেন্দ্রলালের, নজরুলের জীবনানন্দের ওঁরা লিখেছেন :

'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে
সোনা হয় তত খাঁটি
বড় বেশি খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি
আমার বাংলাদেশের মাটি
বাংলাদেশের মাটি বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভূমির মাটি'
'এক রক্তিম উজ্জ্বল দিন
অগ্নিশিখায় জ্বলেছে
দীপশিখায় আলোর সাথীরা
ইতিহাস লিখে চলেছে।
'ও আমার এই বাংলাভাষা
আমার বুক জুড়ানো মুখ জুড়ানো
লক্ষজনের লক্ষ আশা।'
'জয় বাংলা বাংলার জয়'
'সূর্য উঠেছে পূবের আকাশে
আলোয় আলোকময়।

এমনি অনর্গল, সংগীত, যেন সচেতন প্রাণে প্রাণে উচ্চারিত। এইসব গান ওঁদের জীবনের বড় কাছাকাছি, এসব ওঁরা রোদের মত অনুভব করেন, সমীরণের মত উপভোগ করেন, শ্রুতিপথে মর্মে গিয়ে প্রিয়ভাষণ জানায়। কি করে হল? এবার সে বেদনাময় অথবা শপথে উজ্জ্বল কাহিনী বলি।

ইতিহাসের সেই পাতা কয়টি :

১৯০৫-এর বিস্ফোরণের আগে যেমন ১৯০৩-৪ এবং তারও আগে দুই শতাব্দী জুড়ে বাঙালীর আত্মানুসন্ধান, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২১-এ ফেব্রুয়ারীর আগেও তেমনি ১৯৪৮ এবং তারও আগে ভাষা-ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের ভাবনা।

১৯৪০-এ পাকিস্থানের প্রস্তাব। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট পাকিস্থান হাসিল। ১৯৪৮-এ পাকিস্থান গণ-পরিষদে ধ্বনিত হল : আমার ভাষা বাংলা ভাষা।

১৯৪৮-এর ২৫-এ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাঙলা (পাকিস্থান) কংগ্রেস-দলের সভ্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত করাচীর গণ-পরিষদে দাবী রাখলেন, উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও সরকারী কাজে ব্যবহার করতে হবে। তিনি যুক্তি রেখেছিলেন, পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে বাংলা তার যোগ্য মর্যাদা। পাবার দাবী নিশ্চয়ই জানাতে পারে।

কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ পাকিস্থানী হলেও ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দু। পাকিস্থানের ক্রুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিলেন, না, একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।

পাকিস্থানের জনকেরা সেদিন জানতে পারেন নি সেদিন একজন বাঙ্গালী হিন্দুই দুঃসাহসভরে পূর্ব পাকিস্থানের বাঙ্গালী মুসলমানদের অন্তর্বাণী প্রতিধ্বনিত করেছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিন নন।

পূর্ব পাকিস্থানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন লিয়াকৎ আলীর এক ডিগ্রী ওপরে গিয়ে বললেন, পূর্ব পাকিস্থানের অধিকাংশ লোকই (মানে, বাঙ্গালীরাও) উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চান,

বাংলার রাষ্ট্রভাষা হবার কোন যৌক্তিকতাই তাঁরা দেখতে পান না।

১৯৪৮-এর ৪ঠা মার্চ খাজা নাজিমুদ্দিন কলকাতায় এক বিবৃতিতে বলেন:

"I am sure, nobody excepting a" handful of persons in East Bengal demand that Bengali should be the official language of Pakistan.

কিন্তু দেখা গেল, একা বাঙ্গালী হিন্দু ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর পেছনে অজস্র সমর্থনের ছায়া যারা সদ্য-পাকিস্থানের মোহ থেকে উন্মেষিত হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্থানে ক্রমশঃ সর্বত্র বাংলাভাষার প্রতি কেন্দ্রীয় নেতাদের এই বিরূপ বিমাতৃসুলভ মনোভাবে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে লাগল। যে-পাকিস্থান প্রস্তাব সংখ্যায় প্রবলতম বাঙ্গালী মুসলমানের সমর্থনে অপ্রতিরোধ্য গতি নিয়েছিল তাঁদের প্রতি অবাঙ্গালী পাকিস্থানীদের এই উপেক্ষা ও বিদ্বেষ অন্ধজনেরও দৃষ্টি খুলে দিতে লাগল। বাংলাকে সমান্তরাল রাষ্ট্রভাষা করবার দাবীতে জনসভা হতে ও মিছিল বেরোতে লাগল। পথে পথে পোস্টার পড়তে লাগল। 'বায়ু বহে পূরবৈয়া'।

১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে নৌ-বিভাগে কিছু লোক চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়; বলা হয়, ইংরাজী অথবা উর্দুতে পরীক্ষা দিতে হবে। ভাষা ও বৈষয়িক বৈষম্যের লক্ষণও সুস্পষ্ট।

পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম সমিতি ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ ঢাকায় এক সাধারণ ধর্মঘট ডাকলেন। বিক্ষোভকারী, শোভাযাত্রা ও পিকেটারদের ওপর পুলিশ বেদম লাঠি চালালো। প্রথম অগ্নিপরীক্ষা। অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। আহতদের মধ্যে ফজলুল হকও ছিলেন। (১)

খোন্দকার গোলাম মোস্তাফা 'যেন ভুলে না যাই' শিরোনামায় লিখেছেন: (২)

'২১শে ফেব্রুয়ারী ('৫২) আন্দোলনের পথিকৃৎ ১১ই মার্চের ('৪৮) আন্দোলন ছিল এই ঐতিহাসিক না-ধ্বনির উত্তাল তরঙ্গ। ঢেউ লাগলো সারা প্রদেশে। স্বাধীনতাকামী জনসমষ্টির যেন নবযাত্রা শুরু হলো। তরুণ সমাজ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। পুলিশের মুখোমুখি।

"১১ই মার্চ এদের ত্যাগের পরীক্ষা, ঈমানের পরীক্ষা, নবলব্ধ চেতনার অগ্নিপরীক্ষা। এরা জয়ী হলো। চারদিন সংগ্রামের পর।

"একদিকে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন, অন্যদিকে সংগ্রাম পরিষদ। ১৫ই মার্চ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। নাজিমুদ্দিন সরকার অঙ্গীকার করলেন, বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা করা হবে এবং দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সরকার সুপারিশ করবেন কেন্দ্রের নিকট।'

১৯৪৮এর ১৫ই মার্চ খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববঙ্গ বিধানসভায়ও ঘোষণা করলেন, তিনি বাংলাকে উর্দুর সমান মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন। খাজা নাজিমুদ্দিন যখন সভাকক্ষে এই বিবৃতি দিচ্ছিলেন তখন বাইরে ছাত্র-বিক্ষোভ চলছিল।

কিন্তু পরে প্রকাশ পেয়েছে, খাজা নাজিমুদ্দিন এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কিছু করেন নি।

আপাততঃ এলেন পাকিস্থানের জনক ও পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্না। ১৯৪৮এর ২১এ মার্চ রোববার রমনার রেসকোর্স বা ঘোড়দৌড় মাঠে এক বিশাল জনসভায় বললেন, "আমি স্পষ্টভাষায় জানাচ্ছি, পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। যারা এব্যাপারে জনসাধারণকে বিপথে চালিত করবে তারা দেশের শত্রু।"

এরপর ২৪এ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে জিন্না আরও একবার বললেন, প্রিয় ছাত্রগণ, আমি তোমাদের জানাতে চাই, পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দুই। কয়েকজন ছাত্র একযোগে বলে উঠলেন—না, না, না। (৩)

ওঁদের কথা:

সরদার ফজলুল করিম লিখেছিলেন: "১৯৪৮ সালেরই কোন একদিন। আমার নিজের ছাত্রত্ব শেষ হলেও আমাদের তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং-এর সামনের আমগাছের আকর্ষণ তখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমগাছের তলায় সভা বসেছে। কে সভাপতিত্ব করেছিল আজ আর তা মনে নেই। রাস্তায় ১৪৪ ধারার নিষেধ। কিন্তু সেই নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' মুখে নিয়ে মেডিকাল কলেজের লোহার রেলিং টপকে ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের মাঠ পেরিয়ে জগন্নাথ হলে প্রতিষ্ঠিত আইন-সভার উল্টো দিকে যে হাজির হয়েছিলাম—সে স্মৃতি কিছুতেই মুছে যেতে চায় না। সেদিন কোন রক্তারক্তি হয়নি।"

তারপর একদিন।

"সে-ও নিশ্চয়ই ১৯৪৮ সালের ঘটনা। কায়েদে আজম এসেছেন পূর্ব পাকিস্থান ভ্রমণে।......লক্ষের কোঠায় মানুষ যেয়ে হাজির হয়েছে রেসকোর্সের ময়দানে।...শুনলুম তিনি বলছেন ইংরেজীতে: আই টেল ইউ উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গোয়েজ অব পাকিস্থান।...এই অকরুণ আঘাতে জমায়েত লক্ষ মানুষ সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিল। ছাত্রদের বেদনা ফেটে পড়েছিল তাদের প্রত্যেকটা হলের সাজানো তোরণ ভেঙে ফেলার মধ্য দিয়ে। পরের দিন কার্জন হলের সমাবর্তন। (৪).....কায়েদে আজম (৫)...ইংরেজীভাষাতে......অকরুণ কাঠিন্যে বললেন, আই টেল ইউ, উর্দু এণ্ড উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গোয়েজ অব পাকিস্থান। আহত তরুণের দল জাতির বিবেকের বাণী হয়ে এক অপূর্ব ঐকতানে বেজে উঠল: নো নো নো।'

আবুল ফজল বলেছেন: 'ভাষা মানে মাতৃভাষা—কারণ এ ভাষা তার সহজাত, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত আর সহজে আয়ত্ত। তাই অন্যসব কিছু আপোষ চলে, কিন্তু মাতৃভাষা নিয়ে আলোচনা চলে না।'

ঘোড়দৌড় মাঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে ছাত্ররা এই আপোষহীন মনোভাবই ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু অদূরদর্শী শাসকেরা একেবারে ঘাড়ে গিয়ে না পড়লে এবং অভ্যাসবশে বিপরীত হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে ক্লান্ত হয়ে না-পড়া পর্যন্ত সহজবুদ্ধিতে কাজ করে না। আমরা যে সভার কথা বলেছি, সে সভায় ছাত্রদের 'নানানা' কোরাস্ শুনে ক্রুদ্ধ বিমর্ষ জিন্না দ্রুত ভাষণ শেষ করে সভাস্থল ছেড়ে গেলেন, জেদ ছাড়লেন না। ছাত্ররা যেখানে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাতে লাগল সেখানে তিনি এদের স্তব্ধ করার পথ খুঁজতে লাগলেন। উল্লেখযোগ্য, এই সমাবর্তন-সভায় পরবর্তী কোন এককালে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট এবং শেখ মুজিবের "বিচারক" মেজর জেনারেল আয়ুব সাব-এরিয়া কম্যান্ডার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৮এর এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক মন্ত্রী হাবিবুল্লা বাহার, ঢাকায় সাড়ম্বরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করেন। "ডন," "মর্ণিং নিউজ" ক্ষেপে গিয়ে উদ্যোক্তাদের দণ্ডবিধানের দাবী জানালেন। (৬)

পূর্ব পাকিস্থানের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খাঁন তাঁর "ওজারতির দুই বছর"-এ লিখেছেন:

'পূর্ব পাকিস্থানে লোকে যাতে করে রাতারাতি উর্দু শিখতে পারে তার মহড়া চলতে লাগল পুরাদস্তুর। রেডিও পাকিস্থান হররোজ পাঁচ মিনিট উর্দু সবক দিতে লাগল। উর্দু না শিখলে আর যাইহোক চাকরী মিলবে না।

'স্কুল-পাঠ্য বাঙলা বই নতুন ক'রে লেখা হতে লাগল; উর্দু লব্জের গাঁথুনি দিয়ে সৃষ্টি হ'ল এক বিচিত্র বাঙলা ভাষার।' (৭)

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক 'নয়াজামাত' থেকে তিনি কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন; তার একটি এই:—

পাতা জাফরীতে নারজীল বুকে তবুবার শরবৎ; নারঙ্গী বাসিক মেহেদী

(১) কম্পাস, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

(২) একুশে ফেব্রুয়ারী, সংকলন গ্রন্থ, সম্পাদনা—হাসান হাফিজুর রহমান, পুঁথি-পত্র প্রকাশনী, ৯।২, শেখরবাজার, ঢাকা-এক

(৩) কম্পাস, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

(৪) এখানে কিছু তারিখের হেরফের লক্ষণীয়। স্মৃতি থেকে লেখা বলে তারিখও নেই। ঘটনাগুলোর ছাপ রয়েছে মনে।

(৫) এ উপাধি বা সম্বোধন আসলে গান্ধীজীর, তিনি জিন্নাকে এইভাবে জিন্নার তুষ্টির জন্য সর্বপ্রথম সম্বোধন করেন।

ঢাকায় বাংলাভাষা আন্দোলনে শহীদদের অমর স্মৃতিতে নির্মিত শহীদ মিনার

মেজাজ মহব্বৎ। সুম্বলকেশী প্রবাল শাজাদী সাজিয়াছে জওহরী: জখল নূরের ছুড়া হতে তার উঠিয়াছে তকবীর।

"উর্দু-বাঙ্গালা মিশ্রিত পত্রপত্রিকোগুলিকে পাক সরকার সাহায্য দিতে লাগলেন দরাজ হাতে। একটি মাসিকপত্রের নাম 'মাহ-এ-নও' মানে নতুন মাসিক। এক শ্রেণীর মোল্লা-মৌলানারাও সরকারী অনুকূল্যে বাঙ্গলাভাষা ইসলামীকরণের জিগীর তুলে এই ভাষা-হত্যার পশ্চিমী চক্রান্তে শামিল হলেন।' (৮)

একটি নগ্ন সংলাপ :

লিয়াকৎ আলি খানের সঙ্গে আতাউর রহমানের ভাষা বিষয়ে যে সংলাপ হয়েছিল তাতে পশ্চিমা পাকিস্থানীদের পূর্ব পাকিস্থানীদের প্রতি মনোভাব বা অকারণ উষ্মমনাত সুস্পষ্ট এবং এই মনোভাবের অব্যাহত ধারাই আয়ুব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোয় অনুসৃত। যদ্দিন পারমাণবিক শক্তিধর আমেরিকা ও চীনের ভারত- বৈরী- তার অসভ্যরীতি চলবে তদ্দিন তাদের তাঁবেদার পাকিস্থানের এই মনোভাব থাকবে—'পূর্ব পাকিস্থান' 'বাঙলাদেশ' হয়ে গেলেও সে-কয়লার ময়লা যাবে না। লিয়াকৎ ছিলেন একেবারে খাস ভারতের, এখানে থেকে তিনি পাকিস্থান-জনকের দক্ষিণহস্ত ছিলেন, সুতরাং জিন্না ও লিয়াকৎ যে একই বাঙালী-বিদ্বেষে জর্জর ছিলেন তা এই সংলাপে নিঃসংশয়ে প্রতিফলিত। বাংলাভাষা নিয়ে হৈচৈ করার জন্য তিনি আতাউর রহমানকে তিরস্কার করে বললেন : বাংলাভাষা হিন্দু-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, অথচ এই ভাষা নিয়ে মারামারি করে আপনারা পাকিস্থানের মূল আদর্শটাই ধ্বংস করে দিচ্ছেন।

আতাউর : আদর্শটা কি? পূর্ব বাঙলা লুট করাটাই কি আদর্শ নাকি? শুধু বাংলাভাষা কেন আমরা বাঙালীরা তো হিন্দু রক্তের ধারক ও বাহক, আমাদের দেহে সেই রক্ত এখনও বইছে—এসব কথা অনেক অবাঙালী নেতা অনেকবার বলেছেন। * আপনারা আরব ইরাণের, তাই ঘৃণা না করলেও করুণার চক্ষে দেখেন আমাদের।

লিয়াকৎ : কি বলছেন আপনি?

আতাউর : বলছি, বাংলাভাষা কেবল হিন্দুর ভাষা—একথাটা শুধু মিথ্যা নয়, অন্যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলমান বাদশা নবাবরা অনেকেই বাংলাভাষার উৎকর্ষসাধন করেছেন।

লিয়াকৎ : বাজে কথা।

আতাউর : না, এই ইতিহাস।

লিয়াকৎ : বুঝেছি, আপনারা স্বাধীন বাঙলা করতে চান, চান আলাদা হয়ে যেতে।

আতাউর : এটাও একটা অপপ্রচার।

লিয়াকৎ : (স্বগতঃ) আলাদা হবে? শখ তো ভাল! জানে না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আতাউর : না টিঁকে আছি, টিঁকে থাকব, এর চাইতে ভালভাবে টিঁকে থাকব।

লিয়াকৎ : রেখে দিন ওসব লাম্বাকি কথা।" (১১)

পরবর্তীকালে পাকিস্থানী-জনগণ-নিহত লিয়াকতের এই উদ্ধত মন্তব্য এবং আতাউরের বিনম্র অথচ দৃঢ় উত্তর আজ কি অসামান্য রকমে অর্থময় হয়ে উঠেছে।

পূর্ব পাকিস্থান যে পশ্চিমা-পাকিস্থানী লুটেরাদেরই ক্রীড়াভূমি এটা প্রমাণিত হয়েছে। একদিকে বৈষয়িক বৈষম্য অন্যদিকে ভাষাকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম—সামান্য বিবাদ মাত্র নয়। স্বাধীন বাঙলার ভাবনাটা (বা দুর্ভাবনা) পশ্চিমা পাকিস্থানীদের লিয়াকতের প্রধানমন্ত্রিত্ব-কালেই বেশ দাগ কেটে বসেছে। বাঙলা দমন বাঙালী নিধন ও বাংলাভাষা বিলোপের ষড়যন্ত্র পাকিস্থানের জন্মকাল থেকেই। বোঝা যায়, চূড়ান্ত সংগ্রামকালে লিয়াকতের বহু পরে ইয়াহিয়ার পিশাচ-বাহিনী কোন্ মানসিকতার তাড়নায় মনুষ্যত্ববোধকে এমন লজ্জা দিতে পারল। ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কা-নিয়াজীও লিয়াকতের মতোই ভেবেছিল যে, বাঙলা-বাঙালীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করা যাবে। বোঝা যায়, বাঙলা বাঙালী বাংলাভাষা

(৬) (৭) (৮) কম্পাস, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

* এবং এই কারণেই পশ্চিমা পাকিস্থানী খান মুসলমানেরা অনায়াসেই লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করতে পেরেছে, নারী-নির্যাতন করতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেনি। ওদের পাশবিকতা ইতিহাসে দুর্লভ।

(১১) কম্পাস, ১৯এ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

সম্পর্কে পাক শাসকমণ্ডলী পশ্চিমা পাকিস্থানী কি বিদ্বেষ অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা লালন করে এসেছে—যার ফলে, বাঙলা-দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার ওপর পীড়নের লাঞ্ছনার পদ্ধতিতে তারা পশুদেরও হার মানিয়েছে। এখন বড় বড় কবরই আবিষ্কৃত হচ্ছে ; সমীক্ষা হয়নি এদের নরহত্যার, নারীধর্ষণের শিশু নিধনের অশেষ কাহিনীর। লিয়াকৎ আজও নিষ্করুণ সত্য।

নাজিমের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি :

এবং নাজিমুদ্দিনের প্রতিশ্রুতিই মিথ্যা হয়ে গেল। 'লাম্বাকি' বাৎ। 'নবাবজাদা' লিয়াকৎ আলির কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার পাক সংবিধানের মৌল নীতি নির্ধারক কমিটি ১৯৫০-এ সুপারিশ করলেন—উর্দুই হবে পাকিস্থানের একমাত্র জাতীয় ভাষা। কেন্দ্রীয় কর্তাদের কাছে নাজিমুদ্দিনের 'দুর্বলতা' নিন্দিত হল এবং তাঁরা অনায়াসেই বাংলাভাষার দাবীটাকে ভারতীয়দের ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করলেন। পাক-নেতৃবৃন্দের পরিভাষায় ভারতীয় মানেই হিন্দু, পাকিস্থানী মানেই মুসলমান। নেতৃবৃন্দ যেখানে মুসলমানের ভাষা উর্দু বলে স্থির করেছেন, সেখানে বাংলাভাষা উর্দু নয় বলে মুসলমানের ভাষা নয়, ও ভারতীয়ের ভাষা মানে, হিন্দুর ভাষা। অর্থাৎ যে-কোনরকমে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিতত্ত্বটা কায়েম রাখতেই হবে এবং এই সুবাদে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও ভারত-পাক সংঘর্ষটা অব্যাহত রাখতে হবে। নতুবা পাকিস্থানের অস্তিত্বের কোন অর্থই হয় না।

কিন্তু বাঙালী মুসলমানেরা কিছুকাল মোহবশতঃ দ্বিজাতিতত্ত্বে সায় দিলেও এক ভাষাতত্ত্বে সায় দিতে পারেন নি, প্রথমেও নয়, শেষেও নয়। তাঁরা সব মেনেও, সব বৈষয়িক বৈষম্য প্রত্যক্ষ করেও এবং মাঝে মাঝে হিন্দু উৎসাদনে হাত মিলিয়েও মাতৃভাষাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাই—

'১১ই মার্চ বৃথা যায় নি। দমননীতির চাপে সাময়িকভাবে সাংগঠনিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও তরুণসমাজ তথা সমগ্র প্রদেশবাসীর অধিকার-চেতনা ও সংগ্রামী দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।......

'লিয়াকত-রিপোর্ট' নাকচ করে বিকল্প রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য এক মহাসম্মেলন (Grand National convention) আহূত হলো। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন প্রথমে আতাউর রহমান খান ও পরে কমরুদ্দীন আহমদ। পাকিস্থানের শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামো প্রণীত হলো এই সম্মেলনে। ঘোষণা করা হলো, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে, সাড়ে চার কোটি পূর্ববঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে (১২), বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্র-ভাষা ও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে।" (১৩)

মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে লিয়াকৎ-রিপোর্টও অনাদৃত ও প্রত্যাহৃত হল। বাংলাভাষা-বিরোধী চক্রান্ত এবং জাতীয় স্বাধিকার হরণের কারসাজি দুশাতঃ দু'পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু

"লিয়াকৎ আলির পর (পাক) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেন : বাংলাভাষা লেখা হবে আরবী হরফে। অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা তো দূরের কথা, বাংলাকে আর বাংলাই রাখা হবে না। মাথা কেটে মাথা ব্যথা দূরে করে দাও—ফজলুর রহমানের সহজ বুদ্ধি (?) অতি সহজেই ছাত্র-জনতার নিকট বোধগম্য হলো। আবার প্রতিরোধ।......

'আরবী-হরফে-বাংলার প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে অসন্তোষ তখনও স্তিমিত হয়নি। ঢাকায় নিখিল পাকিস্থান মুসলিম লীগের অধিবেশন। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫২। সভাপতির ভাষণে (পাকিস্থানের) প্রধান-মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা।" (১৪)

১৯৪৮এর ১১ই মার্চ। ১৯৪৮এর ১৫ই মার্চ। তারপর আবার ১৯৫২এর ২৬এ জানুয়ারী।

"মাত্র চারদিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ ধর্মঘটের আয়োজন করেন, পুরাতন সংগ্রাম পরিষদকে সক্রিয় করে তোলেন এবং ব্যাপক ভিত্তিতে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য সর্ব-দলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন।" (১৫)

খাটনাপল্লী : ওঁদের রক্ত লেখায় :

৩০এ জানুয়ারী ১৯৫২। ছাত্ররা ক্লাশে যোগ দেন না। বিকেলে ডিস্ট্রিক্ট বার লাইব্রেরী হলে আতাউর রহমানের সভা-পতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি

(১২) এখন লোকসংখ্যা দাবী করা হয় সাড়ে সাত কোটি। ঝড় ও একতরফা রণের সংহার শেষে কমসেকম ৫০ লক্ষ বাদ দিয়ে সাত কোটি।

(১৩) (১৪) (১৫) খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা, 'যেন ভুলে না যাই,' একুশে ফেব্রুয়ারী, পৃঃ ২০৯—২১৩

কমিটি গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুব লীগ, খিলাফতে রব্বানী, ছাত্র লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি এই কমিটিতে নেওয়া হয়। কাজী গোলাম মাহবুব কমিটির আহবায়ক মনোনীত হন।

"এ কমিটিতে ছিলেনঃ আবুল হাশেম, আতাউর রহমান কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, ওলী আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নওয়াজ খান। (১৯৪৮ সালের আন্দোলনের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেলে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাস থেকে তিনি জেল খাটছেন) কমিটি প্রথম সভাতেই স্থির করে, সভা-শোভাযাত্রা ও হরতালের মাধ্যমে সারা প্রদেশে ২১এ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পালন করা হবে।"

যাতে এই কর্মসূচী সফল হয় সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন, শোভাযাত্রা ও ছাত্র-জনতার মিলিত সভানুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য ছাত্ররা ১১ই ও ১৩ই পতাকা দিবস পালনের সিদ্ধান্তে আসেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী অসাধারণ সাফল্যের পাল ফেলে গেল। "স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেমে পড়ে। পুলিশ ঐদিন কোন বাধা দেয় নি। সব-কিছু শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানী ছাত্র-জনতার মিলিত সভায় বক্তৃতা দেন।"

পতাকা দিবস দুটিও শান্ত ছিল।

ধর্মের অজুহাতে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্থান অবজার্ভারের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক আবদুস সালামকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

২০এ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ছটায় ১৪৪ ধারা জারী করা হল। থমথমে জনপদ, অন্তরের আগ্নেয়গিরিতে ক্ষোভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলে জরুরী সভা। বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ মিলেছেন ফজলুল হক হলে।

"পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য জনাব আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদও এক বৈঠকে মিলিত হলো।......অধিকাংশ সদস্যই পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দিলেন।......ছাত্র প্রতিনিধিগণ ছাত্রাবাসের সভাগুলোতে ব্যস্ত।"

সচরাচর যা হয়। নেতৃত্বে দ্বিধা জাগে। "আমরা যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করি তাহলে দেশে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে সরকার জরুরী অবস্থার অজুহাতে সাধারণ নির্বাচন বাতিল করে দিতে পারে। আমরা সরকারকে সে সুযোগ দিতে চাই না। বোঝা গেল, ত্রাস নেতৃত্বের মধ্যে আর নির্বাচনের লাড্ডু গড়ে খালি পড়বার ভাবনা। সাধারণের অন্তস্তল পর্যন্ত নেতৃত্বের দৃষ্টি প্রায়ই যায় না। যখন যায়, তখনই বিদ্যুতালোক।

এমনি দ্বিধা-জড়িমার মধ্যে "এলো দুই জন ছাত্র প্রতিনিধি ঃ ছাত্রগণ আগামীকাল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। এটা ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত। ২১এ ফেব্রুয়ারী ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।"

বুদ্ধের দু'পা পিছিয়ে ঃ এক্ষেত্রে জ্ঞানবৃদ্ধদের কি ভূমিকা হবে? সর্বদলীয় পরিষদের রাজনৈতিক দলভুক্ত বৃদ্ধ সদস্যগণ সিদ্ধান্ত করলেন তাঁরা ছাত্রদের বুঝিয়ে বলবেন। ছাত্ররা না মানলে সর্বদলীয় কমিটি হবে খতম।

"২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে 'বেলতলায়'। তখন ইদানীংকার সর্বজনবিশ্রুত 'আমতলা' খ্যাতি ছিল না। এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমবেত হলো। ছাত্রনেতা গাজিউল হক সে মহতী সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্ররা সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মানতে রাজী হলেন না। তাঁরা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শোভাযাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে কড়া পুলিশ পাহারা।

"এ সময়ে ছাত্রনেতা আবদুস সামাদ একটি আপোষ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ছাত্ররা দশজন দশজন করে বের হবে। এটা এক ধরনের সত্যাগ্রহ। প্রস্তাবটির মাহাত্ম্য হলো এই যে, এতে একদিকে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করা হবে, অপরদিকে ব্যাপক আকারের গোলযোগ এড়ানো সম্ভবপর হবে।

"ছাত্ররা এ প্রস্তাব মেনে নিলেন শেষ পর্যন্ত। দশজন দশজন করে ছাত্ররা বের হতে লাগলেন আর পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। এইরূপ পরিস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। কাঁদানে গ্যাসের এক একটা শেল ছাত্রদের উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিল। ফলে শুরু হলো ইট-পাটকেল নিক্ষেপ। কিছুক্ষণ পর পুলিশবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পরে নিরস্ত্র ছাত্র আর সশস্ত্র পুলিশের এ খণ্ডযুদ্ধের স্থান বদলে গেল। মেডিকেল কলেজ গেট, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হোস্টেল ও তার চারদিকের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল সংঘর্ষ। এসব স্থানে বেপরোয়া লাঠিচার্জের ফলে বহু ছাত্র আহত হলো।

"বেলা তিনটা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন।

"আনুমানিক বেলা ৪টার সময় পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে গুলী চালায়। গুলীতে জব্বর আর রফিকুদ্দিন প্রাণ দেয়।

"এরপর ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। এম-এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আবুল বরকত মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের শেডের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল গুলীর আওয়াজ শুনে। (একটি) বুলেট (বরকতের) উরুদেশ বিদ্ধ করে। প্রচুর রক্তপাতের পর রাত আটটায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়।"

বরকতের মৃত্যুর খবর দাবাগ্নির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত পরিষদে খয়রাত হোসেনের মুলতুবী প্রস্তাব সমর্থন করেন সরকার পক্ষীয় সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ ও সম্পাদক শামসুদ্দিন সাহেব। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন পুলিশের গুলীচালনা সমর্থন করেন। মওলানা তর্কবাগীশ ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন তৎক্ষণাৎ মুসলিম পার্টি থেকে পদত্যাগ করে খয়রাত হোসেনসহ পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। মিসেস আনোয়ারা খাতুন ও মওলানা তর্কবাগীশ পরে আন্দোলনে যোগ দেন। শামসুদ্দিন সাহেব পরদিন পরিষদ সদস্যপদেও ইস্তফা দেন। (১৬)

কবিরউদ্দিন আহমদের 'ইতিহাস' :

"গুলীচালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে-মুখে যেন ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন ঝরে। মেডিক্যাল হোস্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশী হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলী চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবী জানান হয়। ১৪৪ ধারার নাম-নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলীচালনার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট, বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে। শহরের সমস্ত লোক তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে। রাস্তায় আর অলি-গলিতে যেন ঢাকার বিক্ষুব্ধ মানুষের ঝড় বয়ে চলে প্রবলবেগে। মেডিক্যাল হোস্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। মাইক দিয়ে তখন শহীদানের নাম-ঠিকানা ঘোষণা করা হয়। সমস্ত মানুষের মন থেকে যেন তদ-মুহূর্তেই সমস্ত ভয়, ত্রাস মুছে গেছে, চোখে-মুখে সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে।

"বাইরের এমনই তুমুল পরিস্থিতির ঢেউ এসে লেগেছে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যরা নুরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলীচালনার কৈফিয়ৎ দাবী করেন এবং পরিষদ মুলতুবী রাখার দাবী জানান। নুরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'কয়েকজন ছাত্র গুরুতররূপে আহত হয়েছে শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি। আমাদেরকে ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না। পরিষদ কক্ষেই এমনি জঘন্য মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ উঠলো। লীগ পরিষদ দলের জনাব তর্ক-

---

(১৬) একুশে ফেব্রুয়ারী, পৃঃ ২১০—২১৬

বাগীশ বলে উঠলেন, "আমাদের ছাত্রগণ যখন শাহাদাৎ বরণ করছেন তখন আমরা আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাস্ত করব না।"—এই বলেই তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে এসে ছাত্রদের মাইকে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের সপক্ষে বক্তৃতা করলেন।"

আরও এক রিপোর্ট :

২১এ ফেব্রুয়ারী ভোর থেকেই ভাষা সংগ্রাম কমিটির স্বেচ্ছাসেবকেরা পথে পথে টহল দিতে লাগলেন। দোকান পাট নামে মাত্র খুলেই ঝাঁপ ফেলল। রাজপথ যানবাহন শূন্য। স্কুল কলেজ বন্ধ। পথচারী নগণ্য।

বেলা ১০টা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীরা এসে সমবেত হলেন। অ্যান্টি-রায়ট ব্ল্যাকমেরিয়া গাড়ী নিয়ে রাইফেল-ধারী বিরাট পুলিশবাহিনী অদূরে অপেক্ষমান।

বেলা ১২টা। ১০ জন ছাত্রের একটি দল আইন অমান্যে বেরোলেন। ব্ল্যাক-মেরিয়া তাঁদের তৎক্ষণাৎ তুলে নিল। নিয়ে গেল লালবাগ থানায়। ছাত্রদের দলের পর দল। যেন অশেষ। হয়রান পুলিশ এর শেষ দেখার জন্য লাঠি চালালো। নিষ্ফল। কাঁদনেগ্যাস ছাড়ল। ছাত্র-জমায়েত বুঝিবা ছত্রভঙ্গ হল।

বেলা ২টা। আবার ছাত্র-জমায়েত হল। মেডিকাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, সলিমুল্লা হল—চারদিকের স্রোত এসে জমল। স্রোত নয় উথালপাথাল বন্যা। আর ছোট ছোট দল নয়, অবিচ্ছিন্ন ধারা। পুলিশ বেষ্টনী বিপর্যস্তপ্রায়।

পুলিশের শেষ মারণাস্ত্র। গুলী। চলল। বেপরোয়া।

বেলা ৩।।টা। গুলীবিদ্ধ ১৯টি দেহ পড়ল লুটিয়ে। আবদুল জব্বর, রফিক উদ্দিন নিঃশেষ প্রাণে ঘটনাস্থল রাঙিয়ে দিয়ে গেল। আবুল বরকত হাসপাতালে' মহাপ্রস্থানের পথে নিঃসংশয়।

চারশ' লোক হাসপাতালে। পুলিশের নির্বিচার শিকার।

অদূরে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ। বাজেট সেসান। বিরোধীদলের মনোরঞ্জন ধর ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিবাদ করে বললেন, আমাদের ছেলেদের যখন রক্ত ঝরছে তখন আইনসভার অধিবেশন চলতে পারে না। মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মৌলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ দাবী জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে ঘটনাস্থলে যেতে হবে। নুরুল আমিন বললেন, আমরা আবেগে বিচলিত হব না।

কংগ্রেস সদস্যরা প্রথম, পরে মৌলানা তর্কবাগীশও সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

তারপর এবং তারপর :

২২এর প্রভাতী কাগজে হতাহতের সংখ্যা একটা পাওয়া গেল। নিহত [illegible], আহত ৩০০, গ্রেপ্তার ১৮০।

ছাত্রদের মাইকগুলো জেগে উঠেছিল ভোরবেলাতেই। সংগ্রাম। আহ্বান।

গুলী চালানোর সংবাদ ঢাকা শহরেই শুধু ঘুরে ফেরে নি, শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে গেছে। শহরের দোকান-পাট গাড়ী-ঘোড়া, অফিস-আদালত আপনা-আপনি বন্ধ। থেমে নেই শুধু শহীদদের উদ্দেশে 'গায়েবী জানাজায়' শরিক হবার জন্য লোকের আনাগোনা। শহীদদের লাশগুলো কোথায় যেন গায়েব করা হয়েছে। সমগ্র শহর তুলে দেওয়া হয়েছে মিলিটারীর হাতে। কিন্তু গায়েবী জানাজায় অংশ নেয় কয়েক লক্ষ লোক। এতবড় জনসমাবেশ ঢাকায় এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত তিল ধারণের স্থান ছিল না।

জানাজা-শেষে তেমনি বিশাল এক জনসভা হয়। সভাশেষে তেমনি বিশাল এক মিছিল বেরোয়। লক্ষাধিক জনতার মিছিল। সীমাহীন স্পর্ধায় পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করতে চেয়েই ক্ষান্ত হয় না, মিছিলের মাঝখানে লাঠি চালায়, তাতে ফল না পেয়ে আবারও গুলী চালায়।

মিছিল চলবেই :

হাইকোর্টের সামনে এই গুলীচালনার ফলে হাইকোর্টের কেরাণী সাফউর রহমান শহীদ হন। কিন্তু—

> "আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
> নূতন সূর্যশিখা জ্বলবেই।
> চলবেই চলবেই
> আমাদের সংগ্রাম চলবেই।"
>
> —আবু জাফর

মিছিলের মাঝখানে জনতা আঘাতে ছত্রভঙ্গ হলেও পুরোভাগের জনতার মিছিল এগিয়ে যায়, স্টেশন ও নবাবপুর হয়ে এগোতে থাকে। সদর ঘাটে এলে আবার আঘাত পড়ে মিছিলের ওপর। উন্মত্ত পুলিশ। মিছিলের অনেকেই আহতাবস্থায় পড়ে রইল রাস্তার পাশে' তবু মিছিল এগিয়ে চলে। মিটফোর্ড হয়ে চকবাজার দিয়ে মেডিকাল হোস্টেলে আসে।

হ্যাঁ, আরও মিছিল চলেছে; গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসা স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল—মাঝি-মাল্লা, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-শিক্ষকের আপনাআপনি গড়ে ওঠা, চলে-আসা মিছিল। আপন গতিবেগেই।

সকাল ৯টা নাগাদ জনসাধারণের এক বিরাট অংশ 'মর্ণিং নিউজ' সংবাদপত্র অফিস জ্বালিয়ে দেয়। 'সংবাদ' অফিসের দিকেও যাচ্ছিল সেনাবাহিনী বেপরোয়া গুলী চালায়। অনেক হতাহত শাসক-মণ্ডলীর রক্ত-তৃষ্ণা মিটোয়। মর্ণিং নিউজ লিখেছিল, এ আন্দোলন ভারতীয় দালাল ও হিন্দুদের।

বিকেল তিনটের এই রক্ত পিচ্ছিল পথ দিয়েই পরিষদ সদস্যরা বাজেট অধিবেশনে আসেন। কিন্তু সরকারকে গণ-দেবতার কাছে নতিস্বীকার করে বাংলাকে পাকিস্থানের অন্যতর সরকারী বা রাষ্ট্র-ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার সুপারিশ করতে হয়।

তৃতীয়দিন গণ-অভিব্যক্তি অপেক্ষাকৃত শিথিল হয়ে আসতে পুলিশী তৎপরতা বেড়ে যায়। নাজিরাবাদে লাঠিচালনা ছাড়া দৃশ্যতঃ তাদের ক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকলেও গোপন পথে তারা ছিল সক্রিয়। ছেলেদের সব মাইক কেড়ে নেওয়া হল, ধড়পাকড় চলল ব্যাপক। গ্রেপ্তার হলেন মনোরঞ্জন ধর, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীন্দ্রনাথ সেন, মৌলানা আবদুর রশিদ চৌধুরী, আবুল হাশেম, খয়রাত হোসেন, অধ্যাপক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, হামিদুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, গোবিন্দলাল ব্যানার্জি প্রমুখ। মওলানা ভাসানী ঢাকা থেকে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে গেলে সেখান থেকে তাঁকে ধরে এনে ঢাকা জেলে রাখা হয়। ছাত্রাবাসগুলো হামলা চালিয়ে বহু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শহীদ মিনার :

মেডিকাল কলেজের ছাত্ররা আবুল বরকত যেখানে খুন হয়েছিলেন সেখানে রাতারাতি এক শহীদ মিনার তৈরী করেছিলেন। পুলিশ ২৪এ ফেব্রুয়ারী সেটিকেও ভেঙে দেয়। শহীদ শফিকুর রহমানের বাবাকে দিয়ে সে মিনারের উদ্বোধন হয়েছিল। যতক্ষণ স্মৃতিসৌধটি ছিল লোকে এসে শ্রদ্ধা জানাতে ভীড় করত, এই ছিল কর্তৃপক্ষের অস্বস্তির কারণ।

২৫এ ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ দিবস পালনের কথা ছিল। সেদিনই এক সরকারী আজ্ঞায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৫ই মার্চ দেশব্যাপী শহীদ দিবস পালনের ঘোষণা হয়। সর্বদলীয় কর্মপরিষদ দাবী করেন আন্দোলনে সর্বমোট ৩৯ জন শহীদ হয়েছেন। কিন্তু এই দিবসটি ঢাকা শহরে সফল হয়নি হয়েছিল মফঃস্বল অঞ্চলে। কর্মপরিষদে ৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল। ২৭এ ফেব্রুয়ারী ৯ জন আত্মগোপনকারী কর্মকর্তার মধ্যে পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছিল।

তবু সারা প্রদেশের ভাষা-দাবীকে উপেক্ষা করতে না পেরে সরকার এক ভুয়া' তদন্ত কমিশন গঠন করেন। সর্বদলীয় কর্মপরিষদ এ কমিশন বর্জন করেন।

মনে হয়েছিল, ১৯৫২এর বাকি দিন-গুলোতে বুঝিবা ২১এ ফেব্রুয়ারী বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু ১৯৫৩তেই ২১এ ফেব্রুয়ারীতে তার অমর প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল; সারা প্রদেশে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটে ১৯৫২এর হত্যাকাণ্ড নিন্দিত হল, জনতা শপথে কঠিন হল।

খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা দাবী করেছেন, "এ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে দেখা যায়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়। দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্রী (১৬) সংগ্রাম পরিষদের এক তরুণ সদস্যের কাছে নুরুল আমিন পরাজয়বরণ করেন।

"প্রকৃত বিচারে দেখতে গেলে, এ আন্দোলনের সাফল্যজনক ফলশ্রুতি হলো ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র। কারণ, এ শাসনতন্ত্রেই বাংলাকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।"

উল্লেখযোগ্য যে, আন্দোলনকালে ফজলুল হক প্রমুখ ৪০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন ঃ "পূর্ব পাকিস্থানের অধিবাসীরা একটি বিদেশী ভাষা চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা কোনো-ক্রমেই মেনে নেবেন না।"

নুরুল আমিন সেদিন থমকে গেছলেন কিন্তু চিরদাস তিনি এখন পুরোদাসত্ব করছেন পাকিস্থানে।

১৯৫২ থেকে ১৯৭২ ঃ

কুড়িটা বছর। জাতির দীর্ঘসাধনার সংগে তুলনা করলে দীর্ঘকাল নয়। ১৯০৫-এর বিস্ফোরণ-সাফল্য ঘটেছিল ছ'বছরে, একটানা ছ'বছর, এক অখণ্ড আত্মনির্ভর নেতৃত্ব। কিন্তু সে নেতৃত্বকাল ও ভূমিকায় সীমাবদ্ধ। তাই তার পূর্ণাহূতি হয়নি। কিন্তু কুড়ি বছরের সাধনা, আকুতি, বৈষয়িক জীবন-যন্ত্রণা সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে; পূর্ব পাকিস্থানের বন্দীকারা থেকে বেরিয়ে বাঙলাদেশ—স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কি জীবনী-শক্তিবলে এটি হল? তা পাকিস্থান-কারারুদ্ধ বাঙলাদেশের সাহিত্যে বিস্তারিত —প্রবন্ধে, কবিতায়, নাটকে।

মুসলিম নাম-মাহাত্ম্যে বিদ্রোহী কবি নজরুল কার্পণ্যের সংগে গৃহীত হলেও তাঁকে সংস্কারের চেষ্টা কিছু কম হয়নি। বড়জোর তাঁকে গীতিকার হিসেবে সীমাবদ্ধ-ক্ষেত্রে মানা যেতে পারে বিদ্রোহী কবি হিসেবে নয়। এই ছিল পাকিস্থানী শাসক-গোষ্ঠীর খবরদারী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনক্রমেই না।

সরদার ফজলুল করিম 'নজরুল জন্মোৎসব প্রসংগে' খুব স্পষ্ট করে এই মনোভাবের নিন্দা করেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বাংলাসাহিত্যের দু'জন কবি ও স্রষ্টা। কিন্তু নজরুলকে আমরা জাতীয়ভাবে জাতীয় কবি ঘোষণা করার চেষ্টা করি, অপরজনকে বিজাতীয় এবং অ-স্মরণীয় বলে আকারে-ইঙ্গিতে ধোঁকায়-ধমকে বুঝতে প্রয়াস পাই। নজরুলকে একদিন যারা কাফের বলেছিল আজ তারাই তাকে মুসলমান বৈ অপর কিছু স্বীকার করতে নারাজ। হিন্দু কিংবা মুসলমান নির্বিশেষে নজরুল আঘাত করেছিলেন সমাজের যা-কিছু স্থবির সংস্কার ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। সে কারণে স্বাভাবিকভাবে হিন্দু কিংবা মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের স্থবিরতা, সংস্কার এবং সংকীর্ণতার প্রতিভূ সেদিন নজরুলের উপর আঘাতের খড়্গ হেনেছিল।

"কবির আদর্শকে আমাদের সমাজ-জীবনে প্রয়োগের কথা আদৌ চিন্তা করিনে। কবির গান গাইলে যে-পদ আমরা পছন্দ করিনে সে-পদ আমরা কেটে দি। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন' একথা উচ্চারণ করতে আজো আমাদের বাধে। নজরুলের গজল, হামদ ও নাতকে যখন প্রশংসা করি, তখন সে প্রশংসা কৃত্রিম। কেননা, নজরুলের সুরের জগৎ থেকে শ্যামাসঙ্গীত এবং কীর্তনকে নির্বাসন দেওয়া আমাদের জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করি। অর্থাৎ নজরুলকে শত খণ্ডে খণ্ডিত করে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সংগতির সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেটুকু আমরা যেমনভাবে ব্যবহার করতে পারি, সেটুকু আমাদের যে স্বার্থসাধন করে সেটুকু আমরা সেই স্বার্থে ব্যবহার করবো।"

খাস নজরুলের যেখানে এই দুর্দশা সেই মানসিকতা বা মুসলিম শুচিবাইয়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর তো দূরস্থান, রবীন্দ্রনাথও যে অপাঙক্তেয় হবেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু কেবল নির্ভেজাল নজরুল নন, রবীন্দ্র-বিদ্যাসাগর এবং সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যই যে বাঙলাদেশের সাহিত্যিকেরা উদ্ধার করতে পেরেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁদের খাটি বাঙালিয়ানার জেদ ও অটল অটুট নিষ্ঠা। সরদার করিম ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছিলেন ঃ 'নজরুলকে উদ্ধার করতে হবে বার্ধক্যের জরা এবং মৃত্যুর হাত থেকে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাঁর সৃষ্টির বর্ণাঢ্যে, বাঙ্গালীর সর্বধর্ম ও সংস্কৃতির যে ঐতিহ্যে অতুলনীয়ভাবে কবি নিজের জীবনে সম্পৃক্ত করেছেন সেই ঐতিহ্যে, পটভূমিতে—সামগ্রিক শক্তি এবং মহিমায় তরুণদের মধ্যে এবং জনতার মধ্যে।"

নির্বিশেষ রবীন্দ্রনাথ ঃ

রবীন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে ছিলেন নির্বিশেষ, সংগীতে গল্পে নাটকে প্রবন্ধে। একমাত্র অপরাধ তিনি হিন্দু বা অমুসলমান এবং মানুষের কথা বলেছেন। পাকিস্থান মানুষকে অমানুষ করবার ধর্ম নিয়েছিল বলে, রবীন্দ্রনাথের অনাদর ছিল। কিন্তু ঐ পাকের যে বাঙালী মনীষারা জন্মেছিলেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের জন্য আকুল হলেন।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্থানে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে শেষ ব্যাপক হিন্দু নিধন পর্বের চার বছর পরে) ঢাকায় পাঁচজন মহাকবির স্মরণোৎসব উপলক্ষে ইসলামিক একাডেমির ডিরেক্টার আবুল হাশেম রবীন্দ্রনাথ প্রসংগে বলেন ঃ

"যাঁহারা ইসলাম ও পাকিস্থানী আদর্শের নামে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সঙ্গীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন, তাঁহারা শুধু মূর্খই নহেন, দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিতও। তাঁহারা না বোঝেন ইসলাম। তাঁহারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া রবীন্দ্র-বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। বাস্তবে রবীন্দ্র-বিরোধিতা একটা বড় রকমের জুয়াচুরি।"

"যে জাতি নিজের ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়, সে জাতির ভবিষ্যৎ কখনই উজ্জ্বল হইতে পারে না। বাংলাসাহিত্যের গত একশত বৎসরের সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া বাংলাভাষী মানুষের বিকাশ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। যাহারা আমাদেরকে গত একশত বৎসরের বাংলাসাহিত্যের ঐতিহ্য হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে তাহারা চণ্ডীদাস হইতে সুরু করিয়া বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, শরৎ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বর্জনের ওকালতি করে।......শুদ্ধ বাংলাই হইবে বাংলাসাহিত্যের মাধ্যম, অশুদ্ধ বাংলা নহে। এইসব আদর্শবাদীরা শুদ্ধ বাংলাকে হিন্দুয়ানী ও অশুদ্ধ বাংলাকেই মুসলমানী বাংলা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে।

"......রবীন্দ্র-চিন্তার সাথে ইসলামের চিন্তার কোন বিরোধ নাই। রবীন্দ্রসাহিত্য যদি রবীন্দ্রনাথের বদলে কোনো মুসলমান রচনা করিতেন, তবে এইসব পাক্কা মুসলমানরাই তাহাকে নিয়া নাচানাচি সুরু করিয়া দিতেন এবং বলিয়া বেড়াইতেন—ইহাই আসল ইসলামী সাহিত্য এবং ইহাতে পাকিস্থানী আদর্শের সীতাকারের প্রতি-ফলন ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাই ইসলাম-বিরোধী নয় এবং প্রতিটি রচনাই জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য যে ॥

(১৬) যিনি এখন বাঙলাদেশ থেকে পলাতক ও জুলফিকার আলির অনুগ্রহ-ভাজন।

"রবীন্দ্র-সাহিত্যে মুসলিম সমাজের চিত্র কম প্রতিফলিত হইয়াছে ইহা সত্য। তবে এই দুর্বলতার জন্য তাঁহাকে বা অপর কাহাকেও দোষ দেওয়া— চলে না। কারণ মুসলমান সমাজকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার দায়িত্ব মুসলিম সমাজ সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচিত মুসলিম সাহিত্যিকদের। রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের চিন্তা করিতেন, ইহা কোন অন্যায় নহে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের যুগে ভারতীয় মুসলমানরাও পাকিস্থানের কল্পনা করতেন না। মহারাষ্ট্রীয় নেতা শিবাজী ও রাজপুত নেতা রাণা প্রতাপ সিংহ প্রমুখ জাতীয় বীরদের বন্দনা করা কোন অন্যায় নহে। দেশ-প্রেমিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সকলেরই কর্তব্য।" (১৭)

কি নিদারুণ কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্থানের বাংলাভাষাভাষীরা বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতি হারিয়ে আবার নতুন করে ফিরে পেয়েছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় এবং এই কারণে বাংলা-ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আমাদের চাইতেও ও'দের কাছে এত বেশী সমাদরের। আমরা সহজে পেয়েছি।

"১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট বহু-দিনের গোলামীর পর যখন আজাদীর সুপ্রভাত হল," লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডঃ শহীদুল্লাহ "তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে, এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে।"

"কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নূতন নেশা আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা-ভাষায় অপ্রচলিত আরবী-পারসী শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলাভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তাঁরা এইসব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন যে, প্রকৃত সাহিত্য-সেবা—যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হতে পারে, তার পথে আবর্জনাস্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদা-জল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী উস্কানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা এমনকি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্থানের বিরুদ্ধে

(১৭) কম্পাস, ২৭ জুলাই, ১৯৬৮

জনাব আহমেদুর রহমান
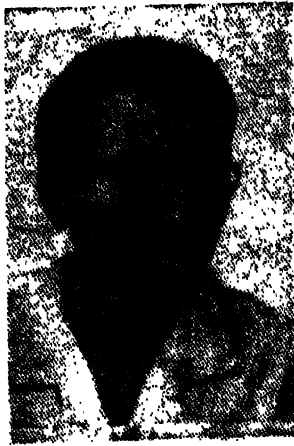
ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন।......করাচীর তাঁবেদার লীগ গভর্ণমেন্ট বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করা দূরে থাক, বাঙ্গালী বালকের কাঁচ মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবী হরফে বাংলাভাষা লেখার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টার সহায়তা করলেন।

আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি 'নূরনামার' লেখক নোয়াখালির সন্দ্বীপ নিবাসী আবদুল হাকিমের একটি কথা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোককে শুনিয়ে রাখছি:—

'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সেসব কাহার জন্ম নির্ণএ না জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা জার মনে না যুআএ।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না জাএ।।
মাতাপিতামোহো ক্রেমে বঙ্গেত বসতি
দেশি ভাষা উপদেশ মন হিতঅতি।। (১৮)

একথারই প্রতিধ্বনি ক'রে আহমেদুর রহমান লিখেছিলেন :

আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া হলে আর কোন কিছুই কেড়ে নেওয়ার বাকী থাকবে না। আমরা তাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলাম— ছাত্রের পাশে শিক্ষক, শিক্ষকের পাশে শ্রমিক, শ্রমিকের পাশে বুদ্ধিজীবী, আমরা দাঁড়িয়েছিলাম একের পিছনে অন্য, একের পাশে অন্য। পূর্ব বাঙলার জনসাধারণ গড়ে তুলেছিল প্রবল প্রতিরোধ। আর সেই সংঘবদ্ধ শক্তির নিকট পরাজিত হ'ল প্রতিক্রিয়ার শক্তি। আমরা রক্ত ঝরালাম, রক্তের বিনিময়ে রচিত হলো আমাদের জয়ের পথ।'

(১৮) ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্থান বাংলা-সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ ; পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সেমিনার প্রকাশিত স্মরণী।

বলা দরকার, আহমেদুর রহমান ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ২২ মে কায়রোতে এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। সুতরাং তিনি জয়ের পথ দেখে গেছেন, দেখতে পাননি পূর্ব পাকিস্তানের পাঁক থেকে বাঙলা দেশের জন্ম—বাঙালীর চূড়ান্ত জয়। তিনি ১৯৩৭এ কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার সরাইল গ্রামে জন্মেছিলেন। ছাত্র-অবস্থাতেই সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন, ১৯৫৪-তে অধুনালুপ্ত মিল্লাতের সহ-সম্পাদক ছিলেন; তারপর ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক। ১৯৬০-এ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র-জীবনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় ১৯৬২-তে তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া বেরোয়, তিনি আত্মগোপন করেন। এমনই এক সংগ্রামী বাঙালী লিখছেন সেই কঠিন জয়যাত্রার কথা :

'একুশে ফেব্রুয়ারী তাই শুধু আত্ম-তর্পণেরই দিন নয় এদিন হিসাব মিলাবার দিনও বটে। বেদনার প্রচ্ছায়ায় বসে আজ আমাদের জয়ের হিসাব করতে হবে, হিসাব মিলের দেখতে হবে বিজয়রথে অগ্রগতি সাধিত হলো কতদূর।...আজো দেখি আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর মাঝে মাঝে নেমে আসে পরিকল্পিত হামলা।'

না, আজ আর সে আশঙ্কা নেই। ১৯৬৫-তে রহমানের মৃত্যুর পর প্রতি বছর ২১এ হিসেব মিলিয়ে এসেছে পূর্ব পাকি-স্থানের বাঙালীরা; ছ' বছর পর এক সূর্যোদয়ে হিসেব মিলে গেছে; বাঙালীর বাঙলাভাষীর এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে; তার নাম বাঙলাদেশ। আজ আর কুণ্ঠিত, শঙ্কিত অথবা খণ্ডিতমনে প্রস্তুত বীরের পদচারণা নয়। আজ স্বাধীন বাঙলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, ফিরে পাওয়া গেছে সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে। ফিরে পাওয়া গেছে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে সঙ্গে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি—তার কথা নয়, তার সুর। শুধু গুটিকয়েক বাংলা সাইনবোর্ড রাস্তাঘাট মোটর গাড়ী হোটেলের সার্টিফিকেটের মুদ্রার ওপর বাংলা ছাপ নয় এবং একটি রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গে বাংলা, ধ্বনিঃ জয় বাংলা! জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা!

তাই, আজ এ সঙ্গীতও আমাদের উচ্চারণ করলেন :

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি'

কলকাতাকে ভোলা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। দুঃস্বপ্নের স্মৃতি কিম্বা আনন্দময় বিগত দিনগুলো কেউ ভোলেন নি। বহু বিদেশীকেও সেই একই কথা বলতে শুনেছি।

দু-এক দিনে বা দু-এক সপ্তাহে কলকাতা কাউকে একান্ত করে নেয় না। কলকাতা শহর একবার কাউকে গ্রহণ করলে, তাকে কেউ ছেড়ে দেন না। কিন্তু কলকাতার কাছে গ্রহণযোগ্য হবার ভাগ্য অনেকেরই থাকে না। এটাই বোধ হয় শহরের বড় ট্র্যাজেডি।

কলকাতা এখন মিছিল নগরী। ট্র্যাজিক শহর। রাজনৈতিক ট্র্যাজিডির নাটকে শহর কলকাতা এখন ক্ষতবিক্ষত। তবে পঙ্গু নয়। নাটকের যেমন দৃশ্য পট বদলায় তেমনি কলকাতার ট্র্যাজিক নাটকের দৃশ্য একদিন বদলাবেই। তেমন আশাবাদ আমরা অনেকেই পোষণ করি।

বঙ্গবন্ধুর যেদিন বঙ্গবন্ধু মুজিব দমদমে বিমানে উঠছিলেন তখন বলেছিলেন, কলকাতাকে আমি ভালবাসি, কলকাতার লোকেরাও আমায় ভালবাসেন।

শেখ মুজিবের প্রথম যৌবন কাটে এই কলকাতায়। তখন তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র। রাজনীতিতে হাতে খড়ি এই কলকাতায়। কলকাতার স্মৃতি তাঁর মানসপট থেকে মুছে যাবার নয়। ১৯৪২-৪৬ সালে কলকাতা গরম। '৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, '৪৩ এর দুর্ভিক্ষ, '৪৫ এর আই, এন, এ আন্দোলন, তারপর '৪৬ সালের দাঙ্গা। স্বাধীনতার আগে ঘটনা-বৈচিত্র্যে কলকাতা তখন ভারতের মধ্যমণি। দিল্লী-বম্বে তখন অনেক পেছনে। ঐতিহাসিক দিনগুলোর কথা মনে পড়ায় শেখ মুজিবের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এই সেদিন। এ যাত্রায় তাঁর কলকাতা সফর দুদিন হলেও ঐতিহাসিক। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের কলকাতা দর্শন নয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবারকার কলকাতায় পদার্পণ করলে তিনি সাংবাদিকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন গত এক বছরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কলকাতার ভূমিকা কি ছিল।

বিগত এক বছরে বাংলাদেশে যখন চলছিল পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর উৎপীড়ন তখন বহু রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন এই কলকাতায়। কলকাতার গুরুত্ব শুধু এখানেই নয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিরা এই কলকাতা থেকেই তাঁদের কাজকর্ম চালিয়েছেন। তাঁদের একমাত্র মিশন অফিসও ছিল কলকাতায়। এই মিশন অফিস থেকেই অনুমতি নিয়ে বিদেশী সাংবাদিকেরা যেতেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখতে।

তাই কলকাতা বঙ্গবন্ধু মুজিবের কাছে কেবলমাত্র বিদেশী রাষ্ট্রের একটি শহর বলে মনে হয়নি।

যাঁরাই জনগণের নেতা তাঁরা অনেকটা মাছের মতন। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না তেমনি জননেতারাও মানুষের ভিড় না দেখলে খুশি হন না। মুজিবের বেলায়ও তাই ঘটেছে। নেহেরুকেও যাঁরা জানতেন তাঁরাও জানেন যে নেহেরু জনস্রোতে যেমন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন তেমনি অন্য কোনোখানেই পারতেন না।

৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় মুজিব প্রায় সারাদিন কাটিয়েছিলেন রাজভবনে। সেখানে তিনি সরকারী লাল ফিতের আবেষ্টনে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের জনসমুদ্রে স্নান সেরে যখন তিনি জনতার সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তাঁকে যেমন প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল ততখানি কিন্তু দেখিনি রাজভবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

রাজভবনের সব কটি অনুষ্ঠানই ছিল সরকারী লাল ফিতের বাঁধা। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে গেছেন, আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেছে সরকারী লেজুড়। প্রাণ খুলে মন খুলে আলাপের সুযোগ তিনি পাননি। সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল সোমবারের বুদ্ধিজীবী শিল্পীদের বৈঠকে। বড় হল ঘরটায় বুদ্ধ-অতিবৃদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের বৈঠক ছিল প্রাণহীন। যে মুজিব বাংলা সাহিত্য চর্চা করেন, সে সম্বন্ধে কেউ একটা কথাও বললেন না। সিনেমা-শিল্পীরাও চুপচাপ। কয়েকজন প্রশ্ন তুললেন বাদুঘরের কথা। সেখানে বাদুঘর কেমন চলছে। জীবন যেখানে মুজিব সেখানে। সাহিত্য-শিল্প জীবনের প্রতীক, সে সম্বন্ধে সবাই ছিলেন নীরব। এক অ-বাঙালী ভদ্রলোক প্রশ্ন তুলেছিলেন, বাংলাদেশে অ-বাঙালীদের কি হাল এখন। মুজিবকে বাধা দিয়ে কেন্দ্রমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বলেছিলেন, এটা প্রেস কনফারেন্স নয়। সুতরাং এ প্রশ্ন অবান্তর। চল্লিশটা মিনিট মুজিবের কাটে একঘেয়েমির মধ্যে। মুজিবের ওই বুদ্ধিজীবী-শিল্পী বৈঠকে যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই চিঠিতে স্বাক্ষর করা ছাড়া আর কোনো আঁচড় কাটেন না। তেমন সব ইন্টেলেকচুয়ালদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাদের সরকার। এমন দৃশ্য মুজিব আশা করেননি।

সাধারণত কোনো বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক কলকাতায় এলে তাঁকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মুজিবের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটেছে বিশেষ কারণে। শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে এই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ভারত সরকার। এই নিয়ম ভঙ্গ করে মুজিব একবার ফুস্ করে চলে গিয়েছিলেন সার্কাস এভেন্যুর বাংলাদেশ মিশন অফিসে। কি করে পথচারীরা জেনে গেল মুজিব যাচ্ছেন ওখানে। ব্যস অমনি জনস্রোত ভেঙে পড়ল পার্ক স্ট্রীট থেকে সার্কাস এভেন্যু পর্যন্ত। সন্ধ্যেবেলা বাংলাদেশ মিশনের গেটের সামনে হাজার লোকের ভিড়। তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে এলেন শেখ মুজিব। তাঁর মুখের হাসি ফুটে উঠল। জনতার ভিড় দেখে তাঁর পুরোনো কলকাতার কথা মনে পড়ে গেল।

বাংলাদেশ মিশনের ঘরোয়া পরিবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
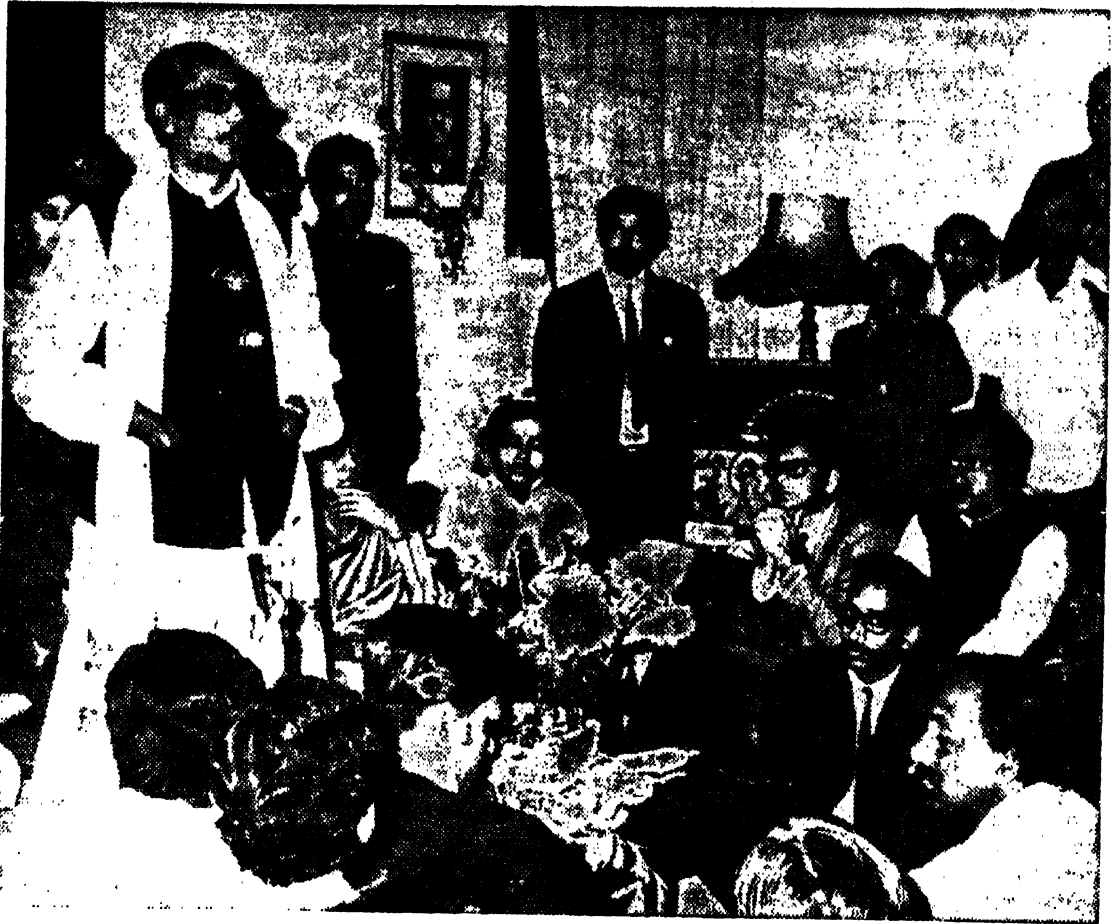
তাই নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সহকর্মীদের সঙ্গে।

বাংলাদেশ মিশনে ছিলেন শেখ মুজিব মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ওই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশের মানুষের ভিড়ে মিশে গেলেন। মিশনের কর্মচারীদের পরিবারের সবাই সেদিন উপস্থিত। সেদিন ওখানে আনন্দ মেলা বসেছিল। ঘরোয়াভাবে সবার সঙ্গে কথাবার্তায় বলেছিলেন—যাই কর না কেন অফিসের আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখ, নিয়মাবর্তী হও।

দুদিনের রাজভবনের রাজকীয় আতিথেয়তা তাঁকে যত আনন্দ দিয়েছিল তার চেয়েও বেশী দিয়েছিল ওই অল্প সময়ের জনতার অভিনন্দন।

রাজভবনে পৌরসংস্থার সম্বর্ধনা সভায় তিনি অনেকের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মিলিত হয়েছিলেন। ওই সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে তাঁকে পাক জঙ্গীশাহীর কুনজরে পড়তে হয়েছিল। তারা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিল তিনি যদি একটা পাকিস্তানের ডিগ্রী নেন তাহলে খুবই ভাল হয়। সে প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, তাঁর প্রথম যৌবনের কলকাতার কথা। প্রথম যৌবনের কলকাতার প্রতি তাঁর যে আন্তরিক টান তা তিনি কখনই ভুলতে পারেন না। বর্তমান কলকাতার জীবনধারা সম্পর্কেও তিনি তাঁর সঙ্গীদের এবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। সেকথা জানিয়েছেন তাঁরই সহকর্মীরা।

রাজভবনে অনুষ্ঠিত প্রেস ক্লাবের সম্বর্ধনায় শেখ মুজিব বলেছেন, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে কলকাতার সংবাদপত্রজগতের ভূমিকা কেউ ভুলতে পারবে না। এখানেও আবার সেই কলকাতা। গত বছরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কলকাতা প্রেস ক্লাবের তাঁবু অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। সে খবরও শেখ মুজিব জেনেছেন। তাই তিনি অতি নম্রভাবে প্রেস ক্লাব ও কলকাতার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর কলকাতা তার ভূমিকা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কলকাতা তার হৃতগৌরব ফিরে পেল। কলকাতায় মুজিবের আগমন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। সে অধ্যায় দুই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের নতুন পদক্ষেপ বলেই অনেকে মনে করছেন।

ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হলেও বহু নেতার দৃষ্টি কিন্তু কলকাতার ওপর আবদ্ধ। জনসাধারণের তো বটেই। রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে বহু মন্ত্রীর যৌবন কেটেছে এই কলকাতায়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও কলকাতাকে আপন বলে মনে করেন। কলকাতা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, দুই বাংলার জনপ্রিয় নগর। পশ্চিম বাংলা 'বিদেশ' হলেও বাংলাদেশের মানুষের কাছে কলকাতা বিদেশ নয়। এমন মনোভাব আমি অনেকের কাছেই শুনেছি। কলকাতা শুধু শেখ মুজিবের প্রিয় নয়, বাংলাদেশের প্রায় ছোট-বড় সবারই প্রিয়।

ঢাকা

'সোনার বাংলা'র রাজধানী

কিষণচাঁদ বর্মন

ঢাকা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের মস্ত রাজধানী। শিক্ষাদীক্ষায় ঐশ্বর্যে, রাজনৈতিক চেতনায়, দেশ সেবায়, এক কথায় সকল বিষয়েই ঢাকার স্থান অতুলনীয়। আজকের মত অতীতেও ঢাকার উত্থান-পতন ঘটেছে। সে ইতিহাস কম চিত্তাকর্ষক নয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সব ইয়োরোপীয় পর্যটক এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের ভ্রমণের বৃত্তান্তে বেঙ্গালা নামে এক বর্ধিষ্ণু নগরীর কথা লিখেছেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ঢাকা ও বেঙ্গালা একই শহর। মোগল সম্রাট জাহাংগীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। রাজধানী স্থানান্তর করার একটি কারণ ছিল, রাজমহলের কাছে গংগার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা হচ্ছিল। তাছাড়া পর্তুগীজ, মগ ও আহোমদের আক্রমণের হাত থেকে বাংলার পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করাও এর আর একটি কারণ ছিল। অবশ্য ইসলাম খাঁর এখানে আসার অনেক আগে থেকেই ঢাকায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বসাকেরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। সম্রাট জাহাংগীরের নামানুসারে ঢাকার নামকরণ হল জাহাংগীর নগর। বুড়ীগঙ্গার তীরে ইসলাম খাঁ বাংলার এই নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় ইসলাম খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর ভাই কাশিম খাঁ কয়েক বছর সুবাদার ছিলেন। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খাঁ ফতেজংগ কাশিম খাঁর জায়গায় বাংলার সুবাদার হলেন। কিন্তু বছর পাঁচেক শান্তিতে কাটাবার পর তিনি বিদ্রোহী রাজকুমার শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলেন। শাহজাহান বেশীদিন ঢাকায় থাকেন নি। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ইসলাম খাঁকে দিল্লীতে উজির নিযুক্ত করলেন এবং পুত্র শাহজাদা সুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠলেন। সুজা সেই বছরেই রাজধানী ঢাকা থেকে রাজমহলে নিয়ে গেলেন। শাহজাদা সুজা দীর্ঘ কুড়ি বছর দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সম্রাট শাহজাহান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলে সিংহাসন নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিরোধ সুরু হয়। সেই সময় আওরংগজেবের সেনাপতি মীর জুমলার কাছে শাহ সুজা পরাজিত হন এবং সপরিবার আরাকানে পালিয়ে গিয়ে সেখানে আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর মীর জুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং তিনি ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে রাজমহল থেকে আবার ঢাকায় বাংলার রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলেন। মীর জুমলার মৃত্যুর পর ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের ভাই ও নুরজাহানের ভাইপো শায়েস্তা খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। শায়েস্তা খাঁর আমলেই ঢাকার সৌভাগ্য রবির উদয় হল। তাঁরই চেষ্টায় ঢাকা ঐশ্বর্যে, সম্পদে, ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। দীর্ঘকাল শাসনের পর ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ অবসর গ্রহণ করলেন এবং কিছুকাল পর আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পর বাহাদুর খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ ও আওরংজেবের পৌত্র আজিম উশ্‌মান ঢাকায় সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আজিম উশসানের সঙ্গে দেওয়ান মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর মনোমালিন্য হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ তখন রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গেলেন। আজিম উশসানকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করা হল। ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী উঠে গেলে ঢাকার শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য একটি নতুন পদের সৃষ্টি হল। পদটির নাম নায়েব নাজিম, বা নবাব নাজিম। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ নবাব বংশের লোকেদের সঙ্গে কিন্তু এই নবাব নাজিমদের কোনো সম্পর্ক নেই এঁরা কাশ্মীরের মুসলমান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী পদ পাবার পর তৎকালীন ঢাকার নায়েব নাজিম নবাব জসারৎ খাঁর শাসন ক্ষমতা লোপ পায়। তাঁর

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের চূড়া

ঢাকার জগন্নাথ হল

মাসহারার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গাজীউদ্দীন হায়দার বা পাগলা নবাব নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে নবাব নাজিমের পদ উঠে যায়। দেনার দায়ে তাঁর সম্পত্তি বিক্রী হয়ে যায়। তারিখ-ই-ঢাকা অনুসারে ঢাকা নগরী চরম উন্নতির সময়ে পশ্চিমে জাফরাবাদ থেকে পোস্তগোলা পর্যন্ত ১০ মাইল ও উত্তরে টংগ নদী পর্যন্ত ১৫ মাইল বিস্তৃত ছিল এবং নগরীর লোক সংখ্যা ছিল ৯,০০,০০০। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নবগঠিত ও অল্পকালস্থায়ী প্রদেশের রাজধানী ছিল। মোগলদের সময়ে মগেরা ২।৩ বার ঢাকা লুণ্ঠন করে। পলাশী যুদ্ধের পর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়ে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা লুণ্ঠিত হয়।

সংযুক্ত বাংলার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শহর ছিল ঢাকা। তারপর দেশ বিভাগের পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী হয়েছিল।

ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। এগুলি প্রত্যেকটিই বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক। অনেকে মনে করেন ঢাকার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ঢাকেশ্বরী নামানুসারেই ঢাকা নাম হয়েছে। প্রবাদ আছে যে, ঢাকেশ্বরী মন্দির মহারাজ বল্লাল সেন নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ঢাকেশ্বরী থেকে ঢাকা কিংবা ঢাকা থেকে ঢাকেশ্বরী কোনটি হয়েছে তা বলা শক্ত। অনেকে আবার বলেন যে, সতীদাহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্নভিন্ন হলে তাঁর মাথার মুকুটের 'ডাক সাজের' কিছুটা অংশ এখানে পড়েছিল। সেই 'ডাক' পতিত হওয়া স্থানটি উপপীঠ বলে গণ্য হয় এবং ত থেকেই ঢাকা নামের উৎপত্তি। অন্য মতে ঢাকেশ্বরী দেবী ছিলেন ঢাকা বা গুপ্ত। মহারাজা বল্লাল সেন তাঁকে আবিষ্কার করেন। পূর্বে 'ঢাকা' ছিলেন বলেই তার নাম হয় ঢাকেশ্বরী। আবার কেউ কেউ বলেন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খাঁ যখন রাজমহল থেকে এখানে রাজধানী উঠিয়ে আনেন তখন তাঁর শিবির থেকে ঢাক বাজানো হয়। এই ঢাকের বাদ্য যত-দূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল ততদূর রাজধানীর সীমা নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং এই শহরের নাম হয়েছিল ঢাকা। কারুর মতে ঢাক নামে গাছ থেকেই ঢাকা নাম হয়েছে কিন্তু আজকাল ঢাক গাছ ঢাকা শহরে বিশেষ কেউ দেখেছেন বলে শোনা যায় না।

মুর্শিদাবাদের মত ঢাকাও বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং

ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

ঢাকার শহীদ সরোবর্দীর কবর
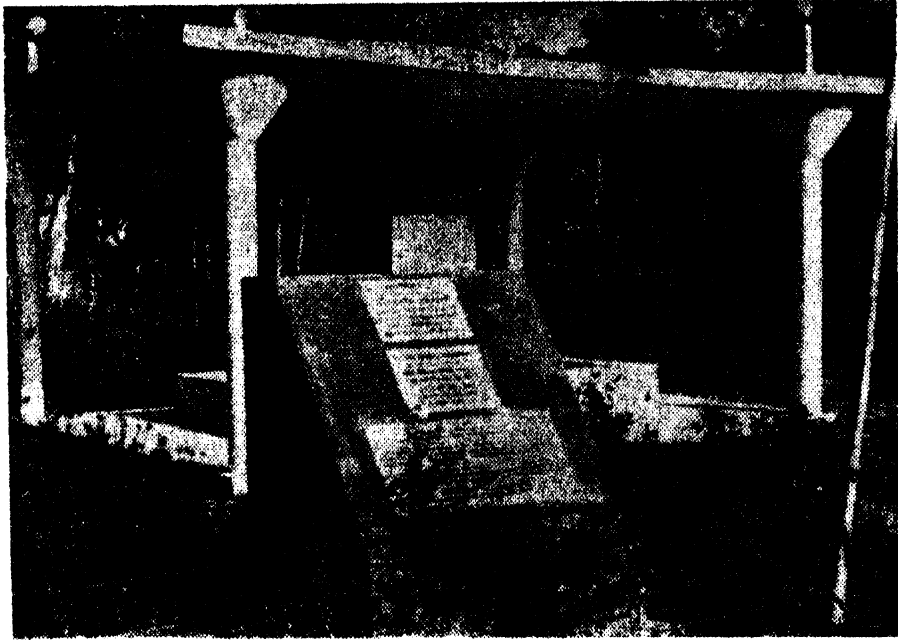
এখানেও ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ বণিকের দল কুঠি স্থাপন করেছিল। পর্তুগীজেরাই সর্বপ্রথম ঢাকায় এসেছিল। মোগল সম্রাট আওরংগজেবের আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঢাকায় কুঠি স্থাপন করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়েছিল।

ঢাকার কথা উঠলে ঢাকাই মসলিনের কথা আপনা থেকেই এসে পড়ে। ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি প্রাচীন গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মসলিন ছিল এক অতি মহার্ঘ বিলাসের সামগ্রী। প্লিনির লেখা থেকে জানা যায় প্রাচীন রোমের মেয়েদের কাছে ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। ঢাকা, সোনারগাঁও ডেমরা প্রভৃতি জায়গায় অতি সূক্ষ্ম মসলিন তৈরি হত। বর্ষাকালই মসলিন বোনার প্রশস্ত সময় ছিল। মসলিনের জন্য ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে সূক্ষ্ম সুতো কাটার নিয়ম ছিল। মসলিন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শোনা যায় যে মাদ্রাজ প্রদেশের মসলিপত্তন বন্দর থেকে ইয়োরোপীয় বণিকেরা এই কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন। এই বন্দরের নাম থেকেই মসলিন নাম হয়েছে। ভ্রমণকারী টাভার্ণিয়ার লিখেছেন যে ইরানের দূত মহম্মদ আলি বেগ ভারত থেকে ফেরার সময় শাহকে উপহার দেবার জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানি মসলিন একটি ক্ষুদ্র নারকেলের খোলের মধ্যে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এক গজ চওড়া এবং কুড়ি হাত লম্বা একটি মসলিনের কাপড় একটি আংটিটির মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে অনায়াসে এদিক থেকে ওদিকে টেনে বের করা যেত। মেপে দেখা গেছে এক পোয়া ওজনের মসলিনের কাপড়ের সুতো লম্বায় ২৫০ মাইল দীর্ঘ! তখনকার কালে একটি মসলিনের দাম ছ-সাত হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল বলে শোনা যায়। কথিত আছে সম্রাট আওরংগজেবের এক কন্যা সাত ফেরতা দিয়ে আবরোয়ান মসলিন পরে পিতার সামনে উপস্থিত হলে তাঁকে লজ্জাহীনা বলে সম্রাট তিরস্কার করেন। নূরজাহান বেগম ঢাকাই মসলিনের অত্যন্ত সমাদর করতেন। সম্রাট শাহজাহান ও আওরংজেবের আমলে রাজ অন্তঃপুরে মসলিনের বিশেষ প্রচলন ছিল। মসলিন যাতে ভারতের বাইরে না যায় এ সম্বন্ধে সম্রাটেরা খুব সতর্ক ছিলেন।

ঢাকাই মসলিনের নানা নাম ছিল যেমন, ঝুনা (অর্থ সূক্ষ্ম দেখতে মাকড়সার জালের মত), শবনম্ (অর্থ সান্ধ্য শিশির-সিক্ত অবস্থায় ঘাসের ওপর বিছানা থাকলে এর অস্তিত্বই টের পাওয়া যেত না, আব-রোয়ান (অর্থাৎ জলের স্রোত—জলের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে পারত)। আরো বহুবিধ ঢাকাই মসলিন ছিল, তাদের নামও বকমারী—সংগতি, সরবতী, রং, নয়নসুক মলমল খাস, খাসা ইত্যাদি। নানা রকম ডুরে কাপড় ছিল—রাজকোট, কলাপাত, পদ্মদশা-হীরার ইত্যাদি। রঙীন মসলিনের নাম ছিল চারখানা, এবং বহু নাম—কবুতরখোপা, শাহজাদার নন্দনশাহী, আনার-দানা প্রভৃতি। বুটিদার ও ফুল তোলা মসলিনের নাম ছিল কসিদা। এরও নানা নাম—নৌবত্তি, উরমী, দোছাক প্রভৃতি। বিচিত্র কারুকার্যখচিত মসলিন বা জাম-দানীও ছিল বহুবিধ যেমন, তোরদার, বুটিদার, তেরছা, পান্নাহাজার, মেল, ছাড়িয়াল, দুবলীজাল ইত্যাদি। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন দেশের জন্য ঢাকায় প্রায় ২৮,৫০,০০০ টাকার মসলিন কাপড় বিক্রি হয়েছিল বলে শোনা যায়।

ঢাকায় ছাড়া আর কোথাও মসলিন প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাপড় ধোলাই করার ব্যবস্থা ছিল না। এই পদ্ধতি ঢাকার কারিগররাই জানতেন। ঢাকাই শাড়ী ঢাকাতেই সবচেয়ে ভাল ধোলাই হত। শাঁখ দিয়ে মার্জনা করে ঢাকার কারিগরেরা শাড়ী উজ্জ্বল মসৃণ করে তুলতেন। এই কাজে তাঁরা ছিলেন সুদক্ষ। ঢাকার শঙ্খকরা বস্ত্র ও রিফু কারি-গরদের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি কাপড়ে রেশমী ও জরির কাজের নাম জরদজী। এর খ্যাতিও যথেষ্ট।

ঢাকাই মসলিন আজ লুপ্তপ্রায় বলা যায়। তবে ঢাকাই শাড়ীর কদর এখনো দেশে-বিদেশে সর্বত্র। ঢাকার রুপোর তারের কাজ (ফিলিগ্রী) এবং শঙ্খশিল্পও গর্বের বস্তু।

বিদেশী কুশাসনের চাপে আর রাষ্ট্র বিপ্লবে বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিল্প সবই ধ্বংসের মুখে। স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকার প্রাচীন গৌরব আর ঐতিহ্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সেই সৌভাগ্যের সূর্যোদয় দেখার আশায় আজ প্রতিটি বাঙালী উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

জোয়ারেতেই ভাঁটা

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

রুমা আর পার্থর ভালবেসে বিয়ে হয়েছিল। যে ভালবাসার গভীরতা ছিল অতলস্পর্শী। একটা সহজ বোঝাপড়ার মধ্যে সংসারে একটি মিষ্টি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল ওরা।

সংসারের একটি সুসম সুগঠিত রূপ দিতে দুজনেই সর্বদা সচেষ্ট। আট থেকে দশ ঘন্টা তাদের ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা। হিসেব মত আর একটু কম হওয়াই উচিত কিন্তু বাড়ীর বাইরে পা বাড়ালে যাওয়া-আসাটা নির্ধারিত ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা সম্ভবপর নয় বলেই কিছুটা বাড়তি সময় যোগ করে আটকে দশ করা হয়েছে। অফিস সুরু এবং শেষে আগে বাসে, ট্রামে কিংবা ট্রেনে উঠতে যে উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতা দেখা যায়, তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে গেলে সময়ের হিসেব রক্ষা করে চলা সম্ভব নয়। তবুও প্রাণ বাঁচিয়ে আর মান বাঁচিয়ে চলার জন্য যতটুকু সময়ের অপচয় না করলে নয়, তার বেশী একটি মুহূর্তও পার্থ কিংবা রুমা নষ্ট হতে দেয় না।

পার্থ প্রায়ই পায় হেঁটে বাড়ী ফেরে। এমনও দেখা গেছে যে, রুমা ট্রামে বাসে বাড়ী ফিরে এসে দেখে যে, পার্থ তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। শুধু অপেক্ষাই নয়, কোন কোন দিন স্ত্রীর সম্মুখে এক পিয়ালা ধূমায়িত কফিও এগিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

রুমার শ্রান্ত মুখে খানিকটা ক্লান্ত হাসি ফুটে ওঠে। বলে, আঃ পার্থ তোমাকে আমার যে আবার নতুন করে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

দুষ্টু হেসে পার্থ বলে, আমার পুরানো বহাল থাক নতুনে আর কাজ নেই। রুমা আরও একটু দুষ্টুমি করে বলে, কেন নতুন ভাল লাগে না বুঝি? পার্থ মুচকি হেসে জবাব দেয়, স্বাদ না পেলে বুঝবো কেমন করে। বলে ওর বিনুনী ধরে আস্তে আকর্ষণ করে।

রুমা বলে, এই হচ্ছে কি......

কেন ভাল লাগছে না?......

মুখ টিপে হেসে রুমা বলে, একটুও না পুরানো যে...

পার্থ তরল কণ্ঠে পুনরায় বলে, তাহলে কাছে এস। নতুন ভাবে একবার চেষ্টা করে দেখি।

এই......

কি বলছো!

তুমি আমার চেয়ে সুগৃহিণী। চাকরীটা ছেড়ে দাও।

তারপর?...

তুমি সংসার দেখবে, আমি পয়সা উপায় করে এনে তোমার হাতে দেবো।

আর আমি সারা দুপুর তোমার কথা ভেবে ছটফট করবো বিকেলের অপেক্ষায়। ঘন ঘন ঘড়ি দেখবো। পার্থ হেসে বলে।

ছাই—দুপুরবেলা পড়ে পড়ে ঘুমাবে। জবাব দেয় রুমা।

আর তুমি যখন অপিস থেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তখন কিছু বাজারের খাবার আর নিজের হাতে প্রস্তুত এক পিয়ালা চা কিংবা কফি এগিয়ে দিয়ে সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে তোমার একান্তে গিয়ে দাঁড়াব। আর, তুমি তাতেই বোকার মত খুশী হয়ে বাজারের খাবার চিবুতে চিবুতে অন্তরঙ্গ সুরে বলবে, একটা লোক না রাখলে দেখছি চলছে না।

পার্থর কথার ধরনে রুমা খিল-খিল করে হেসে ওঠে। বলে, তারপর?

আমি বলব, তা বলে তোমার ঐ জোয়ান মেয়ে মানুষটাকে আমি রাখতে পারব না। নিজে হাতে আমি সব করবো সেও ভাল।

তুমি বলবে তাহলে না হয় একটা জোয়ান ছোকরা চাকরের ব্যবস্থাই দেখি।

এ কথার মানে?

সহজ—স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে পারলেও স্ত্রী পারছেন না।

ওটা পুরুষের কাল্পনিক অভিযোগ। স্ত্রীরা কি স্বামীর বাইরের জীবনকে নজরে রাখতে পারে? না রাখা সম্ভব।

কিন্তু যতটুকু তাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে আছে সেখানে তারা অবিচল। বোল আনার এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই খণ্ড প্রলয়। কথাকটি শেষ করে শব্দ করে হেসে উঠল পার্থ।

মেয়েদের সম্বন্ধে কি সুন্দর তোমার ধারণা পার্থ!

পার্থর বেশ মজা লাগছিল, রুমাকে রাগিয়ে দিতে। সে পুনরায় বলল, তুমি যাই কেন না বলো এইটিই হলো মধ্যবিত্ত সংসারের যথার্থ রূপ। আমরা পুরুষেরা হচ্ছি কলুর ঘানিটানা বোকা বলদ। চোখ বেঁধে একবার চালিয়ে দিলেই হলো। তারপর চলছে ত' চলছেই।

তুমি বলতে চাইছো কি?

চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে কিছু খেতে দিলেই সব ভুলে যায়। এত যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তার কথাও মনে থাকে না।

আহা কি আমার উপমা। প্রস্তুতিটা বুঝি কিছু নয়? রুমা বলে।

গোলমালটা ত সেখানেই। প্রস্তুতির জন্য দিতে হয় সিংহভাগ। আর বলদের ভাগ্যে আধপেটা খাওয়া। তাইতেই খুশী থেকে ল্যাজ নাড়তে হয়, মাথা নাড়তে হয়, কান নাড়তে হয়।

রুমা বলে, তোমার কথা আমিও স্বীকার করি কিন্তু উল্টো করে।

তরল কণ্ঠে পার্থ বলল, গায় লাগলো বুঝি?

রুমা জবাব দিল, লাগবার মত করে বললে লাগে বইকি। এক পিয়ালা কফি খাইয়েই এতটা—আরও কিছু বেশী করলে না জানি কি বলতে।

পার্থ রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, বেশী করলে কি হতো জানি না রুমা, কিন্তু এক পিয়ালা কফি এগিয়ে দিয়ে যে আনন্দ তোমার মধ্যে ফুটে উঠতে দেখলাম সে আনন্দ আমি হলেও ত উপভোগ করতে পারতাম...আনন্দটুকু ভাগাভাগি করে নিয়ে খুশী হয়ে উঠতাম। কিন্তু সংসার করেও একটা বিচ্ছিন্ন জীবন কাটাচ্ছি আমরা।

বুঝতে পারছি না। খুলে বলো। রুমা বলে।

আমরা পুরোপুরি কিছুই হতে পারছি না। জান রুমা আজ তোমার মুখ থেকে অতর্কিতে আমার মনের কথাটাই প্রকাশ পেয়েছে। আমারও বহুবার ইচ্ছে হয়েছে তোমাকে বলি, চাকরীটা ছেড়ে দাও।

একেবারে পুরোপুরি স্বামী হতে চাও। পাওনাগণ্ডার একটু হেরফের হলেই পুরুষের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে তো?

পড়লেই বা। সেই জন্যই এত রং-চং আর সাজপোশাকের দরকার রুমা। নইলে জীবনটা একঘেয়ে আর বিস্বাদ হয়ে পড়তো। অথবা একেবারে থেমে যেতো।

বড্ড চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছো পার্থ...

মাটিতে লাঙ্গলের ফলা বসিয়ে হয় চাষের প্রস্তুতি। মাটি কিন্তু বাধা দেয় না। তার চোখে তখন রঙিন স্বপ্ন। তাই লাঙ্গলের ফলার আঘাতে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেও নিঃশব্দে চোখ বুজে পড়ে থাকে। কেন জান? তার রুক্ষ দেহে সবুজের সমারোহ দেখবার আশায়। মাটির প্রকৃত মূল্য এইখানেই। আর যে মানুষ লাঙ্গলের ফলা মাটির বুকে বসায় তার আনন্দ সৃষ্টি সাফল্যের মধ্যে।

নিজের কথা বলো—আমি মাটির কথা শুনতে চাইছি না।

আমি নিজের কথাই বলছি রুমা। সংসারেরও এইটিই আসল রূপ। নইলে পৃথিবীর মৃত্যু ঘটতো। অর্থহীন হয়ে যেতো তোমার আমার অস্তিত্ব।

হঠাৎ অনেকখানি সজাগ হয়ে উঠল রুমা। পার্থকে আজ নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে যত কথা সে বলেছে তাকে আর নিছক কথার কথা বলে ভাবতে পারছে না। তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে সে পার্থকে দেখতে থাকে। খর দৃষ্টিকে পার্থর মনের গভীরে চালিয়ে দিয়ে তার মনের সত্যকার চেহারাটা দেখতে চায়।

বলে, তুমি আমার কাছে কি চাও পার্থ?

যদি বলি একটি সুন্দর, আনন্দভরা নিটোল সংসার?

একটু হাসবার চেষ্টা করে রুমা বলে, আমাদের সংসারে কি আনন্দের অভাব ঘটেছে পার্থ? আমরা দুজনে মিলে উপার্জন করছি। তুমি সুটের পর সুট করছ আমি কিনছি শাড়ী... তুমি কিনলে ঘড়ি আমি গড়ালাম চুড়ি। ঘরের আবহাওয়া ভারী লাগল দুজনে মিলে গেলাম সিনেমায়। ফিরে এসে রান্নার হাঙ্গামা পোহাতে চাই না—খেয়ে এলাম কোন হোটেল কিম্বা রেস্তোরা থেকে। তোমার মন চাইলে আমাকে অসংকোচে আদর করতে পার আমিও প্রতিদানে তোমাকে যা খুশী তাই দিতে পারি। আমাদের সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কোন বিধি-নিষেধের গণ্ডি টানা নেই...

এর নাম কিন্তু জীবন নয় রুমা...

রুমা এতক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ করে তাকে ভূমিষ্ট হবার সুযোগ দিলেই বুঝি সংসার আনন্দে ভরে উঠতো? তোমার বিরুদ্ধে আমি ব্রিচ অফ কনট্রাক্টের অভিযোগ আনছি পার্থ। তোমাকে সত্যিই চোখ বেঁধে ঘানিতে জুড়ে দেওয়া উচিত।

তা ঠিক রুমা। কিন্তু আমি যে মানুষ এইটেই বহু চেষ্টা করেও ভুলতে পারছি না। তাই চোখের বাঁধন আলগা হতেই ভিতরের অনুভূতিটা সজাগ হয়ে ওঠে। নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের এই ছকে বাঁধা জীবনটাকে মনে হয় কংক্রিটের মসৃণ রাস্তা। এরও একটা রূপ আছে—জীবনীশক্তিও প্রচুর এ-কথা অস্বীকার করি না। তবুও মনে হয় এ রাস্তা ত' মাটির নয় এর সৌন্দর্য ত চোখকে আমন্ত্রণ দিতে পারে না। এর মধ্যে চোখ জুড়ানো রূপ কোথায়। উন্মাদনা আছে, চমক আছে, কিন্তু—জীবনের রস কোথায়... স্নিগ্ধ রূপ কোথায় ......

রুমা ঠাট্টার ছলে বলে, ওহে রসিক পুরুষ এতই যদি তোমার রসে আসক্তি তাহলে সেকথা আগে ভেবে দেখো নি কেন?

পার্থ বলে, মানুষের জীবন একটা ফুল রুমা, ফুলের ত একটিমাত্র পাপড়ি থাকে না। অনেকগুলির সমষ্টি নিয়েই সে সম্পূর্ণ। কুঁড়ি অবস্থায় তাই হয়তো সম্পূর্ণের সন্ধান পাই নি।

তোমার দেখছি ঝরে পড়বার সময় হয়েছে পার্থ

তোমার অনুমান সত্য। তাই বারে বারে পিছন ফিরে তাকাচ্ছি। একেবারে ঝরে পড়বার আগে বাঁচিয়ে রাখবার এই ক্ষীণ আশা।

পার্থ।

বলো।

আজ যত কথা তুমি বললে এর সবই কি তোমার মনের কথা?

তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?

হবারই কথা। প্রথমে ঠাট্টা ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখছো।

তুমি ত রাগ করনি রুমা।

কিন্তু অবাক হয়ে গেছি তোমার এই মানসিক বিপর্যয় দেখে।

পার্থ শান্ত হেসে বলে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দুর্বল হতে থাকে। বিপর্যয় অনিবার্য কারণেই দেখা দেয়। তখনই একটা অবলম্বনের কথা মনে আসে। কিন্তু আজ এসব আলোচনা থাক। অনেকক্ষণ তুমি অপিস থেকে এসেছো। এখনও কাপড়চোপড় পাল্টাবারও সুযোগ পাও নি। তুমি যাও। আমি ততক্ষণে আর একবার কফির বন্দোবস্ত দেখি।

রুমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, তবু ভাল কথাটা এতক্ষণে তোমার মনে পড়েছে। কিন্তু দয়া করে আবার যেন কফি করতে যেও না, ওটা আমার জন্যেই থাক। আর যাবার আগে জানিয়ে যাচ্ছি যে, তোমার প্রত্যেকটি কথাই আমি বিশ্বাস করেছি, কিন্তু মেনে নিতে পারি নি। কোন দিন মেনে নিতে পারবোও না।

পার্থ হেসে বলল, বর্তমানের কথা বলো। ভবিষ্যৎ নিয়ে এক্ষুণি ভবিষ্যদ্বাণী করো না রুমা। পরে হয়তো নিজেই অপ্রস্তুত হবে।

রুমার মুখে একটু যেন বাঁকা হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল।

প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্তি হঠাৎ যেন তার চরিত্র খোয়াল। এলোমেলো হাওয়া উঠেছে। সে হাওয়ায় অশান্ত হয়ে উঠেছে নিস্তরঙ্গ জলরাশি। একান্ত নির্ভরতায় যারা গা ভাসিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে সামাল সামাল রব উঠেছে।

*

অপিস থেকে ফিরে এসে রীতিমতো অবাক হয়ে গেল পার্থ। বাড়ীর চেহারার

আমূলে পরিবর্তন দেখে। রুমা আজ অপিস না গিয়ে ঢেলে সাজিয়েছে তাদের ঘর দুখানিকে। একের স্থানে দুখানি শোবার ঘর হয়েছে।

এতটা আশা করতে পারেনি পার্থ। ম্লানকণ্ঠে বলল, তুমি একই বাড়ীতে দুটো সংসার পাতলে রুমা? লোকে হাসবে যে!

লোকে অকারণেও হেসে থাকে, পার্থ। তাছাড়া দুটো সংসার আবার কোথায় দেখলে তুমি? শুধু শোবার ব্যবস্থাই আলাদা করে নিয়েছি।

এত অল্পেই ভয় পেয়ে গেলে তুমি? অথচ...না থাক...

থাকবে কেন বলেই ফেলো না।

তুমি কিন্তু আমার চেয়েও দুর্বল হয়ে পড়েছো তাই পালিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছ।

সময় থাকতে সাবধান হওয়াকে দুর্বলতা বলে না পার্থ। দৃঢ়তা বলে।

বোধ হয় তাই।

এই নিয়ে রুমার সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা করবার স্পৃহা পার্থর নেই। প্রবৃত্তিও নেই। রুমার বর্তমান ব্যবস্থাকে, কিছুতেই সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। আহত হলো। অপমান বোধ করল। খানিক চুপ করে থেকে রুমার নড়া চড়া লক্ষ্য করতে করতে এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিয়ের আগে দুজনের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়েছিল। কেউ কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। করেও নি কোনদিন। রুমা সংসার চাইলেও সন্তান চায় না। ওতে নাকি দুঃখকে ডেকে

আনা হয়। পার্থ সুখ দুঃখ সব মিলিয়ে যে সংসার তাকেই পেতে চায়। তবুও রুমাকে পাবার জন্য তাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। ভেবেছিল, মুখের কথার চুক্তি-পত্র রুমাই একদিন ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করবে। পুরোপুরি সংসার ধর্মে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু রুমার অনুভূতির দরজা যে স্ক্রু দিয়ে আঁটা ছিল দীর্ঘ দিনের অব্যবহারে তার মাথাগুলো মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে। স্ক্রু-ড্রাইভারের সামান্য চাপেই তাই মাথার খাঁজগুলো সমান হয়ে গেল। খুলতে গেলে ভাঙতে হবে একথা পার্থ আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছে।

কথায় কথায় সে তার মনের কথা প্রকাশ করে ফেলেছে বলেই রুমার এই নতুন ব্যবস্থা। এতদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার নয়া রূপ। কিন্তু পার্থ ত একদিনের জন্যও তার ইচ্ছাকে জোর করে খাটাতে চেষ্টা করে নি তবু এ অবিশ্বাস কেন?

রুমা তার নিজের ঘরে কাজে ব্যস্ত। সে যে এতক্ষণ এ ঘরে একলা চুপচাপ বসে আছে তা নিয়েও ওর মাথাব্যথা নেই। উঠে দাঁড়াল পার্থ। তারপর এক সময় বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় চলে এল। অনেকক্ষণ এলোমেলো উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরে বেড়াল। বাড়ী ফিরে এক পেয়ালা চা পর্যন্ত সে খায় নি। খিদেও পেয়েছে। কিছু খেলে মন্দ হয় না। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল পার্থ। কব্জি ঘড়িটা একবার দেখে নিল। মাত্র সাড়ে সাতটা। প্রায় আধ ঘণ্টা ওখানে কাটিয়ে বেরিয়ে এল। এখনই তার বাড়ী ফিরবার তাগিদ নেই। কিন্তু যাবে কোথায়।

কমলকে মনে পড়ল। বহুকাল দেখা নেই। কালে-ভদ্রে যদিবা হয় তা সামান্য ক্ষণের জন্য। কমল কিন্তু ছাড়তে চায় না। বলে, আমার বাড়ীর পথ ত এক রকম ছেড়েই দিয়েছিস।

পার্থ জবাব দেয়, এ অভিযোগ আমিও দিতে পারি।

কমল এক মুখ হেসে জবাব দেয়, তা ঠিক, তা ঠিক। আসলে কি জানিস পার্থ আমাদের বাইরেটা যত টকটকে হচ্ছে ভেতরটা তার চেয়ে বেশী মরচে ধরে যাচ্ছে —আমরা প্রায় যন্ত্র-মানুষ হয়ে যাচ্ছি রে পার্থ!

বেশ বলেছিস কমল! ভবিষ্যৎ মানুষের চেহারা!...

চমকে উঠল পার্থ। কমল তাকে ডাকছে। ও বাইরের রোয়াকে বসে ছিল। ওর বাড়ীর পাশ দিয়েই সে যাচ্ছিল।

পার্থ বলল, তোর কাছেই এলাম।

হেসে কমল বলল, বৌ ছেড়ে দিলে?

ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমরা কেউ কাউকে বাধা দিই না কমল। সময় পাই না বলেই আসা হয় না।

কমল বলে, আমারও সেই এক কথা। সময় পাই না। তাছাড়া কি জানিস ছেলে-মেয়ে দুটোকে নিয়ে খানিক না কাটালে মন ভরে না।

কমল হা-হা করে হাসতে থাকে।

দুই বন্ধু পুরানো দিনের নানা ঘটনা নিয়ে মেতে উঠল। সময়ের পর্যন্ত জ্ঞান ছিল না। যখন উঠল রাত তখন এগারটা।

পার্থ ফিরে এসেছে। সাড়া পেয়ে রুমা দরজা খুলে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। যাবার আগে বলে গেল যে, পার্থর দেরী দেখে সে খেয়ে নিয়েছে। তার খাবার ঘরে ঢাকা দেওয়া আছে।

শুয়ে শুয়েই পার্থ শুনল—শুনল রুমা ঠিকে ঝিকে বলছে, পার্থর গত রাত্রের অভুক্ত খাবারগুলো নিয়ে যেতে। ইচ্ছে করেই পার্থ অনেক দেরী করে বিছানা ছেড়ে উঠল। আর উঠেই দেখে এরই মধ্যে রুমা আপিসে যাবার জন্য প্রস্তুত। পার্থর সঙ্গে চোখাচোখি হতে একটু হেসে বলল, বেরিয়ে যাচ্ছি। তোমার খাবার জায়গা মতই আছে। খেয়ে নিও।

চলে গেল রুমা। পার্থ শুধু নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

বিকেল বেলা যথাসময় সে ফিরে এল আপিস থেকে, কিন্তু রুমা ফিরল ধারণাতীত দেরী করে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ঘুম জড়ান কণ্ঠে বলল, আমি খেয়ে এসেছি। তুমি বরং দোকান থেকে কিছু আনিয়ে নাও। এটা যে গত রাত্রে তার দেরী করে ফেরা এবং না খাওয়ার জবাব, তা বুঝে নিতে কষ্ট হল না পার্থর।

এমনি করেই শুরু হলো তাদের পাশ কাটিয়ে চলা। কিন্তু এভাবে চলতে চলতে যে একদিন অনিবার্য কারণেই একটা সঙ্ঘর্ষ দেখা দিতে পারে একথা তারা উভয়েই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। অথচ অতি-নাটকীয়তা ওরা কেউই চায় না।

শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে এগিয়ে গেল পার্থ। রুমার ঘরের কাছে গিয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় বলল, আমার ঘরে একবার আসবে কি?

রুমা জবাব দিল, এ ঘরে আসতে তোমার আপত্তি না থাকলে এখানে এসেই বলতে পার।

পার্থ ঘরে প্রবেশ করল। বসবার মত স্থান বিছানা এবং ড্রেসিং টুল ছাড়া আর কিছু ঘরে না থাকায় সে টুলটা টেনে নিয়েই তাতে বসে বলল, এইভাবে আর কতদিন চলবে সেই কথাটাই তোমার কাছে জানতে এলাম।

ছোট্ট উত্তর পাওয়া গেল, মন্দ চলছে কি?

কিন্তু আমার কাছে প্রতিটি মুহূর্ত অসহ্য ঠেকছে। আমি জানতে চাই তুমি কি তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করে নিয়েছো?

রুমা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তুমি বোধহয় এক বিছানায় শোবার কথা বলতে এসেছো?

রুমা...শব্দটা অত্যন্ত কঠিন শোনাল।

রুমা ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, সত্য কথা শুনলে মানুষ সামলাতে পারে না। তোমার বক্তব্যের মধ্যে এ ছাড়া অন্য কিছু যে নেই তা তুমি নিজেও ভাল করে জান।

পার্থ অপমানবোধ করল। কিন্তু যে কথা আজ বলবার জন্য সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ তা না বলে চলে যেতে পারল না। অবিচল কণ্ঠে বলল, আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি একথা আজ আর অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। আমি জের টেনে চলবার পক্ষপাতী নই। তুমি অকারণে জল ঘোলা করলেও আমি সম্মানজনক পথে এই অসহনীয় পরিস্থিতির একটা সমাধানের পথ দেখতে পেয়েছি।

রুমা চেয়ে থাকে জবাব দেয় না।

পার্থ বলতে থাকে, তোমার কথাই ঠিক। আমি আমার মনকে জানতাম না। অথবা ভেবেছিলাম তুমি হয়ত একদিন তোমার মত এবং পথের পরিবর্তন চাইবে। কিংবা আমি ভুল করলে তা সংশোধন করতে সাহায্য করবে। কিন্তু তুমি সে পথে না গিয়ে আমাকে অপমান করতে শুরু করলে। আমি নিজের কাছে নিজে যথেষ্ট ছোট হয়ে গেছি। এ অবস্থা আমি আর চলতে দিতে পারি না। নিজের মান বাঁচাতে আর প্রাণ বাঁচাতে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে।

তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছো?

একটুখানি হেসে পার্থ বলল, না ঠিক অতখানি বোকামী আমি আর করবো না। তাছাড়া তুমি আমাকে ভয় করতে যাবে কেন? তুমি নিজে উপার্জন করছো। কারুর উপর নির্ভর না করেও যখন তোমার অনায়াসে চলে যেতে পারে তখন ভয় করবার প্রশ্নই ওঠে না।

সেই জন্যই তোমার কথায় আমি চাকরীটা ছেড়ে দিতে পারি নি। ভাল লাগত যখন তুমি বলতে, ঘরে-বাইরে এত পরিশ্রম তোমার সইবে না। আজ মনে হচ্ছে আমাকে পঙ্গু আর অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে নিজের ইচ্ছা ষোল আনা পূরণ করাই ছিল তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য। তোমার ইচ্ছার স্টিম রোলারের তলায় আমি বুক পেতে দিতে পারি নি বলেই আজকের এই অসন্তুষ্টি।

জ্বলে উঠতে গিয়েও পার্থ সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু একেবারে চুপ করে থাকাও সম্ভব হল না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, তোমাকে এত কুৎসিত আর নোংরা এর আগে কোনদিন আমার লাগে নি। তবুও তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, আর একটা বড় ভুলের হাত থেকে আজ আমাকে বাঁচালে।

বাঁকা হেসে রুমা বলল তুমি দেখছি রাগ করতেও জান...

চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল পার্থ। একবার স্থির দৃষ্টিতে রুমার আপাদমস্তক

দেখে নিয়ে দৃঢ় পদে ঘর ছেড়ে চলে গেল। শুধু ঘর থেকেই নয় সেই রাত্রেই সে বাড়ী ছেড়েও চলে গেল। চলে যাবার আগে রুমাকে জানিয়ে গেল—তোমাকে মুক্তি দিয়ে নিজেও মুক্তি পেলাম। খুব সহজে একথা বলতে পারি নি অন্ততঃ এইটুকু বিশ্বাস করো।

চমকে উঠল রুমা। বুকের মধ্যে আচমকা একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। চোখ দুটোও জ্বালা করে উঠল। কিন্তু জল পড়ল না। আশ্চর্য! চলেই গেল পার্থ! আর সংগে করে নিয়ে গেল তার সহজভাবে নিঃশ্বাস নেবার বাতাসটুকু পর্যন্ত। নইলে নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট হচ্ছে কেন তার।

অনেক দিন ধরেই তাদের মধ্যের সম্পর্কটা রীতিমত ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। তবুও পাশের ঘরে পার্থর অস্তিত্বটুকু বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিল।

কিছুই নিয়ে যায় নি পার্থ। নিজের অতি প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়গুলো ছাড়া। তাদের প্রথম বিবাহ বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে রুমা পার্থকে একটি রোলেক্স ঘড়ি উপহার দিয়েছিল—যাবার আগে সেটিও খুলে রেখে গিয়েছে অথচ পার্থর দেওয়া হীরের আংটিটি এখনও তার আঙুলে জ্বল জ্বল করছে। খুলে ফেলতে গিয়েও সে পারল না! ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল 'না।'

সারারাত রুমা ছটফট করে কাটালেও, পরদিন সে নিয়মিত কর্মস্থলে চলে গেল। চাকরীটি তাকে রাখতেই হবে। তার বর্তমান জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। পার্থ চলে যাক এইটেই কি সে চেয়েছিল? চলে যাবার পর থেকে এই একটিমাত্র প্রশ্নই বারে বারে তাকে উন্মনা করে তুলছে।

অপিস থেকে শরীর খারাপের অজুহাতে সকাল সকাল চলে এল রুমা, কিন্তু বাড়ী ফিরে মনে হল চলে না এলেই ছিল ভাল। মাথাটা টিপ টিপ করছে। সারা দিনে চা খাওয়াই হয় নি তার। এক পেয়ালা চা করে নিয়ে এক চুমুক মুখে নিয়েই তা ফেলে দিলে। চিনি দিতেই ভুলে গেছে। সকাল বেলা নুন ছাড়া রান্না করে খেতে বসে নিজেকে নিজে ধিককার দিয়েছে। এই মনের জোর নিয়ে এতদিন ধরে এত কাণ্ড করাকে আজ তার কাছে নিতান্ত হাস্যকর মনে হচ্ছে।

রুমার মনের এই অস্থিরতা যখন অনেকটা তার আয়ত্তে এসেছে এমনি দিনেই তার এক বান্ধবী এসে উপস্থিত হল। এই মেয়েটি পার্থর অপিসে কাজ করে। আগেও বার কয়েক এসেছে।

বললে, আশ্চর্য রুমা টাকাটাই তোমাদের কাছে এত বড় হল?

রুমা বলল, টাকা কার কাছে বড় নয় সীমা? এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

নেই! তুমি বলো কি? সীমা জবাব দেয়, টাকার জন্য পার্থবাবুকে তুমি ভারতবর্ষের আর এক প্রান্তে চলে যাবার অনুমতি দিলে?

দিলাম।

তবুও বলব আশ্চর্য হবার কিছু নেই? একটা ছেলেপুলেও ত আজ পর্যন্ত হল না। কি করবে এত টাকা দিয়ে? তুমি ত শুনলাম সংগে যাবে না।

তাই বুঝি?

তাই তো পার্থবাবু বললেন। তার একমাত্র জন্য প্লেনে রিজার্ভেসন পর্যন্ত হয়ে গেছে। আর তুমি বলছো তাই বুঝি!

এর পরে আর পাঁচটা কথার ভেতর দিয়ে কবে কোন প্লেনে কোথায় যাবার জন্য রিজার্ভেসন করা হয়েছে একে একে সব জেনে নিল রুমা।

*

একই প্লেনে রুমাকে দেখে বিস্মিত এবং হতচকিত হল পার্থ। বার কয়েক দৃষ্টি বিনিময় হল। রুমার চোখে মুখে চাপা হাসির বিদ্যুৎ—পার্থর চোখে একরাশ প্রশ্ন।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছে মালপত্র খালাস করে নিয়ে পার্থ গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিল রুমা এগিয়ে এসে বলল, এই পার্থ আমাকে ডাকছো না যে...

গাড়ীর দরজা ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াতেই রুমা গাড়ীতে প্রবেশ করল। পার্থ তাকে অনুসরণ করে পাশে বসে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—তুমি এখানে...মানে কার কাছে...কোথায় নামিয়ে দিতে হবে...

রুমা পার্থর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, কার কাছে আবার—

সহজ কথা...তুমি মুক্তি চেয়েছো আমি মুক্তি দিতে পারবো না। চাকরীটা ছেড়ে দিয়েই তাই চলে এলাম!...

পার্থ শক্ত করে রুমার একখানা হাত চেপে ধরতে আরও নরম আর মিষ্টি করে সে বলে, উহু...আগে বাড়ী চলো!...
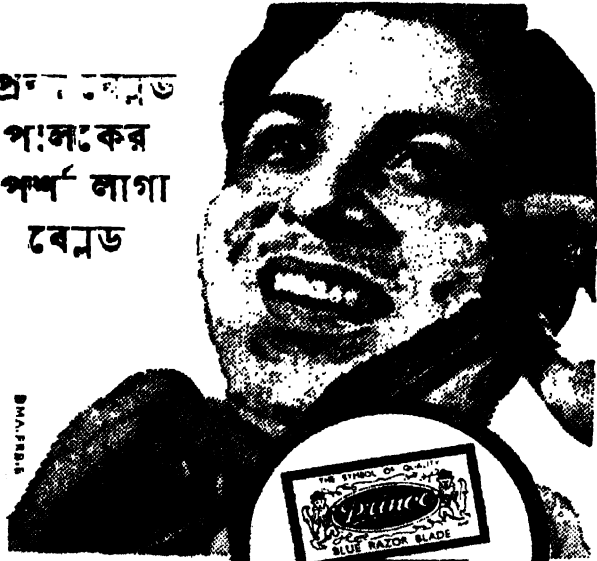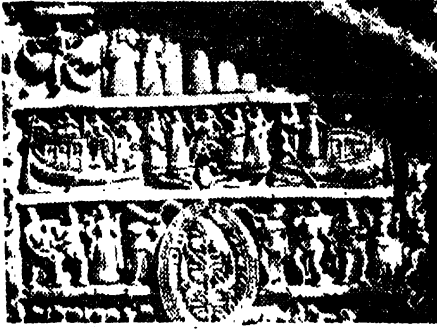
বাঙলার মন্দিরের নিজস্ব ও মিশ্ররীতি নিয়ে আগের প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। নিজস্ব পদ্ধতির মধ্যে চালা ও চাঁদনী মন্দিরে খুব একটা উন্নত পর্যায়ের শিল্প কৌশল পাওয়া না গেলেও এ শ্রেণীর দেবাধিষ্ঠানে বাঙালী স্বর্গের দেবতাকে নিজের হৃদয়বেদিতে বসাবার যে প্রয়াস পেয়েছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ-সব মন্দির ও অন্যান্য শ্রেণীর যে সব মন্দির কালের করাল গ্রাস এড়িয়ে আজও টিঁকে রয়েছে সেগুলির মধ্যে শিল্পকলা কৌশল দর্শককে যেমন চমৎকৃত করে তেমনি মন্দিরগাত্রে প্রোথিত লিপির মধ্যেও সেকালের বাঙলার অনেক কথা জানা যায়। মন্দিরগাত্রে প্রোথিত এ লিপিগুলো হল প্রাচীন বাংলার চিরস্থায়ী নথিপত্র যার মধ্য দিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় ও তারিখ ছাড়াও নির্মাতা ও প্রতিষ্ঠাপকের বিষয়ও জানা যায়। বাঙলার অনেক মন্দির থেকে আজ বিগ্রহ অপসারিত, অনেক সময় শূন্য মন্দিরের গঠন রীতি দেখে সেই মন্দিরটি কোন বিগ্রহের বা দেবতার জন্যে স্থাপিত হয়েছিল তা বোঝবার উপায় থাকে না। লিপিগুলির মধ্য দিয়ে অধিষ্ঠাতার পরিচয়টি সহজেই জানা যায়। অনেক সময় মন্দিরগাত্রে এমন সব কথা লেখা থাকে যার থেকে সমসাময়িক ইতিহাসেরও বহু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। তাই মন্দির সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে মন্দিরলিপির আলোচনাও সমান প্রয়োজন।

বাঙলার মন্দিরের বেশীর ভাগ লিপিই রচিত হয়েছিল সংস্কৃতে। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সাঙ্কেতিক শব্দের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ থাকে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের রচনাকাল যেমন অনেক সময় প্রহেলিকার মাধ্যমে ব্যক্ত হয় তেমনি মন্দিরলিপির সাঙ্কেতিক শব্দগুলিও কতকটা প্রহেলিকার মতো। প্রতিষ্ঠাকাল সাধারণতঃ শকাব্দে ও বঙ্গাব্দে উল্লিখিত থাকে। কোথাও বা বিশেষতঃ মল্লভূমে (বিষ্ণুপুর অঞ্চলে) মল্লাব্দের উল্লেখ থাকে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হ'ল কোন কোন মন্দিরে ইংরেজী সনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য এদের সংখ্যা খুবই অল্প। সংস্কৃত-লিপির পরেই আসে বাংলা-লিপি। বাংলা-লিপি [illegible]

তার মধ্যে সংস্কৃত অনুপ্রবেশ করেছে। বাংলা পদ্যাকারে লিখিত লিপিও বিরল নয়। কোন কোন মন্দিরগাত্রে বৃহৎ বাংলা পদ্যাকারে লিপি প্রোথিত দেখা যায়। অনেক সময় সাঙ্কেতিক শব্দের অভাবে অঙ্কে লিপিকাল নির্দেশিত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় প্রকার ব্যবস্থাও চোখে পড়ে। নীচের আলোচনায় এ-সবের নিদর্শন পাওয়া যাবে।

কলকাতার বাগবাজারে ২৬।১ দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটে দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরটির বয়স মহামহোপাধ্যায় ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে প্রায় দু'শ বছর। বর্তমান সময় থেকে এটি হবে আড়াই শ' বছর। এতে কোন প্রাচীন-লিপি নেই। খ্যাতনামা রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডা এখানে ছিল। মন্দিরটির একটি আধুনিক লিপি আছে। লিপিটি হল ১ 'জগতরাম হালদার কর্তৃক স্থাপিত। তদীয় পৌত্রকন্যা হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী

ভ্রম সংশোধন

অমৃত-এর ৪০ সংখ্যার ১১৬ পৃষ্ঠায় দুটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ওপরের ছবিটি নিচে এবং নিচের ছবিটি ওপরে হবে।

বসন্তকুমারী দেবী কর্তৃক ১৯৭২ সংবৎসরে সংস্কারিত।' মন্দির মধ্যে দুই পাশে দুই মর্মর লিঙ্গ ও মাঝখানে কৃষ্ণপ্রস্তর লিঙ্গ। রামপুরের (মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অধীন) কালুরায় মন্দিরে লিপি নেই, কিন্তু কাছাকাছি আটচালা শিবালয়ে ১৬৭৭ শক ও ১১৬৩ সাল লেখা আছে। কালুরায়ের ঐ দোচালা মন্দিরটিও সে সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়। কালনার (বর্ধমান জেলা) কৃষ্ণচন্দ্রের বাটীর দোচালা মণ্ডপের লিপি : ১৭৫৪।৪।১৬।১৪।

বিষ্ণুপুরের চারচালা মন্দির শীর্ষক অপূর্ব কারু ও পুত্তলমণ্ডিত সোপানযুক্ত জোড়বাংলা মন্দিরের দ্বারের ওপরের দিকের পূর্বাংশে চার সারি সংস্কৃত লিপি হল

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে সুধাংশু।
রসাঙ্ককে সৌধমিদং শকেহব্দে।।
শ্রীবীর[illegible]

মল্লদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ।। সন ৯৬১। লিপিতে শকাব্দ ও সনের অর্থ হল মল্লাব্দ। মল্লাব্দ খৃষ্টাব্দ থেকে ছ'শ চুরানব্বুই বৎসর কম। ইংরেজী ১৬৫৫। মেদিনীপুর জেলার রাণীচক মণ্ডল বংশের জোড়বাংলা মন্দিরে বাংলা-লিপি আছে। কিন্তু এটি প্রাচীন বলে মনে হয় না। কারু ও পুত্তলিকাও এতে নেই।

চার-চালা মন্দিরের মধ্যে নদীয়া জেলার পালপাড়ার মন্দিরটিতে কোন লিপি পাওয়া যায় না। স্থানীয় প্রবাদ এই রাজা গন্ধর্ব রায় এটি প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির যে আত্মচরিত আছে তাতে আছে :

গন্ধর্ব রায় বসে গন্ধর্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত সে গৌরব অপার।।

আদি কবি কৃত্তিবাস ইংরেজী ১৪৭২ সালের কাছাকাছি সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাই এই পালপাড়ার মন্দিরটি কিংবদন্তী অনুসরণ করলে কৃত্তিবাসের সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী বলা যায়।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরের সিংহবাহিনীর মন্দিরটিও বেশ প্রাচীন। এর লিপিটি হ'ল : 'শুভমস্তু শকাব্দা : ১৪১২ মাহ জ্যৈষ্ঠেতে (?) শ্রীশ্রীসিংহবাহিনীর মন্দির। তৃতীয়া তিথি মঙ্গলবার। ৮৯৭ সাল (?) মাহমাসে।' দাসপুরের গোস্বামী বাটীর চারচালা সমাধি মন্দিরটিও চারশ' বছরের পুরানো।

মুর্শিদাবাদ খাগড়ার ঘাটের চার-চালা মন্দিরে সংস্কৃত-লিপি আছে। পুরীধামের মার্কণ্ডেয় সরোবরের ঘাটে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র স্থাপিত চারচালা মন্দিরের লিপিটি হ'ল : 'ষড়সদর্শনির্মিতেহব্দে পঙ্কোদ্ধরত সৌধসোপানং। নৃপকীর্তিচন্দ্রজননীজনিতম্। প্রেষিত হরে কৃষ্ণাতঃ।' লিপির ভ ষ্ণু হ'লে অর্থসংগতি হয়।

আটচালা শ্রেণীর মন্দির মধ্যে শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারী। (মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার রঘুনাথের মন্দির সকলের থেকে বড়ো) শ্যামচাঁদের মন্দিরটি রামগোপাল, রামজীবন, রামভদ্র খাঁ চৌধুরী প্রাতৃগণ ১৬৪৮ শকাব্দ বা ইংরেজী ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এর উচ্চতা

কান্তনাথ মন্দিরের শিলালিপি, এতে শকাব্দ ১৩৭৪ এর উল্লেখ আছে। মন্দিরটি বেশ প্রাচীন
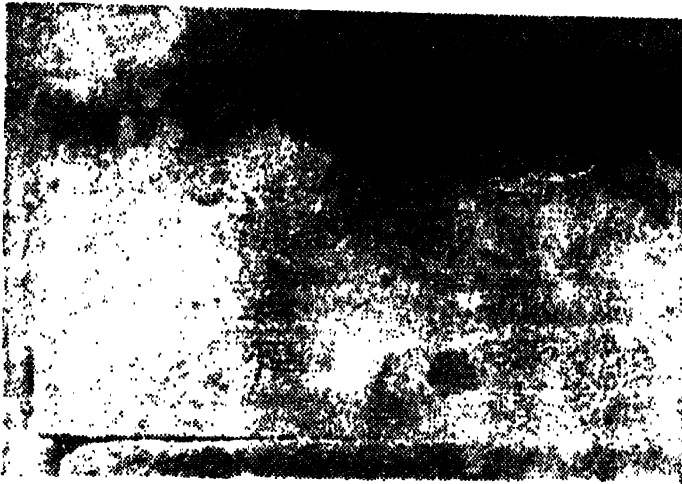
হ'ল একশ' দশ সুট, দেখা ও প্রস্থ যথাক্রমে আটষট্টি ও আটচাল্লশ ফিট। সংস্কৃত-লিপিটি নিম্নরূপ :

শ্রীমতঃ শ্যামচন্দ্রস্য মন্দিরং পূর্ণতামিয়াৎ।
বসুবেদর্তু শুভ্রাংশুঃ সংখ্যায়া গণিতে শকে।।

লিপির বাংলা অর্থ হ'ল '১৬৪৮ শকে শ্রীমান্ শ্যামচন্দ্রের মন্দির সম্পূর্ণ হল।' গড়বেতার (মেদিনীপুর জেলা) রাধাবল্লভের বিষ্ণুপুরী রীতির আটচালা মন্দিরটির সংস্কৃত-লিপিটি হল :

শ্রীরাধিকাব্রজপুরন্দরয়োঃ পদাব্জে।
মল্লস্য পক্ষনবকেবাধিসংখ্যশাকে।।
শ্রীমল্লভূরমণদুর্জনসিংহদেবঃ
সৌধং ন্যবেদয়দিদং গৃহমাদরেণ।।

—অর্থাৎ ৯৯২ মল্লাব্দ ইংরেজী ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ। শিলদার (মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত) রাণী কিশোরমণি স্থাপিত কিশোর-কিশোরীর বিষ্ণুপুরী আটচালা মন্দিরের সংস্কৃতলিপিটি হ'ল : পক্ষবেদসমুদ্রশ্চন্দ্রাশিসভয়্যা শকাব্দসু। কেশব-প্রীতিকার্যেষু দার্বাদং চ দদামাহম্।। শকাব্দা ১৭৪২। এটি শিলদা রাজবংশের গৃহদেবতার মন্দির।

বারো চালা মন্দিরের মধ্যে বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে লিপি আছে। চাঁদনী মন্দিরগুলির মধ্যে দাসপুর থানার সামাট গ্রামের মদনগোপাল জীউর সুদীর্ঘ মন্দিরের ভেতরের ঘরে দেবতাদের দু' পাশে উৎকীর্ণ লিপি : (১) পশ্চিমে—'শ্রীমদনগোপাল : সন ১২৩৫ সাল সৌর মার্গসিরস ২৬ দিবসে' (২) পূবে—'শ্রীরামো জয়তি শকাব্দা ১৭৫০।' মন্দিরটির ছাদ খিলানে গঠিত। কলাগেছ্যা থাম। চারটি পূর্ণ ও দুটি অর্ধ। থোপে থোপে পুত্তলিকা। দ্বারপার্শ্বে অলংকৃত বস্ত্র-পরিহিত দ্বারপালদ্বয় শোভিত। কলকাতার খিদিরপুরে ভূকৈলাস রাজবাটীর বাড়ির ওপর ছাদযুক্ত পতিত পাবনী মন্দিরের সম্মুখের চতুষ্কোণ থামে সংস্কৃতলিপিটি এইরূপ : 'শিবেক্ষণ বিয়ন্মুনীন্দ্রমিতে-শাকবর্ষে বিধৌ দিনে। দিনকরাভিসংক্রমিত-মীনরাশৌ ঘটীত ইদং কলিভবার্ণবে পতিতমেবং, সংরক্ষিতুং জগত পতিতপাবনী বিরাদসীদিম্নাং ভৃঙ্গাদ্‌গীত সুমোদদায়ী সুমনো রাজীবিরাজিস্ফুরম্যা নাবঙ্গী-চর্য্যাশ্বিতাটবী সদনন্দানুসতাণ্ডবং কৈলাসেশ শিবাম্বিতং পুরমিদং কৈলাসতুল্যং কুবিত-স্মাদর্থাবিক্রাকৃতং জগতি ভূকৈলাসসংজ্ঞাঃ যযৌ।' ১৭০৩ শকাব্দাঃ।

কালনার বর্ধমান রাজের ঠাকুর বাড়ীর চাঁদনীর একটি লিপি—

'রসাষ্টঘনমহীমিতে চাপেন্দু মার্তণ্ডকে' —১৬৮৬ শকাব্দাঃ পৌষ মাস। বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর মন্দিরের লিপি হল : 'বসুকর-নবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন। আত-লালতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু।' ৯২৮ মল্লাব্দ। বাঁশবেড়িয়ার রাজবাটীর আলগোছটুংগী মন্দিরলিপি :

মহীব্যোমাংগাসতাংশুগণিতে শকবৎসরে।
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্মমে বিষ্ণুমন্দিরম্।।

শকাব্দাঃ ১৬০১ নদীয়া জেলার গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের এ শ্রেণীর মন্দিরের লিপি—

বেদাশ্বোক্ষগোত্রকৈরব কুলাধীপে শকে শ্রীযুতে।
কৈলাস প্রতিরূপ কৃষ্ণনগরে শ্রীমদ গিরীশোৎসবে।।
নাম্নানন্দময়ী শুভেহহনি মহামায়া মহাকালভৃৎ
রাজ্ঞা শ্রীল গিরীশচন্দ্রধরণী পালেন সংস্থাপিতা।।

১৭২৬ শকাব্দাঃ ঘাটাল মহকুমার রাধা-নগর-নবগ্রামের পঞ্চরত্ন মন্দিরটির প্রস্তরে ক্ষোদিত সংস্কৃত-লিপি হ'ল :

'খবেদরসসংযুক্তে শাকে চৈব নিশাপতৌ।
গোপীনাথস্য বেশ্মেদং ভক্তিতো দত্তবানহম্।।

১৬৪০ শকাব্দা দাসপুর থানার চেতুয়াবাসুদেবপুর গ্রামে মুক্তারাম

সিংহবাহিনী মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি। ১ শকাব্দ ১৪৯২ পাওয়া যায়, যাহা হইতে মন্দিরটি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক।

ভট্টাচার্যের পঞ্চরত্ন মন্দিরে পোড়ামাটির সংস্কৃতলিপি :

দহনবয়মনগণ্যে সম্মিতে শাকবর্ষে
মুচিরনিজয়মেতৎ শ্রীলদামোদরায়।
কুলকুমুদকলেশঃ শ্রীলমুক্তাদ্যরামো
কমলপরমভক্তো দত্তকুর্মোদিমাপ।। ১৭২৩
শকাব্দা।

বিষ্ণুপুরে শ্যাম রায়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরের চার সারি লিপি :

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদেশকাংক-
বেদাঙ্কযুক্তে নবরত্নরত্ন।
শ্রীবীরহাম্বীর নরেশসুনু
র্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ।।
মল্লশকে ৯৪৯।। শ্রীরাজবীর সিংহঃ।
মল্লরাজ শ্রীবীরহাম্বীর। রঘুনাথ সিংহ ও বীর সিংহের নাম সমুখে ও পশ্চাতে এবং শিল্পী শ্রীশ্যামরায় শরণ বিষ্ণুদাসের নামও ক্ষোদিত আছে।

বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রাচীন নবরত্ন দিনাজপুরের (বর্তমান বাংলাদেশ) কান্তনগরের কান্তনাথ মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। এর সংস্কৃতলিপিটি হ'ল :

শ্রীশ্রীকান্ত। শাকে বেদাব্ধিকাল
ক্ষিতিপরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ।
প্রাসাদং চাতিরম্যং সুরচিত
নবরত্নাখ্যমস্মিন্নকার্ষীৎ।।
রুক্মিন্যাঃ কান্তত‍ুষ্ট্যৈ সমুদিতমনসা
রামনাথেন রাজ্ঞা।
দত্তঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজনগরে
তাতসংকল্পসিদ্ধ্যৈ।।'

১৩৭৪ শকাব্দা। কলকাতার টালিগঞ্জে ১নং মণ্ডল টেম্পল লেনে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা উচ্চতম নবরত্ন মন্দিরের লিপি :

'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ শকাব্দা ১৭১৮।
শাকেহষ্টাদশ বাজিচন্দ্রগণিতে কুম্ভস্থিতে
ভাস্করে
রাধাকান্তমুদে শুভাশয়যুতে গঙ্গোপকণ্ঠ-
স্থলে।।
আরব্ধং নবরত্নমেতদমল তদ্রামনাথেন দা—
সেনাস্মিন্নবরুম্মমেত্রবিমিতে পূর্ণত্ব-
মাগান্মধৌ।।
ইতি পুনশ্চ— ১৭৩১।৩ সংক্রান্ত্যাং সর্বং পূর্ণত্বমগাৎ। এ মন্দিরের আদর্শে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিনীর মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, একথা আগেই বলা হয়েছে। প্রবাদ, শিল্পীদের মধ্যে বিশ্বকর্মাও ছিলেন। এগারোজন শিল্পী যখন নীচে কাজ করতেন তখন ওপর থেকে বারোজনকে দেখা যেত। চন্দ্রকোণার লালগড়ের নবরত্নের লিপিটি বর্তমানে লুপ্ত। পূর্বে গৃহীত এই লুপ্ত লিপিটি হ'ল :

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৭৭। শাকেহঙ্ক-
মুনিবাণেন্দৌ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে।
তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে . আরম্ভোহস্য
বভূব হ।।
হরিনারায়ণসুপল্য পত্নী শ্রীলক্ষ্মণাবতী।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ নবরত্নমিদং দদৌ।।
রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দরসিকা শ্রীবীরভানো
র্বধূঃ।
খ্যাতশ্রীহরিনৃপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোল-
রায়াত্মজা।।
মাতা শ্রীযুতমিত্রসেননৃপতেঃ বিখ্যাতকীর্তেঃ
ক্ষিতৌ।
শ্রীনারায়ণমল্লভূপভগিনী রম্যং দদৌ
মন্দিরম্।।
গিরিধারীপদাম্ভোজে নবরত্নমিদং শুভম্।
নির্মায় বহুযত্নেন সমর্পিতবতী মুদা।।
পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী গোকুলদাস।।

লিপিটির আয়তন যে বেশ বড়ো ছিল তা উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায়। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দিরের (যুগান্তরে ১৭ই পৌষ, ১৩৭৫ তারিখে এ মন্দিরের ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে) লিপিটি নিম্নরূপ :

শকাব্দে রসবহ্নিমৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং
মন্দিরম্।
মোক্ষদ্বার চতুর্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী-
রাজিতম্।।
ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনা রব্ধং
তদাজ্ঞানুগো
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী
নির্মমে।। শকাব্দাঃ ১৭৩৬
মন্দিরটির নির্মাণে খরচ হয়েছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। এটি ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নাড়ির আদর্শে পঞ্চতল ও ত্রয়োদশচূড়াযুক্ত।

সতেরো ও পঁচিশ চূড়া মন্দিরে লিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। একুশ চূড়ো মন্দিরে কোন লিপি ছিল কিনা জানা নেই। কালনার (বর্ধমান জেলা) বহুচূড়া মন্দিরে সংস্কৃত লিপি আছে।

কাঁথির কাছে বাহিরী গ্রামের তিনটি শিলালিপি হল :

কালীদাসকুলে বিভীষণ ইতি
শ্রীপদ্মনাভাত্মজঃ
শ্রীমান মাধবতুর্ণরাজকসমো
প্রাসাদমুচ্চৈরিমম্।।
গোপালপ্রতিমাং চ সম্ভিঃ প্রতিষ্ঠাং দ্বিজে
রামং চেহ সুভদ্রয়া সহ জগন্নাথং
ব্যবসীদিপ।।
পৌত্রঃ শ্রীধরণীসুতো ভগবতঃ
সুনুর্দ্বিজন্মশ্রেণী
শ্রীমানর্জুন মিত্র ইত্যভিহিতস্যাচার্য-
চূড়ামণেঃ।।
পুরুষোত্তমাধবঃ কবীন্দ্র ইতি বত্যাংসি
প্রতিষ্ঠ বিধিম।
প্রাসাদস্য বিভীষণস্য বিধিনা কৃত্বা
বিরামং গতঃ।।
শকাব্দে রস শূন্যেবাণধরণী মানে
তৃতীয়াতিথৌ।
বৈশাখে বুধবাসরে মুনিমিতে পক্ষে
যুগাদৌ সিতে
শ্রীবৃত্তার গদাধরায় গুরবে
তদ্দেবতানাং মুদে।
দত্তং গ্রামবরোচিতং প্রতিদিনং (তদ্দে?)
দেউলবাড়াখ্যকম্।।
১৫০৬ শকাব্দাঃ (বা ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ)

উদ্ধৃত শ্লোকে কিছু ভুল আছে। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার রত্নেশ্বরবাটী গ্রামের উৎকলীয় রীতির শিবের বড় দেউলটির লিপিটি এই—

বস্বেষু মুনিসংখ্যাতে শাকে চৈব
নিশাপতৌ।
মাঘস্য পঞ্চবিংশাহে আরম্ভোহস্য বভূব হ।। শকাব্দাঃ ১৭৫৮।২৫শে মাঘ। শিলাবতী নদীর কাছাকাছি মন্দিরটি অবস্থিত।

উপরে উদ্ধৃত বাংলার মন্দিরের বিভিন্ন লিপিগুলি জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য সন্দেহ নেই। কারণ এগুলি প্রায় সবই সংস্কৃতে রচিত। লিপির মধ্যে প্রতিষ্ঠাকাল বলা হয়েছে কতগুলি সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে। অবশ্য শুধু সংখ্যার দ্বারাও সময় কথিত হয়েছে দেখা যায়। সাধারণের বোঝার সুবিধের জন্যই যে এরূপ করা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবুও যেখানে কোন সংখ্যার উল্লেখ নেই সেসব স্থানে সহজে বোঝার জন্যে কতগুলি শব্দের অর্থ এখানে দেওয়া হল :

সুধাংশু=১, রস=৬ অংক=৯ পক্ষ=২ শেবধি=৯ বসু=৮ বেদ=৪ ঋতু=৬ সমুদ্র=৭ শশী=১ শিবেক্ষণ (শিবের চোখ)=৩ বিয়ৎ (আকাশ)=০ মুনি=৭ ইন্দু=১ মহী=১ কর=২ অঙ্গ (বেদাঙ্গ)=৬ সিতাংশু=১ খ=০ নিশাপতি (চন্দ্র)=১ দহন (অগ্নি)=৩ যম=২ নগ=৭ অব্জ=৭ কাল=৩ ক্ষিতি=১ অশ্ব=৭ বাণ=৫ এভাবে লিপিতে উল্লিখিত এ শব্দগুলির অর্থ জানা থাকলে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রকৃতকাল জানতে অসুবিধে হবে না।

বাংলার মন্দির আজ বহুলাংশে ভগ্ন। যে অংশে লিপি ক্ষোদিত থাকে উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে সেগুলি আজ বহুক্ষেত্রে লুপ্ত। তাই অনেকস্থানে মন্দির দাঁড়িয়ে থাকলেও লিপি না থাকায় কোন সময়ের মন্দির তা আজ আর জানার উপায় নেই। সৌভাগ্যের বিষয় মন্দিরগাত্র থেকে উৎক্ষিপ্ত লিপিগুলি অবশ্য কোন কোন স্থানে পুনরায় সরকারী উদ্যোগে পুনঃস্থাপিত হতে দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে এ ধরণের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কোন কোন স্থানে অনেক অজ্ঞ জনসাধারণের গাফিলতিতে অনেক লিপি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেগুলির আর পুনর্নিবেশের সম্ভাবনা নেই। পুরাতত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিরা এ বিষয়ে আরও দৃষ্টি দিলে মন্দির লিপির পাঠোদ্ধার করা যে সম্ভব হবে তাতে সন্দেহ নেই।

॥ ২ ॥

কর্মক্ষেত্রে নামার পর দেখা গেল এই ব্যবসা সম্বন্ধে হেমন্তর একটা অতিরিক্ত অনুভূতি আছে। এখন যাকে ইংরেজীতে ষষ্ঠ অনুভূতি বলে। পূর্ণবাবু তো বটেই আরও অনেককেই মানতে হয় কথাটা। অনেক পাকা ঘুঘু ব্যবসাদার অনভিজ্ঞ অভিভাবকহীনা বিধবা মেয়েছেলে দেখে সোৎসাহে ঠকাতে এসে ঘা খেয়ে ফিরে গেল হার মেনে। অনেক ঘাগী দালাল হিমসিম খেয়ে গেল ওর দূরদর্শিতা ও বুদ্ধির কাছে।

নারকেলডাঙ্গার তিন কাঠা জমির ওপর অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি—ওপর নিচে চারখানা ঘর যেখানে সাড়ে আট হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে সেখানে—তা না কিনে আহিরীটোলায় সওয়া কাঠা জমির ওপরে বহু পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ি আট হাজার টাকায় কেন কেনে তা পূর্ণবাবু পর্যন্ত বুঝতে পারেন না। তিনি খবরটা শুনে—হেমন্তকে কটা ব্যাপারে বেশ লাভ করতে দেখে লুব্ধ হয়ে নিজেই কিনে নিলেন নারকেলডাঙ্গার বাড়িটা। কিন্তু তারপর—ঐ ন' হাজার (কেনার খরচ সহ ধরলে নয়ের বেশীই হবে বোধ হয়) এর ওপর আরও হাজার খানেক টাকা খরচ করে দীর্ঘদিন বসে রইলেন, মোট খরচের দশ হাজার টাকাও কেউ দিতে চাইল না। অথচ হেমন্ত আহিরীটোলার বাড়িতে স্রেফ পলেস্তারা লাগিয়ে সামনেটা সামান্য একটু অদলবদল করে পাইখানাটা ভেঙে নতুন করে তৈরী করিয়ে অনায়াসে বারো হাজার টাকায় বেচে দিল। অর্থাৎ নীট দেড় হাজার টাকা লাভ। সব খরচ খরচা মায় ওর [illegible] ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ধরেও।

হেমন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় ছ' সাত হাজার টাকা লাভ করে ফেলল। একটা ব্যাপারে খালি কিছু লোকসান দিতে হয়েছিল, তাও লোকসান এই হিসেবে যে খরচে আমদানিতে হেরাফের। ওর খাটুনির কোন মজুরী পায়নি। বালিগঞ্জের যে বাড়িটা তৈরী করিয়েছিল—আগেই পেছনের জমিতে বাড়ি করেছে, সামনের বাড়ি উঠে গেলে পেছনের অসুবিধাটা স্পষ্ট চোখে পড়বে সকলের এটা বুঝেছিল ও—খরচ-খরচা বাদে পঞ্চাশেক টাকা লাভে বেচেছে, এখন সামনের অংশে বাড়ি তুলছে। এবং নিশ্চিন্ত আছে—পেছনের বাড়ি যে কিনেছে সে-ই নিজের গরজে খদ্দের খুঁজে আনবে।

তবে বালিগঞ্জে ওর নিজের থাকার সুবিধে হল না। কাজকর্ম বেশির ভাগই উত্তরের দিকে—অতদূরে থেকে আসা-যাওয়ার অসুবিধে হয়, আজকাল অনেক মেয়েছেলে ট্রামগাড়িতে চড়ছে কিন্তু হেমন্ত পারে না, ওর ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া যাতায়াত পোষায় না। তাই বাদুড়বাগানে নিচেতলায় ভাড়াটে সুদ্ধ একটা ছোটবাড়ি কিনে উঠে এল আবার। বালিগঞ্জে যে-বাড়িটা আগে কিনেছিল—জমির সঙ্গে—সে-বাড়িটা বেচল না। একখানা ঘর নিজের জন্যে রেখে ভাড়া দিয়ে দিল। ভাল ভাড়াটেই পেল, ঠাকুরবাড়ির কে এক দৌহিত্র ব্যারিস্টার সবে বিলেত থেকে এসেছে, সে একটু নিরিবিলি হালপছন্দর বাড়ি খুঁজছিল, তার পছন্দ হয়ে গেল জায়গাটা ও বাড়িটা। এক কথায় পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়াতে নিয়ে নিল সে। খবরটা শুনে পূর্ণবাবু পর্যন্ত হাত তুলে নমস্কার করলেন, বললেন, তোমারই হাতযশ। ঐ সম্পত্তিটা এক বছরের ওপর পড়ে ছিল নতুন তৈরী হয়ে ইস্তক কেউ একবার দেখতেও চায়নি। তুমি বাবা ভেলকি লাগিয়ে দিলে!"

পরিচিত মহলে কথাটা একটু একটু করে রাষ্ট্র হয়ে গেল বৈকি!

হেমন্ত আগেও, খাটা কড়িতে দু' পয়সা করেছিল, কিন্তু এখন, ছেলে মরার পর, একেবারে যেন চার হাতে টাকা রোজ-গার করছে। ভাগ্যে থাকলে নাকি এমনিই হয়—যে-সর্বনাশে নাকি একেবারে ভেঙে পড়ার কথা, তাতেই কারও কারও সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। ছেলে মরার ফলে তার আসল যা কাজ যদি ছেড়ে না দিত হেমন্ত, তাহলে এ-কারবার এমনভাবে শুরুও করতে পারত না, এমন বরাতও খুলত না।

পরিচিত মহল এখন এ-শহরে ছোট নয়। এত বছর ধরে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে গেছে, বহু ভদ্রলোকের বাড়িই যেতে হয়েছে তাকে, কোথাও কোথাও বারবার যেতে হয়েছে। বড় সম্পন্ন পরিবারে বহু বধূ বহু কন্যা থাকে, সেসব বাড়িতে বছরে চার-পাঁচবার ডাক পড়াটা খুব সাধারণ ঘটনা, স্বাভাবিক। এইসব বাড়িতে বারবার যাতায়াত করার ফলে অনেকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে গেছে। এই বাড়ি কেনা-বেচার কারবারেও এই রকম প্রাক্তন মক্কেলদের অনেকের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হল—এদের মারফৎও বিস্তর খবর আসতে লাগল—মাল ও ক্রেতা উভয়েরই।

সুতরাং ওর উপার্জন বৃদ্ধি বা অবস্থা ফিরে যাওয়ার সংবাদ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে—ক্রমশ সেটা অতি দূরের আত্মীয় সমাজে পর্যন্ত পৌছবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আর পয়সার গন্ধ পেয়ে সেই সব আত্মীয়সমাজ নতুন করে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্যে ব্যস্ত হবে—তাতেই বা বিস্মিত হবার কি আছে?

তবে হেমন্ত এটা ভাবেনি। তার অস্তিত্ব—বিশেষ করে তার ঠিকানা তার তথাকথিত আত্মীয়রা সন্ধান করতে পারবে এ-কথাটা একবারও ভাবেনি সে।

বিশেষ প্রথম যার আগমন ঘটল তার কথা সুদূরে কল্পনাতেও মনে হয়নি তার।

দাদা। ওর আপন দাদা।

হেমন্ত চিনতেও পারেনি প্রথমটায়। সারাদিন দু' জায়গায় মিস্ত্রী খাটানোর তদারক করা, সুরকি-জোগার গিয়ে বসে সুরকি দেওয়ার জন্যে রাগারাগি করা, খালধারে গিয়ে ছাদে পাতবার টালি দর করে বায়না দিয়ে আসা—এইতেই কেটেছে। একেবারে ভোরে স্নান-আহ্নিক সেরে একটু সরবৎ খেয়ে বেরিয়েছে—সমস্ত দিনে আর কিছুই পেটে পড়েনি। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে আবার স্নান-আহ্নিক সেরে দুটো ভাত খেয়ে নেবে, রাত ন'টা বেজে গেলে আর খাওয়ার উপায় থাকবে না—সেইজন্যেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। বামুনঠাকুরকে কিছুই বলে যায় নি—কখন ফিরবে বা কি খাবে—এই ছুটোছুটি শুরু হবার পর আবার একটি ঠাকুর রেখেছে—সে যদি উনুন না জেলে থাকে এখনও—কিম্বা মনতোলা করে লুচি-পরোটা কিছু ভেজে রেখে থাকে, আজকে আর দুটো ভাত জুটবে না অদৃষ্টে, অথচ প্রাণটা টা-টা করছে সারাদিনের উপোসে—ঘোরাঘুরি ও বকাবকিতে—অন্তরাত্মা একান্তভাবে দুটো ভাতই চাইছে, সেজন্যেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত।

কিন্তু বৎপরোনাস্তি ক্লান্ত উত্তপ্ত হেমন্ত গাড়ি থেকে নামতেই চাকরে মা এসে খবর দিলে, কে একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছেন, ওর সঙ্গে দেখা করবেন বলে।

'ভদ্রলোক? কী রকম লোক? কী চান? বাড়ির দালাল, না খদ্দের?'

'না দিদি। দালালবাবুদের মোটামুটি সবাইকে চিনি, তেনারা কেউ নয়। খদ্দের বলেও মনে হল না—মানে শাঁসালো মানুষ কেউ নয়। কাপড়-জামার হাল ভাল নয়। বামুনসজ্জন হবে—মাথায় টিকি আছে।'

বিরক্ত হয়েই এসেছিল, বিরক্তি মিস্ত্রী থেকে মহাজন সকলের ওপরই প্রায়, এই উৎপাতে আরও বিরক্ত হয়ে উঠল।

'তা কেন এসেছে, কী চায়—তাও জিজ্ঞেসা করে রাখতে পারিসনি? হয়ত শুনবে কার কন্যেদায়। কিম্বা পিতৃদায়—কিম্বা জ্ঞাতিরা ঠকিয়ে নিয়েছে যথাসর্বস্ব, খেতে পাচ্ছে না—সাহায্য চাইতে এসেছে। নানান সত্যি-মিথ্যে এক কাঁড়ি কথা বসে বসে শোনো এখন! তাও এক কথায় কথা শেষও করবে না। উঠবেও না—ন্যাকড়ায় আগুন সব—ঘ্যান ঘ্যান করেই যাবে বসে বসে।'

'শুধিয়েছিলুম দিদি, বললে নি। বললে, 'তেনার সঙ্গে আমার দরকার আছে বিশেষ। আমি তেনার আপনার লোক!'

'আপনার লোক! আমার আপনার লোক আর কেউ নেই। এক যম আছে শুধু!'

গজগজ করতে করতেই বাড়ি ঢুকল।

ওপরে উঠে দেখেও কিন্তু চিনতে পারল না।

খোঁচা খোঁচা এক মুখ গোঁফদাড়ি, হয়ত কামানো হয়নি, কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুল, তার মধ্যে একটা টিকি ফাঁস দেওয়া—আধ-ময়লা ধুতি আর একটা আধ-ময়লা জিনের কোট।

বুঝল ওর অনুমানই ঠিক, সাহায্য চাইতে এসেছে কোন অছিলায়। ঝি এমনি ঢুকতে দেবে না বা বসতে দেবে না বলে আপনার লোক সেজেছে।

আরও বিরক্ত হয়ে, ভুরু কুঁচকে বেশ কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কাকে চান আপনি? কী দরকার?'

লোকটি মাথা হেঁট করে মাটির দিকে চেয়ে বসেছিল। ঘরে চেয়ার আছে তাতে বসেনি, চারুর মার পেতে-দেওয়া আসনে আলতোভাবে বসে আছে।

হঠাৎ হেমন্তর এই রুক্ষ রুষ্ট প্রশ্নে চমকে মাথা তুলে, ওর কঠিনতর ভ্রূকুটির দিকে চেয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। একটু হাসির চেষ্টা করে বলল, 'আমি-- মানে—হিমি আমাকে চিনতে পারলি না?

হিমি!

বহু যুগ বহু শতাব্দী আগেকার নাম এটা, যেন জন্মান্তরের। মনে হল এ-জন্মের অপর পার থেকেই নামটা কেউ উচ্চারণ করল।

এ-নাম হেমন্ত নিজেই ভুলে গেছে। ওর মা ডাকতেন এই নামে শুধু। বাবা পুরো নাম উচ্চারণ করে ডাকতেন হেমন্ত-বালা বলে। বাকী সবাই বলত মেজ-খুকী।

এবার ভাল করে চেয়ে দেখে মনে হল—এই মুখ না হোক, এই হাসির ভঙ্গীটা, চোখের বোকাবোকা পরনির্ভরশীল বিমূঢ় চাউনির ভাবটাও একেবারে ওর অপরিচিত নয়।

তবে পরিচিত হলেও বহুদিনের পরিচয়, জন্মান্তরেরই।

দাদা! সেই দাদার এই হাল হয়েছে!

একবার, এক মুহূর্তের জন্যে স্বাভাবিক স্নেহ-জনিত উৎকণ্ঠা বোধ করেছিল, একটু সহানুভূতি—কিন্তু সে ঐ এক মুহূর্তের বেশী নয়।

'দাদা' শব্দটাও মুখ থেকে বেরোতে যাচ্ছিল—সহজেই, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বললে, 'ও, অদ্বৈত-বাবু। তা কি মনে করে—এমন অসময়ে? ...আমি বড় ব্যস্ত, দেখতেই পাচ্ছ। সারা-দিন স্নানাহার হয়নি—খুব ক্লান্তও।... কোন বিশেষ দরকার আছে?'

আর যাই হোক, ওর দাদা এই অদ্বৈতবাবুটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না বোধহয়। অদ্বৈত নাম রেখেছিলেন বাবা, অদ্বৈতচরণ বড় ও চন্দ্রশেখর ছোট ছেলের নাম—কিন্তু সে-নাম কেউই ব্যবহার করত না। মা ডাকতেন বাদল বা বাদু বলে—শ্রাবণ মাসে হয়েছিল, ঘোর বর্ষায়—সেই নামটাই বেশী পরিচিত।

ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—এই একটি নাম উচ্চারণের আঘাতে কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না, এমনিই—অনেকদিন কোন খোঁজখবর পাইনি—তাই। এই অঞ্চলে আছিস শুনেছিলুম—অনেক কাণ্ড করে আমাদের এক শিষ্যর কাছ থেকে ঠিকানাটা আজই যোগাড় করেছি—'

বাধা দিয়ে হেমন্ত বলল, 'কেন, এত-দিন পরে এত কাণ্ড করার কি দরকার হয়ে পড়ল—হঠাৎ?'

'না—মানে খবর তো পাইনি—'

'খবর রাখার কি চেষ্টা করেছিলে খুব? যেদিন তোমার বাবা আমাকে বাড়ি থেকে ঐভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেদিন এত টান এত উৎকণ্ঠা কোথায় ছিল? সেদিন তো একটা কথাও বলোনি! এত কি ভয়ের ছিল বাবাকে? তার তো—একটু নড়ে বসলেও যদি এক পয়সা রোজগার

হয়—সেটুকু নড়ে বসারও সামর্থ্য নেই। তোমার ওপরই তাঁর নির্ভর।...আর সে তো বহুকালের কথা হল—এতদিনই বা খবর নেবার দরকার বোঝনি কেন?'

'না, মানে পাইনি বলেই—' গলদঘর্ম হয়ে ওঠে বাদল, 'চেষ্টা করেছি বৈকি!'

'মিথ্যে কথা। এত কাণ্ড করলে ঠিকই পেতে। আজ যাদের কাছ থেকে পেয়েছ, তাদের কাছেই পেতে। তা তো নয়—খবর পেয়েছ বলেই খবর নাওনি। দাইয়ের কাজ করে একটা মেয়েছেলে—তার খবর নিয়ে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা করলে লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারবে না—তাই।'

'তা—মানে শিষ্যিসেবক নিয়েই তো আমাদের চালানো—'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে এখন এত খবর নেওয়ার চাড় কেন হল অদ্বৈতবাবু, রাতা-রাতি কি শিষ্যসেবকরা সব খৃষ্টান হয়ে গেল—না তোমাদেরই আর তাদের ওপর নির্ভর করার দরকার রইল না?'

চুপ করে থাকে ওর দাদা, মাথা হেঁট করেই বসে থাকে।

'তা নয়।' হেমন্তর গলা বিলিতী ক্ষুরের মতো শাণিত হয়ে ওঠে, 'এখন শুনেছ অনেক টাকা হয়েছে, সে-কাজও ছেড়ে দিয়েছি, তাই এসেছ। যেদিন বাড়ি থেকে অসহায় বোনটাকে একটা শিশুসুদ্ধ সবাই মিলে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেদিন ভাবোনি যে, এমন দিনও তার আসতে পারে—না? তবে শুনে যাও, সেদিন শেষ অবধি এক বেশ্যার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল—তারই দয়ায় প্রাণ বাঁচানো শুধু নয়—পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি, নিজে স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পেরেছি। এর পরও ইচ্ছে হচ্ছে এখানে বসতে? দ্যাখো—গিয়ে আবার প্রাচিত্তির করতে হবে না? উঠে পড়ো, উঠে পড়ো—কথাটা জানার পর আর এখানে বসে থেকো না। পাপ হবে।'

উঠেই দাঁড়ায় অদ্বৈত, তার কপালে তখন রীতিমতো ঘাম দেখা দিয়েছে, এক-কালে সুগৌর কান্তি ছিল, তা আর নেই—তবু হেমন্ত লক্ষ্য করল ওর মুখ আগুন-বর্ণ ধারণ করেছে।

কিন্তু বাইরের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও, একটু থমকে দাঁড়িয়ে প্রায় মরীয়া হয়ে বলে ওঠে, 'শিবুটা মানুষ হল না, নেশাখোর হয়ে গেছে, বাড়িতেও থাকে না সব সময়—বোধহয় চরিত্রেরও ঠিক নেই, বাবা কিছু বলতে গেলে অকথ্য অপমান করে, আমার একার ওপরই সব।...বাবা শয্যাগত, এখন-তখন অবস্থা, শোথ রোগ হয়েছে—টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না—'

'ওসব কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন? আমার জন্মদাতা এক ব্যক্তি ছিল, ঘোর স্বার্থপর, লোভী ও অকর্মণ্য—তার অত্যাচারে আমার মার অকালমৃত্যু হয়েছিল—আমার কাছে সে লোক বহুকাল মৃত। তোমার বাব আমার কেউ নয়। সুতরাং, ওসব নাকে-কান্নায় আমার মন গলবে না। যতদূর শুনেছি, তোমাদের মধ্যে শিবুরই কিছু মনুষ্যত্ব গড়ে উঠেছে। মানে মানুষই সৎ হয়—মানুষই বদ হয়। তোমাদের মতো বেনে পুতুলরা কিছুই হতে পারে না।...যাক, তেতেপুড়ে এসেছি, আমাকে আর বকিও না। আর কখনও কষ্ট করে খবর রাখারও চেষ্টা করো না। তোমাদের যে মেজবোন একজন ছিল, তাকে তোমরাই মেরে ফেলেছ একদিন—এইটে জেনে নিশ্চিন্ত হও। তোমার বাবা তোমার সে মেজ বোনের বিয়ে দেওয়ার আগে একটু উয্যুগ করে খবরও নিতে পারে নি যে কার হাতে কোথায় দিচ্ছি, বিয়ের পর সে কি অবস্থায় আছে তাও খবর নেওয়া দরকার মনে করেনি। তুমি নিজে দেখে এসেছিলে তার দুর্গতি—তোমার মুখে শুনেও মেয়েকে সেখান থেকে নিয়ে আসার কথা মনে হয়নি তার—শুধু যখন মৃত্যুর হাত থেকে যমদূতদের হাত থেকে ছোট জাতের মেয়ে একটা ঝিয়ের দয়ায় অব্যাহতি পেয়ে একটা মহাপ্রাণ ছেলের সাহায্যে কোনমতে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছিল—তখন বামনাই দেখিয়ে বংশ দেখিয়ে দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল, জেনেশুনে তাকে হয় আত্মহত্যার দিকে, নয়তো খানকিগিরির দিকে ঠেলে দিতে পেরেছিল।...সেই অমানুষ জানোয়ারটার কথা শোনাতে এসেছ আমাকে। তার অসুখ!...টান মেরে রাস্তায় ফেলে দাওনি কেন, জ্যান্তে শ্যাল-কুকুরে টানাটানি করে ছিঁড়ে খেলে তবে তার মহাপাপের প্রাচিত্তির হত।'

তারপর একেবারে দাদার দিকে পিছন ফিরে বললে, 'শুনলে তো আমার মত, এখন সরে পড়ো।'

বলে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। ঠাকুর ও ঝিয়ের সকৌতূহল বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে অপমানিত বড় ভাই কীভাবে চোখের জল চাপার চেষ্টা করতে করতে মাথা নিচু করে নেমে গেল, তাও ফিরে দেখল না আর।

চারুর মা পুরনো লোক, অনেক দেখেছে—সে অতটা ভয় করে না। সে বলল, 'হ্যাঁ দিদি, এ তোমার আপন দাদা? মায়ের পেটের ভাই? তাকে এমন নচ্ছতো-নচ্ছতো করলে। এতটা বাপু তোমার উচিত হয়নি!'

বলতে বলতেই তার নজরে পড়ল হেমন্তরও দুই চোখে টলটল করছে জল। বহুকাল পরে ওর চোখে আবার জল দেখল চারুর মা, তার শিক্ষাদীক্ষা কম কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝল, আঘাতটা আহতের থেকে আঘাতকারীকে কম বাজেনি, সে চুপ করে গেল।

কিন্তু হেমন্ত উত্তর দিল, প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠে বলল, 'আমার বাপভাই কেউ কোথাও নেই। সব মরে হেজে গেছে। সপুরী এক গাড়ে গেছে। ওদের মুখ দেখলেও মহা-পাপ হয়। ওরাই আমাকে আজ এই পথে ঠেলে দিয়েছে।...উচিত, ঐ লোকটা যেখানে বসেছিল সেখানে গোবর-জল-ছড়া দেওয়া। আমার একটিই আপন লোক ছিল, তোদের ও-বাড়ির দিদি, সেও মরে গেছে, তার সঙ্গেই ইহজগতের আপনার লোক চলে গেছে সবাই। ঐ যে এসেছিল তার চেয়ে তোরা আমার ঢের বেশী আপন।'

বলতে বলতেই আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল—যেন হাঁপাতে লাগল সে এবং এত-খানি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াতেই দুই চোখের বাঁধ ভেঙে আকুল অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

(ক্রমশঃ)

তাহলে শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় বাহাত্তরের নির্বাচনী ছকটা যা দাঁড়ালো তার সঙ্গে সাতষট্টি, উনসত্তর বা একাত্তরের ছকের কোনো মিল নেই। সাতষট্টিতে ছিল দুটি বামপন্থী ফ্রন্ট, একটি সি-পি-আই এবং অপরটি সি-পি-এম নেতৃত্বাধীন—পরে অবশ্য দোঁহে মিলে প্রথম যুক্তফ্রন্ট তৈরি হয়েছিল। উনসত্তরে সেই ১৪ পার্টির ফ্রন্টই ছিল একমাত্র কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট। আর একাত্তরে আবার ঘুরে ফিরে সেই দুটি বামপন্থী ফ্রন্ট—দুই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। সাতষট্টির মতো একাত্তরেও নির্বাচনের পর ছকটা আবার পাল্টে যায়। একটি বামপন্থী ফ্রন্ট, অর্থাৎ আট-পার্টির কোনো কোনো শরিক কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়ে মন্ত্রিসভা গড়তে সাহায্য করে। আর এবার এই পাঁচ বছরের মধ্যে চতুর্থ নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্ট তৈরি হল একটিই, কিন্তু উনসত্তরের মতো সেই ফ্রন্ট ব্যাপক হল না, কারণ সি-পি-আই তাতে রইল না এবং ফরওয়ার্ড ব্লক আসনের বোঝাপড়া করলেও তাকে ঠিক ফ্রন্টে যোগ দেওয়া বলে না। অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার পর থেকে মাত্র একবারই দুই কম্যুনিস্ট পার্টি একই ফ্রন্টের পতাকার তলায় নির্বাচনী লড়াই করতে পারলে।

সি-পি-এম এখন দাবি করবে যে, তার নির্বাচনী রণকৌশল সফল। জানুয়ারিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যে বাম-পন্থী ফ্রন্ট গঠনের ডাক দেওয়া হয়েছিল সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে অন্ততঃ দুটি দল—আর এস-পি এবং এস-ইউ-সি। তবু এই সাফল্যকে আংশিক বলতে হবে, কারণ সি-পি-আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়াও সমাজতন্ত্রী দলও এই ফ্রন্টে নেই। সি-পি-এমের পক্ষ থেকে কিছুদিন থেকে বলা হচ্ছিল যে যুক্তফ্রন্টকে আবার জীইয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুন যে ফ্রন্ট তৈরি হল তাতে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের ঠিক অর্ধেক সংখ্যক দল রয়েছে। তাই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত নতুন ফ্রন্টের নাম আর যুক্ত-ফ্রন্ট রাখা গেল না।

এবারের নির্বাচনী ছকটা এ-কথাও পরিষ্কার করে দিলে যে, পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে মধ্যপন্থার আর বিশেষ স্থান নেই। উনসত্তরেও অবশ্য সেই কথা মনে হয়েছিল, কারণ সেবারও কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্টের মধ্যবর্তী কোনো উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল না। তবু তখন কিন্তু 'পোলারাইজেশন' কথাটা চালু হয়নি। একাত্তরের নির্বাচনের পর থেকে যে এই কথাটা চলছে, তার অবশ্য কারণও আছে। উনসত্তরে এক-দিকে যে যুক্তফ্রন্ট ছিল তার মধ্যে সি-পি-এম থেকে সুরু করে বাংলা কংগ্রেস পর্যন্ত নানা মতাদর্শের দলের সহাবস্থান ঘটে-ছিল। কিন্তু একাত্তর থেকে ভোটদাতাদের পছন্দ আরো সুস্পষ্ট—একদিকে কংগ্রেস এবং অপরদিকে সি-পি-এম। আজ এমন একটা অবস্থা দেখা দিয়েছে যে, এই দুটি দল সমান শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং এবারের নির্বাচনেই ভোটদাতাদের আরো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে, কোন দল এগিয়ে যাবে। বিধানসভার দৌড়ে এবারও যদি জয়ী সাব্যস্ত করতে ভোটদাতারা দ্বিধাগ্রস্ত হন তবে কিন্তু পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে স্থিরতা আসবে না।

●

গতবারের আট-পার্টি জোট বা সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিলুপ্তিই পশ্চিম বাংলার রাজনীতি থেকে মধ্যপন্থার বিদায়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ঐ জোটের প্রধান তিন শরিক এখন তিন দিকে। সি-পি-আই কংগ্রেসের সঙ্গে, এস-ইউ-সি সি-পি এমের সঙ্গে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মতো। আট-পার্টির জোটের বাইরে আর-এস-পির 'একলা চলো' নীতির ব্যর্থতাও তাকে সি-পি-এমের দিকে টেনে এনেছে।

এস-ইউ-সি এবং আর এস পি-র মধ্যে শেষোক্ত দলটিই প্রথম সি-পি-এম সম্পর্কে দ্বিধা কাটিয়ে ওঠে। জানুয়ারির মাঝামাঝি, অর্থাৎ প্রায় যে সময় সি-পি-এমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক চলছিল, সেই সময়েই আর এস পি রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, 'সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল গণ-তান্ত্রিক দলগুলির এক হয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন।' কংগ্রেস-বিরোধী ভোট যাতে ভাগাভাগি না হয় এবং একটি বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পও ঘোষণা করা হয়। তবে আর-এস-পি চেয়েছিল যে, সি-পি-এম, এস ইউ সি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়া সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গেও সমঝোতা চালানো হোক। কিন্তু আর-এস-পি একবারও সি-পি-আইয়ের সঙ্গে বোঝা-পড়ার চেষ্টার কথা বলেনি।

এস-ইউ-সি মনস্থির করল আরো পরে। অবশ্য ডিসেম্বরে এই দলও বামপন্থী ঐক্যের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু সেই ঐক্যের পথে প্রধান বাধা যে সি-পি-এমের সংকীর্ণতাবাদ ও বিভেদকামী নীতি তা বলতেও এস-ইউ-সি দ্বিধা করেনি। এই দল স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল যে, বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে 'জোতদার, পুলিশ, গুণ্ডাবাহিনীকে জড় করে সি-পি-এম সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল।' এমনকি সি-পি-এমের আচরণ যে ফ্যাসিস্ট-সুলভ তা বলতেও এস-ইউ-সির আট-কায়নি। এস-ইউ-সির অবশ্য ইচ্ছে ছিল, সি-পি-আইকেও প্রস্তাবিত ফ্রন্টে নিয়ে আসা হোক। তাই সি-পি-আই এবং সি-পি এম উভয়কেই তাদের ভুল রাজনীতি ত্যাগ করে 'সঠিক রাস্তায় ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে' আহ্বান জানানো হয়েছিল।

সি-পি-আইকে অবশ্য বামপন্থী ফ্রন্টে পাওয়া যায়নি, কিন্তু এস-ইউ-সি যে সি পি এম সম্পর্কে দ্বিধা কাটিয়ে উঠল, তার কারণটা কী? সি পি এম কি তাদের 'ভুল রাজনীতি' পরিত্যাগ করেছে? যেসব কারণে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট বিপুলে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও এক বছরের বেশি স্থায়ী হতে পারে নি সেইসব কারণ যে ভবিষ্যতে দেখা দেবে না, এমন গ্যারান্টি কি এস ইউ সি পেয়েছে?

সি-পি-এম সম্পর্কে এস-ইউ-সি'র সন্দেহ ছিল বলেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভাঙবার পর থেকে এই দল সি-পি-এমের সঙ্গে মিলিত কর্মসূচীতে রাজী হতে পারে নি। বিশেষতঃ গত বছর হত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে অভিযানে যখন সর্বদলীয় প্রয়াসের কথা ওঠে তখন এস-ইউ-সি'র দাবী ছিল একটি সর্বদলীয় আচরণ বিধির। ঐ আচরণ বিধির দাবী তুলতে হয়েছে দ্বিতীয় যুক্ত-ফ্রন্টের আমলের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্যেই। সি-পি-এম অবশ্য এই আচরণ-বিধি সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ কখনোই দেখায় নি। বরং প্রমোদ দাশগুপ্ত এই দাবী নিয়ে সুযোগ পেলে পরিহাস করতেও ছাড়েন নি। কারণ ঐ আচরণ-বিধি তৈরি করার অর্থই অতীতের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করা। কিন্তু সি-পি-এম বরাবরই বলে এসেছে যে, তার নীতিতে কোনোদিনই ভুল ছিল না, যুক্ত-ফ্রন্ট ভেঙেছিল কংগ্রেস ও তার দালালদের চক্রান্তে।

এবার বামপন্থী ফ্রন্টে যোগ দেওয়ার আগে কিন্তু আর এস পি এবং এস ইউ সি উভয়েই দাবি জানায় যে, ফ্রন্ট তৈরির আগে অতীতের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করতেই হবে। এত দিন সি পি এম এই দাবি মানতে চায়নি, কিন্তু এবার তাকে তা মেনে নিতে হল। তাই বামপন্থী ফ্রন্টের নীতি সংক্রান্ত ঘোষণায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভাঙার নানা কারণ উল্লেখ করতে হয়েছে। তার মধ্যে কংগ্রেসের চক্রান্ত, কোনো কোনো শরিকের কংগ্রেস-বিরোধিতা ত্যাগ করে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতের চেষ্টা, গণ সংগ্রামে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে ঠিকমতো বুঝতে না-পারা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে তাতে অবশ্য রাজ-নৈতিক মহল বিস্মিত হন নি। অবশ্য গণ-সংগ্রামে ঐক্যের অভাব, এই যুক্তিটাকে অনেকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। তার কারণ, তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে শুরু করে তখনই যখন বেনামী জমি দখলের আন্দোলন চলছিল। ১৪ পার্টির সকলেই অন্ততঃ প্রকাশ্যে আন্দোলনের সমর্থন করেছিল।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভাঙার আসল কারণ অবশ্য নতুন বামপন্থী ফ্রন্টের নীতি সংক্রান্ত ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও কিছুটা অস্পষ্টভাবে। সেই কারণটিকে বলা হয়েছে একটি পার্টির নিজস্ব সংগঠন মজবুত এবং প্রভাব বৃদ্ধির অধিকার প্রয়োগের চেষ্টার ফলে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি। ইংরিজিতে যাকে বলে 'ইউফেমিজম', অর্থাৎ ঘুরিয়ে কথা বলা, এটি বোধহয় তারই একটা চমৎকার উদাহরণ। এই বড় পার্টিটি কে তা বলা হয়নি, কোন্ পথে ঐ পার্টি প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল তা-ও বলা হয়নি। কিন্তু উহ্য থাকলেও এইসব কথা কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ থাকার কথা নয়।

তবে সি-পি-এম যে এটুকুও স্বীকার করতে রাজী হয়েছে, সেটাও কিন্তু কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। তার কারণ, সি-পি-এম এতদিন উচ্চকণ্ঠে বলে এসেছে যে, পার্টি যে-নীতি অনুসরণ করে এসেছে তা নির্ভুল। তাই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের পতনের পর থেকে যখন কথা উঠেছে যে, সি-পি-এম রাজ-নৈতিক দিক দিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে তখনও পার্টি সেই নিঃসঙ্গতাকে লজ্জার বিষয় বলে মনে করেনি, বরং গৌরবের চিহ্ন হিসেবেই অঙ্গে ধারণ করেছে। অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, গত নির্বাচনেও আরো পাঁচটি দল সি-পি-এমের সঙ্গে ছিল, কিন্তু সকলেই জানেন যে ঐ পাঁচটি দলের প্রভাব একান্তই সীমাবদ্ধ। তাই এবারের বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের আগে পর্যন্ত সি-পি-এমের রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতা কাটে নি বলাই ঠিক। কিন্তু সি-পি-এম এতদিন বলে এসেছে যে, পার্টি কংগ্রেসের কয়েকটি দালাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বটে কিন্তু জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, সুতরাং পার্টি ঠিক পথেই চলেছে।

তাই আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, সি-পি-এম কেন এখন ত্রুটি স্বীকার করল এবং নিজের নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্যে আর-এস-পি এবং এস-ইউ-সি'র দাবী মেনে নিল? আর এই শেষোক্ত দুটি দলই বা কেন দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সি পি এমকে নিঃসঙ্গ-তার অপবাদ ঘোচাতে সাহায্য করল?

এই পালা বদলের কারণ একটাই মাত্র হতে পারে—কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি। উনসত্তরের নির্বাচনেই কংগ্রেস এই রাজ্যে হীনবল হয়ে পড়ে এবং তারপর কংগ্রেস দু' টুকরো হওয়ায় তার শক্তি আরো হ্রাস পায়। ইতিমধ্যে এই রাজ্যে প্রধান দলের দাবীদার হয়ে ওঠে সি-পি-এম। সেই দল যে অতঃপর নিজের প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে সবরকম চেষ্টা করেছে সেকথা এখন সরকারীভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। সেই চেষ্টাই কয়েকটি বামপন্থী দলকে সি-পি-এম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের পতনের পরও যেহেতু কংগ্রেস বেশ কিছুদিন হীনবলই ছিল তার ফলেই ঐসব বামপন্থী দলের কাছে কংগ্রেস-বিরোধিতার চেয়ে সি-পি-এম বিরোধিতাই তখন বড় হয়ে ওঠে। কারণ, ঐ সময় তাদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সি-পি-এমের ঐ 'প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা'।

কিন্তু একাত্তরের নির্বাচন, এ-কথা স্পষ্ট করে দিল যে কংগ্রেস এই রাজ্যে নতুন শক্তিতে আবির্ভূত—এবং সেই শক্তি ক্রমশঃই বাড়ছে। রাজনীতির এই পালাবদলই আবার কয়েকটি বামপন্থী দলকে নিজেদের বিভেদ ভুলিয়ে এক পতাকার তলায় সামিল করেছে। সি-পি-এমের কৌশল পরিবর্তনের কারণও তাই।

এটাকে কৌশল পরিবর্তনই বলতে হবে আপাততঃ, কেন না, নীতির পরিবর্তন ঘটেছে কিনা তা শুধু ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। এই প্রসঙ্গে অনেকে যেটা লক্ষ্য করেছেন তা হল, নতুন বামপন্থী ফ্রন্টের আসন বন্টনে সি-পি-এমের যে প্রাধান্য দেখা গেল সি পি এমের সেই প্রাধান্য দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আসন বন্টন অথবা সরকারে ছিল না। সুতরাং এই ফ্রন্টের প্রতি অধিকাংশ ভোটদাতা যদি প্রসন্ন হন তাহলে নির্বাচনের পর দেখা যাবে, ফ্রন্টের মধ্যে ছোট দলগুলির অবস্থা যুক্তফ্রন্টের তুলনায় আরো বেশি অসহায়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টে সি-পি-আই, বাংলা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক মিলিতভাবে ছিল সি-পি-এমের পাল্টা শক্তি। এবার বামপন্থী ফ্রন্টের আসন যেভাবে বাঁটোয়ারা হয়েছে তাতে ঐ ধরনের পাল্টা শক্তি গড়ে ওঠার আর কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

—দেবদত্ত

দেশ বিদেশ

পাকিস্থানের মনোনীত প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো পিকিংয়ে গিয়ে তাঁর প্রাণসখা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে এসেছেন তার মুখের মতো জবাব রয়েছে মুজিব-ইন্দিরা যুক্ত বিবৃতিতে।

বাংলাদেশে এখনও ভারতীয় সৈন্য রয়েছে, এই কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করে ভুট্টো-চৌ বিবৃতিতে বাংলাদেশকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ নামক যে বাস্তব অস্তিত্বটা আজ প্রদীপ্ত সূর্যের মতোই স্বয়ংপ্রকাশ তাকে অস্বীকার করার জন্য পৃথিবীর কয়েকটি দেশ ঐ অছিলাই ব্যবহার করছিল। যেমন ইন্দোনেশিয়া। তার কথা হচ্ছে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া? না, সেখানে ভারতীয় ফৌজ থাকতে কখনও নয়। বাংলাদেশে ভারতীয় ফৌজের অবস্থান নিয়ে যাঁরা এভাবে সোরগোল তুলছিলেন তাঁদের মনের কোণে আশা ছিল, যুদ্ধের পর পৃথিবীর অনেক দেশে যেমন হয়েছে তেমনিভাবে বাংলাদেশেও ভারতীয় ফৌজ কায়েম হয়ে বসবে এবং সেই সুবাদে বাংলাদেশ ও ভারতকে হেয় করা যাবে। এমনকি, ভারতবর্ষের ভিতরে এবং সম্ভবত বাংলাদেশেও এই ধরনের কিছু ছিদ্রান্বেষী আছেন। তাঁদের সকলের মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ইস্তাহারে স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে আনা হবে এবং এই অপসারণের কাজ শেষ হবে ২৫ মার্চের মধ্যে। যে ২৫ মার্চ বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খাঁর নেকড়ে বাহিনী বাংলাদেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই তারিখে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের আগের দিন সেদেশ থেকে ভারতের মিত্রবাহিনী সরে আসবে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ভারত দেখিয়ে দিল যে, বাংলাদেশে তার আধিপত্য কায়েম করার কোন অভিপ্রায় নেই তেমনি বাংলাদেশও দেখিয়ে দিল যে, তার মুক্তি অর্জনে ভারতীয় বাহিনী যে সাহায্য করেছে তার জন্য সে কৃতজ্ঞ থাকলেও প্রয়োজনের বেশী একদিনও সে বৈদেশিক সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকতে চায় না। প্রশ্নটি নিয়ে যারা বাংলাদেশ ও ভারতের মুখে চুনকালি লেপে দেওয়ার আশায় ছিল তাদের সেই আশায় ছাই পড়েছে, বরং ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই ঘোষণা দুই দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

কলকাতায় দুদিন কাটিয়ে এবং ঐ দুদিনে মোট প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টাকাল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে শেখ মুজিবুর রহমান ঐ ঐতিহাসিক যুক্ত ইস্তাহারে স্বাক্ষর করে গেলেন। যদিও ইসলামাবাদের শাসকদের বন্দীশালা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এই দ্বিতীয়বার শেখ মুজিব ভারতে এলেন তাহলেও এই প্রথমবার তিনি তাঁর দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এদেশে এলেন এবং এইবারই প্রথম তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পেলেন।

দুই দেশের মধ্যে যে নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সেই সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করার জন্য এই যুক্ত ইস্তাহারে কতকগুলি বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দুই দেশের মধ্যে বৈষয়িক সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার উপর। দুই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, দুই দেশের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে ও উভয় দেশের জনসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নয়ন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে দুই দেশ নিজেদের মধ্যে নিয়মিতভাবে আলোচনা করবে। দুই প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য যথাসম্ভব সরকারী স্তরে পরিচালিত হবে। দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলের চিরাচরিত বাণিজ্যের আশু সমস্যাগুলির প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, সীমান্ত অঞ্চলে চোরাচালান বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসঙ্গে ইস্তাহারে অন্যান্য যেসব বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিধ্বস্ত ব্যবসা পুনরুদ্ধারে ভারতের সাহায্য দানের কথা এবং বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ফরাক্কা বাঁধ সমেত জলসম্পদ ব্যবহার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যবস্থার উন্নয়নের সমস্যাগুলির কথা।

(ফরাক্কা বাঁধের প্রসঙ্গটিকে যে ইস্তাহারে একটি 'সমস্যা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা লক্ষ্য করার মতো বিষয়। ফরাক্কায় বাঁধ তৈরীতে পাকিস্থানের আপত্তি ছিল। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তাহারেও সেই আপত্তির উল্লেখ ছিল। আজকের বাংলাদেশ সরকারের নেতারা যে সেই আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। তবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এখন দুই দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা ঐ আপত্তির নিষ্পত্তি করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে।)

সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার সংকল্পের উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে, ইস্তাহারে এবিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী এই সংকল্প প্রকাশ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, এবং বিশেষ করে এই অঞ্চলে শান্তি, স্থায়িত্ব ও প্রগতির বিপদগুলি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করে চলবেন।

যুক্ত ইস্তাহারের মধ্যে কোথাও তৃতীয় কোনো দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি। পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের বা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হবে অথবা সমগ্রভাবে এই উপ-মহাদেশে কি ধরনের শক্তি-সমন্বয় ঘটবে তার কোন হদিস এই যুগ্ম ইস্তাহারে দেওয়ার চেষ্টা হয় নি। অবশ্য কোন দেশের নাম উল্লেখ না করেই ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, যারা এই অঞ্চলে অস্থিরতা ডেকে আনতে চায় ও বিশ্বশান্তি বিপন্ন করতে চায় কেবল তারাই বাংলাদেশের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করবে। এটাও ভুট্টো-চৌ যুক্ত ইস্তাহারের একটা জবাব। কেননা

পাকিস্থান ও চীনের নেতারা দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, বাংলাদেশ সৃষ্টিই এই অঞ্চলে অস্থিরতার মূল কারণ।

* * *

ভারতবর্ষের ১৬টি অঙ্গরাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভার মোট ২৭২৭টি আসনের জন্য আগামী মার্চ মাসে নির্বাচন হতে চলেছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে এর মধ্যে দুই হাজারের কিছু বেশী আসনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পার হয়ে গেল। ঐ তারিখের মধ্যে ঐ হাজার দুয়েক আসনের জন্য মোট হাজার দশেক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। গত নির্বাচনে এই আসনগুলিতে মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিলেন প্রায় ১৪ হাজার।

প্রার্থীসংখ্যা কমার একটি কারণ হল, এবার সব দলই ভোট ভাগাভাগি বন্ধ করতে উদ্‌গ্রীব এবং সেজন্য অন্য দলের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সমস্ত নির্বাচনে কংগ্রেস দুয়েকটি বাদে প্রায় সমস্ত আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এইবারই সর্বপ্রথম কংগ্রেস একটা সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণ করে বিভিন্ন রাজ্যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আসন ভাগ করে নিয়েছে। সি-পি-আইয়ের জন্য কংগ্রেস সব চেয়ে বেশী আসন ছেড়ে দিয়েছে বিহারে—মোট ৫০টি। পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি আসন সম্পর্কে, পাঞ্জাবে ১০টি, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে ৫টি করে এবং দিল্লিতে ২টি আসন সম্পর্কে দুই দলের মধ্যে বোঝাপড়া করে কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আইয়ের সহযোগিতা বাড়ান হচ্ছে। কংগ্রেসের কথা হচ্ছে, সেখানেই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও বামপন্থী হঠকারিতা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে সেখানেই সি-পি-আইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

কংগ্রেসের দিক থেকে দেখতে গেলে, এবারকার নির্বাচনের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, যেসব মন্ত্রীর নাম খারাপ হয়েছে এবারকার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। শুধু যে নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজস্থানের মোহনলাল সুখাড়িয়া, মধ্যপ্রদেশের শ্যামাচরণ শুক্ল ও আসামের মহেন্দ্রমোহন চৌধুরীকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা শুধু যে নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্রে ভি পি নায়কের ও হরিয়ানার বংশীলালের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে ফিরে আসার কোন নিশ্চয়তা নেই তা নয়, যেসব মন্ত্রী অযোগ্যতা অথবা অসদাচারের অপযশ অর্জন করেছেন মনোনয়ন না দিয়ে তাঁদের আখের সম্পূর্ণ নষ্ট করা হচ্ছে। এভাবে মধ্যপ্রদেশে শুক্ল মন্ত্রিসভার ১৩জন সদস্য বাদ পড়েছেন (শুক্ল নিজে অবশ্য টিকেট পেয়েছেন), রাজস্থানে সুখাড়িয়া মন্ত্রিসভার ১২জন বাদ গেছেন (সুখাড়িয়া নিজে রাজ্যপাল হয়ে বাঙ্গালোরে চলে গেছেন), আসামে চৌধুরী মন্ত্রিসভার দশজনের নাম কাটা পড়েছে (চৌধুরী নিজে স্বেচ্ছায় নির্বাচনে দাঁড়ান নি), মহারাষ্ট্র ও
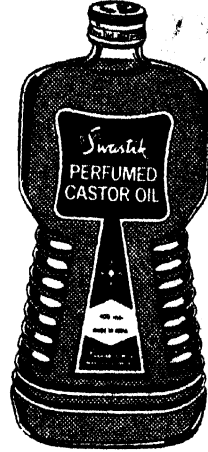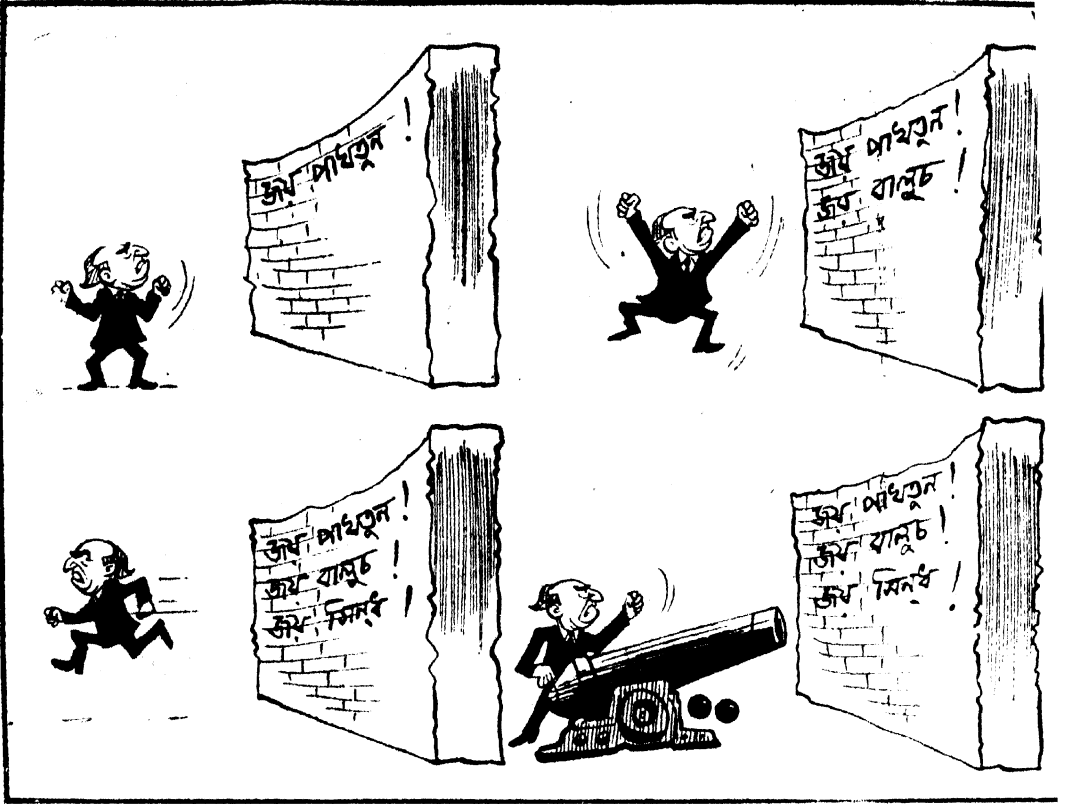
অন্ধ্রপ্রদেশে বাদ গেছেন আটজন করে মন্ত্রী।

এতজন মন্ত্রী ইতিপূর্বে আর কোন নির্বাচনের আগেই নাম-কাটা সিপাইয়ের দলে পড়ে যান নি। যাঁরা কংগ্রেসের মনোনয়ন পেয়েছেন তাঁরা সকলেই হয়তো ধোয়া তুলসীপাতা নন. (এবিষয়ে ইতিমধ্যে দলের ভিতর থেকে কিছু কিছু অভিযোগ উঠছে); কিন্তু নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা যাতে জনসাধারণের অনেক বেশী ভাল ধারণার মধ্যে কাজ আরম্ভ করতে পারেন সেজন্য এবার প্রথম থেকেই বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে।

•

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলালের সঙ্গে পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর অনেক সাদৃশ্য আছে। দুজনেরই ধরণধারণ ডিকটেটরের মতো, যখন-তখন যার-তার হাতে মাথা কেটে দুজনেই বহু শত্রু তৈরি করেছেন এবং দুজনের নামেই দুর্নীতির ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ এসেছে দলের ভিতর থেকে ও দলের বাইরে থেকে। সবচেয়ে বড় মিল কায়রোঁর মতোই শ্রীবংশীলালও একজন কর্মিষ্ঠ নেতা। দুজনেই নিজের নিজের রাজ্যের অনেক উন্নতি করেছেন। কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীবংশীলাল সম্পর্কে বলেছেন, 'উনি বড় বড় কথা বলেন বটে, কিন্তু সেসব কথা তিনি রাখেন।' শ্রীবংশীলালের আমলেই হরিয়ানা গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের দিক দিয়ে সারা ভারতে রেকর্ড স্থাপন করেছে—একমাত্র হরিয়ানা রাজ্যেরই সব গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি পেঁৗছে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু, শ্রীবংশীলালের মুখ্যমন্ত্রিত্বের মেয়াদ আর কত দিন সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মেয়াদ ফুরোবার আগেই বিধানসভা ভেঙে দিয়ে তাঁকে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এটা স্পষ্ট যে, কংগ্রেস হাইকম্যান্ড এবং বিধানসভায় নিজের দলের সদস্যদের চাপেই তাঁকে এই পথে যেতে হয়েছে। যদিও বিরোধী দল তাঁর বিরুদ্ধে ও মন্ত্রিসভার অন্যান্য কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন তাহলেও বিধানসভায় তাঁর মন্ত্রিসভার হেরে যাওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। বিধানসভায় ৮১ জন সদস্যের মধ্যে ৫৫ জনই কংগ্রেসের। তবে এই ৫৫ জনের সকলেই যে কংগ্রেস টিকেটে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন তা নয়, অনেকে দলত্যাগ করে এসে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। শ্রীবংশীলাল যেভাবে শত্রু তৈরী করেছেন তাতে আজকের কংগ্রেসীরা যে দ্বিতীয়বার দলত্যাগ করবেন না তার কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই কংগ্রেস হাইকম্যান্ড শ্রীবংশীলালকে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচনে দাঁড়াবার পরামর্শ দিয়েছেন।

কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হয়ে ফিরে এলে শ্রীবংশীলাল কি পুনরায় দলের নেতা হবেন? খুবই সন্দেহ আছে। কেননা যত দূর খবর আছে, শ্রীমতী গান্ধী হরিয়ানায় মুখ্যমন্ত্রীর পদে অন্য কাউকে দেখতে চান।

হরিয়ানায় বিধানসভায় অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হওয়ায় এখন আগামী মার্চের নির্বাচন প্রায় একটি সাধারণ নির্বাচনের চেহারা নিতে চলেছে। নাগাল্যান্ড, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও কেরল ছাড়া অন্যান্য সব রাজ্যেই এই নির্বাচন হচ্ছে।

এই নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপার নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের খবর আসছে। বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে বিতর্ক উঠেছিল সেটা নির্বাচনের পর ফয়সালা হবে, চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্যামাচরণ শুক্লকে পদত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৩-২-৭২ —পুণ্ডরীক

(বারো)

ব্রজ ডাকছিল, চন্দনবাবু, ও চন্দনবাবু! শুনুন, শুনুন।

সারবন্দি বেদেরা গাছের নিচে শুকনো নয়ানজুলির মাটিতে বেদেরা এসে তাঁবু পেতেছে। গাছের গাধা আর ঘোড়া রোদে দাঁড়িয়ে নিঝুম ঝিমোচ্ছে। বাচ্চারা রাস্তার ধারে জড়ো হয়ে পাথরকুচি নিয়ে ছুটোছুটি করছে পাশে কাঠবেড়ালির পিছনে। ঘাগরা আর লম্বাহাতা রঙীন জামা পরে তিনটি কিশোরী চন্দনকে লক্ষ করে ফিস ফিস করছে আর চোখে ঝিলিক তুলে হাসছে। চন্দন যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নয়ানজুলির ওপাশে কিছু ফাঁকা জায়গায় ঘাসের জঙ্গল—তারপর জ্ঞানবাবুর হলডিং বক্স। অনবরত ধক্-ধক্ আওয়াজ হচ্ছে। একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। কোনটা খালি, কোনটা বস্তা বোঝাই। গাঁয়ের চাষীরা এসেছে 'বাজারে' ধান ভানতে। বেদেদের তাঁবু পড়ার দরুন হাইওয়ে থেকে ধানভানা কলে পৌঁছুবার রাস্তাটা হয়ে পড়েছে সংকীর্ণ। সে-নিয়ে একটু আগে বচসা হচ্ছিল পরস্পর। এখনও থামেনি। কারণ, মাঝে মাঝে জ্ঞানবাবুর লোক এসে বেদেদের শাসিয়ে যাচ্ছে। এরা অবশ্য এ লোকগুলো আর গা করছিল না। রোদে হাত-পা ছড়িয়ে বসে বুড়ো সর্দার-গোছের লোকটা আলবোলা টানছে মৌজে। উনুনে রান্না চাপেছে খোলামেলা আকাশের নিচে। মেয়েরা লকড়ি কুড়িয়ে আনছে। শীতের ঝরেপড়া পাতা ঝাঁট দিয়ে জড়ো করছে। বেশ লাগে এই জীবনটা! যেন অন্তবিহীন স্বদেশ পরিক্রমায় ওদের জীবন কেটে যায়। সে স্বদেশের কোন সংখ্যা নেই।

সেই সময় ব্রজর স্টেশন-ওয়াগনটা ঘর-ঘর করে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। মুখ বাড়িয়ে ব্রজ ডাকছিল। চন্দন হাসিমুখে এগিয়ে গেল। কী ব্যাপার ব্রজবাবু? এই সাত সকালেই ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে? আজও বরযাত্রী বইতে নাকি?

ব্রজ হাসল। তারপর নেমে এসে বলল, আর বলবেন না। চান করিয়ে আনলাম গাড়ীকে। বরযাত্রীর কথা বলছেন—ওরে শালা! কাল একটা স্পেশাল ট্রিপ দিলুম গাঁয়ের দিকে। ব্যাটারা পান খেয়ে এনতার যেমন পিক ফেলেছে গাড়ির গায়ে, তেমনি বমি—ওয়াক থুঃ!...বিকট হেসে বলতে লাগল। বর যেমন তেমনি কনে। বাটা-জেলে হয়তো সারাজীবন জলে-কাদায় শামুকের মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বেড়িয়েছে, এদিকে বিয়ে করতে যাবে—বৌ আনবে মোটর গাড়ি চেপে! মাইরি চন্দনবাবু, শালাদের এ সখের কোন মানে আছে, বলুন? তোদের বাপ-ঠাকুর্দা কখনো হাওয়া-গাড়ি চোখেও দ্যাখেনি।

চন্দন বলল, হাওয়াগাড়ি মানে?

ব্রজ জবাব দিল, মোটরগাড়ীকে ওরা বলে হাওয়াগাড়ি! তুমুল ব্যাপার। আজকাল গাঁয়ের মুন্দফরাসও বলে, বে করব হাওয়াগাড়ি চেপে। যো—আমির শুওরের বাচ্চা বেজা কম মাইনে। লে শালারা, মৌজ করে লে। একবেলার রাজত্ব বই নয়। করে লে রাজত্ব।

চন্দন সিগ্রেট দিয়ে বলল, খুব মৌজে আছেন মনে হচ্ছে।

ব্রজ চোখ নাচিয়ে বলল, কাল খাঁটি দিশি মাল দিয়েছিল দুবোতল। কল্যাণ-গঞ্জের নাম শুনেছেন? বিলপারের গ্রাম। সেখানেই বরের শ্বশুরবাড়ি। জেতে আমার মতই ছোটলোক-টোটলোক ওরা। অমন জিনিস এ ভূ-ভারতে মেলে না চন্দনবাবু! বিলিতি হুইস্কিই বলুন, আর রাম-শ্যামই বলুন—কল্যাণগঞ্জের জুড়ি নেই। পাকা কলা আর গুড় থেকে এলাচ মিশিয়ে যা জিনিস করে, ওঃ!...জিভে চুকচুক শব্দ করল সে... তবে কার কাছে কী বলছি! আপনি তো সাত্ত্বিক মানুষ স্যার। ওর মর্ম আপনি বুঝবেন না। অবশ্যি আপনার মজুমদার মশাই ভালো বোঝেন।

চন্দন বলল, বিয়ের মরশুমে তাহলে বেশ ভালই কাটে আপনার?

ব্রজ বলল, আপনার আশীর্বাদ। আসলে কী হয়েছে জানেন স্যার? সবাই এ তল্লাটে জানতে পেরেছে ব্রজর জাত-গোত্রের হাল-হদিস। এ্যাদ্দিন গাঁ-গেরামের বাবু-সায়েবরাই বিয়ে-সাদীতে গাড়ির বায়না দিতেন। যেই আমি এলুম, তার মানে—আমি এককালের বেজা বাগদী—বড় বাগদী বুনাই, ডোম, ছোটলোক গরীব-গুরবো মানুষ সবাই সাহস পেয়ে ভাবলে, হাজার হোক—আমাদেরই ঘরের ছেলে। যাই না একবার ব্রজর কাছে। গাড়িটাও ছোট। ভাড়াটাড়া কমও লাগতে পারে। ব্যস, এই করে গেল আমার পসার। ওদেরও তো সাধ আহ্লাদ আছে। কালের হাওয়ার বদল ঘটেছে যে! তাছাড়া, ওরাও তো মানুষ বটে। বলুন, আমি কিছু অন্যায় করছি নাকি। নামমাত্র পয়সা নিই। বড়জোর তেলের খরচা আর সামান্য উপরি। আমার মালিকের বেইমানি করলেও চলে না। কর্তা—ওদের লোভ আমি বাড়িয়ে দিয়েছি বলতে পারেন। যে ঘুঁটেকুড়ুনি মেয়ে

স্বপ্নেও ভাবেনি হাওয়া-গাড়ি চেপে স্বামীর ঘরে যাবে, তার তাক লেগে যায়। লোভ বাড়ে। দাবী জন্মে যায় মনে মনে।

ব্রজ নিজের অজান্তে একটা ব্যাপারে চন্দনের চোখ খুলে দিল যেন। হ্যাঁ—লোভ বাড়ছে, দাবী জন্মাচ্ছে নিচেতলার মানুষদের মনে। একটু একটু করে দিনে দিনে ক্রমাগত এই হাইওয়েটা এনে ফেলেছে দূর-দূরান্তর থেকে সভ্যতার নানান শ্রেষ্ঠ ফসলের নমুনা। আর অবহেলিত অভাজন সামান্য মানুষেরা উসখুস করে উঠছে। চোখ ধেঁধে যাচ্ছে ওদের। ওরা টের পাচ্ছে, এতদিনের যে বাঁচা—তা ছিল দীনহীন নগণ্যতার, পশুর মতো বাঁচা। মানুষ নামটার যে বিশাল মহাভারত আছে, তার পাতা খুলে যাচ্ছে সময়ের হাওয়ার ঝাপটায় একটার পর একটা—ওরা চমকে উঠছে। আর এই নির্বাধ উদ্দাম হাওয়া বয়ে আনছে সম্মিলিত জীবনের বেগবতী মহানদীর প্রতীক এই কঠিন সংহত কংক্রিট হাইওয়ে দিয়ে। এই রাজপথটাকে এখন মুক্তির মত লাগে।

দূরে ঢালু থেকে আবার চড়াইয়ে উঠে মিলিয়ে গেছে ধূসর দিগন্তে এই পথটা। দুধারে নবীন গাছপালার সবুজ সমান্তরাল দুটি রেখা। কুয়াশার নীলচে বিস্তার, মিষ্টি শান্ত হলুদ রোদ্দুর, দীর্ঘ পথ—সব মিলিয়ে একটা অবাধ সরল মুক্তির সুখ। চন্দন বলল, যাচ্ছিলুম স্কুল-হোস্টেলে। আমার এক পরিচিত মাস্টারমশাই থাকেন। আপনি তো এখন গ্যারেজে যাবেন ব্রজবাবু।

ব্রজ বলল, হ্যাঁ উঠে আসুন—নামিয়ে দিয়ে যাব। নাকি—ব্রজ হঠাৎ চোখে ঝিলিক তুলে হাসল।—নাকি ছুঁড়িগুলোকে ডাকব—আলাপসালাপ করাবেন। যা জিনিস সব, মিছরির ছুরি, মাইরি! ডাকব?

চন্দন অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল, না না, আমি সেজন্যে দাঁড়াইনি।

ব্রজ হাসতে হাসতে বলল, দাঁড়িয়েছেন কী জন্যে—তা তো বলেননি স্যার। বলেন ডাকব নাকি!

না—চলুন।...বলে চন্দন যেন অস্বস্তির জন্যেই গাড়িতে উঠে বসল।

এত ভীতু লোক দিয়ে সংসার চলে না ...ব্রজও উঠল নিজের আসনে।...তবে যাই বলি স্যার, এরা সেদিকে বড্ড হুঁসিয়ার। খুব কড়া শাসন আছে। আমি ডাকলেই মেয়ে তিনটে ঠিকই আসত। পয়সাও চাইত। কিন্তু পুরুষগুলোও তক্ষুনি এসে দাঁড়াত। প্রতি বছর ওরা বিহারের ওদিক থেকে আসে। ঠিক ওই জায়গায় তাঁবু পাতে। সপ্তাহটাক থেকে চলে যায়। পরের জায়গাটা কোথায় জানেন? কান্দী পেরিয়ে যে বড় পুকুরটা আছে- তার পাড়ে। আমি ভাব জমিয়ে ফেলি বরাবর। এবারও জমবে'খন।

গাড়ি চলতে থাকল। চন্দন বলল, বউদির খবর কী?

ভালই। আর তো গেলেন না স্যার।. ব্রজ বলল।...হ্যাঁ —ভালোকথা। ভুলেই গিয়েছিলাম—পরেশবাবুর বাড়িতে কী সব গণ্ডগোল হয়েছে নাকি—হাসিই বলছিল। ও কোত্থেকে শুনেছে।

চন্দন চমকে উঠেছিল। বলল, গণ্ডগোল? কই —না তো।

ব্রজ বলল, কী-জানি! মেয়েদের কান-পাতলা অভ্যেস। ছেড়ে দিন।

চন্দন কৌতূহলী হয়ে বলল, কী শুনেছেন বলুন তো?

কী যেন—মজুমদার মশাইয়ের স্ত্রী-নাকি নটুবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলেন কবে কোন রাত্রিবেলা। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। বিলাস ওনাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে দেয়। মন্টুর রিকশো ডেকে এনেছিল কি-না। মন্টু বলেছে হাসিকে। তারপর ডাক্তার আনতে হয়েছিল রাত্রেই।

চন্দন রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর?

ব্রজ ওর দিকে তাকাল।...সে-কি! আপনি জানেন না কিছু?

না তো।

সে কী! পরেশবাবুকেও দেখছেন কদিন থেকে। অবশ্যি, উনি তো ব্যস্ত মানুষ—সব সময় বাইরেই ঘোরেন।...ব্রজ ব্রেক কষে বলল, আপনার জায়গা। যান, দেখা করে আসুন। আমি গাড়ি রেখে খেতে যাব।...এই মরেছে! ওরে, হ্যাণ্ডেল লাগা। মাগী গোঁ ধরেছে আবার।

চন্দন আচ্ছন্নভাবে নেমে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ব্রজর গাড়ি চলে গেলে সে ভাবল, এক্ষুনি স্নেহবৌদির ওখানে একবার যাবে নাকি। কিন্তু দ্বিধা এল মনে। যদি সত্যি কিছু ঘটে থাকে, সে তো তাকে নিশ্চয় খবর পাঠাত ডাকতে। হয়তো পরেশ না বললেও তার হাবভাবে টের পেত কিছু ঘটেছে। কিন্তু তেমন কিছু লক্ষ্য করেনি পরেশের আচরণে। কলকাতা থেকে ফিরে সেরাতে পরেশের বাড়ি থাকার কথা। সকালে যখন অফিসে এল, বেশ হাসিখুসি স্বাভাবিক মানুষ। বাড়ির কথা চন্দন কিছু জিগ্যেস করেনি। করলেও কি পরেশদা কিছু বলত ওকে? সে অন্যজাতের মানুষ। বরাবর তো দেখে আসছে চন্দন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল, সেটা বোঝা গেল না। নটুবাবুর কথা চন্দন শুনেছে। পরেশের উন্নতির মূলে সেই ভদ্রলোক, তাও চন্দন টের পেয়েছে। এমন কি তার আবছা কানে এসেছে নটুবাবুর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে পরেশের রহস্যময় সম্পর্কের কথাও। হকসাহেবকে ধরলে জানা যেতে পারে হয়তো। হকসাহেব অনেক কিছু জানেন।

চন্দন ভাবল, এক্ষুনি একবার স্নেহধারার খোঁজ নেওয়া দরকার। অজ্ঞান অবস্থায় নটুবাবুর বাড়ি থেকে তাকে তুলে এনেছিল বলছে ব্রজ। ডাক্তার ডাকতেও হয়েছিল নাকি। কী কাণ্ড! এত সব ঘটে গেছে, অথচ তাকে কিছুই জানান হয়নি! তাহলে কি স্নেহধারা কোন কারণে রাগ করেছে তার ওপর? কেন রাগ করবে সে? রুমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা কানে গেছে বলে?

এই কদিন চন্দনকে খুব ব্যস্ত হয়েছিল। হয়তো স্নেহধারা তাকে পাঠিয়েছিল, কেউ বলেনি। সে ছিল দেখে লতু কিংবা মানতু ফিরে। এমনও হতে পারে।

রাজেন মাস্টারের কাছে পরে চলবে। চন্দন পা বাড়াল। তাকে ধরেছে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি—ত বোধ তার মধ্যে যতটা, ঠিক অবহেলার দুঃখ। মনে মনে রাগও জমছে না পরেশের ওপর। কেন সে সঙ্গে তার বিয়ের কথা তুলে এ অন করে বসল! এখন ও-বাড়ির দিকে বাড়াতেও যে রাজ্যের দ্বিধা সংকোচ, জড়তা আসছে তার। রুমার মুখে হতেও আড়ষ্টতা। সব সরলতা স্বাভাবিকতাকে নিষ্ঠুর ভাবে খুন ফেলেছে পরেশ মজুমদার।

যাওয়া হলো না। রাজেন দেখতে ছিল তাকে। গেটের ভিতর উঁচু বা রোদ পোয়াচ্ছিল কজন মাস্টার রাজেন সেখান থেকে দৌড়ে এল।... চন্দনবাবু!

চন্দন দাঁড়াল।

আরে কী লোক আপনি! সেই দেখা—তারপর আর পাত্তা নেই। অ আসুন।

চন্দন কুণ্ঠিত মুখে বলল, আজ রাজেনবাবু। পরে আসব'খন। খুব ব

রাজেন তার হাত ধরে টানল।...কী বলেন! এই বিদেশে-বিভুঁয়ে একা পড়ে চারদিক থেকে বেদম গুত্তো খ মশাই। চেনা জানা মানুষ নেই যে, এ মন খুলে কথা বলব। জানেন কত সাব কথা বলতে হয়—হিসেব করে মেপেজু বাপস! একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—সেখা দলাদলি পলিটিকস। ভেবেছিলুম, জ্ঞয় শহর জায়গা—সেখানে ওসব স্বাভাবি এখানে এলুম তো দেখি, ওরে বাবা আবার তারও বাড়া। কী ডেঞ্জারাস জা মশাই!

চন্দন শুকনো হেসে বলল, হ্যাঁ। র পুর তো সৃষ্টিছাড়া জায়গা নয়।

রাজেন বলল, আমার ঘরে আস খেজুর পাটালি দিয়ে চা খাওয়াব।

চন্দন অসহায় দৃষ্টে তাকাল।

আসুন, আসুন। ভয় পাবার কি নেই—এখন আর আগের মতো রাজনী করিনে। স্রেফ সাহিত্য নিয়ে আছি।

দুজনে গেট পেরিয়ে হেঁটে গে লম্বা টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে রাজে ঘর। ভিতরে ঢুকে অবাক হল চন্দন। শু অবাক নয়, চমকেও উঠল। বিছানায় হয়ে শুয়ে একজন যুবক বই পড়ছে। এ সাড়া পেয়ে সে বই সরাল মুখের ও থেকে। তারপর উঠে বসল। চন্দন ও চিনতে পেরেছিল। সামান্য দূর থে কদিন আগে দেখেছিল মাত্র—দেখিয়ে দি ছিলেন হকসাহেব। কোন বিশেষ উদ্দে

নয়—ওটা হকসায়েবের অভ্যাস। রূপপুরের সব মানুষকে চিনিয়ে দেওয়ার এক উৎকট খেয়াল আছে ও'র মাথায়। সেই খেয়ালের বশেই হকসায়েব বলছিলেন, ওই—ওই যে ছেলেটি যাচ্ছে, এ-তল্লাটে এতবড় গাইয়ে আর নেই চন্দনবাবু। দারুণ গুণী ছেলে। আমাদের বাণীবাবু হেডমাস্টারের বড় ছেলে। ডাকব নাকি? আলাপ করবেন? ও অমিত, বাবাজীবন!

চন্দন নিবৃত্ত করেছিল হকসায়েবকে। পাণ্ডেজীর কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল তার। রুমাকে ওর সঙ্গেই সেরাতে কান্দী থেকে ফিরতে দেখেছিলেন পাণ্ডেজী।

সেই অমিত! রাজেন বলল, আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু অমিত—হেড-মাস্টার মশায়ের ছেলে। আর ইনি...

অমিত হাসিমুখে নমস্কার করে বলল, ও'কে খুব চিনি।

চন্দন নিষ্পলক তাকিয়েছিল ওর দিকে। কী অপরূপ মুখশ্রী অমিতের! বয়স কত হতে পারে—পঁচিশের মধ্যেই সম্ভবত। চন্দনের চেয়ে বেশ ছোট। আর কিছু না—শুধু চেহারাটাই দেখছিল আপাতত। রুমার নির্বাচন এতটুকু ভুল হয়নি। ধূসর রঙের হালকা খদ্দরের পাঞ্জাবী—পাজামা, বড়-বড় চুল, শিল্পীদের স্বভাবজাত পরিচ্ছন্ন হাসি মুখে—খুব ভালো লেগে গেল চন্দনের—কয়েক মুহূর্তেই। সে নিজের মধ্যে এতটুকু ঈর্ষা-ভাব আবিষ্কার করতে পারল না। বরং মনে হল, রুমা যে সুন্দরের জগতে এতদিনে পা বাড়িয়েছে, রুমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে তারও একটা বিশেষ দায়িত্ব থাকা উচিত। আর, সামান্য কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই অমিতকে তার এত ভালো লেগে গেল!

চন্দন অন্তরঙ্গভাবে কাছাকাছি বসে বলল, আমিও যে ও'কে চিনি না ভাবছেন কেন রাজেনবাবু?

রাজেন বলল, তাই নাকি?

অমিত যেন চমকাল। পরক্ষণে হাসল একটু।...চন্দনবাবুর কথা অনেক শুনেছি অবশ্য। ইচ্ছে ছিল আলাপ করার।

চন্দন সরল মনে বলল, হ্যাঁ। রুমার আমি গারজেন ছিলুম একসময়।

রাজেন বলল, রুমা আবার কে?

অমিত মুখ ফেরাল। চন্দন বলল, সেই যে সেদিন আলাপ করিয়ে দিলুম—পরেশদার শালী। আপনার কী লেখা পড়ে ওর খুব ভালো লেগেছে, রাজেনবাবু। বলছিল।

রাজেন জিভ কেটে বলল, যাঃ! ও কিছু না। আচ্ছা, বসুন—চায়ের যোগাড় করি।

সে চলে গেল। চা খাবার ইচ্ছে না থাকলেও চন্দন আপত্তি করল না। তার ভালো লাগছিল অমিতের সঙ্গে আড্ডা দিতে। একটা অকারণ কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠছিল মনে। সেটা অমিত সম্পর্কেই। অমিত কী বা কে, তার দিন-যাপন, তার আশৈশব খুঁটিনাটি ইচ্ছে-অনিচ্ছে ভালো লাগা-না লাগা বেড়ে ওঠা, তার রক্তমাংসের স্বরূপ—অর্থাৎ অমিতের দেহ-মনের যে মিলিত অস্তিত্বের অখণ্ডতা, তা খুঁটিয়ে পরখ করতে অদ্ভুত সাধ জাগল চন্দনের। এই একটা কিম্ভূত হঠকারী ব্যাপার ঘটতে লাগল তার মনে। ঠিক যেভাবে আজও তার বেয়াড়া ইচ্ছে পেয়ে বসে, রুমার ঊরুর পাঁচড়ার দাগ, নাভির তিল কিংবা শিরদাঁড়ার নিচে পিকচণ্ড্র তেকোণা হাড়ের নীলচে অংশটা দেখতে—সেইভাবেই অমিতের দেহটা দেখতে পেলে ভালো লাগত চন্দনের। হ্যাঁ, অমিতের দেহ ক্রমশ তার ইচ্ছের সামনে বিশাল হতে লাগল। এ মুহূর্তে অমিতকে জড়িয়ে ধরতে পারলে তার অনেকখানি তৃপ্তি মিলে যেত সম্ভবত। এবং হঠকারিতার ঝোঁকে একটুও ইতস্তত না করে সে অমিতের কাঁধে হাত রেখে মৃদু কণ্ঠস্বরে বলল, আপনারা কি বরাবর রূপপুরের বাসিন্দা?

অমিত যেন একটু সংকুচিত হয়েছিল। ওর মধ্যে কিশোরসুলভ এবং সলজ্জভঙ্গী খেলা করছিল সারাক্ষণ। জবাবে সে বলল, নাঃ। বাবা আগে কীর্তিপুর স্কুলে ছিলেন। সেখানেই আমাদের বাড়ি। আমার জন্মও সেখানে।

এখানে কদ্দিন এসেছেন?

বছর তিনেক মাত্র। স্কুল ফাইনাল কীর্তিপুরে হয়েছিল। তারপর বহরমপুরে কলেজ। তারপর তো দু বছর চুপচাপ বসে আছি।...মুখ তুলে হাসল অমিত।

এখানে নিজের বাড়ি, নাকি...

অমিত জানালার দিকে ঘুরে বলল, না। ওই যে কোয়ার্টার। অবশ্যি বাড়ি করার ইচ্ছে আছে বাবার। সামনের বছর রিটায়ার করবেন। তখন তো নিজের বাড়ি চাই-ই
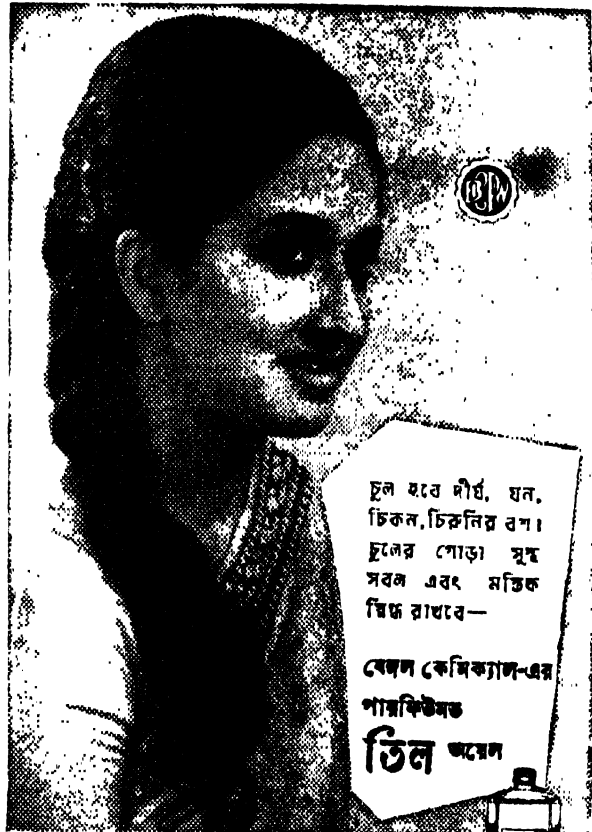
একটা। কীর্তিপুরে আর ফেরার ইচ্ছে নেই। এ জায়গাটা তো বেশ ভালই। শিল্পির কলেজও হয়ে যাচ্ছে শুনেছি।

রুমার সঙ্গে কদ্দিন আলাপ হয়েছে?

অমিত মুখ তুলে নিষ্পলক তাকাল। চমক নয়, চন্দনের মনে হল— মুখটা পলকে নিষ্প্রভ আর বিপন্ন হয়ে উঠেছে। চোখ নামিয়ে জবাব দিল, খুব বেশি দিন না— এই তো গত পুজোয়। ওদের বাড়ির সামনে পুজো হয়। ফাংশনে গাইতে গিয়েছিলুম— তখন।

চন্দন হেসে উঠল।...রুমা গাইতে পারে না। কিন্তু গানটান ভালবাসে খুব। আমিও ভীষণ বাসি-টাসি। রাজেনবাবু আসুক, চা খেতে খেতে শোনা যাবে। কী বলেন?

অমিত একটু কেসে বলল, গলা একটু ধরে গেছে। ঠাণ্ডা লাগিয়েছি।

তাতে কী? আমাকে পর ভাববেন না অমিতবাবু। রুমাকে জিগ্যেস করলেই জানতে পারবেন—আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা কেমন।

কথাটা শুনেই অমিত যেন স্তব্ধ হল। ...আপনি রুমা বা আমার ব্যাপারে কী ভেবেছেন জানিনে—আপনার সঙ্গে আমার এইমাত্র পরিচয় হল চন্দনবাবু, কিন্তু...

তাকে থামতে দেখে সকৌতুকে চন্দন বলল, কিন্তু কী?

রাজেন এসে পড়ায় কথাটা চাপা রইল। রাজেন বলল, অমিত, এবার একটু স্ফূর্তি করা যাক। আমাদের মাননীয় অতিথির সম্মানে—জাস্ট এ সুইট সং' সকালটাও আজ ভারি চমৎকার। হারমোনিয়াম দরকার নেই—খালি গলায়।

অমিত সশব্যস্তে বলল, না না। পরে হবে একদিন। গলাটা ভীষণ ধরে আছে। কাল রাতঅব্দি ফাঁকায় ঘুরেছিলুম, ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

রাজেন চোখ নাচিয়ে বলল, ব্যাপার কী? এত ঘোরাঘুরির তো সন্দেহজনক। একা নয় নিশ্চয়।

অমিত সলজ্জ হাসল। যাঃ!

চালাকি করো না বাবা!...রাজেন ধমকে বলল।...নির্ঘাৎ তুমি সেই মেয়েটির সঙ্গে রাত জেগে ঘোরাঘুরি করেছ' সেই যে—সেই কী নামটা যেন, ইয়েস—আমার স্মৃতির দাম লাখ টাকা—বলছি, প্রী—প্রীতিধারা! রাইট? কান্দী কলেজের ছাত্রী! ছিমছাম হাল্কা গড়ন...

চন্দন অক্লেশে বলল, ওরই ডাকনাম রুমা।

বলেন কী! রাজেন হাঁ করে তাকাল। ...আপনার পরেশবাবুর শালী? ওরে হালুয়া! আমার গপ্প পড়ে ওর ভালো লেগেছে বলছিলেন না? আমি যে ড্যাং-ড্যাং করে নাচব এবার! অমিত, আর পেঁয়াজি চলবে না। গলা খুলে ঝাড়োদিকি। আমি একদৌড়ে হিসি করে আসি।...দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। ঘুরে চাপাগলায় বলল ফের, ল্যাভেটরীতে আজ ছেলেরা কিসব লিখেছে, ভাবা যায় না। ভোরবেলা গিয়ে পণ্ডিতমশাই তো চেঁচামেচিতে হুলুস্থুল করে বসেছিলেন; অনেক কষ্টে সামলানো গেল। বেচারা সেকেলে মানুষ। নতুন এসেছেন এখানে। সবতাতেই হইচই লাগাচ্ছেন। ঢিপেভাঙ্গা গোপীনাথপুরের গেঁয়ো ইস্কুল আর রূপপুরের স্কুল—দুটোর তফাৎ বুঝতে দেরী হচ্ছে, কবে না ছাত্ররা ওঁকে নাকের জলে চোখের জলে করে বসে। বাপ্‌স, কী এঁচেপাকা বিচ্ছু সব!...আরও চাপা গলায় রাজেন বলল, কী লিখেছে জানেন চন্দনবাবু? যদুস্যার প্লাস রক্ষিতস্যার ডিভাইডেড বাই রমলা নন্দী। মিস নন্দী হলেন গার্লস স্কুলের টিচার। আর পারা যায় না।

সে চলে গেলে চন্দন হাসতে থাকল। তারপর বলল, রাজেনবাবু যখন জিয়াগঞ্জ স্কুলে ছিলেন, ছাত্রদের মধ্যে ভীষণ পপুলারিটি ছিল ওঁর। এখানে কেমন?

অমিত অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, ভালো। ছাত্ররা ভালোইবাসে।

আচ্ছা অমিতবাবু?

এ্যাঁ?

কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি।

না, না। বলুন না!

রুমার সঙ্গে লাস্ট কখন আপনার দেখা হয়েছে?

অমিত আগের মত সাদা মুখে তাকাল। ...দেখা? কাল সন্ধ্যায়। বাজারের ওদিকে যাচ্ছিলুম, তখন। কেন?

অনেক দিন ওদের ওখানে যাইনি। খবরও রাখি নে—সময় পাইনে, এত ব্যস্ত থাকি। আচ্ছা অমিতবাবু, ওদের বাড়ির খবর কিছু জানেন? রুমা বলে নি কিছু?

অমিত মুখ নামিয়ে বলল, আমার সঙ্গে ওদের বাড়ির কথা কিছু হয় না কখনও! আর—কই, বলেনি তো কিছু। কেন, কী হয়েছে?

চন্দন সেকথার জবাব না দিয়ে বলল, রুমার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নি?

না তো!

চন্দন এবার সোজা বলল, রুমার বিয়ের কথা শুনেছেন?

অমিত চমকে উঠল। পরক্ষণে সংযত হয়ে শান্তভাবে বলল, হ্যাঁ—শুনেছি।

কার কাছে? নিশ্চয় রুমা বলেছে?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে হচ্ছে, তাও নিশ্চয় শুনেছেন।

অমিত কেমন হাসল।...আপনার সঙ্গে। বেশ তো, ভারি ভালো হবে! রুমা বলছিল...

সেই সময় রাজেন এসে গেল গুন-গুন করতে করেত।...অমিত, চা এসেছে। লাগাও এবার জুতমতো একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে? নাকি সেই ভজনখানা হোক। সেদিন সকালে গাইছিলে—কী যেন......

চন্দন ছটফট করছে ততক্ষণে। রুমা বলছিল—কী বলছিল রুমা? রুমা কী বলছিল? এই কথাটা জানবার জন্যে এখন সে রাজেনকে খুন করতেও পারে। তার চারপাশে রৌদ্রজ্জ্বল সম্ভাবনাময় পৃথিবী থরথর করে কাঁপতে লাগল। গুন গুন করে প্রথম কলিটা গেয়ে ওঠার পর অমিত কণ্ঠ-চড়া পর্দায় তুলে দিল। দূরের স্মৃতির মতো কিছু আবছা ছবি ভেসে এল। আর শীতকালের ঠাণ্ডা হাওয়া, রোদ, দিগন্তে কুয়সার পুঞ্জ, পাখপাখালির ডাক, মাঝে-মাঝে হাইওয়েতে ধাবমান গাড়িগুলোর চাপা নির্ঘোষ—সব মিলিয়ে যে অর্কেস্ট্রা, তার সঙ্গে একটি অচ্ছেদ্য অংশের মতো অমিতের ওই গান অমিত নামক একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওতপ্রোত হচ্ছিল একটি সম্পূর্ণতায়—যা শুধু দুঃখিত করে। ক্রমাগত দুঃখিত এবং বিষণ্ণ করে। সেই ব্যাপক বিষণ্ণতার নিচে চাপা পড়ে গেল রুমা কী বলছিল—তা জানবার প্রবল ইচ্ছেটা।...

একটু পরে খুব ভারি মন নিয়ে চন্দন উঠল। এখন তার একবার রুমার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। আজ কলেজের ছুটি নেই সম্ভবত। বাসস্ট্যাণ্ডের ওখানেই দেখা হতে পারে।

কিন্তু পথে হকসায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হকসায়েবকে সাইকেল চাপতে কোন দিন দ্যাখেনি। সে জন্যেও বটে—কৌতুকে, এবং ওঁকে দেখলেই চন্দন মুহূর্তে যেন মুক্তির খোলা দরজা পেয়ে যায়—সে চেঁচিয়ে ডাকল, হকসায়েব, ও হকসায়েব'

হকসায়েব তক্ষুনি নামলেন সাইকেল থেকে। তারপর বললেন, আরে, আপনাকেই খুঁজে রূপপুর মাথায় করছি কখন থেকে! ওদিকে সাংঘাতিক সর্বনাশ হয়ে গেছে। পরেশবাবু কোথায় এ্যাকসিডেন্ট করে এখন কান্দী হাসপাতালে আছেন। ওরা সব্বাই সেখানে গেছে। চলুন, শিগগির চলুন। শিশিরবাবুর জীপ রয়েছে ওখানে।

(ক্রমশঃ)

পাদ
প্রদীপের
আলোয়
নতুন বাটা এনভয়। আশ্চর্য আধুনিক
দুটি নকশা। এনভয় ১০: সামনে
চামড়ার স্ট্র্যাপ ও স্থায়ী বকলেস যুক্ত
স্লিপ-অন। এবং এনভয় ২৯, ফিতে বাঁধা—
সামনে ও দুপাশে সছিদ্র বর্ডার।
দুটি নকশাই সামনে
কথা ভেবেই তৈরি। অথচ
। বস্তুত আরো আরামের
একটা বেশি চওড়া
নয়। তাই এই জুতো
আপনাকে আধুনিক
দেখাবে নিশ্চয়
মত মনে হবে না।
এনভয় ডার্বি ৫৬
ক্যাজুয়াল
এখন পাওয়া যাচ্ছে।
এনভয় ২৯
সাইজ ৫-১০
এনভয় ১০
Bata

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

'স্মৃতি যেন এক সুদীর্ঘ ভেঙে-ভেঙে যাওয়া রাত। যখন লিখছি তখন মনে হচ্ছে যেন ঘুম থেকে নিয়তই জেগে উঠছি কোন একটা অধরা-মূর্তি ধরার প্রয়াসে, আশা যে আমি একটা অখন্ড স্বপ্ন টেনে আনতে পারব—কিন্তু যা চূর্ণ তা চূর্ণই থেকে যায়—সম্পূর্ণ কাহিনী সর্বদাই পলাতকা।'

এই কথাগুলি বলেছেন একালের এক শক্তিমান উপন্যাসলেখক গ্রেহাম গ্রীন। সাতষট্টি বছর বয়সে তিনি আত্মস্মৃতি লিখেছেন—'এ সরট অব লাইফ'—। এক রকমের জীবন। রবীন্দ্রনাথকে একবার প্ল্যাটফর্মে ডেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'আপনি কেমন আছেন।' উত্তরে বিদেহী রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আছি যে তাও বলতে পারিনে আবার নেই যে তাও নয়, তবে এও এক-রকম থাকা—'

গ্রেহাম গ্রীনের 'আত্মস্মৃতি'র নামকরণের মধ্যে বিদেহী রবীন্দ্রনাথের এই একরকম থাকা কথাটি মনে পড়ে যায়। জীবনের সব কথা তিনি ঠিক ঠিক ধরে রাখতে পারেন নি, তারা হারিয়ে গেছে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, টুকরো টুকরো স্মৃতিকণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অখণ্ড স্বপ্নের অখণ্ড জীবনের কাহিনী লেখকের কল্পনার জালে এসে ধরা দেয় না—তারা এমনই পালিয়ে বেড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।

তিনি তাই স্মৃতির চেয়ে বিস্মৃতিকে আশ্রয় করেছেন। বিস্মৃতি অনেক ভালো। তিনি বলেছেন—

'হয়ত ভুলে যাওয়ার শক্তি উপন্যাস-লেখকের একটু অধিক হয়, অন্য সাধারণ মানুষের চেয়ে এ-ক্ষমতা তাঁর বেশী—লেখককে ভুলতেই হয়, তা না হলে তিনি বন্ধ্যাত্বের শিকার হয়ে পড়েন।'

এই ভুলে যাওয়াটুকু অবশ্য নিজের জীবন সম্পর্কে। উপন্যাসলেখক অপরের জীবন নিয়ে কাজ করেন। সেখানে তিনি লাশকাটা টেবিলে ছুরি হাতে নিয়ে উপস্থিত নৈর্ব্যক্তিক ডাক্তার। যার লাশ কাটা হচ্ছে তার প্রতি যেটুকু আগ্রহ সেটা নিছক একাডেমিক। তার মধ্যে হৃদয়-বলে কিছুই কি নেই? লাশকাটা ছুরি-হাতে ডাক্তারের সঙ্গে লেখকের এখানেই পার্থক্য যে, লেখক হৃদয়টাকে অন্ততঃ সাময়িক ভাবে অকার্যকর করে রাখতে পারেন না।

সাতষট্টি বছর বয়সে পৌঁছে গ্রেহাম গ্রীন জীবনের প্রথম সাতাশ বছরের কথা স্মরণ করতে বসেছেন। তিনি লিখছেন—'আমার যে কথা সবার আগে মনে আসছে সে হল একটি শৈলশীর্ষ পেরামবুলেটর-এ চেপে বসে আছি, আর পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা কুকুর।' এর পর সেই কুকুরের কথা মনে পড়েছে। কুকুরটার ইতিহাস স্মরণে আছে, তিনি তাই কুকুরের মৃত্যু-কাহিনী লিখেছেন—

'কুকুরটা আমার বড় বোনের এখন সেটা আমি জেনেছি। একটা ঘোড়ার গাড়ি চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়—আমার নার্স মনে করেছিল তার মৃতদেহটা এইভাবে বাড়ি নিয়ে আসাটাই সুবিধাজনক।'

এই সামান্য কাহিনী-অংশে ধরা দিয়েছেন লেখক গ্রেহাম গ্রীন। গ্রেহাম গ্রীন লিখেছেন অনেক। 'দি হার্ট অব দি ম্যাটার' 'দি পাওয়ার এ্যান্ড দি গ্লোরী', 'দি এনড অব দি এফেয়ার' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক গ্রেহাম গ্রীন আজ পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন। তাঁর লিপি-কুশলতা ম্লান হয়নি, হয়ত পূর্বের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এই স্মৃতিকথা 'এ সরট অব লাইফ'-এ লেখক গ্রেহাম গ্রীনের প্রতিভার পরিচয় অম্লান রয়েছে।

সমালোচক এলান প্রাইস-জোনস, গ্রেহাম গ্রীনের রচনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় হিসাবে বলেছিলেন—

'he explored a peculiarly English version of the tragic sense of life'.

জীবনের বিয়োগান্ত দিকটির সঙ্গে পরিচয় থাকাটা সার্থক লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। অতিশয় সূক্ষ্ম ভংগীতে গ্রেহাম গ্রীন জীবনের দুঃখের দিকের ইঙ্গিত তাঁর অজস্র রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন, নিজের জীবনের কথা লিখতে বসে জীবনের সেই বিয়োগান্ত দিকটি সম্পর্কে তিনি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন আর সেখানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা।

১৯৩০-এ একটি লেফাফার ছিন্ন অংশে গ্রেহাম গ্রীন লিখে রেখেছিলেন—

"আমি এক সপ্তাহ আগে হ্যারীকে আমার শেষ বিদায় জানিয়ে এসেছি, তার কফিনটা তখন ফেব্রুয়ারী মাসের তুষার-মণ্ডিত মাটিতে নামান হচ্ছিল, তাই অজস্র অজানা লোকের মধ্যে স্ট্র্যাণ্ডের পথে যখন পরিচিতের কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে চলে গেল, আজ সবটুকু কেমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড মনে হল।'

কুড়ি বছর পরে এই কাহিনীকে 'দি থার্ড ম্যান' নামক গল্পে গ্রীন পল্লবিত করেছেন।

গ্রীন বলেছেন—

'My motive for recording these scraps of the past.....is much the same motive that has made me a novelist; a desire to reduce a chaos of experience to some sort of order, and a hungry curiosity. We cannot love others, so the theologians teach unless in some degree we can love ourselves, and curiosity too begins at home'.

অতীতের ভ্রান্তি, ভাবাবেগ আর অতি-রঞ্জনের মধ্যে তাই ফিরে যাওয়ার প্রয়াস করেছেন গ্রীন তাঁর 'এ সরট অব লাইফ' নামক আত্মজীবনীতে। তিনি বলেছেন সেই অতীতের অভিজ্ঞতাকে আবার অনুভবের প্রয়াস করি, তখন যেভাবে তা অনুভব করেছি সেই ভাবে। লেখকের সঙ্গে পাঠকও তাই ফিরে গেছেন সেই অতীতে, ব্রিটিশ মধ্যবিত্তের সেই পুরাতন সমাজে। স্নেহময় জনক-জননী। ছিটগ্রস্ত পিসি, পারিবারিক খেলাধুলো, পাবলিক স্কুল, বালিওল কলেজ, জীবন ও জীবিকা, বিবাহ ইত্যাদি।

জীবনে অনেক দুঃখের দিন এসেছে, অনেক যন্ত্রণা, অনেক বিপর্যয়। স্কুলে পড়াশোনার সময় দুঃখকর অবস্থা, নিজেদের পরিবারে পাগলামির প্রকোপ, এক সময় অসহনীয় একঘেয়েমি দূরীকরণ প্রচেষ্টায় রাশিয়ান রৌলেট নামক জুয়া খেলায় মেতেছেন, অক্সফোর্ডে থাকার সময় সুরার

॥ অসাফল্যের আতংক ॥

স্পর্শে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

গ্রেহাম গ্রীন অসাফল্যের আতংক দীর্ঘদিন উৎপীড়িত হয়েছেন। সাতাশ বছর বয়সে ডায়েরীতে লিখেছেন 'আমি আগে এখানে এসেছি।' দশ বছর আগে তিনি লন্ডনে একজন সাইকিআট্রিস্টের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন—আজ তার জীবনে যেন আশা নেই, বিশ্বাস নেই—আগে প্রেমে পরাজিত, পরে সম্পূর্ণ অসাফল্য। এখানে স্মরণ করা কর্তব্য যে পরিবারে উন্মাদরোগ ছিল—সুতরাং মনে হয় উদ্বেগে তিনি আগে আতংকিত হয়েছিলেন। তাঁর তখন মনে হত স্নায়ু-শিরা একেবারে ছিঁড়ে পড়ছে, ভিতরে ভিতরে কেমন একটা উন্মাদের মনোভংগী পেয়ে বসেছিল। মস্তিষ্কের ভিতর কি একটা যেন ফুলে উঠছিল, শীঘ্র ফেটে যাবে এমন সম্ভাবনা। সামান্য একটু শব্দ তাপর কেউ যদি করত যথা একটা স্লেট নাড়ার শব্দ বা কাঁচি-চামচের ঝনঝনানি তা মস্তিষ্কে এসে তীক্ষ্ণ ছুরির মতো প্রবেশ করত। গ্রেহাম গ্রীন তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য—অনেক সময় বার বার পুনরাবর্তিত হয়েছে তার কারণ হিসাব তিনি বলেছেন

> If there are recurrent themes in my novels it is perhaps only because there have been recurrent themes in my life. Failure seemed then to be one of them'.

পূর্বেই বলেছি অসাফল্যের আতংক তাঁকে বার বার গ্রাস করেছে। জীবনে একবার মাত্র সাফল্যের গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠেছিল, স্কুলের ছাত্র অবস্থায় 'এবোমিনেবল ওয়ান' নামক গল্পটি যখন প্রকাশার্থে গৃহীত হয়, এবং তার জন্য মূল্য পাওয়া গেল। জীবনে সেই একবার। এমন কি প্রথম উপন্যাস প্রকাশের উত্তেজনাও ম্লান হয়েছিল অসাফল্যের আতংক মনকে আগেভাগেই গ্রাস করে বসেছিল। উপন্যাসে যা করার বাসনা ছিল তা করা যায়নি, মনে এই আতংক ছিল।

কিন্তু গ্রেহাম গ্রীনের জীবনালেখ্য সবটুকু অসাফল্যের ইতিহাস নয়, 'এ সরট অব লাইফ' হতাশার-পাঁচালী নয়। অনেক কথা বলা হলেও কোনো কথা না বলার আভাষ আছে এই আত্মকথনের মধ্যে।

গ্রীন একদা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে ক্যাথলিক ধর্মমতে দীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু এখন মৃত্যুর পদধ্বনি যখন আসন্ন হয়ে এসেছে, তখন আর ঈশ্বরে আগ্রহ নেই। তিনি বলেছেন—

> 'I care less and less about religious truth. One has not long to wait for revelation or darkness.'

গ্রেহাম গ্রীনের বর্তমান মানসিকতা এই টি লাইন সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত। আশায় মানুষ যাকে আঁকড়ে ধরে আবার আশায় সেই ধর্মকেই পরিহার করে।

গ্রীনের বক্তব্যে এই আভাষ পাওয়া যায়। তাঁর কাছে অসাফল্য এক রকমের মৃত্যু। সব আসবাবপত্র বিক্রী হয়ে গেছে, আলমারির ড্রয়ার খালি করে ফেলা হচ্ছে, দরোজায় প্রস্তুত গাড়ি এসব নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেমন শববাহীগাড়ি দরজার এসে দাঁড়ায় মৃত্যুর পর-মুহূর্তে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়বহুল পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

'এ সরট অব লাইফ' একটি মহৎ আত্মজীবনী। —অভ্যংকর

A SORT OF LIFE : By : GRAHAM GREENE Published by SIMON & SCHUSTER : $ 6.95.

জয়দেব অনুসন্ধান সমিতির সাহিত্যমেলা

পুণ্য মকর সংক্রান্তির স্নানতীর্থ হিসাবে সাগরমেলা, ত্রিবেণীর মেলা প্রভৃতির সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে জয়দেব কেন্দুলির মেলার নাম পশ্চিমবঙ্গ ও বাইরের লোক জানেন। বাংলার মহাকবি জয়দেব-পদ্মাবতীর স্মৃতিচিহ্নাংকিত এই মেলায় বহু আউল-বাউল-সাধুসন্ত সমাবেশ ও কীর্তন-সঙ্গীতানুষ্ঠান একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বীরভূমের এই মেলাটি এ-অঞ্চলের বিখ্যাত বড় মেলা।

গত বছরের মতো এবারও জয়দেব শ্রীশ্রীহরিদাস আশ্রমে তিন দিন ধরে সাহিত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে (১৪ জানুয়ারী) সভাপতি ও প্রধান অতিথি হয়েছিলেন যথাক্রমে ডঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী ও শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ। সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৫ জানুয়ারী) সভাপতি, প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা ছিলেন যথাক্রমে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, অতিরিক্ত বীরভূম জেলা শাসক শ্রীশ্রীপতি গোস্বামী ও ডঃ সুধীরকুমার করণ। ডঃ মণ্ডল তাঁর ভাষণে মোহন দাসের পুঁথি থেকে জয়দেব যে বীরভূমের কেন্দুলিতে জন্মগ্রহণ করেন সে বিষয়ে নতুন আলোকদান করেন। অধ্যাপক গিরিধারী শাস্ত্রীও অংশ গ্রহণ করেন। কবিতা পাঠ করেন কিশোরীরঞ্জন দাশ।

তৃতীয় অধিবেশন (১৬ জানুয়ারী) পরিচালনা করেন অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক এবং প্রধান অতিথি হয়েছিলেন সিউড়ী সদর মহকুমা শাসক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক মল্লিক ভক্তিবাদ ও কুমুদরঞ্জনের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় অধ্যাপক কিশোরীরঞ্জন দাশও অংশ নেন। কবিতা পাঠ করেন কুমুদকিঙ্কর ও রণজিৎ মুখোপাধ্যায়।

তিন দিন ধরে এই সাহিত্যমেলায় নিম্নলিখিত সঙ্গীতশিল্পী ও বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন : পরিতোষ তেওয়ারী, লক্ষণ দাস, তিনকড়ি দাস, পঞ্চানন বাউল, যতীন্দ্রনাথ দাস, মাধব দাস, পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া গুপ্ত, রাধারাণী দাসী, প্রেম দাসী, গোপাল দাস, কালীপদ পাণ্ডে, দীনবন্ধু দাস প্রভৃতি।

সাত নম্বর ওয়ার্ড : সত্যেন সেন : মুক্তধারা। সাত টাকা।

শ্রীসত্যেন সেন বাংলাদেশের যশস্বী কাহিনীকার। প্রকাশ তালিকায় প্রায় পঁচিশটি বইয়ের উল্লেখ আছে। পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়েছেন বেশ কয়েক বছর। তিনি ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ সালে দু-দুবার গ্রেপ্তার হন। এবং শেষবার গ্রেপ্তার হন ১৯৫৮ সালে। ১৯৫৮ সালের অকটোবর থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন তিনি কারাগারে। কারান্তরালেই তিনি অধিকাংশ বই লেখেন। আর সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই লিখিত হয়েছে তাঁর 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' কাহিনীটি। সাত নম্বর ওয়াড একটি হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ড। লেখক রাজবন্দী হিসাবে সেখানে চিকিৎসাধীন। ওয়ার্ডের তরুণবয়স্ক ডাক্তার সুশৃংখলার ভক্ত। স্টাফ নার্স অত্যন্ত কর্কশ ও অপ্রিয়ভাষী। তা ছাড়া আছে দিবারাত্রি শ্রমে ক্লান্ত সেবিকারা—যে নার্সরা এসেছে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকে। নার্সদের অধিকারের সংগ্রাম—কেবলমাত্র সসম্মানে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। কিভাবে তাদের এক সক্রিয় আন্দোলনের যোগ্য করে তুলল, কিভাবে পাঠরত মেডিকেল ছাত্ররা তাদের পাশে এসে দাঁড়াল, এমনকি রোগিরাও তাদের সমর্থনে কেমন করে

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

'স্মৃতি যেন এক সুদীর্ঘ ভেঙে-ভেঙে যাওয়া রাত। যখন লিখছি তখন মনে হচ্ছে স্বপ্ন ঘুম থেকে নিয়তই জেগে উঠছি কোন একটা অধরা-মূর্তি ধরার প্রয়াসে, আশা যে আমি একটা অখণ্ড স্বপ্ন টেনে আনতে পারব—কিন্তু যা চূর্ণ তা চূর্ণই থেকে যায়—সম্পূর্ণ কাহিনী সর্বদাই পলাতকা।'

এই কথাগুলি বলেছেন এ-কালের এক শক্তিমান উপন্যাসলেখক গ্রেহাম গ্রীন। সাতষট্টি বছর বয়সে তিনি আত্মস্মৃতি লিখেছেন—'এ সর্ট অব লাইফ'—। এক-রকমের জীবন। রবীন্দ্রনাথকে একবার [illegible] ডেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'আপনি কেমন আছেন।' উত্তরে বিদেহী রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আছি যে তাও বলতে পারিনে আবার নেই যে তাও নয়, তবে এও এক-রকম থাকা—'

গ্রেহাম গ্রীনের 'আত্মস্মৃতি'র নাম-করণের মধ্যে বিদেহী রবীন্দ্রনাথের এই একরকম থাকা কথাটি মনে পড়ে যায়। জীবনের সব কথা তিনি ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারেন নি, তারা হারিয়ে গেছে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, টুকরো টুকরো স্মৃতিকণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অখণ্ড স্বপ্নের অখণ্ড জীবনের কাহিনী লেখকের কল্পনার জালে এসে ধরা দেয় না—তারা এমনই পালিয়ে বেড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।

তিনি তাই স্মৃতির চেয়ে বিস্মৃতিকে আশ্রয় করেছেন। বিস্মৃতি অনেক ভালো। তিনি বলেছেন—

'হয়ত ভুলে যাওয়ার শক্তি উপন্যাস-লেখকের একটু অধিক হয়, অন্য সাধারণ মানুষের চেয়ে এ-ক্ষমতা তাঁর বেশী—লেখককে ভুলতেই হয়, তা না হলে তিনি বন্ধ্যাত্বের শিকার হয়ে পড়েন।'

এই ভুলে যাওয়াটুকু অবশ্য নিজের জীবন সম্পর্কে। উপন্যাসলেখক অপরের জীবন নিয়ে কাজ করেন। সেখানে তিনি লাশকাটা টেবিলে ছুরি হাতে নিয়ে উপস্থিত নৈর্ব্যক্তিক ডাক্তার। যার লাশ কাটা হচ্ছে তার প্রতি যেটুকু আগ্রহ সেটা নিছক একাডেমিক। তার মধ্যে হৃদয়-বলে কিছুই কি নেই? লাশকাটা ছুরি-হাতে ডাক্তারের সঙ্গে লেখকের এখানেই পার্থক্য যে, লেখক হৃদয়টাকে অন্ততঃ সাময়িক ভাবে অকার্য-কর করে রাখতে পারেন না।

সাতষট্টি বছর বয়সে পৌঁছে গ্রেহাম গ্রীন জীবনের প্রথম সাতাশ বছরের কথা স্মরণ করতে বসেছেন। তিনি লিখছেন—'আমার যে কথা সবার আগে মনে আসছে সে হল একটি শিলশীর্ষ পেরামবুলেটর-এ চেপে বসে আছি, আর পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা কুকুর।' এর পর সেই কুকুরের কথা মনে পড়ছে। কুকুরটার ইতিহাস স্মরণে আছে, তিনি তাই কুকুরের মৃত্যু-কাহিনী লিখেছেন—

'কুকুরটা আমার বড় বোনের এখন সেটা আমি জেনেছি। একটা ঘোড়ার গাড়ি চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়—আমার নার্স মনে করেছিল তার মৃতদেহটা এইভাবে বাড়ি নিয়ে আসাটাই সুবিধাজনক।'

এই সামান্য কাহিনী-অংশে ধরা দিয়েছেন লেখক গ্রেহাম গ্রীন। গ্রেহাম গ্রীন লিখেছেন অনেক। 'দি হার্ট অব দি ম্যাটার' 'দি পাওয়ার অ্যান্ড দি গ্লোরী', 'দি এনড অব দি এফেয়ার' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক গ্রেহাম গ্রীন আজ পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন। তাঁর লিপি-কুশলতা ম্লান হয়নি, হয়ত পূর্বের উজ্জ্বল্য নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এই স্মৃতিকথা 'এ সর্ট অব লাইফ'-এ লেখক গ্রেহাম গ্রীনের প্রতিভার পরিচয় অম্লান রয়েছে।

সমালোচক এলান প্রাইস-জোনস, গ্রেহাম গ্রীনের রচনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় হিসাবে বলেছিলেন—

'he explored a peculiarly English version of the tragic sense of life'.

জীবনের বিয়োগান্ত দিকটির সঙ্গে পরিচয় থাকাটা সার্থক লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। অতিশয় সূক্ষ্ম ভংগীতে গ্রেহাম গ্রীন জীবনের দুঃখের দিকের ইঙ্গিত তাঁর অজস্র রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন, নিজের জীবনের কথা লিখতে বসে জীবনের সেই বিয়োগান্ত দিকটি সম্পর্কে তিনি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন আর সেখানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা।

১৯৩০-এ একটি লেফাফার ছিন্ন অংশে গ্রেহাম গ্রীন লিখে রেখেছিলেন—

"আমি এক সপ্তাহ আগে হ্যারীকে আমার শেষ বিদায় জানিয়ে এসেছি। তার কফিনটা তখন ফেব্রুয়ারী মাসের তুষার-মণ্ডিত মাটিতে নামান হচ্ছিল, তাই অজস্র অজানা লোকের মধ্যে গোরস্থানের পথে যখন পরিচিতের কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে চলে গেল, আজ সবটুকু কেমন অবিশ্বাস্য বলে মনে হল।'

কুড়ি বছর পরে এই কাহিনীকে 'দি থার্ড ম্যান' নামক গল্পে তিনি পরিবেশন করেছেন।

গ্রীন বলেছেন—

'My motive for recording these scraps of the past. . . is much the same motive that has made me a novelist; a desire to reduce a chaos of experience to some sort of order, and a hungry curiosity. We cannot love others, so the theologians teach, unless in some degree we can love ourselves, and curiosity too begins at home'.

অতীতের স্মৃতি, অন্ধকারে আর আলো-ছায়ার মধ্যে তাই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন গ্রীন তাঁর 'এ সর্ট অব লাইফ' নামক আত্মজীবনীতে। তিনি বলেছেন সেই অতীতের অভিজ্ঞতাকে আবার অনুভবের প্রয়াস করি, যখন যেভাবে তা অনুভব করেছি সেই ভাবে। লেখকের সঙ্গে পাঠকও তাই ফিরে গেছেন সেই অতীতে, ব্রিটিশ মধ্যবিত্তের সেই পুরাতন সমাজে। স্নেহময় জনক-জননী। ছিটগ্রস্ত পিসি, পারিবারিক খেলাধূলা, পাবলিক স্কুল, বালিওল কলেজ, জীবন ও জীবিকা, বিবাহ ইত্যাদি।

জীবনে অনেক দুঃখের দিন এসেছে, অনেক যন্ত্রণা, অনেক বিপর্যয়। স্কুলে পড়াশোনার সময় দুঃখকর অবস্থা, নিজেদের পরিবারে পাগলামির প্রকোপ, এক সময় অসহনীয় একঘেয়েমি দূরীকরণ প্রচেষ্টায় রাশিয়ান রোলেট নামক জুয়া খেলায় মেতেছেন, অক্সফোর্ডে থাকার সময় সুরার

॥ অসাফল্যের আতঙ্ক ॥

স্পর্শে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

গ্রেহাম গ্রীন অসাফল্যের আতঙ্কে দীর্ঘদিন উৎপীড়িত হয়েছেন। সাতাশ বছর বয়সে ডায়েরীতে লিখেছেন 'আমি আগে এখানে এসেছি।' দশ বছর আগে তিনি লন্ডনে একজন সাইকিআট্রিস্টের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন—আজ তাঁর জীবনে যেন আশা নেই, বিশ্বাস নেই—আগে প্রেমে পরাজিত, পরে সম্পূর্ণ অসাফল্য। এখানে স্মরণ করা কর্তব্য যে পরিবারে উন্মাদরোগ ছিল—সুতরাং মনে হয় উদ্বেগে তিনি আগে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁর তখন মনে হত স্নায়ু-শিরা একেবারে ছিঁড়ে পড়ছে, ভিতরে ভিতরে কেমন একটা উন্মাদের মনোভঙ্গী পেয়ে বসেছিল। মস্তিষ্কের ভিতর কি একটা যেন ফুলে উঠছিল, শীঘ্র ফেটে যাবে এমন সম্ভাবনা। সামান্য একটু শব্দ কাপর কেউ যদি করত যথা একটা প্লেট নাড়ার শব্দ বা কাঁটা-চামচের ঝনঝনানি তা মস্তিষ্ককে এসে পৌঁছত ড্রিলের মতো প্রবেশ করত। গ্রেহাম গ্রীন তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য—অনেক সময় বার বার পুনরাবর্তিত হয়েছে তার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন

> If there are recurrent themes in my novels it is perhaps only be aure there have been recurrent themes in my life. Failure seemed then to be one of them',

পূর্বেই বলেছি অসাফল্যের আতঙ্ক তাঁকে বার বার গ্রাস করেছে। জীবনে একবার মাত্র সাফল্যের গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠেছিল, স্কুলের ছাত্র অবস্থায় 'এবো-মিনেবল গ্রোন' নামক গল্পটি যখন প্রকাশার্থে গৃহীত হয়, এবং তার জন্য মূল্য পাওয়া গেল। জীবনে সেই একবার। এমন কি প্রথম উপন্যাস প্রকাশের উজ্জ্বলতাও ম্লান হয়েছিল অসাফল্যের আতঙ্ক মনকে আগেভাগেই গ্রাস করে বসেছিল। উপন্যাসে যা করার বাসনা ছিল তা করা যায়নি, মনে এই অতৃপ্তি ছিল।

কিন্তু গ্রেহাম গ্রীনের জীবনালেখ্য সবটুকু অসাফল্যের ইতিহাস নয়, 'এ সর্ট অব লাইফ' হতাশার-পাঁচালী নয়। অনেক কথা বলা হলেও কোনো কথা না বলার আভাষ আছে এই আত্মকথনের মধ্যে।

গ্রীন একদা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে ক্যাথলিক ধর্মমতে দীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু এখন মৃত্যুর পদধ্বনি যখন আসন্ন হয়ে এসেছে, তখন আর ঈশ্বরে আগ্রহ নেই। তিনি বলেছেন—

> 'I care less and less about religious truth. One has not long to wait for revelation or darkness.'

গ্রেহাম গ্রীনের বর্তমান মানসিকতা এই কটি লাইনে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত। হতাশায় মানুষ শক্তি আঁকড়ে ধরে আবার হতাশায় সেই ধর্মকেই পরিহার করে। গ্রীনের বক্তব্যে এই আভাষ পাওয়া যায়। তাঁর কাছে অসাফল্য এক রকমের মৃত্যু। সব আসবাবপত্র বিক্রী হয়ে গেছে, আলমারির ড্রয়ার খালি করে ফেলা হচ্ছে, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি এসব নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেমন শববাহী গাড়ি দুয়ারে এসে দাঁড়ায় মৃত্যুর পর-মুহূর্তে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়বহুল পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

'এ সর্ট অব লাইফ' একটি মহৎ আত্মজীবনী। —অভয়ংকর

A SORT OF LIFE : By : GRAHAM GREENE. Published by SIMON & SCHUSTER : $ 6.95.

জয়দেব অনুসন্ধান সমিতির সাহিত্যমেলা

পুণ্য মকর সংক্রান্তির স্নানতীর্থ হিসাবে সাগরমেলা, ত্রিবেণীর মেলা প্রভৃতির সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে জয়দেব কেন্দুলির মেলার নাম পশ্চিমবঙ্গ ও বাইরের লোক জানেন। বাংলার মহাকবি জয়দেব-পদ্মাবতীর স্মৃতিচিহ্নাঙ্কিত এই মেলায় বহু আউল-বাউল-সাধুসন্ত সমাবেশ ও কীর্তন-সঙ্গীতানুষ্ঠান একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বীরভূমের এই মেলাটি এ-অঞ্চলের বিখ্যাত বড় মেলা।

গত বছরের মতো এবারও জয়দেব শ্রীশ্রীহরিদাস আশ্রমে তিন দিন ধরে সাহিত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে (১৪ জানুয়ারী) সভাপতি ও প্রধান অতিথি হয়েছিলেন যথাক্রমে ডঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী ও শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ। সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৫ জানুয়ারী) সভাপতি, প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা ছিলেন যথাক্রমে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, অতিরিক্ত বীরভূম জেলা শাসক শ্রীশ্রীপতি গোস্বামী ও ডঃ সুধীরকুমার করণ। ডঃ মণ্ডল তাঁর ভাষণে মোহন দাসের পুঁথি থেকে জয়দেব যে বীরভূমের কেন্দুলিতে জন্মগ্রহণ করেন সে বিষয়ে নতুন আলোকদান করেন। অধ্যাপক গিরিধারী শাস্ত্রীও অংশ গ্রহণ করেন। কবিতা পাঠ করেন কিশোররঞ্জন দাশ।

তৃতীয় অধিবেশন (১৬ জানুয়ারী) পরিচালনা করেন অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক এবং প্রধান অতিথি হয়েছিলেন সিউড়ী সদর মহকুমা শাসক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক মল্লিক ভক্তিবাদ ও কুমুদরঞ্জনের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় অধ্যাপক কিশোররঞ্জন দাশও অংশ নেন। কবিতা পাঠ করেন কুমুদশঙ্কর ও রণজিৎ মুখোপাধ্যায়।

তিন দিন ধরে এই সাহিত্যমেলায় নিম্নলিখিত সঙ্গীতশিল্পী ও বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন : পরিতোষ তেওয়ারী, লক্ষণ দাস, তিনকড়ি দাস, পঞ্চানন বাউল, যতীন্দ্রনাথ দাস, মাধব দাস, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া গুপ্ত, রাধারাণী দাসী, প্রেম দাসী, গোপাল দাস, কালীপদ পাণ্ডে, দীনবন্ধু দাস প্রভৃতি।

সাত নম্বর ওয়ার্ড : সত্যেন সেন : মুক্তধারা। সাত টাকা।

শ্রীসত্যেন সেন বাংলাদেশের যশস্বী কাহিনীকার। প্রকাশ তালিকায় প্রায় পাঁচিশটি বইয়ের উল্লেখ আছে। পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়েছেন বেশ কয়েক বছর। তিনি ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ সালে দু'দুবার গ্রেপ্তার হন। এবং শেষবার গ্রেপ্তার হন ১৯৫৮ সালে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন তিনি কারাগারে। কারান্তরালেই তিনি অধিকাংশ বই লেখেন। আর সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই লিখিত হয়েছে তাঁর 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' কাহিনীটি। সাত নম্বর ওয়ার্ড একটি হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ড। লেখক রাজবন্দী হিসাবে সেখানে চিকিৎসাধীন। ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার সশস্ত্রধারীর জন্য ইচ্ছে নার্স অত্যন্ত কর্কশ ও অপ্রসন্নভাষী। এ ছাড়া আছে দিবারাত্রি শ্রমে ক্লান্ত সেবিকারা—যে নার্সরা এসেছে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকে। নার্সদের অধিকারের সংগ্রাম—কেবলমাত্র সসম্মানে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা কিভাবে তাদের এক সক্রিয় আন্দোলনের যোগ করে তুলল, কিভাবে পার্টির মেডিকেল ছাত্ররা তাদের পাশে এসে দাঁড়াল, এমনকি রোগিরাও তাদের সমর্থনে কেমন করে

এসে দাঁড়াল সত্যেনবাবু অত্যন্ত দরদ দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। আকমল নামে গুরুতর রোগাক্রান্ত তরুণ ছাত্রটিকে এই লড়াইয়ের কেন্দ্র মনে করে প্রফেসর ডাক্তার যখন তাকে ওয়ার্ড থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তখনই দেখা গেল তথাকথিত ল এ্যান্ড অর্ডারের সংগঠনের আসল রূপ। তরুণ ডাক্তারের মানবিকতাবোধ পরাস্ত হয় হুকুমের কাছে, স্টাফ নার্স কর্কশভাষী হয়েও ওয়ার্ডের চিকিৎসাগত পবিত্রতা রক্ষার জন্য পুলিশের প্রতি খড়্গহস্ত হন, আর সমস্ত নার্স ও রোগীরা চিকিৎসার নামে হৃদয়হীনতা বিষয়ে হয়ে ওঠে সচেতন। একটি ওয়ার্ডের প্রতীকে সত্যেনবাবু পাকিস্তানের তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলা এবং সর্বগ্রাসী মানববৈরীতাকে তুলে ধরেছেন। প্রবল স্বৈরাচারী শাসনের যুগে লেখকও কিভাবে প্রতীকের আঙ্গিকে পুরো দমনমূলক ব্যবস্থাটি তুলে ধরতে পারেন 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' তার উদাহরণ। সত্যেনবাবুর ভাষা অত্যন্ত ঝরঝরে, রচনাটি বিস্ময়করভাবে শিল্পোত্তীর্ণ এবং যে কোন সৎ সাহিত্যিক ও সৎ পাঠকের কাছে তা উদাহরণস্বরূপ।

বকুল সেন (উপন্যাস) — বসন্তগৌরী দত্ত। ভারবি, ২৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। সাত টাকা।

বকুল সেন সুন্দরী তন্বী। হাসিখুশী-ভরা আরো পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মতো আনন্দ উচ্ছলতার মধ্যে দিনগুলো অতি-বাহিত করছিল। ঘটনার ঘূর্ণি নিমেষে তাকে স্বাভাবিক জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। গিয়ে পড়ল এক অস্বাভাবিক জীবনের টানাপোড়েনের মধ্যে। বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যে প্রাণপণে যুঝেও কুটোর মতো ভেসে গেল অসহায়ভাবে। তার এই চঞ্চল জীবনে এলো অসংখ্য পুরুষ প্রেম-ভালো-বাসার সুধাপাত্র নিয়ে। কিন্তু কিছুই সে স্পর্শ করতে পারল না—সুন্দর সুখী শান্ত সংসার-জীবনের জন্যে তার আকুল আর্তি কাহিনীকে বিষাদঘন করেছে। ছায়াভিনেত্রী বকুল সেনের আলোছায়াময় আনন্দবেদনা-ঘেরা ঘটনাবহুল জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এ কাহিনী। ভাষা ভালো, কাহিনী গঠনে ও বর্ণনে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারলে এ উপন্যাস আরো চিত্তাকর্ষী হয়ে উঠতে পারত। মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামীর প্রচ্ছদ গ্রন্থখানিতে বিশিষ্টতা এনেছে।

সমকালীন চিন্তা ঃ আবুল ফজল ঃ দাম ছ টাকা।

যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম হলো, তার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েক বছর আগেই। আর এই ভিত্তি গড়ে তোলায় যেজন বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের এবং এরাই আদর্শনিক পথনির্দেশ সংগ্রামী ছাত্রদের দেবার জন্য দীর্ঘদিন থেকেই জাতির কর্তব্যগুলি নির্দেশ করছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে বাঙালী জাতিসত্তার শিকড় আবি-ষ্কার করার জন্য বুদ্ধিজীবীরাই অগ্রণী হন এবং গবেষণার দাক্ষিণ্যে তাঁরা বাঙালি মানসের লোকায়ত ও গণতান্ত্রিক রূপটি তুলে ধরেন। অন্যদিকে সেই বুদ্ধি-জীবীরাই নতুন রাষ্ট্রভাবনা, গণতান্ত্রিক জীবনঅন্বেষা, মুক্তবুদ্ধি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি নানা বিষয়ে সৃষ্টিশীল জীবনধর্মিতায় বাঙালী মানস পরিপুষ্ট করেন। আবুল ফজল বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের এই বৈপ্লবিক বুদ্ধিচর্চার দিগন্তে এক অপ্রতিরোধ্য নাম। ১৯২৬ সালে, তাঁর প্রথম যৌবনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের তিনি অন্যতম পুরোধা ছিলেন। 'সমকালীন চিন্তা' তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানে' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এর আগস্ট মাসে। ভারতে প্রথম প্রকাশ নবেম্বর ১৯৭১-এ। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই বইয়ের প্রবন্ধগুলিতে তিনি তাঁর বিশিষ্ট মতামত দিয়েছেন। বলেছেন, "লেখকও কালের সন্তান আর কাল-শাসিত বলে কালের ঘটনা-স্রোতের প্রতি উদাসীন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় ঐসব ব্যাপারে বক্তব্যহীন হওয়া বা থাকাও। সব লেখকেরই দেশ, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু না কিছু বক্তব্য থাকে। আমার নিজেরও আছে।"

জনাব আবুল ফজল তাঁর অনবদ্য ভাষায় মুক্তচিন্তাকে সংস্কৃতি-জাগরণের অন্যতম প্রধান লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সর্বগ্রাসী পাক-শাসনের চাপ কিভাবে পূর্ববঙ্গে মুক্ত-চিন্তাকে চূর্ণ করেছে। 'সাহিত্য মুক্ত আবহাওয়া আর স্বাধীন পরিবেশের ফসল' কিন্তু 'কে কখন লেখা লিখলে না কি কথা বললে সরকারের বিরাগভাজন হতো না আর পত্রিকা-সম্পাদকরাও ছাপাতে সাহস পাবেন—এ হিসেব করে লিখতে গেলে ...লেখা এক রকম দাঁড় করানো যায় বটে, কিন্তু তা সাহিত্য হয় না।' মুক্তবুদ্ধির আলোতেই তিনি বিচার করেছেন ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রের আদর্শকে। সে আদর্শকে স্পষ্টতই বলেছেন 'এক অবাস্তব কল্পনা।' রাষ্ট্র যে ধর্মসংস্কারের ঊর্ধ্বে বরং 'রাষ্ট্রে যদি একবিন্দু ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে তেমন রাষ্ট্রকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেজন্যেই মন্দ বা অযোগ্য রাষ্ট্র বলে নিন্দিত করবে না।' এবং যে রাষ্ট্র মানুষের সুখ-সুবিধা, শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরী করে সে রাষ্ট্রই আদর্শ রাষ্ট্র। দেখিয়েছেন 'এমনকি ইসলামের জন্মস্থান আরবদেশেও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।' আর এই চিন্তার অনুসরণেই তিনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষারও প্রবক্তা হয়ে-ছেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতিরও তিনি বিরুদ্ধবাদী। এবং ছাত্র আন্দোলনের ধূম্রধুমার শিক্ষায়তনের মধ্যে টেনে আনারও তিনি বিরোধী। ছাত্ররা রাজনীতি নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু শিক্ষায়তনের মধ্যে নয়। দেখা গেছে রাষ্ট্রশক্তি যদি ছাত্রদের একাংশকে মদৎ দিয়ে স্কুল-কলেজে স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ দেয়, তার ফল বিষময় হতে পারে। আবুল ফজলের একথা কথঞ্চিৎ মানলেও জাতির দাবি যখন অগ্রাধিকার পায়, তখন ছাত্রও যোগ্য ভূমিকা নিতে পারে, সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবময় অংশগ্রহণ একথা সপ্রমাণ করেছে।

জনাব আবুল ফজলের বইখানি ঐতি-হাসিকতার কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা-দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তি পরোয়া না করে তাঁদের মুক্ত-বুদ্ধি প্রসূত মতামত লিপিবদ্ধ করে গেছেন আবুল ফজল তাঁদের অন্যতম। স্বাধীন বাংলাদেশে এ-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর গুরুত্ব আরও বেশি হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বইখানির ছাপা বাঁধাই উল্লেখযোগ্য।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

ঘোড়সওয়ার ঃ দ্বিতীয় সংকলন। সম্পাদক আশিস সান্যাল। ৫৩, নিধানপল্লী, কলকাতা-৩২। এক টাকা।

'ঘোড়সওয়ার' কবিতা সংক্রান্ত একটি সার্থক পত্রিকা। দ্বিতীয় সংকলনটিতে শক্তি মুখোপাধ্যায়ের কবিতাবলী ছাড়া আরও যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, দুলাল ঘোষ, বিপ্লব মাজী, চন্দন সেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি। আশিস সান্যালের দীর্ঘ কবিতাটি উল্লেখ-যোগ্য। বিষ্ণু দে সংক্রান্ত আলোচনাটি সুলিখিত। বিদেশী কবিতার কিছু সংকলন ও তরুণ গুপ্তের ষাটের দশকের আমে-রিকান কবিতার বিস্তৃত আলোচনা পত্রিকা-টির সুরুচি ও মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

কালি ও কলম (পৌষ '৭৮)—সম্পাদক ঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা- ১২। এক টাকা।

বাংলা-সাহিত্যের সিরিয়স পাঠকদের খুশী করার মতো নতুন ধরনের রচনার সন্নিবেশ হয়েছে আলোচ্য সংখ্যায়। আছে চারটি প্রবন্ধ, চারটি গল্প, চারটি কবিতা, তিনটি ধারাবাহিক উপন্যাস এবং সাহিত্য-সংসারের বিবিধ খবর। রচনাগুলি সুলিখিত এবং চিত্তাকর্ষী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ গল্পের উৎস', কালীপদ রায়ের 'ডালিম গাছের আত্মকথা' ছবি মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যের অন্তরালে, শরৎচন্দ্র' সাহিত্য পাঠকরা অনেক অজানা তত্ত্বের খবর পাবেন। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত যজ্ঞেশ্বর রায়ের জীবনী উপন্যাস বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

॥৪২॥

দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনে মেঘু ধড়ফড় করে উঠে গেল। বাইরে কাচের প্যানেলের ওপাশে থমকে ছিল কুয়াশার ঊর্ণজাল। চেষ্টা করল তার নজরটা কাচ ভেদ করে ওপাশে ফেলতে। কিছুই দেখা গেল না। দরজা খুলে সে দাঁড়াল। শীতের হাওয়ার সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল একরাশ কুয়াশা। মুহূর্তে এক হয়ে গেল ভিতর ও বাহির। সেই কুয়াশার মাঝে জেগে উঠল যেন কুন্দ কুসুমে সাজানো এক পাষাণ মূর্তি।

—শর্মিষ্ঠা! তুমি এলি?

দমকা-চাবুকের মত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শর্মিষ্ঠা দাঁড়াল মেঘুর মুখোমুখি হয়ে। মেঘুর কথার জবাব না দিয়ে সে গেল সরাসরি নিজের কথায়। সে জিজ্ঞাসা করল পুলিশ সাহেব আর ডেপুটি কমিশনার আজ এখানে এসেছেন?

—কার কাছে শুনলি?

—শুনেছি ভাল লোকের কাছে, বল না। শর্মিষ্ঠার কথায় আবেগ ও উৎকণ্ঠা দুটোই জড়ানো।

—আমি জানি না।

—বলবি না, আমাকে বিশ্বাস হয় না তোর?

এমন কথা আজ শর্মিষ্ঠাকে বলতে হল, শুনতেও হল তা মেঘুকে। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের জের টেনে তার মনে একাধারে দুটি ভাবের প্রক্রিয়া চললো। একদিকে শর্মিষ্ঠার কথায় মধুময় হয়ে উঠল মেঘুর মন; আবার অপরদিকে স্মৃতির রসনা লেহন করে নিল তার মনের সে মাধুর্য। এই দুটি বিরোধী ভাবের মাঝে পেষাই হয়ে মেঘু শ্বাস টেনে জবাব দিলে—বলতে পারি না। তবে যে কথা জানতে চাস তা আমি সঠিক জানি না।

—জানিস না! তুই তা বিশ্বাস করতে বলছিস আমাকে?

—বিশ্বাস করবি না তবে, আমি তো বলছি না তা করতে।

মেঘুর নির্বিকার জবাবে শর্মিষ্ঠা ভেঙে পড়ল।

—এই বিপদের সময় আর জ্বালাসনি আমায়। বল না যা জানতে চাই, তোর দুটো পায়ে পড়ছি। বলে, শর্মিষ্ঠা নুয়ে পড়তে চায় মেঘুর পায়ের ওপর।

একপা পিছিয়ে মেঘু নুয়ে পড়ে, শর্মিষ্ঠার হাত ধরে টেনে তোলে, বলে—কি যে করিস! কিসের বিপদ? আমার দিক দিয়ে তোদের কোন বিপদ আসবে না।

বিহ্বল শর্মিষ্ঠার চোখ।

—আমাদের জন্য আসিনি আমি।

—তবে কার জন্য?

—তোদের, তোর জন্য।

এ আবার কোন খবর! মেঘু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—আমার! কেন, কি হয়েছে আমার?

শর্মিষ্ঠার ফ্যালফেলে চোখ দুটো স্থির হল মেঘুর চোখে। সে বললে—তাও কি হয়, তুই জানিস না?

মেঘুর যেন আনা-নানা ভাব।

—না, ছোট সাহেব আর কিছু বলেন না আমাকে। অবস্থা জটিল হয়ে উঠেছে, আমি আর সামাল দিতে পারব না।

শর্মিষ্ঠার ভাবনার ধারাটা এক পাশ ঘেঁষে বইছিল, কিন্তু মেঘুর কথায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সে বললে—তবে তুই কি করবি? তুই পালিয়ে যা এখান থেকে।

—পালাব! পালাব কেন? বলে, দৃঢ় অথচ হতবাক মেঘুর চোখ দুটো পড়ে রইল শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর।

—নইলে যে মহা মুশকিল হবে।

কথা বলতে শর্মিষ্ঠার স্বরটা কেঁপে উঠল। তবুও তা ধরে না ছোঁয় না মেঘুর মন।

—বড়সাহেব না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যেতে পারব না, কিছু করতে পারব না।

—ততদিন কি তুই বেঁচে—। শর্মিষ্ঠার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়, ভয়ত চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল।

বেশ একটু বিচলিত হল মেঘু। সে বললে—কি হল তোর! কেন এমন করছিস?

—যাদের জন্য তুই এত করলি তারা যে এখন বেহাত হয়ে গেছে, তারা এখন খাঁড়া তুলে ধরল তোর মাথার ওপর, সাহেবরাও তোকে ছেড়ে দিল!

শর্মিষ্ঠার কাঁপা স্বর যেন নেতিয়ে পড়ল। তার ভুলটা শুধরে দিতে মেঘু তৎপর জবাব দিল—সাহেবের তো কোন দোষ নেই। দোষ আমারই, তিনি যা বলেন আমি তা করতে পারব না। তাই আমাকে আর কিছু বলেন না।

—কি বলেছেন সাহেব?

—বলেছেন, কুলি লাইন-এর ঘর ছেড়ে বাংলোয় থাকতে।

—আমিও তো তেমনই বলতে এসেছি। তুই এ ঘর ছেড়ে চলে যা, আজই।

—আমি তা করব না।

—তবে হাকিমের সমনে আজ সব বলে দিবি।

—কি বলে দেব?

—মেকি সাহেব কুলিদের উসকে দিয়েছে—

—তা পারব না। তিনি আমার উপকার করেছেন।

—উপকার করেছেন? —তবে বলে দিবি, কুলিরা তোর ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

কত আজেবাজে গুজবই তো রটে এখানে, এটাও তেমনই একটা ধরে নিল মেঘু। তবুও জিজ্ঞাসা করল—আগুন ধরাবে! কেন?

—তুই তাদের খুন করতে চেয়েছিস।

আসলে অমন কথা তো ওদেরই মুখ থেকে বেরিয়েছে। সেটা এমন আকার ধরে কি করে, তা মেঘু বুঝে উঠল না। সে হতবুদ্ধি হল, বলল—খুন করতে চেয়েছি, আমি! কখন?

—আমি বুঝি, ওটা বাজে কথা। কিন্তু সে ভুল এখন ভাঙবে কে? জানিস তো, যেমন বোকা তেমনি গোঁয়ার সব। চারদিকে খুব রটে গেছে কথাটা। যখন সবাই তোর আপিসে গিয়েছিল তুই নাকি যা-তা সব বলেছিস।

মেঘু একটু বিচলিত হয়েছিল শর্মিষ্ঠার কথায়, কিন্তু তার উৎপত্তির খবরটা শুনে নিশ্চিন্ত হল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে—ওঃ এই কথা!

একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে বটে। তবে, ওদের সঙ্গে আমার কথা সে দিনই প্রথম নয়। মেঘু হেসে উঠল—ও দু-দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

শর্মিষ্ঠা উৎকণ্ঠিত হল, বলল—দু-দিন! দু-দিন কোথায় পাবি?

মেঘু হেসেই উড়িয়ে দিতে চায় শর্মিষ্ঠাকে। ঘটনাটার গুরুত্ব প্রকাশ করতে সে বলল—হাসি নয়! সকলের মুখেই ঐ এক কথা। আজ দরমাহা পাবার পর থেকে দেখবি কি কাণ্ড করে সবাই হাঁড়িয়া খেয়ে।

তবুও মেঘুকে ধাতস্থ করতে পারে না শর্মিষ্ঠা। মেঘু তাচ্ছিল্য করে বলল—সে তো রোজই করে।

—তেমন নয়। গোপনে অনেক চক্রান্ত চলছে, এমন কি ইউনিয়ন বাবুকেও কিছু জানায় নি। জানিস তো ওদের কাণ্ড। টাকা তুলেছে হাঁড়িয়া খেতে। খুব নেশা করবে, তারপর রাত্তিরে তোর ঘরে—

—আগুন দেবে! ধ্যাৎ বিশ্বাস হয় না এ কথা।

—বিশ্বাস হয় না? সব দেখিয়ে দেব, কার ঘরে কোন জিনিসের যোগাড় আছে।

—তা হতে পারে, কিন্তু আগুন ধরাতে পারবে না।

—কেন পারবে না? তোর নামে যে যা তা কথা রটে গেছে, সবাই তাতে খেপে উঠেছে যে। তুই সাহেবদের লোক, তাদের জন্য তুই সব করতে পারিস, করবিও।

—তবে তো ঠিকই শুনেছিস।

—ঠিকই শুনেছি? আমি আর তোকে চিনি না?

—সে পুরোনো কথা, এখনকার কি জানিস?

—ধ্যাৎ, মানুষের অত অদল-বদল হতে পারে?

—হয়ে গেছে, তবু বলে হতে পারে?

—ওটা তোর রাগের কথা। আগে তো এমন ছিলি না। কেন এমন হলি? রাগ করেই তো সেদিন অমন করলি। জানিস তো ওদের বুদ্ধির দৌড়। কেন অত রেগে উঠলি?

সুপ্ত অভিযোগগুলো হঠাৎ ঠেলে উঠল মেঘুর মনে। সে বললে—রাগবে না, পাজো করবে অমন কথায়। ওদের জন্য এত করি সব ভুলে গেল!

—এমন বোকা হলি কবে রে?

—বোকা হলাম!

—তা নয় তো কি? ভুলে গেলি, সবাই তোকে কত ভালবাসে!

—হাঁ, তাই শুধু, ইউনিয়ন বাবু, ইউনিয়ন বাবু।

—তাতেও বুঝলি না যে ওদের পিছনে লোক লেগেছে।

—লোক তো বরাবরই লেগে ছিল।

—তবে আগে কেন এমন হয়নি? সবাই তো তোর কথায় চলত।

—সে আমি চুপচাপ থাকতাম বলে, আর যা চাইত তাই পাইয়ে দিতাম বলে।

শর্মিষ্ঠা তর্জনী তুলল, মেঘুর ভুলটা শুধরে দিতে বললে—সে কথা বলিস নি। তোর এ কাজ পাবার আগে থাকতেই ওরা তোর কথায় ওঠাবসা করত। বুঝলি না, একটু ভেবে দেখলি না, ওদের এত বাড়াবাড়ির পিছনে কি থাকতে পারে? একটু ধৈর্য ধরে থাকলেই দেখতি সব ফন্দি ফাঁস হত। চুপচাপ থাকতে পারলি না আর একটু সময়?

ঘরে আগুন দেবার কথাটা বিশ্বাস হোক বা না হোক, এতদিন পর এমনভাবে শর্মিষ্ঠা যে অযথা তার কাছে আসেনি সেটা মেঘু বুঝেছে। এবং এমন একটা খবর তার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু শর্মিষ্ঠার যুক্তি শুনে তা রূপান্তরিত হল রাগে। সে বললে—হাঁ, চুপচাপ থাকবে! যেমন কুকুর তেমন মুগুরই ওদের ওষুধ।

শর্মিষ্ঠার হাসি পেল, দুঃখও হল। কিন্তু মেঘুর মনের অবস্থা বুঝে সে বললে—ও তো সাহেবদের মতো কথা, তুই অমন হলি কবে রে?

নিজের মন্তব্যটা প্রমাণ করতে মেঘু নজির দেখিয়ে বললে—নিশ্চয়ই শুনেছিস, সাহেব হেঁকে দাঁড়াতেই সব পালাতে পথ পেল না। যত হম্বিতম্বি আমার কাছে।

—শুনেছি সব। তাতে বুঝেছি, সাহেবের স্থিরবুদ্ধি তাই সে চুপ করে শুনছিল তোদের কথা। তুই-ই তো সব মাটি করে দিলি। ওদের সঙ্গে অত কথা বলবার ওটা কি ঠিক সময়? তোর জন্য, তোকে বাঁচাবার জন্যই তো সাহেবকে ফুঁসে উঠতে হল ওদের ওপর।

মেঘু বেপরোয়াভাবে বললে—তবে শুনেছিস তো, আমি এখন সাহেবদের লোক, তাদের জন্য সব করতে পারি।

শর্মিষ্ঠা চোখ দুটো টেনে বড় করল, বলল—ওঃ, এখনো রাগ আছে! আচ্ছা মানলাম তোর কথা, তা বলে তুই খুনও—

—রেখে দে ওসব বাজে কথা।

—ধমক দিয়ে আমায় চুপ করাবি, কিন্তু ওদের সঙ্গে কি করবি?

—কিছুই করব না।

—তা হলে এখান থেকে সরে যাবি না, হাকিম সাহেবের কাছেও কিছু বলবি না?

সকল মতামতের তর্কবিতর্কের শেষ করে মেঘু বললে—না!

শর্মিষ্ঠা কাঁদকাঁদ হয়ে বললে—যাবি না?

শর্মিষ্ঠার ভাব দেখে মেঘু প্রকৃতিস্থ হল। তার মনের কথাটা খুলে বললে—না, তা হলে বড় সাহেবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

ওঃ এতক্ষণ অভিমানের কথা বলছিল। আসলে বেশ টান আছে কুলিদের ওপর। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। ওসব দিয়ে তো এখন চলবে না। শর্মিষ্ঠা বড় ভাবনায় পড়ল। স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগ করে সে বলল—তা হলে বড়সাহেবই তোর সব? আমার একটা কথাও তুই রাখবি না, আমি তোর কেউ নই?

শর্মিষ্ঠার অমন কথায় মেঘু বেশ একটু বিচলিত হল। কিন্তু ভবীর কথা বদল হয় না। অনেক ভেবেচিন্তে খুব অনুনয় করে সে জবাব দিল—তোর এ-কথাটা আমি রাখতে পারব না। তবে তুই যে বলতে এসেছিস সে কথা মনে থাকবে চিরদিন।

একই বিষয় নিয়ে দু'জনের আবদার আবেদন বিপরীত পথে চলল। শর্মিষ্ঠা চায় মেঘুর নিরাপত্তা, মেঘু আঁকড়ে রইল তার আদর্শ। শর্মিষ্ঠা বুঝল, তাকে কিছুতেই নড়ানো সম্ভব হবে না সে পথ থেকে। ব্যর্থতায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল শর্মিষ্ঠা। মেঘুর যে কথায় সে অতখানি ভেঙে পড়ল, সেটাই সহায় করল তাকে তার নিজ মূর্তি ধারণ করতে। এক ঝামটা মেরে সে জবাব দিলে—তোকে মনে রাখতে হবে না! আমি বকশীশ চাইব না তোর কাছে সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে।

মেঘুর হাসি পেল, প্রাণ ভরে সে হেসে নিল শর্মিষ্ঠার আগের মতো রাগ দেখে। হাসিটা থামিয়ে সে বলল—তবে এখন তুই ঘরে ফিরে যা। এখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবি ওদিকে কুয়াশা কেটে যাবে। কেউ না কেউ দেখে ফেলবে তোকে।

শর্মিষ্ঠার পক্ষে মেঘুর হাসি দিগ্বিজয়ী। সেই হাসি সে দেখল অনেকদিন পর। সে সব ভুলে গেল। তার হাসি, তার কথার সূত্র ধরে সে আর একবার চেষ্টা করল। ব্যাকুলভাবে সে বলল—সে ভয় আমি করি না, তুই যদি আমার কথা রাখিস!

মেঘু যেন কেমন হয়ে গেল শর্মিষ্ঠার মুখের দিকে চেয়ে। আবার অত্যন্ত অনুনয়ের স্বরে সে বললে—তা আমি পারি না, এটা বুঝতে চাইছিস না কেন?

শর্মিষ্ঠা আর কোন কথা বুঝতে চায় না, বলে—শুনবি না আমার কথা?

—বড় কষ্ট হচ্ছে তোর কথায় টলতে দিতে।

—তোর কষ্ট হচ্ছে! আর আমার কেমন লাগছে তোর কথা শুনে?

—বড়ই দুঃখিত।

—তুই এইটুকু বলে শেষ করলি, তবে আমি কি করব বলে দে। বলে, শর্মিষ্ঠা দাঁড়াল মেঘুর সামনে শাশ্বত নারীর মতো।

মেঘু ভেঙে পড়ে পড়ে, এমন অবস্থায় একটা পুরোনো কথা স্মরণ করল নিজেকে সবল করতে। মুখটা ফিরিয়ে মেঘু বললে—আমি তার কি জানি? তোর কথা তুই জানিস।

চুরমার হয়ে পড়ল শর্মিষ্ঠা মূক বেদনার নির্মম আঘাতে। আর একবার সে দাঁড়াল মেঘুর চোখে চোখ মিলিয়ে। স্থির গম্ভীর স্বরে বললে—তুই জানিস না! আমি জানি? আচ্ছা তাই হবে, তখন তুইও জানবি।

(ক্রমশঃ)

সংলাপে–অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

একচল্লিশ

...কেলে বেড়াতে গিয়ে দেখি বহু দূরে ...া শেষ করে স্বামিজী এসে বসলেন ...ীরে শিলার ওপর। দল ছেড়ে ছুটে বসলুম কাছে।

...ৎ হেসে স্বামিজী বললেন—কি? ...ু দেখবে? দেখ।

...লুম—আর এক সুযোগ পেয়েছি। ক্ষুদি... ...াঁসির কথা শুনেছি, তারপর কি ...লো?

...াঁসির পর যা হয় তাই অন্ধকার ...এক গম্ভীর স্বরে বললেন ...ী। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছিল ...মে। ঐদিনই কলকাতায় ...র তৎপরতা গেল বেড়ে ...সন্দেহমাত্রেই খানাতল্লাসী আর ...কড়। বিশেষ করে সমস্ত বিপ্লবী ...ীদের ওপর সারাদিন কড়া নজর পুলিশ।

...দিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর খবর ...বারীন সতর্ক করে দিলেন সব ...দের। কলকাতা ছেড়ে নিজের ...দেশে চলে গেল অনেকে। ক'বাক্স নিয়ে হারিসন রোডের একটি বাড়ীতে ...। রইল উল্লাসকর। হেমদাস মুরারি- বাগান থেকে গেল নিজের বাসায়। ...র সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, বোমা আর বোমা ...মাল-মশলা যন্ত্রপাতি মাটিতে পুঁতে ...ল বেশ ভাল করে। ঠিক হল—যে ...ন বিপ্লবী আছে বাগানে, তাদের ...ফেলা হবে ঐদিন শেষ রাত্রে। চোখে ঘুম নাই, বেশ আশঙ্কা আর ...য় কাটছে।

...ত ১২টার পর পুলিশ সমস্ত ...নেক জায়গা আর বাড়ী ঘেরাও ...খুব ভাল করেই ঘিরে ফেলল ...পুকুর বাগানবাড়ীর সামার কার- ...রাত ১টার সময় বিপ্লবীরা বুঝতেও ...ক্ষে নাই। তবে রাতের অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলো দিলেন উপেন্দ্রনাথ। তিনি ওর মধ্যেই সরিয়ে ফেললেন কজন দুঃসাহসিক বিপ্লবীকে। উপেন্দ্রনাথের মতলব—পুলিশের সংগে যুদ্ধ করে বীরের

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মত মরবেন, তবু ধরা দেবেন না কিছুতেই। বারীন বললেন—অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি যখন লুকিয়ে ফেলা হয়েছে তখন পুলিশ ঢুকলেই বা ক্ষতি কি? যদি ধরে তো স্বীকার করব—তুমি আর আমিই বিপ্লবী, আমরাই করেছি এসব। বাকি কেউ কিছু জানে না। সম্পূর্ণ নির্দোষ সবাই। এরা মঠে আসে শুধু ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে।

বলতে বলতেই আস্তে আস্তে পুলিশের দল ঢুকে পড়ল বাগানবাড়ীতে। আর ধরে ফেলল সকলকে। সবশুদ্ধ ত্রিশজন ছিল সেদিন। ধরা পড়ল সবাই, পালিয়ে যেতে না কাউকেই। তার মধ্যে প্রধান কজন— বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ ... ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক বিজয়- নাথ, কুঞ্জলাল সাহা, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র ঘোষ। পাশের বাগানের এক উড়ে মালীও ছিল সেদিন। সংসঙ্গে স্বর্গবাস—
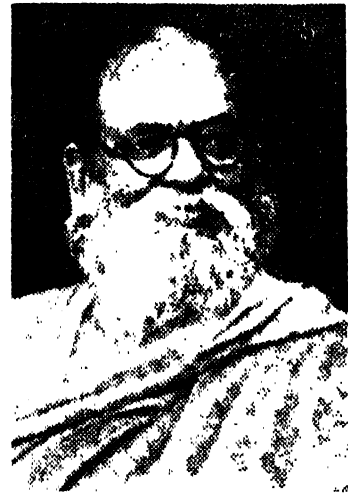
মতিলাল রায়

সে বেচারীও বাদ গেল না, ধরা পড়ল সবারই সংগে।

যে সব জায়গায় মালপত্তর পুঁতে রাখা হয়েছিল তাও খুঁজে বের করে পুলিশ হস্তগত করল গাড়ী গাড়ী বন্দুক পিস্তল রিভলভার, রাইফেল, বোমা, ডিনামাইট, বোমার খোল ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি। আর পেল বিস্ফোরক তৈরীর বই, আর 'গুপ্ত সমিতি গঠন প্রণালী।' বেশ কিছু খাতা নথিপত্রও হাতে পড়ল পুলিশের।

প্রায় একই সময়ে গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে ধরা পড়লেন কানাই দত্ত, নির্মল রায়, ১৩৪নং হ্যারিসন রোড থেকে কবিরাজ ধরনীধর গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আর অশোক নন্দী। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট থেকে ধরা পড়লেন হেমদাস।

হ্যারিসন রোড থেকে চার বাক্স বোমা সমেত ধরা পড়ল উল্লাসকর দত্ত আর যামিনী কবিরাজ।

৪৮নং গ্রে স্ট্রীট থেকে ধরা পড়লেন—অরবিন্দদা, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন বোস আর দীনদয়াল বোস। ঐ দিনেই মেদিনীপুরে ধরা হল সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে।

অরবিন্দদাকে ধরবার সময় এক মজার ব্যাপার। পুলিশের সঙ্গে গেছে এক উঁচুদরের সাহেব অফিসার। তার ধারণা—সাত বছর বয়স থেকে বিলেতে সাহেবী আদব কায়দায় মানুষ, বাংলা কথাই বের হত না যাঁর মুখে, তাঁর ঘর নিশ্চয়ই সাহেবী কায়দায় আসবাবপত্রে সাজানো হবে, পোশাক-আশাকে অরবিন্দ নিশ্চয়ই হবেন তাঁদেরই একজন। অরবিন্দদার ঘরে ঢুকে তো সাহেব হতভম্ব। আসবাবপত্রের মধ্যে মেঝেয় একখানি মাদুর পাতা এক কোণে একটি জলের কুঁজো আর একটি পিতলের কৌটা। মাদুরের ওপর বসে আছেন ধুতি-পরা নেহাত বাঙালী একজন। কৌটোটি দেখে তো সাহেবের হৃৎকম্প—বোমা-টোমাই হবে বুঝি বা! সাহেবের ভয় লক্ষ্য করে অল্প হেসে অরবিন্দদা বললেন—এতে আছে দক্ষিণেশ্বরের পুতরজ—ভগবান রামকৃষ্ণদেবের চরণ স্পর্শে পুতরজ। ধরা হল অরবিন্দদাকে।

৪নং হ্যারিসন রোডে 'যুগান্তর পুস্তকালয়' 'ছাত্র ভান্ডার' আর সমস্ত দেশী প্রতিষ্ঠান তন্ন তন্ন করে খুঁজে পুলিশ অনেক কাগজপত্র তো নিয়ে গেলই আবার দরজায় দরজায় তালা বন্ধ করে দিয়ে গেল সব প্রতিষ্ঠানগুলির।

সকাল হতে না হতেই এই রকম ধর-পাকড়ের কথা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। অরবিন্দদার হাতে হাত-কড়া আর কোমরে দড়ি বেঁধেছে শুনে বড় এটর্নী আর মডারেট নেতারা এলেন ছুটে। ছুটে এলেন মডারেট নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু আর এলেন পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব নিজে। সবাই একযোগে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন অরবিন্দের হাতের হাত-কড়া আর কোমরের দড়ি খুলে দিতে। কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা'—বৃটিশ সরকার কি সোজা চিজ! জানাতো ছিল সবই আগে থেকে, আর একবার প্রকৃত স্বরূপটা বুঝে সবাই প্রশংসা করতে লাগল বিপ্লবীদের কাজের।

পরদিন গ্রে স্ট্রীটের বাড়ী থেকে ধরা হল দেবব্রত বসুকে। সব শুদ্ধ ধরা পড়লেন সাতচল্লিশজন আসামী। শ্রীরামপুরের বাড়ী থেকে ধরে আনা হল নরেন গোঁসাইকে। তার হাতে না আছে হাত-কড়া, কোমরে না আছে দড়ি, দিব্যি রাজার হালে তোয়াজ করে বাড়ীর গাড়ীতে বসিয়ে আনা হল তাকে। সবারই চক্ষু ছানাবড়া, সবাই বুঝল এই ব্যাপক ধর-পাকড়ে নিশ্চয়ই হাত আছে এই নরেন গোঁসাই-এর। 'বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট গাদ্দার সেনানী'—নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক ওটা—ভাবল সবাই।

মুরারিপুকুর বাগানে পাওয়া খাতা পত্র দেখে পরে ধরা পরলেন—শ্রীরামপুরের শ্রীহৃষিকেশ কাঞ্জীলাল, যশোহরের বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মালদহের জীবনকৃষ্ণ সান্যাল, খুলনার সুধীর সরকার, সিলেটের হেম সেন, সুশীল সেন ও বীরেন সেন। তিন ভাই এঁরা। নাগপুরে ধরা হল হরেকৃষ্ণ কানেকে।

আর ধরা পড়লেন—প্রভাসচন্দ্র দেব, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, খোদ এই শর্মা, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিল রায় মৌলিক আর বিজয় ভট্টাচার্য। চন্দননগরের প্রফেসর চারুচন্দ্র রায়ের হাতেও পড়ল হাতকড়া। আর পড়ল এমন একজন লোকের হাতে বিপ্লবাত্মক কাজের বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না যিনি—সম্পূর্ণ নির্দোষ শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ধর-পাকড়ের কথা হল, এইবার সমিতির কথা। মাথা তোলে—সমিতি থাকে কি করে? সমিতিগুলোর ওপর কটাক্ষ হানলে স্যর হার্ভে অ্যাডামসন। তার ওপরে বাংলা সাহিত্যে নামকরা এক প্রাচীন সাহিত্যিক সরকারকে উসকে দিল সমিতিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করতে। একে মা মনসা তাতে আবার ধুনোর ধোঁয়া—আর দেরী হয়? সারা বাংলার অনুশীলন সমিতি, কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতি, বরিশালের বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংহের সাধনা সমিতি, সুহৃৎ সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি—সবই বে-আইনী বলে ঘোষিত হল। এদের কেন্দ্রগুলিকে বলা হল বে-আইনী আড্ডা। পাঁচজনের বেশী এক সঙ্গে মিলতে পারবে না, মিললে কঠোর শাস্তি—এ ভয়ও দেখানো হল।

সমিতির মুখপত্র—'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি', 'বন্দেমাতরম্' উঠে গেল। শুধু গুপ্ত ছাপাখানায় ছাপা হয়ে 'যুগান্তর' বিলি হতে লাগল লোকের হাতে হাতে। আর সমিতিও কি বন্ধ হল একেবারে? কংস কারাগারেজাত শিশুটি কংসের অলক্ষ্যে দিনে দিনে বাড়তে লাগল গোকুলে। অ-ধরা সভ্যরা অতি সংগোপনে কাজ চালিয়ে সমিতিকে বজায় রাখল বিনা নামেই। এই তো গেল পেছনের সূর্যাস্তের পর অন্ধকারের পালা। সামনেও দেখ ভাই। লালিমার লেশমাত্র নাই পশ্চিম দিগন্তে। কালো ঘোমটায় মুখ ঢেকে সন্ধ্যা আসর জাঁকিয়ে বসেছে ধরার বুকে। ওঠা যাক চল।

একটা মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরলাম স্বামিজীর পেছনে পেছনে।

বিয়াল্লিশ

ঠান্ডা জোরদার হয়ে আসছে দিন দিন। বিকেলের বেড়ানো শেষ করে সোজা ফিরেছি বাসায়। স্বামিজীও ফিরেছেন নদীর ধারে না গিয়ে। কলকেয় আগুন ধরিয়ে গড়গড়া নিয়ে এল রেণুদা। স্বামিজীর ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসলুম সামনে। তামাক খাওয়া হয়ে গেলে নির্বাক হাসি মুখে স্বামিজী চেয়ে রইলেন মুখপানে।

হেসে বললুম—সরকারী শ্বশুরবাড়ী তো 'জামাইয়ে জামাইয়ে ভর্তি', আদর আপ্যায়নটা হল কি রকম?

হো হো করে হেসে স্বামিজী বললেন—তাই বটে, তাই বটে, সরকারী শ্বশুর বাড়ীই বটে। আর শুধু কি ওই কটিই? মেদিনীপুর থেকে পাইকারী হারে ধরা হল গরীব-গুর্বো, ধনী দরিদ্র, দোষী নির্দোষ নির্বিচারে যাকে পেল তাকেই। প্রায় শ'খানেক। আদর আপ্যায়নের সে কী ঘটাপটা ধুম-ধাড়াক্কা। প্রথমে জবানবন্দী তারপরে বিচারের প্রহসন।

বারীন বললেন—বন্ধু অবিনাশ আর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে বিপ্লব প্রচারের জন্যে আমি বের করেছি 'যুগান্তর' পত্রিকা। আমিই উল্লাসকর আর উপেন্দ্রকে নিয়ে আরম্ভ করেছি বিপ্লবের কাজ। ইংরেজ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিল—নরেন গোঁসাই। সেও কাজ করত আমাদের সঙ্গে। আর সবাই নির্দোষ।

উপেন্দ্রনাথ জবানবন্দীতে বললেন—ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে উচ্ছেদ করবার জন্যে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করতাম আমি।

উল্লাস কর জবানবন্দীতে বললেন—ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনই আমার জীবনের ব্রত। এটা মহৎ কাজ বলে মনে করি। এই মহৎ উদ্দেশ্যেই প্রাণপণ করে বোমা আবিষ্কার করেছি—আমি। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল কিংস ফোর্ডের গাড়ীতে ছুঁড়ে ছিল আমারই তৈরী বোমা। নারায়ণগঞ্জে গিয়ে ছোটলাটের ট্রেন উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমিই।

আলিপুর বোমার মামলা পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে দেওয়া হল পুলিশ কোর্টে। আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জসীট তৈরী করা হল এখানেই। বারীন ঘোষ জন্মেছেন লন্ডনে, তাই তাঁর কেস হাইকোর্টে পাঠানো স্থির হল। ইংলন্ডে জন্মালে অস্ত্র আইনের আওতায় পড়ে না। বারীন ভাবলেন—হয়তো তাঁকে ছেড়ে দিলে আর সকলকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। হাইকোর্টের সুবিধা নিতে রাজী হলেন না বারীন। হ্যারিসন রোড বোমার মামলায় প্রধান আসামী উল্লাস করের মামলা হাইকোর্ট আর আলিপুর কোর্ট দুই জায়গাতেই উঠল। বাকী সকলের মামলা আলিপুর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আরম্ভ হল।

বাংলায় তো এই—মহারাষ্ট্রে তখন হচ্ছে কি? ক্ষুদিরামের সরকারী কর্মচারী হত্যার অর্থ বুঝিয়ে তিলক নিজের 'কেশরী' পত্রিকায় লিখলেন এক প্রবন্ধ। দেশের লোক যাহোক বুঝল তার মানে কিন্তু বৃটিশ প্রভুরা গন্ধ পেলেন—রাজদ্রোহিতার প্রেরণা দান। এই হীন অপরাধে অপরাধী করে তিলকের হল ছয় বছরের নির্বাসন।

একই সময়ে পাঞ্জাবে আরম্ভ হয়েছে চাষী আন্দোলন। তার নেতাও কি মহানুভব সরকারের কৃপাদৃষ্টি থেকে

বঞ্চিত হলেন? আন্দোলনের পরিচালক লালা লাজপৎ রায়কে নির্বাসিত করা হল। সঙ্গে সঙ্গে ভাই পরমানন্দ, রামভুজ দত্তচৌধুরী, অজিত সিংও হলেন নির্বাসিত।

মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব দেখা হল, ফেরো বাংলায়। এতদিন গরম দলের নেতৃত্ব করছিলেন অরবিন্দদা আর বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিন পাল গেছেন বিলাত, অরবিন্দ আসামী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও আমেরিকায়। দল চালায় কে? ভার পড়ল শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ওপর। তাঁর কত কাজ—দলের নেতৃত্ব, মামলার তদ্বির, উকিল ব্যারিস্টারের কাছে ছুটোছুটি, মামলা খরচের টাকা যোগাড় আবার 'বন্দেমাতরম' সম্পাদনা। 'বন্দেমাতরম' আছে তখনও। যাইহোক কৃষ্ণকুমার মিত্র মশায় ভার নিলেন মামলা খরচের টাকা যোগাড় করবার। তদ্বিরের কাজেও যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগলেন শ্যামসুন্দরকে।

মামলা খরচের কথাটা শোন। সে সময়ে বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। দৈনিক দক্ষিণা মাত্র হাজার টাকা। তাঁকেই দাঁড় করানো হল অরবিন্দদার পক্ষে। একুশ দিন ২১ হাজার টাকা নিয়ে মামলা চালালেন তিনি। এই কদিনেই বুঝলেন—আসামীর টাকা নাই, মামলা চলছে দানের ওপর, হয়তো দক্ষিণায় ভাটা পড়বে ভবিষ্যতে। মামলাটি ছেড়ে দিলেন ভদ্রলোক। কি করা যায়? অরবিন্দদা আর শ্যামসুন্দরের অনুরোধে কৃষ্ণকুমার মিত্র চিত্তরঞ্জন দাসকে নিযুক্ত করলেন অরবিন্দদার পক্ষ সমর্থনের জন্যে। কৃষ্ণকুমার মিত্রের ছেলে সুকুমার মিত্র, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, সন্তোষকুমার বসু আর শচীন্দ্রনাথ বসুও খুব ভালভাবে তদ্বির করতে লাগলেন এই মামলার। এঁরা সবাই তরুণ যুবক আর সুবক্তা।

অবিনাশচন্দ্রের পক্ষ সমর্থনে এলেন ঢাকার প্রধান উকিল আনন্দমোহন রায়। এমান করে ব্যারিস্টার পি মিত্র, রজত রায়, বি সি চ্যাটার্জী, নরেন্দ্রকুমার বসু, বিজয়কৃষ্ণ বসু, চিত্তরঞ্জনের ভগ্নীপতি সুরেন্দ্রনাথ সেন সবে মিলে পঞ্চাশজন উকিল ব্যারিস্টার সমর্থন করলেন আসামী পক্ষ। এঁরা সবাই মামলা চালাতে লাগলেন একটিও পয়সা না নিয়ে।

এই সময়ে আবার একটা ডাকাতি হল ঢাকা জেলায় বহড়ায়। বৃটিশ প্রভুদের মাথায় টনক, বুকে চমক, দিশেহারা। মাথায় ঘায়ে কুকুর পাগল আর কি! কি করে কি না করে বুঝে উঠতে পারে না। ওদের করবার আছেই বা কি—একমাত্র দন্ডদান ছাড়া? করলেও তাই। একই দিনে বোমার মামলায় সাহায্যকারী অনেককে দিলে নির্বাসন দন্ড। নির্বাসিত হলেন 'বন্দেমাতরম' সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'নবশক্তি' সম্পাদক মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, প্রধান অর্থ সাহায্যকারী রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, সুবক্তা শচীন্দ্রনাথ বসু, বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঢাকার অনুশীলন সমিতির অধ্যক্ষ পুলিনবিহারী দাস আর বরিশাল কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এতেও কি তৃপ্তি হল? গরমদলকে গোপনে সাহায্য করার অজুহাতে নজরবন্দী করে রাখল নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রনাথ খাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী আর চারুচন্দ্র দত্তকে। শুধু কি নজরবন্দী—অবিনাশ চক্রবর্তীর চাকরিও খতম। অপরাধ তিনি শ্যামসুন্দরের গাঁয়ের লোক আর সহপাঠী। আরও একটা সরকারী অভিযোগ—একটা ডাকাতিতে নাকি বারীন্দ্র ঘোষ ও আরও কজনকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন অবিনাশ চক্রবর্তী।

এমনি হঠাৎ ধর-পাকড়, মানী লোকের অপমান, নির্বাসন, নির্যাতন, লাঞ্ছনা—সারা বাংলা বিপর্যস্ত মুহ্যমান। তা হলেও বাংলার যুবশক্তি দমে নাই একটুও। বাংলার যুবকরা তখনও ক্ষাত্রতেজে দীপ্ত—অটুট মনোবলের অধিকারী। তারা নিজেরাই গরম দলের নেতৃত্ব তুলে নিল নিজেদের কাঁধে। কৃষ্ণকুমার মিত্রের ছেলে সুকুমার মিত্র একাই তদ্বির করতে লাগলেন আলিপুরে মামলার।

তখন চন্দননগরের মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র রায়, যতীন মুখার্জী, যাদুগোপাল মুখার্জী, রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ, অমর বোস, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেন শেঠ—এইসব যুবকরা যোগাযোগ করতে লাগলেন বিপ্লবীদের সঙ্গে। মামলার কাজে বিশেষ সাহায্য করতে থাকলেন সন্তোষকুমার বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার আরও অনেক যুবক।

কিন্তু মামলায় খরচ? টাকা সংগ্রহ করবে কে? কৃষ্ণকুমার মিত্র তো নির্বাসনে। এগিয়ে এলেন হাটখোলার দত্তবাড়ীর কুমারকৃষ্ণ দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অম্বিকাচরণ উকিল, মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, টাকীর জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। অরবিন্দদার মামলায় যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করলেন তাঁরা। তাঁদের মুক্ত হস্তের দানে মামলা খরচের আর কোন অভাব রইল না।

ঠান্ডা শিশির ভেজা রাত। সকাল সকাল কথা বন্ধ করলেন স্বামিজী।

তেতাল্লিশ

এ কদিন সন্ধ্যেবেলাগুলি একেবারে নিজস্ব। কেবল রেণুদা থাকে স্বামিজীর ঘরে আর কেউ না। মাঝে মাঝে মায়েরা খোঁজ নিয়ে যান, তাতে ব্যাঘাত হয় না কিছু। কাছে বসে জিজ্ঞেস করলুম—স্বদেশী ডাকাতি কতগুলি হয়েছিল, স্বামিজী? কোথায় কোথায় আর কখন? বিপ্লবীদের বেলায় তো এলোপাথারী ধর-পাকড়। ডাকাত ধরে নাই সরকার?

—ও বাবাঃ প্রশ্নে প্রশ্নে ঠেলা গাড়ী বোঝাই করে ফেললে যে—হাসতে হাসতে বললেন স্বামিজী। স্বদেশী ডাকাতি? তা হয়েছিল বেশ কংকগুলো, ধরবে কে? ডাকাতির কলা, কৌশল, পরিকল্পনা, পরিচালনা—সবই ছিল অভিনব। নাগাল পায় নি সরকার। পাবে কি—ডাকাতি তো বিপ্লবীদেরই।

প্রথম স্বদেশী ডাকাতি হয় ১৯০৬ সালে ঢাকায় শেখরনগরে। করেছিল অনুশীলন সমিতি। সার্থক ডাকাতি, ধরা পড়ে নাই কেউ।

১৯০৭ সালে হাটগোছিয়ায় মেলব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল ক্ষুদিরাম। এই বছরেই চাংড়িপোতায় অনুশীলন সমিতির সার্থক ডাকাতি। ক্ষমতা হয় নাই ধরবার।

১৯০৮ সালে শিবপুর ডাকাতি। কর্তা অনুশীলন সমিতি। এই বছরেই জুন মাসে হয় ঢাকার বহড়া ডাকাতি। এও অনুশীলনের সার্থক কাজ। অনুশীলনের আর এক কীর্তি এই বছরেই—ফরিদপুর নড়িয়া গ্রামে ডাকাতি। এই সালেই আগস্ট মাসে বিপ্লবীরা করে ময়মনসিংহ বাজিতপুরে ডাকাতি। আর সেপ্টেম্বরে হয় হুগলী জেলার বিঘাটি গ্রামে। এখানে ধরা পড়ে সাজা পায় কার্তিক দত্ত।

এই দু জায়গায় বেশ একটি ফন্দী বের করেছিল বিপ্লবীরা। গেছে সবাই পুলিশের পোশাকে। ধরবে কে? জন সাধারণ, না পুলিশ। সাধারণ লোক তো পুলিশের নামে ভয়ে কাঁটা, কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে পুলিশের কাজে বাধা দেবে? আর পুলিশ? তাদেরই তো প্রিয় সহকর্মী—আপনজন। তারা বাধা দেবে কি বরং সাহায্য করতে পারলে বাঁচে—কিছু তো ভাগ পাবে। কাজেই পুলিশও ছিল চুপচাপ, দেখেও দেখে নাই।

ছেলেগুলো মতলবটা এঁটেছিল ভাল।

তারপর বোমার মামলা চলতে চলতে ১৯০৯ সালে অক্টোবরের শেষে ডাকাতি হয় নদীয়া জেলার হলুদে বাড়ীতে। এতে ধরা পড়ে কজন। একজনের জেল হয় আট বছর, আর পাঁচজনের সাত বছর করে। ধরা পড়েছিল শৈলেন চাটুজ্জে। তারপর মরণ হরেন বোসের। স্বীকারোক্তি করতে মানা করে শৈলেনকে এক গোপন পত্র লিখল হরেন। আর সেই পত্র পাঠাল জেল পুলিশের হাতে। সে চিঠি ধরা পড়ে জেল হল হরেনের।

এইগুলোই বড় সড় ডাকাতি। তবে ছুটকো ছাটকা আরও কিছু হয়েছিল বৈ-কি, অত মনে নাই, তবে লেখা ছিল সব। তাও সাংকেতিক ভাষায়—নিজে ছাড়া পড়তে পারবে না কেউ। যা বলেছি সবই ছিল ঐ রকমে। ঠিক ঠিক খবর পাওয়া যেত প্রত্যক্ষদর্শী সত্যদ্রষ্টা চর মুখে। লেখালেখির রেওয়াজ ছিল না। 'শতং বদ মা লিখ' রীতি। কখন কার হাতে পড়ে তার ঠিক কি? যেমন হরেন বোসের চিঠি পড়েছিল ডি, আই, জি অফিসার সামসুল আলমের হাতে। চুপ করে স্বামিজী মন দিলেন গড়গড়ায়।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলুম স্বামিজীর ঘর থেকে।

(ক্রমশঃ)

মাতৃভাষার প্রসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য •

মাতৃভাষা যে মানুষের পক্ষে ভাব-প্রকাশের এবং ভাব উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ বাহন এ সত্য সূর্যালোকের মত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বাদপ্রতিবাদ উত্থিত হবারও কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে ইংরাজের রাজ্য গেলেও তাঁদের ছত্রধররা ছায়ার উপরেই ইংরেজির ছাতা ধরে ঐতিহ্য রক্ষা করছেন।

আমাদের এ কথাটা ভুললে চলবে না যে ইংরেজি শিক্ষাকে এদেশে আমরাই সাগ্রহে এবং সাদরে আমন্ত্রণ করেছিলাম। বেণ্টিঙ্ক যখন ১৮৩৫ সালে ঘোষণা করলেন যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসারই ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত তখন বাংলাদেশ তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেছিল। বিরুদ্ধতা যে একেবারেই হয়নি তা নয়, সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের বিরুদ্ধেও এদেশে প্রতিবাদ উঠেছিল। কিন্তু সে যাই হোক শেষ পর্যন্ত শুভ-বুদ্ধিরই জয় হয়েছিল। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

ইংরেজি শিক্ষা কথাটার অর্থ কি? অর্থ এই নয় যে ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে যা শেখানো হয় তাই ইংরেজি শিক্ষা। ইংরেজি শিক্ষা কথাটা আমরা ব্যাপক অর্থে চিরকাল ব্যবহার করে এসেছি। ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক যেটুকু বিদ্যা আমাদের আয়ত্ত হয়েছে ইংরেজের সংস্পর্শে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যেটুকু সম্পদ আমরা প্রায় দেড়শ বছর ধরে আহরণ করেছি তা ইংরেজির মারফতে অর্থাৎ ইংরেজ আমাদের দেশে যে শিক্ষাবিধি প্রবর্তন করেছিল তারই মধ্য দিয়ে। ভারত-হিতৈষী অনেক ইংরেজকে আমরা বন্ধু-রূপে পেয়েছিলাম। তাঁদের সান্নিধ্য তাঁদের সহযোগিতা আমাদের এই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের সহায়ক হয়েছিল।

ইংরেজি শিক্ষা মানে কেবল ইংরেজি ভাষা শিক্ষা নয়, একটা দেশের অধিকাংশ লোক ইংরেজি ভাষা না জেনেও ইংরেজি শিক্ষা অর্থাৎ ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করতে পারে এ কথা আজকের দিনে কল্পনা করা কঠিন নয়, জাপান তার মহৎ দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ আজও বিংশ শতাব্দীর এই অষ্টম দশকেও—ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের অনুপাত সংখ্যা কত? মাতৃভাষার অ আ ক খ যারা লিখতে পড়তে পারে—যাদের 'সাক্ষর' বলে সংজ্ঞা দিয়েছি—তাদের সংখ্যাই এখনও চল্লিশ শতাংশে পৌঁছতে পারল না। এর মধ্যে তো অনুমান বা কল্পনার কোনো অবকাশ নেই, এটা তো নির্মম সত্য। যে কোনো সভ্য দেশের পক্ষে যে কোনো সভ্য জাতির পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? আমরা রেডিও-টিভির প্রতিষ্ঠার মত আকাশ কুসুম সৃষ্টি করি, অথচ অজ্ঞানের অন্ধকারে আজন্ম যাদের দিন কেটে যায়, হলদ এবং লাঙ্গল এবং হাতুড়ি দিয়ে যাদের ইকোনমিক বিধান করি—তাদের নবর করে, বিজলী বাতি নয়, একটি করে মাটির প্রদীপও যে দেওয়া গেল না। অদূর ভবিষ্যতে যাবে এমন ভরসাই কি আছে?

এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করলে উদ্বেগ ও উত্তেজনায় উদ্রিক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এবং তার ফলে এক দল মানুষ নিতান্তই চরমপন্থী হয়ে পড়ে। সারা ভারতবর্ষে এই রকম একটা দলের উদ্ভব হয়েছে দেখতে পাচ্ছি যাঁদের স্লোগান হচ্ছে 'অংরেজী হটাও'। আমি প্রথমেই বলে রাখি 'অংরেজী হটাও' দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমি মনে করি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার যত ব্যাপক হবে এবং যত দ্রুত হবে ততই ভারতের কল্যাণ। দেশের সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন বহুলোকের সঙ্গে এই বিষয়েও আমি একমত যে, পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক যোগ অব্যাহত রাখবার জন্য পশ্চিমের এক বা একাধিক ভাষা শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আর তার মধ্যে ইংরেজির স্থান যে সর্বাগ্রে অন্ততঃ আমাদের পক্ষে বৈদেশিক সকল ভাষার মধ্যে ইংরেজি যে সর্বাগ্রে শিক্ষণীয়, তাও আমি মানি। এই ভাষার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ-দিনের পরিচয়বশতঃ অন্যান্য পাশ্চাত্য
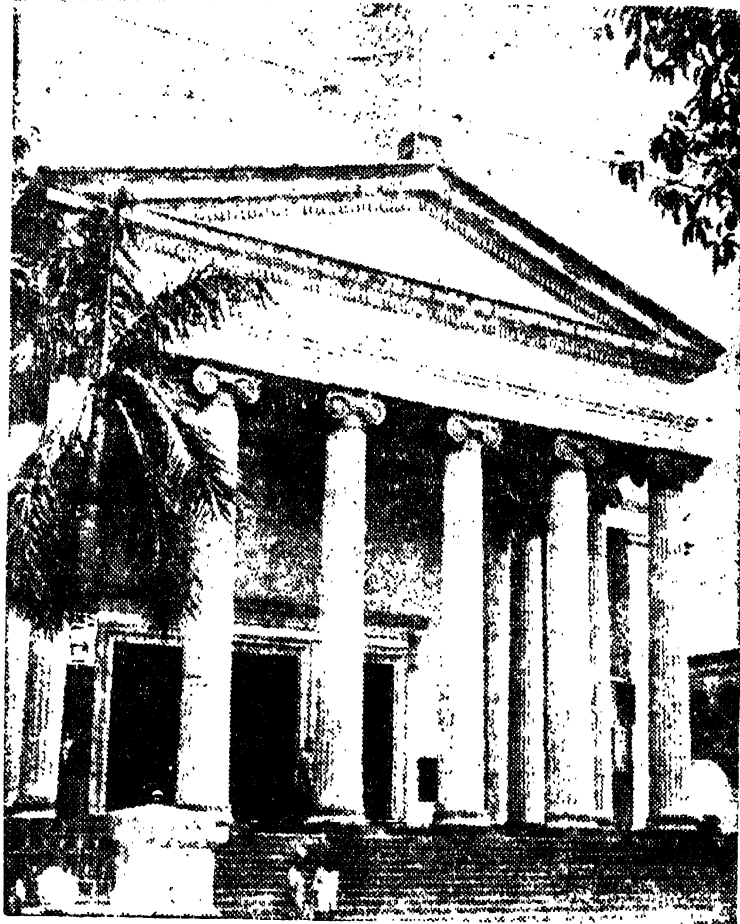
সেনেট হাউস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষার তুলনায় ইংরেজি শেখা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক।

ইংরেজি শেখার জন্যেই ইংরেজি শেখা দরকার। সুশিক্ষিত ভারতবাসী ইংরেজি শিখবেন এ আশা অবশ্যই করব। শিক্ষিত ভারতবাসী গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে প্রণয়ন করব যার বিভিন্ন স্তরে ইংরেজি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, দেখব ইংরেজি ভাষা বিষয়ে অধ্যাপন এবং পরীক্ষণের মান ক্রমশঃ উন্নীত হয়। সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে প্রতিদিন ইংরেজির মানের অবনয়ন ঘটাব এবং সভাস্থলে ইংরেজির জন্যে অশ্রুবর্ষণ করব—এতে ব্যক্তির লাভ হতে পারে কিন্তু দেশের ক্ষতি রোধ করা যাবে না।

আমাদের কর্ম ও চিন্তার মধ্যে সব সময় সঙ্গতি দেখা যায় না। গত কয়েক বছরের মধ্যেই প্রবেশিকা থেকে বি-এ পর্যন্ত পাঠক্রমের সকল সোপানেই ইংরেজি শিক্ষার মানকে অবনমিত করেছি, একটি পাপচক্রের মধ্যে পড়ে ইংরেজি শিক্ষা বিপর্যস্ত হতে হতে বিলুপ্তির প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। ইংরেজি ভাষার শিক্ষক কোথায়? কথাটা শুনতে মধুর লাগবে না কিন্তু কথাটা যে সত্য তা অভিভাবক মাত্রেই স্বীকার করবেন। ইংরেজি শিক্ষার শুরু যেখানে হয় সেই স্কুলে সুযোগ্য ইংরেজি শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আর এঁদের কাছে যাঁরা ইংরেজি শিখে কোনো রকমে বি-এ পাশ করছেন তাঁরা আবার পরবর্তী প্রজাতিকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন। তার যে ফল অবশ্যম্ভাবী তা ঘটছে। পাশ নম্বরের হার কমিয়ে এবং গ্রেস নম্বরের হার বাড়িয়ে সে বিপত্তির হাত থেকে কদিন রক্ষা পাব? চোখের সামনে যে বিপদ ঘটছে আমরা তা দেখেও দেখিনি, আজও দেখছি নে।

যাঁরা বলেন শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন মাতৃভাষা হলেই ইংরেজির জ্ঞান কমবে তাঁদের বক্তব্য শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন যখন পুরোপুরি ইংরেজিই ছিল—তখনও তো কমেছে, তখন থেকেই তো কমেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ইংরেজির মাধ্যম এখনও ওঠেনি সেখানে বাঙালি ছাত্ররা আপন যোগ্যতা দেখাতে পারছে না কেন? এ বিষয়ে যাঁদের বলবার অধিকার আছে তাঁরা বলেন, ইংরেজি লেখা এবং ইংরেজি বলার অক্ষমতাই অসাফল্যের প্রধান কারণ।

ইংরেজি শিক্ষাদান ব্যবস্থার মধ্যেই প্রধান গলদ। দেশে স্কুল বাড়ছে যে হারে উপযুক্ত শিক্ষক সেভাবে তৈরি হচ্ছে না। সকল বিষয় সম্বন্ধেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য, ইংরেজি সম্বন্ধে বিশেষভাবে। ইংরেজির গোড়া পত্তন হচ্ছে না, ভিত্তি আলগা থেকে যাচ্ছে। কলেজে গিয়ে সে আলগা ভিত্তি শক্ত হবে কেমন করে? কলেজের অধ্যাপকদের যোগ্যতা বিচার করব না। শুধু এই বলব তাঁরা যোগ্য হলেও তাঁদের পক্ষে ছাত্রদের ইংরেজি ভাষা বিষয়ে জ্ঞানদানের সুযোগ অল্প। তাঁরা মিল্টন শেকসপীয়রের কাব্য নাটক পড়াবেন, কিন্তু ব্যাকরণ ও রচনা শেখানোর সময় পাবেন কোথায়?

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ছেলেরা প্রবেশিকা থেকে এম-এ পর্যন্ত পড়ছে। ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে গলতে গলতে দু-চারজন শেষ পর্যন্ত থাকছে। তাদের মধ্যে যারা যোগ্যতম শিক্ষাবিভাগ সাধারণতঃ তাদের আকর্ষণ করতে পারে না। ফলে শক্তিমানের সেবা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা বঞ্চিত হচ্ছে। তার ফল পড়ছে সমগ্র জাতির উপরে। এই পাপ-চক্রের আবর্তন কোনো এক জায়গায় কোনো এক সময় বন্ধ করতে হবে। তা যতক্ষণ না পারছি ততক্ষণ একজনের অপরাধে অন্য-জনকে আক্রমণ করে আত্মপ্রসাদের বেশী আর কিছু লাভ হবে না।

পূর্বেও একাধিকবার বলেছি—এখনও বলছি ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে আমি অবহিত। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত ইংরেজিজ্ঞান আশানুরূপ হয় না। আমার তো মনে হয় রুশ জর্মন ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স খোলা হয়েছে ইংরেজীর জন্যে সেরকম একটি বিশেষ কোর্স খোলা আবশ্যক। সাহিত্যতত্ত্ব বা রসতত্ত্ব নয় ভাষা শিক্ষাদানই হবে সে পাঠক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু ইংরেজি ভাষা শেখা এক জিনিস আর ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করা আর এক জিনিস। পূর্বে ইংরেজি শেখা আবশ্যক কিন্তু ভাষা হিসেবেই তা শিখতে হবে। বিষয়-শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে প্রায় আশি বৎসর পূর্বে লিখছেন,—

"স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।...দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই, এ-কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। রাজা কত আসিতেছে, কত যাই-তেছে; পাঠান গেল মোগল গেল, ইংরেজ আসিল আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে; কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে। যাহা কিছু বাংলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায় তবে পরশু ওই বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্‌বুদের মত প্রতীয়মান হইবে। ভালোরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলোকে বুদ্‌বুদ বলিয়া বোঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোক-প্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্পস্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনো মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এরূপ ধবলাকার, একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বু-ধারা।

শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।...জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানকারই হউক ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতাভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিপক্ব রক্তের মতো সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সংকীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপ-স্থিত না করে।" —সাধনা, চৈত্র ১২৯৯।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করলেই যে ইংরেজি শেখার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এরকম একটা ধারণা আজও আমাদের মধ্যে অনেকের আছে। সেকালে তো ছিলই। রবীন্দ্রনাথ প্রতিপক্ষের আপত্তি নিজেই উত্থাপন করে তা খণ্ডন করেছেন।

শিশুকাল থেকে সমস্ত শিক্ষা ইংরেজি ভাষায় নির্বাহ না হলে বাঙালীর ছেলে ভালো করে ইংরেজি শিখতে পারবে না এ ধারণা তাঁর মতে একেবারেই ভিত্তিহীন। যে ভাষা সবচেয়ে পরিচিত সেই মাতৃভাষার সহায়ে শিক্ষাপ্রণালীটি যত সহজে আয়ত্ত হতে পারে অন্য কোনো ভাষার দ্বারা তা হওয়া কখনো সম্ভব নয়। পরিচিতের সাহায্যে অপরিচিতকে চিনি—এটাই হল মনুষ্য প্রকৃতির বিধান। শুধু ইতিহাস ভূগোল গণিত রসায়ন নয় একটি অপরিচিত ভাষা শিক্ষা করতে গেলেও মাতৃভাষাই হবে তার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় এই মত প্রকাশ করেন যে ইংরেজি কখনো বাংলার স্থান অধিকার করতে পারবে না। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, ছেলেমেয়েরা ইংরেজি শিখবে বাংলার পরিবর্তে নয় বাংলার অনুবর্তরূপে।

"বাল্যকাল হইতেই ইংরাজিভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিক-রূপে, অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার অধিক সময় পাওয়া যায়; বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া শিখিবার যথার্থ অবসর থাকে।"

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা ও পরিমাণ যত বাড়ে ইংরেজি শিক্ষা সেই অনুপাতে কমতে থাকে।

(ক্রমশঃ)

অংগনা

ফুলের শোভায় কলকাতা

সকলের মুখে একই কথা, কলকাতা মিছিল নগরী। কেউ কেউ আবার বলেন, এ শহর দুঃস্বপ্নের। শুধু দুঃস্বপ্ন হলে তবু কথা ছিল অনেকে আবার এই শহরের নামে আতংকিত হন। বছর দেড়েক আগে এরকম একটি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাকে। কোন এক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসর বসার কথা ছিল এই শহরেরই এক অভিজাত পল্লীতে: প্রথমে সাংবাদিক সম্মেলন এবং পরে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা। এরকমই রীতি এসব অনুষ্ঠানের। যথারীতি সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলাম। একথা সেকথার পর উদ্যোক্তারা হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসর আজ্র রাত্তিরেই বসবে এবং এখানেই। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। অনুষ্ঠান সূচীর এরকম পরি-বর্তনে আমরা সবাই বিস্মিত। আমাদের এই বিপর্যয়ের ভাব লক্ষ্য করে উদ্যোক্তাদের একজন জানালেন যে কলকাতার পরিস্থিতি সম্বন্ধে সবাই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তাই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসর উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে আমরা ভরসা পাচ্ছি না। প্রোগ্রামের এই অনিচ্ছাকৃত অদল-বদলের জন্য আমরা দুঃখিত। সেখানে কলকাতার অনেক বাঘা বাঘা সাংবাদিক এবং শহরের বহু রথী-মহারথীরাও ছিলেন কিন্তু এহেন উক্তির প্রতিবাদ তো দূরের কথা তাঁরা সবাই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নীরবে হজম করলেন। নীরবতাই যেন পরোক্ষে তাদের সমর্থন জানালো। অথচ এই শহরের সম্মান রক্ষার দায়িত্বও যে আমাদের সেকথা কারো যেন মনেই থাকে না। এভাবে কলকাতায় অপযশ বাড়াতে আমরা নিজেরাই নিজেদের অজ্ঞাতসারে সাহায্য করেছি।

দেশ-বিদেশের বহু শহর-নগর ঘুরে আমার এক বন্ধু তো কলকাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখঃ অনেক শহর ঘুরেও কলকাতার মতো এমন লিভিং সিটি আর একটিও পেলাম না।

ইদানিং এই লিভিং সিটির নিন্দা আরো বেড়েছে। আমাদের দেশেরই নানা অংশে এই শহর নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। মনে হয়, দুঃস্বপ্নের শহর কলকাতা সম্বন্ধে কম-বেশি সবাই আতংকগ্রস্ত। এর অন্তর্নিহিত কারণ বোধহয়, নিজের মহিমা প্রচার। নিজের ঢাক পেটাতে গিয়ে তাঁরা কলকাতার কুৎসা-কীর্তন করেন। বিভিন্ন মহলের এই প্রচেষ্টায় সবাই অনাগ্রহী। দেশী-বিদেশী ভ্রমণকারীদের তেমনভাবে এই শহরের কথা বলা হয় না। ফলে ভ্রমণ-কারীর সংখ্যা বেশ কমে যাচ্ছে। সবাই মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে, কলকাতা খরচের খাতায় জমা হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তো তা নয়। এই শহরের একটি ঐতিহ্যদীপ্ত অতীত আছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে জীবন্ত বর্তমান। এখনো কলকাতা ফুটবল মরশুমে একই রকম আনন্দে মেতে ওঠে। মিউজিক কন-ফারেন্স এবং নৃত্যনাট্য যাত্রা থিয়েটার ছায়াচিত্রের ঢেউয়ে কলকাতা কল্লোলিনী:

তবু নিন্দুকরা বলবেন যে, এই শহর নাকি তার যৌবন হারিয়ে হতশ্রী হয়ে বসে আছে। এর আর কোন আকর্ষণই নেই। এই অপপ্রচারের মুখে তবু যেসব বিদেশী আসেন তাঁরা শহরের নোংরা পরিবেশ আর জঞ্জালের স্তূপ খুঁজে ফেরেন। তাই প্রায়ই কোন বিদেশী ভ্রমণকারীকে দেখা যায় সে. ক্যামেরা বাগিয়ে কোন জঞ্জাল স্তূপ অথবা রাস্তায় বসে থাকা দুঃস্থ অসহায়ের ফটো তুলতে। বিদেশে এরই প্রচার হয় সরবে। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা সম্বন্ধে সবাই মুখ ঘুরিয়ে নেন। বিদেশীদের এই মনোভাবে আমরা অচেতনভাবে মদত যুগিয়ে চলি।

কলকাতার এই দুর্নাম ঘোচাতে একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস এতদিনে নজরে পড়লো। ঐতিহ্যদীপ্ত এই শহরের আকর্ষণ যে আজো সমান একথা সপ্রমাণ করেছে শ্রীমতী উমা বসু ও তাঁর অনুগামীদের অভিনব পুষ্পসজ্জা। 'দি ক্যালকাটা থ্রু ফ্লাওয়ার্স'-এর মাধ্যমে। ফুলের শোভায় কলকাতার কথা বলেছেন তাঁরা। একের পর এক এই শহরের সব ছবি তুলে ধরেছেন দর্শকদের সামনে। দোষ এবং গুণ কোনটাই তিনি বাদ দেননি। সবকিছু সমানভাবে বলেছেন। কলকাতার বৈষম্যকে প্রাণবন্ত করেছেন সহাবস্থানের এক আশ্চর্য নিপুণতায়। বস্তি আর স্কাইস্ক্রেপারের সহ অবস্থিতি যে কাউকে অবাক করবে। কিন্তু যে যতই অবাক হোক না কেন এই শহরের পক্ষে এটি পরম সত্য। এর মধ্যে কোন বাদ-বিসম্বাদ নেই। একে অপরের অস্তিত্বকে যেমন অসহ্য মনে করে না তেমনি ঈর্ষাও করে না। এই সহাবস্থান যেন আজকের জগতের পরম সত্যটিকেই ঘোষণা করেছে। হাজারো ভিন্নতা সত্ত্বেও সংঘাত নয়, পাশা-পাশি থেকে শান্তি অক্ষুন্ন রাখ।

অতিথি শহরে এসেছেন। বৈষম্য এবং সহাবস্থান-এর নিদর্শন দেখার পর কলকাতা সম্বন্ধে এতদিন ধরে কানে শোনা ত্রুটিগুলি তাঁর মনে ভিড় করে আসবে। সেকথা মনে রেখে এবং অতিথির কাছে কোনকিছু গোপন না রেখে এবার তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছে রাজপথে। মিছিলের নগরী হিসেবে রীতিমত প্রসিদ্ধ এই শহরে মিছিলের কোন অভাব নেই। প্রায় রোজই মিছিল লেগে আছে। নানা দাবি-দাওয়ার শ্লোগানে তো মুখর থাকে। বিভিন্ন দাবিসম্বলিত ফেস্টুন-সহ মিছিল আসছে; শহরের সব রাস্তা থেকে। একে একে সব এসে জমা হলো শহীদ মিনার ময়দানে। সেখান থেকে চোখ ফেরালে শুধু দেখা যায় মানুষ আর মানুষ। সঙ্গে তাদের ফেস্টুনগুলি উঁচিয়ে ধরা। অপূর্ব দক্ষতায় শ্রীমতী বসু শহীদ মিনারের পরিকল্পনা করেছেন। আর সেখানে সমবেত মিছিলের প্রতীক হিসেবে রেখেছেন সবুজের সমারোহ। এ থেকে তিনি হয়তো কোন নতুন ইংগিত দিতে চেয়েছেন। তিনি কলকাতার মিছিলকে শ্যাম সমারোহে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন।

কলকাতা প্রাচীনত্বের গরিমায় সবাইকে টেক্কা মেরে চলে। অতিথি শহরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে বোটানিকসের সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ। এই মহীরুহ আমাদের অতীত এবং বর্তমানকে একসঙ্গে ধরে রেখেছে। যেদিন চলে গেছে আর যেদিন আসছে সবই এর কাছে নিজের প্রাণের পরশ রেখে যায়। এখানে এসে দুদণ্ড দাঁড়ালে অনেক অধরা এবং অদেখা কাহিনী কথা যেন বাঙময় হয়ে ওঠে। তাই এখানে এসে কলকাতার প্রাণের হদিশ নিতে হয়। জীয়ন কাঠির সন্ধান রয়েছে এখানে। এখান থেকে সোজা প্রবেশ করতে হবে অতীতের গর্ভে যাদুঘরে। সেখানে থরে থরে সাজানো রয়েছে ইতিহাস। ভগীরথের শঙ্খ নির্ঘোষ আর পুণ্যতোয়ার স্পর্শে সগররাজার ষাট হাজার সন্তান যেমন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল তেমনি এখানে এসে মনের জানালা খুলে দিলে ইতিহাসের পাতা আপনা থেকেই উড়তে শুরু করে। একে একে ঘটনাগুলি সব উঁকি মেরে যায়। পৃথিবীর কত না উত্থান-পতনের স্মারক যাদুঘরের সর্বত্র। ভারতবর্ষে গোটা ইতিহাস এখানে এসে মূক হয়ে রয়েছে। অতিথির সঙ্গে সখ্যতা পাতাতে আর তাঁর কাছে নিজের মনের আগল খুলে দিতে ব্যস্ত। ইতিহাসের ঘনঘটা প্রত্যক্ষ করে অতিথি এবার পরিতৃপ্ত মনে পা ফেলবেন রাজপথে। এবার তিনি এসে দাঁড়াবেন সাম্রাজ্যের স্মৃতিবহনকারী ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে। প্রসারিত উদ্যান থেকে তিনি তাঁর বহিরঙ্গের শোভা দেখবেন অনিমেষ নয়নে। আবার তিনি প্রবেশ করবেন অতীতের গর্ভ-গৃহে। আমাদের পরাধীনতার সকল ইতিহাস সেখানে ধরা রয়েছে। বিগত দুশো বছর তাঁর কাছে একে একে সব কথা বলে যাবে। নির্বাক নয়নে তিনি শুধু চোখ বুলিয়ে যাবেন আর অবাক হয়ে ভাববেন

যে, ইতিহাসের পর ইতিহাস তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে। কিন্তু না তা নয়। তিনি যদি এসে থাকেন শীতে অথবা বর্ষায় তবে দেখবেন যে, এতো অভাব আর দারিদ্র্য এই শহরে তবু দলে দলে লোক ছুটছে স্বর্ণমৃগের সন্ধানে। এ যেমন নেশা তেমনি ভাগ্য ফেরানোর আশাও। তবে এ আশায় নিরাশা বেশি। রামায়ণের সেই কাহিনীও হয়তো এসময় একবার তাঁকে ছুঁয়ে যাবে। সীতার নির্দেশে স্বর্ণমৃগরূপী মারীচের পিছু ধাওয়া করলো রাম, তারও পরে লক্ষ্মণ। আর এই অবসরে শূন্য কুটিরে রাবণ এসে ঘটালো সর্বনাশ। স্বর্ণমৃগের পিছু ধাওয়া থেকে এই বিপদের সংকেত যুগ থেকে যুগান্তরে সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছে। হয়তো আমাদের অতিথির মনেও কোন নতুন চেতনার উদয় হতে পারে।

কলকাতার ভাড়ে মা ভবানী। সেখানে লালবাতি জ্বলছে। চরম দেউলিয়াপনায় ভুগছে এই শহর। দিনের পর দিন পথে-ঘাটে জঞ্জালের স্তূপ জমা হচ্ছে। মনের আনন্দে সেখান থেকে রোগ জীবাণু বাসা বাঁধছে শহরের আনাচে-কানাচে। স্বাস্থ্য-হীনতায় ভুগছে কলকাতা। অনুজ্জ্বল, কৃশকায়। কোথাও কোথাও হাড়গোড় বেরিয়ে পড়ছে। জরাজীর্ণ এবং কুৎসিত চেহারা। এমনিভাবেই তার দিন কাটে। বেচারা অতিথি মুহূর্তে হাঁফিয়ে ওঠেন। হয়তো ভাবেন, এ তিনি কোথায় এলেন। এমনিভাবেই দিন শেষ হয়ে রাত নামে। সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বদলে যায়। তার সর্বাঙ্গে তখন সাজ সাজ ভাব। এ যেন নগরের নটীর অভিসারে যাবার প্রস্তুতি। মোহিনী রাত মায়া কাজল পরিয়ে দেয় অতিথির চোখে। উচ্ছল উদ্দাম জীবন শুরু হয়ে যায়। কত ধন যায় এক প্রহরের প্রমোদে। এত দৈন্যের মধ্যেও এত ধনের অপচয় অতিথির কাছে বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু এখানেই হলো কলকাতার প্রাণ-চাঞ্চল্য। সব-কিছুতেই তার একটা 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব। রাত ফুরিয়ে যাবার আগেই সবাই তাতে শেষ চুমুক দিতে ব্যস্ত। এই শহর অতিথিকে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে।

এভাবে যখন তাঁর মাথায় ভাবনা জট পাকিয়ে যাবে তখন তিনি একটু রিলিফ চাইবেন। কলকাতা সেদিক থেকেও অকৃপণ নয়। একদিকে রয়েছে হাওড়ার পুল আর অন্যদিকে রবীন্দ্র সরোবর। অতিথি যেদিকে খুশি পা চালিয়ে দিতে পারেন। গাড়ি-ঘোড়ারও খুবই সুবন্দোবস্ত। হাওড়ার পুলে তিনি হাওয়া খাবেন আর প্রত্যক্ষ করবেন গঙ্গার শোভা। সেই ভোরেই ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীর ভিড়। কেউ কেউ স্নানের আগে মাটি মেখে নিজেকে শুদ্ধ করে নিচ্ছেন। ধারে কাছে দু-একটা কুস্তির আখড়াও নজরে পড়তে পারে। আর তিনি অবাক হয়ে দেখবেন যে গঙ্গার দু তীর জুড়ে কল-কারখানার বিশাল সমারোহ। আর এই কল-কারখানা ঘিরে দু পারের মানুষ জেগে উঠছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র অসম্ভব কর্ম-চাঞ্চল্য।

কিন্তু রবীন্দ্র সরোবরে জীবনের এই বৈভব অনুপস্থিত। সেখানে নিরিবিলি শান্তি। এককালের বিখ্যাত লেক এখন নতুন নাম নিয়েছে। সাজেরও বেশ পরিবর্তন হয়েছে। কিছুটা হেঁটে আসার পর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম তাঁকে স্বাগত জানাবে। সন্ধ্যার অবকাশে যদি তিনি যান তবে রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চের কোন অনুষ্ঠান তিনি উপভোগ করতেও পারেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মনের খোরাক পাবেন যথেষ্ট। কিন্তু কলকাতায় অবাধ আনন্দের হাট তিনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। সুখ এবং দুঃখ এই শহরে পাশাপাশি চলে। এই আনন্দের মুহূর্তে যে জিনিস তাঁকে পীড়া দেবে তা হলো মানুষের লাঞ্ছনা। সভ্যতার জয়গাথার পাশাপাশি এই পেছিয়ে পড়া কাহিনীর কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সামনে এগিয়ে চলবেন। এই মানুষগুলি সম্বন্ধে তখনই তাঁর ধারণা যাবে বদলে। ওরা বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় জীবনপণ লড়াই করে চলেছেন। ওরা দুর্জয়, দুর্দম, দুর্মদ। জীবনের কাছে হার মানতে তারা রাজি নয় কিছুতেই। ওদের কণ্ঠে শুধুই জীবনের গান। মিছিল-মিটিং আর পোস্টার-ফেস্টুনে এই কথাই সোচ্চার। আর এই হলো কলকাতার জীবন-বেদ। হাজার নিন্দার গ্লানি এবং অবহেলা-উপেক্ষা সহ্য করে কলকাতা হাসি-কান্নার চুনি-পান্নায় আবহমানকাল একই রকম কল্লোলিনী।

প্রদর্শনীটি দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একজনের কথা কানে এসে বাজলো, কলম দিয়ে লেখা যায়, তুলি দিয়ে আঁকা যায় কিন্তু ফুলপাতায় এমন সুন্দর করে মনের কথা বলা মোটেই সহজ-সাধ্য নয়। কথাটা মনে ধরলো। কলকাতার সৌন্দর্য এবং সংস্কৃতিমণ্ডিত জীবনকে নতুনরূপে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন শ্রীমতী উমা বসু এবং তাঁর অনুগামীরা। চারদিকে যখন এই শহরের নিন্দায় কান পাতা যায় না সেই মুহূর্তে তাঁরা একটি মহৎ প্রচেষ্টার সার্থক রূপদান করেছেন। পুষ্পসজ্জার চিরাচরিত ঐতিহ্যের এই আধুনিক প্রকরণ এক নতুন ব্যঞ্জনায় পরিচিত এই শহরকে আমাদের সামনে তুলে ধরলো। আর এই প্রচেষ্টার সাফল্যের সাক্ষ্য দেবে আগামী দিন। এরকম নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনই ছিল শ্রীমতী বসুর কাছে আমাদের প্রত্যাশিত। ইকেবানার মক্কা জাপানে গিয়ে যিনি বিজয়-কেতন উড়িয়ে এসেছেন আর পূর্ণঘট থেকে যাঁর যাত্রা শুরু তিনি আমাদের মঙ্গলকলসের সন্ধান দেবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনের অঙ্গীভূত এই পুষ্পসজ্জা তারই পথপরিক্রমা।

মীনা

ইউ আকারের কাঁটা দিয়ে তৈরী স্টোল
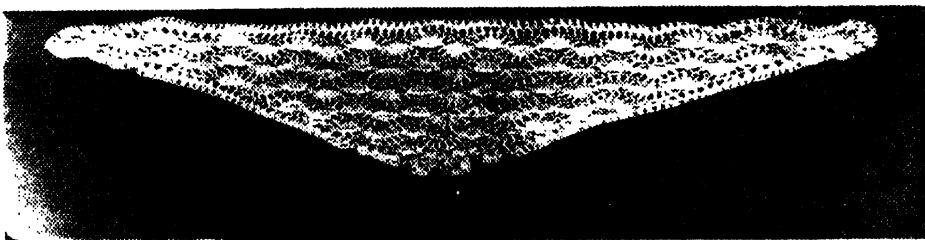
শীতের আসর

হরেক রকম পোশাকে তো বছরের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত বাজার সবগরম। ঋতুভেদে নতুন নতুন জমকালো পোশাকে সাজতে কেই বা না ভালবাসে? এবারের শীত তো বিদায় নিতে চলেছে: যাও অল্প শীত আছে তাতে মাত্র সন্ধ্যার পরেই শীতের সামান্য পোশাক ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। দিনের বেলায় তো তার কোন দরকারই হয় না, উপরন্তু গায়ে রোদ লাগলে বেশ চিড়বিড়িয়ে ওঠে।

এ বছরে নানারকম নতুন নতুন পোশাক শীতের আসরে জাঁকিয়ে বসেছিল। একজন আধুনিকাকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে-ছিলাম, 'কি ব্যাপার এবার যে গায়ে এক-দিনও কার্ডিগান উঠলো না। ওটা কি আর ভাল লাগছে না, নাকি পুরনো হয়ে গেছে?'

'পুরনো মোটেই হয় নি। তবে অধি-কাংশই হাতে তৈরী কার্ডিগানের চেয়ে ব্রাই-নাইলনের কার্ডিগান বেশী ব্যবহার করছে। হালকা রং-এর ব্রাই-নাইলনের কার্ডিগানে ঐ রং-এর উল দিয়ে আমার সামনের দিকে কাজ

ডেইজী নীটারের ফুলে তৈরী স্টোলের একাংশ
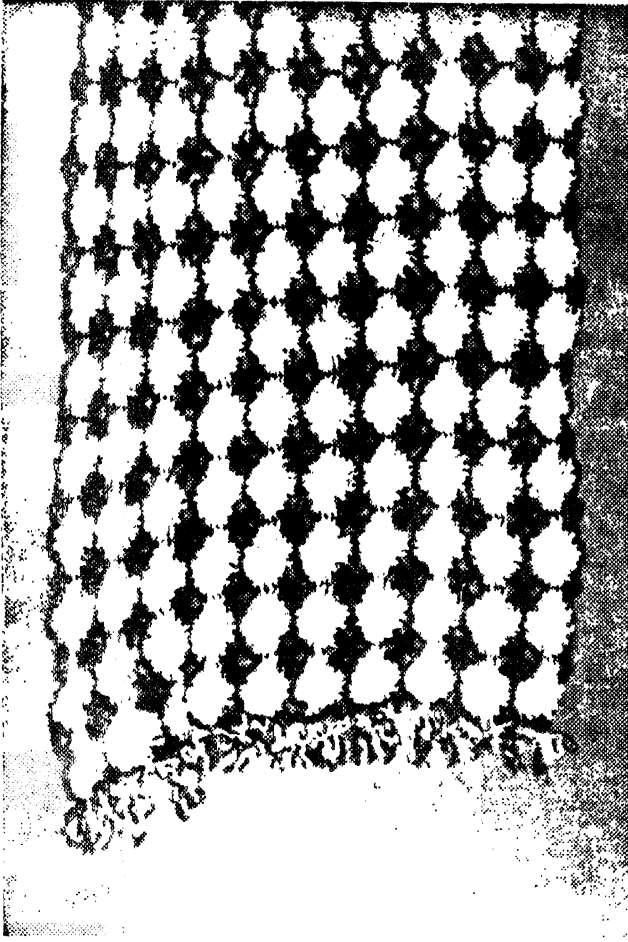
করা থাকে। দারুণ, খুব সোবার ও স্মার্ট দেখায় এরকম কার্ডিগান ব্যবহার করলে। জমকালো কাজও ব্রাই-নাইলনের কার্ডি-গানে প্রচুর দেখা যায়। অবশ্য এগুলোর দাম এত বেশী যে পছন্দ হলেও অনেকেরই নাগালের বাইরে। তবে এবছর কার্ডিগানের চেয়ে শাল ব্যবহার করতেই তো ভালো লাগছে, যা শীত পড়েছে! শালে কিন্তু বেশ গলা, হাত, দরকার মত কান ঢেকেও বসা যায়। তাছাড়া এবছরের ফ্যাসানটাতো শালকে ঘিরেই উঠেছে। রকমারী শাল গায়ে মেয়েরা তো রাস্তাঘাট ঝলমল করে চলছে।'

'শাল তো বড্ড দামী জিনিস, সকলের পক্ষেই তো দামী দামী রকমারী শাল কেনা আর সম্ভব নয়।'

'সে তো নিশ্চয়ই। শাল ছাড়া বাটিকের স্কার্ফ তো জলের দামেই প্রায় বলতে গেলে বিক্রি হচ্ছে, রং-বেরং-এর বাটিকের চাদর প্রতিটি পোশাক-আসাকের দোকানেই ঝুলছে।'

'একথা অবশ্য সত্যি যে বছর দুই-তিন বছরেই বাটিকের চাদরের চলন আর চাহিদা হু-হু করে বেড়ে চলেছে। আর এ শীতে চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুন্দর সুন্দর বহু রং-এর চাদর বেরিয়েছে বেশ সস্তায়। বিভিন্ন শাড়ীর সঙ্গে দামের স্বল্পতার দরুন মানানসই বাটিকের চাদরের ব্যবহারও তো হচ্ছে।'

এমন কি শাড়ীর সঙ্গে মিলিয়েও বাটিকের চাদরের ডিজাইন অনেক সময়েই কিনতে পারবেন। ডেকরেটিভ ডিজাইন ছাড়া ফুল এবং পাখীর নানারকম ডিজাইন এই চাদরে করা হয়ে থাকে। আজকাল অবশ্য অনেক রকমের এ্যাবস্ট্রাক্ট ড্রয়িংও বাটিকের চাদরে হামেশাই দেখা যাচ্ছে।'

'আচ্ছা বাটিকের চাদর ছাড়াও উল আর ক্রচেটের সুতো দিয়ে তৈরী স্টোলও তো ব্যবহার করছেন?'

'ওগুলো তো এক্সেলেন্ট। আমাদের তো দারুন ভাল লাগে।'

উল ও ক্রচেটের সুতো দিয়ে কুরুশে বোনা স্টোল ও গার্ডিয়ান গায়ে দিয়ে অনেককে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। উলের কাঁটার স্টোলও সমান আদরণীয়। নানা রং-এর সুতো দিয়েও চৌক চৌক ঘর করে জমকালো কুরুশের স্টোল তো অনেক অত্যাধুনিকাকেই পরতে দেখা যাচ্ছে। এতে হয়তো শীতের ঠান্ডার উপশম খুব হয় না তবুও অল্প শীতে ব্যবহারের পক্ষে মন্দ নয়।

সুতোর স্টোল ছাড়াও রকমারী উলের স্টোলে বাজার ছেয়ে গেল। ইউ আকারের কাঁটা দিয়ে লেস করে সেগুলি কুরুশ দিয়ে জুড়ে চমৎকার স্টোল তৈরী হয়। এতে উল অবশ্য একটু বেশী লাগে কিন্তু হালকা রং-এর এরকম স্টোল দামী শাড়ীর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পরা যায়। সাধারণতঃ ইউ আকারের কাঁটাতে কুরুশ দিয়ে লম্বা লম্বা লেস করাতে হয়। অনেক সময়ই এই লেস-গুলির কিছু অংশ কুরুশে একসঙ্গে জুড়ে একটি ফুলের মত করা যায় ও অন্যদিকে প্রতিটি লেসের ঘর আলাদা আলাদা জুড়তে হবে। এভাবে ইচ্ছেমত অল্প দূরে দূরে দুদিকেই ফুলের আকার দেওয়া যেতে পারে।

এছাড়া ডেইজী নীটারের তৈরী ফুল দিয়ে কুরুশে জুড়ে সুন্দর সুন্দর স্টোল তৈরী হচ্ছে।

এবছরের শীতের আসরে বলতে গেলে স্টোলই জাঁকিয়ে বসেছে, দেখা যাক আগামীবারে আবার নতুন কি কি আমদানী হয়।

—অঞ্জলি চৌধুরী

বাটিকের চাদর

অরুন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়চৌধুরী। তরুণ মজুমদার পরিচালিত শ্রীমান পৃথ্বীরাজ ছবির একটি দৃশ্যে। ফটো : অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

উপাদান বনাম আকার

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দানের ব্যাপারে যে প্রায়ই ছবির উপাদানকেই সবিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়, একথা, বোধ করি, অনস্বীকার্য। ১৯৭১ সালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কানাড়ী ছবি রামমনোহর চিত্র নিবেদিত "সংস্কার"-এর ক্ষেত্রেও এ-কথা সুনিশ্চিতভাবে প্রযোজ্য। ছবির কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপদানের ব্যাপারে শট ডিভিসনসম্মত সুগঠিত চিত্র-নাট্য, ক্যামেরার অবস্থান ও কম্পোজিশন, শব্দ ও সঙ্গীতের ব্যবহার এবং অভিনয়ের রীতিনীতি বিষয়ে যে-সব শর্ত অবশ্য পালনীয় 'সংস্কার' ছবির বহু জায়গাতেই তা' চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। আবার এমন অনেকগুলি পরিস্থিতি আছে, যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতীকের ব্যবহারে ছবিটি মহৎ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ভণ্ড, লোভী, স্বার্থসর্বস্ব ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামে প্লেগের আবির্ভাবজনিত ইঁদুরকুলের মৃত্যু গ্রামজীবন ও সমাজজীবনকে ভিতরে-বাইরে একাত্ম করে তুলেছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রাণেশাচার্যের মৃত ব্রাহ্মণ নারাণাপ্পার রক্ষিতা চন্দ্রীর সঙ্গে বাঁধভাঙা মিলনের দৃশ্যের সঙ্গে ইন্টার-কাট করে দেখানো হয়েছে কথাকলি নৃত্যনাট্যের মারফত দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব। এও একপ্রকার প্রতীকের ব্যবহার। কিন্তু যেখানে মৃত নারাণাপ্পার শেষকৃত্য পূর্ণ ব্রাহ্মণের মর্যাদায় করা হবে কিনা তার বিচারে বসেছে গুণ্ডা, লক্ষ্মণ প্রমুখ সমাজপতিরা, সেখানে কি ট্রিটমেন্টে, কি চিত্রায়ণে—চলচ্চিত্রের ভাষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত; মনে হয়, প্রচুর কথায় কচকচিভরা মঞ্চ-নাটকের অভিনয় দেখছি! কিংবা মেলাভিমুখী যুবক পুট্টার সঙ্গে প্রাণেশাচার্যের দীর্ঘ কথোপকথনের দৃশ্যও চলচ্চিত্রসম্মত নয়।

কিন্তু উপাদান ও বক্তব্যের দিক দিয়ে 'সংস্কার' রীতিমত অসাধারণ। একজন লোক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও সমাজসম্মত-ভাবে ব্রাহ্মণের পালনীয় আচার মতো না চলে সর্ব প্রকারে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করবার পরে সহসা প্লেগাক্রান্ত হয়ে মারা যায় ওর রক্ষিতার গৃহে। মৃত্যুর পর সঠিকভাবে তার মৃতদেহের সৎকার হবে কিনা, এই প্রশ্ন ব্রাহ্মণসমাজের শিরোমণিদের বিচলিত করে। তাঁরা শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞ, নিষ্ঠাবান ও সচ্চরিত্র যুবক প্রাণেশাচার্যের ওপর এ-বিষয়ে মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে মৃতের রক্ষিতা চন্দ্রী তার সকল গহনা ব্রাহ্মণসভার মাঝখানে রেখে মিনতি জানায়, যেন তার ভর্তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অচিরেই সুসম্পন্ন করা হয়। অন্তত সহস্র মুদ্রা মূল্যের গহনা প্রায় প্রতিটি ব্রাহ্মণকুল-তিলকের রসনাকে লালাসিক্ত করে। কিন্তু প্রাণেশ গহনার পুঁটলিটি নিজের কাছে রেখে শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং যখন শাস্ত্র তাকে তার মীমাংসায় আসতে সাহায্য করে না, তখন সে অপেক্ষমান চন্দ্রীর হাতে

প্রেক্ষাগৃহ

ছিন্নপত্র / পরিচালক দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার। ফটো : অমৃত

গহনার পুঁটলিটি ফেলতে দিয়ে চলে যায় ভগবান মারুতির (বীর হনুমান) কাছে তাঁর নির্দেশ পাবার জন্যে। কিন্তু মারুতির মাথায় স্থাপিত ফুল যখন কিছুতেই স্থানভ্রষ্ট হল না, তখন হতাশ ব্রাহ্মণ প্রাণেশাচার্যের আজন্মসঞ্চিত বিশ্বাসের মূলে লাগল আঘাত। মারুতির মন্দির থেকে বেরিয়েই প্রাণেশ দেখল উপবাসক্লিষ্ট চন্দ্রী বসে আছে তারই অপেক্ষায়। সহানুভূতি জাগল প্রাণেশের মনে; সে চন্দ্রীর দিকে অগ্রসর হ'ল। নিকটবর্তী হতেই চন্দ্রী আকুলভাবে তার পদসংলগ্ন হ'ল। প্রাণেশ

মমতাভরে তাকে তুলে ধরতেই সে তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল প্রাণের উচ্ছ্বাস নিয়ে। মুহূর্তে খসে পড়ল ব্রাহ্মণের আচার, বিচার, নিষ্ঠা, সংযম। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে যে ব্রাহ্মণ যুবক শয্যাশায়ী রুগ্না স্ত্রীর সেবায় কাটিয়ে ইন্দ্রিয়সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, সে আজ প্রবৃত্তির ঐরাবতকে বশে রাখতে পারল না, আকণ্ঠভরে পান করল জীবনামৃত। নিদ্রাভঙ্গে সে দেখল, ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে কলার খোসা; চন্দ্রীর কাছ থেকে শুনেল, সেই নাকি ওগুলিকে উদরসাৎ করেছে। একি বাঁধভাঙা সংযম! অনুশোচনা চরমে উঠল, যখন সে শুনল ওর সেই বাঁধভাঙা মুহূর্তেই ওর রুগ্না স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। এ কি মুক্তি না, পাপের প্রত্যক্ষ ফল? সে যাই হোক না কেন আজ আর সে অপরের বিচারক সেজে বসে থাকতে পারে না। সে তার সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে ভাবল, সে নিজেই আজ পতিত, তার বিচার করবে কে? অতএব স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের পরে সে সকলের অলক্ষ্যে গ্রামত্যাগ করল প্রায়শ্চিত্তের আশায়। চিরায়ত সংস্কারাচ্ছন্ন মন আজ অশান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার মেলাভিমুখী পড়া কি তার সংস্কারের জট খুলতে সাহায্য করেছিল? শাস্ত্রের অনুশাসনের চেয়ে চিত্তের অনুশাসন তার কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল? বহু দেশ পরিভ্রমণ ও বহু লোকের সঙ্গে মিলনের পরে তার কি মনে জেগেছিল,

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,

সহস্র বন্ধন মাঝে লভিব জীবন?'

নতুন মন নিয়ে সে ফিরে এল তার দুর্বাসাপুর গ্রামে, যে গ্রাম আজ প্লেগের মহামারীতে জনশূন্য হয়ে পড়েছে। নারায়ণাপ্পার শুষ্ক কঙ্কালের সে নিশ্চয়ই সদ্গতি করবে। এবং তার জীবনে সদ্গতি করবে কি তারই জন্যে নীরবে অপেক্ষমান চন্দ্রী?

সামাজিক আচারবিচারের জীর্ণ খোলস আজ ঝরেই পড়া উচিত, ভালো-মন্দ মিশিয়েই মানুষ, সে মাত্র ভালো বা মাত্র মন্দ নয় এবং 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই বক্তব্য প্রকাশের জন্যে ডঃ ইউ. আর. অনন্তমূর্তি 'সংস্কার'-এর কাহিনীকে যে পথে বিস্তৃত করেছেন, বছর পঁচিশ আগেও সে-পথ অত্যন্ত সমাজবিরোধী বলে পরিত্যাজ্য বিবেচিত হত। এবং আজও যে সংরক্ষণশীল শাস্ত্রজ্ঞদের রীতিমত বিচলিত করবে না, এমন কথা বলা যায় না। আমরা বলব, অত্যন্ত দুঃসাহসিক এর বক্তব্য এবং দুঃসাহসিকভাবেই তাকে বিধৃত করা হয়েছে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এবং কাহিনীগত এই বক্তব্যটিই 'সংস্কার' ছবিটিকে অসাধারণ করে তুলেছে।

চলচ্চিত্র হিসেবেও অবর্ণনীয়তা আছে ছবির এখানে সেখানে ছড়িয়ে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় হচ্ছে প্রাণেশ এবং চন্দ্রীর যৌনমিলনের দৃশ্যটি। চন্দ্রী দ্বারা প্রাণেশের জানু জড়িয়ে ধরা থেকে শুরু করে শায়িত অবস্থায় তাদের একে অপরের দেহকে বিমুক্ত করার জন্যে হস্ত প্রসারণ এবং একের অপরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্তির আকৃতি—এ যে কি আশ্চর্য বস্তুময়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা বর্ণনার অতীত। গ্রামে প্লেগ আক্রমণের দৃশ্য, প্রাণেশের নিয়মতান্ত্রিক জীবন এবং ছবির দ্বিতীয় ভাগে সত্যানুসন্ধানে তার পথপরিক্রমা ইত্যাদি আরও অনেকস্থানেই ছবির চিত্রধর্মিতা পরিস্ফুট।

ছবির নায়ক প্রাণেশাচার্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন 'তুঘলগ' খ্যাত প্রসিদ্ধ কানাড়ী নাট্যকার গিরিশ কার্নাড। তিনি এর সংলাপও রচনা করেছেন। তাঁর অপার্থিব চোখজোড়া ভূমিকাটিকে যোগ্য বিশেষত্ব দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিনয়—না, অভিনয় নয়, বাস্তব রূপারোপ—ভূমিকাটিকে করেছে প্রাণবন্ত। চন্দ্রীর ভূমিকায় প্রযোজক-পরিচালক টি পট্টভী রামা রেড্ডীর সহধর্মিণী স্নেহলতা রেড্ডীতে রক্ষিতাসুলভ কামাভিব্যক্তির গুরুতর অভাব দেখা যায়। নারাণাপ্পা কেন যে চন্দ্রীতে আসক্ত হয়েছিল, তা বোঝা যায় না। তার মধ্যে কোনো মোহমদিরাময় মাদকতা নেই। কিন্তু প্রাণেশের মীমাংসার ওপর মৃতের সদ্গতি নির্ভর করায় তার প্রতি তার নির্ভরতা এবং তার চিত্ত দ্রব করবার জন্যে তার পদপ্রান্তে পতিত হবার আকুলতা তাঁর অভিনয় মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক লঙ্কেশ বেপরোয়া ব্রাহ্মণ সন্তান। নারাণাপ্পার ভূমিকাটিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। অধ্যাপক প্রাণেশের মুখ থেকে প্রেমের কবিতা শোনবার পরে বিপথগামী ছাত্র শ্রীপতির ভূমিকাকে যোগ্য রূপ দিয়েছেন

জয়দেব। মুখরা গ্রাম্য স্ত্রীলোক অনসূয়ার ভূমিকাটিও সুঅভিনীত। অপর বহু ভূমিকাতেই যে সৌখীন মঞ্চাভিনেতারা অবতীর্ণ হয়েছেন, তা তাঁদের অভিনয়ের ধারা থেকেই বোঝা গেছে।

ছবির কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন চিত্রগ্রহণে অস্ট্রেলিয়ার নবীন ক্যামেরাম্যান টম কোওয়ান। তিনি ছবির মেজাজ অনুযায়ী কাজ করেছেন—কোনো জায়গায় যেন প্রেমের কবিতা, আবার কোথাও কঠিন গদ্য। স্টীড-কার্ড আর একজন অস্ট্রেলিয়ান—হচ্ছেন ছবির সম্পাদক। তিনি বহু জায়গায় জাম্প-কাট পদ্ধতি গ্রহণ করে ছবিটির বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিয়েছেন। শিল্প নির্দেশনায় বাসুদেব বাস্তবধর্মী। ছবিতে সুরসৃষ্টি করেছেন আলি আকবর খাঁর সুযোগ্য শিষ্য, ইংরেজী সাহিত্যে ডক্টরেটপ্রাপ্ত রাজীব তারানাথ। তাঁর আবহ-সংগীত ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। সংলাপে বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণভাবে কানাড়ী ভাষা আমাদের বোধগম্য নয়' ইংরেজী সাবটাইটেলগুলি যথেষ্টক্ষণ স্থায়ী নয় এবং যথেষ্ট অর্থব্যঞ্জকও নয়। তবু ছবিটির প্রতিপাদ্য ও বক্তব্য বুঝতে কারুরই অসুবিধা হবার কথা নয়।

দুঃসাহসিক কানাড়ী ছবি 'সংস্কার'—যার কানাড়ী অর্থ শেষকৃত্য—সামাজিক সংস্কারকে চূর্ণ করে অসামান্যতা অর্জন করেছে এবং সেই কারণেই রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও।

স্টুডিও থেকে

'রূপসী বাংলা'র শুভ মহরত

বাংলাদেশের বন্দিত নায়ক রাজ্জাক-এর কলকাতার প্রথম ছবি 'রূপসী বাংলা'র শুভ মহরত অনুষ্ঠান হচ্ছে ১৮ ফেব্রুয়ারী কলকাতার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাই-কমিশনার জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। সুজনী প্রযোজিত এই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন রণেন মোদক। পরিচালনা ও সংগীত পরিচালনা করছেন যথাক্রমে সরোজ রায় ও পূর্ণদাস বাউল।

১৮ ফেব্রুয়ারী বিরাজ বৌ

কে সি দাস প্রোডাকসন্স-এর সুনীল রায় নিবেদিত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনী 'বিরাজ বৌ' মিনি পিকচার্সের পরিবেশনায় ১৮ ফেব্রুয়ারী উত্তরা, পূরবী উজ্জলা ও অন্যত্র মুক্তি লাভ করছে। পরিচালনায় আছেন মানু সেন, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সলিল সেন এবং সুরযোজনা করেছেন কালিপদ সেন। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—উত্তমকুমার, মাধবী চক্রবর্তী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মঞ্চাভিনয়

দেবসন্স রিক্রিয়েশন ইউনিটের নাট্যাভিনয়ঃ জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দেবসনস রিক্রিয়েশন ইউনিটের সভ্যবৃন্দ সরলা মেমোরিয়াল হলে অভিনয় করলেন শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপু সুলতান'। আজকের বাস্তব সমস্যার নামে যে ধরনের অবাস্তব নাটকের বাজারে ছড়াছড়ি, আনন্দের কথা, বর্তমান সংস্থা সেই-সব নাটককে পরিহার করে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম হোতা টিপু সুলতানের জীবনকে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মনে যে দেশপ্রেমকে উদ্বোধিত করেছেন, তার জন্যে অবশ্যই তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

প্রথমেই হায়দার আলি ও নাম ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীঅনিল সিংহ ও শ্রীসুধেন্দু রায়ের অসামান্য অভিনয় ও বাচন ভঙ্গি উল্লেখ করবার মতো। এ ছাড়া করিম শাহ, সৈয়দ গফফর, পূর্ণিয়া, নানা ফাড়নবীশ, সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, নিজাম, কর্ণওয়ালিশ-এর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীনিমাই চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতপেন সেন, শ্রীগিরীন চৌধুরী, শ্রীসুজিত সেন, শ্রীঅর্চন বিশ্বাস, শ্রীসীতাংশু দাশ, শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন গুহর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন শ্রীপশুপতি চৌধুরী, শ্রীসত্যজিৎ গোরে, শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য, শ্রীসুব্রত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়, শ্রীগৌরীপ্রসাদ দাশ প্রভৃতি। নারী চরিত্রে শ্রীমতী আরতি ঘোষ, শ্রীমতী শাশ্বতী রায়, শ্রীমতী প্রতিমা পাল পূর্ব সুনাম বজায় রেখেছেন। আবহসংগীত চমৎকার। শ্রীপ্রশান্ত ভট্টাচার্যর সংগীত দর্শকদের অভিভূত করেছে। কিন্তু আলোক সম্পাত আরোও উন্নত ধরনের হওয়া উচিত ছিল।

শুভম্ নাট্যগোষ্ঠী

সম্প্রতি শুভম্ নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা রঙ্গনায় শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' (নাট্যরূপ শচীন সেনগুপ্ত) নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। সুঅভিনীত এই নাটকটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন তপন ধর,

শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' চিত্রে মাধবী চক্রবর্তী এবং সুব্রতা চ্যাটার্জি

আরতি ঘোষ, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, সুমিত দেব, লালমোহন মিত্র, দত্তা মুখোপাধ্যায় ও বেবী ঘোষ। নাটকটি পরিচালনা করেন সুমিত দেব।

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল

শুভম নাট্যগোষ্ঠীর আয়োজিত ২৭ জানুয়ারী থেকে ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অভিনীত সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল হল: শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—১ম ওয়াই এম সি এ (কোন্নগর) 'যাদুঘর', ২য়— সংগের দল (লেকটাউন) 'ইশারা', ৩য়—বর্ধমান নাট্যরঙ্গ ইউনিট (বর্ধমান) 'সাদাসিধে'। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—সুনীল ভট্টাচার্য (আমরা কজন); শ্রেষ্ঠ নির্দেশক—অশোকরাম মুখার্জী (সংগের দল); শ্রেষ্ঠ অভিনেতা— অজিত ঘোষ (বর্ধমান নাট্যরঙ্গ ইউনিট); শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা—ইন্দ্রজিৎ গুহ (নন্দন); শ্রেষ্ঠ টাইপ অভিনেতা তাপস ভট্টাচার্য (সপ্তক); শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—অঞ্জলি মুখার্জী (ক্লাসিক থিয়েটার)।

যুবগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান

সম্প্রতি ৮ জানুয়ারী যুবগোষ্ঠী (পার্ক সার্কাস) বিশাল দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন অমিয়ভূতের বহু বিতর্কিত বলিষ্ঠ নাটক (পূর্ণাঙ্গ) 'ঝিঁঝি পোকার কান্না।' সমাজের পঙ্গু বেদীমূলে মনুষ্যত্বের যে অবক্ষয় অনাদর তার এক বাস্তব ছবি এই নাটকে বর্তমান। পরিমল, রবি, ও ডাঃ নীলরতনের স্বতন্ত্র কাহিনীগুলি তীব্র নাটকীয় আবেগে গতিশীল ও প্রাণবন্ত। সমাজে অবিচার ও হৃদয়হীনতার জন্য তাদের জীবন যে কিভাবে ব্যর্থ ও নষ্ট হয়ে গেল তা নাট্যকার সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ও মঞ্চ অভিনেতা সুনীলেশ ভট্টাচার্য।

প্রতিটি চরিত্র নিজ গতিতে এবং আবেগস্পর্শী অভিনয়ে দর্শকমণ্ডলীকে অভিভূত করেছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছেন প্রাণশংকর মণ্ডল (রবি), নীলরতন বসু (ডাঃ নীলরতন), তারক রায় (পরিমল), পবন বেরা (কেষ্ট), হারাধন দেব (মাতাল), গৌতম মুখার্জি (অভিনেতা), অশোক মুখার্জী (নাট্যকার), সুধীর দাস (সহদেব) ও কৃষ্ণ দাস (নৃপেন)।

বিবিধ সংবাদ

আর্ট সেন্টার অব দি ওরিয়েন্ট

সম্প্রতি প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন "আর্ট সেন্টার অব দি ওরিয়েন্ট"র ৩৩তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন "যুগান্তরের সহঃ সম্পাদক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ডঃ রমা চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে শ্রীসেনগুপ্ত ২১৫ জন কৃতী ছাত্রীদের বিভিন্ন পুরস্কার, শংসাপত্র, ডিপ্লোমা প্রভৃতি বিতরণ করেন।

প্রায় ৩০০ ছাত্রী রবীন্দ্রসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, গীটার, সিম্ফনী, নৃত্যনাট্য মালকোষ রাগে রাগরঞ্জনী রাশিয়ান ব্যালেটের অনুকরণে ফ্যাইংবার্ড নৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্যের জন্য পরিচালক শ্রীরণজিৎ গুহঠাকুতা, প্রযোজক শ্রীকমলেশ মজুমদার ও বিভিন্ন বিভাগীয় পরিচালকগণ প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

গুজরাটের ভবনগরে বাকদেবীর আরাধনা

দি বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অন্যান্যবারের মত এবারেও ভাবনগরের বাঙ্গালীরা সরস্বতীপুজো করেছিলেন। তবে এবারের বৈশিষ্ট্য ছিল যে এই পুজো শুধুমাত্র বাঙ্গালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অবাঙ্গালীরাও এতে সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন।

পুজো হয়েছিল সর্দার স্মৃতি ভবনে। মূর্তি এসেছিল আহমেদাবাদ থেকে। স্থানীয় বাঙ্গালী [illegible] মণ্ডপ পরিকল্পনা সকলকেই আকৃষ্ট করে। ২১শে সকাল থেকেই দলে দলে সব হাজির হন পুজোমণ্ডপে। অঞ্জলি বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলেই দেন। পুজো সকাল ৯টার মধ্যেই শেষ হয়ে [illegible] দুপুরে হয় খাওয়া দাওয়া। সন্ধ্যের সময় শুরু হয় অনুষ্ঠান, প্রথমে ছোটদের আবৃত্তি, নাচ গান, তারপর শুরু [illegible] বড়দের [illegible] আবৃত্তি ও কৌতুক অভিনয়ে [illegible] সন্ধ্যাটি হয়ে ওঠে [illegible] স্থানীয় শিল্পীরাও পরে যোগ দেন। [illegible] খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলেই বাড়ী যান।

পরের দিন, অর্থাৎ ২২শে বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের দ্বারা অভিনীত হয় "সোনার হরিণ" নাটক। সভ্যদের অভিনয় ক্ষমতা দেখে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী খুবই মুগ্ধ হন। স্থানীয় অধিবাসীরা এই নাটকটি আবার মঞ্চস্থ করার অনুরোধ জানিয়েছে।

অনুভা ঘোষের শোকসভা

সম্প্রতি গড়চা রোডে মহিলা শিল্পী মহলের নিজস্ব বাসভবনে, সংস্থার সভাবৃন্দ অনুভা ঘোষের অকালমৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্যে এক শোকসভার আয়োজন করেন। এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আন্তরিকতাসিক্ত এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। অনুভা দেবীর প্রতিকৃতিটি বিরাট পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত। ধূপের গন্ধ চারিদিকে বিষন্নতার ছোঁয়া এনে দিয়েছিল। তাঁর প্রতিকৃতির সামনে একে একে কানন দেবী, সরযূ দেবী, সাধনা রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণে অনুভার মধুর স্বভাব ও কর্মনিষ্ঠা যেন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

অনুভার মৃত্যু শুধুমাত্র মঞ্চ ও চিত্রজগতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, মহিলাশিল্পী মহলও ক্ষতিগ্রস্ত হল। তিনি ছিলেন

এ সংস্থার সভা-কর্মী। সংস্থার অগ্রগতির মূলে ছিল লোকেশ্বরীরতার আন্তরিক প্রচেষ্টা। তাঁকে হারিয়ে মহিলা শিল্পী মহল এক একনিষ্ঠ কর্মীকে হারালেন।

এরপর দুই মিনিট নীরবতা পালন করে সভা ভঙ্গ হোলো। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিকৃতি-সজ্জিত পুষ্পস্তবক ও মালা তাঁর স্বামী রবি ঘোষকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মহিলা শিল্পীমহলের সমবেদনা জানিয়ে।

অনুষ্টুপ সঙ্গীতালয়ের উদ্বোধন

গত ২১শে জানুয়ারী ২৮এ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটে সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যালের সভাপতিত্বে অনুষ্টুপ সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গীতালয়ের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং খ্যাতিমান বেহালাবাদক শ্রীপরিতোষ শীল। বনফুল এক অনাড়ম্বর সুন্দর ভাবগম্ভীর ঘরোয়া পরিবেশে প্রদীপ শিখা প্রজ্বলিত করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং তাঁর ভাষণে অনুষ্টুপের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীঅখিল নিয়োগী বলেন, অনুষ্টুপের সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 'প্রেম' নামক একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি জয়কৃষ্ণ সান্যাল সাধনার দ্বারা নির্মল ও পবিত্র চিত্তে সঙ্গীত অর্জনের কথা বলেন। পরিশেষে সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মঞ্জরী মিত্র, মল্লিকা মিত্র, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা সেন ও মঞ্জুষা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগোপাল আশ্রমের অনুষ্ঠান

প্রতি বছরের মত এবারেও অগণিত ভক্তের উপস্থিতিতে পুরুলিয়ার দাদড়ের শ্রীশ্রীগোপাল আশ্রমে মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে রটন্তী কালিকা দেবীর পূজো পাঠ, হোম ও যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়ে গেল স্বামী বিরজানন্দ ভারতী (শ্রীশ্রীক্ষ্যাপা-মনোহর) ঠাকুরের পৌরোহিত্যে। শ্রদ্ধেয় শ্রীভারতী তাঁর ভাষণে বলেন, সারা বিশ্বে শক্তির লড়াই চলেছে, ধ্বংসের তাণ্ডবে দেশের এক সম্প্রদায় মত্ত, এই ধ্বংস ও তাণ্ডব থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে—মা ও মাটির সেবা করতে গেলে যে ধর্মীয় মনোভাবের প্রয়োজন তা আমাদের অর্জন করতে হবে, আমাদের উচিত বহু সাধকের পবিত্র পদধূলি সিঞ্চিত এ ভারতের প্রতিটি সাধনপীঠের পরিচয়ের সঙ্গে আন্তরিক-ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা। এই দাঁদড় আশ্রমের কাছেই বক্রেশ্বরে শ্রীভগবানের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল পদচিহ্ন) ছটি শিলাখণ্ডের উপরে আজও বর্তমান আছে। শুধু তাই নয় যুগযুগ ধরে এই যুগল পদচিহ্নের দর্শনলাভ করতেই এখানে এই দিনটি ভক্তেরা দলে দলে আসে।

দুঃখের বিষয় এমন একটি পীঠস্থানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে কারো লক্ষ্য নেই। এই চরম উদাসীনতার বলি হয়ে এদেশের বহু পীঠস্থান অবলুপ্তির অন্ধকারে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

প্রতি বছরের মত এবছরেও সাধক কবি রামপ্রসাদের ভিটেয় তাঁর পূজ্য প্রসন্নময়ী কালীর অন্নকূট উৎসব প্রায় বিশ হাজার ভক্তদর্শকদের উপস্থিতিতে প্রতিপালিত হল। উৎসবের আগের দিন থেকে বহু যাত্রী দূর থেকে এসে এখানে জমায়েত হয় এবং বহু বিশিষ্ট দল আসে এই ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানে মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করতে। এবারে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিঁথি রামকৃষ্ণ সংসদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা বেশ কতগুলি রামপ্রসাদী সংগীত গেয়ে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। বহু ধর্মার্থীর মধ্যেও ছিলেন ভিনদেশী বহু নরনারী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

কেঁদুলিতে জয়দেব মেলা

গীতগোবিন্দ রচয়িতা বৈষ্ণব কবি জয়দেবের পুণ্য জন্মভূমি বীরভূম জেলার কেঁদুলিতে জয়দেব মেলা হয়ে গেল গত ১৪ই জানুয়ারী থেকে ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত। অজয় নদের তীরে এই বিখ্যাত স্থানটিতে প্রতি বছরের মত এবারেও অগণিত ভক্তদর্শকদের দলে দলে আগমন ঘটে ঐ কটা দিন জুড়ে। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে ক্ষ্যাপা বাউলের দল এসে স্থানটিকে মুখরিত করে তোলে তাঁদের নিজ নিজ দলের মনমাতান বাউল গানে। বাংলার বাউল গান বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য এবং সেদিক থেকে এই মনোজ্ঞ সঙ্গীতের পরিবেশ খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। ভারতীয় ছাড়াও আসেন বহু ভিনদেশী মানুষজনেরা। মেলা নানান মানুষের ভীড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে। দরিদ্র-নারায়ণের সেবাও চলে সঙ্গে সঙ্গে। স্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মেলা সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। সার্থক হয়েছে এবছরেও।

সীতেশ রায়ের চিত্র প্রদর্শনী

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাদার্ণ এভেন্যু রোডস্থ 'বিড়লা একাডেমীতে' উৎপল রোডস্থ 'বিড়লা একাডেমীতে' উৎপল সেনগুপ্ত ও সুভাষ উকিলের উদ্যোগে শিল্পী শ্রীসীতেশ রায়ের চিত্র প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকবে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

অপেশাদার শিল্পীদের অধিকতর প্রেরণা ও উৎসাহ দেবার জন্যে শিল্পী সংস্থা (মৌচাক, স্টেশন রোড, সোদপুর, ২৪ পরগণা) নানান ধরনের গান, নাচ, ছবি-আঁকা, আবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। বিস্তৃত বিবরণ সম্পাদকের কাছে পাওয়া যাবে।

সোনার খাঁচা / কণিকা মজুমদার ও উত্তমকুমার

মন্দিরার 'রাতের গাড়ী' : আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল ১০টায় মন্দিরা নাট্যগোষ্ঠী বিশ্বরূপায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবীণ নট শ্রীসন্তোষ সিংহকে সম্বর্ধনা জানাবেন এবং 'রাতের গাড়ী' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন।

ভুটানে ইন্দ্রজালের আসর

শিল্পীর জীবনে এই প্রথম পাড়ি. বহু যোজন দূরের কোন দেশ নয় ঘরের কাছেরই একটি ভিনদেশ ভুটান। এই প্রথম ভুটানের অধিবাসীদের জীবনেও। তাই সমস্ত ব্যাপারটাই রোমাঞ্চকর কৌতূহলোদ্দীপক এবং উপভোগ্যও। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে সাত হাজার ছশো ফিট উঁচু পাহাড়ে ঘেরা পারোতে তিন দিন ধরে সফলকাম ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে বিজয়িনীর বেশে ফিরে এলেন যাদুসম্রাজ্ঞী উমা দাশগুপ্ত। কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত যাদুর সুপরিচিত খেলাগুলি কুমারী দাশগুপ্ত অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রদর্শন করে ভুটানের পারো-র বাসিন্দাদের জীবনে চমক বিস্ময় ও আনন্দের স্পর্শ দিয়েছেন বিপুলভাবে। এই তিন দিনের যাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন ভুটান সরকারের পারোস্থিত পি ডবলু ডি স্টাফ ক্লাব।

কোন্নগরে নেতাজী জন্ম-উৎসব

গত ২৩শে জানুয়ারী '৭২ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৭৬তম জন্ম-উৎসব সাড়ম্বরে উদযাপিত হোল কোন্নগর কালীতলা কলোনী ময়দানে। বৈকালিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। কমিটি আয়োজিত নেতাজী সম্বন্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও প্রসংশাপত্র প্রদানের পর এই দিনের অনুষ্ঠানসূচীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অস্ত ও উদয়' সংগীতালেখ্য। পরিবেশনায় কোন্নগরের উদয়াচল সঙ্ঘ। সংগীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন দিলীপ দে, সমীর সরকার, তুষার চক্রবর্তী, শিবাণী ভট্টাচার্য, সুনীতা সরকার, বরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থনায়ঃ মণীন্দ্র মিত্র, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়; কণ্ঠসংগীতে দীনবন্ধু রায়, ইন্দ্র চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মণীন্দ্র মিত্র।

সাংস্কৃতিক উৎসব : সম্প্রতি ভবানীপুর মডার্ন স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে চারদিনব্যাপী এক বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্যনাট্য ('শ্যামা'), যাত্রা, বিচিত্রানুষ্ঠান ও সামাজিক নাটকের ব্যবস্থা করে সদস্যরা সকলের প্রশংসাভাজন হন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, স্বপন গুপ্ত, অখিলবন্ধু ঘোষ, বনশ্রী সেনগুপ্ত, আশীষ মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, ভি বালসারা, মিন্টু দাশগুপ্ত, জয়ন্ত রায়, আবদুল জব্বর (বাংলাদেশ) প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীবৃন্দ। সংস্থার পক্ষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তরুণ অপেরা নিবেদিত 'হিটলার' যাত্রাভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। জ্ঞানেশ মুখার্জির পরিচালনায় 'গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর' নাটক দর্শকদের আনন্দ দেয়। সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সার্থক।

ত্রিংশ বার্ষিক আবৃত্তি, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা : আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী, বালিগঞ্জ ইয়ং মেনস এসোসিয়েশন এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন।

রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য। যোগাযোগ ও নামসংগ্রহের ঠিকানা : বি ওয়াই এম এ, ২২৭৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলি ১৯।

বিদ্যাসাগর স্মারক সমিতি ও বিদ্যার্থীরঞ্জনের পক্ষ থেকে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় রাজভবনে বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের হাতে বিদ্যাসাগরের এই প্রতিকৃতিখানি এবং এক প্রস্থ বিদ্যাসাগর রচনাবলী উপহার দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালের উইন্টার অলিম্পিক গেমসের 'সিঙ্গলস লুগে' অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক বিজয়িনী পূর্ব জার্মানীর আনা-মারিয়া মূলার এবং রৌপ্য পদক বিজয়িনী উটে রুমোল্ট।

খেলাধূলা

দর্শক

উইন্টার অলিম্পিক

জাপানের সাপ্পোরো শহরে একাদশ উইন্টার অলিম্পিক গেমসের চূড়ান্ত পদক তালিকায় রাশিয়া সর্বাধিক পদক সহ ৮টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য এবং ৩টি ব্রোঞ্জ বেসরকারীভাবে চ্যাম্পিয়ান শিপ লাভ করেছে। গত ১৯৬৮ সালের অনুষ্ঠানে নরওয়ে এবং রাশিয়া যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল।

এবারের ক্রীড়ানুষ্ঠানে একাধিক বিষয়ে অপ্রত্যাশিত ফলাফল দর্শকদের অবাক করে। কয়েকজন প্রতিযোগী পদক জয় ছাড়াও রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

নেদারল্যাণ্ডসের ২৭ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আর্ড শেঙ্ক স্পিড স্কেটিংয়ের ১,৫০০ মিটার, ৫,০০০ মিটার এবং ১০,০০০ মিটার অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, একই আসরে ইতিপূর্বে স্পিড স্কেটিংয়ের তিনটি স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন নরওয়েরই দুজন—১৯৩৬ সালে ব্যালাংরুড এবং ১৯৫২ সালে অ্যাণ্ডারসন।

পূর্ব জার্মাণীর ১৯ বছরের ছাত্র উলরিখ ভেলিনক-এর নরডিক কম্বাইণ্ড অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয় রীতিমত অসাধারণ সাফল্য। কারণ ইতিপূর্বে এই অনুষ্ঠানে তার সমান বয়সের কোন প্রতিযোগী স্বর্ণপদক জয়ী হন নি।

এবারের অনুষ্ঠানে নেদারল্যাণ্ডসের আর্ড শেঙ্ক ছাড়া তিনটি স্বর্ণপদক

উলরিখ ভেলিনক। ১৯৭২ সালের উইন্টার অলিম্পিক গেমসের 'নরডিক কম্বাইণ্ড' সর্বকনিষ্ঠ স্বর্ণপদক বিজয়ী স্কুলছাত্র

পেয়েছেন রাশিয়ার ২৯ বছরের স্কুল শিক্ষক গালিনা কুলাকোভা।

আইস হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাশিয়া ৫—২ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে এই নিয়ে উপর্যুপরি তিন বার স্বর্ণপদক জয়ী হল।

প্রতিযোগিতায় মোট ৩৫টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল এবং পদক জয়ী হয়েছে ১৬টি দেশ।

পদক জয়ের খতিয়ান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
সোভিয়েট ইউনিয়ন	৮	৫	৩
পূর্ব জার্মানী	৪	৩	৭
সুইজারল্যাণ্ড	৪	৩	৩
নেদারল্যাণ্ড	৪	৩	২
যুক্তরাষ্ট্র	৩	২	৩
পঃ জার্মানী	৩	১	১
নরওয়ে	২	৫	৫
ইতালী	২	২	১
অস্ট্রিয়া	১	২	২
সুইডেন	১	১	২
জাপান	১	১	১
চেকোশ্লোভাকিয়া	১	০	২
স্পেন	১	০	২
পোল্যাণ্ড	১	০	০
ফিনল্যাণ্ড	০	৪	১
কানাডা	০	১	০

অন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস

কোটায়ামের নেহরু স্টেডিয়ামে ১০ম আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় সমস্ত বিভাগের খেলা ধরে কেরল প্রথম স্থান (১৫২·৫ পয়েণ্ট), মহীশূর দ্বিতীয় স্থান (১৩০ পয়েণ্ট) এবং পাঞ্জাব তৃতীয় স্থান (১২০ পয়েণ্ট) লাভ করেছে। কেরল এই সাফল্যের সূত্রে কর্ণেল গোদাবর্মা রাজা মেমোরিয়াল ট্রফি জয়ী হয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় ২৪টি রেকর্ড ভাঙে। তবে জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছেন মাত্র একজন—বিহারের ভি এস চৌহান, ডেকাথলনে ৭০১২ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে।

বাংলার সাফল্য

বাংলা ৭টি স্বর্ণপদক পেয়েছে—মহিলা বিভাগে ১টি এবং বালক বিভাগে ৬টি। বালকরাই শেষ পর্যন্ত বাংলার মুখ রেখেছেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : বিহার (৬৬ পয়েণ্ট)
মহিলা বিভাগ : মহীশূর (৪৪ পয়েণ্ট)

বালক (সিনিয়র) : পাঞ্জাব (৫২ পয়েণ্ট)
বালক (জুনিয়র) : মহীশূর (৩১ পয়েণ্ট)
বালক (সাব-জুনিয়র) : বাংলা
(২৪ পয়েণ্ট)
বালিকা (সিনিয়র) : কেরল (৪২ পয়েণ্ট)
বালিকা (জুনিয়র) : উড়িষ্যা (১৯ পয়েণ্ট)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন

পুরুষ বিভাগ : পারভীন কুমার (পাঞ্জাব)
টি সি চৌহান (বিহার)
উভয়েই ১০ পয়েণ্ট করে সংগ্রহ করেন
মহিলা বিভাগ : নির্মলা উথিয়া (মহীশূর)
—১৫ পয়েণ্ট
বালক (সিনিয়র ও জুনিয়র) :
ডি প্রেমনাথ (মহীশূর)
—১০ ও ১১ পয়েণ্ট
বালক (সাব-জুনিয়র) :
এস রায়চৌধুরী (বাংলা)
—১০ পয়েণ্ট
বালিকা (সিনিয়র) :
কে এম সেলিম (কেরল)
—১৮ পয়েণ্ট
বালিকা (জুনিয়র) :
উষারাণী মিশ্র (উড়িষ্যা)
—৮ পয়েণ্ট

পশ্চিম বাংলার জয়

বালক (সাব-জুনিয়র)

সটপুট : এস রায়চৌধুরী
দূরত্ব ১৯·৬৪ মিটার
লং জাম্প : সুনির্মল ঘোষ
দূরত্ব ৬·২৭ মিটার
ডিসকাস : এস রায়চৌধুরী
দূরত্ব : ৪৮·৭৮ মিটার (নতুন রেকর্ড)
১০০ মিটার : এস এন আর ভৌমিক
সময় : ১১·৮ সেকেণ্ড

বালক (সিনিয়র)

হাইজাম্প : বিকাশ পাল
উচ্চতা : ১·৮৫ মিটার
জাভেলিন : আসত পাল
দূরত্ব : ৫৭·১৪ মিটার

মহিলা বিভাগ

সটপুট : সুব্রতা পাল
দূরত্ব : ১০·৯২ মিটার

চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
মহীশূর	১৯	৫	৮
কেরল	১৬	১৪	১২
পাঞ্জাব	১৫	১১	১১
উড়িষ্যা	১০	৮	৬
বাংলা	৭	৬	১৯
বিহার	৬	৮	৬
রাজস্থান	৪	১২	৬
তামিলনাড়ু	৪	৫	৮
উত্তরপ্রদেশ	৩	৩	৩
মহারাষ্ট্র	২	৬	৭
ত্রিপুরা	২	১	০
অন্ধ্রপ্রদেশ	১	৪	৪
দিল্লী	১	০	১
গুজরাট	১	২	০
হরিয়ানা	১	৫	২
মধ্যপ্রদেশ	০	০	১

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা

জামসেদপুরে আয়োজিত জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব পুরুষ বিভাগে এবং কেরল মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : পাঞ্জাব ১৫-৭, ১৫-১২, ও ১৫-১৩ পয়েণ্টে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : কেরল ১৫-৮, ১৬-১৪, ১৩-১৫, ১৩-১৫ ও ১৫-১৬ পয়েণ্টে বাংলাকে পরাজিত করে।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

কোচিনের মহারাজা কলেজ ময়দানে গত ২৩শে জানুয়ারী থেকে ২২তম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। পুরুষ বিভাগে যোগদান করে ১৯টি, মহিলা বিভাগে ১৪টি এবং বিভাগে ১৫টি দল।

বাংলার সুব্রতা পাল মহিলাদের সটপুট শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন।

পশ্চিমবাংলা পুরুষ, মহিলা এবং বিভাগের নক-আউট পর্যায়ে যোগ্যতা লাভ করে মহিলা বিভাগের জয়ী হয়েছে।

লীগ পর্যায়ের খেলায় বিভিন্ন থেকে চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ কোয়ার্টার ফাইনালে নিম্নলিখিত দল উঠেছিল :

পুরুষ বিভাগ :
'এ' গ্রুপ : সার্ভিসেস এবং বাং
'বি' গ্রুপ : রাজস্থান এবং মহা
'সি' গ্রুপ : রেলওয়ে এবং কেরল
'ডি' গ্রুপ : মহীশূর এবং বিহা

মহিলা বিভাগ :
'এ' গ্রুপ : বাংলা এবং দিল্লী
'বি' গ্রুপ : মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাব
'সি' গ্রুপ : মহীশূর এবং কেরল

বালক বিভাগ :
'এ' গ্রুপ : রাজস্থান এবং তামিল
'বি' গ্রুপ : মহীশূর এবং পাঞ্জাব
'সি' গ্রুপ : চণ্ডীগড় এবং বাংলা
'ডি' গ্রুপ : মহারাষ্ট্র এবং হরিয়া

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : সার্ভিসেস দল ৭২ পয়েণ্টে ভারতীয় রেল দলকে পরাজিত উপর্যুপরি ৩ বার এবং মোট ১৪ বার মেমোরিয়াল ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করে।

মহিলা বিভাগ : পশ্চিমবাংলা ৬০ পয়েণ্টে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দশের জয়ী হয়েছে।

বালক বিভাগ : রাজস্থান ৯৯ পয়েণ্টে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার সি সি আব্রাহাম ট্রফি জয়ী হয়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪২ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 25th February, 1972 শুক্রবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৭৮ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী

এক নজরে

পশুজীবন প্রসঙ্গে : বিপন্ন প্রাণীকুল রক্ষার আবেদনে গতবারের জের টেনে আরও কিছু বলার আছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১৬০০ খৃস্টাব্দের পর থেকে এ পর্যন্ত সভ্য মানুষের সর্বনাশা আক্রমণে ২৭০টি বিভিন্ন জাতির পশু ও পক্ষী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আরও ৬০টি বিভিন্ন জাতির প্রাণী, যার মধ্যে আছে বাঘ, তিন ধরনের নেকড়ে, দু-জাতের অটার, শিল, তিমি, কুমির প্রভৃতি, যদি অবিলম্বে সম্পূর্ণ রক্ষা, যাকে বলে 'ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন' না পায় তবে তারাও এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ডোডো পাখির মতো তারাও চলে যাবে মানুষের স্মৃতির সংগ্রহশালায়।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থাগুলি তাই আজ লুপ্তপ্রায় প্রাণীগুলির, বিশেষ করে লোমশ প্রাণীগুলির প্রাণরক্ষায় এত তৎপর। দুটি বড় কারণে লণ্ডন হয়েছে তাদের আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। প্রথমত, আন্তর্জাতিক ফার বাণিজ্যের শতকরা ৮৫ ভাগ লেনদেন হয় লণ্ডন শহর দিয়ে। দ্বিতীয়ত, এটা দেখা গেছে যে, নানাভাবে চেষ্টা করেও পশুচামড়া সরবরাহকারী দেশগুলির বেআইনী কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব নয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েক লক্ষ বর্গমাইল অরণ্য অঞ্চলে আইনভঙ্গকারী পশু-শিকারীরা এত সংঘবদ্ধ ও তৎপর যে, কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই তার বিরুদ্ধে নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এ ব্যাপারে যে নগদ প্রাপ্তি ঘটে সেটাও উপেক্ষা করার মতো সামান্য অঙ্ক নয়। যেমন, সোমালি সাধারণতন্ত্রে আজ নেকড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ায় সেখানে সরকার নেকড়ে হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন, এমনকি নেকড়ের চামড়া বাড়িতে রাখাও সে রাজ্যে বেআইনী। কিন্তু যেহেতু একটি নেকড়ের চামড়ার দাম ৪০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় আট হাজার টাকা, যা প্রায় বিশজন সোমালির সারা বছরের আয়ের সমান, সে কারণে একটি নেকড়েকে হত্যার সুযোগ পেয়েও অরণ্যচারী সোমালিদের পক্ষে তা হাতছাড়া করা খুবই কঠিন। তাছাড়া দেখা গেছে যে, কোন দেশ পশুচামড়া রপ্তানির ব্যাপারে একটু সতর্ক হলেই প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্য দিয়ে তার বেআইনি চালান বেড়ে যায়। যেমন, ইথিয়োপিয়ার হিসাবে দেখা যায়, ১৯৬৮ সালে সে দেশ থেকে নেকড়ের চামড়া রপ্তানি হয় ৩১২টি, আর '৬৯ সালে একটিও নয়। অথচ ঐ দুই বছরে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রকাশিত হিসাবের তালিকায় দেখা যায় যে, তারা ইথিয়োপিয়া থেকে ২,৭৬৮টি নেকড়ের চামড়া আমদানি করেছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের তালিকাতেই আছে যে, '৬৮ সালে ব্রেজিল থেকে তারা ১৪৭টি নেকড়ের চামড়া আমদানি করেছে। কিন্তু ব্রেজিল ত দূরের কথা, সারা দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও নেকড়ের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, অন্য দেশের নেকড়ের চামড়া গোপনপথে ব্রেজিল ঘুরে আমেরিকায় পৌঁচেছে।

আন্তর্জাতিক ফার বাণিজ্য সংস্থা বন্যপশু সংরক্ষণ সংস্থাগুলির বারবার আবেদনে বাঘ, নেকড়ে, চিতা, অটার প্রভৃতি ছয়টি পশুর চামড়া আমদানি নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বর্তমান স্টক প্রকাশ করেননি, এবং তাঁদের নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের শাস্তি কি হবে তাও বলেননি। সুতরাং বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলির সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট আইন ছাড়া এই বিধ্বংসী হত্যাকাণ্ড বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আর যে-কথা আগেই বলা হয়েছে, যাঁরা ফারের পোষাক পরেন, সেই অভিজাত বিত্তবান সমাজের নরনারীরা যতদিন না অসহায় পশুদের প্রতি সদয় হয়ে ফারের পোষাক বর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করছেন ততদিন বিপন্ন প্রাণীকুলের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির আশঙ্কা কিছুতেই দূর হবে না।

গণবিবাহ : সম্প্রতি মেকসিকো সরকারের উদ্যোগে মেকসিকো শহরে ৬৩৭টি দম্পতির শুভ বিবাহ সম্পন্ন হল। দম্পতির শুভবিবাহ কথাটিকে যাঁরা লজিকের ভাষায় 'রিডাণ্ডান্ট' বলে মনে করছেন, তাঁদের অবগতির জন্য নিবেদিত হচ্ছে যে, ওঁরা অনেকদিন আগে থেকেই দাম্পত্যজীবন যাপন করছিলেন এবং প্রায় সকলেই পুত্রপুত্রী, এমনকি পৌত্রপৌত্রী নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করছিলেন। শুধু আনুষ্ঠানিক বিবাহের জন্য চার্চকে দেয় অর্থের অভাবেই তাঁরা তাঁদের দাম্পত্যকে এতদিন ধর্মগত ও আইনসঙ্গত করতে পারেননি সরকারি অর্থানুকূল্যে এতদিনে তাঁদের ঐ অবশ্যপালনীয় কর্তব্যটুকু সমাধা করা সম্ভব হল। যাঁদের 'বিয়ে' হল, তাঁদের মধ্যে এক বধূর বয়স ৮৩, যাঁর পৌত্রপৌত্রী আছে নয়টি এবং প্রপৌত্রী আছে চারটি।

ধর্মের চাহিদা মেটাতে অপারগ মানুষ কিভাবে অধর্মের জীবন (অবশ্য সেও মানুষের গড়া সংজ্ঞানুসারে) যাপন করতে বাধ্য হয়, এটি তার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সস্তায় বিবাহবিচ্ছেদ : পশ্চিমি দুনিয়ায় বিবাহের মতো বিবাহ বিচ্ছেদও এখন অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার তার সুযোগ নিতেও এগিয়ে আসছে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ। এতে তাদের দুরকম লাভ। এক, বিবাহ বিচ্ছেদের ফি বাবদ কিছু রাজস্ব লাভ, দুই, পর্যটক সমাগম বৃদ্ধি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যয় এখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিচ্ছেদকামী দম্পতি প্রায় সেই খরচে বিমানে চড়ে লাতিন আমেরিকার দেশ হাইতিতে চলে আসে এবং নামমাত্র ব্যয়ে বিবাহবিচ্ছেদ পর্ব সাঙ্গ করে। ফলে, ব্রাউনিং-এর ভাষায়, বিচ্ছেদকামী দম্পতির একটা 'লাস্ট রাইড টোগেদার'ও হয় আর কিছুটা দেশভ্রমণও হয়। অপরদিকে হাইতির সরকারি তহবিলে কিছুটা অর্থাগম হয় আর সেই সঙ্গে তার হোটেল ও পর্যটন ব্যবসায়ও জমে ওঠে। হাইতির প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকেই এজন্য একটি হোটেল খোলা হয়েছে এবং সেই হোটেলে বিবাহবিচ্ছেদের যাবতীয় আইনগত ব্যবস্থাও আছে। ঐ হোটেলের আয় হাইতির প্রতিরক্ষা খাতে জমা পড়ে।

প্রধানমন্ত্রীর বিধবা : ইতালিতে '৫২ সালে যে আইন পাশ হয় তাতে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর বিধবাদের পেন্সনের হার সমান ছিল। সম্প্রতি ঐ আইন সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীর বিধবার পেন্সন পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছে। আর আইন সংশোধিত হওয়া মাত্র ৮১ বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধা সরকার সমীপে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, তাঁর পেন্সন যেন অনতিবিলম্বে ২৫৮·৪০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৩৮৭·৬০ ডলার করা হয়। কারণ তাঁর স্বামী বেনিটো মুসোলিনি ১৯২২ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ইতালির প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন।

ইতালির সংবিধান অনুসারে মুসোলিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এটা প্রমাণ হলেই বৃদ্ধা ডোনা রাচেলের দাবি অনস্বীকার্য হবে, যদিও মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন কোন সম্পর্ক ছিল না। ইতালিতে এতদিন বিবাহবিচ্ছেদ আইন ছিল না বলেই মুসোলিনি তাঁর স্ত্রীকে আইনসঙ্গতভাবে ত্যাগ করতে পারেননি, এবং যাঁর সঙ্গে তিনি বাস করতেন ও যাঁর সঙ্গে একই দিনে তিনি নিহত হন, ইতালির আইনে সেই মহিলাটি ছিলেন মুসোলিনির রক্ষিতা মাত্র। এতদিন পর্যন্ত ইতালির ঘরে ঘরে ঐ অবাঞ্ছিত ব্যাপারটিই ছিল অতি স্বাভাবিক ঘটনা এবং কম্যুনিস্ট নেতা তোগলিয়াত্তি থেকে ফ্যাসিস্ত নেতা মুসোলিনি কেউই ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবু তারই সুযোগে বঞ্চিতা ডোনা রাচেল যদি বৃদ্ধ বয়সে কিছুটা মর্যাদা বৃদ্ধির অবকাশ পান তাতে বোধকরি কারও আপত্তি হবে না।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

আসন্ন নির্বাচন ও জনগণ

ভারতের ষোলটি রাজ্যে এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আগামী ৫ মার্চ থেকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বাকী ক'টি রাজ্যে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন হওয়ায় এখনও তাদের বিধানসভার মেয়াদ ফুরোয়নি। আমাদের দেশে নির্বাচন একটি এলাহি কান্ড। এত বৃহৎ গণতান্ত্রিক নির্বাচনও অন্য কোথাও অনুষ্ঠিত হয় না। জনসংখ্যা তো বটেই আমাদের দেশের ভূখণ্ডের বিস্তৃতিও নির্বাচন অনুষ্ঠানকে রীতিমত কষ্টসাধ্য করে তোলে। এই নির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে প্রায় বারো হাজার। গত সাধারণ নির্বাচনের পর তিনটি অঞ্চল পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে—মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মণিপুর। এই সমস্ত মিলিয়ে বিচার করে দেখলে আমাদের নির্বাচকমণ্ডলীকে সুষ্ঠুভাবে তাঁদের মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া সহজ কাজ নয়। তবে আশার কথা এই যে, গত দুই দশক ধরে ভারত নিয়ম ও শৃংখলানুযায়ী এই নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে।

অতীতের সাফল্য সত্ত্বেও এবারকার নির্বাচনে সরকার, জনগণ ও নির্বাচন কমিশনকে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গণতন্ত্রে নির্বাচন হল জনগণের মতামত গ্রহণের একটি উপায়। নির্দিষ্ট মেয়াদ পার হলেই জনপ্রতিনিধিদের আবার নতুন করে জনগণের কাছে গিয়ে তাঁদের মতামত জানতে হয়। কী ধরনের সরকার তাঁরা চান এবং কাকে তাঁরা প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন এই অধিকার জনগণকে দেওয়া হয়েছে আমাদের সংবিধানে। এই অধিকার কোনোমতেই খর্ব হতে দেওয়া চলে না। শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অবশ্যই নিতে হবে। অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পশ্চিম বাংলায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই সহযোগিতা আরও বেশি প্রয়োজন। কারণ, ২।৩ বৎসর এই রাজ্যে নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে রাজনৈতিক আবহাওয়া কলুষিত হয়ে পড়েছে। বহু রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, সরকারী কর্মচারী, পুলিশ এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হয়েছেন। এখন অবস্থার অনেক উন্নতি হলেও সেই হিংসার আবহাওয়া থেকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি আমাদের রাজ্য। সুতরাং এখানে যাতে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয় এবং ভোটদাতারা অবাধে ভোট দিতে যেতে পারেন তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সকলের আগে কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালদের বিশেষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন সুস্থ আবহাওয়ায় অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত আচরণবিধি অনুসরণের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা স্বয়ং পশ্চিমবাংলা পরিদর্শন করে গেছেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সংগে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। কলকাতা ও আশেপাশের কয়েকটি নির্বাচনকেন্দ্র পরিদর্শন করে গেছেন তিনি। নানাপক্ষ থেকেই অভিযোগ করা হয়েছে তাঁর কাছে। প্রতিপক্ষের হাতে মার-খাওয়া, ভয় ও জুলুমবাজিই ছিল এই অভিযোগগুলোর মূল কথা। নির্বাচন কমিশনার আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে, অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা তিনি করবেন।

এই আশ্বাস নিশ্চিতই ভোটদাতা ও প্রার্থীদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজেরা সংযত না হয় তাহলে শুধুমাত্র সরকারী খবরদারিতে জনসাধারণের মন থেকে ভয়-ভীতির আশংকা দূর হতে পারে না। আজ একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলাতেই হিংসাত্মক রাজনীতি জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করেছে সবচেয়ে বেশি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতির নামে এ-ধরনের মারদাঙ্গা শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, এর ফলও মারাত্মক হতে বাধ্য। তবে আশার কথা এই যে, এখন সেই ভীতির আবহাওয়া অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। গত ক'বছর যে কান্ড চলছিল পশ্চিম বাংলায় সে তুলনায় অবস্থা এখন অনেক শান্ত। কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক আবহাওয়া হয়তো উত্তপ্ত। কিন্তু সার্বিকভাবে অবস্থার উন্নতি হয়েছে অনেকখানি। এখন যা করণীয় তা হল যে সমস্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক খুনজখম হচ্ছে সেগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া এবং কঠোর হস্তে এই সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করা। এ শুধু নির্বাচনের জন্যই প্রয়োজন তা নয়। নির্বাচনের পর যে দলেরই সরকার ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্যই প্রয়োজন হয় সমাজদেহ থেকে হিংসাত্মক রাজনীতির সম্পূর্ণ নির্বাসন ঘটানো। অতীতেও দেখা গেছে যে, সমাজবিরোধীদের আস্কারা দিয়ে প্রতিপক্ষদের শায়েস্তা করার প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিষময়। কারণ, তখন সমাজবিরোধীরাই মাথায় চড়ে বসে নিরীহ মানুষদের ত্রাস সৃষ্টি করে। এর পুনরাবৃত্তি কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না। এতে পশ্চিম বাংলার নামই আরও কলঙ্কিত হবে। সরকার গঠন বা সরকার বদলের মাধ্যম হল ব্যালট বাক্স। এর কোনো বিকল্প গণতন্ত্রসম্মত নয়। ভারতের মানুষ নির্বাচনের পথেই তাদের গণতান্ত্রিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদী এই শক্তির বিরুদ্ধে কখনোই জয়ী হতে পারে না। এই বিশ্বাস নিয়েই আসন্ন নির্বাচনে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এবং আমরা আশা করি জনগণের এই মৌলিক পবিত্র অধিকার রক্ষার জন্য সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পরের সংগে সহযোগিতা করে পশ্চিম বাংলায় একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

শেষ পর্যন্ত কি হবে তা এখন বলা যায় না, কিন্তু এবার পশ্চিম বাংলার নির্বাচনের উদ্যোগ পর্বের সবচেয়ে বড় খবর অবশ্যই ফরোয়ার্ড ব্লকের ভাঙন। এই ভাঙনের জন্যে কেউ কেউ কংগ্রেসের, কেউ বা সি পি এমের 'চক্রান্তের' ওপর দোষারোপ করেছেন, কিন্তু লুকিয়ে লাভ কি যে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা নিজেরাই তাঁদের এই নিয়তিকে ডেকে এনেছেন। গতবারেই লিখেছিলাম যে, পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে মধ্যপন্থা ক্রমেই অচল হয়ে আসছে। অনেক দলই সেই কথা উপলব্ধি করতে পেরেছে। ফরোয়ার্ড ব্লক পারে নি। তাই দু নৌকোয় পা দিয়ে চলার অসম্ভব চেষ্টা চালাতে গিয়ে এই দল যদি আজ জলে পড়ে থাকে তবে সেটা আশ্চর্যের বিষয় নিশ্চয়ই নয়।

অবশ্যই অনেকে বলতে পারেন যে জলে আর পড়ল কই, বামপন্থী ফ্রন্ট তো কোল দিয়েছে ফরোয়ার্ড ব্লককে? কিন্তু এটা খুব বড় সান্ত্বনার কথা নয়। কারণ, প্রথমত এই দল সরকারীভাবে ফ্রন্টে ঠাঁই পায় নি, শুধু কয়েকটি আসনের বোঝাপড়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত সেই বোঝাপড়াও হয়েছে দলের একটি বিশেষ অংশের সঙ্গে। যে-অংশ এই বোঝাপড়া মেনে নিতে পারে নি তারা আজ বিদ্রোহী। তৃতীয়ত, এই সামান্য বোঝাপড়ার জন্যে দলকে কঠোর মূল্য দিতে হল দু দিক দিয়ে—(এক) দলের ভাঙন অনিবার্য হয়ে উঠল এবং (দুই) রাজনৈতিক দল হিসেবে ফরোয়ার্ড ব্লকের 'ইমেজের' গুরুতর হানি হল। এর প্রধান দায়টা দলের নেতাদেরই, কারণ তাঁরা ইদানীং স্পষ্ট রাজনীতির চর্চা করেন নি।

ফরোয়ার্ড ব্লক যে কংগ্রেস-বিরোধী দল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও বোধ হয় মিথ্যে নয় যে, এই দল সি পি এম-বিরোধী দলও বটে। ১৯৭১ সালের নির্বাচনের মতো ১৯৬৭ সালেও বামপন্থীরা যখন দু শিবিরে ভাগ হয়েছিলেন তখন ফরোয়ার্ড ব্লক ছিল সি পি এম-বিরোধী শিবিরেই। সেবার দলের ৭১ জন সদস্য বিধানসভায় নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। দল হিসেবে ফরোয়ার্ড ব্লক ভোট পেয়েছিল মোট ভোটের শতকরা প্রায় সোয়া চার ভাগ। ১৯৬৯ সালের কথা অবশ্যই আলাদা, কারণ সেবার সব বামপন্থীই ছিলেন এককাট্টা। অন্যান্য বামপন্থী দলের মতো ফরোয়ার্ড ব্লকেরও আসন সংখ্যাও যেমন বেড়েছিল (২১), তেমনি বেড়েছিল মোট ভোটের বখরাও (শতকরা পাঁচ ভাগের সামান্য বেশী)।

কিন্তু ১৯৭১ সালে বামপন্থীরা আবার যখন ঐক্যবদ্ধ হতে পারলেন না, তখনও আবার ফরোয়ার্ড ব্লককে দেখা গেল সি পি এম-বিরোধী শিবিরেই। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের পতনের পর থেকে যে-সব দল সি পি এমের হিংসার রাজনীতির কঠোর সমালোচনা করে এসেছে ফরোয়ার্ড ব্লক ছিল তাদের পুরোভাগে। গত নির্বাচনে আট-পার্টি জোটের অধিকাংশ শরিকের মতো এই দলেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল, বরাতে জুটেছিল মাত্র তিনটি আসন। তারপরে কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজনীতি অন্য পথে মোড় নিল। কংগ্রেস-বিরোধিতার তুলনায় সি পি এম-বিরোধিতাই নিশ্চয়ই তখন এই দলের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল, তা না হলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনকে সমর্থন করা সম্ভবপর হত না। আট-পার্টি জোটের প্রধান শরিকদের মধ্যে সি পি আই এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থন ছাড়া ঐ কোয়ালিশন সরকার মাস তিনেকও টিঁকতে পারত না।

কিন্তু গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার-এর পতনের পরেই আবার দেখা গেল, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা তখনও মনস্থির করতে পারেন নি। অর্থাৎ সি পি এম-বিরোধিতার দ্বারা ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজনীতি একটা সুনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করতে চলেছে, এ-ধারণা দেখা গেল ঠিক নয়। কারণ ঐ সরকারের পতনের পরও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে অনেকে ঐ জোটকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। অজয় মুখোপাধ্যায়ও উৎসাহী ছিলেন এ-ব্যাপারে। কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক নেতারা ঘোষণা করলেন যে, শুধু সরকার গঠনের জন্যেই ঐ জোট তৈরি করা হয়েছিল, সুতরাং সরকারের পতনের পর ঐ জোটকে জিইয়ে রাখা অর্থহীন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করলেও ফরোয়ার্ড ব্লক আবার প্রথম সুযোগেই নিজের 'স্বাধীন অস্তিত্ব' ঘোষণা করতে চাইছিল এবং পরবর্তী নির্বাচনের এত আগেই নিজেদের একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে জড়াতে চাইছিল না।

এক হিসেবে দেখতে গেলে, ঐ সময় থেকেই ফরোয়ার্ড ব্লকের অস্পষ্ট রাজনীতির শুরু। সেই সময়কার, অর্থাৎ কোয়ালিশন সরকারের পতনের ঠিক পরেই দলের নেতাদের কথাবার্তা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ফরোয়ার্ড ব্লক যদিও গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনে থাকবে না ঠিক করল, তবু কংগ্রেস যে বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক দল, সে-সার্টিফিকেট দলের অনেক নেতা দিয়ে দিলেন। অন্য দিকে, ঐ কোয়ালিশন জিইয়ে রেখে পশ্চিম বাংলায় একটি সি পি এম-বিরোধী জোটের বুনিয়াদ তৈরীতে যদিও ফরোয়ার্ড ব্লক তখনও প্রস্তুত নয়, তবু সি পি এম যে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষে বিপজ্জনক এ-কথা বলতে আটকালো না।

ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যে খণ্ডিত তার প্রমাণ পাওয়া গেল দলের চুঁচুড়া অধিবেশনেও। সেখানে গৃহীত হল কংগ্রেস এবং সি পি এমের থেকে সমদূরত্বের নীতি। সি পি এমকে তো আগেই বলা হয়েছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে বিপজ্জনক। এবার কংগ্রেসকে বলা হল শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এই ধরনের নীতিতে এমনিতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। মতাদর্শের কারণে কোনো দল কোনো জোটেই যাবে না, এটা ঠিক করতে পারে। আর এস পি গত নির্বাচনে তো সেই পথই নিয়েছিল। কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লকের এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল মতাদর্শ সম্পর্কে নেতাদের মধ্যে ঐক্য নয়, বিভেদ। সেই বিভেদটাকে চাপা দিয়ে রাখার জন্যেই গৃহীত হল চুঁচুড়া প্রস্তাব।

কিন্তু ইংরিজিতে যাকে বলে 'মোমেন্ট অব ট্রুথ' তাকে তো আর চিরকাল ঠেকিয়ে রাখা যায় না। নির্বাচনের সমঝোতার প্রশ্নে তাই বিভেদের চেহারাটা হাস্যকরভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়ল। ফরোয়ার্ড ব্লক কোন জোটে যাবে, নীতির প্রশ্নে সেই মীমাংসা সম্ভব নয় বলে নিতে হল সবচেয়ে বেশী আসন পাওয়ার পথ। তাই ভোটদাতারা জানতে পারলেন যে, জোট বাঁধার প্রশ্নে এই দল কংগ্রেস এবং সি পি এম, দু পক্ষের সঙ্গেই আলোচনা চালাচ্ছে! তার পরের ইতিহাস খুবই সাম্প্রতিক তাই তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটা কথা এখানে বলা চলে। গতবারের আট-পার্টি জোটের প্রধান তিন শরিকের মধ্যে সি পি আই নির্বাচনের পরেই আরো কংগ্রেস-ঘেঁষা হয়ে ওঠে এবং এবারেও তার সেই রূপেই বর্তমান। অন্য দিকে এস ইউ সি কংগ্রেস-বিরোধিতা বজায় রাখে এবং বিধানসভায় স্পীকার নির্বাচন থেকে শুরু করে অনাস্থা প্রস্তাব পর্যন্ত নানা প্রশ্নে সি পি এমকে সমর্থন করে। এবারের নির্বাচনে তাই এস ইউ সি'র সি পি এম শিবিরে যোগদানের মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে। কিন্তু একমাত্র ফরোয়ার্ড ব্লকই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করার পরও আবার সি পি এম শিবিরে নাম লেখাল। এই দলের এই বাঁকাচোরা রাজনীতিকে ভোটদাতারা

কি চোখে দেখছেন, তা জানতে পারার জন্যে অবশ্য খুব বেশী দিন ধৈর্য ধরতে হবে না।

*
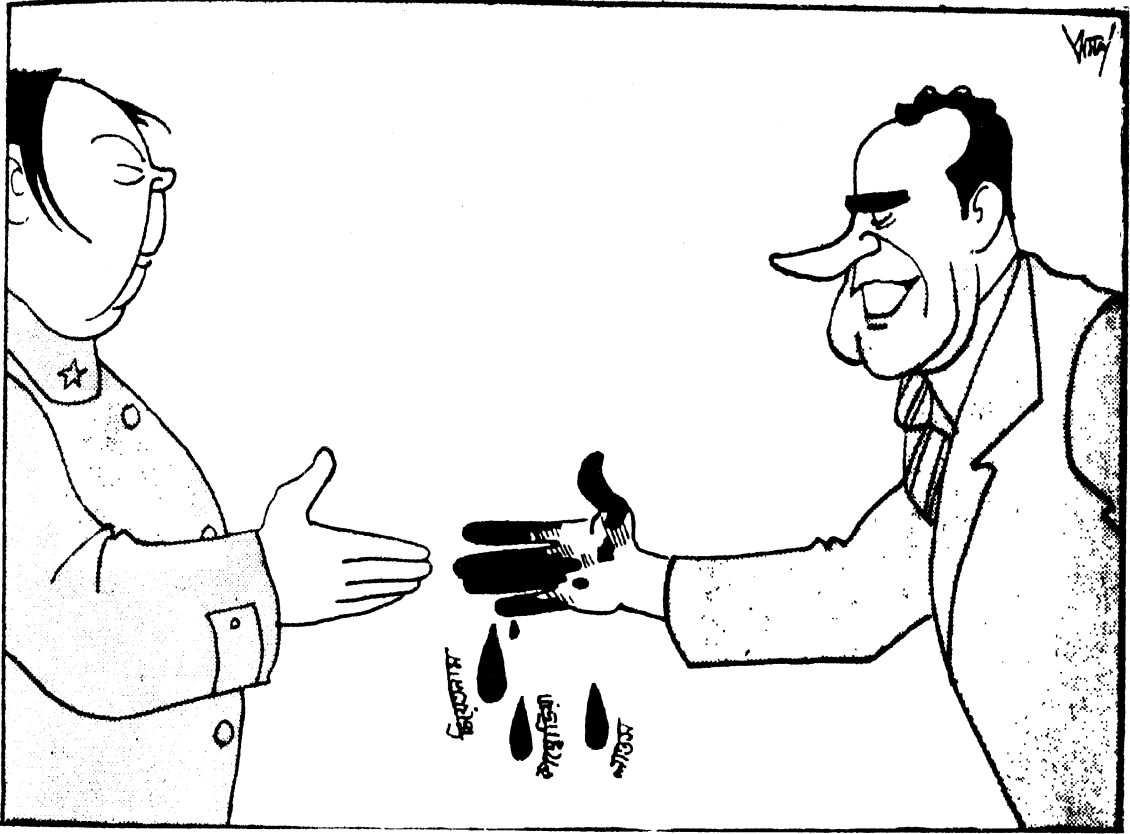
ফরোয়ার্ড ব্লকের না-হয় শেষ পর্যন্ত সি পি এমের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হল, কিন্তু আর একটি দল কোনো শিবিরেই যেতে পারল না। সেই দলটির নাম মুশ্লিম লীগ।

গত নির্বাচনে লীগ একাই লড়েছিল। জিতেছিল সাতটি আসনে। গত বিধানসভায় বিভিন্ন দলের যা আসন সংখ্যা ছিল তাতে এই সাতটি আসনের দাম মোটেই কম নয়। সেই দাম তারা পেয়েও ছিল, কারণ গণ-তান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় লীগের তিন-তিনজন প্রতিনিধি স্থান পেয়েছিলেন —স্বাধীনতার পর পশ্চিম বাংলায় সেই প্রথম। এবারও তাই লীগ যদি আশা করে ছিল যে, তারা কংগ্রেস জোটেই জায়গা পাবে। কিন্তু দেখা গেল, লীগ এবার কংগ্রেসের কাছে অচ্ছুৎ। তার কারণ, বাংলাদেশের ঘটনাবলী। যে-মুশ্লিম লীগ বাংলাদেশে নিষিদ্ধ এবং যে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই লীগের সঙ্গে কংগ্রেস হাত মেলায় কি করে?

ওদিকে সি পি এমও প্রকাশ্যে লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে নারাজ। তার প্রধান কারণ অবশ্যই লীগের 'সাম্প্রদায়িক' চরিত্র। তাছাড়া, যখন গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন গঠিত হয়েছিল তখন সি পি এম সর্বদাই ঐ সরকারকে 'কংগ্রেস-লীগ সরকার' বলে গাল দিত।

বাংলাদেশের ঘটনাবলী মুশ্লিম লীগকে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে অচ্ছুৎ করে তুলেছে দুটি কারণে। (এক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে এই দলের অস্পষ্ট মনোভাব। গত বিধানসভায় ঐ সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের পথ থেকে একটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল। কিন্তু কোয়ালিশন-এর শরিক হওয়া সত্ত্বেও লীগ সহজে ঐ প্রস্তাব সমর্থনে রাজী হতে পারেনি। কারণ, পূর্ব বাংলার স্বশাসনের দাবীর প্রতি দলের সমর্থন থাকলেও স্বাধীনতার দাবীর প্রতি তেমন উৎসাহ ছিল না। (দুই) বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্প্রদায়-ভিত্তিক রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছে এই উপমহাদেশে। মুশ্লিম লীগ যদিও বলতে চাইছে যে, এই দল সাম্প্রদায়িক নয় এবং প্রমাণ হিসেবে তারা গত নির্বাচনে কয়েকজন অ-মুসলমান প্রার্থীকে মনোনীত করেছিল, তবু তাদের সেই দাবী ধোপে টিঁকছে না। তার অন্যতম কারণ বোধ হয় দলের নামটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি কোনো দিনই তেমন প্রশ্রয় পায় নি যদিও এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কিছু কম হয় নি। সেটা এই রাজ্যের ভোটদাতাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই প্রমাণ। যেটা সবচেয়ে সুলক্ষণ, মুশ্লিম লীগ এই রাজ্যের মুসলমান ভোটদাতাদেরও তেমন প্রভাবিত করতে পারে নি। এই রাজ্যের ভোটদাতাদের মধ্যে শতকরা কুড়িজনই মুসলমান। কিন্তু ১৯৭১ সালের নির্বাচনে দেখা গেছে, লীগের প্রার্থীরা মোট ভোটের শতকরা মাত্র দেড় ভাগ ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ সব মুসলমান ভোটদাতাই শুধু মুশ্লিম লীগের ছাপ দেখে ভোট দিতে ছোটেন নি।

এবারের নির্বাচনে মুসলমানদের ভোট কোন্ দিকে যাবে তা ইতিমধ্যেই গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। তার কারণ, বেশ কয়েক-জন দায়িত্বশীল রাজনীতিক অভিযোগ করেছেন যে, মুসলমান ভোটদাতাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলেছে বাংলাদেশ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের জন্মের ফলে ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এবং তার জন্যে দায়ী কংগ্রেস এমন একটা বিষ কানে কানে ছড়ানো হচ্ছে। এর প্রভাব পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের ওপর কি হবে, তা হয়ত আগাম অনুমান করা মুশ্কিল। কিন্তু প্রতিবেশী বিহারে সাম্প্রতিক একটি উপনির্বাচনে এই ধরনের প্রচার বিশেষ কাজে আসে নি। দ্বারভাঙ্গায় কংগ্রেস প্রার্থীই জয়ী হয়েছেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে।

১৭।২।৭২ —দেবদত্ত

কলকাতায় পথের ধারে একটি দেওয়ালে নির্বাচনী প্রচারের একটি পোস্টার।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকসন একথা গোপন করেন নি যে, তাঁর দেশের মানুষ যে চটক ভালবাসে সেকথা মনে রেখেই তিনি তাঁর চীন সফরের পরিকল্পনা করেছেন। মার্কিন সংবাদসাময়িকী 'টাইম' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ১৯৭২ সালের গোড়াতেই তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, মানুষের চন্দ্রযাত্রার মতোই চটকদার (স্পেকটাকুলার) হবে তাঁর এই চীনযাত্রার সফর।

এই লেখা যখন 'অমৃত' পত্রিকার পাঠকদের সামনে পৌঁছবে তখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচেয়ে জনবহুল দুই দেশের নেতাদের মধ্যে শুভদৃষ্টি সারা হয়ে যাবে এবং প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রতিশ্রুত সেই চটকদার সফরের সংবাদ সংবাদপত্র-গুলির প্রথম পাতা জুড়ে থাকবে। ওয়াশিংটন থেকে তিনি ও তাঁর সহযাত্রীরা ইতিমধ্যে চীনের পথে বেরিয়ে পড়েছেন।

সারা পৃথিবীর মানুষ জানেন যে, এই সাক্ষাৎকার ঘটছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউস নিকসনের উদ্যোগে এবং তাঁর আগ্রহে। এই সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি যে দীর্ঘ ও সযত্ন প্রস্তুতি করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণও আমেরিকার ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণকে জানাতে বাকী রাখা হয় নি। পিকিংয়ের আমন্ত্রণ সংগ্রহ করার জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দূত হিসাবে ডাঃ হেনরী কিসিংগারকে গোপনে চীনে পাঠিয়েছেন, এই সফরের সংবাদ ও ছবি প্রচার করার জন্য আমেরিকার পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশনের ৮০ জনকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন (হাজার দুয়েক যেতে চেয়েছিলেন) এবং তাঁরা যাতে দ্রুত সংবাদ ও ছবি পাঠাতে পারেন সেজন্য কৃত্রিম উপগ্রহের মারফৎ চীনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সফরের জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন যে নিজেকে প্রায় পরীক্ষার আগে একজন পড়ুয়ার মতো প্রস্তুত করেছেন সেকথাও ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। কাজ চালাবার মত কিছু চীনা শব্দ তিনি শিখেছেন, বেশ কয়েকটি বই পড়ে চীন ও তার নেতাদের সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছেন (আঁদ্রে মলরোর 'অ্যান্টিমেমোয়ার্স', ডেনিস ব্লাডওয়ার্থের 'দি চাইনিজ লুকিং গ্লাস', জন কে ফেয়ারব্যাঙ্কের 'দি ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড চায়না' ও ফ্রান্সিস সু-র 'আমেরিকানস অ্যান্ড চাইনিজ') এবং আঁদ্রে মলরোকে নৈশ ভোজসভায় আমন্ত্রণ করে তাঁর কাছে চীন সম্পর্কে পাঠ নিয়েছেন।

এমন কি যে তারিখে নিকসন কম্যুনিষ্ট চীনে গিয়ে পৌঁছবেন সেই তারিখটাও মনে হয় বেশ সযত্নে ভেবে-চিন্তেই স্থির করা হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে চীনা পঞ্জিকার 'মূষিক বর্ষ' আরম্ভ হয়েছে। পুরাতন চীনা বর্ষ গণনায় 'মূষিক বর্ষ' হচ্ছে বর্ষবৃত্তের প্রথম বৎসর। বিশ্বাস এই যে, 'মূষিক বর্ষে' নূতন যুগের সূচনা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের চীনে এসে পৌঁছবার কথা এই চীনা নববর্ষের সপ্তম দিনে। এই দিনটি আবার একটি বিশেষ পয়মন্ত দিন হিসাবে গণ্য। এই দিন যদি রোদ ওঠে তাহলে সমগ্র মনুষ্য জাতির পক্ষে বছরটি ভাল যাবে বলে ধরে নেওয়া হয়। এটা আদৌ অসম্ভব নয় যে, দীর্ঘ দুই দশকের অধিককাল যাবৎ কম্যুনিষ্ট চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে অপরিচয়ের ব্যবধান গড়ে উঠেছে সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে চীনের মাটিতে পা দেওয়ার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখটি স্থির করার আগে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা

তারিখটির এই বিশেষ তাৎপর্যের কথা মনে রেখেছেন।

ডাঃ কিসিংগারকে পিকিং-এ পাঠিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে সেদেশে সফর করতে যাওয়ার আমন্ত্রণ সংগ্রহ করে এনেছেন, সেকথা প্রেসিডেন্ট নিকসন প্রথম প্রকাশ করেন গত বছর জুলাই মাসে। তারপর থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই নিকসন সাহেব বুঝিয়ে দিতে কসুর করেন নি যে, এই সফরের মধ্য দিয়ে তিনি ইতিহাস তৈরী করতে চলেছেন। (সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমেরিকার ভোটদাতাদের উদ্দেশে এই প্রচ্ছন্ন আবেদনও রাখতে চেয়েছেন যে, ঐ 'ইতিহাসের' স্রষ্টা হিসাবে তাঁকে ভোটদাতারা যেন আগামী নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় মনে রাখেন।)

বৃহত্তম ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ নেতাকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিশ্ববিপ্লবের পীঠস্থান চীনের নেতারাও যদি অনুরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা বোধ করে থাকেন তাহলে তার কোন লক্ষণ দিচ্ছেন না। এখন পর্যন্ত তাঁরা বাইরে একটা নিস্পৃহ ভাব দেখাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট নিকসন সেধে এই সফরে যাচ্ছেন, তাই আমরা তাঁকে আসতে দিতে রাজী হয়েছি। — এই হচ্ছে এখন পর্যন্ত চীনা নেতাদের প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া। তবে টুকিটাকি খবর থেকে আন্দাজ করে অনুমান করা যায় যে, চীনের নেতারা এই ব্যাপারে নিজেদের যতটা নিরাসক্ত বলে দেখাবার চেষ্টা করছেন আসলে তাঁরা ততটা নিরাসক্ত নন। পিকিংয়ের ঘর-দুয়ার রং করা হচ্ছে (যদিও সেটা নববর্ষ উপলক্ষে করা হয়েছে বলে চালান হচ্ছে), বিদেশে চীনা পাচকদের তলব করে আনা হয়েছে, পিকিং-এর সবচেয়ে সুসজ্জিত হাসপাতালটির নাম বদল করা হয়েছে (হাসপাতালটির নাম ছিল 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হাসপাতাল') এবং বিশিষ্ট অতিথিরা যাতে প্রয়োজন হলে ঐ হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ইত্যাদি।

রাষ্ট্রনেতাদের শীর্ষ সম্মেলন আজকাল বিশ্ব রাজনীতিতে আদৌ দুর্লভ ঘটনা নয়। কিন্তু আমেরিকা ও চীনের নেতাদের এই সম্মেলনের সঙ্গে আর কোন শীর্ষ-সম্মেলনের তুলনা হয় না। এর আগে কোন মার্কিন রাষ্ট্রপতি চীনে যান নি। এখন পর্যন্ত কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়াতেও যান নি, কিন্তু সেখানে যাওয়ার কথা হয়েছিল। ইউ-টু গোয়েন্দা বিমান রাশিয়ার আকাশে পাঠাবার ব্যাপার নিয়ে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের রুশ সফরের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায় এবং রুশ সৈন্যবাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করার পর প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর রুশ সফরের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।) [illegible] নেতারা একাধিকবার মার্কিন [illegible] এসে সেদেশের নেতাদের সঙ্গে [illegible] করেছেন। আর, অন্যদিকে, গত প্রায় ২২ বছর যাবৎ শুধু যে চীনের সঙ্গে আমেরিকার বলতে গেলে কোন যোগাযোগই ছিল না তাই নয়, এখনও চীনকে আমেরিকা কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় নি এবং এখনও চীনের নেতারা 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের' শাপান্ত না করে জলগ্রহণ করেন না।

তবু যে সেই শত্রুভাবাপন্ন অপরিচয়ের দেশের নেতাদের সঙ্গেই 'সংলাপ' চালাবার জন্য (প্রেসিডেন্ট নিকসন এটাকে 'আলোচনা' বা 'নেগোশিয়েশন' বলতে রাজী নন, 'সংলাপ' বা 'ডায়ালোগ' কথাটাই তাঁর বেশী পছন্দ) চন্দ্রযাত্রার সঙ্গে তুলনীয় অভিযানে বেরিয়েছেন সেটা কোন্ উদ্দেশ্যে? নিকসন সাহেব এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, এই সফর থেকে নগদ নগদ ফললাভ হবে এমন আশা যেন কেউ না করেন। সাফল্যের আশা নিয়ে নয়, প্রয়োজন মনে করেই তিনি নাকি এই সফরে বেরিয়েছেন।

কিন্তু আশু ফললাভ কিছু হোক বা না হোক, এই ধরনের একটা সফরের তাৎপর্য অবশ্যই থাকবে হবে। এটা কি একান্তই অসম্ভব যে, এই সফরের প্রধান তাৎপর্য হল এই যে, আমেরিকা ও চীন আসলে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাত মেলাতে চাইছে? প্রেসিডেন্ট নিকসন অবশ্য জোরের সঙ্গে এবং বার বার তাঁর সফরের এই ব্যাখ্যা অস্বীকার করেছেন। 'টাইম' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হেডলী ডোনোভানসহ ঐ পত্রিকার কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই সফরের গোড়ায় প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছেন, 'চীন রাশিয়াকে পরস্পরের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া আমাদের নীতির উদ্দেশ্য নয়।' চীন যাত্রার প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। রাশিয়া ও চীনের বিরোধের সুযোগ নেওয়া যে আমেরিকার উদ্দেশ্য নয় সেকথা বোঝাবার জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, শান্তির সন্ধানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যেমন পিকিংয়ে যাচ্ছেন তেমনি তাঁর আগামী মে মাসে মস্কোতেও যাওয়ার কথা আছে। একথাও ঠিক যে, প্রেসিডেন্ট নিকসনের চীন যাত্রার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত হওয়ার পরও বিভিন্ন বিষয়ে রুশ-মার্কিন সংলাপে কোন ছেদ পড়ে নি অথবা বাধা উপস্থিত হয় নি। বার্লিন সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছে, জীবাণুযুদ্ধ নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছে এবং অস্ত্রসজ্জা সীমিত করা সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে আলোচনা এগিয়েছে।

কিন্তু আমেরিকা যাই বলুন না কেন, বিভিন্ন লক্ষণ দেখে এই সন্দেহ ক্রমেই গাঢ়তর হচ্ছে যে, সোভিয়েট রাশিয়াকে সামলান ও তার সঙ্গে টক্কর দেওয়াই আমেরিকার মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের চীন সফরের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। বিলাতের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার লেখক, সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ ভিক্টর জোর্জা লিখেছেন, রাশিয়া নিজেও এখন প্রেসিডেন্ট নিকসনের পিকিং সফরকে এই রকম একটা সন্দেহের চোখে দেখছে।

'ভয়েস অব আমেরিকা' রেডিওর খবরের প্রচার উদ্ধৃত করে রুশ সংবাদপত্রগুলি লিখছে যে, রাশিয়া যে চীনকে আক্রমণ করতে উদ্যত, একথাটা আমেরিকা এখন খুব ভালভাবেই চীনকে বোঝাবার চেষ্টা

করছে। এটা নিশ্চয়ই তাৎপর্যহীন নয় যে নিকসনের চীন যাত্রার প্রাক্কালে আমেরিকান সাংবাদিক জোসেফ অ্যালসপ একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিয়েছেন। সংবাদটি হচ্ছে এই যে, ১৯৬৯ সালে সোভিয়েট রাশিয়া চীনের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণশালাগুলি ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল এবং এই ব্যাপারে আমেরিকা যাতে 'অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে' সেজন্য আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসন অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সে সময়ে রাশিয়াকে বাধা দেওয়ার ফলেই তখন নাকি চীন রক্ষা পেয়ে যায়। সকলেই জানেন যে, অ্যালসপের সঙ্গে নিকসন সরকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এবং নিকসন সরকারের তরফ থেকে ঠিক এই সময়ে এই ধরনের একটি সংবাদ প্রকাশ করার প্রয়োজন না থাকলে অ্যালসপ এটা লিখতে যেতেন না।

আমেরিকা যে রুশ-চীন বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক নয় তার আরও কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণ উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ যেমন—

...(১) গত বছর প্রেসিডেন্ট নিকসন বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কিত তাঁর বার্তায় বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নততর হলে চীন 'নূতন পথে' তার শক্তিকে চালনা করতে পারবে।

(২) ১৯৭০ সালে একটি সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছিলেন, রাশিয়া যে বিপজ্জনক চাল দিচ্ছে তার একটা জবাব হবে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলা।

একমাত্র সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল গ্রেচকো ছাড়া আর কোন উচ্চ পর্যায়ের রুশ নেতা অবশ্য এখন পর্যন্ত চীন-মার্কিন সংলাপ সম্পর্কে প্রকাশ্যে এই ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তাঁরা যে এই ঘটনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন তাতে সংশয় নেই। দরকার হলে তাঁরাও যে পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেরী করবেন না তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাশিয়ার অজানা নেই যে, আমেরিকা আগে না জানিয়ে চীনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় টোকিও, সিওল, সায়গন প্রভৃতি রাজধানীতে উষ্মা ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার হয়েছে। রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন সম্প্রতি জাপানে গিয়ে যে সে দেশের এই ক্ষতটি খুঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

আমেরিকা-চীন বোঝাপড়ার আসল লক্ষ্য হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া, এটা ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে নিছক অনুমানের চেয়ে কিছু বেশী। অন্তত একজন দায়িত্বশীল আমেরিকান বলেছেন যে, সম্প্রতি ভারতীয় উপমহাদেশে আমেরিকার সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তার সবচেয়ে সহজবোধ্য ব্যাখ্যা হল চীনের সঙ্গে আমেরিকার এই জোট বাঁধার চেষ্টা। এই আমেরিকান হলেন ভারতে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলস। দক্ষিণ এশিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা রোধ করা যেমন আমেরিকার উদ্দেশ্য, তেমনি চীনেরও। একই উদ্দেশ্য নিয়ে তাই তারা উভয়েই পাকিস্তানের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই প্রেসিডেন্ট নিকসন যখন ভারতের সঙ্গে 'গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ' আরম্ভ করার কথা বলেন তখন সর্ত আরোপ করেন যে, ভারতকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'অধিকতর ভারসাম্য' স্থাপন করতে হবে (অর্থাৎ, সোজা কথায় আমেরিকারও পা রাখার জায়গা দিতে হবে)।

আমেরিকান সাংবাদিক জ্যাক অ্যান্ডারসন সর্বশেষ যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় রাশিয়ার গতি রোধ করাটা প্রেসিডেন্ট নিকসন এতই জরুরী মনে করেছেন যে, তার জন্য তিনি এমন কি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একটা পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ারও ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোও আন্তর্জাতিক রাজনীতির একই অংক কষছেন। তাই প্রেসিডেন্ট নিকসনের চীন যাত্রার প্রাক্কালে তিনি 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর সি এল সুলেজবার্গারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আবার ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন, ভারতকে উস্কানী দেওয়ার জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে দায়ী করেছেন এবং আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি নূতন করে ঝালিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্যের জন্যও তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানকে আবার অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার অথবা তার সঙ্গে নূতন প্রতিরক্ষা চুক্তি করার কোন ইচ্ছা আমেরিকার নেই। কিন্তু আমেরিকার এই কথাই যে শেষ কথা এমন মনে করার কারণ নেই। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আমেরিকা মুখে যা বলেছে গোপনে তার বিপরীত কাজ করেছে, অতীতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব দেখা যায় নি।

*

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সদ্য-অপসারিত শ্যামাচরণ শুক্ল মহাশয় একজন সৌখিন মানুষ বলে পরিচিত। সরকারী টাকায় তিনি কিভাবে সখ মিটিয়েছেন তার একটি বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। ভূপালে নবনির্মিত আরেরা হিলের উপর অবস্থিত সচিবালয় ভবনের মধ্যে তিনি যে নিজের জন্য ছয়-কামরার সরকারী চেম্বার বানিয়েছিলেন সেটি তৈরী করতে অনুমান চার লাখ টাকার বেশী খরচ পড়েছে। এই চেম্বারের জন্য রাজস্থান থেকে এসেছে মাকারানা মার্বেল, গোয়ালিয়র থেকে এসেছে পুরু নীল ও বাদামী রংএর কার্পেট এবং দিল্লী থেকে এসেছে বিরাট কাঁচ দিয়ে মোড়া ডেস্ক, ডজনখানেক সোফা সেট, হেলানো চেয়ার, ডিভান, পুরো মাপের আয়না-লাগান ড্রেসিং টেবল প্রভৃতি সমেত বিচিত্র বর্ণের আসবাবপত্র। এই চেম্বারের দেওয়ালগুলি কাঁচের—যাতে ঐ কাঁচের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সারা শহরটিকে ছবির মতো দেখায়। ঐ কাঁচের উপর পুরু রেশম ও নাইলন নেটিংয়ের দুই প্রস্থ পর্দা দেওয়া আছে।

মধ্যপ্রদেশের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশচন্দ্র শেঠী ইতিমধ্যে শুক্ল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, ঐ আমলে একশ টাকা দিয়ে একজন সরকারী কর্মচারী নিজের ইচ্ছামত জায়গায় বদলী হতে পারতেন এবং দেড়শ টাকা দিয়ে বদলীর আদেশ রদ করা যেত।

শুক্ল মন্ত্রিসভার ৪০ জন সদস্যকে মুখ্যমন্ত্রী শেঠী 'আলিবাবার চল্লিশ চোর'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১৭-২-৭২

রাষ্ট্রপতি নিক্সনের হিজিবিজি

Doodle by President Richard M. Nixon, from "The Doodle Book" by Norman Burton Uris, published by the Macmillan Co., USA, 1970 ©

প্রায় প্রারম্ভ থেকেই মনোবিজ্ঞান মানুষের সচেতন প্রয়াসের চেয়ে অসতর্ক অবচেতন কাজের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত পরিচয়ের গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। যেমন, অনেক গৃহস্থই নিতান্ত অবাঞ্ছিত কোন আগন্তুককেও হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু সেই অনভিপ্রেত আগন্তুক সম্পর্কে অভ্যর্থনাকারীর প্রকৃত মনোভাব তাঁর কপট সৌজন্য-বিকশিত হাসির মধ্যে পাওয়া যাবে না। যাবে তৎপরবর্তী-কালে তার সেই অনাহূত অতিথির প্রতি অবচেতন অবহেলায় এবং আপাত অনভি-প্রেত অবজ্ঞায়।

সিঁদেল চোর যখন কোন বাড়ী কিম্বা ব্যাঙ্কে চুরি করতে ঢোকে, তখন সে খুবই সাবধানে দীর্ঘ প্রস্তুতির পরই তা করে। তবু সে যেমন সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় গোয়েন্দা পুলিশের অতি সতর্ক দৃষ্টির অনুসন্ধান-সাধ্য ব্যক্তি পরিচয়ের নানা চিহ্ন, আঙুলের ছাপ, পায়ের দাগ রেখে যায় তেমনি করেই সাধারণ মানুষ যখন সযত্ন প্রচেষ্টাতেও কোন কাজ করে, কথা বলে, ছবি আঁকে, লিখে চলে তখন তার মানসিক পরিচয়ের নানা সঙ্কেত রেখে যায়। মনোবিশ্লেষণ-কারীদের কাছে সেগুলির মূল্য প্রভূত।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে শেষোক্ত পদ্ধতিটি, অর্থাৎ মানুষের সচেতন ও শিক্ষানির্ভর প্রচেষ্টা হাতের লেখার মাধ্যমে তার অবচেতন ব্যক্তিসত্তার পরিচয় অনু-ধাবনকে বলা হয় লিপিবিজ্ঞান বা GRAPHOLOGY—এই বিদ্যার চর্চাকারীদের

Anthony Barber: "I doodle mainly when I am having a long phone call, and sometimes at meetings when I entirely agree with the speake· '

বৃটেনের বর্তমান অর্থসচিব এন্থনী বারবারের হিজিবিজি

Co''n Cowdrey: "I doodle slowly and mostly round words, notes I've made or lists of teams. I often make a terrible mess of my 'minutes"

ক্রিকেট নায়ক কলিন কাউড্রের হিজিবিজি

Doodle by Frank Sinatra, also from "The Doodle Book" by Norman Burton Uris, published by the Macmillan Co., USA, 1970 ©

ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার হিজিবিজি

লেখক আর্থার কোয়েসলারের হিজিবিজি

Arthur Koestler: "I haven't really got anything to say about my doodles at all. I just doodle. I doodle on the back of my manuscripts and various odd bits of paper. But it's not compulsive, I only doodle now and then. I don't doodle anything in particular; I don't read any significance into my doodles"

মতে 'হাতের লেখা' কথাটাই ভুল। কারণ আমরা যখন লিখি তখন হাত নয়, মস্তিষ্কই হচ্ছে প্রকৃত যন্ত্রী। হাত যন্ত্রমাত্র। মস্তিষ্কের প্রেরণা ও অনুজ্ঞাই আমাদের বাহু, কব্জি ও অঙ্গুলিকে পরিচালনা করে—আমাদের লেখায়। সুতরাং চলা-বলা-হাসা কিম্বা স্নেহ-প্রেম-ঘৃণা-ভয় প্রভৃতি আর পাঁচটা অভিব্যক্তির মতই হাতের লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি। তাই লেখার বক্তব্যের মধ্যে যেমন আমাদের সচেতন মনের চিন্তা-ভাবনাগুলি প্রতিফলিত হয় তেমনি তার লিপিমালার ভঙ্গী, টান ও ফাঁসের মধ্যে অবচেতনভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বের অনেকখানি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তার নিষ্ঠা-আবেগ-উদ্বেগ প্রভৃতি মানসিক অবস্থা ও যৌনপরিচয় প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়।

ওই লিপিবিজ্ঞানীদের আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণা হচ্ছে হিজি-বিজি, ইংরাজিতে যাকে বলে ডুডলিং। যদিও লেখারই মত মানুষ কাগজের ওপর কলম-পেন্সিল দিয়েই হিজি-বিজি কাটে তবু লেখার চেয়ে তা বহু পরিমাণে অবচেতন। কেউ বা কোন মিটিং কিম্বা দীর্ঘ টেলিফোন আলাপের একঘেয়েমী এড়াবার জন্যে হিজি-বিজি কাটেন। কেউ কাটেন নৈরাশ্যে, কেউ মনঃসংযোগ চেষ্টায় কেউবা উপভোগ্য একটি বিষয়ান্তরের ব্যস্ততে। তবু তাঁরা সবাই অন্য বা অর্ধমনস্ক অবচেতন রেখার টানে-বক্রে কিম্বা কোণে রেখে যান নিজ ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত। যেমন দৃঢ় রেখার টানে ব্যক্ত হয় আগ্রাসী প্রকৃতির। বিকল ও বিকৃত নারীর প্রতিচ্ছবিতে নারী সংসর্গে অনীহা ইত্যাদি।

পৃথিবীর বহু ইতিহাসখ্যাত ও কুখ্যাত ব্যক্তি অবিশ্রান্তভাবে হিজিবিজি কেটে তৃপ্তি পেতেন। বিশিষ্ট সুইস লিপি-বিজ্ঞানী মাকস পুলভার বলেছেন, 'সচেতন লেখা হচ্ছে অবচেতন অঙ্কন'।—কথাটা ঘুরিয়ে বলা চলে যে অবচেতন অঙ্কন (হিজিবিজি কাটা) হচ্ছে সচেতন লেখার সমতুল্য। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার প্রথম পর্যায়ে সেই সচেতন লেখার সমতুল্য অবচেতন অঙ্কনের এক মহিমান্বিত বিকাশই আমরা দেখেছি। সে যেন কবির হৃদয় মহাসমুদ্রের গহনে মাণিক-মুক্তার অনন্ত ঐশ্বর্যের হঠাৎ ঝলকানি।

রবীন্দ্রনাথেরই প্রায় সমকালে রাশিয়ার দুরন্ত নায়ক স্ট্যালিনও অনেক হিজিবিজি কেটে গেছেন। তবে তিনি সাধারণত সেগুলি করে গেছেন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসে। প্রথমে তিনি পেন্সিল দিয়ে আঁকতেন জ্যামিতির ছক। তারপর গাঢ়, কালো, মোটা-মোটা দাগে সেই ছককে করে তুলতেন এক-একটি অনামা কল্পিত কিন্তু ভীষণাকৃতি জন্তু। কখনো বা ব্যাদিত থাবা নেকড়ে। অন্য সময় বাঁকা, মোটা তীক্ষ্ন দীর্ঘ তীর, ত্রিভুজ ও শূলের ফলা।

স্ট্যালিন প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেসেরও ক্রমাগত হিজিবিজি কাটার অভ্যাস ছিল। তাই কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর পাছে সেগুলি রাশিয়ানদের হাতে পড়ে কোন কিছু ফাঁস হয়ে যায়, সেই শঙ্কায় আমেরিকার গুপ্ত পুলিশেরা সেগুলি দ্রুত হাতে সরিয়ে ফেলতো।

যুদ্ধোত্তর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলী নানা রঙের পেন্সিল দিয়ে আঁকতেন জ্যামিতিক আকৃতি। সেগুলি যেন তাঁর ধীর কিন্তু নিশ্চিত মনের প্রতিফলন।

১৯৪৭ সালের ১লা জুন লর্ড মাউন্ট-ব্যাটনের সঙ্গে কালান্তর বৈঠকে বসে ভারতের নেতারা যখন ভারত বিভাগের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন সেই নেতৃবৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে খুঁতখুঁতে, একগুঁয়ে, দাম্ভিক এবং সম্ভবত সবচেয়ে স্বার্থসর্বস্ব, নিঃসঙ্গ ও বদমেজাজী মহম্মদ আলী জিন্না এক টুকরো কাগজের ওপর আঁকেন একটি কিম্ভূত কিমাকার প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরাস সদৃশ জন্তু-দানব। লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের সংবাদসচিব অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'মিশন উইথ মাউন্ট-ব্যাটেন' নামক গ্রন্থে সেই অঙ্কনের বা হিজিবিজির একটি প্রতিলিপি প্রকাশ করেছেন। মিঃ ক্যাম্বেল জনসন সেটি ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেই প্রভাতের শেষে আমিও ছোট গোল টেবিলটি থেকে একটি বিজয়-স্মারক সংগ্রহ করলাম। জিনিসটি আর কিছুই নয়, এক টুকরো কাগজের ওপর অন্যমনস্কভাবে জিন্নার আঁকা একটি হিজি-বিজি। বৃহত্তম জয়ের মুহূর্তে সেটি তাঁর অবচেতন মন থেকে নির্গত হয়েছে। আমি মনস্তত্ত্ববিদ নই, তবু মনে হয় এরই মধ্যে ক্ষমতা ও গৌরবের প্রতীক অনুভব করতে পারছি।'

মনস্তত্ত্ববিদ আমিও নই। তবু মিঃ ক্যাম্বেল জনসনের কাছে কয়েক বছর আগে মিঃ জিন্নার সেই হিজিবিজিটি দেখে মনে হয়েছিল সেটির রচয়িতা সেই সময় যে অসুর রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে চলেছিলেন ডাইনোসিরাস সদৃশ সেই জন্তু-দানবটি যেন তারই প্রতিমূর্তি। তবে প্রকৃতিসৃষ্ট ডাইনো-সিরাস আর যাই হোক, ছিল নিরামিষাশী ও অহিংস। ধরাপৃষ্ঠে তারা বেঁচেও ছিল বহু হাজার বছর। কিন্তু জিন্নাসৃষ্ট রাষ্ট্র-অসুরটি হল রক্তলোলুপ ও আগ্রাসী এবং একটি শতাব্দীর চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হবার আগেই তার অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে বিপন্ন।

মহানন্দ চোখ মেলল। ঘরের জমাট অন্ধকারের মধ্যে তাকাল সে জ্বল জ্বল করে। কখন খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে, সমস্ত দুপুর বিকেলটাই কেটে গেছে ঘুমের মধ্যে। দু-রাত ভাল করে ঘুম হয় নি। সমস্ত গায়ে গতরে টনটনে ব্যথা অনুভব করল। নরম থাবার মধ্যে লুকিয়ে রাখা নখগুলোকে বেড়াল যেমন ঘুমের আমেজ ভাঙলে ছড়িয়ে দেয়, তেমনি করে গোটান হাত-পাগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চিত হয়ে শুল মহানন্দ। শিথিলতা ছুঁয়ে রয়েছে সমস্ত শরীর জুড়ে। চিলকা হ্রদের মাছ আনতে গেলে এমনিই হয়। যাতায়াতে দু-দুটো রাত কেটে যায় ট্রেনে। ফিরে এলে অন্তত পুরো একটা দিনও বিশ্রাম না নিলে আবার যাওয়া যায় না। বিশ্রাম নেওয়া মানেই ক্ষতি। চাকরি ত নয়, মাছের মহাজনী কারবার। যত গায়ে গতরে খাটতে পারা যাবে, পয়সা তলা যাবে, ততই লাভ এ কারবারে। কারখানায় যখন চাকরি করত তখন খেয়াল-খুশীমত কামাই করলেও চলত, ছুটিছাটা ছিল। কারখানার মত কারখানা। কয়েক হাজার শ্রমিক, কেরানী, অফিসার, পিওন ইঞ্জিনীয়ার কাজ করত। কর্মচারীদের কোয়ার্টার, মেডিকাল এইড, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচা, বোনাস সব কিছু ছিল। অমন ডাকসাইটে কারখানা লক-আউট হয়ে গেল চোখের সামনে। তাই ত মহানন্দ নিরুপায় হয়ে মাছের কারবারে নেমে পড়ল দেরি না করে। অবশ্য পরামর্শটা সুবল দেউটি দিয়েছিল তাকে। সুবল তার বন্ধু। বহু বছর ধরে করছে সে এ কারবার। এখন সে একজন পাকা মহাজন।

অন্ধকারেই হাই তুলল মহানন্দ। হ্যারিকেনের এক চিলতে আলো ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। মিশমিশে অন্ধকারটা চোখ থেকে সরে গেল। মনোরমা সন্ধ্যে দিয়েছে, হ্যারিকেন ধরিয়েছে। আতু নিতু বিলাস নেপাল কাউকেই দেখছে না ঘরে। নেপাল অবশ্য বেপাত্তা হয়েই থাকে। ঘরের জানলাগুলো সপাট বন্ধ। কেবল একটি খোলা জানলার ভাঙা শার্সি দিয়ে বাইরের এক-চিলতে ভিজে আকাশ চোখে পড়ছে। বুঝতে পারল মহানন্দ বাইরে ভীষণ তান্ডবলীলা চলেছে। জল-ঝড়ের গোঙানিটা কানে এল।

—ওগো, তোমার পায়ের দিকের জানলাটা বন্ধ করে দাও, বিছানা ভিজে গেল যে!

দালান থেকেই হেঁকে বলল মনোরমা।

মহানন্দ আর মনোরমা। ওপার বাংলো থেকে এসেই অতি কষ্টে কাজ জোগাড় করেছিল মহানন্দ কারখানায়। কারখানায় কাজ করতে করতেই বিয়ে করেছিল সে মনোরমাকে। সে অনেক দিনের কথা। অতীতের সেই টুকরো টুকরো সুখের মনোরম আঁচ এখনও যেন পোড়া মনে তা দিচ্ছে গুমিয়ে গুমিয়ে। এখন বড় মেয়ে আতু কলেজে পড়ে, বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। বড় ছেলে নিতু উনিশ-কুড়ি বছরের, আসছে বারে হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। ছোট ছেলে নেপাল ষোল-সতের বছরের। ঠেকে ঠেকে খেতে খেতে কোন মতে স্কুলের নবম শ্রেণীতে উঠেছে এবার। ছোট মেয়ে বিলাস দশ-এগার বছরের, প্রাইমারীতে পড়ে। সংসারে খরচ কম নয়। বেশ ভাল করে বুঝেছে মহানন্দ, কারবারে নামতে গেলেই কিছু টাকা মজুত রাখা চাই অসময়ের জন্যে। কিন্তু তার সে অবস্থা কোথায়? যত্র আয় তত্র ব্যয়। কখনো কখন ডানে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। এ কারবারে কেন যেন আস্থাও রাখতে পারছে না। ছা-পোষা লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। বাঁধা মাইনের চাকরি নয়। নিয়মিত যেতে পারলে অবশ্য পয়সার অভাব হয় না। তবে মাছের বাজার উঠতি

পড়তি। ভরসা রাখা দায়। কিন্তু বহু ফড়ে মহাজন এই কারবার করে শুধু সংসারই চালাচ্ছে না, ঘর-বাড়িও তুলছে। সুবল দেউটির অবস্থা ত ফিরেই গেছে। বাড়ি করেছে, আবার দোকান চালাচ্ছে একটা।

—বাবা, দেখতে পাচ্ছ না? বৃষ্টির ঝাপটায় সব যে ভিজে গেল!

বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে, বিছানা ভিজিয়ে দিচ্ছে, তবুও খেয়াল হয় নি মহানন্দর। বড় মেয়ে আতু মহানন্দর পায়ের দিকের আধ খোলা জানলাটা এ'টে দিয়ে চলে গেল। বাইরে সব লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে। বোধহয় বান ডেকেছে কোথাও। বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ। ঘরে শুয়েই বৃষ্টির জলের ঘ্রাণ নিতে পারছে মহানন্দ। এই দুর্যোগে আজ বেরবে কি করে বুঝে উঠতে পারছে না। আজকে চিলকায় তাকে যেতেই হবে। পরশুর পরের দিন থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার জন্যে বাঙলা বন্ধ। আজকে বেরিয়ে পরশু সকালের মধ্যে ফিরতে পারলে তবুও কিছু কিছু বিক্রি হবে। কিন্তু কালকে বেরলে মাছ নিয়ে মুস্কিলেই পড়তে হবে। হিসেব করে দেখল, ঠিক তিন দিন পরেই ধর্মঘট। বাজার বসবে না। ফড়ে মহাজনেরাও আসবে না স্টেশনে।

যাতায়াতের ধকলই কি কম? তাকে রওনা হতে হয় পুরী একসপ্রেসে। ছাড়ে রাত্রে। খুরদা জংশন থেকে পালটাতে হয় গাড়ি ভোরবেলা। পুরী-হায়দ্রাবাদ প্যাসেন-জার ধরতে হয়। রাত জাগা ট্রেনটা ঝিমোতে ঝিমোতে আসে কালুপাড়া ঘাট, ভুষণ্ডপুর তারপর বালুগাঁও। বালুগাঁও আসতে আসতে বেলা নটা-দশটা বেজে যায়। এখানেই নেমে পড়তে হয় তাকে। এখান থেকে চিলকার জেলে-ঘাটে যাওয়া সুবিধে। বালুগাঁও থেকে হাঁটা পথে খানিকটা গেলেই চোখে পড়বে কাটা মাছের পেটির মত পড়ে রয়েছে চিলকা হ্রদ।

মহানন্দ বালুগাঁও স্টেশনে নেমে কাছা-কাছি একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেয়ে ফুক ফুক করে বিড়ি টানতে টানতে বিশ্রাম নেয় খানিকক্ষণ। সকালের দিকে আড়ত-দারেরা চিলকার মেছোহাটে আসে না। সে সময় বেচা-কেনাও চলে না। চায়ের দোকানে চায়ের পাট চুকিয়ে চলে আসে সে একটা হোটেলে। মাদ্রাজী হিন্দু হোটেল। এইটেই তার বাঁধা হোটেল। বালুগাঁওয়ের বিখ্যাত হোটেল। কাছাকাছি একটা পুকুরে চান সেরে হোটেলে খেয়ে নেয় সে। রাত জাগার ক্লান্তিটুকু দূর করে হোটেলের বারান্দায় পাতা একটা খাটিয়ায় শুয়ে। সর্বক্ষণ যে সুতীর ব্যাগটা তার কাঁধে ঝোলান থাকে সেই ব্যাগটা মাথায় দিয়ে বিড়ি অথবা সিগারেট টানতে টানতে গা-হাত-পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে শোয়। সেই সময় রাজ্যের চিন্তা এসে ঘুরপাক খায় মাথায়। লক-আউট কার-খানা। ফের অন্য কোথাও চাকরি জুটবে না, এই মাছের কারবারই করতে হবে বাকী জীবনটুকু? কারখানার প্রভিডেন্ট-ফানডের টাকাটা আর কবেই বা পাবে? আতুটা বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে। কেমন ছন্নমনে ভাব। নেপালের সঙ্গে যে ছেলেটা প্রায়ই আসে, কি যেন তার নাম? শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তর সঙ্গে আজকাল খুব বেশী রকম ফাস্টনাষ্টি করে আতু। শ্রীমন্ত আসলে বড় ছেলে নেপুর বন্ধু। ইদানীং নেপালের সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা করছে। শ্রীমন্তের খপ্পরে পড়ে ছেলেটা ছড় খেয়ে গেল। তার কাটা ছিনতাই করা আর ওয়াগন ভাঙায় ওস্তাদ হয় উঠেছে ওরা। শ্রীমন্ত আর নেপালের কাছে বারকয়েক তাজা বোমা পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশের খাতায় নাম উঠে গেছে নেপালের। পাড়ায় বা আশপাশে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই বাড়িতে চড়াও হয়ে আসে পুলিশ। নেপালকে নিয়ে বাড়িশুদ্ধ তখন অশান্তি আর দুশ্চিন্তা। ছেলেটা বড় ব্যাদড়া। কোন কথা শোনে না। নিজেদের অবস্থাও বোঝে না।

সেদিন সারা রাত বাড়ি ছিল না নেপাল। হঠাৎ ভোরের দিকে কোথা থেকে গুচ্ছের চোরাই তামার পাত আর তার বাড়িতে এনে ঢোকাতেই মুখ ঝামটিয়ে উঠেছিল আতু—স্কুলে যাওয়া নেই, পড়া-শোনা নেই, ভাল কাজ নেই, খালি অকাজ-কুকাজ করে বেড়ান, একটা মূর্তিমান অশান্তি হয়েছিস তুই!

বেয়াদবি গলায় পালটা জবাব দিয়েছিল নেপাল তক্ষুণি—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি দিদি, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের মত থাকবি। যতই কলেজে পড়, তুই দেশের হালচাল কি বুঝবি? পড়াশোনা করে কি হবে? চাকরি কোথায়? চাকরি যারা পায়, কেউ মাইনে পায় তারা?

—তাই বলে গুন্ডামি করবি?

—দেশের যে রকম অবস্থা সেই রকম ত চলতে হবে। এখন সৎ হলে চলবে না। নিরীহ গোবেচারা লোকের ঠাঁই নেই। তারা পড়ে পড়ে মার খায়। বাবাদের কারখানা খুলল? খুব ত অহিংসভাবে প্রতিবাদ জানাল, ধর্মঘট চলল—হল কি?

নিজের ছেলেকে এই রকম জঘন্য সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখে হতাশায় আর আত্মগ্লানিতে ভেঙে পড়েছিল মহানন্দ। কোনদিন কারো সঙ্গে উগ্র মেজাজে কথা বলে নি সে। ছেলেমেয়েদের শাসন করে নি উঁচু গলায়। কিন্তু সেদিন মহানন্দ প্রচণ্ড রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে জুতো দিয়ে মারতে গিয়েছিল নেপালকে। তক্ষুনি আতুই ঠেকিয়েছিল মহানন্দকে। পরমুহূর্তে তীব্র ঘৃণায় মুখ কুঁচকিয়ে কঠিন গলায় বলেছিল মহানন্দ—আতু, ও পাপকে বিদেয় কর বাড়ি থেকে! এখানে ওর ভাত নেই।

সেই থেকে বাড়িতে আর থাকে না নেপাল। আসেও খুব কম। আতুকে নিয়েও কি মহানন্দর কম চিন্তা? তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার, তা না হলে শ্রীমন্তর সঙ্গেই হয়তো ফেঁসে যাবে। কিন্তু কি করে বিয়ে দেবে সে? টাকা কোথায়? বিলালিটা এখনও ছোট। ওর স্কুলে অনেকগুলো টাকা মাইনে বাকী পড়েছে। নামও নাকি খাতা থেকে কেটে দিয়েছে। বিলালি রোজই একবার করে খোঁচায় তাকে। নীচু ক্লাশ বলে ভ্রূক্ষেপই করা হয় না। বড় ছেলে নিতুটা দিনরাত তবলা নিয়ে ব্যস্ত। সকলেই বলে তবলার হাত নাকি ওর ভালই হবে। কিন্তু তবলা শিখতে গিয়ে পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। আসছে বারে কমার্স নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে সে। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তার। একটা প্রাইভেট টিউটর রাখাও দরকার। কিন্তু টাকা কোথায়? মনোরমার ওপর এখন কেন যেন মায়া হয় ভীষণ। ভূতের মত খাটে। ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরণে। সায়া বেরিয়ে থাকে। সায়ার সঙ্গে লাগান ছেঁড়া লেসটা ঝুলতে থাকে। রাউসে বোতাম থাকে না। গায়ের গয়না-গুলো একটি একটি করে বিক্রি করেছে মহানন্দ। মুখ ফুটে একটি প্রতিবাদও করে নি মনোরমা। মনোরমা জানে, হালে পানি পেতে হিমসিম খাচ্ছে তার স্বামী। চিন্তা করতে করতে খাটিয়ার ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ে মহানন্দ। ঘুমটা ছুটে যায় ঠিক বিকেল বিকেল করে। তারপর চা খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে সুতীর ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সোজা চলে আসে সে চিলকার জেলে-ঘাটে।

সূর্যের নিবন্ত আলোর কণাগুলো নিস্তেজ শিখার মত ছড়িয়ে থাকে তখন চিলকার পাড়ে, দূরের দ্বীপগুলোতে। চিলকার চর, বিস্তৃত বেলেমাটির চর। একপাশে ঘন জঙ্গল। চিলকার মাটির হৃদস্পন্দন অনুভব করতে পারে মহানন্দ জেলে ঘাটায় এলে। যেমন করে ঈশ্বরদিতে থাকতে পদ্মার পাড়ের হৃদস্পন্দন শুনতে পেত সে ছোটবেলায়। চিলকার বুকে কোন ঢেউ নেই। নিস্তরঙ্গ শান্ত স্থির। জায়গায় জায়গায় দ্বীপ। শরবন আর হোগলার বনে ভর্তি দ্বীপগুলো। দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো কেমন ধ্যানস্থ। চিলকার নিস্তরঙ্গ বুকে নানা জাতের পাখি এসে বসে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে বেলে হাঁস বক আর চখাচখির দল। মাছরাঙা আর শঙ্খচিল। এখানে এলেই ছোটবেলায় দেখা পদ্মা নদীর কথা মনে পড়ে যায় মহানন্দর। ঈশ্বরদিতে থাকতে পদ্মানদী দেখেছে সে।

জেলে-ঘাটের কাছেই মাছের আড়ত-গুলো। আড়তদারদের বাঁধা জেলের

দুতিনশো জেলে-ডিঙ্গি নিয়ে সূর্যের আলো ভাল করে চিল্কার বুকে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই অদৃশ্য হয়ে যায় দল বেঁধে।

নিস্তরঙ্গ চিলকার বুকে দুপুর গড়িয়ে গেলে ফড়ে দালাল আর বড় বড় মহাজনেরা এসে জড় হয় জেলে ঘাটে। ধূসর আকাশে তখন গোধূলির রঙ ঘনিয়ে ওঠে। ডিঙ্গি ভর্তি ভর্তি মাছ আসে। রূপোলী মাছগুলো ঝিলিক পাড়ে খাপ খোলা তলোয়ারের মত। অজস্র পারশে ভেটকি পুরজাওলি ফোরডি সারডিন শঙ্কর আর ভাংলা মাছ। বড় বড় কাঁকড়া আর চিংড়িও থাকে। জেলেরা ঘাটে পৌঁছতেই ফড়েদের দর কষাকষি শুরু হয়ে যায়। আড়তদারদের কাছে কেউ যেতে চায় না। মহানন্দ নিজেও আড়তদারের কাছে না গিয়ে সোজাসুজি জেলেদের কাছ থেকে মাছ কিনে নেয়। ফাটকা-বাজির মত মাছ বেচা-কেনা শুরু হয়ে যায়। [illegible] বোঝাই [illegible] থাকে ফড়ে আর মহাজনের বাড়িতে। জেলেদের হাতে বাঁধা পয়সা [illegible]। সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা ধরে ভারী ভারী [illegible] মাছের বাকস বোঝাই [illegible] থাকে [illegible]। সারা রাত্তিরে মাছ বোঝাই করে [illegible] দিন [illegible] দিতে [illegible]। এর পর [illegible] শহরের [illegible] চালান হয়ে চলে যায় বিভিন্ন [illegible]।

—বাবা চা খাবে এসো!

হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকেছে বিল্পি। ক্ষীণ আলোর রেশটুকু চোখের পর্দায় কাঁপছে। ভাঙা আলমারির মাথায় বই ছিল। কয়েকখানা বই পেড়ে নিয়ে চলে গেল বিল্পি।

এবারে পাশ ফিরে কাত হয়ে শুল মহানন্দ। বালিশের তলা থেকে বিড়ির কৌটো আর দেশলাই বার করে একটা বিড়ি ধরাল। শুয়ে শুয়েই বিড়ি টানতে লাগল। পান্তু আর বিল্পিটা পড়তে বসেছে দালানে। পড়ার শব্দ আসছে কানে। মহানন্দর ইচ্ছে করল না উঠে গিয়ে চা খেতে। মনোরমা হেঁশেলে ঢুকেছে নিশ্চয়। উঠে গিয়ে চা না খেলে হয় মেয়েকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে, না হয় মনোরমা নিজেই আসবে চা নিয়ে। মনোরমা আর রাঙ্গিলা। একেবারেই বিপরীত। চিল্কার জেলেঘাটে উল্টো দিকেতে কাজ করে রাঙ্গিলা। রাঙ্গিলার চঞ্চলতায় আরো বেশী জীবন্ত মনে হয় চিল্কার জেলেঘাট। রাঙ্গিলার কথা না ভেবে পারছে না মহানন্দ। আড়তদারের কাছ থেকে মাছ নেওয়া বহু ঝামেলা। সহজ উপায়ে সস্তায় নিয়মিত মাছ নেবার জন্যে ফড়েদের জেলে ঠিক করে দেয় রাঙ্গিলা। মহানন্দকেও ঠিক করে দিয়েছিল রাঙ্গিলা। মাছ নিতেই আসে সে এখানে। মাছ কিনে নিয়ে খুরদা রোডের বাজারে যায় বেচতে।

রাঙ্গিলার ঘরের পাশ দিয়েই মাছের হাটে আসতে হয় মহানন্দকে। রাঙ্গিলার ঘর থেকে জেলেঘাট বেশী দূরে নয়। ছিটে বেড়ার একখানা ঘর নিয়ে থাকে সে। চার-পাঁচ বছরের একটিমাত্র ছেলে থাকে কাছে। স্বামী নাকি হাওড়ায় থাকে। ছাপাখানাতে ছাপা বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। সংসারে খুবই অভাব। অবশ্য স্বামী প্রতি মাসে মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠায় রাঙ্গিলার নামে। বছরে একবার করে দেখতে আসে সে। কোন সময়ে আসবে তার ঠিক কিছু নেই। রাঙ্গিলা তার স্বামীর রোজগারের ওপর সবটুকু ভরসা করে না।

বিকেলের দিকে রাঙ্গিলা দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে মেজেগুজে। মহানন্দ হোটেল থেকে এলে দরজায় তালা-চাবি দিয়ে ছেলেটাকে পাশের বাড়িতে রেখে মহানন্দর সঙ্গে জেলেঘাটের পথে বেরিয়ে পড়ে সে। রাঙ্গিলার হাতে একটা বড় বেতের ঝুড়ি থাকে। ঝুড়িটা কাঁকালে করে মহানন্দর গা ঘেঁষে চটুল পা ফেলে চলে। রাঙ্গিলার বয়সটা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না মহানন্দর। মনোরমার থেকে অনেক ছোট

সে। সাতাশ আটাশের বেশী হবে না। মিটোল ভরা বসন্ত দেহে, তবুও ত কাছে টানে। বউ বলে মনেই হয় না। একটি দুরন্ত দামাল কন্যাকুমারী। ঈষৎ গেরুয়া রঙের খাটো একখানা শাড়ি পরণে আঁটসাঁট করে। গায়ের ব্লাউসটা হালকা হলুদ রঙের। গোছা গোছা চুল দড়ি পাকিয়ে রাখে মাথার পেছনে। সুলক্ষী জর্দা দিয়ে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গল্প করতে করতে চলে রাস্তা দিয়ে। জেলেঘাটে পৌঁছে চিলকার হ্রদের জলের ঘ্রাণ নেয় মহানন্দ। বাতাস টেনে নিতে ইচ্ছে করে বুক ভরে। রঙিলার ঠিক সান্নিধ্য নেশার মত ছড়িয়ে থাকে তখন সারা দেহ মন ঘিরে।

সব থেকে ভাল লাগে, রঙিলা যখন ঝগড়া করতে নামে কোমরে কাপড় বেঁধে। এক একদিন মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় জেলেঘাটে। কাড়তে কাড়তে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। রঙিলাকেও যোগ দিতে হয়। এই ত সেদিনকার ঘটনা। এখনও স্পষ্ট ভাসছে চোখের সামনে। ঘাটে মাছ আসতেই কোন কোন ফড়ে জেলের হাতে পয়সা গুঁজে দেয় আগে-ভাগে, মাছ কম থাকলেও নিজের হিসেবী মাছ ঠিকমত পাওয়ার জন্যে। জোগাড় দরেও কিছু সস্তা হয়। সেদিনটা মাছ কম এসেছিল ঘাটে। অথচ, সকলেরই মাছের চাহিদা। একজন ফড়ে ভাল বুঝে জেলের হাতে পয়সা গুঁজে দিতেই রঙিলা তক্ষুনি বাঘিনীর মত লাফ দিয়ে জেলেটির হাত থেকে ছিনিয়ে নিল পয়সা, গলায় শান দিয়ে বলল—আমরা ঘুষ দিই না বলে দরে সুবিধা পাব না, আবার মাছ কম থাকলে মাছও পাব না, বেশ কারবার পেতেছ!

ফড়েটাকেও ছাড়ল না সে। আরক্ত চোখে কোলাব্যাঙের মত গলা ফুলিয়ে তেড়ে এসে বলল ফড়েটাকে—আর আপনাদের আস্কারাতেই ত এমন হয়েছে, ওসব ফিকির চলবে না এখানে। পরে জেলেটার কাছে গিয়ে বলল—সকলকে এক দর দিতে হবে। মাছ যেদিন কম আসবে, সকলে সমান ভাগ পাবে।

তারপরই তুমুল ঝগড়া, শেষে শুরু হয়ে গেল মাছ ছিনতাই। চেঁচানির দমকে রঙিলার শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মাথার খোঁপা আর কোমরে জড়ান আঁচলটি খসে পড়ল। গায়ে কেবল একটিমাত্র ব্লাউস। হেরেছা চোখে তাকিয়ে রয়েছে অনেকে। নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করে উঠতে লাগল রঙিলা। প্রচন্ড ঠেলাঠেলি আর হাতাহাতির মুখে পড়ে বেসামাল হয়ে পড়ে গেল রঙিলা মাটিতে। ঘাটে ভেড়ান ডিঙিগুর কানায় লেগে কপাল ফেটে রক্ত বেরতে লাগল। রঙিলা পড়ে যেতেই এবং কপাল ফেটে রক্ত বেরতেই কোলাহলটা মুহূর্তে মধ্যে থেমে গেল। শেষে মহানন্দ এবং আরও কয়েকজন মিলে রঙিলাকে ধরাধরি করে রিক্সায় তুলে বাড়িতে নিয়ে এল। তাকে সেবাশুশ্রূষা করবার মত কেউ ছিল না সেদিন। বাধ্য হয়ে সকলের অনুরোধে মহানন্দকেই রাত কাটাতে হল রঙিলার ঘরে। পয়সা খরচ করে গরম দুধ আনিয়ে খাওয়াল তাকে। কপালে ব্যানডেজ বেঁধে দিল। মাথায় হাওয়া করল। ওষুধ খাইয়ে দিল। সে রাত্রিটা ঘুমই হল না মহানন্দর। উদ্বেগ আর অস্বস্তির মধ্যে কাটতে লাগল। রাত তখন অনেকটা গড়িয়ে গেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রঙিলার কাছাকাছি মেঝেতে এসে বসে পড়ল মহানন্দ। নিজেকে খুবই পরিশ্রান্ত মনে হল। ভাঙা তক্তপোষের ওপর পাতা ময়লা বিছানায় শুয়ে রয়েছে রঙিলা আর তার ছেলে। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে ছেলেটা। পাশেই আবক্ষ উঁচু হয়ে পড়ে রয়েছে রঙিলা। পা দুটো ছড়ান। কপালে ব্যানডেজ বাঁধা। মাথার চুল আলুথালু। পান খাওয়া লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে। গোটা মুখ জুড়ে ক্লান্তির ছাপ। রঙিলার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটতে লাগল মহানন্দর। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। প্রায় প্রৌঢ়ত্বের বয়ঃসীমায় এসে আকাঙ্ক্ষায় নতুন করে চঞ্চল হয়ে উঠল মহানন্দ। হঠাৎ আড়ষ্ট চোখে চেয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল রঙিলা। মহানন্দর দিকে মুখোমুখি হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল—তুই রাত জেগে বসে আছিস মহানন্দ? মিছামিছি আমার জন্য কষ্ট করছিস।

জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়াল মহানন্দ। তারপর ধীর মন্থর পায়ে রঙিলার কাছে এসে একখানা হাত রাখল তার মাথার ওপর, বলল—মানুষের উপকার করার মধ্যে কোন কষ্ট নেই রঙিলা।

—তুই না থাকলে ওই ফড়েটার মুচ্ছুদ্দীপনা ঘুচিয়ে দিতাম আমি, রোজ রোজ এসে ঝামেলা করবে!

—সব মানুষ কি সমান হয় রঙিলা? এক একটা লোক থাকে নিজেরাই ঝামেলা পাকায়।

—আমার জন্য তোর আজ মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরা হল না। মাছের কি ব্যবস্থা করলি?

—মাছ ত নেওয়া হল না।

—মাছ না নিয়ে ভালই করেছিস, নষ্ট হত।

—এখন কেমন আছিস?

—ভাল আছি।

রঙিলার মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে নিল মহানন্দ। শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বলল সে—আমি তাহলে স্টেশনে চলে যাই, ওয়েটিং হলে একটু ঘুমিয়ে নিই।

কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল রঙিলা ক্ষণিক। আহত পাখির মত দৃষ্টি তুলে চাইল সে মহানন্দর দিকে। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল—রাত্তিরবেলাতে কোথায় যাবি মহানন্দ? আর জাগার দরকার নাই। এখানেই একটুকুন ঘুমিয়ে নে। কাল আমার এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরবি।

—তা হয় না রঙিলা।

—কেন?

—তোর যা শরীরের হাল, কাল তোদের কে রান্না করে দেবে তার ঠিক নেই আবার আমায় দলে টানছিস। বরং পারি ত কালকে সকালে এসে তোকে একবার দেখে যাব, তা না হলে সেই বিকেলে।

দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে বুঝতে পারল মহানন্দ, নিথর বাতাসে কেমন ঘোর লাগা জটিলতা রয়েছে ছড়িয়ে। আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় নি সেদিন। ঘোর জ্যোৎস্না অন্ধকার রাস্তায় নেমে এসেছিল সে। এই ঘটনার পর মহানন্দ তার বাড়িতে দু-বার চা খেয়েছে। একদিন আশ্রয় নিয়েছিল তুমুল বৃষ্টিতে।

বন্ধ করা জানলার ভাঙা শার্সির ওপর সজোরে আছড়ে পড়ছে বাদল বাতাস। বাতাস গর্জন করছে খাঁদে পড়া বুনো হাতীর মত। অসময়ে আলমারির মাথায় রাখা ঘড়িটার অ্যালার্ম হঠাৎ বেজে উঠল। ছেলেমেয়েদেরই কীর্তি। অ্যালার্মে দম দিয়ে কাঁটা ঠিক করতে পারে নি। না হয় ঘড়িতে চাবি দিতে গিয়ে অ্যালার্মেই চাবি দিয়ে রেখেছে। বিরক্তিকর মনে হতে লাগল। এবারে উঠে বসল মহানন্দ। মাথাটা কেমন ভার ভার মনে হল। ব্যাজার হয়ে হাতটা কোনমতে বাড়িয়ে বোতামটা টিপে দিল সে। অ্যালার্ম থেমে গেল। বিড়িটা ঘন ঘন টেনেও সোয়াস্তি হচ্ছিল না। নিবে গিয়েছিল। ঘরের মেঝেতে ফেলে দিল ছুঁড়ে। নিতু আর বিজলি ঘরে ঢুকল। বিজলির হাতে হ্যারিকেন। বিজলি হ্যারিকেনটা তুলে ধরল আলমারির মাথার কাছে। নিতু আলমারির ওপর থেকে বাঁয়া-তবলা নামিয়ে দালানে চলে গেল। বিজলি হ্যারিকেন হাতে চলে

যেতে যেতে বলল—বাবা, আজ আর চিলকায় যেও না, বাইরে কি দুর্যোগ!

কালকেও এমনি দুর্যোগ দেখে এসেছে মহানন্দ চিলকার বুকে। ভিজে ভিজে বিকেলে জেলেঘাটে দাঁড়িয়েছিল সে। মাথায় ছাতা। রাঙ্গালা তার ঝুড়িটা মাথার উপর উপুড় করে তুলে ধরে দাঁড়িয়েছিল মহানন্দর গা ঘেঁষে। জেলেরা তখনও মাছ নিয়ে ফেরে নি। থেকে থেকে বাতাসের তরঙ্গে নিজেদের টাল রাখতে পারছিল না তারা। মহানন্দর মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল সামনের দিকে। পাঞ্জাবির পেছন দিকটা প্যারাস্যুটের মত ফুলে ফুলে উঠছিল। ছাতা শক্ত মুঠোতেও ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাপা গোঙানি ছড়িয়ে ছিল। রাস্তায় রাস্তায় চিলকার বুকে বুকে কেঁদে ফিরছিল সাঁই সাঁই [illegible]। তখনই মনে হয়েছিল মহানন্দর, এটা মনসুনেরই সময়। কিন্তু [illegible] চিলকার তীরভূমি জুড়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। হিসেব করে দেখল মহানন্দ, চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এখানেও নাকি কাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আজ আকাশ ভেঙে পড়ছে। [illegible] চলছে।

একটু পরেই তবলার বোল এল কানে। নতুন ছেলেগুলো [illegible] চাঁচাতে শুরু করেছে। ধা তিন তিনা, তাক ধিন ধিনা! [illegible] ধিনা, ধা তিন তিনা। আজকাল [illegible] পড়া নেই শোনা নেই, পরীক্ষায় পাশ করবার কোন চেষ্টাই নেই, কেবল [illegible] তবলা নিয়েই মত্ত।

উঠবে না? চা খাবে না?

মনোরমা চায়ের কাপ হাতে করে ঘরে ঢুকল। তক্তপোষের উপর একটা কাগজ পেতে চায়ের কাপটা রাখল ধীরে ধীরে। কোন কিছু জবাব না দিয়ে কতকটা দমবন্ধ করে আরও কিছু শোনবার প্রত্যাশায় রইল মহানন্দ।

বাতাসের দমক দেখেছ? বৃষ্টি আজও থামছে না! সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে বাইরে। তোমার কিন্তু আজ চিলকায় যাওয়া চলবে না।

মহানন্দর কাঁধে হাত রাখল মনোরমা। তক্তপোষের ধারটাতে উঠে বসল সে। মনোরমা উঠে বসতেই মহানন্দ হঠাৎ দু-হাতে তার মাথাটা চেপে ধরে মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। মহানন্দর মনে হল, এ যেন ঘর নয়, আলো-আঁধারি গভীর কোন গুহার মধ্য থেকে বহুদিনের জাগরণ শীর্ণ চোখে তাকাচ্ছে দুজনে দুজনের দিকে। মনোরমার ভুরু কাঁপল। স্থির দু' চোখের দৃষ্টি। মহানন্দর এই মুহূর্তে মনে হল, চিলকার আঁকাবাঁকা রূপসী চলনের গতি স্থির হয়ে রয়েছে মনোরমার দু' চোখের তারায়। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কতকটা স্থির কঠিন গলায় বলে উঠল মহানন্দ—আমাকে যেতেই হবে মনোরমা। কাল বাদে পরশু থেকে পর পর দু'দিন ধর্মঘট চলবে। দোকান বাজার বন্ধ। মাছ বিকোবে না। অন্ততঃ কালকেও যদি কিছু মাছ আনতে পারি, কিছু টাকা তো হাতে আসবে।

মাথাটা ঝাঁকাল মনোরমা—না না, যেও না তুমি! এই দুর্যোগের মধ্যে কেন এমন কাজ করছ বল তো?

তেমনিভাবেই কঠিন গলায় বলল মহানন্দ—তার থেকে বল না মনোরমা, আমাদের মত মানুষ কেন বেঁচে থাকে? বাধা দিও না আমাকে, যেতেই হবে।

জামা-কাপড় পরে খেয়ে-দেয়ে যেতে যেতে ট্রেনের সময় হয়ে যাবে। আর দেরি করলে চলবে না। এখুনি উঠবে মহানন্দ এবং যাবে সে, যাবে চিলকাতে। কারণ, জানে সে, ফিশভ্যান থেকে মাছের ঝুড়ি নামাতে না নামাতেই ছেঁকে ধরবে ফড়েরা। আশ্চর্য ব্যস্ততা। মাছের ঝুড়ি ঠিক আছে কিনা, না দেখেই রসিদটাই কিনে নিতে চাইবে অনেকে আগে ভাগে। আর দেরি করবে না। এখনই উঠবে সে, এখনই। আর এই দাহ-শয্যায় শুয়ে থাকতে পারবে না। কেবলই শুনছে সে, হৃদয়ের অনেক অনেক গভীরে, নরম পাড়ে এসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে নিস্তব্ধ চিলকা হ্রদের জলের ছল-ছল শব্দ। মনে হল, চিলকার ছোট ছোট ঢেউ হাসছে। জলভরা সুন্দরী কন্যার মত রুপোলী শাড়ির আঁচল বিছিয়ে রয়েছে বিশাল তীরভূমি জুড়ে। ছোটবেলায় ঈশ্বরদিতে পদ্মাকে দেখেছে সে। পদ্মাও ছিল রূপসী। পদ্মা দামাল দুরন্ত। চিলকাকে এই মুহূর্তে রূপসী বলেই মনে হল তার। কিন্তু সে শঙ্খের মত শান্ত, আত্মস্থ।
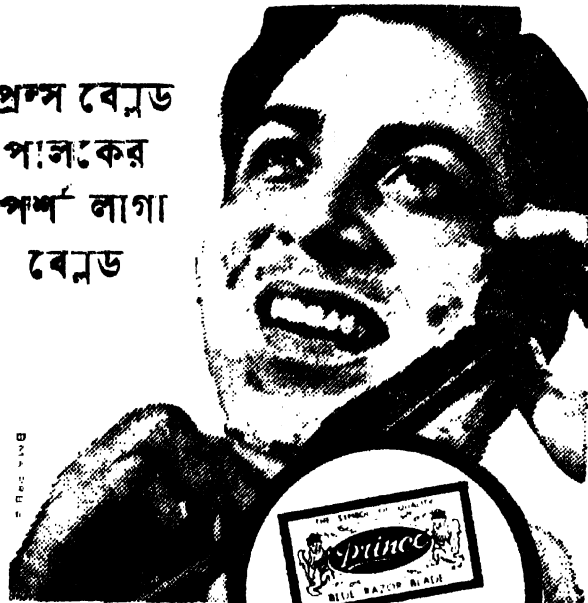
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ডাঃ এলস্টেয়ার ল্যাম একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা। চ্যাথাম হাউসে পঠিত একটি প্রবন্ধ, 'দি চায়না-ইন্ডিয়া বর্ডার : ডিসপিউটেড বাউন্ডারিজ', প্রকাশিত হয় ১৯৬৪-তে, তারই বিস্তারিত রূপ 'দি ম্যাকমোহন লাইন : এ স্টাডি ইন দি রিলেসনস বিটউইন ইন্ডিয়া, চায়না অ্যান্ড টিবেট (১৯০৪-১৯১৪)' এই নামে প্রকাশিত হয়েছে কিছুকাল আগে। ডাঃ ল্যামের মুখ্য বক্তব্য হল, ম্যাকমোহন লাইন বিষয়ে নয়াদিল্লীর মামলা ছায়াচ্ছন্ন, দুর্বল এবং প্রকৃতপক্ষে দাঁড় করানো কঠিন।

প্রাচীন 'আউট লাইন' বা বহির্রেখা যা আসাম প্রান্তের সীমানা, সেটুকু পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে গৃহীত। স্পষ্টতই এই সীমা অতিক্রম করে গেছে, যার উপর কোনো যুক্তিসঙ্গত দাবী চলে না। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের এই যে গন্ডীর বাইরে নাক গলানোটুকু নয়াদিল্লীর বর্তমান 'ক্রি পোস্ট ইম্পিরিয়ালিস্ট এরা' স্বেচ্ছায় প্রতিবেশীর হাতে তুলে দিলেই পারতেন বলে ডাঃ ল্যাম মনে করেন। কারণ তাঁর মতে চৈনিক-তিব্বতে ভারতের অনুপ্রবেশের মতোই এটা গর্হিত কর্ম।

ঐতিহ্যগত সীমানা বিষয়ে এতাবৎ যে জোর দেওয়া হয়েছে তার সঠিকত্ব বিষয়ে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, নয়াদিল্লী বর্তমানে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, এবং ব্রিটিশরা ভারতভূমিতে পদার্পণ করার পূর্বেকার এই 'ঐতিহ্যগত' সীমানার ব্যাপারটা একেবারে বেমানান।

ডাঃ ল্যাম প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। ঘেঁটেছেন ফরেন অফিসে রক্ষিত প্রাচীন নথিপত্র। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রচুর সূত্রসন্ধান করেছেন। এবং যথাসম্ভব সবরকম সূত্র থেকে যেটুকু পেরেছেন সংগ্রহ করেছেন তথ্য। ডাঃ ল্যামের বক্তব্য বেশ চাঁচা-ছোলা, এবং মানচিত্রাদি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান প্রশংসাযোগ্য। ৬৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ অজস্র পরিশিষ্ট সম্বলিত এই গ্রন্থটি তাঁর এক বৃহৎ কীর্তি একথা বলা যায়।

দুঃখের বিষয় তাঁর মতো এমন পন্ডিত ব্যক্তি বিষয়বস্তু সংগ্রহের ব্যাপারে নিজস্ব রুচির প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তাঁর এই গ্রন্থটিকে নিরপেক্ষ বিচার বলে গ্রহণ করা যায় না। একটি বিতর্কিত সীমানা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পক্ষপাতশূন্য একথা বলা যায় না। তিনি গোড়া থেকেই ভারতের তরফের যুক্তির বিরোধী এবং কিভাবে ভারতের বক্তব্য নস্যাৎ করা যায় তার দিকেই সব মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতের যুক্তি কাটান দিয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন চীনের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে। ফলে, গ্রন্থটির গুণাগুণ বিষয়ে বিচারশীল পাঠকের মনে সংশয় জাগবে। নীচের যুক্তিটুকু এমনই এক দৃষ্টান্ত :

'মিঃ নেহরু যিনি চীনাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি এবং মৈত্রীর কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি কেন এক-গুঁয়েমির সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক সিমলা কনভেনসন ও ম্যাকমোহন লাইনের নোটস আঁকড়ে রইলেন তা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম এক রহস্য। এই গ্রন্থ যদি এই রহস্য ছাড়া আরো কিছুর ইঙ্গিত বহন করে, যদি রহস্যের সমাধানের প্রস্তাব এর মধ্যে পাওয়া যায় তবেই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলা যায়।'

(৫৯০ পৃঃ)

ডাঃ ল্যামের গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য এখানে সুস্পষ্ট। একটা রহস্য বর্তমান—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। এবং সেই রহস্য সমাধানের মহৎ দায়িত্ব পালনের স্বেচ্ছানিয়োজিত কর্তব্যভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে রচনা করেছেন এই গ্রন্থ।

এখন প্রশ্ন এই রহস্যটা ঠিক কোনখানে? ম্যাকমোহন লাইন নোটস এবং সিমলা কনভেনসনে? না—পরবর্তীকালে নেহরুকৃত তার ব্যাখ্যা প্রকাশে? ডাঃ ল্যাম গ্রন্থের আরম্ভে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন, 'কিভাবে ইয়ংহাসব্যান্ড মিশনের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ম্যাকমোহন লাইনের আত্মপ্রকাশ ঘটল।' (পৃঃ ৪)। স্পষ্টতই এই পরীক্ষাকর্ম থেকে তিনি অন্যত্র সরে গিয়েছেন। কিংবা গ্রন্থ যতই অগ্রসর হয়েছে ততই বিস্মৃত হয়েছে গোড়ার সংকল্প। এই নিশ্চয়তার অভাব, এবং যথাযোগ্যভাবে বক্তব্য প্রকাশ না করে অতিমাত্রায় অনুমাননির্ভর মন্তব্যে আগ্রহ প্রদর্শন এই গ্রন্থের প্রধান দুর্বলতা।

ঐতিহাসিক হিসাবে ডাঃ ল্যাম মোটামুটি সার্থক, কিন্তু প্রায়ই তিনি তাঁর কর্তব্যে বাঁধা সড়ক থেকে নেমে পড়েছেন এবং একজন প্রতিপক্ষের ভঙ্গীতে পন্ডিত নেহরুকে আক্রমণ করেছেন বা পররাষ্ট্র-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস বিভাগকে নিন্দা করেছেন। একজন ঐতিহাসিকের কাছে নিঃসন্দেহে সকল সৎ ব্যক্তিই আশা করেন ন্যায়সঙ্গত বিচার। কিন্তু বলতে বাধা, ডাঃ ল্যাম সে প্রত্যাশা পূরণে অসফল হয়েছেন।

লেখক এই ধারণা নিয়ে শুরু করেছেন যে ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর সংকট প্রকৃতপক্ষে ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী তিব্বতীয় সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানে ভারত সরকার অসফল হয়েছেন। যদি মিঃ নেহরু এবং তাঁর উপদেষ্টাদের হাতে ইয়ংহাসব্যান্ড মিশনের ফলাফল বিষয়ে অধিকতর নির্ভুল চিত্র থাকত তাহলে তাঁরা ১৯৫০ থেকে যাঁরা ভারতের প্রতিবেশী সেই কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে মীমাংসা করতেন। অতীতের বৃটিশ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভের এখনও হয়ত তেমন বিলম্ব হয়নি। (পৃঃ ৪—৫)

পন্ডিত নেহরু এবং তাঁর উপদেষ্টারা কিভাবে ভুল করলেন, কোন দিক থেকে? গান্ধিজী একদা বলেছিলেন 'জহরলাল হয়ত তাঁর স্বদেশ ছাড়া পৃথিবীর একটি দেশকে সব দেশের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন—সেই দেশের নাম চীন।' ডাঃ ল্যাম স্বীকার করেছেন নেহরু গোড়ার দিকে মরলেন তিব্বত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিটাই মেনে নিয়ে একটা মহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিব্বতের ওপর চীনের আধিপত্য এবং পরে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের চুক্তিতে 'টিবেট রিজিয়ন অব

ম্যাকমোহন লাইন

চায়না' স্বীকার করে নিয়ে তিনি এক শুভারম্ভের সম্ভাবনা প্রদর্শন করেছিলেন। ডাঃ ল্যামের মতে কিন্তু তিনি অচিরাৎ হোঁচট খেয়ে পড়লেন এবং ঠিক যে কি করছেন তা বুঝতে পারলেন না।

'পঞ্চশীল এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির মহৎ বাক্যগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাতাবরণে চীন যে ভারত কর্তৃক ঘোষিত সীমানা-নির্ধারণ মেনে নেবেন এই ধারণাই তাঁর মনে ছিল।' (পৃ ২৩০)

কি সুন্দর বিশ্লেষণ! ভারতের প্রধানমন্ত্রী 'হিন্দি-চীনি ভাই ভাই' ধ্বনির মধুর বুলিতে এমনই অবস্থায় পেণছেছিলেন যে আর সব তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। একজন ইতিহাসবেত্তার পক্ষে পণ্ডিত নেহরুর চরিত্রের এই বিশ্লেষণ দুঃখজনক। 'হরেকৃষ্ণ হরে রাম' মন্ত্রের মতো পঞ্চশীলের মন্ত্র চীনকে মোহগ্রস্ত করবে এবং চীন তার দাবী ছেড়ে দেবে একথা পণ্ডিত নেহরু মনে করেছিলেন এমন ধারণা নিছক বাতুলতা।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের আলোচনায় চৌ এন লাই—যা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা থেকে তিনি সরে যাওয়ায় পণ্ডিত নেহরু যখন প্রতিবাদ জানালেন তখন চীনের প্রধানমন্ত্রী যে জবাব দিয়েছিলেন ডাঃ ল্যাম তাঁর গ্রন্থে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই তা উদ্ধৃত করেছেন। এই চিঠিটি স্পষ্ট এবং পরিষ্কার—

'ম্যাকমোহন লাইন ব্রিটিশ অগ্রাসী নীতির ফল এবং তাকে কোনো মতেই আইনসম্মত বলে মেনে নেওয়া যায় না। এ ছাড়া তিব্বতীয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষরা এই একতরফা সীমারেখা বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তথাপি চীন সরকার একটা বাস্তব ভিত্তি ভঙ্গীতে ম্যাকমোহন লাইনের নীতি বিচার করতে পারেন—তবে এ বিষয়ে সময় প্রয়োজন।'

চৌ এন লাই-এর এই ব্যাখ্যা পরিষ্কার। কিন্তু ডাঃ ল্যাম তা উদ্ধৃত না করে তার সারাংশ দিয়েছেন পাঠকদের সুবিধার্থে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের আলোচনায়—

'নেহরু সম্ভবত—...ভুল বুঝেছিলেন। ...চৌ এন লাই কি বলতে চেয়েছিলেন... বুঝতে পারেন নি। চৌ সম্ভবত বলতে চেয়েছিলেন, স্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ উত্তর চীন-ভারত সীমানা নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনায় চীন ম্যাকমোহন লাইনের মত একটা সীমানা মেনে নিতে রাজী......কিন্তু ভারতের দাবী-মাফিক সীমানা নির্ধারণ যা সাম্রাজ্যবাদের আমলে হয়েছিল তা তিনি মেনে নেবেন না। (পৃঃ ৫৮৩-৮৪)

নেহরুজী সাম্রাজ্যবাদ-উত্তর চীনদেশ সম্পর্কে হয়ত ভুল বুঝেছিলেন। হয়ত সাম্রাজ্যবাদী নামকরণটুকু পরিহার করলেই ভালো হত। অনেকের ধারণা তিনি যদি বলতেন সর্বশক্তিমান মহান চীনা সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমানা বিষয়ক ব্যবস্থা তাহলে হয়ত চৌ এন লাই তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তা হয়নি—

পরবর্তী আলোচনায় ডাঃ ল্যামের বাকী বক্তব্যটুকু পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা যাবে।

—অভয়ঙ্কর

THE MCMOHON LINE: A STUDY IN THE RELATIONS BETWEEN INDIA CHINA & TIBET—(1904 1914). By ALSTAIR LAMB : (2 vols) : Published by ROUTLEDGE & KEGAN PAUL. (London)
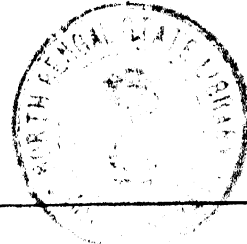
মহানায়ক মুজিবর (জীবনী)—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ। মোহন লাইব্রেরী, ৩৬এ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

জীবনই মানুষকে ঘটনার আবর্তে ফেলে নতুন করে ভাবতে শেখায়, নতুন পথে চলতে শেখায়। মানুষের মতো জাতি এবং দেশকেও। সামনে অগ্রসর হবার সময় পেছন ফিরে নিজের ভুল-ত্রুটির হিসেব-নিকেশ করার তাগিদ আসে। শুরু হয় নতুন করে নতুন যাত্রা নতুন পথে। দেশবিভাগের পর পাকিস্তান কায়েম হতে না হতেই বাঙালী মুসলমানরা বুঝতে পারলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের ফাঁদে পা দিয়ে কি ভুলই না তাঁরা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কামধেনু—শোষিত হবার জন্যেই যেন তার জন্ম। এই বোধ থেকে জন্মাল বাঁধন ছেঁড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল। সেই নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম এবং তার জনকের কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত আনুপূর্বিক ঘটনাকে প্রায় তিনশো পাতায় গ্রথিত করেছেন লেখক প্রশংসনীয়ভাবে। শিল্পী বিভূতি সেনগুপ্তের প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতা প্রশংসা করার মতো।

মৃত্যুহীন প্রাণ (স্মৃতিচারণ)—সাহানা দেবী। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। সাড়ে চার টাকা।

'যে প্রদীপে আমার প্রাণ জ্বালিয়াছ, সে প্রদীপ আমার বাংলার ঘরে ঘরে জ্বালাইতে চাই। বাংলা আপনার আত্মবিকাশ আপনি আপনি করিবে। আপনার গান আপনি গাইবে, আপন সাধন দ্বারা সেই সিদ্ধিলাভ করিবে, আপন গৌরবে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে।...চাই শুধু—প্রাণের আন্তরিকতা, চাই শুধু—জীবনকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা চাই শুধু -আত্মার দীপ হাতে করিয়া প্রতি পদক্ষেপে গণনা করিতে করিতে পথ চলা।'...

—পরিষদ্দৃষ্টি ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের। তাঁর স্বপ্ন ও সত্য দর্শনের নতুন ঠিকানা অজকের নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।'

'মৃত্যুহীন প্রাণ' বেদনায় আবদ্ধ অন্তরের এক আশ্চর্য স্মৃতি-মিছিল—যার প্রেক্ষাপটে বিধৃত হয়েছে দেশবন্ধুর স্মরণীয় ও বরণীয় জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের অন্তরঙ্গ কাহিনী। দেশবন্ধু এবং তাঁর সমগ্র পরিবারের সুখ-দুঃখ আনন্দ বিষাদভরা অনেক ঘরোয়া কাহিনী তাঁর দানধ্যান ত্যাগ তেজস্বিতার অনেক অজানা তত্ত্ব ও তথ্য এই স্মৃতিচিত্রণে উজ্জ্বল হয়ে দেশবন্ধুর কর্মময় বৈরাগ্যভরা মহৎ ও নিবেদিত জীবনকে আরো ভাস্বর করে তুলেছে। তাঁর তিরোধানের পর থেকে তাঁর জীবনকে নিয়ে লিখিত হয়েছে অনেক জীবনী-গ্রন্থ কিন্তু 'মৃত্যুহীন প্রাণ'-এর মতো এমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল এমন দীপ্ত জীবন্ত ছবি আর কোথাও পাওয়া যায়নি। এককালের স্বনামধন্যা সংগীতশিল্পী সাহানা দেবী একালে প্রায় অপরিচিত হয়েও রচনাপ্রসাদগুণে সাহিত্য সাধিকা হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করলেন। সংগীত সাগরে অস্তমিত হবার পর সাহিত্য-গগনে তাঁর এই উজ্জীবন বিস্ময়কর। 'মৃত্যুহীন প্রাণ' তাঁকে সাহিত্যে চিহ্নিত করে রাখবে। পরিমিতিবোধ, আন্তরিকতা ও লিপিকুশলতার বিরল গুণে এ গ্রন্থখানি জীবনী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ কথা কয় (গল্প সঙ্কলন) ঃ সম্পাদক আবদুল গফফার চৌধুরী। মুক্তধারা। দাম সাত টাকা।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক মুক্তিসংগ্রাম সাহিত্যিকের কাছেও বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। স্বাধীনতার সংগ্রামে দীপ্ত প্রতিটি দেশের লেখকই সংগ্রামকে কেন্দ্র করে মহৎ সাহিত্য রচনা করেছেন। 'বাংলাদেশ কথা কয়' বইখানির কাহিনীগুলি মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। একদিকে হত্যা, পীড়ন, ধর্ষণ, অন্যদিকে ব্যাপক প্রতিরোধ ও মানবিকতা এই কাহিনীগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কাহিনীগুলি লিখেছেন বিপ্রদাস বড়ুয়া, নির্মলেন্দু গুণ, আবদুল হাফিজ, সুব্রত বড়ুয়া, ফজলুল হক, আসফ-উজ্‌-জামান, বুলবুল ওসমান, কামাল মাহবুব, আনু ইসলাম, আসাদ চৌধুরী, সত্যেন সেন, ইলিয়াস আহমেদ, জহির রায়হান, কায়েস আহমেদ, শওকত ওসমান ও আবদুল গাফফার চৌধুরী।

রচনাগুলিতে সমসাময়িকতার ছাপ পড়েছে সঠিকভাবেই। যদিও সম্পাদক বলেছেন 'বিপ্লবের প্রচণ্ড বাত্যা ও তরঙ্গ নেমে গিয়ে যখন সৃষ্টির পলি জমবে, তখনই কেবল আশা করা যাবে, এই মহা-বিপ্লবের কাহিনী নিয়ে লেখা সার্থক ও রসোত্তীর্ণ এবং হয়তো যুগান্ত গল্প ও উপন্যাসের।' সম্পাদকের একথা মেনে নিয়েও বলা চলে, সমসাময়িকতাকে অংশ ভাগ করে সংগ্রামে সাহিত্যিকের অপ্রাণ সংযুক্তিকরণ এই গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলিকে এক বিশেষ মহিমা দিয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রতিটি লেখকের কাহিনী আলাদাভাবে আলোচনা সম্ভব নয়। তবু প্রাচীন ও নবীনের এই সংগ্রামভিত্তিক রচনা এক নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে। এ-কাহিনীগুলির বিশিষ্ট কয়েকটিসহ আরও যোগ্য কাহিনী অন্ত-র্ভুক্ত করে অবিলম্বে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বের পাঠকদের কাছে বাংলাদেশের মর্ম-বেদনা ও প্রতিরোধের এই আলেখ্য পৌঁছে দেবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। পশ্চিমবঙ্গের লেখক ও পাঠকদের এই বইখানি বিশেষভাবে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অন্বিষ্ট (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা) সম্পাদক ঃ বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৯।১।১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা তিন। তিন টাকা।

বাংলার অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে 'অন্বিষ্ট' সুপরিচিত। পত্রিকাটির মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যাটি এর পূর্ব ঐতিহ্যকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইতিপূর্বে এই পত্রিকাটির 'এলিয়ট সংখ্যা' ও 'অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা' আমরা দেখেছি। সেগুলি যেমন যে কোন সহৃদয় পাঠক ও গবেষকের পক্ষে সংরক্ষণের উপযোগী ছিল, আলোচ্য সংকলনটিও সেই দাবী রাখে। এতে তিনটি সার্থক গল্প লিখেছেন সুধাংশু ঘোষ, বীরেন্দ্র দত্ত ও তপনলাল ধর। শিবশম্ভু পালের কবিতা বিষয়ক আলোচনাটি পাঠক-মহলে বিতর্কের সূচনা করবে। সম্পাদক ক্রোড়পত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবং তাঁর সমগ্র গ্রন্থপঞ্জী দিয়েছেন। সেখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও অসীম রায়ের সাক্ষাৎকার। অমিতাভ দাশগুপ্ত, স্বপনদাস অধিকারী, অজিত মুখোপাধ্যায় ও সুবন্ধু ভট্টাচার্যের আলোচনা মননিষ্ঠ।

জিগীষা—সপ্তম সংকলন। সম্পাদকমণ্ডলী ৩৭।এ, ডাঃ দেওদার রহমান রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫। পঞ্চাশ পয়সা।

জিগীষার আলোচ্য সংকলনটি উল্লেখ-যোগ্য। এতে সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন রাণা চট্টোপাধ্যায়, কবিতা লিখেছেন অরুণকুমার সরকার, আলোক সরকার, শংকর চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, শান্তি-কুমার ঘোষ প্রমুখ। কাব্যগ্রন্থের আলোচনা গুলি সুলিখিত। বাংলাদেশের কবিতা স্থান পাওয়ায় সংকলনটি সার্থক হয়েছে।

জ্যোতিষ্ক—সম্পাদক দিলীপকুমার সান্যাল, জ্যোতিষ্ক প্রকাশনী, ১৯।৩, শীলস্ গার্ডেন লেন, কলকাতা-২। ষাট পয়সা।

'জ্যোতিষ্কে'র প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা উনিশ শ' বাহাত্তরের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এতে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি লিখেছেন সর্বশ্রী কুমারেশ ঘোষ, সবিতা দাশ, বিশ্বনাথ ঘোষ, শিশির দত্ত, ভাস্কর চৌধুরী, শ্যামল সেন ইত্যাদি। সংকলনটি মানে উল্লেখযোগ্য।

পার্থসারথি (মাঘ '৭৮)—সম্পাদক ঃ প্রীতি-কুমার ঘোষ। ৫।এ, অক্ষয় বসু লেন, কলকাতা-৪। পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকাটি নানান ধরনের আলোচনায় সমৃদ্ধ। লিখে-ছেন শান্তশীল দাশ, প্রিয়রঞ্জন রায়, অমলানন্দ নৈমিষারণ্য শ্যামাচরণ চট্টো-পাধ্যায় অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, হরিপদ চক্রবর্তী অনিলবরণ রায়, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ।

বিচিন্তা (৮ম বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা) সম্পাদনা ঃ নলিনীকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। ৪৩ শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া। এক টাকা।

বিচিন্তা নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার উপজীব্য। পরিচ্ছন্নতা সর্ব অবয়বে। সাহিত্য ভাবনাযুক্ত। প্রবন্ধগুলিই সবচেয়ে উল্লেখ্য, লিখেছেন ঃ অমিতাভ চৌধুরী, সানজিদা খাতুন ও দুলাল চৌধুরী। নতুন রীতির গল্প লিখেছেন জীবন ভৌমিক। নবীন-প্রবীণ কবিদের কিছু ভালো কবিতা ছাড়াও আছে অনুবাদ সাহিত্য, গ্রন্থসমীক্ষা ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত। অবনীন্দ্রনাথকৃত স্কেচ ঃ 'বুড়ো পাখী' ও শিল্পী ধীরেন্দ্রকুমার সেনের আঁকা অবনীন্দ্র প্রতিকৃতি এবং অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় অমিতাভ চৌধুরীর প্রবন্ধ পত্রিকাটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

ইয়েল (১৯৭২)—সম্পাদক ঃ বিনয় দত্ত। ৮ ক্লাইভ রো, কলকাতা-১।

অধুনা অফিসপাড়ার প্রমোদ সমিতির মুখপত্রগুলির চেহারা পালটিয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে সাহিত্য পত্রিকায়। প্রখ্যাত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অ্যানড্রু ইয়েল কর্মীদের বার্ষিকীটি সেকথাই মনে করিয়ে দিল। চমৎকার ছাপা, ঝকঝকে পত্রিকা। বাইরের চটুলতাই সার নয়—সারবান কিছু লেখাও আছে ইংরেজি, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায়। কিছু আলোকচিত্রও।

অর্কোরিনা (ত্রৈমাসিকপত্র) প্রধান সম্পাদক ঃ অমল ঘোষ। ৩০খি, চেমিয়ারস রোড, মাদ্রাজ-২৮। দেড় টাকা।

কাব্য এবং নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'অর্কোরিনা'র আন্তর্জাতিক সংখ্যাটি ইতিমধ্যে শিল্পরসিকদের সানন্দ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রচনাপ্রসাদগুণে এবং পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ-বৈশিষ্ট্যে। আলোচ্য সংখ্যাটি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্নদেশের কবিতা ভাষার বন্ধন পার হয়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর তাবৎ কাব্য-রসিকদের কাছে পৌঁছে দেবার আন্তরিক প্রযত্নে ভাস্বর। শ্রীঅরবিন্দের কবিতা, কবি দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে শ্রীএ রঙ্গনাথনের প্রবন্ধ এবং প্রধান সম্পাদক শ্রীঘোষের রচনা এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। প্রাচীন ক্লাসিক কবি এবং কবিতার সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের সুপরিচিত প্রবীণ ও নবীন কবিদের রচনার যাঁরা যুগপৎ রসা-স্বাদন করতে চান 'অর্কোরিনা' কবিতাপত্রটি তাঁদের অবশ্যই খুশী করবে।

আরক্ষ (৩য় বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা) সম্পাদক ঃ সলিলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৭।১এ গোখেল রোড, কলকাতা-২০। এক টাকা।

ত্রৈমাসিক ভিন্নগোত্রের পত্রিকা। অপ-রাধ, অপরাধ-বিজ্ঞান এবং অপরাধজাত বিবিধ সমস্যার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি ফিরিয়ে দুর্নীতি দমনে জনমত সংগঠন এর লক্ষ্য। বাস্তবভিত্তিক অনেকগুলি কাহিনী আছে। বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কিছু আলো-চনাও। লিখেছেন অনেকেই এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য হলঃ সিকন্দর চৌধুরীর 'মানবিকতার ওপর পাশবিকতা', শীতল-প্রসাদ সরকারের 'হাতের লেখা চেনা যায়' ও পর্যবেক্ষকের 'অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে?'

।। ৩ ।।

আত্মীয় সমাগমের এই শুরু, শেষ নয়। অন্বেন্দ্র এসে চলে যাওয়ার দিন কয়েক পরেই একদিন দুপুরবেলা একটি বৃদ্ধ লোক এসে উপস্থিত। মাথার সব চুল সাদা, ঘোর-কৃষ্ণ বর্ণ। অতি মলিন একটি জীনের কোট পরণে, হাতে একটা ছোট পঁটুলি।

কিছু আগেই লোকটি পাড়ায় এসেছে, এবং খোঁজ-খবর করছে, হেমন্তর ঠাকুর এসে বলেছিল। তখন সে বসে বসে মিস্ত্রীর হিসেব 'ঠিক' দিচ্ছিল, অতটা কান করে নি। গত কয়েক দিনে বিস্তর হিসেব জমে গেছে মিলিয়ে দেখা হয় নি, বিশেষ ছুতোর মিস্ত্রীর হিসেবটা কালই চুকিয়ে দিতে হবে, হপ্তায় হপ্তায় হিসেব করে পাই-পয়সা চুকিয়ে দেয় বলে অনেক সস্তায় হয়, কিছু টাকা কেটে নিলেও ওরা বেশী আপত্তি করে না। সেই দিকেই মনটা ছিল, এখন ঠাকুর এসে খবর দিতে চমকে উঠল, 'না, সেই যে বুড়োটা পাড়ায় আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল বললুম—? সে এসে হাজির হয়েছে। দেখা করতে চায়।'

'বুড়ো? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়...? পাড়ায় খবর নিচ্ছিল কে বললে?'

'খানিক আগে দোকানে গিয়েছিলুম না—তখনই শুনে এসেছি, ঐ গুপ্তদের বাড়িতে আপনার নাম করে কি সব জিজ্ঞেস করছে, কোন বাড়ি, কতদিন এখানে এসেছেন, কে কে থাকে বাড়িতে, কি করেন—এই সব।...আপনাকে যে তখন বললুম এসে?'

'অত কান করিনি তাহলে।' কিন্তু, কি দরকার কিছু বলেছে?'

'না, তা কিছু বলছে না। আমি তো বললুম তাই। তা শুধু বলে, আপনার সঙ্গে দেখা করবে। বলে, ওকে দেখলেই নাকি আপনি চিনতে পারবেন।'

'না, তা হবে না।' বিরক্ত হয়ে ওঠে হেমন্ত, 'বলোগে কোথা থেকে এসেছে, কি নাম কি দরকার—তা না জানলে মা দেখা করবে না—'

কিন্তু এত কথা বলবার আর অবসর মিলল না।

তার আগেই আগন্তুকটি ভেজানো দরজার সুযোগ নিয়ে সরাসরি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। সামান্য একটা অনুমতি নেওয়ার জন্য অযথা বিলম্ব করতে সে রাজী নয়। সিঁড়ির মুখ থেকে একটু এসে গলা খ্যাঁকারি দিয়ে বলে উঠল, 'এই আমি এইছি গো বৌমা। আসা তো হয় না কলকেতায়—এইটুকু তো পথ, হেঁটেই মেরে দিই—তা ধরো নানা ঝঞ্ঝাট তো—ঐ কেত্তন উলীরা গায় না—'কব কি বিশেষ, আঙিনা বিদেশ'—তা আমাদেরও ধরো তাই—তাই এসেই যখন পড়লুম বলি—দেখা করেই যাই একবার। তাখন একটা ভুল বোঝাবুঝিতেই মিছিমিছি—তুমি বৌমা ভয় পেয়ে চলে এলে—আমার মা-টাও ছিল তেমনি পাগল—তাই বলে সাতাসাতাই তো আর আমরা থাকতে—তোমার দিদিরা থাকতে—

আর বলতে হল না।

না বললেও চিনত। বুকের দিক চাপা, পেটের দিক চওড়া—এ গঠন ওর অতি পরিচিত। শ্বশুর বংশের সকলেরই এই ধারা। কেবল তারকই ছোটবেলা থেকে কলকাতায় ছিল বলে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে পিলে লিভার বাড়ে নি বলেই, রোগা হলেও এমন বিসদৃশ গঠন হয়ে ওঠে নি।

এ বিষ্ণুচরণ, ওর ভাশুর।

বুড়ো হয়েছে কিন্তু মুখের ভাবে ও ভাষায় সেই বজ্জাতি খোল আনাই বজায় আছে। চোখের দৃষ্টিতে সেই লুব্ধ ধূর্ততা।

নিমেষে জ্বলে উঠল হেমন্ত। এত ক্রোধ ইদানীং কালের মধ্যে আর কখনও বোধ করে নি ও। দাদা আসতে উত্তেজিত হয়েছিল, বহু দিনের চাপা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল কিন্তু ক্রোধের সঙ্গে এমন অপরিসীম ঘৃণা বোধ করে নি। অথবা এই ইতর খুনেটাকে দেখে ওর যা মনোভাব হল—তা ক্রোধ বা ঘৃণা—কোন শব্দ দিয়েই বোঝানো যায় না।

সে বিষ্ণুচরণের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে বললে, 'ঠাকুর, ঐ বজ্জাত লোকটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও এখুনি। সহজে যেতে না চায়—মোড়ের মাথা থেকে কনেস্টেবল ডেকে নিয়ে এসো—বলো গে একটা লোক চুরি করতে এসেছিল তাকে ধরেছি।...আর তুমি খবরদার অমন দরজা খুলে রেখে আমাকে খবর দিতে আসবে না, যত রাজ্যের চোর-জোচ্চোর খুনে বদমাইশ লোক ঐ ফাঁকই খোঁজে, ঢুকে পড়ে। ফের এ রকম গাফিলি দেখলে তোমার মাইনে কাটব—বলে রাখছি!'

বিষ্ণুচরণ বোধ হয় এই রকম অভ্যর্থনাই আশা করে এসেছিল।

তাই সে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আগের মতো অমায়িক কণ্ঠেই বলে উঠল, 'না না, বৌমা— ছি ছি, এসব কি ছেলেমানুষী করছ! অত কিছু করতে হবে না, বললেই যথেষ্ট অপমান করা হল, তার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।...দেখছি ভুলটা তোমার ভাঙ্গে নি পুরোপুরি।...আমি এমনিই খবর নিতে এসেছিলুম, কিছুর প্রত্যাশী হয়ে আসি নি। বরং—চাও তো এখনও তোমার শ্বশুরের বিষয়ের হিস্যে বুঝিয়ে দিতে পারি।...অবিশ্যি আশায় না আর—আমাদের ছেলে যখন চলে গেছে তখনই তো—তবে ওসব আইনের চেয়ে ঢের ঢের বড় জিনিস হল বংশের

মর্য্যাদা!...ব্যস্ত হয়ো না—আমি যেমন এই-ছিলুম তেমনিই চলে যাচ্ছি, তবে—। ভুল একদিন বুঝতে পারবে—তাও বলে যাচ্ছি—'

ধীরে সুস্থে মুখে একটি অমায়িক হাসির ভাব ফুটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বিষ্ণুচরণ।

বিষ্ণুচরণের আবির্ভাবের পর দরজা খোলা আর বন্ধ রাখার বিষয়ে একটু সতর্ক হতে বাধ্য হল হেমন্ত।

দারোয়ান আর ছিল না, রান্নার লোকও মধ্যে ছাড়িয়ে দিয়েছিল, নিজেই রান্না করত। এখন বাইরের কাজ বাড়ায়—প্রকৃতপক্ষে একটা ছোটখাটো কন্ট্রাকটরের কাজই করতে হচ্ছিল তাকে, বালিগঞ্জের নতুন বাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেলেও কোথাও না কোথাও মিস্ত্রী খাটানো লেগেই থাকে প্রায়, বাড়ি ফিরেও হিসেব নিয়ে বসতে হয় আবার—রান্না খাওয়ার সময় থাকে না। সে জন্যেও বটে আর বাইরের বাজার হাট, পোস্ট আপিসে যাওয়া এসবের জন্যে পুরুষ একটা দরকার বলেও বটে—সে আবার ঠাকুর রেখেছে। ঠাকুরকেই বলে দিল সে, ভেতরে কেউ এসে গেলে কিম্বা বাইরে চলে গেলেই যাতে দরজা বন্ধ হয় সেদিকে কড়া নজর রাখবে। নিজে কোথাও যাবার সময় চারুর মাকে দরজা দিতে বলে যাবে। চেনা লোক ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবে না—কেউ এলে ভেতরে খবর দিতে আসবে যখন দরজা বন্ধ করে আসবে। তাতে কোন ভদ্রলোক রাগ করেন সে দায়িত্ব হেমন্তর। নাম, কোথা থেকে কি কাজে এসেছেন ভাল করে জেনে এসে অনুমতি নিয়ে তবে ওপরে আসতে দেবে। ভাড়াটেরা তাদের বাইরের ঘর দিয়ে যাতায়াত করে সুতরাং এ ব্যবস্থায় তাদের কোন অসুবিধা ঘটবে না।

এই বাড়তি ঝঞ্ঝাটের জন্যে সে এক টাকা করে মাইনে বাড়িয়ে দিল ঠাকুরের।

তবে তাতেও অব্যাহতি পাওয়া গেল না।

আজকাল বাড়ি দেখতে যাওয়া একটা কাজ হয়েছে, প্রায়ই বেরুতে হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পছন্দ হয় না—মানে বাড়ির অবস্থা ও অবস্থানের সঙ্গে দামের সামঞ্জস্য হয় না, তবু দেখতেও যেতে হয়। কোনটা পছন্দসই হবে, না দেখে স্থির করা সম্ভব নয়।

একদিন এমনিই একটা বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ফণীবাবু। কাছাকাছি বলে হেঁটেই গিয়েছিল, হেঁটেই ফিরছে—বাড়ির সামনে আসতে একটি ছোকরা এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করল।

ছেলেটির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, বিরাট অ্যালবার্ট টেরিকাটা লক্‌কা লক্‌কা চেহারা দূর থেকেই দেখেছে হেমন্ত—আলোর খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বার্ডসাই টানছে। ওকে দেখেই সেটা যে ফেলে দিয়েছে তাও লক্ষ্য করেছে—অতর্কিতে ফেলতে হয়েছে বলে চিহ্নটা গোপন করতে পারে নি, এখনও নাক দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে—সস্তা চুরুটের কড়া গন্ধে মাথা ধরে উঠল, কাছে এসে প্রণাম করে দাঁড়াতে।

বিরক্তই বোধ করার কথা, করলও একটু। এমন উপদ্রব বেশী দিন চললে এ পাড়াও ছেড়ে দিতে হবে—বালিগঞ্জের নতুন বাড়ি এখনও বিক্রী হয় নি, সেখানে গিয়েই উঠতে হবে, পুরনো বাড়িতেও একখানা ঘর আছে—যাতায়াতের খরচ বেশী পড়বে কিন্তু তার আর উপায় কি?

কয়েক লহমার মধ্যে কথাগুলো খেলে গেল মাথায়। তবু কে জানে কেন এই ছোকরার মুখের দিকে চেয়ে কেমন মনে হল—এর মুখটা একেবারে অপরিচিত নয়। কোন একটা পরিচিত প্রিয় মুখের সঙ্গে কোথায় একটা আদল আছে। চড়ানো গাল, কোটরগত চক্ষু—ঈষৎ রক্তাভ—এক মাথা চুলে আধুনিক উৎকট টেরি, সবটাই বখা ছেলের লক্ষণ—রোগা তার ওপর এই বয়সেই একটু কোলকুঁজো হয়ে পড়েছে—নানাবিধ অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট, তবু কে জানে কেন হয়ত চাহনিটা সরল বলেই—মনটা আপনিই কোমল হয়ে এল একটু।

কিন্তু কোমল হলে চলবে না। মনকে শাসন করে কণ্ঠস্বর রুক্ষ করায়।

'কি চাই?'

ছেলেটি বার দুই মাথা চুলকে বলে ফেলে, 'আমি—মানে আমি শিবু দিদি'

শিবু! চন্দ্রশেখর।

ও, তাই কোথায় যেন মুখটা দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সেই সদ্যোজাত শিশু দেখেছে বলতে গেলে—মনে পড়া সম্ভব নয়, মার সঙ্গে মুখের সাদৃশ্য আছে বলেই এই ভাবটা মনে এসেছে।

মনে পড়ল দাদার কথা, একেবারেই বিগড়ে গেছে শিবু। নেশাভাঙ করে, বাড়ি আসে না—হয়ত চরিত্রও খারাপ, বলা কিছু বললে তেড়ে মারতে আসে—। চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে পাচ্ছে কথাগুলো।

মুখে যতদূর সম্ভব বিরক্তি টেনে এনে বলল, 'অ। তা এখানে কি মনে করে? কি চাই?'

এবার হেসে ফেলে শিবু, বলে, 'কি চাই বললেই দেবে? আমি যা চাই তা তো বুঝতেই পারছ। টাকা চাই। কোথাও কিছু জোটে নি, ট্যাঁক গড়ের মাঠ একেবারে। তাই অনেক খুঁজে এইছি। কদিন আগেই বাড়িতে পরামর্শ হচ্ছিল কিনা—আমাকে ওরা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না তো—আমি কিন্তু কান খাড়া করে সব শুনে নিইছি—তোমার অনেক টাকা, তোমাকে গিয়ে ধরলে যদি কিছু দাও, কি সব ক বছরের টেক্স খাজনা দেওয়া হয় নি, শীতের কাপড়-জামা নেই — তাই তোমার কাছে আসা।.. জানি না কি হয়েছে, দাদা তো চোখ মুখ লাল করে ফিরল, বুঝলুম তোমাকে গলাতে পারে নি। সেই দেখে আমারও ভরসা হয় নি আর এদিকে ঘেঁষতে। নেহাৎ আজ কোথাও থেকে আর কিছু পাবার আশা নেই বলেই—এক বন্ধু ছিল, আমার মতোই হতভাগা, সে আবার কোথায় চলে গেছে। নিরুদ্দেশ। বন্ধুটা বেশ জোগাড়ে ছিল, যখন এই রকম অবস্থা হত ঠিক কাউকে ভাঁপ্পি দিয়ে টাকাটা সিকিটা বার করে আনত। সে গিয়েই আরও—। তাই মরীয়া হয়েই এসে পড়লুম তোমার কাছে। বলি আমি তো আর ওদের মতো মানুষ নই—আমার অত মান-অপমানও নেই, তাড়িয়ে দাও চলে যাব—।'

'তা মানুষ হোস নি কেন? আপনিই বেরিয়ে আসে প্রশ্নটা, নিজের অজ্ঞাতসারেই। মনটা অকারণেই কোমল হয়ে আসে।

দেখা গেল মানুষ হোক না হোক, বোকা নয় শিবু। এই কোমলতাটা তার বুঝতে দেরী হয় না। সে উৎসাহিত হয়ে বলে 'তা বাড়ি ঢুকবো না? ভয় নেই, বেশীক্ষণ থাকব না। কিছু যদি খেতে দাও খাবো, ঐ সঙ্গে কিছু দক্ষিণে পাই আরও ভাল, তার পরই চলে যাবো।'

ওর রকম-সকম দেখে হাসি পায় হেমন্তর। বলে, 'তা চলো। তবে সত্যিই বেশীক্ষণ বসা চলবে না। তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা আমার ঘুচে গেছে অনেক দিন। আমার বাপ ভাই মরে গেছে বলেই জানি।'

'সে বাবা আর দাদা। আমাকে মেরো না দিদি এরই মধ্যে—দোহাই। আমি তো তোমার কাছে এই সবে জন্মালুম। আমাকে তো হিসেবের মধ্যেই ধরা ছিল না। আমি যে আছি তাই তো জানতে না। তাহলে সে অত দিন আগে মরব কেমন করে?

ভেতরে এসে চারুর মার পেতে দেওয়া আসনখানা টেনে একটা দেওয়ালের দিকে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে জুৎ করে।

উনুন ধরানোই ছিল, হেমন্তের নির্দেশে ঠাকুর কখানা লুচি ভেজে লুচি আর রসগোল্লা সন্দেশ সাজিয়ে দেয় জল খেতে। গণ্ডুষ ইত্যাদির বালাই তো নেই-ই, হাতও ধোয় না শিবু। রেকাবীটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করে দেয়। বলে, 'বাঁচালে ভাই, কি বলে যে আশীর্বাদ করব। যে নেশা করি তাতে একটু দুধ মিষ্টির জন্যে প্রাণটা আইটাই করে—কে দিচ্ছে বলো। অনেক দিন এমন জুতের ভোজ জোটে নি অদেষ্টে!'

'তা কেন নেশাভাঙ করোই বা কেন? বামুনের ছেলে, গুরু বংশের ছেলে—লেখাপড়া শিখতে পারো নি?'

'হয়ে ওঠে নি। ঐ গুরু বংশের ছেলে হওয়াটাই কাল হয়েছে। ভণ্ডামি দেখে দেখে সমস্ত ব্যাপারটার ওপরই ঘেন্না হয়ে গেছল। বিশেষ ঐ বাবাটাকে সহ্য করতে পারি না একেবারে। এমন স্বার্থপর লোক যদি দুটি দেখেছ সংসারে!...তাই মাথায় ঢুকে গেছল বাবা যা বলবে তার উলটোটা করব। সেই জন্যেই লেখাপড়া শেখা হল না—বদ সঙ্গে পড়ে নেশাভাঙ করে উচ্ছন্নয় গেলুম। তবু রক্ষে যে মদটা ধরি নি, একেবারে খাই নি যে তা নয়, দু-একদিন চেখে দেখেছি, কিন্তু ওতে দেদার পয়সা লাগে। তাছাড়া—হুঁশজ্ঞান থাকে না, নন্দমায় গড়াগড়ি যায় নেশার ধমকে—দেখে দেখে কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছল। গোড়া থেকেই, তাই বেঁচে গেইছি!'

অকস্মাৎ একটা অকারণ মমতায় যেন চোখে জল এসে যায় হেমন্তর।

অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে, 'তা এখনও তো ফেরা যায়, সময় তো যায় নি। কতই বা বয়েস তোর?'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে লুচি চিবোতে থাকে শিবু, যেন কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করে বসে বসে। তারপর বলে, 'নাঃ, ও আর হবে না। মিথ্যে স্তোক দিয়ে লাভ নেই তোমাকে। অনেক দিনের অব্যেস হয়ে গেল—এ কি ছাড়তে পারব? তাছাড়া বকাটে বাউণ্ডুলে স্বভাব হয়ে গেছে, এ আর শোধরাতে পারব না। বদ সংসর্গের বড় কড়া টান, কেউ এসে ডাক দিলেই চড়ুকে পিঠ সুড়সুড় করে উঠবে—থাকতে পারব না, দলে ভিড়ে যাবো আবার।'

'কিন্তু এইভাবেই কি চলবে? বিয়ে-থা সংসার ধর্ম করতে হবে না?...রোজগার পাতি! কে তোকে বারো মাস নেশার পয়সা জোগাবে?'

'কে আর যোগাবে! না যোগানোই তো ভাল। পয়সা না জুটলে ও কম্ম আর হবেও না!...আর সংসার ধম্ম? সে তো মানুষে করে দিদি! আমি কি একটা মানুষ? এমনিভাবে চলতে চলতে একদিন কোথাও পড়ে মরে থাকব—চুকে যাবে ন্যাটা পুলিশে এসে ডোম ডেকে মুর্দো সাফ করাবে।'

খাওয়া শেষ করে কি ভাগ্যি উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে আসে কল থেকে।

হেমন্তও আর কথা বাড়ায় না। একবার মনে হয় কাছে রেখে দেয়, সংশোধনের চেষ্টা করে। তার পরই বোঝে বৃথা চেষ্টা। বদভ্যাস এতদূরে মূলে বিস্তার করেছে—তার উচ্ছেদ আর সম্ভব হবে না। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে গিয়ে বাকস থেকে চারটে টাকা বার করে এনে ওর হাতে দেয়।

টাকার পরিমাণটা দেখে দুই চোখ যেন চকচক করে ওঠে শিবুর।

বলে, 'এত দিলে! অনেক দিন এত টাকা এক সঙ্গে চোখেই দেখি নি। ভালই হল, ছোট ভাইপোটা বড্ড কাকা কাকা করে—ঐ একজনই যা টানে ও বাড়ির মধ্যে—কখনও এক পয়সার একটা পুতুল নিয়ে যেতে পারি না—দেখি যদি সব উড়িয়ে না দিই পথের মধ্যেই—কিছু একটা নিয়ে যাবো ওর জন্যে!'

হেমন্ত নিজের ভুলটা বোঝে। এত টাকা প্রথমেই দেওয়া উচিত হয় নি। তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব সংশোধনের চেষ্টায় বলে, 'কিন্তু ঘন ঘন এলে পাবে না, তা আগেই বলে দিচ্ছি। আমার যে কথা সেই কাজ।...তোমার দাদাকে যেমন তাড়িয়েছি তেমনিভাবে তোমাকেও তাড়াব তাহলে ঐ বাইরে থেকেই—দূর দূর করে। আমার কেউ নেই এ পৃথিবীতে আপনার লোক, কারও ওপর আমার এক কড়ারও টান নেই।'

শিবু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'আমাকেও তেমন বোকা পাও নি যে তোমার মতো শাঁসালো মক্কেলকে জ্বালাতন করে মূলো তোলা করব!..এক বছর! দেখে নিও—এক বছরের মধ্যে যদি তোমার চৌকাঠ মাড়াই তো কি বলেছি!'

সে তর তর করে—দুটো ধাপ একসঙ্গে ডিঙোতে ডিঙোতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায়।

শিবু তার কথা রাখতে পারে নি কিন্তু—শেষ পর্যন্ত।

এই দেখা হওয়ার ছ মাসের মাথাতেই আর একদিন এসে হাজির হয়েছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন, হেমন্ত তার পুজোর পর্ব শেষ করে উঠে—সবে দিয়ে যাওয়া সাপ্তাহিক খবরের কাগজখানা খুলে বসেছে—ঝি এসে খবর দিলে, 'তোমার সেই ছোট ভাই এসেছে গো দিদিবাবু, বলে, দিদিকে গিয়ে বলো, আমার কথার খেলাপ করি না আমি, টাকা চাইতে আসি নি, অন্য খুব জরুরী কাজে এইছি।...ও দিদি, তেনার দুই চোখ যেন করমচার মতো লাল—'

'গুচ্ছের কি সব নেশা করেছে আর কি! গাঁজাফাঁজা খায় যা বুঝলুম কথার ভাবে। তাতেই বেভুল হয়ে চলে এসেছে ঝোঁকের মাথায় হয়ত—' হেমন্ত অপ্রসন্ন মুখে বলে।

'না গো দিদি—নেশা নয়।' চারুর মা বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'নেশা হলে বুঝতে পারতুম, এ অন্য জিনিস। মনে হচ্ছে খুব কাঁদাকাটা করেছে।'

ভ্রূকুটি ঘনতর হয় হেমন্তর। বলে, 'নিয়ে আয় ওপরে, আসনটি পেতে দে।'

ওপরে এসে কিন্তু বসে না শিবু, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি কিন্তু নিজে থেকে আসিনি দিদি, আমাকে যেন দোষ দিও না—সবাই মিলে হাতে পায়ে ধরে পাঠিয়েছে—'

গলার আওয়াজেই হেমন্ত বুঝতে পারে যে চারুর মার অনুমানই ঠিক. কণ্ঠস্বর অশ্রুতে বা তার অভ্যাসেই এত গাঢ়। তাছাড়াও. কথা বলছে যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

সে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে, 'তা এত হাঁপাচ্ছিস কেন ?

'এতটা পথ হেঁটে—প্রায় দৌড়ই বলতে পারো এইছি যে। নিহাৎ আসার আগে জগা তেলেভাজাওলার দোকান থেকে কষে এক-টান গাঁজা টেনে এসেছিলুম তাই—নইলে কি সোজা পথ এটা. আড়াই কোশ বেওজর!'

তারপর মিনিটখানেক যেন দম নিয়ে বলে, 'বুড়োর বোধ হয় শেষ সময় উপস্থিত। তোমাকে একবার দেখতে চায়। বলে তো মাপ চাইবে নাকি—অন্যাই যে করেছে তা বেশ বুঝেছে—সেইটেই বলে যাবে।...তা তবু আমি সহজে আসতে চাই নি—বুড়ো যখন আমারও হাত ধরে বললে, আমাকে মাপ করিস শিবু। আমি বাপ হয়ে কখনও বাপের কাজ করি নি—আমি ঘোর পাপী, তখন যেন কেমন হয়ে গেল, কান্না পেয়ে গেল গুচ্ছের, তাই আর থাকতে পারলুম না। গাড়ি ভাড়ার পয়সাও তো নেই, ইদিকেও সময় নেই—হেঁটে আসা ছাড়া উপায় কি বলো, বেশ জোরেই হাঁটতে হয়েছে। তা ঐ বুড়োর কথাতেই আসা। যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছে!'

হেমন্ত বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। অনেক দিনের অনেক বিস্মৃত আবেগ, অনেক অভিমান, অনেক রোষ—একসঙ্গে যেন ভীড় করে থাকে মনের মধ্যে। সেটা সামলে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে দৃঢ় স্বরে ব'লে, 'না ভাই, আমার যাওয়ার কোন কারণ নেই। যার কথা বলছ, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার বাপ ভাই মরে গেছে বহুদিন। তারা যদি বেঁচে থাকত তাহলে বোধহয় আজ এমন ক'রে—আমার বলতে একমাত্র যে ছিল পৃথিবীতে—সেই ছেলেকে হারিয়ে পথের ভিখিরীর অধম হ'তে হ'ত না। তোমার বাবা—তোমার দুঃখ তো হতেই পারে—কিন্তু আমার কেউ নয় ও, কোন কালেই ছিল না। যে ছিল সেও আমার মাকে খুন করেছে, আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছে—নিজের সুখ ছাড়া আর কিছু ভাবে নি কোনদিন—এই পরিচয়েই তাকে জানতুম।...সে যাক গে. তুই বোস, কিছু খেয়ে যা—'

'না থাকগে। দেরি হয়ে যাবে।'

'কিচ্ছু দেরি হবে না।' একরকম ধমক দিয়েই ওঠে. 'ঘরে মিষ্টি আনা আছে দুটো গালে ফেলে যা।'

মিষ্টির সঙ্গে একবাটি দুধও এনে. জোর ক'রে খাইয়ে দিলে একরকম।

শিবু বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কোন মতে খেয়ে নিলে। খাওয়া শেষ হ'তে হেমন্ত ওর হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বলল. যাবার সময় আর হেঁটে যেও না. তাড়াতাড়ি যাওয়াও তো দরকার। এই মোড়েই গাড়ী পাবে—একখানা গাড়ি ভাড়া করে চলে যাও। দেড় টাকার বেশী নেবার কথা নয়—বেশী নেয় বেশীই দিও। হেঁটে যেও না কিন্তু।'

শিবু কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। টাকাটা হাতে নিয়ে একটু অবাক হয়েই চেয়ে থাকে—বলে, 'কে জানে তোকে যেন ঠিক বুঝতে পারি নে দিদি। ওরা যদি কেউই নয়—তাহ'লে আমার ওপরে এত টান কেন ? সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে ঝোঁকের মাথায় এতটা দৌড়ে এসে. বুকের মধ্যেটায় টান লাগছে কেমন—'

করুণ হাসে হেমন্ত। বলে. 'সে তো তুইই সেদিন বলছিলি. ওরা মরে গেছে কিন্তু তুই তো এই সেদিন জন্মালি আমার কাছে!'

আর কিছু বলে না শিবু।

সেদিনের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে নয়—আস্তে আস্তেই নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে।

(ক্রমশঃ)
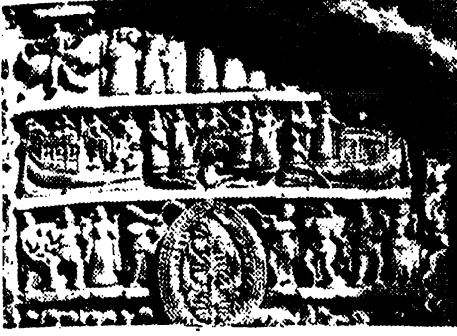
(৪)

বাংলাদেশের অসংখ্য মন্দিরে আজও যেসব লিপি অক্ষত হয়ে রয়েছে তাদের উদ্ধার করে কৌতূহলী পাঠকের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন আজ মন্দির গবেষকদের এক দায়িত্ব বলে গণ্য হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে যে সব মন্দির ভগ্ন-দশায় উপস্থিত হয়েছে এবং অচিরকাল মধ্যেই ভূমিসাৎ হয়ে গিয়ে চিরদিনের জন্যে কৌতূহলী দর্শকের চোখের অন্তরাল হয়ে যাবে তাদের ছবি সংরক্ষণেরও এক বিরাট প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। সৌভাগ্যের বিষয় কোন কোন পুরাতত্ত্বপ্রেমী এ বিষয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালের গবেষকরা যাতে লুপ্ত মন্দিরগুলির ছবি দেখতে পান তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় মন্দির ও মন্দিরস্থ লিপি যাতে অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণ আজও তেমন সজাগ নন। তাঁদেরকে আরও সজাগ করে তুলতে হবে। আজও গ্রামবাঙলার মাঠে ঘাটের মন্দিরগুলি দেখার জন্যে মন্দিরপ্রেমী কোন কোন দেশী বিদেশী ব্যক্তিকে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তাঁরা মন্দিরগুলির দৈনাদশা দেখে প্রায়ই আক্ষেপ করে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায় মন্দিরলিপি মন্দিরের গা থেকে খসে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ তার মূল্য বুঝতে না পেরে সেটিকে নষ্ট করে ফেলেন। এভাবে অনেক প্রাচীন মন্দিরের লিপি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেগুলির যথার্থ কালনির্ণয় অসম্ভব হয়ে ওঠে। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

আগের প্রবন্ধে বাঙলার কয়েকটি মন্দিরের লিপি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি ছাড়া বাঙলার অসংখ্য মন্দিরগাত্রে যে লিপি আছে তাদের মধ্যে কয়েকটি আটচালা মন্দিরের লিপি নীচে উদ্ধার করা হল।

কলকাতার বাগবাজারের মোড়ে একটি আটচালা মন্দিরের লিপি এইরূপ—

শাকে বিলেশয় বিলর্তু বিধৌ বিবর্ধে।
চিত্তে বিলাসফলদং গুরুপাদপদ্ম।।
মাবাস্যাকং শিতিভূতো
দ্বিজাকিঙ্করামোহকাবাঁখিমন্দিরমিদং
পরমৈত্রকাঙ্ক্ষী।। শকাব্দা ১৬০৮।

এখানে একটি মন্দিরগাত্রে রেখাচিত্র আছে। নিমতলাঘাটের (কলকাতা) কাছে 'মদন-মোহন দত্তের বৃহত্তম শিবের আটচালা মন্দিরের লিপিটি এই—

অম্ভোষধীশ ধরণীধর সিতরশ্মি।
প্রখ্যাতশাকসময়ে পিতুরাজ্ঞয়েতৎ।।
সংস্থাপিতং মদনমোহনদত্তপুত্রৈ।
দুর্গেশ্বরাখ্য শিবলিঙ্গমভূৎ সুসৌধে॥
১৭১৬ শকাব্দাঃ

ভূকৈলাসের 'রক্তকমলেশ্বরের আটচালা মন্দিরের লিপি—

চৈত্রেহংকপক্ষগণিতেহহনিপূর্ণিমায়াং।
শাকেহক্ষিশূন্যজলধীন্দুমিতে
গৃহেহস্মিন্।।
শ্রীযুক্ত রক্তকমলেশ্বর নাম লিঙ্গম্
বারে রবেঃ পশুপতেঃ
কৃপয়াবিরাসীৎ।। শকাব্দাঃ ১৭০২

কলকাতার মন্দির স্ট্রীটের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত লুপ্ত মন্দিরের লিপিটি হল : শকাব্দা ১৭২৫।

শাকে বাণযুগাব্ধিচন্দ্রগণিতে
মেষোর্নাবিংশে দিনে।
বারে ভূমিসুতস্য বিপ্রকুলজঃ
সৌখং দশম্যাং তিথৌ।।
শ্রীশ্যামাভিধকো দদৌ সুরধুনী
ক্ষেত্রোপকণ্ঠে শিবম্।
প্রীত্যৈ পুণ্যবতো মুদা স্বরিতয়োঃ
পিত্রোঃ স্বয়ং যত্নতঃ।।

ছোটেলাল কানোড়িয়ার ধর্মপত্নী শ্রীজানকী বাঈ উত্তরভারতীয় বহুচূড় নতুন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন সন ১৩০২ সালের ৬ই কার্তিক।

মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত চেতুয়া বৈকুণ্ঠপুরে নিম্বার্ক মঠের 'বিহারীলাল জীউর চাঁদনী মন্দিরের

রাজা হেমন্ত সিংহের প্রতিষ্ঠিত
হেমন্তনাথের আটচালা মন্দির

শ্রীধরপুরের রঘুমন্দির
স্থাপিত ১২৯০ সাল

সংস্কার সময়ে বর্তমান লেখক রচিত শিলালিপিটি হল :

নগরসবসুভূমে শাকবার্ষেহথ রাধে।
কৃতযুগজনুধস্রে বিশ্বমে সৌরিবারে॥
মরপরমভুবং বেহারীলালস্য বিষ্ণো
হ লধরশরণোহহং ভক্তিতঃ
সংস্কারামি।। (প) শকাব্দাঃ ১৮৬৮

এই মন্দিরের দ্বিতীয় নাগরলিপিটিও লেখক রচিত :

শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে পুরা বনপুরে
স্থাগম্য সিন্দুরে
গোস্বামী শুকদেব নাম বিবুধঃ
নিম্বার্কিনাং নায়কঃ।
শালগ্রামবরং বটস্য ফলকচ্ছ শ্রীধরং
পুজয়ন্
শাকে নেত্রগজেষুচন্দ্রগণিতে
শুদ্ধাশ্রমং সৃষ্টবান্।।

শকাব্দা ১৫৮৩।। লিপির অপরপৃষ্ঠে '(প)' আছে। ঘাটাল থানার হরিদাসপুরের একটি নবনির্মিত চাঁদনী মন্দিরের লিপি :

শীলাবত্যান্তস্তৈতলমুখে
বিপ্রবংশো বরেণ্য
স্তত্তজ্জা বিপ্রো হর ইতি
পুনশ্চাস্ত নারায়ণশ্চ।।
শ্যামা প্রীত্যৈ স চ বুধবরঃ
শ্রীহরেবেশ্ম কৃত্বা।
শাকেহনন্তাবসুগজকুমে দত্তবান্
বিষ্ণবে বৈ।। শকাব্দা ১৮৮১

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা গ্রামে জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'কালীমন্দিরেও একটি আধুনিক সংস্কৃতলিপি আছে। কালীমূর্তিটি পুরীধামে পাওয়া যায়। মূর্তির সম্মুখে শিবলিংগ প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে একসাথে বারোটি ও কালনায় একশ' আটটি শিবমন্দির বর্তমান। কালনার মন্দিরগুলি বৃত্তাকারে আছে। মধ্যবৃত্তে এক থেকে শুরু করে চৌত্রিশটি ও বাইরের বৃত্তে পঁয়ত্রিশ থেকে একশ' আট পর্যন্ত আটচালা মন্দির বর্তমান। এগুলির প্রতিষ্ঠাতা হলেন বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র। মেদিনীপুর শহর, মলিঘাটি (মেদিনীপুর জেলা) শ্যামনগর প্রভৃতি স্থানে শিবালয়গুলি আটচালা শ্রেণীর। গড়বেতার (মেদিনীপুর জেলা) সিংহপাড়ার শিবালয়গুলি দেউল শ্রেণীর, এগুলিতে প্রতিষ্ঠিত লিংগগুলিও বাণলিংগ। নর্মদাগর্ভ থেকে এই বাণলিংগসমূহ পাওয়া গিয়েছে।

মন্দির পুত্তলিকাবলীর মধ্যে এক শ্রেণীর নীতিবাচক চিত্রবিন্যাস দেখা যায়। ঐগুলি বাঙলাদেশের মন্দিরে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে। এদের সংখ্যাও বেশী নয়। এর পারিভাষিক নাম হল 'মণি'। শাস্ত্রের এক বচনে আছে :

বজ্রপাতাদি ভীত্যাদি বারণার্থং
যথোদিতম্।
শিল্পশাস্ত্রেহপি মণ্যাদি বিন্যাসং
পৌরুষাকৃতিঃ।।

সকলপ্রকার মন্দিরই বাঙালী শিল্পীর হাতে বিশেষ একটি রূপ পেয়েছে। প্রধানত অলংকরণ ও পুত্তলিকাবিন্যাসের সরলীকরণের দ্বারাই এটি সম্ভব হয়েছে। এই লক্ষণটি বাঙলাদেশের দেউল মন্দিরে দেখা যায় বিশেষভাবে। কাঠামোটি আছে, কিন্তু নেই কোন অলঙ্করণ বা পুত্তলিকাবিন্যাস। আজুড়িয়ার (দাসপুর থানার অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলায়) শীতলা মন্দিরে কিছু কিছু পুত্তলিকা বিন্যাস আছে। সম্ভবত এটি ছাড়া দেউল শ্রেণীর কোন মন্দিরে এরূপ বিন্যাস নেই।

বাঙলাদেশে রাজধানী জাতীয় প্রাচীন নগর, ভূস্বামিগণের অধিকৃত বৃহৎ প্রাচীন গ্রাম, গংগা প্রভৃতির ন্যায় তীর্থস্থানগুলিতে মন্দিরের সংখ্যা বেশী। মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি বড়নগর, বর্ধমান জেলার কালনা, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর প্রভৃতি মহকুমা শহর, প্রায় প্রতিটি জেলার সদর, চব্বিশ পরগণার বাওয়ালী এবং ধনী ব্যবসায়ি সম্প্রদায়ের কেন্দ্র প্রভৃতি স্থানেই মন্দির বেশী সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানাকে মন্দিরের দেশ বলা যায়। এই থানার প্রতি গ্রামেই এক বা বহু দেবালয় দেখা যায়। গ্রামের সাধারণ দেবতা হলেন শিব, শীতলা ও ধর্ম। এঁদের মন্দির বা মৎকুটির এখানকার প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে।

মন্দিরের শিল্পী সূত্রধরদের অনেকের বাস ছিল মেদিনীপুর জেলার দাসপুরে। দাসপুরের শিল্পীদের মধ্যে ঠাকুরদাস শীল, হুগলির সেনহাটীর কার্তিকচন্দ্র ও

দাসপুরের আলুগোছটুঙী মন্দির
(গোপীনাথ) সন ১১২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত

নিমতলার প্রামাণিকের
নবরত্ন মন্দির
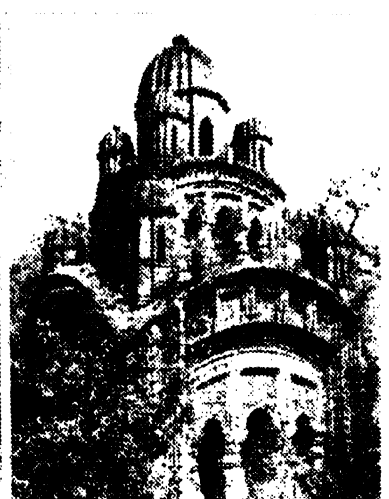
মহিন্দনাথ, বাঁকুড়ার সোনামুখীর রামহরি, দাসপুর থানার কল্মিখোড়ের রাজারাম প্রভৃতির নাম এখনও অনেক মন্দির গায়ে দেখা যায়। সেনহাটী, সোনামুখী ও হাওড়ার থলিয়া প্রভৃতি স্থানে আগে অধিকসংখ্যায় সূত্রধর মন্দিরশিল্পী বাস করতেন। কালের গতিকে তাঁদের পেশার অবনতি ঘটায় অনেকে নানাস্থানে চলে গেছেন। কোন কোন বংশ একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে।

মন্দির ও কবাটের পুত্তলিকা বিন্যাসও উনিশ শতকের শেষের দিকে অবলুপ্তির পথে আসে। সন ১২৯০ সালে দাসপুর থানার শ্রীধরপুরের সামন্ত বংশের মন্দির ও কবাটে শেষ পুত্তলিকা বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। সন ১২৯২, ১৩২২ ও ১৩২৪ সালে রাজারাম মিস্ত্রীর নির্মিত মন্দিরে অলংকরণমাত্র পাওয়া যায়, কোন পুত্তলিকা বিন্যাস নেই।

বাঙলার মন্দিরে সংস্কৃতলিপি সম্পর্কে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লিপি উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধের উপসংহার করব। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায় মল্লেশ্বর মন্দিরটি বঙ্গোৎকল আদর্শে ৯১৩ শকাব্দে (মল্লাব্দে) নির্মিত হয়েছিল। পুরনো মন্দিরটির নতুন করে সংস্কার করেছিলেন বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র। রাজা তেজশ্চন্দ্র সংস্কৃত মন্দিরে যে সংস্কৃতলিপিবিন্যাস করেছিলেন সেটি হল :

শাকেন্দ্রীন্দ্বিদ্রচন্দ্রে ধনপচনগৃহং
সিদ্ধিখাতস্য খাতম্।
শ্রীমল্লেশ্বাসং প্রহরিগণগৃহং
নাট্যযজ্ঞালয়ঞ্চ।।
ধম্মাজ্ঞো ধর্ম্মগেহং নবসদৃশকৃতং
সুক্ষ্মসৌধং স্বকার্ষীৎ।
শ্রীমল্লেশ্বরতুষ্টৌ নৃপবর সুকৃতী
শ্রীযুতেন্তেজচন্দ্রঃ।।

আচার্য পঞ্জিকামতে ১৪৪৪ শকাব্দে নির্মিত রঘুনাথ জীউর দেউল মন্দিরের বাইরের খড়ের দ্বারের ওপরে স্থাপিত তেজশ্চন্দ্রের আরও একটি লিপি দেখতে পাওয়া যায়—

শাকেন্দ্বীষ্বশ্বভূমে রঘুযদুবটে
শাসন স্নানযাত্রা।
বৃন্দা তৌর্যত্রিক শ্রীকপিধন সুঘটী
বাদ্যরাসালয়াদীন্।।
কুপো শ্বৌ নন্দিগেহানুপকময
নবীয়ানি বৃত্যোপকার্ষীৎ।
সীতাকুন্ডস্য খট্টং নরপতি সুকৃতী
শ্রীযুতস্তেজচন্দ্রঃ।।

প্রথম শ্লোকটিতে ভুল থাকতে পারে, দ্বিতীয়টির শকাব্দ হল ১৭৫৩ বা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ। বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাজেই রঘুনাথজীউর মন্দিরের লিপিটি তাঁর জীবৎকালের একেবারে শেষদিকে রচিত হয়েছিল।

চেঁচুয়ার মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১০৮৮ সাল অর্থাৎ ১৬৮১ সাল। দাসপুরের মন্দিরসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম।

নাড়াজোলের (মেদিনীপুর) গড়ের মধ্যে আধুনিক আটচালা শিব মন্দিরের লিপিটি দুর্বোধ্য। লিপিটি হল :

প্রত্যষ্ঠচ্ছুতিষ ত্রিংশাংশে
শাকাব্দেহপতীন্দুগে।
মৃত্যুঞ্জয়শিবং নিস্তারিণীভূপনরেন্দ্রজা॥

লিপিটির মর্মার্থ কোনরকমে এভাবে করা যায়—নরেন্দ্রমাতা নিস্তারিণী ১৮৩০ শকাব্দের ৩০শে আষাঢ় মৃত্যুঞ্জয় শিব প্রতিষ্ঠা করলেন।

কলকাতার ৯৩নং টালিগঞ্জ রোডের মন্দিরগুলির বহির্দ্বারের দুপাশে মর্মর ফলকে বাঙলা ও সংস্কৃত উভয় লিপিই আছে। বাঁদিকের সংস্কৃত লিপিটি হল : শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভদ্রম।

যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি শিরসা
ছত্রধারয়া।
গঙ্গাস্নানে ন গন্তব্য
দেবদেবালয়েষু চ।।
ইতি সদাশিবস্যাজ্ঞা।।

অস্যার্থ।।১।।

সকলের চরণে আমার নিবেদন।
দেবালয়ে যাইবে না করি আরোহণ।।
নিষেধ বিধি কহি কিছু সভার
অগ্রভাগে।
গাড়ি পালকি ঘোড়া
গজাদি নিষেধ আগে।।
পাদুকাপাদেতে আর শিরে ছত্র ধরে।
না যাইবে গঙ্গাস্নানে দেবের মন্দিরে।।
মুনিবাক্য হেলন করে
জাইতে জাহার মন।
শপথ আছয়ে প্রবেশ করিতে অঙ্গন।।

আরব্দ সন ১২০২ সাল তারিখ ২৭ ফাল্গুনে প্রিতিষ্ঠা সন ১২৫৩ সাল তারিখ ৩১ চৈত্র। শ্রীপ্যারীলাল দাস। শ্রীমণিমোহন দাস। ডাইনে মর্মর ফলকে লিপিটি এই—

শকাব্দ ১৭৬৭। এই শ্রীশ্রী বাটীতে কেহ পাদুকা পায়ে দিয়া জাইবেন নাই জে জাইবেন তাহাতে তাল্লাক সন ১২৫২ সাল।

উদ্ধৃত লিপিটির মধ্যে মন্দির প্রবেশের নিষেধবিধিকে দৃঢ়ভাবে দর্শকসাধারণের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। নিষেধবিধি যাতে সকলে বুঝতে পারেন তার জন্যে সাধারণের দুর্বোধ্য সংস্কৃতলিপির ভাষানুবাদ করার দরকার হয়েছিল। লক্ষণীয়, নিষেধবিধির মধ্যে অবিনীতবেশে মন্দির প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও জাতি বৈষম্যের কোন কথা উল্লিখিত হয় নি। মন্দির প্রবেশের এই বিধিনিষেধ প্রাচীন কোন মন্দিরলিপিতে তেমন দেখা যায় না। এর একটা অন্যতম কারণ হতে পারে এই যে প্রাচীনকালে ধর্মপরায়ণ ও মন্দিরদর্শনেচ্ছু জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিধিনিষেধের নিয়ম মেনে চলতেন মনে হয়। তাছাড়া সে সময়ে মন্দির ছিল ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের অবাধ প্রবেশকেন্দ্র। ধর্মানুষ্ঠান সেকালের বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতো।

সেকালের মন্দিরলিপির মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ কিন্তু বাদ পড়ে গেছে। সেটি হল লিপিরচয়িতার নাম। মন্দির-নির্মাতা ও প্রতিষ্ঠাতার নামের অন্তরালে তাঁরা আত্মগোপন করে আছেন। এদের রচয়িতাদের নাম আর কোন দিনই জানা যাবে না। তবে অনুমান করা যেতে পারে এঁরা সম্ভবত সেকালের রাজারাজড়ার সভাপণ্ডিতের পদ অলংকৃত করতেন। যাহোক বাঙলার মন্দিরগুলির লিপিসমূহে এঁদের পরিচয় বা নামের উল্লেখ থাকলে আরো ভালো হত।

রক্তমাখা ছিন্ন শাড়িটির পাড় ॥

আহমদ বুলবুল ইসলাম

(শহীদুল্লা কায়সার-কে)

কেউ কী জেনেছিলো বাংলার অফুরন্ত সবুজে
কেউ কী জেনেছিলো অর্ধভুক্ত শীর্ণ মানুষের পাঁজরে
কেউ কী জেনেছিলো আশী বছরের বুড়োর হাড়ে
প্রতিরোধের হাতিয়ার হবে
দধিচীর মতো;

তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিশোধের নেশায় হোলি খেলবে,
কেউ কী ভেবেছিলো মায়ের বোনের ধর্ষিতা লাশের
ভেতর স্বাধীনতার সূর্যবীজ জন্ম নেবে?

কেউ কী দেখেছে সেই চোখ মৃত্যু কঠিন,
শপথে দৃপ্তমুখ বেয়নেটের খোঁচায় লুটিয়ে পড়ার আগে;
কেউ কী শুনেছে শেষ উচ্চারণ সেই যুবতীর
বুলেটের আঘাতে যে রাঙিয়েছে
বুকের কাঁচুলি।

কেউ কী দেখেছো কখনো সেই যুবতীকে
যে নিজেই কামড়িয়ে খেয়েছে নিজের ঠোঁট
যখন ধর্ষিতা হয় সে বন্দী শিবিরে;
কেউ কী শুনেছো সেই কিশোরের অমোঘ কণ্ঠস্বর, সে
যখন ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে।

তোমরা কী কেউ খুঁজে দিতে পারো
আমার সেই কিশোর ভাইটিকে, যুবতী বোনটিকে?
তার কোনো ছবি তো আমার কাছে নেই,
ঐ হাজার হাজার মরা লাশের মুখ
একেবারে অবিকল আমার বোনের মতো।

কেউ কী খুঁজে দিতে পারো তাকে?
শুধু তার ছিন্ন রক্তমাখা শাড়িটির পাড়
দিতে পারি তোমাকে।

কোনদিন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেলে ॥

শিশির ভট্টাচার্য

কোনদিন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেলে
স্মৃতিকে ডেকো না।
দারুণ পাহাড় স্মৃতি শাঁখের করাত—
যেন কারো হাত

টানা ও পোড়েনে খেলে অদৃশ্যামাকুর সাথে
জ্যামিতিক সরল আশ্লেষে।
কোনদিন পেছনে তাকিয়ে

যদি দ্যাখো ফেলে আসা প্রচণ্ড আমিকে
অবিরত জীবনের ফুলন্ত বিস্ফারে,
হার্ডল্ রেসের মাঠে ঝানু খেলোয়াড়,
কিম্বা যদি তার

শান্তশীল মৃদু মুখ আরক্ত বিস্ময়ে
হৃদয়ে আগুন জ্বালে নৈঋতের মাঠে,
রাতভোর জেগে থাকে নিহত আশার শব নিয়ে,
তবে এই শুষ্কের আড়াল খোঁজা আরোপিত আমি
হয়ে পিছুগামী

বিপন্ন লুকোবে মুখ পরাজিত সম্রাটের মত
এবং নিরত

কালের হোঁচট খাওয়া নড়বড়ে সাঁকো বেয়ে
চলে যাবে সূর্যহীন পথে।

কোন ঠিক নেই ॥ প্রতিমা সেনগুপ্ত

আমার প্রেম কাকে নিয়ে?
তার কোন ঠিক নেই।
যাকে, যে রকম, যতটুকু, যে কোন সময়ে ভাললাগে...
ততটুকুই উপভোগ করে নিই;
এর মধ্যে কোন মিথ্যে নেই।
আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?
না। তা পারব না।

অন্তত,
যতক্ষণ এই মন সব কিছু দেখে
ফুরিয়ে না ফেলে ততক্ষণ।
তারপরে, পৃথিবী যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়
ফিরে তাকাব না।

মাতৃভাষার প্রসারে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাহার প্রধান কারণ, আগাগোড়া মুখস্থ করিতে গিয়া ইংরেজি বুঝিবার এবং রচনা করিবার সময় পায় না। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় পাইতাম তবে ইংরেজিভাষা শিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখনকার অপেক্ষা ব্যাপকতর এবং ইংরেজিভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর করা যাইতে পারিত।'

এই মুখস্থীকরণ প্রবণতার পরিণাম যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে তিনি পরে কবি তার দু একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করার ইচ্ছা থাকলেও সে লোভ সম্বরণ করা গেল। ইংরেজি শিক্ষার সুফলের সম্বন্ধে তাঁর মনে যে কোনো সংশয় ছিল না একথা বারংবার বলেছি। ইংরেজি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের (১৩০৮ পৌষ। ১৯০১ ডিসেম্বর) ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজি ভাষার অনেক ক্লাস তিনি নিজেই নিতেন। ইংরেজি ভাষা শেখানোর পক্ষে কোন প্রণালী সবচেয়ে ফলপ্রসূ, তবে সে বিষয় তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। 'ইংরেজি সোপান', 'ইংরেজি পাঠ', 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা', 'ইংরেজি সহজশিক্ষা' এবং দু খণ্ড 'অনুবাদচর্চা' এই বইগুলি ইংরেজি শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শিক্ষাদান বিষয়ক অনুশীলনের ফল। ইংরেজিকে রবীন্দ্রনাথ হটাতে চাননি। তিনি শুধু বলেছিলেন 'শিক্ষার বাহকতার ভারটা তার হাতে দিও না। সে কাজটা নির্বাহ করা মাতৃভাষার পক্ষেই সহজ। কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেইজন্য পালি ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।'

পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও আমাদের জীবনক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করাতে হলে তাকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই করতে হবে। কিন্তু সহজ কথাটা আজ পর্যন্ত সবাইকে বোঝানো গেল না। অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরীক্ষণ প্রশাসন প্রভৃতি সকল বিষয়ে মাতৃভাষা প্রবর্তনের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। যাঁরা চতুর লোক তাঁরা কলহ করেন না। তাঁরা বলেন, নীতি হিসাবে মাতৃভাষার ব্যবহার অবশ্যই স্বীকার্য

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তবে এখন সময়টা অনুকূল নয়, আরও কয়েকটা দিন যাক।

বেশী দিন নয় মাত্র ন'বছর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন (১৯৬২) সভায় মাতৃভাষার প্রসঙ্গ নিয়ে একটা বিতর্কসভার আকার ধারণ করে। সমাবর্তন উৎসবের প্রথম দিনের নিমন্ত্রিত সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই মন্তব্য করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে এবং সকল শ্রেণীতে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয় দিনের ভাষণদাত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই মতের বিরোধিতা করে যা বললেন, তার তাৎপর্য এই যে শিক্ষার নিম্নস্তরে মাতৃভাষা যদি বা চলে—কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিকেই মাধ্যম রাখা উচিত।

তৎকালীন উপাচার্য তাঁর ভাষণে ইংরেজির সপক্ষেই মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন—

অন্ততপক্ষে স্নাতকোত্তর এবং অনার্স স্তরে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহনরূপে রক্ষা করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে চিন্তা করেছি।

এ স্থলে অন্তত পক্ষে কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। শিক্ষার নিম্নতর স্তরেও ইংরেজিকে মাধ্যম রূপে ব্যবহার করতে পারলেই তিনি সুখী হন কিন্তু জনমতের চাপে তা যদি নিতান্তই সম্ভব না হয় তা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হলে অন্তত অনার্স এবং এম-এ এম-এস-সি'র ক্ষেত্রে না রাখলেই নয়। ইংরেজির স্থলে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তনের জন্যে জনসাধারণের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছে কি কারণে? তিনি বলেন, স্বাদেশিক ভাবাবেগ এর এক কারণ। আর এক কারণ—আঞ্চলিক ভাষার সমর্থিত বিধানের আগ্রহ। কলিকাতার উচ্চতম আদালতের প্রাক্তন বিচারক মহাশয়ের মন্তব্যের সুর শুনে মনে হয় দুটোই অমূলক এবং ভিত্তিহীন। তিনি এবিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করে বলেন—

বিদেশী ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে কোনো বিষয় শিক্ষা করা শিক্ষার্থীর পক্ষে বেশী সহজ এরকম একটা মতবাদ আছে এবং আঞ্চলিক ভাষাকে ইংরেজির স্থলে প্রবর্তন করার ইচ্ছার সেটাও একটা কারণ। বিদেশী ভাষার সাহায্যে জ্ঞানার্জন করতে গেলে জাতীয় শক্তির কিছু অপচয় ঘটে এ ধরনের কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন।

কি কি কারণে লোকে ইংরেজির পরিবর্তে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে ইচ্ছা করেন বলে তিনি মনে করেন, সেগুলি বিবৃত করে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মহাশয় রায় দিলেন—

উল্লিখিত কোনো যুক্তিকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে বর্জন করার পক্ষে সংগত কারণ বলে আমি গ্রহণ করতে পারি না। এজন্য আমি দুঃখিত।

পূর্বোক্ত কারণ দুটির অসারতা প্রমাণের জন্যে তৎকালীন উপাচার্য মহাশয় যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তার উপরে কারও কথা চলে না। সে যুক্তিটা কি?

দেশাত্মবোধক ভাবাবেগ সম্বন্ধে একথা বলাই বাহুল্য যে আমাদের দেশের যাঁরা জাতীয় নেতা ইংরেজি ভাষায় তাঁদের প্রায় সকলেরই অখণ্ড অধিকার ছিল। এতেও যদি প্রতিপক্ষ স্তব্ধ না হয় তাহলে, তাহলে জাতির জনকের নাম করব—যিনি ইংরেজিতে অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে পারতেন এবং প্রকাশ করতেন। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে তাঁর নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

জাতির জনক ইংরেজিতে ভাব প্রকাশ করতেন শুধু নয় অননুকরণীয় ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশ করতেন—ইংরেজিতে তাঁর এমনি অধিকার ছিল। ইংরেজির সঙ্গে দেশপ্রেমের যে কত ঘনিষ্ঠ যোগ তা আমরা এই সমাবর্তন ভাষণের মধ্য দিয়েই প্রথম জানতে পারি। আমরা জানতে পারি গোখলে, তিলক, লাজপত রায়, মতিলাল নেহরু, স্বামী বিবেকানন্দ, রাণাডে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—এঁরা সকলেই "We remarkable for the English style, [illegible] যারা মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করতে চায় তারা নিশ্চয় দেশদ্রোহী।

আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি [illegible] ইংরেজির বদলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত, এটাও তাঁর মতে অন্তঃসারশূন্য অজুহাত মাত্র। তাঁর ধারণা ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন হিসেবে প্রচলিত রাখার দরুন, আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি কখনো ব্যাহত হয় নি, অন্তত বাংলাদেশে তো নয়ই। আঞ্চলিক ভাষার অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া তো দূরের কথা বরং যে সকল বাঙালী সাহিত্যিকের দানে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল তাঁরা সকলেই ইংরেজির মাধ্যমেই বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এই তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে পাছে কেউ সংশয় প্রকাশ করে সে জন্যে বক্তা আগে থেকেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র—বাংলা সাহিত্যকে কি পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছেন তা আমরা জানি। কিন্তু তাঁদের সকলে ইংরেজির মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন বলে সেটা সম্ভব হয়েছে এটা মানতে গেলে সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হবে। কারণ, ইতিহাস বলে তাঁরা সকলেই

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ইংরেজির মাধ্যমে বিদ্যালাভ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য।—কারণ যে ভাষণ থেকে অনুচ্ছেদটি উত্থাপন করছি সেটি প্রদত্ত হয়েছিল এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই। বক্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।—

'বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারম্বার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনো যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভার্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে ঝুঁকিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল 'he is up তিনি হন উপরে, যারা ইংরেজি I সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল 'I by myself I' তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তি পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সদ্গতি ছিল 'নর্মাল স্কুল'—নামধারী মাথা-হেঁট-করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা বিদ্যালয়ে স্বল্প-সন্তুষ্ট বাংলা পণ্ডিতি ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত।...আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।...এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।'

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, নর্মাল স্কুলে পড়ার ফলে বাংলা ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের সাধনাও চলতে লাগল। রচনার সাধনা স্বভাবতই সহজ নয়। তাও যদি আবার বিদেশী ভাষার মাধ্যমে করতে হয় তা হলে পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অল্প বয়সে বাংলা ভাষাটা এইভাবে আয়ত্ত হয়েছিল বলেই ইংরেজি শেখাও তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। নিজের বাল্যশিক্ষার ইতিহাস অনুসরণ করে বলছেন,—'নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।...ইস্কুল পালানে অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের

খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ শিশুকাল থেকে বাংলা ভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত।'

ইংরেজি ভাষায় তিনি যে অধিকার অর্জন করেছেন তার কারণ কি? কবি বলেছেন,—'নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়, সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।'

হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদনের শিক্ষা প্রধানত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়েছিল বটে কিন্তু মধুসূদনের জীবন-চরিত পাঠ করলে দেখতে পাই কবি নিজে পরভাষাবাহিনী এই শিক্ষাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। বলেছেন,
"Such of us as owing to early defective education, know little of it (Bengali) and learn to despise it are miserably wrong". —এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করেও যে বাংলা ভাষায় তাঁর অসামান্য অধিকার এবং গভীর অনুরাগ জন্মেছিল তার প্রধান কারণ শৈশবের গৃহশিক্ষা—সে শিক্ষা স্বভাবত একান্তভাবেই মাতৃভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্রও যে একদা মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার উপযোগিতার সপক্ষে সুদৃঢ় মত প্রকাশ করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে। যে ভাষার মাধ্যমেই তিনি শিক্ষা পান না কেন মাতৃভাষাই যে যোগ্যতম বাহন এ সম্পর্কে তাঁর মনে কখনো সংশয় ছিল না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রবর্তন এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে। সেদিনও বিতর্ক কম হয় নি। প্রবর্তনের পক্ষে যাঁরা উদ্‌যোগী হয়েছিলেন বিরোধী দলের হাতে তাঁদের বারংবার পরাজয় ঘটেছে। যুক্তির চেয়ে সংখ্যার বল সর্বদাই বেশী। সেকালেও তাই ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্বতন অভিভাবকেরা এ বিষয়ে কি ভেবেছিলেন কি করেছিলেন একবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখা যাক। আজ থেকে আশি বছর আগের কথা চিন্তা করুন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সেও একটা স্মরণীয় কাল। সেই প্রথম একজন ভারতীয় বসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে। সার জেমস উইলিয়াম, উইলিয়াম রিচি, জেমস আরস্কাইন, সামনার মেন, সেটন কার, বেলি, ইলবার্ট, হান্টার প্রভৃতির মত বাঘা বাঘা ইংরেজ ভাইস-চ্যান্সেলরের পর ওই পদে অধিষ্ঠিত হলেন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে। ১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে পাঠ করলেন তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণ। তাঁর সেই প্রথম ভাষণেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হল। তিনি বললেন—যদি না মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানকে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় তাহলে জাতি হিসাবে আমরা পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যাপক সংস্কৃতি অর্জন করতে সমর্থ হব না। ইতিহাস আমাদের কি শিক্ষা দেয় তা বিবেচনা করে দেখুন। বিবিধ আধুনিক ভাষার বাহকতায় জ্ঞানের আলোক যতদিন না তার দীপ্তি বিকীর্ণ করেছিল ততদিন ইউরোপের মধ্যযুগীয় অন্ধকার সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নি। ভারতবর্ষেও তাই। একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যমের সাহায্যে জ্ঞানের আলোক আমরা পেয়েছি বটে কিন্তু সমাজের উপরের স্তরেই তার সঞ্চরণ। সমগ্র দেশ যে অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন যতক্ষণ না মাতৃভাষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়া হয় ততক্ষণ সে অন্ধকার অপসারিত হবে না।

শুধু মাধ্যম হিসেবে নয় অধ্যয়নের বিষয় হিসেবেও মাতৃভাষাকে আবশ্যিক পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি এই অভিভাষণে ব্যক্ত করেন।

প্রথম ভারতীয় উপাচার্যের ভাষণে দেশের মর্মকথা সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অভিভাবকেরা এই অভিমতকে কর্মক্ষেত্রে রূপ দেবার জন্যে অগ্রসর হলেন। ১৮৯১-এর ১ মার্চ তারিখে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রেজিস্ট্রারের কাছে এ সম্পর্কে প্রস্তাব করে একটি পত্র পাঠালেন। ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রবর্তন প্রয়াসের ইতিহাসে এই পত্রের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে তার প্রাসঙ্গিক অংশটি অনুবাদ করে দিচ্ছি।

গত বৎসর উপাধি বিতরণের উদ্দেশ্যে আহূত সমাবর্তন সভায় মাননীয় উপাচার্য মহাশয় ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির অধ্যয়নে উৎসাহদানের প্রয়োজনীয়তার দিকে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সে কথা সবার স্মরণ থাকবে। প্রকাশ যে তিনি বলেন,—'যে সকল ভারতীয় ভাষা সাহিত্য-

সম্পদে সম্পন্ন, সংশ্লিষ্ট প্রাচীন ভাষাগুলির সঙ্গে ওই সকল ভাষাকেও আমাদের পরীক্ষাসমূহের জন্যে অবশ্য পাঠ্য করে, এই ভাষাগুলির অধ্যয়নে উৎসাহ দান করা কেবল যে বাঞ্ছনীয় তাই নয় আমার মতে তা একান্ত আবশ্যক।' তাঁর অভিমত সমর্থন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ বিষয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে এই মনে করে সিণ্ডিকেটের বিবেচনার জন্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করছি।

যে প্রস্তাবগুলি স্যর আশুতোষ উপস্থাপিত করেছিলেন তার প্রথমটি এই—

কলাবিভাগের পরীক্ষার জন্যে যে সকল ছাত্রছাত্রী সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করে, তাদের বাংলা, হিন্দী এবং উর্দু এই তিনের মধ্যে যে কোনো একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে।

প্রস্তাবটি সামান্য হলেও সেদিন এটিকে নিতান্ত সামান্য মনে করা হয় নি। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল কেবল সেই সব ছাত্রকে একটি মাতৃভাষা পড়তে দেওয়া হোক যারা আর্টস অর্থাৎ কলা বা প্রজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী। তাও আবার সকল আর্টস পরীক্ষার্থীর জন্যে নয় কেবল তাদেরই জন্যে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হচ্ছে যারা প্রাচীন ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকে একটি পরীক্ষার বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য করতে হবে সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন ভাষার (যেমন, গ্রীক, ল্যাটিন) ছাত্রকে এই ব্যবস্থার অধীন করতে চাওয়া হয় নি। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাদেরও এ প্রস্তাবের বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য এই অতি নিরীহ প্রস্তাবটির অভ্যন্তরেও কেউ কেউ বোধ হয় কোনো বিপত্তির আশঙ্কা লক্ষ্য করেছিলেন। প্রস্তাবটি সিণ্ডিকেটে পাঠানোর আগে আর্টস ফ্যাকাল্টিতে উত্থাপন করা হল। তারিখ ১১ জুলাই, ১৮৯১। পক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত আশুতোষই হেরে গেলেন।

কিন্তু সে পরাজয়ের মধ্যেই ভাবী কল্যাণের বীজ নিহিত রইল। সেদিনকার আলোচনায় কে কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং পক্ষাপক্ষের ধরনটাই বা কি রকম ছিল সেটা জানবার জন্যে পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হলে সেটি যথারীতি সমর্থিত হল। সমর্থন করলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় একটি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে। তাঁর সংশোধনীর তাৎপর্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে কলাবিষয়ক পরীক্ষাসমূহের নিয়মাবলী যেভাবে সংশোধন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়েছে সেভাবে করা বাঞ্ছনীয় নয়।

এই সংশোধনী প্রস্তাবও সমর্থিত হল। সমর্থন করলেন মৌলবি সুরাজউল ইসলাম।

তারপর মূল প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হল। প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন কর্নেল জে, এস, জ্যারেট, নবাব আবদুল লতিফ, রজনীনাথ রায়, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নীলমণি মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তাবের অনুকূলে বক্তৃতা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু ও মহেন্দ্রনাথ রায়। রেঃ ডঃ ম্যাকডোনাল্ড, আনন্দমোহন বসু এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সংশোধনী প্রস্তাবটি সভার সম্মতিক্রমে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। অতঃপর মূল প্রস্তাবটির উপর ভোট গৃহীত হলে ছয় ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা ১৭, পক্ষে পড়েছিল ১১।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হল, এ অনুমান স্বাভাবিক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সে আন্দোলন অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন আলোচনার প্রমাণ বিরল নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে একযোগে আন্দোলন এই প্রথম। ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ দশকটি মাতৃভাষানুশীলনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

বাং ১২৯৯-এর পৌষ মাসের সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হয়—পৌষের প্রথমার্ধ হলে ১৮৯২-এর ডিসেম্বরে। প্রবন্ধটি তার আগে পঠিত হয়েছিল রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে। এখানে এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত ইতিপূর্বেও প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৯০ সালের কার্তিক (অক্টোবর, ১৮৮৩) সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু এটা ঠিক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন চিন্তাশীল বিশিষ্ট মনীষীর মতের আনুকূল্য পাওয়ায় আন্দোলনের কিছুটা প্রসার হল। তবে অনুরাগীর দল সংখ্যায় লঘু। গৌরবের গুরুত্বে সংখ্যালাঘবের দুর্বলতা দূর হয় না। আজ সেটা যেমন সত্য সেদিনও তেমনি সত্য ছিল। আর সমস্যাও সেদিন যা ছিল আজও বোধ হয় তা-ই আছে। প্রকারে ঠিকই আছে, পরিমাণে কিছু পার্থক্য ঘটলেও ঘটতে পারে।

মাতৃভাষাকে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার ক্ষেত্রে কর্মপরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা কেউ কেউ ব্যবহার করতে চাচ্ছি, তার একমাত্র কারণ এই নয় যে তাতে কাজটা সহজ হবে স্বাভাবিক হবে এবং সেটা দ্রুততর নিষ্পন্ন হবে। তার আর এক কারণ এই যে আমার মাতৃভাষা এই অনুশীলনের দ্বারা শক্তিশালী হবে, পুষ্ট হবে এখনও তার পরিণতির যেটুকু বাকী আছে সেটুকু সে লাভ করবে। তাকে যদি অকেজো অকর্মণ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখি, তাকে শ্রদ্ধা না করে কৃপামাত্র প্রদর্শন করি তাহলে সে বৃদ্ধির অবকাশ পাবে কেমন করে?

উপরিউক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—'আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। ...ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংস্পর্শ আমরা লাভ করি না। অন্যদিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া বলেন, 'বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের মত শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।' প্রকৃত কথা আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি। যেদিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায় আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে।'

সে সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনার কি কোনো উপায় নেই? একটিমাত্র উপায় আছে। রবীন্দ্রনাথ সেটি নির্দেশ করে বলেছেন,—এ মিলন সাধন করতে পারে 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য'।

এই প্রবন্ধটি স্বভাবতই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এটি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

'আপনার শিক্ষার হেরফের নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি।' (পূর্বোদ্ধৃত সমাবর্তন ভাষণ দ্রষ্টব্য।) তারপর বলছেন,—

'আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সদস্য বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাহা গৃহীত হয় নাই।'

এ উক্তিটি যে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের সভায় আনীত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ওই প্রস্তাবের সমর্থকদের মধ্যে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসুর নাম দেখেছি। বোঝা যাচ্ছে মাতৃভাষার অনুশীলন সম্পর্কে এঁদের চিন্তাও নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার মাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এঁদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই দুজন মনীষীও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথকে আপন আপন মত জানান। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন,—

'পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতে ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-রূপে রবীন্দ্রনাথ : ১৯৩৩
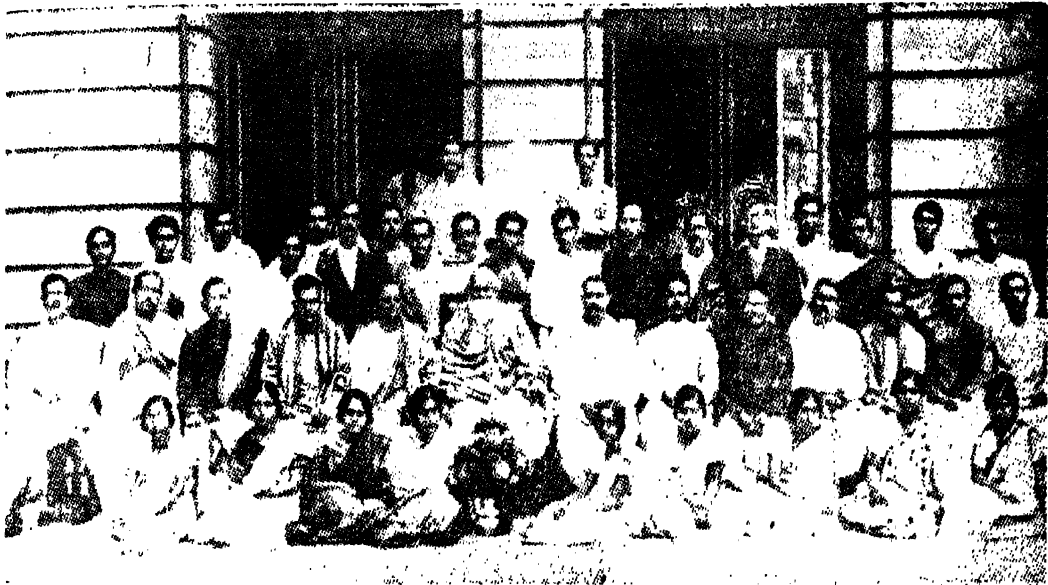
আশুতোষের আনীত প্রস্তাবের সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন এখানেও তারই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর চেষ্টার কি ফল ফলেছিল তা তো আমরা দেখেইছি। প্রস্তাবের পক্ষীয় যে এগারজন সদস্য ছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন আনন্দমোহন বসু। ইনিও রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ পড়েছিলেন এবং খুশী হয়ে প্রবন্ধ লেখককে পত্র লিখে তাঁর ঐকমত্য জানিয়েছিলেন। তিনি লেখেন,—

'পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত; সুতরাং সেই মত এমন সুন্দরভাবে ও দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই।...এখন আলোচ্য প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা ও নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্তন করিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু এ বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎ-সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাবলিক ওপিনিয়ান অনেকটা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি কিন্তু যে পর্যন্ত এই পরিবর্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি।'

নিজে প্রস্তাব উত্থাপন না করেও আনন্দমোহন বসু যে আশুতোষের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন সে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আনন্দমোহন বসু শুধু বাংলা নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাকেও উচ্চতর পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব এবং সে জন্যে চেষ্টা করেছেন, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস-এর ২৬ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর অংশ।

মিস অ্যাডামসের প্রস্তাব ছিল দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ফরাসীর নাম পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হোক। আনন্দমোহন বসুর সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হল ফরাসীর বিকল্পরূপে জর্মনেরও নাম থাকুক। আর যদি কোনো পরীক্ষার্থী কোনো ভারতীয় ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করতে চায় তাহলে তাকেও সে অধিকার দেওয়া হোক। সংশোধনী প্রস্তাবটি লক্ষ্য করে দেখুন। ভারতীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক করার কথা বলা হয় নি। ঐচ্ছিক রূপে পরীক্ষণীয় বিষয়তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হল না। কারণ অতিশয় আইনসঙ্গত সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তি আগে থেকে দেওয়া হয় নি।

শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার কর্তৃত্ব ছাত্রগণের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে একথা তখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন সদস্যদের কারও কারও ভাবনার বিষয় হয়েছিল তা বুঝতে পারা যায়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যত্র বলেছেন,—

'যে কঠিন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা দিই—আমাদের ভাষার সঙ্গে তার প্রকৃতির পার্থক্য দুস্তর। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে মৌলিক চিন্তা জাগ্রত করতে সমর্থ হয় না এইটি তার একটি মুখ্য কারণ। এইরকম একটি ভাষাকে আয়ত্ত করতে গেলে অনুকরণের প্রয়াসই প্রাধান্য পায়। আর এই অনুকরণের অভ্যাস ক্রমে ক্রমে এমনই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তা ছাড়া যে দুর্মূল্য বিদেশী বেশবাস দিয়ে আমাদের ছাত্ররা আপন আপন ভাবনাকে সজ্জিত করতে বাধ্য হয় তার জন্যে তাদের মনঃশক্তির এতই অপচয় ঘটে যে তাদের চিন্তার খোরাক জোগানোর জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।' —কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ, ১৮৯২।

ইংরেজিকে আজও যাঁরা শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমরূপে রক্ষা করার পক্ষপাতী তাঁরা যেন লক্ষ্য করেন, আট দশক আগেও বিদেশী ভাষার বাহকতাকেই সেদিনকার প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় বলে মনে করেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে সে কথা উচ্চকণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন।

ঠিক সত্তর বছর পরে উপাচার্য সুরজিৎ লাহিড়ী ১৯৬২ সালের সমাবর্তন ভাষণে এই বিষয়েই অন্য মত প্রকাশ করেছেন।

একই বিষয় নিয়ে দুই কালের দুই শিক্ষাবিদের চিন্তায় ও মতে কত পার্থক্য থাকতে পারে এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি উল্লেখ করছি এইজন্যে যে, সকল রকম মত এবং সকল রকম চিন্তার মধ্যে থেকেই সত্যের সন্ধান করতে হবে।

ইংরেজির মাধ্যমে ছাত্ররা যে জ্ঞান অর্জন করবে বাংলার মাধ্যমে সেই জ্ঞান অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে সুরজিৎ লাহিড়ী তাঁর সমাবর্তন ভাষণে বলেছিলেন,—কিছুদূরে পর্যন্ত হলেও হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নয়। অনার্স এবং এম-এর ক্ষেত্রে দেশী ভাষা অচল। উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষার ব্যবহার তাঁর মতে সম্পূর্ণ

নয়,—না বিজ্ঞানে না কলাবিষয়ে। যুক্তি এই যে ইংরেজি ভাষায় লেখা বই না পড়তে পারলে উচ্চতর শ্রেণীর অধ্যয়ন বা গবেষণা কোনোটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারবে না।

ইংরেজী বই পড়তে নিষেধ কে করেছে? ইংরেজী শুধু নয় অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার বইও পড়তে হবে। উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা কেউ তো অস্বীকার করে নি। প্রয়োজনীয় বললে যথেষ্ট বলা হয় না আমরা অপরিহার্য বলছি, বিশেষত বিজ্ঞানের গবেষণায়।

আর বাংলায় বই নেই বলে হতাশ হয়ে বসে থাকবই বা কেন? আজ নেই কাল হবে। নিম্নতর মানের বিজ্ঞান পুস্তকও তো আগে ছিল না, এখন অনেক রচিত হয়েছে আরও হচ্ছে। বি-এ পরীক্ষার উপযোগী দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যবিদ্যা প্রভৃতি সকল প্রজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক এখন আঞ্চলিক ভাষায় সকল প্রদেশে অবিরল লেখা হচ্ছে। স্নাতক মানের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। প্রবেশিকা স্তরের তো কথাই নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বাহকতা পুরোপুরি স্বীকৃত। সুতরাং মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সকল পাঠ্যই মাতৃভাষায় রচিত হচ্ছে। মাতৃভাষা পঠন-পাঠন এবং পরীক্ষার মুখ্য বাহন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে অর্থাৎ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উপাচার্য হলেন প্রায় সেই সময় থেকে দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার যে প্রস্তাব ওঠে তার প্রথম সুফল—অবশ্য আংশিক সুফল—ফলল ঠিক অর্ধ শতাব্দী পরে—১৯৪০ সালে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪০ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মাতৃভাষায়। দীর্ঘদিনের অতন্দ্র চেষ্টায় পরীক্ষার নিয়মাবলীর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। যাঁদের নিরলস চেষ্টায় সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁরা জাতির নমস্য।

স্যাডলার কমিশনের নিয়োগ হল ১৯১৭ সালে। তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৯-এ। রিপোর্টে বলা হল,—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজী ব্যবহারের আতিশয্যের ফলে ছাত্রদের শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী ও অঙ্ক ছাড়া আর সকল বিষয়ের জন্যে মাতৃভাষার নির্বিকল্প ব্যবহারই বোধ হয় সঙ্গত হবে।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আশুতোষ বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার জন্য আর একবার উদ্যোগী হলেন। সে ইতিহাস [illegible]।

প্রধান শিক্ষকদের উদ্যোগে ১৯২১ সালের ৫ ই [illegible] সেনেট হাউসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় [illegible] সংস্কার। এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন।

এর পর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং অভিভাবকদের একটি সভা হয়। সভার স্থান ছিল দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস। এই সভা পূর্ববর্তী প্রধান শিক্ষকদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন।

শিক্ষকদের সভা এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের সভা—এই দুইটি সভাই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুমান স্বাভাবিক যে, আলোচ্য দুই সভার পিছনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ আশুতোষের প্রেরণা ছিল। এ অনুমান আরও সমর্থিত হয় এই কারণে যে, প্রধান শিক্ষকদের গৃহীত এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদিত শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ক সিদ্ধান্তটি নিয়ে সিণ্ডিকেটে আলোচনা হল। এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্যে সিণ্ডিকেটে প্রস্তাব উত্থাপিত হল। সিণ্ডিকেট প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্যে পাঠালেন আর্টস ও সায়েন্স ফ্যাকালটির যুক্ত বৈঠকে। উভয় ফ্যাকালটির মিলিত বৈঠকে পাঠ্যবিধির খসড়া প্রস্তুত হল। তাতে প্রস্তাব করা হল,—ইংরেজী ছাড়া আর সকল বিষয়ের অধ্যাপন এবং পরীক্ষণের কাজ মাতৃভাষার সাহায্যে নির্বাহিত হবে। তবে সিণ্ডিকেট বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই বিধানের ব্যতিক্রম করতে পারেন, অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এই বিধানের প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারেন।

যুক্ত ফ্যাকালটির প্রণীত প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী ১৯২২-এর ৭ই জুলাই তারিখে সেনেট অনুমোদন করলেন। কিন্তু সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেল না।

তারপর কয়েক বছর কাটল। আশুতোষের মৃত্যু হল। প্রবেশিকার নিয়মাবলী নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা চলতেই লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও আলোচনার বিরাম নেই। তার একটি কৌতূহলপ্রদ নিদর্শন, বাং ১৩৩২ সালের ৩০ শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।২৫)-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করি—

শিক্ষার বাহন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার সাহায্যে ইতিহাস পড়ান যায় কি না সেই সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই প্রস্তাবের একটি সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহার সারমর্ম এইরূপ—যদি ইংরাজী ইতিহাস ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ফরাসী দেশের ইতিহাস ফরাসী ভাষায় জার্মান দেশের ইতিহাস জার্মান ভাষায় এবং গ্রীসের ইতিহাস গ্রীক ভাষায় শিখান হইবে না কেন? আমার মনে আছে, [illegible] আমি রাজা [illegible] [illegible] মহাশয়ের রচিত একখানি ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম। তিনি একজন আইনবিশারদ ছিলেন। সর্বদা আইনের পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও তিনি তাঁহার মাতৃভাষার অনুশীলনের সময় পাইতেন।...আধুনিক গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তাদের অন্যতম শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বাংলা ভাষায় রোম দেশের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। যদি ৬০ কিম্বা ৮০ বৎসর পূর্বে এরূপ হওয়া সম্ভবপর ছিল, তবে এখন হইবে না কেন?...যখন উইলিয়ম শেকসপীয়র ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার সামান্য জ্ঞান লইয়া লণ্ডনে অভিনেতা হইয়া দু পয়সা অর্জনের অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহাকে ল্যাটিন প্রাইমার পড়িয়া সিনট্যাক্স মুখস্থ করিয়া জুলিয়াস সিজারের...উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল? সৌভাগ্যক্রমে তিনি নর্থ অনূদিত 'প্লুটার্ক' পাইয়াছিলেন। এই অনুবাদ পড়িয়াই অমর কবি শেকসপীয়র তাঁহার অতুলনীয় নাটকসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

অবশেষে ১৯২৯ সালে একটি কমিটি নিয়োগ করা হল। এই কমিটি প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন এবং তার অনেক অংশ পরিবর্তন করেন। শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে গোড়ায় যে প্রস্তাব হয়েছিল তার ভাষাটি কিছু বদলে দেওয়া হল। প্রথমে ছিল—ইংরেজী ছাড়া সকল বিষয়ের অধ্যাপন এবং পরীক্ষণের কাজ নির্বাহিত হবে মাতৃভাষার সাহায্যে। কমিটি এটি বদল করলেন,—

অন্যরকম নির্দেশ না থাকলে ইংরেজি বা আর কোনো ইউরোপীয় ভাষা ছাড়া সকল বিষয়ের উত্তরপত্রই কোনো-না-কোনো একটি মুখ্য দেশীয় ভাষায় লিখতে হবে।

কমিটি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তাবিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই রিপোর্ট গ্রহণ করবার জন্য সেনেটকে অনুরোধ করে যে ভাষণ দিলেন তার কিছুটা তুলে দিচ্ছি।

এই সকল বিধান অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। আমাদের বিশ্বাস এই বিধানগুলির প্রবর্তনে যে সুফল উদ্ভূত হবে তাতে আমাদের প্রদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই পরিকল্পনার প্রথম উপস্থাপনার সময় এর পশ্চাতে যে মহান আদর্শবাদ ক্রিয়া করেছিল আজ তা স্মরণ করি। আজ এই কথা ঘোষণা করা হোক যে, এই দীর্ঘকালীন উত্তপ্ত বিতর্কের সমাপ্তি সাধনের সময় এসেছে। আমাদের আর দ্বিধা করলে চলবে না। অবিচলিত পদক্ষেপে আমাদের সেই দিনটির দিকে এগিয়ে যেতে হবে যেদিন শুধু প্রবেশিকার ক্ষেত্রে নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার বাহনও হবে মাতৃভাষা।

শ্যামাপ্রসাদ সেনেটের সদস্যদের সেই মহান আদর্শবাদের কথা স্মরণ করতে বললেন যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পিতৃদেব ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করে-

ছিলেন। সদস্যদের কাছে তিনি এই বলে আবেদন করলেন যে, তর্ক-বিতর্ক ভুলে তাঁরা মাতৃভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন করুন।

তিন দিনব্যাপী আলোচনার পর সেনেট কর্তৃক ওই রিপোর্ট অনুমোদিত হল। তারিখ ১৩ই আগস্ট ১৯৩২। হাসান সুরাবর্দী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শ্যামাপ্রসাদকে অভিনন্দন জানিয়ে সুরাবর্দী সাহেব বললেন,—তিনি যা করেছেন সে জন্যে আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ। তিনি না থেকলে এই নিয়মগুলি কখনোই অনুমোদিত হত না।

তাঁর পিতার আরব্ধ প্রয়াসের উল্লেখ করে উপাচার্য বললেন,—পিতার আরব্ধ কর্মাদর্শকে তিনি যে সাফল্যের পথে অনেক দূর নিয়ে যাচ্ছেন এ জন্যে তাঁর গর্বিত হওয়ার কথা, গর্ববোধ করার কথা।

এটা ১৯৩২-এর কথা। আমরা জানি সরকারী অনুমোদন না পাওয়ায় তখনই পরীক্ষা সম্পর্কীয় বিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেল আরও তিন বছর পরে, ১৯৩৫-এর জুন মাসে। বাংলাদেশে সেদিন থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন ধারার প্রবর্তন হল।

মাধ্যমিক শিক্ষা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নেই এসেছে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের হাতে। পর্ষদ তাঁদের গৃহীত হায়ার সেকেণ্ডারী এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেছেন।

প্রবেশিকা স্তরে মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের নীতি স্বীকৃত এবং গৃহীত হবার ফলে আর একটা বড় লাভ হল। বাংলা ভাষায় বই নেই বলে যে আশঙ্কায় অনেকের মন আন্দোলিত হচ্ছিল সে আশঙ্কার অনেকখানি অবিলম্বে অপসারিত হল। বাংলা ভাষায় বই বেরোতে দেরী হল না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বাংলাদেশের ঋণ অপরিমেয়। তিনি শুধু নিয়ম অনুমোদন করিয়েই নিশ্চিন্ত রইলেন না যাতে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক রচিত হতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিলেন। তাঁরই উদ্যোগে সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল এদেশের শিক্ষা সংস্কারের ইতিহাসে তার গুরুত্ব অসামান্য। কাজের পরিমাণে এ গুরুত্বের বিচার নয়। কয়েকটি বিষয়ে বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন করে তাঁরা যে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক মাতৃভাষায় রচনা করবার পথ প্রথম উন্মুক্ত করে দিলেন তার ফলেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রয়োগ সম্ভব হল। এই পরিভাষা রচিত হয়েছিল বলেই ১৯৪০ থেকে ইংরেজী ছাড়া অন্য সকল বিষয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বাংলার মাধ্যমে গৃহীত হতে পেরেছিল। পরিভাষা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ আরও একটি কাজে হাত দেন। বাংলা বানান সংস্কারের জন্যে তিনি একটি বিশেষ সমিতি গঠন করেন। সেই সমিতি কর্তৃক যে বানানবিধি প্রস্তাবিত হয়েছিল, অদ্যাবধি আমরা সেই বিধিই প্রধানত অনুসরণ করে আসছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বানানবিধি প্রণয়নের ইতিহাস অন্যত্র বিবৃত হয়েছে। (চতুষ্কোণ, ১৩৭৭ পূজা সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) এই কারণে এখানে তার বিশদ আলোচনা করলাম না।

মাধ্যমিক স্তরে তো কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তাতেই নিশ্চিন্ত থাকলেন না। এবার তিনি কলেজীয় শিক্ষার স্তরেও মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে প্রয়োগ করার জন্যে মনোযোগী হলেন। এই পুণ্য প্রয়াসে তাঁর প্রধান সমর্থক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭-এর সমাবর্তন সভায় (তারিখ ৫ ফাল্গুন ১৩৪৩) বাংলায় প্রদত্ত বিখ্যাত ভাষণটি স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা শ্যামাপ্রসাদের উপাচার্য থাকার কালেই যা ঘটেছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই সমাবর্তন ভাষণে মাতৃভাষাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদানে পিতা-পুত্রের নিরন্তর এবং নিরলস সাধনার প্রতি সম্মান নিবেদন করেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন একলা তিনি নন, তিনি এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গ মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করে নবযুগের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে এসেছেন দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সেই প্রয়াস স্বীকৃতি পায় নি। তিনি বলেন,—

"বর্তমান যুগের নূতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় উদ্যোগকে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণক্ষেত্র থেকে পৃথক করে রেখেছেন, তাকে ভিন্নজাতীয় বলে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন। যখন তিনি আমার মতো বাংলা-ভাষাচর লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গী মঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তারপরে তিনিই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ধারাকে অবতারণ করালেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্বাভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন, আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে সেই পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন।"

রীতির গ্রন্থি মুক্ত হলেও শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে সার্থক হয় নি। পিতার মত তাঁকেও অনেক বাধা বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

তার পরেও প্রায় দশ বছর চলে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক সমাবর্তন উৎসবে প্রথম ভারতীয় আচার্য (চ্যান্সেলর) শ্রীরাজাগোপাল আচারিয়া মহাশয় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করলেন। তারও কিছু পরে ধীরে ধীরে বাংলার ব্যবহার আরম্ভ হল। তখন ছিল দু-বছরের আই এ, আই এসসি এবং বি এ, বি এসসি পাঠক্রম। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স তখনও প্রবর্তিত হয় নি। আই এ, আই এসসি এবং বি এ-র ইংরেজি ছাড়া সকল বিষয়েই বাংলায় পঠনপাঠনের অনুমতি দেওয়া হল। বি এসসিতে ইংরেজী নেই। বি এসসি-র সকল বিষয়েই বাংলায় পঠনপাঠন সিদ্ধ হল। তবে বি এ, বি এসসি-র অনার্স পরীক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেল না। সে নিয়ে আন্দোলন এখনও চলছে, বিতর্কের এখনও অবসান হয় নি।

কলেজীয় স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপাচার্য থাকা কালে। আশুতোষ এবং শ্যামাপ্রসাদের সাধনাকে তিনি ক্রমিক সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবার জন্যে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাচার্য হবার পর তাঁর সমাবর্তনের ভাষণ বাংলায় লেখার কথা ভেবেছিলেন বলে আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কোনো কারণেই হোক তা সম্ভব হয় নি। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজিতে তাঁর ভাষণ লিখলেও তার একটি বাংলা অনুবাদও প্রস্তুত করিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণের ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষারই পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত হয়েছিল। তাঁর পূর্বে বা পরে সমাবর্তন উপলক্ষে আর কোনো উপাচার্যের ভাষণ বাংলায় লিখে বা অনুবাদ করে সমাবর্তন সভায় পঠিত বা বিতরিত হয়েছে বলে জানি না।

বি-এ, বি-এসসি পাস কোর্স পর্যন্ত বাংলার ব্যবহার অনুমোদিত হওয়ায় আজ পদার্থবিজ্ঞান উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বাংলা বই রচিত হয়েছে। অর্থনীতি রাজনীতি দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েরও পাঠ্যপুস্তকের অভাব নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন করার ফলেই বাংলা ভাষার চর্চা বেড়েছে, বাংলা

ভাষায় নানা বিষয়ের বই লিখিত হয়েছে। সুরজিৎ লাহিড়ী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও বাংলার চর্চা ব্যাহত হয় নি। আমরা বলছি শিক্ষার মাধ্যম বাংলা থাকলে বাংলার চর্চা বহুগুণে বৃদ্ধি পেত। কেন না ইতিহাসে সেই প্রমাণই পাওয়া গেল।

যে কোনো প্রথারই সংস্কার করতে যাই না কেন একটু সাহস, একটু আত্মবিশ্বাস এবং একটু দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। আমরা ভীরুতা পরিহার করে অনার্স এবং স্নাতকোত্তর বিভাগেও মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহনরূপে প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত আগে নিতে পারি নি। কিন্তু আর বিলম্ব না করে এখন তো নিতে পারি। মাতৃভাষায় অধ্যয়ন অধ্যাপন শুরু হলেই বই লেখা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় উদ্‌যোগী হলে উৎসাহ দিলে বেশী পরিমাণেই হবে। আগে পড়ার ব্যবস্থা হলে লেখক বই লেখার প্রেরণা পাবেন। কারণ বই বেরোলেই অন্ততঃ কয়েকজন পাঠকও পাওয়া যাবে এমন আশা থাকে। কবে পড়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে সেই সুদূর ভবিষ্যতের আশা নিয়ে কেউ বই লেখায় উৎসাহ পেতে পারেন না। ঘোড়ার আগে গাড়ি না গাড়ির আগে ঘোড়া ?—এ প্রশ্ন অতি পুরাতন। এবং উত্তরও নূতন নয়। প্রায় আশি বৎসর আগেও এ-জাতীয় প্রশ্নোত্তর শোনা গেছে। রবীন্দ্রনাথের সহোদর লোকেন্দ্রনাথ পালিত একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন,—

"যদি বাংলায় শিক্ষা দেওয়াই স্থির হয়, তবে অতি শীঘ্রই সকল বিষয়েই বাংলায় শিক্ষাপুস্তক বাহির হইবে। শিখিবার লোক যে নাই তা নয়। বরং এক আশ্চর্য দেখা যায় যে, বাঙ্গালিতে বাঙ্গালি ছেলেদের জন্য বাংলার ইতিহাস লিখিতেছেন কিন্তু ইংরাজি ভাষায়। যদি বাংলা ভাষায় ইতিহাস পড়াইবার প্রণালী প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলায় লিখিতেন না?"—সাধনা, মাঘ, ১২৯৯।

এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ভাষায় বলেছেন,—

" আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচু দরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই, সেকথা মানি। কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে?...বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?' —শিক্ষার বাহন, ১৯১৫।

একদিনেই প্রয়োজনীয় সব বই বাংলায় লেখা হবে এমন আশা কেউ করে না। কোনো দিনও না হতে পারে। ইংরেজ ছাত্র যখন উচ্চতর বিজ্ঞান পড়ে সে জার্মান শেখে না? ফরাসী শেখে না? সেই সকল ভাষার প্রামাণিক বই, বিশেষতঃ পত্রপত্রিকা না পড়লে গবেষণার কাজ কি কখনো চলে? আমাদের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররাও কাজ চলার মত ইংরেজি অবশ্যই শিখবে। পুনরাবৃত্তি হচ্ছে জেনেও বলি, ভাষা হিসেবে ইংরেজি আমাদের শিখতে হবে। তার মারফতে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বজায় থাকবে। ইংরেজীকে তাই আমরা বলি আমাদের পশ্চিমের জানালা। সে জানালা আমরা বন্ধ করব না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মাতৃভাষার সব কাজ তার হাত দিয়েই চলবে।

যাই বলি না কেন, এবং যতই বলি না কেন তবু ভয় যায় না। যাঁরা দায়ে পড়ে চাপে পড়ে অথবা চক্ষুলজ্জায় পড়ে মাতৃভাষার বাহকতা মানতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে শিক্ষার উচ্চতর স্তরে মাতৃভাষার উপযোগিতা যে স্বীকার করতে চান না। তার প্রধান কারণ সাহসের অভাব।

শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন পূর্বেই এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার যাথার্থ্য আজ হ্রাস পায় নি।—

'বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি।...দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে। কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গামযত্তুৎপহাস্যতাম্। আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এইটুকু কোনোদিনই বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে?...আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলেই তবে বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে?'

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ভরসা আগের চেয়ে বেড়েছে। মাতৃভাষার পক্ষে জনমত ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে। তাকে বেশিদিন রোধ করা যাবে না। এতদিন কেবল শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসাবে বাংলা ব্যবহারের কথা চলছিল, সম্প্রতি প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও বাংলাভাষা প্রয়োগের কথা উঠেছে। এই প্রসঙ্গে সে কথাটাও উল্লেখ করা আবশ্যক। ইং ১৯৬২ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেনেট সভায় এই রকম একটি প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি আসে। সে বিজ্ঞপ্তির জন্মমৃত্যু সমাধির ইতিহাসে কিয়ৎ পরিমাণে কৌতুকের উপকরণ আছে বলেই এখানে সেটির উল্লেখ করছি তা নয়, উল্লেখ করছি এই ভেবে যে সেটি একবার কোথাও প্রকাশিত না হলে তার কথা অজ্ঞাত থেকে যাবে।

ইং ১৯৬২ সালের ৩রা মার্চ তারিখে সেনেট সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন বলে বর্তমান লেখক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেন। সেনেট সভার উক্ত অধিবেশনের অনুষ্ঠানসূচী থেকে সমগ্র বিজ্ঞপ্তির পাঠটি উদ্ধৃত করছি।— "97. A letter da.ed 12.6.61 from Dr. Bijanihari Bhattacharya meber of the senate stating that intends to move the following at the next meeting of the Senate :—

বাংলার প্রাচীনতম ও প্রধানতম এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে *বাংলা ভাষার ব্যবহার হওয়া আবশ্যক বলিয়া সেনেট মনে করেন। এই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সেনেট নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি উপসমিতি গঠিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন :—

উপাচার্য মহাশয় (সভাপতি) অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ দ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহ, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, অধ্যাপক সুকুমার সেন, ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য (সংস্কৃত), শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (আহ্বায়ক)।

*কর্ম পরিচালনার সকল ক্ষেত্র, যথা,— ১, সেনেট, সিন্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি, স্নাতকোত্তর ও প্রাক-স্নাতক বিভিন্ন বোর্ড ও অন্যান্য সমিতি উপ-সমিতি প্রভৃতির আলোচনায় পরিচালনায়, সদস্যবর্গের বক্তৃতায়, সভাপতির ভাষণে।

২, শিক্ষার সকল স্তরে :— অধ্যয়নে, অধ্যাপনে, প্রশ্নপত্রে, পরীক্ষায়।

৩, শিক্ষা ও নিয়োগ সংক্রান্ত সকল মৌখিক পরীক্ষায়।

৪, সকল বিষয়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধে (অন্ততঃ বিকল্প ভাষা হিসাবে)।

৫, সমাবর্তন সভায় আচার্য ও উপাচার্যগণের ভাষণে (অন্য দেশবাসীর পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতে পারে) স্নাতকদের প্রতি উপদেশে, অভিজ্ঞানপত্রে, উপাধিপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদকে, ইত্যাদি।

এই বিজ্ঞপ্তিটি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই জন্যে যে এর ভাষা ছিল বাংলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটা একটা নূতন ঘটনা। অনুষ্ঠানসূচী ইংরেজী টাইপরাইটারে মুদ্রিত হয়ে থাকে। বাংলা টাইপরাইটার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-কর্মে ব্যবহৃত হয় না। কাজেই আমার বিজ্ঞপ্তিটি হাতে স্টেন্সিল কেটে সাইক্লো-

স্টাইল করতে হয়েছিল। হস্তলিপির অনুলিপিগুলি সহজেই নজরে পড়েছিল।

সেনেটের এই অনুষ্ঠানসূচী প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে এক তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হল। পত্রপত্রিকার মধ্যে কেউ কেউ বিরোধীর ভূমিকা নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা প্রবর্তন প্রয়াসের অন্তরালে কিছু গভীর ষড়যন্ত্র আছে—এমন সংশয়ও মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত হল। বাংলা ভাষাকে সর্বাত্মক ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টার ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচারে সভাসমিতিগুলি মুখর হয়ে উঠল। বহু প্রচারিত কোনো কোনো বাংলা সংবাদপত্রে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে দেশের পক্ষে কি বিপদ হতে পারে তা অনুমান করে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হতে থাকল।

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি তুললেন কমলাকান্ত শর্মা (আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ২৪ ফাল্গুন—১৩৬৮। ইং ৮ মার্চ ১৯৬২) কমলাকান্তের আসরে, 'বাংলা ভাষার সর্বাত্মক ব্যবহার'-শীর্ষক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের প্রথম এবং শেষের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করলেই লেখকের বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।—

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের বিশিষ্ট সভ্য অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের...যাবতীয় কার্য অতঃপর বাংলা ভাষায় হোক। বিষয়টি বিবেচনা করবার জন্যে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। (কমিটি গঠিত হয় নি। প্রস্তাবকের ইচ্ছা ছিল একটি কমিটি গঠিত হোক। প্রস্তাবক যাঁদের নিয়ে কমিটি গঠনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন তার মধ্যে 'কমলাকান্ত'-এর নামও ছিল।) অধ্যাপক ভট্টাচার্যের প্রস্তাবের মর্ম ও বিস্তার যদি ঠিক বুঝে থাকি তবে তার পরিণামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হতে বাধা—আর তার পরিণামে বাঙালী স্বার্থের সমূহ হানি হবে, পরমার্থেরও উন্নতি হবে না। উৎকট ভাষাপ্রেম এক প্রকার সাম্প্রদায়িকতা। অতএব আশা করছি অধ্যাপক ভট্টাচার্য স্বকৃত প্রস্তাব প্রত্যাহার করে সকলের ধন্যবাদভাজন হবেন।'

উৎকট ভাষাপ্রেমরূপ সাম্প্রদায়িকতার তিরস্কারও পাছে নিষ্ফল হয় এই আশংকায় সাতদিন পরে পুনশ্চ কমলাকান্তের আসরে 'বাংলা ভাষার সর্বাত্মক ব্যবহার'-এর দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হল। তাতে বাংলাভাষার সর্বাত্মক ব্যবহারের পরিণাম যে কতখানি ভয়াবহ হতে পারে কমলাকান্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসাল ভাষায় তার এক লোমহর্ষণ চিত্র অঙ্কিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হোক চেয়েছিলেন।' কমলাকান্ত তা অস্বীকার করেন নি। 'রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণ নমস্য, পথপ্রদর্শক' এ বিষয়েও তিনি নিঃসংশয়। তবু তাঁদের মত সম্পূর্ণ মানতে তিনি রাজী নন। কারণ তাঁর মতে 'তাঁরা সকলেই দেশের পরাধীনতার দ্বারা conditioned ছিলেন। পরাধীনতার প্রতিষেধক হিসাবে তাঁরা এমন অনেক উক্তি করেছেন এখন যা পুনর্বিচার করবার সময় এসেছে। ভাষা সম্বন্ধে এই প্রস্তাব গৃহীত ও কার্যে পরিণত হলে বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হবে একথা সেদিন বলেছি—আজ আবার বলছি।' পরিশেষে প্রস্তাবকের অভিপ্রায়কে লক্ষ্য ক'রে একটি সংশয়ের বিষবাণ নিক্ষেপ করে বললেন,—'কেন এ প্রস্তাব, কি এর উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত।' যুক্তিকে খণ্ডন করতে হলে প্রবলতর যুক্তির প্রয়োজন। সেটার যখন অভাব ঘটে তখন একটা অস্পষ্ট অনির্দেশ্য রহস্য রোমাঞ্চের ইঙ্গিতে মারাত্মক কাজ হয়। কাজ হল। বিতর্কের ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হতে লাগল।

২ বৈশাখ ১৩৬৯ (১৫-৪-৬২) এর আনন্দবাজার পত্রিকার 'খাল কাটিয়া' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইংরেজির স্থলে বাংলা ব্যবহার প্রবর্তনের প্রয়াসকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দেওয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বস্তরে প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে সম্পাদক লিখলেন,—'নব পর্যায়ে বিরোধটার সূত্রপাত বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। সকলেরই মনে পড়িবে, আগে পিছে তখন যাঁহারা আসরে নামিয়াছিলেন সেই বরেণ্য মনীষীদের মতের মিল ছিল না। (অধ্যাপক বসু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং উপাচার্য সুরজিৎ লাহিড়ীর বক্তৃতার বিষয় পূর্বে বলেছি।) কথায় কথা বাড়ে এ ব্যাপারেও কথা কেবলই বাড়িতেছে। এবং কবির লড়াইয়ের জের টানিয়া বিস্তর কথা কাটাকাটিও হইতেছে। কবির লড়াইয়ে দুই পক্ষ থাকে। ওই প্রসঙ্গে বলা হল 'এক পক্ষের মূল গায়েন ছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।' তার মতে, যারা সমর্থন বা অনুসরণ করেন তাঁদের 'দোহার' বলে পরিহাস করা হল। তাঁরা যে আন্দোলন... থামতে দিচ্ছেন না সে জন্যে তাঁদের প্রতি কিছু বিদ্রূপ বর্ষণ করে বলা হল।—

'বসুমহাশয় স্বভাষার হইয়া খানিক সওয়াল করিয়া—মনে রাখিতে হইবে, সওয়াল করিয়াছিলেন কিন্তু বিভাষায়—আপাতত চুপ করিয়া আছেন, দোহারদের উৎসাহে তবু কিছুতেই যেন ভাঁটা পড়িতে চাহিতেছে না।'

ভাঁটা পড়ে নি একথা সত্য। আগেই বলেছি আমার প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ইং ১৯৬১ সালের জুন মাসে। তারপর সেনেটের একাধিক অধিবেশন হয়। অনুষ্ঠানসূচীতে বিজ্ঞপ্তিটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় ইং ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে। সূচীর অন্তর্ভুক্ত হলেও সময়ের অভাবে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি, পরবর্তী অধিবেশনের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছিল। তরপরেও সেনেটের কতগুলি অধিবেশন হয় সব কটির অনুষ্ঠানসূচীতে প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে থাকে কিন্তু প্রতিবারই আমার প্রস্তাব পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়ে যায়। প্রত্যেক অধিবেশনের নির্দিষ্ট তারিখে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই প্রস্তুত হয়ে সভারোহণ করতেন। বিবাদী দলের মধ্যে আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ অনেক বন্ধুও ছিলেন যাঁরা আমাকে ভূপাতিত করার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবার সভার শেষে আমরা উভয় দলই নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছি। শেষ পর্যন্ত খুব সহজেই একটা সমাধান হয়ে গেল চীনের ভারত আক্রমণে। উপাচার্য বিধুভূষণ মালিক একদিন আমাকে আহ্বান করে আমার বিদ্যাবুদ্ধি ভাষা প্রেম প্রভৃতির প্রশংসা করে এই আশা প্রকাশ করলেন যে দেশের জরুরি অবস্থা বিবেচনা করে প্রস্তাবটি আমি প্রত্যাহার করে নেব। প্রত্যাহার না করলে অধিকতর সুফল ফলত না। সুতরাং উপাচার্য মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম।

সেনেট সভার অভ্যন্তরে আলোচনার সুযোগ না হলেও প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তিতেই অনেক ফল ফলেছিল। বাইরে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ভিতরে তার প্রতিক্রিয়া চলতে লাগল ধীরে ধীরে। পত্রপত্রিকায় প্রতিবাদের সুর শোনা গিয়েছিল সত্য কিন্তু প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষদল নিরুত্তর রইলেন না। পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষের তর্কবিতর্কে কিছু উত্তাপের সৃষ্টি হলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে সুবিধেই হল। তাঁরা উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্য থেকে সার নির্বাচনের সুযোগ পেলেন। জনমত এইভাবেই গড়ে ওঠে এবং এইভাবেই গড়ে উঠেছে। এবং সে জনমত যে বাংলা ভাষার অভিমুখেই সংসরণশীল আজ তার প্রমাণের অভাব নেই।

চুয়াল্লিশ

সকাল থেকেই শীতের আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। সূর্যদেবের মুখ দেখবার যো নাই। একটু বেলা হতেই কখনো ইলশে গুঁড়ি কখনো নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি। মাঝে মাঝে কনকনে হাওয়া। শীত পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। এই শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া আর বাদলে বেড়াতে যাবে কে? সবারই গায়ে মোটা মোটা গরম জামা শাল আলোয়ান।

বিকেলে জল খাবারের পর আস্তে আস্তে স্বামিজীর ঘরে গিয়ে ঢেকে-ঢুকে গুটি-সুটি হয়ে বসে বললুম—আজ মামলা, স্বামিজী।

—আজ তোমার মামলা? এই বাদলায়? কার সঙ্গে? ফ্যাসাদ বাধালে দেখছি—বেশ গম্ভীর হয়েই বললেন স্বামিজী।

বললুম—মামলা সরকারের সঙ্গে, আলিপুর কোর্টে।

—ও তাই বল! সে তো আজ নয়, বিশ বছর আগে ১৯০৮ সালে—হাসতে হাসতে বললেন স্বামিজী।

—তখন আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লি। তিন মাস মামলা চালালেন তিনি। তার পরই বিচারের জন্যে সব আসামীকে পাঠিয়ে দিলেন জজ কোর্টে। হ্যারিসন রোড মামলার প্রধান আসামী উল্লাসকর আর যামিনী কবিরাজ। তাদের মামলা পাঠানো হল হাইকোর্টে। বিচারও হল। সাত বছর করে জেল প্রত্যেকের। আবার আলিপুর বোমার মামলার দরুন উল্লাসকরকে পাঠানো হল জজ আদালতে। মামলাটি হল যেন মাকড়শার জাল—যেমন জটিল তেমনি চমকপ্রদ।

ব্যারিস্টার নর্টন, বার্টন, আর উইথহল দাঁড়ালেন সরকার পক্ষে, সহকারী উকিল [illegible]

লাগল পুলিশের সি-আই-ডি ইনস্পেকটর মোলবী সামসুল আলাম।

ধর-পাকড় মামলা সবই চলতে লাগল বটে তবু বিপ্লব আর বিপ্লবীদের জন্যে সরকারের চোখে সর্ষেফুল। আসামীদের জেল থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার ঘটা শুনলেই বুঝবে ওদের আতঙ্কের বহরটা। আসামীরা থাকত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। ওখান থেকে বেলা নয়টার সময় হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি বেঁধে সকলকে তোলা হত দুখানা মস্ত বড় বন্দী-গাড়ীতে। জাল দিয়ে ঘেরা ঘোড়ার গাড়ী। ঐ গাড়ীর চারদিকে থাকত বহু সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী। গাড়ী দুটির আগে আর পেছনে চলত অশ্বারোহী আর পদাতিক সেনা-বাহিনী। রীতিমত মিছিল।

গাড়ীর ভেতর আসামীরা করত কি? তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ধ্বনি দিত—'বন্দেমাতরম্' আর উদাত্ত স্বরে গাইত দেশমাতার বন্দনা গান। রাস্তার দু' ধারে ভিড় জমে যেত এইসব আসামীদের একটি বার দেখবার জন্যে। তারাই আবার আদালতের উঠোন ভর্তি করে দাঁড়িয়ে আসামীদের গলায় গলা মিলিয়ে ঘন ঘন ধ্বনি দিত—'বন্দেমাতরম্'। এই বিপুল জনতা ছত্রভঙ্গ করতে বেশ বেগ পেতে হত পুলিশদের। আদালতের ভেতরে ছিল একটা প্রকাণ্ড লোহার খাঁচা। আসামীদের এনে একে একে বসানো হত তার মধ্যে। সেই খাঁচার মধ্যে বসেই গান জুড়ে দিত হেমদাস আর উল্লাসকর। সব আসামীই যোগ দিত তাতে। একমাত্র অরবিন্দদা থাকতেন চুপ করে।

আর নরেন্দ্র গোঁসাই? সেও তো আসামী। তাকে আনা হত রাজ সম্মানে, বসান হত জজ সাহেবের পাশের আসনে। আর সন্দেহ থাকে কি? বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই হয়েছে রাজসাক্ষী। ভীরু কাপুরুষ [illegible]

দলের সর্বনাশ করে—বহুজনের জীবনের বিনিময়ে নিজের অমূল্য জীবন বাঁচাতে।

কিছুদিন শুনানী চলল। তারপর কিছুদিন আদালত বন্ধ থাকল কতকগুলো নথিপত্র তৈরী হয় নাই বলে। বেশ কিছুদিন ছুটি। এই সময়ে হেমদাস আর উল্লাসকরের হল গোপন পরামর্শ। হেমদাস বলল—বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি চাই, মারতে হবে নরেন গোঁসাইকে। জেলের ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারে গিয়ে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে সেই রিভলভারের গুলিতে মারতে হবে নরেনকে। এভাবে উল্লাসকর রাজী হল না। ছিনতাই-এর সময়েই একটা গোলমাল উঠবে, নরেনকে মারা ফস্কে যেতে পারে। তখন কানাই দত্ত আর সত্যেন বসু বললেন—আপনি যদি দুটো রিভলভার যোগাড় করে দেন—যেকোন উপায়ে শেষ করে দেব বিশ্বাসঘাতকটাকে। হেমচন্দ্র মহা কৌশলী, কৌশল করে বাইরে থেকে দুটো রিভলভার আনিয়ে দিল সত্যেন আর কানাইকে।

কানাই তখন অসুস্থ, গেল জেল হাসপাতালে। সত্যেনও অসুখের ভান করে ভর্তি হল সেখানে। এক ফন্দী করল কানাই। হাসপাতাল থেকে এক চিঠি দিল নরেন গোঁসাইকে। লিখল—আমি খুব অসুস্থ, জেলের কষ্ট আর সহ্য হচ্ছে না।

বারীনদাকে বললুম নাম তুলে নিতে। বারীনদা রাজী হলেন না, বললেন সত্যের অপমান করতে পারবেন না তিনি। বুঝে দেখলুম বারীনদার খেয়ালে আমাদের জীবন দিয়ে লাভ নাই। আমিও রাজসাক্ষী হয়ে প্রাণ বাঁচাতে চাই। একবার এলে সাক্ষাতে সব কথা হবে।

নরেনের আনন্দ দেখে কে? পাপের সঙ্গী—সঙ্গীর মত সঙ্গী—কানাই দত্ত, [illegible]

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর অগস্ত্যযাত্রা করে কজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার নিয়ে নরেন উঠল হাসপাতালের দোতলায় কানাইকে দেখতে। বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল ওয়ার্ডারেরা। ঘরে ঢুকে নরেন বসল কানাই-এর বিছানার পাশে। কানাই খুব খুশির ভাব দেখিয়ে একথা সে কথা পাঁচ রকমের পাঁচ কথায় নরেনকে আনমনা করে দিয়ে বললে—ভেবে দেখলুম ভাই, তুমি যদি তোমার জবানবন্দী তুলে নাও আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ থেকে বেঁচে যাই। আমার বিশেষ অনুরোধ—আমাদের বাঁচাবার জন্যে তোমার জবানবন্দী তুলে নাও। তোমার হয়ত জেল হবে কিছুদিন, কিন্তু আমরা বেঁচে যাব।

মিনিট খানেক গম্ভীর হয়ে থেকে নরেন বলল—দেখ ভাই, জবানবন্দী থেকে আমার নাম তুলে নিতে কত অনুরোধ উপরোধ করলুম বারীনদাকে। তাঁর সেই এক কথা, সত্যের অপমান করবেন না। তাহলে আমিই বা সত্যের অপমান করি কেন? তবে যা বলেছি পুলিশ দু' চার কথা বাড়িয়ে বলেছে। এখন আর উপায় নাই। বাঁচতে চাও তো রাজসাক্ষী হও।

কানাই-এর মুখ কালী ঢালা, বলল—ভাই তো ভাই, ভাবিয়ে তুললে। দেখি ভেবে। তারপর বলল—আমাকে তুলে একটু বসিয়ে দাও তো ভাই।

যেই না বিছানায় বসিয়ে দেওয়া অমনি কম্বলের ভেতর থেকে হাত বের করে নরেনের বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে কানাই বললে দেশদ্রোহিতার পুরস্কার। গুলি বিঁধল নরেনের বাঁ পাঁজরে। লম্বা চওড়া শক্তিশালী নরেন গুলি খেয়েও ছুটে বেরিয়ে পড়ল বারান্দায়। কানাইও ছুটল পিছু পিছু। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে রিভলভার হাতে ছুটে বেরিয়ে এসে সত্যেন্দ্র গুলি করলেন নরেনকে। একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের বাঁ হাতে লাগল সে গুলি। ওয়ার্ডারেরা কানাইকে ছেড়ে দৌড়ল সত্যেনকে ধরতে। কানাইও সেই সুযোগে ছুটল নরেনের পেছনে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কানাই আর একটা গুলি মারল নরেনের ডান পায়ে। নরেন তবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে জেলের উঠোন দিয়ে। পেছনে পেছনে কানাই। এই সময় বেজে উঠল জেলের পাগলা ঘণ্টা। অমনি এক সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল সব প্রহরী—ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। সেই ধোঁয়ার আঁধারেই নরেনকে লক্ষ্য করে আরও তিনটে গুলি ছুঁড়ল কানাই। এবার চিৎপাৎ দিয়ে মাটিতে পড়ল নরেন। কানাই ছুটে গিয়ে নরেনের বুকের ওপর বসে শেষ গুলিটা নরেনের বুকে বিঁধে বলল—বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। অসুস্থ ক্লান্ত কানাই বসে আছে তো বসেই আছে নরেনের বুকে। তখন তার খুব জ্বর, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আর ওয়ার্ডারেরা ধরে ফেলল কানাইকে। পিপাসার্ত কানাই একটু জল চাইলে পেল নির্মম প্রহার। অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মাটি-মায়ের বীর সন্তান।

কিছু সুস্থ হলে কানাইকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হল বিচারের জন্যে। কানাই বললে—আমার কিছু বলবার নাই। কোন বিচারের আশা করি না ইংরেজের আদালতে। নরেনকে আমিই মেরেছি সত্যেন কিছু করে নাই। এখন শুধু জানতে চাই আমার ফাঁসির দিনটা হবে কবে।

কিছুদিন পরে যথারীতি বিচার হল কানাই আর সত্যেন্দ্রের। দুজনেরই ফাঁসির হুকুম। কোনও আপত্তি নাই কানাইএর। হুকুমের সাতদিন পরেই ফাঁসি। মা ভাইএর অনুরোধে সত্যেন্দ্র আপীল করলেন হাইকোর্টে। সেখানেও বজায় রইল সেই ফাঁসির হুকুম।

জেলের ভেতর গুলি, জেলের ভেতর খুন—এ কি সোজা কথা! খুব কড়াকড়ি করা হল আসামীদের ওপর। প্রত্যেক আসামীকে রাখা হল আলাদা আলাদা নির্জন কুঠরীতে। কদর্য খাবার [illegible] কদর্যতর। ফাঁসির আসামী সত্যেন্দ্র আর কানাইকে রাখা হল হাতে হাতকড়া আর পায়ে বেড়ি পরিয়ে।

রোজ সকালে স্নান আহ্নিক সেরে গীতা পড়েন কানাই। তারপর [illegible] কদর্য খাবার। কানাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। হবে না কেন? জীবনে [illegible] লেশমাত্র নাই—সুখ দুঃখে সমভাব। [illegible] এ কানাই সেই গীতা [illegible] কানাই। আলিপুরের জল্লাদ তো কানাইকে ফাঁসি দেবার ভয়ে কাজ ছেড়ে গেল পালিয়ে। মজঃফরপুর থেকে ক্ষুদিরামের ফাঁসির জল্লাদকে আনা হল টেলিগ্রাফ করে।

ফাঁসির হুকুমের পর কারাকক্ষে সাত দিন নির্জন বাসের সময়েই কানাইএর ওজন বেড়েছিল ১৪ পাউন্ড। জেলর আর জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তো অবাক।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম। এই সময়ে তিনি চাইলেন ব্রাহ্মধর্মের উপদেষ্টা গুরু শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আর কিছু নয় শেষ যাত্রার পূর্বে চান তাঁর আশীর্বাদ আর প্রাণে শান্তি। শান্তির দরকার হয়েছিল সত্যেনের।

সরকারের কাছে হুকুম নিয়ে শাস্ত্রী-মশায় যান জেলখানায়। সত্যেন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বলেন—

—ভগবানে নিষ্ঠা রাখ, শান্তি পাবে। বিরাটের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তৈরী হও। বাপ জ্যাঠার কথা মনে কর—কি রকম ধর্মপ্রাণ ছিলেন তাঁরা। পৃথিবীর সমস্ত ভাবনা চিন্তা দূর করে দাও মন থেকে। ঈশ্বরকে ভাব—শান্তি পাবে।

শাস্ত্রীমশায় ফিরে এলে অনেকে যান তাঁর কাছে সত্যেন্দ্র আর কানাইএর খবর জানতে। দেশশুদ্ধ সবাই তখন সত্যেন কানাইএর ভক্ত। পূজারী বললেই হয়। শাস্ত্রীমশায়ের কথাগুলি শুনে অনেকে

এর কারণ, কাপড়চোপড় পরিষ্কার করতে স্পা অনেক বেশী শক্তিশালী। এর গাঢ় ফেনায় ময়লা কেটে যায়! যেসব ময়লা দাগ কিছুতেই উঠতে চায় না, তা'ও পরিষ্কার হয়ে যায়—এমন কি খরজলে কাচলেও।

সত্যি তাই। ঘরে ঘরে গিন্নিরা দিন-দিনই দেখছেন যে স্পা-ই একমাত্র শক্তিশালী পরিষ্কারক, যা দিয়ে খরজলে কাচলেও কাপড়চোপড় অনেক বেশী পরিষ্কার ধবধবে হয়। এর কারণ, স্পা বিশেষ উপাদানে তৈরী। তাই তো, স্পা-র ওপর সবার এত ঝোঁক! আপনিই বা বাকী থাকবেন কেন?

স্পা

—এই শক্তিশালী ওয়াশিং পাউডারে জামাকাপড় সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়

KPS 6033A

কুসুম প্রডাক্টস্ লিমিটেড

জিজ্ঞেস করলেন—শুধু সত্যেন্দ্রকে আশীর্বাদ করলেন, কানাইকে আশীর্বাদ করলেন না শাস্ত্রীমশায়?

শাস্ত্রীমশায় বললেন — কানাইকে আশীর্বাদ! দেখলুম তাকে, পায়চারী করছে। খাঁচার ভেতর তেজোদৃপ্ত সিংহ। বহুযুগ তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করতে পারে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন—কানাই শিখিয়ে গেল হে। shall আর will এর ব্যবহার করতে আর কেউ ভুল করবে না।

১০ই নভেম্বর ভোর বেলা কানাইএর ফাঁসির সময়। ৯ই নভেম্বর ডাক্তার কানাইকে পরীক্ষা করে সারাদিন রিপোর্ট লিখছেন। কানাই ডাক্তারকে অনুরোধ করল—রাত তিনটেয় তাকে ডেকে দিতে। ডাক্তার রাজী হলেন বটে কিন্তু যথাসময়ে কানাইকে পরম শান্তিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে ঘুম ভাঙাতে সাহস হল না তাঁর। চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে কানাই বলল—আমার অনুরোধ রাখলেন না ডাক্তার বাবু? এখন মাত্র দুঘণ্টার মধ্যে কি করে স্নান আহ্নিক পুজোপাঠ খাওয়া দাওয়া সারি?

যাই হোক জেল কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিলে সব। কানাই স্নান আহ্নিক করে গীতা ভাগবত পাঠ সেরে খাবার খেয়ে গীতাভাগবত হাতে নিয়ে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলল ফাঁসি মঞ্চে নিয়ে যেতে।

আধঘণ্টার ওপর সময় আছে তখনও। তাই ইতস্তত করলেও জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শেষ অনুরোধ রক্ষা করলেন তার।

মঞ্চে উঠে কানাই তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল ফাঁসির সব ব্যাপারগুলি। তারপর বলল—দড়িটা একটু কষা আছে, মেজে দিতে পারলে ভাল হয়। ফাঁসির মঞ্চ থেকে নেমে সকলের সঙ্গে হাসি মস্করা রহস্যালাপ করতে লাগল কানাই।

আর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট? এক আইরিশ সাহেব তিনি—মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছেন কানাইএর মুখপানে। দেখছেন তার রকম সকম হাবভাব। সামনে করালবদন ব্যাদান করে আছে মৃত্যু, তবু—'ও ভয়ে কম্পিত নহে অটল হৃদয়'। একি সোজা বীরত্ব! অনেক ফাঁসি, অনেক মৃত্যু দেখেছেন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কিন্তু এমনটি দেখেন নি আর কখনও। ধন্য বীর!

ফাঁসির ঘণ্টা বাজল। কানাই চোখ হতে চশমা খুলে কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়ে বলল—এটি দেবেন আমার দাদাকে। তারপর গীতা ভাগবত বুকে নিয়ে অমৃতস্য পুত্র অভী কানাই দাঁড়াল ফাঁসির মঞ্চে।

একটু পরেই ফাঁসির মঞ্চ থেকে নেমে এল অমর কানাইএর মরদেহ। সবাই অবাক—একি ফাঁসিতে মৃত্যু, না যোগাসনে? এতটুকু বিকৃতি নাই, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে নাই, জিভ বের হয় নাই মুখ হতে, বুকের ওপর গীতা ভাগবত আঁকড়ে ধরা তখনও, হাত শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে নাই। এ তো সজ্ঞানে স্বাভাবিক মৃত্যু।

কানাইএর দাদা চারুচন্দ্র দত্ত আর চন্দননগরের মতিলাল রায় দরখাস্ত করলেন শ্মশানে শবদাহ করবার অনুমতি চেয়ে। শবদেহ জেলের বাইরে আনা হল বেলা সাতটায়।

তারপর সে কি ভিড়! আগের রাতেই নানান জায়গা থেকে ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়োবুড়ি—সব এসেছে ফুল, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া নিয়ে অমর কানাইকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে, শেষ অর্ঘ্য দিতে। আলিপুরের চিড়িয়াখানা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে সব। শুধু কি রাস্তায়—ছাদ, বারান্দা, গাড়ীবারান্দা তো বটেই রাস্তার ধারের গাছের ডালে ডালে উঠেছে সব আঁচলে ফুল নিয়ে। ওখান থেকেই পুষ্পবৃষ্টি করবে তারা। মায়েদের হাতে শাঁখ আঁচলে খই—তাঁদের আদরের ধনের যাত্রাপথে লাজাঞ্জলি দিয়ে মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি করবেন তাঁরা।

শবাধার এগিয়ে চলল। এগোনো কি যায়? শববাহকেরা অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে ঠেলে যাচ্ছেন শম্বুক গতিতে। সমবেত জনতা ধ্বনি দিচ্ছে—'বন্দে মাতরম'। ফুলে ফুলে শবাধারের আশপাশের লোকরা উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরেছেন—

বন্দেমাতরম্

মাতৃভূমির তরে যেই অকাতরে
নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে
অপঘাত ভয় খণ্ডে তার যায়
মরণে গোলক যায় সে জন

কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে ভিড় সামলানো দায়! সাহায্য নিতে হল ভলাণ্টিয়ারদের।

ঘি চন্দন কাঠে চিতা তৈরী। কালিঘাটের পুজারীরা এসে পুজো করে গেল কানাইএর পুণ্যদেহ। এ নাকি ছিল দেবীর স্পন্দাদেশ। তারপর দলে দলে লোক পুজো করতে লাগল কানাইয়ের। এক দল যায় এক দল আসে। সে কি থামানো যায়? শেষে মতিলাল রায় একটু বক্তৃতা করে সকলের কাছে অনুমতি নিয়ে শব চিতায় তুললেন বেলা তিনটেয়। ঘৃতাহুতি পেয়ে চন্দনকাঠের চিতা জ্বলল দাউ দাউ করে।

মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইয়ের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়। কিছু চিতাভস্ম নিয়ে দাদা চারুচন্দ্র দত্ত আর মতিলাল রায় গেলেন চন্দননগরে বীর মাতার কাছে। চিতাভস্ম নেবার ধুম পড়ে গেল। সারারাত্রি ধরে চিতাভস্ম সংগ্রহ করেছে জনসাধারণে। সেদিন কালিঘাটের কোন দোকানেই একটিও সিন্দুর কৌটা রইল না।

মাস দুই পরে হল সত্যেনের ফাঁসি। হাইকোর্টের আপীল করার জন্যেই এ সময়টুকু পেয়েছিলেন তিনি। কানাইয়ের শবযাত্রার উদ্দীপনা সরকারের একটু ত্রাসের সঞ্চার করেছিল বৈ কি। তাই সত্যেনের শব বাইরে দাহ করবার অনুমতি দিল না সরকার। তখন থেকেই বন্ধ হয়ে গেল ফাঁসির আসামীর শব বাইরে দাহ করা।

এমনি করে ভারতের ভাগ্যাকাশ থেকে চারটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিভে গেল অল্পদিনের ব্যবধানেই।

স্বামিজীর দীর্ঘায়ত চোখ দুটি চকচক করে উঠল।

চোখ মুছে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম ঘর থেকে।

পঁয়তাল্লিশ

সন্ধ্যেবেলা কাছে বসে জিজ্ঞেস করলুম—জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাইকে মারবার পর কড়াকড়ি বেড়ে গেল শুধু জেলখানার আসামীদের ওপর। বাইরে তার কিছু প্রতিক্রিয়া হয় নাই স্বামিজী?

—তা আবার হয় নাই? পুলিশ অত্যাচার উপদ্রব বেড়ে গেল খুব। 'বন্দে মাতরম' 'বেঁধে মারো' ধ্বনির ওপর ওদের আক্রোশ তো ছিল বরাবরই, এখন সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করে দিল একেবারে। সাজোয়ান যুবক দেখলেই সন্দেহ করে নাজেহাল করে। তাতে হল কি? যুবশক্তি দমল কি তাতে? বজ্রআঁটুনি ফস্কা গেরো আর কি। যুবক দল সোচ্চারে গাইল—'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে'। তবে কর্তাব্যক্তিদের ধরপাকড়ে মর্মাহত হয়েছিল খুবই: তাই সভাসমিতি নিষেধাজ্ঞার ওপর আইন অমান্য আন্দোলন করে নাই। লাভ কি? সবাই যদি জেলে যায় তো অসমাপ্ত কাজগুলো করবে কারা? সভাসমিতি একরকম বন্ধই হয়ে গেল। মাত্র মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন গুটি কয়েক ছেলে নিয়ে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে বেড়ান আর বারবার জেলে যান। প্রকাশ্য সভাসমিতি না হোক যুবক কর্মীরা ভেতরে ভেতরে ঠিক মতলব আঁটছিল আর সুযোগ পেলেই কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করছিল।

গোঁসাই হত্যার মাস দুয়েকের মধ্যেই ১৯০৮ সালে নভেম্বরে ফ্রেজারকে আবার হত্যা করবার চেষ্টা করল বাঙলার যুবকরা। এবার এগিয়ে গেল স্কটিশ চার্চ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ রায়। এর বাড়ী আড়বালিয়ায়। তৈরী হয়ে জিতেন দাঁড়িয়েছিল ওভারটুন হলের দরজার পাশে ৬ই নভেম্বর। ফ্রেজার আসতেই তার বুকের ওপর পিস্তল ধরে পর পর তিনবার গুলি করল জিতেন্দ্র। কিন্তু কপাল—গুলি বের হল না একটাও। বর্ধমানের মহারাজা এসে ধরে ফেললেন জিতেনকে। তারপর এল পুলিশ প্রহরীরা। রিভলভারের বাঁট দিয়ে জিতেন মহারাজকে তো মারলই, পুলিশ প্রহরীদেরও আরম্ভ করল এলোপাথারী মার। কিন্তু একা যুবক কতক্ষণ আর পারে এতগুলির সঙ্গে। ঘণ্টাখানেক পরে পরাজিত হয়ে ধরা পড়ল জিতেন্দ্র। দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল তার। ছাপা হ্যাণ্ডবিল বিলি হল হাতে হাতে—

বিপিন যখন জেলে, সুশীল রতন
বেত্রাঘাতে জর্জরিত, স্তম্ভিত জাগ্রত মন,
বিচারে যখন এল ঘোর প্রহসন
তখন ভাবিলে তুমি ফ্রেজার হনন।

মৌলভী প্রাচীন সেই স্বদেশীর ধন,
কুচক্রে পড়িয়া হায়, শত্রু কারাগারে যায়,
লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল যখন,
তখন ভাবিলে তুমি ফ্রেজার হনন।।
ছুটিলে পিস্তল হাতে ওভারটুন হলে
রহিয়া দুয়ার দেশে, মূর্তিমান বীরবেশে,
সম্মুখে স্বদেশ-শত্রু ভীত না হইলে
টানিলে পিস্তল ঘোড়া জয় শ্যাম বলে।
হায়রে না জানি কিবা মায়ের কপাল
একবার দুইবার ঘোড়া টিপি তিনবার
ব্যর্থমনোরথ হলে, বাদী হল কাল
রহিল অক্ষত দেহে বঙ্গের ভূপাল।
তারপর কি আশ্চর্য, অসংখ্য অরাতি
বেড়িয়াছে শতপুরে, ভীত তবু নহ শূরে,
যুঝিলে অক্ষত দেহে মদমত্ত হাতী
উঠিল দিগন্ত দিকে তব জয় ভাতি।
জেলে যাও হে জিতেন্দ্র কিংবা দ্বীপান্তরে
বাঙালী তোমার স্মৃতি পূজিবে হে
নিতিনিতি,
তুমি হে আরাধ্য দেব রহিবে অন্তরে
বাঙালীর হৃদে রবে, রবে না অন্তরে।।

মাত্র তিনদিন পরে ৯ই নভেম্বর হত্যা করা হল পুলিশ ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জিকে—যে ট্রেনে বসে ছলনা করে ধরেছিল প্রফুল্ল চাকীকে। গুলি করল গুনেন দাশগুপ্ত। এ মাসেই ঢাকায় হত্যা করা হল এক জাঁদরেল গোয়েন্দা—সুকুমারকে। এর পরে বাঙলায় পুলিশ জুলুম যা চলতে লাগল তা—অকথ্য অমানুষিক। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি শুনলে পুলিশ ক্ষেপে তো যাবেই, অকারণে যুবকদের নানা জেরা করে, রুলের গুঁতো দেয়, মারপিট করে, আবার ধরে নিয়ে গিয়ে হাজত বাস করায়।

এই আঘাতে কি ভেঙে পড়ে ছেলেরা? মোটেই না, আঘাতে আঘাতে কঠিন থেকে কঠিনতর — দধীচির হাড় — 'বজ্রাদপি কঠোরানি'।

সমিতির বহির্বিভাগীয় কাজ চলত প্রকাশ্যে কিন্তু অন্তর্বিভাগীয় কাজ সংগোপনে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও জানতে পারতেন না,—গোয়েন্দা পুলিশ তো দূরের কথা। তবু এত বিপ্লবী একদিনেই ধরা পড়ল কি করে?

কর্মীদের মনে খটকা। চলল গোপন তদন্ত। দেখা গেল যুগান্তর অফিসে কাজ করে বাঁকুড়া জেলার একটি ছেলে নাম—নরেন্দ্র। আসলে পুলিশের গুপ্তচর সে গোপনে গোপনে সকল আসামীর খবর দেয় পুলিশকে।

তখন মামলা চলছে। বাঁকুড়া জেলাতেই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারের ব্যবস্থা করল জ্যোতিষ ঘোষ। ভবলীলা সাঙ্গ হল নরেনের।

এরপর ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী [illegible] আদালতে দিনদুপুরে [illegible] চারু বসু [illegible] গুলি করে মারল সরকারী উকিল—আশুতোষ বিশ্বাসকে। ধরা পড়ে সেখানে 'সাপর্দ' [illegible] চারু। সে সোজাসুজি বলে দিল—কাজ নাই সেসন বিচারে, কালই লটকে দিন আমাকে ফাঁসিতে।

প্রশ্ন হল—এ কাজ করলে কেন?

—ভবিতব্য। আশুবাবু মরবেন আমার গুলিতে, আর আমার ফাঁসি হবে—এ বিধিলিপি।

চারুর ফাঁসি হল। এসব কি সাধারণ ছেলে? দেবদূত যাকে বলে। বংশের গৌরব মায়ের গৌরব এরা। এই চারু বাঘা যতীনের হাতে তৈরী। যতীনই এর দীক্ষাগুরু।

কথায় কথায় মনে পড়ে গেল। ১৯০৮ সালে ধরা পড়ার আগে 'পরিব্রাজক' হয়ে ঘুরতে ঘুরতে যাওয়া হয়েছিল বৃন্দাবন। ডেরা লালাবাবুর কুঞ্জে।

সমিতি ছেড়ে আসবার সময় একটি ছাড়া সব কেন্দ্রগুলিরই ভার দেওয়া গেছল বাঘের (বাঘা যতীনের) হাতে। বাঘা কিন্তু কামড় ছাড়ে নাই। যখন যেখানেই থামা হোক না, হয় দূত পাঠাত, নয় নিজেই এসে পড়ত যুক্তি-পরামর্শের জন্যে। সমিতির হোমড়াচোমড়া বিপ্লবীরা সব ধরা পড়লে একটু অস্থির হয়ে পড়েছিল বৈ কি। অস্থির হবারই কথা। সমিতির ভীষণ দুর্দিন, অবস্থা গুরুতর, সমস্যা ঘোরতর জটিল। লোক পাঠিয়ে সন্ধান করে হঠাৎ একদিন এসে হাজির বৃন্দাবনে। তারপর যুক্তি-পরামর্শ।

এমন দুর্দিনে মাথার ঠিক রাখতে পারে না সাধারণে। কিন্তু বাঘা তৈরী আলাদা ধাতুতে। এমন অবস্থায়ও ধীর-ভাবে সমস্যা সমাধানের শক্তি রাখত যতীন। অবিচল চিত্ত আর দুর্ধর্ষ অটুট মনোবলের অধিকারী ছিল সে। সে কী আধার! 'কুলং পবিত্রং জননীকৃতার্থাঃ' হয় এই সব ছেলেদের জন্যেই।

ছেঁচাপ্রশ

শীতের সলাতে উঁকে দিয়ে দুদিনের পর্ণা আতিথি বিদায় নিয়েছে। নির্মল নীল আকাশ। মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে শাদা মেঘ। সূর্যদেব যথা-নিয়মে সারাদিন ধরে পাড়ি দিচ্ছেন পূব থেকে পশ্চিমে। মাঠে ঘাটে ঘরে বাইরে আরামদায়ী রোদ্দুর। বিকেলে বেড়ানো আরম্ভ হয়েছে একটু বেলাবেলি।

দল ছেড়ে ধরেছি—মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ। পেছন ফিরে চেয়ে দেখে হেসে হেসে স্বামিজী বললেন—কী? আজ আবার তোমার মামলা নাকি? তা 'বাদল গেছে টুটি' এখন ছুটোছুটি করতে পার কোর্ট কাছারিতে। ছোটো দেখি একটু কেমন পার—বলে নিজেই ছুটতে আরম্ভ করলেন স্বামিজী। স্বামিজীর চলন আমার দৌড়—তাঁর সঙ্গে পারি কখনো। একটু দৌড়েই চলতে থাকলুম আস্তে আস্তে।

অনেকখানি দৌড়ে গিয়ে ফিরে এসে স্বামিজী বললেন—চল আদালতটা বসুক ঐ শিলার ওপর।

সূর্যাস্তের দেরী আছে, চারদিক রোদ্দুরে ঝকমক, কনকনে হাওয়া নেই। গায়ে গরম জামা কাপড় তো আছেই। বেশ আরাম করেই বসা গেল শিলার ওপর।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন স্বামিজী। নদীর ওপারে পাচন হাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল মেঠো সুরে গান গেয়ে নেচে নেচে চলে গেল এক পাল গরুর পেছনে পেছনে।

স্বামিজী বললেন—হ্যাঁ, তারপর আলিপুর বোমার মামলা। চলল বেশ কিছুদিন ধরে। তা বছরখানেকের ওপর। বিচারক ছিলেন জাস্টিস বিচক্র্যাফট। ইনি বিলেতে ছিলেন অরবিন্দদার সহপাঠী। আই, সি, এস পরীক্ষায় অরবিন্দদার ঠিক পরের স্থানটিই অধিকার করেছিলেন ইনি। কাজেই দাদার সঙ্গে যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

অরবিন্দদার হাবভাব আচার আচরণ আর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মূর্তি দেখে মুগ্ধ হলেন বিচক্র্যাফট। এ মানুষ যে বোমা পিস্তল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের উদ্যোগ করবে—বিশ্বাস হল না তাঁর। তাই যখনই সরকারের পক্ষ থেকে অরবিন্দদাকে পাকে জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে, তখনই প্রতিবাদ খাড়া করে অরবিন্দদার পক্ষের ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাসকে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে বলেছেন।

বিচক্র্যাফটের ধারণা—অবিনাশ আর বারীন্দ্রই এসবের মূল। তাঁরাই বোমা অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে বিপ্লব প্রচারের জন্যে 'যুগান্তর' পত্রিকা বের করেছেন। অরবিন্দকে কিছু না জানিয়ে তাঁরাই অরবিন্দের নামে প্রচার চালাতেন। তবে দু' একখানা চিঠিতে স্বাধীনতা সম্বন্ধে অরবিন্দ যা লিখেছেন তা সত্যি। কাজেই অরবিন্দ স্বাধীনতাপ্রিয় এটা সত্যি কিন্তু সক্রিয় বিপ্লবী নন। তার কোন প্রমাণ নেই। তারপর চিত্তরঞ্জন সওয়াল শেষ করে যা বলেছেন তাই সত্যি। সওয়াল শেষে চিত্তরঞ্জন দাস বলেছেন—

> Long after this controversy is hushed to silence, long after this turmoil, this agitation will have ceased, long after he is dead and gone. But he is the Poet of Patriotism, Prophet of Nationalism and Lover of Humanity. His words will be echoed and re-echoed not only in India but over the distant seas and distant lands.

মামলা চলল এক বছর চারদিন। রায় বের হল ১৯০৯ সালের ৬ই মে। রায় দেবার জন্যে বিচক্র্যাফট এসে বসলেন আদালতের আসনে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে বন্দী গাড়ীতে এল আসামীরা। গাড়ী থেকে নামিয়ে দু' দুজনকে এক সঙ্গে হাতকড়া দিয়ে আদালতের লোহার খাঁচায় বসান হল সবাইকে।

আদালতের ঘর উঠোন কোথাও তিল ধরবার জায়গা নাই। লোকে লোকারণ্য। টুঁ শব্দটি নাই—রুদ্ধনিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে সবাই। কি রায় বের হয়, কি অমঙ্গলের কথা শুনতে হয়—সবাই সশঙ্ক। এত লোক তবু নিস্তব্ধ—সূচ পড়লে শোনা যায়। সেই নিস্তব্ধতা ভাঙল উল্লাসকর। সি, আই, ডি ইনস্পেকটর সামসুল আলামকে বললে জোর গলায়—ফাঁসির হুকুম হবে তো এবার, শীগগির পান সিগারেট খাওয়াও, নইলে শেষ করবো তোমায়। হেম দাসও যোগ দিলেন উল্লাস করের কথায়। সামসুল বললে—দাঁড়াও দাদা, রায় বের হলেই খাওয়াবো পান সিগারেট। তারপর আবার নীরব।

'নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী পরে' জাস্টিস বীচক্র্যাফট বলতে লাগলেন —রায় সুদীর্ঘ সমস্তটা পড়বার সময় নেই। কে দোষী কে নির্দোষ তাই বলে দিচ্ছি। সকল চার্জে অভিযুক্ত করে বারীন্দ্র আর উল্লাস করকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদ করবার মূলে এরাই দুজন।

শুনেই উল্লাস করের উল্লাস দেখে কে? খাঁচার ভেতরেই চেঁচিয়ে বলে উঠল—বারীনদা মেরে দিয়েছি শালাদের।

হ্যারিসন রোড বোমার মামলায় উল্লাস করের সাত বছর জেলের হুকুম হয়ে আছে এর আগে। ফাঁসির হুকুমে সেই কারাদণ্ডটা ভোগ করতে হবে না—তাই এই উল্লাস। সে উল্লাস কি থামে! শেষে সামসুল আলাম, কোর্ট ইনস্পেকটর, প্রহরীরা সব এসে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে থামাল উল্লাস করের আনন্দ উচ্ছ্বাস।

বীচক্র্যাফট আবার আরম্ভ করলেন—হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের জন্যে পূর্ণ সাহায্য করলেও প্রত্যক্ষ হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রমাণ নেই। তাই এদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বিপ্লবের সূচনা থেকে বারীন্দ্রকে সব বিষয়ে সাহায্য করেছেন অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আর গোড়া থেকেই বিপ্লবের কাজ করে এসেছেন—হৃষীকেশ কাঞ্জীলাল, সুধীর সরকার, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ বসু। এঁদেরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করলাম। আর আটজন অল্পদিন হল যোগ দিয়েছেন এঁদের সঙ্গে। তাই তাঁদের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, দীনদয়াল বসু, শচীন সেন, পূর্ণ সেন, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ, শচীন সেনগুপ্ত—প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ও প্রমাণ না থাকায় বেকসুর খালাস দিলাম এদের।

তখন গেরুয়া-পরা। ছেড়ে দেবার আগে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করলেন—ছেড়ে দিলে বাড়ী যাবেন তো? হাসি পেল। ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে কত অজ্ঞ এরা! বিশেষ করে সন্ন্যাসের কোন ধারণাই নাই এদের। ঐ তো কতকগুলো পাদরী আর নান। প্রচারক ছাড়া বেশি কিছু নয়। অবশ্য তাদের মধ্যে দু দশজন খুব ভাল যে নাই তা নয়। প্রকৃত সন্ন্যাসী। বেশির ভাগই যা করলে রবিবারে ঐ গির্জায়, তারপর কোনরকম ভোগবিলাসে বাধা নাই তাদের।

উত্তরে বলা হল—সন্ন্যাসীর আবার বাড়ী কোথায়?

একবার আপাদমস্তক নীল চোখ দুটো বুলিয়ে নিয়ে তো সাহেব চুপ।

জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল রায় শুনে। যাঁরা খালাস পেলেন তাঁরাও 'হায়' 'হায়' করতে লাগলেন দণ্ডিতদের জন্যে।

মুক্ত আসামীরা বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরলেন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে, হাতকড়া পরানো দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের তোলা হল বন্দী গাড়ীতে।

চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল—'বন্দে মাতরম', সঙ্গে সঙ্গে বহু মিলিত কণ্ঠে গান আরম্ভ হল—

> তোরা দেখে যা বাঙালীর
> আত্মবলিদান।
> বারীন্দ্র উপেন্দ্র উল্লাস,
> ইন্দু হেমচন্দ্র দাস
> মায়ের পূজাবেদীমূলে
> সঁপিল পরাণ।।

এখন বারীন্দ্র আর উল্লাস করের হাইকোর্টে আপীল করা দরকার। ফাঁসির হুকুমের সপ্তম দিনে ফাঁসি হত তখন। আপীল করতে হলে এই সাত দিনের মধ্যেই। আপীল করলেন বারীন্দ্র। কিন্তু উল্লাসকর রাজী হল না কিছুতেই। কত চেষ্টা করলেন চিত্তরঞ্জন দাস আর অন্যান্য উকিল ব্যারিস্টাররা। আপীলের দরখাস্তে কিছুতেই সই করান গেল না উল্লাস করকে। চারদিন কেটে গেল, মাঝে মাত্র দুটি দিন, তিনদিনের দিন ফাঁসি। ফাঁসিকাঠ পরিষ্কার, জল্লাদও তৈরী।

এত বড় একটা আধার—এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় কি? স্মরণ নেওয়া হল উল্লাস করের মা বাবার।

বাবা মায়ের কত কাকুতি মিনতি, বোঝনো পড়ানো চোখের জলের বদলে উল্লাসকর সই করল আপীলে ফাঁসির মাত্র দুদিন আগে। ফাঁসি বন্ধ হল।

সাধে কি আর দেশবন্ধু! চিত্তরঞ্জনের আন্তরিক চেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলের জন্যেই আপীল করা হল হাইকোর্টে। এবার চীফ জাস্টিস জেঙ্কিন্স আর জাস্টিস কারণড্রফ দুজনে মিলে আরম্ভ করলেন পুনর্বিচার। মামলা চলতে থাকল ক'মাস ধরে। সামসুল আলাম রোজ আসে হাইকোর্টে। আসবেই তো, সরকার পক্ষে যেখানে যত কূটকৌশল, জাল, ফাঁদ সবই যে সামসুলের হাতে। কত ডাকাতির তদ্বির করেছে, কতজনকে ধরেছে, কতজনকে ধরেছে কতজনকে ভয় দেখিয়ে রাজসাক্ষী করেছে। আলিপুর বোমার মামলায় তদ্বির করে সরকারী পুরস্কার পেয়েছে—ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টপদ। একে সরাতেই হবে ধরা থেকে।

তেতে উঠল বীরেন দাশগুপ্ত। সামসুলকে চেনে না সে। তাতে কি? একবার দেখিয়ে দিলেই হল। অস্ত্র? সব যে বাজেয়াপ্ত। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। মিলল অস্ত্র। উড়িষ্যার খাজপুরের সাব-ডিভিসন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র মৌলিক এসেছেন আত্মীয়ের বাড়ী। ঐ বাড়ীতেই থাকেন সুরেশ মজুমদার। ম্যাজিস্ট্রেটের রিভলভারটি কৌশলে সরিয়ে আনলেন তিনি। এই রিভলভার নিয়েই সঙ্গে গেলেন রাজশাহীর সতীশ সরকার। সামসুলকে চিনিয়ে দেবেন তিনি।

সেদিন ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী। সামসুল আলাম উঠছে হাই-কোর্টের সিঁড়ি দিয়ে। সতীশ ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন বীরেনকে। কাছে গিয়ে বীরেন সরাসরি জিজ্ঞেস করল—আর ইউ সামসুল আলম?

উত্তর হল—ইয়েস।

সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার গর্জে উঠল—দ্রাম দাম। সামসুলের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল সিঁড়িতে। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এল বীরেন। —খুন—খুন— চেঁচাতে চেঁচাতে চাপরাশীরা ছুটল পেছনে। অস্ত্রধারী কনস্টেবল একজন ছুটে এল সামনে থেকে। বীরেন গুলী ছুড়ল তার দিকে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল লাগল না। পেছনের চাপরাশীরা ধরে ফেলল বীরেনকে। তারপর মামলা।

বীরেনের মামলা ওঠে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে।

প্রশ্ন করা হলে বীরেন বলে—কিছু বলব না, যা ইচ্ছে হয় কর। কজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে হা-হা করে হাসে বীরেন। বীরেনের হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়েছিল যে চাপরাশী, সাক্ষ্য দিতে এসে বীরেনকে দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল সে। দেখে বীরেনের সে কী হাসি।

এরপর বীরেনের মামলা গেল হাই-কোর্টে দায়রায়। বিচারপতি সার লরেন্স জেঙ্কিন্স। কোন উকিল ব্যারিস্টার নাই বীরেনের। ব্যারিস্টার নিশীথ সেনকে আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে বললেন জেঙ্কিন্স। কিন্তু নিশীথ সেনকে কোন কথাই বলবে না বীরেন। ব্যারিস্টার সেন জজকে বললেন—আসামী সম্ভবতঃ পাগল, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায় না যে। যাই হোক বিচারে ফাঁসির হুকুম হল বীরেনের। অচল অটল বীরেন বীরপদক্ষেপে বেরিয়ে এল কাঠগড়া থেকে।

এই সময়ে এক গোয়েন্দা পুলিশ একটা জাল বিপ্লবী পত্রিকা দেখায় বীরেনকে। কাগজখানিতে বীরেনকে খুব নিন্দা করে লেখা ছিল। কী যে হল—বীরেন আর সামলাতে পারল না নিজেকে, বলে ফেলল—যে যাই বলুক, তার বুক দশ হাত হয়ে আছে একজনের সমর্থনে। —কে সে? ভাবের আবেগে বীরেন বলে ফেলল—যতীন মুখার্জি। আর যায় কোথা? পুলিশের হাতে পড়ে গেল বীরেন। বলে ফেলল সব কথা। লাট সাহেবের কাছে চাইল প্রাণভিক্ষা। পেল না। বাঘা তখন হাওড়া জেলে। প্রেসিডেন্সি জেলে আনা হল তাকে যোগসাজসের চার্জ দিয়ে। বীরেন সনাক্ত করল যতীনকে। পর দিনই বীরেনের ফাঁসির দিন। যতীনের ব্যারিস্টার বলে দিলেন—সেদিন বীরেনকে জেরা করতে পারবেন না তিনি।

পরদিন ফাঁসি হল বীরেনের। প্রকৃত বীরের মতই ফাঁসি মঞ্চে উঠল বীরেন। ফাঁসির আগে বুঝেছিল—কী একটা বিভ্রান্তির মধ্যে যেন পড়ে গেছে সে। দুনিয়ার সবার কাছে ঘৃণিত হলেও যতীন্দ্র নাথের স্নেহহারা হয় নাই—এ সান্ত্বনা ছিল তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

যতীন ক্ষমা করেছিল বীরেনকে। হত্যার যোগসাজসে অর্থাৎ হত্যার অপরাধেই যতীনের মামলা হলে জেরা না করা বীরেনের সাক্ষ্য আইনত অগ্রাহ্য হয়ে যায়। যতীন বেঁচে গেল ফাঁসি থেকে। হাওড়ার ষড়যন্ত্র মামলা টিকল না। যতীন বেকসুর খালাস পেল, ১৯১১ সালে এপ্রিল মাসে।

যতীন ছিল সরকারী চাকুরে। হুইলার সাহেবের প্রিয় স্টেনোগ্রাফার। জেল থেকে খালাস পেল যতীন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গেল তার চাকরী।

রোজগার চাই—সংসার পালন করতে হবে তো। যতীন গেল যশোহর জেলায় ঝিনাইদহে কন্ট্রাকটারী করতে।

ঐ ১৯১১ সালেই ২১শে ফেব্রুয়ারী অনুশীলন সমিতির এক যুবক রিভলভারের গুলিতে মারে গোয়েন্দা বিভাগের হেড কনস্টেবল শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে।

মাত্র দুদিন পরে ২রা মার্চ গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চ কর্মচারী জাঁদরেল ডেনহাম সাহেবকে লক্ষ্য করে ডালহৌসী স্কোয়ারে বোমা ছোড়ে চুঁচড়ার ননীগোপাল মুখার্জি। এবারও ভুল। বোমা গিয়ে পড়ে ইঞ্জিনীয়র কাউলে (Cowley) সাহেবের গাড়ীতে। হতাহত হয় নাই কেউ। হবে কি—বোমা ফাটেই নাই। ধরা পড়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় ননীগোপালের।

সূর্য অস্ত গেছে কিছুক্ষণ আগেই। চারিদিকের সুবিস্তৃত মাঠের বুকে আঁধারের কালিমা। দূরে ঘরে ঘরে শাঁখ বাজিয়ে তুলসীতলায় সন্ধ্যে পিদিম জ্বালছেন মায়েরা।

নিশ্বাস ছেড়ে দুহাতে চোখ রগড়ে চারিদিকে চেয়ে স্বামিজী বললেন—সূর্যাস্তের পরের অন্ধকার দূর করতে মায়েরা ঘরে ঘরে জ্বালছেন পিদিম, আর ভারতের ভাগ্যাকাশে 'একে একে নিবিল দেউটি।'

তা নিঃশেষে নিবল কি? নেবে নাই। জ্বালামুখীর অনির্বাণ শিখার মতই জ্বলতে থাকল দাউ দাউ করে। বাইরে নয় অন্তরে।

স্বাধীনতা স্পৃহা, স্বাধীনতা লাভের সংকল্প আর উদ্দীপনা জেগে রইল দেশ-বাসী আপামর সাধারণের অন্তরে। সঙ্কল্প সাধন কিংবা শরীর পাতন। এবারের প্রচেষ্টা বিফল হলেও স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত এ নিভবে না কোন দিন। দম দেওয়া হয়েছে, কলের চাকা ঘুরবেই—থামবে না। স্বাধীনতা আসবেই। ওঠা যাক, সন্ধ্যে উৎরে গেছে।

শিমূলতলা থেকে উঠে পা বাড়ানো গেল বাসার দিকে।

(ক্রমশঃ)

বর্ধমান, বীরভূম আর উত্তর বাংলার বরেন্দ্রভূমির প্রান্তবর্তী অঞ্চল এখনও সাঁওতাল অধ্যুষিত। জনশূন্য অসমতল পার্বত্যভূমির উদার পরিবেশে দূরে দূরে ছড়ানোছিটোনো দশ-বারোখানি খড়েছাওয়া মাটির বাড়ী, নিকোনো উঠোন, দূরেকটা বারোয়ারী পাতকুয়ো, একটা ডোবা, থান-কতক শিমুল পাকুড় কি কাঁঠাল গাছ, তারই সঙ্গে বাবলা, পটেশ জাতীয় কাঁটা-গাছের ঝোপঝাড়, ইতস্ততঃ একরাশ হাঁস-মুরগি, ছাগল ভেড়া শুয়োরের পাল চরে বেড়ায় এখানেওখানে, দূরে মাঠে গলার ঘন্টা বাজিয়ে গরু চরছে—প্রায় উলঙ্গ কালো রোগা, ঝোটা, পেটফোলা ছেলেমেয়ের দল ধুলোখালি নিয়ে মত্ত খেলায়, দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি ঘেঁষে বসে শালপাতায় তামাক মোড়া চুটি টানে জরাগ্রস্ত সাঁওতালী বৃদ্ধ, কুয়োর ধারে জল তুলতে জটলারত স্বাস্থ্যবতী লাজুক যুবতী দলের হাসির কলরোল—বাংলাদেশের সাঁওতাল পল্লীর শান্ত নিঝুম দুপুর বেলাকার ছবিটা এমনই।

অথচ আর বিলাসী নগরজীবনের প্রাণ-হীনতার বিপ্রতীপ দরিদ্র নিরক্ষর উপেক্ষিত এই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আনন্দ-বেদনায় মধুর, নাচ-গানের কলরোলে বর্ণবহুল জীবনের নানা দিক মনকে আকর্ষণ করে। খেটে-খাওয়া সুঠামদেহী কালো এই মানুষগুলোর অনাড়ম্বর জীবন সহজ বিশ্বাস, ঐকান্তিক ঈশ্বরপ্রতীতি, সঙ্গীত ও নৃত্যে ছন্দোবদ্ধ সাংস্কৃতিক উৎসবঅনুষ্ঠান সভ্যতার ঠুলিপরা আমাদের চোখকে ঈর্ষাতুর করে। অসমৃদ্ধ সাঁওতালী ভাষার শব্দভাণ্ডারে সংখ্যাতত্ত্বের দৌড়—মিটে, বার্‌ইয়া, পিয়া, পুনিয়া, মড়ে, তুরুই সাকুল্যে এক থেকে ছয় পর্যন্ত। কিন্তু মাদলের তালে তালে, যৌথ নৃত্যের ছন্দ দোলায়, মাদকতাময় সুরে সাঁওতাল যুবক যুবতীর দল নানা উৎসবে ব আনন্দ অনুষ্ঠানে যে সব গান গেয়ে থাকে তাদের অর্থগত তাৎপর্যই যে কেবল বিচিত্র তাই নয়, গভীরতাও বিস্ময়কর। একটি ছোট্ট গান, কটি কথা কিন্তু তাদের ভগবৎ বিশ্বাস আর আত্মনির্ভরতা কি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশিত—

'জীবিন বাবা দ জীবিন দিকে
দাড়ি বাবা দ দাড়ি এমকেৎ
আবু আদিবাসি কাড় বারে বোল সাব এন
ভর কিং এমাৎ বোন হোর গেকে।'

জীবনদেবতা আমাদের জীবন দিয়েছেন, শক্তির দেবতা আমাদের শক্তি দিয়েছেন, ভগবান আমাদের মুঠোয় লাঙল তুলে দিয়েছেন আর বরাদ্দ করেছেন ধান।'

কোনো অখ্যাত সাঁওতালী লোক-কবির বাস্তববোধের পরিচয়বাহী আরেকটি গান—

'উদ্‌লে ওরা এল কাতে বুইয়াল্লী।
বল কানা হুহ ইদা কিনি।
হরি বল ভাই, রাধে বল, ঘরেরও
লোক নাই—কে দিবে বাছা।

মের ববাবর চাউলি সাকা
ন মিনুসি তুরিটি নুমি লল—
উকারেন দোমাই তাহে কানা
খিরি চাটানি বার মচা।
বার উমুল রে তাহে কানা
খিরি দাগাড় ডাহার দাগাড়
ডাহার পেঁহ লাড়া আজুম, জুই।

বাংলা তর্জমায় মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায়—'বড় বাড়ী দেখে ভিখারী দাঁড়াল, হাঁক দিল 'হরি বল ভাই, রাধে বল, কিন্তু উত্তর পেল লোক নেই।' —তাৎপর্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

পরবর্তী উদ্ধৃতিতে পাঠক লক্ষ্য করবেন, সাঁওতালীদের দীনহীন অবস্থা সম্পর্কে তাদের সচেতনতা কিন্তু অবহেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়, প্রতিবাদ নয়, বিনম্র ভাষায় সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনায় আবেদন—

'ওমিন মারাং ধার তীরে
বারিয়া গিয়া কিন চাঁদু বোঁগা
মিং দ মিং চাঁদু এিদো দ এিদো চাঁদু।
বারিয়া গিয়া কিন চাঁদু বোঁগা।
আতো সতে রাগ কেদা চাঁদু হিরলে,
চেঁড়ে দোকু রাগ কেদা দারি হিরলে।
দ সাম রেন মানেয়া চাঁদু জনম
হড় হপন বয়হা জাতি সাঁওতাল
পোতাম ঝাম পা তেলে ঝাম পা আকান্
আপে গোত হোঃ সাহেব আমিন।
পোতাম ঝাম পা থন লাড়া জেপে।'

সহজ বাংলায়—'পৃথিবীতে দুটো ভগবান—সূর্য আর চাঁদ।' আমরা জন্ম

গ্রহণ করে ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করলাম, আশ্রয় চাইলাম। আর পাখীরা জন্ম গ্রহণ করে চাঁদের কাছে আশ্রয়ের জন্য গাছ চাইল। পৃথিবীতে আমরা সবাই ভগবানের সৃষ্টি। আমরা সাঁওতালেরা সবার নীচে, সবহারাদের পিছে। হে স্রষ্টা-শ্রেষ্ঠ, তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের এই তলার ধাপ থেকে তুমি তুলে ধরো।'

সাঁওতালী রমণী কণ্ঠে গীত গানের রোমান্টিকতায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের সুধারসে তৃপ্ত শিক্ষিত রুচির মানুষের মনও কম পুলকিত হবে না,—এমনই একটি রোমান্টিক সাঁওতালী গান—

কলকাতা কলগাড়ি ভাগলপুর মালগাড়ি
হঃ হ কেৎ লেকা গাড়িম সিটী কেৎ দ।
চুপে সে মাল গাড়ি তাগি ইং মে
ইং গাংমা আড়াং লেখা আজম লেদা।
চুপে সে মাল গাড়ি তা গিইং মে
ইং হং চালাক্‌ গাড়ি রাসন বাজার।

বিস্ময় পুলকিত চিত্তে আজব শহুরে ট্রেনটাকে সাঁওতাল রমণী থামতে বলছে। ইঞ্জিনের বাঁশীর আওয়াজে যেন সংকেতের ডাক—'সময় মতো না পৌঁছুলে আমি কিন্তু থামব না।' মেয়েটির উত্তর—'আমি এলাম বলে।'

একটা হাসির গানের উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে আপাতরুক্ষ এই নিরক্ষর মানুষগুলোর মনে রসবোধের ঘাটতি নেই।

মারাং বুরু চট্‌ রে হাতী লীকান
গুডু গজ কানা।
কুড়ি দঃ কুড়ি জনা—
কোড়া দঃ পচিশ জনা
গুডু চাঁড় বল রাকাব রাকাবতে
লাওথা ইনা।

'একটা পাহাড়ের ওপর হাতীর সমান একটা ইঁদুর মেরেছে। এতো বড়ো যে কুড়িজন মেয়ে আর পঁচিশজন ছেলেতেও ওখান থেকে নামাতে পারছে না।'

ছেলেদের মনভোলানো ছড়া শুনতে পাওয়া যাবে ধুলোবালি নিয়ে খেলায় মত্ত সাঁওতালী ছেলেমেয়েদের মুখে কিংবা ছেলের বায়না ভোলানো মার গানেও, বাংলা ইকড়ি মিকড়ি ছড়ার আদল দেখে অবাক হতেই হয় যখন শুনি—

ইচিং বিচিং, জামাই বিচিং
তারপর লেক মাকাড় গাতি
ভেল পাত ভেল পাত
হাজার কইলুম, দইলুম
চইরে ভাজাইলুম
ইর্তক লিকি, লাউরে লিকি
ভরম বি ভরম বি
গাই চরা হাবাড় হাবাড়
হাবাড় হাবাড়।

●

দুন্দুভির ডিম ডিম রবে আছে যথার্থই সাঁওতালী উৎসবের আভাস। রবীন্দ্রনাথের উৎসব কবিতার ভাষা আর ছন্দে সাঁওতাল উৎসবের বর্ণময়তা আশ্চর্য-ভাবে মূর্ত। রাত্রির নিস্তব্ধতা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হওয়ার সংগে সংগে—

ওই শুনি পথে পথে
হৈ হৈ ডাক
বংশীর সুরে তালে
বাজে ঢোল ঢাক
মদ্দিত কণ্ঠের
হাস্যের রোল
অম্বর তলে দিল
উন্মাদ দোল।।

বাঙালীর দুর্গোৎসবের মতোই 'বাঁধনা' পরব উপলক্ষে আনন্দকলরোলে মুখর হয়ে ওঠে সাঁওতাল পল্লীর প্রতিটি মানুষ। কিন্তু আমাদের শারদোৎসবে যেমন আড়ম্বরের সমারোহ দরিদ্র সাঁওতালদের বছরের সেরা পরব বাঁধনার তেমন আনুষ্ঠানিক জৌলুস নেই, যতখানি আছে স্বাভাবিক প্রাণের স্পর্শ। পৌষ ডাক দেওয়ার অনেক আগে থেকেই প্রতিটি সাঁওতাল তাদের প্রাত্যাহিক অন্নের এক অংশ সঞ্চয় করে রাখে তাদের বহুকাঙ্ক্ষিত এই বাঁধনা উৎসবের আয়োজনের জন্য। আমাদের পুজোর কেনাকাটার মতোই পৌষের শুরু থেকে হাটে বাজারে দোকান-পাটে সাধ্য মতো উৎসবের উপকরণ কেনার জন্য ভীড় করে সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষেরা।

বহু প্রত্যাশিত পঁচিশে পৌষ তারপর একদিন এসে পড়ে। উৎসবের আয়োজনে প্রস্তুতিপর্বে প্রত্যেক সাঁওতালপল্লীতে একটি আলোচনা সভা বসে। সেই সভায় মুখ্য ভূমিকা প্রত্যেক গ্রামের পাঁচজন প্রধানের। এই পাঁচজনই হচ্ছে গ্রামের পঞ্চ—গ্রামের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এঁদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে। গ্রামের কলহ বিবাদের যিনি মীমাংসা করে দেন তাঁকে বলা হয় মাঝহি, গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা-দের এঁর কথা মেনে চলতে হয়। জগ-মাঝহি হলেন বিবাহের পুরোহিত, পল্লীর সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন তিনি। পুজো-পার্বনে পৌরোহিত্যের দায়িত্ব কিন্তু জগ-মাঝহির নয়, এ-কাজ যিনি করেন তাঁকে নাইকি বলা হয়। গ্রামে অনুষ্ঠিতব্য সভার খবর দেওয়া বা কোনো কলহবিবাদের মীমাংসার জন্য সাঁওতাল-পল্লীর সকলকে একত্র করার কাজ হল গড়েতের। গ্রাম পরিচালনার জন্য নির্বাচিত পাঁচজনের পঞ্চম জনকে বলা হয় পারানিক। তাঁর কাজ হল প্রথমোক্ত চারজনের সংগে সংগে থাকা এবং তাঁরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কিনা সে সম্পর্কে নজর রাখা।

বাঁধনার প্রস্তুতিপ্রসংগে সেই সভায় আলোচনা শেষ হলে গড়েত্ গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের লোকসংখ্যা অনুযায়ী ধান সংগ্রহ করে। সংগৃহীত ধান থেকে পাঁচ গোলা মদ তৈরি করে অতিরিক্ত ধান নাইকিকে দিয়ে দেওয়া হয়।

পঁচিশে পৌষ বাঁধনার দিন পুরোহিত নাইকি একেবারে নিরম্বু উপবাস করেন। গড়েত্ সেদিন পল্লীর প্রতি বাড়ী থেকে অর্ধেক পাই চাল ও একটি করে মুরগি সংগ্রহ করেন। কারো কাছে মুরগি না থাকলে তাকে পাঁচটি ডিম দিতে হয় তার পরিবর্তে। সাঁওতালসমাজে তাকে একঘরে হতে হবে যদি কেউ এ-সব দিতে রাজী না হয়।

সেদিন দুপুরে ছেলেবুড়ো প্রত্যেকে উৎসব প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। এই অনুষ্ঠানে কিন্তু সাঁওতাল রমণীদের যোগদানের অধিকার নেই। —সেই অনুষ্ঠানে কোনো খাবার খাওয়া তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। গড়েত্ তার সংগৃহীত সমস্ত চাল, মুরগি, তেল, নুন ইত্যাদি সেখানে উপস্থিত করেন। নাইকি তখন পুজোয় বসেন, পুজোর পর পরের পর গাদা গাদা মুরগি বলি দেওয়া হয়। উপস্থিত সবাই তখন বনভোজনের মহোৎসবে মেতে ওঠে। খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হলে বয়স্করা মদ্য পান করে। তারপর রাখালের দল গরুর পাল নিয়ে হাজির হয়। মাঠে আতপচাল দিয়ে একটা ঢিপি মতো করা হলে তার ওপর একটা ডিম রাখা হয়। রাখালেরা তখন গরুর পালকে তাড়া করে ঐ ঢিপির ওপর দিয়ে নিয়ে যায়। যে গরু ওই ঢিপিতে পা দেয় তাকে ধরে মাথায় সিঁদুর লেপে দেওয়া হয় আর যার গরু তাকে এক গোলা মদ জরিমানা দিতে হয়।

বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েরা সেদিন সকাল থেকে ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে

গোবর দিয়ে লেপে ঘরের মেঝে, দেয়াল, বাইরের উঠোন, সুন্দর আলপনা দেয় ভেতরে বাইরে। —নিজেদের জামা-কাপড় কাচে, বাঁধনা পরবের দু-তিন দিন আগে সাঁওতাল যুবকেরা তাদের বিবাহিত বোনেদের বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসে। বোনেরা মহানন্দে বাপের বাড়িতে উৎসবের ক'টা দিন কাটিয়ে আসে।

বাঁধনা উৎসব চলে একটানা পাঁচদিন ধরে। প্রথম দিন উমে—সারাদিনের অনুষ্ঠানের পর বুড়োবুড়িরা সেদিনের মতো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। মাঠ থেকে যুবকের দল যায় মন্দিরে, সাঁওতালপল্লীর মাঝহি-স্থান—সেখানে জড়ো হয়ে মাদল বাজিয়ে বাঁধনার আগমন ঘোষণা করে। মেয়েরা দল বেঁধে নেচে গান গায়—'দল-বাদল পুকুরে প্রাণ ভরে স্নান করেছি, কাল আমার মনের সব প্রেমভক্তি দিয়ে দেবতাদের পুজো করব। কাল ভোরবেলাতে আমরা দু' বোনে সাদা কাপড় পরে দুধ দিয়ে ঘর নিকোবো আর দই দিয়ে মাড়ালি দেব।'

প্রথম দিন উমের পর বাঁধনার অন্য চারদিনকে বলা হয়—দাকা, কুনটাউ, জালি ও দাজা। দ্বিতীয় দিন দাকা'র সকালে যুবকরা মাদল বাজিয়ে বাড়ী বাড়ী গরুর কাছে গিয়ে গরু কীর্তন করে। সেদিন সব বাড়ীতে মাংস, পিঠে ইত্যাদি ভালো ভালো খাবার তৈরি হয়। হিন্দুদের শুভকর্মে নান্দীমুখ অনুষ্ঠান কি মহালয়ায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার মতোই দাকার দিন সাঁওতালেরা মৃত পূর্বপুরুষদের নামে পিন্ডিদান করে ও প্রধান দেবতাদের ফুল বেলপাতা ও দূর্বা দিয়ে পুজো করে। কেউ কেউ পুজোয় ছাগল, মুরগি এমন কি শুয়োরও বলি দেয়। পুজোর শেষে সবাই এক সঙ্গে পাত পেড়ে বসে আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করে। তারপর মদ খেয়ে সকলে মিলে গান গায়—'ওই যে সম্মুখে প্রায় ষোলো ক্রোশ দূরে যে দেশটি আবছা আবছা দেখা যায়, সে দেশটির নাম কি? দিদি তুমি যদি না জানো তো আমি বলি, সে দেশের নাম মিশর দেশ। সে দেশের লোকেরা পাথর দিয়ে বাড়ী ঘর তৈরি করে আর গরু দিয়ে নীলনদের জল বহন করে। সে দেশের এক-পাশে আরব সাগর আর এক পাশে নীলনদ। এই দেশেরই নাম মিশর।'

পাঠকদের মতো লেখকও বিস্মিত, উপরোক্ত গানের কথায় নিরক্ষর সাঁওতাল-দের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে। ভাবতেও অবাক লাগে, মাত্র ষোলো ক্রোশ দূরে যে দেশ আবছা অস্পষ্টরূপে সাঁওতালেরা দেখতে পায় তার নাম মিশর দেশ। তবে কি ভারতের আদিম অধিবাসী এই সাঁওতালেরা কোনো এক সুদূরে অতীতে আফ্রিকা ইজিপ্টের আদিম অধিবাসীদের নিকট-প্রতিবেশী ছিল?

ফুলসাজ সাঁওতাল রমণীদের অত্যন্ত প্রিয়। বাঁধনা উৎসব উপলক্ষে সাঁওতাল মেয়েরা কানে দুল, মাথায় ফুল, গলায় চাঁদির হাঁসুলী কিম্বা বড়ো বড়ো পুঁতির মালা পরে সাজগোজ করে।

কুনটাউ হল বাঁধনার তৃতীয় দিন—সেদিন গরুর উৎসব। যুবকেরা সেদিন বাড়ী বাড়ী গিয়ে মাদলের ডিম-ডিম রবে জাগিয়ে তোলে গ্রামবাসীকে। জগমাঝহি যুবকদের সাহায্যে বাড়ীর সামনে দুটো করে বাঁশ পোঁতে। সেই খুঁটি দুটো রঙ-বেরংয়ের নানা নকশা এঁকে চিত্র-বিচিত্র করে দেয়। বিকেলে মেয়েরা ছোটো ছোটো পিঠে বানায় এবং ধানের শিষ দিয়ে গাঁথা মালায় সেই পিঠে ঝুলিয়ে দিয়ে গরুর গলায় পরিয়ে দেয়। গরুকে তখন বেশ শক্ত মোটা দড়ি দিয়ে সেই বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা হয়। নতুন কুলোয় আতপ চাল, ধান, দূর্বা, চিনি, বাতাসা রেখে গরুকে বরণ করে। তখন যুবকের দল মাদল বাজিয়ে গরুর গলায় ঝোলানো পিঠে কাড়াকাড়ি করে খায়। এই পিঠে খাওয়ার পর্ব শেষ হতে দুপুরে গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যায়। তারপর যে যার নিজের গরু নিয়ে বাড়ী ফিরে যায়। রাত্রিকালীন অনুষ্ঠান নাচ গানের, চলে সারারাত। সেদিনের আনুষ্ঠানিক গানে ভাই দাদাকে বলছে—'দাদা। আজ কাড়ার (গরুর) উৎসব। পথে পোঁতা খুঁটিতে কাড়া বেঁধে তুমি সকল লোকের মনে আনন্দ দাও।'

জালি অর্থাৎ বাঁধনার চতুর্থ দিনে সকালে জগমাঝহি আগের দিনের গরুর খুঁটিগুলো তুলে সকলকে ফিরিয়ে দেয়, পরে খাওয়াদাওয়ার পর আরম্ভ হয় নাচ-গানের উৎসব, জালির দিনে সারাদিন ধরে চলে নাচ আর গান, অন্য বিশেষ আর কোনো অনুষ্ঠান সেদিন হয় না।

বাঁধনার শেষ দিন দাজা—এদিন ছোটো ছোটো ছেলেরা নানারকম কসরত দেখায়। অনেকটা আমাদের দুর্গাপুজোর বীরাষ্টমীর মতোই, এদিনই আবার আমাদের বিজয়াদশমীর মতো সাঁওতালেরা একে অন্যের বাড়ীতে গিয়ে পানভোজন করে প্রীতি বিনিময় করে।

বাঁধনা উৎসবের সমাপ্তিতে যে গান গাওয়া হয় তাতে আমাদের বিজয়া গানের মতো উৎসব শেষের বিষাদের সুর মাখা। সে গানে ছোটো বোন তার দিদিকে বলছে—'দিদি! দিদি! তুমি তাড়াতাড়ি এসো। আমাদের হাতীর তুলা উৎসব আজ চলে যাচ্ছে। হাত নেই যে হাত ধরব, পা নেই যে পা বাঁধব। চল দিদি, ঠনটা সাগাড়ে (এমন এক গাড়ি, যা ভগবানের দান) করে হাতীর মতো উৎসবটিকে আবার ঘরে নিয়ে আসব।'

তখন দিদি তার বোন ও অন্য সব যুবক যুবতীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে—'আজই আনন্দের শেষ দিন, তাই আজকের দিনটা আনন্দে হেসে খেলে গান গেয়ে নেচে কাটাও। এবারের মতো উৎসব আর ফিরবে না।'

এই নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট তথ্য বীরভূমে সংগৃহীত। উদ্ধৃত সাঁওতালী গানগুলির জন্য বীরভূমের রাজ্যধরপুরের ধরম মাঝি, সাওড়া কুড়ির হাবাই মাঝির কাছে লেখক কৃতজ্ঞ। শ্রীরাম মুরমু সাহায্য করেছেন বাঁধনার বিশদ বিবরণ দ্বারা।
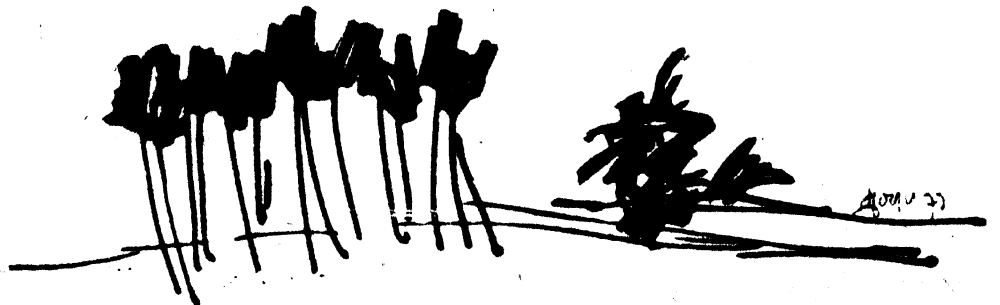
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এরপর মেঘুকে শোনাবার মতো আর কিছু তার থাকে না। দ্রুতপদে মেঘুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শর্মিষ্ঠা। পথ চলতে চলতে, সদ্য সঞ্চিত আশাভঙ্গের ব্যথার ভারে শিথিল হল তার গতি। ওরা যখন দল বেঁধে আসবে মেঘুর ঘর জ্বালিয়ে দিতে তার সামনে পড়ে শর্মিষ্ঠা প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু তাতেও যদি মেঘুর প্রাণরক্ষা না হয়! এমন কত কথা ভাবতে ভাবতে সে চলল। মেঘুর চোখের সামনে—মেঘুর দৃষ্টি ছিন্ন করে, কুয়াশার মাঝে মিলিয়ে গেল তার ব্যথা-ব্যঞ্জক দেহটা।

মেঘুর আহত দৃষ্টি উদাস হল। দৃষ্টি হল অন্তর্মুখ। অনাবিষ্ট মন আবিষ্ট হল, অনাবিল হল। সূর্যের আলোক-সম্পাতে বাইরের কুয়াশা যেভাবে অপসারিত হতে থাকল তার অপেক্ষা দ্রুততালে অপসারিত হয়ে চলল মেঘুর মনের মালিন্য। তার স্মৃতির যত কিছু মলিন আবরণ সব ধুইয়ে মুছিয়ে গেল শর্মিষ্ঠা তার ব্যথা-বিহ্বল দুটি চোখ দিয়ে। সে যেন জেগে উঠল নতুনভাবে শর্মিষ্ঠার অন্তরের আলোর স্পর্শে। বারবার মনকে জিজ্ঞাসা করল—কি কথা বলে গেল শর্মিষ্ঠা?

(তেতাল্লিশ)

মেঘুর চিন্তাধারা বেয়ে বেয়ে তার হাতের কাছে এসে যায় কত কাজ, কাজের অনুশীলনে আসে অভ্যাস, অভ্যাস গড়ে তোলে তার চরিত্র—চরিত্রে এল ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের বুক্ষে লতিয়ে ওঠে নেতৃত্ব। আধুনিক কোন মতবাদ হাত ধরে নি সে নেতৃত্বের। যদিও চারপাশের সব কিছু সে দেখেছে চোখ চেয়ে। তার মনকে দোলা দিয়েছে সে-সব। কোনটা ধ্বংসমুখ কোনটা গঠনমুখ একটা অশান্তির অপরটা শান্তির। শান্তির পথ গঠনের পথ সে বেছে নিতে পেরেছে। গঠনের কাজে যে কিছু ভাঙতে হয় তাও সে বুঝেছে। তারই ওপর তার মতের ভিত্তি। ভাঙ্গার বস্তু সে খুঁজে পেয়েছিল তার চারপাশে বিভিন্ন কৌমের জীবন-যাপন পদ্ধতির মধ্যে। কৌলিন্য গর্বিত জনসমাজ যে সব শ্রেণীর প্রতি উদাসীন। চিরন্তন অবজ্ঞা ও ঘৃণায় নিষ্পিষ্ট তবুও বেঁচে আছে যারা। তারা না মরলে সমাজ মৃত্তিকা সার শূন্য হবে, তারা মরলেও হবে সকল আশার নিঃশেষ। এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে সমুত্থিত জগতের যত মতবাদ। সেই ঘৃণা ও অবজ্ঞার উপাদানে উদ্ভূত মেঘুর দরদী মন। তাই সে চেয়েছিল কুলি-কামিনদের দিগন্তকে বাড়িয়ে দিতে, সে চেয়েছিল ওদের জীবনে মধ্যবিত্ত জীবনের রীতি-নীতি আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে। সে বুঝেছিল এর জন্য চাই নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব। তাই নেতৃত্বের নেশায় তাকে পেয়ে বসে। কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে শুয়ে বসে ভেবেছে। কত কি ভাবনার কথা নাড়াচাড়া করতে করতে তলিয়ে গেছে তার মন—যা সে নিজের ভাবনা বলে চিনতেও পারে নি কখনো কখনো। যেন অনাদি অনন্ত কালের ভাবধারা। মানুষ আসে আর যায়, ভাবের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে। দু পাশের কত কি তুলে নেয়, ফেলেও যায়—ভাব চলে। এমন ভাবনার পথে চলতে চলতে সে যেন তার সাথীদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধির সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে গিয়েছিল অনেক ওপরে—আত্মিক বিকাশের তুঙ্গে। তবুও এতদিন নিজেকে মানিয়ে চলছিল, চালাতে পারছিল।

দুঃখ কষ্ট ওদের চোখে পড়ে না। তা যতই নির্মম হোক না কেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ওদের বুক চুপসে থাকতে পারে। ওদের বুক দুঃখের বিরুদ্ধে ফুলে উঠে ফেটে পড়তে জানে না। যত তুচ্ছ ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ফুঁসে ওঠে, কেউ নাচিয়ে তুললে নেচে ওঠে। তাই নিয়ে ওদের যত বীরত্ব বিকাশ। নেশা করে যত গন্ডগোল বাধায়—ঝগড়া, মারামারি, খুন-খারাপি। কিন্তু কোন নেশা না করে, মেঘু সেদিন কি করে বসল। কর্তৃত্বের উম্মাদনায় মেতে উঠে কি বলতে কি বলে বসল। হয়ে গেল এক কাণ্ড।

সেদিন তো ওদের কথার পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল নিবুদ্ধিতা আর দারিদ্র্য নিষ্পেষিত অসহায় বুকের নিঃশ্বাস। জঘন্য সমাজের গন্ডিতে ওদের বসবাস। তার ওপর চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে যত ঘৃণা আর উপেক্ষা। তলিয়ে যাচ্ছে সব তার ভারে অধোলোকে, জাহান্নমে, নরকে। স্বর্গের সন্ধান পাওয়া কঠিন, কিন্তু নরক তো চোখের সামনে। তারই পচাগলা গন্ধে সেদিন ভরে উঠেছিল ওদের বুকের ভিতরটা। সুযোগ একটা পেয়েছিল। তাকে অবলম্বন করে সেই গন্ধ বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল মাত্র। কিন্তু আসল কথাগুলো ছিল মগজের মধ্যে জোট পাকিয়ে। ওরা তো জানে না কথা বলতে, জানে শুধু ভিড় করে দাঁড়াতে—তারপর ওদের চালিয়ে দেও। যেমন চালক পায়, যেমনিভাবে চালায় সে, তেমনি চলে ওরা। ওরা কেন, সকল শ্রেণীর লোকই তেমন করে। তাই তো করেছিল ওরাও—সমস্ত ভার দিয়েছিল মেঘুর ওপর। মেঘু তো পারে নি ওদের ভার নিতে, ওদের সেই বিশ্বাসের, সেই নিঃশ্বাসের মর্যাদা দিতে, পারে নি তো ওদের বুকের সেই দুর্গন্ধের উগ্রতা দূর করতে, পারে নি ওদের মাথার জট খুলে দিয়ে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে।

ঠিকই বলেছে শর্মিষ্ঠা। কেন সে অমন করল, অমন কাটাকাটা কথা বলল! ওদের কাছে ফিরে যাবার মুখ তো সে নিজেই নষ্ট করেছে। এখন সে ওদের মধ্যে ফিরে যায় কি করে—ছেড়েই বা থাকে কি করে?

বাগানের কর্তৃপক্ষ ও কুলিদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে, তার মীমাংসা করতে গিয়ে মেঘু উভয় পক্ষেরই বিশ্বাস হারাল, অপ্রিয় হয়ে উঠল। পাকায় খাদ মিশিয়ে গিনি সোনা তৈরি হয়। তারই কদর বেশী সংসারে। মেকির বাজারে মেঘু অচল। তার দুঃখ বড়সাহেব যে কাজ তাকে দিয়ে গেছেন সে কাজের অযোগ্য হয়ে বসল সে। তার সমস্ত মনের সঙ্গে দিয়েও এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে একটা জিনিসের সৃষ্টি করতে পারল না যাতে সকল সমস্যার সমাধান হয় আবার যাতে মিলেমিশে

কাজ করতে পারে সবাই। নিয়তির নিয়ন্ত্রণে তার সকল আয়োজন ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ল। তাই বড় অশান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল মেঘু। একটা অসহ্য যন্ত্রণা তার মাথাটাকে ধরে বেঁধে রেখেছিল। আজ শর্মিষ্ঠার সঙ্গে কথা বলার পর সে হালকা হল, শান্ত সবল হল।

শর্মিষ্ঠা চলে গেল। কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে গেল মেঘুর মন ঐ কুলি বস্তির মাঝে। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে তার উদাস দুটি চোখ ফেলে রাখল বাইরে। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে চেনা ঘরের চালাগুলো একটি একটি করে ধরা দিল তার চোখে। লাইনের এপাশ-ওপাশ থেকে মুরগীর ডাক ভেসে আসতে থাকল তার কানে। সেই সঙ্গে এল দু-চারটে কণ্ঠের কল-কাকলিও, যা তার একান্ত চেনা জানা। মেঘুর ইচ্ছা হল ছুটে যায় সেখানে। মিশিয়ে দেয় নিজের গলার স্বর সেই কল-কাকলির সঙ্গে, ঐ হাঁস মুরগীর ডাকের সঙ্গে। যেমনটি সে একদিন করেছে। যা সে অনেকদিন করে না, করে উঠতে পারে না। সেখানকার দৈনন্দিন জীবনধারার অনেক কিছু থেকে সরাসরি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে দ্রুততালে— বাগানের চাকরি নেবার পর থেকে, চাকরির দায়িত্ব বেড়ে উঠার পর থেকে। আরও আগে থেকে, শর্মিষ্ঠাদের ঘরে যাওয়া-আসায় ভাটা পড়ার পর থেকে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হবার পর থেকে শুরু হয়েছে তার মনের যত দুঃখ-দ্বন্দ্ব।

তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মেঘু। ঘুরে বেড়ায় কুলি-লাইনে, বস্তির পথে পথে। দু' পাশ থেকে নাকে আসে বাসি হাঁড়িয়ার গন্ধ। কানে আসে ভাঙখোরের কাশি। চেনা কুকুর পালিয়ে যায় মাংস শূন্য হাড়ের টুকরো মুখে তুলে। দূর থেকে মেঘুকে দেখতে পেয়ে মানুষগুলোও সটে করে গা-ঢাকা দেয়। হাঁস-মুরগীরাও হরতাল করেছে। কচিৎ কখনো হয়ে যায় কারো মুখোমুখি। একদিন যাকে দেখে কত খুশী হয়েছে সবাই, এগিয়ে এসেছে, কত কথা বলেছে হাসতে হাসতে, আর একদিন তাকে দেখে নির্বাক, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পালিয়ে যাবার সুযোগ না পেয়ে।

গত রাত্রে কত সলা-পরামর্শ করেছে সবাই মিলে। মেঘুর দেখা পেলে এই বলবে, ওই করবে। শেষ পর্যন্ত রাত্রির আড়ালে তার ঘরখানা কি করবে সে কথাও ঠিক হয়ে আছে। তাতেও না হলে তারপর কি হবে তাও নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু এমন নির্জনে হাতের কাছে মেঘুকে পেয়েও তারা কিছু বলতে, কিছু করতে পারল না। কেউ ভূত দেখে থমকে দাঁড়ায় কারো ঠোঁটের কোলে ফুটে ওঠে একটু শুখনো হাসি,—মেঘুর প্রাণভরা মন-মাতানো হাসির বিনিময়ে। মেয়েরা তাকিয়ে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে। হাসতে চায় মেঘুর মতো, পারে না। মুখ দিয়ে পারে না, চোখ দিয়ে তারা বলে দিতে চায়—কোথায় যাচ্ছিস বাছা? ঘরে ফিরে যা।

হঠাৎ ভগুয়া সর্দার পড়ে যায় মেঘুর সামনে। মেঘু হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল, কিন্তু সর্দার তা ফিরিয়ে দিতে পারল না। তাকে চকিত করে মেঘু চাপিয়ে দিল নিজের হাতটা তার কাঁধে। হাতখানা যতখানি হালকা ততখানি ভারী হয়ে বলিষ্ঠ সর্দারকে বিশেষ কাবু করে দিল। অমন বাঁধা পড়ে তাকে তাল রাখতে হয় মেঘুর পায়ের সঙ্গে।

মেঘু বুঝল তার মনের ভাবটা। ভগুয়া তার খুব অনুগত, সেও হাতের বাইরে গেছে। খুব জোর গলা না থাকলে দলের বিরুদ্ধে যাওয়াটা এদের কারো পক্ষে বড় কঠিন। তবে হাতে পেলে এর পেটের কথা নেওয়াটা তেমন কঠিন নয়। তাই চলতে চলতে মেঘু বলে—তোরা তবে তাই করবি? সব ঠিক, না?

সব জেনেছে মেঘু! তবে নিশ্চয়ই তার কথাও শুনেছে। ভগুয়া সর্দার নিজেকে সাফাই রাখতে বললে—নাই আমি মত দিয়া নাই।

—তুই মত দিস নি? কি বলেছিস তবে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ভগুয়া বলে—ওদিকে গিয়ে কি হবে? এদিকে চল।

ভগুয়া সাবধান করে দিতে চায়, ঘুরিয়ে দিতে চায় মেঘুর পথটা। কিন্তু মেঘু তা বুঝেও বুঝল না, নয়তো উপেক্ষা করল। সে তখন মোড়টা পার হয়ে বাঁ-পাশেই ফিরল। দেখল সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে রাস্তার ওপর, ঘরের আশেপাশে। কি যেন একটা জটলা চলছে। ভগুয়ার কাছ থেকে ওদের খবরাখবর নেবার আগেই, খবর নিয়ে নিজে তৈরি হবার আগেই মেঘু পড়ে গেল আর এক সমস্যায়। ওদের মুখে চোখে উত্তেজনা সুস্পষ্ট।

সবাই দেখল, আসামী হাজির! কিন্তু আসামী কে? সর্দার, না মেঘু? কে কাকে বন্দী করেছে! যারা ভূত হয়ে ভয় দেখাতে চেয়েছে মেঘুকে, তারাই ভূত দেখল। কেউ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল, কেউ বা গা-ঢাকা দিতে চাইল।

মেঘু হাঁক দিল—কি রে! আমি এলাম তোদের সঙ্গে দেখা করতে, তোদের খবর নিতে, আর তোরা মুখ ফিরিয়ে চললি। কেমন আছিস রে তোরা?

বিদ্বেষ যত উৎকটই হোক অনেক ক্ষেত্রে তা চাপা পড়ে চক্ষু লজ্জায়। মেঘু যেন সভাই তাদের লজ্জায় ফেলে দিল। মনে তাদের যে ভাবই থাক, মুখ ফেরাতে হল।

—ভালই, তুই কেমন? কেউ বলে হাসতে হাসতে। কেউ বা আত্মীয়তা ছেড়ে গম্ভীর হয়ে বলে—তুমি কেমন?

ওদের মতলবের কিছুই যেন জানে না এমনভাবে মেঘু শুরু করে তার কথা। একটু আভাস দিয়ে বলল—তোরা যেমন রাখতে চেয়েছিস।

—আমরা রাখবার কে? কি ক্ষমতা আছে। তোরা সাহেব, আমরা কুলি।

—ওসব কথা বলবি সাহেবদের। আমার মনে তেমন ভাব থাকলে লাইন ছেড়ে থাকতে যেতাম বাংলোয়। বল, ঠিক কি না?

মেঘুর এ কথায় ওদের সব কিছুর ওলট-পালট হয়ে গেল। ওদের খেপানো, আর ঠান্ডা করা দুটোই যেন একই রকম সহজ। সবাই এক বাক্যে সায় দিয়ে বললে—হাঁ হাঁ, তা ঠিক।

ওদের ধস্‌কা মনের ওপর আর একটু ধস্ চাপিয়ে দিতে মেঘু বললে—এই তো সেদিন পর্যন্ত তোদের সঙ্গে নিজের হাতে কাজ করেছি, যখন যেমন দরকার হয়েছে। আজও পারি ছুরি-কোদাল হাতে তোদের সঙ্গে যেতে কোন লজ্জা হবে না তাতে। দেখবি, নিরিখও বজায় রাখব তোদের সঙ্গে। তা কেন! তোদের চাইতে বেশী কাজও করব।

শ্রমজীবীর যত দর্প বাহুতে। এটাও হার মানতে হলে কিছুই থাকে না। নুয়ে পড়ল সকলের দম্ভ। সকলকে মানতে হল—হাঁ সে ক্ষমতা তোর আছে, একথা আমরা সবাই মানি।

একান্ত আত্মীয়ের মতো মেঘু তার জবাব দিল—তবে আর সাহেব বলে আমায় দূরে সরিয়ে রাখতে চাস কেন?

মেঘুর অমন মরমের কথায় সবাই ডুবে গেল সরমে। তবুও কিছু একটা বলে একটু ভেসে উঠতে চাইল—তা করি নি। তবে কাজে তো সাহেব, সেই কথাই বলেছি।

এমন দু-দশ কথার আদান-প্রদানে উভয় পক্ষের মিতালি, অন্ততঃ সহজ ভাব ফিরে এল। মেঘুর প্রথম প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হল। রাতের অন্ধকারে ওদের সকল আয়োজন প্রাতে সূর্যালোকের স্পর্শে ব্যর্থ হতে চলল। প্রভাতের শান্ত স্নিগ্ধ মাধায় লোকগুলোর মনে শান্তির আবাদ করে এগিয়ে চলল মেঘু।

—আয় বাবা, আয় একবার আমার দাওয়াতে।

মেঘু ফিরে দাঁড়াল। এক বস্তি থেকে সে এসেছে আর এক বস্তিতে, এসে পড়েছে রাঘবের ঘরের সামনে। রাঘব তাকে ডাকছে! পথ থেকে মেঘু উঠে গেল তার উঠানে। রাঘবের অভ্যর্থনার বহরে আকৃষ্ট হয়ে মায়ে-ঝিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দুজন দাঁড়িয়ে রইল স্থির, নিশ্চল বিস্ময়াবিষ্টের মতো। সেই মেঘু আজ শুক্রীর সামনে! খুশী বা অখুশী যে ভাবই থাক তার মনে, কিন্তু চোখ তার বিস্ময়-বিহ্বল। শর্মিষ্ঠাও হতবাক! একটু আগে যার কাছ থেকে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে এসেছে শর্মিষ্ঠা, সেই মেঘু! শর্মিষ্ঠার ঘরে! অন্য দিন কি হত বলা যায় না, কিন্তু তখন তার দুটি বিমর্ষ চোখ আহ্লাদে নেচে উঠল, বিষন্ন মন ভরে উপচে উঠল আনন্দের বন্যায়। নিশ্চয় মেঘু তার কথা রাখবে, সে কথাই জানাতে এসেছে।

রাঘবের হাতে তখন এক বাটি চা। সে শুক্রীকে বললে—কি রে! দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এক বাটি চা এনে দে, কিছু খাবার-দাবারও। —একটু খেয়ে যা বাবা, অনেক দিন আমার ঘরে কিছু খাস নি তুই। —ওরে শর্মি, একটা মোড়া দে। সব হাঁ-করে দাঁড়িয়ে আছে!

মেঘুর হাসি মুখখানা সকলের মুখের ওপর দিয়ে এক পাক ঘুরে এল অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে। তার বিনিময়ে কিছু পাওয়াও গেল।

শুক্রীর ইচ্ছা নেই বাবার—সে চায় সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে মেঘুকে একটু দেখতে, শুনতে চায় তার মুখের দুটো কথা। শর্মিষ্ঠাকে জলপান আনতে বলে নিজে মোড়া আনতে ঘরে ঢুকল। এক নিমেষে মোড়াটা এনে দিয়ে মেঘুকে বসতে বলল।

আর কোনদিন রাঘবের অভ্যর্থনা মেঘু কিভাবে গ্রহণ করত বলা যায় না, কিন্তু সেদিন তার ঘরের বাইরে কুয়াশা কেটে যাবার সঙ্গে মনের কুয়াশাও কেটে গেছে। শুক্রীর পানে তাকিয়ে মেঘু আবার হাসল। তার দেওয়া মোড়াটার ওপর বসতে বসতে সে বলল—জেঠী এত রোগা হয়ে গেল কেন জেঠা?

জেঠা কি না কি জবাব দেয়, যার সঙ্গে শুক্রীর মনের কোন কথার মিল না থাকতে পারে। তাই সে নিজেই মেঘুর কথার জবাব দিল—শরীর আর কি করে থাকবে বাবা! দেখলি না মেয়েটা কি মূর্তি নিয়ে ফিরে এসেছে! দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মেয়ে, তাকে তোর জেঠা কোথায় রেখে দিয়েছে। মেয়েটার কথা ভেবে ভেবে—

রাঘব তার প্রতিবাদ করে বললে—আমি রেখেছি! না তুই—।

মেঘুর সামনে বুড়োটা সব ফাঁস করে বুঝি। তাকে থামাতে শুক্রী এক ঝাঁজি দিয়ে বললে—আমি কি মেয়েকে বিবি—

—তুই-ই তো, আমার সঙ্গে ঝগড়া—

হাসতে হাসতে মেঘু হাত তুলে দুজনের কথার মাঝে পড়ে বললে—আচ্ছা-আচ্ছা, আর পুরানো কথা তুলে নতুন করে ঝগড়া করতে হবে না জেঠা। জানি তো সব।

—জানিস তো? কথাটা শুক্রী কেড়ে নিল মেঘুর মুখ থেকে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না তাতে। বেশ বিচলিত হল সে—তা হলে বুড়োটা নিশ্চয়ই সব বলে দিয়েছে সেদিন ডিব্রুগড়ে পৌঁছে। তা নইলে মেঘু আর কার কাছে শুনবে? শুক্রী নিজেকে সাফাই রাখার জন্য বললে—দেখ বাবা, হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমার। যত বয়েস হচ্ছে তত বেড়ে চলেছে। আমার নিন্দে না করলে ওর ভাত হজম হয় না। দেখ না তুই ভেবে, তোর কাছে আমার নামে কত কথা—

—আমি বলেছি?

—আলবাৎ বলেছিস। এই তো সোনার চাঁদ মেঘু! সে কি মিছে বলছে? তোর মুখের ওপরই তো বলছে। তুই না বললে—

ঘরের দাওয়া থেকে শর্মিষ্ঠা এক ঝাঁজি মেরে উঠল—আঃ, চুপ কর না মা। বাবার কি কোন আক্কেল নেই।

—দেখ না মা তোর বাবার কান্ড। বলে, শুক্রী চুপ করে গেল।

চা তৈরী করতে করতে শর্মিষ্ঠা শুনছিল সব কথা। খুব খুশী হচ্ছিল বাপ-মায়ের ঝগড়া শুনে। এতদিন পর মেঘু আসা মাত্র তার মা যে এমনভাবে তারই কথা নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিতে পারে তা সে ভাবতে পারে নি। আগের দিনের এমন কত ঝগড়ার কথা তার মনের মধ্যে মুহূর্তে ভেসে উঠল। কিন্তু এটা তার সময় নয়।

শর্মিষ্ঠার ধমক খেয়ে দুজনেরই আক্কেল ফিরে এল, কথাটাও ঘুরে গেল। রাঘব গম্ভীর হয়ে বললে—এখানকার লাইনের লোকগুলো মুখে যতই ফটফট করুক না কেন তোর সামনে পড়লেই সব ঠান্ডা। কিন্তু এত ডিভ্ শন (ডিভিশন)—কাকে কোথায় সামাল দিবি? তবে যে-ই আসুক আমাদের সঙ্গে একটা লাগবে আগে। আমাদের না হটিয়ে তোর কিছু করতে পারবে না, হাঁ।

মেঘুর মাথায় তখন কি যেন একটা মতলব ঘুরছিল। তবুও রাঘবের কথাটা সে শুনল—মন দিয়ে কান দিয়ে, না হলেও চোখ দিয়ে শুনল—তারপর একটু হাসল মাত্র। সে হাসির যেমন অর্থ ধরে নিল তেমনই ভাবে রাঘব তার কথার জাল বিস্তার করে চলল।

(চুয়াল্লিশ)

মেঘুরে অস্থির চিত্তে স্থিরতা ও অশান্ত মনে শান্তি এনে দিল রাঘবের ঘরে সেই সকালের বৈঠক। পুরানো দিনের কত কথা উঠল—কত হাসির, কত সুখ-দুঃখের, কত স্নেহ-মমতায় জড়ানো সে-সব কথা। কেউ তা শুনতে শুনতে গম্ভীর হল—কেউ বা বলতে বলতে মুখর হল, চপল হল, হালকা হল। বর্তমান চলে গেল অতীতে, অতীত ফিরে এল বর্তমানে। এতদিন রাঘবদের সঙ্গ ছাড়া হয়ে থাকার কথাটা মেঘু ভুলে গেল। আদরে মাখামাখি হয়ে সে আনন্দে সাঁতার দিতে থাকল।

চা খাওয়া শেষ করে মেঘু বিদায় নিল রাঘবের ঘর থেকে। অনাড়ম্বর আদরে বুক বোঝাই করে সে ঘুরে বেড়াতে থাকল এক ঘর থেকে আর এক ঘরে, এক লাইন থেকে আর এক লাইনে। শৈশবের যে স্মৃতি সৌরভে মনপ্রাণ ভরিয়ে নিয়ে সে রাঘবের ঘর থেকে বেরিয়েছে তারই কিছু কিছু বিলিয়ে চলল বস্তির ঘরে ঘরে। এখানকার প্রতি ঘরে তার ছেলেবেলার কত কথা জড়ানো ছড়ানো। তারই অংশ যেমন ঘরে ঘরে খালাস করল তেমন বোঝাইও করল ঘর ঘর থেকে। তাই বোঝা আর কমতে চায় না, বেড়েই চলেছে।

কত কথা বলে, কত কাজ করে চলল। একপাশ সেরে ফিরল আর এক পাশে যাবার জন্য। এবার সে গুমটি থেকে গাড়ী নেবে—যাবে দূরে, আরো দূরে। ডিভিশনের পর ডিভিশনে। চলেছে একমনে, নয়তো আনমনে, স্টাফ লাইনের ভিতর দিয়ে। সেখানকার সকলের চালচলন স্বাভাবিক। তাদেরও দুঃখ আছে, কিন্তু দাবী নেই, উত্তেজনা আছে বিস্ফোরণ নেই। সে সব থাকতে পারে না। কাজের দিক দিয়ে যত অপরিহার্য হোক না কেন, তারা সংখ্যালঘু। তাই মানিয়ে চলতে হয় তাদের। তারা বাগানের মোটামুটি খবর রাখে, খুবই খবর রাখে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির অত খবর রাখে না। তার প্রয়োজনও হয় না। বরং খবর রাখতে গেলে হয়তো মুশকিলে পড়ে যেতে পারে।

অগত্যা তারা কাজ করে, সংসারধর্ম করে। তাদেরই এক ঘরের কথা শোনা গেল।

তাতে হঠাৎ মেঘুর কান কেন বাণবিদ্ধ হল।

—শর্মিষ্ঠা! তুমি মোর হবানে (তুমি আমার হবে কি না)? —তারপর আরো কত কথা হল, সে সব মেঘুর কানে গেল না।

কথাটা ভেসে এল নিধিরামের বাসার একটা ঘর থেকে—রথীরামের কণ্ঠস্বর! মেঘু সচকিতে ফিরে চাইল। আর একটা ঘরে জানালার পাশে প্রমীলা। সে হাসছে! তার অমন হাসি তো মেঘুর চোখে কখনো পড়ে নি। তবে সে হাসছে, না বিদ্রূপ করছে? তবে সে-ও নিশ্চয়ই শুনেছে, রথীরামের সে কথা!

একটু আগে মেঘুর অন্তরে আমূল মথিত হয়ে যে আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল তার অবসান হল। একজনের কথা আর একজনের হাসি—এই দুয়ের সংমিশ্রণে তার মনে যে প্রতিক্রিয়া হল তাতে সে প্রমীলার সৌজন্যতায় সাড়া দিতে পারল না। দ্রুতপদে সে চলে গেল প্রমীলার দৃষ্টির বাইরে, সেই অসহ্য দৃষ্টির অন্তরালে। চোখ দিয়ে মেঘুকে টেনে রাখতে পারল না প্রমীলা—পারল না তাকে দেখাতে, শোনাতে তার দাদার কীর্তি।

গ্যারাজ থেকে গাড়ী নিয়ে মেঘু বেরিয়ে পড়ল। এই ঝামেলার মধ্যে, একটু আগে পুরানো চাপা দুঃখের মীমাংসায় সে কম শান্তি পায় নি। সেটা অবলম্বন করে যে আনন্দ যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছিল, তেমনই অপ্রত্যাশিতভাবে তা বিদায় নিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে সামান্য একটু যুক্তি লাগল শর্মিষ্ঠার কথা তার মন থেকে সরিয়ে দিতে। শর্মিষ্ঠা নিজেই তো তাকে সরিয়ে দিয়েছে, এমন একটা পরিণামের জন্য তার মন তো অনেক দিন আগে থেকেই তৈরি হয়ে বসে আছে। এতে আর ভাববার মতো, এমন বিচলিত হবার মতো কি থাকতে পারে!

কাজ সামনে থাকলে এমন অনেক যুক্তি হাজির হয়ে যায় মেঘুর মনে। সব কিছু চিন্তার ধারা মন থেকে ঝেড়ে মুছে বিদায় দিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে থাকল কুলি বস্তিতে। কুলিদের সমস্যাটাই তখন বড় তার কাছে। অমন জটিল সমস্যার চাপে পড়ে শর্মিষ্ঠার কথাটা চাপা পড়ে গেল।

বাগানের বিষয়টা জটিলতম হয়ে উঠেছে অভিজ্ঞ হাতের চেষ্টায়, অর্থ সামর্থ্যে। তাদের সুচিন্তিত সুনিপুণ চেষ্টা ব্যর্থ করতে চলেছে অদক্ষ অনিপুণ মেঘু। যেখানেই যায় তাদের চতুর চক্রান্তের পরিচয় পায়। সবাই শুনেছে মেঘুর নামে কত কথা, খুনের কথাও। বড় সাহেবের নামেও কত কথা প্রচার হয়েছে। চালানী কুলিদের কায়দা করে আটকে রাখার চক্রান্ত, দু হাজিরা খাটিয়ে এক হাজিরা মজুরী দেবার ফন্দি। এমন কত কি, যার আভাস সে সাহেবের কাছেও পেয়েছে। সে চায় প্রচার কেন্দ্রের সন্ধান। তবেই না সকল প্রান্ত শিথিল করা যাবে। কিন্তু তা আর পায় না, কিন্তু সেও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়।

মেঘু ইস্কুল-কলেজে পড়ে নি। এমন লোক সাধারণতঃ শিক্ষিতের পর্যায় আসে না। কিন্তু শিক্ষা শুধু পাঠশালাতেই যে হয় না, তাও জানা কথা। রাবণের সম্বন্ধে যে দুটি মহাকাব্য সে আশৈশব শুনে এসেছে তার প্রতিটি অংশ তার কণ্ঠস্থ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তার মধ্যে কত ঘটনা, কত চরিত্র সৃষ্টি প্রতিদ্বন্দ্বী, মত প্রতিবাদ, দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব, ঘাত প্রতিঘাত, কত শাস্ত্র, জ্ঞান বিজ্ঞানের কত বিচিত্র ব্যাখ্যা ও বিন্যাস সে পেয়েছে। সে সবের অতি সামান্যই সে বুঝেছে। বরং না বোঝার কথাই বেশীর ভাগ। সেইগুলোই তার মগজটাকে পেষাই করেছে, অথবা তার মস্তিষ্কের পেশীগুলো সেই তত্ত্বগুলোকে পেষাই করেছে। যার ফলে মায়ের কাছে, বাবার কাছে কত প্রশ্নের জাল বিস্তার করেছে। কিন্তু আসল বোঝাবুঝি হয়েছে তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। যখন যেমন প্রশ্ন মনে জেগেছে তেমনই হয়েছে বোধ ও অনুভূতি। তার শিক্ষার পত্তন হয়েছে শৈশবে। ঐ দুটি মহাকাব্যই তার সকল পিপাসা, সকল বোধের, সকল কর্মের মূলে। তাই তার স্বভাবে শিশুর সরলতা যৌবনের বল, প্রৌঢ়ের পরিপক্ক ব্যক্তিত্ব এবং দৃষ্টিতে বিচক্ষণের ভঙ্গি। তাই সে যখন যেমন দেখতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে এবং করতে চেষ্টা করেছে তেমন পেরেছে। ভুল যে করে নি তা নয়, কি তা শুধরে নিতেও তৎপর হয়েছে। যেমন এখন করে চলেছে।

এবার যেতে হবে আর এক দিকে, আরও দূরে। আবার মেঘু গাড়ীতে উঠে বসল। চলতে চলতে ভাবতে থাকল—এই শঠগুলোকে কি করে ধরা যায়, বড় সাহেবের সামনে হাজির করা যায়? আয়নার ভিতরকার ঐ ছবি কটাকে কি করে হাতে-নাতে ধরা যায়?

আয়নার কথা মনে আসতেই মেঘুর চোখের সামনে ভেসে উঠল শর্মিষ্ঠার প্রতিবিম্ব। আজই সকালে দেখা তার

নিজের ঘরে। মেঘু জানতেও পারল না তার মন কেমন করে আবার শর্মিষ্ঠার ভাবনায় তলিয়ে গেল। —কেন শর্মিষ্ঠা আজ তার ঘরে গেল? সে যা ভেবেছে তাই যদি সত্য, তবে কেন অত ব্যাকুল অনুরোধ-উপরোধ করল তাকে নিরাপদ করবার জন্য? —ও কিছু নয়। সহজ সৌজন্য। —সৌজন্য? অত ভোরে, লোক চক্ষুর আড়ালে, লজ্জা-সরমের আশঙ্কা ত্যাগ করে তার কাছে গেল শুধু ঐটুকুর জন্য! —এতদিনের চেনা-জানা, মায়া-মমতা—যা ঘরের পালিত পশু-পাখীর ওপরেও পড়ে থাকে। —শুধু তাই? —তবে তাই হবে। এতে আর এত চিন্তার কি আছে!

মেঘুর গাড়ীখানা এসে গেল রাঘবের ঘরের সামনে, থেমেও গেল। গাড়ীখানা থামল না মেঘু সেটাকে থামাল! যাবার তো ইচ্ছা ছিল অন্য দিকে। এতটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে! একটু লজ্জিত হল মনে মনে। —এসেই যখন পড়েছে তখন একটা কাজ সেরে নিক। —কি কাজ সেরে নেবে, কেমন করে? উপায় খুঁজে পায় না। নেমে উঠে গেল রাঘবের উঠানে। কাউকে দেখতে পেল না। বোধহয় দুপুরের খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। ফিরবে কি ফিরবে না ভাবতে ভাবতে হাঁক দিল—জেঠা, জেঠা,—জেঠী!

শর্মিষ্ঠা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল উঠানে—ডাকল তার মা-বাবাকে। কি যেন একটা নতুন ভাব দেখল মেঘুর চোখে-মুখে। বিহ্বল হয়ে সে তাকিয়ে রইল তার পানে।

শর্মিষ্ঠাকে সামনে পেয়ে মেঘু জিজ্ঞাসা করল—তুই কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?

—কেন? বতীদের ঘরে গিয়েছিলাম একটু।

মেঘুর কথা শুনে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে এল শুক্রী। সে অনুমান করল—হয়তো আর একবার মেঘু এসেছিল। কারো সাড়া না পেয়ে ফিরে গেছে। এই উত্তাল দুর্দিনে, নিশ্চয়ই বিশেষ কোন জরুরী কথা ছিল। তাদের ঘুমিয়ে পড়াটা উচিত হয় নি, অন্তত মেয়েটা ঘরে থাকলেও তো হত। তবে তো তাকে ফিরে যেতে হত না। কারো দোষগুণ বিচার করা শুক্রীর ধাতের বাইরে। সে বেছে নিতে জানে একটি—সুযোগ। তার ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করবার সুযোগ পেয়ে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল শর্মিষ্ঠার ওপর, বলল—একটু! সেই কখন গেছলি, ফিরলি তো একটু আগে। বলে গেলি—কৌতিদের ঘর থেকে একটু ঘুরে আসছি। এখন শুনছি বতীদের ঘর। বার বার বললাম, আজ আর কোথাও যাস নি। তা নয়, আমার কথা কে শোনে বাবা! আমাদের তো অমন সুখের শরীর নয়, খাটা-পেটা শরীর। খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবা, তুই বুঝি ফিরে গেছিস সাড়া না পেয়ে—

শুক্রীর কোন কথা মেঘুর কানে পৌঁছয় নি। তাই সে কোন জবাবও দিতে পারল না।

শর্মিষ্ঠা জানে, তার মা সুযোগের হেলাফেলা করে না। মেঘুকে সামনে রেখে যে কথা সে শর্মিষ্ঠাকে শোনালো তার কোনটাই সত্য নয়। তার মা যে বুঝে শুনে মিছে কথা বলছে তা নয়। নিজের ঠাট বজায় রাখার জন্য এমনই তার পন্থা—হাতের সামনে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে, যেমন ধরে তেমনই আওড়ে যায়। সে বুঝে দাঁড়ালেই তার মা মানতে বাধ্য হবে কোনটা সত্য। সে নিজেই শর্মিষ্ঠাকে বলেছে—যা একবার বতীদের ঘরে। ওদের ঘরের সামনেই মেঘুদের ঘর। ওখানে গেলে ছেলেটার, ওদের সব খবর পাবি। তাই সে গিয়েছিল সেখানে। যখন ফিরেছে তখন তার মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের ডেকে তুলবে কি তুলবে না ভাবছিল, এমন সময় মেঘু এসে পড়ল। তাই জানানো হয় নি যে, মেঘু তখনো ঘরে ফেরে নি, অফিসের দিকেও যায় নি। গাড়ী নিয়ে কোথায় গেছে কেউ জানে না। ছোট সাহেব চারদিকে লোক পাঠিয়েছেন তার খোঁজে। অথচ এখান থেকে মেঘু ফিরে গেছে। একটু আগে ফিরলে মেঘুর সঙ্গে দেখা হত, ছোট সাহেবের উৎকণ্ঠার খবরটাও দিতে পারত তাকে। বড় অন্যায় হয়ে গেছে এত দেরি করে ফেরাটা। সে চুপ করে রইল অপরাধিনীর ভাবে।

এতদিন তার পড়াশোনা নিয়ে যে টানা-পোড়েন চলেছে, তাতে মেঘুর ওপর, তার মায়ের ওপর শুক্রীর রাগ-বিরক্তির ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। তাই শর্মিষ্ঠার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিজির কাছে পড়তে যেতে পারে নি। কিন্তু মায়ের সেই উৎকট ভাব যে মেঘুর প্রতি স্নেহ-মমতার নামান্তর তা সেদিনই প্রথম জানতে পারল শর্মিষ্ঠা। সেটা এক সুখের মুহূর্ত তার পক্ষে। তাই সে মায়ের কোন কথার প্রতিবাদ করল না। যদিও প্রতিবাদ করবার মতো কথা তার ছিল। সে জানে, সে কথা শুরু করলে তা মা চুপ করে যাবে। তা সে করতে চায় না। মেঘুর কথা নিয়ে তার মা তাকে শাসন করছে, মায়ের বকুনি শুনতে বড় ভাল লাগছে শর্মিষ্ঠার। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এর যে কি রকম প্রতিক্রিয়া হল মেঘুর মনে তার কিছুই সে বুঝল না। তেমন কিছু তার মনের মধ্যে ঠাঁই পেল না।

শুক্রীর কথা কটা মেঘুর মনে আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করল। কৌতির ঘরের নাম করে বতীর ঘরে গেছে শর্মিষ্ঠা! অথচ মেঘুর মন জানে দু-জায়গার কোথাও সে যায় নি। নইলে অমন চুপ করে থাকে? যার স্বভাব মায়ের প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করা, তাকে শাসন করা,—যে মা চিরদিন মেয়ের কথা শুনে চুপ করে থেকেছে, সেই মুখরা মেয়ের মুখে আজ কোন জবাব নেই। দাঁড়িয়ে আছে দোষীর মতো।

একটু আগে মেঘু ভেবেছিল শর্মিষ্ঠার কথাটা তার মন থেকে নিংড়ে বার করে দিতে পেরেছে। তবুও ফল্গুর স্রোতে তার মনটা তাকে ঠেলে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে রাঘবের উঠানে—হয়তো যেমন এনেছিল তেমনই নামিয়ে নিয়ে যেত সেখান থেকে। কিন্তু শর্মিষ্ঠার হাবভাব তার নিজের ভাবটার ওলট-পালট করে দিল। নিশ্চয় সে কিছু একটা অন্যায় করেছে। মেঘুর মনে হল জিজ্ঞাসা করে—বতী লিখতে কোন্ কোন্ অক্ষর লাগে? তাতেও যদি না বোঝে শর্মিষ্ঠা, তবে তার ভুলটা সংশোধন করে দিয়ে যায়। লেখার ভুল, মনের ভুল সব শেষ করে দিয়ে যায় মেঘু। মনে যার এত খেলা সে সকালবেলা গেছে দরদ দেখাতে। তার কথা রাখা হয় নি বলে বেরিয়ে এল কত রাগ দেখিয়ে! এত কায়দা শিখে গেছে শর্মিষ্ঠা? সেই শর্মিষ্ঠা! হবে না কেন, যেমন চারপাশে দেখে। নাঃ, সে বলবে—ফাঁস করে দেবে সব।

এমন সময় মেঘুর গাড়ীটার পাশে একখানা জীপ গাড়ী সশব্দে দাঁড়াল। সকলের চোখ পড়ল সেইদিকে। বাগানের সশস্ত্র প্রহরীরা গাড়ী থেকে নেমে ছুটে এল মেঘুর সামনে। তারা মেঘুকে জানাল—ছোট সাহেব তাকে সেলাম দিয়েছেন। বহু লোক তার তালাস করে বেড়াচ্ছে চারদিকে। পুলিশ সাহেব ও ডেপুটি কমিশনার বাগানে এসেছেন।

—তাই না কি?

মেঘু বেশ অপ্রতিভ হল কথাটা শুনে। সত্যিই তো সকাল থেকে সে অফিসে কোন খবর পাঠায় নি। কাজটা বড় অন্যায় হয়ে গেছে। সে বললে—চলো, চলো, জলদি চলো।

(ক্রমশঃ)

কে বড়?

শিলাদিত্য

স্বর্গের নন্দন কানন। পারিজাত পুষ্প গন্ধে দিগন্তর আমোদিত। শান্ত পরিবেশ। বাগদেবী সরস্বতী এই স্থানে প্রাতঃকালে বীণা নিক্কণনে সুর সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সাধনায় ব্যাঘাত ঘটালেন কয়েকজন তরুণ দেবতা।

'গচ্ছস্ফল মতিভ্রম

গজানন, ষড়ানন, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবসমাজের কয়েকজন যুবনেতা মহাকলরবে দেবী সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবী! কালিদাস আর ভবভূতির মধ্যে কে বড় কবি?' দেবী সরস্বতী এই দেবতাদের ভাল করেই চিনতেন। প্রমাণ না পেলে এঁরা যে তাঁর মতামত গ্রাহ্য করবেন না তাও জানতেন। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন, উজ্জয়িনী-রাজের সভার অদূরে অবস্থিত চতুষ্পথের সন্নিকটে তাঁরা যেন পরদিন অলক্ষ্য অবস্থান করেন। সেই স্থানেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

উজ্জয়িনী-রাজের সভায় পন্ডিতের বড় সমাদর। সেই সভায় কালিদাস ও ভবভূতি দুইজনেই পরম সম্মানের পাত্র। শত শত পন্ডিতের মধ্যে তাঁরা দুজনে শিরোমণি বা মধ্যমণি। তাঁরা উপস্থিত না হলে রাজ-সভায় প্রাণের স্পন্দন মন্থর হয়ে যায়। সভায় যাবার রাজপথের এক সংযোগস্থলে, দেবী সরস্বতী মলিনবেশা মাতৃমূর্তিতে এক মৃত সন্তান ক্রোড়ে আবির্ভূতা হলেন, আর অবিরল অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। পন্ডিতেরা রাজসভায় যাবার পথে এই দৃশ্য দেখে সচকিত হলেন। কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন মৃত সন্তানকে রাজপথে প্রদর্শন করবার কি কারণ। দেবী উত্তর দিলেন যে, তিনি দৈববাণী শুনেছেন যদি কোন পন্ডিত 'চৌরেণাবাহৃতং সর্বং বিনা নাসাগ্রমৌক্তিকম (অর্থাৎ চোর নাকের নোলক ছাড়া সব কিছুই চুরি করেছে) এই শ্লোকার্ধের প্রথমার্ধ সঠিক পরিপূরণ করতে পারেন, তাহলে তাঁর অকালমৃত

নিদ্রাব্যস্ত গলদ্বেণীং লসং
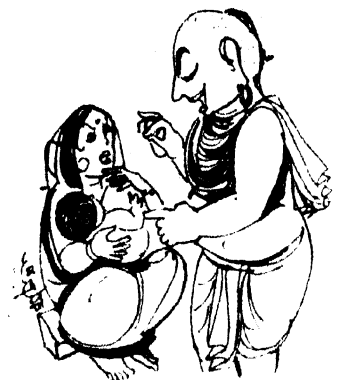
সন্তান পুনরায় জীবন লাভ করবে। পণ্ডিতেরা নির্বাক। অদ্ভুত শ্লোকার্ধ। তার অনেক প্রকার পরিপূরণ হতে পারে, কিন্তু কোনটি সঠিক! পণ্ডিতেরা একের পর এক নিরুত্তরে চলে যেতে লাগলেন। এমন সময় ভবভূতি উপস্থিত হলেন। তিনিও দেবীকে একই প্রশ্ন করলেন কৌতূহলভরে। দেবীর উত্তর শুনে ভবভূতি শ্লোকের প্রথমার্ধ পরিপূরণ করলেন এইভাবে :

নিদ্রাব্যস্ত গলদ্বেণীং লসৎ
ফণিমণিপ্রমাৎ
চৌরেনাবৃতং সর্বং বিনা
নাসাগ্রমৌক্তিকম্।।

অর্থাৎ এক রমণী নিদ্রাভিভূতা হওয়ায়, তাঁর মাথায় বেণী এলায়িত হয়ে নাসিকা-প্রান্তে পড়েছিল। নাসিকাধ্বনির 'ফোঁস ফোঁস' শব্দ শুনে কৃষ্ণবেণীকে কৃষ্ণসর্প বলে চোর মনে করেছিল, আর মুক্তাটিকে ভেবেছিল সর্প-শিরস্থিত মণি। দংশনোদ্যত কৃষ্ণসর্পের মণি অপহরণের সাহস না থাকায় চোর অন্য সব কিছু চুরি করলেও নাকের নোলকটি চুরি করে নি।

অন্তরালে অবস্থিত দেবগণ সাধুবাদ গুঞ্জন করে উঠলেন। দেবীক্রোড়স্থ মৃত সন্তান কিন্তু জীবন লাভ করল না। ভবভূতি ম্লান মুখে দেবীকে বললেন, 'মা, আমি যথাসাধ্য শ্লোক পরিপূরণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় তোমার সন্তানের প্রাণ লাভ হল না।' এই বলে ভবভূতি রাজসভায় প্রস্থান করলেন। একটু পরেই এলেন কবি কালিদাস। তিনিও মৃত সন্তান ক্রোড়ে রমণীকে রাজপথে রোরুদ্যমানা দেখে একই প্রশ্ন করলেন আর অনুরূপ উত্তর পেলেন। কবির প্রতিভা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। তিনি এইভাবে শ্লোকটির পরিপূরণ করলেন :

দেবী। কালিদাস আর ভবভূতির মধ্যে বড় কে?

'অধরাঞ্জন রাগাভ্যাং গুঞ্জাফলমতিপ্রমাৎ।
চৌরেনাবৃতং সর্বং বিনা
নাসাগ্রমৌক্তিকম।।

অর্থাৎ মেয়েটির চোখে কাজল আর ঠোঁটের রং লাল টুকটুকে থাকায় মুক্তাটির তলভাগে পড়েছে লাল আভা আর উপরিভাগে পড়েছে কাজলের কৃষ্ণ আভা। এই কারণে মুক্তাটিকে একটি কুঁচফলের মত দেখাচ্ছিল। নগণ্য কুঁচ ফল ভ্রমে চোর নাকের নোলকটি অপহরণ করে নি।

এই শ্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দেবীর ক্রোড়স্থ সন্তান পুনরুজ্জীবিত হল। দেবী কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে আশীর্বাদ করলেন। তরুণ দেবগণ কিন্তু বুঝতেই পারলেন না ভবভূতির শ্লোকের অপেক্ষা কালিদাস রচিত শ্লোক কোন গুণে উৎকৃষ্ট। তাঁরা দেবীকে উৎকর্ষ অপকর্ষ ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ জানালেন। দেবী উত্তর দিলেন, 'দুই কবিই সুষ্ঠু রচনা করেন, তবে ভবভূতির কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান কিছু কম। এই দেখ না, বেণীর যে অংশটি নাসাগ্রে পড়া সম্ভব, সেটি বেণীর প্রশস্ত বা স্থূল অংশ নয়, সেটি সূক্ষ্মাগ্র ভাগ অর্থাৎ বেণীর শেষাংশ। সর্পভ্রম হলে সূক্ষ্মাংশটি সর্পলাঙ্গুল বলে ভ্রম হওয়াই উচিত ছিল। অথচ সর্পলাঙ্গুলে ফণীমণির স্থান নাই, সর্পফণায় তার স্থান। ভবভূতি অবলীলাক্রমে সর্পলাঙ্গুলে সর্পমণির কল্পনা করলেন একবারও ভাবলেন না কত দূর অসম্ভব কল্পনা করছেন। এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব কালিদাসের শ্লোকে দেখা যায় না, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ কবি।'

দেবগণের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় হল। তাঁরা দেবীর চরণ বন্দনা করে প্রস্থান করলেন।
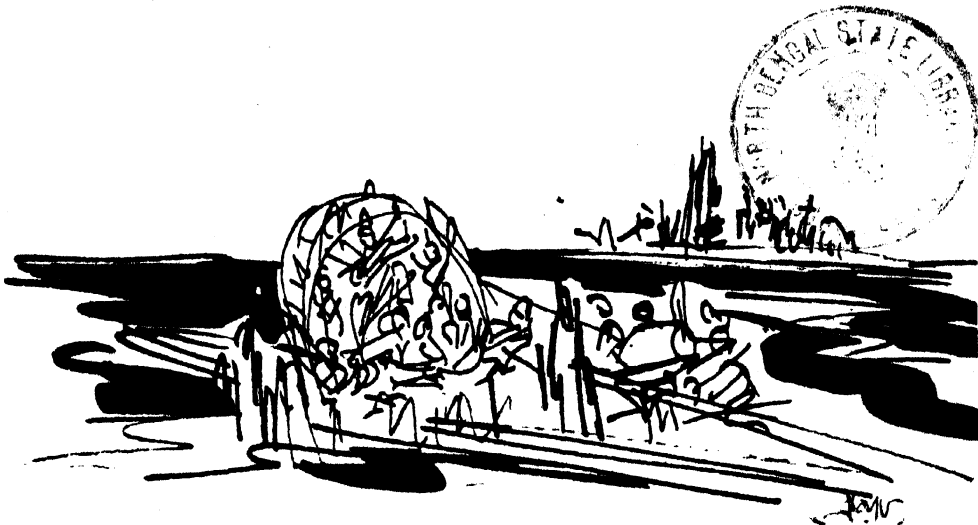
বিজ্ঞানের কথা

বজ্র গোলক

আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো সবাই দেখেছেন, বা আকাশের বিদ্যুৎ মাটিতে নেমে আসা—যাকে আমরা বলি বাজ পড়া—তাও। শেষোক্ত ঘটনাটি যাঁরা চোখে দেখার সুযোগ পাননি তাঁদের কাছেও অবিশ্বাস্য নয়। আকাশের বিদ্যুৎ মাটিতে নেমে আসার বা বাজ পড়ার প্রমাণ অজস্র।

কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে আকাশের বিদ্যুৎ নেমে আসার চেহারা এই একটিই নয়। আরো একটি প্রায় অবিশ্বাস্য চেহারাতেও কখনো কখনো তার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে। পুঁথিপত্রের পৃষ্ঠে ঘাটলে দেখা যায়, অতীতের মানুষেরও একই অভিজ্ঞতা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। চেহারাটি এমন যে জাগতিক কোনো ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। দেখে আতঙ্ক হয়। তবুও চেহারার বর্ণনা দিতে হলে একটা কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চাই। কেউ কেউ বলেন 'সসার' বা চাকি এবং যেহেতু ভাসমান ও ধাবমান অতএব উড়ন্ত। খবরের কাগজের পাঠকরা জানেন, এই উড়ন্ত চাকি নিয়ে বহু উদ্ভট গল্প ছড়ানো হয়েছে। তবে ব্যাপারটা খানিকটা উদ্ভটও বটে। ঝড়বৃষ্টি নেই, এমন কি আকাশে হয়তো মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই (থাকলে তো কথাই ছিল না) আচমকা চোখের সামনে আগুনের একটা গোলা ভেসে বেড়াচ্ছে বা নিতান্তই এলোমেলো ছোটাছুটি করছে, তারপরে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ তুলে ও আগুনের ঝলক তুলে ও কিছুটা গন্ধ ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—তার কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে?

কিন্তু অস্তিত্বটা অতি বাস্তব, অস্বীকার করার উপায় নেই। বলা যেতে পারে এও আরেক ধরনের বজ্র যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'থান্ডারবল', বাংলায় বলা যেতে পারে বজ্রগোলক। সব মিলিয়ে আগুনের একটা গোলা কখনো টেনিসবলের মতো, কখনো তরমুজের মতো, কখনো আরো আরো বড়ো, কোথা থেকে আসে বোঝা যায় না, কেমন করে মিলিয়ে যায় নির্ণয় করা যায় না। গত শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে চাইতেন না, কিন্তু বর্তমান শতকে শুধু যে বিশ্বাস করেন তাই নয় কৃত্রিম বজ্রগোলক তৈরি করার জন্যেও সচেষ্ট হয়েছেন (প্রধানত যুদ্ধের প্রয়োজনে, কৃত্রিম একটি বজ্রগোলকের ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রচণ্ড)।

বজ্রগোলকের পথ। গোলকটি মেঘ থেকে নেমেছিল, তারপরে ইতস্তত ঘুরে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে (ছবির ওপরের দিকে মাঝখানের অংশে)

এই বিষয় নিয়ে লেখা চমৎকার একটি বই আমাদের হাতে এসেছে। বইটির নাম 'দি টেমিং অফ দি থান্ডারবোলটস'। দি সায়েন্স অ্যান্ড সুপারস্টিশন অফ বল লাইটনিং। অর্থাৎ, বজ্রকে বশে আনা, গোলক বিদ্যুতের বিজ্ঞান ও কুসংস্কার। লেখক—সি ম্যাকসওয়েল কেড ও ডেলফিন ডেভিস। বইয়ের পাঠ্যাংশ দেড়শো পৃষ্ঠার মতো, কিন্তু রুদ্ধশ্বাসে পড়তে হয়—বিশেষ করে সেই অংশ যেখানে গত দু-হাজার বছরের লেখাপত্র থেকে বজ্রগোলক প্রত্যক্ষ করার বহু বিচিত্র ঘটনা উদ্ধার করা হয়েছে। এই বইয়ের কিছু তথ্য ও তত্ত্ব বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে চাই। আগ্রহী পাঠকরা গোটা বইটি পড়তে চেষ্টা করবেন (কিনতে না পাওয়া যায়, কলকাতার বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে আছে এ খবর জানিয়ে রাখতে পারি)।

বজ্রগোলক উপকথায় ও সাহিত্যে

মনে করুন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল বলে আপনি কোথাও অপেক্ষা করছিলেন, থামতে বাড়ি ফিরছেন। যানবাহন নেই, অগত্যা হেঁটে। বৃষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে, বিদ্যুতের ঝলক আছে বটে তবে অনেক দূরের আকাশে। আচমকা একটা বাজ পড়ল, সম্ভবত কাছেই। বিদ্যুৎকে কেন যে চপলা বলা হয় তার একটা কারণ হয়তো আপনি বুঝতে পারলেন। বিদ্যুৎ কখন যে কোথায় পড়বে তার কোনো স্থিরতা নেই। তারপরেই সেই কাণ্ডটি ঘটল। কোথা থেকে কে জানে, আগুনের একটা গোলা দেখতে পাওয়া গেল চোখের সামনে। প্রকাণ্ড সাইজের একটা তরমুজের মতো, কিংবা তার চেয়েও বড়ো। স্থির নয়, পাক খাচ্ছে আর ভেসে বেড়াচ্ছে। নিঃশব্দেও নয়, হিসহিস আওয়াজ উঠছে। সারা গায়ে আগুনের ফুলকি, এলোমেলো চলা। তারপরেই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ, চোখধাঁধানো আলোর ঝলক, তীব্র একটা গন্ধ—ব্যস, আগুনের গোলা অদৃশ্য।

এ-দৃশ্য আপনি দেখে থাকতেও পারেন, নাও পারেন। কিন্তু পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। যে দশ লক্ষ বছর ধরে মানুষ এই পৃথিবীতে বাস করছে ততোদিন তো বটেই, তারও আগে জীবজগত শুরু হওয়ার সময় থেকেই, তারও আগে জীবজগতের উপাদানগুলো তৈরি হবার সময় থেকেই। কোটি কোটি বছর ধরে।

আদিম মানুষ তার ধর্মীয় ধারণা গড়ে তুলেছিল কুসংস্কার ও যাদুবিশ্বাস থেকে। কাজেই এই বজ্রগোলক নিশ্চয়ই তার হাতে হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেবতার হাতের আগ্নেয় অস্ত্র। প্রাচীন পুঁথিপত্রে তার কিছু বর্ণনাও পাওয়া যায়। সাহিত্যেও আছে। তবে পুঁথিপত্র ও সাহিত্যের বর্ণনা থেকে অনেক সময়ে স্পষ্ট বোঝা যায় না কোন ঘটনার কথা বলা হচ্ছে—বজ্রপাত না বজ্রগোলক। তবে দুই ঘটনারই প্রত্যক্ষদর্শন পাওয়া যায়। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের ধর্মগ্রন্থে, পুরাণে ও সাহিত্যে উভয় ঘটনার নজির থেকে গিয়েছে।

বজ্রগোলকের তথ্য

বায়ুমণ্ডলের স্থির বিদ্যুতের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে জাহাজের মাস্তুলে বা চোখা পদার্থে এক ধরনের নীলচে আভা সৃষ্টি হয়ে থাকে (তার নানা নাম দেওয়া হয়েছে, সবচেয়ে প্রচলিত নাম সেন্ট এলমোর আগুন)। এ ব্যাপারটার সঙ্গে বজ্রগোলকের খুবই মিল। দুটিই আসলে বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ-

মোক্ষণ—প্রকারে বিভিন্ন। পৃথিবীর মাটি ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বৈদ্যুতিক একটা যোগ সব সময়েই বজায় থাকে, সবচেয়ে ভালো আবহাওয়াতেও। বিদ্যুতের মোক্ষণ জোরালো হলে তবেই নীলচে আভাটি চোখে পড়ে। তাই চোখে পড়তে পারে উচ্চ-ভোলটেজের বৈদ্যুতিক ল্যাবরেটরিতে, মাথার ওপরকার হাই-টেনশন পাওয়ার লাইনে, বিদ্যুৎধারক শিকের ডগায় (আকাশের মেঘ যদি উচ্চমাত্রায় তড়িতাবিষ্ট হয়), এমন কি এরোপ্লেনের প্রপেলারের ডগায়। উড়ন্ত বিমানে সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও কখনো কখনো সেন্ট এলমোর আগুন বজ্রগোলককে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনি একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ক্যাপটেন ডি ম্যাসন ১৯৬৪ আগস্ট সংখ্যার 'ওয়েদার' পত্রিকায়। বর্ণনাটি সংক্ষেপে এই: 'সেন্ট এলমোর আগুন কখনো কখনো হয়ে থাকে ছোট ছোট নীল ফুলকির মতো। এরোপ্লেনের উইন্ডস্ক্রিন বা সামনের দিকের অন্যান্য অংশে ঘা খেয়ে তার তড়িৎমোক্ষণ হয়ে থাকে। তার ফলে এমন একটা আলোর ছটা তৈরি হয় যে ককপিটের ভিতরটা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে ওঠে। কখনো কখনো আঠারো ফুট পর্যন্ত লম্বা ঝলক তুলে নীল শিখা লকলক করে ওঠে। সে-সময় উইন্ডস্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়ালেও চড়াৎ করে আওয়াজ পাওয়া যায় আর আঙুলের ডগায় ছোট একটা ফুলকি। তখন মাথা সামনের দিকে ঝোঁকালেও চুলে টান পড়ে। সেন্ট এলমোর আগুন দেখা দিলেই ধরে নিতে হয় একটা পুরোদস্তুর মোক্ষণের পর্ব শুরু হয়েছে। মোক্ষণ চলবার সময়ে গোড়ায় চোখে পড়ে বিমানের নাকের ডগায় নীল আগুনের একটা গোলা, প্রায় একটা মুরগির ডিমের মতো, তারপরে দেখতে দেখতে দু-তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রায় একটা ফুটবলের মতো, তারপরেই চোখধাঁধানো আলোর ঝলক ও কানে তালা ধরানো বিস্ফোরণ।'

শুধু উড়ন্ত বিমানের ককপিটে বসে নয়, নানা সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নানা ধরনের মানুষও নানা অবস্থায় এই আগুনের গোলা দেখেছেন। এমনি কয়েকটি ঘটনা এই রকমের:

১৯ আগস্ট ১৯০০, রবিবার। প্যারিসের একটি হোটেলের ঘরে এগারোজন মানুষ বাইরের ঝড় থামার অপেক্ষায় ছিল। আচমকা ঘরের মধ্যে একটি নীল আগুনের গোলা উপস্থিত। আকারে একটি শিশুর মাথার মতো। চারজনের গায়ের ওপর দিয়ে গোলাটি ভাসতে ভাসতে ঘর পার হয়ে গেল, খোলা দরজা দিয়ে একেবারে বাইরে। পরক্ষণেই সদরের সিঁড়ির কাছে প্রচণ্ড একটি বিস্ফোরণের আওয়াজ ও গোলাটি অদৃশ্য। ঘরের কেউ-ই আহত হয়নি।

১৮১৭ সালের ঘটনা। স্বামী-স্ত্রী ঘরের মধ্যে ঘুমোচ্ছে। আচমকা প্রচণ্ড আওয়াজে দুজনের ঘুম ভেঙে গেল। গোটা চিমনিটা টুকরো টুকরো হয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আর চোখধাঁধানো একটা আগুনের গোলা তাদের মাথার মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। পার্টিসনের একটা ফাটল দিয়ে গোলাটা পাশের গোয়ালঘরে চলে যায়। তারপরে সেখানে যে কাণ্ড করে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। সারি সারি দুধ-ভরা পাত্র টানতে টানতে নিয়ে যায় ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। পাত্রের ঢাকনাগুলো ভেঙে ফেলে কিন্তু একটি পাত্রও ওলটায় না। বারোটি প্লেটের চারটিকে ভেঙে ফেলে, বাকি আটটিকে অক্ষত রেখে দেয়। একটি মদের পাত্রের ট্যাপ উড়িয়ে নিয়ে যায়, ফলে সমস্ত মদ গড়িয়ে পড়ে। একটি দেওয়ালের ইট খসিয়ে অপর দেওয়ালে এমন সজোরে আছড়ে ফেলে যে ইটগুলো দেওয়ালের গায়ে সেঁটে যায়। সমস্ত জানলা ভেঙে চুরমার করে কিন্তু একটি আয়না দেওয়াল থেকে মাটিতে খসিয়ে অক্ষত অবস্থায় খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখে। একটি চেয়ারের ওপরে কিছু কাপড় জড়ো করা ছিল, সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দরজার কাছে। স্বামী-স্ত্রী ভয়ে কাঁপছিল কিন্তু তারা দুজনেই অক্ষত থেকে যায়।

২২ মে ১৯০১। ফ্রান্সের আওয়ারালস্ক নামে একটা জায়গায় মেলা বসেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি সময়ে একুশজন অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে একটি বাড়ির অলিন্দে আশ্রয় নেয়। সতেরো বছরের একটি মেয়ে বসে সিঁড়িতে, রাস্তার দিকে পিঠ করে। হঠাৎ বাজ পড়ার কান-ফাটানো আওয়াজ শোনা যায় আর দরজার সামনে দেখা যায় চোখ-ধাঁধানো আগুনের গোলা। সতেরো বছরের মেয়েটির মাথা ছুঁয়ে গোলাটা বেরিয়ে যায়, অন্যান্যদের পায়ের কাছাকাছি দিয়ে। তারপরে বাড়ির ভিতরে ঢুকে সমস্ত তছনছ করে। বাড়ির মালিক অবশ্য কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। মেয়েটিকে পাওয়া গিয়েছিল মৃত অবস্থায়, অন্যান্যদের অর্ধমৃত ও বধির কালা অবস্থায়।

উপরে উল্লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত ও আরো অজস্র দৃষ্টান্ত থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা মোটামুটি এই:

বজ্রগোলকের আকার বলের মতো না পেয়ারার মতো। গোলাটি তৈরি হয় আলোকোৎসারী তড়িৎমোক্ষণের ফলে। ইংরেজিতে যাকে বলে লুমিনাস ইলেকট্রিকাল ডিসচার্জ। তৈরি হয় সাধারণত বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় শেষ হবার মুখে, গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালে অপেক্ষাকৃত বেশি।

আগুনের এই গোলাটি দেখে এমনও মনে হতে পারে যে মেঘের তলা থেকে নেমে আসছে। কখনো বা শূন্যে তৈরি হয়ে বাতাসে ভাসতে থাকে।

কখনো বা দেখা যায় কোনো বস্তুর সঙ্গে আঁটা অবস্থায়। বন্ধ ঘরের মধ্যে বা এমন কি আলমারির মধ্যেও তৈরি হতেও বাধা নেই।

গোলার আকার ছোট হলে মটরদানার মতো। কয়েক ফুট ব্যাসের হাওয়াও অসম্ভব নয়। পরিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট রেখায় নয়, আবছা। রঙ সাধারণত লাল বা লালচে কমলা। কখনো বা সাদা কিংবা নীলচে সাদা। রামধনুর যে কোনো রঙেরই হতে পারে তবে সবুজ ও বাদামী বড়ো একটা দেখা যায় না।

স্থায়িত্বকাল সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিন থেকে পাঁচ সেকেণ্ড পর্যন্ত।

মিলিয়ে যাওয়াটা কখনো কখনো নিঃশব্দে, ভূতের মতো। কখনো কখনো কাগজের ঠোঙা ফাটানোর মতো আওয়াজ তুলে। কখনো কখনো চোখধাঁধানো আলোর ঝলক সহ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে।

যেসব গোলা দেখে মনে হয় মেঘ থেকে নেমে আসছে তাদের নেমে আসার বেগ যথেষ্ট বেশি। ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াবার বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ছ-ফুট। কখনো কখনো একই জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকতেও দেখা যায়। বাতাস কোন দিকে বইছে তার সঙ্গে গোলা কোন দিকে যাচ্ছে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

বজ্রগোলকের তত্ত্ব

তাহলে থাণ্ডারবল বা বজ্রগোলকের ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? আগুনের একটা গোলা—এটুকু বোঝা গেল। আরো বোঝা গেল, বজ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে তার চেহারাটি উদ্ভট আচরণ দুর্বোধ্য। ধন-সম্পদের প্রচুর ক্ষতি করতে পারে, প্রাণ-সংহারও করে থাকে। কিন্তু কেমন করে ঘটে। তার ভিতরকার ব্যাপারটাই বা কি? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে অবশ্যই একটি তত্ত্ব চাই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ একটি তত্ত্ব খাড়া করতে পারেননি!

নানা বিজ্ঞানী নানা তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। সংক্ষেপে তত্ত্বগুলো এই:

বিদ্যুৎ চমকালে যে তড়িৎমোক্ষণ ঘটে তার ফলে সৃষ্টি হয় ঘনীভূত নাইট্রোজেন অক্সাইড। আর তারই ফলে বজ্রগোলক।

বিদ্যুৎ-চমকের তড়িৎমোক্ষণে বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাসে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটার ফল বজ্রগোলক।

বিদ্যুৎ-চমকের ফলে জ্বলন্ত আয়নীভূত গ্যাস (প্লাজমা) থেকে বজ্রগোলকের সৃষ্টি।

ঘূর্ণায়মান ধুলোর ঝড়, যার মধ্যে কণিকার সঙ্গে কণিকার ঘর্ষণের ফলে দ্যুতির সৃষ্টি—তাই হচ্ছে বজ্রগোলক।

তড়িতাবিষ্ট মেঘের বৈদ্যুৎ ক্ষেত্রের দ্বারা বিনাস্ত মহাজাগতিক রশ্মির ফলে বজ্রগোলকের সৃষ্টি।

এমনি আরো নানা তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। সর্বশেষ একটি তত্ত্বে বলা হয়েছে, তড়িতাবিষ্ট মেঘ ও পৃথিবীর মাটির মধ্যবর্তী এলাকায় যে বিদ্যুৎক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে তার বিশেষ ধরনের হেরফেরের ফলে এমন বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যা বজ্রগোলকের চেহারা নেয়। গাণিতিক সূত্রের সাহায্যেও তত্ত্বটি প্রমাণিত হয়েছে।

এতসব তত্ত্বের পরেও এখনো পর্যন্ত বজ্রগোলক সম্পর্কে বহু মৌল প্রশ্ন থেকে গিয়েছে যার কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। বজ্রগোলক সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে, এতৎসম্পর্কিত যা কিছু তথ্য সবই চোখের দেখা থেকে, সাক্ষাকারের মাপজোক পাওয়া যায়নি। বজ্রগোলক যেমনভাবে ও কেন হয় তা যদি সঠিকভাবে জানা যেত তবে বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে পারতেন কোথায় ও কখন তার দেখা পাওয়া যেতে পারে। তাহলে মাপজোকের যন্ত্রপাতি সমেত অকুস্থলে উপস্থিত থাকা অসম্ভব হত না। এমন কি এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারেও কৃত্রিম বজ্রগোলক সৃষ্টি করা যায়নি।

তা যখন যাবে তখন বজ্রগোলক হয়ে উঠবে মানুষের হাতে সম্ভবত পরমাণু বোমার চেয়েও ভয়ংকর অস্ত্র। এবং থার্মোনিউক্লিয়ার শক্তির উৎস হিসেবেও সবচেয়ে কম খরচের একটি আয়োজন।

আর কম খরচে যদি বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে যানবাহনও অনায়াসেই বিদ্যুৎ-চালিত হতে পারে। ক্রমে ক্রমে কল-কারখানাও। তখন আর কয়লা বা পেট্রল বা ডিজেল পোড়াবার কোনো প্রয়োজনই হবে না। অনেক ধোঁয়া থেকে আবহাওয়া মুক্ত থাকবে।

১৯৫৫ সালে বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী পিটার কাপিৎজা প্রথম বলেছিলেন যে বজ্রগোলকের ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিতে পারে প্লাজমা পদার্থবিদ্যা। তারপর থেকেই বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবিষয়ে প্রচুর আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। আশা করা চলে, বর্তমান শতক শেষ হবার আগেই বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে কৃত্রিম বজ্রগোলক সৃষ্টি হবে। সম্ভবত তখন আর যুদ্ধের প্রয়োজনে বজ্রগোলকের ব্যবহার হবে না। হবে শান্তির প্রয়োজনে। বিশ্বে শুরু হবে বিপুল এক সমৃদ্ধির যুগ।

কলকাতায় আর্থার ক্লার্ক

জনবোধ্য বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর বিখ্যাত লেখক আর্থার ক্লার্ক সম্প্রতি ভারত সফর করে গেলেন। কলকাতাও তাঁর সফরসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে '২০০১ সালের জগৎ' সম্পর্কে তিনি একটি ভাষণ দিয়ে গেছেন।

তাঁর জন্ম ইংলণ্ডে, লেখাপড়াও ইংলণ্ডে। এখন বসবাস সিংহলে। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সের মধ্যেই প্রচুর বই লিখেছেন। 'দ্য স্যাণ্ডস অফ মার্স' তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা। স্পুৎনিক আকাশে ওঠার অনেক আগেই মহাকাশে মানুষের অভিযান সম্পর্কে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি নিয়ে একাধিক বই তাঁর কলম থেকে পাওয়া গিয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই ১৯৪৫ সালে—বাস্তবে মহাকাশ-গবেষণার যুগ শুরু হবার এক যুগ আগে। তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। অবশ্য তাঁর মতে (কলকাতার একজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যা বলেছেন) কোনো একটি বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে তারিখ মিলিয়ে সত্য হওয়াটা খুব একটা বড় ব্যাপার নয়, যদি হয় তো বলতে হবে ঘটনার যোগাযোগ। আসল কথা সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারা। সেটাই বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী লেখকের পক্ষে বড় কৃতিত্ব। যে কৃতিত্বের অসাধারণ নিদর্শন রয়েছে জুল ভার্নের রচনায়। আর্থার ক্লার্কের কৃতিত্বও কম নয়, যদিও যাঁকে তিনি গুরু বলে মনে করেন (কলকাতার এক সাংবাদিকের কাছে উক্তি) সেই এইচ জি ওয়েলস এক্ষেত্রে কিছুটা নিষ্প্রভ। যাই হোক, আর্থার ক্লার্কের অপর দুটি ভবিষ্যদ্বাণী এই : ১৯৮০ সালের মধ্যে মানুষ ভিন্ন গ্রহে অবতরণ করবে ও ২০৬০ সালের মধ্যে কৃত্রিম প্রাণ তৈরী হবে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে উল্লিখিত সময়ের অনেক আগেই ঘটনা দুটি ঘটে যেতে পারে। তাঁর মত উদ্ধৃত করেই বলি, সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারাটাই বড় কথা—সাল তারিখ মিলল কিনা তাতে কিছু যায় আসে না।

২০০১ সালের পৃথিবী সম্পর্কে তিনি যে ভাষণ দিয়েছেন (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) তার সবচেয়ে বড় কথা, পৃথিবী তখন মানুষের বাসস্থান হিসেবে উৎকৃষ্টতর হবে। অবশ্যই বিনা পরিশ্রমে নয়, মানুষকে অতিমাত্রায় প্রয়াসী হতে হবে এজন্যে। কথাটা এই মুহূর্তে বিশ্বাসযোগ্য হতে না পারে, কিন্তু আর্থার ক্লার্ক জোর দিয়ে বলেছেন যে, একুশের শতকই হবে তাঁর এই উক্তির পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

তিনি আরো বলেছেন, একুশের শতকে মানুষ ভোগ করবে বিপুল এক প্রয়োগিক উৎকর্ষের সুফল, যন্ত্রই তখন প্রধান স্থান নেবে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা এমন সর্বব্যাপক রূপ নেবে যে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অন্য প্রতিটি মানুষের বার্তা-বিনিময় হয়ে উঠবে অতি সহজ ও নৈমিত্তিক ব্যাপার। সেই সঙ্গে গড়ে উঠবে বিশ্বব্যাপী এক ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী। মানুষ আজ পর্যন্ত যত কথা লিখেছে সমস্তই পাওয়া যাবে এই লাইব্রেরীতে। খবরের কাগজ পড়ার আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। গোটা খবরের কাগজটিই ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় অতি সহজেই অধীত হতে পারবে।

তাঁর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণী : একুশের শতকে ভাসমান শহর তৈরী হবে আর ঋতুতে ঋতুতে সেই শহর স্থানান্তরিত হতে পারবে। ডাইনোসররা যেমন এক সময়ে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে তেমনি লোপ পাবে কলকাতার মতো স্থাণু শহরগুলো। ভাসমান শহরগুলো হবে অনেক ছোট এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

তাহলে কি খাদ্যের সমস্যাও থাকবে না? আর্থার ক্লার্কের মতে, থাকার কথা নয়। খাদ্য উৎপাদনে আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যেই একটা বিপ্লব ঘটে যাবে। অপরিশোধিত তৈল ইত্যাদি থেকে তৈরী হবে মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রোটিন। সমুদ্র হয়ে উঠবে খাদ্য সংগ্রহের সবচেয়ে বড় উৎস।

পরিশেষে তিনি কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টির কথা বলেন। প্রজননবিদ্যার আশ্চর্য অগ্রগতির ফলে উন্নততর জীব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁর মতে, একুশ শতকের মধ্যে বাস্তব রূপ নেবার কথা।

কলকাতার সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আর্থার ক্লার্ক একটি দামী কথা বলেছেন : 'আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, সায়েন্স ফিকশন নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। কাহিনীর জাল বুনতে গিয়ে এমন গল্প যেন কেউ না ফাঁদেন যেটা বিজ্ঞানের বিচারে অসম্ভব।'

২০০১ সালের কথা বলতে গিয়েও আর্থার ক্লার্ক কোনো অসম্ভব কথা ফাঁদেন নি। এই দূরদৃষ্টি সামান্য কথা নয়। বৈজ্ঞানিক রচনায় কৃতিত্বের জন্যে ১৯৬১ সালে তিনি কলিঙ্গ পুরস্কার পেয়েছেন। আশা করা চলে তিনি আরও বড় কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন ও আরও অনেকভাবে পুরস্কৃত হবেন। আমরা চাই একুশের শতকেও তিনি বেঁচে থাকুন, নিজের চোখে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যাচাই করুন, এবং ইতিমধ্যে অবশ্যই আরো অনেক লিখুন।

—অয়স্কান্ত

(তেরো)

ক্যাপ থেকে নেমেই হাসপাতালের গেটের পাশে চোখ গেল চন্দনের। শিশিরবাবু আর হকসায়েব কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। চন্দন একটু ইতস্তত করে দাঁড়াল। গেটের পাশেই বিশাল শিরিসগাছ। তার গোড়ায় ঘাসের ওপর বসে আছে স্নেহধারা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে রুমা। স্নেহধারা নিস্পন্দ—রুক্ষ চেহারা, লাল শুকনো চোখ, পরনের শাড়িটা গায়ে এলোমেলো জড়ানো। স্থির তাকিয়ে সে হাসপাতালটাই দেখছে যেন। রুমার চোখ দুটোও লাল—কিন্তু ভিজে। রুমাল ঘষছে বার বার। চন্দনের পায়ের শব্দে স্নেহধারা মুখ ফেরাল না। রুমা তাকে দেখল। কাছে গিয়ে চন্দন ধরা গলায় ডাকল, বউদি!

স্নেহধারা তবু তাকাল না। শুধু বলল, এত দেরী করে এলে?

চন্দন ব্যাকুল হয়ে বলল, আমি খবর পেয়েই চলে এসেছি, বউদি। কেমন আছে পরেশদা? দেখে এসেছ?

জবাবটা রুমা দিল। দেখা করতে দিল না। অপারেশন হচ্ছে বলল।

চন্দন বলল, আমি আসছি, বউদি। কোন চিন্তা করো না। ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর সে এগোল। বারান্দায় উঠতে গিয়ে জানল, রুমাও তাকে অনুসরণ করছে। রুমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে সে দাঁড়াল। রুমা এসে বলল, ওরা মিথ্যে কষ্ট দিচ্ছে—জামাইবাবু বাঁচবে না। আমি জানি।

চন্দন চমকে তাকাল ওর মুখের দিকে। এ মুহূর্তে কী নিষ্ঠুর আর নির্বিকার দেখাচ্ছে রুমাকে। বারান্দার শেষ দিকের ঘরে হকসায়েব আর শিশিরবাবু একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন দেখতে পেল চন্দন। সেইদিকে পা বাড়িয়ে চন্দন বলল, ওসব কথা বলতে নেই।

রুমা শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলল, তুমি জানো না—তাই বলছ। জামাইবাবু সুই-সাইড করেছেন—ওরা কেউ জানে না।

চন্দন কোন কথা না বলে শিশিরবাবুদের কাছে গেল। হকসায়েব চন্দনের হাত ধরে একটু আড়ালে নিয়ে এসে বললেন, খুব সাংঘাতিক অবস্থা চন্দনবাবু। আর কোন আশা নাই। —মাথায় চোট লেগেছে—খুলি ফেটে গেছে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। বন্ধ হচ্ছে না নাকি।

চন্দন বলল, দেখতে দিলে আপনাদের?

নাঃ। বলছে, আধ ঘণ্টা দেরী হবে। সারজেনবাবু আমাদের চেনা লোক।

এ্যাকসিডেণ্টটা কোথায় হয়েছে হক-সায়েব?

চৌরাস্তার মোড়ে—নদীর ব্রীজের কাছে। গাড়ি পড়ে গিয়েছিল নিচে। তাও পানিতে পড়লে হত। পড়েছে পাথরের ওপর। ধসে যাবে বলে দু' ধারে পাথরের চত্বর দেওয়া হয়েছে—সেখানে। কানের কাছে মুখ এনে হকসায়েব আরও বললেন, মদে মাথার ঠিক ছিল না, বুঝলেন? ওনারা বলছেন, খুব মদ খেয়েছিল পরেশবাবু। তবে প্রমথটা জোর বেঁচে গেছে। লাফিয়ে পড়েছিল আগেভাগে। পায়ে সামান্য লেগেছে। ও-ঘরে প্রমথ আছে—চন্দন, ওর কাছে হালহদিস সব পাওয়া যাবে।

চন্দন বলল, রুমা, তুমি বউদির কাছে যাও। আমি এক্ষুণি আসছি।

রুমা কান করল না। ডাক্তারের সামনে গিয়ে বলল, একটিবার ওঁকে এখন দেখা যাবে না স্যার?

ডাক্তার বললেন, এখন সম্ভব নয়। অপারেশন থিয়েটারে কাকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিছুক্ষণ দেরী করা ছাড়া উপায় নেই।

চন্দন বলল, রুমা লক্ষ্মীটি। তুমি বউদির কাছে যাও।

রুমা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে গেল। চন্দন লক্ষ্য করল, ঠোঁট কামড়ে কান্না সামলাতে সবল চেষ্টা করছে সে। আর তার ফলে হয়তো পরেশদার জন্যে নয়—রুমার কথা ভেবেই চন্দনের মনে হল, সশব্দে কেঁদে ফেলতে পারলে আরাম পাওয়া যেত।

এইসব মফঃস্বল শহরের হাসপাতালের আবহাওয়ায় যেন প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর গন্ধ জড়িয়ে আছে। ডেটলের গন্ধ, সারবন্দ সাদা বিছানায় অপেক্ষমান শরীরগুলো, পদ্মফুলের মতো থার্মোমিটার পরীক্ষারত নার্স এবং তাদের এ্যাপ্রনপরা পরীমূর্তি, সাদা দেওয়াল—সব মিলিয়ে সমাধি স্থানের শুভ্রতা। যার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইরের পৃথিবীটার প্রতি নেশা বেড়ে যায়। প্রমথ পায়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে শুয়ে ছিল। এদের দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হকসায়েব পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত

হলেন। চন্দন বলল, গাড়ি কে ড্রাইভ করছিল প্রমথ?

প্রমথ কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল, বাবু নিজে। কলকাতা থেকে বহরমপুরে পেঁৗছেছি ভোরবেলা। সেই সাতসকালে বাবু মদ গিলতে বসল। এত বারন করলুম, কানে নিল না। তেড়ে মারতে এল। তারপর সেই অবস্থায় গাড়ি নিজে ড্রাইভ করছিল। যত বলি, বাবু—আমাকে দিন—গাড়ি এদিক ওদিক করছে। উনি চোখ রাঙালেন। খালি গাড়ি। তাতে স্পীড বাড়তে লাগল মিনিটে মিনিটে। হাটপাড়ায় একটা গরু চাপাও পড়ল। ...একটু দম নিয়ে প্রমথ বলল, সেই সময় বাবু একটা মজার কথা বললেন। বুঝলি প্রমথ, আজ সত্যি সত্যি আমার গাময় চাকা গজিয়েছে মনে হচ্ছে। প্রমথ, যদি গতিক খারাপ দেখিস, লাফ দিবি সঙ্গে সঙ্গে। আজ আমার মাথার ঠিক নেই রে। ...বললুম, তাহলে আমাকে দিন বাবু। দিলেন না। মামাসি তুলে গাল দিলেন। বার বার বলতে লাগলেন, প্রমথ, প্রমথ! আমার একী হচ্ছে রে! গাময় চাকা ঘুরছে। ইস্, কত বড় বড় চাকা রে প্রমথ! —বাবু আবোল-তাবোল বকা সুরু করলেন। কান্দীতে থামবার কথা ছিল। মনে করিয়ে দিলুম। আমলই দিলেন না। ঠিক চড়াইয়ের মুখে—ব্রীজের এক রশি আগে থাকতে টের পেলুম, বাবুর হাত স্টীয়ারিঙে নেই। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে স্টীয়ারিং ধরব ভাবলুম। কিন্তু ততক্ষণে দেখি, গাড়ির চাকা স্ল্যাব থেকে নেমেছে। এমনি দরজা খুলে লাফ দিলুম। ভয়ঙ্কর শব্দ হল একটা। রাস্তা থেকে মুখ তুলে দেখি, চারপাশ থেকে লোকেরা দৌড়চ্ছে। গাড়ির পাত্তা নেই।...

শিশিরবাবু এসে গেছেন ইতিমধ্যে। সব শুনে বললেন, এ আমি জানতুম।

চন্দন প্রশ্ন করল, কী জানতেন শিশিরবাবু?

শিশিরবাবু কোন জবাব দিলেন না। হকসায়েব বললেন, আমি প্রমথর কাছে একটু বসি। বাবা চন্দন, আপনি ওদিকে যান। মেয়েছেলে—হয়তো কান্নাকাটি করছে। ওনাদের একটুখানি দেখুন গিয়ে। শিশিরবাবু, তুমি ভাই দেখ—ওষুধপত্তর বাইরে থেকে কিছু লাগবে নাকি। রক্তও লাগতে পারে। কী বলছেন ডাক্তারবাবুরা?

চন্দন বেরিয়ে এল। বারান্দা থেকে নেমে লন পেরিয়ে গেল দ্রুত। সবকিছু তার চোখে ঝাপসা হয়ে আসছিল। হঠাৎ যেন সে এ বিরাট পৃথিবীতে একা আর অসহায় হয়ে পড়েছে। রুমা মুখ ফিরিয়ে চাপা কাঁদছে। স্নেহধারা কিন্তু স্থির—কেমন কঠোর রুক্ষ চেহারা তার। চন্দন কাছে গিয়ে বসে পড়ল ঘাসের ওপর। ডাকল, বউদি!

স্নেহধারা তাকাল মাত্র।

চন্দন মুখ নামিয়ে বলল, মনে সাহস রাখো বউদি। ভয় করো না।

স্নেহধারা বলল, কিসের ভয়? আমার কিছু হয় নি—ঠিক আছি ঠাকুরপো। আমি... ঠিক আছি।

চন্দন আস্তে আস্তে বলল, সব শুনলুম প্রমথ ড্রাইভারের কাছে। মনে হল, পরেশদা ইচ্ছে করেই এ্যাক্সিডেন্টটা ঘটিয়েছেন।

রুমা নাক মুছে বলল, ইচ্ছে করেই—তা কে না জানে! কিন্তু এই যদি মনে ছিল—কেন, কেন সে... কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

স্নেহধারা বলল, রুমা, চুপ করো। কাঁদবার দিন পরে পাবে। আচ্ছা চন্দন, এখন একবারও দূর থেকে দেখতে দেবে না আমাকে?

চন্দন বলল, দিচ্ছে না। অপারেশন টেবিলে আছে।

স্নেহধারা স্বগতোক্তি করল, শুধু—শুধু একবার একটা কথা জিগ্যেস করতুম ওকে। শুধু একটা কথা।

চন্দন বলল, হয়তো অজ্ঞান হয়ে আছেন।

শীতের বাতাস বইছিল ফাঁকা এই মাঠে। গাছপালার পাতা ঝরে পড়ছিল সর সর থর থর। আকাশজোড়া বিষণ্ণতার রঙটাই যেন নীল মনে হচ্ছিল—স্পষ্ট নীল নয়, একটু ধূসরতাও মিশে রয়েছে তাতে। তিনজনে চুপচাপ বসে রইল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। রুমা আবার একবার ঘুরে এল ওদিক থেকে। ততক্ষণও কোন কথা নেই। সব কথার ওপর পরেশের রক্তাক্ত প্রকাণ্ড শরীরটা যেন চেপে বসে আছে। একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভাসছিল চন্দনের চোখে। একটা ওল্টানো ট্রাক—ঠিক ট্রাক নয়—দানবও নয়, তার চাকাগুলো ঘর ঘর করে সমানে ঘুরছে।

হকসায়েব বেরিয়ে এলেন এতক্ষণে। এদের কাছে এসে বসে পড়লেন। ...বুক বেঁধে শক্ত হোন মা, ভয় করবেন না। আমরা আছি। আমাকে বাবা বলে জানবেন। রুমা, মা!

রুমা তাকাল।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর চাপা করলেন হকসায়েব। ...বিশেষ করে তোমাকেই একটা কথা বলে রাখছি রুমা মা। খুব সাবধান। চন্দনবাবু তুমিও শুনে রাখো বাবা—খবরদার শিশিরবাবু হোন, আর আমিই হই—কখনো কোন কাগজপত্রে সই করতে বললে সইটাই করো না। এ দুনিয়া বড় খারাপ জায়গা মা, সাবধান। আর দ্যাখো মা, দুনিয়ায় এখন বড় অন্ধকার। পাশের মানুষটিও চেনা যায় না—পর না আপন, বাতি থাকলে তো চিনবে গো! বাতি নাই। হাঁ—বড় ঠেকে শিখেছি বাবা। তাই বলছি, খবরদার—কোনরকম কাগজের ধারেকাছে যাবেন না আপনারা। আল্লা পরেশবাবুর জান ফিরিয়ে দিন, মনে মনে মোনাজাত করছি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার ওপর তো হাত নাই। কপালে যদি মউত লিখে থাকেন—হবে। বুক বাঁধতে হবে। আর দেখুন মা বউবিবি, আমাদের ধর্মে বলে—মউতের জন্যে শোক হারাম। শোক করলে তাঁর আত্মার কষ্ট হয়। একটা গল্প বলি শুনুন। একমাত্র আদরের ছেলে গেছে মারা—বিধবা মায়ের। মা শোক করলেন না। বুক বেঁধে থাকলেন। কিছুদিন পরে মা দ্যাখেন, ছেলে এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বললেন দুজনে। কেমন আছ বাবা ওপারে? ...মা, খুব শান্তিতে আছি মা। ...তারপর ছেলে চলে গেল। অমনি মায়ের চোখে দু' ফোঁটা পানি ঝরল। পরদিন ছেলে তাকে দেখা দিল—সামান্য দেরীতে। মা বললেন, দেরী হল কেন বাবা? ছেলে বলল, মা, আজ আসবার সময় দেখি আমার পায়ের নিচে পানি বইছে। তাই আসতে দেরী হল। ...ছেলে চলে গেলে মা আবার কাঁদলেন। পরদিন আরও দেরী হল। ছেলে বলে, মা, আজ আমাকে হাঁটু পানি ভেঙে আসতে হয়েছে। তারপর দিনে দিনে মায়ের কান্না বাড়ে—ছেলেরও আসতে দেরী হয়। একদিন ছেলে এসে বলল, আর পারছি না মা, সাঁতার বানের পানি ভেঙে আর আসবার সাধ্য নাই। তারপর...

শিশিরবাবু বারান্দা থেকে হাত তুলে ডাকছিলেন, চন্দনবাবু!

চন্দন দৌড়ে গেল।

হকসায়েব বললেন, আমিও যাই, মা। আপনারা বসুন। তবে যা বললাম, মনে রাখবেন।

হকসায়েব চলে গেলে স্নেহধারা ডাকল রুমা!

উঁ?

কিন্তু কিছু বলতে পারল না স্নেহধারা। বলবার সুযোগও পেল না। চন্দন দু' হাতে মুখ ঢেকে এগিয়ে আসছে এদিকে। হকসায়েব আর শিশিরবাবু বারান্দায় দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন। চন্দন কাছে এসে অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে বলল, বউদি, পরেশদা নেই।...

• • •

বিপদকে ভয় ততক্ষণ, যতক্ষণ সে ভবিষ্যতের মধ্যে অদৃশ্য। বিপদ এল—চরম বিপদই সেটা, মাথার ওপর থেকে ঝড়ে উড়ে গেল উন্মূল হয়ে বিশাল গাছ। অথচ দেখা গেল, তবু বাঁচতে হয় এবং বেঁচে থাকা যায়। ভাগ্যান্বেষী পরেশ মজুমদার নিজে মরল, কিন্তু তার সাজানো-গোছানো সংসার মরল না—সেই সংসারের সাধ-আশা-আকাংখারও ছেদ পড়ল না। বস্তুত, এই ধরনের স্বার্থপরতা মানুষের মধ্যে আছে বলেই তো মনুষ্যের পৃথিবীর ধারাবাহিকতাটা অক্ষুন্ন আছে আজও।

স্নেহধারাকে দেখে অবাক হয়েছিল চন্দন। এত শান্ত ধীরস্থির আর বুদ্ধিমতী হয়ে উঠতে পারে সে, কল্পনাও করে নি কোনদিন। সে টের পাচ্ছিল, এই অল্প শিক্ষিতা সাধারণ মেয়েটির মধ্য থেকে আস্তে আস্তে একটা ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠেছে। অথচ যার কাছে শক্তি ও সাহস আশা করা গিয়েছিল, সেই রুমা—সে দারুণ ভেঙে পড়েছে। আশ্চর্য, পরেশ ওকে বাঘিনী বলেছিল!

এদিকে চন্দনের উৎকণ্ঠা নিজের ভবিষ্যতটা নিয়ে। এই উৎকণ্ঠাই তার মনে অজস্র ছবি আঁকছিল। ভয়ংকর সব ছবি। পরেশের বীভৎস ক্ষতবিক্ষত দেহটা তার অন্তর জুড়ে আত্মপ্রকাশ করছিল সারাক্ষণ। হয় তাকে এখান থেকে পালাতে হবে, নয়তো শক্ত হাতে পরেশদার হালটা ধরতে হবে। লোকটা সবকিছু জট পাকিয়ে রেখে গেছে। যা কিছু করেছে—সবই এখন অন্ধকারে। হাতড়ে খুঁজে বের করা ছাড়া উপায় নেই।

হাসপাতাল থেকেই লাস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বহরমপুরে গঙ্গা তীরের শ্মশানে। পান্ডেজী এসেছিলেন একটু দেরীতে। তিনিও ছিলেন সঙ্গে। হকসায়েব স্নেহধারা আর রুমাকে রূপপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন। শিশিরবাবু, পান্ডেজী চন্দন আর জনকতক ড্রাইভার-এ্যাসিস্ট্যান্ট মিলে ট্রাকে লাসটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রূপপুর চটিতে তারপর কদিন ধরে শুধু ওই ভয়ংকর দুর্ঘটনার গল্প। সবাই জানে, মাতাল পরেশ মজুমদার এ্যাকসিডেন্ট করে মরেছে। শুধু স্নেহধারা গভীর রাতে বিড়বিড় করে কার উদ্দেশ্যে বলে, ডাইনি, রাক্ষুসী! একটা খেয়েও সাধ মেটে নি—আবার আরেকটা খেলি তুই!

এই কয়েকটা দিন চন্দন ও-বাড়ি গিয়ে রাত্রে থেকেছে। খেয়েছে। দিনে সে বাইরে বাইরে কোম্পানীর কাজে কাটিয়েছে। কোম্পানী আপাতত চলেছে যথারীতি। পান্ডেজী এ ব্যাপারে হঠাৎ বেশ উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। হকসায়েবও তাই। শুধু বেচুবাবুকে দেখলে চন্দনের কেমন চমক খেলে যায়। লোকটার চেহারা যেন ধূর্ত শেয়ালের মতো। ওদিকে হৃদয় ঠাকুরকে ছাড়িয়ে দিতে হল। অনেক পস্তে কান্নাকাটি করে বেচারা ফের শিশিরবাবুর গদীতে গিয়ে জুটেছে।...

রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। চন্দন রুমাদের ওখানে যথারীতি শুতে যাচ্ছিল। রাস্তার ওপর হৃদয়ের সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত সে আসছে। একটু অবাক হতে হয়। এখন তার মৌতাতের সময়। চুপচাপ কোথাও সে ঝিমুবে। তা নয়, বাস্তবাগীশ লোকের মতো এই শীতের রাতে বেরিয়ে পড়েছে। একটা আস্ত কম্বলে তার শরীর ঢাকা। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে আসছিল। চন্দনকে দেখে একগাল হেসে বলল, আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম স্যার।

চন্দন দাঁড়াল। ...কী ব্যাপার ঠাকুর?

হৃদয় এদিক-ওদিক তাকিয়ে আরও কাছে এগোল। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই-ই। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক পরে-পরে দু' চারটে ট্রাক চলে যাচ্ছে। লম্বা ল্যাম্পপোস্টের আলো ঘিরে কুয়াশা জমেছে। হৃদয় ফিক করে হেসে চাপা গলায় বলল, নতুন এক জায়গায় কাজ পাব-পাব হচ্ছে, বুঝলেন স্যার? পাকা কথা এখনও দিই নি। আপনার অনুমতি না নিয়ে কথা দেব না—কভি নেহি। আমি এখনও মনে মনে আপনার আছি স্যার। আপনার আমি কেনা হয়ে গেছি।

চন্দন বিরক্ত হল। এই জন্যে সে তার কাছে আসছে! চন্দন বলল, বেশ তো। তোমার যা খুশি, করবে।

হৃদয় বলল, কথাটা তা নয়। কদিন থেকে সেখানে যাওয়া-আসা করছি—ভাবগতিক না বুঝে হুট করে যেখানে সেখানে ঢুকে পড়া তো ঠিক নয়। তা, যখনই গেছি—একটা ব্যাপার চোখে পড়ছে। দু' চোখের দিব্যি স্যার, বিশ্বাস করুন। সেটা আপনাকে বলা উচিত। না বললে বেইমানী হয়। ওরে বাবা! মজুমদারমশায়ের নুন খেয়েছি—আপনারও তো কম খাই নি!

চন্দন অধৈর্য হয়ে বলল, কী দেখেছ?

হৃদয় আরও চাপা গলায় বলল, ও-বাড়ি আপনি কখনও যান নি। ওই মেয়েটা যা জিনিস, বাপস্! চেনেন না?

কোন্ মেয়েটা?

নন্টুবাবুর বউ। কথায় বলে ছেনাল বুড়িয়ে কুটনি হয়—ও হচ্ছে তাই। এ ব্রাহ্মণ সন্তান ও-বাড়িতে কাজ করবে ভেবেছেন! কভি নেহি। ...শুনুন স্যার, কথাটা বলি। কিন্তু ভয়ে বলি, না নির্ভয়ে?

চন্দন হেসে বলল, নির্ভয়েই বলো না।

মজুমদারমশায়ের শালী হলেন গে আপনার বাগদত্তা স্ত্রী। আপনার দিব্যি স্যার, ওই মাগী ওনাকে নির্ঘাৎ নষ্ট করবে। একটু আগে ওখানে গিয়েছিলুম। নেশাটেশা করে গেলে পাছে রাগ করে, তাই এখনও কিছু টানি নি। স্বচক্ষে দেখলুম, রুমা দিদিমণি, নন্টুবাবুর বউ আর আপনার গে বাণীবাবু হেড-মাস্টারের ছেলে জাঁকিয়ে বসে তাস খেলছে। সে কী হাসাহাসি চলছে! ধিক, শত ধিক!

চন্দন চমকে উঠেছিল। নন্টুবাবুর বউ এবং পরেশ সম্পর্কে অনেক কথা সে রজব বউ হাসির কাছে শুনেছে সেদিন। স্নেহধারার সে রাত্রে ওখানে গিয়ে পড়াটাও বেশ রটে গিয়েছিল। তারপর পরেশের দুর্ঘটনা আর মৃত্যু। সব মিলিয়ে একটা যোগসূত্র অনুমান করেছিল সে। কিন্তু এটা পরেশদার আত্মহত্যা বলে বিশ্বাস করার যুক্তি পায় নি।

রুমা ওখানে তাহলে প্রায়ই অমিতের সঙ্গে আড্ডা দেয়। খুব অবাক লাগল। অবিশ্বাস্য মনে হল। পরেশদার মৃত্যুতে স্নেহধারা বরং ভেঙে পড়ে নি—শক্ত হয়েছে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব, সংসারের দায়িত্ব—এখন তো তার নিজেরই। যথার্থ মায়ের মতো শক্তিমতী হতে পেরেছে সে। ওদিকে চন্দন রুমার ভাবভঙ্গী দেখে

ভেবেছিল, রুমাই ভেঙে পড়েছে। কলেজ যায় না। কেমন উদাসীন হয়ে পড়েছে সে। বিশেষ কথা বলে না। সব সময় কাঁদে লুকিয়ে-লুকিয়ে।

অথচ রুমার ভিতরের চেহারা এই! এখনও সে সমানে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে অমিতের সঙ্গে। অবিশ্বাস্য লাগল কথাটা। হয়তো কোন দরকারে রুমা আজ ওখানে গিয়ে পড়েছিল—ঘটনাচক্রে অমিত ওখানে এসেছিল। তার ফলে—।

চন্দন কড়া স্বরে বলল, যাও ঠাকুর—তোমার নেশার সময় বয়ে যাচ্ছে।

হৃদয় দমল না। বলল, এখনও গেলে দেখতে পাবেন। চলুন না, আমার সঙ্গে চলুন। স্যার, আপনি কী স্যার? আজ বাদে কাল যার আপনার সঙ্গে বে হবে—

আচমকা চন্দন ওর গালে চড় মেরে বসল।

হৃদয় গালে হাত চেপে ধরে একটুখানি মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সশব্দে কেঁদে বলল, মারলেন! আমাকে আপনি মারলেন! এ্যাঁ! আমাকে চড় মারলেন আপনি?

চন্দন ফের চড় তুলে বলল, এক্ষুনি চলে না গেলে আবার মারব। গেট আউট, গেট আউট রাস্কেল কোথাকার!

হৃদয় রুখে বলল, এটা গরমেন্টের রাজপথ। আমি দাঁড়িয়ে থাকব। ইস্, ভারি আমার রূপপুরের নতুন লাট এসেছেন গো! পরেশ মজুমদার একটাই হয়। হুঃ! যাবে—অমনি চাকা উল্টে উচ্ছন্নে চলে যাবে।

সে তক্ষুনি হনহন করে উল্টো দিকে চলে গেল। যদ্দূর গেল, বিড় বিড় করে আরও কী সব বলতে বলতে গেল। হয়তো গাঁজাখোরটা মা-মাসি তুলে গাল দিতে-দিতে যাচ্ছে। চন্দনের ইচ্ছে হল—আরেকবার ওকে চড় কষাতে না পারলে গায়ের ঝাল যাবে না।

কিছুক্ষণ নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার সম্বিত এল। এ কী করল সে! মেরে বসল ওকে। কেন তার এত রাগ হল? না—এমন হঠকারী মেজাজ তো চন্দনের ছিল না। একটা তুচ্ছ জড়বুদ্ধি গাঁজাখোর মানুষকে এমনি করে চড় মারা নিশ্চয় খুব সোজা কাজ। কিন্তু এ কাজ চন্দনের নয়। সে অনুশোচনায় আক্রান্ত হল কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু মাথার ভেতর দিকটা এই ঠান্ডায় মাঝাই যেন আগুন জ্বেলেছে। শরীর কাঁপছে। অবিকল পরেশদার মতো তার গায়ের চাকা গড়াচ্ছে যেন। একটা নিষ্ফল ক্রোধ দুর্নীর গতিতে কেথাও ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। স্তব্ধতার ভিতর কোথায় গোঁ গোঁ ঘর-ঘর শব্দ হচ্ছে।

ঠোঁট কামড়ে ধরে সে একটুখানি ইতস্তত করল। চারদিকে তাকাল হতাশভাবে। দূরে বিশাল বটগাছের নিচে দেহাতি গাড়োয়ানেরা আগুন জেলে বসে রয়েছে। আর কোথাও কোন লোক নেই। দিগন্তে মাঝে মাঝে দূরের গাড়ির হেডলাইটের সুতীব্র ঝলকানি। রাতের দিকেই দূরগামী ট্রাকগুলো হাইওয়েকে নির্ঘোষে ভরিয়ে তোলে। তার সময় হয়ে এল এবার। ঘর-বাড়ির ফাঁকে গাছপালা ঘিরে চাপ চাপ কুয়াশা জমে গেছে। সেই কুয়াশার ভিতর বাতি জ্বলছে ম্লান। কতকটা ঝোঁকের বশে সে এগোল। একটা কিছু করা দরকার—মনে হল তার। একটা অসহায় পরিবারের অরক্ষণীয়া মেয়ে রুমা—তার নামে অনেকটা সম্পত্তি আর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট রয়েছে, ওই পরিবারটার প্রকৃত দায়িত্ব তো রুমার কাছেই জিম্মা! অথচ রুমা অশোভনভাবে এইসব করে চলেছে—এইসব প্রেম-ভালবাসার খেলা! তাছাড়া, সবাই জানে—নটুবাবুর বউর সাহচর্যেই পরেশের যত উন্নতির শুরু। সেই নটুবাবুর বউর হাতে পড়ে যাওয়া আজ রুমার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। খাঁটি গারজেনের মত—একদা যেমন জিয়াগঞ্জে বালিকা রুমাকে শাসন করত নির্দ্বিধায়, তেমনিভাবে শাসন করার তাগিদে চন্দন হেঁটে যাচ্ছিল।

নটুবাবুর বাড়িটা সে একদিন দূর থেকে দেখেছিল মাত্র। পরেশই তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ওই যে ওখানটায় আমার শুরু—এবং শেষও বটে। শেষ কথাটা পরেশের ভাগ্যে ফলে গেছে।

ডাইনে ঘুরে সরু এবড়োখেবড়ো পথ ধরে একটু এগোতেই গাছের জটলা দুপাশে ভাঙা মোটর গাড়ি দাঁড় করানো আছে ওখানটায়। কিছু বড় বড় ড্রামও জড়ো করা রয়েছে। বাংলো প্যাটার্ন বাড়িটা। বেশ নির্জন জায়গা। ওধারে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ—সেখানে অন্ধকার। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সে আলো দেখতে পাচ্ছিল ঘরের। উঁচু বারান্দার ওপর দরজাটা বন্ধ—কিন্তু ঘুলঘুলি দিয়ে আলোর ছটা আসছে। পা বাড়াতেই আচমকা একটা কুকুর কোথায় গরগর করে উঠল। থমকে দাঁড়াল চন্দন। পরক্ষণে টর্চের আলো পড়ল তার গায়ে। ভারি গলায় কে বলল, কে ওখানে?

আর লুকোচুরির মানে হয় না। চন্দন সাড়া দিল—আমি। তারপর বারান্দার দিকে সপ্রতিভ ভঙ্গীতে এগিয়ে গেল।

বিলাস বারান্দা থেকে বলছিল, ইদিকে একবার আসুন গো। এক ভদ্রলোক এয়েছেন।

সুনন্দিতা বেরোল দরজা খুলে। বারান্দার আলো নেভাল কে? অত ক বলেছি—সারারাত আলো জেলে রাখ কানে যায় না কেন?

বিলাস বলল, জ্বালাই তো ছিল। আ শুতে গেলাম, তখনও ছিল। তহ ওনারা দুষ্টুমি করে নিভিয়ে দিয়ে গেছে গত রাত্তিরেও তো তাই করেছিলেন।

সুনন্দিতা ওপাশে গিয়ে সুইচ টি আলো জ্বালাল। তারপর চন্দনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে লক্ষ্য করে বলল, কোত্থেকে আসছেন

চন্দন একটু কেসে বলল, আমি—মা রুমাদের কোম্পানীতে থাকি। আমার ন চন্দন—

কথা কেড়ে সুনন্দিতা বলল, আ আসুন, আসুন। কী ব্যাপার? ভেত আসুন।

ইয়ে—রুমা এসেছিল এখানে? ব দিদি খুঁজছিল।

হ্যাঁ। এই তো এক্ষুনি চলে গেল। দে হয় নি পথে?

না তো!

সুনন্দিত একটু ভেবে বলল, তাহ সম্ভবত ওরা স্কুলের দিক হয়ে গেছে।

চন্দন হঠাৎ একটু রূঢ় স্বরে প্রশ্ন ক বসল, ওরা কে?

সুনন্দিতা হেসে উঠল। ...অমিতও ছি এখানে। অমিতকে চেনেন না?

চিনি।

তাহলে অমিতের ওখান হয়ে বা ফিরেছে এতক্ষণ। বসবেন না?

না। চলি।

বলে চন্দন ঘুরে পা বাড়াল। সুনন্দি বারান্দা থেকে বলল, অত ব্যস্ত হব কারণ নেই। রুমা খুব স্মার্ট মেয়ে। ও সাহস আছে—ভাববেন না। হারিয়ে যাব মেয়ে নয়।

কথাগুলো চন্দনের কানে বিঁধে যাচ্ছি তীক্ষ্ণতায়। সে হন-হন করে এগোল। ব রাস্তায় উঠে খুব দ্রুত হেঁটে স্কুলে এলাকা লক্ষ্য করে সে চলতে থাকল। কি দূর গিয়ে অল্প আলো আর কুয়াশ অস্পষ্ট দুটো মানুষ দেখতে পেল সে। হে হাত ধরাধরি করে চলেছে।

আরও কাছে এগিয়ে যেতে পার রুমাকে পরেশের মতো ধমক দিতে পারত কিন্তু কিছুই করা গেল না। ঠান্ডায় অড় চন্দন নিজের বাসার দিকেই চলল। আ ও-বাড়ি শুতে যাবে না সে।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

বিড়লা একাডেমিতে সাম্প্রতিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের পঞ্চম বাৎসরিক প্রদর্শনী হয়ে গেল, ঘটনাবেগগুলো শেষদিনের আগে আমার এই প্রদর্শনীতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। গিয়ে বুঝলাম আগে না আসায় ক্ষতি হয়েছে নিজেরই। বারংবার না দেখলে এই ধরনের বিশাল প্রতিনিধিমূলক ও সুবিন্যস্ত প্রদর্শনী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা দুরূহ, এবং এমন বহু ছবি এখানে প্রদর্শিত রয়েছে যা বার বার ফিরে ফিরে দেখতে আসতে ইচ্ছে করে। একশো সাতজন প্রবীণ ও তরুণ শিল্পীর মোট একশো চুয়াল্লিশটি কাজ দুটি গ্যালারিতে ছড়িয়ে চমৎকারভাবে সাজানো। ভালো করে উপভোগ করতে গেলে বেশ কয়েকটি সন্ধ্যা এখানে যাপন করা উচিত। বিশেষ কয়েকজনের কয়েকটি কাজের কথা এখানে আলোচিত হল—কিন্তু এর বাইরেও বহু ছবি রয়ে গেল যা বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য এবং অনেককে নিয়ে আলাদা করে প্রবন্ধ লেখা উচিত।

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিকের প্রচ্ছদের মাধ্যমে বাংলার রসিকজনের কাছে সুপরিচিত। রেখার মাধ্যমে রচিত তাঁর ম্যুভ অন [illegible] ছবিটি অসাধারণ ভালো, এবং পূর্ব [illegible]। কিছুকাল আগে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তাঁর একক প্রদর্শনীতে এই ছবিটি দেখেছিলাম। এটি তাঁর প্রথাসিদ্ধ শৈলীর কাজ নয়, দেখে চেনা যায় না তাঁর বলে, তবু চমৎকার রচনা। শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ বেশ ভালো, বিশেষত তাঁর রোলিং কেভ (১০) [illegible] মতো ছবি। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ায়েট ভিজিটর (১১) ছবিটিতে সরল রেখা ও গাঢ় রঙে নাগরিক [illegible] রূপটি সুন্দর ফুটেছে—কিন্তু [illegible] আগন্তুকটি আরেকটু হাইলাইট [illegible] করাতে পারতো। শ্রীবীরেন বসুর [illegible] অভ লাইফ (১৯) ভালো ছবি। শ্রীমতী বীণা ভার্গবের লিথোগ্রাফ ইন [illegible]ডমেন্ট (২০) বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার মতো। গাঢ় কালচে রঙের পটভূমিতে উজ্জ্বল হলুদের প্রয়োগে বিমূর্ত ছবিটি পরাবাস্তবের বৈধতা অর্জন করেছে। শ্রীসলিল ভট্টাচার্যের 'ম্যাসাকার' (২৬) [illegible] নাটকীয় লালের ব্যবহারে দালাক্রোয়াকে মনে পড়িয়ে দেয়। শ্রীগিরিশচন্দ্র বোরার [illegible] রুম (৩০) ছবিটি তাঁর সংযমের [illegible] উদাহরণ।

শ্রীযশোবন্ত সিং বোথরার আঁকা 'মডার্ণ সাইজ' (৩৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যে কোনো সংগ্রহে স্থান পাবার যোগ্য। বিমূর্ত ছবি এত গীতল হতে পারে ভাবা যায় না। বিচারকবৃন্দ এ ছবিটিকে উপেক্ষা

কম্পোজিশন। শিল্পী : অতুল বড়ুয়া
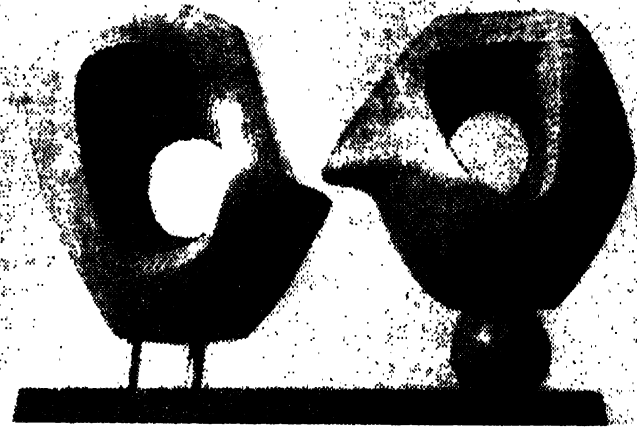
করলেন কেন জানি না। এঁর নাম পূর্বে শুনিনি, স্মারকগ্রন্থেও এঁর পরিচয় নেই। এঁর কোনো একক প্রদর্শনী দেখতে পেলে সুখী হতাম।

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর দ্য ফেস (৪৫) উল্লেখ করার মতো ছবি। শ্রীযোগেন চৌধুরীর পেন্টিং-১ (৪৮) জটিল রেখা-সংস্থাপনে ঐশ্বর্যময়—অনেকদিন পর তাঁর ছবি দেখতে পেলাম। ছবিটি সংগতভাবেই বিচারকমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেছে। শ্রীইন্দ্র দুগারের দুখানি ছবির মধ্যে রঙিন কাগজের উপর টেম্পেরায় আঁকা রাজা ঘাট, বারাণসী ১৯৬৩ (৬০) ছবিখানি রঙে ও মেজাজে কেন জানি না ডানিয়েল ফ্রাঁ-[illegible]য়ের ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

শ্রীশ্যামল দত্তরায়কে জনপ্রিয় চিত্রকর কোনোমতেই বলা যাবে না; জনপ্রিয়তার [illegible] যেসব গুণ প্রয়োজন, উনি যেন সেগুলো সযত্নেই পরিহার করে চলেন। কিন্তু তাঁর রঙিন এচিং কম্পোজিশন (৬৭) দীক্ষিত দর্শকের অভিনিবেশ সংগত কারণেই দাবি করতে পারে। তাঁর আপাত নির্দয়তার ভিতরে ভিতরে অতি কোমল গীতলতার ঢেউ অলক্ষ্যে কাজ করে যায়, এবং রঙিন এচিংয়ের কলাকৌশলের দিকে তাঁর মুনশিয়ানার আলোচনা স্বতন্ত্র তুলনামূলক প্রবন্ধের দাবি তোলে।

শ্রীগোপাল ঘোষের হালের ছবি দেখতে বড়ো কষ্ট হয়।

শ্রীসুনীল গুপ্তের কম্পোজিশন (৭৪) এমন ছবি যা দেখেই 'বাঃ' বলতে ইচ্ছে করে। সম্পূর্ণ বিমূর্ত ছবির এমন প্রসাদগুণ সচরাচর চোখে পড়ে না। শ্রীগণেশ হালুইয়ের নূন (৭৫) ও ডন (৭৬): দুটি ছবিই অনবদ্য—বিশেষত দ্বিতীয়টি। আলোকসামান্য এক কোমলতা ছবিটিতে বাঙ্ময় হয়ে আছে। শ্রীসনৎ করের ক্রেইল ফ্লাওয়ার্স (৭৭) ছবিতে শাদার ব্যবহার চমকপ্রদ। শ্রীপ্রকাশ কর্মকারের ছবি দুটি দেখে মনে হলো তাঁর অসুখ করেছে—সে অসুখের নাম জনপ্রিয়তা। চমক আছে, চোখ-ধাঁধানো চাতুর্য ও দক্ষতা কিন্তু ড্রয়িং রুমে রাখার ছবি, মিউজিয়মে রাখবার মতো নয়। প্রকাশ কি রোগমুক্ত হবার চেষ্টা করবেন না?

শ্রীমতী জোফিন ম্যহোলার লোটাস অ্যান্ড দ্য স্নেক (৯২) নাটকীয়তায় ভরো ভরো চমৎকার ছবি—বারংবার দেখার মতো।

অঙ্গনা

মহান সংকল্প

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, গরীবকে দান করলে পুণ্য হয়। বহুদিন থেকেই এই রীতি চলে আসছে। পুণ্যসঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষায় সবাই যথাসম্ভব দানধ্যান করেন। শোনা যায় যে, রাজা হর্ষবর্ধন এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর প্রয়াগে কোটি দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। সবকিছুই তিনি দান করতেন। প্রার্থী কাউকে ফেরাতেন না। এমন কি দান করতে করতে সব যখন নিঃশেষ হয়ে যেত তখন তিনি নিজের বোনের কাছ থেকে একখানা কাপড় চেয়ে নিয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্রটি পর্যন্ত বিলিয়ে দিতেন। কেন, খুঁজলে আমাদের ঠাকুমা-দিদিমার মধ্যেও যে না ঘটেছে তা নয়। এক ধর্মীয় বিশ্বাসবোধ থেকেই এই ধরনের দান চলে আসছে। আজো কোন কোন বাড়িতে দেখা যায় যে, নিয়মিত গরীব দুঃখীদের সাহায্য করা হয়।

সেদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কোথাও যেতে যেতে এ ধরনের একটি দৃশ্য দেখে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। এক বাড়িতে এক মহিলা, এক মুঠো পয়সা নিয়ে বিলোচ্ছেন। এরকম ঘটনা হামেশাই দেখা যায়, এতে নতুনত্ব কিছু নেই। আমি তাই বন্ধুটিকে তাড়া দিলাম। কিন্তু সে সহজে নড়ল না। বরং ইঙ্গিতে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল। সমবেত পয়সা-প্রার্থীদের মধ্যে তখন হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে ঠিকমতই চলছিল। ক্রমে ভিড় বাড়ছে। ওদিকে পয়সা কমে আসছে। বিলম্বে হতাশ হতে হবে এই ভয় এবং ভাবনায় সবাই তাড়াহুড়ো শুরু করে দিয়েছে। ভদ্রমহিলা এতে কিন্তু একটুও বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। ভিড় কমলে দেখা গেল ইতিমধ্যে একজন আবার পয়সা নিয়ে গেল। একে একে সবাই পয়সা নিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে গেল।

এবার বন্ধুটি আমার হাত ধরে সেই ভদ্রমহিলার সামনে এসে দাঁড়াল। আমাদের দেখে তিনি একটু বিস্মিত হলেন। আমার বন্ধু ভদ্রমহিলার এই অবস্থা দেখে সরাসরি জানিয়ে দিল যে আমরা পয়সার জন্য আসি নি। এমনি দুয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। একথা শুনে ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়ির ভিতর নিয়ে বসালেন। দু-এক কথার পর বন্ধুটি জানতে চাইল যে, এভাবে তিনি কতদিন পয়সা বিলোচ্ছেন। উত্তরে ভদ্রমহিলা গদগদভাবে জানালেন যে, স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকেই প্রতি সপ্তাহে তিনি এভাবে দান করেন। তারপর আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না রেখে তিনি বলে চললেন যে, মোটামুটি বর্ধিষ্ণু পরিবার আমাদের। টাকা-পয়সায় সব সময়ই স্বচ্ছল। অভাববোধ জীবনে কখনো হয় নি। তবু মনে শান্তি ছিল না। এজন্য স্বামীর হাত ধরে অনেক তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু শান্তি কোথাও পাই নি। এত সুখের মধ্যেও একটা অসুখের কাঁটা সব সময় খচখচ করত। মাঝে মাঝে মনের কথা আমি বাড়িতে প্রকাশও করেছি, কিন্তু সবাই আমাকে বোঝাতো যে, এ হল আমার মনের ভুল। মনের যন্ত্রণা মনে নিয়ে বোবাকান্না কাঁদিতাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ আমার স্বামী মারা গেলেন। ছেলেপুলেরা তখন সব নাবালক। বিরাট দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। ছেলেপুলে মানুষ করতে শুরু করলাম। স্বামী মারা যাওয়ায় মনের দ্বিগুণিত জ্বালাকে প্রশমিত করার জন্য এই পথ বেছে নিলাম। এর পর থেকে আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমার মনের সব যন্ত্রণা একদম উধাও হয়ে গেছে। এখন এক অদ্ভুত প্রশান্তি। সব কাজে মন দিতে এতটুকু অসুবিধে হয় নি। ছেলেরা সব বড় হয়ে এখন রোজগারপাতি করছে। মেয়েরা সুখে স্বামীর ঘর করছে। কিন্তু এই অভ্যাসটি আমি আজো বজায় রেখেছি। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন বজায় রাখবো। আর ছাড়বোই বা কেন? ওদের আশীর্বাদেই তো আমার আজকের এই সুদিন।

ভদ্রমহিলা কথা শেষ করে পরিতৃপ্ত নয়নে আমাদের দিকে তাকালেন। বন্ধুটি একটি সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আবার সে শুরু করল একথা-সেকথা। তারপর তূণীর থেকে নিক্ষেপ করল এক অমোঘ অস্ত্র। সে বলল, আচ্ছা, আপনি তো প্রতি সপ্তাহে দানধ্যান করেন। এর চেয়ে ভাল হত দু-তিনজনকে আপনার বাড়িতে প্রতিপালন করা। তাহলে প্রতি সপ্তাহে আপনাকে এই ঝামেলা পোয়াতে হত না। আর যাদের রাখতেন তারাও জীবনে প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পেত। তারাই পরে হয়ত আবার অনেকের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াতে পারত।

ভদ্রমহিলা বন্ধুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আপনি ঝামেলা কাকে বলছেন? প্রতি সপ্তাহে এই দিনটির জন্য আমি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকি। এ যে আমার কি আনন্দ তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। ভদ্রমহিলা আনন্দে চোখ বুজলেন। বন্ধুটি আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিলো।

রাস্তায় বেরিয়ে এসেই সে আমাকে বলল যে, এ ধরনের ভদ্রমহিলারা চান যে, দেশে সবাই ভিখিরি হয়ে থাক আর তাঁরা মনের আনন্দে দান করে পুণ্য সঞ্চয় করুন। তারপর সে একে একে উদাহরণ দিতে শুরু করল। আমাদের তীর্থক্ষেত্র-গুলিতে ভিখিরির ভিড়ে পথ হাঁটা যায় না। সবাই পয়সার জন্য ছেঁকে ধরে। তীর্থ করতে গিয়ে দেবদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও সবাই দান করে অতিরিক্ত পুণ্য-সঞ্চয় করেন। তারপর সে বলল তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতা। একবার সে পিসিমার সঙ্গে কোন এক ধর্মস্থানে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার হাতে একগাদা খুচরো পয়সা নিয়ে বললেন যে, রাস্তায় বেরুলে সবাইকে দিবি। বন্ধু তখন বয়সে ছোট। সে শুধু জানতে চেয়েছিল যে, এতে কি হয়? উত্তরে পিসিমা বলেছিলেন যে, এতে পুণ্য হয়। ভগবান সন্তুষ্ট হন। এর পর সে আর কোন প্রতিবাদ না করে পয়সাগুলো বিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ হলে সে আর একাজ করতে কিছুতেই রাজি হত না। পরিশেষে বন্ধুটি বলল যে, এসব ভদ্রমহিলার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজের ফলেই দেশে গরীব ভিখিরির সংখ্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে। এদের ধারণা যে, কাজ না করে যখন পেট চলে যাচ্ছে তখন আর খাটা-খাটুনির দরকার কি?

পরে অনেকবার ভেবে দেখেছি যে, বন্ধুর কথাটা নেহাত ফেলনা নয়। এই স্রোতে গা ভাসিয়ে আমাদের দেশে একদল অকর্মণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। যারা এমনিভাবে সারাটা জীবন অপরের দয়ার ভরসায় কাটিয়ে দেয়। জীবনী শক্তির এমন অপচয় পৃথিবীর আর কোন দেশে ঘটে কিনা সন্দেহ। এজন্য আমাদের দেশের বদনামও কম হয় না। বিদেশ থেকে পর্যটকরা এসে পয়সা আর খাবার বিলিয়ে এদের ফটো তুলে নিয়ে যায়। আর দেশে গিয়ে তাই সরবে প্রচার করে। এর ফলে দেশের যে কি প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে তা আমরা খুব একটা দেখি না। বিশেষত এদের প্রশ্রয়দানকারী পুণ্যকামী [illegible]

—প্রমীলা

শুষ্কমুখ, পাংশুবর্ণ, শীর্ণকায়া একটি মেয়েকে কোন রকমে বাসের হাতল ধরে বহুদিন ঝুলতে দেখেছি। প্রায় তিন, চার স্টপ পরে অনেক কায়ক্লেশে বলতে গেলে ধস্তাধস্তি করে বাসের ভিতরে যাবার ছাড়পত্র পেত। কোন কোন দিন লক্ষ্য করতাম বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বাসের পাদানিতে পা রাখার সৌভাগ্যটুকু অর্জন করতে পারত না। অথচ আমরা যারা বাসের ভিতর থেকে উদাস-উদার চোখে বাইরের জগতটাকে দেখবার চেষ্টা করতাম তাদের দিকে মেয়েটি কেমন অসহায়ভাবে তাকাত। অথচ আমরা নিরুপায়। শিয়ালদার সেই প্রচণ্ড ভিড়ে ওকে অথৈই জলে পোকার মতো মনে হয়।

সেই মেয়েটি এক শনিবারে প্রায় ফাঁকা ভিড়ে আমার পাশে এসে বসল। ওকে দেখে বার বার আমার একটা কথাই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল 'রোজ এত ভিড়ে ঠেলাঠেলি না করে যাতায়াতের সময়টা একটু আগে-পরে করলে কেমন হয়?' অথচ স্বাভাবিক একটা জড়তায় কেমন বাধো-বাধো ঠেকছিল।

হঠাৎ বাসের একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সামলিয়ে অনুচ্চ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললাম, 'ড্রাইভারদের কোন রকমে গাড়ী চালালেই যেন কর্তব্য শেষ হলো। প্যাসেঞ্জারদের দিকে একটুও নজর নেই।' আচমকা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে প্রায় সকলেই সরবে অথবা নীরবে বিরক্তি প্রকাশ করছেন অথচ মেয়েটির মুখ বেশ উজ্জ্বল। অবাক হলাম। ওকে দেখে বেশ কৌতুক বোধ করলাম। সামান্য একটু রসিকতা করে বললাম, 'কি ব্যাপার সকলেই ঝাঁকুনি খেয়ে বেশ উত্তেজিত অথচ আপনি নির্বিকার?'

মেয়েটি সুন্দর একটা হাসি ছড়িয়ে বললো, 'রোজ যা ধস্তাধস্তি করে বাসে উঠতে হয় তার তুলনায় এ ঝাঁকুনি তো কিছুই নয়। অথচ এতেই সকলে এত ক্লান্ত।'

'আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি জনসমুদ্রে আপনি খড়কুটোর মতই ভাসছেন। জীবনের ঝুঁকিও কম নেন না। আচ্ছা, এতো ভিড়ে ঠেলাঠেলি না করে একটু আগে পরে ফেরুলেই তো পারেন।'

'সেটা সম্ভব হলে তো সবচেয়ে ভাল ছিল কিন্তু ট্রেনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাতে এদিকে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক দূরে থেকে দিনের পর দিন আমাকে যাতায়াত করতে হয়। খুবই কষ্ট হয়। তবুও উপায় নেই আসতেই হবে।'

'বাড়ী থেকে যাতায়াত না করে হোস্টেলে থাকলেই তো পারেন।'

'অনেক চেষ্টা করেছি, খোঁজাখুঁজির বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নি তবুও সুবিধাজনক জায়গায় একটা হোস্টেলে সীট পাই নি। যেখানে গিয়েছি সেই এক কথা এখন সীট নেই, মাস কয়েক বাদে একবার খোঁজ নেবেন। 'সীট নেই' কথাটা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছি।'

'সে কি! একটা লেডিজ হোস্টেলে সীট পেলেন না?'

'যাওবা একটা হোস্টেলে সীট পেয়েছিলাম সেটা বাসস্টপ থেকে এত দূরে যে পায়ে হেঁটে অত দূরে গিয়ে যদি বাসই ধরতে হয় তবে আর ট্রেন ধরে বাসে যাতায়াত করতে ক্ষতি কি। আর হোস্টেলের কথা শুনলে তো অবাক হয়ে যাবেন। বহু পুরনো দোতলা বাড়ী। দোতলার একটা অংশ তো একতলার থামে হেলান দিয়ে কোন রকমে ফাটা-চেরা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাকী অংশে গোটা পাঁচেক ঘর। মন্দ নয় সে ঘরগুলো। আলো-হাওয়াও যথেষ্ট আছে। তবে যা খরচ আর খাবারের যে ফর্দ তাতে তো আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল।'

'হোস্টেলে থাকতে গেলে তো কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হবে। তবুও মনে হয় এভাবে যাতায়াতের চেয়ে ওটা খুব খারাপ ছিল না।'

'তা সত্যি। হোস্টেলে থাকলে আমাকে অনেক কিছু অসুবিধা মেনে নিতে হবে জানি তবুও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে অত দীর্ঘ-পথ পায়ে হেঁটে বাসে উঠতে তো সেই একই হাল। কলেজের কাছাকাছি একটা হোস্টেল পেলে তার খাওয়া থেকে শুরু করে অনেক কিছু ব্যাপারেই কষ্ট সইতে পারতাম। এই হোস্টেলে যেমন খরচ তেমনি যাতায়াতের অসুবিধা।'

'তাছাড়া ভিজিটারসদের ঘর দেখলে আপনার বিরক্ত লাগবে। চায়ের দোকানের মত দাগধরা টেবিল, মাথার ওপরে একটা ফ্যান নেই, যাও একটা টেবিল ফ্যান আছে তাতে একজনেরই কোন রকমে হাওয়া লাগতে পারে। প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত হয়ে যে ভিজিটাররা আসবেন তাঁরা ঘণ্টা কয়েকের জন্য পাখার নীচে বসে গল্প করার সুযোগ পাবেন না। তালিকা এখানেই শেষ নয় আরো অনেক রকম অসুবিধা। আর অনেক জায়গায় দেখেছি যথেষ্ট বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। প্রচুর জল নেই। যার ফলে ঠিক ঠিক সময়ে স্নান করতে না পারলে মাথায় এক ঘটি জল নাও পড়তে পারে আবার ঠিক সময়ে যাবেই বা কি করে মর্নিং কলেজের প্রার্থীদের আগে-ভাগে সুযোগ দিতে হবে। তারপর অন্যদের যখন বেলাই হোক। আবার এমন অনেক হোস্টেল আছে যেখানে এত সব অসুবিধার কথা কোন মেয়েকেই ভাবতে হয় না। সব রকম সুবিধাই সেখানে আছে। কিন্তু সেখানকার রাজকীয় খরচ চালিয়ে আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের পক্ষে থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।'

মনে মনে ভাবলাম ঐ আর এক সমস্যা হোস্টেল জীবনের। হাত-মুখ ধোওয়া, স্নান করা সবেতেই ঘড়ি ধরে সময়, শোওয়া-বসা হাঁটা-চলা তাও পরিমিত স্থানে। উপরন্তু বাকি আছে? চাহিদার তুলনায় লেডিজ হোস্টেল সংখ্যায় এত কম যে, যানবাহনের সুবিধা আছে এমন হোস্টেলে মেয়ে দিতে গেলে [illegible] করবে এ আর বেশী কথা কি?

অনেক হোস্টেলেই লক্ষ্য করেছি ঘরগুলো এত কাছাকাছি যে, একজনের পড়া অন্যদের মুখস্থ হয়ে যায় অথচ নিজের পাঠ্যপুস্তকের এক বিন্দুও কর্ণগোচর হয় না। সেক্ষেত্রে তারা কোন অভিযোগ বা নালিশ অথবা সীটের সুষ্ঠু বণ্টনের কথা বলতে গেলে সুপারের মুখ-খারাপটাই শুনতে হয়। তিনি হয়তো রেগে বলেই বসলেন 'আমার এখানে থাকতে হলে এই কানুন হজম করতেই হবে। নয়তো অন্য কোথাও চলে গেলে আমার কোন আপত্তি নেই।'

বহু কষ্টে একটা হোস্টেলে যাও বা জায়গা পাওয়া গেছে সেটুকু হাতছাড়া হবার ভয়ে কেউ মুখ খোলে না। সুপারের সব রকম রোষ মুখ বুজে সহ্য করে থাকতে হয়।

এ ছাড়া আলো জ্বালিয়ে রাত্রিতে পড়াশুনা করারও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। তার থেকে অল্প একটু সময় বাড়ালেও সুপারের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য এমন অনেক সুপারও আছেন যাঁরা তার আবাসিকের মেয়েদের সুযোগ-সুবিধার দিকে সব সময়ই সজাগ। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার্থিনীদের সুবিধামত ঘর রদবদল করে, যথাযথ আলোর ব্যবস্থা করে দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না। তাঁদের এই মহানুভবতা অসীম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অধিকাংশ আবাসিকের মেয়েরাই স্বীকার করে।

এছাড়া চাকুরীজীবী মেয়েদের হোস্টেলেও (ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল) সেই একই সমস্যা। জল, খাওয়া-দাওয়া, সীটের সুষ্ঠু বণ্টন সব দিক দিয়েই তারা নানা সমস্যায় নাজেহাল। অথচ প্রয়োজনের তাগিদে ও হোস্টেলের স্বল্পতার দরুণ সব কিছুকেই তাদের সহ্য করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পরিক্রমা

প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতে সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছরে নির্বাচকমণ্ডলীর ডাক পড়ে—নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে নির্বাচনের ডাক প্রতি বছরেই আসছে। নির্বাচনটা রাজ্যের বাৎসরিক পর্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এই নির্বাচন নিয়ে চার বার রাজ্যবাসীকে ভোট দিতে হচ্ছে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য। কিন্তু কোনও সরকারই টেঁকে না। রাষ্ট্রপতির শাসনই স্বাভাবিক ব্যবস্থা। কোনও নির্বাচনই রাজ্যে স্থায়ী জন-প্রতিনিধিত্ব-শীল সরকার দিতে পারে নি। রাজ্যবাসী গত চার বছরে দু'বার বামপন্থী অর্থাৎ কংগ্রেস বিরোধীদের সরকার গঠনের সুযোগ দিয়েছিলো। কিন্তু নিজেদের মুর্খামি, দলীয় সংকীর্ণ কলহ, সবার ওপরে শারিকী মারাপিটের রাজনীতি আমদানী করে পশ্চিম বাংলাকে এক চিরস্থায়ী সন্ত্রাসের কবলে ফেলে দিয়েছে। তাই নির্বাচকমণ্ডলী বামপন্থী ও কংগ্রেস বিরোধিতার বাস্তব অর্থ কী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। বীতশ্রদ্ধ জনমত তাই ১৯৭১ সালে আবার কবর থেকে কংগ্রেসকে তুলে এনেছেন। কিন্তু একক সরকার গঠনের শক্তি কংগ্রেস পায় নি। ছোটখাট দলগুলো এবং নির্দলদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী দু'টি প্রধান দল—কংগ্রেস ও সি পি এমকে বাছাই করলেন। উভয় পক্ষই কাছাকাছি আসন পেলেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন সরকার হোল। তারও আয়ু বেশীদিন ছিলো না। আবার রাষ্ট্রপতির শাসন। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা রোগে পঃ বঙ্গ ভুগছে। এ-থেকে কে উদ্ধার করতে পারে?

এই তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় আবার '৭২ সালের নির্বাচনী ডাক রাজ্যের নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে উপস্থিত। ভোটের আর মাত্র দু' সপ্তাহ বাকী। এখন নির্বাচক-মণ্ডলী নিঃশব্দ ভোটারদের মেজাজে নির্বাচনী আন্দোলন নেই। কিন্তু ভোটের নামে মারপিট সন্ত্রাস জুলুমবাজীর কতগুলো ঘটনা ঘটছে। সি পি এম পুরোন বন্ধুদের সাথী হিসাবে পেয়েও যেন আগের মেজাজে কথা বলতে পারছেন না। এখনও বলছেন 'আমরা রক্তাক্ত, আক্রান্ত।' খুনের রাজনীতির স্রষ্টাদের এবার প্রায়শ্চিত্তের পালা। আর যাঁরা এই মারপিটে উস্কানী দেবে, 'খুনের বদলে খুন' বলে চিৎকার করবে, তাদের রাজ্যবাসী নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে না। গণতন্ত্রে হিংসা ও অরাজকতার স্থান নেই। তবুও দেখছি, হানাহানির দৃশ্য। রাজ্যবাসী এটা আর সহ্য করতে পারছে না। তাই তাঁরা ভোটের ব্যাপারে টুঁ' শব্দটি করছেন না।

আজ যখন সি পি এম 'সন্ত্রাস' 'সন্ত্রাস' বলে চিৎকার করছেন, 'অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন হবে কিনা এই সন্দেহ প্রকাশ করছেন তখন তাদের শুধু '৭১ সালের সেই বিভীষিকাময় সন্ত্রাস ও নকশালী তৎপরতার দিনের অভিজ্ঞতা একবার স্মরণ করতে বলি। যে সমাজ-বিরোধীরা বিভিন্ন দলকে শক্তিশালী স্ফীতকায় করেছিলো তাদের সায়েস্তা করতে রাজনৈতিক দলগুলো কি কখনও সচেষ্ট হয়েছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। রাজ্যের গুণ্ডামী, মারাপিটের উস্কানীদাতা রাজ-নীতিকরা একবার নিজেদের বুকে হাত দিয়ে বলুন তাঁরা দলে সমাজবিরোধীদের নেবেন না, বরং সমাজবিরোধীদের ভদ্র, সংযমী সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার কাজে সচেষ্ট থাকবেন। দেখবেন, রাজ্যবাসীর মনে স্বস্তির ভাব ফিরে আসবে। খাওয়া-পরা, চাকরীর সংস্থানে কেউ কিছু করবেন না, শুধু আশ্বাসের বুলি ছেড়ে কী সমস্যার প্রতিকার হবে? শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার ছেলের দল কী করবে বলতে পারেন? পুলিশী ব্যবস্থায় সাময়িক এর প্রতিকার হয়। কিন্তু উন্নয়ন কর্মসূচী প্রয়োগের দ্বারা নতুন নতুন কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাই এই সমাজবিরোধীদের সংশোধনের প্রধান ওষুধ। বছর বছর ভোট হওয়ার ফলে অবশ্য বেকারদের মাসখানেকের জন্য কিছু কাজ আসে। কার্যত পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন পর্বটা একটা কুটির শিল্পের স্থান নিয়েছে। কিন্তু এতে তো সমস্যার প্রতিকার কিছু হয় না।

এই অনিশ্চয়তা অস্থির পরিস্থিতি থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী মুক্তি চায়। চায় একটি সুস্থ পরিচ্ছন্ন জনকল্যাণমূলক প্রশাসন। কে এই সরকার দিতে পারে। কংগ্রেস, না সি পি এম?

এখন রণক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত। একদিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস ও সি পি আই। অপর দিকে সি পি এম, আর এস পি, এস ইউ সি-সহ সাত দলের বাম ফ্রণ্ট ও ফঃ ব্লক। এছাড়া আছে অন্যান্য দল যথা সংগঠন পন্থী কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, জনসঙ্ঘ, গোর্খা লীগ, ধাড়াপন্থী বাংলা কংগ্রেস, সোস্যা-লিষ্ট পার্টি প্রভৃতি। উভয় জোটই ২৮০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। কিন্তু কোনও দলই নিজস্ব দলের নামে ২৩৭টির বেশী প্রার্থী দেন নি।

এবারকার নির্বাচনী যুদ্ধে হার-জিতের কথা বলার আগে একটা সহজ সত্য সবাইয়ের মনে রাখা দরকার। পশ্চিম বাংলার মার্কসবাদে বিশ্বাসী বামপন্থীরা কোনও দিন কংগ্রেসকে হারাতে পারে নি। ১৯৬৭ সালে যার জন্য কংগ্রেস পরাস্ত হয় সেই শ্রীঅজয় মুখার্জী ও তাঁর বাংলা কংগ্রেস আর বামপন্থীদের সংগে নেই। এবার শ্রীঅজয় মুখার্জী কংগ্রেসের প্রার্থী। যাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কংগ্রেস বিরোধিতা বার বার '৬৭ ও ৬৯ সালে কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলো তিনি এবার কংগ্রেসে ফিরে আসায় কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হয়েছে। আরও মনে রাখা দরকার ১৯৬৭ বা ৬৯ সালের এমন কি '৭১ সালের কংগ্রেস আর ১৯৭২ সালের কংগ্রেস এক নয়। আজকে কংগ্রেসে নতুন রক্তের প্রবেশ ঘটেছে। নতুন জোয়ার এসেছে। তেমনি সেই সি পি এম আজ নেই। '৭১ সালের সি পি এম আর '৭২ সালের সি পি এমের শক্তি এক পর্যায়ে নেই। বহু প্রতিকূলতা ও দুর্বলতার শরিক সি পি এম তাই এবার পুরোন শত্রুদের নিজেদের সাথী হিসাবে টেনে এনেছেন। নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। নিজের দুর্বলতা ঢাকছে এটাই শেষ কৌশল। কিন্তু জনমনের ছবিটি কী পাল্টাতে পেরেছে?

ফরওয়ার্ড ব্লকের শেষ রাত্রির ডিগবাজী রাজনৈতিক মহলে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সি পি এম তার দোস্ত আসন ভাগ করাকে নিয়ে এতো তোয়াক্কা করলো কেন? এ যেমন প্রশ্ন, তেমনি প্রশ্ন এতদিন

পরে কেন ফঃ ব্লক সি পি এমের কোলে গিয়ে বসলো। শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সি পি এম জড়িত ছিলো না, এই সার্টিফিকেট আদায় সি পি এমের একটা লক্ষ্য ছিলো। তা প্রথম পর্যায়েই পাওয়া গিয়েছে। ফঃ ব্লকের নেতারা গদগদ হয়ে সেই সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন। আর ফঃ ব্লক নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবেই সি পি এমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু মুসলিম লীগের ব্যাপারে দু' চারটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। লীগের নেতারা কোভের সঙ্গে বলেছেন—সরকার গঠনের সময় তাঁরা কংগ্রেসের মিত্র হিসাবে বিবেচিত হোতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনের সময় তাঁরা শত্রু—এটা নিতান্ত সুবিধাবাদী নীতি। সঙ্গে সঙ্গে গত বছরের আট পার্টির জোটের এস ইউ সি, ফঃ ব্লকের অথবা আর এস পির আত্মসমর্পণ ও সি পি-এমের লেজুড়ে পরিণত হওয়াকেও পরম সুবিধাবাদী বলা চলে।

সি পি এমের প্রতিকূলতা বা সাংগঠনিক দুর্বলতার ছবির পাশাপাশি কংগ্রেসের দুর্বলতাগুলোকে চেপে রাখলে নির্বাচনী ফলের অঙ্কটা ঠিক বোঝা যাবে না। প্রাথমিক দুর্বলতা হোল রাজ্য স্তরের নির্বাচনী পরিচালনার আয়োজনে। যাঁরা গতবার অন্ধকারাচ্ছন্ন সঙ্কটের দিনে রাজ্যের নির্বাচনী হাল ধরেছিলেন তাঁরা যেন ক্রমশ নিষ্প্রভ ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাই বাস্তববাদী সংগঠকের অভাব দেখা দিয়েছে। অবশ্য নতুন নতুন বহু সংখ্যক যুবক, ছাত্র ও জাতিক এবার নির্বাচনী হাল ধরেছেন। আজ কংগ্রেসের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল—জনসমর্থনও প্রচুর। তাই এই দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস কাটিয়ে উঠতে পারবে বলেই ভরসা করা হচ্ছে।

সি পি আইকে সঙ্গে না নিলে কী কংগ্রেস জয়ী হোতে পারে না? এই প্রশ্নেই দলীয় দুর্বলতা থাকছে। সি পি আই ও কংগ্রেসের মৈত্রী সর্ব-স্তরে এখনও মধুর পরিস্থিতি আনতে পারে নি। ওপরতলার ঐক্যকে নীচের তলা পর্যন্ত প্রসারিত করার জন্য উভয় পক্ষেই উদ্যমের অভাব নেই। ৪১টি আসন কংগ্রেস সি পি আইকে দেওয়ায় অনেক কেন্দ্রে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। এই অসন্তোষকে কাজে লাগাবার জন্য সংগঠনপন্থী কংগ্রেস, সি পি এম জোট বেশ তৎপর তার প্রমাণ বহু কেন্দ্রেই রয়েছে। তাই কংগ্রেস ও সি পি আই যুক্ত প্রচার, যুক্ত সভার দিকে নজর দিয়েছেন। উভয়ে দলের কর্মীদের মধ্যে ঐক্যও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

গতবার কংগ্রেস ভোট ও বামপন্থী ভোট ভাগ হয়েছিলো। এবার তার সুযোগ বেশী কেন্দ্রে নেই। শুধু তাই নয়, এবার ৯৮টি কেন্দ্রে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন যুদ্ধের ছবি তুলে ধরেছে। তবুও গতবারের নির্বাচনী ফলের ভেতর দিয়ে আগামী নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলের ছবিটার আভাষ পাওয়া যেতে পারে। এবার দলগুলি যেভাবে জোটবন্দী হয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে সমর্থিত সহ কংগ্রেস ও সি পি আই মোর্চা (গতবারের হিসাব অনুযায়ী) ১২৫ জন সদস্য শক্তি নিয়ে নেমেছেন। আর সি পি এম জোট ও ফঃ ব্লক (গতবারের হিসাব অনুযায়ী) ১৩৫ জন সদস্য শক্তি নিয়ে নেমেছেন। এর বাইরে রয়েছে কুড়িটি আসন—এই দুটো জোটের বাইরের দলের হাতে।

১৯৭১ সালের অর্জিত আসনগুলো সবাই রাখতে পারবে কী? নিশ্চয়ই না। উত্থান-পতনের আভাষ স্পষ্ট। বাংলাদেশের জন্ম ও শ্রীমতী গান্ধীর বলিষ্ঠ ভূমিকা, পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের বিজয়, রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাস, নতুন নতুন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জন্ম ইত্যাদির প্রতি-ক্রিয়া নির্বাচনী ফলে দেখা যাবে কিনা এইসব প্রশ্নও বিবেচনা করতে হবে। তবে পরিবর্তনের ঝড়ের আভাষ পশ্চিম বাংলার রণক্ষেত্রে সর্বত্র।

(ক্রমশঃ)

রাজ্য বিধানসভার প্রতিনিধিদের জেলাভিত্তিক দলগত চিত্র ১৯৭১

বন্ধনীর মধ্যে ১৯৬৯ সালের দলগত চিত্র

জেলা	আসন	কং(শা)	সি-পি-এম	সি-পি-আই	বাং কং	ফঃ ব্লক	এস ইউ সি	পি এস পি	মুঃ লীগ	আর এস পি	*অন্যান্য ও নির্দল
কোচবিহার	৮	৭(৬)				১(২)					
জলপাইগুড়ি	১১	৯(৭)	১(−)	−(১)						১(২)	−(১)
দার্জিলিং	৫	২(১)	১(−)								২(৪)
পঃ দিনাজপুর	১১	১১(৩)	−(২)		−(১)	−(১)		+(১)		−(২)	−(১)
মালদহ	১০	৫(৫)	২(−)	১(২)							২(৩)
মুর্শিদাবাদ	১৮	৮(৫)	৩(−)	−(১)	−(২)				৪(২)	১(৪)	২(৪)
নদীয়া	১৪	১(৫)	৯(২)	−(১)	−(৩)				১(−)		৩(৩)
২৪ পরগণা	৪৯	১৪(৪)	২৩(২৪)	১(৭)	১(৫)	২(২)	৪(৪)		২(১)	১(২)	−(১)
কলকাতা	২২	১৬(৫)	৫(৮)	১(৪)		−(২)				−(২)	−(২)
হাওড়া	১৬	৩(১)	১২(৮)		−(১)	−(৫)	−				১(১)
হুগলী	১৮	৪(২)	১০(৯)	১(১)		−(৩)					৩(৩)
মেদিনীপুর	৩৫	১২(৬)	৬(৩)	৮(১০)	৪(১১)			৩(৪)			২(১)
পুরুলিয়া	১১	৯(৩)	১(−)	−(১)	−(১)	−(১)	১(১)				−(৪)
বাঁকুড়া	১৩	৩(−)	৮(৪)	−(১)	−(৬)	−(১)					২(১)
বর্ধমান	২৪	১(২)	২২(১৭)	−(১)	−(২)						১(৩)
বীরভূম	১১	−(−)	৭(৩)	১(−)	−(১)	−(৪)	২(২)				১(২)
মোট আসন	*২৭৭	১০৫(৫৫)	১১১(৮০)	১৩(৩০)	৫(৩৩)	৩(২১)	৭(৭)	৩(৫)	৭(৩)	৩(১২)	২০(৩৪)
দলীয় শক্তি হ্রাস−+বৃদ্ধি		+৫০	+৩১	−১৭	−২৮	−১৮	−	−২	+৪	−৯	−১৫

*অন্যান্য : আর-সি-পি— ৩(২), কংগ্রেস (সং) ২(−), বিপ্লবী বাং কং ১(−), গোর্খা লীগ ২(৪), ওয়ার্কার্স পার্টি ২(২), মাঃ ফঃ ব্লক ২(১), লোকসেবক সংঘ—(৪), জনসংঘ ১(−), ঝাড়খণ্ড ২(−), নির্দল ৪(১১), এসএস·পি ১(১)।

*শ্যামপুকুর (কলকাতা, দম দম (২৪ পরগণা), পরগণা), উখড়ায় (বর্ধমান) নির্বাচন স্থগিত আছে।

+বন্ধনীর মধ্যে আসন সংখ্যা ১৯৬৯ সালে অবিভক্ত কংগ্রেসের। দমদম ও উখরায় স্থগিত নির্বাচনের ফলও হিসাবে ধরা হলে মোট ২৭৯টি আসনের মধ্যে সি-পি-এম লাভ করে ১১৩টি আসন।

নিউইয়র্কের ঠাকুর সোসাইটির আয়োজিত শ্যামা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

জলসা

নিউইয়র্কে শ্যামা নৃত্যনাট্য

নিউইয়র্কের টেগোর সোসাইটি আয়োজিত 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য সার্থকতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সোসাইটি উদ্বৃত্ত ৭৫০ ডলার বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে সেবাপরায়ণতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন রাখেন।

কলকাতার শিল্পী মহলে সুপরিচিত নৃত্যশিল্পী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার শ্যামার ভূমিকায় এক কথায় অপূর্ব। নৃত্যনাট্যের পরিচালনায় তিনি যে বিরল সাফল্যের নিদর্শন রেখেছেন বিদেশে তার তুলনা মেলে না। অমিয় ব্যানার্জির পরিচালনায় সঙ্গীতে পনেরোজন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। নৃত্যে কয়েকজন আমেরিকান শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। তারাও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

নিউইয়র্কের বাইরে কয়েকটা শহরে এই নৃত্যনাট্য পরিবেশনের আয়োজন করেছেন টেগোর সোসাইটি। মেক্সিকো এবং [illegible] হবার কথা চলছে। রবীন্দ্র ভাবনাকে ছড়িয়ে দেবার আন্তরিক চেষ্টা করছেন সোসাইটি এইভাবে। শ্যামা নৃত্যনাট্য সেই আন্তরিক আয়োজনের এক উজ্জ্বল নজির। শ্যামা নৃত্যনাট্যের নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন : সুখেন্দু দত্ত, শিহরণ দাশগুপ্ত, পিনাকী সেনগুপ্ত, মিকেল ডি নুঝো, মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার, সারা বারনেট, পল্লবী ভট্টাচার্য, গেল জিলাক, অম্বালিকা মিশ্র, মিলনী মুনসন, শ্যামাশ্রী সেনগুপ্ত; সঙ্গীতাংশে : অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস সেনগুপ্ত, ফারুকুল ইসলাম, শ্যামল মৈত্র, মুক্তি লাহিড়ী, শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী চক্রবর্তী, নীলাঞ্জনা ধর, করবী নাগ এবং সঙ্গীত সহযোগিতায় ছিলেন বাদল [illegible], [illegible] সান্যাল, [illegible] শাক্য, [illegible] ভৌমিক, [illegible] মুখোপাধ্যায়, অপু সেনগুপ্ত প্রমুখ।

নিউইয়র্কের ঠাকুর সোসাইটি আয়োজিত শ্যামা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

'ভারতীয় সংগীতের অন্তর্মুখীন ধ্যান-রূপের কাছে পাশ্চাত্য শ্রদ্ধানত'—রবিশঙ্কর

দীর্ঘ তিন বছর বাদে রবিশঙ্কর ১২ই কলকাতা আসেন তার আগে অবশ্য দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজে সর্বসমেত দশটি অনুষ্ঠানে বাজিয়ে এবং আহমেদাবাদ, পুণা, ভূপাল ঘুরে। এই সফরেই ত ডক্টরেট পেলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারী উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টারের তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে তিনি এবার কলকাতায় একটিমাত্র সাধারণ অনুষ্ঠানে সেতার বাজান।

১২ তারিখে মানে ঠিক কলকাতায় পৌঁছেই তিনি সাংবাদিকদের সংগে সাক্ষাৎ করেন ম্যাকসমুলার ভবনে—শ্রীমতী অমলা-শঙ্কর আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে।

গত কমাস ধরে অনবরত পরিভ্রমণে পন্ডিতজী শ্রান্ত, ক্লান্ত। কিন্তু অক্লান্ত—তাঁর সাংবাদিকদের অজস্র প্রশ্নের সপ্রতিভ এবং প্রাঞ্জল জবাব।

প্রথম প্রশ্ন ছিল—ওদেশে এখন ভারতীয় সংগীতের চাহিদা ও আদর ঠিক কি ধরণের?

১৯৬৪ সালের সেই উন্মত্ত হয়ে ক্ষাপার পড়ার চাঞ্চল্য এখন মোড় নিয়েছে অতলান্তিক গভীরতার ঐশ্বর্যের বাঁকে। এর জন্যই আমি আর ভাই আলি আকবর গত আঠারো বছর ধরে প্রাণান্তিক চেষ্টা করেছি—আজ তা সার্থক সফল।

বিরুদ্ধ সমালোচনা কম শুনিনি। অবশ্য তাতে আমি অভ্যস্ত। শুনেছি আমি নাকি আমার বাজনায় পাশ্চাত্য সংগীত মিশিয়ে ভারতীয় সংগীতের শুদ্ধতা ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছি। এ প্রসংগে কিন্তু যে কথাটা সকলের মনে রাখা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে এই **এই যে—ভারতীয় সংগীত এত বিরাট এত উদার আর এমন অন্তহীন এর সৃষ্টিশীল-**তার আকাশ যে এখানে কোনো মেকানিক্যাল **মিকসার'-এর প্রয়োজনই হয় না।** ট্রেডিশন বজায় রেখেও নানান দিকে এর বিস্তার করা চলে এবং সারা পৃথিবীতে এমন কোনো সাঙ্গীতিক ঐশ্বর্য নেই যার অভাব ভারতীয় সংগীতে আছে।

তাছাড়া ভারতীয় সংগীত ধ্যানের বস্তু, চিত্তবিনোদনী গুণ এখানে উপরি-পাওনা। এই কথাটাই ওদের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছি নানাভাবে।

প্রথমত—আমার বাজনার আগে রাগের মেজাজ, গতি, প্রকৃতি এমন কি পর্দাবিন্যাসও ওদের বুঝিয়ে দিই। আর একথা অস্বীকার করবার কোনো কারণ নেই যে সত্যি করে বুঝতে চায় বলেই ওরা বোঝে আর সন্ধানী এবং গ্রহণশীল অন্তর বলেই গ্রহণ করতে পারে।

ইহুদি মেনুহিনের মত প্রতিভাবান শিল্পী তাঁর সহজাত অন্তর্মুখীনতার প্রসাদেই ভারতীয় সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই তিনি যখন আমার সংগে বেহালা ও সেতারের দ্বৈতবাদন এল পি ডিস্ক করলেন আমি আপত্তি করার কোনো কারণ দেখিনি। দুটি এল পি ডিস্ক বেরিয়েছে। একটিতে—পুণ্যকেলী তিলং অন্যটিতে পিলু এবং আরো কয়েকটি বড় রাগ। এটা মনে রাখতে হবে ভারতীয় সংগীতের বিস্তার, শ্রুতি ভেদ্য-এ অনভ্যস্ত ও'রা। তবু মাত্র অল্পদিনের রিয়ার্স্যালে যা করেছেন তাতে শুধু আমি নই রসিকসমাজ মুগ্ধ। রেকর্ডটির বিপুল চাহিদাই তার প্রমাণ।

সম্প্রতিকালে এন্ড্রু প্রেভিনের সংগে লন্ডন কন্সার্টোতে অর্কেস্ট্রার সব চাহিদা মিটিয়েও ভারতীয় সংগীতের ঢং আমি বজায় রেখেছি। সা-চেঞ্জ করে প্রথমে খাম্বাজ, তারপর সিন্ধুভৈরবী, আড়ানা এবং শেষ মাঝ খাম্বাজে ফার্স্ট মুভমেন্ট, সেকেণ্ড মুভমেন্ট থার্ড মুভমেন্ট ও ফোর্থ মুভমেন্ট রচিত। এ রেকর্ডটিরও বিপুল সমাদর হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত প্রসংগে বলেন, বালচন্দর ছাড়া বিশেষ কেউ ওদেশে ব্যাপক পরিভ্রমণ করেননি। তবু যে কজন গেছেন তাঁদের গান ভাল লেগেছে। আমেরিকান গায়কের দক্ষিণ ভারতীয় এল পি ডিস্কই তার প্রমাণ।

আলি আকবর কলেজ ওখানে খুবই ভাল চলছে।

সিনেমা সংগীত প্রসংগে বললেন, চার্লির সংগে কাজ করে আমি খুশী। তবু এডিটিংয়ে অনেক সুন্দর অংশের ছাটকাট আমায় বেদনা দিয়েছে। ফিল্ম মিউজিকে আমি বিষয়বস্তুর ভাবানুসারী সংগীত রচনা করি এবং এদিক দিয়ে বিচার করলে মিউজি-ক্যালি আই অ্যাম প্লেয়িং ডাবল লাইফ। সিনেমায় অফার আসে অনেক। কিন্তু সিলেকটেড সাবজেকট ছাড়া আমি করি না। আই অলওয়েজ ট্রাই টু বি নিয়ারেস্ট টু দ্য থিম।

বাংলাদেশের সাহায্যে আলি আকবর ও রবিশংকরের রেকর্ডে আজ পর্যন্ত ২০০,৫০ হাজার ডলার উঠেছে। বাংলাদেশের প্রয়োজন মিটে গেলে অন্য কোনো কল্যাণমূলক কাজে এটা খরচ হোক এই আমাদের ইচ্ছে।

রবিশংকর তাঁর নানামুখীন সাংগীতিক কাজ সমাপন করে আবার নভেম্বরে আসছেন বলে জানালেন।

* * *

মিছিল নগরী কলকাতার বদনাম নেই কোথায়? বিদেশী ছায়া-ছবি, মার্কিণদের নগ্ন নৃত্য 'ও! ক্যালকাটা!' থেকে আরম্ভ করে কত বই-পুস্তিকা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিদেশে তার ইয়ত্তা নেই। বিদেশে বস-বাস করবার সময় টেলিভিশানে কলকাতার নোংরা ছবি দেখে আমরা অনেকেই প্রতিবাদ করতাম। বিদেশী কেন এদেশের বহু ব্যক্তি কলকাতার নামে নাক সিঁটকান। দিল্লী-বম্বের অনেকে এখনও এমন সব প্রশ্ন করেন, কলকাতায় সন্ধের পর কি রাস্তায় বেরুন যায়?

কলকাতার যত অপবাদই থাকুক না কেন, বিদেশে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী এখনও কলকাতাকে ভালবাসেন। দশ-পনর বছর আগে যে সব বিদেশী কলকাতার তৎকালীন সাংস্কৃতিক জীবন দেখেছেন তাঁরাই কলকাতাকে ভালবাসেন। সেদিনের কলকাতা আর নেই। এ আক্ষেপ করলেন ফরাসী পিয়ানো শিল্পী ম' রাফ্‌ফি পেত্রোসিয়ান।

ম' রাফ্‌ফি পেত্রোসিয়ান

রাফ্‌ফি পেত্রোসিয়ান শুধু ফ্রান্সেই সুপরিচিত নন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। ইনি ধ্রুপদী সংগীতের সাধক। পাঁচ বছর বয়সে সংগীত সম্মেলনে পিয়ানো বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর গুণমুগ্ধদের সংখ্যা সেই থেকে বৃদ্ধির পথেই।

পেত্রোসিয়ান প্রথম কলকাতায় এসে-ছিলেন ১৯৫৪ সালে। তারপর এই শহরে তিনি পিয়ানো বাজিয়েছেন পাঁচ-ছ' বার। এবার তিনি দিল্লীতে বাজানোর প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে কলকাতায় এসে বাজিয়ে-ছেন শনিবার ৫ই ফেব্রুয়ারী কলামন্দিরে। কলকাতার আলিয়ান্স ফ্রাসেজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। দেড় ঘণ্টায় বাজিয়ে-ছিলেন মোজার্ট, বিঠোফেন, শ'পা, সুম্যান, দেবুশি, লিট। কলকাতার জন্যে একটি সংগীত পেত্রোসিয়ানের জন্যে রচনা করে-ছিলেন ম' জ' বো। এটিও পেত্রোসিয়ান বাজিয়েছিলেন সেদিন। এর থেকেই কল-কাতার ওপর তাঁর টানের কথা প্রমাণ পায়।

পেত্রোসিয়ান যে কটা সংগীত বাজিয়ে-ছেন তার কোনোটাতেই কেউ খুঁত ধরতে পরেননি। সমস্ত শ্রোতৃমন্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনেছেন।

পেত্রোসিয়ান আমায় বলেছিলেন, ১৯৫৪ সালের সে কলকাতা আর নেই। তখন কল-কাতা ছিল সাংস্কৃতিক জীবনে জম-জমাট। কলকাতার বর্তমান অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত। যতবারই কলকাতা এসেছেন ততবারই কলকাতার সংগীতমহল ও সংগীতপ্রেমিকদের দেখে কলকাতাকে ভালবেসে ফেলেছেন। ভারতে এলে তিনি কলকাতায় আসার লোভ সামলাতে পারেন না। তাই বলে গেলেন, সামনের বছরে আবার আসছি। তখন যেন দেখি কলকাতা সেই ১৯৫৪ সালের জীবন্ত যুগে ফিরে গেছে।

[illegible] ও তাঁর [illegible]

'আমাদের নৃত্য জীবনেরই প্রতিবিম্বন। প্রত্যেকটি নৃত্যেই [illegible] রীতি-

গীত, ভাবভাবনা আকাঙ্ক্ষা ও অভীপ্সারই সৌন্দর্য ছন্দিত রূপ খুঁজি নৃত্যে।' এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে অমৃতের প্রতিনিধিকে জানালেন মোয়সেয়েভের নৃত্য সম্প্রদায়ের শিল্পী ও ভাষ্যকার ফিলাটোভ।

পরিচালক স্রষ্টা মোয়সেয়েভ জীবনরস রসিক। তাই তাঁর নৃত্য জীবনেরই রূপায়ণ। রবীন্দ্র সদনে ভারত সরকার আমন্ত্রিত মোয়সেয়েভের নেতৃত্বাধীন রুশ নৃত্য সম্প্রদায়ের নৃত্যগুলি উপরোক্ত নৃত্যদর্শনেরই এক মঞ্জরিত রূপ মেলে ধরল। প্রতিটি নৃত্যই মোয়সেয়েভের নিরীক্ষণশক্তি, নৃত্য রচনার শিক্ষা মার্জিত অসাধারণ প্রতিভা এবং মঞ্চ, আলোক, সজ্জা পরিকল্পনা, বর্ণবিন্যাস—সংগীত, তথা কলাশিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সুগভীর জ্ঞান-পাণ্ডিত্য শিল্পীজনোচিত রসবোধ সর্বোপরি সহজাত অন্তর্দৃষ্টির আলোয় যেন ঝলমল করছিল।

মোয়সেয়েভ এবং তাঁর শিল্পীদের কাছে শোনা গেল পদব্রজে ভ্রমণ তাঁর জীবনের নেশা। ছোটবেলা থেকে সারা রাশিয়াই তিনি হেঁটে বেড়িয়েছেন। এই সময়কালেই নানান গ্রাম, জনপদ ও গ্রামজীবনের ছবি, লোকনৃত্যের নানান ছন্দরূপ—মানসপটে এঁকে রাখতেন। জীবনকে তাঁর দেখেছেন শিল্পীর দৃষ্টিতে, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার উপাদানে কল্পনার রং মিশিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক আশ্চর্য লোক যা দর্শকদের চোখই শুধু ভরিয়ে দেয় না। প্রাণও ভরায়।

লোকনৃত্যের চরিত্র বজায় রেখেও কল্পনাতের, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিমার্জনাদ্বারা মোয়সেয়েভ যে রসমূর্তি সৃজন করেছেন তা যেন মূল ভাবের এক নতুন উত্তরণ ঘটিয়েছে। রূপদ্রষ্টা ও স্রষ্টার এই দুর্লভ সমন্বয়ই নৃত্যদর্শনের প্রতিটি মুহূর্তকে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা করে তুলেছে।

সেদিনের অনুষ্ঠান রাশিয়ান সুইট এন্স, টার্টার নৃত্য, উয়েচকার, আজার মিলটারি, নাভাল সুইট, পার্টিশন—চলমান জীবনের নানামুখী চিন্তা, আবেগ ও কর্মধারাকে রঙে-রসে অপরূপ করে তুলেছে। নৃত্যশিল্পীদের পদক্ষেপের নকসা, অঙ্গভঙ্গিমা ও গতিভঙ্গি কিছুই আমাদের অদৃষ্টপূর্ব অথবা অজানা নয়—তবু প্রতি মুহূর্তে চমকে উঠে ভেবেছি একি প্রাণের উজ্জ্বল বিকাশ না, স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের উল্লাস? এমনই তাঁর প্রয়োগশিল্পের যাদুকরী প্রতিভা।

প্রথম নৃত্যটির কথাই ধরা যাক। রাশিয়ান সুইট। এর মধ্যেই যেন প্রতিফলিত হোলো রুশ চরিত্রের ছবিখানি একাধারে উত্তাপ ও সংযম, নম্রতা ও হঠকারিতা আত্মপ্রসাদ ও কৌতুকপ্রিয়তা। এ নাচ। নৃত্যশিল্পীদেরও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে বিশেষ করে আদাগিও'র। তাছাড়া সাটিনের ব্যালেশিপারের পরিবর্তে কুশীলবরা পায়ে দিয়েছেন 'হাই-হিল' জুতো।

সহকারী-সংগীত ছিল 'কামরচকা' তথা সাদাসিদে একটি লোকসংগীত তারপরই নৃত্যের বৃত্তে—ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মেজাজের চরণক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া। কয়েক মুহূর্তের গীতিকাব্যিক নিশ্চলতার পরই উদ্দাম আনন্দের জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়া।

ভারতীয় নৃত্যকলামন্দিরের নৃত্য বিচিত্রায় 'শিবপার্বতী' বন্দনা নৃত্যে শিশুশিল্পীরা। পরিচালনায় নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

চলমান নৃত্যের কত না ছাঁদ ছন্দ। কখনও বৃত্ত, কখনও ত্রিকোণ, কখনও আলপনা—কখনও মস্ত এক ফুলের তোড়ার মত দর্শকের মনে নানান রঙের কাঁপন ও আবেগ জাগিয়ে। এই ত জাতশিল্পীর—লক্ষণ যা মানুষের মনকে দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে নিয়ে মুক্তি দেয় এক নির্মল আনন্দের স্রোতে।

সোভিয়েটের গ্রাম ও নগরের দৃশ্যাবলী বৈচিত্র্য বিশেষ করে আধুনিক নাগরিক কর্মব্যস্ত জীবনের আবেদন মোয়সেয়েভের মনকে কত নাড়া দিয়েছে তারই এক ভাস্বর রূপ 'নাভাল সুইট' ও পার্টিশন। একটি ১৯৪৪ সালে অপরটি ১৯৬০-এর রচনা। সম্মিলিত আঠারোজন মানুষের চলাফেরা দেহসঞ্চালন যে অবিকল জাহাজকেই মনে করিয়ে দিতে পারে একথা কি ভাবতে পারতাম যদি না এ নাচ দেখার সুযোগ ঘটত?

আর উল্লেখযোগ্য এদের সজ্জা ও বর্ণবিন্যাসে শিল্পসৌন্দর্য যা নিপুণ চিত্রকরকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রতিটি নৃত্যই রুশ জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠে তাদের জীবনধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানশেষে রবীন্দ্রসদনের অধ্যক্ষা তপতী রায় যখন মোয়সেয়েভ ও তাঁর শিল্পীদের হাতে পুষ্পস্তবক দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন—সারা হলের হর্ষধ্বনি থামতেই চায় না। এ যেন ভারত ও সোভিয়েটের সংস্কৃতির জগতে নব মিলন দেওয়া-নেওয়া, কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবার নতুন প্রতিজ্ঞা।

দেশপ্রাণ স্মৃতিরক্ষার্থে নটরাজের অনুষ্ঠান

দেশপ্রাণ স্মৃতিরক্ষা সমিতি—দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষায় ব্রতী এক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৬-এ এই কাজের জন্যই যাঁরা ২৫০০০ টাকা ব্যয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশপ্রাণ স্মৃতিমন্দির নির্মাণ, রসা রোডকে দেশপ্রাণ শাসমল রোড ও একটি পার্কের নামকরণ দেশপ্রাণ শাসমল পার্ক নামকরণ করেছেন বলে গত সোমবার (৭ই ফেব্রুয়ারী) অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে আয়োজিত রবীন্দ্রসদনের উৎসব সন্ধ্যায় সম্পাদক বনবিহারী দাস জানান।

সেদিনের আকর্ষণ ছিল 'নটরাজ' নৃত্যনাট্য। নটরাজের এক চরণের আঘাতে ধ্বংস অন্য চরণাঘাতে ফুটে ওঠে সৃষ্টির শতদল। বৈশাখের দাবদাহের তপ্তশ্বাসে তপস্বীর উষ্ণশ্বাস, জ্যৈষ্ঠের অগ্নিবাণে জীর্ণ জরা ভস্মীভূত রূপে। তারপর একে একে আষাঢ়ের ঘনঘটায় স্নিগ্ধ বারিপাতের আশ্বাস, শ্রাবণের ধারায় কত না ব্যঞ্জনা, শরতের ঝলমলে হাসির আলো—তথা ঋতুচক্রের আবর্তন ধ্বনিত হয় কবিগুরুর অতুলনীয় গানে। প্রেক্ষাগৃহে আধো অন্ধকার। কানে আসে শুধু গান আর গান। প্রাণ দুলে ওঠে রসোচ্ছলতায়—যখন সে গান শোনা যায় কণিকার অপরূপ কণ্ঠে, নীলিমা সেনের মায়া সেনের সন্তোষ সেনগুপ্তর ব্যঞ্জনাধর্মী গান। এঁরা ত গানের ডালি ভরে দিয়েছেনই। অন্যান্য শিল্পীরাও সেদিন আশ্চর্যসুন্দর গেয়েছেন। সুমিত্রা সেন, বাণী ঠাকুর, বন্দনা সিংহ, অর্ঘ্য সেন, সুশীল মল্লিক, স্বপন গুপ্ত, গোরা সর্বাধিকারী—এঁরা কোনোদিন কণিকা, সুচিত্রা, দেবব্রত, অশোকতরু হতে পারবেন কিনা জানি না। তবে পূর্বসূরী সৃষ্ট রবীন্দ্রসংগীত ঐতিহ্যের মান যে অনাহত রাখবেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নৃত্যের প্রধান আকর্ষণ বালকৃষ্ণ মেনন! শ্রীমেননের ধ্রুপদী নৃত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশেছে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন ভাবধারা তাই এমন রসোত্তীর্ণ নৃত্য সম্ভব হোলো যা তাঁর বয়সকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে গ্রন্থনায় রাধামোহন ভট্টাচার্য। প্রদীপ ঘোষও তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

—চিত্রলেখা

হরে কৃষ্ণ হরে রাম/দেবানন্দ এবং জিনাৎ আমান

চিত্র-সমালোচনা

শরৎ কাহিনীর নব রূপায়ণঃ

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশী আগে শরৎচন্দ্রের রচনা 'বিরাজবৌ' মাসিক ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। বোধ করি, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা নাটকাকারে গ্রথিত হয়ে 'বিরাজবৌ' প্রথম অভিনীত হয় ১৯১৮ সালে স্টার রঙ্গমঞ্চে। প্রায় চৌদ্দ বছর পরে ১৯৩২ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন এই স্টার রঙ্গমঞ্চ লিজ নিয়ে তাঁর নব নাট্যমন্দির'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন, তখন তিনি প্রথমেই মঞ্চস্থ করেন এই 'বিরাজবৌ' নাটক; অবশ্য এর নাট্যরূপ স্বয়ং শরৎচন্দ্রের দেওয়া বলে শোনা যায়। এরও বারো বছর পরে ১৯৪৬ সালে সবাক চিত্রাকারে মুক্তিলাভ করে অমর মল্লিক পরিচালিত 'বিরাজবৌ'। এই চিত্ররূপটি আমরা দেখবার সুযোগ পাইনি; কাজেই সে-রূপ কেমন হয়েছিল, তার চিত্রনাট্য কোন পথ ধরে গড়ে উঠেছিল, সে-সম্বন্ধে আমরা একটিও কথা বলতে পারব না।

বর্তমানে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে গত ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে দেখানো হচ্ছে কে সি দাস প্রোডাকসন্স-এর সুনীল রায় নিবেদিত, কে সি দাস প্রযোজিত এবং মানু সেন পরিচালিত 'বিরাজবৌ'। সলিল সেন রচিত দীর্ঘায়িত চিত্রনাট্য অবলম্বন করে গড়ে-ওঠা ছবিটি প্রদর্শিত হয় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। তার মধ্যে নায়ক নীলাম্বরের আদরের ছোট বোন পুঁটি ওরফে হরিমতির বিবাহের পূর্ববর্তী অংশে দেখানো হয়েছে নীলাম্বরদের বৈষয়িক স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য এবং পুঁটির প্রতি নীলাম্বরের প্রাণঢালা স্নেহ। মূল রচনার এক জায়গায় আছে অনূঢ়া ছোট বোন হরিমতী তার দাদা নীলাম্বরকে অনুযোগ করে বলছে, (বোষ্টমদের) কেন দাও না দাদা, আমাদের ত এক [illegible] আছে? [illegible] এই কথার ওপর নির্ভর করে চিত্রনাট্যকার সলিল সেন ওদের বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবের অবতারণা করেছেন। [illegible] এই [illegible] গল্পটির (উপন্যাসের [illegible] এই কাহিনীতে অনুপস্থিত। প্রথম পরিচ্ছেদে আছে নীলাম্বর আদৌ উপার্জনের ধার দিয়ে যায় না এবং তার ছোট ভাই পীতাম্বর সকাল বেলা ভাত খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া হুগলীর আদালতের পশ্চিম দিকের একটা গাছতলায় গিয়া বসিত এবং সমস্ত দিন আর্জি লিখিয়া যা উপার্জন করিত, সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী ফিরিয়া সেগুলি বাক্স বন্ধ করিয়া ফেলিত। [illegible]

আজকের নায়ক/ভারতী দেবী ও শমিত

বসন্ত বিলাপ/অপর্ণা সেন। পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত

বাগান, পুকুর থাকায় খাবার পরবার অভাব না হওয়া, আর দোল-দুর্গোৎসব করার সামর্থ থাকা—এক কথা নয়।

কিন্তু বিরাজবৌ কাহিনীর বড়ো কথা নীলাম্বর ও বিরাজবৌয়ের মধ্যের আশ্চর্য সম্পর্কটি। সে শুধু হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নয়। সহকারশাখাকে আশ্রয় করে মাধবীলতা যেমন বেড়ে ওঠে, ছোট্ট বিরাজ ঠিক তেমনই করে প্রায় শিশুকাল থেকে নীলাম্বরকে আশ্রয় করে বড়ো হয়ে উঠেছে। ন'বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার আগে থেকে বিরাজ নীলাম্বরের সঙ্গেই খেলাধুলো করত। সে জানত, নীলাম্বরই তার ধ্যান, জ্ঞান, তার দেবতা এবং তার অহঙ্কার ছিল, 'আমার মত সতী সংসারে আরও থাকতে পারে কিন্তু মনেজ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে, একথা মানিনে। আমি কারও চেয়ে এক তিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হন আর যেই হন।' দুঃখের বিষয়, চিত্রনাট্য বিরাজের এই রূপ প্রকাশে সমর্থ হয়নি। তাই, যেখানে বিরাজই মুখ্য হওয়া উচিত ছিল, সেখানে ছবিতে দেখি নীলাম্বরই সব, বিরাজ গৌণ। যে-বিরাজ নীলাম্বরময়, সেই-বিরাজ যে নীলাম্বরের ওপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করতে পারে ক্ষণিকের উত্তেজনায়, এইটাই হচ্ছে 'বিরাজবৌ' কাহিনীর ট্র্যাজিডি। তাই এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে সংবিৎ ফিরে আসবার পর মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত। কাহিনীটি ট্র্যাজিডি, কমেডি নয়, বিরাজের মৃত্যুতে এই ট্র্যাজিডির শেষ।

তবে চিত্রনাট্যের এই ত্রুটি বহুলাংশে ঢাকা পড়েছে নায়ক নীলাম্বরের ভূমিকায় উত্তমকুমারের জীবন্ত অভিনয় গুণে। বিরাজের প্রতি নীলাম্বরের স্বতোৎসারিত ভালবাসাকে তিনি তাঁর বাচন, চাউনি, ভঙ্গী দিয়ে যে আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত করেছেন, তা একমাত্র তাঁতেই সম্ভব। এই সঙ্গে চিত্রনাট্য যদি নীলাম্বরের কপালের লিখনের প্রতি অগাধ বিশ্বাসকে বড়ো করে দেখাতে সাহায্য করত, যে বিশ্বাসের বসে সে বলতে পেরেছিল, 'চেয়ে দেখ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজা-মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েছে—আমি ত অতি তুচ্ছ!'—তাহলে উত্তমকুমারের অভিনয়ের মধ্যে আমরা অধিকতর উপভোগ্য বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করতুম। বিরাজের ভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তী যতদূর সম্ভব প্রাণঢালা অভিনয় করেছেন; পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবপ্রকাশ তিনি করেছেন অনায়াসেই। সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের মোহিনী মিষ্টত্বে ভরা—বড়োজা ছিল তার কাছে আদর্শ রমণী, যাকে ভালো না বেসে, ভক্তি না করে সে পারেনি। ছোট ভাই পীতাম্বরের ভূমিকায় যদি অনুপকুমারকে নির্বাচন করাই হল, তাহলে ভূমিকাটিকে তাঁর অনুযায়ী রূপ দেওয়া উচিত ছিল। অপরাপর ভূমিকায় দিলীপ রায় (জমিদার রাজেন), নীলিমা দাস (সুন্দরী), বিকাশ রায় (নায়েব), কমল মিত্র (নারায়ণ ঠাকুর), গৌর শী (মতি চাঁড়াল), শিবানী বসু (পুঁটু) প্রভৃতি অনেকেই চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিজয় দের আলোকচিত্রগ্রহণ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়; তিনি ছবির মেজাজের সঙ্গে তাঁর ফোটোগ্রাফীকে একাত্ম করে তুলেছেন। সম্পাদক তাঁর কাঁচিকে আরও তীক্ষ্ম করলে ছবিটি দৈর্ঘে ও সুসংবদ্ধতায় আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। ছবিতে গানের প্রয়োজন নীলাম্বর 'কীর্তন গাহিতে, খোল বাজাইতে' ওস্তাদ ছিল, এই কথা প্রতিপন্ন করার জন্যে; নইলে গান ছবিকে সমৃদ্ধ হতে যে বিশেষ সাহায্য করেছে, এমন কথা বলা যায় না।

শরৎ সাহিত্যের আকর্ষণ, মনে হয়, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে। তাই

অমৃতবাজার-যুগান্তর-অমৃত কর্মচারী সমিতি প্রযোজিত জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার নাটকের একটি বিশেষ দৃশ্যে আঁধার ঘোষ, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঃ কুনাল এবং মিহির চক্রবর্তী।

বেঞ্চার রূপসজ্জায় সুধীর মুস্তাফী

দেখি কে সি দাস প্রোডাকসন্স-এর 'বিরাজ-বৌ' সাধারণ দর্শকদের মনে ধরেছে খুব বেশী করে।

চেকোশ্লোভেকিয়ার চলচ্চিত্রোৎসব

আসচে ৩ মার্চ থেকে কলকাতার লাইট হাউসে এক সপ্তাহব্যাপী চেকোশ্লোভে-কিয়ার চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসবে যে সাতখানি ছবি দেখানো হচ্ছে, তাদের নাম : ট্রিকস অব ডিসেপটিভ লাভ, আই কিলড আইনস্টাইন, জেন্টলমেন ?, ম্যান অ্যাবাউট টাউন, জাম্পিং ওভার পুডেলস এগেন, অন দি কমেট, দি কী এবং দি কপার টাওয়ার। এই সাতখানি কাহিনীচিত্রই আধুনিক এবং এর আগে কলকাতায় প্রদর্শিত হয়নি।

দয়াশংকর সুলতানিয়ার আসচে হিন্দী ছবি 'পরিবর্তন'

প্রযোজক-পরিচালক দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া বেশীর ভাগ বহির্দৃশ্য সংবলিত যে ছবিটি প্রায় সমাপ্তির মুখে এনে ফেলেছেন, তার নাম 'পরিবর্তন'। একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবনী অবলম্বনে ছবিটি গড়ে উঠেছে।

মঞ্চাভিনয়

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার : অমৃতবাজার পত্রিকা - যুগান্তর-অমৃত কর্মচারী সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্প্রতি বিশ্বরূপায় পরিবেশিত হোল 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' নাটকটি। নাটকটির কাহিনীতে যে তীব্র সংঘাত আছে তা সামগ্রিক প্রযোজনায় অসাধারণ বলিষ্ঠতার প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং এর জন্য ধন্যবাদ প্রথমেই যিনি দাবী করতে পারেন তিনি হোলেন প্রধান নাট্যনির্দেশক শ্রীসুধীর মুস্তাফী। নাটকটির প্রয়োগপরিকল্পনায় তিনি যে প্রতিটি মুহূর্তেই শিল্পসচেতন ছিলেন, তার যথেষ্ট নজীর প্রযোজনায় চোখে পড়ে। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখেন শ্রীবিভাস মুখোপাধ্যায়।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারকে নাট্যরূপে বিকশিত করে তোলেন শ্রীজয়দেব বসু। শ্রীবসুর নাট্যরূপে মূল গ্রন্থের সংশয়, সংঘাত, হৃদয়ের আলো-অন্ধকারের কম্পন সবই অক্ষুণ্ন আছে। জোড়াদীঘির জমিদারের সঙ্গে রক্তদহের জমিদারের সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই নাটকের গতি অগ্রসরমান হয়েছে। আর এরই মধ্যে আবর্তিত হয়েছে প্রেম প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের প্রহর।

নাটকের প্রতিটি শিল্পীই যেন চরিত্রের অঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন এবং সেই জন্যেই সামগ্রিক প্রযোজনাটি কোনক্ষেত্রেই শৈথিল্যে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। জোড়াদীঘির জমিদার উদয়নারায়ণের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর যন্ত্রণাকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটে ধরেন ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি রীতিমত সৎ অভিনেতারই ছাপ বহন করে। দর্পনারায়ণ (বড়) এর চরিত্রটি বীরেন ঘোষের সৎ অভিনয়ে মোটামুটি ভাবে সার্থক হয়ে ওঠে। মাঃ কুনালের ছোট 'দর্পণ'ও হয়েছে অসম্ভব সপ্রতিভ ও স্বচ্ছন্দ। আঁধার ঘোষের 'আশির্বাদ' একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। শম্ভু রায়চৌধুরী 'বাণী বিজয়' চরিত্রে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। দিলীপ মৌলিকের 'পরন্তপ রায়'ও একটি প্রোজ্জ্বল চরিত্র ছিল। ক্রূরতার মুহূর্তগুলি যেমন তিনি জীবন্ত ভাবে পরিস্ফুট করেছেন তেমনি নিঃসীম ট্রাজিক মুহূর্তে তিনি হয়েছেন আবেগে পরিশীলিত। পরন্তপের খানসামা 'বেঞ্চা'র চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয় করেছেন নাট্যনির্দেশক শ্রীসুধীর মুস্তাফী। এমন সাবলীল অভিনয় খুব কম চোখে পড়ে। বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্রাণী' ও হিমানী গাঙ্গুলীর 'চাঁপা' এ দুটি মর্মস্পর্শী চরিত্র-চিত্রণ হোতে পেরেছে। প্রতিমা পাল 'বনমালা' চরিত্রের অতলে পৌঁছতে পেরেছেন।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন চিত্রিতা মণ্ডল, আশিস ভট্টাচার্য, অনিল দাস, শিবনাথ ভট্টাচার্য, নৃপেশ ভট্টাচার্য, মিহির চক্রবর্তী, অচ্যুত সিংহ, রমেশ ভঞ্জ, নিতাই সেনগুপ্ত

রমেন মজুমদার, শ্যামল দে, অসিত সিকদার, নমিতা গাঙ্গুলী, প্রকাশ ঘোষ, হিরণ্ময় মুন্সী।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীপ্রথনাথ বিশী। শ্রীবিশী নাটকটি দেখে প্রভূত প্রশংসা করেন।

আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'কেদার রায়'—আগে যে সব ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক নাটক নাট্যানুরাগীদের বিস্মিত এবং মুগ্ধ করেছিল তার যে আজো আবেদন আছে, তার প্রমাণ কয়েকদিন আগে দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত হোল 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে। নাটকের নাম 'কেদার রায়'। রমেশ গোস্বামীর এই নাটকটি একদিন আলোড়ন

নাটু/মাঃ প্রিন্স

এনেছিল বাংলার নাট্যরসিক মহলে। সেই একই আস্বাদ সেদিন আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা আনলেন মঞ্চের আলোয়।

এ ধরনের নাটকের সাফল্য নির্ভর করে সামগ্রিক অভিনয়ের সংঘবদ্ধতার ওপর। প্রতিটি শিল্পীই প্রথম থেকে এই সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন বলে নাটকের গতি ব্যাহত হয়নি। চরিত্রোপযোগী অভিনয় করে যাঁরা দর্শকদের মনকে আকৃষ্ট করেন, তাঁরা হোলেন বিমল চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমন্ত), প্রভাত গৌতম (কেদার রায়), ধীরেন দে (ঈশা খাঁ), অজিত মুখোপাধ্যায় (কার্ভালো), শোভনলাল (চাঁদ রায়), হিমানী গাঙ্গুলী (সোনা)। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন ধ্রুব সাহা, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অমলকৃষ্ণ বিশ্বাস, মানিক পাল, বিধান সরকার, জগন্নাথ বসু, বিশ্বজিৎ মিত্র, শংকর ঘোষ, শিপ্রা চক্রবর্তী, রমা গুহ, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুরুতে পদ্মশ্রী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং এই প্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন অনুষ্ঠান সভাপতি কলকাতা বেতারকেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রীদীপকুমার সেনগুপ্ত।

'ঋতুরাজে'র 'অজানা কাহিনী': একটি বলিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণভাবে বাস্তবনিষ্ঠ একটি নাটক সেদিন 'রঙমহলে'র মঞ্চের অঙ্গিনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। নাটকের নাম 'অজানা কাহিনী', পরিবেশন করেছিলেন 'ঋতুরাজে'র শিল্পীরা। নাট্যকার দীপ্তিকুমার শীল এই নাটকের মধ্যে রূঢ় বাস্তবকেই সংঘাতের আড়ালে রেখেছেন। ডক্‌ইয়ার্ডের শ্রমিকদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার ছবি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন শ্রীশীল এই নাটকে। নাটকের সংলাপে বাস্তবরসই প্রাধান্য পেয়েছে, অকারণে উচ্ছ্বাস এসে চরিত্রের স্বকীয়তাকে আচ্ছন্ন করেনি। কয়েকটি টাইপ চরিত্রের সৃষ্টি নাট্যকারের সুগভীর ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ এ্যাডভানি একটি অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি। নাটকের প্রধান চরিত্র আলির মধ্য দিয়ে নাট্যকার বোধহয় একটি সত্যকেই প্রদীপ্ত করতে চেয়েছেন যে হৃদয়ের সম্পর্ক যেখানে সত্যি গভীর সেখানে হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ নেই।

নাটকটির সামগ্রিক অভিনয় মোটামুটিভাবে স্বচ্ছন্দই হয়েছিল। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন দিলীপ বসাক (মিঃ এ্যাডভানি), অসীম সরকার (প্রকাশ), সত্যেন ঘোষ (আলি), অশোক চন্দ্র (মুরুশেদ), মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় (হরিদাস), কমল দাস (শিবুদা), গঙ্গাধর পাল (সোরাব), শুভময় গুপ্ত (মুকুল), প্রশান্ত মজুমদার (রবিন), দীপ্তিকুমার শীল (রমেশ), মাঃ টাবু (নিলধন), বিশু রায়, শৈলেন দত্ত, মদন মজুমদার।

আলোক সম্পাতে ও আবহসংগীতে ছিলেন ক্ষুদিরাম দাস ও রবিন মণ্ডল।

কল্পলোকের 'শ্রেষ্ঠ ইনাম': 'কল্পলোকে'র শিল্পীরা সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'য় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠ ইনাম' নাটকটি পরিবেশন করে তাঁদের পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই নাটকে ঐতিহাসিক

সৃজনী প্রযোজিত 'রূপসী বাংলা'র মহরতে কাহিনীকার রণেন মোদক, সঙ্গীত-পরিচালক পূর্ণদাস বাউল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশ' হাইকমিশনার আনোয়ারুল করিম চৌধুরী, পরিচালক সরোজ রায় ও নায়ক রাজ্জাক। ফটো : অমৃত

সত্যের আলোয় মূর্ত হয়ে উঠছে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর পারিবারিক জীবন এবং তাঁর সাম্রাজ্য শাসনের উদার দৃষ্টি-ভঙ্গি। ঠিক এরই পাশে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে নবাবকন্যা আজিমুন্নেসা আর কুমার রঘুনন্দনের প্রেম। এই প্রেমের ঘাত-প্রতি-ঘাতই নাটকটির মূল গতিকে দিয়েছে প্রাণ-বেগ। এছাড়া নাটকটির মধ্যে অনেক মুহূর্ত আছে যার মধ্য দিয়ে চিরন্তন জীবনরস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নাটকটির প্রযোজনায় নির্দেশক দুলাল দত্ত যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার প্রয়াসের সেতুবন্ধন করেছেন তা নাট্য-পরিবেশনার প্রতিটি মুহূর্তে চোখে পড়ে। প্রধান চরিত্র মুর্শিদকুলি খাঁর চরিত্রে রূপ-দান করেন তিনি। তাঁর কয়েকটি অভিব্যক্তি সত্যি ভোলা যায় না। রঘুনাথ চক্রবর্তীর 'রঘুনন্দন' ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহম্মদজান' দুটি বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টি হতে পেরেছে। সুপর্ণা চ্যাটার্জি 'আজিমুন্নেসা'র ভূমিকায় মোটামুটি ভাবে প্রাণের সঞ্চার করতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন বিনয় সান্যাল, দিলীপ গুপ্ত, প্রকাশ দত্ত, আর শংকরম্, শেখর চন্দ, শঙ্কর রায়, ধ্যান দাশগুপ্ত, কান্তি মজুমদার, শৈলেন ব্যানার্জি অহিভূষণ নাগ, সবিতা মুখার্জি, শিবানী ভট্টাচার্য কবিতা গাঙ্গুলী গীতা ঘোষ, নমিতা গাঙ্গুলী।

আবহসংগীত পরিকল্পনায় শচীন বসু প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

মহিলা শিল্পী সংস্থার যাত্রাভিনয় : সম্প্রতি শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরীর পৌরাণিক নাটক 'সন্ধিপুজো' যাত্রার পালায় পরিবেশিত হোল কলকাতার রাজরাজেশ্বরী অবৈতনিক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। পালাটির প্রযোজনা করেন মহিলা শিল্পী-সংস্থা। শিল্পীদের অন্তর নিষ্ঠার ছোঁয়ায় নাটকটির প্রতিটি চরিত্র আলোর দীপ্তিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং এই সূত্রেই সপ্রতিভ হয়ে ওঠে সামগ্রিক প্রযোজনাটি। সর্বাঙ্গীণ এই সাফল্যের জন্য শিল্পীদের সংগে নির্দেশক দিলীপ পালও নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখেন।

বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন ইলা সেন, দীপিকা দাস, চারুশীলা সরকার, সবিতা মুখার্জি দীপ্তি ঘোষ, শোভা বিশ্বাস, সন্ধ্যা মিত্র অমিয়াবালা, সুধা সরকার, শান্তি ঘোষ, শীলা চক্রবর্তী, আশা দত্ত, কৃষ্ণা চ্যাটার্জি রেখা দাস, রত্না দত্ত, ডলি বিশ্বাস কুমকুম ঘোষ।

ফ্রেন্ডস ক্লাবের 'বর্বর বাঁশী' : যাদবপুরের ফ্রেন্ডস ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন মঞ্চে 'বর্বর বাঁশী' নাটকটি পরিবেশন করে নাট্যচর্চায় তাঁদের সুগভীর আন্তরিকতাই চিহ্নিত করেছেন। রূঢ় বাস্তবের মর্মান্তিক এক জীবনসত্যের ওপর গড়ে ওঠা এই বলিষ্ঠ নাটকটির পরিবেশনাকে নির্দেশকের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও শিল্পীদের স্বকীয়তায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

যাঁদের সমবেত সহযোগিতায় মঞ্চের আলোয় নাটকটি একটি সত্য রূপ মেলে ধরেছিল, তাঁরা হোলেন অনিল ভৌমিক, চন্দন চৌধুরী মহাদেব চৌধুরী, সাধন দাশগুপ্ত, নিমাই হালদার, চঞ্চল মুখার্জি, সোনা দাশগুপ্ত, জহর ভৌমিক, বিমল দাস চাকলাদার।

মেবার পতন : সম্প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' নাটকটি পরিবেশিত হোল 'ষ্টার' রংগমঞ্চে। অভিনয়ের আয়োজন করেন জে-সি এন্ড কে-সি ড্রামা গ্রুপের শিল্পীরা। সুশীলকুমার হালদার নির্দেশিত এই নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার দে, কিশোরীমোহন নন্দন, দেবী হালদার, শিব সাহা ও দীপা হালদার।

পাভলভ ইনষ্টিটিউটের অভিনয় : আগামী ৫ মার্চ রবিবার সকাল ৯-৩০ মিঃ রঙ্গনা থিয়েটার হলে পাভলভ ইনষ্টিটিউট নাট্য সংস্থা কর্তৃক শ্রীকুইক্ষুট বিরচিত স্যাটায়ার ধর্মী 'কল্মাষপাদ নাটক' অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান যুগের নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অমিল মেকিত্ব ও গোঁজামিল নিয়ে রচিত এই বিশেষ ধরণের নাটকটি এর আগে এই শহরে নবম সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

তানসেন সংগীত সম্মেলন

তানসেন সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধন সভায় সংঘসচিব শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে বাৎসরিক সঙ্গীতোৎসবে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে শিল্পীদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন ছাড়াও সিম্পো-জিয়াম, মাসিক অধিবেশন ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান মাধ্যমে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের শ্রোতা ও শিল্পী গড়ে তোলার কাজ সঙ্ঘ অনলস-ভাবে করে যাচ্ছে। কোলকাতার বাইরেও এ সঙ্ঘের শাখা হিসেবে বেশ কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষালয় গড়ে উঠেছে।

সংঘসচিবের বিবৃতির পর শুরু হয় সঙ্গীত সম্মেলন। প্রবীণ শিল্পী জয়কৃষ্ণ সান্যাল মিঞা কি টোড়ি রাগে আলাপ, ধ্রুপদ ও জৌনপুরীর ধামার—বিষ্ণুপুর ঘরানার এক সুন্দর নজীর রাখেন। মাঝে মাঝে হয়ত স্বরবিচ্যুতি ঘটেছে। কিন্তু সে ত্রুটি ঢেকে দিয়েছে তাঁর পান্ডিত্য ও রাগ-শুদ্ধতা। তার সঙ্গে সুযোগ্য পাখোয়াজ সঙ্গতে ছিলেন রাজীবলোচন দে। নবাগত শিল্পী বসন্ত রাও দেশপান্ডের (পুণা) খেয়ালের গায়কী ও সুরবিন্যাস প্রশংসার দাবীদার। প্রাণ খুলে তারিফ করা যেত যদি কণ্ঠস্বরের ওজস্ থাকত। তবলা সঙ্গতে ছিলেন চন্দ্রভান্। উদীয়মান শিল্পী গৌতম রায়ের ঠুংরী অভিনন্দিত হয়েছে। কিন্তু খেয়াল আরো অনুশীলনীর অপেক্ষা রাখে। আর এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান ছিল শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালকোষ রাগে পরিবেশিত খেয়াল। সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেও ইনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন এবং তার মধ্যে শিক্ষার্থীদের অনুধাবনীয় বিষয় পেশ করতে পেরেছেন। ইনি ১১ মাত্রার অষ্টমঙ্গলা তালেও গেয়েছেন এবং তার সুকঠিন গতিতে সুসংবদ্ধ থেকেছেন। এর সঙ্গে সারেঙ্গী ও তবলায় ছিলেন মহম্মদ সগীরুদ্দিন ও কানাই দত্ত। শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের টপ্পায় সুগভীর চিন্তা ও অনুশীলনীর স্বাক্ষর মুদ্রিত। শঙ্করা রাগে পরিবেশিত সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের খেয়াল রাগশুদ্ধতা, স্বরস্পষ্টতা ও মেজাজ আনন্দদায়ক। তবে তানের অঙ্গে বৈচিত্র্যের অভাবে মাঝে মাঝে একঘেয়ে লেগেছে। ঠুংরী ইনি সুন্দর গেয়েছেন।

ওস্তাদ আমীর খাঁ পরিবেশিত চন্দ্র-মধুর, কলাশ্রী, ললিত ও গুজরী টোড়ি তাঁর স্বভাবানুগ শান্ত মেজাজেই গেয়েছেন। ওপরের দিকে তাঁর কণ্ঠ সহজ সঞ্চারী নয় বলেই হয়ত অন্তরা অঙ্গ তিনি ছুঁয়েই চলে এসেছেন। এবং এ অংশ বাড়ত্ সুবিস্তৃত না হওয়ার বৈচিত্র্যহীনতা অনেকেরই ভাল লাগেনি। ত্রি-তালে লয়াকারীর অভাব তাদের ক্ষুন্ন করেছে—কলাবন্তী অঙ্গে যাঁরা আবেগ ও উত্তেজনা পিয়াসী। মালতী পান্ডের পুরিয়া ধানেশ্রী ও 'নন্দ'এ নির্ভুল রাগপরিবেশনা ও স্বর-প্রয়োগ সত্ত্বেও অনুষ্ঠান জমে না ওঠার কারণ তাঁর নিস্তেজ কণ্ঠ। সুনন্দা

মা ও মাটি/নন্দিনী

পট্টনায়েকের বৈরাগী ভৈরব তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য পরিবেশিত হয়ে শ্রোতাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন সিক্ত হয়েছে। এক মর্যাদা গম্ভীর অধ্যাত্ম ভাব যেন আরাধনার পরিবেশ সৃষ্টি করে। শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে ইনি শোনালেন সেই অতুলনীয় ভজন যা 'ওঙ্কারনাথকে' স্মরণ করিয়ে দেয়। নিখিল ঘোষের তবলাসঙ্গত আশানুরূপ হয়নি।

শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি শিষ্যের মধ্যে শচীন বসুর গানে প্রতিশ্রুতির আশ্বাস পাওয়া গেল। সুধেন্দু মুখোপাধ্যায় যথাযোগ্যমানে প্রতিষ্ঠিত নন।

যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে বহুদিন বাদে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব শ্রোতাদের আনন্দের কারণ হয়েছে। দরবারী কানাড়ার জমাটবাঁধা বেদনা তারে আন্দোলিত গান্ধারে যেমন অনুরণিত হোলো তেমনই কল্পনার মহৎ বিস্তার নানা ছন্দ ও লয়ের জোড় অঙ্গে।

পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্য নেই কারণ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত থেকে যে বস্তু এক সংহত, সংযত মাধুর্য সৃষ্টি করেছে সে হোলো তাঁর অসামান্য শিল্পবোধ। মণিলাল নাগের দুটি অধিবেশনের মধ্যে শুদ্ধসারং ও ঠুংরী অধিকতর চিত্তগ্রাহী। দরবারী কানাড়ার আলাপ অঙ্গ যথাযোগ্য, তবে গতের অঙ্গে আড়ানার ছায়া দরবারী কানাড়ার গাম্ভীর্যে ক্ষুণ্ণ করেছে, যদিও শ্রুতিমাধুর্যের অভাব ঘটেনি। বিমল মুখোপাধ্যায়ের দরবারী কানাড়া এক বিশেষ বাদনশৈলীর প্রামাণ্য নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান। শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় 'পূরিয়া মঞ্জরী' রাগে বাজিয়ে শোনান—পূরিয়া কল্যাণের সঙ্গে এ রাগের সামান্যই তফাৎ।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নিভা দাসের বেহালাবাদন প্রশংসার্হ তবে আরো শিক্ষা ও রেওয়াজ দরকার। ঝিনঝোটি এবং মিশ্র

জীবন সৈকতে/মণিকা মিত্র পরিচালনা : স্বদেশ সরকার

মলার রাগে ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেতার বাদন অন্তর স্পর্শ করে বিশেষ করে ভাবমাধুর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যই। রবীন ঘোষ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বাগেশ্রীর আলাপ ও যোগরাগে পরিবেশিত গতে। বাহাদুর খাঁর আহির ভৈরব রাগে আলাউদ্দিন ঘরানার উচ্চমান সুপরিলক্ষিত যদিও গতের অঙ্গে লয়কারীর প্রাবল্য রাগের অন্তর্নিহিত শান্ত ভাবকে কিছুটা ব্যাহত করেছে। বোলের স্পষ্টতা ও লয়দক্ষতার কারণে প্রশংসিত হয়েছে সৌমেন ঘোষের তবলা-লহরা। সঙ্গতিয়াদের মধ্যে কেরামৎ খাঁর বিচার নিষ্প্রয়োজন। নিখিল ঘোষ একক তবলাবাদক হিসাবে মনে যতটা দাগ কাটতে পেরেছেন সঙ্গতকার হিসাবে ততটা নয়। কানাই দত্ত আপন মানেই প্রতিষ্ঠিত। অমর দে ও স্বপন চৌধুরী তরুণ তবলাবাদক হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন।

নতুন রেকর্ড

গ্রামোফোন কোম্পানীর নতুন উপহার শ্রীঅরবিন্দের বাণীবাহী একটি এল, পি, ডিস্ক ও দেশাত্মবোধক দুটি ই, পি, রেকর্ড বর্তমান যুগ ও পরিবেশের পটভূমিকার ছন্দেই ছন্দ মেলানো যেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা।

শ্রীঅরবিন্দ দেশপ্রেমিকই শুধু নন। তিনি একাধারে দেশনেতা, কবি, দার্শনিক, সত্যদ্রষ্টা সাধক। মানুষ তাঁর দর্শনে সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি নয়—সে হোলো সচ্চিদানন্দের অংশ আর তার অন্তরশায়ী শুদ্ধ চৈতন্য অথবা চৈতন্য-পুরুষের জাগরণ ঘটানোর প্রয়াসই হবে তার চরম সাধনা।

এই দিব্যজীবনের স্বপ্ন তাঁর লাইফ ডিভাইন, সাবিত্রী এই রকম কত সৃষ্টিতে না ছড়ানো।

শোনা গেল করণ সিং-এর সংহত গম্ভীর কণ্ঠে শ্রীঅরবিন্দের নানান রচনা ইনভিটেশন, রু, রিভিলেশন, কাম গোল্ড অফ গড, দি গোল্ডেন লাইট, ক্রস এ ব্রিজ অফ সারিয়েল সায়েন্স, দি সিম্পল উন, দি আওয়ার অফ গড, ফ্রম এসেজ অন দি গীতা, হিম টু দি মাদার অন দি ফিফটিনথ আগস্ট, ১৯৪৭।

শ্রীঅরবিন্দের অনবদ্য রচনাশৈলীর নিদর্শনরূপে প্রথম ৯টি কবিতার মূল্য অপরিসীম। উপরিপাওনা হিসেবে অনুভব করা যায় তাঁর ধ্যানচিন্তার ছায়া।

দ্বিতীয়ার্ধে গদ্যাংশ — সাধক শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মচিন্তার ভাস্বর রূপ। সমাপ্ত হয়েছে ফিফটিনথ অব আগস্ট (১৯৪৭)—যেদিন এই মহান নেতা ও ভারতের স্বাধীনতালাভের দিনটির আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটেছে।

ই, পি, ডিস্ক লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠে 'সত্যমেব জয়তে', ও 'যে সমর মে' পরিবেশিত হয়েছে—সহশিল্পীরূপে আছেন জয়দেব, নরেন্দ্র শর্মা, উদ্ধবকুমার। এই রেকর্ডের লভ্যাংশ শিল্পীরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্পণ করেছেন। 'মেরী পিয়ারী জন্মভূমি'—রেকর্ডে ঐ গান ছাড়াও যে গানগুলি মান্না দের কণ্ঠে শোনা গেল সেগুলি হোলো 'ইয়ে জশ জগ হ্যায়' 'ইজ বাড় লজায়' 'আমন কা সিপাহী'।

এঁদের মত শিল্পীর কণ্ঠসম্পদ ও আবেগ মিশে গানগুলি যে কত আকর্ষণীয় হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

খেলাধূলা

দর্শক

দলীপ ট্রফি

...পুরের কীনান স্টেডিয়ামে ...৬৫ দলীপ ট্রফি আঞ্চলিক ক্রিকেট ...গিতার সেমি-ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল ...ম ইনিংসের রান সংখ্যার ভিত্তিতে ...ল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ... এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে ...ঞ্চল দল ৯ বার এই প্রতিযোগিতার ...লে উঠলো এবং ইতিপূর্বে তারা ৭ দলীপ ট্রফি জয়ী হয়ে সর্বাধিক-এই পুরস্কার লাভের রেকর্ড ... আঞ্চলিক দলীপ ট্রফি ক্রিকেট ...গিতার সূচনা ১৯৬১—৬২ সালে। ...বের প্রতিযোগিতায় অজিত ওয়া-...দেকার) পশ্চিমাঞ্চল দলের এবং ...সেনা (বিহার) পূর্বাঞ্চল দলের ...ত্ব করেন।

...ম দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ...১ টি উইকেট খুইয়ে ২৮৯ রান ...রেছিল। ১ম উইকেটের জুটিতে ...গাভাস্কার (১০১ রান) এবং রাম-...নাথ (১৩১ রান) দলের ২২৫ রান ...ভিত শক্ত করেছিলেন। এখানে ...গাভাস্কার এবং পাকার দলীপ ...তিযোগিতায় প্রথম খেলতে নেমেই ...রির গৌরব লাভ করলেন।

...ই দিনে লাঞ্চের পর ৩৮ মিনিট ...মাঞ্চল ৪৪৯ রানের মাথায় ...দের প্রথম ইনিংসের খেলার ...ষণা করে। অশোক মানকাদ ...রানে অপরাজিত থাকেন। ...কি সময়ের খেলায় ২ উইকেটের ...১০১ রান সংগ্রহ করে। খেলার ...দিন পশ্চিমাঞ্চলের ১ম ইনিংসের ...রান অতিক্রম করে খেলায় জয়লাভ ...পূর্বাঞ্চলের আরও ৩৪৯ রান ...র প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ...দিনের খেলা এবং ১ম ইনিংসের ...ট।

...য় অর্থাৎ শেষ দিনে পূর্বাঞ্চলের ...স ২১৫ রানের মাথায় শেষ হলে ...৪ রানের পিছনে পড়ে ফলো-অন ...ত হয়। পূর্বাঞ্চলের ২য় ইনিংসের ...রানের মাথায় (৩ উইকেটে) খেলাটি ...।

...নালে পশ্চিমাঞ্চল দলের বিপক্ষে ...ক্ষিণাঞ্চল বনাম মধ্যাঞ্চল দলের ...জয়ী দল।

...মাঞ্চল : ৪৪৯ রান (৪ উইকেটে ...। গাভাস্কার ১০১, পাকার ...ওয়াদেকার ৪০ এবং এ ভি মানকাদ ১০০ এবং পানিকর ৬৭ রান। ...১১৩ রানে ২ উইকেট।)

...ঞ্চল : ২১৫ রান (দলজিত সিং ...রায় ৩৯ এবং রমেশ সাকসেনা ...। ইসমাইল ৪৮ রানে ৫ এবং ...৪০ রানে তিন উইকেট)।

...ও ৭৮ রান (৩ উইকেটে। আর মুখার্জি ৩৯ রান। মানকাদ ২১ রানে ৩ উইকেট)।

গালিনা কুলাকোভা (রাশিয়া) : জাপানের সাপ্পোরো শহরে সদ্য সমাপ্ত একাদশ উইন্টার গেমসের ক্রশ কান্ট্রি স্কিয়িং অনুষ্ঠানে তিনটি স্বর্ণপদক জয় করেন। ইনি স্কুলের শিক্ষক, বয়স ২৯।

আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

মাদ্রাজে আয়োজিত ৩৭তম আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে, মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র এবং জুনিয়র বিভাগে মহীশূর দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। গতবারে ২৬তম অনুষ্ঠানেও এই ফলাফল দাঁড়িয়েছিল।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : রেলওয়ে ৩—২ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার রহিমতুল্লা কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৩—০ খেলায় কেরলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ছয়বার ছাদা কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে।

জুনিয়র বিভাগ : মহীশূর ৩—০ খেলায় উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু'বার নারাঙ্গ কাপ জয়ী হয়েছে।

ইন্টার-জোন-সেমি-ফাইনাল

জোন-চ্যাম্পিয়ান হিসাবে নিম্নলিখিত রাজ্য দলগুলি ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলেছিল। এখানে উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাব তিনটি বিভাগেরই সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র দু'টি বিভাগের ফাইনালে খেলে পুরুষ বিভাগে রানার্স-আপ এবং মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করে। অপর দিকে পাঞ্জাব কোন বিভাগেরই ফাইনালে উঠতে পারেনি।

সেমি-ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : রেলওয়ে ৪—১ খেলায় পশ্চিম বাংলা এবং মহারাষ্ট্র ৩—২ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৩—০ খেলায় বিহার এবং কেরল ৩—০ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

জুনিয়র বিভাগ : মহীশূর ২—১ খেলায় মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ ২—১ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা

পুণার ডেকান জিমখানা কোর্টে আয়োজিত এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলসে ৪নং

আন্না-মারিয়া মুলার (পঃ জার্মানী)ঃ জাপানের সাপ্পোরো শহরে সদ্য সমাপ্ত একাদশ 'উইন্টার গেমসে' মেয়েদের সিংগলস টোবোগান অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক বিজয়িনী। ইনি ৪৪-৩২ সেকেন্ডে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন।

বাছাই খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি অপ্রত্যাশিতভাবে ১নং বাছাই প্রেমজিৎলালকে সেমি-ফাইনালে এবং ২নং বাছাই বিজয় অমৃতরাজকে ফাইনালে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছেন। ৩নং বাছাই প্রখ্যাত রমানাথন কৃষ্ণান কোয়ার্টার ফাইনালে আনন্দ অমৃতরাজের কাছে হেরে যান। এবারের প্রতিযোগিতায় মাত্র একজন বিদেশী খেলোয়াড় ছিলেন—আমেরিকার জ্যাক আকেসন। তিনি ২য় রাউণ্ডেই বিদায় নিয়েছিলেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস ঃ ৪নং বাছাই খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি ১—৬, ৬—৩ ৬—৪ ও ৬—১ গেমে ২নং বাছাই খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ ২নং বাছাই জুটি আনন্দ এবং বিজয় অমৃতরাজ (মাদ্রাজ) ৭—৬, ৩—৬, ৬—১ এবং ৫—২ গেমে ১নং বাছাই জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ঃ ১নং বাছাই খেলোয়াড় কিরণ পেশওয়ারিয়া (অমৃতসহরে) ৬—২ ও ৬—০ গেমে ২নং বাছাই সুস্মান দাসকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ঃ রেখা দত্ত এবং উদয় কুমার ৬—১, ৩—৬ ও ৬—১ গেমে সুস্মান দাস এবং শোভা পাওয়ার... পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ঃ কিরণ পেশোয়ারিয়া এবং রয়আপ্পা ২—৬, ৭—৬ ও ৬— গেমে রতন আধানী এবং ... পরাজিত করেন।

ক্রীড়ানুষ্ঠান

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ... সেন্ট্রাল এ্যাসোসিয়েশনের ... ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ... উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ... প্রতিত্ব করেন ক্রীড়া সাংবাদিক ... ভাষাকার শ্রীঅজয় বসু। ... প্রারম্ভে শ্রীরণজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ভাবের কারণে পল্লীর ছোট ছেলে... খেলার অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন।

খেলার ফলাফল

২০০ মিঃ দৌড় ঃ ১ম—শ্রী... কুমার সরে, ১০০ মিঃ দৌড় ঃ ১ম— শ্রীচঞ্চল মজুমদার, ১০০ মিঃ দৌড় (বয়স্কদের) ঃ ১ম—ভানুলাল ... মিঃ দৌড় (সকলের জন্য) ঃ ১ম— ... ব্যানার্জী; ১০০ মিঃ দৌড় (বালকদের) ১ম—দীপক মুখার্জী; ৭৫ মিঃ (বালকদের) ঃ ১ম ভারতী গোস্বামী ... দৌড় (বালকদের); ১ম—অভিজিৎ ... ৭৫ মিঃ দৌড় (বালকদের) ঃ ... গৌতম অধিকারী ; ৫০ মিঃ দৌড় (বালিকাদের) ঃ ১ম— সুলেখা চক্রবর্তী।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক অমৃতের স্বত্বাধিকারিবৃন্দ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবরণ। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখের পরবর্তী প্রথম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিতব্য।

ফর্ম ৪

(রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশনের স্থান—১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

২। প্রকাশনার সময়ক্রম—সাপ্তাহিক. প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিতব্য।

৩। মুদ্রকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৬। যে সব ব্যক্তি পত্রিকাটির অংশীদার বা শতকরা এক অংশের বেশী শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা : সর্বশ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার (মৃত) ১৭১এ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা—২৬; প্রাণতোষ ঘটক (মৃত) ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯; মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী (মৃত) ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা; মনোজ বসু, পি-৫৬০, লেক রোড, কলিকাতা-২৯; গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা; সুমথনাথ ঘোষ, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, বিশু মুখোপাধ্যায়, ১২ডি, রাজা কালীকিষণ লেন, কলিকাতা—৫; ভবানী মুখোপাধ্যায়, ১৬, অভয় বিদ্যালংকার রোড, কলিকাতা—৩৪; তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, ৬, শিবশংকর মল্লিক লেন, কলিকাতা—৪; অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩; তুষারকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩; শচীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা এবং প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

আমি সুপ্রিয় সরকার এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্বাঃ/সুপ্রিয় সরকার

তাং—২৫-২-৭২

১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৩ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 3rd March, 1972 শুক্রবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৮ **.52 Paise**

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

'এক নজরে'

ভ্রান্ত ম্যালথুস : দেড়শ' বছর আগে (১৮২৪ সালে) জনতত্ত্ববিদ ম্যালথুস বলেছিলেন, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ প্রভৃতি মনুষ্যঘাতী ব্যাপক বিপর্যয়গুলি মানুষের ছদ্মবেশী বন্ধু। কারণ মানুষ যখন বাড়ছে জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮ গতিতে), আর খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে গাণিতিক হারে (১, ২, ৩, ৪ গতিতে), তখন সব মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই দুর্ভিক্ষ, সংক্রামক রোগ বা যুদ্ধ কয়েক বছর অন্তর এসে যে কিছুটা 'স্টক ক্লিয়ারেন্স'-এর কাজ করে দিয়ে যায় সেটা খারাপ কিছু নয়। পৃথিবীতে যদি কোনদিন যুদ্ধ না হত বা দুর্ভিক্ষে সংক্রামক রোগে অগণিত মানুষের প্রাণহানি না হ'ত তাহলে মানুষের ভিড়ে আজ পৃথিবীতে পা রাখারও জায়গা থাকত না।

ম্যালথুসের এই তত্ত্ব সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল মহলে আলোড়ন আনে, কিন্তু আপন ভাগ্য জয়ে বিশ্বাসী মানুষ কোনদিন প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক বিপর্যয়কে অমোঘ বিধিলিপি বলে মেনে নেয় নি। তাই ক্ষুধা ও রোগ জয়ের সংগ্রামে মানুষ কখনও ক্ষান্ত হয় নি বা যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে মদৎ দিতেও বুদ্ধিজীবী শান্তিকামী মানুষ কখনও পশ্চাদপদ হয় নি। মানুষের নিরলস বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের ফলেই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত হ'তে চলেছে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগগুলি, যাদের আক্রমণে একদা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হ'ত। প্রচন্ড রাজনৈতিক বিপর্যয় ছাড়া কোন দেশে ক্ষুধায় ব্যাপক মৃত্যুও আজ অসম্ভব ঘটনা, সরবরাহের পথ উন্মুক্ত থাকলে অতি দুর্গম দেশেও পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে খাদ্য পৌঁছে যায়। আর এই পরমাণু অস্ত্রের যুগে কোন ব্যাপক বিশ্বযুদ্ধ আর হবে না বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ম্যালথুস উল্লেখিত জন-নিয়ন্ত্রণ শক্তিগুলিকে জনগণ নিজের হাতেই শক্তিহীন করে দিচ্ছে আর তার ফলে পৃথিবীর লোকসংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত গতিতে। কিন্তু যে কারণে ম্যালথুস আশঙ্কিত শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন এগিয়ে আসে নি। ম্যালথুসের রচনা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বৃটেনের লোকসংখ্যা বেড়েছে পাঁচ গুণ, আর আমেরিকার পঁয়ত্রিশ গুণ, কিন্তু সে-সব দেশই এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বাধিক সমৃদ্ধ দেশ। ম্যালথুসের সমকালে রাশিয়ার লোকসংখ্যা ছিল চার কোটি, দেড়'শ বছর বাদে আজ রাশিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় চব্বিশ কোটি। তাতে রাশিয়া দীন বা দিশাহারা না হয়ে হয়েছে পৃথিবীর দুই বৃহত্তম শক্তির একটি। সুতরাং তত্ত্বের কথা বাদ দিয়ে শুধু বাস্তব পরিস্থিতির বিচারেই প্রমাণ করা যায় যে ম্যালথুস তত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রকাশিত এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১৬০০ খৃষ্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত, অর্থাৎ সাড়ে তিনশ বছরে যুদ্ধে মোট সাড়ে চার কোটি সামরিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে প্রায় তিন কোটি লোকের, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা ৯১ লক্ষ। **অথচ ঐ সময়ের ব্যবধানে (১৬৫০-১৯৫০) পৃথিবীর লোকসংখ্যা পঞ্চাশ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০০ কোটি। সুতরাং তার মধ্যে ঐ সাড়ে চার কোটি লোক বেঁচে থাকলে কি আর এমন ক্ষতি হ'ত?** রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, দুর্ভিক্ষ, **মহামারী ও যুদ্ধ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা মাত্র দশ বছর পিছিয়ে রাখতে পেরেছে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধে যদি কোনদিন পৃথিবীর কেউ না মরত তবে ১৯৮০ সালে পৃথিবীর যা লোকসংখ্যা হবে তাই হ'ত ১৯৭০ সালে।** তাতে **নিশ্চয়ই পৃথিবী রসাতলে যেত না, কারণ ১৯৮০** সালে পৃথিবী **শুধু মনুষ্যভারে রসাতলে যাবে এমন আশঙ্কা কেউ প্রকাশ করে নি।**

ভাষা প্রসঙ্গে : কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মারিও পেই সম্প্রতি বিশ্বের ভাষা সম্পর্কে একটি চিন্তাসমৃদ্ধ নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, সারা পৃথিবীতে এখন দু' হাজারেরও বেশি ভাষা প্রচলিত আছে, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ডজনখানেক ভাষা আছে যার প্রতিটিতে পাঁচ কোটি বা তার বেশি লোক কথা বলে। সে ভাষাগুলি হ'ল—ইংরেজি (৩০ কোটি), হিন্দুস্তানি (২০ কোটি), স্প্যানিশ (১৬ কোটি), রাশিয়ান (১৪ কোটি), জার্মান (১১ কোটি), জাপানি (১০ কোটি), পর্তুগীজ (৯ কোটি), আরবি (৯ কোটি), বাংলা (৯ কোটি), ফরাসি (৮ কোটি), ইতালিয় (৬ কোটি) ও জাভানিজ (৫ কোটি)।

অধ্যাপক পেই বলেছেন, রাজনৈতিক কারণে ইংরেজি ভাষার প্রচার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ব'লে ইংরেজি ভাষীদের মধ্যে অন্য ভাষা শেখার অনিচ্ছা দিনে দিনে বাড়ছে। তিনি বলেছেন, ইংরেজি ভাষীদের ধারণা, একুশ শতাব্দী নাগাদ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একটা যেমন-তেমন ইংরেজি, যাকে বলে 'ব্যাড ইংলিশ' চালু হয়ে যাবে সুতরাং তাদের অন্য ভাষা শেখার দরকার কি? কিন্তু অধ্যাপক পেই সতর্ক ক'রে বলেছেন, রাজনৈতিক কারণে আজ যা সত্য, আর এক রাজনৈতিক কারণে তাই একদিন মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। ইউরোপে মধ্যযুগ থেকে নেপোলিয়নের সময় পর্যন্ত ফরাসি ভাষা ছিল ক্রুসেডরদের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' এবং শিক্ষিত ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মহলে সর্বাধিক প্রচারিত ভাষা। কিন্তু ফরাসি ভাষার সে মর্যাদা আজ লুপ্ত, তারই শূন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজি ভাষা। কিন্তু এ অধিষ্ঠান চিরস্থায়ী মনে করার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। কারণ এখনই, শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরে তাকে হার মানাতে পারে চীন। চীনের জনসংখ্যা এখনও মোটামুটিভাবে তিনটি বৃহৎ ও পরস্পরের অবোধ্য ভাষা জোটে বিভক্ত। কিন্তু চীনের কমুনিস্ট সরকার তার মধ্যে 'মান্দারিন চীনা' ভাষাকে সংশোধিত লাতিন হরফে লিখিত রূপ দিয়ে তাকেই চীনের রাষ্ট্রভাষা এবং সকল চীনার অবশ্য শিক্ষণীয় বলে ঘোষণা করেছেন। অপর দুটি বৃহৎ চীনা ভাষা থেকেও প্রচুর শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে ঐ সরকারী ভাষায় এবং ঐ ভাষার নাম দেওয়া হয়েছে 'পুস্তোংহুয়া' অর্থাৎ বিশ্বজনীন ভাষা। সুতরাং অনতিবিলম্বে 'পুস্তোংহুয়া' হয়ে উঠবে পৃথিবীর আশি কোটি, অর্থাৎ ইংরেজিভাষীর তিন গুণ মানুষের লিখিত ও কথ্যভাষা।

বিদেশী হরফে লেখা ও কয়েকটি ভাষা থেকে সঙ্কলিত শব্দে কৃত্রিম ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁরা সন্দিহান তাঁরা উর্দু ভাষার সৃষ্টি বৃদ্ধি ও প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই নিঃসন্দেহ হ'তে পারবেন। ভারতে মুশ্লিম অভিযানকালে বহিরাগত সৈনিকদের প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছিল ঐ ভাষা, উর্দু মানেই হ'ল শিবিরের ভাষা। ভাষাটির মূল ভিত্তি হ'ল ফার্সি হরফ ও হিন্দি ভাষা, তার মধ্যে পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আরও কত আরবি ফার্সি ও ইরানি তুরানি শব্দ। তাতে উর্দু হয়েছে আরও সমৃদ্ধ ও বহুজনবোধ্য। ইসলাম অভিযানের যুগ শেষ হয়েছে, কোথায় কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের সৈন্য শিবির, কিন্তু উর্দু ভাষাও সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। অধ্যাপক পেই এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভাষা সমস্যা সমাধানে **ইস্রায়েল ও ইন্দোনেশিয়ার সফল** প্রয়াসের কথা।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

রাজনীতির নতুন খেলা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসনের পিকিং সফরকে রাজনীতির এক নতুন খেলারূপেই চিহ্নিত করা যায়। গত বাইশ বছর ধরে চীনের সঙ্গে আমেরিকার যে চরম শত্রুতা ছিল এই সফরের দ্বারা তার অবসান ঘটিয়ে নতুন কূটনৈতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যময়। মহাশক্তিধর মার্কিন প্রেসিডেন্ট যেচে এই নিমন্ত্রণ আদায় করেছিলেন এবং এককালের শত্রুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন পিকিং-এ। এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। এতে চীনাদের জাতীয় দম্ভ বা অহংকার অটুট রইল। তাঁরা বলতে পারবেন যে, দ্যাখো আমেরিকা আসলে কাগুজে বাঘই। নইলে এমনভাবে তার প্রেসিডেন্ট ছুটে আসতেন না আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। নিকসনের গরজ বেশি। তাই কে কি বলল সেদিকে নজর না দিয়ে তিনি কাজের কথা বলার জন্য পিকিং-এর নেতাদের সঙ্গে পাঁচদিনব্যাপী আলোচনা শেষ করে ঘরে ফিরলেন।

আমেরিকা ও চীন পরস্পর আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে যদি বিরোধ মিটিয়ে ফেলে তাহলে কারো কিছু বলার থাকবে না। আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসাই তো প্রত্যেক শান্তিকামী দেশের কাম্য। কিন্তু সেয়ানে সেয়ানে যখন কোলাকুলি হয় তখন ব্যাপারটাকে অত সহজ চোখে দেখা যায় না। মার্কিন সরকার রাতারাতি তপস্বী বনে গেল এটা যেমন বিশ্বাস্য নয়, দুনিয়ায় বিপ্লবের জিম্মাদার চীন তেমনি শান্তি শান্তি বলে উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য সুরু করল, এও এক অভাবনীয় ঘটনা বলেই লোকে মনে করবে। এশিয়ার বুকে মার্কিন সমরশক্তি এখনও চেপে বসে আছে। ভিয়েতনামে নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন বিমানবাহিনী ও তার তাঁবেদার সৈন্যরা। কোরিয়ার বুকেও মার্কিন সৈন্য রয়েছে কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়াকে দরকার মত শায়েস্তা করার জন্য। পরমাণু শক্তিধর মার্কিন সপ্তম নৌবহর তাইওয়ান থেকে সুরু করে গোটা দক্ষিণ চীন সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে কমিউনিস্টদের ঠেকাবার জন্য। অথচ এরি মধ্যেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট চাইছেন চীনের সঙ্গে একযোগে 'লং মার্চ' করতে। উদ্দেশ্য—মানবজাতির কল্যাণ। খুবই ভাল কথা। কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকলে এ নিয়ে কোনো চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সব কথাই এত সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনিই তো শান্তি রক্ষার নামে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশের দরিয়ায়। তিনিই পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনীকে অস্ত্র শস্ত্র জোগান দিচ্ছিলেন নিরীহ বাঙালীদের হত্যা করে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডত্ব রক্ষা করার জন্য। ভারতকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি বড় রকমের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হতেন না যদি পাকিস্তান তার আগেই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে না যেত। বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের উদ্বেগ ও উদ্যমের এই নমুনা দেখার পর পিকিং-এ তাঁর সুভাষিতাবলীর ওপর তাই সহজে আস্থা রাখা যায় কি?

এশিয়ার ওপরে এতকাল পশ্চিমী শক্তিগুলোই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোড়লী করে আসছিল। এশিয়ার অধিকাংশ দেশই ছিল ইয়োরোপের কোনো না কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লুন্ঠনের উপনিবেশ। আমেরিকার কোনো উপনিবেশ না থাকলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার আধিপত্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এখন চীন সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠায় আমেরিকা চাইছে তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে এশিয়ার শক্তির ভারসাম্যটা ঠিকঠাক করে নিতে। অর্থাৎ এশিয়া বিষয়ে চীনের কথা বলার অধিকার আমেরিকা পরোক্ষে স্বীকার করে নিতে চাইছে। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় এই পুরনো শক্তির খেলা অচল। এশিয়ার সমস্যা এশিয়াবাসী নিজেরাই সমাধান করবে। অপর কারো খবরদারী তারা আর সহ্য করতে রাজী নয়। সুতরাং এশিয়ায় কী ঘটবে বা ঘটা উচিত তা শুধু পিকিং-এ বসে আলোচনার দ্বারা নিষ্পত্তি হতে পারে না। টোকিও, হানয়, জাকার্তা, ঢাকা, নয়াদিল্লীর বক্তব্যও সেখানে খুবই সঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক। বৃহৎ শক্তি বলে নিজেদের যাঁরা জাহির করেন তাঁরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বলয় স্থির করবেন এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন দেশগুলো বিনা বিচারে সেই সীমারেখা মেনে নেবে, আজকের পরিবর্তিত দুনিয়ায় একথা চিন্তা করা খুব রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় নয়। উত্তর ভিয়েতনাম একটি ক্ষুদ্র দেশ, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে তার দুর্জয় প্রতিরোধ দুনিয়ার শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করে পারে না। সেই ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিশ্চয়ই ওয়াশিংটন বা পিকিং বলে দিতে পারে না। তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশে কী হবে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব এখানকার জনগণের। বৃহৎ শক্তিবর্গের দূতিয়ালী, মিতালী বা গোপন চুক্তির দ্বারা তা নির্ধারিত হবে না। তবে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথে যে-কোনো সমস্যার সমাধান সকলেরই কাম্য। বিশেষ করে ভারত সব সময়েই এ ধরনের আলোচনার পক্ষপাতী। মার্কিন দেশের সঙ্গে চীনের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটলে তাকে শান্তিকামী মানুষ স্বাগত জানাবে। কিন্তু একে নতুন কোনো রাজনৈতিক জোট হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা হলে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশগুলো তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধা করবে না।

বৈদিক ঋষি বলেছেন—'পশ্য দেবস্য কাব্যম্ ন জীর্যতি ন মমার'। দেবতার (আদি কবি পরব্রহ্মের) রচিত এই বিশ্ব-প্রকৃতিরূপ কাব্যের দিকে তাকাও. এতে জীর্ণতাও নেই. মৃত্যুও নেই। তাই তো আমরা দেখতে পাই, শীতের জীর্ণতার পরে বসন্তের সমাগমে প্রকৃতি নতুন সাজে সজ্জিতা হয়, কোন যাদুমন্ত্র-বলে বৃদ্ধা যেন নবযৌবনের শ্রীসম্পন্না হয়, আবার গ্রীষ্মের কৃচ্ছ্র ও উগ্র তপস্যার পর আকাশ থেকে স্নিগ্ধ বারিধারা নেমে এসে পৃথিবীকে শ্যামলা ও শস্যশালিনী করে দেয়। আবার একথাও সত্য যে, প্রকৃতির রাজ্যে সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা চলেছে পাশাপাশি। তাই বসন্ত-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'বসন্তে কি শুধুই কেবল
ফোটা ফুলের মেলা রে,
দেখিস না কি শুকনো পাতা
ঝরা ফুলের খেলা রে'।

বাংলাদেশে বসন্ত ঋতু হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ক্ষণজীবী, তাই তাকে বরণ করে নেবার মতো মনের প্রস্তুতি থাকা চাই। বসন্ত-সম্পর্কে একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'কখন বসন্ত গেল,
এবার হোলো না গান,
কখন বকুল-মূল
ছেয়েছিল ঝরাফুল,
কখন যে ফুল-ফোটা
হয়ে গেল অবসান।
কখন বসন্ত গেল,
এবার হোলো না গান'।

শরতের নিরভ্র আকাশ, শ্যামলা ধরণী, আদ্রতাবিহীন স্নিগ্ধ সমীরণ ভরা নদী ও বিহঙ্গের কলগান বৈদিক ঋষিদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তাই তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন, 'পশ্যেম শরদাং শতম্ জীবেম শরদাং শতম্' অর্থাৎ আমরা যেন শত শরৎকাল দর্শন করি, আমরা যেন শত শরৎকাল বেঁচে থাকি। পরবর্তীকালে মহর্ষি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ করে কতো কবিই তো নিপুণ চিত্রকরের মতো নানা ঋতুর সৌন্দর্যের ছবি এঁকেছেন। শুধু প্রকৃতির রূপ, রস, শব্দ, বা গন্ধ সম্পর্কেই যে কালিদাস সজাগ ছিলেন তাই নয়, তরুণ-তরুণীর মনের ওপর বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব-সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব মহাজনগণও বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ও চিত্রাঙ্কন-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পদকর্তাগণ প্রধানত শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলারই বর্ণনা করেছেন, কারণ, তাঁরা জানেন—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ'।

শ্রীকৃষ্ণের দোল-লীলা এই মধুর-লীলারই অন্তর্গত। এই মধুর লীলার সময় শ্রীভগবান যোগমায়ার দ্বারা নিজের স্বরূপ আচ্ছাদন করেন বলেই শ্রীমতীর সঙ্গে তাঁর এই প্রেমের লীলা চলে। কিন্তু কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখতে পান, নিত্য বৃন্দাবনে নিত্যকাল এই লীলা চলেছে। রক্তবর্ণ কুঙ্কুম এই অনুরাগেরই প্রতীক। ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে যখন আম্রমুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর হয় কোকিলের কূজনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হয়, তখনই তো নিখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধার এই প্রণয়-লীলার উপযুক্ত সময়। অবশ্য এ লীলাও প্রকট-লীলা।

'কুঙ্কুম' কাব্যগ্রন্থের উপক্রমে কবি বলছেন—

'কে আর তোমারে
ভালোবাসিবে কুঙ্কুম?
আশা, চিন্তা, সুখ সব
যত কিছু অভিনব
দেশময় নূতনের জবর জুলুম'।

কবি গোবিন্দ দাসের অভিযোগ হচ্ছে—
'যাহারা পুরাণা দল
সকলেই বেদখল
নাহি আর আগেকার সে ভারত-ভূম'।

কারণ, এখন যুবক-যুবতীরা 'প্রমত্ত অটো-ডি-রোজে',—যখন চারদিকে নানাবিধ 'পারফিউমের মরশুম' চলেছে, তখন কুঙ্কুমকে আদর করবে কে?

কবির অভিযোগ স্বীকার করেও একথা বলতে হয়, কুঙ্কুমের আদর হয়তো ভারত থেকে কখনো একেবারে বিলুপ্ত হবে না।

বাঙ্গালীর দুটি প্রধান উৎসব—দুর্গোৎসব আর দোল। একটি শরৎকালীন উৎসব, যাকে কবির অশ্বমেধ-যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর একটি বসন্তোৎসবের অঙ্গ। বসন্তোৎসব হচ্ছে প্রাচীন ভারতের বহুল প্রচলিত মদনোৎসব যার বর্ণনা রয়েছে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাদিতে এবং যা আজো একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। শ্রীপঞ্চমীতে এর আরম্ভ এবং দোললীলায় এর পরিসমাপ্তি। কন্দর্পদেবের পূজা এবং ফল্গুৎসব (ফাগুয়া) এই উৎসবের অঙ্গ। এই উৎসবে কুঙ্কুম ও রঙ-এর ছড়াছড়ি, আর দোদুল দোলায় দোল খাওয়া-অন্তরের অনুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ। বসন্তোৎসবের অঙ্গীভূত এই দোল-লীলায় আমরা প্রাকৃতজনেরা রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলারই অনুসরণ করি। আমরা তো নিত্য সুখ-দুঃখের দোলায় দোল খাচ্ছি।

Man! Thou art a pendulum betwixt smiles and tears—Byron.

আবার প্রকৃতির রাজ্যেও এই দোল-লীলা চলেছে। তাই কান্ত কবি লিখেছেন—

'স্বর্ণোজ্জ্বল কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর
জল মাঝে খেলে মৃদু দোল।'

কিন্তু যিনি স্বয়ং মদনমোহন বা মদন-মন্মথ, যাঁর চরণে শরণ নিলে প্রাকৃত মানুষের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়, মধুর রসের সাধক যখন তাঁর সঙ্গে অপ্রাকৃত দোললীলার আস্বাদন করেন, তখন তাঁর কাছে 'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'।

বাঙ্গালীর নিকট এই দোল পূর্ণিমা বা ফাল্গুনী পূর্ণিমার আরও একটি সুগভীর তাৎপর্য আছে। প্রায় পাঁচশো বছর পূর্বে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) এই পুণ্য তিথিতেই নদীয়া নগরীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম ও 'প্রেমধর্ম' প্রচারের ও নিজ রসাস্বাদনের জন্য, শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেদিন 'চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়'। অথবা অকলঙ্ক চন্দ্রের আবির্ভাবে সকলঙ্ক চন্দ্র লজ্জায় মুখ ঢাকলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতকারেরা বলেছেন, এই চন্দ্রগ্রহণের আরো সার্থকতা আছে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, তৎকালীন নবদ্বীপে বাঙ্গালী-মনীষার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছিল। সেদিন বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের সঙ্গে বাগযুদ্ধে বালকেরাও অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতো। দুঃখের বিষয়, বিদ্যা ও আভিজাত্যের গর্বে গর্বিত এই সব পণ্ডিতদের হৃদয় ছিল শুষ্ক মরুভূমির মতো, ভক্তির স্নিগ্ধ বারিধারা তাঁদের হৃদয়কে কখনো আর্দ্র করে নি। তখন ধর্ম শুধু বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়েছিল অর্থাৎ ধর্মের গ্লানি ঘটেছিল।

কিন্তু ভক্তের কাতর ক্রন্দন ছাড়া তো বৈকুণ্ঠবিহারী মর্তধামে অবতীর্ণ হন না। তাই জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য তুলসীর মঞ্জরী ও গঙ্গাজলে নিত্য কৃষ্ণসেবা করতেন এবং কৃষ্ণাবেশে হুঙ্কার ও গর্জন করতেন। বৈকুণ্ঠের অধিপতি তখন জীবের উদ্ধারের জন্যে নেমে এলেন মর্তধামে। এদিকে চন্দ্রদেব রাহুগ্রস্ত হওয়াতে 'হরিবোল' ধ্বনিতে দিগ-দিগন্ত প্লাবিত হোলো, কেউ অভ্যাস বা সংস্কারের বশে, কেউ বা লীলাচ্ছলে 'হরিবোল' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। এর দ্বারা বুদ্ধিমানেরা বুঝতে পারলেন যে, আজকের এই পুণ্যতিথিতে যাঁর আবির্ভাব ঘটলো, তিনি নাম ও প্রেমের বন্যায় নিখিল ভুবন প্লাবিত করবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব-সম্পর্কে একালের কবি বলেছেন — 'বাঙ্গালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'।

আর সেকালের পদকর্তা নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

'গৌরাঙ্গের দুটি পদ
যার ধন-সম্পদ
সে জানে ভক্তিরসসার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা
যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তার'

সেকালের একজন বৈষ্ণব মহাজন বলেছেন—

'যদি গৌর না হইত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে,
রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
ভূতলে জানাতো কে'?

বাঙ্গালী জানে, ফাল্গুনী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁর আবির্ভাবের দ্বারা ধন্য করেছেন। তাই প্রতি দোল পূর্ণিমায় সে স্মরণ করে জঙ্গম হেমকল্পতরুরূপী শ্রীগৌরাঙ্গকে, যিনি জীবের প্রতি করুণাবশত অযাচিতভাবে সকলকে ভুবনমঙ্গল হরিনাম প্রদান করেছেন। **আর স্মরণ করে বলরামের অবতার** শ্রীমন্নিত্যানন্দকে, স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন। এই প্রভু নিত্যানন্দ—

'দয়াময় অতি পতিত পাষণ্ডী
প্রাণে না মারিল কারে,
হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে'।

আজ দোল পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে আমরা পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে বিশ্বের ভরণ-পোষণ-কর্তা, যুগধর্মের পালনকারী, নিখিল জগতের পরম হিতকারী শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীমন্নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। এঁদের দুজনারই বাহু জানু পর্যন্ত লম্বিত, অঙ্গকান্তি স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল, ও চক্ষুদ্বয় কমল দলের মতো বিস্তৃত, আর এঁরা দুজনেই শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীর্তনের একমাত্র প্রবর্তক।

'আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ'

ইংরিজি নববর্ষে অনেকেই অনেক সাধু সংকল্প গ্রহণ করেন, কিন্তু অনেকের পক্ষে ঐ সংকল্প গ্রহণই সার, কারণ সংকল্প পালন করা আর বিশেষ হয়ে ওঠে না। তা নিয়ে অনেক রসিকতাও চালু আছে। আমাদের দেশে নির্বাচন সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চেই হয়, আর নানা দলের নির্বাচনী ইস্তাহার বেরোয় তাই বছরের গোড়াতেই। ঐ সব ইস্তাহার যে ধরনের প্রতিশ্রুতিতে ভর্তি থাকে কেউ কেউ হয়ত তাকে নববর্ষের সাধু সংকল্পের সঙ্গে তুলনা করতে চাইতে পারেন। তার কারণ অধিকাংশ প্রতিশ্রুতিই ঐ ইস্তাহারের পাতাতেই শেষ পর্যন্ত থেকে যায়।

তবু কিন্তু ইস্তাহার প্রতি নির্বাচনেই বেরোয়, যদিও ভোটদাতারা কজন সেই সব ইস্তাহার পড়ার শ্রম স্বীকার করেন সে-সম্পর্কে কেউ গবেষণা করলে হয়ত অনেক আকর্ষণীয় তথ্য জানা যেতে পারে। এবারের নির্বাচনেও সব দল, সব মোর্চা, সব ফ্রন্টের তরফ থেকে যথারীতি ইস্তাহার বেরিয়েছে। এক দফা তো ফ্রন্টের বা মোর্চার তরফ থেকে বক্তব্য জানানো হয়েছে, তার ওপর আবার ঐ সব ফ্রন্টের শরিকেরা নিজ নিজ দলের ইস্তাহার আলাদা করে প্রকাশ করেছেন। মনে হয়, এদের বক্তব্য সম্পর্কে ভোটদাতাদের মনে যাতে কোনো সংশয় না থাকে সে-জন্যে এরা চেষ্টার কোনো কসুর করছে না।

তবে এই সব কর্মসূচী বা প্রতিশ্রুতির বন্যার মধ্যে পশ্চিমবাংলার ভোটদাতাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা এবং বামপন্থী ফ্রন্টের কর্মসূচী। দুই পাল্টা শিবিরের কর্মসূচী হলে কি হবে, একটু খুঁটিয়ে দেখলে দু'পক্ষের কর্মসূচীর মধ্যে বেশ কিছু মিলও চোখে পড়বে। এই মিলের কারণ, পশ্চিমবাংলার বৈষয়িক অবস্থা। সেই বৈষয়িক অবস্থা এখন যে রোগে ভুগছে তার দাওয়াই খুঁজতে গিয়ে দুই পক্ষই একই জায়গায় এসে থেমেছে। যেমন ধরুন, বেকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যবস্থা অথবা লক আউট-ক্লোজার বন্ধ করা, ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার, মুনাফা শিকার ও মজুতদারি বন্ধের উদ্যোগ, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতি।

পশ্চিমবাংলার রোগমুক্তি দূরে থাক তার বর্তমান রোগ যাতে আরো দুরারোগ্য না হয়ে ওঠে সেই জন্যেও যে এই সব ব্যবস্থা দরকার এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দু'পক্ষকেই তাই এই ধরনের কর্মসূচীর ওপর জোর দিতে হয়েছে। আর দু'পক্ষের কর্মসূচীর মধ্যে এই সাদৃশ্য এ কথাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, যদিও এক পক্ষ নিজেদের বামপন্থী বিশেষণে ভূষিত করেছে তবু তাঁদের প্রতিশ্রুত কর্মসূচীর মধ্যে এমন কিছু স্থান পায় নি যার দ্বারা তাদের প্রতিপক্ষকে দক্ষিণপন্থী বা প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করতে সুবিধে হয়।

অবশ্য সাদৃশ্যের এখানেই শেষ নয়। কংগ্রেস-সি পি আইয়ের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা এবং সি পি এম নেতৃত্বাধীন উভয় পক্ষ এবার স্বাভাবিক কারণেই যে বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছে তা হল এই রাজ্যে স্থায়ী সরকার গঠনের প্রশ্ন। ১৯৬৭ থেকে শুরু করে গত পাঁচ বছরে এই চতুর্থ নির্বাচন এবং চার চারটি সরকার, সরকারের অস্থিরতার পটভূমিকায় এবার স্থায়ী সরকার গঠনের প্রশ্নটি যে বড় হয়ে দেখা দেবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার কর্মসূচীর মুখবন্ধে এই প্রশ্নটিকে খুব স্পষ্টভাবেই তুলে ধরা হয়েছে : গত পাঁচ বছরে চারবার তাঁদের (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে) ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। নির্বাচিত অস্থায়ী সরকার আর রাষ্ট্রপতির শাসন—এটাই হয়ে উঠেছে এই দুর্ভাগা রাজ্যের পৌনঃপুনিক লক্ষণ। খুব স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ এমন এক স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার চান যে সরকার জনসাধারণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সচেতন......।'

দু'পক্ষই স্থায়ী সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলেও, কেন যে স্থায়ী সরকার গঠিত হতে পারছে না সে বিষয়ে অবশ্যই দু'পক্ষের বক্তব্য দু'রকম। বামপন্থী ফ্রন্টের আবেদনে বলা হয়েছে : 'কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৭ সাল হতে তারা প্রতি নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করেছে........কংগ্রেসী শাসকেরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে বারে বারে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙেছে।' আর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার মতে এই রাজ্যের অস্থিরতার জন্যে প্রধান দায়ী সি পি এমের। কারণ, সি পি এমের লক্ষ্যই হল 'এই রাজ্যে স্থায়িত্বহীনতা চালু করা এবং সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ অগ্রগতিকে অসম্ভব করে তোলা।' তা ছাড়া সংযুক্ত পার্টির বামপন্থী ফ্রন্ট স্থায়ী সরকার গঠনের কথা বললেও তারা স্থায়ী সরকার গঠনে সত্যিই সক্ষম কিনা মোর্চার পক্ষ থেকে বিগত দুটি যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই মোর্চার 'এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সচেতন ও দেশপ্রেমিক নির্বাচকমণ্ডলী সি পি এম পরিচালিত সাতপার্টির মোর্চাকে ও সিন্ডিকেটের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল জোটকে প্রত্যাখ্যান করে এক শক্তিশালী, প্রগতিশীল ও স্থায়ী সরকার গঠনের জন্যে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার পক্ষে বিপুলভাবে রায় দেবেন।'

বামপন্থী ফ্রন্ট কিন্তু বলছে যে, এবার পশ্চিমবাংলার বামপন্থী দলগুলি শুধু ঐক্যবদ্ধ হয়েই দাঁড়ায় নি, 'অতীতের ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতাগুলি' তারা কাটিয়ে উঠেছে। এই ভুলভ্রান্তিগুলি কী, তার পরোক্ষ হদিসও দেওয়া হয়েছে। যেমন স্বীকার করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে 'একটি দল তাদের প্রভাব বৃদ্ধির অধিকার প্রয়োগ' করতে যাওয়ার ফলে ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এই সব ভুলভ্রান্তি এবং ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ' এবং সেগুলিকে দৃঢ়ভাবে অতিক্রম করার জন্যে বামপন্থী ফ্রন্ট তাই এবার আগে থেকেই সতর্ক হয়ে শরিকদের জন্যে কতকগুলি সর্বসম্মত সম্পর্কবিধিও তৈরি করা হয়েছে। এই আট দফা সম্পর্কবিধির মধ্যে প্রধান কথা হল, প্রত্যেক শরিকের তার নিজস্ব মতামত প্রচারের অধিকার থাকবে এবং কোনো শরিক অপর কোনো শরিকের এই অধিকার খর্ব বা ক্ষুণ্ণ করতে চেষ্টা করবে না। শরিকদের মধ্যে কোনো মত-বিরোধ দাঁড়ালে বা এক শরিক অপরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তুললে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শরিকদের মধ্যে পারস্পরিক

আলোচনার দ্বারা এ ধরনের মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে। ভীতিপ্রদর্শন, মারধরের হুমকি, গালিগালাজ এবং অন্যান্য সবরকম অগণতান্ত্রিক জবরদস্তিমূলক ও অশোভন পদ্ধতি যুক্তফ্রণ্টের ধারণার বিরোধী এবং তাই এসব নিষিদ্ধ।

অনেক ভোটদাতা নিশ্চয়ই এই সম্পর্ক-বিধিকেও সাধু সংকল্পের আওতার মধ্যেই আনতে চাইবেন, কারণ তাঁদের মনে পড়ে যাবে যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের আমলে যখন শরিকী সংঘর্ষের সূত্রপাত হল তখনও এই ধরনের একটি আচরণবিধিই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে শরিকী সংঘর্ষ অথবা যুক্তফ্রণ্টের ভাঙন কোনোটাই ঠেকানো যায় নি। সুতরাং, এবারের সম্পর্কবিধি কতোটা কাজে লাগবে তা কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষার আগে বোঝবার উপায় নেই।

*

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা এবং বামপন্থী ফ্রন্টের বক্তব্যের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য রয়ে গিয়েছে দিল্লীর সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। সাত-পার্টির পক্ষ থেকে যে আবেদন প্রচারিত হয়েছে তাতে এই রাজ্যের যাবতীয় দুর্গতির জন্যে দায়ী করা হয়েছে দিল্লীকে। তাদের অভিযোগ, আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে ন্যায্য অধিকার ও সম্পদ হতে বঞ্চিত করে কংগ্রেস সরকার সমস্ত সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছে এবং রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহায় কৃপাপ্রার্থী করে তুলেছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই নীতি এক মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশি তখন কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত করে চলেছে। রাজ্যগুলির ন্যায্য ক্ষমতা ও অর্থের জন্যে এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের দাবি আদায়ের সংগ্রামকে বামপন্থী ফ্রণ্ট জোরদার করে তুলতে চায়। ফ্রণ্টের মতে, একমাত্র কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী সরকারই রাজ্যগুলির অধিকার ও মর্যাদার সংগ্রামকে জোরদার করে দেশকে শক্তিশালী করতে পারে।

ফ্রণ্টের নেতা সি পি এমের পক্ষে অবশ্য এই 'লাইন' যে মোটেই নতুন নয় তা সকলেই জানেন। গত বছর নির্বাচনের সময় থেকেই ঐ দল এই শ্লোগান নিয়ে নির্বাচনে নেমেছে। বাংলাদেশের ঘটনাবলী যে এই শ্লোগান তুলতে সাহায্য করেছে তাও অজানা নয়। তবে একমাত্র বামপন্থী সরকারই রাজ্যগুলির অধিকার ও মর্যাদার জন্যে সংগ্রাম করতে পারে, এ-দাবি অনেকেই মেনে নিতে নারাজ। কারণ তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকারও রাজ্যের স্বশাসনের দাবিতে জোর লড়াই চালাচ্ছেন। এমন কি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন বিবেচনার জন্যে ডি এম কে সরকার বিচারপতি রাজামান্নারকে নিয়ে একটি কমিশন পর্যন্ত গঠন করেছিলেন এবং সেই কমিশনের বিস্তারিত সুপারিশে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের যে-সব পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় বৈপ্লবিক। কিন্তু তাই বলে ডি এম কে সরকারকে কেউই বামপন্থী সরকার বলতে চাইবেন না, অন্তত সি পি এম যে অর্থে বামপন্থী সে অর্থে তো নয়ই।

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার কর্মসূচীতেও এই প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। মোর্চা এই আশা প্রকাশ করেছে যে, ভারত সরকার এই রাজ্যকে তার ন্যায্য অংশ দিতে এবং রাজ্যকে পুনর্গঠনের কাজে উদারভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। তবে মোর্চার সঙ্গে ফ্রন্টের বক্তব্যের পার্থক্য এই যে, মোর্চা এই প্রশ্নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে নি, করা সম্ভবও নয়। এই প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে সিণ্ডিকেট কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক মোর্চার কর্মসূচীতেও। ঐ মোর্চাও দাবি করেছে, পশ্চিমবাংলার প্রতি দিল্লীর বিমাতৃসুলভ মনোভাবের পরিবর্তন চাই।

আর একটি প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবে সব বক্তব্যের মধ্যেই এসে পড়েছে—সেটি হল পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের বিচারের সময় সব পক্ষই যে অপর পক্ষকে দায়ী করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যেমন, বামপন্থী ফ্রণ্ট বলছে যে, বিশেষত গত নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকে কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে পশুশক্তির জোরে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে এক জঘন্য অত্যাচারের তাণ্ডব চালিয়েছে। পুলিশ সি আর পি এবং নানা রকমের সশস্ত্র বাহিনী এবং শাসক কংগ্রেসের সৃষ্ট বিশেষ গুণ্ডাবাহিনীর সাহায্যে কংগ্রেস সরকার দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে এবং অবাধে লুঠ, খুন, গৃহদাহ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ফ্রণ্টের এই বক্তব্য পড়ে মনে হতে পারে যে পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছে মাত্র গত নির্বাচনের পর। দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে অবস্থা কী রকম ছিল, পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসের রাজনীতি কীভাবে শুরু হল সেই সব দুরূহ প্রশ্নের মধ্যে বামপন্থী ফ্রণ্ট যেতে চায় নি।

সে যাই হোক, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার বক্তব্য একেবারেই বিপরীত। কারণ সেখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, সি পি এম হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি আমদানি ও অনুসরণ করেছে। সি পি এমের ভ্রান্ত ও বিকৃত কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি নকসালপন্থী আন্দোলনের জন্ম দেয় এবং তারা উভয় মিলে উৎপাদন, শিক্ষা ও সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সন্ত্রাসের রাজনীতির উদ্ভব সম্পর্কে দু'পক্ষের ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও দু'পক্ষই কিন্তু অবস্থার প্রতিকার ঘটাবার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা বলেছে যে, তার অন্যতম লক্ষ্য হল আইনের শাসনকে পুনরুদ্ধার করা, জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও শান্তি-বিধান। বামপন্থী ফ্রন্টও বলেছে যে, তাদের লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পুনরুদ্ধার এবং কংগ্রেসকে পরাস্ত করার মধ্যে দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে, কারণ গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করাই নাকি কংগ্রেসী সন্ত্রাসের লক্ষ্য।

নির্বাচনী প্রচারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গও স্বাভাবিকভাবেই এসে যাচ্ছে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা বলেছে যে, 'পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের সম্মুখীন হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে, যে-মুক্তি সংগ্রাম সফল করতে ভারত এক চমৎকার ভূমিকা পালন করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে... পাকিস্তানী সামরিক জুন্টার আক্রমণ আমাদের ওপর যে স্বল্পকালস্থায়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল সেই যুদ্ধে গৌরবময় বিজয়ের প্রেক্ষাপটে।' বামপন্থী ফ্রন্টের অভিযোগ, কংগ্রেস নেতারা বাংলাদেশের জনগণের মহান সংগ্রামের সাফল্যের কৃতিত্বকে নিজেরা আত্মসাৎ করতে চাইছে, অথচ ভারতের সমস্ত জনগণ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী পার্টিগুলি প্রথম থেকে বাংলাদেশের জনগণের সক্রিয় সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার কর্মসূচীর মুখবন্ধে কোথাও বাংলাদেশ নীতির সাফল্যের জন্যে একা কংগ্রেসের হয়ে কৃতিত্ব দাবি করা হয়েছে বলে দেখা গেল না। কারণ সেখানে বলা হয়েছে যে, 'এই বিজয় যথার্থই সমগ্র জাতির সাফল্য, তার দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিসমূহের সাফল্য।'

—দেবাস্ত

দেশ বিদেশ

১৯৭১ সালে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস যেভাবে জয়গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করেছিল বিধানসভাগুলির আসন্ন নির্বাচনেও কি তারা তেমনি সাফল্য অর্জন করবে?

ভারতবর্ষের ১৬টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলের বিধানসভা এবং দিল্লির মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে এই প্রশ্ন উঠছে। যে সব রাজ্যে এবার নির্বাচন হচ্ছে সেগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল এবং গুজরাট ও মহীশূরে কংগ্রেস ভাগ হয়ে যাওয়ার পর আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামীদের হাতে ছিল না। খাস রাজধানী দিল্লির মেট্রোপলিটান কাউন্সিলে ক্ষমতাসীন দল জনসংঘ। এই রাজ্যগুলি কি কংগ্রেস পুনরুদ্ধার করতে পারবে? এবং অন্যগুলি কি নিজেদের হাতে রাখতে পারবে? গতবার জনসাধারণের নাড়ী টিপে কংগ্রেসের বিপুল সাফল্যের পূর্বাভাষ দিতে না পারায়, সাংবাদিকদের ও অন্যান্য রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। সেই কারণেই কিনা কে জানে, এবার নির্বাচনী ভবিষ্যদ্বক্তারা রয়ে-সয়ে কথা বলছেন।

তবে, হাওয়া দেখে ইতিমধ্যে হয়তো স্বচ্ছন্দেই কয়েকটি অনুমান করা চলে। যেমন, আসাম, মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ ও হরিয়ানা নিয়ে কংগ্রেসের উদ্বেগের কারণ নেই। এইসব রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে এমন বিরোধী দল বলতে প্রায় কিছুই নেই। হরিয়ানায় যেটুকু ছিল সেটুকুও এখন কোণঠাসা। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার ও দিল্লি, এই চারটি হিন্দীভাষী এলাকায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী চ্যালেঞ্জ এখনও দূর হয়নি। মধ্যপ্রদেশে জনসংঘের ভোট ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে ১৬.৬৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৮.২৮ শতাংশ হয়েছে, আর সে-জায়গায় কংগ্রেসের ভোট ঐ সময়ে ৩৮.৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে [illegible] শতাংশ হয়েছে। ঐ রাজ্যে জনসংঘের নেতা [illegible] প্রাক্তন মহা[illegible] তাঁর মা। শ্রীমতী বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া নামে নির্দল হলেও আসলে জনসংঘের পক্ষেই প্রচার করছেন। মধ্যভারত অঞ্চলে তাঁদের উভয়েরই বিপুল প্রভাব রয়েছে। কংগ্রেস এই প্রভাব কতখানি কাটাতে সমর্থ হবে তার উপর মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনের ফলাফল অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করবে।

রাজস্থানে কংগ্রেসের পক্ষে এবার কতকটা স্বস্তির কারণ এই যে, ঐ রাজ্যে স্বতন্ত্র দলের আগেকার শক্তি এখন আর নেই। সেখানকার ভারতীয় ক্রান্তি দলও বিলুপ্তপ্রায়। তবে, সেখানে দলের বিদ্রোহীদের নিয়ে কংগ্রেসের একটা সমস্যা রয়েছে। কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অপরাধে সেখানে প্রায় ৪৫ জনকে কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড অথবা বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিধানসভার স্পীকার নিরঞ্জননাথ আচার্য।

•

দলের মনোনয়ন না পেলে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে দলের মনোনীত প্রার্থীর বিরোধিতা করা কংগ্রেসে কোন নূতন ঘটনা নয়। তবে এবার রোগটা আগের তুলনায় বেশী ছড়িয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ((সংগঠন কংগ্রেসের একজন নেতা বলেছেন, দল যখন এক ছিল সে-সময়ে কখনও 'বিদ্রোহী কংগ্রেসী'দের সংখ্যাটা এত বেশী হয়নি।) দলের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অপরাধে একমাত্র অন্ধ্রেই দুইশ-র বেশী কংগ্রেস সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের হিসাব হচ্ছে:—

কাশ্মীর—৬৯
মহারাষ্ট্র—৪২ (বিধানসভার একজন ও বিধান পরিষদের একজন সদস্য সহ।)
মহীশূর—২৭
গুজরাট—১৩ (একজন প্রাক্তন উপমন্ত্রী সহ)
আসাম—২।

এই হিসাবও সম্ভবত অসম্পূর্ণ। শেষ পর্যন্ত এই 'বিদ্রোহী কংগ্রেসী'দের সংখ্যা কত দাঁড়াবে তা এখন বলা কঠিন। নির্বাচনে না দাঁড়িয়েও কিছু বিক্ষুব্ধ মনোনয়নপ্রার্থী কংগ্রেসী যে গোপনে গোপনে মনোনীত কংগ্রেসপ্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করবেন সেটাও জানা কথা। অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দল বলতে প্রায় কিছুই নেই, ১৭ জন কংগ্রেসপ্রার্থী সেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। অথচ কংগ্রেসের পাল্টা প্রার্থীরা বা বিদ্রোহীরা সেখানে দলের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়েছেন। সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস নেতারা যে ভাবিত হয়েছেন তার লক্ষণ ইতিমধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টের কংগ্রেস সদস্যদের কাছে একটি [illegible] পত্র পাঠিয়ে এই আবেদন জানিয়েছেন যে যেসব কংগ্রেসকর্মী মনোনয়ন না পেয়ে হতাশ হয়েছেন তাঁরা যেন সেই হতাশা-বোধের তাড়নায় দলের প্রতি তাঁদের আনুগত্য বিসর্জন না দেন।

এই নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে এবার কংগ্রেসকে যে জটিলতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পত্রে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে সংখ্যালঘু, নারী ও সমাজের অন্যান্য অনগ্রসর অংশকে এবং তরুণ সম্প্রদায়কে অধিকতর প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার যে চেষ্টা করা হয়েছে শ্রীমতী গান্ধী বিশেষভাবে তার উল্লেখ করেছেন।

•

গত বছর লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সিদ্ধান্তের সমর্থনে অন্যতম যুক্তি ছিল এই যে, বিধানসভার নির্বাচন থেকে লোকসভার নির্বাচনকে আলাদা করা দরকার। কেননা, দুটি নির্বাচন একসঙ্গে হলে প্রধান প্রধান জাতীয় প্রশ্নগুলি চাপা পড়ে গিয়ে ছোটখাট স্থানীয় প্রশ্নগুলিই বড় হয়ে ওঠে। এবার বিধানসভাগুলির নির্বাচনে যাতে স্থানীয় প্রশ্ন প্রাধান্য না পায় সেজন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী খুবই সচেষ্ট আছেন। এজন্যই এবারকার নির্বাচনে তাঁর মূল শ্লোগান হচ্ছে, গরীবী হঠাবার যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হলে কেন্দ্রের মতো রাজ্যগুলিতেও গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, স্থায়ী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগী সরকার চাই। অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধী যেমন বিধানসভার নির্বা-

মনেও জাতীয় প্রশ্নগুলিকে উপরে তুলে রাখতে চাইছেন তেমনি সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি জনগণের ঘোষিত আস্থাকেও এই বিধানসভার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ঝালিয়ে নিতে চাইছেন। 'কেন্দ্রে-রাজ্যে-এক-সরকার'-এর এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস তার বৃহত্তম নির্বাচনী মূলধন ভাঙাবারও চেষ্টা করছে। নিঃসন্দেহে সেই মূলধন হচ্ছে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা।

●

এই নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী যেমন কংগ্রেসের বৃহত্তম রাজনৈতিক মূলধন, 'কেন্দ্রে-রাজ্যে-এক-সরকার' যেমন তাদের মূল আওয়াজ তেমনি তাদের নির্বাচনী অভিযানের আশু লক্ষ্য হল বিরোধীদের ভোটের শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ভাঙিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে আনা। ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে কংগ্রেসের অভিজ্ঞ নেতারা দেখেছেন যে, ঐ পরিমাণ ভোটের হেরফের হলেও কংগ্রেসের বিরাট জয় হবে।

ভারতবর্ষে নির্বাচনের পাটিগণিতের মজাই এই যে, এখানে শোচনীয় পরাজয় ও বিপুল সাফল্যের মধ্যে ভোটের অঙ্কের ব্যবধান সামান্য। ১৯৬৭ সালে মোট ভোটের ৪০·৭৩ শতাংশ পেয়ে অবিভক্ত কংগ্রেস লোকসভার ৫২০টি আসনের মধ্যে ২৭৯টি লাভ করে কোন মতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রেখেছিল। অথচ ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ আসনই দখল করে নিল মোট ভোটের মাত্র ৪৩·০৬ শতাংশ, অর্থাৎ আগের নির্বাচনের তুলনায় ২·৩৩ শতাংশ মাত্র বেশী, ভোট পেয়ে। ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সংগঠন কংগ্রেসের তুলনায় মাত্র চারগুণ বেশী ভোট পেয়ে কংগ্রেস তাদের চেয়ে ২২ গুণ বেশী আসন পেয়েছে। ভোটের এই বিচিত্র পাটিগণিতের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে এখন কংগ্রেস চেষ্টা করছে বিভিন্ন রাজ্যে 'মার্জিন্যাল' ভোটগুলি নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে। নিজেদের ভোটগুলি ঠিক রেখে কংগ্রেস যদি হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে জনসংঘের এবং পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ভোটের একটা অংশ নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে তাহলে তারা ১৯৭১ সালের বিজয়-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে পারবে, অন্যথা নয়।

●

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয় ও বাংলা দেশের অভ্যুদয় এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেসকে অনেকখানি সাহায্য করবে, এটা তো তাদের হিসাবেই আছে। বিরোধিদের কেউ কেউ তো কংগ্রেসকে অন্যায় সুযোগ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এই নির্বাচনকে 'খাকি নির্বাচন' বলে পরিহাস করেছেন।

বিহারে এই সব বিরোধী দল এখন কংগ্রেসের সুযোগকেই দুর্যোগে পরিণত করার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি ঐ রাজ্যে রামভাজা নির্বাচনকেন্দ্র থেকে লোকসভার

যে উপনির্বাচন হয়ে গেল সেখান থেকেই এই চেষ্টা শুরু হয়েছিল এখন সেটা আরও জোরদার হয়েছে।

যে প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা হচ্ছে সেটা হল বাংলাদেশের 'বিহারী' মুসলমানদের প্রশ্ন। বাংলাদেশে সকল অবাঙ্গালী মুসলমানকেই 'বিহারী' বলে অভিহিত করা হয়। তারই সুযোগ নিয়ে বিহারে প্রচার করা হতে থাকে, বাংলাদেশে বিহারী মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এবং ভারত সরকার তাদের ফিরিয়ে না এনে ঐ অত্যাচারে সহযোগিতা করছেন।

এই প্রচার সম্প্রতি আরও উগ্র হয়ে উঠেছে। বকসী গোলাম মহম্মদ গয়াতে কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে গেলে কৃষ্ণপতাকাধারী তরুণরা তাঁকে 'মুসলিম হত্যাকারী' বলে ধিক্কার দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। পাটনায় বিহারী বাঁচাও সম্মেলন হয়েছে এবং সংবাদে প্রকাশ যে, ঐ সম্মেলনের পর পাটনা শহরে মিছিল বার করে 'মুজিব মুর্দাবাদ' ধ্বনি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ঐ অবাঙ্গালীরা সাধারণভাবে ইসলামাবাদের দালালি করেছে, পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখন তারা সেখানকার বাঙালীদের ঘৃণা ও ক্রোধের পাত্র। ঢাকার সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এই অবাঙ্গালীদের সঙ্গে পাকিস্তানবাসী বাঙ্গালীদের বিনিময়ের চেষ্টা করছেন। পাকিস্তান তার এই নাগরিকদের গ্রহণ করতে নারাজ। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেছেন, এই মানুষগুলি একসময়ে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ভারত থেকে এসেছিল, ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠলে তাদের ভারতেই ফিরে যেতে হবে। ভুট্টোর এই কথার সঙ্গে সায় দিয়ে বিহারে একদল মানুষও দাবী করছে যে, এই বিহারীদের ভারতে ফিরে আসতে দিতে হবে।

সংগঠন কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী দল এবং এমনকি জনসংঘও বিহারে এটিকে নির্বাচনী প্রশ্নে পরিণত করার চেষ্টা করছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অবাঙ্গালীদের ভারতে গ্রহণ করার দাবীকে 'সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, এই দাবী মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশে বিহারীদের উপর অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে বলে যে প্রচার চালান হচ্ছে সেটা 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন'।

•

মধ্যপ্রদেশ সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট, একজিকিউটিভ কাউন্সিল, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল প্রভৃতি সব সংস্থা বাতিল করে দিয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাভার সরাসরি নিজেদের হাতে নিয়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস অফিসারকে 'রেকটর' করে বসিয়েছেন।

কিছুদিন যাবতই উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়ে দারুণ অব্যবস্থা চলছে। টাকা-পয়সার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে আট লাখ টাকা ওভার ড্রাফট্ নিতে হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল বার করা হচ্ছে না।

কিছুদিন আগে একজন মিলিটারি জেনারেলকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করে বসান হয়েছিল। তিনি দুয়েকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ব্যাপারস্যাপার দেখে সরে যান। সেই অবধি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাচার্য ছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সংস্থা নাকি উপদলীয় কোন্দলে প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল।

২৪-২-৭২ —পুণ্ডরীক

ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের মুখ্য ফলশ্রুতিসমূহের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার বহুল প্রচার ও প্রসার অন্যতম। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সংগে এদেশের মানুষের সুপরিচয়ের ফলে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে নবজাগরণের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। শিক্ষিত মানুষের মনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন মুক্তির প্রেরণা অনুভূত হয়েছিল তীব্রভাবে। কিন্তু চারুকলার ক্ষেত্রে অবস্থা হয়েছিল ভিন্নতর। সাহিত্যের প্রসংগে দেখা যায় ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেও তখনকার অনেক সুধী পন্ডিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষাকে অবহেলা ও বর্জন করেন নি। তাঁরা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কিন্তু এদেশে যুগ যুগান্তরের শিল্প ঐতিহ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিদেশী চিত্ররীতি অনায়াসে ও আচিরে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যার পূর্ণ প্রভাব অতিক্রম করার চেষ্টা কোনদিনই হয় নি। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথের শুভ আবির্ভাব ও যৌবনে তাঁর স্বচেষ্টায় প্রাচ্য রীতির সাধনা এই বিষয়ে নবজাগৃতির সূচনা করলেও পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব অতিক্রম করে নবারীতিকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করা কোনদিনই সম্ভব হয় নি। নবজাগরণের উৎপত্তিস্থল যেমন বাংলাদেশ, আধুনিক চিত্রকলার জন্মও হয়েছিল তেমনি কলকাতা শহরে। তার জনক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতঃপর তা কলকাতার আর্ট স্কুলে স্থান লাভ করার পরে ক্রমশঃ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছিল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য যেমন ধারায় চলছে, তদনুরূপ পাশ্চাত্য শিল্পের সংগে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্ররীতিরও সহাবস্থান চলেছে য় এই শতকের প্রারম্ভ থেকে।

দ্বেষ-বিদ্বেষ ও ভেদ-বিভেদ যে হয়নি তা নয়। কারণ মিঃ ই বি হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে কলকাতার আর্ট স্কুলে নিয়ে ভারতীয় বিভাগ খোলার ফলে বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে আঘাত পড়ার আশংকা হয়েছিল তৎকালীন শিক্ষক ও ছাত্রদের মনে। সুতরাং কিছু প্রতিবাদ ও বিদ্বেষভাব হয়েছিল অনিবার্য। তাহলেও ভারতীয় প্রথায় শিক্ষাদানের কাজ ব্যাহত হয়নি কখনও। ছাত্রসংখ্যা সীমিত হলেও ক্রমান্বয়ে তাঁদের দ্বারাই নবপদ্ধতির দীপ্তি-দ্যুতি বিকীর্ণ হয়েছিল দেশের সর্বত্র। বিদেশেও তার মহিমা বৈশিষ্ট্য প্রচারিত হয়েছিল অবিলম্বে।

শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা উচ্চপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন বিভেদ-বিরোধ কিন্তু তাঁদের মনকে কখনও স্পর্শ করে নি। নিজ নিজ আদর্শে আস্থা রেখে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই তাঁরা কর্মপথে অগ্রসর হতেন। এর উন্নততর ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন রাজা রবি বর্মা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিগত শতাব্দীর শেষ তিনদশক জুড়ে রবি বর্মা ছিলেন বৃটিশ ভারতের চিত্রকলা রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। কিন্তু তাঁর চিত্রাঙ্কণের শিক্ষা ও চর্চা বিশেষ নিয়মিত কোন পন্থায় চলার ব্যবস্থা হয় নি কখনও। বিভিন্ন সময়ে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা ও পরিচালনা লাভের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাকে চূড়ান্ত পরিণতির সহায়ক বলা চলেনা। অতএব তিনি স্বচেষ্টা ও প্রতিভার বলেই প্রখ্যাত হন, সমসাময়িক ভারতের অদ্বিতীয় শিল্পীরূপে সম্মানিত হয়েছেন বারংবার। যশের মুকুটই তাঁকে প্রকৃত রাজমর্যাদা দিয়েছিল। সম্মান সুখ্যাতির অফুরন্ত ধারায় তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন অনবরত। হোক না বিদেশী রীতি,—তিনি ভারতীয় হয়ে প্রায় স্বয়ংসিদ্ধভাবেই চিত্রাঙ্কণে যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা বিস্ময়ের বিষয়।

রবি বর্মার জন্ম হয় কিলিমান্নরে ১৮৪৮ খৃঃ ২৯ এপ্রিল। তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবারেরই একটি স্বতন্ত্র শাখার সুসন্তান ছিলেন। বাল্যকালে তিনি সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শৈশবেই তাঁর মধ্যে চিত্রাঙ্কণ প্রতিভা হয়েছিল প্রস্ফুট। খড়ি ও কয়লা দিয়ে শিশু বয়সেই তিনি বাড়ীর মেঝেতে ও দেয়ালে নানা দেব দেবীর মূর্তি আঁকতেন। তাঁর জনৈক মাতুল ছিলেন এই বিষয়ে তাঁর বিশেষ উৎসাহদাতা। তিনিও ছবি আঁকতেন। কিন্তু পরিবারের অন্যান্যরা চিত্রাঙ্কণের কাজকে ভাল চোখে দেখতেন না। তথাপি তাঁর মামা তাঁকে জলরঙ-এ চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। সুদূর দক্ষিণের গ্রাম অঞ্চলে সেই সময় বিলাতী রঙ-তুলি পাওয়া যেতনা। রবি বর্মার মাতুল নিজেই রঙ ও তুলি তৈরী করতেন।

তেরো বছর বয়সে রবি বর্মা তাঁর মামার সংগে ত্রিবান্দ্রামে গিয়ে রাজাকে কয়েকটি ছবি উপহার দেন। রাজা তা দেখে খুব খুসী। তখনকার কালে চিত্রাঙ্কণ কর্ম উচ্চ পর্যায়ের কাজ বলে বিবেচিত হোত না। তা সত্ত্বেও রাজা তরুণ শিল্পীকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত হননি।

১৮৬৮ খৃঃ থিওডোর জনসন নামে জনৈক ইংরেজ শিল্পীকে নিয়োগ করা হয়েছিল ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ও তাঁর পরিজনদের প্রতিকৃতি রচনার জন্য। সেই শিল্পীর কাজের সময় অন্য লোকের তাঁর ঘরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু রাজানুগ্রহে রবি বর্মা তাঁর অঙ্কণপদ্ধতি দেখার সুযোগ পেয়ে যান। সেই কাজ দেখে দেখে তিনি তেলরঙ-এ ছবি আঁকার কাজে হাত দিয়েছিলেন। প্রথমে অবশ্য নানা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কারণ কোন নির্দেশক বা পরামর্শদাতা কেউ ছিলেন না। ক্রমশঃ নিজের অধ্যবসায় ও সাধনাতেই তাঁর জীবনে অসামান্য সাফল্য এসেছিল। মাদুরার রামস্বামী নায়েক নামে আর একজন শিল্পীর কাছেও তিনি গিয়েছিলেন অয়েল পেন্টিং-এ শিক্ষালাভের জন্য। কিন্তু তিনি শিক্ষা দিতে রাজী হননি। আর রবি বর্মাও হতাশ হয়ে চিত্রাঙ্কণে ছেদ টানেননি। তিনি ক্রমশঃ নিজের পথ কেটে এগিয়ে গেলেন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে। ১৮৭৩ খৃঃ থেকে তিনি জয়ের গৌরব লাভ করতে থাকেন। আর প্রতি বছরই কিছু না কিছু পুরস্কার, পদক ও সম্মান তাঁর জন্য নির্দিষ্ট থাকতো।

সুদূর দক্ষিণ ভারতে রবি বর্মা যখন তাঁর তেলরঙ-এ অঙ্কিত চিত্র সম্ভারের জৌলুষে দেশের মানুষকে অভিভূত ও বিস্মিত করে রেখেছিলেন,—বলতে গেলে সেই সময় অবনীন্দ্রনাথের জন্ম (১৮৭১ খৃঃ)। তারপরে তরুণ অবনীন্দ্রনাথ যখন পাশ্চাত্য পন্থায় শিক্ষালাভ করে প্রতিকৃতি অঙ্কণে ও দৃশ্যচিত্র রচনায় মশগুল, বাড়ীতে স্টুডিয়ো তৈরী করে দিনরাত ছবি আঁকছেন, সেই সময় একবার রবি বর্মা কলকাতায় আসেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে জনৈক তরুণ শিল্পীর সাধনা চলছিল জেনে সেযুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় চিত্রকর গেলেন সেখানে সেই তরুণের সন্ধানে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুজনের সাক্ষাতে মিলন হোল না। অবনীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে ছিলেন অনুপস্থিত। রবি বর্মা তাঁর স্টুডিয়োতে গিয়ে তাঁর কিছু কাজকর্ম দেখে গেলেন মাত্র। আর অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি শক্তির প্রভূত প্রশংসা করে 'ভবিষ্যত উজ্জ্বল' ঘোষণা করে যান।

রবি বর্মা কলকাতায় এসেছিলেন দুই বার। একবার ১৮৮৮ সালে; আর দ্বিতীয়

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

যায় ১৮৯৪ খৃঃ। অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিও-স্রোতে কোন সময় গিয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বারে গিয়েছিলেন। কারণ অবনীন্দ্রনাথের বিবৃতিতে মনে হয় তিনি তখনও দেশীয় পন্থায় ছবি করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হন নি। কিন্তু পাশ্চাত্য রীতিতে বেশ পাকাপোক্ত হয়েছিলেন। তিনি দেশী মতে চিত্র চেষ্টা শুরু করেন ১৮৯৫ সালে। এই প্রসঙ্গে রবি বর্মার পরলোক গমনের পরে অবনীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে প্রবাসীতে লিখেছিলেন,—

'বহু বৎসর হইল, চিত্রবিদ্যায় আমি তখন একজন শিক্ষার্থী মাত্র, সেই সময় একদিন এই জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন; ঘরে না থাকায় আমার সঙ্গে তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নাই। তিনি আমার তখনকার একখানা sketch দেখিয়া বলিয়াছিলেন, It is rather ambitious for the youngman. অর্থাৎ ছোকরার সাহস ত কম নয়। এই তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়।'

জীবনধারা, চিত্রাঙ্কন চর্চা ও সে বিষয়ে চিন্তা এবং মৌল আদর্শে এই দুই ভিন্ন-পন্থী মহান শিল্পীর মধ্যে মিল ও অমিল দুই-ই দেখা যায় যথেষ্ট পরিমাণে। আর তা বেশ কৌতূহলকর।

রবি বর্মা ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই অতি সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের সন্তান। দুজনারই শৈশবের শিক্ষা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পথ ধরে এগিয়েছিল। এঁদের দুজনার মধ্যেই শিশুকাল থেকে শিল্প প্রতিভার বিকাশ দেখা গিয়েছিল। শিশু রবিবর্মা বাড়ীর দেয়ালে ও মেঝেতে অনবরত চিত্রাঙ্কন করতেন খড়ি ও কয়লা দিয়ে। আর শিশু অবনীন্দ্রনাথও পিতার বাগান বাড়ীতে আশেপাশে যা দেখতেন তাই মেঝেতে, কাগজে ও খাতায় এঁকে তুলতেন। রং ও ছবির প্রতি ছিল তাঁর সহজাত প্রবল ঝোঁক। রবিবর্মা যে পদ্ধতিতে ছবি এঁকে খ্যাতির উচ্চচূড়ায় উঠেছিলেন তাতে তিনি নিয়মিত শিক্ষা লাভের কোনও সুযোগ পাননি। অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা লাভের অবকাশ পেলেও পরে যে ধারায় চিত্রাঙ্কন করে তিনি আধুনিক চিত্রকলার প্রবর্তক ও যথার্থ গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সেখানে তাঁরও কোনও গুরু বা পরিচালক কেউ ছিলেন না। কঠোর পরিশ্রম ও কতশত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্বচেষ্টায় তিনি সেই নব-উদ্ভাসিত রীতিকে চূড়ান্ত সার্থক করে তোলেন।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই দুই শিল্পীর জীবন-ধারায় সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। দুজনাই জীবনের প্রথম ভাগে নিজ নিজ পরিবার-পরিবেশ মধ্যে এক-আধজন উৎসাহদাতা পেয়েছিলেন। রবি-বর্মার মামা অভিজাত পরিবারের আদর্শ প্রভাব এড়িয়ে তাঁকে জলরং-এ ছবি করার পথ-নির্দেশ করতেন। অবশেষে ত্রিবাঙ্কুরের রাজাও তাঁকে বিবিধ সুযোগ সুবিধা দান করে তেলরং-এ চিত্র রচনার যোগ্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেষ্টন ছিল যাবতীয় চারুকলার আনন্দ-রস-ধারায় অভিসিঞ্চিত। কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, নাটক ও চিত্রকলার একটি অনাবিল পরিমণ্ডলে হয়েছিল তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, সংগীত-রসিক এবং বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মে ও সৌন্দর্য-চর্চায় গভীর অনুরাগী। পিতার অকাল-বিয়োগের পরে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চার পথে যখন অগ্রসর হলেন, তখন তাঁর মুখ্য উৎসাহ-দাতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি ব্যতীত তাঁকে আরও উৎসাহ দিতেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতার পত্নী, শিল্পীর জননী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা, ভগিনীপতি প্রমুখ ব্যক্তিরা। অতঃপর তিনি তাঁর স্বকীয় পন্থায় চিত্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মুখ্য উৎসাহদাতা ও প্রেরণাকারী রূপে পেলেন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ ই বি হ্যাভেলকে। মিঃ হ্যাভেলের সহৃদয় প্রেরণা ও সহায়তা সেই নবাবিষ্কৃত চিত্রশৈলীকে প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

এই দুই শিল্পীর চিত্রাঙ্কন রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও বিষয়বস্তু ও মূল প্রেরণায় কিছু বৈসাদৃশ্য ছিল না। রবিবর্মা শিল্পীজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এঁকে চলেছিলেন মানুষের প্রতিকৃতি ও পুরাণশাস্ত্র ও প্রাচীন কাব্য-কাহিনী এবং রামায়ণ মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে। অবনীন্দ্রনাথের কর্মধারা পর্যা-লোচনা করলেও দেখা যায় যে, তিনি গোড়াতে অয়েল কালারে ও পরে প্যাস্টেলে পোর্ট্রেট এঁকেছেন জীবনভর। আর তাঁর প্রারম্ভিক রচনা থেকেই দেখা যায় চিত্রে বিষয়বস্তুরূপে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃত কাব্যকথার ভিড়।

টেকনিক, মিডিয়াম ও রূপরচনার মৌল আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্নতর হলেও এই দুই ভারতীয় শিল্পী পৃষ্ঠপোষক ও সমঝদার রূপে পেয়েছিলেন তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর-দের ও দেশীয় রাজা-মহারাজাগণকে।

কলকাতার ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রধান সভ্য ও সহায়ক-দের মধ্যে আধুনিক চিত্রশৈলীর প্রতি শ্রদ্ধা-বান বিদেশী ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। তদ্ব্যতীত ভারতীয় রাজা-মহারাজারাও আধুনিক চিত্রপট ক্রয় করে করে এ যুগের নব পদ্ধতির স্রষ্টা ও তাঁর ছাত্রদের যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। তার ফলে অনেক দেশীয় রাজ্যের চিত্রালয়ে অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় ছাত্রদের ছবি সম্মানের স্থান লাভ করেছে।

এই বিষয়ে রবিবর্মার জনপ্রিয়তা সর্ব-জনবিদিত। তিনি ভারতের রাজা-মহারাজা-দের দরবারে যে সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন তা অতুলনীয়। প্রতিটি বড় বড় রাজপ্রাসাদে ও বিভিন্ন রাজ্যের আর্ট-গ্যালারীতে রবিবর্মার অঙ্কিত আলেখ্যাচিত্র

ও পৌরাণিক বিষয়ের চিত্রের সংখ্যা সুপ্রচুর।

১৮৭৫ খৃঃ ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস ভারত ভ্রমণে এলে রবিবর্মা তাঁকে একটি তামিল মেয়ের বাজনা বাজানোর ছবি উপহার দিয়ে সম্মানিত হন। ১৮৭৮ খৃঃ তিনি বাকিংহামের ডিউকের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি অঙ্কনের দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রতিকৃতি রচনার আংগিক কৌশলের চের উপরে স্থান দিয়েছিলেন রবিবর্মার কলাপ্রতিভাকে।

অবনীন্দ্রনাথের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ১৯১১ সাল। রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী দিল্লী থেকে এলেন কলকাতায়। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন গভর্নর জেনারেল। স্থির হোল রাজা ও রাণী আর্ট স্কুলের গ্যালারী দেখতে যাবেন। আর অবনীন্দ্রনাথের উপরে ভার পড়লো তাঁদের ওরিয়েন্টাল আর্ট সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবার। সেখানে টাঙানো ছিল অবনীন্দ্রনাথের ছবি 'রাণী তিষ্যরক্ষিতা'। ইংলণ্ডের রাণী মেরী ছবিটি দেখে মুগ্ধ হলেন। তা জেনে শিল্পী সেটি উপহার দিলেন রাণীকে। আজও সেই ছবিখানি ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদের দেয়ালের শোভাবর্ধন করে চলেছে। সেই ঘটনার ঐ বছর মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথ সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন।

রাজা ও রাণীর কলকাতায় আগমন উপলক্ষ্যে অবনীন্দ্রনাথের উপরে ভার পড়েছিল মঞ্চ ও তোরণ সজ্জিত করার। তিনি ছাত্রদের সহযোগিতায় ভারতীয় রীতিতে সেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন অতি চমৎকারভাবে। পরে বর্ধমানের মহারাজা সেই ছবিগুলি ন্যায্যমূল্যে কিনে নিয়েছিলেন।

দুই শিল্পীর জীবনে নানা ঘটনা ও কর্মধারায় অনেকখানি এক-রূপতা দেখা গেলেও চিত্রাংকনের মৌল আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। রবিবর্মা যে পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুকে চিরকালের অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যে ছিল অতিমাত্রায় আপাতঃ রমণীয়তা ও সাধারণ মানুষের হৃদয়গ্রাহী উপাদান বৈভব। সুতরাং তাঁর রচিত পৌরাণিক বিষয়ের ও হিন্দু দেব-দেবীর চিত্রপট দেশের আপামর জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর তুলিকায় দেবদেবীর ও পৌরাণিক ধর্মীয় চিত্র এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি গৃহে তাঁর ছবি শোভা পেত। এর মূলে দ্বিতীয় আরও একটি কারণ ছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে বোম্বাইতে একটি লিথোগ্রাফ প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্যই ছিল সেখানে তাঁর চিত্রের রঙীন প্রতিলিপি তৈরী করে সস্তা দামে তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া। সেই চেষ্টা তাঁর সম্পূর্ণ ফলবতী হয়েছিল। এই অবস্থায় সাধারণ লোকের মনেও তাঁর চিত্র সম্বন্ধে একটা ভাবাবেগ ও প্রবল আগ্রহ হয়েছিল সঞ্চারিত।

কিন্তু অবনীন্দ্র-চিত্রের ক্ষেত্রে অবস্থা হয়েছিল একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি যে 'ওয়াশ' পদ্ধতিতে জলরং-এ ছবি এঁকেছেন তার বাহ্যরূপে তেল-রংয়ের পাশ্চাত্যপন্থী চিত্রের ন্যায় জাঁকজমক ও জৌলুষ সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব নব্যরীতির চিত্রে আপাতঃ রমণীয়তা স্বল্প। তার রূপ ও ঐশ্বর্য অন্তরে নিহিত। তা গভীর অনুভাব অনুভূতি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষনাত্মক দৃষ্টি দ্বারা আয়ত্বের বিষয়। সুতরাং তার জনপ্রিয়তা রবি বর্মার ছবির তুলনায় অত্যন্ত কম।

সহর অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সমাজেই মাত্র অবনীন্দ্র-চিত্রের আদর ও কদর ছিল সীমিত। তার মধ্যেও বিরোধী মতের কিছু অভাব দেখা যায় নি। নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার তীক্ষ্ম আঘাতে অবনীন্দ্র চিত্রকে জর্জরিত হতে হয়েছে অবিরত। পরন্তু রবি বর্মার জীবনে সুখ-সম্পদ ও সুখ্যাতির ধারা ছিল নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবহমান।

মানুষ হিসেবে কিন্তু দুজন ছিলেন অনেক খানি একই ধাতের। রবি বর্মা ছিলেন

রাজা রবিবর্মা

অতি শান্ত, বিনীত ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ। তাঁর মধ্যে অহংকার ছিল সামান্য। সবসময়েই তিনি অভাবগ্রস্ত লোকেদের সাহায্য করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা ছিল তাঁর অবসর বিনোদনের মুখ্য উপায়। সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেও তিনি কদাপি গর্ব অভিমান প্রকাশ করেন নি। শেষ বয়সে মনে করতেন যে প্রকৃতির মধ্যে নিহিত গূঢ় শক্তি সম্ভারের তুলনায় তাঁর জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অতি সামান্য।

অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন অনেকটা দরদী হৃদয়ের আনন্দময় পুরুষ, ভদ্র মার্জিত ব্যক্তিত্ব, পরিশীলিত উদার মনের মানুষ, স্নেহশীল গুরু, বদান্য ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সুরসিক সমঝদাররূপে তিনি ছিলেন তুলনাহীন।

এই শিল্পীদ্বয় দুটি শিল্পচর্চার বিপরীত ধারায় চললেও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন বরাবর। দেখা সাক্ষাৎ না হলেও অন্তরের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছিন্ন। আর তা হয়েছিল উভয়ের অংকিত চিত্র-মাধ্যমে।

রবিবর্মার ছবির প্রতিলিপি একদা অনবরত মুদ্রিত হোত কলকাতার প্রবাসী পত্রিকাতে। মডার্ন রিভিউ পত্রিকা প্রকাশনের পূর্বেই রবিবর্মা লোকান্তরিত হন। অতএব তিনি অবনীন্দ্র চিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভের যেটুকু সুযোগ পেয়েছিলেন তা প্রবাসী পত্রিকার মাধ্যমেই। বাংলা ১৩১০ সনের আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে অবনীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুশয্যায় শাহজাহান' ছবিখানির রঙ্গীন প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছিল। তা দেখে রবিবর্মা প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয়কে একটি চিঠি লিখেছিলেন (প্রবাসী, ১৩১০, অগ্রহায়ণ) এই মর্মে :

"I regret I have not yet had the pleasure of seeing any of the original works of Mr Tagore. I am sure they will be as beautiful in colour as they are in composition. The subject of the 'Last days of Shahjahan' is full of poetry and pathos".

রবিবর্মা পরলোক গমন করেন ৫৮ বছর বয়সে বাংলা ১৩১৩ সনের আশ্বিন মাসে (১৯০৬ খৃঃ)। তার কিছু দিন পূর্বে বোম্বাই চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি অবনীন্দ্রনাথের কয়েকখানি মৌলিক ছবি দেখতে পান। তারপরে কলকাতায় এক বন্ধুকে চিঠি লিখে তিনি অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথও কোনদিন রবিবর্মার বিদেশী প্রথায় অংকিত চিত্রকে অবজ্ঞা-অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন নি। ভিন্নপন্থী ও স্বতন্ত্র মতাবলম্বী হয়েও এঁরা উভয়ে কোন সময় বিরুদ্ধ মত প্রকাশ বা ঈর্ষাদ্বেষ পোষণ করেননি। রবিবর্মার লোকান্তরের পরে অবনীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে লিখেছিলেন,

'রবিবর্মা যে পাকা রসজ্ঞের মত আমাদের কাব্য ভাণ্ডারের যা কিছু উত্তম বাছিয়া লইয়াছিলেন একথা কেহই অস্বীকার করিবে না এবং একথাও ঠিক যে আজ রবিবর্মার সুনাম যেজন্য, দু'দশটা স্বর্ণপদক তাহার কারণ নয়, কিন্তু একমাত্র স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্মে আস্থাই তাহার মূল কারণ হইতে পারে।...

তিনি আজ যে আনন্দের সৌন্দর্যের দান আমাদের জন্য রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছেন সেটুকু সংগ্রহ করিতে যে প্রাণপাত করিয়াছেন সেজন্য তিনি যে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন একথা দুইবার বলিতে হইবে না।'

'প্রবাসী' পত্রিকার শুরুতে রবিবর্মার অনেক তৈল চিত্রের প্রতিলিপি যে মুদ্রিত হয়েছিল তা সুবিদিত। তৎপরে আবার অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চিত্র স্থান পেতে লাগলো নিয়মিত। অতএব দুই শিল্পীর রচনাবলীর প্রচার মাধ্যমও হয়েছিল একটি বিশেষ পত্রিকা। প্রবাসী সম্পাদক রবিবর্মার মৃত্যুর পরে শ্রদ্ধা নিবেদনকালে সেইজন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি প্রবাসী সম্পাদকের কাছে বাংলা বর্ণ পরিচয় পুস্তক চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বাংলাভাষা শেখার জন্য খুব আগ্রহ হয়েছিল সম্ভবতঃ প্রবাসীতে তাঁর চিত্র মুদ্রণের জন্য। সম্পাদক মহাশয় অবিলম্বে বর্ণপরিচয় পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শিল্পী তা খোলার অবকাশ আর পাননি। বইটি পেয়ে তিনি প্রবাসী সম্পাদককে লিখেছিলেন,—

Kilimanur, 22nd August, 1906

My dear Sir,

Yours of the 4th instant duly to hand. I am sorry to note that I have not as yet acknowledged receipt of the Bengali primers you kindly sent me a few days back. But my health being for the last two months gradually worse I was prevented from attending to any thing else.

Yours Sincerely
Ravi Varma

তাঁর ইহজগৎ ত্যাগের পরে প্রবাসীতে শোকবার্তা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সম্পাদক মহাশয় লিখেছিলেন—'তাঁহার মত ভদ্রলোক অতি অল্পই দেখা যায়। আমাদের সহিত তাঁহার কখনও চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তিনি অনেক অপ্রকাশিত তৈলচিত্রের ফোটোগ্রাফ দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।'

দক্ষিণ-পূর্বে দুই প্রান্তের দুই যশস্বী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রশিল্পী। বয়সের ব্যবধান তেইশ বছর। চিত্রাদর্শে দুস্তর প্রভেদ। তা সত্ত্বেও উদার দৃষ্টি, সৌন্দর্য-চেতনার সমধর্মিতা, দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতিতে গভীর আস্থা ও আভিজাত্যের উন্নত মর্যাদাবোধে উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক অপ্রত্যক্ষ বন্ধুত্বের সেতু-বন্ধন। অধুনা এ দৃষ্টান্ত বিরল।

ওসমান মিঞা মারা যাবার পরে কাঁদেনি ফরিদা কিন্তু এখন পেটের ছেলে আজিজ তাকে কাঁদাচ্ছে। ওসমানও ছিল জেদী, রাগ-বিরাগ তারও কম ছিল না। কিন্তু হাজার রাগ করলেও শেষ পর্যন্ত ফরিদার কোন কথা কি ফেলতে পারত সে? মেজাজ ঠান্ডা হলে তামাক টানা বন্ধ করে পায়চারী করত ওসমান। ফরিদা বুঝতে পারত স্বামীর মন নরম হয়েছে, তখন সে মুখ আরো শক্ত করে বসে থাকত। তারও মন-অভিমান কি কম! শেষমেষ ওসমান কথা বলত এরকমভাবে—'তুমি যখন এমুনে কইরা কইত্যাছ, তাইলে—' অর্থাৎ আপসের প্রস্তাব। বিবির কাছে জারিজুরি আর কতক্ষণ খাটে কোন্ মিঞার? মেয়েদের এতে গর্ব হয়—ফরিদারও হত।

কিন্তু আজিজুল—তার আজিজটা—যাকে সে পেটে ধরেছে, তার সঙ্গে পেরে ওঠে না ফরিদা। বড় জেদী আর অভিমানী ছেলে—তার কাছে ফরিদার অভিমান ভেসে যায়। অথচ মন মানে না। মায়ের মন। নানা চিন্তা ভয় ত্রাস পাক খায় বুকের ভেতরে। জীবনে অনেক দুর্ঘটনা দেখেছে ফরিদা—অনেক শোক আর যন্ত্রণা তার মনটাকে চষা জমির মত এবড়ো-খেবড়ো করে দিয়েছে। তাই একটুতেই ভেঙে পড়ে ফরিদা—কলজেটা কুভাবনায় ধড়ফড় করে তার।

ক্যাম্পের বাইরে এসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে ফরিদা—তার দু চোখ চলে যায় বড় বড় কড়ি গাছগুলোর ভেতর দিয়ে দূরে যেখানে আগে চেকপোস্ট ছিল। এই পথেই তারা এসেছিল কুড়ি পঁচিশ দিনের পথ পায়ে হেঁটে। আর এখন দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করে আজিজের জন্য।—কখন ফিরবে সে তার কোন ঠিক নেই। গোড়াতে মুক্তিবাহিনী যেত ওপারে বর্ডারের কাছা-কাছি অঞ্চলে—খুব একটা ভেতরে ঢুকত না। সন্ধ্যায় চলে যেত, কখনো রাতেই কিম্বা ভোরে ফিরে আসত। প্রথম যেদিন রাতে আজিজ সারা গায়ে জামা-কাপড়ে রক্ত নিয়ে ফিরে এল—খ্যাপার মত চোখ হয়ে গিয়েছিল তার, সারা শরীর কাঁপছিল বাঁশ-পাতার মত—মুখ আর ঠোঁট দুটো রক্তশূন্য পাংশু হয়ে গিয়েছিল, যেন তার শরীরের থেকেই সব রক্ত বেরিয়ে গেছে। আজিজ বলছিল তার মাথা যেন ফেটে পড়ছে—ভয়ানক যন্ত্রণা মাথায়। নিজের হাতে মানুষ মারা সেই প্রথম—মানুষের রক্তের ছিটে গায়ে মুখে সেই প্রথম। তার ষোল বছর বয়েসের আজিজ। তাকে ধরাধরি করে ক্যাম্পের জনাচারেক মিলে তার মাথায় জল ঢেলে-ছিল অনবরত। ফরিদা আজিজের মাথাটা দু হাতে সাপটে কোলে ধরে রেখেছিল, সেইই শিশু বয়েসে যেমন করে ধরে তাকে স্তন দিত অবিকল সেই ভঙ্গিতে।

তারপরে আর কোনদিন এরকম অস্থির হয় নি আজিজ, নিজের শরীরে লেগে-থাকা-রক্ত সে নিজের হাতেই অবলীলায় মুছে ফেলেছে এর পরে। এবং গর্বে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—ফিরে এসে ডান হাত উঁচু করে সৈনিকের ভঙ্গিতে সে হেসে বলেছে—'আইজ আমি নিজের

হাতে তিনটা পশুরে খতম করছি।' তিনটে পশু নিজের হাতে শেষ করে তার সবাঙ্গে যেন মানসিক পরিতৃপ্তির উত্তেজনা। গোড়াতে বারণ করত ফরিদা আজিজ মুক্তি-বাহিনীতে নাম লেখাক এটা সে মনে-প্রাণে চায় নি। কিন্তু জেদী ছেলেটা কি কথা শোনে? বরং উল্টে সে ওসমানের মৃত্যুর কথা এমন করে বলত—ফরিদার তখন নিজেরই লজ্জা হত, কোন মুখে সে ছেলেকে ঘরে আটকে রাখবে? ফরিদার রক্তেও দপ করে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠত।

সে দৃশ্য কি ভোলা যায়? ওসমান মিঞার খুন দেখেছে নিজের চোখে ফরিদা। এখনো মনে পড়লে মাথা ঝিম ঝিম করে, সারা শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। তার ভয় হয় সে আবার ফিট হয়ে যাবে, যেমন সে হত্যার দৃশ্য দেখে ফিট হয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য তার ফিটের ব্যামোটা আগের থেকেই ছিল। সতের আঠার বছর আগে এমনি মৃত্যুর দৃশ্য যখন সে প্রথম দেখে—যখন বাবা আর সতের বছরের ভাইকে এমনি খুন হতে দেখে তখনই সে প্রথম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও মাঝে-মধ্যে সে অজ্ঞান হয়ে যেত।

আর এই ফিটটাই তাকে বোধহয় সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল। ফিট না হলে সে ছুটে যেত, যেখানে বায়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, গুলী খরচ না করে রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে ওসমান মিঞার মাথাটা মিলিটারীরা চৌচির করে দিয়েছিল। ওসমান মিঞা শেষ চেষ্টায় গাঁয়ের মোড়ল জাবেদের পা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল কিন্তু পারে নি। তখন ফরিদার পক্ষে আর্তনাদ করে ওঠাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু তার আগেই সে ফিট হয়ে যায়। আর সেই সুযোগেই আজিজ করিম আর নির্মল তার শরীরটাকে তুলে নিয়ে ছুটে পালিয়েছিল দরগার ওপাশের জঙ্গলে। নইলে ওসমানের বোন রাবেয়াকে যেমন করে পশুরা চেটেপুটে খেয়েছিল—তারপর গুলী করে চিরদিনের মত ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিয়েছিল ঘরের মধ্যেই, তেমনি তাকেও ওরা চেটেপুটে খেত আর ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেত।

কিন্তু না, এসব কথা আর সে ভাববে না। তাকে অন্যমনস্ক দেখলে আজিজ যেমন তাকে ধমকায়—তেমনি করে নিজেকে ধমক দেয় ফরিদা, আজিজের হয়ে নিজেকেই সে নিজে শাসন করে। তার দৃষ্টিটাকে সে ক্যাম্পের এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়ে নেয়। তারপর দূরে পিচ রাস্তার দিকে তাকায়। পর পর মিলিটারী গাড়ি ছুটে যাচ্ছে দ্রুত বেগে। আর ঠিক এ সময়েই সেই লোকটাকে তার চোখে পড়ল। লোকটা বড় রাস্তা থেকে নেমে কড়ি গাছের পাশ কাটিয়ে এদিকে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীরটাই দুলে উঠল ভূকম্পনের মত।

লোকটাকে যে দীনু সরকারের বৌ দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরেছে সেজন্য নয়। দীনু সরকারের বৌ এমনি আচমকা ক্যাম্প থেকে ছুটে যায় আর যাকে সামনে পায় তাকেই দু হাতে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে—'আমার সুবলরে দেখছ?' তার ছেলে সুবলকে তার সামনেই—পাকিস্তানী মিলিটারীরা গলায় দড়ি বেঁধে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর ছটফট করতেই একটি গুলী গিয়ে ফুটো করে দিয়েছিল তার কলজে। তাকে আর কারো পক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব না এটা সবাই জানে। তাই দীনু সরকার ওকে আটকে রাখে—কখনো বেঁধে রাখে ক্যাম্পের ভিতরে। কাঁদতে কাঁদতে বোধহয় ওর চোখের জল ফুরিয়ে গেছে, এখন আর ও কাঁদে না, ঝিম মেরে অথর্বের মত পড়ে থাকে ক্যাম্পে। কিন্তু সুযোগ পেলেই কখনো-সখনো আচমকা ছুটে আসে। লোকটাকে জড়িয়ে ধরতে লোকটাও ঘাবড়ে গেছে কিন্তু এজন্য ফরিদার শরীরটা দুলে ওঠে নি, সে ভয় পেয়েছে লোকটাকে সে চিনতে পেরেছে বলে।

লোকটা গতকাল, পরশুও ঘুরে গেছে। দূর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফরিদাকে লক্ষ্য করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ফরিদা ক্যাম্পের ভেতরে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। না দিয়ে উপায় কি? সতের আঠার বছর আগেকার পুরোণো জীবনের কথা সে এত-দিন ধরে ভুলে থাকতে চেষ্টা করেছে—সবটা সে ভুলতে পারে নি, কিন্তু এতকাল কেটে গেছে সবার চোখের আড়ালে। কিন্তু চোখের আড়াল হলেই কি সব ধুয়ে মুছে যায়? ফরিদার চোখও চলে যায় লোকটার দিকে—রক্তের স্রোতে টান লাগে। একবার ছুটে যেতে ইচ্ছা করে — গিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে—'তোমার নাম মধু ঘোষ না?'

কিন্তু ছুটে যাওয়াও হয় না—ক্যাম্পের ভেতরে পালিয়ে যেতেও পা বেধে যায়। কতক্ষণ এরকম নিশ্চলভাবে কেটে গিয়েছে খেয়াল করে নি ফরিদা, কখন যে লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে সেটাও যেন সে টের পায় নি। শুধু হঠাৎ সে চমকে ওঠে দুটি শব্দে—'রেণু না?'

মুহূর্তে ঘোমটা টেনে দেয় ফরিদা, শুধু নিজের মুখটাকে নয়, সমস্ত শরীরটাকেই সে আড়াল করে ফেলতে চায়। লোকটি সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। তার চোখও গিয়ে পড়েছিল লোকটার ওপরে—আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়েছিল ডান হাতে সেই ছটা আঙুল—চোখে মুখের অনেক ভাঙচুর হয়েছে ঠিকই, চুলেও পাক ধরেছে—কিন্তু চিনতে কি ভুল হয়? রক্তের টানকে কে অস্বীকার করতে পারে? তবু লজ্জা অভিমান আবেগ ভেতরে একাকার হয়ে তাকে মূক করে দেয়। লোকটা উদগ্রীব গলায় বলে ওঠে—'রেণু আমাকে চিনতে পারিস নাই? আমি মধু?'

ওসমানের মৃত্যু চোখে দেখে যে-ফরিদা কাঁদবার সুযোগ পায় নি, যে কান্না তার বুকে চাপা পড়েছিল—তা যেন শত মুখে বেরিয়ে আসতে চায়। চোখের জলে সব ভেসে গেলে ফরিদা যেন বেঁচে যায়, তবু সে কাঁদতে পারে না। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মধু আবার বলে—'আমি তোকে চিনতে পারছি রেণু।' আর ধরে রাখতে পারে না নিজেকে, কোন রকমে চাপা আবেগে সে বলে ওঠে—'তোমাগো রেণু আর নাই দাদা। আমি অখন ফরিদা।'

মধু অবাক হয় না, অবাক হবার কথাও নয়। যে-রেণু আঠার বছর আগে ওপারে দাঙ্গায় উধাও হয়ে গিয়েছিল সে যে এখন ফরিদা বা শবণম বা লতিফা এরকম একটা কিছু হয়ে গেছে—সেটা তো তারা ধরেই নিয়েছিল। বাবা আর ছোট ভাই রতনের মৃতদেহ পিছনে ফেলে, রেণুর নিরুদ্দেশ মেনে নিয়ে মাকে সঙ্গে করে মধু যখন পালিয়ে এসেছিল তখন শুধু অনুতাপ আর লজ্জা ছাড়া বুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না। তারপর আবার এপারে এমনিভাবে তাদের দেখা হবে, কে জানত? এত দিন মৃত্যুর মত একটা ব্যবধান তাদের আড়াল করে রেখেছিল। যেন পুনর্জন্মের মত আবার দেড় যুগ পরে দাদা আর বোনে দেখা। হারিয়ে যাবার দুঃখ স্মৃতি ফিরে পাবার উত্তেজনা সব মিলে-মিশে এক দুর্বোধ্য অনুভূতি চনকায় মধুর মনে। কত কথাই তার বলতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না। সে ছোট্ট করে শুধু বলে—'আবার তোর দেখা পাব, ভাবতে পারি নাই রে রেণু।' 'আমিই কি ভাবতে পারছিলাম তোমাগো ফিরা দেখুম?' রেণু স্তিমিত গলায় উচ্চারণ করে।

'তোদের বুঝি খুব কষ্ট হইচে, কেমনে আইলি এপারে?' উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করে মধু। 'কুড়ি পঁচিশ দিন হাঁইটা আইচি, কিয়ে কষ্ট গেচে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবা না।' — বলতে বলতে গলা কেঁপে যায় রেণুর। 'আর কে কে আছে তর?' — মধুর গলায় সস্নেহ প্রশ্ন। 'থাকার মধ্যে আছে এখন এক জোয়ান পোলা আজিজ, তার বাপরে তো মিলিটারীরা খুন করচে'—বলেই কেমন বিব্রত বোধ করে রেণু। আজিজের বাবা ওসমান — সতের আঠার বছর আগে যারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বোধহয় তার একথাটা মনে পড়ে যায়। হয়তো মধুর মনেও একথা আসছে, কিন্তু সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল—'ছেলে কত বড় হইচে এখন?' 'ষোল বছর'—অন্যমনস্কভাবে বলল রেণু। মধু কি তখন সতের বছরের তার ভাই রতনের কথা ভাবছিল? কিম্বা রেণুও? যে রতনকে ছেলেবেলায় নিজের কোলে কোলে রাখত। মা ব্যস্ত থাকত সংসারের কাজে, কাজেই ছোট ভাই সারাক্ষণ থাকত তার কোলে। আদর করে রেণু তাকে ডাকত—'রতু রতুয়া।'

মধু বলে—'তর ছেলে কোথায়? দেখি একবার—' রেণুর উৎকণ্ঠা আবার ফিরে আসে, সে বলে—'ছাওয়ালে কি ঘরে থাকে? যুদ্ধে গেছে—আসলে তো রোজই ফিরত—

মুখে শুনু হইয়া গেছে—বইলা গেছে কবে ফিরুম তার ঠিক নেই।'—তার গলার আওয়াজে দুশ্চিন্তা ভয় ফুটে ওঠে। তাড়াতাড়ি মধু বলে—'চিন্তা করিস না, ঠিক ফিরবে—ওরা তো জিততে আছে'—'কপালে কি আছে কে জানে, আমার কপালডাই তো পোড়া—বড় ভয় লাগে'—রেণু ক্লিষ্ট চোখে দূরে তাকায়। তার সারা শরীরে উদ্বেগ।

মধু তাতে অন্য ভাবনায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে—'খুব অত্যাচার হয়েছে ওপারে—কত লোক যে মারা গেছে—' 'অত্যাচার?'—অবাক চোখে তাকায় রেণু—'সেই সব কথা আর কইও না। চোখের উপরে কত খুন দেখলাম—কি যে গেচে মনের উপর দিয়া'—বলে ইতস্তত করে রেণু। সেসব দুঃখের কথা যেন মুখে আনতেও তার ভয় হয়। তার চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে তাই প্রসঙ্গ পাল্টায়—'তোমরা কেমুন আছ কও।' 'আর থাকা। কোন রকমে একটা জবর দখল কলোনীতে মাথ গোঁজার ঠাঁই পাওয়া গেছে। একটা চটকলে চাকরী করি'—মধু কোন রকমে শেষ করে।

'কিছু খা কর নাই?—' রেণু তার দাদার ভাঙাচোরা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে। নিজের লোক সবাই সুখে থাকুক এটাই বোধহয় সবাই প্রত্যাশা করে। রেণুও করে। তবু খুব খুশী হয়ে বলার কথা তেমন খুশী হয়ে ওঠে না মধু—সে মৃদু গলায় বলে—'তোরে—বিয়ে একটা হয়ে গেছে।' 'ভাওয়াল মেয়ে?'—উৎসুক প্রশ্ন রেণুর। 'না হলেই ভাল ছিল, এমন আর কি উপায় করি। মা দুইটা মেয়ে হারাইছে।'—মধু বিষন্ন গলায়ই বলে।

ঠিক এ সময়ে কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থমকে যায় রেণু। মধু তার সেই মুখটা দেখে। রেণুর সারা মুখে একটা চাপা সংকোচের আভাস। মনে মনে সে জানে মায়ের কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করেনি রেণু। আসলে রেণুর মনেও তখন মায়ের কথা তোলপাড় করছে। কিন্তু কোন্ মুখে সে মায়ের কথা জানতে চাইবে? মায়ের কথা মনে আসতেই আবার মৃত্যুর ছবি চোখে ভেসে ওঠে। সেদিনই প্রথম রেণু ফিট হয়ে গিয়েছিল। তার আগে তার ছোট ভাই—রতনটা বাবাকে আক্রান্ত হতে দেখে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠেও ঢুকে গিয়েছিল একটা তীক্ষ্ম বর্শা। পিঠটা দিয়ে রক্ত উঠেছিল—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচর হঠাৎ দুলে উঠেছিল রেণুর সামনে, সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে নিজেকে আবিষ্কার করেছিল কিছু অপরিচিত লোকের মধ্যে? তাদের কারো কারো শরীরে তখনো রক্ত লেগে ছিল।

মনে মনে মধু চায় রেণু মার কথা বলুক। গতকালই সে যখন রেণুকে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছিল, তখনই বাড়ি গিয়ে মাকে তার কথা বলেছিল মধু। কিন্তু মা বিচলিতও হয় নি ব্যাকুলও হয় নি। শুধু ভাবলেশহীন দু চোখের দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল মাত্র। সে দৃষ্টি দেখে তার মনের কোন কথা অনুমান করা যায় না। মধু আস্তে করে বলল—'রেণু, মাকে তোর কথা বলছি।' বিব্রত রেণু আরো বিব্রত হয়ে যায়। সে আঁচল দিয়ে মুখ ঘষে—তারপর মৃদু উত্তেজনার সঙ্গে বলে—'মা কেমুন আচে দাদা?' 'মার থাকা আর না থাকা—বাতে শরীরের অর্ধেক অবশ, বেশী হাঁটতে চলতে পারে না। তার ওপরে দেশ ছাড়ার পরে সেই যে কথা বন্ধ করেছে—মাঝে মধ্যে একটা-আধটা কথা বলে—আর সব সময় চুপচাপ বসে থাকে ঠাকুরের আসনের সামনে—' বলে মধু চুপ করে থাকে। হঠাৎই রেণু প্রশ্ন করে—'রতনের জন্য কাঁদাকাটা করে না?' রতনের কথাই বার বার আজ রেণুর মনে পড়ছে—খুব সম্ভবত এই জন্য যে আক্কিজুলের বয়েসও এখন ষোল বছর। সতের বছরের রতনের কথা যতবার মনে পড়ছে ততবারই আক্কিজুলের মুখটা ভেসে উঠছে তার মনে। 'নারে, মার চোখে জল দেখি নাই কোনদিন।'—মধু উদাস রেণুকে জানায়। রেণু ভাবে কাঁদলে তবু ভাল—শোকে কাঁদতে না পারলে মানুষের মনে যন্ত্রণা বড় বেশী অসহ্য হয়ে ওঠে।

মধু অবাক হয়ে রেণুকে দেখে—এখনো সে একবারও মাকে দেখার কথা বলছে না। সে কি মাকে দেখতে চায় না? চিন্তিত রেণুকে চমকে দিয়ে মধু বলে—'মা আর বেশীদিন বাঁচবে নারে।' রেণু তবু নিরুত্তর। মধু অবাক হয় তারপর স্পষ্ট করে বলে—'মাকে একবার দেখতে যাবি না, রেণু?'

রেণু মাথা হেঁট করে — যেন সমস্ত গ্লানি তার মাথার ওপরে বোঝার মত চেপে আসে। সে ইতস্তত করে তারপর অপরাধীর মত গলায় বলে 'আমার কি সেই মুখ আছে দাদা? মা কি আমারে—' মধু অবাক হয়ে ভাবে মেয়ে ভয় পায় তার মার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। মায়েরও তো অস্থির হয়ে ওঠবার কথা ছিল, কিন্তু মার সেই উদাসীন মুখ—নিরুত্তাপ চাউনি মনে পড়ায় এবং রেণুর সঙ্কুচিত ভাব দেখে তার মন বিষন্ন হয়ে ওঠে। নিজের মনটাকে শক্ত করে সে বলে—'মাকে দেখতে যাবি না, তা কি হয়? আমি তোকে কাল বিকালে এসে নিয়ে যাব রে রেণু—' রেণু মুখে আঁচলচাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকেলে নিয়ে যেতে চায় কেন দাদা? সে ভাবে—রাতে ব্ল্যাক আউট চারিদিকে তখন অন্ধকার থাকবে বলে কি? যাতে অন্য লোকের চোখে না পড়ে?

ক্লান্ত গলায় রেণু বলে—'থাইক দাদা—আমার ভয় লাগে। মা যদি—' মুখে একথা বললেও সেই মুহূর্তে রেণুর মনটা অভিমানে কেমন যেন প্লাবিত হয়ে যায়। বড় মেয়ে বলে মায়ের আদরটা সে কত পেয়েছে—সে কথা তার মনে আসে। সংসারের সব কাজে ছিল সে মায়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী। সেই মাতো দাদাকে বলে দেয় নি তাকে জোর করে নিয়ে যেতে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিজেকেই অপরাধী মনে হয়—সে এখনো বেঁচে আছে এটাই হয়তো মার কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মা কি কখনো তার এই রকম পরিণতি কোনদিন চেয়েছিল?

তবু মধু জোর দিয়েই বলে—'তোর ভয় নাই, তুই তৈরী হয়ে থাকিস, তোকে এসে আমি নিয়ে যাব।' কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রেণু। অনুতাপ লজ্জা আর ভয়ের ক্লেদাক্ত স্রোত তার কণ্ঠা অবধি উঠে আসে। সে মনে মনে বলে—আমার যাওয়া চলে না, যাওয়ার মুখ নেই আমার। 'তাহলে আমি যাই রেণু'—মধু চলে যাবার উদ্যোগ করে। কিন্তু চলতে গিয়ে পিছন ফিরে রেণুর সঙ্কুচিত শরীরটা দেখে হঠাৎ থমকে যায় সে। সহসা ছোট-বেলার কথা তার মনে পড়ে যায়।

কি তড়বড় করে হাঁটে রেণু। মধু তখন ফুটবলের ওস্তাদ খেলোয়াড় সে প্রায়ই চুপচাপ রেণুর পায়ে লেঙ্গি মেরে আনন্দ পেত। কখনো উল্টে পড়ে যেত রেণু, মাকে গিয়ে সক্রোধে নালিশ জানাত সে চোখের জলে। হেসে মধু মাকে গিয়ে বলত—'এইটা তো ফাউল না মা, আমি সাইড থিকা চার্জ করচি।' ক্রুদ্ধ রেণু তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

তার রাগ ছাড়াবার জন্য মধু সেই বরেবাড়ি থেকে বকফুল সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। রেণু বকফুল ভাজা খেতে খুব ভালবাসত। সে ফুল দেখে রেণু এমন নাচনাচি জুড়ে দিত তখন কে বলবে খানিকক্ষণ আগেই সে তার দাদাকে আক্রমণ করেছিল ক্ষিপ্ত বাঘের মত? সেই রেণু বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল দাঙ্গায়। নিজের অক্ষমতা অপদার্থতার জ্বালা বুকে নিয়ে মায়ের হাত ধরে এপারে চলে এসেছিল মধু। কে জানত এমনি করে আবার তাদের দেখা হবে?

মধু দু পা এগিয়ে আসে তারপর অনুতপ্ত মৃদু গলায় বলে—'আমি তো আছি রেণু তোর ভয় নাই, কাল তোকে নিয়ে যাব।' একটা উদ্গত আবেগে রেণুর শরীরটা কেঁপে ওঠে—সে বলে—'তোমার পাও দুইটা একটু ছুঁইতে দিবা দাদা?' রেণু তার অগ্রজকে প্রণাম করতে চায়, আজন্ম সংস্কারে এটা চাওয়াই তো স্বাভাবিক। তবু এত দ্বিধা, প্রণাম করবার অধিকার কি সে হারিয়ে ফেলেছে? স্থির হয়ে দাঁড়ায় মধু অপেক্ষা করে, রেণুর হাত নেমে আসে সহসা, মাথা নীচু হয়। মধুর দু চোখ তখন কি দুর্বোধ্য আবেগে যেন সজল হয়ে ওঠে — হয়তো রেণুরও।

•

সামনে মধু পথ প্রদর্শকের মত হাঁটে—পেছনে নিঃশব্দ শিথিল পায়ে রেণু তাকে অনুসরণ করে যায়। সবে সূর্য অস্ত গেছে—তবু আকাশে সামান্য আলো, অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হবে। রাস্তায় আলো জ্বলবে না। ব্ল্যাক আউট চলছে এখনো।

মধু যেন তার বোনকে সঙ্গে করে পিছন পানে হাঁটছে। যে-সময়কে তারা ফেলে এসেছে পিছনে — তারা যেন সেই পুরোণো দিনের দিকে ফিরে যাচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই—কি বা এত কথা বলার আছে যে কোন কথাই কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হতে পারছে না।

মধুর সঙ্গে রেণু যাবে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে একথা হয়েছিল সাত দিন আগে। কিন্তু এতদিন যাওয়া হয় নি। বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ, গায়ে বেহুঁশ জ্বর নিয়ে আজিজ ফিরেছিল যেদিন মধুর সঙ্গে রেণুর কথা হয় সেদিন রাত্রেই। এক দিন রেণু তার ছেলেকে ছেড়ে এক পা-ও নড়ে নি। মধু প্রতিদিনই এসেছে আর ফিরে গেছে। দু দিন থেকেই আজিজ যেন সম্পূর্ণ সুস্থ—শুধু সুস্থ নয় সে আহত হয়েছিল তাও বোঝা যাচ্ছে না। দু'দিন আগেই ঢাকার পতন হয়েছে, বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। আজিজ যেন কবরের তলা থেকে জ্যান্ত উঠে এল এই খবর শুনে। সে যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছে, শিশুর মত ছটফট করছে, কবে সে মাকে নিয়ে দেশে ফিরবে। ঠিক হয়েছে আগামীকালই তারা রওনা দেবে দেশের দিকে। মধুর সামনেই এসব ঠিক হল, মধু হঠাৎ কেমন অসহায়-ভাবে বলে উঠেছিল, 'তাহলে তুই মার সঙ্গে দেখাটা করে যাবি না রেণু?'

আজিজ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, সে জানত মধু তার মায়ের দেশের বাড়ির লোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সব শুনল, তার মা-যে রেণু সেকথাও তার অজানা রইল না। প্রথমে সে গম্ভীর হতবাক হয়ে গিয়েছিল—যা নাটকের চেয়েও নাটকীয়, জীবনে যখন তার চেয়েও অভাবিত কিছু ঘটে, মানুষ সহজে কি তা বিশ্বাস করতে পারে! রেণু চেয়েছিল আজিজ যেন এসব জানতে না পারে কিন্তু লুকিয়ে রাখা গেল না। তার প্রয়োজনই বা কি? আজিজকে রেণু ভালভাবেই চেনে, চোখের সামনে তাকে বড় হতে দেখল—তাদের সময়ে হিন্দু বলে মুসলমান বলে যে দূরত্ব ছিল এরা তা মানে না। আজিজের বন্ধু নির্মল—সে ভালবাসত রাবেয়াকে। রাবেয়ার মৃত্যুর পরে সে কেমন গুম হয়ে গিয়েছিল—মুক্তি-যুদ্ধে আজিজের পাশে দাঁড়িয়ে নির্মল নিজে মৃত্যুবরণ করেছে। আজিজও বলে—'আমরা পেট পুইরা খাইতে পাই না, আমাগো শিক্ষা নাই—চাকরী নাই—হিন্দু-মুসলমান সকলকারই এক অবস্থা মা—সেইখানে তো জাত নাই।' তার ষোল বছরের ছেলেটার মুখে এসব কথা শুনে রেণুর বুকটা ভরে যায় আবেগে।

আজিজই আজ তাকে জোর করে পাঠাল। নয়তো মায়ের সঙ্গে হয়তো সত্য রেণু দেখা করতে যেত না। রেণুর না এসে উপায় ছিল না। ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাতটা গলায় ঝুলিয়ে আজিজ তো লাফিয়েই উঠেছিল সেও যাবে তার দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে। কিছুতে তাকে থামানো যায় না। একটা যুদ্ধ জয়ের সমান আনন্দ আর উত্তেজনায় সে নাছোড়বান্দা — সে যাবেই, অনেকশেষে রেণু তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখে এসেছে। বলেছে আরেকবার দেশ থেকে এসে সে যেন দেখা করে যায়। আজিজ মধুর কাছ থেকে তাদের বাড়ির ঠিকানা পরিচয় সব জেনে নিয়ে তবে শান্ত হয়েছে।

রেণু যে আজিজকে নিয়ে আসে নি সে শুধু আজিজের হাতের জন্য নয়, রেণু আতঙ্কিত তাকে দেখে তার মা কি করবে! মধুর হাতে ছোট্ট একটা টর্চ সেটা জ্বলছে-নিভছে। খালি পায়ে হাঁটছে রেণু, খোয়া-ময় রাস্তা—এর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক পথ তারা কুড়ি পঁচিশ দিন হেঁটে পার হয়ে এসেছিল। আজকেই এতে তার কোন কষ্ট হচ্ছিল না শুধু তার মন মায়ের কথা ভেবে তোলপাড় করছে—অথচ দাদাও কিছু বলছে না। শেষে রেণুই জিজ্ঞেস করে—'আমার কথা শুইন্যা মায় কি কইল দাদা?' অন্ধকারে মধুর অন্যমনস্কতা ভেঙে যায়—সে এরকমই ভয় করছিল, রেণু কিছু জিজ্ঞেস করবে। মধু কি বলবে ভেবে পায় না, হাজার হলেও নিজের পেটের সন্তান তো, মা হয়ে মেয়েকে কি উপেক্ষা করতে পারবে? সে অন্য কথা বলে—'প্রায় তো এসেই পড়লাম, এই রাস্তাটা মোড় নিলেই আমাদের বাড়ি—'

রেণুর বুকটা চুপসে যায় দাদার কথা শুনে। তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে তার মনটা দমে যায়। আর সামনেই সেই বাড়ি যেখানে গিয়ে তার মাকে রেণু দেখতে পাবে আঠারো বছর পরে—উত্তেজনা আশংকায় তার হাত পা শিথিল হয়ে আসে। রাস্তা ক্রমে সরু হচ্ছে—আশে-পাশে খানা-ডোবা, একটা ঝোপঝাড়ে ঘেরা বাড়ির সামনে এসে মধু বলে—'শোকে দুঃখে মা অন্য রকম হয়ে গেছে রে রেণু।'—বলে সে বাড়ির ভেতরে ঢোকে—'আয় রেণু এসে গেছি আমরা—'

শঙ্কিত উদ্বিগ্ন পায়ে রেণু মধুকে অনুসরণ করে। একটা বড় টিনের ঘর, বাঁশের বেড়া, সামনে ছোট্ট বারান্দা। উঠোন থেকে দেখা যায় বারান্দার বাঁ পাশের ঘরে কে একজন পিছন ফিরে বসে আছে। ডান দিকের ঘরে ঢুকে যায় মধু—গলা সামান্য উঁচু করে বলে—'মণির মা রেণু এসেছে।'

উঠোনেই দাঁড়িয়ে থাকে রেণু। ঘর থেকে মোড়া হাতে একটি ঘোমটা-টানা বৌ বেরিয়ে আসে। সঙ্গে একটি ফ্রক-পরা ছ সাত বছরের মেয়ে। বৌটি বেশ ত্রস্তভাবে এসে উঠোনেই মোড়াটা এগিয়ে দেয়। পেছনে মধু এসে বলে—'বারান্দায় দাও না—' রেণু প্রতিবাদ করে—'না ঠিক আছে।' মধু রেণুকে বলে—'তোর বৌদি, আর এই মেয়ে মণি,'—তারপর মণির হাত ধরে বলে রেণুকে দেখিয়ে—'তোর পিসি রে মণি,' সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি সঙ্কুচিত হয়ে মধুর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। রেণুর ইচ্ছে করে বৌদিকে প্রণাম করতে—তাদের সম্পর্ক প্রণামের কিন্তু তার হাত ওঠে না হয়তো বয়সে তার ছোটই হবে বৌদি এমনি যুক্তি তার মাথায় আসে। 'চা কর।' —মধু বলে। বৌদি এবারে ভাল করে রেণুর দিকে তাকায় রেণুও। বৌদি হেসে বলে—'তুমি বস আমি চা করে আনি।'

মধু মেয়েকে বলে—'পিসিকে প্রণাম কর।' সরল পিতৃভক্ত মেয়েটি ভীরু পায়ে রেণুর কাছে আসতেই রেণু তাকে দু হাতে টেনে নেয়—জিজ্ঞেস করে 'নাম কি তোমার?' মেয়েটি ধপ করে প্রণাম করে। রেণু তার চিবুক স্পর্শ করে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে। তখন মধু ইতস্তত করে বাঁদিকের ঘরে ঢুকে যায়। রেণু স্পষ্ট বুঝতে পারে থান-পরা ঘোমটা টানা তার মা ঠাকুরের আসনের সামনে বসে আছে। স্থির নিষ্কম্প তার শরীর। সামনে প্রদীপ

জ্বলছে। মধু খুব কাছে গিয়ে কিছু বলে বোধহয় নিম্নস্বরে।

এ সময় মেয়েটি খুব আস্তে রেণুকে প্রশ্ন করে—'তুমি আমার পিসী?'

'হ্যাঁ তোমার পিসী।'—বলে রুদ্ধ আবেগে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে রেণু আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের ভেতরে কান্নার শব্দে সে চমকে ওঠে।

হতচকিত রেণু দেখে মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিলাপ করছে তাঁর মাথা মাটি স্পর্শ করছে। তার কান্নার সুর ক্রমে অস্থির হয়ে উঠেছে, কোন কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, মাঝে মধ্যে—'হায়রে আমার রতন রে।' — সম্ভবত এ জাতীয় কোন শব্দ উঠছিল। হয়তো শুধু রতনের নয়, বাবার মৃত্যুর শোকও হয়তো মার এতদিনের জমানো কান্নায় ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এখন সামনে লণ্ঠন জ্বলছিল—বৌদি রেখে গেছে, রেণুর ইচ্ছা হচ্ছিল লণ্ঠনটা নিভিয়ে দেয়। খুব সঙ্কুচিত হয়ে মধু মায়ের পেছনে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। রেণুর মনে হয় তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

মেয়েটি সভয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখে—হঠাৎ তার ঠাকুমার কান্নার কারণ সে অনুমান করতে পারে না। ফলে সে পিসীর দিকে চেয়ে দেখে। তার চোখেও জল দেখে সে অবাক হয়। রেণুর চোখের জল তখন নিঃশব্দে তার দু গাল বেয়ে পড়ছে। তার বার বার মনে হয় না এলেই ভাল হত। মায়ের কান্না থামে না। অনেকক্ষণ ওরা সবাই নির্বাক হয়ে থাকে। চা দিয়ে যায় বৌদি কিন্তু চা খেতে পারে না রেণু, চা জুড়িয়ে জল হয়ে যায়। রেণু বুঝতে পারে মা কিছুতেই উঠবে না, তার দিকে ফিরেও চাইবে না। তবু তার ইচ্ছা করে শুধু মায়ের মুখটা একবার দেখতে কিন্তু মা তেমনি উপুড় হয়ে পড়ে আছে আসনের সামনে।

রেণু এসব ভুলে গেছে কতদিন, তার কোন ঠাকুর নেই, তার কোন নামাজ নেই—পূজা নেই। রেণুর কাছে এসব অবান্তর হাস্যকর হয়ে গেছে কবে। ঠিক এ সময় তার ওসমানের কথা মনে পড়ে। বাবাকে ভাইকে খুন হতে দেখে সে মূর্চ্ছা গিয়েছিল, তারপর তার মূর্চ্ছা সেরে গেলে সে দেখেছিল কয়েকটি লোক তার ইজ্জত নেবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ এ সময় কোথা থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওসমান। ওসমান তার ইজ্জৎ বাঁচিয়েছিল, বিয়ে করবার জন্য সে জোর জবর-দস্তিও করে নি। শেষ পর্যন্ত রেণু নিজেই রাজি হয়েছিল। মা কি আশা করেছিল মান বাঁচাতে তার রেণু আত্মহত্যা করবে? সে চেষ্টাও রেণু করে নি তা নয়, কিন্তু ওসমানের জন্যই রেণু সেটা করতে পারে নি। নিজে হাতে নিজেকে খুন করা সবচেয়ে কঠিন কাজ।

এ সময় হঠাৎ রেণু উঠে দাঁড়ায়, দৃঢ় স্বরে মধুকে বলে—দাদা চল যাই—আমারে পৌঁছাইয়া দিয়া আস।' তার কণ্ঠস্বর উঁচু বলেই তার মায়ের কানে গিয়া থাকবে। কিন্তু তাতে তার কান্না থামে না বরং আরো বেড়েই যায়। 'হায়রে আমার রতন।' — তার মায়ের কণ্ঠস্বর আরো স্পষ্ট হয়। রেণুর মনে হয় মায়ের এ-শোক এ-কান্না শুধু তাদের দূরত্বকে বাড়িয়েই দিচ্ছে। মা কখনো তার সামনে এসে দাঁড়াবে না। হতাশভাবে মধু বেরিয়ে আসে, সেও বুঝতে পারে মা আসবে না কিছুতেই রেণুর সামনে। রেণুকে সহজভাবে নিতে পারছে না বলেই এতদিন বাদে মা কান্নায় ভেঙে পড়ছে।

অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে রেণু সবই কি তার দোষ? তার মনে হয় ছুটে চলে যায় সে এই মুহূর্তে এখান থেকে। তবু পা বাড়িয়ে সে অবাক হয়ে যায়। ভেতরের কান্না তার কণ্ঠায় এসে চেপে ধরে, তার মনে হয় অন্তত একবার সে মাকে চোখের দেখা দেখে যায়। শেষবারের মত সে মুখ ঘুরিয়ে দেখে—কিন্তু মা তেমনি অনড়—তেমনি উপুড় হয়ে পড়ে কান্নাকাটি করে যাচ্ছে। তার মনে হয় শেষ সুযোগও তার হাত ছাড়া হয়ে গেল, এত কাছে এসেও সে মায়ের মুখটা দেখে যেতে পারল না, কোন দিন এই জন্মে আর মায়ের মুখ তার দেখা হবে না।

মধু নিরুপায় গলায় বলে—'চল রেণু তোকে দিয়ে আসি।' ঠিক এই মুহূর্তে দাদার ওপরেই রেণুর রাগ হয়ে যায়—এই জন্যই কী তবে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল? 'এ-সবের কী দরকার আছিল দাদা?' —তীব্র ভৎসনার সুর তার গলায়। তার দু' চোখ অশ্রুপূর্ণ। দ্রুত পায়ে রেণু উঠান থেকে রাস্তার দিকে ছুটতে যাবে ঠিক এ সময়ে বাইরে কিছু লোকের গুঞ্জনে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। আর কিছু ভাববার আগেই হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে—'মা'—জোরে হাঁক দিয়ে আজিজ উঠোনে এসে দাঁড়ায়।

গাঢ় নৈঃশব্দের মধ্যে—আজিজের কিশোর কণ্ঠের 'মা'—ডাক যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে যায়। ঘরে কান্নার আওয়াজ যেন সে-শব্দে ডুবে যায়। খানিকক্ষণ এরপর বিস্ময়কর নিস্তব্ধতা। আজিজ কিছু বুঝে উঠতে পারে না, তার মা—উঠোনে দাঁড়িয়ে আর সবাই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেভাবে তার আসাটাই বুঝি অন্যায় হয়েছে, হেসে আজিজ বলে ওঠে, 'চইলা আসলাম মা, থাকতে পারলাম না। তুমি একাই সব দেখবা আমি দেখুম না?'

হঠাৎ এ সময়ে রেণু তার সরল তেজস্বী ছেলেকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে কেঁদে ওঠে। আজিজ আরো অবাক হয়। তার মনে হয় মাকে ছেড়ে যেতে তার নিজের মায়ের বুঝি অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। 'আমব তো এখন আসুম মাঝে মধ্যে'—আজিজ নিজের মাকে সান্ত্বনা দেয়, তারপর বলে—'কই দিদিমা কোথায়?' বলে সে মাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে তখন রেণুর মায়ের কান্না থেমে গেছে। নিজের কান্নার শব্দে সে সম্পূর্ণ না শুনলেও কিশোর কণ্ঠের জোরালো 'মা' ডাক তার কানে গেছে। গত আঠার বছর ধরে রতনের যে-ছবি তার বুকের ভেতরে যন্ত্রণাময় বাৎসল্যের ঘেরাটোপে বন্দী রয়েছে—সে ছবিও সেই কিশোর রতনের। তার কণ্ঠস্বরও ছিল এমনি জোরালো। সময় চলে গেছে কিন্তু মায়ের কাছে সে রতনের বয়েস বাড়ে নি, তার সেই কিশোর শরীর মায়ের মনের মধ্যে জীবন্ত অপরিবর্তনীয়ভাবে বেঁচে আছে। কোন্ মা তার ছেলের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারে? সন্তান মরে গেলেও সে মায়ের কোল জুড়ে বসে থাকে চিরদিন—তার বুকের খোপে চিরজীবী হয়ে বসে থাকে। ফলে বৃদ্ধা রেণুর মা হঠাৎ বার্ধক্যে দুর্বল দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। অস্পষ্ট স্বরে আপন মনে উচ্চারণ করে—'কে?' তার শিথিল হাতের শক্তিতে সে কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারে না। ভারী শরীরটা কাঁপতে থাকে, তবু বার বার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

আর ঠিক তখনই নিজের মায়ের হাত ছাড়িয়ে নেয় আজিজ। ঘরের মধ্যে এই বৃদ্ধাকে তার চোখে পড়ে। তার উঠে দাঁড়াবার অক্ষম চেষ্টা দেখে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, সহসা সে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছুটে যায়। একেবারে ঘরের ভেতরে ঢুকে বৃদ্ধাকে সবল দু-হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে আজিজকে দেখতে থাকে। তার ক্ষীণ দৃষ্টিতে সবকিছু স্পষ্ট হয় না, সামান্য ঝাপসা লাগে, তাই হাত বুলিয়ে পরম মমতায় সে আজিজের মুখ চোখ নাক—গলার থেকে ব্যাণ্ডেজে ঝোলানো আহত হাত স্পর্শ করে। তার দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। হঠাৎ আজিজ ঝপ্ করে প্রণাম করে তার দিদিমাকে—তারপর কোমল বিষাদাচ্ছন্ন গলায় বলে ওঠে—'কান্দ ক্যান দিদিমা?'

আর বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে তখন রেণু সশব্দে কেঁদে ওঠে। দীর্ঘকাল বুকের ভেতরে জমিয়ে রাখা অসহ্য কান্নায় সে এতদিন বাদে ভেঙে পড়ে।

নিজেকে সর্বাঙ্গে মেলে ॥

শংকর চট্টোপাধ্যায়

আজ নিজেকে সর্বাঙ্গে মেলে বসে আছি
তোমরা কেউ এসো না।
এখন আমার চোখের জল ধরতে এসেছে নদী
ছায়ায় ওম পেতে ভুবন
আত্মায় ভাগ বসাতে অগ্নি
তোমরা এ-সব মিথ্যে করে দিও না।

দ্যাখো আমার কয়েদখানায় আলো পড়েছে গভীর হয়ে
লুট চলেছে রঙের
বাইরের বরাদ্দ বন্ধ, নিজস্ব ভাঁড়ারে দিচ্ছি টান
নিজেকেই কাঁদাচ্ছি অবুঝ হয়ে।
আজ নিজেকে সর্বাঙ্গে মেলে বসে আছি
তোমরা আমাকে মিথ্যে করে দিও না।

দিনরাত্রি পথ চলা ॥

বার্ণিক রায়

দিন রাত্রি আমি পথ হাঁটছি কিছু দেখবো বলে
কিছু পাবো এই ভেবে
আসলে কিছুই পাই না, কিছুই দেখি না
সারাদিন সারা রাত্রি এমন অদ্ভুত খোঁজার কোনো মানে হয় না
মানে হয় না বলেই চলছি, এগোচ্ছি।

বিনিদ্র রাত্রির তন্দ্রাশূন্য চোখে সুদূর কান্নার জল দোলে
পথশ্রান্ত পথিকের দু' হাঁটুতে ক্লান্তির বিষাদ জড়ো হয়।

কিন্তু কি খুঁজি, কি চাই, কি যে দেখি?
আমার চাওয়া আছে, চাওয়ার বস্তু নেই
বস্তু থাকলেও তাকে পাওয়া যায় না
তাই চলছি, হাঁটছি, জেগে আছি, চোখে একটুও ঘুম নেই,
এমনি চলতে চলতেই
অন্ধকারে সকল খোঁজার শেষ হবে

সেই লক্ষ্যেই আমরা কেবল স্থির
আর সব চঞ্চল, অস্থির।

নগ্নদেহে ঈশ্বরের মতো ॥

কান্তি গুপ্ত

এসো আজ স্নান করি
নগ্ন দেহে গঙ্গোত্রী-উজানে,
নগ্ন দেহে, ঈশ্বরের মতো।
আমাদের মগ্ন-অহমিকা
ফুল হ'য়ে পল্লবিত হোক;
গভীর মাটির বুকে নত হ'য়ে
নামুক নীরবে,
পরিণত বনস্পতি যেন।

রঙীন মাছের মতো খেলা করি
তালে তালে চলোর্মির নীচে;
হাঁস হ'য়ে ভেসে যাই
বহুদূরে বনান্ত-রেখায়।
যখন নিবিড় মেঘে বেলা যাবে
উৎস-মুখে কোমল আলোয়,
কেমন নিঃশব্দে ঘরে ফেরা
নতশীর্ষ গুল্মের কিনারে;
সর্বাঙ্গে সবুজ ক্ষমা
ছায়া হ'ব আভূমি-প্রণত।

এসো আজ স্নান করি
নগ্ন দেহে ঈশ্বরের মতো।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ডাঃ ল্যাম তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে নেহরুজীর প্রতি তাঁর বিরূপতার পরিচয় দিয়েছেন। যত্রতত্র নেহরুজীকে এক হাত নেওয়ার লোভ দংবরণ করতে পারেন নি। নেহরু কেন চীনা দাবী মেনে নেন নি, তাঁর এই অনীহা এক হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী মনোভংগীর পরিচায়ক. এই জাতীয় নানা মন্তব্য দ্বারা ডাঃ ল্যাম তাঁর গ্রন্থটিকে কলংকিত করেছেন। নেহরুর এই একগুঁয়েমির ফলেই নাকি—

"The state of Sino-Indian relation deteriorated to the point, in late 1962, when the Chinese lunched their military demonstration in Ladakh and across the Mc Mahon Line". (P.584)

ভারতীয় ভূভাগের মধ্যে চৈনিক অনুপ্রবেশ কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫০ মাইল ভিতরে পৌঁছেছিল—তার নাম নাকি 'মিলিটারি ডেমোনস্ট্রেসনস'। যা ঘটেছিল তার নাম যদি ডেমনেস্ট্রেসন হয় তাহলে সেই যে বলে 'বঁড়শিও নয় টঁড়সিও নয়—সোজা বেঁকানো'—যুদ্ধের অর্থও তাই হয় ওঠে।

চীনারা যা করেছিলেন তার সঙ্গে নাম মেলে না। সুজারেনিটি এবং 'সভরেনিটি' এই দুটি কথার তাত্ত্বিক চুলচেরা পার্থক্য ইয়ং হাসব্যান্ড মিশনের কালেই সুস্পষ্ট ছিল এবং এই কালে তার ব্যবহার গভীর অর্থব্যঞ্জক হয়ে উঠেছিল। ডাঃ ল্যামের গ্রন্থেই একটি মজার কথা উল্লিখিত হয়েছে—

"during Calcutta negotiations (in 1905, designed to secure China's 'adhesion' to the Lhasa convention) Tang (Shaoyi) had from time to time said Suzerainty when he meant Soverignty" (P. 42).

ডাঃ ল্যামের যুক্তির প্রয়োজনে যে সব তথ্য অসুবিধাজনক মনে হয়েছে তা তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। পরলোকগত চার্লস বেল এবং মিঃ হিউ রিচার্ডসনকে কোনো মতেই নয়াদিল্লীর হিস্টরিক্যাল ডিভিসনের মিত্র বলা যায় না। দীর্ঘকালের নিবিড় সংযোগের ফলে এঁদের তিব্বত এবং তিব্বতীদের সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সর্বজন স্বীকৃত কিন্তু ডাঃ ল্যাম বলেছেন যে এই পণ্ডিতরা তিব্বতের একটা বিকৃত আকৃতি এঁকেছেন—সব রকম চীনা বস্তুর প্রতি তিব্বতিদের অনাগ্রহ বিষয়ে তাঁরা যা বলেছেন তা নাকি বিকৃত।

এই সব মন্তব্য পড়তে বসে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগবে যে স্থান কাল পাত্র বিষয়ে ডাঃ ল্যামের জ্ঞান কতখানি প্রত্যক্ষ। আঞ্চলিক ভাষা বিষয়ে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই. শুধু মাত্র ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এবং লন্ডনের পাবলিক রেকর্ড অফিসের ওপর নির্ভর করে তিনি এই গ্রন্থ লিখেছেন।

ডাঃ ল্যাম প্রায়শ উল্লিখিত একটি ধারণার ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস যে সমগ্র ভারত-চীন সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্নটি নিয়ে ভারত যদি আলোচনায় বসত বা আকসাই চীন নিয়ে একটা লেনদেন করত তাহলে হয়ত পিকিংও ম্যাকমোহন লাইন মেনে নিত। যে লেখক সমগ্র সমস্যাটির গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন এবং অজস্র নথীপত্র ঘেঁটেছেন তিনি যে প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য প্রমাণ উপেক্ষা করতে পারেন তা বিস্ময়জনক মনে হয়। এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রচন্ড জনদাবীর ফলে পরলোকগত লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন যে চীনের সঙ্গে আলোচনার তিনি উদ্যোগ করবেন। তবে তার জন্য অন্তত সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ দাদক থেকে সাতটি বেসামরিক ঘাঁটি সরিয়ে নিতে হবে। এই সাতটি ঘাঁটি কলম্বো প্রস্তাবের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করে বসানো হয়। বলা বাহুল্য, পিকিং গালভরা জবাব দিয়ে শাস্ত্রীজীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এই সূত্রে ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে থাউ ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসে প্রদত্ত চৌ এন লাই-এর আনুষ্ঠানিক উক্তর দ্রষ্টব্য—

"We will not withdraw a single one of these [illegible] and at the same time the Indian Government has to be reminded that 90,000 square Kilometres of territory South of the so-called Memohon Line are Chinese territory over which China never relinquished its Soverignty..can wait".

ডাঃ ল্যামের বিভিন্ন যুক্তি জালের কাছে এই কথাগুলি কত সুস্পষ্ট এবং অর্থব্যঞ্জক। লেখকের চুলচেরা তর্কের কাছে মুখের মতো জবাব।

এই গ্রন্থে অন্যত্র তিনি স্বীকার করেছেন যে সীমানা নির্ধারণের কাজে ম্যাকমোহন খুব বেশী সরে গিয়েছেন বলা যায় না। ডাঃ ল্যাম স্বীকার করেছেন কার্যক্ষেত্রে একটা সুক্ষ্ম সীমারেখা উদ্ভাবন করা একটা সহজসাধ্য কাজ নয়। তিনি বলেছেন —'যদি কোনো রকম সালিশীর ব্যবস্থা হত তাহলে তাওয়াং বা লোহিত অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র ম্যাকমোহন লাইন জাতীয় একটা সীমারেখাই নির্দিষ্ট হত।' লোহিত এবং তাওয়াং-এ ভৌগোলিক সীমারেখার সঙ্গে রণকৌশলগত যুক্তি জড়িয়ে আছে এই তাঁর ধারণা।

এক কথায় উপরোক্ত কথার মর্মার্থ হল এই যে ম্যাকমোহনের হাতের কাজ 'এথনিক' দিক থেকে সুদৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মাত্র যে দুটি ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত আপত্তিকর মনে হয়েছে তার পিছনে আছে রণকৌশলগত যুক্তি। ম্যাকমোহন কবরে শুয়ে ডাঃ ল্যামের কাছ থেকে এই অনিচ্ছাকৃত প্রশংসা লাভ করে নিশ্চয়ই খুসী হবেন।

ডাঃ ল্যাম বলছেন লালচীন মোটেই আগ্রাসী নয়, মাঞ্চুদের চীন বা রিপাবলিকের কালের চীনের চেয়ে বরং অধিকতর নরমপন্থী—'র‍্যাদার মোর মডারেট'। তিনি এইখানে উল্লেখ করেছেন চীন কিভাবে বর্মা, নেপাল এবং পাকিস্তানের সীমানার মীমাংসা করে নিয়েছে। ডাঃ ল্যামের এই উক্তিও ঠিক নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত কারাকোরম সীমানা চুক্তিটি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেই তা জানা যাবে. এছাড়া ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী চীন-বর্মা আলোচনার কথাও স্মরণযোগ্য। গালুম, কাংক্যাং, অথবা কাচিন অঞ্চলগুলি সংক্রান্ত বিতর্কের কথা ডাঃ ল্যামের নজর এড়িয়ে গেছে। তিনি হয়ত বলতে চান যে নেহরুজী যদি বেশী হৈ চৈ না করতেন তাহলে ম্যাকমোহন লাইনকে একটা আইনগত মর্যাদা দিয়ে চৌ-এন-লাই এবং তাঁর সরকার একটা 'রিমার্কেবল সারেনডার' করতেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এই বিতর্কমূলক গ্রন্থবিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। কয়েকটি মুখ্য বক্তব্য মাত্র আলোচিত হল।

বিতর্কিত ম্যাকমোহন লাইন (২)

আমাদের মনে হয় সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে নয়াদিল্লীর কর্তারা পরিপূর্ণ বিচার করেন নি। ইয়ং হাসবাণ্ডের অভিযানের সম্যক অর্থ তাঁরা উপলব্ধি করেন নি। এই বিষয় পুনর্বিচার প্রয়োজন এবং একটি বিতর্কিত সীমানা যা নিয়ে একটি বিরাট শক্তি ও মহান প্রতিবেশীর সঙ্গে এমন ধীর মনকষাকষি চলছে তার সম্মানজনক মীমাংসা সাধন প্রয়োজন।

চীনের সঙ্গে এই সীমানা বিষয়ে সংঘর্ষ এবং সম্পর্কের অবনতির ফলে নেহরুজীর অন্তরে যে গভীর আঘাত লেগেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়, এবং এরপর নেহরুজী আর তাঁর পূর্বেতন স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে পাননি।

এই সূত্রে প্রাক্তন দালয় লামা এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের কথায় তাঁর 'টিনপট ডিপ্লোমেসি'কেও সম্পূর্ণ অপরাধী করা যায়। বিশ্লেষণের ফলে বলা যায় ইয়ং হাসবাণ্ডের অপসারণের পর শক্তির ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা আর পূর্ণ করা যায়নি। ম্যাক্মোহন' যে সীমারেখা এঁকেছেন সেটি বৃহৎ শক্তির ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে এমন এক অবস্থায় পৌঁছবে যে তার ন্যায়নিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ আর সম্ভব নয়।

—অভয়ঙ্কর

The McMohan Line: A study in the relations between India, China and Tibet -(1904-to 1914). —By ALASTAIR LAMB : 2 vols

John Keats: His mind and work by Bhabatosh Chatterjee Publisher —Orient Longman, 17, Chittaranjan Avenue, Calcutta -13. Price Rupees Thirty

সতেরো শ' আটানব্বই খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ও কোলরিজের যুগ্ম প্রয়াসে যে 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' প্রকাশিত হয় ইংলণ্ডে, সেই প্রকাশকাল থেকেই ঐতিহাসিকভাবে রোমান্টিক সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে ইংরেজী সাহিত্যে। এই রোমান্টিক সাহিত্যের অতুলনীয় কবি-গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন কবি জন কীটস। সেকালের তরুণ কবি কীটসের অল্প বয়সে মৃত্যু কি ভয়ংকর আলোড়ন তুলেছিল রোমান্টিক কবিকুলে, তার প্রমাণ আছে শেলীর শ্রেষ্ঠ শোক কাব্য 'এ্যাডোনেইস' রচনার ঘটনায়। কীটসের মৃত্যু শেলীর কাছে দারুন এক ক্ষতি বলে মনে হয়েছিল। পত্রিকায় কীটসের বিরুদ্ধে সমালোচনা শেলীকে তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার করেছিল।

এই কীটসকে নিয়ে শুধু আলোচনা নয়। বলা যায় বুদ্ধিগত আন্দোলন তৈরী হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী মহলে। সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক-সমালোচক শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায় রচিত কীটসের মানসধর্ম ও কবিকর্মের দীর্ঘ ও মূল্যবান আলোচনা গ্রন্থটি তার আর এক প্রমাণ।

একথা সাধারণভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কীটস রূপ, রস, শব্দ স্পর্শ গন্ধের জগতে বিহ্বল এক তরুণ সপ্রাণ কবি। কিন্তু কীটসের অন্তর্জীবনের ঘোষণা হল— তাঁর সাহিত্য ও জীবন ভাবনা ইন্দ্রিয় নির্ভর সৌন্দর্য বিহ্বলতার স্তর থেকে উন্নীত হওয়ার এবং বুদ্ধি নির্ভর পরিণতি লাভ ও সামগ্রিকভাবে চেতনার জাগরণের অক্লান্ত প্রয়াস। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কীটস সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত ধারণার মধ্যে নতুন বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন।

প্রবন্ধকারের মূল লক্ষ্য হল কীটসের অধ্যাত্ম অনুসন্ধিৎসার স্বরূপ অনুসন্ধান। এ বিষয়ে তিনি প্রধানত কবির চিঠিপত্র ও কবিতাবলীই গ্রহণ করেছেন। তিনি আলোচ্য কবির অধ্যাত্ম-অনুসন্ধিৎসার যে দুটি প্রধান দিক নির্দিষ্ট করেছেন, তা তাঁর আলোচনার স্পষ্টতার ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিচায়ক। 'কীটস আদ্যন্ত সৌন্দর্য সম্ভোগের কবি', তিনি 'বিউটি মিস্টিক' তাঁর সৌন্দর্য তন্ময়তা যেন বা তাঁর কাব্যের সহজ ললাট-লিখন, এরকম প্রথানুগ আলোচনার ধারাকে সরিয়ে নতুন চিন্তায় ব্রতী হয়েছেন প্রবন্ধকার তাঁর গ্রন্থে। কবির কবিতা ও চিঠিপত্র তাঁর সর্বকালের আধুনিকতার প্রাণচিহ্ন বহন করছে—প্রবন্ধকারের লক্ষ্যবস্তু এটাই।

লেখক আলোচনাটিকে তিনটি অংশে ভাগ করেছেন, নাম দিয়েছেন 'দি পোয়েট অব সার্চ' 'দি কমিক ইন কীটস' এবং 'দি পোয়েট্রি অব জন কীটস।' প্রত্যেকটি অংশের আলোচনা বিস্তৃত এবং যুক্তিনিষ্ঠ। কবির কাব্য থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে এবং কবির সমসময়বর্তীকালে লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে ভবতোষ বাবু যে নিজস্ব বক্তব্যের উপস্থাপনা করেছেন, তা প্রবন্ধকারের বাস্তব যুক্তিনিষ্ঠ মৌলিক চিন্তার পরিচয় নিঃসন্দেহে। কীটস ও শেকসপীয়ার সংক্রান্ত আলোচনাগুলি এবং আধুনিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সঙ্গে কীটস কবিমানসের যোগসূত্রের প্রসঙ্গগুলি নিপুণ মনস্বিতার সঙ্গে রচিত।

লেখক কবির কবিতাগুলির আলোচনা-কালে কোথাও নিজস্ব লক্ষ্য থেকে সরে যাননি। সচেতন, সতর্ক প্রবন্ধকার কীটস সম্পর্কিত বিভিন্ন খ্যাত কীর্তি সমালোচকের মন্তব্যকে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে আপন যুক্তিগ্রাহ্য ও মননশীল ভাবনায় আলোচনা করেছেন। নিরপেক্ষ সমালোচকের আবেগহীন দৃষ্টিভংগী আলোচ্য গ্রন্থের সার্থক আলোচনার সহায়ক হয়েছে।

গ্রন্থটির ভাষা সহজ ও গতিপ্রাণ। জটিল অংশগুলিকে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সমালোচনা কোথাও এতটুকু নীরস হয়নি বরং একজন রোমান্টিক কবিকে আলোচনা করতে বসে সমালোচক সমালোচনায় কখনো কখনো রোমান্টিক রীতিকে অনুসরণ করেছেন। যুক্তিনিষ্ঠ মৌলিক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগী থাকায় প্রবন্ধকারের বর্তমান গ্রন্থটি ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যে মর্যাদা-পূর্ণ স্থান পাবে বলে মনে করি।

জয় বাংলা (বিশেষ সংখ্যা।১৯৭২)। সম্পাদকমণ্ডলী— আবদুল গাফফার চৌধুরী, ডঃ এবনে গোলাম সামাদ, ইত্যাদি। মুজিবনগর, বাংলাদেশ। মূল্য দুই টাকা।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারীর ঠিক আগের দিনটিতেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র জয়বাংলা'র বিশেষ সংখ্যাটি একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পত্রিকাটিতে বেশী নতুন লেখা প্রকাশিত হয়নি তবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে 'জয় বাংলা' পত্রিকায় যেসব ঐতিহাসিক ভাষণ, বিবৃতি এবং অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, আলোচ্য সংকলনটি তাদের নিয়েই বিশেষ সংখ্যা। মুক্ত বাংলাদেশের পক্ষে পত্রিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল বিশেষ। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ ছবি এতে স্থান পেয়েছে। পীর আলি ও কামরুল হাসানের বিখ্যাত কার্টুনগুলি এর অন্যতম সংযোজন। পুনর্মুদ্রিত ও নতুন রচনাগুলির লেখকসূচীতে আছেন মুজিবর রহমান, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমিজুল হক বাদশা, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবদুল খামান ইত্যাদি। সার্থক কয়েকটি কবিতা সংকলিত হয়েছে যাঁদের তাঁ

হলেন সর্বশ্রী অন্নদাশংকর রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বোম্বানা বিশ্বনাথন ও নির্মলেন্দু গুণ। সংকলনটির প্রত্যেকটি রচনা সুচিন্তিত এবং মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে মূল্যবান। এপার বাংলার প্রতিষ্ঠিত প্রচ্ছদ চিত্রী পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদপট এর অন্যতম মূল্যবান দিক। সংকলনটি সর্ব-স্তরের বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের পক্ষে সংরক্ষণের উপযোগী।

অথৈ জলে মানিক—দেবল দেববর্মা। বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা—১২। পাঁচ টাকা।

শ্রীদেবল দেববর্মা একজন প্রতিষ্ঠিত কথাকার। তাঁর আলোচ্য গ্রন্থটি সেই প্রতিষ্ঠার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। গ্রন্থটি প্রধানত দুটি বড় গল্প বা নভেলেটের সংকলন। গল্প দুটির মধ্যে একটি নাম গল্প, অপরটি 'অন্তরে আঁধার'। দুটিই গোয়েন্দা গল্প।

প্রথম গল্প অর্থাৎ 'অথৈ জলে মানিক' গল্পে লেখক একটি শিশুসন্তান চুরির কাহিনী সূত্রে কাহিনীর জটিলতা এনেছেন। অমলা দেবী হাসপাতালে সন্তান হারিয়ে পাগলের মত। স্বামী অমিয়বাবু বিখ্যাত সি আই ডি ইন্সপেকটর রাজীব সন্যাল ও তার সহকর্মী সুব্রতর সাহায্যে সমস্যার সমাধান আনে। নার্স ক্লারা সিম্পসনকে দোষী মনে হয় প্রথমে, শেষে সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। অতৃপ্ত সন্তান-বাসনা এই কাহিনীর রহস্যঘন জটিলতা সৃষ্টির সহায়ক। রুমা দেবী, জগদীশ রায়, অমলা দেবী, অমিয়বাবু ইত্যাদি চরিত্রের ভিড়ে লেখক যে রুদ্ধশ্বাস কাহিনী গেঁথেছেন তা শিল্পসার্থক।

দ্বিতীয় গল্পের রহস্যজনক খুনের মূলে আছে মাতৃহৃদয়ের অফুরন্ত সন্তান-স্নেহ। দয়ালবাবুর রহস্যজনক মৃত্যু আপাত দৃষ্টিতে আত্মহত্যা মনে হলেও ডিটেকটিভ রাজীব সান্যাল এ খুনের কিনারা করেন। শমিতা সরদার, নীরেন-বাবু, দয়ালবাবু, প্রভঞ্জন ইত্যাদি চরিত্র সুঅঙ্কিত। গোয়েন্দা কাহিনী রচয়িতা হিসেবে এ গ্রন্থে লেখকের নিজস্ব কৃতিত্ব স্পষ্ট।

শ্রীমতী যে ডাকে—সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রকমারী বুক হাউস, ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

তরুণ সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক শ্রীসুভাষ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আলোচ্য উপন্যাসটি লেখকের শিল্প-কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। উপন্যাসটির পটভূমি নেপাল। নায়ক নিঃসঙ্গ, প্রায় নিঃসম্বল এক সেলস-ম্যানেজার। নাম পল্টু। কোম্পানীর ব্যবসা বাড়াতে আসে নেপালে। নেপালে তার সংগ্রামী জীবন শুরু। এখানেই নায়িকা ললিতা থাপারের সঙ্গে আলাপ হয়। এই এয়ার-হোস্টেসের সঙ্গে পল্টুর যে প্রেম, তারই কাহিনী মনোরম ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। লেখক নেপালের যে প্রাকৃতিক চিত্র এঁকেছেন, তা সার্থক। ডঃ দাস, মতিলাল-বাবু, বন্ধু সুখেন্দু, অরুণবাবু ইত্যাদি চরিত্র সুঅঙ্কিত। বিদেশিনী 'মিসেস রাণা'র স্নেহ ভালবাসা পল্টুর জীবনে পাথেয় হয়। উপন্যাসটির রচনা ভঙ্গির বক্তব্য অনুসারী।

দোতারা—গংগাধর বন্দ্যোপাধ্যায়। মনলোক, ৭ এন্টনীবাগান লেন, কলকাতা—৯। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দোতারা এক নবীন লেখকের মধুর উপন্যাস। লেখক নীলুর মত আত্মভোলা সহজ, সরল মানুষকে কাহিনীর নায়ক করেছেন। তার জীবন প্রাথমিক পর্বে ছিল সহজ, সরল। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার জীবনে আসে দুটি নারী—ঝর্ণা ও তারা। এরা দুজন নীলুর জীবনকে কিভাবে এক জটিল যন্ত্রণায় বাঁধে, এ উপন্যাস তারই কাহিনী। লেখক ঝর্ণার বিবাহিত জীবনে মদ্যাসক্ত, অর্থলোলুপ, ব্যভিচারী স্বামী ও শশুরের যে অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার দেখিয়েছেন তা মর্মস্পর্শী। নীলু, ঝর্ণা, তারা, চঞ্চল ইত্যাদি চরিত্র সুঅঙ্কিত। ভাষা কবিত্বপূর্ণ।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কালিয় (মাঘ, '৭৮) সম্পাদিকা : গৌরী গুপ্ত। ২০বি বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা—৯। এক টাকা।

নবজাতক সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকাদের খুশী করবার জন্যে নানান ধরনের রচনার ও বিভাগের আয়োজন রয়েছে। এতে সম্পাদকের সচেতন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল। গল্প কবিতা প্রবন্ধ ভ্রমণ কাহিনী ছাড়াও আছে সিনেমা, অভিনয় জগৎ, রাশিফল প্রভৃতি বিভাগ। শঙ্করবিজয় মিত্রের 'বিশ্ববিজয়ী মঞ্জবীর গোবর গুহ' ও ডাঃ ডি এন রায়ের 'ক্ষয়রোগের ইতিহাস' বিশেষ উল্লেখ্য রচনা।

বর্তিকা (শ্রীপঞ্চমী সংখ্যা '৭৮)—সম্পাদক : মণীষ ঘটক। গোরাবাজার, বহরমপুর। এক টাকা।

বহরমপুর থেকে প্রকাশিত এই সাময়িক পত্রিকাটি দীর্ঘ ষোল বছর ধরে যুগপৎ বঙ্গবাণীর সেবা এবং সাহিত্য পাঠকদের তৃপ্তিবিধান করছে প্রশংসনীয়-ভাবে। এর পিছনে রয়েছেন কল্লোল যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যরথী 'যুবনাশ্ব'—মণীশ ঘটক। একাত্তরে পা রেখে আজও যিনি নিরলসভাবে লিখে চলেছেন। এই বিশেষ সংখ্যাটিতে অনেকগুলি ভাল জাতের লেখা আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল ক্রোড়পত্রটির। শ্রীঘটকের একাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্য করে তাঁর গুণগ্রাহী বঙ্গসাহিত্যের সুখ্যাতদের শুভেচ্ছা-অভিনন্দন এতে স্থান পেয়েছে। লিখেছেন : প্রমথনাথ বিশী, রেজাউল করিম, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, কিরণ-শঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

নবান্ন ভারতী (ত্রৈমাসিক '৭৮)—সম্পাদক জ্যোতির্ময় ঘোষ। ৪৩ নিমু গোস্বামী লেন, কলকাতা—৫। পঁচাত্তর পয়সা।

ত্রৈমাসিকটি একাধিক কারণে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। শুধু সাহিত্যের ফসল নয়—কৃষিকর্মজাত ফসলের দিকে এর আন্তরিক অনুরাগ লক্ষ্য করবার মতো। বস্তুত 'কৃষি লক্ষ্মী'র পর এমন সাময়িক পত্রিকা আর চোখে পড়ে নি। কৃষি-নির্ভর গ্রামবাংলার মানুষদের এ পত্রিকা প্রয়োজনে আসবে। কনককমল চট্টোপাধ্যায়ের 'গাছের দুধ', ডকটর নীলরতন ধরের 'বিজ্ঞান ও সভ্যতা', সঞ্জীব সরকারের 'কেরলের একটি গ্রামে', বিজয় অধিকারীর 'আমার কথা শুনুন' এবং কৃষি সমাচার সম্পর্কীয় লেখাগুলি গ্রামীণ মানুষদের অনেক কাজে আসবে।

ঝংকার (প্রজাতন্ত্র ও ঈদ-উজ-জোহা সংখ্যা)—সম্পাদক : নূরুল ইসলাম। কানখুলি, ডাকঘর : গার্ডেনরীচ, কলকাতা—২৪। দেড় টাকা।

সাহিত্য, সিনেমা ও মঞ্চবিষয়ক এই পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় নবীন ও তরুণ লেখক-লেখিকাদের সঙ্গেই লিখেছেন সাহিত্যের 'বিশেষ জনেরা'। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সমরেশ বসু, বিরুপাক্ষ, বিনতা রায়, নজরুল সম্পর্কে বেগম সুফিয়া কামাল, 'বড়মা হেমলতা ঠাকুর' সম্পর্কে অর্চনা মিত্রের লেখা দুটি ভাল লাগল। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ছাড়াও আছে নানান বিষয়ে নানান বিভাগ।

প্রাপ্তিস্বীকার

বাংলা (সঙ্কলন)—সম্পাদক : বিকাশ পাল, নারায়ণ দেব। ২৪১এ শান্তি কলোনী। আলিপুরদুয়ার জংশন। জলপাই-গুড়ি। পঁয়ত্রিশ পয়সা।

সাহিত্য অনুরাগী তরুণদের এই সংকলনে লিখেছেন : সুশীল রায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অর্ণব সেন প্রমুখরা।

সৈকত (শ্রীপঞ্চমী সংখ্যা '৭৮) সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র পার্ক, ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া। পঞ্চাশ পয়সা।

মাটিয়ারী-বানপুর উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকা (বার্ষিক সংখ্যা '৭১) সম্পাদনা : তাপসকুমার মিত্র। বানপুর, নদীয়া।

মর্মরানুগ (কবিতা সম্পর্কীয় মাসিকপত্র) সম্পাদনা : কেদার ভাদুড়ী ও দেবকুমার বসু। ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। এক টাকা।

সংলাপ (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা '৭৮)—সম্পাদক : শেখ সালাউদ্দিন। ১১৯বি বি সি জি আর রোড, কলকাতা—২৩। পঁয়ষট্টি পয়সা।

বালার্ক (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা '৭৮)—সম্পাদক : দেশমূর্তি চৌধুরী। স্বাস্থ্য বিদ্যায়তন, ৮২।২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। পঞ্চাশ পয়সা।

চিঠি পেলাম। আমি বিস্ময়ে হতবাক। এতো মুক্তিপণের আগুন এদের মনে! লিখেছে :

ভাই,

রফিকের চিঠিতে লেখা আপনার একটা কথা খুবই যুক্তিপূর্ণ। ইদানীং আমিও তাই ভাবছি। ভাবছি পড়ালেখার ব্যাপারে। সত্যিই 'ভবিষ্যৎ তো আর অন্ধকারাচ্ছন্ন কোরে রাখা যায় না?' কিন্তু তাই, আরো লেখাপড়া শিখে, আরো শিক্ষিতা হোয়ে, আরো বুঝেসুঝে আবারও তাদেরই তাঁবেদারী করা—যারা আমার মায়ের চোখে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়েছে। বাবার বুকে ছোরা বসিয়েছে। ভাই-এর রক্ত শুষে বুড়ীগঙ্গার জলে ছুঁড়ে মেরেছে। আর আমার বোনকে ধর্ষণ কোরেছে। না ভাই, তা যেন আর হয় না। কেন হয় না জানিনে। তবে রক্তের দাগ কি এতো তাড়াতাড়িই মোছে? মোছে না। বইপত্তর নেই। নিরাপত্তা নেই। অনেক কালের সাধ অনেকদিন আগেই মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। তাকে পুনরুজ্জীবিত করবার কোন উৎসাহ পাচ্ছিনে। যেন আর ভালো লাগছে না। মানুষ সভ্য হয়েই বেশী অসভ্য হচ্ছে। এই কি শিক্ষা? হয়তো এই-ই তাদের শিক্ষা।

শুধু আপনাদের ঝিকরগাছার কেন? বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধে ভরা অনেক আনাচ-কানাচ তো জগতের বহু মহা-মনীষীদের পদভারে ক্ষণে ক্ষণে চমকে

থমকে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু কেন ওঁরা আজও আসছে? আমার বিরাট প্রশ্ন। রূপসী বাংলার অপরূপ ক্লান্ত মলিনতা দেখতে? নাকে সুগন্ধি রুমাল চাপা দিয়ে বাংলার নিভে-যাওয়া চোখের তারার অগণিত শবাধার দেখতে? সমবেদনা জানাতে? কিন্তু এ সবের তো আমি আর কোন প্রয়োজনই দেখতে পারছিনে।

আপনাকে লিখতে লিখতে একটা কবিতা মাথায় আসছে। কবিতাটা লিখলাম। নো কমেন্ট।

সংগ্রাম সংগ্রাম

আমি ছাত্র।
আগে বই বুকে চেপে স্কুলে যেতাম।
হেসে খেলে বেড়াতাম।
রাতে বুক ভরে ঘুমোতাম।
আর অনেক স্বপ্ন দেখতাম।
আর স্বপ্নকে সত্যি হওয়াবার জন্য
সংগ্রাম করতাম।
এখন আমি আর স্কুলে যাই না।
তেমন হাসি ও খেলি না।
স্কুলের খাতায় আমার এই অনুপস্থিতিও
এক সংগ্রাম।
কখনো বিরস আর কখনো হাসিমুখ
সেও সংগ্রামের এক চেহারা।
আমাদের এই সমবায় সংগ্রাম
এক মহান সংগ্রাম।

এই জাতীয় সংগ্রামে আমরা
রাজপথের শহীদের রক্ত মুছে নিয়ে
ঝান্ডা উড়াবো।
ঝান্ডা উড়বে অম্লান।
চির উজ্জ্বল।

রাজপথের অবহেলিত রক্তের পতাকা
মাথার 'পর দেখে
ওই খাকি পোষাকের বুট পরা
ফুট ফাট গোলাম সাহেবরা
পালাবার পথ খুঁজে পাবে না তখন।
তখন আপনাতে নিজেকে কোণঠাসা করে
আমাকে পথ করে দেবে।
আমি তখন আবার স্কুলে যাবো
আর সেই পুরনো স্বপ্নকে
সত্য হওয়াবার জন্য
করবো সংগ্রাম।
হবো মানুষ!

স্নেহে ধন্যা—
হামিদা

আমি তন্ময় হোয়ে অনেক ভেবেছি। অনেকবার পড়েছি। ভয়ে কাউকে দেখাইনি তখন। সেন্সরের জাল ভেদ কোরে ও-আগুন ঝরা চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছেছিলো তখন সেই তো আমার পরম সৌভাগ্য।

তোমরা এসব মেয়েদের কি বলবে জানিনে। হয়তো বলবে লক্ষ্মী মেয়ে। আমি বলি পলাশ মেয়ে! লালে লাল! আগুন-ঝরা লাল। আগুনের শিখা!

আচ্ছা কেষ্টদা, শুনেছি চব্বিশ বছরে ওরা আমাদের অসীম ঠকিয়েছে। ওরা বিত্তবান ও মননশীল হোয়েছে। আমাদের বাঙালী কোরে রেখেছে। মানুষ হোতে দেয়নি। ওরা আমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী গুণী হোয়ে এই অত্যাচার, এই নিপীড়ন, এই পাশবিক অনাচার কি কোরে করলো? আমার কি মনে হয় জান?

এমিল জোলার 'নানা' এর সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা স্বীকার কোরবেন ঃ পরিবেশ মানুষকে দিয়ে সব অনাচার করিয়ে নেয়। কথাটা একান্তই সত্য। অনেক শিল্পী নিষ্পাপ মুখের ছবি আঁকতে গিয়ে যে কচি শিশুকে ক্যানভাসের বুকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরবর্তী জীবনে মানুষরূপী শয়তানের ছবি আঁকতে গিয়ে যাকে মডেল করলেন, সমাজের সব চাইতে কুখ্যাত অপরাধী বলে যাকে আঁকবেন স্থির করলেন, সে আর কেহ নয়; তারই প্রথম জীবনের আঁকা নিষ্পাপ শিশুর পরিণত জীবনের শোচনীয় পরিণতি। পরিবেশ ও রক্তের ধারায় এমনি করেছে তাকে। এ সবই এনভায়রনমেন্ট ও ট্র্যাডিশন।

আমার মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তানী সকলের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। গা ঢেলে দেওয়া ট্র্যাডিশন। এর গতি অপরিবর্তনীয়।

ভীতচকিত বন্য হরিণের মতো বনে জংগলে অনেকদিন কাটিয়েছি। অনেক জনপথ মাড়িয়েছি। অনেক নাম না জানা মানুষের সাহচর্যে গিয়েছি। কিন্তু কোথাও কেউ ইজ্জত মান ও জান মানের নিরাপত্তা দিতে পারেনি। কচি শিশুগুলোর মুখের দিকে চেয়ে দেখেছি। ভেবেছি আগামী-কালের স্বাধীন বাংলাদেশের ভাবী নাগরিক ওরা। ওদের বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে। তাই হিংস্র শত্রুর কবল থেকে বাঁচবার ও বাঁচাবার প্রয়াসে ছুটে বেড়িয়েছি এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রকোপে পিছ পা হইনি। হায়রে জীবন! জীবনের মায়ায় কতো কিই না কোরেছি। আজ সে সব কথা ভাবতে সারা শরীর শিউরে ওঠে। স্মৃতি কতো ভয়াবহ!

আমরা জানতাম, বিশ্বাস করতাম, অত্যাচারীর কৃপাণ ভোঁতা হবেই। ধ্বংস হবে সমূলে অত্যাচারী। কর্পূরের মতো উড়ে মিশে যাবে আকাশে বাতাসে।

তাসের রাজ রাজড়াদের কথা শুনেছি। শুনেছি তারা ঝটকা হাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হোয়ে উড়ে যায়। এবার দেখলাম। জেনারেল ইয়াহিয়া আর তার অত্যাচারী সৈন্যদল ধুয়ে মুছে সাফ হোয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে। ইতিহাসের কলঙ্ক সব। ইতিহাস কোনদিনই এদের ক্ষমা করবে না।

তোমাদের আকাশবাণীতে প্রায়ই একটু গান শুনতাম। কার লেখা জানিনে। চুপ চুপ উৎকর্ণ হোয়ে শুনতাম। তখনকার দিনে আকাশবাণী বা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনা মানে বুলেটের সামনে বুকটা এগিয়ে দেওয়া। তবুও বিশ্বাস কোরতে একটুও দ্বিধা হয় না যে খাঁচায় আটকে পড়াদের সবাইর ও দু'টোর সব অনুষ্ঠান না শুনলে মনে হতো দিনটা বাজে হয়ে গেলো। গানের দু'একটা কলি মনে আছে। কলি কটি না লিখে পারছিনে।

'বিশ্ব কবির সোনার বাংলা
নজরুলের বাংলা দেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নাই শেষ।'

এর সাথে আমার নিজের কথায় লিখতে ইচ্ছে করে—

মুক্তিযোদ্ধার রক্ত-পণে
ঘুচলো দেশের দুঃখ-ক্লেশ,
বিশ্ব সভায় আসন পেলো
শেখ মুজিবের বাংলা দেশ।

সে যে তোমার আমার বাংলাদেশ! এ দেশ মুক্ত এখন। আমরা বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক। দেশ গড়ার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। তোমাদের দেশের পারদর্শীরা অক্লান্ত পরিশ্রম কোরে আমাদের দেশকে সোনার বাংলা তৈরী কোরতে দিন-রাত ব্যস্ত। তুমি কবে তোমার বন্ধুর মুক্ত বাংলা দেশ গড়ার অনুপ্রেরণা দেখতে এসো। আসবে তো কেষ্টদা? তুমি যদি না এসো, আমার সব কিছু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যে। আসবে কিন্তু! তোমার আসবার প্রতীক্ষায় দু'-বাহু বাড়িয়ে থাকলাম।

তোমাদের মহান ভারতের জনগণ, তার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর নির্ভীক সৈনিকরা অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের রাহুমুক্ত কোরেছেন। বিশেষ কোরে, শ্রীমতী গান্ধীর ভূমিকায় আমরা চিরকৃতজ্ঞ। জগত তো হকচাকিয়ে গেছে। আমরা মুক্ত এখন। মুক্তির আনন্দে তোমাদের জয়গান গেয়ে চলেছি। তোমাদের আরো জয় হোক। তোমাদের সবার বন্ধুত্বের কথা আমরা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবো।

॥ ৪ ॥

এর পর অবশ্য আর অনেকদিন কেউ আসেনি।

ও বাড়ি বেচে শাঁখারিটোলায় চলে আসাও তার একটা কারণ হতে পারে। নতুন পাড়া। তাছাড়া কিছুদিন ঘোরাঘুরিও বন্ধ আছে। ঠিকানাটা ঠিক জোগাড় করতে পারেনি সবাই।

কেবল শিবুই আসে মধ্যে মধ্যে। এখানেও এসেছে। দৈবাৎ এখানে আসার আগে দেখা হয়েছিল—ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিল হেমন্ত।

সেও আসে এক বছর ছ' মাস অন্তর। উল্কার মতো হঠাৎ এসে পড়ে, হয়ত কোনদিন ভাতও খায় এসে, কিম্বা একটু দিদি, দু একটাকা নেয়—চলে যায় আবার। কোথায় থাকে কি করে তা বলে না, বাড়িতে থাকে না বেশির ভাগ সময়ই। চেহারা যা হচ্ছে বাঁচবেও না বেশী দিন মনে হয়। তবু ফেরাতেও পারে না। কোন কথাই শোনে না, হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে, 'বেঁচে কি হবে আমার? কার কি কাজে আসব বল! শিগগির শিগগির শেষ হয়ে যাওয়াই তো ভাল।' দেখেশুনে হাল ছেড়ে দিয়েছে হেমন্ত। আর সবই যখন গেছে, ওর জন্যেই বা ভেবে কি হবে। ছেঁড়াচুলে খোঁপা বাঁধতে যাওয়া!

বাইরে ঘোরাঘুরির বন্ধ করতে হয়েছে নানা কারণে।

দেশের শান্তি বা স্থিতিশীলতা নেই। অতবড় স্বদেশী আন্দোলন গেল—অত হাঙ্গামা হুজ্জুৎ, দেশব্যাপী একটা অশান্তির তরঙ্গ—তাতে অত ক্ষতি হয়নি। এখন এই কোথায় যেন একটা খুব গোলমাল লড়াই বাধবে নাকি—তা সেই লড়াই বাঁধবার সূচনা বা উপক্রমণিকা থেকেই টাকার বাজারে বড় টালমাটাল যাচ্ছে। বাড়ি জমি যাদের আছে তারা বেশী দাম চাইছে— অথচ বাজারে খদ্দের কম। দু-একটা ব্যাপারে কোনমতে কেনা দাম উঠছে, একটাতে কিছু লোকসানও দিতে হয়েছে। তাই দেখে পূর্ণবাবুই পরামর্শ দিয়েছেন, 'এত হাঁকড়পাঁকড় করার দরকারই বা কি। যা করে নিয়েছ তাতে তিন জন্ম বসে খেতে পারবে। বরং বেশী লোভ করতে গেলেই হয়ত অতি লোভে তাঁতি নষ্ট—সেই কথা হবে। দিনকতক একটু চুপ করে বসে থাকো দিকি। একটু জিরোও। খাটলেও তো কম নয়। বসে বসে দেশের হাওয়া কোন দিকে যাচ্ছে একটু লক্ষ্য করো। এই যে লড়াই বাধল—এর কি ফলাফল হয় তাও দ্যাখো। সবাই বলছে ইংরেজ হারবে, তাহলে তো ঘোর অরাজকতা। যাওয়ার আগে মরণ কামড় দেবে হয়ত ইংরেজ, টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়াও আশ্চর্য নয়। খুব টাকা রোজগার হচ্ছে—এ দুর্নাম এখন না হওয়াই ভাল, হ্যাঁ—যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ধন অপবাদ ভাল নয়। যুগে যুগেই—এই হানাহানিতে বড়-লোক, ব্যবসাদাররা মার খেয়েছে ডাকাত লুটেরাদের পোয়াবারো।...কাজ-করবার বন্ধ করে দিন কতক হাত গুটিয়ে বসে থাকো।'

কথাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। শোনেও।

টাকার জন্যেই যে এই কারবার শুরু করেছিল—বা করছিল, তা ঠিক নয়।

আসলে কিছু একটা কাজ ছাড়া থাকা সম্ভব নয় বলেই আরও এই ভূতের মতো, উদয়াস্ত পরিশ্রম। ভেতরের শূন্যতা ও হাহাকার ভোলার জন্যেই দিনরাত মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখা। এটা এখন নেশা নয়, একটা জীবনের অবলম্বনও। চুপচাপ বসে থাকলেই কেবল মনে পড়ে যে ওর কেউ কোথাও নেই। জীবনে কোন আশা বা আশ্বাস নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই। একেবারেই নিঃসঙ্গ, নিরাত্মীয় সে।

কিন্তু তবু—কী আর করা যাবে। লোকসান দেওয়ার থেকে দু-চার দিন চেপে থেকে বাজারের হাবভাব দেখাই ভাল। দালালরা আসা-যাওয়া করছে—খোঁজ-খবর যে না রাখছে তা নয়। কিন্তু বুঝতে পারছে না ঠিক, মানুষের মনের আর পয়সার গতি কোন দিকে যাচ্ছে।

এমনি একটা কর্মহীনতা ও অবলম্বনহীনতার মধ্যেই—ওর পূর্ব জীবনের একটা হারিয়ে যাওয়া অধ্যায় আবার যেন এক প্রেতমূর্তি পরিগ্রহ করে উঠে এল বিস্মৃতির শ্মশান-শয্যা থেকে।......

সেদিন ঝি যখন এসে খবর দিলে, 'কে একজন লোক দেখা করতে চায়'—তখন স্নানাহার শেষ করে সবে একটু শুয়েছে হেমন্ত, তন্দ্রার ভাবও এসেছে একটু, তার মধ্যেই জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কী রকম লোক?

চারুর মা বললে, কেন দুঃখী লোক বলেই মনে হয়, কোরা কাপড়ের ওপর একটা তালি দেওয়া ময়লা জামা, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো—হাতে একটা গামছায় বাঁধা কি পুঁটুলি—'

কথা শেষ করতে না দিয়ে তেমনি নিদ্রালু কণ্ঠেই বলে উঠল 'বাস, বাস, বুঝে নিয়েছি। আমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ। বলগে যা দেখা হবে না।' বলেই পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘণ্টা দুই পরে ঘুম থেকে উঠতে চারুর মা খবর দিল, 'সেই লোকটা ঠায় বসে আছে দিদি, ঐ সামনের রকে—।'

বিরক্তিতে মনটা খিঁচড়ে যায় হেমন্তর।

এ পাড়াও ছাড়তে হবে দেখছি, না হলে আর শান্তি থাকবে না। শুরু হয়ে গেল এখানেও। কিন্তু কোন পাড়াতেই বা যাবে, সেখানে যাবে সেখানের খবর কি আর বার করতে পারবে না কেউ?

বিরক্তও হয়—তেমনি কৌতূহলীও হয় একটু।

উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ায়। আত্মীয় তো বটেই সে তো বোঝাই যাচ্ছে—প্রশ্ন, কোন্ তরফের?

কিন্তু জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠল।

এ কে?...কে এ? এতকাল পরে কোথা থেকে এল?

মৃত্যুর কোন্ পার থেকে?

হরিচরণ!

সেই মুখ, সেই চোখ, সেই আকার ও আকৃতি।

হাত পা কাঠি কাঠি, পেটটি ডাগর, পোড়া তামাটে তামাটে রঙ। কেশবিরল একখানি মাথা, চোখ দুটি ঈষৎ হরিদ্রাভ—দুষ্ট যকৃতের লক্ষণ, কতকাল স্নান করেনি, সর্বাঙ্গে খড়ি উড়ছে, যে কটি চুল আছে তাও শনের মতো শুকনো খাড়া খাড়া। এক কথায় আপাদমস্তক হরিচরণ।

অবাক হয়ে তাকিয়েই আছে, ছেলেটি হঠাৎ চোখ তুলে এদিকে চেয়ে দেখল একবার। চোখাচোখি হতেই বিনীত অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে, 'জ্যাঠাইমা, আমি গো, সাধুচরণ।......অনেকক্ষণ বসে আছি। সেই ভোরে বেইরেছি বাড়ি থেকে, পেটে একটুন জলও পড়েনি।'

সাধুচরণ নাম মনে পড়ে না। শোনেনি অবশ্যই। শোনবার কথাও নয়। তবে জ্যাঠাইমা যখন বলছে—আন্দাজে বোঝা যায়—ছোট দেওরের ছেলে। সে যখন চলে আসে তখনই দেওরের বিয়ের কথা হচ্ছিল, সম্ভবত তার পরই সেটা হয়ে গেছে। আর, বছর দুইয়ের মধ্যেই যদি ছেলে হয়ে থাকে তো—এই বয়সটি হবার কথা। তারকের থেকে বছর ছয়েকের কি আটের ছোট।

কী করবে, বুঝে হবে, চিনতে না পারার ভাব করবে কি বাড়িতে আসতে বলবে—মন স্থির করার আগেই সাধুচরণ রোয়াক থেকে গুটিগুটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে ওপরে উঠে এল, তার পর পুঁটুলিটি মেঝেয় নামিয়ে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ও জিভে ঠেকিয়ে সেইখানেই বসে পড়ল।

'পায়ে আর কিছু নেই জ্যাঠাইমা, এতটা পথ হেঁটে আসা—ঘোরাঘুরি—তারপর ধরো দাঁইড়েই আছি অমন পাঁচ দণ্ড। দোর খুলবে না এখন বুঝে শেষে ঐ ওদের দাওয়ায় গে বসলুম। তাও ভয়—চোর বলে বুঝি বা পুলিশে দেয়।'

'তা এত কাণ্ড করার দরকারই বা কি ছিল? আমার কাছে কেন?' বিরসকণ্ঠেই প্রশ্ন করে হেমন্ত। এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে যেন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

'কিছু না, এমনিই।' খুব সহজভাবেই উত্তর দেয় সাধুচরণ, শুনি তো তোমার কথা—দেখা তো হয়নি কখনও। আরও একবার এসেছিনু, কেউ জানত না—বাড়ি থেকে পাইলেই এসেছিনু বলতে গেলে—সে অনেক দিনের কথা, তখন ছেলেমানুষ, তারকদার খুব ভাল চাকরি হয়েছে বলাবলি করছেল জ্যাঠারা, ভালভাবে ডাক্তারি পাশ করেছে শুনে তাখন থেকে দেখার ইচ্ছে, শরীর তো ভাল না—ভেবেছিনু যদি দাদা কৃপা করে কাছে রাখে—চাকর-বেয়ারাও তো দরকার হবে—তা ফাঁক পেয়ে আসব আসব করছি, ইরিমধ্যে শুনিনু দাদার ভারী ব্যামো, শোনামাত্রকই বেইরে পড়েছিনু দেশ থেকে যা পাওয়া যায় ফল-ফলুরী নে—তা এসে শুনিনু তোমরা বাইরে কোথায় কোন পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে গেছ। সে এবাড়ি নয়—এর চেয়ে বড় একটা বাড়ি ছেল—তা কী আর কব, দারোয়ান ছেল সে বাড়িতে, সে তো আর আমাকে চেনে না, ফল-পাকুড়গুলো তাকেই দিতে—সে এক পাত ভাত ধরে দিলে, খেয়ে ফিরে গেনু। তার পরও একবার এসেছিনু—তখন তুমি কোথায় থাকো কেউ বলতে পারলে না। তার পর তো দেখি বাড়িতে অপর লোক সব।'

এইবার হেমন্তর মনে পড়ল কথাটা।

দারোয়ান শিউপূজন বলেছিল বটে যে, কে একজন এসেছিল ওরা দার্জিলিং চলে গেলে খোঁজ করতে—ষোল-সতরো বছরের ছেলে—কিছু ফলমূল হাতে নিয়ে।......তখন এ-সব কথায় কান দেবার মতো অবস্থা নয় মনের—দেয়ও নি। তার পরও মনে ছিল না যে ভাল করে জিগ্যেস করবে। শুধু স্মৃতির কোন অন্ধ গুহায় কথাটা থেকেই গিয়েছিল। আজ মনে পড়ল।...

কানে গেল সাধুচরণ বলছে, শরীর ভাল না জ্যাঠাইমা, কাল রোগ ধরেছে, এই দ্যাখো কথা কইছি ভাল মানুষের মতো, এখুনি হয়তো কম্প দিয়ে ভালুকের মতো জ্বর আসবে। তখন একেবারে জন্তু হয়ে যাবো। তাছাড়া পেটও ভাল না, পিলে-লিভার পেটজোড়া—ডাক্তাররা বলে। তা চিকিচ্ছে করানোর তো পয়সা নেই যা করে ঐ হাসপাতালের ডাক্তার—দুক্রোশ ভেঙে হাসপাতালে গেলে একশিশি মিকচার মিলবে, তা সে দুটি দিনের মতো, গোনা ছ দাগ।......রোজ রোজ হ্যাতটা পথ হাঁটা যায়—তুমিই বলো না?...... তাই বলি, বেশীদিন তো আর নয়, শেষই তো হয়ে এল—মানুষটাকে কখনও দেখিনি—মরার আগে চোখে দেখেই যাই একবার। আমি কিছু চাইতে আসিনি, বিধবাটাকে রেখে যাবো, অল্প বয়েস আর ঐ একটা গুয়ের গোবলা ছেলে—তাখন যদি ছিচরণে আশ্রয় দাও একটু! ওখেনে থাকলে সেও বাঁচবে না!'

হেমন্ত শুনছিল কতকটা অন্যমনস্ক হয়েই। সে চেয়ে ছিল সাধুচরণের চোখ দুটোর দিকে। ঠিক তেমনি চোখের চাউনিটা পর্যন্ত। অবিকল হরিচরণ একেবারে। মনে হচ্ছে, সেই আকার ধরে কোন আত্মা এসেছে, সবটাই অবাস্তব অশরীরী ছায়া-মূর্তি।

কীই বা বয়স ওর, তারকের থেকেও কত ছোট, এখনই মৃত্যুর কথা ভাবছে, বিধবা বৌ ও ছেলের কথা!

কেউই বাঁচবে না ও-বংশে, ঐ লোকগুলো নিজেদের পাপেই নির্বংশ হয়ে যাবে। একটার পর একটা বৌ বিধবা হবে। তারই মতো অবস্থা হবে হয়ত—শিশুসন্তান নিয়ে বিধবা বৌয়েল। হয়ত এর বিষয়ের অংশ নিয়েও তেমনি কামড়াকামড়ি করবে এর জ্যাঠারা।...

মন কোথায় চলে গিয়েছিল, কোন সুদূর অতীতে। নিজের দুর্ভাগ্যের স্মৃতিতে ডুব দিয়েছিল। হঠাৎ এক সময় যেন বাস্তবে নেমে এসে দেখল সাধু একটু অবাক হয়ে কেমন এক ধরনের উৎসুক দীন চোখে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

মায়াও হয়। কোনই কারণ নেই ও-বংশের কারও প্রতি মায়া হবার, কাড়বংশ সব সমান, সবাই পাজী; তা ছেলেও মায়া হয়।

বলে, 'তা তোমার মা-বাবা?'

'হুঃ! গলায় জোর দিয়ে হাসে সাধুচরণ। বলে, 'বাবাও তো অক্কা গো—এই বছর-চারেক হল। মা-টা ছিল, তা জানোই তো ও-বাড়ির হাল, এমন ক্যাচা-খেউ করে লাগল সব্বাই—তবু তো ঠাকুমো নেই, ঠাকুমার কী হল জানো তো, গিন্নিণী অস্বাস্তির ব্যামো, শেষকালটায় যেমন পেছনে লেগেছেন তোমাদের—তেমনি শাস্তি, গুয়েমুতে সর্বাঙ্গে নোংরা মেখে পড়ে থাকত, কেউ উঁকিও মারত না কাঠি করেও ছুঁত না—এই আমি, এই শম্মা। তাখন আমার কতই বা বয়েস—তবু আমিই কাছে যেতুন, জলটা খাবারটা দিয়ে আসতুন—হ্যাকো হ্যাকো দিন কাঁথাকানিগুলো নে গিয়ে পগারের জলে ধুয়ে দিতুন—তা যা—কী যেন বলছিনু—মায়ের কথা, মাও ও-বাড়ির যে ধারা, সেই ধারায় গেল, আড়া থেকে গলায় দড়ি দে ঝুলল একদিন। রাতারাতি ওরা রাট্ট দিলে যে ওলাউঠো হয়ে মরেছে।...তা আমাদের ও বাড়ির কথা জানো তো সবাই, কেউ কি আর এত ভদ্দরতামাফিক কথা সহজে বিশ্বেস করে? জানাজানি কানাকানি—শেষে থানা-পুলিশও হল—দারোগা এল বাড়িতে খোঁজ করতে, তাখন এই শম্মার পারে

ধরতে হল শেষ কালে. কি করি—বংশের কেলেংকার তো যাতেই হোক. আমিই বলব যে, হাঁ—ওলাউঠোই ঠিক। তবে ঐ জ্যাঠা হারামজাদারা ছাড়া পায় !..

চারুর মা এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ কি রকম অভ্যর্থনা হবে জানতে চায়। চোখে নীরব প্রশ্ন, জল-খাবার দেব, না গলাধাক্কা ?

হেমন্ত তবুও যেন মনস্থির করতে পারে না। কতকটা সময় নেবার জন্যেই বলে, 'সঙ্গে কি ও ?'

'এই বাগানের দু-চারটে ফল—। আর গামছা একখানা।'

'ওতে আমার দরকার নেই বাবা, ও তুমি কাউকে ডেকে দিয়ে দাও। ও বাড়ির দুব্বো ঘাসে পর্যন্ত পাপ. ও আমি ছোঁব না।... চারুর মা. ঠাকুরকে বল—কাঠের উনুনে একটু জল গরম করে দিতে। চান করুক। একটু মিছরি ভিজিয়ে দে—শরবৎ খাক এখন। তারপরে সকাল করে চাট্টি ভাত করে দেয় যেন, নিরামিষ কাঁচকলা পটলের ঝোল আর ভাত. তেল কম—লঙ্কা শর্ষে বাদ।... কিন্তু পরবে কি. এ বাড়িতে তো ধুতির পাট নেই।'

সাধুচরণ একটু ইতস্তত করে বলে, 'তা দাদার কাপড়-চোপড় এক আধখানা পড়ে নেই ?'

না, সে আমি রাখি না। আর রাখলেও তোমাকে দিতুম না পরতে।...শাড়িই পরো এখন। আমার আগেকার সরু পাড় শাড়ির কখানা পড়ে আছে এখনও—।'

দৈবক্রমে সেদিনই পূর্ণবাবু এসে গেলেন। আজকাল আর রোজ এধারে আসতে পারেন না, কষ্ট হয়। সাত-আট দিন অন্তর একদিন হয়ত এক-আধ ঘণ্টার জন্য এসে খবর নিয়ে যান।

সাধুচরণের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ শুনে খুব হাসলেন খানিকটা।

বললেন, 'য়্যাঁ বল কি! ওর বাপ-জ্যাঠারা যা পারে নি—ও তাই পারলে! বাহাদুর ছেলে বলতে হবে।...যাক, এত-দিনে সাধুর আগমন হল তোমার বাড়িতে। ...তা মন্দ কি। যদি ওদের মতো বদ না হয়, তোমাকে দেখাশুনো করে একটু—ভালই হবে।...কৈ দেখি একবার চিজটিকে, ডাক দিকি!'

সাধুচরণ এসে নমস্কার করে একেবারে পায়ের কাছেই বসল পূর্ণবাবুর।

পূর্ণবাবু কিছুক্ষণ ধরে আপাদ-মস্তক দেখার পর ঝিকে ডেকে বললেন গাড়ি থেকে তাঁর ডাক্তারী ব্যাগটা আনতে। [illegible] নাড়ি দেখে চোখের কোল দেখে, [illegible] টিপে টিপে দেখে [illegible] শুয়ে পড়তে বললেন। বুকে [illegible] বুক-পিঠ দেখলেন, পেটটা [illegible] অনেকক্ষণ ধরে।

দেখতে দেখতেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। এখন কান থেকে চোঙা নামিয়ে ওকে উঠে বসতে বলে হেমন্তর দিকে চেয়ে বললেন, এ তো সিরিয়স অবস্থা দেখছি।...কাল একবার কাউকে দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিও। আমি ইন্দুকে দিয়ে দেখিয়ে নেব ভাল করে। ও ছোকরার জ্ঞান খুব—। আমি অবিশ্যি কিছু ভুল দেখি নি এতকাল পরে—তবু, সেকেণ্ড ওপিনিয়ন নেওয়া ভাল।'

তারপর সাধুকে বললেন, 'রোগ তো বেশ পাকিয়ে তুলেছ দেখছি। যদি এখন থেকে খুব ধরাকাঠে না থাকো, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করো—তাহলে বেশী দিন আর জ্যাঠাইয়ের আদর ভোগ করতে হবে না। আমি তামাশা করছি না কি মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছি না—সত্যিই অবস্থা খুব খারাপ। যদি খুব সাবধানে আর নিয়মে থাকো তাহলে একটা চান্স আছে বাঁচার—নইলে ওষুধ যতই দিই, বাঁচতে পারবে না।'

সাধুচরণ কাঁদো কাঁদো হয়ে খপ করে পূর্ণবাবুর পায়ে হাত দিয়ে বললে, 'মাইরি বলছি—এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—যা বলবেন তাই শুনব, যেমনভাবে থাকতে বলবেন তেমনিভাবে থাকব। কচি বৌ, একটা ছেলে হয়েছে তার উপরি—জীবনে খুব মায়া, সত্যি বলছি আপনাকে। তবে আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম পেরায়—ওখানে তো কোন চিকিচ্ছেই হয় নি ধরুন, আর খাওয়ার ধরাকাঠই বা করব কি, সাতার যা হয় বাড়িসুদ্ধু সবাইকার তাই তো খেতে হবে. ডাল চচ্চড়ি অম্বল—এই তো বাস্তু-দেবতা বলতে গেলে—আমার জন্যে আলাদা করে আর কে কি করছে! তুমিও যেমন।... এখেনে জ্যাঠাইমা দয়া করে ঠাঁই দিলেন তাই নইলে সাঁতা কথা বলতে কি, শেষ দেখাই দেখতে এইছিনু — যদি বৌ-ছেলেটাকে একটু কৃপা করেন এই আশায়। নিজের আশা আর রাখি নি। মাইরি বলছি!'

তারপর নিজের এই ভাবাবেগে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'ইস, পায়ে হাত দিয়ে ফেলনু, আপনি বামুন বটে তো? নইলে—মানে আপনার আবার পাপ হবে—সেই চিন্তা।...আপনার নামটি কি? খুব বড় ডাক্তার তা তো বুঝতেই পারছি—তবু, আপনারা ?'

'আপনারা' অর্থাৎ আপনি কি জাত ?

হেমন্তর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। ধমক দিয়ে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, আর বামনাই ফলাতে হবে না। তোমরা আবার বামুন! তোমরা বামুন তো চাঁড়াল কে?'

কাঁচুমাচু মুখ করে সাধুচরণ আরও খানিকটা বিনয় প্রকাশ করে ফেলে। কি করা উচিত কি করলে জ্যাঠাইমা খুশী হবে ভেবে না পেয়ে—পায়ে হাত দেওয়াই নয় শুধু, পায়ের ধুলোই নিয়ে নেয় এক খাবলা।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চানন রায়

(৫)

বাংলার মন্দিরে যেসব লিপি দেখতে পাওয়া যায় তাদের বেশীর ভাগই সংস্কৃতে রচিত। সেইগুলি তাই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছে বোধ্য হলেও বেশীরভাগ লোকের কাছেই তা দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশে সেজন্যে অনেক সময় প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ পাওয়া যায় সংখ্যায়। সেকালে শকাব্দের চলন খুব বেশী ছিল বলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মন্দির-লিপিতে শকাব্দের উল্লেখ আছে। দেবাধিষ্ঠানের লিপি দেবভাষায় রচিত হওয়া স্বাভাবিক হলেও এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট বিধি ছিল না। তাই বহু মন্দির গাত্রে বাংলা ভাষায় রচিত লিপিও দেখতে পাওয়া যায়। তবে এগুলির বেশীর ভাগই সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত পদে গঠিত হত। বাংলা ও সংস্কৃতের এক মিশ্রভাষায় রচিত এ লিপিগুলি দুর্বোধ্য সংস্কৃতভাষায় রচিত লিপির থেকে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ছিল সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু বাংলা পদ্যে রচিত লিপিও বাংলাদেশের মন্দিরগাত্রে যে নেহাৎ কম নয় বেশ কয়েকটি মন্দিরেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সব থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার হল একটি মন্দিরে বাংলা পদ্যে রচিত এক বিরাট লিপি পাওয়া গেছে। এ লিপিটি আছে মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্ভুক্ত রাধাকান্তপুর গ্রামে দাসেদের একটি পঞ্চানন্দের মন্দিরে। মন্দিরটি আটচালা/আলগোছটুংগী রীতির বা একরত্ন। লিপির রচনাকাল হ'ল সন ১২৫১ সাল। কিন্তু মন্দিরটি এ সময় থেকে প্রায় দুশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল বলে লিপি থেকে জানতে পারা যায়। এ লিপি থেকে সতেরো শতকে মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-বরদা অঞ্চলের বিদ্রোহী জমিদার শোভাসিংহের এক নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী জানতে পারা যায়। রাধাকান্তপুরের দাসবংশের পূর্বপুরুষ জনানন্দ দাস সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্ধমান থেকে গোপীনাথের বিগ্রহ এনে এখানে স্থাপিত করেছিলেন। জনানন্দ ছিলেন এক সম্পন্ন জমিদার। নবাবের ভয়ে তিনি তার সীমানার চারধারে গড় নির্মাণ করে একটি পুকুর খনন করতে সুরু করেছিলেন। সেই পুকুর খনন করবার জন্যে তাঁর এত মজুরের দরকার হয়েছিল যে সে সময়ে ঐ অঞ্চলের প্রতাপশালী রাজা শোভা সিংহ তাঁর কোন কাজের জন্যে উপযুক্ত সংখ্যক মজুর যোগাড় করতে না পেরে জানতে পারলেন যে জনানন্দের কাজের জন্যেই তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। জনানন্দের

রাধাকান্তপুরের পঞ্চানন্দ মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ

রাধাকান্তপুরের পঞ্চানন্দ মন্দির

অনুগত শোভা সিংহকে একথা জানালে তিনি জনানন্দের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। কিন্তু জয়চণ্ডীর এমনি মহিমা যে কাটামুণ্ডু দুর্গা দুর্গা বলে উঠল। এরূপ অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে শোভা সিংহের বিস্ময় হল। জনানন্দের মধ্যম ভ্রাতা নারায়ণ দাসের বংশে জন্মগ্রহণ করেন যজ্ঞেশ্বর। সন ১২৫১ সালে তিনি প্রায় দুশো বছর আগের তাঁর পূর্বপুরুষের কীর্তি এ মন্দিরটি মেরামতি করে এই দীর্ঘ লিপিটি মন্দিরগাত্রে বিন্যস্ত করেন। মন্দির সংস্কার-কালে তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল জরাজীর্ণ পুরানো মন্দিরটির সংস্কার অথবা একেবারে ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরী করা যুক্তি-যুক্ত হবে কিনা। শেষ পর্যন্ত পিতৃ-কীর্তিকে একেবারে নষ্ট না করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি হীরু মিস্ত্রীকে এনে মন্দির মেরামতি করেছিলেন।

মন্দিরগাত্রে এটি একটি শুধুমাত্র বৃহত্তম লিপি হিসেবে নয়, প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের এক মূল্যবান উপকরণ ও তার সঙ্গে লোমহর্ষণ অলৌকিক কাহিনী যুক্ত হয়ে বাংলার মন্দির-লিপির ইতিহাসে এটি একটি স্বতন্ত্র স্থান লাভ করবার যোগ্য। পূর্বে আলোচিত মন্দির-লিপির সঙ্গে এর পার্থক্য যে স্পষ্ট তা সহজেই চোখে পড়বে। নানা দিক থেকে মূল্যবান এই লিপিটি এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। লিপিটি সম্পূর্ণ হয়েছে পোড়া-মাটির অক্ষরের মোট কুড়িটি লম্বিত সারিতে। মন্দিরের ডানপাশে দ্বারের ওপর দিকে এটি আজও বিরাজমান। পদ্যটি দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত হলেও দীর্ঘ বিলম্বিত কুড়িটি সারিতে সম্পূর্ণ হওয়ায় এখানেও সেভাবে উদ্ধৃত করা হল :

রাধাকান্তপুরে বাস নাম জনানন্দ দাস
স্বর্গে বাস এই সে কারণে :
মহামহ। পুণ্যফলে সপ্ত পুত্র ক্ষিতিতলে
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাদাস নামে :
যিনি দাতা পুণ্যোদয় প্রকাশিত মহাশয়
মধ্যম তৃতীয় সহোদরে :

বর্ধমানে পাঠাইয়া গোপীনাথে আনাইয়া
স্থাপন করিলা এই ঘরে :
নবাব পৃথিবীপতি তাঁর ভয়ে ব্যস্ত অতি
সীমানা ঘেরিয়া খুলিলা গড় :
দমামা দরজা পরে জয়চণ্ডীর কৃপাবরে
পুষ্করিণী খুলিল তারপর :
সন্ধান পাইল যদি সভা সিংহ নরপতি এই
হেতু কড়া না আইসে :
রূপবান ক্রোধভরে আজ্ঞা দিল অনুচরে
হান শির পদাতিক রোষে :
বিপক্ষ হইল কাল কাল হৈল পরকাল
কিছু না জানিল মহাশয় :
তাহাতে ছেদিল মুণ্ড, দুর্গা দুর্গা ডাকে
তুণ্ড শুনি রাজা মানিল বিস্ময় :

কবিতা করিতে তাঁর এই স্থানে আটাভার
হইল দুই শতেক বৎসর :
রীতিনীতি পিতৃকীর্তি এই বংশে অদ্যা-
বধি বন্দ নাই হতেছে সুন্দর :

আশ্রম হইল ইথে বৃক্ষ হৈল জীর্ণরেতে
সারাইতে সাধ্য নাহি কার :
নারাণ দাসের বংশে মধ্যম বাড়ীর অংশে
যজ্ঞেশ্বর জন্মেছিল সার :
সন ১২৫১ সালে গোষ্ঠির সহিত মিলে
নানা যুক্তি করে জনে জনে :
কেহ বলে লয়া কর কেহ বলে একেই সার
যজ্ঞেশ্বরের কিছুই না লয় মনে :
পিতৃকীর্তি ডুবাইয়া কেমনে করিব ইহা
সারাইব যা থাকে ভাগ্যেতে :
ভদ্রলোক ডাকাইয়া হীরু মিস্ত্রী আনাইয়া
উদ্যোগ করিল সারাইতে :
সন ১২৫১ সালে গোপীনাথের কৃপাবলে
মন্দির করিল মেরামতি :
হিসাব করহ সবে ইহাতে নিকাশ পাবে
কবিতা সমাপ্ত হৈল ইতি :

মন্দিরদ্বারের বেশ কিছুটা ওপরে লিপিটি বর্তমান থাকায় ও স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হওয়ায় লিপিটি যথার্থরূপে উদ্ধার করা বেশ আয়াসসাধ্য। বর্তমান লেখক বহু আয়াসে লিপিটি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন পাঠকদের অবগতির জন্যে তাই এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল। রাধাকান্তপুরের দাসেদের এ মন্দিরটিতে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির কাজও খুব সুন্দর। অপূর্ব কারুশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে কয়েকটির আলোকচিত্রও এ প্রসঙ্গে দেওয়া গেল। পোড়ামাটির একটি চিত্র হল ধনপতি ও শ্রীপতির সমুদ্রের মাঝ দরিয়ায় কমলে-কামিনীর দর্শন। শিল্পীর অসাধারণত্ব এর মধ্যে এত স্পষ্ট যে সহজেই তা রসিক দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। টেরাকোটার আর একটি চিত্র হল গ্রাম-বাংলার চৈত্র মাসের গাজন বা চড়ক উৎসবের। বলা বাহুল্য এগুলি সবই সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রাচীন কাহিনীকে অবলম্বন করে। এছাড়া আরও অসংখ্য চিত্র মন্দিরটির সম্মুখদিককে অপূর্ব অলঙ্করণে মণ্ডিত করেছে তা দেখলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। তাই মন্দিরপ্রেমী ও পুরা-তত্ত্বান্বেষী মাত্রেরই এ মন্দিরটি দর্শন করা কর্তব্য।

মন্দিরটি দর্শনের জন্যে যাত্রাপথ সহজ। হাওড়া স্টেশন থেকে সাউথ ইস্টার্ণ রেলের হাওড়া-পাঁশকুড়া বা হাওড়া-খড়্গপুর লোক্যাল করে পাঁশকুড়ায় নামতে হবে। পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে ঘাটাল-পাঁশকুড়া বাস বা ট্যাকসিতে করে টালিডাটা স্টপেজে নেমে পিচ রাস্তার পূর্ব দিকের কাঁচা রাস্তা ধরে একটু এগোলেই বাঁদিকে পড়বে দাসেদের বাড়ী। অতএব একটু পরিশ্রম করে দেখে আসার কোন অসুবিধে নেই। যাতায়াত খরচও খুবই সামান্য ও কলকাতা থেকে সকালে রওনা হয়ে রাত্রের আগেই ফিরে আসা সম্ভব। বাস রাস্তা থেকে হাঁটা পথ ৫।৭ মিনিটের বেশী হবে না। ওখান থেকে স্টেশনে ফেরার বাসও ঘন ঘন পাওয়া যায়। বাংলা পদ্যে অনন্যসাধারণ লিপি ও পোড়ামাটির নিখুঁত কাজের জন্যে পুরাতত্ত্বান্বেষী ও মন্দিরগবেষক মাত্রেরই এ মন্দিরটি দর্শনযোগ্য।

রাধাকান্তপুর গ্রামে উৎকলীয় রীতির একটি মন্দির আছে। এটির গাত্রে উৎকীর্ণ বাংলা পদ্যে রচিত একটি লিপিও উল্লেখ-যোগ্য। পদ্যে শিব স্থাপনের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্যটি উদ্ধার করা হল :

রাধাকান্তপুরের (দাসপুর থানার অন্তর্গত) পঞ্চানন্দ মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ
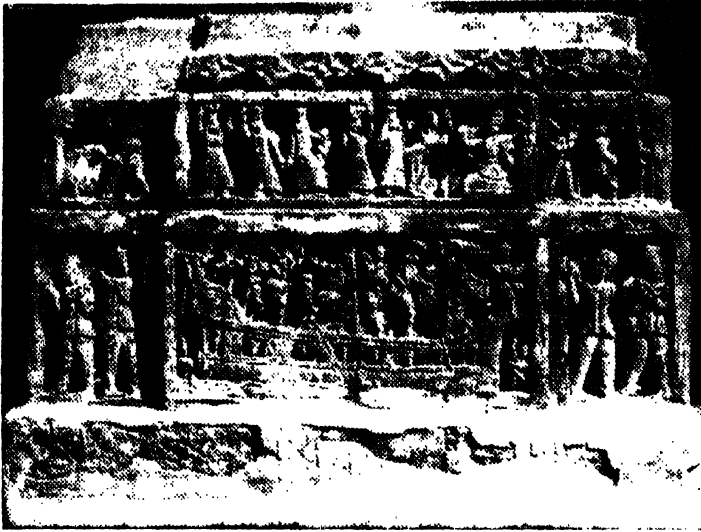
শ্রীশ্রীকাশীশ্বর মহাদেব স্থাপন। শকাব্দ ঃ ১৭৬৭ সন ১২৫২ সাল মাহ আষাঢ়।

জেই হেতু মহাদেব কাশীশ্বর নামঃ
কমললোচন দত্ত গিয়েছিল গয়াধাম ঃ
পিতার কর্ম পরে কাশী গমন বাসনাঃ
কিন্তু গিহে ভার্য্যগণ করিল মানা ঃ
প্রীত্যাগমনেতে সিব স্তাপন করিবে ঃ
কাশী গমনের ফল তাহাতে পাইবে ঃ
এই হেতু প্রকাস হইল কাশীশ্বর ঃ
মন্দার সমান কাম মোদক কিংকরঃ (?)

শেষে সারির অর্থটি বোঝা যায় না, অতএব উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এখানের রাধাকান্তপুর গ্রামের অধিবাসী কমললোচন দত্তের ১২৫২ সালের (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসে কাশীশ্বর শিবমন্দির স্থাপনের এক কৌতুককর ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত দাসেদের মন্দির মেরামতির এক বছর পরেই এ মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল। গয়া থেকে প্রত্যাগমন করেই কমললোচন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ শিবমন্দির তাঁর কাশী না যাওয়ার দুঃখ দূর করার জন্যে। তাই শিবের কাশীশ্বর নামটিই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। মনে হয় যজ্ঞেশ্বর দাসের অনুকরণে কমললোচনও মন্দিরগাত্রে বাংলা পদ্য প্রোথিত করার জন্যে ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের নিখুঁত ছন্দ ও সাবলীল ভঙ্গিমা অনুকরণে তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন তা সহজেই চোখে পড়ে।

বাংলার মন্দিরগাত্রে অনেক সময় আবার সংস্কৃত লিপির পাশে বাংলা পদ্যলিপি দেখতে পাওয়া যায়। এর একটি উদাহরণ হল কলকাতার ৯৩নং টালিগঞ্জ রোডের মন্দিরসমূহে। মন্দিরগুলির বহির্দ্বারের দুই পাশে মর্মর ফলকে বাংলা ও সংস্কৃত দুটি লিপি দেখা যায়। বলা বাহুল্য বাংলাটি সংস্কৃতের অনুবাদ মাত্র। এটির বিষয়ে আগের একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি আছে দ্বার ভিতরে উঠানের ডাইনে কাল পাথরে রেখালিপি। সংস্কৃত অংশটি হল ঃ

শাকে শৈলাঙ্গামৈত্রপ্রমিত ইহ ঘটে
তেন সপ্তাঙ্কমানে।

গোরীজানে নিশান্তং সুরধুনিতটগং
দ্বাদশং সংজ্ঞয়া চ।
গোপালদৌকহর্ম্যং প্রণতিনতশিরাস্তস্য
মধ্যে করোতি।

দাসস্তৎ প্যারিলালো ভুবি হরিহর
ধাম্নেতি নাম্না প্রকাশ্যং।।

বাংলা পদ্যটি হ'লঃ

মুরারিমুরলীছিদ্রকুমারবদন ঃ
রত্নাকর শুধাকর শাকের গমন ঃ
কুম্ভে সপ্তবিংশতি দিবসে শুভক্ষণে ঃ
শুভারম্ভ সুরেশৈবলিনী সন্নিধানে ঃ
রাশী সংখ্যা কাশীপতি সানন্দে বেষ্টিতঃ
মধ্যে নবরত্নে শ্রীগোপাল বিরাজিতঃ
বাল্যবেশে ননী আসে ভঙ্গী মনোহরঃ
তুলনা কি দিব রূপ জিনি জলধরঃ
তাহালয় নাম হৈল হরিহর ধামঃ
প্যারিলাল দাসের আশা লইতে হরিনামঃ

লক্ষণীয় এখানে সংখ্যার দ্বারা শকাব্দের উল্লেখ নেই। বাংলা পদ্যটির প্রথম তিনটি পংক্তিতে শকাব্দের উল্লেখ আছে। এ তিন পংক্তির ব্যাখ্যা হল—মুরারিমুরলীছিদ্র (অর্থাৎ কৃষ্ণের বাঁশীর ছিদ্র)=৭ কুমারবদন (অর্থাৎ কার্তিকের মুখ)=৬ রত্নাকর (সমুদ্র)=৭ সুধাকর (চন্দ্র)=১। বাঁদিক থেকে অংকগুলি সাজিয়ে গেলে হবে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ। আর 'কুম্ভে সপ্তবিংশতি দিবসে'র অর্থ হচ্ছে, ২৭শে ফাল্গুনে। মেষাদি রাশি থেকে কুম্ভ হল ১১শ রাশি=১১শ মাস বা ফাল্গুন মাস ধরতে হবে। সংস্কৃত লিপিটির প্রথম সারিতেও ঐ একই শকাব্দ হয় অর্থাৎ শৈল (পর্বত)=৭ অঙ্গ (বেদাঙ্গ)=৬ ও মৈত্র=১৭ বা ১৭৬৭ শকাব্দ। বাংলা পদ্যটিতে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, সংস্কৃতের মতো এতেও সময়-সূচনার জন্যে সাংকেতিক শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। মূল সংস্কৃতে ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দগুলির সঙ্গে এর প্রভেদ সহজেই চোখে পড়ে। অতএব কবিতাটি যে যথার্থ বিদগ্ধজনের রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত ও বাংলা পদ্যলিপি একত্র থাকার আর একটি নিদর্শন হ'ল হুগলী জেলার মহানাদে 'ব্রহ্মময়ীর নবরত্ন' মন্দির। এর সংস্কৃত লিপিটি হলঃ শ্রীশ্রীদুর্গাশরণম।

শাকে ভূশর মৌনচন্দ্রগণিতে
শ্রীকালিকায়া মঠঃ।

উর্ধ্বে পার্শ্বচতুষ্টয়েষু বিলসৎ
হংসেশ্বরাদি শিবঃ।।

শ্রীকালীং ঃবর্ভাঞ্জনীং ভবভয়ং হন্তং
মধ্যেঽস্থাপয়ৎ।

শ্রীসদগোপকুলোদ্ভবো গুণবরঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাখ্যকঃ।।

১৭৫১ শকাব্দাঃ।

বাংলালিপিটি এই—

ব্রহ্মময়ীর বাসজন্য নির্মিত
নবরত্ন পঞ্চ শিব তাহাতে বেষ্টিত—

পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ চারি,
উর্ধ্বে এক শ্বেত তারি

দেখিবারে অতি সুশোভিত
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাম অশেষ গুণে গুণধাম
সদ্গোপ কুলে উৎপত্তি

ভবসিন্ধু তরিবারে সুযত্ন করি অন্তরে
কালীপদে করিয়ে প্রণতি

সন ১২৩৬ সাল। মন্দিরটির তিনতলায় হংসেশ্বর শিব আছেন। কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষণীয়, বাংলা পদ্যটি মূল সংস্কৃতের অনুবাদ হলেও সংস্কৃতে যেরূপ শকাংকের উল্লেখ সাংকেতিক শব্দের দ্বারা করা হয়েছে বাংলা পদ্যটিতে সেরূপ নেই। মন্দিরটি শকাব্দ ১৭৫১ বা ইংরেজী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

অনেক মন্দিরে সন তারিখ সোজাসুজি বাংলা গদ্যে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ঘাটালের সিংহবাহিনীর মন্দিরের লিপি উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরটির সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। লিপিটি এই ঃ 'শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৪১২ মাহ জৈষ্ঠেতে (?) শ্রীশ্রীসিংহবাহিনীর মন্দির। তৃতীয়া তিথি মঙ্গলবার। ৮৯৭ সাল।'

মলিঘাটী (মেদিনীপুর জেলা) হরিনারায়ণপুরের আগুনখাকীর মাড়োর দুটি আটচালা মন্দিরের পশ্চিমেরটির লিপিটি হলঃ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণো জয়তি। সন ১১৭২ সাল তাং ৬ই আষাঢ় শ্রীবলরাম বেরার মাতা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সন ১৩৫১ সাল মাহ আষাঢ় জ্ঞাতিসহ মেরামত করা হইল।' মনে হয় ১৩৫১ সালে সংস্কারের সময় প্রাচীন লিপিটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ মন্দিরটি আঠারো শতকের সতীদাহের স্মৃতিটি ধারণ করে আছে। এইরূপ আগুনখাকীর মাড়ো জাড়িপাই, খড়ার প্রভৃতি স্থানে আছে।

নাড়াজোলের রাজাদের সমাধিমন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল দেউলের ওপর নিম্নমুখী পদ্মফুলের মত। একটির লিপিঃ শ্রীযুক্ত রাজা মোহনলাল খাঁন। মৃত্যু সন ১২৩৭ সাল মাহ ফাল্গুন। ইং সন ১৮৩০। মাহ ফেব্রুয়ারী। রাজবাটীর কাছে আর একটির লিপি—রাজা অযোধ্যারাম খাঁন। জন্ম ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮২১ সাল। ২১শে মাঘ সন ১২২৮ সাল, মৃত্যু ২৮শে জুন ১৮৭৯ সাল ১৫ই আষাঢ় সন ১২৮৬ সাল।

দাসপুরের খাঁজহীন দেউলচূড় পঞ্চরত্নের লিপিঃ শ্রীশ্রীজিউদোধি বামনাসন—শকাব্দা ১৭৬৮ সন ১২ স ৫৩ সাল তারিখ ১৫ ফাল্গুন পরিচারক শ্রীযুক্ত রামকহারী চক্রবোর্ত্তির মন্দির। কৃত মিস্ত্রী শ্রীঠাকুরদাস সিল—সাং দাসপুর।। ইতি সমাপন। মন্দিরটি পরিত্যক্ত। দুটি হাতের মধ্যে তিনটি দরুণ খিলান কক্ষাদিও আছে। ছিয়াত্তরটি খোপে পুত্তলিকা। দুটি পূর্ণ ও দুটি অর্ধ ইমারতি থাম।

দাসপুরে পিচ রাস্তার পাশের দেউল শিবালয়ের দ্বারের ওপরে দু সারি লিপি আছে—

শ্রীশ্রীশীতলানন্দ শিবঠাকুর (?) শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৭১ সন ১২৫৬ সাল তারিখ ১৩ ফাল্গুন শ্রীগোলক মিস্ত্রী।

রঘুনাথপুরে (দাসপুর) পথের পাশে পঞ্চরত্ন তুলসী মঞ্চটির পঁচিশ খোপে ও দক্ষিণ ও পূর্বদিকের মোট পঞ্চাশটি খোপে পুত্তলিকা ও অলংকার আছে। দু সারি লিপি হল : শ্রীশ্রীবিন্দা দেবী সকাব্দা ১৭৭৫ সন ১২স ৬০ সাল তারিখ ২৭ যৈষ্ঠান। পরিচারক শ্রীরাধামহন পরামানিক মিস্ত্রী শ্রীঠাকুরদাস সিল। এ মন্দিরটিও চারপাশে দরুন খিলান। কলাইকুণ্ডের (দাসপুর) কাছেও এরূপ একটি মঞ্চ আছে। কোন কোন স্থানে ইমারতি ও মন্দিরাকৃতি তুলসী মঞ্চ। গোঁসাইবেড়ের তুলসীমঞ্চ গজাকৃতি।

মন্দির ও মঞ্চে ইংরেজী সন খুব একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু এমনও কিছু কিছু মন্দির দেখা যায় যেখানে শকাব্দও বাংলা সনের সংগে ইংরেজী সনেরও উল্লেখ করা হয়েছে।। এধরনের একটি মঞ্চ হল পাঁশকুড়ার (মেদিনীপুর জেলা) নিকটবর্তী ইটোরা মাঙগলোই গ্রামের একটি অষ্ট কোণ, ত্রিতল, ত্রয়োদশ চূড়ার সোপানযুক্ত পুত্তলিকা বহুল সুঠাম মঞ্চের লিপি : শ্রীরাধাদামোদর জীউ। শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৭৮০ সন ১২৬৬ ইংরাজী সন ১৮৫৯ সাল। শ্রীঠাকুরদাস মাইতি।

মলিঘাটী থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে সাকিরদাগ্রামে সামন্তগণের শিবের দেউলের লিপি—শকাব্দা ১৮১৩।১২৯৮—১৫।১৮৯১ ইংরেজী তারিখের অংক ভগ্ন। এই বংশের দর্পনারায়ণ সামন্ত রেশম ব্যবসায়ে ধনী হয়ে দোতলা প্রাসাদ, পাকা ঘাটসহ পুকুর ও দাসপুরের মিস্ত্রীর দ্বারা এই দেউল মন্দির নির্মাণ করান।

উপরে উল্লিখিত মন্দিরগুলিতে যেসব বাংলা লিপির উল্লেখ করা হল সেগুলি ছাড়া আরও কত শত মন্দিরে যে বাংলা-লিপি আছে তার ইয়ত্তা নেই। কেই বা তাদের আজ খোঁজ রাখে— বাংলার বনে-জংগলে, পথে-ঘাটে অনেক পোড়ো ভাংগা মন্দির আজও দেখতে পাওয়া যায়। তাদের অনেকের আজ লিপি বিধ্বস্ত। অনেক মন্দিরের যে স্থানটিতে লিপি ছিল সেটি শূন্য দেখা যায়। শূন্য স্থান থেকে অনুমান করা যায় লিপিটি স্থানচ্যুত হয়েছে। বাংলার মন্দিরে সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির কাজ যেমন অনেক স্থানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, মন্দিরলিপিও সেরূপ ধ্বংসের মুখে। মন্দির বিধ্বস্ত হতে বেশ সময় লাগে, কিন্তু মন্দিরলিপি নষ্ট হতে সময় লাগে না। তাই এগুলির প্রতি সকলের সতর্ক থাকা উচিত।

ভারতের উত্তর সীমান্তে হিমালয় সংলগ্ন যে তিনটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অবস্থিত, স্বাধীন সার্বভৌম ভুটান তার অন্যতম। ভারতের সংগে তার আত্মিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যোগ সুপ্রাচীন ও সুগভীর। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল, এই সেদিন উদযাপিত হল ভুটানের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় দিবস। এই জাতীয় দিবস ভুটানবাসীর জীবনে ৬৪তম জাতীয় দিবস। আজ থেকে ঠিক ৬৪ বছর আগে ১৭ ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে বর্তমান ভুটানের নবযুগের সূচনা হয়েছিল। ভুটানের ইতিহাসে ঘটেছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। সেদিন 'ওয়াংচুক' পরিবার বংশপরম্পরায় ভুটানে রাজত্ব করার অধিকার পেল। প্রথম বংশানুক্রমিক রাজা স্যার 'ওগেন ওয়াংচুক' সরকারী অফিসার ও কর্মচারী, সন্ন্যাসীমণ্ডলী ও জনসাধারণের সম্মতিক্রমে সিংহাসন আরোহণ করেন। বর্তমানে ভুটানরাজ 'শ্রীজিগমে দোরজি ওয়াংচুক' এই বংশের তৃতীয় উত্তরাধিকারী। পিতা জিগমে ওয়াংচুক-র পর বর্তমান রাজা ইং ১৯৫২ সালে সিংহাসন আরোহণ করে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।

১৭ ডিসেম্বর ১৯০৭ সালের এই যুগান্তকারী ঘটনা আর এক দৃষ্টিকোণ হতে নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। এতদিন যাবৎ ভুটানের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে রক্তক্ষয়ী এক চক্রান্তের ইতিহাস। স্যার ওগেনের সিংহাসন আরোহণের মধ্যে দিয়ে যবনিকা পতন হল সেই চক্রান্ত বিক্ষুব্ধ ও রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের। ন্যায় শান্তি ও প্রগতির বাণী নিয়ে জন্ম নিল বর্তমানের ভুটান।

১৯০৭ সালে বংশানুক্রমিক রাজপদ সৃষ্টির পূর্বে ভুটানে এক বিশেষ ধরণের শাসনব্যবস্থা ছিল। শাসনব্যবস্থা ধর্মীয় ও পার্থিব এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। 'ধর্ম-রাজা' ও 'দেবরাজা' নামে দুটি রাজপদ সৃষ্টি হয়েছিল। এই দুইয়ের মধ্যে ধর্ম-রাজাই রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু তিনি ধর্মীয় জীবন যাপন করতেন, তাই পার্থিব অর্থাৎ দেশের শাসন-ব্যবস্থা দেখা শোনার প্রয়োজনে তিনি একজন সহকারী নিয়োগ করতেন। এই সহকারীই দেবরাজা নামে পরিচিত ছিলেন। তাই তখনকার শাসন ব্যবস্থা ছিল ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা।

ভুটানে এই ধরনের শাসনব্যবস্থা কবে থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেকথা সঠিক-ভাবে বলা কঠিন। কারণ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পুনাখ জং (প্রাসাদ)-এ ডংসা পেনলুপের (ডংসার গভর্ণর) লাইব্রেরী আগুনে পুড়ে যাওয়ায় এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র কিছুই প্রায় বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে আগুন, ভূমিকম্প, বন্যা ও যুদ্ধেও প্রয়োজনীয় দলিলপত্র বিনষ্ট হয়। তাই ভারতবর্ষ হতে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত 'রাজনৈতিক' মিশনগুলি ভুটান পরিদর্শন করেন তাদের বিবরণই লিখিত ভুটানের অতীত ইতিহাস খুঁজে পাওয়ার একমাত্র উপায়।

১৮৯৫ সালে রংপুরের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্কট্ তার সেরেস্তার কর্মচারী কৃষ্ণকান্ত বসুকে ভুটানের দেবরাজার কাছে পাঠান। এই কৃষ্ণকান্ত বসুর সঙ্গে আর একজন বাঙ্গালী সেই সময় ভুটানে গিয়েছিলেন তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়।

এই কৃষ্ণকান্ত বসুর দেওয়া বিবরণ থেকে জানা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর কোন এক সময় 'লাম সোপটো' নামে এক ব্যক্তি ভুটানের উত্তর দিক হতে 'পুনাখা'-এ এসে উপস্থিত হন। এই সময়ে ভুটানে 'কোচ' নামে এক উপজাতি (যারা বর্তমানে কোচ-বিহার অঞ্চলে বসবাস করে) বসবাস করত। এই 'লাম সাপটো' পুনাখা-এ আসার পর মানুষের উরুর হাড় দিয়ে তৈরী একটি বাঁশী বাজান শুরু করেন ও সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘটনা ঘটতে থাকে। এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা দেখে কোচ রাজা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন ও পরিবার পরিজনসহ রাজত্ব ও সিংহাসন পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। লাম-সোপটো কিন্তু এই পরিত্যক্ত শূন্য সিংহাসন দখল করলেন না। তিনি 'লাসা' থেকে একজন পরিচিত দেশ-বাসীকে আনিয়ে 'দেবরাজা' নাম দিয়ে দেশের পার্থিব শাসনভার তার হাতে তুলে দেন। এবং তিনি নিজে 'ধর্মরাজা' নাম গ্রহণ করে রাষ্ট্রের ধর্মীয় প্রধান হিসাবে ধর্মকার্যে মনোনিয়োগ করেন।

কিন্তু ভুটানে ভারতের আর একজন রাজনৈতিক মিশনের নেতা স্যার 'আসলি ইডেন' অন্য মত ব্যক্ত করেছেন। তার মতে 'লাম সোপটো' তিব্বত হতে কোন সহকারী আনেননি বরঞ্চ 'ডাপাগসেন সিপটুন' নামে একজন নবাগত তিব্বতী 'লাম সোপটো'র কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং এরই উত্তরাধিকারী 'সাবড্রাং নেজোয়াং নাম-গোয়েল' 'দেবরাজা' ও 'ধর্মরাজা' এই পদ দুটির সৃষ্টি করে ধর্মকে শাসনব্যবস্থা থেকে পৃথক করেন। এবং নিজে 'ধর্মরাজা' পদে অধিষ্ঠিত হয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 'গুরু পদ্ম শম্ভু' ভুটানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এবং পরবর্তী কালে তিব্বত হতে 'তোজো ডাকগুম সিগপো' ভুটানে বৌদ্ধধর্মের 'ড্রাকপা' অর্থাৎ (লাল টুপি ও কুর্তা) মত প্রচার করেন। ভুটানে বৌদ্ধধর্ম ও তার এই বিশেষ সম্প্রদায়টির প্রচলন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে 'সাবড্রাং নেগোয়াং নাম গোয়েল'-এর অবদান অপরিসীম।

এমনিভাবে অতীত ভুটানে দুটি রাজপদের সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে দেশে সুষ্ঠু শাসনের প্রয়োজনে 'দেবরাজা'র অধীনে রাজ্যের প্রধান প্রধান অফিসারদের নিয়ে একটি পরিষদ গড়ে ওঠে। দেশে সুশাসনের জন্য দেবরাজাকে পরামর্শ ও সাহায্য করাই ছিল এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

রাজ্যে দুটি রাজপদ সৃষ্টি হলেও এর কোনটাই কিন্তু বংশানুক্রমিক রাজপদ ছিল না। তত্ত্বগত দিক হতে দেবরাজার

নিয়োগের বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। একটি হল, দেবরাজা পরিষদের একজন সদস্য, তিনি এই পরিষদের 'সদস্যগণের দ্বারা ৩০ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অপর মতটিতে এই নির্বাচনকে স্বীকার করা হয় না। এই মত অনুসারে, দেবরাজা সদস্যগণের মনোনীত ব্যক্তি।

বাস্তব ঘটনা ছিল তত্ত্বের ঠিক্ বিপরীত। বাস্তবে দেবরাজা নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন বা মনোনয়নের কোন স্থানই ছিল না। ভুটান তখন নয়টি প্রদেশে (পরে শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য দুটি প্রদেশ 'কুরুটোড' ও 'কুরু-মাত'কে সংযুক্ত করা হয়) ও পরে আটটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, এই আটটি প্রদেশ এক একজন 'পেনলুপ' বা গভরনরের অধীনে শাসিত হত। এই 'পেনলুপ' বা গভরনরেরা দেবরাজার নিকট অধীনস্থ কর্মচারী। এই আটজন গভরনরের মধ্যে 'প্যারো পেনলুপ' ও 'তংসা পেনলুপ' সব চাইতে ক্ষমতাশালী ছিলেন। স্যার আসলি ইডেনের মতে দেবরাজার নিয়োগে এই দুইজন 'পেনলুপ'র বা গভরনরের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে যখন যে বেশী ক্ষমতার অধিকারী হতেন তখন তিনি-ই তার মনোনীত ব্যক্তিকে দেবরাজার পদে প্রতিষ্ঠিত করতেন।

আবার অন্যজন ক্ষমতাশালী হয়ে আগের দেবরাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতেন। এই ক্ষমতা দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এক দেবরাজার উদয় হত আর অন্যের হত পতন। অর্থাৎ দুই গভরনরের ক্ষমতার লড়াইয়ের ঘুঁটি ছিলেন দেবরাজা।

এই ক্ষমতার লড়াই শুধু মাত্র দেবরাজার সিংহাসনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্ষমতার লড়াই রাজ্যের অন্য সরকারী পদগুলির ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। স্যার আসলি ইডেন এরূপ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। 'পেনলুপ'দের 'জিমপন' অর্থাৎ গভরনরদের 'চিফ সেক্রেট্যারি' বা প্রধান কর্মসচিবরা ঐ একই পদ্ধতিতে গভরনরের পদ দখল করতেন। বিপদকালে 'পেনলুপ' তার 'জিমপনে'-র সাহায্য কামনা করতে বাধ্য। এবং 'জিমপন'ও ভবিষ্যতে 'পেনলুপ' পদ পরিত্যাগ করলে ঐ পদ পাবেন এমন প্রতিশ্রুতি পেলেই পেনলুপকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। কিন্তু বিপদ হতে উদ্ধারের পর যখন 'জিমপন' দেখতেন 'পেনলুপ' তার কথা রক্ষা করে পদ ছেড়ে দিচ্ছেন না তখন তিনি হয় গুপ্তহত্যা অথবা শক্তির সাহায্যে সিংহাসন দখল করতেন। প্রকৃতপক্ষে তাই এই অবস্থা ছিল 'জোর যার মুল্লুক তার।'

বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু দেবরাজা বা 'পেনলুপ'দের ক্ষমতা দখলের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। দুটি বিবদমান গোষ্ঠী পরস্পর হতে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে পরস্পরের দিকে তীর নিক্ষেপ করত। যখন এই তীরের আঘাতে কোন এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটত তখন উভয় দলই এই মৃতদেহ পাওয়ার লোভে ছুটে এসে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। মৃতদেহ দখলে আনার পর মৃত ব্যক্তির 'যকৃৎ' দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'মাখন' ও 'চিনি' সহকারে তারা আহার করত। এবং মৃতদেহ হতে চর্বি ও রক্ত সংগ্রহ করত এক ধরনের বাতি তৈরীর জন্য যা ভগবানের নিকট নিবেদন করা হত। আবার ঐ মৃতদেহের হাড় সংগ্রহ করত এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে। আর মৃতদেহের মাথার খুলি দিয়ে পুজা-পার্বণে ব্যবহারের জন্য রূপোর সাহায্যে এক ধরনের বাটি তৈরী করত জল খাবারের জন্য।

ধর্মরাজা-র পদটিও বংশানুক্রমিক নয়, এক বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতির মাধ্যমে এক ধর্মরাজার মৃত্যুর পর আর এক ধর্মরাজার আবির্ভাব হত। ভুটানে ও তিব্বতে বিশ্বাস করা হয় ধর্মরাজা নবরূপে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ।

এই ধর্মরাজার মৃত্যু নেই। তাঁর মৃত্যু মানে পুরোন এক নশ্বর দেহ ছেড়ে নতুন এক নশ্বর দেহ গ্রহণ। মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা আবার এক শিশু হয়ে নবজন্ম নিয়ে ফিরে আসে। এক বিশেষ পদ্ধতি ও কতগুলি লক্ষণ নবজাতকের মধ্যে পরিলক্ষিত হলে বিশ্বাস করা হয় ধর্মরাজা শিশুরূপে আবার ফিরে এসেছেন। সাধারণত এক ধর্মরাজার মৃত্যুর পর বারো মাস ধর্মরাজার সিংহাসন শূন্য থাকে এই সময় প্রধান পুরোহিত ধর্মরাজার ধর্মীয় কাজগুলি করেন আর দেবরাজা রাষ্ট্রের প্রধানরূপে দেশ শাসন করেন। বিশ্বাস করা হয় এই বারো মাস পরে ধর্মরাজার পুনরাবির্ভাব ঘটবে।

শিশু ধর্মরাজের প্রথম আবির্ভাবের সূচনা হয় যখন কোন নবজাত শিশু জন্মের পরই মাতৃদুগ্ধ পান না করে গোদুগ্ধ পান করতে চায়। এবং কতগুলি শব্দ পরিষ্কার উচ্চারণ করে বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সেই শব্দগুলির অর্থ প্রকাশ করে। এই সংবাদ দরবারে পৌঁছনর পর প্রধান প্রধান পুরোহিতের একটি দল সেই শিশুর জন্মস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এবং সঙ্গে নিয়ে যান মৃত দেবরাজার ব্যবহৃত কিছু জিনিস। শিশুর সামনে ঐ জিনিসগুলি আরও কিছু অন্য অনুরূপ জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয়। শিশু যদি মৃত দেবরাজের ব্যবহৃত জিনিসগুলি ঠিক ঠিক চিনে ফেলতে পারে তখন তাকেই ধর্মরাজের শিশুরূপে বলে ঘোষণা করা হয়। এবং মহাসমারোহে পুনাখা প্রাসাদে সেই শিশুকে ধর্মরাজের শূন্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, আর, বি, পেমবারটন্ যখন ভুটানে যান তখন তিনি নয় বছরের এক শিশুকে ধর্মরাজার সিংহাসনে দেখেন এবং ঐ শিশু

গত চার বছর পূর্বে এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন একথা জানতে পারেন।

এই ধর্মরাজার ঠিক নিচে বারোজন প্রধান প্রধান পুরোহিত নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ দেশে ধর্মের রক্ষা ও চর্চার বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতেন। মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্বও এ'দের উপর ছিল।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৭ সাল পর্যন্ত এই দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থাই ভুটানে বলবত ছিল। কিন্তু এই একটি দিনে এতদিনের পুরোন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি হয়ে ভুটানবাসীর জীবনে ও ভুটানের ইতিহাসে এক নতুন শাসনব্যবস্থা জন্ম নিল। নিঃসন্দেহে এই কৃতিত্বের সম্পূর্ণ অধিকারী স্যার 'ওগেন ওয়াংচুক', বর্তমান ভুটানের প্রথম বংশানুক্রমিক রাজা। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, দেবাজগমী নামগোয়েলে'র ছেলে 'ওগেন ওয়াংচুক' 'তংসা'-র 'পেনলপ' বা গভরনররূপে দেশের রাজনীতি ও শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকেও দেশের রাজনীতির ক্ষমতা লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য যার একটা অংশ তংসার পেনলপ হিসাবে তাঁর প্রাপ্য, এই দাবী তাঁকে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে চক্রান্ত ও হত্যার রাজনীতিতে টেনে নামায় এবং তিনিও যথারীতি তাঁর নিকট-আত্মীয় 'পারো'র 'পেনলপে'র সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে 'এলো ডোরজি' 'থিম্বু'র 'জংসেন' অর্থাৎ প্রধান সচিবকে পরাজিত করেন এবং 'পুনাখা'র প্রধান সচিবকে হত্যা করে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেন। এই ঘটনার ঠিক কুড়ি বৎসর পর ঘটনাপ্রবাহ তাঁকেই দেশের প্রকৃত শাসক বা দেবরাজা পদে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই সময়ে ধর্মরাজার মৃত্যু হয়। দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে দেবরাজাই রাষ্ট্র প্রধান হন। কিন্তু বহুদিন পরেও ধর্মরাজার পুনরাবির্ভাব না ঘটায় দেবরাজা দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তির হাতে দেবরাজা-র কার্যভার অর্পণ করে নিজে ধর্মরাজার ধর্মীয় জীবনযাপন শুরু করেন। ঠিক সেই সময়ে দেশে এই সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন তসাং-র পেনলপ 'ওগেন ওয়াংচুক'।

তাছাড়া রাষ্ট্রে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহায়তাও কম ছিল না। ভুটানে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ স্নেহভাজন ব্যক্তি। কারণ, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বত ও ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক দ্রুত অবনতির পথে ধাবিত হয়। এই সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন ও ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সালের ব্রিটিশ ও তিব্বত সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁরই। তাই ভারত সম্রাটের পক্ষ হতে ওগেন ওয়াংচুক'কে 'নাইট কমেন্ডার' উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'প্রিন্স অব ওয়ালেস' যখন কলকাতায় আসেন তখন স্যার ওগেন ভারত সরকারের নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে কলকাতা পরিদর্শন করেন।

তাঁর জীবনের এই ঘটনাপ্রবাহ অবশেষে ১৯০৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তাঁকে দেশের সর্বউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে বহু বিভক্ত ভুটান এক সূত্রে গ্রথিত হয়। দ্বন্দ্ব, কলহ, ষড়যন্ত্রের ইতিহাসের উপর নেমে আসে যবনিকা। দ্বৈত শাসনের পরিসমাপ্তি হয়ে উদ্ভব ঘটে বংশানুক্রমিক রাজপদের। নিঃসন্দেহে এদিন ভুটানের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় দিন।

আজকের ভুটান ভগবান বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে ন্যায় শান্তি ও প্রগতির পূজারী। এই সেদিন ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে ভুটান বিশ্বসভার ১২৮তম স্বাধীন সার্বভৌম সদস্য হিসাবে যোগদান করেছে ন্যায় শান্তি ও প্রগতির বাণী নিয়ে।

প্রথমে বুঝতে পারি নি।

না বুঝতে পারলেও আমার চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারি নি।

আশ্চর্য, বিশ্বভারতীর যে ঘরখানায় রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি সব থরে থরে সাজানো আছে। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন—রবীন্দ্রনাথ!

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ!
সেই শুভ্র দাড়ি গোঁফ সেই পা পর্যন্ত লম্বা জোব্বা গায়ে। আর হাতে কলম।

ঘরের গভীর অন্ধকারেও তাঁর সেই বিরাট মূর্তি চিনে নিতে দেরি হলো না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো কবে—

অথচ তিনি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছেন তাঁর পাণ্ডু-লিপি-র ঘরখানা থেকে! ব্যাপার কি ?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ঢিপ করে তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করে বিস্মিত গলায় জিগেস করলাম, গুরুদেব, আপনি?

হ্যাঁ।

আপনি তো—

হ্যাঁ।
তবে?

আসতে হলো। বাধ্য হয়ে।

কিন্তু ঐ পাণ্ডুলিপির ঘরে...হাতে-কলম...মানে

রবীন্দ্রনাথ এবার যেন বেশ গম্ভীর হলেন। হাত দুখানা পেছনে রেখে বললেন...

তুমি দেখছি আমাকে রীতিমত জেরা করতে আরম্ভ করলে। যা কেউ কখন করতে সাহস করেনি আগে। উকিল নাকি?

তাড়াতাড়ি বললাম, আজ্ঞে না। এই একটু লেখা-টেখা—। মানে, আপনাকে যে কখনো এখানে এভাবে দর্শন করতে পারবো, তা ভাবতেও পারিনি। তাই—

আমিও ভাবতে পারিনি, যে আবার আমাকে আসতে হবে। রবীন্দ্রনাথ একটু থেমে বললেন, ভাবতে পারিনি, কলম হাতে ঢুকতে হবে পাণ্ডুলিপির ঘরে—

এবার খুব আমতা-আমতা করেই জিগ্যেস করলাম, গুরুদেব, তাই তো অবাক হয়ে গেছলাম, তাই জিগ্যেস করেছিলাম আপনাকে—

এতক্ষণে রবীন্দ্রনাথের গোঁফ দাঁড়ি ভরা মুখখানা যেন নরম হলো। তবে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন,

বলি, খবরের কাগজ পড়ো?

সোৎসাহে বললাম, কী বলচেন গুরুদেব! সকালে উঠে মুখের সামনে খাবার না জুটুক, চোখের সামনে খবরের কাগজ না পেলে মন হাঁফিয়ে ওঠে! আর শুধু কি তাই? খবরের ধাক্কায় খাবারের কথা মনেই থাকে না। বিশেষ করে কিছুদিন ধরে যা চলছে! ভারত-পাক যুদ্ধ, বাংলাদেশ স্বাধীন, শেখ মুজিবর মুক্ত—

ঐ মুজিবের জন্যেই আমাকে আসতে হলো।

মুজিবের জন্যে?

হ্যাঁ, ও আমার পরম ভক্ত। আমার কবিতা তোমার কটা মুখস্থ আছে?

মাথা চুলকোচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, কোন কবিতাটার ঠিক পুরোটা মুখস্থ আছে।

থাক, খুব হয়েচে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, দেখি তো সঞ্চয়িতা খুলে আমার কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে, গীত-বিতান হারমোনিয়মের ওপর ফেলে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হচ্ছে; আর মুজিবকে বলো, সে আমার পুরো কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে দেবে। কিন্তু মুজিব এবার আমায় বড় প্যাঁচে ফেলে দিয়েচে। ও আমার ভক্ত বটে, তবে গুরুমারা বিদ্যেও রপ্ত করেচে দেখলাম—

উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করলাম, কেন?

রবীন্দ্রনাথ স্মিত হেসে বললেন, কাগজে পড়োনি, মুজিব বলেচে, বাংলাদেশের সাত কোটি সন্তান বুকের রক্ত দিয়ে মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েচে—গুরুদেবের ঐ লাইন 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি।'

হ্যাঁ, তাই বটে! মনে পড়লো মুজিবের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বুক ভরে পরম আশ্বাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, আমার খেদ বাংলাদেশ মিটিয়েছে, আমি সুখী। কলমটি দেখিয়ে বললেন, তাই আমি এসেছিলাম ঐ কবিতাটির শেষের দুটো লাইন কেটে দিতে—

পরক্ষণেই তাঁর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো, সারা মুখ থমথমে হয়ে গেল, একটা চাপা রাগে মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। বজ্রগম্ভীর গলায় হাতের কলমটি দেখিয়ে বললেন, তবে ঐ দুটো লাইনের বদলে কী লিখেচি জানো?

ভয়ে ভয়ে বললাম, না।

লিখেচি—লিখেচি 'পশ্চিমবঙ্গ সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি, রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ করোনি।'—আরো বললেন, জানি ছন্দ মিললো না। না মিলুক। তোমাদের জীবনের ছন্দ গেচে হারিয়ে। আর রাগের মাথায় ছন্দ-ফন্দ বন্ধ হয়ে যায়।

কী সর্বনাশ!

ভয়ে-ভয়ে মৃদু আপত্তি করলাম, গুরুদেব, ক্ষমা করা কি চলে না? একটু ভেবে দেখুন। লোকে—

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিলেন রবীন্দ্রনাথ, লোকলজ্জা কী আছে তোমাদের? তোমরা ক্ষমার অযোগ্য বাঙালী নামের অযোগ্য। ভেবেছিলাম লিখবো রেখেছো 'বাঙালী' করে নয়, রেখেছো 'শয়তান' করে মানুষ করোনি। লিখিনি, এই তোমাদের ভাগ্যি যাও!

ভাবছিলাম, তাহলে দাঁড়াতো কি!

আরে সর্বনাশ!

পরক্ষণেই চোখ তুলে দেখি, রবীন্দ্রনাথ অদৃশ্য।

বর্তমান শতকের চারের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিবর্তিত বিশ্ব-ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় তুলে ধরলো। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন একদিকে যেমন পর্যুদস্ত, পরাজিত, অন্যদিকে তেমনি স্থানান্তরিত ভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ। অবশ্য শুধু পর্যন্ত তাও সাধারণ মানুষের দেশপ্রেমের কাছে নতিস্বীকার করে স্বক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করল। ইতিহাসের এই আশ্চর্য পট-পরিবর্তনের দেশ ইন্দোনেশিয়া। ডাচ সাম্রাজ্যবাদের পতন, প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রাচ্যশক্তিরূপে জাপ সাম্রাজ্যবাদের উত্থান, ১৯৪২-এ জাপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা দখলদাররূপে 'বাহসা ইন্দোনেশিয়া'র প্রচলন ইন্দোনেশীয় জনজীবনে এক অভূতপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার করলো। প্রাচীনের বুদ্ধিজীবী মানস এই প্রক্রিয়ায় কিছুদিন অভিভূত ছিল। কিন্তু পরিবর্তমান কালের অগ্নিগর্ভ ক্ষণে কল্পনাপ্রবণতায় আবেগপ্রবণ জাতিক এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় ভোলে না। তাই ইতিহাসের ধারাপথ বেয়ে ইন্দোনেশীয় জনগণ জাপ সাম্রাজ্যবাদকেও ছিটেফোঁটা করলো আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার জনক সুকর্ণ-র নেতৃত্বে।

ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক কবিতার গতি প্রকৃতি জানতে হলে ইতিহাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকাটুকু জানা দরকার। কেননা ইতিহাসের দোলিতে আমরা একথা জেনেছি যে, সাহিত্য-সমাজ-অর্থ-সংস্কৃতি ও আত্মিক জীবনের প্রতিফলন। এতে একদিকে যেমন মহৎ আশঙ্কার রাগিণী, অন্যদিকে তেমনি নিতান্ত মানবের জীবনের আর্তি ও ধ্বনিত। ইন্দোনেশীয় আধুনিক কবিতার অনুদিত উদ্ধৃতি এ সত্যের ইঙ্গিতবাহী। ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক কাব্যসাহিত্য ১৯২০-র সূচনাকাল হলেও প্রকৃতপক্ষে যথার্থ আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ ১৯৪২-এর বারুদের গন্ধে ভরপুর বাতাসের ধোঁয়ায়। স্বদেশানুরাগিকতার নবজাগরণ, শিল্প-বিপ্লব, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রভৃতির মাধ্যমে মূল্যবোধ পরিবর্তিত হলেও ইতিহাসের সামগ্রিক যন্ত্রণায় ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা উন্মুখর হয় নি। ইন্দোনেশিয়ার এলাচ, লবঙ্গ অধ্যুষিত বনদ্বীপে মন্থর জীবনধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তার প্রতিফলন অনুযায়ী যেমন গতানুগতিক কবিতা লেখা হচ্ছিল—তেমনি আধুনিকতার মন্ত্রীসদৃশ কবিতার সূচনাও শুরু হয়ে যায়। 'বাহসা ইন্দোনেশিয়া' অঞ্চলের মাঝে মাঝে ডাচ ভাষায় রচিত কবিতায় নবজীবনের বিদ্রোহ বিকাশন। ১৯৪২-এ ইন্দোনেশিয়ার কাব্যসাহিত্য আধুনিকতার গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করলো।

১৯৪৫-এর ইন্দোনেশীয় কাব্যের স্বাদ তরুণ কবিদের কম্বুকণ্ঠে উচ্চকিত, চিত্রকল্পে অনন্য, স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান।—এ যেমন সত্য তেমনি বাস্তব আবার বুদ্ধিজীবী স্বাতন্ত্র্যবাদী কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত কবিগোষ্ঠীর সংঘর্ষ; ইন্দোনেশীয় কাব্যের আত্মিক সংকট তবে সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বের উপল বন্ধুর বিসর্পিত পথরেখা অতিক্রম করে ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক কবিতা সার্থকতার পথে আগুয়ান। অতি সাম্প্রতিক ইন্দোনেশীয় কবিতা দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতার ফসল, আঙ্গিকে পরিবর্তিত সমাজ-মানসিকতার প্রভাব। গত জীবনের বঞ্চনা ও বেদনা থেকে মুক্তিলাভ করে আধুনিক ইন্দোনেশীয় কবিতা সার্থকতার সীমাস্বর্গে উন্নীত হওয়ার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়পণ, আনন্দে উদ্বেলিত।

বর্তমান শতকের চারের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি খাইরিল আনোয়ার সিতর সিতুমোরাঙ্গ, রিভ সুমায়াজো রাস্তান্দি কর্তাকুসুমো, রেন্দ্রা প্রভৃতি। উপরিউক্ত গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত কবি ব্যক্তিত্ব খাইরিল আনোয়ার। ১৯২২-এর জুলাই মাসে মেডান শহরে খাইরিলের জন্ম। ১৯৪৩-এ দীপ্যমান কবি প্রতিভায় বিতর্কিত কবি-ব্যক্তিত্ব। তিনি বিপ্লবে বিশ্বাসী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও বিপ্লবী চেতনায় বর্তমান। খাইরিলের এই বিপ্লবী-দর্শন কিন্তু আরোপিত নয়, দেশের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমতাসঞ্জাত উপলব্ধি। তাঁর জীবনে একদিকে অজস্র কাব্যানুরাগীর প্রশংসাধন্য ভূমিকা অন্যদিকে সমালোচকদের তীব্র তীক্ষ্ণ আক্রমণ। আর আত্মিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিশ্ব-মানবতাবাদের দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলো তাঁর কাব্যে স্বর্ণফসলে সমুজ্জ্বল। কিন্তু মাত্র সাতাশ বছর বয়সে ১৯৪৯-এর এপ্রিল মাসে কবি লোকান্তরিত হলেন। ইন্দোনেশিয়া তার প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম কবি আনোয়ারকে হারাল। কবি খাইরিল আনোয়ারের একক কাব্য সংগ্রহ দুটি—'সার্প গ্রেভিল' এবং 'হোয়াট ইজ স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাণ্ড ব্রোকেন'। আর যৌথ সংগ্রহ একটি—'নয়েজ মিকসড ইন ডাস্ট'। মৃত্যুর পর ১৯৫০ সালে তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সামগ্রিকভাবে প্রকাশিত হয়। কবিতা ছাড়া ছোট গল্পেও তাঁর কবি-মানস প্রস্ফুটিত। সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে আনোয়ারের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। 'স্টোরি ফর ডি টি'তে আদিম স্বাস্থ্যবাদের আরণ্যক তন্ময়তা। 'গার্ডেন' প্রেমকাব্যে কবির নিঃসঙ্গ বেদনার প্রস্রবণ। 'এম্পটি' কাব্যগ্রন্থে শূন্যতার বোধ ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত। কবির কণ্ঠে এ সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। মৃত্যুর পদক্ষেপ শুনতে পেয়েছিলেন বলেই কবি বোধহয় উচ্চারণ করেছিলেন—

'হাজার বছর দীর্ঘ পরমায়ু আমি চাই।'

যুগযন্ত্রণা থেকেও কবি যে নিস্পৃহ বা উদাসীন থাকতে পারেন না কবি তাও মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

'প্রেমের আরতি নয়তো এখন আর।'

ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেমাপেক্ষা কবির কাছে সামাজিক দায়িত্ব অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

চিত্রকল্প রচনায় খাইরিল আনোয়ার সিদ্ধহস্ত। 'বাহসা ইন্দোনেশিয়া'কে তিনি চিত্রকল্প রচনার সার্থকতার সীমাস্বর্গে উন্নীত করলেন। 'গোধূলি', 'সমুদ্রতীর', 'অন্ধকার', 'ঈগল' ইত্যাদি তাঁর প্রিয় চিত্রকল্প। ডাচ ভাষার মাধ্যমে লব্ধ ইউরোপীয় মানসিকতাকে আনোয়ার প্রথম ইন্দোনেশীয় কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কবি এখানেও দ্বন্দ্বে আকীর্ণ—পাশ্চাত্য মানস মনীষা, আবার তার ভয়ংকর সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা। সমালোচকরা তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করেছেন পাশ্চাত্য ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে বিপ্লবী চিত্তবৃত্তিতে আস্থাবান প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব।

খাইরিলের সমসাময়িক কবি সিতর সিতুমোরাঙ্গ অস্তিত্বের যন্ত্রণায় পীড়িত। আত্মিক সঙ্কটের ছবি আছে কিন্তু সমাধান নেই। আধুনিক মানুষের না পাওয়ার যন্ত্রণা, স্বীকারোক্তির বেদনা, সভ্যতার দ্বন্দ্ব সিতুমোরাঙের কাব্যে প্রতিফলিত। 'দুঃখ' কবিতায় সিতুমোরাঙের অস্তিত্বের যন্ত্রণামুখরতা। কবি এই সংশয় বেদনা থেকে মুক্তির পথ খুঁজলেও সার্থক হন নি। 'লেটার্স অন গ্রীণ পেপার', 'ইন ভার্স', 'অ্যানোনিমাস ফেস'—এই তিন কাব্যগ্রন্থেই একই সুরের উন্মুখর সংশয়ের প্রকাশ। কবি শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতায় মুক্তির তোরণতীর্থ দেখতে পেলেন—আর সে তোরণ-তীর্থে স্বর্ণসমুজ্জ্বল প্রভাত শান্তির প্রত্যাশা।

রিভো সুমায়দজোর প্রথম সংকলন গ্রন্থের নাম 'বিবেক ও কর্ম'। এতে আছে ছোট গল্প পাঁচটি, একাঙ্ক নাটক দুটি ও বেশ কিছু কবিতা। অধিকাংশেরই রচনাকাল ১৯৪৬—১৯৫০। কবিতাগুলোর আঙ্গিক, প্রকরণ ও সুর অত্যন্ত সাধারণ হলেও স্পষ্টতায় তীব্র, জীবনবোধের সততায় উজ্জ্বল। সুমায়দজো চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য তার সমস্ত রচনায় চিত্রকল্পের আয়োজনের থেকে বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বোধহয় কবি চিত্রকল্পের মাধ্যমরূপে চিত্রশিল্পকে আর ঘটনার জন্য কবিতাকে বেছে নিয়েছিলেন কিন্তু ১৯৬০-এর পর অকস্মাৎ সুমায়দজোর শিল্পীমন কাব্যের রূপবন্ধে মুক্তি পেতে চেয়েছে। তাই চিত্রশিল্পীর তুলি চিত্রকল্প রচনার লেখনীতে পরিণত। ১৯৬৩-তে প্রকাশিত এক কাব্যগ্রন্থে এর প্রকাশ অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সুমায়দজোর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যবদ্বীপীয় সংস্কৃতি ভাবনা ও লোকভাবনার রূপায়ণ।

রাস্তান্দির কবিতায় আধুনিক ভাবনার রূপায়ণ ছন্দে, চিত্রকল্পে ও বিষয়বস্তুতে লক্ষণীয়। কবির রচনা অজস্র না হলেও তিনি সৃষ্টিধর্মে ও উল্লেখযোগ্য কবি প্রতিভা। আসন্ন উৎপাতের এক ক্রান্তিকালীন সম্ভাবনায় কবি যেন বিচলিত—

'কৃষ্ণবর্ণ মেঘে এক নিষ্ঠুর সংকেত,
সঙ্গীতবিহীন মহীরুহের দল সন্ত্রস্ত,
শাখায় শাখায় সংসক্ত পত্রাবলী
নিঃসাড়ে অভিশাপ দেয় তাকে
যে পাখিটা এখনো উঁকি মারে।'

রেন্দ্রার উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বন্দী'। পরাধীন জাতির মর্মবেদনায় অভিষিঞ্চিত, কোন অজানা বন্দীর প্রতি শ্রদ্ধানম্র কণ্ঠের অঞ্জলি, বন্দী দেশপ্রেমিকের বর্ণনায় কবির ভাষা ও চিত্রকল্প কবির ভাবাবেগ ও কাব্যিক প্রতিভার ইঙ্গিত বহন করে।

'প্রস্তর শয্যায় শায়িত দীর্ঘ দেহটি,
যেন কৌমুদীবিহীন পর্বত শ্রেণী।
অস্পষ্ট ঘোলাটে চোখে
অবজ্ঞা করে কারাকক্ষের গবাদ।'

আস্রুল সানি ও রিভাই অ্যাপিন খাইরিল আনোয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও তাঁদের কবিতায় চিন্তা ও বক্তব্য থাকলেও উচ্চতর কাব্যিক স্তরে উন্নীত হতে পারে নি। আস্রুল সানি শান্তিপূর্ণ [illegible] জীবনাদর্শে বিশ্বাসী কবি। রিভাই অ্যাপিনের প্রবন্ধ 'ডেভলক ইন [illegible] ইমোশানাল পোয়েট্রি'তে কবির কাব্যাদর্শ ঘোষিত। প্রকাশমান কাব্যধারায় দ্বিতীয়োক্ত কবি উল্লেখ্য হলেও তাঁর কাব্যের আবেগপ্রবণতা চিরন্তনতা লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উল্লিখিত কাব্যগোষ্ঠীর বাইরে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম [illegible] সালে। প্রচলিত কাব্যধারায় তিনি সক্রিয় প্রতিবাদ। খাইরিল আনোয়ারের নেতৃত্বে যে কাব্যাদর্শ আধুনিক ইন্দোনেশীয় কাব্যসাহিত্যের ধারায় প্রতিষ্ঠিত তার মূল সুর বিশ্বমানবতাবাদ। বিশ্বনাগরিকমনোভাব তাঁর কাব্যধারায় ক্রিয়াশীল বলেই তাঁর কবিতাকে কোন চিহ্নে চিহ্নিত করা চলে না। আসলে আনোয়ার সর্বজনীন ও সর্বকালীন কবি। মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত কবি বাকরুল সালে মনে করেন শিল্প উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। আর তাঁর মতে, সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কিন্তু বস্তুবাদ তো সব নয়। বস্তু অতিক্রমী অস্তিত্বই তো মানবিক চিন্তা চেতনার কেন্দ্রবিন্দু।

বাকরুল সালেকে কেন্দ্র করে যে গোষ্ঠী ইন্দোনেশীয় কবিতার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ক্লারা আকুসিতা। বস্তুহারা প্রপীড়িত নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনাই এঁদের কাব্যের বিষয়বস্তু। 'হুম দে [illegible] হাঙগার এ্যাণ্ড লাভ ভোয়েলস' এই জাতীয় এক কাব্যসংকলন। সাধারণ মানুষের সাধারণ আকাঙ্ক্ষার কথাই আজকের ইন্দোনেশীয় কবিতার বিষয়বস্তু।

সাম্প্রতিক কালে ইন্দোনেশীয় কাব্য যেমন বিশ্ব-কাব্যান্দোলনের ধারা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারছে না, তেমনি আবার সমকালীন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার প্রভাব থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, অনেক কবির কাব্যে জীবনবোধ ও বোধ সম্পর্কিত বিচারণার দ্বন্দ্ব প্রস্ফুটিত। আলোচ্য শতকের ছয়ের দশকে ইন্দোনেশিয়া ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে উপনীত হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেই ক্রান্তিকালীন সংকটও ইন্দোনেশিয়ার কবিতায় ছায়াপাত করেছে। ইন্দোনেশীয় কবিতার এক প্রান্তে পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙে ফেলার নঞর্থক জীবনদর্শন, আর একদিকে কিছু গড়ে না ওঠার যন্ত্রণা। তবুও এই দোলাতেই ব্যক্তির মাঝখান দিয়েও আধুনিক ইন্দোনেশীয় কবিতা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে অতিক্রম করে এক কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ে আস্থাবান চিত্তবৃত্তির পথিক হবার স্বপ্ন দেখছে।

।। চোদ্দ ।।

সেদিন দুপুরে যে অমিতকে এত ভালো লেগেছিল, আজ রাতে তাকে মনে মনে একশো চাবুক মেরে নিজেরই ক্লান্তি এল। আর চন্দন দেখল, অমিত তার চাবুক খেয়েও অনর্গল হেসে যাচ্ছে। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব দৃশ্য কল্পনা করল সে। রুমা [illegible] তিলোত্তমা অমিতকে দেখাচ্ছে। কিম্বা রুমা-অমিতের জড়াজড়ি দেহ অন্ধকারের স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে আসছে। সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে সব ভুলতে এবং ঘুমোতে চাইল চন্দন—তবু ঘুম এল না। বাইরে শীতের ঝিমধরা রাত মাঝে মাঝে কাঁপিয়ে দিল ভারি ট্রাকের ঘর-ঘর শব্দ। পাশের ঘরে হীরুবাবুর কাশি শোনা যাচ্ছিল। তারপর বেচুবাবুর ঘুমজড়ানো কণ্ঠস্বর—রাতে সিগ্রেট না খেলেই পারেন! চন্দনের ইচ্ছে হল বাকি রাতটুকু ওদের সঙ্গে গল্প করে কাটালে রেহাই পাওয়া যেত। ঝোঁকের বশে উঠে বসল সে। ঘরের ভেতরটায় ওম আছে। দরজা খুললেতেই ওমটা নষ্ট হয়ে গেল। কুয়াশার মধ্যে চাঁদ [illegible]-ডাঙার তালগাছগুলোর মাথা ছুঁয়েছে। ধাবার হোটেলে এখনও আলো জ্বলছে। আবছা কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কালো কালো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা। ফিকে জ্যোৎস্নায় হাইওয়ের শিশিরভেজা বুকটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চন্দনের মনে হল, পরেশ মজুমদারের [illegible] সে [illegible] করলেও করতে পারে। [illegible] তাকে [illegible] [illegible]। কোম্পানীটা [illegible]। [illegible] [illegible] বেচুবাবুদের [illegible] [illegible] কথা। ওরা পরেশের ঝামেলার মধ্যে থাকতে কেউ রাজি নয়। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এখন যে-যার দিকে পালাতে চায়। ওরা পালাক। চন্দন একা চালিয়ে যাবে।

আর তক্ষুনি মনে পড়ল, এখন এখানে যা-কিছু সবই তো রুমার সম্পত্তি! ফের রুমা আর অমিত তার মগজে উড়ে এসে ঢুকল। জ্বালা শুরু হল। নাঃ, তার কিছুই সাজে না। তাকে সকালেই চলে যেতে হবে রূপপুর ছেড়ে। নিজের কোন অধিকারই সে আর খুঁজে পেল না। তার সব অধিকারের সনদ পরেশ মজুমদারের রক্তে কালো হয়ে ঢাকা পড়েছে, আর অকেজো হয়ে গেছে।

রাগে তেতো হয়ে সে দরজা বন্ধ করে আলো জ্বাললো। নিজের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। কেন থাকবে—কার জন্যে থাকবে? স্নেহধারাও এক অদ্ভুত মেয়ে। কই, আজ রাতে যে সে শুতে বা খেতে গেল না, ডাকতে পাঠাল না তো তাকে? রুমার ওপর স্নেহধারার যে সংশয় তা পরেশের মৃত্যুর পরই সম্ভবত উবে গেছে। হাজার হোক, মায়ের পেটের বোন—পর তো নয়। হয়তো স্নেহধারা অমিতকেই রুমার বর হিসেবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। আর সে-কারণেই রুমার বিয়ের ব্যাপারে চন্দন সম্পর্কে এত জেনেশুনেও সে চুপচাপ ছিল এতদিন। তাছাড়া সবচেয়ে ভাববার কথা—পরেশের মৃত্যুর পর স্নেহধারা রাতারাতি বদলে অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে। তার ধৈর্য সাহস আর [illegible] [illegible] [illegible] দেখে [illegible] চন্দন। শক্ত হাতে [illegible] [illegible] স্নেহধারা যেন তৈরী। চন্দনের মনে পড়ল গত দুদিন ধরে স্নেহধারা তার স্বামীর কারবার সম্পর্কে খুঁটিয়ে জেনে নিতে চাচ্ছিল। হকসায়েবকেও ডেকে পাঠিয়েছিল।

অভিমানে মন আরও অস্থির হল চন্দনের। চন্দন চলে গেলেও আর পরোয়া নেই স্নেহধারার। কারণ, হকসায়েব আছে। বেশ তো—আমি কে তোমাদের! পর ছাড়া আপন নই।...চন্দন মনে মনে কথাগুলো বলে তক্তাপোষের নিচে থেকে তার বাকসোটা টেনে সাবধানে বের করল। পিছনে আরেকটা বড় বাকসো আছে। সেটায় পরেশের কী-সব জরুরী কাগজপত্র থাকে। হঠাৎ মনে পড়ল, পরেশ একদিন ঠাট্টার ছলে তাকে বলেছিল, যদি কোনদিন পথে এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে মারা পড়ি, ওটা খুলে দেখিস চাঁদু। কিন্তু খবরদার, কারো সামনে নয়।...চন্দন বলেছিল, কী আছে ওতে?

পরেশ মাথা দুলিয়ে রহস্যময় ভঙ্গীতে হেসেছিল। কোন জবাব দেয়নি।

পরেশের চাবির গোছা চন্দনের কাছে আছে। সে খুব সাবধানে বাকসোটা টেনে বের করল। তারপর খুলল। কয়েকটা ফাইল। একটা মোটা বাঁধানো খাতা। এক-গুচ্ছের আলগা কাগজপত্তর। তারপর একটা ভাঁজ-করা পুরনো হলদে-হয়ে-ওঠা খবরের কাগজ। তার নিচে পরেশের একটা লং-কোট। এটা নতুন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু শীতেও তো কোনদিন গায়ে দিতে দ্যাখেনি তাকে। কোটটা [illegible] চন্দন [illegible] উঠল। [illegible] [illegible] [illegible]।

থাকে-থাকে [illegible] [illegible] [illegible] বাঁধা নোটের [illegible]। কিছু দশ, কিছু একশো টাকার নোট।

এত টাকা এখানে কেন? ব্যাঙ্কে রাখেনি কেন পরেশ মজুমদার? একটা ঝড় এসে গেল কোত্থেকে। এ-টাকার খবর আজ আর কেউ জানে না। এর মালিক হতে পারে চন্দন। কোন বাধা নেই। কোন হিসেব নেই। এর জন্যে কোন ট্যাকসো দিতে হবে না সরকারকে। কাঁপন্ত হাতে খুব তাড়াতাড়ি গুণে নিল চন্দন। সবশুদ্ধ আঠারোটা বাণ্ডিল—তার মানে যোগফল দাঁড়াবে প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি। খুঁটিয়ে হিসেব করতে ভয় পেল সে। জীবনে এত টাকা একসঙ্গে সে দ্যাখেনি। কোথায় পেত এত টাকা পরেশ মজুমদার?

শরীর অসম্ভব ভারি হয়ে পড়ল তার। ভারি হাতে বাকসোয় সব আগের মতো রেখে সে মেঝেয় বসে সিগ্রেট টানতে থাকল। তাকে কেন্দ্র করে সেই ঝড়টা ঘুরপাক খাচ্ছে। মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে মুহুর্মুহু। কিন্তু খুব শান্তভাবে সে একটু একটু দুলতে থাকল শুধু।...

সকালে—সবে সূর্য উঠেছে, দরজায় ভালো করে তালা এঁটে চন্দন রাধার হোটেলে গেল। রোদে তখনও তাপ ফোটেনি। রাধা শশব্যস্তে বলল, কী ভাগ্যি! আসুন, আসুন চন্দনবাবু।

একটা চেয়ার বাইরে রোদে বের করে দিল সে। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। সামনে ফাঁকা হাইওয়ে। শিরিশগাছের তলায় আগুন জেলে একদল লোক বসে আছে। চন্দন একবার সামান্য দূরে রাস্তার ওপারে নিজের ঘরটা দেখে নিয়ে বসল। বলল, কাল সারারাত আলো জ্বলছিল হোটেলে—ব্যাপার কী রাধাদি?

রাধা বাঁকা ঠোঁটে জবাব দিল, আর বলবেন না ছোটবাবু। সময় নেই, অসময় নেই, এসে সব জ্বালাতন। খিদে পেয়েছে, ভাত খাব। সবে তন্দ্রামত এয়েছে, এক ভানপিটে এসে হুলুস্থূলে বাধাল কাল রাত্তিরে। আমার মরণ আছে? মা-গঙ্গার ধারে গিয়ে আবার সরে এসে জুড়ে বসল কোথায়—সেটা দেখুন ছোটবাবু।

রাধা হাসতে লাগল। চন্দন বলল, কে এসেছিল? শংকর নাকি?

শংকর শব্দটা শুনে রাধার মুহূর্তকাল চমক খেলল যেন। সে বলল, ওকে চেনেন নাকি ছোটবাবু?

খুব চিনি।...চন্দন একটু হেসে বলল। ...তাছাড়া রাতদুপুরে তোমাকে জ্বালানোর সাহস আর কোন ড্রাইভারের থাকবে!

রাধা হেসে গড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। ...সেই রাত্তিরে আলু ভাতে রান্না করে গরম-গরম খাওয়ালুম মিন্সেকে। খেয়েদেয়ে তখন বলছে কী জানেন? সেই যে কথায় বলে, খেতে পেলে শুতে চায়!

চন্দন বলল, শুতে চাইল বুঝি?

রাধা সকৌতুকে আঙুল তুলে ভিতরটা দেখিয়ে দিল নিঃশব্দে। দুটো টেবিল এক জায়গা করে তার ওপর আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে কে ঘুমোচ্ছে। চন্দন লক্ষ্য করল ওর পাশের জায়গায় সম্ভবত কেউ শুয়েছিল—এখনও ফাঁকা পড়ে আছে। মনে হল, ওই ফাঁকাটায় যেন রাধার শরীরের একটা ছাপ এখনও টাটকা লেগে রয়েছে। হৃদয় অন্তত বাজে কথা বলার পাত্র নয় বলে মনে হচ্ছে। চন্দন মুখ ফিরিয়ে হাসল। অন্য সময় হলে রাধাকে সে বেশ কিছুটা ঘৃণা করত। তার হাতে কিছু খাবার কথা ভাবতেও পারত না। বিশেষ করে এখনও রাধার দেহটা হয়তো অশুচি হয়ে আছে। অথচ চন্দনের মনটা হঠাৎ সকালে এত ওপরে ভেসে আছে যে কোন শুচিতা-অশুচিতা ভালোমন্দ ব্যাপার তার নাগাল পাচ্ছে না। নিজের মধ্যে একটা নতুন শক্তির কঠিন স্পর্শ প্রতিমুহূর্তে সে অনুভব করছে।

রাধা বলল, বসুন। চা করতে বলি। আমারও খাওয়া হয়নি। অ সন্ধে, মা সন্ধ্যামণি!

সে ডাকতে ডাকতে ভিতরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, তা ছোটবাবু, তারপর তো আর ইদিকমুখো হলেন না। একটা শুভ খবর শুনছিলুম—তার কী হল?

চন্দন বলল, কিসের?

রাধা প্রশ্নটা আমল না দিয়ে বলল, ওরে ব্বাস! একদিন কী কাণ্ড হয়েছে জানেন না? দিদিমণি যাচ্ছিলেন সামনে দিয়ে—যেই ডেকে বলেছি,...

বাধা দিয়ে চন্দন বলল, শুনেছি।

রাধা আবার চেঁচাল, সন্ধ্যা রে! তারপর চন্দনের কাছে এসে চাপা গলায় বলল, বড়বাবু থাকলে কথা ছিল না। কিন্তু আমি বলি কী ছোটবাবু, কাজটা শিগগির চুকিয়ে ফেলুন। এখন বলতে গেলে ওনাদের মাথার ওপর আপনি ছাড়া তো কেউ নেই। দেরী না করাই ভালো। কথায় বলে, বিষবৃক্ষ চিনলেই গোড়াশুদ্ধ উপড়ে দিতে হয়। বেশি বাড়তে দেবেন না।

চন্দন তাকাল। হঠাৎ তার ইচ্ছে করল এই ধুমসি মেয়েটাকে এক চড় কষে মারে। সিগ্রেট বের করে ঠোঁটে রাখল সে। ধরাতে ভাল লাগল না। সারারাত সিগ্রেট খেয়ে গলা জ্বালা করছে।

রাধা একটা কিছু আঁচ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ বদলাল।...তা খাওয়াদাওয়া হচ্ছে কোথা ছোটবাবু? আমার বাবা যে সেদিন বলে গেলেন, তার কী হল! হুদেকে তো ছেড়ে দিয়েছেন!

'আমার বাবা' মানে হকসায়েব। চন্দন বলল, সেজন্যেই এলুম রাধাদি। আজ থেকে এখানেই খাবো। কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাচ্ছি।

সে পকেটে হাত ভরলে রাধা জিভ কেটে হস্তদন্ত করজোড়ে বলল, ছি-ছি! ও কী কথা! আপনার মতো মানুষকে সেবা করব, ধন্য হব—আগাম আপনি রাখুন ছোটবাবু। আপনার যা ইচ্ছে মাসকাবাড়ে দেবেন। সন্ধ্যা চা হল?

একটি কিশোরী ঝকঝকে নকসাকাটা প্লেটে চমৎকার সুদৃশ্য এক কাপ চা আর বিস্কুট এনে সামনে ধরল। বোঝা গেল, রাধা হোটেলওয়ালি ছোটবাবুর সম্মানে এ-ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এ কি নিছক একজন মাসকাবারি ভদ্রলোক খদ্দের ধরার ফাঁদ মাত্র?

মেয়েটি ফিরে গিয়ে গেলাসে রাধার জন্যে চা এনে দিল। চন্দনের সামনে মাটিতে বসে রাধা চা খেতে থাকল। একটু পরে সে বলল, ছোটবাবু?

উঁ?

পরেশবাবুর শুনেছি বিস্তর কাঁচা-পয়সা এর-ওর কাছে রাখা ছিল। খোঁজখবর পেলেন তো সেগুলোর?

চন্দন চমকে উঠেছিল। বাইরের কনকনে হাওয়াটা তার ভিতরে ঢুকে সারা দেহ নিঃসাড় করে ফেলল কয়েক মুহূর্তে। সে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, কে বলল?

রাধা রহস্যময় ভঙ্গীতে মাথা দোলাল। ...আমার বাবা বলছিলেন।

হকসায়েব?

আবার কে? উনি পরেশবাবুর জোটের একজন কিনা। তাছাড়া বড়বাবু ওনাকেই বিশ্বাস করতেন—আর কাকেও তো নয়। শুনলুম, অনেক কাঁচা টাকা বেচুবাবুকে উনি রাখতে দিয়ে কলকাতা গেলেন—তারপর তো এ্যাকসিডেন্ট হল। বেচুবাবুকে শুধোবেন তো কথাটা।

চন্দন কঠিন স্বরে বলল, হকসায়েব শুধোননি কেন?

রাধা একটু হাসল।...বাস্ রে! ওনার সে সাহস আছে? তাছাড়া উনি শুধোবার কে? কেন—আপনাকে বাবা কিছু বলেননি?

না তো!

রাধা একটু ভেবে বলল, তাহলে বলবেন। কাল দুপুরবেলা কথায় কথায় হঠাৎ বলছিলেন বাবা। আমি ছাড়া তো মনের কথা কারো সঙ্গে ভাঙেন না। ভাঙবেন কার কাছে বলুন? রূপপুর বড় সাংঘাতিক জায়গা।

হঠাৎ ইচ্ছে হল, এক্ষুনি হকসায়েবের গাঁয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা জেনে নেয়। কিন্তু শরীর আর মন কেমন অবশ হয়ে পড়ছিল চন্দনের। পরেশ মজুমদার তার টাকা সামলাতে পারছিল না। আশ্চর্য লাগে। টাকা সে বাড়িতে স্নেহধারার কাছে রাখলেও তো পারত! বেচুবাবু আর কোনমতে পাত্তা দেবে না—সেটা বোঝা সহজ। কিন্তু জেনেশুনে অমন বোকামি কেন করল পরেশদা? চন্দনের কাছে রাখলেও পারত—রাখেনি। এমনকি ওই বাকসোটার মধ্যে অত টাকা রেখেছে, তাও পরিষ্কার বলেনি চন্দনকে! না—অবশ্য এটা চন্দনের প্রতি অবিশ্বাস মোটেও নয়, সেটা অভাবনীয়। আসলে চন্দনকে সে আনাড়ি বা ছেলেমানুষ ভেবেছিল। কিন্তু ভাবতে খারাপ লাগে, হকসায়েব তো চন্দনকে কিছু বলেননি!

রোদ সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হোটেলের ভিতর রাধার লোকেরা ব্যস্ত হচ্ছে তার মৃদু সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। শংকর ড্রাইভার তখনও কাঠ হয়ে ঘুমোচ্ছে। কাপ রেখে চন্দন উঠে দাঁড়াল। স্নেহধারার ওখানে যেতে হবে।...

স্পা ওয়াশিং পাউডার
গুণে অসাধারণ কেন জানেন ?
BLUE
Spa
POWDER
স্পা
স্পা ওয়াশিং পাউডারের
পরিষ্কার করার ক্ষমতা ঢের বেশী!
খুব ঘন ফেনায় ময়লা কাটিয়ে
দেয়! এমন কি খর জলে কাচলেও
যেকোন গভীর দাগ
অনায়াসেই উঠে যায়!
জোরদার স্পা ওয়াশিং পাউডারে কাচা কাপড়-চোপড়ে একটা বাড়তি উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। খর জলে কাচলেও তার হেরফের হয় না। পরিষ্কার ও ঝকমকে ক'রে কাচার বিশেষ উপাদান রয়েছে এই ওয়াশিং পাউডারে। অন্য ওয়াশিং পাউডার হার মানলেও স্পা কখনো হাল ছাড়ে না। এর অফুরন্ত ফেনা কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা ধুলোময়লা সব সাফ করে দেয়। আপনার জামাকাপড় অনায়াসে পরিষ্কার ও ঝকমকে হয়ে ওঠে। কাজেই গিন্নীরা আজকাল বেশীর ভাগই স্পা ব্যবহার শুরু করেছেন। আপনিই বা বাকী থাকেন কেন?
বিশেষ উপাদানে তৈরী
স্পা
অনায়াসে কাপড় কাচার
একটি শক্তিশালী ওয়াশিং পাউডার!
কুসুম প্রডাক্টস্ লিমিটেড

হাঁটতে হাঁটতে এগোল সে। স্নেহধারার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলবে, স্পষ্ট ভেবে নেওয়া তার দরকার ছিল। অথচ কিছু মাথায় আসে না। আড়ষ্ট প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সে শুধু অনুভব করছিল, সে বদলে গেছে অনেকখানি।

বাঁক নেবার সময় দূরে থেকে কে তাকে ডাকছিল। থমকে দাঁড়াল চন্দন। ব্রজ ড্রাইভার একটা লম্বা কোট পরে এদিকে এগিয়ে আসছে।

ব্রজ এসে বলল, কদিন ছিলুম না স্যার। আপনাদের বড় বিপদ গেল এখানে—ওখানে আমারও গেল একটা। রাজকমলদা মারা গেছেন। সে নিয়ে খুব ভোগান্তি হল। বহরমপুরে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলুম। সেখানেই চোখ বুজলেন। এ একরকম ভালই হল। খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন তো!

...ব্রজ সিগ্রেট বের করে ফের বলল, নিন স্যার। যা ঠাণ্ডা পড়েছে, ভাবা যায় না! এদিকে গাড়িটার অবস্থাও বাবুর মতন প্রায়—হাসপাতালে দিয়েছি কাল। যে-কদিন ছিলুম না, ট্রিপ তো কামাই হলে চলে না। ব্যাটা নেতাকে জিম্মা দিয়ে কনকপাড়া গিয়েছিলুম। এসে দেখি, এই অবস্থা করে দিয়েছে। যাক্ গে, পরেশবাবুর হালহদিস সব শুনলুম। ও আমি জানতুম স্যার, নির্ঘাৎ জানতুম। কবে দেখবেন এই ব্রজগোপাল দাসও মাথা ভেঙে পড়ে আছে নয়ানজুলিতে। আমাদের হাতে কালের চাকা স্যার, এ হতেই হবে। বেদের মরণ যে সাপের হাতেই হয়!

সিগ্রেটটা নিয়ে চন্দন বলল, তাই কদিন দেখিনি আপনাকে!

ব্রজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এক মস্তো ঝামেলা কাঁধে পড়ল চন্দনবাবু। ওদিকে বউদি আর তার মেয়েকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছি। কনকপাড়ায় থাকতে চাইছে না। বলছে, রূপপুরে ঘরটর দেখে দাও ব্রজ। এখানে নির্বান্ধব জায়গায় টিঁকতে পারব না!...সে না হয়, নিয়ে এলুম এখানে। কিন্তু রাজকমলদা দেনায় চুর হয়েছিলেন যে ওদিকে! ইলেকসান করতে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় একগাদা দেনা করেছিলেন। তারা এখন ছেঁকে ধরেছে বউদিকে। মাঠে যা জমিজমা ছিল, এমনকি বাড়িটা পর্যন্ত বন্ধকী কবলা হয়ে আছে। সে-সব আর উদ্ধার করা অসম্ভব। নীট সম্পত্তির মধ্যে এখন শুধু এই গাড়িটা। বউদি বলছে, ওটা বেচে দাও—আর চালানো যাবে না। মাসে গড়ে আড়াই থেকে তিনশো টাকা লেগে যাচ্ছে মেরামতি খরচায়। বুঝুন ব্যাপার! আমি গেলুম স্যার।

বলতে বলতে হঠাৎ ব্রজ কণ্ঠস্বর চাপা করল। মুখে কৌতুক ঝিলিক দিল।...একেই বলে কপাল। পরেশ মজুমদার আর ব্রজ! ওনার ভাগ্যে জুটেছিলেন নুটুবাবু—আমার রাজকমলবাবু। নুটুবাবুর বউ মজুমদারমশাইকে লাল করে দিয়েছিল। আর আমার বেলা? শালা একেবারে উল্টো! খিক খিক করে হেসে উঠল সে।

চন্দন বলল, পরে দেখা হবে। চলি এখন।

ব্রজ বলল, মুজুমদারবাড়ি যাচ্ছেন? আসুন। আজ সারাদিন আমার ছুটি। দুপুরে আপনার আপিসে যাব'খন।

সে চলে গেল। চন্দন স্নেহধারার বাড়ির দিকে চলতে থাকল। আবার তার মনে ঝড়টা এসে পড়ল। রুমা—রুমা তার সামনে একটা অশ্লীলতম দৃশ্যের মতো এসে ভেসে আসছিল। আর তত সে কেঁপে উঠছিল মুহুর্মুহু।

কিন্তু দরজা খুলে দিল সেই রুমাই।

খুলে দিয়ে একপাশে দাঁড়াল। তার দিকে চন্দন তাকায়নি। সে হনহন করে উঠোনে এগিয়ে ডাকল, বউদি!

স্নেহধারা রান্নাঘর থেকে শান্তভাবে বেরিয়ে এসে বলল, রাতে এলে না। সারারাত কান করে ছিলুম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

চন্দন গম্ভীর মুখে বলল, হ্যাঁ।

স্নেহধারা বারান্দার তক্তাপোষে রোদে বসে বলল, কাল রাতে হকসায়েব এসেছিলেন। তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে থাকলেন। অনেক জরুরী কথা ছিল। বললেন, যাবার পথে তোমার ওখানে খোঁজ করবেন।

চন্দন বলল, কই, যাননি তো!

রুমা বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, গেলেও তোমার দেখা পেতেন না।

চন্দন ঘুরল না ওর দিকে। আস্তে বলল, কেন পেতেন না? ছিলুম।

রুমা বলল, ছিলে না। অত রাতে কোথায় বেরিয়েছিলে!

চন্দন বাঁকা ঠোঁটে বলল, তুমি গিয়েছিলে নাকি?

রুমা অনায়াসে জবাব দিল, হ্যাঁ। ওখান দিয়ে আসছিলুম। দেখলুম, তোমার ঘরের দরজা বন্ধ। তারপর দেখলুম তোমার মতো কে একজন অনেকটা দূরে আসছে। আমরা—আমি আর দাঁড়াইনি। যা ঠাণ্ডা পড়েছিল রাত্রিবেলা!

স্নেহধারা বলল, হ্যাঁ, ঠাণ্ডা পুইয়ে এবার জ্বর ধরিয়ে বসে থাকো। কলেজ কামাই হোক—সামনে একজামিন।

রুমা বলল, সে এখনও দেরী আছে অনেক। তবে জ্বর এসে যাচ্ছে নির্ঘাৎ। সকাল থেকে রোদ বড্ড মিষ্টি লাগছে যে! সতু, থারমোমিটারটা নিয়ে আয় তো, ক ডিগ্রি হল দেখি।

স্নেহধারা কড়ামুখে বলল, জ্বরজ্বর হলে তো বাঁচি। ঘরবন্দী হয়ে পড়ে থাকিস। দিন-রাত্রি অতবড় মেয়ে টোটো ঘুরে বেড়ানো—এতটুকু ভয়ডর নেই। মাথায় তুলে দিয়ে কেটে পড়েছে—আমি কী করব?

রুমা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। চন্দন বলল, আমার কিছু কথা আছে বউদি। সেজন্যে সকালবেলা চলে এলুম।

স্নেহধারা চাপা গলায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, কথা আমারও আছে। বলি-বলি করে বলা হয়নি। তাছাড়া, আরও অনেক কারণ ছিল। চলো, আমার ঘরে গিয়ে বসি। গ্যাঁদা, ও গ্যাঁদা! চায়ের জল চাপা।

স্নেহধারার পরনে বিধবার শাদা পোষাক চোখ সওয়া হয়ে গেছে এতদিনে। এমনি করে আরও অনেকদিনের মতো তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে কথা বলার ডাকে আজ তবু একটা পার্থক্য টের পাচ্ছিল চন্দন। সেই সব দিনে স্নেহধারা ছিল সধবা, অথচ তার ডাকে থাকত একটা যেন গভীর অসহায়তা। আজ আছে প্রশান্ত শক্তি আর সাহস। এগুলো পেল কোথায় স্নেহধারা? কোথায় পায় মেয়েরা?

বিছানার নরম গদীতে পা তুলে বসল চন্দন। স্নেহধারা কি এখনও এই বিছানায় শোয়? কৃচ্ছ্রসাধন করে না? পরে জেনে নেবেখন। কিছু খুঁটিনাটি অদ্ভুত কৌতূহল মাথায় এসে গেল চন্দনের।

স্নেহধারা চাপা গলায় বলল, হকসায়েব তোমাকে কিছু বলবেন—আমি ওসব তোমাদের কোম্পানীর কথা কিছু বুঝিনে। ও ঝামেলা চুকিয়ে দেওয়া ভালো। আমার কথা হল—তোমার আর রুমার সম্পর্কে।

চন্দন মুখ তুলল। স্নেহধারা মিটিমিটি হাসছিল। চন্দন বলল, ওকথা থাক।

স্নেহধারা বলল, ভাই চাঁদু—আমাকে বিশ্বাস করো, সব জেনেও আমি এ্যাদ্দিন তোমাকে এ নিয়ে কিছু বলিনি—কেন বলিনি জানো? কিছু মনে করো না ভাই—তোমার বাবা-মাকে তো আমি চিনি। এদিকে তুমি যা ছেলে, বাবামার অমতে কিছু করতে পারবে না—আমার ধারণা হত। তোমার দাদা যখন কথাটা বলেছিলেন, আমি উড়িয়ে দিয়েছিলুম। যাঃ, সে কি হয়? তারপর উনিও আর গা করলেন না—আমিও মাথায় আনলুম না। রুমার বিয়ে একদিন দিতেই হবে। তবে এখনও তো ওর পড়া শেষ হয়নি। তাছাড়া এম-এ পড়ার ওর খুব ইচ্ছে। এসব ভেবে ঠিক করেছিলুম, চন্দন তো আছেই—সময় আসুক, তারপর সব হবে। কিন্তু...হঠাৎ এই অপঘাত ঘটে গেল। কদিন থেকে মনে মনে কেবলই ভেবেছি, লোকটার যা ইচ্ছে ছিল—তা হবে নাই বা কেন? সে আর যাই করুক, তার বউ ছেলেমেয়েদের পথে

তো ভাসিয়ে যায়নি। সারাজীবন হেসে খেলে বাঁচবার মতো রেখে তো গেছে।

চন্দন তাকাল।

স্নেহধারা কণ্ঠস্বর আরও চাপা করে বলল, তোমাকে আমি লুকোব না। রুমার ওপর আমার খুব ভয়ও ছিল। তোমার দাদা বেঁচে থাকলে হয়তো ভয়টাও বাঁচত। আজ আর আমার ভয় নেই ওর জন্যে। তোমার দাদা অনেকগুলো টাকা রুমার কাছে রেখেছিল। রুমা কাল রাত্রে সেগুলো দিয়েছে আমাকে। সে অনেক টাকা, ভাই—অনেক। এখন কথা হচ্ছে—অত টাকা কাছে রাখতেও ভয় করে। তুমি বলো, ওগুলো কোথায় রাখব। ব্যাঙ্কে রাখব ভেবেছিলুম, রুমা নিষেধ করল। ওর নামে তো অনেক সব গোলমাল আছে। সরকার বাজেয়াপ্ত করে ফেলতে পারে নাকি।

টাকা! একটা আশ্চর্য জিনিস। চন্দন ভাবল। টাকা সব উল্টোপাল্টা করে ফেলে। মানুষকে বদলে দিতে পারে মূলশুদ্ধ। এই পরেশ মজুমদারের বউকে—এই চন্দনকে টাকা অনেকটা বদলে দিয়েছে। পরেশ এত সব টাকা না রেখে গেলে ব্যাপারগুলো অন্য-রকম হয়ে যেত। চন্দন একটু কেসে বলল, এখন থাক। আর কাকেও বলোনি তো?

স্নেহধারা মাথা দোলাল।...পাগল হয়েছ! আমি একা ভয়ে কাঁপছি।

ভয়ের কী?...চন্দন বলল।...থাক না। যেমন খরচা করো। আচ্ছা বউদি, কোম্পানি নিজের টাকটা শিলিগুড়ির গ্যারেজ থেকে এসে যাচ্ছে। আমি বলছিলুম, কোম্পানী উঠে যাচ্ছে, যাক। ওই গাড়িটা ...দাদার সাপ্লাই কারবার চালিয়ে গেলে ...পেট্রোল পাম্পটা তো রইলই। আমি দেখাশুনো যেমন করছি, করব।

স্নেহধারা বলল, তোমার যা খুশি করো—আমার কোন আপত্তি নেই।

চন্দন বলল, কিন্তু তোমাদের পক্ষ থেকে একজন থাকা দরকার। শুধু হীরু-কে দিয়ে কাজ হবে না।

স্নেহধারা হেসে উঠল।...কে থাকবে? লতুরা বড় হোক। আমি তো কিছুই বুঝিনে।

কেন? রুমা। রুমা পাম্পে গিয়ে বসুক সকাল-সন্ধে—তাহলেই হবে।

স্নেহধারা বড় বড় চোখে বলল, রুমা! পারবে?

কেন পারবে না? পড়াশুনা যা করার—ওখানে বসেই করবে। রুমা, ও রুমা!

রুমা এল পাশের ঘর থেকে। তার পিছনে গ্যাঁদা—ট্রেতে চা আর তেলেভাজা। ট্রেটা স্নেহধারা সযত্নে হাঁটুর ওপর নিয়ে বলল, রুমা—তুই পাম্পে গিয়ে দুবেলা বসবি আজ থেকে। বারোভূতে সব লুটে খাচ্ছে—চাঁদু একা কোনদিন দেখবে?

রুমা মুখ ঘুরিয়ে বলল, পাগল! বরং চন্দনদা আমার বদলে একজন রাখো বরং। আমিও তো তাই ভেবেছি—আরো একজন লোক দরকার। যাকে বিশ্বাস করা যাবে।

স্নেহধারা বলল, কোথায় পাবি তেমন লোক?

রুমা ভেংচি কেটে বলল, কোথায় পাবি? কত শিক্ষিত ছেলে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। আমি দেব একজন। ভীষণ বিশ্বাসী—কোয়ালিফায়েড। কাজ তার দরকারও।

স্নেহধারা প্রশ্ন করল, কাকে দিবি শুনি? কে সে?

রুমা বলল, অমিতকে চেনো না? পরক্ষণে সে চলে গেল।

স্নেহধারা থমথমে মুখে চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দনের মুখটা লাল: সে নিঃশব্দে চা খাচ্ছে।

একটু পরে স্নেহধারা খুব আস্তে বলল, অমিতকে তুমি চেনো না চাঁদু? এখানকার হেডমাস্টারমশায়ের ছেলে। গান-টান গায়।

চন্দন হাসবার চেষ্টা করে বলল, চিনি। পরিচয় হয়েছে একদিন। তা রুমা মন্দ বলেনি। ভালই হবে।

স্নেহধারার মুখে একটা কাঠিনতা ফুটে উঠছিল আস্তে আস্তে। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, না।

কেন না? চন্দন হালকা স্বরে—যেন ওকে তাতিয়ে দিতেই প্রশ্নটা করল।

স্নেহধারা বলল, একথার জবাব আমি দিতে পারতুম—দেব না। এ্যাদ্দিন এখানে থেকেও তোমার জানা উচিত ছিল—এত আত্মভোলা ছেলে তুমি তো নও চাঁদু।

জানি।...বলে চন্দন মুখ নিচু করল। কাপটা রেখে দিল।

স্নেহধারার মুখ থেকে সেই কাঠিনতাটা যায়নি। সে গলা নামিয়ে বলল, তোমার দাদা যদি রুমার ওপর বরাবর কঠিন হত, কিছুতেই এসব ঘটত না। লাই দিয়ে-দিয়ে মাথায় তুলে গেছে—এখন নামাতে হিমসিম খেতে হবে। কিন্তু আমি নামাবই। যা হয় না—হতে পারে না, সম্ভব নয়—

কেন নয়, শুনি? চন্দন বাধা দিয়ে একটু হাসল।

স্নেহধারা সোজা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, তোমাকে পর করতে আমি পারব না।

চন্দন আরও হাসতে গিয়ে দেখল, সে নিজের অজানতে রেগে লাল হয়ে আছে। অস্ফুটকণ্ঠে সে বলল, যা ছিলুম বা যা আছি, তার বেশি আর আপন করে লাভ কী বউদি?

স্নেহধারা কী বলতে যাচ্ছিল, লতু এসে চাপা গলায় বলল, মা মাসি কাঁদছে ওঘরে। দেখবে এস।

তুই দ্যাখ গে যা। স্নেহধারা খেঁকিয়ে উঠল।...অ্যাদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে। সেই এতটুকু থেকে জ্বালাতে শুরু করেছে, আজও কি রেহাই দেবে ভাবছ? কেন, হঠাৎ কান্নার হল কী শুনি?

চন্দন উঠে দাঁড়াল। তারপর স্নেহধারার দিকে না তাকিয়েই বেরোল। পাশের ঘরে ঢুকে সে দেখল, রুমা উপুড় হয়ে বালিশের কোন আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে কাঁদছে। হঠাৎ তার কান্নাকাটির কারণ কী, খুঁজে পাচ্ছিল না চন্দন। রুমা কি আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শুনেছিল এতক্ষণ? সে ভেবেছিল, হাসিতে মুড়ে কিছু সান্ত্বনা আর প্রতিশ্রুতি দেবে রুমাকে—আশ্বস্ত করবে। কিন্তু সেই চাপা রাগটা তার মধ্যে দুলে উঠল। ফুলে উঠল আস্তে আস্তে। চন্দন একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এল। বারান্দায় এসে দেখল স্নেহধারা তখনও সেখানে চুপচাপ কঠিন মুখে বসে আছে।

চন্দন বলল, বউদি, আমি যাই।

স্নেহধারা কোন জবাব দিল না। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চন্দন বেরিয়ে এল। পথে নেমে সেই টাকাভরা কালো বাক্সোটার কথা মনে পড়তেই এখানে যা ঘটেছে, মুহূর্তে ভুলে গিয়ে সে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকল।
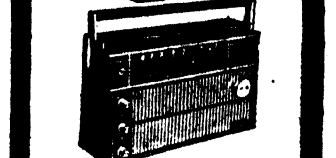
(ক্রমশঃ)

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন (বাঁদিক থেকে) : ডঃ কুদরত ই খুদা, অধ্যাপক সত্যেন বসু, অধ্যাপক ডব্লু ডি ওয়েস্ট, রাজ্যপাল শ্রীএ এল ডায়াস এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন চলছে। প্রায় ২,০০০ প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ডি এইচ আর বার্টন সমেত চল্লিশজন বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ডঃ কুদরৎ-ই-খুদার নেতৃত্বে বাইশজনের একটি প্রতিনিধি-দল। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক এন আর ধর, ডঃ আত্মারাম প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। অধিবেশনের সভাপতিত্ব করছেন সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ডঃ ডবলু ডি ওয়েস্ট। প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী ডঃ ওয়েস্ট ইংলণ্ড থেকে ভারতে এসেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এবং এদেশকেই স্বদেশ করেছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কলকাতায় এই নিয়ে দশটি অধিবেশন হল। আগের অধিবেশনটি হয়েছিল সাত বছর আগে।

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিশেষ জোর পড়েছে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে বিজ্ঞানীদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার ওপরে। যাকে বলা হয় আত্মনির্ভরতা সেটি অর্জন করতে হলে বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের তাই অবহিত হতেই হবে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম তিন দিনের অধিবেশনে বিভিন্ন ভাষণে এই দায়িত্বপালনের জন্যে ডাক দেওয়া হয়েছে।

আত্ম-নির্ভরতার জন্যে চাই একটি মজবুত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ভিত্তি। বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করতে গিয়ে ভারতের পরিকল্পনা বিজ্ঞান ও কারিগরী মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেছেন যে, ভারত এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আত্মনির্ভর অর্থনীতির দিকে ভারত দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। সেজন্যে চাই সঠিক অগ্রাধিকার, দিক্-নির্দেশ, গতিসঞ্চার ও প্রতিষ্ঠানগত সমর্থন। বক্তব্যকে স্পষ্ট করবার জন্যে তিনি যে সংস্থাটির নাম উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি। তিনি বলেছেন, এটি একটি স্বাধীন সংস্থা, এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা ও ইঞ্জিনিয়াররা কোনো এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবাহক নন। এগারোটি গোষ্ঠী সংগঠিত হয়েছে এই সংস্থায়—দেশের অর্থনীতির এক-একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এলাকার জন্যে এক-একটি গোষ্ঠী। প্রত্যেক গোষ্ঠীর গোড়ার কর্তব্য, অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো স্থির করা, যেখানে চাই প্রচণ্ড রকমের বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক প্রয়াস।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের মতে, গোড়ার পর্বের এই কাজে শুভ সূচনা হয়েছে। তিনি দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। ভারতের ইস্পাতশিল্পে গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করার জন্যে সংস্থার পক্ষ থেকে ভারতের ইস্পাত মন্ত্রকের সহযোগিতায় একটি কারিগরী গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। এমনি অপর একটি গোষ্ঠীর কর্মক্ষেত্র জ্বালানী ও শক্তি (পাওয়ার)। এই গোষ্ঠী বর্তমানে দুটি প্রক্রিয়া পরখ করে দেখছেন এবং প্রক্রিয়া দুটির বাস্তব প্রয়োগও ঘটেছে। এর ফলে কয়লা থেকে পাওয়া যাচ্ছে তরল জ্বালানী এবং নিম্নমানের কয়লা থেকে তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানী, রাসায়নিক পদার্থ ও শক্তি। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ-কারণে যে, অপরিশোধিত তৈল আমদানী করার জন্যে ভারতকে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। এই দুটি প্রক্রিয়া সফল হলে ও ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হলে এই বিশেষ ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা যেতে পারে।

এমনি অপর একটি ক্ষেত্র হচ্ছে রসায়ন শিল্প। শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের ভাষণ থেকে জানা যায়, আগামী মাসে সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সারা দেশের একশো জন রসায়নবিজ্ঞানী ও রসায়ন-প্রযুক্তিবিদ একটি সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন। তাঁদের বিশেষ আলোচনার বিষয় হবে রসায়ন শিল্পের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিকল্পনা। জৈব রসায়ন, পেট্রো-রসায়ন, পলিমার, সার ও কৃষি-রসায়ন সম্পর্কিত রাসায়নিক পদার্থগুলোকে তাঁরা সমগ্রভাবে বিচার করে দেখবেন এর এক্ষেত্রেও আত্মনির্ভরতা অর্জনের বিকল্প একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে কর্মসূচী নির্ধারণ করবেন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেছেন, সংস্থার কাজ এখনো প্রাথমিক পর্বে রয়েছে। তবে সংস্থার কাজ যাতে আরো সম্প্রসারিত হয় ও অর্থবহ হয় সেজন্যে ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যাতে অনুরূপ ক্ষেত্রে বিদেশী বিজ্ঞানীদের তৎপরতার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন তার জন্যে বিদেশে যাবার, বিভিন্ন সেমিনারে ও সম্মেলনে যোগ দেবার এবং বিদেশী বিজ্ঞানীদের বইপত্র আনিয়ে পড়ার অবাধ সুযোগ পেয়ে থাকেন। আশা করা হচ্ছে, এ-ধরনের যোগাযোগের ফলে ভারতেও বৈজ্ঞানিক কর্মের সার্থক প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদল গড়ে উঠবে।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম আক্ষেপ করে বলেছেন, ভারতের শিল্পোদ্যোগগুলিতে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্যে ধার্য পরিমাণ দুঃখজনক রকমের যৎসামান্য। এমনকি যাঁদের যথেষ্ট সম্পত্তি আছে তাঁরাও এ-ব্যাপারে কার্পণ্য করে থাকেন। এর ফলে তাঁরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছেন। নিজস্ব কৃৎ-কৌশলকে উন্নত করে তোলার জন্যে যদি-না তাঁরা প্রচুর অর্থসংস্থান করেন, গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রক্রিয়াগুলোকে ব্যবসায়গতভাবে প্রয়োগ করার জন্যে যদি-না তাঁরা তৎপর হন, তাহলে তাঁরা টিঁকে থাকতে পারবেন না এমন সম্ভাবনাই প্রবল।

বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারলে ধ্বংস অনিবার্য। বেসরকারী শিল্পোদ্যোগগুলি যদি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সহায়তা নেয় সেটা তাদের পক্ষেই

মূল্যবান। এখনো কথাটা উপদেশের মতো শোনাতে পারে, আগামী দিনে হয়ে উঠবে অমোঘ সতর্কবাণী।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন—বই লিখে, বক্তৃতা দিয়ে ও বিজ্ঞান-মেলার আয়োজন করে তাঁরা যেন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ ও প্রবল একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন।

বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতের মানুষের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পেয়েছেন সম্মেলনের সভাপতি ডঃ ডবলু ডি ওয়েস্ট গত পঞ্চাশ বছর ধরে, বিশেষ করে সাত-চল্লিশের পরবর্তী কালে। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই সময়ের মধ্যে লক্ষ্যণীয় রকমের উন্নতি ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল ৪ কোটি টাকা, এখন ৬০০ কোটি টাকা। উচ্চতর শিক্ষায় ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬০০, এখন প্রায় কুড়ি লক্ষ।

বিজ্ঞানের উন্নয়নে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার বিষয়টিও তিনি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশনে তিনি প্রথম যোগ দিয়েছিলেন সেটি হয়েছিল কলকাতায়, ১৯২৮ সালে। সেই অধিবেশনে পড়ার জন্যে নিবন্ধ ছিল ৪৬৯টি। চল্লিশ বছর পরে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ১,৭২৪। তার চেয়েও বড়ো কথা, এখনকার অধিবেশনে নিবন্ধ পড়ার চেয়েও ঝোঁক বেশি পড়েছে আলোচনার ওপরে, দেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো নিয়ে।

ডঃ ওয়েস্ট একটি কথা জোরের সঙ্গে বলেছেন : অসন্তোষের অনুভূতি বা আত্ম-সমালোচনা মনোভাবে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তার জায়গায় চাই অর্জিত সাফল্য নিয়ে গর্ব। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে বিজ্ঞানীরা যা করেছেন তা কোনোক্রমেই উপেক্ষার বিষয় নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ পি কে বসুর ভাষণে গর্ববোধ করার মতো একটি বড়ো সাফল্যের উল্লেখ আছে। এতকাল পর্যন্ত ভারতের বৃহত্তর সমস্যা ছিল খাদ্য সরবরাহের সমস্যা। সবুজ বিপ্লব ঘটে যাবার পরে গ্রামাঞ্চলের উন্নতির ধারা আমূলে বদলে গিয়েছে। খাদ্যের ঘাটতি পড়ার আশঙ্কা কমছে।

সঙ্গে সঙ্গে যে-সমস্যার সমাধান করা যায়নি এবং বর্তমান কাঠামোর মধ্যে সমাধান করা সম্ভবও নয়, তারও উল্লেখ তিনি করেছেন। বেকারীর সমস্যা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শুরু হবার সময়ে (১৯৫৭) বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ। ১৯৬৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয়েছিল এক কোটি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখে অনুমান করা হচ্ছে, বর্তমান দশকটির শেষে চাকুরি-সন্ধানীর সংখ্যা আরো প্রায় ছয় কোটি বাড়বে। বেকারীকে যদি বর্তমান মাত্রায়ও রাখতে হয় তাহলে ১৯৮১ পর্যন্ত প্রতি বছরে ৬০ লক্ষ কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা থাকা দরকার। অথচ বর্তমান অবস্থায় — যেখানে পাবলিক সেক্টরের বৃদ্ধির হার শতকরা ২'২ এবং প্রাইভেট সেক্টরের শতকরা ১—বছরে কর্মসংস্থান হতে পারে বড়োজোর তিন লক্ষ মানুষের। যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কর্মসংস্থান করা অতি দুরূহ ব্যাপার। গ্রামাঞ্চলে বেকারী সৃষ্টি হয়ে থাকে দুটি কারণে—জমি না থাকা ও জমির সামান্য ব্যবহার। শহরের বেকারদের মধ্যে আছে তিনটি দল—সদ্য গ্রাম থেকে আসা চাকুরিসন্ধানী, জুনিয়র স্কুলের লেখাপড়া ছেড়ে আসা বা পাশ করা শ্রমজীবী, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বেকার ছাত্র। কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধানে গ্রামের ও শহরের পরস্পর-নির্ভরতার কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। ভারতের মতো উন্নতিশীল দেশে সমাধানটি কী হতে পারে?—এই প্রশ্ন তুলেই তিনি ভাষণ শেষ করেছেন।

ডঃ বসুর ভাষণের মোট কথা—বেকার সমস্যা আছে, থাকবে, বেড়ে চলবে। তবে খাদ্যের ঘাটতি কমে যাবার দিকে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাদ্যের ফলন বাড়ছে।

আমাদের দেশে খাদ্যের ঘাটতি থাকাটা যেমন একটা সমস্যা তেমনি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কী কী ও কতখানি খাদ্য দরকার সে-সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকাটাও একটা সমস্যা। ডঃ নীলরতন ধরের বক্তৃতা শেষোক্ত বিষয়ে : 'খাদ্য ও স্বাস্থ্য'। একজন মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী সুষম খাদ্যের যে তালিকা তিনি উপস্থিত করেছেন তা এই—গম চাল আলু ডাল ফল, প্রচুর পরিমাণ রান্না-করা ও রান্না-না-করা শাকসবজি (গাজর টম্যাটো ইত্যাদি তিনশো সাড়ে তিনশো গ্রামের মতো) এবং তার সঙ্গে সিকি বা আধ লিটার দুধ। ডঃ ধরের মতে একজন কঠোর শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যেও এই খাদ্য যথেষ্ট।

তিনি আরো বলেছেন, অপুষ্টির মতো অতিভোজনও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

ওপরের তালিকায় মাংস বা মাছের কোনো উল্লেখ নেই। তবে মাংসের বেলায় গোরুর চেয়ে মুরগির মাংসের তিনি পক্ষ-পাতী। ইউরোপীয়দের কাছে গোরুর মাংসের খুবই কদর, এক কিলোগ্রাম গোরুর মাংসের জন্যে তারা ৩৫ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত দাম দিতে রাজী। কিন্তু গোরুর মাংসে শরীরে অ্যাসিড তৈরি হয়। কিন্তু মুরগির মাংস বা মাছ বা ডাল বা দুধ শরীরের অ্যাসিডিটি দূর করে। আধুনিক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, দুধ তিনটি গুরুত্ব-পূর্ণ উপাদানে সমৃদ্ধ : কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ এবং প্রোটিন। তাছাড়াও আছে ভিটামিন এ ও ডি ও কয়েকটি অতি-প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ (সহজপাচ্য অবস্থায়)।

আমাদের দেশের খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট ও মিষ্টান্নের ভাগ বেশি। এর ফলে প্যান-ক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্ন্যা-শয়ের কাজ, শরীরের মধ্যে গ্লুকোজের অক্সিডেশন বা জারণপ্রক্রিয়ায় সাহায্য করা।

অ্যাপোলো—১১ উৎক্ষেপনের প্রস্তুতি চলছে। বৃহস্পতি গ্রহে যাবার পথে উত্তাপ, শীতলতা, শূন্যতা ও বিকীরণের যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে ব্যোমযানটিকে যেতে হবে হুবহু সেই অবস্থা তৈরী করে ব্যোমযানটিকে পরখ করা হচ্ছে। ব্যোমযানের মধ্যে থাকছে ১১টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। ১৯৭৩ সালে অনুরূপ আরেকটি ব্যোমযান (অ্যাপোলো—১২) উৎক্ষিপ্ত হবার কথা আছে।
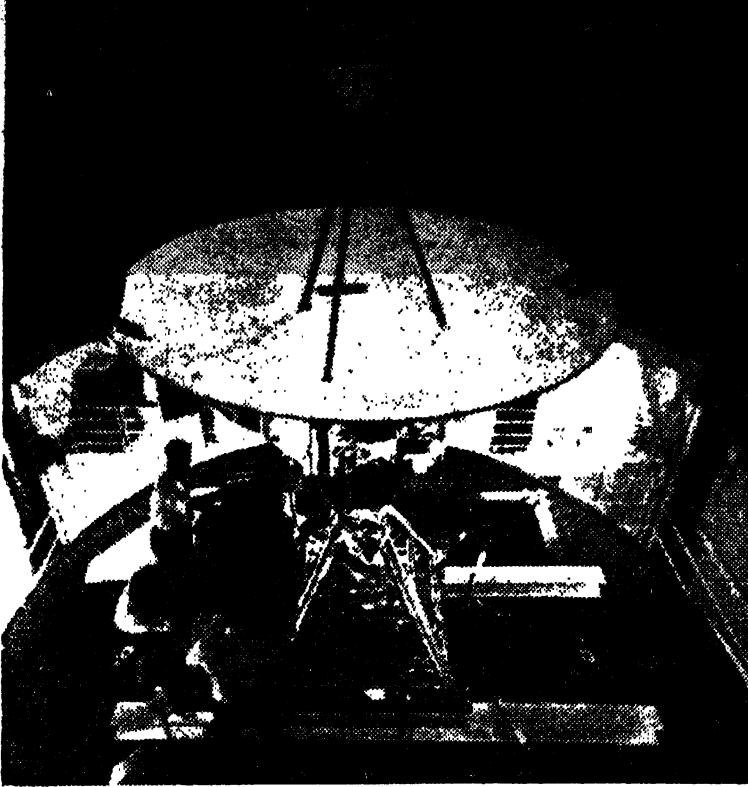
স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের শরীরে দিনে ৫০০ গ্রাম গ্লুকোজ জারিত হয়ে থাকে, তার ফলে ২,০০০ ক্যালরি উৎপন্ন হয়। রক্তে থাকে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় গ্রাম গ্লুকোজ এবং রূপান্তরিত হয় গ্লাইকোজেনে। অতি-ভোজনের ফলে প্যানক্রিয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের গ্লুকোজ পুরোপুরি জারিত হয় না, কিছুটা থেকে যায় ও মূত্রপথে চলে আসে। ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র হয়ে থাকে অতি-ভোজনের ফলে।

এই লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখনো বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়নি। ইতিমধ্যেই অনেকগুলো শাখার অধিবেশনও হয়ে গিয়েছে। যেমন কৃষিবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ভূগোল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি। এই সমস্ত শাখার অধিবেশনে অনেকগুলো প্রবন্ধও পাঠ করা হয়েছে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রথম দিনে দুজন প্রয়াত বিজ্ঞানীর স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এই দুজন বিজ্ঞানী হচ্ছেন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের পূর্বতন চেয়ারম্যান ডঃ বিক্রম সারাভাই এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের পূর্বতন সভাপতি ও বারাণসী ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাধ্যক্ষ ডঃ এ সি যোশী। দুজন বিজ্ঞানী সম্মানসূচক সদস্য-পদ লাভ করেন। তাঁরা হচ্ছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু ও এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রি।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পুস্তকের একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যাম-সুন্দর গুপ্ত। পৃথক একটি অনুষ্ঠানে কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে সমাগত বিজ্ঞানীদের তিনি সম্বর্ধনাও জানিয়েছেন।

পায়োনিয়র-১১

আগামী ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে মার্কিন বিজ্ঞানীদের পায়োনিয়র-১১ বৃহ-স্পতি গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা করবে। পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় দু-বছর। ব্যোমযানটি বৃহস্পতির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, অবতরণ করবে না। ইতিপূর্বে শুক্র ও মঙ্গলে মার্কিন বিজ্ঞানীদের যে ব্যোমযান পৌঁছেছে তারাও অবতরণ করেনি। মেরিনার-৯ এখনো মঙ্গলগ্রহকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। সোভিয়েতের ব্যোমযান কিন্তু শুক্র ও মঙ্গল উভয় গ্রহে অবতরণও করেছে।

পায়োনিয়র-১১ যদি সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহলে বৃহস্পতি গ্রহের উদ্দেশে মানুষের পাঠানো ব্যোমযান এই প্রথম।

গোলমাল হলে আরো বেশি মনোযোগ

গোলমালের মধ্যে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে হলে মনোযোগ দেওয়া যায় না, আমাদের তাই ধারণা। কিন্তু রবার্ট হকী নামে একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে উল্টো খবর জানা গিয়েছে। বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয় ছিল, পর্যবেক্ষণ-গত দক্ষতার ওপরে গোলমালের প্রভাব। তিনি দেখিয়েছেন, একটানা জোরালো গোল-মালের মধ্যে থাকলে মানুষের মনোযোগ আরো কেন্দ্রীভূত হয়। এ অবস্থায় তার দৃষ্টির সীমানায় অব্যবহিত সামনের কোনো পর্যবেক্ষণে সে আরো বেশি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু একই অবস্থায় দৃষ্টির সীমানায় কিনারের দিকের পর্যবেক্ষণে সে ততোটা দক্ষ নয়।

গবেষণাটিকে পরে তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এবারে তাঁর গবেষণার বিষয়, স্বল্পকালস্থায়ী স্মরণ শক্তি। পরীক্ষাকার্যটি ছিল এইরকম। এক-একজন মানুষকে তিনি কতকগুলো অক্ষরের একটি তালিকা দেখিয়েছেন, পর মুহূর্তেই অক্ষরগুলো স্মরণ করতে বলেছেন। অক্ষর-গুলো সাজানোর একটি বিশেষ কায়দা ছিল—লাইন বরাবর একটানা নয়, কিনারা ঘেঁষে কোণে কোণে। পরীক্ষা চালিয়ে-ছিলেন দু-দল মানুষের ওপরে: একদলকে অক্ষরগুলো দেখানো হয়েছিল চাপা গোল-মালের মধ্যে, অপর দলকে একটানা জোরালো গোলমালের মধ্যে। অক্ষরগুলো যে কোণে কোণে বসানো হয়েছে সে-বিষয়ে পরীক্ষাকর্তা আগে থেকে জানান নি। দেখা গেল, তালিকার অক্ষরগুলো স্মরণ করার ব্যাপারে দু-দলের স্মরণশক্তিই প্রায় সমান। তবে টানা জোরালো গোলমালের মধ্যে থেকে যারা অক্ষরগুলো দেখেছে তারা কোন অক্ষরের পর কোন অক্ষর তা বলার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত বেশি দক্ষ। তারপরে যখন কোন অক্ষরটি কোন কোণে তা স্মরণ করতে বলা হল তখন দেখা গেল, চাপা গোলমালের মধ্যে থেকে যারা অক্ষর-গুলো দেখেছে তারা অনেক অনেক বেশি দক্ষ।

কোন কোণে কোন অক্ষর, সে-সম্পর্কে পরীক্ষাকর্তা কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। তা সত্ত্বেও, অক্ষরগুলো যারা দেখছিল তারা তখনো পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় এই খবরটির সম্পর্কেও আগ্রহী হয়েছে। কিন্তু গোলমাল বাড়লে আগ্রহ কমে যায়, কিন্তু মনোযোগ আরো বাড়ে। এ থেকে সিদ্ধান্তটি এই হয় যে দেখার ব্যাপারটা সরল ধরনের হলে গোলমালে দেখার ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু অনেকগুলো খুঁটিনাটি সম্পর্কে একসঙ্গে সজাগ থাকতে হলে নিস্তব্ধতাই ভালো।

—অয়স্কান্ত

হিন্দু সমাজের অনাদিকাল প্রচলিত বিবাহ-প্রথা, সংশ্লিষ্ট নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা বর্তমান যুগে অসুবিধাজনক মনে হওয়াতে সরকার বিবাহ সম্পর্কে যে নতুন আইনের প্রণয়ন করেছেন তার নাম হ'ল 'হিন্দু-বিবাহ আইন ১৯৫৫।' এই আইন সরকার প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছেন সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তিগত স্বার্থ, স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য, যাতে এই আইন বিবাহিত দম্পতির দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। এই নতুন বিবাহ আইনের মূল জিনিস যেটি তা হ'ল স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের আইন যা আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের চিরাচরিত বিবাহ আইনের বিরোধী। এই বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনের মধ্যে যে প্রধান জিনিসটি রয়েছে তা হ'ল গিয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, যেটি সমাজবাদের মূলকথা।

এই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের যে সর্ত-গুলি আছে তা মোটামুটি এই রকম:—

দশ নম্বর ধারার এক নম্বর উপধারা অনুযায়ী জেলা আদালতে যেখানে দম্পতির বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল আবেদনকারীকে সেখানের আদালতে দরখাস্ত পেশ করতে হবে। দরখাস্ত করবার কারণগুলি হ'ল এই রকম:—(ক) দরখাস্ত পেশ করবার অব্যবহিত দু' বছরের মধ্যে যে কোনও এক পক্ষ অপরপক্ষকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

(খ) আবেদনকারীর প্রতি অপর পক্ষ নির্দয়তা বা নিষ্ঠুরতা করেছেন যার ফলে তিনি মনে করেন একত্র বাস করলে দৈহিক বিপদের কারণ হতে পারে।

(গ) স্বামী বা স্ত্রীর যে কোনও এক-পক্ষ অন্ততঃ এক বছর ধরে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এবং তা দুরারোগ্য।

(ঘ) দরখাস্ত পেশ করবার পূর্বে অন্ততঃ তিন বছর যে কোনও একপক্ষ যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত যা অপর পক্ষ হতে সংক্রামিত হয় নি।

(ঙ) আবেদনকারীর দরখাস্ত পেশ করবার আগে হতে অব্যবহিত দু' বছরকাল অবিরাম ভাবে বিকৃত মস্তিষ্ক।

(চ) বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার পর যে কোনও এক পক্ষের স্বামী বা স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য পুরুষ বা নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক।

দশ নম্বর ধারার দু' নম্বর উপধারা অনুযায়ী পৃথকীকরণের ডিক্রী পাওয়ার পর আবেদনকারী স্বামী বা স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী একত্র বাসের জন্য পুনরায় দরখাস্ত করলে, আদালত বিচার করে যা যুক্তিসঙ্গত তাই করবেন ও আদালত ইচ্ছে করলে আগের বিচ্ছেদের ডিক্রী বাতিল করতে পারেন।

১৪ নম্বর ধারার ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী:—

বিবাহের পর তিন বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোনও দরখাস্ত গ্রহণ করবেন না।

২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী:—

যতদিন না স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করবেন, ততদিন তিনি স্বামীর নিকট তার ভরণ-পোষণের জন্যে মাসিক কিছু অর্থ পাবার উত্তরাধিকারিণী। আদালত বিবেচনা করবেন কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে ভরণপোষণ পাবার অধিকারিণী এবং তা নির্ভর করবে স্ত্রীর আর্থিক অবস্থার উপর।

বিবাহের পৃথকীকরণের ডিক্রী পাবার পর স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পৃথকভাবে বসবাস করতে পারবেন এবং তারা অন্য পুরুষ বা নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। পৃথকীকরণের তিন বৎসর পর স্বামী বা স্ত্রীকে পুনরায় আদালতে আবেদন করতে হবে চিরবিচ্ছেদের ডিক্রী পাওয়ার জন্যে তারপর মকদ্দমার শেষ শুনানীর পর তারা চিরবিচ্ছেদের ডিক্রী পাবেন। স্বামী বা স্ত্রী এই ডিক্রীর আদেশ, যেদিন হতে বহাল হবে তার এক বছর পরে পুনরায় বিয়ে করতে পারবেন (১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী)।

এরপর এই বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন নিয়ে অনেক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে এবং তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর চিন্তার বিষয়।

যদি স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য কৃতসংকল্প হন, যদি তাঁদের যুক্তি ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত হয়, তাহলে তাঁদের দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষা করে থাকবার কি যুক্তি আছে? বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী কি তিন বছরের আগেই মঞ্জুর করা যায় না? এই ডিক্রী পেলেই স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই ইচ্ছানুযায়ী পুনরায় বিবাহ করতে পারবেন। যৌবনের এই তিন বছরকাল অতি দীর্ঘকাল ও গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সময়েই মানুষের জীবনে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়।

২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীর নিকট ভরণপোষণ পাবার অধিকারিণী। কিন্তু যদি কোনও স্ত্রী স্বামীর গৃহ ছেড়ে চলে যান, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অত্যাচার করা প্রভৃতির অভিযোগ প্রমাণ না করতে পারেন এবং যদি স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ করতে সম্মত থাকেন তাহলে স্ত্রীর স্বামীর নিকট খোরাক-পোশাক পাবার কি অধিকার আছে? এই রকম স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর পক্ষে যে কণ্টকর ও মর্মান্তিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আইনের এই দিকটি আমাদের চিন্তা করবার বিষয়।

দশ নম্বর ধারার ১(ক) উপধারা ও চোদ্দ নম্বর ধারার এক নম্বর উপধারার সর্তগুলিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলি থেকে এই জিনিসটি খুব ভালভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এইসব সর্তই দম্পতির বিবাহ সম্পর্ক রক্ষা করবার প্রচেষ্টা। যদি কোনও প্রকারে সময়ের প্রভাবে বিবাহিত দম্পতির মনের পরিবর্তন ঘটে ও তাঁদের দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আবার শুভ পুনর্মিলন সম্ভব হয়। দশ নম্বর ধারার ১(ক) অনুযায়ী দু' বছর ও চোদ্দ নম্বর ধারা অনুযায়ী তিন বছর কাল বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, কারণ এই সময়ের মধ্যে শুভ ও অশুভ দুই-ই ঘটতে পারে। চোদ্দ নম্বর ধারার ১(ক) অনু-যায়ী যদি পুনর্মিলন না ঘটে তাহলে তারা বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন আদালতে। কিন্তু দম্পতিদের প্রমাণ করতে হবে তাঁরা অত্যাচারিত বা অপর পক্ষ অতীব ঘৃণ্য নীচ ও দুরভিসন্ধিযুক্ত এবং সেখানে পরস্পরের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব ত নয়ই বরঞ্চ ভয়াবহ ও বিপদসংকুল। অতএব এই অনুচ্ছেদগুলির তাৎপর্য শুভকামনা ও শান্তির প্রয়াস, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়াস প্রায়ই বিপরীতগামী হয় ও এইসব কারণেই বিচ্ছেদ প্রার্থী দম্পতিদের সাহায্যের জন্যেও এই হিন্দু বিবাহ আইনের সংশোধনের জন্য আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তু সবসময় এই সমস্যার কোনও একটি সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় যা সব অশান্ত দম্পতির শান্তি আনতে পারে। আইনজ্ঞ-

গণদের মতে পরীক্ষা হিসেবে কিছু সংশোধন করা উচিত যাতে এই হিন্দু বিবাহ আইন লোহার বেড়া হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে শান্তির পন্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান যুগে সমাজে যে বিবাহ-প্রথা বেশী প্রচলিত হয়েছে তা হ'ল যুবক ও যুবতীর পরস্পরের অবাধ মেলা-মেশায় আকৃষ্ট হয়ে নিজেরা বিয়ে করা। এই রকম বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত বিবাহ হয়ে থাকে। এই রকম বিয়ের জন্য যে কোনও একজন দায়ী ও অপর পক্ষ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একথা কখনই বলা চলে না। স্নেহ, ভালবাসা ও প্রেমে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক। দৈহিক সুখ ক্ষণস্থায়ী অতএব মানসিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হওয়ার দরুণ বহুক্ষেত্রেই ছদ্মপ্রেম ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে ও আনুষঙ্গিক দ্বন্দ্বের অঙ্কুর গজায়। এই রকম প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় যে সিনেমায়, থিয়েটারে অফুরন্ত আনন্দে দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করে মাঝ পথে ঝড় ও বজ্রাঘাতে দাম্পত্য জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়া। উপন্যাসে, রাজা-রাণীর গল্পে, এদেশের ও বিদেশের ইতিহাসেও এই রকম অনেক ঘটনার নজীর পাওয়া যায় ও এ-সবের চিত্র দেখলে বা ইতিহাস পড়লে আমাদের একটি শিক্ষণীয় বস্তুর কথাই স্মরণ হয় যে আমাদের আগের বিবাহ-প্রথা যা ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু সমাজের ভিত্তি ছিল বা আধুনিককালের স্বাক্ষরিত বিবাহ কোনটি শ্রেষ্ঠ? সামাজিকভাবে বলতে গেলে মানুষের সুখ, শান্তি ও স্বার্থের কথাই বলতে হয় এবং এই পরিস্থিতিতে পুরাতন সমাজতন্ত্রের মান ম্লান হয়ে পড়ে এবং বিবাহের বিধি-ব্যবস্থাও মানুষের প্রয়োজনীয়তার অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। হিন্দু শাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় ও আশ্রয়হীন বলে মনে করেন আধুনিক মানুষ তাঁর যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে। ১৯৫৫ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন হিন্দু বিবাহকে আইনের আওতায় আনেন তখন লোকসভা ও রাজ্যসভার অনেক সভ্যরা আপত্তি ও যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিয়েছিলেন এই আইনকে রোধ করার জন্যে, কিন্তু এই বিবাহ আইনকে রোধ করা তাঁদের পক্ষে কোনও ক্রমেই সম্ভব হ'ল না। কিন্তু যতই সময় অতিবাহিত হচ্ছে, ততই বিভিন্ন রকম সমস্যা ও অসুবিধার উদ্ভব হচ্ছে এবং এই আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও তত বেশী হয়ে পড়েছে। যাঁরা আইন প্রণয়ন করেন তাঁরা সব সমস্যার সমাধান করবেন বা করতে পারবেন, সুতরাং সেই দিক্ থেকে হিন্দু বিবাহ আইনের সমালোচনা ও বিধিব্যবস্থার সংশোধন বর্তমানে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

উন্নতিশীল দেশসমূহের অধিকাংশ স্থান যেমন গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি স্থানে এই আইনের সর্তগুলিকে অনেকাংশে শিথিল করা হয়েছে যাতে বিবাহিত দম্পতি অতি সহজেই বিচ্ছেদের ডিক্রী পেতে পারেন ও পুনরায় বিবাহে আবদ্ধ হতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে একথা আমরা প্রায়ই শুনি যে তিনি দ্বিতীয় স্বামী তিনি তৃতীয় স্ত্রী ইত্যাদি। এই পূর্বে দম্পতিদের পুত্র-কন্যার কি অবস্থা হবে তার ব্যবস্থা অতি সহজ না হলেও ঐসব দেশে এই রকম পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা আদালতই বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গতভাবে নিরূপণ করে দেন, যাতে সামাজিক সুব্যবস্থা বজায় থাকে।

জাপানের বিবাহ-আইনের সর্ত অপেক্ষাকৃত সহজ ও শিথিল হলেও বিবাহের ভিত্তি সেখানে কিছুটা ধর্মীয় থাকায় বিচ্ছেদ প্রার্থী দম্পতির সংখ্যা শতকরা হারে উপরোক্ত দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম।

আমাদের প্রায় প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের জনগণ বৌদ্ধ। তাঁদের সমাজ ধর্মকে ভিত্তি করে বিবাহ-প্রথার প্রচলন করলেও সমাজে অনেক দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। বিবাহিতা স্ত্রীর শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও মর্যাদা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেখানে। বিবাহের নিয়ম শিথিল হওয়ায় বিবাহ কতকটা ইচ্ছাকৃত হয়ে পড়েছে ও স্ত্রীলোকদের নারী-স্বাধীনতার অজুহাতে সমাজে অনেক দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। অপর দিকে আবার বিবাহ সহজসাধ্য হওয়ায় বহু দেশের লোক ধর্মীয় নারীকে বিবাহ করে সামাজিক অনৈক্য আনছে।

উপরোক্ত সভ্য দেশের উদাহরণ থেকে আমাদের বিবেচনা করা উচিত কি প্রকার বিবাহ-আইন ভারতের পক্ষে শুভ, আনন্দদায়ক ও মঙ্গলময়। আইনের অনুচ্ছেদ ও তার সর্তাদি যদি সংক্ষিপ্ত ও অল্প সময়-সাপেক্ষ হয়, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলেও বহু নরনারী পুনরায় বিবাহ করে সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হতে পারেন। যদি স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন অসম্ভব হয় ও তাঁদের বিচ্ছেদ না হয় তবে তাঁদের অশান্তি ক্রমশঃ বেড়ে চলবে ও তাঁদের সে অশান্তি নির্বাপিত হবে না যতক্ষণ না তাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী পাবেন। এই বিবাহ বিচ্ছেদ সময়সাপেক্ষ বলেই ভারতে বিচ্ছেদ-প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে ও ভবিষ্যতে আরও বাড়বে, যতক্ষণ না এই বিচ্ছেদ-আইন স্বল্প সময়-সাপেক্ষ করা না হবে। দম্পতিগণ বাধ্য ও নিরুপায় হয়েই আদালতে আসেন যখন পুনর্মিলনের সকল প্রচেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়। কে চায় যে তার সংসারের সকল কথা আদালতে ব্যক্ত হয়, কিন্তু অনন্যোপায় হয়েও বিবদমান দম্পতিগণ আইনের আশ্রয় নেন শান্তির জন্যে। এই প্রথায় যদি অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, দম্পতিদের পুনরায় বিবাহের আশা-ভরসা ক্রমেই হ্রাস পায় ও জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

আমাদের সমাজ অন্য দেশের সমাজের মত জড় বিজ্ঞানের প্রভাবে [illegible] চলেছে ও চলবে, এতে আনুষঙ্গিক [illegible] অশান্তি ও বিপদ আসবে তাতে আর সন্দেহ কি! বর্তমান সমাজ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর বেশী নির্ভরশীল হয় তবে অনেক সময় সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা পড়ে ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আমাদের দেশ ধনীক শ্রেণীর দেশ নয়। বিচ্ছেদ-প্রার্থীদের খুব কম সংখ্যকই আদালতে সাহায্য লাভের সুযোগ পান অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যে। সুতরাং এ রকম অবস্থায় অশান্ত দম্পতিদের শান্তি দানের উদ্দেশ্যে সরকার যদি গরীবের সাহায্যের জন্যে ও আইনগত বিধানের জন্যে একটি ছোটখাটো সংস্থার কথা চিন্তা করেন তা সমাজের পক্ষে খুব শুভ হবে। এই রকম সংস্থা দেশের শাসনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত বা আধাসরকারী শাসনতান্ত্রিক সংস্থা হতে পারে। এদের প্রধান উদ্দেশ্যই গরীব শ্রেণীর দম্পতিদের অশান্তি দমন করবার এবং এর বিনিময়ে তাঁরা যার যে রকম অর্থনৈতিক সম্পত্তি তার কাছ থেকে সেই অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করবেন। এছাড়া আরও একটা জিনিস চিন্তা করবার বিষয়। আদালতের দ্বারস্থ হবার আগে বিচ্ছেদ-প্রার্থীরা যদি কোন পুনর্মিলন সংস্থার সাহায্য পান তাতে হয়ত বিচ্ছেদ-প্রার্থীর সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে। এইসব সংস্থা বিচ্ছেদ-প্রার্থীদের তাদের [illegible] মাধ্যমে মানসিক [illegible] ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারেন ও তাতে অনেক অশান্ত দম্পতির আগুন নির্বাপিত হয়ে তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। সামাজিক নিরাপত্তায় এইসব সংস্থার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

(পঁয়তাল্লিশ)

তখন অপরাহ্ন, সূর্যদেব হেলে গেছেন [illegible]। বাগানের প্রহরী বেষ্টিত হ'য়ে [illegible] হল বড় সাহেবের বাংলোর [illegible]। ডেপুটি কমিশনার এ্যালবিয়ন [illegible] ও পুলিশের বড় [illegible] উইলিয়াম প্রভৃতি সাহেবরাও [illegible] অফিস ঘরে। মেঘুও [illegible] সেখানে গেল। উপস্থিত সকলের [illegible] অভিবাদন জানালে। [illegible] মেঘু মুখ ফিরিয়ে চাইল ডেপুটি কমিশনারের পানে, আবার বললে গুড আফটারনুন স্যার।

[illegible] না পেয়েই সকলে একযোগে প্রতিনমস্কার দিল, তারপর সবাই একসঙ্গে [illegible] তুলে চাইল মেঘুর।

জেলার শাসক, শীন-স্মিথ গম্ভীর স্বরে [illegible] মেঘু, ইউ আর আন্ডার মাই অ্যারেস্ট।

হাকিম সাহেবের কথায় ও মুখের ভাব [illegible] সকলে স্তম্ভিত না হয়ে পারল না! [illegible] অভিপ্রায়ের আভাস তো কেউ [illegible] পায়নি। বাগানের কর্তৃপক্ষরা বা [illegible] তাদের বিচলিত হবারই কথা, [illegible] মেঘু শুধু নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে [illegible] তার মুখের কোন পরিবর্তন দেখা দিল না।

শীন-স্মিথ বলে চললেন—শুনেছি সব [illegible] যত অপকর্ম করেছ তার সাক্ষী [illegible] বেড়াচ্ছিলে বুঝি? খবরটা গোপন [illegible] কথা, কি ক'রে জানলে আমি [illegible]?

—আমি তো কোন অপকর্ম করিনি, [illegible] সাক্ষীও ভাঙাইনি। শুধু মিথ্যার [illegible] প্রতিবাদ করেছি। তাতে যদি দোষ [illegible] থাকে তবে আমি নিরুপায়।

—কোন অপকর্ম করনি? বলে, ডেপুটি কমিশনার সামনের ফাইলটার ওপর হাত [illegible] আবার বললেন—কোন অপকর্ম [illegible] এই ফাইলে সব প্রমাণ আছে।

—ফাইলে কি আছে আপনি জানেন, [illegible] আমার কথাই আমি জানি।

এমন নির্ভীক জবাব মেঘুর মুখ থেকে শোনবার অবকাশ হয়নি সাহেবের। তিনি মনে মনে তাকে তারিফ না করে পারলেন না। তবু কিন্তু তাকে একটু দাবিয়ে রাখতে বললেন—আচ্ছা, পরে দেখা যাবে সেসব, এখন আর দাঁড়িয়ে তর্ক করতে হবে না। চট ক'রে চারটি খেয়ে এস। তারপর তোমার জবানবন্দী নেওয়া হবে।—আর শোন, রাত্রে তো আমায় এখানে থাকতে হবে—আমার স্ত্রী মিঃ গর্টফিল্ডের মুখে অনেক শুনেছেন তোমার মায়ের কথা। তাঁর ইচ্ছা তিনি তোমার মায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হবেন। তাই তিনি থাকবেন তোমার মায়ের কাছে। আর তোমায় থাকতে হবে আমার সঙ্গে। বুঝেছ? বলে, হেসে ফেললেন শীন স্মিথ।

বাগানের সাহেবরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, হাকিম সাহেবের কথার সকল মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হোক বা না হোক।

গর্টফিল্ডের চিঠিপত্র নিয়ে মেঘু বহুদিন আগে থাকতেই শীন স্মিথের কাছে যাওয়া-আসা করে। তাতেই সে জেনেছে যে হাকিম সাহেব বেশ একটু প্রহসনপ্রিয়। মেঘুকে নিয়ে তিনি অনেক সময় একটু আধটু কৌতুক ক'রে থাকেন। তার পদোন্নতির ধাপে ধাপে সাহেবের পরিহাসের ধরনও বদল হয়েছে। মেঘুর মনে পড়ল সেসব কথা। অধুনা শীন-স্মিথের অফিসে বা বাংলোয় গেলে তিনি রসিকতা ক'রে মেঘুকে বলেন—ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। এই কথাটা তো আর কারো জানার কথা নয়। আচ্ছা, ওটা না হয় হ'ল সেই রসিকতা। কিন্তু তাঁর শেষের প্রস্তাবটা হেঁয়ালির মতো লাগল। কথাটা বুঝতে না পেরে সে বললে—আমার ঘরে?—আপনার—

প্রস্তাবটার গুরুত্ব কমিয়ে দিতে, সাহেব সহজভাবে বললেন—হাঁ গো, আমাদের অমন অভ্যাস আছে। প্রায়ই তো মফঃস্বলে অজ পাড়াগাঁয়ে আমাদের যেতে হয়, আমরা বেশ ভোগ করি সেসব।

উইলিয়ম জানে না শীন-স্মিথের ঠাট্টা-তামাশার কথা। যদিও তাঁর সঙ্গে গর্টফিল্ডের ভাব বন্ধুত্বের খবরটা তার অজানা নয়, তবু সেও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার সে বুঝল শীন-স্মিথের মনের ইচ্ছাটা। উইলিয়মের সঙ্গে দেখা হবা মাত্র তিনি মেঘুর খোঁজ-খবর নিয়েছেন। আরো জানিয়েছেন—বড় সাহেব বিশেষ অনুরোধ ক'রে তাকে 'তার' পাঠিয়েছেন যাতে মেঘুকে নিরাপদে রাখার কোন ত্রুটি না হয়। কিন্তু শীন-স্মিথের পক্ষে এখানে এতটা করা বড় বেমানান, বড় বিস্ময়জনক। তার ওপর আরো কত কি হেঁয়ালির কথাও তিনি বলেছেন। বড় সাহেব বিলেত থেকে ফিরে এলে সবাই নাকি স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা শুনে। এমন ধরনের কত রহস্যের আবরণ ঢাকা সেসব উক্তি। ইংরেজ অপরের কথা শোনে বটে, কিন্তু প্রশ্ন ক'রে শুনতে চায় না। তাই রহস্যের ঢাকাও খুলল না।

খাওয়া দাওয়া সেরে মেঘু ফিরে এল। সকলে মিলে বেরিয়ে পড়ল তদন্তের কাজে। চা-বাগানে মালিক ও কুলিদের মধ্যে বিদ্বেষ বিক্ষোভ, বা মতান্তরের ঘটনা তদন্ত করে থাকে লেবার কমিশনার। কিন্তু এটার ফ্যাকড়া যতই থাক, মূল হচ্ছে গুলি চালানো। জেলার শাসক ও শান্তিরক্ষক হিসেবে এটা ডেপুটি কমিশনারের কাজ। পাঁচ সাতখানা গাড়ীতে, স্টেশন ওয়াগনে বোঝাই যত সরকারী ও বাগানের কর্মচারী এবং সিপাহীরা ঘুরে বেড়াতে থাকল। কয়েকটা ডিভিসন ঘুরে সবাই বুঝল, অল্প সময়ে মেঘু কম কাজ করেনি। স্থায়ী কুলিদের প্রায় সকলেই বাগানের কর্তৃপক্ষের সপক্ষে, অথবা সত্য কথা ব'লে গেল। চালানী কুলিদেরও বেশীর ভাগ তাই করল। যে কজন বিপক্ষে, অথবা চক্রান্তের অনুরূপে ব'লে গেল তাদের কথাগুলো উল্টা-পাল্টা এবং আত্মবিরোধী। সকলে বুঝে উঠতে পারেনি যে তাদের দল এতটা ভেঙে গেছে, বা এত অগোছালো। সাহেবরা তদারক তদন্ত ও জবানবন্দী নেওয়া শেষ ক'রে চলে গেল। তারপর, সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে অথবা ঘটনাটা আরো জটিল ক'রে তুলতে শুধু হ'ল তাদের কলহ-বিবাদ। কেউ গেল

পড়শীর নাক থেঁতো করতে, এক পাড়া কোমর বাঁধল আর এক পাড়ার লোকগুলোকে টিট করতে।

তিনটে ডিভিশনের কাজ শেষ করতেই সন্ধ্যা নেমে এল। যদিও অফিসের কাগজপত্র দেখেই তদন্তের চৌদ্দআনা কাজ হয়ে গেছে, তবুও ঐ দু-আনাটাই ষোল-আনার শামিল। অফিসে ডেকে এনে বা সামনে গিয়ে কুলিদের সঙ্গে একবার কথা বলা উচিত। তা না হলে তারা বুঝবে না যে তদন্ত সত্যই হয়ে গেছে। আবার কতগুলো চিঠিপত্রের, বা অন্য রকম ঝামেলা থেকে যাবে। উইলিয়মও তা চায় না। কিন্তু আর পারা যায় না। পথের শ্রান্তি, কাজের ক্লান্তি গা-হাত-পা টেনে ধরেছে। এতগুলো ফাইল ঘাঁটা, তার ওপর এতক্ষণ একটানা এইসব বিটকেল লোকগুলোর সঙ্গে হৈ-হল্লার কথা—আর কি মন মেজাজ ঠিক থাকতে পারে। তার ওপর সন্ধ্যাও নেমে এসে রসান দিয়েছে। শীন-স্মিথের হাই উঠছে। তাঁর দেখাদেখি আর সকলেরও সেই দশা। এখন ক্লাবে না গেলে দেহ চাঙ্গা রাখা দায়। অবশিষ্ট কাজ কাল শেষ হবে। তবে মুখ্য কাজ হয়ে গেছে। অতএব তদন্তের দল ভেঙ্গে দেওয়া হল। হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক বদলে আসতে চ'লে গেল সাহেবরা।

মেঘুর ওপরও আদেশ হল—সে যেন অবিলম্বে শীন-স্মিথের কাছে ফিরে আসে।

ক্লাবে আজ হৈ-হৈ-রৈ-রৈ। এমন অতিথি অনেকদিন আসেনি। সেখানে মহোৎসবের ব্যবস্থা। যারা তদন্তের ব্যাপারে সরাসরি জড়িত নয় তারা, অর্থাৎ তেমন সাহেবরা আগেই গেছে সেখানে। বিধি ব্যবস্থা মতো সব দেখাশোনা করতে হবে তো। উইলি যাবে অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে।

সেভয় হোটেল ফেরত সেফ আছে ক্লাবে। এমন ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানের সকল আদব-কায়দায় দক্ষ ও নিপুণ সে। তবুও এক-এক সাহেব এক-এক দিকের ভার নিয়েছে—যেমন, খাবার ও মদের তালিকা, নাচ-গানের ব্যবস্থা, আলো, সাজানো-গোছানোর। এমন কত কি, যাতে কোন ত্রুটি না থাকে। সবই হয়েছে। অতিথিরাও সময় মতো হাজির। পোর্টিকোর সামনে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। একে-একে সবাই গাড়ী থেকে নামল। কিন্তু তার মধ্যে একজনকে দেখে সাহেবদের তাক লেগে গেল।

এখানে মেঘু কেন! সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড, তা বুঝতে একটু সময় লাগল। যা বুঝল তার প্রতিক্রিয়া হল সকলের মনে। মেঘু, মেঘুই—কাজ তার যত বড়ই হোক। নিজের দেশে জাতভাইদের সঙ্গে যা হয়, তা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার, এখানে তেমন করলে কি মান থাকে! দেশের শাসন ও সমাজ পদ্ধতি এবং এখানকার শাসন ও সমাজ দুটোর ধারাই বিভিন্ন। সবাই জানে অনেক ইংরেজ আই সি এস-এর কথা। নতুন এসে যখন মহকুমায় যায়, তখন গেঁও লোকের সঙ্গে মেলামেশায় কোন বাছবিচার করে চলে না। তার মূলে আছে অনেক কথা।

বর্বর অনুর্বর পশ্চিম আজ সুসভ্য উর্বর। দ্বন্দ্বদ্বেষে ভরা তার কাহিনী। অভিজাতের সঙ্গে জনগণের সংগ্রাম সংঘর্ষে ভরা, দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্তির ইতিহাস। নতুনের আবর্তন মার্জিত পাশ্চাত্য জগতের সমাজ। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র মজ্জাগত হয়েছে সেখানকার মানুষের। গণ অর্থে গণ-দেবতার পূজারী তারা। এদিকে প্রাচীনের বুলি আওড়ে চলে ভারত—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মিথ্যাটা সহজ বোধে আঁকড়ে মুখ ফিরিয়ে রইল জগৎ থেকে, সত্যটা বোঝবার চেষ্টা রইল বিরল হয়ে। কিন্তু পশ্চিম জানাল—সবার উপরে মানুষ সত্য।

তাই দেশে যেমন ব্যবহার করে থাকে, নতুন সাহেবরা এখানে এসেও তেমন করতে যায় ও হোঁচট খায়। তখন, তেমন হাকিমকে সেক্রেটারিয়েটে চালান দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেখানে কিছুদিন রেখে পুরানো কর্মচারীদের আদব কায়দা রপ্ত করবার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ ভদ্রলোক তো তেমন নতুন নন।

উন্নমন্ত্র যত উদারই হোক না কেন, সে সব জাতীয়তার গণ্ডি ছাড়িয়ে এখনো উঠতে পারেনি। তার আশাও বৃথা। ওদেশ সেদেশের মতবাদের নাম করে মানুষ শুধু তার মনকে ফাঁকি দিয়ে ছোটে সেই মরীচিকার পিছনে। সাহেবরা বাস্তব বোধে, মরীচিকার ধার ধারে না। তাই তাদের উদ্বেগের কারণ স্বাভাবিক, ও সহজবোধ্য। লক্ষ্মীমপুর জেলার শাসক, ইংরেজ অভিজাত বংশের অ্যালবিয়ন শীন-স্মিথের সঙ্গে মেঘু! সবাই বুঝল তা। মেঘুর ইচ্ছা নেই ক্লাবে আসবার। ঠিকই তো। বুঝদার। তবুও তার হাত ধরে টেনে গাড়ী থেকে নামানো হল। তার হাতে হাত গলিয়ে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এগিয়ে আসছেন শীন-স্মিথ। সাহেবরা এগিয়ে এসেছিল হ্যাণ্ডসেক করতে। কিন্তু সেদিকে শীন-স্মিথের চোখ নেই, তিনি ব্যস্ত ঐ অনিচ্ছুক মেঘুটাকে নিয়ে। সকলের সঙ্গে হস্ত-মর্দনটাও হল না অমন টানা-হেঁচড়ায় পড়ে। শুধু এদিক-ওদিক তাকিয়ে গুড ইভনিং-এর ওপরই অভিবাদনটা শেষ করতে বাধ্য হলেন শীন-স্মিথ।

ডেভিডের অনেকদিনের বাসনা মেঘুকে নিয়ে আসে ক্লাবে। কিন্তু সাহস পায়নি। তার বাসনাটা রূপ দেবার পরিকল্পনা থাকে থাকে সাজানো ছিল। প্রথম তাকে গির্জা থেকে ঘুরিয়ে আনবে।—তার নিজের দীক্ষা-ভিষেক হয় ওয়েলস ক্যাথলিক মিশনে। তাই তাদের প্রথায় নাম হয় ডেভিড। একে ক্যাথলিক তার ওপর ওয়েলস—এটা যে প্রোটেষ্টান্ট বা অমনই যে কোন মিশনের তুলনায় অধস্থ তা সে বুঝেছে অনেক বিলম্বে। তাই সে মেঘুকে নিয়ে যাবে কোন একটা কুলীন গির্জায়। তাতেই যে সব শেষ হবে না, তাও সে জেনেছে। শুধু যে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ সে সকল কথা—তা নয়; দৈনন্দিন জীবনেও প্রতিফলিত এবং নিয়ত পুনঃকৃত। গির্জার ভিতরে যাই হোক, বাইরে সেই সাদা কালো সমস্যা। গির্জার ভিতরেও অনেক ভিতরের কথা আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা সারা বিশ্বের মানব সমাজকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত করা। তাই অসীম ধৈর্য তাদের সেই ঈশ্বরাদিষ্ট কাজে। সকল বস্তুকের মর্মার্থ গ্রহণ করা তার সাধ্যাতীত, সাদা-কালো সমস্যার প্রতিবিধানও তার ক্ষমতার বহির্ভূত। তারই মধ্যে যতটুকু করা যায় তা সে করবে। সেই আশায় সুযোগের সন্ধানে ছিল। অতএব গির্জার অভিযান শেষ হলে নিজের ঘরে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করবে মদের টেবিলে, তারপর মদের সঙ্গে আসবে খাবার। তখন আসবে মেঘু। নেশার ঘোরে তা মনে ধরবে না কারো। এমন করে সকলের আড়ালে, সকলের সঙ্গে খাইয়ে-দাইয়ে তাকে জাতে তুলবে। তারপরই সে এক পার্টি দেবে ক্লাবে। পাশ্চাত্য দেশে অমন সমস্যা দেখা দেয় না, তাই এমন মৌলিক গবেষণা করবার দরকার হয় না। সেখানে এমন গবেষণা করবার ক্ষমতাও নেই কারো। কিন্তু মেঘু তাতে কতখানি সহযোগিতা করবে সেটা ডেভিড ভেবে দেখেনি।

সে যাই হোক, শীন-স্মিথের সঙ্গে মেঘুকে আসতে দেখে খুব খুশী হল ডেভিড। তার মাথা থেকে এক গুরুভার

বারিদবরণ ঘোষ

(১)

সরস্বতীর ভাবপ্রসাদ ও স্বভাবকর্মীর কর্মৈষণা আপন জীবনে একীভূত হওয়ায় শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের সেবা ব্যতীত সমাজের বিভিন্নমুখী কর্মরত উদযাপনে সফলকাম হয়েছিলেন। সমাজের বহুবিধ প্রগতির সঙ্গে আপনাকে জড়িত রেখে তিনি মানব সমাজকে সেবা করে গিয়েছেন।

আচার্য শাস্ত্রীর এই সেবা প্রবৃত্তি প্রধানতঃ তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে.— এক, শিক্ষাক্ষেত্রে, দুই, সমাজসেবায় ও তিন দেশপ্রেম তথা রাজনীতিতে।

শিক্ষা বিষয়ে পণ্ডিত শাস্ত্রীর কর্ম-পদ্ধতি ছিল দ্বিশাখাবলম্বী। প্রথম শিক্ষক হিসাবে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা; দ্বিতীয়, শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ও দান।

(২)

আদর্শ বাংলা বিদ্যালয়ের গণ্ডী তখনও শিবনাথ পার হননি; অর্থাৎ ন' বছর বয়স হওয়ার আগেই শিবনাথের প্রথম শিক্ষকতা শুরু হয়। তাঁর পিতার সম্পর্কিত এক খুড়ী, গৌরাঙ্গী বিধবা এক যুবতী শিবনাথের প্রথম ছাত্রী।১ মাস্টারমশায়ের চেয়ে ছাত্রী 'পাঁচগুণে সে বড়।' ক্ষুদে মাস্টারমশাইটি ছাত্রীকে বর্ণ পরিচয় করাতেন।

দ্বিতীয় ছাত্রী বন্ধুবর ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের ভাগ্নী মহালক্ষ্মী।২ ছাত্রীর সঙ্গে শিবনাথ ধর্মবিষয়ক আলোচনার ফাঁকে বাংলা ও ইংরাজী পড়াতেন। শিবনাথের বয়স তখন কতই বা—বছর একুশেক। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের কথা, মাস্টারমশাইটি তখনও এল-এ পরীক্ষা দেননি। তাছাড়া কলকাতা থেকে স্বগ্রাম মজিলপুরে যখন গরম বা শীতের ছুটির সময় বাড়ী যেতেন, তখন গ্রামের পাঠশালাতেও মাঝে মাঝে পড়াতে যেতেন।৩

এখনও পর্যন্ত শিবনাথ বৃত্তিধারী মাস্টারমশাই হয়ে ওঠেননি। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করে ও শাস্ত্রী উপাধি পেয়ে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমের মহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চাকরিতে ঢুকলেন। মাইনের টাকা দুটো আঙ্গুলে গুণলেই শেষ হয়ে যায়। আশ্রমবাসিনী মহিলাদের মধ্যে কেশব-পত্নী জগন্মোহিনী দেবীকেও ছাত্রী হিসাবে পেলেন।৪ বয়স্কা ছাত্রী মাস্টারমশায়ের পড়ানোতে এত মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে স্বামী পড়ার ব্যাপারে নাক গলাতে এলে আমলই দিতেন না।

কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল মাতুলালয় হরিনাভি। মাতুলের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদনা ব্যাপারে হরিনাভিতে গিয়ে সেখানকার বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও 'হেডমাস্টার' হয়ে গেলেন। বছর দেড়েক সেখানে চাকরি করলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি ঢেলে সাজাবার নানা যত্ন নিয়েছিলেন। বেতনহারের সংশোধন ও বিদ্যালয়ের নৈতিক অবহাওয়া শুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাঁর প্রাণ পর্যন্ত সংশয়াপন্ন হয়ে উঠেছিল।৫ ঐ বিদ্যালয়ের এক মাস্টারমশাই যাত্রাদলে সঙ সাজতেন। আপত্তি করতে গিয়ে মামলায় পর্যন্ত জড়িয়ে গেলেন শিবনাথ। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরোধীদলকে আদর্শের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছিল। কিন্তু শিবনাথের স্বাস্থ্য গেল ভেঙে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ নাগাদ হরিণাভি থেকে ভবানীপুরে চলে এলেন শিবনাথ।

তৎকালীন ডেপুটি ইনস্পেকটর অফ স্কুলস রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শিবনাথকে ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বান স্কুলের হেড-মাস্টার করে নিয়ে আসেন। পুরো দুটো বছর এখানে চাকরি করলেন। এই সময়ে কেশব-বিরোধী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবনাথও এর দলে ভিড়ে গেলেন। নিজের বড় মেয়ে হেমলতাকে এই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন (পরে বিদ্যালয়টি 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নাম গ্রহণ করে এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বেথুন কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়)।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের শুরুতে হেয়ার স্কুলে হেড পণ্ডিত-কাম-ট্রানস্লেটর মাস্টারের পদ সৃষ্টি হলে শিবনাথ ভবানীপুর থেকে ঐ পদ গ্রহণ করে হেয়ার স্কুলে আসেন। এখানেও দু বছর চাকরি করেন। কিন্তু ধর্মরাজ্যের বৃহত্তর আহ্বানে তিনি শিক্ষকতা কর্মে আর থাকতে চাইলেন না। সর্বোপরি তাঁর স্বাধীনতাবোধ সরকারী কর্ম পরিত্যাগের জন্য যেন বার বার তাগাদা দিচ্ছিল। সুতরাং সাংসারিক অনটন সত্ত্বেও সকলের নিষেধ গ্রাহ্য না করে তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ থেকে 'বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করিয়া মহাকর্মের আবর্তে পড়লেন।৬ স্বাধীনভাবে শিক্ষকতা-বৃত্তির এখানেই শেষ। অবশ্য সারা জীবনই তিনি মানব-সমাজকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তাছাড়া কয়েকটি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত থেকে তিনি সেই সব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকতা করেছিলেন।

(৩)

চাকরি ছেড়ে দিলেও একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। ব্রাহ্মসমাজের নানা আন্দোলনে লিপ্ত থাকায় তা করে উঠতে পারেননি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একটা সুযোগ এল। আনন্দমোহন বসু এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। আনন্দমোহনের অর্থানুকূল্যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষকতায় ও শিবনাথের সাক্ষাৎ দায়িত্বে সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হয়। 'প্রথম মাসেই ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হইল।' দলে দলে ছাত্র ভর্তি হতে থাকে। শিবনাথের নামেই স্কুলের সুনাম। নিজে শিক্ষকতাও করতে লাগলেন।৭ বহু ছাত্র ভর্তি হওয়ার দরুন অন্য কলেজ থেকে বহু বিতাড়িত ও অভব্য ছাত্রও এসে গেল। অথচ বিদ্যালয়টি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল 'বালকদিগের প্রাণে জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের নীতি শিক্ষা দেওয়া।' চরিত্রবান শিবনাথ ছাত্র বাছাই-এর কাজে দুরন্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে শহরের অন্যান্য বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এ সম্পর্কে শিবনাথের মতটি যথার্থই গ্রহণযোগ্য—'এক শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় সকলের শিক্ষকদের মধ্যে আত্মীয়তা ও যোগ না থাকিলে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের অভিভাবক এই উভয়ের মধ্যে সাহচর্য না থাকিলে, বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই দুইটিরই অভাব।'

সিটি স্কুল স্থাপনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার। কারণ ধর্ম-বিহীন শিক্ষার অসারতা শিবনাথ জানতেন। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়েও ছাত্রীদের তিনি নীতি শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া একটি ছাত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। আনন্দমোহন বসু এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। ২৭-এ এপ্রিল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সিটি স্কুলের ঘরে ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আনন্দমোহন বসু, নগেন্দ্রনাথ চট্টো-

পাধ্যায়, শিবনাথ নিজে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখেরা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। শিবনাথ অচিরে শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরূপে পরিচিত হন।৮ এমন কি বিরোধীরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যেতেন বক্তৃতা শুনে।৯ ছাত্ররা হতেন অভিভূত।১০ ধর্ম-শিক্ষার জন্য অন্য প্রতিষ্ঠান না থাকায় ছাত্রসমাজের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল।

সখা পত্রিকার সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন প্রতিষ্ঠিত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়েও শিবনাথ উপদেশাদি দিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের কয়েকজন কন্যার১১ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তাপর একটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের শিবনাথ উৎসাহদাতা ও নীতিশিক্ষক ছিলেন।১২

(৪)

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ ইংলণ্ডে যান। সেখানকার শিশু বিদ্যালয়গুলি তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে। এমনিতে শিশুশিক্ষা ব্যাপারে তাঁর বরাবরই একটা কৌতূহল ছিল। হরিণাভি ও ভবানীপুরে যখন ছিলেন, তখন নীচু ক্লাসের ছাত্রদের 'ভুলাইয়া পড়াইবার' উপদেশ দিতেন। ইংলণ্ডের অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ব্যতীত কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 'আত্মচরিতে' তিনি স্পষ্টতঃই লিখেছেন, 'শিশুদের এই শিক্ষা-প্রণালী আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমি আসিবার সময় কিণ্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রোবেলের জীবনচরিত ও উক্ত শিক্ষা প্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া আনিলাম।' দেশে ফিরেই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৬ মে তারিখে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় স্থাপন করেন ব্রাহ্মপাড়ার শিশুদের জন্য। আনন্দমোহনের হস্ত এবারেও সহযোগিতায় প্রসারিত হল। বিদ্যালয়টির নামকরণ প্রসঙ্গে শিবনাথ বলেছেন, 'জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা শিক্ষালয় স্থাপন করিব, বিদ্যালয় নাম রাখিব না—আমরা প্রকৃত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, পুঁথিগত বিদ্যালয়, সুতরাং চেয়ার টেবিলের আবশ্যকতা কি? আমাদের বালিকারা মাদুর পাতিয়া পড়িবে, তাহাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিবার কোন বাধা থাকিবে না।'১৩ এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার আগে এদেশে কিন্ডারগার্টেন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ হিসাবে শিবনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিবনাথ এতই চিন্তাপূর্ণ থাকতেন যে, ডালের বদলে জল দিয়ে ভাত মাখতেন কোন কোন দিন।১৪ শিবনাথ নিজে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে বোর্ডে ছবি এঁকে গল্পাচ্ছলে পড়াতেন। ছেলেরা তাঁর সম্পর্কে এতই নির্ভয় ছিল যে, শিবনাথের ক্লাসের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত।

স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে শিবনাথের একটা নিজস্ব মত ছিল।১৫ তিনি মেয়েদের [illegible], [illegible] ও [illegible]

ফিজিকস পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন। এ ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘোর মতান্তর ঘটে, যখন তিনি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন, সেই সময়। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়েও সেই মতান্তর দেখা দেয়। শিবনাথ বিদ্যালয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি শিশুদের স্বাধীন চিন্তা বিকাশে বাধা ঘটাবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করলে শিবনাথ এর সাক্ষাৎ-সংস্রব ত্যাগ করেন।

১৮৯৬ খৃস্টাব্দে কোয়েটা থেকে শিবনাথ বাঁকিপুরে প্রচার কার্যে আসেন। স্টেশনে অনেকগুলি এম.এ-কে উপস্থিত দেখে গুরুদাস চক্রবর্তী একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। স্টেশন থেকে এসেই শাস্ত্রী মহাশয় একটি 'চমৎকার প্রস্পেকটাস' রচনা করে ফেলেন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমৃত্যু তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(৫)

শিক্ষা সম্পর্কে শিবনাথের কতকগুলি ব্যক্তিগত ধারণা গড়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ শিশু এবং মহিলাদের শিক্ষাদান ব্যাপারে। শিশুদের শাস্তিদান তিনি পছন্দ করতেন না। অন্তরে তাঁর একটি শিশু মন বাস করত। অতি সহজেই শিশু হয়ে শিশুদের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়টি নিপুণভাবে শিখিয়ে দিতে পারতেন। তিনি এমন আশ্চর্যভাবে ক্রীড়াচ্ছলে সকল বালককে পড়া শিখিয়ে দিতেন যে, তারা বলত, 'পণ্ডিত মশাই তুমি আমাদের ক্লাসে এস, আমাদের সঙ্গে খেলা করবে।'১৭ শিশুদের শিক্ষণীয় গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি যে কত চিন্তাশীল ছিলেন নিজের উদ্ধৃত মন্তব্য থেকে সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শিবনাথ লিখেছেন, 'বর্তমান সময়ে শিশুদের
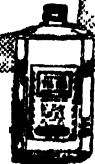
পাঠোপযোগী বাংলা সাহিত্যের বড় শোচনীয় অবস্থা। তাহাদের শিক্ষোপযোগী গ্রন্থও নাই এবং শিক্ষোপযোগী প্রণালীও নাই।...এক পার্শ্বে কতকগুলি নীরস ও আকর্ষণবিহীন পাঠ্যবিষয় অপর পার্শ্বে শিক্ষকদের ভ্রূকুটি ও বেত্রাঘাত উহার মধ্যে নির্বাক শিশুরা ভীত ও বিরক্ত হইয়া দিনপাত করে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পুস্তক একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে অর্পিত হয়। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি এরূপে ভার লইলে মনুষ্য গর্দভ না হইয়া থাকিতে পারে না। শিশুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। সেই সেই সময়ে তদুপযুক্ত বিষয়গুলি তাহাদের সমক্ষে ধারণ করা উচিত, তাহা হইলে তাহাদের পড়িতে আনন্দ হয় এবং পাঠ করিয়া উপকারও লাভ করে।

'...শিশুদিগকে শিক্ষা দেবার সময় দুইটি কথা স্মরণ রাখা উচিত (১ম) পাঠ্য-বিষয়গুলি যেন তাহাদের আমোদজনক হয় (২য়) সেগুলি পঠিত হইয়া যেন তাহাদের মনোবৃত্তির বিকাশের সাহায্য করে। দেখা যায় বাল্যকালে কল্পনাশক্তি প্রবল থাকাতে শিশুরা উপন্যাস ও আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে ভালবাসে ; সুতরাং সে সময় গল্পের আকারে ইতিহাসের স্থলে স্থলে বর্ণনা বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনচরিত্রের স্থলে স্থলে ঘটনা অতি অল্প আয়াসেই তাহাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারা যায় এবং সেই আকারে তাহাদিগকে ধর্মনীতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে পারা যায়।'১৮

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ ; কিন্তু এটি শিশু-শিক্ষা সম্পর্কে শিবনাথের চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রকাশ। আর এ কারণেই শিবনাথ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় এতো মনোযোগী হয়েছিলেন। 'সখা', 'মুকুল' পত্রিকার পৃষ্ঠা খুললেই শিবনাথের শিশু-সাহিত্যের মিষ্টস্বাদ আস্বাদন করা যায়।১৯ বর্তমান শিক্ষা জগতের ধারকেরা একবার এ মন্তব্য বিবেচনা করলে গর্দভ-নির্মাণের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

ভারত আশ্রমের ছাত্রীদের তিনি মুখে মুখে মেণ্টাল সায়েন্স ও লজিক বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ছাত্রীরা২০ সেগুলি নোট করে নিতেন।২১ এঁদের পড়াতে শিবনাথের আনন্দের সীমা থাকত না।

শিক্ষার পাঠক্রম যাই হোক, তার সঙ্গে ধর্ম ও নীতি যুক্ত না থাকলে শিক্ষা পূর্ণ হয় না, এই ধারণাকে শিবনাথ বরাবর পোষণ করে এসেছেন। সে কারণে যেখানেই ধর্মযুক্ত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হত, সেখানে শিবনাথের উৎসাহের অন্ত থাকত না। সেদিক থেকে বলা যায়, শিক্ষকতা-বৃত্তি তাঁর ধর্মজীবনের একাংশকেই উজ্জ্বল করেছিল।

প্রসঙ্গ নির্দেশ॥

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ, ১৩৫৯), পৃঃ ২৮।

২। তদেব, পৃঃ ৭৮।

৩। তদেব, পৃঃ ২৫২-৫৩।

৪। তদেব, পৃঃ ১০৯-১১।

৫। 'কি করিব কর্তব্যবোধে লোকের অপ্রিয় হইতে হইল।' তদেব, পৃঃ ১২১।

৬। অথচ আর দু' মাস মাত্র অপেক্ষা করলে স্কুলের বোনাস-স্বরূপ অনেক টাকা পেতে পারতেন।

৭। তদেব, পৃঃ ১৬১-৬৪।

৮। শিবনাথ - রচিত 'বক্তৃতা-স্তবক' (১৮৮৮) পুস্তকে ছাত্রসমাজে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে।

৯। 'An orthodox gentleman of the old school who was not at all sympathetic towards Pandit Shastri but reasons to be hostile to him, once remarked, "One feels inclined to stand and hear him for hours' — Hemchandra Sarkar, Shivanath Sastri, PP. 36.

১০। একজন ছাত্র এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছে, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়াছে দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে এবং চিত্ত ক্ষুদ্রকে ছাড়িয়া ভূমার আশ্রয় লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে শিখিয়াছে।'— রজনীকান্ত গুহ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

১১। কুমারী কামিনী সেন, লাবণ্যপ্রভা বসু, কুমুদিনী খাস্তগীর, সরলা মহলানবিশ ও হেমলতা ভট্টাচার্য এর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৯৬।

১৩। ডঃ হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী (১৯২০), পৃঃ ২৩৪-৩৫।

১৪। তদেব, পৃঃ ২৩৬।

১৫। শিবনাথের স্ত্রী-শিক্ষা - সম্পর্কিত মতামতের জন্য দ্রষ্টব্য, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাত্মা বেথুন ও এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১১, পৃঃ ২৪৪-৫৫। এই প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি বঙ্গ দেশের সামাজিক উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যেই হইবে।'

১৬। রজনীকান্ত গুহ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

১৭। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২৫৩।

১৮। সোমপ্রকাশ, সম্পাদকীয় রচনা, ১২ই ফাল্গুন ১২৮০ (২৩-২-১৮৭৪) পৃঃ ২২৬-২৮।

১৯। 'উপকথা' (১৯০৭) শিবনাথ-রচিত শিশুপাঠ্য বিদেশী-গল্পের অনুবাদ সংগ্রহ। সম্প্রতিকালে 'ছোটদের গল্প' (১৯৬০) ও স্বনামাপুরুষ (১৯৬২) নামে শিবনাথের দুটি গল্প ও জীবনী সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

২০। ছাত্রীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগীর ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন।

২১। এই নোটগুলি 'বামাবোধিনী' পত্রিকা'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রঃ, শ্রাবণ ১২৮০, মাঘ-ফাল্গুন ১২৮১, বৈশাখ ১২৮২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮২ সংখ্যা।
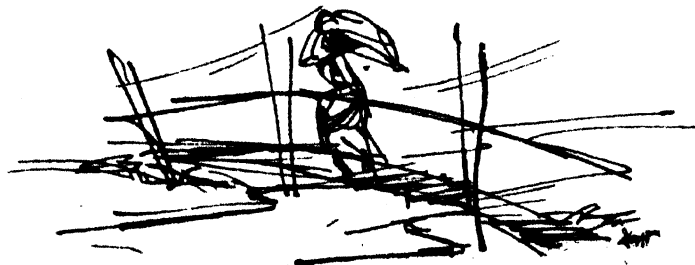
সংলাপে-অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

সাতচল্লিশ

সন্ধ্যেবেলায় যথাসময়ে স্বামিজীর কাছে। গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে স্বামিজী মুচকে হেসে বললেন—আজ আবার মহাভারতের কোন পর্ব?

হেসে বললুম—শান্তি পর্ব, বাবা। আজ হাইকোর্টে আপীল মামলা।

—শান্তি কোথা? এরই মধ্যে শান্তি পর্ব। এই তো সবে ভীষ্ম পর্ব। ভীষ্মের শরশয্যাটা রচনা হয়েছে মাত্র। এখনও মহাবীর কর্ণ আছে না? এরপর, দ্রোণ পর্ব, কর্ণ পর্ব, শল্য পর্ব। শান্তি পর্ব অনেক দূরে। পর পর পর্ব। পর্ব বাদ দিয়ে মহাভারত হয়?—স্বামিজীর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু থেমে বললেন—হ্যাঁ, হাইকোর্টের রায় বের হল বেশ ক'মাস পরে। বারীন আর উল্লাসকরের ফাঁসির বদলে হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হেমচন্দ্র আর উপেন্দ্রেরও তাই। অবিনাশ ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ আরও ক'জনের যাবজ্জীবনের বদলে সাত বছর। হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায় আর ক'জনের দশ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হল। বালকৃষ্ণ কানে আরও দু-তিনজন মুক্তি পেল। শৈলেন্দ্র বসু আর বীরেন সেনের আগেকার দণ্ডই বহাল থাকল।

ক'জনের বিচারের সময় দুই জজে মতান্তর। বিচার করলেন তৃতীয় জজ। তাঁর রায়ে মুক্তি পায়—ইন্দ্রনাথ নন্দী, সুশীল সেন আর কৃষ্ণজীবন সান্যাল।

চন্দননগর থেকে ধরে আনা হয়েছিল চারুচন্দ্র রায়কে। ফরাসী রাজ্যের প্রজা বলে রেহাই পেলেন তিনি।

এরপর দণ্ডপ্রাপ্তদের বিজয় যাত্রা।

জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে 'মহারাজা' নামে দায়মালবাহী জাহাজ। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র আর সব দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের তোলা হল সেই জাহাজে। যাবে আন্দামান। জাহাজঘাটে ভিড়ে ভিড়। চোখ শুকনো ছিল না কারুর। তবু গলা ছেড়ে মিলিত কণ্ঠে গান ধরলে সবাই—

দেখরে সকলে, নীল সিন্ধু জলে
ভেসে যায় মায়ের পূজার ফুল,
আবার যাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর,
আর ফিরবে না—তাদের উদ্দেশে গাইল—
মাতৃভূমির সন্তান বীর
আবার আসিও ফিরে

নির্দিষ্ট সময়ে ভোঁ দিয়ে ছাড়ল জাহাজ। যতক্ষণ জাহাজের মাস্তুলটি দেখা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সবাই। তারপর উদ্বেল জনতা চোখ মুছতে মুছতে ধীর মন্থর পদে বাড়ী ফিরল।

মাণিকতলা বোমার মামলা, হ্যারিসন রোড বোমার মামলা, হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা—একা কলকাতাতেই তো মামলায় মামলায় ছয়লাপ, ঢাকা, বরিশাল, মেদিনীপুর—সারা বাংলাতেই ধরপাকড় আর মামলা। বাংলা যেন মামলাময়।

১৯১০ সালে ঢাকা তোলপাড়—ধরপাকড়ের হিড়িক। দলবল সমেত গ্রেপ্তার হলেন পুলিন দাস। এদিকে কলকাতায় মিত্তির সাহেবের বাড়ী ঘেরাও করে রাখতে লাগল পুলিশ। এই সময়ে সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ মারা গেলেন মিত্তির সাহেব। সমিতির ইন্দ্রপাত হল।

ধৃষ্টদ্যুম্নরা নিরস্ত্র আচার্য দ্রোণকে হত্যা করল।

সভ্যরা বিরাট মিছিল করে কেওরাতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়ে দাহ করল মিত্তির সাহেবের মরদেহ।

শুরু হল ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা। চিত্তরঞ্জন দাশ গেলেন আসামীদের পক্ষ সমর্থন করতে। সুবিধা হল না। পুলিন দাস, ভূপেশ নাগ, শান্তি মুখার্জি, আরও ক'জন—কারুর দ্বীপান্তর কারুর বা জেল।

আপীল এল হাইকোর্টে। সি আর দাশ তখন খুব ব্যস্ত ডুমরাও মামলা নিয়ে। রাজী হলেন না এবার মামলা চালাতে। ধরা হল তাঁর রাজনৈতিক গুরু বিপিন পালকে। বিপিন পাল আরও অনেকের চেষ্টায় দাশ রাজী হলেন বটে, তবে মামলাটি আরম্ভ করে দিয়েই চলে যাবেন তিনি। আরম্ভের বক্তৃতা খুবই ভাল হয়েছিল, আর হয়েছিল খুব কাজের।

এ পর্যন্ত বোমা পিস্তল রাখার মতই গীতা আর চণ্ডী বাড়ীতে রাখা দণ্ডার্হ হয়েছিল। সরকারী ব্যারিস্টার অনুশীলন সমিতির সভ্য হওয়ার নিয়ম, আদ্য-প্রতিজ্ঞা, মধ্য-প্রতিজ্ঞা, অন্ত-প্রতিজ্ঞা পড়ে শোনালেন। তারপর ইন্সপেকটর রিপোর্ট পড়ে শুনিয়ে দিলেন কোথায় কোথায় খানাতল্লাসীতে পাওয়া গেছে গীতা আর চণ্ডী।

জজ আশুতোষ মুখার্জি। জিজ্ঞেস করলেন—গীতা চণ্ডী উল্লেখের কারণ কি? কৌঁসুলী বললেন—রাজদ্রোহের প্রেরণা যোগায় গীতা।

আশু মুখার্জি স্তম্ভিত। বললেন—ভাবগ্রাহী জনার্দনরা এ পল্লবগ্রাহী মতটা পেলেন কোথা হতে? গীতা অতি উঁচুদরের দর্শনশাস্ত্র। রোজই পড়া হয় হিন্দুর বাড়ীতে।

আর চণ্ডী?

কৌঁসুলী বললেন—চণ্ডী উৎসাহ দেয় খুনখারাপিতে।

আশুতোষ বললেন—উদ্ভট কথা, প্রায়ই চণ্ডী পাঠ হয় আমার বাড়ীতে।

তখন কৌঁসুলীর যা অবস্থা! নথিপত্র গুটিয়ে সরে পড়তে আর পথ পান না।

গীতা চণ্ডী থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল।

হাইকোর্টের রায়ে কয়জন খালাস পেল, কয়জনের সাজা কমে গেল। তবে পুলিন দাশের হল সাত বছরের দ্বীপান্তর।

ওদিকে মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলা। ধরেছে তো অনেককেই। মেদিনীপুর জজ আদালতে জামিন পায়নি কেউ। দরখাস্ত আসে হাইকোর্টে। তখন পুজোর ছুটি—হাইকোর্ট বন্ধ। বিচার করতে বসলেন ছুটির জজ সারদাচরণ মিত্র আর চিটি সাহেব। সারদাচরণ জামিন দেবার পক্ষে, চিটি নয়। পদমর্যাদায় সারদাচরণ বড়। তাঁর রায়ই বহাল হল। দেশের লোক সাধুবাদ দিল সারদাচরণকে।

দায়রা মামলার আপ্রুভার লালমোহন সাহা স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিল। সরকারী তরফের ব্যারিস্টার এস পি সিংহ তিনজন আসামী ছাড়া আর সকলের মামলা তুলে নিলেন। এই তিনজন—যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষকুমার দাশ আর সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জি। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—এরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছিল। খুনের ফটো পাঠিয়ে ভয় দেখিয়ে বেনামী চিঠি লিখেছিল ওয়েস্টনকে।

ইতিমধ্যে এস পি সিংহ চলে গেলেন বড়লাটের পরিষদের সর্বপ্রথম আইনমন্ত্রী হয়ে। এলো গ্রেগরী সাহেব বাঙলার অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে। সবাই বলে—'গেড়গড়ি'। মামলা করতে মেদিনীপুরে গেল গড়গড়ি। দশ বছর করে দ্বীপান্তর দণ্ড হল আসামীদের।

আপীল এল হাইকোর্টে। বিচারে বসলেন চীফ জাস্টিস লরেন্স জেঙ্কিন্স আর আশুতোষ মুখার্জি। চীফ জাস্টিসের জেরায় উত্তর দিতে পারল না গড়গড়ি। তার পরেই উধাও, আর হাইকোর্ট-মুখো হল না সে। আসামী তিনজনই বেকসুর খালাস।

মুখে বিষাদের কালো ছায়া, চুপ করলেন স্বামিজী।

বললুম—ছাড়া পেয়ে আপনি তো আশ্রমে এলেন, শ্রীঅরবিন্দ জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলেন, বাবা? আন্দোলনের কাজ একেবারেই ছেড়ে দিলেন তিনি?

খুব জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামিজী বললেন—জেল থেকে খালাস পেয়ে—অরবিন্দদা উঠলেন গিয়ে তাঁর মেসোমশায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাসায়। কৃষ্ণকুমার মিত্র তখনও নির্বাসনে। বিপিন পাল গেছেন বিলাতে। সেখানে বের করছেন 'স্বরাজ' নামে একখানি ইংরেজী মাসিক পত্র। দেশের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ গেছেন ম্যাঞ্চেস্টারে। ইংলণ্ডের সর্বত্র ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন ভারতের স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে। তিনি প্রচার করছেন ভারতের বিপ্লব থামাতে হলে দরকার খুব শীগগির শাসন সংস্কার। মহারাষ্ট্র-বীর লোকমান্য তিলকও তখন বর্মার জেলে।

বাঙলা তথা ভারত অন্ধকার। জনগণ পুলিশী নির্যাতনের ভয়ে সশঙ্ক। কেউ কারুর সঙ্গে দেখা করতেও চায় না, পাছে পুলিশের সন্দেহের চোখে পড়ে। সভাসমিতি বক্তৃতা, মিটিংফিটিং তো বন্ধ একেবারে। অবশ্য এ অবস্থাতেও গোপনে গোপনে অরবিন্দদা ও এই শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল রাসবিহারী আর বাঘা (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।' শিবঠাকুরের সলতেটুকুতে তেলের যোগান দিয়ে ওরাই জ্বালিয়ে রেখেছিল আর কি।

অরবিন্দদা বুঝলেন কর্মপন্থা বদলাতে হবে। উত্তেজনার বশে কাজ করলে চলবে না। সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। পবিত্র গীতাধর্মের আশ্রয় না নিলে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না। নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাস করা চাই। শক্তির সাধনা করতে হবে দেশবাসীকে।

আঁধার ঘরে আলো জ্বাললেন অরবিন্দদা। জেল থেকে বেরিয়ে প্রথম বক্তৃতা করলেন উত্তরপাড়ায়, তারপর বিডন স্কোয়ারে আর বরিশালের ঝালকাটিতে।

উত্তরপাড়ায় অরবিন্দদার বক্তৃতা। সভার আয়োজন করলেন—মনেপ্রাণে পুরো স্বদেশী রাজেন্দ্রনারায়ণ—রাজা প্যারীমোহনের ছেলে। সহায়ক হলেন—শ্রমজীবী সমবায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সভা আরম্ভ হল। অরবিন্দদা বললেন—বিলাতে থাকতে থাকতেই যৌবনে প্রত্যাদেশ পান ভারতে মুক্তির বাণী প্রচার করতে। তাই তিনি আসেন এদেশে। সেদিন একটি বাণী ছিল তাঁর অন্তরে—যা তিনি শোনাতে চান দেশবাসীকে। তিনি একটুও বিচলিত হন নি তাঁর মোকদ্দমায়। তিনি দেখেছিলেন আদালত সব 'বাসুদেবময়'। অভিযোগকারী সরকারী ব্যারিস্টার 'বাসুদেব', এজলাসে বসে 'বাসুদেব', কাঠগড়ায় 'বাসুদেব' আসামীপক্ষের উকিল ব্যারিস্টার কৌসুলীরাও 'বাসুদেব'। 'বাসুদেব' এসেছিলেন তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে। তাই মক্কেল হিসেবে যেসব নির্দেশ দিতে হয় নিজের ব্যারিস্টারকে—তা তিনি দেন নি সি আর দাশকে। 'বাসুদেবই' তাঁকে বের করে এনেছেন তাঁর কাজ করবার জন্য।

দেশের মুক্তির কথাও প্রচার হচ্ছে ভগবানের প্রত্যাদেশেই। বক্তৃতা শুনে সভার সবাই বিমুগ্ধ। পরদিন খবরের কাগজে যারা পড়েন তারাও বিমোহিত।

পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করলেন অরবিন্দদা। প্রচার চাই— দেশবাসীকে বোঝাতে হবে। ১৯০৯ সালের জুন মাসে বের করলেন ইংরেজী পত্রিকা—'কর্মযোগীন' আর কিছু পরে বাংলা পত্রিকা 'ধর্ম'।' ধর্ম, জাতীয়তা আরও অনেক কিছু বেশ ভালভাবেই বোঝাতে লাগলেন দেশবাসীকে। ২রা জুলাই কর্মযোগিনে লেখেন 'আত্মবলির তত্ত্ব'!' কাগজের কাটতি বাড়তে লাগল হু-হু করে। হাজারে হাজারে বিক্রি।

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দদার অনুমতি চাইলেন কর্মযোগিনের বাঙলা অনুবাদ বের করতে। দেশে ইংরেজী-না-জানা লোকই বেশি। তারাই বা অরবিন্দদার শিক্ষায় বঞ্চিত থাকবে কেন?

হাওড়ায় 'কর্মযোগী' প্রেস থেকে বের হতে থাকল বাংলা 'কর্মযোগিন' পত্রিকা। তারই বা কাটতি কি রকম। ঘরে ঘরে সমাদর পেল বাংলা 'কর্মযোগিন'।

এমনি করে প্রচারের কাজ চালাচ্ছেন অরবিন্দদা। বৈপ্লবিক কাজ বন্ধ। কিন্তু স্বদেশী ডাকাতি চলেছে সমান তালে। 'শ্রমজীবী সমবায় সংস্থার' মত এক-একটা সংস্থা গড়ে তার আড়ালে গোপনে গোপনে চলেছে বৈপ্লবিক কাজ।

তখন ভারতের গভর্ণর লর্ড মিন্টো। তিনি তো হিমসিম খেয়ে গেলেন, তবু পারলেন না বিদ্রোহ দমন করতে। বিলাতে ভারত সচিব ছিলেন মর্লি সাহেব। বলা হত মর্লি মিঞা। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার মর্ম কিছুটা ঢুকল সচিবের মাথায়। শাসন সংস্কারের একটা খসড়া করে ১৯০৯ সালে মর্লি পাঠালেন ভারতে। মডারেট নেতারা কিছু অদল-বদল করে মেনে নিতে চাইলেন ঐ মর্লি মিন্টো শাসন সংস্কার। নামে 'শাসন সংস্কার' আসলে একটি সুপক্ক মাকাল ফল।

প্রথম চোটেই মুক্তি দেওয়া হল কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শচীন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী দাস, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এই সব নেতাদের।

মডারেট নেতাদের মর্লি মিন্টো শাসন সংস্কার মেনে নিতে দেখে হতভম্ব হলেন অরবিন্দদা। কর্মযোগিনে প্রবন্ধ লিখলেন দেশবাসীর প্রতি একটি খোলা চিঠি লিখলেন—এই ভুয়ো শাসন সংস্কার মেনে নিলে দেশের খুবই ক্ষতি হবে। ইংরেজরা বলে ভারতবাসী উপযুক্ত হয় নাই। ইংরাজদের সদিচ্ছা আদেশবলে যদি বিশ্বাসই হয়, তাহলে দেশের শিক্ষাটি ইংরাজ শাসন বর্জিত করে নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে দেখিয়ে দিন না—ভারতবাসী উপযুক্ত কিনা। ইংরাজ যা দিতে চাচ্ছে তা—পাকা গোলামী। ওরা মনে করছে শুধু শাসনে ফল হবে না, তাই তারা নিচ্ছে দু-মুখো শাসন ব্যবস্থা। দেশের কতকগুলি লোক ভুললেও গরম দলের কেউ নেবে না ও ব্যবস্থা। ইংরাজ ভাবছে গরম দলকে শেষ করে দিয়েছে। আসলে তা সত্যি নয়। তারা দিন দিন গোকুলে বাড়ছে। এখন শুধু নেতার অপেক্ষা। নেতাও তৈরী। তিনি যেদিন নামবেন আসরে সেদিন ইংরাজ রাজত্বের অবসান।

সরকার তো রেগে খাপ্পা।

এরপর কর্মযোগিনের আর এক সংখ্যায় বের হল অরবিন্দদার প্রবন্ধ—আমার রাজনৈতিক উইল।

আর সহ্য হল না সরকারের, অরবিন্দদাকে গ্রেপ্তারের মতলব করল।

শ্যামপুকুর 'কর্মযোগিন অফিসে' বসে অরবিন্দদা তাশ খেলছেন সেদিন নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ আর রামচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। মতিলাল রায় ও আর কজন যুবককে নিয়ে হঠাৎ এসে হাজির ভগিনী নিবেদিতা। বন্ধ হল তাশ খেলা। নিবেদিতা বললেন—কর্মযোগিনে প্রবন্ধ পড়ে খুবই চটেছে সরকার। আপনাকে গ্রেপ্তার করবার মতলবে আছে। সামসুল আলমের হত্যার সঙ্গেও জড়াতে চায় আপনাকে। কোন প্রতিবাদ না করে আমার সঙ্গে চলে আসুন এক্ষুনি।

নিবেদিতা অরবিন্দদাকে প্রথমে নিয়ে গেলেন উদ্বোধন অফিসে। সেখান থেকে চন্দননগরে মতিলাল রায়ের কাছে কিছুদিন থেকে ব্যবস্থা করলেন পণ্ডিচেরী নিয়ে যাবার। এ সময়ে মতিলাল রায়, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর অরবিন্দদার মামাতো ভাই সুকুমার মিত্র সাহায্য করেছিলেন খুব। তাঁদেরই সাহায্যে বাংলা সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশে [illegible] নাম নিয়ে ফরাসী জাহাজ [illegible] চড়ে অরবিন্দদা গেলেন পণ্ডিচেরী।

এর কদিন পরেই বের হল গ্রেপ্তারের পরোয়ানা। তখন তাঁকে পায় কে? সবাই [illegible] তপস্যা করতে গেছেন। ১৯১৪ সালের ৪ অক্টোবরের তাঁর অনুরক্ত ভক্তরাও [illegible] আলেননি কাউকে।

জেল থেকে খালাস পেয়ে নিজে বরাবর আসা হল এই চালা আশ্রমে। লোকেও মিথ্যে বলে নাই, অরবিন্দদা তপস্যাই করলেন সেখানে।

আটচল্লিশ

সন্ধ্যেবেলা স্বামিজীর কাছে বসলুম মুখোমুখি। তামাক টানতে টানতে বার-দুই মুখপানে চেয়ে বললেন—কি, কাঠগড়ার আসামী নাকি?

ঈষৎ হেসে বললুম—বড় খারাপ লাগছে স্বামিজী। এত বড় প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেল?

—বাহ্যত তাই বটে। কিন্তু বিফল হল কি? রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে কত কষ্টে মাটি ওলট-পালট করে চাষ দিয়ে বীজ বোনে চাষী। ফসল ফলে। পাকা ফসল কেটে এনে হাসি মুখে ঘরে তোলে। পরমানন্দে হয় নবান্ন। এও তাই। কষ্ট করে মাটি ওলটপালট করে বীজ বোনা হল। অঙ্কুর গজিয়েছে। ফসল ফলবে ঠিক সময়ে। অরবিন্দদার কথা কি মিথ্যে হয়? গোকুলে মা-যশোদার স্তন্যপুষ্ট হয়ে বাড়তে লাগল সমিতি।

—এখানে তো এই—অগ্নিদেবের দুটি মাথা আপনারা দুজনে দুদিকে গেলেন সন্ন্যাস যোগ নিয়ে। ওদিকে আন্দামানে নেতারা কি করছেন, স্বামিজী?

—ঘানি টানছে, আর করবে কি! বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাস, অবিনাশ হেমদাস, ইন্দুভূষণ, হৃষিকেশ, সুধীর, বিভূতি ননী-গোপাল—আরও কতগুলি রত্ন ঘানি টানেন সারাদিন। খাবার পান অতি কদর্য। ঘানি টানা কি সোজা—গুরুতর পরিশ্রম।

কুলি মজুর হলেও বা কথা ছিল তা' ভদ্র-ঘরের ছেলে—পারবে কেন? শরীর খারাপ হতে লাগল। জেলখানার ভালমন্দ কিছু বলতে পারবে না কেউ। বললে অকথ্য অত্যাচার। উল্লাস, ননী, ইন্দু প্রতিজ্ঞা করে বসল—ঘানি টানা আর নয়, তাতে যা করে করুক, সইবে তারা। এরা সব কম-বয়সী। বড়দের দল—উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র সবাইকে বোঝালেন—ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকা দরকার। অনেক কাজ। কিন্তু তারা কি শুনল? বন্ধ করল ঘানি-টানা। অমনি আরম্ভ হল পাশবিক অত্যাচার। উল্লাসকরকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সারাদিন রাত চলল প্রহার। ইন্দুভূষণ আর ননীগোপালের ওপর চলল অমানুষিক নির্যাতন। সইতে না পেরে জাঙিয়া ছিঁড়ে গলায় দাঁড় দিয়ে সব জ্বালা জুড়োলো ইন্দুভূষণ। প্রহারের ঠেলায় উল্লাসকর পড়ল প্রবল জ্বরে। তার ওপরে জেল ওয়ার্ডার এমন করে ঘাড় মটকে দিল যে, উল্লাসকর গেল অজ্ঞান হয়ে। চিকিৎসায় জ্বর বন্ধ হল, কিন্তু উল্লাস তখন বদ্ধ পাগল। এমনি কৌশলে মুছে দিল মহাবিপ্লবীর বিপ্লব-বাদ। ননীগোপাল অনশনে মৃত্যুবরণ করতে চাইলে। ৭২ দিন সজ্ঞানে মুখ দিয়ে কিছু খাওয়ানো গেল না তাকে। এই তো অবস্থা।

এই সময় আন্দামান বন্দীদের দেখতে বিলেত থেকে এলেন স্যার রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডক। বিপ্লবীদের ঘানি টানা বন্ধ করে তিনি হুকুম দিলেন নারকেল দড়ি তৈরী করতে। পরিশ্রম কমল কিছুটা।

এবার বাঙলায়। ১৯১১ সালে মর্লি-মিণ্টোর দু-নম্বর চাল। ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড মারা গেছেন। সিংহাসনে বসেছেন পঞ্চম জর্জ। দিল্লীতে দরবার। সম্রাট আসছেন ভারত পরিদর্শনে। সে-কি জাঁক-জমক—কি ধুমধাম। দিল্লীনগরী সাজল উৎসবের সাজে। পঞ্চম জর্জ এলেন। তাঁর মুখ দিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী ঘোষণা করালে মর্লিমিণ্টোর মাকাল ফলের দ্বিতীয়াংশ। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ। কাটা পূর্ব বাঙলা পশ্চিম বাঙলা জোড়া লাগল বটে, কিন্তু আসাম হল আগের মত চীফ-কমিশনারের প্রদেশ। উপরন্তু সঙ্গে পেল গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্ট আর কাছাড়। বিহার আর উড়িষ্যা—যা ছিল এতকাল বঙ্গের অঙ্গ, কেটে বেরিয়ে হল স্বতন্ত্র প্রদেশ। বিহারে জুড়ে গেল মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা আর পূর্ণিয়া। হুকুম হল কলকাতার বদলে দিল্লী হবে ভারতের রাজধানী।

আসল কথা—বাঙলা বিপ্লবের পীঠস্থান। তাই যেন-তেন প্রকারেণ একে ছোট করা চাই-ই।—যাতে জনসংখ্যা বেশি না হয়। জনসংখ্যা বেশি হলে বিপ্লবীও বেশি হবে। দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে যাবার কারণও তাই—বিপ্লব-ভূতের ভয়।

বেনীতি চাল—বঙ্গভঙ্গ রদ। কেউ কেউ খুশিও হলেন বটে, কিন্তু চাল হল বেতালা। ১৯০৫।৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে যে ফল হত এখন কি আর তাই হল?

বঙ্গভঙ্গ রদের দাবীতেই দানা বেঁধে উঠেছিল স্বরাজের দাবী। এখন স্বরাজ না হলে কি থামতে চায়? তাই বঙ্গভঙ্গ রদ হল কিন্তু বিলিতি বর্জন রদ হল না। বিপ্লবীদের কাজও চলতে লাগল গোপনে গোপনে আর প্রকাশ হতে থাকল মাঝে মাঝে।

—কিভাবে প্রকাশ পেতে থাকল, স্বামিজী?—জিজ্ঞেস করলুম উৎসুক হয়ে।

—সে আর এখানে নয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সাঙ্কেতিক নোট আছে। আশ্রমে গিয়ে বলব'খন। এখান থেকে ফেরবার সময়ও হয়ে এল। এখন থাক।

বলে স্বামিজী তুলে নিলেন একখানা বই।

প্রায় দু মাস কাটল গুমোয়। এরপর ফেরবার পালা। কদিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো হল খুব। তারপর একদিন সব গোছগাছ করে নিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে আসা গেল কলকাতায়।

সপ্তাহ দুই থাকতে হল [illegible] লেনে বসাক কাকুর বাড়ীতে।

আগের মতই সব। সকাল বিকেল ভক্ত অনুরাগীদের আসা-যাওয়া আলাপ আলোচনা, বাড়ীর গাড়ীতে চড়ে এখানে ওখানে বেড়ানো। এরই মধ্যে একদিন বাড়ীশুদ্ধ সবাই মিলে যাওয়া গেল বরানগর যোগেন্দ্র বসাক রোডে বসাক ফ্যাক্টরীতে। প্রকাণ্ড বাগান বাড়ীতে রিবিট তৈরীর কারখানা—রিবিট কল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত লোহার রড থেকে মেসিনে রিবিট তৈরী হচ্ছে ঘট ঘট ঘ্যাচাং—ঘট ঘট ঘ্যাচাং কানে তালা লাগবার যোগাড়। কত মিস্ত্রী কাজ করছে কালি ঝুলি মেখে।

পুরানো অফিস ঘরের লাগাও তৈরী হচ্ছে বিরাট তিনতলা নতুন বাড়ী। সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। মাঠের পর কাক-চক্ষু জলে ভর্তি পুকুর।

ঘুরে ফিরে দেখে দু-একটা [illegible] বাতলালেন স্বামিজী।

টবিন রোড, আলমবাজার, দক্ষিণেশ্বর, বরানগর বাজার, কুটিঘাট, কাশীপুর দেখে ফেরা হল বেলা ১১টায়।

বিকেলে এলেন মৃৎশিল্পী গোপেশ্বর পাল। কথা হল এবার স্বামিজী আশ্রমে

ফিরলে পাল মশায় গিয়ে তৈরী করে দেবেন যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর মূর্তি শাদা সিমেন্টের।

নির্দিষ্ট দিনে ফেরা হল আশ্রমে।

ঊনপঞ্চাশ

কতদিন অনুপস্থিত। ঝেড়ে মুছে সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে বসতে কেটে গেল দুদিন। আরও দু-চারদিন পর সন্ধ্যেবেলা চৌকী নিয়ে খাটিয়ার পাশে বসতেই স্বামিজী বললেন—অনেকদিন বন্ধ আছে তোমার গল্পের আসর। তাই না? এবার শোন কটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এলোমেলো মনে হলেও যোগসূত্র আছে তলায় তলায়—

দিল্লীর দরবার, বঙ্গভঙ্গ রদের নামে নতুন করে বঙ্গ অঙ্গচ্ছেদ আর দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে যাওয়ার আদেশ—তিনটিই হয় ১৯১১ সালে।

রাজধানী হঠানো আদেশের দিনেই পুলিশ ইনস্পেকটর মনোমোহন ঘোষ নিহত হল বরিশালে। আবার মৈমনসিং-এর পুলিশ ইনস্পেকটরকে গুলি করল যুবক রাজকুমার।

বজ্র আঁটুনি তবু নামহীন সমিতি দিনে দিনে বাড়ছে গোকুলে। গোপন পরিচালনা করছে বাঘা যতীন, রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ওস্তাদ এরা। এদের আড্ডা হল ১।১নং কলেজ স্ট্রীটে গৌরাঙ্গ প্রেসের বাইরের ঘরখানি। একে একে এসে এখানে মেলে এরা। তারপর সব বিষয়ে আলোচনা হয় প্রেসের ম্যানেজার সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রমজীবী সমবায়ে মিলিত হয়েও চলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার আলোচনা। আবার কখনো কখনো ক্রেতা হয়ে যায় কমলালয়ে। হৃদ্গোপাল আরও কজন বিশিষ্ট বিপ্লবী ক্রেতা হয়ে দরদস্তুর করতে করতেই চালায় ভাবের আদান-প্রদান।

সহপাঠী উল্লাস করের বোমা তৈরীর ফর্মুলা নিয়েছিল রাসবিহারী। সেই ফর্মুলা নিয়ে রাসবিহারী চলে গেল চন্দননগরে। সেখানে মতিলাল রায়কে নেতা করে আরম্ভ করল বোমা তৈরী। অনেক পিস্তল আর রিভলভারও যোগাড় হতে থাকল ফরাসী রাজ্য চন্দননগরে। কিছুদিন পরে রাসবিহারী গেল বাংলার বাইরে—কাশীতে। সেখানে শচীন্দ্র স্যান্যালের সাহায্যে বোমার কারখানা করবার জন্যে তৈরী করে এক এক বিপ্লবী দল।

এইবার দেশের জন্যে দেশছাড়া—মানে বাংলার জন্যে বাংলা ছাড়া। দেশ তো ভারত। বাংলার মর্যাদা অগ্রগামীর মত অক্ষুণ্ণ রাখবে। তা সে হাত-পা কেটে দিলেও কুম্ভকর্ণের মত গড়াতে গড়াতে গ্রাস করবে অশ্ব গজ রথ-রথী—সব।

১৯১২ সাল। ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রবেশ করবেন নতুন রাজধানী দিল্লীতে। বিরাট শোভাযাত্রা। ভারতের রাজন্যবর্গ উপস্থিত। আগে পিছে লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী সৈনিক। মাঝখানে রাজসজ্জায় হাতীর পিঠে সস্ত্রীক লর্ড হার্ডিঞ্জ। এমন সময়ে দূরে থেকে দড়ির সাহায্যে বোমা ছুঁড়ল রাসবিহারী। বোমা ফাটল ভীষণ আওয়াজ করে। হাতীর পিঠের মূল্যবান হাওদাটি গেল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে। মাহুত মারা গেল, হাতীটি আহত হল। হাতীর পিঠ থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন লেডি হার্ডিঞ্জ। আহত হয়ে হাতীর পিঠেই অচৈতন্য হয়ে পড়লেন লর্ড হার্ডিঞ্জ।

ধীর মস্তিষ্ক হার্ডিঞ্জ অচৈতন্য হবার আগেই বললেন—কারুর ওপর কোন অত্যাচার যেন না হয়—

তবু পুলিশ কি ছাড়ে— অনুসন্ধান চাই—আসামীকে ধরতেই হবে। খোঁজ-খোঁজ। প্রত্যেক বাড়ীই খানাতল্লাস। তা বিপ্লবীকে পাবে কোথায়? ঘন্টাঘর ধারের বাড়ীটি ছিল মেয়েদের জন্যে। স্ত্রীবেশে রাসবিহারী বোমা ফেলেছিল সেখান থেকেই। তল্লাসের সময় স্ত্রীবেশেই ঘোমটায় মুখ ঢেকে চলে গিয়েছিল পুলিশের চোখের ওপর দিয়ে। তারপরে আর ধরে কে? রাসবিহারীকে ধরবার জন্যে ২০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। আর হল রামের অপরাধে শ্যামের দণ্ড—সন্দেহ করে দুজন নিরপরাধের ফাঁসি। সরকারের পুরস্কার ঘোষণাই সার হল—আজ পর্যন্ত পায়নি কেউ।

ছদ্মবেশে রাসবিহারী সোজা চলে গেল পাঞ্জাবে। সেখানেই বেশ কিছুকাল রইল সে। এই সময়ে লাহোরের গভর্নরকে বোমা মারতে গিয়ে মারা পড়ল এক নির্দোষ মানুষ। পুলিশ তদন্তে ধরা পড়ল দিল্লীর আমিরচাঁদ। এ্যাপ্রুভার হয় পাঞ্জাবের দীননাথ। দিল্লীতে বোমার কথায় রাসবিহারী বসু আর বসন্ত বিশ্বাসের নাম করে সে। রাসবিহারী গা ঢাকা দেয়, বসন্ত বিশ্বাস ধরা পড়ে। লাহোর বোমার মামলায় ফাঁসি হয় তার। রাসবিহারীকে ধরবার জন্যে আরও মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়।

১৯১৫ সালে পাঞ্জাবে সর্বনাশ। পাঞ্জাব তথা সারা ভারতে বিপ্লব অভ্যুত্থানের দিন স্থির হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী। সারা দেশের সিপাহী আর বিপ্লবীরা একযোগে করবে বিপ্লব—দ্বিতীয় সিপাহী বিপ্লব আর কি। গোপন তারিখটি ফাঁস হয়ে যায়। তাই ২১শের বদলে ঠিক হয় ১৯শে ফেব্রুয়ারী। বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং—রাসবিহারী, পিংলে আর কর্তার সিংকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

বাইশ বছরের পাঞ্জাবী যুবক কর্তার সিং আর মহারাষ্ট্রী যুবক পিংলে এসেছিল আমেরিকা থেকে দেশের টানে। এসেই মহা-উৎসাহে জুটেছিল রাসবিহারীর সঙ্গে। কর্তার সিং আর দলের সবাই ধরা পড়ে, পিংলে আর রাসবিহারী পালায়। বিচারে কর্তার সিং আর কজনের ফাঁসি আর অনেকের দ্বীপান্তর হয়।

এরপর রাসবিহারী চলে যায় কাশী। পিংলেকে পাঠায় মীরাটে, যদি কিছু কাজ করা যায় ওখানে। ওখানকার দেশী সিপাইরা রাজী। পিংলে রাত্রে থাকে ব্যারাকে। হঠাৎ নজর পড়ে এক অফিসারের। রাতারাতি গোরা সৈনিকরা নিয়ে নেয় পিংলেদের ম্যাগাজিন আর চাবি। দেশী সিপাইরা আর পিংলে গ্রেপ্তার হয় সকালে। তারপরে আর কি—ওদের বাঁধা ধরা নীতি—পিংলের ফাঁসি। ফাঁসি বা দ্বীপান্তর হয় আরও অনেকের।

কাশীতে শচীন্দ্র স্যান্যালের বিপ্লবীদের কিছুদিন দলের অনেককে বোমা ও রিভলভারের প্রয়োগ রহস্য শেখায় রাসবিহারী। তারপর চলে আসে বাংলায়। কিছুদিন চন্দননগরে মতিলাল রায়ের কাছে থেকে দেখে দেশে কোন কাজে যোগ দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। শেষে দেশের বাইরে গিয়ে দেশের কাজ করবার জন্যে রাসবিহারী ১৯১৫ সে ছদ্মবেশে ছদ্ম নামে চলে যায় জাপানে। সেখানেই বিয়ে থা করে আজীবন জাপানবাসী হয়ে রইল সে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্যে জাপানের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল রাসবিহারী।

আজ এই পর্যন্তই থাক। কাল হবে কর্ণ পর্ব—অমর শহীদের অমর কীর্তি। রথ-চক্র-আবদ্ধ নিরস্ত্র মহাবীরের আত্মা-র্পণ। সপ্তরথীতে ঘেরা অমিততেজা অভিমন্যু।

পঞ্চাশ

সন্ধ্যেবেলা ক্ষুণ্ণমনে [illegible] বর্ণপর্ব বাকী। তার আগে একটা কথা—সবই তো ছত্রভঙ্গ। নেতারা দিকে দিকে। আন্দোলন জোরদার করবার পত্র-পত্রিকাগুলিও বন্ধ। দেশবাসীর উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাত কি করে? কর্মীরা সব ঝিমিয়ে পড়েছিলেন তো?

—ঝিমিয়ে পড়বে? অত সহজ নয়। আলাদা ধাতুতে তৈরী সব। ছত্রভঙ্গ তো বটেই, যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি, পত্র-পত্রিকা পড়াও নিষিদ্ধ। তা হোক, যুগান্তর বাঁধা ভাষায় যুগান্তর এনে ভাসাতে কারা? বীরবাণী। পত্র-পত্রিকা গেল, লেখা হল বই। কবিকুলতিলক কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নি-বীণায় অগ্নি ঝঙ্কার। দেশের সেই অবস্থায় কর্মী ও নেতাদের দিগদর্শী ভাষা কি? যেমন ভাষা, তেমনি ভাব, যেমন ছন্দ, তেমনি সুর। গুপ্ত সমিতির প্রাণ নজরুলই প্রদীপ্ত গীতিরূপ—দীপক রাগ। জান সেই গানটি—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু...

—জানি স্বামিজী, গাইতে পারি না, বলতে পারি।

—আচ্ছা, বল দেখি—কোলের ওপর দুহাত রেখে সোজা হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন স্বামিজী।

আবৃত্তি করলুম

দুর্গম গিরি কান্তার মরু
দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে
যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল,
ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল,
কার আছে হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান,
হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।

এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি,
নিতে হবে তরী পার
তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী
সান্ত্রীরা সাবধান?
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা
ঘোষিয়াছে অভিযান।

ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে
পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে,
দিতে হবে অধিকার।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া,
জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার
মাতৃমুক্তি পণ!

হিন্দু না ওরা মুসলিম?
ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?
কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোরা মা'র।
গিরি সংকট, ভীরু যাত্রীরা,
গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ পথ যাত্রীর মনে
সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ?
ত্যজিবে কি পথমাঝ?
করে হানাহানি তবু চলো টানি
নিয়েছ যে মহাভার।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ
পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা
ক্লাইভের খঞ্জর।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়
ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে
রাঙিয়া পুনর্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা
জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

মাথা দুলিয়ে স্বামিজী বললেন—এই তো! বোঝ এর মর্ম? স্বদেশী আন্দোলনকে উৎসাহিত করবার জন্যে অবিনাশ ভট্টাচার্য লিখলেন—'বর্তমান রণনীতি' আর 'মুক্তি কোন পথে'; হল বাজেয়াপ্ত, আলিপুর বোমার মামলা শেষ হবার আগেই ১৯০৮ সালে মে মাসের ১লা কি ২রা হবে। এইসব বই-এর অনুসরণে কিরণচন্দ্র মুখুজ্জে লিখলেন—কঃ পন্থাঃ। বই বের হবামাত্র বই-খানি বাজেয়াপ্ত তো হলই, শাস্তি হল কিরণ মুখুজ্জের।

বাংলার তো এই হাল।

মহারাষ্ট্রে তিলক মহারাজ কারাগারে। পাঞ্জাবের বীর শ্রেষ্ঠ লালা লাজপত রায়, অজিত সিং নির্বাসনে। কাথিয়াবারের স্বামিজী কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে প্রতিষ্ঠা করেন একটি আশ্রম। নাম হয় ইণ্ডিয়া হাউস। এই আশ্রম থেকে বৃত্তি দিয়া মহারাষ্ট্রের যুবকদের আনা হত বিলেতে পড়বার জন্যে। আশ্রমের বৃত্তি নিয়ে যুবক মদনমোহন ধিংড়া আর বিনায়ক দামোদর সাভারকর বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়ছে তখন।

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের বড় ভাই গণেশ দামোদর সাভারকর বিপ্লবীদের জন্যে লেখে 'লঘু অভিনব ভারত মেলা'। বইখানি প্রকাশিত হল পুণা থেকে। লেখক ফলও পেলেন হাতে হাতে। গণেশ দামোদরের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এতে বিলেতে স্বামী কৃষ্ণবর্মার ছাত্রদের মধ্যে হল দারুণ বিক্ষোভ আর অশান্তি। প্রতিহিংসায় স্যর কর্জন ওয়েলিকে লণ্ডন শহরেই হত্যা করল মদনমোহন ধিংড়া। লণ্ডনেই ফাঁসি হল তাঁর।

এদেশে কি বিপ্লব বন্ধ হল? ভারতে নাসিক জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন সাহেব মারা পড়ল বিপ্লবীদের হাতে। লর্ড মিণ্টোকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হল আমেদাবাদে। এর জন্যে ফাঁসি হল দুজন বিপ্লবী যুবকের।

পুলিশ সন্দেহ করল এই সব হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে বিলাতের বিনায়ক দামোদর সাভারকর। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে বিনায়ককে জাহাজে পাঠিয়ে দিল ভারতে। জাহাজ ফ্রান্সের উপকূলের কাছে আসতেই বিনায়ক দামোদর সমুদ্রে মারল এক ঝাঁপ। তারপর সাঁতার কেটে একেবারে ফ্রান্সের মার্শাই বন্দরে। ফ্রান্সের পুলিশ গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দিল ভারতে। বিচার হল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ড। আবার জাহাজে পাঠান হল আন্দামানে।

অমিত শক্তিশালী যুবক। এবারেও পুলিশের চোখে ধুলি দিয়ে হাতের পাশের বেড়ি ভেঙে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষটায় ধরা পড়ে। আন্দামান যেতে হয় বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে। বড়ভাই গণেশ দামোদর সাভারকর তো আগে থেকেই ছিলেন সেখানে, আর ছিলেন বাংলার বারীন ঘোষ, প্রমুখ প্রমুখ অনেক বীর। তাঁদের সঙ্গে পোর্ট-ব্লেয়ারে সেলুলার জেলে ঘানি টানবার কাজ পায় বিনায়ক।

কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধ। মহাবীরের মহা-রণটা হল না আজ। কাল হবে।

স্বামিজী চুপ করলেন।

একান্ন

সন্ধ্যেবেলা। স্বামিজী বললেন—আজ মহাবীরের মহারণ, কি বল?

—পশ্চিমবঙ্গে সমিতিগুলির ভার পড়ে-ছিল বাঘের ওপর—যতীন মুখুজ্জে। বাঘই বটে একেবারে সুন্দরবনের আদকোড়া বাঘ। যেমন তেজ, তেমনি শক্তি—জ্বলন্ত আগুনের গোলা। আবার বুদ্ধির প্রাখর্যও তেমনি। পশ্চিম বাংলার বিপ্লবীদের 'অবিসংবাদিত নেতা' বলে মেনে নিয়েছে সবাই। শুধু পশ্চিম বাংলায় কেন—সারা বাংলায় যত বিভিন্ন বিপ্লবী দল ছিল, সবাই নেতার পদে বরণ করল বাঘাকে। বাংলার বাইরে কাশীর শচীন স্যান্যালও নেতা বলে মেনে নিল তাকে।

এই সময়েই বিপ্লবের কাজ আবার উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। আবার দরকার মত খুন-জখম-ডাকাতি। দেশের স্বাধীনতা ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় খুন-জখম-রক্তপাতে। চাই অস্ত্রশস্ত্র। অস্ত্রের জন্য চাই টাকা। টাকাওয়ালারা, টাকার কুমীররা হাঁ করেই আছে, নিতে জানে, দিতে জানে না—সুতরাং ডাকাতি লুটপাট। স্বদেশী ডাকাতি তাই পাপ নয়—বহু জন-হিতায় জগদ্ধিতায় যে কর্ম।

যতীনের পরিচালনা। ১৯১৩ সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর বিপ্লবীদের রিভলভারের গুলিতে মারা পড়ল হেড কনস্টেবল হরিপদ দেব। ঐ বছরেই রাজাবাজার বোমার মামলা। আপার সার্কুলার রোডের ২৯৬-১ নম্বর বাড়ী খানাতল্লাসীতে পুলিশ গ্রেপ্তার করল শশাঙ্ক ওরফে অমৃতলাল হাজরা আর অন্য তিনজনকে। তারা সিগারেটের টিনে বোমা তৈরী করত সেখানে। সেই টিন আর বিপ্লব সংক্রান্ত কাগজপত্র পড়ে পুলিশের হাতে। পনেরো বছর নির্বাসন দণ্ড হয় শশাঙ্কের। শশাঙ্ক হাজরা যে রকম বোমা তৈরী করত ঠিক সেই রকমই বোমা কলকাতা, মৈমনসিং, মেদিনীপুরেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৯১৪ সালে ১৯শে জানুয়ারী চিৎপুর রোড আর গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম থেকে নামবার সময় পুলিশ ইনস্পেকটর নৃপেন্দ্র ঘোষকে গুলি করে মারে দুজন বিপ্লবী। একজন যায় পালিয়ে। আর একজন নির্মল-কান্ত রায় ধরা পড়ে পালাতে গিয়ে। একটা ছোট ছেলে অনন্ত তাকে চেপে ধরে তার চাদর। তাকেও গুলি করে মারে নির্মল। পাঁচঘরা রিভলভার ছিল তার হাতে। হাই-কোর্টে দুবার বিচার হয় তার। দুবারই তার পক্ষ সমর্থন করেন বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার সি নর্টন। অধিকাংশ জুরীর মতে নির্দোষ বলে খালাস পায় নির্মল।

এই সালেই ডাকাতি হল বরানগর, আলমবাজার, বৈদ্যবাটী আর আড়িয়াদহে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা ইউনিভারসিটি কনভোকেশনে আসবেন বড়লাট। ব্যবস্থা করেছে দুঁদে পুলিশ ইনস্পেকটর সুরেশ মুখুজ্জে। হঠাৎ সামনে এসে হাজির বাঘের দোসর চিত্তবাঘ- বাঘার সহকর্মী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। ফেরারী আসামী সে। ইনস্পেকটর গেল তাকে ধরতে। অমনি চিত্তপ্রিয় আর চারজন বিপ্লবীর পিস্তল উঠল গর্জে। ইনস্পেকটর সুরেশ মুখুজ্জের ভবলীলা সাঙ্গ। বিপ্লবীরা উধাও। এও বাঘার পূর্ব পরিকল্পনা।

১৯১৪ সালে ২৮শে অকটোবর নতুন কায়দায় ডাকাতি হল ইংরেজ অস্ত্রব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত রডা কোম্পানীতে। কোম্পানীর এক কেরানী কাস্টম হাউস থেকে ২০২ বাক্স অস্ত্র গুলি বারুদ কার্টিজ ছাড় করে তার ১৯২ বাক্স এনে রাখল রডা কোম্পানীর গুদামঘরে। ম্যানেজারের প্রশ্ন – আর দশ বাকস কই? —এনে দিচ্ছি বলে কেরানী বের হল গুদামঘর থেকে। বের হল তো বটেই আর ফিরল না সে। একেবারে নিরুদ্দেশ। ঐ বাক্সে ছিল ৫০টি বড় আকারের মশার পিস্তল, আর ৪৬০০০ বার গুলি ছোঁড়ার উপকরণ। মশার পিস্তল যে বাক্সে থাকে সেই বাক্সটি কুঁদোয় লাগিয়ে দিলেই হয়ে যায় রাইফেল। কাঁধে রেখেই ছোঁড়া যায় তখন। বাংলার নটি বিভিন্ন কেন্দ্র বিপ্লবীরা ভাগ করে নিয়েছিল এই ৫০টি মশার পিস্তল আর ব্যবহার করেছিল বহু হত্যা আর ডাকাতিতে।

সরকারও বসে ছিল না। পুলিশী নির্যাতন, ধর-পাকড়, খানাতল্লাসীর হিড়িক। ৩৯ নম্বর পাথুরিয়াঘাটা খানাতল্লাসীতে পুলিশ পেল একটা সাংকেতিক ফর্দ। তা থেকে ওরা জানতে পেরেছিল বিপ্লবী সংঘের অস্ত্রশস্ত্রগুলি আছে কোন্ কোন্ জায়গায়। আর জেনেছিল—বোমা ও বিস্ফোরক তৈরী হয় তিন রকমে—তামা-পিতলের খোল পাত্র চোঙের আকারে আর নারকেলের খোলে।

তাহলেও বন্ধ হয়নি স্বদেশী ডাকাতি। বেপরোয়া ভাব। গোপীমোহন রায়ের গদিতে ১২৩০০ টাকা নিয়ে গেল ডাকাতরা। যার বাড়ীতে ডাকাতি, তিনি পেলেন শীলমোহরকরা এক চিঠি। শীলমোহরে আঁকা ছিল ভারতবর্ষের ম্যাপে বাংলার মাথায় সূর্যোদয়। ম্যাপের চারপাশে গোলাকার বৃত্ত। ওপরের দিকে বাংলায় লেখা—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। নিচের অংশে ইংরাজীতে লেখা— United India.

বেশ বড় চিঠি। সারাংশ—আমাদের কলকাতার রাজস্ব বিভাগের দুজন অবৈতনিক কর্মচারীর নেওয়া ৯৮৯১ টাকা আপনার কাছে ধারস্বরূপ নেওয়া হয়েছে। পরে সুদসহ ফেরত দেওয়া হবে। আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওটি আপনার নামে জমা রইল। ঈশ্বরের দয়ায় আমরা কৃতকার্য হলেই একসঙ্গে সুদসহ আপনাকে ফেরত দেওয়া হবে। আপনি মহানুভব, আমাদের কর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন। আমাদের কর্মচারীরাও নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছে। আপনি কথায় বা কাজে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে বা আমাদিগকে পুলিশের হাতে দিলে আমরা আমাদের কথা বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারব না। পুলিশরা আমাদের কাজের বিরোধী। সেই জন্যে সম্মিলিত ভারতের শাসনতন্ত্র ঐ পুলিশ কর্মচারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে ত্রুটি করে নাই। ইংরাজ সরকার শত চেষ্টা করেও তাদের রক্ষা করতে পারে নাই। তাই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আপনি এমন কিছু করবেন না, যাতে পুলিশের রক্তে মাতৃভূমিকে কলুষিত করতে বাধ্য হই। বিদেশী শাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করতে হলে দেশবাসীদের স্বার্থত্যাগ, অর্থদান ও সহানুভূতি দরকার। আমাদের কাজের গুরুত্ব বুঝে ধনীরা যদি মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক অর্থদানে দেশের সনাতন ধর্ম স্থাপনে সাহায্য করতেন তাহলে দেশবাসীকে এমনি করে কষ্ট দিতে হত না। আমাদের প্রস্তাব না মানলে আমাদের এমনি করেই টাকা যোগাড় করতে হবে। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নতুন ক্ষত্রিয় ধর্ম নিয়ে বিদেশী শৃঙ্খল থেকে দেশকে উদ্ধার করারূপ মহাযজ্ঞ করবার সংকল্প করেছি। আপনি কি আমাদের জন্যে কিছু খরচ করতে কুণ্ঠিত হবেন? জাপানের উন্নতি হয়েছে ধনীদের দ্বারাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে দেশবাসীকে উপযুক্ত মন আর শক্তি দান করুন।

(স্বাঃ) জে বলবন্ত
মিলিত স্বাধীন ভারত রাজ্যের বঙ্গ-
শাখার রাজস্ব সম্পাদক

এরপর যতীনের পরিকল্পনা যেমন বিরাট, তেমনি বিপদাশঙ্ক, তেমনি অমিত সাহসের পরিচায়ক। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনাতে হবে, দেশের সর্বত্র বিপ্লবীদের হাতে ঐ অস্ত্র তুলে দিয়ে সারা ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে। ভারতের বাইরে প্রাচ্যদেশে বিপ্লবী জাগিয়ে তুলে ব্রহ্মদেশ অধিকার করতে হবে। পশ্চিমে স্বাধীন ভারত রাজ্য স্থাপন করতে হবে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অধিকার করতে হবে।

চাই অর্থ। বিদেশ থেকে অস্ত্র আনতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। ডাকাতি ছাড়া উপায় কি—স্বেচ্ছায় দেবে না যখন ধনকুবেররা। আরম্ভ হল ডাকাতি। ১৯১৪ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটার এক চাউল ব্যবসায়ীর ক্যাসিয়ারের কাছ থেকে ২২০০০ টাকা জোর করে নিয়ে আসা হয়। বিপ্লবীরা ডাকাতি করতে গিয়েছিল ট্যাকসি চড়ে। ফেরবার সময় ট্যাকসি-চালক কথা না শুনে অন্য পথে ট্যাকসি চালালে গুলি করে মেরে তাকে ফেলে দেওয়া হল ট্যাকসি থেকে।

তারপর গার্ডেনরিচ ডাকাতি। ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী বার্ড কোম্পানীর এক দারোয়ান ব্যাঙ্ক থেকে ২২০০০ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গার্ডেনরিচ কোম্পানী মিলে। তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় ঐ টাকা। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্র রায়), সুরেশ মজুমদার, পশ্চিম বাংলার আরও অনেকে ধরা পড়ে। অনেকদিন মামলা চলবার পর খালাস পায় সবাই।

এরপর বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ।

আমেরিকায় গদর পার্টির কাজ চলেছে পুরোদমে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের যুগান্তর আশ্রম আর হরদয়ালের গদর পার্টি মিলে হয়েছে এক। নেতা হরদয়াল জার্মান সম্রাটের অর্থ সাহায্য আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতবর্ষে বিপ্লব করতে ইচ্ছে করল। মালয়ের গুরুদিৎ সিং 'কোমাগাটামারু' নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে কানাডায় যেতে চাইল। এই জাহাজে কলকাতা আর সিঙ্গাপুর থেকে বহু যুবক নিয়ে গুরুদিৎ সিং হাজির হল কানাডায়। সে সময় মাথাপিছু ২০০ ডলার না দিলে কানাডায় নামতে দেওয়া হত না কাউকে। কানাডার উপকূল ছেড়ে কোমাগাটামারু ফিরে এল সিঙ্গাপুরে। সেখানেও নামতে দেওয়া হল না কাউকে। শেষে ১৯১৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কোমাগাটামারু এল বজবজে। গভর্নমেন্ট যাত্রীদের স্পেশাল ট্রেন করে এখানেও নামতে না দিয়ে সোজা পাঠাতে চাইল পাঞ্জাব। এই আদেশ [illegible] পালন করতে রাজী হল না যাত্রীরা। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল। বহু লোক হতাহত হল। বহু যাত্রী অন্ধকারে [illegible] গেল পালিয়ে। এই সব বিপ্লবীদের মধ্যে তিনশত শিখ বন্দী হল। [illegible] পাঞ্জাবে বিদ্রোহ হয়। নেতা রাসবিহারী, ভাই পরমানন্দ আর পিংলে। এক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে কেমন করে তা ব্যর্থ হল [illegible]।

১৯১৪ সালে জার্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। জার্মানীতে যেসব ভারতীয় আর বাঙ্গালী বিপ্লবীরা ছিল তারা বিপ্লবের জন্য জার্মানীর সাহায্যে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল। ১৯১৫ সালে মার্চ মাসে প্রথমেই জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ইউরোপ থেকে বোম্বাই এসে খবর দেন জার্মানী বিপ্লবে সাহায্য করবে। ব্যাটাভিয়ায় কাজ করবার জন্যে একজন এজেন্ট পাঠাতে বললেন তিনি। যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী ভোলা চাটুয্যেকে আগেই পাঠিয়েছিলেন ব্যাঙ্ককে। ভূপতি মজুমদার গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরে। এখন নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে পাঠানো হল ব্যাটাভিয়ায় জার্মানদের সঙ্গে কার্যক্রম ঠিক করতে। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য সি, মার্টিন ছদ্মনামে গেল ব্যাটাভিয়া। ঐ মাসেই অবনী মুখুজ্জে নামে আর একজনকে পাঠানো হল জাপানে।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পরিক্রমা

প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible] ফল কী হতে পারে তার [illegible] হিসাবে আমরা তিনটি [illegible] করতে পারি :

১। অতীত নির্বাচনের তথ্য,
২। বর্তমান পরিবেশ, রাজনৈতিক [illegible] বিন্যাস—জোটবন্দীর প্রকৃতি,
৩। [illegible] বর্তমান মানসিকতা [illegible]।

[illegible] সালের সঙ্গে এমনকি ৬৭ বা [illegible] সঙ্গে '৭২ সালের রাজ্যের [illegible] ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি [illegible] জোটবন্দীর প্রকৃতি এবং [illegible] মানসিকতায় বিশেষ মিল [illegible] না। ফলে, অতীতের [illegible] দিয়ে সব্বই আমরা [illegible] ফলের সন্ধানে যান না [illegible] ভোটের গতি-প্রকৃতি বা [illegible] ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছান [illegible] অবশ্য কিছুটা আভাস মিলতে [illegible]

[illegible] মনস্তত্ত্ব নিয়েই এবার [illegible] করছি। প্রথমেই উল্লেখ করছি [illegible] ২০ শতাংশ অধিবাসী মুসলমান-[illegible] কেন্দ্র করে কারণ, রাজ-[illegible] মুসলমানদের মনোভাব নিয়ে [illegible] সৃষ্টি হয়েছে। বামপন্থী [illegible] শরিক সি পি এম এবং [illegible] কৌশলী প্রচারকরা বলছেন: পূর্ব [illegible] ধ্বংসের জন্য শাসক কংগ্রেস ও [illegible] শ্রীমতী গান্ধী দায়ী। কাজেই [illegible] কংগ্রেসের ওপর বীতশ্রদ্ধ। উর্দু [illegible] বিভিন্ন বামপন্থী মুসলমান [illegible] বলে প্রচারিত বিবৃতিতে [illegible] করা হয়েছে যে, কংগ্রেস মুসল-[illegible] স্বার্থরক্ষা করে না, বরং ইসলাম-[illegible] মুসলিম লীগের নেতারাও [illegible] ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিবিধ [illegible] মুসলমান ভোটারদের মন-[illegible]।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক [illegible] মুক্তি সংগ্রামকে সর্ববিধভাবে [illegible] করে, পাকিস্থানী সৈন্যদের নারকীয় অত্যাচার স্তব্ধ করে, সাধারণ মুসলমান নাগরিকদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়ে এবং শরণার্থীদের আবার স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়ে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির ব্যবস্থা করে—এককথায় বাংলাদেশে স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করে ভারত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি ভুল করেছেন? নিশ্চয়ই না। এই রাজ্যে মুসল-মানরা কী স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হোক, ইয়াহিয়ার দানবীয় অত্যাচার বন্ধ হোক চাননি? তাঁরাও চেয়েছেন, বাম-পন্থীরা চেয়েছেন। সারা ভারতবাসীই চেয়েছেন। তার জন্য মুসলমানদের মোক্ষম কংগ্রেস বিরোধী হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। অবশ্য যাঁরা দু' নৌকায় পা দিয়ে সুবিধাভোগীর সুবিধা পেতে চেয়েছিলেন সে হিন্দুই হোন, আর মুসলমানই হোন তার মনে কষ্ট হোতে পারে। অবশ্য ইয়াহিয়ার পক্ষে ওকালতি করার লোক এই রাজ্যে কেউ নেই একথা বলা ঠিক নয়। আমরা নিশ্চিত সীমান্তের আটটি জেলার বাঙালী মুসলমান কংগ্রেস এবং শ্রীমতী গান্ধীর পরিচালনায় সরকারের বিরুদ্ধে অন্য কারণে বিরুদ্ধে গেলেও, বাংলাদেশের প্রশ্নে যাচ্ছেন না। অবশ্য, কলকাতা ও শিল্পা-ঞ্চলের অবাঙালী বিহারী ও উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থানকারী অবাঙালী মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোতে পারেন। কিন্তু যারা ভারত ছেড়ে বাংলা-দেশে গিয়েছিলেন পাকিস্থানই যাঁদের প্রিয়ভূমি তাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সেখানকার সরকার ও জনগণই নির্ণয় করবেন। কলকাতা বা শিল্পাঞ্চলের মুসল-মানরা এই ব্যাপারে নাক গলালে বাংলা-দেশের নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমান ভাইদের তারা বিব্রত করবেন। বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকাংশই মুসলমান। তাঁরা নিশ্চয়ই মুসলমান বা হিন্দু কাউকেই বিতাড়িত করবেন না। কাজেই বাংলাদেশের **পশ্চিমবাংলায় মুসলমানদের ক্ষোভ ও রাগের কারণ থাকতে পারে না।**

রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কারণে মুসলমানদের ক্ষোভ কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে থাকতে পারে। বামপন্থীরা সেই ক্ষোভে ঘৃতাহুতি দিয়ে ভোট আদায়ের কৌশল করতে পারেন—এই সন্দেহ কতটা বাস্তব তা অবশ্য জানা সম্ভব নয়। কার কি মনে আছে তা বাইরে থেকে বুঝা কঠিন।

১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী যুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিকতা, ভোটের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তারা সব সময়েই স্থানীয়ভাবে বা জেলায় বিভক্ত। কংগ্রেসকে তারা সব কেন্দ্রে বরাবর সমর্থন দেয়নি। তেমনি বামপন্থীরাও সব সময় সমান সমর্থন পায়নি। ১৯৬৭ ও '৬৯ সালে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের মূলে গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের পাশ বদলের প্রভাব প্রতি-ফলিত হয়েছিলো। এই প্রসঙ্গে আমরা কিছু অতীত তথ্য তুলে ধরতে পারি। মুসলমানগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলার ১৮টি আসনের মধ্যে বরাবরই অন্যূন ১০টি আসনে মুসলমান প্রার্থী নির্বাচিত হচ্ছেন। তেমনি মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও ২৪ পরগণা, বর্ধমান, বীরভূম, কোচ-বিহার, কলকাতায় প্রত্যেক বারেই ৬ থেকে ১ জন করে মুসলমান প্রার্থী নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে ৩৬ জন, ১৯৬৯ সালে ৩৮ জন এবং ১৯৭১ সালে ৪০ জন মুসলমান প্রার্থী বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে কংগ্রেস দলের ১৭ জন, বামপন্থীদের ১৭ জন, মুসলিম লীগের ৬ জন এম-এল-এ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কাজেই মুসলমান ভোটাররা যে দুই তিন অংশে বিভক্ত এটা নতুন ঘটনা নয়। রাজ্যের ২৮০টি আসনের মধ্যে ৭৫টি আসনে মুসলমানরা ভোটে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এদের মানসিকতায় কিছু পরিবর্তন এলেও তারা **কংগ্রেসকে ত্যাগ করে বামপন্থী বা মুসলিম লীগের গলায় বিজয় মাল্য তুলে**

দেবে এমন মানসিকতা কোথাও নেই। কিছু কিছু পকেটে ভোটের কিছু হেরফের ঘটতে পারে। কারণ, মুসলমানদের এক বিরাট অংশ অনিশ্চিতমনা বা কোন দলের নির্দিষ্ট ভোটার নয়। তাই সবারই মুসলমানদের মানসিকতা নিয়ে সন্দেহ বা উদ্বেগ জেগেছে।

এরই পাশে উদ্বাস্তু বাসিন্দা, অবাঙালী সাধারণ শ্রমিকদের মনোভাব ক্রমশ বামপন্থীদের প্রতিকূলে হয়ে উঠছে এমন তথ্যও হাজির হচ্ছে। বামপন্থীরা মুসলমানদের মধ্যে যত বেশী বাংলাদেশের জন্ম ও পাকিস্থান ধ্বংসের জন্য কংগ্রেসের ওপর দোষ চাপাচ্ছে ততই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের (পূর্ববাংলার বিতাড়িত, নিপীড়িত হিন্দু) মধ্যে স্বভাবতই কংগ্রেসের অনুকূলে মনোভাব গড়ে উঠছে। কারণ, বাংলাদেশের জন্মকে তাঁরা সবচাইতে বেশী অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা দেশে আবার ফিরে না গেলেও তাঁরা এটা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছেন যে পূর্ববাংলায় আর দাঙ্গা হবে না, হিন্দু ও মুসলমান ভাই ভাই হিসাবে সুখে বসবাস করবে এবং তাদের মতো বাংলাদেশের মানুষকে আর উদ্বাস্তু হয়ে কোনদিন জীবনযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। পূর্ববাংলার হিন্দুরা (যারা এখন পশ্চিমবাংলার স্থায়ী বাসিন্দা) তারা আরও খুশী এই ভেবে যে দুই বাংলার মানুষের মধ্যে সখ্যতা-প্রীতি বাড়বে, যাতায়াত সহজ হবে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটবে।

রাজ্যের অধিবাসীদের মানসিকতায় সাধারণভাবে কিছু পরিবর্তন এসেছে। তারা সন্ত্রাস চায় না। হিংসার আগুন যারা প্রজ্বলিত করেছিলো তারাই এখন সেই আগুনে পুড়ে মরছে—এটাই স্বাভাবিক। শ্রেণী সংগ্রামের নামে কৃষকে কৃষকে, শ্রমিকে শ্রমিকে, শিক্ষকে শিক্ষকে, ছাত্রে ছাত্রে, কর্মচারীতে কর্মচারীতে মারপিটের দুঃখজনক পরিণতি কী ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে তা সাধারণ বুদ্ধিজীবী বা খেটে খাওয়া মানুষ উপলব্ধি করেছে। হিংসার প্রশ্রয় দিয়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি বা বেকারী দূরের কথা বলা অর্থহীন। অবশ্য এটা ঠিক, রাজ্যের কংগ্রেসবিরোধী ও কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটারের হার বেড়ে গেছে। অনিশ্চিতমনা, কোনও দলীয় বাঁধা ভোটার নন এমন ভোটারের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে।

এছাড়া, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তির উজ্জ্বল আলো সাধারণের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। শ্রমিক ও কৃষক শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব এখন ক্রমশ কমছে। যুবকদের চিন্তায় ওলটপালটের ভাব রয়েছে। আগে যেমন যুবক ও ছাত্র মানেই কংগ্রেসবিরোধী বলে ধরা হোত, আজ তার বিপরীত। কংগ্রেসের দিকে ছাত্র ও যুবকদের ক্রমবর্ধমান ঝোঁক অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

কানঘেঁষা আসন

আপনাদের প্রথমেই কানঘেঁষা আসনগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে বলছি : অর্থাৎ যেসব আসনগুলো ১৯৭১ সালে সংখ্যালঘু ভোটে, সামান্য ভোটের ব্যবধানে জয়ী কেন্দ্র। এগুলো ধরে রাখা এবার বেশ কঠিন। সি পি এম জোটের প্রার্থীরা খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে গতবার এই কেন্দ্রগুলোতে বিজয়ী হন : ২৪ পরগণার সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, কুলতলি, গোসাবা, বারুইপুর মগরাহাট পূর্ব, কুলপি, মহেশতলা, দার্জিলিং-এর জোড়বাংলো, মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজোল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা, নদীয়ার কালীগঞ্জ, শান্তিপুর, রাণাঘাট পশ্চিম, রাণাঘাট পূর্ব, কলকাতার মাণিকতলা, মেদিনীপুরের ভগবানপুর, খেজুরী, মুগবেড়িয়া, পুরুলিয়ার বলরামপুর, রঘুনাথপুর, বাঁকুড়ার ইন্দপুর, সোনামুখী, কোতলপুর, বর্ধমানের আসানসোল, বর্ধমান দক্ষিণ, কেতুগ্রাম, বীরভূমের বোলপুর, রাজনগর। এই জোটের পক্ষে এবার এই ৩০টি আসন কী রক্ষা করা সম্ভব হবে?

তেমনি কংগ্রেস-সি পি আই জোটের কানঘেঁষা আসন হোল জলপাইগুড়ির কালচিনি, ফলাকাটা, ধূপগুড়ি, রাজগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ, মালদহের রতুয়া, মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ, খড়গ্রাম, ২৪ পরগণার ক্যানিং, গার্ডেন রীচ, মগরাহাট পশ্চিম, বীজপুর, কলকাতার কবিতীর্থ, বেলেঘাটা দক্ষিণ, জোড়াতলা, হুগলীর চুঁচুড়া, দাঁতন, গোপীবল্লভপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর। এই ২০টির অধিক আসন কী এবার এই জোট রাখতে পারবে?

অতীতের নির্বাচনী অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে কানঘেঁষা আসনগুলোর প্রায় অর্ধেকাংশের হাতবদল প্রত্যেক নির্বাচনেই ঘটেছে। এবার কানঘেঁষা আসনের ফলাফল সি পি এম-এর বিরুদ্ধে যাবে—এ ধারণার যথেষ্ট তথ্য আছে।

এই '৭২ সালের নির্বাচনে অবশ্য পরিসংখ্যান ভিত্তিক আলোচনায় প্রায়ই বলা হচ্ছে যে এবার শাসক কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, এবং সি পি আইর মধ্যে ভোট ভাগ হচ্ছে না। কাজেই এই মোর্চার অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রগুলোতে গতবারে এই দলের মিলিত ভোটের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ একপক্ষে ধরা আবশ্যক। তেমনি বামপন্থী জোটে সি পি এম ও অন্যান্য দলের ভোট ভাগ হচ্ছে না। কাজেই সেই ভাগে প্রতিটি কেন্দ্রে সি পি এম ও জোটভুক্ত অন্যান্য বামপন্থী দলের প্রাপ্ত ভোটটা যোগ দিলে তবে সম্ভাব্য ফলাফলের পূর্বাভাস ঠিক করা যেতে পারে।

কিন্তু সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে সি পি আই ও বাংলা কংগ্রেস তার সব ভোট কংগ্রেস বা কংগ্রেস সি পি আইকে তার সব ভোট এনে দিতে পারবে না। কংগ্রেসবিরোধী ভোট কিছুটা অন্যত্র যাবেই। তেমনি ফঃ ব্লক, আর এস পি এবং এস ইউ সি তাদের সব ভোট, বিশেষত সি পি এম বিরোধী ভোটার সি পি এমকে এনে দিতে পারবে না। তেমনি সি পি এমও তার সব ভোট ফঃ ব্লক প্রভৃতি দলের প্রার্থীদের এনে দিতে পারবে না। কারণ কমিটেড অর্থাৎ দলীয় সুনির্দিষ্ট ভোটটা তারা টানতে পারে। অনিশ্চিত ফ্লোটিং ভোটার যারা নির্বাচনী সাফল্য-অসাফল্যের নির্ধারক তাদের কোনও দল ইচ্ছা অনুযায়ী টানতে পারছে না। নির্দলদের (জোটভুক্ত নয়) বা অন্য দলের প্রাপ্ত ভোটটা কীভাবে এবার ভাগ হবে তাও বলা কঠিন। নির্দল বা কংগ্রেসের (সংগঠন) ভোটের বেশীর ভাগ কংগ্রেস মোর্চার অনুকূলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

জোটবন্দীর প্রকৃতি

এবার জোটবন্দীর প্রকৃতি অন্য হয়েছে। বামপন্থীদের ক্ষেত্রে সি পি এম প্রভাবিত জোটের চেহারাটি দাঁড়িয়েছে ১৯৬৭ সালের ইউ এল এফের মতো। পি ইউ এল এফের একমাত্র ফঃ ব্লক সি পি এমের সাথী। ১৯৬৭ সালে ও ১৯৬৯ সালে এই জোটের অন্তর্ভুক্ত সাতটি দল ও ফঃ ব্লক মোট আসন লাভ করেছিলো যথাক্রমে ৬৯ এবং ১২৫টি। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে '৭১ সালের ফলের ভিত্তিতে এই জোটের মোট শক্তি সমর্থিতসহ ১০৮।

কংগ্রেস এই প্রথম একটি দলের সঙ্গে প্রকাশ্যে ফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনী যুদ্ধে নামলো। গতবার কতগুলো কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। কিন্তু কোনই সমঝোতা ছিলো না। এবার কম্যুনিস্ট পার্টি তার সাথী। অজয়বাবুর বাংলা কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের একাংশ আগেই কংগ্রেসে এসে গেছে। কাজেই এই মোর্চার সঙ্গে ১৯৬৯।৬৭ সালের পুরান কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ঠিক হবে না। 'ইন্দিরা মুজিব-কোসিগিন এনেছে বিশ্বে নতুন দিন'—এই শ্লোগান কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টদের কণ্ঠে যুক্তভাবে ধ্বনিত হচ্ছে এবার।

আশ্চর্যের কথা সোস্যালিস্ট পার্টি কোনও মোর্চা না থাকা সত্ত্বেও সি পি এম কতগুলো আসনে সোস্যালিস্ট পার্টিকে সমর্থন দিচ্ছেন। এই সোস্যালিস্ট পার্টির প্রার্থীরা বিজয়ী হোলে তাঁরা বামফ্রন্টের শরিক হচ্ছেন না—এটা স্পষ্ট। বরং সোস্যালিস্ট পার্টি তাই বলছেন। তবুও কংগ্রেসকে পরাস্ত ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির আশায় সি পি এম সোস্যালিস্টদের উত্তরবাংলা মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরে সমর্থন করছেন।

—ক্রমশঃ

অঙ্গনা

গিন্নিদের অসোয়াস্তি

কর্তা রোজগার করেন। গিন্নি সংসার চালান। মাসকাবারে কর্তা যা পান গিন্নির হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হন। সংসার চালানো সম্পর্কে আর বিশেষ কোন ভাবনা তাঁর নেই। এবার সব ব্যবস্থা করবেন গিন্নি। মাসের মাঝামাঝি এসে দুজনেই মাস কাবারের আশায় থাকেন। কারণ, এরপর সংসার আর চলতে চায় না। গিন্নি সংসার চালালেও অ-চলার আঁচটা, কর্তাকেও স্পর্শ করে। ধারদেনা তো আর গিন্নি করবেন না। সেটা কর্তাকেই করতে হয়, অবশ্যই গিন্নির পরামর্শে। এই অবস্থায় তাই তাঁরা মাস শেষ হওয়ার দিন গোনেন। অবস্থাটা এমন যে এতদিনে তাঁরা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন এবং এই মাসটা শেষ হলেই তা হাতে এসে পৌঁছবে। প্রতি মাসেই অবশ্য এই অবস্থা। কিন্তু গুপ্তধন তাঁরা পান না। মাস গেলে যা পান সেই টাকা কটাই হাতে আসে। এতেই মন মনে গাঙে জোয়ার ডাকে। কিছুদিন নিদারুণ টানাটানির পর টাকা কটা হাতে পেয়ে কর্তা যেমন খুশি হন তেমনি গিন্নিও। অন্তত কিছুক্ষণ টাকাগুলি ছাপ্ত থাকে। তারপরই তো আবার যে কে সেই। একটু পরেই গয়লা আসে। মুদিখানার টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। বাড়িওয়ালা আসবে। মাইনের সিংহভাগ সেখানেই চলে যাবে। তারপর সামনে পড়ে থাকবে একটি অনন্ত-বিস্তৃত মাস আর সংসারের টানাপোড়েন। গিন্নি দু চোখে অন্ধকার দেখবেন আর তাঁর মনে হবে যে এ মাস যে কবে শেষ হবে তার কোন ঠিক নেই।

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরণীর কথা: 'আমার তো প্রতি মাসেই এরকম মনে হয়। আর জিনিস-পত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে আমার বাজেট মাথা নত করেই আছে। কোন মাসেই এঁটে উঠতে পারি না। প্রতিটি নিম্নবিত্ত ঘরে আমার মতো একই অবস্থা। আমার স্বামী সরকারী অফিসে লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক। পে-কমিশনের রায়ে মাইনের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি ডি-এও বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এতো মরুভূমিতে জল ঢালার সামিল। মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজার আরো বেড়ে যায়। এদিকে স্বামী বেচারা সারাদিন খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে ফেরে। তাঁকে তো আর কিছু বলা যায় না। তাছাড়া আরো বেশি খাটলে ও'র শরীরও টিঁকবে না। তখন তো না টানার থেকে পা টানার সমস্যায় পড়ে যাব।

আমাদের বিয়ে হয়েছে দশ বারো বছর। তখন মাইনে কম থাকলেও সমস্যা এতোটা ছিল না। আমাদের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। ছেলেটি স্কুলে যায়। মেয়েটিকেও সামনের বছর ভর্তি করে দেব ভাবছি। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম যদি এভাবে বেড়ে চলে তবে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার বাড়তি খরচ চালাবো কোথা থেকে? এখন সংসারই ঠিক-মতো চালাতে পারছি না। ছেলেমেয়ের প্রয়োজনীয় দুধ এবং পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়াও বাধ্য হয়েই কমাতে হয়েছে। এদিকে বাড়তি খরচ লেগেই আছে। সমাজে বাস করতে গেলে সামাজিকতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। এর সবটাই অবশ্য আমাদের ঠুনকো ভদ্রতা। দামর্থ্য নেই তবু সামাজি-কতা করতে হবে। বাধ্য হয়েই ধারদেনা করতে হয়। আর এ হলো আমাদের জীবনের এক পরম অভিশাপ। প্রায় প্রতি মাসেই এর জের টানতে হয়। এর ফলে মানসিক শান্তিও অনেকখানি বিঘ্নিত হয়। খিটিরমিটির লেগেই থাকে।

অথচ আমি যে কিছু করে স্বামী ও সংসারকে সাহায্য করবো সে পথও বন্ধ। লেখাপড়া বেশি জানি না। হাতের কাজ কিছু জানি কিন্তু একা সংসার সামাল দিয়ে আর সময় পাই না।' কথাগুলো বলে তিনি একদণ্ড আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর মুখটা ভার ভার, চোখের কোণে কি যেন চিকচিক করছে।

আর এক বোনের উক্তি: 'আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রোজগার করি। আমি স্কুল শিক্ষিকা। স্বামী কলেজের অধ্যাপক! দুজনের রোজগার তেমন কম নয়। কিন্তু আমার স্বামী ইউ. জি. সির টাকা নিয়মিত পান না। এ টাকা পেতে বেশ কয়েক মাস দেরি হয়। এদিকে আমরা দুজনেই প্রায় সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকি। আমাদের বিয়ে হয়েছে বছর পাঁচেক। একটি মেয়ে। মেয়েটির দেখাশোনার জন্য একজন সর্বক্ষণের লোক রাখতে হয়েছে। এছাড়া রান্নাবান্নার জন্য একজন ঠাকুর আছে এবং একজন চাকরও! এরা আমাদের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করে, মাইনেও দিতে হয়। আমার মাইনের প্রায় সবটাই চলে যায় এদের তিনজনের মাইনে আর বাড়ি ভাড়ায়। দুধের খরচ থেকে সারামাস স্বামীর টাকার ওপর নির্ভর করতে হয়। বিয়ের আগে কোনদিন ভাবিনি চাকরি করবো। প্রথমদিকে অভাব বিশেষ বুঝিনি। ঠাকুর-চাকর তখন ছিল না। নিজেই সব করতাম। কেবল একজন ঠিকে ঝি ছিল। কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পরই স্বামীর অসুবিধা বুঝলাম। এই অসংকুলানের মোকাবিলা আর স্বামীকে সাহায্য করার জন্য চাকরি নিলাম। তবে আমার আশা ভঙ্গ হতে দেরি হলো না। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাকে বাজেট টানতে হচ্ছে। ফি-মাসে একই অবস্থা। এর উপর অসুখ-বিসুখ আর আত্মীয়কুটুম্ব থাকলে তো কোন কথাই নেই। অসুখ-বিসুখের মতো আত্মীয়স্বজনও এখন উপদ্রব মনে হয়। সবকিছুর দামই বাড়ছে। কলকাতা শহরে বাড়িভাড়ার যা অবস্থা সে তো সকলেরই জানা। এ অবস্থায় ভেবেছি, চাকর এবং ঠাকুর আর রাখবো না। মেয়ে রাখার জন্য সর্বক্ষণের মহিলাটি সব করতে রাজি আছে। দুজনকে জবাব দেওয়াও হয়ে গেছে। কিন্তু বাজারে দরের সঙ্গে আমার হিসেব তবু মেলাতে পারছি না। শুনলে অবাক হবেন যে, সিনেমা দেখা ছাড়া আর সব সাধ-আহ্লাদই প্রায় বর্জন করেছি। আজ পর্যন্ত খুব দূরে কোথাও যাইনি অর্থাৎ যেতে পারিনি আর্থিক অসংকুলানের জন্য। বিয়ের পর পুরী গিয়েছিলাম। এটাই এখনো আমার জীবনের সবচেয়ে লম্বা ট্যুর। এখন শুধু ভ্রমণকাহিনী পড়েই বেড়ানোর শখ মেটাতে হয়।

যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে সেভাবে আমাদের মাইনেও বাড়ানো দরকার। একথা তো ঠিক যে আমাদের দেশের শিক্ষকরা সবচেয়ে অবহেলিত। এ'দের আর্থিক অবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। কারণ, সমাজের আশা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অভাবের যন্ত্রণাই যদি মনে সবসময় খচখচ করে তবে পড়ানোর মতো মানসিক প্রস্তুতি আসবে কোত্থেকে? এজন্যই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে স্কুলের চাকরিকে কেউ কেউ স্টপগ্যাপ ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। অবশ্য মাইনে বাড়িয়ে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জিনিসপত্রের দাম যদি বেড়েই চলে তবে তা হবে নেহাত নিরর্থক তাই এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে অন্যভাবে। আমার আপনার সমবেত প্রচেষ্টায়ই এই দুর্বামূল্য বাঁধি রোধ করা সম্ভব।' এবার ওঠা যাক। মেয়ের ওষুধ আনতে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মনে হলো প্রতিরোধের কথায় জেরার আশংকায় তিনি আত্মগোপন করলেন।

তৃতীয়া আর একজন: 'আমার স্বামী একজন ছোটখাটো ব্যবসায়ী। একসময় আয়পত্র ভালই ছিল। তখন অতশত ভাবিনি বেশ বড়লোকী চালেই দিন কেটেছে। কোন অভাববোধ তখন ছিল না। ইচ্ছেমতো খরচ করেছি। কোন জিনিস একটা দরকার হলে তিনটে আনিয়েছি। দুটো নষ্ট করেছি। আমি বরাবরই এমনি বেপরোয়া। মা-বাবার ঘরেও তাই ছিলাম। আত্মীয়স্বজনরা ঠাট্টা করতেন, ভাগ্য করে এসেছিলি তাই মা-বাবার ঘরে যেমন স্বামীর ঘরেও তেমনি। যখন-তখন সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যেতাম। প্রতি বছর দুবার বেড়াতে যেতাম। সেও খুব

একটা কাছেপিঠে নয়, বেশ দূরে দূরে। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন সেসব দিনের কথা মনে পড়লে দুঃখ হয়। তখন যদি একটু সমঝে চলতাম তাহলে এমন অবস্থা হয়তো হতো না। তারপরই মনে হয়, ব্যবসা মার খেয়ে যাচ্ছে আর আমি সমঝে চললেই বা কি লাভ হতো? এখন ব্যবসার যা অবস্থা তাতে সংসার চালানোই দশদায়। মাঝে মাঝে ভাবি যে ব্যবসার মতো অনিশ্চতের উপর নির্ভর করার চেয়ে চাকরি করাই ভাল। আমার ছেলেকে কোনমতেই ব্যবসায় ঠেলবো না। শেষে হয়তো বেচারা না খেয়ে মরবে। তার চেয়ে ও বরং চাকরি করবে। চাকরিতে বাঁধা আয়, খরচও হবে সেভাবে। অথচ আমার স্বামীর আয়ে হেরফের যথেষ্ট কিন্তু ব্যয় দিনে দিনে বাড়ছে। এর কারণ জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। অনেক কাটছাঁট করেও পারছি না। আগে রাঁধার লোক ছিল। এখন নিজেই রাঁধি। আর শখ-আহ্লাদ তো কবেই ভুলে গেছি। বেড়ানোর পাট মিটে গেছে। সিনেমায় যাই সেও ছমাসে নমাসে। এদিকে সরকারী আর বেসরকারী অফিসে ডি-এ বাড়ে আর আমরা পড়ি ফাঁপরে। ও'দের আয় বাড়ে খরচও বাড়ে। কিন্তু আমাদের আয় বাড়লো না অথচ খরচ বাড়লো একইরকম। এরকম বেমক্কা মাইনে বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান হবে বলে তো মনে হয় না। বরং কিছু লোকের কষ্ট লাঘব করতে গিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের দুর্দশা বাড়ানো।'

এই একই অভিযোগ করলেন এক অ্যাডভোকেট পত্নী, চাকরির নির্দিষ্ট আয়ে তবু পারিবারিক খরচের বাজেট তৈরি করা যায়। কিন্তু আমার পক্ষে তাও সম্ভব হয় না। কারণ, আয়ের কোন স্থিরতা নেই। কোন কোন মাসে বেশ আয় হয়। আবার কোন কোন মাসে তেমন হয় না। এর ফলে প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়তে হয়। এদিকে জিনিস-পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। জীবনের প্রয়োজনীয় সব বস্তুই আজ জীবনের চেয়েও মহার্ঘ। সত্যি কথা বলতে কি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারটা যেন আগুনের উপর থেকে ঢাকা সরিয়ে নেওয়ার মতো। এর আঁচ আমাদের সকলকে প্রায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। পরিবারে পরিবারে এই কারণে অসন্তোষ বাড়ছে। প্রতিকূল আর্থিক অবস্থার সঙ্গে লড়তে লড়তে গৃহিণীরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। জিনিসপত্রের দাম বাড়াটা এখন অনেক কিছুর মতো আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। একে আমরা মেনে নিয়েছি প্রায়। তবে এই মূল্যবৃদ্ধির গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে তখনই যখন সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বাড়ে। সারা বাজার যেন এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকে। বেচারাদের মাইনে বেড়েও কোন সুরাহা হয় না। অথচ দুর্ভোগ ভুগতে হয় আমাদের সবাইকে।

'অনেকদিন আগে আপনাদেরই পত্রিকায় এক প্রথিতযশা লেখকের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই লেখাতে তিনি বলেছিলেন যে, এক বস্তুর কারবারী সেই দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে লাভ করেন ঠিকই কিন্তু তিনিই আবার একইভাবে অন্য দশজনের দ্বারা প্রবঞ্চিত হন অর্থাৎ তাঁরা স্ব স্ব দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে বসে আছেন। এভাবে সকলেই আরো লাভ করতে গিয়ে দাম বাড়িয়ে চলেন এবং অন্য জায়গায় যে ঠকে যান তা পুষিয়ে নিতে চান। এভাবে দাম ক্রমশই বেড়ে চলে। একসময় তা সাধারণ ক্রেতার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এটাই হলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আসল রহস্য অবশ্য আমার মতে। এই বোধটা যদি কারবারী তথা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় যে, বেশি মুনাফা করতে গিয়ে তুমিও প্রতারিত হচ্ছ তবেই মূল্য-বৃদ্ধির প্রতিকার সহজ হবে।'

কিন্তু এই শুভবুদ্ধি জাগবে কবে? সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এই অতি-লোভের মানসিকতার বদল না হলে মূল্য-বৃদ্ধির আঁচ আমাদের সকলের অস্তিত্বকে অল্পবিস্তর ঝলসে দেবে। আর গিন্নিদের অসোয়াস্তি বাড়তেই থাকবে। প্রতিকারের জন্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে না থেকে একটা উপায় আমরা নিজেরাই করে নিতে পারি তা হল আর্থিক সাধ্যের বাইরে পা না ফেলা—ইংরেজিতে যাকে বলে : 'কাট ইয়র কোর্ট অ্যাকর্ডিং টু ইয়র ক্লথ'—

আপনারা কি বলেন?

রুচি বদল

শীতের আয়ু ফুরিয়ে এলেও এখনও ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি টম্যাটো আর পালং শাকে বাজার সরগরম। এর প্রতিটির মধ্যেই প্রোটিনের ভাগ বেশি। অন্যান্য খাদ্যগুণেও এসব সব্জী বেশ কুলীন। সবজীর ফলন যখন তেজী তখন আসুন এ সময়ে নানা মুখরোচক খাবারে আমরা রুচি ফেরানোর চেষ্টা করি। এই অবসরে কয়েকটি রুচিকর খাবার নিয়ে তাই আলোচনা করা হলো।

ফুলকপির দম-মশলা :

উপকরণ : একটা ফুলকপি, দুটো ছোট পেঁয়াজ, এক টুকরো আদা, চারটে শুকনো লংকা, দুটো লবংগ, দুটো এলাচ এক টুকরো দারুচিনি, আধ চামচ হলুদ, আধ চামচ চিনি এক কাপ দই, দু চামচ ঘি, দুটো বড় টম্যাটো, ধনেপাতা আর আন্দাজমতো লবণ।

প্রস্তুত প্রকরণ : প্রথমে সব মশলা বেটে নিতে হবে। এবার ফুলকপি টুকরো টুকরো করে লবণ-জলে অল্পক্ষণ সেদ্ধ করে রাখতে হবে। বাটা মশলা সামান্য ঘি দিয়ে উনুনে কড়াই চাপিয়ে দিতে হবে। এভাবে মশলা ভালো করে ভেজে নিতে হবে। মশলা ভাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টম্যাটো কেটে নিয়ে ওর মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে এবং একই সঙ্গে দইও। সব জিনিসটা তৈরি হয়ে এলে উনুন থেকে নামিয়ে নিতে হবে। পরিবেশনের সময় এই গরম মশলা ফুলকপির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে আর তার উপর ধনেপাতা কেটে ছড়িয়ে দিতে হবে। রুটি বা লুচির সঙ্গে বেশ ভালোই লাগবে।

কড়াইশুঁটির বরফি :

উপকরণ : ৫০০ গ্রাম ছাড়ানো কড়াইশুঁটি, ৫০০ গ্রাম চিনি, ২৫০ গ্রাম খোয়া ২৫০ গ্রাম ঘি এবং ৫০ গ্রাম করে কিসমিস, শুকনো নারকোল, আখরোট আর বাদাম।

প্রস্তুত-প্রকরণ : ছাড়ানো কড়াইশুঁটি প্রথমে সামান্য ঘিয়ে ভেজে নিতে হবে। ভাজা কড়াইশুঁটি এবার একটু বেটে নিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাটা যেন মিহি হয়। এই অবসরে খোয়া বেশ ডগডগে লাল করে ভেজে নিয়ে আলাদা রাখুন। এরপরে বাকি ঘিয়ে বাটা কড়াইশুঁটি ঢেলে দিন। বেশ ভালো করে ভাজুন। ভাজা হয়ে এলে নামিয়ে নিন। একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলে খোয়া মিশিয়ে নিন। এখানেই কিন্তু শেষ হলো না। এখনো অনেকটা বাকি রয়েছে। উনুনে কড়াই বসিয়ে জল দিয়ে চিনি ঢেলে দিন। চিনি যখন ফুটতে শুরু করবে তখন খোয়া মেশানো কড়াইশুঁটি তাতে ছেড়ে দিয়ে খুব নাড়তে থাকুন। সবটা মাখোমাখো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। একটা থালায় সামান্য ঘি মাখিয়ে ছড়িয়ে দিন। বাদাম, নারকোল, কিসমিস আর আখরোট উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। ঠাণ্ডা হয়ে এলে সম্পূর্ণ জিনিসটা জমে যাবে। এবার ছুরি দিয়ে সাইজমতো কেটে নিন।

এতে ঘরে সকলের যেমন মিষ্টি খাওয়ার সাধ মেটে তেমনি অতিথি আপ্যায়নও চলতে পারে।

টমাটোর পোঙ্গল :

উপকরণ : কুচিকুচি করে কাটা ৪ কাপ টম্যাটো, ৩৫ গ্রাম আমসী, ৩৫ গ্রাম আখরোট, আধ কাপ করে নারকোল কুচি ও পেঁয়াজ কুচি, ২ চামচ আদা কুচি, ১ চামচ ধনেপাতা কুচি, ১ চামচ লংকা গুঁড়ো দেড় চামচ সরষে, বড় চামচের এক চামচ ছোলার ডাল, চারটে কাঁচালংকা, ৩ চামচ লবণ, একটি তেজপাতা, এক চামচ লেবুর রস আর প্রয়োজনীয় ঘি এবং তেল।

প্রস্তুত-প্রকরণ : আখরোট আর আমসী প্রথমে ঘিয়ে ভেজে রাখুন। এবার কড়াতে তেল দিন। তেল গরম হয়ে এলে সরষে, শুকনো লংকা আর ছোলার ডাল ছেড়ে দিতে হবে। এরপর দেরি না করে ধনেপাতা, তেজপাতা, কাঁচালংকা, পেঁয়াজ আর আদা দিয়ে দিন। সবকিছু তো আপনার হাতের কাছেই রয়েছে। সুতরাং দেরি হওয়ার কথাও নয়। একটু নাড়াচাড়া করুন। জিনিসগুলো ভাজা হয়ে এলে তিন কাপ জল আর নুন দিয়ে দিন। এখন একটু ফুটতে দিতে হবে। ফুটে এলে টম্যাটো আর নারকোল ছেড়ে দিন। আস্তে আস্তে সবকিছু বেশ মজে আসুক। যখন দেখবেন যে রস ঘন হয়ে এসেছে তখন আখরোট আর আমসী দিয়ে দিন। আর দেরি করবেন না। এখন নামিয়ে নিন। তবে নামানোর আগে লেবুর রসটা দিয়ে দেবেন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

দক্ষিণ ভারতে এটি খুব প্রিয় খাদ্য। রুটি পরিবর্তনে আমাদেরও ভালই লাগবে।

শুকনো রুটি চিবোতে চিবোতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। রুটি খাওয়া যাদের অভ্যাস আছে তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে, বাধ্য হয়েই রুটি খেতে হচ্ছে তাদের তো অসুবিধে হবেই। তবে এতদিনের অভ্যাসে রুটি খাওয়া গা-সহা হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে। তার সহজলভ্য উপকরণে শীতেই তার সুবিধা।

আলু রুটি বা পুরি :

উপকরণ : ১ কিলো আটা, ১ কিলো আলু, আদা, পেঁয়াজ কাঁচালংকা। রুটি হলে আর কোনকিছুর দরকার নেই একান্ত প্রয়োজনীয় লবণ ছাড়া। তবে পুরি বানাতে হলে প্রয়োজনীয় ঘি দরকার। আবার ঘি পছন্দ না হলে তেলেও চলতে পারে।

প্রস্তুত প্রকরণ : আলু সেদ্ধ বসিয়ে আটা মেখে নিন। তারপর আদা, পেঁয়াজ আর লংকা কুচিয়ে নিন। এতক্ষণে আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে। আলু ছাড়িয়ে নিন। আলুগুলো চটকে নিন। মাখা হয়ে গেলে আদা, পেঁয়াজ আর লংকাকুচি মিশিয়ে নিন। এবার রুটি বেলার কাজ। রুটি বেলার জন্য লেচি করুন। প্রতিটি লেচি হাতের তেলোয় নিয়ে একটু বড় করে মাঝখানে আলুর হিসেবমত পুর দিয়ে আবার গোল করে ফেলুন। বেলে নিয়ে ভাজুন। রুটি না হয়ে পুরি হলে রুটিটা একটু টেনে আসার পর ঘি বা তেল দিয়ে ভেজে নিতে হবে।

উপকরণ : ১ কিলো আটা, আধ কিলো ছোলার ছাতু, রসুন, কাঁচালংকা আদা এবং লবণ। পুরির জন্য ঘি বা তেল।

ছাতু রুটি বা পুরি :

প্রস্তুত প্রকরণ : আটা মাখুন। রসুন, লংকা আর আদা কুচিয়ে নিন। ছাতু মাখুন শুকনো শুকনো করে। রসুন, লংকা আর আদা কুচি মিশিয়ে দিন। এবার লেচি করে আর সেই লেচি আগের মতোই হাতের তেলোয় নিয়ে একটু ছড়িয়ে হিসেবমতো ছাতুর পুর দিন। আবার গোল করে বেলে নিয়ে ভাজুন। ইচ্ছে করলে পুরিও করতে পারেন। নিয়ম-প্রণালী সেই আগের মতোই।

আলুপুরি আর ছাতুপুরি গরম গরম খেতে খুব স্বাদ। রুটির ক্ষেত্রেও সেই কথা খাটে। তবে এর সঙ্গে ফুলকপির দম-মশলা আর টম্যাটোর পোওলাল থাকলে তো সোনায় সোহাগা। এবং সবশেষে কড়াইশুটির বরফি। কম খরচে রীতিমতো রাজসিক ভোজন।

—প্রমীলা

সৃষ্টি ও সংগ্রাম

ভাল ভাল মাটিকে বাঁদিকে আর শীতের কাঁচা রোদটাকে পিঠে ফেলে সরু গলিতে ঢুকে পড়লাম। জানতাম তখনই ভরা মরশুমে। তাই মরশুমী ভিড়টাকে ধীরে ধীরে পার হয়ে পেণছে গেলাম শ্রীমতী বিমলা পালের কুঠারিতে। বিমলা পালের নাম হয়তো খুব সুপরিচিত নয় কিন্তু কুমোরটুলীর কুমোর পাড়ায় বিমলা পালের নাম এককথায় সকলেই জানে। শুনেছিলাম ঐ অঞ্চলে মহিলামহলে মূর্তি গড়তে বিমলা পালের জুড়ি নেই। তাই একদিন গিয়ে হাজির হলাম তাঁর কাজকে প্রত্যক্ষ করার জন্য।

বিমলা পাল তখন দারুণ ব্যস্ত, অবসর বড় কম। সামনে সরস্বতী পুজো, তারপর সংসারের অনেক ঝামেলা। সে সবের ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে মূর্তি গড়তে হয়। স্বাভাবিক একটা কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম তাঁর কাজের কলা-কৌশল। চোখে মুখে ধীর-স্থির, শান্ত একটা ভাব খেলা করে বেড়াচ্ছে। একাগ্র চিত্তে অতি নিপুণভাবে মূর্তির চোখে তুলির আঁচড় টানছেন। ডাইনে-বাঁয়ে সারি সারি অনেক মূর্তি। সবগুলোই সরস্বতীর। সামান্য উপরে একটা মাচাতে খানকতক গণেশ, কার্তিক আর লক্ষ্মীর মূর্তিও রয়েছে।

বিমলা পাল অত ব্যস্ততার মাঝেও মৃদু হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

বললাম 'আপনার নাম-ডাক অনেক-দিনই শুনেছি। ভাবলাম একবার ঘুরে আসি। তাছাড়া আপনাদের সম্বন্ধে আমার একটা কৌতূহল আছে। আমি কিছু জানতে চাই।'

বিমলা দেবী হাতের মূর্তিটা পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চলুন পাশের ঘরে গিয়ে বসা যাক। এখানটা যা ভরাট হয়ে আছে।'

তাঁকে অনুসরণ করে হাজির হলাম ছিমছাম একটা ঘরে। ঘরে দু-চারটে পুতুল সাজানো, তাছাড়া আছে সংসারের টুকি-টাকি নানা জিনিস।

আমাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বিমলা দেবী নিজে বসলেন টুলে। মুখে প্রশান্ত হাসি, বললেন, 'আমাদের সম্বন্ধে আগ্রহ আছে এটা কেমন যেন বেমানান তাই না। আমরা মূর্তি গড়ি, ক্রেতারা আসেন দলে দলে, যাচাই করেন এটা-ওটা, দরদামে মিলে গেলে আমাদের কিছু আয় হয়। অবশ্য আজকাল শুনেছি অনেকেই আমাদের কথা লেখালেখির জন্য এ চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবুও আমরা যেন কেমন আশান্বিত নই।'

বুঝলাম অভাব-অনটনের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে কেমন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন জগতটার ওপরে। বললাম, 'আপনি আশা হারালেই বা কি জনসাধারণ কিন্তু দিন দিন আপনাদের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠছে। আপনাদের কাজের তারিফ তারা ঠিকই করছে।'

'শুধু তারিফ করলেই তো আর পেট ভরে না—তার জন্য চাই প্রচুর বাস্তব পরিকল্পনা, বাঁচার মত অর্থ', কেমন বিদ্রোহের ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করলেন।

আমি খুব সাবধানে তাঁর জীবনের যন্ত্রণাকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। বললাম, 'কেন আপনার স্বামী শ্রীমধুসূদন পালের মূর্তির চাহিদাও তো কম নয়।'

'বাঙালী জীবনে কয়েকটা পুজোপার্বণ ছিল বলেই তো বেঁচে আছি নইলে আ এই জাতব্যবসা করতে হতো না। দিন দি পুজোর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বলেই তো আমাদের বেশী দুটো পয়সা আসছে। সারা বছরে মাত্র তিন মাস আমরা কাজের মূল্য পাই—অন্য সময়ে তো আমাদের কিছু করার নেই।'

'মূর্তি গড়তে আপনার কেমন লাগে?'

অত্যন্ত সোজা সরল উত্তর : 'মোটেই ভাল লাগে না। শিল্প যখন নিজের রুচির তাগিদে সৃষ্ট হয় ততক্ষণই তা আনন্দ দেয়, রুজিরোজগারের সৃষ্টি আনন্দের বদলে বেদনাই আনতে পারে।' হাসলেন একটু কিন্তু হাসিটা কেমন যেন বিষণ্ণ। কথাটা পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য বললেন, 'ধরুন আমার কথা। কুমোরবাড়ীর মেয়ে আমি। মূর্তি আমি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই গড়তে চাইবো ও পারবো। কিন্তু মনের চাহিদার সঙ্গে যা গড়ছি তার যেন মিল নেই। যেমনটি চাইছি তা যেন হচ্ছে না। পেটের ক্ষিধে মেটাতে আর চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে ছাঁচে মূর্তি গড়ছি, ছা-পোষা কেরাণীর মত তুলি ঘোরাচ্ছি, তাতে মনের ক্ষুধার কোন উপশম নেই।'

লক্ষ্য করেছি বিমলাদেবী শুধুমাত্র ছাঁচেই মূর্তি গড়েন, পুতুল সেও নামে-মাত্র তৈরী করেন। নয়, দশ ইঞ্চি থেকে শুরু করে এক ফুট পর্যন্ত মূর্তিই বেশী করে থাকেন। সাধারণতঃ ছাঁচের কাজেই তিনি পারদর্শিনী। অনুভব করলাম : তাঁর সৃজনী-প্রতিভাকে স্বচ্ছ নদীতে ভাসাতে না পেরে, খানা-খন্দর জমে যাওয়া জলে আবর্তিত হতে দেখে দুঃখবোধ করছেন।

খানিক নীরব রইলাম। শেষে জিগ্যেস করলাম, 'আপনাদের আদি বাড়ী কোথায়? আপনার গড়া মূর্তি দেখে মনে হচ্ছে আপনি তো কোন দক্ষ শিল্পী ঘরানার উত্তরসূরী।'

ও'র চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। খুশীতে ঠোঁট দুটো যেন বারদুয়েক কেঁপে উঠলো। ও'র মনের ভেতর একটা আনন্দ যেন বেজে উঠল। তবুও শান্ত-মন্দর স্বরে বললেন, 'আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা এমনকি তারও পূর্বপুরুষেরা

।।আদিবাসীদের প্রথম লোহা আবিষ্কার।।

।।ছাঁচে তৈরী মাছ।।

।। এই সমস্ত আলোকচিত্রগুলি শিল্পী সুধীর পালের নিকট হ'তে সংগৃহীত ।।

সকলেই ছিলেন শান্তিপুরে। কিন্তু সেখানে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ঘটল। কাজের কদর নেই, রুজিরোজগার প্রায় বন্ধ তাই অনেকেই মিলে দল বেঁধে চলে এলাম কলকাতার এ অঞ্চলে। অবশ্য আমরা পিতৃকুল থেকে যতটা না পেয়েছি তার চেয়েও বেশী দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছি মাতৃকুল থেকে'—বলেই তিনি উঠে তিনটি ফটো আমার সামনে মেলে ধরলেন। 'কাজ দেখে চিনতে পারছেন—এগুলো কার হাতের?'

বেশ চেনা চেনাই ঠেকছিল কারণ ঐ অঞ্চলে আমার মাঝে মাঝে যাতায়াত করতে হয়— খানিক প্রয়োজনে এটা-সেটা বায়নায়, খানিক ভাল লাগায়। তবুও আমি নীরব হয়ে রইলাম তাঁর কথা শোনার জন্যে।

উঁচু গলায় যেন একটু গর্ব এসে মিশল। বললেন, 'ভাস্কর এস পালের নাম শুনেছেন তো এগুলো তাঁরই কাজ। এস, পাল ও কার্তিক পাল এ'রা সবাই আমার মামা। কয়েক পুরুষ ধরেই আমার মামাবাড়ীর লোকেরা কৃষ্ণনগরে বসবাস করছেন। শুনেছি মামাদের পূর্বপুরুষের কাউকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাটোর থেকে মূর্তিগড়ার জন্য কৃষ্ণনগরে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে তাঁরা সেখানেই রয়েছেন। আমার মামা সুধীর পালের কাছ থেকে তাঁর ঠাকুরদার থেকে শোনা যে স্বর্গত যদুনাথ পাল যিনি একসময়ে আর্ট কলেজের প্রফেসর ছিলেন তিনিই পুতুল শিল্পকে ব্যবসায়ী ভিত্তিতে দাঁড় করাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন যাতে মূর্তিগড়ার ফাঁকে ফাঁকে ভাস্কররা পুতুল গড়ার (যেটা কৃষ্ণনগরে খুব দেখা যায়) কাজে মেতে থাকতে পারেন ও যার থেকে কিছু আয়ও হয়।'

বললাম, 'সেটা তো সবচেয়ে ভাল। ছাঁচে গড়ার একঘেয়েমী থেকে অন্ততঃ সৃষ্টির আনন্দে কিছু সময় পুলকিত হতে পারবেন। তারপর সেগুলোকে বিভিন্ন দোকানে দিয়ে দিন। সমঝদারের অভাব হবে না। আপনি পুতুল গড়েন তো?'

'পুতুল গড়ে আমাদের অভাব মেটে না। আগে অভাব দূরীকরণের ভাবনা তারপর অন্যকিছু। আমাদের তৈরী পুতুল আর কটা বিক্রী হয়। সব দোকানেই সরকারী কলেজের ছাপমারা শিল্পীদের কাজ নিতে চায়। কলেজের চাপরাশ থাকলেই হল। কিন্তু চাপরাশ থাকলেই কি শিল্প হয়? কিন্তু কলেজের ডিগ্রিধারী কজন শিল্পী প্রকৃতই ছবি আঁকছে আর মূর্তি গড়ছেন? আমরা নিজেরাও দোকান খুলে দেখেছি খরচ যোগানোর অসুবিধায় তা বন্ধ করতে হয়েছে। অথচ আমাদের জন্য কারুরই ভাবনা নেই। তাই তো আমাদের ঘরের ছেলেরা জাতিগত পেশা ছেড়ে চাকুরীর ও আর্ট কলেজে ঢোকার চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। আমরা বাঁচলাম কি মরলাম তা দেখার মত লোক নেই। পরাধীন ভারতে আমাদের জন্য যাও হত একালে তাও হচ্ছে না। যে সব দোকানে আমাদের তৈরী জিনিসপত্র রয়েছে তারা কেবল দোকানের শ্রীবৃদ্ধিই করছে-কটা বিক্রী হলো আর কটা রইলো তা দেখার মতও লোক নেই। প্রাচীনকালে যেমন শুধু আদান-প্রদানের ওপরেই আমাদের নির্ভর করতে হতো যেমন গণেশের মূর্তি কাউকে দিলে তার বিনিময়ে মূর্তির পেটে যতটুকো চাল ধরতো ততটুকুই আমাদের পাওনা হতো। আজ যদিও আমরা সেই পেটমাপা চাল না পাই, তবুও পুজোপার্বনের ওপরেই আমাদের নির্ভর করে বাঁচতে হয়। আমাদের অধিকাংশের সৃষ্টি শুধুমাত্র বছরের খোরাক জোগায়, শিল্পের মর্যাদা পায় না। যাঁরা মর্যাদা পাচ্ছেন তাঁরা ভাগ্যবান। আমরা হতভাগ্যেরা কোণঠাসা হয়েই আছি। জানি না এই অনিশ্চিত ও দুঃখজনক অবস্থা থেকে মুক্তি কতদিনে আসবে।'

ফিরতে ফিরতে ভাবলাম বন্ধদুয়ার একদিন খুলবেই। শিল্পের কোন জরা নেই, মৃত্যু নেই। শিল্পীরা তাঁদের যথার্থ মূল্য পাবেনই। স্থির বিশ্বাস সরকার আর জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতায় আমাদের মৃৎশিল্পীরা সৃষ্টির আনন্দের ও স্বকীয় প্রতিভা বিকাশের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবেনই।

অঞ্জলি চৌধুরী

প্রদর্শনী

কর্পোরেশন পার্কে চতুর্থ বার্ষিক শিল্পমেলা চলছে। এবারও অন্যান্য বারের মতো ছাত্র ও সম্পন্ন শিল্পীরা তাঁদের ছবি নিয়ে এসেছেন মেলা প্রাঙ্গণে, এবং নিজস্ব প্রদর্শনী বা আর্ট গ্যালারির চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি করবার চেষ্টা করছেন। আসর জুড়ে শিল্পী বসে গেছেন কাগজ পেন্সিল নিয়ে—আপনার পোর্ট্রেট করে দেবেন পাঁচ টাকায়। একদিকে শতরঞ্চি বিছিয়ে রোজই সন্ধেবেলা কিছু-না-কিছু আলোচনার আসর বসছে মাইক্রোফোনে—উৎসাহী যে-কেউ তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

ছবি রয়েছে নানা ধরনের—খুব খারাপ থেকে খুব ভালো পর্যন্ত তাদের ব্যাপ্তি। [illegible] যায় না এমন ছবিও রয়েছে [illegible] আবার চোখ ফেরানো যায় না এমন ছবিরও অভাব নেই। কিন্তু ছবির আলোচনা করে লাভ নেই। এই মেলার উদ্দেশ্য শিল্পী চিত্রকর ও দর্শকের মধ্যে সেতুবন্ধন—কলকাতার মতো সংস্কৃতিচেতন শহরে শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান [illegible] কমিয়ে আনবার চেষ্টা করা। [illegible] রচনা করেছেন দর্শক ও চিত্র-[illegible]। কলকাতার কলারসিক শিল্পের [illegible] বিভাগের এমন কি পরীক্ষামূলক [illegible] অসাধারণ উৎসাহী। যে-কোনো [illegible] কিছু অন্তত বিক্রি হয়, [illegible] নাটকের টিকিট বিক্রি হয় এখানে, যে-কোনো ধরনের [illegible] আসন সংগ্রহ করা [illegible]। কিন্তু কলকাতার কলা-রসিকের উৎসাহের জোয়ার চিত্রশিল্প পর্যন্ত পৌঁছয় না। অসাধারণ চিত্রপ্রদর্শনী [illegible] অভাবে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে।

এবং কলকাতাবাসী চিত্রকরগণও [illegible] দর্শকবিমুখ। সাধারণ দর্শক—যাঁর ছবি দেখার অভিজ্ঞতা নেই, অথচ যিনি ছবি দেখতে ও রসগ্রহণ করতে আগ্রহী তাঁর সাহায্যের জন্য কোনো আয়োজন করেন না তাঁরা। এই মেলা যখন প্রথম শুরু হয়েছিলো, তখন ভাবা গিয়েছিলো যে এ ব্যবধান হয়তো এই মেলার মাধ্যমে কমতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দর্শক ও শিল্পীর মধ্যে সেতু হিসেবে দাঁড়াবার পরিবর্তে এই মেলা এখন শিল্পীদের বাৎসরিক মিলন স্থান হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রমেই. দর্শক যে-দূরে, সেই দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন।

অথচ, এখনো এই মেলাকে ভালোভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিল্পিগণ [illegible] আসুন, কাকে গ্রাফিক বলে, কাকে বলে ইনট্যাগলিও, বিমূর্ত ছবি কীভাবে দেখতে হয়, আঁকবার সময় কী-কী সমস্যার সমাধান করতে হয়, একটি ভালো রেখা ও একটি খারাপ রেখার কী পার্থক্য, কোন রঙের পাশে কোন রং লাগাতে হয়, এই জাতীয় সহজ কিন্তু প্রাথমিক তথ্যগুলি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে বুঝিয়ে দিন। তাতে আপনাদের লাভ ছাড়া লোকসান নেই। মাঝখানের মণ্ডপটিতে চারু-শিল্প মহাবিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হোক, কিন্তু সেই সঙ্গে একদিন হোক বাউল গান, একদিন কবিতা পাঠের আসর, একদিন আধুনিক নাটক অভিনয় ও তৎসহ আলোচনা ও অন্য দিন আরো এমন কিছু যাতে সাধারণ আগ্রহী মানুষ আধুনিক শিল্পকলায় ক্রমশ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন এবং সমস্ত প্রযুক্ত শিল্পের শিল্পীদের এক মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয় শিল্পমেলা। তা হলেই অচিরকালের মধ্যে এই মেলা এক মহামেলায় পরিণত হতে পারবে, এমন কি কলকাতার জাতীয় উৎসবেও পরিণত হতে পারে।

ম্যাক্সম্যুলার ভবন হায়দরাবাদের তিনজন শিল্পীর ছবি ও গ্রাফিকস-এর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। এঁরা হলেন সূর্য-প্রকাশ, কে লক্ষ্মণ গৌড় ও ডি দেবরাজ। প্রথম দুজনের বয়স ৩২, তৃতীয়জনের ২৮। তিনজনই প্রথিতযশা শিল্পী, বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সম্মানিত, ললিতকলা অ্যাকাডেমির জাতীয় আধুনিক চিত্রশালা এঁদের তিনজনেরই ছবি সংগ্রহ করেছেন। কলকাতার কলারসিকগণ সম্ভবত এঁদের ছবি পূর্বে দেখেন নি। ছবিতে শিরোনামা ব্যবহার করেন নি এঁরা কেউই—কারণ জিজ্ঞাসা করায় সূর্যপ্রকাশ জানালেন, এঁদের বিশ্বাস নামকরণ করলে ছবির সীমা বেঁধে দেওয়া হয়—সেই সীমিতকরণে এঁদের অনাস্থা। কথাটা কিছু দূর পর্যন্ত সত্য বিশেষত বিমূর্ত ছবির ক্ষেত্রে। কিন্তু কোনো বাস্তব জিনিসের নামে নাম-করণ না করে কোনো বিমূর্ত ভাবনার নামেও তো নামকরণ সম্ভব, ছবি—সে যতই বিমূর্ত হোক—কোনো এক ভাবনারই প্রকাশ যখন।' অনেক শিল্পীই ছবি বা

শিল্পী—কে লক্ষ্মণ গৌড়

শিল্পী—ডি দেবরাজ

ভাস্কর্যের নামকরণে পরাঙ্মুখ—কিন্তু নাম সম্বলিত হলে ছবিকে সীমিত না করে ছবির অর্থলোকের পথে পদসঞ্চারও করে দিতে পারে—তার অনেক উদাহরণ আছে।

এঁদের মধ্যে সূর্যপ্রকাশের কাজ সবচেয়ে মনোহর; বিশাল ক্যানভাসের উপর উজ্জ্বল রঙের সাতখানা ছবি, প্রতিটিতেই মাধ্যমের উপর তাঁর প্রভুত্বের প্রভাব স্পষ্ট। ছায়াহীন পালমোথা রঙের পশ্চাৎপটের উপরে সহসা-বাঁক-নেয়া পাথুরে টেকশ্চার নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে। তুলির টান অত্যন্ত জোরালো ও ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষরবহ। শ্রীকে লক্ষ্মণ গৌড় সতেরোটি জিংক এচিং ও পাঁচটি লিথোগ্রাফ এনেছেন প্রদর্শনীতে। ছোটো-ছোটো কাজ করতে ভালোবাসেন ইনি। মানুষের মুখ ও শরীরের বিস্ময়কর বিকার ঘটিয়ে তার সঙ্গে নানা ধরনের পশুর—বিশেষত ছাগ জাতীয় পশু শরীরের সমাহার ঘটিয়ে ইনি ছবিতে দান্তে-বর্ণিত নিরয়যাত্রার আভাস এনেছেন। বোধের যে-অংশ জান্তব, বুদ্ধিবিমুখ, আদিম ও ঈশ্বরপীড়িত, যে-অংশ মধ্যযুগীয় পাপ-বোধে আচ্ছন্ন, সে-অংশকে তাঁর ছবির অভিজ্ঞতা যেন বুদ্ধি ও আধুনিকতার নির্মোকের অন্তরাল থেকে অবলীলায় বার করে আনে। এবং তার পাশের দেয়ালেই ডি. দেবরাজের সারি-সারি আনন্দোজ্জ্বল প্রাথমিক রঙেরঞ্জিত এচিং ও রঙিন লিথো (সংখ্যায় ২৩টি)—চমৎকার প্রতিতুলনায় সজ্জিত। ফুল, পাতা ও উদ্ভিদদের আকার ভেঙে ভেঙে তাঁর বস্তুবিন্যাস—এত সরল ও মাটির কাছাকাছি, শ্রীলক্ষ্মণ গৌড়ের পরে দেখলে যেন সহজ ও শান্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাস ফিরে আসে। এই তিনজন শিল্পীকে কলকাতার কলারসিকদের কাছে পরিচিত করে ম্যাক্সমুলার ভবন পুনশ্চ ধন্যবাদার্হ হলেন।

অস্ট্রেলিয়ান প্রিন্ট প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে আধুনিক অস্ট্রেলিয়ান প্রিন্টের একটি প্রদর্শনী চলছে। এটি ইদানীংকালের অবশ্য দ্রষ্টব্য প্রদর্শনীগুলির অন্যতম। অস্ট্রেলিয়া বললেই পশম ও মাখন মনে পড়ে শিল্পের ক্ষেত্রে এই দ্বীপ-মহাদেশের বিষয়ে বিশেষ কোনো ধারণা ছিলো না। এই প্রদর্শনী দেখে বোঝা গেল, ছবির ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ারা পেছিয়ে নেই, যদিও অস্ট্রেলীয় মানস বলতে কোনো দৈশিক ভাবমূর্তি এই প্রদর্শনীতে ফুটে ওঠে নি—অর্থাৎ এমন কোনো সামান্য লক্ষণ পাওয়া গেলো না, যা অন্য একটি ছবিতে আরোপ করে ছবিটি অস্ট্রেলীয় বলে শনাক্ত করা যাবে।

ছবির প্রিন্ট তৈরির একটি ক্ষীণ ধারা গত শতকের প্রথমার্ধ থেকেই অস্ট্রেলিয়ায় বহমান ছিলো। এই শতকের গোড়ার দিক থেকেই কলারসিক ও শিল্প সংগ্রাহকদের নজরে পড়ায় এই শিল্প ধারাটি পুষ্টি লাভ করতে থাকে। কোনো নিজস্ব অস্ট্রেলীয় ধারা যে তৈরি হয় নি, তার কারণ বোধহয় অস্ট্রেলিয়ার ক্ষুদ্র ইতিহাস এবং ইউরোপের শিল্পধারার প্রবল প্রভাব। কিন্তু তা হলেও, কাজের স্পষ্টতা ও মুন্সিয়ানায় এই প্রদর্শনী থেকে আমাদের উক্ত ধারার শিল্পীদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে বলে মনে হয়।

•

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে শ্রীসুকুমার মুন্সীর একটি একক প্রদর্শনী চলছে। তাঁর কাজ করার পদ্ধতি একটু আলাদা। রবার সলিউশন ও ফোটো রং করবার ফ্লুইড কলারের সাহায্যে তিনি কাগজের উপর বাটিকের এফেক্ট আনবার প্রয়াসী। কাজটি খুব নতুন নয়—ইতোপূর্বে শ্রীঅন্নদা মুন্সীর কাজে এই পদ্ধতির প্রয়োগ আমরা দেখেছি। শ্রীকুমকুম মুন্সীর, মনে হয় নতুন পদ্ধতিটি এখন পর্যন্ত কেবল ব্যবহার করে যাচ্ছেন রেওয়াজের মতো—এর ভিতর দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ কীভাবে সম্ভব, সে সমস্যার সমাধান এখনো তাঁর ছবিতে হয়ে ওঠে নি এখনো—সুন্দর রং ও প্রাকৃতিক রেখার সমাহার মাত্র হয়ে আছে। মনে হয়, আত্মবিকাশের পথে এগোতে গেলে তাঁকে বস্তু ও ভাব প্রকাশ করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। ওজনের অভাব তাঁর ছবিতে বড়ো বেশি প্রতীয়মান।

কয়েকটি কাজ ওরই মধ্যে সুন্দর ছবি হয়ে উঠেছে—কিন্তু শ্রীমুন্সী যেহেতু ছবির কোনো নাম বা ক্রমিক সংখ্যা দেন নি, তাই তাদের উল্লেখ করা গেলো না।

•

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ক্যালকাটা পেইন্টার্স গোষ্ঠীর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেলো। প্রকাশ কর্মকার, দিলীপ কুণ্ডু, তপন ঘোষ, রবীন মণ্ডল, গোপাল সান্যাল, অমিতাভ সেনগুপ্ত, শুভপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, যোগেন চৌধুরী, শঙ্কর গুহ, ঈশা মহম্মদ ও অমল চাকলাদারের সব সমেত ৩৮টি ছবি এই প্রদর্শনীতে দেখা গেলো।

প্রকাশ কর্মকারের বাহাত্তরের চিত্রকলা (২) সুন্দর বলা যায় না কোনো মতেই—কিন্তু প্রবল পৌরুষের আকর্ষণ ছবিটির সামনে দর্শককে দাঁড় করিয়ে রাখে। কালো ও হলুদ রঙের নাটকীয়তার বিরোধের প্রকাশ ছবিটিতে গতি এনেছে। কিন্তু জনপ্রিয় হবার বড় বেশি ঝোঁক তিনি কিছুতেই সামলাতে পারছেন না—ফলে তাঁর হালের ছবি কেমন পোস্টার-ধর্মী বলে মনে হয়। দিলীপ কুণ্ডুর নিরুপমাওলা পর্যায়ের চারখানি ছবি জটিল রেখা সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে আক্রান্ত ভারসাম্য আনবার চমৎকার দৃষ্টান্ত। রবীন মণ্ডল যে পদ্ধতিতে ছবি এঁকেছেন তা যেন এখনো তাঁর ভিতরকার জিনিস নয়—খানিকটা নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে এখনো। গোপাল সান্যালের 'আত্মচর্যা' পর্যায়ের চারখানি ছবিও সুন্দর হই লালের দিকের রং ও চারাগাছ ও পাথর ব্যবহার রূপকধর্মী হয়ে উঠেছে—খানিকটা মধ্যযুগীয় চেতনার আভাস আছে। কোথাও কোথাও খুব সামান্য কিন্তু সচেতনভাবে লৌকিক ডিজাইনের ব্যবহার এই চেতনাকে আরো বেশি ফুটিয়ে তুলেছে। শুভপ্রসন্ন সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত—তাঁর ছবি আধুনিক সমাজ, তার বিষম বন্টন ব্যবস্থা, অশুভ ভবিষ্যতের পূর্বগামী ছায়া—সব নিয়ে নিজস্বতায় সমৃদ্ধ। যোগেন চৌধুরীর চারটি ছবি—স্মৃতির স্মৃতি—ছবি হিসেবে ভালোই, কিন্তু স্মৃতি হিসেবে বড়ো বেশি বাস্তব ও নাট্য-পরায়ণ। স্বপ্নে কি আমরা অমন বাস্তবভাবে করে ভাবি? ছবিগুলির নাম বদলে দিলে বোধহয় সুবিচার করা হতো। ঈশা মহম্মদের কাপড়ের কোলাজ বেশ চমকপ্রদ। অমল চাকলাদারের বর্ণব্যবহার প্রীতিকর।

—চিত্ররসিক

ডি এস পিকচার্সের 'পরিবর্তন' চিত্রে মনীষা। প্রযোজনা পরিচালনা : দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া।

চিত্র-সমালোচনা

সংরক্ষণশীলতা বনাম সংস্কারসাধন

ধরমচাঁদ জৈন নিবেদিত, কেদারনাথ আগরওয়ালা প্রযোজিত এবং অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত সঙ্গীতা প্রোডাকসন্স-এর 'মা ও মাটি' একদিকে যেমন জমিদার (জমিদারী প্রথা বিলোপের পরে যার নাম হয়েছে জোতদার) বনাম রায়তের স্বার্থ-সংঘাতকে তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনই সকল চাষী একত্র হয়ে যন্ত্রের সাহায্যে যৌথ খামার প্রথায় চাষ করলে যে ঢের বেশী ফলন হয় ও উৎপাদন বাড়ানো যায়, তাও বলবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কৃষক জমিদারের কাছে চির-দিন ঋণী হয়ে থাকে কেন, জমিদার ও কৃষকের স্বার্থের বিরোধ কোন্‌খানে, জমিওয়ালা প্রজা কোন্ বিচিত্র উপায়ে ধীরে ধীরে জমিহীন প্রজায় পরিণত হয়, প্রজারা ঐক্যবদ্ধ হলে জমিদারের স্বার্থে আঘাত লাগে কেন, এইসব তথ্যকে আশ্রয় করে বিশ্বাস্য ও বাস্তব পরিস্থিতি রচনা ও নাটক গড়ে তুলতে গেলে যে-বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন, তার অভাবে মাত্র রায়তদের তরফ থেকে বীজধান প্রার্থনা এবং জমিদারের (জোতদারের) সেই বীজধানের জন্যে চড়া দাম হাঁকার মধ্যেই বিরোধের যা-কিছু পর্যবসিত হল। অপরদিকে কৃষি কলেজ থেকে পাস-করা ইন্দ্রনাথ কোন্ উন্নত প্রথার চাষ-আবাদ পদ্ধতির প্রচলন করে গ্রামের মাঠে সোনার ধান ফলাল, তারও কোনোও নিদর্শন দেখা গেল না। জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পরে সরকার বীজধান, সার, পোকামাকড় মারার ওষুধ, জলসেচের জন্যে পাম্প প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। আলোচ্য ছবিতে কিন্তু সে-সবের উল্লেখমাত্রও নেই। কাহিনীকারের অজ্ঞতার জন্যেই একটি ট্রাক্টার কেনবার জন্যে যাত্রাওয়ালী পুতুলসমেত অপেরার অবতারণা করতে হয়েছে এবং মূল কাহিনীকে স্বাভাবিক পথে এগোতে না দিয়ে কুহেলি-ইন্দ্র-পূর্ণ হরফে রোশনলাল সম্পর্কিত একটি নতুন কাহিনীর আমদানী করা হয়েছে। ফলে গ্রামের প্রজারা জোতদার বিধুবাবুর পিছনে ধাওয়া না করে কুহেলির আততায়ী রোশন-লালের পিছু নিয়েছে এবং রোশনলালের অপঘাত মৃত্যুর পরে বিধুবাবুর সম্মুখীন হয়ে কুহেলির হত্যার জন্যে বিধুবাবুকে দায়ী করে তাঁর কাছে জবাবদিহি দাবী করে। কোথাকার সমস্যা কোথায় এসে দাঁড়াল! কোথায় চাষীপ্রজা বনাম জোতদার, আর কোথায় হত্যাকারী বনাম ইন্দ্র-কুহেলির মা!

যে-বিষয়বস্তুর ওপর কাহিনী রচিত হবে, সে-সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে কাহিনীর একটি বিশ্বাস্য রূপ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, 'মা ও মাটি'র ক্ষেত্রেও তাই

ঘটেছে। ছোটখাট বিষয়েও কাহিনীকারের অজ্ঞতা কি রকম, তার একটি উদাহরণ হচ্ছে ট্রাক্টর কেনার জন্যে ইন্দ্রকে কল্যাণীতে হাজির করা। কল্যাণীতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বটে, কিন্তু ট্রাক্টর কেনবার জন্য কাউকে সেখানে দৌড়তে হবে, এমন কথা কেউ কোনোদিন শোনে নি।

প্রসংগক্রমে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, ঠিক এই জোতদার ও চাষীদের মধ্যে বিরোধকে অবলম্বন করে কিছুদিন আগেই 'জনতার আদালত' নামে আর একখানি অসার্থক ছবি আমরা দেখেছি এবং মজার কথা, সেই ছবি ও বর্তমান ছবির নায়ক একই শিল্পী। এবং দুখানি ছবিতেই প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল কল্যাণী মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন সন্ধ্যারাণী (যদিও বর্তমান ছবিতে তিনি নায়কের মা এবং সে-ছবিতে তিনি ছিলেন জমিদারের স্ত্রী)।

আলোচ্য ছবিতে যাঁরা সুযোগ-সুবিধা মতো নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (কুহেলি), রবি ঘোষ (ইন্দ্রের সহকারী ও গ্রাম্য মেয়ে সীতার প্রেমপ্রার্থী), অনুভা ঘোষ (অঞ্জনা), সন্ধ্যারাণী (ইন্দ্র ও কুহেলির মা), নন্দিনী মালিয়া (জোতদারনন্দিনী রাজশ্রী) এবং রত্না ঘোষাল (গ্রাম্য মেয়ে সীতা)। জোতদার কিবুবাবু এবং [illegible] ওরফে রোশনলালের ভূমিকায় ক্রমে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশ

আরতি ভট্টাচার্য স্ত্রী ছবিতে। পরিচালক : সলিল দত্ত। ফটো : অমৃত

মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আতিশয্যদোষে দুষ্ট। নায়ক ইন্দ্ররূপে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ একটি মধ্যমান রক্ষা করে চলেছে: কোথাও কোনো ঔজ্জ্বল্য নজরে পড়ে না।

ছবির দুখানি গান—কি রচনা, কি সুরযোজনা—কোনোদিক দিয়েই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে নি।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

"অপরাহ্নের আলো"র সংগীতগ্রহণ

কিনে পিকচার্স-এর পরবর্তী বাঙলা ছবি হচ্ছে স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে গঠিত "অপরাহ্নের আলো"। ছবিটির পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন অর্ধেন্দু সেন। সম্প্রতি বোম্বের ফেমাস সিনে ল্যাবরেটারীতে এই ছবির কয়েকখানি গান গৃহীত হয়েছে সংগীত পরিচালক বিজন পালের পরিচালনাধীনে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন আশা ভোঁসলে, মান্না দে এবং অন্যান্য শিল্পী। ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে মার্চ থেকে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' :

পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর বিরাট ইউনিট এবং অনেক শিশু-শিল্পী নিয়ে বেশ কয়েকদিন একটানা বহির্দৃশ্য গ্রহণ করার পর আবার কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অন্তর্দৃশ্য গ্রহণে।

কে. এল. কাপুর ফিল্মস প্রযোজিত 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' সম্পূর্ণ মজাদার এক কিশোর কাহিনীর চিত্ররূপ।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরসংযোজিত এ ছবিতে অভিনয় করছেন—উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, শ্যাম লাহা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল দত্ত, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ বসু, হিরণ্ময় মিশ্র, বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গা মিশ্র এবং অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়চৌধুরী। এঁদের মধ্যে অনেকেই নবাগত শিশুশিল্পী এবং এঁদের সংগে আশ্চর্য অভিনয় করেছে একটি চিল, যে হবে এই ছবির একটি বিস্ময়কর আকর্ষণ।

'মেঘের পরে মেঘ'

টেকনিসিয়ান্স ওন প্রোডাকসন্সের 'মেঘের পরে মেঘ' ছবির চিত্রগ্রহণ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টিতে আছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্তা, নির্মলা মিশ্র ও বাচ্চু রহমান।

চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন—যথাক্রমে সুনীল চক্রবর্তী, অনিল সরকার ও অমিতাভ বর্ধন।

চরিত্রচিত্রণে আছেন—অনিল চট্টোপাধ্যায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গুলচান্দানী ও অজয় সরকার। ছবিটির চিত্রগ্রহণ শেষ হতে বেশী দেরী নেই।

"ছিন্নপত্র" ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ

কলামন্দির নিবেদিত "ছিন্নপত্র" ছবির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন যাত্রিকগোষ্ঠী। সুরারোপ নচিকেতা ঘোষের।

উত্তমকুমার ছবিটির প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী চক্রবর্তী, কমল মিত্র, অসিতবরণ, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, সাধন সেনগুপ্ত ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়।

শুভ চিত্রম ছবিটির বিশ্ব পরিবেশক।

'চিঠি'—আসছে।

ডাঃ আর এন বসুর প্রযোজিত [illegible] আর্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রাণ মাতানো হাসির ছবি "চিঠি" খুব শীঘ্র আসছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন—পরিচালক [illegible] পাধ্যায় স্বয়ং। সুরসৃষ্টিতে শ্যামল মিত্র। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র।

সমিত ভঞ্জ ও সন্ধ্যা রায় ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন—রবি ঘোষ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, জ্যোলিতা চট্টোপাধ্যায়, [illegible] বসু, শিউলি মুখোপাধ্যায়, নীলোৎপল দে, নিভাননী দেবী, জহর রায় ও অনুপ ঘোষ।

শেষ পর্ব-এ মিঠু মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা : চিত্ত বসু। ফটো : অমৃত

ফিল্ম ফাইনান্সিং কর্পোরেশন ছবির পরিবেশক।

নবরামছিল চিত্রের একটি দৃশ্যে সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল, সোম মুখোপাধ্যায় ও শমিত্র বিশ্বাস। পরিচালনা : পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়।

ফটো : অমৃত

বনপলাশীর পদাবলী'র সংগীতগ্রহণ

শিল্পীসংসদ প্রযোজিত 'বনপলাশির পদাবলী'র সংগীতগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, উৎপলা সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের বেশ কয়েকটি গান ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। ছবিটির সংগীতপরিচালনায় আছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র।

রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে এ-ছবির চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে কানাই দে, রবি চট্টোপাধ্যায় ও কমল গঙ্গোপাধ্যায়।

ছবির অন্যান্য শিল্পী : সুপ্রিয়া দেবী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, নির্মলকুমার, জহর রায়, মধু বসু, বিধু দে, জীতেন ব্যানার্জি, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, সীতেশ চক্রবর্তী, গৌর শী, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল সেন, শিশির মিত্র, বনানী চৌধুরী, শমিতা বিশ্বাস, শুভ্র সেন, স্বপনকুমার; মলিনা দেবী, মাধবী নন্দী, শিপ্রা মিত্র, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী চক্রবর্তী প্রমুখ।

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিমিটেড পরিবেশিত এ-ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ আগামী মাসেই শুরু হবে।

'মেমসাহেব'-এর দ্বিতীয়পর্বের সংগীতগ্রহণ :

অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত ও পরিবেশিত এবং পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত নিমাই ভট্টাচার্যের 'মেমসাহেব'-এর দ্বিতীয় পর্বের সংগীতগ্রহণ করা হয়েছে গেল ১৮ই ফেব্রুয়ারী টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। এই পর্বে একটি রাগসংগীত ও একটি রবীন্দ্রসংগীত (সমবেত কণ্ঠে) গৃহীত হয়েছে। দ্বৈতসংগীতে ছিলেন—আরতি দে ও সঙ্গীতে পরিচালিকা স্বয়ং। অন্যটি সমবেত কণ্ঠে গেয়েছেন—বাণীচক্রের শিশুশিল্পীরা।

জানা গেছে যে, এই ছবির বহিঃদৃশ্যগ্রহণের জন্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা বর্তমানে দিল্লীতে আছেন এবং সেখানে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেনকে নিয়ে কিছু দৃশ্যগ্রহণ করে আগ্রা ও জয়পুরের দিকে বাকি অংশের চিত্রগ্রহণ শেষ করে সমগ্র ইউনিট মার্চের ৬।৭ তারিখ কলকাতায় ফিরবেন।

উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আছেন—সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, গীতা দে, মাস্টার ইন্দ্রজিৎ এবং নবাগতা মধুছন্দা রায়।

মঞ্চাভিনয়

টেক এসোসিয়েশনের নাট্যাভিনয়

টেক্ এসোসিয়েশন প্রযোজিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'মন্বীপান্তর' নাটকটি গেল ২৬শে জানুয়ারী রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চে এক উজ্জ্বল সাফল্যের নিদর্শন। সমকালের পটে অতীতের কথা বলার ভঙ্গীটি নিখুঁত সত্যের আবরণে মোড়া। নাট্য-আন্দোলনের শতবর্ষ পূর্তিকে কেন্দ্র করে আজ থেকে একশত বর্ষ পূর্বের ঘটনা নির্বাচনে অধুনা পরিচিত এই নাট্য-সংস্থাটি একটি বিশেষ যুগভাবনার পরিচয় দেয়। কাহিনীর কিছু অংশে যে অবাস্তবতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সুষ্ঠু পরিচালন গুণে এবং আঙ্গিক ও অভিনয়ের মেলবন্ধনে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। এই সাফল্যের জন্যে কয়েকজন শিল্পী বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কালীচরণের ভূমিকায় দেবরাজ-এর নাম। তাঁর অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের আগাগোড়া অভিভূত করে রাখে। এর পর বিশেষ প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী মুকুন্দ চরিত্রে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও টগর চরিত্রে গীতশ্রী দেবীর। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে ধনদাপ্রসাদ ও জ্ঞানদা প্রসাদ যথাক্রমে সুব্রত রায় ও রামরঞ্জন নাথের অভিনয়, প্রমদা ও গুরুপদর চরিত্রে স্বপন দে ও অহিভূষণ রায় এবং তারাচরণের ভূমিকায় সুধাংশুশেখর নাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পদ্ম চরিত্রে প্রভাতী মিত্রকে ভাল লাগে। নাটকটি পরিচালনা করেন বিকাশ মিত্র। আবহসংগীত ভাল। ত্রুটিহীন পরিচালনা, সু-অভিনয় এবং আলো ও আঙ্গিকের সংমিশ্রণে নাটকটিকে জীবন্ত করে তুলেছিল।

নিখিল ভারত বহুভাষার নাটক প্রতিযোগিতা

খড়্গপুরের রবীন্দ্র ইনস্টিটিউটে আসছে ১৮ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ছ'দিন ধরে নিখিল ভারত বহুভাষার নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দিন বেলা তিনটায় এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায় এবং শেষ দিন ২৩ মার্চ পুরস্কার বিতরণ করবেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। প্রতিদিন তিনখানি করে (রবিবার ১৯ মার্চ চারখানি) পাঁচ দিনে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, আসামী,

মারাঠী, তেলেগু ও মালয়লম ভাষায় ষোলখানি নাটক অভিনীত হবে। শেষ দিনে প্রতিযোগিতা-বহির্ভূত বিশেষ অনুষ্ঠানস্বরূপ অভিনীত হবে সংস্কৃত নৃত্যনাট্য 'মেঘমেদুরে মেদিনীয়ম্'। বারান্তরে আমরা এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আরও তথ্য পরিবেশন করবার আশা রাখি।

'মেয়ে মানুষের গপ্পো' ও 'অথ থানা পুলিশ কথা' : নাট্যপ্রযোজনায় 'গান্ধার গোষ্ঠী'র যে শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে নাট্যানুরাগীদের যে আন্তর পরিচিতি আছে, তা আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁদের সাম্প্রতিক নাট্যপরিবেশনায়। কয়েক-দিন আগের একটি সকালে মুক্ত অঙ্গনে পরিবেশিত নাটকদুটি ছিল 'মেয়ে মানুষের গপ্পো' ও 'অথ থানা পুলিশ কথা'।

'মেয়ে মানুষের গপ্পো' নাটকের সংঘাত গড়ে উঠেছে মেসে চাকুরে তিনটি কুমারী মেয়ের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার আবর্তকে কেন্দ্র করে। নাটকটির সংলাপে এবং কয়েকটি মুহূর্তে নাট্যকার কবিতা সিংহের কবিমন মাঝে মাঝে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা কোন ক্ষেত্রেই নাটকের স্বকীয় দুর্বার গতিকে ব্যাহত করেনি। দেবী, সুধা আর সুরমা তিনবন্ধু চাকরী করে তিনটি বিভিন্ন অফিসে—আবার সকল কাজের শেষে তারা ফিরে আসে তাদের নির্দিষ্ট বেড়ে। শত নিয়মের মাঝেও এক অলিখিত নিয়মের তাগিদে মন প্রেম ও ভালোবাসার স্নিগ্ধতায় একটু পেলব হোতে চায়। তারা প্রেম চায়, প্রেম নিবেদন করতে চায়। এই প্রেমের ট্রাজেডিকেই ভাষা দিয়েছে 'মেয়ে মানুষের গপ্পো' নাটকটি। এই তিনটি মেয়ের যন্ত্রণাকে মঞ্চের আলোয় মূর্ত করে তোলেন কবিতা সিংহ, নন্দা গঙ্গোপাধ্যায় ও শেফালী গঙ্গোপাধ্যায়। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

'অথ থানা পুলিশ কথা'য় নাট্যকার বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশকে নিয়ে তীব্র বিদ্রুপাত্মক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। নির্দেশক অসিত মুখোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু প্রয়োগপরিকল্পনায় ও দলগত সংযত অভিনয়গুণে নাটকটি সার্থকভাবে উপ-স্থাপিত হয়েছে।

শীতের শেষেও জেমিনী সার্কাসের আসর জমজমাট পার্ক সার্কাস ময়দানে। নয়ন-নন্দিনীদের নয়নাভিরাম লীলাভিনয়ের একটি দৃশ্য।

বিবিধ সংবাদ

১৯৭১ সালে প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে বি এফ জে-এর রায়

গেল শনিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, রাত্রি আটটার সময় ১৯৭১ সালে কলকাতায় প্রদর্শিত বাংলা, হিন্দী ও বিদেশী ছবি সম্পর্কে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সভাদের রায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের বিচারে প্রথম দশখানি **ভারতীয় ছবি হচ্ছে :** নিমন্ত্রণ, আনন্দ, সীমাবদ্ধ, চেতনা, সারা আকাশ, মালাদান, গুড্ডি, এখনই, তেরে মেরে স্বপ্নে এবং খামোশী। **প্রথম তিনখানি বিদেশী ছবি:** **চার্লি, উডস্টক ও মিডনাইট কাউবয়।**

শ্রেষ্ঠ পরিচালক : তরুণ মজুমদার (বাংলা, নিমন্ত্রণ), হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (হিন্দী, আনন্দ) ও মাইকেল ওয়াডলে (বিদেশী—উডস্টক)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : উত্তমকুমার (বাংলা—এখানে পিঞ্জর), রাজেশ খান্না (হিন্দী—আনন্দ) ও ক্লিফ রবার্টসন (বিদেশী—চার্লি)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : সন্ধ্যা রায় (বাংলা—নিমন্ত্রণ), রেহানা সুলতান (হিন্দী—চেতনা) ও সোফিয়া লোরেন (বিদেশী—সান ফ্লাওয়ার)। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : চিন্ময় রায় (বাংলা—এখনই), অমিতাভ বচন (হিন্দী—আনন্দ)। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (বাংলা—মালাদান), ফরিদা জালাল (হিন্দী—পারশ)। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার : সত্যজিৎ রায় (বাংলা—সীমাবদ্ধ), বাসু চট্টোপাধ্যায় (হিন্দী—সারা আকাশ)। শ্রেষ্ঠ সংলাপ-রচয়িতা : সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহ (বাংলা—সীমাবদ্ধ এবং এখনই), গুলজার (হিন্দী—আনন্দ)। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-পরিচালক হেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বাংলা—জয়জয়ন্তী) শংকর জয়কিষেণ (হিন্দী আন্দাজ)। শ্রেষ্ঠ গীত রচয়িতা : শ্যামল গুপ্ত (বাংলা—জয়জয়ন্তী), হসরৎ জয়পুরী (হিন্দী—আন্দাজ) শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পী : শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা—নিমন্ত্রণ), কে কে মহাজন (হিন্দী সাদা-কালো—সারা আকাশ), ভি রত্র (হিন্দী রঙীন—তেরে মেরে স্বপ্নে)। শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক : সুনীতি মিত্র (বাংলা—কুহেলি), দেশ মুখোপাধ্যায় (হিন্দী—জল বিন মছলি)। শ্রেষ্ঠ শব্দানুলেখক : বাণী দত্ত, নৃপেন পাল ও সুজিত সরকার (বাংলা—কুহেলি), এ কে পারমার ও মঙ্গেশ দেশাই (হিন্দী—জল বিন মছলি)। শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা : দুলাল দত্ত (বাংলা—সীমাবদ্ধ), বিজয় আনন্দ (জনি মেরা নাম)। শ্রেষ্ঠ নেপথ্যগায়ক : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (বাংলা—ধনী মেয়ে), কিশোরকুমার (হিন্দী—আন্দাজ)। শ্রেষ্ঠ নেপথ্যগায়িকা : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (বাংলা—জয়জয়ন্তী), লতা মঙ্গেশকর (হিন্দী—তেরে মেরে স্বপ্নে)। বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন 'গুড্ডি' চিত্রে অভিনয়ের জন্যে জয়া ভাদুড়ী।

জেমিনী সার্কাস

প্রতি বছরের মত এবারেও জেমিনী সার্কাস নতুন নতুন মজাদার রোমাঞ্চকর খেলার ভাণ্ডার নিয়ে কোলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে তাঁবু ফেলেছে। খেলা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। বাঘেরা আগুনের গোলকের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। ব্যান্ডের তালে তালে বাঘ-সিংহের হাততালি দেওয়া। একটা ভল্লুক মটর সাইকেল চালিয়ে দর্শকদের চমক লাগিয়ে চলে গেল। হঠাৎ দেখি একটা গাধা ছুটে এসে রেলের সিগন্যাল ডাউন করে দিয়ে চলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের বুক চিরে বাঁশি বাজাতে বাজাতে একটা মিনি রেল বেরিয়ে এল। নানান জীব-জন্তুতে ভরা এই জেমিনী রেলটার চালক একটি শিম্পাঞ্জী। বাস্তবিক দেখার মত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এই দৃশ্য তাদের কল্পনার বাইরে। তার মধ্যে জোকারদের মজার ব্যাপারগুলো তো আছেই। তারপর ব্যালেন্স, অন্ধকারে ফ্লাইং ট্রাপিজ, প্লাস্টিক গার্ল, জীপ-জাম্প, এক-চাকা সাইকেল চড়ে মেয়েদের ভলিবল খেলা, কামানের মুখ থেকে মানুষ বেরিয়ে আসা আরও কত কি রোমাঞ্চকর খেলা আছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আনা জলসিংহ (শীল) পর্যন্ত বাদ যায়নি। খেলা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হয়েছে এইসব খেলা আয়ত্ত করা সামান্য ব্যাপার নয়। নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং সংযম না থাকলে এই রকম পাকা খেলোয়াড় হওয়াও সম্ভব নয়। দর্শকদের মন-জয়-করা খেলা জেমিনী পরিবেশন করতে পেরেছে।

নতুন মুখ : মহুয়া রায়চৌধুরী 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিতে। পরিচালক : তরুণ মজুমদার, প্রযোজনা : কে এল কাপুর ফিল্মস।

গ্রামোফোন কোম্পানীর রবিশঙ্কর সম্বর্ধনা

পণ্ডিত রবিশঙ্করের সপ্তাহব্যাপী কোলকাতা অবস্থান অন্তে যাত্রা শুরুর আগে গ্রামোফোন কোম্পানীর বিশেষ অনুরোধে কিছুক্ষণের জন্য নবনির্মিত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সদ্য-উন্মোচিত স্টুডিও পরিদর্শন করতে আসেন।

স্টুডিওর সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত, স্বাচ্ছন্দ্য ও রমনীয়তা দেখে পণ্ডিতজী খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। এইখানেই আমেরিকায় হিট রেকর্ড সেলের সেই দুটি বিখ্যাত ডিস্ক 'কনসার্ট অন বাংলাদেশ' ও 'জয়বাংলা' বাজিয়ে তাঁকে শোনানো হলো।

পরিশেষে কোম্পানী-পরিচালক তাঁর হাতে একটি এইচ এম ভি সুপার স্টিরিও সাউন্ড সিস্টেমের মেশিন উপহার দেন।

খেলাধূলা

দর্শক

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট খেলা

কিংস্টনের স্যাবিনা পার্কে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। নিউজিল্যাণ্ডের খুব বাহাদুরী যে তারা দারুণ সঙ্কটে পড়েও শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র রেখেছে। খেলার অমীমাংসিত ফলাফল সাধারণত দর্শকদের মনঃপূত হয় না। কিন্তু এই খেলাটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় লরেন্স রোয়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যে অমরত্ব লাভ করেছে। [illegible] তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে উভয় ইনিংসে [illegible] সেঞ্চুরী (২১৪ ও ১০০ নটআউট) করেন যা একদিক থেকে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রথম নজির এবং অপরদিক থেকে তৃতীয় নজির। প্রথম আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার [illegible] তাঁর আগে আর কেউ খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন নি। [illegible] তাঁর আগে মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—অস্ট্রেলিয়ার ডগ ওয়াল্টার্স এবং ভারতবর্ষের সুনীল গাভাস্কার একটি টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী এবং ডাবল সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন।

[illegible] ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় লরেন্স [illegible] সেঞ্চুরী করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রয় ফ্রেডারিকস (১৬৩ রান) [illegible] নিউজিল্যাণ্ডের গ্লিন টার্নার নট আউট [illegible] এবং মার্ক বার্জেস (১০১ রান)।

প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের মাত্র একটা উইকেট খুইয়ে ২৭৪ রান সংগ্রহ করে। ওপনিং ব্যাটসম্যান রয় ফ্রেডারিকস (১২৬ রান) এবং নবাগত খেলোয়াড় লরেন্স রো (৯৪ রান) ২য় উইকেটের জুটিতে ১৯৬ রান তুলে অপরাজিত থাকেন। ফ্রেডারিকস শেষ ৯০ মিনিটের খেলায় যা গা-ঘামিয়ে খেলে [illegible] রান সংখ্যা তুলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চা-পানের ৫ মিনিট আগে ৫০৮ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় দলের রান ছিল ৩৮৪ (২ উইকেটে)। ২য় উইকেটের জুটিতে ফ্রেডারিকস (১৬৩) এবং রো (২১৪) দলের ২৬৯ রান তুলে দিয়েছিলেন।

জামাইকার ২৩ বছরের যুবক লরেন্স রো তার খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে যে দ্বিশত রান (২১৪) করেন তা আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় নজির। তাঁর আগে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন মাত্র এই একজন খেলোয়াড়—১৯০৩ সালে সিডনি মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের আর ই ফস্টার (রান ২৮৭)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপুল সংখ্যক ৫০৮ রানের (৪ উইকেটে) পিছনে থেকে দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় নিউজিল্যাণ্ড ১ম ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৪৯ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৮০ (৫ উইকেটে)। ফলো-অন থেকে ছাড়ান পেতে তাদের তখনও ২৯ রান করার দরকার ছিল। হাতে ছিল ১ম ইনিংসের পাঁচটা উইকেট। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে গ্লিন টার্নার (১৬৪ রান) এবং উইকেট কিপার কেন ওয়াডসওয়ার্থ (৫০ রান) দলের অতি মূল্যবান ১৭২ রান তুলে অপরাজিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরাই দলকে অপমানজনক অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্স দলের ৯ জন বোলারকে দিয়েও টার্নার ওয়াডসওয়ার্থের ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি ভাঙতে পারেন নি। লাঞ্চের সময় নিউজিল্যাণ্ডের খুব কাহিল অবস্থা ছিল ৫ উইকেট পড়ে ১২৮ রান। ৫ম উইকেট পড়েছিল ১০৮ রানের মাথায়। গ্লিন টার্নার মাটি কামড়ে ৭ ঘণ্টা ব্যাট করে ১৬৪ রান তুলেছিলেন।

চতুর্থ দিনে ৩৮৬ রানের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের তিন উইকেটের বিনিময়ে ১৬৮ রান তুলে ২৯০ রানে এগিয়ে যায়।

নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের খেলায় ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে টার্নার এবং ওয়াডসওয়ার্থ ২৯৫ মিনিটে দলের ২২০ রান যোগ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ২২০ রানই আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। টার্নার দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা ৩২ মিনিট খেলে ২২৩ রান তুলে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই প্রথম ডাবল সেঞ্চুরীতে ২৫টা বাউণ্ডারী ছিল। তিনি একাই দলের মোট রানের (৩৮৬) অর্ধেকের বেশী রান তুলে দিয়েছিলেন।

পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হিসেব করেই ২য় ইনিংসের ২১৮ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। লরেন্স রো ২য় ইনিংসেও সেঞ্চুরী (নটআউট ১০০ রান) করে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে বিশ্ব রেকর্ড করেন—খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার প্রথম নজির।

শেষ দিনের খেলার বাকি ৩১০ মিনিটে নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৪১ রান সংগ্রহ করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। নিউজিল্যাণ্ড জয়লাভের কোন চেষ্টাও করেনি। ২য় ইনিংসের ১৩৫ রানের মাথায় ৫ম উইকেটের পতনে তারা এক সময় খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি মার্ক বার্জেস (১০১ রান) এবং কেন ওয়াডসওয়ার্থ (নটআউট ৩৬ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে দু'ঘণ্টা খেলে দলের ৭৯ রানই তুলেননি খেলাটা বেশী সময়ই টিকিয়ে রেখেছিলেন। বার্জেস দাঁতে দাঁত দিয়ে খেলেছিলেন। তিনঘণ্টার খেলায় তিনি তাঁর ১০১ রানে ১৫টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী করেন। নিউজিল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের ২৩৬ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘটে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৫০৮ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রয় ফ্রেডারিকস ১৬৩ এবং লরেন্স রো ২১৪ রান। হাওয়ার্থ ১০৮ রানে ২ উইকেট)

ও ২১৮ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রো নটআউট ১০০ রান। কংডন ৪৫ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড : ৩৮৬ রান (গ্লিন টার্নার নটআউট ২২৩, কেন ওয়াডসওয়ার্থ ৭৮। ডো ৭৫ রানে ৩, শিলিংফোর্ড ৬৩ রানে ৩, হলফোর্ড ৪ রানে ২ এবং গিবস ৯৪ রানে ২ উইকেট)

ও ২৩৬ রান (৬ উইকেটে। মার্ক বার্জেস ১০১ রান। হলফোর্ড ৫৫ রানে ৪ উইকেট)

দলীপ ট্রফি

সেমিফাইনাল খেলা

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফি আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে মধ্যাঞ্চল দল ৫ উইকেটে গত বছরের দলীপ ট্রফি বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। ফাইনালে মধ্যাঞ্চল দল খেলবে শক্তিশালী পশ্চিমাঞ্চল দলের বিপক্ষে। এখানে উল্লেখ্য, দীর্ঘ সাত বছর পর মধ্যাঞ্চল দল ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করলো।

প্রথম দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ২৭৭ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে মধ্যাঞ্চল দল কোন উইকেট না-খুইয়ে ৯ রান সংগ্রহ করে।

প্রথম দিনের খেলায় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা—ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খানের ৯০ রান, ৯৭ মিনিটে জয়সীমা এবং বিশ্বনাথের ৩য় উইকেটের জুটিতে ১০২ রান এবং মধ্যাঞ্চল দলের অলরাউণ্ডার সেলিম দুরানীর ৬৫ রানে ৬টা উইকেট।

সেলিম দুরানী

দ্বিতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে মধ্যাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ৩০৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৩২ রানে এগিয়ে যায়।

মধ্যাঞ্চল দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন—সেলিম দুরানী (৮৩ রান), পার্থসারথি শর্মা (৮৩) এবং লক্ষ্মণ সিং (৫১)। সেলিম দুরানী এইদিন ৬০ রান পূর্ণ করার সূত্রে দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতায় তাঁর ১,০০০ রান পূর্ণ করার গৌরবলাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতায় তাঁর আগে এই তিনজন খেলোয়াড় ১,০০০ রান পূর্ণ করেছেন—অজিত ওয়াদেকার, এম এল জয়সীমা এবং মনসুর আলি খাঁ। তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষদিনে দাক্ষিণাঞ্চল দল ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১৪৩ রান তুলে ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই অবস্থায় খেলার বাকি ১৩৮ মিনিটে মধ্যাঞ্চল দলের জয়লাভের জন্যে ১১২ রান সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৭ মিনিট আগে মধ্যাঞ্চল দল ৫ উইকেটের বিনিময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ২ রান তুলে ৫ উইকেটে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণাঞ্চল : ২৭৭ রান (মনসুর আলি ৯০, জয়সীমা ৫৬ এবং বিশ্বনাথ ৪৩ রান। সেলিম দুরানী ৬৫ রানে ৬ এবং ঘাটানি ৫১ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৪৩ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জয়ন্তীলাল ৫৩ নট্‌আউট। কৈলাশ ঘাটানি ৪৯ রানে ৪ এবং অশোক জগদল ৩১ রানে ৩ উইকেট)

মধ্যাঞ্চল : ৩০৯ রান লক্ষ্মণ সিং ৫১, পার্থসারথি শর্মা ৮৩ এবং সেলিম-দুরানী ৮৩ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ১০৫ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ৯১ রানে ৩ উইকেট।

ও ১১৪ রান (৫ উইকেটে। পার্থসারথি শর্মা ৪৯ রান। চন্দ্রশেখর ৪১ রানে ৪ উইকেট)

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

মাদ্রাজের কর্পোরেশন ইনডোর স্টেডিয়ামে ৩৩তম জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ১৭ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র পাদুকোন প্রকাশ পুরুষ এবং বালকদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আগে কোন খেলোয়াড় একই আসরে পুরুষ এবং বালকদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হননি। তিনি পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালে পাঁচবারের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এবছরের ১নং বাছাই খেলোয়াড় সুরেশ গোয়েলকে এবং সেমিফাইনালে ৩নং বাছাই

পি প্রকাশ

রমেন ঘোষকে হারিয়ে ফাইনালে [illegible] ছিলেন। অপরদিকে ফাইনালে [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বী ৪নং বাছাই দেবীন্দর [illegible] (পাঞ্জাব) ২নং বাছাই খেলোয়াড় [illegible] ঘোষকে হারিয়েছিলেন। প্রকাশ [illegible] জাতীয় খেতাব জয়ে বাছাই [illegible] মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে [illegible] পুরুষদের বাছাই তালিকায় প্রকাশের [illegible] স্থানই ছিল না।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : [illegible] পাদুকোন প্রকাশ [illegible] ১৫-৩ ও ১৮-১৭ [illegible] দেবীন্দর আহুজাকে [illegible] করেন।

পুরুষদের ডাবলস : [illegible] সুরেশ গোয়েল এবং [illegible] (রেলওয়ে) ১৫-১১ ও [illegible] রমেন ঘোষ এবং [illegible] (উড়িষ্যা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : [illegible] মূর্তি (মহারাষ্ট্র) [illegible] পয়েণ্টে ২নং বাছাই [illegible] (অন্ধ্র) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : ১নং বাছাই [illegible] শোভা মূর্তি এবং মোদিন [illegible] (মহারাষ্ট্র) ১৫-৮ ও [illegible] নোরীন পাদুয়া এবং [illegible] (কেরল) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস : পাদুকোন প্রকাশ (মহীশূর) ১৫-১১ ও [illegible] পয়েণ্টে হনুমন্ত রাওকে [illegible] পরাজিত করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ রচনা ॥ শ্রেষ্ঠ লেখক

সত্যজিৎ রায়ের নূতন চিত্রনাট্য

কাঞ্চন জঙ্ঘা ৪৲

প্রায় প্রতি বছরই যিনি শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচনার সম্মান লাভ করেন তাঁরাই স্বরচিত কাহিনীর এই চিত্রনাট্য একাধারে সাহিত্যামোদী ও চলচ্চিত্রামোদীদের মুগ্ধ করবে।

প্রমথনাথ বিশীর
নূতন উপন্যাস

পূর্ণাবতার ১০৲

শ্রীকৃষ্ণের ঘাতক জরার জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস

জরাসন্ধর
নূতন উপন্যাস

নিঃসঙ্গ পথিক ১০৲

লেখকের জন্মভূমি ও মর্মভূমি বাংলা দেশের বিখ্যাত নদ আড়িয়াল খাঁর পটভূমিতে লেখা অনন্য উপন্যাস

শংকরের
নূতন উপন্যাস

স্থানীয় সংবাদ

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত

কলকাতার কাছেই

নূতন মুদ্রণ—আট টাকা

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
১৯৭২এর আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত ভ্রমণ কাহিনী

মণিমহেশ (নূতন মুদ্রণ) ৬॥

বিভূতি রচনাবলী

এপর্যন্ত বিভূতি রচনাবলীর নয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে! যে খণ্ডে যে সব বই আছে :

১ম খণ্ড : পথের পাঁচালী, মেঘমল্লার, স্মৃতির রেখা, আমার লেখা। প্রধান ভূমিকা—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১ম খণ্ডের ভূমিকা—প্রমথনাথ বিশী

২য় খণ্ড : অপরাজিত (১ম খণ্ড) তৃণাংকুর মৌরীফুল, অভিযাত্রিক। ভূমিকা—অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৩য় খণ্ড : অপরাজিত (২য় খণ্ড), কেদার রাজা, যাত্রাবদল, ঊর্মিমুখর। ভূমিকা—ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়)—ইংরাজী পথের পাঁচালীর অনুবাদক।

৪র্থ খণ্ড : দৃষ্টিপ্রদীপ, কিন্নরদল, রূপহলুদ, উৎকর্ণ। ভূমিকা—ডঃ সুকুমার সেন

৫ম খণ্ড : আরণ্যক, অশনি-সংকেত জন্ম ও মৃত্যু, বনে পাহাড়ে, থলকোবাদে এক রাত্রি। ভূমিকা—ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

৬ষ্ঠ খণ্ড : আদর্শ হিন্দু হোটেল, বিপিনের সংসার, বেণীগির ফুলবাড়ি। ভূমিকা—গোপাল হালদার

৭ম খণ্ড : অনুবর্তন, নবাগত, অসাধারণ, হে অরণ্য কথা কও। ভূমিকা—পরিমল গোস্বামী

৮ম খণ্ড : দেবযান, উপলখণ্ড, বিধু মাষ্টার, ছায়াছবি। ভূমিকা—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

এবং

৯ম খণ্ড : চাঁদের পাহাড়, মরণেরডঙ্কা বাজে, মিশমিদের কবচ, তালনবমী, হীরা-মানিক জ্বলে ও এতাবৎ অপ্রকাশিত ছোটদের ২টি গল্প। ভূমিকা—লীলা মজুমদার। পিতৃ তর্পণঃ লেখকের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই খণ্ডে প্রতিটি গ্রন্থের বর্ণমধুর প্রচ্ছদপট ও অতিরিক্ত একটি বহুবর্ণের জ্যাকেট।

।। সম্ভবত আরও ৩ খণ্ডে রচনাবলী সমাপ্ত হবে ।।

প্রতিটি খণ্ডে মূল্যবান গ্রন্থ পরিচয় লিখেছেন চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৪৲ : প্রথম খণ্ড পুনর্মুদ্রণ ১৬৲ : দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রণ যন্ত্রস্থ।

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৪ সংখ্যা

Friday, 10th March, 1972 শুক্রবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৭৮

প্রচ্ছদ : শ্রীঋতু দাশ

'এক নজরে'

ওরা বাঁচতে পারে : আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার সুপ্রীম কোর্টে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ৬-১ ভোটে মৃত্যুদণ্ড সংবিধান-বিরোধী বলে ঘোষিত হয়েছে। বিচারপতি-মণ্ডলীর গরিষ্ঠ অংশ তাঁদের রায়ে বলেছেন, মৃত্যুদণ্ড একটি অতি নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি এবং তা মানুষের মর্যাদা ও মানবিক আদর্শ-উদ্বুদ্ধ বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন। বিচারপতিরা আরও বলেছেন, মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও নিষ্ঠুর শাস্তি হল, এক ভয়ংকর পরিণতির প্রতীক্ষায় মৃত্যুঘরে বসে দণ্ডিত ব্যক্তির বছরের পর বছর অতিবাহিত করা। ঐ মানসিক নির্যাতনে মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার সানকুয়েন্টিন গ্যাস চেম্বারে প্রাণ দেওয়ার জন্য এখন ১০৬ জন হতভাগ্য অপেক্ষা করছে, তাদের মধ্যে পাঁচ-জন স্ত্রীলোক। ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন আদালত, মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করায় গত চার বছরে ঐ রাজ্যে কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি, এবং সেই কারণেই মৃত্যুদণ্ডিতের সংখ্যা ঐভাবে বেড়ে গেছে। যে শতাধিক নারীপুরুষ সান-কুয়েন্টিন গ্যাসঘরের অদূরে বসে কমবেশি চার বছর ধরে মৃত্যুর আগে হাজারবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে তাদের মধ্যে আছে সেনেটর কেনেডির হত্যাকারী শিরহান বি শিরহান ও সারন টেট হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত চার্লস মনসন।

১৮৯৩ সাল থেকে গত চার বছর আগে পর্যন্ত ক্যালি-ফোর্নিয়ায় মোট ৫০২ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। তাদের মধ্যে ২১৫ জনকে সান কুয়েন্টিন জেলে এবং ৯৩ জনকে ফলসন জেলে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, এবং অবশিষ্ট ১৯৪ জনকে স্যান কুয়েন্টিন গ্যাসঘরে ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড রদের দাবিতে মানবিক আন্দোলনের সূচনা হয় এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে। তারপর তা প্রায় জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয় অপরাধী লেখক সিরিল চেসম্যানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের তৎকালীন গভর্নর এডমণ্ড জি ব্রাউন নিজে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী ছিলেন বলে তিনি চেসম্যানের মৃত্যু প্রায় আট বছর ঠেকিয়ে রাখেন। তারপর সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে '৬৯ সালে চেসম্যানের মৃত্যু হয়। কিন্তু চেসম্যানের প্রাণদান যে ব্যর্থ হয়নি তা বোঝা যায়, পরবর্তীকালে গভর্নর ব্রাউনের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড-বিরোধী আন্দোলনের আরও শক্তিবৃদ্ধিতে। ক্যালিফোর্নিয়ায় গত চার বছরে যে কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত ঐ রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতেও যে মৃত্যুদণ্ড সংবিধান-বিরোধী বলে ঘোষণা করা হল সে ঐ আন্দোলনেরই বাঞ্ছিত পরিণতি। চেসম্যানের মৃত্যুর পর গত দশ বছরে ক্যালিফোর্নিয়ায় মাত্র দুজনের, একজনের '৬৩ সালে ও একজনের '৬৭ সালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

রাজপুত্রের লাঞ্ছনা : সাম্রাজ্য নেই, তাই বোধহয় সম্রাটেরও প্রয়োজন নেই আর বৃটেনের। নইলে একদা যে নৃপতির দীর্ঘ-জীবনের জন্য দিবারাত্রি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতো বৃটেনের জনগণ, আজ তাঁরই জন্য বরাদ্দ ব্যয়কে তারা অবাঞ্ছিত বোঝা বলে মনে করবে কেন? কদিন আগে, কমন্স সভায়, রাজ-বিরোধিতার জন্য খ্যাত শ্রমিক সদস্য ডবলিউ হ্যামিলটন বলেন, রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী চার্লসের জন্য যে বছরের ব্যয় বাবদ এক লক্ষ দশ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় বিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয় সেটা খুবই অন্যায়। দুজন কয়লাখনি শ্রমিক মাটির নীচে পঞ্চাশ বছর কাজ করেও যে টাকা, উপার্জন করতে পারে না, একটি 'অপদার্থ ও বাজে ছোকরার' (টুয়ার্প) জন্য প্রতি বছর রাজস্ব থেকে সে টাকা মঞ্জুর করা কখনও সমর্থন করা যায় না। শ্রীহ্যামিল্টনের বক্তব্য বিষয়ে অনেকেই সমর্থন জানান, কিন্তু তিনি যে যুক্তরাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজাকে 'টুয়ার্প' বলে উল্লেখ করেছেন, সেটা বিশেষ আপত্তিকর ও 'আনপার্লামেণ্টারিয়ান' বলে মনে হয় অনেকের। তাই স্পীকারের নির্দেশে মাননীয় সদস্য শুধু ঐ কথাটি প্রত্যাহার করে নেন।

সভ্যতার পিলসুজ : রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ খেটে খাওয়া মানুষদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ওরা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় করে সভ্যতার আলো ধরে আছে; সকলে আলো পায় আর তেল গড়িয়ে পড়ে ওদের গা দিয়ে। —প্রায় একই ধরনের কথা শুনতে পাওয়া গেছে, দক্ষিণ ভারতের একদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও বর্তমানে মহীশূরের অংশ কুর্গ-এর অধিবাসীদের কাছ থেকে। তারা বলেছেন : কুর্গ অন্যকে আলো দিতে বাতির মতো জ্বলে নিঃশেষ হচ্ছে।

পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার কোলে ভূমিবদ্ধ ছোট্ট সুন্দর দেশ কুর্গ। সেখানে জন্মেছেন ভারতের দুই প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি জেঃ কে এম কারিয়াপ্পা ও জেঃ কে এস থিমায়া, কিন্তু সেখানে প্রতিরক্ষার কোন ঘাঁটি বা কোন অস্ত্র কারখানা, এমনকি একটা সৈন্য ব্যারাকও আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। কেন্দ্রের দুই প্রাক্তন রেলমন্ত্রী, পরলোকগত এইচ সি দাসাপ্পা ও শ্রী সি এম পুনাচা কুর্গের লোক, কিন্তু সারা কুর্গে এক মিটারও রেলপথ নেই। কুর্গ থেকে বেরিয়েছে কাবেরী নদী, কিন্তু সে নদীর সব জল কাজে লাগাচ্ছে মহীশূর ও তামিলনাড়ু রাজ্য। কুর্গে উৎপন্ন কফি সারা দেশে প্রিয়, কিন্তু কুর্গবাসীরা কফি খায় না। কুর্গীদের কাছে বোধহয় আবহাওয়ার জন্য কফির চেয়ে চা বেশি প্রিয়। তাই কফির দেশ কুর্গকে বাইরে থেকে চা এনে খেতে হয়।

আইনের সুযোগে : আধুনিক জীবন যেসব জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার সমাধান সব রাষ্ট্র সর্বদা করতে পারে না। প্রায় ক্ষেত্রেই এই অক্ষমতার মুখ্য কারণ ধর্মীয় সংস্কার, অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাধাও দুরতিক্রম্য। ফলে যেসব রাষ্ট্র ঐসব জটিল সমস্যার সহজ ও সুলভ সমাধান দিতে পারে তারা শুধু স্বদেশেরই উপকার করে না, বিদেশীরাও তার সুযোগ নিতে ছুটে আসে, আর তার ফলে রাষ্ট্রে অর্থাগমও কিছু কম হয় না। হাইতিতে বিবাহবিচ্ছেদ স্বল্পব্যয়ের ও সহজলভ্য হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেখানে বিবাহবিচ্ছেদকামীরা কিভাবে দলে দলে ছুটে যায় তার কথা ইতিপূর্বে একবার আলোচিত হয়েছে।

সম্প্রতি বৃটেনে সরকারি সূত্রে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, ১৯৭০ সালে বৃটেনে যে ৮৬ হাজার নারীর গর্ভপাত ঘটানো হয় (পূর্ব বছরের তুলনায় ঐ সংখ্যা ৬০ শতাংশ বেশি) তার মধ্যে বিদেশিনীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজারেরও বেশি। আবার তাঁদের মধ্যে ৩,৫০০ জন এসেছিলেন শুধু পশ্চিম জার্মানি থেকে। বলা বাহুল্য, নিজেদের দেশে আইনের প্রতিবন্ধকতার জন্যই ঐ বিদেশিনীদের বৃটেনে ছুটে আসতে হয়।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

এবারের নির্বাচনের লক্ষ্য

অনেক প্রতীক্ষার পর অবশেষে পশ্চিম বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিন সমাগত। এগারোই মার্চ নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দিয়ে তাঁদের প্রার্থী নির্বাচিত করবেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা। লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচনও একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। ১৯৬৭ সালের পর থেকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন। বলা যেতে পারে যে ওই সময় থেকেই সারা ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে এক পার্টির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চিরাচরিত ঐক্যে ফাটল ধরে। যে বিরোধী দলগুলো খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে এতদিন ক্ষমতা থেকে দূরে ছিল, সাতষট্টি সালের নির্বাচন তাদেরও সুযোগ করে দিল ক্ষমতার গদীতে বসবার। আমাদের পশ্চিম বাংলায় তখন থেকেই ক্ষণস্থায়ী সরকারের সূত্রপাত সাতষট্টি সাল থেকে বাহাত্তর সাল পর্যন্ত চারবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর মধ্যে ১৯৬৯ সালে বামপন্থীরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও ক্ষমতা হাতে রাখতে পারেনি। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে কোনোপক্ষই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। জোড়াতালি কোয়ালিশন সরকার একটা গঠিত হয়েছিল কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের সমর্থনে। কিন্তু তাও টিঁকতে পারেনি।

এবারের নির্বাচনে তাই নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে একটা বড় প্রশ্ন—স্থায়ী সরকার গঠন। নির্বাচকমণ্ডলী বা [illegible]রাই পারেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে। প্রতি বছরই নির্বাচন কোনো রাজ্যের পক্ষেই মঙ্গলজনক হতে পারে না। একটি স্থায়ী সরকার না থাকলে রাজ্যের প্রশাসনিক উন্নতির আশা যেমন করা যায় না তেমনি অপূর্ণ থাকে রাজ্যের [illegible] উন্নতির প্রতিশ্রুতি। পশ্চিম বাংলার সমাজজীবনে সর্বব্যাপী নৈরাশ্যের মূল কারণ তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা। একসময়ে এই রাজ্য শিল্পোন্নয়নে ভারতের মধ্যে ছিল অগ্রণী। স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে পশ্চিম বাংলার সেই অগ্রণী ভূমিকা চলে যায় অন্য রাজ্যের হাতে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট বা পাঞ্জাবের সঙ্গে সঙ্গে এখন আর পশ্চিম বাংলা শিল্পোন্নয়নে পাল্লা দিয়ে পারে না। তার ফলে ঘনবসতিপূর্ণ পশ্চিম বাংলার মানুষের হাতে না আছে পর্যাপ্ত চাষের জমি, না আছে শিল্পসমৃদ্ধির চাবিকাঠি। এদিকে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ফলে প্রচুর শিক্ষিত তরুণ ছেলের জীবিকার অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যা আজ এত ব্যাপক এবং গভীর যে শুধু রাজনৈতিক শ্লোগান দিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য চাই কাজ—এক্ষুনি অবিলম্বে পশ্চিম বাংলার রুগ্ন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য চাই ব্যাপক কর্মকাণ্ড। দুঃখের বিষয়, পশ্চিম বাংলার দুরবস্থা সম্পর্কে সকলে অল্পবিস্তর একমত হলেও কীভাবে এই দুরবস্থার প্রতিকার সম্ভব তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের। মতভেদ থাকা বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু গণতন্ত্রে এই মতভেদের নিরসন হয় আলোচনা বা বিতর্কের মাধ্যমে। কখনোই তাকে রাস্তার লড়াইয়ে পরিণত করে নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও হল জনগণের মতামতকে সম্মান দেওয়া। তাদের সম্মতিতেই জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন এবং ভবিষ্যৎ সরকারের ভিত্তি স্থাপন করবেন। পশ্চিম বাংলায় গত ক' বছর সরকারের অদলবদল ঘটেছে বহুবার। তাতে এই রাজ্যের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তাই বেড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধও ডেকে এনেছে অনেক অবাঞ্ছিত ও অশুভ পরিণতি। এর অবসানের জন্যই প্রয়োজন অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে জনমতের অভিব্যক্তি। ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। সারা এশিয়ায় পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে ভারত গত আড়াই দশক ধরে। এত বড় একটি দেশে দূরতম পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে ভোটদাতাদের অধিকার পৌঁছে দেওয়া বেশ দুরূহ কাজ। ভারত সেই কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে। পশ্চিমবাংলায় সেই অনুষ্ঠান হচ্ছে এগারোই মার্চ—প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন। এই রাজ্যের মানুষের রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত প্রখর। তাঁরা বুঝেশুনেই তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, এটা আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন একটি সুস্থ, সুদল এবং স্থায়ী সরকার। জনসাধারণ, আমরা আশা করি, নিজেদের ভবিষ্যত ও এই রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের স্বার্থে, এমনভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন যাতে গত কয়েক বছরের অস্থির অভিজ্ঞতার শেষে এই রাজ্য সত্যিকারের একটি স্থায়ী ও কল্যাণব্রতী সরকার পায়।

নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো বিপজ্জনক কাজ অল্পই আছে। আমাদের দেশে যে-পদ্ধতিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তাকে তেমন বৈজ্ঞানিক বলা চলে না, কিন্তু বিদেশে এই পদ্ধতিটা প্রায় ফলিত বিজ্ঞানের (নাকি ফলিত জ্যোতিষের?) পর্যায়ে পৌঁচেছে বলা চলে। কিন্তু সেখানেও প্রায়ই হিসেব মেলে না। যেমন, বৃটেনে ১৯৭০ সালে যে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করবে, তা কোনো বিশেষজ্ঞই আগে থেকে অনুমান করতে পারেন নি। এদেশেও ইদানিং এই ধরণের ফলিত বিজ্ঞান চালু হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে পশ্চিম বাংলার অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে দিল্লীর একটি জনমত-বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের যে হাল হয়েছিল তা দেখার পর এ-সম্পর্কেও সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। ঐ প্রতিষ্ঠানটি অনেক অঙ্ক কষে দেখিয়েছিল যে, কংগ্রেস ঐ নির্বাচনে শ' দেড়েক আসন পাবে। কিন্তু ফল বেরোবার পর দেখা গেল যে কংগ্রেস ঐ সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে।

অন্যান্যদের কথা ছেড়েই দিন, রাজনীতি যাঁদের পেশা সেই রাজনীতিকেরাও তো সব সময়ে নির্বাচনের ফল আগাম অনুমান করতে পারেন না। অথচ তাঁরা নাকি জনসাধারণের নাড়ি ধরেই বসে আছেন। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস যে এই রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হবে তা তো কংগ্রেস নেতারা নিজেরাও অনুমান করতে পারেন নি। কিন্তু ঐ বছর যে দুটি বামপন্থী ফ্রন্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তারাও ভাবতে পারে নি কংগ্রেস হেরে যাবে, কারণ তা হলে নির্বাচনের আগেই তারা হাত মেলাতো, নির্বাচনের পরে নয়। ১৯৬৯ সালে অবশ্য ঐ দুই ফ্রন্ট নির্বাচনের আগেই এক হতে পেরেছিল, ফলে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা যে উজ্জ্বল এটা অনেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস যে ঐভাবে পর্যুদস্ত হবে তা বামপন্থী নেতাদের দূরতম কল্পনারও অতীত ছিল। অনেক কংগ্রেস নেতা ঐ বছর ভেবেছিলেন যে, যেহেতু প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে পশ্চিম বাংলার ওপর দিয়ে অনেক অশান্তি গেছে এবং বিশেষতঃ চালের দর পাঁচ টাকায় উঠেছিল তখন ভোটদাতাদের রায় নিশ্চয়ই বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু দেখা গেল সে-হিসেবও মিলল না। ১৯৭১ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সময়ও দেখা গেল যে, অনুরূপভাবেই অনেক হিসেবের গোলমাল হয়ে গেল। কংগ্রেস যে আবার নতুন শক্তিতে এই রাজ্যে আবির্ভূত হবে, তা অনেকে যেমন অনুমান করতে পারেন নি, তেমনই সি পি এমও যে একক প্রচেষ্টায় বিধানসভায় বৃহত্তম দলে পরিণত হবে তাও অনেকে ভাবতে পারেন নি।

এবারেরও যথারীতি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যাচ্ছে। দু-পক্ষই দাবি করছেন যে তাঁরা জিতবেন। যেহেতু দু-পক্ষেরই জয়লাভ সম্ভব নয়, তাই এক পক্ষের হিসেবে নিশ্চয়ই ভুল আছে। কোন্ পক্ষ ভুল করছেন তা জানার জন্যে অবশ্য খুব বেশি দিন ধৈর্য ধরার দরকার নেই।

কেন যে হিসেবের ভুল হয় তা বলা মুস্কিল। একটা কারণ এই যে, অধিকাংশ সময়েই নেতাদের হিসেবের মধ্যে দিয়ে তাঁদের মনোগত বাসনাই প্রকাশ পায়। তাঁরা যে হিসেব দেন সেটা অনেকটাই সাবজেকটিভ, অবজেকটিভ নয়। দ্বিতীয় কারণ, আজকাল অনেক ভোটদাতাই বিশেষ মুখ খুলতে চান না, যদিও তাঁদের অনেকেই আগে থেকে ঠিক করে রাখেন কাকে ভোট দেবেন। এই ধরনের মনস্থির-করা ভোটার ছাড়া অবশ্য কিছু গা-ভাসানো ভোটারও থাকেন। তাঁরা অনেক সময়েই মত পাল্টান। সমসাময়িক পরিবেশ ও ইস্যু অনুযায়ী তাদের মত পরিবর্তন হয়। কিন্তু অন্ততঃ গত নির্বাচন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরাও বিশেষ আলাপ-আলোচনার মধ্যে যাচ্ছেন না। তৃতীয় কারণ, নির্বাচনে জাল ভোটের দাপট। কোনো কেন্দ্রের ভোটদাতারা তো নিজেরা ভোট দিয়ে এলেন, কিন্তু পরে জাল ভোটের দাপটে দেখা গেল যে, সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল। আর যাই হোক, জাল ভোট সম্পর্কে তো আর ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না!

•

এবারের নির্বাচনে দু' পক্ষই যে জিতবেন বলে দাবি করছেন তা তো ভোটদাতা মাত্রেই জানেন। সেদিন কলকাতার এক কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি এবার তরুণতম প্রার্থীদের অন্যতম। স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, কংগ্রেস এবার ১৫৫টি আসন পাবেই, আর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার কথা যদি ধরেন তবে ১৭০।

আর এক কংগ্রেস নেতার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনলাম। গত নির্বাচনে তাঁর অনুমান নাকি অদ্ভুতভাবে মিলে গিয়েছিল। তাই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর তাঁর সহকর্মীদের অগাধ আস্থা। তাঁর অনুমান, এবার মোর্চা সবশুদ্ধ ১৫৫টি আসন পাবে।

এবার কংগ্রেস শিবিরে আশার কারণও অবশ্য অনেক। প্রথম কারণ অবশ্যই শ্রীমতী গান্ধীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। প্রধানতঃ বাংলাদেশ ও ভারত-পাক যুদ্ধের সময়েই সেই বলিষ্ঠতার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠলেও অন্যান্য প্রশ্নেও তার পরিচয় পাওয়া গেছে। তাই কংগ্রেস আশা করছে যে শ্রীমতী গান্ধীর ঝটিকা সফরের পর কংগ্রেসের সাফল্যের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। দুটি বিশেষ কারণে বাংলাদেশ নীতির সাফল্য কংগ্রেসকে সাহায্য করবে বলে কংগ্রেস মহল মনে করছে তা হল : (এক) শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ফলে পশ্চিম বাংলার বুকের ওপর থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেছে। বাংলাদেশ সমস্যার বাঞ্ছনীয় পরিসমাপ্তি না ঘটলে ভারতে আগত শরণার্থীদের প্রতি চার জনের মধ্যে তিনজনের ভারই পশ্চিম বাংলাকে বইতে হতো। এখন শরণার্থীরা ফিরে যাওয়ার পর কংগ্রেস কর্মীরা শূন্য শিবিরগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে তাই বলতে পারছেন যে, শ্রীমতী গান্ধীর সফল নেতৃত্ব শুধু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকেই সাহায্য করেনি, পশ্চিম বাংলাকেও এক বিরাট সমস্যা থেকে রেহাই দিয়েছে। (দুই) স্বাধীনতার পর থেকে পূর্ব বাংলার যে-সব মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এই রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাঁদেরও অনেককে কংগ্রেসের দিকে টেনে আনবে। এঁদের একটা বড়ো অংশই এত দিন কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে তাঁরা এখন তাঁদের ফেলে-আসা জন্মভূমির সঙ্গে আবার একটা যোগসূত্র খুঁজে পাবেন, যে যোগসূত্র পাকিস্তানী দখল বজায় থাকলে সম্ভব হতো না।

কংগ্রেসের আশার আর একটা বড় কারণ এবার কংগ্রেস শিবিরে তরুণ ও যুবকর্মীদের প্রাধান্য। কংগ্রেস বহু জায়গাতেই তরুণ কর্মীদের মনোনয়ন দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এবার যে বিপুল সংখ্যক তরুণ ও যুবক কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনের কাজে নেমেছে আগে তেমন কখনোই নামে নি। তরুণ কর্মীরা যে-কোনো দলের পক্ষেই সম্পদ। নানা জেলায় কলেজের নির্বাচনে ছাত্র পরিষদের সাফল্যকেও কংগ্রেস বিশেষ আশার লক্ষণ হিসেবে দেখছে।

কংগ্রেসের বড় আশার কারণ, পশ্চিমবাংলার জনগণ আর জোড়াতালি সরকার

যুদ্ধে গুরুতর আহত বন্দীদের বিনিময় পরিকল্পনা অনুসারে ২৫শে ফেব্রুয়ারী যেসব ভারতীয় বন্দী দিল্লী আসেন, তাঁদের একজনকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

দেশে বিদেশে
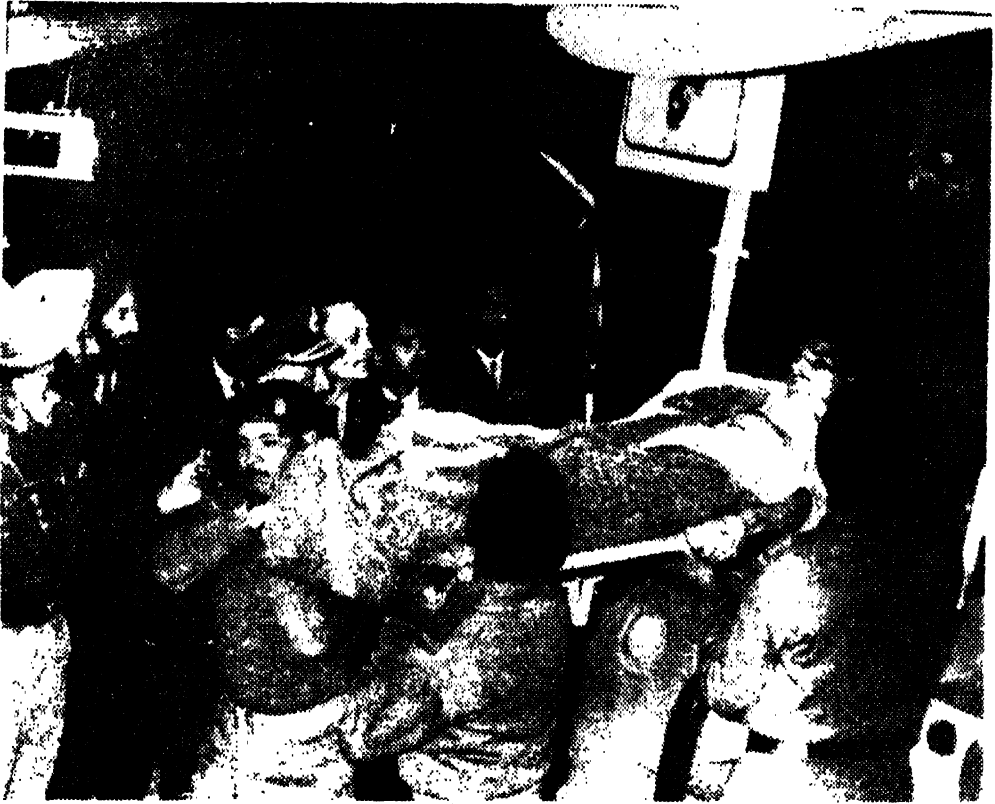
ভারতবর্ষের ১৬টি রাজ্যে ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা ও একটি মেট্রোপলিটান কাউন্সিল (দিল্লী)-এর জন্য নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব এখন সমাপ্তপ্রায়। এই নির্বাচনে মোট ২৭২৭টি আসন পূর্ণ করা হচ্ছে। তার মধ্যে ৩৫টি আসনে প্রার্থীরা ইতিমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছেন। বাকী ২৬৯২টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কংগ্রেস প্রার্থীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী—২৫৩৪। প্রধান প্রধান অন্য কতকগুলি দলের প্রার্থী সংখ্যা হচ্ছে :

জনসংঘ—১২২৬
কংগ্রেস (সংগঠন)—৮৭১
সোস্যালিস্ট পার্টি—৫৫১
সি পি এম—৪৫৭
সি পি আই—২২৫
স্বতন্ত্র—২১৬

এই ২৬৯২টি আসনের জন্য দলীয়-নির্দলীয় সব মিলিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ১১,১৩৮ জন প্রার্থী। এই প্রার্থীদের মধ্যে জয়ীদের বেছে নেবেন সারা দেশ জুড়ে প্রায় ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ভোটদাতা।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে বিভিন্ন দল যে অভিযান চালিয়েছে তার পর্যালোচনা করলে ইতিমধ্যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাবে। সবচেয়ে লক্ষণীয় হল, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই নির্বাচনী প্রচার অভিযানকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয় প্রশ্নসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন এবং বিরোধী দলগুলিও নিজেদের প্রধানত ঐসব প্রশ্নের ভিতরই সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।

স্পষ্টতই কংগ্রেস এবারকার নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীকে তাদের বৃহত্তম পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করছে। ঝড়ের বেগে তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর দলের হয়ে প্রচার সফরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর পক্ষে রাজ্য স্তরের এই নির্বাচন গত বছরের লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনেরই পরিশিষ্ট। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে লোকসভায় ও বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসের যে নির্বাচনী বিপর্যয় ঘটেছিল তার চিহ্ন মুছে দিয়ে নূতন করে তিনি রাজনীতির ছক সাজাতে চাইছেন। কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি ইতিমধ্যে তাঁর দলের একটি নূতন 'ইমেজ' তৈরী করেছেন এবং সাহসের সঙ্গে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সম্মুখীন হয়ে নূতন রাজনীতির প্রথম পর্ব সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করেছেন। এখন তিনি বিধানসভাগুলিতেও সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন। সেই জন্যই বার বার তিনি রাজ্যে রাজ্যে ভোটারদের সামনে দাঁড়িয়ে উল্লেখ করছেন, কোন্ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি গত বছর লোকসভার নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তাঁর সরকার কি করেছেন এবং প্রতিশ্রুতিগুলি যাতে তিনি রক্ষা করতে পারেন সেজন্য বিধানসভার ভোটারদের কাছে তিনি কি চান। ভোটারদের একটি খোলা চিঠি পাঠিয়ে শ্রীমতী গান্ধী আবেদন জানিয়েছেন, 'গরীবী হঠাও' কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য রাজ্যগুলিতে এমন সরকার চাই যারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি অনুগত এবং যাঁরা কেন্দ্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন।' প্রকারান্তরে শ্রীমতী গান্ধী ভোটারদের কাছে আবেদন রেখেছেন, 'লোকসভায় কংগ্রেসকে বিপুলভাবে জয়ী করে আপনারা আমার নেতৃত্বের প্রতি যে আস্থার পরিচয় দিয়েছেন এবার বিধানসভাগুলিতেও আমার দলের প্রার্থীদের জয়ী করে সেই আস্থার পরিচয় দিন।'

নির্বাচনী সাফল্যের একই ফরমুলা দ্বিতীয়বারও ঘটবে কিনা সেটা আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হবে। কিন্তু
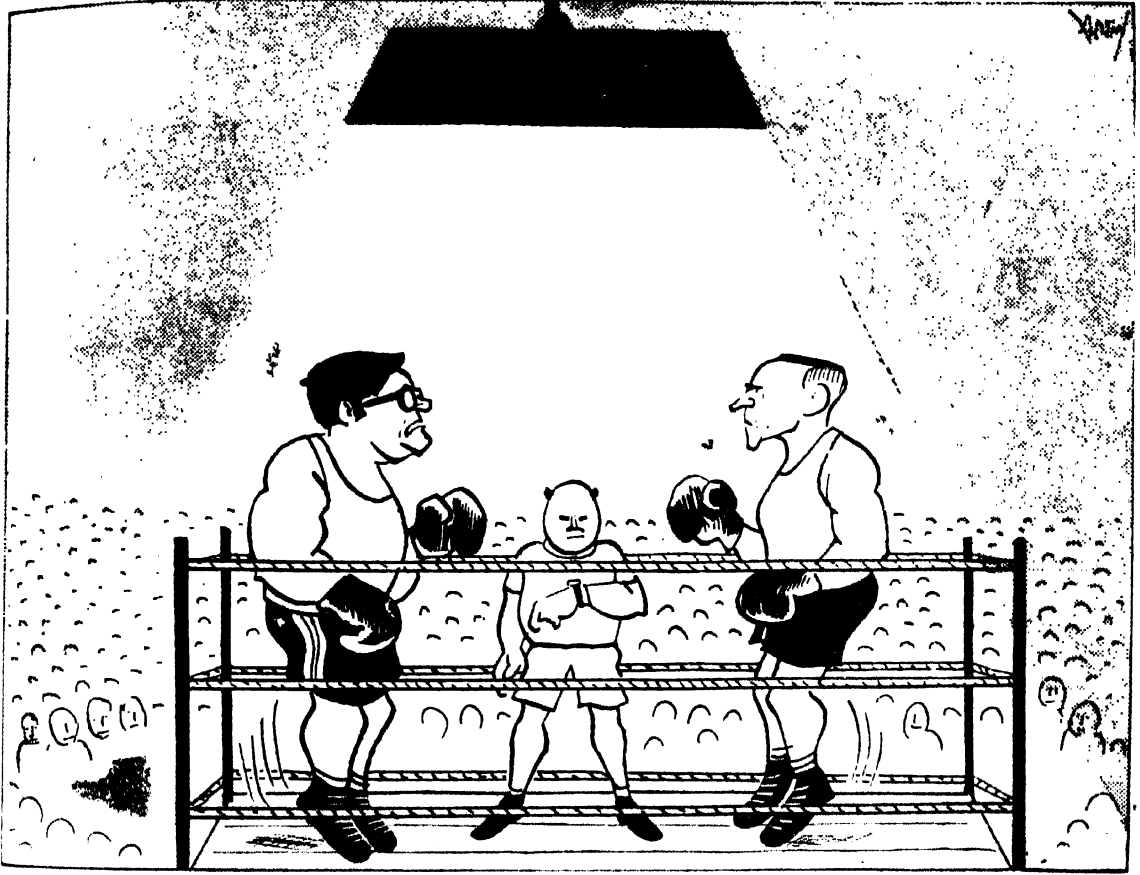
ইতিমধ্যেই বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে শ্রীমতী গান্ধীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সংগঠন কংগ্রেসের সভাপতি সাদিক আলি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী আসলে এই হুমকিই দিচ্ছেন যে, রাজ্যগুলিতে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হলে কেন্দ্র তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না। তিনি বলেছেন যে, রাজ্যগুলিতে যে দলেরই সরকার গঠিত হোক না কেন, কেন্দ্র তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নীতি ও সংবিধানের দিক থেকে বাধ্য। কোন কোন বিরোধী নেতা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, শ্রীমতী গান্ধী একদলীয় শাসন প্রবর্তন করে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকে আরও দুর্বল করে দিতে চাইছেন। লক্ষণীয় যে, পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি যে অন্যতম প্রধান নির্বাচনী 'ইস্যু' উঠিয়েছে সেটা হল, রাজ্যের হাতে আরও বেশী ক্ষমতা দিতে হবে।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযানে দ্বিতীয় আর একটি বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছেন। সেটি হল, রাজ্যগুলিতে স্থায়ী সরকার গঠনের প্রশ্ন। ১৯৬৭ সালের পর রাজ্যে রাজ্যে যেসব বহুদলীয় জোটের সরকার গঠিত হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা ভাল হয় নি। দলত্যাগ এবং শরিক দলগুলির মধ্যে বাদবিসম্বাদের ফলে এই সব 'খিচুড়ি সরকার' স্থায়ী হতে পারে নি। শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেস সদ্য অতীতের এই অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে স্থায়ী সরকারের প্রশ্নটি বড় করে তুলে ধরছেন। একমাত্র মেঘালয় ছাড়া (সেখানে এ পি এইচ এল সি'কে সব আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) আর সর্বত্রই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য লড়াই করছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস অবশ্য সি পি আইয়ের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করেছে। কিন্তু কেরলের মত এই সব রাজ্যেও কংগ্রেস সি পি আইয়ের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করবে কিনা সেটা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না। কংগ্রেস যেভাবে স্থায়ী সরকারের শ্লোগান দিচ্ছে তা থেকে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, সরকার গঠনের জন্য তাঁরা পারতপক্ষে সি পি আইয়ের সহযোগিতা এড়িয়ে চলতে চায়।

কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারের আর একটি বিষয় হল, ভারতের উপর থেকে যুদ্ধের বিপদ এখনও কাটে নি। নিক্সন-চৌ যুক্ত ইস্তাহার অনেকটা যেন অযাচিত-ভাবেই এই প্রচারের সুবিধা করে দিয়েছে। এই ইস্তাহারে ইসলামাবাদের প্রতি পিকিং ও ওয়াশিংটনের দুর্বলতা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। চীন ও আমেরিকা আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবে না। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে দুই রাষ্ট্রনেতাই ভারত ও পাকিস্তানকে অবিলম্বে নিজ নিজ সীমান্তের ভিতরে ও কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ভিতরে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই তার এক পা এগিয়ে গিয়ে 'স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য' পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের সংগ্রামের প্রতি এবং 'জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রামের' প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। সুতরাং, শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে ভোটারদের একথা বোঝান কঠিন হচ্ছে না যে, চীন ও আমেরিকা পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার সুযোগ ছাড়ে নি এবং অদূরভবিষ্যতে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

•

এখন পর্যন্ত একটি মাত্র স্থানীয় প্রশ্ন খুব জোরালভাবে তুলে কোন কোন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সম্বর্ধনার জন্য ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে নির্মীয়মান পাকা মঞ্চ
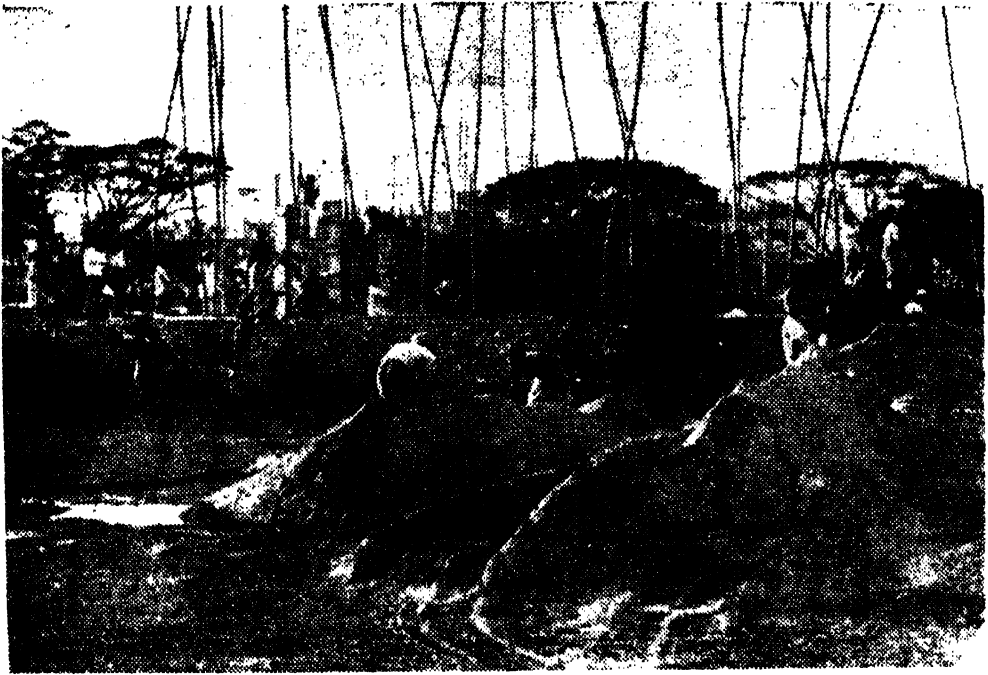
আলিপুরস্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপাখানায় নির্বাচনের প্রস্তুতি কাজ চলেছে।

বিরোধী দল কংগ্রেসকে কোণঠাসা করতে চেয়েছিল। সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের তথাকথিত 'বিহারী' মুসলমানদের প্রশ্ন। এই 'বিহারী' মুসলমানদের ভারতে আনার দাবী সমর্থন করে ভোটের বাজারে কিছুটা সুবিধা করে নিতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস (সং), সোস্যালিস্ট পার্টি ও জনসঙ্ঘের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। কিন্তু এই প্রচারে খুব সুবিধা হয় নি বলে মনে হচ্ছে। জনসঙ্ঘের অটলবিহারী বাজপেয়ী, বলরাজ মাধোক প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ, সংগঠন কংগ্রেসের মোরারজী দেশাই, সোস্যালিস্ট পার্টির এস এম যোশী প্রভৃতি 'বিহারী' মুসলমানদের ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবীর বিরোধিতা করেছেন। জয়প্রকাশ নারায়ণও এই দাবীর বিরোধিতা করেছেন। এমন কি, মুস্লিম লীগের বিহার শাখাও এই দাবী সমর্থন করে নি।

হিতে বিপরীত হতে পারে আশঙ্কা করে বিহারে বিরোধী দলগুলি এখন বাংলাদেশের 'বিহারী' মুসলমান নিয়ে প্রচারে ক্ষান্ত দিয়েছে।

৩-৩-৭২

এর নাম সমাজদেহ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

রমাকে আজ আর সংগে আনে নি রাণী। কি হবে ও কেবল কাঁদে। বেচারী ছেলেমানুষ। এটা বোঝে না যে, চোখের জল ছোঁয়াচে। কান্না কি রাণীরই পায় না? কিন্তু নিজেকে শক্ত না রাখতে পারলে খোকনের কি দশা হবে—সেও ত সামলাতে পারবে না। আর এই-সব থানার লোক বিরক্ত হয়ে ধমক দেবে। নয় ত রুখু মেজাজে তাগাদা দেবে,—'হয়েছে আপনাদের?' তারপরই হাত বাড়িয়ে দেবে খোকনের দিকে। তখুনি আবার লক-আপে ঢুকিয়ে দেবে। এক বছর ধরে জেল গেট দেখে রাণী বুঝেছে, কান্নাকাটির কোনো দাম নেই।

আজ অবিশ্যি একা আসে নি রাণী। একজন সঙ্গী জুটেছে। হৃদয়ের মা। হৃদয় আর খোকন যেমন একই সংগে ধরা পড়েছিল তেমনি বরাবর এক জেলেই ছিল। আর আশ্চর্য দুই গার্জেনের দেখা করার দিন - সময়ও এক! এবারও জেল থেকে ওদের দুজনকেই বড় লোহার দরজার বাইরে পার করেই সংগে সংগে পুলিশের গাড়িতে তুলেছে। না একটু হাঁটতেও দেয়নি জেলের বাইরে।

খোকনের সেই একটু হাসি আর ভারি গলায় কী শ্লেষ! কাল ও বলল — না মা, আমাদের এরা খুব যত্ন করে। নইলে দ্যাখো, বাসে-ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে আপিস যেতে, বাড়ি ফিরতে কতো ধকল পোয়াতে হত। এরা একেবারে হাজির, গাড়ী নিয়ে সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের জন্যে। বেরুতে যা দেরী!......

ছেলেটা এখনো ঠিক তেমনি তামাশা করে কথা বলে। তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ ভেঙে পড়ে। পুজোর পর যখন রাণী জেলে দেখা করতে গিয়েছিল তখন খোকন বলে-ছিল—'আর পারছি না মা! বাপীকে বল, এক বছর ত হয়ে এল। এবার যেন আমায় ছাড়াবার জন্যে একটু চেষ্টা করেন। হয়ত ছাড়তে দেবে তাহলে।' খুব সহজ সুরে বলতে গিয়েও ছেলেটার গলার স্বর কেমন বুজে এসেছিল।

বেচারী খোকনের বাপী। একা মানুষ সংসারের কোন্ দিকে নজর দেবে ভাবতেই দিশেহারা। রাণীর কষ্ট হয় ওঁকে কিছু বলতে। অথচ বিধাতা এমনই করেছেন যে, দুনিয়ায় দ্বিতীয় কাউকে বলার সুযোগ নেই। ছিল যে, সে ত এখন হিসেবের বাইরে। মাথায় কী যে পোকা ঢুকলো, এই নকশালী নেশায় মেতে উঠল। [illegible]

গেলে, বাধা দিতে চেষ্টা করলে ভুরু কুঁচকে বিচিত্র হাসির আমেজ ছড়িয়ে জবাব দিত—'তুমি বোঝো না মা, অন্যায়-অবিচার আর অত্যাচারের মোকাবিলা করার দিন এসেছে। সবাই যদি মুখ বুজে এইভাবে মার খেয়ে যায় তাহলে মানুষের কষ্ট কোনো দিন ঘুচবে না। জবাব দিতে হবে।' কিম্বা কখনো বলত—'এমন কোনো কাজ করব না যাতে তোমাদের ক্ষতি হয়।' খোকনের বাপী এক-একদিন ক্ষেপে গিয়ে ছেলেকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার হুমকিতে ফেটে পড়তেন। আশ্চর্য, মাথা হেঁট করে সেই বকুনী মুখ বুজে হজম করত।

পুরনো দিনের ছবিতে রাণী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। পাশ থেকে হৃদয়ের মা হঠাৎ বললেন—দিদি, দেখুন ত ওই লোকটা কি না!

দুই ছেলের দুটি জননী প্রতীক্ষা করছেন একটি মানুষের জন্য। যিনি কাল আশ্বাস দিয়ে ছিলেন—'রোজ আসবেন। ছেলেকে দেখে যাবেন—কোনো অসুবিধে হবে না।'

চমকে রাণী তাকাল—'কে? কই!' ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। বারান্দাটায় পড়ন্ত বিকেলের ছায়া। বাইরে বেরিয়ে, চলে যাওয়া লোকটির ওপর নজর বুলিয়ে মুখ আঁধার করে দাঁড়িয়ে রইল রাণী। বারান্দার নীচে উঠোন। উঠোনে ব্যাডমিন্টনের কোর্টে চারটি ছেলে খেলছে। ওরা খোকনের চেয়ে বয়সে একটু কম! রাণীর শূন্য দৃষ্টি ওদের ওপর দিয়ে তিন-চার বছর পেরিয়ে গেছে। ছেলের খেলার শখ হয়েছে। বাপের পুরনো বেঁকে-যাওয়া র‍্যাকেটখানা নিয়ে মেরামতের কসরৎ করছে। নতুন ত কেনার পয়সা নেই! পারতোও ছেলেটা। মাথা খাটিয়ে ঘরের আজনা তৈরী, বাথরুমে একটা কাঠের ডান্ডাকে পাড় দিয়ে ঝুলিয়ে কেমন সুন্দর কাপড়-গামছা রাখার ব্যবস্থা করেছিল—সেটা আজও আছে। ...'আপনি এখানে দাঁড়াবেন না। ঘরে গিয়ে বসতে বললাম সে!' গোঁফওলা বদ মেজাজী সেপাইটার ধমকে রাণী আবার নিজের চেয়ারে এসে বসল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো—'না দিদি, তিনি নন!'

থানার আপিস ঘর তিনখানা টেবিলে কাজ আর গল্প চলছে। দুটি মহিলা চতুর্থ টেবিলে মুখোমুখি দুই চেয়ারে বসে। হৃদয়ের মা অধীরভাবে বললেন—'অনেকক্ষণ ত হয়ে গেল দিদি, কই তিনি ত এলেন না।'

একটি মেয়ে ঢুকলো। তার পিছনে বছর ত্রিশ বয়সের একজন দোহারা চেহারার ভদ্রলোক। মহিলা দুজনকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—'আপনারা?'

ও-পাশের টেবিল থেকে একজন বললেন—'ও'রা কেষ্টো বাবুর জন্যে বসে আছেন।'

রাণীর মনে হল নবাগত ভদ্রলোক হয়ত সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন তাই সহানুভূতি উদ্রেকের সুরে বলল—'দেখুন, কেষ্টো বাবু আমায় বলেছিলেন ছেলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন। কালও তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তা ঘন্টা দুই হল বসে আছি। তিনি ত এলেন না। আপনি যদি—'

ভদ্রলোক ফিরেও দেখলেন না। ও ধারের যে টেবিলে একজন বসে কাজ করছিল সে উঠে তাঁকে চেয়ার ছেড়ে দিতে বসে পড়লেন এবং উদাসীনভাবে জবাব দিলেন—'যিনি বলেছেন আপনাকে তিনিই ব্যবস্থা করবেন! জানেন ত লক-আপে থাকলে দেখা করার নিয়ম নেই।'

হৃদয়ের মা বললেন—তিনি কখন আসবেন?

—তা বলা যায় না। আসতেও পারেন, নাও পারেন।

—কি হবে দিদি কেষ্ট বাবু যদি না আসেন?

হৃদয়ের মায়ের এ কথার জবাবে রাণী কিছুই বলে না। কী বলবে? রাণীর ত তবু ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। হৃদয়কে যে কোথায় রাখা হয়েছে তা-ই জানতে পারে নি ওর বাড়ির লোক। তিন-চার দিন ধরে একবার লালবাজার, একবার এ-থানা, একবার ও-থানা দৌড়ে বেড়িয়েছে তনয় আর মলয় — হৃদয়ের দুই দাদা। যেখানেই গিয়েছে সেখানেই শুনেছে —'না আমরা বলতে পারবো না। দেখুন খোঁজ ক'রে লালবাজারে।' হয়ত এস-বি, কি ডি-ডি থেকে ধরে থাকবে!' রমাকেও ত এই থানার লোক ওই কথা বলেছিল। অথচ রমা দেখেই লোকটিকে চিনতে পেরেছিল। সেই সবুজ সোয়েটার আর চোখের কোণে কাটা দাগ—ওই লোকটিই রমার ভাইকে হাত ধরে গাড়িতে তুলেছে। সকাল থেকে আড়াই ঘন্টা ওরা সবাই প্রতীক্ষা করছিল জেল-গেটে। রমার আশা তার ভাই ছাড়া পেলে ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি নিয়ে যাবে। আর নানান থানার লোক গাড়ি নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল, যাদের ছাড়া হবে তাদের তুলে নেবার জন্য। রমা ত আর তা জানতো না। গাড়িতে যখন ওদের ওঠানো হয়—তখন খোকনই জোর গলায় বলেছিল—এই থানার নাম। ওরা গাড়িতে, রমা বাসে—গন্তব্য এক হলেও গতির তারতম্যে রমার পৌঁছতে একটু দেরী হয়েছিল। সবুজ সোয়েটার পরা লোকটা অম্লান বদনে রমার কথা এমন-ভাবে উড়িয়ে দিল যে বেচারী থ হয়ে কিছু-ক্ষণ কথাই বলতে পারেনি। রমা ঢোক গিলে আর একবার বোঝাতে গিয়ে আরও ধাক্কা খেয়েছিল। লোকটা বলেছিল—'আপনার ভুল হচ্ছে। এখান থেকে কেউ ওই জেলে যায় নি। আপনি—' রমা ছেলেমানুষ। একজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানকে এ-রকম জোর মিছে কথা বলতে দেখে মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল সে থানায় আর এক-মুহূর্তও দাঁড়ায়নি। রাণী আশায়-আশায় বসেছিল দুটি ভাই-বোন ফিরবে—কতোদিন পরে বাড়ির ছেলে ঘরে ফিরবে। বেলা দুটোর সময় খোকন [illegible] রমা ফিরেই কান্নায় ভেঙে পড়ল।

যে মেয়েটিকে নিয়ে এল সে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। বয়স ওর সতেরো-আঠারো হবে। রমার বয়সী। হয়ত দেখতে রমার চেয়ে ভালো কিন্তু চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায় ওর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

ভদ্রলোক ভূমিকা করলেন—'এখন কেমন লাগছে বীণা? বিপ্লব এসে গেছে তো না?' মেয়েটি জবাব দিল না।

—আচ্ছা বীণা তুমি কি মনে করো ক'টা পুলিশকে খুন করতে পারলেই বিপ্লব হল। আর রাতারাতি দেশের চেহারা পাল্টে যাবে?

হৃদয়ের মা, রাণী উভয়েই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

ভদ্রলোক বোধহয় সেটা টের পেয়েছিলেন, বললেন—জানেন, যেদিন একটা পুলিশ মারা হত সেদিন বীণাদের বাড়িতে উৎসব হত! পোলাও মাংস খেয়ে [illegible] আনন্দ করতো। কী বীণা তাই করতে না?

মেয়েটিকে বার কয়েক ওই একই প্রশ্ন করার পর ও শুধু ছোট্ট করে ঘাড় নাড়িয়ে জানালো কথাটা সত্যি!

জেরা চলল। ভদ্রলোক চিবিয়ে চিবিয়ে একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে [illegible] করে মেয়েটির ধৈর্য আর [illegible] ভেদের চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছেন। [illegible] বাবার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। [illegible] শেষ দিনের দিকে তাকিয়ে [illegible] শায়ী। বীণাকে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় [illegible] হয়েছিল, ওর বালিশের তলায় [illegible] পাওয়া গেছে। ওর কাজই ছিল মাল [illegible] করা। কতোদিন ধরে কতো [illegible] ওর হাত দিয়ে চালান হয়েছে [illegible] নেই। বেশ কিছুক্ষণ এই বিচিত্র [illegible] জালে রাণী জড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েটা [illegible] নির্বিকার মাথাটা ওর একপাশে [illegible] পিঠের ওপর রুখু চুলগুলো [illegible] না। রাণী ভাবছিল ভদ্রলোকের [illegible] ধৈর্য।

হৃদয়ের মা ওর গায়ে ঠেলা দিতে রাণী চোখ তুলল।

রাণী কাগজে মোড়া জামা আর [illegible] জামার প্যাকেটটা দেখল, প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে আর একটা মোড়কে [illegible] নাড়ু। কলা, পাঁউরুটি আর দুটো [illegible] লেবু। কাল খোকন বলে দিয়েছিল, [illegible] দিন স্নান হয়নি, এক জামা-কাপড়ে কাটছে [illegible] উপায় কি? আচ্ছা এই মেয়েটিকে কোথায় রেখেছে? ওরও কি স্নান বন্ধ? [illegible] মনের মধ্যে মুহূর্তে যেন সব কিছু [illegible] পালটে করে দিচ্ছে। ইস্, কতো দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপিস থেকে রমার বাবা হয়ত এতক্ষণে ফিরেছেন। নিশ্চয় ব্যস্তভাবে পায়-চারী করছেন আর সিগারেট টানছেন। বেশি সিগারেট খাওয়া বারণ, তবু—।

ঘরের মধ্যে দীর্ঘকায় একজন ঢুকলেন। দেখেই মনে হয় পদস্থ অফিসার। সবাই উঠে দাঁড়াল কপালে হাত তুলে সালাম করল। রাণী, হৃদয়ের মা দুজনেই উঠলেন। গুরুগম্ভীর ভঙ্গীতে ভদ্রলোক চারদিকে নজর বুলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে রাণী

আর্ত-স্বরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে—শুনেছেন?

হৃদয়ের মা কয়েক পা এগিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন—দেখুন! আমরা তিন ঘণ্টার ওপর বসে আছি। ছেলেকে একটু দেখবো, দেখেই চলে যাবো।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন—লক-আপে ত দেখা করার নিয়ম নেই।

ভদ্রমহিলা কাতর কণ্ঠে বললেন—কতো দূর থেকে এসেছি। এতদিন ত জানতেই পারিনি আপনারা এইখানে ধরে রেখেছেন। আমার ছেলেরা তিন-চার দিন এসে ঘুরে গেছে, কেউ সত্য কথাটা বলে নাই। এইভাবে ভোগায় কী লাভ হয় বলেন ত! মায়ের দুঃখ—

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। তারপর ঘরের কাকে উদ্দেশ করে বললেন—'এ'দের কেন বসিয়ে রাখা হয়েছে।' পূর্ব মুহূর্তের রোষের সঙ্গে এই কথার সঙ্গতি খুঁজে পেল না রাণী।

যিনি মেয়েটিকে জেরা করছিলেন তিনি ছাড়া আর সকলেই সমস্বরে জবাব দিল—দেখা হবে না, একথা অনেক বার বলা হয়েছে তো, যদি ওঁরা বসে থাকেন ত আমরা কী করতে পারি স্যার? মেয়েছেলের উপরে ত আর জোর খাটানো যায় না।

ভদ্রলোক রাণীর দিকে একবার চোখ রেখেই দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন এবং গম্ভীরভাবে বললেন—আপনারা এভাবে কেন যে আসেন বুঝি না। যদি ফিরিয়ে দিই তখন দোষ দেবেন আমাদের। বেআইনী কাজই বা কি করে করতে দিই বলুন!

রাণী বুঝতে পারে দেখা আজ হবে না। তবুও প্রশ্ন করে — দেখা না হলে এগুলো নিয়ে কি করি বলুন ত?

এবার তিনি সরাসরি তাকালেন—কী? এগুলো মানে—

খানিকটা ভরসা পেল রাণী — খোকনের জামা-কাপড় এনেছিলাম। কাল ও বলে দিয়েছিল আনতে। আজ দশ দিন ধরে এক-বস্ত্রে রয়েছে। স্নান পর্যন্ত হয় না। গায়ে একটা চাদর ছিল তাও ত আপনাদের আপিসে জমা করে নিয়েছে! না গামছা, না সাবান, এমন কি দাঁত মাজা মুখ ধোয়া, মাথা আঁচড়ানোর চিরুনিটি পর্যন্ত কাছে রাখা আপনাদের বারণ! ও বলেছিল জামা-টামা পেলেই নেবে তাই এনেছিল। আর এই নাড়ু তৈরী করেছি। কলা, কমলা এই—

ভদ্রলোক নিজের হাত দুখানা মুঠো করে সামনের দিকে আস্তে আস্তে নাড়াচ্ছিলেন — রাণীর কথা শেষ হতে থামিয়ে বললেন — দেখুন, লক-আপ থেকে এদের বার করা হবে না। আপনার যা দেবার সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে বাড়ির তৈরী কোনো খাবার দেওয়ার নিয়ম নেই—

হৃদয়ের মা বললেন—কেন? মা হয়ে ছেলেকে ত আর বিষ মিশিয়ে দেবে না খাবারে।

ভদ্রলোক আবার হাসলেন।

রাণীর বুক কেঁপে উঠল। লোকটার হাসিকে ওর বড় ভয়।

সেই মুহূর্তে জেরা-করা ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণস্বর ঘরখানায় ছড়িয়ে পড়ল—তুমি নেহাৎ মেয়েছেলে তাই গায়ে হাত দিতে পারছি না। নইলে চাবকে, বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে বসে কথা কি করে বার করতে হয় দেখিয়ে দিতাম।

ওদিকে কান দেবার মতো অবকাশ নেই রাণীর। উদগ্র আগ্রহে অফিসারের বেদবাণী শোনার জন্য ও মুহূর্তকে আটকে রেখেছে চোখের তারায়। হৃদয়ের মায়ের যুক্তি দিয়ে আর যা-ই হোক কাজের কাজ হবে না রাণীর তা জানা হয়ে গেছে। ও বলল—আজ যখন এগুলো এনেছি কি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, বলুন।

—ঠিক আছে। আর কখনো আনবেন না।

ভদ্রলোক হাঁক দিলেন — লক আপ!

একজন সেপাই এল।

অফিসার পদোচিত গুরুগম্ভীর ভঙ্গীতে বললেন — ওর হাতে দিয়ে দিন।

প্লাস্টিকের বালতি-ব্যাগটা হাতে তুলে রাণী বলল — আমরা ওর সংগে যাই নইলে ছাড়া-কাপড়চোপড় —

—না - না। কোনো চিন্তা করবেন না। একটু অপেক্ষা করুন লক-আপের ওই লোকই এনে দেবে।

লক-আপের লোহার মোটা গরাদ দেওয়া দরজাটা বারান্দা থেকে দেখা যায়। বার কয়েক দুই মাই সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এর আগে — যদি দেখতে পাওয়া যায়! কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দিচ্ছিল না থানার লোকেরা। অদ্ভুত এদের মেজাজ। নজরে পড়লেই তেড়ে আসছিল, হাঁকিয়ে দিচ্ছিল। এমন ভাব যেন লোহার গরাদ দিয়ে দেখা হলেই ওদের কেড়ে নিয়ে পালাবে এই মায়েরা!

হৃদয়ের মা বললেন — চলেন দিদি আমরা বাইরে যাই, এখানে এঁদের কাজের অসুবিধা হচ্ছে।

অফিসারটি এবার কিছু বললেন না।

বারান্দাটা ইংরেজি 'এল'-এর মতো। দুই লাইনের সংযোগস্থলে দাঁড়ালে একেবারে লক-আপ দরজার মুখোমুখি হয়ে ভেতরের দেয়াল অবধি নজর চলে যায়। রাণী একফালি বারান্দাটার বাঁ পাশেও থানার অফিস।

সেখানে কর্মব্যস্ততা। রাণী অতি সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। বারান্দার নীচে মাঠে 'গেম্-বল' হাঁক উঠল। এদিকে গরাদের লোহার লম্বা লোহাটার সঙ্গে মুখ-মাথা যতোটা ঠেলে দেওয়া যায় দিয়ে খোকন আর হৃদয় চেঁচিয়ে বলছে—মা তোমরা চেষ্টা করছ ত! বাপীকে ব'ল আসতে, দাদাকে ব'ল যেন তাড়াতাড়ি করতে। এখানে রাখবে না কিন্তু। খুব শীগ্‌গির। সোনা কাকা যেন আসে।

লক-আপের লোকটি ওদের আড়াল করে দাঁড়াল। ওরা দুজনেই হাঁটু মুড়ে কাৎ হয়ে দেখছে। রাণীর বুকের মধ্যে কী অসহ ঝড়। মনে হচ্ছে দেহের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে বেরিয়ে আসবে! হাত নেড়ে জানাতে চাইল অনেক অনেক কথা। কিন্তু—! দেখেছে জেল গেটেও ঠিক এমনি হয়—গুছিয়ে রাখা সব কথাই হারিয়ে যায়। হাতড়ে খুঁজে পাওয়ার আগেই বিদায়ের তাগিদ দেয় পিছনের বিধাতা। এমনিই হয়। কাল তবু পাশপাশি চেয়ারে বসে কিছু কথা হয়েছিল। সে ত বার বারই বলেছে — 'আমি আর পলিটিকস করব না। ও'রা যেমন ভাবে চান লিখে দেবো। বাপীকে ব'ল দেরী হলে মিসাতে ঠেলে দেবে কিন্তু।' রাণীও বলেছে কাকে কাকে ধরা হয়েছে! খোকনের বাপী যে তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন সেটা ছেলেকে বুঝিয়েছে রাণী। খোকন বলেছে মিথ্যে একটা চার্জ সাজিয়ে ছুটির দিনে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে দাঁড়-করানো হয়েছে। আবার তারিখ পড়েছে রবিবারে।

খোকনের মুখ এখন দেখা যাচ্ছে না। এই হাসিটুকুও রাণীর মনকে খোকনের গত সন্ধ্যার সাক্ষাতের স্মৃতি জুড়ে দখল করেছে। থেকে থেকে ছেলেটা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, 'দ্যাখো ওদের কী মগজ মা। এদিকে লক-আপে আটক রেখে দিয়ে দিব্যি বলে দিল আমি নাকি ছাড়া পাওয়ার পরদিন রাত্রে বোমা-পিস্তল নিয়ে সিনেমার সামনে দাঙ্গা করছিলাম, বুঝলে।' মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি জানি খোকনের হয় ত মনে হয়েছে যে, যথেষ্ট ধাক্কা লাগে নি, তাই পুনরাবৃত্তি করল—'বুঝলে মা! ভাবলেও হাসি পায়, ওরা কেমন মিছে কথা বানাতে পারে!' রাণীর পাশে হৃদয়ের মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। টের পেল কিন্তু কিছু বলল না। বাধা দিয়ে কি হবে! আর কি বলেই সান্ত্বনা দেবে? সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে রেখে রাণী পাশের অফিসের দ্বিতীয় দরজাটা পেরিয়ে গেল। বালতি ব্যাগ নিয়ে লোকটা আসছে। গরাদেতে আবার সেই মুখ. খোকন, হৃদয়—'আসবে। কাল এসো। বাপীকে বল। সোনা কাকা। দাদা। [illegible]'

[illegible] দিয়ে লোকটি বলল —[illegible] না। আমাদের শেষে [illegible]।'

[illegible] দুজন লোক আপিসের সামনে খট্ খট্ শব্দে এসে দাঁড়াল।

আর কি হবে। রাণী শেষবার তৃষিত দৃষ্টি দিয়ে পিছন ফিরল।

হৃদয়ের মা হঠাৎ সামনের দিকে হন হন করে চলে গেলেন। লোকটি হৈ-হৈ করে পিছু পিছু ছুটল। তিনি বাধা পেয়ে গর্জে উঠলেন—খেয়ে ফেলবে নাকি! এ কী অন্যায়। চোখের দেখা, একটু কাছে গিয়ে, তাতেও—

রাণী এবার এগিয়ে তাঁর হাত ধরল—চলুন দিদি! কি হবে ওদের সংগে ঝগড়া করে?

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তিনি মাঠের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন--এগুলি কি মানুষ?

ত্বরিতপদে রাণী তাঁকে কতকটা জোর ক'রে ডজনখানেক পুলিশ আর সি-আর-পি-ই বোধহয় হবে (নইলে পোশাক আলাদা কেন হবে এটা রাণী কাউকে জিগ্যেস না করে নিজেই ধারণা করে নিয়েছে)—তাদের পেরিয়ে বাইরে খোলা আকাশের নীচে নামল।

তারপর স্বগতভাবেই বলল—ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই দিদি।

—আপনিই বলুন ভাই, আমরা দাঙ্গাও করি নি, ছেলেকে ছিনিয়ে নিতেও আসি নি। কিন্তু এমন ভাব করে—

থানার এলাকা পেরিয়ে বিরাট চওড়া রাস্তা। হরদম বড় বড় ট্রাক, বাস, নানা ধরনের গাড়ি চলছে। এখানে দাঁড়ালে মনে হয় যেন অন্য জগৎ!

রাণী বলল--দেখুন, সব ঝামেলাই মুখ বুজে সইতে হয়। সবই ত ওই ছেলেগুলোর মুখ চেয়ে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

—তা সত্যি। সত্যি কোনো উপায় নাই। বড় ছেলেটা আজ কদিন কী দৌড়ানই দৌড়াচ্ছে, আর তেমনি দু-হাতে খরচও করছে। কাজ কারবার দেখারও ফুরসৎ পায় না দিদি। এত ক'রেও যদি হৃদয়কে ছাড়াতে না পারা যায় তাহলে কী হবে ভগবানই জানেন।

রাণী বলল—আমাদের উনিই কি কম করছেন! নবকংগ্রেসের লীডারকে ধরা থেকে শুরু করে সরকারী বড় কর্তা কিছুই বাদ নেই।

—আপনার কর্তার ত অনেক জানা-শোনা! নইলে আজও হয়ত হৃদয়ের খোঁজ বার করা যেত না।

—না দিদি জানাশুনো দিয়েও কিছু কাজ হচ্ছে না। দেখলেন ত এদের ব্যাভার। টাকা ছড়াতে পারলে কোনো ভাবনাই ছিল না।

কথাটা রাণীর পছন্দ হল না। কি জানি ওর ধারণা শুধু টাকাপয়সায় এ সমস্যার মীমাংসা হবার নয়। এই এক বছরে ওর যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বুঝেছে ব্যাপারটা খুব জটিল। অনেক ধনীর দুলালকেও রাণী জালের ওপারে মলিন মুখে লোহার রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। তাদের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয় টাকা ঢালতে কার্পণ্য করে নি। আসলে সরকারপক্ষ কতকগুলি ধারণার বশেই এমন একটা পথ বেছে

[illegible]রেছে যাতে রাণী বা হৃদয়ের মায়ের [illegible]কালোন্টিক দিয়েই আশাভরসার আশ্বাস [illegible] না।

হৃদয়ের মা বললেন—এখন কি করবেন?

—বাড়ি যাবো। রান্নাও ত করতে হবে। উনি হয়ত ভাবছেন—!

একখানা বড় ট্রাক ঝকড়-ঝকড় করে [illegible] গেল। হৃদয়ের মা চোখ মুছে বললেন—না তো বলছি না। কাল আসবেন ত?

—আসতে হবে। আপনার ত শরীর ভালো না—

—হ্যাঁ। আজ ত ছেলেদের [illegible] [illegible]সছি। কাল ওদের পাঠিয়ে দেবো ভাবছি। [illegible] ওরা টাকাপয়সা দিয়ে বাইরে এনে কথা বলতে পারে দেখুক চেষ্টা করে।

[illegible] মন্দ নয়। কেন না এর আগে যে [illegible] গণ্ডগোলে ছিল সেখানে ওইভাবেই [illegible] তলার লোকদের সাহায্য মিলেছিল। [illegible] এটা শোনা কথা সত্যিমিথ্যে কিছু [illegible] নেই রাণীর। খোকনের বাপই এ [illegible] [illegible] শেষে ওখানে গিয়ে [illegible] [illegible] পুরোনো বন্ধু। তিনি অনেক [illegible] করে দেখাচ্ছিলেন এবং পরামর্শও [illegible] কাকে ধরলে কাজ হবে। তদবির [illegible] দিয়ে দেখা যাচ্ছে সরকারী মহল [illegible]। এঁদের কিছুতেই মাথায় ঢুকছে [illegible] এই ছেলেদের আবার সমাজের সাধারণ [illegible] ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া দরকার। [illegible] ভাবছেন এদের আটকে রাখলেই [illegible] [illegible] উন্নতি হবে। রাণীর [illegible] একজন বড় অফিসার বলেছি [illegible] ছেড়ে দিলে এরা যে আবার [illegible] [illegible] ছেলের মগজে ভ্রান্ত পথের বিষ [illegible] দেবে না এমন কোনো গ্যারান্টি [illegible] মশাই, এক্সপেরিমেন্ট করার মতো [illegible] আর নেই!

আরও সাত-সতেরো রকমের চিন্তার [illegible] ধাক্কায় রাণী কেমন দিশেহারা [illegible] করে। এর মধ্যে কখন হৃদয়ের মা [illegible] নিয়ে বাসে উঠে চলে গেছেন, কখন রাণীর চোখের সামনে দিয়ে ওর বাড়ি [illegible] বাসগুলো থেমেছে—ছেড়েছে রাণী [illegible] দেখে নি। ওঠবার কথা মনেই পড়ে [illegible] [illegible] কেবলই মনে হচ্ছে, এইভাবে [illegible] কতোকাল ছেলেটাকে কাটাতে হবে, [illegible] বাবার উদয়াস্ত খাটুনীতে শরীরটা [illegible] ভেঙে পড়বে—দেখতে হবে, কিন্তু [illegible] মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। [illegible] ওই মেয়েটা যাকে জেরা করা হচ্ছে, [illegible] না ভবিষ্যৎ কী! আচ্ছা, এই যে [illegible] একটা দাঙ্গার দায়ে খোকনকে [illegible] হয়েছে সত্যিই কি এর জন্য ওকে [illegible] হবে! রমার কথা ভাবলে আরও [illegible]—ওর নরম মনটা কিভাবে এরা [illegible] দিচ্ছে। রমা ত এখন পুলিশের [illegible] তেজেবেগানে জ্বলে ওঠে। [illegible] ভালো সম্বন্ধ এসেছে। কিন্তু ছেলের [illegible] পুলিশে চাকরী করেন এতেই রমার দারুণ আপত্তি। কাল বলে দিয়েছে ওখানে যদি বিয়ে দাও তার আগে আমি বিষ খাবো।

পর পর দু-খানা কালো ভ্যান চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে রাণীর বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগল। চমকে উঠে ও চলতে শুরু করল। না, বাসে উঠবে না। বরং সেই পয়সা দিয়ে কাল খোকনের জন্যে দুটো কলা কেনা যাবে। এই ত এইটুকু পথ, গলিঘুঁজি কাটিলে কতোই আর সময় লাগবে! তবু কিছু সাশ্রয় হবে সংসারের।

লোহার গরাদ ধরে দুটো শুকনো মুখ! মাটিতে বসে পড়ে ওরা বলছে—তাড়াতাড়ি করো নাইলে দেরী হয়ে যাবে। আবার এসো! আর তাদের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইছে বন্দুকধারী অনেক-অনেক পল্টন। তাদের মুখ নেই সমস্তটাই পিঠ।

সামনাসামনি একটা লোক পথ আগলে দাঁড়িয়ে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে রাণী আবার দেখল, লোকটা সরে এসেছে। পথ বন্ধ। রাণী চায় নি এই অসময় ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে মনকে সরাতে। কিন্তু এই জনবিরল পথে এইভাবে বাধা পেয়ে বিরক্ত হল, তারচেয়ে বেশি ভয়। বিভ্রান্ত হয়ে অন্যধারে যাবার চেষ্টা করবে কিনা ভাবতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রাণী। মাথা-গুলি হারিয়ে গেল সেই মুহূর্তেই। সঙ্গীহারা রাণীর চোখের সামনে ঘন অন্ধকার নেমে আসে।

অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর—রাণু!

এবার মুখ তুলে তাকায় রাণী—তুমি?

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাণী বুঝতে চেষ্টা করে তার মনের ভাব। আর বলে—বাড়ি ফিরছি না বলে খুঁজতে বেরিয়েছ? খুব রাগ করেছ, হাঁ গো!

বিরাম চৌধুরী ক্লান্তি মুছে ফেলে বললেন—চলো একসঙ্গেই ফিরি।

—তার মানে, তুমি আপিস থেকে বাড়ি যাও নি?

—না। এই খোকনের ব্যাপারে এক-জনের কাছে একটু কনসাল্ট করতে এলাম। কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল। আমার ভয় করছিল, বাড়ি গিয়ে বকুনী খেতে হবে।

—এখানে কে? তোমার সেই উকীল বন্ধু রমনীবাবু?

—হ্যাঁ।

—তা উনি কি বললেন?

—বললেন, মিথ্যে মামলার বিরুদ্ধে লড়ে কোনো লাভ হবে না। বরং বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে ছেলেটাকে তার জের সামলাতে হবে। ওরা যা চায় তা-ই মেনে নিতে হবে। এছাড়া কোনো পথ নেই।

রাণী একটু হাসল।

—হাসলে যে?

—এমনি!

—চলো।

—হ্যাঁ, পথের মধ্যে এইভাবে বেশিক্ষণ থাকলে লোকেই বা ভাববে কী!

—দ্যাখো।

—বলো।

—আমাদের জীবনটা মেনে নিতে নিতেই শেষ হলো একদিন।

—কি রকম?

—এই একবার ওরা যা করল, তা মানতে হ'ল—

—আবার এখন এরা যা করবে তাও না-মেনে উপায় নেই।

ওরা চলতে চলতে কথা বলছিল। এক-সময়ে কথা ফুরিয়ে শুধু চলার গতিটা নীরবতার পাশাপাশি সময়কে টানতে থাকল। একজন দেখল দেয়ালে মুছেআসা পোস্টার সারি, আর কতকগুলি দেয়ালে নতুন হরফের তাজা কালিতে দেয়াল ভর্তি। আর একজনের চোখের সামনে সেই মুখগুলি, সেই পিঠ ফিরে এল।

একদিন জঙ্গলে গিয়ে গাছ ঠিক করে আসা হল। পুজো হল সে-গাছের। তারপর ও। চেরাই-খোদাই হয়ে তৈরী হল দমুখো কুমীর—সরল-সংযম এক শিল্পসৃষ্টি। গুজরাতের বায়রার আদিবাসী জীবনে এ-কুমীর নিতান্তই ধর্মীয় আচারের এক অঙ্গ হিসেবে গণ্য। বাজারে বিকোবার জন্যে নয়। একই ব্যক্তি এক্ষেত্রে একই সঙ্গে পুজারী, কাঠুরে আর শিল্পী। এই সৃষ্টিধারা এদেশের গ্রামীণ তথা আদিবাসী-উপজাতি জীবনের সঙ্গে সহজ এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নিজ হাতে তৈরী করা কাঠের খুলি আর ভালুকের লোমে সজ্জিত এক ঝুড়ি, নেফার সেই ওয়ানচো বুড়ো কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী নয়। তার ধারণা, শেষদিন তার ঘনিয়ে আসছে। তখন সমাধির পাশে যদি ঐ ঝুড়িটি না থাকে, তবে ওপারে তার কানাকড়ি দামও হয়ত কেউ দেবে না। ঘরের কাছের বাংলার দক্ষিণ রায়ের উদাহরণও নেওয়া যেতে পারে। সুন্দরবনে কেউ কাঠ কাটতে, কেউ মধু সংগ্রহে চলেছে। বাঘের বিপদ সামনে। দক্ষিণ-রায়ের পুজো দিয়ে বনে প্রবেশ করছে সবাই। লৌকিক এই দেবতাটির কল্পনাই কেমন অদ্ভুত। উল্টানো ঘটের আকৃতি-বিশিষ্ট মুখ। হলদে রঙের ওপর কালো টান। ত্রিভুজাকৃতি মুকুটে লতাপাতার নকসাকাটা। আরণ্যক জীবনের অধিষ্ঠাতার ছাপ সর্বাঙ্গে। উদ্ভব বা কল্পনা যেভাবেই হয়ে থাকুক, এই সবগুলো ক্ষেত্রেই গঠন, বর্ণ বা শিল্পের ছোঁয়া নানাভাবে সুপরিস্ফুট।

লোকায়ত শিল্পের এই বহু বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য সম্ভার সারা ভারতবর্ষ জুড়েই ছড়ানো। টুকরো টুকরোভাবে আলোচনা শর হয়ে থাকলেও, একত্রিত আকারে তার পরিচয়-সাধন-চেষ্টা, বিশেষত শিল্প-

মথুরার স্টেনসিল কৃষ্ণ

সৌকর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, তেমন একটা হয় নি। যতটুকু যা, কখনও বা নজরে আসে, বহুলাংশেই সেটা সমাজবিজ্ঞান বা নৃতত্ত্বের অন্তর্ভূত। তাছাড়া অসুবিধাও রয়েছে এধরনের কোনও সংগ্রহ প্রচেষ্টার। বাস্তুগত ও বিশেষ উপলক্ষ্যে ব্যবহারের জন্য তৈরীর কারণে, অধিকাংশ সময়েই এসব জিনিস কিনতে পাওয়া যায় না। আর সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে, অনেক জাতের আচরণই আজ বিলুপ্তির মুখে। তাছাড়া সংগ্রাহকারের সেই মন বা চোখ নিয়ে জিনিস খোঁজার লোকেরও অভাব রয়েছে। স্বাধীনতালাভের পর অবস্থা আরও ঘোরালো হয়েছে। অবক্ষয় ত বন্ধ হয়নি বরং তথাকথিত শিক্ষাবিস্তারের ফলে সেটা ত্বরান্বিত হয়েছে। বিদ্যালয় বা বৃত্তির দাক্ষিণ্য সরকার সম্ভবত বাড়িয়েছেন। সাইকেল, ঘড়ি বা টেরিলিন-শার্টের বিক্রির হারও হয়ত বেড়েছে আদিবাসী বা উপজাতি ছাত্রদের মধ্যে। কিন্তু পরিবর্তে তাদের বিসর্জন দিয়েছে অনেককিছুই। আর শিখেছে নিজেদের আত্মীয়গোষ্ঠীকে অবজ্ঞা করতে।

এতৎসত্বেও আজও সৌন্দর্যবোধ তথা শিল্পের নানামুখী প্রকাশ লোকায়ত জীবনে অঙ্গন-প্রাঙ্গণ, গৃহসজ্জা, মন্ডন-অলঙ্করণ, বেশভূষা ও বহুবিধ আচার-আচরণের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। বহু-আলোচিত অলঙ্কার ও পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে, অন্যান্য যেসব উপকরণ শিল্প-সৌকর্যে উল্লেখনীয় ব্যবহৃত মাধ্যম অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে সেগুলো বিভক্ত করা যেতে পারে।

প্রথমেই কাঠের তৈরী কিছু সামগ্রীর উল্লেখ করা যায়। ঘর তৈরীতে কাঠের ব্যবহার রয়েছে। আর ঘরের দরজা, জানালা ইত্যাদি সম্ভবমতো অংশ কারুকার্যখচিত করারও রেওয়াজ আছে। অলঙ্কৃত পাটা ইত্যাদি ছাড়াও, কাঠের মূর্তি বা মুখোশও তৈরী হয়। এমনকি সাঁওতাল বা উপজাতিদের বাদ্যযন্ত্রও নিপুণ কারিগরীতে সমৃদ্ধ দেখা যায়।

এর পরেই ব্যবহার বা প্রাধান্যের দিক থেকে ধাতুর স্থান। তামা ইত্যাদির একক ব্যবহার কিছু দেখা গেলেও, প্রধানত পিতল বা একাধিক মিশ্রধাতুরই প্রচলন বেশী। কাঠের মতো এক্ষেত্রেও মন্ডনধর্মী পাত্র এবং রিলিফে করা মূর্তি ইত্যাদি যেমন দেখা যায়, তেমনি ত্রিমাত্রিক সৃষ্টিও নজরে আসে। ধাতুনির্মিত সব নিদর্শনের কথা প্রসঙ্গে স্বতঃই ঢোকরা কাজের কথা আসে। কারণ কৌশলে আদিম, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে কাজগুলো প্রায়শই সহজ ও স্বচ্ছন্দ। যাযাবর ও ভ্রাম্যমাণ উপজাতি মহলে এর চলন বেশী হলেও, মধ্যপ্রদেশ,

ঢোকরা কাজের নমুনা

বিহার এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও এই কাজের স্থায়ী বন্দোবস্ত রয়েছে। অবশ্য বিদেশে ঢোকরা কাজের চাহিদা ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাই এর মূলে।

বাঁশ-বেতের বা কাপড়-কাগজের মন্ডের তৈরী শিল্পনমুনারও দেখা মেলে। কোনো অঞ্চলের কিছু মুখোশ, উত্তর ভারতের দশেরা উৎসবের নানা মূর্তির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উড়িষ্যায় কেলু-কেলুনীর মতো বড় মূর্তিও দেখা যায়। রাজস্থানের ভিলেদের মধ্যে রঙীন মুখোশ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

'ককু' উপজাতির কাষ্ঠনির্মিত গাধা

কলাকেলানী পাপেট
(কারুশিল্প প্রশিক্ষণ ও নমুনা কেন্দ্র। ভুবনেশ্বর)

মাটি পোড়ামাটি, ব্যবহারের দিক থেকে একটা জনপ্রিয় মাধ্যম। বাঁকুড়া বা গুজরাত, এমনকি দক্ষিণ ভারতেও ধর্মীয় আচরণের অংশ হিসেবে পোড়ামাটির ঘোড়া তৈরীর রেওয়াজ রয়েছে। মাটিতে রিলিফ ধর্মী কাজের উদাহরণ হিসেবে রাজস্থানের মোলেলার কাজও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লৌকিক শিল্পসম্ভারের অন্যতর শাখা হিসেবে চিত্র-নিদর্শন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। সংখ্যাও যেমন অনেক, বৈচিত্র্যের দিক থেকেও সেগুলো রকমারি। কালীঘাটের এবং বাংলার পুঁথিগুলো অন্যান্য পটচিত্র, রাজস্থানী জন্মপত্রিকা, মথুরার স্টেনসিল, অধুনা-সুপরিচিত মধুবাণীর কাজ, এমনকি ওড়িশার শৈলীর কিয়দংশকে উপরিউক্ত এই বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা চলে। তাছাড়া দেওয়াল অলংকরণ উদ্দেশ্যেকৃত কাজকেও এর মধ্যে গণ্য করা যায়।

কালীঘাটের বা বাংলার পট এমনকি সাঁওতালী পটও কিছু কিছু আলোচনার ফলে অপেক্ষাকৃত পরিচিত। তাঞ্জোর চিত্রও একেবারে অজানা নয়। মথুরার স্টেনসিল সে-অর্থে ততটা বহুল পরিচিত না হলেও, স্থানীয়ভাবে এর চর্চা বা প্রচলন বেশ রয়েছে। এখনও মন্দিরের আশেপাশে বা মেলায় এর দেখা মেলে। তবে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে আজ বিহারের মধুবাণীর কাজের চাহিদা নিশ্চয়ই ক্রমবর্ধমান। ফলে এখন এ-ছবি নিয়মিত আঁকা হচ্ছে। দেওয়াল-মণ্ডন প্রসঙ্গে হরিয়ানা অঞ্চলের সাঁঝির উল্লেখ সহজেই করা যেতে পারে।

মোটামুটিভাবে যতটুকু যা উল্লেখ করা হল, সেটা নিতান্তই আভাসমাত্র। এর পরিসরও এত ব্যাপক যে সীমিত আকারে কোনও সুসংবদ্ধ আলোচনা সম্ভবও নয়। উদাহরণ সবই ছড়ানো আর আক্ষেপের কথা এই যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সব এক জায়গায় দেখারও বিশেষ সুবিধা নেই। সেরকম চেষ্টাও বড় একটা হয় নি। যদি বা কখনও হয়েছে তাও নিতান্তই সাময়িকভাবে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে। এ প্রসঙ্গে বছর দুয়েক আগে দিল্লীতে ললিতকলা আকাদমী আয়োজিত ও অধ্যাপক শঙ্খ চৌধুরী পরিকল্পিত মনোজ্ঞ প্রদর্শনীটির উল্লেখ করা চলে।

তাই মনে হয়, আজ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আদিম-উপজাতি ও লোকায়ত শিল্পের একটি বা সম্ভব হলে একাধিক স্থায়ী সংগ্রহশালা গড়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কিছু জিনিস হয়ত এরকম অবলুপ্তির হাত থেকে তাহলে বাঁচানো যেতে পারে। কারণ, পরে কতটা কি আর থাকবে বলা যায় না। ভেরিয়ার অলউইনের অনুসরণে তাই বলতে হয়—"বড় দেরীতে শুরু হচ্ছে। আর কিছুই বোধহয় নেই। কিছু খুঁজতে হলে এখন জঞ্জাল আর আস্তাকুঁড়ই ঘাঁটতে হবে।"

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিপ্লবী বীর ও চিন্তানায়ক মানবেন্দ্র রায় যখন পরলোকগমন করেন তখন স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৭।২৮ জানুয়ারী তারিখে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে অনেক কথার মধ্যে লিখিত হয়েছিল—এদেশের দুর্ভাগ্য যে শ্রীযুক্ত রায় তাঁর স্বদেশবাসীর পক্ষে অগ্রিম জন্মনিয়েছিলেন, তাঁর বক্তব্য বুঝতে কিছু সময় লাগবে।' ঠিক কি লিখিত হয়েছিল তা স্মরণ নির্ভর করে বলা কঠিন, তবে সেই উক্তি এই জাতীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সেই সময় কবি ও সাহিত্যিকার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'স্টেটসম্যানে'র অন্যতম সম্পাদকীয় লেখক ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের অন্তরের যোগ ছিল। কলিকাতায় এলে মানবেন্দ্রনাথের সংগে সুধীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ আলোচনা চলত, সুতরাং বিদগ্ধ মনীষী সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। মানবেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা উপন্যাসের মত বিস্ময়কর। প্রকৃতপক্ষে মানবেন্দ্রনাথ এক স্মরণীয় বঙ্গ সন্তান যাঁর জীবনেতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন সর্বাধিক।

মানবেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ তিন মহাদেশ বিস্তৃত। দুদশক কাল ধরে তিনি এশিয়া, আমেরিকা ও য়ুরোপের বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনে একটি মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শোনা যায় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট নর্থ দীর্ঘকাল ধরে মানবেন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা করছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই "এম-এন রায়'স মিশন টু চায়না" —"দি কম্যুনিষ্ট কুয়োমিণ্টাং স্পিাট—১৯২৭' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মানবেন্দ্রনাথের প্রকাশ্য জীবনকথা যেটুকু পাওয়া যায় সে তাঁর স্বরচিত স্মৃতিচারণ নির্ভর। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে এবং স্মৃতিচারণে প্রাপ্ত তথ্যাদি অবলম্বনে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কিছু জীবনকথা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। এই দিক থেকে স্বদেশরঞ্জন দাস প্রণীত "মানবেন্দ্রনাথ—জীবন ও দর্শন" নামক গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর পূর্বে এই গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা এই বিভাগে করা হয়েছিল।

সম্প্রতি শ্রীসমরেন রায় "দি রেস্টলেশ ব্রাহ্মিন" নামে ইংরাজীতে এম এন রায়ের পূর্ব জীবনের কথা বিধৃত করেছেন। সমরেন রায় প্রায় কিশোর বয়স থেকেই মানবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগে এসেছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সেই সংযোগ অক্ষুণ্ন ছিল, তিনি লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কনগ্রেসমেনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে এই গোষ্ঠী র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে পরিবর্তিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বালক মানবেন্দ্রনাথ যখন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে স্বদেশে পরিচিত ছিলেন সেই কালের বিস্তারিত বিবরণ পরিবেশন করেছেন। তিনি এই কর্মে সকল প্রকার সূত্র সন্ধান করেছেন এবং তা যথাযথ ব্যবহার করেছেন। যুক্তিগ্রাহ্য জীবনকথা পরিবেশনে যেসব মালমশলা প্রয়োজন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐতিহাসিকের মনোভঙ্গী নিয়ে তা সংগ্রহ করেছেন। বিশেষ করে নরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের মানুষ যাঁরা আজো বর্তমান এবং তাঁর আত্মীয়বর্গের নিকট থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে নরেন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—"গার্ডেনরীচ ডাকাতি মামলায় যেদিন নরেন ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হলেন সেদিন বিষণ্ণ চিত্তে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বলেছিলেন—"আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেল।" এমনই মূল্যবান ভূমিকা ছিল কিশোর নরেন ভট্টাচার্যের বাংলার বিপ্লববাদের সেই গোড়ার যুগের সংগ্রামে। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "Naren was one of the most colourfull figures in the revolutionary movement and his organisational skill was conspicuous'.

এই কারণে যতীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যকে ঠিক তাঁর পরের ধাপে ঠাঁই দিয়েছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণবঙ্গের এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ পরিবারে ধর্মীয় আবহাওয়ায় নরেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ট হন। এই গ্রন্থের লেখক তাই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'রেস্টলেশ ব্রাহ্মিন', অশান্ত ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক মোক্ষ সন্ধানে ব্রতী না হয়ে দুঃসাহসিক বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হল। তারপর স্বদেশের সীমানায় আপনাকে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন, বিশ্বজনের কল্যাণের মহৎ ব্রত পালনের দায়িত্ব নিয়ে। সমরেন রায় তাঁর গ্রন্থে নরেন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক জীবনারম্ভ এবং যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যুগান্তর দল সংগঠনে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের কথা বলেছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যুগান্তর দল সংগঠিত হয়। সমরেন রায়ের গ্রন্থটি মানবেন্দ্র রায় কর্তৃক ভারতের মুক্তি আন্দোলনে জার্মান সহযোগে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অস্ত্রশস্ত্র আমদানির প্রয়াস এবং বাটাভিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্ত্র সন্ধানে মানবেন্দ্রনাথের অকুণ্ঠিত প্রয়াসের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায় অন্য গ্রন্থে বর্ণিত হবে এবং সেই গ্রন্থটি লেখক বর্তমানে প্রায় শেষ করে এনেছেন।

অনেকে মনে করেন 'পথের দাবী'র নিম্নলিখিত অংশে শরৎচন্দ্র মানবেন্দ্রনাথকেই স্মরণ করেছেন।

"রাজার শত্রু! হ্যাঁ, শত্রু বলবার মত লোক বটে। বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন, সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমান চলত, কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত

বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ

ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি সমান বেগে চলে।......এ ছেলে যে কোথা থেকে এসে বাঙলামুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না।"

শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থ সম্ভবত ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন। তখনও এম-এন রায় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য এদেশে পৌঁছায় নি। শরৎচন্দ্রের জীবিত অবস্থায় এম-এন রায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও সম্ভব হয় নি। তবে, ব্যক্তিগতভাবে এই মানুষটির প্রতি তাঁর যে অসীম শ্রদ্ধা ছিল তা আমরা জানি।

সমরেন রায় নয়টি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মানবেন্দ্রনাথের জীবনের বিকাশের কাল বিষয়ে লিখেছেন এবং শেষের তিনটি পরিচ্ছেদের নাম 'ফ্রম বাতাভিয়া টু বাটাভিয়া,' 'ট্রিপস টু বাটাভিয়া' ও 'ইন সার্চ অব আর্মস'।

বলাবাহুল্য এই গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যাদির মাধ্যমে নরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের বাংলাদেশের বিপ্লবচেতনার অনেক মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যায়। একদা বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা বিদেশীর সাহায্যে অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যেভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন তার বিস্ময়কর ইতিহাস সমরেন রায় অপূর্ব সংযম এবং দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে লেখক শ্রীঅরবিন্দের কর্মযোগী ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিয়েছেন।

মহাজনীবী মানবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম অংশ। বাল্যজীবন এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আয়োজনে তাঁর ভূমিকা বিষয়ে লেখক যে সব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তার মধ্য থেকে কিশোর ও তরুণ নরেন্দ্রনাথ এক নতুন মূর্তিতে প্রকাশিত।

গ্রন্থের আরম্ভে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে তরুণ নরেন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ।

—অভয়ঙ্কর

THE RESTLESS BRAHMIN: Early life of M. N Roy—(with a forward by —Dr. Jadugopal Mukherjee) — By SAMAREN ROY. Published by Allied Publishers, Bombay, Calcutta, Delhi. Price Rs. 12-00 only

মধ্যাহ্নের ব্যাধ—শান্তনু দাস। প্রকাশক গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, ৪।১, আফতাব মসজিদ লেন, কলকাতা—২৭। দাম চার টাকা।

তরুণ কবি শ্রীশান্তনু দাস বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে একটি অতি-পরিচিত নাম। এঁর বহু কবিতা আমরা কলকাতার ছোট-বড় পত্রিকায় এবং মফস্বল থেকে প্রকাশিত 'লিটল ম্যাগাজিনে' ইতি-পূর্বে পড়েছি। উনিশ শ' পঁয়ষট্টি থেকে একাত্তর পর্যন্ত তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন, তাঁর 'মধ্যাহ্নের ব্যাধ' সেগুলির অধিকাংশ নিয়ে একটি সার্থক কাব্য সংকলন গ্রন্থ। এই কবিতাগুলির আগের কবিতা নিয়ে তাঁর প্রথম সংকলন গ্রন্থ 'দীর্ঘশ্বাস মগ্নে স্মৃতিময়' প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থের মতই আলোচ্য গ্রন্থটিও কবির সুনাম প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

শ্রীশান্তনু দাস নিঃসন্দেহে একজন রোমান্টিক ও আধুনিক মন ও মননের কবি। শুধু বিষয় ভাবনায় নয়, কবির শব্দ, ছন্দ ও স্তবক-বিন্যাস, চরণ রচনা দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, কবি সমকালের কাব্য-আন্দোলনের দিকে পিছন ফিরে কোনরকমেই কবি-ভাবনায় ব্যস্ত হননি। সুললিত ছন্দে যেমন কবি সিদ্ধহস্ত (আমায় তুমি চিনতে পারো?) তেমনি মাত্রাবৃত্ত ও কোন কোন ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তে সুনিপুণ। 'বকুল ফোটায় বকুল ঝরায়', 'দাঁড়ে বসে টিয়ে বঙ পাখি', 'শব্দ শুনি ধূকে' ইত্যাদি কবিতায় কবি যেভাবে চরণ ভেঙে বক্তব্যকে সেই ভাঙার ছন্দে ও শব্দে অর্থবহ করে তুলেছেন, তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। শব্দ ব্যবহারে কবি আপন স্বাধীনতাকে ভোগ করেছেন ঠিকই, কিন্তু এতটুকুও যথেচ্ছাচারী নন। তিনি একই সঙ্গে ইংরিজি শব্দ ও বাংলা মুখের ভাষার শব্দ ও ইডিয়ম বসিয়ে আধুনিক কাব্যভাষায় 'ডিকশান'কে স্বনিষ্ঠায় জেনেছেন।

আলোচ্য কবির বক্তব্যে ভয়ংকর তাঁর আত্মগত ক্রোধ ব্যক্ত। এ ক্রোধ বিকৃত যুগ-যন্ত্রণা থেকে জাত, কখনো স্মৃতি অনু-ষঙ্গে, কখনো সমকালের ঘটনার পটে চিত্রিত। নিজের অস্তিত্বের কথা ঘোষণায় কবি বলেছেন, 'আমি আছি,/যৌবনের লাভাস্রোতে নির্মম আগুন নিয়ে বনজ মাটির কাছাকাছি।' (মধ্যাহ্নের ব্যাধ) নিজেকে নিয়ে কৌতুক বা ব্যঙ্গ করার প্রবণতা কবির সেই অস্তিত্বের মূল্যবোধ ও তন্নি-হিত ক্রোধ থেকে জাত—'আমি শালা হেঁটে যাচ্ছি—হাঁটছি তো হাঁটছিই...' (যেতে হবে রাজার সভায়), 'বহুদিন হল স্যার নামহীন গোত্রহীন কোন এক জারজের মতো/মিশে গেছি জনস্রোতে' (কোথায় গেলেন স্যার)। কবি-ব্যবহৃত চিত্রকল্প মুগ্ধ করে। সুকান্ত ভট্টাচার্য আর শুধু মৃত কবিমাত্র নন, তিনি আলোচ্য আধুনিক কবির কাছে এক প্রতীক-প্রতিম বলিষ্ঠ নাম। কবি যখন বলেন, 'দুঃস্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙে ঘণ্টা বাজে', 'বিশাল নদীর মত ভয়ংকর অন্ধকার', 'এগিয়ে যাচ্ছে দুঃস্বপ্নের রাত থেকে স্বপ্নের ভোরে' তখন কবির চিত্রকল্প

নিহিত একান্ত নিঃসঙ্গ অভিজ্ঞতা স্বভাবী পাঠককে মুগ্ধ করে। গ্রন্থটির অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রচ্ছদ নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মত।

শান্ত সন্ধ্যা (কবিতা)—বিমলচন্দ্র বেদজ্ঞ। প্রকাশক : লীলা দেবী, ১১।৩৯, মল রোড, কলকাতা-২৮। ছ' টাকা।

জগৎ-সংসার ও বিশ্বপ্রকৃতির নানা ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংবেদনশীল মনে দোলা দেয়, ভাবনার মেঘ সঞ্চার করে। তারই ছবি ফুটে ওঠে শিল্পী-কবি ও কথা-কারের সৃষ্টিতে। বিমলচন্দ্র বেদজ্ঞের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'শান্ত সন্ধ্যায়' তারই প্রতিচ্ছবি রয়েছে প্রায় আড়াই শো পাতা ভরে নানান স্বাদের নানান রসের, নানা ছন্দের ছোট-বড় ছড়া ও কবিতায়। ভঙ্গি প্রাচীনপন্থী হলেও অনুরাগীরা এ থেকে আনন্দ ও তৃপ্তি পাবেন। ভূমিকা লিখেছেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ।

প্রবাল (কবিতা)—শ্রীমুন্সী। হরফ প্রকাশনী এ-১২৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা : ১২। তিন টাকা।

আশি পাতার এই কবিতার বইটি ভরে আছে টুকরো টুকরো অনেক কবিতায়। প্রকাশভঙ্গি আধুনিক হয়তো নয়—তবু সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ্য করবার মতো। সাদা-মাটা কবিতা পড়তে যাঁরা ভালোবাসেন 'প্রবাল' তাঁদের খুশী করবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

মৃত্তিকা (ত্রৈমাসিক কবিতা-সংকলন)—সম্পাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম-সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা : ১২। এক টাকা।

সাহিত্যে সংকলন প্রকাশ করা অধুনা একটা রুটিমাফিক আয়োজনে দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে সংকলনের ধার এবং ভার দুই-ই গেছে কমে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিক কবিতা-সংকলনটি তথাকথিত সংকলনগুলির এক আশ্চর্য ব্যতি-ক্রম। রসবিচার এবং উপভোগ্যতা এই দুই দিক দিয়েই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলা কাব্যের সমস্ত লেখকের প্রবীণ নবীন, খ্যাত স্বল্প-খ্যাত—কবিতা চয়ন করে নিপুণ মালা-করের মতো বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধের সমাহার ঘটিয়ে মালা গেঁথেছেন সম্পা-দক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। অথচ প্রতিটি কবিতাই স্বতন্ত্রধর্মী এবং উপ-ভোগ্য। 'মৃত্তিকা'-জাত তাজা জীবনের আঘ্রাণ এ সংকলনের সর্ব-অবয়বে। সর্ব-শ্রেণীর সকল দলের সকল বয়সের কবিদের কবিতার এই সংকলনটি কাব্য-অনুরাগীদের সাদর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। উপহার দেবার ও সংগ্রহ করে রাখবার মতো কবিতা-সংকলনের জন্যে সম্পাদক কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, এবং প্রচ্ছদ (শিল্পী : কমল সাহা) মনে রাখবার মতো।

কবিতা কবিতা (ফাল্গুন ৭৮)—সম্পাদক : অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৬ নবীন সরকার লেন, কলকাতা—৩। পঁয়ত্রিশ পয়সা।

'যে কবিতা যুগধর্মী হয়েও জীবনধর্মী যার আবেদন শুধু মস্তিষ্ককে নয়, হৃদয়ের অনুভূতিকে তোলপাড় করে' সেই প্রাণধর্মী কাব্যরসে কলম ডুবিয়ে কবিতা লিখেছেন : রতন লাহিড়ী, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার দাস, সুখরঞ্জন চক্রবর্তী মানসকুমার মুখোপাধ্যায়, সমীর দে, সত্যসাধন গুপ্ত, অজিতকুমার বাইরী, রঞ্জিতকুমার সরকার, মৃণাল বণিক, অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ঘোষ, অমরনাথ বসু, তপনকুমার মুখোপাধ্যায়, দীপংকর গুহ, কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হে রাখাল রাজা

তারাপদ রায়

আমার-ও তো স্বাধীনতা চাই।

স্বাধীনতা মানে সেই—
প্রথম মর্ণিং স্কুল, আমগাছে প্রথম মুকুল
প্রভাত ফেরির মাঠে উতলা ধরণী;
স্বাধীনতা মানে সেই নতুন বর্ষার জলে সচ্ছল স্বাধীন
গহনার নৌকো এসে ঢুকে যায় গঞ্জের ভিতরে
আজাদ স্টোর্সের পাশে পুরানো পুলের তলা ঘিরে
ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণিস্রোত স্বাধীন, স্বাধীন।
নিরবধি মাঠ ভরে ধানের অনন্ত শীষ ছুঁয়ে
স্বাধীন হাওয়ার হাতে স্বাধীন সকাল।

অন্ততঃ দশবার,
অন্ততঃ দশবার এই স্বাধীনতা আমি
মনে মনে নিশ্চিত জিতেছি
চারাবাড়ি ভাঙাচরে স্তব্ধ কাশবনের ভিতরে
ছেঁড়া লুঙ্গি, খালি গায়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে
সাতজন্মে একবার, জন্মে জন্মে এই শেষবার
শেষ ও প্রথমবার বন্দুকের নলে চোখ রেখে
হে রাখাল রাজা
আমিও তোমার সঙ্গে
তোমার চোখের পাশে একই নলে আমার-ও তো চোখ।

আমার-ও তো স্বাধীনতা চাই,
ভিক্ষাহীন, ঘৃণাহীন আমার সে স্বাধীনতা
অন্ধকার নদীতীরে
কাদা জলে, সাপ-জোঁক, গুলি ও আগুনে
আমার রক্তের মধ্যে হে রাখালরাজা।

সুদিন তুমি কোথায় গেলে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

ঠাকুমার মুখে গল্প শোনা
সুদিন তুমি কোথায় গেলে—
আমাদের ত্যজ্য করে কোথায় গেলে?
কেউ তোমাকে গাল দিয়েছে
না কি কোনো দৈত্য দানো
তোমার উপর জোর করেছে
আমাদের ত্যজ্য করে
অভিমানী সুদিন তুমি কোথায় গেলে?

তাই এখানে অসুখ-বিসুখ
সকল কিছু পাল্টে গেছে
অষ্ট প্রহর ভীষণ আকাল
মর্ত নয় তো বদ্ধ পাতাল
রোদের আলোয় ঘুন ধরেছে
জলাশয়ের দয়া গেছে
গাছের স্বাস্থ্য খুন হয়েছে
সমস্তক্ষণ ভীষণ আকাল
মর্ত নয় তো বদ্ধ পাতাল
মানুষ-মানুষ পোষাক পরে
মানুষ কেমন সঙ সেজেছে
ঠাকমার মুখে গল্প শোনা
সুদিন তুমি এদেশ ফেলে
কোন বিদেশে কোথায় গেলে!

ফুনসুলিং-এ ঘণ্টা বাজে

চন্দন সেন

শালবন পেরিয়ে গেলে রাত্রি শেষ,
রাত্রিশেষে অন্য এক সকালের
যাত্রা সুরু হয়—
ভুটানি পাহাড় বেয়ে
নেমে আসে
উদাসী নদীর সাদা পানি;
ফুনসুলিং-এ ঘণ্টা বাজে
ঘণ্টা বাজে মন্দিরের প্রশান্ত উঠানে।

শালবন পেরিয়ে গেলে রাত্রিশেষে,
রাত্রিশেষে প্রকৃতির রঙীলা সময়ে
বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসে
মানুষের কান্না ঘাম
রক্ত মুছে দিতে।

।। ৫ ।।

পরের দিনই ঠাকুরকে সঙ্গে দিয়ে সাধুচরণকে হাসপাতালে পাঠাল হেমন্ত। সেখানে দু-তিনজন ডাক্তারকে দেখিয়ে, পরামর্শ করে পূর্ণেবাবু প্রেসকৃপশান লিখে দিলেন, বড় বোতলের এক বোতল মিকশ্চার করিয়েও দিলেন। কিন্তু সব ওষুধই বার বার শাসিয়ে দিলেন, শুধু ওষুধে না থাকলে বেশী দিন বাঁচবে না। পূর্ণেবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন, শুধু ম্যালেরিয়া নয়, কোথাও থেকে কালাজ্বরের বীজাণুও ওর দেহে ঢুকেছিল, রক্তের অবস্থা খুব খারাপ।

নিজেই এসে বলে সাধুচরণ কথাগুলো।

সেই মতো হেমন্তও কড়া হাতে রাশ ধরে। কাঁচকলা ভাতে আর কাঁচকলা পটল দিয়ে কচি মাছের ঝোল—তৈলবর্জিত—দুবেলা এই বরাদ্দ। জলখাবার পাঁউরুটি আর চিনি। কোন কোন দিন সুজির রুটি আর গুড়।

এদিকের রুক্ষতা অন্যদিকে পুষিয়ে দেয় অবশ্য। নতুনবাজারে লোক পাঠিয়ে ভাল ভাল ফল আনিয়ে দেয়। বাতাবি লেবু শশা কলা তো আছেই—আঙুর বেদানাও থাকে তার সঙ্গে। কিন্তু সাধুচরণ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, তার মুখে এসব রোচে না। খেতে বসে দুবেলা কান্না আসে তার, ফল দেখলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। দু-চার দিন পরে ভয়ে ভয়ে জ্যাঠাইয়ের কাছে মুড়ির কথা তুলেছিল—মুড়িতে দোষ কি? ও তো ধরো ভাতের মতোই। হাল্কা করে অল্প একটু তেল হাত বুলিয়ে—ধমক খেয়ে চুপ করে গেছে।

কিন্তু ওর যে ভাল লাগে না, মনমরা হয়ে থাকে সেটা হেমন্তর চোখ এড়ায় না। এই পথ্য খেয়ে থাকার অর্থ সে ভুল বোঝে। বৌ-ছেলে ফেলে এসেছে, না জানি তারা কি দুরবস্থার মধ্যে আছে—তাদের কথা ভেবেই এমন মন গুমরে থাকছে নিশ্চয়। দু-চার দিন দেখে সে বলল, 'তা বৌমাকেও এখানে আনিয়ে নাও না। তোমারই বা এত কষ্ট করে কে! তাছাড়া ওখানে থাকলে ছেলেটা বাঁচবে না এই তো বলো—দুজনকেই আনিয়ে নাও।...চিঠি লিখে জানো, আসতে চায় কিনা আসতে পারবে কিনা—তারপর একদিন গিয়ে নিয়ে এসো।'

সাধু প্রথমটা যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে খানিকটা, হাঁ করে।

তারপর যখন বোঝে হেমন্ত তামাশা করছে না বা মনে ঢিল মেরে ওর মনের কথাটা বোঝার চেষ্টা করছে না—তখন লাফিয়ে ওঠে একেবারে।

গলা থেকে এই কদিনের চিঁ-চিঁ ভাব এক নিমেষে কেটে গিয়ে বেশ জোর দিয়েই বলে ওঠে, 'আসতে পারবে কিনা, মত নেওয়া—মানে? কি আমার একেবারে মানাবর ঘরামী! আসতেই হবে। এ কি তার খুশীমতো কাজ নাকি? আমি হুকুম করা—আসবে না! ইঃ, তার বাপ আসবে—সে তো ছেলেমানুষ?'

তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকেই আবার বলে, আমি তাহলে কালই চলে যাই জ্যাঠাইমা কি বলো? গে ঝুটি ধরে নে আসি—।'

হেমন্ত সেই প্রজ্জ্বলন্ত উৎসাহে এক ঘড়া জল ঢেলে দেয়। বলে, 'না আগে চিঠি লেখো, তৈরী হয়ে থাক। হঠাৎ নিতে গেলেই কেউ ঘর-সংসার থেকে অমনি দু ঘন্টায় বেরিয়ে আসতে পারে না।...আর ঐ ছুতোয় যে তুমি সেখানে গিয়ে বসে আবার দুদিন তিনদিন ধরে নানান অখেচড় খেয়ে আসবে—তাও হবে না। অনেক কাণ্ড করে সারানো হচ্ছে, দুদিনের অত্যেচারে সে সব নষ্ট করা চলবে না।...যেদিন যাবে—ভোরে দুটি ভাত খেয়ে চলে যাবে—সন্ধ্যের আগে এখানে এসে পৌঁছবে। না হলে আর এ বাড়ি ঢোকা হবে না, সে আমি সাফ বলে দিচ্ছি।'

মুখটা বেজার করে বসে থাকে সাধু। এতটা বন্দীদশা কারুরই—বিশেষ পাড়াগাঁয়ের ছেলের পছন্দ হবার কথা নয়, হয়ও না। নিহাৎ অনেক তোয়াজে আছে, তাছাড়া তিন-তিনটে প্রাণীর ভার নিতে চাইছে একটা লোক—তাকে চটাতেও ইচ্ছা করে না। জ্যাঠাইয়ের কত টাকা—তা সঠিক না জানলেও অনেক টাকা যে আছে — তার একটা আঁচ পেয়েছে সে। ভবিষ্যতে ওরই ছেলে এই সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক হবে এটা কল্পনা করে হর্ষ-রোমাঞ্চ হয় ওর।

অগত্যা একটা চিঠি লিখতে হয়, চিঠির উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে হয়।

মনোরমা—সাধুর স্ত্রী তো পা বাড়িয়েই ছিল বলতে গেলে, ও বাড়ির নিরন্তর দুঃখ ভোগ এমনিতেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল, অভাব তো আছেই তার ওপর নিরন্তর কলহকোঁদল, পরস্পরকে ছোবল মারা—এ আর তার সহ্য হচ্ছিল না, তার ওপর—রুগ্নাই হোক আর যাই হোক—স্বামী একটা ছিল, সেও নেই, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল তার। জাঠশাশুড়ীর অত্যাচার ও বাক্য যন্ত্রণায় অস্থির সেও শাশুড়ীর পন্থা অনুসরণ করবে কিনা যখন ভাবছে সত্যি সত্যিই—তখনই এই চিঠি গিয়ে পড়ল।

মনোরমা নিজে লিখতে জানে না, পাড়ার একটি ইস্কুলের ছেলেকে ধরে, একটা পয়সা দিয়ে পোস্টকার্ড আনিয়ে তাকে দিয়েই চিঠি লেখাল, 'তুমি আমাকে সত্বর লইয়া না গেলে আমি অবশ্য অবশ্যই কাটাপুকুরে ডুবিয়া মরিব। কোনমতেই তাহার অন্যথা হইবে না জানিবে।'

সাধু পরেরদিন ভোরবেলাই রওনা হয়ে গেল, জ্যাঠাইমার নির্দেশমতো আলু পটলভাতে আর দই দিয়ে ভাত খেয়ে। তবে সেদিনই আর ফিরতে পারল না। সম্ভব নয় তা হেমন্তও জানত, তবে আরও বেশী দেরি না করে সেই জন্যেই কড়া রকমের কড়ার

করিয়ে নেওয়া। পরেরদিন বিকেলেই মনোরমা আর ছেলে গৌরকে নিয়ে চলে এল। জ্যাঠাইরা নাকি আসার সময় খুব বাঁকাবাঁকা কথা বলেছে, 'যারে গৌর, যা যা। এবার তোর কপাল ফিরল। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা লোক কথায় বলে, তোর অদেষ্টে দেখি সেই স্বপনই সত্যি হয়ে গেল রে ছোঁড়া!... যা যা, লুটে নিগে যা—যা পারিস!...তবে বুঝে বরাতজোর, যদি টিঁকে থেকে ওর পয়সা ভোগ করতে পারো তবেই। ও বাবা পিশাচে পাওয়া মেয়ে মানুষ—তুই ওর পয়সা খাবি কি ও তোর জীবনটা চুষে খাবে—তাই দেখগে যা। যাচ্ছিস তো তো নাচতে নাচতে!'

কথাটা গৌরকে বলা অনর্থক। সে তখন নিতান্তই শিশু, এসব কথার অর্থ বোঝার কথা নয় তার। তাকে ওরা বলেওনি অবশ্য। আসলে সাধু আর মনোরমাকে উদ্দেশ করেই বলা। ঈর্ষার বিষ—কোনমতেই ঢাকা যাচ্ছে না।

সবটা ঠিক বলা না গেলেও সাধুচরণ এর অনেক কথাই বলল এসে। শুনে শুধু হেমন্তর মুখের কঠিন ভঙ্গীটা কঠিনতর হল। এর কোন উত্তর দেবার চেষ্টাও করল না। প্রতিপক্ষ যেখানে অনুপস্থিত বাদানুবাদ করতে গিয়ে নিঃশ্বাস নষ্ট করে লাভ কি?...

মনোরমা কালো রঙের ওপর মন্দ দেখতে নয়। আর—ও গ্রাম কি ও অঞ্চলের মেয়ে নয় বলেই বোধ হয়—বেশ স্বাস্থ্যবতী। ওর বাড়ি এদিকে—ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলে। এদের বাড়ির এমনই 'সুনাম' রটে গেছে চারিদিকে যে কাছাকাছি কোথাওকার মেয়ে এদের ঘরে দিতে চায় না। দূরে দূরান্ত থেকে আনতে হয়। ছেলেটাও, মায়ের স্বাস্থ্যের জন্যেই বোধহয়—খুব একটা রুগ্ন বা পুঁয়ে পাওয়া নয়, হাত-পাগুলো মোটাসোটা গোলগাল।

দুচারদিন দূরে দূরে রাখলেও বেশীদিন ছেলেটাকে দূরে ঠেলে রাখতে পারল না, গৌর শিগগিরই 'গৌরসুন্দর' 'গোরা' হয়ে ওর বুকে উঠল এবং একরকম হেমন্তর কোলেই মানুষ হতে লাগল। মনোরমার তাতে খুব একটা আপত্তিও দেখা গেল না, সে যেন বরং নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সুখী ও নিশ্চিন্ত হবারই কথা সাধুচরণের, কিন্তু তা হতে পারল না সে।

এই শাসন আর বন্ধন তার ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল। এই খাওয়া রোজ খাওয়া যায় না। জলখাবার বলতে দুধসাবু আর নয় তো কাঁচকলা সেদ্ধ মিছরির গুঁড়ো দিয়ে। বড়জোর তাতেই কোন কোনদিন মিছরির বদলে নুন আর মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখা হয়। আগে পাঁউরুটি খাচ্ছিল, বামুনের কারখানায় তৈরী পাঁউরুটি, তাতেও অম্বল হতে লাগল—সেই জন্যেই নতুন এই ব্যবস্থা। একটু তেল না, একটু ঘি না—দুটো ভাজাভুজি কিছু খাবার উপায় নেই। সকালে সেদ্ধ মাছের ঝোল ভাত, রাত্রে সেই রকমই ঝোল আর রুটি। বড়জোর রকমফের হিসেবে—কোন কোনদিন একটু পলতা বা উচ্ছের সুক্তো হয়, তাও তাতে সর্ষে বাদ, শুধু ধনেবাটা দিয়ে সুক্তো—মানুষ কেন গোরুতেও তো খেতে পারে না। খেতে বসলে চোখে জল এসে যায় তার মনে হয় এমন করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও তো ঢের ভাল।

আরও মুশকিল হয়েছে এই, পুরনো রোগ—সারতে দীর্ঘ সময় লাগছে। এত ধরাকাটে থেকেও উন্নতির গতি এত মন্থর যে, ঠিক কতটা কি হচ্ছে, আদৌ কোন উন্নতি হচ্ছে কিনা সেটা বোঝা যায় না। মানে হিসেবে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। দৃষ্টিগোচর হওয়ার মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নয় সেটা। তাতেই সাধুচরণ ও মনোরমার ধারণা হয়েছে যে, এসব অকারণ, এই এত কড়াকড়ি। কিছুতেই কিছু হবে না। আর সারবেই না যখন, তখন যে কদিন বাঁচে একটু ইচ্ছেসুখে খেয়ে নিতে দোষ কি? এক এক সময় আড়ালে কপাল চাপড়ায় সাধু, এই জন্যে কি এত মতলব খেলিয়ে সে এই ঐশ্বর্যের মধ্যে এসেছিল! চারিদিকে ভোগের বস্তু থরে থরে সাজানো, ভাল ভাল সুখাদ্যর আয়োজন চারিদিকে, তার মধ্যে সে-ই সবেতে বঞ্চিত হয়ে থাকবে? তাহলে আর এত দীনতা স্বীকার করে এখানে পড়ে থাকার প্রয়োজন কি?...

আহারের কষ্ট ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে এটা বুঝেছিল হেমন্ত তাই বলে শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে সে যে এমন কান্ড করে বসবে তা সে কেন, সাধুচরণ নিজেও বোধহয় ভাবে নি।

কথাটা তাকে একদিন চারুর মা-ই বললে।

'দিদি, বৌটা বোধহয় ওর বরকে বাইরে থেকে এটাওটা এনে খাওয়াচ্ছে!'

হঠাৎ কদিনেই যে খুব দ্রুত একটা অবনতি ঘটেছে তা হেমন্তও লক্ষ্য করেছিল।

চোখ দুটো আবার হলদে হয়ে উঠেছে, পাইখানার চেহারাও ভাল নয়, হাতপা দুটো ফুলো ফুলো বোধ হচ্ছে। বোধহয় গাও গরম হয় বিকেলের দিকে। লক্ষণ সব দিকেই খারাপ।

কিন্তু শঙ্কিত বোধ করলেও কারণটা কি আন্দাজ করতে পারছিল না। এক একবার মনে হচ্ছে এই রুগ্ন দুর্বল শরীর নিয়ে স্ত্রীর কাছে থাকতে দেওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, আবার ভাবে তার সঙ্গে যকৃতের অবনতি ঘটার কি কারণ থাকতে পারে।

তবু হেমন্ত অবাক হয়ে যায় চারুর মার কথা শুনে।

'সে কি রে! দূর! বৌমানুষ কোথা থেকে কি নিয়ে আসবে? ও বাইরে বেরোয় নাকি?'

'হ্যা গো দিদি, বললে বিশ্বাস করছ নি, আজ স্বচক্ষে দেখলুম যে! দুপুরবেলা এদিক ওদিক দেখে টুপ করে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই পেট কাপড়ে করে নেসে বরের ঘরে ঢুকল। এই তো মোড়েই তেলেভাজার দোকান, কতটুকুই বা, যেতে আসতে তিনচার মিনিটের বেশী লাগে না। ওরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—ফাঁকে বেরিয়ে দোকানপানি করা ওদের খুব রপ্ত আছে। আর... মায়ের যা চেহারার ছব্বা, আর যা কাপড়চোপড়ের ছিরি—এখানেও কেউ অবাক হবে না দেখে। কোন ভদ্দরবাড়ির বৌ কেউ ভাববে না, মনে করবে কোন বাড়ির চাকরাণী।'

ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় হেমন্ত চারুর মাকে।

চেহারা নিয়ে এত ব্যাখ্যানা করার কি আছে! যতই হোক, ওর শ্বশুর বংশের বৌ, চারুর মার সমান কেউ নয়।

বিশ্বাস হয় না—কথাটা একেবারে উড়িয়েও দিতে পারে না ঠিক।

অসুখ যে আবার বাড়ার দিকে যাচ্ছে—সেটারও অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু, তখনই কিছু বলে না। চুপ করে সুযোগের অপেক্ষা করে। নিজের চোখে না দেখলে কিছু বলা উচিত নয়।...শুধু সন্ধ্যেবেলা মনোরমা যখন তেল গরম করে এনে ওর গায়ে মাখাতে বসল—এটা ওদের দেশের দিকে গুরুজনকে সেবার প্রধান অঙ্গ বলে পরিচিত, তা জানে বলেই প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি করলেও খুব বেশী বাধা দেয় নি—তখন হেমন্ত কথাবার্তার মধ্যে মোড় ঘুরে ইচ্ছে করেই সাধুচরণের অসুখের প্রসঙ্গে চলে এল। ওর অসুখ যে কত গুরুতর—এ থেকে কত কী অনিষ্ট হতে পারে, মহা সর্বনাশ ঘটাও আশ্চর্য নয়—তা বুঝিয়ে, কিছু বা সত্য কিছু কাল্পনিক এ রোগের অশুভ পরিণতির দৃষ্টান্ত দিয়ে—সাধুচরণের পরমায়ু কত সূক্ষ্মসূত্রে ঝুলছে তাই বোঝাবার চেষ্টা করল। ওষুধ নয়—ওষুধে বিশেষ কিছু করতে পারবে না আর, শুধু পথ্যের ওপরই ওর নিরাময় হওয়া নির্ভর করছে। সাবধান না থাকলে বাঁচার কোন আশাই নেই—এই কথাটাই বার বার নানারকমভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলল মনোরমাকে, যাতে মাথার মধ্যে চিন্তাটা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

'যদি নোলার সাধ ভাল করে মেটাবার ইচ্ছে থাকে, অনেকদিন ধরে ইহজগতের ভাতমাছ খাওয়ার সাধ থাকে—তাহলে এখন কিছুদিন বাপু নোলাটি সামলাতে হবে—এইটে ভাল করে বুঝিয়ে দিও তোমার বরকে। মুখে কুলুপ এঁটে রাখতে হবে। এই যা খাচ্ছে মনে করবে এইটেই ওষুধ, এর ওপরেই জীবনমরণ নির্ভর করছে।'

শান্তভাবে মুখে ঘোমটা টেনে বসে বসে শুনল মনোরমা, সায়-সূচক ঘাড়ও নাড়ল বার কতক, ভাব দেখে মনে হল কথাটার গুরুত্ব ভাল করেই বুঝেছে।

হেমন্ত কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। যদি বা একটু আধটু অত্যাচার করে থাকে—না-জানতে, এবার আর করবে না।

তবু পরেরদিন একটু সতর্ক রইল।

দুপুরবেলা সে দরজা ভেজিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল প্রতিদিনের মতোই। মনোরমাদের খাওয়ার পাট তো আগেই চুকে গেছে, ঠাকুর ও ঝিয়ের ভাত বেড়ে রেখে নিজে খেয়ে রান্নাঘর ধুয়ে রেখে বেরিয়ে পড়ল দ্বিপ্রাহরিক আড্ডায়। চারুর মা রান্নাঘরের সামনের রকে খেতে বসেছে সদরের দিকে পিছন ফিরে।

এই উত্তম সুযোগ, যদি বাইরে যেতে হয় তো এখনই যাবে।

হেমন্ত পা টিপে টিপে বাইরে এসে দাঁড়াল। সাধুদের ঘরও দোতলায়, তবে সিঁড়ির ওধারে, দরজাটা চট করে দেখা যায় না এঘর থেকে। কিন্তু হেমন্তেরও তীক্ষ্ণদৃষ্টি—একটা ডুরে কাপড়ের আভাস ত্বরিৎগতিতে সিঁড়ির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সেটা ওর নজর এড়াল না। তার পরই অতি মৃদু একটা শব্দ পাওয়া গেল সদর দরজা ভেজিয়ে দেবার। শব্দ না করারই প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছে—তবু সামান্য যেটুকু আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

হেমন্ত এবার এগিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল, এদিকের ঘরের দরজার আড়ালে। একটু পরেই আবার সেই অতি মৃদু শব্দ—এবার অবশ্য আগের চেয়ে একটু বেশী—কেউ ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল নিশ্চয়। তারপর আর কোন আওয়াজ নেই। পা টিপে টিপে সাবধানে উঠলে আওয়াজ পাওয়াই বা যাবে কেন?...

সিঁড়ির মুখে এসে নিজেদের ঘরের দিকে বেঁকে যাবে মনোরমা—ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল হেমন্ত ওর ওপর। কোঁচড়ের কাপড়টা একটা থলির মতো করে কোমরে গোঁজা—সেটা ধরে টান দিতেই চারিদিকে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মুড়ি বেগুনি ডালবড়া ফুলুরি, তেলেভাজা কচুরি। কোন ঠোঙায় নেয়নি পাছে জিনিসটা ফুলে থাকে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কাপড়ে তেল লাগার আশঙ্কা গ্রাহ্য না করে কোঁচড়েই নিয়েছে। এগুলি এখন হয় সাধুচরণ একা নয় তো দুজনেই বসে বসে খাবে। শেষেরটাই বেশী সম্ভব।

রাগ সামলাতে পারল না হেমন্ত। টেনে একটি চড় বসিয়েদিল মনোরমার গালে। মনোরমা সে আঘাতের বেগ সামলাতে পারল না। টাল্টারি খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল মেঝেতে। তবু তখনও নিরস্ত হতে পারল না, হেমন্ত তখন চণ্ডালক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে প্রায়, তার ওপরই একটা লাথি কষিয়ে দিল মনোরমার মাজায়।

'হারামজাদী! তোমার পেটে পেটে এত শয়তানি! আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি! আমার কাছে উড়ে যাবে!...তোর বাপ-ঠাকুর্দা শ্বশুররা পারবে না, তিন পুরুষ এলেও না। সেইজন্যে দেখি আবার চোখ উল্টে হচ্ছে ছোঁড়ার, নালিথলি পাইখানা শুরু হয়েছে। আর তুমি মাগ হয়ে নিজে হাতে করে বিষগুলো এনে খাওয়াচ্ছ!... তাই তো বলি আমার এত যত্ন এত ওষুধ সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে কেন! তুমি এই কাজ করছ বসে বসে তার হবে কি!.. সেইজন্যে তোমাকে আনালুম এখানে ঝকমারি করে!'

চেঁচামেচিতে চারুর মা ছুটে এসেছে নিচে থেকে ভাত ফেলে—কিন্তু সাধুচরণ ঘর থকে বেরোল না। জ্যাঠাইয়ের এই রণ-চণ্ডী মূর্তি সে এর আগে দেখেনি। লাথি মারার আওয়াজটাতেই বুঝেছে পায়ের জোর। নিজে এখন বেরিয়ে বাঘের মুখে পড়তে রাজী নয় সে। ঐ লাথি সে খেলে আর বাঁচবে না।

চারুর মাই এক হাতে মনোরমাকে ধরে তুলল। খুবই লেগেছে তার, উঠতে পারছে না। কোনমতে চারুর মার হাতে ভর দিয়ে বেঁকেচুরে উঠে ঘরের মধ্যে গেল। কথা বলার শক্তিও নেই তার, আর বলবেই বা কি!

চারুর মা পুরনো ঝিয়ের অধিকারে একটু তিরস্কার করল হেমন্তকে।

'উকি বাপু! যাই করুক, এত বড় বৌটোকে লাথি মারা তোমার উচিত হয়নি। মেয়েছেলের পা চলা বড় খারাপ। তার ওপর বামুনের সধবা! সাক্ষাৎ দুগ্গোর অংশ ওরা। এমন চণ্ডাল রাগ রাখা ঠিক নয়। স্থানে-অস্থানে লেগে গেলে কি হত!...আর তোমার বা এত মাথা ব্যথা কিসের? তাদের ছাগল তারা যদি ন্যাজের দিকে কাটে! মরবার শখ হয়েছে মরুক না। তারা যদি নিজে হাতে করে বিষ খায় তো তোমার কি! তুমি বড়জোর বলতে পারো যে, যেখেন থেকে এয়েছ সেখেন যাও, আমার সামনে বিষ খাওয়া চলবে না!...ব্যস্! চুকে গেল ল্যাঠা!'

সে গজগজ করতে করতে নিচে নেমে গেল। ততক্ষণে হেমন্তরও লজ্জা বোধ হয়েছে, সেও চুপ করে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। রুদ্ধ ক্রোধে তখনও সর্বাঙ্গ কাঁপছে তার—তবু এতখানি করা উচিত হয়নি, তাও বুঝেছে।

আবার সব চুপচাপ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই কানে গেল—কে একজন কোঁকাচ্ছে আস্তে আস্তে।

বোধহয় মনোরমা।

একবার ভাবল গিয়ে একটু দেখে কোথায় কী লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এ-ধরনের প্রশ্রয় পেলে ভবিষ্যতে কোন শাসনেরই মূল্য থাকবে না। এ-শাসনও অনর্থক হয়ে পড়বে।

ওর তরফ থেকে যথেষ্ট ইতরতা প্রকাশ হয়েই গেছে, তার যে সামান্য সুফল হতে পারে—মিছিমিছি সেটুকুও নষ্ট করে লাভ নেই। তাছাড়া এতো একরকম মানুষ খুন করাই। ঐ রুগীকে এই সব অখাদ্য যোগানো, এর সাজা কঠোর হওয়াই উচিত।

সেদিন মনোরমা আর উঠল না। ওঠার শক্তি নেই অথবা অভিমান—তাও খোঁজ করল না হেমন্ত। সাধুচরণও ওর সামনে এল না, এড়িয়ে এড়িয়ে গেল। সেটা রাগ নয়—ভয়। বৌয়ের যে পরিমাণ শাসন দেখল—না জানি ওর অদৃষ্টে কি আছে।

হেমন্ত পরের দিন চারুর মাকে হুকুম দিয়ে দিল, বেশ জোরে, সবাইকে শুনিয়েই—ঠাকুর যখন থাকবে না, সদর দরজায় ভেতর থেকে চাবি দিয়ে রাখতে। আর ঠাকুরকেও বলে দিল—সাধু আর সাধুর বৌয়ের ওপর যেন কড়া নজর রাখে।

দিনকতক শান্তিতেই কাটল। মনোরমাও তার অভ্যস্ত তেলের বাটি নিয়ে দেখা দিল আবার। হেমন্তও সম্ভবত অনুতপ্ত কুণ্ঠাতেই আর ও-প্রসঙ্গ তুলল না। সাধুরও স্বাস্থ্যের সে-অবনতিটা বন্ধ হয়েছে, সেটাও বোঝা গেল ঐ কদিনেই।

আট-দশদিন পরে সাধু একদিন ভোর-বেলা চোখের জল মোছার ভাব করতে করতে এসে জানাল, সে এই ভোরবেলা স্বপ্ন দেখেছে—ছোট ভাইটার খুব অসুখ। ভোরের স্বপন তো বলে সত্যিই হয়, তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। জ্যাঠাইমা যদি একটা দিনের ছুটি দেন তাকে—তাহলে সে একবার গিয়ে বাপ-মা-মরা ভাইটাকে একটিবার চোখের দেখা দেখে আসে!

হেমন্ত বলল, 'ছুটির কথা বলছ কেন বাবা! তুমি এখানে চাকরিও করো না, জেলখানাতেও নেই। সে-ক্ষেত্রেই ছুটির কথা ওঠে। তুমি নাবালকও নও। ইচ্ছে হলেই চলে যাবে। তবে আমার সাফ কথা, যদি আজই ফিরে না এসো, তাহলে আর এখানে আসার চেষ্টা করো না। আমি এক গাদা টাকা খরচ করে তোমার চিকিচ্ছে করাবো, দুবেলা দাঁড়িয়ে থেকে ঘড়ি ধরে পথ্যি খাওয়াবো—আর তুমি দুদিনের জন্যে সেখানে অখাদ্যি-কুখাদ্যি খেয়ে সবটা বরবাদ করে দেবে। বারে বারে এ-ধাষ্টামো আমি সহ্য করতে রাজী নই। যে মরবে আপনার দোষে কী করবে তার হরিহর দাসে! মরার ইচ্ছে থাকে স্বচ্ছন্দে মরোগে যাও, তবে তার মধ্যে আর আমাকে জড়িও না!'

সাধু তখন তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে প্রতিবাদ করল বটে কিন্তু না যাওয়ার কথা কিছু বলল না।

সে ভেবেছিল যে, এই কঠিন কথার পর সাধু যাওয়া স্থগিত রাখবে। ভাইয়ের শরীর কেমন আছে একখানা এক পয়সার পোস্টকার্ড লিখলেই জানা যায়। তার জন্য জন্য দেশে যাওয়ার কোন দরকার নেই, সেজন্যে যাচ্ছেও না। নিতান্ত মরণদশায় ধরেছে বলেই পতঙ্গের মতো মৃত্যু আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

কর্তব্যবোধে কথাটা মনোরমাকেও বলল একবার। মনোরমা মাথা নিচু করে মেঝেতে পায়ের নখ দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে জবাব দিল, 'কী জানি কি বুঝছে। আমিও তো তাই বলছিলুম—মিছিমিছি এত কান্ড করে হুড়তে-পুড়তে যাওয়ার কি দরকার। স্বপন তো কত কি দেখছে লোকে!'

অজয় আজ ২৭ রান তুলেছে, বোনকে সাইকেল ক'রে বেড়িয়ে এনেছে, বাড়ির পড়া তৈরী করেছে, আর এখন সে বেরিয়েছে মহানন্দে আম পাড়তে।

অজয়ের মা বলেনঃ

"ভাগ্যিস্ 'হরলিক্স' ছিল—'হরলিক্স' বাড়তি পুষ্টি দেয় বলেই না ও এমন চৌকশ ও চটপটে।"

'হরলিক্স' পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

ওর কথা বলার ধরনে আর নিরুদ্বেগ গলার আওয়াজেই বোঝা গেল যে, এ-যাওয়াতে ওর সায় আছে। কে জানে সব-সুদ্ধ চলে যাওয়ারই ভূমিকা কিনা। সাধুচরণ না ফিরলে জ্যাঠাইমা মনোরমাকে ও তাড়িয়ে দেবেন, অথবা ভালয় ভালয় পাঠিয়েই দেবেন।...

তাতে কোন আপত্তিও ছিল না—কিন্তু ঐ ছেলেটা। গৌরটা যে ওকে পেয়ে বসেছে। মনোরমাকে তাড়ালে ওকেও ছেড়ে দিতে হয়, তাতে তেমন রাজী নয় হেমন্ত।

।। ৬ ।।

সাধুচরণ সেদিন তো নয়ই, পরের দিনও এল না।

তারপরেও বেশ কয়েকদিন কেটে গেল, না এল মানুষটা, না এল তার কোন খবর। কিন্তু মনোরমা যেরকম নির্বিকার ও নিশ্চিন্ত—তাতে মনে হয় সাধু যে আর আসবে না, অন্তত এখন কিছুদিন আসবে না, সে তা বিলক্ষণ জানে।

হেমন্তও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করল না এ নিয়ে—মনোরমাকেও কিছু বলল না, যেন সাধুচরণ বলে কেউ এখানে ছিল না, থাকার কথাও নেই—এইভাবে চলতে লাগল। একবার ওর নামও উচ্চারণ করল না।

দিন সাত-আট পরে একদিন দুপুর নাগাদ—সাধুচরণ নয়—আর এক মূর্তি দেখা দিল।

সাধুর ভাই নিমাইচরণ।

বিস্মিত হেমন্ত 'কে' বা 'কী চাই' প্রশ্ন করার আগেই মনোরমা 'ওমা, এ যে ঠাকুরপো!' বলে ঘোমটা টেনে দিল এবং আগন্তুক ছেলেটি একেবারে ঠাকুর প্রণামের মতো হেমন্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ও জিভে ঠেকাল।

উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে। ঠিক হরি-চরণ বা সাধুচরণের ছাঁচে নয়—তবু চেহারা ও মুখের ধাঁচে ও-বংশের আদল আছে পুরোপুরি। বরং একে দেখে, আকারে-প্রকারে ছোটভাই শিবুর কথাও মনে পড়ে। তার মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল, উসকো-খুসকো রুক্ষ—এর সে জায়গায় তৈলসিক্ত বিপুল টেরি। আর বিড়ি খেয়ে খেয়ে এই বয়সেই ঠোঁট ও দাঁত কালো।

নিমাইচরণ অমায়িক হাসির সঙ্গে বললে, 'আমি নিমাইচরণ জ্যাঠাইমা, সাধু আমার দাদা, বললে বিশ্বাস যাবেন না—আপন বড় ভাই।'

হেমন্ত ততক্ষণে প্রাথমিক বিস্ময় সামলে নিয়েছে। নিরাসক্তভাবে জবাব দিলে 'অ, তা হবে।...তা এখানে কি মনে করে? আমি তো ডাকিনি!'

এ-নিরাসক্তি গায়ে মাখল না নিমাই-চরণ, আত্মীয়তার সুরে বলল, 'দাদা—মানে সেখানে গিয়ে খুব অত্যাচার চালাচ্ছে। পান্তাভাত, ডাল-চচ্চড়ি, তেলে-ভাজা, প্যাজের বড়া—যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। বলে কি, বলে মরব তো জানা কথাই, তাহলে আর জেলখানায় লপ্‌সি খেয়ে মরি কেন!...তার ফল যা হবার তাই হয়েছে—হাত-পা ফুলে ঢোল। কাল থেকে রক্তপাইখানা রক্তপেচ্ছাপ শুরু হয়েছে।'

আবারও সেই শীতল কঠিন কণ্ঠ শোনা গেল, 'ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই। এছাড়া কোন কাজের কথা থাকে যদি, বলে চলে যাও। আমার অনেক কাজ আছে। অকারণ ভ্যাজভ্যাজানি শোনার সময় নেই। বৌমাকে যদি নিয়ে যাওয়ার মতলব থাকে, স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই। তার যাবার ইচ্ছে থাকলেই চলে যেতে পারে।'

থতমত খেয়ে গেল নিমাইচরণ। আমতা আমতা করে মাথাটাথা চুলকে বলল, 'আপনি—মানে আপনি হুট্ করে ছেড়ে দিলেন কেন? কী রকম পাজী জানেন না? ওকে ছাড়াটাই ঠিক হয়নি আপনার!'

'ধরেই বা রাখব কেন? আমার কি গরজ? আমি এয়ে বেরে তাকে আনতেও যাইনি, সে থেকে আমার কোঠা-বালাখানাও তুলে দিচ্ছে না। নিজের ইচ্ছেতে এসেছে, নিজের ইচ্ছেতে চলে গেছে।...ব্যস্। ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে, আপদের শান্তি হয়েছে। আমি তোমাদের আত্মীয় বলে মানিও না, তার কথাও নেই। আমার অত টানও নেই, জোরও খাটাতে চাই না। এত কাণ্ড করবই বা কিসের জন্যে? নাকে কান্নায় ভুলে কদিন ঠাঁই দিয়েছিলুম, সেইটেই আমার অন্যায় হয়ে গেছে!'

জ্যাঠাইয়ের কথাবার্তার যেন থেই ধরতে পারে না নিমাইচরণ। হতাশার ভঙ্গীতেই বলে, 'এত করলেন আপনি, প্রাণটা বাঁচাতে পারলেন না!'

'যার প্রাণ সে যদি বাঁচাতে না চায়, অপরের এত মাথাব্যথা কি? ছেলেমানুষও নয়, নাবালকও নয়। যা করছে বুঝেই করছে নিশ্চয়। যাক গে, তুমি এখন একা ফিরবে, না তোমার বৌদিকে নিয়ে ফিরবে?'

তারপর নিমাইচরণের উত্তরের অপেক্ষা না করেই চারুর মাকে ডেকে বলল, 'একে একটু জল খেতে দে চারুর মা। রুটি-পরোটা যা হয় করে দিতে বল। ময়দা না থাকে গোলার আটা আছে, তাতেই করতে বলে দে। ভাত খেতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করে নিস। আর বৌমাকে এখানে আসতে বল।'

মনোরমা সামনে এসে নতমুখী হয়ে দাঁড়াতে বলল, 'সব শুনেছ তো?...এই জন্যেই তো পাঠিয়েছিলে! বিধবা হবার এত শখ—তা সেটার ব্যবস্থা তো শুনছি প্রায় হয়ে এসেছে। তা সে যাক গে, এখন যদি লোকদেখানো একবার যেতে চাও, অনায়াসে চলে যেতে পারো। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে আবার চলে আসতে চাও, চলে এসো। কিন্তু এখানে যদি থাকতে হয়—এই শেষ যাওয়া, আর কখনই যাওয়া চলবে না। গেলে একেবারে যেতে হবে।...আর ছেলেকে নিয়েও যাওয়া চলবে না। সে গেলেও চিরকালের মতো যাওয়া—এ-দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলের ভার যদি আমাকে নিতে হয়, ঐ অস্বাস্থ্য আর কুশিক্ষার মধ্যে আমি ওকে যেতে দেবো না। ওখানের মূলসুদ্ধ উপড়ে না আনলে এখানে বাঁচাতে, বড় করতে পারব না।...দ্যাখো, যা ভাল মনে করো, বুঝে দেখে ঠিক করো।'

আর সেখানে দাঁড়াল না হেমন্ত। ভেতরে নিজের ঘরে চলে গেল ওদের কথাবার্তা ও পরামর্শের সুযোগ দিয়ে।

কিছুক্ষণ গুজ-গুজ করে নিমাইচরণের সঙ্গে কি পরামর্শ হল, তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে নিমাইচরণ ঘরের মধ্যে ঢুকল।

'তাহলে ঐ আপনার কথাই রইল জ্যাঠাইমা। শুধু বৌদিকেই নিয়ে যাচ্ছি আমি। বলতে গেলে দাদার শেষ সময় তো—ওর একবার যাওয়া দরকার। গৌর এখানে থাক। যদি ভগবান নিয়েই নেন দাদাকে, তাহলে কাজকর্ম চুকে গেলে আবার বৌদিকে এনে আপনার পায়ে ফেলে দোব, আর—আশা নেই-ই অবিশ্যি, যদি একটু ভালর দিকে যায়ই—তাহলে তো দু-চার দিনের মধ্যেই এসে যাচ্ছি। বাস্তবিক, আপনি যা করলেন—! ছেলেটা যদি মানুষ হয়, আপনার কাছে থাকলেই হবে। আর তো কেউই হল না মানুষ। আমাদের ওখানে যারা থাকবে তারা এমনি আমাদের মতো বাঁদরই তৈরী হবে এক-একটি। দাদার এধারে ভাগ্যটা ভালই ছিল, ঠিক জায়গায় এসে পড়েছিল কিন্তু সুখভোগ করার বরাত আলাদা। নইলে এমন দুর্বুদ্ধিই বা হবে কেন!

এই বলে আবারও হাঁটু গেড়ে বসে, ভক্তিভরে ওকে প্রণাম করল নিমাইচরণ।

হেমন্ত হাসল একটু। আর যাই হোক—নেশাখোর বখাটে ঠিকই, নির্বোধ নয় ছেলেটা। সম্ভবত ও-ই এতক্ষণ ধরে বলে বুঝিয়ে রাজী করিয়েছে গৌরকে রেখে যাওয়ার প্রস্তাবে। আখেরটা নিজে বুঝেছে, বৌদিকেও বুঝিয়েছে। নইলে মনোরমার এই কঠিন সর্তে রাজী হবার কথা নয়।

তখনই ভাত খেয়ে নিয়ে ওরা দুজনে রওনা হয়ে গেল।

চিঠি এল দিন কয়েক পরেই।

একখানা নয়, দুখানা।

একটি লিখেছে নিমাইচরণ, সম্ভবত নিজেই লিখেছে, কারণ হাতের লেখা দুষ্পাঠ্য—হরফ পড়াও যায় না সব—এত আঁকাবাঁকা আর বানানগুলি প্রায় দুর্বোধ্য।

তাতে শুধু সাধুচরণের মৃত্যু সংবাদটুকু দেওয়া হয়েছে। ওরা গিয়ে পৌঁছবার আগেই শ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, হুঁশও ছিল না। ওরা যাওয়ার দুঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেছে। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলেই বৌদিকে নিয়ে সে চলে আসবে। পরম পূজনীয়া জ্যাঠাইমার শ্রীচরণ দর্শনের জন্যে তাদের উভয়ের প্রাণই ব্যাকুল হয়েছে...ইত্যাদি।

দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছেন হেমন্তর মেজজা।

মানে, তাঁর জবানীতেই লেখা, সম্ভবত পাড়ার কোন ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে লিখিয়েছেন, হাতের লেখা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং বানান ভুলও কম।

তিনি প্রথমেই ডাইনী পিশাচী রাক্ষসী প্রভৃতি প্রীতিবর্ধক ও শ্রুতিসুখকর সম্বোধন জানিয়ে লিখছেন : 'পরে লিখি, এখনও কি এ-বংশের রক্তভক্ষণ করিয়া তোমার সাধ মেটে নাই? তুমি কি সেই সাতশো রাক্ষসীর ঝাড় হইতে আসিয়াছ, তোমার শ্বশুরের বংশের এই ভিটাকে শ্মশান না করিয়া ছাড়িবে না? আরও কত জোয়ান ছেলের রক্ত খাইতে চাও তুমি? আরও কতগুলি মানুষ খাইলে তোমার ক্ষুধা মেটে? এখনও বড় ক্ষুধা তাই বুঝি আর একটাকে জীয়াইয়া রাখিয়াছ জিওল মাছের মতো?...ছিঃ! অতিবড় পাষাণ হৃদয়ও কোন মানুষের মৃত্যুকালে তাহার একমাত্র পুত্রকে দূরে সরাইয়া রাখে না।...আহা, বাছার প্রাণটা বুঝি ঐটুকু আশাতেই, একবার ছেলের মুখটা দেখিবে বলিয়া কোনমতে কণ্ঠনালীর কাছে ধুক ধুক করিতেছিল। না জানি বাছা আমার কি গভীর দুঃখ লইয়াই প্রাণত্যাগ করিল! কেন একবার শেষ দেখাটুকু দেখিতে দিতেও এত কি আপত্তি হইল তোমার? তোমার মুখের গ্রাস তো আর কেহ কাড়িয়া লইতেছিল না!' ইত্যাদি ইত্যাদি—

এসব ভাষা যার হেমন্তকে আঘাত করে না।

সামনে বললেও না, চিঠিতে লিখলেও না। সে পড়ে হেসে, চিঠিটা একপাশে ফেলে দেয়, চারুর মাকে বলে, 'কুড়িয়ে রেখে দে, কাল আমার গৌরের দুধ গরম করতে লাগবে!'

তারপর গৌরকে বুকে তুলে নাচাতে নাচাতে বলে, 'কী রে ছোঁড়া, তোকে নাকি আমি জীইয়ে রেখেছি—পরে খাবো বলে? কি বলিস তুই, সত্যি? বল না! আ খেলে যা, দেখছিস এসব কত কি শক্ত শক্ত কথা হচ্ছে, ছোঁড়া হেসেই গেল। বড় মজা পেয়ে গেছ না, বড্ড আদর! আবার নাচন হচ্ছে আমার বুকের ওপর। এটা তোমার নাচার জায়গা? এ কি পাথরের দেহ পেয়েছ?... অবিশ্যি তোর আর এক দিদা তাই বলেছে।...নে, নাম ঢের হয়েছে।'

বলে, কিন্তু নামাতে পারে না, উল্টে বুকে চেপে ধরে অজস্র চুমো খায় ছেলেটাকে।

আরও দিন বারো তেরো পরে নিমাই-চরণ ও মনোরমা ফিরে এল।

যতই রাগ থাক মনোরমার ওপর, ঐটুকু মেয়ের বিধবার বেশ দেখে চোখ ফেটে জল এসে গেল হেমন্তর। নিমাইয়ের মাথা কামানো, সম্ভবত সেই শ্রাদ্ধ করেছে দাদার।

'এই এনে দিলুম জ্যাঠাইমা তোমার বৌকে। আর এই আমিও। আজ থেকে আমাকেও তোমার সন্তান বলে জেনো। মারো কাটো ফাঁসি দাও, লাথি মারো—একটি টুঁ শব্দ করব না। সে ছেলে আমি নই। তোমার কোন হুকুমে যদি কোনদিন অবমানি্য যাই তো আমার এই জিব তুমি নিজে হাতে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ছিঁড়ে দিও, আমার নামে কুকুর পুষো।'

উদ্গত অশ্রু অতিকষ্টে সংযত করে রুদ্ধ গাঢ়কণ্ঠে হেমন্ত বলে 'না বাবা, ঢের হয়েছে। আর সন্তানে কাজ নেই আমার। এমনিতেই রাক্ষসী, ডাইনী পিশাচী শুনতে শুনতে কান পচে গেল, আবার কচকগুলোকে জড়িয়ে নিমিত্তের ভাগী হতে চাই নে।...আর, এই বলছি, সত্যিই যদি তোমাদের ধারণা হয়ে থাকে যে আমি বসে বসে শ্বশুরকুলের সব ছেলে খাচ্ছি, তাহলে এখনও সময় আছে, গৌরকে নিয়ে চলে যাও। যা হবার—দেশে গিয়ে হোক—আমি আর দুর্নামের ভাগী হতে চাই না।'

নিমাইচরণ যেন নিমেষে জ্বলে উঠল।

'ঐ মেজ জ্যাঠাইমাটা লিখেছে বুঝি! কী এক চিঠি লেখাচ্ছিল বটে, আমি দেখিচি।হিংসে, হিংসে—রীষ; বুঝলে? ও আর কিছু নয়—লঙ্কাবাটার মতো জ্বলছে সব বুকে রীষের জ্বালা।...ঐ যে যাওয়া মাত্তর শুনেছে খোকাকে তুমি ছাড়নি, ওখেনে গেলে শরীর খারাপ হবে বলে ধরে রেখেছ—অমনি মাথা ঘুরে গেছে সবাইকার। বলে, তবে ওতো পুষ্যি নিয়ে নিলে ছেলে করে নিলে ওটাকে। যথাসর্বস্ব যা কিছু আছে—পয়সা কড়ি—সব তো তাহলে ও পাবে।...ব্যস, আর যায় কোথা, ঘরে ঘরে কপাল চাপড়ানি শুরু হয়ে গেল। বলে কি, আমাদের ঘরে সব এমন চাঁদপানা ছেলে থাকতে কী দেখে ঐ কালো ভূতকে পছন্দ করলে! আমার বলে কি, আমাদের নাতিগুলোকে বল গিয়ে একবার দেখিয়ে আসি, যদি কাউকে চোখে লাগে।...বুঝলে এবার রীষের জ্বালাটা কী প্রকার!'

তারপর চিঠির বয়ানটা সব শুনে বললে 'ইঃ রে! দেখবার জন্যেই প্রাণ ধুক ধুক করছিল!...হুঁশজ্ঞান ছিল কিনা দাদার। আমরা যাখন গিয়ে পৌঁছলুম তাখন কি কিছু বোঝার মতো অবস্থা ছিল নাকি দাদার? এই যে আমরা গেছি—তাই কি টের পেয়ে গেল, না চোখই খুলল একবার। তাখনই তো হয়ে এয়েচে। তারপর যতটুকু বেঁচে ছিল সে তো নামে মাত্তর।...তার আগেও তো শুনলুম যা, মাথাটায় গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, ঘোলাঘোলা বুঝছিল সব।...ও তুমি ওসব ছেঁদো কথায় কান দিও না জ্যাঠাইমা। তুমি যদি একটা ছত্তরও জবাব দাও, তাহলেই হুড় হুড় করে এসে পড়বে সব—দলকে দল!'

হেমন্ত আর কথা বাড়াল না।

এসব নোংরা কথা আলোচনা করার মতো অবস্থা নয় তার। ঐ যে থান-পরা শুধু-হাত সাশ্রুনতমুখী মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে—ও যেন তারই দুর্ভাগ্য নতুন করে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছে—নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। একই দুর্ভাগ্য, একই ইতিহাস মনে হচ্ছে। ওর ঐ ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়া চোখের জলে নিজেরই সেই এক বিগত দিনের অসহায় অবস্থা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সে দুহাত বাড়িয়ে মনোরমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার কাঁধে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে উঠল।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চানন রায়

(৬)
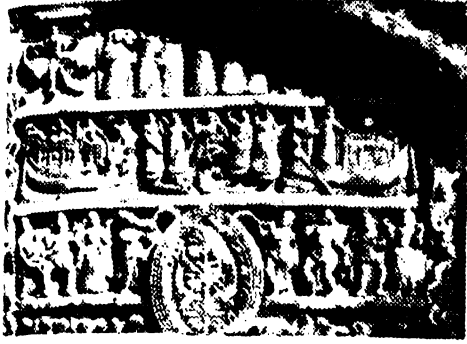
বাঙলার মন্দিরে দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি বর্তমান একথা আগের লেখাগুলিতে উল্লেখ করেছি। কিন্তু বেশীরভাগ মন্দিরেই একতলায় ঠাকুর থাকেন দেখা যায়। সেক্ষেত্রে দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতির মন্দিরের শোভাবর্ধন করা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন থাকে না। তাছাড়া অনেক মন্দিরেই দ্বিতল বা ত্রিতলে ওঠবার কোন সিঁড়ি দেখা যায় না। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির কথা অবশ্য আলাদা, সেখানকার প্রায় সব মন্দিরেই ওঠবার সিঁড়ি আছে। বর্তমানে ওখানকার মন্দিরগুলির প্রায় সবই দেবতাবিহীন কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় দ্বিতলগুলিতেও দেবতা থাকতেন, অবশ্য সম্ভবতঃ কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এঁদের নীচেরতলা থেকে ওপরের তলায় নিয়ে আসা হত। বিগ্রহের সংখ্যা বেশী হলে অবশ্য মন্দিরের একতলায় যেখানে স্থান সংকুলান হত না সেখানে অন্যান্য দেবতাকে দোতলায় বা কোন কোন ক্ষেত্রে তিনতলায় না এনে উপায় থাকত না। অনেক মন্দিরে আবার দ্বিতলের বা ত্রিতলের কোন গুপ্ত কক্ষ থাকত, কোন হাঙ্গামা বা বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে বিগ্রহরক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে বিগ্রহগুলিকে এসব গুপ্তকক্ষে রাখার ব্যবস্থা করা হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কালনার (বর্ধমান জেলা) লালজীর মন্দিরের নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরটির দোতলার কাছে একটি গুপ্তকক্ষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। এ মন্দিরে এখনও অনেকগুলি বিগ্রহ রোজ পূজিত হচ্ছেন। সম্ভবতঃ বর্গীর হাঙ্গামা থেকে এসব বিগ্রহগুলিকে রক্ষার জন্যে এ গুপ্তকক্ষ তৈরী হয়েছিল। কালনার লালজীর মন্দিরটির পঁচিশটি চূড়ো থাকলেও নিয়মানুযায়ী এর সাতটি তল যে নেই একথা আগের একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি।

ভুরশিট রাজবংশের রাজা প্রতাপনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত গড়ভবানীপুরের ভগ্ন আলপোছচূড়ো মন্দিরটি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সন ১২০৯ সালের ৪৮০৭৫ নং তায়দাদ থেকে জানা যায় এ মন্দিরের প্রধান দেবতা ছিলেন গোপীনাথ জীউ। এই তায়দাদে মন্দিরের নক্সা ও ঠাকুরদের উপরকক্ষের বর্ণনা আছে। এ বর্ণনানুসারে জানা যায় প্রথম তলে বা নীচের তলে চতুর্ভুজ গণেশ, দ্বিভুজা ইন্দ্রাণী; দ্বিভুজা অভয়া, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দশভুজা; দ্বিভুজা ভৈরবী, চতুর্ভুজা ভুবনেশ্বরী ও চতুর্ভুজা গজলক্ষ্মী থাকতেন। দ্বিতলে থাকতেন গঙ্গাধর শিব, গোপাল; গোপীনাথ, দামোদর (চক্র); রাধিকা ও কাশীনাথ শিব এখন ঐ বিগ্রহগুলি পাঁড়ুয়াগড়ের চণ্ডীমণ্ডপের একটি কক্ষে আছেন। ঐ স্থানের প্রধান শালগ্রাম শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ। ওখানে প্রশান্তিপাথরের দ্বাদশান্তিকের মতো একটি ধাতুময়ী মূর্তিরও পূজা হয়। বিগ্রহগণের মাঝখানে যে দশভূজা আছেন তার বর্ণনা হলঃ "এই দুর্গাপ্রতিমা অষ্টমাতৃকায় পরিবেষ্টিতা এবং দেবীর দক্ষিণপার্শ্বে গণেশ ও অধে লক্ষ্মী, বামোর্ধে কার্তিকেয় ও অধে সরস্বতী বিদ্যমান।"১

রাজা প্রতাপনারায়ণ ভূরিশিটের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। বিখ্যাত টীকাকার ভরত মল্লিক ছিলেন তাঁর সভাপণ্ডিত। কর্ণগড়ের রাজা লক্ষ্মণ সিংহ তাঁর ভাই শ্যাম সিংহের দ্বারা নিহত হলে তাঁর তিনজন প্রপৌত্র ছুট্টু রায়, রঘুনাথ রায় ও দুর্গাদাস রায় রাজা প্রতাপনারায়ণের আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর প্রভাবে পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধার করেন।২ ভারতচন্দ্রও রাজা প্রতাপনারায়ণের উল্লেখ করেছেন। ১৫৮৪ শকে বা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে রচিত রামদাস আদকের "অনাদি মঙ্গলে" 'রাজা রায় প্রতাপনারায়ণে'র উল্লেখ আছে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মেদিনীপুর-কেশপুর-চন্দ্রকোণা পথের নেড়া দেউল নামক গ্রামে একটি দিঘীর ধারে পথের পাশে দেউল শ্রেণীর একটি মন্দির আছে। এটির ওপরে আমলক না থাকায় একে নেড়া দেউল বলে। এটি বাঙলা ও উড়িষ্যার সীমা নির্দেশক। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এই পথে পুরীধাম গিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে আছে 'বাংলার সীমা নেড়া দেউল দেখিয়া'।

বর্তমান বাংলাদেশে (লুপ্ত পূর্ব পাকিস্তান) যে সকল স্থানে দোচালা মন্দির আছে তাদের সম্পর্কে মন্দিরপ্রেমী স্বর্গত

১। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও বাণীকুমার রচিত 'রায়বাঘিনী,' নতুন সংস্করণ; ১৩৬৪ পৃষ্ঠা ৪১৮

ঘাটালের চারচালা সিংহবাহিনী মন্দিরের লিপি। এতে বংশাব্দ ও মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা জিতারাম কর্মকারের নাম আছে। মন্দিরটি ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

লেখক কর্তৃক মেদিনীপুর জেলার একটি মন্দিরের লিপি উদ্ধারকার্য।

অধ্যাপক ডেভিড ম্যাককাচ্চ একটি চিঠিতে বর্তমান লেখককে জানিয়েছিলেন (চিঠিটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে) :

'Do-Chala temples are rare in West Bengal, commoner in East Pakistan (e.g Bardhankuti in Rangpur, Puthia in Rajsahi, Hati Kumrul and Handial in Pabna, Naldanga and Lohagora in Jessore etc.) In West Bengal the best are at Baranagar, in Murshidabad (charbangla-mandir and Panchanan Shibmandir): the biggest is at Debgram in West Dinajpur. Most of the others I have seen are very plain, like the one at Rampur. e.g at Amadpur in Burdwan district, Ganpur in Birbhum district, and others I can't remember off-hand. I found the ruin of one at Sribati near Katwa in Burdwan, and only three days ago in Murshidabad district at Pachaupara on the road from Jangipur to Sagardighi, I was looking at another ruined one—27.1.70.'

কেম্ব্রিজের এম-এ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক মন্দিরপ্রেমী ডেভিড ম্যাককাচ্চন আজ আর ইহলোকে নেই। গত ১২-১-৭২ তারিখে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে এই সুধীগবেষকের প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে। লেখকের সঙ্গে তিনি যেভাবে বাংলাদেশের পথেপ্রান্তরে মন্দিরের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন ও নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা তুলনাহীন। আজ এই মুহূর্তে সেই নিরলস বিদেশী যুবকটির কথা মনে পড়ছে যার বয়স হয়েছিল মাত্র ৪১ বৎসর যিনি লেখকের বাড়ীতে এসে নিজের ঘরের ছেলের মতো থেকে গিয়েছেন অনেকদিন। সেই সুধী যুবক বন্ধুটির উদ্দেশ্যে আজ জানাই অন্তরের প্রাণঢালা ভালবাসা ও শুভকামনা করি তার স্বর্গত আত্মার।

মন্দিরশিল্পে ক্রমবিকাশ ঘটেছিল কিনা, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। বাংলাদেশে নিজস্ব, মিশ্র ও বৈদেশিক রীতির মন্দিরসমূহের যে তারিখ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, উৎকলীয় দেউল মন্দির এদেশে সকলের চেয়ে পুরাতন। দোচালা মন্দিরের প্রথম আবির্ভাবের কোন তারিখ আজও পাওয়া যায় নি, তাই চারচালা মন্দির যে এরই ক্রমপরিণতি একথাও বলা যায় না। সকলের থেকে পুরোনো তারিখ আটচালা মন্দিরেই পাওয়া যাচ্ছে। এটি হল চোদ্দশ শকাব্দের। আবার কান্তনগরের নবরত্ন মন্দিরও ঐ শতকে নির্মিত। এ থেকে অনুমান হয় একই সময়ে সকল শ্রেণীর মন্দিরই পরিকল্পিত হয়ে থাকতে পারে। চাঁদনী মন্দিরে চূড়া সংযোজন করে মিশ্র মন্দিরগুলি হয়েছে। এগুলি চালামন্দির নয়। এদেশে মন্দিরের বয়স হাজার বছরের বেশী হবে না বলে মনে হয়। উড়িষ্যার সকলের থেকে পুরানো মন্দিরের বয়স তেরোশ বছরের কিছু উপরে হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দির সম্পর্কে আজ ব্যাপকতর গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এও প্রয়োজন মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির কাজগুলিকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করার। বর্ধমান জেলার কালনা শহরে পোড়ামাটির কাজ করা কয়েকটি উৎকৃষ্ট মন্দিরের কিছু কিছু পোড়ামাটির মূর্তি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের লিপিগুলিও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাঙলার মন্দির-মসজিদ তার গৌরব এর মধ্য দিয়ে সেকেলের বাঙালীর মানসিক বিকাশের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। নানা শ্রেণীর মন্দির পরিকল্পনার মধ্যে সেযুগের বাঙালী মন্দিরশিল্পীরা একদিকে যেমন তাঁদের বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন অন্যদিকে অত্যুৎকৃষ্ট কলানৈপুণ্যেরও পরিচয় রেখে গেছেন। এঁদের বংশধারা আজ একপ্রকার নিশ্চিহ্ন। পোড়ামাটির কারুশিল্পও আজ এদেশ থেকে অন্তর্হিত। বাঙলার এই শিল্প যে একদা এক বিরাট বিপ্লব এনেছিল, সে শিল্প বাঙলার আজ আর কোথাও দেখা যাবে না। বাঙালীর এটাকে একটা বিরাট দুর্ভাগ্য বলা চলে।

২। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও বাণীকুমার রচিত 'রায়বাঘিনী', নতুন সংস্করণ,১৩৬৪ পৃষ্ঠা ৪১৭

ওই ঘড়িটার জন্যে কারো কারো হয়তো কষ্ট হয়। রাগও হয় কারো। যদের হাতে ঘড়ি থাকে, বড় ঘড়ি তাদের কোন উপকারে লাগে না। তা-ও কি জোর করে বলা যায়? হাতের ছোট ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেলে বড় ঘড়ির মহানুভবতার আশ্রয় তো নিতেই হয়। খারাপ থাকলে তখনকার মতো সময় মাটি, মন মাটি। তাই রাগ তো হতেই পারে। ঘড়ি যাদের নেই তাদের অনেকের সময়ের খোঁজে দরকার থাকে না। তবু মানুষ তো বটে! জ্ঞান-গম্মি থাকলেই সময়জ্ঞান হয়। সময়ের সংধানে দিনে অন্তত একবার অস্থির হতেই হয়। তখন যদি পোড়ার ঘড়ি দম বন্ধ করে মজা দেখায়, কার না দুঃখ হয়? কারো দুঃখ, কারো রাগ—এই নিয়ে চৌরঙ্গী রোডের, না, জওহরলাল নেহরু রোড এখন, তাহলে দাঁড়ালো জওহরলাল নেহরু রোডের বড় ঘড়িটা বছরে একশ' দিন যদি সময় জ্ঞাপন করে তো বাকি দুশো প'য়ষট্টি দিন কুপোকাৎ। ঘড়িটাই আসল, সময় চেনাই সার কথা। তবে কিনা এখন আর ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। উল্টো দিকে শহীদ মীনার। গ্রীষ্মকালে বিকেল পাঁচটা থেকে আর শীতকালে অপরাহ্ন তিনটে থেকে মস্ত শহর হয়। এই কলকাতায় এত লোকও থাকতে পারে! বাপস্ রে বাপ্। হরির নাম খাব্লা খাব্লা। এখানে এক খাব্লা, ওখানে এক খাব্লা। ময়দানের ঘাসে সেন্ট থেকে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে কি শোনে কে জানে? মুখস্থ ধরলে একটা লাইনও বলতে পারবে না। শুধু কি এই—একদিকে বিহারী রামায়ণ পাঠ। আরেক দিকে কানের ময়লা তোলা আল্লার নামে ব্যবসাদার। মাজন বিক্রি এদেশে আগের তুলনায় কত বেড়ে গেছে তা টের পাওয়া যায় আরেক কোণ থেকে। আবার কেউ কেউ ম্যাজিক দেখায়। দেখায় তো?

সবই ম্যাজিক। দেখালেও ম্যাজিক। না দেখালেও ম্যাজিক। বিকেল হয় হয়। দোতলা বাস, একতলা বাস, লম্বা ট্রাম সবই একটা বিশাল জনতার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ওরা আপিসের কাজ সাংগ করে ফেরে। আর অন্য দিকে বেকার-সাকার সকলেই, সংগে ময়দানে যারা বেড়াতে আসে সব দাঁড়িয়ে পড়ে গোল হয়ে।

লেডিজ এ্যান্ড জেন্টলম্যান—তোমরা সকলে তফাতে দাঁড়াও, আমি একটা খেলা দেখাবো। খেলা দেখাতে দু' মিনিটও লাগবে না। যা টাইম যাবে তোড়জোড়ে। তফাত যেতে তোমরা যত গড়িমসি করবে, আসল খেলায় তত দেরি হবে। ওই দ্যাখো, খোকন কেমন বলামাত্তর পেছন দিকে চলে গেছে। গুড খোকন। বড়দের কথা মানতে হয়। এই যে—এই নীল ফ্রক মেয়ে—দাঁড়িয়ে দেখছো কি? সরতে পারছো না? হাটো—পিছু হাটো। আরে! এ যে কথাই শোনে না? আবার হাসে দাঁত বার করে? বাঃ ভাবছো মজা করছি, তাই না? দেখবে? এই দ্যাখো, তুললাম লাঠি। ফটাস্ মাটিতে মারলাম। মাটিতে লাগলো। এই রকম তোমারও লাগবে। হুঁ বাব্বা—লাঠির ভয় সবাই পায়। সেই সবা সরলে তো? মিষ্টি মুখে কাজ চলে না আজকাল। কাইন্ডলি দাদা—প্লিজ—দাঁড়ি তো বেশ লম্বা করেছেন। তবে কিনা, বুদ্ধিতে খোকনের চেয়েও হাল্কা। দয়া করে স্লাইট পেছনে যান আরো। হল্লা এসে গেলে খেলা দেখাতে পারবো না। মালপত্তর তুলে টেঁসে দৌড় মারতে হবে। ধরাও পড়তে পারি। ফাইন, দশ টাকা বা বেশি।

ভেরি গুড। ওই পজিসনে দাঁড়িয়ে থাকবেন সকলে। নড়বেন না। খবরদার। এই রে! মেয়ের বুঝি ধুলো গেছে চোখে। আরে আরে—অমনি করলে চোখের বালি সরে কখনও। যাক্ গে—আমার কি? যা খুশি করো।

হাঁ—এবার দেখুন। আবার বাঁ পাশে আপনারা। ডান পাশে আপনারা। সামনেও আপনারা। যেদিকেই যাবো, সেদিকেই ভালবাসা। পেয়ারের জনসাধারণ। থুড়ি। জনগণ। আমার পেছনে মনুমেন্ট। আপনাদের অবশ্য সামনে। ওই মনুমেন্টের তলা থেকে 'জনগণ' কথাটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি। ভারি সুন্দর কথা, তাই না? এই যে দাদু—ও দাদু—,ভাবছেন কি অত? ছেলে তাড়িয়ে দিয়েছে? বাঃ! এটা বুঝি হাসির কথা হ'ল? সবাই হাসলেন কেন? দাদু কত কষ্টে ছেলেকে মানুষ করেছে। সখ করে ছেলের জন্য বউ এনে দিয়েছে। ভেরি সরি। ছেলে লাভ করে বিয়ে করে নি তো দাদু? আচ্ছা! কথায় কথায় আপনারা এত হাসেন কেন বলুন তো? এই দ্যাখো—দাদু-ও হাসে। মনের হাসি তো? না, সকলে হাসছে বলে লজ্জা ঢাকছেন? না না। কিন্তু মনে করবেন না। আই সে দি বং। আপনারা আমার ইংরেজী কথা শুনে মজা পাচ্ছেন। বাট রিয়ালি,

মানে সত্যি সত্যি আমি ইংরেজী জানি। আই নো ইংলিশ।

নাউ লেডিজ এ্যান্ড জেন্টলম্যান—আমার কোন যন্ত্রপাতি নেই। ঘোড়া নেই। বাঘ হাতী কিছুই নেই। আছে কেবল একটা পুঁটলি। ভেতরে,—না। ভেতরে কি আছে এক্ষুনি। লিক আউট করবো না। আস্তে আস্তে তা আপনারা দেখতে পাবেন। আমিই দেখাবো।

একি! ও ডান পাশের সুট বাবু! চলে যাচ্ছেন কেন? দেখলেন তো, আপনি সটকাচ্ছেন তো সঙ্গে আরও পাঁচজন কেটে যাচ্ছে। দাঁড়ান দাঁড়ান। খেলা দেখে যান। আই সি—বোধহয় দেরি করে ফেলছি, তাই না? অল রাইট। এবার শুরু।

আমার নাম হরিশচন্দ্র। আগে ছিলো উইলিয়ম গোমেশ। মাঝখানে একবার হয়েছিলাম লালা দেশমুখ। যাক্ গে, পাস্ট ইজ পাস্ট। এ্যাট প্রেজেন্ট আই এ্যাম হরিশচন্দ্র। হরিশচন্দ্র নাথ।

বরাবরই চেঁচিয়ে কথা বলি। ছোট বেলায় ছিলাম, ভালো গাইতে পারতাম। বয়েস বাড়তেই চটে গেলাম গানের ওপর। ধরলাম খেলা। খেলা মানে ম্যাজিক। এঁনি ওয়ে, আত্মজীবনী শোনাতে চাই না। দেখুন—এই যে—ভালো করে দেখুন। এই পুঁটুলিটা আমি আপনাদের মাঝখানে রাখবো। তারপর সরে যাবো পেছনে। এখান থেকে যেই হাততালি লাগাবো, পুঁটুলিটা ফেটে প্রথমবার বেরোবে রাশি রাশি টুকরো কাগজ। কাগজে লেখা থাকবে 'আপ' আর 'ডাউন।' যে আপ কাগজ পাবে সে আপ। যে 'ডাউন' কাগজ পাবে সে ডাউন।

বুঝতেই পারছেন জনগণ—কি সাংঘাতিক খেলা আমি দেখাতে চলেছি। কিন্তু খুব সাবধান। কেউ পুঁটলি টাচ করবেন না। তাহলে সব কাগজ উড়ে গায়ে লেপ্টে যাবে। ছাড়াতে হলে যেতে হবে হসপিটালে। চামড়া কেটে তবে রেহাই।

কি খুকু! হাঁ হয়ে গেলে যে? তোমার আর দোষ কি? ওই দ্যাখো, তোমার বাবার চোখ ছানা হয়ে গেছে। হ্যালো ইয়ংম্যান—হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে বলছি। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটি কি হয়? এত লোকের মাঝখানে অমনি করে দাঁড়াতে আছে? ছিঃ! খেলা শেষ হোক। গঙ্গার ধারে নিয়ে যা খুশি কোরো। ডোন্ট মাইন্ড। আমি ভীষণ স্পষ্টবাদী। সাফ সাফ বলবো, তাতে মার খাই সে ভি আচ্ছা। অত হেসো না খোকা। পেটে পেইন হবে। একটা ছোট গল্প বলি শুনুন। একদম ছোট্ট। এক মিনিটও লাগবে না। তারপরই অসলি খেল শুরু হবে। যে চলে যাবে, সে পস্তাবে। আমার কি? প্লিজ ব্রাদার—বাদামের খোলা ওখানে ফেলবেন না। এ খেলা হচ্ছে একরকম সাধনা। যেখানে খেলবো, সেখানটা পথ-পরিষ্কার থাকা চাই। পবিত্র না হলে ঠিকমতো খুলবে না কিছু। ভগবান মানেন তো? না মানার চান্সই বেশি এটা তো অবিশ্বাসের যুগ! আরে মশায়, ভগবান না মানলে লোকে একটা কিছু তো মানে? আপনারা মানেন কলা। ডোন্ট মাইন্ড। আগেই বলেছি, আমি একটু স্পষ্টবাদী। কি বললেন? জোরে বলুন। ও! গল্প শুনতে চান না। বেশ। খেলাই দেখাচ্ছি। এই যে, পুঁটুলিটা দেখছেন, দেখছেন তো সকলে? আরো তুলছি ওপরে। সকলে দেখছেন তো? খোকা-খুকু মা-মাসি দাদা-বউদি সকলে দেখুন। ভয় পাবেন না কেউ। আমি এটাকে ছুঁড়ে ঠিক আপনাদের মাঝখানে বসিয়ে দোব। তারপর মারবো হাততালি। চটাচট কাগজ বেরোবে। আপ আর ডাউন। ডাউন আর আপ। তাহলে গল্পটা কিন্তু আর বলা হলো না। আপনারা মানা করছেন। এই ওয়ান—এই টু—আর বলা হলো না। আপনারা মানা করছেন। এই ওয়ান—এই টু—এই থ্রি থ্রি থ্রি থ্রি—থ্রি। যা পলাছি উড় যা। দেখুন ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চারা! ঠিক আপনাদের মাঝখানে পড়েছে তো?

এবারে যে যেমন বসে আছেন, উঁহু—উঁহু, ঠেলাঠেলি করবেন না। চুপচাপ যে যেমন পজিসনে আছেন সেভাবে দাঁড়ান। হেই ছোকরা? ছুটোছুটি করছিস কেন? অ্যাঁ!

এবার একটি নিবেদন আছে। আমি শ্রীহরিশচন্দ্র। সবই দান করে দিয়েছি। নিজের বলতে কিছুই নেই। পেটটাই সম্বল। খিদে সইতে পারি না। খেলা আমি দেখাবোই। যেমন কথা তেমন কাজ। তবে তার আগে দয়ালু জনগণ—আমার হাতে কিছু কিছু দিন। যার যা দেওয়ার পুঁটলির কাছে ফেলুন। আমি টাইমমত কুড়িয়ে নোব।

কে বললেন কথাটা? কে বললেন? আগে খেলা দেখাতে হবে? না। তা হবার জো নেই। যে খেলার যা নিয়ম। আগে মাল ছাড়তে হয়। রেলগাড়িতে তো না চড়ার আগেই পয়সাটা চুকিয়ে দেন দাদা। এটাও প্রায় সেই রকম। আপনারা কে 'আপ' মার্কা আর কে 'ডাউন' মার্কা তা এক্ষুনি জানতে পেরে যাবেন। ডাউন হলে পয়সা না দিয়ে ভাগবেন, সেটি আর হবে টিচ্ না। অনেক ঠকেছি। তবে সত্যি বলছি—মা কালীর দিব্যি—কারুকে সজ্ঞানে ঠকাই নি। যদি কেউ বলে ঠকেছি, তবে সেই ধরুক। আমি নির্দোষ।

বাঃ! বাঃ! ভেরি ফাইন। এই দেখুন সোনার ছেলে খোকন টিফিনের পয়সা থেকে পাঁচ পয়সা ছুঁড়ে দিলো। আপনারা ওকে ফলো করুন। খোকনের গুড লাক আপনাদেরও। কুইক দাদারা। দাদু, খেলা দেখাবো এবার।

বারে বাহু! বারে বাহু! এই তো পড়ছে—এই তো! দারুণ জমবে খেলা।

এখন যদি অনুমতি করেন তো পয়সা গুলো কুড়িয়ে নি। কি—! আপত্তি নেই তো? এই নিলাম কুড়িয়ে। বলেছি তো ক্ষিদে আমি একদম সইতে পারি না।

আপনারা যে এভাবে আমাকে হেল্প করবেন, তা আমি ভাবতেই পারি নি। থ্যাংক জেন্টেলমেন, থ্যাংক স্যার, থ্যাংক ম্যাডাম। যারা দিতে পারলেন না মনে মনে তারাও কোনো দুঃখ রাখবেন না ভাই। এই ময়দানে কত লোক সকাল থেকে ভোরে শোয়, ঘুমোয় গান গায়। আবার কত লোক কাজে যায়। পয়সা কামায়। পকেটমার পকেট খোঁজে। এই দ্যাখো, আবার বাজে বকছি। নো। এবার ম্যাজিক। তার আগে একটা কথা, মাত্তর একটা।

এই যে মনুমেন্ট, তার তলায় আমি কত কথা শুনিছে আজ পর্যন্ত। বিস্তর কথা। এখানে মিটিং হয়। আপনারা আসেন। আপনারা মানে জনগণ। জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাঙ্গা করে রাখাই মনুমেন্টতলার কাজ। দশ বছর ধরে আর কোন কাজ এই জন্যই এই তীর্থ হাতে নিতে পারছে না। আর জানেন তো, শুনলে হাসবেন, আমিও সেই সব মিটিংয়ে বক্তৃতা শুনি। মুখস্থ বলে দিতে পারি অনেক লাইন। জনগণ মানে জনসাধারণ। মানে আপনারা। দিব্যি আমার কথা শুনছেন। খেলা দেখাবো বলেছি, পয়সা দিলেন। আপনারা কত ভালো। আপনাদের তুলনা হয় না। ঠকাতে বুক ফেটে যায়।

চেঁচাবেন না দাদা। ধৈর্য ধরুন। এবার হবে আপ-ডাউনের খেলা। অনেক কথা বললাম। আরো হয় তো বলবো। কোন অন্যায় করে থাকলে নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন। আপনারা চটে গেলে আমি আর খেলোয়াড় থাকবো না। ফালতু বনে যাবো।

হয়তো আমার তারিফ করছেন। এত ফাইন কথা বলি বলে। আমার এ গুণ আপনাদেরই দেওয়া। আপনারা মনুমেন্টের পায়ের তলায় আসেন বলেই নেতারা বক্ বক্ করে। ওই বকবকামি শুনে শুনে আমিও ভালো বকতে শিখেছি। সবই আপনাদের আশীর্বাদে।

এনি ওয়ে, আমি এবার পিছু হটে যাচ্ছি। অনেকটা পিছু হটে হাততালি মারবো। ফেটে যাবে পুঁটলি। আপ-ডাউন মার্ক নিয়ে আপনারা যে যার বাড়ি চলে যাবেন।

কেউ নড়বেন না। আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। আমি জানি আপনারা তা করবেন। মনুমেন্টের তলা থেকে, ঝুড়ি ঝুড়ি মধুপান করেছি, মনুমেন্ট তো বলা যাবে না? বলতে হবে, শহীদ মিনারের তলা থেকে সে শিক্ষা আপনারা ভালোভাবেই পেয়েছেন। অপেক্ষা করার শিক্ষা। মন দিয়ে প্রতিশ্রুতির বাণী শোনার শিক্ষা।

নমস্কার দাদারা। এই পিছু হটছি। এই হটলাম আরো। এবার ভাগবো।

আপনারা অপেক্ষা করুন।
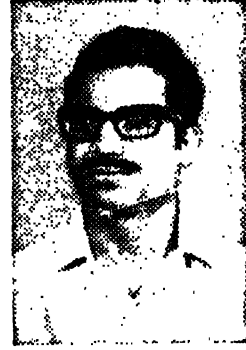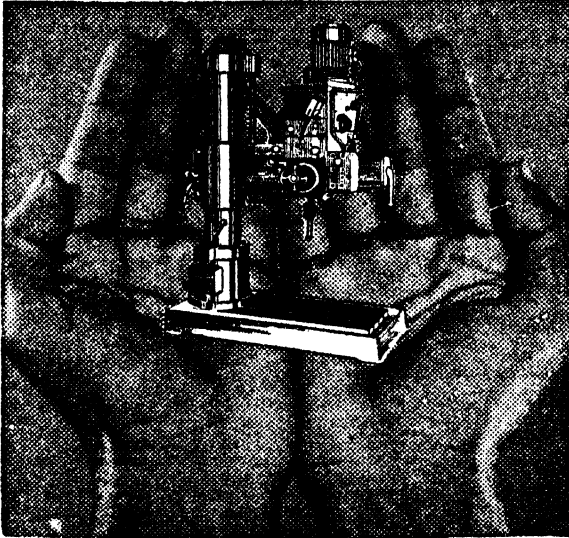
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সি, মার্টিন (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে থিওডোর হেলফারিক নামে এক জার্মানের কাছে হাজির হলেন। হেলফারিক জানালেন—'মেভারিক' নামে এক জাহাজে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া হতে অস্ত্রশস্ত্র করাচীতে আসছে। ঐ জাহাজ বাংলায় আনবার জন্যে বললেন মার্টিন। সাংহাই-এর জার্মান কনসুলারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাই ঠিক হল। মেভারিক হনলুলু থেকে জাভার দিকে যাত্রা করল। ঐ জাহাজে ত্রিশ হাজার রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেলে চারশ বার করে ছোড়বার উপকরণ আর দু লক্ষ টাকা আসছিল। মেভারিক জাহাজের মাল সুন্দরবনে রায়মঙ্গলে নামাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে জুন মাসে মার্টিন ফিরে এল দেশে। বাঘা যতীন, যাদুগোপাল মুখুজ্জে, ভোলানাথ চাটুজ্জে, অতুল ঘোষ আর মার্টিন (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য) ঐ মাল কি করে কোথায় নামিয়ে নেওয়া যায়, কিভাবেই বা কাজে লাগান যায়, ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ঠিক হল—অস্ত্রশস্ত্র তিন ভাগ করে হাতিয়া, কলকাতা আর বালেশ্বর—এই তিন জায়গায় পাঠানো হবে। হাতিয়ায় কাজ করবে বরিশালের দল।

বাংলায় যে ইংরেজ সৈন্য ছিল তাদের সঙ্গে লড়তে বিপ্লবীরাই যথেষ্ট। কিন্তু বাইরে থেকে সৈন্য আমদানী করলে ভয়ের কারণ। বাঘা ঠিক করল রেললাইনের প্রধান প্রধান পুলগুলি উড়িয়ে দিয়ে বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করতে হবে। যতীন বালেশ্বর থেকে ভার নেবে মান্দ্রাজ রেললাইনের। ভোলানাথকে পাঠানো হল চক্রধরপুরে বি-এন রেললাইনের ভার দিয়ে, আর সতীশ চক্রবর্তী ই-আই-রেলের অজয় নদের পুল উড়িয়ে দেবে ঠিক হল। নরেন চৌধুরী আর ফণী চক্রবর্তীকে যেতে বলা হল হাতিয়ার। সেখানকার বিপ্লবীদের সাহায্যে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিকে অধিকারে এনে আসবে কলকাতার দিকে ফোর্ট উইলিয়ম দখল করতে। চন্দ্রকান্ত দত্ত আর হেরম্ব চক্রবর্তী একযোগে আক্রমণ করবে বর্মামুলুকে। সানফ্রান্সিসকো আর অন্যান্য জায়গা থেকে গদর দলের অনেক বিপ্লবী এসে গেছে শ্যামরাজ্যে। বর্মা আক্রমণে যোগ দেবে তারা।

গ্রামগুলিকে স্বাধীন বলে প্রচার করতে হবে। কোন স্বাধীন রাজ্যে অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রেরণা থেকে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আফগানিস্তানে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করে নিজে হন রাষ্ট্রপতি, বরকতউল্লা পররাষ্ট্র সচিব, আর ওবেদুল্লা হন স্বরাষ্ট্র সচিব। তুর্কী ও রুশের সঙ্গে মৈত্রী প্রস্তাব করা হয়।

এই সময়ে পরামর্শের প্রয়োজন বোধে যশোহরের বিখ্যাত দেশসেবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দূত করে বাঘা যতীন পাঠায় এই উপাধ্যায় যতীন্দ্রের কাছে। যথাযথ যুক্তি দেওয়া হয় সব শুনে। তারপরে বাঘের সঙ্গী চিত্তবাঘ চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত আর যতীশ পালকে নিয়ে যতীন চলে যায় বালেশ্বরে। সেখানে পাহাড় আর গভীর জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তারা।

রায়মঙ্গলের কাছে এক জমিদারের সঙ্গে মাল খালাসের লোকজন, গাড়ীঘোড়া যানবাহনের ব্যবস্থা করে যাদুগোপাল অপেক্ষা করতে থাকল সেখানে। রাত্রে 'মেভারিক' আসবার কথা। জাহাজে সারি সারি খাড়াভাবে আলো জ্বলবে—তাই দেখে চেনা যাবে মেভারিককে। অতুল ঘোষের নির্দেশে কতকগুলি লোককে নৌকা করে পাঠানো হল রায়মঙ্গলের খুব কাছে।

জুন মাস শেষ হতে চলল—মেভারিক এল না। ওরা ভেবেছিল ১লা জুলাইয়ের মধ্যে অস্ত্র বন্টন শেষ করে ফেলবে। ওদিকে পুলিশ ও গভর্নমেণ্ট টের পেয়েছিল। তাই মেভারিক জাভায় এলে ডাচ গভর্নমেণ্ট খানাতল্লাস করে ফিরিয়ে দেয়। জার্মান কনসাল জেনারেল আরও দুখানি অস্ত্রবোঝাই জাহাজ পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন—একখানি রায়মঙ্গলে, অপরখানি বালেশ্বরে। তাও এসে পৌছায় নাই। নীলসেন নামে এক জার্মানের নির্দেশে দুজন চীনাম্যান ১২৯টি অটোমেটিক পিস্তল ও ২০৫৫০ রাউন্ড গুলি বারুদ শ্রমজীবী সমবায়ের অমরেন্দ্র চাটুজ্জের কলকাতা ঠিকানায় পেণছে দেবার জন্যে আনছিল কাঠের তক্তার বাণ্ডিলের মধ্যে। তাও ধরা পড়ল সাংহাই-এর মিউনিসিপ্যাল পুলিশের হাতে। মোকদ্দমা হল। অমরেন্দ্রনাথ আশ্রয় নিল চন্দননগরে। জাপান থেকে ফেরবার পথে অবনী মুখুজ্জে ধরা পড়ল সিঙ্গাপুরে। তার নোটবই-এ অনেকের ঠিকানা পেল পুলিশ। ভোলানাথ চাটুজ্জে ধরা পড়ল গয়ায়। জেল হল। জেলের ভেতর আত্মহত্যা করল সে। সি মার্টিন (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য) মেভারিক জাহাজেই চলে যায় আমেরিকা। আমেরিকা গভর্নমেণ্ট গ্রেপ্তার করে তাকে।

ইংরেজের সন্ধানশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ, ক্ষমতাও তেমনি অপরিসীম। বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা আপাতত হার মানল তার কাছে।

(বাহান্ন)

স্বামিজী যেন তৈরীই ছিলেন। কাছে বসতেই বললেন—আজ পূর্ণাহুতি। মৃত্যুঞ্জয়ীদের মৃত্যু জয়।

আগে বিজয় যাত্রা। যাত্রামঙ্গলটা শোন।

বেলেঘাটা ডাকাতির দুদিন পরে পাথুরেঘাটার বাড়ীতে যতীন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন্দ্র আর যতীশ—পঞ্চ মহাবীরের যুক্তি হচ্ছে বালেশ্বর যাবার, হঠাৎ এক অচেনা লোক—নীরদ হালদার ঘরে ঢুকে ডাকছে যতীনের নাম ধরে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। সরকারী গুপ্তচরটা মল সেখানেই। তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশে পাঁচজনে পাড়ি জমাল বালেশ্বরে।

মনোরঞ্জন

নীরেন্দ্রনাথ

বাঘা যতীন

মহানদীর সাগরসঙ্গমের মোহানার কাছে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইল বাঘা অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই জার্মান জাহাজের প্রতীক্ষায়। কদিন কাটল, জাহাজ এল না। তরপর ক'জায়গায় ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে শেষে সবান্ধবে আশ্রয় নিল কাপ্তিপোদার গভীর জঙ্গলে।

যতীন চায় বিপ্লব প্রচেষ্টা সফল করতে, সরকার আর পুলিশ চায় বিপ্লবীদের ধ্বংস করতে। যতীনের গতিবিধির সন্ধান রেখেছিল পুলিশ। গোপনে গোপনে জেনেছিল বালেশ্বরে কোথাও লুকিয়ে আছে যতীন।

১৯১৫ সালে ৭ই আগস্ট পুলিশ খানাতল্লাস করল কলকাতার হ্যারি এণ্ড সন্সের দোকানে। বিপ্লবীদের দোকান এটি। গ্রেপ্তার হল কজন। জার্মানির সংগে ষড়যন্ত্রের খবর জেনেছিল পুলিশ। তাই কজন সি-আই-ডি পুলিশ অফিসার চলে যায় বালেশ্বরে। হ্যারি এণ্ড সন্সের একটি শাখা ছিল সেখানে—'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'। ৮ঠা আগস্ট খানাতল্লাসীতে গ্রেপ্তার হল এক যুবক। এর কাছ থেকে বিশেষ সন্ধান পেল পুলিশ। আর সন্ধান পেল—একজন গ্রামবাসীকে আহত করে পাঁচজন বাঙালী লুকিয়ে আছে কাপ্তিপোদার জঙ্গলে। বালেশ্বর থেকে কুড়ি মাইল দূরে কাপ্তিপোদা। পুলিশ ঘিরে ফেলল ঐ জঙ্গল। তারপর তল্লাসীতে পেল সুন্দরবনের এক প্ল্যান ম্যাপ আর পেনাং-এর খবরের কাগজের কাটিংস। মেভারিকের খবর ছিল এতে। বিপ্লবীরা নিশ্চয়ই কাছেপিঠে আছে এখানে কোথাও। নিঃসন্দেহ হয়ে সশস্ত্র পুলিশ জঙ্গল ঘেরাও করে অনুসন্ধান চালাতে লাগল।

যতীনের সঙ্গীরা কেউ কেউ বললে—এ জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতে। যতীশ তখন খুব অসুস্থ। অন্যত্র যেতে হলে ফেলে যেতে হয় তাকে। রাজী হল না যতীন। সে যে সবারই 'বড়দাদা'। অসুস্থ ভাইকে নিশ্চিত মরনের মুখে ফেলে দাদা কখনো যেতে পারে? ঐ জঙ্গলের মধ্যেই চারদিকে খাদ কাটা একটি অংশে আশ্রয় নিল তারা।

বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ আর নীলগিরি রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ আর সৈন্যদল নিয়ে এসেছে বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি, ডেনহাম, বার্ড আর টেগার্ট। হাতী চড়ে এসেছিল এরা। হাতীর গলার ঘণ্টা শুনে যতীনদের জানিয়ে দেয় এক গ্রামবাসী।

জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চলছে ঘেরাও দল; এগিয়ে তো যাচ্ছে কিন্তু ঠিক আস্তানা যে মালুম হচ্ছে না। সাহেবরা পর পর দুজন লোক পাঠাল জঙ্গলের ভেতর কেউ আছে কিনা দেখতে। দেখে এসে দুজনই বলল—কেউ কোথাও নেই, সব ফাঁকা।

বিশ্বাস হল না সাহেবদের। এগিয়ে যেতে যেতে আরও গভীরে সন্ধান করতে থাকে তারা। এই সময়ে দেখা গেল এক জায়গায় একটা সরু ডালে কাপড় নাড়ল। মনোরঞ্জনরাও দেখল। বুঝল—পুলিশ বাহিনীর সংকেত এটি। একজন গুপ্তচর গাছের ডালে উঠে লক্ষ্য করছিল বিপ্লবীদের। সেই করেছে ঐ সংকেত।

যুদ্ধ হয় দু রকম—শিলষ্ট ট্রেঞ্চে বা খোড়া গর্ত থেকে, আর সারফেস অর্থাৎ বালির বস্তা বা ঐ রকম জিনিসের আড়াল থেকে। বিপ্লবীরা চারপাশে পেয়েছিল খোড়া গর্ত। ঐ গর্তের একদিকে ছিল বিরাট উই-ঢিপি। যতীন রইল তার আড়ালে।

সংকেত পেতেই সরকার পক্ষ থেকে গুলি চলল—গুড়ুম্ গুড়ুম্। অপর পক্ষ চুপচাপ। যতীনের নির্দেশ। মশার পিস্তলের পাল্লার বাইরে ছিল সরকারী সৈন্য। গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে এসে সৈনিক দল পেশছল পিস্তলের পাল্লার মধ্যে। আর অমনি যতীনের আদেশ—

ব্যস, ফটাফট ফটাফট মশার পিস্তল গুলি বর্ষণ করতে লাগল অবিশ্রামে। হতাহত হতে হতেই বৃটিশ সৈন্যরা পালাতে লাগল প্রাণের ভয়ে। সংগে ছিল র‍্যাদারফোর্ড। তারও অবস্থা তাই—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। কিছু পেছিয়ে গিয়ে কাদামাটিতে শুয়ে পড়ল সৈন্যরা। অনেকে রইল ধানক্ষেতের আলের আড়ালে। তাদের মধ্যে বন্দুক ছুড়তে কেউ মাথা তুললেই সংগে সংগে পায় উত্তর। তবে বৃটিশ সৈনিকরা ছোড়ে বেপরোয়া আর বিপ্লবীরা ছোড়ে বুঝেশুনে।

এমনি যুদ্ধ চলল দু ঘণ্টা। বহু হতাহত হল সরকার পক্ষে। বিপ্লবীরা মাত্র পাঁচজন আর বৃটিশ পক্ষে আড়াইশ তিনশ তো বটেই। পঞ্চবীরের পাঁচশ শক্তি—বড় সোজা কথা নয়। এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

এইবার বিপ্লবীদের টোটা ফুরিয়ে এসেছে। চামড়ার থলি ভর্তি টোটা চাবিবন্ধ। টোটা বারুদ বের করতে বলল যতীন।

হায়রে দুর্ভাগ্য। চাবি মিলল না কারুর কাছে। কোথায় পড়ে গেছে কে জানে। চামড়ার থলে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলবার চেষ্টা হল। যা শক্ত থলে—দাঁতে কাটল না কিছুতেই।

যতীনের বাঁ হাতে গুলি লেগেছিল। এক হাতেই মশার পিস্তল ছুড়ছিল সে। কিন্তু টোটা যে নাই—করে কি? নিরস্ত্র মহাবীর অভিমন্যু। গাছের ডালে উঠেছিল ওপক্ষের এক সুবেদার। কানের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া এক গুলি এড়াতে গিয়ে চিত্তপ্রিয় যেন মাথা তুলেছে অমনি সুবাদার অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি ছুড়ল চিত্তপ্রিয়ের মাথায়। বীরেন্দ্রবাঞ্ছিত শয়নে চিত্তপ্রিয় পড়ে গেল মাটিতে। যতীন গেল তাকে কোলে তুলে নিতে। এমন সময় একটা গুলি এসে ঢুকল তার পেটে। সাংঘাতিক আহত হয়ে যতীন পড়ে গেল। যতীশও আহত হল ভীষণ। আহত তিনজনকে নিয়ে খুবই বিব্রত হয়ে পড়ল নীরেন আর মনোরঞ্জন। এই সময়ে সৈন্যরা পেছন থেকে এসে গ্রেপ্তার করল তাদের।

বাজেশ্বর হাসপাতালে পাঠানো হল যতীনকে। পরদিন টেগার্ট হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিল তাকে। আহত পিপাসার্ত যতীন তখন চাইছিল জল খেতে। এক গ্লাস জল নিয়ে দিতে গেল টেগার্ট। যতীন নিল না, বলল—যার রক্ত দেখতে চেয়েছিলুম, তার হাতে জল নিয়ে তেষ্টা মেটাতে চাই না। নির্নিমেষে যতীনের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল টেগার্ট। কোন রকম অসদ্ব্যবহার করে নাই সে। কদিনের মধ্যেই ৩৬ বছরের বাঘা যতীন চলে গেল সাধনোচিত ধামে ১৯১৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে।

স্পেশাল বিচারে নীরেন আর মনোরঞ্জনের হল ফাঁসি। ফাঁসির আগের দিন তারা চিঠি লিখল অন্তরঙ্গ বন্ধু ভূপতি মজুমদারকে—দাদা, কাল আমাদের জীবনের বিজয়া দশমী। ঐদিন আপনাকে ও চিরপ্রিয় জন্মভূমিকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাবার আগে মাতৃভূমির স্বাধীনতা কামনা করে যাব। যদি এ ব্রত অসমাপ্ত থেকে যায়, কামণা করব যেন আবার এই দেশে জন্মে ব্রত উদ্‌যাপন করে যেতে পারি।

যতীশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আন্দামানে পাঠানো হল তাকে। জেলের কষ্টে পাগল হয়ে যায় যতীশ। তখন তাকে পাঠান হয় দেশে—রংপুর জেলে। সেখানেই মৃত্যু হল যতীশের।

যতীনের মৃত্যুর পর খবর পাবার আগেই ব্যারিস্টার জে, এন, রায় টেগার্টকে জিজ্ঞেস করেন—যতীন বেঁচে আছেন, কি মারা গেছেন?

অত্যন্ত দুঃখিতভাবে টেগার্ট বলেন—unfortunately he is dead.

ব্যারিস্টার রায় বলেন— শত্রুক্ষয় unfortunately কেন?

টেগার্ট উত্তর দেন—

I had to do my duties, but I have a great admiration for him. He was the only Bengalee who died fighting from a trench.

পরম শত্রুরও চিত্ত জয় করেছিল যতীন। এমনি ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বীরত্ব আর সাহস। যতীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টা একরকম শেষ হল বলা যায়। তবে এর ফল রয়ে গেল—অনির্বাণ আহিতাগ্নির মত।

তিন্পাত্র

চাম্না আশ্রমের পরিবেশ স্বাভাবিক। আগের মতই সব। সেই পরিচিত ভক্ত অনুগতদের আনাগোনা, যুক্তি, উপদেশ, আলাপ আলোচনা, অনাথ আতুর দুঃস্থ রোগীদের ওষুধ পথ্যের দরবার। সেই ঋণপ্রার্থীদের দু হাঁটুর মাঝে চিবুক রেখে সসঙ্কোচে উবু হয়ে বসা। আগের মতই সেবস্থালীর কাজকর্ম রেণুদার, রান্নাঘরের ভার আমার।

সকালে স্বামিজী দক্ষিণের বারান্দায়। জেয়কজনের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ। বিদায় নিয়েছেন আগন্তুক সবাই। বেলা ৯টা। ঠুং ঠুং ঘণ্টি বাজিয়ে এসে ডাকহরকরা স্বামিজীকে প্রণাম করে দিয়ে গেল ক'খানি চিঠি।

একে একে সব ক'খানি পড়লেন স্বামিজী। চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল ঈষৎ হাসির রেখা। বললেন—কাশী থেকে আসছেন এক সাধু ছেলে—জন্ম-সন্ন্যাসী। সারনাথের বুদ্ধ—মহাবোধি সত্ত্বায় সত্ত্ববান। রূপে গুণে নামে ভাবে এক—যোগেশ্বর। পূর্বাশ্রমের নাম। সন্ন্যাস আশ্রমের নাম—স্বামী প্রজ্ঞানপাদ। সন্ন্যাসে দীক্ষিত হয়েছিলেন এখানেই। সেবা যত্নের কথা যেন বলতে না হয়। হাতে হাতে যুগিয়ে দিও সব। তবে দরকার হবে না—স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ম্ভর, স্বাবলম্বী। বিদেশী কলেজী বিদ্যাও শেষ পর্যায়ে—ডবল এম-এ গোল্ড মেডেলিস্ট। ইংরেজী বাঙলা সংস্কৃত অংক ও বিজ্ঞানে সমান পণ্ডিত। মহাবিদ্বান। আর জ্ঞানে তো কথাই নাই। পরশু আসবেন আশ্রমে। থাকবেন দু দিন।

ঠিক দিনেই বেলা দশটায় গরুর গাড়ী থেকে নেমে দক্ষিণ ফটকের মালতী মাধবী বিতানের ভেতর দিয়ে এলেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ। আজানুলম্বিতবাহু, দীর্ঘাকৃতি কনককান্তি মহাপুরুষ। চিন্তালেশ শূন্য প্রশস্ত ললাট, করুণাঘন দীর্ঘায়ত চোখ দুটি যেন শান্তির ঝরণা। পরনে গৈরিক খদ্দর, গায়ে গৈরিক খদ্দরের জামার ওপর ডান বগলের নিচ দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর গৈরিক খদ্দরের চাদর।। অবিকল বুদ্ধ। এক ছিলেন 'অদ্বিতীয় অমিতাভ' ইনি দ্বিতীয় অমিতাভ।

শান্ত ধীর পদক্ষেপে আঙিনায় এলেন মহাশ্রমণ। দেখতে পেয়েই আসুন, বসুন বলে সাদরে কাছে বসালেন স্বামিজী। তারপর কুশলাদি বিনিময়। ততক্ষণে গাড়ু গামছা দেওয়া হয়েছে দাওয়ায় হাত পা ধোবার জন্য। হাত পা মুখ ধুয়ে সুখাসনে বসলেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ। তারপর আলাপ আলোচনা। ঈষৎ হাসি জড়ানো মধুবর্ষী মৃদু স্বর।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর নদীতে স্নান করে এসে বসতেই স্বামিজীর ডাক। জলখাবার খেলেন না, মাত্র এক গ্লাস সরবত খেয়ে শান্তচিত্তে বসলেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ।

কথাবার্তায় একটু দেরী। ১২টা বাজতেই স্বামিজীর ঘরে পাশাপাশি পাতা দুখানি আসনের সামনে জলচৌকীর ওপর থালা ও জলের গ্লাস রেখে এল রেণুদা। দু স্বামিজী বসলেন। শুরু হল পরিবেশন। খেতে খেতে রান্নার তারিফ। উষা নাই, আশ্রমে রান্না করে কে জানতে চাইলেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ। সবিস্তার পরিচয় দিলেন স্বামিজী।

খাওয়া শেষ। কাছে ডেকে স্নেহাশীর্বাদে ভরিয়ে দিলেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ।

এরপর বিশ্রাম। তিনটের পর আবার দক্ষিণের বারান্দায় আলোচনা। এবার তত্ত্ব আলোচনা—মৃদুস্বরে।

পড়ন্ত বেলায় লাঠি হাতে দু স্বামিজী একত্রে বেড়াতে বের হলেন সামনের মাঠে সাঁওতাল পাড়ার পথে।

সন্ধ্যের পর ফিরে স্বামিজী বসলেন নিজের জায়গায়, স্বামী প্রজ্ঞানপাদ পান্থশালার খড়িমুখো পূব বারান্দায়। লণ্ঠন দিতে গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই স্বামী প্রজ্ঞানপাদ বললেন—এস, এস খোকা, এস! বল কি খবর।

কি খবর—কি বলি? বলে ফেললুম যা দিনেও সাহস করে বলতে পারি নাই স্বামিজীকে। বাস্তবিকই এক এক সময় স্বামিজীর রুদ্রমূর্তি আর জলন্ত দৃষ্টির সামনে কেউই শঙ্কিত না হয়ে পারত না। কিন্তু ইনি যে শান্ত সৌম্য অভয় মূর্তি। তাই বললুম নিঃসঙ্কোচে।

সারা দেশের লোক ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করে কত ব্রত, নিয়ম, উপবাস, পূজো আচ্ছা করে। কিন্তু এখানে যা শুনি তা বেশ বুঝতে পারি না। দেশের লোক সবাই কি ভুল পথে চলছে স্বামিজী। ঠাকুর দেবতা ভগবান আছে কি নাই? কি সত্যি স্বামিজী?

—বা, বা বেশ প্রশ্ন—একটু মাথা দুলিয়ে হাসিমুখে মৃদুকণ্ঠে বললেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ। —কি সত্যি—এই তো প্রশ্নের মত প্রশ্ন—আসল প্রশ্ন। ধর—আছে। তাহলে কোথায়—এই তো? গান গাইতে পার?

—না স্বামিজী।

—শোন তবে। বিশুদ্ধ সুরে স্বভাব মধুর স্বরে আস্তে আস্তে গাইলেন—

ডুব দেরে মন অন্তরেরই অন্দরে।
কালী কৃষ্ণ বিশ্ব জগৎ
তারই মাঝে বন্ধ রে।।

খুঁজিস কোথা বাহির মাঝে
সবই যে তোর ভিতর মাঝে
ঘুরিস নে আর মিছে কাজে,
মিটিয়ে নে তোর সন্দ রে।।

আবার—

ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজে
পাবি রে অমূল্য ধন।।

প্রথমটি অন্তরে আর দ্বিতীয়টি বাইরে। এই দুটি দর্শন। অন্তর আর বাহির। এই দুটি দেখা হলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। বুঝবে কি সত্যি। সত্য দর্শন হবে।

বললুম—প্রকৃতির রূপের বৈচিত্র্য সব সময়ে দেখা যায় চারদিকে। রূপ রস শব্দ স্পর্শ বর্ণ গন্ধ—যা দেখবার দেখা যায়, যা অনুভব করবার করা যায়। এ সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নিয়ে বিচার সমীক্ষা চলতে পারে। কিন্তু অন্তর? অন্তর তো দেখবার জিনিস নয়। অন্তর সমীক্ষা কি করে করা যায়, স্বামিজী?

অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা শক্ত বটে কিন্তু অসম্ভব নয়। এর জন্যে চাই অভ্যাস

ধৈর্য আর বিচার। শেষ রাতে—ধর সাড়ে তিনটে চারটের সময় প্রকৃতি থাকে শান্ত নিস্তব্ধ। এই সময়ে চুপচাপ নিশ্চিন্ত মনে সোজা হয়ে বসতে হয়—কিছু করছি না—এইভাবে। মনকে রাখতে হয় একদম ফাঁকা। কোন রকম ভাব ভাবনা কল্পনা রাখতে নাই। তারপর লক্ষ্য করতে হয় মনের গতি। একটা না একটা ভাব উঠবেই মনের গহনে। তখন বিচার করতে হয় ঐ ভাবটির গতি প্রকৃতি—কি চায় সে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঐ ভাবটি নিয়ে আসে আপাত মধুর ভোগ সুখের মোহ। বিচার করতে হয় ঐ ভাবটি সৎ কি না। ঐ কল্পিত সুখ কতক্ষণ স্থায়ী। সৎ মানেই—যা সত্য, বিকারহীন স্থায়ী। এর উল্টো হলেই তা অসৎ। তখন ঝেড়ে ফেলে দিতে হয় সেই ভাব। এমনি করেই ধীরে ধীরে করতে হয় মন সমীক্ষা। সজাগ থাকতে হয়। এ অভ্যাস আর সাধনা সাপেক্ষ। এখন বুঝবে না। পরে জেনে নিও স্বামিজীর কাছে। অভ্যাস করো।

ক্ষুদ্র দুর্বল আমি, শক্তিই বা কতটুকু? এ কঠিন কাজ কি সম্ভব আমা দ্বারা?

—কে বললে তুমি ক্ষুদ্র দুর্বল?—বেশ গম্ভীর স্বরেই বললেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ। কে তুমি, কি তোমার শক্তি জান না—তাই বলছ এমন কথা। শিশুপুত্রকে দোলনায় দোল দিতে দিতে মা গুন গুন করে গান করছেন—শোনাচ্ছেন তার স্বরূপ। শিশু শুনছে কিন্তু বুঝছে না। না বুঝুক, তবু মা গাইছেন—

শুদ্ধ যে তুই, বুদ্ধ যে তুই, তুই রে নিরঞ্জন।
নিত্য যে তুই, মুক্ত যে তুই, তুই রে সনাতন।।
সকল জগত সাগর পারের তুই যে মহাকবি।
তোরই রূপের আলোক পেয়ে জ্বলছে যে
ঐ রবি।
তোর অপরূপ সুরের হাওয়ায় গাইছে
পাখি গান।
তোরই গায়ের সুবাস মেখে বাতাস
মাতায় প্রাণ।।
ওঠরে অমল দেখরে চেয়ে হৃদয় ভরা ধন।
অভয় যে তুই সুধার হাসি হাসরে
সকল ক্ষণ।

তুমি কি কম? সর্বশক্তির মূল আধার। মন থেকে দুর্বলতা দূর কর। নিজেকে জান, নিজের শক্তিকে জান। ক্লৈব্যং মাস্ম গম, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। সজাগ থাকো। অসম্ভব বলে কিছুই থাকবে না।

কিছু বুঝে কিছু না বুঝে চলে এলুম রান্নাঘরে।

তিন দিন আশ্রমে বাস করলেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ। তাঁর চলন-বলন হাবভাব কথা-বার্তার এমন একটা শান্ত মধুর ছন্দ যে আশ্রমের স্বভাবশান্ত পূত পরিবেশ যেন পূততর হয়ে উঠল এই কদিনেই।

চতুর্থ দিনে স্বামিজীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন স্বামী প্রজ্ঞানপাদ।

কিশোর লেখকের তৈরি যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর মৃন্মূর্তি

চুয়াম

আশ্রমে সাধারণ জনসমাগম নিত্য-নৈমিত্তিক। এবার সাধু সমাগম। স্বামী প্রজ্ঞানপাদ চলে যাবার কদিন পরেই ধানবাদ থেকে এলেন স্বামী ইচ্ছানন্দ। ইচ্ছা মাত্রই না কি অনেক কিছু করতে পারেন—তাই এই নাম। গোলগাল বেঁটেখাটো সদাপ্রফুল্ল শ্যামসুন্দর মানুষটি। পরনে গেরুয়া, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবীর ওপর গেরুয়া চাদর, পায়ে বাদামী জুতো। মাথায় ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুল, আনন্দোজ্জ্বল চোখ মুখে মৃদু হাসি। হাতের সুটকেশ, ছাতা, লাঠি দাওয়ায় রেখে 'নমো নারায়ণায়' বলে বসলেন স্বামিজীর কাছে পাতা কম্বলের ওপর। আশ্রমিক কুশলাদি আদান-প্রদানের পর চলল নানান জায়গার ভ্রমণ কাহিনী।

ইতিমধ্যে যথারীতি পাদ্য অর্ঘে করা হল অতিথি সৎকার। থাকবার জায়গা হল অতিথিশালায়।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর নির্দিষ্ট জায়গায় সুটকেশ ছাতা লাঠি রেখে নদীতে স্নান করে এলেন স্বামী ইচ্ছানন্দ। তারপর রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে বললেন—কি খোকা, কি করছ?

আসন পেতে দিয়ে প্রণাম করে বললুম কাজের তালিকা।

আসনে বসে সদালাপী মিষ্টভাষী ইচ্ছানন্দ আরম্ভ করলেন নানা কথা। কাজ করতে করতে শুনলুম—পূর্বাশ্রমে ছিলেন কলিয়ারীর ম্যানেজার। রোজগার করেছেন বহু টাকা।

সংসার ছিল। এরই মধ্যে আলাপ হয় এক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গে। অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধির অনেকগুলিই আয়ত্ত ছিল তার। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিদ্যা। দেখে-শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁরই কাছে দীক্ষা নিয়ে যোগাভ্যাস শুরু করেন স্বামী ইচ্ছানন্দ। কটি সিদ্ধাই লাভ হয়। মনে প্রচুর আনন্দ আর শক্তি পান। তারপর আর ভাল লাগে না, সংসার। অসাড় বলে মনে হয়। টাকা-কড়ি বিষয়-আশায়—সংসারের জিনিস সংসারকে দিয়ে, ছেলেদের হাতে নিজস্ব কর্তৃত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়েন সন্ন্যাসের পথে মুক্তির সন্ধানে। অনেক যোগী ঋষি মহাপুরুষের সংসর্গে এসেছেন তিনি। স্বামী নিরালম্বের সঙ্গেও পরিচয় এই সন্ন্যাস আশ্রমেই।

বললুম — যোগসিদ্ধাই কি রকম, স্বামীজী? পূর্বাশ্রমের নামই বা কি?

—পূর্বাশ্রমের নাম? ওটা নাই শুনলে। সে মরেছে, এ মুখে আর উচ্চারণ করতে নেই। যোগসিদ্ধাই শোন। ইচ্ছাশক্তি জানত—নানা রকম প্রক্রিয়া আর অভ্যাসযোগে ঐ ইচ্ছাশক্তিটাকে বাড়ান আর কি। ইচ্ছাশক্তিকে আরও জোরদার করা। এতে সিদ্ধ হলে অনেক সম্ভাব্য ইচ্ছা পূরণ করা যায়। এটা সত্যি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায়। দেখবে? এস এদিকে—হাসতে হাসতে বললেন ইচ্ছানন্দ স্বামী।

যাব কি? যা মুস্কিল তখন। দেশলাই ফুরিয়েছে। রেণুদা সাঁওতাল পাড়ায়। একটি মাত্র দোকান সেই চাম্রা গাঁয়ে। দেশলাই আনে কে? উনুন ধরান যাচ্ছে না, বেলা হয়েছে।

দেখে-শুনে ইচ্ছানন্দজী উনুনের কাছে এসে বললেন—কাঠ সাজিয়েছ? আচ্ছা দেখা যাক। মেরুদণ্ড সোজা করে পদ্মাসনে বসে মিনিট পাঁচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উনুনের ভেতরের কাঠগুলির পানে, তারপরে ঘাড় নিচু করে গাল ফুলিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে থাকলেন উনুনের মুখে। ফুঁ ফুঁ তিন ফুঁ—পিদিমের শিখার মত

স্পা ওয়াশিং পাউডার
গুণে অসাধারণ কেন জানেন ?
স্পা ওয়াশিং পাউডারের
পরিষ্কার করার ক্ষমতা ঢের বেশী!
খুব ঘন ফেনায় ময়লা কাটিয়ে
দেয়! এমন কি খর জলে কাচলেও
যেকোন গভীর দাগ
অনায়াসেই উঠে যায়!
জোরদার স্পা ওয়াশিং পাউডারে কাচা কাপড়-চোপড়ে একটা বাড়তি উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। খর জলে কাচলেও তার হেরফের হয় না। পরিষ্কার ও ঝকমকে ক'রে কাচার বিশেষ উপাদান রয়েছে এই ওয়াশিং পাউডারে। অন্য ওয়াশিং পাউডার হার মানলেও স্পা কখনো হাল ছাড়ে না। এর অফুরন্ত ফেনা কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা ধুলোময়লা সব সাফ করে দেয়। আপনার জামাকাপড় অনায়াসে পরিষ্কার ও ঝকমকে হয়ে ওঠে। কাজেই গিন্নীরা আজকাল বেশীর ভাগই স্পা ব্যবহার শুরু করেছেন। আপনিই বা বাকী থাকেন কেন?
TO OPEN PIERCE HERE
নীলা
স্পা
BLUE
Spa
POWDER
বিশেষ উপাদানে তৈরী
স্পা
অনায়াসে কাপড় কাচার
একটি শক্তিশালী ওয়াশিং পাউডার!
কুসুম প্রডাক্টস্ লিমিটেড

জ্বলে উঠল সব নিচের কাঠের আগাগাটি। তারপর একে একে ধরে গেল কাঠ।

দেশলাই নাই, চকমকি নাই, আগুন এল কোত্থেকে? তাজ্জব ব্যাপার। ম্যাজিক জানেন না কি?

—ম্যাজিক নয়, এ যোগসিদ্ধাই, সাধনার ফল। ইচ্ছা-পূরণ। আবার দেখ — বলে আমার হাতের পাতার উল্টো পিঠে নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুল ঘষে ইচ্ছানন্দ স্বামী বললেন—শোঁক, গোলাপ ফুলের গন্ধ।

সত্যি তাই, ভুর ভুর করছে তাজা গোলাপের গন্ধ। মিনিট তিনেক পরে আবার বুড়ো আঙুলে ঘষলেন—এবার সদ্য-ফোটা বেলফুলের মিষ্টি গন্ধ। এমনি করে মিনিট পনেরোর মধ্যেই জুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধার গন্ধ শুঁকিয়ে দিলেন ইচ্ছানন্দ স্বামী।

এ কি ম্যাজিক, তান্ত্রিক আচার, যোগসিদ্ধাই না যাদু? অসম্ভবকে সম্ভব। কেমন করে হয়? দস্তুরমত অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম ইচ্ছানন্দ স্বামীর মুখপানে।

হাসতে হাসতে ইচ্ছানন্দ বললেন—অবাক হয়ে গেলে যে! দেখলে তো সিদ্ধাই-এর জোর। এবার ঠাণ্ডা হও একটু সরবত খেয়ে। আন এক গ্লাসজল।

জল আনা হল। গ্লাসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ইচ্ছানন্দজী বললেন—খাও ফেলা আনন্দ করে।

সত্যি সরবত। বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

দুপুরে খাবার সময় স্বামীজীকে বললাম আস্তে আস্তে—ইচ্ছানন্দ স্বামীর ইচ্ছাপূরণের কাহিনী।

খেতে খেতে বিদ্যুৎবর্ষী চোখে চেয়ে স্বামীজী শুধু বললেন—হুঁ।

বিকেলবেলা। স্বামীজী বসেছেন দক্ষিণের বারান্দায়। পান্থশালার বিছানা থেকে উঠে মুখে হাতে জল দিয়ে এসে স্বামীজীর কাছে বসলেন ইচ্ছানন্দ স্বামী।

ভ্রু কুঁচকে ইচ্ছানন্দজীর মুখ পানে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে স্বামী নিরালম্ব জলদগম্ভীর স্বরে বললেন—আপনি নাকি এখনও মেতে আছেন সিদ্ধাই-টিদ্ধাই ভোজ-বাজী ভেল্কীবাজী নিয়ে। মোহ কাটাতে পারেন নাই। সংসার বন্ধনের মতই ওটিও মায়ামোহের বাঁধন। নামে যোগযুক্ত হলে কি হবে, আসলে নিচুস্তরের। আত্মার উন্নতির পথে—আত্মদর্শনের পথে অন্তরায়। এ মোহ-মুক্ত হতে না পারলে আশ্রমে এসে কোন লাভ নাই। এটা বুজরুকির জায়গা নয়। সাবধান।

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে নীরবে বসে থেকে ধীরে ধীরে বললেন—ইচ্ছানন্দ স্বামী—অনেক চেষ্টা করেছি, স্বামীজী। সফলও হয়েছি কিছুটা। তবু মাঝে মাঝে এসে পড়ে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ। একটা প্রলোভন লোককে তাজ্জব করে দেওয়ার। বুঝতে পারি—এটা মায়ামোহের কুহক জাল ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুশোচনাও জাগে। তবে কমে আসছে অনেকটা। ভুলতে চাইছি আর ভুলবও। এ মোহ দূরে করবই। শক্তি হারা হই নি, মনের জোর আছে এখনও।

—হ্যাঁ, তাই। যে পথে পা বাড়াতে চাইছেন, সমূলে তুলে ফেলতে হবে সে পথের কাঁটা। চাই অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি। বাধা দূরে করুন। এগিয়ে চলুন।

৫টার সময় বেড়াতে বের হলেন দুই স্বামীজী।

তিন দিন আশ্রম-বাস করলেন স্বামী ইচ্ছানন্দ। পরের দু দিনই বেশীর ভাগ সময় স্বামীজীর সঙ্গে একান্তে চলল অধ্যাত্ম তত্ত্ব আলোচনা।

চতুর্থ দিন সকালে স্বামীজীর কাছে বিদায় নিয়ে ইচ্ছানন্দ স্বামী গেলেন কলকাতায়।

যাবার সময় প্রণাম করতেই মাথায় হাত দিয়ে হেসে হেসে বললেন—ওসব কিছু নয় খোকা—ওব কিছু নয়। সিদ্ধাই-টিদ্ধাই সব ভেল্কী ভোজবাজী, সব ঝুটো। ওর চেয়ে ঢের ভাল জিনিস—দামী জিনিস আছে স্বামীজীর কাছে। পার তো আদায় কর—অমূল্য জিনিস। সিদ্ধাই-টিদ্ধাই-এ ভোল ফেরো না—সব ঝুটো সব বাজে—মেকী।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তাঁর যাত্রা-পথের দিকে।

পনের

শীতের সকাল। মাঘ মাস। গাঁয়ের লোকে বলে—মাঘের জাড়ে মোষের শিং নড়ে। সত্যি তাই। শীতটা পড়েছে বেশ জবরদস্ত রকমের। কাঁঠাল তলায় রোদ-ছায়ার আলপনা। রোদে পিঠ রেখে স্বামীজী কাঁঠালতলায় ইজিচেয়ারে বসে-ছেন পশ্চিম মুখো। সামনে মাঠের পারে সাঁওতাল পাড়া। অনেকগুলি সাঁওতাল ছেলেমেয়ে শুকনো পাতা কাঠকুটো জেলে আগুন পোয়াচ্ছে গোল হয়ে ঘিরে বসে। তাদের পরনে না আছে কাপড়, গায়ে না আছে জামা। কজনের মাত্র একফালি কৌপিন, মেয়েগুলির পরণে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত এক একফালি ন্যাকড়া। ছোট্ট দু-একজনের গায়ে জড়ান গামছা।

স্বামীজীর ডাকে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সামনে আঙুল দেখিয়ে স্বামীজী বললেন—দেখ, দেখ তোমাদের দেশের ছেলেমেয়ে। গ্রীষ্মের খর রোদ, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের কনকনে ঠাণ্ডা—সবই সহ্য করতে হয় এদের, এই শিশুকাল থেকেই। এমনি করেই আগাছার মত বেড়ে ওঠে এরা। খাবার জোটে দাকা দামাড়ি আর ওড়—ফ্যান, ভাত আর শাকপাতা। শিকার করে কাঠবিড়ালী, খরগোস আর ইঁদুর। ঘরে পোষে হাঁস-মুর্গী শুয়োর। এদের মাংস খায় ওরা। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় কি? পয়সার অভাবে বিক্রী করতে হয় বেশীর ভাগ। যাই হোক—সাদাসিদে খাঁটি জিনিস খেয়ে আর প্রাকৃতিক বৈষম্য সহ্য করার অভ্যাসে এদের শরীর গড়ে ওঠে পোড়-খাওয়া লোহার মত মজবুত। বড় হয়ে এরা করে চাষ-আবাদ আর মুটে-মজুরের কাজ—দেশের দশের সেবা। অনেকের মুখেই অন্ন জোগায় এরা। এত কষ্ট করে—এত খাটা-খাটুনি করে নিজেদের ভাগে যা পায়—তা ওদের মাত্র ছ মাসের খোরাক। আর ছ মাস ঋণ করে খেতে হয় এদের। অবশ্য জোটাতে পারলে অনেকে মজুর খাটে। তবু সদা-প্রসন্ন। অল্পেই সন্তুষ্ট এরা। ঐ শোন আগুন পোয়াতে পোয়াতে কেমন মিঠে সুরে গান ধরেছে ছেলে-মেয়েরা।

মাত্র খাওয়া-পরা—অল্প অভাব এদের। সেই অল্পটুকুও জোটাতে পারে না দেশের লোক। পারবে কি করে? বিদেশী সরকার। শিক্ষিত ভদ্রলোকদেরই থোড়াই কেয়ার করে—তা এরা তো নিরক্ষর ছোট লোক। কাহন কড়ি কে বা পোছে, কে বা বুড়ীর চক্ষু মুছে—এদের জন্যে ভাববার কেউ নাই। বিদেশী সরকারের বয়ে গেছে ভাবতে। তাদের দৃষ্টি শুধু খাজনার দিকে। কেউ খেতে পায় আর না পায়—যেন-তেন-প্রকারেণ নিজেদের পেট ভরলেই হোল, শোষণটা চাই। দেশ স্বাধীন হলে এই সব দুর্গতদের কিছুটা সুরাহা আশা করা যায়, চাই স্বাধীনতা। তা না হলে দেশের দুর্দশা ঘুচবে না।

স্বামীজী চুপ করলেন। ধীরে ধীরে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস। কেমন যেন বিমনা ভাব। উদাস চোখে কিছুক্ষণ কাঁঠালতলার

দিকে চেয়ে বললেন—অনেক শুকনো পাতা জমেছে, জড়ো করে জ্বালত একটু আগুন। পোয়ানো যাক একটু।

ঝাঁটা হাতে রেণুদা এসে জড়ো করে দিল পাতার গাদা। দেশলাই ছিল রেণুদার ট্যাঁকে, শুকনো পাতায় আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

মুখে মৃদু হাসি টেনে স্বামীজী বললেন — শীগগির যাও খোকা, খাটের নীচে বড় স্যুটকেসের ভেতরে ডান দিকে আছে কতকগুলি খাতা। নিয়ে এস। সবগুলি আনবে।

এক ছুটে গিয়ে খাতাগুলি এনে দেওয়া হল স্বামীজীর হাতে।

স্বামীজী এক একখানি করে খাতা ফেলতে লাগলেন আগুনে।

ব্যস্ত হয়ে বললুম—ওকি করছেন বাবা, আগুনে দিচ্ছেন কেন খাতাগুলি? খাতা ভর্তি লেখা।

—তাই তো দেওয়া হচ্ছে আগুনে। বনফায়ার—বহ্নুৎসব। বাঁধন মুক্ত।

বাঁধন বলে বাঁধন। পূর্ণাহুতি হোক। বাকী ছিল এটুকু—হাসতে হাসতে বললেন স্বামীজী।

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কি লেখা আছে, স্বামীজী? কোন বই-এর পান্ডুলিপি না কি? নষ্ট হয়ে যাবে?

—অত ব্যস্ত হবার কিছু নাই। পান্ডুলিপি নয়। সাংকেতিক ভাষায় লেখা অগ্নিযুগের নোট। পড়ে বুঝতে পারবে না কেউ।

তেজে তেজ মিশে যাক—অগ্নিযুগের কথা অগ্নিতেই থাক। আপাতত ওদের কাজ শেষ—বলতে বলতে শেষ খাতাখানি আগুনে দিয়ে এই শীতেও কপালের ঘাম মুছলেন স্বামীজী।

কথা ও কাজ শেষ করে স্বামীজী উঠে গিয়ে বসলেন দক্ষিণের বারান্দায়।

ছি-ছি—এ কি হল! একটা মহান যুগের ইতিহাস—স্বাধীনতার জন্যে বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাস—অগ্নিযুগের অগ্নিবাণ অগ্নিগর্ভেই বিলীন হল—মনটা হায়-হায় করে উঠল—দু চোখে বইল আঝোর ধারা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আগুন নিবল। সামনে এক গাদা মিশ কালো ছাই। মাঝখান থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধূপের ধোঁয়ার মত সরু একফালি ধোঁয়া।

হঠাৎ পেছনে হাসির রোল। মিশির ছোপ-ধরা কালো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে রেণুদা বলছে—কি, আজ ওই ছাই-ই খাওয়াবে না কি?

তারপর মুখপানে চেয়ে কাঁধের তোয়ালেয় মুখ চোখ মুছে দিয়ে বলল—কাঁদছ কেন খোকা? কি হল? বাবাজী বকেছেন?

—না। কি যে হল, তা তুমি বুঝবে না, দাদা—একটা যুগের ইতিহাস গেল ছাই হয়ে। খাতা পোড়ানোর কথা শুনে রেণুদা আরও হেসে বললে—স্যুটকেসের খাতাগুলো তো? বেশ হয়েছে, আপদ গেছে। খালি বোঝা—ঝাড়া-মোছা আর নিমপাতা দিয়ে রাখা। কত হোমড়া-চোমড়া বিদ্বান পণ্ডিত কেউ কি পড়তে পেরেছে? পুলিশ এলে খালি—লুকোও লুকোও। তা ভালই হয়েছে—নষ্ট হয় নাই, পুরনো বদলে নতুন হয়েছে। দেখো ও ঘরের টেবিলে। বেড়াতে যাও না—বাবাজী পড়ছেন সব। বলেছেন—ভাঙা ঢাক, সব ফাঁস করেছে।

ওগুলো পড়তে পারত না কেউ, এগুলো পড়বে সবাই। কাঁদে না, ছিঃ, চলো।—কাঁধে হাত জড়িয়ে রান্নাঘরে নিয়ে এল রেণুদা।

ছাপ্পান্ন

দিন দশেক পর। আশ্রম সেবাবিভাগে ভিড় কম। শীতের সময়, গ্রামীণ স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। জ্বরজ্বালা, বদহজম, পেটের অসুখ নাই বললেই হয়। যা আছে—দু-চারজন সর্দি-কাশি হাঁপানী আর বাতের রোগী। তারাও এসে চলে গেছে নিজের নিজের ওষুধপত্র আর পথ্যের ব্যবস্থা নিয়ে।

স্বামীজী পড়ছেন বেশ মোটা একখানা বই চরক সংহিতা। দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার অধ্যায়। সব জিনিসের গুণাগুণ বেশ খুঁটিয়ে লেখা আছে এতে। বহু প্রাচীন লেখা। তবু আধুনিক রসায়নাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে বিশ্লেষণ নিখুঁত।

বেলা ৯টা। পশ্চিমের ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল ভাল ছইওয়ালা এক গরুর গাড়ী। গাড়ী থেকে নামলেন সাটিনন্দী গ্রামের দুর্গাদাস আর সত্যদাস রায়। স্বামীজীর অনুরাগী ভক্ত এঁরা। 'ভক্ত' কথাটা ঠিক খাপ খায় না। এসেছেন অনেকবার। কোনদিন তত্ত্ব আলোচনা, জ্ঞানের অনুশীলন করতে শোনা যায় নাই। বিষয়ী সম্পন্ন লোক। বিষয়-সম্পত্তির কোন রকম গোলযোগে পড়লেই সমস্যা সমাধানের জন্যে আসেন বিষয়বিরাগী স্বামীজীর কাছে। বিষয়বিরাগী হলেও সাংসারিক আচার-আচরণ আর বৈষয়িক বিচার বুদ্ধি স্বামীজীর প্রচুর। বিধিবিধান আইনকানুন জানেন বেশ ভালভাবেই। তাই স্বামীজীর কাছে প্রায় সব সমস্যারই সমাধান খুঁজে পান বিষয়ী বিত্তবানরা। রায়মশায়দেরও অনুরাগ এই বিষয়ভিত্তিক।

স্বামীজীকে প্রণাম করে দু ভাই বসলেন কাছে। এক ঝুড়ি তরিতরকারী আর সন্দেশের হাঁড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে গেল গাড়োয়ান।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে স্বামীজী বললেন—আজ আবার কি ফ্যাসাদ বাধিয়েছ? স্বামীজীর মুখে চাপা হাসি।

বড় ভাই দুর্গাদাস রায় বললেন—ফ্যাসাদ তেমন কিছু নয়, বাবা, তবে একটা সমস্যা বটে। বড় ছেলে বীরেনের বিয়ের বয়স হয়েছে। সংসার ধর্ম তো করতেই হবে। যোগ্য পাত্রীর সন্ধান ও কথাবার্তা চলছিল নানা জায়গায়। ইতিমধ্যে ওর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এসে বললে—বীরেন বলেছে 'বীণাপাণি' ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না সে। শুনে তো হতভম্ব। অনেক বোঝান হল। ছেলে নাছোড়বান্দা। মুখের ওপর স্পষ্টই বলে দিল—বিয়ে করতে হয় তো বীণাপাণিকেই করবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওদের ভাব হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। চিঠিপত্রও লেখালেখি চলে। মেয়েটি স্বল্প-শিক্ষিতা, মধ্যবিত্ত গেরস্ত ঘরের। দেখতে চলনসই—খুব ভালও নয় আর খারাপও নয়। গেরস্থালী কাজে বেশ পটু। বয়স ষোল।

অধরোষ্ঠ চেপে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন স্বামীজী। কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন কি করে বীরেন? সংসার পালন করতে পারবে না, ঘাড়ে চাপানো হবে একটা বোঝা?

—সে দিকে ভালই। থানা স্টেশনে গোলাদারী আর কাপড়ের দোকান চালাচ্ছে ভালভাবেই। কাপড়ের দোকানের সঙ্গে একটা দরজীর দোকানও খুলেছে। নিজে ছাঁটকাট সেলাই-এর কাজ শিখে অর্ডার নিয়ে জামা, ফ্রক, [illegible] পাঞ্জাবী কোট প্যান্ট সবই তৈরী করে। চালু দোকান—উপায় করে মন্দ নয়। সেদিক থেকে ভাববার কিছু নাই—বললেন দুর্গাদাস রায়।

রায়মশায়ের মুখপানে স্থির দৃষ্টি রেখে স্বামীজী বললেন—ভাববার আরও একটা দিক আছে। এই সব অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে—এদের ভালমন্দ বিচার বুদ্ধি থাকে না, দূরদৃষ্টি তো দূরের কথা। সংসারে অনভিজ্ঞ এরা। অনেক সময় চোখের নেশায় বা প্রবৃত্তির তাড়নায় গোলমাল করে বসে। সেটা অস্থায়ী—রং ছুট। চোখের রং ছুটলেই সব গেল। সারা জীবন অশান্তি। কখনও কখনও জন্মায় সত্যি ভালবাসা — যাকে বলে 'প্রেম'। এটি বাঞ্ছনীয়। দু তরফেই ভাল করে দেখতে হবে—প্রকৃত ভালবাসা, না—অপ্রকৃত চোখের নেশা। প্রথমটি গ্রাহ্য, দ্বিতীয়টি ত্যাজ্য। প্রেম হলে বাধা দেবার কিছু নাই, বাধা দিতেও নাই। দুটি জীবন নষ্ট করা হয়। দেখেছ—খোলাখুলি যাচাই করে?

—দুজনকে আলাদাভাবে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখেছি, বাবা। আমরা দুজনেই। ওদের মা কাকিমাও করেছেন। যা জেনেছি তাতে মনে হয় কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবে না স্বামীজী।

(ক্রমশঃ)

ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম পর্যায়

দিলীপ চক্রবর্তী

ইংরেজী ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ের আলোচনার আগে একটি বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। সাধারণত ভারতীয় লেখকদের ইংরেজী রচনাকেই ইংগ-ভারতীয় সাহিত্য নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। (অবশ্য এই পরিভাষাটি এখন আর ভারতীয় এবং বিদেশী সমালোচকেরা বড় একটা পছন্দ করেন না। তাঁরা এই সাহিত্যকে 'ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্য' নামে অভিহিত করেন।) উপরোক্ত নামকরণ যে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, একটা উদাহরণ দিয়ে সে কথা স্পষ্ট বলা যেতে পারে। কয়েক বছর আগে তরুণ সাহিত্যিক অরুণ জোশী 'দ্য ফরেনার' নামক একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন। এই সুরচিত উপন্যাসটি ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকমহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এই উপন্যাসের পটভূমি আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়। উপন্যাসের নায়ক ভারতীয় [illegible] ত্রিনিদাদের অধিবাসী। তাকে অবশ্য এই বিশিষ্ট পটভূমিকাতেই অধিকাংশ সময় দেখতে পাই। প্রসঙ্গক্রমে অবশ্য লেখক ভারতের কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুখ্য পটভূমির পাশে সে বর্ণনা যান্ত্রিক এবং অনুল্লেখ্য বলেই মনে হয়। তাই এই উপন্যাসটিকে ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় উপন্যাস বলে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়, যদিও এই উপন্যাসের লেখক একজন ভারতীয়। এ কথা অবশ্য আধুনিককালের সর্বাধিক আলোচিত ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় উপন্যাস, রাজা রাও লিখিত 'দ্য সারপেন্ট এন্ড দ্য রোপ' সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। এই উপন্যাসে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পটভূমি গৌণ, ভারতীয় পটভূমি অধিকতর উল্লেখযোগ্য এবং উপন্যাসের নায়ক রাম প্রকৃত অর্থেই ভারতীয়। সে বিদেশে চাকরী করে সন্দেহ নেই, তার স্ত্রীও বিদেশিনী, কিন্তু সে মনপ্রাণে ভারতীয়। তাই এই উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে ইংরেজী ভাষায় রচিত ভারতীয় উপন্যাস। কিন্তু যে কোন পটভূমিতে রচিত ভারতীয় লেখকদের যে কোন রচনাকেই আলোচ্য সাহিত্যের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হতে পারে না।

পক্ষান্তরে বিদেশী লেখকদের ইংরেজীতে রচিত ভারতসম্বন্ধীয় রচনাকে অনায়াসেই আলোচ্য সাহিত্যের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যদিও কোন কোন সমালোচক এই অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে তাঁদের মতামত দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় অজস্র উপন্যাস রচিত হয়েছে। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ ঔপন্যাসিকেরাই লিখেছেন। আমাদের এই উপমহাদেশ স্বাধীন হবার পরেও এখনো বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক ভারতবর্ষের পটভূমিকায়, ভারতীয় চরিত্র অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করে চলেছেন। এইসব ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ক্রিস্টিন ওয়েস্টেন, উইলিয়াম বুকান, রুমের গোদার ও জন মাস্টার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচিত উপন্যাসগুলিকে ইংরেজী ভাষায় রচিত ভারতীয় উপন্যাস বলে অভিহিত করার বিপক্ষে কোন যুক্তিগ্রাহ্য অভিমত আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য ভারতীয় পটভূমিতে রচিত অসংখ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে খুব কমসংখ্যক উপন্যাসই উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তির পর্যায়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক এল ব্র্যাণ্ডারের একটি অভিমত স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন যে ভারতীয় উপমহাদেশের পটভূমিতে রচিত বহুসংখ্যক উপন্যাসগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি উপন্যাসই বিশিষ্ট সাহিত্যিক মর্যাদা দাবী করতে পারে। এই তিনটি উপন্যাস হল— রুডিয়ার্ড কিপলিঙ রচিত 'কীম', ফস্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' এবং জর্জ অরওয়েলের 'বার্মিজ ডেজ'। এই উপন্যাসগুলি নিঃসন্দেহে ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের শাখাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরে এবার আমাদের মূল বিষয়টি আলোচনা করতে সুবিধা হবে। আলোচ্য সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের সব লেখকেরাই সহজবোধ্য কারণেই ইংরেজ। তখনো ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়নি। অবশ্য এসব লেখকদের রচনাবলী প্রকাশিত হবার কয়েক দশক পরেই ভারতীয় লেখকেরা ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজীতে কাব্যরচনা করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। পরে অবশ্য তাঁরা তাঁদের বিশিষ্ট প্রতিভা মাতৃভাষার সেবাতেই নিয়োগ করেছেন। কিন্তু ইংরেজীতে রচিত তাঁদের সাহিত্য বৈশিষ্ট্যবর্জিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত এ সব স্বনামধন্য লেখকদের ইংরেজী রচনাগুলি নিয়ে এতদিন বড় একটা আলোচনা হয়নি। ইদানীং অবশ্য কয়েকজন সুধী সমালোচকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। এসব রচনাগুলি ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দ ইংরেজী ভাষায় লিখিত ভারতীয় সাহিত্যের উদ্ভব কাল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ বছরেই 'বেংগল গেজেট' নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এ পত্রিকায় বিভিন্ন খবরাখবর ছাড়াও ছোটগল্প ও কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। এ প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'বেংগল গেজেট' প্রকাশিত হওয়ায় দু দশক পর থেকেই আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির গোড়া পত্তন হওয়া শুরু হয়। তাই আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলি এবং ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্য প্রায় সমসাময়িক।

'বেংগল গেজেট' পত্রিকায় বহু নিয়মিত লেখকদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমজন স্বনামধন্য স্যর উইলিয়াম জোনস এবং অপরজন অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত এবং পরিমিত খ্যাতিসম্পন্ন জন লেডন। এই দুজন সাহিত্যিক ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের পথিকৃৎ। এঁদের হাতেই এই সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল।

সুবিখ্যাত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, জগদ্বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ স্যর উইলিয়াম জোনসের নতুন করে পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বেশ কয়েকজন লেখক তাঁর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এসব সত্ত্বেও কিন্তু একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে তিনি কেবলমাত্র একজন বহির্বিশ্বের কর্মী পুরুষই ছিলেন না, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক অন্তর্মুখী কবিমনও ছিল। সন্দেহ নেই যে তাঁর কবিতা ইংলণ্ডের সমকালীন কবি অথবা পাঠকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, কিন্তু ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের কবিমনে তাঁর কাব্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জোগাতে সক্ষম হয়েছিল। তাই ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। উইলিয়াম জোনস তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনে বিভিন্ন ধরনের [illegible] মধ্যেও প্রচুর কবিতা রচনা করেছিলেন। স্বভাবতই এসব কবিতাবলীর মধ্যে অনেকগুলিকেই খুব উঁচুদরের সাহিত্যকীর্তি বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু একজন্যে তাঁর কাব্যকে অনুল্লেখ্য বলে

বিবেচনা করা অনুচিত। কাব্যের প্রসাদগুণ ছাড়াও তাঁর কবিতাতে হিন্দুধর্মের দেবদেবী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও ভক্তিমিশ্রিত মনোভাব, কালিদাস ও জয়দেবের অতুলনীয় কাব্যসুষমার স্বচ্ছন্দ ইংরেজী অনুবাদ এবং তার সাথেই হাফিজের কাব্যের অনুবাদ, আধুনিক পাঠককেও আনন্দ দিতে সক্ষম হবে।

স্যর উইলিয়ম জোনসের কাব্যসম্ভারকে সাধারণত দুভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে—(ক) তাঁর মূল কবিতাবলী, (খ) সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাব্যের অনুবাদ। তাঁর মূল কবিতাগুলির মধ্যে হিন্দুজাতির বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাগুলি, যথা, হ্যীম টু নারায়ণ, হ্যীম টু লক্ষ্মী, হ্যীম টু কামদেব, হ্যীম টু সরস্বতী' ইত্যাদি সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এসব কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই, তবুও তাঁর 'হ্যীম টু লক্ষ্মী' কবিতার থেকে কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করে তাঁর কবিতার স্বরূপটি জানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

দেবী লক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য করে কবি লিখেছেন :

> Daughter of Ocean and
> primeval night,
> Who fed with moon beams
> dropping silver dew,
> And cradled in a mind were
> dancing light,
> Sow'et with a smile new
> stores and creature' new.

আলোচ্য প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের অবতারণা না করলে কিন্তু আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যে সময় কবি উইলিয়ম জোনস তাঁর বিভিন্ন কবিতায় হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন এবং বৃহত্তর য়ুরোপীয় পাঠকবর্গকে হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন ও সুবিপুল ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন, সে সময়ে য়ুরোপের সর্বমহলে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এক নিদারুণ অবজ্ঞা ও অনাদরের ভাব বিদ্যমান ছিল। দু' একটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করা যেতে পারে। বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ স্যর জন উডরফট তাঁর অধুনাবিস্মৃত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ইজ ইণ্ডিয়া সিভিলাইজড' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন :

> On November 7th 1919, The Daily Telegraph (London) wrote: "There is no civilization known to the world except that of Christianity? All then who are not christians are uncivilized! Cardinal Bourne, speaking about this time at Watford said, 'when you come to nations where Christianity has not penetrated,there is no civilization in our sense of the word except fragmen' which they had picked up from the civilizd christian nation".

যে সময়ে এই ধরনের মতামত য়ুরোপীয় সমাজে প্রচলিত ছিল, সে সময়ে স্যর উইলিয়ম জোনসের প্রথাবিরোধী মতামত নিশ্চয়ই বিশেষরূপে প্রশংসার্হ।

ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম যুগের অপর পথিকৃৎ জন লেডেন। তাঁর জীবনধারা স্যর উইলিয়ম জোনসের মত কর্মবহুল ছিল না। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে কবিতার স্থান মুখ্য নয়। বস্তুত ভাষাতত্ত্ব এবং প্রাচ্য দেশগুলির সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন অধ্যয়নের প্রতিই তাঁর অধিকতর আগ্রহ ছিল। কিন্তু তবুও তাঁর রচিত কাব্য ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। জন লেডেনের কাব্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দর্শনীয় বিষয়গুলির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে, যা সহজেই মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। কবি তাঁর কর্মজীবন ভারতে অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মন মাঝে মাঝেই স্বদেশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। এই ব্যাকুলতা তাঁর অনেক কবিতাতেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই গৃহমুখিনতার মধ্যে যে বেদনা ও বিষণ্ণতার সুর আছে তা সহজেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁর একটি কবিতায় (ওড অন লিভিং ভেলোর) ভেলোরের সীমান্তবর্তী পাহাড়ের চূড়ার এবং অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে। কিন্তু এই বর্ণনাই আলোচ্য কবিতার একমাত্র আকর্ষণ নয়। কবিতাটির শেষে তিনি তাঁর স্বদেশে অতিবাহিত ছেলেবেলার নানা রঙের দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন :

> Yet not for this I muse unseen
> Besides that river's bed of sand,
> Here first, my passive soul to
> cheat
> Fancy portrayed in various sweet,
> The mountains of my native land.

এতো গেল কবিতার কথা। অষ্টাদশ শতকের শেষ দুই দশকে ইঙ্গ-ভারতীয় উপন্যাসেরও আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য কাব্যের তুলনায় এই যুগের উপন্যাস সংখ্যায় এবং সাহিত্যগুণেও অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যুগে লিখিত উপন্যাসও উল্লেখের দাবী রাখে। কবিতা ও উপন্যাসের সাথে সাথেই সমালোচনা সাহিত্যেরও এই সময়েই আবির্ভাব হয়।

আর সেনকোর্ট সম্ভবত ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম সমালোচক। তিনি তাঁর এককালের জনপ্রিয় রচনা ইণ্ডিয়া ইন ইংলিশ লিটারেচার গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে জে, এ, স্কট রচিত নবাব নামক উপন্যাসটি ইংরেজী সাহিত্যের এই শাখার প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। অধুনা দুষ্প্রাপ্য এ উপন্যাসে লেখক সেকালের ভারতীয় নবাবদের বিলাসব্যসন, ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে হার্টলে হাউস নামক আরেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচিত হয়। প্রথ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসনের টেকনিক অবলম্বন করে লেখক পত্রাকারে এই উপন্যাসটি রচনা করেন।

লেখক এই উপন্যাসে সোফিয়া গোল্ডবোর্ন নাম্নী এক সুন্দরী তরুণীর কথা উল্লেখ করেছেন। সে ভারতবর্ষে এসেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে। এদেশ সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য সে তার ইংলণ্ডবাসিনী বান্ধবী আরাবেলাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছে। এই চিঠিগুলিই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। অবশ্য এ বিষয় ছাড়াও সোফিয়া কয়েকটি চিঠিতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের বাসস্থান, সুখসুবিধা, স্বাচ্ছন্দ-অস্বাচ্ছন্দ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সে পরিবেশন করেছে। এ উপন্যাসে সেকালের একটি নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। নিঃসন্দেহে হার্টলে হাউস একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই উপন্যাসের লেখক কে এ প্রশ্নের মীমাংসা কিন্তু আজো হয়নি। বস্তুত সে সময়ে এবং পরবর্তীকালেও এই উপন্যাসের রচয়িতার বাস্তব পরিচয় নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। সে যুগের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কর্মাধ্যক্ষ জন ম্যাকফারলেনও এই লেখকের পরিচয় জানার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও বিফল হন। তাঁরই মত আরো অনেকের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ইদানীং ইংরেজী ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্যের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। এই সাহিত্য সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রায়ই আলোচনা হয়ে থাকে। বস্তুত, আমাদের এ কথা মনে হতে পারে যে ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশেষ প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জনজীবনে এই সাহিত্যের লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যাবে। ইংরেজীতে রচিত ভারতীয় সাহিত্যের এই সম্ভাবনার যুগে প্রথম পর্যায়ের লেখকদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সাহিত্যের সেই প্রাথমিক উদ্ভবের যুগে সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে কিন্তু তাঁদের রচনার ভিত্তিমূলেই যে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য নির্মিত হয়েছে এ কথা অস্বীকার করলে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ করা হবে।

॥ ৪৬ ॥

অনিবার্য কারণে গর্টফ্রেড সেদিন বাগানে পৌঁছাতে পারলেন না। একদিকে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে শীন্-স্মীথ ফিরে যেতে পারেন না, অপরদিকে তদন্তের কাজটাও শেষ হয়নি। দুটি কারণবশত, সুতরাং শীন্-স্মীথকে আর একদিন থাকতে হবে।

ক্লাবের পানাহার ও নাচ-গানের শেষে ফিরে আসতে রাত হয় গভীর। অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্টা মেঘুকে শীন্-স্মীথের নির্দেশে ম্যানেজারের বাংলোতেই থাকতে হয়। পরদিন ভোরে মুহূর্তের জন্যও মেঘু ছাড়ান পেল না শীন্-স্মীথের কাছ থেকে। সেদিন আহার সবই সেখানে। একই টেবিলে তাঁদের সঙ্গে খেতে বসে সাহেব-মেমদের প্রায় মাথা কাটা যাবারই শামিল হয়েছে। এমন সব অভাবনীয় কাণ্ড কেউ সহ্য করতে পারছে না, আবার প্রতিবাদও করতে পারছে না। মিসেস শীন্-স্মীথ সেই রাত কাটালেন বিলির ক্যোয়টারে। তাঁরা বোঝালেন বটে—দুজনে মিলে জঙ্গলে গিয়ে এর চাইতে কত নিকৃষ্ট স্তরে থাকার অভ্যাস তাদের আছে। কিন্তু এখানে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা বাগান এবং পদোচিত ব্যবস্থাও এখানে আছে। তা সত্ত্বেও যতসব উৎকট, মান-সম্মানহানিজনক কাজ।

বিলির ঘরে মিসেস শীন্-স্মীথ বিলিকে নিয়ে কতটা করেছেন তার খবর জানা হয়নি কারো, কিন্তু হাকিম-সাহেবের হাতে পড়ে মেঘুর যে অবস্থা হয়েছে তা সবাই দেখেছে। তাই তার প্রতি ঈর্ষার ভাব কারো মনে আসে নি, বরং তার প্রতি সকলেই সহানুভূতিসম্পন্ন। বেচারাকে সকলেই নিরুপায়। অনেকেরই নজর চোখগুলো শুধু ঘুরে এসেছে তার মুখের ওপর দিয়ে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে বেচারা মেঘু। খেতে বসেছে, খেতে পারে নি পেট ভরে। কথা বলেছে বোবার মত। মন খায় না তবু সেখানে বসে খেতে হয়েছে। গলা দিয়ে কিছু নামতে চায় না—গিলতে হয়েছে লেবুর জল, লেবু নিংড়ানো রস। কান ভোঁ-ভোঁ করেছে, শুনতে হয়েছে গান। চোখে দেখতে পায় না, চোখ তুলে চাইতে পারে না—দেখতে হয়েছে নাচ।

মেঘুর সামনে কথা বলতে, গান গাইতে সাহেবদের গলা বন্ধ হয়ে আসে—তবু কথা বলতে হয়, গাইতে হয় গান; নাচতে গিয়ে মেম-সাহেবাদের পা জড়িয়ে যায়, পায়ে খিল ধরে যায়—তবু নাচতে হয়।

একটি দম্পতি নীরবে উপভোগ করে গেছে এক-একটা দৃশ্য। অপরপক্ষ সহ্য করেছে সব, সংযম সহিষ্ণুতাও দেখিয়েছে প্রচুর, কিন্তু তাদের চোখমুখ কিছু বিদ্রোহ করেছে। সে সব যত দেখেছে, তত তাঁরা বাড়াবাড়ি করে গেছেন—সরল, অবোধ, নির্বোধের মতো।

উইলিয়ম পড়ে যায় উভয়সংকটে—কাকে রাখে আর কাকে ছাড়ে। আভাসে ইঙ্গিতে শীন্-স্মীথকে সে জানায়—যদি মেঘুর নিরাপত্তা তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে তার ব্যবস্থা সে করেছে, এবং তাঁর উপদেশ অনুসারে যা কিছু করতে প্রস্তুত; আর মেঘুর মাকে বাংলোয় ডেকে এনে মিসেস শীন্-স্মীথের যেমন মর্জি তেমন আলাপ আলোচনার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। কিন্তু শীন্-স্মীথ স্বল্প কথায় জানিয়ে দেন—এই দুটি চরিত্র ঘনিষ্ঠভাবে জানবার তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এবং তার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি চাই। মেঘুর ক্যোয়টারটা একটু বড় হলে সে নিজেও সেখানে যেত। তাই তার পরি-কল্পনাটা দুটি অংশে ভাগ করতে বাধ্য হয়েছে—পরে দুটি অংশের লব্ধ বস্তুর যোগফল বিচার করে দেখা হবে।

যুক্তিটা তেমন জোরালো বোধ না হলেও, কল্পনাটা যে দৃঢ় সেটা বোঝবার কোন ত্রুটি হল না। অগত্যা ওদিকের হাল ছেড়ে বাগানের সাহেবদের সামাল দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় উইলিয়মের রইল না। সে নানা ছলে সকলের সামনে ঘুরে বেড়াতে থাকে, সাবধান করে—অতিথি যেন কোন রকম অসম্মান না হয়।

কেউ যেন জীবনে আর কোন ডেপুটি কমিশনার দেখে নি, এমন কোন ইংরেজকে আহ্বান করে ঘরে আনে নি! অমন ইংরেজ অতিথিও দেখে নি কোথাও কেউ!

কি মুশকিল! আবার মহারাণীর সৌজন্যতার দৃষ্টান্ত দেখায়! কবে কুইন্ ভিক্টোরিয়া কোন ভারতীয় অতিথির সম্মান বজায় রাখতে অতিথির অনুরূপ হাত-ধোয়ার বাটির জলে চুমুক দিয়ে-ছিলেন। ওটা হয় আষাঢ়ে গল্প, নয়তো কোন ইংরেজী কেতায় অনভ্যস্ত সম্ভ্রান্তের মান রাখতে অমন করতে হয়। কিন্তু শীন্-স্মীথের কাণ্ডটা তো তেমন নয়। ইচ্ছা করেই তাদের মানসম্মান ঢিলে করতে এমন করা। তাঁর মনে কি আছে কে জানে! যাই হোক—অসহ্য, অমার্জনীয় অপরাধ।

—তবুও অতিথি।

আহা! ধর্মরাজ এলেন। মান ইজ্জৎ সব গেল, শোনাতে এলেন ধর্মতত্ত্ব।—মনের কথা মনেই চেপে রাখতে হয়। বুদ্বুদটাও ওঠবার জো নেই ধর্মরাজের খাতিরে, উইলিয়মের সনির্বন্ধ অনুরোধে।

শীন্-স্মীথের বাগানে আসার ও তার ফলাফলের আর একটা বিশেষ দিক আছে। তিনি আসবার পূর্বে ধর্মঘট শুরু হওয়াটা ছিল অনিবার্য। অর্থের দিক দিয়ে, বছরের এমন সময় সেটা বড় মারাত্মক হত। সেটা শুরু হয় হয়, এমন সময় এল সরকারি তদন্ত। পুলিশ ও হাকিমকে সকলেই ভয় করে, বিশেষ করে যেখানে গলদ থাকে। তদন্তটা পুলিশের হাকিম সাহেব তার সাক্ষী। এই তদন্তের সামনে সকল নকসা, সকল চক্রান্ত ভেঙে চুরমার হতে চলেছে। যে সব মজুরেরা গোলমালে মেতে উঠেছিল, নাচিয়ে তুলেছিল আর সকলকে মামলায় জিততে আসার নেশায়, তারা বেশ মুষড়ে পড়েছে। তাদের গর্ব এখন আহত। কাজের শেষে সে যার ঘরে চলে যায়, তাদের অনেকে এখন তেমন অবারিত ঘুরে বেড়ায় না। যদি বা বাইরে যায় কারো দেখা পায় সকলের তবে পাশ কাটিয়ে চলে। শুধু আড়চো চোখে তাকায় এদিক-ওদিক। কে জানে কার মনে কি আছে, কে কোন দলের লোক! বাগানের বরকন্দাজ দেখলে মাথা নীচু করে। তার ওপর আছে

সরকারি অফিসারদের সঙ্গে আগত বন্দুক-ধারী সিপাহী। এই অল্প সময়ে পরিস্থিতিটা কত বদলে গেছে। এক গম্ভীর আতঙ্ক জড়িয়ে ধরেছে সকলকে।

সরকারি দপ্তরে জুলুমের যে সব ফিরিস্তি দিয়ে মজুরেরা নালিশ জাহির করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, সে সব নিয়ে বেশ ঝঞ্ঝাট বেঁধেছে। অভিযোগকারীরা বুঝেছে তদন্তের ফল ভাল হবে না। অথচ ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সাহেবের সামনে তাদের অভিযোগগুলো খাড়া রাখতে না পারলে চলবে না। তা না পারলে লেবার-কমিশনার, এমিগ্রেশন - কন্ট্রোলারের কাছেও তাদের সব অভিযোগ ভেস্তে যাবে। সেখানেও কিছু হবে না। অথচ তার কোন পথ করে উঠতে পারছে না।

ওদিকে গামারিঘাট অঞ্চলে, জোরহাটে ধর্মঘট লেগেছে। তাদের কাজ কেমন এগিয়ে চলেছে দিন দিন। তাদের কত কিছু দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। সে সবের সঙ্গে নিজেদের কথা মিলিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে দলের কেউ কেউ। আবার কেউ বা ভাবে এখানে তো এমনিতেই সে সব পেয়ে আসছে তারা। ভুলে যায় সব ক্ষণিকের জন্য, তবে এ ঝামেলা কিসের জন্য?

ধর্মঘটটা এক সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ, সে ব্যাধি সকল অর্গল ভেদ করবার মতো শক্তিসম্পন্ন। তা শান্তি অশান্তির ধার ধারে না বর্তমান যুগে। ধর্মঘটের বাজারে এক অংশ থেকে অপর অংশে তা বিস্তার করতে পারা যায় অল্পায়াসে। কয়েকটা গরম গরম কথা বললেই কাজ হাসিল হয়। এখানকার মোড়লরাও তাই করে। মোট কথা অন্তহীন তাদের ঝামেলা অগনিত তাদের দুঃখদৈন্যের তালিকা—একটা ছেড়ে দিলে অপরটা যাবে, সব যাবে। এমন করে ধনীর কাছে হার মানলে তাদের কি আর রক্ষা আছে?

হাঁ-হাঁ! বীরের জাত তারা, বীর তারা —হার মানতে পারে না কোন মতে। যত দুর্বল তত তার দম্ভ। সবাই সবলে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে। যে যেমন বোঝে। কেউ বুঝে পাগল, কেউ না বুঝে।

গোলমাল যখন শুরু হয় নি, তখন একরকম ছিল। কিন্তু শুরু যখন হয়েছে তার শেষ না দেখে উপায় কই। এখন নেশায় পেয়ে বসেছে। এক পক্ষ নেশায় মত্ত, আর এক পক্ষ সরে দাঁড়িয়েছে। সব দোষ তাদের, তারা বিশ্বাসঘাতক। একসঙ্গে এতটা এগিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আরো কি করে তার ঠিক কি! তাদের জব্দ করতে হবে। শোধ নিতে হবে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের। একটার ওপর এল আর এক ধান্দা, আর এক ঝঞ্ঝাট। এই বুঝি লেগে যায় একটা নিজেদের মধ্যে।

পাকা বুদ্ধির মহড়া চলে আনাচে-কানাচে। সরকারি কর্মচারী, সিপাহীদের সামনে হট্টগোল বাধানো উচিত হবে না। ওরা চলে গেলে দেখা যাবে, নইলে অনেক বিপদ এসে যাবে। দলের নেতার ভাবনা—হয়তো আসল লোকের নাম ফাঁস হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ঝগড়া করা বিপদজনক, আবার বিষয়টা এমন ঢিলে দিয়ে রাখাও নিরাপদ নয়। এ সময় গোলমালটা আর একভাবে জিইয়ে রাখাই ভাল, অন্তত ইউনিয়নের মিটিং-এ। জরুরী মিটিং ডাকা হচ্ছে, একটা ভেঙ্গে যাচ্ছে, বসছে আর একটা। তবু কাজ কিন্তু এগোয় না। বেশীর ভাগ লোকই মত প্রকাশ করেছে—অভিযোগ অমূলক, অতএব ধর্মঘটের কথা আসতেই পারে না। অযথা কাজ বন্ধ করে নিজেদের ক্ষতি করতে যাবে কেন, তখন কে খেতে দেবে? কিন্তু অপর পক্ষ সংখ্যায় অল্প হয়েও বড় কঠিন। কাজ বন্ধ করার পরিণাম আলোচনা করতে চায় না, ভাবতেও চায় না। শুধু বিবাদ-বিসংবাদের কথা তুলে মিটিং-এ কোন সিদ্ধান্ত হতে দেয় না। কেউ দেখায় সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, কেউ দেয় লাঠালাঠির ইঙ্গিত।

।। ৪৭ ।।

পরদিন সকালে গটফ্রিড পৌঁছলেন বাগানে। এই খবরটা মোটামুটি সকলের পক্ষেই সোয়াস্তি ও আনন্দের। কিন্তু তাঁর হাতে তখন দুটি বিশেষ জরুরী কাজ—একটির প্রতিকূলে অপরটি। শীন-স্মীথ দম্পতি বিদায় নেবার পূর্বে যথাযোগ্য একটা সান্ধ্যভোজের ব্যবস্থা, আর বিলেতের খবরটা সকলকে দেওয়া। তিনি জানেন যে প্রথমটা যতখানি আনন্দদায়ক, পরেরটা ততখানি উদ্বেগজনক বা মর্মান্তিক হবে সকলের পক্ষে। অন্তত সাহেবদের পক্ষে সেটা বজ্রাঘাততুল্য। কিন্তু যা কর্তব্য তা করতেই হবে। তাই তিনি সকল সাহেবদের বাংলোয় আহবান করলেন মধ্যাহ্নভোজে। দুটো কাজই এক বৈঠকে সেরে নেবেন। সন্ধ্যানুষ্ঠানের আলোচনাটা খাবার পরের জন্য স্থগিত রেখে বলতে শুরু করলেন অভিঘাতের নির্মম সংবাদটা। সেটা বেশ মোলায়েম করে ব্যক্ত করবার জন্য তিনি যথাসাধ্য যত্ন নিলেন। তাই গল্পচ্ছলে, কিছু প্রাসঙ্গিক কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিবরণের অবতারণা করে এমনভাবে তা পরিবেশন করলেন, যাতে নিরানন্দের বার্তার অপর দিকটা সহজ ও সুখপ্রদ করে তোলা যায় সান্ধ্য অনুষ্ঠানে। অন্তত সকলের উদ্বেগ ও আশঙ্কা কিয়দংশে বিলীন হয়ে যেতে পারে সন্ধ্যার আনন্দোৎসবে।

শুকনাশারি টি এস্টেট বিক্রি হয়ে গেছে, জলের দরে। মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকায়।

গটফ্রিড যেমন ভেবেছিলেন—এইটুকু শোনা মাত্র সকলের চোখেমুখে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ঘরের এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্যন্ত একটা গুনগুন শব্দ বয়ে চলল। তিনি সকলকে অভয় দিলেন, শেষ পর্যন্ত সকল কথা ধৈর্য ধরে শুনতে অনুরোধ করলেন। তাঁর কথায় সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কান খাড়া করে রাখল।

গটফ্রিড আবার শুরু করলেন তার আনু-সঙ্গিক বিবৃতি—কারণ, ভারতবর্ষে চা বাগান চালানোর অসুবিধা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে শ্রমিকদের সামলানো দায়। কোম্পানির মালিকরা মনে করেন-এদেশের সবাই আদ্যকালের ধারণা নিয়ে বসে আছে। মালিক মাত্রই নিষ্পেষক, আর কুলিরা নিষ্পেষিত। সরকারপক্ষ চা বাগানের কাজকর্মের কথা কিছুই জানে না, তার সমস্যাও বোঝে না। তার ওপর পলিটিক্স্ করছে, প্যাঁচ কষছে শ্রমিক নেতারা—তাদের দাবির, বা আবদারের অন্ত নেই। সরকার পক্ষ প্রায় তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছে আজকাল। আরো দুর্দিন আসবে, তার আগেই স[রে] পড়া ভাল।

এইটুকু বলেই তিনি চলে গেলেন অ[ন্য] কথায়, প্রসঙ্গটা একটু হালকা বা গভী[র] করতে, অথবা বাকীটুকু সহ্য করবার শ[ক্তি] সঞ্চয়ের সময় দিতে। —এমন সরে পড়ক[ ] দৃষ্টান্তের অভাব নেই পৃথিবীতে। মান[ুষ] স্বদেশে এক প্রান্ত থেকে যায় অপর প্রান্তে দেশ থেকে যায় দেশান্তরে—সেই স[ঙ্গে] যায় শিল্প-বাণিজ্য। ভাগ্যান্বেষণে [ ] যায়ই, তা ছাড়া আরো কত কার[ণে] দেশান্তরে যায়। যে যার ধর্ম ও সংস্কৃ[তি] রক্ষা করতে, বিপ্লব এবং যুদ্ধবিগ্র[হে] বিধ্বস্ত হয়েও যায়। ইওরোপে, পৃথিবী[র] সর্বত্র সে সবের প্রচুর প্রমাণ আছে। বিভি[ন্ন] ধর্মবৈষম্যের কথা ছেড়েই দিলাম, এব[ং] ধর্মাগত নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কথা কে না জানে! সব দ্বন্দ্বের মূলে অসহিষ্ণুতা ও অজ্ঞতা।

কথায় বলে—মানুষের পশুত্ব এখ[নো] দূর হয়নি। কথাটা যতখানি মিথ্যা ততখানি সত্য। মিথ্যা—কারণ, মান[ুষ] মানবের কল্যাণকামী হয়ে অনেক কি[ছু] করেছে। সত্য—কারণ, মানুষের ভিতরে পশুত্ব ভাব সময়ে ধ্বংসমুখ হয়ে উ[ঠে] মানুষকে বিনাশ করে। তার যুক্তি পাও[য়া] যায় একটা সত্যে—জীবসৃষ্টির শুরু থে[কে] এই পর্যন্ত বিবর্তনের ইতিহাস খতি[য়ে] দেখা যায় যে উদ্ভিদাদি থেকে কৃমি, এ[বং] কৃমি থেকে ক্রমান্বয়ে বানর পর্য[ন্ত] পৌঁছোবার সময় যতখানি মন্থর ও দীর্[ঘ] কালব্যাপী, বানর থেকে মানুষ পর্য[ন্ত] পৌঁছোনোর সময়টা সেই অনুপা[তে] ততখানি দ্রুত ও স্বল্পকালে প্রসমা[প্ত।] ফলে মানুষের দেহের বিবর্তনের স[ঙ্গে] মনের বৃত্তি ও বিবর্তন তাল রাখ[তে] পারেনি। অপরপক্ষে এটাও বলা যা[য়] সভ্যতার কতগুলো স্তর পার হয়ে এ[সে] মানুষের মন প্রকৃত সভ্য ও উন্নত হ[তে] পারে সেটার সময় থাকেনি পৃথিবী[র] সর্বাংশে। এই অসামঞ্জস্যই সর্বজনীন সর্বাঙ্গিন অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। এক প[ক্ষ] উঠতে, বা অপরকে টেনে ওঠাতে পো[রে] আর এক পাশ তাকে টেনে ধরবে। [ ] তাই নয়, একে অপরের বিরু[দ্ধে] জন্যও বিশেষ সচেষ্ট। উভয় [ ] পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির

"খোকন হবে দশের সেরা"
জীবন বীমা করান
জীবন সুখে ভ'রে উঠবে
ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে—পাশ্চাত্য জগতের মনীষীরা আজ যা ভাবতে শিখেছে, এখানকার মুনি ঋষিরা তা জেনেছে হাজার হাজার বছর আগে। বেদান্ত ধর্মের ঔদার্য, অদ্বৈতবাদের সর্বজনীন ভাব, বেদোপনিষদের সার তত্ত্বই তার প্রমাণ। তাই এখানকার বিভেদটা সীমাবদ্ধ ছিল নাস্তিক ও আস্তিকের দ্বন্দ্বে—আস্তিক ও আস্তিকের ভেদাভেদ নয়।

এখন এটাকে উলটো করে, জীব-জগতের অপরাপর প্রাণীর স্বভাব মানুষের তথাকথিত উন্নত ভাবের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাক। কর্মচক্রানুসারে সেখানেও কর্মবিরতি নেই। প্রত্যেক জীবই নিজ নিজ স্বভাব, ইন্দ্রিয়বোধ ও গুণানুসারে কর্ম করে চলে। কিন্তু তারই মধ্যে কত গুণভেদ পাওয়া যায়। কৃমি ও মৎস্য জগতের বোধশক্তিটা সীমাবদ্ধ। তারই মধ্যে ডলফিন কত উন্নত। মানুষ তাদের মারে বটে, কিন্তু কত মানুষকে বাঁচায় তারা। সর্কাসের ও গৃহপালিত জীবজন্তু কত স্মরণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও মায়ামমতার পরিচয় দেয়। কলকাতার দাঙ্গার সময়, রাত্তিরে একটা দোকান ভেঙ্গে লুট হচ্ছিল। সেটার কাছেই একটা থানা। দুটো নেড়ী কুকুর দু'পাশ থেকে চিৎকার করে, ঠিক সিপাহীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য।

গৌরীপুরের রাজার একটা হাতী ছিল, সে রসগোল্লা ভাল বাসত। রাজার দেখা পেলে, তাঁর পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করে হাতে দিত। রাজা তখন তাকে একটা টাকা দিতেন, সেটা নিয়ে হাতীটা ছুটতো বাজারে। তাকে একদিন সাপে কাটলো, সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল, রাজা সামনে আসা মাত্র তাঁকে ক্ষত স্থানটা শুঁড় দিয়ে দেখিয়ে দিলে। সাধ্যমতো চেষ্টা করলেন রাজা, কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না।

রাণাপ্রতাপের চৈতক তো ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা।

আর্জেন্টিনার এক পাহাড়ে কয়েকজন অশ্বারোহী শিকারে যায়। তাদের একজন দলছাড়া হয়, ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে সারারাত জঙ্গলে থেকে গেল। ঘোড়াটা বাড়ী ফিরে হ্রেষা রবে জানিয়ে দেয় বিপদের কথা। রাতের অন্ধকারে তো জঙ্গলে কিছু দেখা যাবে না। পরদিন সকালের জন্য স্থগিত রইল। ঘোড়াটা পথ দেখিয়ে সকলকে নিয়ে গেল। কিন্তু সেই জঙ্গলে দুটো পুমা সারাটা রাত তাকে রক্ষা করে অন্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে।

এক শিম্পাঞ্জির মালিক ক্যালি-ফোর্নিয়ার আদালতে অভিযুক্ত হয় লোকালয়ে বন্যজন্তু রাখার অপরাধে। জজ সাহেব, আগের একটা বিখ্যাত কেস উল্লেখ করে বলেন—সেই কেসেই দেখানো হয় আমরা বানরের বংশধর। এবং ঐ প্রাণীটিও তার আত্মীয়। কাছারির ভিতরে ও বাইরে এই জীবটির আচার ব্যবহার আমি যতদূর সমীক্ষা করে দেখেছি, তাতে কোনরকম বন্যভাব তো পাইনি, উপরন্তু অনেক মানুষে অপেক্ষা তার চালচলন বহুলাংশে ভালই পেয়েছি।

বন্যজন্তু আদালতে খালাস পায় তার মানবত্ব প্রমাণ করে, কিন্তু বহু মানুষের বন্য ব্যবহার মানুষের আদালতে পৌঁছায় না!

যেমন হ্যুগেনটেরা ধর্ম ও প্রাণ রক্ষা করতে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হয়ে গেল ইংলণ্ডে, ইহুদীরাও গেল—এবং সেখানে শিল্প-বাণিজ্যের কত উন্নতি করল। কত জার্মান, কত রাসিয়ানও বিপদ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংলণ্ডের কোলে। ঠিক তেমন অবস্থায় পড়ে পার্শীরা এল এদেশে, তাদের শিল্প বিচক্ষণতা, এ দেশের শিল্পবাণিজ্যে তাদের দান কে অস্বীকার করতে পারে? আর এক ভাবে স্প্যানিশ ও পর্তুগীজরা কত দিকে ছড়িয়ে পড়ল, কত নতুন জাত সৃষ্টি করল, আজ তারা কোথায় তলিয়ে আছে। ব্রিটিশরাও কত কাণ্ড করল, কত বড় বড় জাতের সৃষ্টি করল, কিন্তু আজ কিভাবে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে ঠেক খাবে কে জানে! —পাশ্চাত্য জগতের অভ্যুত্থানের বহু পূর্বে ভারতবর্ষ বহু শীর্ষে উঠে নিজের ভারে নেমে এসে ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মহাভারত কথিত গান্ধার, কুরু আজ কোথায়? চন্দ্রগুপ্ত, অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য কতদূরে বিস্তৃত ছিল! বেদোপনিষদ কতদূরে প্রসার লাভ করে! সব মুছে গেলেও আছে অন্তত একটা সাক্ষী—পৃথিবীর সকল ভাষায় ভারতীয় ভাষার প্রাদুর্ভাব ও প্রভাব।

গর্টফ্রিডের মনটা যখন খুব ভাল থাকে তখন, যখন কোন জিনিস অপরকে গ্রহণ করাবার সঙ্কল্প করেন তখন তিনি এমন ধরনের কথার সূত্রপাত করেন। বাগানটা হস্তান্তর হবার খবরটা অশুভ বলেই ধরে নেয় সকলে, কিন্তু তার মধ্যে তাদের সকলের পক্ষে গ্রহণ করবার কি থাকতে পারে! সে যাই হোক, তাঁর কথার ভঙ্গিতে অভিজ্ঞদের কিছু ভাব পরিবর্তন হল। তার ওপর সকলেই সকল খবর রাখে না, অনেকে জানা বিষয় ভুলেও থাকে। সবাই জানে গর্টফ্রিড অনেক তত্ত্বে বিশারদ। তাই সকলেই তাঁর কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে লাগল।

এখানকার কৃষ্টি প্রসারের আর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পৃথ্বীরাজের বিধ্বস্ত সৈন্যদের ইতিবৃত্তে। তখনকার প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধ শুরু হত সূর্যোদয়ের পর, এবং সূর্যাস্তের পর বিশ্রাম। কিন্তু সেই বিশ্রামের সময় শত্রুপক্ষ অতর্কিতে পৃথ্বীরাজের সৈন্যদের আক্রমণ করে। তাতে তারা বিধ্বস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে, এবং দেশ দেশান্তরে। আরব্য দেশ তখন দ্বন্দ্ব ও দলাদলিতে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত। সেই পথে ইওরোপের দিকে যাবার সময় তারা এক পক্ষের হাতে পড়ে অপর পক্ষের অসৎ ব্যবহারের ফলে বলে পার পেয়ে যেত। আজও তারা যাযাবর জীবনযাপন করে নিজেদের সত্তা বজায় রেখেছে, কোথাও তারা জিপসি কোথাও বা রোমানি—অর্থাৎ রম মানি। তাদের নাচগান, খেলাধুলো, কারুকলা নানা দেশে প্রচলিত। আসলে তারা তো ছিল যোদ্ধা, ইওরোপের অনেক রাজার পক্ষে যুদ্ধ করে তাদের শত্রুদের বিতাড়িত করেছে। —হাঙ্গেরি ও ফিনল্যাণ্ডের ভাষার সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু ঐ দুটো ভাষারই উৎপত্তি নিরূপণ করা বড় কঠিন। কারো মতে, নিদেন রাসিয়ান ভাষাতাত্ত্বিকের মতে দাক্ষিণাত্যের ভাষার সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়। তাই এটা অনুমেয় যে পৃথ্বীরাজের দক্ষিণ দেশীয় সৈন্যদের, অর্থাৎ দক্ষিণ দেশাগত জিপসিদের শব্দের প্রাদুর্ভাব ঐ দুটি ভাষায়। শ্লাভ ভাষা যে আর্যাবর্তের ভাষাসম্ভূত সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই। ল্যাটিনের আদি কথা তো সবাই জানে।

ইওরোপের যত বেকার বোম্বেটে এই তো সেদিন গেল আমেরিকায়, সোনা ফলাও করলে সেখানে। তাদের দাসত্ব করতে যারা যায় তাদের অবস্থাও তাদের মুলুকের মানুষের অপেক্ষা অনেক ভাল। আজ সেখানে খরচ বৃদ্ধির ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানের লালবাতি জ্বলেছে, অনেকে সরে পড়েছে দেশান্তরে। বিস্তার নয় টিঁকে থাকার জন্য। পূর্বে ছিল যাদের প্রসার, সে সব এখন গোটানোর পথে। এখন চলছে প্রতিযোগিতার বাজারে টিঁকে থাকার প্রচেষ্টা। মানুষ তার বৃত্তি ছেড়ে বেঁচে থাকে কি নিয়ে। পুরুষপরম্পরায় অভিজ্ঞতালব্ধ এক-একটা বৃত্তি। অ্যালফ্রেড কুপ তার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত, নুরেমবার্গের বিচারে যার মৃত্যু অনিবার্য ছিল সে রক্ষা পেয়ে গেল একটি কারণে—কুপের সঙ্গে জার্মানির শিল্পোদ্ধারের সম্ভাবনা কবরস্থ হবে। অতএব কুপের জীবন রক্ষা পেল, সেই সঙ্গে জার্মানির শিল্পের পুনর্জন্ম লাভ করল। তাই নিজ নিজ বৃত্তি বাঁচিয়ে রাখতে আমেরিকার শিল্পপতিরা গেছে লাইবেরিয়া, হল্যাণ্ড জার্মানী এমন কি ইংলণ্ডেও গেছে, যেখানে যেমন সুবিধে পেয়েছে। আমেরিকা থেকে সে সব কাজকারবার চালাবার প্রচেষ্টা অন্ত নানা কারণে বিফল হত, জনসাধারণের হাতেও সস্তায় পণ্যদ্রব্য পৌঁছাতো না —একদিন ব্রিটেনের ভাগ্যান্বেষীরা এখানে এসেছিল। তারা বেশ কিছু দিয়েছে নিয়েছেও। কিন্তু দেওয়ার অনুপাতে নিয়েছে বড় বেশী। তাই আজ তারা সরে পড়তে বাধ্য, এমন কি নিজের দেশেই টিঁকে থাকতে পারছে না—পরিস্থিতি বাড়াই করবার ক্ষমতার অভাবে, দূরদর্শিতার অভাবে। একদল যায়, আর একদল আসে। এ জগতে টিঁকে থাকবে শুধু দূরদর্শী ও খাটিয়ে শিল্পপতি এবং কর্মী। নইলে

হঠাৎ যাওয়া আসা বন্ধ হবে। কিন্তু এক ব্রিটিশ কোম্পানি যেখান থেকে চলে যাচ্ছে সেখানে আর এক ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান আসার মধ্যে এক রহস্যজনক কারণ আছে।

সমবেত সাহেব কর্মচারীরা সংস্তম্ভিত হয়ে শুনেছিল বড়সাহেবের কথা। তারই মধ্যে, বাগান বিক্রির খবরটা শোনবার পর, যে যার ভবিষ্যত ও ভাগ্য পরিবর্তনের ভাবনায় নিমজ্জিত হয়, প্রায় নির্জীব হয়ে পড়ে। যদিও শুরুতেই গর্টফ্রিড সকলকে অভয় দিয়েছেন, এবং এমন প্রফুল্লচিত্তে নানা কথার অবতারণা করে কথা বলে চলেছেন, তবুও শেষ না শোনা পর্যন্ত তাদের মনের দোদুল্যমান ভাবটা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অবস্থায় রহস্যের ইঙ্গিতে ঘরখানা যেন বেশ একটু সজীব হয়ে উঠল। সকলেই একটু নড়েসরে নতুন খবর নিয়ে কান খাড়া করে রাখল।

পূর্বের মালিকরা এই টাকায় নতুন বাগান করবে, আফরিকায়। সেখানকার শ্রমিকরা নাকি খুব খাটিয়ে, কিন্তু তারা এখানকার কুলিদের মতো চতুর নয়। তাদের মনে থাকে না কিছু। আজ যা বলবে কালও আবার তা বলতে হবে। এটাই এক বড় সমস্যা। তবে তাদের নিয়ে আর কোন ঝামেলার আশঙ্কা নেই, তারা সস্তাও। আশা করা যায় বেশ কিছুদিন এমন চলবে। যে ভুল ইংরেজরা এখানে করেছে তা সেখানে করবে না। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে নানা প্রদেশ থেকে কুলি আনিয়ে বাগানে প্রতিস্থাপিত করা। মস্ত বড় একটা দ্বীপ কেনা হয়েছে অনেকদিন আগে। বৃষ্টি হয় বেশ, চা-চাষের আদর্শ উপযোগী দ্বীপটা। সেখানে মানুষের বসবাস ছিল না। অতএব সেটা নিয়ে রাজনৈতিক ঝামেলা ওঠার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। শুধু জঙ্গল, সে সব কেটেকুটে সাফ করা হয়েছে। বছর মেয়াদে কুলি চালান আসে আশপাশের মূলভূমি থেকে। স্থায়ী কুলি রাখার সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে। কিন্তু এখন দেখা যায় অসুবিধেটাই বেশী। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবে না সেখানে। এই ভাবেই চাষের কাজ চালিয়ে আসছে। বছরখানেকের মধ্যেই চারাগুলো পাতা দেবার উপযোগী হয়ে উঠবে। কারখানা ঘরবাড়ী সব তৈরি হয়ে গেছে। এবার জোর ক'রে কাজ শুরু হবে। এখানকার যে কোন কর্মচারী, মায় কুলি পর্যন্ত যে সেখানে যেতে চাইবে তাকে সেখানে কাজকর্ম দেওয়া হবে, তবে যাওয়া আসার পাথেয় খরচ সমেত পাঁচ বছরের চুক্তিতে। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সে চুক্তি নবীকৃত করাও চলবে। মালিকরা বিশেষভাবে জানিয়েছেন যে, এখানকার যে কোন কুলি কর্মচারী যাতে মনে না করে—এতদিন খাটিয়ে তাদের জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হ'ল।—যারা তা চায় না তারা এখানে থেকে যেতে পারে। নতুন ক্রেতা তাতেও রাজী। উপস্থিত শ্রোতারা দু' পক্ষেরই তারিফ করল। কর্মচারীরা নিশ্চিন্ত হ'ল।

গের্টফ্রিড সেটা লক্ষ্য করলেন। একটু থেমে আবার শুরু করলেন—বাগানটা কিনেছে স্বর্গীয় জনসনের এস্টেট। সব কাজ করেছে এস্টেটের এক ট্রাস্টি—সলিসিটর। যার হাতে জনসন এস্টেটের কর্মভার অর্পিত। এতদিনের মুনাফা জমে এস্টেটের তহবিলে অনেক টাকা প্রায় বৃথা পড়ে ছিল। তারই এক অংশে এই বাগানটা কেনা হয়েছে ট্রাস্টিদের—অর্থাৎ জনসনের বাপ, ভাই ও সলিসিটরের সম্মতিক্রমে। ট্রাস্টিদের একজন নিখোঁজ। বছর চব্বিশ আগে সেই নিরুদ্দেশ ট্রাস্টির খোঁজে ভারতবর্ষের বহু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা ক'রে, প্রতি বছরই তেমন বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। দুরধরিয়া বাগানের ম্যানেজারও এক বছর নানা প্রদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে তাঁর খোঁজ ক'রে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার পর তাকে চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়েছে।

জনসনের দলিলের সর্ত অনুযায়ী এখন এস্টেটের একমাত্র উত্তরাধিকারী, এবং সর্বময় কর্তা সেই নিরুদ্দেশ ট্রাস্টির গর্ভজাত সন্তান—জনসনের একমাত্র পুত্র, মেঘনাদ জনসন।

যেন হাঁ-ক'রে সবাই রূপকথা শুনছিল এতক্ষণ। মনের মধ্যে কৌতূহলের যে জাল বোনা হচ্ছিল, তা আর শেষ হতে চায় না। এবার সবাই একসঙ্গে ফেটে পড়ল—মেঘু!

সাহেবরা অবাক! অবাক হ'ল, না মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল, বা অমনই একটা কিছু হ'ল। গর্টফ্রিড তো ঠাট্টা করেও এমন কথা বলেন না কাউকে। বিশেষ ক'রে তারা তাঁর অধস্তন কর্মচারী, এবং বয়সে অনেক ছোট।

—মেঘু! চারপাশ থেকে প্রশ্ন বর্ষণ হ'ল—মেঘু! আমাদের মেঘু?

গর্টফ্রিড হাসতে হাসতে তাদের সমর্থন ক'রে বললেন—সেইজন্যই তো পঞ্চাশ হাজার টাকাটা ফসকে গেল।

—ফসকে গেল! গর্টফ্রিডের এতবড় লোকসানের কথায়, আসল কথাটা ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়ে গেল।

—ফসকে গেল! কি রকম? ব'লে, উইলি তার মাথাটা চাড়া দিয়ে সিধে হ'য়ে বসল।

—বাগানটা বিক্রী হচ্ছে বলেই আমার বিলেতে যাওয়ার তলব পড়ে। গিয়ে শুনলাম সব কথা, ক্রেতার নামও জানলাম। আইনত তখনও মেঘুর মায়ের সন্ধান দিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবার কথা। টাকাটা তো মেঘুর এস্টেট থেকেই যাবে। অন্য কেউ হ'লে সঙ্কোচের কোন কারণ থাকত না, কিন্তু এক্ষেত্রে তা আর করি কি ক'রে বল?

উইলিয়ম আস্তে আস্তে হেলান দিল চেয়ারে। আর সবাই যেন বোবা হ'য়ে গেছে। কথা কইছে বোবার মত মুখর হ'য়ে।

শীন্-স্মিথ ও তাঁর স্ত্রী মুচকি মুচকি হাসছেন। আর সকলে প্রলাপের মতো প্রশ্ন ক'রে চলেছে—গর্টফ্রিডের এক-

একটা কথা শেষ হবার পর, নয়তো কথার মাঝামাঝি।

এতক্ষণ পর সমস্ত ঘটনা সকলের মনের মধ্যে, সকলের চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ধরা দিল, দেখা দিল। তখন সবাই বুঝল মিঃ ও মিসেস্ শীন্-স্মিথের এমন সব উদ্ভট আচরণের অর্থ। সব খবরই তাঁদের জানা, শুধু দম বন্ধ ক'রে বাগানের সকলকে নিয়ে রগড় করা হচ্ছিল।

সকলের সকল প্রশ্নের যথোচিত জবাব শেষ ক'রে গট্‌ফ্রিড শুরু করলেন ঘরোয়া কথা। জনসনের আত্মীয়েরা বিলির অত দুঃখ-কষ্টের বিবরণ শুনে খুবই মর্মাহত হলেন, আবার মেঘুর এতটা উন্নতির কথা শুনে সবাই খুশীর চাইতে বেশী হলেন আশ্চর্য। জনসন খুব বড় মানুষের ছেলে, সেও নাকি তার বাবার সঙ্গে রাগারাগি ক'রে এদেশে আসে, এবং নিজের সামর্থ্যে এখানে বিষয়-সম্পত্তি করে। কি অদ্ভুত মিল দুজনের জীবনধারায়। তাঁরা সবাই দেখতে চেয়েছেন মেঘুকে। এখুনি তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমায় আবার ফ্লাই করতে হবে মেঘুকে নিয়ে। মেঘুও এখন সাবালক হয়েছে, নিজের বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নিক ট্রাস্টিদের কাছ থেকে।

এত কথার পরেও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে দুলতে দুলতে উইলিয়ম একটা নিঃশ্বাস টেনে বললে—এটা একটা নাটকীয় ঘটনা! বাস্তব হ'লে, কপাল বটে একখানা! মানতেই হবে তা।

—কপালটাই দেখলে! আজীবন দুঃখ-দুর্ভোগটা তোমাদের চোখে পড়ল না? এত কষ্টে কি এদের পড়বার কথা! যত নষ্টের গোড়া ঐ ম্যানেজারটা, তাই তো তার চাকরিটা গেল। হয় খুঁজে বার কর, নয় ভাগো।

খবরটা সাহেবদের মারফত গেল বাবুদের কানে, বাবুদের মারফৎ গেল কুলিদের কানে।—রাবণ লছমীও শুনল। তারা অবিশ্বাস করল, বিশ্বাস করল, হাসল, কাঁদল, চেঁচামেচি করল।—শুনল রাঘব, শক্রী, শর্মিষ্ঠা। তারা ছুটে এল মেঘুদের ঘরে। সেখানে ঘরের সামনে, অগণিত লোক সমাগম। নিজেদের যত ভেদাভেদ সব অন্তর্হিত হয়েছে, শত্রুমিত্রের ভয় ভেঙে সব এক হ'য়ে গেছে। অথচ এক অবর্ণনীয় ভাবে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চেয়ে আছে ঘরের কারো কাছ থেকে একটু করুণা-দৃষ্টি পাবার আশায়। তারা জানে না, ঘরের ভিতরে সকলের অবস্থা। তারা বোঝে না, ঘরের ভিতরে সকলের অবস্থা তাদের অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নয়।

বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে রাঘবরা ঢুকল সেই ঘরে। তাদের বাধা দেবার কেউ ছিল না। যদিও কয়েকটি প্রহরী সেখানে ছিল, তারা পথ ছেড়ে দিল তাদের। গেল তারা বিলির সামনে—হতবিহ্বল, অর্ধ-চেতন বিলি সামনে। সে মুখ তুলে চাইল, তার নিষ্প্রভ চোখদুটো ঘুরে এল রাঘব, শক্রী ও শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর দিয়ে। কোন কথা সে বলতে পারল না। মিসেস্ বিলি জনসন তখন মিসেস্ শীন্-স্মিথের শুশ্রূষার জোরে কোনমতে বসে আছে। চোখদুটো তার খোলা বটে, কিন্তু দৃষ্টি-শূন্য।

রাঘবদের কেউ ভাবতে পারেনি যে, এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে তারা। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। হয় নিরুপায় হ'য়ে, নয় বিমূঢ় হ'য়ে, নয়তো মিসেস্ শীন্-স্মিথের ইঙ্গিতে তারা চলে গেল অন্য কামরায়, যেখানে রাবণ ও লছমী আছে। রাঘবদের দেখা মাত্র ওদের চোখ নেচে উঠল। রাবণে রাঘবে হ'ল মিতালি, কোলাকুলি—রাবণ রাঘবকে জড়িয়ে ধ'রে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল। লছমী ঝাঁপিয়ে পড়ল শক্রীর কোলে, জড়িয়ে ধরল শর্মিষ্ঠাকে—হাসল, কাঁদল, আরো কত কি করল। সে আর এক অবর্ণনীয় দৃশ্য, অভাবনীয় কাণ্ড। এর জন্যও তারা প্রস্তুত ছিল না।

ক'দিন ধ'রে বিলিকে কত রূপকথা শুনিয়েছেন মিসেস্ শীন্-স্মিথ। শীত-বসন্তের মতো।—যদি শোন, জনসনের ভাই, বাবা তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তুমি কি করবে? —যদি শুনতে পাও—জনসন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দিয়ে গেছেন, তাতে কি খুব আশ্চর্য হবে?

এ আবার কোন্ ধরনের কথা! এমন তো কেউ কখনো বলেনি, বিলি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। এমন মানুষ তো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। তবুও সে বোঝে না কোন কথা, আবার বোঝেও। কিন্তু বিহ্বল তার চোখ, স্তব্ধ বুকের ভিতরটা। সেই নিস্তব্ধ বুকের পর্দায় বাজতে থাকে মিসেস্ শীন্-স্মিথের যত কথা। সকল ধ্বনির প্রতিধ্বনি হারিয়ে যায় তার বুকের মধ্যে।

চিরদুঃখিনীর কানের পাশে এমন কথা ভাল লাগে, আবার ভাল লাগেও না। কি আর জবাব দেবে? বিলি চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু অতবড় লোকের গৃহিণী! যদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার একই প্রশ্ন করেন, যদি জানতে চান তার মনের কথা—পারা কি যায় কিছু না বলে? অন্ততঃ জনসনের আত্মার তৃপ্তির জন্য, জনসনের স্মৃতির মর্যাদা রক্ষার জন্যও কিছু বলা নিতান্ত প্রয়োজন, কর্তব্য।

তাই মিসেস্ শীন্-স্মিথের প্রশ্নে নিঃশ্বাস টেনে বিলি বলেছে—সে-কথা আর ভাবি না। তবে এটা নিশ্চয়, তাঁর যা-কিছু সম্পত্তি দিয়ে যাবার কথা আমাকেই। তাঁর মৃত্যু এমন অকস্মাৎ না হ'লে করতেনও তাই।

কেমন ক'রে, কেন তাদের বিয়েটা হয়নি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণও দিয়েছে বিলি। এবং সেইজন্যই জনসনের ইচ্ছা ছিল একটা দানপত্র ক'রে রাখবেন। তার একটা খসড়াও সে দেখেছে। এ-বিষয়ে সে নিজে কখনো কিছু না বললেও, জনসনের আগ্রহে বিরতি ছিল না। বিশেষ ক'রে সে গর্ভবতী হবার পর।

—কোন খবর না নিয়েই তো চলে এসেছ। জনসনের মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর কোন খবর নিয়ে তো দেখনি।

মিসেস্ শীন্-স্মিথ যেমন কথা বলেছেন তেমনি এগিয়ে বসেছেন বিলির কাছাকাছি। তাকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছেন কত সহানুভূতির কথা ব'লে।

মনের আতঙ্ক ও নৈরাশ্য প্রকাশ ক'রে বিলি তার জবাব দিয়েছে—তখন যা মনের অবস্থা, তার ওপর ম্যানেজারটার অমন ব্যবহার, ভয়ই হ'ল। কারই বা তখন তেমন মন ছিল, অত বুদ্ধি ছিল যে, ঝামেলা করবে, ওসব আকাশ-কুসুম ভাববে। বেঁচে আছি ছেলেটাকে নিয়ে, এই যথেষ্ট—তাও এরা ছিল ব'লে। এখন আর অত ভাবি না। ছেলেটা আশানুরূপ মানুষ হ'য়ে উঠেছে, তা কেন আশার অতিরিক্ত। আমার মতো ভাগ্যে এটা কম গর্বের কথা নয়।

—তা ঠিকই বলেছ। ছেলের মতো ছেলে মেঘু। যে-কোন দেশের, যে-কোন

মায়ের পক্ষে গর্বের বস্তু। তবু ওদিকটা ছেড়ে দেবে কেন?

মনের অগোচরে বিলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে—কার জিনিস, কোথায় আছে, কেমন ক'রে আর তা ধ'রে আনব?

—ঠিকানা তো জান, একটা চিঠি লিখে দেখ না। হয়তো কোন উইল বা দলিলপত্র থাকতে পারে। তুমিই তো বলছিলে দান-পত্রের কথা। কত কষ্ট হয়তো তাঁরা করেছেন তোমার খোঁজ ক'রে।

ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে বিলি চেয়ে থেকেছে, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে একটু ফিকে হাসি। মনের অগোচরে মুখ সায় দিয়ে গেছে যতসব আজগুবী কথায়—তা হয়তো করে থাকবেন, ওঁরা লোক বড় ভাল।

সাগ্রহে মিসেস্ শীন্-স্মিথ ঝুঁকে পড়েছেন, বিলির মুখের কাছে গিয়ে বলেছেন—তবে! তবে লেখই না একটা চিঠি। ভাল লোক যখন বলছ, তখন নিশ্চয় একটা মোটা মাসোহারা তো দিতে পারেন, আর থোক্কা কিছু টাকা। ছেলেটাকে বিলেতে পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলতে পারবে। আরো বড় হবে, কত বড় হবে! কোন মা তা চায় না সন্তানের কল্যাণে? এইজন্যই তো আমি এখানে এসেছি।

কথায় কথায় এক হ'য়ে গেছে দু'জনের মনপ্রাণ। বিলির অন্তর থেকে গড়িয়ে পড়েছে অতীতের যত আকাশ-কুসুম স্বপ্নবৎ কথা মিসেস্ শীন্-স্মিথের কানে। বিলির বিগত জীবনের যত ব্যথা-বেদনা বেরিয়ে এসেছে, তার বর্তমানের নিঃশ্বাসে। সে প্রতিটি নিঃশ্বাসের মাঝে থেমে থেমে বলেছে—তাও যে না ভেবেছি তা নয়। —এক-এক সময় বড় কষ্ট হয়েছে ছেলেটার জন্য।—কার ছেলে, কি করছে।—কোদাল নিয়ে গেছে বাগানে হাজিরা খাটতে, মা হয়ে তা দেখতে হয়েছে, সহ্যও করতে হয়েছে। তবে একটা সান্ত্বনা ছিল—মেঘু যা করেছে সব নিজের গরজে, খুশী হ'য়ে। তা না করতে দিলে আবার পড়াশোনায় মন দিত না। হাঁ, যে-কথা বলছিলাম—জনসনের বাবা বা ভাই-এর কাছে চিঠি লেখার বড় ভয় ছিল। যদি ওদিকে কিছু না হয়! আর এদিকে কথাটা জানাজানি হয়ে যায় তখন ছেলেটাকে নিয়ে পড়ে যাব এক ঝঞ্ঝাটে।—তারপর যখন সব খোলাখুলি প্রকাশ হ'য়ে গেল, দেখলাম ছেলেটা তাতে নতুন প্রেরণায় জেগে উঠল —সেটা কম সোয়াস্তির কথা নয় আমাদের পক্ষে তখন ভেবেছিলাম, এবার একটা চিঠি লিখি।—কিন্তু অতদিন পর সব ভুলে গেছি, কোনমতে ঠিকানাটা মনের মধ্যে হাতড়ে পেলাম না।—সে ভাবনা [illegible] জন্মের মতো [illegible] দিলাম।—[illegible] মানুষ [illegible] ওসব [illegible] না

[illegible] আগ্রহে বিলির মনে আশার আলো পুনরুদ্দীপিত করতে মিসেস্ শীন্-স্মিথ বলেছেন—তাই নাকি? আচ্ছা, আমি ঠিকানা জোগাড় ক'রে দেব। একটা চিঠি লিখে দেখ কি হয়। সোজা কথায় যদি হ'য়ে যায়—ভালই, নয়তো, আমার বড় ভাই বিলেতে খুব বিখ্যাত ব্যারিস্টার, তাঁকে ব'লে দেব—হয় কিছু সম্পত্তি, নয়তো দু-পাঁচ হাজার টাকা মাসোহারা, যা হয় একটা হ'য়ে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি তোমায়। এর জন্য তোমার কোন কষ্ট, কোন খরচ হ'বে না।

কথায় কথায় রূপনগর থেকে বিদায় নিয়ে রূপকথা নেমে এসেছে নিছক বাস্তবে। আশা-নিরাশায় হেলেদুলে, মৃদু ভরসায় ভরে মেতে উঠেছে বিলির বুকের ভিতরটা। বিলি চুপ ক'রে থেকেছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে। দু-চোখ তার বন্ধ হ'য়ে গেছে—দুঃখে, আনন্দে, আবার খুলেও গেছে—দুঃখে নয়তো আনন্দে।

এমনিভাবে সাধ্যমত মিসেস্ শীন্-স্মিথ চেষ্টা করেছেন বিলিকে এমন একটা ধাক্কা সামাল দেবার উপযোগী ক'রে তুলতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও খবরটা যখন এল তখন তাকে সামাল দেওয়া সংশয়াত্মক বিষয় হ'য়ে উঠল। আর কিছু নয়—শুধু চুপ ক'রে চেয়ে আছে। দুটি চোখ অনধিকৃত—কানদুটো ইন্দ্রিয়জ্ঞান হারিয়েছে। সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে—কি ভাবছে সে, কি করছে? কি হবে, কেউ বুঝে উঠতে পারে না। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করল, এবং তখনকার জন্য কিছু স্টিমিউল্যান্ট দিয়ে গেলেন, রাতের জন্য ব্যবস্থা দিলেন সিডেটিভ।

ওদিকে শীন্-স্মিথ বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন মেঘুকে নিয়ে। প্রকাশ্যে তাকে নিয়ে তিনি কত কাণ্ড করেছেন,—গোপনে দিয়েছেন পরামর্শ, প্রশ্নগুলো হয়েছে দুর্বোধ্য, মেঘু বিভ্রান্ত হয়েছে তাঁর কথা শুনে—তুমি তো মস্তবড় লোক হে। জনসনের যা-কিছু সম্পত্তি তার সবই তো তোমার পাবার কথা। তা কি তুমি জান না, বা বোঝ না? দেখ হে, দিনকতক পর আমি বিলেতে যাব। তখন আমার ব্যারিস্টার সম্বন্ধীকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করিয়ে দেব। সব পেয়ে যাবে তুমি। তখন আমাদের মতো গরীব লোকের কথা মনে থাকবে তো? হাঁ, থাকবে। তুমি ভাল ছেলে। এতবড় চাকরি পেয়ে এখনো কুলি-লাইন ছাড়তে পারনি—এতেই তো তোমার পরিচয় পাওয়া যায়। না হবে কেন? এতবড় বাপের ছেলে।—দেখি দেখি তোমার হাতের রেখা—।

শীন্-স্মিথের কথায় মেঘু শিশুবৎ চেয়ে থেকেছে। সেই শিশুর হাতটা টেনে নিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থেকেছেন, চোখ বুলিয়ে গেছেন হাতের রেখার ওপর মিনিট-কতক, নিজের আঙুলে দিয়ে সেগুলো মাপাজোখা ক'রে, পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। তারপর বিজ্ঞ জ্যোতিষীর মতো মন্তব্য দিয়েছেন—বাজী রাখতে পারি।—বাপের সম্পত্তি যদি তোমার হাতে না আসে—আমি এক মাসের, মাসের কেন বছরের মাইনের টাকা হেরে যাব।—যাবে আমার সঙ্গে বিলেতে? তোমার কোন ভাবনা নেই, শুধু আমি যা বলব তাই ক'রে যাবে, তাতেই হবে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোন কথার জবাব দেবার অবসর তাকে দেননি শীন্-স্মিথ। তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারেনি মেঘু। শুধু তাকিয়ে থেকেছে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে—নয়তো রয়েছে মাথা হেঁট করে।—এসব ভাবনাচিন্তা মেঘুর মনে আসবার কোন অবকাশ হয়নি কোন-দিন, তাই তার পক্ষে এসব বোঝাও দুষ্কর। কিন্তু শীন্-স্মিথ এমনভাবে তাঁর বক্তব্য বিবৃত ক'রে গেলেন যে মেঘুর মতো অনাসক্তও তা না বুঝে পারল না।

সাহেব তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে এক-আধটা ঠাট্টা-তামাসা করেন বটে, কিন্তু এমন কথা বলেননি তো কখনো। সাহেবের কথার মর্মার্থ গ্রহণ করবার অঙ্কুর যখন তার মনের মধ্যে গজিয়ে উঠল, তখন সে অঙ্কুর ধীরে ধীরে ডাল-পাতায় বিস্তৃত হয়ে, পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকল।—তবে কি সত্যই এসব হ'তে পারে?

ইংরেজরা যুদ্ধবিগ্রহ করে, ভাঙ্গাগড়া করে ধ্বংস করে সৃষ্টি করে—বর্তমান জগতে কত বড় বড় কাজ করে। প্রাচ্য-বাসীর ধরনে মনোবেগাবিষ্ট হ'লে তাদের চলে না। গট্‌ফ্রিড তাঁর উপক্রমণিকা শেষ ক'রে সরাসরি চলে গেলেন কাজের কথায়, এবং বাগান চালানোর বিষয় মেঘুর মতামত জানতে চাইলেন। যদিও তিনি জানেন তার মনের অবস্থা, তবুও তাকে বাধ্য করলেন অনতিবিলম্বে তাঁর কথার জবাব দিতে। ক্ষণিকের জন্য মেঘু প্রকৃতিস্থ হ'তে বাধ্য হ'ল। অত্যন্ত করুণ ও বিনীত ভাবে, অতি সংক্ষেপে তার বক্তব্য শেষ করল। সকলে বুঝল—হ'তে পারে সে মালিক, কিন্তু বড় সাহেবই সর্বময় কর্তা হ'য়ে থাকবেন। তাতে সাহেবদেরই প্রথম মনবিবর্তন দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের পরিবর্তে পুষ্প বর্ষিত হ'তে থাকল বাগানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

দ্রুতবেগে খবরটা ছুটতে থাকল দূরে থেকে আরো দূরে। সেই সঙ্গে কাতারে-কাতারে কুলিরা সার দিয়ে ছুটল মেঘুর ঘরের দিকে। এই জনতা মেঘুকে ধ্বংসের নয়, প্রতিষ্ঠার। প্রহরীদের সাধ্যাতীত এ-জনতা সামাল দেওয়া। স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে, শিশুরা সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, অবাক হ'য়ে ছুটেছে তীর্থযাত্রীর মতো। বিস্ময়ের তলায় ঢাকা পড়ে গেছে সকলের বিরোধ বৈরভাব সকল ঝামেলার কথা-কল্পনা। সেদিন সকালে যারা মেঘুর সঙ্গে কথা বলেছে [illegible] দাঁড়িয়েছে, তারা ধন্যজ্ঞান করেছে নিজেদের। তারা নিশ্চিন্ত নিরাপদ বোধ করছে মনে মনে।

বাগানের নানা অংশে নানা ভাবের প্রতিক্রিয়া চলেছে। সকলের সকল চেষ্টা মেঘুকে নিয়ে। কে তার সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠতা করতে পারে।—বেচারা নিধিরাম আশপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে সরে গেছে। ঘেঁষতে পারেনি তার কাছে এতবড় সাহেবদের ঠেলে। বাগানের সাহেবরা, হাকিম সাহেব, পুলিশ সাহেব—তাদের মাঝে মেঘু। মেমরাও যাওয়া-আসা করছে, নতুন চোখে সবাই দেখছে মেঘুকে। ডেভিড ঘুরছে-ফিরছে কথাও বলছে। কিন্তু তার মেয়েটা উসখুস ক'রে মুখ বুজে থেকেছে আশেপাশে। অনেক চেষ্টা করেও এ্যানি এগোতে পারেনি মেঘুর সামনে।

রুকুনীর সঙ্গে প্রমীলা গেছে মেমুদের ঘরে। মেঘু তো নেই সেখানে, আর যারা আছে তারা না-থাকারই শামিল। মেমুদের কারো কাছে যাওয়া না-যাওয়া দুটোই যে সমান, সেটা কেউ বুঝে ওঠে না। ওখানে গিয়ে প্রমীলা পড়ে গেছে শর্মিষ্ঠার সামনে। বেজির সামনে সাপটার মতো—তার চোখদুটো টেনে নিয়েছে শর্মিষ্ঠার চোখ। অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেছে, উপায় নেই সেখান থেকে প্রমীলার চোখ ফেরাবার। যেন আগুন ঠিকরে আসছে সে চোখ থেকে, প্রমীলাকে না পুড়িয়ে ছাড়বে না।

মেঘু? সে নির্বিকার, অনাসক্ত। সে শোনে নি কিছু। সে সব শুনেছে। বিশ্বাস করেনি, সব বিশ্বাস করেছে। সে ধীর, স্থির, আশ্চর্য, অভিভূত উদভ্রান্ত—নিদ্রিত, জাগ্রত। ঘুমিয়ে জেগে থাকে, জেগেও ঘুমিয়ে থাকে মেঘু। আবিষ্ট, অনাবিষ্ট তার মন। দগ্ধ, বিমুগ্ধ, বিমূঢ় তার মন। যা কিছু পুরানো সব মুছে গেছে মন থেকে, যা কিছু পুরানো সব জড়িয়ে আছে তার মনে নতুনের সঙ্গে, নতুনভাবে। কথা কয় সে, কয়ও না: সংযত, অসংযত তার কথা। সে নতুন। সে পুরানো। পুরানো গাছে নতুন পাতা। শীতের পাতাঝরা ডালে বসন্তের সবুজ অঙ্কুরের মতো নতুন সে। আর একবার মেঘু নবজীবন লাভ করল, আর একবার জানতে পারল সে জাতিসংকর।

সাহেব-মেম? ভোল ফিরে গেছে তাদের। একদিন যাদের মাথা কাটা গেছে মেঘুর সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসে, আর একদিন তারা ধন্য হয় মেঘুর সঙ্গে এক টেবিলে বসতে পেয়ে। একদিন যারা বিরক্ত-আড়ষ্ট ভাব দেখিয়েছে মেঘুর সামনে নাচ-গান করতে, আর একদিন মেঘুর সামনে তাদের গতিবিধি সহজ-সাবলীল, ছন্দপূর্ণ, ছন্দবিহীন, উদ্দাম-চঞ্চল। মেঘুকে নিয়েও নাচগান করতে ব্যস্ত ব্যগ্র। পারে তো তাই করে। টানতে টানতে তারা নিয়ে যায় মেঘুকে, নির্বাক নিস্পন্দ মেঘুকে। কোন ইংরেজ মেঘুর স্থলাভিষিক্ত হলে অতটা করা সম্ভব হত না তাদের পক্ষে।

সে রসে বিমুখ মেঘু। তাদের অত চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখে একটু হাসিও ফুটে ওঠে না। হতে পারে জাতিসংকর, কিন্তু জাতিস্মর সে। সে জানে তার স্থান ওখানে নয়। যদিও সাহেবদের কাছে জাতিসংকর আজ শংকররূপে আবির্ভাব হয়েছে।

একথা বলা বাহুল্য যে নানা স্তরের ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মোটকেড় শহরে, এমনকি গ্রামেও বসবাস করে থাকে। তাদের পরস্পরের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বা যোগাযোগ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে। শহরে কেউ কাউকে জানারও প্রয়োজন হয় না। সেখানে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে পরস্পরের অবধেয় না হয়ে কেউ কারো পরোয়া না করেও প্রায় পাশাপাশি বসবাস করতে পারে—তা একদিকে মেঘুর তুলনায় বহুগুণ ধনী এবং অপরদিকে বাগানের কুলিদের অপেক্ষা অধমজন দুঃস্থ দুটোই হতে পারে।

কিন্তু এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাগানজেলাতো মাত্র তিনটি সম্প্রদায়—সাহেবেরা, বাবুরা আর শ্রমিকরা। এদের একের সঙ্গে অপরের অর্থসামর্থ্য ও দৈনন্দিন জীবনযাপন ধারায় আকাশপাতাল প্রভেদ। অংশীদারেরা বিলেতে বসেই কর্মচারীর মারফত বাগান চালিয়ে এসেছে এতকাল। সেখানে সর্বাংশের অধিকারী মেঘু। তাই এটা একটা কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তো নয়ই, উপরন্তু এটাই এখানকার সকল বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন কীলক।

সেই উপলক্ষ্যে কুলিকর্মচারী সকলেই কামাই অনুরূপ পারিতোষিক পেয়েছে। তাই বাগানে উৎসব। কানায় কানায় বাগানটা ভরে আছে উৎসবের আনন্দে। কুলিদের ঘরে, বাবুদের ঘরে, সাহেবদের ক্লাবেও সর্বত্র হৈহৈ রৈরৈ।—কেবল একটি ঘরে সবাই স্থির হয়ে বসে আছে যেন শ্রাদ্ধবাসরে—জনমনের স্মৃতিতর্পণে।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

নির্বাচনের কথায়

আমার এক পরিচিতার কাছে নির্বাচনের কথা পাড়তেই তিনি সরোষে মন্তব্য করলেন, 'এককালে জানা ছিল যে কানু ছাড়া গীত নেই আর এখন দেখছি ভোট ছাড়া কোন প্রসংগ নেই। যেখানে যাও সেখানেই এই এক কথা। দু'পাঁচজন এক সঙ্গে বসে একটু জমিয়ে আড্ডা দেব তা নয় ঘুরে ফিরে সবাই সেই এক জায়গায় পৌঁছে যায়। এ যেন সেই 'অল রোডস লীড টু রোম'-এর মতো ব্যাপার। এ আর ভালো লাগে না।

'কেন ভালো লাগে না?' আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল।

'কাঁহাতক আর পারা যায়। ভোট তো এখন বছরকার ব্যাপার। আগে প্রতি পাঁচ বছর ভোট হতো। এখন হয় বছর বছর। এই দেখ না, ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর দু'বার মধ্যবর্তী নির্বাচন হলো। এটা অবশ্য সাধারণ নির্বাচনের কথা। কিন্তু গতিক দেখে মনে হয় এরপর সাধারণ নির্বাচন বলে কোনকিছু থাকবে না। বছর বছর ভোট হবে। এসব দেখে-শুনে ভোট সম্বন্ধে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। এ-ব্যাপারে কথা বলতেও আর ইচ্ছে করে না। আর আপনিই ভেবে দেখুন না নিছক রাজনৈতিক নেতাদের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার জন্য এরকম বিরাট জনবল এবং অর্থবলের অপচয়ের কোন মানে হয়? কোন দেশে এমনটা হয় শুনেছেন? তোমরা লাঠালাঠি করে মরছ আর দায় ভোগ করতে হয় আমাদের। তাই ভোটের আলোচনায় আর মন লাগে না। জানিতো, আসছে বছর আবার ভোটের বাদ্য বেজে উঠবে। তার চেয়ে বরং দু'দণ্ড বাংলাদেশ নিয়ে কথা বললে প্রাণটা জুড়োয়। সত্যি, পূর্ব-পাকিস্তান যে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসবে ভাবতেই পারিনি কোন দিন। কতদিন পর আবার দেশে ফিরতে পারবো। এটা ঠিক দেশে ফেরা নয়—পরবাসে যাওয়া। জন্মভূমি দেখতে পাবো সেটাই বড়ো কথা।' এবার তাঁর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল।

তিনি যে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য পারমিটের চেষ্টা করেছেন সেকথা আমার জানা ছিল। ঘট করে কথাটা মনে পড়লো যে, ফর্ম আনার পর এখনও তিনি সেটা জমা দেননি। জন্মভূমি দেখার আগ্রহ স্বাভাবিক ভাবে দেরি করছেন কেন? সন্দেহ থেকেই কথাটা সরাসরি জিগ্যেস করে ফেললাম, আপনি কি ভোটের আগেই যাচ্ছেন বাংলাদেশে?

এবার ভোটের কথায় তিনি আর ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বরং বেশ শান্তস্নিগ্ধ কণ্ঠেই বললেন, তা কি করে হয়? নাগরিকের দায়িত্ব আর কর্তব্য পালন না করে বেড়াতে যাই কি করে? তাই ভোট দিয়ে তারপর যাব ভাবছি।

এবার আমার পালা। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, তাহলে ভোট সম্বন্ধে আপনার এতো বিরক্তি নেহাতই মনগড়া। আসলে আপনি এ-ব্যাপারে অনেকের চেয়ে বেশি উৎসাহী।

তা উৎসাহ থাকবে বৈকি! আমরা একেবারে সমান-অধিকারের সুযোগ পেয়েছি। পৃথিবীর খুব কম দেশেই তা সম্ভব হয়েছে। আমেরিকা - ইংল্যাণ্ড - জার্মাণীর মেয়েদের এই সুযোগ আদায়ের জন্য কম লড়তে হয়নি। সুতরাং যে সুযোগ এত সহজে আমরা পেয়েছি তার সদ্ব্যবহার করতে হবে সবাইকে। তাছাড়া পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশ হলো সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর এই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হলেন একজন মহিলা। এ তো কম গৌরবের কথা নয়। বিশ্বে আর কটা রাষ্ট্রের নারী-সমাজ এতো স্বল্প সময়ে এই গৌরব অর্জন করতে পেরেছে বলুন? আমার বিচারে নির্বাচন হলো আরো অধিকার অর্জনের সুযোগ। সে সুযোগ আমরা নিশ্চয়ই হেলায় হারাতে পারি না। তাই নির্বাচন সম্বন্ধে আমার উৎসাহ খুবই স্বাভাবিক।

তাহলে এতো বিরক্তি প্রকাশ করলেন কেন? ভদ্রমহিলাকে আর একটু উস্কে দিই। বিরক্তি কি সহজে আসে। সারা দেশে মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক মহিলা। অথচ আজ পর্যন্ত যতগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে হিসেব নিলে দেখা যাবে যে মহিলা-প্রার্থীর সংখ্যা সে তুলনায় নেহাতই সামান্য। কেউ কেউ বলবেন যে এ হলো আমাদেরই দোষ। আমরাই নিজেদের রাজনীতি থেকে দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছি। তাই নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। সব রাজনৈতিক দলই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই একই কথা বলবে। তাঁরা আরো বলবেন যে ডাউনিং স্ট্রীট বা হোয়াইট হাউসে মহিলাদের প্রবেশাধিকারলাভের সম্ভাবনা এখনো দূরে

অন্তত কিন্তু সে দেশের নারীসমাজ নির্বাচনে দারুণ উৎসাহ নিয়ে নিজ নিজ প্রার্থীর হয়ে কাজ করেন। আমি কিন্তু তাঁদের এই অভিযোগ মানতে রাজি নই। স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে শুরু করে প্রতিটি ব্যাপারে আমরা রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে এসেছি এবং দিনে দিনেই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তো সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম যে মণিপুরের মেয়েরা এবারকার নির্বাচনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শত শত মেয়ে সেখানে নিজ নিজ প্রার্থীর অনুকূলে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন। কথায় কথায় তো আমরা বিদেশের তুলনা টানি কিন্তু আমাদের দেশেও তো এ জিনিস হচ্ছে। তবু কোন রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আরো প্রমাণ হাতের কাছেই রয়েছে গুজরাটে ১৬৮টি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে ৪০টিতে মহিলা ভোটারের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। মোট ভোটারের ক্ষেত্রেও মেয়েরা প্রায় পুরুষের সমান সমান। তবে এই অবিচার কেন?

অন্য সব রাজ্যের কথা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরুন না কেন। ১৯৬৭ সালের পর এই রাজ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার নির্বাচন হচ্ছে কিন্তু মহিলাপ্রার্থীর সংখ্যা তেমনভাবে বাড়ছে না। বরং দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও সংসদে মহিলা সদস্যার সংখ্যা হাতে গোনা যায়। অথচ এখন পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা তার একমাত্র প্রতিকার আরো অধিকসংখ্যক মহিলার মনোনয়নদান। দলমত নির্বিশেষে সকলকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থাকে উপলব্ধি করতে হবে মায়ের অন্তর দিয়ে। গত কয়েক বছরে কত মায়ের কোল খালি হয়েছে আর কত স্ত্রী স্বামী হারিয়েছেন সেকথা ভাবতেও আমি শিউরে উঠি। সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র নারী। যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করেছিলেন ইয়াহিয়া-শাহী জল্লাদের উদ্যত বেয়নেটের মুখে অসহায় বাংলাদেশবাসীর অবস্থা। তাঁর এই মহান উপলব্ধি থেকেই সে দেশের আকাশে আজ শোভা পাচ্ছে স্বাধীনতার সূর্য। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এই রাজ্যের বর্তমান অবস্থার উপলব্ধি এবং প্রতিকার নারীর পক্ষেই সম্ভব। পুরুষ শাসন করেন। কিন্তু নারী শুধু শাসন করেন না তিনি মাতৃহৃদয় প্রসারিত করে উপলব্ধিও করেন। আর তা হলেই বছরান্তে এমন ভোটের বাদ্যি বেজে উঠবে না। এই সঙ্গে অতীতের মতো বর্তমানেও এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই সারা দেশে এক নতুন রাজনৈতিক সচেতনতার জোয়ার বইবে। যার পথিকৃৎ হবো আমরা।

সমস্ত গুমোট কাটিয়ে এক চিলতে হাসিতে এতক্ষণে তিনি উজ্জ্বল হলেন।

নিজের কথায় পশ্চিম বঙ্গের মহিলা পুলিশ

'সেই সংস্কার আমাদের এখনো কাটেনি। সেই কবে আমরা 'লেডি ডাক্তার' কথাটা আমদানি করেছিলাম কিন্তু তারপর থেকে এর আর কোন পরিবর্তন হয়নি। সেদিন এমনিতেই ডাক্তারের স্বল্পতায় মহিলা কোন ডাক্তারের সন্ধান ছিল দুর্লভ। তাই বোধহয় লেডি ডাক্তার কথাটির উদ্ভব। পুরুষডাক্তার বা, মহিলা-ডাক্তারও তাই। দুজনেরই পরিচয় ডাক্তারিতে। কিন্তু 'লেডি ডাক্তার' কথাটি আমাদের দেশে চলে এসেছে এবং এখনো চলছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে যেমন লেডি ডাক্তার, পুলিশ সার্ভিসে আমরা তেমনি লেডি পুলিশ। একদল রোগ সারিয়ে সমাজের কল্যাণ করে আর আমরা সামাজিক নিরাপত্তার ভিৎ গড়ে তুলি। খুব বড় কথা খুব ছোট করে বললাম বটে কিন্তু এর মধ্যে একচুল অসত্য নেই। সামাজিক নিরাপত্তা-বিধানই হলো আমাদের পুলিশ সার্ভিসের মূল কথা। কথাটা শুনে হয়তো কেউ অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন তবে তাঁরা যদি আমাদের চাকরির সব কথা শোনেন তাহলে এই সন্দেহ মিলিয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক।

পশ্চিমবঙ্গে আমরা সাকুল্যে তেরজন লেডি পুলিশ। আরো একজন ছিলেন। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। ১৯৬৬ সালে আমাদের চাকরি হয়। এর আগে কোনদিন ভাবতেই পারিনি যে পুলিশের চাকরি করবো। এ-সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের কারো বাড়িতেই কোন আপত্তি ওঠেনি। চাকরি সে পুলিশ হোক আর কেরানী হোক তাতে আমাদের আপত্তি ছিল না। আমাদের কথা ছেড়ে দিয়ে আরো পাঁচজনের কথা ধরলে অবশ্য এ-সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। সেই যে প্রথমে সংস্কারের কথা বললাম। নার্সের চাকরিতেও তো অনেক মা-বাবা মন খুলে সায় দিতে পারতেন না। বরং এটা বাদ দিয়ে অন্য-কিছু হলেই ভালো। অথচ ভেবে দেখুন এ নার্সিং-এর মতো এমন পুরোপুরি সমাজধর্মী কাজ আর কি আছে?

তাই সেদিন খুব বেশি ভিড় হয়নি। মোট প্রার্থী ছিল তিনশোর কিছু উপরে। এবার কিন্তু সংস্কার ফিকে হয়ে আসছে। নতুন লেডি পুলিশ নেওয়া হচ্ছে জনা দশেক। এজন্য প্রায় হাজার দুয়েক ইন্টারভ্যু দিতে এসেছিলেন। এর একটা বড় কারণ যে এখন চাকরির বড়ো অভাব। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হবে আগেকার দিনের সেই গোঁড়ামি অনেক ক্ষেত্রের মতো এখানেও টিকছে না। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে আমাদের নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে লেডি পুলিশের পত্তন। সেদিক থেকে আমাদের পথিকৃতের মর্যাদা প্রাপ্য। অবশ্য কলকাতা পুলিশে অনেক আগে থেকেই লেডি পুলিশ প্রচলিত ছিল। তবে সবই হয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে। ১৯৪৯ সালে কলকাতা পুলিশে প্রথম মহিলা রিক্রুট হন।

এমনিতে পুলিশের ট্রেনিং এক বছর। আমরা কিন্তু আট মাসের ট্রেনিং নিয়েছি। ট্রেনিং শেষ করে যখন চাকরিতে জয়েন করলাম তখনো এ-সম্বন্ধে আমাদের খুব একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে এটা বুঝেছিলাম যে পুলিশের মতো সব সময় ধরাচূড়ো পরে আমাদের ডিউটি করতে হবে না। আমাদের কাজ হবে ভিন্ন ধরণের। কাজ করতে এসেই স্বাদ পেয়ে [illegible] একমাত্র মহিলাসংক্রান্ত ব্যাপারেই আমাদের ডাক পড়ে। এর মধ্যে মিসিং স্কোয়াডের কাজই বেশি। এজন্য আমাদের প্রায় সব দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। আমরা অনেকেই লখ্নৌ, পুরী গিয়েছি একাজের দায়িত্ব নিয়ে। প্রাথমিক কাজটা অবশ্য পুলিশ স্তরে। তারপর আমরা গিয়ে তাদের নিয়ে আসি। এ সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়। যাতে উদ্ধারপ্রাপ্তা না পালিয়ে যায় অথবা ট্রেন থেকে না লাফিয়ে পড়ে। সময় সময় অবশ্য আমাদের সঙ্গে পুলিশ থাকে। কিন্তু সব সময় তো থাকে না। তাই খুব সাবধানে থাকতে হয়। প্রচুর মেয়ে এভাবে আমরা উদ্ধার করে মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। কাজের মধ্যে এটাই হলো আমাদের মুখ্য। আর এখানেই [illegible] পাঁচটা কাজের সঙ্গে আমাদের তফাৎ। এয়ার-হোস্টেসরা যেমন কাজের সুবাদে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পায় তেমনি আমরা নিজের দেশকে বেশ ভালোভাবে দেখার সুযোগ পাই। অন্য কোন চাকরিতে এমন সুবিধা পেতাম কিনা খুবই সন্দেহ। সেদিক থেকে একাজ আমাদের খুবই পছন্দ। প্রথমে অনেক আশংকা ছিল তবে সেসব আশঙ্কা এখন অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে।

একটা মজার কেসের কথা বলি শুনুন। বাড়ির ঝি—গেরস্থের গয়নাগাটি নিয়ে পালায়। অনেক দিন পর বাড়ির মালিক তাকে এক জায়গায় দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ মহিলাটিকে ধরে। এরপর দায়িত্ব আসে আমাদের। আমরা তার সঙ্গে ঘরে

ঘুরে কোথায় তিনি সেই গয়না বেচেছেন তার হদিশ করে বেড়াই। কিছু কিছু গয়না উদ্ধারও হয়। এভাবে আমাদের কাজ হয়ে গেলে তাকে আমরা পুলিশ কাস্টোডিতে গচ্ছিত করে দিই।

যখন কোথাও কিছু ঘটে এবং তাতে মেয়েরা অংশ নেয় তখন আমাদের ডাক পড়ে। এই ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের প্রায় সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে বেড়াতে হয়। ধরুন, কোন কারখানার সামনে মেয়ে ধর্মঘটীরা শুয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আমাদের গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনতে হয়। পুলিশ এ সময় একদম নিরুপায়। আমরা গিয়ে ধর্মঘটী মহিলাদের সংগে কথাবার্তা বলি। নানাকথা বোঝাতে হয়। তারপর তাঁরা প্রায়ই আপনা থেকেই সরে যান। অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে বোঝাতে পারলে সবাই বোঝেন। অবুঝের মতো ব্যবহার কেউ করেন না।
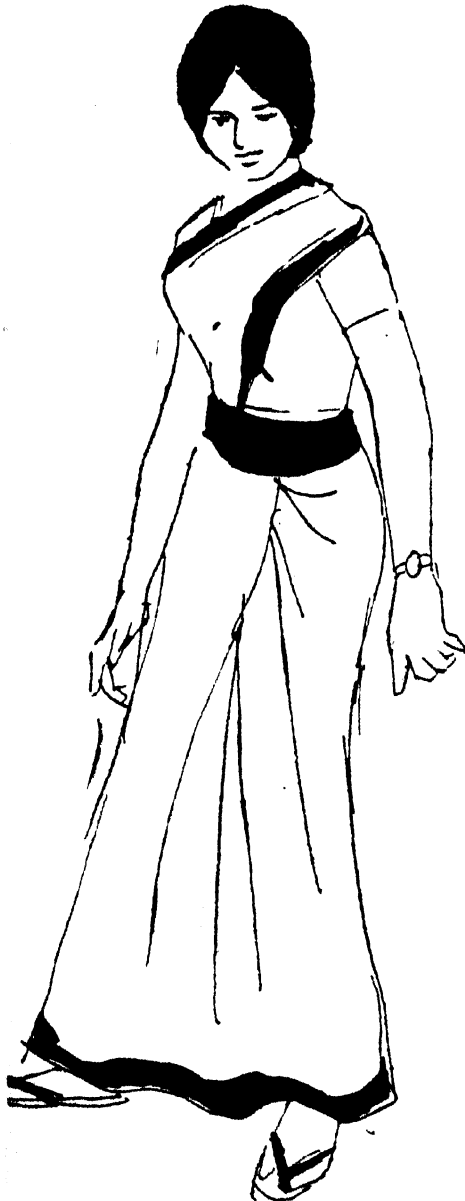
এই যে আমরা দায়িত্ব নিয়ে প্রায়ই বাইরে যাই এ ব্যাপারে আমাদের অফিস কর্তৃপক্ষ খুব সজাগ। আমরা সরাসরি এস-পি'র অধীনে কাজ করি। কোথাও আমাদের পাঠানোর প্রয়োজন হলে তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন। প্রায়ই আমরা একাজে অফিসের গাড়ি পাই এবং এসকর্টও। কিন্তু যখন বাড়ি থেকে যাই তখন নিজেরাই চলে যাই। গাড়ি বা এসকর্টের অপেক্ষায় থাকি না। আর কোথাও গিয়ে কোন অসুবিধা হয় না। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা থাকে। গুরুত্ব অনুসারে রেডিওগ্রাম মেসেজে আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে দেখা যায় যে স্টেশন থেকে আমাদের নেওয়ার জন্য লোক থাকে। আর থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধার কথা তো ওঠেই না।

আমাদের আর একটা বড়ো সুযোগ যে আমরা ভি. আই. পি ডিউটি করি। প্রধানমন্ত্রী কলকাতা এলে আমরা এয়ারপোর্টে যাবই এবং খুব কাছেই থাকি। এই তো সেদিন যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এলেন আমরা ভি আই পি ডিউটি করে এলাম। অত কাছ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখতে পাওয়ার এই সুযোগকে অনেকেই ঈর্ষা করেন। কলকাতার লেডি পুলিশদের কিন্তু এই সুযোগ নেই।

এতো বড়ো ডিউটি আমরা করি এজন্য কিন্তু আমাদের ধরাচূড়ো পড়তে হয় না। ইচ্ছেমতো পোষাকে আমরা এই ডিউটি করি। অফিসেও আসি ইচ্ছেমতো জামাকাপড় পরে। এ-ব্যাপারে কোন বাধা-বাধকতা নেই। তবে যখনই বাইরে যাই তখন নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। নীল পাড় সাদা খোলের শাড়ি, নীল ব্লাউজ আর নীল চটি এই হলো আমাদের ইউনিফর্ম। এছাড়া অবশ্য মাস্টার প্যারেডের জন্য এক প্রস্থ পোষাক আছে। আর সেটা পুরোদস্তুর পুলিশী পোষাক। সাদা ফুল প্যান্ট, সাদা ফুলহাতা হাওয়াইন সার্ট, কালো বুট আর ব্যারেট টুপি। এই পোষাকে যখন প্যারেড করি তখনই কেবল মনে হয় যে আমরা পুলিশের চাকরি করি। অন্য সময় একথা ভুলক্রমেও মনে উঁকি দেয় না।

কোন ডিউটি না থাকলে আমরা দশটা পাঁচটা অফিস করি। ঠিক একেবারে কেরাণীদের মতো। এ সময় সবই অফিসিয়াল কাজ। মেসেজ রিসিভ করি, মেসেজ পাঠাই। আর ভাবি আবার কবে বাইরে যাব। দেখতে দেখতে সুযোগ এসে যায়। অবস্থা বুঝে বাইরে গিয়ে অনেক সময় আমাদের বেশ কিছুদিন থাকতে হয়। অবশ্য আরো লেডি পুলিশ নেওয়া হলে আমাদের দায়িত্ব কিছুটা হাল্কা হবে। অবশ্য আমাদের বাইরে যাওয়া কমুক এটা আমরা চাই না।
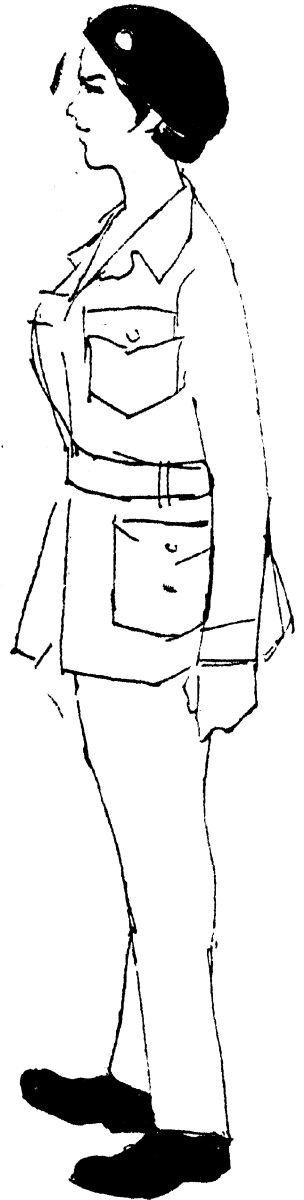
সাধারণতঃ সাব-ইন্সপেক্টর আর অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পদেই আমাদের নিয়োগ হয়। আমাদের মধ্যে কেউ কনস্টেবল নেই। কেন নেই তা অবশ্য জানি না। তবে সব পদেই আমাদের নিয়োগ দরকার। লেডি পুলিশদের আরো শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। এই চাকরি সম্বন্ধে অনেকের অনেক জল্পনা-কল্পনা। আমরা এসে দেখলাম সে সবই নেহাত কল্পনার ব্যাপার। বাস্তবের সংগে তার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এই চাকরিতে বৈচিত্র আছে আর মজার নেশা পেয়ে বসে। একঘেয়েমিতে আমাদের খুব কমই ভুগতে হয়। তাই এরকম একটি চাকরির সুযোগ আরো অবারিত করে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটানো দরকার।

—প্রমীলা

।। পনের ।।

শীত ফুরোতে-না-ফুরোতে পাণ্ডেজীর বাড়ির পিছনে বিশাল শিমুল গাছটা লালে লাল হয়ে উঠেছে। পিছনের মাঠে জায়গায়-জায়গায় কয়েক পোঁচ সবুজ চৈতালি চোখে পড়ছে। ওটা জ্ঞানবাবুদের ফারম। সমানে পাম্পিং মেসিনের ধকধক আওয়াজ শোনা যায়। হাইওয়ের গাছে গাছে হলুদ ঝরন্ত পাতার গা ঘেঁষে কচি সবুজ পাতা মুখিয়ে উঠছে। পীরের দরগার পাশে সারকাসের মরশুমী তাঁবু পড়েছে। রূপপুরে এখন ভিড় বাড়ার দিন। পীরের থানে মেলা বসছে। প্রায় সারারাত হাইওয়ে মানুষের পায়ের শব্দে চঞ্চল হয়ে থাকে। বাস-ট্রাকের হর্ন বাজে ঘনঘন। দিঘার ওপর জলহাঁসের পাখনার শব্দ হয়। এইব নতুন চঞ্চলতা রূপপুরে চটিকে চাঙ্গা লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। গ্রাম-নগরী এখন কিছুদিন ঝুমুর মেয়ের মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সেই সময় একদিন ব্রজ কাঁচুমাচু মুখে চন্দনের কাছে এল।... কেমন আছেন স্যার? অনেকদিন থেকে ভাবছিলুম যাই-যাই, আসা হয় না। আর আজকাল ব্যস্ত লোক আপনি, দেখা পাব—মনেও থাকে না!

চন্দন ব্রজকে খুঁটিয়ে দেখছিল। কী হয়েছে ব্রজর? কেমন যেন সিঁটিয়ে যাওয়া চেহারা। অযত্নের ছাপ সারা শরীরে। প্যান্ট-শার্ট অসম্ভব ঢিলে দেখাচ্ছে। বড়োর মজার কথা চুলগুলো চুড়োবাঁধা জট—সন্ন্যাসীদের মতো পিঠের দিকে ঝুলছে।

ব্রজ বসে ফের বলল, একটা সিগ্রেট দিন।

চন্দন সিগ্রেট দিয়ে বলল, কী খবর বলুন? আর তো আপনার গাড়িটা দেখি না।

রুটপারমিট ক্যানসেল হয়ে গেছে।... ব্রজ বলল। ...গাড়িটা সারানো গেল না। অনেক টাকার দরকার। এখন বউদি বলছেন বেচে দিতে। কে কিনবে বলুন? লোহালক্কড়ের দামে ঝেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শিশিরবাবুদের কাছে গিয়েছিলুম। ওনাদের আবার ভীষণ গরজ। সেকেলে মডেলের স্টেশন-ওয়াগন—ও হাতির খোরাক জোগাতে রাজী নন। বললেন, ব্রজ বরং তুমি আমাদের গাড়ি চালাতে চাইলে বলো। ভালো মাইনে দেব।

চন্দন বলল, সে মন্দ প্রস্তাব নয়। রাজী হলেন না কেন? ওঁরা তো ভালই দেনটেন শুনেছি।

ম্লান হাসল ব্রজ।...ভালোমন্দ যাই হোক, গাড়িটা আমার অনেক বছরের সঙ্গী চন্দনবাবু। ওকে মরতে দিতে মন চায় না। সে আমি বোঝাতে পারব না স্যার! টাটকা তেজী গাড়ি অনেক হয়তো পাব। গাঁক গাঁক করে এক দমে হাজার মাইল দৌড়ে যাবে। কিন্তু সে অন্য জিনিস! মাঝপথে ফাঁকা মাঠে যদি না বিগড়ে গেল, গাছতলায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে দেখতে সিগ্রেট খেতে না পেলুম, তো কিসের সুখ স্যার? সে আমি বোঝাতে পারলুম না। বরং ছেড়ে দেব ড্রাইভারি। হাসি বলছিল, পথে পথে ঘোরার চেয়ে বিনি রিস্কে একটা দোকান খুলে বসো স্টেশনারি। মজুমদার মশায় তল্লাটে যা ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন না! সবাই এখনও তাই নিয়ে ভেবে সারা।

চেষ্টা করে জোরে হাসতে লাগল ব্রজ।... তা হাসিই আবার বলল আপনার কথা।

চন্দন তাকাল।... আমার কথা মানে?

ব্রজ একটু গম্ভীর হল। ...ও কোত্থেকে শুনেছে, আপনি নাকি নিজে স্বাধীনভাবে কাজকারবার করবেন। তাই আমিও ভাবলুম, গাড়িটার ব্যাপারে একটা রিস্ক আপনি যদি নিতে পারেন—চেষ্টা করা যাক। অনেক দিনের আলাপ আপনার সঙ্গে। আচ্ছা স্যার, আপনাদের কোম্পানীটা তো উঠে গেছে—তাই না?

চন্দন একটু চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ। এখন তো শুধু এই পাম্পটা নিয়ে আছি। আমার বিরক্তি ধরে গেছে। ভালো লাগছে না। তাছাড়া— ...হাসল সে।... মেয়েরা মালিক হলে যা হয়। ভাবে যে তলে তলে ভীষণ ঠকাচ্ছি!

ব্রজ মাথা নেড়ে বলল, না-না। সবাই তা নয়। রাজকমলদার স্ত্রীর অবশ্য মতি-গতি আমি ভালো টের পাই নি। সময় বা পেলুম কোথায়? তবে মজুমদারমশায়ের স্ত্রী শুনেছি ভীষণ ভালো মানুষ। কেন? সে রকম কিছু টের পাচ্ছেন নাকি?

চন্দন দুম করে বলে দিল। ...পাচ্ছি বইকি। এমনি-এমনি বলছি নাকি? আপনাকে সব কথা বলতে আমার আপত্তি নেই ব্রজবাবু। পাম্পটার কাগজে-কলমে মালিক পরেশদার শালী। কিন্তু...

ব্রজ বলল, আরে, কী মুসকিল! ভুলেই গেছলুম কথাটা। আপনাদের সেই শুড কাজের কন্দুর কী হল?

চন্দন শুকনো হাসল। ...নাঃ! এখন বিয়ে-টিয়ে আমার পোষাবে না। দিদি-বোনটোন সব আছে, ভাইটাই আছে—অনেক

ঝামেলা কাঁধে আছে ব্রজবাবু। ওটা আমি নাকচ করে দিয়েছি।

ব্রজ মাথা দোলাল। ...উঁহু। কাজটা ঠিক হয় নি স্যার। ওনাদের মাথার ওপর পুরুষ মানুষ একজন দরকার ছিল। আপনার চেয়ে যোগ্য আর কে আছে!

থাকতে পারে। আমি ছাড়া যোগ্য কেউ নেই—এটা ঠিক নয় ব্রজবাবু। যাক্ গে, কথা শুনুন। পান্ডেজী আমাকে কিছুদিন থেকে বলছেন—স্বাধীনভাবে একটা কিছু করতে। বউদির সঙ্গে যদি বা পোষাত, হকসায়েব তা হতে দেবেন না। হকসায়েব উড়ে এসে জুড়ে বসে ওদের মুরুব্বী হয়ে গেছেন। তাঁর পরামর্শেই বউদি ওঠে-বসে। দেখে শুনে আমার খুব খারাপ লাগছিল। তাছাড়া মাসের শেষে নিজের হাতে মাইনে নিতেও সংকোচ হয় আমার। ওদিকে... চন্দন গলাটা চাপা করল। ...হীরুবাবু কী বিশ্রি লোক ভাবা যায় না। মিথ্যে কী সব লাগিয়ে আসে মাঝে মাঝে। বউদি আগের মতো আর বিশ্বাস করতে পারছে না। এ অবস্থায় আমি কী করি বলুন?

ব্রজ নিরাশ মুখে বলল, সেও একটা কথা। আমার কপালটা আসলে এ্যাদ্দিনে সত্যি ভেঙেছে চন্দনবাবু। ভেবেছিলুম, গাড়িটা যদি আপনারা নেন, তাহলে নতুন করে রুট-পারমিট করিয়ে নিতে আমার অসুবিধে ছিল না। আমার লোক আছে। আর, সারানোর খরচা এসটিমেট করে দেখেছি—হাজার তিনেক লাগতে পারে। তাহলে এখন ক' বছর নিশ্চিন্ত।

চন্দন বলল, কী দামে বেচতে চান আপনার মালিক?

ব্রজ তাকাল। দু' চোখে একটা চাঞ্চল্য খেলা করছে। বলল, নেবেন আপনারা চন্দনবাবু? খুব বেশি দিতে হবে না। বউদির হাজার পাঁচ মতো দরকার আপাতত। মেয়ের বিয়ে লাগিয়েছেন। তারপর উনি শিলঙে দাদার কাছে চলে যাবেন। আমাকে বিশ্বাস করুন, ঠকবেন না। গাড়িটা খাঁটি বিলিতি জিনিস। সারালে এখনও হেসে-খেলে পঞ্চাশ বচ্ছর চলে যাবে—তাতে কোন ভুল নেই।

চন্দন বলল, কাকেও এখন বলবেন না। আমিই নেব। রুট-পারমিটের দায়িত্ব কিন্তু আপনার।

ব্রজ সোৎসাহে হাত বাড়াল। ...সিগ্রেট দিন স্যার। আপনার ভালো হবে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। উঃ, আমি শেষ হয়ে গিয়েছিলুম! রাতের পর রাত একটুও ঘুমোতে পারি নি। জানেন স্যার? একটুখানি চোখে ঘোর লাগলেই স্বপ্ন দেখতুম খালি। ওই গাড়িটার স্বপ্ন। সবুজ রঙে জেল্লা ঠিকরে বেরোচ্ছে। নাচতে নাচতে চলেছে উঠন্ত ছুকরীর মতো। আমার—আমার কী যে হত চন্দনবাবু! চটকা ঘুম ভেঙে যখন টের পেতুম, ওটা স্বপ্ন—বিশ্বাস করুন, আমি কাঁদতুম। চুপি-চুপি কাঁদতুম একা। ভোর-বেলা হাসি হাসপাতালের ডিউটি সেরে এসে ডাকত। ...তারপর...

চন্দন বলল, চেপে যান। হকসায়েব আসছেন।

সামনে রাস্তায় রিকশো থেকে হক-সায়েবকে নামতে দেখা যাচ্ছিল। চন্দন একটুখানি গম্ভীর হল। ব্রজ পা দুটো নাচাচ্ছিল। হকসায়েব এসে বললেন, আরে এক কান্ড! রাধিকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শঙ্করকে মেরেছে না কী করেছে, খোদায় মালুম, কিছু বুঝতে পারলুম না! শঙ্কর করেছে কী, এক কড়াই তর-কারিতে থুথু ফেলে দিয়েছে! ছি ছি, এ কী মানুষের কাজ! অত করে রাধিককে বলি, মা—বয়স হয়েছে, এখন ওসব দুষ্টুকে প্রশ্রয় দিও না। পস্তাবে। কানেই নেয় না। এবার নাও, ঠ্যালা সামলাও।

ব্রজ হন্তদন্ত হল।... কী মুশকিল! তাই কখন থেকে কানে চেঁচামেচি আসছিল! শালা শঙ্করাটার বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি। বড় দেমাগ শালার। ছ্যা, ছ্যা, পাঁচটা ভদ্রলোকে খায়-টায়—তাতে থুথু দিলে! মাতলামির জায়গা পায় নি।

চন্দন হাসতে হাসতে বলল, সর্বনাশ! আমিও তো খাই।

ব্রজ পলকে উঠে দাঁড়াল। ...ও শালাকে আজ আমি মারব।

হকসায়েব উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, এই ব্রজ! বাবা ব্রজ! ছেড়ে দে ও-সব মাতাল টাতালের কান্ড! তুই চুপচাপ বস দিকি বাবা। ওরা যা খুশি করুক, তোর কী?

চন্দনকে অবাক করে ব্রজ দৌড়ে বেরিয়ে গেল। হকসায়েব তাকে আটকাতে পারলেন না। চন্দন বুঝতে পারছিল না, ব্রজর হঠাৎ কী হল? সে উঠে দরজায় গেল। ব্রজকে ডাকবে ভাবল। কিন্তু ব্রজ তখন রাস্তা পেরিয়ে প্রায় দৌড়চ্ছে।

চন্দন ঘুরে হকসায়েবকে বলল, ব্রজ এত ক্ষেপল কেন হকসায়েব?

হকসায়েব তেতো মুখে জবাব দিলেন, এ লাইনের ড্রাইভারদের কারবারই এ রকম চন্দনবাবু। ভিতর-ভিতর কার সঙ্গে কী থাকে, হঠাৎ কেটে বেরিয়ে পড়ে। এ কি নতুন দেখছি? খরা আসতে দিন, তখন রোজ সন্ধ্যাবেলা ড্রাইভারদের মাথা ফাটাফাটি দেখবেন। তখন ডোমকুনাইরা সব তালগাছে ভাঁড় লাগাবে। ব্যাটারা তাই খাবে আর মারামারি করবে। গতবার পাঞ্জাবীদের সঙ্গে বাঙালীদের লেগেছিল। সে এক কান্ড! শেষ অব্দি পরেশবাবু গিয়ে মিটমাট করে দিলেন।

চন্দন আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, হকসায়েব, আপনি বরং যান। আমিও যাচ্ছি। এই সামান্য ব্যাপারে মারামারির কী আছে!

হকসায়েব গুম হয়ে বললেন, রাধিকের শিক্ষে হোক—আর শঙ্করাটারও শিক্ষে হোক না। আমি বলে-বলে হদ্দ হয়ে গেছি। ছাড়ুন।

রাধার হোটেলের সামনে ছোটখাটো ভিড় জমেছে। ব্রজকে দেখা গেল আলখেল্লা কোটটা খুলে একজনের হাতে দিচ্ছে। শঙ্কর চেঁচাচ্ছে, আবে শালা ষষ্ঠি! আমার হান্ডিল কাঁহা বে? ব্রজ আরও চড়ায় চেঁচিয়ে উঠল, আও বে হান্ডিলকা বাচ্চা! শালা ঢ্যামনা!

তারপর দুজনে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেল। চন্দনের বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল। একটু আগের ব্রজ আর এই ব্রজ—দু'জনের মধ্যে এত তফাত সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু ব্রজর কী রাগ ছিল শঙ্করের ওপরে যে গায়ে পড়ে এমন মারামারি করতে গেল? চন্দন দেখল, ব্রজ শঙ্করকে চিত করে ফেলে বুকের ওপর বসে গেছে। রাধা—এলোমেলো চুল, কোমরে আঁচল জড়ানো, ব্রজর সোয়েটারটা ধরে প্রাণপণে টানছে। সোয়েটারটা ব্রজর লম্বা চুলে আটকে যাচ্ছে। সেই সময় আরো ক'জন ব্রজকে গিয়ে ধরল। ব্রজ উঠে দাঁড়াল। শঙ্কর তখনও চিত হয়ে পড়ে আছে। ব্রজ একটু পিছিয়ে আসতেই শঙ্কর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রজর ওপর। ব্রজ হয়তো অপ্রস্তুত ছিল। টাল সামলাতে না পেরে সে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেল। সেই ফাঁকে তার লম্বা চুল খামচে ধরে শঙ্কর চেরা গলায় চেঁচাল, আবে ষষ্ঠি, তুই কোথায় বে! আন মেরা হান্ডিল!

এক প্রান্তে একটি হাফপ্যান্ট পরা কিশোর দু-হাতে চোখ মুছছিল এতক্ষণ। এবার সে দৌড়ে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটার দিকে গেল। ব্রজ নোংরা থেকে ওঠবার প্রচন্ড চেষ্টা করছে। কিন্তু শঙ্কর তার চুল ধরে বুকে একটা হাঁটুর চাপ দেওয়ার ফলে সে বেকায়দায় পড়ে গেছে। এ সময় সেই কিশোরটি সত্যি সত্যি একটা হান্ডিল নিয়ে দৌড়ে এল।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না চন্দন। হকসায়েব যাবেন না যাবেন না বলে চেঁচালেও সে এক দৌড়ে রণস্থলে গিয়ে হাজির হল। ভিড়ের লোকগুলো হাসছে আর প্রাণভরে মজাটা উপভোগ করছে। চন্দন ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল, এই শুওয়ের বাচ্চারা!

তারপর একটানে শঙ্করকে ছাড়িয়ে নিল। ব্রজও উঠে দাঁড়াল। ভিড়টা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পরেশ মজুমদারের গদীর ছোটবাবুকে তারা নিরীহ ভদ্রলোক বলেই জানত। তার এ মূর্তি দেখেই হয়তো সবাই তাজ্জব হয়েছিল।

শঙ্কর চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়েছে। রাধা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে এবার। শঙ্করের হাত ধরে টেনে তফাতে আনছিল চন্দন। হঠাৎ ব্রজ ইতিমধ্যে কখন ষষ্ঠির হাত থেকে হান্ডিলটা কেড়ে নিয়েছে, সে লক্ষ্য করে নি। আচমকা হান্ডিলটা শঙ্করের মাথার পিছনে মেরে বসল সে। শঙ্কর বাপ রে বলে উবুড় হয়ে পড়ে গেল।

চন্দন ঘুরে ব্রজর দিকে এগোতেই ব্রজ প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল।

রক্তে চুল ভিজে যাচ্ছে শঙ্করের। এতক্ষণে রক্ত দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, ধর, ধর খুন করে পালাল!

রাধা শঙ্করের মাথায় নিজের আঁচলটা চেপে ধরে ভাঙা গলায় কে'দে উঠল, ওরে আমার কী সর্বনাশ হল রে!

চন্দন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সামনের লোকটাকে ব্যস্তভাবে বলল, একটা রিকশো দেখনে তো। শিগগির! হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

রিকশো কাছেই ছিল। অজ্ঞান হয়ে গেছে শঙ্কর। ধরাধরি করে রিকশোয় তুলে দিল সবাই মিলে। রাধা শঙ্করকে ধরে বসে রইল। রিকশোটা হাসপাতালের দিকে এগোতে থাকল। চন্দন পা বাড়াচ্ছিল। হঠাৎ তক্তাপোষের নিচের সেই কালো বাকশোটার কথা মনে পড়ামাত্র সে লম্বা পায়ে রাস্তা পেরিয়ে এল। এসে দেখল, হকসায়েব চুপচাপ বসে আছেন। চন্দনের চমক খেলে গেল। হকসায়েব কি ইতিমধ্যে তক্তাপোষের নিচেটা দেখে নিয়েছেন?

দেখলেই বা কী! বাকসে কী আছে, কেমন করে জানবেন। ওটা চন্দনের মনের ভুল। সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, ব্রজটা সাংঘাতিক। জানতুম না তো!

হকসায়েব বললেন, ওই কুকুর-চন্ডালীর মধ্যে মানুষ যায় কখনও?

চন্দন বলল, ব্রজ শঙ্করের মাথায় মেরেছে। মরে যাবে কিনা কে জানে! হাসপাতালে তো পাঠিয়ে দিলুম।

এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলার ইচ্ছে সম্ভবত হকসায়েবের নেই। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ নড়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ—যে জন্যে এলুম। একবার মজুমদার বাড়ি যেতে হবে চন্দনবাবু। বিশেষ কথা আছে। বউবিবি আপনাকে খবর পাঠায় নি?

চন্দন মাথা দোলাল। ...কই, না তো! কী ব্যাপার?

সে কী! আমার কাছে কাল সন্ধেবেলা লোক পাঠিয়েছিলেন।

আমি কিছু জানি নে।

হকসায়েব পকেট থেকে পানের কৌটো বের করে বললেন, হয়তো লোক আপনার কাছেও পাঠিয়েছিল—আপনার দেখা পায় নি। যাক্ গে, চলনু। ওদিকে একটুখানি গোলমাল লেগেছে। পরেশবাবু হাজার জায়গায় ফ্যাসাদ বাধিয়ে রেখে গেছেন। মেয়েছেলের ওপর যত ঝামেলা। এ-সব সামলায় কে এখন? আপনিও এ লাইনে নতুন মানুষ।

কী হয়েছে হকসায়েব?

পান গালে পুরে হকসায়েব বললেন, নুটুবাবুর বউ বলেছে—পরেশবাবু নাকি হাত চিঠিতে ওনার কাছে কবে পনের হাজার টাকা নিয়েছেন সর্বমোট। সুদ ধরলে হাজার বিশ-বাইশ হয়। সুদ উনি নেবেন না। নগদটা দিতে হবে। বঝেুন কান্ড!

সে কী! চন্দন অবাক হল। ...হাত-চিঠিগুলো দেখিয়েছে?

হ্যাঁ—আমি দেখেছি। পরেশবাবুর সই আমি চিনি। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার—প্রত্যেকটি কাগজে সাক্ষীর দস্তখত করেছেন বেচুবাবু আর বিলাস। বিলাস হচ্ছে ওনাদের চাকর।

বউদি কী বলছেন?

সেই বলাবলি নিয়েই আলোচনা হবে, চলুন।

চন্দন গুম হয়ে বলল, কিন্তু আশ্চর্য! আমাকে তো কিছু বলে নি বউদি!

হকসায়েব একটু হাসলেন। ...বলত। আপনি তো ইদানীং ও-বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন এক রকম।

চন্দন চুপ করে গেল। হকসায়েব উঠে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, হীরুবাবু ও হীরুদা! আমার সঙ্গে ছোটবাবু একবার বেরোচ্ছেন। এদিকে আসুন।

চন্দন বলল, থাক। তালা-চাবি দিয়ে যাচ্ছি এ ঘরে।

হাত নাড়লেন হকসায়েব।...কিছু দরকার নেই। হীরুদা বড় বিশ্বাসী মানুষ। আর কীই বা আছে আপনার ঘরে?...হেসে উঠলেন জোরে।...পয়সাকড়ি জমানোর মতো মানুষ আপনি নন চন্দনবাবু। আর জমবেই বা কোত্থেকে! পরেশবাবু থাকলে কথা ছিল। চলুন। হীরুদা, কই এলে?

চন্দন হীরুবাবুকে আমল না দিয়ে তালা দিল দরজায়। চাবিটা পকেটে রেখে পা বাড়াল। তার পা উঠছিল না ও-বাড়ির দিকে যেতে। তবু যেতে হবে—এটাই বড্ড খারাপ লাগে। রাস্তায় এসে হঠাৎ তার মনে হল রুমার কথা। রুমাকে অনেকদিন দ্যাখেনি। রুমার মধ্যে কিছুদিন জ্বর হয়েছিল নাকি। সে যায়নি। অমিত নাকি আজকাল ও-বাড়ি আসা-যাওয়া করে। ভালোই তো! কোয়ালিফায়েড গুণী ছেলে—রূপবান!

এরপর প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে রুমাদের বাড়ির পথের মাটি গরম হয়ে উঠছিল যেন। তার ভিতরেও সেই তাপ পেণছে যেতে থাকল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে যাচ্ছিল তার। সারা শরীর তৃষ্ণায় ছটফট করছে। দূরের এক ছোট্ট শহরের প্রান্তপ্রবাহিনী কালো জলের নদী মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, সেই গহন ও গভীর শান্ত ধারা থেকে কবে তার হাতে ভেসে এসে ধরা পড়েছিল একটা রূপালি মাছ। এখন সে চঞ্চল আর এত প্রাণবন্ত যে ছটফট করে পালিয়ে গেল হাত থেকে। ধরে রাখা গেল না। রাগে-দুঃখে চন্দন আড়ষ্ট হচ্ছিল। তবু যেতে হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এটা ঠিক নয়। পাগোড়ী অসম্ভব ধূর্ত মানুষ। তিনি বলেছেন, ঠিক ঠিক নেহী চন্দনবাবু। রূপপুরে থেকে যদি আপনা পাঁও পর খাড়া হতে না পারেন, আপনি নিজের বেওকুফির জন্য পরে আফশোস করবেন। হাঁ—আমি বলছি চন্দনবাবু। ঝুটমুট আশা করবেন না। রুমা লড়কির বিভা হবে আরেকজনের সাথে—আমি শুনেছি। সব খবর রাখি। আপনি জানেন না হেডমাস্টারের বাড়ি আজকাল পরেশবাবুর স্ত্রী জানাশোনা করেন। বিভা ওখানেই হবে। ঔরৎ লোগোকা বুদ্ধিশুদ্ধি এইরকমই হয়, বাবুজী। ছেড়ে দিন। বরং নিজে কিছু করুন। পুঁজি নেই—তো আমি পুঁজি দিচ্ছি। বলুন, কত চান? আমার গাড়িতে আপনার মাল পেণছে দেবে—স্রেফ তেলের দাম দেবেন। ব্যস!...

কিন্তু এই কারবারী সফলতা কি সে চেয়েছিল? শুধু টাকার জন্যে বেঁচে থাকা—টাকার স্বপ্নে টাকার ভাবনায় সব সময় লিপ্ত থাকা! অথচ পালানোর পথটা দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

নুটুবাবুর বউ সামান্য মেয়ে নয় চন্দনবাবু!...হকসায়েব বলে উঠলেন... সবাই বলে, ও নিজে স্বামীকে খুন করেছিল। সত্যিমিথ্যে খোদা জানেন। কিন্তু ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। এতদিন পরেশবাবু থাকতে টাকা চেয়েছিল অথচ পরেশবাবু দ্যায়নি—এটা কি বিশ্বাস করবার মত কথা? পরেশবাবুর টাকা ছড়িয়ে বাঁয়ে রাখা ছিল। বিশ-বাইশ কেন, দু-চার লাখও উনি হাজির করতে পারতেন। অথচ...এ কী কান্ড, দেখুন।

চন্দন কোন জবাব দিল না।

দরজা খুলে দিল গ্যাদা। এদের ঝি। বলল, বউদি এক্ষুনি বেরিয়েছে।

হকসায়েব বলেন, তাহলে?

চন্দন বলল, পরে আসব'খন।

হকসায়েব গ্যাদাকে বললেন, দুপুরের দিকে আবার আসব'খন। বাবা গেদু, বউ-বিবিকে বলিস, আমরা এসেছিলুম। চন্দন চন্দনবাবু।

চন্দন ঘুরল। পা বাড়ালে। সেই সময় পিছন থেকে রুমা ডাকল, চন্দনদা, চলে যাচ্ছ কেন? এস।

বুক ছলাৎ করে উঠেছিল চন্দনের। সে একটুদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গেছে। হকসায়েব বললেন, তাহলে আপনি গিয়ে গল্পসল্প করেন। আমি একবার জ্ঞানবাবুর ওখানে যাই। কাজ আছে। বরং বউবিবি এলে খবর দেবেন।

হকসায়েব চলে গেলেন। চন্দন আস্তে আস্তে দরজার দিকে ঘুরল। দেখল, রুমা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে স্মিত হাসি। মুহূর্তে চন্দনের ভিতর একটা খুসির বিদ্যুৎ ঝিলমিল করে উঠল। সে বাড়ি ঢুকল।

রুমার ঘরে গিয়ে সপ্রতিভভাবে বসল সে। টেবিলের একরাশ বইপত্তর। রুমা তক্তার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, তুমি ভীষণ রাগতে পারো তো আজকাল! আমি কিন্তু আর চেষ্টা করেও রাগতে পারিনে। কেঁদে ফেলি—ঠিক আগের মতো।

সনতু আর সনতু উঁকি দিচ্ছিল দরজায়। রুমা ধমক দিয়ে বলল, এখানে কী রে! যা, পড় গিয়ে। ওরা চলে গেল।

গাঁদা ওদিক থেকে চেঁচিয়ে বলল, আজও কলেজ যাবে না নাকি? বেলা হয়ে গেল যে।

রুমা উঠে গিয়ে দরজা থেকে জবাব দিল, তুই আমার গারজেন নাকি রে? নিজের কাজ কর।

আওয়াজ এল—বেশ, আজও কামাই কর। বউদি এসে বকবে। আমার কী!

হাসতে হাসতে রুমা সরে এসে একেবারে চন্দনের কাছ ঘেঁষে বিছানায় বসে বলল, আমার গারজেনের সংখ্যা দিনে-দিনে বেড়ে যাচ্ছে। কী কপাল!...আরে! কথা বলছ না যে তুমি! মৌনব্রত পালনের জন্যে তোমায় ডাকিনি!

চন্দন একটা বই তুলে পাতা ওল্টাচ্ছিল। বলল, কী বলব?

বইটা কেড়ে নিল রুমা। তারপর আচমকা চন্দনের কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, আহা, চাঁদু আমার রাগ করেছে রে!...পরক্ষণে খিলখিল করে হাসি।

তাকে নিয়ে কি তামাসা করছে রুমা? চন্দন ওর মুখের দিকে তাকাল। খুব আস্তে বলল, ছেলেমানুষীর বয়স আর তোমার নেই, রুমা।

রুমা বলল, চাঁদু বললুম বলে ভীষণ অপমানিত হলে বুঝি! ফেট্, তুমি কী! রূপপুরের গদীওয়ালাদের দলে পড়ে তুমিও আস্ত গদীওলা হয়ে গেছ। কই, কেমন ভুঁড়ি বাগিয়েছ নাকি দেখি!

বলে সে চন্দনের সোয়েটার টানাটানি করতে সুরু করল। কেন এমন করছে রুমা? তাকে কি সে এই ছেলেমানুষীতে ভুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছে? রাগ করবে, না অপমানিত বোধ করবে, নাকি সহজ মনে এটা নেবে, ঠিক করতে পারছিল না চন্দন। সে শুধু বলল, নাঃ, ভুঁড়ি আমার হবে না।

রুমা ওর পেটটা টিপে দিয়ে বলল, হয়েছে মনে হচ্ছে। হবে না আবার! টাকার সঙ্গে বাস করলে ভুঁড়ি হয়। জামাইবাবুকে বেল তো দেখেছি। কেমন করে দিনে দিনে ইঞ্চিইঞ্চি করে বাড়ছিল। বড়ো বয়স অব্দি বাঁচলে দিদির বরাতে গিরিগোবর্ধন ধারণ করা ছিল।...হঠাৎ জিভ কাটল।...এই মা। গারজেনের সামনে কী অশ্লীলতা করে ফেলেছি! আজ আমার মাথার ঠিক নেই!

চন্দন নিজের শরীরে রুমাকে অনুভব করছিল। এ কী সুখ! শরীরের সুখ—নাকি মনের! মনে তো জ্বালা—ঘৃণা, অথচ শরীরে একটা চঞ্চলতার স্রোত বইছে। সে আস্তে আস্তে রুমার হাতটা নামিয়ে দিল কাঁধ থেকে। রুমা তবু তার দুটো হাতই ধরে ফেলল। নিজের কোলের ওপর নিয়ে বলল, এখনও তোমার রাগ পড়েনি? ঠিক আছে—উপুড় হয়ে শোও। কোমরে পা রেখে নাচানাচি করছি আগের মতো।

চন্দনের শরীরের কোষে কোষে অনেক কথা—অনেক ক্ষুধার্ত কথা মাছির মতো ভনভন করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। স্মৃতির অজস্র মড়ার ওপর বসে থাকা মাছিগুলোর বিরক্তিকর ওড়াউড়ি। তার ইচ্ছে করল বয়সের উজোনে ছুটে গিয়ে—এখন যেমন রুমা চলে যেতে পেরেছে—সেই আগের সব ঘটনার ঘরে হানা দ্যায়। খামচে খুবলে তুলে নিয়ে আসে সব সকাল দুপুর বিকেল আর গঙ্গার জলে চিত সাঁতার দেওয়া তরুণ শরীরের ওপর একটা বালিকা-শরীর!

আর, দুরন্ত হঠকারীতায় চন্দন রুমার দু-কাঁধে হাত রেখে তাকাল চোখের দিকে। কয়েক মুহূর্তে নিষ্পলক পরস্পরকে অনুভব করল যেন। তারপর ছেড়ে দিল চন্দন। মুখ নামিয়ে বলল, কলেজ কামাই করছ কেন?

এমনি। ভাল্লাগে না।

কেন?

জানিনে।...রুমাও মুখ নামিয়েছে। আগুনে খুটছে।

রুমা!

উঁ?

কিন্তু কী বলবে ভেবে পেল না চন্দন। চুপ করে গেল।

রুমা মুখ তুলে বলল, কী?
কিছু না।

আমি জানি, কী বলবে।

বলো।

উঁহু—থাক।

চন্দন হাসবার চেষ্টা করে বলল, তুমি কিছুই জানো না রুমা—সব তোমার নিজের বানানো। তোমার ওপর কোন দাবী নেই আমার। কারণ, তোমার সঙ্গে আমার বয়সের অনেক তফাৎ। কোন দাবীই শোভা পায় না। পরেশদা ভুল করছিলেন।

বয়সের কথা কেন তুলছ? আর জামাই-বাবুর কথাই বা কেন? ফেট! ওসব আমি ভাবছি নাকি এখন?...রুমার কপালে যেন দুঃখের ভাঁজ স্পষ্ট হল।

তবে কী ভাবছ?

ভাবছি, তুমি কেন একবারও...

ওকে চুপ করতে দেখে চন্দন একটু ঝুঁকে বলল, কেন একবারও? কী রুমা?

রুমা সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, কেন তুমি একবারও জোর করতে পারলে না?

জোর করতে? তোমাকে?...চন্দন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।...কিসের জোর শুনি? গায়ের জোর? জোর করব কেন? কী পাবার জন্যে রুমা?

রুমা উঠে দাঁড়াল।...চেঁচিও না। আসছি—বসো।...বলে বেরিয়ে গেল সে।

(ক্রমশঃ)

ভেষজ ব্যবস্থাপনায় প্রাচীন ভারতীয় মান

মাধবেন্দ্রনাথ পাল

'আমাদের পূর্ব-পুরুষদের দিকে অবজ্ঞাভরে চাওয়া খুবে সহজ...। কিন্তু উত্তম পুরুষ আমাদের চেয়ে যাঁরা প্রকৃতপক্ষে কোন অংশে কম সচেতন ছিলেন না, সেই সব পূর্ব-পুরুষের দল, যে সব ধারণা আজ আমাদের কাছে আজগুবি বা অসম্ভব বলে মনে হয়, কেন সেই সব ধারণায় উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য সচেষ্ট হলে বেশী লাভবান হতে পারব।' প্রাচীনকালের অবহেলিত জ্ঞান-গরিমার বিষয়ে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে টমাস হেনরী হাকসলী এইরূপ মন্তব্য করেন।

"It is easier to snee. at our ancestors....but it is much more profitable to try to discover why they, who were really not one with less sensible persons than our excellent selves, should have been led to entertain views which strike us as absurd".

উপরোক্ত মন্তব্যটি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি কিছু কম প্রযোজ্য বলে মনে হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে ব্যাধি হল 'ডিজিজ' (Disease) আরামের অভাব, যা শুধুমাত্র বাহিরের লক্ষণ বুঝায়। আর আয়ুর্বেদমতে ব্যাধি হচ্ছে 'রোগ', (রুজতীতি ইতি রোগম্) যা কিছু আমাদের পীড়া ও যন্ত্রণা দেয়, তাকে বলে রোগ। এমন কোন ব্যাধি নাই যেখানে শারীরিক বা মানসিক কোন না কোন প্রকার পীড়া বা যন্ত্রণা হয় না। আরামের অভাব বা অসুখের মূলে যে কারণসমূহ নিহিত, রোগ শব্দে সেই ব্যাপক ও সুগভীর ভাব প্রকাশিত। 'ডিজিজ' শব্দে তত গভীর ও ব্যাপকভাবের ব্যঞ্জনা কোথায়? ব্যাধি নিরসনকল্পে আধুনিককাল প্রচলিত 'ড্রাগ' (Drug) শুধুমাত্র দ্রব্যবিশেষ। কিন্তু আয়ুর্বেদ মতে প্রচলিত 'ভেষজ' শব্দে (ভেষং রোগভয়ং জয়তীতি ভেষজম্) যা কিছু রোগ ভয় দূর করে, সেই সব কিছু দ্রব্য, অন্যান্য ব্যবস্থাদি (যেমন মানসিক ব্যাধিতে প্রযোজ্য সুনির্দিষ্ট শান্ত বাক্যাদি) এবং উভয়ই এই সকল কিছুকে বুঝান হয়। শুধুমাত্র তাই নয়, যা কিছু রোগ ভয় দূরে করতে পারে না, সে সব কিছুকে বলা হয়েছে 'অভেষজ'। অনেক ক্ষেত্রে ড্রাগের ব্যবহারে অবাঞ্ছিত উপসর্গাদি দেখা দিতে পারে এবং দেয়ও। ভেষজ প্রয়োগে সেরূপ কোন উপসর্গাদি কখনই দেখা দেয় না; যদি তা দেয়, তবে সে দ্রব্য বা ব্যবস্থা আর ভেষজ পদবাচ্য থাকে না, অভেষজরূপে পরিণত এবং বর্জনীয় হয়। ভেষজ ও অভেষজ দুটি সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হওয়াতেই আয়ুর্বেদের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। অথচ এখনও পর্যন্ত আধুনিক চিকিৎসায় সেইরূপ দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত দ্রব্য আছে বলে শোনা যায় নি।

দেহের ভিতরে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হয়ে বিপাক বা রূপান্তরের ফলে নানাবিধ দ্রব্যে পরিণত হয়, অনুরূপভাবে দ্রব্যগত ভেষজও জীর্ণ হয় ও বিপাক বা রূপান্তরের পথে চালিত হয়। উপনিষদে সেজন্য 'অন্নম্ আছে। খাদ্যদ্রব্য রস-সমৃদ্ধ বলে জীর্ণ হলে ভেষজম্' বা অন্নই ভেষজরূপে কল্পনা বিপাকে প্রধানতঃ রস, রক্ত, মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র নামক সপ্তধাতুতে ক্রমান্বয়ে পরিণত হয় ও দেহের পুষ্টি-সাধন করে। বীর্যশালী (বা কার্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন) বলে, দ্রব্যগত ভেষজ বিপাকে রসাদি সপ্তধাতুতে পরিণতি লাভ অপেক্ষা প্রধানতঃ রোগের কারণ নির্মূল করার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াসম্পন্ন বা বলবান হয়ে উঠে। খাদ্যদ্রব্য ও দ্রব্যগত ভেষজে এই যা প্রভেদ, কিন্তু দেহাভ্যন্তরে বিপাকের মাপকাঠিতে বিশেষ কোন ভেদ নাই। বীর্যশালিতার মানদন্ডে বিচার করলে, কোন দ্রব্য অন্ন বা ভেষজ পদবাচ্য হয়। রোগের কারণনাশক বীর্যবান দ্রব্যই ভেষজ এবং রোগের কারণনাশে অপারগ হীনবীর্য দ্রব্য অন্ন বা খাদ্যরূপে পরিগণিত।

বীর্য দু প্রকার—উষ্ণবীর্য ও শীতবীর্য। আধুনিক রসায়নের সংজ্ঞাতে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে (রূপান্তর-ক্রিয়া) হয় তাপ উদ্গীর্ণ হবে, না হয় তাপ শোষিত হবে। যে বিক্রিয়াতে তাপ উদ্গীর্ণ হয়, তাকে তাপ-উদ্গারী (Exothermic একসোথার্মিক) এবং যে বিক্রিয়াতে তাপ শোষিত হয়, তাকে বলে তাপ-শোষী (Endothermic - এন্ডোথার্মিক) বিক্রিয়া। উষ্ণবীর্য ও শীতবীর্য ভেষজের বিপাকে তাপ-উদগারী ও তাপ-শোষী বিক্রিয়ার ইংগিত আছে বলে মনে হয়। ভেষজ মাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র রোগনাশক ক্ষমতা বা সামর্থ্য বর্তমান, ভেষজ ভেদে এই ক্ষমতা বা সামর্থ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। যে ভেষজ আমাশয় রোগনাশক, তা অম্লনাশক নাও হতে পারে। এক এক ভেষজের এই প্রকার স্বতন্ত্র রোগনাশক ক্ষমতা বা সামর্থ্য উক্ত ভেষজের কোন সুনির্দিষ্ট অথচ অব্যক্ত কোনরূপ শক্তির জন্যই সম্ভব হয় আয়ুর্বেদে এইরূপ সুনির্দিষ্ট অথচ অব্যক্ত শক্তিকে ভেষজের 'প্রভাব'রূপে কল্পনা করা হয়েছে। রস ও বিপাক, বীর্য ও প্রভাব এই চারিটি বিশেষ ধারণার সমষ্টিগত পরিণামে কোন দ্রব্য অন্ন বা ভেষজ কি হবে তা নির্ধারিত হয়। সুতরাং 'ড্রাগ' শব্দ অপেক্ষা ভেষজ শব্দটি কত বেশী ব্যাপক ও গভীর অর্থবোধক এবং কত নিশ্চয়াত্মক সংজ্ঞা নির্দেশ করছে, তা সহজেই লক্ষণীয়।

ভেষজ প্রস্তুত কার্যে কোন দ্রব্য কতটুকু গ্রহণ করতে হবে, সেই পরিমাণ নির্ধারণের জন্য কত সূক্ষ্ম মানদন্ড প্রচলিত ছিল, তা বিস্ময়কর। রুদ্ধ জানালার রন্ধ্রপথে অনুপ্রবিষ্ট সূর্যকিরণ পথে যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা দৃষ্ট হয়, তার এক একটিকে বলে 'বংশী'। এইরূপে ছয় বংশীতে এক 'মরীচি', ছয় মরীচিতে এক 'রাজিকা', তিন রাজিকায় এক 'সর্ষপ', আট সর্ষপে এক 'যব', চার যবে এক 'গুঞ্জা' বা 'রতি' ছয় রতিতে এক 'মাষা' এবং আট মাষায় এক 'কোন' বা এক 'তোলা'। এক 'বংশী' পরিমাণ বস্তুভার আধুনিক প্রচলিত কিলোগ্রামের কত শত সহস্রাংশ ভাগ হবে, তা কল্পনা করে নিতে হবে।

বংশী-মূলক মানদন্ড সম্পর্কে বাংলা ১৩১৭ সালে প্রকাশিত গোবিন্দদাস বিরচিত 'কালিঙ্গ পরিভাষার' বাংলায় কবিরাজ শ্রীহরলাল গুপ্ত কর্তৃক অনুবাদিত 'পরিভাষা-প্রদীপ' গ্রন্থের ৫—৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে পরিভাষা শব্দে কি বুঝায়, তাও অনুধাবনযোগ্য। স্বর্গীয় বৈদ্যকুলচূড়ামণি ভিষগ্বর শ্রীকণ্ঠদাস বিরচিত 'পরিভাষা সংগ্রহ' গ্রন্থের বাংলা ভাষায় মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের প্রধান ছাত্র রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুবাদিত গ্রন্থে কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় এম-বি, মহাশয় লিখিত ভূমিকার কিয়দংশ প্রণিধানযোগ্য : 'গাঢ়ান্ধকারাবৃত পথে প্রদীপের ন্যায় কিম্বা সুদুস্তর জলধিতরণে অর্ণবযানের তুল্য, পরিভাষা শাস্ত্র প্রবেশ পথের একমাত্র সাহায্যকারী। বিশেষতঃ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে একথা সর্বাপেক্ষা অধিক সত্য, কেননা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অতি দুরূহ সংকেত নিবদ্ধ, অতঃ সেই সমস্ত সংকেতের তাৎপর্য কেবলমাত্র পরিভাষাতেই বিবৃত। ...বৈদ্যক চিকিৎসা বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দুই প্রকার।

…সম্বন্ধে তান্ত্রিক ওষধাদির প্রস্তুত বা প্রয়োগের জন্য বিশেষরূপে পরিভাষার মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কিন্তু বৈদিক চিকিৎসাবিধি সম্পূর্ণরূপে পরিভাষার অধীন। ভৈষজ্য নির্মাণ, ওষুধের যথাযথ মাত্রা নিরূপণ, প্রয়োগস্থল, কোন ব্যাধিতে কোন সময়ে বা কিরূপ অনুপান সহ ঔষধ প্রযোজ্য, ঘৃত তৈল, কষায় ও গুড় প্রভৃতির পাকপ্রণালী এবং পাকসিদ্ধি প্রভৃতি অশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ই পরিভাষার সাহায্যে জানিতে হয়।…বিষয়সমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে এবং গ্রন্থের বিস্তৃতির সংকোচ সাধন করিতে একটা নিয়মিকা শক্তির আবশ্যক হইয়া থাকে। এই নিয়মিকা শক্তিরই নামান্তর পরিভাষা।'

ভেষজের মূলাধার দ্রব্য উৎপত্তি ভেদে প্রধানতঃ ওষধি এবং পার্থিব দ্রব্য নামে পরিচিত। প্রাণী-জগৎ হতে উৎপন্ন দ্রব্য ওষধি, যেমন গাছ তরুলতা ও জান্তব-দ্রব্য এবং জড়জগৎ হতে লব্ধ দ্রব্য পার্থিব দ্রব্য যেমন ধাতু ও খনিজ পদার্থ ইত্যাদি। ওষধি দুই প্রকার, স্থাবর ও জংগম। স্থাবর ওষধি আবার চারি প্রকার—যথা, বনস্পতি, বৃক্ষ বীরুধ এবং প্রকৃত ওষধি। যে উদ্ভিদে ফুল ফোটে না, কিন্তু ফল হয়, তার নাম বনস্পতি যথা উড়ুম্বর বা ডুমুর। যে গাছে ফুল ফোটে ও ফল হয়, তাকে বলে বৃক্ষ, যথা আম, জাম ইত্যাদি। গুল্ম জাতীয় ও লতানে গাছ ইত্যাদিকে বলে বীরুধ যথা পিপুল, পান ইত্যাদি। ফল পাকলেই যে গাছ মরে যায়, তার নাম প্রকৃত ওষধি, যথা কলাগাছ ধান গম শসা ইত্যাদি। প্রাণীজগৎ হতে লব্ধ জংগম ওষধিকেও চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—গর্ভজ (গরু, হরিণ ইত্যাদি) অণ্ডজ (পাখী, সাপ ইত্যাদি) স্বেদজ (পিঁপড়ে, কীট পতঙ্গাদি) এবং পচনশীল বস্তুজাত (ব্যাঙ্গ ইত্যাদি)। যদিও আধুনিক জ্ঞানের আলোকে স্বেদজ ও পচনশীল বস্তুজাত জংগম ওষধির সঠিক ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হয় না, তবুও বিবিধ ওষধি-দ্রব্যকে কত সুন্দররূপে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা হয়েছে, তা লক্ষ্য করার মত।

ভেষজ নির্মাণের জন্য বল্কল, পত্র, ফুল, ফল, মূল, কন্দ, গাছের রস, তরুক্ষীর জাতীয় আঠালো দ্রব্য উদ্ভিদ জগৎ হতে আহরণ করা হয়। স্থাবর ওষধি-উৎপাদিকা উদ্ভিদ কোন স্থানে ও কিভাবে চাষ-আবাদ ও পরিচর্যা করতে হবে, সেই সব বিষয়ে বিশদ জ্ঞাতব্য আয়ুর্বেদে লিপিবদ্ধ আছে। দেবালয়, উই ঢিবি, কূপমধ্যে জাত বা গর্ত, পথের নিকটস্থ এবং শ্মশানে ও বৃক্ষমূলে উৎপন্ন ওষধি সকল আহরণ করা চলবে না। যে সময়ে জন্মের নিয়ম সে সময়ে না জন্মে অকালে বা অন্য সময়ে জন্ম হলে এবং যে বৃক্ষ যেরূপ হওয়া নির্দিষ্ট তা অপেক্ষা ছোট, বড় অথবা বহুকাল ধরে জন্ম হলে; জল, অগ্নি, কীটাদি কর্তৃক অবস্থার পরিবর্তন হলে, সেই সকল ওষধি আহরণ করতে নাই, কেননা উহাদের দ্বারা রোগ-নাশের যথাযথ ফল পাওয়া যায় না।

বিন্ধ্যাচল ইত্যাদি পর্বত উষ্ণ অঞ্চলে এবং হিমালয় ইত্যাদি পর্বত শীত বা হিম অঞ্চলে অবস্থিত। আগ্নেয় গুণবিশিষ্ট (সম্ভবতঃ উষ্ণ বীর্যকর) ভেষজ প্রস্তুত করার জন্য বিন্ধ্যাচলাদি উষ্ণ অঞ্চলজাত ওষধি গ্রহণীয় এবং অনুরূপভাবে সোমগুণবিশিষ্ট (সম্ভবতঃ শীতবীর্যকর) ভেষজের জন্য হিমালয় অঞ্চলজাত ওষধি প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য বন ও উপ-বনের (মনুষ্যরচিত কৃত্রিম ভেষজ-উদ্যান) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে যে সব ওষধি জন্মায়, সে সকলও আহরণ করা যায়। তবে পর্বতজাত, বিশেষ হিমালয় অঞ্চলের পর্বতজাত ওষধি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, ইহাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকারগণের সুচিন্তিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা।

হিমালয় অঞ্চলে উৎপন্ন যে সব ওষধি রসবীর্যে ভরা, যথোপযুক্ত সূর্যকিরণ সম্পাত, ছায়াচ্ছন্ন বায়ু চলাচল, বারিপাত-পুষ্ট এবং পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি কর্তৃক অনাক্রান্ত ও কোনরূপ আঘাতে বা ব্যাধিতে পীড়িত হয় নাই, সেইরূপ ওষধি ঋতু অনুসারে সংগ্রহ করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম অবশ্য পালনীয়।

ঋতুভেদে ওষধি আহরণ-প্রথা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। শীতকালে বৃক্ষের মূল, গ্রীষ্মকালে পাতা, বর্ষাকালে বল্কল বসন্তকালে কন্দ, শরৎকালে নির্যাস (তরুক্ষীর আঠা) ও হেমন্তকালে সার (কেন্দ্রীভূত সার বা শাঁস) গ্রহণ করার নির্দেশ আছে। উল্লেখ্য, মূল ও কন্দের প্রভেদ এই যে, যে উদ্ভিদের একটিমাত্র শিকড়, তাকে বলে মূল, যথা বামনহাটি, রাস্না প্রভৃতি, আর যে উদ্ভিদের একাধিক শিকড় অথবা উহার মূলদেশ গোলাকার ও বড়, তাকে বলে কন্দ, যেমন শতমূলী বীট আলু, ওল মান ইত্যাদি। মোট কথা, যে বৃক্ষের ফুল ও ফল যে ঋতুতে হয়, সেই ঋতুতে তা গ্রহণীয়।

যথোপযুক্ত বিধিনিয়মে আহৃত ভেষজ-বৃক্ষ ও লতাগুল্মাদি পরিষ্কার পরি-চ্ছন্ন ভাণ্ডার গৃহে সংরক্ষণ করতে হবে। ভাণ্ডার গৃহের দ্বার পূর্ব বা উত্তর মুখে অবস্থিত হবে, গৃহে বায়ু চলাচল নিরোধ করতে হবে এবং জল, অগ্নি ও আর্দ্রতা, ধূম, ধুলো-বালির প্রবেশ এবং ইন্দুরাদি ও চতুষ্পদ প্রাণীর উপদ্রব হতে ভাণ্ডারগৃহকে সুরক্ষিত করতে হবে।

চর্মত্বক, নখ, লোম, রক্ত, মাংস, চর্বি তৈল, অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি জান্তবদ্রব্য প্রাণী-জগৎ হতে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি ও সময়ে আহরণ করা হয়। কস্তুরী আয়ুর্বেদে প্রচলিত ভেষজাবলীর একটি বিশেষ উপাদান। হরিণের নাভিদেশে কস্তুরী থলি পূর্ণ হলে হরিণ যখন নিজেই নিজের গন্ধে পাগল হয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে, সেই সময় কস্তুরী আহরণ করাই বিধেয়।

পার্থিব-দ্রব্য যথা ধাতু ও খনিজ পদার্থ কিভাবে সংগ্রহ ও শোধন করতে হবে, সেই বিষয়ে আয়ুর্বেদে লিপিবদ্ধ বিবরণ পাঠ করলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যে সব পদ্ধতিতে ধাতু-নিষ্কাষণ ও শোধন করা হয়, সেই সকল পদ্ধতি হতে আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতি কোন অংশে হীন ছিল বলে মনে হয় না। সেই বিষয়ে বিশদ বিবরণ এবং ভেষজের মূলাধার দ্রব্য সম্মিলনে কিভাবে ভেষজ নির্মাণ করা হয়, সে সমস্ত স্বতন্ত্র আলো-চনার বিষয়বস্তু।

উপরোক্ত আলোচনা হতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পূর্ব-পুরুষগণ ভেষজ ব্যবস্থাপনায় কত পর্যবেক্ষণশীল, চিন্তামগ্ন ও কর্মকুশলতায় পরিচ্ছন্ন-বুদ্ধি এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে সতর্ক ও একনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি-শক্তি ও নিরীক্ষণ নিপুণতা আজ নিছক প্রাচীন বলে অবহেলায় তুচ্ছ করার মত বুদ্ধিহীনতা আর কিছুই নাই। প্রসঙ্গতঃ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনকরূপে গণ্য হিপোক্রেটিস প্রাচীন চিকিৎসা-বিদ্যার উপর যে মন্তব্য করেন, তা বিশেষভাবে স্মরণীয়ঃ 'যাই হোক, আমি ঘোষণা করি যে, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে আজকের মত যথাযথ সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই বলে অনুসন্ধান প্রণালী ত্রুটিপূর্ণ ছিল বা আদৌ কোন অনুসন্ধান প্রণালী ছিল না বলে প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালীকে বর্জন করা উচিত নয়, বরং গভীর অজ্ঞতা হতে উহা যুক্তিবাদের সাহায্যে যতদূর সম্ভব সঠিক ও প্রকৃত সম্পূর্ণতায় কাছাকাছি এসে উন্নীত হয়েছিল, এই জন্যই আমার মনে হয়, প্রাচীন আবিষ্কার-সমূহ যা নিছক দৈবলব্ধ জ্ঞান হিসাবে নয়, বরং যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক পথে চালিত অনুসন্ধানের ফলেই লব্ধ জ্ঞান হিসাবে আমাদের প্রশংসা করা উচিত।'

> 'I declare however, that we ought not to reject the ancient art as non-existent, on the ground that its method of enquiry is faulty just because it has not attained exactness in every detail, but much rather, because it has been able to rise from deep ignorance to approximately perfect accuracy, I think we ought to admire the discoveries as the work not of chance but of enquiry mighty and more profitable to try to discorectly conducted. — Hippocrates on Ancient Medicine, Jones Edition, Vol I, 1923, p. 23

প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ ব্যবস্থাপনা এইরূপ সম্প্রীতি ও অনুসন্ধানী দৃষ্টির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করার দিন এসেছে, যেদিন তা করা সম্ভব হবে, ভেষজ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেদিন নব নব তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কারের সম্ভাবনা হাতছানি দিতে থাকবে।

বহু দিনের কথা। গোয়েন্দাগিরির দুর্গম পথে তখন আমি নবীন পথিক। ভেবেছি কি তখন একদিন হয়ে যাব পুরোনো? বাসি? ফুরিয়ে যাবে প্রয়োজন আমার? ঝাপসা হয়ে যাবে দৃষ্টি? ভুলে যাব চলার ধর্ম? বিস্মৃতিবিজড়িত অতীতের পানে থাকব তাকিয়ে অসহায় মৃত্যুময় দৃষ্টিতে? অপেক্ষা করব কখন জাগবে হঠাৎ আলোর ঝলকানি, শুধু ঘিরে রাখতে একটি দিন-রাত্রির খেলাকে।

তাই হয়। এই জীবনের ধর্ম। নবীন চিরকাল নবীন থাকে না। তারাও হয় পুরোনো, পরমপাকা। আবার সেদিনকার কাঁচা নবীন এগিয়ে আসে। যুগে যুগেই এমনি করে নবীন আসে সৃষ্টির খাতিরে সৃষ্টিকর্তার ইঙ্গিতে। তবু ভাল লাগে পুরোনো কথা। ভাল লাগে স্মৃতিচারণ। কারণ সেদিন দু চোখ ভরে যা দেখেছি, দু কান ভরে যা শুনেছি, তা আমার কাছে ছিল অপ্রাকৃত, অপার্থিব অবাস্তব, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব। তবু সত্য। নিষ্ঠুর নগ্ন সত্য। সেই এক অসাধারণ ঘটনার আজ আমি অবতারণা করছি যা আমার গোয়েন্দা-জীবনের সুদৃঢ় ভিতকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেদিন যা জেনেছিলুম তা আগে জানি নি, যা শিখেছিলুম তা আগে শি নি, শেখবার সুযোগ বা অবকা কোনটাই মেলে নি। মনে পড়ে সালটা ছি ১৯৪৮। তারিখ ঠিক মনে নেই। বোধ হ ২০শে আগস্ট। সেদিনকার মেঘা প্রদোষেই শ্রীমতী লরা বার্নাডের স আমার প্রথম পরিচয়।

অবশ্য এ পরিচয় আমার কাছেই নি। হয়েছিল আমার এক বন্ধুর কন্যা ডাকতাম তাকে 'কে' বলে। ভালবাসা নামের ছিল সংজ্ঞা। কিন্তু বেশ ছিলাম ছোট্ট ইংরেজী শব্দ গণ্ডীতে, বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম

...এতে। সে ছিল আমারই সহযাত্রী। ...আমরা একই পথের পথিক।

...দ্বিপ্রহরে যখন আমি দপ্তরে ... সেই সময়ে বন্ধুবর ... কোন উপক্রমণিকা না করেই ... একটা মুস্কিল হয়েছে, আমান ... আমি কিন্তু কিছু হদিশ ... না। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে ... গেল তা সংক্ষেপে অনেকটা ...

...টি সন্নিহিত এক শৌখিন ... অঞ্চলে চারতলার ওপর এক ... পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, শান্তিময় ... বাস করেন এক উচ্চশিক্ষিত সুখী ... পরিবার। গৃহস্বামী জন বার্ণাড ... রাজকর্মচারী এবং তার ... লরা দিল্লীর নিকটবর্তী কোন ... বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, অকস- ... ডাবল এম-এ। বার্ণাডদের ... চার পুত্রসন্তান। তাদের মধ্যে ... নাবালকত্বের আঙিনা সবে ... তৃতীয়টি নাবালক। সব- ... নেহাতই শিশু। বয়স ছয়। ... চল্লিশোর্ধ লরা দীর্ঘদিন ছুটি ... স্বামীর আবাসে। এই ... নিয়েই যত বিপদ, যত কিছু ... উপদ্রব।

... পাঁচ-ছয় দিন আগে গোয়েন্দা ... বন্ধুবরকে আদেশ করেন মিঃ ... লরার সঙ্গে দেখা করতে। ... এই যে, তাঁদের বিশেষ ... অভিযোগ সম্পর্কে থানা-পুলিশ ... উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, বেপরোয়া। ... কোন চেষ্টাই তারা ... অপরাধ হয়েই চলেছে, স্ত্রী- ... অত্যাচার, স্ত্রীজাতির ওপর ... পুলিশ? পুলিশ এ বিষয়ে ... অপারগ। অগত্যা ... বার্ণাড দম্পতির আবাসে। গৃহ- ... উপস্থিত ছিলেন না। লরাই ... করে। সত্য কথা বলতে কি ... মাধুর্যময় ব্যক্তিত্বে, ও ... অভিভূত হয়ে পড়ে। ... সে যেন অভ্যাগত অতিথি, ... বহুকালের সুহৃদ, পরম ... আতিথেয়তা যেন ত্রুটি- ... সেখানে যেন তাঁর সতর্ক ...

... আলাপান্তে বন্ধুবর ... প্রশ্ন করে তাঁর অভিযোগটি কি? ... ছিলেন না। তিনি চমকে ... হয়ে ওঠেন। ঘরের ... থাকেন ভীতচকিত ... বন্ধুবরকে ইসারায় স্তব্ধ ... তারপর ধীরে ধীরে তাঁর ... এগিয়ে এসে অস্ফুট স্বরে ... দেওয়ালেরও কান আছে। আপনি ... দয়া করে একটু চাপা ... বন্ধুবর অপ্রস্তুত। লরার ... ভয়ের চমক। বন্ধুবর ... পারে নি এ ভয়ের কারণ কি? পরে ...ছিলেন যখন লরা এ ভয়ের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন। ঘরের ভেতর বন্ধুবর, শ্রীমতী ও শ্রীমতীর শিশুপুত্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। লরার নির্দেশে শিশু-পুত্র অন্য ঘরে চলে গেল। ভয়বিহ্বল পদ-ক্ষেপে লরা দরজার দিকে গেলেন। ভারী পর্দাগুলি লাগিয়ে দিলেন। অতি সন্তর্পণে চার ধার ঘুরে-ফিরে লক্ষ্য করলেন তাঁদের কেউ দেখছে কিনা—তাঁদের কথা কেউ শুনছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে লাল কার্পেটের ওপর গদীমোড়া একটা চেয়ার বন্ধুবরের কাছে টেনে নিয়ে বসলেন। চোখে মুখে তাঁর ভয়ের ইঙ্গিত, বিপর্যয়ের আশঙ্কা, আসন্ন বিপদের চিহ্ন। তাঁর চার-ধারে যেন গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সহস্র গুপ্তঘাতক চরমাসিদ্ধির অভিপ্রায়ে। কিছুক্ষণ চলে গেল। লরা শান্ত হলেন। শুরু হল তাঁর বিবৃতি।

'আজ কয়েক মাস ধরে আমার ওপর চলছে অসম্ভব অত্যাচার। গভীর রাত্রে যখন আমি নিদ্রায় কাতর, প্রায় অচেতন তখন সে আসে। ঐ যে দেখছেন পুব দিকের জানালা? দেখছেন? ঐ-ঐ জানালা বেয়ে সে আসে ঘরের ভেতরে। তারপর আমার শয্যার পাশে গুঁড়ি মেরে এসে আমার গলায়, বুকে পিন ফোটাতে শুরু করে। ভয়ে আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। আমি চিৎকার করতে পারি না। জানি না ওটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের সূচ অথবা আলপিন কিনা? শুধু এইটুকু বুঝি যে আমায় পিন ফুটিয়ে ফুটিয়ে মারছে। যখন প্রায় অর্ধমৃত তখন সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ দিয়েই। আমি সভয়ে তাকিয়ে থাকি নিষ্পলক দৃষ্টিতে। ঠাহর করতে পারি না লোকটা কে? ভাবছেন বুঝি আমি আমার স্বামীকে একথা বলি নি? বলেছি। বলেছি আমার বড় দুই সন্তানকেও। তারা সারা রাত্রি জেগেছে অপরাধীকে ধরবার জন্য। কিন্তু পারে নি। রাতভোর আমার স্বামী আমার পাশে শুয়ে জেগে থেকেছেন আসামীকে ধরবার জন্য। কিন্তু তিনি পারেন নি। কাউকে দেখতেও পান নি। কিন্তু ভোরবেলায় লক্ষ্য করেছেন অজস্র পিন ফোটার সরু দাগ আমার কণ্ঠদেশে, আমার বক্ষে আমার দুই বাহুর চারপাশে। তিনি বিশ্বাস করেন নি প্রথমে। ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন। রক্ত পরীক্ষা করিয়েছেন। রক্তে আমার কিছুই পাওয়া যায় নি। পরীক্ষায় কিছুই মেলে নি। মিলেছে একটিই নিদারুণ সিদ্ধান্ত একটি অভ্রান্ত অভিমত, নিভুল অমোঘ সত্য। সেটা হচ্ছে আমার দেহের ওপর যে অজস্র গোলার্ধ রক্তবর্ণ ছিদ্রের দাগ তা উদ্ভূত হয়েছে এক-মাত্র হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের সূচ অথবা আলপিন ফোটানোর ফলে। আপনি বোধ-হয় বিশ্বাস করছেন না? ভাবছেন আমি কি উন্মাদ? না তা নয়। চাক্ষুস দেখলে বিশ্বাস হবে কি আপনার? লরা বস্ত্র সরিয়ে দেখালেন। দেখালেন জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ, দেখালেন অজস্র পিন ফোটার দাগ, কণ্ঠে, বাহুতে, জানুদেশে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, দগ-দগ করছে, অসীম অত্যাচারের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে। লরা চুপ করল।

কিছুকালের মধ্যে গৃহস্বামী ঘরে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন তাঁর দুই সাবালক পুত্র। জনে জনে প্রশ্ন করা হোল কিন্তু একই উত্তর। লরার বিবৃতি তাঁরা সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন। শুধু তাই নয়। তাঁরা জানালেন প্রথম দিনের ঘটনার পর থেকেই পুব জানালাতে লোহার গরাদের উপর ঢেকে দিয়েছেন কাঁটা তারের জাল। লাগিয়ে দিয়েছেন সেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি। জ্বালিয়ে দিয়েছেন সেখানে হাজার বাতির আলো। কিন্তু লরার মতে তবু সে মৃত্যুপথিক আসে একই পথে, যন্ত্রণা দেয়, চলে যায় নিঃশব্দে, অনাবিষ্কৃত জানো-য়ারের মত সেই একই পথ বেয়ে। লরার স্বামী বা ছেলেরা, এমন কি লরা নিজেও কোনদিন সে আততায়ীকে দেখেন নি। কোনদিন লরাকে তাঁরা আর্তনাদ করতে শোনেন নি। ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকে লরার ভীষণাকৃতি এ্যালসেশিয়ান কুকুর। সেও কোনদিন ডাক দেয় নি। শুধু লরা অনুভব করেছেন অদৃশ্য আততায়ীর বিশীর্ণ বীভৎস স্পর্শ। ভোগ করেছেন রাতের পর রাত, মৃত্যুযন্ত্রণা, সয়েছেন অসহনীয় দুঃখ।

লরা বলেন, জানেন এটা খালি ঘটে গভীর রাতে, দিনে নয়। কখনও সূর্যালোকে নয়। এতদিন এটা আমার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। এখন আমার শিশুপুত্র মনে হয় এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। মনে হয় মাঝে মাঝে তার দেহেও যেন পিন ফোটার দাগ দেখি।' লরা থামলেন। তিনি ঘেমে উঠেছেন। চোখের কোণে একবিন্দু জল চিক চিক করছে। তাঁর স্বামীও শব শুন-ছিলেন। চোখে মুখে তাঁর দুর্ভাবনার ছাপ।

পুব দিককার জানালাটি মাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিটের ওপর উঁচু। তার ধারে এমন কিছু নেই, যা ধরে বা ভর করে কোন লোক সে জানালা বেয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারে। এটা প্রায় অসম্ভব, অবাস্তব। তাছাড়া ঐ জানালা নীচে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। যদি কেউ জানালা বেয়ে ঘরে ঢুকতে চায়, তবে সে অপরের নজরে নিশ্চিত আসবে। বন্ধুবর ঘুরে ঘুরে তদন্ত করল। লরা ও জনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করল। কিন্তু তার মধ্যে অসাধারণ কিছুই খুঁজে পেল না যা সন্দেহ করা চলে। সে জানালার নীচে পথের ওপর দুজন সাদা পোশাকে প্রহরী বসিয়ে দিল। তাদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হোল রাতভোর যেন ঐ জানালা নজরে রাখে। যদি কেউ জানালা বেয়ে ওঠে, তৎক্ষণাৎ তাকে যেন বন্দী করে। বিদায়ের প্রাক্কালে সে প্রশ্ন করল, 'আপনার কি কারুকে সন্দেহ হয়?'

লরা চুপ করে ভাবে। তারপর উত্তর দেয়, 'দেখুন আমি তো স্পষ্ট করে কাউকে দেখি নি। তবে আগে মনে হত যে আততায়ী আমার বাবুর্চি ছাড়া আর কেউ নয়। ওকে কয়েক মাস আগে আমি বরখাস্ত

করেছি কাজে অমনোযোগিতার জন্যে। কিন্তু তাই বা বলি কি করে? আমার বাড়ী থেকে চলে যাবার পর আর কোনদিন তাকে দেখি নি। তবে জানেন মাঝে মাঝেই আমার কাছে সবটাই অপ্রাকৃত, স্বপ্নময়, ভৌতিক, পারলৌকিক বলে মনে হয়! মনে হয় দিনের চেতনা যখন রাতে নিদ্রার অবচেতনার মধ্যে ডুব দেয়, তখন কে যেন প্রতি রাতেই আমাকে নিয়ে যায় মৃত্যু-পারাবারের তীরে। আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে উষার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে। শুধু রেখে যায় দেহে আমার ক্ষতের দাগ, আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে সে এসেছিল।' লরা চুপ করলেন। কণ্ঠে তাঁর ভয়ার্ত বিপন্ন সুর।

চার-পাঁচ দিন কেটে গেল। সাদা পোশাকের প্রহরী বদলে দিয়ে সমস্ত প্রহরীকে বসান হল। তারা কাউকেই দেখতে পায় নি। এমন কোন পথ নেই, যে পথে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা না করা হয়েছে। তদন্তকারী স্বয়ং দরজার চাবি ছিদ্র দিয়ে রাতভোর বিনিদ্র নজর রেখেছে মিঃ জনের সহযোগিতায়। কিন্তু কাউকে সে দেখতে পায় নি। শুধু দেখেছে লরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তার বক্ষদেশ নামছে আর উঠছে গভীর সুষুপ্তিতে। কিন্তু পর দিন: যথা পূর্বম তথা পরম। লরার দেহে পিন ফোটার দাগ। লরার একই বিবৃতি। সে এসেছিল ঐ পূর্ব দিককার জানালা বেয়ে। তাকে শাস্তি দিয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও বাবুর্চির সন্ধান মেলে নি তবে জানতে পারা যায় যে সে বরখাস্তের পরেই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায় পশ্চিমের কোন এক শহরে জীবিকার সন্ধানে। আর তার খোঁজ মেলে নি। তদন্তকারী হতভম্ব, হতবাক, হয়রান। সিগারেটের এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করে আমাকে, 'তুমি ভাই যাবে একবার? মুস্কিল আসান করবে?' সমস্ত ঘটনাটি আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। কিন্তু কোথায় যেন কিসের আকর্ষণ। উত্তর দিলাম, 'নিশ্চয়ই যাবো।'

লরার ফ্ল্যাট। বন্ধ দরজা। বাইরে ডাক-ঘর বোতাম টিপলাম। দরজা খুলে লরার উপস্থিতি। উপস্থিতি বলব না সে যেন আবির্ভাব। দীর্ঘ শুভ্র বস্ত্রপরিহিতা স্বেতাঙ্গিনী। সৌম্য প্রসন্নতায় মুখটি ভরা। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে পড়েছে সারা অঙ্গ ঘেরে। কি প্রশান্ত আর পারস্পরিকতেই না চোখে মুখে আনন্দের মহিমা। সদাস্নাতে, স্নিগ্ধ স্নেহঘন করুণার তিনি যেন প্রতিচ্ছবি। লরার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। পরিচয়ের পর সাদরে বসালেন বসবার ঘরে। শান্ত, নিস্তব্ধ পরিবেশ। সূক্ষ্ম সুরুচি আর কৃষ্টির ছোপ ঘরের সর্বাঙ্গে। রূপ ও রুচির বর্ণাঢ্য সামঞ্জস্য।

প্রশ্ন শুরু হোল। নানান ধরনের প্রশ্ন যা ছড়িয়েছিল লরার শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সিংহদ্বার পর্যন্ত। সব উত্তরই লরা দিলেন শান্তভাবে। কিন্তু কোথাও তাঁর বর্তমান দুরূহ জটিল সমস্যার সমাধানের ক্ষীণতম পথনির্দেশ, ক্ষীণতম সূত্র পাওয়া গেল না। বর্তমান ঘটনার সম্বন্ধে লরার একই বক্তব্য, একই বিবৃতি যা তিনি বন্ধুবরকে দিয়েছিলেন, তার থেকে একটুকুও তফাৎ নয়। বার বার লরা ঐ একই কথা বলেন, একই অভিযোগ করেন একইভাবে তাঁর ওপর দৈহিক অত্যাচারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেন। আমাদের অনুরোধে লরার স্বামী লরাকে পুনরায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করান। পুনরায় রক্ত পরীক্ষা হয়। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। এ-সমস্যার সম্ভাব্য পথনির্দেশ কোথাও মেলে না। প্রত্যহ লরার দেহে সূঁচ ফোটানোর দাগ আমাদের সমস্যা সমাধানের সকল প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়।

তবে কি সত্যই মনে করতে হবে যা-কিছু ঘটছে তা প্রেতচালিত? প্রেতাত্মা উদ্ভূত? অপচ্ছায়ার ইন্দ্রজাল? মেনে কি নিতে হবে যে, এ-ঘটনা শরীরের উপর অশরীরীর সংশয়াতীত আক্রমণ? বিশ্বাস করতে হবে কি যে, এ ঘটনা নিছক ভৌতিক? প্রেতপুরীর রহস্যজালাবৃত দুর্মদ দৈত্যের ইঙ্গিত? অথবা প্রেত-জগতে ভারহীন, ভাসমান, বায়বীয় অপদেবতার নিষ্ঠুর খেলা? জীবিতের উপর মৃতের প্রচণ্ড আক্রোশের নির্মম বিজ্ঞপ্তি? বিশ্বাস করতে হবে কি যে, এই বিংশ শতাব্দীতে ফাউস্টের মেফিস্টোফেলিস তমসাবৃত হিম-শীতল সমাধি ভেদ করে মৃত্যোত্থান করেছেন? কি জানি? মন মানতে রাজী নয়, বুদ্ধি বিদ্রোহ করে, আমার সমগ্র চিন্তাধারা এ-যুক্তির সঙ্গে মিতালী করতে অপারগ। তবু যখন লরা বলে চলে, তখন যেন শুনি ক্রাইস্টাবেলের কালো ধ্বনির প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। লরা বলে, 'সে আসে, আসে।' কেমন করে প্রমাণ করি, সে আসে না। এটা ভুল—শুধু ভুল।

তিনটি প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথমত লরার দীর্ঘদিন ছুটি নেবার কারণ কি? এ ছুটি নেবার কয়েকমাস আগেও তো তিনি পঁচিশ দিন স্বামীগৃহে ছুটি কাটিয়ে গেছেন। হঠাৎ বেশ দীর্ঘমেয়াদী ছুটি নেবার কি প্রয়োজন হোল? দ্বিতীয়তঃ এই অত্যাচার তাঁর স্বামীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না তো? ডক্টর ফ্রয়েড উল্লিখিত Sadism বা অপরের উপর দৈহিক অত্যাচারের মাধ্যমে যৌনসুখ উপভোগ করা বা আত্মতৃপ্তির ব্যাপার নয় তো? তৃতীয়তঃ এটা massochism-এর এক বিকৃত রূপের অভিব্যক্তি নয় তো? অর্থাৎ যিনি অত্যাচারিতা হচ্ছেন, তিনি গোপনে অপর কারুকে দিয়ে অথবা নিজেই নিজের ওপর অত্যাচার চালিয়ে এক অস্বাভাবিক যৌনানন্দের শিহরণ অনুভব করছেন না তো? মিঃ জনকে বিশ্বাস করে আমাদের 'মনের' কথা জানানো ছাড়া আর গতি ছিল না। এ সংশয়প্রবাহ পারাপারের খেয়া-তরীর একমাত্র কাণ্ডারী তিনিই ছিলেন। একদিন সুযোগ এল। সরাসরি মন খুলে আমাদের সন্দেহের কথা বললাম। ভয় পেয়েছিলাম এই ভেবে যে মিঃ [illegible] আমাদের কথার ত্রুটি নেবেন। কিন্তু কিছুই না। আমার জীবনে এমন সহানুভূতিশীল এবং সমস্যা-বিশ্লেষণে [illegible] আগ্রহী পুরুষ এর আগে দেখিনি, আমাদের সাহায্যার্থে তিনি সর্ব[illegible] প্রস্তুত।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি [illegible] দীর্ঘ ছুটি নেবার ব্যাপারে [illegible] বিস্তারিত কিছুই জানালেন না [illegible] লরাকে এ-বিষয়ে প্রশ্নও করেন নি [illegible] সেটা লরার নিজস্ব ব্যাপার। [illegible] বার্তায় যেটুকু জানতে পেরেছি [illegible] বুঝেছি, সেটা হচ্ছে লরা [illegible] চালনার ব্যাপারে বেশ কিছুদিন [illegible] একটা অতৃপ্তিকর ক্লান্তি যেন [illegible] সময়ে ঘিরে থাকত। এটা চলেছে [illegible] এক বছর। এর আগে পঁচিশ [illegible] ভোগের পর যখন লরা [illegible] যাচ্ছেন, তখন কথাপ্রসঙ্গে [illegible] 'আমার আর ভালো লাগছে না [illegible] করতে। এর পরেই [illegible] ছুটি, তারপরই নেবো [illegible] ছুটি।' কাজ করা না করা [illegible] না নেওয়া, সবটাই [illegible] উপরে। সেইহেতু এই [illegible] তুলিনি। কিছুদিন পরে [illegible] খবর পেলাম যে [illegible] নিয়ে আমার কাছে আসছে। [illegible] আমি অত্যন্ত খুশীই হয়েছিলাম [illegible] এই ভেবে যে, লরার শরীর [illegible] না। সে ভালো হয়ে যাবে [illegible] পেলো।

দ্বিতীয়তঃ আপনারা [illegible] অপরাধ আমি স্বয়ং করছি [illegible] এটা একটা ফ্রয়েডীয়ান [illegible] ব্যাপার কিনা? আপনারা [illegible] হন, তার জন্যে আমি [illegible] প্রস্তুত। তাছাড়া এটা তো [illegible] কর্তব্য! আপনারা যদি [illegible] আজ রাত্রি থেকেই আমি [illegible] নেবো সে-কোন অজুহাতে। [illegible] না এর কারণ কি? আর [illegible] সুবিধে হবে সংশয়াতীতভাবে [illegible] উপনীত হতে যে, এ অপরাধ [illegible] না অপর কেউ!' আমরা মিঃ জনকে [illegible] উদার প্রস্তাবে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানালাম।

সেই রাত্রেই মিঃ জন [illegible] লাগার অজুহাতে এবং নিদ্রাহীনতার [illegible] কারণে অন্য ঘরে শয়ন করলেন। [illegible] পাহারার ব্যবস্থা হোল। [illegible] যে কে সেই! গতদিনের [illegible] ফোটাবার যে দাগগুলি ধীরে ধীরে [illegible] আসছিল, রাত্রের অন্ধকারে [illegible] আবার জাঁকিয়ে উঠল লরার [illegible] সকালে গিয়ে দেখি লরার [illegible] বাহু, জানুদেশ ছেয়ে গেছে [illegible] কণ্টকবিদ্ধ আঘাতে। লরার [illegible] যেন এক অসহায় আত্মসমর্পণের [illegible] তিন রাত এই ব্যবস্থাই চলল। কিছুই হোল না। শুধু এইটুকুই [illegible]

[illegible] হোল যে, লরার স্বামী লরার [illegible] করার জন্য দায়ী নন। [illegible] লরা কি নিজেই সবার [illegible] অন্ধকারে, অন্য কারোর [illegible] স্বহস্তে আপন দেহের [illegible] উৎকট যৌন শিহরণে [illegible] করেন এবং সকালে তাঁর [illegible] সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি [illegible] করে মনের গভীরতম প্রদেশে এক [illegible] সুখানুভূতি উপভোগ করেন? [illegible] কি লরার দেহের শোণিত- [illegible] কামনা? এই ছিল আমার [illegible] প্রশ্ন। এ-ব্যাপারে লরার স্বামী [illegible] এগিয়ে এলেন। তাঁর [illegible] ব্যবহারে প্রকাশ পাচ্ছিল সীমাহীন [illegible] মানসিক বৃত্তি, সমস্যা সমা- [illegible] তাঁর সাহায্যে লরার [illegible] লরার শয়নকক্ষ তন্ন-তন্ন [illegible] গেল, কিন্তু কোথাও [illegible] সিরিঞ্জের সূঁচ বা [illegible] গেল না। তাঁর জিনিসপত্তর [illegible] করে দেখা গেল, এমনকি তাঁর [illegible] পর্যন্ত বাদ গেল না। [illegible] বৃথাই গেল। প্রতিটি [illegible] নিয়ে দেখা যাচ্ছে [illegible] হোল না। কণ্টক- [illegible] লরার দেহের দাবী একইভাবে [illegible] ধরা দিল। তার আর কোন [illegible] না।

[illegible] একটা প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই পে[illegible] প্রশ্নটি সাধারণ। সবাইকে [illegible] কেন তাঁর বাবুর্চিকে [illegible] এর উত্তর লরা [illegible] দ্বিতীয়তঃ আত- [illegible] পূর্বদিকের জানালার মধ্য [illegible] একপ্রকার অসম্ভব। সেই [illegible] অপরাধীর কাছে কেন [illegible] হয়ে উঠল বোঝা গেল [illegible] আরও তিনটি জানালা ছিল। [illegible] রোজই যাই, কিন্তু বৃথা। [illegible] পাথর চাপা পড়ে [illegible] সমাধানের মুখগহবর। দীর্ঘ [illegible] গেল। কোথাও কিছুর [illegible] পাওয়া গেল না। অথচ দেখি [illegible] লরা অপেক্ষা করেন আমাদের [illegible] আমাদের উপস্থিতিতে লরা যেন [illegible] কত তৃপ্ত। কোথায় যেন [illegible] কোন এক বিরাট মহী- [illegible]। তাঁর যেন ভয় নেই, [illegible] নেই, দাহনও নেই।

[illegible] কেটে গেছে। নানা কারণে [illegible] যেতে পারিনি। একদিন [illegible] বৃষ্টি অজস্র ধারায় বৃষ্টি। [illegible] শুরু হোল ঝড়। সে কি [illegible] মেঘের গুরু গুরু গর্জনে [illegible] অন্তরীক্ষ প্রকম্পিত। [illegible] বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল [illegible] হোল আসা-যাওয়া। [illegible] পথঘাট রূপ নিল এক [illegible] পার্বত্য স্রোতের। [illegible] অপরাহ্ন চার। অপেক্ষা

করছি সদর দপ্তরে। বসে আছি বৃষ্টি-শেষের অপেক্ষায়। বন্ধুবর প্রশ্ন করল, 'লরা আজ টেলিফোন করেছিল। যাবে?' উত্তর দিলাম, 'চল যাই। কিন্তু কোন মুখে? তাঁর কোন উপকার তো করতে পারিনি।'

পার্ক স্ট্রীট জলে জলময়। লরার বাড়ির কাছে এক হাঁটু জল। সেই জল ঠেলতে ঠেলতে আমরা লরার বাড়ি হাজির। লরার সেই একই সুস্নিগ্ধ আনন্দ-ঘন আহ্বান। মুখে তাঁর স্নেহের প্রলেপ। করুণাভরা দৃষ্টিতে তাঁর একই জিজ্ঞাসা, একই অভিযোগ, একই অভিমান। এতদিন আসিনি কেন? কোথায় ছিলাম এতদিন? আমাদের উপস্থিতিতে লরার কত আনন্দ। অহেতুক স্নেহ যেন তাঁর সারা অঙ্গ বেয়ে উপচে পড়ছে।

কিন্তু তখনও কি এক মুহূর্ত ভেবেছি যে, সেই বাদল-রাতের ঝোড়ো ঝাপটায় খুলে যাবে অচলায়তনের বন্ধ বাতায়ন? অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকার গিরি-গহ্বরের প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়ে নিয়ে আসবে অজস্র আলোর ঝরণা? মিলবে আমাদের এতদিনের প্রতীক্ষার ফল, সমস্যা সমাধানের গভীর সূত্র? মুস্কিল আসান হবে সত্যিই বাস্তব? সত্যিই সম্ভব?

গৃহস্বামী তখনো আসেননি। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। নানা কথা হল শুরু, গরম কফির উপরে। কথায় কথায় সে বাদল-সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠল। কথাপ্রসঙ্গে উঠল গত কয়েক বছরের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার রক্তস্নান সবে শেষ হয়েছে। কিন্তু সে সব কুমুরের রেশ, তার অনু-রণন তখনো থামেনি। তখন আমি একটার পর একটা কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার তিক্ত, যন্ত্রণাজর্জর অভিজ্ঞতার কথা বলে চলেছি। কিন্তু যতবারই Communal Riot অর্থাৎ 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা' এই কথাটা উচ্চারণ করেছি, ততবারই দেখেছি লরার মুখ-চোখ ভয়ে পাংশু বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করলাম লরার কোথায় যেন গভীর অস্বস্তি। লরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি অবাক বিস্ময়ে। তাঁর পাণ্ডুর মুখে ভেসে উঠল রক্তের ছোপ, চোখে ফুটে উঠল এক অস্বাভাবিক আলো। কিন্তু তবু বলে চলেছি কি হয় দেখব বলে। দেখব বলে এর শেষ কোথায়? আমার কথা শুনতে শুনতে যেন ঘরের আবহাওয়া, পরিবেশ বদলে গেল। কে যেন লরার ভাবধারায় সহসা মোচড় দিলে উল্টো দিকে। ভুলবো না কোনদিন লরার সে আদিম বন্য চাহনি। উর্ধ্বগামী রক্তস্রোত যেন ঠেলে ফুঁড়ে তীব্র বেগে চোখে-মুখে, মাথায় চড়তে শুরু করেছে। তাঁর শ্বেতস্নিগ্ধ ললাটের উপর নীল শিরাগুলো যেন ফুলে ফেঁপে উঠলো। তাঁর কপালের দুই পার্শ্বে রগের ভিতর উষ্ণ রক্ত যেন সশব্দে আছড়ে পড়ছে। সেই শব্দ যেন বাইরে থেকে শোনা যায়। ক্রমশঃ লরার চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। আমি কিন্তু দেখছি। সব লক্ষ্য করে

চলেছি। কিন্তু তবু বলে চলেছি। মনে হচ্ছে লরা বুঝি আর পারছে না। লরার দৃষ্টি আরক্ত, বিস্ফারিত, শক্ত বদ্ধমুষ্টি। দেহে যেন অসংযত অনড় বাঁক। হাসি তাঁর কোথায় মিলিয়ে গেছে। তাঁর দীর্ঘ ভ্রূদ্বয় ক্রূর কুঞ্চিত, কপালে অজস্র গভীর খাদ সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ লরা ফেটে পড়লেন তীক্ষ্ণ, তীব্র কর্কশ আর্তনাদে। তাঁর গলার শিরা ফুলে উঠল। চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'Stop for Heaven's Sake—ভগবানের দোহাই চুপ করুন'—থর থর করে কাঁপছে তাঁর দেহ। সে আর্তনাদের মাঝে যেন অনলপ্রবাহ, অসূয়া আর অনু-চিকীর্ষার বহিস্ফুলিঙ্গ, এক শরাহত বন্য জন্তুর নিষ্ফল জিঘাংসার ব্যর্থ আক্রোশ, অক্ষমতার বেদনা, অকুণ্ঠ দুর্বার বিদ্বেষ। উত্তেজনা আর উন্মাদনায় মাথা ঝুঁকে পড়ছে। আমি চুপ করলাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বন্ধুবরের দিকে তাকালাম। সেও আমার দিকে দেখছে। ইসারায় বললে, 'এর মধ্যেই রহস্যের বীজ লুকিয়ে আছে।' উত্তর দিলাম 'ঠিক তাই। এতদিন পরে আবিষ্কার করেছি। চুপ কর।'

দশ মিনিট কেটে গেল। লরা তখনও হাঁফাচ্ছেন। ঘর্মাক্ত কলেবর। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ লাল কার্পেটের ওপর। যেন শরের পলকহীন স্তব্ধ দৃষ্টি। কোথা থেকে ঝড় এসে যেন সব ছারখার করে দিল মুহূর্তের মাঝে। কিন্তু কেন? কেন এ মানসিক উত্তেজনার প্রচণ্ড প্রকাশ? কি এমন হোল যার ফলে মুহূর্তের মাঝে লরার স্বরূপ পাল্টে দিল? তাঁকে করে তুলল উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ততার উদ্দীপ্ত শিকার? বধ্যভূমিতে মৃত্যুভয়চকিত বেসামাল বন্যজন্তু। যতবার riot কথাটি উচ্চারণ করেছি, তত-বারই লরা কেন শিহরিত হয়ে উঠেছেন? কেন? কি আছে এর মাঝে? আরও দশ মিনিটের মধ্যেই লরা যেন তাঁর সম্বিত ফিরে পেলেন। চোখে তাঁর বিষণ্ণ, অনু-তপ্ত দৃষ্টি—কোথায় যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছেন। চোখে তাঁর লেগে আছে কাতর, সানির্বন্ধ অনুরোধ, 'ভুল করে যদি অপরাধ করে থাকি তো ক্ষমা করে নেবেন।'

সমস্ত ঘটনাটি অত্যন্ত সহজ, সরল করে নিতে আমাদের বেশীক্ষণ সময় লাগল না। এমন ভাব দেখালাম যেন কোথাও কিছু হয়নি। রাত তখন সাড়ে নটা। লরার স্বামী ঘরে ফিরলেন। তাঁকে গোপনে সমস্ত ঘটনাটির বিশদ বিবরণ দেওয়া হোল। দেখলাম মিঃ জন গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমার প্রশ্নে তিনি জানালেন যে, তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় কোনদিন এরূপ ঘটনা ঘটেনি। তাঁর কাছ থেকে লরার বালিকা বিদ্যালয় এবং তাঁর দিল্লীর জীবন সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল।

মিঃ জন ও লরার কাছ থেকে যখন সে রাতের মত বিদায় নিলাম, তখন ঘড়িতে এগারটা বাজে। বৃষ্টি তখন শেষ হয়ে গেছে। রাস্তায় জলকল্লোল। সর্বনাশের পথচারীর জল ঠেলে চলার সন্ত্রস্ত, সন্ত্র-

র-র শব্দ। গ্যাসবাতির আলো পথের জলের ওপর পড়েছে কেঁপে কেঁপে এঁকে-বেঁকে। অদ্ভুত সাদা-কালো, কালো-সাদা ভয়ে ভরা দাগ জলের উপর—লরার মনের মতই আতঙ্কে ভরা।

কূল পেয়ে গেছি তখন। পেয়ে গেছি কিনারা। চুটিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। নানাদিকে—নানাধারে। নানা লোককে নানাভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে আছেন সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত। দেশী, বিদেশী চিকিৎসক স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানবিদ এবং আরও কত তা আজ আমার মনে নেই। সন্দেহাতীত ভাবে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হোল। মনে হল পার হয়ে এসেছি বিষাক্ত বিসর্পিল বৈতরণী। শীঘ্রই এই ঘটনার গুপ্ত, অপ্রকাশ্য, প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠভূমি স্পর্শ করলাম। আবিষ্কার করলাম লরার বর্তমান বৃত্তান্ত পটভূমিকায় এক মর্মন্তুদ কাহিনী। গভীর তদন্তে যা জানা গেল তা সংক্ষেপে এই-রকম :—

অক্সফোর্ডের ছাত্রীজীবন শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ জনের ও লরার প্রথম পরিচয় এক ভোজসভায়। পরে তাঁরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মিঃ জন সেই সময়ে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বিবাহের পরই জন ও লরা ভারতে চলে আসেন এবং কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটের কাছে এক অঞ্চলে একটি ফ্ল্যাটে বসবাস শুরু করেন। কিছুকাল পরেই লরা একবার দিল্লীতে যান এবং সেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। (স্থানটা কোথায় সেটা বলবার প্রয়োজন মনে করি না)।

বিদ্যালয়ের তরণী বেয়ে চলেছিল বেশ। দোদুল দোলায় দখিন হাওয়ায়। দশ বছর চলে গেল। সরকারের স্বীকৃতিতে স্কুল বোর্ডের হল সৃষ্টি। সর্বময়ী কর্ত্রী শ্রীলরা হলেন বহুধাবিভক্তা। তিনি হলেন স্কুল বোর্ডের সদস্যা। ক্ষমতা হয়ে গেল সীমিত। স্কুল বোর্ডই বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে সর্বেসর্বা। স্বাস্থ্যের কারণে স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রী বহুকালের জন্য ছুটি নিলেন। সেখানেই শুরু হোল ঝড়ের সংকেত, বিপদের সূত্রপাত। স্কুল বোর্ডের মনোনীত এক তরুণী বিদায়ী শিক্ষয়িত্রীর শূন্যস্থান পূরণ করলেন। একদিন লরা আবিষ্কার করলেন সেই শিক্ষয়িত্রী এক গর্হিত কর্মে লিপ্তা, যেটা স্বাভাবিক সুস্থ শিক্ষাদানের পক্ষে সম্পূর্ণ বিরোধী, বিশেষ করে বালিকা বিদ্যালয়ে। লরা তাঁকে এই অশিষ্ট আচরণ সম্পর্কে গভীরভাবে সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। তখন লরা তাঁকে সরাসরি বরখাস্ত করলেন। সে ক্ষমতা তাঁর ছিল।

কিন্তু ফল কি তাতে হোল? স্কুল বোর্ডের মাঝেই তখন ঘুন ধরেছে। সে নবীনা যে সম্প্রদায়ের এবং যে ধর্মাবলম্বী ছিলেন, সেই একই সম্প্রদায়ের, একই ধর্মের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্কুল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তাঁদেরই সালিশীতে সদ্যবরখাস্তা তরুণীকে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী করে নেওয়া হয়। তরুণী লরার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্বিচারের আবেদন করেন। বোর্ডের আদেশানুসারে সেই তরুণী সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে পুনর্বহাল হলেন, লরার সোচ্চার প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

লরার পক্ষে এ অন্যায়কে মেনে নেওয়া ছিল একরকম অসম্ভব। একদিন যিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের সর্বময়ী কর্ত্রী, যাঁর আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি তাঁরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর অন্যায়ের কি প্রতিবিধান করতে পারবেন না? যা অন্যায়, যা অনাচার, যা অবিচার তার সাথে কি তাঁকে করতে হবে দ্বিধাহীন আপোষ! দিতে হবে নিঃসর্ত আত্মাহুতি? করতে হবে মৌন মিতালী? তাঁর অন্তস্তলের গভীরতম প্রদেশে কোথায় যেন আঘাত লাগল। মর্মে মর্মে তিনি হয়ে উঠলেন রক্তাক্ত। স্কুল বোর্ডের বিচার তাঁর কাছে লাগল অনন্ত অবিচার; স্কুল বোর্ডের শাসন তাঁর কাছে নিছক প্রহসন হয়ে দাঁড়াল। সে দেখা দিল যেন এক অন্ধকার, অবিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্রের রূপ ধরে যার একমাত্র উদ্দেশ্য লরাকে হতমান করা, লরাকে ঠেলে দেওয়া দুঃসহ অবলুপ্তির পথে।

কিন্তু এ ঘটনাই শেষ নয়। এর পর আরও কিছু অঘটন ঘটল যা লরার মানসিক জগতে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করল—তাঁর জীবনকে করে দিল ছারখার। একদিন স্কুল শেষে লরা বাড়ি ফিরছেন, এমন সময় কজন লোক রিকস থামিয়ে তাঁকে প্রচণ্ড প্রহার করল। আক্রান্ত লরা কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন এবং বেশ কিছুদিন হাসপাতালের বাসিন্দা হন। পুলিশী তদন্তে জানা গেল আক্রমণকারীরা সেই নবীনা শিক্ষয়িত্রীর বন্ধুবান্ধব। তাঁদের মধ্যে একজন সেই তরুণীর প্রণয়ী। এখানে বলা বাহুল্য যে তরুণী যে ধর্মাবলম্বী ছিলেন, আক্রমণকারীরা সেই একই ধর্মভুক্ত। কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেন। যখন সে পুলিশী মামলা বিচারাধীন তখন চতুর্দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ভীষণাকার ধারণ করল। রক্তের স্রোত শুরু হোল বইতে। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল, আর্ত, বিপন্ন নরনারীর ভয়ার্ত চীৎকারে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল। আদালতে লরার মামলার নিষ্পত্তি হবার আগেই মাঝপথে নানা কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য মামলা মুলতুবী হয়ে গেল। হতগৌরবা, অপমানিতা, হৃতসর্বস্বা লরার গর্বের শেষ স্বপ্নসৌধ যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার পদ থেকে চিরবিদায় নিতে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু সেখানেও দোটানায় পড়লেন। একধারে রইল তাঁর অতিসাধের সৃষ্টি, তাঁর স্বপ্নলোকাচ্ছন্ন জীবন, তাঁর স্বপ্নের চিরসুন্দর সার্থকতা। অপরদিকে রইল তাঁর কামনা-বাসনার শেষ ভস্মাবশেষ। লরা দীর্ঘদিন [illegible] নিলেন এবং কলকাতায় স্বামীগৃহে ফিরে এলেন।

স্বামীগৃহে তাঁর চারজন ভৃত্য ছিল। লরা লক্ষ্য করলেন যে তারা সবাই লরার আক্রমণকারীদের মত একই ধর্মাবলম্বী। বিশেষ কোন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরিসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ [illegible] বিশেষকে অতিক্রম করে চলে গেছে [illegible] কোন ধর্মীয় সমাজের বিরুদ্ধে [illegible] ভাবতে পারছেন না [illegible] তাঁর চোখের সামনে তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন [illegible] কল্পনাকে ধূলিসাৎ করবার জন্য [illegible] তারা বেঁচে থাকবে, মহানন্দে ঘুরে [illegible] বেড়াবে, আর তিনি চেয়ে থাকবেন [illegible] পুরুষের মত নীরবে নির্বিকার [illegible] মনের ওপর নৈরাশ্য জমাট বাঁধতে [illegible] করে, ঘনিয়ে আসে কালো অন্ধকার [illegible] অতল অন্ধকারের বুকে জন্ম নেয় [illegible] প্রতিশোধস্পৃহা, জিঘাংসার প্রথম [illegible] লরার চিত্ত তখন অশান্ত, উদ্ভ্রান্ত [illegible] পর দিন, রাতের পর রাত [illegible] তন্দ্রাহীন, বিরামহীন দুর্ভাবনা [illegible] অতন্দ্র, অশ্রান্ত দুশ্চিন্তা। [illegible] চিন্তা করেন, কিভাবে তাঁর উপর [illegible] অত্যাচার, অকুণ্ঠ অবিচার [illegible] এবং কিভাবে তার প্রতিকার [illegible] হাস্যকর ব্যর্থ প্রহসনে পর্যবসিত [illegible] কিভাবে তিনি তাঁর প্রতিপত্তি [illegible] গৌরব, মানমর্যাদা ইজ্জত, আত্মসম্মান [illegible] ধীরে খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে [illegible] তাঁরই হাতে গড়া জগৎ থেকে [illegible] নির্বাসিতা। যতই ভাবেন [illegible] ভাবনার জট আরও পাকিয়ে [illegible] অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তিনি [illegible] চিন্তাধারার উদ্দাম [illegible] উঠলেন। [illegible] অন্তহীন ভাবনার [illegible] উন্মাদ।

এই মানসিক অবস্থায় [illegible] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান হলো। [illegible] আবিষ্কার করলেন যে তাঁর ভৃত্যরা [illegible] তাঁর শত্রুপক্ষ একই ধর্মাবলম্বী। [illegible] তাদের বিদায় করতে বদ্ধপরিকর [illegible] উঠলেন। ধীরে ধীরে তাদের [illegible] ছুটি বার করে একে একে [illegible] তিনজন বিদায় নিল। তাদের [illegible] পূরণ করল তিনজন ভিন্নধর্মের লোক। চতুর্থজন ছিল তাঁর বাবুর্চি। তাকে [illegible] দেবার সময় হোল বিপদ। যাবার [illegible] সে শাসিয়ে গেল। শাসিয়ে গেল [illegible] হত্যা করবে বলে। লরা তখন [illegible] জানলার ধারে একাকিনী দাঁড়িয়ে। [illegible] সেই সময় কেউ তখন ছিল না। [illegible] যে সহজভাবে লরাকে হত্যা করবে না। [illegible] প্রতি রাতেই লরার কাছে আসবে [illegible] দিককার জানলা দিয়ে। ধীরে ধীরে [illegible] হত্যা করবে সর্বাঙ্গে [illegible] ফুটিয়ে। তার কর্কশ কণ্ঠের [illegible] অভিশাপ লরার অগোচরে [illegible] তাঁর মনোমন্দিরের আনাচে কানাচে [illegible] প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। [illegible] যেন গড়িয়ে পড়ল আকাশ থেকে [illegible] পাতার মত।

সে হত্যার ভীতিপ্রদর্শন [illegible] কাজ দিল যেহেতু সে ভীতি লরার [illegible] এমন এক সন্ধিক্ষণে হাজির হোল যা লরার

ক্ষীণ, ভঙ্গুর ক্লিষ্ট বিধ্বস্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্নায়ুগুলির পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। স্নায়ুযুদ্ধে লরা তখন নিশ্চয় পরাজিতা। গভীর রাতে শয্যার উপর লরা ধড়মড় করে উঠে বসেন। অস্ফুট কণ্ঠে স্বামীকে প্রশ্ন করেন, 'দেখো ঐ...ঐ পূবে জানালা দিয়ে কে যেন আসছে।' জন খুঁজে বেড়ান, কাউকে পান না দেখতে। লরাকে শুইয়ে দেন। মাথায় হাত বোলাতে থাকেন। আবার ভয়বিহ্বল লরা শয্যার উপর উঠে বসেন। ভয়চকিত বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকেন তাঁর বাহুদ্বয়ের অসংখ্য রোমকূপের দিকে। জনকে ডেকে বলেন, 'দেখছ না—পিন ফোটার দাগ? ঐ লোকটা আমাকে পিন ফুটিয়ে চলে গেল। দেখছ না কিভাবে হাতটা ফুলে উঠেছে?'

সমস্যা সমাধানের মূল সূত্র তখন পেয়ে গেছি। যা ভেবেছিলাম তাই বোধহয় ঠিক। একই চিন্তার উপর দীর্ঘদিন তীব্র, অবিরত কেন্দ্রীভূত মনঃসংযোগ ও মনোসন্নিবেশের ফলে সেই চিন্তাধারার ফল প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, বাস্তবতার মাঝে জীবন্ত, সজীব হয়ে উঠছে না তো? কালবিলম্ব না করে আমরা তৎকালীন এক বিরাট মনস্তত্ত্ববিদ-এর শরণাপন্ন হলাম। আজ তিনি পরলোকে। তাঁর অভিমতে একই চিন্তা যখন এক বিষয়ে প্রচন্ডভাবে কেন্দ্রীভূত হয় এবং বারবার আত্মসংকেত বা আত্মসূচনার ফলে (auto suggestion) মনের গহন কোণে বিশেষ আকার গ্রহণ করে, তখন সেই চিন্তার বাস্তব রূপ দেহে প্রতিফলিত হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। এটা বিশেষ করে ঘটে স্ত্রীলোকের উপর। বিশেষ করে ঘটে কোন এক মানসিক বা দৈহিক বিপর্যয়ের ফলে। তাঁর কথা সেদিন আমার নোটবুকে লিখেছিলুম, সেটুকুই জানিয়ে দিচ্ছি।

> 'It is no wonder that the pin marks are the effects of constant concertration on one and a single thought. Physical manifestation might appear as a result of systematic auto suggestion and constant thinking. The condition of the mind sets an encouragement when the patient is suffering from certain physical or mental malady.

কিন্তু লরার শারীরিক অসুস্থতার কথা তো আমরা শুনিনি - বা গত দশ মাসের মধ্যে লরার শারীরিক অসুস্থতা তো লক্ষ্য করিনি। প্রশ্ন করলাম মিঃ জনকে। তিনি জানালেন, লরা কিছুদিন আগে তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু ইউরোপীয়ান শল্য-চিকিৎসক মনোস্তত্ত্ববিদের কাছে গিয়েছিলেন। তবে কি কারণে তিনি সঠিক তা জানেন না। আমরা কালবিলম্ব না করেই সেই চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করলাম। যা জানলাম তাতে লরার মানসিক বিপর্যয়ের সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা রইল না। তাঁর কাছে জানতে পারলাম লরা তাঁর জীবনের দারুণ সংকটময় পরিবর্তনের মাঝে চলেছেন। তিনি চলেছেন মাতৃত্বের নির্বাসনের শেষ বাঁকে—উপস্থিত হচ্ছেন ঋতুমতী রজস্বলা নারীর বন্ধ্যাত্বের শেষ আঙিনায়। তিনি আমাদের সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,

> 'You needn't worry It is a bad case of climacteric. The threat came when she was already in it Her nerves were shattered Constant thinking and auto-suggestion perhaps had their say in the matter. Read these books and you would know the reasons why?.. ...'

'চলে আসবার আগে তিনি আমাদের কয়েকটি বই দিয়েছিলেন। আমার ক্ষুদ্র জরাজীর্ণ নোটবই-এ একটি বইয়ের কয়েকটি লাইন লেখা আছে দেখলাম। লেখকের নাম মনে নেই। সে পাতা ছেঁড়া। লেখক বলছেন—

> 'The unpleasant symptoms which are very general amongst women at the climacteric are mostly due to the upset of the nervous system. These are flushes, nervousness and irritability, disturbances of the circulation causing 'pins and needles etc and dyspepsia'—and neuralgia of various sorts'

অর্থাৎ যে আর্তস্তিকর উপসর্গ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের জীবনে দারুণ সঙ্কটময় পরিবর্তনের কালে দেখা দেয়, তা সাধারণতঃ ঘটে থাকে তাদের স্নায়ুমণ্ডলের বিপর্যয়ের ফলে। এইগুলি আকস্মিক উত্তেজনা, স্নায়ুদুর্বলতা ও ক্রোধশীলতা বা উত্তেজনার আকারে দেখা দেয় যা রক্ত-সঞ্চালন বা রক্তপ্রবহনের পথে বাধা সৃষ্টি করে—এবং ফলে 'পিন ও সূচের' আঘাত ইত্যাদির নানা প্রকারের স্নায়ুবেদনা ও অগ্নিমান্দের সৃষ্টি করে।

লরার সমস্যা তখন আমাদের কাছে অত্যন্ত স্বচ্ছ, সরল। মিঃ জনকে জানালাম মনস্তাত্ত্বিকের ব্যবস্থা করতে। শ্রদ্ধের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানবিদ যিনি ছিলেন আমাদের দুরূহ পথের প্রথম নির্দেশক, তাঁর পরামর্শে আমরা প্রায় রোজ লরার বাড়ি যেতাম এবং নিয়ম করে লরাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা বর্ণনা করতাম। ধীরে ধীরে লরা সমগ্র ব্যাপারটিকে সহজ করে নিলেন। কোথায় তাঁর সেই উত্তাপ? কোথায় রইল উন্মত্ত উত্তেজনা? ধীরে ধীরে সবই চলে গেল।

আমাদের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। মিঃ জন ও লরার অপার কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের মাঝে আমরা বিদায় নিলাম। বহুকাল চলে গেছে। হঠাৎ একদিন এল লরার টেলিফোন। অনুযোগ : তোমাদের আজ আসতেই হবে। নৈশভোজন আমারই কাছে। না এলে আর বোধহয় দেখা পাবে না।'

মনে আছে সে রাতে লরা কত খুসী কত স্বাভাবিক আনন্দে যেন ঝরে পড়ছেন: জানালেন কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে আবার তিনি শুরু করবেন তাঁর কল্পনার সৃষ্টি। সেখানে আবার ফিরে পাবেন যা হারিয়েছেন এখানে।

বিদায় নিলাম, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। লরার সঙ্গে এর পর আর কোনদিন দেখা হয়নি। কোনদিন হবে কিনা তাও জানি না। তবে যেটুকু জানি, যেটুকু বুঝি, তা হচ্ছে লরা আর জনের কাছে আমার আর বন্ধুবরের স্মৃতি চিরজাগ্রত থাকবে।
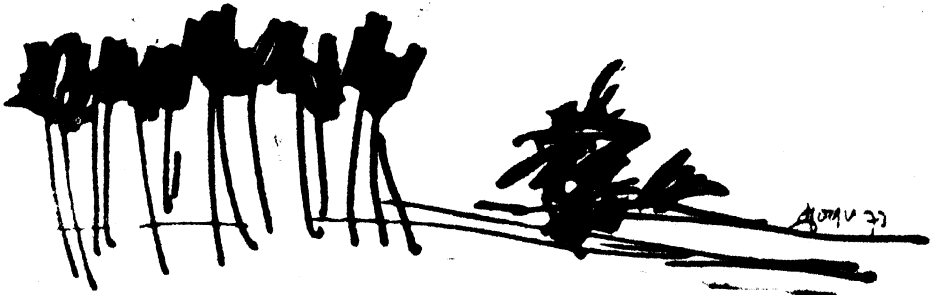
পশ্চিমবাংলায় ভোট গ্রহণ হচ্ছে আসছে শনিবার। ১১ই মার্চ। নির্বাচনী রণক্ষেত্রের শেষ মুহূর্তের চেহারা দেখে কিছুই বলা চলে না। উভয় জোটই বলছেন জিতবেন। স্থায়ী সরকার করবেন। কিন্তু ভোটদাতাদের মনের খবর কী? কোনো দলই তা সঠিকভাবে ধরতে পারছে না। না পারারও যথেষ্ট কারণও আছে। তেমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের গুণও আছে। তবুও বলবো এবার নির্বাচনী হাওয়া কংগ্রেসের অনুকূলে। জানি, একথা সি পি এম পন্থীরা মানবেন না। বহু তথ্য ও যুক্তি নিয়ে তাঁরা হাজির হবেন এই অনুকূলে হাওয়ার দাবী নস্যাৎ করতে। উভয় পক্ষই সমান সমান। এই কথা বলাই বোধ হয় নিরাপদ। দু পক্ষই তাতে খুসী। কিন্তু হাওয়া অনুযায়ী কংগ্রেস মোর্চারই বিজয়ী হওয়া উচিত। এবারকার ফলে, কিছুটা বিস্ময়ের সম্ভাবনা আছে।

সি পি এম এর সাফল্যের যুক্তি হোল এই: সি পি এম-এর সাংগঠনিক ব্যাপ্তি এবং বামপন্থীদের একতা, দ্বিতীয়ত কংগ্রেসীদের ঘরোয়া কলহ, কংগ্রেস-সি পি আই কর্মীস্তরে বিভেদ-অসন্তোষ, যুব কংগ্রেসের ভেতরে বিদ্রোহ; তৃতীয়ত অজয় মুখার্জির প্রভাব হ্রাস, চতুর্থত সি পি আই ও কংগ্রেস সম্পর্কে শ্রমিক, কৃষক এবং সংখ্যালঘুদের ধারণার পরিবর্তন অর্থাৎ প্রতিকূলে চিন্তা। এইসব কারণে কংগ্রেস-সি পি আই মোর্চা ভাল ফল করতে পারবে না। তাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বামপন্থী জোটের করায়ত্ত।

কিন্তু এইসব তাত্ত্বিক বা হিসাব-বিশারদরা ভুলে যান ভোট বা ভোটাররা কারও কেনা নয়। দলীয় নির্দিষ্ট ভোটের বাইরে প্রচুর ভোট রয়েছে। তাদের মানসিকতা বদলাচ্ছে ও বদলাবে। নির্বাচনী জয়-পরাজয় বিচার করার ক্ষেত্রে প্রথম স্থির করতে হবে কংগ্রেস বিরোধী ও সি পি এম বিরোধী ৩৮ শতাংশ ভোট কীভাবে এবার বিভক্ত হবে। গত বছর ২৩৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস ২৯.৩ শতাংশ এবং সি পি এম ২৩৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩২.৬ শতাংশ ভোট লাভ করেছিলো। এর বাইরের ৩৮ শতাংশ ভোটের কত অংশ জোটবন্দীর ফলে কার সঙ্গে গিয়েছে তার হিসাব *এরূপ: কংগ্রেসের নিজস্ব ২৯.৩ শতাংশ + সি পি আইর ৮.৬ শতাংশ + বাংলা কংগ্রেস ও পি এস পি-সোস্যালিস্টদের যে অংশ যুক্ত হয়েছে কংগ্রেসী মোর্চায় তাদের প্রাপ্ত প্রায় ৫.১ শতাংশ অর্থাৎ ৪৩ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ ১৪ শতাংশ অন্যান্যের ভোট কংগ্রেসী মোর্চায় যুক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সি পি এম-এর নিজস্ব ভোট ৩২.৬ শতাংশ + তার পুরান জোটের সঙ্গীদের ভোট + আর এস পি, এস ইউ সি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ভোট—মোট ৮ শতাংশ অর্থাৎ ৪০.৬ শতাংশ ভোট সি পি এম-ফঃ ব্লক বামপন্থী জোটের হাতে রয়েছে। এরা বাইরে রয়ে গেলে ১৬.৪ শতাংশ ভোট। এটা কীভাবে কোন্ বাক্সে যায় তাও দেখা দরকার। এখানেই জয়-পরাজয়ের অঙ্ক রয়েছে। এছাড়া নির্দলীয়দের প্রাপ্ত ভোটের অধিকাংশই কংগ্রেসের অনুগামী ভোট।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, প্রাপ্ত ভোটের হারের সঙ্গে প্রাপ্ত দলীয় আসনের হার কখনই এক নয়। ১৯৭১ সালে কংগ্রেস ও সি পি এম নিজেদের প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় বেশী আসন লাভ করেছিলো। আর ভোটারদের প্রদত্ত ভোটের হারের হ্রাসবৃদ্ধির ওপর অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের হার বাড়ে বা কমে। এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, গতবার সি পি এম-এর বিরুদ্ধে ৬৮টি ভোট পড়েছে, আর শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৭০টি ভোট পড়েছিলো।

যাইহোক, আসন্ন নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল বিচার করতে গিয়ে একদিকে যেমন কংগ্রেস বিরোধী ভোট বেড়েছে, না কমেছে তার যেমন বিচার করতে হবে সি পি এম বিরোধী ভোট বেড়েছে না কমেছে তার তথ্যও বুঝতে হবে। শহর ও গ্রামের নির্বাচনী যুদ্ধের পূর্বাভাস এ সাক্ষ্যই দেয় যে, কংগ্রেসের অনুকূলে ভোট গড়ে ১০ শতাংশ বেড়েছে।

আজ নির্বাচনী রণক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝাতে হবে অতীতের কংগ্রেস বিরোধী ও বামপন্থীদের একাংশ কংগ্রেসী মোর্চায় যুক্ত। ফলে শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেসকে আগেকার প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী বলে বর্ণনা করলে কংগ্রেস-সি পি আই মোর্চার প্রকৃত শক্তি যাচাই করা সম্ভব নয়। সি পি আই এককভাবে বা সি পি এমের সঙ্গে বা ফঃ ব্লক-এস ইউ সির সঙ্গে থাকলেই বামপন্থী, কংগ্রেসের সঙ্গে গেলেই খারাপ—এটা সঠিক মূল্যায়ন নয়। তেমনি সি পি এমের একক শক্তি আর ৮টি ছোট-মাঝারি দলের সম্মিলিত বাম শক্তি এক নয়, এটাও মনে রাখতে হবে।

এবার আমরা দুই জোটের সাফল্যের দাবীর মূল হিসাব নিয়ে একটু বিচার করতে পারি। উভয় পক্ষের হিসাব থেকে পরিষ্কার উভয় জোটই ১৫২ থেকে ১৭৫টি আসনের মধ্যে নিজেদের অঙ্ক সীমিত করেছেন। কংগ্রেস সব জেলাতেই ভাল ফল করবেন দাবী করেছেন। বিশেষত বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, মালদহ প্রভৃতি জেলায় আরও ভাল করবেন। অন্তত কমপক্ষে গতবারে ঐসব জেলায় প্রাপ্ত আসনের ওপর আরও ৪৫টি বেশী আসন পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে দাবী করছেন। অন্যান্য জেলাতে অর্জিত আসন সংখ্যা বজায় থাকবে। এছাড়া সি পি আইও এবার বেশী আসন পাবে। কাজেই তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে এগিয়ে রয়েছে।

এবার সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের শেষ বক্তব্যটা বিচার করতে পারি। তিনি বলেছেন যে, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহার—(এই জেলাগুলোতে মোট

১৪টি আসন আছে) জেলায় সি পি এম জোটের আসন বাড়বে। কতটা বাড়বে তা বলেননি। শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া ও নদীয়ায় মোটামুটি জোটের শক্তি একই থাকবে। এখানে আছে ৫৩টি আসন। তিনি আরও বলেছেন যে, কলকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগণায় আরও শক্তি বাড়বে। কতটা বাড়বে তার কোন আভাস বা হিসাব তিনি দেননি। এখানে ৯১টি আসন আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর নির্বাচনী ফল সংক্রান্ত দাবীতে বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও দার্জিলিং জেলায় তাঁদের শক্তি বাড়বে কী কমবে তা কিছুই উল্লেখ করেননি। এখানের মোট ৭৬টি আসনের মধ্যে ৩৩টি আসন সি পি এম জোটের হাতে গতবার ছিলো। পরোক্ষভাবে শ্রীদাশগুপ্ত স্বীকার করছেন তাঁরা এই শক্তি বজায় রাখতে পারছেন না। বর্ধমানের সি পি এম দুর্গ এবার ভাঙছে। কতটা তা নির্বাচনী ফলেই বুঝতে পারবেন।

শ্রীদাশগুপ্ত সম্প্রীতি সব জেলা ঘুরে এসে বলেছেন যে, তাঁদের জোট ১৭৫টি আসন পাবে। কিন্তু তার পূর্বে উল্লিখিত তথ্য ও বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার ঐ জোটের হাতে ১৯৭১ সালের ফল অনুযায়ী যে ১২৮টি আসন আছে তা বজায় রেখে, নতুন কেন্দ্র দখলের মতো সম্ভাবনায় ভাল পরিস্থিতি এবার নেই। সি পি এম জোট উপরোক্ত থেকে যে বর্ধিত আসনের কথা বলেছেন। তা যদি তারা পানও, তবুও কি দিয়ে তাঁরা বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুরে ঘাটতি ক্ষতিপূরণ করতে পারবেন কী?

সি পি এমের পরিসংখ্যানবিদরা বলছেন যে গতবারে অর্জিত ১৩৮টি আসন এবং আর এস পি, এস ইউ সি, ... সি পি এম স্বপক্ষে হারান ২৪টি আসন এবার পাবেন। অর্থাৎ ঐ শক্তি গিয়ে দাঁড়াল ১৬২। আর এই অংক থেকে বাদ দিন কংগ্রেস, সি পি আই ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে ভোট ভাগাভাগিতে হাত-ছাড়া ১০টি আসন। নীট ১৫২টি আসন সি পি এম জোট পাবেই।

এই হিসাবের প্রসঙ্গটি সি পি এম ও কংগ্রেসের অবস্থাটা একটু পুরান তথ্যের ভিতর দিয়ে বিচার করতে পারি। ধরুন, কংগ্রেস ও সি পি এম ঠিক ১৯৭১ সালের শক্তি পর্যায়েই রয়েছে। এই সঙ্গে জোট-বন্দীর নতুন বন্ধুদের শক্তি যোগ হোল। এর ফলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় দেখা যাক :

মানিকতলা—এখানে কংগ্রেস পেয়েছিলো ১৫৬৮২ আর সি পি আই পেয়েছিলো ৯২১৪। মোট ২৪৮৯৬টি ভোট পায়। আর সি পি এম প্রার্থী মোট ১৬৭৭৩টি ভোট পেয়ে গতবার বিজয়ী হয়েছিলেন। কংগ্রেস-সি পি আই মোর্চার হাতে এবার এ সীট আসা উচিত। কিন্তু ফল কী হয় দেখা যাক।

এবার ধরুন, কবিতীর্থের কথা। এখানে ১৯৩৭২টি ভোট পেয়ে কংগ্রেস বিজয়ী হন। আর ফঃ ব্লক প্রার্থী পান ১২৯৫৫ ভোট এবং সি পি এম পান ১২০৩৬ ভোট। মোট ২৪৯৯১ ভোট সি পি এম মোর্চার হাতে। গত বছরের ফল অনুযায়ী এবং এবারকার জোটবন্দীর প্রকৃতি অনুযায়ী সি পি এম জোটের হাতে এ সীট যাওয়া উচিত। দেখা যাক, ফল এবার কী হয়।

এবার আসুন, হুগলীর চাঁপদানীর দিকে আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। গতবার ২৩২১০টি ভোট পেয়ে সি পি এম এই আসনটি পায়। ঐ কেন্দ্রে গত বছর কংগ্রেস (শা) ১২৯১৬ ও সি পি আই পান ১০২৪৪টি ভোট। এদের মোট দাঁড়ায় ২৩১৬০। এই কেন্দ্রে কংগ্রেস (সং) পেয়েছিলো ২০৯৩। দেখা যাক, এবার এই কেন্দ্রের ফল কী দাঁড়ায়?

এইভাবে উভয় জোটের পক্ষে অনুকূল ও প্রতিকূল এমন ৭৫টি আসনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখান যায় যে, জোটবন্দীর নতুন প্রকৃতি নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করবেই। কানঘেঁষা আসনগুলোর কথাও এই প্রসঙ্গে আসছে। কাজেই বহু উত্থান-পতনের সম্ভাবনা এবারকার জোট-বন্দীর প্রকৃতি, রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে। পুরান তথ্যভিত্তিক দল থেকে দেখান চলে উভয়েরই লাভক্ষতি প্রায় সমান সমান। কংগ্রেসের লাভের অংক সামান্য হলেও একটু বেশী।

সম্ভাব্য নির্বাচনী সাফল্যের চিত্র তুলে ধরতে হলেই কয়েকটি বিষয়ে সঠিক উপলব্ধি থাকা দরকার। প্রথমত—প্রার্থীর যোগ্যতা, স্থানীয়ভাবে পরিচিতি, প্রভাব ও জনসেবার খ্যাতি। দ্বিতীয়ত—দলের প্রভাব ও সাংগঠনিক সক্রিয়তা; তৃতীয়ত—জাল ভোট বছর বছর বেশী পড়ছে, না কমছে। অগ্রাহ্য বা বাতিল ভোটের হার কতো। চতুর্থত—কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, সম্প্রদায়গত চিন্তার প্রভাব কত।

এইসব প্রসঙ্গ ভোটকেন্দ্রের ফলাফলকে প্রভাবিত করে। তাই অল্প ভোটের ব্যবধানে অনেক কেন্দ্রে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

কিন্তু যাঁরা নির্বাচনী যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল স্থির করেন তাঁরা হোলেন অস্থিরমনা-অনির্দিষ্ট-ফ্লোটিং ভোটার। এঁরাই শেষ রায় দেবেন। ফ্লোটিং ভোটাররা

সব কিছু দেখেশুনে শেষ মুহূর্তে মন স্থির করেন। এ'দের মনজয়ের জন্য কত না আয়োজন। যাঁরা কংগ্রেস বা সি পি এম কাউকেই পছন্দ করেন না এমন ভোটাররা, যত অল্পসংখ্যকই হোক না কেন, এবার ১০০টি কেন্দ্রে সরাসরি লড়াইর ফলে তৃতীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে দেখা গিয়েছে ফ্লোটিং ভোটাররা কেন্দ্রে কে জয়ী হবে, কার কার মধ্যে তীব্র লড়াই হচ্ছে তার তথ্য সংগ্রহ করে সম্ভাব্য জয়ী প্রার্থীর দিকে ঝুঁকে পড়েন। নির্বাচনী প্রচারে এই ভোটার অংশটিই কিছুটা প্রভাবিত হয়। কিন্তু নির্বাচনের ফল দেখে প্রমাণ পাবেন দেওয়ালের লিখন আর কপালের লিখন এক নয়।

পশ্চিমবাংলার মানুষ গত পাঁচ বছরের মধ্যে আবার চতুর্থ নির্বাচনে ভোট দিতে যাচ্ছেন। এ'রা সবরকম প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এখন প্রশ্ন, এই নির্বাচন কী রাজ্যে একটা স্থায়ী সরকার আনবে? না আবার রাষ্ট্রপতির শাসন। নির্বাচনী ফলেই তার উত্তর পাবেন।

এপার বাংলার ইলেকশান কড়চা

সুশান্তকুমার মিত্র

মা দুর্গার আগমনের পূর্বে যেমন দশদিক মুখরিত করে আগমনী-বার্তা ঘোষণা করে শিউলী, কাশ, সাদা মেঘের ভেলা, রোদ্র-ছায়ার খেলা, যেমন বসন্তের আগমনের পূর্বে ধরণী নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে, অথবা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের পূর্বে যেমন ধূম উদ্গীরণ হতে থাকে, তেমনি ইলেকসন-আগমনের পূর্বে আমাদের অতি পরিচিত এই বস্তু জগতে কতকগুলি 'মিস্টিক' পরিবর্তন ঘটে—তা যেমন মিস্টিরিয়াস, তেমনি রিয়ালিস্টিক, তেমনি স্যাটারিক।

ডাক্তারী শাস্ত্রে যেমন সাইন ও সিমটম্, অর্থাৎ চিহ্ন ও লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে, 'ইলেকসন' নামক পেসেন্টেরও তেমনি কতকগুলি চিহ্ন আছে যা সাদা চোখে দেখা যায়, আর কতকগুলি লক্ষণ আছে যা অনুভব করে বোঝা যায়। এমনি একটি সাম্প্রতিক চিহ্নস্বরূপে তার আগমনী বার্তাকে বিজয়োল্লাসে ঘোষণা করছে বোমার শব্দ, পাইপ গানের সঙ্গীত। অথবা আর একভাবে বলা যায়—ইলেকসন যেন বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধা। একের পর এক স্তর অতিক্রম করে পূর্ণতা লাভ করবে। প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দিনক্ষণ ঘোষণা—অর্থাৎ 'এখনো তারে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশি শুনেছি।' পূর্বরাগ তখন অনুরাগে রূপান্তরিত হয়, ধরা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পোস্টারের রঙে রসে, মসনদের স্বপ্নে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা পার্টিগত ভিত্তিতে এসে অথবা জোট বেঁধে মুখরিত করে তোলেন এ ভব সংসার, এবং রাজনীতির প্রেম যেহেতু শ্রীরাধিকার প্রেম অপেক্ষা গাঢ়-গভীর, তাই কৃষ্ণপ্রতিম জনগণের দুঃখে দরবিগলিত হয়ে ওঠেন ভব ভাগ্যবিধাতারা।

প্রেম থাকলেই মান হয়। নির্মলশাসনের প্রগাঢ় প্রেম থেকে যাদের তালাক দেওয়া হয় অভিমান তাদের হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তখনই ঠিক গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় মানের সঙ্গে মানকচুর একটা গভীর আত্মীয়তা আছে। আবার কৃষ্ণকে পেয়েও শ্রীরাধার মনে সকারণ মান হয়, হারানোর ভয়ে হয় অকারণ মান। ইলেকসনে জয়লাভ করেও দপ্তর বণ্টনে আর একপ্রস্থ মানের পালা চলে,—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, পার্টির সঙ্গে পার্টির। কারণ মান না রাখলে সম্মান থাকে না।

ইলেকসনের প্রাক্‌কালে পোস্টারের রঙে আসে নববসন্ত। আর আসে অষ্টাদশ শতকের কবির লড়াই, আখড়াই-এর সুগভীর প্রেরণা। ভোটার ভাবে—'আমার যে দিন কেটে গেছে চোখের জলে' তা বুঝি ঘুচলো, প্রার্থীমাত্রেই ভাবেন—'এবার সখি সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা।' আর কবি ভাবেন—'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।'

কাশীরাম দাস বলে গেছেন 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।' এ যুগের মহাভারতে রাজনীতির প্রেরণায় ইলেকসন শুধু একটি পর্ব নয়, পার্বণও। ইলেকসনের ফল ঘোষণার মধ্যে কেউ লাভ করেন চতুর্বর্গ ফল—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছুই বাদ যায় না, কেউ বা পরাজিত হয়ে দেখেন 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া।'

ইলেকশনের শেষ পর্বের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় : যে মহাজন প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বলেছিলেন—'এ পথে আমি যে গেছি বার বার ভুলি নি তো একদিনও', তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে 'বৃহত্তর ক্ষেত্রে' আত্মনিয়োগ করেছেন। দর্শকরূপী ভোটাররা প্রশ্ন করেন 'তুমি কোন পথে যে গেলে পথিক, আমি দেখি না তোমারে।' কারণ জীবাত্মা তখন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ফললাভ করে পরমাত্মায় বিলীন—'নাই নাই সে পথিক নাই!' ইলেকশন নাটকের নায়ক-উপনায়ক-প্রতিনায়ক সকলেরই কিন্তু সুদৃঢ় বিশ্বাস—'আমি না করিলে করিবে কে আর উদ্ধার এই দেশ!' ভোটারদের প্রতি তাঁদের অনমনীয় মনোভাব—'তোরে নাহি করি ভয়, এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।'

রঙ্গমঞ্চ জুড়ে শুধু অন্ধকার—'তিমির নিকুঞ্জরি ঘোর যামিনী।' এ যামিনী পার্টি বাজির অন্ধকার, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অন্ধকার, ভবিষ্যত স্বপ্নের অন্ধকার। নির্বাচনের স্বরূপ, তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সাম্প্রতিক সুতীব্র তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্তমানে এপার বাংলার জনগণকে অন্ধকারের কথাই স্মরণ করায়। আমাদের সামনে অন্ধকারই শুধু একমাত্র বাস্তব সত্য হয়ে বিরাজ করছে। মনে হচ্ছে—কত বৃক্ষ বিলীন হয়ে গেল, কিন্তু আমাদের জীবনে অন্ধকারের আর শেষ নেই। ঔপনিষদিক ব্রহ্মের মত 'নিহিতং গুহায়াং' হৃদয় কন্দরের সঙ্গে আশা আকাঙ্খার রঙিন স্বপ্ন হৃদয় সমুদ্রের অন্ধকার থেকে জন্ম লাভ করে অন্ধকারেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসান।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমান।।

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের কন্দরে, কারণ আশা নিয়েই মানুষ বাঁচে, আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, অপরের পরামর্শ শুনে রাখে না। গত পাঁচ বছরে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চারটি, আর একটি হতে চলেছে। এবার আমাদের আশা হয়তো ভাষা পাবে একক পার্টি বা জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠে। আমাদের বিশ্বাস—

পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে
ফুরায় সত্যের যত পুঁজি।
যাত্রা কর যাত্রী দল,
এসেছে আদেশ,
বন্দরের বন্ধনকাল
এবারের মত হল শেষ।

জলসা

একটি মহৎ অনুষ্ঠান

কানন দেবী পরিচালিত উইমেনস ক্র্যাফটস এসোসিয়েশন এবারও রবীন্দ্র সদনে একটি সাংস্কৃতিক উৎসব উপহার দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যদান। গত বছরের অনুষ্ঠান-সংগৃহীত অর্থে এঁরা বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলের বেতন, বই কেনা ও পুস্তকাদির অর্থ দিয়ে কল্যাণমূলক কাজে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রেখেছেন।

এদের এই মহৎ কাজে বিনা পারিশ্রমিকে অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়ে যেসব শিল্পী সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সন্ধ্যা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত ও বীরেন বসু। আধুনিক, রবীন্দ্রসংগীত, রামপ্রসাদ ও নজরুলের গানে এঁরা বাংলা গানের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের মান তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য অপরিচিত কিন্তু প্রতিশ্রুতিময় শিল্পীদের সঙ্গে সুধীসমাজের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সে দায়িত্বও এঁরা সাফল্যের সঙ্গেই পালন করেছেন—নৃত্যাঞ্জলি গোষ্ঠীর নৃত্যনাট্য 'মিলন' মঞ্চস্থ করে।

নৃত্যাঞ্জলি গোষ্ঠীর 'রূপকথা' আগে একবার এঁদের শিল্পনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে মনকে স্পর্শ করেছিল। সেদিনের সম্ভাবনা আজ সার্থকতার দিকে আরো এক ধাপ এগিয়েছে। এ খবর নিশ্চয় আনন্দের। রূপকথার খ্যাতিকে মিলন অতিক্রমই করেছে।

মণিপুরের কয়েকটি সুনির্বাচিত সুরের সঙ্গে নৃত্যের সুসম্বন্ধ মিলনে কাহিনী রূপায়িত। শিল্পীরা সকলেই নৃত্যকে এক সমৃদ্ধ রূপ দিয়েছেন।

নৃত্যের পুরোভাগে যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হলেন রাজকন্যার ভূমিকায় পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়। নায়িকার উপযুক্ত সব দিক থেকেই ইনি সমৃদ্ধা। বিশালাক্ষী, চঞ্চলা, ভাবোচ্ছলা—সবার ওপর নৃত্য-পটীয়সী। কুমারীচিত্তে প্রেমের জাগরণ, তার রূপান্তর, মিলনাকাঙ্ক্ষা মিলনের জন্য বিরহকাতরতা সর্বশেষে মধুরমাধুর্যে প্রিয়ের সঙ্গে মিলনানন্দের করুণ আবেগ—সব যেন স্বতঃস্ফূর্ত ঝর্ণার মত উচ্ছলিত হয়েছে পূর্ণিমার নৃত্যে, অভিনয়ে ও ভাবে। মণিপুরীর নৃত্যসুষমায় নারী-চরিত্র যেন ফুলের মতই বিকশিত। নৃত্য-নাট্যের শিল্পীতালিকায় ইনি নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল সংযোজন। অনিমেষ কুমারও তাঁর উচ্চস্থানে সগৌরবে সমাসীন। কুমার সংকেতর ভূমিকায় প্রদীপ্ত নিয়োগী সার্থক। মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ ও বেদনা মন্ত্রী আঙ্কতার অভিনয়ে স্বচ্ছ। টীম-ওয়ার্ককে সার্থক করেছেন সমর চট্টোপাধ্যায়, সুশান্তমোহন বসু এবং অন্যান্যরা।

সখীদের ভূমিকায় ছিলেন সংগীতা সরস্বতী, অনিমা ঘোষ, সুতপা দাশগুপ্ত, মধুমিতা মিত্র, ভারতী সেনগুপ্ত ও তনিমা গঙ্গোপাধ্যায়। সংগীতাংশে—অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠসৌকর্য ও পরিবেশনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও দরদের সঙ্গেই গেয়েছেন। আশিস সেনগুপ্তর গানও সুগীত। নৃত্যপরিকল্পনায় পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, নাট্যরূপদানে সুনন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সামগ্রিক পরিচালনায় উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন প্রীতি চট্টোপাধ্যায়।

রবিশংকরের বাজনা ও পরমেশ্বরী

দীর্ঘ তিন বছর বাদে রবিশংকর দেশে এসেছিলেন স্বল্পকালের জন্য। তার মধ্যে কোলকাতায় তাঁর অবস্থানকাল ছিল স্বল্পতম এবং অনুষ্ঠান আরো স্বল্প। মাত্র দুটি। একটি এলগিন রোডের 'ঐকতান'-এ কল্পনা সেন, উদয়শংকর ও বিমান ঘোষ আয়োজিত। অন্যটি কলামন্দিরে। উদয়শংকর কালচারাল সেন্টার নিবেদিত। প্রথমটি ঘরোয়া আসর শুধুমাত্র শিল্পী, কলারসিকদের জন্য, দ্বিতীয়টির শ্রোতা সাগরপারের সেনেটর রাজনীতিবিদ, ভুবনবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শিল্পপতিবৃন্দ, চিত্রতারকা, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী, সাংবাদিক-মণ্ডলী, শিল্পী ও সঙ্গীতরসিক।

পরিবেশের এ-হেন তারতম্যে বাজনারও রকমফের ঘটাই স্বাভাবিক।

প্রথম আসর বসল সীমিত রসজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে। আড়ম্বরহীন কিন্তু শিল্পমণ্ডিত ছোট্ট মঞ্চটি দেখাচ্ছিল ঠিক পূজাবেদীর মত। ধূপ জ্বলছিল তার অপার্থিব গন্ধে এক রমণীয় পরিবেশ রচনা করে। তার মধ্যে পণ্ডিতজী যখন সেতার হাতে বসলেন, মনে হোলো ধ্যাননিষ্ঠ সাধক যেন তপস্যায় বসেছেন, আর তাঁর পূজা-রতির প্রসন্ন আলোর নির্মল প্রসাদ যেন ছড়িয়ে দিচ্ছেন শ্রোতাদের মধ্যে।

প্রথমে ধরলেন 'শুদ্ধ কল্যাণ'। পুরো-পুরি ধ্রুপদী ধাঁচের আলাপ, যে আলাপ শক্তিযন্ত্রের ওঙ্কার ধ্বনির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাগবিস্তারেও দেখলাম সেই অনুপম রবিশঙ্করী ঢং—অতিধীরে, একটি, দুটি, তিনটি পরে চারটি। এইরকম করে, পর পর সুর নিয়ে অতি সূক্ষ্ম তানের মালা গেঁথে চললেন। এলেন জোড়ের অঙ্গে। কত না ছন্দ, কত বৈচিত্র্য। কখনও মৃদুগুঞ্জন, কখনও জলদগম্ভীর খরজের মহিমান্বিত মর্যাদাবোধ আবার গান্ধারের বুকে বিলীয়-মান শান্ত রেশ। কিছুতেই যেন তৃপ্তি নেই। ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করার মত মালা গাঁথা হোলো কই? কোনটিই যে মনের মত হয় না। শিল্পীর এই অতৃপ্তিই যেন শ্রোতাদের অন্তরের অতলে তৃপ্তির নিটোল পূর্ণতা বিছিয়ে দেয়।

পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়

জোড়ের অঙ্গেই লক্ষ্য করলাম আরও একটি জিনিস। এর আগে রবিশঙ্করের বাজনায় ছিল কৃন্তন জমজমার অলঙ্কৃত সমারোহ। এবারে ধাঁচ বদলেছে। কৃন্তনের নূপুরে নিক্কণে রোমান্সের একটা চমক রাঙন বিভোরতা আছেই। হয়ত সে ঝলকানি এবার ছিল না। তবে তার ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছে শিল্পীর অন্তর্মুখীন আকূতি। মীড়ের কাঁপনে আর গমকের ওজসেই যা আভাষিত।

রবিশংকর বলেন—ট্রেডিশন বজায় রেখেও বিপুল ইম্প্রোভাইজেসনের অবকাশ একমাত্র ভারতীয় সঙ্গীতেই আছে।

আর এটা যে আছেই রবিশঙ্করের বাজনাই তা জানিয়ে দিচ্ছে। শিল্পীর চিন্তার মোড় ঘোরার ছবি বাজনাতেও প্রতিফলিত।

আলাপের পর একতালার গতে আল্লারাখার সঙ্গে সঙ্গতমাধুর্যও এক অপরূপ সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতা। এখানে আল্লারাখা তবলাকে একটু নীচু সুরে মধ্যমে বেঁধে নেওয়ায় ঠিক পাখোয়াজের বোলের গম্ভীর আওয়াজ ধ্বনিত হোলো যা এই ধরনের ধ্রুপদী বাজনার সঙ্গে ভারী মানিয়েছিল।

এর পরই 'পরমেশ্বরী'—পণ্ডিতজীর স্ব-সৃষ্ট রাগ। ১৯৬৮তে কোলকাতার কাছেই একটি গ্রাম চেঙ্গাইল যাবার পথে এই রাগের প্রেরণা পেয়েছিলেন। কোমল রেখাব ও গান্ধারের সঙ্গে শুদ্ধ ধৈবত মিশে

যে কি অনির্বচনীয় ভাবাবেশ সৃষ্টি হয়! তার মধ্যে এক মধুর বিষণ্ণতা ছাড়াও যে উপলব্ধিটি বড় হয়ে উঠেছিল তা হোলো একটা তীব্র একাকীত্ববোধ। মনে হয়েছিল এই একাকীত্বের দ্বীপান্তর থেকেই সুরের তরণী বেয়ে চিরবিরহী জীবাত্মা যেন পরমাত্মার অভিসারী হয়ে বেরিয়েছে। এই চাওয়ার বেদনাই মূর্ত, নানা দুরোভাবী মীড়, তানের ত্বরান্বিত গতিমাধুর্যে ঝটকার চাঞ্চল্যে। **বাগেশ্রীর আর্তি, আহির ভৈরোর জলভরা চোখের আকুতি, বিলাসখানির বিষণ্ণ গাম্ভীর্য ও শুদ্ধ ভৈরবীর ভক্তির আবেগের অপরূপ মিলনে 'পরমেশ্বরী' রবিশঙ্করের এক অভিনব রূপকল্পনা।** দ্বিতীয় দিনে পন্ডিতজী বাজিয়েছেন মারবো (আলাপ ও গৎ), যোগ, শ্যামকল্যাণ ও বাংলা ধুন।

মারবা-র আলাপে দাবদগ্ধ রুক্ষ রুদ্র তাপসের উদাস বৈরাগী ভাব তার গৈরিক আভার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে শ্রোতাদের মনে। গৎ কিন্তু সেই তুলনায় অনেক ম্লান। যদিও মাঝে মাঝে সৌন্দর্যদীপ্ত মুহূর্ত হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

শ্যাম-কল্যাণের উল্লাসের নাচন শ্যামল বাংলার ধুনের নানারঙা বর্ণ ও গন্ধে ভরা উপান্তের মোহানায়। রবিশঙ্করের বাজনা বিস্তৃত হয় আপন সৌন্দর্যানুভূতি বিকাশের দিব্য প্রেরণায়। পাত্রভেদে, পরিবেশভেদে তার রূপ বদলাতে পারে—কিন্তু উৎস এক—যাকে শিল্পী বলেন ট্রেডিশন।

যুগযাত্রীর সঙ্গীতোৎসব

সম্প্রতি বি এল সাহা রোডে 'যুগযাত্রী' প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সারারাত্রিব্যাপী এক উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব বিনা দক্ষিণায় রসজ্ঞ শ্রোতাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গান-বাজনা শোনবার সুযোগদান তথা সুনিশ্চিত শ্রোতৃগোষ্ঠী গড়ে তুলে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের প্রসার ও প্রচার। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে এ'দের উদ্যমের মহত্ব ও সার্থকতা অনস্বীকার্য। শিল্পীরাও বিনা পারিশ্রমিকে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে এ'দের কাজে সহায়তাই করেছেন।

উদ্বোধনে সভাপতিত্বকালে শ্রীকালিদাস সান্যাল ভারতীয় হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে খেয়াল গানের স্থান কোথায় ও তার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং খেয়াল গানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইনি উজ্জ্বল আশা পোষণ করেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় বাণী রায়ের খেয়াল দিয়ে। রাগ কলাবতী। এ'র সঙ্গে তবলা সঙ্গতে ছিলেন নীরেন রায়। প্রতিশ্রুতিময় শিল্পীরূপে ইনি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছেন। বাগেশ্রী, কল্যাণশ্রী ও মালকোষ রাগে স্বকীয় ভঙ্গিতে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন ওস্তাদ আমীর খান। স্বল্পপরিসরের মধ্যেও আপন সঙ্গীতচিন্তার স্বচ্ছ রূপ মেলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। কালিদাস সান্যালের 'ললিত' কোমল মধুরতায় রাত্রিশেষের প্রহর ঘোষণা করল। ললিতের কমনীয় বিস্তারের পরই ভাবসঙ্গতি রেখে যোগিয়ায় দাদ্রা ধরাটা সত্যিই শিল্পশ্রীমন্ডিত। তবে শ্রীসান্যালের মৌলিকতার পুরোপুরি নক্সা পাওয়া গেল স্ব-রচিত সুরে গাওয়া বাংলা খেয়ালে। এ'র সঙ্গে সারেঙ্গী ও তবলা সঙ্গতে ছিলেন লড্ডন খাঁ ও বিশ্বনাথ বসু। সারারাতব্যাপী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হোলো সুনন্দা পট্টনায়কের বৈরাগী ভৈরব দিয়ে। শিল্পীর উদাত্ত মধুর কণ্ঠ যেন শ্রোতাদের জাগরণক্লান্তচিত্তে শান্তিজল ছিটিয়ে দিল। শ্রোতারা এ'কে ছাড়তেই চায় না। জগন্নাথ স্বামী, এবং স্ব-রচিত দুটি ভজন গাওয়ার পর 'যোগী মত যা' গেয়ে তবে ছুটি মিলল। যন্ত্রসঙ্গীতের আসর জমে উঠেছিল মণিলাল নাগ ও ভি জি যোগের যোগ ও কৈরবাণী দিয়ে। এ'দের সঙ্গে অপূর্ব তবলাসঙ্গত করেন অমর দে।

আলি হোসেন ও সম্প্রদায়ের মঙ্গল-ভৈরবী রাগে বাজানো সানাই আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। লড্ডন খাঁর সারেঙ্গীর সঙ্গে শ্রীকুমার বসুর তবলালহরা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এই তরুণ শিল্পী প্রখ্যাত তবলিয়া বিশ্বনাথ বসুর পুত্র আগামী যুগের অবশ্যম্ভাবী প্রতিশ্রুতি।

ইংরাজীতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচারে বিবেকানন্দ হলে ইংরাজীতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়। অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা বসুর পরিচালনায় 'রম্যবীণা'র শিল্পী গোষ্ঠী পরিবেশিত এই অনুষ্ঠানটি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের পনেরোটি ধর্ম-সঙ্গীতের সার্থক রূপায়ণ করেন। সুধাহাসি বসু ও সুচন্দ্রা বসু কৃত অনুবাদগুলি আসল সুরে ও তালে জনপ্রিয় গানগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

একক সঙ্গীতে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন দরদী গায়ক গোপাল পাত্র, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচন্দ্রা বসু। সপ্ততি-বর্ষোত্তীর্ণা সুধাহাসি বসুর একক সঙ্গীত এই দিক দিয়ে স্মরণীয় এবং উপভোগ্য। আশিস রায় ও দীপালি বসুর দ্বৈত সঙ্গীতও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। অনুষ্ঠানটির সাবলীল গতি, তথ্যপূর্ণ ইংরাজীতে ব্যাখ্যা ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের সুর ও ভাব-গাম্ভীর্য শ্রোতৃমন্ডলীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী সভানেত্রীর ভাষণে রবীন্দ্রসংগীতের ভাষান্তরে প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে রম্যবীণার সদস্যাবৃন্দকে এই প্রচেষ্টার জন্যে সাধুবাদ জানান। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সুচন্দ্রা বসুর বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীতকে বিশ্বসমাজে সমুপস্থিত করার আন্তরিক আয়োজনকে সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর বলে অভিনন্দিত করেন।

'নূপুর ধ্বনি'র বার্ষিক উৎসব

'নূপুর ধ্বনি'র তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উৎসব 'কলা মন্দির' রঙ্গমঞ্চে সম্প্রতি উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে উক্ত সংস্থার শিশু সভ্যবৃন্দের দ্বারা 'সাত ভাই চম্পা' নৃত্যনাট্য, মাঝে ছায়া হালদারের কথক নৃত্য ও শেষে 'শেষ প্রতিশ্রুতি' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন নূপুর ধ্বনির সভ্যবৃন্দ। 'সাত ভাই চম্পা'র নৃত্যাংশে অংশ গ্রহণ করেন সুপর্ণা দাস চাকলাদার, কলি মুখোপাধ্যায়, সুস্মিতা দাস, অনসূয়া দে, সংগীতা সরকার প্রমুখ। দ্বিতীয়াংশে 'কথক নৃত্য' পরিবেশন করেন ছায়া হালদার। লক্ষ্ণৌ ঘরানা ও রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের নৃত্যাংশ সত্যই প্রশংসনীয়।

'শেষ প্রতিশ্রুতি' নৃত্যনাট্যের নৃত্যাংশে শবরীর ভূমিকায় ছায়া হালদার অভিনয় চরিত্রকে নৃত্যে সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'পুন্ডরিকা' বেশী সুব্রতা রায়ও দর্শকের মনে রেখাপাত করেছে। উক্ত নৃত্য নাট্যাংশে একক বা সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি প্রায় সব গানই শ্রুতিমধুর। যন্ত্রসংগীত, মঞ্চ-পরিচালনা, আলোক সম্পাতে ও পরিচালনায় কিছু ত্রুটি হয়তো ছিল তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সমষ্টিগতভাবে 'সাত ভাই চম্পা' ও 'শেষ প্রতিশ্রুতি' নৃত্য-নাট্য দুটি সাফল্যমন্ডিত হয়েছে।

নৃত্যাংশে অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে অরুণ মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, কমলেশ মজুমদার, জোৎস্না দে সরকার প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ছায়া হালদার।

—চিত্রাঙ্গদা

নটী/সন্ধ্যা রায়। পরিচালনা : নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। —ফটো : অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

(১) পথের সন্ধান?

'রাস্তা চলতে কেউ জানিনা
শুধু জানি লাফ দিয়ে ছুটতে
পুরোনো এ পৃথিবীকে মানিনা'

—এই গান দিয়ে **সঙ্গীতা ফিল্মস-এর নিবেদন এবং দীনেন গুপ্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'আজকের নায়ক'** ছবিটির আরম্ভ। ছবির শুরুতে এই সমবেত সংগীতটি বলতে চেয়েছে, বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের যুবকসমাজের একটি নাতিবৃহৎ অংশ যে নানাবিধ সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে, তার কারণ, এই সমাজ-বিরোধীরা নানা কারণে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। তাই এরা সহজভাবে পৃথিবীতে পথ চলা ভুলে গেছে এবং পরিবর্তে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে। মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা যে-সব নিয়মকানুনের প্রবর্তন করেছে, সৎ অসৎ, ভালো-মন্দ সম্পর্কে যে-ধারণার সৃষ্টি করেছে তাদের বিদ্রোহী মন যে সমস্তই ওলট-পালট করে দিয়েছে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, তারা কেন ঐ সমাজবিরোধিতার পথে পা বাড়িয়েছে, সে-সম্বন্ধে ওদের কেউই বক্তব্যকে পরিস্কার করে বলবার ক্ষমতার অধিকারী না হলেও স্রেফ গলার জোরে চেঁচিয়ে প্রত্যেকেই নিজেকে 'মস্তান' বলে জাহির করতে চায়। গানটি এক কথায় সমাজ-বিরোধীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও সমাজবিরোধিতার করেছে নিন্দা।

'আজকের নায়ক'-এর নায়ক দেবু গুপ্তও সমাজবিরোধী মস্তান। লেখাপড়ার প্রতি তার অশ্রদ্ধা, সে বলে, লেখাপড়া শিখে কি হবে! কিন্তু তাই বলে সে কোকেন, আফিম, গাঁজার স্মাগলার নয়। বন্ধু চন্ডীর কথায় বিশ্বাস করে তার একটি ট্রাংক বাড়ীতে রেখে সে যখন পুলিশ দ্বারা ধৃত হল, তখনও কিন্তু সে বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখে 'ট্রাংক কার?' এবং 'কোথা থেকে এল?'—পুলিশের এ প্রশ্নের উত্তরে 'জানিনা' বলে হাসিমুখে কারাবরণ করল।

প্রেক্ষাগৃহ

শর্মিলী কথাচিত্রে রাখী

তাই তার বৃদ্ধ পিতা এই সান্ত্বনা নিয়ে মৃত্যু বরণ করলেন যে, 'আমার ছেলে নির্দোষ', 'তার চোখ দেখে আমি বুঝেছি, সে নিরপরাধ—সে যে আমার ছেলে।'

'স্মাগলার' ধনী বন্ধু চণ্ডী তাকে বারংবার নিজের শিকার করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। শেষ পর্যন্ত যখন রিভলভার হাতে নিয়ে চোরাই মাল ওর কারখানায় রাখবার জন্যে চণ্ডী বলপ্রয়োগ করে, তখনও দেবু অটল থেকে ওর শিকার হতে অস্বীকার করেছে।

কাহিনীকার বলতে চেয়েছেন, বাঁচার তাগিদেই আমাদের ঘরের ছেলেরা হয়ে উঠেছে মাস্তান, সমাজবিরোধী, সুযোগ-সুবিধা পেলে ওরাও ভদ্রভাবে বাঁচবার চেষ্টা করে, সুখী জীবনযাপন করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াস পায়, যেমন পেয়েছিল দেবু।

'আজকের নায়ক'-এর নায়ক দেবু, বলব নেহাৎই বরাত জোরে, স্মাগলার চণ্ডীর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার পেয়ে একটি লেদ মেশিনের কারখানা খুলতে পেরেছিল এবং ততোধিক ভাগ্যবলে তাহার আত্মীয়ের চেষ্টায় চণ্ডীর টাকা যথাসময়ে প্রত্যর্পণ করে নিজের ঐ কারখানাটিকে রক্ষা করতে পেরেছিল। না, এটা কোনো সমাধান হল না। সমাজ-বিরোধিতার পথ থেকে সরে আসবার অনুকূলে একটা জোরালো, সর্বজনগ্রাহ্য বিধান চাই। ভাগ্যের দোহাইপাড়া এক্ষেত্রে অচল। 'আজকের নায়ক'-এর বক্তব্যের সংগে আমরা একমত হতে পারলুম না এবং দর্শকদের মধ্যেও যাঁরা আমাদেরই মত ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁদের আমরা দোষ দিতে পারি না।

অভিনয়ে নায়ক দেবুর ভূমিকায় সমিত ভঞ্জ নিঃসন্দেহে বাস্তবোচিত চরিত্র চিত্রণের প্রয়াস পেয়েছেন। দেবুর প্রৌঢ় পিতা, নিম্ন মধ্যবিত্ত চাকুরে সত্যবাবুর চরিত্রটির একটি বিশ্বস্ত রূপ দিয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতাময়ী স্নেহপ্রবণ মায়ের চরিত্রটিকে জীবন্ত করেছেন ছায়া দেবী। নায়িকা রত্না বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন নবাগতা সুমিতা মুখোপাধ্যায়; তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে চরিত্রটির মানস ব্যথাবেদনাকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় জয়শ্রী রায় (দেবুর ভগ্নী রমা), রবি ঘোষ, নির্মল ঘোষ, চিন্ময় রায়, কাজল গুপ্ত, নির্মল ঘোষ, কামু মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের কোনো কোনো বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সংলাপের কোনো কোনো অংশ পরিষ্কার শ্রুতিগ্রাহ্য নয়। কেন, তা বলা শক্ত। ছবির প্রথম কোরাস গানটি লয়ের জন্যে অনুধাবন করা কঠিন। দ্বিতীয় একক গানটি (আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া) অপ্রয়োজনীয়। আবহসংগীতের সঙ্কেত ভাব লক্ষণীয়।

সপ্তায়তন সিনেমা নিবেদিত 'আজকের নায়ক' বর্তমান যুগসমস্যার একটি আংশিক আলেখ্য মাত্র।

(২) হিপির রাজ্যে

নবকেতন ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড নিবেদিত ও দেব আনন্দ রচিত, প্রযোজিত, পরিচালিত এবং অভিনীত 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' নামে রঙীন ছবিটিতে নেপালের কাঠমাণ্ডুস্থ হিপির রাজ্যটি যে পরিপাটিভাবে দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তার আকর্ষণ মোটেই কম নয়। এবং মাত্র এই একটি আকর্ষণই ছবিটিকে অসাধারণভাবে জনপ্রিয় করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। এই হিপির আড্ডাটিকে যে একান্ত অনাবশ্যকভাবে ছবিটির মধ্যে আমদানী করা হয়েছে এ অভিযোগ কেউ করতে পারবেন না। নায়ক তার অত্যন্ত স্নেহভাজনা ভগ্নীর সন্ধানে এসেছে এই হিপি রাজ্যে। কারণ সে তার প্রবাসী পিতার পত্র থেকে জেনেছে যে তার ভগ্নীটি হিপিদের দলে মিশেছে এবং বাপের আশ্রয় ত্যাগ করে তাদেরই সংগে নেপালের কাঠমাণ্ডুতে আছে।

এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে কাহিনীর গোড়ার কথাটুকু বলা দরকার। মিস্টার ও মিসেস জয়শোয়াল থাকেন আমেরিকার মন্ট্রিলে। কারণে অকারণে তাঁদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত হয় তাঁদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ। আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওঁদের মেয়ে যশবীর থাকে বাপের কাছে এবং বালক পুত্র প্রশান্ত চলে আসে মায়ের সংগে ভারতে। এরপর দীর্ঘ পনেরো বিশ বছর কেটে যায়। মেয়ে যশবীর বিমাতার অযত্নে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং হিপির দলে মিশে নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের অবসান

ঘটার। এরপরের মধ্যায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। হিপির আড্ডায় ঢুকে প্রশান্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় জেনিস নামে মেয়েটির দিকে। সে বলে, আমার বাপ নেই, মা নেই, এ পৃথিবীতে কেউ নেই। শুধু আমি আছি, আর আমার 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' নাম আছে। বাপের পদের নির্দেশমতো প্রশান্ত পুলিশ অফিসার ঠাকুর সাহেবের সাহায্য নেয়। এবং স্থির-বিশ্বাসে জেনিসকেই নিজের স্নেহের ভগ্নী যশবীর বলে সম্বোধন করে। যশবীর কিন্তু তার পূর্বের জীবনে ফিরে যেতে চায় না। পরিণামে অন্য কোনো পথ না পেয়ে সে শান্তভাবে মৃত্যু বরণ করে। অপরদিকে হিন্দী ছবির চিরাচরিত পথে প্রশান্ত শান্তি নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং খল-নায়কের সঙ্গে প্রচণ্ড বিরোধিতার পরে উভয়ে মিলিত হয়।

নেপালের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বহিদৃশ্যপূর্ণ ছবিটি নয়নাভিরাম। হিপি-দের আড্ডার দৃশ্য যতদূর সম্ভব বাস্তব-ভাবে গৃহীত। ছবির কলাকৌশল বা টেকনি-কের দিক নিখুঁত—ইংরাজীতে বলব নিভুল। কিন্তু মোদ্দা কাহিনীটি একে-বারেই মামুলি—সেই প্রেম, খলনায়ক ইত্যাদির সমাবেশ। বাড়ার ভাগ যেটা, ভগ্নীর জন্য ভাইয়ের অন্বেষণ—সেইটিই ছবির আকর্ষণ। ওই হিপির রাজ্য এবং তার বাস্তব চিত্র। কিন্তু ওই চিত্র পর্যন্ত, যার মাধ্যমে বাঁচবার শর্তটুকু প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু উদ্ঘাটিত হয় না। হিপিরা কেন হিপি, ওদের জীবনাদর্শ কি, সে-সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান নেই, কোনো বিশ্লেষণ নেই। এমন কি, প্রশান্তরূপী দেবআনন্দ যেন গানের মাধ্যমে বলেন:

"দেখো, ও দিয়ানো তুম ইয়ে কাম
না করো
রাম কা নাম বদনাম ন করো......
হরে কৃষ্ণ হরে রাম
জীবন কো নশে কা তুম গুলাম
না করো..."

তখন মনে হয়, তাঁর এই আবেদন নিতান্তই অলৌকিক। তিনি হিপিদের জীবনদর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলেই এমন আবেদন করেছেন।

অভিনয়ে দেব আনন্দ প্রমাণ করেছেন, আজও তিনি নায়কবেশে দর্শকদের মনো-রঞ্জনে যথেষ্ট সক্ষম। প্রশান্তর স্নেহভাজনা ভগ্নী যশবীরের ভূমিকায় নবাগতা জিনত আমন হিপিণী হিসেবে নিজেকে সার্থক করে তুলেছেন। তিনি যেন হিপি-দর্শনে ডুবে আছেন এবং তাঁর বিভোরতা যেন বাস্তব। প্রশান্তর প্রেমিকা শান্তি বেশে মমতাজ সাধামত সু-অভিনয় করেছেন। প্রশান্ত ও যশবীরের বাপ-মা বেশে যথাক্রমে কিশোর সাহু এবং অচলা সচদেব বিশ্বাস্য অভিনয় করেছেন। খল-নায়করূপে প্রেম চোপরা সার্থক অভিনয় করেছেন। রাজেন্দ্র-নাথ ও ছোট মেহমুদ ছবির হাল্কা অংশ রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন।

[illegible]/রজনী গুপ্ত। পরিচালনা : তপন সিংহ —ফটো : অমৃত

ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর কয়েকটি গান। বিশেষ করে 'কাঞ্চী রে কাঞ্চী' এবং 'দম মারো দম' গান দুটি এখনই লোকের মুখে-মুখে ফিরছে। সুর-যোজনায় রাহুল দেববর্মনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ছবি হিপিদের বাস্তব চিত্র হিসেবে অতুলনীয় এবং এর গানগুলি বারংবার শোনবার মতো।

স্টুডিও থেকে

সুবোধ মুখোপাধ্যায় প্রোডাকসন্সের 'শর্মিলী'

আজ ১০ মার্চ শুক্রবার সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকসন্স নিবেদিত, সমীর গাঙ্গুলী পরিচালিত এবং দীনেশ পিকচার্স পরিবেশিত ইস্টম্যান কলার ছবি 'শর্মিলী' মুক্তি লাভ করছে রকসী, জেম, কৃষ্ণা প্রিয়া মিত্রা গণেশ রূপালী নবীনা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে। শচীনদেব বর্মণ দ্বারা সুরা-রোপিত এই ছবির নায়ক-নায়িকা হচ্ছেন শশী কাপুর ও রাখী।

অজন্তা আর্ট-এর 'রেশমা ঔর শেরা'

অজন্তা আর্ট নিবেদিত ও সুনীল দত্ত প্রযোজিত পরিচালিত এবং অভিনীত ইস্ট-ম্যান কলার ছবি 'রেশমা ঔর শেরা' আজ শুক্রবার ১০ মার্চ প্যারাডাইস সিনেমা এবং অন্যত্র মুক্তি লাভ করছে। জয়দেব দ্বারা সুরসংযোজিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় সুনীল দত্তর সঙ্গে আছেন ওয়াহীদা রেহমা, অমিতাভ বচ্চন, বিনোদ খান্না জয়ন্ত পদ্মা খান্না প্রভৃতি শিল্পী।

স্টুডিও পরিক্রমা

আপনি কি ভাগ্যে বিশ্বাসী? 'না—বললে শুনছি না। কেননা আজকাল প্রায় শতকরা নব্বুইজনই নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ জানার জন্য কমবেশী আগ্রহী।

যেমন ধরুন আপনাদের প্রিয় অভিনেতা একমেব দ্বিতীয়ম্ উত্তমকুমারের কথা। তিনি বেশ কয়েক বছর আগেও জ্যোতিষীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় এখন তিনি তাঁর নির্বাচিত জ্যোতিষীর পরামর্শ ছাড়া এক-পাও নড়েন না।

কথা হচ্ছিল সেদিন স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে 'সোনার খাঁচা' ছবির সেটে উত্তমবাবুর সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভাল আমি নিজেও জ্যোতিষীতে বিশ্বাসী, তাই উত্তমবাবুর সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু আমাদের আলোচনা মাঝপথেই থেমে গেল—গুরো-গম্ভীর এক কণ্ঠস্বর শুনে—'সাইলেন্স প্লিজ' অল লাইটস—

নিমেষে সেটের সব লাইটগুলো একে একে জ্বলে উঠলো। সেটের কলগুঞ্জন থেমে গেল মুহূর্তে।

—উত্তম এসো। উত্তমবাবু উঠে এগিয়ে গিয়ে সেটের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাডি-লাক গাড়ীর ড্রাইভিং-এর আসনে গিয়ে বসলেন। আগেভাগেই অপর্ণা সেন ড্রাই-ভারের পাশে সিটটি দখল করে বসেছিলেন।

আবার আওয়াজ শুনতে পেলাম—কথা বলবেন না—আমরা শট নিচ্ছি।—

উত্তম রেডি? উত্তমবাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

—স্টার্ট প্রোজেকটার, স্টার্ট ক্যামেরা!

অবাক হয়ে দেখলাম উত্তমবাবুর গাড়ীর

জীবন সৈকতে অপর্ণা সেন। পরিচালনা : স্বদেশ সরকার। —ফটো : অমৃত

পেছনের পর্দায় ফুটে উঠছে কোলকাতার জনবহুল রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে ট্রাম, বাস, ট্যাকসি ও প্রাইভেট গাড়ী। উত্তমবাবু গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরে সামনের দিকে চোখ রেখে নায়িকা অপর্ণা সেনের সঙ্গে অস্ফুটে গলায় কথা বলছেন এবং অপর্ণাদেবী স্মিতহাস্যে তার জবাব দিয়ে চলেছেন।

আবার সেই কণ্ঠস্বর—কাট। বলাবাহুল্য কণ্ঠস্বরের অধিকারী অগ্রদূত গোষ্ঠীর অন্যতম বিভূতি লাহা।

জানতে পারলাম—এই স্যুটিং প্রথার নাম ব্যাক প্রোজেকশান। আপনারা যখন এই দৃশ্যটা ছবিতে দেখবেন তখন দেখতে পাবেন উত্তমবাবু গাড়ীটা কোলকাতার জনবহুল রাস্তায় ড্রাইভ করে নিয়ে চলেছেন। সত্যিই আজব কান্ডকারখানা এই সিনেমা জগৎ।

সরকার ফিল্মস-এর পতাকাতলে নির্মিত ছবির পরিচালনায় আছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী। বীরেশ্বর সরকার রচিত ও সুরারোপিত এবং মিহির সেন চিত্রনাট্যায়িত 'সোনার খাঁচা'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে সমাপ্তির পথে। ছবিতে উত্তম, অপর্ণা ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আছেন—সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, অপর্ণা দেবী, রবীন মজুমদার, সুলতা চৌধুরী প্রমুখ।

চন্ডীমাতা ফিল্মস-এর পরিবেশনায় ছবিটি আত্মপ্রকাশ করবে।

সেখান থেকে সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সোজা এসে ঢুকলুম ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। 'বহুরূপী' ছবির স্যুটিং হচ্ছিল। প্রযোজক দীনেশ দে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। 'পান্না-হীরে-চুনী', 'সোনা বৌদি' ছবির পর 'বহুরূপী' দীনেশ চিত্রম-এর তৃতীয় প্রচেষ্টা। প্রণব রায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তরুণ পরিচালক মিঠু চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতেই পরিচালকরূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এর আগে তিনি পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী ও পীযূষ গাঙ্গুলীর সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। প্রসঙ্গ প্রযোজক শ্রীদে জানালেন—এখানে তিন সপ্তাহ স্যুটিং করে তারপর লোকেশন স্যুটিং করবেন দমদম এয়ারপোর্ট এলাকায়, খিদিরপুর ডক এবং কোলকাতার বহুল রাস্তায়। তাহলেই এই ছবির স্যুটিং পর্বের সমাপ্তি।

আউটডোর লোকেশানে একটা গান 'পিকচারাইজ' করা হবে। গানের কথা ক'টিঃ

বন্ধু, শোন শোন
এখানে হাজার মানুষের একই গান
শান্ত আকাশ চাই না তো
আমি দুনিয়াতে ঝড় আনবো
তোমরা আমার লোক
অনেক সুখ আরাম
আমরা লাখো গরীব
নেই কো কোন প্রাণের দাম।

গানটা আমি শুনেছি। গানটির কথা যেমন অর্থবহ, তেমনি সুন্দর সুর। এই গানটি নায়ক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে থাকবে। সুরকার অজয় দাসের সুরে গান গেয়েছেন মৃণাল চক্রবর্তী।

আজকের জটিল জীবন সমস্যার পটভূমিকাতে ক্রাইম ও সাসপেন্সের মাধ্যমে বেশ জমাটি নাটক 'বহুরূপী'। এ নায়ককে বহুরূপে উপস্থিত করা হবে চরিত্রে। নায়কের ভূমিকায় আছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। দুটি [illegible] চরিত্রে আছেন—বঙ্কিম ঘোষ [illegible] আকাশ খান) এবং কৃষ্ণা বসু। অন্য চরিত্রে আছেন—তরুণকুমার, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, [illegible] মুখোপাধ্যায় ভারতী দেবী [illegible] ও মলিনা। ছবির চিত্রগ্রহণ [illegible] ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে [illegible] গুপ্ত, সঞ্জিত সেন ও বসাক [illegible]।

এবারে স্বল্প কথায় [illegible] খবর দিই। পরিচালক তরুণ মজুমদার পরবর্তী ছবি শ্রীমান [illegible] স্যুটিং প্রায় শেষ করে এনেছেন। [illegible] ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের [illegible] যোগী, আকর্ষক একটি গল্প অবলম্বনে ছবিটি গড়ে উঠেছে। [illegible] শিশু শিল্পীকে এই ছবিতে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য [illegible] রায়চৌধুরী ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। [illegible] পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে আছেন—[illegible] দত্ত, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায় [illegible] শ্যাম লাহা প্রমুখ। [illegible] প্রোডাকসন্স প্রযোজিত এ ছবির সঙ্গীতে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

দিল্লী ও আগ্রায় উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেনকে নিয়ে একটানা সপ্তাহব্যাপী [illegible] দৃশ্যগ্রহণ শেষ করে পরিচালক [illegible] মুখোপাধ্যায় গত সপ্তাহে তাঁর ইউনিট কোলকাতায় ফিরে এসেছেন। তাঁর [illegible] ছবি 'মেমসাহেব।' নিমাই ভট্টাচার্য রচিত

কাহিনী অমৃতেই প্রকাশিত হয়েছিল। ছবিতে প্রযোজিকা-সংগীত পরিচালিকা ... ভট্টাচার্য টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে ... গান রেকর্ড করেছেন। তার মধ্যে ... দ্বৈত কন্ঠে গেয়েছেন—মান্না দে ও ... ভট্টাচার্য স্বয়ং। অপরটি রবীন্দ্র- ... (কোরাস) গেয়েছেন—বাণীচক্রের শিল্পীরা। উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন ... ছবির অন্যান্য শিল্পী তালিকায় ...—সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ..., বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, নবাগতা ... ও মাস্টার ইন্দ্রজিৎ। প্রযোজিকা ... ভট্টাচার্য এক সাক্ষাৎকারে জানিয়ে- ...—এই মাসের মাঝামাঝি আউটডোরের ... শুরু হবে এবং এই পর্বের ... শেষ হলেই ছবির বারো আনা কাজ ... হয়ে যাবে।

... একটি উল্লেখ করবার মতো খবর: ... ছবির প্রযোজক সংস্থা সাহা ... সন্ন্যাসী কথাশিল্পী প্রফুল্ল রায়ের ... চিত্রস্বত্ব কিনেছেন।

মঞ্চাভিনয়

পত্রিকা ভবনে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর': ... ফেব্রুয়ারী '৭২ মঙ্গলবার ১৪নং ... চ্যাটার্জি লেনের পত্রিকা ভবনে ... গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভাব (দোল-পূর্ণিমা) মহোৎসবে সন্ধ্যা ৬টায় ধর্মসভা ... সম্মেলন হয়। মঙ্গলাচরণ করেন ... স্বামী চিন্ময়ানন্দ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ... শ্রীনাথ রায় সম্মেলনের উদ্বোধন ... সভাপতি ও প্রধান অতিথির ... অলংকৃত করেন যথাক্রমে প্রভুপাদ ... কিশোর গোস্বামী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী।

সম্মেলনান্তে বাংলার অন্যতম প্রাচীন সৌখিন নাট্য সংস্থা রাজবল্লভ-... সমিতি সাংস্কৃতিক সভ্যগণের ... ও শ্রদ্ধার্ঘ্য ভক্তভৈরব মহাকবি গিরিশ-... অমর অবদান 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ...-রূপান্তর মধু সংলাপী নাট্যকার ... ভট্টাচার্য দলগত ও ব্যক্তিগত ... নৈপুণ্যতা অগণিত ভক্ত ... সমক্ষে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে ... হয়। বহু দিন পরে আবার ... মঞ্চে দেখলাম নামভূমিকায় শিব-... সিংহ, পাগলিনী—প্রভাতকুমার ঘোষ, ...—রাধিকামোহন মুখোপাধ্যায়, ...—কানাইলাল ঘোষ, দেওয়ান—কালা-... প্রভৃতি সুদক্ষ অভিনেতাদের। ... পর যার চরিত্রটি সর্বক্ষণ দৃষ্ট হয় সে ... অষ্টম বর্ষীয়া কুমারী দিপালী দাস, ... বালক বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ-এর ... কণ্ঠে গান ও সাবলীল ভঙ্গিমায় ... ও অভিনয় বাস্তবিকই প্রশংসার-... ভক্তিপূর্ণ ভাবধারায় অভিনয়ে ... ভক্তমণ্ডলীকে কাঁদায় 'বিল্বমঙ্গল' ...। পাগলিনী ও ভিক্ষুক তাঁদের ... সমধুর গানে দর্শক-... দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিম্নোক্ত ... অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের দাবী রাখে বণিক—আশীষ ভট্টাচার্য, সোমগিরি—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দারোগা — দুলালচন্দ্র ঘোষ, শিষ্য—শিবনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীরাধা—কুমকুম ঘোষাল, অহল্যা—সুনীতি দাস, ভৃত্য—সত্য ঘোষ, টহলদার—অমর চক্রবর্তী ও রবীন দে প্রভৃতি।

নাট্য নির্দেশনা ও সুর সংযোজনায়—প্রভাতকুমার ঘোষ। যন্ত্র-পরিচালনায়—নলিনীকান্ত করণ। যন্ত্রসঙ্গীত সহ-যোগিতা করেন—হরিচরণ দাস, লক্ষ্মী শ্রীমানী, বিশ্বনাথ দাঁ, মুরলীধর মল্লিক, গদাধর মল্লিক, ভূপেন ব্যানার্জি, সুবীর চ্যাটার্জি, খোকা ঘোষ, সুবর্ণকুমার দাস প্রভৃতি।

'হাসুবানু' নাট্যাভিনয়

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের নোটিশ সেকশান 'মিত্রম' সংস্থা সম্প্রতি ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ সান্যালের বহুপঠিত উপন্যাস 'হাসুবানু'র নাট্যরূপ খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন। এ অভিনয়ের সবচেয়ে বড় সার্থকতা সেদিন মূল কাহিনীকার শ্রীসান্যাল নাট্যারম্ভের শুরু থেকে শেষ-পর্যন্ত ছিলেন এবং শুধু তাই নয় তাঁর মতে কাহিনীর মূল বক্তব্য বজায় রেখে মিত্রম্ নাট্যগোষ্ঠী যে অভিনয় সেদিন করলেন তাতে তিনি বিশেষ প্রীত হয়েছেন। প্রবোধবাবুকে অভিনয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, অফিস নাট্য-সংস্থার এত ভালো অভিনয় তিনি বহুদিন দেখেননি। 'হাসুবানু'র নাট্যরূপে দিয়ে-ছিলেন গিরীন চক্রবর্তী। নাট্যপরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য। নাট্যরূপ ও পরিচালন-মুন্সিয়ানার জন্যে উভয়েই কৃতিত্ব ও প্রশংসার দাবী করতে পারেন। এই দিক দিয়ে মিত্রম্ গোষ্ঠীকে অভিনন্দন।

বৃহৎ উপন্যাসের নানা ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্রকে গ্রথিত করে একটা নাটক খাড়া করা খুব দুরূহ কাজ। নাট্যরূপদাতা কৃতিত্বের সঙ্গে তা করেছেন। কিছু ত্রুটি অবশ্যই আছে এবং চরিত্রাভিনয়ে। তা স্বীকার করে নিয়ে নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে নাটকের মূল চরিত্র 'হাসু বানু'—সে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টো-পাধ্যায়। নায়ক বিমলাক্ষ চরিত্রে রমেন মিত্র—এক কথায় সুন্দর। এছাড়া অনিল মুখোপাধ্যায় ও অলকা গাঙ্গুলীর অভিনয় অনবদ্য। অপরাপর চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেছেন তাঁদের সকলের অভিনয়গুণেই নাটকটি জমে উঠেছিল। আবহসঙ্গীত নাটকটির সাফল্যে অনেকখানি সহায়তা দিয়েছে।

'সিলুয়েটে'র নাট্য উৎসব

মধ্যম গ্রামের 'সিলুয়েট' নাট্য সংস্থার দু-দিনব্যাপী (৪ঠা ও ৫ই মার্চ) নাট্য উৎসব হয়ে গেল বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান 'পতঙ্গ' নাটকে আমাদের জীবনের রোজনামচা অতি অনায়াসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই বুক-চাপা কান্না, অহেতুক মৃত্যুর আতঙ্ক, সেই জীবন যন্ত্রণার উৎকট প্রকাশ, অথবা শ্লোগানের ফালতু বাড়াবাড়ি। 'পতঙ্গ' নাটকে আজকের বিপুল শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিমুহূর্তের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নচিন্তা অব্যক্ত রক্তাক্ত যন্ত্রণায় যেমন রূপ তেমনি বৈপ্লবিক চেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে, এবং মুখোশধারী সমাজ-সোহাগী ধনিক শ্রেণীর পতঙ্গের মতোই অনিবার্য মৃত্যুর কথা ঘোষিত হয়েছে বারবার। প্রত্যেক অভিনেতার নিপুণ চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতায় নাটকের মূল কাহিনী ও আন্তরিক বক্তব্যকে সার্থক করে তুলেছে।

দ্বিতীয় দিনের 'নায়িকার মৃত্যু' সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের নাটক। এই নাটকে মৃত্যুর ঘন রহস্যময়তার অপ্রত্যাশিতভাবে যবনিকা পতন ঘটেছে। সমস্ত দর্শক রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে নায়িকার মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটনে নায়কের মতোই বিভ্রান্ত অস্থিরতায় আকুল। এই মানবিক রহস্যনাটক 'নায়িকার মৃত্যু' এবং 'পতঙ্গ' সেদিনের বসন্ত সন্ধ্যায় সমস্ত দর্শককুলকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল।

দু-দিনের নাটকের টিমওয়ার্ক এবং আলোক, সংগীত ও সর্বাঙ্গীণ শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন পরিচালনা প্রশংসার দাবী রাখে। দুটি নাটকই রচনা ও পরিচালনা করেছেন—রামানুজ সেনগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন: অরবিন্দ বিশ্বাস, মাণিক মৈত্র, সুসার চক্রবর্তী, অরূপ আচার্য, প্রদীপ ঘোষ, সুবীর কর্মকার, শচীন সরকার; পুলক চক্রবর্তী। আবহসংগীতে ছিলেন—সন্তোন বিশ্বাস ও সম্প্রদায়। সংগীতে ছিলেন—মলিনা সেনগুপ্তা, মিনতি সরকার, কল্পনা ঘোষ, চন্দ্রিক সেনগুপ্ত, সুসার চক্রবর্তী ও অরুণ সাহা।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ছোট ফণি—যাত্রাজগতের বিখ্যাত অভিনেতা সর্বজনপ্রিয় ছোট ফণি গত ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার সকালে হৃদ-রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বৎসর। শিল্পজগতের ছোট ফণির আসল নাম ছিল শ্রীফণিভূষণ মতিলাল। তিনি এই শিল্প-প্রকরণের সর্বপ্রাচীন তিনি ব্যক্তির একজন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে যাত্রা জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

ফণিভূষণ মতিলাল প্রথমে যাত্রায় আসেন সাত-আট বছর বয়সে। শশী হাজরার দলে সখী হিসাবে। পরে নট্ট কোম্পানীতে চরিত্রে শিল্পী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'খনা' পালায় তাঁর খনা চরিত্রের অভিনয় খুব প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এই পালায় মিহির সাজতেন শ্যামসুন্দর গোস্বামী। একদিন দুজনে পরামর্শ করে ভূমিকা পাল্টে নিলেন। ফণিবাবু সাজলেন মিহির। সেই থেকেই অভিনেতা ছোট ফণির আবির্ভাব। তাঁর মিহির খনার চাইতে অনেক বেশি যশ অর্জন করেছিল।

পরবর্তীকালে এই শিল্পী নবদ্বীপ সাহার দল নট্ট কোম্পানী আর্য অপেরা গণেশ রঞ্জন নাট্যভারতী প্রভৃতি বহু যাত্রা-দলের বিভিন্ন পালায় অভিনয় করে অপ্রতি-দ্বন্দ্বী যাত্রাভিনেতার সম্মান অর্জন করেন। একাদিক্রমে তিনি আটচল্লিশ বছর যাত্রা শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর অভি-নীত বিখ্যাত চরিত্র শাম্ব (লীলাবসান) প্রবীর (প্রবীরার্জুন) কৃষ্ণ (জরাসন্ধ) ভরত (কৈকেয়ী) ভীষ্ম (উপেক্ষিতা) এবং আরো অনেক। তবে তাঁর সিরাজ চরিত্রাভিনয়ের কথা আজও সকল যাত্রামোদীর মুখে মুখে। গত সাত-আট বছর ধরেই ফণিবাবু অসুস্থ ছিলেন। এবং বৃহস্পতিবার সকালে চা খাবার সময় হঠাৎ তিনি অসুস্থতা অনুভব করেন। উঠতে গিয়ে পড়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র তিন কন্যা নাতি-নাতনী এবং বহু গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শবদেহে মাল্য-দান করেন পঞ্চু সেন, শিব ভট্টাচার্য, যতীন চক্রবর্তী, শৈলেন মোহান্তি, কিষাণ দাশ-গুপ্ত বিজয় মিত্র এবং তরুণ অপেরা, সত্যম্বর অপেরা, যাত্রাশিল্পী সংঘ শিল্পী-সংসদ, নাট্য ভারতী, নিউ প্রভাস অপেরা মাধবী নাট্য কোম্পানী প্রভৃতি।

যাত্রা শিল্পী সংঘ ১১ মার্চ একটি শোকসভার আয়োজন করেছেন।

মূকাভিনয়

তরুণ মূকাভিনেতা কমলেশ ভট্টাচার্য আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা অর্জন করছেন। সম্প্রতি বাটানগরে এক অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় পরিবেশন করে নতুন করে তারই পরিচয় রাখলেন। এই অনুষ্ঠানে বেকার জীবনের যন্ত্রণায় রচিত 'এরা কারা?' ও 'বাংলাদেশ' সম্পর্কীয় 'আমার সোনার বাংলা' দর্শকদের বিপুল আনন্দ দিয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্রোৎসবের উদ্বোধন

গেল শুক্রবার, ৩ মার্চ, স্থানীয় লাইট-হাউস সিনেমায় চেকোশ্লোভাকিয়ার সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্রোৎসবের উদ্বোধন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। নাতি-দীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় ভারত ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে বহু বর্ষব্যাপী সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মৈত্রী বন্ধনের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'চেকো-শ্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্যনির্ভর প্রাণসত্তা আছে ও সেই কারণেই এর চরিত্রে আছে বলিষ্ঠতা, জীবনীশক্তি, বৈচিত্র্য এবং আধুনিকতা। সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার পারদর্শিতার সমন্বয় ঘটেছে বলে চেকো-শ্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্র এমন একটি উদ্দীপনা লাভ করেছে, যার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই বলা চলে।' অনুষ্ঠানে চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রেস অ্যাণ্ড কালচ অ্যাটাশে মিঃ জা ব্রেজিক এবং ট্রেড কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন।

লাইম লাইটের দু-দিনব্যাপী মিলো

সব আসছে ১৩ ও ১৪ মার্চ লাইম লাইট **পরিচালনায় মহাজাতি সদনে** প্রতি **সন্ধ্যে ৬টায়** দু-দিনব্যাপী মিলোৎসব আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে স**ভাপতি ও প্রধান অতিথির** আসন গ্রহণ করু সান্তাইলাল কে শাহ ও ডঃ রমা চৌধুরী

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৩ মার্চ সো**মবার সন্ধ্যে ৬টায়** সংস্থার সভ্যদের দ্ব শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় **মিত্রের 'নিজস্ব সংবাদদাতা'** নাটকটি মঞ্চ হবে। ১৪ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যে ৬ সাংস্কৃতিক ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হবে।

রবীন্দ্র অনুরাগীদের বিশেষ অনু সাগর সেনের পরিকল্পনা ও নির্দেশ রবিরশ্মি গোষ্ঠী তাঁদের চতুর্থ প্রযো সফল রূপদানে আসছে ১৮ মার্চ, শনি সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে 'বিশ্বজন মোহি' **নিবেদন করবেন।**

অনুষ্ঠানটি একটি মনোজ্ঞ সংগীত নৃত্যবহুল প্রদর্শনীই নয়, এর মাধ্য দর্শকরা রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে এক গবেষণা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিভিন্ন ধরনের সংগীত কবে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে ছিল এবং তার ফলশ্রুতি সাধারণ মানু কিভাবে পেয়েছে, তাঁর বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ পাশ্চাত্য, প্রাদেশিক ও লোকগীতির মাধ্যমে তারই সম্পর্কিত বিচিত্র অভিনব প্রয়া জনা হচ্ছে এই **'বিশ্বজন মোহিহে'**।

কবিগুরুর এই মহান সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে দিকে দিকে পৌঁছে দিয়ে তাঁদের প্রয় মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বে রবিরশ্মি সাফল্য লা করবেন, এই আশা করি।

১৯৭২-এর গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার

ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রযোজিত ছবিতে একটি গণিকার ভূমিকায় অসামান্য নাটনৈপুণ্য প্রদর্শন করে জেন ফণ্ডা বৎসরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে গণ্য হয়ে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার লাভ করেছেন। কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক ফিল্ম ক্রিটিক সার্কেলও তাঁকে এই ভূমিকাভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত করেছেন।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও **শক্তি সংঘের** পরিচালনায় প্রথম বার্ষিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন স্কুল ও প্রতিষ্ঠানের একশতজন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। পরমেশবন্ধু মৌলিক, অমর দত্ত, বলাইলাল দাস, শংকর দত্ত, অমর বসুমল্লিক, বুদ্ধদেব দত্ত, জ্যোতির্ময় মালিক, সৈকত সেন, অরুণাংশু, মঞ্জু, তপন কর, দিলীপ দেবনাথ, রঞ্জিত রায় **মহঃ সোফি, শ্যামসুন্দর ব্যানার্জি,** অভি**জিৎ রায়, স্বপন ভট্টাচার্য, শিশির চক্রবর্তী, মণ্টু সাহা প্রমুখ কর্মীদের** অক্লান্ত

নিম্নলিখিত শাখাসমূহে প্রতি- অনুষ্ঠিত হয় : ছাত্র মঙ্গল বেলঘরিয়া, মহাত্মা গান্ধী হাই জনতা কলেজ, রাণীপুর, প্রাথমিক বিদ্যালয়,

সংস্কৃতির 'অনুপ্রবেশ' মঞ্চাভিনয়

(হাওড়া) প্রখ্যাত সংস্থা গেল ১৩ই ফেব্রুয়ারী এক তাঁদের মঞ্চসফল নাটক 'অনু- করেন। উৎসবে সভাপতিত্ব নিমাই মান্না।

গণনাট্য সংঘের (আমতা) বিভিন্ন সঙ্গীত পরি- করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিমাই মান্না, শ্যামাপ্রসন্ন নাটক ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। অতঃপর 'সংস্কৃতি' নাটক 'অনুপ্রবেশ' মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে মান্না, অরূপ মান্না, বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় নির্দেশনায় ছিলেন নির্মল 'অগ্নিশিখা গোষ্ঠী' ও 'আসেও শানাও' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান

ইলেকট্রনিকসের গেল ১৬ই ফেব্রু. কলেজ হলে উৎসব পালন করেন। অতিথি- সংস্থার প্রধান ডঃ তিনি কর্মিবৃন্দকে নিরলস কর্মের জন্য ও ন্যাশনাল আর্থিক সাহায্যের জন্য করেন।

ব্রিগেডিয়ার ডি স্বরূপ, ও ইন্স- ও কর্মিবৃন্দের করেন ও জানান যে, এ- বিশেষভাবে শ্রীমতী দত্তগুপ্ত বিজয়ীদের পারি করেন।

হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশন করেন বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়। নৃত্যে কুমারী ও দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ হয় ইন্সপেক্টরেটের নিবেদন 'আলোয় দেখা'। অভিনয়গুণে নাটকটি উপ- মঞ্চসজ্জা, আলোক ও করবার মতো। শশাঙ্ক ভট্টাচার্যের। এ কে আগরওয়াল ইন্সপেক্টরেটের পক্ষ জ্ঞাপন করেন। জাতীয় পরই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে বাগবাজার গৌরিক সঙ্ঘ আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ ও শ্রীশচীন দেববর্মনকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। চিত্রে শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং শ্রীআঁধার ঘোষকেও দেখা যাচ্ছে।

দুই গুণীর সম্বর্ধনা

বাগবাজার গৌরিক সঙ্ঘের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক দুই গুণীজন খ্যাতনামা প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও সঙ্গীতশিল্পী কুমার শচীনদেব বর্মণকে সম্বর্ধনা জানান হয় ৫ মার্চ। শ্রীঘোষ ও কুমার দেববর্মণ উভয়েই সম্বর্ধনার উত্তরে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

শ্রীঘোষ ও কুমার দেববর্মণ উভয়েই স্মৃতিচারণ করেন। শ্রীঘোষ বলেন : যাঁদের আমি প্রতিদিন পাশে পাই আজ তাঁরাই আমাকে সম্বর্ধিত করছে। এতে আমি যে আনন্দ লাভ করছি, তা প্রকাশ করা যায় না।

কুমার দেববর্মণ বলেন, আমি কৃতজ্ঞ। উদ্যোক্তাদের কাছে আরো কৃতজ্ঞ কারণ তুষারদার মতন এক মহান ব্যক্তির সঙ্গে আমাকেও বাগবাজার পল্লীবাসী সম্বর্ধনা জানালেন।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখার্জি (বনফুল)।

অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বলেন, কিছু কিছু মানুষ আমাদের জীবনে আসেন, যাঁরা আমাদের চরিত্র ও জীবন-ধারাকে উন্নত করতে সহায়তা করেন। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তেমনি এক মহান পরিবারের মানুষ। সঙ্গীতশিল্পী কুমার শচীন দেববর্মণও আমাদের গৌরব। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাই।

প্রধান অতিথি শ্রীবলাইচাঁদ মুখার্জি বলেন, অর্ধশতাব্দী ধরে দক্ষতার সঙ্গে শ্রীঘোষ যেভাবে দেশকে সেবা করেছেন তা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। তিনি আরো বলেন, শ্রীঘোষ একজন প্রকৃত কৃষ্টিবান পুরুষ।

সঙ্ঘের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীপ্রফুল্ল কান্তি ঘোষ বলেন, বাংলার যে একটা নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে মাঝে কিছু সময়ের জন্য তা বিঘ্নিত হলেও আজও অব্যাহত রয়েছে। তিনি পল্লীর যুবকদের বিভিন্ন কাজের প্রশংসা করে আরো বলেন, সেই ঐতিহ্যকে অটুট রাখার জন্য শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও কুমার শচীন দেব বর্মণের ন্যায় গুণীদের আদর্শকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। শ্রীঘোষ আরো বলেন, '৭১ সালের এই সময়ে আজকের ন্যায় এ রকম শুভ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হতো না। কিন্তু আজ মানুষ বুঝতে পেরেছে—হিংসায় সফলতা আসে না। তিনি শান্তি বজায় রাখার জন্য মহল্লার প্রতি- বেশীদের কাছে আবেদন জানান।

সভাশেষে এক বিচিত্র অনুষ্ঠানে শ্রীহেমন্ত মুখার্জি শ্রীসন্ধ্যা মুখার্জি, শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী, শ্রীমানবেন্দ্র মুখার্জি, শ্রীঅনুপ ঘোষাল, অধ্যাপক দীপঙ্কর চ্যাটার্জি শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র, শ্রীমতী বনশ্রী সেনগুপ্ত, আলি হোসেন ও সম্প্রদায়, শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ও সম্প্রদায়, শ্রীজহর রায়, শ্রীমন্টু ভট্টাচার্য প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং সমাগত অতিথি, শিল্পী সকলকে ধন্যবাদ জানান শ্রীআঁধার ঘোষ।

খেলাধূলা

দর্শক

ডুরাণ্ড কাপ

১৯৭১ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) শেষ হয়েছে। ফাইনালে উঠেছিল জলন্ধরের দু'টি দল—বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং লিডার্স ক্লাব। ফাইনাল খেলা দু'দিন হয়েছিল। প্রথম দিনের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ১—০ গোলে লিডার্স ক্লাবকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার ডুরাণ্ড কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২১ মিনিটের মাথায় সিকিউরিটি ফোর্স দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আজেব সিং জয়সূচক গোলটি দেন। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যোগ্য দল হিসাবেই যে ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে যে আটটি দল খেলেছিল তাদের মধ্যে কলকাতার ছিল মাত্র একটি—১৯৭০ সালের ডুরাণ্ড কাপের রানার্স-আপ এবং ১৯৭১ সালের রোভার্স কাপ বিজয়ী মোহনবাগান। কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান ০—২ গোলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের কাছে হেরে গেলেও তাদের এই পরাজয় অগৌরবের হয়নি। কারণ মোহনবাগান দলের ৬ জন খ্যাতনামা খেলোয়াড় খেলেননি, তাঁরা অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অলিম্পিক ক্যাম্পে আটকে ছিলেন।

কলকাতার দুই প্রখ্যাত ক্লাব—ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এবারের প্রতিযোগিতা থেকে শেষ পর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করে নেয়। গতবারের ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল প্রতিযোগিতা থেকে তাদের নাম প্রত্যাহার প্রসঙ্গে বলেছিল, যেহেতু তাদের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় ফেডারেশনের ক্যাম্পে আছেন সেইহেতু দলের পক্ষে প্রতিযোগিতায় যোগদান সম্ভব নয়। মহমেডান স্পোর্টিং নাম প্রত্যাহার প্রসঙ্গে কোন কারণ দেয়নি। কলকাতার এই মহমেডান স্পোর্টিং দলই ১৯৪০ সালে ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়ে ডুরাণ্ড কাপকে জাতিচ্যুত করেছিল। ১৯৪০ সালের আগে কোন ভারতীয় দল ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়নি।

এবারের প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ২—১ গোলে দেরাদুনের গোর্খা ব্রিগেডকে এবং লিডার্স ক্লাব ৩—০ গোলে বিকানীরের রাজস্থান আর্মড কন্সটা-বুলোরীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

ভারতের প্রাচীনতম ফুটবল প্রতি-যোগিতা হল এই ডুরাণ্ড কাপ, সূচনা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। এই প্রতিযোগিতাটি গোরা দলের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এমনকি অসামরিক ইউরোপীয় ফুটবল দলেরও এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল না।

এ পর্যন্ত উপর্যুপরি তিনবার ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছে এই তিনটি দল : এইচ এল আই (১৮৯৩-৯৫), ব্ল্যাক ওয়াচ (১৮৯৭-৯৯) এবং অসামরিক দলের মধ্যে মোহন-বাগান (১৯৬৩-৬৫)।

অলিম্পিক ফুটবল

১৯৭২ সালের অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার এশিয়ান-জোন বাছাই পর্বের খেলা আগামী ২০শে মার্চ রেংগুনে শুরু হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ২০ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল তৈরী হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মহম্মদ হাবিব দলের অধিনায়ক হয়েছেন। দলের ২০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আই এফ এ-র আছেন এই ৮ জন খেলোয়াড় : গোলে তরুণ বসু; ব্যাকে সুধীর কর্মকার, শংকর ব্যানার্জি এবং এন গোস্বামী; হাফব্যাকে এস চৌধুরী, ফরওয়ার্ডে মহম্মদ হাবিব (অধিনায়ক), ভূজর দাস, এস ঘোষদস্তিদার।

ব্যাডমিণ্টনের ক্রমপর্যায়

ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন ... গত জাতীয় প্রতিযোগিতায় ... সাফল্যের ভিত্তিতে ১৯৭২ ... ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করে... মহীশূরের পাড়ুকন প্রকাশ ... বালকদের সিংগলসে প্রথম স্থান ... সতের বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ... জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা... মাত্র বালকদেরই সিংগলস খেতা... পুরুষদের সিংগলস বিভাগে ... পরাজিত করে শেষ পর্যন্ত ... বিভাগেও সিংগলস খেতাব ... ছিলেন। সুতরাং পুরুষ বিভাগে ... সাফল্যকে 'বেড়ালের ভাগ্যে ...' সমান করে দেখা উচিত হবে না।

পুরুষদের সিংগলস : ১ম ... (উড়িষ্যা), ২য় ... (পাঞ্জাব), ৩য় ... (রেলওয়ে)

মহিলাদের সিংগলস : ১ম ... (মহারাষ্ট্র), ২য় ... (মহারাষ্ট্র)

বালকদের সিংগলস : ১ম ... এবং অশোক কুমার ... হনুমন্ত রাও এবং ...

জাতীয় টেনিস প্রতিযো...

কলকাতার ... কোর্টে জাতীয় টেনিস ... সম্প্রতি শেষ হল। বিদেশ থেকে ... খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছি... তেমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ... তবুও এঁদের মধ্যে ... খেলোয়াড় এবং ... ৮নং বাছাই আমিস্টাড নিল ... সিংগলসের কোয়ার্টার ফাইনা... বাছাই জয়দীপ মুখার্জিকে ... দর্শকদের হতবাক করেছিলেন। ... সিংগলস ফাইনালে ১নং ... মেরীলিন টেশ (অস্ট্রেলিয়া) ... শ্রীমতী নিরুপমা মানকাদকে ... করেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : ৭নং বাছাই ... মিশ্র ৪-৬, ৬-৪, ৮-১০, ... গেমে ৪নং বাছাই রমানাথন ... পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : ২নং বাছাই মেরীলিন টেশ (অস্ট্রেলিয়া) ... ৬—২ গেমে ১নং বাছাই নিরুপমা মানকাদকে পরাজিত ...

পুরুষদের ডাবলস : ১নং ... লাল এবং জয়দীপ মুখার্জি ... ৬—২, ৯—৪ ও ৯—৭ গেমে ... মিশ্র এবং রমানাথন কৃষ্ণন ... পরাজিত করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৫ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 17th March, 1972 শুক্রবার, ৩রা চৈত্র, ১৩৭৮ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এক নজরে

তৃষ্ণায় পৃথিবীর মৃত্যু : এই গ্রহের শেষ পরিণতি সম্পর্কে নানা আশংকা প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানী মহলে। কেউ বলেছেন, যে দ্রুতগতিতে এই পৃথিবী সূর্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তাতে শুধু তাপের অভাবেই একদিন প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়বে। সারা পৃথিবী হয়ে যাবে মেরু অঞ্চলের মতো তুষারাবৃত। আবার কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, ঐ 'তাপমৃত্যু'র অনেক আগে পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, মহাকাশ থেকে তার দিকে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে আসা আর একটি গ্রহের আঘাতে। যেমন এক আকস্মিক ঘটনায় একদিন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনই আর এক আকস্মিক ঘটনায় একদিন মৃত্যু হবে তার। জনতত্ত্ববিদরা বলছেন, ঐসব মহাজাগতিক দুর্ঘটনা ঘটার অনেক অনেক আগে, প্রাণীর চাপেই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়বে। যে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে পৃথিবীতে মানুষ নামক কীটের সংখ্যা তাতে শতাব্দীকালের মধ্যে এ গ্রহে মানুষের পা রাখার মতো জায়গা পাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের স্বাস্থ্য ও আবহ-তত্ত্ববিভাগ থেকে প্রকাশিত এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, পানীয় জলের যে ব্যাপক অপচয় ও দূষিতকরণ শুরু হয়েছে তা যদি অবিলম্বে বন্ধ না হয় তাহলে শতাব্দীকালেরও আগে শুধু তৃষ্ণার জলের অভাবে পৃথিবীতে প্রাণীজগত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে এ উক্তি অতিকথিত বলে মনে হলেও প্রকৃত অবস্থা সত্যই ভয়ংকর।

এই পৃথিবীতে জল আছে ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার। কিন্তু তার শতকরা ৯৮ ভাগ হল সাগর মহাসাগরের লোনা জল; অবশিষ্ট যে দুই-শতাংশ, তারও ১·৩৫ শতাংশ আটকে আছে পর্বতশৃঙ্গে অথবা মেরু অঞ্চলে তুষার হয়ে, আর প্রাণীদেহে, গাছের পাতায় ও আবহাওয়ায়। একটি মনুষ্যদেহের ত ৫৬ শতাংশই জল, একটি জেলি মাছের জলভাগ ৯৯ শতাংশ। মানুষের রক্তস্রোত থেকে দাঁতের এনামেল, গাছের শেকড় থেকে পাতার শিরা, ডিম, আলু, শাকসব্জি—সবই সজীব হয়ে আছে জলকণায়। সুতরাং, সাগর মহাসাগরের লোনা জল বাদ দিয়ে, এবং প্রকৃতি, কৃষি ও প্রাণীজগতের প্রয়োজন মিটিয়ে পানের জন্য যে জল অবশিষ্ট থাকে তা পৃথিবীর মোট জলরাশির শতকরা একভাগের দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র। সে জল ছড়িয়ে আছে নদী ও ঝর্ণাধারায়, কূপ ও পুষ্করিণীতে অথবা মাটির সামান্য নীচে। কিন্তু পানীয় জলের ঐ সামান্য সঞ্চয়টুকুর যে বেপরোয়া অপচয় এবং দূষিতকরণ শুরু হয়েছে তা যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে তৃষ্ণায় এ পৃথিবীর মৃত্যু অনিবার্য হবে। এখন তৃষ্ণার জলের সবচেয়ে বড় ভাগীদার হল শিল্প। একটি মোটরগাড়ি তৈরির জন্য বিভিন্ন ধাপে লাগে ৪০ হাজার গ্যালন জল, এক ব্যারেল অপরিশুদ্ধ তেল শোধনে প্রয়োজন হয় ১৮½ ব্যারেল জল, এক টন ইস্পাত করতে লাগে ৬৫ হাজার গ্যালন জল, এমনকি এক গ্যালন দুধ প্রক্রিয়নেও লাগে পাঁচ গ্যালন বিশুদ্ধ জল। এই থেকেই বোঝা যাবে যে, শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির প্রয়োজনে মানুষের পানীয় জলে কিভাবে টান পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে, ১৯৭৫ সালে সে দেশের পানীয় জলের দু-তৃতীয়াংশই লেগে যাবে শিল্পের প্রয়োজনে। তারপরও নদীর ধারে গড়ে ওঠা কলকারখানার নোংরা ও তেলকালিতে দূষিত ও অপেয় হয়ে যাচ্ছে বড় বড় নদীর জল। পানীয় জলের সমস্যা শিল্পসমৃদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রে যে কি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তা এই থেকেই বোঝা যাবে যে, পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাতে সে দেশে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি ২,৬২৫ কোটি টাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মানুষের খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়নের প্রয়োজনেই পৃথিবীর পানীয় জলের মোট সঞ্চয়ের দুই-তৃতীয়াংশ প্রয়োজন, কিন্তু তা পাওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করে এ অভাব পূরণ সম্ভব নয়, কারণ তা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। একজন মানুষের সারা বছরে যে গড়ে ১০৭০ ঘনমিটার জলের প্রয়োজন হয়, সমুদ্রের জল থেকে তা প্রস্তুত করতে ব্যয় হয় ১৪০ পাউন্ড, অর্থাৎ প্রায় ২৮০০ টাকা।

পানাসক্তি : মাথাপিছু মদ্যপানের হিসাবে ফরাসির স্থান এখন পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর শীর্ষতালিকায়। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইতালীয়র চেয়ে একজন ফরাসি গড়ে দেড়গুণেরও বেশী মদ্যপান করে। ঐ তালিকায় তৃতীয় স্থানাধিকারী সুইজারল্যান্ড, তারপর পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ও বেলজিয়াম। আমেরিকার স্থান সপ্তম, যদিও সে দেশের শতকরা প্রায় সত্তরজন মদ্যপান করে এবং নব্বই লক্ষ লোক রীতিমতো মাতাল, যাকে বলে এলকোহলিক। সর্বাধিক মদ্যপানকারী প্রথম বিশটি দেশের মধ্যে এশিয়ার দেশ আছে দুটি—চতুর্দশ স্থানে জাপান এবং বিংশতিতম স্থানে ইস্রায়েল।

একজন ফরাসি সারা বছরে গড়ে মদ্যপান করে ২৩ লিটার, একজন ইতালীয় ১৫·২ লিটার, একজন আমেরিকান ৯·৮ লিটার, একজন জাপানি ৫·৭ লিটার ও একজন ইস্রায়েলি ৩·১ লিটার।

মাথাপিছু মদ্যপানের তালিকায় আমেরিকার স্থান সপ্তম হলেও সে দেশে মদ্যপানজনিত সমস্যা কিরকম একটা বড়রকমের জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা দেশের এক সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকার প্রায় নব্বুই লক্ষ লোক, অর্থাৎ সে দেশের কর্মী মানুষের শতকরা দশ ভাগ এখন এমনই পানাসক্ত যে তারা রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্যদপ্তরের স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য অথবা মত্ত বেহুঁস অবস্থায় পথচলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রতি বছর অন্ততঃ ২৮ হাজার লোকের অপঘাত মৃত্যু হয়। মদ্যপানের জন্য আমেরিকার প্রতি বছর অপচয় হয় ১৫০০ কোটি ডলার, অর্থাৎ প্রায় ১১,২৫০ কোটি টাকা। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে দশ থেকে বারো বছর। রাস্তায় মাতলামো করার জন্য প্রতি বছর পঁচিশ লক্ষ লোককে গ্রেপ্তার করা হয় যা সে দেশের মোট গ্রেপ্তারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ঐসব লোককে গ্রেপ্তার এবং যাদের বিচারের ব্যবস্থা করতেও মার্কিন সরকারের ব্যয় হয় বছরে দশ কোটি ডলার অর্থাৎ পঁচাত্তর কোটি টাকা। মদ্যপানের তালিকায় আমেরিকার স্থান সপ্তম হলেও অন্যান্য কারণে মদ্যপানজনিত সমস্যা সে দেশেই এখন সর্বাধিক মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

ইতালির ক্ষণভঙ্গুর মন্ত্রিসভা : এ সমস্যা দীর্ঘদিন ফ্রান্সেরই একচেটিয়া ছিল। ১৯৫৮ সালে দ্যগলের অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত মন্ত্রিসভার পতন-অভ্যুত্থান ফ্রান্সে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে করা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, তৃতীয় রিপাবলিকের সত্তর বছর আয়ুষ্কালে ফ্রান্সে মোট ৮৮টি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল এবং তাতে প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছিলেন সর্বসমেত ৫০ জন। যুদ্ধের পর চতুর্থ রিপাবলিকের তের বছর আয়ুষ্কালে ফ্রান্সে আরও পঁচিশটি মন্ত্রিসভার পতন হয়। তারপর দ্যগল চতুর্থ রিপাবলিক বাতিল করে প্রেসিডেণ্ট-প্রধান যে পঞ্চম রিপাবলিকের পত্তন করেন তা মন্ত্রিসভা ক্ষণস্থায়িত্বের বেইজ্জতি থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করে।

এখন দেখা যাচ্ছে, ইতালিকে ফ্রান্সের ঘাড় থেকে নামা ভূতটি পেয়ে বসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে ১৯৪৫ সালে প্রজাতন্ত্রী সংবিধান গৃহীত হয়। তারপর থেকে গত সাতাশ বছরে ইতালিতে মোট ২৩টি মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। পূর্ণ মেয়াদে রাজ্যশাসন কারও ভাগ্যেই ঘটেনি। কদিন আগে যে ২৪তম মন্ত্রিসভা গঠিত হল, সেটা সংখ্যালঘুর মন্ত্রিসভা।

সম্পাদকীয়

নির্বাচন পর্বের সমাপ্তি

গত পাঁচ মার্চ থেকে ভারতের ষোলটি রাজ্য বিধানসভায়, একটি কেন্দ্রশাসিত এলাকায় এবং একটি মেট্রোপলিটান কাউন্সিলে সদস্য নির্বাচনের জন্য যে ভোট গ্রহণ সুরু হয়েছিল তা শেষ হয়েছে। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সময়ে এই নির্বাচনের ফলাফল অধিকাংশই জানা হয়ে যাবে। উনিশ কোটি ভোটার ও বারো হাজার প্রার্থী নিয়ে নির্বাচন একটি এলাহি কান্ড। ভারতবর্ষ এই নির্বাচনী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে আসছে বিগত ১৯৫২ সাল থেকে। পশ্চিমী পর্যবেক্ষকরা ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস দলে ভাঙন লক্ষ্য করে অনেকে এই হতাশোক্তি করেছিলেন যে, ভারতে সম্ভবত শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। জওহরলাল নেহরুর জীবনাবসানের পরও অনুরূপ আশংকা অনেক 'ভারত-হিতৈষী' প্রকাশ করেছিলেন যে, এই বিশাল দেশকে গণতান্ত্রিক পথে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আর কারো হবে না। সুতরাং ভারতে গণতন্ত্রের পরীক্ষার শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ভারতের মতো একটি অনগ্রসর এবং অধিকাংশ নিরক্ষর অধ্যুষিত দেশে বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুশৃংখলভাবে শিক্ষিত করে তোলা একটি দুরূহ কাজ। অথচ প্রতিবারই সমস্ত পর্যবেক্ষকদের অযথা আশংকাকে ব্যর্থ প্রমাণিত করে ভারতের জনসাধারণ তাঁদের সহজ বিচার বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক বিবেচনা প্রয়োগ করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন সুষ্ঠুভাবে। গণতন্ত্র একটি মহৎ শিক্ষণীয় অনুশীলন—এই উক্তির যাথার্থ্য ভারতের মানুষ বার বার প্রমাণ করেছেন। ভারতের মাটিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের শিকড় আজ বহুদূরে গভীরে প্রসারিত। একে দুর্বল করার জন্য নানা প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক ও উগ্রপন্থী দল চেষ্টার ত্রুটি করছে না। অনবরত এই ধরনের অশুভ শক্তির চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে ভারতের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকে। এবারের নির্বাচনেও এই চ্যালেঞ্জ ছিল এবং ভারতের জনগণ তার উত্তর দিয়েছেন ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে। কোন রাজ্যে কী ধরনের সরকার হবে তা অল্প কদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হবে। কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে শোষণমুক্ত করার প্রগতিশীল নীতি অনুসরণে এই সরকার বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যেই বহু জনহিতব্রতী নীতি এই সরকার কার্যকর করেছেন। কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা সহজ হয়েছে। আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট রাজনীতির খপ্পরে পড়লে দেশেরই ক্ষতি। তেমনি গণতন্ত্রকে ভিতর থেকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র যারা করে তারাও দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির পরিপন্থী। জনসাধারণকে এই ধরনের বিপদ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। এবারের নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা শুধুমাত্র একটা পোষাকী ব্যাপার নয়। দেশকে শক্তিশালী করতে হলে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে অগ্রগতির কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে এই পথেই আমাদের যেতে হবে।

গণতন্ত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানই শেষ কথা নয়। নির্বাচনের পরই সুরু হয় আসল কাজ। জনগণের সম্মতি ও অসম্মতি এই নির্বাচনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাঁদের কর্মসূচী জনগণের অভিপ্রেত নয় তাঁদের নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করে তাঁদেরই নির্বাচিত করেন জনগণ যাঁদের কর্মসূচীর ওপর তাঁরা আস্থা রাখেন। এই নির্বাচন রাজ্য বিধানসভার জন্য হলেও গোটা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতেই একে বিচার করতে হবে। ভারতের সামগ্রিক কল্যাণ এবং জাতীয় ঐক্যের কথা মনে রেখেই সমস্ত রাজ্য সরকারগুলোকে তাদের নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। ভারতের সর্বত্র যদি এক দলীয় সরকার নাও হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। জনগণের ইচ্ছানুযায়ীই গঠিত হবে বিভিন্ন রাজ্যের সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেই প্রত্যেকটি রাজ্যকে স্ব স্ব লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে। কেন্দ্রের সঙ্গে অযথা বিরোধ করে কারোরই কোনো লাভ হবে না, এতে শুধু তিক্ততা এবং হতাশাই বাড়বে।

নির্বাচনের সময়ে পারস্পরিক দোষারোপ এবং সমালোচনা যা হয়েছে এখন তা বিস্মৃত হবার সময়। জনগণ স্বাধীনভাবে যে রায় দিয়েছেন তা স্বীকার করে নিয়ে নির্বাচনোত্তর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য জনপ্রতিনিধিদের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এখন। দারিদ্র্য দূর করার জন্য যে-প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন তা অবিলম্বে কার্যকর করার দায়িত্ব তাঁর দলের সরকারসমূহের। শিক্ষিত বেকারের সমস্যাও আজ ভারতের সর্বত্র খুব তীব্র। পশ্চিম বাংলার তো সমস্যার অন্ত নেই। জনসাধারণকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা এখন রক্ষা করতে হবে। নির্বাচনী উত্তাপ শান্ত হয়ে গেলে যদি জনগণের জনপ্রতিনিধিগণ বিস্মৃত হন তাহলে নিজেদের বিপদই তাঁরা ডেকে আনবেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচন যে ক্ষমতা তাদের ওপর ন্যস্ত করেছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগেই সামাজিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

এই লেখা যখন আপনারা পড়বেন তখন দেশের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনের পালাও শেষ। ফলাফল প্রকাশও সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা। গত বছরে পশ্চিম বাংলা বিধানসভার ভোট-গণনায় বেশ দেরী হয়েছিল। নতুন যে ভোটগণনার পদ্ধতি (একটি কেন্দ্রের সব বুথের ব্যালট পেপার একটি পিপের মধ্যে ফেলে মিশিয়ে দিয়ে তার পর গোনা) গত-বার থেকে চালু হয়েছে, তাই নাকি ছিল দেরীর কারণ। সি পি এম এবং কংগ্রেসের মধ্যে যখন জোর পাল্লা চলছিল সেই সময়ে ফল প্রকাশের ঐ বিলম্বিত লয় উত্তেজনাকে একেবারে চরমে পৌঁছে দিয়েছিল। এবারেও যদি ভোট গণনার কাজ ঐ একই তালে চলে তবে হয়ত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ২৮০টি কেন্দ্রের ভোট গোনার কাজ শেষ হবে না। তা না হোক, তবু এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন ভোটদাতাদের রায় যে কোন দিকে যাচ্ছে তার একটা আঁচ পাওয়া যাবেই।

তাই এই মুহূর্তে নির্বাচনের ফল নিয়ে গবেষণা করা তেমন কাজের কথা নয়। তবে গবেষণা দু-একটি বিষয়ে করা চলতে পারে। একটি হল, এই নির্বাচনে দুটি প্রধান মোর্চা, অর্থাৎ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা এবং বামপন্থী ফ্রন্টের মধ্যে কেউ কি সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, নাকি অবস্থাটা গতবারের মতোই দাঁড়াবে? যদি একটি মোর্চা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তবে বুঝতে হবে পশ্চিম বাংলার মানুষ এবার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ঘোচাবার জন্যে বদ্ধপরিকর। অবশ্য অনেকে হয়ত বলবেন, ১৯৬৯ সালে সুস্পষ্ট রায় দিয়েও পশ্চিম বাংলার মানুষ স্থায়ী সরকার, অর্থাৎ পাঁচ বছরের জন্যে স্থায়ী সরকার পায় নি। সে যাই হোক, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা এবার জয়ী হলে সমস্যা বিশেষ নেই, কারণ ঐ মোর্চায় দুটি মাত্রই দল। কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলেও মন্ত্রিসভাতে প্রথমেই যোগ-দান না করতেও পারে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজেই সে-কথা জানিয়েছেন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেননও কলকাতায় নির্বাচনী সফরে এসে ঐ ধরনের কথাই বলেছেন। কেরলেও যখন 'মিনিফ্রন্ট' প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে তখন কংগ্রেস তাকে সমর্থন জানালেও মন্ত্রিসভায় যোগ দেয় নি, দিয়েছে অনেক পরে। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস-সি পি আই মোর্চা জয়ী হলেও কেরলের পাল্টা ছবিই দেখতে পাওয়া যেতে পারে—অর্থাৎ সি পি আই কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন জানালেও আপাতত মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না। তবে কেরল ও পশ্চিম বাংলার অবস্থার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবেই। কেরলে কংগ্রেস সি পি আইয়ের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সি পি আইকে মন্ত্রিসভা গড়তে দিয়েছিল। আর পশ্চিম বাংলায় সি পি আইকে অবশ্য জুনিয়ার পার্টনারই থাকতে হবে।

অপর দিকে, বামপন্থী ফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে যে-সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না। তার কারণ, এই ফ্রন্টে এবার সি পি এমের প্রাধান্য চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো শক্তি থাকবে না। তাই বৃহত্তম শরিক হয়েও সি পি এমকে মুখ্যমন্ত্রীর পদের দাবী ছাড়তে হবে না, অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ পাওয়ার জন্যে নাছোড়বান্দা হতে হবে না, যেমন ১৯৬৯ সালে হতে হয়েছিল। এবার ফ্রন্টের বা গঠন অনুযায়ী ঐ দুটি পদই সি পি এমের হকের পাওনা। অন্যান্য দপ্তর বন্টনেও সি পি এমের প্রাধান্য বজায় থাকার কথা। ১৯৬৯ সালে সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস বা ফরোয়ার্ড ব্লকের মতো দল ফ্রন্টে থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের শক্তি উল্লেখযোগ্য হলেও প্রধান প্রধান প্রায় সব কটি দপ্তরই পেয়েছিল সি পি এম। অবশ্য এবার ফ্রন্ট জয়ী হলে সি পি এম যদি রাজনৈতিক কারণে বা কোনো শরিককে খুশী করার জন্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর অপর কাউকে দিয়ে দেয় সে অন্য কথা। ১৯৬৯ সালে সি পি এম যে কটি দপ্তরের ওপর দাবী জানিয়েছিল তার মধ্যে ছিল খাদ্য দপ্তর। অন্যান্য শরিকেরা যখন সেই দাবি মেনে নিল তখন কিন্তু দেখা গেল যে, সি পি এম ঐ খাদ্য দপ্তর নিজের দখলে না রেখে আর সি পি আইয়ের সুধীনকুমারকে ছেড়ে দিল। এবার যদি সি পি এম জয়ী হয় তবে কোনো কোনো দপ্তরের ব্যাপারে সেই ধরনের উদারতা দেখাতে পারে।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের মতো এবারের বামপন্থী ফ্রন্টের গোড়াতেই সঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা নেই, তবে ক্ষমতায় এলেও ফ্রন্টের শরিকেরা কতো দিন ঐক্যবদ্ধ থাকবে সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। ফ্রন্টের শরিকেরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তারা এবার খেয়োখেয়ির পথে যাবে না। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট তের মাস টিঁকেছিল, অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বামপন্থীরা এবার নিশ্চয়ই আরো বেশী দিন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করবে। তা যদি তাদের পক্ষে সম্ভব না-ও হয় তবুও সেই অনৈক্যের বিপদটা দেখা দেবে না।

[illegible]নের পরেই একটা বিপদ দেখা [illegible] দুটি প্রধান মোর্চা [illegible] সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। [illegible] হলে যেমন কারো পৌষ [illegible] তেমনই এই অবস্থা ঘটলে রাজ্যের [illegible] বিপর্যস্ত হবে ঠিকই, কিন্তু [illegible] বারো হবে। আমি [illegible] দলগুলির কথাই বলছি। যদিও [illegible] দুটি মোর্চার তুলনায় তো বটেই, [illegible] দুটি দলের তুলনায় তাদের [illegible] মিলিত শক্তি হবে সামান্য, তবু [illegible] তখন নির্ভর করবে পশ্চিম [illegible] ঠিক যেমন গত বছরে হয়ে-[illegible] সি পি এম নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত বাম [illegible] বিধানসভায় ১২৫ জনের বেশী [illegible] জোগাড় করতে পারল না। [illegible] বাড়িয়ে ১৪০-এর দাগ [illegible] কিন্তু তার জন্যে বেশ চড়া [illegible] হয়েছিল। মুশ্লিম লীগের [illegible] জন্যে তাদের সাতজন [illegible] তিন-তিনজনকে মন্ত্রি[illegible] পর নির্বাচনে সোস্যালিস্ট [illegible] মাত্র জিতেছিলেন, তিনি [illegible] তাঁকে মন্ত্রী করতে [illegible] বিধানসভায় পি এস পি'র [illegible] সাকুল্যে ছিলেন। এঁদের মধ্যে [illegible] দাস ও প্রবোধ সিংহ [illegible] পেয়ে গিয়েছিলেন। [illegible] কংগ্রেসের পাঁচজন সদস্যের নেতা [illegible] মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করতে [illegible]

[illegible] চড়া দাম দিয়েও গণতান্ত্রিক [illegible] মন্ত্রিসভা মাস তিনেকের বেশী [illegible] মুশ্লিম লীগের [illegible] সমর্থন প্রত্যাহার করে [illegible] করলেই ভেঙে পড়ে গিয়ে-[illegible] মন্ত্রিসভার অবস্থা একেবারে [illegible] দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটে তার [illegible] অনেকে চাপও দিতে চেষ্টা [illegible] যেমন বাংলা কংগ্রেসের সুশীল [illegible] ধরেই বাংলা কংগ্রেসে শেষ [illegible] দেখা দিল, আর মন্ত্রিসভাও [illegible]

[illegible] যদি পশ্চিম বাংলার ভোট-[illegible] ছোট দলগুলিকে এই ধরনের [illegible] তবে এই রাজ্যের অনিশ্চয়তা [illegible] মুশ্লিম লীগ নেতা হাসানুজ্জ-[illegible] অবশ্য বলেই রেখেছেন যে, এই [illegible] কেউ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা [illegible] শেষ পর্যন্ত 'ব্যালেন্সিং [illegible] দাঁড়াবেন তাঁরাই। ১৯৬৯ [illegible] ফ্রন্টের বিপুল সাফল্যের মধ্যেও [illegible] আসনে জিতেছিল। গতবারে [illegible] বেড়ে দাঁড়ায় সাত। নির্বাচনের [illegible] লীগকে নিয়ে গতবার দু পক্ষই টানা-টানি করেছিল, শেষ পর্যন্ত লীগ গিয়েছিল কংগ্রেসের দিকে। এবার অবশ্য কংগ্রেস এবং সি পি এম দু পক্ষের কাছেই মুশ্লিম লীগ অচ্ছুৎ। কিন্তু যদি কোনো পক্ষই গরিষ্ঠতা না-পায় তবে লীগের কপাল ফিরবে কিনা কে জানে? রাজনীতিতে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

লীগ ছাড়া ছোট দল বলতে আসরে আছে সংগঠন কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, ভারতীয় আওয়ামী লীগ, সোস্যালিস্ট পার্টি, জনসঙ্ঘ ও গোর্খা লীগ। প্রথম চারটি দল মিলে তৈরী করেছে গণতান্ত্রিক মোর্চা। এই মোর্চার অন্যতম নেতা ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কিছু দিন আগে ঘোষণা করেছিলেন, 'কংগ্রেসের চেয়ে সি পি এমও ভালো', কারণ কংগ্রেস নাকি ফ্যাসিবাদী এবং ফ্যাসিবাদের চেয়ে মার্কসবাদ তবু ভালো। এ-থেকে মনে হতে পারে যে, নির্বাচনের পর প্রয়োজন হলে সংগঠন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গড়ার ব্যাপারে সি পি এমকে সমর্থন করতে পারে। কিন্তু সংগঠন কংগ্রেসেরই আর এক নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন আবার বলছেন যে, তাঁরা অকমিউনিস্ট সরকার গড়তে সাহায্য করবেন। অকমিউনিস্ট সরকার হতে হলে নিশ্চয়ই সি পি এমের সেই মন্ত্রিসভায় থাকা চলবে না। তেমনই সি পি আইয়েরও থাকা চলবে না। তবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে যদি সি পি আই সমর্থন করে তবে, তবে তিনিও সেই মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন কিনা তা অবশ্য প্রফুল্লবাবু জানান নি। গত বছরে কিন্তু তাই করেছিলেন।

জনসঙ্ঘ কোনো জোটে নেই। গতবারে তারা একটি মাত্র আসনে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু আটটি কেন্দ্রে তারা ছিল দ্বিতীয় স্থানে। এবারে জনসঙ্ঘ গতবারের তুলনায় কম আসনে প্রার্থী দিয়েছে। কিন্তু অবস্থা যদি গতবারের মতো দাঁড়ায় তবে বিধান-সভায় তাদের দুটি বা একটি আসনও মহা-মূল্যবান হয়ে দাঁড়াতে পারে। গোর্খা লীগ গতবারে দুটি আসন পেয়েছিল। এবার তারা কোনো জোটে নেই, তাছাড়া দলও দ্বিধাবিভক্ত। তবু তাদের পক্ষে দার্জিলিংয়ে গোটা দুই আসন দখল করা অসম্ভব নয়। ভোটদাতাদের রায় অনিশ্চিত হলে সেই দুটি আসনের দামও কম হবে না।

●

গত বছরের নির্বাচনের পর থেকেই এই রাজ্যের রাজনীতিতে পোলারাইজেশন বা মেরুকরণ কথাটি চালু হয়েছে। কিন্তু সেই মেরুকরণের ধারা গতবারে সম্পূর্ণ না-হওয়ায় ছোট দলগুলি তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী মর্যাদা পেয়ে গিয়েছিল। এবারের নির্বাচনে যে তিনটি সম্ভাব্য ফল হতে পারে তা হল : (এক) প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার জয়, (দুই) বামপন্থী ফ্রন্টের জয় এবং (তিন) কোনো পক্ষই গরিষ্ঠতা না-হওয়ায় অনিশ্চয়তা এবং তার ফলে ছোট দলগুলির পোয়াবারো। প্রথম দুটি বিকল্পের যে-কোনো একটি হলেই পশ্চিমবঙ্গ আপাততঃ রাজনৈতিক স্থিরতার মুখ দেখবে, আর শেষোক্ত অবস্থা হলে রাষ্ট্রপতির শাসন বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এই লেখা লেখবার সময় এই-টুকুই মাত্র বলা চলে।

১০-৩-৭২ —দেবদত্ত

তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী ১১ মার্চ কলকাতায় সারাভারত ... অধিকর্তাদের সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন।

দেশে বিদেশে

এই সংবাদ পর্যালোচনা যখন পাঠকদের সামনে পৌঁছবে তখন অনেকগুলি তাজা খবর পাঠকদের সামনে থাকবে। যেমন, এই সময়ের মধ্যে রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনের ফলাফল জানা হয়ে যাবে। নির্বাচনের ফলাফল গত বছরের লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের মতোই কংগ্রেসের অনুকূলে যাবে কিনা, ১৯৬৭ সাল থেকে যেসব রাজ্য স্থায়ী সরকারের সন্ধান লাভ করার জন্য বৃথা চেষ্টা করে আসছে তারা এবার সফল হবে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর ততদিনে জানা হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, সংসদের বাজেটের অধিবেশন ততদিনে আরম্ভ হয়ে যাবে। রেলওয়ে বাজেট রেলযাত্রী ও অন্যান্য রেল ব্যবহারকারীদের জন্য কি বাড়তি বোঝা বহন করে নিয়ে এল সেটাও ততদিনে মানুষের জানা হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, ঐ সময়ের মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাবে। সেটা হল বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ অপসারণ। প্রধানমন্ত্রী গান্ধী ও প্রধানমন্ত্রী মুজিব একমত হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় ফৌজ সরিয়ে আনার জন্য সময়সীমা (২৫ মার্চ) নির্দিষ্ট করে দিয়ে এসেছিলেন তারও ... সপ্তাহ আগে শেষ ভারতীয় সৈনিক বাংলাদেশের মাটি থেকে সরে আসছেন।

আর, ... অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে ভারতীয় বাহিনীর অপসারণের পর হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

*

ইতিমধ্যে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির কোন লক্ষণ নেই।

মাসখানেক প্রায় পার হয়ে গেল, প্রেসিডেন্ট নিকসন মার্কিন কংগ্রেসে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করে বলেছিলেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হবে তা নিয়ে ভারতের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সংলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি।'

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ২৮০টি আসনের সর্বশেষ ফলাফল :—

কংগ্রেস—২১৬, সি পি আই—৩৫, সি পি এম—১৪, এস ইউ সি—১, আর এস পি—৩, ওয়াকার্স পার্টি—১, কংগ্রেস (সং)—২, গোর্খা লীগ—২, মুসলিম লীগ—১, নির্দল—৫।

এক মাস বাদে প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটিতে তাঁর বার্ষিক রিপোর্ট দিয়েছেন। এই এক মাসে নয়াদিল্লীতে ও ওয়াশিংটনে কয়েক দফা কথাবার্তা অবশ্য হয়েছে। নয়াদিল্লীস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কীটিং বার দুয়েক ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী টি এন কলের সঙ্গে দেখা করেছেন। ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত লক্ষ্মীকান্ত ঝা ... দেখা করে এসেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সেক্রেটারী জোসেফ সিসকোর সঙ্গে। এমন কি, প্রেসিডেন্ট নিকসনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ হেনরী কিসিঙ্গারও রাষ্ট্রদূতকে ডেকে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এবং সর্বশেষে ... নিকসনের চীন সফরের ফলাফল সম্পর্কে ভারতকে অবহিত করার জন্য ... মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সও রাষ্ট্রদূতকে ঝাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জ্যাক অ্যান্ডারসনের দৌলতে এটা জানা হয়ে গেছে যে, গত ডিসেম্বর মাসেই মার্কিন সরকার ভারতীয় প্রতিনিধিকে তাচ্ছিল্য করার নীতি গ্রহণ করেন। তিন মাস বাদে এই প্রথম ... সেই নীতির ব্যতিক্রম করলেন।

কিন্তু এই সব দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনার কোনটাই 'গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ' এর সূচনা নয়। বরং, ইতিমধ্যে ... কারণে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে উন্নতির চেয়ে অবনতির লক্ষণই ... হয়ে উঠেছে।

এই অবনতির একটি—এবং প্রধান কারণ হল, প্রেসিডেন্ট নিকসনের সফরের শেষে আমেরিকা ও চীনের নেতারা যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন তাতে অযাচিত ভাবে এবং কতকটা গায়ে পড়ে কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে এনে ভারতকে খোঁচা দেওয়া

[illegible] জেলায় মহিলা ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দিকে যেতে দেখা যাচ্ছে।

[illegible] এটা অবশ্য ঠিক যে, [illegible] কাশ্মীরবাসীদের 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'-এর কথাটা চীনের পক্ষ হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে মার্কিন বক্তব্যের অংশ হিসাবে নয়। তাহলেও এটা লক্ষণীয় যে, এই যুক্ত ইস্তাহারে কাশ্মীরই একমাত্র তৃতীয় দেশের প্রসঙ্গ যার সঙ্গে আমেরিকা ও চীনের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। এই ধরনের একটি প্রসঙ্গকে চৌ-নিকসন যুক্ত ইস্তাহারে স্থান দিতে রাজী হয়ে আমেরিকা ভারতের সঙ্গে ভালভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার রাস্তায় কাঁটা দিয়ে রেখেছে।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে, প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর রিপোর্টে ভারতের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভের জন্য যে দুটি সর্তের উল্লেখ করেছিলেন সেই দুটি সর্ত তাঁরা এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন। একটি সর্ত হল, ভারতকে প্রধান প্রধান সব শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ, সাদা কথায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা একটু কাটছাঁট করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জায়গা করে দিতে হবে। দ্বিতীয় সর্ত হল, দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ (অর্থাৎ ভারত) এই উপমহাদেশে তার প্রতিবেশীদের প্রতি কি মনোভাব অবলম্বন করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হবে। অর্থাৎ কিনা পাকিস্তানের কাছ থেকে ভারতকে সদাচরণের সার্টিফিকেট নিতে হবে।

এখনও ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ভবিষ্যৎকে এই ধরনের সর্তের উপর দাঁড় করিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা প্রমাণ দিচ্ছেন যে, অতীত থেকে তাঁরা বিশেষ কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি। একের পর এক মার্কিন সরকার ভারতের বিরুদ্ধে বদ্ধমূল সংস্কার পোষণ করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানকে নিক্তির পাল্লায় চাপিয়ে সব সময়ে লক্ষ্য রেখেছেন, ভারতের দিকে পাল্লাটা যাতে হেলে না পড়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ভারতকে শাস্তি দিয়েছেন। মোট ফল হয়েছে এই যে, ভাল করতে খারাপভাবে করে আমেরিকা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেছে।

যেমন মার্কিন খাদ্য সাহায্যের কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষের তরফ থেকে আমেরিকার গমের জন্য সর্বপ্রথম আবেদন করা হয় ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে। মার্কিন প্রতিনিধিসভা ১৯৫১ সালের জুন মাসের আগে সেই আবেদন মঞ্জুর করেন নি। এবং প্রতিনিধিসভা শেষ পর্যন্ত যখন 'জরুরী খাদ্য সাহায্য বিল' আনলেন তখন 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা লিখলেন, 'যেটা এক জাতির প্রতি অন্য জাতির উদার ও মানবিক মমতার অভিব্যক্তি হতে পারত এবং তাই হওয়া উচিত ছিল সেই ব্যাপারটা থেকে হৃদয়ের সকল সম্পর্কই মুছে দেওয়া হল।' (নিউইয়র্ক টাইমস, ৮ মে, ১৯৫১)।

নিউইয়র্ক টাইমসের এ রকম মন্তব্য করার কারণ ছিল। দুটি কারণে আমেরিকা তখন ভারতের প্রতি রুষ্ট। এক, কোরিয়ায় মার্কিনী অভিযানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের বিরোধিতা করে ভারত তখন আমেরিকাকে চটিয়েছে। দুই, কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারত আমেরিকাকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেছে। মার্কিন আইনসভায় এই খাদ্য সাহায্য বিল নিয়ে আলোচনার সময় পরে

উত্তর কলকাতার একটি কেন্দ্রে মহিলা ভোটদাতাদের লাইন

পরে ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসেই বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সিনেট কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর টম কোনোলি বলেছিলেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সমস্ত বিষয়টি পুরোপুরি পর্যালোচনা না করে ভারতের অনুরোধ মঞ্জুর করা হবে না। ১৯৫১ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিলটি যে আকারে গৃহীত হল তার সঙ্গে ভারতে আমেরিকান গম পাঠাবার মূল প্রস্তাবটির পার্থক্য লক্ষণীয়। মূলে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, উদ্বৃত্ত মার্কিন গমের ভাণ্ডার থেকে ভারতকে দান হিসাবে দশ লক্ষ টন দেওয়া হোক এবং আরও দশ লক্ষ টন ভারতকে বিক্রী করা হোক। প্রতিনিধি সভা প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। তাঁরা বললেন, এই গম ভারতকে দেওয়া হবে কর্জ হিসাবে। এই গমের জন্য দামও ধরা হল চড়া হারে। সে সময়ে সবচেয়ে সেরা গমের বাজার দর ছিল টন প্রতি ৬৩.৩৩ ডলার, আর ভারতে পাঠান মার্কিন গমের দাম ধার্য হল টন প্রতি ১০৫ ডলার! স্থির হল, ভারতকে ২৫ বছরে এই গমের দাম শোধ করতে হবে সন্তরে আড়াই শতাংশ হারে সুদ সমেত। আর একটা সর্ত হল এই যে, পারমাণবিক চুল্লের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (যেমন, বেরিলিয়াম) দিয়ে এই ধার-করা গমের কিছু অংশ শোধ করতে হবে। মার্কিন আইনসভার বিলে আরও বলা হয়েছিল, ভারতে যে গম পাঠান হবে তার অন্তত অর্ধাংশ বহন করে নিয়ে যেতে হবে ভাড়া-করা আমেরিকান জাহাজে। কার্যত আমেরিকান গমের প্রায় সবটাই মার্কিন জাহাজে বহন করে নিয়ে আসতে হয়েছে, আর এই বাবদ ভারতকে জাহাজ ভাড়াই গুণতে হয়েছে মোট প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কাগজে-কলমে যদিও এমন কোন সর্ত ছিল না তাহলেও আমেরিকা থেকে পাঠান গমের বন্টনের তদারকী করার উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লীতে আমেরিকার 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা দপ্তর'-এর একটি অফিস খোলা হয়েছিল। ঐ দপ্তরের প্রতিনিধিকে ভারতের তরফ থেকে কূটনৈতিক মর্যাদাও দেওয়া হয়েছিল।

১৪ বছর পরে ভারত যখন আর একবার আমেরিকার কাছ থেকে খাদ্য সাহায্য চেয়েছিল তখনও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। চেস্টার বোলস তাঁর আত্মজীবনী 'প্রমিসেস টু কিপ: মাই ইয়ারস ইন পাবলিক লাইফ' গ্রন্থে সেকথা লিখেছেন। বোলস সাহেব দুবার ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ১৯৬৫ সালে তিনি ওয়াশিংটনকে তাগাদা দিয়ে ভারত থেকে তার পাঠাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য, ভারত যে খাদ্য সাহায্য চেয়েছে সেটা যেন দ্রুত মঞ্জুর করা হয়। ওয়াশিংটনের কর্তারা তাঁর এই সব তারের কোন কোনটির আদৌ উত্তরই দেননি, আর কোন কোনটির উত্তর দিয়েছেন ভাসাভাসাভাবে। বোলস লিখেছেন, 'আমি এর কারণ অনুসন্ধান করলে (মার্কিন) পররাষ্ট্র দপ্তরে আমার যেসব বন্ধু ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে আমি একটা বেসরকারী খবর জানলাম যে, প্রেসিডেন্ট জনসনের [illegible] ও ক্রোধেরই এটা প্রকাশ [illegible] ভিয়েতনামে সামরিক [illegible] বেশী করে জড়িয়ে পড়ার প্রধানমন্ত্রী [illegible] বাহাদুর শাস্ত্রী আমাদের [illegible] করছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী [illegible] আমেরিকা সফরের প্রস্তাবিত [illegible] দেওয়ায় ভারতীয় সংবাদপত্র [illegible] সমালোচনা করছিল। [illegible] জন্যই প্রেসিডেন্ট জনসন [illegible] প্রতি বিরক্ত ও [illegible] উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বোলস সাহেব [illegible] আমেরিকা সফর বাতিলের [illegible] উল্লেখ করেছেন সেটিও [illegible] সম্পর্কের ইতিহাসে একটি [illegible] ঘটনা। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল [illegible] স্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব [illegible] সফরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। [illegible] পিণ্ডির সঙ্গে ওয়াশিংটনের [illegible] কথাবার্তা চলছিল। আয়ুব [illegible] সঙ্গে তার জমাবার চেষ্টা [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। এই অপছন্দের কথাটা পাকিস্তানকে [illegible] ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের আমেরিকা সফরের প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। প্রায় একই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর [illegible] মেরিকায় যাওয়ার একটা কথা [illegible] যেহেতু আয়ুব খাঁর সফর [illegible] সেহেতু সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীর [illegible] কারণ, বোলস সাহেবের কথায় [illegible] পররাষ্ট্র দপ্তর ধরেই [illegible] পাকিস্তান ও ভারতের আয়তন [illegible] সমস্যার প্রকৃতিতে যে পার্থক্য [illegible] বিবেচনা না করেই সব সময়ে পাকিস্তান ও ভারতকে এক ব্র্যাকেটে রাখতে হবে।

১০-৩-৭২ —[illegible]

রোজভিলায় দ্বিতীয় ডাকাতি

চিত্রা সেনগুপ্ত

এমন সুরক্ষিত 'রোজভিলাতে' যে ডাকাতি হতে পারে কেউই ভাবতে পারেনি। তাই বোধহয় প্রথমটা রোজভিলার বাসিন্দারা কেউ টের পায়নি কিম্বা পেয়েও বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। অথচ অবিশ্বাস্য ঘটনাটা দিন-দুপুরেই ঘটে গেল। রোজভিলাকে চারদিক থেকে এমন সন্তর্পণে ঘিরে ফেলে ডাকাতরা কয়েকজন উদ্যত রিভলবার হাতে গেট পেরিয়ে সটান বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল যে একতলায় ঠাকুর-চাকররা আচমকা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেবার আগে পর্যন্ত রোজভিলার সুভান্ত শান্ত পরিবেশে এতটুকু উত্তেজনার সাড়া জেগে ওঠেনি।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য এত বড় একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেল রোজভিলাতে অথচ আশেপাশের বাড়ির বাসিন্দারা কেউ টের পর্যন্ত পেল না। অবশ্য একেবারে পায়নি বলা যায় না। তবে সে অনেক পরে। তাও পুলিশ না এসে পড়লে পেত কিনা সন্দেহ। কারণ এপাড়ার বাসিন্দারা কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। শহরের সব-চেয়ে অভিজাত মহল্লা এটা। সবাই বড় চাকুরে। অর্থ এবং মর্যাদায় সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানের বাতাস এখানের গাম্ভীর্য এখানের সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য... সবই আলাদা।

অবশ্য এতকালের বিশ্বাসের ভিতটা রোজভিলার ডাকাতির পরই যেন টলে উঠল। প্রতিবেশীরা সবাই শংকিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে, শুধু রোজভিলাতে নয়, প্রত্যেকের বাড়িতেই অনুরূপ ডাকাতি হবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আজ না হোক কাল হতে পারে। কাল না হয় পরশু। দিনক্ষণটাই বড় সমস্যা নয়। যে সমস্যাটা সবার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হল যে যে কারণ-গুলো ডাকাতদের রোজভিলাতে ডাকাতি করতে উৎসাহিত করেছে...বাইরের লোকেরা না জানুক, কিন্তু এই অভিজাত মহল্লার মানুষেরা সবাই জেনে গিয়েছেন, প্রত্যেকের বাড়িতেই একই কারণগুলো রয়ে গেছে।

সেদিনও সোনার থালার মত সূর্য পূবে দিগন্তে রাঙিয়ে ভেসে উঠল নির্মেঘ স্বচ্ছ আকাশের বুকে। সেদিনও অন্যদিনের মত স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় ছিল পাড়াটায়। মাঝে মাঝে কেবল রাস্তা দিয়ে দামী মোটর গাড়ি যাতায়াতের সুরেলা হর্ণের শব্দ জেগে উঠছিল। ওদিকের প্রকাণ্ড বড় বাড়িটা থেকে গ্রে হাউন্ডের গুরু-গম্ভীর ঘেউ ঘেউ ডাক ভেসে আসছিল। আর রোজকার মতো রোজভিলার দোতলার একটা ঘর থেকে অর্গানের সংগে শর্মিলার মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠের—'একে একে প্রভু আজি, ডাকিতেছে নাম ধরি'—একে একে ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিছে আজি...গানটি ভেসে আসছিল। সব মিলিয়ে অভিজাত মহল্লার আবহাওয়াটা বড় শান্ত সমাহিত ছিল।

দারোয়ান শিউপুজন লাঠি হাতে লোহার ফটকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। আর প্রকাণ্ড সবুজ লনের ওপর ছড়ি হাতে বুড়ো কর্তা চিন্তাহরণবাবুর ব্যস্ত সমস্ত পায়চারি আর কখনো কখনো ছড়ি ঘুরিয়ে অদৃশ্য কোন শত্রুর উদ্দেশ্যে শাসানি আর হস্তিতম্বি লক্ষ্য করে মিটি-মিটি হাসছিল। শিউপুজনের মনে হয় এমন অভিজাত পাড়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে চিন্তাহরণবাবু যেন একমাত্র ব্যতিক্রম। বড় বেমানান। এমন অভিজাত ধনী দিবাকরবাবুর স্ত্রী মমতার বাবা...পরিচয় দিতেও যেন লজ্জা করে।

পাগল ছাড়া আর কি? বদ্ধ পাগলাই বুড়ো কর্তা আর কত কসরৎই যে দেখায়।

রোজ সকালে শর্মিলা যখন অর্গান বাজিয়ে সুললিত গলায় গান গায়, বুড়ো-কর্তা ঠিক সেই সময় নিচের লনে এমনি করে পায়চারি করে। কখনো আক্রোশ ভুলে গানের তালে তালে আনন্দে কোমর দুলিয়ে নেচে ওঠে দেখে হেসে বাঁচে না শিউপুজন। এক এক সময় নিজেরই অবাক লাগে ওর। বড় মেমসাহেবের বাবা বড় অদ্ভুত মানুষ। আজ না হয় পাগল, কিন্তু একদিন খান-দানি আদমি ছিলেন দেখেই বোঝা যায়। ধনসম্পত্তিও ছিল প্রচুর। সবই মেয়ে জামাইকে দিয়ে দিয়েছেন। রোজভিলাটাও মেয়ে জামাইকে দান করেছেন। তবু কাউকে ভালবাসেন না পাগলা বুড়ো। সকলকেই দূরে দূরে করেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছোট নাতনীটি। শর্মিলা ওঁর নয়নের মনি। ওর গান শুনতে শুনতে যেন মোহিত হয়ে পড়েন চিন্তাহরণবাবু। শর্মিলাও তাই। এ বাড়িতে দাদুই যেন ওর ভরসা। দাদু না থাকলে ও যেন বাঁচতেই পারত না। কিন্তু দাদু আর নাতনীর এত ভালবাসা দিবাকর-বাবু আর রমলা মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। বলেন, শর্মিকেও পাগল করে ছাড়বেন বাবা। তাই যতদূর সম্ভব বাবাকে আটকে রাখা হয় ঘরে। চাকরবাকরদের ওপরেও সেই রকম নির্দেশ দেওয়া আছে। আর বাড়াবাড়ি করলে যেন বড়মেমসাহেবকে খবর দেওয়া হয়। অবশ্য বাড়িতে খুব কমই থাকেন বড় মেমসাহেব। ফেরেনও অনেক রাতে, বেসামাল হয়ে। তাই চিন্তাহরণবাবুর তদারকির ভার চাকরবাকরের ওপর। ওঁর বেসামাল ভাব দেখলেই জোর করে ঘরে পুরে রাখার নির্দেশ আছে।

শিউপুজন গেটের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে খৈনি ডলছিল আর বুড়ো কর্তার কসরৎ দেখতে দেখতে মজা উপভোগ করছিল। শর্মিলার সুরেলা গলার গানটা সকালের স্নিগ্ধ আবহাওয়াটাকে যেন সুরে সুরে ভরিয়ে দিয়েছিল। ওদিকে বড় মেম-সাহেবের সখের বোগনভেলিয়ার ডালে ডালে দুটো ছোট্ট টুনটুনি দোল খেতে খেতে ঠোঁটে মধুর সন্ধান করছিল। আচমকা শিউপুজনের ঠিক পেছনেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সব ছত্রাখান হয়ে পড়ল। শিউপুজন যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠার পর্যন্ত সময় পেল না। তার আগেই গেটের সামনে যে মোটর গাড়িটা থেমে পড়ল, তার থেকে চারটে সুবেশ যুবক বিদ্যুৎগতিতে নেমে এসে গেট খুলে ওর সামনে লোডেড রিভলবার তুলে কর্কশ গলায় চাপা হুংকার করে উঠল—চুপ! চিৎকার করলেই শেষ।

বাইরে রাস্তায় মোটরটা গেট ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়ে থেমে পড়ল। আরোহীরা এমন একটা ভাব-ভঙ্গী করল যেন হঠাৎ টায়ারটা ফেটে গেছে। ভেতরে যারা ঢুকল তাদের আবার নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে [illegible]

মেরামতির ভান করল। এমন তো হয়ই আকছার। কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামায়?

শিউপুজন ভয়ে আর আতঙ্কে কাঠ হয়ে উঠল। গলাটা শুকিয়ে উঠল। চারিদিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু কি আশ্চর্য, চরম বিপদের মুখেও রোজভিলাটা পরম প্রশান্তি গায়ে মেখে এখনো তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতটুকু চাঞ্চল্য জেগে ওঠেনি এবাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে। শর্মিলা ওর সুরেলা গলায় রোজকার মত সকালে কসুগাঘন ঈশ্বরের বন্দনা করে গান গাইছে। বুড়ো কর্তা এখনো তেমনি ওপর থেকে ভেসে আসা নাতনীর গান শুনতে শুনতে সম্মোহিত হয়ে কোমরে হাত রেখে তালে তালে নেচে যাচ্ছেন। দিবাকরবাবু রমলা আর নির্মলার হয়তো এখনো ঘুমই ভাঙেনি। রোজকার মত অঘোর ঘুমের মধ্যে গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে। সবই ঠিক আছে। কেবল উদ্যত রিভলবার হাতে ডাকাতরা এই মুহূর্তে ওর সামনে দাঁড়িয়ে না থাকলে শিউপুজন নিজেও হয়তো কোন অস্বাভাবিকতা অনুভব করত না। কেন কে জানে সমস্ত অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করে ভয়ের সঙ্গে হঠাৎ প্রচণ্ড হাসি পেল শিউপুজনের।

চোখে সানগ্লাস আর মুখে রুমাল চাপা দিয়ে সম্ভবত পরে সনাক্তকরণের ঝামেলা এড়াতে চাইল ডাকাতরা। তারপর শিউপুজনের প্রতি নির্দেশ হল—যা বলা হবে লক্ষ্মী সুবোধ বালকের মত শুনে যাবে। কোথায় টাকা থাকে কোনটায় গয়না, কে কোন ঘরে থাকে, কোনদিক থেকে বিপদ আসতে পারে ওদের—সব কিছু বলে দিতে হবে ডাকাতদের। আর তা না করলে, নির্ঘাৎ মৃত্যু।

শিউপুজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল ডাকাতরা। বাড়ির আবহাওয়া লক্ষ্য করে ওরা বোধহয় নিজেদের নিরাপদ বোধ করছিল। তাই যেন কোন রকম তাড়াহুড়ো করে কাজ সারার তাগিদ নেই ওদের। ছোট নুড়ি বিছান পথটি মাড়িয়ে ওরা হাঁটছিল গাড়ি বারান্দার দিকে। আর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিল।

হঠাৎ সবুজ লনের ওপর চোখ পড়তেই সবাই একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিউ-পুজনের প্রতিও চাপা হুংকার ধ্বনিত হয়ে উঠল—হল্ট! আশ্চর্য...কী করছে লোকটা? চিন্তাহরণবাবুকে নির্বিকার প্রশান্তিতে ওপর থেকে ভেসে আসা মেয়েলি কণ্ঠের সংগীতের তালে তালে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নাচতে দেখে ডাকাতরাও রুমালের আড়ালে না হেসে পারল না। সত্যি আশ্চর্য...রোজ-ভিলার সব কিছুই অবাক হবার মত। সব কিছু ব্যতিক্রম। না হলে ডাকাতির মুহূর্তে এমন ভ্রূক্ষেপহীন আচরণ এমন উপেক্ষা আর নির্লিপ্ত প্রশান্তি...ওদের নিজেদের অভিজ্ঞতাতেও এই প্রথম বইকি?

শিউপুজন নিজের থেকেই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে [illegible]

[illegible]—বুড়ো কর্তা বিলকুল পাগল আ[illegible] আছে হুজুর...লেকিন বহুত রইস আ[illegible] থা...শুনা, বহুত পাড়ীলিখি আদমী বুড়োবাবু...।

কিন্তু চিন্তাহরণবাবুর যেন [illegible] ভ্রূক্ষেপ নেই। এতগুলো উটকো লোক ওর চারপাশে জটলা করছে...হুঁস [illegible] এতটুকু। শেষ পর্যন্ত আর কিছুক্ষণ বুড়ো কর্তার নাচ দেখে ডাকাতদের একজন নি[illegible] থেকেই এগিয়ে চাপা গলায় হুংকার [illegible] নির্দেশ দিল—হল্ট, হল্ট...ও দাদু শুনে হল্ট!

আচমকা রসভঙ্গ হওয়ার আশঙ্ক[illegible] চিন্তাহরণবাবু একবার শুধু ওঁর বি[illegible] বিরক্ত দৃষ্টিটা ঘোরালেন ওদের দিকে। কি[illegible] নাচ থামালেন না। বরং অপ্রত্যাশিতভা[illegible] এতগুলো সমঝদার দর্শক পেয়ে দৃষ্টি[illegible] প্রদীপ্ত নরম হয়ে এল, কত কাল পর [illegible] নাচের এমন সমঝদার সব মানুষ পেলে[illegible] আজ সেসব দিনের কথা ভুলেই গেছে[illegible] চকিতে উল্লসিত হয়ে উঠল ওঁর মুখ চোখ[illegible] ওদের দিকে তাড়াতাড়ি আঙুল তুলে এক[illegible] শুধু অপেক্ষা করতে বললেন।

শিউপুজন কাঁদবে না হাসবে ভে[illegible] পেল না। আর ডাকাতগুলোকেও বলিহারি[illegible] সবার বয়সই কম। চ্যাংড়ার দল। নেহা[illegible] ওদের হাতে লোডেড রিভালবার আছে তাই[illegible] না হলে এক এক থাপ্পড় মেরে ওদের হা[illegible] মুচড়ে ওগুলো কেড়ে নিয়ে গলা ধা[illegible] দিয়ে ওদের গেটের বাইরে ঠেলে বার ক[illegible] দিয়ে আসত শিউপুজন।

ডাকাতরা হঠাৎ অসহিষ্ণু গলায় ধমকে উঠল—বলছি না—হল্ট! থামুন বলছি এখনো। দেখেছেন আমাদের হাতে কি? একটু চেঁচিয়েছেন কি নির্ঘাৎ মরতে হবে জেনে রাখবেন।

চিন্তাহরণবাবুর পা দুটো এবা[illegible] নিশ্চল হয়ে থেমে পড়ল। একটু যে[illegible] বিমর্ষও দেখাল ওঁকে। একটু দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল চোখে-মুখে। একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিলেন মনে মনে। তারপর এক-পা এক-পা করে ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন—তার মানে ডাকাতি! তোমরা ডাকাতি করতে এসেছ, এই তো।

একজন ডাকাত এবার কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব চেপে কর্কশ করে তুলে—আপনার অনুমান মিথ্যে নয় দাদু। আর আশাকরি সেই সঙ্গে এটাও অনুমান করে নিতে আপনার অসুবিধে হয়নি যে কোনরকম অবাধ্যতা আমরা বরদাস্ত করি না।

চিন্তাহরণবাবু এবার যেন নতুন করে দুশ্চিন্তায় পড়লেন। না ঠিক ভয়ে নয়। ভাবছেন...আশেপাশের এত সব অবস্থাপন্ন বাড়ি থাকতে শুধু রোজভিলাতেই বা বার বার ডাকাতির অর্থ কী! তাই মাথার এলো-মেলো বিভ্রান্ত চুলে আঙুল চালাতে চালাতে [illegible] মতো কথা কয়ে উঠলেন—এ [illegible]

ভিলায় ডাকাতি হতে চলেছে: একবার নয়, দুবার। কে জানে...তারপর আর...

—দাদু! অযথা দেরি হতে দেখে ওরা আবার গর্জে উঠল—আপনি কিন্তু এখনো আমাদের কথার জবাব দেননি, খেয়াল রাখবেন। যদি অন্যথা করেন আপনাকেও কিন্তু...

ওরা শেষ করার আগেই চিন্তাহরণবাবু বলে উঠলেন—না না অন্যথার কথা নয়। আমি শুধু বলছিলাম, তোমরা ডাকাতি করতে এসেছ করো। কিন্তু আমার চেয়ে এবাড়ির হালচাল আর কেউ ভালো জানে না। আমি বলছিলাম কিছু পাবে না তোমরা। আগের বারের ডাকাতিতেই সব খোয়া গেছে।

তবু ডাকাতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই চিন্তাহরণবাবুর। ওরা কাউকেই পেছনে ফেলে রেখে যেতে চায় না। একতলা থেকে চাকর চাকর, সোফার দরোয়ান—সকলকেই রিভলবারের আড়াল করে দোতলায় নিয়ে চলল। সঙ্গে চিন্তাহরণবাবুকেও যেতে হল।

এতগুলো সশস্ত্র মুখোশধারী ডাকাতকে আচমকা দেখে ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল রোজভিলার একতলার পোষ্যরা; কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই চার-চারটে উদ্যত পিস্তল ওদের দিকে এগিয়ে আসতেই আর্তনাদটা যেন একবার মাত্র ককিয়ে উঠেই থেমে গেল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁদতেও বোধহয় ভুলে যায় মানুষ। ডাকাতদের সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো নিঃশব্দে দোতলায় বড় সাহেব দিবাকরবাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা; কারো মুখে কথা নেই। কেবল একটা চরম কিছু ঘটে যাবার জন্যে যেন সবাই নির্বাক প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য, রোজভিলাটা এখনো তেমনি সর্বাঙ্গে নিঃশব্দ প্রশান্তি জড়িয়ে ঘুম ঘুম চোখে ঝিমুচ্ছে: এতক্ষণ ধরে বাড়িতে এত কাণ্ড ঘটে গেল, তার কিছু টের পাননি দিবাকরবাবু। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে ডিভানে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে একমনে পাইপ টেনে ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছেন।

ওর শোবার ঘরের ভেতরে আশ্চর্য এক শান্ত স্তব্ধতা বিরাজ করছে। যেন কোন ক্যাথলিক গির্জার মধ্যে উপাসনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সমবেত ভক্তমণ্ডলী কেবলমাত্র ফাদারের উপস্থিতির জন্যে অপেক্ষারত অবস্থায় নীরবে দণ্ডায়মান রয়েছেন। ওদিকে খাটের ওপর স্ত্রী রমলা বিস্রস্ত বেশবাসে এখনো গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ওপাশের ঘর থেকে শর্মিলার সুরেলা গলায় প্রভু বন্দনা... একে একে নাম ধরি, ডাকিছেন প্রভু আজি... সংগীতটা এখনো হাওয়ায় ভেসে আসছে সবার কানে। আর কোন শব্দ নেই কোনদিকে। কেবল ওদিকের বাড়ির সেই প্রকাণ্ড হাউন্ডের আর্তনাদটাই যা সব প্রশান্তিকে মাঝে মাঝে দিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

কত দীর্ঘকাল পর আজ শ্বশুর জামাইয়ের সামনা-সামনি দেখা হল। তাজ্জব-তাড়া পাইপ সরিয়ে বিস্মিত চোখ তুলে দিবাকরবাবু কিছুক্ষণ চিন্তাহরণবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন কিছু প্রশ্ন করতে চাইছেন, কিন্তু বিস্ময়ে কণ্ঠস্বরটা স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। আবার চিন্তাহরণবাবুর পেছনে বাড়ির সব ঝি-চাকর...চার-চারটে রুমালে মুখ আড়াল করা মানুষ, হাতে রিভলবার...অথচ সবাই আশ্চর্য চুপচাপ...সব মিলিয়ে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে উঠছে দিবাকরবাবুর। তবু একবার সাহস করে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস না করেও পারলেন না—কী ব্যাপার! এখানে তোমরা কেন? কী চাও। আর...আর আপনি কেন এখানে? যান নিজের জায়গায় যান...

চিন্তাহরণবাবু এতক্ষণ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার মুখ খুললেন—আমি ইচ্ছে করে তোমার কাছে আসতে চাইনি দিবাকর। এরা ডাকাতি করতে এসেছে। আমাকে শুধু ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে বলেছে...

কিন্তু ওর কথাটা শেষ হবার আগেই দিশাহারা হয়ে তাড়াতাড়ি ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দিবাকরবাবু! চিৎকার করে উঠলেন—হোয়াট! পাগলামীর আর জায়গা পাননি? ডাকাতি...? আই সে, গেট আউট। আর শিউপূজন বৈদ্যনাথ, এ আবার কোন খেলা রে তোদের। তোরাও কি পাগলের পাল্লায় পড়ে পাগল হলি শেষে। যা চলে যা, এখুনি...

কিন্তু দিবাকরবাবুর মুখের বাকী কথাগুলো মুখেই রয়ে গেল। ওঁর সামনে আচমকা চার-চারটি মুখোশধারী মানুষের হাতের রিভালবারকে এগিয়ে আসতে দেখে কথা হারিয়ে ফেলে চুপ করে গেলেন। নিদারুণ ভয়ে আর আতংকে আবার ডিভানের কোলে ঢলে পড়ে বললেন—ডাকাতি...ডাকাত! না-না...আমায় মারবেন না...আমি জানি না...

ঘরের মধ্যে চেঁচামেচি শুনে রমলার সকালের আমেজ ধরা ঘুমটাই বিশ্রীভাবে ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসেই জোরে চিৎকার করে উঠল—এ্যাঁ বল কী? ডাকাত...পুলিশ...বাবা...শিউপুজন...

—চুপ! প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দের মত চাপা রুদ্ধ একটা কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। —চাবি কই? দেরি করবেন না। সামান্য টুঁ শব্দ করার চেষ্টা করবেন না। করলেই নির্ঘাত মৃত্যু জেনে রাখবেন। চাবি কই...চটপট দিয়ে ফেলুন, দেরি করবেন না...

কিন্তু চাবি নিয়ে ঘরের মধ্যে একজন ডাকাত আলমারীর দিকে এগুতেই প্রবল আপত্তিতে ভেঙে পড়লেন দিবাকরবাবু—না-না, ওখানে নয়...ওখানে টাকা নেই। দয়া করে ওটা খুলবেন না...আমি বলে দিচ্ছি কোথায় টাকা পাবেন...প্লিজ...ওটা খুলবেন না...

কিন্তু বাধা দিতে গিয়ে পরোক্ষে ডাকাতদের মনে নিদারুণ একটা কৌতূহল জাগিয়ে তুললেন দিবাকরবাবু। আর হলোও তাই। নিমেষে আলমারিটা খুলে ফেলতেই থরে থরে সাজান দামী মদের বোতলগুলো গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি হয়ে একটা মিঠে সুরেলা ঝংকার তুলে বেজে উঠল।

একজন ডাকাত চকিতে দিবাকরবাবুর দিকে রিভালবার ঘুরিয়ে গর্জে উঠল--উঁহু...হল্ট। কোন রকম বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না। তারপর প্রশ্ন করল—আপনি মদ খান?

দিবাকরবাবু সসংকোচে একবার সমবেত আশ্রিত পালিত পোষ্যদের দিকে তাকিয়ে শুকনো একটা ঢোক গিলে বললেন—হ্যাঁ।

আবার তেমনি বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠে প্রশ্ন হল—শুধু মদ যে নয়, সে আপনিও জানেন। আমিও জানি। কত পার্সেন্ট কোকেন পাইল আছে?

দিবাকরবাবু এবার চুপ করেই রইলেন দেখে ডাকাতটা নিজে থেকেই বলে উঠল—এ বয়সেও এতটা উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় আপনার! আশ্চর্য!

অন্যেরা তখনো আলমারীর তাকগুলোয় দ্রুত হাতে তল্লাশী চালিয়ে যাচ্ছিল। একজন হাতের কাছে কী যেন আবিষ্কার করে আবার প্রশ্ন করল—আর এই ন্যুড ছবিগুলো! মেয়ের বয়সী মেয়েদের ন্যাংটো ছবি। এগুলোও সব এতিকসাদের কাজ করে নিশ্চয়ই। শুধু তাই নয়...আরো কিছু নিষিদ্ধ ড্রাগস রয়েছে দেখছি। আশ্চর্য, বাইরে থেকে আপনাকে দেখে এতটা সাই-ফার ভাবা যায় না। তা সে যাই হোক... টাকা কোথায়! এমন সব রসের খনি যক্ষের মত আগলে রেখেছেন, কেবল টাকার বেলায় ভোঁ ভাঁ...। তামাসা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? এখনো বলুন...টাকা কোথায়; আর এই চেস্ট অব ড্রয়ার্সটার চাবি কই? কী আছে ওটাতে?

রমলার ঘুম-ভাঙা চোখ দুটো হঠাৎ আতংক ভুলে প্রতিহিংসায় দপ করে জ্বলে উঠল স্বামীর...সংরক্ষিত মদের হদিশ অবশ্য অজানা নয় ও'র কিন্তু তাতে কোকেনের পাইল আর ছবিগুলো! আশ্চর্য, ওর বিশ্বাসের ওপর এত বড় ডাকাতি... এতকাল একসঙ্গে এক শয্যার পাশাপাশি শুয়েও এই ঘৃণ্য মানুষটাকে চেনা যায়নি। ছিঃ থুঃ থুঃ...রোষ কষায়িত চোখ দুটো দিয়ে চকিতে একবার অপাঙ্গে দেখে নিল দিবাকরবাবুকে।

চাকর-বাকরদের চোখে-মুখে যুগপৎ কৌতূহল এবং বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল। কেউ কেউ আড় চোখে বড়সাহেবকে লক্ষ্য করে মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোতে চেষ্টা করল।

—এ চেস্ট অব ড্রয়ারের চাবি কই? একজন ডাকাত আবার গর্জে উঠল—টাকা কোথায় আছে বলুন লুকোতে চেষ্টা করলে ফল ভাল হবে না বলে রাখছি।...

দিবাকরবাবু কোন রকমে মুখটা তুলে বললেন—ওটা আমার স্ত্রীর। ওর কাছে চাবি পাবেন।

রমলা এবার ডুকরে কেঁদে উঠল—আমি বলছি টাকা নেই। কিছু নেই, এমন কি সোনার গহনাও নেই...সব মেকি গহনা বিশ্বাস করুন, আমাদের বাইরে থেকে যা মনে হয়...

কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ করার আগেই একজন ডাকাত রিভালবার উঁচিয়ে তেড়ে এল রমলার দিকে—চুপ! টাকা নেই বললেই হল...মনে রাখবেন বেশী চালাকি করতে চেষ্টা করলে নির্ঘাত মরতে হবে আমাদের হাতে। এখনো বলছি বার করুন...চটপট চাবিটা দিয়ে দিন...।

রমলা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বালিশের তলা থেকে চাবিটা বার করে দুহাতে বুকের মধ্যে চেপে ধরে প্রবল আপত্তিতে ভেঙে পড়ল—না-না অসম্ভব...আমি চাবি দিতে পারব না...তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেলুন আপনারা সেও ভাল। কিন্তু আমি চাবি দিতে পারব না...আমি চেঁচাব প্রাণপণে চেঁচাব।

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণবিদারক একটা বোমা ফাটার মত শব্দ হল—চোপ! বলেই পাশের লোকটাকে ইংগিত করল—ওয়ান মিনিট ওনলি দেন ফায়ার নাউ বি রেডি...

নিদারুণ ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল রমলা। আর ওর হাত ফস্কে চাবিটা মেঝেতে পড়ে গেল।

খোলা হল রমলার চেস্ট অব ড্রয়ারস। এবার বেরুল জড়োয়ার সেট, হীরের কানের দুল আর আংটি ...দামি পাথর বসান গোটা তিনেক ব্রেসলেট। অপ্রত্যাশিতভাবে এত দামী দামী গয়নাগাটি পেয়ে ডাকাতরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভাল করে জিনিসগুলো পরীক্ষা করে রাগে আর বিরক্তিতে ওগুলো মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে গর্জে উঠল—আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? বলুন......তাড়াতাড়ি বলুন টাকা কোথায় রেখেছেন।

আলমারী তছনছ করে আরো কিছুক্ষণ তল্লাসী চলল। আরো বেরুল একটা সুদৃশ্য দামী ব্রিফ কেস। ওর ভেতরেই নগদ টাকা থাকতে পারে ভেবে ব্রিফ কেসটা খুলতেই একরাশ কাগজ ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। ছোট ছোট কাগজ আর কার্ডে সযত্নে আর বড় আদর করে লেখা—জন্মদিনে আমার

মালামালিকে সামান্য জড়োয়ার সেটটি দিলাম—তোমার অলক।' আরেকটাতে, স্বপ্ন কাশ্মীরের সেই মধুর স্মৃতিঘেরা দিন গুলোকে ধরে রাখার জন্যে এই ছোট হীরের আংটি আমার আর রমলার স্মারক চিহ্ন হয়ে রইল—তোমার নিরুপম।' এমনি আরও কত অসংখ্য!......

একজন ডাকাত জোরে জোরে পড়ে যাচ্ছিল কাগজের টুকরোগুলো। আর পরক্ষণেই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল। চাকরবাকর দারোয়ান-দারোয়ান সবাই এই গৃহস্বামীর [illegible] হয়ে পড়ার রহস্যে হতবাক হয়ে [illegible] যাচ্ছিল। আর রমলা মাথা নিচু করে নীরবে কেবল আকুল কান্না কেঁদে যাচ্ছিল।

ডাকাতেরা নেহাতই নিরাশ হয়ে পড়ল [illegible] এখানেও দেখছি টাকা নেই। বুড়ো ঘুঘু [illegible] একটা অন্ততঃ খুন না করলে কথা [illegible] করা যাবে না।

চিন্তাহরণবাবু প্রথম থেকেই কড়ি [illegible] দিকে মুখ উঁচু করে স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিলেন। এত যে কাণ্ড হচ্ছে ঘরের মধ্যে ভ্রূক্ষেপ নেই ওঁর। এবার আর থাকতে [illegible] না। ওদের কথার [illegible] হেসে উঠলেন। আমি তো আগেই বলেছি [illegible] পাবে না তোমরা। এ বাড়িতে [illegible] ডাকাতি। যা ছিল প্রথমবারে [illegible] গেছে।

—হরবখত' দিশাহারা রাগে ওদের একজন গর্জে উঠল—সব বাজে কথা। ওসব [illegible] অনেক দেখেছি আমরা। বলেই চিন্তাহরণবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল—[illegible] তাকান আমার দিকে। আপনার মেয়ে [illegible] দেখছি শয়তানের শিরোমণি, পাঁজর [illegible] সহজে ওদের মুখ থেকে কথা [illegible] না। আপনি বলে দিন কোন ঘরে [illegible] টাকা থাকে। নেই বললেই তো ভয়ে [illegible] বাবা...অতবড় কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর উনি...যিনি চার হাজার টাকা মাইনে পান তার বাড়িতে টাকা নেই একথা আপনার মত পাগল ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না দাদু......বলুন, বলে ফেলুন... [illegible] বলে দিন......আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।

ওদের কথা শুনে চিন্তাহরণবাবু এবার হা-হা করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। তারপর [illegible] হাসি চাপতে চাপতে বললেন—তার [illegible] টাকার সন্ধান বলে দিতে পারলে আমি [illegible] পাগল নই...হা...হা...তবে হাঁ বলে দিতে পারতুম, কিন্তু ঐ যে বললাম রোজ-ভিলাতে এটা দ্বিতীয় ডাকাতি। যারা আগে [illegible] তারা তোমাদের জন্যে যদি কিছু না রেখে গিয়ে থাকে—সে দোষ কি আমার......

তারই মধ্যে কে যেন একজন ওপাশের ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ থাকতে দেখে দরজার ওপর দমাদম লাথি কষাতে শুরু করল—কে আছে ঘরে, খুলুন দরজা... আশ্চর্য! এবার বুঝেছি এঘরেই সব আছে, তাই দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দুমদুম করে আরো কয়েকটা লাথি মারতেই ভেতর থেকে ঘুমজড়িত মিষ্টি মেয়েলি গলায় উত্তর ভেসে এল—কেন? এখন ঘুমোচ্ছি—বিরক্ত কর না এখন।

সকলকে উদ্যত রিভলভারের সামনে আটকে রেখে দুজন রয়ে গেল ওঘরে। কেবল চিন্তাহরণবাবুকে সঙ্গে করে অপর দুজন বন্ধ দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

দরজায় আবার দুমদাম লাথির ঘা পড়ল—পরে ঘুমোবেন, এখন দরজা খুলুন... তাড়াতাড়ি খুলে দিন নাহলে মুস্কিলে পড়বেন...

ঘরের ভেতরে মেয়েলি কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে করভাবে নীরব হয়ে উঠল। নিমেষে সমস্ত বাড়িটা নিথর স্তব্ধতার গভীরে হারিয়ে গেল। রোজভিলার বাতাসে এতবড় অমঙ্গলের কোন চিহ্ন নেই, নেই এতটুকু চঞ্চলতা। কেবল বাইরের রাস্তা থেকে মোটরের সুরেলা হর্নের শব্দ থেকে থেকে ভেসে আসছে। এখনো কোন গ্রে হাউণ্ড কুকুরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ওঠে থেকে থেকে সারা হচ্ছে। ওদিকের ঘরে বসে এখনো শামিলা তেমনি মনোযোগসহকারে সঙ্গীতের সাধনা করে যাচ্ছে। বেচারা জানেই না এই মুহূর্তে এখানে একটা ভয়ঙ্কর ডাকাতি হচ্ছে ওদের বাড়িতে। বড় আবেগ দিয়ে গান গাইছে শামিলা...সুরে সুরে মাতোয়ারা করে তুলেছে ভিলার শান্ত নিঃশব্দ বাতাসকে।

দরজা খুলতে যত দেরী হচ্ছে ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে ডাকাতেরা। চিন্তাহরণবাবু বললেন—আমার বড় নাতনী নির্মলার ঘর এটা। অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করে তাই উঠতে দেরি হয় ওর।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুমজড়িত চোখে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সুন্দরী তরুণী নির্মলা দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল—খুন...খুন...পুলিশ... বাঁচাও...

কিন্তু নির্মলার আতঙ্কিত অস্ফুট চিৎকারটা ঘরের বন্ধ আবহাওয়ার মধ্যেই মাথা কুটে মরল। পর মুহূর্তে ডাকাতদের উদ্যত রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়ে পাথরের কাঠ হয়ে উঠল ও। তখুনি একজন গর্জে উঠল—একদম চুপ! একটু চিৎকার করলেই গুলী করে দেব। এখন যা বলছি তাই করুন। ...এ ঘরের আলমারীটা [illegible] খুলে ফেলুন চটপট, টাকা চাইই আমাদের [illegible] সময় নষ্ট করবেন না...

নির্মলা এবার অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ল—টাকা? আমার কাছে তো টাকা থাকে না। বিশ্বাস না হয় খুলে দেখুন?

বলেই ভয়ে ভয়ে খাটের বিছানা তুলে চাবি বার করতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য...সুদর্শন হারামজাদাটার স্বাদ, এক-টুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। আর হবেই বা [illegible] কেন? কুকুরকে বেশী লাই দিলে যা হয়। এই মুহূর্তে সুদর্শনের চেয়ে নিজের ওপরেই রাগে ঘৃণায় প্রতিহিংসায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল। পরক্ষণেই বাস্তসমস্ত হয়ে চাবি খোঁজার অছিলায় চোঁ করে গেঞ্জিটা বালিশের নিচে গুঁজে দিল নির্মলা। কিন্তু ডাকাতদের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না ও। একজন চাবুকের মত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওর হাতটা চেপে ধরল—উঁহু কী এটা দেখি কি লুকিয়ে ফেললেন... বলতে বলতে গেঞ্জিটা উঁচুতে তুলে ধরে বলল—আপনার বিছানায় পুরুষের গেঞ্জি কেন! কার এটা? আপনার...

নির্মলা ওর লজ্জারাঙা মুখটা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—আমাদের বাড়ির চাকর সুদর্শনের গেঞ্জি...

—বুঝলাম, কিন্তু ওটা আপনার বিছানায়...কথা শেষ করার আগে কী ভেবে সামলে নিয়ে চুপ করে গেল, বলল—যাকগে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাদের কোন উৎসাহ নেই...এখন খুলে ফেলুন আলমারীটা। চাবি কই...বলতে বলতে বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে চাবি বার করে নিয়ে এল। খুলে ফেলা হল আলমারী। পাওয়া গেল...দামী দামী কিছু শাড়ি, অনেকগুলো ফটো অ্যালবাম, একটা সেফটি রেজার, শ'খানেক টাকা...গোটা তিনেক খরচ হয়ে যাওয়া দামী এক প্যাকেট সিগারেট। একটা হাত বাক্সের মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে পাওয়া একতাড়া চিঠি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের কিছু সরঞ্জাম...তবু আশ্চর্য আলমারীটা তন্নতন্ন করে খুঁজে লুকোন টাকার কোন হদিশ পেল না ডাকাতরা।

সত্যি সত্যি এবার গভীর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ল ওরা। এতক্ষণে যেন ওদের মনে হচ্ছে চিন্তাহরণবাবুর কথাটাই ঠিক। রোজভিলাতে দ্বিতীয় ডাকাতি এটা। যা ছিল প্রথমবারে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে ওরা। কিছুই কেলে যায়নি তো এরা পারে কি? শুধু মিথ্যে মিথ্যে এতটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হয়নি ওদের।

আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে, ব্যর্থ ডাকাতির বিড়ম্বনা গায়ে মেখে ছুটতে ছুটতে বাইরে রাস্তায় ওদের জন্যে অপেক্ষমান গাড়িতে চড়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল। প্রতিবেশীরা কেউ জানতেই পারল না পাশের বাড়িতে নিঃশব্দে এতবড় ডাকাতি হয়ে গেল।

গৃহহারা কবি জন হাওয়ার্ড পেন

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

গৃহ-সুখ বা গৃহের মহিমা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বহু কবিতা বা গান রচিত হয়েছে. এর মধ্যে 'হোম, হোম, সুইট সুইট হোম' শীর্ষক ইংরাজী কবিতাটি জনপ্রিয়তায় বোধহয় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। এটি গান হিসাবেও গীত হয়ে থাকে, আসলে এটি গান রূপেই রচিত হয়েছিল।

এই গীতি কবিতাটির রচয়িতার নাম জন হাওয়ার্ড পেন্‌। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের উপকণ্ঠে এঁর জন্ম হয়েছিল। গীতি কবিতাটি পড়লে মনে হবে এই কবি নিশ্চয়ই সারাজীবন বেশ ভালভাবেই গৃহসুখ বা সংসার সুখ উপভোগ করতে পেরেছিলেন এবং সেই অভ্যাস-সুখই তাঁকে গৃহের প্রশস্তি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাস্তবে ঘটেছিল ঠিক তার বিপরীত। জন্মাবধি দারিদ্র্য, ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা ও দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেই এই হতভাগ্য কবির জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। শৈশবকাল অতিক্রান্ত হবার আগেই তাঁকে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়তে হয়েছিল—গৃহসুখ কাকে বলে তার আস্বাদ লাভের সৌভাগ্য হতভাগ্য পেনের হয় নি. ঘর তাঁর ছিল না, ঘরণীও ছিল না।

পেনের বয়স যখন পাঁচ তখন তাঁর দরিদ্র পিতা নয়টি সন্তান নিয়ে নিউইয়র্ক অঞ্চল থেকে—জীবিকার প্রয়োজনে বোস্টনে চলে এসেছিলেন। শিশুকাল থেকেই পেন হয়ে উঠেছিলেন খুবই খামখেয়ালী ও ভাবপ্রবণ। সহজাত প্রতিভা ছিল কিন্তু পড়াশুনোয় মনঃসংযোগ করার মত মনের স্থৈর্য তাঁর ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন, খুবই বড় একজন অভিনেতা হবেন। ছেলের পড়াশুনোয় মন নেই, আর তাকে শিক্ষাদানের মত আর্থিক সঙ্গতিও নেই. এই অবস্থায় পেনের পিতা, তাকে নিউইয়র্কের একটি হিসাবরক্ষার অফিসে ঢুকিয়ে দিলেন. পেন তখন সবে শৈশব অতিক্রম করেছেন। নিউইয়র্কে এসে পেন সুবিধা পেলেই থিয়েটার দেখতে যেতেন আর নাট্যজগতের খোশখবর সংগ্রহ করে বেড়াতেন। নাটক দেখে দেখে নাটক রচনার কৌশলটিও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, সহজাত প্রতিভা এ বিষয়ে তাঁর সহায় হয়েছিল।. মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি 'থেসপীয়ন মিরর' নামে নাট্যজগৎ সম্বন্ধে একটি পত্রিকা সম্পাদন করে প্রকাশ করতে লাগলেন। এই কাগজটি নাট্যামোদিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখনকার দিনের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'ইভনিং পোস্ট' এর সম্পাদক খোঁজ নিয়ে যখন জানলেন যে এর সম্পাদক-পরিচালক একটি চৌদ্দ বছরের বালক, সামান্য কেরানীর কাজ করে যে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে তখন তিনি খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। 'ইভনিং পোস্ট' সম্পাদকের চেষ্টায় পেনের সঙ্গে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এই বন্ধুদের চেষ্টায় কিছুদিন পর পেনের লেখা একটি নাটক সাফল্যের সঙ্গে নিউইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল। যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পেনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল' এর লেখক ওয়াশিংটন আরভিং। পেনের অনন্যসাধারণ প্রতিভা আছে অথচ তাঁর শিক্ষার অভাব, এইজন্য আরভিং ও অন্যান্য বন্ধুরা তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য একটি কলেজে ভর্তি করে দিলেন। পেনের পিতার পক্ষে এই শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ সম্ভব ছিল না, এইজন্য বন্ধুদের চেষ্টায় এক বদান্য ভদ্রলোক তাঁর উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করতে সম্মত হলেন। পেন্‌ বছর খানেক মন দিয়ে পড়লেন কিন্তু এত বেশী খরচ করতে লাগলেন যে, যে ভদ্রলোক তাঁর শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে পেনের মনান্তর হয়ে গেল। এই সময় পেনের পিতা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। পেন এই অবস্থায় পড়া ছেড়ে অভিনেতারূপে থিয়েটারে যোগ দিলেন। প্রথমদিকে অভিনেতারূপে তাঁর বেশ নাম হল, উপার্জনও বেশ হতে লাগল। পেন ভাবলেন এখন থেকে তাঁর অর্থচিন্তার আর দরকার হবে না। সুতরাং প্রচুর অর্থ তিনি যথেচ্ছভাবে খরচ করতে লাগলেন। উপার্জিত অর্থ যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন পেন ভবিষ্যতে শোধ করবেন ভেবে ঋণ করতে লাগলেন। মাথার উপর ঋণের বোঝা যখন বেশ ভারী হয়ে উঠেছে তখন দেখা গেল—পেনকে কোন নাট্যপরিচালক আর কাজ দিতে চাইছেন না। তাঁর বদমেজাজ ও খামখেয়ালের জন্য
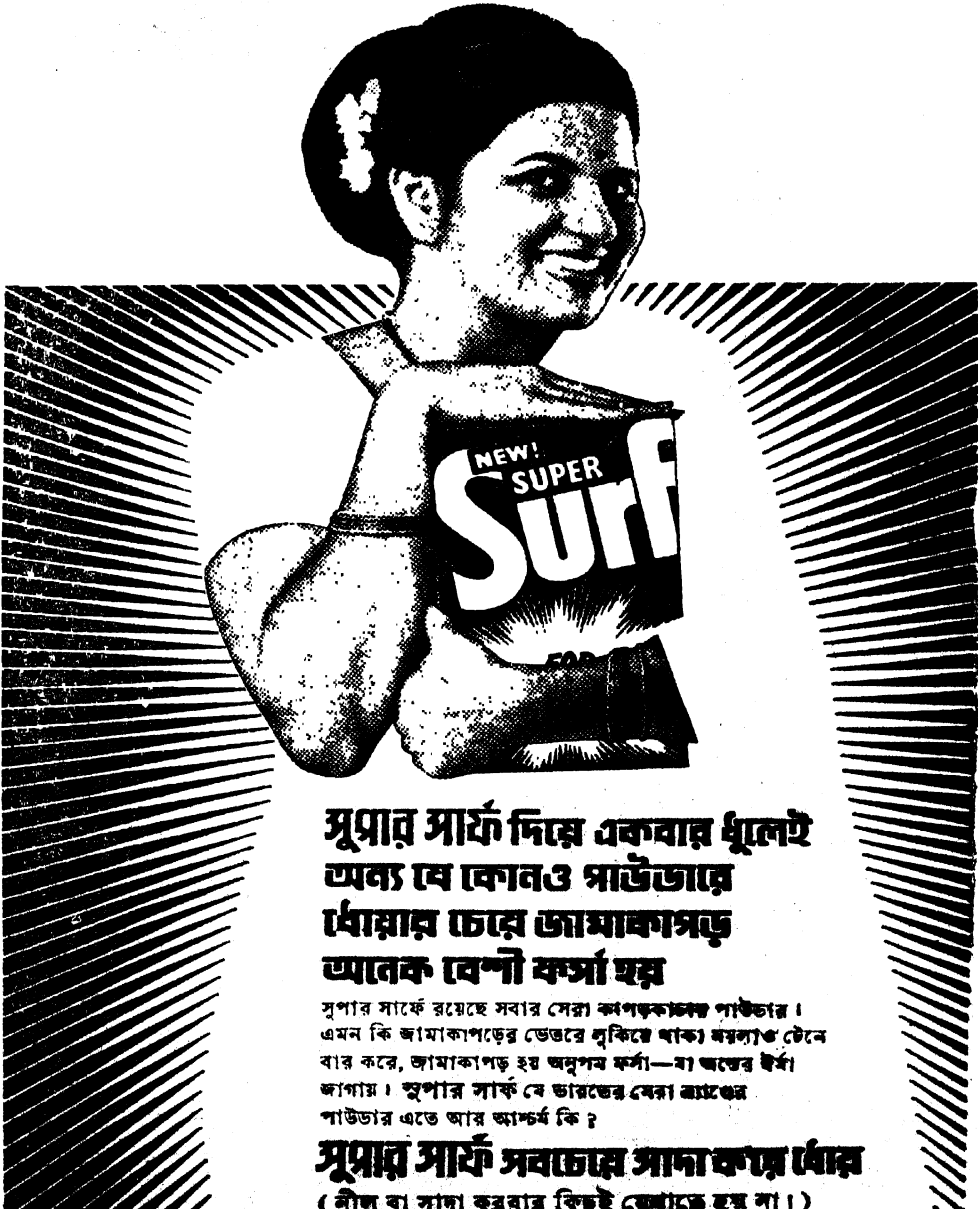
পরিচালকরা সকলেই তাঁর উপর খুবেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিছুদিন কর্মহীন, উপার্জনহীন জীবন যাপন করার পর বন্ধুদের পরামর্শ ও উদ্যোগে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পেন্ ইংল্যাণ্ডে চলে এলেন—জীবিকার আশায়। নূতন দেশে এসে প্রথম প্রথম পেনের দিন ভালই চলতে লাগল, তাঁর লেখা নাটক অভিনীত হল, এমন কি অভিনেতারূপেও তাঁর সুনাম হল। কিন্তু পেন্ তাঁর পুরাতন অভ্যাস—অমিতব্যয়িতা ত্যাগ করতে পারেন নি, যথারীতি তিনি উপার্জনের অধিক ব্যয় করতে লাগলেন এবং ঋণ বাড়তে লাগল। উপার্জন বাড়াতে হবে, টাকার খুবেই প্রয়োজন, এই প্রয়োজন মেটাতে পেন্ নিজেই একটি 'থিয়েটার' দল গঠন করলেন—কিন্তু তাঁর থিয়েটার চলল না, ঋণের দায়ে পেন্‌কে জেলে যেতে হল। জেলে বসে ফরমায়েসি নাটক লিখে উত্তমর্ণের টাকা শোধ দিয়ে পেন্ বছরখানেক পর ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জেল থেকে মুক্তি পেলেন। জেলের বাইরে এসেও তিনি শান্তি পেলেন না, অন্য পাওনাদারেরা তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। আবার জেলে যাবার ভয়ে পেন্ লণ্ডন থেকে প্যারিসে পালিয়ে এলেন। এখান থেকে তিনি ফরমায়েসি নাটক লিখে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিতে

লাগলেন, এই আয় থেকে কোন রকমে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় চলতে লাগল।

১৮২২ এর অকটোবর মাসের এক সন্ধ্যায় মেঘাচ্ছন্ন বিষন্ন আকাশের নীচে উত্তমর্ণের ভয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে পলাতক পেন্ প্যারিসে তাঁর দৈন্য-জর্জরিত বাস-স্থানে বসেছিলেন। ক্ষুব্ধ ব্যর্থ পেনের সহসা মনে পড়ে গেল তাঁর শৈশবের কথা,—পিতা মাতার স্নেহ দৃষ্টির নীচে নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে তাঁদের ছায়া ঘেরা, নিকুঞ্জ-বেষ্টিত ছোট্ট কুটিরে চিন্তাহীন জীবনযাত্রার ছবি।

পেন লিখে ফেললেন তাঁর এই বিখ্যাত গীতি-কবিতা—'হোম, সুইট্ হোম'

"Mid pleasures and palaces though
ve may roam
Be it ever so humble,
there is no place like home,
A charm from the sky seems to
hollow us there,
Which, seek through the world is
never met with elsewhere,
Home, Home, sweet, sweet, home
There is no place like Home!
there is no place like home".

কবিতাটির চারিটি স্তবক, প্রতি স্তবকে ছয়টি পংক্তি, প্রত্যেক স্তবকের শেষ দুটি পংক্তি—'হোম হোম সুইট সুইট হোম' দেয়ার ইজ্ নো প্লেস লাইক্ হোম্,'—বাকী স্তবকগুলিতেও 'ধ্রুবপদ' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই কবিতাটি পেন্ তাঁর লেখা ক্লরমায়েন্স 'মিলান-কন্যা ক্লারি' নাটকে জুড়ে দিলেন। এটি সাফল্যের সঙ্গে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লণ্ডনের রংগমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ নাট্য পরিচালক স্যার হেনরি বিশপ্। তিনি এই গানটিতে সুরারোপ করেন। গানটি গেয়েছিলেন পরিচালকের স্ত্রী সুগায়িকা অ্যানা বিশপ। অ্যানার কণ্ঠে গানটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রংগমঞ্চের বাইরেও এই গানের ঢেউ এসে পড়েছিল এবং সেই ঢেউ সারা পৃথিবীতেও ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয়নি। অসফল নাট্যকার ও অভিনেতা পেনের নামও এই গানটির রচয়িতারূপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই গান থেকে পেন্ প্রচুর খ্যাতি পেলেও অর্থ কিছুই পেলেন না, কারণ গানটি যে নাটকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার গ্রন্থস্বত্ব পেন্ আগেই সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। প্যারিসে কিছুকাল বাস করার পর পেন্ আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু বৈষয়িক উন্নতি তাঁর আর হয়নি। নানা প্রকার সাহিত্যিক উঞ্ছবৃত্তি করে কোন রকমে তাঁকে দিন কাটাতে হত। ঋণজর্জর ও আধা-বেকার পেন্ কবি শেলির মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা মেরীর প্রেমে পড়েছিলেন কিন্তু মেরী তাঁকে কৃতার্থ করেননি। সকল দিকে ব্যর্থ হয়ে পেনের পক্ষে ইংল্যাণ্ডে বাস আর সম্ভব হয়নি। দীর্ঘকাল পরে ১৮৩২এ পেন্ তাঁর স্বদেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসেছিলেন। দেশবাসী 'হোম হোম সুইট হোম' এর কবিকে প্রচুর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। স্বদেশে কিছুদিন তাঁর বেশ ভালই সময় কেটেছিল কিন্তু এই উত্তেজনা থেমে গেলে পেন্ আবার অর্থ কষ্টে পড়েছিলেন। আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করে চলা তাঁর স্বভাবে ছিল না আঘাতের পর আঘাত পেয়েও শিক্ষা নেওয়ার লোক তিনি ছিলেন না। ঋণ আর সহৃদয় বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে কোন রকমে তাঁর দিন কেটে গিয়েছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রতিপত্তিশালী বন্ধুরা পেন্ এর জন্য একটি ভাল চাকুরী সংগ্রহ করে দিলেন—তিনি আফ্রিকার টিউনিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কনসাল' বা রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন। পেনের ভাগ্যে এই শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৪৫-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসক দলে পরিবর্তনের ফলে পেন্ এই পদটি হারালেন। আবার সেই সংগ্রাম ও ঋণজর্জর দিনগুলি ফিরে এল। বন্ধুদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৫১তে পেন্ আবার তাঁর পুরাতন পদটি ফিরে পেয়ে টিউনিসে চলে গেলেন। ততদিনে বহু ঋণ জমে গিয়েছে, চাকুরী করে সেই টাকা থেকে তিনি তাঁর ঋণ শোধ করতে থাকলেন। পাওনাদারদের তাগিদ আর তাদের দেওয়া লাঞ্ছনা অপমান বেশী দিন আর অবশ্য পেন্‌কে ভোগ করতে হয়নি। হোম, সুইট সুইট হোমের কবি 'হোম' থেকে বহুদূরে বিদেশ টিউনিসে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তখনও তাঁর প্রচুর ঋণ শোধ বাকী ছিল। যে শান্তি তিনি জীবনে পাননি, মৃত্যু তাঁকে সেই শান্তি এনে দিয়েছিল অন্ততঃ পাওনাদারদের তাগাদা আর কটুবাক্য থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

পেনের মৃত্যু হলেও তাঁর গানটি লোপ পায়নি, এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে গিয়েছিল। একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের বাসভবনে এক বিশ্ববিখ্যাত গায়িকার গানের আসর বসেছিল। স্বয়ং লিঙ্কন্ গায়িকাকে 'হোম, সুইট হোম্' গানটি গাইতে অনুরোধ করেছিলেন। গায়িকার সুরটি জানা ছিল কিন্তু গানের কলিগুলি তাঁর ভাল জানা ছিল না। প্রেসিডেন্ট এটা বুঝতে পেরে নিজেও অনুচ্চ কণ্ঠে সুর মিলিয়ে গায়িকাকে গানের কলিগুলি জুগিয়ে দিয়েছিলেন। গান যখন শেষ হল তখন সবাই লক্ষ্য করেছিল প্রেসিডেন্টের দুচোখ দিয়ে জল ঝরছে।

পেনের মৃত্যুর একত্রিশ বছর পরে মার্কিন জনগণ পেনের কফিন সমেত মৃতদেহ টিউনিস থেকে তুলে এনে নিউইয়র্কের ওক্ হিল সমাধিভূমিতে সমারোহের সঙ্গে সমাহিত করেন, সেখানে একটি স্মৃতিসৌধও নির্মিত হয়েছিল। হতভাগ্য কবি জীবদ্দশায় যে ঘর পাননি, মৃত্যুর পর কৃতজ্ঞ দেশবাসীর কাছ থেকে তা পেয়েছিলেন।

পেনের লেখা 'দ্বিতীয় চার্লস' নামে একটি নাটক মার্কিন নাট্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এ এইচ কুইনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। নাট্য-শাস্ত্র বিশারদ কুইনের মতে পেন্ ছিলেন একজন কুশলী ও শক্তিশালী নাট্যকার। পেনের লেখা ১১ খানি অপ্রকাশিত ও লুপ্ত নাটক 'আমেরিকার লুপ্ত নাটক' গ্রন্থমালায় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি জীবনচরিতও প্রকাশিত হয়েছে, এর একটি নাম আকাশচারী জন হাওয়ার্ড পেন্ (জন হাওয়ার্ড পেন্—দি স্কাই ওয়াকার)। নাট্যকার হিসাবে পেনের নাম স্থায়ী হক বা না হক তাতে কিছু আসে যায় না। হোম সুইট হোমের কবি হিসাবে তাঁর নাম যে মুছে যাবে না একথা নিশ্চিত বলা যায়। এটি দিয়ে তিনি অতীত ও বর্তমানের বহু সফল কবি ও নাট্যকারের থেকে ভাগ্যবান।

বিজয়িনী ইন্দিরা

জওহরলাল নেহরু তনয়া প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছেন, নানাভাবে, নানা প্রসঙ্গে। তাঁর পিতৃদেব কর্তৃক লিখিত—দুহিতার কাছে পিতার পত্র নামক গ্রন্থটি শুধু ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর জন্য লিখিত হলেও সারা দুনিয়া সেই গ্রন্থ পাঠ করেছে। মতিলাল নেহরুর পৌত্রী এবং জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী আজ ভুবন বিখ্যাত। তিনি এখন খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে। 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' 'গার্ডিয়েন' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে তিনি মহারাণী ভিকটোরিয়া, ক্যাথরিন দি গ্রেট, প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহিয়সী মহিলাদের সমপর্যায়ভুক্ত এমন মন্তব্যও করেছেন। এই মুহূর্তে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জীবনের কথা নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই নানাভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষাতেও একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিখ্যাত জীবনীকার মণি বাগচি মহাশয়ও 'ভারত রত্না ইন্দিরা' এই নামে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন কথা রচনা করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে প্রায় পঞ্চাশখানি জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন, বাঙালী মনীষার পরিচয়জ্ঞাপক সেইসব গ্রন্থ সর্বত্র সমাদর লাভ করেছে, এছাড়া ছোটদের জন্য বানাডে শ নামক একটি ক্ষুদ্র জীবন কথাও লিখেছেন। জীবনী সাহিত্যে তাঁর দান স্বীকৃতি লাভ করেছে।

'ভারতরত্ন ইন্দিরা' গ্রন্থটি মূলতঃ সাম্প্রতিক ইতিহাস। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্যাপারে ইন্দিরাজীর যে মহান ভূমিকা এই জীবনী গ্রন্থে তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তার ফলে গ্রন্থটি ডিসেম্বর—৭১ খৃষ্টাব্দের আঠারো দিনের যুদ্ধের একটি তথ্যানুগ ইতিহাস হয়ে উঠেছে। অতি সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সেই কারণে উচ্ছ্বাস এবং আবেগমুক্ত জীবনী রচনা করা হয়ত সম্ভব হয়নি। শক্তিময়ী মাতৃমূর্তি ইন্দিরা গান্ধীর অসাধারণ শৌর্য এবং ধৈর্যের পরিচয় প্রসঙ্গে হয়ত এই উচ্ছ্বাস কিছুটা অনিবার্য। বিশেষতঃ সমসাময়িক ঘটনা লেখকের মনে একটা স্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করে। তবে, এই যুদ্ধ এবং তার সঙ্গে বিজড়িত স্বদেশ ও বিদেশের অনেক ঘটনা আজ ইতিহাসের বিষয় বস্তু। আজকের এই উচ্ছ্বাস এবং আবেগের মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ার অনেক পরেও নিরাসক্ত এবং নিরপেক্ষ মানুষকে এদিনের এই বিজয়িনী ইন্দিরা গান্ধীকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতে হবে, কারণ রাষ্ট্রগঠনে অসামান্য কৌশল এবং বিদেশী শক্তির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে অসাধারণ সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত অসহায় মানুষ যখন ভারতে এসে আশ্রয় নিল, এবং দিনের পর দিন অসহায় বাঙালীদের ওপর পিশাচ ইয়াহিয়ার সেনাদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল তখন আন্তর্জাতিক নেতাদের অনেকেই চোখ বুজে রইলেন। সেই সংকট মুহূর্তে, দীর্ঘ ন-টি মাস, ইন্দিরা যে আশ্চর্য কূটনীতি এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে তা তুলনাহীন।

শ্রীমতী গান্ধী যেদিন পরিষদীয় দলের নেতৃ নির্বাচিত হলেন সেদিন অনেক কথার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

'আমি সব সময়েই নিজেকে একজন দেশসেবিকা বলে গণ্য করেছি, যেমন আমার পিতৃদেব নিজেকে তাঁর স্বজাতির প্রথম সেবক বলে গণ্য করতেন। আমি নিজেকে আমার দলেরও একজন সেবিকা মনে করি। সেবিকা আমি এই মহান দেশের জনসাধারণের। আমাদের এই দেশ অতি প্রাচীন, এর ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার মহৎ।'

সেদিন তিনি একতার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক দেশে অনেক দল ও মতের প্রতি খাপ খাইয়ে রাষ্ট্রনায়ককে চলতে হয়। নিয়ামকতন্ত্রে যা চাবুকের জোরে আদায় করা হয় সেই 'লয়্যাল্টি' বা আনুগত্য গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। ভারতের নানা মত নানা পথের রাজনৈতিক চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই সুবিশাল রাষ্ট্রের শাসনভার যে শক্তিময়ী নারী নিজের হাতে নিয়েছেন তাঁরও চিত্ত সংশয় ছিল, দ্বিধা ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই প্রাথমিক জড়তাকে কাটিয়ে তুলেছেন তিনি। নিজের দল থেকেই যে বাধা এসেছিল সেই বাধা তিনি অনায়াস ভঙ্গীতে কাটিয়ে বিজয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ বিজয়িনীর বরমাল্য কণ্ঠে তুলে নিলেন। সারা ভারতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই নির্বাচনে ইন্দিরাজী নিজের দলকে জয়যুক্ত করলেন, কেন্দ্রে একটি দৃঢ়-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল।

তারপর দ্রুতগতিতে কিছু কিছু শাসন সংস্কার করা হয়েছে, খাদ্যে ভারত স্বয়ম্ভর হয়েছে, আর ১৯৭১-এর ডিসেম্বর যুদ্ধের পর ভারত জগৎসভায় সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে রূপান্তরিত করার জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টাও এইসূত্রে স্মরণীয়।

পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ দীর্ঘদিনের। ভারত স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি, তার কারণ কূটনৈতিক দিক থেকে তা শিষ্টাচার সম্মত নয়। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অপপ্রচার করে থাকেন, পূর্ব-বাংলার আন্দোলন দীর্ঘকালের, ভারত কি করছিল এতদিন? এসব নিছক অপরিণত মস্তিষ্কের প্রশ্ন। ভারত সুদীর্ঘ ন-মাসের মুক্তিযুদ্ধে আত্মিক সমর্থন জানিয়েছে। সারা বিশ্বকে সজাগ করেছে। 'দ্যাট ওমান'কে জব্দ করার জন্য ইয়াহিয়া নানা কৌশল করেছে, তাকে মদত জুগিয়েছে বিশ্বের দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্র।

এইকালে শ্রীমতী গান্ধী নিকসনকে যে বলিষ্ঠ পত্র দিয়েছিলেন তা এই সূত্রে স্মরণীয়:

> 'We seek nothing for ourselves, we do not want any territory of what was East Pakistan and now constitutes Bangladesh. We do not want any territory of West Pa_kistan We do want lasting peace with Pakistan'.

তারপর ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যা ঘটেছে তা ভারতীয় মাত্রেরই স্মৃতিপটে আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক।

শ্রীমতী গান্ধীর জীবনের সর্বোত্তম লগ্ন ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। সেদিন লোকসভায় তিনি ঘোষণা করেন—

> 'Dacca is now the free Capital of a free country. We hail the people of Bangladesh in their hour of triumph. All nations who value the human spirit will recognise it as a significant miles one in man's quest for liberty."

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অন্য কোনো দৃষ্টান্ত নেই, যেখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্র এইভাবে আত্মত্যাগ করে এক অদম্য প্রাণশক্তির অধিকারী দুর্দমনীয় জাতিকে সহায়তা করেছে স্বাধীনতা লাভে।

সংক্ষেপে হলেও কুশলী জীবনীকার মণি বাগচি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে 'ভারত-রত্ন ইন্দিরা' গ্রন্থে ১৯৭১-এর ইন্দিরার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনার ওপর প্রাধান্য দিয়ে একটি মনোজ্ঞ জীবনী রচনা করেছেন তজ্জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটিতে অনেকগুলি সুমুদ্রিত আর্ট প্লেট আছে।

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে গান্ধীজী নেতাজী, লেনিন ইত্যাদি মনীষীদের জীবনকথার পূর্ণ বিরাট মহাকাব্য রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত তাঁর মহাকাব্যটিও একটি স্মরণীয় অবদান। কিছুকাল আগে প্রকাশিত তাঁর 'রাঙামাটি' ও 'আরক্ত পদ্মা' নামে তাঁর দুটি ক্ষুদ্র কাব্য-গ্রন্থের মাধ্যমে 'শাশ্বতী বাংলা'র চিন্ময়ী মূর্তির অনুধ্যান বন্ধনমুক্তির কঠোর তপস্যাব্রতের মহতী সিদ্ধির সম্বোধিত সংবাদ। শ্রীভট্টাচার্য 'ইন্দিরা বিজয় কাব্যে' ইন্দিরা নেতৃত্বে ভারত পৌরুষ যে অলোক-সামান্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে যে অকুতোভয় দীপ্তির পরিচয় দান করেছে তার কাহিনী বিধৃত করেছেন। সনেট-রীতি আশ্রয়ী এক নতুন ধারার ছন্দে এই কাব্য গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। পৃথিবী আলোড়নকারী যে ঘটনার মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী অসামান্য শক্তিমত্তায় ও অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে ভারতকে এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য তা সুন্দরভঙ্গীতে ১০৮টি সনেটাশ্রয়ী কবিতায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে যথার্থ 'সামগ্রিক বিশ্ব বিবেক চেতনায় মানবিকতা উদ্ধার কাহিনী' কবি যে অনায়াসভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন তার জন্য তিনি প্রশংসিত হবেন।

—অভয়ঙ্কর

(১) ভারতরত্ন ইন্দিরা (জীবনী)—মণি বাগচি প্রণীত।। প্রকাশক : দি বুক এক্সচেঞ্জ, ২১৭ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬।। দাম ছয় টাকা মাত্র।

(২) ইন্দিরা-বিজয় (কাব্য)—কালীপদ ভট্টাচার্য প্রণীত।। প্রকাশক : শোভনা প্রেস পাবলিকেশনস, ১৬, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিন্যু, কলি-১৭।। দাম দু টাকা মাত্র

পূর্বাঞ্চলের লেখক সম্মেলন

উৎকল তরুণ লেখক গোষ্ঠীর আন্তরিক আয়োজনে সম্প্রতি কলকাতার শ্রীশিক্ষায়তনে দু-দিনব্যাপী পূর্বাঞ্চলের লেখকরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে এক সমাবেশে হার্দ্য পরিবেশে মিলিত হয়েছিলেন একে অন্যেকে জানবার ও চেনবার জন্যে। পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি স্থান থেকে ভিন্নভাষাভাষী প্রায় দুশত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী। সভাপতিত্ব করেন সতীকান্ত গুহ। প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন অশোককুমার সরকার। প্রধান বক্তা অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন যে ভারতে সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাসে বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের সম্মেলন এই প্রথম। এই সম্মেলন একতার প্রতীক—ভাব বিনিময়ের এবং বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের মধ্যে মিলনের প্রতীক। অনুষ্ঠানে বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, শ্রীচরণ বরাজ ডঃ কৃষ্ণচরণ বেহারা, দেবেন্দ্রনাথ মানসিংহ প্রমুখ আঞ্চলিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। কাব্য ও নাট্য সাহিত্য নিয়েও বিশিষ্ট কবি ও নাট্যরসিকরা মিলিত হন। স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর বসে। পূর্বাঞ্চলের খ্যাতনামা কবিদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবান কবিরাও এতে অংশ গ্রহণ করেন। কলকাতার সাহিত্য-জীবনে এই সম্মেলন নতুনত্বের স্বাদ এনেছে। সম্মেলন সর্বদিক দিয়ে সার্থক হয়েছে—এজন্যে উৎকল তরুণ গোষ্ঠীকে আন্তরিক অভিনন্দন।

সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার

বাংলাভাষায় ভ্রমণ কাহিনী 'মণিমহেশ' এর জন্য প্রখ্যাত চর্চাণিক ও সাহিত্যরসিক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ সালের আকাদমী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সম্মান মূল্য পাঁচ হাজার টাকা এবং খোদিত তাম্রফলকের একটি পেটিকা। প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং বহু ইংরেজি উপন্যাসের প্রণেতা ডক্টর মুলুকরাজ আনন্দ তাঁর 'মর্নিং ফেস' উপন্যাসের জন্যেও এই পুরস্কার লাভ করেছেন। এই দুজন ছাড়া বিভিন্ন ভাষার আরো তেরোজন লেখক পুরস্কার-প্রাপক তালিকায় আছেন। 'মণিমহেশ'-এর রচয়িতা হিমালয় প্রেমী শ্রীমুখোপাধ্যায়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

রামমোহনের দ্বিশতবার্ষিক জন্ম-উৎসব

সম্প্রতি (২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারী) দুই-দিনব্যাপী উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের নবরূপকার যুক্তিবাদী রাজা রামমোহনের দ্বিশতবার্ষিক জন্ম উৎসবের সূচনা ঘটে রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর (হুগলী) গ্রামে।

এই দুইদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানে অঙ্গ ছিল শোভাযাত্রা, বেদগান, ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থানে শ্রদ্ধামাল্য অর্পণ এবং রামমোহন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। মূল সভাস্থল রাজা রামমোহন মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের এক শোভাযাত্রা আসে রামমোহন এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থানে রামমোহন স্মৃতি-মন্দিরে। এস্থানে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ র[illegible] চৌধুরী, সভাপতি বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান ধীরাজ বসু প্রমুখ। দুশো জন্মবর্ষের প্রতীক হিসাবে দুশো মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়ে ডঃ চৌধুরী সর্বকালীন মানুষ ও আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি বিচারপতি শ্রীমিত্র তাঁকে অভিহিত করেন 'যুক্তি অনুসারী' ও 'ভক্তির সাধক' বলে। অনুষ্ঠানটি রাধানগর দ্বিশতবার্ষিকী [illegible] সব কমিটির আন্তরিক আয়োজনে সার্থক হয়ে ওঠে।

২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী 'ত্রিবৃত্ত' 'আধুনিক সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রয়াসে ও কুচবিহার জেলা একুশে ফেব্রুয়ারী দি[illegible] উদযাপন সমিতির উদ্যোগে [illegible] জেলাব্যাপী বাংলা ভাষা দিবস উদযাপিত হয়।

শহরের রাস্তায় রাস্তায় মাঙ্গলিক আলপনা দেয়া হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী প্রতিটি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে শহীদদের প্রতি স্মৃতি তর্পণ, এবং দুপুর ১২ টায় শহীদদের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন, জনসাধারণ সন্ধ্যায় গৃহগুলোকে আলোক সজ্জা করেন এবং চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শন এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

শহীদ বেদীতে মাল্য অর্পণ করার পর সন্ধ্যায় নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনাসভার সূচনা ঘটে, প্রধান বক্তা কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, বাংলাদেশের আমন্ত্রিত অতিথি (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী) অধ্যাপক পুলিনবিহারী দে ও তরুণ অধ্যাপক মৃন্ময় চক্রবর্তী একুশে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

কবি সম্মেলনে নীরজ বিশ্বাস, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর চট্টোপাধ্যায়, জগৎ সাহা, সবিতা দেবী, কল্যাণময় রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ দাস, অজিত লাহিড়ী, ও রণজিৎ দেব স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। এই সভায় বাংলাদেশ-বিষয়ক চলচ্চিত্র এবং একুশে ফেব্রুয়ারীর উপর একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। জেলা ন্যায়াধীশ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ কোলে সভায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্যে। ডঃ সুবোধরঞ্জন রায়, অপর্ণা দত্ত, সুমিতা নিয়োগী, হরিশচন্দ্র পাল ও ডাঃ অজিত রায়চৌধুরী প্রমুখ ধন্যবাদার্হ।
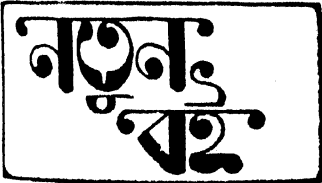
খণ্ডিত একক। মৃণাল দেব। প্রকাশক অভিজ্ঞান, ২-এ, মাধব দাস লেন, কলকাতা ৬। মূল্য দু' টাকা।

মৃণাল দেবের ছোট ছোট কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছি। দীর্ঘ কবিতা রচনায় তিনি যে সমান সার্থক কবি, তাঁর প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ বোধিদ্রুমে শ্বেত পিপীলিকা' তা প্রমাণ করেছে। 'খণ্ডিত একক' কবির সদ্য প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। শিল্পী নিতাই ঘোষের মনোরম প্রচ্ছদে 'পেপার ব্যাকে' আলোচ্য গ্রন্থটির অঙ্গ-সৌষ্ঠব সুরুচিপূর্ণ।

কবিতার বিষয়ে কবি তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থ থেকে আরও গভীরে যেতে পেরেছেন এবং স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। কবি যে মানুষ সম্পর্কে আন্তরিকভাবে কাব্যময় অনুভূতির কেন্দ্রে আন্দোলিত হন, তার পরিচয় এ গ্রন্থের বহু পংক্তিতে স্পষ্ট। কবি মৃণাল দেবের গূঢ় রোমান্টিক বিষাদ থেকে জাত ক্রোধ একালের প্রতি, কিন্তু সেই ক্রোধ যথার্থ মানবিক বোধের মুক্তিকাশ্রয়ী মূল্যায়নের কারণেই। কবির এই ক্রোধ যুগ ও কাল, তার মধ্যে বিচরণশীল মানুষদের দেখার দৃষ্টি বদলে দিয়েছে।

কিন্তু জীবনের ইতিবাচক বক্তব্যকে চান বলেই নেতিবাচক তীব্র, তির্যক শব্দ, বাক্যবন্ধ, চিত্রকল্প ইত্যাদির মধ্যে কাব্যিক অনুভূতি যোগ করে আঘাত করতে চেয়েছেন সবরকমের আধুনিক সুবিধাবাদীদের। চিত্রকল্প রচনার দক্ষতাই শুধু নয়, জীবনের মূলকে যথার্থ তান্ত্রিকের মত অনুসন্ধান করার প্রয়াসও ধরা পড়ে কবিতাগুলিতে। ক্লেদাক্ত জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু তারই মধ্যে নিজ সত্তার খণ্ডিত একাকতায় আত্মমগ্ন থেকেছেন, পালিয়ে যেতে চান নি। বস্তুত মৃণাল দেব স্বল্প প্রচারিত কবি, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও তার প্রকাশে যে কোন প্রতিষ্ঠিত আধুনিক তরুণ কবির পাশে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত সম-ক্ষমতাসম্পন্ন নিঃসন্দেহে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

দিশারী (ত্রৈমাসিক) সম্পাদক : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিশারী সাহিত্য সংস্থা, কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ষাট পয়সা।

অনেক লিটল ম্যাগাজিনই সাহিত্যপাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে এই ছোট-র মধ্যেই বড়-র প্রাপ্তিযোগ ঘটে। মেলে অনেক অজানা তথ্য ও তত্ত্ব। এই দিক দিয়ে নৃপেন ভট্টাচার্যের 'ডাইরীর ছেঁড়া পাতায় বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গটি উল্লেখ্য। তেরোটি কবিতা। তিনটি গল্প আর তিনটি প্রবন্ধ আলোচ্য সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি লোকশিল্পের ওপর সুলিখিত।

সংবেদ (দ্বাদশ সংকলন)—সম্পাদক শরৎসুনীল নন্দী ও প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত। ১১৬।১ আনন্দ পালিত রোড, কলিঃ-১৪। পঞ্চাশ পয়সা।

পত্রিকাটিকে বলা যায় মধ্যপন্থী মেজাজের। সূচীপত্রের পাতায় ছাপা হয়েছে ইংরেজী একটা পংক্তি : 'আর্ট ফর সার্ভিস অ্যান্ড গ্রেসেডনেস'। সংস্কৃত অনুবাদে যার অর্থ, 'সেবায়ৈ কল্যাণায় চ কলা।' এই সংখ্যায় দুটো প্রবন্ধ লিখেছেন প্রভাতরঞ্জন সরকার ও সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন বারীন্দ্র দে, পার্থ গুহ বকসী, শরৎসুনীল নন্দী, সুভাষ সরকার, শংকর দাশগুপ্ত, ধূর্জটি চন্দ, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনেকে। একটু প্রথাগত ভঙ্গিতে লেখা হলেও 'একালের কবিতার চেহারা' শীর্ষক প্রবন্ধটি অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

অভিনব অগ্রণী (বিশেষ বাংলাদেশ সংখ্যা) সম্পাদক : দিলীপকুমার বাগ। ৮০ বৈষ্ণবপাড়া লেন, হাওড়া-১। পঞ্চাশ পয়সা।

বিশেষ তরুণদের এই মাসিক পত্রিকাটি চৌদ্দ বছর ধরে কিশোর-তরুণ মনের খোরাক জুগিয়ে আসছে প্রশংসনীয়ভাবে। বিশেষ বাংলাদেশ সংখ্যা তারই বিশিষ্ট নিদর্শন।

প্রাপ্তি স্বীকার

বিদ্রোহী সম্পাদনা : মলয় গোস্বামী ও দেবব্রত চক্রবর্তী। মতি রায় রোড, নবদ্বীপ। পঁচিশ পয়সা।

সোনার বাংলা (বিশেষ সংকলন)—সম্পাদকমণ্ডলী। ২০১ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা : ৭। তিরিশ পয়সা।

ত্রুটি স্বীকার

৪২ সংখ্যার (১২ ফাল্গুন ৭৮) সংকলন ও পত্র-পত্রিকায় আলোচিত পত্রিকাটির নাম বিচিন্তা নয়—'বিচিত্রা'।
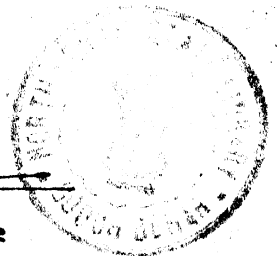
রাজা রামমোহন প্রশস্তি ॥

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নবযুগ-প্লাবনী ও পাবনী যে মন্দাকিনী ধারা
তুমি তা'রি বারিবাহ সে-ধারায় সেচিলে সাহারা।
মিলনের যমুনায়, বিচারের জ্ঞান-সরস্বতী
প্রাচ্য-মধ্য-পাশ্চাত্ত্যের ত্রিপথগা ঐতিহ্য মহতী
মিলাইলে বঙ্গদেশে, ভাষা-ভাব-বিতর্ক-বিশ্লেষে,
আজিও আদর্শ তার রাজে সর্বদেশ-শীর্ষ-দেশে।।

দেশ-কাল যাহা বলে, যাহা চলে কলের মতন
গতানুগতিক-ধারা, করে যা'রা সদানুবর্তন,
তুমি তার বহির্ভূত, নবোদিত বলিষ্ঠ বিপ্লবী,
যুগান্তর-প্রবর্তনে পালা বদলের প্রতিচ্ছবি।
সত্য-জ্ঞান-অনন্তের বার্তাবহ বৈজয়ন্তী-ধারী
মিথ্যা পাপ প্রতিরোধে সতর্ক জাগ্রত প্রতিহারী।।

তোমার কারুণ্য দিল চক্ষে চক্ষে আশ্চর্য কাজল
সহমৃতাসতী-দুঃখে প্রতিচক্ষু হইল সজল।
পরাবিদ্যা সাধনায় বহুর মাঝারে হেরি একে
'একমেবাদ্বিতীয়ম্' দীক্ষা দিলে ডাকিয়া প্রত্যেকে।
এ-মহামানব-সিন্ধু মুক্তি চিন্তা তরঙ্গে উদ্বেল
পরাধীন দেশে শান্তি ইন্দ্রজাল ভেজাল ও ভেল!

তাই ভারতের মুক্তি সাধনার প্রস্তুতি তোমার
সুতীক্ষ্ণ শাণিত প্রজ্ঞা সে-যুদ্ধের খর তরবার।
ইটালি স্বাধীন হলে জানাইলে সানন্দ বন্দনা
বেদান্তের বেদীপরে আরম্ভিলে প্রারম্ভ সাধনা।
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ফরাসী-বিপ্লব-লব্ধ ফল
সযত্নে আনিলে বহি শিখাইলে রোপণ কৌশল।।

মৃতকল্প মূর্চ্ছাতুর ছিল দেশ অহল্যা পাষাণী
নব-রাম-পদ-স্পর্শে সারা দেশ উঠে সাড়াদানি।
উদয়-চেতনা লোকে কৃতবিদ্য ভদ্র সুধীগণ
সহসা জাগ্রত শক্তি মুক্তি মন্ত্রে লভিল জীবন।
জাতি ভেদ, ছদ্মোর্গ,—নবযুগে ভার্গবের মত,
কুঠারে কাটিয়া মূল একসূত্রে বাঁধিলে ভারত।।

স্বৈরাচারী, বৈরাচারী, চারি জাতি চুয়াল্লিশ হাঁড়ি,
হাঁড়িতে প্রবিষ্ট ধর্ম! কিম্বা ধর্ম মালা জটা দাড়ি!
সুবিশাল এই বিশ্বে এক ব্রহ্ম, ধর্ম একেশ্বর
বাকী মিথ্যা খুঁটি-নাটি ঝুটো-ল্যাঠা-জ্যাঠামি-জর্জর।
নর বলি, পশু বলি আর বলি অবলা রমণী,
নরপশু তা'রা যারা বলি দেয় ভগিনী জননী!

অলীকে ও অলৌকিকে লোক সব হারাইল দিশা
মাধ্যন্দিন সূর্যালোকে অসূর্যম্পশ্যের অমানিশা!
মাতৃ মাতামহী ছাড়ি শৃঙ্গ-পুচ্ছবতী হ'ল মাতা!
গোমূত্র গোময়ে শুদ্ধি করে বুদ্ধি হীন ছাতা-নাতা!
ধর্মবীর, কর্মবীর, লক্ষ্যস্থির ধ্যানদৃষ্ট পথে
কায়কল্প-চিকিৎসায় সে-সঙ্কটে বাঁচালে ভারতে।।

বঙ্গের দুলাল তুমি জন্ম সূত্রে সাধিষ্ঠ বাঙালী
'ভারত পথিক' পরে,—নিখিল বিশ্বেরে দিলে ডালি
উদার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য; নবজন্ম লভিলে আবার
বিশ্ব-রাজসভাস্থলে তুমি হলে সদস্য দুর্বার।
তুমি বাজাইলে শঙ্খ যুগ সন্ধিক্ষণে, মহামতি!
প্রণিহিত কায়মনে লহ প্রতিজনের প্রণতি।।

॥ ৭ ॥

এই যাত্রাতেই নিমাইচরণের থেকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার—কিন্তু হেমন্ত সে সাধে বাধ সাধল। দুটো দিন অপেক্ষা করে থেকে, নিজে থেকে চলে যাওয়ার অবসর দিয়ে যখন দেখল নিমাই সেদিক দিয়েই যাচ্ছে না, এবং খাওয়াদাওয়ার এত জুৎ—হলই বা নিরামিশ খাওয়া—ফেলে তার আশু যাওয়ার কোন ইচ্ছেও নেই তখন, তিন-দিনের দিন সকালে নোটিশ দিল।

'তোমার বৌদিকে পৌঁছে দেওয়া হয়ে গেছে, তুমি বাবা এবার সরে পড়ো। যদি কখনও দরকার মনে করি, ডেকে পাঠাবো।'

একটু অবাক হয়ে যায় বৈকি নিমাইচরণ। থতমত খেয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলে, 'না, মানে আপনাকে এই বয়সে দেখাশুনো করাও তো একটা কত্তব্য। তাছাড়া অনাথ ভাইপোটাকেও ছেড়ে যেতে ঠিক যেন প্রাণ চায় না। তাই ভাবছিলুম যে—আপনার শ্রীচরণেই যদি জীবনের বাকি দিন কটা—'

হেমন্ত ওর কথা 'শ্রী' ফাঁদাতেই থামিয়ে দিলে একরকম, 'এই বয়সে এখনও আমি তোমার মতো অনেক অপোগণ্ডকে দেখা-শুনো করার হিম্মৎ রাখি। আমার কথা ভেবে তোমাকে অস্থির হতে হবে না। তাছাড়াও—আমাকে দেখবার ঢের লোক আছে। বোবা ছেলে আছে অনেকগুলি, তারা তোমার মতো বাজে বকে না, রোজগার করে খাওয়ায়। আর অনাথ ভাইপোকে যদি মানুষ করার ক্ষমতা থাকে, তার মা যদি চায়—নিয়ে চলে যাও, চোখ ছাড়া করতে হবে না। আমাকে যদি মানুষ করতে হয় তবে তোমাকে বাদ দিয়েই করব।...তোমার জীবনেরও এখনও অনেকদিন বাকি—আমার শ্রীচরণ এখন থেকে তোমার ভার বইতে রাজী নয়।'

নিমাইচরণ এত কথাতেও ক্রুদ্ধ হল না—অন্তত তার আচরণে সে ক্রোধ প্রকাশ পেল না—তর্ক করল না, ব্যস্ত হয়ে উঠে নিজের আন্তরিকতা প্রমাণ করতে চাইল না; এক রকমের করুণ বিষণ্ণ মুখে মাথা হেঁট করে বসে রইল এবং দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই—আবারও জ্যাঠাইমাকে একটা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, গোরাকে চুমু খেয়ে বৌদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

শুধু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল, 'আমি কিন্তু মধ্যে মধ্যে আসব বাপু, তাইড়ে দিওনা। আসব, আবার চলে যাব তোমাদের দেখেই।'

এরপর আর মনে মনে তারিফ না করে উপায় থাকে না ছেলেটাকে।

মনোরমার আদরযত্নের কোন ত্রুটি রইল না।

নিজের প্রথম বৈধব্যের অসহায় দুঃখ দিনগুলি মনে করে এই মেয়েটার সমস্ত বেদনা যথাসাধ্য মুছে নেওয়ার জন্যে কৃত-সংকল্প হেমন্ত।

ওর স্বভাবের অসংখ্য দোষত্রুটি, স্বামীর সঙ্গে শত্রুব্য ব্যবহার—সব ভুলে ওকে বুকে টেনে নিল সে, সেগুলোকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার দোষ বলে ধরে নিয়ে ক্ষমা করল। সেই সঙ্গে, এ অবস্থায় যতটা সম্ভব—ওর অভাবগুলো পূরণের চেষ্টা করতে লাগল। মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ হয়েছে, সেটার ক্ষতি দুধ দই ঘি দিয়ে পূরণের ব্যবস্থা করল। একাদশীর দিন জোর করে সামনে বসিয়ে দুধ সন্দেশ খাওয়াল। বলল, 'পাপ হয় আমার হবে মা, নরকে যেতে হয় তো আমিই যাবো। তুমি খাও, আমি বলছি এতে কোন দোষ হবে না।'

এছাড়াও একটা দুঃসাহসিক কাজ করল। যে থান দুখানা সঙ্গে এনেছিল মনোরমা, সে দুটো চাকর মাকে বিলিয়ে দিয়ে নরুন পাড় ধুতি আনাল এবং সামনের হাতে পরার জন্য সেকরা ডেকে দুগাছা চুড়ি গড়িয়ে দিল, নিজের একটা সরু হারও বার করে দিল বাক্স থেকে, বলল, 'ছেলের মাকে শুধু গলায় জল খেতে নেই, এটা পরে থেকো।'

হারে তত আপত্তি করার কারণ নেই, নরুনপাড় ধুতি ও চুড়ি পরতে মনোরমা নিজেই আপত্তি করেছিল, ভয়ে ভয়েই অবশ্য—ভয় তার দুদিকেই; একদিকে জ্যাঠাইমা, প্রতিবাদ করলে হয়ত জ্বলে উঠবেন, আর একদিকে—বোধ করি এই ভয়টাই প্রবলতর—সামাজিক দুর্নামের আশংকা। সে বলেছিল, 'দেশের দিকে যদি জানতে পারে খুব নিন্দে হবে মা। বলবে বেবিশ্যে হয়ে গেছি। ভদ্দর লোকের—বামুনের ঘরে পেড়ে কাপড় কেউ পরে না ওদিকে, হাতেও কিছু রাখে না।'

হেমন্ত সে আপত্তি কানে তোলে নি। বলেছিল, 'দেশের দিকে দুর্নাম হয় হোক, তুমি সেখানে যাচ্ছও না, সে বদনাম কানেও আসছে না। লোকে ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইনী বললে রাজার মায়ের তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। তুমি শহরে আছ, সেখানকার চালে চললেই হল, সেখানে না কেউ নিন্দে করে, সেইটেই দেখা দরকার। কলকাতায় এখন আস্তে আস্তে চল হচ্ছে, দুএকটা বেশ নামকরা লোকের বাড়িতে দেখে এসেছি নিজের চোখে, অল্পবয়সী বৌয়েরা বিধবা হলে চুড়ি কি বালা একরকম কিছু হাতে রাখিয়ে দেয়—নরুনপাড় ধুতিও। ...তাছাড়া আমার বাড়িতে কে-ই বা আসছে, কেই বা গিয়ে নিন্দে করবে তোমার!'

এর পর আর কোন কথা বলে নি মনোরমা।

সে তো পরতেই চায় এসব—পরার সাধ তো কিছুই মেটে নি। তার বাপের বাড়ি থেকে যা দু-এক ভরি সোনা দিয়েছিল তা বহু দিনই বেচে খেয়ে বসেছিল সাধুচরণ, শেষ যেটুকু ছিল—গলায় সরু গোট হার আর দুগাছা পেটি—তাও বেচে শ্রাদ্ধ হয়েছে। কিছু কোথাও নেই বলেই আরও, অমন সর্ব-আভরণরিক্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।...

খাওয়া পরা কোন দিকেই যত্নের কোন ত্রুটি রইল না, অবশ্য বিধবা — বিশেষ ব্রাহ্মণের বিধবার পক্ষে যতটা সম্ভব,—তার ফলে মনোরমার স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে উঠল আগের চেয়ে, যৌবন যেন এতদিনে পরিপূর্ণতা লাভ করে ওর দেহে। আগেকার সেই জবুথবু জড়ভরত হয়ে থাকা মলিন চেহারা ঘুচে গিয়ে যেন নতন মানুষ বেরিয়ে এল—কালো রঙের ওপরই একটা শ্রী আর লাবণ্য ফুটে উঠল।

তবু মনোরমার মনে সুখ নেই। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে পাড়াগাঁয়ের বৌ—তাদের খাওয়া-দাওয়ার ধারণা আলাদা; গরমের দিনে তারা পান্তা খেতে চায়, গুড় তেঁতুল মেখে ভাত খাওয়ার লোভ; মুসুর ডাল মাস-কলাইয়ের ডাল পুঁই শাক—এসব এখানে এসেই শুনছে বামুনের বিধবাদের পক্ষে অখাদ্য, দেশে এসবের বাছবিচার নেই। এগুলোও তার খেতে ইচ্ছে করে, আরও হয়ত খাওয়া নিষেধ বলেই এত প্রবল লোভ তার। পান্তা ভাত খেতে দেয় না হেমন্ত, বলে, 'ইচ্ছে হয় টাটকা ভাতে জল ঢেলে পরিষ্টি করে খাও।' কিন্তু সে পান্তায় মন ভরে না, আমলাটে গন্ধ ছাড়ে না তা থেকে। মুড়িও আগে খেতে দিত না, ওর ঐকান্তিক আকুতি বুঝে পরে অনুমতি দিয়েছে; শুকনো মুড়ি তাও, বলে 'জল লাগলেই সকড়ি হয়ে যায় মুড়ি-চিঁড়ে—সে খেলে আর সেদিন ভাত খাওয়া চলবে না। এমন কি লঙ্কার সংগেও খাওয়া চলবে না।'

সবচেয়ে কষ্ট হয় ওর বেগুনী ফুলুরির জন্যে, সেটা একেবারে নিষিদ্ধ এ বাড়িতে। মনোরমার জন্যেই মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে দিয়ে তৈরী করায় আজকাল, কিন্তু তাতে মনোরমার মন ভরে না। বলে, 'বাজারের বেগুনী ফুলুরিতে যে সুন্দর গন্ধ আর সোয়াদ—এতে তা নেই।'

হেমন্ত বলে, 'ওদের যত রাজ্যের ভেজাল তেল—খুঁজে খুঁজে সস্তায় কিনে এনে ঐসব ছাইভস্ম ভাজে। আর সেও খুব দোষ দেওয়া যায় না কারবার করতে বসেছে ওরা, লাভটাই দেখবে বৈকি।...আর তা ছাড়া সব বেগুনীর দোকানেই পিঁয়াজের বড়া ভাজে—ছোঁয়ানেপা একসা—জেনে-শুনে তোমাকে খেতে দিই কি করে?'

অগত্যা চুপ করে থাকে মনোরমা, সেই সুদূর সুদুর্লভ অখাদ্য বস্তুগুলির কথা মনে করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

সবচেয়ে যেটা অপছন্দ ওর, বাড়ি থেকে কোথাও বেরুতে পারে না।

কখনও কখনও, জ্যাঠাইমা যখন গাড়ি করে বাইরে যান, বাড়ি দেখতে কি বাড়ি সারাতে কি অন্য কোন বৈষয়িক কাজে টেকিল বাড়ি—তাও সব সময় নয়—সংগে নিয়ে যান হয়ত। পালে-পার্বণে গঙ্গাস্নানেও নিয়ে যান সংগে করে, একদিন কালীঘাটেও নিয়ে গিয়েছিলেন—তবে এ যাওয়াতে তৃপ্তি হয় না। দেশে থাকতে সেই পুকুরঘাটে গিয়ে অন্য বৌদিদের সঙ্গে গল্প করা বড় জাঠ-শাশুড়ির ভাষায় 'হ্যাসড়া প্যাড়া'—কিম্বা নির্জন দুপুরে বাগানে বাগানে ঘুরে ডাঁশা কুল কি ডাঁশা পেয়ারা সংগ্রহ করা—মনে পড়ে ওর চোখে জল এসে যায়। ওর খুব ইচ্ছে করে—অন্তত আশ-পাশের কারও বাড়ি গিয়ে প্রাণভরে খানিকটা বকে আসে কিন্তু সেখানেও হেমন্তর কড়া নিষেধ—'একা কারও বাড়ি যাবে না, আমাকে জিগ্যেস না করে'—অমান্য করে যেতে সাহসে কুলোয় না।

শুধু ছেলের মুখ চেয়েই পড়ে থাকা এখানে—এই জেলখানায়।

ছেলের আখেরের কথা ভেবেই।

নইলে মনোরমা এই ভাল খাওয়া-দাওয়ার তোয়াক্কা করত না।

লুচি জল খাবার, দশমীর রাত্রে ঘন দুধের সংগে লুচি খাওয়া — এসবে অরুচি ধরে গেছে ওর। এর চেয়ে গুড় তেতুঁল কি পুঁই চচ্চড়ি কি সজনা খাড়া ছেঁচকি দিয়ে পরিষ্টি ভাত খাওয়া ঢের সুখের।

কী যে ওর দেওরের এই খাওয়ার ওপর এত লোভ তা বুঝতে পারে না মনোরমা। তবু মাছ-মাংস ডিম এ সবগুলো সে বোঝে। আজকাল, সে বিধবা হয়ে আসবার পর থেকে কোন কারণেই মাছ আসে না এ বাড়িতে আর। তবু ছুটে ছুটে আসে নিমাই এই খাওয়ার লোভেই। কত কড়া কড়া কথা বলেন জ্যাঠাইমা, কি হেনস্তা না করেন প্রতি-বারই। কুকুর বেড়ালের মত 'দূর দূর' 'ছেই ছেই' করেন প্রায়—তবু ছুটে ছুটে আসবে আর পড়ে থাকবে। শেষ পর্যন্ত ঘাড়-ধাক্কা দেবার মত যখন করবেন শাশুড়ি তখন বাড়ি ফিরবে।

লজ্জা সরম একেবারেই নেই, এমন বেহায়া যদি দুটি দেখেছে কেউ! এই অপমান লাঞ্ছনার মধ্যেই রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে ছানার ডালনা, ধোঁকার ডালনা ফরমাশ করবে আর সেই খাওয়া খাবে বসে বসে অম্লান বদনে। ঘেন্নাপিত্তির কোন চিহ্নও নেই ওর।...

নিমাইচরণের এই সহ্য গুণ, বিনয় ও 'নেটিপেটি'ভাবে হেমন্ত ভেতরে ভেতরে যে একটু নরম না হয়েছে তা নয়, কিন্তু ওকে এখানে থাকতে দেয় না অন্য কারণে।

মুখ চোখের চেহারা ভাল নয় ওর। যে উগ্র লোলুপতা ও ক্ষুধার্ততা ফুটে ওঠে ওর দৃষ্টিতে তার অর্থ বোঝে হেমন্ত ভাল ভাবেই। ওদের বংশের দোষ এটা। অর্থের লোভ যত না হোক—এই বয়সেই নারীদেহ সম্বন্ধে লোভ অত্যন্ত প্রবল। এই যে এত হেনস্তা সহ্য করেও পড়ে থাকে, সে কেবল খাওয়ার জন্য নয়। সুখাদ্য সুস্বাদুটা ওর এখানে পড়ে থাকার একটা ছুতো।

বিশেষ করে বছর খানেক এখানে ব... পর যখন সুখাদ্য ও সুনিয়মে মনোরমার পূর্ণতর হয়ে উঠেছে, সাধারণ শ্যামাঙ্গী মেয়ের চেহারাতে লাবণ্য সঞ্চার হয়ে... তখন থেকে নিমাইয়ের ছোঁকছোঁকানীও বেড়ে গেছে। এটা হেমন্তর দৃষ্টি এড়ায়... কতই বা বয়স ওর, দুজনে হয়ত এক বয়... হবে—এই বয়সে এতটা ক্ষুধা স্বাভাবিক... এ ওদের বিশেষ রক্তের দোষ।

মনোরমা অতটা বোঝে না। তার... নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবনে একটি সমবয়... অল্প বয়সী ছেলের সাহচর্য ভাল ল... কথা—তা যেমন ধরনেরই হোক না ... তাছাড়া সে এই ধরনের অশিক্ষিত ... খাওয়া হ্যা-হ্যা করে বেড়ান ছেলে দে... অভ্যস্ত। তাই জ্যাঠাইমার এই কুকুর-... করায় ক্ষুণ্ণই হয়।

কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারে... করার প্রয়োজন আছে তাও বোঝে... এটাকে শ্বশুর বংশ সম্বন্ধে স্বাভ... বিদ্বেষ বলেই মনে করে। হেমন্তও ... থেকে বলতে পারে না। সাবধান ক... গেলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে, ... আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে ব্যাপা... তবে এটা সে জানে, নিজের অভি... দিয়েই বোঝে—কোন যুবতী মেয়ের ... অল্পবয়সী ছেলের সাহচর্যের প্রতি আ... সাধারণ ভাল লাগার স্তরে থাকতে ... না বেশী দিন, অতি দ্রুত গভীরতর গা... ভাল লাগায় গিয়ে পৌঁছবে। মনো... মত স্বাস্থ্যবতী বলিষ্ঠ গঠনের ... জৈবক্ষুধা অবশ্যই সাধুচরণকে দিয়ে ... নি, সে ক্ষুধা তার তৃপ্তির পথ খ... বেড়াবেই।

কারণটা বুঝতে পারে না ... মনোরমা ক্ষুণ্ণ হয়, ক্ষুব্ধ হয়। আজ... সে নিমাইচরণের আসার দিনগুলির ... চেয়ে বসে থাকে। আর কিছু না, ... গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা। তার মত অশি... গ্রাম্য মেয়ের বোধগম্য আচরণ ও কথাব... জ্যাঠাইমার শাসন ও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গ... কাটা ঊষর জীবন মরুর মধ্যে দে... উপস্থিতিগুলোই যেন ছায়াশীতল ... মরুদ্যান।

এ অবস্থায় ভাল খাওয়া কি ... লোভে—কীই বা ভাল তাই, মাছ বাদ ... খাওয়া আর শাড়ি গয়না বাদ দিয়ে ... বা কি মেয়েদের? সে সব তো ঘুচে ... গেছে চিরকালের মত—সে কিছুতেই ... থাকত না এখানে, পালিয়ে ঐ ... বাড়িতেই চলে যেত। সেখানে ধান ... করে ক্ষার ঠেঙিয়ে খাড়া-ছেঁচকি ... ভাত খাওয়াও ঢের ভাল ঢের বেশী ... সেটা স্বাভাবিক জীবন, সেইটেতেই অ... সে। সেখানকার মানুষগুলো সাধারণ, পরিচিত। দিন-রাত কলহকোন্দিয়া পরের ভাল দেখলে তাদের বুক ফাটে, নিন্দায় পঞ্চমুখ—তবু রক্ত মাংসের ম... তারা। সেখানে এই দেওর থাকে, গল্প ... লোক, খুনসুটি করার লোক।

যেতে পারে না—শুধু ছেলেটার মুখ চেয়ে। ছেলেটাকে জ্যাঠাইমা যেন হাতের তেলোতে রেখেছেন। তাকে মা বলতে শিখিয়েছেন নিজেই। মনোরমাকে ডাকে বৌমা বলে। ভাল সাহেবী ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। তাদের গাড়ি এসে নিয়ে যায়। সেই সব খরচ যোগান জ্যাঠাইমা, সেখানে উপযুক্ত দামী পোশাক আশাক সব। তাতেই এটা স্বপ্ন দেখতে বাধে না যে এই বিপুল ঐশ্বর্যের একদিন তার ছেলেই মালিক হবে, রাজা ছেলের মা হবে সে। সেদিন এসব শাসন কড়াকড়ি কিছু থাকবে না, যা খুশী তাই করতে পারবে।

ঐশ্বর্য যে ঠিক কত তা জানে না, তবে অনেক যে—এটা ধারণা করতে পারে। মাঝে মাঝে বুড়ো পূর্ণবাবু আসেন, ওদের সরিয়ে দিয়ে কি সব হিসেব নিকেশ হয়, খাতাপত্র কত কি বেরোয়, টাকাও গোনাগাঁথা হয়। জ্যাঠাইমা একটা কারবার করেন, সে জানে—বাড়ি কেনাবেচা, জমি কিনে বাড়ি তৈরী করা। আগে নাকি খুব জোর ছিল ব্যবসা এখন বিলেতে না কোথায় কি এক তুমুল লড়াই হয়ে গেল ক বছর ধরে—সে লড়াই থামবার পর বাজার নাকি খুব মন্দা যাচ্ছে, দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে—কারবার আর তত জোর চলছে না। দু একটা লেনদেনে না কি কিছু লোকসানও খেয়েছেন। তৎসত্ত্বেও, এখনও অনেক আছে। মধ্যে মধ্যে সাবধানে কিছু কিছু বেচাকেনাও করেন, তাছাড়া তিন-চারটে বাড়ির ভাড়াও তো আসে, সেও বড় কম নয়।

এই জন্যেই দাঁতে দাঁত চেপে সুখে থাকার এই কষ্ট সহ্য করে মনোরমা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে খুবই কষ্ট হয়। এক-আধবার—যখন জ্যাঠাইমা কাজে একা কোথাও যান—তখন নতুন ঝিয়ের প্রায় হাতে পায়ে ধরে খোশামোদ করে একটু-আধটু বেরিয়ে পড়ে সে। তবু ভাগ্যিস চারুর মা নেই, শরীর খারাপ বলে দেশে চলে গেছে, দেশেই থাকবে—জ্যাঠাইমা মাসে তিন টাকা করে পাঠান তাতেই চলে যায় নাকি তার, সেদিক দিয়ে তবু সোয়াস্তি খানিকটা। চারুর মার বড় কড়া নজর ছিল, আর সে বড় বেশী মনিবের পোঁ-ধরা। সে থাকতে একটু কিছু করার উপায় ছিল না শাশুড়ির হুকুম না নিয়ে। তাহলেই আগে গিয়ে বলে দেবে অমনি কুট করে। এ নতুন ঝিয়ের তবু দয়া-মায়া আছে। জ্যাঠাইমারই খরচের বাকস থেকে দু-এক পয়সা করে সরানো সিকিটা-আধুলিটা দিয়ে তাকে হাত করেছে মনোরমা। এটা ওটা আনিয়ে খেতেও পারে জ্যাঠাইমার অনুপস্থিতিতে, বাইরেও বেরোতে পারে। অবশ্য কারও বাড়ি যেতে ভরসা হয় না—কে কখন কথায় কথায় বলে দেবে ওঁকে—শুধুই একটু বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি ঘোড়া দেখা যায়।

তবু তাতেই যেন খানিকটা মুক্তি।

আর শাশুড়িকে ফাঁকি দেবার একটা আনন্দ।

(৮)

সে বছর শেষা শীতে পূর্ণবাবু খুব অসুখে পড়লেন।

প্রথমটা অতকিছু বোঝা যায়নি—কিন্তু সামান্য তিনচারদিনেই রোগটা বাড়াবাড়িতে দাঁড়াল। একটু অত্যাচারও হয়ে গিয়েছিল, তবে সে এমন কিছু নয়। বাইরে থেকে এসে গরম বোধ হওয়াতে হঠাৎ জামাটামা সব খুলে ফেলেন, মায় গেঞ্জি পর্যন্ত। ঘামের ওপরই ঢকঢক করে ঠান্ডা জল খান খানিকটা। তাতেই—প্রথমে একটু সর্দি হল, সঙ্গে জ্বর—দেখতে দেখতে সেই সাধারণ সর্দিজ্বরই প্রবল আকার ধারণ করল, বেহুঁশ অচৈতন্য হয়ে পড়লেন একেবারে।

ডাক্তার বন্ধুরা এসে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, নিউমোনিয়া, বুকের অবস্থা খারাপ, বাঁচার আশা কম।

এ রোগে চিকিৎসার চেয়ে শুশ্রূষা বেশী দরকার। পূর্ণবাবুর স্ত্রীও বুড়ো হয়ে পড়েছেন, ছেলের বৌ চিররুগ্ন, মেয়েরা সবাই বিদেশে। এ অবস্থায় কে দেখে সে-ই সমস্যা। ডাক্তাররা বললেন, 'ভাল নার্স রাখা দরকার, মেডিকেল কলেজে খবর দিন, তারাই ভাল লোক পাঠাবে।'

ও'রা নিজেরাই খবর পাঠাচ্ছিলেন মেডিকেল কলেজে, পূর্ণবাবুর স্ত্রী শরৎ-সুন্দরী নিষেধ করলেন। বললেন, 'ভাল নার্স আমার সন্ধানে আছে আমি নিয়ে আসছি।'

পূর্ণবাবুর এক ছাত্র সম্প্রতি খুব নাম করেছেন, বিলেতফেরৎ ডাক্তার—তিনিই অগ্রণী হয়ে দেখছিলেন, তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

'আপনি আর কেন কষ্ট করবেন, বলুন না কে, কাকে ডাকতে হবে, আমরাই খবর পাঠাচ্ছি।'

শরৎসুন্দরী একটু ম্লান হেসে ঘাড় নাড়লেন। সে হাসি একটু রহস্যময়ও—মর্মান্তিক কোন কৌতুকের হাসি—অন্তত প্রধানবাবুর তাই মনে হল।

কথাটা শরৎসুন্দরী কদিন ধরেই ভাবছেন, পূর্ণবাবু এই অসুখে পড়া থেকেই।

স্বামীর মন কোথায় পড়ে আছে—তা তিনি জানেন। আগে বিদ্বেষ ছিল বৈকি, বিছের জ্বালার মতো সে বিদ্বেষ ঐ বিশেষ ব্যক্তিটি সম্বন্ধেই। এদিক ওদিক নানা প্রণয় ঘটনা তিনি জানতেন—দীর্ঘকাল ধরেই জানেন, ভাল করে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই।

সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর—পূর্ণবাবুর বয়স তখন ষোল। খেলাধুলো করে বেড়াতেন যখন তখনকার কথা আলাদা কিন্তু ষোলসতেরো বছর বয়সে—যখন স্বামী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন, তখনই বুঝলেন আর যাই হোক—স্বামীর জীবনে তিনি প্রথম রমণী নন, একমাত্র তো ননই।

তারপর বহু এসেছে, গেছে। এতে কতকটা তাঁরা অভ্যস্তও ছিলেন সেকালে। স্বামীকে একা পাওয়া প্রায় কারও অদৃষ্টেই ঘটত না। তবু তো ইনি আর একটা কি দুটো বিয়ে করে সতীনের প্রতিষ্ঠা করেন নি বাড়িতে।

কিন্তু সেসব ছুটকো-ছাটকা জল-স্থায়িনীদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও হেমন্ত সম্বন্ধে থাকতে পারেন নি। এটা যে শুধুই দৈহিক আকর্ষণ নয়—গভীর ভালবাসা—তা তিনি স্ত্রীর মন দিয়ে বুঝে-ছিলেন। স্বামীপ্রেমের সুরে বাঁধা হৃদয়ের তারে সে আঘাত ধরা পড়েছিল—যেমন বহু-দূরবর্তী ভূমিকম্পের সংবাদ সিসমোগ্রাফে ধরা পড়ে।

রাগ করেছেন, ঝগড়া করেছেন, অশান্তি করেছেন—কিন্তু জেদী ও কর্তৃত্ব-সচেতন পূর্ণবাবুকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি, তিনিই বরং স্ত্রীকে শাসন করে দিয়েছেন। বেশী বিরক্ত করলে সরিয়ে দিয়েছেন বা নিজেই সরে গেছেন, কিছুদিন অন্যত্র গিয়ে বাস করেছেন।

তারপর, কমলাক্ষ পর্বেও, আর একদফা কান্নাকাটি কলহবিবাদ করে স্বামীকে সতর্ক সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন—তবে তার আর প্রয়োজন রইল না।...তারপর তো দীর্ঘকাল সম্পর্কই ছিল না কোন, যাওয়া-আসা মুখদেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু শরৎসুন্দরী নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি —স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কী হাহাকার আর কি বিপুল তৃষ্ণা তাঁর অন্তরে তখনও।

বুঝেছেন, সেই প্রথম যে. ইতিমধ্যে ঐ অবাঞ্ছিত বাইরের স্ত্রীলোকটি কখন তাঁর স্বামীর মনের অধিকাংশ অধিকার করে নিয়েছে—তিনি তা টেরও পান নি। সেখানে আজ শরৎই অতিরিক্ত, একটা দায় মাত্র।

এটা প্রচন্ড আঘাত। এই আঘাতেই তিনি আরও বুড়ো, আরও অথর্ব হয়ে পড়েছেন—স্বামীর চেয়ে ঢের বেশী। বেদনার সেই দুঃসহ বোঝাই এত দ্রুত তাকে অন্তরে বাইরে পঙ্গু করে দিয়েছে।

তার পরও সে যন্ত্রণা কমে নি।

দৈহিক সম্পর্ক আর নেই, থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাতেও কোন সান্ত্বনা পান নি শরৎসুন্দরী। আগেকার সকাম তৃষ্ণার প্রবল তরঙ্গ আবেগোর্মি মিলিয়ে গেছে ঠিকই—এখন তা নিস্তরঙ্গ সরোবরের গভীরতায় প্রবেশ করেছে, পূর্ণবাবুর রূপজ আসক্তি এখন সুগভীর প্রেমে পরিণত হয়েছে।

পরস্পরের প্রতি এই নির্ভরতা, পরস্পরের সাহচর্যে—সুধু মাত্র সান্নিধ্যেই প্রীতি, তৃপ্তি বোধ—এ প্রেম তিনি স্বামীর কাছ থেকে কোন দিনই পান নি, এটা ভুলতে পারেন কৈ?...

তবু, আজ স্বামীর এই জীবন সঙ্কটের মুহূর্তে—তাঁরও প্রেমই বড় হয়েছে—ঈর্ষা ও বিদ্বেষের চেয়ে। পূর্ণবাবু এই রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে, অর্ধচেতন অবস্থাতে কার সঙ্গ কার সেবা চাইছেন—তা শরৎসুন্দরী জানেন; এও জানেন যে কোন ভাড়া করা নার্সই সেই মানুষটির মতো আন্তরিকভাবে সেবা করবে না।...তাই যদি হয়, হয়ত বা স্বামীর জীবনের এই শেষ কটি দিন—এইটুকু শান্তি ও তৃপ্তি লাভের হন্তারক

হবেন না তিনি, সংসার থেকে শেষ বিদায়ের কালে ও'র প্রাণের পাত্র অমৃতেই পূর্ণ করে দেবেন। হলাহল যেটুকু তা তাঁরই থাক—ভাগ্যের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য—তার বদলে সুধাই তুলে দেবেন তিনি স্বামীর তৃষার্ত মৃত্যুহিম ওষ্ঠাধরে।

পূর্ণবাবুর বন্ধু বা ছাত্র কোন ডাক্তারেরই নিষেধ কানে তুললেন না তিনি। ছেলের ভ্রূকুটিও গ্রাহ্য করলেন না। কোচম্যানকে গাড়ি বার করতে বলে নিজেই বেরোলেন শুশ্রূষাকারিণী ডেকে আনতে।

ছেলে বললে, 'আহা, তা না হয় আমরাই যাচ্ছি কেউ, তোমার আবার এই শরীরে—কোথায় পড়ে টড়ে যাবে—গাড়ি পাঠালেও তো হয়—ডাকলেই আসবে, এর জন্যে এত হীনতা স্বীকারের দরকারটা কি? কী এমন মান্যমান লোক!'

মা যে কাকে ডাকতে যাচ্ছেন পরেশ তা অনুমান করতে পেরেছে বৈকি। তাতেই আরও বিস্মিত ও বিরক্ত সে।

কিন্তু শরৎসুন্দরী তেমনিই রহস্যময় মৃদু হাসির সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন, বললেন, 'ডাকলে সে আসবে না। এমনিই একাজ এখন আর করে না। এখানে তো আরও আসতে চাইবে না।...তোরা ব্যস্ত হোস নি বাবা, আমি যা করছি, ভেবে বুঝেই করছি। এখন এসব ছোটখাটো মান-অপমান মর্যাদার কথা ভাবার সময় নয়।'

ঠিকানা শরৎসুন্দরীর জানার কথা নয়—তবে কোচম্যানরা বাড়ি চিনবে এটুকু তিনি জানতেন। কিন্তু গাড়িতে উঠে যখন বললেন, 'হেমন্তমার বাড়ি চলো'—তখন তারও কথাটা বুঝতে কিছু সময় লাগল।

সে বোকার মতো খানিকটা ও'র মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'হেমন্ত মার বাড়ি? মানে—সেই বৌবাজারে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কানে কম শুনছিস নাকি?'

'হাপনি যাইবেন—সেইখানে?' আবারও বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করে সে।

এবার বিরক্ত হয়ে শরৎসুন্দরী মুখ ঘুরিয়ে বসলেন।

এরপর আর সন্দেহ রাখার কোন অবকাশ থাকে না। আপন মনেই, না-বোঝার ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে—সাহেবের দিকে চেয়ে হাত ও চোখের বিচিত্র ভঙ্গী করে কোচবকসে চড়ে বসে পেয়ার আলি কোচম্যান...

পূর্ণবাবুর অসুখের কথা হেমন্ত শুনেছিল। সইসই এসে খবর দিয়ে গেছে, সেও ঠাকুর পাঠিয়ে খবর নিয়েছে। তবে তাতে স্থূল খবরটা—অর্থাৎ বুকে সর্দি বসে জ্বর হয়েছে—এর বেশী কিছু জানা যায় নি। বিস্তারিত সংবাদের জন্যে সেও ছটফট করছিল মনে মনে। পূর্ণবাবু আগের চেয়ে অনেক বেশী আপন হয়ে গেছেন এই ক বছরে। প্রীতি ও সখ্যের বন্ধন কামজ আসক্তির থেকে অনেক বেশী নিবিড়, অনেক বেশী ঘাতসহ। অন্তরঙ্গ তো বটেই। তাই ওথাকার বিদ্বেষ ও ঘৃণার লেশমাত্রও নেই আর মনে। এখনকার উৎকণ্ঠা একেবারেই নির্ভেজাল ও সত্য।

তবু, এই আগমন আর আহ্বান বহু দূর কল্পনাতেও ভাবা যায় না।

দরজার কাছে একটা গাড়ি এসে থামতে ঝি যখন এসে বলল, বুড়ো মতো একজন মেয়েছেলে এসেছে এবং 'হেমন্ত আছে বাড়িতে?' বলে নাম ধরে খবর নিচ্ছে—তখনই যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিল—কিন্তু নিচে এসে মানুষটাকে দেখে একেবা নির্বাক, স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর যাবে হোক—শরৎসুন্দরীকে দেখার আশা করে নে, এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। অন্য কোন লোক—এমন কি স্বয়ং মহারাণী মে এসে দাঁড়ালেও সে এত বিব্রত ও বিস্ম হত না।

কীভাবে অভ্যর্থনা জানাবে অপ্রত্যাশিত অনাহূত অতিথিকে—আপ বলবে না 'তুমি' বলবে, কী মনে করে এ ছেন উনি, অপমান করতে, কলহ করতে অথবা স্বামীরই খবর দিতে কেবল গুরুতর কোন দুঃসংবাদ জানাতেই—কিছু বুঝতে না পেরে, জীবনে এই প্রথম হয় নির্বোধের মতো শূন্য মূঢ় দৃষ্টি তাকিয়ে রইল—কোন সৌজন্য প্রকাশ কর বা সাদর সম্ভাষণ জানাতে পারল না।

সেজন্য অবশ্য অপেক্ষাও করলেন শরৎসুন্দরী।

এ দৃশ্য উপভোগ করারই কথা ত অন্য সময় হলে এই সাক্ষাতের কৌতুক নিঃসন্দেহে আনন্দ দিত তাঁকে—কিন্তু এ সে সময় নয়, সে কথা মনেও পড়ল না।

এমন কি, ওর এই বিমূঢ়তাও বোধ ক ভাল করে লক্ষ্যে পড়ল না—শরৎসুন্দ নিজেই এগিয়ে এসে হেমন্তর হাত দু ধরে বললেন, 'ভাই, শুনেছ তো—ও'র অসুখ। ভাল হয়ে যে উঠবেন—এটুকু আ করতে সাহস হচ্ছে না, কোন ডাক্তারও ভর দিতে পারছেন না। বোধ হয়...বোধ শেষ অবস্থাই এটা। তোমার একবার সময়ে যাওয়া দরকার যে! তোমার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে নিশ্চয়ই ভেত ভেতরে—তাছাড়া, আর কেউ তো নেই,

সময় তার ভারই বা কে নেবে তুমি ছাড়া!... আর তো কেউ এমন প্রাণ দিয়ে ওঁর মন বুঝে করতে পারবে না!'

বলতে বলতেই দু' চোখের কোল বেয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল তাঁর।

কে জানে, এটা স্বামীর অসুখের জন্য উদ্বেগ, আসন্ন বৈধব্যের আশঙ্কা—না এই নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করার—করতে বাধ্য হওয়ার বেদনা এটা। রিক্ততার, নিঃস্বতার অশ্রু এটা।

প্রথম বিস্ময়ের বিহ্বলতা হেমন্তর কেটে গেছে ততক্ষণে। বুদ্ধি ও বিবেচনা ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব সক্রিয়তা।

সে ওঁর মুঠির মধ্যে ধরা নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁর হাত দুটোই চেপে ধরে, বলে, 'এর জন্যে আপনি এই শরীরে আবার নিজে আসতে গেলেন কেন দিদি! আমাকে একটা হুকুম করে পাঠালেই তো যেতুম। সইসটাকে বলে দিলেই হত। চলুন চলুন ভেতরে বসবেন চলুন!'

'আজ থাক ভাই। এখন আর অপেক্ষা করা চলবে না। ভগবান যদি দিন দেন, তাঁর দয়ায় অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে—তাহলে অবশ্যই আর একদিন আসব, বসবও।... এখন কি গল্প করার সময় আর হাতে নেই। এখন সবাই মিনিট গুনছেন সেখানে। সেই জন্যেই তো ছুটে আসতে হল—যদি ভাবো এ ডাকের মধ্যে কোন অসম্মান আছে, যদি না যাও সে ঝুঁকি আর নিতে রাজী নই।'

'তাহলে চলুন দিদি, এখনই চলে যাই—এই সঙ্গে।'

'এই অবস্থায়—?' এবার বিস্মিত হবার পালা শরৎসুন্দরীর, 'কাপড়টা ছাড়বে না? অন্য কাপড় চোপড়—চাদর?'

'না, কাপড় বদলাবার দরকার হবে না। কী এমন উৎসবের বাড়ি যাচ্ছি যে সেজেগুজে যেতে হবে?...তবে কাপড় একখানা নিতে হবে বটে। থান কাপড় পরি তো—। সে ওখানে মিলবে না—ঈশ্বর করুন কোন দিনই না মেলার দরকার হয়।.. চলুন আপনাকে গাড়িতে বসিয়ে দিই আগে, তারপর ঠিক এক মিনিটের মধ্যে চলে আসছি—'

এক মিনিট না হোক, দু-তিন মিনিটের মধ্যেই নেমে আসে হেমন্ত। একটা গামছা ও খান দুই থান ধুতি নিলে—একটা তার মধ্যে রেশমের কাপড় পুজোর জন্যে—আঁচলে টাকাটা বাঁধতে বাঁধতেই এসে গাড়িতে চেপে বসে।

সেই যে গিয়ে রোগীর পাশে বসল হেমন্ত দীর্ঘ দিন আর উঠতে পারল না।

কঠিন অসুখ, এ বয়সে এ রোগী কেউই বাঁচে না—নিতান্ত পূর্ণবাবুর কঠিনতর প্রাণ বলেই যমে যেতে লাগলেন। জীবনমৃত্যুর মাঝে দোল খাওয়া যাকে বলে—তাই চলতে লাগল তাঁর—যমে-মানুষে টানাটানি ঠিক যাকে বলে। কোন সংজ্ঞা নেই রোগীর, বেহুঁশ অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। হেমন্ত যখন আসে তখন একবার চোখ চেয়ে দেখেছিলেন, চিনতেও পেরেছিলেন বোধ হয়—কারণ হেমন্ত হাতের ওপর হাত রাখতে দুর্বল হাতেই ঈষৎ একটু চাপ দিয়েছিলেন একবার—তারপর সেই যে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজেছিলেন পূর্ণবাবু, আর একবার চোখ খোলেন নি।

তাঁর এই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই দেখে ছাত্র বিধানবাবু সুদ্ধ অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, মাস্টার মশাইয়ের ঐটুকু দেহে যে এতটা শক্তি ছিল তা কখনও ভাবাও যায় নি—না? অদ্ভুত ফাইট দিচ্ছেন কিন্তু! এই দেখে মনে হচ্ছে বাঁচানো হয়ত একেবারে ইম-পসিবল নাও হতে পারে।'

তিনি অবশ্য যা করবার সবই করলেন। অন্য প্রবীণ ডাক্তার দুচার জন আসা-যাওয়া করলেও বিধানবাবুর মতেই চিকিৎসা হতে লাগল। নীলরতনবাবু অজিতবাবু এঁরা রোজই আসতেন কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা পাল্টান নি কখনও। আসলে ওঁরা হাল ছেড়েই দিয়েছেন—ভাবটা এই রকম—'ছোকরার খুব সর্দারী করার শখ—করুক, কেমন বাঁচাতে পারে দেখাই যাক না।'

এর মধ্যে এক মিনিটও বিছানা ছেড়ে ওঠা যায়নি বলেই বাড়িতেও আসা যায় নি আর। স্নান ও আহারের ছুটি পেয়েছে ক্ষেপে ক্ষেপে। হয়ত ডাক্তারবন্ধু কেউ এসে বসে আছেন, সেই ফাঁকে একবার উঠে স্নান করে এল, আহ্নিক করতে হয় রোগীর মাথায় আইসব্যাগ ধরেই, মনে মনে—খাওয়া সেও ঐখানে পাশে বসেই, একটা চোখ রোগীর দিকে রেখেই। ঘুমটা অবশ্য চলে পালা করে। প্রথম রাত্রে শরৎসুন্দরী এসে বসেন, দশটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত। তিনি আপিংখোর মানুষ, তাঁর সহজে ঘুম আসে না—তিনি আরও জেগে থাকতে পারেন কিন্তু হেমন্ত দেয় না। ওর এমনিতেই পরপর রাত-জাগা অভ্যাস আছে, ছেলেকে দিয়ে সে অভ্যাস পাকা হয়ে গেছে বলতে গেলে—তার দু-তিন ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। সে একটা নাগাদ উঠে পড়ে—জোর করে শরৎকে পাশে তাঁর শোবার ঘরে পাঠিয়ে দেয়—আর কারও জেগে থাকার দরকার হয় না। এতদিন লাগবে হেমন্তও ভাবে নি, মনোরমাও না।

সে পড়ে গেল এ বাড়িতে সম্পূর্ণ একা। খালি অভিভাবক শূন্য বাড়িতে ওর সঙ্গে গ্রাম-ছোকরা উড়ে ঠাকুরকে রাখা সঙ্গত হবে না বলে, এখান থেকেই তাকে ডেকে পাঠিয়ে ছুটি দিয়েছে হেমন্ত। ঝি আর মনোরমা—এবং গৌর এই তিনটি প্রাণী থাকে। হেমন্ত আসার সময় খরচের মতো টাকা মনোরমার কাছেই রেখে এসেছিল। একটা আন্দাজী হিসেব করে—এক মাসের মতো খরচ। তাছাড়া কিছু ওর সঙ্গেও থাকে—টাকা রাখার জন্যে ক্রুশে বোনা পশমের একটা থলি সর্বদা কোমরে থাকে, গোপালীর নিজে হাতে বুনে দেওয়া—হেমন্ত বলে,' হাতিয়ার, কলিযুগে টাকাই যথার্থ হাতিয়ার।' এই থেকেই সে একদিন অন্তর পূর্ণবাবুর সইস রামধনকে দিয়ে বাজার করিয়ে পাঠায়। সে অমনি সেই সময়ই আর কোন দরকার আছে কিনা, কে কেমন আছে সেই খবর নিয়ে হেমন্তকে এসে বলে যায়।

সেদিক দিয়ে অসুবিধে কিছু নেই। সহস্র দুশ্চিন্তা ও একাগ্র পরিশ্রমের মধ্যেও সে চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঠিক থাকে ওর। মাসকাবারী উটনো তোলা থাকে—তবু দু-চার পয়সার কোন জিনিস যদি দরকার হয় রামধনই এনে দেয়। 'ঝি যেন বৌমাকে একা ফেলে একপাও কোথাও না যায়'—কড়া হুকুম দিয়েছে হেমন্ত, 'যা কিছু দরকার হবে বাইরের কাজ রামধনই করে দেবে।'

তা করেও রামধন। দুবেলাই এসে খবর নিয়ে যায়।

ওদিকটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে রোগীর দিকে মন দিতে পারে হেমন্ত।

(ক্রমশঃ)

।। সাত ।।
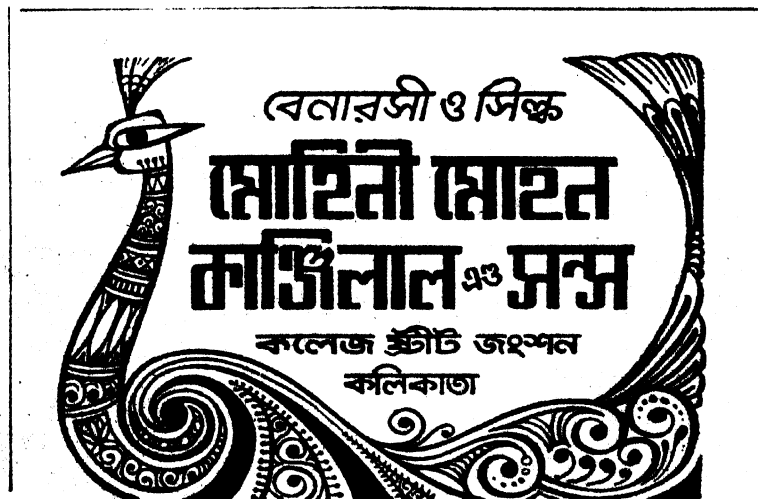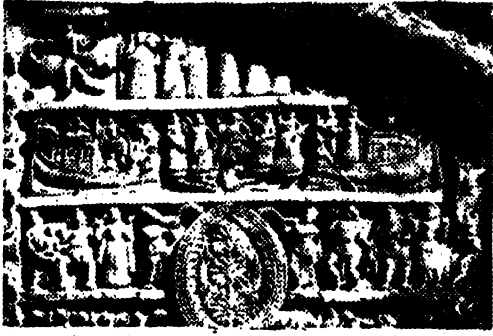
মন্দিরের দেবদেবী

আগের লেখাগুলিতে বাঙলার মন্দিরের গঠনরীতি, বিভিন্ন রীতির মন্দির, মন্দিরলিপি ও বিগ্রহবিন্যাসের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মন্দিরের দেবদেবী সম্পর্কে তেমন কিছু বলা হয় নি। মন্দির নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার বহিরঙ্গের শিল্পকলা ও গঠনপদ্ধতি যেমন আবশ্যিকরূপে জ্ঞাতব্য তেমনি যাঁদের জন্যে এত আয়োজন ও কলাকৌশলের ছড়াছড়ি তাঁদের বিষয়ও মন্দিরসম্পর্কিত আলোচনার এক আবশ্যিক অংশ। আবশ্যিক, এ কারণে যে বাঙালী শিল্পীর যে মানসিকতা থেকে পল্লী ও শহরের নানা অঞ্চলে নানা রীতির মন্দির জন্ম নিয়েছিল তার পিছনে ছিল দেবদেবী সম্পর্কে সে যুগের মানুষের এক বিশেষ ধরনের ভাবনা। সে ভাবনা থেকেই সম্ভবত নানা শ্রেণীর মন্দিরের জন্ম হয়েছে। মন্দিরদেবতার মধ্য দিয়ে সে যুগের মানুষের ধর্মচিন্তারও এক মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে।

মধ্যযুগে বাঙালীর ধর্মজীবন মোটামুটি পৌরাণিক দেবদেবীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। মন্দিরদেবতার মধ্যে শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য খুব বেশী করে চোখে পড়ে। বেশীর ভাগ মন্দিরেই এই প্রধান দুই পৌরাণিক দেবতার অধিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। আবার ষোল শতকে শ্রীচৈতন্যের ভাববিপ্লবের সূচীমুখে যখন বাঙালীর মন বৈষ্ণবভক্তিরসে অভিষিঞ্চিত হল সে সময়ে বিষ্ণু বা রাধাকৃষ্ণ বাঙালীর ধর্মচিন্তার অনেকটা অংশ জুড়ে রইলেন। রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা চলতে লাগল বাঙলার নানা অঞ্চলের মন্দিরে, মন্দিরগাত্র অলঙ্কৃত হল রাধাকৃষ্ণলীলার কাহিনী অবলম্বনে বিবিধ চিত্রভাস্কর্যে। বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ প্রভাবের কথা বাদ দিলেও (যেখানে মল্লরাজাদের আমলে রাধাকৃষ্ণের অনেক মন্দির তৈরী হয়েছিল সতেরো শতকে ও তারও পরে) বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলেও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের জন্যে যে বিপুলসংখ্যক মন্দির তৈরী হয়েছিল তা বুঝতে পারা যায়। এমন কি শহরাঞ্চল থেকে বহুদূরে পল্লীর অনেক দুর্গম অঞ্চলেও শ্যামরায়, বঙ্করায়, গোবিন্দ জীউ, গোপীনাথ প্রভৃতির যেসব মন্দির আজও চোখে পড়ে তাদের অনেকগুলির জন্ম হয়েছিল এসময়ে। এমন কি যেসব স্থানে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায়, কালুরায় প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীদের মন্দির দেখতে পাওয়া যায় সেসব মন্দিরগাত্রেও পোড়ামাটির চিত্রের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটি আবশ্যিকভাবে স্থান পেয়েছে। মেদিনীপুর জেলার অনেক মন্দিরে এর নিদর্শন মেলে। উদাহরণস্বরূপ দাসপুরের কাছাকাছি বলিহারপুরে গোঁড়ীবুড়ীর মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর একটিমাত্র টেরাকোটা হল রাধাকৃষ্ণের। গোঁড়ীবুড়ীর মন্দির সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি। সে যুগে সমাজে বৈষ্ণবধর্মের অপ্রতিহত প্রভাবের কথা মনে রেখে লৌকিক ও অনার্যপ্রভাবিত দেবদেবীর মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

সমাজে যখন কৃষ্ণ ও রাধা এক উচ্চস্থান লাভ করেছেন সে সময়ে কিন্তু আবার লৌকিক দেবদেবীরাও জনমানসে আধিপত্যবিস্তার করতে শুরু করেছেন দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্যোত্তর যুগের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে এটা সহজেই [illegible] যায়। পৌরাণিক শিব এ সময়ে [illegible] উঠেছেন কৃষক শিব, আর কৃষক বাঙ[illegible] তার প্রিয় শিবের জন্যে তৈরী [illegible] দিয়েছেন মন্দির। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে [illegible] মন্দিরগুলি হল, দোচালা, চারচালা ই[illegible] জাতীয়—আবার অনেকগুলি [illegible] রীতির মন্দিরের ধাঁচে তৈরী। [illegible] বাঙলার অনেক গ্রামে ঘুরলে শি[illegible] মন্দির যে কতো দেখতে পাওয়া যা[illegible] সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না, আর লক্ষ[illegible] বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এসব মন্দির হল চ[illegible] শ্রেণীর—যে চালায় কৃষক বাঙালী [illegible] করে গ্রামের একপ্রান্তে। এসব চালা[illegible] মন্দিরে অলঙ্করণ খুব একটা [illegible] না, অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। [illegible] চালামন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠায় [illegible] বাঙালীমন যে শিবকে কতখানি [illegible] করে নিয়েছিলেন তার পরিচয় [illegible] পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন স্থানে একই [illegible] শিবের বারো ও একশো আটটি ম[illegible] দেখতে পাওয়া যায়। এসব মন্দিরই বে[illegible] ভাগ ক্ষেত্রে চারচালার। দক্ষিণেশ্বরে শি[illegible] এধরনের বারোটি মন্দির দেখা যায়, [illegible] বর্ধমান জেলার কালনায় বর্ধমানরা[illegible]

সরতপুরের (দাসপুর থানা) পঞ্চরত্ন শীতলামন্দির আটচালা শিবমন্দির ও সামনে টিনের আটচালা।

প্রতিষ্ঠিত এধরনের একশো আটটি মন্দির আছে।

চালাশ্রেণীর মন্দিরের পরে উৎকলীয় শ্রেণীর মন্দিরেও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হতেন। ওড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর মন্দিরের ধাঁচে এ ধরনের মন্দির পল্লী ও শহরাঞ্চলের বহুস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের মন্দিরকে উৎকলীয় দেউল আখ্যাও দেওয়া হয়। এর বহির্গাত্রে অনেকগুলি খাঁজ আছে, তবে খাঁজগুলি উপর থেকে নীচু পর্যন্ত লম্বায়মান, ইস্‌লামীয় রীতির ন্যায় কেবলমাত্র উপরের অর্ধাংশে সমান্তরাল খাঁজবিশিষ্ট নয়। এ শ্রেণীর মন্দির বাঙলাদেশে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে এর টাইপটি অনেক রত্নমন্দিরের চূড়ার অনুকৃত হয়েছিল বিশেষভাবে: অবশ্য ঊর্ধাংশে সমান্তরাল খাঁজবিশিষ্ট ইস্‌লামীয় রীতিটি অনেক রত্নমন্দিরের রত্ন বা চূড়ায় অনুকৃত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। উৎকলীয় টাইপের রত্নগুলিকে দেখলে এগুলিকে উৎকলীয় রীতির একটি বহু দেউলের ক্ষুদ্র রূপান্তর বলে মনে হয়। উপরের আমলক, কলশ প্রভৃতিও উৎকলীয় রীতির দেউলের মতো। বাঙালীর ঘরের দেবতা শিবের অধিষ্ঠানের জন্যে এই উৎকলরীতির দেউলের পরিকল্পনা যে বিখ্যাত ভুবনেশ্বর মন্দিরের অনুকরণে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। পশ্চিম বাঙলার বিশেষ করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি বাঙলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের দেউল বহু দেখা যায়, যেহেতু এ অঞ্চলগুলি ওড়িষ্যার কাছাকাছি বলে। বাঁকুড়া জেলার ওঁদা থানার অন্তর্গত বিহারপুর গ্রামে জগমোহন সমেত উড়িষ্যা-রীতির পাথরের দেউল আছে। জগমোহন-টির সম্মুখের কিছু কিছু অংশ বর্তমানে ভগ্ন। বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার সিহরগ্রামেও উৎকলশ্রেণীর দেউল আছে। তবে এ দুটি দেউলে উড়িষ্যারীতি পুরো-পুরি অনুকৃত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুরের সুদূরে গ্রামাঞ্চলে ও বর্ধমানের অনেক স্থানে উৎকলীয় রীতিটি বাঙালী শিল্পীদের হাতে ঈষৎ রূপান্তরিত হলেও ধাঁচটির যে বিশেষ পরিবর্তন হয় নি তা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে দাসপুর থানার বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিবের দেউলটি উল্লেখযোগ্য। (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)। এটি বৈকুণ্ঠপুর-ঘাটালের পুরানো রাস্তার ঠিক পাশেই অবস্থিত। কালনায় বর্ধমান রাজবাটীর ভেতরে শিবের দেউলটিও এই রীতির ও প্রচুর অলংকরণযুক্ত।

উল্লিখিত এ দুটি রীতির মন্দির ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর মন্দিরে সাধারণ বাঙালীর একান্ত আপন ও প্রিয় শিবের অধিষ্ঠান বড় একটা দেখা যায় না। অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু বাঙালীমন এ দুই শ্রেণীর মন্দিরেই তাদের এককালের অতিপ্রিয় দেবতাকে স্থান করে দিয়েছিল। আজও গ্রামবাঙলার প্রান্তে, মাঠ-ঘাটের এককোণে শিবলিঙ্গ চাষীদের মাঝেই অবস্থান করছেন। চড়ক-গাজনে,

দাসপুরের বিখ্যাত গোঁড়বাড়ির মন্দির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৪ সাল। মন্দিরটি একরত্ন বা আলগোছ টঙ্গী
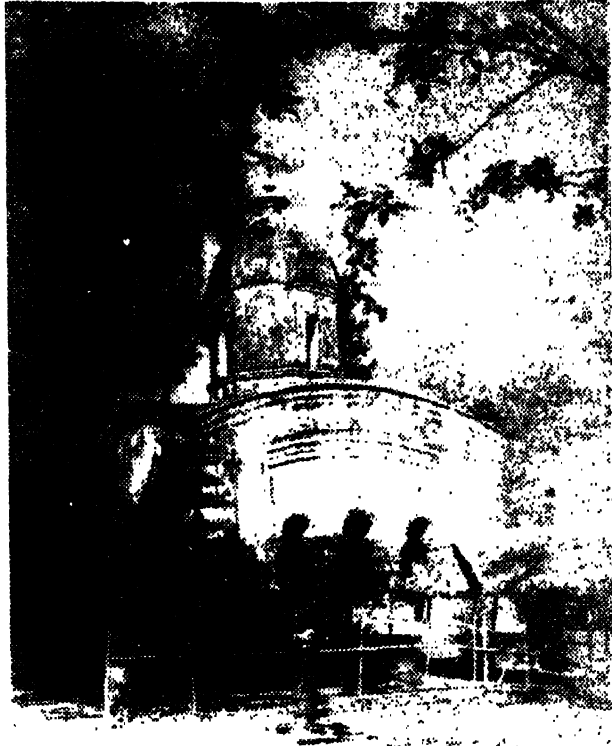
মেলায় ও পুজোপার্বণে আজও কেমনে ভীড় জমে পল্লীকৃষক ও রমণীদের। তাঁরা ভীড় করেন সেখানে তাঁদের প্রিয় দেবতাকে অন্তরের ভক্তিরসে অভিষিক্ত করতে।

লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে শীতলা, মনসা, ধর্ম প্রভৃতিকে ধরা হয়। এছাড়া অনার্যপ্রভাবিত কোন কোন দেবী যথা, ওলাইবুড়ী, ঘাগরবুড়ী, গেঁড়ীবুড়ী, ইত্যাদিও আছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল রাঢ় বাঙলায় বিশেষ করে দক্ষিণরাঢ়ের মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বহু স্থানে এসব লৌকিক দেবদেবীর বহু মন্দির আজও চোখে পড়ে পল্লীপরিক্রমা-কালে। পৌরাণিক দেবদেবী অপেক্ষা এঁরা আগে নিতান্ত অবহেলিত হয়ে থাকতেন। এঁদের স্থান ছিল হয়তো মাটীর তৈরী কোন খোড়ো ঘরে, অথবা গ্রামের এক কোণে কোন গাছের তলায়। মনসার পুজো হয় সাধারণত সিজ গাছের নীচে।

কিন্তু মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করলে আজও চোখে পড়বে এসব দেবদেবীর নানা জাতের মন্দির। এ থানার এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে শীতলা কোন মন্দিরে পূজিত হন না এবং শীতলার বেশীর ভাগ মন্দিরই হল চাঁদনী রীতির। পঞ্চরত্ন টাইপের কিছু কিছু মন্দিরও যে নেই তা নয়। তাই লৌকিক দেবতাশ্রেণীর মধ্যে শীতলাকে অভিজাত দেবী বলা যেতে পারে। শীতলার চাঁদনী রীতির মন্দির আছে দাসপুর থানার বাসুদেবপুর গ্রামে, বৈকুণ্ঠপুরে, হরিরামপুরে, পাঁচা প্রভৃতি গ্রামে। পঞ্চ-রত্নের মন্দির দেখা যায় এ থানারই সুরতপুর গ্রামে ও কলমিজোড়ে। সুরত-পুরের মন্দিরে পোড়ামাটির সুন্দর অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। এ মন্দিরটির ঠিক পাশেই রয়েছে শিবের অষ্টশাল (আট-চালা) মন্দির আর তার সামনেই টিনের আটচালা যেখানে উৎসবাদি উপলক্ষ্যে শিবের গান, শীতলার গান ইত্যাদি আজও হয়ে থাকে। লক্ষণীয়, এ আলোকচিত্রে (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য) বাঙালীর নিজস্ব পরিকল্পনায় রচিত আটচালা মন্দির, তারই ঠিক সামনে চারদিক খোলা আটচালা মণ্ডপ ও শীতলার পঞ্চরত্ন মন্দিরটি কেমন পরস্পর সহাবস্থান করে আছে। নিজস্ব ও মিশ্ররীতির দুটি মন্দির পাশাপাশি তৈরী করে সূত্রধরেরা তাঁদের বিচক্ষণতা ও শিল্পনৈপুণ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন। দাসপুর থানার অনেক চাঁদনী মন্দিরে শীতলাকে আজও দেখা যায়। বছরের একদিন দেশপুজো উপলক্ষ্যে এসব মন্দিরে ধুমধাম করে দেবীর পুজো আজও হয়ে থাকে। বাঙলার পল্লী অঞ্চলে কালী, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতির তুলনায় শীতলা মন্দির যে প্রতিটি গ্রামেই দেখা যায় তার কারণ হল এ দেবতাটি কোন ব্যক্তিবিশেষের নন ইনি সমস্ত গ্রামবাসীরই পূজনীয়। বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে শীতলা অপ্রতিহতভাবে প্রভুত্ব করেন

আজুড়িয়ার (দাসপুর থানা) একটি বিশেষ রীতির মনসা মন্দির

বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের উৎকলীয় রীতির শিবের দেউল

সকলের উপরে। তাই শনি অথবা মঙ্গলবারে তাঁর পুজোর অনুষ্ঠান হতে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে। দাসপুর থানার (মেদিনীপুর জেলা) আজুড়িয়া গ্রামের শীতলা মন্দিরটি পোড়ামাটির সুন্দর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ, কিছু কিছু সুন্দর ফুলকারি নকসাও এতে আছে।

এর পরে গ্রাম্য দেবদেবীগণের মধ্যে মনসাও পুজো পেয়ে আসছেন অনেককাল ধরে। রাঢ়বাঙলায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মনসার পুজো হয় সিজগাছের নীচে, কোন সময় মনসার পটে। এঁর জন্যে প্রতিষ্ঠিত কোন মন্দির বিশেষ দেখা যায় না। আমাদের জানা মনসার একটি মন্দির আছে দাসপুর থানার আজুড়িয়া গ্রামে। (এর একটি আলোকচিত্র এ প্রসঙ্গে দেওয়া হল)। মন্দিরটি একটি বিশেষ রীতির। কতকটা চারচালা জাতীয় বলে মনে হলেও ঠিক চারচালা নয়। চালের প্রতি কোণ ঈষৎ খাঁজের দ্বারা নির্দিষ্ট। এ কোণগুলিকে কতকটা সিজগাছের পাতার মতো দেখায়। মন্দিরটিতে কোন লিপি নেই, তবে গঠনবৈশিষ্ট্য দেখে পুরানো বলেই মনে হয়। এ জাতীয় ছত্রাকার চালাযুক্ত মন্দির বাঙলায় খুব একটা চোখে পড়ে না। রত্নমন্দিরের কোন কোন রত্নে ছত্রাকার চালও লক্ষ্য করা যায়।

দাসপুর থানার বলিহারপুরের গেঁড়ীবুড়ীর একরত্ন বা আলগোছটঙী মন্দিরটির রত্নটি কতকটা এরূপ ছত্রাকার। প্রশস্ত চাঁদনী টাইপের মন্দিরের মাঝামাঝি আজমোহে যেন একটি চুড়োকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যার চালটা হল কতকটা ছাতার মতো। ওলাই বুড়ী ইত্যাদির মতো গেঁড়ীবুড়ীও পল্লী অঞ্চলে পুজো পেয়ে থাকেন। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এঁদের কোন মন্দির থাকে না। কোন গাছের তলায় বা মাঠের একপ্রান্তে এসব দেবীরা সাধারণত পুজো পেয়ে থাকেন। কিন্তু বলিহারপুরে বৃহদাকারের গেঁড়ীবুড়ীর মন্দিরটিকে দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। মন্দিরের গায়ে যে শিলালিপিটি আছে সেটি হল : 'শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৭৯ সন ১১৬৪ সাল'। বস্ত্র ও অলঙ্কারে আবৃত গেঁড়ীবুড়ী দেবীর মূর্তিটি ভয়ঙ্করী। তাঁর পাশেই কয়েকটি সিংহাসন দেখা যায়। এদের মধ্যে ধর্মরাজের আঠারোটি শিলা বর্তমান। এঁরা প্রধানত কূর্ম, বুদ্ধ ও গোলাকৃতি। এই আঠারোটি শিলার নাম হল : রঘু রায়, কালু রায়, মোহন রায়, সুন্দর রায়, দামোদর রায়, মদন রায়, বুড়ো রায়, কিশোর রায়, দলমাদল, যাত্রাসিদ্ধ, স্বরূপনারায়ণ, বুদ্ধ, শ্যামরায়, গৌড়ধ্বজ, বাঁকুড়া রায়, রথচক্র, জয়বিজয় ও মনোহর রায়। নবাব আলীবর্দি ও সিরাজ উদ্দৌলার সমসাময়িক কোন দস্যু নাকি এ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি ও দুর্গাপুজোর সময়ে এখানে বিরাট মেলা ও পুজো প্রভৃতি হয়ে থাকে। পুজো উপলক্ষে বলিদানও হয়। গেঁড়ীবুড়ীর মন্দিরে অলঙ্করণ বিশেষ কিছু নেই, রাধাকৃষ্ণের ছোট্ট একটি টেরাকোটা আছে লিপিটির ঠিক নীচে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখো।

গেঁড়ীবুড়ীর মন্দিরটি এ অঞ্চলের এ[কটি] প্রসিদ্ধ মন্দির। একই মন্দিরে এতগুলি ধর্মরাজ শিলা বড় একটা চোখে পড়ে না। দাসপুর অঞ্চলে এককালে এঁদের প্রভা[ব] যে খুব বেশী ছিল তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। গাছতলা থেকে এঁরা একেবারে পাকা মন্দির দালানে উঠে এসেছিলেন। এ থেকেই জনমানসের ওপর এঁদের প্রভাব যে কতখানি পড়েছিল তা অনুমান করা চলে। দাসপুর অঞ্চলে দক্ষিণরায়, কাল[ু] রায়ের মন্দিরও দেখতে পাওয়া যায়। (দাসপুর থানার রামপুর গ্রামে দক্ষিণরায়ের দোচালা মন্দিরটির ছবি এ সিরিজের প্রথম লেখাটিতে ছাপা হয়েছে)। এছাড়া পল্লীর হাটে-ঘাটে অনুসন্ধান করলে লৌকিক আরও অনেক দেবদেবীর মন্দির দেখতে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস। বেশী ভাগ ক্ষেত্রেই এসব মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ খুব একটা থাকে না। গ্রামপ্রান্তের নানাস্থানে এরা নিতান্ত বৈচিত্র্যহীনভাবে অবস্থান করলেও গ্রামের অধিবাসীদের শ্রদ্ধা ভক্তিতে এসব মন্দিরের দেবদেবীরা যে কোন পৌরাণিক দেবদেবী থেকে কোন অংশে কম নন। সরল ও আড়ম্বরহীন বাঙালীর কাছে পৌরাণিক দেবতা শিব যেমন এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এঁরাও তেমনি জনপ্রিয়তার দিক থেকে কোন অংশেই কম ছিলেন না। এঁদের জন্যে নির্মিত মন্দিরগুলিতেও সরল বাঙালী আড়ম্বরহীনতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

(ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ ভারত-বর্ষের দিকে চেয়ে বিস্মিতভাবে বলেছিলেন 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি'—অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য! নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, কত অমিল এই দেশটির মানুষগুলোর মধ্যে—অথচ এরা একসূত্রে বাঁধা একটি জায়গায়, যেখানে সবাই এরা সমান—তা হল এদের দেশ ভারতবর্ষ। এরা সবাই ভারতবাসী। এই ভারতীয়ত্ব বোধই এদের সকল অমিলের ভেতর মিলনের অমৃতত্ব বয়ে আনে। এক সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীতে এমন দেশটি খুঁজে পাওয়া ভার।

গত ২০শে জানুয়ারি প্রাক্তন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির সুবর্নসিরি জেলার জিরো শহরে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অরুণাচলের উদ্বোধন করতে এসে ভারতীয়দের এই অপূর্ব একতাবোধের প্রসঙ্গে বলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের মানচিত্রে নতুন সংযোজন হল অরুণাচল প্রদেশ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির জনসাধারণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরিত হল। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেছেন, নতুন এই প্রদেশটির সার্বিক উন্নয়নের সরকারী প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করে ভারতের এগিয়ে চলার পথে অরুণাচলের জনগণও শামিল হবেন।

কামেঙ, সুবনসিরি, সিয়াঙ, লোহিত এবং টিরাপ—এই পাঁচটি হল অরুণাচলের জেলা। জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ এবং আয়তন ৩১,৪৩৮ বর্গমাইল। এর পশ্চিমে ভূটান, উত্তর এবং উত্তর-পূবে তিব্বত ও চীনের সিং কিয়াঙ প্রদেশ, দক্ষিণ-পূবে ব্রহ্মদেশ।

সুবনসির জেলার আয়তন, প্রায় ৫ হাজার বর্গমাইল। আসামের সমতলভূমি থেকে তিব্বতের সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই [illegible] বন জঙ্গল, উঁচু-নীচু পাহাড়, উপত্যকাময়—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এই জেলার কয়েকটি পাহাড় বারমাসই বরফাবৃত থাকে। এই জেলারই সদর দফতর জিরো। অরুণাচল প্রদেশের রাজধানীও বটে। আপাটানি, ডাফ্‌লা, টাগিন প্রভৃতি উপজাতিরা এই জেলাটিতে বাস করে।

কামেং জেলার সদর দফতর হল বমডি-লা। এই বমডি-লাই ১৯৬২ সালে চীনেরা দখল করে নিয়েছিল। এই জেলার আয়তন প্রায় ৫,৪০০ বর্গমাইল। মোনপা, শেরডুকপেন, মিজি, আকা, খোয়া, ডাফলা এবং সুলুং—এরা হল কামেং জেলার অধিবাসী উপজাতি। এই জেলার তাওয়াং-এ সাড়ে তিনশ বছরের পুরানো বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠটি অবস্থিত।

৮৪,০০০ হাজার জনসংখ্যার জেলা সিয়াঙ-এর আয়তন ৮,১১৬ বর্গমাইল। সদর দফতর হল আলং। এই জেলার 'আদি' উপজাতিরা শুধু কর্মদক্ষ বা তাঁত বুনতে পটু তাই নয়—নৃত্যে এবং সঙ্গীতেও এদের সমান দক্ষতা আছে। এই আদিদের অবশ্য বোগাম, বোমি, গলোঙ, খাম্বা, টাগিন প্রভৃতি প্রশাখাও আছে।

লোহিত জেলায় (৯,০৫৮ বর্গমাইল) মিশমি, খামপ্টি, সিঙফু প্রভৃতি উপজাতিদের বাস। এই সদর দফতর টেজু। টিরাপ জেলার (আয়তন ২,৭২৯ বর্গমাইল) সদর দফতর খোন্‌সা। এই জেলার অধিবাসী হল টাংসা, নোক্‌টে, ওয়ানচো প্রভৃতি উপজাতি।

নিজস্ব পোষাকে আদিযোদ্ধা

সুবর্ণসিরির ডাফ্‌লা সর্দার

উৎসবের সাজে নোক্‌টে যুবতী

অর‍ুণাচলের প্রধান প্রধান উপজাতির সংখ্যা ২২টি। এ'রা অতিথিপরায়ণ, ধর্মভীর‍ু, সৎ এবং আমোদপ্রিয়। কৃষি, তাঁত বোনা, মাছধরা প্রভৃতিই হল এদের প্রধান উপজীবিকা। এ'রা প্রধানত বৌদ্ধ, তবে কামেঙ জেলার 'আকা' উপজাতিদের মধ্যে কিছ‍ু বৈষ্ণবও আছে।

দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাতে অর‍ুণাচলও (তৎকালীন নেফা) এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিকল্পনাগ‍ুলি সাফল্য-মণ্ডিত হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল নিম্নর‍ূপ ঃ

শিক্ষার ক্ষেত্রে	১৯৪৭	১৯৭০
প্রাথমিক স্কুল	৩	৪৬৩
মাধ্যমিক ইংরাজি স্কুল	—	৪১
উচ্চ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	—	১৬
কলেজ	—	১
স্কুল ও কলেজের ছাত্র	৩৩	২১,৮[illegible]
স্নাতক	—	৫৮

যোগাযোগ	১৯৪৭	১৯৭০
মোটর রাস্তা	১৬৮ কিঃ মিঃ	১৮০০ কি মি
যাত্রীবাহী বাস	—	১০

স্বাস্থ্য	১৯৪৭	১৯৭০
স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতাল	১৫	১০[illegible]
সাধারণ হাসপাতাল	—	[illegible]
যক্ষ্মা হাসপাতাল	—	[illegible]
জেলা যক্ষ্মা প্রকল্প	—	[illegible]
ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র	—	৭[illegible]
চিকিৎসক	জানা যায়নি	১৪[illegible]

কৃষি	১৯৪৭	১৯৭০
কৃষি খামার		১[illegible]
পতিত জমি উদ্ধার	জানা যায়নি	৪৬,০০০ একর
কৃষি জমি	,,	২,০০০০০ একর
বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদন	,,	৭০,০০০ টন
পশ‍ু চিকিৎসালয়	.	৬৮
মৎস্য প্রকল্প	,,	৪৭৭
সমাজ সেবা কেন্দ্র	—	৭টি প্রতিষ্ঠান ২৬টি কেন্দ্র

স‍ুতরাং গত ২৩ বছরে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের উন্নতি হয়েছে প্রশংসনীয়ভাবে।

প‍ূর্ণ রাজ্য নাইবা হল প্রদেশ অর‍ুণাচলই 'নেফা'র মান‍ুষদের সম‍ৃদ্ধির পথের সন্ধান দিয়েছে। এবার পরিশ্রম নিষ্ঠা ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অর‍ুণাচলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উন্নতির পথে, প্রগতির পথে। অর‍ুণাচলেই হয়তো হবে প‍ূর্ব ভারতের সার্বিক উন্নয়নের অর‍ুণোদয়।

নেফায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহর‍ু
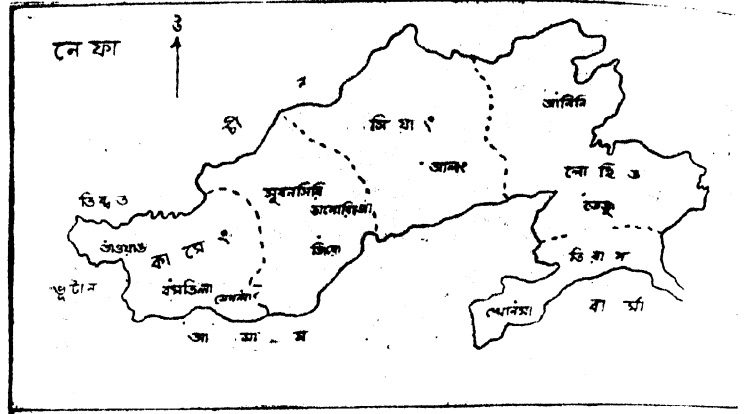
'লে মার হ্যান্ডেল, জোরসে মার। জাড়ে শালা একদম জমে গেলি নাকি? ডি-এস-টি-এস পেরিয়ে গেলে আর অ্যাকটিও পেসেনজার মিলবেক নাই।'

ড্রাইভারের আসনে বসে উৎসাহ দেয় ফটিক। গোঁ গোঁ শব্দে গর্জন করে ইঞ্জিনটা স্টার্ট নেয়। ঝাঁকুনি দিয়ে বাস চলতে শুরু করে। হ্যান্ডেলটা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে সামনের দরজার হাতলটা ধরে ঝুলে পড়ে নিতাই। বাসের ক্লিনার।'

বাস ছুটে চলে। হিম ঝরছে এখনও। কম্ফর্টারটা মাথায় ভালো করে পাক দিয়ে নেয় ফটিক। ঘুম জড়ানো চোখ দুটো একবার রগড়ে নেয়। তারপর গাড়ির গতি খানিক বাড়িয়ে দেয়। এই সবে ভোর হ'ল। গাছের মাথায় মাথায় পাখ-পাখালির ঘুম ছাড়লো এইবার। বাসে যাত্রী বিশেষ নেই। গুটিকয়েক মানুষ কেবল পেছনের লম্বা টানা সিটটায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কেউ কেউ ঢুল ঢুল করে তাকাচ্ছে। আবার কারো কারো ঘুম ছাড়ে নি এখনও। বসে বসে ঢুলছে। একেবারে কোণে বসে আছে শিউনন্দন। যাবে কাজোড়া। কোলিয়ারীতে কাজ করে। রোজকার প্যাসেঞ্জার। শীতের কামড় ভুলতে সে তারস্বরে গান জুড়েছে। জানালাগুলো সব ঠান্ডার জন্যে বন্ধ। বাস ছুটেছে গতিতে। নিতাই সমানে চেঁচিয়ে চলেছে রোজ দিনকার মতো। রাণীগঞ্জ অন্ডাল, ভিরিংগী, দুর্গাপুর...। রানীগঞ্জ পর্যন্ত বাসের এমনিই হাল। মেজাজে চালায় ফটিক। যাত্রীর ওঠা-নামা বিশেষ থাকে না। রানীগঞ্জের পর থেকেই শুরু হয় ভিড়। ঘন ঘন লোক ওঠে নামে। ঘণ্টা বাজে। অধিকাংশই দুর্গাপুরের কারখানার ডিউটি প্যাসেঞ্জার। গায়ে তেল-কালি মাখা জামা, পায়ে মিলিটারি বুট আর হাতে 'টিফিন ক্যারিয়ার' নিয়ে ওঠে ওরা দল-বেঁধে। বাসের মধ্যে জায়গা না হলে বাসের চালে গিয়ে ওঠে। আর ওঠে দুর্গাপুরে আই-টি-আই-এর ছাত্ররা। নামে মুচিপাড়ার মোড়ে। নিতাইয়ের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে রোজ ঝামেলা করে ছেলেগুলো। এই সময়টায় বাসে আর পা রাখারও জায়গা থাকে না। সামনের মাডগার্ডে উঠে চেঁচায় নিতাই। শিবতলা, গোপালপুর...।

আসানসোল থেকে গোপালপুর। দিনের মাথায় তিন বার যাতায়াত করে ফটিক। 'বিজয়লক্ষ্মী' বাস নিয়ে। নিতাই বলে, 'দিনের মাথায় তিনবার টিরিপ দিতে হয় গো বাবুমশায়রা। তা বাবু তাতে আমাদের ডেরাইবারের অ্যাকটুকুনও কেলান্তি নাই। এর থেকে অনেক বেশী দূরত্বে অনেক বেশী ট্রিপ দেয় অনেক ড্রাইভার ফটিক তা জানে। তবু নিতাইয়ের কথায় বাধা দেয় না। ফটিককে সবারই সামনে একটু জিতিয়ে দিয়েই ও খুশী। বাধা দিলে ও কষ্ট পাবে। বড়ো ভালোবাসে নিতাই ফটিককে। 'ওস্তাদ' বলতে একেবারে অজ্ঞান। ভোর পাঁচটায় ফটিক বাস ছাড়ে আসানসোল থেকে। গোপালপুরে পৌঁছয় পৌনে আটটা নাগাদ। তারপর মাঝে খানিকক্ষণ বিশ্রাম। হাটতলার বুড়ো বটগাছটার তলায় বাস রেখে রাসু-ময়রার দোকানে চা, সিংগাড়া খেয়ে 'সেরেফ' একটা ঘুম। তারপর আবার টিরিপ শুরু। সাড়ে দশটায় গোপালপুর ছেড়ে একটায় আসানসোল। সেখানে মতি সিংয়ের দোকানে মাংস আর ভাত খেয়ে খানিক বিশ্রাম। তারপর আবার মার হ্যান্ডেল। আবার নিতাইয়ের তারস্বরে চীৎকার। তেল মবিলের একঘেয়ে গন্ধ। সাড়ে তিনটেয় গোপাল-পুরে। এই সময় বাসটা হাটতলার বটগাছটার কাছ থেকে ময়রাপুকুরের ধার পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যায় নিতাই। বালতিতে জল নিয়ে বাসটা ধোয়ামোছা করে। ন্যাকড়া ভিজিয়ে গা'টা ভালো করে মোছে। মেজাজ ভালো থাকলে ফটিক রসিকতা করে বলে, হ্যাঁ রে নেতাই তু শালা তো বেশ ডেরাইবারি শিখে গেইছিস। ইবারে যি তুকে কিলিনার বলবেক সি শালার মাথায় হ্যান্ডেলটো দিয়ে দিবি এক ঘা। একদম জোরসে। বাস ফিনিশ। একদম ফক্কা। নিতাই মনে মনে খুব খুশী হয়। মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হাসে। একটু চালাতে পেলেই ও খুশী। সন্ধ্যে ছটায় শুরু হয় লাস্ট ট্রিপ। নিতাই বলে, 'শ্যাষ টিরিপ'। রাতে বাস থাকে আসানসোলে। পীর মহম্মদের গ্যারেজে। নিতাই ঘুমোয় বাসের পেছন দিকের লম্বা সিটটায়। বাস গ্যারেজ করে ফটিক বেরিয়ে যায়। ফেরে মাঝরাতে। বেহেড মাতাল হয়ে। দিশি মালের গন্ধে ভরে যায় বাসটা। নিতাই ধরে শুইয়ে দেয় ফটিককে। ঘুমুলে চাদরটা চাপা দিয়ে দেয় গায়ে। যেদিন আবার মদের সংগে মেয়ে-মানুষ জুটে যায় সেদিন ফিরতে আরো বেশি রাত হয়। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। নিতাই বলে, 'ওস্তাদ সিদিন মাল খেয়ে একদম ডাউন হয়ে যায়।' ভোরে উঠতে পারে না। বাস ছাড়তে অনেক দেরী হয়। প্যাসেঞ্জার হাত ছাড়া হয়ে যায়। সারাদিন মেজাজ চড়ে থাকে ফটিকের। কারণে অকারণে নিতাইকে গালাগালি দেয়। কিন্তু বলতে গেলেই বলে, 'অ্যাও চোপরও শালা শুয়োরের বাচ্চা।' চুপ করে যায় নিতাই। ওস্তাদকে তো চেনে সে। এখন কথা না বলাই ভালো। এইসব দিনগুলোতে বাস ছোটে হাওয়ার বেগে। বার বার ঘন্টা দিলেও বাস থামে না। যাত্রীরা গালমন্দ করে। বেশি চেঁচামেচি হলে ফটিক রেগে যায়: নিতাইকে বলে, 'এই শালা সঙের মতন দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? নামিয়ে দে সব। বল বাসের গোলমাল আছে। বাস যাবেক নাই। বেরেক ডাউন।'

বাঁশকোপা গ্রামের পরান বাউরীর ছেলে ফটিক। ফটিকচাঁদ বাউরী। পরাণ গাঁয়ের চৌকিদার। ভাগে সামান্য জমিও চাষ করে শিবু মোড়লের। ফটিকই পরাণের একমাত্র সন্তান। অনেক আদরে মানুষ। খায়-দায় তেল জবজবে লম্বা চুলে টেরি বাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। গায়ে পরে রঙীন ছিটের সার্ট। পরনে রংগচংগে লুঙ্গি। পরাণ কখনও বলে, 'হ্যাঁ রে ফটকে আমি তো এবারে বুড়ো হলম, চাষবাসের কাজকম্ম একটু আধটু দেখে নে। চোখ বুজলেই যে সব ফরসা রে বাপ।' সে কথায় কান না দিয়ে ফটিক বলে, 'দাও দিকি অ্যাকটো বাইক কিনে, চেপে ঘুরে বেড়াই অতন কুন্ডুর বেটার মতন। বনবন করে চাকা ঘুরবেক। শন্‌শন করে হাওয়া ছুটবেক কানের পাশ দিকে। কিরিং কিরিং ঘন্টা। দশ মিনিটেই রাজবাঁধ।' পরাণ অবাক হয়ে একদিন তার বউকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁ গো তোর বেটার হঠাৎ বাইক চাপার সখ হোলো ক্যানে বল দিকি।' [illegible] উল্টিয়ে সুখী জবাব দিয়েছিল, 'ক্যা জ[illegible] যাবু, ছেলে কি আমাকে ধরা-ছোঁয়া দি[illegible] ছেলে যেন উড়ো জাহাজের মতন সব[illegible] উড়ছে আকাশে।'

আসলে ফটিকচাঁদ তখন 'পির[illegible] জমিয়েছে। রাজবাঁধের শিবুপদ ডোমের [illegible] শংকরীর সংগে। রাজবাঁধের ধারে অ[illegible] গাছের ডালে তখন অভদ্র বর্ষায় পা ঝু[illegible] বসে থাকে ফটিক। বনে 'কাড়ান' ছাতু তু[illegible] আসে শংকরী। তখন ওদের দেখা হ[illegible] গাছে অমনি করে বসে থাকতে দেখে সে[illegible] অন্নদা রানার বলেছিল, 'দ্যাখ ফট্‌কে ত[illegible] হোঁকাগিরি করে বর্ষা-বাদলার দিনে গ[illegible] পালায় উঠে বসে থাকিস না। বাজ[illegible] পড়বেক। নয় তো সাপে খাবেক। [illegible] গত্তয় জল ঢুকেছে। ওরা এখন গাছপালা[illegible] আশ্চয় লিয়েচে। কথা শুনে পানের ছো[illegible] লাগা দাঁত বের করে হেসে উঠেছিল ফটি[illegible] শিস্ দিয়ে গান ধরেছিল, 'পিরীতির ব[illegible] বুঝে কয়জনা, পিরীতি কঠিন কম্ম স[illegible] পারে না।'

সেই শংকরীরই বিয়ে হবে। [illegible] একদম প্রায় পাকা। ছেলে বাস ড্রাইভা[illegible] আসানসোল-বরাকর লাইনে বাস চা[illegible] খবরটা সংগ্রহ করেছিল নিতাই। ফটি[illegible] ডান হাত। ফটিক বলে, 'এঁসসটেন।' সে[illegible] শংকরীর সংগে দেখা হতেই ব্যাপারটা [illegible] প্রশ্ন তুলেছিল ফটিক। শংকরী জবাব দি[illegible] ছিল, 'হ্যাঁ বাপ তো উটোকেই মনে লিয়ে[illegible] বলছে হাজার হোক কাঁচা পয়সা ওজগা[illegible] ডেরাইবারির চাকুরি। আমি তুর কথা ব[illegible] ছেলম বাপটোকে। তা সি বললেক, ফট[illegible] কী রইচে। বাপটো চোখ বুজলেই [illegible] উটোর সব ফরসা। শালা তো গায়ে [illegible] দিয়ে বেড়ায়। চাষবাসও জানে না। ক[illegible] কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে। বসে বসে বাপের ভ[illegible] মারছে।' তবে কী হবেক? শংকরীর ম[illegible] দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেছিল ফটিক। শংক[illegible] উত্তর করেছিল, 'কী আর হবেক! তু[illegible] বদ্দমানে ডেরাইবারি শিখে আয়গা। ই বি[illegible] আমি ভেংগে দোব। ডেরাইবারি শিখে এ[illegible] বাস চালালে বাপটো হয়তো বিয়ে দি[illegible] আর গররাজি হবেক নাই।' তখন কি জানে[illegible] ফটিক মেয়েটার এত ছল চাতুরী। সেই ব[illegible] ডেরাইবারকেই তার মনে ধরেছে। ফটিক[illegible] এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে বিয়ে সার[illegible] এ একটা চাতুরী।

ফটিক গেল বর্ধমানে। বাপ পরাণ গজ[illegible] গজ্ করতে লাগল। সুখী বললে, 'তা যা[illegible] ক্যানে, শখ যখন হইছে তখন তাই শিখ[illegible] গা।' চুপ করে গিয়েছিল পরাণ। ফিরে এ[illegible] কিন্তু শংকরীকে আর দেখতে পায় [illegible] ফটিক। সে তখন সেই বাস ড্রাইভারে[illegible] বিয়ে করে তার ঘর করতে গেছে। নিত[illegible] বলেছিল, 'অ্যাকদিন দেখা হইছিল কাজোড়া[illegible] শংকরীর মরদটার নাকি ওখানেই ঘর।' [illegible] বর্ষাতেই ফটিকের মা আর বাপ এক সংগে[illegible] বাজ পড়ে মারা পড়ল। রাতে ঘুমোচ্ছি[illegible]

ঘরে। এমন সময় বাজ পড়ল। সাপিগস বাজ। একদম পুড়িয়ে ছাই করে দিলে। এরপর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেল ফটিক। ঘসী-গোড়ের ডাঙগায় নির্জন ছাতিম গাছটার তলায় চুপচাপ বসে থাকত। কথা কইতো কম। তখনই একদিন নিতাই খবরটা আনলে। 'বিজয়লক্ষ্মী' বাস বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ড্রাইভার নাই। নিজের মধ্যে আবার যেন জেগে উঠলো ফটিক। মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'চ লেতাই কালই যাই। মালিকের সঙ্গে দেখা করে আসি গা। আমিই চালাবো বাস। ডেরাইবার। হ্যাঁ শালা ডেরাইবার হবো। একসিলেটর চাপব। ইঞ্জিন গোঁঙাবেক গোঁ গোঁ। ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছুটবেক। ঘর, বাড়ি, গাঁ সব পাক খেতে খেতে ছুটবেক পেছুতে।' বলতে বলতে থর থর করে কাঁপে ফটিক। উত্তেজনায় সারা শরীরটা কেমন যেন করে ওঠে। নিতাইকে বলে, 'আর তু শালাও ওই বাসেই কাজ নিবি। ঝাড়পুঁছ করবি। কি বলে সেই কিলিনার হবি। সেই থেকেই বিজয়লক্ষ্মী বাসের ড্রাইভার ফটিক। 'কিলিনার' নিতাই।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাস ছেড়েছে ফটিক। গরম কাল। লু বইছে চারিদিকে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোডের পিচ গলে একেবারে জল। রাস্তাময় নরম পিচের ওপর গাড়ির চাকার দাগ। মাথায় একটা ভিজে গামছা জড়িয়ে নিয়েছে ফটিক। নিতাই গরম-টরম কেয়ার করে না। বেশী গরম লাগলে জামাটা খুলে নেয়। হাতকাটা গেঞ্জিটা পরে থাকে। চীৎকার চলে কিন্তু সমান তালে। হেঁভি, খাসড়া, একশো-বারো...। রোক্কে জেনানা! রানীগঞ্জ বাজারে অনেকক্ষণ দাঁড়ায় বাসটা। কিসের একটা জমাটি মেলা বসেছে। রাজ-বাড়ীর পাশের মাঠটায়। সার্কাসের তাঁবুও পড়েছে একটা। তাঁবুর ভেতরে একটা বাঘ গোঙাচ্ছে। নিতাই বলে উঠল, 'সাঙ্গিন বাঘ, গোঙানি দেখেছো ওস্তাদ।' একি! শঙ্করী না? হ্যাঁ শঙ্করীই তো! তার বাসেই তো উঠলো। ছাতা, পুঁটলি, চাকী, বেলুন আরো কি কি সব সঙ্গে রয়েছে। মেলার কেনাকাটা বোধহয় ওগুলো। মেলা দেখতেই এসেছিল। মুহূর্তে কেমন যেন হয়ে যায় ফটিক। বুকের ভেতরটায় কেমন যেন আইঢাই করছে। বারবার ঘন্টা দেওয়া সত্ত্বেও গাড়ীতে স্টার্ট দিতে ভুলে যায় সে। নিতাই বোঝে ব্যাপারটা। খানিক পরে সামলে নেয় ফটিক। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরে গাড়ীতে স্টার্ট দেয়। গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে বাস ছোটে। স্পীড ওঠে চল্লিশ পঞ্চাশ। স্পীডোমিটারের নিষ্ক্রিয় কাঁটাটা শূন্যের ঘরেই থেকে থেকে লাফিয়ে ওঠে। ফটিক দেখাবে আজ ডেরাইবারি কাকে বলে। আগুনের হল্কার মতো লুয়ের আঁচ আজ তার শরীরে জ্বালা ধরিয়েছে। তার ওপর আবার শঙ্করীর সাজগোজ, চুল বাঁধার ঢং, পুরুস্টু বুকে আগুন ধরিয়েছে ফটিকের বুকে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা হাত দেখায়। সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই তার। তাকে আজ গতিতে পেয়ে বসেছে। নিতাই চেঁচায় জোড়ে কাজোড়া কোলিয়ারী মেয়ে-মানুষ নামাতে হবেক। চাপড় মারে বাসের গায়ে। তবু বাস থামে না। থামে কাজোড়া কোলিয়ারী ছাড়িয়ে এসে আরও মাইলখানেক পথ এগিয়ে। নামে শঙ্করী আর তার মরদ। বাস ছেড়ে দেয় ফটিক। এমন সময় ফটিককে একটা কুৎসিৎ গাল দেয় শঙ্করীর মরদ। বাস থেমে যায়। শুয়োরের বাচ্চা কি বললি বলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে ফটিক। সঙ্গে সঙ্গে নামে নিতাই। ফটিক ছুটে গিয়ে জামার কলারটা চেপে ধরে শঙ্করীর মরদের। ক্রোধে অপমানে সারা শরীরটা এখন কাঁপছে তার। কলারটা চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ফটিক। একেবারে রণং দেহি মূর্তিতে। চীৎকার করে ওঠে শঙ্করীর মরদের দিকে চেয়ে, 'বল শালা মরদের বাচ্চা বটিস তো আর একবার তুর গালের কথাটি বল।' নিতাই ততক্ষণে পেছন দিকে গিয়ে ঘা কতক বসিয়ে দিয়েছে শঙ্করীর মরদকে। আচমকা মার খেয়েই ফটিকের হাত ছাড়িয়ে শঙ্করীর মরদ দিল এক ছুট। বাবা গো মাগো বলে একেবারে পাশের কুলি ব্যারাকের মধ্যে। দূরে দাঁড়ালে ফটিক। শঙ্করীব সামনা-সামনি। একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শঙ্করী। ভয়ে কাঁপছে। তার দিকে কয়েক পা এগোতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফটিকের বুকে। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। কান্না ভেজা গলায় চীৎকার করতে লাগলে, মরদ বটিস তো আমাকে তুর বাসে চাপিয়ে লিয়ে পালা। আমি তুকে সাঙ্গা করে আবার ঘর বাঁধব। ততক্ষণে একটা শুকনো গাছের ভাঙ্গা ডাল নিয়ে ছুটে এসেছে শঙ্করীর মরদ। তাকে দেখেই নিতাইও ছুটে গিয়ে বাসের মধ্যে থেকে লোহার হ্যান্ডেলটা নিয়ে এসেছে। তাকে থামালে ফটিক। পেছন থেকে শঙ্করীর মরদ ঘা কতক বসিয়ে দিলে ফটিকের পিঠে। নিতাই চীৎকার করে উঠল, 'ছেড়ে দাও ওস্তাদ কুত্তার বাচ্চাটো তুমার গায়ে হাত তুলেছে। শালার লাশটো আজ কাঁকর খাদের মাঝে ফেলিয়ে দি।' তাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে ফটিক। আসার সময় শঙ্করীর মরদকে বলে, 'তুর মেয়ে-মানুষটোকে লিয়ে যা।' ড্রাইভারের সিটে বসে আবার গাড়ীতে স্টার্ট দেয়। গাড়ী ছুটতে থাকে। নিতাই রাগে ফুঁসতে থাকে। ওস্তাদ তাকে আজ কেন থামিয়ে দিলে সে বুঝে উঠতে পারে না।

ময়রা পুকুরের ধারে বটগাছটার তলায় বসেছিল ফটিক। একটু দূরে গুম হয়ে বসেছিল নিতাই। এখনো শেষ ট্রিপ বাকী। ফটিক চেয়েছিল অনেক দূরে। শালবনের ভেতর দিয়ে অনেক দূরে। অর্থহীন দৃষ্টিতে কী দেখছিল বোঝা যাচ্ছিল না। হয়তো কিছুই দেখছিল না। চমক ভাঙ্গালো নিতাইয়ের ডাকে। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়েছে সে।

লাস্ট ট্রিপের সময় হলো। উঠে আসে ফটিক। নিতাইকে বলে, 'স্টার্ট বন্ধ কর বে শালা গাড়ী যাবেক নাই। গাড়ী খারাপ। বেরেক ডাউন। নিতাই দেখলে তার ওস্তাদের চোখের কোলে জল। নিতাই জিজ্ঞেস করলে, 'ওস্তাদ তুমি আমাকে ধরলে ক্যানে বলো দিকি? হ্যান্ডেলের এক ঘায়ে শালোকে কাঁকর খাদে শুইযে রেখে তো শঙ্করীকে লিয়ে আমরা পালিয়ে আসতে পারতম?' খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে ফটিক। তারপর আপন মনেই বলে, 'নিজে জ্বলছি সেই ভালো রে নেতাই আবার অপরের ঘর জ্বালানো ক্যানে। ওরা দুটিতে যখন ঘর বেঁধেছে তখন কি পেয়োজন সে ঘরে আগুন দিয়ে। থাক দুটিতে। সুখ মিলুক ওদের। আমার দিন এমনি করেই কেটে যাবেক। চোখ মুছতে মুছতে বাস থামিয়ে আসছিল নিতাই। ওস্তাদের 'হেদয়'টার পরিচয় সে অনেক আগেই পেয়েছিল। আজ আরও ভালো করে পেয়েছে। জনকয়েক যাত্রী এসে উঠতে যাচ্ছিল বাসে। ফটিক চীৎকার করলে, 'নেমে যাও গো সব বাস যাবেক নাই। 'বেরেক-ডাউন'। যাত্রীরা চলে যেতেই নিতাইকে হাঁক পাড়লে, 'এই শালা সিটের তলা থেকে মালের বোতলগুলো বের কর।'
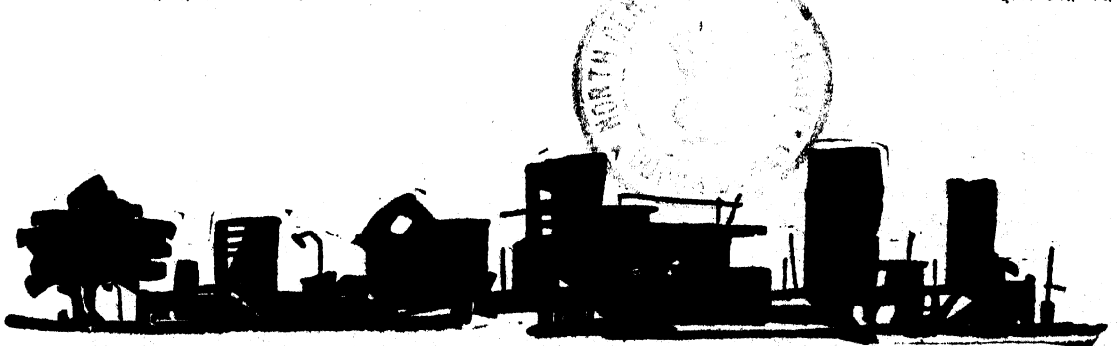
সংলাপে-অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গম্ভীর স্বরে স্বামিজী বললেন—তবে আর কথা কি? বিয়ে দিয়ে দাও যত শীগগির পার। দেরী করে লাভ নেই—শুভস্য শীঘ্রম্। দেরী করলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। পাড়াগেঁয়ে ব্যাপার। বদনাম রটতে কতক্ষণ? তখন অন্য কোথাও মেয়েটির বিয়ে হওয়া কঠিন হবে। বিরোধী পক্ষ আছে নাকি?

—তা আবার নাই? এ বাড়ী ও বাড়ী গিয়ে ভাঙচি দিচ্ছে ক'জন, পাড়ায় পাড়ায় জটলা করছে, কুৎসা রটাচ্ছে। বিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টায় আছে—ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন দু ভাই।

হা-হা করে হেসে স্বামীজী বললেন—তবে তো আরও ভাল। এদের অসাধ্য কিছুই নাই। মায়ের ঘরের মাসী, বাপের ঘরের পিসি এরা। লেগে পড়। ঢোল সানাই রোসন চৌকী নবোদ বরবাদ। আটখানা ঢাক বায়না কর। সারাদিন সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ঐ আটখানা ঢাক বেজে প্রেমের জয় ঘোষণা করবে।

রায়মশায়রাও হেসে উঠলেন হো-হো করে। আড়াআড়ির গ্রাম, মনঃপুত হল কথাটা। বললেন—তাই হবে স্বামীজী। মাঘ মাস তো শেষ হয়ে এল। বাড়ীর প্রথম ছেলের বিয়ে। জোগাড়-যন্তর একটু করতে হবে বৈ কি। এ কটা দিনের মধ্যে হয়ে উঠবে না। ফাল্গুনে কি বোশেখে। বিবাহটা চিরাচরিত বৈদিক পদ্ধতিতেই হবে তো স্বামীজী?

—হ্যাঁ, বৈদিক মতেই হবে। তবে রীতি-পদ্ধতির সংস্কার করে নিতে হবে একটু।

—কি রকম সংস্কার, স্বামীজী?

—দেখ, সারাদিন পাত্রপাত্রী উপবাস করে রাত্রে বিয়ে—এটাই প্রচলিত রীতি। [illegible] না। পেটের জ্বালা নিয়ে কেউ কাউকে মনে-প্রাণে বরণ করতে পারে কি? শারীরিক মানসিক কোন রকম ক্লেশ থাকলে তা সম্ভব নয়। এটি বাদ দিতে হবে। পেট ভর্তি মনে তৃপ্তি ও স্ফূর্তি থাকা চাই। উপবাস তো নয়ই। সেদিন পাত্রপাত্রীকে পেট ভরে খাওয়াতে হবে তৃপ্তিকর সুখাদ্য। যাকে বলে—'ঘি চবচব অষ্ট রন্ধন পাঁচ পরমান্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন' আর কি। তবে 'অতি' বা 'গুরু' না হয়ে যায়। দেহ নিরুদ্বেগ চিত্ত প্রফুল্ল থাকবে এতে।

রাত্রে — বিয়ে। কেন? অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে হয় তো? সূর্যও সাক্ষী থাকুক না। প্রকাশ্য দিবালোকে পরস্পর পরস্পরকে প্রত্যক্ষ করবে—সেই তো ভাল। রাতের অন্ধকারে অস্পষ্টতার মধ্যে কেন? আর কোন দেশে রাত্রে বিয়ে হয় বলে তো জানা নাই।

দু ভাই সোৎসাহে বলে উঠলেন—সেই ভাল হবে, স্বামীজী। রাত্রে বরযাত্রী কনেযাত্রীর আদর-আপ্যায়ন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় ঝামেলা পোয়াতে হয়, স্বামীজী। রাত কাবার হয়ে যায়। এ দিনের আলোয় ভালয় ভালয় সব চুকে যাবে। সেই ভাল স্বামীজী।

—তবেই দেখ, রাত্রে কত অসুবিধা। প্রথা বলে মেনে নিতেই হবে তার কোন কথা নাই। সুবিধা-অসুবিধা দেখতে হবে বৈকি। আর একটা কাজ করতে হবে। বৈদিক বিবাহ মন্ত্র লেখা সংস্কৃতে। দেবভাষা হতে পারে—কিন্তু পাত্রপাত্রী বা সাধারণের বোধগম্য ভাষা নয় সংস্কৃত। এই মন্ত্রে আছে অনেকের অনেক জানবার বিষয়। বিশেষ করে বর-কনে আর বরকর্তা কনেকর্তার। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য আর প্রতিজ্ঞা বা শপথের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এই মন্ত্রে। কিন্তু বোঝে কে? শুক পাখির 'হরেকেষ্ট' বুলির মত আউড়ে যায় খালি। বিন্দু-বিসর্গ বোঝে না। এর কোন মানে হয়? কথা বলল—কিন্তু কি বলল নিজেও জানে না, কাকে বলল—সেও জানে না। বোবায় বোবায় আকার ইঙ্গিতে ভাবের আদান-প্রদান হয়, এ তারও অধম। কতকগুলো শব্দ হড়বড় করে বলে গেল কিন্তু ভাবের আদান-প্রদান হল না। এ কোন রকমে মেনে নিতে পারা যায় না। বিয়ের মন্ত্র হবে—সহজবোধ্য বাঙলায়।

—কিন্তু বাঙলা মন্ত্র পাব কোথায় স্বামীজী? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুরোহিতরা কি রাজী হবেন বাঙলা মন্ত্র পাঠ করাতে? একটু বিমর্ষভাবে বললেন দুর্গাদাস রায়।

—বাঙলা মন্ত্র? আচ্ছা, এস কদিন পর, অনুবাদ করে দেওয়া যাবে। পুরোহিতরা বাঙলা মন্ত্র পড়াতে চাইবেন না? বলে দেব মোক্ষদাকে। নিয়ে যেও তাকে। তবে পাত্রীপক্ষের পুরোহিতকে রাজী করাতে হবে। রাজী না হয় মোক্ষদার দাদা ভূতনাথ আছে। করে দিও কন্যাপক্ষের পুরোহিত। দুজনেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ব্যস, ল্যাঠা চুকে যাবে?

এ করা চাই। নতুন যুগ, নতুন প্রথা চালু হোক। দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী হওয়া চাই সব। সংস্কৃতের যুগ গেছে। ও এখন ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ। মন্ত্রতন্ত্র সব কিছুই এখন চাই সর্বজনবোধ্য জীবন্ত বাঙলা ভাষায়।

দু ভাই খুব খুশী। একটা নতুনত্বের আস্বাদ। আর সেই নতুনকে প্রথম চালু করবেন তাঁরা। এ কি কম গৌরবের কথা? বেশ উৎফুল্ল হয়েই রাজী হলেন দুজনে।

এবার স্নানাহার আর বিশ্রাম।

বিকেলবেলা স্বামীজীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন রায়মশায়রা।

স্বামীজীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছিল। শুভদিনে ঢাকের বাজনায় সারা গ্রাম উচ্চকিত করে দিনের

বেলায় বাঙলা মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়েছিল বীরেন্দ্র রায় আর বীণাপাণির।

সাতাম

সেই—সকালে আসা সন্ধ্যেয় যাওয়া বনপাসের ঝণ্টুর দল আর সবান্ধব ওস্তাদের আসা-যাওয়াটা একটু ঘনঘনই হচ্ছে। অনেক দিন গুরুদর্শন হয় নাই—তারই ক্ষতিপূরণ আর কি। এদের হঠাৎ আবির্ভাবে শান্ত আশ্রম হয়ে ওঠে হৈ-হুল্লোড়ে গুলজার, নদীর জল তোলপাড়। সংযত হবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সারা আশ্রম হয়ে ওঠে আনন্দমুখর। বাধা দেন না স্বামিজী, বলেন—সুখের পরিণতিই আনন্দ। ওরা সুখী হয়, আনন্দ করে, করুক—নির্দোষ আনন্দ। এমনি করতে করতেই নেশা জমবে, বুঝতে চাইবে—চরম আনন্দ, পরম আনন্দ কি।

ঝণ্টুর দল এলে রান্নার ছুটি, কিন্তু ছুটোছুটি বেড়ে যায় দশগুণ। দুজনেরই—রেণুদার আর আমার। ভাঁড়ারের বড় বড় হাঁড়ি কুঁড়ি বাসনপত্র সবই কাজে লাগায় ওরা। ওদের সঠিক পরিমাণ জ্ঞানে প্রায়ই বেড়ে যায় আট দশজনের খাবার। সাঁওতাল পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে সেগুলির সদ্গতি করতেই সন্ধ্যে উৎরে রাত হয়। তারপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পরদিন সকালে ঝাঁটা হাতে সাফ করে বাসনের কাঁড়ি নিয়ে রেণুদা বসে খাঁড়ির ঘাটে। অগোছাল ভাঁড়ার গুছিয়ে নিতে দেরী, রান্না শেষ হতে বারোটা।

মাঘী পূর্ণিমা। সকালবেলায় ঝণ্টুর দল এসে হাজির। দলপতি ওস্তাদের সঙ্গে হরেরাম দাস, গোপাল খাঁ, অহীভূষণ আর নন্দী সাহা। মাংস রান্নায় হরেরাম দাসের হাতযশ খুব। মাংসও এসেছে অনেকখানি। স্বামিজীকে প্রণাম করে একটুখানি কাছে বসেই সবাই মহা উৎসাহে লেগে গেল কাজে। ছোকরার দল নিজেরাই করে নিল কর্ম-বিভাগ। সবাই লেগেছে নিজের নিজের নির্দিষ্ট কাজে। দুজনে গাছতলায় ইটের মস্তবড় উনুন তৈরী করে ধরাচ্ছে, কেউ বসেছে কুটনো কুটতে, কেউ বাটনা বাটতে। বড় বড় বালতি করে নদীর জল তুলে আনছে দুজন। রান্নাঘরে দুটো কাঠের উনুন জেবলে দুটো তরকারী বসিয়ে দিয়েছে দুজন। ততক্ষণে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কোমরে গামছা বেঁধে নতুন উনুনে চাপিয়ে দিলেন মাংসের কড়া।

বেলা ১১টার মধ্যেই মাংস সমেত পঞ্চ-ব্যঞ্জন আর ওদের হিসেব মত সিদ্ধচালের পর্যাপ্ত ভাত রান্না হয়ে গেল। বাকি শুধু স্বামিজীর খাসখানি আতপের ভাত। ঝণ্টু কোম্পানির পাকা রাঁধুনিও রাঁধতে জানে না এটি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই রান্না করে পরিবেশন করলুম স্বামিজীকে।

স্বামিজীর খাওয়া শেষ। দক্ষিণের বারান্দায় সারি সারি কলাপাতা পেতে বসে গেছে ঝণ্টুর দল। পরিবেশন করছে দুজন। পরিবেশন শেষ তবু হাত গুটিয়ে বসে আছে সবাই। খেতে আরম্ভ করে না কেউ—প্রসাদ চাই।

মুখে সংস্কার মুক্ত, ভেতরে সংস্কার যুক্ত—ভক্ত বিটলেমি। ওদিকে স্বামিজীর থালা সাফ। সাফ করে পরিমাণ মত খাওয়াই অভ্যাস। দেখেশুনে হাসতে হাসতে স্বামিজী বললেন—প্রসাদ আবার কি? যা খাও তাই-ই প্রসাদ। উচ্ছিষ্ট খাওয়া চলবে না। তা সে যত বড় মহাপুরুষেরই হোক না কেন। কার শরীরে কি ব্যাধি আছে কে জানে। ব্যাধি সংক্রামিত হতে পারে উচ্ছিষ্টের ভেতর দিয়ে। তবে হ্যাঁ প্রসাদ খেতে পার তোমাদের ঠাকুরদেবতার। উচ্ছিষ্ট করে খায় না তারা। মানুষ দেবতা হলেও প্রসাদ খাবে না কখনও। বেলা হয়েছে। নাও, নাও, খেয়ে নাও সব।

খাওয়া আরম্ভ হল। খাটুনি তার ওপরে দুপুর গড়িয়ে গেছে। যার যা দরকার চেয়ে নিয়ে মিনিট কয়েকের মধ্যেই চেটেপুটে 'পিপিপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে' করে উঠে পড়ল সব। নিজেরাই পাতা ফেলে বারান্দা পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে এসে শুয়ে পড়ল আধছায়া আধরোদে এখানে ওখানে যার যেখানে খুশি। বন্ধুবান্ধব সহ ওস্তাদ শুয়ে পড়লেন পান্থশালায়।

সাড়ে তিনটেয় স্বামিজী বেরিয়ে বসলেন বারান্দায়। অমনি ঝণ্টুর দল এসে বসল স্বামিজীর বাঁদিকে বারান্দার লম্বা অংশে আর সবান্ধব ওস্তাদ ডানদিকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কথা কইলেন হরেরামদা। বললেন—বাবা, আমাদের গ্রামটি খুবই বড়, বাসিন্দাও সংখ্যায় প্রচুর। সব কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। শিক্ষা সংস্কৃতি নাই বললেই হয়। ১০।১২ বছরের ছেলেরা পাঠশালা ছেড়েই ঢোকে কাজ শিখতে। সোনা-রূপা গয়না, ছুরি-কাঁচি, বাসন তৈরী নয়তো লোহার ফাল, কোদাল, হাতা-খুন্তী তৈরীর কাজে। অল্প বয়সেই রোজগার করতে শেখে। অশিক্ষিত কাজেই চাকরির জন্যে উমেদারী করতে হয় না—এটা সত্যি। কিন্তু রোজগার ক'রে করে কি? কেউ সৎপথে কেউ অসৎপথে অযথা অপব্যয় করে। কখনও অভাব ঘোচে না তাদের। অভিভাবকদেরও লক্ষ্য নাই। থাকবে কি—তারাও তো অশিক্ষিত—কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাবে কি করে?

শশীদাদা এসেছেন ভাগলপুর থেকে। পূজা থেকেই আছেন এখানে। আমাদের কাজকর্ম দেখেশুনে আশ্রমের শিক্ষাদীক্ষার ওপর তাঁর খুব শ্রদ্ধা। যেন আঁধারে আলো দেখতে পেয়েছেন।

এতক্ষণ হরেরামদার মুখপানে একদৃষ্টে তাকিয়ে শুনছিলেন স্বামিজী। এখন মৃদু হেসে বললেন—আলোটা কি রকম? টর্চ-লাইট না সার্চলাইট?

একটু থতমত খেয়ে হরেরামদা বললেন—না স্বামিজী, মুখের কথা নয়, দাদার অন্তরের কথা। গ্রামে থাকেন না কিন্তু গ্রামের ওপর দরদ আছে। গ্রামের ভাল-মন্দ ভাবেন। ব্যথা পান। এই আশ্রমের একটি শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চান গ্রামে। তাতে থাকবে একটি লাইব্রেরি। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থাকবে তাতে বয়স্ক অল্পবয়স্ক সবাই কাজের অবসরে এসে পড়াশুনো আলোচনা করবে। মাসে অন্ততঃ একবার করে আপনাকে যেতে হবে, বাবা। দু-তিন দিন থেকে শিক্ষা দেবেন সকলকে। পরিচালনার ভার নিতে হবে আপনাকে।

দাদার বিশ্বাস—অনেক কাজ হবে এতে: কুসংস্কার মুক্ত হবে, অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর হয়ে অনেকটা জ্ঞান হবে। সবচেয়ে বড় কথা

—চরিত্র গঠন হবে। আপনার অনুমতির জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন দাদা। অনুমতি পেলে দাদা আসবেন আপনার কাছে কি করতে হবে সব জেনে নেবার জন্য।

—আশ্রমটি হবে কোথায়? সব খুঁটিয়ে দেখা না হলেও তোমাদের গ্রাম সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আছে। পাড়ার নাম বললে বোঝা যাবে।

—মিস্ত্রী পাড়ার শেষে বাঁধাপুকুরের পশ্চিমে বড় সরাণ রাস্তা। সেই রাস্তার ওপরেই আমাদের একটি বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল ডাকঘর। ডাকঘর এখন অন্যত্র চলে গেছে। বাড়ী খালি। ঐ বাড়ীটিই আশ্রম করতে চান দাদা। আপনার অনুমতি আর আদেশের অপেক্ষা। আদেশ পেলেই সব যোগাড় করবেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চান বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন।

আধবোজা চোখে একটু ভেবে নিয়ে স্বামিজী বললেন—দেশপ্রীতি নিঃস্বার্থ জনহিতকর ইচ্ছা। বাধা দিতে নাই। উদ্দেশ্য মহৎ। বল তৈরী হতে। দেখা যাক ফলাফল কি হয়।

হরেরামদার সংগে সংগে আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল সব মুখগুলি। যেন নীরব জয়ধ্বনি। কৃতার্থ হয়ে একে একে স্বামিজীর পদধূলি নিয়ে বিদায় হল স-ওস্তাদ ঝণ্টুর দল।

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। শীতের কনকনে হাওয়া। লাঠি হাতে বেড়াতে বের হলেন স্বামিজী।

একটু পরেই দশ থেকে আঠারো বছর বয়সের একপাল সাঁওতাল ছেলেমেয়ে এসে হাজির। প্রত্যেকের হাতে কানাউঁচু থালা, নয়তো জামবাটি। স্বামিজীর নির্দেশ। আশ্রমে বসে খেতে গেলে রাত হয়ে যায়। ঘরে নিয়ে গিয়ে খাবে। পরিবেশন শেষ হলে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে থালাবাটি নিয়ে চলে গেল সব।

বেড়ানো শেষ করে স্বামিজী এসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন বারান্দায়-পাতা ঢালা বিছানায়।

অনেক দিন পরে সন্ধ্যেবেলা বসলুম স্বামিজীর কাছে। ততক্ষণে গড়গড়া এসে গেছে রেণুদার হাতে। তামাক টানতে টানতে স্বামিজী বললেন—আজ খুব খাটুনি, কি বল? শুয়ে পড়বে সকাল সকাল।

—খাটুনি হলেও কষ্ট হয়নি, বেশ আনন্দেই কেটেছে, বাবা।

—হ্যাঁ, যে কাজে আনন্দ পাওয়া যায় তাতে কষ্টবোধ থাকে না। সেটা মনের দিক থেকে। শরীরের ক্ষয় আর অবসাদ হয় ঠিকই। তাই তাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার, নইলে স্বাস্থ্যহানি হয়। সকাল সকাল শুয়ে পড়বে।

মৌনং সম্মতি লক্ষণম—চুপচাপ বসে রইলুম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললুম—এখনও ঘুম পায় নি, বাবা। এই তো সবে সন্ধ্যে। একটু বসি, ঘুম পেলেই শুয়ে পড়ব।

স্বামিজী হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, আচ্ছ, বস একটু। অনেক দিন পরে তোমার সাঁঝের আসর। তা আজ তুমি বক্তা। বল দেখি—তোমাদের গ্রামের এই যে এত লোক আশ্রমে আসে কি উদ্দেশ্যে। আশ্রমে আসার সার্থকতা নৈতিক সংস্কার বা আত্মশুদ্ধি আর জ্ঞান-অনুশীলন। এই উদ্দেশ্যেই কি আসে সবাই?—তোমাদের গ্রামের লোক। দেখেশুনে মিলেমিশে যা বুঝেছ, বল।

ভাবনায় পড়ে গলুম, ভয়ও হল। এ কি প্রশ্ন! বললুম—একথা আমায় জিজ্ঞেস করছেন কেন, বাবা? আমি কতটুকু বুঝি? কি করে বলব—কার মনে কি আছে, কে কি উদ্দেশ্যেই বা আসে? অন্যের মনের মধ্যে ঢোকা কি সোজা কথা—কি করে জানব অপরের মনের কথা?

বেশ জোরের সংগে স্বামিজী বললেন—সোজা নয় বলেই তো জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তোমার জ্ঞানে যা বুঝেছ বলতে হবে। ছোট থেকেই সবাইকে চেনো জানো। গ্রামে এদের কাজকর্ম আচার আচরণ দেখেছ। হয়ত জটলা পাকিয়ে আলাপ আলোচনা, ভাবের আদান-প্রদান, তর্কাতর্কিও শুনেছ অনেক। এখানে এসে কি করে—তাও দেখছ বহুবার। প্রত্যেকের সম্বন্ধে ধারণা একটা জন্মেছে। নিঃসংকোচে খোলাখুলি বল সেইটুকু। অপরের মনস্তত্ত্ব বিচারের শক্তি থাকা চাই বৈকি। তাহলেই যে যেমন লোক তার সংগে তেমনি ব্যবহার করতে শিখবে। ঠকতে হবে না। বল, বিচারবুদ্ধির দৌড়টা দেখা চাই তো।

মহামুস্কিল। ছোট থেকেই জানাশোনা আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রত্যেকের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা একটা হয়েছিল নিশ্চয়ই। প্রমাণ করি কি করে? নিজের ধারণায় যা সত্যি অন্যের ধারণায় তা ভুল হতে পারে। বিশেষ করে—সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যম-প্রিয়ম্। আবার—সত্যি কথা বলতে পারি সইতে যদি পারো, সত্যি কথা সহ্য হয় না কারও। বিরাগভাজন হতেই হয়। একমাত্র ভরসা যে—শ্রোতা স্বামিজী। কথা বের হবে না সহজে। হয়তো একেবারেই বের হবে না। সাত-পাঁচ ভেবে চিন্তে বললুম— ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি—পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য বা মতলব অনুসারে এদেরকে কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

—বেশ তো, শ্রেণী ভাগ করেই বল।

—ডান হাত মাথায় রেখে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন স্বামিজী।

—কিন্তু ভয় করে যে! দাদা শুনলে ধমকাবেন, হয়তো মারবেন—মুখ নিচু করে বললুম আস্তে আস্তে।

—ভয় কিসের? সত্যি বলতে ভয়? এতো শোনা কথা নয়—নিজের ধারণা, বিচারবুদ্ধির নমুনা। ভুল থাকলে সংশোধন হয়ে যাবে। বল—গম্ভীরস্বরে বললেন স্বামিজী।

—নিজের ধারণা সত্যি। কিন্তু অপ্রিয় তো হতে পারে। অপ্রিয় সত্যি কি বলা উচিত, স্বামিজী?

—ঠিক কথা। অপ্রিয় সত্য বলতে নেই কারুর মুখের ওপর। নিজের দোষত্রুটি নিজে দেখে না কেউ। তাই অপ্রিয় সত্য শুনলে কেউ ব্যথা পায়, মর্মাহত হয়, কেউ বা রেগে ঝগড়া মারামারি বাধায়। পরম আত্মীয়ও পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা কোথায়। তোমার বিচার-বিবেচনার গতি দেখতে হবে। সোজা পথে না উল্টো পথে। নির্ভয়ে বল—মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন স্বামিজী।

সাহস পেয়ে বললুম—প্রথমে বেনে-বুদ্ধির দল—ব্যবসায়ী। সোনা-রূপো দামী-দামী হীরে জহরতের কাজ করে। মৌখিক আলাপ খুব ভাল থাকলেও খদ্দেররা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না এঁদের। এঁরা দেখেছেন স্বামিজীর সংগে বহু ধনাঢ্য লোকের পরিচয়। স্বামিজীর মোকাবিলায় তাঁদের খদ্দের করতে পারলে দামী দামী কাজের অর্ডার পাওয়া যাবে। তখন পোয়া-বারো, প্রচুর আয়। এই উদ্দেশ্যে আসেন এক দল। গড়ুরপক্ষীর মত ভক্তিও দেখান খুব।

স্বামিজী শুনছিলেন চোখ বুজে। বললেন— যথা—হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট দু-একজন দলপতির নাম বল।

গো—বাবু, ক—মিস্ত্রী। এদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, ধর্মের ধার ধারেন না।

তারপর?

—স্বার্থসর্বস্ব দ্বিতীয় দল। এরা ভাবে—এ তো বেশ, পাপপুণ্য ধর্মাধর্ম বলে কিছু নাই। যা খুশি কর—যা খুশি খাও পর ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—সুখ আরামে ভোগ বিলাসে থাক। ব্রাহ্মণ শূদ্র ছোট বড়ই বা কি? জোর যার মুলুক তার। মতলব খাটিয়ে সমাজপতি হয়ে সমাজের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হয়ে দিব্যি সমাজ শাসন করা যায়। আশ্রমের মতবাদের কদর্থ করে স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলে ধরে নেয় এইসব স্বার্থান্ধের দল। বেপরোয়া কোন রকম অন্যায় করতে দ্বিধা করে না এরা। এখানে ভক্তের ছদ্মবেশটা পুরোপুরি থাকে।

—যথা—হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট?

—মিষ্টভাষী সুবিনীত অতি ভক্তিমান গ—রায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট হয়ে অন্যায়, অবিচার, স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত বইয়ে দিয়েছেন দলের ক'জনকে নিয়ে। কোন রকম অন্যায় করতে বাধে না। কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমা। কত সংসার যে উৎসন্ন দিয়েছেন। মামলা জেতবার জন্যে দলিল জাল করেন—নিজের চোখে দেখেছি। কতবার রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গেছেন দোতলার নির্জন ঘরে। বলেছেন—তোমার ড্রইং ভাল এই নামটা অবিকল নকল করে দাও তো এই কাগজখানায়। দিয়েছি। ব্যাপারটা জানতুম না। পরে বুঝেছি—জাল দলিল, আসল দলিল দাতার নাম জাল করে নিচ্ছেন। কদিন পরে বাবা টের পেয়ে বিষম ধমক দেন। জনে ডাকাডাকিতেও আর যাই নাই সেদিন থেকে

আচ্ছা, নম্বর তিন?—প্রশ্ন করলেন স্বামিজী।

—এটি নির্দোষ হুজুগে [illegible] হুজুগনেড়া হুজুগ পায়, হুজুগ [illegible]

দৌড়ে যায়'—তাই আর কি। মওকা জোয়ান দলের মুরুব্বিও আছেন কজন। সত্য, ধর্ম, আত্মোন্নতি, জ্ঞান অনুশীলনের কোন বালাই নাই এদের। বেশ মজা, বেশ ফূর্তি, ভূরিভোজের ব্যবস্থা, ভিড়ে পড়া যাক দলে—এই ভাব আর কি। ফূর্তি, আনন্দ, খাওয়া-দাওয়াই লক্ষ্য এদের। তবে পল্লী-মঙ্গল সমিতির যত কাজ—করে এরাই।

—যথা, হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট?

—সত্য দাস, শঙ্কর দাস, অহীভূষণ গদাই দাস আর ছিদাম, পীতবাস, দিবাকর, গোবর্ধন—ঝন্টুর দল। গ্রামের মড়া পোড়ানো, আগুন নেবানো, পল্লীমঙ্গল সমিতির চাল আদায়, দুঃস্থ গেরস্থকে গোপনে গোপনে চাল বিলি করা, চোর ধরা, লোকের বিপদ আপদ দায় দৈবে কোমর বেঁধে এগিয়ে যাওয়া—এসব এরাই করে ওস্তাদের ইঙ্গিত মাত্রেই।

—সত্যিই নির্দোষ নিষ্পাপ এরা। না দরকার শাস্ত্র আলোচনা, এদের কাজই পথ দেখিয়ে দেবে। দেশসেবা জনসেবা কি বল! সব ধর্মের ওপরে।

আচ্ছা, ক্ল্যাসিফিকেশন করেছ আর কটা?

—আর একটা, বাবা 'চতুর্বর্গ মরাসংঘটা' আর কি। শেষ দল—বিচারবান, বিবেচক। উচ্চ শিক্ষিত না হলেও অভিজ্ঞ, নিজেদের ওপর সজাগ দৃষ্টি। এঁরা ভাবেন—সত্যিই এপথে আছে কিছু। আর্যশক্তির অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। মূর্খ আমরা, জানি না কিছুই। স্বামিজী পরম জ্ঞানী। যতটুকু পারি আদায় করে নিই এঁর কাছে। এই ইচ্ছার আসেন এ দলটি। নিষ্ঠা আছে এঁদের। দলটি খুবই ছোট, সংখ্যায় কম।

কথা হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট? হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজী।

—দাদা, গোপী মিস্ত্রী আর ননী সাহা। সত্যাজিজ্ঞাসু এঁরা, 'পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' ভাবটি আছে এঁদের।

আর একজন, দলে ভিড়েন নাই, আশ্রমেও আসেন নাই কোনদিন, কামার-পাড়ার কদিন দেখেছেন আর শুনেছেন আপনার কথা। তাতেই খুব শ্রদ্ধাবান। একলব্যের মত একনিষ্ঠ সাধক আর কি! শশী দাস। এই দলছাড়া দলে আর কাউকে তো দেখি না স্বামীজী।

উৎফুল্ল মুখে স্বামীজী বললেন—নিয়ে এস তো নোটবুক আর কলমটা।

'চতুর্বর্গ বিভাগ' নোট করলেন স্বামীজী। তারপর হেসে হেসে বললেন—এর মধ্যে তুমি কোন দলে? দলবল নেই তোমার—একক?

—একক বৈকি। কোন দলই তো আমাকে আনে নাই এখানে, অপরাধ—ঠাকুর গড়ি—পৌত্তলিক।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চোখ বুজে স্বামীজী বললেন—এইটিই স্বরূপ, 'একমেবাদ্বিতীয়ম' আচ্ছা, যাও, শুয়ে পড় গে।

আটাশ

বলি বলি করেও বিশেষ দরকারী কথাটাই বলা হয় নি কাল। যা প্রশ্ন আর শুতে যাবার তাগিদ! সন্ধ্যে হতেই গড়-গড়াটা নিয়ে গেলুম স্বামীজীর কাছে। আঙিনায় নয়—বারান্দায়। শীতকাল, ফাঁকা আঙিনায় হাড়-কাঁপানো কনকনে হাওয়া। এখন সন্ধ্যেবেলা বসবার জায়গা—বারান্দায়।

যথাস্থানে গড়গড়া রেখে বসলুম কম্বলে।

ভ্রু কুঁচকে স্বামীজী বললেন — রেণু কোথায়? তুমি গড়গড়া আনলে যে?

ভাব—যার যা কাজ তাই করা চাই।

বললুম—কলকেয় আগুন দিয়ে ভাঁড়ার ঝাড়-পোঁছ করছে রেণুদা। তাই আনলুম।

নল টানতে টানতে স্বামীজী বললেন—কি খবর?

—বিশেষ দরকারী খবর, বাবা। বছর কেটে গেছে। এ বছরও ফেব্রুয়ারী শেষ হতে চলল। সামনে কলেজ সীজন। ভর্তি হবার সময়। এক বছর তো পিছিয়ে গেলুম সহপাঠীদের থেকে। আর কত সময় নষ্ট হবে, বাবা?

গম্ভীর হয়ে স্বামীজী বললেন—গত সীজনের আগেই বলা গেছল দুলালকে। রাজী হয় নাই। কেন যে—বোঝা যায় না। মতলব স্পষ্ট বলে না। কি করাতে চায়, কোন লাইনে দিতে চায়—লাইন তো ধরিয়ে দিতে হবে একটা।

একটু চাপা গলায় স্বগতোক্তির মত বললেন—আশ্চর্য। ছেলেরা পড়তে না চাইলে জোর জবর-দস্তি করে পড়তে দেন অভিভাবকরা। এদের সবই উল্টো—ছেলে চায় পড়তে, অভিভাবক দেয় বাধা। অনাছিষ্টি কাণ্ড। শুধু বলে—পড়তে গেলে ওর অসুখ করে। যারা পড়ে না তাদের কি অসুখ করে না? কি এমন অসুখ যার একমাত্র কারণ—পড়াশুনো?

আমাকে লক্ষ্য করে বললেন — শুনেছ কিছু দুলাল তোমায় পড়তে দিতে চায় না কেন, কোন লাইনেই বা দিতে চায়?

—সোনা-রুপোর লাইনে বাবা। ৮ বছর বয়সে পাঠশালার পড়া শেষ হতেই দিয়ে-ছিলেন কাজে। প্রথমে নিজের কাছে ক মাস পাটি দাগা, খাতায় আঁকা তারপর বড় ওস্তাদ বড়মামার কাছে গড়া কাজে। চার-পাঁচ মাসেই শিখেছিলুম অনেকখানি। কিন্তু পড়ার নেশা যায় নি। বড় কান্না কাঁদতাম পড়বার জন্যে। মনটা হু হু করত। একদিন কেঁদে-কেটে ধরলুম অহীদাকে। বোলপুরে থাকেন, কটি ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন বোলপুর হাই-স্কুলে। দেখা-শুনাও করেন তাদের। দাদার অন্তরঙ্গ বন্ধু অহীদা ব্যথা বুঝলেন। দাদাকে বলে কয়ে বুঝিয়ে শুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বোলপুর হাইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন আমাকে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরই বাসায়। পেয়িং গেস্ট হয়ে। খুব কম খরচেই হত। মাসে সাত টাকা মাত্র—খাবার, জলখাবার, স্কুলের বেতন সব সমেত।

সোনা-রুপোর কাজে তো কাঁচা পয়সা উপায়—খুব রোজগার। তা ছেড়ে পড়তে গেলে কেন? পড়ে কি তারচেয়ে বেশী উপায় করতে পারবে?

—উপায়ের কথা কিছু ভাবি নাই, বাবা। পড়তে চেয়েছিলুম পড়ার নেশায়। নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন মা। দ্বিতীয় ভাগ শেষ হতেই রোজ দুপুরে খাওয়ার পর মায়ের সমবয়সী আটের বৌদির হল-ঘরে মায়ের কোলের কাছে বসে পড়তে হত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ আরও কত পুরাণ উপপুরাণ, মঙ্গলকাব্য। পুঁথি শুনতে সব বয়সী মেয়েরা জড়ো হতেন হলঘরে। যেন কথ-কথার আসর। একখানা শেষ হলে আর একখানা। পড়ে যেতুম—বুঝিয়ে দিতেন মা। সবাই শুনতেন তন্ময় হয়ে। এমনি চলেছিল মায়ের মৃত্যুর সাতদিন আগে পর্যন্ত। নেশা জমে গিয়েছিল, তার ওপরে মা বলতেন—'লেখাপড়া করে যে, সদাসুখে থাকে সে।' —নেশা জোরদার। উপায়ের কথা ভাবি নাই—লেখাপড়ায় সুখী হওয়া যায়—মনে গেঁথে ছিল এইটাই।

পাঠশালা শেষ হবার কিছুদিন পরেই ৯ বছর বয়সেই মা মারা গেছেন। তার আগেই পড়েছিলুম ঐ সব বই। বিদ্যা-সুন্দরের মত অশ্লীল বইও পড়েছি মায়েদের মজলিসে। অশ্লীল অংশটা বুঝিয়ে দিতেন না মা, বুঝতুম না কিছুই। দেখেছি মেয়েরা হাসতেন মুখ টিপে টিপে। যাঁদের কাছে পড়েছি তাঁদের দেখলে জমে মনে লজ্জা পাই এখন।

রোজ সন্ধ্যে থেকে বাবাকে শোনাতে হত কালী সিংহের মহাভারত। শক্ত লাগত। অনেক কথার মানেই বুঝতুম না। তবু পড়ে যেতে হত রাত ৯টা পর্যন্ত।

ঘাড় নেড়ে অস্ফুট স্বরে স্বামীজী বললেন—ভিতটা পাকা। মায়ের শিক্ষা—বড় শিক্ষা। মায়ের কাছেই ছেলেরা ভাষা শেখে, তাই বলা হয় মাতৃভাষা। আচ্ছা, পাঠশালে পড়া বলতে পারতে কেমন?

—সবাই বলতেন খুব ভাল। সব পরীক্ষাতেই প্রথম হতুম—তা সে পাঠশালে স্কুলে সব জায়গাতেই। পাঠশালে তিন মাস অন্তর 'বাবু' স্কুল ইন্সপেক্টর আসতেন। একজন—ভবতারণবাবু। সব ছেলেকে নানা প্রশ্ন করতেন। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না অনেকে। আমায় যা জিজ্ঞেস করতেন সব বলতে পারতুম ঠিক ঠিক। খুশী হয়ে কত পুরস্কার—খেলনার বাকস, বিস্কুট লজেন্সের বাকস, গল্পের বই, ছবির বই আবার কখনো কখনো রুপোর মেডেল। খুব আনন্দ হত। আরও বেশী মন দিয়ে পড়াশুনো করতুম। পড়ার নেশা পেয়ে বসেছিল।

—স্কুলে পড়বার সময় কি অসুখ হয়ে-ছিল তোমার? দুলাল বলে—পড়ে পড়ে তোমার অসুখ করেছিল, তাই তোমায় পড়তে দেবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—

দুবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, বাবা।

—চরিত্র গঠন হবে। আপনার অনুমতির জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন দাদা। অনুমতি পেলে দাদা আসবেন আপনার কাছে কি করতে হবে সব জেনে নেবার জন্য।

—আশ্রমটি হবে কোথায়? সব খুঁটিয়ে দেখা না হলেও তোমাদের গ্রাম সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আছে। পাড়ার নাম বললে বোঝা যাবে।

—মিস্ত্রী পাড়ার শেষে বাঁধাপুকুরের পশ্চিমে বড় সরাণ রাস্তা। সেই রাস্তার ওপরেই আমাদের একটি বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল ডাকঘর। ডাকঘর এখন অন্যত্র চলে গেছে। বাড়ী খালি। ঐ বাড়ীটিই আশ্রম করতে চান দাদা। আপনার অনুমতি আর আদেশের অপেক্ষা। আদেশ পেলেই সব যোগাড় করবেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চান বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন।

আধবোজা চোখে একটু ভেবে নিয়ে স্বামিজী বললেন—দেশপ্রীতি নিঃস্বার্থ জনহিতকর ইচ্ছা। বাধা দিতে নাই। উদ্দেশ্য মহৎ। বল তৈরী হতে। দেখা যাক ফলাফল কি হয়।

হরেরামদার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সব মুখগুলি। যেন নীরব জয়ধ্বনি। কৃতার্থ হয়ে একে একে স্বামিজীর পদধূলি নিয়ে বিদায় হল স-ওস্তাদ ঝণ্টুর দল।

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। শীতের কনকনে হাওয়া। লাঠি হাতে বেড়াতে বের হলেন স্বামিজী।

একটু পরেই দশ থেকে আঠারো বছর বয়সের একপাল সাঁওতাল ছেলেমেয়ে এসে হাজির। প্রত্যেকের হাতে কানাউঁচু থালা, নয়তো জামবাটি। স্বামিজীর নির্দেশ। আশ্রমে বসে খেতে গেলে রাত হয়ে যায়। ঘরে নিয়ে গিয়ে খাবে। পরিবেশন শেষ হলে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে থালাবাটি নিয়ে চলে গেল সব।

বেড়ানো শেষ করে স্বামিজী এসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন বারান্দায়-পাতা ঢালা বিছানায়।

অনেক দিন পরে সন্ধ্যেবেলা বসলুম স্বামিজীর কাছে। তৎক্ষণে গড়গড়া এসে গেছে রেণুদার হাতে। তামাক টানতে টানতে স্বামিজী বললেন—আজ খুব খাটুনি, কি বল? শুয়ে পড়বে সকাল সকাল।

—খাটুনি হলেও কষ্ট হয়নি, বেশ আনন্দেই কেটেছে, বাবা।

—হ্যাঁ, যে কাজে আনন্দ পাওয়া যায় তাতে কষ্টবোধ থাকে না। সেটা মনের দিক থেকে। শরীরের ক্ষয় আর অবসাদ হয় ঠিকই। তাই তাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার, নইলে স্বাস্থ্যহানি হয়। সকাল সকাল শুয়ে পড়বে।

মৌনং সম্মতি লক্ষণম্—চুপচাপ বসে রইলুম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললুম—এখনও ঘুম পায় নি, বাবা। এই তো সবে সন্ধ্যে। একটু বসি, ঘুম পেলেই শুয়ে পড়ব।

স্বামিজী হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, বস একটু। অনেক দিন পরে তোমার সাঁঝের আসর। তা আজ তুমি বক্তা। বল দেখি—তোমাদের গ্রামের এই যে এত লোক আশ্রমে আসে কি উদ্দেশ্যে। আশ্রমে আসার সার্থকতা নৈতিক সংস্কার বা আত্মশুদ্ধি আর জ্ঞান-অনুশীলন। এই উদ্দেশ্যেই কি আসে সবাই?—তোমাদের গ্রামের লোক। দেখেশুনে মিলেমিশে যা বুঝেছ, বল।

ভাবনায় পড়ে গলুম, ভয়ও হল। এ কি প্রশ্ন! বললুম—একথা আমায় জিজ্ঞেস করছেন কেন, বাবা? আমি কতটুকু বুঝি? কি করে বলব—কার মনে কি আছে, কে কি উদ্দেশ্যেই বা আসে? অন্যের মনের মধ্যে ঢোকা কি সোজা কথা—কি করে জানব অপরের মনের কথা?

বেশ জোরের সঙ্গে স্বামিজী বললেন—সোজা নয় বলেই তো জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তোমার জ্ঞানে যা বুঝেছ বলতে হবে। ছোট থেকেই সবাইকে চেনো জানো। গ্রামে এদের কাজকর্ম আচার আচরণ দেখেছ। হয়ত জটলা পাকিয়ে আলাপ আলোচনা, ভাবের আদান-প্রদান, তর্কাতর্কিও শুনেছ অনেক। এখানে এসে কি করে—তাও দেখছ বহুবার। প্রত্যেকের সম্বন্ধে ধারণা একটা জন্মেছে। নিঃসংকোচে খোলাখুলি বল সেইটুকু। অপরের মনস্তত্ত্ব বিচারের শক্তি থাকা চাই বৈকি। তাহলেই যে যেমন লোক তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করতে শিখবে। ঠকতে হবে না। বল, বিচারবুদ্ধির দৌড়টা দেখা চাই তো।

মহামুস্কিল। ছোট থেকেই জানাশোনা আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রত্যেকের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা একটা হয়েছিল নিশ্চয়ই। প্রমাণ করি কি করে? নিজের ধারণায় যা সত্যি, অন্যের ধারণায় তা ভুল হতে পারে। বিশেষ করে—সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যম্-অপ্রিয়ম্। আবার—সত্যি কথা বলতে পারি সইতে যদি পারো, সত্যি কথা সহ্য হয় না কারও। বিরাগভাজন হতেই হয়। একমাত্র ভরসা যে—শ্রোতা স্বামিজী। কথা বের হবে না সহজে। হয়তো একেবারেই বের হবে না। সাত-পাঁচ ভেবে চিন্তে বললুম— ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি—পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য বা মতলব অনুসারে এদেরকে কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

—বেশ তো, শ্রেণী ভাগ করেই বল। —ডান হাত মাথায় রেখে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন স্বামিজী।

—কিন্তু ভয় করে যে। দাদা শুনলে ধমকাবেন, হয়তো মারবেন—মুখ নিচু করে বললুম আস্তে আস্তে।

—ভয় কিসের? সত্যি বলতে ভয়? এতো শোনা কথা নয়—নিজের ধারণা, বিচারবুদ্ধির নমুনা। ভুল থাকলে সংশোধন হয়ে যাবে। বল—গম্ভীরস্বরে বললেন স্বামিজী।

—নিজের ধারণা সত্যি। কিন্তু অপ্রিয় তো হতে পারে। অপ্রিয় সত্য কি বলা উচিত, স্বামিজী?

—ঠিক কথা। অপ্রিয় সত্য বলতে নেই কারুর মুখের ওপর। নিজের দোষত্রুটি নিজে দেখে না কেউ। তাই অপ্রিয় সত্য শুনলে কেউ ব্যথা পায়, মর্মাহত হয়, কেউ বা রেগে ঝগড়া মারামারি বাধায়। পরম আত্মীয়ও পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা কোথায়। তোমার বিচার-বিবেচনার গতি দেখতে হবে। সোজা পথে না উল্টো পথে। নির্ভয়ে বল—মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন স্বামিজী।

সাহস পেয়ে বললুম—প্রথমে বেনে-বুদ্ধির দল—ব্যবসায়ী। সোনা-রূপো দামী-দামী হীরে জহরতের কাজ করে। মৌখিক আলাপ খুব ভাল থাকলেও খদ্দেররা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না এঁদের। এঁরা দেখেছেন স্বামিজীর সঙ্গে বহু ধনাঢ্য লোকের পরিচয়। স্বামিজীর মোকাবিলায় তাঁদের খদ্দের করতে পারলে দামী দামী কাজের অর্ডার পাওয়া যাবে। তখন পোয়াবারো, প্রচুর আয়। এই উদ্দেশ্যে আসেন এক দল। গড়ুরপক্ষীর মত ভক্তিও দেখান খুব।

স্বামিজী শুনছিলেন চোখ বুজে, বললেন— যথা—হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, দু-একজন দলপতির নাম বল।

গো—বাবু, ক—মিস্ত্রী। এদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, ধর্মের ধার ধারেন না।

তারপর?

—স্বার্থসর্বস্ব দ্বিতীয় দল। এরা ভাবে —এ তো বেশ, পাপপুণ্য ধর্মাধর্ম বলে কিছু নাই। যা খুশি কর—যা খুশি খাও পর। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—সুখ আরামে ভোগ বিলাসে থাক। ব্রাহ্মণ শূদ্র ছোট বড়ই বা কি? জোর যার মুলুক তার। মতলব খাটিয়ে সমাজপতি হয়ে সমাজের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হয়ে দিব্যি সমাজ শাসন করা যায়। আশ্রমের মতবাদের কদর্থ করে স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলে ধরে নেয় এইসব স্বার্থান্ধের দল। বেপরোয়া কোন রকম অন্যায় করতে দ্বিধা করে না এরা। এখানে ভক্তের ছদ্মবেশটা পুরোপুরির থাকে।

—যথা—হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট?

—মিষ্টভাষী সুবিনীত অতি ভক্তিমান গ—রায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট হয়ে অন্যায়, অবিচার, স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত বইয়ে দিয়েছেন দলের ক'জনকে নিয়ে। কোন রকম অন্যায় করতে বাধে না। কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমা। কত সংসার যে উৎসন্নে দিয়েছেন। মামলা জেতবার জন্যে দলিল জাল করেন—নিজের চোখে দেখেছি। কতবার রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গেছেন দোতলার নির্জন ঘরে। বলেছেন—তোমার ড্রইং ভাল, এই নামটা অবিকল নকল করে দাও তো এই কাগজখানায়। দিয়েছি। ব্যাপারটা জানতুম না। পরে বুঝেছি—জাল দলিল, আসল দলিল দাতার নাম জাল করে নিচ্ছেন। কদিন পরে বাবা টের পেয়ে বিষম ধমক দেন। অনেক ডাকাডাকিতেও তার বাড়ী যাই না সেদিন থেকে।

আচ্ছা, নম্বর তিন?—প্রশ্ন করলেন স্বামিজী।

—এটি নির্দোষ [illegible] দল [illegible] [illegible] পায়, [illegible] [illegible]

দৌড়ে যায়'—তাই আর কি। মওকা জোয়ান দলের ধরনকও আছেন ক'জন। সত্য, ধর্ম, আত্মোন্নতি, জ্ঞান অনুশীলনের কোন বালাই নাই এদের। বেশ মজা, বেশ ফুর্তি, প্রীতিভোজের ব্যবস্থা, ভিড়ে পড়া যাক দলে—এই ভাব আর কি। ফুর্তি, আনন্দ, খাওয়া-দাওয়াই লক্ষ্য এদের। তবে পল্লী-মঙ্গল সমিতির যত কাজ—করে এরাই।

—যথা, হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট?

—সত্য দাস, শঙ্কর দাস, অহীভূষণ গদাই দাস আর ছিদাম, পীতবাস, দিবাকর, গোবর্ধন—ঘণ্টুর দল। গ্রামের মড়া পোড়ানো, আগুন নেবানো, পল্লীমঙ্গল সমিতির চাঁদা আদায়, দুঃস্থ গেরস্থকে গোপনে গোপনে চাল বিলি করা, চোর ধরা, লোকের বিপদ আপদ দায়-দৈবে কোমর বেঁধে এগিয়ে যাওয়া—এসব এরাই করে ওস্তাদের ইঙ্গিত মাত্রেই।

—সত্যিই নির্দোষ নিষ্পাপ এরা। না বুঝে শাস্ত্র আলোচনা, এদের কাজই পথ দেখিয়ে দেবে। দেশসেবা জনসেবা কি কম! সব ধর্মের ওপরে।

আচ্ছা, ক্ল্যাসিফিকেশন করেছ আর কটা?

—আর একটা, বাবা 'চতুর্বর্ণ' মরাসংটা' আর কি। শেষ দল—বিচারবান, বিবেচক। উচ্চ শিক্ষিত না হলেও অভিজ্ঞ, নিজেদের ওপর সজাগ দৃষ্টি। এ'রা ভাবেন—সত্যিই এপথে আছে কিছু। আর্যশাস্ত্র অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। মূর্খ আমরা, জানি না কিছুই। স্বামিজী পরম জ্ঞানী। যতটুকু পারি আদায় করে নিই এঁর কাছে। এই ইচ্ছায় আসেন এ দলটি। নিষ্ঠা আছে এঁদের। দলটি খুবই ছোট, সংখ্যায় কম।

যথা হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট? হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজী।

—দাদা, গোপী মিস্ত্রী আর ননী সাহা। সত্যজিজ্ঞাসু এঁরা, 'পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' ভাবটি আছে এঁদের।

আর একজন, দলে ভিড়েন নাই, আশ্রমেও আসেন নাই কোনদিন, কামার-পাড়ায় কদিন দেখেছেন আর শুনেছেন আপনার কথা। তাতেই খুব শ্রদ্ধাবান। একলব্যের মত একনিষ্ঠ সাধক আর কি! শশী দাস। এই দলছাড়া দলে আর কাউকে তো দেখি না স্বামীজী।

উৎফুল্ল মুখে স্বামীজী বললেন—নিয়ে এস তো নোটবুক আর কলমটা।

'চতুর্বর্ণ বিভাগ' নোট করলেন স্বামীজী। তারপর হেসে হেসে বললেন—এর মধ্যে তুমি কোন দলে? দলবল নেই তোমার—একক?

—একক বৈকি। কোন দলই তো আমাকে আনে নষ্ট এখানে, অপরাধ—ঠাকুর গড়ি—পৌত্তলিক।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চোখ বুজে স্বামীজী বললেন—এইটিই স্বরূপ, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আত্মা, যাও, পড়ে পড় গে।

আটাশ

বলি বলি করেও বিশেষ দরকারী কথাটাই বলা হয় নি কাল। যা প্রশ্ন আর শুতে যাবার তাগিদ। সন্ধ্যে হতেই গড়-গড়াটা নিয়ে গেলুম স্বামীজীর কাছে। আঙিনায় নয়—বারান্দায়। শীতকাল, ফাঁকা আঙিনায় হাড়-কাঁপানো কনকনে হাওয়া। এখন সন্ধ্যেবেলা বসবার জায়গা—বারান্দায়।

যথাস্থানে গড়গড়া রেখে বসলুম কম্বলে।

ভ্রূ কুঁচকে স্বামীজী বললেন — রেণু কোথায়? তুমি গড়গড়া আনলে যে?

ভাব—যার যা কাজ তাই করা চাই।

বললুম—কলকেয় আগুন দিয়ে ভাঁড়ার ঝাড়-পোঁছ করছে রেণুদা। তাই আনলুম।

নল টানতে টানতে স্বামীজী বললেন—কি খবর?

—বিশেষ দরকারী খবর, বাবা। বছর কেটে গেছে। এ বছরও ফেব্রুয়ারী শেষ হতে চলল। সামনে কলেজ সীজন। ভর্তি হবার সময়। এক বছর তো পিছিয়ে গেলুম সহপাঠীদের থেকে। আর কত সময় নষ্ট হবে, বাবা?

গম্ভীর হয়ে স্বামীজী বললেন—গত সীজনের আগেই বলা গেছল দুলালকে। রাজী হয় নাই। কেন যে—বোঝা যায় না। মতলব স্পষ্ট বলে না। কি করাতে চায়, কোন লাইনে দিতে চায়—লাইন তো ধরিয়ে দিতে হবে একটা।

একটু চাপা গলায় স্বগতোক্তির মত বললেন—আশ্চর্য। ছেলেরা পড়তে না চাইলে জোর জবর-দস্তি করে পড়তে দেন অভিভাবকরা। এদের সবই উল্টো—ছেলে চায় পড়তে, অভিভাবক দেয় বাধা। অনাছিষ্টি কাণ্ড। শুধু বলে—পড়তে গেলে ওর অসুখ করে। যারা পড়ে না তাদের কি অসুখ করে না? কি এমন অসুখ যার একমাত্র কারণ—পড়াশুনো?

আমাকে লক্ষ্য করে বললেন — শুনেছ কিছু দুলাল তোমায় পড়তে দিতে চায় না কেন, কোন লাইনেই বা দিতে চায়?

—সোনা-রুপোর লাইনে বাবা। ৮ বছর বয়সে পাঠশালার পড়া শেষ হতেই দিয়ে-ছিলেন কাজে। প্রথমে নিজের কাছে ক মাস পাটি দাগা, খাতায় আঁকা তারপর বড় ওস্তাদ বড়মামার কাছে গড়া কাজে। চার-পাঁচ মাসেই শিখেছিলুম অনেকখানি। কিন্তু পড়ার নেশা যায় নি। বড় কান্না কাঁদতাম পড়বার জন্যে। মনটা হু হু করত। একদিন কেঁদে-কেটে ধরলুম অহীদাকে। বোলপুরে থাকেন, কটি ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন বোলপুর হাই-স্কুলে। দেখা-শুনাও করেন তাদের। দাদার অন্তরঙ্গ বন্ধু অহীদা ব্যথা বুঝলেন। দাদাকে বলে কয়ে বুঝিয়ে শুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বোলপুর হাইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন আমাকে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরই বাসায়। পেয়িং গেস্ট হয়ে। খুব কম খরচেই হত। মাসে সাত টাকা মাত্র—খাবার, জলখাবার, স্কুলের বেতন সব সমেত।

সোনা-রুপোর কাজে তো কাঁচা পয়সা উপায়—খুব রোজগার। তা ছেড়ে পড়তে গেলে কেন? পড়ে কি তারচেয়ে বেশী উপায় করতে পারবে?

—উপায়ের কথা কিছু ভাবি নাই, বাবা। পড়তে চেয়েছিলুম পড়ার নেশায়। নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন মা। দ্বিতীয় ভাগ শেষ হতেই রোজ দুপুরে খাওয়ার পর মায়ের সমবয়সী জাঠের বৌদির হল-ঘরে মায়ের কোলের কাছে বসে পড়তে হত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ আরও কত পুরাণ উপপুরাণ, মঙ্গলকাব্য। পুঁথি শুনতে সব বয়সী মেয়েরা জড়ো হতেন হলঘরে। যেন কথ-কথার আসর। একখানা শেষ হলে আর একখানা। পড়ে যেতুম—বুঝিয়ে দিতেন মা। সবাই শুনতেন তন্ময় হয়ে। এমনি চলেছিল মায়ের মৃত্যুর সাতদিন আগে পর্যন্ত। নেশা জমে গিয়েছিল, তার ওপরে মা বলতেন—'লেখাপড়া করে যে, সদাসুখে থাকে সে।' —নেশা জোরদার। উপায়ের কথা ভাবি নাই—লেখাপড়ায় সুখী হওয়া যায়—মনে গেঁথে ছিল এইটাই।

পাঠশালা শেষ হবার কিছুদিন পরেই ৯ বছর বয়সেই মা মারা গেছেন। তার আগেই পড়েছিলুম ঐ সব বই। বিদ্যা-সুন্দরের মত অশ্লীল বইও পড়েছি মায়েদের মজলিসে। অশ্লীল অংশটা বুঝিয়ে দিতেন না মা, বুঝতুম না কিছুই। দেখেছি মেয়েরা হাসতেন মুখ টিপে টিপে। যাঁদের কাছে পড়েছি তাঁদের দেখলে মনে মনে লজ্জা পাই এখন।

রোজ সন্ধ্যে থেকে বাবাকে শোনাতে হত কালী সিংহের মহাভারত। শক্ত ভাষা। অনেক কথার মানেই বুঝতুম না। তবু পড়ে যেতে হত রাত ৯টা পর্যন্ত।

ঘাড় নেড়ে অস্ফুট স্বরে স্বামীজী বললেন—ভিতটা পাকা। মায়ের শিক্ষা—বড় শিক্ষা। মায়ের কাছেই ছেলেরা ভাষা শেখে, তাই বলা হয় মাতৃভাষা। আচ্ছা, পাঠশালে পড়া বলতে পারতে কেমন?

—সবাই বলতেন খুব ভাল। সব পরীক্ষাতেই প্রথম হতুম—তা সে পাঠশালে স্কুলে সব জায়গাতেই। পাঠশালে তিন মাস অন্তর 'বাবু' স্কুল ইন্সপেক্টর আসতেন। একজন—ভবতারণবাবু। সব ছেলেকে নানা প্রশ্ন করতেন। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না অনেকে। আমায় যা জিজ্ঞেস করতেন সব বলতে পারতুম ঠিক ঠিক। খুশী হয়ে কত পুরস্কার—খেলনার বাক্স, বিস্কুট লজেন্সের বাকস, গল্পের বই, ছবির বই আবার কখনো কখনো রুপোর মেডেল। খুব আনন্দ হত। আরও বেশী মন দিয়ে পড়াশুনো করতুম। পড়ার নেশা পেকে উঠেছিল।

—স্কুলে পড়বার সময় কি অসুখ হয়ে-ছিল তোমার? দুলাল বলে—পড়ে পড়ে তোমার অসুখ করেছিল, তাই তোমায় পড়তে দেবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—দুবার [illegible] [illegible], [illegible]

স্কুলে পড়বার সময়ে বটে, তবে পড়ে পড়ে নয়। পড়াটা অতি সহজেই করতে পারতুম।

বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে স্বামীজী বললেন—ইনস্যানিটি?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে স্বামীজী আপন মনেই বললেন—পড়ে পড়ে ইনস্যানিটি? হবার মত কোন লক্ষণ তো মিলছে না। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন — আচ্ছা তোমার অসুখের ঠিক আগে, ধর, তিন থেকে সাত দিন আগে তোমার মনে কি হত বলতে পার?

—পারি, বাবা। গোড়া আর শেষ দিকের সবই মনে আছে বেশ স্পষ্ট। মাঝখানটা অস্পষ্ট, ঝাপসা, অনেক কিছু একেবারেই মনে নেই।

—ভাল কথা। ঠিক ঠিক বল দেখি, সে সময়ের ভাব আর ভাবনাগুলো—আগ্রহের সঙ্গেই বললেন স্বামীজী।

—ফোর্থ ক্লাসে সবে উঠেছি। সরস্বতী পুজোর সময় বাড়ী এসে শুনলুম মেজদার বিয়ে। মাঘ মাসেই। কথাবার্তা পাকা। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলুম। মা মারা যাওয়ার পর সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন মেজদা আর মেজদি। মায়ের অভাব বুঝতে দিতে চাইতেন না এঁরা। এমন মেজদার বিয়ে, নতুন বৌদি আসবেন। আনন্দের কথা আর বলতে হয়! ছুটি শেষে হাসি মুখে গেলুম বোলপুরে। কদিন পরেই সহপাঠী বিজয় বাড়ী থেকে গিয়ে বলল—শীগগির বাড়ী যা, তোর মেজদার খুব অসুখ, দেখতে চাইছে তোকে। ছুটি নিয়ে বাড়ী এসে দেখি মেজদা মারা গেছেন আগের দিন। জেঠাইমার বুকফাটা কান্না। মেজদার অন্তিম কথা—চললুম খোকার কাছে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। ধুলোয় লুটিয়ে আছাড়ি বিছাড়ি কাঁদলুম। থামাতে পারে না কেউ, থামাতে এসে কেঁদে ফিরে যায় সবাই। দাদা এসে তুলে বসিয়ে ধমক দিলেন—জন্মালেই মরে, তার জন্যে মেয়েদের মত অত কান্না কিসের? আর কান্না কিসের? বোঝেই বা কে আর বোঝাবেই বা কে? বাইরে কান্না থামাতে হল, কিন্তু অন্তর কাঁদতে লাগল গুমরে গুমরে। পর দিন কাঁদতে কাঁদতে গেলুম বোলপুরে। পড়াশুনো করি স্কুলে যাই আমি, আর পড়ার ঘরে একলা বসে কাঁদি। পড়ায় মন বসে না, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে হৈ-হল্লা হাসিঠাট্টা মসকরায় যোগ দিই না। শুকনো মুখে বসে থাকি ক্লাসে। চিরহাসি মুখে কালি ঢালা। মাস্টার মশায়রা স্নেহের [illegible] বোঝান কত। চুপ করে শুনি, শুনতে শুনতে বই-এ মুখ লুকিয়ে কাঁদি। থামাতে চাইলে কি হবে—কান্না বাড়ে বৈ কমে না। দিনের পর দিন এমনি চলে।

[illegible] দিন পরে স্কুল থেকে ফিরতেই একখানা চিঠি হাতে দিয়ে অহীদা [illegible]—পড়ে দ্যাখ, দুলাল লিখেছে। [illegible]

গলার স্বর রুদ্ধ দু' চোখ জলে ভরা—ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললুম। বলতে পারলুম না আর, মুখ নীচু করে বসে রইলুম চুপচাপ।

আনত মুখপানে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে ধমকের সুরে স্বামীজী বললেন—বিচলিত হলে চলবে না, বল তারপর।

—একটু আসি বাবা—বলে উঠে গিয়ে মুখ চোখ জল দিয়ে ধুয়ে নোট খাতার ভেতর থেকে পুরোনো চিঠি বের করে এনে স্বামীজীর হাতে দিয়ে বললুম—এই চিঠি বাবা।

চশমা চোখে দিয়ে স্বামীজী লণ্ঠনের আলোয় পড়লেন—

কল্যাণবরেষু— ২রা ফাল্গুন

প্রিয় অহী, শুনলুম খোকা গত পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম হতে পারে নাই। তুমি জান সংসারে ভাইগুলোর ওপরই আমার মায়া-মমতা বা যত টান। আজ থেকে ঐ শুয়োরটার ওপর চটলো। ওর মুখ আর দেখতে চাই না। কালই এক কাপড়ে বাড়ী থেকে দূর করে দিও ওকে।

আশা করি তোমরা দুজনে ভাল আছ। কাজের চাপ কেমন। এখানে খুব কাজ। ফাল্গুনে বিয়ের লগনসা পড়েছে। প্রীতি নিও, কুশল দিও।

শ্রীসত্যদুলাল রায়

পড়া শেষ করে আরক্ত চোখে স্বামীজী বললেন—এই চিঠি? দুলালের হাতেরই তো লেখা! ইংরাজীতে প্রথম হতে পারে নাই বুঝি?

চোখ মুছে গলা ঝেড়ে বললুম—হ্যাঁ বাবা, হয়েছিলুম। ক্লাসের তো বটেই, স্কুলের সব ছেলের মধ্যেই পেয়েছিলুম সব চেয়ে বেশী নম্বর। স্কুল ফার্স্ট, ক্লাশ ফার্স্ট—দুটো প্রাইজই ছিল। সেকেণ্ড বয়ের সঙ্গে টোটালে ৮০ নম্বরের তফাৎ। দাদা কার কাছে শুনেছিলেন জানি না। কোনদিন জিজ্ঞেস করেন নাই আমাকে। মার্কসিট ছিল—দেখতেও চান নাই।

হুঙ্কার ছেড়ে মাথা দুলিয়ে স্বামীজী বললেন—হুঁ, অপরাধী জানিল না অপরাধ তার বিচার হইয়া গেল, তুমি বিচারক! যত্তো সব—। তারপর?

—বুকে যেন ছুরি বসিয়ে দিলে। আঘাতের ওপর আঘাত। মা নেই, মেজদা নেই, দাদা মুখ দেখবেন না—বেঁচে থেকে কি লাভ। সুযোগ খুঁজে বেড়াই আত্মহত্যার। কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াব? মৃত্যু চাই—সব জ্বালা জুড়াবে। বিষ খুঁজি। নজরে পড়ল স্পিরিটের বোতলের লেবেলে ছাপা অক্ষরে লেখা—পয়সন্। এক ফাঁকে ঘরে ঢুকে ঢক ঢক করে খেয়ে নিলুম খানিকটা। শব্দ পেয়ে অহীদার স্ত্রী বাৎসল্য বৌদি টান মেরে বোতলটা কেড়ে নিলেন হাত থেকে। ডাক্তার এলেন, মরা হল না।

কদিন পরে নির্জন বাঁধাঘাটে ডুবতে গিয়ে [illegible] খেতে গিয়ে ধরা পড়লুম তিন-কড়ির হাতে। সেও পড়াশুনো করত অহীদার বাসায় থেকে। একসঙ্গেই থাকতুম দুজন। আমার গতিবিধির ওপর গোপনে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছিল তাকে। এর পর অহীদা আমাকে দিয়ে গেলেন বাড়ীতে। সেখানেও ঐ চেষ্টা—গলায় ভোজালি মারা, দড়ি দেওয়া, জলে ডোবা। যত বাধা পাই তত রোখ চড়ে। শেষে পুরো ইনস্যানিটি। কি করেছিলুম, কি না মনে নাই কিছু।

গড়গড়ার নলে শেষ টান দিয়ে স্বামীজী বললেন—ভাল হল কি করে?

—স্থানীয় ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় ফল হয় নাই। মুঙ্গের থেকে একজন বৈদ্য এসে ভাল করেছিলেন প্রথম বারে, দই-এর সঙ্গে গাছের শিকড় বাটা খাইয়ে।

স্বামীজী চোখ বুজে চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর—হুঁ বলে জিজ্ঞেস করলেন—দ্বিতীয়বার হয়েছিল কখন?

—সেকেণ্ড ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছি। স্কুল ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট—দুই-ই আছে। নতুন ক্লাস আরম্ভ হয়েছে ২রা জানুয়ারী, ১লা ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজোর ছুটিতে এসেছি বাড়ী।

আর পড়তে হবে না। দাদা দিলেন বড়মামার কাছে কাজ শিখতে। তখন সব আনন্দের বড় আনন্দ ছিল পড়া। এত আনন্দ খেলাতেও পেতুম না। সেই আনন্দের মাথায় বাড়ী। মন গেল বিগড়ে। মুখ্যু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল। আবার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা। আবার ইনস্যানিটি। তবে এবার অল্প দিন—মাস চারেক। তিরোলের লোহায় সম্পূর্ণ ভাল হয় নি। ভাল করেছিলেন কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ইউনান সাহেব।

তার পরেও তো পড়লে। পাশও করলে ভালভাবেই। আবার পড়তে পাঠালে কখন?

—পাঠান নি। সেকেণ্ড ক্লাসটা আর পড়া হল না। বেশ সেরে গিয়ে মাস দুই বাড়ীতে আছি। দাদার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ৬ দিন পরেই প্রসূতির ভীষণ অসুখ। যমে মানুষে টানাটানি—জীবন-মরণ সমস্যা। স্থানীয় চিকিৎসকরা হিমসিম খেয়ে পরামর্শ দিলেন বর্ধমানে চিকিৎসা করাতে। বাড়ী ভাড়া করা হল বর্ধমান কালীতলায়। দশম দিনে পাল্কী করে বৌদিকে রেখে এলুম বর্ধমানে। সেবার জন্যে গেলেন দুই বড়দিদি। বাড়ীতে সেজদি রইলেন গেরস্থালী নিয়ে। আমি রইলুম আঁতুড়ে শিশু-চর্চায়। সুস্থ হয়ে বৌদির ফিরতে লেগেছিল এগারো মাস। তাই সেকেণ্ড ক্লাসটা পড়া হল না।

ইনটারেস্টিং। আবার [illegible] সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্তি হতে হল [illegible] একটা বছর নষ্ট।

—[illegible] হতে হয় নি, বাবা। একটা বছর নষ্ট হলেও নষ্ট করি নি। সদা সতর্ক হয়ে

শিশু চর্যায় নিবিষ্ট থাকলেও মাঝে মাঝে পড়ার জন্যে মন ব্যাকুল হত। বিশেষ করে রাত্রে—চোখে ঘুম আসত না, সহপাঠীদের কথা মনে হয়, কেমন পড়ছে সব। অগ্রাণ মাসের প্রথমেই চিঠি লিখলুম হেড মাস্টার বঙ্কিমচন্দ্র সেনগুপ্ত মশায়কে। 'পড়ার ব্যবস্থা না করলে এবার নির্ঘাত মৃত্যুবরণ, আর লোকালয় নয়, নির্জনে কোন জঙ্গলে গিয়ে। ঠেকাতে পারবে না কেউ।' হেড-মাস্টার বঙ্কিমবাবু ছিলেন যেমন বিদ্বান ও সদাশয় তেমনি ছাত্রদরদী স্নেহময়। স্কুল শেষ না করে আমাকে ছাড়তে চান নি তিনি। কোন মাটার মশায়ই চান না।

দিন চার পরে হেড মাস্টার মশায়ের চিঠি নিয়ে একজন লোক এল দোকানে। দাদাকে লেখা চিঠি। লিখেছেন—ছোট মেয়ে কমলার বিয়ে, সনির্বন্ধ অনুরোধ দু-চার দিনের জন্যে নিশ্চয়ই পাঠাবেন খোকাকে।

—বোলপুরে গেলেই ও পড়তে আরম্ভ করবে—দাদা পাঠাতে চান না কিছুতেই। লোকটিও নাছোড়বান্দা, মনিবের হুকুম, খোকাকে না নিয়ে যাবে না সে।

অনেক কথা কাটাকাটির পর বিয়ের পর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাবে লোকটি—এই সর্তে রাজী হলেন দাদা।

বোলপুর গেলুম ৮ই অগ্রান। বিয়ে-থা কোথায় বা কি! হেড মাস্টার মশায় মাথায় পিঠে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—দ্যাখ দিকি, তোর জন্যে এই মিথ্যের অবতারণা। তা বলে যুধিষ্ঠিরের মত নরকে যেতে হবে না রে। তিনি করেছিলেন গুরু হত্যার জন্যে, আমাকে করতে হল শিষ্য রক্ষার জন্যে। নিজের হোক আর অপরের হোক—প্রাণ রক্ষার জন্যে মিথ্যে বলা পাপ নয়।

যাই হোক, এসেছিস খুব ভাল কথা। এক সপ্তাহ পরে ১৬ই অগ্রান বাৎসরিক পরীক্ষা। পরীক্ষা দিতে হবে।

বোঁ করে মাথা ঘুরে গেল। সারা বছরটা কিছুই পড়ি নাই, পরীক্ষা দেব কি? ভয়ে ভয়ে শুকনো মুখে চাইলুম মাস্টার মশায়ের পানে।

মাস্টার মশায় বললেন—শুধু খাতায় নাম সই করে আসিস। তোর প্রমোশন গেছে কোথায়? ফার্স্ট টারমিন্যাল, সেকেন্ড টারমিন্যাল দেওয়া নেই। সেক্রেটারী মশায় আর কমিটি আপত্তি তুলতে পারেন। কোন ভয় নেই। পরীক্ষা দে। সারা বছরের বেতনও তোর মাফ করা হবে।

এক সেট নতুন বই দিয়ে বললেন—ওপরের ঘরে গিয়ে একটু দেখে শুনে নে কদিন। এখানেই থাকবি। এখান থেকেই পড়াশুনো করবি সামনের বছরটা। অহী-বাবুর বাসা থেকে তোর জামা কাপড়ের ট্রাঙ্কটা নিয়ে আসিস। বিছানা তোর করাই আছে।

তবে আর ভাবতে [illegible]। মাস্টার-[illegible]

ওপরের ঘরে। প্রচুর আলো হাওয়া যুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো ঘর। সিঙ্গল বেড খাটের ওপর ধবধবে বিছানা। এক কোণে টেবিল চেয়ার। টেবিলের ওপরের দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো সরস্বতীর ছবি।

মনের খুঁটিনাটি সবই জানা ছিল মাস্টার মশায়ের। পুত্রাধিক স্নেহে পড়িয়ে এসেছেন এতদিন। তাই আমার মনের মত করেই সাজিয়ে রেখেছেন ঘরখানি।

সাতদিন পরে। পরীক্ষা শুরু হল ১৬ই অগ্রান, শেষ ২৪শে। ফল বের হল ৬ই পৌষ, ৭ই প্রমোশন। ক্লাস ফার্স্ট, স্কুল ফার্স্ট-কিছুই নয়, ফোর্থ হয়েছি। প্রাইজ পাব না, থার্ড হলেও বা কথা ছিল।

—বল কি?—স্বামীজী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন মুখপানে। তারপর হেসেহেসে বললেন—বেশ মজা লাগছিল, না? কামারপাড়াওয়ালারা জব্দ হয়েছিল বেশ। দুলাল কি করলে তখন?

—আসতে দেরী দেখে রাগে ছটফট করছিলেন। ১লা পৌষ অহীদার ঠিকানায় চিঠি লিখেছিলেন বাড়ী চলে আসতে। উত্তরে লিখেছিলুম ৭ই ৮ই শান্তিনিকেতনের মেলা দেখে যাব।

৭ই পৌষ দশটার ট্রেনে দাদা এলেন বোলপুরে শান্তি নিকেতনের মেলা দেখতে। উদ্দেশ্য—ফেরবার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন আমাকে।

মেলা শেষে ৯ই পৌষ দাদা আর অহীদা দেখা করলে হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে।

যথোচিত আলাপ আপ্যায়নের পর হেড-মাস্টার মশায় বললেন—খোকার অসুখ পড়ে কি না পড়ে, সেটা সঠিক বোঝা হয়নি। আর একটা বছর মাত্র। ওকে রেখে যান এখানে। সমস্ত দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। যদি অসুখ করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে পাঠাবো আপনার কাছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এই আমার একান্ত অনুরোধ।

হা হা করে হেসে স্বামীজী বললেন—বেড়ে মজা। যেমন মজা তেমনি সাজা। ফিরে এল দুলাল?

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে। বড়দিনের ছুটি তখন। বাড়ী এসে উঠতে বসতে দাঁত খিঁচুনী, ধমক-ধামক, বকুনি। তবে মারধোরটা হয় নাই।

—আমি বোলপুরে গেলেই পড়তে আরম্ভ করবে শুয়োরটা। না পাঠালেই হত। পাঠানোই ভুল হয়েছিল—বলে বার বার আক্ষেপ করতে লাগলেন দাদা।

—তোমার বাবা কি বল্লেন?

—বাবা, হ্যাঁ, বাবা আড়ালে বাঁ হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মোছেন আর জ্যাঠামশায়কে বলেন তুমি জান বাড়ীর সব ছেলেকেই পড়িয়েছি। চড় চাপড় কানমলা খেয়েছে সবাই। খুব অল্প সময় পড়লেও একটা বাক্য লেখারও সুযোগ দেয় নাই খোকা। আর এটার কপালেই কী লাঞ্ছনা! অপরাধ পড়তে চায়।

আমাকে বললেন—নাই বা পড়ালি, বাবা ও যখন চায় না। ছল ছল চোখে চেয়ে থাক বাবার মুখ পানে। আর কিছু বললেন না বাবা।

১৭ই পৌষ গেলুম বোলপুরে। ১৮ই ক্লাস আরম্ভ। হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ীতেই ছিলুম সারা বছর। বড় আনন্দেই কেটেছে। গুরুমায়ের স্নেহ-যত্ন ভোলবার নয়। হারানো মাকে ফিরে পাওয়া। শুধু আমার ওপরেই নয়, স্কুলের সব ছেলের ওপরেই তাঁর সমান স্নেহ। বলতেন—আমার সাড়ে চারশ ছেলে। বোলপুরের প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন্দ্র হয় সিউড়ী। প্রতি বছর সিউড়ী যাবার দিনের আগের সন্ধ্যায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে যেতে হত গুরুমায়ের কাছে সত্যনারায়ণের প্রসাদ আর প্রসাদী পুষ্প নিতে। তাদের কল্যাণ কামনায় সত্যনারায়ণ। সিউড়ী যাবার দিন সকালে ট্রেন ধরবার এক ঘণ্টা আগে আবার সকলকে যেতে হত গুরু মায়ের কাছে। দধি-মঙ্গল। সকলের কপালে দই হলুদের ফোঁটা আর মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে, চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে বলতেন—মাথা ঠাণ্ডা করে খুব ভাল করে লিখবি সব। ভয় করিস না। তোদের ইস্কুল। ইস্কুলের নাম রাখিস, মান রাখিস। দুর্গা দুর্গা।

গুরুমাকে প্রণাম করে মাস্টার মশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে গেলুম সিউড়ীতে শেষ পরীক্ষা দিতে।

এইটুকু যা হোল হেডমাস্টার মশায়ের দয়ায়।

গম্ভীর স্বরে স্বামীজী বললেন—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে প্রাণের অধিক প্রিয় হয়েছিল পড়াশুনো। এইটুকু ছেলের মনস্তত্ব বোঝাবার ক্ষমতা নাই—ওরা আসে আত্মতত্ত্ব বিচার করতে! কেন আসে ওরা আশ্রমে? পরকে বিচার করা যত সহজ নিজেকে বিচার তত সহজ নয়। কি নৈতিক উন্নতি হয়েছে ওদের?

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে স্বামীজী বললেন—আচ্ছা, এবার একবার বলে দেখা যাক কি মতলব দুলালের। বেশি উপায় হলেও সোনা রুপোর কাজ করবার ইচ্ছে নেই তোমার?

আস্তে আস্তে বললুম—না বাবা, উপায় বেশি হলেও শঠতা, মিথ্যা আর চুরি এ ব্যবসায়ে মূলধনের সামিল। স্বচক্ষে দেখেছি। আশ্চর্য হয়েছি এদের উপস্থিত বুদ্ধি আর বাক্-চাতুর্য দেখে। কাজ শেখাটা এমন কিছু শক্ত নয়, কিন্তু ব্যবসাটা আমার পক্ষে দুরূহ। বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে পড়ে না। সৎ-উপজীবিকা নয় বলেই আমার ধারণা। তাই এ কাজ শিখতে মন চায় না, বাবা।

এরপর খাওয়াদাওয়া বিশ্রামের পালা।

(ক্রমশঃ)

কিটি-পার্নেল কাহিনী

শৈলেশ সেন

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন গৌরবের শীর্ষে, অর্ধেক পৃথিবী তার পদভারে কম্পিত, পার্নেলের আবির্ভাব ঠিক সেই মুহূর্তে। তখন ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের বেশীর ভাগ মানুষ ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কন্ঠগুলোকে খুব সহজেই ধর্মীয় অনুশাসনে দমন করা যেত। স্বভাবতই আইরিশ নেতৃবৃন্দ সরাসরি স্বাধীনতার দাবী তুলতে ভয় পেতেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আরামকক্ষে হাজিরার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মাসোহারা তুলতেন পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্যরা। এমন কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবে অনেক সদস্য আপন গৌরববোধে আত্মহারাও হতেন। শিক্ষিত আইরিশ ভদ্রলোকেরা অবশ্য হোম-রুলের দোষগুণ নিয়ে মাঝে মধ্যে একান্তে আলোচনা করতেন। কিন্তু নিদারুণ ক্ষোভ আর হতাশায় আচ্ছন্ন ছিল আয়ারল্যান্ডের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল। দারিদ্র্য আর অর্থাভাবে হিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হত গ্রামের সাধারণ মানুষেরা।

আয়ারল্যান্ডের এই পরিবেশে পার্নেলের আবির্ভাব সত্যিকার এক বিস্ময়কর ঘটনা। কারণ তিনি ছিলেন তথাকথিত বিশিষ্ট ভদ্রলোক, অভিজাত জমিদার তনয়। রাজনীতির শুরুতে পার্নেল নিজেও ইংল্যান্ডের সামগ্রিক রাজনীতি নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকতেন। ব্রিটিশ আর্মিতে ডিসিপ্লিনের অজুহাতে সেই সময়ে নির্দয়ভাবে বেত মারার প্রথা চালু ছিল। সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন পার্নেল। বলা চলে তাঁরই একক প্রচেষ্টায় এই অর্থহীন প্রথা চিরকালের মত রদ হয়ে যায়। অথচ সেই পার্নেলের মধ্যেই যে বিদ্রোহের বীজ গুপ্ত থাকতে পারে, রক্ষণশীলতার প্রতিমূর্তি পার্নেল নিজে ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে যে কি প্রচন্ড বিপর্যয় সৃষ্টি করবেন, তার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত প্রথম অবস্থায় দেখা যায়নি। পার্লামেন্টের ইংরেজ সদস্যরা তাঁকে খুশি ও প্রশ্রয়ের আনন্দে আখ্যা দিয়ে বলতেন—পার্নেল একালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংলিশ আইরিশম্যান।

পুরো নাম চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল। পড়াশুনো করেছিলেন কেমব্রিজে, বিষয় গণিত এবং খনিবিদ্যা। বিরাট এক জমিদারীর উত্তরাধিকারী পার্নেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন ভাবনা ছিল না। পরে হয়েছিলেন মান্যগণ্য এক শেরিফ, অবসর সময়ে খেলতেন ক্রিকেট। জীবনের লক্ষ্য ছিল উইকলো পাহাড়ে স্বর্ণ অনুসন্ধান করে আরও বড়লোক হওয়া। মা ছিলেন অভিজাত এক আমেরিকান মহিলা। মায়ের মধ্যে কিছু পরিমাণে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব দেখা যেত, বাবা ছিলেন নির্বিরোধী রুচিবান পুরুষ। কী এক আশ্চর্য গতি পার্নেলকে সহসা টেনে নিয়ে গেল রাজনীতিতে। এবং ক্রমে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পার্নেল আইরিশ প্রশ্নের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি জড়িয়ে ফেললেন।

কিটি ও'শিয়া

পার্নেল

সদা হাস্যময় এক উজ্জ্বল উৎসাহী যুবক রাতারাতি যেন এক দৃঢ়, গম্ভীর, ভীতিকর প্রৌঢ় ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। পার্লামেন্টের সাধারণ আইরিশ সদস্যরা তাঁর সঙ্গে ভয়ে কথাই বলতেন না।

আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পার্নেল নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় নাম: আশ্চর্য, অদ্ভুত এবং অজানা রহস্যে আবৃত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, পার্নেল সম্পর্কে বলা হত যে, একজন আইরিশম্যান হিসাবে সাধারণ আইরিশ চরিত্রের দোষত্রুটি বা গুণাবলীর কোন কিছুই লক্ষণীয়ভাবে তাঁর মধ্যে ছিল না। আইরিশ পার্টির সমস্ত ক্ষমতা যখন পার্নেলের করতলের মধ্যে, এমন কি পার্লামেন্টের সামনের সারির আইরিশ নেতারা পর্যন্ত নেতৃত্বের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী তখন পার্টির প্রায় সকল সদস্যই গোঁড়া ক্যাথলিক অথচ নেতা পার্নেল ছিলেন নির্ভীক প্রোটেস্টান্ট। একথাও সমান সত্য যে, আয়ারল্যান্ডের চার্চ বা বিদ্রোহীরা তাঁকে নেতা হিসাবে পুরোপুরি পছন্দ করত না, তথাপি রাজনীতিক্ষেত্রে এরাই ছিল তার অন্ধ অনুগামী। তিনি নাকি শত্রুপক্ষকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করে নিতেন ছিনু

প্রকৃতক্ষেত্রে সেই অস্ত্রের ব্যবহারে নিদারুণ ভয় পেতেন। মার্জিতরুচিবোধসম্পন্ন এই মানুষ একদিকে যেমন হিংসাত্মক কার্যকলাপে বাধা দিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে সন্দেহ নেই তিনি নিজেই ছিলেন আইরিশ বিপ্লবীদের প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু।

পার্নেলের জীবনের বিচিত্র স্রোতধারা হারিয়েছে কালের কলঙ্কিত পথে, কিন্তু পরবর্তীকালের ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড তাঁকে কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। সত্যিই অদ্ভুত তাঁর চরিত্র। পার্নেল প্রোটেস্ট্যান্ট হয়েও করেছেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র নেতৃত্ব, নিজে বিরাট জমিদার হয়েও সাধারণ প্রজাদের উপদেশ দিতেন ভূমিরাজস্ব না দিতে, আইন ও শৃঙ্খলার একনিষ্ঠ সমর্থক উস্কানি দিতেন বিদ্রোহ এবং অরাজকতাকে। উনবিংশ শতকের আইরিশ ইতিহাসে পার্নেল একদিকে যেমন রাজনৈতিক সততা ও সাহস এবং প্রেম ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন তেমনি অপরদিকে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে কুঠারাঘাত করে তিনি সেই ইতিহাসে এক অত্যন্ত বেদনাজনক অধ্যায় সংযোজন করেছেন।

তখন রাণী ভিকটোরিয়ার আমল। ১৮৮০ সালে গ্ল্যাডস্টোন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হলেন। আয়ারল্যান্ডের আকাশে তখন ভয়ংকর ঝটিকার ইঙ্গিত। কালক্ষেপ না করে তিনি আইরিশ সমস্যার সমাধান করতে অগ্রণী হলেন। পার্নেল সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল, গ্ল্যাডস্টোন বুঝেছিলেন একমাত্র পার্নেলের পক্ষেই আয়ারল্যান্ডে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। পার্নেলের সহায়তা নিয়ে তিনি আয়ারল্যান্ডকে হোমরুল দেওয়া মনস্থ করলেন। কিন্তু পার্নেল আইরিশ সমস্যার কোনরূপ ক্ষণস্থায়ী সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন না। তবু হয়ত পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া সম্ভব হত, কিন্তু বাধ সাধলেন গ্ল্যাডস্টোন ক্যাবিনেটের দাম্ভিক সদস্যরা। পার্নেলের উত্তাপের কণ্ঠ তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। পার্নেলকে অকারণে জেলে পুরে দেওয়া হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সারা আয়ারল্যান্ডে বীভৎস খুনোখুনি আর হিংসার রুদ্ধ প্রকাশ। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার বুঝলেন পার্নেল ছাড়া আর কারও পক্ষে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। পার্নেল মুক্তি পেলেন। দ্বিগুণতর সম্মান নিয়ে আবার কমন্স সভায় ফিরে এলেন পার্নেল।

মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে পার্নেল আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক জগতে প্রায় একনায়ক হয়ে উঠলেন। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে তাঁর তখন অত্যন্ত তিক্ততার সম্পর্ক, কেবলমাত্র গ্ল্যাডস্টোনকে তিনি মানুষ হিসাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। ভবিষ্যতে অবশ্য তাতেও অনেকখানি চিড় ধরেছিল। এই অবস্থায় গ্ল্যাডস্টোনের আয়ারল্যান্ড বিষয়ক সেক্রেটারি এবং একজন উচ্চ ইংরেজ রাজকর্মচারী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলেন। পার্নেলকে এই হত্যার সঙ্গে জড়ানোর হীন প্রচেষ্টা চলেছিল, কিন্তু এই হত্যার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য স্বয়ং পার্নেল এগিয়ে এসেছিলেন, পার্নেল জানতেন এই ধরনের রাজনৈতিক হত্যা সমস্যা যেমন বাড়িয়ে তুলবে তেমনি অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে ইংরেজ শাসকদের উৎসাহ যোগাবে। জীবনে তখন তাঁর একটিই মাত্র লক্ষ্য—আইরিশ স্বাধীনতা। শারীরিক অসুস্থতা, বৃটিশ চক্রান্ত বা বিপ্লবীদের অনুনয় কোন কিছুই তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি।

পার্নেলের জীবনে ঠিক এই সময় ঘটল এক অভাবিত ঐতিহাসিক ঘটনা। হঠাৎ এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার ঝাপটায় পার্নেল যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন। জীবনের নির্দিষ্ট স্রোত ধাবিত হল সম্পূর্ণ এক ভিন্নপথে। রাজনীতির বাইরের জগত সম্পর্কে পার্নেল এতকাল ছিলেন নির্বিকার, বাইরের জগতের প্রেম-ভালোবাসা আর কামনা-বাসনার প্রতি তাঁর ছিল চরম ঔদাসীন্য। পূর্বে আইরিশ স্বাধীনতার জন্য তিনি বিনা দ্বিধায় সবকিছু পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন তেমনি পরে প্রয়োজনের মুহূর্তে নিঃসংকোচে বিসর্জন দিলেন নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। বিসর্জন দিলেন তাঁর প্রিয় আয়ারল্যান্ডকেও—একজন মহিলার জন্য। তিনি মিসেস কিটি ও'শিয়া।

আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কিটি ও'শিয়ার কোনরকম দুর্বলতা ছিল না। নিজে ছিলেন মনে-প্রাণে ইংরেজ মনোভাবসম্পন্না এবং একজন অভিজাত ইংরেজ ফিল্ড মার্শালের ছোট বোন। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তাঁর ছিল দুর্নিবার উচ্চাশা, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন রকম ঝুঁকি নিতে মিসেস ও'শিয়া প্রস্তুত ছিলেন। স্বামী ক্যাপ্টেন ও'শিয়া স্ত্রীকে বিশ্বাস করতেন না, নিজে ছিলেন অস্থির ও দুর্বলচিত্ত! কিটি ও'শিয়া স্বামীকে সম্পূর্ণ অপদার্থ বলে গণ্য করতেন, নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর তাঁর আস্থা ছিল অনেক বেশী। জন্ম-সৌভাগ্যে উভয়েরই মেলামেশা ছিল উঁচু মহলে, এমনকি প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গেও কিটি ও'শিয়া ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করেছিলেন। পরে এই মহিলা পার্নেল এবং গ্ল্যাডস্টোনের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র হিসেবে কাজ করতেন।

কিটি এবং পার্নেলের প্রথম পরিচয় বেশ নাটকীয়। ইংরেজ সমাজে পার্নেলকে নিয়ে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলত, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বকেও ভয় করত প্রায় সকলে। কমন্স সভার গ্যালারিতে বসে ইতিপূর্বে পার্নেলকে দেখেছেন কিটি ও'শিয়া, নিবিষ্টচিত্তে তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন এবং সব মিলিয়ে মানুষটির প্রতি মনে মনে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছেন। একদিন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাজী ধরলেন যে ডিনার খাওয়াতে পার্নেলকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসবেন। কিটি যখন কমন্সসভায় হাজির হলেন তখন পার্নেল সভাকক্ষে বক্তৃতারত। কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে কিটি ও'শিয়া সভার মধ্যে নিজের কার্ড পাঠিয়ে দিলেন।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই পার্নেল ভিজিটার্স রুমে ছুটে এলেন। কোন কথা না বলে কিটি ও'শিয়ার কার্ডখানা টেবিলের উপর রেখে দিলেন। আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন মিসেস ও'শিয়াকে, তারপর সুতীব্র কণ্ঠে বললেন—আপনার পরিচয় আমি জানি না, ভবিষ্যতে এভাবে বিরক্ত না করলেই আমি খুশি হব। কিটি ও'শিয়ার হাতে ছিল সদ্য প্রস্ফুটিত একটি লাল গোলাপ। সেই ফুলটি তাঁর হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। গমনোদ্যত পার্নেল নীচু হয়ে সেটি কুড়িয়ে নিলেন। প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি বিজড়িত সেই ফুলটি চিরকালের জন্য সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল। লাল গোলাপ ফুলটির শুষ্ক বিবর্ণ [illegible]

পাপড়িগুলো পার্নেলের শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁর কফিনের মধ্যে দিয়ে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

কিটি ও'শিয়ার বিরুদ্ধে যত সমালোচনাই হোক না কেন একথা সত্য যে তিনি পার্নেলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। পার্নেল নিজেও সম্পূর্ণভাবে কিটির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আদর করে তাঁকে ডাকতেন 'কুইনি।' রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে যখন অত্যন্ত অসহায় মনে হত তখন কিটি ও'শিয়া ছিলেন তাঁর সব আশা এবং উৎসাহের কেন্দ্রস্থল। পার্নেল মন্তকণ্ঠে বলতেন—কিটি মাই কুইন অ্যান্ড কম্প্যানিয়ন। কিন্তু কিটি ও'শিয়াকে বিবাহের আগ্রহে বাদ সাধলেন ক্যাপ্টেন ও'শিয়া। তিনি ডাইভোর্সে সম্মত হলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পার্নেলকে ব্ল্যাকমেল করা এবং নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেওয়া। বাধ্য হয়ে পার্নেল ক্যাপ্টেন ও'শিয়ার মনরক্ষা করে চলতে শুরু করলেন। ক্রমান্বয়ে কয়েক বছর পার্নেল এবং কিটি স্বামী-স্ত্রীরূপে অবৈধভাবে বসবাস করেছেন, ক্যাপ্টেনের দিক থেকে কোন বাধা আসেনি। সুযোগ বুঝে ক্যাপ্টেন ও'শিয়া আইরিশ হোমরুলের মস্ত এক সমর্থক হয়ে উঠলেন। পার্নেল তাঁকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে টেনে নিলেন। পার্নেলের সহায়তায় নির্বাচনে জয়লাভও সম্ভব হল। পার্নেল নিশ্চয় ভেবেছিলেন, ক্যাপ্টেন ও'শিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল চুপচাপ থাকবেন। আগুন নিয়ে খেলার পরিণাম পার্নেল তখনও ঠিক বুঝতে পারেননি। আইরিশ পার্টির একচ্ছত্র নেতৃত্ব তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছিল যুক্তিহীন আত্মতুষ্টির মনোভাব। পার্নেল আরও জানতেন না ক্যাপ্টেন ও'শিয়ার অন্তরে প্রতিশোধের কি নিদারুণ স্পৃহা সর্বদা জাগরূক ছিল। প্রতিশোধের লক্ষ্য ছিলেন মিসেস কিটি ও'শিয়া, পার্নেল একজন মাধ্যম মাত্র। ভবিষ্যতে ক্যাপ্টেন ও'শিয়া তাঁর সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন।

ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের 'গ্র্যান্ড ওল্ডম্যান' গ্ল্যাডস্টোন ক্ষমতাচ্যুত হলেন। প্রকৃতপক্ষে পার্নেলের ভাগ্যবিপর্যয়ের সেই থেকে সূত্রপাত। লর্ড স্যালিসবেরির নতুন সরকার আইরিশ নেতার সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে নামলেন। সাধারণ ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা হোমরুলের বিরোধী তাঁরাও পার্নেলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করতেন। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অপদস্থ এবং জনসমক্ষে হেয় করার সবরকম প্রচেষ্টা অতি গোপনে চলতে লাগল। বিখ্যাত 'পিগট কেস' এই প্রচেষ্টার অন্যতম পরিণতি।

১৮৮৭ সালে 'দি টাইমস' পত্রিকা 'পার্নেলিজম অ্যান্ড ক্রাইম' নামে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করে। এই প্রবন্ধে পার্নেলকে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অভিযুক্ত করা হয়। প্রমাণ একখানা চিঠি, পার্নেলের স্বহস্তে লিখিত। টাইমস পত্রিকা খুবই উচ্চমূল্য দিয়ে রিচার্ড পিগট নামে একজন সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের কাছ থেকে চিঠিখানা খরিদ করেছিল। এই চিঠির পূর্ণ রহস্য আজ পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি। তবে চিঠিটি যে জাল সে সম্পর্কে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

ব্রিটিশ সরকার কাল বিলম্ব না করে পার্নেলের বিচারের জন্য কোর্ট বসালেন। কিন্তু চিঠিটির সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য সরকার বা টাইমস পত্রিকার কর্তৃপক্ষ মোটেই সচেষ্ট হননি। হয়তো অনুসন্ধানের সদিচ্ছাও তাদের ছিল না। বিচার চলল দীর্ঘ এক বছর ধরে, আইরিশ মুক্তিসংগ্রামের অনেক লোমহর্ষক তথ্য সরকার কোর্টের সামনে হাজির করলেন। সারা ইউরোপ এবং আমেরিকার সাংবাদিকেরা ভিড় করলেন লণ্ডন কোর্টে। সাধারণ জুরিদের পার্নেল সম্পর্কে দুর্বলতা থাকতে পারে সন্দেহ করে সরাসরি বিচারকদের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তবু শেষরক্ষা হল না, ভীষণভাবে অপদস্থ হল স্যালিসবেরির সরকার।

পার্নেলের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী ছিল রিচার্ড পিগট নামে সেই ভণ্ড জালিয়াত এবং প্রধান প্রমাণ সেই জাল চিঠি। চিঠিখানা স্বচক্ষে দেখে পার্নেল পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন, হুবহু তাঁর নিজের হস্তাক্ষর। হস্তাক্ষরবিদরা পর্যন্ত অনুরূপ সাক্ষ্য দিলেন। এই ঘোর বিপদে পার্নেলকে উদ্ধার করেন কিটি ও'শিয়া। চিঠিখানাতে 'হেজিটেন্সি' এবং 'লাইকলিহুড' শব্দ দুটির ভুল বানান মিসেস ও'শিয়ার নজরে আসে। তিনি পার্নেলের আইনজীবী লর্ড রাসেলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। এবারকার জেরায় তিনি পিগটকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হলেন। কোর্টের মধ্যে তাকে অনেকগুলো শব্দ লিখতে দেওয়া হল, তার মধ্যে 'হেজিটেন্সি' এবং 'লাইকলিহুড' কথা দুটিও ছিল। পিগট ঠিক ঐ দুটি বানানই ভুল লিখল, তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল সাজানো কেস, পিগট দেশ ছেড়ে স্পেনে পালিয়ে গেল। বিচারের জন্য তাকে আর কোর্টে হাজির করা যায়নি, মাদ্রিদের এক হোটেলে আত্মহত্যা করে পিগট জীবন শেষ করে।

পিগট কেসের পরিণতি সরকারের পক্ষে চরম অবমাননার কারণ হয়ে দাঁড়াল। একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারণে সাধারণ ইংরেজ নাগরিকেরাও প্রকাশ্যে সভা-সমিতি করে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আয়ারল্যান্ডের হোমরুল লাভের এতখানি উজ্জ্বল সম্ভাবনা আগে কখনো দেখা যায়নি। ইংরেজ শাসকেরা প্রমাদ গণলেন। এর পরেই ঘটল পার্নেল এবং আয়ারল্যান্ডের চূড়ান্ত ভাগ্যবিপর্যয়। আকস্মিকভাবে ক্যাপ্টেন ও'শিয়া তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ডাইভোর্সের মামলা আনলেন। কারণ, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কিটির প্রবঞ্চনা এবং পার্নেলের সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রণয়। ক্যাপ্টেন ও'শিয়া কেন যে নিজের আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে কোর্টে হাজির হয়েছিলেন সে ইতিহাস আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেকের বিশ্বাস এর পেছনে সরকারের গোপন প্রয়াস ছিল, অবশ্য তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই, কারণ চতুর ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ বুঝেছিলেন যে পার্নেলের পতন এবং আইরিশ হোমরুল আন্দোলনের সমাধির মধ্যেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব।

প্রকৃতপক্ষে ডাইভোর্স মামলা শুরু হওয়াতে মিসেস ও'শিয়া এবং পার্নেল প্রথমদিকে খুশিই হয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে মিথ্যে সম্পর্কের বেড়াজাল ছিন্ন করে এতদিনে হয়তো পাওয়া যাবে মিসেস পার্নেল নামের গৌরব। বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে

প্রেম সামাজিক প্রশ্নে নিন্দনীয় হলেও পার্নেল তাঁকে ভালবাসতেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। পার্নেলের বিশ্বাস ছিল, কিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আয়ারল্যান্ড নিশ্চয়ই ক্ষমার চোখে দেখবে।

কেস শুরু করা হল তুমুল সোরগোল তুলে। গোঁড়াপন্থীরা একটি নোংরা অস্ত্র হাতে পেলেন। পার্নেলকে দৃষ্টান্ত করে সমগ্র আইরিশ জাতির চরিত্র নিয়ে জঘন্য কটাক্ষ এবং বিদ্রূপ চলল। পার্নেল ডাইভোর্স কোর্টে হাজির হতে অস্বীকার করলেন। ক্যাপ্টেন ও'শিয়া এবং তাঁর পরামর্শদাতারা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারলেন। একজন সৎ এবং একনিষ্ঠ স্বামী কিভাবে নিজের বিবাহিতা স্ত্রী এবং তাঁর প্রেমিকের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন তার করুণ-বিষন্ন কাহিনী ক্যাপ্টেন ও'শিয়া সার্থকভাবে তুলে ধরলেন। জনসাধারণের অকৃপণ করুণা পেতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন ও'শিয়া। রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা পার্নেলের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে নেমে পড়লেন। বৃদ্ধ গ্ল্যাডস্টোন পার্নেলের সমস্ত ব্যাপার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। আইরিশ জনগণের মধ্যেও অসন্তোষ ধূমায়িত হতে শুরু করল। নিকট বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন আপাততঃ কিছু-কালের জন্য রাজনীতি থেকে অবসর নিতে, পরে সুযোগমত আবার তিনি নেতৃত্বে ফিরে আসতে পারবেন। পার্নেল স্পষ্ট ভাষায় বললেন—চাতুরীর প্রয়োজন নেই, এই নিন্দা ও নিরানন্দের মধ্যেই আমার নেতৃত্বে আমি সবচাইতে বেশী আস্থা আশা করি। সারা পৃথিবীর কাছে—আইরিশ জনগণ যেন বলতে পারে, আমাদের মিঃ পার্নেলকে আমরা কোন সময়েই পরিত্যাগ করি নি—তিনি আমাদের সর্বসময়ের নেতা।

পার্নেলের আরও বিশ্বাস ছিল এই দুঃসময়ে তাঁর প্রিয় আইরিশ পার্টি নিশ্চয় তাঁর পাশে দাঁড়াবে। মাত্র আগের দিন বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি পার্টির নেতা পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবিলম্বে পার্টির জরুরী সভা বসল। বেশ কিছু সদস্য এক-যোগে দাবি জানালেন—পার্নেল নেতৃত্বে থাকতে পারবেন একটি মাত্র সর্তে, মিসেস ও'শিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চিরকালের মত চুকিয়ে ফেলতে হবে। উন্মুক্ত সভায় দাঁড়িয়ে পার্নেল দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমি সমাজ, সংস্কার মানি না। আমি কিটি এবং আয়ারল্যান্ডকে সমানভাবে ভালবাসতে চাই। তুমুল গণ্ডগোলের মধ্যে কোন কিছু নির্ধারণ না করেই সভা ভেঙে গেল। এতদিন যাঁরা দোটানার মধ্যে ছিলেন আজকের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির ফলে তাঁরাও পার্নেল-বিরোধীদের দলে নাম লেখালেন।

বিরোধীদের নেতা ছিলেন হিলি নামে পার্নেলের একজন পুরাতন সহকর্মী। পরবর্তী সভায় এঁরা ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে এলেন। হিলি প্রথমেই পার্নেলকে চ্যালেঞ্জ করলেন—মিঃ পার্নেল, নেতৃত্বের যোগ্যতা আপনি হারিয়ে ফেলেছেন। আপনার সব ক্ষমতার উৎস ছিল আইরিশ জনগণ, তারা আজ আপনাকে আর চায় না।

পার্নেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন—মিঃ হিলি, নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হবার মত যোগ্যতা আপনি এখনও অর্জন করেননি। আমারই সাহায্যে আপনি আজ পার্টির এক স্তম্ভ, আমারই অনুগ্রহে আপনি পার্লামেন্টের মেম্বার, কিন্তু নেতৃত্বের প্রশ্নে আপনাকে অন্তত আরও দশ বছর আমার অ্যাপ্রেণ্টিস খাটতে হবে।

ক্রুদ্ধ হিলি ফেটে পড়লেন—মিঃ পার্নেল, রাজনৈতিক সততার প্রশ্নে আপনি নিজেই কি আর নেতৃত্ব আঁকড়ে থাকতে পারেন?

নিরুত্তর পার্নেলকে উদ্দেশ্য করে হিলি চরম আঘাত হানলেন—ডাইভোর্স কোর্টে আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

সাতদিন যাবৎ সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে চলতে লাগল তীব্র বাদানুবাদ। সপ্তম দিনে এর সমাপ্তি। টেবিলের মাঝখানে ক্লান্ত, বিষন্ন পার্নেল চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে একজন সদস্য বললেন—লুক অ্যাট হিম, দি মাস্টার অফ দি পার্টি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিলির চীৎকার শোনা গেল—কিন্তু তিনি কোথায়, আই মীন দি মিসট্রেস অব দি পার্টি।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত পার্নেল উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজনায় তাঁর হাত-পা তখন কাঁপছে, মনে হল হিংস্র বাঘের মত তিনি হিলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। অতিকষ্টে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করলেন পার্নেল, এক অদ্ভুত দৃঢ়তায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। নিঃশব্দে নিজের ছাতা আর টুপি তুলে নিলেন। তারপর শান্ত, নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললেন—যেখানে একজন মহিলার সম্মান রেখে কথা বলা হয় না সেই কাপুরুষদের ঘৃণ্য সভা থেকে আমি চির-কালের মত বিদায় নিচ্ছি।

রাজনীতি থেকে পার্নেলের শেষ বিদায়ের দিন ৬ই ডিসেম্বর ১৮৯০ সাল। তারপর সামান্য কয়েক মাসের আয়ু। ১৮৯১ সালের ৬ই অকটোবর ব্রাইটনে তাঁর সকল সুখ-দুঃখের সাথী কিটির কোলে মাথা রেখে পার্নেল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন তাঁর মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়স। রোগে, হতাশায় আচ্ছন্ন মানুষটিকে দেখে মনে হোত যেন ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ। গ্ল্যাডস্টোন যাঁর মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবার সম্ভাবনার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যু ঘটল আইরিশ চ্যানেলের অপর পারে একটি নির্জন, নিরুত্তাপ, সাধারণ কক্ষে। পাশে শোকগম্ভীর স্তব্ধ একটি নারী মূর্তি। শিয়রে একটি বহু পুরাতন লাল গোলাপের কতগুলো শুষ্ক পাপড়ি। পার্নেল ও কিটি ও'শিয়ার প্রেম আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার সম্ভাবনা অন্ততঃ তিরিশ বছর পিছিয়ে নিয়ে গেল। এর জন্য সমগ্র আয়ারল্যাণ্ড একবাক্যে কিটি ও'শিয়াকে দায়ী করল। হতভাগিনী কিটি—পার্নেলের প্রিয় কুইনি—আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ কোনদিন তাঁকে ক্ষমা করতে পারে নি।

।। ষোল ।।
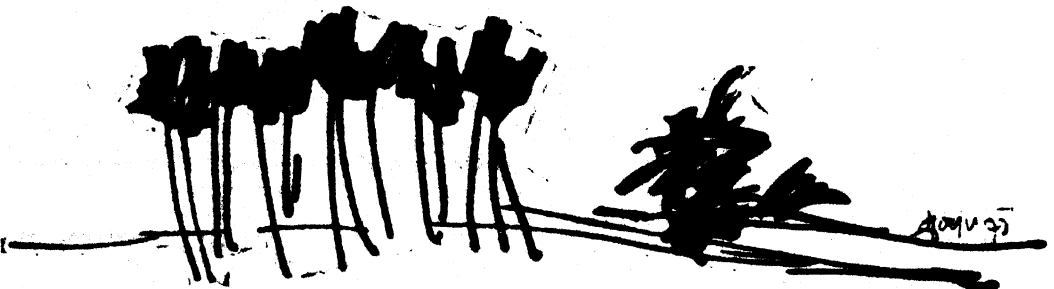
চন্দন চা খেতে খেতে স্নেহধারা ফিরল রিকশো চেপে। উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। দরজার কাছে থেকে তাকে বলতে শোনা গেল, ছেনাল! বেশ্যা! আমি যেচে পড়ে গেলুম, আর আমাকে ছোটলোকের মতো অপমান করলে! বলে কি না—আমার নিয়েই তো তোমাদের জমিদারি! কার টাকায় বড়-লোক হয়েছ—তাই বললে, বুঝলি রুমা?

রুমা বলল, তখন অমন করে বারণ করলুম, শুনলে না! এখন আর চেঁচাচ্ছ কেন? ওঘরে চন্দনদা তোমার অপেক্ষা করছে—আর সিন ক্রিয়েট করো না।

চন্দন এসেছে নাকি?......স্নেহধারা হাঁফাতে হাঁফাতে এগোচ্ছিল।...আর হকসায়েব? হকসায়েব আসেন নি?

এসেছিলেন। তুমি নেই শুনে চলে গেলেন।...রুমা তার পিছন পিছন এল।

স্নেহধারা এ ঘরে ঢুকেই চন্দনকে দেখে বলল, এই যে চাঁদু! তোমার যে পাত্তাই পাইনে। মরেছি—না বেঁচে আছি, একবার দেখে যাবে তো! তোমাকেও রূপপুরের বাতাস লেগেছে দেখছি।

চন্দন কুণ্ঠিতভাবে হাসল।...না। মানে —সময় পাইনি। তাছাড়া......

বাধা দিয়ে স্নেহধারা বলল, কেন তুমি আসো না—সে আমি জানি। তোমার এখন নিজের কত কাজ বেড়েছে। বাড়বে বই কি। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করবে। আমরা তোমার কে ভাই!

চন্দনের ভিতরটা শুকিয়ে গেল। স্নেহধারা কী বলতে চায় তাকে? কতটুকু জেনেছে তার? সে গম্ভীর হয়ে বলল, পরের কথায় যদি নিজে থেকেই আমাকে পর করে দাও, আমি কী করব বলো বউদি? তাছাড়া তোমার এ্যাডভাইসারের তো আর অভাব নেই।

কিসের অভাব নেই? ......স্নেহধারা তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল।

রুমা হাসতে হাসতে বলল, দিদি কথা-টার মানে জানে না। স্রেফ মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দাও না যে তোমার হকসায়েব থাকতে বেচারা চন্দনবাবুর কী দরকার।

হঠাৎ চোখের সামনে একজন বয়স্ক গুরুগম্ভীর মানুষের কাপড় ফস্ করে খুলে তাকে ন্যাংটো দেখালে লজ্জা পেতে হয়। মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে রুমাই দুষ্টু হাতে এটুকু করে বসল। তার ফলে স্নেহধারা আর চন্দন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে-ছিল কয়েকমুহূর্ত। তারপর স্নেহধারা কিন্তু রেগে গেল। রুমার উদ্দেশ্যে ঝাঁঝাল স্বরে বলে উঠল, তুই কী বুঝবি মাথার ওপর কী ঝড় চলেছে! ওদিকে ওই বেশ্যার জুলুম—এদিকে পেট্রোলপাম্পটা বারোভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে কি না কে জানে! এইসব নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে এবার পথে বসলে শত্রুদের মুখে হাসি ফুটবে।

চন্দন তাকিয়ে ছিল স্নেহধারার মুখের দিকে। কথাটা শেষ হলে সে আস্তে বলল, পেট্রোল পাম্প বারোভূতে লুটে খাচ্ছে, কে বলল বউদি?

স্নেহধারা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে বলছিনে ভাই। বুঝতে তো পারছি।

কী বুঝতে পারছ, বউদি?

চন্দন জবাব শোনার জন্যে একটুখানি কান করে থাকল। কিন্তু স্নেহধারা কিছু বলল না। রুমা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। সতু দরজার কপাটে পিঠ দিয়ে একটু-একটু দুলছে। স্নেহধারা মুখ ফিরিয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে জানা-লার ধারের চেয়ারটায়। রান্নাঘর থেকে লঙ্কা-ফোড়নের ঝাঁঝ ভেসে আসছে। ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হচ্ছে। বাইরে কাকের ডাক—মাঝে মাঝে আবছা ভারি ট্রাকের চাকা গড়িয়ে যাওয়া ঘর্‌ঘর্ আওয়াজ—কে কাকে ডেকে-ডেকে হন্যে হল কোথায়।

চন্দন উঠে দাঁড়াল।......তোমাদের কাজ আমি ছেড়ে দিলুম বউদি।

স্নেহধারা ঘুরে বলল, ছেড়ে দিলে মানে?

আমার পোষাবে না। তোমাদের হক-সায়েব হোক, কিংবা বলতো হীরুবাবুকেই সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজই। কিংবা তুমিও আসতে পারো—রুমাকেও নিয়ে এস। তুমি না বুঝলে সে বুঝতে পারবে। কতটাকা আমি মেরেছি—সেও জানা যাবে।

বলেই চন্দন বেরিয়ে পড়ল। বারান্দা থেকে নামবার সময় সে স্নেহধারার ফুঁপিয়ে ওঠা শুনতে পেল। অসংলগ্ন কী সব বলছে স্নেহধারা। সদর দরজার কাছে আসতেই রুমা ডাকল তাকে—চন্দনদা।

দাঁড়াল চন্দন। রুমা দৌড়ে কাছে এসে বলল, ফেট! কী হচ্ছে!

কী হবে?

দিদির ওপর মিছেমিছি রাগছ কেন? মিছেমিছি!

তা বই কি ওর অত বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। যে-যা বলে, বিশ্বাস করে বসে। মাথা খারাপ

ভেবো না এর জন্যে—আমি ওকে ঠিক করে দেব।

চন্দন একটু সহজ হয়ে বলল, কিন্তু অন্য অসুবিধে আছে। আমার নিজেরও ঝামেলা আছে। মায়ের অবস্থা ভালো না। দিদি বাইরে চাকরী পেয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের দেখাশোনা করার লোক নেই।

রুমা পা বাড়িয়ে বলল, বেশ তো—ওঁদের নিয়ে এসো এখানে।

চন্দনের হাসি পেল। ......ওসব সংসারী ব্যাপারে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া তোমাদেরও তো ঝামেলা এখন কম নয়। ট্রাকটা ভাড়া খাটিয়ে খরচা ওঠে না। শিশিরবাবুদের কমলা ট্রান্সপোর্ট জোর কম-পিটিশান চালিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানবাবুরাও ট্রাক কিনেছে দুটো। তোমাদের ট্রাক প্রায়ই গ্যারেজে পড়ে থাকে আজকাল। পেট্রোল-পাম্প শিশিরবাবুরাও বসাচ্ছে। জায়গা কিনেছে কোথায়। এগুলো তোমরা ভাববে না—শুধু ভাববে যে...........

রুমা বলল, চলো—তোমার মাথাটা ঠাণ্ডা করে দিই।

আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে।......চন্দন দরজা থেকে রাস্তায় নামল।

পিছনে স্নেহধারার ডাক শোনা গেল, রুমা, কোথায় যাচ্ছিস?

আসছি। তুমি চুপচাপ বসো তো!

শোন। এই কাগজগুলো দ্যাখ।

আসছি বলছি।

না। এক্ষুনি আয়।......স্নেহধারার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল।

রুমা গোঁ ধরে বলল, বাজে বকো না। আসছি।......তারপর চলতে সুরু করল চন্দনের আগে-আগে। পিছনে স্নেহধারার রুমা ডাকটা বেশ কয়েকবার শোনা গেল। শেষ ডাকটা চড়ায় উঠে বেলুনের মতো করে ফাঁস করে তুবড়ে গেল যেন।

ছোট রাস্তাটা চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল দুজনে। একটা বাড়ি থেকে রুমার বয়সী একটি মেয়ে বই হাতে বেরোচ্ছিল। রুমাকে দেখে সে চোখ নাচাল মাত্র। রুমা বুড়ো আঙুল নাড়ল।

হাইওয়ের মুখে চন্দন থমকে দাঁড়াল। রিকশোয় হাসপাতাল থেকে রাধা শঙ্করকে নিয়ে ফিরছে। শংকরের মাথায় ব্যান্ডেজ। রাধা দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। চন্দনকে দেখামাত্র রাধা রিকশোওলাকে বলল, এই, দাঁড়া—দাঁড়া একটুখানি।......ছোটবাবু, ও চন্দনবাবু!

চন্দন এগিয়ে গেল।......এক্ষুনি ছেড়ে দিলে যে!

শঙ্কর হাসছে।......ফার্স্টএড দিয়ে ছাড়লে। শংকরের হেডের দাম আছে স্যার। তবে বেজার বাজার এবার গরম না করে ছাড়ব না। আমি কথা দিলুম স্যার—আপনার দিব্যি।

রাধা ধমকাল।......থাম্ মিনসে! তখন তো বেঁহুশ হয়ে চোখ উল্টে পড়েছিলি। রাধাকে লোকে মন্দ বলে—রাধা না থাকলে এ লাইনের ড্রাইভার মিনসেদের হাড়ির হাল হয়ে যাবে। কোথা-কোথা সব হাগড়েকোপুলে এসে এখানে মরেছে। আমি না থাকলে কে দেখত তোদের শুনি? ও ছোটবাবু, আপনে কথা আছে। বেজার নামে থানায় কাগজ-কলমে ঠুকে দিতেই হবে। খুব বাড় বেড়েছে ওর। এতকাল জানাইনি—শুধু আপনার খাতিরে। আপনি যা বলবেন, তাই হবে ছোটবাবু। যদি মরেই যেত লোকটা!

চন্দন বলল, ঠিক আছে। যাবখন। ওকে সাবধানে রেখো।

রিকশোটা চলে গেলে রুমা বলল, মারামারি হয়েছে নাকি?

হুঁ।

রুমা হাসল।......বাঃ, এরই মধ্যে রূপ পুরে জামাইবাবুর জায়গা দখল করে ফেলেছ তাহলে। জানো, ড্রাইভারদের মধ্যে যত মারামারি হত এখানে—সব কিছুর জাজ হতেন জামাইবাবু।

চন্দন বলল, আচ্ছা রুমা তুমি জানো—পরেশদার সঙ্গে নন্টুবাবুর বউর কী ব্যাপার ছিল?

রুমা একটু চুপ করে থেকে বলল, জানি। ভীষণ ধরনের প্রেমট্রেম ছিল। তবে যাকে বলে অচরিতার্থ ভালবাসা। সেই থেকেই নাকি জিঘাংসা জন্মায়। সুনন্দিতাদি এখন মনের ঝাল মেটাচ্ছে দিদির ওপর।

আর তোমার সঙ্গে তো দিব্যি ভাব ওঁর।......চন্দন কথাটা বলেই রুমার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টে।

রুমা অপ্রস্তুত হল না।......আমার সঙ্গে সবার ভাব। এই তো মজা! কারণ টাকা-পয়সা সংসারটংসারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই।

তুমি তো প্রায় ওখানে যাও?

যাই। মানে যেতুম। তবে ইদানীং আর যাই নে।

কেন? টাকার দাবী করছে বলে?

উঁহু। মেয়েটা জঘন্য।

তার মানে?

রুমা আস্তে হাঁটছিল। এবার দাঁড়াল। ...তোমাকে বলা যায়। লুকোনোর মতো কথা তো নয়। আমি ওখানে যেতুম—ছেলেবেলা থেকে, মানে যদ্দিন এখানে এসেছি—ওদের ওখানেই তো অনেক দিন থাকতে হয়েছিল। খুব ভালবাসত সুনন্দিতাদি। জামা-কাপড়ও কিনে দিত এক সময়। নতুন বাড়ীতে আসার পরও দিদিকে লুকিয়ে গেছি কতদিন। ইদানীং আরেকজনও আমার সঙ্গে যেত। সুনন্দিতা-দির সঙ্গে ওদের ফ্যামিলির খুব ভাব আছে তো।

অমিত?

হুঁ। কিন্তু এক সময় লক্ষ্য করলুম—আমরা গেলেই সুনন্দিতাদি আমাদের ঘরে রেখে হুট করে বেরিয়ে যায়। বিমানকে ডেকে নিয়ে যায়। বলে যায়, তোমরা গল্প করো। আমি না আসা অব্দি পালিও না। চুরি হয়ে যাবে। তারপর অনেক দেরীতে ফিরে বলত—কি, কেমন জমল? প্রথম-প্রথম বুঝতে পারি নি। পরে বুঝলুম ও কি বলতে চায়। অমিত তো ভীষণ রেগে গেল। আমিও। কি ভেবেছে? আসলে কি জানো চন্দনদা, ও সেকেলে মেয়ে। সেক্স ছাড়া কিছু বোঝে না তো। আমরা যে ওসবের সুযোগ খুঁজছি নে মোটেও—রুমা চটুল হাসল হঠাৎ।...এই, ফের দুজনের সামনে অশ্লীলতা হল।

চন্দন বলল, যাঃ।

রুমা বলে চলল, আসলে ওই সেকেলে ধিঙ্গিগুলো আমাদের বুঝতে পারে না। কোন ছেলের সঙ্গে কোন মেয়ের বন্ধুত্ব মানেই ওদের চোখে ইয়ে। অথচ আমাদের কাছে তো এটা কিস্যু না—স্রেফ ডালভাত

অমিতের সঙ্গে তোমার কি ডাল-ভাতেরই ব্যাপার?

রুমা একটু চমকাল যেন। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। পা বাড়াল দ্রুত। বলল, ফেট! ওকথা ছাড়ো। তোমার মাথা ঠাণ্ডা করি।

চন্দন প্রসঙ্গটা ছাড়ল না।...স্রেফ ডাল-ভাত তো বরাবর ভালো লাগে না। তাই পরে একটু আমিষ ঝোলটোল এসেই যায়। এটাই নিয়ম রুমা—জীব জগতের আইন।

তুমি আমার গারজেন। যা বলবে, শুনে যাব। কারণ, এটাও প্রচলিত নিয়ম।...রুমা হেসে ফেলল।

চন্দন আরও এগোল।...অমিতকে তুমি কেমন ভালবাসো, রুমা?

তার মানে?

কথাটার জবাব দাও।

জবাব নেই।

আমাকে গারজেন স্বীকার করেছ কিন্তু। গারজেন জবাবটা চাচ্ছে—তার দরকার এটা।

কারো সঙ্গ কাকেও ভাল লাগে। এ ছাড়া আর কিছু মাথায় আসে না আমার।

শুধু এই?

এই।

তখন বললে, কেন আমি জোর করিনে। জোর করলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

করব বই কি!...খিলখিল করে হেসে উঠল রুমা।

রুমা!

চেঁচিও না—পথে এত লোক যাচ্ছে।

চন্দন ক্ষিপ্র হাতে সিগারেট বের করল। ধরিয়ে নিল। চারপাশে সব কিছু কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশ সরে যাচ্ছে কোথায়। এ কি তার আনন্দ? না—আনন্দ তো অন্য রকম ব্যাপার। এটা বিষের যন্ত্রণা। এর সঙ্গে গম্ভীর দুঃখের বিস্বাদ। আজ দিনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল! এ কি রুমার দূরে সরে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়ানো, নাকি সত্যি সত্যি কাছে আসা—একেবারে রক্তের ভিতর কণ্টকারী অনুপ্রবেশ! হঠাৎ হনহন করে চলার গতি বাড়িয়ে দিল সে।

বাসার সামনে এসে বলল, এস—তোমাকেই হিসেব বুঝিয়ে দিই। তুমি বুঝতে পারবে। হক সায়েবকেও ডেকে পাঠাচ্ছি। জ্ঞানবাবুর গদীতে থাকার কথা। হীরুবাবু, শুনুন!

রুমা ওর হাত ধরে টানল।...অমন চেঁচাচ্ছ কেন? কী, হল কী তোমার?

হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল চন্দন। তাড়াতাড়ি দরজার তালা খুলে সে ঘরে ঢুকল। ব্যস্তভাবে ফাইল খাতাপত্র

নামাতে থাকল র‍্যাক থেকে। তারপর ডাকল, রুমা, এস, দেখে যাও! হীরুবাবু, শিগগির আসুন!

রুমা নীচে দাঁড়িয়ে আছে তখনও। হীরুবাবু দৌড়ে এল কাচঘর থেকে। ফরিদ-শম্ভু কাঠ হয়ে দাঁড়াল প্যান্ট্রির সামনে। সবাই টের পেয়ে গেছে একটা কিছু ঘটছে। অস্বাভাবিক আর বিশ্রী।

হীরুবাবু বলল, কি হল চন্দনবাবু?

আপনি সব বুঝে নিন। ক্যাশবই আপটু ডেট করা আছে। ক্যাশ তো আপনার আছে।

আহা, ব্যাপারটা কি বলবেন তো খুলে?

আমি চাকরী ছেড়ে দিলুম।...বলে চন্দন বিছানার নীচে থেকে আগের রাতে লিখে-রাখা রেজিগনেশন চিঠিটা বের করে হীরুবাবুর হাতে দিল। তারপর দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, ফরিদ! শিগগির জ্ঞানবাবুর গদী থেকে হকসায়েবকে ডেকে নিয়ে আয়।

ফরিদ ইতস্তত করছে দেখে সে গর্জাল।...চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব এক্ষুনি। যা বলছি, কর।

ফরিদ ভয় পেয়ে দৌড়ে চলে গেল। রুমা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। স্লিপারে পাথর কুচি সরাচ্ছে—মুখটা মাটির দিকে।

হীরুবাবু ডাকল, রুমা! একবার ভেতরে এসো না মা। এসব কি হচ্ছে। কী কাণ্ড। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিনে!

চন্দন চেঁচিয়ে উঠল।...শাট আপ! ওল্ড ফুল! বোঝেন না! ন্যাকা! কত টাকা আমি মেরেছি? বলুন এক্ষুনি—কত টাকা আমি আত্মসাৎ করেছি?

হীরুবাবু ঘাবড়ে গিয়ে থতমত হয়ে বলল, আহা হা! কে—কে এসব বলেছে? ছি-ছি-ছি!

চন্দন বিছানাটা গোছাতে থাকল। একটা বড় স্যুটকেস আর এ্যাটাচিকেস টেনে নিল তক্তাপোষের নীচে থেকে। আলনা থেকে জামা-প্যান্ট তোয়ালে টেনে বিছানার সঙ্গে জড়াল। জানালার কাছে রাখা সাবান টুথব্রাস সেফটিরেজারগুলোও কাগজে মুড়ে ফেলল। বালিশের নীচে রাখল। তারপর ডাকল, শম্ভু! স্যাথ তো বাইরে কোথায় লুঙ্গিটা মেলে দেওয়া আছে।

রুমা তখনও একই ভঙ্গীতে স্তব্ধ। শম্ভু এক দৌড়ে লুঙ্গিটা এনে দিল। সব গুছিয়ে চন্দন বাইরে এল।...রুমা, যদি পরে কিছু গোলমাল ধরা পড়ে—আমি দায়ী থাকলুম সেজন্যে। আশা করি, তেমন কিছু নেই। থাকতে পারেও না। হক-সায়েবের জন্যে আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি নে।

সে একলাকে রাস্তার ধারে গিয়ে ডাকল, এই রিকশো! রিকশো!

একটা রিকশো এগিয়ে এল কাছে। চন্দন পাগল হয়ে গেছে যেন। তার ভঙ্গীতে পাগলামির মতো উদ্ভটতা। জিনিসপত্র তুলে রিকশোয় লাফ দিয়ে বসল সে। তারপর বলল, চলি হীরুবাবু। অন্যায় কিছু বললে ক্ষমা করবেন।...চলো, বাস ষ্টেশন।

হকসায়েব দৌড়ে আসছেন দেখা গেল। চলন্ত রিকশোর সামনে দু হাত তুলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, কী হয়েছে কী চন্দনবাবু?

চন্দন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, কিছু হয় নি। আমি চলে যাচ্ছি। সব রয়েছে—বুঝে নিন গে। রিকশো, চলো। বাস ফেল করব।

রিকশোর হ্যাণ্ডেলটা ধরে হকসায়েব বললেন, সবুর। রোখ বাবা।...চন্দনবাবু, মাথা হঠাৎ গরম হয়ে গেল কেন, বলুন তো? ছি, ছি, এ কি কাজের কথা? আজ ওনাদের চারদিকে দুষমণ—আপনি কিনা ওনাদের নিজের লোক—এ দুঃসময়ে এমন করে চলে যাচ্ছেন?

আমিও ওদের দুষমণ কি না—তাই যাচ্ছি।

পানরাঙা জিভ কেটে হকসায়েব হাসলেন।...আহা হা হা। একী কথা। কে বলেছে আপনি দুষমণ? রাগটা করছেন কার ওপর? অবুঝ মেয়েছেলে—কথায় বলে, বারো হাত কাপড়েও মেয়েমানুষ ন্যাংটো।

চন্দন ব্যংগ করে বলল, আপনিও তো হকসায়েব কম মানুষ নন। আপনাকেও আমার চেনা হয়ে গেছে। আপনিই তো ওদের চোখে আমাকে অবিশ্বাসী করে তুলেছেন। অস্বীকার করতে পারেন?

হকসায়েবের মুখটা লাল হয়ে উঠল।... একটু সমঝে বলবেন চন্দনবাবু। এ হক বড় সহজে রাগে না। তল্লাটের কেউ এক তিল বদনাম দিতে পারবে না যে আমি কথা লাগিয়ে বেড়াই! ওই বদনামে আমার বড্ড রাগ হয়—দুঃখ হয়।

আপনি বলেন নি বউদিকে যে আমি নিজের নামে আলাদা কারবার করছি এখানে?

হ্যাঁ, বলেছি।...হকসায়েব জোরের সংগে বললেন।...সে কি মিথ্যে চন্দনবাবু? বলুন, পান্ডেজীর সংগে কি কথা হয়েছে আপনার? সব খবর এ হক বুড়োর কানে আসে।

চন্দন গজগজ করে বলল, আপনার সংগে তর্ক করার সময় নেই আমার। সে জন্যেই তো সম্পর্ক চুকিয়ে চলে এলুম। রিকশো, চালাও।

সামনে দাঁড়িয়ে হকসায়েব বললেন, দাঁড়াও, বাবা।...পরক্ষণে রিকশোওলার দিকে তাকিয়ে কপালে রোদ আড়াল করতে হাত রেখে বলে উঠলেন, আরে, মুকুন্দ না? তুমি এ লাইনে কবে থেকে? কী কান্ড! কার রিকশো এটা?

মুকুন্দ রিকশোওলা হাসল। গামছাটা কোমরে ফতুয়ার ওপর বাঁধতে বাঁধতে বলল, নিজেই কিনলুম বাপজান। দশ কাঠা ছিল আর বাকি—তাই বেচে কিনলুম। ষেচুবাবুরা তো বিশ্বাস করে একখানা বাইতে দিলেন না। ভাবলেন, মুকুন্দ বেচে পালিয়ে যাবে দেশ ছেড়ে। ইঁদিকে আপনিও আশা দিয়ে রাখলেন।

হকসায়েব বললেন, হ্যাঁ—কিনব খান-কতক। তবে সদ্য ধানটান উঠল—দর পাচ্ছিনে। ওদিকে রেশমের কারবারে তো এক গুচ্ছের লোকসান...

চন্দন গম্ভীর গলায় বলল, আমার দেরী হচ্ছে হকসায়েব।

হকসায়েবের এতক্ষণে যেন চন্দনকে মনে পড়ল।...চন্দনবাবু, আপনি বোধ হয় ভুল করলেন গো! এসময় ওনাদের ছেড়ে যাওয়া ঠিক হল না।

কেন? আপনি তো আছেন!

তা—থাকতে হবে বই কি। ওই আমার কাজ চন্দনবাবু। দুনিয়ার অনাথপ্রতিম লোক নিয়েই আমি থাকি—আপনি আমার কিছু জানেন না। যাক গে, রিকশো ঘোরান। বাবা মুকুন্দ, ঘোরা।

না। তুমি বাস ষ্টেশনে চলো।

চন্দনবাবু!

ক্ষমা করবেন হকসায়েব—যদি কিছু অন্যায় করে থাকি।

সামনে থেকে সরে হঠাৎ খিক খিক করে হেসে উঠলেন হকসায়েব।...রূপপুরে সবাই আসে—এখান থেকে কারো যাওয়া হয় না। তবে আপনি দেখুন, যেতে পারেন নাকি! এখানকার মাটিতে পরেশবাবুদের মতন কিস্তর লোক টাকা পুঁতে গেছে গো! এ মাটির ওপর যে পাখানি ফেলেছে, সেই মুখ নামিয়ে গন্ধ শুঁকেছে। আপনার মতনই সবায় এখানে একদিন এসেছিল চন্দনবাবু। যান, আসুন। আমার সাধ্য কি আপনাকে বাধা দিতে পারি? যে পারত—সেও...

রিকশো গড়াচ্ছিল। হকসায়েব ডাকতে ডাকতে এগোলেন—রুমা, ও মাজননী! শোন-শোন, যেও না। জরুরী কথা আছে।

চন্দন মুখ ঘুরিয়ে দেখল, রুমা হন-হন করে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে।...

•

বাসষ্টেশনে এসে আচমকা সব রাগ পড়ে গেল চন্দনের। আচ্ছন্ন চোখে সে দূরে—অনেক দূরে পেট্রোল পাম্পটার দিকে তাকাল। একটা মায়া। এখনও হাত-ছানি দিচ্ছে। কেন এ হঠকারীতা করে ফেলল সে?

সামনে একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। আধ ঘণ্টা দেরী আছে ছাড়তে। দু পকেটে হাত পুরে ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগ্রেট ধরে একটু পায়চারী করল সে। সত্যি সত্যি চলে যাবে জিয়াগঞ্জে? হকসায়েব বলল যে, এখান থেকে কারো নাকি যাওয়া হয় না! কেন হবে না যাওয়া? সে যেতে পা বাড়িয়েছে তো!

কিন্তু...একটার পর একটা বিরাট কিন্তু এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে নিরন্তর। আর রুমা কেন তাকে ওকথা বলল? কেন অমন করে বলল? চন্দনের বয়স খুব কম হয় নি। তার সেই বয়সের বড় অপমান করে বসল যেন রুমা।

স্যার, স্যার! এই যে! এখানে।

ব্রজ মাথাঅব্দি মাফলার জড়িয়ে একটা চায়ের দোকান থেকে বেরিয়েছে। তাকে ডাকছে। চন্দন পাল্টা ডাকল তাকে। ব্রজ দৌড়ে এল। তারপর জিনিসপত্র দেখে চমকে উঠল।...কোথায় যাচ্ছেন হঠাৎ?

ম্লান হাসল চন্দন।...জিয়াগঞ্জ।

বাড়ী যাচ্ছেন? তা এসব সংগে কেন? কবে আসছেন?

আর আসছিনে ব্রজবাবু। চাকরী ছেড়ে দিলুম।

এ্যাঁ...ব্রজর জিভ বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ—সত্যি।

ব্রজ লাফিয়ে এসে ওর দু হাত ধরে ফেলল, যাঃ কি যে বলেন। আমি—আমি যে মারা পড়ে যাব স্যার! সর্বনাশ! তা হয় না—ওরে বাবা! হঠাৎ কি হল?

ভাববেন না—আপনার গাড়ি আমি নেব।

না—না স্যার। যাবেন কেন?...ব্রজ ছটফট করতে থাকল।...আপনার যাওয়া হবে না স্যার। জানেন, শালা শংকরাকে মারলুম কেন আজ? ও রাধাকে বলেছিল—ছোটবাবুর সংগে তোর অত ঢলাঢলি কিসের? কেন তুই হারামজাদী ওকে আলাদা যত্ন করে খাওয়াবি? সব্বাই তোর খদ্দের—সব্বাই সমান।

চন্দন অবাক হল।...আমার সংগে ঢলা-ঢলি? রাধার? কে এসব বলে!

বলছি কী তবে। শালা শংকর বলে। চলুন, এক্ষুনি রাধিকের কাছে চলুন। রাধা কথায়-কথায় আমাকে বলে ফেলে-ছিল। আপনি লজ্জা পাবেন বলে কানে তুলি নি আপনার। সেই রাগ আজ ঝেড়ে দিয়েছি!

চন্দন সিগ্রেট দিল ওকে।...ছেড়ে দিন।

কিন্তু আপনার যাওয়া হবে না স্যার। চলুন, এক্ষুনি চলুন আমার বাসায়। জিনিসপত্র রেখে চলুন হাটুবাবুর গ্যারেজে। গাড়ীটা চোখেটোখে দেখে সব ঠিক করবেন। শুভস্য শীঘ্রং।

চন্দন একটু ভাবল। হকসায়েবের কথাটা কানে এখনও ভাসছে।

ব্রজ টানল ওকে।...কি কি পার্টস লাগবে, চোখে না দেখে এস্টিমেট করা ঠিক নয়। কি কিনছেন—যাচাই করে নিতে হবে না? এদিকে এতক্ষণ আমি বসে জল্পনা-কল্পনা করছি — আর আপনি কেটে পড়ছেন? এই রিকশো! এদিকে এস। এই জিনিসগুলো আমার বাসায় পেঁছে দাও। চার আনা পাবে দাদু—ব্রজর খাতির। দেখো, পড়েটড়ে যায় না!

চন্দন বলল, কিন্তু...

রাখুন আপনার কিন্তু স্যার। আপনার জন্য জেলখাটার কাজ করে বসলুম। আর আপনি আমাকে ফেলে পালাবেন? হাসি আছে বাসায়। এত খুশী হবে—ভাবা যায় না! ওরে ছোঁড়া, রিকশোর সংগে এসো তো। আমরা ধীরেসুস্থে যাচ্ছি। আর বউদিকে বলিস, জিয়াগঞ্জের স্যার এবেলা খাবেন।

রিকশোর জিনিসপত্তর চাপানো সারা। শুধু এ্যাটাচি কেসটা হাতে নিল চন্দন।

(ক্রমশঃ)
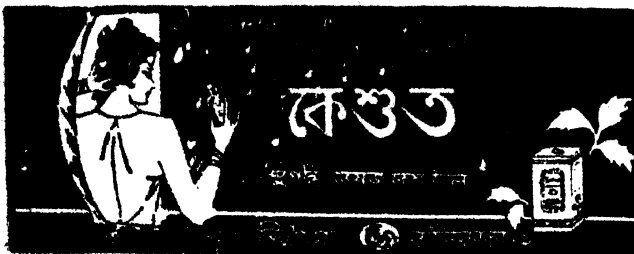
বিজ্ঞানের কথা

বজ্রগোলক ও প্লাজমা জেনারেটর

আগের একটি সংখ্যায় (নং ৪২, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৭৮) বজ্রগোলক নিয়ে আলোচনা তুলেছিলাম। সে আলোচনা ছিল দুজন বৃটিশ লেখকের লেখা একটি বইয়ের ভিত্তিতে। আলোচনার শেষে বলা হয়েছিল যে, '১৯৫৫ সালে বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী পিটার কাপিৎজা প্রথম বলেছিলেন যে, বজ্রগোলকের ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিতে পারে প্লাজমা পদার্থবিদ্যা। তারপর থেকেই বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এ বিষয়ে প্রচুর আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। আশা করা চলে, বর্তমান শতক শেষ হবার আগেই বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে কৃত্রিম বজ্রগোলক সৃষ্টি হবে। সম্ভবত তখন আর যুদ্ধের প্রয়োজনে বজ্রগোলক ব্যবহার হবে না। তবে শান্তির প্রয়োজনে। বিশ্বে শুরু হবে বিপুল এক সমৃদ্ধির যুগ।' এই লেখা প্রকাশিত হবার পরে দুজন সোভিয়েত বিজ্ঞানীর লেখা দুটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে। প্রথমটি বি উমারোভের 'বল লাইটনিং' বা বজ্রগোলক। দ্বিতীয়টি আলেকসান্দর শাইন্দালিন-এর 'ফার্স্ট প্লাজমা পাওয়ার প্লান্ট ইন অপারেশন' বা প্রথম প্লাজমা শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র চালু। এই দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করতে চাই। বিষয়টি সম্প্রতিকালে বিজ্ঞানীদের কাছে কতখানি গুরুত্ব পেয়েছে, এই দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে তা বোঝা যাবে।

বজ্রগোলক :—

বি উমারোভ বলছেন, বজ্রগোলক প্রকৃতির এক অদ্ভুত ব্যাপার। শত শত বছর ধরে এই ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করে এসেছে। প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত এই বজ্রগোলকের রহস্য উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি।

সম্ভবত তার কারণ কিছুটা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে বজ্রগোলক যেমন আচমকা দেখা দেয় তেমনি পলকের মধ্যে মিলিয়ে যায়। কৃত্রিম বজ্রগোলক সৃষ্টি করা বা গবেষণাগারে বজ্রগোলক পরখ করার চেষ্টা আজ পর্যন্ত সফল হয় নি। তবে উল্লেখ করা চলে যে সোভিয়েত বিজ্ঞানী জি বাবোৎ একবার বজ্রগোলক-ধরনের একটা ব্যাপার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ব্যাপারটি ঘটেছিল দুই ইলেকট্রোডের মধ্যে টেনশন বা টান বিপুল একটি মাত্রায় পৌঁছবার ফলে, যন্ত্র থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল আগুনের একটি গোলক আর প্রচণ্ড শব্দ তুলে ফেটে পড়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শত শত বিজ্ঞানী বজ্রগোলক নিয়ে গবেষণা করছেন। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এম এ লাভরেন্তিয়েভ ও পি এল কাপিৎজাও (দুজনেই আকাদেমি-সদস্য) এই দলে আছেন।

বজ্রগোলককে ব্যাখ্যা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। কিন্তু কোনো তত্ত্ব দিয়েই সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় নি। প্রত্যেকটি তত্ত্বই কোনো না কোনো দিকে দুর্বল।

কারও কারও মতে, বজ্রগোলক হচ্ছে একদলা প্লাজমা, সাধারণ বজ্রপাত ঘটলে এই প্লাজমা কিছুক্ষণের জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অন্য একদল বলেন, বজ্রগোলক হচ্ছে সাধারণ বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট একটা শিখা, ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটক থাকার ফলে রাসায়নিক দিক থেকে সক্রিয় পদার্থ জ্বলতে শুরু করে।

অন্য আরেক দল এই তত্ত্ব উপস্থিত করে যে, বজ্রগোলক হচ্ছে সাধারণ বজ্রপাতেরই ফল আর বিদ্যুৎচমকের ফলে সৃষ্ট বেতারতরঙ্গ বজ্রগোলকের তেজের উৎস।

একটি তত্ত্ব মানলে অপর তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায় আর এতসব তত্ত্ব দিয়ে যে-ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তা এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে চলে যার কোনো ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না।

বজ্রগোলক দেখা দিলে টেলিভিশন ও রেডিও সেট বন্ধ হয়ে যায়, টেলিফোন অচল হয়ে পড়ে, সদরের কলিং-বেল-এ আপনা থেকেই সাড়া জাগে, হাত থেকে আংটি ও বালা বাগদাদের চোরের হাত-সাফাইয়ের মতো অবলীলায় অদৃশ্য হয়ে যায় (ঠিক অদৃশ্য হওয়া নয়, সঠিকভাবে বলতে হলে উবে যায় আর কাণ্ডটা ঘটে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে)

এসব ঘটনার ব্যাখ্যা কি? কারও কারও মতে বজ্রগোলকের মধ্যে আছে দুটি অংশ—বাইরের বলয় যেখান দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, আর গোলাকৃতি চৌম্বকক্ষেত্র। বজ্রগোলকের ভিতরে পরিপূর্ণ ভ্যাকুয়াম বা বায়ুশূন্যতা। বিদ্যুৎচৌম্বক শক্তি গোলকটিকে ফাটিয়ে দিতে চায়, অন্যদিকে বায়ুর চাপ গোলকটিকে চেপে ধরে। এই টানা-পোড়েনের মধ্যে সমতা যতোক্ষণ বজায় থাকে ততোক্ষণই গোলকটির আয়ু। সম্ভবত এই কারণেই আংটি বা বালা গোলকের গ্রাসে পড়ে। অনেকটা ট্রান্সফর্মারের গৌণ-কুণ্ডলীর মতো যা সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে একটি ধাতুদ্রব্য অকল্পনীয় মাত্রার বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে সেই ধাতুদ্রব্যটির পলকের মধ্যে উবে যাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

অসাধারণ এই বজ্রগোলকটির এই হচ্ছে কয়েকটি রূপ। এখনো পর্যন্ত রহস্যময় কিন্তু বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ। বিজ্ঞানীরা দিনের পর দিন তাঁদের গবেষণাগারে এই বজ্রগোলকের সন্ধানে রয়েছেন, খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছেন তার রহস্য, তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত। তাঁরা চাইছেন বজ্রগোলককে বশে আনতে। প্রকৃতির বিরাট দানকে যদি আয়ত্তে আনা যায় তাহলে মানুষের হাতে আসবে অফুরন্ত এক শক্তির উৎস।

প্লাজমা পাওয়ার প্লান্ট :

বজ্রগোলক সম্পর্কে আগের আলোচনাতেও বলেছি আর উপরে উদ্ধৃত আলোচনাতেও দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ বিজ্ঞানী বজ্রগোলককে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন প্লাজমার সাহায্যে। প্লাজমা ব্যাপারটা কি? এমন একটা উঁচু মাত্রায় উত্তপ্ত গ্যাস যার পরমাণু থেকে গোটাকতক ইলেকট্রন চ্যুত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী দিনের বিশ্বে প্লাজমা বড়ো রকমের ভূমিকা নেবে। বজ্রগোলক যদি প্লাজমা-সংক্রান্ত একটি ব্যাপার হয় তাহলে সঙ্গত কারণেই প্রকৃতির এই বিরাট দানটিই হয়ে উঠবে শক্তির এক বিরাট উৎস। তার ফলে পৃথিবীর চেহারাটাই বদলে যাবার সম্ভাবনা। তা কেমন করে ঘটবে তারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে আলেকসান্দর শাইন্দালিনের প্রবন্ধে।

আমরা শক্তির যোগান পাই নানা চেহারায়। তবে সবচেয়ে সুবিধের ও সবচেয়ে কম খরচের চেহারাটি হচ্ছে বিদ্যুৎ। কোনো একটি দেশে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় তা থেকে সেই দেশের কারিগরী অগ্রগতির একটি নিরীখ পাওয়া যেতে পারে।

শক্তি যোগানের ব্যবস্থা বা পাওয়ার প্ল্যান্ট এখনো পর্যন্ত চালু রাখা হচ্ছে জ্বালানী পুড়িয়ে, প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে যে-জ্বালানী সংগ্রহ করা হয় (কয়লা ও তেল)। কিন্তু কতখানি জ্বালানী পুড়িয়ে কতখানি শক্তি পাওয়া যাবে, সেই হিসেব করতে বসলে দেখা যাবে শূন্যতার মাত্রা অনেকখানি। যতোখানি ভালো ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব তা হলেও এই শূন্যতার মাত্রা হয়ে দাঁড়ায় ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ, যে পরিমাণ জ্বালানী পুড়ছে তার মাত্র ৪০ শতাংশ রূপান্তরিত হচ্ছে বিদ্যুতে—বাকি সবটাই, বলা চলে, 'ধোঁয়া হয়ে উবে যাচ্ছে।' তার ফলে শুধু যে প্রকাণ্ড একটা অপচয় ঘটছে তাই নয়, বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে তুলে প্রকাণ্ড একটা অপকারও পাকিয়ে তোলা হচ্ছে।

এতোটা অপচয় ঘটার কারণ নিহিত রয়েছে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে তার ভিতরে। পদ্ধতিটি কী? স্টীম টারবাইন। অর্থাৎ [illegible]

মঙ্গলগ্রহের বিরাট একটি ফাটল, মেরিনার-৯ থেকে তোলা ছবি। ফাটলটি লম্বায় প্রায় ৫০০ কিলোমিটার ও চওড়ায় ১২০ কিলোমিটার। ফাটলটির যে চেহারা দেখা যাচ্ছে তা গড়ে তুলতে জলেরও কিছু ভূমিকা আছে মনে হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ভূমির এই বিশেষ বিন্যাসটি সম্ভবত একমাত্র জলপ্লেই সম্ভব।

বাষ্প করা এবং সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘোরানো। এমনকি পারমাণবিক শক্তিচালিত পাওয়ার স্টেশনেও মূল পদ্ধতিটি একই—সেখানে জলকে বাষ্প করা হয় পারমাণবিক চুল্লির সাহায্যে। জলকে বাষ্প করার ব্যাপারটাই এমন যে তাপমাত্রাকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার ওপরে নিয়ে যাওয়া চলে না। আর এইটেই হয়ে দাঁড়ায় অপচয়ের কারণ। টারবাইন ও স্টীম জেনারেটরের ব্যবস্থাটাই এমন যে মূল পদ্ধতিটিকে বজায় রেখে তাকে আরও উন্নত করে তোলার সুযোগ নেই।

কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে ম্যাগনেটোহাইড্রোডায়নামিক (সংক্ষেপে এম এইচ ডি) জেনারেটর তৈরি করেছেন তার মূল পদ্ধতিটিই একেবারে ভিন্ন ধরনের। জেনারেটরের নাম যতোই খটোমটো হোক, যে-নীতির ভিত্তিতে জেনারেটরটি চালিত তা খুবই সরল, বলতে গেলে সেই ফ্যারাডের সময় থেকেই সকলের জানা। নীতিটি কি? একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে যদি বিদ্যুৎ-পরিবাহী পদার্থ চালিত হয় তাহলে সেই পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখনো পর্যন্ত যে-ধরনের জেনারেটরে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করি তাতে এই বিদ্যুৎ-পরিবাহী পদার্থটি হচ্ছে তার আর একটি চৌম্বকক্ষেত্রে তাকে ঘোরানো হয় টারবাইনের সাহায্যে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ-পরিবাহী পদার্থটি যে তার-ই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তরল কিংবা গ্যাসীয় পদার্থও হতে পারে। এম এইচ ডি জেনারেটরে এই বিদ্যুৎ-পরিবাহী পদার্থটি হচ্ছে বিপুল শক্তিসম্পন্ন প্লাজমা।

জ্বালানী এক্ষেত্রেও পোড়ানো হচ্ছে এবং তার ফলে পাওয়া যাচ্ছে উচ্চ তাপসম্পন্ন গ্যাস। তারপরে সেই গ্যাসের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয় বাড়তি একটি ভাগ যা থেকে সহজেই ইলেকট্রনগুলো চ্যুত হয়। এমনিভাবে পাওয়া যায় প্লাজমা। তারপরে সেই প্লাজমাকে করা হয় প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন এবং তাকে চালিত করা হয় একটি শক্তিশালী চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে স্থাপিত আয়তাকৃতি চ্যানেলে। এই চ্যানেলের দেওয়াল-ই হয়ে ওঠে ইলেকট্রোড, উৎপন্ন বিদ্যুৎ এই ইলেকট্রোড থেকে সংগ্রহ করা হয়। লক্ষ করবার বিষয় এই যে এক্ষেত্রে না দরকার হচ্ছে কোনো টারবাইনের, না কোনো ঘূর্ণ্য অংশের। গতিশীলতা রয়েছে একমাত্র চ্যানেলের ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান প্লাজমার মধ্যে, তাছাড়া সবকিছুই নিশ্চল। জল ফুটিয়ে বাষ্প নয়, গ্যাস উত্তপ্ত করে প্লাজমা এই হচ্ছে মূল পদ্ধতি। কাজেই উত্তাপের মাত্রাকে প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে তুলতেও কোনো বাধা নেই।

যে পরিমাণ উত্তাপ যোগান দেওয়া হচ্ছে এই ব্যবস্থায় তার ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। তার মানেটা দাঁড়ায় এই যে একই পরিমাণ জ্বালানী পুড়িয়ে আরও ৫০ শতাংশ বেশি বিদ্যুৎ।

এই হচ্ছে প্লাজমা-জেনারেটর। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম প্লাজমা জেনারেটরটি ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে এবং সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন মূলধনী খরচও সাধারণ স্টীম-জেনারেটরের বেলায় যা, প্লাজমা জেনারেটরের বেলায় তার চেয়ে বেশি নয়। ফলে প্লাজমা জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হলে শক্তি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড়ো রকমের একটি পরিবর্তন ঘটে যাবে।

অনুমান করা হচ্ছে, বস্তুগোলকও প্রকৃতির ভাণ্ডারে এমনি একটি বিপুল

মেরিনার-৯ থেকে তোলা মঙ্গলগ্রহের বিরাট ছবি হচ্ছে এই ছবি। ছবিতে মঙ্গলগ্রহের প্রকাণ্ড একটি আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়মুখ দেখা যাচ্ছে। আগ্নেয়গিরিটির নাম নিক্স অলিম্পিকা। এটির তলদেশ অপেক্ষাকৃত পরিধি প্রায় ৫০০ কিলোমিটার, উচ্চতা হিসেবে অন্তত ৬ কিলোমিটার। ছবিতে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই ছবি ও অন্যান্য ছবি দেখে মার্কিন বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, ভূ-বিজ্ঞানের দিক থেকে মঙ্গলের সক্রিয়তা চাঁদের চেয়ে বেশি, পৃথিবীর চেয়ে কম।

প্লাজমা জেনারেটর। মানুষের হাত এখনো এই ভাণ্ডারে পৌঁছয় নি। তবে অচিরেই পৌঁছবে, সেকথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। তখন? তখন বিশ্বে অবশ্যই শুরু হবে বিপুল এক সমৃদ্ধির যুগ।

মহাকাশে তৎপরতা :

পায়োনিয়র-১০ বৃহস্পতি গ্রহের দিকে ধাবমান, এ সপ্তাহে এইটিই সবচেয়ে বড়ো খবর (গতবারের বিজ্ঞানের কথায় ভুলে পায়োনিয়ার-১১ লেখা হয়েছে)। এই ব্যোমযানটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছে কেপ কেনেডি থেকে, গত ২রা মার্চ তারিখে। আশু লক্ষ্য বৃহস্পতি, কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। বৃহস্পতি পেরিয়ে চলে যাবে সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহ প্লুটোর দিকে, প্লুটো পেরিয়ে চলে যাবে সৌরলোকের বাইরে নক্ষত্রলোকের দিকে। এ কারণে যাত্রার শুরুতে ব্যোমযানটিকে বিপুল একটি গতি দিতে হয়েছে, যাতে সৌরলোকের মহাকর্ষের বাঁধন ছিঁড়ে ব্যোমযানটি বেরিয়ে যেতে পারে। সকলেই জানেন, এতদিন পর্যন্ত যতো ব্যোমযান পৃথিবী থেকে আকাশে তোলা হয়েছে তার কোনোটিই সৌরলোকের বাইরে যায় নি, তেমন আয়োজনও কোনোটির বেলাতেই ছিল না। কোনো ব্যোমযান যদি যাত্রা শুরু করার পরে সেকেণ্ডে ৭ মাইল বা ১১-২ কিলোমিটার বেগ অর্জন করতে পারে, একমাত্র তাহলেই সেই ব্যোমযানটির পক্ষে মহাকর্ষ ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। আজ পর্যন্ত যতো ব্যোমযান চাঁদ বা শুক্রগ্রহে বা মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দিয়েছে তাদের প্রত্যেককেই অন্ততপক্ষে এই বেগ অবশ্যই অর্জন করতে হয়েছিল। এই প্রথম এমন একটি ব্যোমযান পৃথিবী থেকে রওনা হল যার এই সৌরলোকের বাইরে যাবার কথা। এ-কারণে যাত্রাশুরুতে তাকে অনেক বেশি বেগসম্পন্ন করতে হয়েছে—সেকেণ্ডে ১১-২ কিলোমিটারের জায়গায় ১৬ কিলোমিটার। ব্যোমযানটি বৃহস্পতির আকাশে পৌঁছবে একুশ মাস পরে, প্লুটোর আকাশে বারো বছর পরে। তারপরে কোনো এক নক্ষত্রলোক? সে হিসেব না করাই ভালো, কেননা পৃথিবী থেকে নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার আলোকবর্ষ।

ইতমধ্যে লুনা-২৫ আলাদাভাবে চাঁদের মাটিতে নেমেছিল এবং চাঁদের পাথর সংগ্রহ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। অন্যদিকে তিনজন নভশ্চরকে নিয়ে অ্যাপোলো-১৬ চাঁদের দেশে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের দুটি মার্স ব্যোমযান এবং মার্কিন বিজ্ঞানীদের মেরিনার এখনো মঙ্গলগ্রহের কক্ষে পাক খেতে খেতে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। কলকাতার ইউ এস আই এস-এর সৌজন্যে মেরিনার-৯ থেকে তোলা মঙ্গলগ্রহের দুটি আলোকচিত্র আমরা পেয়েছি। সে-দুটি এইসঙ্গে ছাপা হল।

মানবমন :

'মনোবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা' মানবমন-এর একাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি—মার্চ ১৯৭২) আমাদের হাতে এসেছে। অন্যান্য সংখ্যার মতো এই সংখ্যাতেও পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ : মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, টেলিপ্যাথি ও আধুনিক বিজ্ঞান—পরিতোষ গুপ্ত, কমিউনিজম নির্মাণকর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ—অধ্যাপক এ আর্নল্ডোভ, মানবশিশু ও পশুশাবকদের ওপর মাতৃস্নেহের প্রভাব—সন্তোষকুমার দে। তাছাড়া আছে এই পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণীয় বিভাগ মনোবিদ-লিখিত মনোবিদের ডায়েরী। আধুনিক কালের ঘটনাবলীকে যাঁরা সঠিকভাবে বুঝতে চান, এই পত্রিকাটি পড়লে তাঁরা অবশ্যই উপকৃত হবেন।

ডঃ জ্যোতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—

কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ও রক্তবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ জ্যোতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃতী বিজ্ঞানীর আসনটি শূন্য হয়ে গেল। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে কর্মজীবনের মধ্যগগন থেকে তিনি এমন আকস্মিকভাবে বিদায় নেবেন, তা কল্পনা করা যায় নি।

তাঁর জন্ম ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস ডিগ্রী লাভ ১৯৪২ সালে, এম-ডি ডিগ্রী লাভ ১৯৪৯ সালে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ছিলেন মেডিকেল গবেষণার ভারতীয় পরিষদের রক্তবিজ্ঞান (হেমাটোলজি) ইউনিটের রিসার্চ অফিসার। রকফেলার ফেলোশিপ নিয়ে রক্তবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্যে ১৯৫২ সালে গিয়েছিলেন বোস্টনের নিউ ইংল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিলেন স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনের রক্তবিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ১৯৫৬ থেকে রক্তবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ১৯৬৬ থেকে অধ্যক্ষ।

রক্তবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন ও বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছেন। রক্তবিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্যে দেশের ও বিদেশের বহু উচ্চ সম্মানপদক লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক্তবিজ্ঞানী।

—[illegible]

অ্যাপোলো-১৩ ব্যোমযানের তিনজন মনুষ্যযাত্রী : জন ইয়ং, অধিনায়ক; চার্লস ডিউক, যন্ত্রযানের পাইলট, টম মাটিংলি, কম্যান্ড যানের পাইলট। প্রথমোক্ত দুজন চাঁদের দেকার্ত অঞ্চলে অবতরণ করে ৭৩ ঘণ্টা কাটাবে।

অধৈর্য গলায় বিমলেন্দু বলল, নাঃ, তোমাদের নিয়ে আর পারা যায় না। সেই দুপুর থেকে মা-মেয়ে সাজগোজ শুরু করেছ, এখন চারটে বাজতে যাচ্ছে তবু শেষ হওয়ার নামটি নেই।

কি মেয়ে কি মা কেউই কথাটা গায়ে মাখল না সুপ্রভা যেমনি নিবিষ্টমনে আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখে ক্রীম ঘষছিল তেমনিভাবেই গালে ক্রীম ঘষতে থাকল, পছন্দসই না হওয়ায় মীরাও খোঁপাটা ভেঙে চুড়ো খোঁপা বাঁধতে শুরু করল।

দরজার দিকে পিছন ফিরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মা মেয়ে প্রসাধন করছিল। সুপ্রভা আয়নার একেবারে কাছাকাছি, সুপ্রভার প্রসাধনমগ্ন মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিমলেন্দু অসহিষ্ণু বিরক্ত গলায় ফের বলল, যাচ্ছ দুর্গা দেখতে, সাজগোজের এত ঘটা কিসের?

পেছন ফিরে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সুপ্রভা বলল, তোর বাবার কথা শুনেছিস মীরা? বলে কিনা সাজগোজের ঘটা, কত যেন দিয়ে-থুয়ে রেখেছে একেবারে। নতুন ডিজাইনের একছড়া নেকলেসের কথা বলেছিলাম সেদিন, তা তোর বাবা কি বললে জানিস? বললে, দু'ছড়া নেকলেস তো রয়েছে, আবার মিছি-মিছি গয়না কিনে টাকা ব্লক করা কেন? আদ্যিকালের পুরনো নেকলেস গলায় দিয়ে আমি বেরোতাম ভেবেছিস? নেহাত মানুষটা মরতে বসেছে এক্ষুনি দেখতে না গেলে খারাপ দেখায় পর তো নয়, তোর বাবার আপন কাকা, তাই।

শাড়ী গয়না ইত্যাদি নিয়ে হামেশাই অনুযোগ করা সুপ্রভার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে বলে বিমলেন্দু সুপ্রভার অভিযোগের জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের ওপর যে সিগারেটটা সে প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ঠুকে আসছে সেইটাই আরো বার কয়েক ঠুকে সে বলল, আর দেরি কোরো না, দোহাই তোমাদের। এরপর পাঁচটা বেজে গেলে আর বাসে উঠতে পারব না।

—বাসে যদি উঠতে না পারি, মীরা সুপ্রভার প্রতিবিম্বে চোখ রেখে ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলল, ট্যাক্সি তো আছে, না কি বল মা?

ভেতরে ভেতরে বিমলেন্দুর মেজাজটা অনেকক্ষণ থেকেই বেশ তিরিক্ষি হয়ে উঠছিল, এখন মীরার কথায় তার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলে গেল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বিমলেন্দু বলল ট্যাক্সি তো থাকবেই বাবার তেল-কল রয়েছে যে!

পেছন ফিরে বিমলেন্দুর ক্ষিপ্ত রুদ্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মা মেয়ে হেসে গড়াগড়ি যায় আর কি! উত্তেজনা দমন করবার জন্য বিমলেন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের ওপর ঠুকে ঠুকে সিগারেটের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির যে কায়দাটা খরচ বাঁচাবার জন্য বিমলেন্দু রপ্ত করে নিয়েছে, রাগ সামলাতে এখন সে সেই কৌশলটাও ভুলে গিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল।

দরজায় তালা এঁটে মীরা সুপ্রভাকে নিয়ে বাসস্ট্যাণ্ড এসে বিমলেন্দু কব্জি ঘুরিয়ে হাতঘড়ি দেখল। সাড়ে পাঁচটা বেজে দু মিনিট বেশি এবং বিমলেন্দুর আশংকা যে যথার্থ একখানা বাস তখন এসে দাঁড়াতেই তা স্পষ্ট বোঝা গেল। বাসের ভেতরের তো কথাই নেই, বাইরেও পাদানিতে কোনমতে একখানা পা রেখে রড ধরে বেশ কিছু মানুষ বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। নামবার লোক বেশি ছিল না, চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে একটি মেয়ে যেই নেমেছে, অমনি একপাল মেয়ে-পুরুষ যেন বাসের দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু একজন উঠতে পারল কি পারল না, ওই অবস্থায়ই বাস ছেড়ে দিল। পরপর আরো দুখানা বাস এল, প্রায় একই অবস্থা বরং ভিড় যেন ক্রমশঃ বাড়ছে মনে হল বিমলেন্দুর। কিন্তু সুপ্রভা বা মীরাকে এজন্য এতটুকু চিন্তিত মনে হচ্ছে না। মা মেয়ে দুজনেরই প্রসাধন-চর্চিত মুখে একটা সতেজ প্রফুল্লতার ভাব লক্ষ্য করে বিমলেন্দু মনে মনে খেপে উঠল।

একটা ফিরতি ট্যাক্সি আসতে দেখা গেল এই সময়, বিমলেন্দুদের কাছাকাছি এসে ট্যাক্সির গতিটা প্রায় থেমে যাওয়ার মতো আস্তে হয়ে গেল এবং বিমলেন্দুর খুবই সন্দেহ সুপ্রভা ও মীরা নিশ্চয়ই মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারায় ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে থাকবে কেন না ট্যাক্সিটা সুপ্রভার গা ঘেঁষে একেবারেই থেমে গেল এবং ট্যাক্সিচালক সাদর আহ্বানের ভঙ্গিতে ট্যাক্সির দরজাটা খুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে বিমলেন্দুর সম্মতির কোনরকম অপেক্ষা না রেখেই প্রথমে সুপ্রভা এবং তার পিছনে পিছনে মীরা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। সুপ্রভা মীরা

এমনকি ট্যাকসিওয়ালা সমেত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই যে বিমলেন্দুরে কিন্তু খসাবার ধান্দায় থাকে সেই নির্মম সত্যটা উপলব্ধি করতে করতে ক্রুদ্ধ বিমলেন্দুও অগত্যা টাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে চলবার নির্দেশ দিল।

অনেকদিন পর ট্যাক্সি চড়তে পেয়ে মীরা ভীষণ খুশি, সুপ্রভাও কিছু কম খুশি না। দুজনেই জানালার বাইরে তাকিয়ে মানুষজন দোকানপাট দেখছিল, সিটে হেলান দিয়ে ঢিলেঢালা ভংগিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে যেন ট্যাক্সি চড়ার বিলাসিতাটুকু তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছিল। খুশির ভাবটা চেপে রাখতে না পেরে মীরা বলে উঠল, ট্যাক্সি চড়ে কোথাও যেতে কী ভীষণ ভালো লাগে, তাই না মা?

উত্তরে সুপ্রভা কোন কথা বলল না, বিমলেন্দুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসল শুধু। ট্যাকসিতে ওঠার পর থেকেই বিমলেন্দু কোন দিকে তাকাচ্ছিল না, ঘাড় শক্ত করে স্থির চোখে সে মীটারের দিকে চেয়েছিল। মীটারের টাকা পয়সার অংক-গুলো যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, তার সঙ্গে তাল রেখে বিমলেন্দুর হৃদ্পিণ্ডটাও সমানে লাফাচ্ছিল। চোখদুটো মীটারে স্থিরনিবদ্ধ থাকলেও মীরার কথাগুলো বিমলেন্দুর কানে গিয়েছিল, মুখ বিকৃত করে সে বলল, খুব যে ফুর্তি দেখছি! মনে থাকে যেন ফেরবার সময় হেঁটে আসতে হয় সেওভি আচ্ছা, ওসব ট্যাকসি-ফ্যাকসি চলবে না।

ট্যাক্সি ঘোষবাবুর বাজারের কাছে এসে পড়ল। পাশের গলিতেই বিমলেন্দুর কাকার বাড়ী। সুপ্রভা ড্রাইভারকে বলল, রোখো, রোখো।

ফুটপাথ ঘেঁষে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়ল। কাল বিলম্ব না করে বিমলেন্দু নিজেই ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে পড়ল। যথা লাভ। কাকার বাড়ী পর্যন্ত ট্যাক্সি গেলে মীটারের টাকার অংক আরো চড়ত নিশ্চয়ই, কাকার বাড়ী অবশ্য এখান থেকে বেশি দূরে না, সামান্য কিছু পয়সা হয়তো বেশি লাগত ওই পর্যন্ত গেলে, তবু সুপ্রভার সুমতি হওয়ার দরুণ যা দু পয়সা বাঁচল তাই যথেষ্ট। কিন্তু মীটার দেখে বিমলেন্দুর চক্ষুস্থির। সাত টাকা আশি পয়সা। সুপ্রভা আর মীরা ততক্ষণে ফুটপাতে নেমে দাঁড়িয়েছে। ঢোক গিলে বিমলেন্দু ট্যাকসির ভাড়া মিটিয়ে দিল।

রাস্তা পার হয়ে বাজারের গেটের সামনে আসতে সুপ্রভা বলল, পাঁচটা টাকা দাও, ফল কিনতে হবে।

এতক্ষণে বিমলেন্দু সুপ্রভার আগে-ভাগেই ট্যাকসি থেকে নামবার তাৎপর্যটা অনুধাবন করতে পারল। বিরস মুখে সে বলল, ফল কি হবে আবার?

—কি আবার হবে? রুগী দেখতে গেলে সবাই ফল নিয়ে যায়।

বিমলেন্দু আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করল, কাকাবাবুর তো গলায় ক্যান্সার, কিছু খেতে পারেন না শুনেছি।

—সে তোমার ভাবতে হবে না, সুপ্রভা ধমকে উঠল, তুমি টাকা বার করো, আমি শুধু হাতে যেতে পারব না। আমার কি মান-সম্মান নেই নাকি?

বাজারে ঢুকে ফল কিনে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। গলিতে ঢুকে সুপ্রভা আর মীরা আগে আগে হাঁটছিল, ফলের ঠোঙা হাতে বিমলেন্দু পেছনে। অনেকগুলো টাকা গচ্চা গেছে, সেই শোক বিমলেন্দুকে ক্লান্ত বিমর্ষ করে তুলছিল, কি এক অবসাদে যেন তার সারা শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, পায়ের গতিও কেমন শ্লথ মন্থর হয়ে আসছিল।

মীরা সুপ্রভার পিছন পিছন কাকার বাড়িতে ঢুকে একতলার বারান্দায় আসতে বিমলেন্দু বেশ কিছু মেয়েপুরুষের জটলা দেখতে পেল। মুমূর্ষু মানুষটাকে দেখতে অনেকেই এসেছে। নিকটআত্মীয় ছাড়াও দূর সম্পর্কের কিছু মানুষও যেন এসেছে মনে হয় কেননা বেশ কয়েকজন মেয়ে পুরুষকে বিমলেন্দু চিনতে পারছিল না। অপরিচিত মানুষগুলোর সকলেই যে আত্মীয় এমন অবশ্য কোনো কথা নেই, কাকার কি তাঁর ছেলেদের বন্ধুবান্ধবীও হতে পারে। একতলার এই প্রশস্ত বারান্দাটা বহু মানুষের কণ্ঠস্বরে বেশ সরগরম, সমাগত মেয়ে-পুরুষদের বেশভূষা হাসি আলাপে কেমন একটা উৎসব-উৎসব গন্ধ যেন পাওয়া যায়। বারান্দায় একপাশে একখানা ইজিচেয়ারে কাকীমাকে বসে থাকতে দেখল বিমলেন্দু, সাদা খোলের লালপেড়ে একখানা তাঁতের শাড়ীতে, কপালে সিঁদুরের বড় কোটায় শান্তসমাহিত কাকীমার চেহারার একটা সহজ সপ্রতিভ ভাব ফুটে উঠেছে। প্রতিটি মানুষের দিকেই কাকীমার দৃষ্টি সজাগ, নতুন কেউ এলেই তাকে কাছে ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে তাঁর একবারও ভুল হচ্ছিল না। কাছে যাওয়ার জন্য হাত ইশারা করে সুপ্রভাকে ডেকে কাকীমা বললেন, প্রভা এয়েছো, তা এতদিনে তোমার আসবার সময় হল মা?
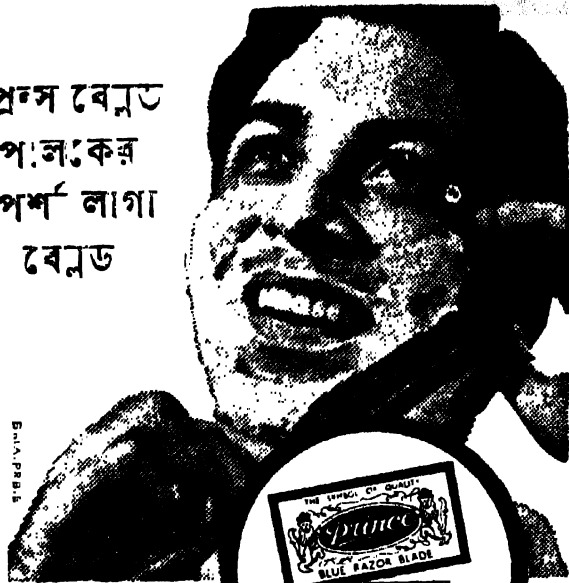
বিমলেন্দুর হাত থেকে ফলের ঠোঙাটা নিয়ে সুপ্রভা কাকীমার দিকে এগিয়ে গেল। কাকীমার অনুযোগের উত্তরে সুপ্রভা কি বলল বিমলেন্দু তা শুনতে পেল না, তার চোখ তখন জটলার মধ্যে হঠাৎ পরিতোষকে দেখতে পেয়ে খুশিতে চকচক করে উঠেছে। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ক্লান্তি বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠল বিমলেন্দু, তার রক্তের মধ্যে ফের সজীবতা অনুভব করল সে। পরিতোষ এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিল, বিমলেন্দুর সম্পূর্ণ অপরিচিত ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পরিতোষ এই সময় হঠাৎ বাঁ হাত চোখের সামনে তুলে ধরে হাত ঘড়ি দেখল তারপর ঈষৎ ব্যস্ত ভঙ্গিতে বারান্দা অতিক্রম করে সদর দরজার পথ ধরল। বিমলেন্দু পেছন থেকে খপ্ করে পরিতোষের হাত চেপে ধরল তারপর ঘুরে গিয়ে পরিতোষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গলায় যথাসম্ভব মেয়েলী ঢঙ আনবার চেষ্টা করে বলল, পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ?

এমনিতে বিমলেন্দুর রসিকতা বড় একটা আসে না, কিন্তু কার্যোদ্ধারের সময় প্রয়োজনমত রঙ্গরসিকতা করতে বিমলেন্দুর জুড়ি নেই। পরিতোষের বোধ হয় কোথাও যাবার বেশ তাড়া ছিল, বিরক্ত স্বরে চাপা ধমক দিল সে, আঃ, কি হচ্ছে বিমল, পথ ছাড়, আমার এখন ঠাট্টাইয়ার্কি করবার সময় নেই, ভীষণ ব্যস্ত আমি।

—কিন্তু আমারও যে তোমাকে ভীষণ দরকার। একেবারে যাকে বলে ক্যাপিটাল লেটার্সে মোস্ট আর্জেন্ট।

—হঠাৎ এ অধমকে এত দরকার পড়ল যে?

বিমলেন্দুকে যেন রসিকতায় পেয়েছে, গলায় গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে সে বলল, টেন্ডার ইজ দি কজ মাই সোল।

বিমলেন্দুর বলার ভঙ্গিতে এবার পরিতোষ না হেসে পারল না, বলল, তা এতে আমার কি করবার আছে? অফিস থেকে টেন্ডার ইনভাইট করেছে, তুমি তোমার কোটেশান দাও।

—সেইজন্যেই তো তোমাকে দরকার, তুমি হচ্ছ গিয়ে ভেতরের লোক। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে কোটেশানটা দিতে চাই।

—আমি আর কি পরামর্শ দেব? এতকাল এসব কাজ করছ, তুমি নিজেই হিসেব করে যা করবার করো। পরিতোষের গলায় কেমন একটা নির্লিপ্তি।

বিমলেন্দু ঝানু ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ের সূত্রে বহু মানুষের সঙ্গে তাকে ওঠাবসা করতে হয়। কম তো না, আটচল্লিশ বছর বয়েস হল তার, মেয়ে মীরারই তো বয়েস আঠারো হল বোধ হয়, এই দীর্ঘকাল সে মানুষের ভাবগতিক দেখে আসছে, শুধু দেখে আসছে না, চটপট তাকে মানুষের মনের কথা বুঝে ফেলতে অভ্যেস করতে হয়েছে, কোন ফুলে কটি বাতাসায় কোন দেবতা তুষ্ট তাকে জানতে হয়েছে তবেই না দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছে বিমলেন্দু। সুতরাং পরিতোষের এই বাহ্যতঃ অনাসক্তির মূল কারণ অনুধাবন করতে বিমলেন্দুর এতটুকু বিলম্ব হল না। সম্পর্কে পরিতোষ মামাতো ভাই হলে কি হবে, বখরায় কমতি হলে তারও মুখ যে বেজার হবে এতো স্বাভাবিক। আড়চোখে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে বিমলেন্দু বলল, গেলবার টেন পার্সেন্ট দিয়েছি বলে মুখ ভার করে থেকো না, এবার ফিফ্‌টিন পার্সেন্ট দেব। এখন প্রসন্ন হও দেবী, না গুড়ি দেবী নয় দেব।

—পরশু লাস্ট ডেট, এখন ঠাট্টা রাখো, পরিতোষ বলল, কথা হচ্ছে কোটেশান কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৈরী করব নাকি?

—না না, এখানে কেন, বাইরে কোন চায়ের দোকান-টোকানে বসতে হবে। কলম তো আছেই, শুধু কাগজটা কিনে নিতে হবে কোনো স্টেশনারী দোকান থেকে। সূচনা অবশ্যই শুভ বলতে হবে, না হলে তোমাকেই বা এখানে পাব কেন, কাল আবার আমাকে তোমার অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করতে হোত।

—নাও, আর বকবক কোরো না, পরিতোষ চাপা ধমক দিল, এখন কোথায় যাবে তাড়াতাড়ি চলো। হিসেব করতেও অনেক সময় লাগবে।

দুজনে বেরিয়ে গেল।

মীরা সুপ্রভার পেছনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে আড়চোখে সুব্রতকে দেখছিল। বারান্দায় জটলার এক পাশে সরে গিয়ে সুব্রত অন্য সকলের চোখ বাঁচিয়ে মীরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিল। কিন্তু মীরা কখনো সোজাসুজি সুব্রতর দিকে তাকাচ্ছিল না, মীরার গম্ভীর থম থমে মুখে বরং সুব্রতকে আমল না দেওয়ার একটা প্রতিজ্ঞা ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছিল। পরিতোষকে নিয়ে বিমলেন্দু বেরিয়ে যেতেই সুব্রত আস্তে আস্তে এসে মীরার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল তারপর ফিসফিস করে বলল, একটা জরুরী কথা আছে।

মীরার এখন যা বয়েস, এই সব সতেরো-আঠারো বছর বয়েসের মেয়েদের কাছে কোন যুবকের জরুরী কথার একটা গভীর গোপন তাৎপর্য থাকে, ওই শব্দগুলোর সঙ্গে শরীরের এক বিচিত্র শিহর যেন অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধা। মীরা তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে এখন সেই শিহর অনুভব করল, সুব্রতকে কোনরকম পাত্তা না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে, মৃদু গলায় সে বলল, বলুন।

তেমনি ফিসফিস করে সুব্রত বলল, এখানে বলতে পারব না।

সুব্রতর এই কথায় মীরার কৌতূহল আরো তীব্র হয়ে উঠল, উত্তেজনা দমন করে সেও চাপা গলায় বলল, তবে কোথায় বলবেন।

—ওপরে চল, সকলেই তো এখানে, ওপরে বিশেষ কেউ নেই মনে হচ্ছে।

সকলেই এ ওর সঙ্গে কথা বলছে, কেউ বিশেষ লক্ষ্য করল না, চুপচুপি প্রথমে সুব্রত তারপর মীরা বারান্দার বাঁ দিক ঘেঁষে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

সেই মুহূর্তে সুপ্রভা বলছিল, কিন্তু হাসপাতালে দিলেন না কেন? সেখানে তবু চিকিৎসাটা ভাল হতো।

বিমলেন্দুর ছোট কাকীমা অর্থাৎ সুপ্রভার খুড় শাশুড়ী বললেন, চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন বলে হাসপাতালও আর রাখতে চাইছিল না, রুগীর ভিড় তো কম নয় আজকাল, আমরাও জোরাজুরি করিনি, কদিনই বা আর বাঁচবেন, মিছিমিছি আর হাসপাতালে ফেলে রেখে কি লাভ, তবু যা হোক চোখের ওপর দেখতে পাব। অনেকগুলো কথা একনাগাড়ে বলবার জন্যেই বোধ হয় দম নিতে একটু থামলেন খুড় শাশুড়ী; তারপর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাও দেখে এস, কোণের ঘরে আছেন।

দোতলার ঝুল-বারান্দাটা সত্যি সত্যিই ফাঁকা। বারান্দায় দুটো আলোর একটাও জ্বলছে না, কেউ এখন পর্যন্ত এদিকে আসেনি মনে হচ্ছে, এলে অন্ততঃ একটা আলো নিশ্চয়ই জ্বলত। উত্তর দিকের অংশটা আরো বেশি নিরিবিলি, অন্ধকারও ওখানটায় বেশ ঘন। পেছন দিকের ঘরখানা থেকে কাঁচের জানালা চুঁইয়ে যে আলোটুকু

আসছে তাও যৎসামান্য। অনুচ্চ ছোট পাঁচিল দিয়ে বারান্দাটা ঘেরা, একটু ঝুঁকে দাঁড়ালে গলির রাস্তাটা ভালোভাবে দেখা যায়। পাঁচিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে সুব্রত বলল, তোমার এত রাগের কিন্তু কোনো মানে হয় না মীরা।

—না, রাগবে না, মীরা ফোঁস করে উঠল, আপনি আমাকে ফেলুরাণী বলবেন কেন?

—একটু ঠাট্টাও করতে পারব না এ কেমন কথা!

—এর নাম ঠাট্টা, মীরার গলা অভিমানে থম থম করছিল, না হয় দু'বার প্রি-ইউ-নিভার্সিটি পরীক্ষায় ফেল করেছি, তা বলে আপনি আমাকে ফেলুরানী বলে ডাকবেন? আমার বুঝি মনে লাগে না।

—তুমি বিশ্বাস করো মীরা, সুব্রতর গলা অনুতাপে কোমল শোনাল, কথাটা তুমি এমন সিরিয়াসলি নেবে আমি বুঝতে পারিনি।

—তা পারবেন কেন, মীরা ঠেস দিয়ে বলল, নিজে ডাক্তারী পড়ছেন তো, সেই দেমাক নিয়েই থাকেন, অন্যের কথা কি বুঝবেন?

এই সময় নিচের কোন ঘরে কে যেন রেডিও খুলে দিয়েছে, বেশ জোরেই ছেড়েছে নিশ্চয়, কেননা এখান থেকেও হিন্দী গানের কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত স্বরে মীরা বলল, এরা কি রকম মানুষ দেখছেন, রুগীর বাড়িতে কেউ এত জোরে রেডিও ছাড়ে?

নিচে রুগীর ঘরের দরজার কাছাকাছি একখানা টুলের ওপর বসে বসে হিরণ ঢুল ছিল। রাতে ঘুমোতে পায় না সে, রুগীর পরিচর্যা করতে হয়, তাই দিনরাত সব সময় তার চোখে শুধু ঘুমের ঢুলুনি। রেডিওতে উচ্চগ্রামে হিন্দী গান বাজছে, সেই আওয়াজ কানে আসতে হিরণের চটকা ভেঙে গেল। আচমকা জেগে উঠে সে সামনে সুপ্রভাকে দেখল।

কি রে, অসময়ে এত ঢুলছিস কেন, রাতে ঘুমোস না নাকি?

—ঘুমোতে দিচ্ছে কে, হিরণ হাই তুলল, ওষুধ-পথ্যি, বিছানা পাল্টানো, ময়লা সাফ করা রুগীর যাবতীয় সবকিছু আমাকেই করতে হয়। ঝিনে-মাইনেয় এমন সেবাদাসী তো আর কেউ নেই। রাত জেগে জেগে শরীরে আর কুলোয় না তবু শব্দটি করি না। আমি পরের গলগ্রহ, আমার কথা কে শুনবে বলো? দু' মুঠো খেতে দিচ্ছে এই ঢের।

হিরণের গলা কান্নায় জড়িয়ে আসছিল। ছোট খুড়শ্বশুরের মেজ মেয়ে হিরণ। বিয়ের তিন মাস না যেতেই হিরণের কপাল পুড়ল। অলক্ষুণে বউয়ের শ্বশুর বাড়ীতে ঠাঁই হল না, নিঃসন্তান বিধবা হিরণ সেই থেকে বাপের বাড়ীতে পড়ে আছে। বছরের পর বছর বাপের বাড়ীতে আছে হিরণ কিন্তু মেয়ের মর্যাদা নেই তার, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে চলবার মতো লেখা-পড়ার জোর ছিল না হিরণের, আস্তে আস্তে বাড়ীর সকলেই ঝি-চাকরের কাজগুলো একে একে কখন যেন তার হাতে তুলে দিয়েছে। স্বামীহারা বিধবা মেয়ে মানুষের যে এই পৃথিবীতে কোথাও কোন জোর নেই, থাকে না, কখনো জামা কাপড় কাচতে কাচতে, কখনো ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বা এর ওর ফরমাইশ খাটতে খাটতে ক্রমশঃ হিরণ তা বুঝে ফেলেছে। বুঝে ভিতরে ভিতরে যেমন হতভম্ভ হয়ে গিয়েছে, বাইরেও তেমনি বোবা হতে শিখেছে। কিন্তু সুপ্রভা এ বাড়ীর কেউ নয় বাইরের মানুষ, তাই সুপ্রভাকে কাছে পেয়ে অনেক দিন পর কিছুটা আক্ষেপ প্রকাশ না করে সে পারল না।

সাদা ধবধবে বিছানার ওপর খুড়শ্বশুর চোখ বুজে শুয়ে আছেন, সেইদিকে চকিতে একবার তাকিয়ে সুপ্রভা বলল, আস্তে বলতে পারিস না, কাকাবাবু শুনতে পাবেন যে!

—কিচ্ছু শুনতে পাবে না, হিরণ গলা নামাল না একটুও, ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আর তো কোন চিকিৎসা নেই, ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয় কেবল।

বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুপ্রভা কয়েক মুহূর্ত খুড়শ্বশুরের শীর্ণ ফ্যাকাসে মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকল, ফলের ঠোঙাটা নামিয়ে রাখল পাশের ছোট টেবিলটার ওপর তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

ফের পুরনো কথার জের টেনে হিরণ বলল, অন্য সবাইর কথা ছেড়ে দাও, মাও বড় একটা আসে না এদিকে, কোনমতে একবার এসে উঁকি দিয়ে চলে যায়। তুমি আবার মাকে বোলো না যেন এসব।

বারান্দায় ফিরে আসতে খুড়শাশুড়ী সুপ্রভার দিকে তাকালেন তারপর বড় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দেখতে এসে ভালই করলে প্রভা, কখন যে চোখ বোজেন ঠিক তো নেই। আমারও মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, উনি তো যাচ্ছেনই, ভাবনা-চিন্তায় আমিও শেষ হয়ে গেলাম।

খুড়শাশুড়ীর শান্তসমাহিত মুখে ভাবনাচিন্তার কোন লক্ষণ দেখতে পেল না সুপ্রভা, অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল সে। বহুদিনের পুরনো ঝি সুবর্ণ পাশেই দাঁড়িয়েছিল, এখানে এসে অবধি সুপ্রভা ওকে ওখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে, বোধ হয় গিন্নীমার ফাই-ফরমাশ খাটাই ওর প্রধান চাকরি, সুপ্রভার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সুবর্ণর দিকে তাকিয়ে খুড়-শাশুড়ী বললেন, কি যে ছাই পান দিলি তখন সুবাস, মুখেও লাগল না, আর দুখিলি পান দে, ভালো করে ছেঁচে দিস কিন্তু।

সুবর্ণ চলে যেতে খুড়শাশুড়ীর যেন এতক্ষণে খেয়াল হয় রেডিওটা বড় বেশি জোরে বাজছে, কথাবার্তা বলতে শুনতে অসুবিধে হচ্ছে, মুহূর্তে তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল, ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বললেন, কান ঝালাপালা করে দিলে একেবারে। প্রভা, তুমি ও ঘরে ছোটবৌমাকে রেডিওটা একটু আস্তে করে দিতে বল না মা।

ওপরে খুল-বারান্দায় রেডিওর আওয়াজ হঠাৎই কমে অস্পষ্ট হয়ে আসায় মীরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বলল, বাব্বা, বাঁচা গেল। শান্তিতে দুটো কথা বলা যাবে এখন।

বারান্দার এই অংশটা আগের মতই নিরিবিলি, অন্ধকারও তেমনি ঘন। কিন্তু সুব্রত চুপ করে আছে, মীরাও যেন আর কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না, অথচ অন্য সময় সুব্রত যখন কাছে থাকে না, কত কথা এসে ভিড় করে মীরার মনের মধ্যে। বলবার মতো কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে না, আবার একেবারে চুপচাপ থাকতেও অসহ্য লাগছে। শেষ পর্যন্ত মীরা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ছোট ঠাকুরদা আপনার কি হন?

—এই তো মুস্কিলে ফেললে, সুব্রত বলল, আমি ঠিক বলতে পারব না, সে এক জটিল ব্যাপার।

—কি রকম? মীরা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

—উনি হলেন আমার মায়ের সেজ পিসেমশাইয়ের ছোট ভাই, এখন তুমি হিসেব করে দ্যাখো আমার কে হন।

মীরা হেসে ফেলল, অন্ধকারে ওর সাদা দাঁতগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল, বলল, আমার দ্বারা হবে না, কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে যেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর মীরা এবার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ডাক্তারী পাশ করবার পর আপনি কি করবেন? প্র্যাকটিস না চাকরি?

দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল সুব্রতর ঠোঁটে, ঘন অন্ধকারের জন্যেই বোধ হয় সেটা মীরার চোখে পড়ল না, মীরার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে সুব্রত বলল, তুমি যা বলবে তাই করব।

আবেগে উত্তেজনায় মীরার শরীর কেঁপে উঠল, সলজ্জ ভঙ্গীতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে কপট ক্রোধের সুরে সে বলল, এ রকম করলে আমি কিন্তু নিচে চলে যাব।

সুব্রত কোন কথা বলল না, মীরাও চুপচাপ। খানিক পরে অস্বস্তিকর নীরবতাটা কাটাবার জন্যেই যেন একটু ঝুঁকে পড়ে সুব্রত গলির রাস্তায় চোখ রাখল। একটু বাদে সুব্রতর দেখাদেখি

মীরাও কনুইয়ে ভর দিয়ে পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। গলির রাস্তায় খুব একটা লোকজন নেই এখন আর। ঠুন ঠুন আওয়াজ তুলে দু'একখানা রিকসা আসছে-যাচ্ছে। একখানা ট্যাক্সিও গলির রাস্তা ধরে বেরিয়ে গেল অনেকক্ষণ পর। আটটা বেজে গেছে বোধ হয়, দোকানীরা একে একে ঝাঁপ ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। এই সময় ছাই রঙের একখানা প্রকাণ্ড মোটরগাড়ি প্রায় নিঃশব্দে গলিটায় ঢুকে পড়ল এবং তার পর ঝুল-বারান্দার ঠিক সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। মোটরের দরজা খুলে একটি মেয়ে নামল। বছর পঁচিশেক বয়েসের ছিম-ছাম চেহারার মেয়েটি, ওপর থেকেও তার বেশভূষার চাকচিক্য বেশ চোখে পড়ছে।

চোখ বড়ো করে মীরা মেয়েটিকে দেখছিল, ঘাড় ফিরিয়ে সুব্রতর চোখে চোখ রেখে বলল, ও কে জানেন?

সুব্রত ঘাড় নাড়ল।

—ও হচ্ছে রিণা সোম, ছোট ঠাকুরদার শালীর সেজ মেয়ে। মস্ত বড়লোক ওরা।

রিণা ততক্ষণে সদর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে। নিচের বারান্দায় কালোমাসী তখন সুপ্রভাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে করতে কোণঠাসা করে ফেলেছে। প্রকাণ্ড চেহারাটা নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে কালোমাসী সুপ্রভাকে বলছিল, দুটো পয়সার মুখ দেখেছিস বলে অত অহংকার করিস নি প্রভা। গরীব বলে এত অছেদ্দা যে দশমীর পেন্নামটা পর্যন্ত করতে যাসনি গেল বছর। গুরুজনদের মনে—

সেই মুহূর্তে রিণা বারান্দায় এসে দাঁড়াতে বাকি কথাটা আর শেষ করল না কালোমাসী, হাঁ করে তাকিয়ে রইল রিণার দিকে। শুধু কালোমাসী কি সুপ্রভা নয়, বারান্দার প্রত্যেকটি প্রাণী উগ্র প্রসাধনে রঞ্জিত রিণার দিকে তাকিয়ে যেন চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল। রিণা যে খুব একটা রূপসী তা নয়, তবু তার বেশভূষা প্রসাধনে এমন একটা পারিপাট্য, তার চলা কিংবা দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যে এমন অদ্ভুত একটা ঋজুতা যে অতি সহজেই মানুষের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করে নেয়। উগ্র প্রসাধনের জন্য প্রথমে চোখ একটা ধাক্কা খায় বটে, তবে সয়ে যাবার পর মনে হয় এনামেলকরা মুখ এবং ঠোঁটের চড়া রঙ রিণার মধ্যে একটা অভিজাত অলৌকিক সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। রিণা এগিয়ে আসছিল, প্রতি পদক্ষেপে তার সুঠাম দেহ-বল্লরী যেন নাচছিল, সুপ্রভাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হঠাৎ বোধ হয় তার নাকে বারান্দার পাশের উঠোন থেকে কোনো ভ্যাপসা গন্ধ এসে লেগে থাকবে, কেননা ওই উঠোনের দিকে তাকিয়েই নাক কুঁচকে রিণা তার হাতের ছোট রুমালটা নাকে চেপে ধরল, বলল, অফুল।

সুপ্রভার খুড়শাশুড়ীকে এইবার যেন একটু বেশি ব্যস্ত মনে হল, নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে তিনি বললেন, আরে রিণা যে। আয়, আয়, তারপর বাড়ীর সব খবর ভালো তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাল, এখন তুমি চট্ করে বলো দিদি মেসোমশাই কোন ঘরে আছেন, রিনার গলা থেকে অধীর ব্যস্ততা ঝরে পড়ল, দেখেই আবার এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে।

—এত তাড়া কিসের?

—তাড়া! বল তাড়ার চেয়েও বেশি, কাল ন্যুইয়র্ক চলে যাচ্ছি আমরা, তার যোগাড়-যন্তর আছে না? ও তো আসতেই পারল না, চৌরঙ্গীতে পার্টি রয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে সেই পার্টিতে ছুটব। আমার ওপর কি রকম স্ট্রেন পড়ছে বুঝতে পারছ? নাউ, হ্যারি আপ মাই ফেয়ার লেডি, প্লিজ।

রিণার মাসীমা আঙুল দিয়ে কোণের ঘর দেখিয়ে দিলেন। রিণা ঘরে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে এসে ফের বারান্দায় এল। তারপর মাসিমাকে বলল, এখন চলি তাহলে, বাই বাই।

পায়ের জুতোয় শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল রিণা, দোতলার ঝুল-বারান্দা থেকে মীরা আর সুব্রত রিণাকে গাড়িতে উঠতে দেখল। তারপর হর্ণের প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে গাড়িটা গলি থেকে বেরিয়ে গেল। গলি থেকে গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত পরেই গলির বাঁকের মুখে বিমলেন্দুকে দেখতে পেল মীরা। বেশ দ্রুত-পায়েই যেন এগিয়ে আসছে বিমলেন্দু। মীরা সুব্রতকে বলল, এই, বাবা আসছেন। তাহলে ওই কথা রইল কিন্তু।

—হ্যাঁ, কাল ঠিক আড়াইটের সময় পাঁচ মাথার মোড়ে থাকব আমি।

—না থাকলে খুব খারাপ হবে কিন্তু। মীরা শাসাল। মীরাকে আশ্বস্ত করবার জন্য তিন সত্যি করল সুব্রত, থাকব, থাকব, থাকব।

ঝুল-বারান্দা ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল মীরা। সুব্রত একটু পরে নেমে আসবে ঠিক করল, সেইটেই সর্বদিক থেকে ভালো। বিমলেন্দু ততক্ষণে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার সারা শরীরে ব্যস্তসমস্ত ভাব কাচ-পিসী এই সময় মায়ের নেকলেসটার সমালোচনা করছিল, যাই বলো প্রভা, তোমার নেকলেসটার ডিজাইনটা কিন্তু সাত-পুরনো। পয়সা হলেই মানুষের যে রুচি পাল্টায় না তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়।

দ্রুতপায়ে হেঁটে আসার জন্যই বিমলেন্দু বারান্দায় পৌঁছে হাঁফাচ্ছিল, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। আসবার সময় ট্যাকসির পিছনে খরচার জন্য তার মনটা এখনো খচখচ করছে, ফের ট্যাক্সি খরচের ভয়ে তার বুকের ভেতরটা এখন বেশ কাঁপছে, কেননা রাত ন'টা বেজে গিয়েছে, এবং রাত নটার পর কলকাতা থেকে শহরতলীতে যাবার বাস সার্ভিস বড়ো অনিয়মিত তো বটেই তা ছাড়াও শেষের দিকের বাসগুলোয় ভীষণ ভিড় হয়, ছাদে চড়েও বহু মানুষকে যেতে হয় কখনো কখনো, এই অবস্থায় এখন স্ট্যান্ডে গিয়ে কোনমতে একখানা বাসে উঠতে না পারলে ফের সেই ট্যাক্সি এবং ট্যাক্সি মানেই বিমলেন্দুর গায়ের রক্ত জলকরা বেশ কিছু কড়কড়ে নোট। ব্যস্ত অসহিষ্ণু গলায় বিমলেন্দু বলল, ওসব গয়নার কথা পরে হবে, এখন শীগ্গির চলো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো, সুপ্রভাও কোন আপত্তি না করে পা বাড়াল, চলরে মীরা, ওবেলার রান্না রয়েছে সেগুলো গরম করতে হবে, দুটি-ভাতও ফোটাতে হবে। তাই কত রাত হবে কে জানে।

বাইরে এসে বিমলেন্দু দ্রুত পা ফেলছিল। গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি এসে সে দেখল, মীরা সুপ্রভা বেশ খানিকটা পিছনে পড়ে গেছে। বিমলেন্দু বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু বাদেই সুপ্রভা মীরা বিমলেন্দুকে এসে ধরল। এইবার ওরা একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছল।

সুপ্রভা বলল, কি চেহারা হয়েছে কাকাবাবুর দেখেছ, চেনাই যায় না একেবারে, তাই না?

—এই যাঃ, বিমলেন্দু জিভে কামড় দিল তারপর জিভের ওপর থেকে দাঁত সরিয়ে বলল, দেখেছ, একদম ভুলে গেছি, আমি তো কাকাবাবুকে একবারটি দেখলামও না।

ছি ছি, তুমি কি রকম মানুষ, কাকাবাবুকে দেখবার কথা ভুলে গেলে! সুপ্রভার গলায় আফসোস, এত পয়সা খরচা করে এখানে এসে কি লাভ হল তাহলে?

—লাভ! এইবার বিমলেন্দু হাসল বলল, লাভ যে একেবারে হয়নি তা বলতে পারি না, আর কিছু না হোক গিলবার্ট কোম্পানীর চল্লিশ হাজার টাকার কন্ট্রাক্টটা তো পাব। পরিতোষ নিজের গরজেই ওটা যাতে পাই তার ব্যবস্থা করবে। তাই নাকি! চোখ বড়ো বড়ো করে সুপ্রভা তাকাল, এবার কিন্তু আমাকে নতুন ডিজাইনের নেকলেস করে দিতে হবে বলে রাখছি।

চল্লিশ হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট ছাড়াও আরো একটা লাভ হয়েছে, সুপ্রভা ভাবল। ভেবে নিজের মনেই হাসল সে। সেই লাভের কথাটা অবশ্য এখুনি বিমলেন্দুকে বলা চলে না। বিমলেন্দুর কাকার বাড়ী গিয়ে পৌঁছনোর একটু পর থেকে চলে আসবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টা মীরা আর সুব্রত যে দোতলায় একসঙ্গে কাটিয়েছে, সুপ্রভা সেটা খেয়াল করেছে বৈকি। সুব্রত ডাক্তারী পড়ছে, দেখতেশুনতেও মন্দ না, মীরা যদি অমন একটা পাত্র বিনা পয়সায় গেঁথে তুলতে পারে মন্দ কি! পারবে কিনা সেটা বুঝতেই যেন সুপ্রভা ভালো করে একবার মীরাকে দেখল।

একখানা বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। বেশ ফাঁকা। মীরা সুপ্রভার বসার জায়গা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

সুপ্রভা মীরার পেছনে পেছনে বাসের দরজার দিকে এগোতে এগোতে বিমলেন্দু এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পরিবার পরিকল্পনাঃ আরেক দৃষ্টিতে

মনুর সন্তানদের বংশ বৃদ্ধি দিনে দিনে পৃথিবীর পক্ষে ভয়ানক ভাবনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বংশবৃদ্ধির ধারা যদি অব্যাহত থাকে তবে বিপদ অনিবার্য। আর সেই বিপদসংকেত প্রায় আমাদের দরজার কাছাকাছি। যে কোন সময় এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এবং এর ফলে সমস্ত মনুষ্যজাতিকে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে। সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে ঘটনাটি বিস্তারিত বললে সকলের পক্ষে সহজ বোধগম্য হবে। পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা হচ্ছে ৩৭০-৬ কোটি। এই শতাব্দীর শেষে তা হবে দ্বিগুন। দেখা যাচ্ছে যে তখন পৃথিবী জনসংখ্যার ভারে প্রকম্পিত হবে। অথচ গোড়ার দিকের হিসেব নিলে ঠিক এর সঙ্গে মেলে না। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের এ হিসাবে দেখা যায় যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১০০ কোটি। এই জনসংখ্যা দ্বিগুন হলো ১৯৩০-এ। কিন্তু তিন গুন হয়ে গেল মাত্র তিরিশ বছর পরেই অর্থাৎ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে।

পৃথিবীর এই ব্যাপক জনবৃদ্ধি আমাদের বিশেষ করে নাড়া দেয় এই কারণে যে ভারতবর্ষ হলো জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। চীন শীর্ষ-স্থানে। ১৯৭১-এর জন-গণনা অনুযায়ী আমাদের লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪-৭ কোটিতে। পৃথিবীর সমস্ত লোকসংখ্যার শতকরা ১৪-৪ জন হলো ভারতবাসী। আমেরিকা, রাশিয়া আর জাপানের লোক-সংখ্যা যোগ করলে যা দাঁড়াবে আমাদের দেশেই তার সমান মানুষের বাস। ভারতীয় জনসংখ্যা শতকরা ২-৬ জন হারে প্রতি বছর বেড়ে চলেছে। আগামী ২৭ বছরের মধ্যে এই হার দ্বিগুন হওয়ার সম্ভাবনা। ১৮৫০-এ পৃথিবীর জনসংখ্যা যা ছিল আগামী ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা হবে তার চেয়ে ১০ কোটি বেশি। অবশ্য পৃথিবীর সব দেশে একই নিয়মে জনসংখ্যা বাড়ছে না। বিভিন্ন দেশে এই বৃদ্ধির হারও ভিন্ন ভিন্ন।

প্রতি হাজারে আমাদের দেশের বর্তমান জন্ম ও মৃত্যুহার যথা-ক্রমে ৪২ এবং ১৭। জন্মহারের ক্ষেত্রে আমরাই অবশ্য সর্বোচ্চ নয়! আফ্রিকা মহাদেশে জন্মহার সবচেয়ে বেশি। নাইজেরিয়া, রোওয়ান্ডা এবং সোয়াজিল্যান্ড এক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে রয়েছে এসব দেশের জন্মহার প্রতি হাজারে ৫২ জন। আর এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী দেশ হলো লুক্সেমবার্গ এবং সুইডেন। এ দুই দেশের জন্মহার হলো প্রতি হাজারে ১৩-৫ জন। এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করছে আফগানিস্থান। এই প্রসঙ্গে আরো একটা বলে রাখা ভালো যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জন্মহার কোন সময়ই খুব বেশি নয়। কারণ, সেসব দেশে স্বাভাবিক জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু আছে। অবশ্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনায় তফাৎ বিস্তর। প্রথমটিতে সন্তান না চাওয়ার অভিলাষ এবং শেষোক্তটিতে ইচ্ছে মতো সন্তান চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বর্তমান জনসংখ্যার চাপে অস্থির পৃথিবীতে এ দুয়ের মধ্যে আমরা আর ফারাক খুঁজে পাচ্ছি না। সবই আমাদের কাছে একই অর্থে হাজির হচ্ছে যে, জনসংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায় এবং এ ব্যাপারে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এবার প্রাসঙ্গিক কথায় আসা যাক। মৃত্যুহারের দিক দিয়েও আফ্রিকা সব দেশকে টেক্কা মেরেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মৃত্যুহার হলো পশ্চিম আফ্রিকার অ্যাংগোলায়—প্রতি হাজারে তিরিশ জন। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্থানের অধিকারীদের তালিকায় আছে তাইওয়ান, সিংগাপুর এবং অন্যান্য তিনটি ছোট দেশ। এসব দেশের মৃত্যুহার হলো প্রতি হাজারে ৫ জন। এদিকে পৃথিবীর তিনটি অগ্রগণ্য দেশ আমেরিকা, বৃটেন এবং রাশিয়ার জন্মহার ও মৃত্যুহার হলো যথা-ক্রমে ১৮-৩ এবং ৯-৩, ১৬-৬ এবং ১১-৯, ১৭-০ এবং ৮-১। এমনকি চীনে এই হার হলো ৩৩ এবং ১৫।

জন্মহার এবং মৃত্যুহারের এই পর্যা-লোচনা থেকে একটা তথ্য অন্তত উদ্ঘাটিত হচ্ছে যে, পৃথিবীর অগ্রগণ্য দেশগুলির তুলনায় এই দুই ব্যাপারেই আমাদের পশ্চাদ-গামিতা খুবই বেদনাদায়ক। যদিও আমাদের দেশের জন্মহার এবং মৃত্যুহারের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে তথাপি তবু মৃত্যুহার যে বেশি সেকথা অনস্বীকার্য। এর ফলে ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যান্য দেশকে অবলীলাক্রমে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ, আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ২-৬ জন এবং গোটা পৃথিবীতে সেই হার হচ্ছে শতকরা ২-০ জন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার দেশের পক্ষে রীতিমতো উদ্বেগের কারণ। এর প্রতিবিধানে ১৯৫১—৫২ সালে ভারত সরকার পরিবার-পরিকল্পনার কার্যসূচী গ্রহণ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম সরকারী উদ্যোগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস দেখা গেল। বর্তমানে পরিবার-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করা। আগামী পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে জন্ম-হার প্রতি হাজারে ৩২ জনে নামিয়ে নিয়ে আসার জন্য জোর চেষ্টা চলছে। এর সুফলও পাওয়া গেছে। নিজেদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে অনেকেই পরিবার পরি-কল্পনার আওতাভুক্ত হয়ে মোটামুটি সুখী পরিবার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের সরকারী উদ্দেশ্যও সফল হচ্ছে। প্রথমদিকে ধর্মীয় কারণ কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে-ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তা অপসারিত হয়ে গিয়েছে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, এ পর্যন্ত ৮-৬ মিলিয়ন লোক এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এই পরিমান লোক বাস করে কিউবায়। তাই সেদিক থেকে পরিবার-পরিকল্পনার সাফল্যকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা যায় না। কারণ, এই কর্মসূচীর মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক এই পরিকল্পনা। ব্যাপক প্রচারই অবশ্য এই সাফল্যলাভে আমাদের সাহায্য করেছে।

চতুর্থ পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষদিকে পরিবার-পরিকল্পনার কর্মসূচী আরো জোরদার হচ্ছে। গোটা দেশে তখন ৫২২৫টি গ্রামে পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপিত হবে, ৩১,৭৫২টি উপকেন্দ্র এবং ১৮৫৬টি কেন্দ্র থাকবে শিল্পাঞ্চলে। এর ফলে লক্ষ্যে পৌঁছুতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হবে না।

পরিবার-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাস হলো বিশেষ স্মরণীয়। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে 'পপুলেশন গ্রোথ অ্যান্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট' সংক্রান্ত আলোচনার পর প্রস্তাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস করার জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পৃথিবীর জনসংখ্যার ভার এই প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করলো। পরিবার-পরিকল্পনায় পৃথিবীতে সবচেয়ে সফল হয়েছে তাইওয়ান। ১৯৫৮—৬২ সালের মধ্যে এদেশে জন্মহার শতকরা ১০ জন হ্রাস পায়। ১৯৬৬ সালে কোরিয়ায় যে লোক গণনা হয় তাতে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা ২-৯ থেকে ২-৭-এ নেমে এসেছে। ১৯৪৮ সালে জাপানে জন্মহার ছিল হাজারে ৩৩ জন। এখন তা এসে দাঁড়িয়েছে ১৭ জনে। অবশ্য এই সাফল্যের মূল কারণ হলো গর্ভপাত। অবশ্য সম্প্রতি আমাদের দেশেও এই আইন বৈধ স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৭০—৭১ সালে পরিকল্পনার কর্মসূচী যেভাবে এগুচ্ছে তাতে ১৯৯১—৯২ সালে প্রায় ২৬ মিলিয়ন জন্মরোধ করা সম্ভব হবে আর এ পর্যন্ত ১০-৯ মিলিয়ন দম্পতি এই পরিকল্পনার সুফল ভোগ করছেন। পরিবার-পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের আরো দাবী হচ্ছে যে এসময়ে জন্মহারও হ্রাস পেয়েছে। গান্ধীগ্রাম প্রজেক্টের হিসাব অনুযায়ী জন্মহার বর্তমানে ৩৬-৩ জনে নেমে এসেছে। আর এ সম্বন্ধে সিঙ্গুরে রুরাল এরিয়া প্রজেক্টের দাবী হলো যে, জন্মহার ৩৩-৯ জনে নেমে এসেছে। তবে এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু বলা এখন সম্ভব নয়। তবে একথা সত্য যে, জন্মহার হ্রাস পাচ্ছে।

আমাদের দেশে জন্মহার যেভাবে বেড়ে চলেছিল তার মোকাবিলায় জন্যই পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী নেওয়া হয়। কারণ, তখনো পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে

এই ব্যাপক একমাত্র জবাবই হলো এধরণের কর্মসূচী। তারপর থেকে এই সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশে ব্যাপক কাজ হয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে ফসল আমরা ঘরে তুলতে পারিনি। তবে কাজ যে হয়নি এমন নয়। এই পরিকল্পনার ঘোষণাবিহীন আর একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা জন্মহার হ্রাস-এ আরো বেশি সক্ষম হবো। বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে যে, শিক্ষার প্রসারের সংগে জন্মহার হ্রাস পেয়েছে। শিল্পের বৃদ্ধি এবং গ্রামের শহরীকরণের মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাসে বহুল পরিমাণে সফল হওয়া যায়। পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যও লুকিয়ে রয়েছে এই সাফল্যের মধ্যে। ১৯৭২ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে সাক্ষরের হার শতকরা ২৯-৩ জন। অন্যদিকে রাশিয়া, আমেরিকা এবং জাপানে এই হার হলো শতকরা ৯৮ জন। এব্যাপারে গোটা পৃথিবীর গড় হলো শতকরা ৫২ জন। অর্থাৎ সর্বদিক দিয়েই শিক্ষিতের তুলনায় আমরা পিছিয়ে আছি। এছাড়া আরো একটা লক্ষ্যণীয় ঘটনা যে, কৃষিকর্মেই এখনো আমাদের জনসংখ্যার বেশির ভাগ এখনো নিয়োজিত। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ অনেক উন্নতি করেছে। আমেরিকায় শতকরা মাত্র ৯ জন কৃষিকাজ করে। এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে না ওঠা পর্যন্ত পরিবার-পরিকল্পনার সম্পূর্ণ ফসল আমরা ঘরে তুলতে পারবো না। শিক্ষা, শিল্প এবং শহরাঞ্চল বৃদ্ধির সংগে সংগে সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে আগ্রহী হবে। আর তখনই ঘটবে আমাদের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ।

—প্রমীলা

শীত শেষে

এবারের শীত তো শেষ হয়ে এলো। তাই সব বাড়ীর বধূরা শীতের যাবতীয় জিনিস কাচা ধোওয়া করে তুলতে শুরু করছেন। সেই সুবাদে আমার পিসিমাও শীতের অন্যান্য জিনিসের সংগে সযত্নে তাঁর ঠাকুমার তৈরী একটা কাঁথা ধুইয়ে রোদে শুকুতে দিলেন। কাঁথাটি খুব পুরনো। সুতরাং সেটির দীর্ঘায়ুর আভিজাত্য, সেলাই ও ডিজাইনের নৈপুণ্য আমাকে সহজেই আকর্ষণ করল।

এক সময় কাঁথা আমাদের সাংসারিক জীবনযাত্রার একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। সুতরাং তার কদর ছিল গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। এখনও অবশ্য কাঁথার কদর বা আদর একটুও কমে নি, যদিও তার প্রয়োজনটা অনেক কমে গেছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য আমরা সামান্য আয়াসেই শীতে ব্যবহার্য নানা রকম যন্ত্রচালিত জিনিস পেয়ে থাকি। তার তুলনায় কাঁথা তৈরীর মেহনত অনেক বেশী।

আমাদের দেশের মেয়েরা কর্মমুখর দিবসের ফাঁকে ফাঁকে গ্রীষ্মে গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায়, বর্ষায় ঘরের কোণে, শীতে দুপুরের মিঠে রোদ পিঠে ফেলে নিকানো উঠোনে মাদুর বা চাটাই বিছিয়ে নানা রকম গল্পের আমেজে কাঁথা সেলাই করতেন। রাতের অবসরের ফাঁকে তুলতেন রঙীন ফুল। তখন হয়তো জ্বলতো রেড়ির তেলের প্রদীপ, আজ যেমন জ্বলে কেরোসিনের বাতি, কোথাও বা বৈদ্যুতিক আলো। সবচেয়ে মজার কথা কাঁথা সেলাই যেমন সম্পূর্ণ মেয়েদের ব্যাপার তেমনি কাঁথার রকমারী ডিজাইন তাদের নিজ নিজ সৃষ্টি। একে অপরের ডিজাইনের অনুকরণে অনেকটা হেয় হয়ে যেতেন। মেয়েদের এই সৃজনী প্রতিভা রূপের মধ্যে অপরূপ, সুন্দরের মধ্যে মাধুর্যে মিশ্রিত হয়ে এক অভিনবত্বে মনের কল্পনাকে ব্যক্ত করতো।

তখনকার মানুষ ছিল গ্রামে। শহর সভ্যতার যন্ত্রদানবের অনেক বাইরে। পেশা অনুযায়ী তারা বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করতেন। কুমোর গড়তো মাটির পাত্র, কাঁসারী গড়তো বাসন, তাঁতী বুনতো কাপড়, জেলে ধরতো মাছ আর ঘরের বধূরা শাশ্বত মানবী-মনের কল্পনায় তুলতো হরেক রকমের ডিজাইন। সাধারণত সুতোর কাপড়েই তৈরী হতো কাঁথা। সে কাপড় পুরণো হলেও যথেষ্ট শক্ত থাকতো। তাই এই সব কাঁথা তৈরীর জন্য বাছাই করা হোত কাপড়। সে কাপড়ের কোনটা হতো নীলাম্বরী, কোনটা হতো ডুরে, কোনটা আবার এক রং-এরই জমকালো শাড়ী। তারপর শাড়ীর পাড়ের রঙ্গীন সুতো খুলে নিয়ে তাই দিয়ে সেলাই হতো ধানের শীষ, শিউলি ফুল, জোড়া কলকা, কলমী লতা রজনীগন্ধা, বরফী, বিভিন্ন আকারের বাটির মাপে গোল (কখনও বা একটা গোলের ভিতরে আরেকটা গোলের শুরু হতো), পদ্মফুল, হাতী, ঘোড়া, হাঁস, ময়ূর প্রভৃতি গৃহপালিত বা বহু-পরিচিত জন্তু-জানোয়ার।

তাহলে একমাত্র অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের সঙ্গে কাঁথার কি সম্পর্ক আছে?

তবুও যেটুকু আছে বা রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে সেটুকু শুধু রয়েছে সূচের কার্যের তালিকাভুক্তির মধ্যে—নিজের প্রেরণায় নয়।

কাঁথাশিল্প বাংলার কুটির শিল্পের এক বিরাট অঙ্গ। সে শিল্প ধনী দরিদ্র উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে আদরনীয়। ধনীর ঘরের খাট বা আলনা অথবা দরিদ্রের সাধারণ বিছানা ও বাঁশের আলনাতে একই-ভাবে শোভা পেত। কাঁথা ব্যবহারের সুখ বা হাতে তৈরীর ঐশ্বর্য ভোগ করতে ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

বহু বিচিত্র রং-এর কাঁথা যদিও সেলাই করা হয়ে থাকত তবু লাল, কালো, হলুদ রংকেই প্রধান রং হিসাবে বেছে নিতেন। সরু মোটা দু রকমের সূচ দিয়েই ডিজাইন ফোটাবার চলত কসরত।

দুই বাংলার সর্বত্রই কাঁথা সেলাই-এর বহুল প্রচলন থাকলেও জয় বাংলার কাঁথাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের মধ্যে যশোরের তৈরী কাঁথার জুড়ি খুব অল্পই মেলে। মিহি সেলাই-এ রকমারী জমকালো ডিজাইন এত ধৈর্যসহকারে যশোরের মহিলারা করতেন যে, সেই দক্ষতা দেখলে অবাক হতে হয়। পর পর সুতোর গাঁথুনিতে তাঁরা যে কাঁথা সেলাই করতেন সেগুলো আজকের দিনে আমাদের কাছে অকল্পনীয়। বলা বাহুল্য এত যত্নসহকারে যে নিখুঁত কারিগরী তাঁরা কাঁথাতে ফুটিয়ে তুলতেন তা তাঁরা দৈনন্দিন জীবনেও ব্যবহার করতেন। আর আজ তা শুধু সংগ্রহশালার সম্মান, ঐতিহ্য বজায় রাখার কাজেই সহায়তা করছে। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলার বিভিন্ন জেলার কাঁথা দেখলে সর্বাগ্রে একথাই মনে হয়।

মাঝে মাঝে আমার পিসিমার মুখে যশোরের কাঁথার গল্প শুনতে শুনতে কেমন আনমনা হয়ে পড়ি। ভাবি, কেমন করে তাঁরা সারা দিন-রাতের ক্লান্তির অবসরটুকু হেলায় নষ্ট না করে নিজেদের কল্পনাকে বিকাশ করতেন কাঁথায়। দুপুরের বিশ্রামে পিসিমারা যখন কাঁথা সেলাই করতে বসতেন তখন পিসিমার বুড়ী ঠাকুমা একটা মোড়াতে বসে ছড়ি ঘোরাতেন। ভাবখানা এমন যে, ছড়ি ঘুরিয়েই দুনিয়ার সব ধূলিকেই পাঠিয়ে দেবেন শূন্যে। কাঁথা শিল্পীদের আশে-পাশে যেন কোন ধুলো জমতে না পারে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে তখন সেই বুড়ি লড়াই করতেন ধুলো-বালির সঙ্গে। তাই দেখে নাকি পিসিমারা হাসাহাসি করতেন। বুড়ি শুধু তাতেই ক্ষান্ত হতেন না, তাঁদের দিনের কাঁথা সেলাই-এর গল্পও বলতেন।

এই কাঁথার মধ্যে সেকালের মেয়েদের শিল্পরুচিবোধের পরিচয় মিলত। ছেঁড়া কাপড়ে জোড়া দেওয়া গাত্রাবরণের মধ্যে থাকত তাঁদের বহুমুখী রূপের সন্ধান। কাঁথা শুধু গায়ের ঢাকা হিসেবেই ব্যবহার করা হতো না, তা আয়নার ঢাকায়, ঝোলা, বালিশের ওয়াড়, রুমালে, কুটুমবাড়ীর তত্ত্ব ঢাকায়, নতুন শিশুর জন্মদিনে উপহার হিসেবে এই কাঁথার প্রচলন খুব বেশীই ছিল। 'নকসা কাঁথার' কাহিনী আজ মুখে মুখে গল্প হয়ে ফিরছে। আজ যদিও বুড়ি বেঁচে নেই তবু উত্তরাধিকারসূত্রে আমার পিসিমা গল্প বলার কায়দাটাকে বেশ রপ্ত করেছেন। কয়েক যুগের বৃদ্ধা পিসিমা ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজকুমারের গল্প, দৈত্যদানা, ভূতপেত্নীর অলৌকিক ঘটনার নানা কাহিনীর সঙ্গে বাংলার মহিলাদের কাঁথা সেলাই-এর যাদুকরী শক্তির গল্প শোনাতেও মুখর।

—অঞ্জলি চৌধুরী

আটচল্লিশ

গর্টফ্রিড বাগান থেকে অনুপস্থিত, এমন সময় আসে বিভ্রাট বিপর্যয়, তার ওপর বাগানটা হস্তান্তরের খবর। এমন সব বিস্ফোরক কারণে তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েন, যে কোন রকমের সম্বাধ-সংঘর্ষের আশঙ্কায়। তাই তিনি সকল ঘটনা বিবৃত ক'রে শীন-স্মিথের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। তিনি যেন অবিলম্বে মেঘুর ও বাগানের নিরাপত্তার সমুচিত ব্যবস্থা করেন। এবং গর্টফ্রিড বাগানে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন বাগানেই থাকেন। তাঁর অনুরোধ শীন-স্মিথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, এবং তার অতিরিক্তও অনেক কিছু করেছেন। অনাথায় মেঘুর ভাগ্য বিবর্তনের সংবাদটা এমন অকস্মাৎ প্রকাশ হবার পর মেঘুর, বিলির এবং ওদের ঘরের সকলের যে কি হ'ত বা না হত তার অনুমান করা দুষ্কর। শীন-স্মিথ সম্পাতির প্রত্যুৎপন্নমতির যথোচিৎ তারিফ করলেন, তার জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাও গর্টফ্রিড প্রকাশ করলেন।

অনতিবিলম্বে সবাই জানল, মেঘু বাগানের মালিক বটে, কিন্তু সকল কর্তৃত্ব গর্টফ্রিডের হাতে। তবু তার মধ্যে অনেক অদল-বদলও হয়েছে। পূর্বে তাঁকে চলতে হ'ত বিলেতের কর্তাদের নির্দেশ অনুযায়ী, কিন্তু এখন মালিক সশরীরে বাগানেই হাজির। তার শ্রমিকদের পক্ষে এটা কম প্রেরণার খবর নয়। যদিও সে চলে গেছে কুলি বস্তি ছেড়ে গম্মটির বাংলোয়। তা তো স্বাভাবিক। তবুও সেটা তো বিলেতের মতো দূর নয়। তার ওপর আরো কত আশা-ভরসার কথা সবাই শুনেছে। সর্বাপেক্ষা হেতুগর্ভ কথা—মেঘু যেমন নির্দেশ দেবে বড়সাহেব তেমনই করবেন। একে বড়-সাহেব তার ওপর পিছনে মেঘু। এত বড় মেঘু। তবে আর ভাবনা কিসের। বড়সাহেব ও মেঘুর কথোপকথনের ভাবার্থ সকল শ্রেণীর পক্ষেই মনোরঞ্জক হ'ল।

কলাপাতা ছেঁড়া যায় কিন্তু তার নিজস্ব ভাবে। তার উলটোটা করতে গেলেই বিভ্রাট। এখানে উলটোটাই হল অর্থাৎ যে যার ভাবে কেটে নিল ছিঁড়ে নিল। কিন্তু তার ফল উলটো হ'ল না। সকল দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল অভাবনীয়ভাবে। সহজ অবস্থা ফিরে এল। শুধু তাই নয়, দ্বিগুণ উৎসাহে সকলে লেগে গেল বাগানের কাজে। ভাবনা চিন্তার কোন কিছু রইল না কারো পক্ষে। এমন একটা পরিস্থিতি ফিরে আসবার পর, মেঘুর বিলেতে যাবার সকল ব্যবস্থা স্থির হ'ল। গর্টফ্রিডের আদেশে, ইচ্ছায় বা চেষ্টায় সে বিলেতে চলাফেরা করবার উপযোগী হ'য়ে উঠেছে। এসব যদিও বাহ্যিক ব্যাপার, তায় মায়ের শিক্ষায় সে সকল সমাজে সচল। তবুও সকল দেশে সকল সমাজেই, এমন কি এক দেশের সমাজের বিভিন্ন স্তরে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। মেঘুর পদানুযায়ী তাকে ইংরেজ সমাজে অবাধ মেলামেশা করবার মতো তৈরি ক'রে তুলতে গর্টফ্রিড বিশেষ যত্ন নেন। এর পূর্বে সাহেবী চাল-চলনের মহড়া সে দেয়নি, সেসব নিয়ে বিলি কখনো ব্যতিবাস্ত করেনি মেঘুকে। তবে ছুরিটা, কাঁটাটা নাড়াচাড়া, উলটে রাখা, চিৎ করা, মুখ বন্ধ ক'রে চিবানো, দাঁত দেখানো না দাঁত বন্ধ রাখা প্রভৃতির মহড়া হ'য়ে গেছে এ্যানির কাছে, কত হাসাহাসির মধ্যে। ডেভিড ও গর্টফ্রিডের কেতা কায়দা ও আচার ব্যবহারে কিছু পার্থক্য, কিছু বিশেষত্ব থাকা স্বাভাবিক। সেই জন্য গর্টফ্রিড বেশীর ভাগ সময় নিজের কাছে মেঘুকে রেখে দেন। এবং বিলিকেও নির্দেশ দেন যেন সেও তার যথাসাধ্য ক'রে যায়। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তাকেও আভাস দেওয়া হয় নিজের ঘরেও যেন পূর্ববৎ ইংরেজী আচার ব্যবহার প্রবর্তিত করে, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য।

একদিকে গর্টফ্রিডের সঙ্গে, তার বাংলোয় লাঞ্চ ও ডিনার খাওয়া, অপরদিকে বাগানের আর সকল খাঁটি সাহেবদের সঙ্গে মেলা-মেশা, তাদের ঘরেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করা। ঘরে তার মাও কম যায় না। এই সবের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে করতে ইংরেজী কেতা-কায়দায় পাকো দস্তুর রপ্ত হ'য়ে উঠল মেঘু। এমন কি গর্টফ্রিডকেও তাদের ঘরে মাঝে মধ্যে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হয়। তাঁর ইচ্ছায় মেঘু লাইনের ঘর ছেড়ে গম্মটির কাছাকাছি এক বাংলোয় বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। তা নইলে বাগানের মান থাকে না। সাহেবদেরও মানায় না অত বড় বড় বাংলোয় থাকা। তারা মেঘুর মতো থাকার অভ্যস্ত নয়, তা পারবেও না। একটু রসিকতা করে বড়সাহেব মেঘুকে বোঝাল—যেমন পাখির খাঁচায় বাঘ পোষা যায় না।

একদিন মেঘুর বাংলোয় বসে আলোচনা প্রসঙ্গে গর্টফ্রিড বলেন—থাকার মধ্যে কি আছে! এখন তো তোমারই সব। তোমার ইচ্ছাই সকলের ইচ্ছা। তোমার হুকুম তামিল করতে আমরা সবাই বাধ্য।

মেঘুর বিনয় বিনম্র মাথা হেঁট হ'য়ে রয়েছে, বলেছে—আপনি যেন অমন কথা বলবেন না। চিরদিন যেমন হুকুম দিয়ে চালিয়েছেন, আজও ঠিক তেমনটি করবেন দয়া ক'রে। তা নইলে বড় কষ্ট পাব।

—দেখছ। দেখেছ মিসেস জনসন, তোমার ছেলের কাণ্ড। শুনলে তো তার কথা? এত বড় একজন প্ল্যান্টার—কর্মচারীর হুকুম মেনে চলবে।

—মেঘু তো ঠিকই বলেছে মিঃ গর্টফ্রিড। এখানে আপনি থাকতে, ও হুকুম দেবার কে?

—বাঃ! আমি দিলাম তোমার কাছে একটা নালিশ। কোথায় ছেলেটাকে শাসন করবে, শুধরে দেবে! তা নয়, মায়ে-বেটায় এক কর্মচারীকে কি এমন কোণঠাসা করতে হয়? আমি এখন যাই কোন কোণে?

সময় বিশেষে বা স্থান বিশেষে দেশীয় ভাষায় কথাও হয়। রাবণ ও লছমী তখন ঘরে ঢুকছিল চায়ের সরঞ্জাম বোঝাই করা ট্রে নিয়ে। লছমী শুনল বড়সাহেবের কথা, সে হাসতে হাসতে বললে—কোণেও ঠাঁই হবেক নাই। দুই কোণে আবার হামরা দুইজনা। হাইখানে যায়েন হাকিম সাহেব।

ঘরের মাঝে বড় টেবিলটার সামনে এসে লছমী সবিনয় আবেদন জানাল সোফা থেকে উঠে যাতে গর্টফ্রিড সেখানে আসেন।

গর্টফ্রিড হাসতে হাসতে বললেন—ওরে বাবা। চারটে কোণই জুড়ে বসেছ তোমরা। তা হ'লে আমি এখন যাই কোথা?

লছমী জোর গলায় তার জবাব দিল—আপনে থাকবেন মাঝে। এখন শীঘ্র আসেন, নাহিতো হামরা চারিজন মিলি—

রাবণ ফিসফিস ক'রে লছমীকে একটা ধমক দিল—কি বলছিস হাকিম সাহেবকে—

গর্টফ্রিডকে ছেড়ে লছমী ধরল রাবণকে, বললে—কি বক-বকাইছিস তু'! হামি কি তু'র বাগানের হাজরা কাম খাটেছি নাকি রে? তু'র কামাই খা'ছি নাকি রে? হামার ছেইলারটা খাই—

সাহেবের সামনে লছমী আবার কি বলে তার ঠিক নেই। নিজের হাতের ট্রেখানা টেবিলের ওপর রেখে, মুখ নীচু ক'রে রাবণ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পালাল। রাবণের যাত্রাপথে তার চোখজোড়া টান করে রাখল তাকে ঠেলে বার ক'রে দেবার ভঙ্গিতে, তারপর কথার বাকী অংশটা শেষ করতে লছমী বললে—হামকে চো-খ দেখাবা আইছে!

বিলি তাড়াতাড়ি উঠে এল লছমীর হাতের বোঝাটা খালাস করতে। তাকেও এক ধমক দিয়ে সে বললে—নাই নাই, তুমি হাটেন—হাম রাখতে জানি। —বিলির মুখের ওপর কটমটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার বললে—থুকী রকম হামকে ধ্যম শিখাবা আইছে!

বিলি জানে ক'দিন ধ'রে মেঘু ছাড়া আর কেউ তার মেজাজের কাছে ঘেঁষতে পারে না। ধমক খেয়ে সেও ফিরে গেল তার নিজের সোফাটার সামনে।

মাঝের গোল টেবিলটার ওপর মালপত্র খালাস করে লছমী শ্রান্তিটা দূর করতে তার হাত দুটো তালি দিয়ে একবার ঝেড়ে নিল। তারপর গর্টফ্রিডের পানে তাকিয়ে বললে—লেন হুজুর, আসেন—নাহি তো চতুর্দোলা উঠায়ে আনিস।

মেঘু কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল লছমীকে। গর্টফ্রিড ইসারা ক'রে তাকে থামিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন—তিনি বেশ উপভোগ করছেন লছমীর কথাগুলো।

কৃত্রিম অভিযোগের ভাব দেখিয়ে গর্টফ্রিড বললেন—এই বয়সে চতুর্দোলা নাগরদোলায় উঠতে হলেই গেছি আর কি। নাঃ! তোমাদের চাকরি আমার পোষাবে না, বাগান ছাড়তে হবে দেখছি।

অমন রসিকতা লছমী বোঝে না, সে মহা ভাবনায় পড়ে গেল। সাহেব বাগান ছাড়লে বাগান চলবে কি ক'রে? মেঘুর যে মহা মুশকিল হবে! সে তাড়াতাড়ি গর্টফ্রিডকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বললে—নাগরদোলা তো নাই কইছি, চতুর্দোলার কথা হে কহেছি।

মেঘু হাসতে হাসতে বললে—ছোটমা চেয়ারকে চতুর্দোলা বলে।

মেঘুর কথায় লছমীও ঘাড় নেড়ে সায় দিল—হাঁ, উ'টা কইতে লাড়ি যে।

কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে গর্টফ্রিড বললেন—তা হ'লে দোলাদুলির কথা বলনি তো?

ওখানে দাঁড়িয়ে কথার পিঠে কথা বলতে গেলে হয়তো আরো ফ্যাসাদ বাড়তে পারে। তার স্থান এখানে নয়, রান্নাঘরে। সে সংক্ষেপে মিনতি করে বলল—নাই-নাই। দেখবি রে মেঘু, হাকিম হুজুরকে—যেন কোন অসুবিধে তাঁর না হয়।

সাহেব বাগান ছেড়ে যাবার ভাবনা থেকে লছমী মুক্ত হ'ল। অতি ব্যস্তভাবে সে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে, যেন তার কত কাজ পড়ে আছে বাইরে।

উনপঞ্চাশ

মেঘুর চাল-চলন গতিবিধি এখন ধরা-বাঁধা। আগের মতো যখন-তখন যেখানে খুশি যেতে পারে না। বাগানের কাজকর্ম চালানো, নিয়ম-কানুন, সকলের মান ইজ্জৎ প্রভৃতি রক্ষা করা সবই বড়সাহেবের দায়িত্ব। এইসব চিরাচরিত বিধি ব্যবস্থার সংমিশ্রণে একটি বস্তু তার চারপাশে শক্ত পাঁচিলের মতো খাড়া হ'য়ে আছে। সেই পাঁচিল ভেদ করা মেঘুর সাধ্যের বাইরে। তার ইচ্ছা সেখানে পরাভূত।

মেঘুর প্রকৃতি গর্টফ্রিডের বিশেষভাবে জানা। তার ওয়েলফেয়ারের কাজ শুরু হবার প্রথম দিকে সে এক-একটা উদ্ভট প্রস্তাব নিয়ে আসত। তিনি বুঝিয়ে দিতেন তাকে, কতটা উচিত অনুচিত বা সম্ভব অসম্ভব। এখন সে মালিক, তার প্রতিটি কথার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ধরে নেবে সকলে। অলসদের কোন প্রশ্রয় সে দেবে না, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের কথা শুনলে ভেঙ্গে পড়বে। তা ভাল। কিন্তু মালিক হবার পর সেসব যাচাই করে দেখার স্পৃহা লোপ পেয়েছে। তার ওপর যে রকম মতামত সে প্রকাশ করেছে তাতে গর্টফ্রিড বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েন। সে লাভ চায় না, মোটামুটি চলে গেলেই সন্তুষ্ট। অতএব সকলের মজুরী বাড়িয়ে দেওয়া হ'ক। গর্টফ্রিড তাকে বুঝিয়ে দেন—তার উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু কাজটা তেমন সহজ নয়। এর মধ্যে ভেবে দেখার অনেক আছে। মোটামুটি কথা—ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ভংগ হবে এসোসিয়েশন ছাড়তে হবে, অপরাপর বাগানের সঙ্গে শত্রুতা দেখা দেবে। তদুপরি, চায়ের ব্যবসা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও প্রতিযোগিতা সাপেক্ষ। আজ বাজার ভাল, পয়সা দিতে পারা গেল। পরে যখন মন্দা বাজার আসবে, তখন কি হবে! এখানে মজুরীর হার থাকবে বেশী অথচ তা দিতে পারা যাবে না, তখন উপায়? হাজিরা কম থাকলে বাড়ানো যায়, কিন্তু বেশী থাকলে কমানো বড় শক্ত। মেঘু জানে সব, বড়মানুষ হ'য়ে সব ভুলে গিয়েছিল। পুরানো খবরগুলো নতুন ক'রে শুনল, নতুন ভাবনায় পড়ল।

অমন সোজাসুজি দরমাহা না বাড়াতে পারলেও পরোক্ষভাবে অনেক কিছু করা যায়। এমন অনেক ব্যবস্থা বর্তমানেও প্রচলিত। প্রয়োজন মতো সেসব বাড়ানো যায়। মেঘুকে সান্ত্বনা দিতে গর্টফ্রিড তেমন করতে উপদেশ দেন। লাভ লোকসানের অনুপাতে সেসব কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। মনে রাখতে হবে বাজারের অবস্থা এবং কাজ-কর্ম চালানোর দক্ষতা ও কৌশলের ওপর সব নির্ভর করে। লাভ করতেই হবে এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বজায় রাখতে হবে। তার ওপর আছে জনসাধের অসম্পূর্ণ কাজটা পূর্ণ করা—ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপক্রমণিকা লেখাটা শেষ করা।

ইতিহাসের কথা উঠতে সে বিষয় অনেক আলোচনা হ'ল উভয়ের। কাজটা কতখানি এগিয়েছে সেসব শুনে মেঘু বিশেষ অনুপ্রাণিত বোধ করল। সেই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কৌমের কথা গর্টফ্রিডের মুখ থেকে মেঘু শুনল—কেমন ক'রে তাদের আচার অনুষ্ঠান পূজা-পর্ব হিন্দুসমাজে গৃহীত এবং প্রচলিত হয়েছে। যেমন কামরূপের কামাখ্যা শব্দটি এসেছে খাসিয়াদের 'কা-মেই-খা' থেকে—যে কথার অর্থ ঠানদিদির পূজা। খাসিয়া ধর্মের একটা অঙ্গ মৃত গুরুজনের তর্পণ করা। তারা মাতৃকুলধর্মী, তাই ঠানদিদি তাদের উপাস্য। এবং ঐ কামাখ্যা পাহাড় এককালে তাদেরই আরাধনার মন্দির ছিল। খাসিয়া ভাষার তিনটি শব্দ জুড়ে হ'ল কামেখা—এবং কালক্রমে তার আর্যীকরণের ফলে হ'ল কামাখ্যা। ভগবতীর এমন নাম বেদে-পুরাণে পাওয়া যাবে না। কেমন ক'রে অনার্যদের মনসা, শীতলা আরো কত জীব-জন্তু ও প্রকৃতির আরাধনা দেবদেবীর প্রতীক রূপে আর্যসমাজে প্রবর্তিত হ'ল, সেসব চিত্ত-বিলোভন জনক কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ মেঘুর মনে পড়ল এই বাগানে তো অনেক জাতের বসবাস। এবার নতুন চোখ মন নিয়ে তাদের দেখে বেড়া'বে। গর্টফ্রিডের কাছে তাই পুরানো প্রস্তাবটা আবার নতুন ক'রে সে দাখিল করল।

কিন্তু গর্টফ্রিডের আশংকা কখন কোথায় মেঘু আবেগের বশে কি করতে কি ক'রে বসবে, কি বলতে কি ব'লে ফেলবে যা সামাল দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে তাঁর পক্ষে। তিনি বলেন—বাগানের সবকিছু তোমার জানা। অফিসের কাগজপত্র দেখলে, ডিভিশনের ম্যানেজারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলে সব খবর পাবে।—যখন যা দরকার বোধ করবে আমায় বলবে, আমি তা করিয়ে দেব। যখন যাকে দরকার বলে দেবে—সে এখানে এসে যাবে। তোমার ঘরে

বেড়াবার তো কোন প্রয়োজন নেই।—যদি কোথাও যেতে চাও তবে বলবে—আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমি, ডিভিশনের ম্যানেজার, দুজনকেই সঙ্গে থাকতে হবে। অন্ততঃ দুজনের একজন থাকবে। এর দায়িত্ব অনেক, তোমায় একলা ছেড়ে দিতে পারি না। নিয়মও নয় তা।

বাগানের সব তার জানা? জানা বলেই তো যেতে চায়, আরো বেশী ক'রে জানতে চায়, তাই ঘুরে বেড়াতে চায় সেখানে আগের চাইতে বেশী ক'রে। কাগজপত্রের মধ্যে কি কারো মুখ দেখা যায়—না, ডেকে আনলে ওদের ঘর দেখা যায়? সবই ঠিক-ভাবে চলছে বটে, তবু নিজের চোখে দেখাটা বড় তৃপ্তির, তেমন না দেখতে পারলে মন মানে না। নিজের হাতে কিছু করে না এলে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'তে চায় না। যেমন আগে করত, তার চাইতে অনেক বেশী করতে পারে এখন, কিন্তু তার উপায় নেই।

যদি অন্য কোন বাগান খরিদ করা হ'ত, এবং মেঘু সেখানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত, তা হ'লে সেখানকার ম্যানেজারের পক্ষে তাকে সামাল দেওয়া কঠিন হ'ত। তা হলে সে কল্পতরু হতে পারত। স্বচ্ছন্দে নিজের আজগুবি অবাস্তব আদর্শ অনুষ্ঠিত করতে গিয়ে অনায়াসে সব খুঁকে দিতে পারত সে। বাস্তব জগতে এমন দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যাবে। গটফ্রিড কিন্তু তার কাছে চীনের প্রাচীর, হিমালয়সম দুর্লঙ্ঘ্য। এমন কি গটফ্রিড চান, মেঘু বাগান ছেড়ে কোন শহরে বসবাস করুক। নিরঞ্জিরা বাগানটা থাকলে সেখানে থাকতে দিত, তাতেও হয়তো তিনি সম্মতি দিতেন না। কিন্তু এটা কেনার সঙ্গে সেটা বিক্রি করার দের ট্রাস্টি। কারণ, সেখানে চীনা গাছ, তার উৎপন্নের হার অধুনা লাভজনক নয়। তার আমূল পরিবর্তনও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তার ওপর বাগান কেনা না কেনার মূলে উদ্দেশ্য বিলির খোঁজ করা। বিলির সঙ্গে আছে রবণ ও লছমী, তাই হয়তো তারা কোন বাগানেই আছে। কারণ, বাগানের কুলির পক্ষে বাগানে থাকাই স্বাভাবিক। দার্জিলিং অঞ্চলে তারা নেই সেটা নিঃসন্দেহ। সে অঞ্চলে বিলিকে প্রায় সকলেই জানে। পুলিশের খবর—তারা তিন-জনেই আসামের দিকে গেছে। সে যাই হোক, মেঘুর সুবর্ণশিরি বাগানে থাকা না থাকার বিষয়টা এখনো ঝুলছে। বিলেত থেকে ফিরে এলে সেটা নির্ধারিত হবে। শহরে থেকে শুধু ভোগবিলাস নয়, মেঘুর ও বিলির জন্য বহু কার্যকলাপের পরি-কল্পনাও গটফ্রিড জানিয়ে রেখেছেন। বিলি সেটা সানন্দে গ্রহণ করেছে। কিন্তু মেঘুর পক্ষে সেটা নির্বাসন এবং ভাবনারও বিষয় বটে।

পদোন্নতির ধাপে ধাপে মেঘুর স্বজন-প্রিয়তা ও বিনয়নম্রতা বেড়েই চলেছে। এই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য আজ সহস্র ধারায় উন্মুখ। সেই উন্মুখ চিত্তমনের সঙ্গে বাদ সাধে বাগানের রীতিনীতি;

এসবের সঙ্গে তার মনের সংঘাত তাকে অত্যন্ত পীড়িত ক'রে তুলল।—শুরু হল মেঘুর প্রকৃত দুঃখের জীবন। এত সুখের মধ্যেও এত দুঃখ থাকতে পারে তা কারই বা জানা।—তবুও বড়সাহেবের অবাধ্য হওয়া, বা তাঁকে কোন মতে অসন্তুষ্ট করা মেঘুর পক্ষে অসম্ভব, কল্পনাতীত। তাকে হার মানতে বাধ্য করল তার বর্তমান পরিস্থিতি।

বিলেতে যাবার দিন এগিয়ে এল। গটফ্রিডকে মেঘু জানাল — তার বড় সাধ, যাবার আগে একবার কুলি-লাইন ঘুরে আসে। এক কথায় গটফ্রিড সম্মত হলেন। তাঁর নির্দেশে প্রোগ্র্যাম তৈরী হল। খবরটা দ্রুতগতিতে প্রচার হল বাগানের সকল অংশে। অনেকেই খুশী হল, অনেকের ভয় ভাবনাও হল। কি দেখতে সে আসছে! সকল খবরই তো তার জানা। যে যেমন মন নিয়ে চলাফেরা করে তেমনই প্রতিক্রিয়া হল তাদের এক-একজনের মনে। এক রবিবার নির্দিষ্ট সময়ে ঘুরে বেড়ানো শুরু হল। পূর্ব নির্ধারিত মতে আর সকলের সঙ্গে মেঘুও একজন। সবাই মিলে ঘুরে বেড়াতে থাকল কুলিদের বস্তিতে বস্তিতে। দলটা বেশ বড়—গটফ্রিড, ডিভিশনের ম্যানেজাররা সবাই, চৌকিদার, জমাদার, মুহুরী, সর্দার আরো কত লোক। গাড়ীর মিছিল, মানুষের মিছিল। এমন মালিকের আবির্ভাব কোন দিন হয় নি এখানে। অতএব এতটা হয়ও নি। তাই এতটা কেউ বুঝেও ওঠে নি, এমন কি মেঘুও না। মেঘু ভেবেছিল—বড়-সাহেব আর যখন যে ডিভিশনে যাবে সেই ডিভিশনের ম্যানেজার তার কাছাকাছি বা সঙ্গে থাকবেন। তাই সে সব দেখেশুনে বেশ একটু মুষড়ে পড়ল।

অনতিবিলম্বে প্রচার হয়ে পড়ল, সেই মিছিলের কথা, এমনভাবে মেঘুর বাগান পরিদর্শনের কথা। গাড়ীর মিছিলটা দেখতে, সাহেবদের মিছিলটা দেখতে সকলেরই ভাল লাগে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হল না। অন্তত কুলিদের সবাই এটা সহজ-ভাবে নিতে পারল না। তাদের বিষয়, তাদের সকল খবর মেঘুর বড় বেশী রকম জানা। কম অস্বস্তির, কম আশংকার কথা নয় এটা তাদের পক্ষে। যে যত মেঘুর কাছাকাছি ছিল তার তত ভয়। যাদের সঙ্গে তার চেনা-জানা নেই তাদের পক্ষে মেঘু এক কৌতূহলের বস্তু।

কয়েকটা বস্তি ঘুরেই মেঘু বুঝল—যে মুখ সে আগে দেখেছে সকলের, যে মুখ সে দেখতে এসেছে—সে মুখ দেখে না। সে ভেবেছিল যা কিছু অদল-বদল হবার সে সব তারই হয়েছে, আর কারো কিছু হয় নি।—সে ভুলটা ভেঙ্গে গেল। একদিন যারা মেঘুকে দেখে ছুটে এসেছে, কত কথা বলেছে, কত হেসেছে,—আজ তারা মেঘুর সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে, সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে। দূরেও কেউ সরে যাচ্ছে সন্ত্রস্ত-সম্ভ্রমে। কি যেন একটা অদ্ভুত কিছু দেখার ভাব তাদের চোখে। মেঘুর কথার জবাব তারা দিতে পারে না আগের

মতো, কোন কথাই যোগায় না তাদের মুখে। মেঘুর হাসির কথায় তারা হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে না নিজেদের ঠোঁটে। সেই যে বাল্য সখা-সখীর দল—তারা আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছে তাকে। নাম ধরে ডাকলে ভয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ভাবনা—মেঘুর সঙ্গে তারা একদিন খেলাধুলা, রঙ্গরস করে না জানি কতই অপরাধ করেছে, আজ যদি ধরে সে সবের শাস্তি দেয়! বড় মানুষকে বিশ্বাস কি? কম বড় মানুষ মেঘু! এতগুলো সাহেবের

অন্নদাতা। এত বড় বাগানের মালিক। যারা আগে ছিল তারা তো তাদের মালিক—সে একজন হুজুর হাকিমের ওপরওয়ালা, রাজার রাজা! বিশেষণের শেষ হয় না মেঘুর বর্ণনা দিতে।

চাকরীর আমলে, মেঘু পদ ও মর্যাদা এই দুটি বস্তু একীভূত হতে দেয় নি। প্রথমটি গ্রহণ করলেও শেষেরটি পৃথক করে স্বিধাশূন্যভাবে পরিত্যাগ করতে পেরেছিল। তাই সে কুলিবস্তি ছেড়ে নির্দিষ্ট বাংলোয় থাকতে যায় নি, তাই তার উন্নতির প্রকৃত তাৎপর্যটা কুলিদের চোখে পড়েও পড়ে নি। মেঘুর পদটা তারা মন দিয়ে বুঝলেও হৃদয় দিয়ে বোঝে নি, এবং তাই তার মর্যাদাও দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করেও করে নি। মেঘুর পদটার গুরুত্ব তারা বেশ বুঝেছিল। তার ফল তারা যেমন পেয়েছে, ভোগ করেছে তেমনি, স্বভাব বশতঃ এগিয়ে গেছে তার মর্যাদা দিতে। কিন্তু মেঘু তাদের প্রতিহত করেছে, বিমুখ করেছে, নিরাশ করেছে, ফিরে করেছে তা গ্রহণ না করে। মেঘুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কুলিদের পক্ষে তার পদ-মর্যাদা দেওয়াটা অবশ্যম্ভাবী হত যদি সে বাংলোয় বসবাস করত। তাহলে পরবর্তী কালের পরিস্থিতির জন্য উভয় পক্ষ কিয়দংশে প্রস্তুত হয়ে থাকবার সুযোগ পেত, বর্তমান মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের উপযোগী হয়ে উঠতে পারত—উভয় পক্ষ মানসিক সমতা রক্ষা করে চলতে পারত।

কাজের সম্মুচিত কোয়ার্টার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চলাফেরা এসব তো ধরাবাঁধা, অবধার্য। এর ব্যতিরেকে, কর্তা বা কর্মীর যে কোন পক্ষের ত্রুটি বা গলদই চোখে পড়ে। যে দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে মেঘু যেভাবে বসবাস করছে তা সাহেব-বাগান তো দূরের কথা, কোন দেশীয় বাগানেও সম্ভব হত না। এবং মেঘু ছাড়া আর কোন লোকের পক্ষে তেমন করাও দুরূহ, দুঃসাধ্য হত। তেমন নজির পূর্ব-পশ্চিমের কোথাও বোধ হয় পাওয়া যাবে না। এমন একটা ব্যাপারে গর্টক্রিডের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও কিন্তু সম্মতি দিয়েছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন মেঘুকে। তিনি জানতেন এই নিয়ে সাহেবদের মধ্যে কত সমালোচনা হবে। তাই একদিন উইলিয়ামের সামনে প্রখ্যাত ডচ চিত্রশিল্পী ফ্যান ক্ক্কের একটা কাহিনী ব্যক্ত করলেন। তেমন বা আরো মর্মস্পর্শী ঘটনা ভারতবর্ষে প্রচুর, কিন্তু নিজেদের দেশের কথাটা সাহেবদের পক্ষে সহজবোধ্য ও বেশী হৃদয়গ্রাহ্য হবারই কথা। ফ্যান ক্ক্ক তখন বিলয়ানক-এর কয়লা-খনির অঞ্চলে ডমিনি, অর্থাৎ পাদরী ছিলেন। খনির শ্রমিকদের দারিদ্র-দুর্দশা দেখে তিনি বড় মর্মাহত হন। এবং এতটা মুষড়ে পড়েন যে, নিজের সমস্ত ভোগলিপ্সা বিলুপ্ত হয়। খাওয়া-পরা শোয়া-বসা সবই করতেন শ্রমিকদের অনুরূপ। অর্থাৎ তাদের মধ্যে তাদেরই একজনের মতো হয়ে থেকে ধর্মাচার্যের কাজ করতেন। সকলের সেবায়, রোগীর শুশ্রূষায় নিজের পরমায়ু পর্যন্ত খরচ করে নিঃস্বভাবে অতিকষ্টে, এমন কি অনেক সময় অনাহারেও দিন কাটাতেন। এমনভাবে জীবনযাপন করে কঙ্কালসার হয়ে পড়েন। এমন সময় তাঁর ধর্মপীঠের ডিরেকটর হঠাৎ একদিন কার্য পর্যবেক্ষণে হাজির হলেন সেখানে। গীর্জায় এসে দেখেন কিম্ভূতকিমাকার বেশে, উন্মাদসম আবেগপূর্ণভাবে, অতি কুৎসিত ফ্যান ক্ক্ক উপস্থিত শ্রমিকদের ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন, আর শ্রোতারা মুখব্যাদান করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন উন্মাদের প্রলাপ শোনার ভঙ্গিতে। ডিরেকটর যেমন দেখলেন, বুঝলেন তেমন কাজ করলেন। কোন অনুসন্ধান বা বিচার-বিবেচনা না করে ধরে নিলেন লোকটা পাগল হয়ে গেছে, অতএব তাকে পদচ্যুত করলেন। সে যুগ তো বাদ-প্রতিবাদের ছিল না, সে যুগ ছিল বিলাপের। শ্রমিকদের বিলাপ বাতাসে আকাশে মিলিয়ে গেল, ফ্যান ক্ক্ক সত্যই পাগল হলেন, অথবা সেই কর্মাধ্যক্ষ তাকে বাধ্য করলেন পাগল হতে।

গল্পটা শেষ করে গর্টক্রিট বলেন—পাগল তিনি নিশ্চয়ই হয়েছিলেন, কিন্তু তেমন পাগল সংসারে কটা পাওয়া যায়! মেঘুও প্রায় তেমনই একজন। জীবিকা অর্জনের জন্য যাই করুক না কেন, ওর আসল কাজ সেবা। সেটাই ওর জীবনের ব্রত। সব কাজেই নিষ্ঠা চাই। জীবিকা আর ব্রত এই দুটো এক করে নিতে পারলে যদি ওর কর্মনিষ্ঠা বেড়ে যায়, যদি ও শান্তি পায়, এবং সেটা যদি আমার কাজের পক্ষে হানি-কর না হয়, তাতে আমি বাধা দিতে যাব কেন! মন থাকলেও আমি পারব না অমন করতে—পারলেও তোমরা সবাই মিলে আমার চাকরীটা খতম করবে, আমায় পাঠাবে রাঁচি নয়তো বহরমপুর। মনের কথা ছেড়েই দিলাম, দিনকাল বদলে যে কোন দিকে ছুটেছে সেটা আর ক'জন বিচার করে দেখে। —অন্তশত শ্রেণী বিচার এখান আমরাই পত্তন করেছি। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের ধরনে অমন উৎকট সম্বন্ধ ছিল না। ভেবে দেখ না—মহাত্মা গান্ধী অমন সর্বজনপ্রিয় হলেন কেমন করে! আমরা তাঁকে নেংটা ফকির বলে উড়িয়ে দিতে চাইলে কি হবে। আমাদের মত সর্বগ্রাসীর দেশ নয় তো এটা। ফকিরের দেশ, সর্বত্যাগীর দেশ—রামায়ণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরই কদর ও শ্রদ্ধা দিয়ে এসেছে এরা।

এক রাত্রে ক্লাবের মজলিসে সেই গল্প ও সেদিনকার সকল কথা সকল সাহেবদের উইলি শুনিয়েছে। মানুষ তো, তার ওপর আধুনিক ভাবাপন্ন যুবক তারা। যথার্থ মন দিয়ে তারা কথাগুলো শুনল। ফ্যান ক্ক্কের ব্যথাটা মূর্ত হয়ে উঠল সকলের মনে, তাঁর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিও দিল সকলে মিলে। তাই নিয়ে বেশ কিছু আলাপ-আলোচনাও হল।—তারপর থেকে মেঘুর প্রতি তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করাটা সাহেবরা ছেড়ে দেয়, তার পরিবর্তে শ্রদ্ধা, সহানুভূতি বা করুণা অথবা অমনই কোন একটা চোখ দিয়ে তারা দেখে মেঘুকে।

যখন মেঘু দাসত্ব করত, তখন গর্টক্রিড তার কত কামনা মঞ্জুর করেছেন, কিন্তু এখন আর তা পারেন না। এখন সে বাধ্য হয়েছে বাংলোয় থাকতে, সকলের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে। তাই ডেপুটি কমিশনার চলে যাবার পর সাহেবরা ছাড়া আর কেউ, অন্ততঃ বাগানের শ্রমিকরা তাকে দেখতে পায় নি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এতদিন পর এই তার প্রথম সর্বজন-সমক্ষে আবির্ভাব, সকলের চোখে এটা আবির্ভাবই বটে। ইত্যবসরে তারা, শুধু তারা কেন বাবুভায়ারা, বাগানের সকলেই মেঘুকে উপযুক্ত মান-মর্যাদা দিতে শিখে নিয়েছে। যা এতদিন দেয় নি, দিতে শেখে নি তার জন্য মনে-মনে অনুতপ্ত ও অপরাধী বোধ করেছে। প্রকাশ্যে ও আড়ালে তাই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনাও হয়েছে। তাই আজ তারা সকলে মেঘুর পদোচিত মর্যাদা দিতে চলেছে—গণ্ডায় গণ্ডায় চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে সে দেওয়া। এমন ভাবের মর্যাদা দিতে তারা [illegible] অথবা পিছিয়ে গেছে। এমনভাবে [illegible] দিয়ে মেঘুকে খুশী করতে, তাকে [illegible] করে তার প্রসাদ লাভ করতে [illegible] চেষ্টা করেছে সকলে।

কার্যসূচীর তালিকা অনুযায়ী গাড়ী মিছিলটা এল রাঘবের ঘরের [illegible] রাস্তায়। গর্টক্রিড এখানকার [illegible] মনে একটা ছক করে রেখেছিলেন। [illegible] গাড়ী থেকে নেমে সকলকে গাড়ীতেই [illegible] থাকতে নির্দেশ দেন। তারপর [illegible] বুঝে বাকীটুকু নির্ধারিত [illegible]। [illegible] মেঘুর উৎপত্তিস্থান [illegible] তাঁর মতলবটা পণ্ড হয়ে গেল। [illegible] সেখানে একটা বিশ্রী ঘটনার [illegible]

মেঘু ও গর্টক্রিড [illegible] থামার পূর্বে [illegible] অবস্থায় মেঘুর চোখ পড়ল [illegible] ঘরের বাঁশের [illegible] দুটি চোখের ওপর। [illegible] চোখে ফুটে উঠল—[illegible] অখুশী ও ভয়-সন্ত্রাস। [illegible] বিহ্বল তার দুটি চোখ। [illegible] পুরানো, কত নতুন! যে চোখ [illegible] দেখে নি, চিনেও [illegible] নি ভুলতে।

গাড়ীটার চাকা থামা মাত্র, কারো দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা না করে মেঘু নিজেই দরজা খুলে এক লাফে গাড়ী থেকে নেমে ছুটে চলে গেল রাঘবের উঠানে। সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সকলেই গাড়ী থেকে নেমে তার পিছু পিছু এলোমেলোভাবে এগিয়ে চলল। অগত্যা গর্টক্রিডকেও চলতে হল সেই সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা চলে গেল তাঁর হাতের বাইরে। স্থির নিশ্চিন্ত ভাবে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যটা দেখা ছাড়া আর কিছু তাঁর করবার রইল না।

ইতিমধ্যে মেঘু পৌঁছে গেছে রাঘবের দরজার সামনে, আগের মতো গলা ছেড়ে ডাকল—জেঠা-জেঠা, জেঠী!

রাঘব ও শক্রী যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে দুজন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, মেঘুর পায়ের কাছে, পায়ের ওপর! তারা জানে তাদের অপেক্ষা দোষী ও অপরাধী আর কেউ নেই সে বাগানে। তাই দুজন এক সঙ্গে কেঁদে উঠল—বাবা, বাবা, আমাদের অপরাধ নিস না। আমাদের ক্ষমা করেন!

কি শুনছে, কি দেখছে সে, এত দ্রুত মানুষের এত পরিবর্তন হয়! হায় হায়! তার মাথাটা কাটা গেল, না মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল! না মেঘুর পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা সরে গেল!

গার্টফ্রিড বাগানে পৌঁছানোর পর অপরাপর ঘটনার সঙ্গে আর একটা শেষ হয়েছে। ম্যাকনিল চাকরী ছেড়ে চলে গেছে। সে ছিল এই ডিভিশনের ম্যানেজার। তার জায়গায় এসেছে নতুন সাহেব—বেরি-হোয়াইট। এদের কথা বাগানের আর সবাই জানে, তাই তারা পিছিয়ে পড়ে চুপচাপ মুখ ফিরিয়ে ছিল রাঘব ও শক্রীর কান্ড দেখে। বেরি-হোয়াইট নতুন তাই তার বিশেষ কিছু জানবার অবসর হয় নি তখন পর্যন্ত। ওই লোক দুটোকে যাদের ধমক দেবার কথা, যাদের কর্তব্য ওদের সরিয়ে দেওয়া তারা সবাই চুপ, যেন বিমূঢ় হয়ে মুখ ফিরিয়ে আছে! ব্যাপারটা সে বুঝল না, তবুও নিজেই এগিয়ে যাচ্ছিল—গার্টফ্রিডের চোখে তার চোখ পড়তে সে থেমে গেল। তিনি ইসারায় তাকে বুঝিয়ে দিলেন—এখানে যা কিছু করবার, তিনি নিজেই করবেন।

ব্যস্ত বিমূঢ় হয়ে মেঘু একবার চেপে ধরে জেঠার হাত, আর একবার ধরে জেঠীর. অতি ব্যগ্র বিনয় ভক্তি ভরে বললে—কি কর! কি কর জেঠা, জেঠী ওঠ—

কে তার কথা শোনে! কান তাদের বন্ধ, বধির। শুধু একটি শব্দের জন্য তা খুলতে পারে। তারই জন্য আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে—না বাবা, না হুজুর, বলেন ক্ষমা—

শর্মিষ্ঠা ভেবেছিল, সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে না এতগুলো লোকের সামনে। কিন্তু তার বাপ-মায়ের অবস্থা, অথবা কান্ড দেখে পারল না সে চুপ ক'রে বসে থাকতে। সে বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে উঠানে, ছুটে এসে বাপ-মাকে ধমক দিয়ে টেনে ধরল। তারপর স্থির প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেঘুর পানে।—এমন চোখ মেঘু জীবনে দেখেনি। আহত সাপের চেয়েও ভীষণ সে চোখ। কোন ঐশ্বর্যের খাতির রাখে না সে চোখ। নিজের সম্মান জন্য যা কিছু করতে পারে সে চোখ। একটাও কথা বার হ'ল না শর্মিষ্ঠার মুখ থেকে, তার দরকারও ছিল না। চোখ দুটোই জানিয়ে দিচ্ছে তার মনের কথা।

সেই চোখের পানে তাকিয়ে শক্রী ও রাঘবের ক্ষমা লাভের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ভঙ্গ হ'ল, তারা মূর্ছিত হ'য়ে পড়ল। সেই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটা সকলের পক্ষেই অপমানজনক বোধ হ'ল।

সেই চোখের সামনে মেঘুর পা-দুটো টলতে থাকল নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে। সে চোখ মেঘুকে হুকুম করছে সেই উঠান থেকে নেমে যেতে।—পারল না মেঘু সে চোখের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে।

শর্মিষ্ঠার চোখের ওপর, মুখের ওপর থেকে তার দগ্ধ দৃষ্টিশূন্য চোখ দুটো টেনে ফিরিয়ে এনে মেঘু আপন মনেই বললে—এখানে একটা ভাল ঘর উঠবে হয় না!

এতক্ষণ পর গার্টফ্রিড সক্রিয় হবার অবকাশ পেলেন. তিনি এগিয়ে গেলেন, বললেন—তাই হবে, নকশা তৈরী হ'য়ে গেছে।

—জেঠার একটা ভাল কাজ।

তাকে নিশ্চিন্ত করতে গার্টফ্রিড বললেন—তা আমি আগেই দিয়েছি, সে এখন জমাদার। আচ্ছা, আরো বড় কাজ দেবার কথা ব'লে দিয়ে যাব।

যতটুকু মেঘুর কানে গেল তাতে সে নিশ্চিন্ত হ'ল, তবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—এদের যেন কোন কষ্ট না হয়, যখন যা দরকার—।

আর কোন কথা মেঘু বলতে পারল না। কন্ঠ রুদ্ধ হ'ল—তার বুকের মধ্যে তখন বিস্ফোরণের আয়োজন চলেছে, চোখ দুটো জ্বলছে—চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়, বুকটা ফেটে পড়তে চায় সদ্য ভস্মদগ্ধ হৃদয়ের আগুনে।

—আমি সব জানি, সব বুঝি। সব হবে, কিছু ভেব না সে জন্য। ব'লে, মেঘুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন গার্টফ্রিড।

যত তৎপর মেঘু রাঘবের উঠানে এসেছিল, তার চাইতে তৎপর সেখান থেকে নেমে গেল। যতখানি আনন্দের আতিশয্যে তার বুকটা ভরিয়ে নিয়ে সে বাগান দেখে ফিরবে ভেবেছিল ততখানি ব্যথিত ও ভগ্ন হৃদয় মন নিয়ে সে গাড়ীতে উঠে বসল। গার্টফ্রিডের মুখের প্রতি সে মুখ তুলে চাইতে পারল না, মাথা হেঁট ক'রে রেখেই মেঘু বললে—আর নয়, এবার ঘরে ফিরব।

দল ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে ব্যক্তি ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলের মনও ভেঙে পড়ল। যেন একটা বিয়োগান্ত নাটক দেখে যে যার ঘরে ফিরল।

এখান থেকে যার যেদিকে ঘর সেদিকে চলে গেল। যাদের ঘর গুমটির দিকে তাদের গাড়ী চলল মেঘুর, অর্থাৎ মেঘু ও গার্টফ্রিড যে গাড়ীতে সেই গাড়ীর পিছু-পিছু। পথে মেঘু কোন কথা বলতে পারল না, সে অবস্থাও তার ছিল না। গার্টফ্রিডও কোন চেষ্টা করলেন না তাকে কথা বলাবার।

মেঘুর আঘাতটা গার্টফ্রিডের মনেও প্রতিফলিত হয়। তাঁর মনেও সেটার কম প্রতিক্রিয়া হয়নি। তাই তাঁর বিবেক বিশেষ জাগিয়ে তোলে তাঁকে। ঘটনাটার এমন পরিণামের জন্য নিজেকেই দায়ী [illegible] করেন। দলটা বড্ড বড় হয়েছিল [illegible] নিজে আর মেঘু থাকলে হয়তো [illegible] হ'ত না। তা তিনি করতেন কি [illegible] ডিভিশনের ম্যানেজাররা হয়তো ভুল [illegible] ক্ষুণ্ণ হ'ত। চৌকিদার, জমাদার না থাকলে চলে না, কোথা দিয়ে কি হ'য়ে [illegible] দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পারে। [illegible] সাহেবের সঙ্গে মেঘু [illegible] সামনে গেলেও এমন হবার কথা [illegible] একলা ছেড়ে দেবার প্রশ্ন [illegible] পারে না। সবদিক ভেবেচিন্তেই [illegible] প্রস্তাব করেছিলেন—যার সঙ্গে [illegible] কথা বলতে চাও তাকে [illegible] এনে কথা বল। [illegible] সকলেই বুঝতে মেঘুর [illegible] চিন্তা মুহূর্তের জন্যও দূর [illegible] ভাবনা—তাতে তাদের [illegible] হবে, কেউ তেমন মন খুলে কথা [illegible] না। তাই মেঘু অনুরোধ [illegible] করেনি যখন গার্টফ্রিড প্রস্তাব করেছিলেন রাঘবকে ডেকে আনাবার [illegible] অনুগতদের সঙ্গে দেখা [illegible] অগত্যা বেছেবেছে তেমন [illegible] পদোন্নতির ব্যবস্থা গার্টফ্রিড [illegible] যাতে সবাই অনুভব করে [illegible] হাতের প্রলেপ। তবুও [illegible] হবারই। তাদের ঘরে [illegible] গেলেও আর তেমন মনখোলা [illegible] পারতে না। [illegible] নিজের ঘরে রাবণই [illegible] যেতে চায় না—সে মেঘুকে [illegible] খাওয়াপরা দিয়ে মানুষ [illegible] মধ্যে বসবাস করেছে। [illegible] দুটোই শত্রু, প্রতিটি পদক্ষেপ [illegible] চিন্তা করে। অনাধায় মুশকিল। [illegible] কোন একটা পরিস্থিতির [illegible] তো গার্টফ্রিড অনুকূল মত দিতে পারে মেঘুর প্রস্তাবে। ভাবতেন, কি [illegible] পারতেন তিনি সেটা [illegible] ঠেকলে লোকের শিক্ষা [illegible] শিক্ষাটা বড় মর্মান্তিক।

গুমটির কাছাকাছি এসে মেঘু [illegible] ড্রাইভারকে আদেশ করল গাড়ী থামাতে। গাড়ী থেকে নেমে সে গার্টফ্রিডকে বললে—আমি একটু নিধিরামবাবুর ঘরে যাই [illegible] তো সময় হবে না। আপনি বাংলোয় যান দয়া ক'রে মাফ করবেন এর জন্য।

গার্টফ্রিডের জবাবের জন্য অপেক্ষা না ক'রে সে চলে গেল নিধিরামের কোয়ার্টারের দিকে। গার্টফ্রিড বুঝলেন নিধিরামের ঘর পর্যন্ত সে গাড়ীতে যেতে চায় না, [illegible] থেকে তাদের ঘরের সামনে নেমে [illegible] দেখাতে চায় না। নিজের [illegible] এতটা কোন দিন করেনি। গার্টফ্রিড ভাবলেন তা যাক, ওদের সঙ্গে দুটো কথা বলে মেঘুর মনটা হয়তো একটু হালকা হবে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে, তিনি ড্রাইভারকে গাড়ী চালাবার আদেশ দিলেন।

(ক্রমশ)

চিত্র-সমালোচনা

বিভিন্নরূপী দুই যমজ বোন

সুবোধ মুখার্জী প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং সমীর গাংগুলী পরিচালিত রঙীন ছবি শর্মিলী দুই যমজ বোনের কাহিনী. যাদের মধ্যে একজন ধীর, নম্র, মুখচোরা, লজ্জাবতী লতা এবং অপরজন চঞ্চলা, প্রাণে জ্বলা, যৌবন মদে মাতোয়ারা আধুনিকা। কাহিনীকার গুলশন নন্দ চলচ্চিত্রের দর্শকদের মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাহিনী রচনা করেছেন। কাজেই নায়ক অজিত সৈন্য বিভাগে কাজ করে এবং অসমসাহসিক হলেও ভালো গান গাইতে জানে। সে প্রথমে অকস্মাৎভাবে চঞ্চলা কামিনীর সাক্ষাৎ পায় ও প্রেমে পড়ে। কিন্তু সে ক্ষণিকের ব্যাপার। পরে পালক-পিতা ফাদার জোসেফের ইচ্ছাক্রমে যখন বিবাহের জন্যে তার সামনে লজ্জাশীলা কাঞ্চনকে হাজির করা হয়, তখন সে তাকে কামিনী বলে ভুল করে এবং কামিনী ভেবেই তার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। কাঞ্চন ফুলশয্যার রাত্রেই অজিতের ভুল ভেঙে দিলে অজিত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকানো হয়েছে মনে করে কাঞ্চনকে ত্যাগ করে সেনা-নিবাসে ফিরে যায়। সেখানে সে নিজেকে মদের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে এবং সে চেষ্টায় অসমর্থ হয়ে আত্মহত্যা করবার জন্যে তীব্র বেগে জীপ গাড়ী চালায় বিপদসঙ্কুল পথের মধ্য দিয়ে। দুর্ঘটনায় সে পতিত হয় ঠিকই, কিন্তু হাসপাতালে নীত হয়ে চিকিৎসিত হতে থাকে। খবর পেয়ে ফাদার জোসেফ কাঞ্চনকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হন এবং ডাক্তারের মুখ থেকে যখন শোনেন যে, ওর বাঁচবার ইচ্ছাকে জাগ্রত করতে পারলেই ওর আঘাত সেরে যাবে, তখন তিনি কাঞ্চনকে অনুরোধ করেন, অজিতের সামনে কামিনীর ভূমিকা অভিনয় করতে। স্বামীর সুখেই ওর সুখ এই ভেবে কাঞ্চন যখন অজিতের সামনে কামিনীর ভূমিকা অভিনয় করে চলেছে এমন সময়ে আসল কামিনীর আবির্ভাব ঘটে। সে এখন

আলো আমার আলো/সুচিত্রা-উত্তম

কুচক্রী 'টাইগার'-এর সঙ্গিনী, গোপন দলিল পাচারের জন্যে একটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এরোপ্লেন করে তাকে গন্তব্য স্থানে যেতে হবে। অজিত কিন্তু এতদিনে নিজের ভুল বুঝে কামিনীরূপিনী কাঞ্চনকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। আসল কামিনী নিজের কাজের ভার কাঞ্চনের ওপর দিয়ে যখন অজিতের সম্মুখীন হল, তখন অজিত অল্পক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করল, সে যে কামিনীকে ভালোবাসে এ সে কামিনী নয় এবং যখন ওর মুখ থেকে শুনল, তার ভালোবাসার সামগ্রী এতক্ষণে এরোপ্লেনে চাপতে চলেছে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, তখন সে ছুটল সেই এরোপ্লেনের অভিমুখে এবং প্রচন্ড বাধাকে অস্বীকার করে এরোপ্লেনে চাপবার পরে সম্মুখীন হল সেই হীনমতি টাইগারের। এর পরের উত্তেজক দৃশ্য চোখে দেখাই ভালো—চলন্ত এরোপ্লেনের মধ্যে শক্তির লড়াই এবং শেষ পর্যন্ত জ্বলন্ত এরোপ্লেন থেকে নায়ক-নায়িকার প্যারাচুট-যোগে ঝম্প প্রদান, বোধ করি, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই প্রথম।

প্রেম ঈর্ষা, ভ্রান্তি, খলতা, ন্যায়-অন্যায়ের বিরোধ, উত্তেজক নৃত্য, পশ্চাদ্ধাবন প্রভৃতি দর্শক মনোরঞ্জক সকল মালমশলাই ছবিটিতে ভরে দেওয়া হয়েছে প্রচুর পরিমাণে এবং সেই কারণে ছবিটি দেখে দর্শক সাধারণ যদি রীতিমত খুশী হন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু মাত্র মনোরঞ্জন করাই চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য হতে পারে না, তাকে সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী হতে হবে। এবং এ-ব্যাপারে ছবিটির কোনো ভূমিকা নেই।

কাঞ্চন ও কামিনীর দ্বৈত ভূমিকায় রাখীর সু-অভিনয় ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ বলে গন্য হবে। অপরাপর ভূমিকায় শশী কাপুর (অজিত), নাজির হোসেন (ফাদার জোসেফ), অনীতা দত্ত (কাঞ্চন কামিনীর মা শান্তি), ইফতেকার (সৈন্য বিভাগের প্রধান) প্রভৃতি চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। ছবির অপর আকর্ষণ হচ্ছে নীরজ রচিত শচীনদেব বর্মণ সুরারোপিত ও কিশোরকুমার, লতা মঙ্গেশকর এবং আশা ভোঁসলে গীত গানগুলি।

সুবোধ মুখার্জী প্রোডাকসন্সকৃত 'শর্মিলী' দর্শক সাধারণকে খুশী করবার মতো ছবি। --নান্দীকর

স্টুডিও সংবাদ

'আলো আমার আলো'র শুভমুক্তি

আজ শুক্রবার, ১৭ই মার্চ মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে চারুচিত্র-এর বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'আলো আমার আলো।' উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত এই ছবিটি একটি রাহুগ্রস্ত প্রাণে প্রেমের বর্তিকা যে-আলো জেলে দিল, তাকেই উপজীব্য করে প্রতিভা বসু দ্বারা রচিত কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বঙ্কিম ঘোষ ভারতী দেবী, ভাস্কর চৌধুরী। ছবির পরিচালনা, সুরযোজনা, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে পিনাকী মুখোপাধ্যায়, পবিত্র চট্টোপাধ্যায় যুগ্মভাবে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা এবং রবীন দাস।

'পরিবর্তন'-এর শুটিং সমাপ্ত

ডি, এস, পিকচার্স-এর প্রথম রঙীন হিন্দী ছবি 'পরিবর্তন'-এর শুটিং দিল্লী ও সিমলা অঞ্চলে একটানা বারো দিন ধরে চলবার পরে সমাপ্ত হয়েছে। প্রযোজক দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া দ্বারা পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন রঞ্জিৎ মল্লিক, হীনা কৌসর, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, লোলিতা চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় মৌম্র মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর চৌধুরী, মনীষা, জালান আগা এবং সুধা শিবপুরী। উদয়শঙ্করের পুত্র আনন্দ-শঙ্কর ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন এবং সত্য রায় করেছেন চিত্রগ্রহণ। জুন মাসে ছবিটি মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

মুক্তিপ্রতীক্ষার অপর্ণা : দিলীপ সরকার প্রযোজিত সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত জরাসন্ধের 'অপর্ণা' শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ-এর পরিবেশনায় শ্রী-প্রাচী-ইন্দিরায় 'আজকের নায়কে'র পরই মুক্তি পাবে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—সলিল সেন, প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানের সুর দিয়েছেন—রবীন চট্টোপাধ্যায়। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন : আরতি মুখার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা বসু, গীতা মুখোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোঃ ও চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। নৃত্যে : নৃত্যরাজ হীরালাল। চিত্রগ্রহণে : কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সম্পাদনায় : সুবোধ রায়। প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, 'গঙ্গাপদ বসু, গীতা নাগ, গীতা দে, অমরনাথ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, জহর রায়, তরুণকুমার, তৃপ্তী ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, রেবা দেবী, সুচেতা বন্দ্যোঃ, বিজন ভট্টাঃ, বীরেন চট্টোঃ, মাঃ তপন, অরিন্দম ও কুমারী শর্মিলা প্রভৃতি।

নতুন দিনের আলো : রাখালচন্দ্র সাহার প্রযোজনায় বাদল পিকচার্সের অষ্টম ছবি অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত নতুন দিনের আলোর চিত্রগ্রহণের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছবিখানি এখন সম্পাদকের টেবিলে। সুর দিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্রগ্রহণে : অনিল গুপ্ত। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, বিদ্যা রাও, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ রায়, বিকাশ রায়, চিন্ময় রায়, বিনতা রায়, দীপান্বিতা রায়, বঙ্কিম ঘোষ, শমিতা বিশ্বাস, কল্যাণ, দেবরাজ, পদ্মা দেবী, প্রমোদ গাঙ্গুলী প্রভৃতি। জি, আর, পিকচার্স ছবিখানির একমাত্র পরিবেশক।

'রূপসী বাংলা'

দুই বাংলার শিল্পী সমন্বয়ে প্রথম চিত্র প্রয়াস 'রূপসী বাংলা'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান গেল ১৮ ফেব্রুয়ারী ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনার জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। বাংলাদেশের নায়ক রাজ্জাক মহরত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ চিত্রপরিচালক শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায়।

তরুণ সাংবাদিক ও লেখক শ্রীরণেন মোদকের কাহিনী ও চিত্রনাট্যএর ভিত্তিতে 'রূপসী বাংলা' পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক শ্রীসরোজ রায়। সংগীত ও শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে সর্বশ্রী পূর্ণ দাস ও দীপেন সেন।

মহরত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সয়ে জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী বলেন, 'রূপসী বাংলার শুভ মহরত দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রাজ্জাক এই মহৎ প্রচেষ্টার সংগে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শ্রীরণেন প্রযোজক সংক্ষেপে ছবির মূল বিষয়বস্তু অভ্যাগতদের সামনে তুলে ধরেন। চলার পথে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ চাইলেন পরিচালক শ্রীসরোজ রায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং শেষে সংগীত পরিবেশন করেন বাউল দম্পতি পূর্ণ দাস ও মঞ্জু দাস।

মঞ্চাভিনয়

ইস্টার্ন রেলওয়ে অডিট রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'বিপ্লবী বাংলা' : বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদকে সজোরে আঘাত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার পবিত্র সংকল্পে যাঁরা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন একদিন এবং যাঁরা দেশের জন্য হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছিলেন, সেইসব অগ্নিযুগের দৃপ্ত শহীদদের সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'বিপ্লবী বাংলা'। বীরু মুখোপাধ্যায়ের এই নতুন নাটকটির প্রথম অভিনয়ের আয়োজন করেন ইস্টার্ন রেলওয়ে অডিট রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন। প্রতিটি শিল্পীর অন্তরছোঁয়া অভিনয়ে সমগ্রিক নাট্যপ্রযোজনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন অভয় ঘোষ (যতীন্দ্রনাথ), সুশীল রায়চৌধুরী (অতুল), কণীন্দ্রলাল দত্ত (প্রফুল্ল), সুব্রত রায় (বীরেন), সমর মুখার্জি (কানাই), অরুণ রায় (সত্যেন), ক্ষৌনীশ ব্যানার্জি, দিলীপ বিশ্বাস, রণজিৎ মজুমদার, রণজিৎ ঘোষ, কান্তচন্দ্র সাধুখাঁ, রাধাকমল মুখার্জি, অজিত দত্ত, প্রাণেশ চ্যাটার্জি, গৌতম রায়, অনিল রায়, স্যামুয়েল প্যোয়ী, চণ্ডী ব্যানার্জি, ননীগোপাল সেন, মুকুন্দ মুখার্জি, গীতা নাগ (বিনোদবালা), যূথিকা ব্যানার্জি (ইন্দুমতী), ইন্দিরা দে (নীলিমা), মঞ্জুশ্রী মুখার্জি (লক্ষ্মী), গায়ত্রী সরকার (ডরোথি)।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীউদয়শংকর।

'সুদামা' নাট্যাভিনয়—গেল ২৩শে ফেব্রুয়ারী রামলীলাবাগান সার্বজনীন পূজামণ্ডপে অনাথ স্মৃতি সঙ্ঘ অপরেশ মুখার্জীর 'সুদামা' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন। বিভিন্ন চরিত্রে চরিত্রানুগ অভিনয় করেন যথাক্রমে শীলা দত্ত (কৃষ্ণ), আরতি দাশ (ছদ্মবেশী কৃষ্ণ), রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায় (পরাণ), সন্ধ্যা দাশ (সুমতী), মালতী বারুই (রুক্মিণী) ও উর্মিলা বারুই (দেবর্ষি)। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন যথাক্রমে নমিতা মল্লিক (সুদামা), দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ও সবিতা মল্লিক (দ্বারী), কৃপা মান্না (তুলসী), রবী মুখোপাধ্যায় (সহচরী) ও শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সাউ, নূপুর গুপ্তা, রামপিয়ারী মুড়াই, দুলারী মুড়াই ও পুষ্প মাঝি (সখিবৃন্দ)। অভিনেতাদের মধ্যে অধিকাংশই কিশোর-কিশোরী। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন অনিমা দাশ। অমিয় মুখোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

লালমণিহাটে 'সূর্যের প্রার্থনা' মঞ্চাভিনয়

বাংলাদেশের লালমণিহাট কলেজের আমন্ত্রণে শহীদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী কুচবিহারের 'জেনকিনস্ স্কুল কালচারেল ফোরামের' সভাবৃন্দ লালমণিহাটের রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মঞ্চে অভিনয় করলেন 'সূর্যের প্রার্থনা' নাটকখানি। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে ১৯৭১এর সফল মুক্তিসংগ্রাম পর্যন্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এ নাটকের আখ্যান। গানে, অভিনয়ে আর গ্রন্থনায় এক অপূর্ব মায়াজাল রচিত হয়েছিল সেদিন বাংলাদেশের ঐ মঞ্চে।

নাটকটির গ্রন্থনায় ছিলেন বিনয় সেন। তাঁর কন্ঠস্বর নাটকের ভাব প্রকাশের সহায়ক ছিল। এ নাটকের গানগুলি মঞ্চ নিবেদনকে যেন জীবন্ত করে তুলেছিল। সমবেত কন্ঠে গাওয়া কয়েকটি গান সত্যিই ভোলা যায় না।

নাটকটির দলগত অভিনয় সমবেত দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। দু-একটি বাদে ছোটবড় প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। প্রশান্ত গোস্বামীর অভিনয় অনবদ্য। তিনি দাপটের সংগে অভিনয় করেছেন। বরকতের মায়ের ভূমিকাভিনেত্রীর অভিনয়ও উল্লেখ্য। কবির ভূমিকায় শঙ্করদেব চক্রবর্তীর অভিনয় নাটকের মেজাজের সহায়ক। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে সুঅভিনয় করেন রামপ্রসাদ নায়েক, তপন মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর প্রসাদ ও রমেন্দ্রনারায়ণ সাহা।

চেক ছবি ট্রিকস্ অব তিমোর্শিভ লাভ

চেক চলচ্চিত্র উৎসব

চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী সপ্তাহ

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রক চেকোশ্লোভাক সোস্যালিস্ট রিপাবলিক সরকারের সহযোগিতায় সম্প্রতি চেকোশ্লোভাকিয়ার সাতখানি আধুনিকতম কাহিনী চলচ্চিত্রের সঙ্গে সমসংখ্যক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের যে-প্রদর্শনী ব্যবস্থা করেছেন ভারতের নয়াদিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, ভূপাল ও ভুবনেশ্বরে, তাকে 'উৎসব' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে, এই ছবিগুলির প্রদর্শনী বাবদ জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো প্রমোদকর নেওয়া হয় নি এবং প্রতিটি শহরেই সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর প্রথম দিনটিতে একটি করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ঠিক উৎসব বলতে যা বোঝায়, প্রদর্শনী গৃহকে পত্র, পুষ্প, পতাকা এবং আলোকমালায় সজ্জিত করা, নহবৎ বা অন্য কোনো আধুনিক ইলেকট্রোনিক কণ্ঠসঙ্গীতের ব্যবস্থা করা ও চেকোশ্লোভাক ফিল্ম ডেলিগেশনের আগমন—তার একান্ত অনুপস্থিতিই নজরে পড়ল আমাদের কলকাতা শহরে। অপরাপর শহরে কিভাবে এই উৎসব পালিত হয়েছে, সে-খবর আমরা জানি না।

তবে ধন্যবাদ দেব তাঁদের যাঁরা বর্তমান প্রদর্শনীর জন্যে সাতখানি কাহিনী-চিত্র নির্বাচন করেছিলেন। কারণ, এই সাতটি ছবির প্রত্যেকটি অন্যটি থেকে পৃথক—কি বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের দিক দিয়ে, কি অনুসৃত কলাকৌশলের বৈচিত্র্যে। একমাত্র 'ম্যেন অ্যাবাউট টাউন' ছবিটি সাদাকালোয় গৃহীত, বাকী ছ'খানি ছবিই রঙীন। বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিচিত্র চিন্তাধারার সঙ্গে কলাকৌশলের অসামান্য দক্ষতা মিলিত হলে যে-কি আশ্চর্য শিল্পবস্তুর জন্ম সম্ভব, তার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা গেছে এই ছবিগুলির মধ্যে কোনো কোনোটিতে।

সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে আমাদের কারেল কাচিনা পরিচালিত 'জাম্পিং ওভার পুড্‌লস এগেন' ছবিটি। বাচ্চা ছেলে অ্যাডাম, তার বাবার কাজ হচ্ছে ঘোড়াকে পোষ মানানো। এ-ব্যাপারে তাঁর জুড়ী নেই। মায়ের কড়া নজরকে ফাঁকি দিয়ে অ্যাডাম তার বাবার ঘোড়া-শিক্ষকতার কাজ দেখতে যায়। মনে মনে তার ইচ্ছে, সেও একদিন ঐ কাজে তার বাপের মতোই পারদর্শী হবে। কিন্তু বিধি বাম। একজন লোহারকে গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল বলে সে ওকে মারতে তাড়া করেছিল। কোনোক্রমে তার চোখ এড়িয়ে জলের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে সে-যাত্রা সে রক্ষে পেয়েছিল। কিন্তু ফলে তার পা পোলিও রোগাক্রান্ত হল। বহু চিকিৎসা সত্বেও সে তার পা জোড়ার স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পেল না। বাঁ পায়ের দুর্বলতার জন্যে তাকে ক্রাচের সাহায্যে চলাফেরা করতে হত। কিন্তু অসাধারণ মনোবল ও দুরন্ত ইচ্ছা অ্যাডামকে কি করে পায়ের দৌর্বল্য সত্বেও দক্ষ ঘোড়-সওয়ারে পরিণত করেছিল, তারই জ্বলন্ত ও জীবন্ত দৃশ্য ছবির শেষাংশকে সমৃদ্ধ করেছে। 'দি ফানি ওল্ডম্যান' ছবির যশস্বী পরিচালক কারেল কাচিনা হাল্কা ও গুরুগম্ভীর রসের আশ্চর্য সমন্বয়ে 'জাম্পিং ওভার পুড্‌লস্ এগেন' ছবিটিকে একটি মাধুর্যমণ্ডিত ও মানবিক আবেদনপূর্ণ শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছেন। অবশ্য মুখ্য ভূমিকায় ভ্লাডিমির ড্লুহি-র সুন্দর আকৃতি ও ততোধিক সুন্দর অভিনয়

ছবিটির সাফল্যে অনেকখানি সহায়তা করেছে।

জুলেস ভার্নের কাহিনী অবলম্বনে গঠিত বিজ্ঞান-কাহিনী চিত্র **'অন দি কমেট'** কলাকৌশলের পারদর্শিতার একটি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ১৮৮৮ সালে ফরাসী আলজিরিয়ার একটি অংশ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যপথে পরিক্রমা করে এবং এক সময়ে মঙ্গল গ্রহের সন্নিকটবর্তী হওয়ার ফলে অস্বাভাবিক ভূকম্পন, উল্কা-বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি উপদ্রবক্লিস্ট হওয়ার পরে আবার পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত হয়—এই কাল্পনিক কাহিনীর এমন একটি নিখুঁত চিত্রায়ণ করেছেন কারেল জেমান, যার তুলনা কচিৎ পাওয়া যায়। এ-রকম বিস্ময়কর কলাকৌশল আমরা কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

মানবিক সম্পর্কের ওপর গড়ে উঠেছে মার্টিন হোল পরিচালিত **'দি কপার টাওয়ার'**। তিনটি বন্ধু প্রতি বছরই একটি পর্বতসংকুল অঞ্চলে যেত কিছুদিন সেখানকার নির্জনতা উপভোগ করবার জন্যে। একবার তাদের মধ্যে এসে পড়ল একটি নারী। তিন বন্ধুর মধ্যে পিরিন পড়ল তার প্রেমে এবং অবশেষে দুজনের বিবাহও হয়ে গেল। বাকী দুজন বন্ধু প্রথম প্রথম কেমন যেন বিচ্ছিন্ন বোধ করতে লাগল, কিন্তু সাস্কা আশ্চর্য উপায়ে তাদের বন্ধুত্ব অর্জন করল এবং সকলে মিলে আনন্দে অতিবাহিত করল সারাটা গ্রীষ্মকাল। শরৎ সমাগমে সাস্কা পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে নিকটবর্তী শহরে যেতে শুরু করল এবং ক্রমে পিরিনের সন্দেহভাজন হয়ে পড়ল। পিরিনের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল পিরিন যদি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো তাহলে আমাকে অযথা সন্দেহ করে আমাদের ভালোবাসাকে কলঙ্কিত করো না। কিন্তু পরে যখন পিরিন জানল, সে হাসপাতালের এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ করে, তখন সে ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং পর্বত চূড়া থেকে তাকে ফেলে দিয়ে হত্যা করল। এবং এরও পরে যখন ডাক্তারের নিজের মুখ থেকে আসল কথা প্রকাশ পেল যে, ডাক্তারের শত প্রেম নিবেদনকে উপেক্ষা করে সাস্কা তার স্বামীর ভালোবাসাকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিল, তখন পিরিন নিজেও আত্মহত্যা না করে পারে না।

—আশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের রোমাঞ্চকর পরিবেশের মধ্যে ছবির বেশীর ভাগই নির্মিত। কাহিনী বিস্তারও ঘটেছে বিচিত্রভাবে, বিশ্বাস্যরূপে। ক্রমে ছবিটি অসামান্য নাটকীয়তা অর্জন করেছে। এবং সকল পরিস্থিতির মধ্যে বাস্তব অভিনয় করেছেন সকল শিল্পীই—বিশেষ করে পিরিন বেশে স্টেফান কিরেটিক ও সাস্কার ভূমিকায় এমিলিয়া ভাসারিয়োভা। ছবিটি সম্বন্ধে একমাত্র অভিযোগ ছবির শেষাংশ অপেক্ষাকৃতভাবে সংক্ষিপ্ত করা উচিত ছিল এবং তা না করার ফলে ছবির ভারসাম্য বজায় থাকে নি।

চেক ছবি অন দি কমেট

ওল্ড্রিচ লিপস্কি পরিচালিত **'আই কিল্ড আইনস্টাইন জেন্টলমেন'** আর একখানি বিজ্ঞান-কাহিনী চিত্র হলেও 'দি কমেট' ছবির চিন্তাধারা ও কলাকৌশলের সঙ্গে এর অনুমাত্রও মিল নেই। আধুনিক পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক পদার্থবিদ্যার (নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর) জনক আইনস্টাইন বর্তমানের বহু বিপত্তির জন্যে দায়ী—যেমন বায়ু দূষিত হওয়ায় নারীরা সন্তান প্রসব করতে পারছে না, নারীদের মুখে দাড়ি গজাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি—সেই কারণে বর্তমানের জনকয়েক বৈজ্ঞানিক ঘড়ির কাঁটাকে পিছন দিকে চালিয়ে একটি 'ফ্লাইং সসার'-এ চেপে আইনস্টাইনের যুগে পৌঁছলেন তাঁকে হত্যা করবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু ঘটনা অন্য পথে চলায় তাঁকে হত্যা করা হল না। দ্বিতীয় বারের চেষ্টাও ব্যর্থ হল আর এক কারণে। বার বার ব্যর্থ হওয়ার পরে বৈজ্ঞানিকরা সাব্যস্ত করলেন আনবিক শক্তি আবিষ্কার করে আইনস্টাইন কোনো অপরাধ করেন নি, আজকের মানুষ সেই শক্তির অপব্যবহার করেই যত অনর্থের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ছবিটি এই ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট বিদ্রূপাত্মক না হয়ে স্থানে স্থানে গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ায় তেমন উপভোগ্য হয় নি। এবং কালের গতিকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে ফ্যান্টাসির সম্ভাবনা ছিল, তারও কোনো সদ্ব্যবহার করা হয় নি।

চমৎকার উপভোগ্য ছবি হয়েছে জিরি ক্রেজিক (উইরি ক্রেউইক ?) পরিচালিত ছোট ছবি দুখানি **'আর‍্যাব হর্স'** ও **'ইয়ার-রিং'** যাদের এক সঙ্গে নাম দেওয়া হয়েছে—**'ট্রিকস্ অব ডিলোপিটড লাভ'**। একটি ভালো ঘোড়ায় চেপে মিলান শহরের মেয়ররূপে শহরে প্রবেশ করে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার লোভে একজন লোক তার সুন্দরী স্ত্রীকে ঘোড়ার যুবক মালিকের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করতে দিতে পারে এবং তারই ফলে চিরদিনের জন্যে হারাতে পারে স্ত্রীর ভালোবাসা—এই বক্তব্য অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে আর‍্যাব হর্স-এ।

• 'ইয়ার-রিং' ছবিটি আরও মারাত্মকভাবে বিদ্রূপাত্মক। পুরুষত্বহীন স্বামী নিজে নিজে দাবা খেলে সময় অতিবাহিত

করেন। স্ত্রী চায় তাঁর সঙ্গ, সে বিশ্বাস করে না তাঁর অক্ষমতার কথা, ভাবে, স্বামীর মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা নেই। অল্প বয়সী দাসীর সঙ্গে স্বামীর ব্যবহার স্ত্রীর ভাবনাকে সমর্থন করে। স্বামী যখন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দাসীর সঙ্গে নিভৃতে দেখা করতে চায়, স্ত্রী তখন তাকে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হতে বলে এবং যথা-সময়ে নিজে দাসীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে স্বামীর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। স্বামী কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণ করে নিজের পরিবর্তে তার চাকরকে দাসীর ঘরে পাঠিয়ে দেয়। —এর পরে যা ঘটল, তা অনুমানের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু ফলশ্রুতি হিসেবে স্ত্রীর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে, 'তোমার সম্বন্ধে আমার সে-ভয় ছিল, তা একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে এবং তোমার পুণ্যে আমি মা হতে চলেছি' এবং এরও পরে উজ্জ্বল দৃশ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে, স্ত্রী উল দিয়ে সন্তানের পোশাক তৈরী করছে ও স্বামী দোলা খেলাতে খেলাতে নবজাত শিশুকে কোল দিচ্ছে। —ছবিটি যে বিচিত্রভাবে উপভোগ্য, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

জেনেক পোড্‌স্কালস্কি পরিচালিত 'মেন অ্যাবাউট টাউন' ছবিটিও হাল্কা মেজাজের এবং উপভোগ্য। তিনজন রাজ-মিস্ত্রী এসেছে প্রাগ শহরের পুনর্গঠনের কাজ করতে। তারা শুনেছে নাইট ক্লাবের কথা, তাদের ইচ্ছে, তারাও ওখানে গিয়ে মজা উপভোগ করবে। তারা আদব-কায়দা, কথাবার্তা, পোশাক-আশাকে রীতিমত আধুনিক হয়ে যখন তিনজন সুবেশা রমণীর সান্নিধ্য লাভ করেছে, তখন সহসা বিপদবার্তা ঘোষিত হয়ে ছবির পরি-সমাপ্তি ঘটাল। কিন্তু এতে প্রচ্ছন্নভাবে যে-সামাজিক বিদ্রূপটি চিত্রিত হয়েছে তা আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নি।

জীবন সৈকতে/সৌমিত্র ও অপর্ণা সেন

নাৎসী অধিকৃত বোহেমিয়াতে যে সাম্যবাদী প্রতিরোধকারীর দল গড়ে উঠেছিল, তারই একটি সভ্যের শেষ দু' দিনের জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে ভাডিমির চেক পরিচালিত 'দি কী' ছবিখানি। একটি লুকিয়ে থাকবার মতো ফ্ল্যাটের চাবি সমেত সে ধরা পড়ে জার্মান গেস্টাপোদের হাতে। নানা রকম অত্যাচারের পরেও যখন জার্মান কমিশনার তার মুখ খোলাতে পারেন না, তখন ঐ চাবি কোন্ ফ্ল্যাটের, তারই জন্যে ব্যাপক তল্লাসী শুরু হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে তালাটি বদলে ফেলায় চাবি সংক্রান্ত কোনো হদিসই মেলে না। বন্দী অবস্থায় ঐ সাম্যবাদী সভ্যের গত জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র যেমন একদিকে দেখানো হয়েছে তেমনই অন্য দিকে নৃশংসভাবে বন্দীর শিরচ্ছেদের দৃশ্য ও [illegible] কঠিন কঠোর, নিষ্পৃহ কমিশনারের [illegible] দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে ছবিটিকে নাৎসী বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও একটি চমৎকার শিল্পবস্তু হিসেবে পরিণত করবার জন্যে।

কাহিনী চিত্রগুলির সঙ্গে [illegible] স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়, তাদের নাম হচ্ছে : নেহেরু অ্যান্ড চেকোশ্লোভাকিয়া, ফায়ার্ড রিভার্স, নিউ শ্লোভাকিয়া, এ-বি-সি, দি মোল অ্যান্ড দি গ্রীন স্টার, মেটামর্ফিউজ এবং হোমল্যান্ড। নাম থেকেই বোঝা কঠিন নয় যে, তিনখানি ছবিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত এবং তার মধ্যে একখানি ঐ দেশে পণ্ডিত নেহেরুর পদার্পণ ও ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করে। বাকী চারখানির ভিতর সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক হচ্ছে 'মেটামর্ফিউজ'। পম্পির ফ্রেসকোগুলির সাহায্যে পরি-চালক জিরে ব্রেড্‌কা যে-ভাবে অর্ফিউস এবং ইউরিডাইসের প্রাচীন কাহিনীর রূপদান করেছেন, তা তাঁর আশ্চর্য সৃজনী শক্তির পরিচায়ক। স্থিরচিত্রে গতির সংযোগ এবং তাতে কণ্ঠদান এক অনন্যদৃষ্ট চিত্রায়ণের নিদর্শন। প্লাস্টিকের সাহায্যে শিশুদের বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে 'এ-বি-সি'তে। প্রকাণ্ড লৌহ-কারখানার গলিত লৌহ হচ্ছে 'ফায়ার্ড রিভার্স'-এর উপাদান। কার্টুন ছবি মারফত একটি ছোট্ট পোকার আকাশের গায়ে তারা

শিল্পকন্যা : মিঠু মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

রুমানোর দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে 'দি মোল অ্যান্ড দি গ্রীন স্টার্স'এ।

খুব একটা অভাবনীয় কিছু দেখা না গেলেও সদ্য অনুষ্ঠিত 'চেকোশ্লোভাক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' চেকোশ্লোভাকিয়ার আধুনিকতম চলচ্চিত্র শিল্পের সম্যক পরিচয় বহন করে।

—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সুচিত্রা মিত্রের একক রবীন্দ্রসংগীতের আসর

রবি তীর্থের প্রযোজনায় আসছে ২৫ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের একক রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পূজা ও ব্রহ্ম সঙ্গীত এবং বসন্ত এই দুটি পর্যায়ে শ্রীমতী মিত্র সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

ভারত-বাংলাদেশ সংস্কৃতি ও মৈত্রী মেলা

আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে কলকাতায় সপ্তাহব্যাপী ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের উদ্যোগে এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী এবং কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক, কবি ও শিল্পীকে মেলায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। জানা গেছে তারা সকলেই যথাসময়ে উপস্থিত হবেন।

শ্রীঅন্নদাশংকর রায়কে সভাপতি, শ্রীবাণীকণ্ঠ গুহকে অস্থায়ী সভাপতি ও শ্রীসুধীর ভট্টাচার্যকে সাধারণ সম্পাদক করে এক মেলা-কমিটি গঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের (১৫২ রবীন্দ্র মুখারজি রোড, কলকাতা-২৫) পক্ষ থেকে শ্রীঅন্নদাশংকর রায়, শ্রীঅজিত দত্ত, ডাঃ এ এম ও গণি, শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব, শ্রীমতী অমলাশংকর, ডাঃ অমল সেন, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীমতী লীলা মজুমদার, বিচারপতি এস এ মাসুদ, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীপরিতোষ সেন, শ্রীশম্ভু মিত্র, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীসুভাষ মুখার্জি, শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীমণীন্দ্র রায় এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন:

দেশভাগের সময় আমাদের সকলের ধারণা ছিল যে, এপারের সঙ্গে ওপারের স্বাভাবিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু দেশভাগ পরিণত হলো সর্বপ্রকার বিচ্ছেদে। সাহিত্যে, শিল্পে, নাটকে, সিনেমায় জীবনের বিভিন্ন প্রকাশে আমরা পরস্পরের বিচ্যুত হয়ে বিপরীত মুখে ভেসে যেতে থাকলুম। পাঁচ বছর এইভাবে কাটবার পর শান্তিনিকেতনে পূর্ব-পশ্চিম উভয় দেশের সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। কথা ছিল এরকম মেলা বছরে একবার না হোক কয়েক বছর অন্তর বসবে। কিন্তু ১৯৫৩ সালের পুনরাবৃত্তি আজ ১৯৭২ সাল অবধি হয় নি।

এই উনিশ বছরে দুই প্রান্তের ব্যবধান আরো বিপুল হয়েছে। কেমন করে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করে আমরা এই সংকল্প নিয়েছি যে, উভয় প্রান্তের সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতিকে নিয়ে আবার মেলা বসাতে হবে। এবার কেবল সাহিত্য-মেলা নয়, সংস্কৃতিমেলা। বইপত্র, চিত্র প্রভৃতির প্রদর্শনী। নাট্যাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন। নাচ গানের আসর। লোকগীতি প্রভৃতির রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো। বিশিষ্ট অতিথিদের আলাপ আলোচনা, ভাব-বিনিময়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্যাবলী ও দৃশ্যাবলী প্রকাশ।

এই মেলা যাতে সফল হয় তার জন্যে আমরা উভয় প্রান্তের শিল্পী সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি। জনসাধারণের কাছেও সহযোগিতার জন্যে আবেদন পেশ করছি। কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই মেলা সফল হলে পর ঢাকাতেও অনুরূপ মেলার আয়োজন সহজসাধ্য হবে। সকলের সমর্থন পেলে বাৎসরিক মেলার উদ্যোগ করা যাবে। যতদিন না উভয় প্রান্তের স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন এর প্রয়োজন থাকবে। আমরা দেশভাগ রদ করতে চাই নে। ঐতিহাসিক কারণে যা হবার তা হয়ে গেছে। আমরাও মেনে নিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিন্ন করে কোন পক্ষই লাভবান হয় নি। যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হলে উভয়েই লাভবান হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য আমাদের মেলার মূলমন্ত্র। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ফলে এ-সুযোগ বহুকাল পরে এসেছে। আমরা আর কালবিলম্ব না করে সামনের এপ্রিলেই মেলা প্রাঙ্গণে মিলিত হচ্ছি। মৈত্রী পরিষদের তরফ থেকে সবাইকে সাদর আহবান। মেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে : পুস্তক ও চিত্রপ্রদর্শনী, নাটকাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনাচক্র।

খেলাধূলা

দর্শক

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

আগামী ১৮ই মার্চ জলন্ধরে ৩৭তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসছে। এবারের প্রতিযোগিতায় যোগদান করছে ২৫টি দল। এই ২৫টি দল চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। লীগ খেলার শেষে প্রতি গ্রুপের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলকে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হবে। এই কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা থেকে নক-আউট প্রথার খেলা শুরু।

চারটি গ্রুপে যে-সব দল খেলবে তাদের নাম :

'এ' গ্রুপ : পাঞ্জাব (গতবারের বিজয়ী), উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কেরল, জম্মু-কাশ্মীর এবং আসাম।

'বি' গ্রুপ : বাংলা, মহীশূর, ভূপাল, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং বিহার।

'সি' গ্রুপ : সার্ভিসেস, তামিলনাড়ু, বিদর্ভ, মধ্যভারত, উড়িষ্যা, প্যাতিয়ালা এবং গোয়া।

'ডি' গ্রুপ : বোম্বাই, রেলওয়ে, হায়দরাবাদ, হরিয়ানা, দিল্লী এবং গুজরাট।

বাংলার খেলা

মার্চ ২১ : বিপক্ষে রাজস্থান
" ২৩ : বিপক্ষে মহারাষ্ট্র
" ২৪ : বিপক্ষে ভূপাল
" ২৫ : বিপক্ষে মহীশূর
" ২৬ : বিপক্ষে বিহার

অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন

আগামী ২২শে মার্চ লণ্ডনের বিখ্যাত উইম্বলী এম্পায়ার পুলে ৬২তম অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এ-বছরের প্রতিযোগিতায় ৩০টি দেশের ৩০০ জনের বেশী খেলোয়াড়ের যোগদানের কথা আছে। ভারতবর্ষ এ-বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করছে না।

এই অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার যে-কোন বিভাগে খেতাব লাভের মূল্য, বে-সরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব জয়।

এ-বছরে পুরুষদের সিঙ্গলসের বাছাই তালিকায় ইন্দোনেশিয়ার ২২ বছরের খেলোয়াড় রুডি হার্টোনো শীর্ষস্থান লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, হার্টোনো গত চার বছর (১৯৬৮-৭১) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। ১৯৬৮ সালে হার্টোনো তাঁর ১৮ বছর বয়সে সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে তিনি আজও পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় সর্ব-কনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ান।

ইংলন্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

আগামী গ্রীষ্মকালে আয়ান চ্যাপেলের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরে যাবে। দলের নির্বাচিত ১৭ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে পাঁচজনের কোন টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নেই। এই পাঁচজন হলেন হ্যামন্ড, কুলি, ম্যাসী, ফ্রান্সিস এবং এডওয়ার্ডস।

গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী, বিল লরী এবং রেডপাথ—এই তিনজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে দলভুক্ত না করায় নির্বাচক-মণ্ডলীকে বেশ কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জীর তিন-বারের ইংল্যান্ড সফরের অভিজ্ঞতা আছে। ওপনিং ব্যাটসম্যান বিল লরীর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল শেষ ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ১৯৬৮ সালে। শেষ দু'বারের ইংল্যান্ড সফরে রেডপাথ দল-ভুক্ত হয়েছিলেন। পেস বোলার জেফ হ্যামন্ড এবং ডেভিড কুলির দলভুক্তিই যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

গত ১৯৭১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড ২—০ খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে 'এ্যাসেজ' জয়ী হয়েছিল। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার আজ 'এ্যাসেজ' উদ্ধারের পালা। ইংল্যান্ডগামী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আয়ান চ্যাপেল আশা করেন তাঁর দলেরই জয় হবে। তাঁর মতে ব্যাটিং এবং বোলিং এ দুই দিকে সমান নজর রেখে দল তৈরী হয়েছে।

ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় - নির্বাচন মণ্ডলীর সভাপতি এ্যালেক বেডসার বলেছেন, আগামী ১৯৭২ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের জয় হবে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান দলের নির্বাচিত সতেরজন খেলোয়াড়ের মধ্যে মাত্র সাতজনের ইংল্যান্ড সফরের অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার বাকি ১০ জন খেলোয়াড় ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলতে খুব অসুবিধায় পড়তে হবে। তবে আবহাওয়ার ওপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে ইংল্যান্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া পেরে উঠবে না। তবে আবহাওয়া ভাল থাকলে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা চমক দিতে পারবেন।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

আয়ান চ্যাপেল (অধিনায়ক), ডগ ওয়ালটার্স, জন গ্লিসন, জন ইনভেরারিটি, এ্যাসলে ম্যালেট, পল শিহান, ব্রায়ান টেবার, জি এস চ্যাপেল, আর এ ম্যাসী, কে আর স্ট্যাকপোল, জি ডি ওয়াটসন, ডেভিড কুলি, জেফ হ্যামণ্ড, ডেনিস লিলি, বব ম্যাসী, রস এডওয়ার্ডস এবং রু ফ্রান্সিস।

হকি টেস্ট

দিল্লীর শিবাজী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হকি টেস্ট খেলায় পশ্চিম জার্মানীর কাছে ভারতবর্ষের ০—১ গোলে পরাজয় ভারতীয় হকির কর্মকর্তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর দলগত সংহতি, ... ক্ষিপ্রতা এবং ক্রীড়ানৈপুণ্যের কাছে ভারতীয় দল একেবারে নিষ্প্রভ ... এক কথায় পশ্চিম জার্মানী এই ... পূর্ণ খেলায় ভারতবর্ষকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। মাত্র এক গোলের এই জয়লাভ দিয়ে পশ্চিম জার্মানী দলের শক্তি বিচার করলে মস্ত ভুল করা হবে। প্রথমার্ধে ১২ মিনিটের মাথায় ভারতবর্ষ গোল ... দীর্ঘ সময়ে তা শোধ দিতে পারেনি। অন্তত হকি খেলায় ভারতবর্ষের এ ধরনের অক্ষমতা চরম ব্যর্থতার পরিচয় নয় কি? ভারতীয় হকি দলের ... বলবীর সিং এই খেলা প্রসঙ্গে বলেছেন ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের বিচারে ... স্বীকার করতেই হবে যে, পশ্চিম জার্মানীর খেলোয়াড়রা ... ভারতীয় হকি খেলার কর্মকর্তারা ভারতবর্ষের এই পরাজয়ে ... পড়লেও, অনেকেই সাফাই গাইতে কোমর বেঁধে আসরে নেমে গেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষান্মাষিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষান্মাষিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৬ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 24th March 1972 শুক্রবার, ১০ই চৈত্র, ১৩৭৮ .52 Paise

এক নজরে

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার :

রাষ্ট্রের পুরস্কার ভাগ্যগুণে বা যশোগুণে বিশেষ ব্যক্তিদেরই প্রাপ্য ব'লে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু গণতন্ত্রী ফ্রান্স এ ব্যাপারে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ফরাসি সরকার স্থির করেছেন, তাঁরা মধুচন্দ্রিমার প্রথম রাত্রে সব দম্পতিকে বালজাক ও ভিক্টর হিউগোর ছয়খানি উপন্যাস উপহার দেবেন। আমরা সকলে ত রাষ্ট্রেরই সন্তান, সুতরাং শুভদিনের শুভমুহূর্তে আশীর্বাদস্বরূপে এমন অমূল্য উপহার যদি রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া যায়, সে ত সত্যিই আনন্দের কথা। ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী অলিভার গিশার্দ ঘোষণা করেছেন, ফ্রান্সে প্রতিবছর গড়ে যে সাড়ে তিন লক্ষ বিবাহ হয়, রাষ্ট্রের উপহার ছয়টি ধ্রুপদ উপন্যাস তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যথাসময়ে পেঁছিবে। আর দম্পতির পক্ষ থেকে যদি আগেই বাছাইর কথা জানিয়ে দেওয়া হয় তাহ'লে ত খুবই ভাল কথা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন : আমরা দেশের ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে চাই। আর ছ'খানি সুন্দর বই উপহার পেলে তাদের আরও বই কেনার আগ্রহ বাড়বে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটা হবে রাষ্ট্রের একটি সাংস্কৃতিক তৎপরতা।

আমাদের দেশে এমন একটা ব্যবস্থা বোধহয় কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কারণ, প্রথমত এদেশে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিধাতার এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়, রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বললেই হয়। তারপর ফ্রান্সে যদি প্রতিবছর সাড়ে তিন লক্ষ বিবাহ হয়ে থাকে তবে জনসংখ্যানুপাতে ভারতে প্রতি বছর বিবাহ অন্তত চল্লিশ লক্ষ, যাদের একখানি ক'রে গীতা-সাইজের গীতাঞ্জলি উপহার দিতে গেলেও সরকারের প্রায় দেউলিয়া হওয়ার অবস্থা হবে। আবার যে চল্লিশ লক্ষ দম্পতি প্রতি বছর এদেশে বিয়ের পিঁড়িতে বসে তার অন্তত উনচল্লিশ লক্ষই নিরক্ষর। সুতরাং তাদের উপহার হিসাবে বই দিতে হলে একখানা 'প্রথমভাগ' দেওয়াই সঙ্গত। সুতরাং যা ফ্রান্সে সম্ভব তা ভারতেও সম্ভব এমন কথা বলি না। কিন্তু ফ্রান্সের উপহার পরিকল্পনাটি যে প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জাপানের সেই মানুষটি : জাপানের সেই দুঃসাহসী বেপরোয়া সৈনিকটি যে আটাশ বছর গুয়ামের জঙ্গলে লুকিয়েছিল, আদিম গুহামানবের মতো যে বনের পশু ও গাছের ফল খেয়ে আর সমুদ্রের ঢেউ গুণে দিন কাটাত, সভ্যতার কল-কোলাহলের মধ্যে যে আর কোনদিন ফিরে আসার কথা ভাবেনি, রিপ ভ্যান উইংক্লের মতো হারিয়ে যাওয়া সেই মানুষটির হঠাৎ ফিরে আসার অভিজ্ঞতা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সে তরুণ বয়সে, তাই ছাপ্পান্ন বছর বয়সে ফিরে এসে এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাকে দেখতে হয়নি যে প্রৌঢ়া ভার্যা অপরের ঘরণী হয়ে সুখে দিনাতিপাত করছে। যুদ্ধে যোগদানের সময় আপন বলতে তার শুধু মা'ই ছিল এ সংসারে, ফিরে এসে সে মাকে আর দেখতে পায়নি, আর জানতে পারে যে সন্তান আর কোনদিন ফিরবে না ভেবে মা আর একটি ছেলেকে দত্তক নিয়ে তাকেই বাড়িঘর বিষয়-আশয় সব দিয়ে গেছে। কিন্তু সে ঘটনাটিকে অতি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিল এবং তাই সব সম্পদ ফিরিয়ে দিতে চাইলেও সে তা গ্রহণ করেনি। কারণ তার জন্য মানুষের কত ভালবাসা যে সঞ্চিত হয়েছিল তা সে ফিরে আসার পরেই উপলব্ধি করতে পারে।

সিওচি ইয়োকোই এখনও টোকিওর হাসপাতালেই আছে কারণ সভ্যজগতের ভোজ্য এখনও ধাতস্থ হয়নি তার। তার ওপর যুদ্ধের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলির ভয়ংকর স্মৃতি হঠাৎ এতদিন পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে তার প্রতি রাত্রির নিদ্রা বিঘ্নিত করছে, সে কারণে মানসিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়েছে তার। কিন্তু ইতিমধ্যে সারা জাপান থেকে তার আরোগ্য ও নিরাময় কামনা ক'রে চিঠি এসেছে কয়েক হাজার আর মনিঅর্ডার এসেছে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার। তাছাড়া জাপানের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং বেতার ও টি-ভি কর্তৃপক্ষও জানিয়েছেন যে ইয়োকোইর পুনর্বাসনের জন্য প্রতিদিন চারিদিক থেকে মনিঅর্ডার আসছে তাঁদের অফিসে। আবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে ইয়োকোইর সঙ্গে ঘর বাঁধার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে অনেক নারী তাঁদের কাছে চিঠি লিখেছেন।

চোর পালালে :

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—এটা এদেশের সুপ্রচলিত প্রবাদ। কানাডার সরকারি দপ্তরও এখন ঐ রকম নানা কথা ভাবছেন। তবে তাঁদের সমস্যা চোর নয়, খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন বন্দী। সে যে অমন ক'রে সমাজ বিজ্ঞানের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে তা কারা কর্তৃপক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেউই ভাবতে পারেন নি।

কানাডার পার্লামেন্টে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে জানানো হয়, আটত্রিশ বছর বয়স্ক ইয়োভস যোক্রে স্ত্রীকে ফাঁস দিয়ে হত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু মাত্র চোদ্দ মাস দণ্ডভোগের পর গত খৃষ্টমাসের প্রাকসন্ধ্যায় তাকে যে বিবাহের জন্য পঞ্চাশ ঘণ্টা ছুটি দেওয়া হয় সেই ছুটির পর আর সে জেলে ফিরে আসেনি এবং সে এখন কোথায় তা কর্তৃপক্ষের কারও জানা নেই। পার্লামেন্টে সরকার পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয় যে, বন্দীকে ছাড়ার সময় তাকে কোন প্রহরাধীনে রাখা হয়নি। কারমেন পারেন্ট নামক ২৭ বছর বয়স্কা এক প্রাক্তন নানকে বিবাহ করার জন্য যোক্রেকে জেল থেকে ছাড়া হয়েছিল।

সলিসিটর জেনারেল জাঁ-পিয়ের গয়ার বলেন, জেলে থাকতেই যোক্রে একটি জাল পাসপোর্ট জোগাড় করে এবং তার বাড়িঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও পাকা ক'রে ফেলে, যা থেকে সে অন্তত এক লক্ষডলার পায়। তারপর বিয়ের ব্যাপারটা একেবারে শিকেয় তুলে সে গাঢাকা দেয়। যোক্রেকে ছাড়া হয়েছিল এক সমাজবিজ্ঞানীর বারবার অনুরোধে। তিনি বলেছিলেন, যোক্রে বিবাহের সুযোগ পেলে তার অবৈধ প্রণয়ের তিনটি সন্তান ও প্রণয়িনী কারমেন পারেন্ট বৈধ অধিকারে যোক্রের বাড়িতে বাস করতে পারবে।

বিষাক্ত মুদ্রা :

কলকাতায় যে দারুণ খুচরো সঙ্কট চলেছে তার একটা বড় রকমের সান্ত্বনা মার্কিণ মুল্লুক থেকে পাওয়া গেছে। কেনটাকির দুই ডাক্তার বি এল এব্রামস ও এন জি ওয়াটারম্যান 'এমেরিকান মেডিকাল এসোসিয়েশনের' গত ২৮শে ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন, তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৩ ডলার ৪৭ সেণ্ট মূল্যের খুচরো মুদ্রা এবং দেড় শ ডলারের নোট সংগ্রহ ক'রে রসায়নাগারে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে মুদ্রাগুলির ১৩ শতাংশ ও নোটগুলির ৪২ শতাংশ সংক্রামক রোগের বীজাণুতে আচ্ছন্ন। সুতরাং, তাঁদের উপদেশ, টাকা পয়সা হাতে নাড়াচাড়া করার ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব কম করাই ভাল।

— প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

অভাবিত জয়, অসাধারণ দায়িত্ব

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় অধিকাংশ রাজ্যেই ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু এবারে একমাত্র মণিপুর, মেঘালয় ও গোয়া ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেস শুধু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় ফিরে আসেনি, প্রধান বিরোধী দলরূপে পরিগণিত জনসংঘ, স্বতন্ত্র, সোস্যালিস্ট ও মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা চরম পর্যুদস্ত হয়েছে। বিহার ও মধ্যপ্রদেশ ছাড়া গণনীয় বিরোধী দল অন্যান্য রাজ্য থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন। কংগ্রেসনামধারী সংগঠনপন্থী কংগ্রেস মহীশূর, গুজরাট, হরিয়ানা ও বিহারে কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও দেশের অন্যত্র তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে। মার্কসবাদীরা সারা ভারতে মাত্র ২৫টি আসন পেয়েছে। সে তুলনায় জনসংঘ অনেক ভাল ফল করেছে। সোস্যালিস্টরা অল্প হলেও সাতটি রাজ্যে প্রতিনিধি পাঠাতে পেরেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাত করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। এবার তেরোটি রাজ্যেই তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে জয় খুবই উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেসের এই জয় গতবারের লোকসভা নির্বাচনের জয়েরই সমতুল্য কিংবা তার চেয়েও বেশি। এগারোটি রাজ্যেই কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দুই তৃতীয়াংশ ছাড়িয়ে গেছে। বাকী পাঁচটি রাজ্যেও কংগ্রেসেরই আধিপত্য। কোথাও কোথাও বিরোধী দল প্রায় নিশ্চিহ্ন। প্রতি দশটি আসনের মধ্যে সাতটিই গেছে কংগ্রেসের দখলে। জওহরলাল নেহরুর আমলে অবিভক্ত কংগ্রেস যখন ছিল খুবই শক্তিশালী তখনও এমন নির্বাচনী সাফল্য তারা লাভ করতে পারেনি। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাও অন্যান্যবারের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে কংগ্রেসের পক্ষে। সবচেয়ে আশ্চর্য জয় হয়েছে পশ্চিমবাংলায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের সমস্ত হিসাব-নিকাশ ভ্রান্ত প্রমাণিত করে বহুদিনের বামপন্থী ঘাঁটিরূপে পরিগণিত পশ্চিমবাংলা পাঁচ বছর পর আবার কংগ্রেসকে বিজয়ী করেছে এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যা কোনোদিন এ রাজ্যে কংগ্রেস লাভ করেনি। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসবিরোধী কিংবা কেন্দ্রবিরোধী এই ধরনের অভিযোগ তুলে আর তাকে অবহেলিত বা বঞ্চিত রাখা চলবে না। কংগ্রেস এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়েছে যা স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলেও পাওয়া যায়নি। কী আসন সংখ্যায়, কী ভোটের সংখ্যায় পশ্চিমবাংলার মানুষ কংগ্রেসকে আগামী পাঁচ বছর বিনা দ্বিধায় এবং কার্যত বিনা বিরোধিতায় কাজ করবার সুযোগ এনে দিয়েছে। এ সুযোগ কোনো রাজনৈতিক দলের কাছেই সহজে আসে না। তার সদ্ব্যবহারের দ্বারাই এই অসামান্য বিজয়কে জনসাধারণের কাছে সত্যকারের তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হবে।

বামপন্থীরা একাধিকবার এই রাজ্যের জনসাধারণের আস্থা লাভ করে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা করতে পারেননি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে এই রাজ্যে বৃহত্তম দলের স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল গণতান্ত্রিক নির্বাচন। সে সুযোগও গ্রহণ করতে পারেননি তাঁরা। আজ কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের এই বিপুল সমর্থনকে বামপন্থীরা নির্বাচনী কারচুপি বলে চিহ্নিত করছেন কোন যুক্তিতে? ২৮০টি আসনেই কি কারচুপি করে জেতা যায়? আর যদি নির্দিষ্ট কয়েকটি কেন্দ্রে গোলমাল হয়ে থাকে (যে অভিযোগ মার্কসবাদী নেতারা করেছেন) তাহলেও গোটা নির্বাচনের সাফল্য বানচাল হয়ে যায় না। কংগ্রেসের এই জয়কে বলা হয়েছে তারুণ্যের জয়। বহুসংখ্যক তরুণ এবার কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন। তাঁদের হয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করেছেন বহু যুবক। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এর আগে এত ছাত্র ও তরুণকর্মীকে কোনোদিন টানতে পারেনি। এটাও তার জয়ের অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই। তবে আসল জয়ের কারণ, এই রাজ্যের মানুষের মোহভঙ্গ। বামপন্থী রাজনীতি এমন একটা স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে মুখরোচক শ্লোগান এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ ছাড়া তাদের দেবার আর কিছু ছিল না। তাদের ঐক্য ছিল নিতান্তই আসন ভাগাভাগির। জয়ের পর এই ঐক্যের স্বরূপ কী হয় তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দেখেছে। সুতরাং এবারে তারা আর শ্লোগানে ভোলেনি। স্থায়ী, সুস্থ এবং পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভোট দিয়েছে কংগ্রেসকে। এখন তার দায়িত্ব হবে প্রতিশ্রুতি পালন। 'গরিবী হঠাও' কথাটির মধ্যেই আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলমন্ত্র নিহিত। পশ্চিমবাংলা খুবই দুঃস্থ, বিভ্রান্ত এবং নানা আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। কংগ্রেস সরকার আগামী পাঁচ বছরে এই রাজ্যকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলতে বদ্ধপরিকর হোন। আজকের পশ্চিমবাংলায় এটাই একমাত্র দাবি এবং প্রত্যাশা।

পশ্চিমবাংলার নির্বাচকমণ্ডলী এবার বিধানসভার নির্বাচনে এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। বহু লাঞ্ছনা, দুঃখভোগ ও রাজনৈতিক জুয়াখেলায় নিপীড়িত পশ্চিমবাংলার মানুষ রাজ্যে স্থিতি ও শান্তির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে বিপুলভাবে তাঁরা সাড়া দিয়েছেন, কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে ২১৬টি আসনে বিজয়ী করে নির্বাচকমণ্ডলী শুধু কংগ্রেস বা প্রধানমন্ত্রীর জয় নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জয় ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের পাশে, স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ সাহায্য দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সরকার যে অভূতপূর্ব সাহস ও বিচক্ষণ নীতির পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রতিও এই ভোটের মারফতে এপার বাংলার মানুষ বলিষ্ঠ সমর্থন জানালো। এ জয় ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের। পশ্চিমবাংলার মানুষ সমৃদ্ধ পশ্চিমবাংলা দেখতে চায়।

কিন্তু প্রধান বিরোধী জোট সি পি এম নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েও পরাজয় স্বীকার করছে না, 'জালিয়াতী' ও 'নির্বাচনী প্রহসনের' কথা তুলে নিজেদের ইমেজ রক্ষার শেষ চেষ্টা করছে। ইতিহাসের গতিকে কী এইসব বাজে তথ্য দিয়ে অস্বীকার করা যায়? মার্কসবাদী দল কীভাবে জনগণের রায়কে এভাবে অস্বীকার করার সাহস পায় তা দেখে নিশ্চয়ই যুক্তিবাদী নাগরিক বিচলিত হবেন। কিন্তু কেন সি পি এম শোচনীয়ভাবে নির্বাচনে হারলো, কেন কংগ্রেস এতো বিপুল ভোট ও বিপুল আসন পেলো তার প্রাথমিক মূল্যায়ন, এখানেই করবো।

অমৃতে বিগত কয়েকটি সংখ্যায় যখন বলেছিলাম যে, '৭২ সালের কংগ্রেসকে '৬৭ বা ৬৯, এমনকি ৭১ সালের কংগ্রেসের শক্তি ও জনপ্রিয়তার সঙ্গে তুলনা করা চলে না, তখন কিছু লোক আমার বিশ্লেষণকে কংগ্রেস ঘেঁষা বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনী ফল প্রমাণ করেছে যে, এবারকার কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক ব্যাপ্তি এবং যুবশক্তির অভাবনীয় সমাবেশের সঙ্গে অতীতের কোন তথ্যে মিল নেই। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনের জনপ্রিয়তা ও জনশক্তির সমর্থন লাভ করেছে। বার বার বলেছি যে, এবার নির্বাচনী হাওয়া কংগ্রেসের অনুকূলে, সরকার তাদের করায়ত্ত। সি পি এম পন্থীরা উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনী তথ্যে আমাদের অনুমান যে ঠিক ছিলো তা প্রমাণিত। তাই নির্বাচনী ফলের আলোচনার সূচনায় এবারকার রায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো আগে তুলে ধরছি।

উল্লেখযোগ্য তথ্য :

'৭২ সালের নির্বাচনের ফলাফলের কতগুলো উল্লেখযোগ্য তথ্য হোল এরূপ : (১) কংগ্রেস এই সর্বপ্রথম গত সাতটি নির্বাচনের মধ্যে বিধানসভার শতকরা ৭৮ ভাগ আসন লাভ করলো (মোট প্রার্থী ছিলো ২৩৪ জন)।

(২) কংগ্রেস এই সর্বপ্রথম প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৪৯ শতাংশের বেশী ভোট পেলো।

(৩) কংগ্রেস-সি পি আই মোর্চা সমর্থিত নির্দলসহ প্রদত্ত বৈধ ভোটের শতকরা ৬৪ ভাগের বেশী ভোট পেলো (মোট ২৮০ জন প্রার্থী)। [১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিলো প্রায় ৫১ শতাংশ ভোট]।

(৪) সি পি এম এবার ১৯৭১ সালের তুলনায় গড়ে প্রায় ৫ শতাংশ ভোট কম পেয়েছে। অর্থাৎ এবার পেয়েছে গড়ে ২৮ শতাংশের মতো।

(৫) সি পি এম জোট ফরওয়ার্ড ব্লক সহ ২৮০ জন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ ভোট কম পেয়েছে।

(৬) আসনের দিক থেকে সি পি এম জোট গতবারে অর্জিত মোট ১৩৮টি আসনের তুলনায় এবার পেয়েছে মাত্র ২০টি।

(৭) সি পি এম নিজে হারিয়েছে ৯৯টি আসন, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩টি, আর এস পি ৩টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, এস ইউ সি ৬টি, মাঃ ফঃ ব্লক ২টি, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ১টি, সমর্থিত নির্দল [illegible]

(৮) গোর্খা লীগ, আর এস পি ও সংগঠন কংগ্রেস তার শক্তি বজায় রেখেছে।

(৯) মুসলিম লীগ ৭টির মধ্যে ৬টি হারিয়েছে, পি এস পি (সোস্যালিস্ট) ২টি হারিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক, ঝাড়খণ্ড, বাংলা কংগ্রেস, জনসংঘ পরিষদীয় রাজনীতি থেকে বিলুপ্ত।

(১০) সি পি আই ৩৫টি আসন (৪১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে) লাভ করে রাজ্যের দ্বিতীয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১৯৬৭ সালে ১৬টি, ১৯৬৯ সালে ৩০টি, এবং ১৯৭১ সালে ১৩টি আসন সি পি আই লাভ করেছিলো।

(১১) এবারকার নির্বাচনে ১ জন বিদ্রোহী কংগ্রেস, ১ জন বিদ্রোহী ফঃ ব্লক নির্বাচিত হয়েছেন। আর বামফ্রন্টের সমর্থিত ১ জন, কংগ্রেস সমর্থিত ২ জন নির্দল নির্বাচিত।

সর্বসম্মতিক্রমে পঃ বঃ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর সহকর্মীদের সঙ্গে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ছবিতে বাঁদিক থেকে প্রথমে শ্রীরায়ের পত্নী শ্রীমতী মায়া রায়।

আগেই বলেছিলাম এবার জোট-বন্দীর প্রকৃতি অনুযায়ী গতবারের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে কংগ্রেস-সি পি আই জোটের পক্ষে ৪৩ ভাগ এবং সি পি এম জোটের পক্ষে ৪০ ভাগ ভোট ছিলো। এবারকার নির্বাচনী রায় থেকে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস-সি পি আই জোট ২১ ভাগ ভোট বাড়াতে পেরেছে, আর কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার ২৮-৬ থেকে ৪৯-৬ এর বেশী অর্থাৎ ২০ ভাগের বেশী বেড়েছে। আর সি পি এম জোট গড়ে ৭ ভাগ ভোট কম পেয়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। আর সি পি এম হারিয়েছে ৫ ভাগ ভোট।

কংগ্রেস এই বর্ধিত ভোট কোন সূত্রে পেল—প্রথম কংগ্রেস-সি পি এম জোটের বাইরের যে ভোট ছিলো তার বহুলাংশ কংগ্রেসের অনুকূলে গিয়েছে। আর সি পি এম তার সাথীরা যে ফ্লোটিং ভোটটা পেতো তার হার ভীষণভাবে কমে গেছে। কংগ্রেস এবার গতবারের সংগঠন কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, নির্দল, লীগ ও অন্যান্য দলের ভোটের বিরাট অংশ নিজের দিকে টেনে এনেছে। যুব শক্তি নতুন ভোটারদের এক বিরাট অংশকে কংগ্রেসের অনুকূলে এনেছে। কাজেই কংগ্রেসের এত বিরাট জয় সম্ভব হয়েছে।

ইন্দিরা ঢেউ

পশ্চিমবাংলার নির্বাচনী যুদ্ধে ইন্দিরা ঢেউ ভীষণভাবে বিরোধীদের বিপর্যস্ত করেছে; ঝড়ের মুখে তৃণ যেমন উড়ে যায় সেইভাবে শহর ও গ্রামে ইন্দিরাজীর আহ্বান অনুযায়ী সি পি এমকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে। ইন্দিরাজী রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বহু সভা থেকে বলেছিলেন, আমার হাত শক্ত কর, আমাকে মদৎ দেও, আমি পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য করবো। দেশবাসী তাঁর কথায় আশা পেয়েছেন; কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে তাঁর হাত শক্ত করেছেন।

যারা 'ইন্দিরা ইয়াহিয়া' এক করে পোস্টার লিখেছিলেন, দেশনেত্রীকে গণতন্ত্রের হত্যাকারিণী বলে অভিহিত করেছিলেন তাঁদের নির্বাচনী যুদ্ধে পরাস্ত করে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রতিবাদ। ঐ মার্কসবাদী নেতারা কালের আহ্বান বুঝতে না পেরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ছোট করে দেখতে গিয়ে বিপদে পড়লেন, ইন্দিরাজী ও ভারত সরকারকে হেয় করতে গিয়ে রাজ্যবাসীর কাছে নির্মম জবাব পেলেন। তবুও তাঁরা নির্বাচনী রায় মানবেন না। 'কারচুপি'র অভিযোগ তুলে বাজীমাৎ করার মতো পরিবেশ আজ আর সি পি এম-এর নেই। তবুও তারা আর্তনাদ করছে, আরও করবে। জনগণের রায়কে যারা সম্মান দিতে চায় না, তারা কোন মুখে নির্বাচন চায় বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তা ভেবে পাওয়া যায় না।

ফুটবল খেলায় দুই পক্ষ হারজিতের প্রশ্নে, একটি গোলের ব্যাপারে একমত নাও হোতে পারে। একটি গোলকে অপর পক্ষ অফসাইড গোল বলে বর্ণনা করতে পারে। এ নিয়ে দু দলের সমর্থকদের মধ্যে বচসা হোতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেফারীর রায় মেনেই নিতে হয় বা আদালতে গিয়ে বিচার চাইতে হয়। কিন্তু বিজয়ী দল বিজয়ী হিসাবেই বিবেচিত হয়। অন্য রায় হোলে আবার বিপ্লব হোতে পারে। সাধারণত রেফারীর সিদ্ধান্ত মেনে চলাই খেলোয়াড়সুলভ আচরণ। এবার পশ্চিমবাংলায় ভোট হয়েছে, ফলও বেরিয়েছে। কোনও কোন কেন্দ্রের ব্যাপারে আপত্তি থাকলে তা রিটার্নিং অফিসার, ইলেকশন কমিশনে জানানো চলে; তাঁদের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে উচ্চ আদালতে বিচার চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ২৮০টি কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন চাওয়া, সব কেন্দ্রে জালিয়াতী হয়েছে বলে তারস্বরে চিৎকার কী গণতন্ত্রসম্মত যুক্তিবাদী দাবী হোতে পারে? আর রিটার্নিং অফিসারের রায় যদি আপনি নাই বিশ্বাস করেন, তবে পুনরায় নির্বাচন চাওয়াতো নিরর্থক। এই প্রশাসন যন্ত্রই তো নির্বাচন চালাবে। এই প্রশাসন যন্ত্রই ১৯৬৭, ৬৯ সালে নির্বাচন পরিচালনা করেছে। তখন যেহেতু কংগ্রেস

হেরেছিলো, সি পি এম বহু আসন পেয়েছিলো, যুক্তফ্রন্ট সাফল্য লাভ করেছিলো তাই সেদিনকার নির্বাচন ঠিক ছিলো, বৈধ ছিল, আর ৭১ সালের নির্বাচনী ফলও ঠিক ছিলো; শুধু অবৈধ হলো '৭২ সালের নির্বাচন। কেননা, কংগ্রেস বিপুলসংখ্যক আসন পেয়ে ক্ষমতায় এলো। আর সি পি এম ধরাশায়ী, মুমূর্ষু অবস্থায় পড়েছে। কাজেই নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। কংগ্রেস যখন ৫৫টি আসন পায় তখন সব ঠিক, কিন্তু সি পি এম ১৪টি আসন পেলে, সব বেঠিক ধরনের যুক্তি দিয়ে বাস্তব সত্যকে চাপা দেওয়া চলে কী?

সি পি এম হারলো কেন?

সি পি এম-এর নির্বাচনী পরাজয়ের মূলে রয়েছে নেতাদের আত্মসন্তোষ, দম্ভ এবং দলের বিভিন্ন ফ্রন্টের দুর্বলতা। দেশের মানুষের মধ্যে সি পি এম-এর সন্ত্রাস ভীতি, সি পি এম বিরোধী মনোভাব যে বেড়ে চলেছে তা চাপা দিয়ে ভোটারদের কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিরোধী—এই দুই ভাগে ভাগ করতে গিয়েই সি পি এম বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি বা চায়নি। '৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকে রাজ্যের মানুষেরা যে সি পি এম ও সি পি এম বিরোধী এই দুইটি স্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত তার ফল কিছুটা ১৯৭১ সালের নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছিলো। কিন্তু সেদিন সি পি এম বিরোধী ভোট কংগ্রেস, আট পার্টির জোট, বাংলা কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস, লীগের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে প্রায় ৪৪টি আসন সি পি এম লাভ করেছিলো সংখ্যালঘু ভোটে।

সরকারী ক্ষমতা হারাবার পর ক্রমশ একাংশ সমর্থক দলের বিরুদ্ধে চলে যায়, মারাপটের রাজনীতির বলি হয়ে বহু ক্যাডার বসে যায়, এবং ছাত্র, যুবক, শিক্ষক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমশ দ্বিধা বৃদ্ধি পায়। '৭২ সালের গোড়ায় দেখা যায় সি পি এমের কিষাণ সভার সদস্য শক্তি তিন লাখের বেশী কমে গেছে, ছাত্র পরিষদের বিপুল জয়ের মধ্য দিয়ে দেখা যায় স্কুল, কলেজে সি পি এম-এর অনুগামী ছাত্রের শক্তি অর্ধেকের বেশী কমে গেছে, তেমনি যুবশক্তিও ক্রমশ সরে যায়। শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, সওদাগরী কর্মচারীদের সংগঠনগুলো ক্রমশ বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর আন্দোলন বিমুখতার ফলে সি আই টি ইউ ক্রমশ দুর্বল হোতে থাকে। সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি থেকে প্রচুর সরকারী কর্মচারী সরে দাঁড়ায়, জেলায় জেলায় সি পি এম বিরোধী সরকারী কর্মচারীরা সঙ্ঘবদ্ধ হোতে থাকে। মেদিনীপুরের সি পি এমের বার্ষিক সম্মেলনে পার্টির পুস্তকে উল্লিখিত তথ্যে এই দুর্বলতাগুলোর আভাস থাকলেও, প্রকৃত চিত্র কর্মীদের সামনে তুলে ধরা হয়নি। অর্থাৎ সি পি এম সমস্ত ফ্রন্টে, সমস্ত ক্ষেত্রে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে এবং দলকে নতুন করে ঢেলে সাজতে না পারলে কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে নির্বাচনী যুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে না এমন চিত্র কোন সময়েই তুলে ধরা হয়নি। অবশ্য নির্বাচনী যুদ্ধে অপর ছোট দলগুলো, যারা অতীতে শত্রু বলে চিহ্নিত ছিলো তাদের সঙ্গে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার দিকটা তুলে ধরা হয়েছিলো। কারণ শাসন ক্ষমতায় আসতে হলে আর এস পি, এস ইউ সি, ফঃ ব্লকের দরকার।

কিন্তু একবারও সি পি এম হিসাব করে দেখলো না, পুরান আট পার্টির শরিকরা '৭১ সালে কার ভোট কেটেছিলো, কংগ্রেস, না সি পি এমের ভোট। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন চেহারা বা তথ্য থাকলেও দেখা যাবে, এরা সি পি এম বিরোধী ভোটই বেশী টেনেছিলো। কাজেই এরা সি পি এমের সঙ্গে গেলেও সেই ভোটও তারা সঙ্গে নিয়ে যাবে এ ধারণা ভুল। আর এই ছোট দলগুলোর নিজস্ব ভোটের হার ক্রমশ কমে গেছে। সি পি এম নিজেই এদের কোমর ভেঙে দিয়েছিলো; এখন ক্রক্ষেপ দিয়ে সোজা করলেও এরা আগেকার মতো শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। ফলে, এরা দুর্দিনের ফল-আমদানীকারক হয়ে উঠতে পারেনি। বরং পার্টির কাছে ভার হিসাবে দাঁড়িয়েছিলো। এতো মিত্র এনেও শক্তি বাড়ান গেল না।

সবচেয়ে বড় কথা হোল এই যে, সি পি এমের সন্ত্রাস-ভিত্তিক প্রচার, ইন্দিরা বিরোধী, কেন্দ্র বিরোধী প্রচারে নির্বাচকমণ্ডলী সায় দেয়নি। এই নেতিবাচক প্রচার ও প্রোগ্রাম নির্বাচকমণ্ডলীকে কংগ্রেসমুখী করে তুলেছে।

সি পি এমের সাংগঠনিক দুর্বলতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ হয়েছিলো রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ছাঁটাইর ব্যাপারে। সি পি এমের অনুগামী ১৩ জন সরকারী কর্মচারীকে রাজ্যপাল ছাঁটাই করলেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলন ব্যর্থ হোল, শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল ডায়াসের জয় হোল। তারপর বার বার বলা হয়েছিলো তীব্র গণসংগ্রাম শুরু হবে, কিন্তু কিছুই হয়নি, এই সংগ্রামবিমুখতাই কর্মীদের মধ্যে হতাশা এনেছে।

সি পি এম-এর অভিযোগ তথ্যভিত্তিক নয়

পশ্চিমবাংলার বহু কেন্দ্রের ফল থেকে দেখান যায় যে, গতবার সি পি এম প্রার্থীরা বিভিন্ন কেন্দ্রে যে ভোট পেয়েছিলেন এবার তার সমান, বা বেশী বা কোথাও সামান্য অল্প ভোট পেয়েছেন। কাজেই সেই সব কেন্দ্রে ভোটের জালিয়াতি বা কারচুপি হয়েছে এ যুক্তি ভিত্তিহীন।

সি পি আই'র নতুন জয়যাত্রা

সি পি আই বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক লাইন নিয়ে নতুন জয় করায়ত্ত করেছে। বিপুল ভোটে, বিপুল আসন লাভ করেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে গিয়ে সি পি আই সবচেয়ে লাভবান। কিন্তু নির্বাচনী মৈত্রীর মধ্য দিয়ে সি পি আই যদি কংগ্রেসের প্রভাবিত এলাকায় নিজেদের সংগঠনের প্রসার করতে চায় তবে ভবিষ্যতে ঐক্যে ফাটল আসতে পারে। কংগ্রেসের ভেতরে কে তার মিত্র, আর কে তার বিরোধী এই বাছাই করে কৌশল স্থির করতে গেলে সি পি আইর জয়যাত্রা ভবিষ্যতে মন্থর হোতে পারে। কারণ, ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত চরিত্র হননের প্রশ্নে কংগ্রেস কর্মী ও সি পি আই কর্মীদের মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্রে বিরোধ দেখা দিয়েছে। তেমনি কংগ্রেস সি পি আইকে ব্যবহার করে, পরে তার অবদান অস্বীকার করলে কংগ্রেসও অনেক ক্ষেত্রে বিপদে পড়বে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোটের ভবিষ্যৎ উভয় দলের মধ্যে সম্পর্কের ওপরই নির্ভরশীল।

বিধানসভায় বিরোধী দলের অভাব

একটা স্থায়ী সুস্থ সরকারের তীব্র আগ্রহে নির্বাচকমণ্ডলী এমন রায় দিয়েছেন যার ফলে এবার রাজ্য বিধানসভায় কোনও বিরোধী দল রইল না। সি পি এম মোট মাত্র ২০টি আসন লাভ করেছে। আর অন্যান্য দল ও নির্দল সদস্য রয়েছে মাত্র ৬ জন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ইতিহাসে এতো অল্প বিরোধী সদস্য সংখ্যা এর আগে কখনও ছিলো না। ১৯৫২ সালে ৮৬ জন, ১৯৫৭ সালে ১০০ জন, ১৯৬২ সালে ৯৫ জন, ১৯৬৭ সালে ১২৭ জন, ১৯৬৯ সালে ৬২ জন এবং ১৯৭১ সালে ১২৫ জন। এবার দাঁড়ালো মোট বিরোধী শক্তি ২৬ জন।

এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক বিজয় ও কতগুলো ছোট মাঝারি দলের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার নতুন যাত্রা শুরু হোল।

তুলনামূলক দলগত অবস্থা

(চারটি নির্বাচনের ভিত্তিতে)

দলের নাম	১৯৬৭	৬৯	৭১	৭২	লাভ+ ক্ষতি—
কংগ্রেস—	১২৭	৫৫	১০৫	২১৬	+১১১
সি পি এম—	৪৪	৮০	১১৩	১৪	—৯৯
সি পি আই—	১৬	৩০	১৩	৩৫	+২২
বাংলা কং—	৩৪	৩৩	৫	×	—৫
ফঃ ব্লক—	১৩	২১	৩	×	—৩
পি এস পি—	৭	৫	৩	×	—৩
আর এস পি—	৬	১২	৩	৩	—
এস ইউ সি—	৪	৭	৭	১	—৬
মুসলীম লীগ—	—	৩	৭	১	—৬
গোর্খালীগ—	২	৪	২	২	—
সংগঠন কং—	—	—	২	২	—
অন্যান্য ও নির্দল	২৯	৩০	১৭	৬	—১১
মোট	২৮০	২৮০	২৮০	২৮০	

একাত্তরে শ্রীমতী গান্ধীর জয়রথ সারা দেশ পরিক্রমা করে শেষে এই পশ্চিমবাংলাতেই কিছুটা থমকে দাঁড়িয়েছিল। লোকসভায় তার দল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে কী হবে, এই রাজ্য থেকে লোকসভার অর্ধেক আসনও কংগ্রেসের ভাগ্যে জোটে নি। বিধানসভার পরবর্তী নির্বাচনে দলের অবস্থা উনসত্তরের চেয়ে অনেক ভালো হলেও, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আশা পরিণত হয়েছিল দুরাশায়। শ্রীমতী গান্ধীর জয়যাত্রা যারা প্রতিহত করেছিল তারা হল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। কিন্তু আজ ঠিক এক বছর পরে দেশ জুড়ে যে 'ইন্দিরা-তরঙ্গ' চলেছে তার সামনে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি একেবারে খড়কুটোর মতোই ভেসে গেল।

প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সব হিসেব গোলমাল করে দিয়ে কংগ্রেস আবার এই রাজ্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বোধহয় তা বলাও ঠিক হল না, কারণ এবারের রেকর্ড অতীতের সব কীর্তিকেই ম্লান করে দিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও কংগ্রেসের সাফল্য বেশ কিছুটা বিস্ময়কর। কিন্তু মনে হয় পশ্চিমবাংলার সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের অবস্থার রীতিমতো পার্থক্য রয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেসের নতুন শক্তি ও ভাবমূর্তির সঙ্গে জনসঙ্ঘ বা স্বতন্ত্রের মতো দক্ষিণপন্থী দল এবং সোস্যালিস্ট পার্টির মতো বামপন্থীরা যে পাল্লা দিতে পারছে না তা বিভিন্ন রাজ্যে একাত্তরের লোকসভার নির্বাচনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অমন যে মহীশূর সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের নায়ক নিজলিঙ্গাপ্পাজীর দুর্গ বলে পরিচিত ছিল সেই দুর্গে হানা দিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর দলের প্রার্থীরা সব কটি লোকসভার আসন দখল করেছিলেন। সুতরাং মহীশূরের মতো রাজ্যে এবার বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস যদি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তবে তাতে কোনো মতেই অবাক হওয়া চলে না। অন্যান্য অনেক রাজ্য সম্পর্কেও এই কথা খাটে। খাটে না শুধু পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে।

কারণ এই রাজ্যে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার ১৯৬৯ সালের তুলনায় একাত্তরে কমে যায় এবং সেই তুলনায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ভোটের অনুপাত যায় বেড়ে। আমি জানি এই হিসেবের মধ্যে একটা অসঙ্গতি আছে। কারণ, একাত্তরের নির্বাচনে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত ছিল। কিন্তু একাত্তরে দুই কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার যোগ করলেও ১৯৬৯ সালের হারের চেয়ে কম হয়। অবশ্য কংগ্রেসের ভোটের হার কম হওয়ার একটা বড় কারণ, ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ২৮০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল, একাত্তরে তা দেয় নি। অপরদিকে, একাত্তরে সি পি এম দুইশতাধিক আসনে প্রার্থী দিয়েছিল, আর ১৯৬৯ সালে তাদের প্রার্থীর সংখ্যা ছিল একশর কম। কিন্তু এ-সব হিসেব সত্ত্বেও এ-কথা সত্যি যে, সি পি এমের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল দলের পক্ষে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। একাত্তরের ফল বিশ্লেষণ করলে অপর কোনো রাজ্যেই প্রতিপক্ষের এমন আশাপ্রদ অবস্থা দেখা যায় না। বাহাত্তরের নির্বাচনে কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্য এবং সি পি এমের অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের পুরো তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্যে এই কথাটা মনে রাখা দরকার।

এবারের নির্বাচনে কোন্ দল কতো শতাংশ ভোট পেল তার হিসেব এখনও পাওয়া যায় নি। কিন্তু সে হিসেব বোধ হয় কিছুটা অবান্তর। কারণ, কংগ্রেস যেখানে শতকরা ৭৫টি আসন দখল করেছে সেখানে ভোটের গড়পড়তা হার, কোন্ দল কার কাছ থেকে কটা আসন ছিনিয়ে নিল, কোন্ জেলায় কোন্ দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল সে-হিসেবে সাধারণ মানুষের আগ্রহ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কারণ এবারে শুধু কংগ্রেস আর কংগ্রেস, আর সেই সঙ্গে সি পি আই। তার মধ্যে মাঝে মাঝে যতিচিহ্নের মতো অন্যান্য দল। বামপন্থী ফ্রন্টের মধ্যে একমাত্র আর এস পিই গতবারের সমানসংখ্যক আসন পেয়েছে (তিনটি)। সংগঠন কংগ্রেসেরও শক্তি অপরিবর্তিত (দুই)। কিন্তু অন্যান্য ছোট দলের অনেকেই নিশ্চিহ্ন।

সবচেয়ে কাহিল অবস্থা ফরওয়ার্ড ব্লকের। স্বাধীনতার পর থেকে এই প্রথম বিধানসভায় এই দলের কোনো প্রতিনিধি থাকছেন না। আগের ছটি নির্বাচনে বিধানসভায় দলের শক্তির তারতম্য ঘটেছে, কখনও বেড়েছে কখনও কমেছে—১৯৫২ সালে ১২, ১৯৫৭ সালে ৮, ১৯৬২ ১৯৬৭ সালে ১৩, ১৯৬৯ সালে ২১ এবং ১৯৭১ সালে তিন। কিন্তু এবারে নেতাজীর নামের সঙ্গে জড়িত এই দলটি পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল। অপরদিকে, ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে যাঁরা নির্দল হিসেবে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন তাঁদের অন্তত দুজন জিতে গেলেন।

এস ইউ সির অবস্থা ফরওয়ার্ড ব্লকের তুলনায় ভালো হতে পারে, কিন্তু এমনিতে মোটেই ভালো নয়। কারণ, একাত্তরে সাতটির বদলে এবার তাদের বরাতে মোটে একটি আসন—অথচ একাত্তরে আট-পার্টি জোটের মধ্যে এস ইউ সিই ছিল একমাত্র দল যার শক্তি উনসত্তরের তুলনায় অটুট ছিল। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনেও এস ইউ সির ছিল একটি আসন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ঐ সংখ্যা বেড়ে হয় দুই। কিন্তু তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এস ইউ সির কোনো প্রার্থীই জয়ী হতে পারেন নি—এবারের মতো সেবারও সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। অবশ্য ১৯৬৭ সালে দলের বরাত ফেরে, দখলে আসে চারটি আসন। উনসত্তর ও একাত্তর দুটি নির্বাচনেই শক্তি দাঁড়ায় সাত।

আর এস পি, এস ইউ সি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক, কোনো দলেরই প্রভাব রাজ্যের সর্বত্র সমান নয়। কিন্তু কয়েকটি জেলায় এইসব দলের প্রভাব এতদিন বেশ অনুভূত হতো। তাই সি পি এমের আশা ছিল, এই সব দল বামপন্থী ফ্রন্টে আসায় তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কিন্তু সব হিসেবই গোলমাল হয়ে গেল।

•

কেন এমন হল?

এই আলোচনাই এখন সর্বত্র। রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন, কারণ কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই মেলে নি। কংগ্রেসের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা

আশাবাদী ছিলেন তাঁরাও এই ধরনের সাফল্য কল্পনা করতে পারেন নি, যেমন পারেন নি ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্টের নেতারা।

বামপন্থী ফ্রণ্ট অবশ্য তাদের বিপর্যয়ের একটা সরলীকৃত ব্যাখ্যা হাজির করেছে। সেটা হল নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ। নির্বাচনে ভীতি প্রদর্শনের কোনো ঘটনাই ঘটে নি, এমন দাবি কেউই করেন নি। অনেক পোলিং বুথে নিয়ম-বহির্ভূত কাজের রিপোর্টও নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে। কিন্তু শুধু এই ধরনের কিছু ঘটনা দিয়ে কি কংগ্রেসের এই বিপুল সাফল্যকে ব্যাখ্যা করা যায়? সেই ব্যাখ্যা হাজির করতে গেলে ধরে নিতে হয় যে, ২৮০টি কেন্দ্রেই কারচুপি হয়েছে।

কিন্তু বামপন্থী ফ্রণ্ট বা সি পি এম নেতারা এখন এই কথা বললেও প্রথম থেকে কিন্তু তা বলেন নি। সি পি এমের মুখপত্রে প্রথমে কুড়িটি কেন্দ্রের তালিকা দিয়ে বলা হয় যে, ঐ সব কেন্দ্রে অবাধ নির্বাচন হয় নি। পরে সি পি এম নেতারা বলতে থাকেন যে, চল্লিশটির মতো কেন্দ্রে অবাধ নির্বাচনে বাধা পড়েছে। ঐ অভিযোগ করার সময়েও যে সি পি এম নেতারা সাফল্যের আশা ত্যাগ করতে পারেন নি, তার প্রমাণ সোমবার পর্যন্ত (অর্থাৎ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পরেও) তাঁরা পার্টির কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে ভোট গণনার সময় পার্টির কাউণ্টিং এজেন্টদের খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে, কারণ ভোট গণনার সময় কারচুপি হতে পারে। যাঁরা মনে করছেন যে 'গোটা নির্বাচনটাই একটা বিরাট প্রহসন' হয়েছে তাঁরা আবার কী করে ভোট গণনার সময় বিশেষ সতর্কতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন, এই প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে। তাঁরা অবশ্য ভোট গণনা শেষ পর্যন্ত বর্জন করেছেন, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত তাঁরা যখন নিয়েছেন তখন ভোটের ফলাফলের গতি সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহই ছিল না। অথচ বরানগরে অবাধ নির্বাচন ব্যাহত হয়েছে, এই কথা ঘোষণা করে সি পি এম নেতারা ঐ কেন্দ্রের ভোট গণনা বর্জনের কথা শনিবারই ঘোষণা করেন। ঐ সময়েই যদি সব কেন্দ্রের ভোট গণনা বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত তবে সি পি এমের অভিযোগ জনসাধারণের কাছে আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত বলে অনেকে মনে করছেন। শুধু কারচুপির কথা বলে যদি বামপন্থী ফ্রণ্ট নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে যান তবে কি তাঁরা নিজেদের সঙ্গে বেশ কিছুটা বঞ্চনা করবেন না?

কারচুপি দিয়ে যদি কংগ্রেসের সাফল্যকে ব্যাখ্যা না করা যায় তবে কী দিয়ে যাবে? ঠিক কোন্ কারণে হাওয়া কংগ্রেসের দিকে ঘুরেছে তা হয়ত নির্দিষ্ট করে বলা মুস্কিল। তবে কারণের নিশ্চয়ই অভাব নেই। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব তো রয়েছেই, তার ওপর রয়েছে বাংলাদেশের ঘটনাবলী। বাংলাদেশের ঘটনার সবচেয়ে বেশি প্রভাব যদি এই রাজ্যেই পড়ে থাকে তবে সেটা মোটেই আশ্চর্য নয়। বাংলাদেশ সমস্যার বাঞ্ছিত সমাধান না হলে যে পশ্চিমবাংলাকেই সবচেয়ে বিপদে পড়তে হত তা সকলেই জানেন। তাই, সেই বাঞ্ছিত সমাধানকে যিনি সম্ভব করেছেন সেই প্রধানমন্ত্রীর দলকে এই রাজ্যের মানুষ সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসবেন এটাই স্বাভাবিক। অনেক জ্ঞানী লোকের মুখে শুনেছি, বাংলাদেশ-বাংলাদেশ বলে এত চীৎকারের কী আছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই যেন আমাদের সব সমস্যা মিটে গেল! তা মোটেই ঠিক, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হল বলেই আমরা যে অনেক নতুন সমস্যার হাত থেকে বেঁচে গেলাম সে বিষয়ে সন্দেহ কী? এই সত্যটা জ্ঞানীরা না বুঝলেও সাধারণ মানুষ তা বুঝেছেন, নির্বাচনের ফলাফল দেখে এই কথাই মনে হয়।

কিন্তু তবু আমি বলব, কংগ্রেসের অভাবিত সাফল্যের প্রধান দুটি কারণের মধ্যে বোধহয় বাংলাদেশ পড়ে না। এর একটি কারণকে যদি সাবজেকটিভ বলি, অপরটি হল অবজেকটিভ কারণ। প্রথম কারণ, এই রাজ্যে পাঁচ বৎসরব্যাপী অনিশ্চয়তার অবসান ঘটাবার জন্যে সাধারণ মানুষের আকুতি। কংগ্রেস মানুষের সব আশা পূরণ করতে পারে নি, কিন্তু কংগ্রেসের বিকল্প খুঁজতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন যে, নানা কারণে সেই পরীক্ষা সফল হয় নি। তাই তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন কংগ্রেসের কাছে।

দ্বিতীয় কারণ হল, কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি। ঠিক এতোটা সুপরি-কল্পিত ও সংগঠিতভাবে কংগ্রেস আর কোনো নির্বাচন লড়েছে বলে অনেকেই মনে করতে পারেন না। তার একটা কারণ অবশ্যই এই যে, এর সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের জীবনমরণের প্রশ্ন জড়িত ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ, অসংখ্য যুবক এবার কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতে এগিয়ে এসেছিল। এই ব্যাপক যুব সমর্থন যে কংগ্রেস-সি পি আই মোর্চার পেছনে ছিল তা নির্বাচনের আগে যে কোনো জেলায় গেলেই চোখে পড়েছে। কংগ্রেস যদি নতুন পথে চলতে শুরু করে তবে এই যুবশ্রেণীর জন্যেই করবে। এই যুবশ্রেণী দলের সম্পদবিশেষ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নির্বাচনের পরে কংগ্রেস নেতাদের যে-সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা হল এই বিরাট শক্তিকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করা। কংগ্রেস যে বিরাট শক্তি নিয়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে, এই কাজে তাঁরা কতোখানি সফল হবেন তার ওপর।

●

কিন্তু বামপন্থীরা অতঃপর কী করবেন? তাঁরা বিধানসভায় যোগ দেবেন না, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই স্বাভাবিক। ফ্রণ্টের অন্যান্য শরিকেরা কেউ কেউ বিধানসভায় গেলেও সি পি এম হয়ত যাবে না। যে নির্বাচনকে তারা 'আগাগোড়া ধাপ্পা' বলছে, বিধানসভায় যোগ দেওয়া মানেই সেই নির্বাচনকে মেনে নেওয়া। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ যতোটা সহজ মনে হয় ঠিক ততোটা সহজ নয়। কারণ এর সঙ্গে এই সব দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। বিধান-সভা যদি বর্জন করা হয় তবে একটা বিকল্প কর্মপন্থা দলের কাণ্ডারদের সামনে রাখতে হবে। সেই বিকল্প পথ ঠিক করার আগে অনেক কিছু ভাবতে হবে। বিধান-সভা বর্জন মানেই কি পার্লামেণ্টারি পথও বর্জন? সেই বর্জনের নীতি কি শুধু পশ্চিমবাংলাতেই অনুসৃত হবে, অথবা সারা দেশে? এই সব অনেক প্রশ্ন এখন অবশ্যই দেখা দেবে।

১৬-৩-৭২ —দেবদত্ত
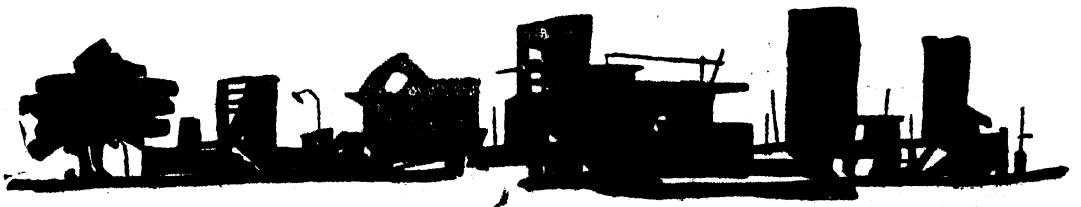
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় বিমান থেকে অবতরণ করলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান তাঁকে ফুলের তোড়া হাতে দিয়ে অভ্যর্থনা করছেন।

দেশে বিদেশে

একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সাংবাদিকের ভাষায় এতো 'ইন্দিরা তরঙ্গ' নয়, 'এ হচ্ছে 'ইন্দিরা তুফান'। কথাটা চালু হয়েছে গত বছর লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর থেকে। এ নির্বাচন মানুষকে অবাক করে দিয়েছিল। মুমূর্ষু রোগী যেন জাদু-বলে উঠে দাঁড়াল। মাত্র দু বছর আগে যে কংগ্রেসের নাম অনেক রাজ্যে মুছে গেছে বলে মনে হচ্ছিল, যে কংগ্রেস দিল্লির রাজ-পাট আঁকড়ে ধরে ছিল কোন মতে, সেই কংগ্রেস রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে নিল ১৯৭১-এর নির্বাচনে। এমন একটা অবাক কাণ্ডের অন্য ব্যাখ্যা যাঁরা খুঁজে পান নি তাঁরাই নাম দিয়েছিলেন 'ইন্দিরা তরঙ্গ'। অর্থাৎ ইন্দিরার নামের, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নাম্নী সেই নেত্রীর অনন্য নেতৃত্বের জাদু।

১৯৭২-এ প্রমাণ পাওয়া গেল, সাফল্যের চেয়ে সফল আর কিছু নেই। 'ইন্দিরা তরঙ্গই' এখন 'ইন্দিরা তুফান'। সেই তুফানের সামনে সব ওলটপালট। বিরোধীরা ছত্রভঙ্গ। এক বছরের মাথায় একই জাদুর দ্বিতীয় প্রদর্শনী।

ভেবে দেখলে, এবারকার ঘটনা আরও চমকপ্রদ। ১৯৭১-এর 'ইন্দিরা তরঙ্গে' পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশ ভেসে যায় নি। এবার ঐ দুটি রাজ্যও 'ইন্দিরা তুফান' এড়াতে পারে নি। বিধানসভাগুলির নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় প্রায় সর্বত্র। ভারতের ১৬টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভার জন্য এবং দিল্লির মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের জন্য এবার নির্বাচন হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু মেঘালয়, মণিপুর ও গোয়া। অন্য সর্বত্র কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। রাজধানী দিল্লির মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের উপর থেকে জনসংঘের আধিপত্য দূর হয়েছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। গুজরাট ও মহীশূরে শ্রীমতী গান্ধীর দলের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর। সে সবই আবার কংগ্রেসের দখলে। মেঘালয়ে কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। ঐ নূতন রাজ্যটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে কংগ্রেসের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলন (এ-পি-এইচ-এল-সি) নামক দলটি। সুতরাং মেঘালয়েও কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে না।

কিন্তু কংগ্রেসের এবারকার নির্বাচনী সাফল্যের সম্পূর্ণ পরিমাপ করা যাবে না শুধু নূতন কংগ্রেস সরকারগুলির সংখ্যা গণনা করে। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা এবার একটি নূতন রেকর্ড। এবার যে মোট ২৭২২টি আসনের জন্য নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে ২৫২৪টির জন্য কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল। ১৩টি আসনের ফলাফল ঘোষণা বাকী থাকতেই জয়ী কংগ্রেসপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯১৭। অর্থাৎ সাফল্যের হার হল ৭১ শতাংশ। অতীতে আর কখনও কংগ্রেস এতখানি সাফল্য দেখাতে পারে নি। এর কাছাকাছি গিয়েছিল ১৯৫৭ সালে। সেবারে বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ৬৫-৪ জন নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে শতকরা ৬০-৫ জন কংগ্রেসপ্রার্থী এবং ১৯৬৭ সালে মাত্র শতকরা ৪৮-৭ জন কংগ্রেসপ্রার্থী সাফল্যলাভ করেছিলেন।

রাজ্যওয়ারিভাবে দেখলে, কংগ্রেসের সাফল্যের হার সবচেয়ে বেশী পশ্চিমবঙ্গে, প্রায় ৯০ শতাংশ। আসাম ও গুজরাটের ভোটদাতারা শতকরা ৮৩ জন কংগ্রেস-প্রার্থীকে, মহারাষ্ট্রের ভোটদাতারা শতকরা ৮২ জন, হিমাচল ও মধ্যপ্রদেশের ভোট-দাতারা শতকরা ৭৭ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের ভোটদাতারা শতকরা ৭৬ জনকে জয়ী করেছেন। বিহারে কংগ্রেস প্রার্থীদের সাফল্যের হার ৬৪ শতাংশ। যেসব রাজ্যে এবার কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল তাদের মধ্যে বিহার, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব বাদে সব রাজ্যেই কংগ্রেস দুই তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। এও একটা রেকর্ড।

কংগ্রেসের এই প্রকাণ্ড সাফল্যের উল্টো পিঠ হল অকংগ্রেসী দলগুলির নিদারুণ ব্যর্থতা। যেসব দলকে একদা কংগ্রেসের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবা হত রাজ্যের পর রাজ্য থেকে সেসব দলের নাম এবার মুছে গেছে।

স্বতন্ত্র পার্টির কথা ধরা যাক। এক সময়ে মনে হয়েছিল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেসের পরই স্থান লাভ করতে পারে এই দল। ১৯৬২ সালে এই দল সারা দেশে মোট ভোটের ৭-৮৭ শতাংশ এবং ১৯৬৭ সালে ৮-৫ শতাংশ পেয়েছিল। ১৯৭২-এর নির্বাচনে যে কয়টি রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে সেগুলিতে এই দল মোট ভোটের কত শতাংশ পেয়েছে তার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নি বটে, তবে তারা বিধানসভার যে কয়টি আসন সংগ্রহ করতে পেরেছে তার ভিত্তিতেই বলা যায়, স্বতন্ত্র দলের এবার ভরাডুবি হয়েছে। বিদায়ী বিধানসভাগুলিতে স্বতন্ত্র দলের আসনসংখ্যা ছিল ৫৪ (১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর সবগুলি রাজ্য বিধানসভায় স্বতন্ত্র দলের সদস্য সংখ্যা ধরলে অনেক বেশী—আড়াই শ'র বেশী হবে। পরে দফায় দফায় মধ্যবর্তী নির্বাচন ও দলত্যাগের ভিতর দিয়ে দলের শক্তিহ্রাস ঘটেছে)। এবারকার বিধানসভাগুলিতে স্বতন্ত্র পার্টির যেসব সদস্য নির্বাচিত হয়ে এলেন তাঁদের সংখ্যা মাত্র ১৬।

যেসব রাজ্য স্বতন্ত্র দলের ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে গুজরাট। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সেখানে ঐ দলের ৬৬ জন বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। এবার সেখানে ঐ দল ৪৭ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। একজনও জিততে পারেন নি। চারজন বাদে অন্য সব স্বতন্ত্র প্রার্থীর জামানৎ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবাই মিলে ভোট পেয়েছেন শতকরা মাত্র ২ ভাগ।

স্বতন্ত্র পার্টির আর একটা ভরসা ছিল অন্ধ্রপ্রদেশে। ১৯৬৭ সালে সেখানে ঐ পার্টি ৯০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, জয়ী হয়েছিল ২৯টিতে। দলত্যাগের ফলে পরবর্তী কালে ঐ ২৯ জনের স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর শক্তি হ্রাস পেয়ে মাত্র ১০ জনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার স্বতন্ত্র পার্টি অন্ধ্রপ্রদেশে মাত্র ২০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল, পেয়েছে মাত্র দুটি। ২০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে ভোট পেয়েছে মোট ভোটের মাত্র ২-১ শতাংশ।

মহীশূরে ১৯৬৭ সালে ১৬ জন স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। দলত্যাগের ফলে সেই সংখ্যা কমতে কমতে ১৯৭১ সালের গোড়ায় ৪-এ এসে দাঁড়াল। এবার সেখানে স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থী ছিলেন মোট ৩১ জন। তাঁদের মধ্যে ২৬ জনের জামানৎ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বাকী ৫জনও নির্বাচিত হতে পারেন নি।

জনসংঘের উত্থান ও পতনের হিসাবটাও চমকপ্রদ। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে এই দল মোট ভোটের অনুপাতে নিজেদের ভোটের হার ধাপে ধাপে ৩-০৬ শতাংশ থেকে ৯-২৯ শতাংশে তুলতে সমর্থ হয়েছে। বিদায়ী বিধানসভাগুলিতে এই দলের সদস্যসংখ্যা ছিল ১৭৬। এবারকার নির্বাচনে তাদের প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১২৩২। কংগ্রেস বাদে আর কোন দলই এবারকার নির্বাচনে এত অধিকসংখ্যক প্রার্থী দেয়নি। কিন্তু তারা জিতিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে মাত্র ১০৫ জনকে। অর্থাৎ তাদের সাফল্যের হার সাড়ে আট শতাংশের কিছু বেশী (যে জায়গায় কংগ্রেসের সাফল্যের হার ৭১ শতাংশ)।

জনসংঘের লোকসানের অঙ্ক ভারি হয়ে গেছে দিল্লির মেট্রোপলিটান কাউন্সিল তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায়। বিদায়ী কাউন্সিলের মোট ৫৬ জন সদস্যের মধ্যে ৩২ জনই ছিলেন জনসংঘের। নূতন কাউন্সিলে জনসংঘ সদস্য থাকলেন মাত্র ৫ জন। কাউন্সিলের কার্যনির্বাহক পরিষদের চারজন সদস্য, কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রভৃতি সহ জনসংঘের বিশিষ্ট নেতারা কংগ্রেসের হাতে পরাজিত হয়েছেন।

জনসংঘের আশা ছিল, মধ্যপ্রদেশে তারা ক্ষমতা লাভ করতে পারে। কংগ্রেসও এই রাজ্য সম্পর্কে খুব নিশ্চিন্ত ছিল না। বিশেষ করে, গোয়ালিয়রের রাজমাতা শ্রীমতী বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া জনসংঘের সপক্ষে তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করায় ফল কি দাঁড়াবে সে-বিষয়ে কংগ্রেসের দুশ্চিন্তা ছিল। গোয়ালিয়র জেলায় জনসংঘ অবশ্য ভালই ফল দেখিয়েছে। ঐ জেলায় ১৯৬৭ সালে তারা যেখানে ১৫টি আসন লাভ করেছিল সে-জায়গায় এবার তারা পেয়েছে ১৯টি। কিন্তু মোটের উপর গোটা রাজ্যে জনসংঘ ক্ষমতার ধারে কাছেও আসতে পারেনি। বিদায়ী বিধানসভায় তাদের যেখানে ৭৮টি আসন ছিল সে জায়গায় এবার তারা ২১৬ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে এবং মোট ভোটের ২৮-৪৬ শতাংশ পেয়েও ৪৮টির বেশী আসনে জয়ী হয়নি।

আর একটি সর্ব-ভারতীয় দল মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি যার পতন হয়েছে অল্প বিস্তর সব রাজ্যেই এবং সবচেয়ে চমকপ্রদভাবে — পশ্চিমবঙ্গে। বিদায়ী বিধানসভাগুলিতে এই দলের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ১২৮। এবারকার নির্বাচনের পর ঐ সদস্যসংখ্যা মাত্র ৩৪-এ নেমে এল। গত বছর লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময়েই প্রমাণ পাওয়া গেছে, সি-পি-এম-এর শক্তি বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গেই কেন্দ্রীভূত। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে এই দল তাদের শেষ ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গেও বিরাট ঘা খেল। সারা দেশে এবার তারা যে ৪৬২ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল তাঁদের মধ্যে এরাজ্যে ২০৮ জন দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ ২০৮-এর মধ্যে জয়ী হয়েছেন মাত্র ১৪ জন, আর ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বাকী ২৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন।

সংগঠন কংগ্রেস ও সোস্যালিস্ট পার্টির অবস্থাও তথৈবচ। বিদায়ী বিধানসভাগুলিতে সংগঠন কংগ্রেসভুক্ত সদস্যদের সংখ্যা ছিল ২০৭। এবার তারা প্রার্থী দিয়েছিল ৮৭২ জন, জয়ী হয়েছেন মাত্র ৮৮ জন। কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর যে দুটি রাজ্য সংগঠন কংগ্রেসের দিকে গিয়েছিল সেই দুটির একটি হচ্ছে গুজরাট, অন্যটি মহীশূর। গুজরাটের বিদায়ী বিধানসভায় সংগঠন কংগ্রেসের ৮১ জন সদস্য (১৯৭১ সালের ১ মে-র হিসাব) ছিলেন, এবার নির্বাচিত হয়ে এসেছেন মাত্র ১৬ জন। যে সুরাট জেলায় সংগঠন কংগ্রেস এখনও বেশ শক্তিশালী বলে অনেকের বিশ্বাস ছিল (সংগঠন কংগ্রেসের নেতা মোরারজী দেশাই এই জেলার অধিবাসী) সেখানেই এবার ঐ দলের প্রার্থীরা ধরাশায়ী হয়েছেন। মহীশূরে সংগঠন কংগ্রেসের ১০৪ জন বিধানসভা সদস্য ছিলেন। এবারকার নির্বাচনের পর তাদের সংখ্যা কমে ২৪-এ এসে দাঁড়িয়েছে। সোস্যালিস্ট পার্টির অবস্থাও কম শোচনীয় নয়। ৬৫৩ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে এ পার্টি মাত্র ৫৮ জনকে অর্থাৎ বিদায়ী বিধানসভাগুলিতে তাদের সদস্যদের ([illegible] জন) মাত্র অর্ধেককে জয়ী করে আনতে পেরেছে। একমাত্র বিহারে ছাড়া আর কোথাও তাদের সদস্যসংখ্যা একক [illegible] দশকের ঘরে ওঠেনি।

কংগ্রেস ছাড়া অন্য যে একটি [illegible] এবারকার নির্বাচনে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে পেরেছে সেটি হল সি-পি-আই। বিদায়ী বিধানসভাগুলিতে তাদের আসনসংখ্যা ছিল ৭৬, নূতন বিধানসভাগুলিতে ১১২। প্রকারান্তরে এটাকেও [illegible] কংগ্রেসেরই জনপ্রিয়তার প্রমাণ [illegible] কেননা, হিসাব নিলে দেখা যাবে, [illegible] রাজ্যে সি-পি-আই কংগ্রেসের সঙ্গে [illegible] বেঁধে নির্বাচনে লড়েছে সেখানে [illegible] অপেক্ষাকৃত ভাল ফল দেখিয়েছে (যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার), আর যেসব রাজ্যে সি-পি-আই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধে নি, সেসব রাজ্যে সি-পি-আই বিশেষ [illegible] ফল দেখাতে পারে নি। (যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ মহারাষ্ট্র ইত্যাদি)।

*

কংগ্রেসের প্রায় এই একচেটিয়া ক্ষমতা লাভের এবং বিরোধী দলগুলির বিধানসভা থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার তাৎপর্য নিয়ে এখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে। প্রথম তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন অকংগ্রেসী দলকে, বিশেষ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে, এখন তাদের [illegible] পুনর্বিবেচনা করতে হবে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা এ কে গোপালন ইতিমধ্যে বলেছেন যে, তাঁর পার্টি এখন থেকে পার্লামেন্টারি রাজনীতির পথ ছেড়ে অন্য [illegible] নীতি গ্রহণের কথা বিবেচনা করবে।

এই ঘটনার দ্বিতীয় আর একটি তাৎপর্য হল, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের আমলের মতো আর একবার আসমুদ্র-হিমাচল সারা ভারতবর্ষ (নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর, গোয়া, তামিলনাড়ু, ওড়িষ্যা ও পণ্ডিচেরী বাদে) এক দলের শাসনাধীনে এল। সারা দেশব্যাপী একটা কর্মসূচী নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 'গরীবী হঠাও' নীতি রূপায়ণের যে সুযোগ আজ এসেছে এত বড় সুযোগ ইতিপূর্বে আর কখনও এদেশে আসে নি।

১৮-৩-৭২ —পুণ্ডরীক

১৯৭২-এর নির্বাচন
দলগত অবস্থা

অন্ধ্রপ্রদেশ
কংগ্রেস—২১৯
স্বতন্ত্র—২
সি-পি-আই—৭
সি-পি-এম—১
অন্যান্য দল—৫
নির্দল—৫৩
———
২৮৭

আসাম
কংগ্রেস—৯৫
স্বতন্ত্র—১
সি-পি-আই—৩
সোস্যালিস্ট পার্টি—৪
অন্যান্য দল—৬
নির্দল—৫
———
১১৪

বিহার
কংগ্রেস—১৬৭
কংগ্রেস (সং)—৩০
স্বতন্ত্র—২
সি-পি-আই—৩৫
জনসংঘ—২৬
সোস্যালিস্ট পার্টি—৩৩
অন্যান্য দল—১৩
নির্দল—১২
———
৩১৮

গুজরাট
কংগ্রেস—১৩৯
কংগ্রেস (সং)—১৬
সি-পি-আই—১
জনসংঘ—৩
নির্দল—৮
———
১৬৭

হরিয়ানা
কংগ্রেস—৫২
কংগ্রেস (সং)—১২
জনসংঘ—২
অন্যান্য দল—৪
নির্দল—১১
———
৮১

হিমাচল প্রদেশ
কংগ্রেস—৫১
জনসংঘ—৫
সি-পি-এম—১
অন্যান্য দল—১
নির্দল—৭
———
৬৫

জম্মু ও কাশ্মীর
কংগ্রেস—৫৬
জনসংঘ—৩
অন্যান্য দল—৫
নির্দল—৯
———
৭৩

মহারাষ্ট্র
কংগ্রেস—২২২
জনসংঘ—৫
সি-পি-আই—২
সি-পি-এম—১
সোস্যালিস্ট পার্টি—৩
রিপাবলিকান—৩
অন্যান্য দল—৯
নির্দল—২৫
———
২৭০

মধ্যপ্রদেশ
কংগ্রেস—২২০
জনসংঘ—৪৮
সোস্যালিস্ট পার্টি—৭
সি-পি-আই—৩
নির্দল—১৮
———
২৯৬

মেঘালয়
এ-পি-এইচ-এল-সি—৩২
নির্দল—১৯
কংগ্রেস—৯
———
৬০

মহীশূর
কংগ্রেস—১৬৫
কংগ্রেস (সং)—২৪
সি-পি-আই—৩
সোস্যালিস্ট পার্টি—৩
অন্যান্য দল—৬
নির্দল—১৫
———
২১৬

মণিপুর
কংগ্রেস—১৭
অন্যান্য দল—১৮
(মণিপুর পিপলস পার্টি সহ)
সি-পি-আই—৫
সোস্যালিস্ট পার্টি—৩
কংগ্রেস (সং)—১
নির্দল—১৬
———
৬০

পাঞ্জাব
কংগ্রেস—৬৬
সন্ত অকালী—২৪
সি-পি-আই—১০
সি-পি-এম—১
নির্দল—৩
———
১০৪

রাজস্থান
কংগ্রেস—১৪৫
স্বতন্ত্র—১১
জনসংঘ—৮
সি-পি-আই—৪
সোস্যালিস্ট পার্টি—৪
কংগ্রেস (সং)—১
নির্দল—১১
———
১৮৪

ত্রিপুরা
কংগ্রেস—৪১
সি-পি-এম—১৬
সি-পি-আই—১
নির্দল—২
———
৬০

পশ্চিমবঙ্গ
কংগ্রেস—২১৬
সি-পি-আই—৩৫
সি-পি-এম—১৪
কংগ্রেস (সং)—২
অন্যান্য দল—৮
নির্দল—৫
———
২৮০

দিল্লি
কংগ্রেস—৪৪
জনসংঘ—৫
সি-পি-আই—৩
কংগ্রেস (সং)—২
অন্যান্য দল—১
নির্দল—১
———
৫৬

গোয়া
মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দল—১৮
ইউনাইটেড গোয়ান দল—১০
কংগ্রেস—১
নির্দল—১
———
৩০

(গুজরাটের একটি কেন্দ্রে, হিমাচল প্রদেশের তিনটি কেন্দ্রে, জম্মু ও কাশ্মীরের একটি কেন্দ্রে পরে ভোট নেওয়া হবে।)

মারিয়ানে মূর

এষা ভট্টাচার্য
অমলকান্তি ভট্টাচার্য

বিগত ৫ই জানুয়ারী ন্যু ইয়র্কে চুরাশি বছর বয়সে মারা গেলেন মারিয়ানে মুর—পাউন্ডকে বাদ দিলে ইংরেজি ভাষার শতাব্দীপ্রারম্ভের নতুন কবিতা আন্দোলনের যাঁরা ছিলেন সর্বশেষ প্রখ্যাত জীবিত প্রতিনিধি। আশ্চর্য ছিলো সেই লগ্নে তাঁর আবির্ভাব, কেননা সে এক ভাঙচুরের কাল, জর্জিয়ান কবিদের ধূসরতা আর 'পীত দশকের' কুয়াশা ভেদ করে ইংরেজি কবিতায় তখন নতুন নির্মাণ দেখা দিচ্ছে : ছন্দে জানান দিচ্ছে অস্থিরতা, আগের যুগের ভাষাস্পন্দের সঙ্গে ঐ নতুন উচ্চারণ আর মিলছে না, ব্রাত্য শব্দ ও ভাবনা, নোংরা শহর ও বিপজ্জনক সমকাল গতানুগতির শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত লুপ্ত করে দিয়ে কবির রচনার মধ্যে প্রবিষ্ট ও প্রবেশোন্মুখ। মেয়ে-কবি বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তাঁদের স্ফূর্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল সময় নয় সেটা, মেয়েদের পেলব, স্নিগ্ধ, মৃদু নিক্কণ সেই বহুমুখী অর্কেস্ট্রার মধ্যে হারিয়ে যাবার কথা। ইংরেজি ভাষায় মহিলা-কবিরা সংখ্যায় দীন নন; শ্রীমতী ইভান্স, রসেটি, ব্রাউনিং, ডিকিন্‌সন্‌ ও লাওয়েল-রা বেশ কিছু সুকবিতা রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন; সে-সব কবিতার গুণাবলীও তর্কাতীত। কিন্তু মানতেই হয়, তাঁরা প্রায় সকলেই উত্থিত হয়েছেন স্থিতিশীল যুগে, অর্থাৎ সেই অন্তর্বর্তী সময়ে, যার বহু আগে কাব্যভাবনায় বিপ্লব ঘটে গেছে একটা, এবং পরবর্তী আলোড়ন তখনো পর্যন্ত অনাগত। তাঁদের রচনার মধ্যেই সাক্ষ্য মিলবে, তাঁদের প্রবণতা ছিলো পরিবর্তন নয়, অনুবর্তনের দিকে, উপপ্লব নয় অনুলাপের দিকে, তীব্রতার থেকে গীতল-মসৃণ মেলোডিতেই তাঁদের রচনার মধুর, দীর্ঘশ্বসিত ও বর্তুল ছন্দপ্রবাহ বেশি তৃপ্তি পেতো।

পন্ডশ্রম হবে যদি এঁদের সঙ্গে মারিয়ানের সাধর্ম্য খুঁজতে যাই আমরা। তিনি যখন মঞ্চে এলেন, তখন পাদ-প্রদীপের সামনে প্রধান ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছেন বেপরোয়া পাউন্ড এবং মনীষী এলিয়ট, ওদিকে ইয়েটস তাঁর বহু-অধ্যায়বিশিষ্ট কবিজীবনের একের পর এক পরিচ্ছেদ পেরিয়ে চলেছেন নিশ্চিত অমরতার অভিমুখে। যে-একমুঠো ক্ষুদ্রকায় পদাবলী সম্বল করে কবিতাক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ, তাতে যদি শুধু গুরুত্ব বা গাঢ়তা নয়, অব্যবহিত নতুনত্বের অভিঘাতও না থাকতো, তবে তিনি বৃত হওয়া দূরে থাক, গৃহীত পর্যন্ত হতেন কিনা সন্দেহ।

সেই আদিকাল থেকেই তাঁর কবিতায় তরুণ কবিগোষ্ঠীর প্রতিটি চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ছিলো : ছিলো ছন্দ ভাঙার কারিগরি, ছিলো শব্দব্যবহারের যদৃচ্ছতা, বাগ্বিধির তীক্ষ্ণতাসাধন, বিষয়বস্তু ও চিত্রকল্পের গুরুচণ্ডালী। আর সর্বোপরি ছিলো এ-শতকের কবিতার সেই অনিবার্যতম বৈশিষ্ট্য : সংরাগবিদ্ধ মন্ময়তার বদলে বুদ্ধিপ্রণোদিত নৈর্ব্যক্তিক সমীক্ষার নিরাসক্তি। কবিতে কবিতে প্রতিতুলনায় যাঁদের আনন্দ, মারিয়ানের কবিতা পাতায় পাতায় তাঁদের চমৎকৃত করবে। এলিয়টের গূঢ়তা ও নির্লিপ্তি; পাউন্ডের স্পষ্ট, কড়া ও খাড়া রেখার চিত্রাঙ্কণ, যা-কিছু কবিতায় 'চলে' না তাকে লাইনের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিয়ে ইচ্ছেমতো স্বরবিসঙ্গতি কিংবা দূরাগত স্বরসাদৃশ্য জাগাবার দুঃসাহস; ইমেজিস্ট-দের নিস্তাপ, উজ্জ্বল নক্সীকাঁথার শিল্প-চাতুর্য;—সবই অমোঘভাবে উঁকি দেয় মারিয়ানের ঝুড়ি থেকে, অথচ সবই অন্য এক শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অন্য এক বিন্যাসে সমগ্রের মধ্যে তাকে সুসমঞ্জস করে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই জন্যেই স্বকালের সমস্ত মুদ্রাদোষ ও উদ্ভাবনের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তিনি তাঁর সমকালীন অধিকতর শক্তিমান পুরুষ-কবিদের অনুসারী বা অনুকারী ছিলেন না, শতাব্দীর সবচেয়ে সপ্রাণ কাব্যধারাটিকে একাধিক অর্থে প্রভাবিতও করেছিলেন, ছিলেন একাধারে সহকবিদের সহযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী। ভুলে যাচ্ছি না, তৎকালীন আরও এক মহিলা-কবি অমনই দার্ঢ্য ও পুরুষোচিত অনার্দ্র পেশলতায় সুসম্পন্না ছিলেন এবং সেই উত্তাল সময় পার হয়ে এসে তাঁর কবিতাও আন্তরিক মূল্যেই আজ পর্যন্ত অনাদৃত। এডিথ সিট্‌ওয়েলের কবিতার সঙ্গে, অন্তত চিত্রধর্মিতার দিক দিয়ে, মারিয়ানের মিল খুঁজে বের করা খুব কষ্টসাধ্য নয় :

"খামার-পুকুর ফল-তুলতুলে পক্বতায়
মসৃণ তলে আলোকচিত্রে যেন ভ্যাঙায়..."

কিংবা

"মোরগ, রাজার গরিমায় স্ফীত, স্বর্ণে-
লোহিতে শ্মশ্রু-ও
স্বর্ণে-লোহিতে কিরীটী, তুলেছে নিনাদ
অনেক অশ্রুত..."

—এই ছবিগুলি মারিয়ানেরও হতে পারতো। কিন্তু সে ছবিতে এই প্রি- র‍্যাফে-লাইট কবিতাসুলভ গড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না, কোথাও না কোথাও খোঁচা একটা থাকতোই। উত্তরকালে এডিথের কবিতা এই অগভীর ইন্দ্রিয়কৈবল্য ছেড়ে নতুন খাতে এগোয় : সেটা অনেকটা ইয়েটসীয় ধাঁচের। ব্যক্তিগত সংরাগ, ক্রোধ ও বেদনাই তার উপজীব্য। আর, ইয়েটসেরই মতো, তাতে অভিনবত্বের সমস্ত দাবী মিটিয়েও মূল ভঙ্গিটি সুরেলা, গীতিময়, বর্ণাঢ্য। এদিকে মারিয়ানের কবিতার অগ্রসৃতি অনেকটা এলিয়ট ধরনে : তাতে ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হচ্ছে গদ্য ও বিমূর্ত ভাবনা, নিরাকৃত হচ্ছে যা কিছু ব্যক্তিগত বা আত্মজৈবনিক, তার স্বরপ্রক্ষেপও কিছুটা জটিল—যা প্রথম ধাক্কায় পাঠককে কিছুটা প্রতিহতই করে। পাঠককে অবশ্য চুম্বকের মতো টেনে রাখে তাঁর কবিতার গোটা চেহারাটা : কাটা কাটা লাইন, কোনোটা ছোটো কোনোটা বড়ো, যতি পড়ছে যেখানে সেখানে, স্তবক শেষ হচ্ছে অপ্রত্যাশিত খণ্ডাংশে; সাবলীল একটানা পড়তে গেলে পদে পদে ঠোক্কর খেতে হয়—এমনভাবে সমস্তটা বিন্যস্ত যে কোনো কোনো শব্দের উপর পাঠককে জোর দিতে হয় বেশি, কোনোটাতে কম, সুন্দর একটি চিত্রকল্পের পরেই হোঁচট খেতে হয় নেহাৎ গ্রোজ্জেইক বিমূর্ত একরাশ শব্দবন্ধে, অনুরণনে সমৃদ্ধ ধ্বনিসৌষ্ঠবের পরেই অকস্মাৎ কর্কশ আওয়াজ ঝাঁকুনি দিয়ে তন্দ্রালুতা ভাঙায়। ফলতঃ, তাঁর কবিতায় নতুনত্বের অন্বেষণে সচেষ্ট হতে হয় না; সেটা চোখে লাগে।

বোঝা পরের কথা, শুধু দেখনাই বিচারেও —ঐ কাটা-কাটা, ছোটোবড়ো পংক্তির পারম্পর্যে, পংক্তি-বিদ্রোহী কিন্তু বাঁধাধি-অনুগ প্রতিস্থাপনে, স্তবকের অপ্রত্যাশিত ফাটলে, এবং স্তবক থেকে স্তবকান্তরে স্তবক-ছাপানো ভাবনার নিরন্তর যুক্তিশৃঙ্খলাসিদ্ধ কিন্তু লাফিয়ে-চলা অগ্রসরিততে এবং বিচিত্র প্রকাবিক সংলাপসম্মত ছন্দস্পন্দে—এ সিদ্ধান্ত অমোঘ হয়ে ওঠে : নাঃ নতুন বটে। একটু খাঁতয়ে না দেখলে ধরা পড়বে না, ছাপার পাতায় ঐ নিয়মভাঙা শব্দপ্রবাহ এক গূঢ় নিয়মের দ্বারা নিয়মিত। কোনো বিশেষ কালের বা শ্রেণীর কবিতার মধ্যে তাঁর 'উৎস' খুঁজতে যাওয়া বৃথা; কোনো প্রাচীন মডেলের সঙ্গে তাঁর কবিতাকে মেলাতে গেলেও ব্যর্থ হতে হবে। তাঁর স্তবক-ধারণা, তাঁর পংক্তির বিশেষ খাঁজ ও ঢোল, তাঁর ইডিয়মের আস্বাদ ও ডৌল তাঁর স্বকীয়—কিন্তু স্বৈরাচারী নয়, সুশাসিত। তাঁর স্তবকের গড়ন নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর ভাষায় বাক্যেরই নিজস্ব 'আকর্ষণ ও আততির' সহায়তায়—কখনও ভাবনা বা চিত্রকল্প এবং কখনো বা বিন্যাসের যুগলাদ্বের ভিন্নমুখী আকর্ষণের মধ্যে ভাবসাম্য বজায় রেখে। স্তবকগুলি সুষম ও পরিমিত। তাঁর পংক্তিগুলি যদিও দৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্যে বহুরূপী ও বিস্ময়কর, অক্ষরমাত্রায় পরিমিত এবং স্তবকসমূহের সুর-সঙ্গতিতে সহজে বিন্যস্ত; তেমনি আশ্চর্য তাঁর মিলের সম্ভার—কখনো সহজ মনোসিলেবল বলেই সজীব ও মনোহরণ, কখনো দুই ভিন্নধর্মী, ভিন্নদৈর্ঘ্য ও ভিন্নভাবে সাধিত শব্দের অনুপ্রাসের চমকে জীবন্ত; কখনো-বা একটি শব্দকে ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে মিলের জোগান অব্যাহত রাখা হয়, এবং প্রায়শঃই মিলের বদলে পংক্তি প্রবাহের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকে সমধ্বনি।

'পারী রিভ্যু'—পত্রিকার গ্রীষ্ম-হেমন্ত সংখ্যায় মারিয়ানে মুর-এর এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিলো। কবিচিত্তের গতি-প্রকৃতির এক আন্তরিক বৃত্তান্তের দর্পণ হিসাবে সেটি স্মরণীয়। 'আমার কবিতাকে... কবিতা বলা যায় শুধু এই জন্যেই যে তাদের ধরাবার মতো আর কোনো শ্রেণীবিভাগ ধারে কাছে নেই'—সাধারণভাবে কবিতা ও বিশেষভাবে তাঁর নিজ কবিতা সম্পর্কে এই উদ্দীপক ও উন্মীলক মন্তব্যের পর কবি তাঁর রচনাপ্রণালীর বর্ণনায় বলেন : প্রথমেই মনের মধ্যে ভেসে উঠলো কোনো সুসম্মত বাক্যাংশ' এবং একই সঙ্গে অন্য 'কোনো চিন্তা বা বিষয় যা সমপরিমাণে মনোরম'; সেই যাত্রাবিন্দু থেকে সংযুক্তিক এবং অক্ষরমাত্রিক পংক্তিন্যাসে কবিতাটি বেড়ে উঠলো আপন নিয়মে—যদিও অন্ত্যমিলগুলি প্রায়ই লঘু এবং অস্বাভাবিক : অস্বাভাবিক কেননা বেজে ওঠবার তাগিদে তাদের কোনো কোনোটি প্রায় উচ্চারণের বদল দাবী করে। পংক্তি নয়, স্তবকই তাঁর কবিতার স্বাভাবিক য়ুনিট, অক্ষরসাম্য এবং মিলসংস্থানের ভিত্তিতে গ্রথিত—এবং এই প্যাটার্ন তিনি সতর্কভাবে, এমন কি, খানিকটা গোঁড়ামির সঙ্গেও অনুসরণ করে থাকেন। তাঁর পংক্তির বিশেষ অবয়ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : 'আমাকে নিয়ন্ত্রিত করে বাক্যের নিজস্ব টান, যেমন বস্ত্রতন্তুকে অভিকর্ষ।'

এলিয়ট এবং অন্যান্য কবিদের মতোই মিস মুরেও উদ্ধৃতিসংখ্যা কম নয়, কিন্তু এলিয়টের উৎসগুলি যেখানে মূলত অতীত যুগের কবিকুল, মিস মুর গদ্যে-পদ্যে উভচর। শেকসপীয়র ও দান্তের পাশাপাশি, তিনি ডঃ জনসন, স্যার টমাস ব্রাউন, ও ফ্রান্সিস বেকন থেকে উক্তি ছেঁকে নিয়ে এবং উক্তি-চিহ্ন ব্যবহার করে, নিজের পংক্তি ও স্তবক-ন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে, ভেঙে ও সাজিয়ে দেন। পক্ষান্তরে উদ্ধৃতিকে এলিয়ট ব্যবহার করে থাকেন সাধারণত ভিন্ন অর্থানুষঙ্গের যোজনায়, আর মারিয়ানে মুর তাঁর আহৃত উদ্ধৃতিগুলিকে নিয়ে কবিতার মধ্যেই তর্ক চালান, ব্যাখ্যা করেন, আক্রমণ বা সমর্থন করেন। তাঁর 'কালেক্টেড পোয়েমস'এ 'ওয়েস্টল্যান্ড'-এর ধরনে টীকাগুচ্ছ রয়েছে, কিন্তু তা যে ওয়েস্টল্যান্ডের মতো কবিতা-তিরিক্ত উৎসংক্যে পাঠককে অপচালিত করে না, এলিয়ট নিজেই তার স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন 'সমালোচনার সীমান্ত' নামক নিবন্ধে —'মারিয়ানে মুরের প্রসঙ্গে বলতে হয়, তাঁর কবিতান্তিক টীকাসমূহ সর্বদাই যথাযথ, উদ্দীপনকারী, সুসম্পূর্ণ এবং সুখপ্রদ —'উৎস' সন্ধানীর উৎসাহ প্রজ্জ্বলনের ভ্রান্তি থেকে বিরত।'

কিন্তু মারিয়ানের সবচেয়ে আশ্চর্য ও আকর্ষক উপহার তাঁর কবিতার চিত্রশালা : যেখানে উদ্ভাসিত হয় অনেক অদ্ভুত মূর্তি, উঁকি মারে বানর ও মহিষ, নকুল ও ময়ূ-

মারিয়ানে মূর

এষা ভট্টাচার্য
অমলকান্তি ভট্টাচার্য

বিগত ৫ই জানুয়ারী নিউ ইয়র্কে চুরাশি বছর বয়সে মারা গেলেন মারিয়ানে মুর*—পাউন্ডকে বাদ দিলে ইংরেজি ভাষার শতাব্দীপ্রারম্ভের নতুন কবিতা আন্দোলনের যিনি ছিলেন সর্বশেষ প্রখ্যাত জীবিত প্রতিনিধি। আশ্চর্য ছিলো সেই লগ্নে তাঁর আবির্ভাব, কেননা সে এক ভাঙচুরের কাল, জর্জিয়ান কবিদের ধূসরতা আর 'পীত দশকের' কুয়াশা ভেদ করে ইংরেজি কবিতায় তখন নতুন নির্মাণ দেখা দিচ্ছে : ছন্দে জানান দিচ্ছে অস্থিরতা, আগের যুগের ভাষাস্পন্দের সংগে ঐ নতুন উচ্চারণ আর মিলছে না, ব্রাত্য শব্দ ও ভাবনা, নোংরা শহর ও বিপজ্জনক সমকাল গতানুগতির শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত লুপ্ত করে দিয়ে কবির রচনার মধ্যে প্রবিষ্ট ও প্রবেশোন্মুখ। মেয়ে-কবি বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তাঁদের স্ফূর্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল সময় নয় সেটা, মেয়েদের পেলব, স্নিগ্ধ, মৃদু নিক্কণ সেই বহুমুখী অর্কেস্ট্রার মধ্যে হারিয়ে যাবার কথা। ইংরেজি ভাষায় মহিলা-কবিরা সংখ্যায় দীন নন; শ্রীমতী ইভান্স, রসেটি, ব্রাউনিং, ডিকিন্সন ও লাওয়েল-রা বেশ কিছু সৎকবিতা রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন; সে-সব কবিতার গুণাবলীও তর্কাতীত। কিন্তু মানতেই হয়, তাঁরা প্রায় সকলেই উত্থিত হয়েছেন স্থিতিশীল যুগে, অর্থাৎ সেই অন্তর্বর্তী সময়ে, যার বহু আগে কাব্যভাবনায় বিপ্লব ঘটে গেছে একটা, এবং পরবর্তী আলোড়ন তখনো পর্যন্ত অনাগত। তাঁদের রচনার মধ্যেই সাক্ষ্য মিলবে, তাঁদের প্রবণতা ছিলো পরিবর্তন নয়, অনুবর্তনের দিকে, উপপ্লব নয় অনুলাপের দিকে, তীব্রতার থেকে শীতল-মসৃণ মেলোডিতেই তাঁদের রচনার মধুর, দীর্ঘশ্বসিত ও বর্তুল ছন্দপ্রবাহ বেশি তৃপ্তি পেতো।

পণ্ডশ্রম হবে যদি এঁদের সঙ্গে মারিয়ানের সাধর্ম্য খুঁজতে যাই আমরা। তিনি যখন মঞ্চে এলেন, তখন পাদ-প্রদীপের সামনে প্রধান ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছেন বেপরোয়া পাউণ্ড এবং মনীষী এলিয়ট, ওদিকে ইয়েটস তাঁর বহু-অধ্যায়বিশিষ্ট কবিজীবনের একের পর এক পরিচ্ছেদ পেরিয়ে চলেছেন নিশ্চিত অমরতার অভিমুখে। যে-একমুঠো ক্ষুদ্রকায় পদাবলী সম্বল করে কবিতাক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ, তাতে যদি শুধু গুরুত্ব যা গাঢ়তা নয়, অব্যবহিত নতুনত্বের অভিঘাতও না থাকতো, তবে তিনি বৃত হওয়া দূরে থাক, গৃহীত পর্যন্ত হতেন কিনা সন্দেহ।

সেই আদিকাল থেকেই তাঁর কবিতায় তরুণ কবিগোষ্ঠীর প্রতিটি চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ছিলো : ছিলো ছন্দ ভাঙার কারিগরি, ছিলো শব্দব্যবহারের যদৃচ্ছতা, বাগ্বিধির তীক্ষ্ণতাসাধন, বিষয়বস্তু ও চিত্রকল্পের গুরুচণ্ডালী। আর সর্বোপরি ছিলো এ-শতকের কবিতার সেই অনিবার্যতম বৈশিষ্ট্য : সংবাগবিদ্ধ মন্ময়তার বদলে বুদ্ধিপ্রণোদিত নৈর্ব্যক্তিক সমীক্ষার নিরাসক্তি। কবিতে কবিতে প্রতিতুলনায় যাঁদের আনন্দ, মারিয়ানের কবিতা পাতায় পাতায় তাঁদের চমৎকৃত করবে। এলিয়টের গূঢ়তা ও নির্লিপ্ত; পাউণ্ডের স্পষ্ট, কড়া ও খাড়া রেখার চিত্রাংকণ, যা-কিছু কবিতায় 'চলে' না তাকে লাইনের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিয়ে ইচ্ছেমতো স্বরবিসঙ্গতি কিংবা দূরাগত স্বরসাদৃশ্য জাগাবার দুঃসাহস; ইমেজিস্টদের নিস্তাপ, উজ্জ্বল নক্সীকাঁথার শিল্প-চাতুর্য;—সবই অমোঘভাবে উঁকি দেয় মারিয়ানের ঝুড়ি থেকে, অথচ সবই অন্য এক শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অন্য এক বিন্যাসে সমগ্রের মধ্যে তাকে সুসমঞ্জস করে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই জন্যেই স্বকালের সমস্ত মুদ্রাদোষ ও উদ্ভাবনের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তিনি তাঁর সমকালীন অধিকতর শক্তিমান পুরুষ-কবিদের অনুসারী বা অনুকারী ছিলেন না, শতাব্দীর সবচেয়ে সপ্রাণ কাব্যধারাটিকে একাধিক অর্থে প্রভাবিতও করেছিলেন, ছিলেন একাধারে সহকবিদের সহযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী। ভুলে যাচ্ছি না, তৎকালীন আরও এক মহিলা-কবি অমনই দার্ঢ্যে ও পুরুষোচিত অনার্দ্র পেশলতায় সুসম্পন্না ছিলেন এবং সেই উত্তাল সময় পার হয়ে এসে তাঁর কবিতাও আন্তরিক মূল্যেই আজ পর্যন্ত অনাদৃত। এডিথ সিটওয়েলের কবিতার সঙ্গে, অন্তত চিত্রধর্মিতার দিক দিয়ে, মারিয়ানের মিল খুঁজে বের করা খুব কষ্টসাধ্য নয় :

"খামার-পুকুর ফল-তুলতুলে পঙ্কতায়
মসৃণ তলে আলোকচিত্রে যেন ভ্যাঙায়..."

কিংবা

"মোরগ, রাজার গরিমায় স্ফীত, স্বর্ণে-
লোহিতে শ্মশ্রু-ত
স্বর্ণে-লোহিতে কিরীটী, তুলেছে নিনাদ
অনেক অগ্রত..."

—এই ছবিগুলি মারিয়ানেরও হতে পারতো। কিন্তু সে ছবিতে এই প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিতাসুলভ গড়িয়ে যাওয়ার স্বস্তি থাকতো না, কোথাও না কোথাও খোঁচা একটা থাকতোই। উত্তরকালে এডিথের কবিতা এই অগভীর ইন্দ্রিয়কৈবল্য ছেড়ে নতুন খাতে এগোয় : সেটা অনেকটা ইয়েটসীয় ধাঁচের। ব্যক্তিগত সংরাগ, ক্রোধ ও বেদনাই তার উপজীব্য। আর, ইয়েটসেরই মতো, তাতে অভিনবত্বের সমস্ত দাবী মিটিয়েও মূল ভঙ্গিটি সুরেলা, গীতিময়, বর্ণাঢ্য। এদিকে মারিয়ানের কবিতার অগ্রগতি অনেকটা এলিয়ট ধরনে : তাতে ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হচ্ছে গদ্য ও বিমূর্ত ভাবনা, নিরাকৃত হচ্ছে যা কিছু ব্যক্তিগত বা আত্মজৈবনিক, তার স্বরপ্রক্ষেপও কিছুটা জটিল—যা প্রথম ধাক্কায় পাঠককে কিছুটা প্রতিহতই করে। পাঠককে অবশ্য চুম্বকের মতো টেনে রাখে তাঁর কবিতার গোটা চেহারাটা : কাটা কাটা লাইন, কোনোটা ছোটো কোনোটা বড়ো, যতি পড়ছে যেখানে সেখানে, স্তবক শেষ হচ্ছে অপ্রত্যাশিত খণ্ডাংশে; সাবলীল একটানা পড়তে গেলে পদে পদে ঠোক্কর খেতে হয়—এমনভাবে সমস্তটা বিন্যস্ত যে কোনো কোনো শব্দের উপর পাঠককে জোর দিতে হয় বেশি, কোনোটাতে কম, সুন্দর একটি চিত্রকল্পের পরেই হোঁচট খেতে হয় নেহাৎ প্রোজেইক বিমূর্ত একরাশ শব্দবন্ধে, অনুরণনে সমৃদ্ধ ধ্বনিসৌষ্ঠবের পরেই অকস্মাৎ কর্কশ আওয়াজ ঝাঁকুনি দিয়ে তন্দ্রালুতা ভাঙায়। ফলতঃ, তাঁর কবিতায় নতুনত্বের অন্বেষণে সচেষ্ট হতে হয় না; সেটা চোখে লাগে।

বোঝা পরের কথা, শুধু দেখনোই বিচারেও —ঐ কাটা-কাটা, ছোটোবড়ো পংক্তির পার-স্পর্যে, পংক্তি-বিদ্রোহী কিন্তু বাঁধাবাঁধ-অনুগ যতিস্থাপনে, স্তবকের অপ্রত্যাশিত ফাটলে, এবং স্তবক থেকে স্তবকান্তরে স্তবক-ছাপানো ভাবনার নিরন্তর যুক্তিশৃঙ্খলাসিদ্ধ কিন্তু লাফিয়ে-চলা অগ্রসৃতিতে এবং বিচিত্র অকাব্যিক সংলাপসম্মত ছন্দস্পন্দে—এ সিদ্ধান্ত অমোঘ হয়ে ওঠে : নাঃ নতুন বটে। একটু খতিয়ে না দেখলে ধরা পড়বে না, ছাপার পাতায় ঐ নিয়মভাঙা শব্দপ্রবাহ এক গূঢ় নিয়মের দ্বারা নিয়মিত। কোনো বিশেষ কালের বা শ্রেণীর কবিতার মধ্যে তাঁর 'উৎস' খুঁজতে যাওয়া বৃথা; কোনো প্রাচীন মডেলের সঙ্গে তাঁর কবিতাকে মেলাতে গেলেও ব্যর্থ হতে হবে। তাঁর স্তবক-ধারণা, তাঁর পংক্তির বিশেষ খাঁজ ও টোল, তাঁর ইডিয়মের আস্বাদ ও ডৌল তাঁর স্বকীয়—কিন্তু স্বৈরাচারী নয়, সুশাসিত। তাঁর স্তবকের গড়ন নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর ভাষায় বাক্যেরই নিজস্ব 'আকর্ষণ ও আতিের' সহায়তায়—কখনও ভাবনা বা চিত্রকল্প এবং কখনো বা বিন্যাসের যুগ-লের ভিন্নমুখী আকর্ষণের মধ্যে ভাব-সাম্য বজায় রেখে। স্তবকগুলি সুষম ও পরিমিত। তাঁর পংক্তিগুলি যদিও দৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্যে বহুরূপী ও বিস্ময়কর, অক্ষরমাত্রায় সুমিত এবং স্তবকসমূহের সুর-সংগতিতে সযত্নে বিন্যস্ত। তেমনি আশ্চর্য তাঁর মিলের সম্ভার—কখনো সহজ মনোসিলেবল বলেই সজীব ও মনোহরণ, কখনো দুই ভিন্নধর্মী, ভিন্নদৈর্ঘ্য ও ভিন্নভাবে সাধিত শব্দের অনুপ্রাসের চমকে জীবন্ত; কখনো-বা একটি শব্দকে কাটিয়ে দু-ফাঁক করে মিলের জোগান অব্যাহত রাখা হয়, এবং প্রায়শঃই মিলের বদলে পংক্তি প্রবাহের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকে সমধ্বনি।

'প্যারী রিভ্যু'—পত্রিকার গ্রীষ্ম-হেমন্ত সংখ্যায় মারিয়ানে মুর-এর এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিলো। কবিচিত্তের গতি-প্রকৃতির এক আন্তরিক বৃত্তান্তের দর্পণ হিসাবে সেটি স্মরণীয়। 'আমার কবিতাকে... কবিতা বলা যায় শুধু এই জন্যেই যে তাদের ধরাবার মতো আর কোনো শ্রেণীবিভাগ ধারে কাছে নেই'—সাধারণভাবে কবিতা ও বিশেষভাবে তাঁর নিজ কবিতা সম্পর্কে এই উদ্দীপক ও উন্মীলক মন্তব্যের পর কবি তাঁর রচনাপ্রণালীর বর্ণনায় বলেন : প্রথমেই মনের মধ্যে ভেসে উঠলো কোনো সুসম্মত বাক্যাংশ' এবং একই সঙ্গে অন্য 'কোনো চিন্তা বা বিষয় যা সমপরিমাণে মনোরম'; সেই যাত্রাবিন্দু থেকে সংযুক্তিক এবং অক্ষর-মাত্রিক পংক্তিন্যাসে কবিতাটি বেড়ে উঠলো আপন নিয়মে—যদিও অন্ত্যমিলগুলি প্রায়ই লঘু এবং অস্বাভাবিক : অস্বাভাবিক কেননা বেজে ওঠবার তাগিদে তাদের কোনো কোনোটি প্রায় উচ্চারণের বদল দাবী করে। পংক্তি নয়, স্তবকই তাঁর কবিতার স্বাভাবিক য়ুনিট, অক্ষরসাম্য এবং মিলসংস্থানের ভিত্তিতে গ্রথিত—এবং এই প্যাটার্ন তিনি সতর্কভাবে, এমন কি, খানিকটা গোঁড়ামির সঙ্গেও অনু-সরণ করে থাকেন। তাঁর পংক্তির বিশেষ অবয়ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : 'আমাকে নিয়ন্ত্রিত করে বাক্যের নিজস্ব টান, যেমন বস্ত্রতন্তুকে অভিকর্ষ।'

এলিয়ট এবং অন্যান্য কবিদের মতোই মিস মুরেও উদ্ধৃতিসংখ্যা কম নয়, কিন্তু এলিয়টের উৎসগুলি যেখানে মূলত অতীত যুগের কবিকুল, মিস মুর গদ্যে-পদ্যে উভচর। শেকসপীয়র ও দান্তের পাশাপাশি, তিনি ডঃ জনসন, স্যার টমাস ব্রাউন, ও ফ্রান্সিস বেকন থেকে উক্তি ছেঁকে নিয়ে এবং উক্তি-চিহ্ন ব্যবহার করে, নিজের পংক্তি ও স্তবক-ন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে, ভেঙে ও সাজিয়ে দেন। পক্ষান্তরে উদ্ধৃতিকে এলিয়ট ব্যবহার করে থাকেন সাধারণত ভিন্ন অর্থানুষঙ্গের যোজনায়, আর মারিয়ানে মুর তাঁর আহৃত উদ্ধৃতিগুলিকে নিয়ে কবিতার মধ্যেই তর্ক চালান, ব্যাখ্যা করেন, আক্রমণ বা সমর্থন করেন। তাঁর 'কালেক্টেড পোয়েমস'এ 'ওয়েস্টল্যান্ড'-এর ধরনে টীকাগুচ্ছ রয়েছে, কিন্তু তা যে ওয়েস্টল্যান্ডের মতো কবিতা-তিরিক্ত ঔৎসুক্যে পাঠককে অপচালিত করে না, এলিয়ট নিজেই তার স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন 'সমালোচনার সীমান্ত' নামক নিবন্ধে —'মারিয়ানে মুরের প্রসঙ্গে বলতে হয়, তাঁর কবিতান্তিক টীকাসমূহ সর্বদাই যথা-যথ, উদ্দীপনকারী, সুসম্পূর্ণ এবং সুখপ্রদ —'উৎস' সন্ধানীর উৎসাহ প্রজ্জ্বলনের ভ্রান্তি থেকে বিরত।'

কিন্তু মারিয়ানের সবচেয়ে আশ্চর্য ও আকর্ষক উপহার তাঁর কবিতার চিত্রশালা : যেখানে উদ্ভাসিত হয় অনেক অদ্ভুত মূর্তি, উঁকি মারে বানর ও মহিষ, নকুল ও মরু-

অম্বিক, মৎস্য ও সমুদ্রগম্বুক, হাতির পাল আর পেলিকান। 'হিংস্র ক্রিসান্থিমাম মুন্ড' নিয়ে ভয়ঙ্কর দানবের মতো সিংহ তাকিয়ে থাকে; 'ছোট্ট কটি পায়ের উপর স্নায়ুকাতর এক উলঙ্গ তরোয়ালের' মতো টিকটিকি তিরতির করে হেঁটে যায়; হাতিরা দেখা দিয়ে যায় তাদের 'কুয়াশাবরণ চামড়া আর যথাযথ কার্যকরী ঝুলন্ত উপাঙ্গসমূহের সমাহার' নিয়ে; নৌকোর দাঁড়গুলি ওঠে পড়ে 'জল-মাকড়শার দাঁড়ার মতো' সঞ্চালনে; 'কৃষ্ণ স্ফটিকের মধ্য দিয়ে' সন্তরণশীল মাছেদের 'কাক-নীল পাখনা' খোলে আর বন্ধ হয় 'মর্মাহত পাখার মতো'—সমুদ্রের মধ্যে মাছ নয়, মাছের মধ্যেই সমুদ্র 'জীর্ণ হয়ে ওঠে'; আর প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়... 'বাতাস মাড়িয়ে, ঠিক যেমন ফুলের রাশি মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরেছে সে'—নির্ভার, 'একরত্তি এক পক্ষীরাজের মতো ঠ্যাঙে' ভর করে উড্ডীন।

খুঁটিয়ে দেখা টুকরো টুকরো ছবি এসব, ধরা হয়েছে এক আপখেয়ালী কল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে। সম্পূর্ণ বিসদৃশ একাধিক ভাবচ্ছবি বা বস্তুকে এঁটে দেওয়া হয়েছে পরস্পরের সঙ্গে—জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে উভয়কেই, পরস্পরের ঘর্ষণে। এই কল্পনা-চারিতা 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো বৃত্ত, বা অধিবৃত্ত, বা ত্রিভুজ রচনা করে না, আপন গতিতে কেবল বয়েই চলে—এক অপ্রত্যাশিত উপসংহারের দিকে। 'ইংলন্ড' কবিতায় এক দ্রুত-অপসৃয়মান আলোর ফোকাসে একের পর এক আলোকিত হয় ইংলন্ড ('শিশু-নদীর দেশ, একফোটা সব শহর, প্রতিটি শহর নিজস্ব অ্যাবী ও ক্যাথীড্রালে সম্পূর্ণ') ইতালী ('স্থূলতা-বিশিষ্ট সম্ভোগের উপ-চার'), গ্রীস (ছাগ দুধে ও অলাবুতে খাদ্যমান, অভিশ্রুত সম্মোহনের নীড়'), ফ্রান্স ('নিশীথ-প্রজাপতির শৃঙ্গ'), সুদূর মহতী প্রাচ্যভূমি ('অজস্র শামুক, আর আবেগচঞ্চল দ্রুতলেখ, পিঙ্গবরণ আরশোলা, শিলাস্ফটিক আর নির্বিকার প্রশান্তি নিয়ে আগাগোড়া বাদুড়ের আবহে ভরপুর') : কিন্তু এ-সবই ভূমিকা, পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখন্ডের ও সভ্যতার এই চরিত্রদ্যোতক ভাস্বর বর্ণনাপুঞ্জ কিংবা কবিতাটির খোদ শিরো-নাম থেকেও বোঝা যাবে না, কবিতাটির আসল বিষয়বস্তু আমেরিকার সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ওপর কবির অভিমত। কিংবা সেই 'বানরেরা' কবিতাটিতে চলচ্চিত্রের মতো একে একে সরে যাওয়া বানর (যারা 'খালি চোখ টেপে, আর সাপকে ডরায়'), জেব্রা (যারা 'আপন অস্বাভাবিকতায় অনুপম'), দীর্ঘগ্রীব টিয়া বা হাতির পালের দৃশ্যা-বলীর মধ্যে তৃপ্তি পেতে পেতে কে অনুমান করতে পারবে সব-কিছুকে উড়িয়ে দিয়ে কবির স্মৃতিসূচিকা বিদ্ধ হবে এক 'অবি-স্মরণীয় বিড়ালে'? আর, আরেকটি কবিতায় ('স্তব্ধতা') বিড়ালের 'মুখ থেকে জুতোর ফিতের মতো ঝুলন্ত ইঁদুরের নরম লেজ'—এর অত্যন্ত বাস্তব ও ভয়াবহ ছবিটির সম্মুখীন হয়ে কে চট করে বুঝে উঠবে, এর উপমেয় 'অভিজাত অতিথিদের' প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস? এরই নিরিখে মারিয়ানের দৃশ্যাবলী সম্পর্কে এলিয়টের মন্তব্য : 'আসলে ওটা একটা যাত্রাবিন্দু, যার পরেই একটা না একটা কিছুর উপর ভাবনা ও অনুভাবনার শুরু।'

অবশ্য মারিয়ানে যদি শুধুমাত্র চকিত ছবির, ক্ষণিক ও পলাতক মুহূর্তের কবি হতেন, তাহলে তাঁর স্থান হতো সেইসব গৌণ কবিদের সমাজে, যাঁরা বরাবর সুঠাম কবিতা ও কিছু সুস্বাদ পংক্তি লিখে স্মরণীয় হয়েছেন। এই সব কবিকে যে কোনো বিচ্ছিন্ন কবিতায় পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব, সমগ্রে ও বিশেষে সত্যি কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু উত্তরকালের যে-পাঠক মারিয়ানে মুর-এ লিপ্ত হবেন, তাঁকে পড়তে হবে তাঁর সমগ্র রচনাবলী, গদ্য-পদ্য দুই-ই : সমস্তটা না পড়া পর্যন্ত সেই সামগ্রিক চরিত্রের নকশাটি সম্পূর্ণ হবে না, যার উপলব্ধি না ঘটলে কোনো সুকবিকেই সম্পূর্ণভাবে লাভ ও পরিপাক করা অসম্ভব। কেবল স্বভাবগুণেই বা স্বভাবদোষেই অনেকে কবি হয়ে থাকেন, কিন্তু মারিয়ানে সেই গোত্রের একজন, যাঁদের কবিতা এক স্বোপার্জিত ধারণা বা দর্শনের সূত্রে গ্রথিত এবং এক স্বনির্দিষ্ট আদর্শের দিকে তীরের মতো ধাবমান। যে-আদর্শ 'আপন কামনাতপ্ত পুবোলী হাওয়ার দাব-দাহে যা কিছু মুক্তির নামে ব্যক্তিগত আলো-ড়ন' তা থেকে শিল্পীর আত্মপ্রত্যাহার (দ্রঃ 'ইজ ইওর টাউন নিনেভে?')। সে-আদর্শ 'মরুত্বের ভার অঙ্গীকার' করে নিয়েও নিজের অবিরল উর্ধ্বতন :

'জোয়ারের ঘোর লাগা সমুদ্র যেমন মাথা কুটে
বন্ধনের মুক্তি চায়, না পেয়ে কিছুতে
আত্মসমর্পণে খুঁজে পায়
আপনার অবিরলতায়।'

সে-আদর্শ পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতো 'বন্দী হয়েও বলীয়ান গানে গানে ঋজু অবয়বে বেড়ে ওঠা' (দ্রঃ 'হোঅট আর ইয়ার্স?') এবং সর্বোপরি 'কল্পনার আক্ষরিক অনু-বৃত্তির' সাহায্যে এমন এক 'কল্পকানন' রচনা, যাতে সঞ্চরণ করবে 'প্রকৃত ভেকের দল' (দ্রঃ 'পোয়েট্রি')। প্রকৃত ভেক—অর্থাৎ রোমান্টিকদের ব্যক্তিগত, ভেকধারী দাদুরী নয়, কিংবা প্রতীকীদের রহস্যঘন চিত্রকল্পও নয়, সেই নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা, যা 'কল্পকাননে' ঢুকে পড়ে কল্পনাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তোলে।

(জীবনী-চুম্বক : ১৮৮৭তে জন্ম, টি এস এলিয়ট যেখানে জন্মেছিলেন, সেই সেন্ট ল্যুই, মিসুরিতে। অভিভাবক ছিলেন ঠাকুরদা, এক প্রেসবিটেরিয়ান যাজক। স্নাতক হন ১৯০৯এ, ১৯১১য় ইংলন্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণ করে ফিরে এসে, ১৯১১ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত এক সরকারী ইন্ডিয়ান স্কুলে স্টেনোগ্রাফীর শিক্ষকতা করেন, ১৯২০-১৯২৪ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর সহকারী পদে, পরবর্তী পাঁচ বছর 'ডায়াল' পত্রিকার সম্পাদনায় কেটেছে।

---

* MARIANNE MOCRE : নিখুঁত উচ্চারণ অনুযায়ী যথাযথ লিপ্যন্তরের অস্বাভাবিকতার কথা চিন্তা ক'রে বাংলা-ভাষার মেজাজ অনুসারে নামের বানান মারিয়ানে মুর-ই লেখা হ'লো।

মারিয়ানে মুরের দুটি কবিতা

কোনো স্টীম রোলারের প্রতি

টীকাটিপ্পনি তো
অসার তোমার কাছে প্রয়োগ ব্যতীত।
ঘটে আধা বুদ্ধি টুঁ টুঁ। টুকরোগুলো পিষে-
তুল্যমূল্য ক'রে ছাড়ো, আর তারপর
আগে বাড়ো পিছে হঠো তাদের উপর।

প্রোজ্জ্বল ঝামার দল
প্রধান চাঁইয়ের সঙ্গে মিলেমিশে হয় সমতল।
যদি না নান্দনিক তাবৎ ব্যাপারে
নৈর্ব্যক্তিক বিচারপদ্ধতি হ'তো অধিবিদ্যাগতভাবে
অসম্ভব, তুমি

নাগালে পৌঁছোতে তার
প্রায়। আর যদি তা-ই বলো, আমি ভাবতেই পারি না
তোমার ও প্রজাপতির সাযুজ্য, কিন্তু তা ব'লে এই
সম্পূরক সুসঙ্গত কিনা
সে-প্রশ্ন বৃথাই তোলা, যদি তা থাকেই।

মাছের ছাঁচে গড়া এক মিশরীয় কাচের বোতল

এখানে পিপাসা,
এখানে ধৈর্য আছে, আদি থেকে আসা,
আর শিল্প—উত্তাল ঢেউয়ের শীর্ষে উৎক্ষিপ্ত নিশান,
আপন অপরিহার্য লম্বতায় পরিদৃশ্যমান।

ভঙ্গুরতা নেই,
সুতীব্র বর্ণচ্ছটা—সেই
চমৎকার প্লুতগতি সাবলীল প্রাণী—মাছ—যার
খরচিক্কণ আঁশ ঠিকরে ফিরিয়ে দেয় সূর্যের তীক্ষ্ণ তলোয়ার

অল ইণ্ডিয়া বেকার সমিতির খ্যাতির ও সমৃদ্ধির মূলে ছিলেন সমিতির সভাপতি, বিখ্যাত সরকারী কলেজের ভূতপূর্ব এবং কতকাংশে অভূতপূর্ব রসায়নের অধ্যাপক নিরঞ্জন সান্যাল। মাথার ঘাম মাথায় শুকিয়ে অহোরাত্র মস্তিষ্ক কর্ষণ করে তিনি সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর যে বিচিত্র পরিকল্পনা খসড়া করেছিলেন তা-ই একদা পল্লবিত হয়ে বেকারতত্ত্বের উপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক গবেষণা হিসেবে স্বীকৃত হয়। এই পরিকল্পনার প্রচণ্ড আকর্ষণে একদল অনন্যসাধারণ মানুষ প্রথম সুযোগেই এই সমিতিতে এসে যোগ দেন। এঁদের অ-গতানুগতিক চালচলন ও সভাপতির একাধিক উক্তি এই সমিতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অস্বাভাবিক রকমে কৌতূহলী করে তোলে।

গ্রাসাচ্ছাদনের স্থূল অভিসন্ধি নিয়ে উপার্জনের চেষ্টায় যারা ব্যর্থ তারা অভিধানগত অর্থে বেকার হলেও অল ইণ্ডিয়া বেকার সমিতির চৌকাঠ ডিঙোতে সাহস পেত না। এই সমিতির সভ্যরা সকলেই ছিলেন এক একটি অসাধারণ বেকার। তাঁদের অনেকেই মোটা মাইনের চাকুরী পেয়েও নেননি। কেউ কেউ ব্যবসা ও শিল্পের জগতে কোটি টাকা রোজগারের কবাট খোলা পেয়েও খালি হাতে পিছু হটে এসেছেন। এঁরা সকলেই মনের মতো কাজ চেয়েছিলেন। পাননি। এই অর্থে এঁরা বেকার। টাকা রোজগার করে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা চলে। কিন্তু শুধু তার জোরেই বেকার সমস্যার সমাধান করা চলে না। সেজন্য প্রয়োজন কাজের মতো কাজ, বিশেষ করে মনের মতো কাজ। সার্থক হবার সুযোগ।

সমিতির সভ্যরা সকলেই ছিলেন সম্পত্তিপন্ন বেকার। না হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। সভ্য হতে গেলে প্রথমেই একদফায় এক হাজার টাকা জমা দিতে হত। সমিতির নিয়মাবলীর আনুকূল্যে তারপর প্রায়ই নানা উপলক্ষ্যে নানা অঙ্কের টাকা জমা দেবার সুযোগ

মিলত। ফলে সমিতির জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই ছিল। সাড়ম্বরে নানা অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এই অর্থশালী বেকারের দল যখন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন, যুক্তির শরজালে সহজ বুদ্ধির আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলতেন, জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিচলিত না হয়ে পারতেন না। কিছুক্ষণের জন্য সাধারণ বেকারদের সমস্যাটাকে বৃথা বিড়ম্বনা বলে মনে হত।

সমিতির সভাপতি বেকারতত্ত্বের চুল-চেরা বিচারে ছিলেন বেকারচূড়ামণি। তিনি এমন একটা মনের মতো কাজ চেয়েছিলেন যার সন্ধান ভূভারতে কস্মিনকালে কেউ তাঁকে দিতে পারত না। দিতে পারার পথে একাধিক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল। নিরঞ্জন সান্যাল দীর্ঘকাল ধরেই মানবজাতির এক বিরাট সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। তিনি দেখছিলেন কথার চাপে কাজের জগৎ ক্রমেই খাটো হয়ে আসছে। মানুষের কীর্তির প্রেরণা কথার সলতেয় অগ্নিসঞ্চার করার পর কাজের মশাল জ্বালাতে গিয়ে নিভে যাচ্ছে। মানুষের বরাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই জুটছে বেশী। আপাতদৃষ্টে মানুষের কাজের পাহাড় যত উঁচুই মনে হোক, তার গোড়ায় ফাঁকি বলে প্রায় আগাগোড়াই ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। নিরঞ্জন সান্যাল বুঝেছিলেন সত্যিকারের কাজের পরিমাণ বাড়াতে গেলে, কথার বহর কমাতে হবে।

নিরঞ্জন সান্যাল মাথা ঘামিয়ে একটা বুদ্ধি বার করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কথার নেশা মানুষকে পেয়ে বসেছে। কথার দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে তার মনকে ফেরাতে হবে। এর একমাত্র পথ কথার প্রক্রিয়াকে কষ্টসাধ্য করে তোলা। অভিধানের সব অর্থই মানুষের মনে অক্ষুণ্ণ রেখে শব্দগুলোকে নির্বাসন দেওয়া। কথাকে রসনার আওতা থেকে টেনে বার করে কাজের ঘানিতে জুড়ে দেওয়া। অর্থাৎ কথা বলতে গেলে এক একটা কাজের ভিতর দিয়েই বলতে হবে। আরামে আলস্যে শুধু রসনা সঞ্চালন করেই কথা বলা চলবে না। কথা বলতে গেলে তা আয়াসসাধ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহারের ভিতর দিয়ে করতে হবে। মোট কথা কাজ দিয়েই কথা শুরু হবে।

নিরঞ্জন সান্যাল ভেবেচিন্তে দেখে-ছিলেন (যে একবার কাজের নেশায় যদি হাতেখড়ি হয়ে যায়, মানুষের মন কথার নাগপাশ থেকে ছাড়া পেয়ে কাজে জড়িয়ে পড়বে। কাজের চিন্তাই মানুষকে পেয়ে বসবে। মানুষের কাজের ইতিহাসের চেহারা বদলে যাবে। ফাকা কথার ঘুণে-ধরা কাঠামোটা চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ে কীর্তির বনিয়াদ নূতন করে পাতা হবে।) এর জন্য অবশ্য প্রথমেই রসনা সম্বন্ধে একটা এস্পার ওস্পার করতে হবে। মানুষের জীবনে রসনার ভূমিকা খাটো করে আনতে গেলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে আহার ও পানীয় আস্বাদন ছাড়া রসনা কোনোপ্রকারেই অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। নিরঞ্জন সান্যাল বছরের পর বছর অবিশ্রাম চিন্তা করে রসনা সংযত করার একটা উপায়ও বার করেছিলেন। তাঁর কথা ও কাজের সুদীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধাকারে লিখে রসনা সংযত করার ফর্মুলো-সমেত তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন। কোনো সাড়া পেলেন না। পরে একদিন, ক্লান্তি ও অবসাদের এক চরম মুহূর্তে তাঁর হৃদয়ঙ্গম হল যে সাড়া পাওয়া যাবে না। তারপরই তিনি এক চরমপত্রে জগতের বেকারদের আহ্বান জানিয়ে অল ইণ্ডিয়া বেকার সমিতির গোড়া পত্তন করেন।

সেদিন নিরঞ্জন সান্যাল ছুটির দিনের সকালে অফিস ফাঁকা পেয়ে সেখানেই বসে তাঁর বিচিত্র জীবনের ভূত ভবিষ্যত বর্তমান নিয়ে আকাশপাতাল চিন্তা কর-ছিলেন। যদিও তাঁর বেকার সমিতি কয়েকটা লাফে খ্যাতি ও সমৃদ্ধির চূড়োয় উঠে গিয়েছিল, সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে নূতন সভ্যদের প্রবেশপথ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবুও শুধু সমিতির কীর্তি ও খ্যাতি আঁকড়ে পড়ে থাকতে কোথায় যেন দম্ভে বাধছিল। তাঁর বেকারতত্ত্ব যে আধুনিক মানুষের জীবনের একটি অমূল্য ভাষ্য এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। তাঁর এই তত্ত্ব সভ্যজগতের মনে কী পরিমাণে এবং কী শ্রেণীর সাড়া জাগিয়েছে, জানবার জন্য তাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। নিজেকে সভ্যজগতের ভূমিকায় বসিয়ে তিনি তাঁর বেকারতত্ত্ব সম্বন্ধে আকাশকুসুম কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর তত্ত্ব দৃষ্টিপথে পড়েছে কিনা, এবং পড়ে থাকলে বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের টনক নড়েছে কিনা এবং নড়ে থাকলে কতটা নড়েছে, এ চিন্তা প্রায়ই তাঁর মনকে নাড়া দিয়ে যেত।

নিরঞ্জনের চিন্তার স্রোতে ভাটা পড়ল। সচরাচর এরকম হয় না। বুঝলেন সমিতির অফিস-ঘরে কোথাও কোনো একটা পরিবর্তন ঘটেছে। নিরঞ্জন মুখ তুলে সম্মুখে তাকাতে দেখলেন একটি মানুষ অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছে। আগন্তুক বয়সে তরুণ এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত।

আগন্তুক একটু ইতস্তত করে বলল, 'আসতে পারি?' নিরঞ্জন সান্যাল কথার আশ্রয় না নিয়ে নীরবে সম্মতি জানালেন। আগন্তুক সন্তর্পণে ভিতরে এল। বসতে গিয়ে ইতস্তত করল। নিরঞ্জন অঙ্গুলি-সংকেতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিতে বসে পড়ল।

আগন্তুক সসম্ভ্রমে নিরঞ্জন সান্যালকে লক্ষ্য করছিল। নিরঞ্জন সান্যালের স্পষ্ট মনে হল সে কোনো জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছে। কিন্তু শুরু করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে। নিতান্তই কথা বলার একটা সুযোগ দেবার জন্য নিরঞ্জন আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি সভ্য পদপ্রার্থী?'

আগন্তুক ঈষৎ মাথা নেড়ে নিরঞ্জনের প্রশ্নের জবাব দিল।

নিরঞ্জন বললেন, 'নূতন সভ্য নেওয়া আমরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। যদিও কখনো সখনো এক আধজনকে নেওয়া হয়, তাকে যে পরিমাণ অর্থদণ্ড দিতে হয় তা অনেকেরই সাধ্যের বাইরে। গোড়ায় যখন প্রবেশমূল্য এক হাজার টাকা ধার্য করে-ছিলাম, ভেবেছিলাম বাড়াবাড়ি হল। এখন তো দশগুণ হয়ে গিয়েছে। এবং যেহেতু সমিতির গত অধিবেশনে সভ্য হবার পথে কিছুকালের জন্য 'নো এন্ট্রি' নির্দেশ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, বিষয়টা সম্ভবত উত্থাপন করাই চলবে না। করা গেলেও সমিতি গুরু অর্থদণ্ডের নির্দেশ দেবে।'

আগন্তুকের মুখে দৃঢ়সংকল্পের আভাস পাওয়া গেল। সে অবিচলিত কণ্ঠে বলল, 'সভ্য আমাকে হতেই হবে। আমার কাছে এ হচ্ছে জীবনমরণ সমস্যা। সেজন্য যে-দণ্ড দিতে হয় যে-ভাবেই হোক দেব।'

নিরঞ্জন সান্যাল বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলেন। পরে আগন্তুককে সকৌতূহলদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বিশেষ প্রবেশমূল্য বাবদ একদফায় বিশ হাজার টাকা দিতে রাজী আছেন? অর্থাৎ পারবেন?'

আগন্তুকের মুখে একমুহূর্তের জন্য হতাশার ছায়া পড়েই সরে গেল। কঠোর সংকল্পে তার মুখ কঠিন হয়ে এল। বলল, 'না পারার প্রশ্ন ওঠে না। এ এমনই একটা বিষয় যে আমাকে পারতেই হবে। না পেরে উপায় নেই।' ভিতরের পকেট থেকে একটা স্ফীত খাম বার করে এনে ভিতর থেকে সবকটা নোট বার করে টেবিলে রেখে সে একশ টাকার দুশো নোট গুণে একটা তাড়া করে নিরঞ্জন সান্যালের দিকে ঠেলে দিল। বাকী নোট কটা খামে পুরতে পুরতে বলল, 'আমার শেষ একুশ হাজার টাকা কাল ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলাম। আপনাকে দেবার পর আমার কাছে বাকী এক হাজার টাকা রইল। সে যাহোক, দেখবেন সভ্য হবার পথে কোনো বাধা না থাকে।'

'থাকবে না।' নিরঞ্জন সান্যাল বললেন। আগন্তুকের কথায় ও আচরণে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরে একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'ধরে নিতে পারেন আজ থেকে আপনি বেকার সমিতির একজন সভ্য। কিন্তু অর্থদণ্ডের পালা এখানেই শেষ নয়। বছরে নানা সময়ে নানা ছুতোয় সমিতি আপনার কাছে নানা অঙ্কের মোটা টাকা দাবী করবে। আপনার যদি বড়রকমের রোজগারের কোনো ব্যবস্থা না থাকে—'

বাধা দিয়ে আগন্তুক বলল, 'নেই। আমার প্রায় অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ অবস্থা। কিন্তু বাধার কথা মনে স্থান দেবেন না।

আপনার সমিতি আমার হয়ে আমার সব বাধা ঠেলে সরিয়ে দেবে।'

আগন্তুকের কথায় নিরঞ্জন সান্যাল স্তম্ভিত হলেন। আগন্তুক নিরঞ্জনের মুখে তাঁর মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে বলল, 'আমার পক্ষে বিশ হাজার টাকা দিয়ে আপনার সমিতির সভ্য হওয়া লটারী খেলার সামিল। কিন্তু এ এমনই এক লটারী যে আমাকে জিততেই হবে। না জিতলে বিরাট একটা কাজ পণ্ড হবে।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমার নামটা অচিরেই যাতে সভ্যদের খাতায় ওঠে দেখবেন। আমি যথাসত্বর আপনার সঙ্গে দেখা করব। বিষয়টা আগাগোড়া আলোচনা করব।'

একটা ছোট নমস্কার জানিয়ে আগন্তুক প্রস্থান করল। নিরঞ্জন রহস্যগ্রস্তের মতো তাঁর সম্মুখে নোটের তাড়ার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ঘটনার পর তিনদিন কেটে গেল। এই তিনদিন নিরঞ্জন প্রায় প্রতিমুহূর্তে সেই তরুণের প্রতীক্ষায় রইলেন। তার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে থেকে থেকেই তাঁর মনে নানা সংশয় নানা প্রশ্ন নিয়ে এল। এক একবার এ কথাও মনে হল যে বিশ হাজার টাকার সঙ্গে সম্ভবত কোনো অশুভ দুর্ঘটনার একটা নিকট সম্পর্ক আছে। এবং প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই নিজের ভূমিকা শেষ করে তরুণ তাঁর কাঁধে একটা অবাঞ্ছনীয় নাটকের পুরো দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে।

তরুণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পর দিনই নিরঞ্জন সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে তাকে সভ্য করে নিয়েছিলেন। বাদবিতণ্ডায় সেদিন সমিতির অফিসঘরের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির অকাট্য যুক্তি খণ্ডনের সমতুল্য কোনো যুক্তিই খুঁজে না পেয়ে সভ্যরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের সব আপত্তি তুলে নিলেন। নিরঞ্জন সান্যাল বলেছিলেন, 'যে তার যথাসর্বস্ব একুশ হাজার টাকা থেকে বিনা দ্বিরুক্তিতে বিশ হাজার টাকা দিতে পারে তার দাবীর চেয়ে সভ্য হবার বড় কোনো দাবী কল্পনাই করা যায় না। ঐ দাবীই হচ্ছে মূলত আমাদের সম্মতি।' বিশেষ কারণে সমিতির সভ্যদের কাছে তিনি তরুণের শেষ কথাগুলির উল্লেখ করেননি। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি যেন তরুণের সঙ্গে তাঁর সমিতির বিরুদ্ধে এক অজ্ঞাত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তরুণের সঙ্গে একটা খোলাখুলি আলোচনার জন্য তিনি অধীর হয়ে পড়লেন।

চারদিনের দিন, যখন নিরঞ্জন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তরুণ এল। তখন ঘড়ির কাঁটা সওয়া দশটায় পৌঁছেছে। নিরঞ্জন নৈশভোজনের পর তাঁর সাজানো হলঘরে গুনে গুনে পঁচিশটা পাক দিয়ে দু' হাজার সাড়ে ছশ ফিট, অর্থাৎ হিসেবে আধমাইলের দশ ফিট বেশী পথ পদব্রজে স্বাস্থ্যান্বেষণের নিত্যক্রিয়া শেষ করে ডিভানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ সময়ে কেউ এলে নিরঞ্জন আশা করতেন তাঁর দরোয়ান কিম্বা বেয়ারা তাঁর হয়ে দু'-চারটা মিছে কথা বলে তাঁকে বিপন্মুক্ত করবে। বেয়ারা আগন্তুকের স্লিপটা নিরঞ্জনের হাতে দিয়েই তার করণীয় কাজ সারতে যাচ্ছিল। শশব্যস্তে উঠে পড়ে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপাতে চাপাতে নিরঞ্জন বললেন, 'অন্দর লে আও।'

তরুণ ভিতরে আসতে নিরঞ্জন লক্ষ্য করলেন তাঁর মনের উপর থেকে একটা বিষম ভার সরে গেল। প্রকাশ্যে একটা নির্বিকার ভাব দেখিয়ে তিনি বললেন, 'তারপর? এত রাতে?'

নিরঞ্জনের প্রশ্ন কানে না তুলে তরুণ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি এখন আপনার সমিতির সভ্য কি না তা-ই বলুন?'

নিরঞ্জন আশ্বাসসূচক ভাবে মাথা নাড়লেন। পরে মৃদুস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

তরুণের মুখ এক অপার্থিব শান্তিতে ভরে গেল। সে ধীরে ধীরে একটা সোফায় বসে গা এলিয়ে দিল। তারপর নিরঞ্জনকে আর্দ্রস্বরে বলল, 'আপনি আমার কী উপকার করলেন বুঝিয়ে বলি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি গতজন্মে নিশ্চয়ই আমার কেউ ছিলেন।'

তরুণের ভাবাবেগ নিরঞ্জনের মনের একটা কোমল স্থান স্পর্শ করেছিল। রসনা সংযত করার আগেই নিরঞ্জনের মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল, 'গতজন্মের কথা বলতে পারি না। তবে এ জন্মে তো নিশ্চয়ই। আমি এই কটা দিন প্রতিমুহূর্তে আপনার প্রতীক্ষা করেছি।' নিঃসঙ্কোচে, শিষ্টাচারের অনাবশ্যক একটা গিঁঠ খুলে ফেলে বললেন, 'তুমি আসায় ফলে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।'

নিরঞ্জনের মুখে 'তুমি' সম্বোধনে তরুণ প্রথম যেন বিচলিত হল। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাকে চেনেন!' নিরঞ্জন নীরবে মাথা নাড়লেন। তখন, নিরঞ্জনের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করে, কী বুঝে সে বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে বলল, 'আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা, সবচেয়ে বড় সুযোগ একসঙ্গে উপস্থিত। আজ অন্তত একজনকে বিশ্বাস না করে আমার উপায় নেই।' নিরঞ্জনের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বলল, 'সেই একজন আপনি।'

নিরঞ্জন বললেন, 'তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো।'

তরুণ বলল, 'দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকার ফলে আমার কথায় ও আচরণে মাঝে মাঝেই, অন্তত গোড়ার দিকে, সঙ্কোচের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। উপেক্ষা করবেন। ভুল বুঝবেন না। একদিন সবই খুলে বলতে হবে। সেদিন আপনাকেই বলব।'

নিরঞ্জন বুঝলেন কোথাও একটা রহস্য থেকেই যাচ্ছে। এবং এই রহস্যই হচ্ছে এই তরুণের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

তরুণ বলল, 'আমার নাম কৃতান্ত সেন। সত্য হোক মিথ্যা হোক, এই নামেই আপনি আমাকে ডাকবেন।'

নিরঞ্জন কী একটা বিষয় স্মরণ করার চেষ্টা করেও যেন পারছিলেন না। তরুণের কথায় যেন বিষয়টা ধরতে ছুঁতে পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এই নামের বিষয়টাই থেকে থেকে হয়তো আমার অজ্ঞাতসারেই মনে খোঁচা দিচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয় সমিতির অধিবেশনে তোমার ব্যাপারটা নিয়ে তর্কের ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু একবারও কেউ নাম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করল না। আমিও তোমার সম্বন্ধে এত দুর্ভাবনার মধ্যেও তোমার নাম সম্বন্ধে তেমন সচেতন হতে পারিনি। কেন জানো?'

কৃতান্ত কোনো জবাব দিলো না।

নিরঞ্জন বললেন, 'প্রথম পরিচয়েই আমার কাছে তোমার আসল সত্তাটা এত বড় মনে হয়েছে আমার মন এতটা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে যে তোমার পোশাকী নাম সম্বন্ধে স্বাভাবিক কৌতূহল পর্যন্ত চাপা পড়ে গিয়েছে। কৌতূহলটা থেকে থেকে ইঁদুরের মতো মনে ছোটো ছোটো দাঁত বসিয়েছে এই মাত্র।' তারপরই কী মনে করে নিরঞ্জন সম্মুখে একটু ঝুঁকে বসে বললেন, 'এখন ব্যাপারটা যতটা সম্ভব খুলে বলো।'

কৃতান্ত সেন বলল, 'ব্যাপারটা আপনাকে নিয়ে শুরু। বেকারতত্ত্বের উপর আপনি যা বলেছেন, লিখেছেন প্রতিটি অক্ষর আমার কণ্ঠস্থ। প্রতিটি যুক্তি আমার চিন্তার খোরাক জুটিয়েছে। দিন বা মাস নয়। কয়েকটা বছর এভাবে কেটেছে। এই কয়েকটা বছর আপনার তত্ত্বের জঠরে বাস করার ফলে আমার পুনর্জন্মের মতো হয়েছে। জীবনের অর্থ, এমনকি জড়-পৃথিবীর জল হাওয়ার অর্থ পর্যন্ত বদলে গিয়েছে। ফলে আমি সত্যের দিক দিয়ে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে একটা বিস্ময়কর উদ্ভাবন এই দুটি সম্ভাবনার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।'

নিরঞ্জন সেন বললেন, 'বুঝলাম না। বুঝিয়ে বলো।'

কৃতান্ত সেন বলল, 'বেকারতত্ত্বে আপনি কথা ও কাজের আপেক্ষিক হিসেবটা পাল্টে দিতে চেয়েছেন। কথার চাপে কাজ চাপা না পড়ে, কাজ কথাকে ছাপিয়ে উঠুক, চিরাচরিত কথার মায়াজাল চিরদিনের মতো ছিন্ন হোক, কাজের নিয়মিত স্বচ্ছন্দ ভাষায় মানুষ কথা বলুক, এইরকম একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনি বারবার প্রকাশ করেছেন।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'ঠিক।'

কৃতান্ত সেন বলল, 'আপনার এই আকাঙ্ক্ষার ভিতর আমি একটা তত্ত্ব দেখতে পাই। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি আদৌ সচেতন কিনা, জানি না। অন্তত বাহ্যত এটা আমার আবিষ্কার।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'যেমন—

কৃতান্ত বলল, 'কথা ও কাজের যে ইতিহাস আপনার মন ব্যর্থতায় ভরে দিয়েছে, তার সর্বাঙ্গে মানুষের চরিত্রের ছাপ। মানুষ অর্থাৎ মানুষের চরিত্র না বদলালে এ ইতিহাস বদলাবে না। বদলানো অসম্ভব। ফলে কথা ও কাজের আপেক্ষিক হিসেব পাল্টে দেবার ব্যবস্থা ছাপার অক্ষরের তত্ত্ব হিসেবেই থেকে যাবে, কখনো জীবনের জীবন্ত সক্রিয় তত্ত্ব হয়ে উঠবে না।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'মানুষের ইতিহাস পাঠ করেও বলতে চাও মানুষ বদলায় না?'

কৃতান্ত সেন বলল, 'ধাক্কা গুঁতো খেয়ে টোল খায়। সেটাই আমরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখি অর্থাৎ তিলকে তাল করি। ভিতরে, আসলে যে-ইতিহাস, সেই ইতিহাসই থেকে যায়। বদলায় না।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'তুমি বলতে চাও মানুষের চরিত্র না বদলালে সে কথা ও কাজের নূতন হিসেবটা সহজে মেনে নেবে না?'

কৃতান্ত সেন এ কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি জীবনের যে একটা ছক এঁকে দিয়েছি, সে মতে চললে যে কোনো মানুষের চরিত্র বদলাতে বাধ্য। চরিত্র আর কী করে বদলানো যায়?'

কৃতান্ত সেন বলল, 'যায়। এতক্ষণে বুঝলাম আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিতর যে-তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছি, তা আমারই আবিষ্কার। আপনি সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন।'

নিরঞ্জন সান্যাল ঈষৎ হেসে বললেন, 'মেনে নেবার আগে আবিষ্কারের রূপটা স্পষ্ট দেখতে চাই।'

কৃতান্ত সেন বলল, 'আপনি যেমন কথার চাপ থেকে মুক্ত করে কাজকে বড় করতে চেয়েছেন, আমি তেমনি অকাজের জঞ্জাল থেকে সত্যিকারের কাজকে অর্থাৎ সার্থক কাজকে সরিয়ে এনে বাড়বার ও বড় হবার সুযোগ দিতে চেয়েছি। মানুষের চরিত্র বদলানোর একটা প্রয়োজন বোধ করেছি। এবং এই প্রসঙ্গে একটা উপায় সম্বন্ধে একটা চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।'

নিরঞ্জন সান্যাল গভীর মনোযোগের সঙ্গে কৃতান্ত সেনের কথা শুনছিলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'সম্ভবতঃ তত্ত্ব আবিষ্কারের পর তাকে মানুষের জীবনে সক্রিয় করতে গিয়ে উদ্ভাবনের কথা ভেবেছ।'

কৃতান্ত সেনের দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে মানুষের বাহ্য নক্সাটা বদলে দিতে হবে। মাংস ও মেদ ইত্যাদির চাপ থেকে মগজকে মুক্ত করতে হবে। মানুষ মস্তিষ্ক-প্রধান হলে তবে তার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'তুমি যৌগিক সাধনার কথা বলছ—যে-সাধনার বলে ঋষিরা দেহ বশে রাখতেন?'

কৃতান্ত সেন বলল, 'না। আমি দেহের নক্সাটাই বদলে দিতে চাই। শুধু প্রকৃতিতে নয়, আকৃতিতেও আমার পরিকল্পিত মানুষ হবে মস্তিষ্ক-প্রধান।'

নিরঞ্জন সেন স্তম্ভিত হলেন। বললেন, 'তা কী করে সম্ভব?'

কৃতান্ত সেন বললেন, 'ঠিক পথে চললে অক্লান্ত চেষ্টায় নিশ্চয়ই সম্ভব। সহজে কিম্বা সাধারণ চেষ্টায় নয়।'

নিরঞ্জন সান্যাল সবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'সম্ভব হলেও তা হবে একটা অবাঞ্ছনীয় পরিণতি। বিকৃত বীভৎস বিবর্তন।'

কৃতান্ত সেন শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার প্রতিভায় হোক, অদৃষ্টের জোরে হোক, যেদিন অসম্ভব সম্ভব হবে আপনার মনোভাব সেদিন ষোলো আনা না হলেও বারো আনা বদলাতে বাধ্য।'

নিরঞ্জন সান্যালের মুখ একটা তিক্ত হাসিতে ভরে গেল। বললেন, 'তার পূর্বে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রয়োজন।' তারপর কী ভেবে বললেন, 'আমি বৈজ্ঞানিক। সৃষ্টির ইতিহাসে যে কোনো নূতন সম্ভাবনা, যত উৎকট ও ভীতিকর হোক, আমার কৌতূহলের বিষয় না হয়ে পারে না। আমি তোমার সঙ্গে তোমার পরিকল্পনা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে চাই।' বলেই নিরঞ্জন চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। তার দিক থেকে সে রাতে আর কোনো বিশেষ সাড়া পাওয়া যাবে না বুঝে কৃতান্ত সেন ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রস্থান করল।

পরদিনই কৃতান্ত পুনরায় রাতে এসে হানা দিল। নিরঞ্জন সান্যালের দিক থেকে কোনো বিরক্তির লক্ষণ দেখা গেল না। বরং মনে হল তিনি যেন এই সাক্ষাতের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। দ্বারপথে কৃতান্ত ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছিল। নিরঞ্জন সোৎসাহে তাকে ভিতরে আহ্বান করে বললেন, 'এসো। এসো।' পাশের সোফাটা দেখিয়ে বসতে বললেন। কৃতান্ত বসতে বললেন, 'তারপর, তোমার কাজ কদ্দূর এগোলো?'

কৃতান্ত বলল, 'আপনার দিক থেকে সাড়া পেলেই এগোতে পারি।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'কাজটা তো তোমার। তুমি যাদুকর। আমি দর্শক।'

কৃতান্ত সেন বলল, 'সচরাচর যাদুকর খেলা শেষ হলে বকশিস পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে দর্শকের কাছ থেকে বকশিসটা আগাম পাওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।'

নিরঞ্জন সকৌতূহলে কৃতান্ত সেনকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

কৃতান্ত সেন বলল, 'মাত্র তিন লাখ টাকার জন্য একটা যুগান্তকারী সম্ভাবনার কয়েক হাতের ভিতর এসে আমাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। এই টাকাটা পেলে সাতদিনের ভিতর, হয়তো তার আগেই আমার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্বন্ধে হাতেনাতে প্রমাণ দিতে পারি।'

নিরঞ্জন সান্যাল তাঁর কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। অস্ফুটস্বরে বললেন, 'তিন লাখ টাকা?'

কৃতান্ত সেন বলল, 'তিন লাখ টাকা আপনার সমিতির পক্ষে কিছুই নয়। ব্যক্তিগতভাবেও এ টাকা আপনি অনায়াসে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে জোটাতে পারেন।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'কিন্তু সাত-দিনে কিম্বা তার চেয়েও স্বল্পকালে তিন লাখ টাকা দিয়ে তুমি কী করবে? তোমার প্রস্তাব অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অবাস্তব ঠেকছে।'

কৃতান্ত সেন বলল, 'আমি আমার পিতার মৃত্যুর পর সাত লাখ একুশ হাজার টাকার একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট পেয়ে ভেবেছিলাম, সারাজীবনেও ঐ টাকা খরচ করে উঠতে পারব না। সাত লাখ টাকা রিসার্চে ও এক্সপেরিমেন্টে খরচ করতে আমার দু' বছরও লাগেনি। বিশ হাজার টাকা সমিতির ফাণ্ডে দিতে আমার এক মিনিটও লাগেনি। যদি—'

নিরঞ্জন বাধা দিয়ে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'দু' বছর আর সাতদিন এক কথা নয়।'

কৃতান্ত সেন বলল, 'অদৃষ্ট যখন পথ ছেড়ে দেয়, মানুষের জীবনে একদিনে এক বছরের হিসেব বুঝে পাওয়া যায়। ব্যাপারটা নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর ধাপে ধাপে এগিয়ে এখন বন্যার মতো বাঁধের গায়ে আছড়ে পড়ছে। পথ পেলেই প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে যাবে। আমার এক্সপেরিমেণ্টের এখন মহাসংকট। কিন্তু তার ওপারেই বিরাট সাফল্যের উজ্জ্বল প্রভাত। এখন ঐ তিন লাখ টাকা কয়েকটা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার নির্ভয়ে অকাতরে খরচ করতে হবে। না করে উপায় নেই। না হলে আমার কাজের সঙ্গে সঙ্গে আজ কি কাল আমিও শেষ।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'তুমি কোথায় এক্সপেরিমেণ্ট করছ? কাকে নিয়ে করছ! আমি একবার দেখতে চাই।'

কৃতান্ত সেন বলল, 'তা অসম্ভব।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন. 'কেন?'

কৃতান্ত সেন বলল, 'আপনি যা দেখবেন তা অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব প্রহসন বলে মনে হবে। অবিশ্বাস ও উত্তেজনার মুহূর্তে আপনি এমন কোনো উক্তি করতে পারেন, এমন কোন কাজ করে বসতে পারেন, যার ফলে আমার মন টলে গিয়ে গবেষণার সূক্ষ্ম সূত্র হারিয়ে ফেলতে পারে।'

নিরঞ্জন সান্যাল বললেন, 'তবু, তিন লাখ টাকা! এমন যদি হয় তুমি বিকৃত-মস্তিষ্ক?'

কৃতান্ত সেন সকাতরে বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করুন।'

নিরঞ্জন সান্যাল কঠোর হবার চেষ্টা করে বললেন, 'কী করে করি?'

কৃতান্ত সেন বলল, 'জীবনে একবার করুন।'

নিরঞ্জন দৃঢ়স্বরে বললেন, 'না।'

কৃতান্ত সেন হাত মুঠ করে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

নিরঞ্জন সান্যালের সংকল্প টলে গিয়েছিল। মনে মনে তিনি প্রায় হার মেনেছিলেন। বুঝেছিলেন, এই হার মানবার কারণ তাঁর মনের এক অন্ধকার কোণে প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রস্তাবনার পর পালা শুরু না হয়ে পারবে না। তবু সে-রাতে তিনি কৃতান্ত সেনকে ফিরিয়ে দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু সে চলে যাওয়ার পরও স্পষ্ট বুঝেছিলেন তার আসবার পথ বন্ধ হল না। কবাট খোলা রইল।

পরদিন নিরঞ্জন সান্যাল সারাদিন বিষয়টা নিয়ে মনে তোলপাড় করলেন। যতই তিনি অসম্ভবের সম্মুখে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দেয়াল তুলে দেবার চেষ্টা করলেন, বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন অশরীরীর

মতো সেই অসম্ভব অলক্ষ্যে সেই দেয়ালের সম্মুখ থেকে পিছনে এসে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াল। দিনের আলোয় চারিদিকের কর্ম-কোলাহলের ভিতর রহস্যরূপী একটুকরো অন্ধকার রাত তাঁকে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে এক কল্পনাতীত পরিণতির অপেক্ষায় রইল।

রাতে বেয়ারা যখন একটা শ্লিপ এনে তাঁর সম্মুখে ধরল, তিনি দৃকপাত না করেই বললেন, 'লে আও।' দ্বারপথে একটি মানুষের আবির্ভাব হতে নিরঞ্জন সান্যাল বিস্মিত হলেন। দেখলেন একটি তরুণী। শুধু সুন্দরী বললে অতি-শয়োক্তির বিপরীত অপরাধ করা হয়। রূপশাস্ত্রের ভাষ্যকার হলে নিরঞ্জন সান্যাল এই সুন্দরীকে নিঃসঙ্কোচে তিলোত্তমা আখ্যা দিতেন।

নিরঞ্জন সান্যালের ইঙ্গিতে তরুণী ধীরপদে ভিতরে এসে পাশে একটি সোফায় বসল। বলল, 'আমার নাম প্রতিমা।'

নিরঞ্জনের মনে কে নিঃশব্দে প্রতিবাদ করে উঠল, 'না। তুমি তিলোত্তমা।'

নিরঞ্জনকে নিরুত্তর দেখে প্রতিমা প্রমাদ গণল। ইতস্তত করে বলল, 'আমি কৃতান্তের হয়ে আপনার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি।'

নিরঞ্জন তৎক্ষণে উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছিলেন। বললেন, 'কৃতান্ত এল না কেন? সে কি অসুস্থ?'

প্রতিমা মৃদুস্বরে বলল, 'অসুস্থ নয়। সে প্রায় ভেঙে পড়েছে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছে।'

নিরঞ্জন কোনো কথা বললেন না।

প্রতিমা বলল, 'তার বক্তব্য সে এই ক'দিনের আলোচনায় আপনাকে জানিয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য আপনাকে জানানো হয়নি।'

নিরঞ্জন প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?'

প্রতিমা সসঙ্কোচে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কৃতান্তের গবেষণায় এক হিসেবে আমি তার সহকর্মী। আমাকে নিয়েই তার প্রথম এক্সপেরিমেণ্ট।'

নিরঞ্জন বললেন, 'অর্থাৎ তুমিই তার পরিকল্পনার মস্তিষ্কপ্রধান মানুষ।'

প্রতিমা ম্লান হেসে বলল, 'হ্যাঁ।'

নিরঞ্জন প্রতিমাকে লক্ষ্য করতে করতে বললেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভীত।'

প্রতিমা বলল, 'ঠিক। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নয়। টাকার অভাবে যদি এক্সপেরিমেণ্ট পরিণতির কাছাকাছি এসে আটকে যায়, এই দুর্ভাবনায়।'

নিরঞ্জন বললেন, 'তুমি কি কৃতান্তের এই এক্সপেরিমেণ্টে সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছ?'

প্রতিমা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই। না হলে কেন এই গুরুতর ব্যাপারে জড়াতে যাবো?'

নিরঞ্জন গলা নামিয়ে দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কৃতান্তকে ভালো-বাসো?'

প্রতিমা বলল, 'এ-প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে এই এক্সপেরিমেণ্টের প্রতি আমার মনোভাবের কোনো সম্পর্ক নেই।'

নিরঞ্জন কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি কৃতান্তের হয়ে তিন লাখ টাকা চাইতে এসেছ?'

প্রতিমা বলল, 'না। আমি পুরোপুরি নিজের স্বার্থে নিজের দায়িত্বে টাকার আবেদন নিয়ে এসেছি।'

নিরঞ্জন বললেন, 'কিন্তু তিন লাখ টাকা—'

কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রতিমা বলল, 'জানি তিন লাখ টাকা কোনো সুস্থ মানুষই সজ্ঞানে জলে ফেলে দিতে রাজী হতে পারেন না। আমি আপনাকে বৃথা আশ্বাস দিচ্ছি না। যদি আপনি এ-বিপদে আমার সহায় হন, বিশ্বাস করে আমাকে তিন লাখ টাকা দেন, আমি কোনো-না-কোনো দিন, হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই সুদে-আসলে পরিশোধ করব।'

নিরঞ্জন নিজের অজ্ঞাতসারেই হাস-লেন।

প্রতিমা নিরঞ্জনের অনিচ্ছাকৃত হাসি লক্ষ্য করল। ধীরকণ্ঠে বলল, 'আমি স্যর সুধাকান্তের উত্তরাধিকারিণী।'

সে-রাতে প্রতিমার হাতে নিরঞ্জন তিন লাখ টাকার একখানা চেক দিতে গিয়ে পরিষ্কার বুঝেছিলেন কৃতান্ত ও প্রতিমা উপলক্ষ মাত্র। এ-পালার প্রচ্ছন্ন মুখ্য নায়ক অদৃষ্ট। এবং তার হাতেই তিনি তাঁর সমিতির তিন লাখ টাকা তুলে দিলেন। ব্যাপারটার অলৌকিক দিকটা সম্পূর্ণ চেপে নিরঞ্জন একটা স্বকপোল-কল্পিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সমিতিকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে সবক'টি সভাকেই দলে টেনে নিলেন। সমিতির একটা বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। গোড়ায় খানিকটা হৈ-চৈ কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর টিপ্পনী একটা বিরোধের আভাষ দিয়ে নিরঞ্জন সান্যালের ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির সম্মুখে মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল।

তারপর এক-একটি করে দিন নিরঞ্জনের অস্তিত্বের এক-একটা তারে সপ্তমের পর্দায় ঝঙ্কার তুলে যেতে লাগল। সাতদিনের দিন নিরঞ্জন একটা অসম্ভব ভয় ও উত্তেজনায় এবং একটা আশ্চর্য অবর্ণনীয় প্রত্যাশায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রাত্যহিক জীবন-পর্বে কোনো চাক্ষুষ পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু নিজের ভিতরে তিনি যেন জড়-জগতের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। এই দিনটা সন্ধ্যায় বা রাতে কী সংবাদ নিয়ে

আসে, তার উপরই যেন তাঁর অন্তর্লোকের বাঁচামরার ব্যাপারটা নির্ভর করছিল।

সন্ধ্যারাতেই খবর এল। কৃতান্ত বা প্রতিমা কেউ এল না। সম্পূর্ণ একটি অপরিচিত লোক নিরঞ্জন সান্যালের সঙ্গে দেখা করল। তার হাতে একটি কারুকার্য-করা দামী পাতলা চামড়ার ব্যাগ। নমস্কার করে নিরঞ্জনের হাতে একটা চিঠি দিয়ে ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

নিরঞ্জন তন্ময় হয়ে চিঠিটা পড়লেন। একবার, দুবার, তিনবার। লোকটিকে একটা প্রশ্ন করার জন্য তিনি অবশেষে মুখ তুললেন। দেখলেন তাঁর তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে সে অন্তর্ধান করেছে।

চিঠিটা তাঁকে আশা ও আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়ে কী একটা কথা বলতে গিয়ে না বলে থেমে গিয়েছিল। চিঠি কৃতান্তের। সে লিখেছিল, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু, এক্সপেরিমেন্টের প্রথম পর্ব শেষ। রাত বারোটায় এই ব্যাগ খুললে আর একখানা চিঠি দেখবেন। সেই সঙ্গে প্রমাণস্বরূপ এক্সপেরিমেন্টের একটা নমুনাও পাবেন। চিঠি ও নমুনা মিলিয়ে চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবেন কতদূর এগোতে পেরেছি। আমার অনুরোধ আপনি আমার দ্বিতীয় চিঠির সর্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি অচিরেই একদিন সফল হব। সফল হয়েছি বলা চলে। আপনি ঠকেননি। ঠকবেন না।'

নিরঞ্জনের বুকের ভিতরে হঠাৎ উত্তরের হাওয়া, নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু তারপরই তাঁর মন একটা অকারণ আশায় যুক্তির শক্ত জমি ধরে উঠে যাবার চেষ্টা করল। অবসাদ ও উত্তেজনার মাঝখানে পড়ে তিনি বরাবার অলৌকিক উপায়ে মরে বারবার অলৌকিক উপায়ে বেঁচে উঠলেন। রাত বারোটায় নিরঞ্জন সান্যাল শোবার ঘরের জানলা কবাট বন্ধ করে কম্পিত হস্তে ব্যাগ খুললেন। ব্যাগে একটা চিঠি গালা দিয়ে মুখ আটকানো একটা ছোট শিশি। এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে একফুট প্রমাণ একটা প্যাকেট। নিরঞ্জন সান্যাল খামটা সাবধানে খুলে চিঠি বার করে নিয়ে পড়লেন।

কৃতান্ত লিখছে, 'এ চিঠি প্রতিমার লেখার কথা ছিল। কিন্তু এখন তার পক্ষে কিছুকাল চিঠি লেখা কোনো রকমেই সম্ভব নয়। তবু আমার সঙ্গে সেও আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছে যে যদিও আমরা শেষ ধাপে এসে থেমে গিয়েছি, একটা বাধা এসে দাঁড়িয়েছে, এ বিপর্যয় সাময়িক। হয়তো যা বিপর্যয় বলে মনে হচ্ছে তা পূর্ণ পরিণতির সংক্ষিপ্ত রূপ। কোনো বিশেষ অর্থে সাবধান। প্যাকেট বিছানায় কিম্বা টেবিলে মাঝখানে রেখে সাবধানে খুলবেন। সুগোপনে সাবধানে রক্ষা করবেন। মনে রাখবেন আপনার বুদ্ধি, বিবেচনা ও সাহসের আমার ও প্রতিমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে বলেই আপনার হাতে আমরা সাধনার ফল তুলে দিচ্ছি। এই প্যাকেটে যে-জগতে, জীবনের যে-স্তরে সত্য, সেখানে আমার ও প্রতিমার একমাত্র প্রতিবেশী আপনি। আপাততঃ আমি আপনার নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছি। আশা করি শীঘ্রই দেখা হবে। সময়মতো আসতে পারবো।'

চিঠি পড়ে নিরঞ্জন হতবুদ্ধি হলেন। সে-কথা দু ছত্রে এক চিঠিতে বলা যায় তার জন্যে দুটো চিঠি লেখার এবং দীর্ঘ ভনিতার অর্থ কী? ঐ প্যাকেটে কী আছে? হয়তো রাশি রাশি নোটের তাড়া, তিন লাখ টাকা। তাঁকে নিয়ে কৃতান্তের ও প্রতিমার প্রহসন-নকসার শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য। তবু সন্দেহের শেষ রাখতে নেই।

টেবিলের মাঝখানে রেখে নিরঞ্জন সান্যাল সাবধানে প্যাকেটটাকে খুলতে লাগলেন। একভাঁজ পাতলা কাপড়ের স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে হাস্যকর আবিষ্কার। পটু হাতে তৈরী একটি নারীমুণ্ড। প্রতিমার মুখের একটি অবিশ্বাস্য নিখুঁত প্রতিরূপ। তাঁর গোড়ার দিকের আশঙ্কা তাহলে সম্পূর্ণ সত্য। কৃতান্ত ও প্রতিমা এখন কোথায় তাঁকে নিয়ে কী পরিহাস করছে ভেবে নিরঞ্জন সান্যাল নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। নিজেকে মহামূর্খ গাল দিয়েও ক্রোধের উপশম হয় না। তিন লাখ টাকায় যে প্রহসন তিনি কিনেছেন, তার গ্লানি তাঁর মনে একটা ভারী কালো চাদর টেনে দেয়। অর্থশোক একটা নিছক অপ্রিয় মানসিক ক্রিয়ার চেয়ে গুরুতর মনে হয় না। ক্লান্ত দেহমনে নিরঞ্জন টেবিলের সম্মুখে একটা চেয়ারে কোনো-রকমে বসলেন। সম্মোহিতের মতো নারী-মুণ্ডের দিকে চেয়ে রইলেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁর মুখ্তার চূড়ান্ত প্রমাণ ঐ নারীমুণ্ড থেকে তিনি চোখ ফেরাতে পারলেন না।

নিরঞ্জন বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলেন কিম্বা একটা অস্পষ্ট নামহীন-রূপহীন চিন্তায় আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন, তাঁর সঠিক জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে তিনি চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। ঘরে তিনি কার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলেন। নিরঞ্জন চারদিকে তাকালেন। কেউ নেই। বন্ধ ঘরে কারো আকস্মিক উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই। হয়তো তাঁর কানের ভুল। কিম্বা কল্পনা। নিরঞ্জনের প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ সতর্ক হয়ে পড়েছিল। তিনি গা মোড়া দিয়ে চেয়ারে ঠিকঠাক হয়ে বসলেন। ঠিক এই সময়ে দীর্ঘশ্বাসের পুনরাবৃত্তি হল।

নিরঞ্জন বিস্মিত হলেন। তাঁর কান কি তাঁকে আবার প্রতারণা করছে? না তিনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন? না কল্পনার অলীক দীর্ঘশ্বাস শুনছেন? নিরঞ্জন আবার চারদিকে তাকালেন। তাঁর দেহ ও মনের কোন্ অবস্থায় ধ্বনির কোন্ মরীচিকা তাঁকে বিভ্রান্ত করছে ভেবে তিনি বিচলিত হলেন। দেহ ও মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা দরকার। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের চারধারে কয়েকটা পাক দিলেন। এবং এক সময়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। কারণ, ঐ দীর্ঘশ্বাস। এবার দীর্ঘশ্বাসে ছেদ পড়ার লক্ষণ নেই। স্বাভাবিক ছন্দে শরীরীর দীর্ঘশ্বাসের মতো তাঁর কানে আঘাত করে চলেছে। এক দুর্নিবার আকর্ষণে নিরঞ্জন ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে নারীমুণ্ডের দিকে তাকালেন। তিনি তাঁর দু চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। দেখলেন প্রতিমার প্রতি-রূপের দুটি চোখ আস্তে আস্তে খুলেছে। শেষে তার স্থির পূর্ণদৃষ্টি নিরঞ্জনের উপর পড়ল। নিরঞ্জনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা হিমপ্রবাহ তীব্রবেগে নেমে গেল। বৈজ্ঞানিক নিরঞ্জন ভয় ও বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নেবার চেষ্টা করলেন, একটা ব্যাখ্যার জন্য মরীয়া হয়ে যুক্তির ও অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে হাত বাড়ালেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি প্রতিমার কণ্ঠে সুস্পষ্ট শুনলেন, 'কৃতান্ত, কৃতান্ত কোথায়?'

ভয়ে বিস্ময়ে যতটা, তার চেয়ে নিরঞ্জন ঢের বেশী অভিভূত হলেন তাঁর এই অভাবিত অভিজ্ঞতায়। এক অস্বাভা-বিক মর্মান্তিক পরিণতির চাক্ষুষ প্রমাণে। নারীমুণ্ডের দুচোখে দুফোঁটা জল চকচক করছে। তারপর অজস্রধারে গাল বেয়ে নামল। দীর্ঘশ্বাসে নাসিকা স্ফারিত হতে থাকল। অধরোষ্ঠ কাঁপতে লাগল।

প্রতিমার কণ্ঠে নিরঞ্জন আবার শুনলেন, 'আপনি ওভাবে তাকাবেন না। আমার ভয় করছে। কীরকম মনে হচ্ছে। কাছে আসুন। কথা বলুন। কৃতান্ত কোথায়?'

নিজেকে শক্তির ও সাহসের আশ্বাস দিয়ে নিরঞ্জন দুহাত মুঠ করে দৃঢ়পদে কয়েক পা এগোলেন। প্রতিমার প্রতিরূপ তাঁকে নির্ণিমেষে দেখছে। তার দৃষ্টিতে ভয়, প্রত্যাশা ও সকাতর মিনতি।

প্রতিমার কণ্ঠে আবার সুস্পষ্ট উচ্চারিত হল, 'আমি এখন একা। অত্যন্ত একা। আমাকে রক্ষা করুন। আশ্রয় দিন।'

নিরঞ্জন বুঝলেন প্রতিমার প্রতিরূপ নারীমুণ্ড তাকে যে-স্তরে আহ্বান করছে, অভিজ্ঞতার সেই স্তরে উঠে তাকে মেনে নিয়ে বিষয়টার কুলকিনারা করা ছাড়া উপায় নেই। নিরঞ্জন বললেন, 'তুমি প্রতিমা?'

প্রতিমার প্রতিরূপে হাহাকার করে বলে উঠল, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? কৃতান্ত কোথায়?'

নিরঞ্জন বললেন, 'জানি না। কিন্তু তোমার এ কী অবস্থা! তুমি কী করে বেঁচে আছো?'

প্রতিরূপের দীর্ঘশ্বাসে ঘর ভরে গেল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'বুঝেছি। কৃতান্ত হয়তো আর ফিরবে না।'

(আগামীবারে সমাপ্য)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

॥ স্মরণে মননে রাসেল ॥

যাঁরা মনীষী তাঁদের সান্নিধ্যে থাকাটাও একটা ভাগ্যের কথা। অনেকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভৃত্য বনমালীকে ঈর্ষা করেন, যদি বনমালী হওয়া যেত তাহলে না জানি কবির জীবনের কত কথা, কত খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া সম্ভব হত! বনমালী তেমন লেখাপড়া জানতো না, নইলে তার কথা নিশ্চয়ই শোনা যেত। দেখা গেছে রাষ্ট্রনায়ক ও সমরনায়কদের জীবনের নানাদিকের ঘটনা লেখার অনেক লোক পাওয়া যায়। এযুগের মহামনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল দীর্ঘদিন মর্তধামে ছিলেন, তাছাড়া তিনি নিজেই কয়েকটি খণ্ডে তাঁর আত্মজীবনী রচনা করে গেছেন, তাঁর কথা প্রায় সকলেরই জানা। তথাপি রুপার্ট ক্রুসে-উইলিয়ামস 'রাসেল রিমেমবারড' নামে একটি প্রশংসনীয় গ্রন্থে রাসেলের জীবনের কিছু কথা নিবেদন করেছেন। তিনি ভাগ্যবান, রাসেলের কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। প্রায় পঁচিশ বছর কাল তিনি রাসেলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। ক্রুসে-উইলিয়ামস নিজেও একজন গণিতবিদ, তাই তিনি নিজেই মাঝে মাঝে রাসেলকে কিছু কিছু বুদ্ধির প্রশ্নাদি করতেন রাসেলের 'থ্রি-ডাইমেনসন্যাল মাইনড' পরীক্ষা করাই ক্রুসে-উইলিয়ামসের উদ্দেশ্য ছিল। রাসেল নাকি একেবারে বাজে উত্তর দিয়ে হেরে গেছেন।

ত্রিস্তর মনের বদলে রাসেল বলতেন আমার ওয়ান ডাইমেনসন্যাল মাইনড। সুতরাং মোটরকার পরিকল্পয়িতা কিংবা চিত্রশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর কাছে বাস্তবতা প্রতীকের মাধ্যমে এসেছে এবং অনেক সময় শুধু কথা দ্বারাই তিনি অর্থ বুঝতে পারতেন।

একবার একটি চাষী সোজা তাঁর কাছে এসে হাজির হয়ে এমন একটি প্রশ্ন করে যা তাঁকে অতিশয় বিস্মিত করে তোলে। চাষীটি এসেই বলল—'আমি একজন লর্ড রাসেল। একটি মাত্র কথায় সম্বন্ধবাদ বা থিয়োরী অব রিলেটিভিটি—বুঝিয়ে দিন।'

রাসেলের ছিল অসাধারণ স্মরণশক্তি। 'ওয়ান ডাইমেনসন্যাল মাইনড' এবং [illegible] কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। অন্যদিকে তিনি অতিশয় [illegible]— অর্থাৎ আনাড়ির মত নির্দেশ [illegible] নিজের [illegible] [illegible] [illegible] পারতেন না। [illegible] তিনি [illegible] করতেন। [illegible] তাঁকে 'অর্ডার অব মেরিট' উপাধিদান করা হয় তখন তিনি ঘাবড়ে গেলেন। কি আশ্চর্য, রাজা একেবারে সাধারণ মানুষের মতই ব্যবহার করলেন।

স্বয়ং গণিতবিদ এবং দার্শনিক হওয়ায় ক্রুসে-উইলিয়ামস রাসেলের সংগে তাঁর পঁচিশ বছরের যোগাযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন। 'রাসেল রিমেমবারড' ঠিক জীবন কথা নয় তবে এক মহামনীষীর রেখাচিত্র। ক্রুসে-উইলিয়ামসের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি একালের এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার মনের খবর কিছু কিছু ধরতে পেরেছেন।

ব্যক্তিগত কথাবার্তা, সামান্য টুকরো ঘটনা ইত্যাদির দ্বারা ক্রুসে-উইলিয়ামস ব্যক্তি রাসেলকে গড়ে তুলেছেন। রাসেলের অসামান্য প্রজ্ঞা, সরসতা, অনুভূতি, মানসিকতা, দুর্বলতা, ব্যক্তিগত ঝোঁক—একাধিক স্ত্রী—সবকিছুই একটি চমকপ্রদ উপন্যাসের মত মনোহর ভংগীতে বিধৃত।

রাসেলের সবচেয়ে বড়ো ঝোঁক ছিল গণিতে, গণিত তাঁর প্রিয়। কেবলই চিন্তা করতেন গণিত কিভাবে ছোটদের শেখানো যায়। শুদ্ধ তর্ক-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গণিতকে গড়তে হবে, আর তা সিদ্ধান্ত থেকে আহরণ করতে হবে। সাধারণ বস্তু যে আসলে অতিশয় জটিল এবং বিচিত্র— এই ধারণা সপ্রমাণে তিনি আনন্দ পেতেন। উইলিয়ামস বলছেন—

"Implicit exaggeration was a factor in much of Russels Wit"

তিনি ছিলেন গাণিতিক-দার্শনিক এবং সোস্যালিস্টও। তবে সোস্যালিস্ট হলেও 'আর্ল' হতে তাঁর বাধেনি। উপাধিটা কেন যে বিসর্জন দিতে হবে তা তিনি ভেবে পেতেন না। বরং ইমার্জেন্সীর কালে এই উপাধিটাই বেশ উপকার দেয়। হোটেলে, দোকানপাটে একটু অতিরিক্ত খাতির পাওয়া যায়। তাঁর মতে বংশানুক্রমে প্রদত্ত উপাধি দেওয়ার রীতি তুলে দেওয়া দরকার।

রাসেল সোস্যালিস্ট, তাই বলে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বিসর্জনে তিনি রাজী নন। সব ছেড়ে দিয়ে কেবল দাতব্য কর্মে আত্মনিয়োগেও তিনি আগ্রহী ছিলেন না।

১৯৩৮-এ রাসেল সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং পরে ১৯৪০-এ সিটি অব নিউ ইয়র্ক কলেজে দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁকে নিয়োগ করার জন্য আপত্তি ওঠে এবং আদালতের হুকুমে নিয়োগ বাতিল হয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—

"Russell advocated immoral and Salacious doctrines and wrote filth"

পরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী প্যাট্রিসিয়া এবং পুত্র কনরাদ পেনসিলভ্যানিয়ায় এল। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। বিশ্রী রকমের সাইনাস ইনফেকসনের ফলে তিনি অথর্ব হয়ে গেলেন এবং চাকরী গেল। এই চাকুরীহীন অবস্থায় তিনি লিখলেন 'হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ণ ফিলোসফি'—এই গ্রন্থ তাঁর পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর ভিত্তিতে রচিত।

১৯৪৪-৪৫-এ অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হল। তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশের সংগে সংগে সাফল্য লাভ করল। ব্রিটিশ চিন্তানায়ক ততদিনে খ্যাতি অর্জন করেছেন ন্যুক্লিয়ার ডিস আর্মামেন্ট বা আণবিকযুদ্ধ থেকে নিরস্ত করার আন্দোলনে এবং তাঁর সতেরখানি গ্রন্থ ফরাসী এবং জার্মাণ ভাষায় অনূদিত হল। যখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর তখন তাঁর সামনে পরিশ্রমময় আরো পঁচিশটি বছর পড়ে রইল।

এই কালেই রাসেল এবং তাঁর স্ত্রীর জীবনে সাফল্য এল। ক্রুসে-উইলিয়ামসের আলাপচারের প্রথম কয়েকটি বছর রাস-

নৈতিক আলোচনায় ভরপুর হলেও পরবর্তী কাল লেখকের পক্ষে এক অপূর্ব আনন্দময় বিশুদ্ধ পরিবেশে মননশীল জগতে বিচরণের কাল।

১৯৪৮-এ রাসেলের 'হিউম্যান নলেজ' প্রকাশিত হল। চতুর্দিকে ভালো রিভিয়্যু বেরোল, রাসেল খুশি, কিন্তু রাসেলের প্রত্যাশামাফিক যথাযোগ্য মূল্যায়ন হল না।

১৯৪৯-এ প্যাট্রিসিয়ার সংগে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটল। তিনি কনরাদকে নিয়ে কর্ণওয়ালে চলে গেলেন। রাসেল একটু মানসিক আঘাত পেলেন। রাসেলের চরিত্রে দুটি সত্তা বর্তমান। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেই তিনি লিখেছিলেন—

> "The centre of me is always and eternally a terrible pain .... a searching for something beyond what the world contains something transfigured and infinite.. It is like passionate love for a Ghost"

এই কালে তাঁর আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল বিশেষতঃ 'হিউম্যান নলেজ' গ্রন্থটি অসফল হওয়ায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৯-১৯৫০ সম্মানলাভের কাল। প্রথমে এল 'অর্ডার অব মেরিট', তারপর 'নোবেল প্রাইজ।' ১৯৫০-এ আমেরিকা ভ্রমণ তাঁর কাছে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা! এখানেই এডিথ ফিনচের সংগে আবার দেখা, এডিথ পরে রাসেলের চতুর্থা স্ত্রী হলেন। এডিথ ও রাসেলের সুগভীর প্রেম রাসেলের জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনেদিল বিষাদাচ্ছন্ন অন্ধকারময় আচ্ছন্ন মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আনন্দের সাগরে যেন অবগাহন করলেন।

রাসেল বলতেন, সূর্য প্রতিদিন উদিত হয়, অনেকদিন ধরে উদিত হচ্ছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয়, কেউ-ই নিশ্চয় করে বলতে পারে না, কালও আবার সূর্য উঠবে।

'হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ণ ফিলসফিতে' তিনি মন্তব্য করেছেন—

> "To teach how to live without certainty and without being paralysed by hesitation is perhaps the chief thing that philosophy in our age can still do for those who study it".

হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে তিনি আতংকিত ছিলেন। তিনি বলতেন, এটা পরিহাসের বিষয় নয়, সমগ্র মানবসমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শেষ জীবনে তাঁর শ্রবণশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন, কিন্তু কোনোরকম যান্ত্রিক সহায়তা তাঁর পছন্দ হত না। সেটা ঠিকমত পরিচালনা করতে পারতেন না, ফলে নানারকম উৎকট আওয়াজে বিরত হতেন। এর ফলে তিনি আপনাকে অতি অসহায় মনে করতেন।

অতি ক্ষীণ শরীর, যেন একটি চড়ুই, কিন্তু কেউ লক্ষ্য করেনি ঐ শরীর নিয়েই তিনি বেশ ভালোভাবে টি'কে ছিলেন।

তাঁর সংগে কথাবার্তা বলা সহজ ছিল। সর্বদাই সবাইকে খুশি রাখতে তিনি ভালোবাসতেন। সবাই তাঁকে ভালো বলুক, ভালোবাসুক এটাও চাইতেন।

ক্রসে-উইলিয়ামস একটি আশ্চর্য রেখাচিত্র এ'কেছেন, যা রঙে-রসে উজ্জ্বল।

—অভয়ঙ্কর

RUSSELL REMEMBERED By RUPERT CRAWSHAY WILLIAMS Published by — OXFORD UNIVERSITY PRESS Price L 2 only.

ভগ্ন পক্ষ (উপন্যাস)—রমাদাস হালদার। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা—১২। চার টাকা।

অম্বর আর কেতকী ভাই-বোন। মা অবশ্য একজনঃ স্টেপা। কিন্তু কেতকীর জন্মদাতা একজন আলাদা সৈনিক। ঘটনার আবর্তে দুজনে দুদিকে ভেসে গিয়েছিল। কেউ কাউকে জানে না, চেনে না। নামে ভারতীয় বাঙালী হলেও দুজনেরই মাতৃভূমি ইংল্যান্ড। সেখানেই আকস্মিকভাবে একে অন্যের দেখা পেল। শুরু হল জটিলতা। এই জটিল অন্তর্বাস্তব অবস্থা থেকে কি করে তারা মুক্তি পেল—তাই নিয়েই এ গ্রন্থের কাহিনী। সহজ সরলভাবে গল্পটি বলতে পেরেছেন লেখক—এটা সঠিক অর্থে উপন্যাস নয়, বরং বড় গল্পই বলা ভালো।

আলোছায়ার অন্তরালে (উপন্যাস)—শিপ্রা দত্ত। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা : ১২। ছ'টাকা।

ভাগ্যের পরিহাসে নিয়তির ললাটলিখনে শিল্পপতি রাহুল রায়ের সন্তান অনাথ আশ্রমে মানুষ হতে লাগল শিল্পপতির অগোচরে। সর্বাঙ্গসুন্দরী এক কন্যাকে 'দত্তক' নিয়ে তিনি মানুষ করতে লাগলেন। ঘটনার কুটিল প্রবাহে আলোছায়াভরা জীবনের নানা পথ মাড়িয়ে অনাথ আশ্রমে লালিত রাহুল একদিন এসে মুখোমুখি হল শিল্পপতির পালিতা কন্যার। ঝড় উঠল, নামল অন্ধকার। অন্ধকার পার হতেই ফুটল আলো। নাটকীয় ঘটনার করুণ মধুর সমাপ্তি রেখা প্রশংসনীয় ভাবে টেনেছেন লেখিকা

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কাকলি (মাঘ, ১৩৭৮)—সম্পাদনা : পারুল দাশ। অভয়নগর, আগরতলা। এক টাকা

ছোটদের লেখা এবং ছোটদের জন্যে বড়দের নানান ধরনের লেখা দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যাটিতে স্থান পেয়েছে। রঙচঙে ছাপা পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন। সত্যিই ছোটদের মনের মতো পত্রিকা 'কাকলি'।

অতিথি (দোল সংখ্যা '৭২)—সম্পাদক অসিতকৃষ্ণ দে। ১এইচ।৪ প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২। পাঁচাত্তর পয়সা।

তরুণদের সাময়িকপত্র। এতে আছে নটা গল্প, তিনটি কবিতা, জিজ্ঞাসার জবাব আর রেহানা, ওয়াহিদা, সুচিত্রা : তিন তারকা সম্পর্কীয় আলোচনা। লেখাগুলি হাল্কা ও সাধারণ মানের।

অভী : (রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় বার্ষিকী '৭২) নরেন্দ্রপুর, ২৪-পরগণা।

নরেন্দ্রপুর সারা ভারতের শিক্ষা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় নাম। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত এই মহাবিদ্যালয়ে তরুণ জীবনকে অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত করে 'মানুষ' গড়ার কাজ চলেছে নিরন্তর। অভীঃ বার্ষিক সংকলনের নানান ধরনের রচনায় তাই আভাষিত। সেই সংগে পরিচয় মেলে বহুমুখী শিক্ষার জীবনকে সম্পূর্ণ করে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা। দ্বিভাষায় (বাংলা ও ইংরেজি) প্রকাশিত এই সংকলনে অনেকগুলি ভালো লেখা আছে যা বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজ ভাবনায় ভাস্বর। অধ্যাপকরাও ছাত্রদের সংগে কলম ধরেছেন। কতকগুলি লেখা ছাত্র-রচিত হলেও বিষয়-ভাবনা এবং বাকভঙ্গির দিক থেকে পরিণত—রচনাগুলি সুলিখিত। অমিয়কুমার ভট্টাচার্য, শংকরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সমীরকুমার দত্ত, লোকেশ ভট্টাচার্য প্রমুখের রচনা এই দিক থেকে উল্লেখ্য।

॥ ৯ ॥

একেই শহরের বন্দী জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল মনোরমা, হেমন্ত ও ঠাকুর—দুজনের অনুপস্থিতিতে হাঁপিয়ে উঠল একেবারে। ওর যেন ডাক ছেড়ে কান্না পায় এক এক সময়। জনহীন শব্দহীন বাড়িটা গিলতে আসে ওকে। ছেলে থাকলেও তবু একরকম করে কাটে। ছেলে দুপুরে ইস্কুলে যায়—সে সময়টা সম্পূর্ণ একা, গোটা বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে।

এ সময়টা পাগলের মতো অবস্থা হয় মনোরমার। প্রাণপণে রাস্তার দিকের ঘরটায়—হেমন্তর শোবার ঘরে থাকার চেষ্টা করে। রাস্তা বলতে অবশ্য গলিই, তবু যতটা সম্ভব সেই দিকেই চেয়ে বসে থাকে—সেখানে পথিকদের আনাগোনার আওয়াজের দিকে কান পেতে। দুপুরে তো বটেই, বিকেলে পর্যন্ত ঝিটা ঘুমোয় পড়ে পড়ে। ছেলে নেই—কোনমতেই সে সময়টা বাড়ির মধ্যে আসতে পারে না, গা ছমছম করে। সত্যি সত্যিই এক একসময় মনে হয় ওর, অশরীরী ছায়ামূর্তির দল চারিদিকের কোণে খাঁজে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওর দিকে চেয়ে নিষ্করুণ বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

আরও মুশকিল হয়েছে এই, আগে তবু ঝিকে দুচার পয়সা ঘুষঘাস দিয়ে এক আধবার বাইরে বেরিয়ে পড়া চলত—দু পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও সেটাও একটা মুক্তি। একটা অবকাশের মতো ছিল—এখন তাও যেতে ভরসা হয় না। বাড়িতে এত জিনিসপত্র, টাকাকড়িও অবশ্যই কিছু আছে—যদি চোর আসে। ওর দোষে কোন ক্ষতি হলে কিছু ক্ষোয়া গেলে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতবে জ্যাঠাইমা। যা লোক, আর যা মেজাজ!

বরং ঝিটাই এখন একআধবার বাইরে যায়— নিজের পানদোক্তা কেনার নাম করে, সেই ফাঁকে আশপাশের বাড়ির ঝিদের সঙ্গে দুটো গল্প করে আসে। সইস রামধন যখন খবরাখবর নিতে আসে, তখন তাকে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে যায় সে।

এই রামধন আসার সময়গুলোই মনোরমার মরুভূমি তুল্য জীবনে ওয়েশিস। রামধন যেন ওর জীবনের দিকের পৃথিবীর দিকের বাতায়নও। তার মুখেই সে সংসারের সংবাদ পায়—দুনিয়ায়, মানে ওদের সীমাবদ্ধ দুনিয়ার, যত কেচ্ছাকেলেঙ্কারীর মুখরোচক খবর।

এই ধরণের খবরই চায় সে, হেমন্তর সংসারে যা পাওয়ার উপায় নেই। হেমন্ত উপস্থিত থাকলে রামধনও যা দিতে পারত না। রামধনের মতো লোকের সঙ্গে কথা বলাই তো বৌমানুষের পক্ষে কল্পনাতীত। এর আগে যখন সে এসেছে, সদরের কাছে দাঁড়িয়ে যা বলবার বলে চলে গেছে জবাব নিয়ে। বাড়িতে ঢোকারও উপায় ছিল না।

এখন তাই—রামধনের কথাগুলো, গল্পগুজব—বুভুক্ষুর মতোই গেলে সে বসে বসে। পূর্ণবাবুদের কথা, হেমন্তর সঙ্গে তার সম্পর্ক মায় কমলাক্ষ প্রসঙ্গ—কিছুই বাদ যায় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রস দিয়ে রসান দিয়েই বলে রামধন। সে সময় সে ছিল না, তবে ভৃত্য পরম্পরায় শুনেছে। এসব ন্যায্য উত্তরাধিকারের মতোই এক ঝি কি চাকর অপরকে বলে যায়—খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখা হলেও, একবেলা কেন এক ঘন্টা সময় পেলেও এইসব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীগুলো বলে নেয়—অবশ্য কর্তব্য হিসেবে।

রামধনও এইভাবেই শুনেছে, সেই প্রথম আমল থেকেই পূর্ণবাবুর সব কেলেঙ্কারীর কাহিনী, স্বামীস্ত্রীর অবনিবনাও হবার কারণ ও বিবরণ। কিছু বেশী শুনেছে হয়ত। একেবারে ভুল শোনে নি। সেই-গুলোই হয়ত আর একটু রং চড়িয়ে মিথ্যের খাদ দিয়ে বলে তখন। রামধন নাকি জাতে পোদ বা হাড়ি বা ঐ ধরণের কোন জল-অচল জাত। তাই ব্রাহ্মণ বাড়ির ভেতরে এসে বসতে পারবে কোনদিন একথা সে কল্পনাও করেনি কখনও, তার ওপর বসা শুধু নয় বসে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প করার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করবে—এ তার স্বপ্নেরও বাইরেকার জিনিস। সুতরাং তারও উৎসাহের অবধি থাকে না—এক 'বামনী'কে এইসব খবর যোগাতে।

রামধনের বয়স তেত্রিশ চৌত্রিশ, বেশ শক্তসমর্থ। রংটা মিশ কালো হলেও দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়। বয়সের চেয়ে ছোটই দেখায় বরং। এমন লোকের সঙ্গে কথা কইতেও ভাল লাগে।

মানববাড়ির ইতিহাস ছাড়াও অনেক কথা জানতে পারে মনোরমা ওর মুখ থেকে। লোকটা গল্প করতেও জানে। বেশ গুছিয়েই বলে কথাগুলো—যখন বলে। নিজের কথাও বলে অনেক। দুটো বিয়ে করেছিল, একটা আট বছর বয়সে, সে বৌ সোমত্থ হবার আগেই মরে যায়, আরেকটার সঙ্গে তবু বছর দুই ঘর করতে পেরেছিল, ছেলেও হয়েছিল একটা—তারপর সবসুদ্ধ ওলাবিবির দয়ায় শেষ, যাকে বলে ঢাকী-সুদ্ধ বিসর্জন।

না, আর বিয়ে করেনি। এই তো বারোটি টাকা মাইনে এখানে, এর মধ্যেই নিজেকে খেতে হয়— কীই বা থাকে! দেশে মা নিজে হাতে মাটি কুপিয়ে যা পারে চাষবাস করে—জমি কিছুই নেই, বিঘে-খানেক বড় জোর ঠেকিয়ে বাড়িয়ে—তাতে তার কোন মতে চলে যায় ভিক্ষে দুঃখু করে। রামধন এখন আর একটা বিয়ে করলে দেশে রীতিমতো টাকা পাঠাতে হবে। চার পাঁচ টাকার কম পাঠালে চলবে না। এই মাইনের থেকে খাওয়া পরা চালিয়ে মাসে চার পাঁচ টাকা বাঁচানো খুব কষ্টের কথা। তা ছাড়া অসুখবিসুখ আছে, ছেলেমেয়ে হতে থাকবে—পেটও বাড়বে—কী বা নিজে খাবে আর কী বা ওদের খাওয়াবে।

না না, ছেলেমানুষ ছিল যখন—বিয়ের ফুর্তিতে বিয়ে করেছে— অত কিছু ভাবেনি। মা দাদা দাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছে। এখন চোখ কান খুলেছে—আর সাহস হয় না। দাদা ছিল যখন তখন এতটা ভয়ও ছিল না। সে জন খাটত, তাতেই সংসার চলে যেত। সেও 'নিউদ্দিশ' আজ চার বছর কেউ বলে ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে 'পুলিপোলাও' খাচ্ছে আন্দামানে বসে, কেউ বলে খুন হয়েছে। দাদার 'পরিবার' আর একজনকে ধরে তার ঘরে গিয়ে উঠেছে ছেলেপুলে সুদ্ধ—ঝামেলা মিটে গেছে।

মনের মতো শ্রোতা পেয়ে রামধন সোৎসাহে বলে যায়—অতি অসাধারণ এইসব সাধারণ কাহিনী। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে মনোরমাও। এখানকার পোশাকী জীবন নতুন পাম্পশু জুতোর মতোই অসহ হয়ে চেপে বসেছে, রামধনের এইসব গল্পের মধ্যে যেন মুক্তির স্বাদ পায় সে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।...

ক্রমশ রামধনের এখানে থাকার সময় বিলম্বিত হয়। ঝিও খুশী হয় তাতে, নিশ্চিন্ত হয়ে এদিকে ওদিকে যেতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়াতে পারে। মনোরমাও ঝিয়ের অনুপস্থিতিতে অনেকটা স্বাধীনতা পায়। এটা-ওটা খাওয়ায় রামধনকে, চা করে দেয় লুকিয়ে। ওদের বাসনেই দেয়। শাশুড়ী জানতে পারলে জ্যান্ত পুঁতবে, এসব বাসন ব্যবহারযোগ্য তো থাকবেই না—সে কথা একবারও মনে পড়ে না। রামধনকে দিয়েই কোননি কুলপী আনিয়ে খায় দুজনে বসে। মনোরমার অত বামনাই নেই, ছোট জাতের ছোঁয়া লাগলেও জাত যাবে—একথাটা ওর মাথায় ঢোকে না অত। তাছাড়া লুকিয়ে খেতে দোষ কি?

বেগুনি ফুলুরি তো বটেই—রামধন প্যাঁজের বড়া খাওয়াবার জন্যও জেদ করে, কিন্তু অতটা আবার সাহসে কুলোয় না মনোরমার। পিঁয়াজের বড় দীর্ঘস্থায়ী গন্ধ, দূর থেকেও নিঃশ্বাসে পাওয়া যায়। ঝি যদি ধরে ফেলে? সে বড় লজ্জার কথা। বামুনের বিধবা পিঁয়াজ খেয়েছে—তার ওপর রামধনের নিয়ে আসা খাবার। হয়ত ঐ ঝিই আর তার কাজ করতে চাইবে না।

দিনের বেলায় এখানের উপস্থিতিটা দীর্ঘায়িত করতে রামধনেরও সাহসে কুলোয় না। হেমন্তমার হুঁশ বড় 'টনকো'—চারদিকে চোখ কান খোলা থাকে তাঁর। রামধন কখন যায় কখন ফেরে—বাড়ির আর কেউ অত লক্ষ্য না করলেও তিনি ঠিক খেয়াল করে রাখেন। এত বড় অসুখের সেবা শুশ্রূষার মধ্যেও এক ফাঁকে বেরিয়ে এসে জেরা করেন। তখন নানা রকম মিথ্যে বলতে হয় বানিয়ে বানিয়ে—কল্পিত কাজের ফিরিস্তি দিতে হয়, কোন কোনদিন হঠাৎ আত্মীয়ের সাক্ষা-দেখা-হয়ে যাওয়ার গল্প ফাঁদতে হয়।

না, সে বড় গোলমাল, দিনমানে দেরি হয়ে গেলে।

তাই—হেমন্তমা না পাঠালেও, অন্য কাজের ফাঁকে, কিম্বা কাজ না থাকার অজুহাতে বেড়াতে যাবার নাম করে পালিয়ে চলে আসে সে আজকাল। সন্ধ্যার পরই সে অবসর মেলে বেশির ভাগ। প্রথম প্রথম ছেলের জন্যে একটু অসুবিধা হত, রামধন ইঙ্গিত বুঝে আর একটু রাত ক'রে আসতে লাগল। তখন ঝি থাকলেও, সে বসে বসে ঢোলে কিম্বা সোজাসুজি মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে শুয়েই পড়ে। নইলে—'বড্ড ঘুম পাচ্ছে বাপু বসে বসে, ঐ নোকটা তো আছে—আমি বরং ততক্ষণ একটু পাশের বাড়ির হরিদিদির কাছ থেকে একটুন পান দোক্তা খেয়ে আসি' বলে বেরিয়ে পড়ে।

এই উভয় পক্ষেরই বাঞ্ছিত—একান্ত সাহচর্যের ফল যা ফলবার ফলল।

দ্রুতই ফলল বলতে গেলে।

একদিন—যথেষ্ট কাছাকাছিই বসে ছিল দুজনে—তবু বাতাস করার অছিলায় আর একটু কাছ ঘেঁষে বসল মনোরমা। রামধনের সইস-জীবনে এ অভিজ্ঞতা অভিনব শুধু নয়—অবিশ্বাস্য। এমনিও তার দেশে থাকতেও এ কেউ করে নি কখনও। এর অর্থও তার না বোঝবার কথা নয়।... বিশেষ পাখার অভাবে যখন আঁচল দিয়ে বাতাস করতে হয়—হাতটা ওঠা-নামার ভঙ্গীগুলো তখন বিশেষ আমন্ত্রণ জানায়, আশ্বাস ও অভয় দেয়, স্পর্ধা ও সাহস যোগায়। আঁচল গায়ে এসে পড়ে স্পর্শে প্রশ্রয় দেয়—কাজটা এগিয়ে রাখে অনেকটা। ঘন নিঃশ্বাসের শব্দটাও শুনতে কোন অসুবিধা নেই। সেটাও এক ধরনের উৎসাহ, প্ররোচনা।

অতএব রামধন যদি কিছুক্ষণের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে খপ্ করে আঁচল সুদ্ধ হাতটা চেপে ধরে তো তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আর—ওপক্ষ থেকে যদি মুখ নত হওয়া ছাড়া কোন প্রতিবাদ না জাগে তাহলে সে হাত ধরে আরও কাছে টানবে রামধন—এও স্বাভাবিক।...

মরুভূমিতে তৃষ্ণার সময় থকথকে পাঁকও লোভনীয়, জীবনরক্ষক বলে মনে হয়, পোকা-বিলবিলে পচা জল দেখেও তৃষ্ণার্ত পথিক সাগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মনোরমাও নিদারুণ তৃষ্ণায় এই পঙ্কে ঝাঁপ দেবে—এতেই বা আশ্চর্য কি?

পূর্ণবাবুকে মৃত্যুর দিক থেকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনতে পুরো দুটি মাস সময় লাগল।

এই দু' মাস কোন দিকে তাকাবার, অন্য কোন কথা চিন্তা করার অবসর মেলে নি হেমন্তর।

প্রথম যেদিন চোখ খুলে চাইলেন পূর্ণবাবু, হেমন্তকে চিনতে পারলেন, প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কখন এলে? তোমাকে কে খবর দিলে?'

হেমন্ত হেসে বলল, 'কখন কি বলছ, কবে এলে তাই জিগ্যেস করো! এই তো

প্রায় দু' মাস হ'ল—এখানে বসে আছি, এই এক ঘরের মধ্যে!'

'দু-মাস। এতদিন ভুগছি!'

এই বলে—সম্ভবত এত কথা বলা ও অসুখের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব অনুভব করার ক্লান্তিতেই চোখ বুজলেন আবার। খানিকটা পরে—আবার যখন কথা বলার মতো অবস্থা হ'ল তখন প্রশ্ন করলেন, 'তার পর? তোমার ঘর-সংসার দেখছে কে?'

'গোবিন্দ দেখছেন। আর কে দেখবে। এখান থেকে রামধন গিয়ে খবর নেয়, বাজার-দোকান করে দেয়—ঝি আছে আর বৌমা আছে, রাঁধে বাড়ে খায়-দায়। বাড়ি-ঘর যা হয়ে আছে, বুঝতেই পারছি—এক হাট। ...এইবার তুমি একটু ভালর দিকে—এখন দিদিই দেখতে পারবেন, এবার আমি ছুটি নোব। সত্যিই—কী যে হচ্ছে!'

আরও খানিকটা চোখ বুজে থেকে শক্তি সঞ্চয় করেন পূর্ণবাবু, তারপর বলেন, 'আর দুটো একটা দিন থেকে যাও। বসতে পারি একটু আগে—। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, দু' একদিনে বেশী কি ক্ষতি হবে!'

আর একটু থেমে বলেন, 'কিন্তু তুমি এখানে—সেইটেই বুঝতে পারছি না। খবর পেয়ে এলে বুঝি? এরা কিছু বললে না?'

'না, খবর পেয়ে আসি নি। দিদি নিজে গিয়ে ডেকে এনেছেন।'

'কে ডেকে এনেছে—মেজবৌ? নিজে গিয়ে ডেকে এনেছে। আশ্চর্য!' অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না এর পর।

দুর্বল মস্তিষ্কে এতখানি বিস্ময়ের আঘাত সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল।

অবিশ্বাস্য বিস্ময়। সেই সঙ্গে বুঝি একটু অনুতাপও।

বুদ্ধিমান বহুদর্শী পূর্ণবাবুর সেই রোগাচ্ছন্ন চিন্তা শক্তিতেও কার্যকারণ যোগাযোগটা বুঝে নিতে দেরি হয় না। কতখানি ভালবাসায় এতটা ঔদার্য, এতটা আত্মত্যাগ সম্ভব হয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। মেয়েদের এই ঈর্ষাটা জয় করা সহজ নয়, কঠিন পরীক্ষা এটা—চূড়ান্ত অসম্মান ও আঘাত ভুলে গিয়ে বহুদিনের বহু আঘাত ও অপমান—এই দীনতা ও পরাজয় স্বীকার করা।

বড় অন্যায় হয়ে গেছে। বড়ই অবিচার করেছেন স্ত্রীর প্রতি, জীবন-সঙ্গিনীর প্রতি। দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী।

শরৎ সুন্দরীর প্রতি অবিচারই করে গেছেন জীবন ভোর। কখনও তার দিকটা বোঝবার চেষ্টা করেন নি—তার জ্বালাটা বোঝবার চেষ্টা করেন নি। নিজের সুখের কথাই ভেবেছেন শুধু নিজের প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যুগিয়ে গেছেন—বিচার বিবেচনা বিবেকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে। ক্ষীণতম প্রতিবাদ সামান্যতম বাধাতেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন স্ত্রীর প্রতি।...

হেমন্তও বুঝি বোঝে এই নীরব থাকার অর্থ।

ওঁর মনের তরঙ্গ ওঠা পড়ার শব্দ শুনতে পায় নিজের মনে।

আস্তে আস্তে বলে, 'আমার আর না থাকাই ভাল—বুঝলে? এবার দিদিই বসুন কাছে, তাঁর সেবাই নাও দু'দিন।... আর তো খুব একটা মেহনতের কাজ রইল না—যেটুকু দরকার হবে, উনিই পারবেন চালিয়ে নিতে।'

'তাই যেয়ো।' পূর্ণবাবুও ধীরে ধীরে জবাব দেন, কথাগুলোর অর্থ উপলব্ধি করতে করতে, 'কাল পরশুই চলে যেয়ো। বরং মধ্যে মধ্যে এসে খবর নিয়ে যেয়ো এক আধবার। গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে। গাড়িরও তো বিশেষ কাজ নেই, বসেই তো আছে। চলেই যাও। তোমারও ঘর-বাড়ির কি হাল হচ্ছে কে জানে। ...এর মধ্যে একদিনও যাও নি? ...কে জানে কী হবে। বৌটাকে একা রেখে আসা ঠিক হয় নি। ওটা আস্ত বুনো—পোষ মানতে এখনও ঢের দেরি।'

'কী করব বলো। ওদিকে আর তাকাবারই যে অবসর পাই নি। তোমার কথা ভাবব না, সংসারের কথা ভাবব!

অনেকক্ষণ পরে ছোট্ট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে পূর্ণবাবুর। বলেন, 'আশ্চর্য'! তোমারও—। তোমাকেও এতকাল চিনতে পারি নি। ...কাউকেই। নিয়েই গেলাম জীবনভোর, দেওয়ার কথাটা আর ভাবা হয়ে উঠল না। ...এত পাষণ্ড তবু তো তোমরা আমাকে—। এটা ভগবানের অহেতুক আশীর্বাদ, আমি এর যোগ্য নই।'

বলতে বলতে দু' ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে পূর্ণবাবুর।

এই শরীরে এতটা আবেগের আঘাত সহ্য হবে না বুঝে হেমন্ত 'আসছি' বলে উঠে ভেতরের দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। সে যতক্ষণ কাছে থাকবে পূর্ণবাবু চুপ করে থাকতে পারবেন না, আর এখন যে সব কথা হবে—এই ধরনের আবেগ ঘেঁষেই চলবে তার বক্তব্য।

(ক্রমশঃ)

গণনা ॥ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোলে গোলাপী পদ্মের কুঁড়ি রেখে
তুমি ঘুমে মূর্ছিতা নারী বিচিত্র বিছানায়
দুই বিষফল থেকে শুষে নেওয়া
রসসিক্ত অসরল পঙ্কিল আঙুলে
তোমার সন্তান
নিদ্রাহীন আমিষ দুচোখে আততায়ী।

বিস্ফোরিত পূর্ণিমার দেহ থেকে
সুপ্লিন্টার ছড়ায় ঘাসে
হাতে মুখে বারুদের নির্বিন্ধ আঘ্রাণ
অদূরে বিক্ষুব্ধ ভর্তা
ঘোলাটে আবেগে তপ্ত
রক্তে বাজে নিরুচ্চার হ্রেষা—

নিহত বিচ্ছিন্ন ফল কয়েক বছর পরে
পার্কে পাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষ ॥ ১৯৭১ ॥ দীপেন রায়

আর একবার সে তার সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস নদী ও তটিনী
বন-উপবনে জ্যোৎস্নায় মানুষের সমতট জুড়ে
প্রত্যেকের হৃদয়ে হৃদয়ে
এরকম অনিবারণীয় মিছিল-মানুষ-নৌকা-এরোপ্লেনে
শক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র
আর একবার সে তার সমুদ্র-পর্বত ও
অরণ্য অবাধ দুলে উঠে মানুষের মুখ ও স্বদেশের মতো
অনিবারণীয় সে শুধু অমোঘ হতে কেবলই অমোঘ
চূড়া ও পর্বতশীর্ষ
আর একবার এরকমই সামাল সামাল—
চতুর্দিকে দড়ি ও নোঙর তাকে বেঁধে ফেলবার।
সে শুধু থেকে থেকে কঠিন নিয়ম হয়ে
উঠে আসছে স্পর্ধায়
উত্তোলিত পতাকার মতো।

এখন দিতে পারি ॥ হাসনে আরা

আমার প্রথম যৌবনের ভালবাসার
একটুকরো উত্তপ্ত চুম্বন তোমায় ছুঁড়ে দিয়েছিলাম
তুমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

আমার হৃদয়ের উচ্ছল মাদকতার নোনা স্বাদ
তোমায় দিতে চেয়েছিলাম, দুহাত উজাড় করে
তুমি ঘেন্নায় সরে গিয়েছিলে।

আমার দেহ মনের সব ভালবাসা
তোমায় দিতে চেয়েছিলাম
ফাগুনের মুঠো মুঠো আবীর ছড়ানোর মত
তুমি শত্রু বলে দুহাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলে।

মেঘনার শুভ্র জলে অবগাহন করে
শত শত শহীদের রক্তে ধোওয়া
রাখী বন্ধনী নিয়ে
তোমার হাতে পরাতে চেয়েছিলাম
তুমি হাত সরিয়ে নিয়েছিলে।।

আজ আমার যৌবন নেই, শূন্য ঘর
হৃদয় বড় ঠাণ্ডা আর আবেগহীন
আশেপাশে কোন নদী নেই অবগাহনের
দেখি না কোন শহীদ কোথাও সামনে
আজ এসে তুমি বললে, দাও ......

এখন বেদনা দিতে পারি স্মৃতির মূল্যে কেনা।।

মানুষের বন্ধু ডলফিন

দিলীপ মালাকার

ছোটবেলায় নৌকোয় চড়ে পদ্মার এপার ওপার করেছি বহুবার। পদ্মার বুকে দেখতাম 'শিশু'রা ডিগবাজী খাচ্ছে। মজা লাগত দেখতে। মাঝিদের ভাষায় ওরা 'শিশু' —'শিশুক'। শুদ্ধ বাংলায় শুশুক। যার ইংরেজী নাম 'ডলফিন' বা 'পরপোজ'। মাঝিরা বলত, ওরা আমাদের জীব। তাই ডিগবাজী খায়। ওদের নাকি মারতে নেই। নৌকোর কাছে এসে কয়েকটা শুশুক মুখ তুলে ডিগবাজী খেত। তাই দেখতাম বিস্ময়ে। মাঝিদের কাছে ডলফিনের অনেক গল্প শুনতাম। জলের অন্য কোনো হিংস্র জীব সামনে এলে মাঝিরা বৈঠা বা লগি দিয়ে তাড়া করত, কিন্তু ডলফিনকে নয়। জেলেদের জালে ডলফিন পড়লে তাকে ছেড়ে দিত জেলেরা তাও দেখেছি।

মাঝিরা বলত শুশুকেরা ঝড়ের আগে এসে জানান দিত নানা রকমের আওয়াজ করে। তাই বুঝে মাঝিরা নদীর কিনারে নৌকো নিয়ে যেত। কোনো কোনো শুশুক খেলা করতে করতে মাইলের পর মাইল নৌকোর সঙ্গে যেত। চেনা-পরিচিত নৌকোর সঙ্গে ওদের ভাব জমে যেত। একঘেয়ে নদীপথে মাঝিদের মন্দ লাগতো না ওই জলের সঙ্গী পেয়ে।

আমায় এক মাঝি বলেছিল, মাঝ-নদীতে একটা নৌকো ডুবে যায়, তারা তার খবর রাখত না, গোটাচারেক শুশুক এসে তাদের নৌকোকে ঘিরে ধরে। খানিক পরে তাদের দুটো শুশুক এগুতে থাকে। মাঝিরা ভাবল এত মজার খেলা, তারা কৌতুহলে এগুতে থাকে। খানিক দূরে গিয়ে দেখে একটা নৌকো উপুড় হয়ে আছে। তারা তৎক্ষণাৎ ডুবন্ত লোকদের সন্ধানের কাজে লেগে যায়। এমনি বহু গল্প শুনেছি পদ্মার মাঝিদের কাছে।

সমুদ্র ও বড় নদীতে ডলফিনের বাস কয়েক হাজার বছরের। অনেক দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে ডলফিনের উল্লেখ দেখা যায় বহুবার। গ্রীক পুরানে ডলফিনের উল্লেখ সবচেয়ে বেশী। পৌরাণিক যুগে সমুদ্রযাত্রীদের সঙ্গে ডলফিনের দেখা হত নিয়মিত। তাদের সঙ্গী হিসাবে বহু দূর পর্যন্ত যেত ডলফিনেরা।

জলজ জীবদের মধ্যে মানুষের মিতা-দের মধ্যে ডলফিন। আতলান্তিক ও ভূমধ্যসাগরে জেলেরা আগেও যেমন ডলফিনের সাহচর্য ও সাহায্য পেয়েছে তেমনি এখনও পেয়ে আসছে। ডলফিনের মানুষ-প্রীতি নিয়ে নানান রকমের গবেষণা চালাচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে সময়ের প্রয়োজন। তবে আসল গবেষণা চালান হচ্ছে ডলফিনের ভাষা, মানুষের সঙ্গে ডলফিনের ভাব আদান-প্রদানের একটা ব্যবস্থা কি করে করা যায় তাই নিয়ে। তাহলে ডলফিনকে দিয়ে একটা নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে আরেক নৌকোর মাঝির মধ্যে খবর পাঠান সম্ভব হবে সমুদ্রে। সমুদ্রের কোন জায়গায় মাছের ঝাঁক রয়েছে তার সন্ধানও দিয়ে থাকে ডলফিনেরা। তাছাড়া কোনো মাছ ধরার নৌকো ঝড়ের মুখে পড়লে বা বিপদে পড়লে ডলফিনের সাহায্যে যাতে বিপদ-সংকেত পাঠান যায় সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা চলছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওসিয়ানোগ্রাফি ইন্সটিটিউটে ও মার্কিনদের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন বাইওলজি ইন্সটিটিউটে।

কিছুদিন আগে সোভিয়েট দরিয়া উত্তরসাগরে একদল সোভিয়েট জেলে নৌকো মাছ ধরছিল। ঝড়ে তাদের কয়েকটা নৌকো ডুবে যায়। যাদের নৌকো ডোবেনি তাদের কাছে এসে কয়েকটি ডলফিন এক অদ্ভুত আওয়াজ করতে থাকে আর এগুতে থাকে। ওই নৌকোগুলো ওদের অনুসরণ করে বেশ কিছু দূরে গিয়ে দেখে তাদের সঙ্গীরা নৌকোর একটি অংশ ধরে প্রাণ বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে যাত্রায় বিপদগ্রস্ত জেলেরা প্রাণে বাঁচে ডলফিনদের শুভ প্রচেষ্টায়।

ইউরোপের জেলেরা মাছ ধরতে যায় অতলান্তিক সমুদ্রে, ভূমধ্যসাগারে, উত্তর সাগরে সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে। ইউরোপের বহু জেলে মাছ ধরার নৌকো নিয়ে অতলান্তিক সমুদ্র পারাপার করে প্রায়ই। ইউরোপ থেকে চলে যায় দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে চিংড়ি মাছ ধরতে। এবং তাই নিয়ে বিভিন্ন দেশের জেলেদের মধ্যে কখনো সমুদ্রবক্ষে লড়াইও বেধে যায়। উত্তর সাগরে সোভিয়েট জেলে, বৃটিশ নরওয়েজিয়ান, জার্মাণ, ড্যানিশ, ফরাসী, আইসল্যান্ড ইত্যাদি জেলেরা যায় মাছ ধরতে দল বেঁধে। একজনের এলাকায় আরেকজন গিয়ে যখন মাছ ধরে তখন লড়াইও বেধে যায়। অনেক সময় তাদের জন্যে তাদের দেশের রণপোতও থাকে। একটু বাড়াবাড়ি হলে রণপোত থেকে গোলাগোলি ছোঁড়া হয়। ইউরোপিয়ানরা যত মাংস খায় তার সমান খায় মাছ। আমরা মাংস তো খাই না, মাছও পাই না। ওরা অত মাছ ধরে বলেই ওদের দেশে মাছের দাম আমাদের মাছের দামের অর্ধেক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ। আবার অনেক সময় এত মাছ ধরে নিয়ে আসে যে মাছ বেচায় বাজার থাকে না। কুচো মাছগুলো তারা গুঁড়ো করে গরু, শুয়োর মুরগীদের খাওয়ায়। তারও বেশী হলে জমিতে সার দেয়। আমাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা নিজেরাই মাছ খেতে পাই না, জমিতে সার তো অনেক দূরের কথা। ওদের দেশের এলাকায় সমুদ্র থাকলেই তার মাছ ধরে আনে। আমাদের দেশের

ক্যালিফোর্ণিয়ার সান্তাক্লারা ডলফিন সার্কাসে ডলফিনের খেলা।

টফির ছবি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের ক্যালিফোর্ণিয়ার গবেষণাগারে ডুবুরির কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডলফিন টফি ডুবুরিদের অক্সিজেন গ্যাস ফুরিয়ে গেলে নতুন গ্যাস সিলিন্ডার জোগায়। ১৬ মাস ডুবুরির কাজের শিক্ষা গ্রহণ করে 'সিল্যাব' নামে মার্কিণ সাবমেরিণের সংগে সংগে ঘুরে বেড়ায় সমুদ্রে। যখনই দরকরা পড়ে তখনই টফি দূতের কাজ করে। একটি সাবমেরিন থেকে আর একটি সাবমেরিণে চিঠির থলে পৌছে দেয়।

এলাকার সমুদ্র থাকতেও আমরা মাছ ধরি না এবং সেই মাছ খাই না। তাই আমাদের দেশে মাছের এত দাম।

মাছ ধরতে গিয়েই ডলফিনের সঙ্গে জেলে ও মাঝিদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে ইউরোপে।

কিছুদিন আগে দুটো সোভিয়েত মাছ ধরার স্টিম নৌকো উত্তর সাগরে ছিল দিন-দশ ধরে। রোজই তারা দেখত দুটো ডলফিন তাদের নৌকোর চারধারে খেলা করে বেড়াচ্ছে। কখনো বা লাফিয়ে উঠে হাসছে, খেলছে। মাঝিরা তাদের মাছ দিত খেতে। মাছ খাওয়ার লোভে তাদের ছেড়ে যেত না ডলফিন-দুটো। ডলফিনদের একটার নাম দিয়েছিল তারা 'পেড্রো', আরেকটার নাম 'ভোলচুকা'। নাম ধরে ডাকলে তারা সাড়া দিত। হাতে মাছ নিয়ে থাকলে হাত থেকে তারা মাছ নিয়ে খেত। ওই সমুদ্রে নির্জনে মাঝিদের কাছে ডলফিনদুটো তাদের দুজন সঙ্গী বনে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে খেলা করত। যেন তারা পোষ-মানা জীব। যেমন বাড়ীতে কুকুর বা বেড়াল খেলা করে, তেমনি ওই দুটো ডলফিন জলে নৌকোর পাশে খেলা করত। দিন-সাতেক ওইভাবে থাকার পরে একটি নৌকো চলে যায় বেশ খানিক দূরে জাল পাততে। অন্যটি ওখানেই থেকে যায়। ঠিক একদিন পরে পেড্রো নামে ডলফিনটি এসে সমুদ্রতীরের কাছের নৌকোটার চারধারে লাফাতে থাকে আর একটা অদ্ভুত আওয়াজ করতে থাকে। ওই নৌকোর মাঝিরা তাকে মাছ দিয়ে আপ্যায়ন করতে চাইলে পেড্রো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নৌকোর চারধারে ঘুর-পাক খেতে থাকে। মাঝিরা একটু আশ্চর্য বনে যায়। কারণ, যে ডলফিন মাছ এত ভালবাসে, সে মাছ খাচ্ছে না কিন্তু কেমন একটা আওয়াজ করছে কেন। পেড্রো মাঝে মাঝে কিছুদূরে গিয়ে আবার ফিরে আসছিল। তাই দেখে ওদেরও কৌতূহল বাড়তে থাকে। শেষে কৌতূহলের বশে তারা নোঙর তুলে পেড্রোকে অনুসরণ করতে থাকে। মাইল-দুয়েক দূরে গিয়ে দেখে তাদের সঙ্গী নৌকো আধ-ডোবা অবস্থায়। মাঝি ও জেলেরা নৌকোটা ধরে জলে ভাসছে। আধ-ডুবন্ত জেলে ও মাঝি-দের তারা উদ্ধার করে তাদের নৌকোয় তুলে আর ভাঙা নৌকোটা বেঁধে তারা তাদের বন্দরের দিকে পাড়ি দেয়। ওই নৌকোর এক মাঝি মিঃ আলেকজান্দার বলেছেন যে, তিনি পরে আরও কয়েকবার ঠিক ওই জায়গায় গেছেন মাছ ধরতে এবং দেখেছেন, সেই একই দল ডলফিন তাদের ঘিরে ধরেছে। কৌতূহলের বশে তিনি 'পেড্রো'র নাম ধরে ডাকেন এবং মাছ হাতে নিয়ে বসে থাকেন। পেড্রো নামে সেই ডলফিনটা তার হাত থেকে মাছ খেয়েছে পরেও। শুধু তাই নয়, 'পেড্রো' তাদের সঙ্গ কখনই ত্যাগ করত না। যখন যেদিকে তারা নৌকো নিয়ে যেত, পেড্রো তাদের অনুসরণ করত। সে-খবর জানতে পেরে পরে একদল সোভিয়েত বিজ্ঞানী গিয়েছিল ওই ডলফিন দল, বিশেষ করে পেড্রোর কীর্তিকলাপ দেখতে। রুশ-বিজ্ঞানীর দল পেড্রোর গলার আওয়াজ টেপ-রেকর্ড করে, ছবি তোলে ও নানান রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সমুদ্রবিজ্ঞান পরিষদে। তাদের পরীক্ষায় জানা যায় যে, ডলফিনের নিজেদের মধ্যে ভাষার আদান-প্রদান করতে পারে এবং মানুষের কথাবার্তার কিছুটা নকল করতে পারে। জলজীব-দের তুলনায় তাদের বুদ্ধি অনেক বেশী। উপরন্তু মানুষের প্রতি ওদের স্বভাবসিদ্ধ একটা টান আছে। বুদ্ধিতেও তারা অন্যান্য জলপ্রাণীর চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে করে ডলফিনদের পোষ মানিয়ে সমুদ্রে যখন জেলেরা মাছ ধরতে যাবে, তাদের সব রকমের যাতে সংকেত

পাঠাতে পারে। এ-ব্যাপারে সোভিয়েতদের মতন মার্কিন বিজ্ঞানীরাও বহুদূর এগিয়েছেন।

সম্প্রতি মার্কিন লোকসভায় ক্যালিফোর্ণিয়ার সদস্য মিঃ গ্লেন এ্যান্ডারসন একটি প্রস্তাব এনেছেন যে, নেহাৎ যদি না এড়ান যায় তাহলে যেন কোনো জেলে সমুদ্রে মাছ ধরার সময় কোনো ডলফিনকে না মারে।

অতলান্তিক সমুদ্রে মার্কিন উপকূলে মার্কিন জেলে ছাড়াও, জাপানী, মেক্সিকান, স্পানিশ, পেরুভিয়ান ইত্যাদি জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে বহু ডলফিনকে মেরে ফেলে। গত এক বছরে এমনি আড়াই লাখ ডলফিনকে মারা হয়েছে। সাধারণতঃ মাছ ধরতে গেলে জালে ডলফিন উঠে আসে, জালে ডলফিনগুলো বিরক্ত করে। বিরক্ত করলে জেলেরা ডলফিন মারে। মার্কিন লোকসভার প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এভাবে মানুষের বন্ধু ডলফিনদের মারলে আর কোনো ডলফিন বেঁচে থাকবে না। তাই তাদের আর মারা চলবে না।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন বাইওলজি ইন্সটিটিউট ডলফিনের ভাষা, সংকেত নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। তাঁরা বলছেন যে, ডলফিনের মস্তিষ্কের একটি অংশ রেডার যন্ত্রের কাজ করে। এরা বেশ মেধাবী। এদের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। একটি ডলফিন আরেকটি ডলফিনের সংকেত শুনতে পায় বহুদূরে থেকে। সংকেত শুনে ওরা দ্রুত চলে যেতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা ওদের সাংকেতিক শব্দগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টায় আছেন। ভবিষ্যতে ওদের সমুদ্রে বার্তাবাহকের কাজ করান হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সার্কাসে ডলফিনের খেলা দেখান হচ্ছে। লস এঞ্জেলস ও ফ্লোরিডায় দুটো ডলফিন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। একটা সুইমিং পুলে তাদের রাখা হয়েছে। ওখানে ওদের দৌড়-ঝাঁপ করান হয়। ওদের মধ্যে সাঁতার প্রতিযোগিতায় ভাল ফল দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, বোর্ডে বসিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাপারেও তারা অনেক কারসাজি দেখিয়েছে। তবে খানিক বাদে বাদে ওদের মাছ খেতে দিতে হয়।

শিশুরা যেমন অবুঝ আচরণ করে ঠিক তেমনি করে থাকে ডলফিনরা। লস এঞ্জেলস্-এর ডলফিনদের তারে আগুন জ্বালিয়ে তার ভেতর দিয়ে লাফান শেখান হয়েছে। দেখা গেছে ওদের যেভাবে এবং যা শেখান হয়, তাই ওরা অতি সত্বর শিখে নিয়ে ঠিক ওইভাবে কাজ করতে পারে। তাই কিছু বৈজ্ঞানিক ভাবছেন ওদের গৃহপালিত কুকুরদের মতন মানুষের কাছে [illegible] কি করে। কিন্তু সবচেয়ে [illegible] নিয়ে। কুকুরকে বাড়ীর [illegible] কোনো জায়গায় রাখা যায় কিন্তু ডলফিনকে রাখতে হবে ছোটখাট পুকুর বা সুইমিং পুলে। তেমন অবস্থা আছে ক'জনের? একমাত্র ধনী ব্যক্তিরা বাড়ীর আঙিনায় সুইমিং পুল নির্মাণ করে ডলফিন পুষতে পারে, অন্যরা নয়। কুকুরের বেলায় তা নয়। তবে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ডলফিনদের শিখিয়ে নিয়ে পরে সমুদ্রে জেলে নৌকোর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তারা মাছের ঝাঁক কোথায় আছে তার খবর জোগাড় করে এনে দেবে অথবা অন্য কোনো নৌকো বিপদে পড়লে তার খবর জানিয়ে দেবে সামনের নৌকোকে।

কিছুদিন আগে একদল মার্কিণ বিজ্ঞানী এসেছিলেন ভারতের ডলফিন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে। গাঙ্গেয় উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র নদের ডলফিনদের বলা হয় প্ল্যাটানিস্তা গ্যাঙ্গেটিকা অথবা অন্ধ ডলফিন। আসলে কিন্তু এরা অন্ধ নয়। বাইরে থেকে এদের চোখ দেখা যায় না। গায়ের ভেতরে রয়েছে এদের চোখ। পরিষ্কার জলে এরা কাত হয়ে সাঁতার কাটে। ঘড়ির কাঁটার মতন ঘুরপাক খায়। কখনো ডুবে যায় কখনো বা ওপরে ভেসে ওঠে। সাঁতার কাটার সময় এরা ল্যাজটাকে অনেক ওপরে তুলে চলে। অন্য জাতের ডলফিনদের মতন নয়। এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। তবে সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা ওদের অন্য জাতের ডলফিনদের মতন একই। এরা যেমন সংকেত পাঠায় তেমনি সংকেত গ্রহণ করে মুখের ভাষায় এবং ডানার আঘাতে।

ডলফিনরা স্তন্যপায়ী জলজীব, তিমি মাছ গোত্রে পড়ে। সাধারণতঃ লম্বায় এগার ফিটের মধ্যে হয়। ভূমধ্যসাগর ও অতলান্তিক সাগরের ডলফিনের দৈর্ঘ্য ছয় থেকে আট ফিটের মধ্যে। দাঁতের সংখ্যা ১৬০ থেকে ২০০র মধ্যে। পিঠের রং কালো, পেটের রং সাদা।

ডলফিন সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ছে পৃথিবীর সর্বত্র। আমাদের দেশেও রয়েছে গাঙ্গেয় মোহানায় প্রচুর। কিন্তু আমাদের কৌতূহল অন্যদের চেয়ে বেশ কম ডলফিন সম্বন্ধে।

পঞ্চানন রায়

(আট)
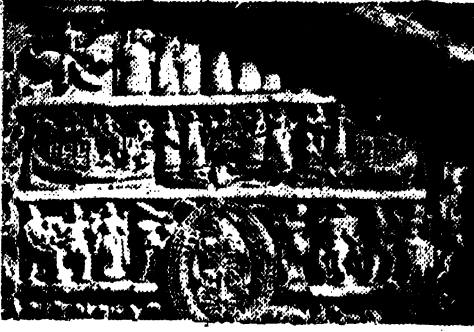
বাঙলার মন্দির' পর্যায়ে আগের লেখাগুলিতে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরের সাধারণভাবে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে বিদগ্ধ মহলের অজ্ঞাত এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা কিছু কিছু মন্দির সম্পর্কে আলোচনা মোটামুটি সীমাবদ্ধ রেখেছি। কেন না, বর্তমান সিরিজের লেখাগুলিতে এরকম নাম না জানা ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলির কথা বাঙলার পাঠকের সামনে তুলে ধরাই হল আমার উদ্দেশ্য (অবশ্য প্রয়াস যে দুর্বল তাতে সন্দেহ নেই)। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের যেসব মন্দির আজও মন্দির-প্রেমীদের চোখের আড়ালে থেকে গেছে এবং যাদের মধ্যে প্রাচীন বাঙলার শিল্পীদের ভাস্কর্যকলার অদ্ভুত নিদর্শন এখনও কিছু কিছু চোখে পড়ে, সেসব মন্দির সম্পর্কে বর্তমানের মন্দির গবেষকদের ওয়াকিবহাল করার এক বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু এসব মন্দির ছাড়াও বাঙলার অঞ্চলবিশেষের যেসব মন্দির ইতিহাসের পাতায় আজও অক্ষয় হয়ে আছে যাদের গঠনবৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ আজও দেশী-বিদেশী সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে বর্তমান পর্যায়ের লেখাগুলিতে তাদের কথা না বললে আলোচনা যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে বাঁকুড়া জেলা বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দিরগুলির আলোচনা অপরিহার্য মনে করি, যদিও এখানে এ জেলার সমস্ত মন্দিরের উল্লেখ ও বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব ও অবকাশও খুব অল্প।

মুসলমান আমলের আগে থেকেই বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে কিছু কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। পাথর ও ইঁটের তৈরী এসব মন্দিরের কিছু কিছু আজও মহাকালের দৃষ্টি এড়িয়ে অবশিষ্ট রয়েছে। বিষ্ণুপুরে প্রাক-মুসলিম যুগের মন্দির না থাকলেও (বাঁকুড়া জেলার) অম্বিকানগরের পাথরের দেউলটি কিন্তু মুসলিম পূর্ববর্তী যুগের। এছাড়া ছাতনা থানার অন্তর্গত দেউল-ভিড়ার পাথরের তৈরী যে দেউলটি ভগ্নশীর্ষ হয়ে আজও অবস্থান করছে সেটিও তৈরী হয়েছিল মুসলমান আমলের অনেক আগে খৃস্টীয় দশ শতকে। মুসলিম পূর্ববর্তী যুগের এ ধরনের পাথরের আরও দেউল বাঁকুড়া জেলায় দেখতে পাওয়া যায়। প্রাক-মুসলিম যুগের ইঁটের সুদৃশ্য একটি দেউল আছে ওন্দা থানার অন্তর্গত বহুলাড়া গ্রামে। ইঁটের আরেকটি ধ্বংসপ্রায় দেউল আছে সোনাতপল গ্রামে বাঁকুড়া শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে। সোনাতপলের থেকে বহুলাড়ার মন্দিরটির অবস্থা এখনও ভালো, অবশ্য যদিও এর চূড়াটি অনেক আগে থেকেই ভগ্ন। বহুলাড়ার এ মন্দিরটির যেখানে সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গটি স্থাপিত সে স্থানটি মন্দিরদ্বার থেকে বেশ কিছুটা নীচে। মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর অলংকরণ। মন্দিরগাত্রের অলংকরণগুলি এত নিখুঁত ও স্পষ্ট যে শত শত বৎসর অতিক্রান্ত হলেও এগুলি আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানে ইঁটের স্থায়িত্ব যেখানে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বেশী হবে না, সেখানে এ ধরনের একটি অতি-প্রাচীন মন্দিরের সূক্ষ্ম অলংকরণ কি করে এতদিন টিকে আছে তা চিন্তা করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। বহুলাড়ার এ মন্দিরের পোড়ামাটির নকাশি টালিগুলি ছাড়া উল্লেখযোগ্য আরেকটি নিদর্শন হল পোড়ামাটির কিছু কিছু মূর্তি। এ মূর্তিগুলি বহির্গাত্রের দেওয়ালের তিন দিকের তিনটি খোপে সন্নিবিষ্ট। পূব ও উত্তর দিকের খোপে মল্লবেশধারী বীর হাতি ও সিংহের সাথে যুদ্ধোদ্যত। এগুলি অন্তমধ্যযুগীয় মন্দিরের অসংখ্য পোড়ামাটির মূর্তির তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হলেও মুসলিম যুগের পূর্ব-বর্তী পোড়ামাটির নিদর্শন হিসেবে এর এক বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে করি। টেরাকোটা মূর্তি ছাড়া এ মন্দিরে রক্ষিত গণেশ, দশভুজা, পার্শ্বনাথের মূর্তিও দেখা যায়। এগুলি পরবর্তীকালে অন্য কোন স্থান থেকে আনীতও হতে পারে। সোনাতপলের ইঁটের দেউলটি খুবই জরাজীর্ণ এবং আন্দাজ বহুলাড়ার মন্দিরের সমকালীন হলেও এটি কোন এক অজ্ঞাত কারণে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হওয়ায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। মুসলিম পূর্ববর্তী যুগের পাথরের মন্দিরগুলিতে কোন অলংকরণ চোখে পড়ে না। পাথরগুলির সংস্থান বহু ক্ষেত্রে আলগা হয়ে গেছে। বাঙলার মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাঁকুড়ার এই প্রায়বিধ্বস্ত প্রাক-মুসলিম যুগের মন্দিরগুলির এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর প্রাচীনকাল থেকেই মন্দির শিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বাঙলার নিজস্ব ও মিশ্র শৈলীর সব রকম মন্দিরই এখানে দেখতে পাওয়া যাবে—এ জন্যে এবং বিশেষ করে অপূর্ব অলংকরণ ও পোড়ামাটির মূর্তির জন্যেও বিষ্ণুপুর মন্দির বাঙলার মন্দির মধ্যে আবশ্যিকভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুর মন্দির নিয়ে ইতিপূর্বে নানা আলোচনা হয়ে থাকলেও বর্তমান পর্যায়ের আলোচনায় তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কারণ পরবর্তী কালে বিষ্ণুপুরী রীতির জনপ্রিয়তা দক্ষিণ ও পূব রাঢের অনেক স্থানে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীদের হাতে কিছু কিছু 'বিষ্ণুপুরী রীতি যে বিস্ময়করভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তাও লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরী আটচালার কথা এর আগের একটি লেখায় উল্লেখ করেছি। বাঙলার নিজস্ব শৈলী চালা, যোড়বাংলা, চাঁদনী মন্দির, মিশ্র শৈলী রত্নমন্দির এবং বিদেশী শৈলী উৎকলীয় রীতির মন্দিরও বিষ্ণুপুরে আছে। অবশ্য ষোলশো খৃস্টাব্দে বীরহাম্বির নির্মিত বিখ্যাত রাসমঞ্চটিতে এক বিশেষ ধরনের শৈলী লক্ষ্য করা যায়। এতে সর্বশুদ্ধ খিলান আছে একশো আটটি। তিন প্রস্থের খিলান সমেত দেওয়াল গর্ভ ও আরেকটি কক্ষকে চারদিকে ঘিরে রয়েছে। খিলানগুলি এভাবে আছে—প্রথম প্রস্থে দশটি করে চার ধারে চল্লিশটি, দ্বিতীয় প্রস্থেও দশটি করে চল্লিশটি ও তৃতীয় প্রস্থে পাঁচটি করে কুড়িটি আর অতিরিক্ত আটটি এ নিয়ে মোট একশো আটটি খিলান। রাসের সময় নগরের সমস্ত মন্দির থেকে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এনে এখানে রাখা হতো সকলের দর্শনের জন্যে। কিন্তু এখন রাসমঞ্চটি পরিত্যক্ত।

বাঙালীর নিজস্ব শৈলী চালাজাতীয় মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপুরে একবাংলা বা দোচালা একরকম নেই বললেই চলে। গোঁসাই পাড়ায় মদনমোহন মন্দিরের কাছে একটি দোচালা নহবৎখানা দেখতে পাওয়া যায়। এর ছাদে কড়ি-বরগার ব্যবহার দেখে এটিকে আধুনিক বলেই মনে হয়। পাশাপাশি দুটি দোচালাকে যুক্ত করে যে যোড়বাংলা শ্রেণীর মন্দির হয় তার দুটি নিদর্শন এখানে আছে। একটি হল বিখ্যাত কেষ্ট রায়ের মন্দির।

ব্রজকিশোর রায়ের (দাসপুর) আল্ গোছ্ টুংগী বা একরত্ন মন্দির।

এর ভেতরে বাইরে অপূর্ব পোড়ামাটির অলঙ্করণ দর্শকবৃন্দের মন মুগ্ধ করে। এ মন্দির ও জন্মন আরেকটি যোড়বাংলার কথা প্রথম প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। এ দুটিরই ওপরে উঠবার সিঁড়ি আছে। আটচালা শৈলীর মন্দির বিষ্ণুপুরে খুব কম। বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে আটচালা মন্দির অনেক দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু মদনমোহন মন্দিরের উত্তরে গোঁসাইপাড়ায় ও খড়বাংলো পাড়ায় রাধাবিনোদের মন্দির ছাড়া আর কোন আটচালাজাতীয় মন্দির বিষ্ণুপুরে আছে বলে মনে হয় না। রাধাবিনোদের মন্দিরটিতে পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট কাজ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর সম্মুখের ও ওপরের চারচালার কিছু কিছু অংশ ভেঙে পড়ায় পোড়ামাটির অপূর্ব অলঙ্করণ অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বীর হাম্বিরের পুত্র রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ এটি তৈরী করান ৯৬৫ মল্লাব্দ বা ১৬৫৯ খৃস্টাব্দে। গোঁসাই-পাড়ার আটচালা মন্দিরটি বিখ্যাত শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা-প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকের বিশ্বাস। এ দুটি মন্দিরই ইঁটের তৈরী। কিন্তু শেষেরটিতে পোড়ামাটির কাজ বিশেষ কিছু নেই। চালাজাতীয় মন্দির বিষ্ণুপুরে এত কম কেন তা বোঝা যায় না, চারচালা একটি মন্দির মাড়ুইবাজারে অবস্থিত। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৫৯ খৃস্টাব্দ। বিষ্ণুপুরের বাইরে তেজপান, সারাকোণ ও সিমলাপালে আটচালা মন্দির আছে। এগুলি বিশেষ ধরনের আটচালা। এ ধরনের আটচালার কথা প্রথম লেখাটিতে আলোচনা করেছি। পাত্রসায়ের থানার নারিচা গ্রামে সর্বমঙ্গলার একটি চারচালা মন্দিরও দেখা যায়। এটি পাথরের তৈরী।

নিজস্ব রীতির চাঁদনী মন্দির হল বিখ্যাত মৃন্ময়ী দেবীর একতলা দালান। এটির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জগৎমল্লের নাম মন্দির গাত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা-কাল লেখা আছে বাঙলা ৪০৪ সাল। কিন্তু নানা কারণে এটিকে বীর হাম্বিরের প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃন্ময়ীর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ আছেন। প্রচলিত রীতি থেকে মৃন্ময়ী দুর্গার কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতীর ওপরে আসীন। সাধারণতঃ এঁরা লক্ষ্মী-সরস্বতীর নীচে থাকেন দেখা যায়। চাঁদনীজাতীয় মন্দির বিষ্ণুপুরে আর নেই, তবে রঘুনাথবাড়ীকেও নিয়মমাফিক চাঁদনী আখ্যা দেওয়া যায়।

রত্নমন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপুরে সবচেয়ে সংখ্যাবহুল হল একরত্ন বা আল্ গোছটুঙ্গী মন্দির। এগুলি বেশীর ভাগই পাথরের তৈরী। চিন্ময়ী ও মদনমোহনে একরত্ন মন্দির ইঁটের। বিষ্ণুপুরে একরত্নমন্দিরের সংখ্যা হল সবশুদ্ধ বারো। এদের মধ্যে লালবাঁধের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরের কালাচাঁদের পরিত্যক্ত মন্দিরটিকে সকলের থেকে প্রাচীন বলা যায়। রাজা রঘুনাথ সিংহ ৯৬২ মল্লাব্দ বা ১৬৫৬ খৃস্টাব্দে এটি তৈরী করান। লালবাঁধের এই দিকে পরিত্যক্ত আরও কয়েকটি এ ধরনের মন্দির দেখা যায়। এদের মধ্যে সব থেকে অর্বাচীন হল মহারাজা চৈতন্যসিংহ প্রতিষ্ঠিত রাধাশ্যামের মন্দিরটি। এটি ১০৬৪ মল্লাব্দে বা ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। মল্লরাজাদের গড়ের ভেতরে লালজী ও রাধাশ্যামের মন্দির দুটিও আল্ গোছটুঙী রীতির। এছাড়া রাধা-কৃষ্ণ, মুরলীমোহন ও মদনমোহনের মন্দির-গুলিও এ শ্রেণীর। লালবাঁধ তীরবর্তী মন্দিরগুলি হ'ল কালাচাঁদ, রাধাগোবিন্দ, নন্দলাল ও রাধামাধবের। এসব মন্দিরের গায়ে পাথরের ভাস্কর্যগুলির অভিনবত্ব তেমন কিছু নেই। মন্দিরগুলি এখন পরি-ত্যক্ত। বিখ্যাত মদনমোহন মন্দিরটির গায়ে অসংখ্য টেরাকোটা বিদ্যমান। এটির প্রতি-ষ্ঠাতা হলেন মল্লরাজ দুর্জনসিংহদেব। ১০০০ মল্লাব্দে বা ১৬৯৪ খৃস্টাব্দে মন্দিরটি তৈরী হয়। এতে নীচের দিকে জীবজন্তু, পশুপক্ষী থেকে সুরু করে ওপরের দিকে রাধাকৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি পোড়ামাটির ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায়। লালজী ও রাধাশ্যামের মন্দির দুটির প্রতিষ্ঠাকালের মধ্যে একশো বছরের ব্যবধান। মদনমোহন ও এ-দুটি মন্দিরই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। লালজীর মন্দির রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহ তৈরী করিয়েছিলেন ৯৬৪ মল্লাব্দে বা ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে আর রাধাশ্যাম মন্দিরটি চৈতন্য-সিংহ তৈরী করিয়েছিলেন ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে। মল্লরাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির মধ্যে এটিতে একমাত্র শকাব্দের উল্লেখ আছে। অন্যান্যগুলির কোন কোনটিতে শকাব্দের উল্লেখ থাকলেও সেগুলি মল্লাব্দই বুঝতে হবে। রাধাশ্যামমন্দিরে নকাশি কাজের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। মুরলীমোহন মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাত্রী হলেন মহারাজ দুর্জনসিংহের মহিষী শ্রীমতী চূড়ামণি। এটি ৯৭১ মল্লাব্দ বা ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে তৈরী হয়েছিল।

একরত্ন বা আলগোছটুঙী শ্রেণীর পরে পঞ্চরত্ন শ্রেণীর মন্দির বিষ্ণুপুরে আছে মাত্র দুটি। একটি হল বিখ্যাত শ্যামরায় ও অপরটি হল মদনগোপালের। মদনগোপালের মন্দিরটি তৈরী করান বীরসিংহ মহিষী চূড়ামণি ৯৭১ মল্লাব্দ বা ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে। এ মন্দিরটি পাথরের এবং এতে তেমন কোন অলংকরণ নেই। শ্যামরায়ের পঞ্চরত্নটি ইঁটের তৈরী এবং পোড়ামাটির অপূর্ব অলঙ্করণে অলঙ্কৃত। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল হল ৯৪৯ মল্লাব্দ বা ১৬৪৩ খৃস্টাব্দ। বীর হাম্বিরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ এই অপূর্ব ও টেরাকোটা শিল্পে সমৃদ্ধ এ মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামের সঙ্গে যুবরাজ বীরসিংহের নামেরও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। শ্যাম-

রায়ের মন্দিরের মাঝের চূড়োটি হল আট-কোণা ও চারপাশের চারটি চূড়া চারকোণা। মন্দিরের দোতলায় উঠবার প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। এ মন্দিরটির প্রায় সব স্থানেই দেখতে পাওয়া যায় পোড়ামাটির অজস্র অলঙ্করণ। অলংকরণগুলির মধ্যে কৃষ্ণলীলা ও কীর্তনের বহু চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে। এ-ছাড়াও আছে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য এবং বহু বিচিত্র নকাশি কাজ। শ্যামরায়ের এ মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের অন্যতম একটি প্রাচীন ও অপূর্ব শিল্পসমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ যে একটি মন্দির সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিষ্ণুপুরে নবরত্নের একমাত্র মন্দিরটি কোন মল্লরাজ করান নি। এটি তৈরী করিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের বসুবংশের কোন ব্যক্তি। কবে এটি তৈরী হয়েছিল তা লিপির অভাবে বুঝতে পারা যায় না, তবে এতে পোড়ামাটির কাজের যে নমুনা মেলে তার সঙ্গে মল্লরাজ প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মন্দিরে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির কাজের তুলনা করলে এর অর্বাচীনত্বই প্রতিপন্ন হবে। শ্রীধরের এই মন্দিরটির পোড়ামাটির অলঙ্করণগুলি শুধুমাত্র একটি দেওয়ালেই দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় এ নবরত্ন মন্দিরটি বিষ্ণুপুরে নেহাতই আগন্তুক। মল্লরাজগণের কাছে এ ধরনের মন্দির আদৌ আদৃত হয়নি।

বিদেশী রীতির বিশেষ করে উৎকলীয় দেউল বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে দেখা গেলেও বিষ্ণুপুরে খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। মল্লেশ্বরের মন্দিরটি একটি বিখ্যাত দেউল। ল্যাটারাইট পাথরে তৈরী এ মন্দিরটি নির্মাণ বা সংস্কার করিয়েছিলেন বীর হাম্বিরের পুত্র শ্রীবীরসিংহ ৯২৮ মল্লাব্দ বা ১৬২২ খৃস্টাব্দে। এর ভগ্ন শীর্ষদেশের জায়গায় আটকোণা একটি চূড়া সংস্থাপিত হয়েছে দেখা যায়। এছাড়া গড়ের মধ্যে আরও দু-একটি দেউল দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিতে কোন প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ নেই। এছাড়া যোড়বাংলা মন্দিরের কাছে আরও দুটি দেউল মন্দির দেখা যায়। এগুলিতে কিছু কিছু পোড়ামাটির কাজ দেখতে পাওয়া যায়। ওড়িষ্যার রীতির রেখ দেউল বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার বিক্রমপুর গ্রামে আছে। এটির সামনে জগমোহন আছে। এছাড়া তালডাংরা থানার হাড়মাসরা গ্রামেও উৎকলীয় রীতির একটি পাথরের দেউল দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিতে স্পষ্টভাবেই ভুবনেশ্বর মন্দিরের রীতিটি অনুকৃত হয়েছে দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলায় পরিবর্তিত উৎকলীয় রীতির রূপ এগুলিতে তেমন পাওয়া যাবে না।

বিষ্ণুপুরের উল্লিখিত এসব মন্দিরের গঠনবৈশিষ্ট্য ও টেরাকোটাশিল্প ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে নববৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় এসব মন্দিরের রূপসজ্জা ও অলঙ্করণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। মন্দিরের থাম, খিলান, কার্নিস ও রত্নগুলির সঙ্গে মুসলিম পূর্ববর্তী যুগের মন্দিরগুলির এক বিশেষ পার্থক্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়। নবভাবের বন্যায় বাঙালী নিজের মনোমত করে তৈরী করতে লাগলো দেবতার গৃহ। চালা, চাঁদনী, বাংলা টাইপের মন্দিরগুলির সৃষ্টি হ'ল এভাবে। আর সঙ্গে এসে যোগ দিল ওড়িষ্যায় অনুসৃত মন্দির স্থাপত্যের নাগরশৈলীটি যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সুউচ্চ শিখর ও সংলগ্ন জগমোহন। বিষ্ণুপুরের রত্নমন্দিরের রত্নগুলির শিখরের ঊর্ধ্বাংশ প্রায়ই সমান্তরাল খাঁজবিশিষ্ট, কতকটা ব্রজধামের দেউলের মতো। কিন্তু মল্লরাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির মধ্যে সুউচ্চ শিখর-স্থাপনের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না, তাদের বেশী ঝোঁক ছিল পোড়ামাটির অলঙ্করণ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠায়। ফুলকারি নকসার প্রাচুর্য এবং কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ভাস্কর্যশিল্প মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করায় তাঁদের ছিল গভীর আগ্রহ। এর ফলে মন্দিরের দালানকে বেশ প্রশস্ত করতে হয়েছে, রত্নগুলিকে করতে হয়েছে ক্ষুদ্র অথচ চওড়া এবং গর্ভগৃহের চারপাশ বা সমুখভাগের দালানকেও প্রশস্ততর করতে হয়েছে পোড়ামাটির কারুকার্য দিয়ে ভরে তোলার জন্যে। বিষ্ণুপুরের এ জাতীয় মন্দিরগুলির সাথে বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের মন্দিরগুলির এক পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। একমাত্র দিনাজপুরের (বর্তমান বাংলাদেশ) কান্তনগরের কান্তনাথের নবরত্ন মন্দিরটির মধ্যে বিষ্ণুপুরের মন্দিরের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অলঙ্করণ ও পোড়ামাটির কারুকার্যের প্রাচুর্যও এ মন্দিরটিতে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরদালানটিও বেশ প্রশস্ত। এদিক থেকে বিষ্ণুপুরী মন্দিরের সাথে এ মন্দিটির নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। বর্ধমানের কালনার লালজীর মন্দিরের অসংখ্য টেরাকোটা বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার সোনামুখী গ্রামের বাজারে পঁচিশ-চূড় শ্রীধর মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্যণীয় হল এটির দুটি তলেই সব কটি চূড়া বর্তমান। প্রতি তলের প্রতি কোণে তিনটি করে চূড়া থাকায় বারোটি করে চব্বিশটি ও মাঝের একটি নিয়ে মোট পঁচিশটি চূড়া। কিন্তু এটির নির্মাণকাল হল বাঙলা ১২৫২ সাল বা ১৮৪৫ খৃস্টাব্দ। এ মন্দিরটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর অসংখ্য টেরাকোটা অলঙ্করণসজ্জা। তাছাড়া ফুলকারি নকসারও যথেষ্ট ব্যবহার এতে লক্ষ্য করা যায়। এসব দিক থেকে এ মন্দিরটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে টেরাকোটা শিল্পে প্রাচীন মন্দিরের তুলনায় এটির শিল্পনিদর্শন যে স্থূল তা সহজেই চোখে পড়ে। (ক্রমশঃ)

কাদিলপুরের দত্তদের রঘুনাথের পঞ্চরত্নমন্দির

।। পঞ্চাশ ।।

কারখানায় কাজ করবার সময় মেঘুর প্রতি নিধিরাম যে প্রকৃত স্নেহ-মমতা দেখিয়েছে তা জানা। তাই মেঘুর ভাগ্য পরিবর্তনের খবরটা যেমন বিস্ময়কর তেমন আনন্দেরও নিধিরামের পক্ষে। মেঘুর সঙ্গে একটু দেখা করতে, তার হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস জানাতে কত চেষ্টা সে করছে। কিন্তু তা সে পেরে ওঠে নি সাহেবদের ব্যূহ ভেদ করে। সেই মেঘু নিধিরামের ঘরে! এমন অপ্রত্যাশিত অভ্যাগতের জন্য তার ঘরের কেউ প্রস্তুত ছিল না। অভূতপূর্ব বিস্ময়ে মেঘুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নিধিরাম। কি করবে না করবে ভাবতে ভাবতে তাকে বসতেও বলা হল না। তার এমন ভাব মেঘুর পক্ষে দেখা এই প্রথম। কিন্তু এই একটি সকালে মেঘুর অনেক শেখা হয়ে গেছে, তাই বুঝল সেটাও। তার ওপর তাকে আরো বিস্মিত করতে সে এমন একটা কাজ করে বসল, যা সে আর কখনো করে নি। মেঘু তার মাথাটা নীচু করল নিধিরামের পায়ের ধুলো নিতে।

হতবুদ্ধি নিধিরাম ব্যাকুল হয়ে এক-পা পিছিয়ে গেল, মেঘুর হাত ধরে বললে—আহা, কর কি, করেন কি।

মেঘু হাত জোড় করে বললে—আপনার অনুগ্রহ না পেলে যে আমার কিছুই হত না।

মেঘুর বিনয়ে নিধিরাম বিভ্রান্ত হল, বললে—অনুগ্রহ কি বাবা, সাহেব, আমার কর্তব্য করেছি।

কর্তব্যপরায়ণ নিধিরামের সঙ্গে তর্ক করতে মেঘু বললে— বেশ, তবে এখন দয়া করে আমায় কর্তব্য পালন করতে দিয়ে এ-সংসারে আমার মাথাটা রাখবার মতো একটু ঠাঁই করে নিতে দিন।

মেঘু জোর করে নিধিরামের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল। পার্টিকুলেজের পায়ের ধুলো মেঘু নিয়েছে কিনা জানা নেই, তবে সে চেষ্টা যদি করে থাকে কখনো তা সে পেয়েছে আশীর্বাদ সমেত। তা না হলে থাকলে, ঘরের বাইরে মেঘুর পক্ষে পায়ের ধুলো বা আশীর্বাদ কুড়ানোর প্রচেষ্টা এই প্রথম। রাঘবের ঘরেও তা করত, কিন্তু সেখানে অমনভাবে বিমুখ হয়ে এই ভাল মানুষটাকে বিব্রত করল। নিধিরাম তাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। যাদের পায়ের ধুলো জাতিকুল, ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে অবারিত নিধিরাম তো এখানে তাদের এক-জন নয়। বড় সাহেবের কানে কথাটা গেলে তিনি কি মনে করবেন!

পাশের কামরায় পর্দার আড়াল থেকে প্রমীলা দেখছিল সব। এ অবস্থায় তার কি করা কর্তব্য? সেও একটা কাজ পেল। সে ভেবে বার করল পায়ের ধুলোর আদ্যোপান্ত তত্ত্ব ও তাৎপর্য। পায়ের ধুলো দেওয়া-নেওয়াটা মোটামুটি দুটি পর্যায় সে ভাগ করল। একটি শুদ্ধ ভক্তির—যা জাতি-কুল ধর্মের বাছবিচার করে না; অপরটি সামাজিক—যা জাতিকুল বিশেষে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ও বয়স অনুযায়ী সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ব্যবহারিক রীতিনীতি সাপেক্ষ। অতএব মেঘু যদি তার বাবাকে এতখানি মর্যাদা দিতে পারে তবে সে-ই বা পিছিয়ে থাকে কোন লজ্জায়। তারও তো কিছু করা কর্তব্য। বয়সে প্রমীলার অনেক বড় মেঘু। কনিষ্ঠার অধিকার নিয়ে সে ছুটে এসে দাঁড়াল তার মুখোমুখি, মাথা হেঁট করল মেঘুর পায়ের ধুলো গ্রহণ করতে।

তৎপর প্রমীলার হাত দুটো ধরে মেঘু বললে—আপনি কেন এ কাজ করতে এলেন? না-না, তা হয় না।

এইটুকু বলে শেষ করলেই হত। কিন্তু প্রমীলার বিস্ময় ভাবটা দূর করতে, অথবা নিজের আপত্তিটা কারণ দেখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে মেঘু বলে—আপনাকে পায়ের ধুলো দেবার তো অধিকার নেই আমার।

প্রমীলা ভেবেছিল কাজটা সহজ। অপর পক্ষের যে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে, তা তার মনে স্থান পায় নি। নিজের অধিকারটাই সে বিচার করে দেখেছে, সে-ও জোর দিয়ে তার উত্তর দিল—কেন থাকবে না? আপনি যে বাবার পায়ের—

মেঘু বিনয় নম্রভাবে তার যুক্তি দেখিয়ে বললে—ওঁর কাছে আমি কাজ শিখেছি, ওঁর অনেক অনুগ্রহ পেয়েছি। আর সমাজেও উনি বড়। আমি আপনাকে এ-কাজ করতে দিই কি রে? মাফ করবেন আমাকে।

প্রমীলা এগিয়েছিল তার সামাজিক অধিকারটাই প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু মেঘুর কথায় বড় ধাঁধায় পড়ে গেল। সমাজে মেঘুর স্থান নীচে, তা হয় কি করে। আর কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে সে আধুনিকা হতে, সমাজদ্রোহী হতে বাধ্য হল, বললে—আপনি কি সমাজ মানেন?

তাকে তর্ক থেকে নিবৃত্ত করতে মেঘু বললে—মানা না মানা আলাদা কথা। কিন্তু যা আমার নেই তার প্রতি আমি কটাক্ষ করি কোন্ সাহসে, তাকে অবজ্ঞা করি কোন্ অধিকারে, তার মূল্যই বা কতটুকু?

মেঘুর সঙ্গে এমন কথা কাটাকাটি সে করে নি কোন দিন। হাসি তামাশাই করেছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে না পেরে মনে মনে ক্ষেপে উঠল। এবার সে জাতিদ্রোহিতা করে বললে— আপনি তবে জাতও মানেন?

তার কথায় মেঘু হেসে উঠল। এই প্রথম তাকে রেগে উঠতে দেখল। মেঘুর মনের অমন অবস্থায় সেটা মন্দ লাগল না। কিন্তু তাকে নিরস্ত্র করতে, বা প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে সে বলল—এই দেখুন! ও জিনিসের কিছু আমার জানা নেই, জানবার অধিকারও নেই। ও বিষয়ে কোন প্রশ্ন আমার মনে কোন দিন আসে নি, তাই তার মীমাংসাও হয় নি। ওসব নিয়ে কি করে কথা বলি, বলুন তো? এখন থাক ওসব কথা—

নিজের ভাবনায় নিধিরাম অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমটা সে তেমন লক্ষ্য করে নি। পরে যখন প্রমীলার কথাগুলো কান থেকে মনে পৌঁছল, তখন তা বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। তাকে ধমক দিয়ে সে বললে

—থাম। ভাগ্গর মানুষের সঙ্গে অমন তর্ক করতে হবে না।

হঠাৎ মেঘুকে তাদের ঘরে পেয়ে, মেঘুকে তার বাবার পায়ের ধুলো নিতে দেখে, প্রমীলা এতই খুশী হয়েছে যে তাকে প্রণাম করতে এসে, তার সঙ্গে আগের ধরণে কথা বলতে বলতে এত বড় কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল। বাপের ধমকে প্রমীলা প্রকৃতিস্থ হল। সে সসম্ভ্রমে হাত জোড় করে নমস্কার করল, তার বাচালতার জন্য ক্ষমাও চাইল, তারপর যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে চলে গেল।

তাতে মেঘু কাশ একটু দুঃখিত হল, সে বললে—সকলকে থামিয়ে দেবার মতো একটা কথা পেয়েছেন সবাই। অথচ আমার মন যেমন ছিল তেমনই আছে, মুহূর্তের জন্যও তার বদল হয় নি। এটা কেউ বুঝতে চায় না।—সারাটা সকাল আজ বাগানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে এলাম। কি দেখলাম জানেন?—যার জন্য আমি কোন মতে প্রস্তুত ছিলাম না।

একটা থমথমে ভাবে আচ্ছন্ন হল মেঘুর মন। সে আর কিছু বলতে পারল না।

নিধিরাম জানে সব। বিদ্যুৎ প্রবাহে খবর পৌঁছে গেছে তার কাছে। মেঘুর ভাগ্যোন্নতির পর এই সে প্রথম তাকে সামনাসামনি দেখল, দেখল তার ব্যবহার, শুনল তার কথা—বুঝল তাকে, বুঝল তার ব্যথা সমস্ত অন্তর দিয়ে। কিন্তু কি আর সে বলতে পারে। মাথাটা নীচু করে সে চুপ করে রইল।

ক্ষণিকের নিস্তব্ধ মুহূর্তে তারা একটু সুযোগ পেল পরস্পরের বিষয় ভেবে দেখার। নিধিরাম বুঝল—মেঘু ধনী হয়েছে, বটে, কিন্তু অনেক ধনীর মতো তার অন্তর নিঃস্ব হয় নি, স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ তার অন্তর, আকাশ সদৃশ বৃহৎ উদার তার মন। মেঘুও বুঝল—অপরাপরের মতো তার বিষয় নিয়ে নিধিরামের মনেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে, কিন্তু আগের মতোই দরদী মন তার, সে আগের মতোই তার ব্যথার ব্যথী। এই বোঝাবুঝি শেষ করে এই নিষ্ক্রিয় পটভূমিকে সক্রিয় কর তুলতে হবে। একজনকে কথা বলতে হবে। মেঘুর মন তখনও ভারাক্রান্ত। কিন্তু তার আন্তরিক ব্যবহারে নিধিরাম সহজ ভাব ফিরে পেয়েছে। প্রথম তার মস্ত বড় ত্রুটিটা সংশোধন করতে মেঘুকে বসাল, তারপর মেঘুর থমথমে ভাবটা দূর করে দিতে সে চলে গেল অন্য কথায়। নিধিরাম জিজ্ঞাসা করল—তা কতদিন থাকতে হবে বিলেতে?

রুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলার শক্তি ফিরিয়ে এনে মেঘু ধীরে ধীরে উত্তর দিল—বেশী দিন নয়, কয়েক মাস।

তারপর দুজনই ভাবতে থাকল এবার কি বলবে। নিধিরাম কিছু খুঁজে পেল না, কিন্তু মেঘু একটা পেল। সে বললে—আপনি রথীরাম বাবুর বিয়ের খোঁজ করছিলেন যে, ঠিক হলে জানাবেন কিন্তু। আমার সাধ্যমতো কিছু করবার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

কাজকর্মের কথা আলোচনা করবার কোন প্রয়োজন নেই, তা মেঘু পারেও না। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কথা সে কেন বলল তা বোঝা গেল না। সে নিজেও তার তাৎপর্য হাতড়ে পেল না। যে দেশে মেয়ের বিয়েটাই ভাবনা চিন্তা ও সমস্যার বিষয় সেখানে ছেলের বিয়ের চিন্তাটা যেন অশোভনীয়, অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। তার ওপর সাধ্য মতো করবার প্রতিশ্রুতি! এখনকার মেঘুর মুখ থেকে এমন কথা অনেকের পক্ষেই যথেষ্ট। এমন সোয়াস্তিজনক প্রতিশ্রুতি মেয়ের নাম করে দিলেই বেশী মানানসই হত। অবশ্য মেয়ের বিষয় এমন কথা নিধিরাম কোন দিন আলোচনা করে নি মেঘুর সঙ্গে। কিন্তু তাতে কি! সে নিজেই তো কথাটা তুলতে পারত।

নিধিরামের মনে হল, কবে যেন রথীরামের উড়ুউড়ু ভাবের কথা সে বলেছিল মেঘুকে, তাই ভেবেছিল বিয়ে দিলে তার সে ভাবটা দূর হতে পারে, সংসারে মন বসতে পারে। সে কথা এখনো তার মনে আছে? সে অতি উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিল—নিশ্চয় নিশ্চয়ই জানাবো, কিন্তু কিছুই তো ঠিক হয়নি। বলেছিলাম তো তখন—ছেলেটার সংসারের দিকে মন নেই। এখনো তেমনই আছে, বিয়েতে কিছুতেই রাজী হয় না। সংসারে সকলেই সন্তান লালন-পালন করে এই আশায় যে, বড় হয়ে তারা বাপমাকে শান্তি দেবে, কিন্তু আমার ভাগ্যে তা নেই।

সত্যই তো, নিধিরামের কথায় মেঘুর মন সায় দিল। এতদিন পর অন্ততঃ একজনের সুখ-দুঃখের বিষয় আলোচনা করবার সুযোগ পেয়ে সে তৃপ্ত হল। নিধিরামের অশান্তিতে সংলিপ্ত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—বিয়েতে রাজী হয় না। কেন, কি বলে?

অবাধ্য ছেলের কথাটা উঠতে তার কথা বলতে বলতে নিধিরাম ক্রমান্বয় উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে ভাবল—এবার যদি মেঘুর সাহায্যে কিছু করানো যায়, ছেলেটাকে বাধ্যে আনা যায়। সে জানে যে মেঘু কাজের ছেলে, অকাজ পছন্দ করে না। তাই সে বললে—কারণ তো কিছুই দেখায় না। ওর মনে যে কি আছে তা বোঝাও দায়। দেখতে পাই, মেতে আছে শুধু গান-বাজনা আর নাটক-থিয়েটার নিয়ে। এখন মেতেছে 'যযাতি-শর্মিষ্ঠা' নাটকে। দিন নাই, রাত নাই সকল সময়ে শুধু—'শর্মিষ্ঠা' আর 'শর্মিষ্ঠা'।

মেঘুর মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল—'শর্মিষ্ঠা'! তবে কি সেদিন...! তাই বুঝি প্রমীলা অমন হাসছিল?

মেঘুর মনের ভাবটা নিধিরামের বোঝবার কথা নয়। ছেলের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করতে সে বক্তৃতা [illegible] আলাপ।লা হয়ে গেল। কাজে কর্মে পর্যন্ত—।

হঠাৎ থেমে গেল নিধিরাম। ক্ষণিকের জন্য ভুল করে ভেবেছিল, সে যেন আগের মেঘুর সঙ্গে কথা বলছে। কাজে মন না থাকার কথাটা বর্তমান মেঘুর সামনে বলা, ছেলেটার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে কাজে অবহেলা মেঘু অত্যন্ত অপছন্দ করে। বাপ হয়ে ছেলের এতটা অনিষ্ট করতে পারে কি!

নিধিরামের অভিযোগটা মেঘু বুঝল। কিন্তু বাপের পরিবর্তে ছেলের মনঃপূত কথাই প্রকাশ করে সে বললে—মন লাগে এমন কাজের কথা বলে যাব। ক্লাবে গানবাজনার মাস্টারি পেলে বোধহয় খুশী হবেন তিনি?

মেঘুর কথায় নিধিরাম খুবই আশ্চর্য হল। কাজে মন নেই তার, সেটা বুঝেও তাকে প্রশ্রয় দিতে চাইল। সত্যই কি সে এতখানি বদলে গেছে!—তবুও, যে কাজ তার রুচি বিরুদ্ধ এমন কাজের প্রস্তাব শুনে, নিধিরাম পিতৃ-সমুচিত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললে—তাহে তো আরো—

নিধিরাম তার বক্তব্যটা শেষ করতে পারল না। পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে দু-হাত জোড় করে রথীরাম দাঁড়াল মেঘুর সামনে, বললে—খুব খুশী হব স্যার, হুজুর।—বাবা, আপত্তি করবেন না, যা বলবেন তাই শুনব।

হাসতে হাসতে মেঘু বলল—আচ্ছা আচ্ছা রথীরামবাবু, তাই হবে। একবার কলকাতায় গিয়ে কয়েক মাস থেকে সব দেখেশুনে আসবেন, ফিরে এসে খুব ভাল করে ক্লাবটা চালাবেন।

নিধিরাম আশা করেছিল সে ছেলেটাকে শাসন করে যাবে, শায়েস্তা করে দেবে। তার পরিবর্তে তাকে আশকারা দিয়ে মেঘু বলে কি! নিধিরাম তার হতভম্ব চোখ দুটো মেলে রাখল মেঘুর মুখের ওপর।

তাকে সান্ত্বনা দিতে মেঘু বললে—স্ফূর্তি কি এটাও তো চাই মানুষের মতো থাকতে গেলে।—এ বিষয়ে রথীরামবাবুর প্রতিভা আছে, দেখবেন ভালই হবে।—আপনার কথাও বলে যাব।

নিধিরাম সহজ লোক, সরল পথে চলে। কারো সঙ্গে সে কখনো তর্কাতর্কি করে না। মেঘুর সঙ্গে তেমন করবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার ওপর ছেলেটা বাধ্য হবার কথা দিয়েছে, মেঘুও বলছে তার ভালই হবে। নিধিরামের বর্তমান সমস্যার আশাতিরিক্ত সমাধান তো হয়ে গেছে। তার ওপর মেঘু তাকেও ভরসা দিল। সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গদগদ স্বরে বললে—অনুগ্রহ বাবা।

সাহেব বলতে গিয়ে নিধিরাম মেঘুকে বাবা বলে ফেলল। সেজন্য মনে মনে জিভ কাটল বটে, কিন্তু সেটা শুধরে নেবার কোন

চেষ্টা করল না, তেমন করে তাকে আর ব্যথা দিতে গেল না।

কিন্তু ব্যথা সে পেয়েছে। তা বোঝা গেল তার জবাব দেবার ভাবে। অকুণ্ঠিতভাবে মেঘু তার জবাব দিল—একদিন আপনার হাতে ক্ষমতা ছিল, আমার প্রতি কত সহানুভূতি, কত অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, তাই আমি মনে করি এটুকু আমার কর্তব্য।—আর একটা কথা এখন বলে রাখি—রথীরামবাবুর রুচি ও চাল-চলন আমার ভাল লাগে, তাকে ভার দিলাম যোয়ান ছেলেদের নিজের মতো রুচিসম্পন্ন করে তোলবার। যে কাজ আমি অসম্পূর্ণ রেখে এলাম, সেটা সম্পূর্ণ করবার উপযোগী যেন হয়ে ওঠেন উনি। বড়সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে পরে একদিন এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলব। সে সব ফিরে আসার পর হবে, এখন কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন।

উপকারজ্ঞ দুটি মানুষ তাদের হৃষ্ট অন্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল প্রতিগ্রাহীর বিনীত দৃষ্টিতে। এর মধ্যে প্রমীলা চা ও জলপান দিয়ে গেছে। তা শেষ করে, মেঘু একটু হেসে বললে— জলপানে মাসিমার হাতের স্পর্শ পেলাম, কিন্তু দেখা তো পেলাম না।

রথীরাম ছুটে গিয়ে পাশের কামরা থেকে তার মাকে ধরে আনল।

হাসতে হাসতে মেঘু উঠে গিয়ে রুকনীর পায়ের কাছেও মাথা নীচু করতে গেল। তাকে বাধা দিয়ে রুকনী বললে—তোমারই যুক্তির জোরে এ কাজ তোমায় করতে দিতে পারি না।

রুকনীর সংযত ভাব, বা ভাবের বৈশিষ্ট্য মেঘুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অভ্যাস মতো আজ আর সে 'বাবা-বাছা' বলল না মেঘুকে। এমন কি সম্বোধনের সর্বনামটাও বদল করল না তার স্বামী-পুত্রের তুল্য।

রুকনী তাকে তুমি বলায় মেঘু খুবই তৃপ্তি পেয়েছে, কিন্তু সব মিলিয়ে যা পেল তাতে সে সুখী হতে পারল না। তাই নিজের সহজাত . আবেগ ঢেলে মেঘু বললে—কেন! আমি নিধিরামবাবুর কাছে কাজ শিখেছি, আপনি তাঁর স্ত্রী।

পতিপুত্রের কৃতজ্ঞতা ও হৃষ্টচিত্তের সঙ্গে রুকনী মনে মনে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিল মেঘুর কথার জবাব দেবার আগে। সেটা মেঘুর মনকে কতখানি আঘাত দিতে পারে তা ভেবে দেখার মন তার ছিল না তখন। নিজের লজ্জিত মুখ গর্ব-ভরে উঁচু করে সে মেঘুর জবাব দিল—কাজ শিখে তোমার যা হয়েছিল তার চাইতে অনেক বেশী প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়ে গেলে আমার স্বামীকে, আমার পুত্রকে। তাতে আমরা অনেক ভালভাবে বসবাস করব। তোমার স্থান থেকে তুমি যথাসাধ্য করেছ। সেটাই যথেষ্ট। আর বোঝা বাড়াতে যাবে কেন?—আমার স্থান কোথায়, তা কি তোমার অজানা?—তোমার কথার দু-রকম অর্থ হতে পারে না যে বাবা।

বড়ই সংযমের সঙ্গে শুরু করেছিল সে, কিন্তু রুকনীর রসনা বিদ্রোহ করল তার মনের সংযত ভাবের ওপর। স্থির করেছিল—ঘনিষ্ঠ সম্বোধন থেকে নিজেকে টেনে রাখবে। কিন্তু সেই বলগা শিথিল হল মনের অজ্ঞাতে। তাই সে থমকে থেমে রইল, যাতে তার ত্রুটিটা অপ্রমাণ থেকে যায়।

নিজের কর্তব্যজ্ঞানে নিধিরামের সঙ্গে দেখা করাটা মেঘুর মনে তালিকাভুক্ত হয়ে ছিল। কিন্তু তখন সে সেখানে গিয়েছিল তার সদ্যদগ্ধ মনটাকে নিধিরামের ঘরের স্নিগ্ধ পরিবেশে স্নান করিয়ে নিতে। ভেবেছিল অপরাপরের ধরনে নিধিরামের কোন পরিবর্তন হয় নি। অতএব আশা করেছিল, সেই সহজ সরল দরদী মানুষটিকেই দেখবে। কিন্তু তারও অমন আড়ষ্ট ভাব দেখে মেঘু নিতান্ত ব্যথিত হয়। প্রমীলা ম্লানমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তা দেখেও তার কম কষ্ট হয় নি। অনেক পরে নিধিরামের সহজ ভাব ফিরে আসে। তবুও আগের নিধিরামকে সে দেখতে পেল না। তার জন্য সে কত চেষ্টা করল। আগের মনটা লুকিয়ে রইল অন্তরের অন্দর মহলে, কিছুতে সে বেরিয়ে আসতে চায় না। রথীরামের কথাটা উঠতে, রথীরাম সামনে আসতে মেঘুর আশা কতকাংশে পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু রুকনীর কথাগুলো তাকে টেনে নিয়ে গেল তার মনে এক গভীর কোণে, সেখানে আবদ্ধ হয়ে রইল তার হতবুদ্ধি অবচেতন মন চেতনার সন্ধানে।

মেঘুর সেই ভারাক্রান্ত মনের ওপর আরো কিছু ভার চাপিয়ে দিতে রুকনী বললে—প্রমীলা যদি তোমায় প্রণাম করে যেতে পারত, তবে হয়তো এ ভুলটা আমার থেকে যেত। হয় তো—।

ঐ পর্যন্ত বলে রুকনী থেমে গেল। তার কথাটা সে শেষ করতে পারল না।—মেঘুর ভাগ্যোন্নতির খবর শুনে সে খুবই খুশী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যখন বুঝল তাদের ঘরে আসা যাওয়া করাটা তার মতো লোকের পক্ষে আর সম্ভব নয় তখন থেকে তার সকল স্বপ্নের, সকল আশা ও আনন্দের সমাধিও হয়ে গেছে। তার চিত্ত নির্বিকার নয়, তাদের সংসারে সেটা তার মতো আর কাউকে তেমন আঘাত করেছে কিনা প্রকাশ্যে তা জানা যায় নি। তার নিজের দুঃখটা বুকের মধ্যে থমকে ছিল এতদিন। মেঘুকে তাদের ঘরে পেয়ে, আর সকলের মনে যে ভাবই হোক, তার বুকের মধ্য থেকে সেই চাপা, দুঃখটা পরিপ্লাবিত হয়ে উঠল। যেন তারই বিলাপে রুকনী ক্ষণে মুখর হয়ে উঠল, আবার ক্ষণে মূক হয়ে পড়ল।

কথায় কথায় কোন বিষয়ের মীমাংসা হতে পারে, আবার কোনটা জটিল হয়েও উঠতে পারে। নিজের কথার জালে জড়িয়ে পড়ে মেঘু গুম হয়ে রইল। একটা থেকে মনটাকে মুক্ত করতে এসে লিপ্ত হয়ে পড়ল আর একটায়। এতদিন তার সমাজ, বিশ্ব-সংসার নিজের ঘরের ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে সে এতদিন প্রণাম করেই এসেছে, তাকে প্রণাম করবার মতো কেউ নেই। অতএব মনে আসে নি যে প্রণাম করতে গেলে, সেটা দিতেও হয়। এটা সে ভেবে দেখেনি যে সেটা থেকেও নিজেকে উদ্ধার করতে গেলে এমন একটা প্রশ্নের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে যা, সে আশেপাশে দেখেছে কিন্তু, নিজের মধ্যে কোনদিন সচেতনভাবে তোলাপাড়া করে দেখেনি। নিজের ঘরের গন্ডির বাইরে অজ্ঞাতসারে একটু উঁকি দিতে এসে আর একটা সমস্যার মধ্যে সে পড়ে গেল। সমাজ ও জাত-বেজাতের প্রশ্নটা এমনভাবে এসে তাকে যেমন ভাবিয়ে তুলল, তেমন ব্যথাও দিল।

ওসব যে সে জানে না, বা দেখেনি তা নয়। সব দেখেছে—বাবুদের ঘরে, কুলিদের ঘরে। খুব ভালভাবেই দেখেছে কুলিদের মধ্যে। তাই তো সমাজসেবক হতে গিয়েছিল। তার নিজের প্রশ্ন মনে স্থান পায় নি—সে চলে গিয়েছিল তার বাইরে, তা থেকে বহু দূরে। তেমন থাকতেও পারত, যদি আবেগের বশবর্তী হয়ে ওইটুকু সামাজিকতা সে দেখাতে না যেত, নিজের শ্রদ্ধাবিনোদ ভাবের প্রশ্রয় দিয়ে, চিত্তবিনোদ করতে গিয়ে যদি অপরকে তেমনটি প্রতিদান দেবার জন্য অনুপ্রাণিত না করত। অতি অসাবধানে অতি নিরীহের মতো, যে ব্যথা সে অপরকে দিয়েছে তার ফলাফল ভোগ করতেই হবে।

রুকনীর কথায় মেঘু আহতের মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইল। তার স্বামী-পত্র যেমন আহত, তেমন বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে থাকল—কেন সে এমন করল, কি বলতে চায় সে। রথীরাম আর নিধিরাম তো রুকনীর ধরনে অবাস্তব মন নিয়ে বসবাস করে না। তাই এর বেশী আর কিছু তারা ভাবতে পারে না।

এমন সময়ে বিলি এসে হাজির হল নিধিরামের ঘরে, তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে। মেঘু বুঝল—বড় সাহেব শুধু গাড়ীখানা পাঠিয়ে নিধিরামের সামনে তাকে বিব্রত করতে চান নি, তাই তার মাকে পাঠিয়েছেন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

(ক্রমশঃ)

শরীরের ব্যাপারে অন্যতম প্রধান জিনিস হল মাথা। তা আপনার, আমার যার মাথাই হক। শরীরের আর সব অঙ্গের তুলনায় মাথা অলস ও আরাম-প্রিয় অবশ্যই। মাথা স্বভাবত ভীতুও। বিপদে-আপদে ঝগড়া-ঝাঁটিতে হাত-পা এগিয়ে আসবে, রুখে দাঁড়াবে। দরকার হলে মারামারি ও লড়াই করতেও পেছপা হবে না। কিন্তু মাথা? কোন ঝগড়া-ঝঞ্ঝাটেই ও যাবে না। বরং যতদূর সম্ভব নিজের মাথা বাঁচাবারই চেষ্টা করবে। মাথা ভীতু, তাই বলে অন্যরা তাকে অবহেলা বা অনাদর করে না। হাতাহাতি ও মারামারিতে হাত দুটোও প্রাণপণে চেষ্টা করবে মাথাটা বাঁচাবার, মাথাকে নিরাপদ আশ্রয় দেবার। কারণ, হাত-পা নাক-কান কাটলে তবু কিছুটা বাঁচবার সম্ভাবনা, কিন্তু মাথা ফাটলে আর রক্ষে নেই। তেমন তেমন হলে শরীরই খতম।

মাথার বদ গুণ যথেষ্ট। কুঁড়ে, ভীতু, বিলাসী ইত্যাদি। এ সত্ত্বেও মাথার তোয়াজ করে সকলেই। মাথাকে নিয়ে সদা ব্যস্ত সবাই। কারণ মাথা মানেই মগজ। এবং মগজ মানেই বুদ্ধি। হাত-পা ইত্যাদি বাকী সকলেরই বুদ্ধিশুদ্ধি কম। তারা শুধু গাধার মত খাটতে পারে। বলা বাহুল্য, মাথাই তাদের খাটায়। অতএব মাথা যদি বুদ্ধি খাটানো হঠাৎ বন্ধ করে, তবে হাত-পা নাক-চোখের কাজ বন্ধ। হয় তারা চুপটি করে বসে থাকবে, না হয় নিজের বুদ্ধি খেলিয়ে কাজ করতে গিয়ে অকর্ম ও অপকর্ম করে অনর্থ বাধাবে। তাই মাথার সেবায় ব্যস্ত সব সময় সবাই। মাথাকে সুখে, স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে রাখতে হবে বৈকি। মাথা যে সে জিনিস নয়। ভগবান শুধু শুধুই মাথাকে শরীরের সবার ওপরে এনে বসান নি। মাথা কিছু কাজ করুক বা না করুক, শরীরের মধ্যে আসলায় সবচেয়ে মূল্যবান হল মাথা। তাই তো প্রতিপক্ষের সব সময় আক্রমণের লক্ষ্য অপর পক্ষের মাথা। মাঝে মাঝে কি বিজ্ঞপ্তি দেখেন না, অমুকের মাথা চাই। কখনো ঘোষণা দেখেছেন কি, অমুকের হাত-পা, চোখ কি নাক চাই? কেন? কারণ মাথাই সবচেয়ে মূল্যবান। আর মাথাটি চলে গেলে শরীরও তো খতম। তাই সবার প্রথম ও প্রধান কাজ মাথা বাঁচানো। সকলের সদাসর্বদা উপদেশ: মাথা ঠিক রাখো, মাথা ঠাণ্ডা রাখো, মাথা শক্ত রাখো। মাথা গরম কোর না।

উপদেশগুলো যথাযথ অবশ্যই। মাথা-ওয়ালা সমস্ত মানুষেরই পালন করা উচিত। কিন্তু সকলে তা পারছে না। মানে করা যাচ্ছে না। কারণ আজকাল অভাব-অভিযোগ, অনটন, দুঃখ-কষ্ট সেই সঙ্গে নানাবিধ সমস্যার এত ভাবনার বোঝা বেড়েছে যে, মাথা কিছুতেই ঠিক রাখা যাচ্ছে না। যারা এই বাজারে তা রাখতে পারছে, তাদের মাথার তারিফ করতে হবে বৈকি। এজন্যে অবশ্য মাথাদের দোষ দেয়া যায় না। নানা মানুষ, রকমারী মাথা। সব মাথা যেমন আকৃতিতে সমান নয়, তেমন নয় প্রকৃতিতেও। কোন কোন মাথায় প্রচুর বুদ্ধি খেলে। এই সব ভাল মাথা। তবে ভয়েরও আছে। কারণ বুদ্ধিমান মাথা থেকে শুভবুদ্ধি না বেরিয়ে যদি বদ বুদ্ধি বেরোয়, তবে ভাবনারই কথা। তারা মাথা-মোটাদের নাস্তানাবুদ করে তো ছাড়বেই, সেই সঙ্গে সমাজ ও দেশের কত যে ক্ষতি করবে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই।

মাথা নিয়ে সমস্যা মাথা ঠাণ্ডা রাখা, মাথা শক্ত রাখা অবশ্যই। শরীরের ওপরে মাথা। মাথার মধ্যে মগজ, মাথার ওপরে চুল। মাথার সঙ্গে এখন ভাবনা চুল

নিয়েও। আগে চুল নিয়ে সমস্যা প্রায় ছিল না। তখন বৃদ্ধ হলে চুলে পাক ধরত, টাকের আবির্ভাব হত। এখন অসময়ে পাকছে চুল, অকালে পড়ছে টাক। কুড়ি কি চব্বিশ বছর বয়েসে মাথার ওপর চকচকে এক টাক কেই বা খুশী মনে মেনে নেবে? কিন্তু না নিয়ে কোন উপায় নেই। তাই নানা সমস্যার সঙ্গে মাথাকে এখন টাক ও চুল পাকা নিয়েও মাথা ঘামাতে হচ্ছে। পাকা চুল কাঁচা করার জন্যে নানা মলম, টাকে চুল গজাবার জন্যে তেলের পর তেল বদলে শেষে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা চাপড়াতে হচ্ছে। বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত মাথাতে চুল বাঁচাবার সমস্যা প্রবেশ করতে যদি মাথা আরো গরম হয়, তবে দোষ দেবেন কাকে? রাগে যে মাথার চুল ছিঁড়বেন তারও উপায় থাকবে না। এখন তাই কোন মাথাতে মাথা ভর্তি চুল দেখলে অনেকেরই হিংসে হওয়া স্বাভাবিক।

সংসারের হাজারো ঝক্কি-ঝামেলা সামলাতে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে ছেলেমেয়েদের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে বাবা-মায়েরা মাঝে মাঝে চিৎকার করতে বাধ্য হন : হারামজাদারো আমার মাথা খা। তবে প্রেমিকা যখন প্রেমিককে বলে 'লক্ষ্মী সোনা, আমার মাথা খাও', তখন অবশ্য তা অন্য রকমের খাওয়া। প্রথমটা রাগের, পরেরটা অনুরাগের। খাবার কথা উঠলেও বলা বাহুল্য মাথা কিন্তু খাবার জিনিস নয়। তবে মানুষের মাথা না হলেও, কিছু জীবজন্তুর মাথা অবশ্য খাওয়া হয়। খাদ্য হিসেবে সে সব মাথা পরম উপাদেয়। আর মাছের মুড়োর তো কথাই নেই : বিশেষ ডাল বা চচ্চড়িতে। অনেকের মাথা খাদ্য হিসেবে ভক্ষণে না গেলেও, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বাড়ির ড্রইংরুমের দেয়ালে সযত্নে শোভা পায়। উদাহরণ, বাঘের মাথা, হরিণের মাথা, বাইসনের মাথা। মিউজিয়ামে তো সব জীবজন্তুর মাথাই স্বাগত। আর মানুষের কাটা মুন্ডুর আপাতত যে রকম ছড়াছড়ি সে প্রসঙ্গ নাই বা তুললাম।

মাথার জন্যে মাঝে মধ্যে বকুনি, ধমকানি খেতে হয়। সহ্য করতে হয় অপমানও। যেমন, মাথামুণ্ডু কি বকছেন, মাথায় কি আপনার গোবর পোরা, আপনি একটি গবেট, হেঁড়ে মাথা আপনার. হেড অফিসে বড়ই গোলমাল, মাথার স্ক্রুগুলো বড় আলগা ইত্যাদি। মাথায় বুদ্ধি কম হলে হেনস্তার একশেষ। মাথা নামান না, মাথা সরান না এ অনুরোধ তো হরদম। আজকাল নতুন অনুরোধ হচ্ছে : মাথাটা কেটে পকেটে পুরুন না।

মাথা রয়েছে বুদ্ধি রাখার জন্যে। এবং বুদ্ধি রয়েছে তা খাটাবার জন্যে। বলা বাহুল্য সকলেই তার সাধ্যমত ও সামর্থ্যমত মাথা খাটাচ্ছে পৃথিবীতে। কিন্তু যত মানুষ, তত রকমারী মাথা এবং তত রকমের বুদ্ধি। তাই বুদ্ধির তারতম্যে সকলে সমান মাথা খাটিয়েও সমান ফল পাচ্ছে না। মগজ যাদের প্রখর ও পরিষ্কার তারা তাড়াতাড়ি ওপরে উঠছে। মাথামোটারা পেছিয়ে পড়ছে। অবশ্য তাদের যদি টাকার ও সুপারিশের জোর থাকে, তাহলে অন্য কথা।

আপনার মাথা আপনার নি[জস্ব] সম্পত্তি। এবং বেশ মূল্যবান সম্প[ত্তি।] নিজের মাথা নিয়ে আপনি যেভাবে [খুশি] চালান, খেলান ও খাটান। মাথার [জোরে] মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেন। বয়[স্ক] না হলে অবশ্য সংসার বা বাড়ির মাথা [হতে] পারবেন না। তাতে কি। তেমন [যে] মাথা যদি থাকে, মাথার জোরে ও[পরে] উঠতে কতক্ষণ? চাই কি সমাজের [মাথা,] জিনিয়াস মাথা হলে দেশেরও মাথা [হতে] পারেন। তবে মাথা যেমন উঁচু করার জ[ন্যে] তেমনি আবার নীচু করার জন্যেও। [শ্রদ্ধা] ও ভক্তিতে মাথা নত করা এক জিনি[স,] লজ্জা, অনুশোচনা, অপরাধে [ক্ষমার] জন্যে মাথা নীচু করা অন্য জিনিস।

মাথা আপনার। অতএব মাথা [দি]য়ে আপনি যা প্রাণ চায় করতে পারেন। [যে] ব্যাপারে মাথা ঘামান বা না ঘাম[ান] আপনার মর্জি। আপনার মাথা [নিয়ে] কারুর মাথাব্যথা নেই। দেনার দায়ে [যারা] মাথা বিকিয়ে থাকেন, তবে অবশ্য [তা অন্য] কথা। তখন মাথা আপনার অপরের হা[তে।] আমাদের প্রত্যেককেই মাঝে ম[াঝে] কিছুক্ষণের জন্যে অন্যের হাতে মাথা সমর্প[ণ] করতে হয়। সেই ভাগ্যবানটি হ[চ্ছে] নাপিত। যাঁরা চাকর-বাকর দিয়ে মা[থা] টেপান, তাঁরাও মাথা অন্যের হাতে অপ[ণ] করেন। এসব সমর্পণে অবশ্য কোন জো[র] জবরদস্তি নেই : একেবারে স্বেচ্ছায়।

আপনার মাথা নিয়ে অন্য মাথারা মা[থা] ঘামাবে একমাত্র তখনই যখন দেখা হবে [যে] আপনার মাথা এমন সব কাজ করছে যা[তে] পাড়াশুদ্ধ সকলের মাথা কাটা যাচ্ছে তখন যদি সব মাথা মিলে আপনার মা[থা] নেড়া করে মাথায় ঘোল ঢেলে পাড়া থেকে বিতাড়িত করে, তখন যেন মাথা চাপড়াবে[ন] না। আপনার মাথা, ব্যবহার তার অবশ্য[ই] করবেন। তবে অপব্যবহার করলে[ই] মুস্কিল। নিজের মাথা যদি নিজে নষ্ট করতে চান করুন, তবে দোহাই অপরের মাথা খাবেন না। এবং অপরে যদি আপনার মাথা চিবোতে আসে, চিবোতে দেবেন না। আর সাবধান, হুট করে যেখানে-সেখানে মাথা গলাবেন না। দেখবেন, কেউ যেন মাথায় চাঁটি মেরে কিছু খসিয়ে না সরে পড়ে। এমন কোন ব্যাপারে ঢুকবেন না যেখান থেকে শেষ পর্যন্ত মাথা বাঁচিয়ে পালাতে না হয়। আজেবাজে কোন কিছুতে মাথা ঘামাবেন না অকারণে। রাগে মাথা গরম করবেন না। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা যতই হক, দোহাই, মাথা খারাপ করবেন না। কারণ মাথার গোলমাল যদি সত্যি হয়, তবে পাগলখানায় প্রবেশই মাথার শেষ পরিণতি। আর পাগল একবার হয়ে গেলে, মাথা থাকলেই কি, না থাকলেই কি।
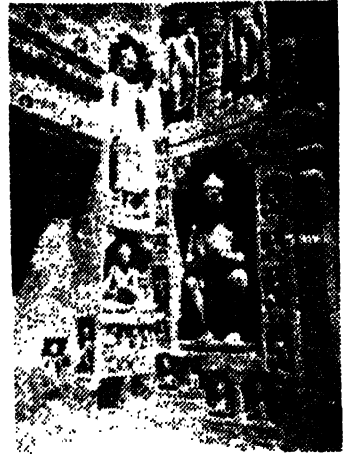
দেশী ও বিদেশী শিল্প-রসিকদের কাছে ভারতের গুহাশিল্প নিজস্ব মহিমায় এক স্বতন্ত্র আসন সংগ্রহ করে নিতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের গুহাশিল্প, ভারতেরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচায়ক—তৎকালীন সামাজিক বিধিব্যবস্থার পরিস্ফুরণ—সর্বোপরি শিল্প হিসাবে এক অপরূপ নিদর্শন। তাই আজো দেশী ও বিদেশী ভ্রমণকারীরা ভারতের অন্যান্য দ্রষ্টব্য জিনিসের তালিকার মাঝে সগৌরবে চিহ্নিত করে অজন্তা ইলোরার গুহাশিল্পের কথা, ইন্দোরের 'বাগ' গুহার কথা, ঔরঙ্গাবাদ গুহা সম্পদের কথা, বোম্বের এলিফ্যান্টা গুহাশৈলীর কথা, পুরীর কাছে উদয়গিরি—খণ্ডগিরির গুহা ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শনের কথা।

এইসব গুহাশিল্প সম্বন্ধে স্যার জেমস ফার্গুসন, মেজর গিল, জর্জ গ্রিফথ, ফা হিয়েন, হুয়েন সাং প্রমুখ প্রখ্যাত বিদেশী শিল্প-সমালোচকরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এই গুহাশিল্পগুলি নির্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? সার্থকতাই বা কতটুকু—স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে।

এর জবাবে বলা চলে—গুহাশিল্পগুলি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীর আগে তৈরি হয়নি। যে যুগে জন-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোন যোগাযোগ ছিল না। সাধারণ মানুষের কাছে কোন পরিবর্তন, বিবর্তন, সামাজিক রীতি-নীতির সংবাদ পৌঁছে দেবার কোন মাধ্যম ছিল না: সংবাদপত্রের প্রচলন হয়নি। তাই স্বভাবতই শিলালিপির প্রাধান্য দেখা যায়। উদয়গিরির গুহায় প্রপঞ্চ খরবোলার জীবন-বাণী উৎকীর্ণ আছে। রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে শিলালিপিগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন। গুহাশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হবার এবং এই শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদান ও গ্রহণ করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করা যেতে পারে।

ভারতের গুহাশিল্পগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সমতা লক্ষ্য করা গেছে। তা হলো—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রকাশ বিকাশ ও উন্নতি সাধন।

অর্থাৎ মূলতঃ এই দুটি ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের উপর নির্ভর করেই বা তাদের প্রয়োজনের খাতিরেই ভারতের গুহাশিল্পের জন্ম হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রচার, আন্দোলন ও প্রশিক্ষণের আধার হিসাবে এই গুহাশিল্পগুলি নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। গুহাশিল্পগুলি সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—'চৈত্য' ও 'বিহার' অর্থাৎ মন্দির হিসাবে ও বসবাসকারী গৃহ হিসাবে।

প্রয়োজনের খাতিরে একদা যে গুহাগুলির জন্ম হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে শিল্পীদের অদম্য উৎসাহ ও নিষ্ঠার যাদুস্পর্শে যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তবে যতই বিন্যাস ঘটুক না কেন—মূল উদ্দেশ্য থেকে কিন্তু সরে যায় নি। এটাই বুঝি গুহাশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূলতঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বুদ্ধদেব ও পরেশনাথের জীবন ও বাণীর বিশ্লেষণ করা হলো এই গুহাশিল্পের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। তাছাড়া তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার রূপ ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে—ক্ষেত্রবিশেষে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানভাগ প্যানেলের সাহায্যে অপরূপ শিল্পসুষমায় উদ্ভাসিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গুহাশিল্পগুলির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করা বোধকরি প্রাসঙ্গিক হবে।

প্রথমেই নীলাচলের পথে আসা যাক। পুরীর বুড়ি ছুঁয়ে বাসটা ক্রমে ভুবনেশ্বর অতিক্রম করে খণ্ডগিরি-উদয়গিরির মাঝে এসে দাঁড়াল। দু'পাশে পাহাড়, মাঝে কালো পীচের রাস্তা। খণ্ডগিরির মাথার উপর পরেশনাথের মন্দির। পূর্ণাবয়ব মূর্তি বিরাজমান। এই মন্দিরে উঠার পথে কয়েকটি ছোট গুহা নজরে পড়ে। এর মধ্যে 'অনন্ত গুহা' কিছু স্বতন্ত্র। অপর দিকে উদয়গিরি। প্রথমেই নজরে পড়ে স্বর্ণপুর

ইলোরা

অজন্তা

গুহা'। এখানকার তরুলতার কারুকার্য এবং হস্তিটিকে বড় প্রাণবন্ত মনে হয়। 'গণেশ গুহা'—দুটি ঘর একটি বারান্দা—স্তম্ভগাত্রে নারীমূর্তি, দেওয়ালে চিত্রাবলী। 'জয়-বিজয় গুহা'—'বৈকুণ্ঠ গুহা'—সবশেষে 'হাতি গুহা'। এখানে একটি অবিস্মরণীয় শিলালিপি আছে। আর আছে খরবোলার জীবনচরিত। যিনি পনেরো বছর বয়সে অর্থ, ধর্ম, সমাজ আর রাজনীতিতে এক অপূর্ব প্রাধান্য দেখিয়েছিলেন।

রাজ্য জয়ের নেশার চেয়ে—যে নেশা তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল তা হলো প্রজাদের মন জয়ের নেশা। আর এ নেশায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই সিদ্ধিলাভের অমর কাহিনী এই হাতি-গুহার গাত্রে খোদিত আছে।

এবার একবার চোখ ফেরানো যাক মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের দিকে। না, ঠিক ইন্দোর নয়—সেখান থেকে আরো ৯৮ মাইল দূরে 'বাগ' গুহাশৈলীর সন্নিকটে। 'বাগ' গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে বাগ নদীর তীরে বাগ গুহাগুলি রয়েছে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে জঙ্গল আর পাহাড়ের মাঝে নির্জন স্থানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তপস্যা করবার জন্যে এই গুহাগুলি নির্মাণ করেন। এগুলি তৈরী হয়েছে আনুমানিক পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। মোটমাট ন'টি গুহা ছিল। এর মধ্যে আছে মাত্র পাঁচটি। বাকি চারটি প্রাকৃতিক অত্যাচারে

অজন্তা

ইলোরা
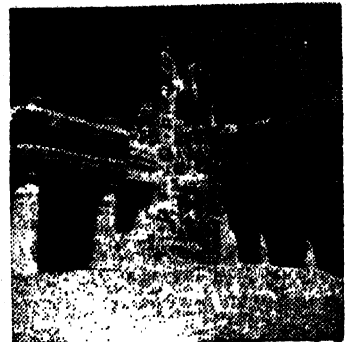
নষ্ট হয়ে গেছে। গুহাগুলির ভিতর 'চৈত্য' ও 'বিহার' আছে।

২নং গুহা সম্পূর্ণ গুহা। বড় হল ঘর ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি ছোট ঘর। বাকী তিনটি গুহার গঠনপ্রণালী প্রায়ই একই রকম। ৪নং গুহা আকারে বড়, কারুকার্য অপূর্ব। 'রংমহল' নামে খ্যাত। বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের পর উক্ত সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীরা এখানে বসবাস করতেন। অনেকের মতে তাঁরা গুহাগুলির ভিতরে রান্না করতেন এবং তাই ধোঁয়ায় শিল্প-গুলির রঙ নষ্ট হয়ে গেছে।

এবার আসা যাক বোম্বেতে। সৌন্দর্য-নগরী বোম্বে...রূপসী বোম্বের সান্নিধ্যে। এলিফ্যান্টা গুহায় যাবার রাস্তা এই সমুদ্রের পথে। সাত মাইলের তফাৎ। কেন এই বিচিত্র নাম 'এলিফ্যান্টা কেপ' হলো—স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে। ১৫৩৪ খৃঃ এই স্থান পর্তুগীজদের দখলে ছিল। সে সময় এখানে একটি পাথরের হস্তিমূর্তি পাওয়া যায় এবং সেই থেকেই এই দ্বীপের নাম এলিফ্যান্টা কেপ নামে পরিচিতি লাভ করে। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে এই গুহাগুলি নির্মিত হয়েছিল। এখানকার গুহাগুলিতে সাধারণতঃ মহাদেবের বিভিন্ন প্রকৃতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিল্পগুলিকে দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(১) নৃত্যরাজ শিব, (২) শিবের অন্ধক বধ, (৩) শিব-পার্বতীর বিয়ে, (৪) ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে, (৫) মহেশ্বররূপী শিব, (৬) অর্ধনারী মহেশ্বর রূপে (৭) পার্বতীর সঙ্গে সোহাগরূপে (৮) কৈলাশ উৎক্ষেপণ রূপে শিব ও (৯) সর্ব-রূপে শিব।

পর্তুগীজ সৈন্যেরা এখানে প্রতিরক্ষা শিবির স্থাপন করেছিল। 'সুটিং'-এর লক্ষ্য ছিল গুহার ভেতরকার মূর্তিগুলি। তাদের লক্ষ্য যে অব্যর্থ ছিল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই নজরে পড়ে পা ভাঙা নটরাজের মূর্তি...অন্ধক সেখানে আর নেই, যেখানে শিব তাকে বধ করছেন ইত্যাদি।

বোম্বে থেকে ফেরার পথে একবার নজর দেওয়া যাক ঔরঙ্গাবাদের দিকে। ঐতিহাসিক তত্ত্বে ভরপুর ঔরঙ্গাবাদ জেলার অন্দরে, শহরের কাছে ঔরঙ্গাবাদ গুহাশিল্পগুলি আপনাকে অবশ্যই হাত-ছানি জানাবে। অবশ্য বিশেষ কোন প্রাধান্য নেই এইসব গুহাগুলির। সংখ্যায় মোট বারোটি গুহা। তৈরী হয়েছে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। কিছু চৈত্য ও কিছু বিহার রয়েছে। প্রথম গুহাটি আটটি থামওয়ালা ৭৬ ফিট বারান্দা সংলগ্ন একটি গুহা। নারী-মূর্তি থামগুলি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বোধিসত্ত্ব পদ্মাসনে বসে, নাগরাজ মাথার উপর ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় গুহা চৈত্য। এই গুহাগুলির ভিতর কয়েকটি শিল্পকার্য অপূর্ব মনো-মুগ্ধকর। পুরুষ ও মেয়েরা দু' দলে বসে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করছে...সুসজ্জিতা রমণী মেয়েদের গলায় হার হাতে মালা। ৭নং গুহায় একটি অপূর্ব প্যানেল আছে। নৃত্যের প্যানেল। সাতজন বাদ্যযন্ত্রীর মাঝে নৃত্যরতা রমণী। পিছনের বারান্দায় বোধি-সত্ত্ব বজ্রপাণী রূপে ধরা দিয়েছেন।

এই ঔরঙ্গাবাদের পথেই আমরা এগিয়ে যাবো ইলোরা ও অজন্তার পৃথিবী-বিখ্যাত গুহাশিল্প সাম্রাজ্যে। অজন্তা-ইলোরার শিল্প সুষমার তুলনা নেই পৃথিবীতে।

অনুমিত হয় ইলোরার গুহাশিল্পগুলি বার শতকের মধ্যে নির্মিত হয়। ইলোরায় মোট ৩৪টি গুহা আছে। এই গুহাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে ১২ বুদ্ধ, ১৭টি শিব ও ৫টি জৈন সমন্বয়। বৌদ্ধ গুহাগুলি সাধারণতঃ ৩৫০ থেকে ৭০০ খৃঃ মধ্যে তৈরী হয়। এক থেকে ৪নং গুহা মামুলী। ৫নং গুহা বিহার। আকারে বৃহৎ, ১১৭ ফিট লম্বা ও ৫৮ ফিট চওড়া। ৬নং গুহা শিল্প-ঐশ্বর্যে গরীয়ান...সুসজ্জিতা রমণী, রমণীর বাম হাতে ময়ূর। অনেকের মতে দেবী সরস্বতী। ৭নং ৮নং ও ৯নং গুহার প্রাধান্য কিছু নেই। ১০নং গুহা চৈত্য—স্থানীয় লোকেরা বলে "সুতার-কোপড়া" অর্থাৎ বিশ্বকর্মা গুহা। ১১নং ও ১২নং গুহা যথাক্রমে দোন থাল ও তিন থাল গুহা। অর্থাৎ দোতালা ও তিন-তালা। এমন বিচিত্র গুহা আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। ১৪নং গুহায় আমরা একটি দুর্গার প্যানেল দেখতে পাবো। অপর একটি প্যানেলে—স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা এবং ধ্বংসকারী রূপে বিষ্ণুকে দেখতে পাওয়া যাবে।

ইলোরার গুহাশিল্পের যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয়, সেটি হলো— কৈলাস গুহা...১৬নং গুহা...যাকে বলে রঙমহল। এই গুহার পরিকল্পনা অপূর্ব। আয়তন ১৬৪×১০৯×৯৬ ফিট। প্রমাণ সাইজে জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি, মানুষের মূর্তি দেব-দেবীর মূর্তি দেখা যায়। অনুমান করা হয় যে—কয়েক হাজার শিল্পী দীর্ঘ কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে কৈলাশ গুহা নির্মাণ করেন। বিরাটকায় কৈলাশ গুহার বর্ণনা দিতে গেলে প্রথম থেকে দেওয়া ভাল। ঢুকতেই সামনে যে প্যানেল পড়বে—সেটি গডেস অব ওয়েলথ। এটি অতিক্রম করলেই সামনে পাবেন গঙ্গা যমুনা। অবগাহন করে শরীর ও মন সুস্থ ও পবিত্র করুন...তবেই ও মন্দিরে প্রবেশ করবেন। এর পরে নজরে পড়বে একটি বৃহৎ হস্তী ও জয়স্তম্ভ। এবার নজর ফেরান বাঁ-দিকে...পর পর ১২টি প্যানেলের এক বৃহৎ সমাবেশ।

এই প্যানেলের এক একটিতে অপূর্ব ভাবে দেখানো হয়েছে 'রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ', 'শিব-পার্বতীর বিয়ে', 'নৃত্যরত শিব' ইত্যাদি। এখানে আছে ৫টি জৈন গুহা। ইলোরা গুহাশিল্পের সম্যক পরিচয় দেবার মত একান্ত অভাব এই নিবন্ধে তাই পরিশেষে শিল্প-গরিয়সী অজন্তা গুহাশিল্প সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে আমার নিবন্ধ শেষ করবো। অশ্ব-খুরাকৃতি প্রায় এক মাইল দৈর্ঘ্য এই অজন্তা গুহা রাজ্যে ২৯ট গুহা আছে। এর মধ্যে ২৪টি বিহার, ও ৫টি চৈত্য। নির্মাণকাল দ্বিতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। অজন্তার শিল্প (Art) এক বিস্ময়ের বস্তু আর এই বিস্ময়ের যাদুকর হল ফ্রেস্কো। যার তুলনা নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই সব মহামূল্য সম্পত্তির অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

"Nothing is known about the ajanta artists who could produce such marvellous painti s of an equal merit"

জনৈক সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীতে।

ইলোরা যেমন দোতালা গুহা, তিনতলা গুহা বা কৈলাশ গুহার শিল্প ঐশ্বর্যের জন্য সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে, অজন্তার তেমনি ১নং, ১৬নং, ১৭নং, ১৯নং গুহার শিল্প সুষমা স্মরণযোগ্য। ১৬নং Flying Couple ও ১৭নং গুহার 'নৃত্য সভা' 'উড়ন্ত অপ্সরা ও গান্ধারী' প্রভৃতি।

আদিম থেকে আধুনিক সব যুগেই নারীরা সাজগোজে আগ্রহী। একটি প্যানেলে দেখানো হয়েছে—অজন্তা নারী দর্পণের সামনে বসে আছে—তার সঙ্গীরা তাকে সাজগোজে সাহায্য করছে। অজন্তা নিজের রূপে নিজেই বিভোরা।

এবার ধীরপদে প্রবেশ করা যাক ১নং গুহার মধ্যে। এখানে বুদ্ধ ধর্মচক্র পরি-বর্তন মুদ্রায় উপস্থিত রয়েছেন। বিমুগ্ধ হয়ে এদিকে সেদিকে দৃষ্টিকটু তাকান না কেন, চারিদিকে শুধু ফ্রেস্কো আর ফ্রেস্কো। কি অপূর্ব পরিকল্পনা। কি মহৎ শিল্প-মাধুর্য। দৃষ্টিনি ... একটি নাগা ... যেকেই দেখুন না কেন চারিটি হরিণ

আপনার নজরে ঠিক পড়বে......কিন্তু, ছাপা? মাত্র একটি।

সত্যরতা বালিকা 'সুন্দরী সুসজ্জিতা নর্তকী' 'উপবিষ্ট বাদ্যযন্ত্রী দল' 'একটি নারীমূর্তির প্রতীকী' ইত্যাদি। শিল্পগুলি এত প্রাণবন্ত এত হৃদয়গ্রাহী যা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। যাঁরা একবার কষ্ট-স্বীকার করে অজন্তা-ইলোরায় পৌঁছুতে পেরেছেন—তাঁদের নয়ন সার্থক হয়েছে। শিল্পের কি পরিভাষা আছে? নেই। শিল্প অনুভবের জিনিস। উপলব্ধির জিনিস।

প্রাকৃতিক নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি এই সব গুহাশিল্প। অনেক ক্ষতি হয়েছে। আর যাতে না হয় সেজন্য নানান ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আরো সুখের কথা, হালের সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারা গেল যে, প্রধান প্রধান গুহাশিল্পগুলি প্রাকৃতিক আবহাওয়ার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শীততাপনিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে।

এই সব গুহাশিল্পের শিল্পীরা, উপদেষ্টা এবং পরামর্শদাতারা কালের কপোলতলে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, আমাদের বারবার কাছে ডেকেছে......আমরা ভ্রমণ-পাগোলেরা গেছি......যাচ্ছি এবং যাবো। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাববো — আজ থেকে শত শত বছর আগে যে গুহাশিল্পের জন্ম হয়েছিল......সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও কি আমরা তার চেয়ে অধিকতর সুন্দর গুহাশিল্প কিছু দিতে পেরেছি?*

* রচনায় ব্যবহৃত ছবিগুলি লেখকের তোলা।

হিমালয়ের সানুদেশে শোনিতপুর নগরীর যত কিছু শোভা ও বৈভব তা শুধু দৈত্যরাজ বাণের মনোরম প্রাসাদ-পুরীটিকে আশ্রয় করেই মূর্ত ও উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে যেন। হিমালয়নিষ্যন্দী সান্দ্রতুষারশীতল বায়ু প্রভাবে নিদাঘ-রৌদ্রের বহ্নিজ্বালায় বিন্দুমাত্র তাপিত হয় না এই প্রাসাদের রত্নজালমণ্ডিত শিলা-কুট্টিমগুলি। তার শ্বেতকমলপ্রভ শিখর-কেতনটিকে দেখে মনে হয়, যেন তা নগাধিরাজ হিমালয়েরই আর একটি চূড়া। আরও মনে হয়, বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত অসংখ্য হর্ম্য ও স্তম্ভাবলীবিধৃত বিশাল-ধবল সমগ্র প্রাসাদটি যেন কৈলাসপতি মহাদেবের বরে অজেয় দৈত্যরাজ বাণের উদ্ধত গর্বের এক মূর্ত প্রতীক। এক অভ্রংলিহ স্পর্ধায় ও শুভ্রকুটিল ভ্রূকুটিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে উপেক্ষা করে চলেছে তা যুগ যুগ ধরে।

কিন্তু কেউ জানে না, অসুরাধিপতি বাণের এই অনন্ত সুখৈশ্বর্যমণ্ডিত ও প্রতাপান্বিত প্রাসাদের গর্বস্ফীত কিন্তু বক্ষের অন্তঃস্তলে কোন এক মণিময় প্রকোষ্ঠের নির্জনে অসফল স্বপ্নের এক সর্পিল হতাশা একটি কুমারীর কুসুমকোমল প্রাণের সমস্ত সুষমাকে কুরে কুরে ক্ষয় করে দিচ্ছে। কেউ বুঝতে পারে না, সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে বেদনাতপ্ত একটি সকরুণ দীর্ঘশ্বাস সমগ্র প্রাসাদের সুখো-চ্ছ্বাসস্নিগ্ধ আবহাওয়াটিকে ভারাক্রান্ত করে দিতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে।

কেউ না জানলে বা না বুঝলেও দৈত্য-রাজতনয়া ঊষার মর্মব্যথা একজন জানে। সে হচ্ছে অবিরাম সহচরী কিঙ্করী চিত্র-লেখা।

প্রতিদিন অপরাহ্নে রাজোদ্যান সন্নি-হিত সরোবরের স্নিগ্ধ বনচ্ছায়াবিমণ্ডিত নীল মরকত শিলার সোপানে বসে রাজ-নন্দিনী ঊষার জলদকৃষ্ণ কেশদাম বিন্যস্ত করে দেয় যখন চিত্রলেখা, তখন লাস্যবিলোল বাতাসের একটি লীলায়িত ঢেউ এসে মৃদুচঞ্চলিত করে দেয় ঊষার কর্ণকুণ্ডল-দুটিকে। কয়েকটি অবাধ্য ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তল-চূর্ণ কর্ণপাশ হতে উড়ে এসে পড়ে তার রক্তাভ কপোল ফলকের উপর। দেখে মনে হয় যেন কোন মধুলুব্ধ অলি রাগোদ্ধত হৃদয়ে তোষণ করছে এক লজ্জারক্তা কুসু কোরককে।

ঊষার কেশবিন্যাসের পর তার অঙ্গ-রাগ সাধনে তৎপর হয় চিত্রলেখা। লাক্ষা-রসরাগে তার গুরু নিতম্বদেশ ও চন্দনরসে চর্চিত করে দেয় তার মুক্তাবলী-শোভিত বক্ষঃস্থল। তারপর বর্ণগন্ধ-বিহ্বল এক বনান্তিক অপরাহ্ণে মদিরানস সমীরনসঞ্চালিত মৃদুবীচি-ক্ষুব্ধ সরোবর সলিলে গিয়ে স্নান ক দুজনে। মৃণালভুক মরালীর মত স প্রস্ফুটিত রক্তকমলের মৃণালগুলি আন্দোলিত করতে করতে এক লীলা-বিলাসে মত্ত হয়ে ওঠে যখন ঊষা, তখ তাদের পীত পরাগে অনুলিপ্ত হয়ে ও তার হস্তফলক। তার বিগলিত অঙ্গরা মৃদুসুরভিত হয়ে ওঠে সরোবরে উদ্বেলিত সলিল রাশি আর সেই সৌরভ সঞ্জাত এক বিহ্বল মদাবেশে চঞ্চল হয়ে ওঠে মীনপুচ্ছসি।

কৃষ্ণসলিল সেই কমল সরোবরে ইচ্ছা মত জলকেলি করে প্রাসাদ-অন্তঃপুরে তা মণিদীপিত প্রকোষ্ঠের মধ্যে ফিরে আসে

উষা। তার স্নানান্তিক দেহসৌন্দর্যের এক শীকরসিক্ত ব্যঞ্জনা প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে তার নবকাশকুসুমসঙ্কাশ শ্বেতবসনে। তখন রাজতনয়ার নবযৌবনোৎফুল্ল অঙ্গলতিকাটিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে সযত্ন-রচিত প্রসাধনে ও বিচিত্র রত্নাভরণে ভূষিত করে দেয় চিত্রলেখা।

কিন্তু উত্তম বসন ভূষণ ও প্রসাধন দ্বারা দ্বিগুণীকৃত দেহসৌন্দর্যের এই সুললিত সম্ভার শান্ত বা তৃপ্ত করতে পারে না উষার মনকে। অশান্ত বক্ষের উত্তানবিড় চঞ্চলতায় ক্ষণে ক্ষণে কেমন যেন অধীর ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে উষা। সুক্ষ্ম গভীর এক আলোড়নে তার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। রোষভরে বলে, ক্ষান্ত হও সহচরী, কী হবে এই সব রূপসজ্জায়?

সহচরী চিত্রলেখা জানে, রাজকন্যার এই রোষে কোন ক্রোধান্বিত কুটিলতা নেই। এই রোষ যেমন কৃত্রিম তেমনি মধুর, যৌবনমদায়িত এক অভিমানের রঙে রাঙা। একান্তপ্রার্থিত প্রণয়ীর প্রতি পূর্বরাগের এক গোপন আবেগ স্তবকিত মেঘভারের মত ভারাক্রান্ত করে তুলেছে তার অন্তরাকাশটিকে।

নীলোৎপলতুল্য অক্ষিপল্লব দুটিকে মুক্ত বাতায়নপথে সুর্যাস্তবিধুর দিক-চক্রবালের দিকে উদাস ও প্রসারিত করে দিয়ে উষা বলে, আমার স্বপ্ন কি কখনো সফল হবে না সহচরী?

সাথীহারা বনকপোতীর কণ্ঠনিঃসৃত হতাশ কুজনের মত এই বিষণ্ণ অনুযোগ রোজ একবার করে ধ্বনিত হয় উষার কণ্ঠে। অন্যদিন এ অনুযোগের কোন প্রত্যুত্তর দেবার প্রয়োজন অনুভব করে না চিত্রলেখা। কিন্তু আজ আর পারল না। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে চিত্রলেখা বলেন, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন রাজনন্দিনী, আপনার সেই আশ্চর্য স্বপ্নের অর্থ আমি আজও বুঝতে পারি নি। বুঝে উঠতে পারি নি স্বপ্নদৃষ্ট অলীক যুবরাজের চরণে প্রাণমন সমর্পণ করে আপনার এই নবোদ্ভিন্ন যৌবনজীবনের সমস্ত কুসুমিত উচ্ছ্বাসের অপব্যয় করে চলেছেন কেন আপনি। আপনার বিশুদ্ধ প্রণয়োদ্যমের এই অর্থহীন অবক্ষয়ে আমি ব্যথিত না হয়ে পারছি না রাজকুমারী।

একই সঙ্গে এক অপরিসীম রোষে ভ্রূবল্লরীকে কুঞ্চিত ও আয়ত লোচন দুটিকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে উষা বলে, তোমার ধৃষ্টতা সত্যই অমার্জনীয় চিত্রলেখা। মহাদেবী পার্বতী প্রদত্ত বর মিথ্যা হবে, মিথ্যা হবে তাঁর আশীর্বাদধন্য দৈববাণী, এই উদ্ধত অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেবার মত দুঃসাহস কোথায় পেলে তুমি?

ফণিনীর মত মন্ত্রমুগ্ধ নীরবে মাথা নত করে থাকে চিত্রলেখা।

চিত্রলেখার বিনয়নম্র নীরবতায় উষা প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্ট না হলেও অনেকাংশে প্রশমিত হলো তার ক্রোধ। সুরভিত স্মৃতির এক মধুর ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে উষা বলল, আমার সেই অলৌকিক স্বপ্ন-বৃত্তান্তের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছি তোমায়। শঙ্খধবল জ্যোৎস্নালোকে বিগলিত সেই বসন্ত রাত্রির স্মৃতি আমার অন্তরপর্বে অম্লান কুসুমের মত বর্ণে গন্ধে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে চিত্রলেখা।

মরুতহিল্লোলিত বসন্তমোদে উল্লসিত হয়ে চন্দ্রিকাবিহ্বল চকোরের মত আমি কানন সংলগ্ন উপবনবীথিকায় ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে ক্রমশ দূরে চলে যাই। সহসা আমার মনে হয়, চন্দ্রালোকবিধৌত দিগবলয়ের ঐ রহস্যনিবিড় ছায়ময়তায়, যেখানে আকাশ ও পৃথিবী এক নিগূঢ় নৈশ মিলনে নিমীলিত হয়ে আছে, আমিও সেখানে গিয়ে বিলীন হয়ে যাই নিঃশেষে। আমার আরও মনে হলো, আমার ক্ষুদ্র প্রাণসত্তার সমস্ত বিশিষ্টতা চাওয়া পাওয়ার স্বার্থ-সম্পৃক্ত চেতনার মুক্তি ঘটুক এক মহা-জাগতিক চেতনার অমলধবল অনন্ত আলোকরাশির মধ্যে। কান্না ও গানের অভিন্ন মাধুর্যে আত্মহারা এক আশ্চর্য পাখির মত চন্দ্রসূর্যবিহসিত নীল নভো মণ্ডলকে আমি যেন যুগ যুগ ধরে পরিক্রমা করে বেড়াই, মর্তমানবের এই জগতে আর যেন আমি কখনো ফিরে না আসি।

এই সব চিন্তাতরঙ্গে চিত্তকে দোলায়িত করতে করতে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চলেছিলাম আমি। সহসা মন্দার কুসুমসুবাসিত দূরে কৈলাসশিখরে সুরত-কেলিরত হরপার্বতী দৃষ্টিপথে পতিত হলেন আমার। দেবদম্পতির এই অপ্রাকৃত মিলনদৃশ্য কামাতিতপ্ত করে তুলল আমার চিত্তকে। আমি কুমারী, তবু পতিমদ-বাসনা জাগল আমার মদনানল প্রজ্জ্বলিত ও ফুলশর-জর্জরিত হৃদয়ে। কিন্তু কোথায় আমার পতি! আমি তখন কামনা-কাতর চিত্তে দেবীর নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললাম, হে দেবী, দেবী হলেও তুমি নারী। আমার নারীহৃদয়ের গোপন অভীপ্সা তোমার অজানা নেই। অচিরে যেন আমার সেই অভীপ্সা পূরিত হয়। অচিরে যেন আমার এই কুমারীজীবনের দুর্বিষহ নিঃসঙ্গতার অবসান হয় এবং উপযুক্ত রূপগুণসদৃশ এমন এক রাজ-পুত্রের সঙ্গে বিধি অনুযায়ী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হই, যিনি একাধারে আমার পতি ও প্রণয়ী, স্বামী ও সখারূপে আমার দেহমনের সকল কামনাকে পরিতৃপ্ত করবেন।

আনন্দবেদনার এক মিশ্রিত আবেশে আমি বিমূঢ় ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। সহসা এক দৈববাণী কর্ণগোচর হতে সচকিত হয়ে উঠলাম আমি। বড় মধুর ও সুখশ্রাব্য সে বাণী। দূরাগত গীতধ্বনির মত সে-বাণীর ধ্বনি একদিকে যেমন আমার কর্ণকুহরকে মুগ্ধ ও বিবশ করে ফেলল, অন্যদিকে তেমনি তার অর্থ পরি-তৃপ্ত করল আমার অন্তরাত্মাকে। দেবী বললেন, ধৈর্য ধরো। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি স্বপ্নে যাকে দেখবে, তাকেই তুমি কায়মনোবাক্যে পতিত্বে বরণ করবে। মনে মনে তাকেই তুমি তোমার প্রাণমন সমর্পণ করবে। কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই বিচলিত হবে না তুমি।

সেই রাত্রির মধ্যযামে দেবীকথিত সেই মধুর স্বপ্ন দর্শন করলাম আমি। দ্বারকা আমি যাইনি, তবু অলৌকিক দেবী-মাহাত্ম্যবলে স্বপ্নকুহেলিসমাচ্ছন্ন আমার মানসপটে দ্বারকার বিশাল রাজপ্রাসাদটি সজীব হয়ে ফুটে উঠল এক রহস্যময় আলোকপাতে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এক-মাত্র রাজপ্রাসাদ ছাড়া দ্বারকা নগরীর অন্য কোন ভূপ্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হলো না আমার। আর সেই বিশাল প্রাসাদে প্রদ্যুম্নপুত্র যুবরাজ অনিরুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন জনপ্রাণীকে দেখতে পেলাম না। ব্রীড়াকুণ্ঠিত অপাঙ্গে আমি একবার কোন-রকমে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সহাস্য-বদনে এগিয়ে এসে সপ্রেমবচনে তুষ্ট করতে লাগলেন আমায়। ফুল্ল ইন্দীবরের মত তাঁর লোচন। বিশাল আয়ত তাঁর বক্ষঃ-পট। অর্জুনবৃক্ষের শাখার মত তাঁর বলিষ্ঠ বাহু। মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত আমার অন্তর আকুল হয়ে উঠেছিল তাঁকে বারবার দেখার জন্য। তবু লজ্জাবিগলিত এক তরলতায় আতুর ছিল আমার দৃষ্টি। বিপুল পুলকোদ্গমে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার হৃদয়। আমি আর একবার তাঁর দিকে আমার মদরাগাঙ্কিত নেত্রান্ত উত্তোলিত করতেই অকস্মাৎ আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হলো। স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত বস্তু নিবিড়ধবল এক কুহেলিকায় নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেল মুহূর্তে।

আর কোন কথা বলতে পারল না উষা। প্রবল বাষ্পাবেগে রুদ্ধ হয়ে এল তার কলহংসনিন্দিত কণ্ঠস্বর। দ্রুতশ্বাসিত স্পন্দনে স্পন্দিত হতে লাগল তার স্তনবন্ধুর বক্ষঃস্থল। চিত্রলেখা জানে, এই প্রকারের ভাববিকার মাঝে মাঝে ঘটে থাকে রাজকন্যা উষার। এমনি করে অবিরত স্বেদাশ্রুবর্ষণে, দ্রুত-লয়িত শ্বাসকম্পনে, ও আবেশজড়িত নয়ননিমীলনে কল্পিত রাজপুত্রের প্রতি তার অতৃপ্ত অনঙ্গাবেশ স্ফুরিত হয় মাঝে মাঝে।

উষাকে যত্নসহকারে ধরে বৈদূর্যমণি-খচিত সেই বিশাল স্বর্ণপর্যঙ্কের দুগ্ধ-ফেনানিভ শয্যার উপর তাকে শায়িত করে দেয় চিত্রলেখা। তারপর কবরীগ্রথিত চন্দ্রোপল ও কুসুমদাম সহসা শিথিল হয়ে পড়লে স্বস্থানে সংস্থাপিত করে দেয় সেগুলিকে। উষার পূর্ণচন্দ্রগ্রস্ত মুখ-মণ্ডলে উদ্গত মুক্তানিভ স্বেদবিন্দুগুলিকে আপন বসনাঞ্চল দিয়ে মুছিয়ে দেয়।

একথা যতবার ভাবে ততই আশ্চর্য হয়ে যায় চিত্রলেখা, সব স্বপ্নই অলীক, নিদ্রা-ভঙ্গে কোন অস্তিত্ব থাকে না তার। কিন্তু এ কোন স্বপ্ন যা দিব্যালোকোজ্জ্বল জাগরণকালেও বিলীন হয়ে যায় না এবং যার কাঠোরতম অস্তিত্ব জীবনের অন্য সব বাস্তবতাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে এক

প্রস্তরসদৃশ গুরুভারের দ্বারা পীড়িত করতে থাকে একটি প্রাণকে।

প্রভঞ্জনরূপ এক প্রবল হতাশার অভিঘাতে তরুবর বিচ্ছিন্ন প্রিয়ঙ্গুলতিকার মত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ঊষা। কাতরকণ্ঠে বলে, তবে কি আমার স্বপ্ন সফল হবে না কোনদিন? আর যে ধৈর্য ধরতে পারি না কিংকরী।

চিত্রলেখা বুঝতে পারে, এবার অসহিষ্ণুতার শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে ঊষা। প্রিয়মিলনে অধিক বিলম্ব ঘটলে বৃন্তচ্যুত প্রস্ফুটকুসুমের মত প্রাণরস অভাবে দিনে দিনে ম্লান হতে ম্লানতর হয়ে উঠবে তার তারুণ্যললিত অঙ্গলাবণ্য।

ঊষার স্বপ্নবৃত্তান্তটিকে তার কামাতিতপ্ত চিত্তের কল্পিত সৃষ্টি বলে মনে মনে অবিশ্বাস করলেও তার প্রতি চিত্রলেখার সমবেদনা অপরিসীম। ব্যথাহত কণ্ঠে কম্প্রবক্ষে চিত্রলেখা বলে, আপনার এ-দশা আমিও আর চক্ষে দেখতে পারছি না। আজ্ঞা করুন রাজনন্দিনী, আমায় কি করতে হবে বলুন। আপনার স্বপ্ন সফল করে তুলবার জন্য যদি আমার তুচ্ছ জীবনও বিসর্জন দিতে হয়, তাতেও আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করব না কোনদিন।

নিবাত-নিষ্কম্প নিশীথবীণার মত কণ্ঠে ঝংকার তুলে ঊষা বলে, আমি তা জানি সহচরী। জানি বলেই আমার আজ্ঞা পালনের জন্য অজস্র দাসদাসী সতত প্রস্তুত থাকলেও আমি তোমারি উপর নির্ভর করি সবচেয়ে বেশী। তুমি ত শুধু আমার কিংকরী বা সহচরী নও, তুমি আমার প্রিয়তমা সখি। আমার এমন কোন গোপন কথা নেই যা তোমার অবিদিত। জীবনে তুমি আমার অনেক আদেশ পালন করেছ, অনেক আনন্দ আমায় দান করেছ। কিন্তু আজ আমি একটি আদেশ তোমায় দান করতে গিয়ে তার কথা কিছুতেই ব্যক্ত করতে পারছি না কেন সখি? আদেশ নয় ঠিক অনুরোধ। এ-অনুরোধ অন্তরের একটি গোপন এষণা হতে উৎসারিত হয়ে আমার কণ্ঠনালীতে এসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে; প্রকাশের কোন পথ খুঁজে না পেয়ে আমার শিরায় শিরায় স্বগত উচ্চারণের এক অশ্রুত ধ্বনিস্পন্দন জাগিয়ে কেবলি বার বার ফিরে ফিরে যাচ্ছে।

কী সে অনুরোধ রাজতনয়া? আপনি অকুণ্ঠভাবে আজ্ঞা করুন! আমি নিশ্চয়ই তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারলিপ্ত দিগ্‌বলয়ের দিকে বিষাদবিধুর দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইল ঊষা। শীতাহত শীর্ণ বনভূমির সকরুণ মর্মরধ্বনির মত নৈরাশ্যনিবিড় ব্যঞ্জনায় নিস্বনিত হয়ে উঠল শুধু তার হৃদয়-বিমথিত একটি দীর্ঘশ্বাস। পরে আকাঙ্ক্ষিত ও সংশয়শিহরিত ভীরুকণ্ঠে উত্তর করে মঙ্গলভাষিণী ঊষা পারবে কি সখি, আমার দুঃখ অন্ধকারসমান আবাস সঞ্জীবিত করে তুলতে? কিন্তু সে যোজন দূরবর্তী দ্বারকাপুরীর রাজপ্রাসাদে কুমার অনিরুদ্ধ সকাশে গিয়ে সব কথা ব্যক্ত করা ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখি না। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁর প্রতি আমার নিবেদিত প্রেমের অর্ঘ্যভার বহন করে নিয়ে যেতে পারবে কি সখি? তাঁকে গিয়ে ঠিকমত বলতে পারবে, সূর্যগতপ্রাণা কমলের মত গন্ধোচ্ছ্বাস পরিপূরিত আমার অন্তর-কোরকটি তাঁরই জন্য অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে আজও। আরও বলবে, স্বল্পসলিল সরোবরের মৃতপ্রায় মীনপঙ্‌ক্তির মত আমার প্রাণবায়ুকে কোনরকমে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি শুধু তাঁরই জন্য।

এক অটল আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় ও সমুন্নত হয়ে ওঠে চিত্রলেখার সর্বাঙ্গ। কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে বলে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি রাজকন্যা, আগামীকাল শোণিতপুরের সূর্য আর আমায় এখানে দেখবে না। রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই যাত্রা শুরু করব আমি দ্বারকার পথে। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি, আপনার এই অতুলনীয় প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদানসম্বলিত আশ্বাস-বাণী না নিয়ে আমি ফিরব না। আপনার প্রেম সত্য সত্যই তুলনাবিহীনা রাজকুমারী। সকল প্রেমই এক সজীব প্রতি-বস্তুকে অবলম্বন করে বৃক্ষাবিষ্ট লতার মত লীলায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু আপনার মত কেউ এক অলীক স্বপ্নপ্রতিমাকে দিনের পর দিন অন্তরের এক সুরভিত নিভৃতে লালন করে চলে না এমনভাবে। আপনি সত্যিই অনন্যা।

চিত্রলেখা দ্বারকাপুরীর পথে রওনা হয়ে গেলে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্ষণে ক্ষণে দোলায়িত হতে থাকে ঊষার প্রেম-প্রতিভাস চিত্ত, যেন পবনাবধূত কোন বিশুষ্ক বিবর্ণ বৃক্ষপত্র আন্দোলিত হচ্ছে বসন্তাগমের আশায়। সারাদিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় রাজোদ্যানবাটিকার লতাকুঞ্জে বসে কাননপ্রান্তের পথপানে চেয়ে থাকে ঊষা। একবার মনে হয়, একটি অখণ্ড কুমারীহৃদয়ের কামনাবাসনা প্রভৃতি বিচিত্র আবেগানুভূতির উপচারে সজ্জিত প্রেমার্ঘ্যের প্রতিদান না দিয়ে পারবেন না কুমার অনিরুদ্ধ। চিত্রলেখার মুখ থেকে সবকিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত অনুরূপ প্রেমসঞ্জাত হবে তাঁর মনে এবং অনুরাগনিবিড় আগ্রহের আতিশয্যে হয়ত তার সঙ্গেই চলে আসবেন এখানে। প্রিয়-মিলনোন্মুখী কোন বাসকসজ্জিকা নায়িকার মত ঊষা ত তাঁরই জন্য নবসাজে সজ্জিত করে রেখেছে তার সমগ্র দেহ-মন।

কিন্তু যদি তার এই অযাচিত প্রেমার্ঘ্য হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করেন কুমার অনিরুদ্ধ, বিফলমনোরথ হয়ে যদি ফিরে আসে কিংকরী চিত্রলেখা, তাহলে কেমন করে এ-জীবন ধারণ করবে ম্রিয়মাণা ঊষা। তৈলহীন দীপশিখার মত তার জীবনও কি ধীরে ধীরে ঢলে পড়বে না মসীলিপ্ত মৃত্যুর কালিমাকুটিল কোলে?

দিনে দিনে দিন গত হয়। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে। নবজলসম্ভৃত নীল ... মেঘমালায় আবৃত হয়ে ওঠে সমগ্র আকাশ। গুরুনিতম্ব... স্তনভারশোভিনী ও কজ্জলিতাক্ষি ক... মত জলভারে অবনত মেঘরাজি ঘ... চুম্বন করছে যেন শিলাজতু ... আমোদিত শৈলশিখরগুলিকে। নির্ঝরবাহিত উপলরাশির উপর চন্দ্রাঙ্কিত পুচ্ছভার বিস্তার ... মদিরানন্দে নৃত্য করছে কলাপ কলা... বর্ষাগমে নবজলসম্পাতে বনস্থলীর স... হয়েছে বিদূরিত। দলিত বৈদূর্যমণি... শ্যামল তৃণাঙ্কুরে আচ্ছন্ন হয়ে ... আতপতাপপ্রদগ্ধ শুষ্ক শষ্প প্রান্তর ... কিন্তু দূরীভূত হওয়ার পরিবর্তে দ্বি... কৃত হয়ে উঠেছে ঊষার প্রণয়তৃষ্ণ... সন্তাপ। অঙ্কুরিত না হয়ে আরও ... ও বিশীর্ণ হয়ে ওঠে তার আশাবীজ...

প্রতিদিন অপরাহ্নে উদ্যান... সংলগ্ন সরোবরের ঘাটে সেই শ... মরকত শিলার সোপানে বসে ঊষার ... মেঘচিকুর বিন্যস্ত করে দেয় স... তারপর কেতকীকুসুম খচিত ... বকুলমালা পরিয়ে দেয় ঊষার কণ্ঠে... সুবাসিত গ্রীবাদেশে। কুটজকু... অবতংসে শোভিত করে দেয় ... কর্ণযুগল।

বনভূমির উপান্তবর্তী পথপানে ... দৃষ্টিতে চেয়ে কাতরকণ্ঠে ঊষা ... কী হবে সখি, এভাবে আমায় সা... আমার জীবনযৌবন সব বৃথা। আমার আশাপথ চেয়ে দিন গনে যাও...

সখিরা সান্ত্বনা দেয় ঊষাকে, ... হোন রাজনন্দিনী। চিত্রলেখা সুখবর ... ফিরে আসবে, দেবাদিদেব মহাদেব ... পার্বতীর ইচ্ছায় ও কৃপায় আ... মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

অবশেষে সত্যিই সেই শুভদিনটি ... পড়ে। ঊষার সেই বহুপ্রার্থিত ... কুমার অনিরুদ্ধ সকলের অলক্ষ্যে অ... সহচরী চিত্রলেখার সঙ্গেই প্র... অন্তঃপুরের সেই মণিদীপিত প্রকো... মধ্যে অকস্মাৎ আবির্ভূত হন। ... পুলকোদ্গমে আত্মহারা হয়ে পড়ে ঊষা ... মুদ্রিতদল ছায়াম্লান কোন ... অকস্মাৎ সূর্যোদয়ে উৎফুল্লহৃদয়া ... উঠেছে সোহাগভরে।

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চিত্রলে... একবার অবলোকন করে ঊষা বলে, এ... করে সম্ভব হলো সহচরী? ... দ্বাররক্ষী ও রাজকর্মচারীর সত... কৌতূহল নিবৃত্ত করে কেমন করে ... আর্যপুত্রকে নিয়ে এলে এই ... অন্তঃপুরে?

কৃতকার্যের গর্বানুভূতিতে প্রো... হয়ে ওঠে চিত্রলেখার মুখমণ্ডল। ... হাসি হেসে চিত্রলেখা বলে, সৌভাগ্য... দ্বারকার রাজপথে দেবর্ষি নারদের সা... পেয়ে গেলাম সহসা। তাঁকে সব কথা ... তাঁর কৃপা ভিক্ষা করায় তিনি আমায় ... এক তামসীবিদ্যা শিখিয়ে দেন যার ব... কোন স্থানে আমি আমার ঈপ্সিত ...

...উপস্থিত অন্য সকলের দৃষ্টিশক্তিকে ...লাঙ্ঘন করে অনায়াসে কার্যসিদ্ধি ...তে পারি।

...মণিমাণিক্যখচিত মুক্তাহারটিকে গলদেশ ...তে খুলে মুহূর্তে চিত্রলেখাকে দান করল ...। মধুর বচনে বলল, তোমার ঋণ ...বনে কোনদিন পরিশোধ করতে পারব না ...। আমার অন্তরের অপরিসীম ...জ্ঞতার অভিজ্ঞানস্বরূপ আমার এই ...দ্র পার্থিব উপহারটুকু গ্রহণ করে ধন্য ... আমায়।

রাজ-অন্তঃপুরের যে দিকটি রাজ-...নন্দিনী ঊষার জন্য একান্তভাবে নির্দিষ্ট, ...খানে তার প্রীতিধন্য কতিপয় দাসদাসী ...ছাড়া আর কারও যাতায়াত নিষিদ্ধ, রাজ-...অন্তঃপুরের সেই নির্জন বিভাগটিতে ঊষার ...পার্শ্ববর্তী একটি সুরম্য প্রকোষ্ঠ মধ্যে ...কবার ব্যবস্থা হলো কুমার অনিরুদ্ধের! ...র যত্নসাধনের জন্য নিযুক্ত হলো কয়েক-...ন বিশ্বস্ত দাসদাসী।

প্রথমে স্নিগ্ধনির্মল সলিলে স্নান ...রিয়ে উত্তম বস্ত্র ও ভূষণে বিভূষিত করা ...লো অনিরুদ্ধের বরতনু। বর্ষণসিক্ত ...দ্যুতাগ্নির বর্ধিত প্রভাজালের মত ...জ্জ্বলতর হয়ে উঠল সুস্নাত ও ...সজ্জিত অনিরুদ্ধের অঙ্গকান্তি। তারপর ...স্বর্ণবিমণ্ডিত অমলধবল একটি ...আসনে উপবেশন করিয়ে উত্তম খাদ্য ... পানীয় দ্বারা তুষ্ট করা হলো তাঁকে। ...আহারান্তে দীর্ঘ বিশ্রামে সমস্ত পথশ্রম ...অপনোদিত হলে কুমার সকাশে ধীর ...পদক্ষেপ উপস্থিত হলো গজগামিনী ঊষা। ...কিন্তু কোন কথা বলল না। শুধু কুমারের ...পদতলে বসে নীরব নয়নে ক্ষুধিত হৃদয়ে ...ন করে যেতে লাগল তাঁর চন্দ্রানিন্দিত ...মুখসুধা।

ব্যস্ত হয়ে পর্যঙ্ক হতে নেমে এসে ...কে মৃদুকরস্পর্শে উত্তোলিত করে ...অনিরুদ্ধ বললেন, ওঠ প্রিয়তমে, তোমার ...অকৃত্রিম প্রেমের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে মুগ্ধ ...য়ে আমি আমার সমাজ সংসার ও রাজ-...ঐশ্বর্য ত্যাগ করে দীনহীন বেশে তোমার ...পাশে চলে এসেছি। তোমার এই প্রেমের ...যুগপৎ প্রগাঢ়তা ও সমুন্নতির প্রভাবে আজ ...আমি মহাপৃথিবীর ব্যাপ্তিকে খুঁজে ...পেয়েছি তোমার অন্তরপ্রদেশে।

বহুবাঞ্ছিতের স্পর্শে ধন্য হয় নবনীত-...। ঊষা। প্রাণবল্লভের নিশ্বাসমারুতের ...স্পর্শভায় মুহূর্তে শীতল হয়ে যায় ...মার মনোননজনিত গাত্রসন্তাপ। ব্রীড়া-...ভনের রোমাঞ্চ জাগে সারা অঙ্গে, যেন ...পুষ্পোর্নিবিড় এক কুসুমোচ্ছ্বাসে রোমাঞ্চিত ...। হয়ে উঠেছে কোন বসন্তসোহাগিনী ...কলিকা তরুলতা। পুলকাকুল কণ্ঠে ...নতমুখী ঊষা বলে, দাসীর প্রতি এতই ...ন কৃপা তখন আমায় চিরদিনের সাথী ...রে আমায় কৃতার্থ করুন কুমার। আপনিই ...আমার একবাঞ্ছিত দেবতা; বহু পূর্বেই ...আমি আমার প্রাণমন ইহকাল ও পরকাল ...অর্পণ করেছি আপনার চরণকমলে।

আপনার প্রসন্নতাই হবে আমার প্রাণরসের উৎস, আপনার স্পর্শই হবে আমার প্রাণের উত্তাপ, আপনার হাস্যচ্ছটা হবে আমার প্রাণের আলো।

সেইদিনই সেই গোপন অন্তঃপুরে দৈত্যরাজতনয়া ঊষার সঙ্গে গান্ধর্বমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন প্রদ্যুম্নতনয় কুমার অনিরুদ্ধ। শঙ্খধ্বনি হলো না মুহুর্মুহু। আয়তীমতী জীবৎপুত্রিকা পুরকামিনীদের কেয়ূরকর্ষণ ও নূপুর-নিক্কণসহযোগে অনুষ্ঠিত হলো না কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সীমন্তে শ্বেত-সর্ষপযুক্ত দূর্বাঙ্কুর দিয়ে আশীর্বাদ করল না কেউ ঊষাকে। শুধু একটি রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে প্রজ্জ্বলিত একটি গোলাকার ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করে নীরবে নিঃশ্বাসের মিলিত হলো [illegible] দুটি প্রাণের [illegible]। বাইরের এই গোলাকার অগ্নিকুণ্ডটি যেন [illegible] [illegible] দুটি [illegible] অনির্বাণ [illegible]। [illegible] এমনি করে চিরদিন [illegible] থাকবে ওদের [illegible]। কোনদিন নির্বাপিত হবে না সে [illegible] পাপ ও কোনদিন ম্লান হবে না তার নিষ্কম্প শিখা।

[illegible] চিত্রলেখা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকলের দৃষ্টিপথে। [illegible] [illegible] তার কথা গোচরীভূত হয়ে পড়বে তাঁর।

কিন্তু কবে কতকাল পরে শেষ হবে তাদের এই বন্দীজীবন? ঊষা ও অনিরুদ্ধ দুজনেই ভাবতে থাকে। জ্বলন্ত প্রেমাগ্নি দ্বারা উজ্জ্বলিত দুটি ললিততনুর আপাত সুখের অন্তরালে শংকানিবিড় এক বিষাদের ছায়া ঘন ও ব্যাপ্ত হয়েই উঠতে থাকে দিনে দিনে। ক্রমে সেই ছায়াটি প্রকট হয়ে ম্লান করে দেয় ওদের সমস্ত উজ্জ্বলতা।

কাঞ্চনকুসুমের মত স্বর্ণপ্রভ শারদ অপরাহ্নের রৌদ্রলিখায় অলিম্পিত হয়ে আছে শোণিতপুরীর শ্যামশষ্প বনভূমি। গাঢ় বিষাদে স্তব্ধ হয়ে আছে পুষ্পহীন তমাল ও কদম্বতরুর ছায়া। পুন্নাগ পরাগ কেশরের গন্ধভারে মন্থর হয়ে উঠেছে সরোবরতীরের শীকরসিক্ত বাতাস। সেদিন ঊষা ও অনিরুদ্ধ দুজনেই বিস্মৃত হয়ে যায় চিত্রলেখার সতর্কবাণী। রাজ-অন্তঃপুরের সেই শঙ্খধ্বনি পাষাণস্তূপের সীমানা ত্যাগ করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলে ওরা। রাজনন্দিনী ঊষার সঙ্গে এক অপরিচিত যুবককে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠে দ্বাররক্ষীর দল। কিন্তু কাছে এসে প্রশ্ন করবার সাহস পায় না কেউ।

বৃন্তচ্যুত অজস্র কুসুমখচিত শ্যামল তৃণভূমির উপান্ত পার হয়ে গিয়ে সরোবর তীরে একটি সপ্তপর্ণ তরুতলে বসে দুজনে। মরকতমণিসন্নিভ সরোবরের নীরে মৃদু সমীরণহিল্লোলে দোলায়িত কল্লোৎপলভারে অবনত মৃণালগুলির দিকে অনিমেষনয়নে চেয়ে থাকে।

বিষণ্ণ অক্ষিপল্লবগুলি তুলে শান্তকণ্ঠে বলে অমিতনয়না ঊষা, আপনার জন্য সত্যই আমি দুঃখিত কুমার। আমার আত্মসর্বস্ব প্রেমে ধিক। যে প্রেম প্রেমাস্পদের মুক্তজীবনকে আপন অন্তঃপুরের স্বর্ণপিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে কামনা চরিতার্থতা মানসে, সে প্রেম একান্তভাবে স্বার্থপর ও ঘৃণ্য নয় কি?

নবজলধারাসিক্ত বনভূমির সৌরভে মত্ত মাতঙ্গের মত কুমার অনিরুদ্ধ বক্ষোলগ্না ঊষার বদনসৌরভবিশিষ্ট অধরোষ্ঠ বারবার চুম্বন করেও তৃপ্ত হন না যেন। কোন কথা না বলে অন্তরের অনন্ত অকৃত্রিম প্রণয়রস অজস্র চুম্বনলিখায় দ্বারা অঙ্কিত করে দিতে চান যেন ঊষার পূর্ণচন্দ্রানিন্দিত মুখমণ্ডলে।

প্রণয়বিহ্বল এক নিবিড় আবেগে নীলাকাশের দিকে খঞ্জননিন্দিত দুটি চক্ষুর দৃষ্টি তুলে ঊষা বলে, মনে হয় স্ফটিক-কুট্টিম পরিশোভিত এই পাষাণ প্রাসাদের সীমানা ছেড়ে বহুদূরে দুজনে চলে যাই; তারপর কপোতকূজিত কোন এক পুষ্প-

কাননের নিভৃতে কোবিদারতরুর স্বর্ণ-ছায়াতলে একটি লতাগৃহ রচনা করি।

সব কথা শেষ হলো না উষার। সহসা কার বজ্রগর্জনে প্রকম্পিত হয়ে উঠল সমগ্র কাননভূমি। সন্ত্রস্ত উষার মুখ থেকে সব কথা শুনে বিদ্যুৎবিলসিত এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন দৈত্যরাজ বাণ। উষা ও অনিরুদ্ধ দুজনেই অনুভব করল, বাণের সেই সন্ত্রাসনিষ্যন্দী হাসির শব্দাভিঘাতে স্খলিত ও বিচূর্ণিত হয়ে পড়ছে তাদের প্রতিটি বক্ষঃপঞ্জর। সেই বিভীষিকাময়ী হাস্যবেগ প্রশমিত করে দৈত্যরাজ জীমূত-মন্দ্রে বলেন, আমার জ্ঞাতিশত্রু কৃষ্ণের পৌত্র প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ হবে আমার জামাতা! হাসালে আমায় বৎস। কিন্তু স্মরণ রাখবে, অবিবাহিতা কন্যা পিতার অধীনা, এই যুবক শত্রু বা মিত্র যেই হোক, আমার অজ্ঞাতসারে তাকে পতিরূপে গ্রহণ করে যে অন্যায় তুমি করেছ আমি তা কখনই ক্ষমা করব না।

শরবিদ্ধ বিহঙ্গীর মত ব্যথাহত কণ্ঠে উষা বলে, যা শাস্তি দেবার তা আমায় দিন; কুমারকে কোন শাস্তি দেবেন না। কারণ কুমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আমিই একমাত্র অপরাধিনী। আমি স্বেচ্ছায় তাঁর প্রতি অনুরাগিনী হয়ে গান্ধর্বমতে তাঁর সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি।

ক্রোধকুটিল নেত্র হতে অগ্নি বিচ্ছুরিত করে বাণ উষাকে বলেন, গান্ধর্বমতের কোন আচার আচরণ অসুরাধিপতি বাণের রাজ্যে কখনো চলবে না। মোহপ্রসাবিণী অগ্নির জ্বলন্ত রূপে আকৃষ্ট হয়ে মূঢ় পতংগের মত এই যুবক ন্যায়ধর্মে বীরধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে সামান্য এক নারীর মোহে পররাজ্যে তস্করের মত গোপনে প্রবেশ করেছে। সুতরাং একে আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। আর তোমার শাস্তিস্বরূপ আমার নির্বাচিত অসুরকুলোদ্ভব কোন যুবককে বিবাহ করতে বাধ্য করব আমি। তুমি আমার কন্যা হলেও ইচ্ছার স্বাধীনতার নামে তোমার স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দেব না কোনদিন।

নিমজ্জমান ব্যক্তির ভাসমান কোন তুচ্ছ তৃণখণ্ড অবলম্বনের মত একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে উষা। কাতরকণ্ঠে বলে, আপনি অসুরাধিপতি; মহাদেবের বরে আসুরিক শক্তির উপাসনায় আপনি সিদ্ধ। কিন্তু প্রেমধর্মের মর্ম উপলব্ধি করতে আপনি সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। দেব দানব ও গন্ধর্বলোকে প্রেম এক মহান ধর্মরূপে পরিগণিত। আমি কুমারের প্রতি স্বপ্ন-দর্শনে প্রেমাসক্ত হয়ে তাঁর শরণাগত হওয়ায় উনি অন্য সব ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র প্রেমধর্মের খাতিরে গোপনে এখানে এসে মিলিত হয়েছেন। আপনি বৃথা গঞ্জনা ও ভর্ৎসনা দ্বারা মনোক্লেশ দান করছেন কুমারকে।

কিন্তু উষার কোন যুক্তিজালই প্রশমিত করতে পারল না দৈত্যরাজ বাণের কোপ-বহ্নি। শত অনুনয় বিনয়েও বিন্দুমাত্র শিথিল হলো না কুমার অনিরুদ্ধের প্রতি তাঁর প্রদত্ত দণ্ডাদেশ। মুহূর্তে কয়েকজন দৈত্যাকার দ্বাররক্ষী এসে প্রাসাদান্তর্গত প্রস্তরনির্মিত একটি অন্ধকার কারাগারের মধ্যে নিয়ে গেল কুমার অনিরুদ্ধকে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। সেই সপ্তপর্ণতরুতলে মৃদুচঞ্চল ছায়াবিচূর্ণিত চন্দ্রালোক দ্বারা বিধৌত তৃণশয্যার উপর দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ ক্রন্দনে বিলাপ করতে থাকে প্রিয়বিচ্ছেদব্যথাতুরা একাকিনী উষা। তার অশ্রুবাষ্পে মলিন হয়ে উঠেছে যেন অমলধবল চন্দ্রালোকের সমস্ত উজ্জ্বলতা। জ্যোৎস্নামোদী বাতাসের সমস্ত কুসুমা-ভিসারী চঞ্চলতা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেছে তার শব্দহীন বিলাপের সুগভীর হাহাশ্বাসে। বেদনাবিহ্বল মনের বিলীয়মান চেতনা নিয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে উষা। চেতনাবিরহিত বিবশ দেহের জড়ভার আর বহন করতে না পেরে ভূলুণ্ঠিত লতাবল্লরীর মত পড়ে যায় ভূতলে আর সংগে সংগে চিত্রলেখা এসে সযত্নে তুলে ধরে। সুখদুঃখের অবিরাম সহচরী কিংকরী চিত্রলেখা বীজনপত্র সঞ্চালন সহযোগে প্রিয়বচন দ্বারা প্রীত করবার চেষ্টা করে রাজনন্দিনীকে।

সম্বিৎ পেয়ে নিদাঘশুষ্ক ক্ষীণকণ্ঠ তটিনীর মত কাতরস্বরে অনুনয় করে উষা, স্বর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষীর মত প্রস্তরকারাপ্রতিম এই রত্নপ্রাসাদ মধ্যে পিতৃস্নেহপিঞ্জরে আর আবদ্ধ থাকতে চাই না আমি সখি। তুমি আমাকে আর কুমার অনিরুদ্ধকে অবিলম্বে উদ্ধারের ব্যবস্থা কর। এ দুঃখ আমি কেমন করে ভুলব সখি, এ মুখ আমি কেমন করে তাঁকে দেখাব ভবিষ্যতে, আজ আমারি জন্য আমারি প্রেমের প্রতিদান দিতে গিয়ে অন্ধকার কারান্তরালে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাঁর অমূল্য জীবন।

অনন্যোপায় হয়ে দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করে যোগমায়াশ্রিতা চিত্রলেখা এবং তাঁরই নির্দেশে দ্বারকাপুরীর পথে রওনা হয়ে যায়। যাবার আগে একবার উষাকে সতর্ক করে দিয়ে যায় চিত্রলেখা, মানবরূপী দেবতাত্মা কৃষ্ণকে তুমি চেনো না রাজকুমারী। কুমার অনিরুদ্ধের উদ্ধারকল্পে স্ফুরিত হবে তাঁর যে বিরাট সমরোদ্যম, তাতে বিধ্বস্ত হবে এই শোণিতপুরীর শ্বেতমর্মরনির্মিত বিশাল প্রাসাদ, বিচূর্ণিত হবে দৈত্যরাজের আকাশচুম্বিত দম্ভ।

আশ্বস্ত হয় উষা। নিদাঘান্তিক শীতল বায়ুবলয়িত বক্ষশ্বাসের মত স্বস্তিতর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, তাই হোক সখি। বিবাহিতা নারীর পতিই একমাত্র আশ্রয়-স্থল। বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত মৃত্যু-সন্ধুক্ষিত পতিহীনা প্রাণ নিয়ে আমি বাঁচতে চাই না। তাছাড়া আত্মগত কামনা পূরণই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয় সখি, আমি চাই দম্ভসম্বলিত কঠোর রাজধর্মের উপর মমতামেদুর প্রেমধর্মের জয়।

চিত্রলেখার মুখে বারতা পাবামাত্র দ্বারকাপতি কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন বহু সৈন্য-সমভিব্যাহারে শোণিতপুরের পথে [যাত্রা] করলেন সংগে সংগে। তীরবেগে [পথ অতিক্রম] করে অচিরে উপস্থিত হলেন শৈল[মালা]শায়িত শোণিতপুর নগরীতে। [রণভেরীর] নির্ঘোষে নিনাদিত হলো চতুর্দিক। গজ ও অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলি[রাশি] গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আচ্ছন্ন করে সমগ্র আকাশ। দৈত্যরাজ বাণও অসুরসৈন্যসহ সজ্জিত হয়ে রণসাজে।

প্রাসাদশিখর হতে চিত্রলেখার একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল উষা সম[র] দিকে। অলখ্যে সৈন্যদেহস্রুত শোণি[তে] আর্দ্র ও রক্তবর্ণ হয়ে উঠল সমুখিত রাশি। বর্মধারী বীরবৃন্দের কোষ অসির আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হতে লাগল বিলোলঘণ্টাধ্বনিত গ[জের] বিশাল দন্ত হতে। তুরঙ্গমস্কন্ধনি[বদ্ধ] দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল শো[ণিত] সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ বক্র নখাগ্রভাগে।

দেখতে দেখতে ব্যথাহত হয়ে কোমলপ্রাণা উষা। অবশেষে চেতনা [হারিয়ে] ফেলে। মুকুলিত কমলদল মধ্যে বিম্বিত শশাংকপ্রতিমার মত স[খী] সহচরীবৃন্দ মধ্যে বিরাজ করতে অচেতন উষা। অসমাবর্তিনী... পড়ে তার কবরীবদ্ধ কেশপাশ। দ... শীতল সলিলসিঞ্চনে উষা চেতনা পাবার সংগে সংগে সেই শুভ সংবাদ [দান] করে চিত্রলেখা। দৈত্যরাজ বাণ প[রাজিত] হয়েছেন অমিতবিক্রম কৃষ্ণ ও প্রদ[্যুম্নের] বিশাল বাহিনীর কাছে। ভূলুণ্ঠিত তাঁর গগনচুম্বিত দম্ভ আর সংগে কারামুক্ত হয়েছেন কুমার অনিরুদ্ধ।

তবু একবার সংশয়বিকম্পিত প্রশ্ন করে উষা, এ কি সত্য চিত্রলেখা?

একবাক্যে উত্তর দেয় সমস্ত স[খী], আপনি নিশ্চিন্ত রাজনন্দিনী। কৃ[ষ্ণ ও] প্রদ্যুম্নের অলৌকিক সমরপ্রতিভায় [বিস্মিত] হয়ে দৈত্যরাজ স্বীকৃতিদান ক[রেছেন] আপনাদের বিবাহকে; আশীর্বাদ ক[রেছেন] আপনাদের।

সহসা সসংকোচে পলায়ন ব্যঞ্জনিকাবৃন্দ। উষা পিছন ফিরে [দেখে] কুমার অনিরুদ্ধ। উষার চম্পককলির অঙ্গুলিসমন্বিত একখানি হস্ত [নিজ] করমধ্যে ধারণ করে অনিরুদ্ধ বলেন, কমলায়তাক্ষি, এস রথ প্রস্তুত। [তোমার] অনিন্দ্যসুন্দর রূপের বিভায় উজ্জ্বল [করে] তুলবে চল আমাদের দ্বারকাপুরী। মা[য়া]রূপিণী, আজ আমাদের কাছে আহবে [শুধু] দৈত্যরাজের যে পরাজয় তা নিতান্ত প্রেমধর্মের কাছে দম্ভোচ্ছ্বসিত আসু[রিক] শক্তির পরাজয়। আজ আমাদের এই প্রকৃতপক্ষে তোমার জয়। তোমার অভি[লাষ] পূর্ণ হয়েছে প্রিয়ভাষিণী। এস, বিলম্ব করো না।

ওদের জন্য ভাবুন

দখতে দেখতে আর একটা বছর চলে এলো। ত্রয়োদশ বিশ্ব বিকলাঙ্গ। এই বিশ্ব বিকলাঙ্গ দিবস এখন ীর সারা দেশের সাথে তাল রেখে ও বিশেষ উদ্দীপনার সাথে পালিত এই বিশ্ব বিকলাঙ্গ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হোল বিকলাঙ্গ অর্থাৎ যাঁরা ীন-মূক-বধির-পঙ্গু তাঁদের পুন-র কথাটা ঐদিনে প্রতিটি স্বাভাবিক নর কাছে জানানো। বিকলাঙ্গরাও া জনগণের চেয়ে কোন অংশে কমতি

শ্ব বিকলাঙ্গ দিবসের শুরু ১৯৫৯ । ২০শে সেপ্টেম্বর সুইজারল্যাণ্ডে। রল্যাণ্ডের একটি শহর জুরিখ-এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসে এবং সেই ন থেকে শপথ নেওয়া হয় দুনিয়ার ঙ্গ ভাই-বোনেদের পুনর্বাসনের প্রচারের জন্য বিশ্ব বিকলাঙ্গ দিবস বছর প্রতিপালিত হবে প্রতি বছরের াসের তৃতীয় রোববার। তবে ইটালীর বকলাঙ্গ কল্যাণসংস্থা ফির্মিটিক) সালে বিকলাঙ্গ দিবস পালন করে। র ঢেউ ভারতের তীরে এসে আছড়ে বোম্বাইয়ে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর হ্যাবিলিটেশন অফ দি হ্যাণ্ডিক্যাপড ১৯৬৩ সালে বিশ্ব-বিকলাঙ্গ টিকে সর্ব প্রথম ১৯৬৩ সালে প্রতি- ় করে। আর রূপসী কোলকাতায় বিকলাঙ্গ দিবসের শুচিতা এসে য় ১৯৬৪ সালে। পৃথক পৃথক ভাবে াতার কয়েকটি সংস্থা এই দিনটিকে করে আসছিল। শেষে ১৯৬৭ সাল সব সংস্থাগুলো একসঙ্গে বিশ্ব-ঙ্গ দিবসটিকে বিশেষ শপথের দিন পালন করে আসছে।

আমরা সেই দেশেই বাস করি যে-দেশে রয়েছে ৯০ লক্ষ পঙ্গু, ৫০ লক্ষ দৃষ্টিহীন, ২০ লক্ষ মূক ও বধির, ১৫ লক্ষ মানসিক বিকল এবং এছাড়া রয়েছে ২০ লক্ষের মত মানুষ যাঁরা বিভিন্ন ব্যাধিতে দৈহিক অপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে পঙ্গুর সংখ্যা প্রায় ৫৬ হাজারের মত এবং দৃষ্টিহীনের সংখ্যা ৪ লক্ষ। এ-ছাড়া একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ দৃষ্টিহীন, ৫ লক্ষের মত পঙ্গু, ২ লক্ষা-ধিক বধীর ভারতে রয়েছে। বহু সমস্যার মত এই সমস্ত বিকলাঙ্গদের পূর্ণ পুন-র্বাসন দেওয়াও ভারতের একটি অন্যতম মহা সমস্যা। অথচ অন্যান্য দেশের মত ভারতে বিকলাঙ্গদের জন্য পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে বেশ দেরী হয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বোম্বাই শহরে বিকলাঙ্গ ও পঙ্গুদের পুনর্বাসন তথা চিকিৎসার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে শ্রীমতী ফতেমা ইসমাইল ভারতের বিকলাঙ্গ ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় রোটারী ক্লাবের প্রচেষ্টায় অনু-রূপ একটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। এই প্রতিষ্ঠানটি কলকাতা তথা পূর্ব ভারতে প্রথম ও ভারতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। স্বর্গতঃ বিধানচন্দ্র রায় পোলিও হাস-পাতাল একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

সারা পশ্চিমবঙ্গে অন্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৬টি যেখানে দৃষ্টিহীন ভাইয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। সারা ভারতে দৃষ্টিহীনদের প্রতিষ্ঠান রয়েছে মোট ১১০টির মত। বিকলাঙ্গদের বিশেষ করে পঙ্গুদের জন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে সারা ভারতে ৬০ থেকে ৬৫টির মত। পশ্চিম-বঙ্গে রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান ১০টি মাত্র। মূক ও বধিরদেরও প্রতিষ্ঠান রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭।৮টা।

বিকলাঙ্গ ভাই-বোনেদের পুনর্বাসনের জন্য পৃথিবীর প্রতিটি দেশ আজ জেগে উঠেছে। সমাজের জন-জীবনের সকল সমস্যার মত এই পুনর্বাসন সমস্যাও একটি অন্য-তম প্রধান সমস্যা। তাই দেখি, ইংল্যাণ্ডে বিকলাঙ্গ ভাই-বোনেদের চাকুরীতে নিয়োগের জন্য একটি আইন চালু হয় ১৯৪৪ সালে। এই আইনানুযায়ী যে-সংস্থায় ২০ জন বা তার বেশী ব্যক্তি নিয়ো-জিত থাকবেন সেই সংস্থায় শতকরা ৩ জনের মত বিকলাঙ্গকে চাকুরীতে বহাল কোরতে হবে। পশ্চিম জার্মানীতেও অনু-রূপ আইন বলবৎ রয়েছে। তবে শতকরা ৮ জনকে চাকুরী দিতে হবে এই আইনের আওতায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট কমিটি বিকলাঙ্গদের পুনর্বাসনে সহায়তা করে। বিদেশের সাথে তাল মিলিয়েই ভারত সরকার ১৯৫৮ সালে একটি বলিষ্ঠ তথা সুমহান পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন। ন্যাশানাল এডভাইসরি কাউন্সিল ফর দি এডুকেশান অফ দি হ্যাণ্ডিক্যাপড একটি বিশেষ চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেন। এবং শেষপর্যন্ত ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে বোম্বাইতে প্রথম এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ গড়ে ওঠে। দিল্লীতে দ্বিতীয় একসচেঞ্জ গড়ে ওঠে ১৯৬১ সালের মার্চে, ১৯৬২ সালের এপ্রিলে মাদ্রাজে তৃতীয় ও চতুর্থটি গড়ে ওঠে ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে হায়দ্রাবাদে। কোল-

ব্লাইন্ড বয়েজ স্কুলে অন্ধ ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা
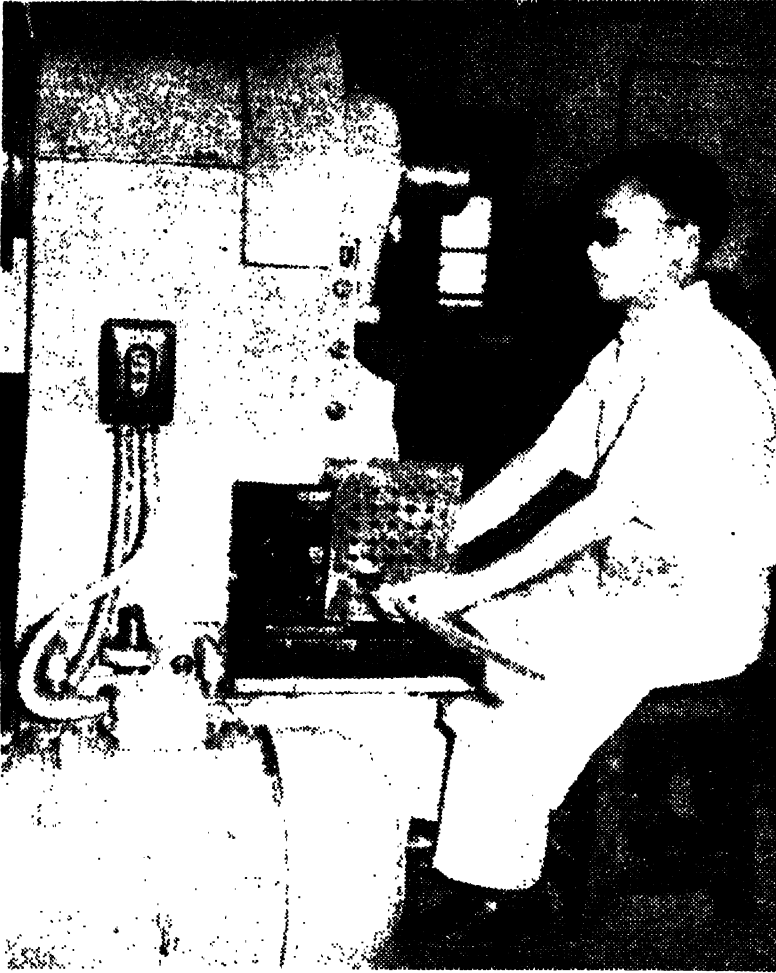
কাতায় পঞ্চম এক্সচেঞ্জ গড়ে উঠলো ১৯৬৩ সালের এপ্রিলে। এরপর স্পেশ্যাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ গড়ে উঠলো আরও চার-চারটি — আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, জলন্ধর এবং কানপুরে।

স্বাভাবিক মানুষ যা শিখতে পারে ১ বছরে তা শিখতে বিকলাঙ্গ ভাই-বোনেদের লাগে পাঁচ বছরের মত। তাই সেদিকে তাকিয়ে ভারত সরকার সরকারী চাকুরীর বয়ঃসীমা বিকলাঙ্গদের ক্ষেত্রে পাঁচটি বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন। চাকুরীতে নিয়োগের সময়ও পাঁচ বছরের বেশী বয়স পর্যন্ত বয়স শিথিল করা হয়েছে। অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মহীশূর এবং মাদ্রাজ সরকার চাকুরী বিনিয়োগ ক্ষেত্রে বয়সের সীমা ১০ বছরের মত শিথিল কোরে দিয়েছেন। অনুরূপ ব্যবস্থার কথা পশ্চিমবংগে ১৯৬৮ সাল থেকে চলছে। ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবংগে অনুরূপ সংস্থাটির চালু থেকে প্রায় ৭০০ জনের মত বিকলাঙ্গ ভাই-বোনকে চাকুরী পাবার সুযোগ করে দেওয়া হোয়েছে। একটি মেডিক্যাল বোর্ড আছে, তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরে দেখে শারীরিক সক্ষমতানুযায়ী বিকলাঙ্গ ভাই-বোনেদের চাকুরীর ব্যবস্থা তাঁরা কোরে দেন। বিশেষ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিকলাঙ্গ ভাই-বোনেদের কর্ম-সংস্থান কোরে দেওয়ায় সমাজের বিরাট একটা সমস্যার সমাধানে দরাজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিকলাঙ্গ ভাই-বোনেরা প্রমাণ দিয়েছে সুযোগ ও সুবিধা পেলে তারাও স্বাভাবিক মানুষদের মত জীবনের সকল ক্ষেত্রে যথা সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক বিস্ময়ের সৃষ্টি কোরতে পারে। সরকারের দেখাদেখি ভাই ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন ফর দি ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপড্ নামে একটি সমিতি কোলকাতায় গড়ে ওঠে ১৯৬৪ সালে। বিকলাঙ্গ বন্ধুদের অভাব-অভিযোগ লাঘব করা ও কারিগরী শিক্ষা প্রদান করাই এদের মূল লক্ষ্য। এই বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ কো একটি কোরে কারিগরী শিক্ষা পরিচালনা করে থাকে এবং নিজস্ব পত্রিকার মাধ্যমে এদের [illegible] হোয়ে থাকে।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিরূপে বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় সময় বোঝা যায় না। একটি ই একটি অঙ্গের নাশ হলে অনেক সম ইন্দ্রিয় বা অন্য অঙ্গের ক্ষমতা রকমে বৃদ্ধি পায়। যেমন দৃ অনেক সময় ভাল গায়ক হয়। মূ হলে অনেক সময় দৃষ্টিশক্তির ক্ষম বৃদ্ধি পায় যে, সামান্য ঠোঁটের লক্ষ্য করে সব কথা বুঝতে পা মানুষ হাতের অভাবে পায়ের ছবি আঁকতে পারে। আবার এমন আছে—হাত-পা দুই-ই নেই তারা তুলি ধরে ছবি আঁকতে পারে। সব ছবি সাধারণ স্বাভাবিক আঁকা ছবির চেয়ে কোন অংশে সাধারণ ছবির সমকক্ষ নিয়ে সমান মর্যাদা লাভ করে। তাই যাচ্ছে, পঙ্গু অর্থাৎ বিকলাঙ্গ বোনেরা ইচ্ছে করলে নিজেদে সুন্দর সুন্দর কাজে নিযুক্ত কোরে পারে।

তবে এ-কথা ভুললে চলবে না কথা বলে ওদের পুনর্বাসন দেওয়া না। বিকলাঙ্গ ভাই-বোনেদের প্রতি ভীতির ছবি তুলে ধরতে হবে। সমাজের 'করুণার পাত্র' শুধু—এক যেতে হবে। ওদের প্রতি সহানু হতে হবে। ভাবতে হবে ওদের কথা কোরতে হবে প্রতিটি বিকলাঙ্গ আমাদের ভাই-বোন। তাদের সমা র্বাসন দেওয়াটাই হোল প্রধান যেহেতু বিকলাঙ্গ সেহেতু কর শুধু একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য চলবে না। বিকলাঙ্গ ভাই-বোনে আমাদের কাছ থেকে আন্তরিক সহা সেটুকু পেলেই তারা নাকি অনেক পায়। সেটুকুও তো আমরা দেখতে যাই। সম্প্রতি বাংলাদেশে জঙ্গী বর্বরতা রুখতে গিয়ে দেশের স্বা জন্য বহু ভাই-বোনেরা তো হোয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ বা বাংলাদেশ সরকার কি তাদের ভুলে নিশ্চয়ই যাবে না। সমাজে তাদের র্বাসন নিশ্চয়ই হবে। বিশ্ব-বি দিবসে আসুন আমরা শপথ নিই-বিশ্বের বিকলাঙ্গ ভাই-বোনেরা ভাই—তাদের সমস্যা আমাদের সমস্যা। তাদের প্রতি সহানু দৃষ্টি দেব।

—মাণিকলাল

।। সতেরো ।।

হাজীবাবুর গ্যারেজ থেকে যেদিন নতুন রূপে গাড়িটো বেরিয়ে আসে সম্ভবত রূপপুরে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। ব্রজর সে কী কানফাটানো চিৎকার—আ রে মেরে রূপপুরবালি। মারে মেরে দিলপিয়ারি। আররররর ছর্-রাহর্ নাচনেবেলি! প্রিং প্রিং হর্ন বাজায় আর সিটে বসে পাছা ঠুকে নাচে ব্রজ ড্রাইভার। বিকট চ্যাঁচায় সে—চলো রে বিবি-জান! উররররর্ ঝকমক শাড়ি ঠোঁটে পান! হই যানেবালে লোক। বেজোর পিয়ারি ক্ষেপেছে হে, ক্ষেপেছে!

হাইওয়ে দিয়ে জোরে ছুটেছে স্টেশন-অভিমুখে। ব্রজর চেঁচানি শুনে দুপাশে লোক জমে যাচ্ছে। গাড়িটার আষ্টেপৃষ্ঠে কুমারি ফুলের ঝালর—যেন বিয়ের গাড়ি। আর সারাদুপুর মদও গিলেছে ব্রজ। চাপতে যাবার সময় তো রীতিমতো টলছিল। কিন্তু মোটো পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলে নিয়েছে—ব্রজর গা টলে স্যার, হাত টলে না।

টলে না তা বোঝা যাচ্ছিল ক্রমশ। শেষবেলায় মেলার ভিড় বাড়ে হাই-ওয়েতে। প্রতিমুহূর্তে চন্দন ভাবছিল, এক্ষুনি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। অথচ ঘটছে না। গরুর গাড়ি রিকশো ট্রাক বাস আর পায়েচলাদের পাশ কাটিয়ে যেভাবে এগোচ্ছে, ব্রজকে বাহাদুরি দিতে হয়।

কিন্তু লজ্জায় পড়ে গেছে চন্দন। সে আড়ষ্ট হয়ে ব্রজর বাঁয়ে নিজেকে কতকটা গোপন করেই বসেছে। এত হই-চই চেঁচা-মেচি আর পাগলামি সুরু করবে ব্রজ, সে ভাবতেই পারেনি। রুস্তমদের পেট্রোল পাম্পের সামনে আসতেই সে সিগ্রেট ধরানোর ছলে মাথা নিচু করেছিল। পরে মাথা তুলে পিছনে একবার দেখে নিয়েছে। হকসায়েব আর কারা যেন বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কোন মেয়ে সেখানে ছিল না—তা নিশ্চিত।

গাড়িটার চলার শক্তি যাচাই করতে গিয়ে ব্রজর মাথায় এত সব খেলে গেছে। গোড়ায় চন্দনের মৃদু আপত্তি শুনে সে একগাল হেসে বলে দিয়েছে—পাবলিসিটি চাই স্যর, পাবলিসিটি! এখন মেলার মরশুম। রাস্তার লোক রাজ্য জুড়ে খবর ছড়াবে বুঝলেন না?

আসল উদ্দেশ্য যেন তা নয় ব্রজর। গাড়ি অচল হলে যারা ওকে ঠাট্টা করেছিল, কিংবা গাড়িটা সচল থাকতেও যারা ব্রজকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে—সবার চোখের সামনে এমনি করে ব্রজ তার শোধ তুলছে সম্ভবত। সে কখনও একহাতে স্টিয়ারিং ধরে—কখনো একেবারে ছেড়ে দিয়ে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে সবার দৃষ্টি টানছে গাড়িটার দিকে। ছড়া কাটছে। গান গাচ্ছে। সীটে ধুপধাপ পাছা ঠুকছে আর কোমর দোলানোর চেষ্টা করছে।

চৌমাথার কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল সে। আশ্চর্য হাত ব্রজর! গোল ছোট্ট পার্কে ঘাসের ওপর প্রতিদিনের মতো আড্ডা দিচ্ছিল একদল ছেলে। ব্রজ হাত বাড়িয়ে ডাকল—কাম অন, কাম অন মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস।

তারা লাফিয়ে উঠল। তারপর হুল্লোড় করে দৌড়ে এল রেলিং ডিঙিয়ে।...আরে ব্বাস! এ যে ব্রজদার সেই রূপকুমারী!...... আরে, রূপকুমারী আজ ফুলকুমারী হয়ে গেছে!... এই ব্রজদা, ছাদে চাপব মাইরি!... ব্রজদা, ও ব্রজদা, এ যে ময়ূরপঙ্খী নাও ব্রজদা!

ছাদে মচমচ শব্দ হচ্ছিল। চন্দন উদ্বিগ্ন-ভাবে বলল, আহা, ভেতরে জায়গা আছে! ব্রজ চোখ টিপল। ছাদে হুল্লোড় চলছে। গলা ধরেছে ওরা। আরো কারা সব দৌড়ে এল চারপাশ থেকে। এখানে চারদিকেই দোকান—চারটে রাস্তায় ছড়ানো। সামনেটার হাইওয়ে বেরিয়ে গেছে। দুতিন মিনিটের মধ্যেই গাড়ির ভিতর-বাইরে গাদাগাদি ভিড়। চন্দনের একটুও ভালো লাগছে না। ব্রজর ওপর রাগ হচ্ছে। কিন্তু ব্রজ নির্বিকার হাসছে আর হেঁড়ে গলায় গান গাইছে। গাড়ি ফের স্টার্ট দিয়ে সে মুখটা চন্দনের দিকে ঘুরিয়ে চোখে ঝিলিক তুলল। চাপা গলায় বলল, এইবার বুঝুব কেমন হয়েছে—বুঝলেন স্যার? ওপরচাপ আর ভিতরচাপ সমলে যদি বিবিযান নাচেন, জানবেন অলরাইট। নয়তো ফের ওষুধ খাওয়াতে হবে।

হ্যাঁ—এ চাপ এখন সামলে নিলেও মাস-টাক পরে বিবিজানের কী হবে, সেটা বলা কঠিন। চন্দন ভাবছিল। এযাবৎ তৈরী শ্রেষ্ঠতম শক্তিশালী গাড়ির পক্ষেও রূপপুর রুটের এই ধকল সামলাতে কিছুদিনেই হাঁপানি দেখা দেবে—তা বোঝাই যাচ্ছে। রাজকমলবাবুর বউ কম দুঃখে এমন একটা আয়ের রাস্তা ছাড়েনি।

গাড়িও কিন্তু ব্রজর মতো বেপরোয়া। সমানে চলেছে আবার। ওপরে ছেলেগুলো সত্যি সত্যি নাচছে। মচমচানি বাড়াতে সেটা বোঝা গেল। উদ্দাম হাওয়ার ঝাঁক এল ফাঁকা মাঠে পৌঁছলে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ। দুধারে বড় গাছপালা নেই। শূন্য খয়েরি বাঁজা ডাঙা আর পিঙ্গল বিকেলের মাঠ। কোথাও কোন সবুজ নেই এদিকটায়।

ধু ধু প্রান্তরের দিগন্তে সূর্যটা লাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ-হঠাৎ কোথাও একটা বাঁজা-ডাঙার নিঃসঙ্গ বিশাল শিমুলে লাল ফুল দেখে মনে হয় এই কঠিন রুক্ষতাকেও বসন্তকাল মনে রেখেছিল।

তিন মাইল নেমে একটা বিলাঞ্চলের শুরু। দুপাশে বাবলাবন। বিকেল ফুরিয়ে এল। একটা শান্ত ধূসরতা নেমে আসতে থাকল মাঠের ওপর। আর সেই ধূসরতাকে বিশ্রীভাবে ফোঁড়াফুঁড়ি করে মাঝে মাঝে ট্রাক-বাসের খর হেডলাইট শিসিয়ে উঠল। ব্রজ চেঁচাচ্ছে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! ছাদের ওপর সেই কথাটা কেড়ে নিয়ে ওরাও গর্জে উঠছে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সামনের ট্রাকটা চাকা নামিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পাঞ্জাবী ড্রাইভার মুখ বের করে দেখছে। পিছনে একদঙ্গল কুলিকামিন লোক কী বুঝেছে কে জানে, হইচই করে সায় দিল যেন—কালো হয়ে আসা আকাশের পটে কতকগুলো হাত জোরে নড়তে থাকল। একটা বাসের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কানে এল—বেজো মলো রে! ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়! বাসের এ্যাসিস্ট্যান্ট বাসের গায়ে থাপ্পড় মেরে বলল, ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়! আর চেনা ড্রাইভার দেখে ব্রজ পিছনের সেই বাসটার উদ্দেশ্যে চেঁচাল একবার—কান্তদা, দেখা হবে হে!

দূরে আলোর ফুটকি জ্বলজ্বল করছে। আন্দি বাজার। আবার কী? এবার ফেরা যাক। চন্দন ডাকল, ব্রজদা! ব্রজ মুখ ফেরাল......দাদা বললেন! আপনিও? উরে ব্বাস! পরক্ষণে বিকট চেঁচিয়ে উঠল—চলো রূপপুর যানেবালে!

ব্রেক কষে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে গেছে গাড়িটা। সবাই সিগ্রেট জ্বালছে। হল্লার বিরতি নেই। চন্দন দেখল দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকা চাঁদ উঠেছে। তার নিচে সমুদ্রের মতো ছড়ানো অন্ধকার। এই তো শুরু। গাড়ি ব্যাক করে সাবধানে ঘোরাচ্ছে ব্রজ। ছাদের ওপর থেকে কে আওয়াজ দিচ্ছে—বাস, বাস, ঠিক হ্যায়। রাস্তা এখানে পাশের জমির প্রায় সমতলে। শুকনো নয়ানজুলি আর রাস্তার মধ্যে ঘাসের জমি।...ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাস। আর নয়—গর্তে পড়বে। ঠিক হ্যায়, রোখকে! গাড়ি ঘুরে রূপপুরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে। তারপর চলতে থাকল। অমনি দ্বিগুণ বেড়ে উঠল হল্লা। সামনে হেডলাইট আবার।......দূরে হটো, দূরে হটো! ব্রজ হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে—দূরে হটো এ গাড়িবালে, রূপকুমারী চলল ঘর।

ফেরার পথে হাওয়া আরও বেড়েছে। একটু-একটু ঠাণ্ডার ছোঁওয়া আছে। পাদানী থেকে একটা লোক উঁকি মেরে চন্দনকে বলল, নমস্কার সার!

চিনতে পেরে চন্দন বলল, ব্যাপারী না? এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। কখন চাপলেন আপনি?

চৌমাথায় সার।

ভিতরে এসে বসুন। এখানে জায়গা আছে।

সামনের দিকে চন্দনের পাশে তিনজন (এ লাইনের হিসেবে) বসে যাওয়া যায়। কেউ চন্দনের পাশে এসে বসেনি—অথচ জায়গা ছিল। চন্দনের প্রতি রূপপুরের মানুষের সমীহ আছে—সেই প্রমাণ কি? খুসি মনে চন্দন ফের ডাকল, চলে আসুন না।

মনিরুদ্দীন ব্যাপারী ভিতরে এল সাবধানে। তার চুলে কুসুমেল তেলের কড়া গন্ধ। গায়ে নীল ফুলশার্ট, পরনে ধুতি, পায়ে বুটজুতো, গলায় মাফলার। ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল।—বেজোদা, ভানমতীর খেল দেখিয়ে দিলে হে! বহুত আচ্ছা!

ব্যাপারীদা!... ব্রজ চন্দনের বুকের কাছ দিয়ে থ্যাবড়া মতো বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিল।...ধুস্ শালা! তুমিও আছো, তা বলতে হয় এতক্ষণে!

পিছনে কোরাসে ফিলমের গান গাইছে ওরা—অথবা গাইবার চেষ্টা করছে। নানা পর্দার গলা। সবাই স্ফূর্তিতে টালমাটাল। পাশের পাদানীতে কারা সারাক্ষণ হাসছে আর হাসছে। ব্রজ আওয়াজ তুলে বলল, কাল ছোটবিবিকে নিয়ে বহরমপুর চলো ব্যাপারীদা! স্যারের সামনেই বলছি, ওলো ভাড়া নেব না মাইরি—দিব্যি।......

মনিরুদ্দীন ফ্যাচ ফ্যাচ করে হেসে বলল, তাই যাব হে, যাব।...সার, আগে থেকে বলে রাখছি—একদিন গাড়ি আপনার গাড়িটা দিতে হবে।

কী ব্যাপার?... চন্দন বলল।...নিশ্চয় দেব। গাড়ি তো আপনাদেরই।

আমার শালার বিয়ে। রাস্তা কাঁচা হলেও এখন শুকনো খটখটে। ব্রজ তো চেনেই।

যাবে চন্দন। এই তো নতুন জীবনের সুরু। অতর্কিতে এসে পড়েছে এদিকে। এও একটা অদ্ভুত জীবন—গতির ছন্দে বাঁধা—কিছু প্রচণ্ডতা নেই, কেমন যেন শান্ত স্বচ্ছন্দ হালকা একটা সুর। মেঠো পথে ধুলো উড়িয়ে চলবে তার সবুজ স্টেশনওয়াগন। গাড়ির মধ্যে বর আর কনে। ফুলের বালয়। টোপর। কত সব মুখ, কত মানুষ!

চৌমাথায় ফিরে এল গাড়ি। বাজারের আলো চারপাশে। গাড়ি থেকে শেষ হল্লা চূড়ান্ত আওয়াজ দিয়ে ফেটে পড়ল। ধুপ-ধাপ মচ-মচ নেমে যাচ্ছে সব।...চলি বেজোদা, চলি সার।...বেজো, কাল পুণ্ডুলে যাচ্ছি—সীট রেখো।... ড্রাইভারদা, সামনে সীট চাই কাল। ফরেস্ট বাংলোর কাছে উঠব।... ব্রজদা... বেজোদা... ব্রজভাই... কত-রকম। আর, সার—বুক ফুলিয়ে চালান গাড়ি, আমরা আছি।...ছোটবাবু, নমস্কার—চললুম। দেখা হবে।... সার, আপনার গাড়ির অক্ষয় পরমায়ু হোক! আর কেউ বাসে চাপবে না—সব আপনার ওপর, হেঁ... হেঁ...হেঁ!

গাড়ি খালি হলে চন্দন বললে, ব্রজদা, পাশে কোথাও রেখে চলুন এবার চা খেয়ে নিই।

ব্রজ স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝুঁকে চুপচাপ ছিল কয়েক মিনিট। মুখ তুলে সোজা হল। ...একটা স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল, তাই না সার? উঃ, আমার কী যে হচ্ছে!... দুহাত বাড়িয়ে চন্দনের পাদুটো ছোঁ[য়ার] চেষ্টা করে কপালে ঠেকাল। চন্দন পা সরি[য়ে] নিয়েছে।...আপনি আমার জন্ম-জন্ম...

কী ব্রজদা?

কিছু না। গাড়ি সাইড করি।

বাস-স্ট্যাণ্ডের একপ্রান্তে ফাঁকা জা[য়গা] দেখে গাড়ি রাখল ব্রজ। তারপর দু[জনে] নামল। ব্রজ আর টলছে না। চন্দন আ[ড়]মোড়া ছেড়ে বলল, স্যাংগুভ্যালিতেই [চলুন]।

গুডি ঠিক হ্যায়!... ব্রজ অনুসরণ ক[রল] তাকে। আঙুলে চাবির রিং আলোয় ঝি[ক]মিক করে কাঁপছে। ঝিনঝিন দুলছে, বাজছে। গুনগুন করে গান গাইছে [ব্রজ]।

একটু চমকাল চন্দন। হকসায়েব দাঁড়ি[য়ে] কার সঙ্গে কথা বলছে—স্টেশনারি দোকা[ন]টার সামনে—পরক্ষণে মুখটা গম্ভীর ক[রে] সে। উঁচু রাখল। পাশ কাটিয়ে এগোল।

কিন্তু গায়েপড়া ব্রজ এদিকে [দেখে] ফেলেছে—হকসায়েব স্যার, এই যে! নমস্কার, নমস্কার! আরে, এতক্ষণ রূপপুরে [কী] কাণ্ড হল—ছিলেন কোথায় গো? [আসুন] দেখুন—আমার রূপকুমারী [illegible] থেকে ঘুরে এসেছে। দোওয়া করুন।

হকসায়েব ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। [illegible] কেমন আছো? হ্যাঁ, সে কথা [illegible] শুনেছি। তোমার মালিক কই? [illegible] দুপুরে কেরামতী দেখিয়েছ [illegible] বাবা ব্রজগোপাল!

মালিক ততক্ষণে নমস্কার সেরে সীতাং[শু]বাবুর চায়ের দোকানে ঢুকে পড়েছে।

ব্রজ ফিরে এলে সে বলল, ব্রজদা [হক]সায়েবের সঙ্গে গাড়ি নিয়ে কী কথা [হল]?

ব্রজ হাসল। তাকে ক্লান্ত দেখা[চ্ছে] এবার। রুমালে মুখ মুছে বলল, হকসা[য়েব] খুব খুসি। এ লাইনে সবাই খুসি [হবে] স্যার। হবে না কেন বলুন? [illegible] মজা দেবেটা কে? ওহে সীতাংশুদা, দেখ[তে] পাচ্ছ তো?

সীতাংশুবাবু এগিয়ে এল কাউন্টা[র] থেকে।...সব শুনেছি চন্দনবাবু। ভা[লো] ভালো। ব্রজর একটা গতিক হল [illegible] এ. ও কার কাছে না সাধাসাধি কর[ছে]। যাক গে, ট্রায়াল কেমন হল হে ব্রজ?

ব্রজ সোল্লাসে বলল, আরে ব্বাস! [illegible] লাংস অব্দি বদলে গেছে। [illegible] নবযৌবনের সুরু সীতাংশুদা।

ভিড় আছে টেবিলে। কোণের [illegible] পর্দা পড়ে আছে। [illegible] পা [illegible] যাচ্ছে—স্লিপারের সঙ্গে চপ্পল—নানারকম। চন্দন বলল, গাড়িটা তো নিলুম। আপ[না]দের আশীর্বাদ সীতাংশুবাবু। দেখা [যাক] নতুন ভেনচার—কী হয়।

হবে, হবে। এ লাইনে আঙুল ফু[লে] কলাগাছ হয় চন্দনবাবু। শুধু একটু [illegible] চয়ে চাই। ওরে নৃপতি, এদিকে চা আ[ন]। কিছু খাবেন চন্দনবাবু?

ব্রজ বলল, আমি অনেক খাব দাদা। [illegible] চা বিনিদুধে।...

সীতাংশুবাবু চলে যাচ্ছিল, চন্দন ডাকল—শুনুন।...চাপা গলায় সে বলল, সেই জায়গাটার কথা বলছিলেন—

আরে, সে তো আর আপনারা এলেনই না! শুনেছি, কোন মারোয়াড়ি এসে কথা বলে গেছে। হাজিসায়েবকে তাহলে আবার ধরতে হয়।

কালই ধরুন না।

বললে নিশ্চয় ধরব। ওই তো আমার কাজ।...সীতাংশুবাবু ঝুঁকে এল।...আর চন্দনবাবু ওটার কী হল? পরেশ-বাবুর ভাগ্যে যা ছিল, ঘটে গেল। তাবলে অসমাপ্ত কাজটা সমাপ্ত করতে দেরী হচ্ছে কেন? যাব নাকি ওনার স্ত্রীর কাছে। আমি ভাবছিলুম, এ্যাদ্দিন শোক-দুঃখ সামলাতে গেল।

নাঃ।...চন্দন হাসল।...ওটা ফেঁসে গেছে।

ফেঁসে গেছে? কে ফাঁসাল?

ব্রজ বলে উঠল আরে ছাড়ুন দাদা। ওসব একেলে মেয়েদের নিয়ে স্যার বিপদে পড়বেন নাকি? পথেঘাটে প্রেম করে বেড়ায় যারা—ছোঃ!

সীতাংশুবাবু হো-হো করে হেসে উঠল।...ব্রজর মুখে রাখঢাক নেই!

চন্দন বিকৃতমুখে বলল ও মেয়ে আমার চলবে না সীতাংশুবাবু।

তবে বলুন—অন্য মেয়ে দিচ্ছি। ওর চেয়ে রূপসী—উচ্চবংশ, পয়সাকড়ি আছে।

সে হবে। আগে জায়গাটা করে দিন শিগগির। চোত্‌মাসের শেষেই বাড়িটা করাব ইচ্ছে। জিয়াগঞ্জে ওদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। দেখাশুনো করতে পারিনে—দূরে পড়ে আছি।

কালই দেখছি। তবে—অন্যটাও ভেবে দেখবেন। ভালো পাত্রী হাতে আছে।

ব্রজ শুধোল এখানে ভালো পাত্রী আবার কে হে সীতাংশুদা?

আছে আছে। বলব'খন। আগে তোমার স্যারকে ঠিক করো।...বলে সীতাংশুবাবু কাউন্টারে চলে গেল।...

একটু পরে বেরোল দুজনে। অত উত্তেজনার পর ব্রজর ক্লান্তি স্বাভাবিক। কিন্তু চন্দন তো উত্তেজিত হয়নি মোটে। তবু তাকেও এত ক্লান্তি পেয়ে বসছে কেন? সে চুল খামচে ধরে সেই স্টেশনারি দোকানটার দিকে তাকাল। হকসায়েবকে দেখতে পেল না। গাড়ির কাছে এসে সাবধানে চারদিক লক্ষ্য করল। দেখল না ওঁকে গাড়িতে ঢুকে বলল, আমাকে পান্ডেজীর গদীতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যান। আমি পরে যাচ্ছি।

ব্রজ স্টার্ট দিয়ে বলল, আজ গাড়ি আমার বাসার সামনে রাখব স্যার। কাল থেকে গ্যারেজে দেব।

বাইরে ফাঁকায় কোথা রাখবেন?

ব্রজ হাসল।...আজ বউ ছেড়ে বিবি-জানের সঙ্গে শোব—কিছু মনে করবেন না স্যার।

চন্দন হেসে উঠল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে ব্রজ ডাকল, স্যার!

বলুন।

মাঝে মাঝে বেজা বেয়াদবি করবে। কানে নেবেন না।

নেব না।

মাঝে মাঝে হয়তো উল্টে আপনাকেই ধমকাব। রাজকমলদাকেও ধমকাতুম। কিছু মনে করবেন না।

বেশ তো।

ব্রজ গুনগুনিয়ে উঠল। সামনে বাঁ-দিকে পান্ডেজীর গদী। ব্রেক কষে সে বলল, বেশি দেরী করবেন না। হাসিকে আজ হাসপাতাল যেতে বারন করেছি। দুচারজন বন্ধুবান্ধব বেজার আছে স্যার—তাদেরও যেতে বলেছি। শিগগির ফিরবেন কিন্তু। এ লাইনে যখন এলেন, চেনাজানা থাকা দরকার। হঠাৎ শালা ব্রজ পটল তুললেও আপনার গাড়িকে তো গড়াতে হবে।

চন্দন ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, আরে—গাড়ির আসল মালিক তো আপনি।

ব্রজ বিকট চেঁচিয়ে উঠল—হেই রূপপুর যানেবালে!......

পান্ডেজী নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। চন্দনকে দেখে বললেন, আসুন, আসুন! আপনার কথাই ভাবছিলুম। তখন তো দেখলুম, খুব—একদম হল্লা করে চলেছেন...

নাঃ। ওরা চেঁচাচ্ছিল। ব্রজর পাগলামি।

চলুন, ওপরে যাই।

ওপরে খোলা ছাদে একটা সতরঞ্জি বিছিয়ে দিলেন পান্ডেজী। বসে বললেন, তো ঠিক লাইনসে এসে গেলেন চন্দনবাবু। আভি তো বিয়ের মরশুম সুরু হচ্ছে, খুব চাহিদা হবে। দিনে দোনো ট্রিপ, বাস! আর ব্রজও খুব সাচ্চা লোক। ওকে বিশওয়াস করা যায়।

চন্দন বলল, অ্যাসিস্টান্ট কাকেও রাখছি নে অবশ্যি। নিজে থাকব ওর সঙ্গে।

রুট-পারমিট মিলেছে?

হ্যাঁ। আগের রুটেই।

তো বাস। মজাসে চালিয়ে যান।

পান্ডেজী একটা এজেন্সি পাইয়ে দেবেন—বলছিলেন!

জরুর। পঁচিশ পারসেন্ট ডিপজিট সিরফ। বাস! রুপেয়া না থাকলে আমার কাছে লিন।

সে কিছু আছে, পান্ডেজী। সে জন্যে ভাববেন না।

হঠাৎ একটু ঝুঁকে চাপা হেসে পান্ডেজী বললেন, সে আমি অনেক আগে টের পেয়েছে চন্দনবাবু। পরেশবাবুকে আমি ভাল জানত।... তারপর ফিসফিস করে বললেন, কেতনা মিলা হ্যায় আপকো?

শিউরে উঠল চন্দন। অদূরে রাস্তার শালকাঠের পোস্ট থেকে সামান্য আলোর ছটা এসে ছাদে অস্পষ্ট আলো পড়েছে। পান্ডেজীর চোখ দুটো জ্বলছে যেন। হঠাৎ এক মুহূর্তে লোকটাকে অসম্ভব ধূর্ত মনে হল। বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে কেমন অবশ হয়ে পড়ল। আড়ষ্টভাবে শুধু বলল, তার মানে?

খিকখিক করে হাসলেন পান্ডেজী।...আমি জানি, বেচুবাবুর কাছে ছিল তিন হাজার। এক চালানের পুরা টাকা। লেকিন, সাঁইথিয়ার তিন ট্রাক মালের হিসেব আমার ছিল। উন্নিশ জানুয়ারি মাল পঁহুছ গেল। তেইশ রোজ সেগুলো গেল বর্ডারের দিকে। মনে পড়ছে চন্দনবাবু? আমি আপনার সাথে গপ করছিলুম? পরেশবাবু এসে গেলেন। আমি টাকার গন্ধ পাই, চন্দনবাবু। পরেশবাবুর সাথে সেদিন কমসে কম দো লাখ থাকবার কথা। তো...

চন্দন তেঁতো হয়ে বলল, ওসব কিছু জানি নে। ছেড়ে দিন।

হাঁ—ছেড়ে তো দেবই। ঠিক হ্যায়, ছেড়ে দিলুম। চা খাবেন?

নাঃ।

তবে মেঠাই খান।

না। আমি যাই, পান্ডেজী। কথাটা মনে রাখবেন।

চন্দনবাবু!

বলুন।

রাগ করবেন না আমার ওপর। পরেশবাবুর টাকা যার-যার কাছে ছিল এখন তাদেরই হয়ে গেল। কে দাবী করতে পারবে বলুন? তো এক বাত চন্দনবাবু, নুটুবাবুর জেনানা বহুৎ ঝামেলা করছে ওনাদের। হকসায়েব বলছিলেন।

তা আমি কী করতে পারি?

হঠাৎ পান্ডেজী ওর একটা হাত হাতে নিলেন। ...চন্দনবাবু, টাকা সবাই কামায় কিন্তু বড়া দিল সবার থাকে না। বেচুকে বললুম, ওনারা জেনানা লোক—ঝামেলা হচ্ছে। তো তুমি ফায়সালা করে দাও। বেচু রাগ করল। আমি বলি চন্দনবাবু, আপনি এখন ওটার ফায়সালা করে দিন যদি কুছ রুপেয়া লাগে, দিয়ে দিন।

চন্দন হাসবার চেষ্টা করে বলল, আমি কোত্থেকে দেব? সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। তবে বউদিরাও তো এখন প্রচুর টাকার মালিক। পরেশদা ওদের দিয়ে গেছে, জানেন না?

জানি। রুমাকে নিয়ে পরেশবাবুর স্ত্রী এসেছিলেন। বলেছেন—কিছু টাকা আছে তবে সে সামান্য টাকা। আপনি একটু কোশিশ করুন। আপনি সিকিটা দিন বেচুকে আবার ধরছি। হকসায়েব আর আমি দুজনেই বলছি। শিশিরবাবু কথা দিয়েছেন—ভাইকে দেখবেন।

চন্দন এক নিশ্বাসে বলে দিল, যা আছে দেব।

পরক্ষণে তার ভিতরটা রাগে থমথম করতে থাকল। ভয়ও হল তার। পান্ডেজী কী ঘড়েল মানুষ! পরেশের সব গতিবিধি—সব রোজগারের হিসেব যেন তার শ্যেনচক্ষু এড়াতে পারে নি কোনদিন। চন্দন এখানে যা কিছু করবে, তাও তার চতুর তীক্ষ্ম দৃষ্টির আড়ালে হয়তো থাকবে না। একে এড়িয়ে থাকাই সঙ্গত। এক্সেস সে নেবে না। শুধু গাড়ি নিয়েই চলুক।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন চন্দনবাবু।... পান্ডেজী বললেন।

চন্দনের বলতে ইচ্ছে হল, এত ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মভীরু লোক তুমি পান্ডেজী, তো তুমিই সব দেনাটা শোধ করে দাও না।... বলতে পারল না সে। আর এক মুহূর্তও এখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না তার। সে উঠে দাঁড়াল।... তাই হলে এখন আসি। যখন দরকার হবে, বলে পাঠাবেন—আমি দিয়ে দেব।

পান্ডেজী রাস্তা অব্দি সঙ্গে এলেন। রাগ করলেন না তো চন্দনবাবু?

না।

রাগ করবেন না। কারবারী লোকের রাগ করা ঠিক নয়। চামড়া শক্ত থাকা চাই।

থাকবে।... বলে চন্দন চলে এল।

হাঁটতে হাঁটতে আগাগোড়া সবটা ভাবল সে। কী চমৎকার সহজভাবে পান্ডেজী তাকে প্রায় ন্যাংটো করে দেখে নিলেন আসলে। কী বোকা সে, এত বোকা! এর চেয়ে ইলেকট্রিক মিস্তিরি হয়ে থাকাই তার উচিত ছিল। কেন সে চড়া সুরে প্রতিবাদ করে বলল না যে পরেশ মজুমদারের কালো টাকার একটুখানিও সে পায় নি? ওটা তার দুর্বলতা। তাকে আরও চতুর আর নির্বিকার হতে হবে। বুদ্ধিমান হতে হবে। দয়ামায়া-করুণা-ভালোবাসা এইসব জিনিসগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। বিবেককে পুরো খতম করা দরকার তার।

তা যদি না পারে, তাহলে এক্ষুনি অ্যাটাচি কেস আর গাড়িটা নিয়ে স্নেহলতার কাছে যাওয়া উচিত। সব ওদের ফিরিয়ে দিয়ে সোজা জিয়াগঞ্জ ফিরে যাওয়া উচিত।

রুমাকে মনে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা হয়ে গেল তার ঔচিত্যবোধটুকু। এত রাগ, এত ঘৃণা যে একটা অতটুকু মেয়ের ওপর কারো হতে পারে, ভাবতেও পারে নি কোনদিন। ইচ্ছে করে বা চেষ্টা করে আর কোন মতে সহজ থাকা যাচ্ছে না। খালি মনে হচ্ছে, রুমা—রুমা তার অস্তিত্বকে, তার মানুষের জীবনটাকে ভীষণ অপমান করেছে। এর যে কোন ধরনের প্রতিশোধ তার চাই-ই।

ভিড়ের ভিতর হেঁটে সে অনেক দূরে এগোল অন্যমনস্কভাবে। ডাইনে রজর বাসার রাস্তা। বাঁদিকে এখানটা কিছু ফাঁকা—গাছপালা আছে পিছনটায়। তারই ওদিকে নটুবাবুর বাড়িটা। মাথার ভিতর একটা অদ্ভুত ইচ্ছে সুড় সুড় করে উঠল। সুনন্দিতার কাছে গিয়ে জানতে ইচ্ছে হল, সত্যি সত্যি কত টাকা পরেশ ওর কাছে দেনা করেছে। কিম্বা এ শুধু সুনন্দিতার একটা খেলা! মৃত প্রেমিকের স্ত্রীকে নিয়ে অদ্ভুত তামাসার খেলা করছে না তো মহিলাটি? ব্যাপারটার মধ্যে একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছে চন্দন। পরেশ তার সব দেনাপাওনার খবর চন্দনকে বরাবর দিয়েছে। ওটা যদি সত্যি হয়, তাহলে অন্তত চন্দনের কাছে লুকোনর কী দরকার ছিল পরেশের? তাছাড়া—এত লাখো লাখো টাকা দু-পাশে যে জড়ো করে বাস করেছে, তার পক্ষে সুনন্দিতার ওই সামান্য টাকা দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি কেন? গোলমাল কোথাও একটা আছে। সম্ভবত পরেশের সইগুলো জাল। এ বেচুবাবুরই কোন চক্রান্ত। সুনন্দিতার সঙ্গে বেচুবাবুর কোন গোপন সম্পর্ক নেই তো? সম্ভবত নেই। থাকলে কারো না কারো কাছে তার আভাষ পাওয়া যেত।

গাছপালার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। তারপর কুকুরের গর্জন শোনা গেল যথারীতি। বিলাস বলে উঠল, কে ওখানে?

চন্দন সাড়া দিয়ে বলল, আমি—ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করব।

পর্দা তুলে সুনন্দিতা বেরোল।... কে এল বিলাসকা?

চন্দন এগিয়ে নমস্কার করল।

সুনন্দিতা যেন কয়েক মুহূর্ত দেখে নিল তাকে। তারপর বলল, ও, আপনি! আসুন, আসুন! ভেতরেই আসুন।

বিলাস কুকুরটা টানতে টানতে ওদিকে কোথায় নিয়ে গেল। চন্দন ভিতরে ঢুকে সোফায় বসল। তারপর বলল, অনেক দিন থেকে আসব ভাবি, আসা হয় না। পরেশদার মুখে আপনার কত কথা শুনেছি।

সুনন্দিতা একটা ভ্রূ আশ্চর্য ভঙ্গীতে তুলে বলল, আমার কথা! তাই নাকি? কী কথা?

হ্যাঁ। সে অনেক। আপনাদের এখানেই তো প্রথম পরেশদা থাকতেন। সেই সব গল্প।

বলুন, চা—না কফি?

হঠাৎ এই পরিবেশ আর সুনন্দিতার কণ্ঠস্বর মিলে একটা হালকা খুশির আমেজ এসে গেল চন্দনের মনে। সে বলল, কফি। আপনি একা একা তাস খেলেন দেখছি।

মৃদু হাসল সুনন্দিতা। ...খেলি। সময় কাটাই।

একা কী খেলেন?

সরমা, ফকির জল।... বলে সুনন্দিতা খোলা চুলের গোছা পিঠে সরিয়ে নিল।... পেসেন্স খেলি। আপনার পরেশদার শিক্ষা। তবে মাঝে মাঝে জুটিও পেয়ে যাই।

চন্দন চটুল স্বরে বলল, রুমা এখনও আসে নাকি?

কে, রুমা?... সুনন্দিতা হেসে উঠল। তারপর মাথা দোলাল।... আর আসে না। রাগ হয়েছে। ওর দিদির ওপর মামলা করতে যাচ্ছি যে!

শুনেছি। অবশ্যি, আপনি হয়তো জানেন—আমি ওদের ওখানে নেই এখন।

জানি বইকি। সব কানে আসে। রজর গাড়ি কিনেছেন। রজর বাসায় বাস করছেন। আরও জানি......

ওকে থামতে দেখে চন্দন বলল, আর? আসুন, তাস খেলি। তেমন কোন জরুরী দরকার নেই নিশ্চয়?

তা নেই। কিন্তু দুজনে কী খেলব?

আছে—শিখিয়ে দিচ্ছি। ...সুনন্দিতা তাস গোছাতে সুরু করল।

মহিলাটি সুস্থ মস্তিষ্কের তো? নাকি ছিটগ্রস্ত? চন্দন দারুণ অবাক হয়ে গেল। নতুন আলাপ সবে—আর এরই মধ্যে নিঃসঙ্কোচে তাস খেলার আমন্ত্রণ! সে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। অথচ এত ভালো লাগছিল সুনন্দিতাকে! যেন কতদিনের চেনাজানা—অনেক বার দেখা আর আলাপ—মুখের প্রতিটি রেখা বা দেহের প্রতিটি ভাঁজ এত চেনা লাগে।

সুনন্দিতা বেন টের পেয়েই বলল, আমার কাছে যে আসে—তাকেই তাস খেলতে হয় চন্দনবাবু। এ আমার হবি—ভীষণ বদঅভ্যাস। তাছাড়া আর কী করব! পরক্ষণে একটু হাসল সে। ফের বলল, অবশ্যি আমার কাছে কেউ আর আসেই না আজকাল। আমি খুব খারাপ মেয়ে কিনা। এই যে আপনি এসেছেন—কেন এসেছেন বেশ বুঝেছি—তবে সে সব পরে হচ্ছে। এখন খেলা। আর কিছু নয়। আপত্তি না থাকলে রেডিওটা খুলে দিই?

চন্দনের ভিতরটা দারুণ অস্বস্তিতে শিরশির করে উঠল।

(ক্রমশঃ)

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

(উনষাট)

ফাল্গুন মাস। শীত বিদায় নিচ্ছে। বসন্তের আগমনী। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমন্ত পুরীর ঘুম ভাঙছে। পাতা-ঝরা হাড়-জিরজিরে গাছের ডালে ডালে নব কিশলয়ের সমারোহ। অশোক পলাশ শিমূল গাছে রঙের হোলি খেলা। ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন। ডালে ডালে কোকিলের কুহু তান। মন্দ মন্দ মলয় বাতাস। ভারী সুন্দর সকাল।

সবাই আপন আপন কাজে। স্বামিজী যথাপূর্ব দক্ষিণের বারান্দায়। কাজ—রোগীদের ওষুধ পথ্য, ভোগীদের যুক্তি পরামর্শ, আর ঋণ প্রার্থী কিষাণদের ধমক-ধামকের পর দরকার মত টাকা দেওয়া।

'বামুন বাদল বান, দখনে পেলেই যান' দক্ষিণা পেয়ে একে একে বিদায় নিয়েছে সবাই। গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার' বইখানায় মন দিয়েছেন স্বামিজী।

বেলা ৯টা। ভাল বিছানা পাতা রঙচঙে ছইওয়ালা গরুর গাড়ী থেকে নেমে এলেন মাইল কয়েক দূরে হিঠা গাঁয়ের জমিদার নৃসিংহ পালের ভাই কালো পাল-মশায়।

কালোকোলো সুগঠিত চেহারা। সারা অঙ্গে যৌবন লাবণ্য, সুন্দর মুখশ্রী। পরণে ধোপ-দুরস্ত শান্তিপুরী কোঁচান ধুতি, গায়ে মটকার পাঞ্জাবি, গায়ে লপেটা। আগে গুরুর কাছে শিষ্যরা আসতেন 'সমিৎ-পানি' হয়ে। সমিধের প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই এখন আসেন মিষ্টান্ন-পানি হয়ে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয় নাই। মস্ত বড় সন্দেশের ঝাঁড়ি আমার হাতে দিয়ে স্বামিজীকে প্রণাম করে কাছে বসলেন পালমশায়।

বিষয়ী মানুষ—জমিদার বাড়ীর ছোট-বাবু। বৈষয়িক আর কূটনৈতিক আলোচনায় কাটল কিছুক্ষণ। তারপর শুরু হল তত্ত্ব আলোচনা। আলোচনার চেয়ে 'তর্ক' বলাই সমীচীন। পালমশায় ভক্তিমার্গের লোক। স্বামিজীর ওপর অটেল ভক্তি, অচলা শ্রদ্ধা। হলে কি হয়—জ্ঞানমার্গ ধরতে পারছেন না ঠিক ঠিক। সংশয় আছে। কাজেই আলোচনায় আসে তর্কের আভাস।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর হাসতে হাসতে স্বামিজী বললেন—না, কালোবাবু, পথটা ধরি ধরি করেও ধরা হচ্ছে না ঠিক। 'নান্যা পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' এছাড়া অন্য পথ নাই। এ তোমায় স্বীকার করতেই হবে একদিন। তবে দেরী আছে। বিচার-বুদ্ধি আর অনুভূতির অভাব। বিষয় কর্মের মাঝেই থেকেই লক্ষ্য রেখ—নির্বিষয়ে। পথ খুঁজে পাবে একদিন।

আলোচনার সমাপ্তি। প্রণাম করে বিদায় নিয়ে কালোবাবু উঠলেন গাড়ীতে।

বেলা ১১টা নাওয়া খাওয়ার সময়। ঠুং ঠুং ঘণ্টি বাজিয়ে ডাকহরকরা এসে প্রণাম করে দিয়ে গেল একখানি চিঠি।

উৎফুল্ল হয়ে স্বামিজী ডেকে বললেন—খোকা, তোমার আস্তানাটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফিতের খাটিয়ায় ভাল নরম বিছানা করে রাখতে বল রেণুকে। চেয়ার আর ইজিচেয়ার দুটোই দেবে বারান্দায়। খাবার জলের কুঁজো, হাত-পা ধোবার জলের বালতি, ঘটি, গাড়ু গামছা, তোয়ালে—সব যেন ঠিক থাকে। পালিতপুর, আশ্রম থেকে তিব্বতী বাবা আসবেন কাল।

—তিব্বতীবাবা, যিনি মাকে সন্ন্যাসের সময় নাম দিয়েছিলেন—চিন্ময়ী মা?

—হ্যাঁ, তিনিই। বলতে লাগলেন স্বামিজী—অতি বৃদ্ধ, মহাজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। বয়সের গাছ-পাথর নাই। ঠিক বয়স যে কত, কোথায় জন্মস্থান—কি জানবার উপায় নাই। পূর্বাশ্রমের কোন কথা বলেন না কখনও। শিশুর মত নিষ্কলুষ সরল স্বভাব। শিশুর মত কখনো কখনো রাগ করে অশ্লীল গালাগাল দিয়ে বসেন লোকজনদের। পরক্ষণেই সামনে যাকে পান তাকেই বলেন—ঐ দেখ গো নোংরা কথা বের হয়েছে। তোমরা বকো না কেন গা? কী তোমরা—মানুষ না ভূত? নোংরা কথা কান দিয়ে শোন? ভাল লাগে বুঝি শুনতে? শালাদের নোংরামিতেই নেশা গা, নোংরামিতেই নেশা।

সঠিক বয়স জানবার উপায় নাই। তিব্বতে ছিলেন ষাট বছর, মাদ্রাজে চল্লিশ বছর, হায়দরাবাদে তিরিশ বছর আরও অনেক জায়গায় অনেক বছর করে। কখন কোথায় কত বছর ছিলেন, লেখা আছে একটা হ্যাণ্ডমেড তুলোট কাগজের হলদে রঙের ছোট মোটা খাতায়। কাছে কাছে থাকে, কারুর দেখবার জো নাই। ঐ সব বছরের অঙ্ক গুলো যোগ করলে অনেক হয়—তা প্রায় আড়াই শ'র মত। হাতে লেখা বাংলায়। কিন্তু লেখার হরফ আর টানটোন তিনশ' বছর আগের লেখা পুঁথির হরফের মত। বলা যায় না বয়সের কথা—অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। তবে অসম্ভব নয়, মহাযোগী। প্রকৃষ্ট যোগ অভ্যাসে আয়ু বাড়তে পারে।

আশ্চর্য রকমের অব্যর্থ ফলপ্রদ অনেক ওষুধ আর পোষ্টাই হালুয়া তৈরী করতে জানেন তিব্বতী বাবা। সোহং স্বামীর কাছে শোনা—বাড়ী ছিল শ্রীহট্টে। চোদ্দ বছর বয়সে সন্ন্যাস নেবার অনুমতি চান মায়ের কাছে। মা অনুমতি দেন কটি সর্তে—কখনও ভিক্ষা করবে না, কারুর দান নেবে না, আর ধরমশালায় থাকবে না। তাই জ্ঞান অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে ওষুধ তৈরী করতে শেখেন তিব্বতেই।

তিব্বতীরা বৌদ্ধ। বৌদ্ধ শ্রমণদের অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করে, বিশেষ করে তথাগতের জন্মস্থান ভারতের শ্রমণদের। শ্রীহট্টও বৌদ্ধপ্রধান জায়গা। নতুন সন্ন্যাসীর পরনে ছিল বৌদ্ধ শ্রমণের পোশাক—হলদে অন্তর্বাস, হলদে বহির্বাস। সারা শরীর ঢেকে ডান বগলের তলা দিয়ে ঘুরে হলদে চাদরের আঁচল ছিল বাঁ কাঁধের ওপর। হুবহু বৌদ্ধ শ্রমণ। তিব্বতীরা পরম শ্রদ্ধা ভক্তিতে মঠে রেখেছিল তাঁকে। সেখানেই পুরোপুরি চর্চা করেন সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্র। বৌদ্ধ ভিষগাচার্য নাগার্জুনের চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে অব্যর্থ ফলপ্রদ ওষুধ তৈরী করতে শিখেছেন অনেক। ফর্মুলা লেখা আছে। বিভিন্ন রোগে ওষুধ দিয়ে পরিবর্তে যা পান—মূল্য হিসেবে বলতে পারো—তাই দিয়েই বরাবর নিজেকে চালিয়ে আসছেন ইনি। মায়ের কাছে নিজের স্বীকৃতি পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে। ভিক্ষা, দান গ্রহণ বা ধরমশালায় বাস করেন নাই কখনও। তিব্বতে এতদিন ছিলেন—তাই সবাই বলে—তিব্বতী বাবা। তিব্বতী ভাষাও জানেন খুব ভাল। ওখানকার বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি প্রায় সবই তিব্বতী ভাষায় লেখা। ভারত হতে সংগৃহীত পালি, সংস্কৃতের অনুবাদ। কাজেই তিব্বতী ভাষা না জানলে ওখানকার শাস্ত্র আলোচনা করবেন কেমন করে। তাই প্রথমেই খুব ভাল করেই আয়ত্ত করেছিলেন—তিব্বতী ভাষা।

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানমার্গী সোহং স্বামীর গুরু পরমহংস তিব্বতী বাবা আশ্রমে আসবেন কাল, দেখবে। জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ মহাপুরুষ। সেবা যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি যেন না হয়—আনন্দোজ্জ্বল হাসি হাসি মুখে চেয়ে রইলেন স্বামিজী।

—দেখেছি তিব্বতীবাবাকে। একবার এসেছিলেন বোলপুর কাছারি পটিতে জমিদার সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ী। খবর পেয়েই দলে দলে লোকের ভিড়—মহাপুরুষ দর্শনে। কতজনের কত আকুল প্রার্থনা—ওষুধ, আশীর্বাদ, শিক্ষা, জ্ঞান-উপদেশ। গিয়েছিলুম অহীদার সঙ্গে। অহীদা দেখেছিলেন আরও ক'বার, পরিচয় ছিল। অল্প সময়েই অল্প কথায় স্নেহ আশীর্বাদে অভিষিক্ত করেছিলেন। তাঁর তৈরী অতি সুস্বাদু পুষ্টিকর হালুয়া খেয়েছি ক'দিন। প্রণাম করে বিদায় নিতেই হাতে দিয়েছিলেন অনেকখানি। খাবার নিয়মও বলে দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

—তাই নাকি? তবে তো খুব ভাল। বলতে হবে না বিশেষ কিছু। বুঝতেই পারছ সেবার ধন—হাসতে হাসতে বললেন স্বামিজী।

॥ ষাট ॥

সকালবেলা। ভোরবেলা প্রাতর্ভ্রমণটা সেরে এসেই স্বামিজী এলেন পান্থশালায় গোছগাছ পরিপাটি হয়েছে কিনা দেখতে। পছন্দ মত একটু এদিক-ওদিক করিয়ে স্বামিজী এসে বসলেন দক্ষিণের বারান্দায় তিব্বতীবাবার প্রতীক্ষায়। অধীর আগ্রহ। বারবার দেখেন দক্ষিণ আর পশ্চিম ফটকের পানে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে ওঠেন—রোদে আসতে কষ্ট হবে যে। গাড়োয়ান ব্যাটা করে কি—তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে আনতে পারে না? যততো সব কুঁড়ের বাদশা।

অবশেষে বেলা নটায় তিব্বতীবাবার গাড়ী এসে দাঁড়ায় দক্ষিণ ফটকের বাইরে। সঙ্গের প্রৌঢ় সন্ন্যাসী হাত ধরে ধীরে-সুস্থে গাড়ী থেকে নামিয়ে নেন তিব্বতীবাবাকে। পেছনে ছাতা ধরেছেন নির্মলা মা। কাশী থেকে কদিন আগে এসেছেন পালিতপুর আশ্রমে।

ধীর পদক্ষেপে হাসি মুখে আশ্রমে এলেন পরমহংস তিব্বতীবাবা। ঈষৎ খর্বাকৃতি গোলগাল নধর চেহারা। অতি বৃদ্ধ কিন্তু বার্ধক্যের শুষ্কতা বা রুক্ষতা নাই লাবণ্যে উজ্জ্বল। গৈরিক পরিধেয়, গৈরিক উত্তরীয়, গায়ে মোটা কাপড়ের পুরোহাতা গৈরিক আঙরাখা, মাথায় দুকান ঢাকা গৈরিক গোল টুপি, পায়ে বাদামী রঙের জুতা, হাতে দণ্ড। প্রশস্ত ললাটে জ্ঞানরেখা. স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দু চোখের প্রান্তদেশে ঈষৎ কুঞ্চিত মুখে শিশুর সরল হাসি। দুই গালের লোলচর্মে বার্ধক্য বোঝা গেলেও স্থবিরত্ব বা অক্ষমতা আসে নাই। এতখানি বয়সেও। মহাযোগীর যোগজীবন।

—কই গা, নিরালম্ববাবা, কেমন আছ গা, শরীর গতিক ভাল তো? আশ্রমের সব কুশল বল গা—আঙিনায় এসে হাসিমুখে হাঁক দিলেন তিব্বতীবাবা। স্বামিজী ততক্ষণে উঠে গেছেন তাঁর কাছে। সঙ্গে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলেন পাশে তৈরী নরম বিছানায়।

কুশলাদি আদান-প্রদানের পর স্নান করে এসে রান্নাঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর মুখ হাত ধুয়ে সন্দেশ আর গরম দুধ খেয়ে তিব্বতীবাবা গেলেন পান্থশালায়। সঙ্গে স্বামিজী আর প্রৌঢ় সন্ন্যাসী।

পরিপাটি রান্নাঘরে দুপুরবেলা কাছে বসে দু মহাপুরুষকে খাওয়ালেন নির্মলা মা।

আহারান্তে বিশ্রাম। বিশ্রামান্তে বেলা তিনটের পর স্বামিজী এলেন পান্থশালায় তিব্বতীবাবার কাছে। স্বামিজী চেয়ারে, তিব্বতীবাবা ইজিচেয়ারে মুখোমুখি।

কিছুক্ষণ অনুচ্চস্বরে তত্ত্ব আলোচনা—আত্মতত্ত্ব। অনুচ্চ হলেও সুস্পষ্ট স্বর। এক সময়ে শিশুর মত হা-হা করে হেসে তিব্বতীবাবা বলে উঠলেন—হা গা নিরালম্ব বাবা, এখনও সেই দেশ, দেশ স্বরাজ-ফরাজ বাতিক আছে না কি গা? না, গা না, আর ওসব নয় গা। যে পথের যা—নিষ্ঠা চাই গা নিষ্ঠা চাই।

মৃদু হেসে স্বামিজী বললেন—না বাবাজী, আর নয়। সে সবের পূর্ণাহুতি হয়ে গেছে।

—কি বললে গা? পূর্ণাহুতি? আরে না-না, তার এখনো দেরি আছে গা, দেরি আছে। এই তো সবে ঊষা—ব্রাহ্মমুহূর্ত, হোমের আগুন জ্বলছে—এরই মধ্যে পূর্ণাহুতি কি গা, দেরি আছে গা, দেরি আছে। এখনও কত কাঠ পুড়বে, কত ঘি জ্বলবে, কত মন্ত্র পড়বে—তবে তো পূর্ণাহুতি গা। পুরোনো ঋষিরা বুড়ো হ'বে গা, মরবে, নতুন ঋষি আসবে গা, নতুন

শিষ্য ও গুরু / সোহং স্বামী ও তিব্বতীবাবা

মন্ত্র পড়বে। পূর্ণাহুতি হবে গা—তখন পূর্ণাহুতি হবে। সেদিন রাক্ষস ব্যাটারা পালাতে পথ পাবে না গা—পালাতে পথ পাবে না। মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবে গা—সেদিন হবে। তবে কিছু দেরি আছে গা দেরি আছে—বলে চুপ করলেন তিব্বতী-বাবা।

স্বামিজীর মুখ উজ্জ্বল, চোখে বিদ্যুতের দীপ্তি, অধরে তৃপ্তির হাসি।

পাঁচটা বাজতেই স্বামিজী বেড়াতে গেলেন সাঁওতাল পাড়ার দিকে। শ্বেত পাথরের রেকাবিতে ফল সন্দেশ ও গেলাসে বেলের সরবত এনে নির্মলা মা খাইয়ে গেলেন তিব্বতীবাবাকে। এরপর সমস্ত আশ্রম ঘুরে দেখতে লাগলেন তিব্বতীবাবা। সঙ্গে দুজন—প্রৌঢ় সন্ন্যাসী আর আমি।

প্রথমেই তিব্বতীবাবা গেলেন চিন্ময়ী মায়ের সমাধি মন্দিরে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন চারিপাশ। অতি সন্তর্পণে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ল একটা। তারপর আশ্রমের প্রতিটি গাছপালার সঙ্গে যেন কথা কইলেন। এমনি দেখা। আগে দেখার সঙ্গে এখনকার দেখা মিলিয়ে নিলেন। ঘাটের ধারে বটগাছের ছাল কিছু তোলা, মাঝ-খানের শিউলী গাছটির একটি ডাল ভাঙা। নজর এড়ালো না কিছুই। ফোটো ফোটো চামেলী কুঁড়িগুলিকে হাত বুলিয়ে আদর করলেন যেন। সন্ধ্যার মুখে এসে বসলেন দক্ষিণের বারান্দায় ঢালা বিছানায়।

স্বামিজীও এসে বসলেন পাশের পৃথক বিছানায়।

—হ্যাঁ গা নিরালম্ববাবা, এ কেমন করে হল গা—বটগাছের অনেকখানি ছাল তোলা গা, আর শিউলী গাছের ডাল ভাঙা গা। এ কেমন করে হল গা? খুব দরকার না হলে কি গাছের ছাল তুলতে আছে গা, না ডাল ভাঙাতে আছে?—গম্ভীর স্বরে বললেন তিব্বতীবাবা।

—শিউলী গাছের ডাল ঝড়ে ভেঙেছে বাবা, আর বটগাছের ছাল তুলে নিয়ে গেছে সাঁওতালরা—ওষুধ তৈরী করবে—বললেন স্বামিজী।

ওষুধ তৈরীর নামে যেন আশ্বস্ত হলেন তিব্বতীবাবা, বললেন—তাই বল গা, তাই বল। দরকার হয়েছে তা নেবে বৈকি গা। বিনা দরকারে কারুর অঙ্গহানি করবা না গা কারুর অঙ্গহানি করবা না। বড় কষ্ট গা বড় কষ্ট।

আর হাঁ দেখ গা নিরালম্ববাবা, দময়ন্তী মায়ের মন্দির এত নোংরা কেন গা?

শুধু গরু-ছাগলই নয়, ছেলেপিলেরাও নোংরা করেছে মন্দিরের মেঝে। এ ভাল নয় গা এ ভাল নয়। দময়ন্তী মায়ের মন্দির—শুদ্ধ শুচি রাখতে হবে গা, সারাক্ষণ শুদ্ধ শুচি রাখতে হবে। নোংরা রাখলে চলবে কেন গা? এ বড় খারাপ গা, বড় খারাপ। মূর্তি বসাবে বলেছিলে, তা কই গা? এখনও বসালে না কেন গা? মূর্তি থাকলে ছেলেপিলেরা উঠবে না ভয়ে। ঠাকুর দেবতাকে ভয়। তা কই গা তোমার যাজ্ঞবল্ক্য আর গার্গীর মূর্তি?

—কিছুদিন পরেই হবে বাবাজী। কলকাতা থেকে গোপেশ্বর পাল জানিয়ে-ছেন—মাসখানেক পরে এসে মূর্তি তৈরী করে দিয়ে যাবেন।

—হ্যাঁ, তাই করে নাও গা, শীগগির করে নাও। আর দেখ গা—মহাজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য—ভাব তো জানাই আছে গা, বজায় থাকে যেন গা—সরল সমত তেজী ভাব। আর হাঁ গা—দময়ন্তী মায়ের ভাবেই হবে গার্গী, সেই কেশচূড়া গা, সেই গেরুয়া পরা। তফাৎ নাই গা, কোন তফাৎ নাই। দময়ন্তী—গার্গী —চিন্ময়ী মা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট মন্দিরের দিকে স্বপ্নাতুর চোখে চেয়ে রইলেন তিব্বতী-বাবা। নির্বাক স্বামিজীর অপলক দৃষ্টি অনুসরণ করল বাবাজীর দৃষ্টিকে।

একষট্টি

সন্ধ্যের আগেই নির্মলা মা রান্নাঘরে। নৈশ না, সান্ধ্য আহার—সন্ধ্যের একটু পরেই খান তিব্বতীবাবা।

ভাঁড়ার হতে হাতে জিনিস যোগান—যা চাইছেন তাই বের করে দিচ্ছি নির্মলা-মাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মলা মা তৈরী করে ফেললেন অতি উপাদেয় ঢাকাই পাটি-সাপটা। আর সাড়ে সাতটা বাজতেই পরিবেশন করে খাওয়ালেন তিব্বতীবাবাকে।

খেতে খেতে কি খুশি—একেবারে ছেলেমানুষের মত ফেটে পড়া হাসি। হাসতে হাসতে বললেন—কি করেছে গা নির্মলা, একেবারে ঢাকাই আমদানী যে গা। বড় চমৎকার হয়েছে গা। ঢাকা ছাড়া আর কোথাও এমনটি হয় না গা। হ্যাঁ গা হ্যাঁ, তাইতো বলি হবে না কেন গা? তুমি তো ঢাকারই মেয়ে, নয় গা নির্মলা? ঢাকার মায়েরা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না এমনটি। বড় ভাল হয়েছে গা।

ভাল হলে কি হবে—বাবাজী খেলেন মাত্র দুখানি। নির্মলা মার কত অনুরোধ উপরোধ অভিমান—কিছুতেই আর এক-খানিও নিলেন না তিব্বতীবাবা। বললেন—আজ আর নয় গা আজ আর নয়। রেখো দুখানা, কাল জলখাবার হবে গা। বাসি পিঠা, বেশি মিঠা—নয় গা নির্মলা মা? রেখো গা রেখো দুখানা।

রান্নাঘরে এসে হাসতে হাসতে নির্মলা মা বললেন—দেখলে খোকা, কে বলবে বুড়ো মানুষ—একেবারে শিশুটি। যেমন খুশি, তেমনই হাসি, তেমনই শিশুর মত গোঁ। একবার না বললে আর 'হাঁ' হবে না।

স্বামিজী ও আর সবাইকে পরিতোষ করে খাইয়ে নিজে খেয়ে তেলের বাটি হাতে নিয়ে নির্মলা মা গেলেন পান্থশালায়।

খাটের বিছানায় মশারি টাঙানো। তিব্বতীবাবা চুপচাপ শুয়ে আছেন। ঘুমোন নাই তখন। মশারিতে ঢুকে পায়ে তেল মালিশ করতে বসলেন নির্মলা মা। বসে রইলুম পাশে চেয়ারে।

কে গা? নির্মলা? আবার এত রাতে জ্বালাতে এলে কেন গা? শোও গিয়ে বললেন তিব্বতীবাবা।

—জ্বালাচ্ছি আর কই, বাবার পায়ে একটু তেল মালিশ করে দিচ্ছি বৈ তো নয়—অভিমানের সুরে বললেন নির্মলা মা।

—জ্বালাইবা গা জ্বালাইবা, কেউ কেডা নয়, নির্মলা মা, না জ্বালাইয়া ছাড়বা?—ঢাকার মেয়ের সঙ্গে ঢাকাই চালেই হেসে হেসে বললেন তিব্বতীবাবা।

ঢাকার মাও কি ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে? চটপট উত্তর দিলেন—জ্বালামু না? মাইয়া অইতে আছি ক্যান? বাপেরে জ্বালামু না তো জ্বালামু কারে? বেশ করমু। মাইয়া অইছি বাপেরে জ্বালাইবার লাইগাই। আপনি পোলাপান অইয়া ঘর ছাইড়া বাপেরে জ্বালাইয়াছেন কি কেমডা?

—হেই দ্যাখ, গোসা করতি আছ ক্যান নির্মলা মা? তবে তো খাইতে দিবা না। প্যাট জ্বলতি লাগবো গা। না-না গোসা

করবা না গা, গোসা করবা না। আর কিছু কমু না গা আর কিছু কমু না। যা খুশি কর গা গিয়া।—খাঁটি ঢাকাই চালে বললেন তিব্বতীবাবা। কে বলবে জন্ম ঢাকাই বাঙ্গাল নয়?

ফিক করে একটু হেসে নির্মলা মা মন দিলেন আপন কাজে। কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। তারপর আস্তে আস্তে কাশী, নৈনিতাল, আলমোড়া—নানান জায়গার নানা গল্প। বলতে বলতে নির্মলা মা এক সময়ে তুললেন সোহং স্বামীর কথা।

ছেলেমানুষের রূপকথা শোনবার আগ্রহ। শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ছেলে-মানুষের মতই প্রশ্ন করছেন—তারপর? তারপর অইলো কি গা নির্মলা?

সন্ন্যাসিনী হলে কি হয়—ঢাকাই মেয়ে কি কম— একথা সেকথা পাঁচটা পাঁচরকম বলে হঠাৎ এক সময় বলে বসলেন—দাদা শ্যামাকান্ত করতেন সার্কাস। বুনো বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই। কত নামডাক, কত টাকাকড়ি, কত রাজারাজড়ার দেয়া সোনার মেডেল। সব ফেলে হঠাৎ বেপাত্তা। হিমালয়ে গেছেন যোগ সাধনা করতে। কোথায় সার্কাস আর কোথায় সাধনা। বাবা মাকে কি কম জ্বালিয়েছেন শ্যামাকান্ত? ঘর ছাড়লেই বাপ-মায়ের মনে কষ্ট। দারুণ আঘাত। আপনিও তো বাবা এমনি করেই জ্বালিয়েছিলেন বাবা-মাকে? এখন জ্বালাচ্ছেন কাদের বাবা? কে আছেন এখন সেখানে?

—আরে না গা, কেউ জ্বলাতি আছে না অখন। চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার অইয়া গেছে গা গিয়া। চলতি আছে পনেরো-ষোলো পুরুষ একসঙ্গে। চিনবোই বা কেডা, জানবোই বা কেডা—খিল খিল করে হেসে বললেন, তিব্বতীবাবা।

পলক মাত্র। হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গল, জলে উঠে বললেন—হেই দ্যাখ গা, কি সব বইল্যা নিতে আছ। যাও যাও দূরে হওগা এহান থিক্যা। দূরে হও গা দূরে হও—নির্মলা মাকে গোটা দু-চার মৃদু ধাক্কা দিয়ে পা গুটিয়ে নিলেন তিব্বতী-বাবা।

—সাধু সন্ন্যাসী অইয়া আপনাগো এত গোসা ক্যান, বাবা? ঢাকাই সুরে বলে হাসতে হাসতে মশারি থেকে বেরিয়ে তেলের বাটি যথাস্থানে রেখে নির্মলা মা গেলেন নিজের বিছানায়।

বারো

পরদিন সকাল।

স্বামিজী বেড়িয়ে এসে বসেছেন অঙ্গনের বারান্দায়। ভোরবেলা প্রাতঃকৃত্য সেরে আশ্রমের চারদিক ঘুরে বেড়িয়ে এসে তিব্বতীবাবা বসেছেন স্বামিজীর কাছে নির্দিষ্ট বিছানায়।

গ্রামীণ দুঃস্থ অর্থী প্রার্থীদের আসা-যাওয়া শুরু।

নবপ্রতিষ্ঠিত বনপাশ আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিরালম্ব

দুই বাবাজীকে বেশি মিঠা বাসি পিঠা খাওয়ালেন নির্মলা মা। আশ্রমিক সঙ্ঘও বাদ গেল না। সবাই তৃপ্ত।

নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ অনুচ্চস্বরে আলোচনা হল দুই মহাপুরুষের।

—কই গা নির্মলা মা, পেয়ারা দাও নিরালম্ব বাবাকে—হাঁক দিলেন তিব্বতী-বাবা। খুব ভাল পেয়ারা, কাশী থেকে এনেছে নির্মলা মা।

স্বামিজীর আপত্তি, একটু আমাশয়ের ভাব দেখা দিয়েছে।

—কি যে বল গা, নিরালম্বর আবার অসুখ, তার আবার আমাশয়। না-না গা, ওসব কিছু না। খাও খাও ওতেই সেরে যাবে গা। দাও গা দাও নির্মলা। ভাল দেখে বড় বড় চারটে পেয়ারা দাও নিরালম্ব বাবাকে।

আর 'না' করবার যো কি—খেতেই হল। স্বামিজী খেলেনও খুব তৃপ্তি করে। সত্যিই ভাল হয়ে গেল বুঝি—আমাশয়ের ভাব আর দেখা যায়নি।

ওদিকে গ্রামে গ্রামে রটে গেছে তিব্বতী-বাবার আসার কথা। নানা উপাচারে শ্রদ্ধার্ঘ্য সাজিয়ে দলে দলে ভক্ত সমাগম হতে থাকল বাবাজীকে দর্শন করতে।

একে একে পদধূলি নিয়ে প্রত্যেকেই দিতে গেল যথাসাধ্য শ্রদ্ধা উপচার। দেখেই তিব্বতীবাবা চাদরে হাত ঢেকে বললেন—ওসব কি গা? খাবার জিনিস? যাও গা যাও নিয়ে যাও সব। ছেলেপুলেদের দিয়ে দাও গা গিয়ে। খেয়ে ফেলুক। কত খুশি হবে গা তারা। যাও গা যাও, নিয়ে যাও, দিয়ে দাও গা তাদের। তাদেরই জিনিস গা, তাদের না দিয়ে এখানে আনছ কেন গা?

হাতের জিনিস হাতে, শুকনো মুখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে সবাই। ফিরে কি নিয়ে যেতে পারে—মহাপুরুষের সেবার জন্যে কত আশা করে সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ এনেছে সব।

তা হলে কি হয়—নেওয়া তো দূরের কথা তিব্বতীবাবা চাদর থেকে হাতও বের করলেন না, ছুঁলেনও না।

ভক্তি উপাচার—ফিরে দিলে বাধা পায়, নির্মলা মা নিয়ে তুলে রাখলেন সব ভাঁড়ারঘরে।

—ও কি করলে গা নির্মলা? কি দিয়েছ যে দান নিচ্ছ? কিছু না দিয়ে নিতে নাই গা। অগ্রদানীর মেয়ে না কি গা—দান নিচ্ছ? ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বললেন, বাবাজী।

ততক্ষণে হাসিমুখে নির্মলা মা প্রত্যেকের হাতে দিয়েছেন দুটো করে বড় বড় কাশীর পেয়ারা।

—দেখতে আছ গা নিরালম্ব বাবা, ডাহার মাইয়ার কাণ্ড—ঢাকাই সুরে বলে শিশুর মত খিল খিল করে হেসে উঠলেন তিব্বতীবাবা।

চাম্রা আশ্রমে সাতদিন থাকলেন তিব্বতীবাবা। এই কদিনের পরিবেশ ভোল-বার নয়। আশ্রমের স্বভাব-শান্ত পরিবেশ হয়ে উঠল আরও শান্ত আরও মাধুর্যময়। কেমন একটা পবিত্রতার ভাব। কোন গোলমাল নাই—টুঁ শব্দটি শোনা যায় না। যার যা কাজ চুপচাপ করে যায় সবাই হাসি মুখে খুশি মনে। লোক সমাগম বেশি। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু জিজ্ঞাস্য। ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, শান্ত মধুর অল্প কথায় প্রত্যেকেই উত্তর পাচ্ছেন আপন প্রশ্নের। শেষে আবার হাসি মস্করাও আছে একটু একটু। অশ্লীল শব্দও দুটো-একটা বেরিয়ে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে গালাগালি—বেটারা কান পেতে আছে মেয়েরা কথা শোনবার জন্যে। বলে দেয় না কেন গা?

কে বলে দেবে, আগে থেকে জানবে কেমন করে কখন ও শব্দটা আসবে?—এ ছেলেমানুষী! অনেকে হাসছে, অনেকে উচ্ছ্বসিত হাসি চাপতে মুখে কাপড়

গুঞ্জছে। গুরুমশায়ের ধমক-ধামক ঠ্যাঙানি ছাড়াই আপন আপন প্রশ্নের যথাযথ উত্তরে শিক্ষাও হচ্ছে বেশ। বিমল আনন্দের হিল্লোল। যাবার সময় আশ্রমের ফটক পার হয়েই মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান ধরে অনেকে—'মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দ থাকে।' কেউ বা—'পাগলা-বাবা, পাগলী আমার মা'।

একদিন সমাগত রোগীদের তিব্বতী-বাবারই ওষুধ দিচ্ছেন স্বামিজী। একটি মাত্র ওষুধ—'ঝারুয়া'। স্বাদহীন শাদা মিহি-গুঁড়ো। পরিমাণ খুবই অল্প— এক কান-খুস্কিতে যতটুকু ধরে সেইটুকু মাত্র। একই ওষুধ—ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন অনু-পান। সব রোগেই সমান ফলদায়ক। আশ্চর্য।

তিন-চার দিনেই সম্পূর্ণ নিরোগ হয়ে রোগীরা এসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ওষুধের। স্বয়ং ধনন্তরীর ওষুধ।

তিব্বতী বাবা হাসিমুখে বলেন—হাঁ গা হাঁ, খুব ভাল ওষুধ গা। তা বলি—কাছে এসে কদিন আশ্রমে থেকে শিখে নে সব। তা কেউ কি আসে গা? মাগ-ছেলে ছেড়ে শালারা আসবে কি গা? রোগে ভুগে সারা হবে, তবু ওষুধটা শিখে নেবে না। শুধু কি নিজের গা, কতজনের কত উপকার হবে গা। শিখে নে—তা শিখবে না। আশ্রমে খাবিদাবি থাকবি, আর শিখবি—তা শুনবে কি গা? মরবিই তো—তা যদ্দিন বাঁচিস ভুগিস কেন গা? শিখবি না তো মর গা। ভুগে ভুগে জ্যান্ত-মরা হয়ে থাক গা।

বিরক্তির ঈষৎ কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল অধরের পাশে। কতক্ষণের জন্যেই বা। একটু পরেই যা-কে তাই—প্রশান্ত প্রফুল্ল মুখশ্রী।

সাতটি দিন বেশ কাটল—নতুন পরি-বেশে। হাসি-খুশি আনন্দ, কিন্তু হৈ-হুল্লোড় নাই। মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ—বোঝবার জো নাই। কে বলবে অতি বৃদ্ধ! একেবারে সরল শুদ্ধ সদানন্দ শিশুটি। Two extremities meet at a point হয়েছে তাই। শৈশব বার্ধক্যকে জবরদখল করেছে অবশ্য চাপল্যটুকু হারিয়ে। হাস্য-লাস কথাবর্তায় নিষ্কলুষ শিশুর সরলতা! বাইরে থেকে মহাপুরুষদের চেনা দায়' এদের কোন বিশেষ লক্ষণ নেই, পার্থিব ক্রিয়াকর্ম দেখে এঁদের চেনবার উপায় নেই। তাই বলে—

শুক ত্যাগী, কৃষ্ণভোগী, জনকঃ রাজ্যকারকঃ
বোমদেব বেশ্যাসক্তঃ নারদ কলহপ্রিয়ঃ।

শুকদেব, কৃষ্ণ রাজর্ষি জনক, বামদেব, —এঁদের প্রত্যেকেরই ক্রিয়াকর্ম বাহ্যিক আচার আচরণে কতই না তফাৎ। অথচ এঁরা প্রত্যেকেই মহাজ্ঞানী, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। বাইরের কাজ দেখে বিচার করলে এঁদের চেনা যাবে না মোটেই। তিব্বতীবাবাই তাই—চেনবার উপায় নাই। বাইরে সদানন্দ শিশুটি অন্তরে অনন্ত-জ্ঞানের অফুরন্ত জ্যোতি।

অষ্টম দিনের সকালেই যাবার তোড়-জোড়। সঙ্গী প্রৌঢ় সন্ন্যাসী চলে গেছেন আগেই। সঙ্গে যাবেন নির্মলা মা।

তিব্বতী বাবা বললেন—ও খোকা চলনা গা, দেখে আসবে গা আশ্রমটী। পালিত-পুরের আশ্রমটী চিনে আসবে গা, চল গা চল। রেণু চালিয়ে নেবে গা দুদিন।

পা তো উঠেই আছে—স্বামিজীর অনু-মতির অপেক্ষা।

হাসতে হাসতে স্বামিজী বললেন—যাও, বেড়িয়ে এস বাবাজীর সঙ্গে।

আর পায় কে? দুখানা জামা-কাপড় গামছায় বেঁধে নিয়ে তিব্বতীবাবার সঙ্গে গেলুম পালিতপুর আশ্রম।

তালিত স্টেশনের মাইল দেড়েক উত্তর-পূর্বে পালিতপুর আশ্রম। প্রশস্ত ছায়া-শীতল জায়গা। মাঝখানে লম্বা পুকুর। পাড়ে কলাঝাড়, আম, জাম, কাঁঠাল, বট অশ্বত্থ গাছ, মাঝে মাঝে লাউ-কুমড়োর মাচা। পশ্চিম পাড়ে পুবদুয়ারী চারখানি একতলা পাকা ঘর। দুখানি বাবাজীর বসবার আর শোবার, একখানি সেবক-শিষ্য সন্ন্যাসী দুজনের আর একখানি অতিথি অভ্যাগত-দের জন্যে। একটু দূরে ভাঁড়ার ও রান্নাঘর। পাচক পরিচারক থাকে ওখানেই। আশ্রমের চতুঃসীমা ঘিরে দুর্গের মত জলভর্তি পরিখা। বাইরের গরু-ছাগল এসে গাছপালা নষ্ট না করে—তাই এই ব্যবস্থা। পশ্চিম দিকে আশ্রমের প্রবেশ পথ, পরিখার ওপর বাইরের সঙ্গে যোগসেতু।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমানের বিখ্যাত ধনী ধর্মদাস তা। তিব্বতীবাবার ফেরবার খবর পেয়ে সস্ত্রীক এসেছেন পালিতপুর আশ্রমে।

দুদিন আনন্দে কাটিয়ে তৃতীয় দিন বিকেলে তিব্বতীবাবা ও সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে ফিরে এলুম চান্না আশ্রমে।

(তের্ষাট্টি)

চৈত্র সংক্রান্তি। বর্ষবিদায়। দূরে গ্রামে গ্রামে গাজনের ড্যাডাং ড্যাডাং বাদ্যি। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদলের মিলিত কণ্ঠের গর্জন—হর-হর মহাদেব, বোম্ বোম্ ভোলানাথ, জয় বাবা কৈলাসপতি কি জয়। জয় বাবা বিশ্বনাথ কি জয়। কোথাও কোথাও আবার দের ভক্তয় গাজন নষ্ট। পাড়ায় পাড়ায়, গাঁয়ে গাঁয়ে গাজনে গাজনে রেশারেশি, দলাদলি—মারপিট। যে দলে ভক্ত বেশি, তাদেরই শক্তি বেশি, কাজেই জিত। দু-চারটে নালিশ আসছে স্বামিজীর কাছে। প্রথমে দু-চারটে ধমক-ধামক লাঠি তুলে মারতে যাওয়া, শেষে মোকাবিলা মিটমাট। পরনে গেরুয়া গলায় শাদা সুতোর উত্তরী গোছা, কাঁধে নতুন লাল গামছা হাতে বেত গলা জড়াজড়ি করে হাসি মুখে চলে যাচ্ছে দু-গাজনের বিরোধী ভক্তদল নির্বিরোধী হয়ে।

বর্ষ আরম্ভ। বৈশাখ মাস। কদিন পরেই আশ্রমে এলেন দু-ভাই—হরেরাম আর শশীভূষণ দাশ মশায়—বেনপাস কামার-পাড়া গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠার নিয়ম-কানুন জানতে আর স্বামিজীকে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানাতে। বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে অক্ষয়-তৃতীয়া। বেশি দেরী নাই।

স্বামিজীকে প্রণাম করে কাছে বসলেন দু-ভাই।

শশী দাশ মশায় বললেন—আশ্রম প্রতিষ্ঠার রীতি-পদ্ধতি কিছুই তো জানি না, বাবা, দয়া করে বলে দিন কি করতে হবে।

স্বামিজী হাসলেন, বললেন—কী হবে গো আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে?

একটু হতচকিত হয়ে শশীবাবু বললেন—বড় কষ্ট হয় স্বামিজী, গ্রামের লোকদের মতিগতি দেখে। ছেলে বুড়ো, আধবুড়ো, জোয়ান—কারুরই শিক্ষা বলতে, সংস্কৃতি বলতে কিছু নাই। কাঁচা-পয়সা উপায় করছে খাচ্ছে দাচ্ছে, ফূর্তি করছে, আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি মামলা মোকদ্দমা করে ফতুর হচ্ছে। চরিত্র তো কারুরই নাই। স্নেহ দয়া, মায়া, উদারতা—মনের কোমল বৃত্তি-গুলোও যেন একেবারে লোপ পেয়েছে। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করে না, বড়রাও ছোটদের স্নেহের চোখে দেখে না। সব যেন বিজাতীয় ভাব, আপনজনকে আপন ভাবে না। আত্মীয়ে আত্মীয়ে জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে কলহ। 'অয়ং নিজ পরোবেত্তি'—এই নীচ ভাবটাই যেন প্রবল হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত ইতর লঘুচেতা সব। কেউ কারুর হিতচিন্তা তো করেই না, অপরের ভালও দেখতে পারে না। তাই বড় কষ্ট হয়, বাবাজী।

এতবড় একটা সমৃদ্ধ গ্রাম, শিল্পী কারিগরের জায়গা, প্রায় সবাই স্বাধীন কারিগর, চাকরী-চাকরী করে কারুর পাছে উমেদারী করতে হয় না—এমন গ্রামে সং লোক, চরিত্রবান সজ্জনের অভাব। এইজন্যেই গ্রামটি উৎসন্নে যেতে বসেছে। একথা ভাব-বার মত লোকও কাউকে দেখি না। বড় কষ্ট হয়, স্বামিজী।

আমি অতি ক্ষুদ্র—কী-ই বা করতে পারি? নিঃসন্তান। তবে আপনাদের আশীর্বাদে ভাগলপুরে সোনা-রূপার দোকান খুব চালু। আয় ভালই। সমস্ত খরচ খরচা বাদে সঞ্চয় মন্দ নয়। বয়সও হয়েছে, ডাক পড়লে সব ছেড়েছুড়ে ফেলে কবে চলে যেতে হবে। মনে হয় একটু কিছু করি দেশের জন্যে। অন্ততঃ মানুষের মত মানুষ—সজ্জন চরিত্রবান দু-চারজনও যদি গড়ে ওঠে, তা হলেও লাভ। আমার ধারণা—আশ্রমকে উপলক্ষ করে আপনার সংসর্গ ও শিক্ষায় আর কিছু না হোক মানুষ হবে। চরিত্র গঠন হবে। এ আমার অন্তরের বিশ্বাস। আপনি দয়া করলে এটুকু হবেই, বাবা, এ আমি জোর করে বলতে পারি। আর আমার মত ক্ষুদ্রজনের সেইটুকুই পরম

হত। কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধার মত সেবার জন্যে একটু কিছু করা হয়েছে—এ সান্ত্বনাটুকু পাব। তাই বলছি বাবা, আপনি এ দয়াটুকু করুন।

স্বামিজীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন শশীদা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপাদ-মস্তক দেখতে দেখতে তাঁর কথাগুলি যেন গিলে খাচ্ছিলেন স্বামিজী। ধীর গম্ভীর কন্ঠে বললেন—সৎ ইচ্ছা, মহৎ ইচ্ছা—সন্দেহ নাই। এইরকম ভাববার লোক পাড়ায় পাড়ায় দু-একজন থাকলেই গ্রামগুলির এ দুর্দশা হত না আজ। সত্যিই মানুষের মত মানুষের অভাব। কিন্তু বাবু, পাড়াগাঁয়ের সংসারী লোক সংসারের বোঝা ঘাড়ে, সংসার প্রতি-পালনের দায়িত্ব আছে, উপায়ের ভাবনা আছে। আশ্রমের সংস্পর্শে কদিনই বা আসতে পারবে এরা? শেষে আশাভংগের দুঃখ পেতে না হয় তোমাকে।

যোড়হাত করে শশীদা বললেন—তা-ও ভেবেছি, বাবা। ভয়ও হয়েছে, জানি তো গাঁয়ের লোকদের। একমাত্র ভরসা—আপনি। প্রথমেই নেশা ধরিয়ে দিতে হবে, আশ্রম চালার উপযোগিতা দেখিয়ে দিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা। সে বিষয়ে আমি বেশি কি বলতে পারি, বাবা? এ কাজটুকু আপনাকে করাতে হবে, স্বামিজী।

চোখ বুজে একটু ভেবে নিলেন স্বামিজী। তারপর বললেন—সৎ সংকল্প, সৎ চেষ্টা, জনহিতকর চিন্তা। চেষ্টা করে ফল ফলের কথা কিছু বলা যায় না। তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ'—যত্ন করেও যদি সিদ্ধ না হয়, বুঝতে হবে যত্নে বা চেষ্টায় কোন ত্রুটি হয়েছে।

যদি আন্তরিকতা থাকে, নিষ্ঠা থাকে তাহলে সংকল্প সাধন হবে। আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর। যাওয়া যাবে মাঝে মাঝে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। স্বামিজীর পদধূলি মাথায় নিয়ে শশীদা বললেন—তা হলে প্রতিষ্ঠার নিয়ম-কানুনগুলো, বাবা?

ততক্ষণে গড়গড়া এসে গেছে। টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্বামিজী বললেন—সে বিশেষ কিছু না। ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বই-এর আলমারি, বইপত্তর, আর লোকজনের বসবার জন্যে ঢালা বিছানা—সতরঞ্চের ওপর ফর্সা ধবধবে চাদর পেতে রাখা। কিছু ধূপ-ধুনোর ব্যবস্থা রাখবে—কোন রকম বদগন্ধ না আসে।

হাঁ, সাধ্যমত একটা ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করতে হবে। খাওয়া-দাওয়া। ওটা দরকার। সকালে সভা করে আশ্রমের উদ্দেশে বুঝিয়ে দেওয়া। তা করতেই দুপুর হয়ে যাবে। সবাই মজুর খেয়ে বাড়ী যাবে। ব্যস্ আর কিছু না। এইরকম একটু যোগাড়-যাগাড় করে তারিখ আর সময় বলে সকলকে আশ্রম প্রতিষ্ঠায় খবর দাও।

কৃত-কৃতার্থ দু-ভাই-এর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। স্বামিজীকে প্রণাম করে বললেন—তা হলে উঠি বাবা। তবে খোকাকে পাঠিয়ে দিতে হবে দুদিন আছে স্বামিজী। অনেক কাজ হবে।

—কি এমন বেশি কাজ! দুদিন আগে নয়, একদিন আগে গেলেই যথেষ্ট। আগের দিনেই যাবে খোকা।

আর কথাটি নাই। স্বামিজীর কাছে বিদায় নিয়ে দু-ভাই উঠলেন গাড়ীতে।

(চৌষট্টি)

বৈশাখের মাঝামাঝি। কাল অক্ষয়-তৃতীয়া। ভাঁড়ার আর রান্নাঘরের ভার রেণুদাকে দিয়ে স্বামিজীকে প্রণাম করে সকালেই এলুম কামারপাড়ায়।

সূর্য তত প্রখর হয় নাই। বসন্ত যাই যাই করেও যায় নাই এখনও। ঝিরি-ঝিরি মলয় বাতাস গাছে গাছে ফুলপাতাদের দোল দিচ্ছে। ডালে ডালে অজস্র ফুল-ফল। আম গাছে বউলের বদলে থোকা থোকা আম। কতক কাঁচা, কতক ডাঁশা, কতক পাকা—রসে রসে টইটম্বুর। একঠেঙো তালগাছের মাথায় পাতার ছাতার নিচে কাঁদি কাঁদি কাঁচ তাল, খেজুর গাছের ঝাঁকড়া মাথায় সোনার বরণ পাকা খেজুর। জাম গাছে পাকা পাকা কালো জাম। পাতাবিরল কৃষ্ণ-চূড়া গাছের মাথায় মাথায় রক্ত-সোনালী ফুলের তোড়া। মল্লিকা, মুচকুন্দ, গন্ধরাজের সুবাস মাখা মলয় হাওয়া।

বছরের প্রথম মাস। মা-বোনেদের কত কাজ—বার ব্রত, পূজো-আর্চা। ছোটদের পুণ্যিপুকুর, গোকাল, বড়দের হরিচরণ, শিবসনাতন, ফলদান, অক্ষয়ফল, নারায়ণের ব্রত—আরও কত কি।

ছোট ছোট মেয়েরা সাজি হাতে নয়তো কচুর পাতে ফুল তুলতে বেরিয়েছে ভোর-ভোর, গোকাল-ব্রতীরা দূর্বাঘাসের ছোট ছোট আঁটি, তেল, হলুদ, জলের ঘটি নিয়ে চলেছে গোয়াল পানে। ঘরকন্নার পাট-ঝাট সেরে মায়েরা কলসী কাঁখে নাইতে চলেছেন পুকুরঘাটে। সকাল সকাল না নাইলে কি চলে—বার-ব্রত আছে তো।

ব্রাহ্মণদের পোয়াবারো। সকালবেলায় স্নান সেরে ফোঁটা কেটে, সাদা পৈতের গোছা গলায় দিয়ে রঙিন ছাপা নামাবলী গায়ে দিয়ে ছোট থেকে বুড়ো সব বয়সের ব্রাহ্মণই এখানে ওখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছেন। মায়েদের নজরে পড়া চাই তো—কিছু না কিছু মিলে যাবেই তাহলে।

গ্রামের এই শুদ্ধ শুচি ভাবটুকু নিজের অজান্তেই মনে ফুটিয়ে তোলে শুচিতার ভাব। সংগে সংগে বিমল আনন্দ।

নিজেদের বাড়ীর আগেই শশীদার বাড়ী। প্রথমেই গেলুম তাঁর সংগে দেখা করতে—বেলতলার ঠাকুরদালানে বসে আছেন শশীদা, হরে-দা আরও কজন।

—এসো এসো, বাঁচা গেল—বলে শশীদা ডান হাতখানি পিঠে রেখে বললেন—অনেক কাজ, খাটতে হবে, বুঝলে? তোমার জানা আছে স্বামিজীর কখন কি দরকার। তোমাকেই সব জোগাতে হবে হাতে-হাতে—মানে—স্বামিজীর সেবার ভার তোমার। কোন ত্রুটি—সেবা-অপরাধ যেন না হয়। আজ থেকে তোমার আস্তানা এ-বাড়ীতেই বুঝলে?

—কেন? ও বাড়ীতে থাকলে কি হবে?

কাকার বয়সী শশীদার বয়স পঁয়ষট্টি বছর। মৃদু হেসে বললেন—হবে না কিছু। তোমার আবার এ-বাড়ী ও-বাড়ী কি? বাড়ীতে থাক কদিন? আর এও তো তোমারই বাড়ী। দাদার বাড়ী আর ভাই-এর বাড়ী কি আলাদা? এখানেই থাকবে। তবে যাও, একবার দেখা করে এসো সকলের সংগে। শীগগির এসো।

তাই হল।

দুপুরের খাওয়ার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আশ্রমের বড় হল ঘরে শতরঞ্চ চাদর পেতে ঢালা বিছানা, মাঝখানে জানালার কাছে স্বামিজীর বসবার জায়গা, আলমারি, চেয়ার ইজিচেয়ার সাজাতে গোছাতেই সন্ধ্যে। হল-ঘরের মাঝখানে কড়িকাঠে টাঙানো হল বড় ডে-লাইট। সদর দরজার দুপাশে কলা-গাছ আর পূর্ণঘট, মাথায় আমশাখার মালা।

রাত পোহাতেই শশীদা হরেরাম দা, কিংকরদা আরও কজন গ্রামের মাতব্বর এসে বসলেন আশ্রমবাড়ীর বারান্দায়। সবাই উদগ্রীব—চেয়ে আছেন পথপানে। বেলা নটায় স্বামিজীর গাড়ী এসে দাঁড়াল আশ্রমবাড়ীর দরজায়।

গাড়ী থেকে নেমে এলেন স্বামিজী। সুটকেস হাতে রেণুদা এল পেছনে পেছনে।

আনন্দের হুল্লোড়। একে একে প্রণাম করলেন সবাই।

পা ধুয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন স্বামিজী।

জলযোগ শেষ হতেই এল অম্বুরী তামাক দেওয়া নতুন গড়গড়া।

ততক্ষণে দলে দলে বালক-বৃদ্ধ-যুবা—নানা বয়সের নানা লোকে ভরে গেছে আশ্রমের হলঘর, বারান্দা, উঠোন থেকে রাস্তা পর্যন্ত।

স্বামিজী বললেন—তোমাদের গ্রাম আর গ্রামের লোকদের সম্বন্ধে অনেকদিন থেকেই অনেক কথা শোনা আছে। শিল্প-সমৃদ্ধ বড় গ্রাম, তোমরা সবাই প্রায় শিল্পী। তবে আধুনিক শিক্ষা তো বটেই নৈতিক শিক্ষাতেও তোমরা পেছিয়ে আছ অনেক-খানি। সেকথা তোমরা ভাব না কেউ। নিজেদের কথা নিজেরাই ভুলে আছ। তোমাদের কথা ভেবেছেন—এই শশীবাবু।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোকে

আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে কোপেনহেগেনে সমাজতান্ত্রিক দেশের মহিলাদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর তাবৎ মহিলাদের সমস্যা নিয়ে সেখানে সুদীর্ঘ আলোচনা চলে। প্রথম সম্মেলনেও এরকম আলোচনা হয়েছিল। নিজেদের মুক্তির আলোকে তাঁরা সকলের কথা বিবেচনা করছিলেন। হয়তো এরকম বাৎসরিক অনুষ্ঠান এবং আলাপ আলোচনার মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যেতো যদি না সম্মেলনের শেষে একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপিত হতো। শ্রীমতী ক্লারা জেটকিন এক প্রস্তাব দিলেন যে, প্রতি বৎসর ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে উদযাপিত হোক। এরপর সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি হলো না। সর্বসম্মতক্রমে ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাব গৃহীত হলো। সেই থেকে প্রতি বৎসর এই দিনটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কিন্তু এই শক্তিকে স্বীকার করে নিতে সকলের ছিল দারুণ কুন্ঠা। মেয়েদের শক্তিকে অস্বীকার করাই ছিল সেদিনের রেওয়াজ। এসম্বন্ধে লেনিনের উক্তি হলো : দি স্ট্যাটাস অফ উওমেন আপ টু নাউ হ্যাজ বিন কম্পেয়ার্ড টু দ্যাট অফ এ স্লেভ, উওমেন হ্যাভ বিন টায়েড টু দি হোম। এই ছিল সেদিনের বাস্তব অবস্থা। নারীর স্বাভাবিক অধিকারের প্রত্যাশাকে সবাই ব্যঙ্গ করতেন। কিন্তু এই শক্তিকে অন্ধকারে রেখে যা অস্বীকার করে দেশ ও জাতির পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। তাই রুশদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে লেনিন গর্ব ভরে ঘোষণা করলেন যে, ফর দি ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি, আওয়ার ল হ্যাস রিমুভড এভরিথিং দ্যাট ডিনায়েড উওম্যান রাইট। জাতি গঠনের কাজে নারীশক্তিকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদের পরিপূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় বিভূষিত করলেন। আর তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে রুশ ললনারা আত্মনিয়োগ করলেন দেশ ও জাতির পুনর্গঠনে। আজ সে দেশের দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় যে, কি বিপুল অগ্রগতি তাঁদের সাধিত হয়েছে। সারা দেশের অর্ধেক কর্মী হলেন তাঁরা। ইঞ্জিনীয়ার এবং টেকনিশিয়ান-এর দিক থেকে পৃথিবীর অনেক দেশকে তাঁরা টেক্কা মেরেছেন। প্রতি তিনজনে একজন হিসেবে পুরুষদেরও তাঁরা ছাড়িয়ে গেছেন। শিক্ষকতা এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগে তাঁদের হার হলো যথাক্রমে ৭২ এবং ৮৫। এই সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যাপারেও তাঁদের সংখ্যা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে মোট কর্মীর তাঁরাই হলেন ৬১ ভাগ। বিজ্ঞানে রুশদেশের অগ্রগতি পৃথিবীতে আজকের বিস্ময়। ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা পৃথিবীর প্রথম এবং আজো একমাত্র মহিলা নভশ্চর। এই দুর্লভ সম্মানের পেছনে যেমন রয়েছে সারা জাতির অবদান তেমনি বিজ্ঞানকর্মে নিযুক্ত শতকরা ৪৭ জন নারীর ঐকান্তিক বাসনা আর সাধনা।

বিশ্ব নারী দিবসের আলোকে এসে যায় আরো একাধিক দেশের নারীসমাজের অগ্রগতি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কাহিনী। যুদ্ধবিধ্বস্ত পূর্ব জার্মানীর কথাই যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে, সেদেশের মহিলাকুল এক অসাধ্যসাধন করেছেন। সেদিন জার্মানীতে পুরুষেরা ছিলেন সংখ্যাল্প, নারীরা ছিলেন সংখ্যাধিক। তাই এই বিভীষিকা উত্তরণে তাঁদের বিরাট ভূমিকা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। দেশের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে সেদিন তাঁরা এক বীরশ্রেষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এক জরুরী পরিকল্পনা হাতে নেন। সেই পরিকল্পনার নাম হলো, সেভ দি চিলড্রেন। দেশ বাঁচতে চায় শিশুর মধ্য দিয়ে আর সেখানেই হাজারো স্বপ্ন জমা থাকে। এসময় শিশুদের অবস্থা ছিল খুবই দুঃসহ। যুদ্ধ তাঁদের মা-বাবা কেড়ে নিয়েছে। অনাথ, অসহায় অবস্থায় তাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই তাঁদের বাস। আবার কেউ বা মা-বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের সময় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারা পালিয়ে ফিরেছে। এভাবে তারা নিজেদের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। প্রথম এই কাজে হাত দিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে স্থাপন করলেন প্রভিসনাল চিলড্রেন্স হোম। শুরু হলো শিশুদের উদ্ধারকার্য। রাস্তা থেকে, ধ্বংসস্তূপ থেকে আর বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ি থেকে শিশুদের নিয়ে এসে এইসব হোমে রাখা হলো। এভাবে অনেক মা-বাবা তাঁদের হারানো সন্তান ফিরে পেলেন। আর যাদের মা-বাবার খোঁজ পাওয়া গেল না তাদের জন্য এগিয়ে এলেন দেশের অসংখ্য সন্তানহারা মা-বাবার দল। তাঁ[...] সেসব শিশুদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে নিজে[...] সন্তানব্যথা নিবারিত করলেন।

সারা দেশে সেদিন দারুন অভাব। অন্ন বস্ত্র-খাদ্য কোন কিছুর সুব্যবস্থা নেই এর বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ালেন সে দেশে[র] নারীসমাজ। সর্বত্র স্থাপিত হলো সেলা[ই] ঘর। পুরানো সব কাপড়চোপড় থেকে জা[মা] তৈরি করে সকলের আশু প্রয়োজ[ন] মেটানো হলো। সব কলকারখানা তখ[ন] অচল। যুদ্ধে প্রায় অধিকাংশই ধ্বংস হ[য়ে] গেছে। যা আছে তারও কার্যকরী ক্ষম[তা] নেই। দোকান থেকে জিনিষপত্র কেনা[র] সামর্থ নেই মানুষের। অথচ এই সুযো[গে] কালোবাজারী আর মুনাফাখোররা মাথ[া] চাড়া দিয়ে উঠলো। নারীসমাজ দায়ি[ত্ব] নিলেন এদের মোকাবিলার। কেউ যাতে বে[শি] দামে জিনিস বেচতে না পারে সেদি[কে] তাঁরা কড়া নজর রাখলেন আর সেই স[ঙ্গে] সব জিনিস সকলের মধ্যে সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। এভাবে [...] দেশকে পুনর্গঠিত করতে সাহায্য করে[ন] তাঁরা। পূর্ব জার্মানীতে নারীর ম[র্যাদা] আজ বিস্ময়কর। দেশের সর্বত্র এখন তাঁ[রা] আরো বৃহত্তর ভূমিকা পালন ক[রে] চলেছেন। সে দেশে আজ আর কোন বি[ষয়ে] নারী বা পুরুষ এই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত ন[য়]। এদেশের এক মহিলা সাহিত্যিক [...] কিছুদিন আগে ভারত ভ্রমণে এসে [...] করেন যে, সাহিত্যে আমাদের [...] বিবেচিত হয় নারী বা পুরুষ হিসেবে ন[য়] সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা গড়ে তুলে[ছি] আমাদের দেশের সাহিত্য, শিল্পকলা এ[বং] সবকিছু।

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এসে যা[য়] বাংলাদেশের কথা। এক নদী রক্ত পেরি[য়ে] সে দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। পা[ক] জঙ্গীশাহীর নিষ্ঠুরতম আক্রমণের মু[খে] দাঁড়িয়ে দেশের মুক্তিযুদ্ধে পুরুষদের স[ঙ্গে] কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা লড়াই করেছেন বিভিন্ন স্থানে তাঁরা শত্রুসৈন্যের গ[তিবিধির] সংবাদ সংগ্রহ করেছেন জীবনপণ কর[ে]। এজন্য তাঁদের মূল্য দিতে হয়েছে অপরি[-] সীম। তাঁদের নারীত্ব হয়েছে লাঞ্ছিত কিন্তু দেশের মুক্তি সাধনায় এজন্য তাঁ[রা] কোন দ্বিধা করেন নি। আবার কোথা[ও] কোথাও তাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন আহ[ত] মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষার। আশ্র[য়হীন] মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব তাঁরা বহন করেছেন। শত্রুর বিরুদ্[ধে] [...]

লড়াইও করেছেন। প্রচণ্ডতম আঘাত হেনেছেন শত্রুকে। আমরা ভুলতে পারি না রোশেনারা বেগমের কথা। বুকে মাইন বেঁধে শত্রুর ট্যাঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ে যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভাস্বর করে গেলেন। অনেক ইতিহাস-খ্যাত বীরাঙ্গনার কথা আমরা জানি। কিন্তু রোশেনারা আমাদের অভিজ্ঞতার সম্পদ। শোনা যায় যে, কোন এক দেশের রমণীরা দেশের প্রচণ্ড সংকটে নিজেদের মাথার চুল দিয়ে ধনুকের ছিলা তৈরি করে দিয়েছিলেন, রোশেনারার ঐতিহাসিক আত্মদানে নারীর স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা আরো ভাস্বর হলো।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু রক্ত-মূল্যে যে স্বাধীনতা তাঁরা অর্জন করেছেন তা সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজেও সে দেশের নারীসমাজ অক্লান্ত প্রয়াসে কাজ করে চলেছেন। পাক চমূদের হাতে দেশের যে বিপুল সংখ্যক নারীর অবমাননা হয়েছে তার প্রতিকারে তাঁরা স্থাপন করেছেন একাধিক হোম। এই নির্যাতিতা মহিলাদের এখানে আশ্রয় দেওয়া হবে। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং কাজকর্মের সমস্ত দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন। জীবনের সর্বস্বের বিনিময়ে তাঁরা স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। তাই পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন নারী সমাজ। নারী-সমাজের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছেন স্বাধীন সরকার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের যুবকদের কাছে আহ্বান রেখেছিলেন স্বেচ্ছা-বিবাহের মাধ্যমে এই মহিলাদের সামাজিক মর্যাদায় পুনরায় অধিষ্ঠিত করার। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সে দেশের যুবকরা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছেন। এছাড়া দেশের নারীসমাজ দেশের পুনর্গঠনে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কালক্রমে তাঁরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবেন বিশ্বের এক অগ্রগামী নারীসমাজ হিসেবে।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আমরাও লাভ করেছি এক দুর্লভ সম্মান। অবশ্য অন্যান্য দেশের মতো আমাদের ইতিহাস এক্ষেত্রে পশ্চাদগামিতায় কণ্টকিত নয়। বেদের যুগে আমাদের ছিল স্বাভাবিক অধিকার। কিন্তু মধ্যযুগের অন্ধকার অধ্যায়ে আমরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তারপর আবার সুযোগ আসতেই আমাদের জাগরণ শুরু হয়েছে। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সমস্ত জাতিকে শোনালেন এক অমেয় মন্ত্র : এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়। নারীজাতির বিরাট শক্তিকে অবহেলা করে আমরাও এগুতে পারবো না। সেই হলো আমাদের পক্ষে সঞ্জীবনী মন্ত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। পরবর্তী-কালে আমাদের অগ্রগতি আরো বিস্ময়কর। শিল্প-শিক্ষা-বিজ্ঞানে আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। সমানাধিকারকে সংবিধানের পাতায় না রেখে আমরা সর্বত্র নিজেদের অধিকার আদায় করে নিয়েছি। আর সর্বোপরি আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধার তিনি। এ মর্যাদা নিঃসন্দেহে দুর্লভ। আমাদের এই অধিকারের যোগ্য করে নিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি। অতীত ইতিহাস আর বর্তমান সাধনাই আমাদের এই সাফল্যের চাবিকাঠি। এই সাফল্যের মর্যাদা রাখতে গিয়েই আমাদের আরো ব্যাপক অগ্রগতি বাঞ্ছনীয়। আমাদের এই নবজীবনের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র। তবেই সমস্ত দেশের নারী-সমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় তা পূর্ণতর রূপ পাবে। আর সেদিন উদাহরণ খুঁজতে গিয়ে আমাদের বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না বরং তাঁরাই আমাদের কথা বলে নিজেদের বিকাশের পথ খুঁজে পাবে।

—প্রমীলা

উল্লেখনীয়

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় মহিলাপ্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ১৭ জন। অথচ গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২৭। রাজ্যের ১৬টি জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় কোন মহিলাপ্রার্থী নেই।

পশ্চিমবঙ্গে এবার ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় ২,২৩,০৪,৮৫৬ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার হলেন ১,১০,৩২,৪২৮ জন। মোট নির্বাচকমণ্ডলীর প্রায় অর্ধেক।

সারা দেশের ভোটদাতাদের মধ্যে এই একই চিত্র নজরে পড়ে। এবারকার নির্বাচনে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ১২,৫০,৩৩,৩১০ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার হলেন ১,৪৬,৭৭,৯০৯ জন।

* * *

গত ভারত-পাক যুদ্ধে নিহত ভারতীয় বীর জওয়ানদের জায়াদের সমাজ ও সংসারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ওড়িশায় একটি বিধবা সংস্থা গঠন করা হয়েছে। সমস্ত নিহত জওয়ানদের সহ-ধর্মিণীদের তাঁদের নিজ নিজ আর্থিক অবস্থা, সন্তান-সন্ততি ও শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত তথ্য জানাবার জন্যে রাজ্য জনসংখ্যা বিভাগ আবেদন জানিয়েছেন।

কলকাতায় ভারতীয় বণিকসভার দশজন সদস্যযুক্ত একটি সমীক্ষা দল দুদিন ঢাকা সফর করে আসেন। কলকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীদের স্ত্রীদের নিয়ে এই দলটি গঠিত। তাঁরা কয়েকটি অনাথ আশ্রম এবং যেসব মেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যের কামনার বলি হয়েছেন তাঁদের জন্য স্থাপিত বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

জানবার মতো খবর......

জামসেদপুরে নাগরিক কমিটির মহিলা শাখা জওয়ান কল্যাণ তহবিলে দু' লাখ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছেন। কমিটির চেয়ারম্যান লেডি রোশন গান্ধী সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ'র হাতে এই টাকা তুলে দেন।

* * *

বোম্বাইয়ের নতুন শেরিফ শ্রীমতী মেহবুবে নসরুল্লাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য প্রবাসী বাঙালী মহিলা সমিতির উদ্যোগে এক সভা হয়। সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী সন্ধ্যা পালিত শেরিফকে স্বাগত জানান। সমিতির [illegible] কাজের বিবরণ পাঠ করেন সম্পাদিকা শ্রীমতী উষা ধোলাডে।

সমিতির মহৎ প্রয়াসের প্রশংসা করে শ্রীমতী নসরুল্লা দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিতে ক্রেতাদের প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং এ ব্যাপারে মেয়েদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে অনুরোধ জানান।

* * *

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে শহীদ-দের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য তিনি পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। তিনি আরো জানান যে, স্বাধীনতার জন্য যেসব সরকারী কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের পত্নীরা পেনসন পাবেন। অন্যান্যরা আর্থিক সাহায্য পাবেন। তাঁদের ভরণপোষণের সকল ব্যবস্থা করা হবে।

* * *

নির্যাতিতা মেয়েদের জন্য ঢাকায় একটি হোম চালু হয়েছে। ঢাকার মহিলা রিলিফ কমিটির সদস্যরা বাংলাদেশ মহিলা সেবাসংঘ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেছেন। লাঞ্ছিতা ও নিপীড়িতা মহিলাদের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অধিকার লাভের সব রকম ব্যবস্থা করা হবে। পাক সৈন্যদের অত্যাচারে যারা শিকার হয়েছেন তাঁদের জন্যই এই ব্যবস্থা।

দুঃস্বপন

শ'রে শ'য়ে লোকের গাদাগাদি দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল আমাদের মত ছ'-সাতটি মেয়ের একটি দল। ছোট স্টেশন, ততোধিক ছোট একটি ওয়েটিং রুম। এতগুলো লোকের রাতের আস্তানা চাই। 'শোওয়া তো দূরের কথা, সামান্য পা গুটিয়ে বসতে পারলেই যথেষ্ট, তাতে আবার পা ছড়ানোর চিন্তা' অত্যন্ত বিরক্তিতে মন্তব্য করেছিল একটি মেয়ে। সম্ভবত ওদের দলের সর্বকনিষ্ঠা মেয়েটির চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। ওকে দেখেই সেটা বুঝতে পারছিলাম। চোখ অসম্ভব লাল, তার সঙ্গে ঘন ঘন হাই উঠছিল। সেই অবস্থায় কাঁধে একটা কিট্ ব্যাগের বোঝা চাপিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুও নিরুপায়। বিরাট জন-সমুদ্রে নড়াচড়ার কোন উপায় ছিল না।

ঘটনা ঘটেছিল বোলপুর স্টেশনে। সকলেরই লক্ষ্য দোল উৎসবের ছুটিটাকে একটু নতুনভাবে উপভোগ করা। তাই ঝপাঝপ ছোটখাটো একটা কিট্ব্যাগ নিয়ে অনেকেই বেড়িয়ে পরেছে। হোটেলে স্থান নেই, তিলধারনের জায়গা নেই 'পৌষালী'তে। আগে থেকেই সেখানে জায়গা বরাদ্দ হয়েছে কিছু লোকের। ইয়ুথ হোস্টেল, গেস্ট হাউসও বোঝাই। গেস্ট হাউসে জাপানীজ ডেলিগেটস্ ও ম্যাকসমুলার ভবনের কিছু ছেলের জায়গা সংরক্ষিত করা হয়েছে। সুতরাং অন্যদের জন্য রয়েছে উদার আকাশের নীচে উন্মুক্ত প্রান্তর, নয়তো নবমুকুলিত আম্রকুঞ্জের ছায়া। ওয়েটিং রুমের একটি দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলাম। তখনও সন্ধ্যা হতে কিছু দেরী।

ঝোলাঝোলা নিয়ে আমরা পাঁচজন বেরিয়ে পড়লাম আশ্রয়ের আশায়। মনে মনে ভাবলাম পরিচিতদের বাড়ী আগে ঢু মারবো—জানি, সেখানেও কোন আশ্রয় মিলবে না। তবুও যেতে হবে। একে একে মাস্টারমশাই, অধ্যাপক, দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ী খোঁজ করলাম। আমাদের দেখে সবাই বিব্রত। কেউ কেউ চা-পানের নিমন্ত্রণ অবশ্য করেছিলেন কিন্তু রাত্রির আস্তানার কথা একবার ভুলেও উচ্চারণ করেননি। আবার কেউ হয়তো উদাস-উদাসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাদের অন্য কোথাও খোঁজ নেবার উপদেশ দিয়েছিলেন। কেউ আবার বলেছিলেন 'অতিথি-অভ্যাগতের ঠেলায় আমিই কূল-কিনারা পাচ্ছি না, তার ওপর তোমাদের কোথায় জায়গা দি, তাছাড়া আমার এক বিদেশী বন্ধুর আসার কথা আছে', কথাটা ডাহা-মিথ্যা, উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখেছিলাম [illegible] সব গড়ের মাঠ, কিন্তু আগন্তুক-দের কোন বাক্স-প্যাটরা নেই। বিফল মনোরথ হ'য়ে আমার এক বন্ধু বলেছিল 'বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী বিদেশ-বিভুঁয়ে কি ক'রে স্থান দেবে! হতাম বিদেশী—জায়গা হয় কিনা দেখা যেত।' অবশ্য বিদেশীদের প্রতি ওর কোন বিজাতীয় মনোভাব নেই। শুধু ওর ক্ষোভ নিজের দেশবাসীর প্রতি এত অবহেলা দেখে। ইয়ুথ হোস্টেল, গেস্ট হাউস পূর্বেই আমাদের আবেদন না মঞ্জুর করেছে।

যাই হোক শান্তিনিকেতনের ভিতরের আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের বসতবাটীতে অনুসন্ধান চালালাম। বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতা। 'দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগি' একটু আশ্রয়ের অধিকাংশই চুপচাপ। কেউ কেউ বা আমাদের জায়গা দিতে পারলেন না ব'লে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করলেন। হঠাৎ সহৃদয় এক ভদ্রলোক আমাদের বললেন, 'যদি কোথাও জায়গা না হয়, তবে আমার বাড়ীতে কষ্ট ক'রে রাতটুকু কাটিয়ে যাবেন। আমি ছা-পোষা মানুষ। গরীবের কুঁড়েতে একটু ক্লেশ স্বীকার করবেন।' বুঝলাম অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও ভদ্রলোক আমাদের স্থান দিতে চাইছেন। অন্যদিকে আমার এক বন্ধু চলার পথেই এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলেছে। সেই ভদ্রলোকই আমাদের একটা মোটামুটি আস্তানা জুটিয়ে দিলেন। শুধু দু'রাত্রি বাস। ভোরবেলায় বেড়িয়ে পরবো আর রাত্রিতে প্রবেশ। ঘরের জন্য সামান্য ভাড়াই স্থির হ'য়েছিল। বাসস্থান স্থির হ'তেই আমরা শান্তিনিকেতনের চত্বরটা ঘুরে দেখার জন্য বেড়িয়ে পড়লাম। এক-বারেই রাতের খাওয়াটা চুকিয়ে ফিরবো। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের দলের একজন বললো, 'কি আশ্চর্য আমরা জনাকয়েক একটা মাথা গোঁজার স্থান জোগাড় করতে নাজেহাল। অথচ বিদেশের মেয়েরা প্রতি গরমেই হিচ্-হাইক করতে হ্যাভারস্যাকের মধ্যে স্লিপিং ব্যাগ, মেডিক্যাল-কিট, ব্যবহার্য খুব অল্প পোষাক (সাধারণতঃ হিচ্-হাইকের দলেরা জিন ও কর্ডের পোষাক ব্যবহার করে) নিয়ে বেড়িয়ে পরে। এই দল মাঝে মাঝে সামান্য টাকা-পয়সা কখনো বা শুধু হাতেই বেড়িয়ে পরে এক রোমাঞ্চকর জীবনের আস্বাদনে। এমনি সৌভাগ্যশালিনী তারা যে ভিন্ন ভিন্ন গাড়ীতে লিফ্ট চেয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হ'লে গীটার বা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র অথবা সঙ্গীত শুনিয়ে কিছু কিছু উপার্জনও করে। অনেকে অবশ্য ট্রাভেলারস চেক সঙ্গে বহন করে, হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা, অসুখ প্রভৃতিতে ট্রাভেলারস চেক যথেষ্ট সাহায্য করে। তবু শূন্য হাতে মন-প্রাণ ভরে দেশ দেখতে তাদের কোন অসুবিধা নেই।'

প্রতি উত্তরে অন্য একজন বলেছিল 'হিচ-হাইক করতে আমরাই বা কতটুকু সাহসী, আর অন্যান্যরাই বা আমাদের সাহায্য করতে কতটুকু [illegible] আকাশের নীচে, রাস্তার ধারে যেমন-তেমনভাবে শুয়ে রাতটা কাটাতে [illegible] কি খুব ইচ্ছুক?'

অন্যজন বলেছিল, 'তোমরা না যাও, আমি দু'একজনকে নিয়ে হিচ্-হাইক-এ বেরুবো আগামীবার। [illegible] আমি অন্তত রাজী নই।'

ওদের বাদানুবাদ শুনতে বেশ [illegible] লাগছিল। ক্রমেই ঠাণ্ডা হাওয়াটা বাড়ছিল তাই নিজেদের ডেরায় ফিরে গেলাম।

পরদিন অন্ধকার থাকতেই চাঁদের আলোয় পা ফেলে ফেলে 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' বৈতালিক দলের সঙ্গীতের ধ্বনিতে ফাল্গুনের বাতাসকে আবার নতুন ভাবে উপলব্ধি করলাম। 'ওরে [illegible]' গানের সুরে মুখর হ'য়ে উঠলো। [illegible] পূবে আকাশে হালকা একটা [illegible] আভা ছড়িয়ে পড়েছে। 'ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্' নৃত্য— শোভা-যাত্রা প্রতিটি গৃহবাসীকে বসন্ত ডাক দিয়ে [illegible] নাচে-গানে, আবৃত্তিতে 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়', 'এই উদাসী হাওয়ার' [illegible] ক্ষণের দর্শকেরা আনন্দলোকে [illegible] করতে লাগলো। [illegible] আবৃত্তিতে উৎসব শেষ, শুরু [illegible] আবিরের ছড়াছড়ি, দিকে দিকে আবিরে[illegible] পাঞ্জাবী ওড়না উড়তে লাগলো। অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের আবির দেবার জন্য বিন্দুমাত্র [illegible] দ্বিধা নেই। এরপর বেশ কয়েক ঘণ্টা বিরতি। আবার সন্ধ্যার পরে শুরু হবে উৎসবের আসর। এরই ফাঁকে দিনের আলোয় [illegible] একবার গাছে গাছে ঘেরা শান্তিনিকেতন ঘুরতে লাগলাম। খানিক ঘুরে-ফিরে বিশ্রামের জন্য খোলা মাঠে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পরলাম তাদের পাশেই যারা আমাদেরও আগে ঐ মাঠে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাদের অধিকাংশই সেইদিনের অনুষ্ঠান দেখা সাঙ্গ করেই ফিরে যাবেন। কিন্তু বিদেশীদেরও ঐ একই অবস্থা। তারাও গাছের ছায়ায় বিশ্রাম ক'রে বেড়িয়ে পড়ছে ভারতীয় ঐতিহ্যকে পরখ করতে। আমাদের কথা স্বতন্ত্র। সেরাত্রিতে অনুষ্ঠান শেষে রয়ে গেলাম সেখানেই। পরদিন প্রাতঃকালে গৃহকর্ত্রীর কাছে বিদায়পর্ব সমাধা করতে যেতেই তিনি স্মিতহাস্যে বললেন, 'এসেছো ভালোই করেছো, তবে বাপু তোমাদের মত কয়েকজন মেয়ের এত সাহস ভাল নয়।' তার মত বর্ষীয়সীর মুখে সমবেদনাহীন কথাটা শুনে আগামীবারের হিচ-হাইক করতে যাওয়াটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হ'লো।

—[illegible]

অনেকদিন পর এটাচির তোবড়ান ডালাটা খুলল রমেন। খুলে ওটার চতুষ্কোণ গহ্বরের ভেতর তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কিছু একটার জন্যে খুলেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তা সঠিক কী, ভাবতে গিয়ে অনেক কিছুই যেন একসঙ্গে মাথা জাগিয়ে উঠল। এক সময় মনে হল, হয়ত সবগুলির জন্যেই সুটকেশ খুলেছে সে। না বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সময় ছিল, মনটাও কিছু বিক্ষিপ্ত ছিল। হয়ত এই দুইয়ের জন্যেই রমেন হঠাৎ বেশ কিছুদিন বাদ সুটকেশটা খুলে ফেলল হাতের কাছে পেয়ে গেছে বলে।

সুটকেশের ভেতর এমন কিছু মহামূল্য ধনসম্পত্তি ছিল না যে তাই নিয়ে ভেবে আকুল হয়ে হঠাৎ হঠাৎ খুলে দেখতে হবে ঠিক আছে কিনা। ছিল না বলে ওটা খোলাও হয়নি, গরজও আসে নি এতদিন। যে সব জিনিস ছিল, তা না-থাকলেও এমন কিছু ক্ষতি ছিল না এখন। খবরের কাগজের কিছু পুরানো কাটিং গোটা দু'তিন পেন—তার মধ্যে অকেজো পেলিক্যান একটা, তামাক রাখার ছাতাপড়া পাউচ, কিছু খুচরো কাগজে আঁকা ড্রয়িং এবং দলিলের মত ভাঁজকরা কটা সার্টি-ফিকেট—তার মধ্যে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের দেওয়া মেরিট সার্টিফিকেট একটা—এ আর এমন কি। এ সব বাদে যেটি হাতে উঠল, তা হল চৌকো ভাঁজকরা কাগজটা। চৌকো ভাঁজ করে মোড়া আর্টপেপার এবং একপোঁচ ধুলো উপরি। ভাঁজ না খুললেও ভেতরের বস্তুটি চোখে স্পষ্ট। কাগজটা হাতে নিতে এখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাঁজ খুলে দেখার, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করার মত কিছু নেই। এখন নিতান্তই ওটা অপ্রয়োজনীয়। পরিত্যক্ত কাগজের হাবড়ার ভেতর পড়ে থাকলেই বা কি। ছিলও তাই। কেবল চিঠি ক'খানার গতি করেছিল রমেন। বছর দুই আগে এমনিভাবেই হঠাৎ একদিন সুটকেশ খুলেছিল। কিছু একটা খুঁজতে গিয়ে ডালার ভেতর দিককার পকেটে হাত দিতে কাগজগুলো হাতে ঠেকল। একে একে সেগুলো বার করে কিছুক্ষণ নাড়া-চাড়া করেছিল সে। বস্তুত, কাগজগুলো নাড়াচাড়া করেনি, সেই খান তিনচার কাগজের ওপর সামান্য যে কটা লাইন ছিল, সেগুলিই উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ইলাস্টিকের মত ছোট বড় করছিল যেন। সুন্দর ঝকঝকে দাঁতের পাটির মত উজ্জ্বল লাইনগুলো থেকে নতুন নতুন আনকোরা দুর্মূল্য শব্দগুলি খুলে খুলে পরখ করছিল, এতদিন বাদে তা কতটা ভোঁতা কি পিঁজে আলু হয়ে গেছে। অবশেষে বহ্ন্যুৎসব করার আগে শেষবারের মত আর একবার সেগুলি পড়ে দেখবে কিনা ভাবল। তারপর আর না ভেবে মনের নরম জায়গাটায় প্রচণ্ড

এক ঝাঁকানি মেরে দলা পাকিয়ে ফেলল কাগজগুলো। ছেঁড়েনি টুকরো করে। দু'তিনবার চেষ্টার পর দেশলাই জেলে শেষে দলার ওপর বাতাসে শিখা এবং কুণ্ডলী ধোঁয়া দেখল। তারপর এতদিন বাদে আবার এই।

কিন্তু এবার আর অগ্নিযজ্ঞ না। কি করা, কি করা ভাবতে ভাবতে মুখের প্রোফাইলের সেই পাতলা ভিজে ভিজে ঠোঁট দুটি রমেনের চোখের ওপর দাঁড়িয়ে গেল। এবং দুটি আর্দ্রস্বভাব চোখ। পাখির দাঁড়ের মত চোখ না। বরং তা মাছের ল্যাজের মত বলা যায়—শেষের দিকে রূপকথার পরীর চোখের মত বাঁকা আর শেষের কবিতার লাবণ্যর মত টানা টানা। স্বভাব-আর্দ্রতার জন্যে চোখ তুলে তাকালে মনে হত, অপেক্ষাকৃত বড় চোখের পাতা দুটি যেন গভীর সমুদ্রের জলে হাসা-মেঘের ছায়া ফেলে রেখেছে। এবং হাসলে ছায়ার জলে তিরতির ঢেউ উঠে চিক্‌চিক্‌ করত। সে কথা থাক। পাঠকরা কাগজখানা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যে সেটা খুলে ফেলেছিল, খোলার পরে তা খেয়াল হল রমেনের। কাগজের সঙ্গে লেপটে এঁটে ছিল ছবিটা। কাগজ থেকে তা আলাদা করতে গিয়ে শুকনো আঠা দাঁড়িয়ে উঠে এল হাতে। মাত্র কটা বছরের ভেতর অমন ঝক্‌ঝকে ফটোটা থো ফুটে লালচে বিবর্ণ হয়ে গেছে। চোখের স্বভাব, মুখের আদল, কি ঠোঁটের গড়ন—কিছুই বোঝবার জো নেই। আগাগোড়া ঝাপসা আর ধোঁয়াটে। অথচ এ ছবির মত সত্যিই তো আর আসল চেহারা নয় অলকার। ছিলও না কোনদিন।

জানলার ওদিকে সিঁড়ির ঘুলঘুলি থেকে বাবার গলা শুনতে পেল রমেন। প্রাতঃসন্ধ্যার মন্ত্রপাঠ। স্পষ্ট জোর জোর গলায় মন্ত্র পড়ে সন্ধ্যাহ্নিক করছেন শিবপদ। অর্থাৎ দ্বিতীয়বারের জন্যে চা-টা এখুনি উনুনে বসান হবে গরম করতে। চা খেয়েই তেল মাখতে বসবেন উনি। তারপর ঘাড় ধরে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে স্নান খাওয়া জামাকাপড় পরা এবং দেড় মাইল হেঁটে নতা কুড়ির ব্যান্ডেল লোকাল ধরা। সন্ধ্যাহ্নিকের গলা শুনে রমেন নড়েচড়ে বসল। গরম করা তলানি চায়ের আধকাপ ভাগ নিয়ে এখুনি হয়ত মা ঢুকবে। হয়ত কেন, মা-ই। বনু এ সময় কাচিৎ বাড়ি থাকে। যেদিন ওর ফিরতে দেরি রাত হয়, আর পরদিন সকালে ওঠে অনেক দেরিতে, সেদিন সকালের দিকে বেরোয় না। ঘরেই থাকে। যাইহোক, মা ঢোকার আগেই মেঝের ওপর নামানো কাগজপত্র সমশুদ্ধ এটাচির ভেতর তুলে রাখল রমেন। ঝাপ্‌সা ছবিটাও। ছবিটা যে মার কাছে ধরা পড়ার ভয়েই তাড়াতাড়ি তুলে ফেলল সে, তা হয়ত ঠিক না। এতদিন বাদ সব চুকেবুকে যাওয়ার পরেও ওটা নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করতে দেখলে নিজের আহাম্মকী ধরা পড়ে যাবে। কিম্বা ছেলেকে এইভাবে শোক করতে দেখলে মায়ের কষ্টটাই তার চেয়ে বেশী হবে—

যে-কোন কারণেই হোক রমেন গুটিয়ে ফেলল কাগজপত্রের সঙ্গে ছবিটাও। মা তো বুঝবে না, ছবিটা আসলে সে দাহ করার কথাই বসে বসে এতক্ষণ ধরে ভাবছে—শোক না, স্মৃতিচারণও না। শেষ পর্যন্ত আপাতত ছবির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। তাতে কিছু না, এখন আর ওটার এমন কিছু গুরুত্ব নেই যে এই মুহূর্তে যা হয় একটা কিছু করে ফেলতে হবে। এটাচি বন্ধ করে সে একদিকে ঠেলে রাখল চৌকির নিচে। আবার কতদিন কত বছর পরে এমনি কোন কারণে-অকারণে হয়ত হাত পড়বে। কিম্বা আদৌ পড়বে কিনা কে জানে। ভাঙা চৌকি, ভাঙাচোরা টিনের সুটকেশের জঞ্জালে জমা হবে গিয়ে ভেতরের কাগজপত্র সার্টিফিকেট-গুলো সমেত এককালের অনবদ্য ছবিটাও। কোনোদিনই জিনিসগুলো যখন আর কোনো কাজে আসছে না, তাই আহা-তুহু করার নেইও কিছু।

আপিস যাবার মুখে ভেজান পাল্লা দুটো ঠেলে ঘরে ঢুকলেন শিবপদ। রমেন কি একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। সম্ভবত ছাত্রেরই স্কুলপাঠ্য কোন বই। দরজার কাছ থেকেই শিবপদ বললেন, 'আজ আর তো টিউশানি নেই, ছটা থেকে ভটা কারফিউ বলে গেছে—আমিও ফিরবো পাঁচটা দুয়ের গাড়িতে।' রমেন নিরুত্তরে তাকাল বাবার দিকে। আসল কথাটা শোনার জন্যে তাকিয়ে রইল।

—বলছিলাম, দেবুকে আজ বেরুতে না দেয়াই ভাল। ওর বন্ধু-বান্ধবদের তো জানিস, কারফিউ কেন, কোন কিছুই মানে না।

রমেন চৌকি থেকে নামতে নামতে বলল, 'ও কি কারো কথা শোনে নাকি! মস্তানি যেদিন বেরুবে......' কথাটা শেষ হবার আগেই বাবার অসহায়, করুণ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে। তারপর গলা বদলে বলল, 'দুপুরের দিকে ধর্মতলারটা পড়িয়ে আসব গিয়ে। তব, আপনি ভাববেন না, বাকি সারাদিনই তো বাড়ি আছি।'

শিবপদ বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ির নিচে আশ্রয় পাওয়া গৃহস্থের অকর্মণ্য বুড়ো-কর্তার মতো রমেনের চোখ দুটি একবার বালিঝরা দেয়ালে থেমে রইল। তারপর জানলার মরচে পড়া গরাদের ফাঁক দিয়ে হেঁটে গেল পালতে মাঠের শেষ কিনার অবধি। বাঁ-হাতে চাকলাদার ঝোপের পাশ দিয়ে শিবপদ টুকটাক এগিয়ে চলেছেন। বয়সের ভারে তাঁর ঘাড় থেকে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কোমরেও একটা ছোটখাট বাঁক। মানুষটার আর দোষ কি! সেই কবে পাঁচ বছর আগে রিটায়ার করেছেন। একটানা সাঁইত্রিশ বছর চাকরি করে শেষ জীবনটা কোথায় একটু জিরেন খাবেন, বরাতে সইল না। একমাত্র রোজগেরে ছেলে—ছেলের মত ছেলে বলা যায়—অকেজো হয়ে ঘরে ঢুকল, তারপর আর একটি দিনও অপেক্ষা না করে নতুন করে আবার শুরু হল মানুষটার দৌড়ঝাঁপ।

তায় এ আর সরকারী আপিস না, মাড়োয়ারী বাড়ির সামান্য চাকরি। বাঙালী হয়েও একান্ত নিরীহ বুড়ো মানুষ বলেই কাজটা পেয়েছেন। রমেনের বয়সী জোয়ান কর্মঠ হলে প্রথম দিনই দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে দিত না, চাকরি তো ছার। মাঠ ছাড়িয়ে স্টেশনে যাবার পিচ-রাস্তায় উঠে শিবপদ একটা বাঁকে চাপা পড়তেই রমেন চোখ তুলে আনলো লম্বা একটা নিঃশ্বেস ফেলে।

অর্থাৎ, এই দুটো বছর কী যে ঘটে গেল কোথা দিয়ে! শিবপদর মতোই তারও যেন ব্রহ্মাণ্ডের কারো ওপর কোন অভিযোগ নেই। দেবু-দীনু কি রুনু—সকলের চোখেই সে যে এখন অপ্রয়োজনীয় আসবাব বিশেষ, এটা জলের মতোই স্বচ্ছ। বয়েস সব সাত আট বছরের করে ছোট হলে কি হবে, ঠোঁটের আগায় শানানো কথা সব সময়। দেবু ইস্কুল করে না, বুর্জোয়া শিক্ষা বদলাতে হবে। অথচ কি করে সারাদিন বাইরে, জানার উপায় নেই। দীনু সবে ক্লাস সেভেন বলে তালিম নিচ্ছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। আর রুনুর কথা তো একেবারে আলাদা। এখন সব কিছুর বাইরে ও। হাওড়া গার্লস-এ ভর্তি হয়েছিল বছর দুই আগে। তখন রমেনের চাকরি ছিল, মাস গেলে ওভারটাইম নিয়ে ছ'সাতশো রোজগার। স্বচ্ছল অবস্থা সংসারের। হাই ফার্স্ট ডিভিসন হলেও ঐ কলেজেই রুনুকে ভর্তি করে দিয়েছিল রমেন। কো-এডুকেশন নেই, পরিবেশটাও বেশ ঠাণ্ডা, তাই। খাস কলকাতার কলেজে ভর্তি হতে না পারার জন্যে রুনু প্রথমটা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে রমেন ওর মাথায় আস্তে একটা চাপড় দিয়ে ভুলিয়েছিল, 'তুই না মুখচোরা হাবিটোল, রোজ কলকাতা যেতে হলে দেহের সবকটা অঙ্গ নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে হবে না। রাজধানীর ট্রাম বাসের আসল চেহারা হালফিল তো দেখনি! সেই পাসিঁয়াগানে থাকার কলকাতা এখন আছে মনে করেছিস নাকি!'

কিন্তু রমেন জানে, অতীতের জাবর কেটে এখন আর লাভ নেই। এখন নিজের দৌড় তো দুটো টিউশানি জড়িয়ে সত্তর টাকার মধ্যে। মাঝে মাঝে অনেক রাত অবধি যখন ঘুম আসে না, দেবুর কথা-গুলো রমেনের মনে হয়। ঘরের একদিকে মেঝের বিছানায় দুজনেই তখন ঘুমোচ্ছে। ওদের নিশ্চিন্ত ঘুমের দিকে তাকিয়ে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে অন্ধকারের মধ্যেই। দেবুর শক্ত-চোয়াল কঠিন মুখে জ্বলন্ত গোলার মত চোখ দুটো ধক্‌ধক্‌ করছে। বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছেলেবেলাকার খোসে পংগু দেবু, বছর তিন আগেও দাদার বকুনি খেয়ে প্যান্টে যে পেচ্ছাব করে ফেলতো সে-ই বলছে, 'জন্ম যখন দিয়েই ফেলেছেন, বাঁচার চেষ্টা নিজেদেরই করতে হবে। পয়েন্টেড ওয়াক মাস্টার এ মাসে আমি কিনবই।' শিবপদ সেখানে ছেলের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। জীর্ণ চাদরটা কান অবধি টেনে ঢাকা দিয়ে কোনক্রমে রমেনের ঘরে ঢুকে

পড়েছিলেন টাল খেতে খেতে। রমেন [illegible] হাত ধরে চৌকির ওপর বসাতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শিবপদর [illegible] দুটি চোখের কোণে জল স্তব্ধ হয়ে [illegible]। তিনি কেবল আর্দ্র গলায় উচ্চারণ করেন, 'নিতাই নিতাই'। তারপর আর কোনও কথা না।

কি সেরাতের রনুর কথা। ইস্কুল ছেড়ে সে কলেজে যাতায়াত করছে ক'মাস [illegible]। এর মধ্যেই রমেনের ব্যাপারটা ঘটে [illegible]। তারপর থেকেই চুপচাপ এক-[illegible] বাড়িতেই। কিন্তু রনু তখনো [illegible]। রোজই সকাল সকাল [illegible] ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয় ট্রেন ধরতে, [illegible] সেই কতো রাত্রে। সেদিন রাতেও [illegible] পেরিয়ে রনু ফিরলো। বাইরের [illegible] তার মুখের তীব্র ঝাঁঝালো [illegible] রমেনের নাকে লেগেছিল। [illegible] মধ্যেই রনুর পা টলছে দেখতে [illegible] গলা থেকে জোর ধমকটা [illegible] বেরিয়ে এসেছিল নিজেও বুঝতে [illegible]। তারপর ভেতরে আলোয় [illegible] পরা রঙ্গিনী রনুকে [illegible] চোখ নামিয়েছিল রমেন। ওর [illegible] দিকে আর এক মুহূর্তও [illegible] থাকতে পারেনি। এর চেয়ে কিছু [illegible] খালি গায়ে থাকলে হয়ত সহ্য [illegible] ক' মাস আগেও সে নিয়মিত [illegible] জোগাড় করা বা সন্ধ্যা-[illegible] কিম্বা মা অশুচি থাকলে [illegible] লক্ষ্মীকে জল-বাতাসা দেওয়ার [illegible] পরতো না, কেবল আঁচলটা পাক [illegible] জড়িয়ে নিত। লক্ষ্মীর ঘটের [illegible] জোড়হাতে বসে থাকার [illegible] সত্যিকার একজন নিষ্ঠাবান [illegible]। দেহে বস্ত্র রইল কি রইল [illegible] নয়। রমেন এখন মাটিতে [illegible] দেখতে পেল, সর্বশরীরের [illegible] রনু তাকে বিদ্রূপ করছে।

[illegible] হয়ে দাঁড়াতে পারছে না রনু, [illegible]। রমেনের ধমক শুনে খলখল [illegible] গড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে [illegible] অগ্রজের দিকে দুহাত [illegible] ডার্লিং. আ-য়াম [illegible]। হুঁ আমি তোমার মতো অতো [illegible] যে কাঁকনের ধাক্কা খেয়ে [illegible] বুকে চাপড়ে মরব। টাকা কি [illegible] আসে, এনজয় কিসে হয়, জানি আমি।' [illegible] আরো কি বলতে যাচ্ছিল, তার [illegible] চৌকাঠ ধরে বসে পড়ল। [illegible] পর্যন্ত রমেন ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। পৃথিবীটা চোখের ওপর উল্টেপাল্টে খেতে খেতেই দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সেরাতেও খালি বারান্দার [illegible] বাবার গলা শুনতে পেয়েছিল, 'নিতাই নিতাই।'

কাঁকনের ধাক্কা কথাটার মধ্যে রনু [illegible] বলতে চেয়েছিল, রমেন জানে। দাদাকে উপলক্ষ্য করে এককালে অলকার সঙ্গে রনুর যে মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাকে করে অনেক সময় সে খুনসুটি করলে অলকার মুখেচোখে আবির ছড়িয়ে পড়তে দেখে রমেন সামনে থেকে সরে যেত। আজও যেন অলকার ইংগিত করতেই সরে গেল সে। কিন্তু রনুর চোখে এখন ঘৃণা ও অবজ্ঞা, দাদার বস্তাপচা বোধ-বুদ্ধির জন্যেই সম্ভবত। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিল রমেন। রনুর চোখের দগ্ধ ক্লান্ত পিপাসার মদ অলকাকে শিয়রে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল।

অলকার মুখে বিশেষ কোন কথা ছিল না। বড় চোখের পাতার নিচে আর্দ্রস্বভাব চাহনির গভীরে যা কিছু কথা, যা কিছু আলোছায়ার খেলা। কমলেশ যে কিছু বুঝতে পারেনি এমন না। বন্ধুকে জানে বলেই কিছু বলেনি। কিম্বা সে নিজেকে নিয়ে, নিজের কেরিয়ার নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, বাজে জিনিসে সময় নষ্ট করতে চায়নি। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকেই যেন রমেনের সঙ্গে আলাদা রাস্তার চুক্তি হয়ে গিয়েছিল কমলেশের। 'ব্রাদার, নিজের কেরিয়ার আর কেউ গড়ে দেবে না। নীতি আর ভালমানুষী নিয়ে ধুয়ে খেলে কুকুরেও পেচ্ছাব করবে না বলে দিলুম'—কমলেশ যখন তখন কথাগুলি বলতো। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সতর্কবাণী। কি চাকরিতে ঢোকার পরেও যখন খুব যাতায়াত ছিল ওর ওখানে, আড্ডা দিয়ে খুব একটা সময় নষ্ট করতে রমেন দেখেনি। বরং বলতে গেলে অলকার সঙ্গেই তার বন্ধুত্বটা শেকড় গেড়েছিল ক্রমশঃ। আর ইত্যবসরে কমলেশ পর পর কতকগুলো ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়ে তীরের মত ঠিক ঠিক দরজায় লক্ষ্যভেদ করে একেবারে একজিকিউটিভে লাফ মেরেছিল। রমেন তখনো গারনার ওয়ালেসের মেকানিকাল ডিজাইনার—থ্রি ফিফটি-সিকস হাণ্ড্রেড। ইতিমধ্যে কমলেশ হাউসিং স্কীমের ফ্ল্যাট কিনেছে। অ্যামবাসেডর মার্ক-টু খানা অবশ্য নিজের পয়সাতে কিনতে হয়নি। অন্যদিকে চাকরির একসটেনশন থেকে রিটায়ার করে রমেনের বাবা শিবপদ পুরোপুরিভাবে ধর্মকর্মে মন দেওয়ায় সংসারের অনেকখানি চাপ রমেনের ওপর এসে পড়েছিল। তথাপি শেষ অবধি কমলেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব—কিছুটা ঘাটা পড়লেও, টিঁকে ছিল; শনি-রবিবারের জমাট আড্ডা তখনও একেবারে বন্ধ হয়নি। আড্ডা আর চা, চা আর কফি। কমলেশ তার নামই দিয়েছিল, 'চা-তাল'। অলকাও মাঝে মাঝে দাদার কথাটা পুনরাবৃত্তি করতো ধোঁয়াওঠা কাপ বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে। কখনো বা ঠাট্টা করে বলেছে, 'দরকার হলে না হয় আরো একশ একবার চা খাওয়াতে পারি। কিন্তু দোহাই, দাদার মত গ্রেড আর লিফটের মেসিনে জুততে যাবেন না!'

রমেন হেসে বলেছে, 'গেলেই কী, তুমি তো আর পি. এ. হতে যাচ্ছো না!'

'জানি, আপনি তা পারবেন না। জোড়াসাঁকোর ফকিরবাবায় ডুব দিয়েছেন. মনে বাতি জ্বলেছে বলেই ও সব হবে না আপনাকে দিয়ে। হলে তো হতই।' রমেনের পারা না পারা সম্পর্কে নিজের চাপা ইচ্ছা ব্যক্ত হয়ে পড়াতে অলকা সম্ভবত লজ্জা পেয়েছিল। কেননা ওর মুখে মুহূর্তের জন্যে পাকা আপেলের ছোপ পড়েই মিলিয়ে গেল। রমেনের চোখে অবগাহনের তৃপ্তিটুকু অলকা লক্ষ্য করেনি। পরিবর্তে রমেনেরই দেওয়া নাম, ফকিরবাবার, অর্থাৎ রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুরঙ্গের মোড়া পাতাটায় চোখ নামিয়েছিল। রমেন ঠোঁট টিপে বলল, 'দামিনী-পর্ব আর শেষ হবে না, তাই না!'

বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ দিয়েই আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল পরস্পরের মধ্যে। শ্রদ্ধার সম্পর্কও। আর ঠিক ততটাই অশ্রদ্ধায় তার কাছ থেকে ছিটকে পড়েছিল কমলেশ। কমলেশ বলেছিল, 'তুমি যখন হিউম্যানিটি হিউম্যানিটি কর, হাসতে হাসতে পেটে খিল লেগে যায় আমার। ছাতাধরা ঐ সব শব্দগুলো শুনলে রাগও হয় খুব।'

রমেন জানে, অলকার সংস্পর্শে সে না থাকলে কমলেশের এত রাগের কারণ ছিল না হয়ত। এর পরও কমলেশ বলে যাচ্ছিল, 'যাই কর আর না কর, মালিককে তোমার চাই-ই। বুদ্ধিমান হলে কাজে লাগাও, নইলে রগড়াও জীবনভোর। আর, ফেলো-ওয়ার্কার্সদের জন্যে যখন গদগদ হয়ে ওঠো ব্রাদার, তখন সত্যিই মনে হয়, দারুণ স্নায়ুরোগে ভুগছো তুমি।' রমেন মৃদু মৃদু হাসছে দেখে কমলেশ আরো কি বলতে যাচ্ছিল, অলকা সংযত কঠিন গলায় যেন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, 'দাদা!' অতএব এফিসিয়েন্সী ট্যালেণ্ট ইত্যাদি কথাগুলো কমলেশের গলার ভেতরই জমাট বেঁধে রইল বদরক্তের মতো।

অতীত এই ক' বছরে একরকম ধুয়ে-মুছে ফেলেছিল রমেন। রনুর ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন বাদ স্নায়ু দুর্বলতাটাই হয়ত দেখা দিয়েছিল আবার। তাই পরদিন সকালেই ঝকঝকে বর্ণমালার বহুৎসব করে ভারমুক্ত হয়েছিল। আর বিপ্লবী দেবুর কথা ভাবতে গিয়ে কমলেশেরই উল্টো পিঠের ছায়া তার চোখে ধকধক করে উঠেছিল।

কিন্তু কিছুই করার ছিল না রমেনের। পার্সিবাগানের পাড়া ছেড়ে গেরস্তের নরচেপড়া বাকসপ্যাটার্নার পাশাপাশি সখের বাজারে নন্দালয়ের দেড়খানা ঘরে এসে

উঠতে হয়েছে। ইদানীং মা'র মত সেও কেন বোবা, পাথর। কিম্বা আষ্টেপৃষ্টে টোল-খাওয়া হেঁসেলের ঘটি যেন, এদিক থেকে ওদিক গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই। দিনান্তে কলকাতা যেতে হত ঠিকই—মানিকতলার টিউশানি, কিন্তু কমলেশ বা আর একজন হাতে না দেখে, পা টিপে টিপে। যেন সে ঢেউখেলানো তেলা লাঠিহাতে ফকির, ভং ভং রাস্তায় ঘুরছে। গেরস্তের মানুষজন খোঁজাখুঁজি করলেই ফু-মন্তরে উধাও।

আর অলকা হয়ত এই দু-আড়াইটা বছর তার স্কুল করার সময়টুকু বাদে শহরের পথেঘাটে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। কি কমলেশ, আরো ট্যালেন্ট আরো এফিসিয়েন্সীর জোরে এতদিনে কণ্ট্রোলার হয়ে স্যান্যাল সাহেবের আদুরে মেয়েকে ঘরে এনে স্বতন্ত্র রুচিতে ফ্ল্যাট সাজিয়ে আলাদাভাবে ঘরকন্না করছে। তা করুক, বিন্দুমাত্র যায় আসে না রমেনের। তার আকাশজোড়া ঘন অন্ধকার কেটে গিয়ে কোনোদিনই যে আর পূব-আকাশ ফরসা হবে না তা জানে সে। বস্তুতঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এখন একই সরলরেখায় দাঁড় করিয়ে দেখতে রমেন অভ্যস্ত।

যেমন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন শিবপদ-বাবু এই বয়েসে পৌঁছেও। রিটায়ার করে একটানা পাঁচ বছর নিতাই ভজনার পর কেমন সহজেই অভ্যাস করে নিতে পেরেছেন এই বাষট্টি বছর বয়সের দশটা-পাঁচটা। কি দেবু-দীনু-রুনুকে তাদের জ্ঞান হবার পর থেকে একটা বয়েস পর্যন্ত যিনি গীতার শ্লোক মুখস্ত করিয়েছেন, ব্যাখ্যা করে মানে বুঝিয়েছেন, আজ তাদের গলা থেকে নতুন নতুন শ্লোকের আবৃত্তিগুলো অম্লানবদনে শুনতে কতো সহজে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন মানুষটা। দেবুকে আজ ঘরে আটকে রাখার কথা বলে শিবপদ যখন মাঠের রাস্তায় নামলেন ন'টা কুড়ির ট্রেন ধরতে, তখন রমেন কেবল বাবার সর্বংসহা চোখদুটির দিকে তাকিয়েছিল, শিবপদ বাবা বলে তাঁর লক্ষ-কোটি বছরের পিতৃ-অভ্যাসের কথা ভাবছিল।

ক'দিন পরের ঘটনা। নাটকীয় হলেও ঘটে গেল, মানিকতলা স্টপে বাস থেকে নামার পর দু'পা এগোতে না এগোতেই রমেনের পথ আগলে ব্রেক কষে থেমে গেল গাড়িটা। আপিস-ভ্যান। কমলেশ পিছনের সীট থেকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে রমেন যে!' থতমত খেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। যখন হুঁস হল, তখন আর সটকে পালাবার উপায় ছিল না। কম-লেশের দিকে অপ্রস্তুত হেসে রমেন বলল, 'হ্যাঁ অনেকদিন বাদ, ভাল তো?' বহুকষ্টে যেন কথাক'টা বলতে পারল সে।

'কোনো কথা না, উঠে এসো'—কমলেশ ভ্যানের দরজা খুলে দিল। রমেন কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করছিল। গাড়ির ভেতর আরো দু'জন বাঙালী সাহেব এবং উগ্রশ্রী তরুণী একজন। ভ্রু কুঁচকে একরকম দৃষ্টিতে সবাই তাকে লক্ষ্য করছে দেখল সে। চেহারা ছাড়াও ইদানীং রমেনের পোশাকআষাক অনেকটা আগেকার দিনের কানুনগো-র মত। সংক্ষিপ্ত সাদাসিধে ও কিছুটা বিবর্ণও। নিজের ইস্ত্রিছাড়া আড়-ময়লা প্যান্ট-জামার দিকে আড়চোখে এক-বার তাকিয়ে গাড়ির ভেতর গেল সে। কমলেশের জন্যে সন্ধ্যার টিউশানিটা কামাই হল।

সি আই টি-র সার সার অট্টালিকা দু'দিকে রেখে গাড়ি ছুটে চলেছিল। কমলেশ ছাড়া গাড়ির অপর তিনজন ইতি-মধ্যে যে-যার জায়গায় নেমে গেছে। এক সময় কমলেশের ফ্ল্যাটের নিচে এসে গাড়ি ঠেকল। গৃহস্বামীর পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে রমেন মনে মনে একবার হিসেব কষল। হুঁ, প্রায় তিন বছরই হবে—তিন বছর বাদ আবার এ-বাড়িতে ঢুকছে সে। একই ফ্ল্যাট, তবে ভেতরের চেহারা কিছু বদলেছে। ভিতর দেয়ালে হালকা পিঙ্ক ডিসটেম্পার কলার। ড্রয়িং-রুমের রং বাদামী। কমলেশ পিংক কলারটা বেশী পছন্দ করত বলে নিজের ঘরের রং ঐ করেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দায় পড়তে হয়। বারান্দায় জাফরি থেকে সারি সারি টব ঝুলছে, তাতে নানা রংয়ের মরশুমী ফুল এবং গোটা-দুই চারাগাছের মানিপ্ল্যান্ট। মানিপ্ল্যান্টের শাখা-প্রশাখা মূলে গাছ থেকে আলাদা হয়ে গ্রীল জড়িয়ে রয়েছে। কোণের একটা টবে কমলেশই পরিচয় দিল—ক্যালিফরনিয়ান সিলভার জুঁই, গ্রীলের বাইরে বেরিয়ে কুঞ্জমতো একটা ঝোপ তৈরি করেছে। আর বারান্দায় যেদিকে মুখোমুখি দুটো সোফা পাতা, ঠিক তার কোণ বরাবর দু'-তিন রকম ক্যাকটাস। রমেন দেখল, কমলেশ তার বরাবরের সেই ছিমছাম রুচির অভ্যাসটা ঠিক বজায় রেখেছে। অলকার ব্যাপার হলে রডোড্রেনডন গাছের কথা উঠত এসবের বদল, কিন্তু রক্তকরবীর চারা গাছ অন্ততঃ একটা।

বহুকাল বাদ বন্ধুকে পেয়ে কমলেশ খুশী হয়েছিল বৈকি! হবারই কথা। আজকাল এই যুগে সত্যিকার বন্ধু-টন্ধু আর মেলে না। যারা জোটে, সবার পিছনেই থাকে ধান্ধা আর কাজ গোছাবার তাল। রমেনের মত অমন নিঃস্বার্থ বিশ্বস্ত সুহৃদ মেলা দুর্লভ। স্ত্রী বিশাখাকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিল রমেনের সঙ্গে। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই আপিসের পোশাক ছেড়ে এসে কমলেশ বসল। বন্ধুর অনুপস্থিতিতে রমেনের কেবলই মনে হচ্ছিল, কমলেশ যেন সেই সব মহামূল্য শব্দ—'ট্যালেণ্ট' 'এফিসিয়েন্সী' ইত্যাদি শেষবারের মত সপ্রমাণ করার জন্যেই তাকে মানিকতলার পথ থেকে ভ্যানে তুলে ইলোপ করে এনে এখানে ফেলেছে। পর-ক্ষণেই এ-সব অসুস্থ চিন্তা মন থেকে ঠেলে ফেলে সে উঠে গিয়ে দাঁড়াল বই-আলমারির মুখোমুখি। সমস্ত বাড়ি এবং লোকজনের দিকে পিছন ফিরে কাঁচের ভিতর দিয়ে এক মনে সে বই দেখতে থাকল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পরিচিত পুরোনো সে-সব বই ছাড়াও অনেক নতুন বই কিনে সাজান হয়েছে। কমলেশ নিশ্চয়ই এ-সব সাহিত্যের বই, কবিতার সংকলন ছোঁয়ও না। এ-সবে সময় অপচয় সে কোনোদিনই করে না। তাছাড়া বইয়ের এই আলমারি, যাবতীয় বইপত্রের আসল মালিক কে জানে রমেন। অলকা এখনো এ-বাড়িতে থেকেই মাস্টারি করছে, পথে আসতে আসতে কমলেশই কথাটা বলেছিল এক-রকম উপযাচক হয়ে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে অসমাপ্ত প্রসঙ্গটা শেষ করেছিল, 'আর জানো রমেন, তোমার সেই কবি-কবি অলকা এখন একেবারে টিপি-কাল মাস্টারণী—যেমন রুক্ষ মেজাজ তেমনি ম্যানিয়াকেস্ড।' কথাটা বলেই কী অসম্ভব রকম যেন বিশ্রী শব্দ করে হেসে উঠেছিল কমলেশ। তারপর হাসি থামতে থামতে রমেনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চকিতে রমেনের মনে হল যেন প্রকাণ্ড এক হিংস্র সিম্পাঞ্জি হয়ে কমলেশ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বড় বড় নখ দাঁত দিয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করছে। কিম্বা তার মুখের ওপরকার ইনএফিসিয়েন্সীর চপ্টা গুলোয় আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে যেন ভূগোল ম্যাপের ব্যারেন ল্যান্ডগুলোর লাঠির ডগায় খোঁচা মারছে। উত্তরে একটিও কথা না বলে বিবর্ণ প্যান্টের দু' পকেটে হাতদুটি ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে রমেন সিঁড়ি ভাঙছিল।

রমেন ঠিক আগের মত খোলা হতে না পারলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই ড্রয়িংরুমের বাতাস হাল্কা হয়ে উঠল। এক সময় অলকা ঘরে এল। উচ্ছ্বাস নেই, উদ্বেগ নেই—উল বোনার উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে যেন এ-ঘরে একবার ঘুরে যাওয়া। এমনি একটা প্রসঙ্গ নিয়ে যেন সে বসল এক-দিকে। সকলের চোখের ওপরই সময়ের মৌন মিছিল থমকে দাঁড়াল। অলকাও নিঃস্তব্ধ। সেই রূপকথার পরীর মত বাঁকা চোখ তুলে একবারও সে কাউকে জিজ্ঞেস করল না, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' ঘরের সরবতায় রমেনের হুঁ, হ্যাঁ ছাড়া যা-কিছু বাকবিনিময় কমলেশ ও বিশাখার মধ্যে।

ইতিমধ্যে বাচ্চা চাকর কফি দিয়ে গেছে। চারজনের চার কাপ কফি বানিয়ে

তিন কাপ বিশাখাই এগিয়ে দিয়েছে যার যার সামনে। রমেন সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে ফেরৎ দিয়েছে। কমলেশ কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিল, মুখ নামিয়ে বলল, 'কি হে, এ-সব কি দেখছি, অমৃতে অরুচি!'

রমেন কাল্পনিক হেসে বলল, 'এখন আর ভাল লাগছে না খেতে।'

—তা লাগছে না ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা সুখের বলে মনে হচ্ছে না। আমার দেওয়া সে নামটা কি মিথ্যে করে দিতে চাও নাকি!

হালকা রসিকতা কমলেশের। অলকা ছাড়া সবাই যোগ দিল। সে কেবল কোনা থেকে চোখ তুলে একবার দেখল রমেনকে।

রমেন এতক্ষণে যেন অলকার সম্পূর্ণ মূর্তিটা দেখতে পেল। চোখের সেই স্বাভাবিক আর্দ্রতা নেই। দুটো বছরে তা শুষে নিয়ে এখন কাঠঠোকরার দূরগামী স্বরের মতই নিষ্করুণ এবং একটানায় শক্ত। চোখের বড় বড় পাতাদুটির ভাঁজ-রেখায় কিরকম এক রুক্ষতা ফুটে উঠেছে। রমেন লক্ষ্য করল, পোশাকআষাকেও অলকা সংক্ষিপ্ত। হ্রস্ব কালাপাড় সাদা শাড়ি এবং হালকা ফিরোজা রংয়ের ব্লাউজে তাকে শিবপদর গায়ত্রী মন্ত্রের মতই সহজ ও ঋজু দেখাচ্ছে, বারান্দায় টবের ক্যাকটাসের মত তীক্ষ্ণও বটে।

কথাবার্তার ফাঁকে আবার চা এলো। কমলেশ আজ বেশ হাসিখুশী। সম্ভবত আগেকার পরিবেশটাকেই ফিরিয়ে আনতে চাইছে সে। কিন্তু একদিক সযত্নে এড়িয়ে চলছিল—রমেনের চাকরি, কারখানা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। কমলেশ জানে এখানে এসেই দুজনের ভেতর ভীষণভাবে জট পাকিয়ে যায়। তাছাড়া বন্ধুর চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সে-দিকে কোনো উৎসাহ ছিল না তার। শিবপদবাবু রিটায়ার করাতে একা উপায়ী রমেনকে কলকাতা ছেড়ে শহরতলীতে গিয়ে উঠতে হয়েছে, এটুকু শুনেছে সে। কাজেই তার পক্ষে, বিশেষ করে তার মতো নীতিবাগীশ ছেলের পক্ষে কতটা কি সম্ভব, হাসি গল্পের মধ্যেও কমলেশ হয়ত এগুলো ভেবেছিল।

রমেন এবারেও চা খেল না। চায়ের সঙ্গের ওমলেট কি ফ্রিজের ঠাণ্ডা পুডিং পর্যন্ত না। প্যান্টের দু' পকেটে হাত রেখে তেমনি হেসে বলল, 'এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।' প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যথোচিত বিনয় থাকলেও অলকার মুখের ওপর যেন কেউ পচা কাদা ছুঁড়ে মারল। কমলেশের মুখও চকিতে কাল হয়ে উঠল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে মোড় ফিরে যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করল, আজকের সন্ধ্যা ভারী হতে দেবে না। পরিবর্তে হেসে বলল, 'তুমি যেরকম একভাবে হাত গুটিয়ে রেখেছ ব্রাদার, মনে হচ্ছে দু'হাতে খাবা-ভর্তি দুটো এসিড-রাজভোগ কি পাইপ-গান আর চাকু নিয়ে তৈরী হয়ে এসেছ। কাগজে দিনকাল যা, কিছুই বিশ্বাস নেই।' রমেন না হেসেই বলল, 'আমার ট্যালেন্টের দৌড় তো তোমার জানা, হলে ও-সব আগেই হতে পারতো।' ঘরের বাতাসে মিষ্টি হাস্যরস দানা বেঁধে উঠল। অলকার ঠোঁট সামান্য ফাঁক হলেও হাসি বলে মনে হয় না। কিম্বা আজকাল সে এইরকমই হাসে কিনা রমেন ঠিক বুঝল না। কিছুক্ষণ পরে যেন কিছু কথা বলার সূত্র পেয়ে রমেন বলল, 'ভয় হয় দেবুকে নিয়ে, আজকাল ও কি করে না করে কিছুই বুঝতে পারি না। রাতদিন খালি দল দল ছেলে আর চক্‌চকে চোখের চাহনি সব। মানা করলেও শোনে না, গ্রাহ্যই নেই কাউকে।' রমেনের মুখে অসহায়তা ফুটে উঠল। আলোর পিছন করে বসার দরুন তার ছায়া পড়েছিল মেঝেয়, অস্পষ্ট ছায়া। কমলেশ ঘাড় ফিরিয়ে ছায়া দেখল। যেন সেই ঘোরাল ছায়ার মধ্যে সে দেবুর চোখের চক্‌চকে চাহনি দেখতে পেয়ে সিঁটকে উঠে বলল, 'সত্যিই আজ-কাল রাস্তাঘাটের যা ব্যাপার...। সেজন্যেই তো দিনে দিনে অফিস-ভ্যানে বাড়ি ফিরি সকলে মিলে একসঙ্গে।'

কথাবার্তার মধ্যে অলকা ভিতরে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো। হাতের কাপগুলো টেবিলে সাজিয়ে কফি ঢালল।—'খান, কড়া মিষ্টি করে নিজে হাতে বানিয়ে এনেছি।' কাপশুদ্ধ রমেনের দিকে বাড়িয়ে ধরল অলকা। এখন তার কথার মধ্যে আদেশ এবং অনুনয় একসঙ্গে ঠেলে বেরুল। 'নিজে হাতে বানিয়ে এনেছি' কথাটার মধ্যে রমেনের এ ক'বার কিছু না খাওয়ার সূত্র লুকিয়ে আছে যেন, কমলেশ ও বিশাখা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। রমেন এবার সত্যিই বিস্মিত। বলল, 'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বললাম তো কিছুই খাব না এখন।'

—'ও।' যেন জেদ চেপে গেল অলকার। 'জলটুকুও ছোঁবেন না প্রতিজ্ঞা করেই ঢুকেছেন, তাই না!' দীর্ঘকাল খাপে বন্দী তলোয়ার টেনে খুলতেই যেন স্পষ্ট আলোয় ঝলসে উঠল। উত্তেজনায় কাঁপছিল অলকা। পুনরায় ঝন্‌ঝন্ বেজে উঠল সে, 'খাবেন না? শ্রেণীশত্রু?' অলকার কণ্ঠস্বর বেশ উচ্চগ্রামে ওঠার জন্যে বিকৃত শোনাল। রমেন এতক্ষণ রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, অলকার শেষ শব্দগুলোয় জানলার বাইরে অন্য বারান্দার ক্যাকটাসে চোখ নামাল। যেন চোরাগোপ্তার ঝলসানো ধার বুকে আমূল বিদ্ধ হতে সে কাতরে উঠে চোখ বুজল। কমলেশ ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে অলকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অলকাকে এত উত্তেজিত হতে কখনো দেখেনি। কিছুটা ভয় ভয় করলেও রমেনের কিছু না খাওয়া সম্পর্কে অলকার উক্তিটায় তার পিঠে সজোরে কে যেন চাবুক কষিয়ে দিল। কমলেশের চোখে আগুন ঠিকরে উঠল। দৃঢ় হাতের মুঠিতে সে রমেনের বাহুতে চাপ দিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠল, 'সত্যিই তাই? কী, কথা বলছো না কেন?'

রমেন আগের মতই শান্ত সংযত গলায় বলল, 'না সত্যি তা নয়। হাত দিয়ে খাবার অবস্থা নেই আমার, তাই।' প্যান্টের দু' পকেট থেকে হাতদুটি মুক্ত করে সামনে মেলে ধরল রমেন। মুহূর্তে যেন প্রচণ্ড এক বাজ পড়ে একাকার করে দিল সকলকে। অদ্ভুত এক শব্দ করে অলকা চোখ বুজে বসে পড়ল সোফায়। অনেক-ক্ষণ অবধি চোখ বুজে স্থানুবৎ নিশ্চল রইল, যেন চেতনাহীন মমি। আর কমলেশ ও বিশাখা কেবল বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে স্বচ্ছ হেসে রমেন বলল, 'কলিগদের কাছে ঋণশোধ দিয়েছি। ওরা আমাকে শ্রেণীশত্রুর শাস্তি দিয়েছে, একেবারে খতম করেনি।'

—'কি বলছো তুমি!' উৎকণ্ঠায় ফেটে পড়ল কমলেশ।

—'হ্যাঁ, ওরা ভুল করেছিল। কাগজপত্র ছিল ঠিকই, ক্যান্টিনে বসে একজোড়া চোখ স্কেচ করছিলাম। ওরা ভেবেছিল, আমি কাজ করছি ভেতরে।'

—তারপর, তারপর কী!'

রমেন করুণচোখে হাসল, 'তারপর আর কি, জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে হাতদুটো চেপে ধরল ফার্নেসে। পরে অবশ্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিল বলে শুনেছি।' রমেন থামল। ঠাণ্ডা একটা দীর্ঘশ্বাস ছিন্নভিন্ন হয়ে তার গলা থেকে বেরিয়ে এল। চোখ পড়ল অলকার দিকে। সর্বশরীর টান করে নিঃশব্দে বসেছিল অলকা। নিশ্চল তৈলচিত্রের মত তার চোখ-দুটো দিগন্তবিদ্ধ, স্থির। কমলেশ তাকিয়েছিল রমেনের দুই বীভৎস হাতের দিকে। কব্জির নিচু থেকে শেষ অবধি ও-দুটো যেন বরফ-রংয়ের ভুতুড়ে হাত। চেটোর ওপর মাংসের রেখা সামান্য থাকলেও আঙুলের পার অবধি সাদা হাড়গুলো কেবল দেখা যাচ্ছে। আঙুলের শেষের দিক নখ-বরাবর কেটে বাদ হয়েছে। পাটকাঠির মত সাদা আঙুলগুলো থেকে চোখ ফেরাতে গিয়ে কমলেশের মনে হল, নিষ্ঠুর এই পৃথিবী কত সহজে রমেনকেও বাদ করে ছিল। হাতের বিভীষিকা দেখে হয়ত সে ভয় পেয়ে থাকবে, বন্ধুর কাছ থেকে আস্তে আস্তে পিছু হটছিল তাই। শেষে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসল কমলেশ। প্রেতল হাতের ভৌতিক ছায়ার মধ্যে নতুন করে কিছু আবিষ্কার করল কিনা কে জানে, তাতে শান্ত দুটি চোখের দিকে অনেকক্ষণ অবধি নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে [illegible]।

আর [illegible] মূর্তিটা বাজপড়া গাছের [illegible] খাঁ-খাঁ করছিল। স্থির [illegible] আছে কেবল। মানুষটির [illegible] একদিন যদি বাস্তি জ্বলেছিল, আজ তার কিম্বদন্তী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল অলকা।

"সৌরভ" সংস্থার পক্ষ হতে সম্প্রতি নিবেদিত দুটি অনুষ্ঠানের শুধু ধার নয়, ভারও ছিল। কণ্ঠসংগীতের জনপ্রিয় শিল্পী সংগীতালংকার সুনন্দা পট্টনায়ককে এঁরা সংগীতরসিক সমাজে উপস্থিত করলেন কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যের কারণে নয়। শ্রীমতী পট্টনায়কের সংগীতপিপাসু রসিক গুণসংখ্যা অগণণন। কিন্তু সংগীতসম্মেলনে বেশী রাতে অথবা একেবারে শেষে এঁর অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবার কারণে অনেকেই নানা অসুবিধার জন্য ইচ্ছে থাকলেও এঁর গান শুনতে পান না। তাঁদেরই প্রাণভরে গান শোনাবার জন্য বিশেষভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে সংস্থা সম্পাদিকা নমিতা চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানান। শিল্পী সম্বন্ধে বললেন রাইচাঁদ বড়াল ও ভি জি যোগ। এঁদের ভাষণে জানা গেল শ্রীমতী পট্টনায়ক শুধুমাত্র জনপ্রিয় শিল্পী আশ্চর্য কণ্ঠের অধিকারী অসাধারণ প্রতিভাময়ীই নন, ইনি সাধিকা, আরাধিকা, যাঁর গানে শ্রোতাদের অন্তর ভক্তির আবেগে আপ্লুত করে।

পণ্ডিত লালমণি মিশ্রকে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। ইনি বেনারসে থাকেন। পণ্ডিতজী শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর বীণবাদকই নন, সংগীতবিদ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সংগীতশাস্ত্রের একনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসু গবেষক। ট্রেডিশন বজায় রেখেও নানান পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা ইম্প্রোভাইজ করে ইনি বীণাবাদনে নিজস্ব এক সংগীত-ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছেন।

সুনন্দা পট্টনায়ক শুরু করলেন "শ্যামকল্যাণ" দিয়ে। তাঁর বিলম্বিতের ধীরছন্দী বিস্তার যেন আরাধিকার ধ্যান। মনে হোলো অতি সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে চরণ ফেলে শিল্পী যেন এগোচ্ছেন তাঁর ইষ্টদেবতার অভিসারে। প্রতিটি স্বর-বিস্তার সরগম সমন্বয়ের কি ললিত-মধুর ভঙ্গি। প্রতিটি পর্দার সুক্ষ্মতম শ্রুতিও যেন শিল্পীর আদরের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে ওঠে দেবতাও বুঝি সম্মান আকুল। দ্রুতের অঙ্গে যখন এলেন মিলনের আনন্দলোকে পৌঁছে যাবার দীপ্ত উল্লাস ঝলকে উঠল "পরমধন বাহিরে"। তারপর কত না তানের বাহার। কখনও সাপটের বিদ্যুৎদ্যুতি, কখনও চক্রীর লুকোচুরির খেলা, কখনও বোলতানের মধুর মিনতির কত না দীপারতি। শিল্পীর গানের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনিও মুখর হয়ে ওঠে "তারাণা"র উজ্জ্বল উদ্বেল শিহরিত লগ্নে।

গানের সঙ্গে প্রাণ এক হয়ে না গেলে আঙ্গিক এমন লাবণ্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। এরপর ভজনের পালা। গাইলেন "জগন্নাথ স্বামী", "ভজগোবিন্দম" তবু শ্রোতাদের যেন পিপাসা মেটে না—আরো চাই, আরো, আরো। তাঁদের প্রাপ্তির করপুট ভরে উঠল শিল্পীর স্ব-রচিত কয়েকটি অপূর্ব ভজন দিয়ে। তার মধ্যে একটি হোলো "নানা রংগমে"। এ গানটি তাঁর ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যুর শোকাবহ মুহূর্তে রচিত। এ শুধু গানই নয়, তার অধিক।

উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হোলো এই যে গানের মাঝখানে হঠাৎ মাইক্রোফোন গেল বিগড়ে। শিল্পী কিন্তু নির্বিকার, অবিচলিত। আপন ভাবের অমৃতলোকে আত্মহারা। আর তার আশ্চর্য শক্তিসমৃদ্ধ কণ্ঠ মাইক্রোফোন বন্ধ হওয়ার ভ্রূকুটিকে অনায়াসে তুচ্ছ করে বাইরে দাঁড়ানো অগণিত শ্রোতাকে তৃপ্ত করেছে। এ হেন কণ্ঠ এখনকার দিনে বিরল।

শিল্পীর সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে তবলা ও সারেঙ্গীসংগত করেছেন শ্যামল বসু ও মহেশ মিশ্র। হার্মোনিয়মে ছিলেন যাদুকর সংগীতিয়া স্বয়ং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। বারানসীর শিল্পী পণ্ডিত লালমোহন মিশ্র বীণা বাজিয়ে শোনালেন "আভোগী-কানাড়া" রাগে।

ধ্রুপদী আলাপ ত সবাই বাজান। কিন্তু প্রতিটি স্বরের গাম্ভীর্য, মর্যাদামণ্ডিত চলনে যে ভাবের প্রতিফলন দেখা গেল, তা শুধু সারাজীবনের অনুশীলন ও অভিজাত ঘরানার সনন্দবাহীই নয়, এতে ছিল পণ্ডিতজীর বৈদগ্ধ্য, মননশীলতা ও অনুভবের গভীরতা।

গতের অঙ্গে তানের বৈচিত্র্য ত ছিলই, আর এ বৈচিত্র্যবাহারে রোমান্সের ছোঁওয়া ছিল বলেই তা মনে এমন করে দাগ কাটতে পেরেছে।

লক্ষণীয় বিষয় ছিল তাঁর পেপার-ওয়েট দিয়ে বাজানো। সুরচালনার যন্ত্রের এহেন ভারেও কি শুদ্ধ সুন্দর শ্রুতি।

এঁর সঙ্গে তবলাসঙ্গতে ছিলেন বেনারসেরই তরুণ প্রতিভাসম্পন্ন তবলাবাদক ঈশ্বরলাল। ইনি যে [illegible] সুযোগ্য শিষ্য বাজনাই তার প্রমাণ।

রেকর্ড সমালোচনা

নানা সমস্যাভারে এখন বাঙালীর জীবনে বসন্ত-সমাগমকে অভ্যর্থনা জানাবার অবকাশ সীমিতই। এবার বসন্তের আগমন সূচিত হোলো শুধু গ্রামোফোন কোম্পানীর বসন্ত বন্দনা-সিরিজের রেকর্ডগুলো। স্বল্প পরিসরের মধ্যেই নানারকম গান আছে।

যেমন দেশাত্মবোধকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শুভলক্ষ্মী ও দিলীপ রায়ের রেকর্ড। গানগুলি হোলো 'এ-দেশের মাটির পারে' ও "মাগো তোমার ভাবনা কেন"—গৌরীপ্রসন্নর রচনাকে অপূর্ব রূপশ্রীদান করেছেন হেমন্তবাবু, সুর ও কণ্ঠ উভয় দিক দিয়েই।

সলিল চৌধুরীর কথা কানু ঘোষের সুরে মান্না দে গেয়েছেন "সাত সাত কোটি বাঙালীর" ও "ও ভাই ভাইরে"।

শুভলক্ষ্মী ও দিলীপ রায়ের কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম' ও 'ধনধান্যে-পুষ্পেভরা' একদা শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছে। এ-গানকে পুনর্মুদ্রিত করে গ্রামোফোন কোম্পানী সংগীতরসিকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন গৌতম মিত্র, রামানুজ দাসগুপ্ত ও পূরবী মুখোপাধ্যায়।

গৌতম মিত্রর গান আগে শুনেছি। সুন্দর সু-পরিশীলিত কণ্ঠ, [illegible] দক্ষতাও। এঁর গাওয়া "আমার আপন গান" ও "মলিন মুখে ফুটুক হাসি" সত্যিই মনকে আকৃষ্ট করে।

রামানুজ দাসগুপ্তের "কোন পুরাতন প্রাণের টানে" ও "বাদল মেঘে মাদল বাজে" সু-গীত।

একটি ই, পি, ডিস্কে তাড়িৎ চৌধুরীর ও পূরবী মুখোপাধ্যায়ের দুটি করে গান "আমার মন বলে চাই" ও "বাদল বাউল" এবং "আমার বাঁধিই বেলা যায়গো" ও

আমার সুরে লাগে"—চারখানি গানই সংগৃহীত হবার মতই। রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গীত দুটি দ্বিজেন্দ্রগীতি "আয়রে বসন্ত" ও "সুখের কথা বোলো না তে" দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গীতবিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যকারী।

সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। এবার অঞ্জন নিয়োগীর কথা ও সুরে গাওয়া তার দুটি গান "ও পাখি তুই বলিস রে" ও 'মেঘলা যেন না হয়"—এর দুটিতে শিল্পীকে আরো পরিণত মনে হলো। নতুন তিনজন শিল্পীতালিকায় এসেছেন তাঁরা হলেন : অসীমা ভট্টাচার্য, যতীন রায় ও অরূপ সরকার। আধুনিক গানের শিল্পী তালিকায় এ'রা নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সংযোজন।

পার্ক-সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স

পার্ক-সার্কাস সঙ্গীত সম্মেলনের শেষ রাত্রির অনুষ্ঠানে প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিলেন সুনির্বাচিত শিল্পিবৃন্দ। রাত জাগার ক্লান্তি এ'রা সত্যিই ভুলিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে ছিল সোনাল মানসিংএর নৃত্য। পরিবেশন করলেন ভারতনাট্যম ও ওড়িশীর কিছু অংশ। ইনি রূপময়ী, শিক্ষাদক্ষা এবং নিষ্ঠাবতী। সেদিকের নিক্ষণে এ'র কোনো কার্পণ্য ঘটেনি। অভাব শুধু স্বতঃস্ফূর্ততা আর অনুভব গভীর অভিব্যক্তির। সুনন্দা পট্টনায়ক ধরলেন "জয়জয়ন্তী"। এ রাগে তিনি সখ্য এবং জয়ন্ত-মল্লার ও জয়জয়ন্তী গেয়েই কোলকাতার প্রথম আসরে তিনি আপন আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের ভাবগম্ভীরতায় পরিবেশিত এই রাগ ১৯৫৭ অব্দের সদারং সঙ্গীত সম্মেলনের সেই অনুষ্ঠানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

শেষের অনুষ্ঠান ছিল ভজনের। শ্রোতাদের অনির্বন্ধ অনুরোধে একাধিক ভজন তাঁকে গাইতে হয়েছে এবং তা যথারীতি আবেগসজল পরিবেশ রচনা করেছে।

জিতেন অভিষেকী এবারের সম্মেলনের এক নতুন আকর্ষণ। কয়েক বছর আগে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেলে এ'র গান শুনেছিলাম। ভালও লেগেছিল। এবারে আরো গভীর, ভরাট ও মাধুর্য সঞ্চারী। ইনি গেয়েছেন নটভৈরব ও পরমেশ্বরী (রবিশঙ্করসৃষ্ট রাগ)। কিরণার লালিত্য ও গোয়ালিয়রের ওজসের চিত্তগ্রাহী মিলন দর্শকচিত্তকে বিমুগ্ধ করেছে।

বাহাদুর খাঁন ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরোদ ও সেতারে আলাউদ্দিন ঘরানার উচ্চমানের নিদর্শন মিলেছিলো।

অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠানে আমীর খাঁর আভোগী, চন্দ্রমৌলী এবং কলাশ্রী তাঁর নিজস্ব পরিবেশন শৈলীতেই সুবিস্তৃত।

আরতি বাগচী উদীয়মান শিল্পীরূপে ইতিমধ্যেই সুপরিচিতা হয়েছেন। এবারের অনুষ্ঠান সেই পরিচয়কেই দৃঢ় করেছে।

মণিলাল নাগের "চন্দ্রকোষ" ও তাঁর সুনামেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

"সৌরভ" সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান প্রযোজিত এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ পরিচালিত "কোরাল এনসেম্বেল" অবশ্যই সম্ভাবনাসমৃদ্ধ।

ভি জি যোগ ও আলি আহমেদের বেহালা ও সানাইএর দ্বৈতবাদন অসম সমন্বয়, যন্ত্র ও শিল্পী উভয় বিচারেই! জামিল হায়দারের কণ্ঠসঙ্গীত একরকম।

অনীতা মজুমদারের "পূরিয়াকল্যাণ" সকলের প্রশংসা পেয়েছে।

সংগঠকবৃন্দ ধন্যবাদার্হ তৃপ্তি চক্রবর্তী তথা এক নতুন শিল্পীকে রসিকজনের গোচরে আনার জন্য। ইনি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যা। সুকণ্ঠী, সাহসী এবং আত্মপ্রত্যয়ী। যদি ওপরের দিকে কণ্ঠ সংযম ও স্বরের পারিপাট্যে মনোনিবেশ করেন এবং নিজেকে শিক্ষার্থী এই কথা নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণে রাখেন সত্যিকারের শিল্পী হয়ে ওঠা এ'র পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।

সঙ্গতিয়াদের মধ্যে ছিলেন শ্যামল বসু, কানাই দত্ত, অনিল ভট্টাচার্য, গোবিন্দ বসু, মহেশ। আপনাপন মানানুযায়ীই এ'রা সঙ্গ করেছেন।

সুরসভার বসন্ত উৎসব

গত ৫ই মার্চ বিড়লা একাডেমী হলে সুরসভার শিল্পীরা 'বসন্ত উৎসব' পরিবেশন করেন। নাচ ও গানে সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্ব ছিল রথীন চৌধুরীর ওপর। রবীন্দ্রসঙ্গীতাশ্রয়ী গোটা অনুষ্ঠানটি সেদিনের দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছে। শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশন এবং নৃত্য ভঙিমা ও ছন্দের সমন্বয় বোধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতে বীথি দাস, শাশ্বতী গুপ্ত, ইন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, সংযুক্তা দেব, শিপ্রা ভট্টাচার্য, সুপ্তা শ্যাম, উমা কর, লক্ষ্মী গুপ্ত, তপতী হাজারী, শ্রীলেখা সিংহ ও রথীন মুখোপাধ্যায় এবং নৃত্যে শান্তা বসু রায়, চন্দনা বসু ও শকুন্তলা বসুরায় সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি কুড়িয়েছেন। রামগোপাল ভট্টাচার্যের নৃত্যপরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সব শেষে সুচিত্রা মিত্র কয়েকটি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্ধন করেন। অনুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীতে ও সঙ্গতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, চাঁদু বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর বসাক, অমৃতলাল রায়, দুলাল ভট্টাচার্য ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

সুরস্রষ্টা ফ্রানজ শ্যুবার্ট

দিলীপ মৌলিক

সময়ের যে প্রবাহটা ১৭৫০ থেকে ১৮৩০-র সীমারেখা ধরে আবর্তিত হয়েছিল তাই ইউরোপের সংগীতের ইতিহাসে এনেছিল চিরন্তনের উন্মাদনা। আর তাতেই ইউরোপের সুরলোক ভরে উঠেছিল অতল মনের মুঠো মুঠো ঐশ্বর্যে। এই সময়েই ভিয়েনার ক্লাসিক সংগীতের দৃপ্ত কল্লোল সংগীতানুরাগীদের মুগ্ধ করেছিল এবং সেই দেশের মাটিতেই লালিত স্মরণীয় কয়েকজন সুরস্রষ্টার গভীরতম অনুভূতির সেতুবন্ধনে সমগ্র ইউরোপীয় সংগীতের ধারা নতুন পথে এগিয়ে যাবার জন্য পেয়েছিল একটা দীপ্ত আভাস। এই বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত সময়কে যে চারজন সুরস্রষ্টার অনন্য প্রতিভা প্রাণময়তায় আন্দোলিত করে তুলেছিল তাঁরা হোলেন জোসেফ হেডন (১৭৩২-১৮০৯), উলফগ্যাং অ্যামেডাস মোজার্ট (১৭৫৬-১৭৯১), লুডউইগ ভ্যান বিটোভেন (১৭৭০-১৮২৭) এবং ফ্রানজ শ্যুবার্ট (১৭৯৭-১৮২৮)। সামগ্রিকভাবে ইউরোপের সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এই সব সুরস্রষ্টাদের সৃষ্টি ভাষা পেয়েছে। তাঁদের অনুভূতিতে স্পন্দিত হয়েছে মানুষের মানসিক জগতের রূপান্তর, ফরাসী বিপ্লবের তীব্র উন্মাদনা: নেপোলিয়নের অসাধারণ পরাক্রম, যুদ্ধ জয় শেষে তাঁরই পরাজয় এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন, এবং 'রেস্টোরেশন' যুগের পুরনো সামন্ততান্ত্রিক প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এইসব সমাজজীবনের ইতিহাস নানাভাবে প্রভাবিত

করেছে এই সুরকারদের। কিন্তু তাঁরা তাঁদের অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও নৈপুণ্যের ছোঁয়ায় সমসাময়িককালের জীবন দর্পণে দেখতে পান আগামী জীবনের সূর্যালোককে। তাই সময়ের সীমা পেরিয়ে এ'দের সৃষ্টি আজো আমাদের অনুভূতির দোসর।

সুরস্রষ্টা হিসাবে ফ্রানজ শ্যুবার্টের নাম বিশ্বনন্দিত। তাঁর প্রচুর সুর তাঁর জীবদ্দশাতেই অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। নাচের হলে, কাফে রেস্তোরায় প্রায় সর্বদাই তাঁর গান গাওয়া হোত। শ্যুবার্টের সংক্ষিপ্ত জীবনে তাঁর ৬০০ গান যে সুরের বৈশিষ্ট্য মেলে ধরে তার মধ্যে যথার্থভাবে পল্লীগীতির আমেজ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সব গান ছাড়াও তিনি ৮টি সিম্ফনি, পিয়ানোর জন্য অনেকগুলো স্বরলিপি, অপেরার কিছু গানও লেখেন। অবশ্য এগুলো প্রায়ই এখন বিস্মৃতির অতল গর্ভে।

এই বিশ্ববিখ্যাত সুরস্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুব দুঃখের এবং অনেক দুর্যোগে ভরা। কিন্তু সব রকম ঝড়-ঝঞ্ঝার অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শ্যুবার্ট সুরের প্রদীপ জ্বালিয়ে শূন্যতাকে পূর্ণতায় ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। ১৭৯৭-র ২১ জানুয়ারী তাঁর জন্ম হয় ভিয়েনার এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষক। খুব ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি অসাধারণ প্রবণতা এবং অপূর্ব কণ্ঠ থাকার জন্য তাকে ভর্তি করা হয় ভিয়েনার এক সংগীত বিদ্যালয়ে। সেখানে অর্কেস্ট্রার শিল্পী তৈরী করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হোত। কয়েক বছর পরে তাঁর গলা ভেংগে গেলে ও বিদ্যালয় ছেড়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবার স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু এ কাজ তাঁর মন ভরাতে পারলো না। এক বছরের শিক্ষকতা ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে সংগীতচর্চা ও সুরকার-গীতিকার হবার চেষ্টা করতে থাকলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বোধহয় তখন তিনি খুব একটা আশাপ্রদ ছবি দেখতে পাননি। তখনকার দিনে ইউরোপের সংগীত জগতের মধ্যমণি যে ভিয়েনা সেখানে একজন সংগীত পরিচালক হবার চেষ্টা করেন তিনি অনেক। মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর আন্তর প্রয়াস চলে; কিন্তু প্রাপ্তির আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। স্বাচ্ছন্দ্যতার জীবনে আর্সেনি, দারিদ্র্যের সংগে অবিরত সংগ্রাম করেই তাঁর জীবন কাটতো। গান লিখে যে অল্প অর্থ তিনি উপার্জন করতেন তাই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। এমনি করে হয়তো বেশী দিন রক্তাক্ত সংগ্রামে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা যায় না। প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্ব সম্পর্কে অর্থহীনতার প্রশ্ন আসে এবং একদিন অজান্তেই নিভে যায় জীবন প্রদীপ। শ্যুবার্টের বেলাতেও তাই হোল। ১৮২৮-এর ১৯ নভেম্বর মাত্র ৩১ বছর বয়সে তাঁর জীবনের সূর্যটা চিরকালের মতো অস্ত গেলো পশ্চিম দিগন্তে। তাঁর মৃত্যুর ৮মাস আগে শ্যুবার্টের সৃষ্ট সমস্ত সুর নিয়ে একটি কনসার্টের আয়োজন করা হয় এবং এই থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয় তাঁকেই।

নিজের জীবন দারিদ্র্যের দুঃসহ জ্বালায় ক্ষত-বিক্ষত হোলেও সুরসৃষ্টির সময় তিনি আশা আর আনন্দের রামধনুর মতো উচ্ছল হয়ে উঠতেন। ভুলে যেতেন, কোথায় তাঁর চেয়ে না পাওয়ার সীমাহীন যন্ত্রণা, শুধু ভেবে যেতেন সুরতরঙ্গের কল্লোলে। শুনতে পেতেন মানুষের সেই জীবনের জয়গান যে জীবন নিরাভরণ আনন্দে উচ্ছল ও উদ্বেল। ওয়ালটজ প্রভৃতি সুরের বিস্তারের মধ্য দিয়ে তাঁর আনন্দ ও আশার আভাসকেই তিনি মুখর করে তুলতেন। অস্ট্রিয়ার পল্লীগীতির ভাণ্ডার থেকে সুর নিয়ে শ্যুবার্ট এই সুরগুলোর মধ্য দিয়ে মৌলিকত্ব ও মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন যথেষ্ট। তাঁর সিম্ফনিগুলোর মধ্যেও পরিচিত সুরের দোলা রয়েছে অনেক।

শ্যুবার্টের এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। খুব তাড়াতাড়ি এবং অনায়াসেই গোটে, শিলার এবং হাইনে প্রভৃতি অবিস্মরণীয় কবিদের কবিতাকে স্বচ্ছন্দে নতুন রূপ দিতে পারতেন। একটা পূর্ণ গল্পকে কেন্দ্র করে দুটি মোটামুটি দীর্ঘ সংগীতালেখ্য শ্যুবার্টের অসাধারণ কল্পনাশক্তি ও সুরগভীরতার ফসল। প্রথম সংগীত পর্যায় যার নাম ছিল 'ডাই স্কোন মুলেরিয়ান' তার নায়ক ছিল একজন ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তি। পথ চলতে একটি শান্ত উপত্যকায় একটি ছোট্ট নদীর কাছে একটি মিলের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। মিল মালিকের মেয়েকে সে দেখলো। দৃষ্টি বিনিময়ের সংগে সংগে হোল হৃদয়ের বিনিময়। দুজনেই অনুরাগ আর ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধা পড়লো। এই পর্যায়ের সংগীত সৃষ্টির মধ্যে ভালোবাসা, তার আনন্দ যন্ত্রণা সব কিছু ধ্বনিত হয়েছে নতুনতর এক সুরলালিত্যে। এই হৃদয়দীপ্ত, উজ্জ্বলিত সৃষ্টির সময়কাল ছিল ১৮২৩, যখন শ্যুবার্টের চরমতম অর্থ সংকট চলছে, আর অসুস্থতা দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় সংগীতালেখ্যটির নাম হোল 'ডাই উইনটারাইজ।' এটি আরো ট্র্যাজিক সুরে ভরা। এখানেও নায়ক ভ্রাম্যমাণ কিন্তু সে নায়িকার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত; তার প্রেমিকা তাকে ছেড়ে চলে গেছে; তাই সে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু নিজের একাকীত্বের বেদনা নিয়ে; মনে মধ্যে উঁকি মারছে ফুরিয়ে যাবার বিষণ্ণ চিন্তা। শ্যুবার্ট তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে এই সংগীতালেখ্যটি রচনা করেন। এর মধ্যে তাঁর নিজের যন্ত্রণাদগ্ধ মন যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনই আভাসিত হয়েছে তখনকার মানবতাবাদী, সত্যানুসন্ধানী শিল্পীদের নির্জনতার নিঃসীম বেদনা।

আর একটি দুরূহ কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, যা ভারতীয়দের কাছে নিশ্চয় এক আনন্দের বিষয় বলে মনে হবে। তিনি ১৮২৬-এ কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটককে সংগীতে রূপ দিতে শুরু করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে তাঁর প্রয়াস শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণতার রূপ পায়নি। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু বই ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে অনূদিত হয়ে জার্মাণী এবং অস্ট্রিয়ায় প্রসার লাভ করেছিল। শ্যুবার্টও এই সাহিত্য থেকে ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের স্পন্দন অনুভব করতে চেয়েছিলেন।

শ্যুবার্টের সুরসৃষ্টির জনপ্রিয়তার আর একটি দিকও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বুর্জোয়া সম্প্রদায় পরিচালিত বহু অনুষ্ঠানে তাঁর অতি প্রচলিত কিছু সুরকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়। এতেই এক সময়ে শ্যুবার্ট একচ্ছত্র নায়ক হয়ে ওঠেন। এবং অতি শিথিল অপেরা জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে যায়। অবশ্য গভীরতার দিক থেকে এ ব্যাপারটা মোটেই সুখকর নয়।

জার্মাণীতে শ্যুবার্টের সুরসৃষ্টির প্রচুর জনপ্রিয়তা আছে। সেখানকার কনসার্ট, বেতার অনুষ্ঠানে তাঁর সুর প্রভূত পরিমাণে ধ্বনিত হয়। অনেক রেকর্ডও আছে তাঁর সুরের। জার্মাণীর সঙ্গীতপিপাসু জনসাধারণ এই স্মরণীয় সুরস্রষ্টার প্রতিভার সংগে নিবিড়ভাবে পরিচিত হোতে পেরেছেন। শহর ও গ্রামের স্কুলেও শ্যুবার্টের সুরতরঙ্গের সুষ্ঠু পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস চলছে এগিয়ে। সুরস্রষ্টা শ্যুবার্ট যে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের সীমাতেই ফুরিয়ে যাননি, আজকের শতাব্দীতেও তিনি যে প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন, তারই প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে এই সব প্রয়াসের মধ্যে।

—দিলীপ মৌলিক

অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত ও সুরারোপিত নিমাই ভট্টাচার্য রচিত 'মেমসাহেব'-এর দিল্লীর আউটডোর স্যুটিং-এর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন

প্রেক্ষাগৃহ

আমেরিকান চলচ্চিত্রে সমাজসচেতনতা

চলচ্চিত্র সমালোচক-বিচারক এবং সানফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ডিরেক্টার ডক্টর অ্যালবার্ট জনসন সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী এই কারণে যে, তিনিই আমেরিকার দর্শকদের সঙ্গে আমাদের সত্যজিৎ রায়ের পরিচয় সাধন করেছিলেন তাঁর অপুত্রয়ীর (অপু সম্পর্কিত পথের পাঁচালী অপরাজিত এবং অপুর সংসার—এই তিন খানি ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রজগতে অপু-ত্রয়ী বা অপু-ট্রিলজি নামে পরিচিত) মাধ্যমে। 'সমাজ-সমালোচক রূপে চলচ্চিত্রের ভূমিকা'—এই বিষয়ে বক্তৃতা এবং আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে ডঃ জনসন তাঁর সঙ্গে এনেছেন ছ-খানি স্মরণীয় সবাক চিত্র : (১) মিস্টার স্মিথ গোজ টু ওয়াশিংটন, (২) গ্রেপস অফ র‍্যাথ (৩) সিটিজেন কেন, (৪) বুমেরাং (৫) ইন দি হিট অব দি নাইট এবং (৬) রেবেল উইদাউট এ কজ।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সাহিত্যে ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত কৃষ্ণকায় আমেরিকান অ্যালবার্ট জনসন বাল্যকাল থেকেই চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহশীল এবং আসক্ত। তাঁর কথাবার্তা থেকে আমরা জেনেছি, আমেরিকান শুধু আমেরিকান কেন, বিশ্বের — চলচ্চিত্রের যশস্বী পরিচালকদের প্রত্যেকের মানসিকতা, শিল্পসত্তা, প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সন্ধানী চোখ যথার্থ মূল্য নির্ধারণে তৎপর। ডি ডাবলিউ গ্রিফিথ থেকে শুরু করে আণ্ডারগ্রাউন্ড সিনেমার কেনেথ অ্যাংগার, ব্রুশ বেলী, জর্ডান বেলসন, কেন জ্যাকবস প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে তিনি এমন অবলীলাক্রমে স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলেন যেন এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল বা আছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সহজ সম্পর্ক স্থাপনে তিনি একজন পুরোদস্তুর বৈঠকী লোক।

আমেরিকান চলচ্চিত্রে সমাজ-সচেতনতা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়, ১৯৩৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ফ্রাঙ্ক কাপরা পরিচালিত 'মিস্টার স্মিথ গোজ টু ওয়াশিংটন' ছবির বহু আগে নির্বাক যুগেই সামাজিক অনাচার অন্যায়, অসাম্য সম্পর্কে চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকদের মধ্যে সচেতনতা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। সাহিত্যের মতো চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছিল বর্ণবৈষম্যমূলক কাহিনী 'আঙ্কল টমস কেবিন' ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। ডি ডাবলিউ গ্রিফিথ-এর 'এ কর্ণার ইন হুইট' মানুষের খাদ্য নিয়ে ব্যবসায়িক অসাধুতা সম্বন্ধে জনসমাজে তীব্র আলোড়ন তুলেছিলেন ১৯০৯ সালে। চার্লি চ্যাপলিন-এর 'দি ট্রাম্প' প্রভৃতি কথাবাক্যহীন ছবি মানুষকে যে সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছিল এ-কথা অনস্বীকার্য। ডি ডাবলিউ গ্রিফিথ-এর 'ইনটলারেন্স', 'বার্থ অব এ নেশন' প্রভৃতি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়েছিল দর্শকদের মনে।

ছবি শুধুই প্রমোদোপকরণ নয়, তার সাহায্যে দর্শককে শিক্ষাদানেরও প্রয়ো-

জনীয়তা আছে, এই সত্য সাধারণত স্বীকৃত হলেও শিক্ষাদান করতে গিয়ে পাছে চলচ্চিত্র নীরস হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে অধিকাংশ চলচ্চিত্রকারই নিছক উন্মাদনাকারী কাহিনীকেই তাঁদের চিত্রের উপজীব্য করলেও কোনো কোনো সমাজসচেতন পরিচালক তাঁদের ছবির মাধ্যমে জীবনাদর্শ সম্পর্কে ইঙ্গিত — কখনও বলিষ্ঠ আবার কখনও ক্ষীণ — না দিয়ে পারেন নি। মানুষের জীবনযাত্রা দিন দিন যতই জটিল হয়ে উঠছে, চলচ্চিত্রও ততই জীবনমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। তাই ফ্রাঙ্ক কাপরার 'মিঃ ডীডস গোজ টু টাউন', 'ইউ কান্ট টেক ইট উইথ ইউ', 'মিঃ স্মিথ গোজ টু ওয়াশিংটন', চার্লি চ্যাপলিনের 'মডার্ণ টাইমস', 'গ্রেট ডিকটেটর', 'মোসিঁয়ে ভার্দু' 'কিং ভিডর-এর' 'দি সিটাডেল', 'র‍্যাসমস ইন দি ডাস্ট' প্রভৃতি ছবি যুদ্ধপূর্ব যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার ও বৈষম্য সম্বন্ধে যেমন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, যুদ্ধপরবর্তী যুগে 'ডেথ অব এ সেলসম্যান', 'ইনট্রুডার ইন দি ডাস্ট', 'স্টেট অব দি ইউনিয়ন', 'দি নেকেড সিটি', 'বুমেরাং', 'দি বীটার রাইস', 'রেবেল উইথাউট কজ', এবং আরও আধুনিককালে 'হু ইজ আফরেড অব ভার্জিনিয়া উলফ', 'পিটার অ্যান্ড আলভা' প্রভৃতি ছবি মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধ, যৌনজিজ্ঞাসা, নিরর্থক জীবনযাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে চলেছে—এবংএ-ব্যাপারে কোনো কোনো ছবি পুরোপুরি সিরীয়াস আবার কোনোটি বা হাল্কা, কৌতুকাশ্রয়ী।

চিত্র-সমালোচনা

(১) পরশ পাথর

পরশ পাথরের কথা পড়েছি, শুনেছি। কখনও চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। ওর স্পর্শে ধুলো পর্যন্ত নাকি সোনা হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক আজও দু-চারজন আছেন, যাঁদের সংস্পর্শে এসে অতিবড়ো পাষণ্ডেরও চরিত্র বদলে যায়, সে সজ্জনে পরিণত হয়। সৎসঙ্গে কাশীবাস কথাটা মিথ্যে নয়। **চারুচিত্র নিবেদিত 'আলো আমার আলো'** ছবির নায়ক নীলেন্দু মিত্রের জীবনেও পরিবর্তন এসেছিল একটি নারীর সান্নিধ্যে এসে। যে নীলেন্দু নারীকে জীবনে ভোগ্য সামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু সে কোনো দিনই স্বীকার করেনি, সেই নীলেন্দুই যেদিন অ্যামনেসিয়ার রোগী অতসী হালদারের শিশুসুলভ সারল্য এবং তাকে ডাক্তার জ্ঞানে তারই ওপর একান্ত নির্ভরতার সম্মুখীন হল, সেদিন সে প্রথমে হল বিভ্রান্ত এবং পরে ক্রমে হল তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ। শিশুকে মানুষ যেমন স্নেহ, আদর দিয়ে ভরিয়ে তোলে, অতসীকেও নীলেন্দু তেমনই শিশুজ্ঞানে অন্তরের সকল মমতা উজাড় করে ঢেলে দিল। অতসীকে কিসের জন্যে তার কাছে জোর করে ধরে আনা হয়েছিল, সেকথা সে ভুলেই গেল। অতসী আজ তার চোখে দেবশিশুর মতোই পবিত্র, নির্মল, শুচিস্নিগ্ধ। তাই পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়ে যখন অতসী নীলেন্দুকে অত্যাচারী, লম্পট বলে অভিহিত করল, তখন নীলেন্দু তার অন্তরকে উন্মোচন করে অকপটভাবে বলল : তুমি আমার জীবনের আলো, তোমার চোখের আলোয় আমি পথ চিনেছি, আমি নতুন পথে চলতে শিখেছি। —তবু অতসী টলল না। সে ফিরে এল তার বাপের বাড়ীতে। নীলেন্দুর বিরুদ্ধে হল নালিশ। আদালতে চলল বিচার। কিন্তু সেখানে অতসী নীলেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে তাকে দোষী বলতে পারল না—সে বলল, উনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।—এরপরে যে দুজনে মিলন হল, সেকথা বলাই বাহুল্য।

অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী দক্ষতা দেখিয়েছেন নায়িকা অতসীর ভূমিকায় সুচিত্রা সেন। প্রহৃত হয়ে জ্ঞান হারাবার পরে যখন অতসী নীলেন্দুর বাড়ীতে নীত হল, তারপর থেকে ছবির একেবারে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত তাঁর অভিনয় অবাক হয়ে দেখবার মতো। এমন কি, যেসব দৃশ্যে অতসী নীলেন্দুর সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই সব রোমান্টিক দৃশ্যেও তিনি আনন্দের প্রতিমূর্তির মতো প্রতিভাত হয়েছেন। অতসীর চরিত্র-চিত্রণ তাঁর শিল্পীজীবনের অন্যতম স্মরণীয় ভূমিকা হয়ে থাকবে। নায়ক নীলেন্দু বেশে উত্তমকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুঅভিনয় করেছেন। তাঁর মুখের 'চরিত্র ব্যাপারটা রেলেটিভ,—বড়লোকদের কাছে এটা লাকসারি, আর গরীবদের প্রাণের তাগিদ'—কথা সহজে ভোলবার নয়। যেখানে অন্তরের সকল ভালোবাসাকে অতসী ফুৎকারে উড়িয়ে দিল বলে নীলেন্দু মদ্যপান করে আবার নিজের নারী লিপ্সাকে জাগ্রত করে অতসীর সকল অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করতে এল, এবং এসে অতসীর মুখের পানে চাইবার পরে তার সকল বন্যতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হল, নিজের কাছে যেন নিজেই পরাস্ত হল, সেখানে উত্তমকুমারের অভিনয় এককথায় অপূর্ব। 'আলো আমার আলো' ছবি আসলে হচ্ছে উত্তম-সুচিত্রার ছবি। কিন্তু ওরই মধ্যে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যাঁরা তাঁদের নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন নায়িকার পিতা গগন হালদারের ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ; এ ধরনের চরিত্রাভিনয়ে তিনি আজও অদ্বিতীয়। এছাড়া যাঁদের নাম করব, তাঁরা হচ্ছেন বিকাশ রায় (সুধীন ডাক্তার), বঙ্কিম ঘোষ (মহিম), সুব্রত সেন (মানব মিত্র), জহর রায় (গজানন), ভাস্কর চৌধুরী (পার্থ), ভারতী দেবী (অতসীর মা) প্রমুখ।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী আলোকচিত্র গ্রহণে আলোছায়ার খেলায় অভিনব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। এ ছবিতে অপটিকস-এর কাজ প্রয়োজনাতিরিক্ত নয় এবং নিখুঁত। শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনাও দক্ষতার পরিচায়ক। গানে সুরে পবিত্র চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্ব দেখাবার বিশেষ সুযোগ না পেলেও আবহ-সঙ্গীত রচনায় তিনি অসামান্য মুন্সিয়ানার নিদর্শন রেখেছেন। এ ছবির আবহসঙ্গীতে যন্ত্রসঙ্গীতের দান অল্প নয়।

চারুচিত্র নিবেদিত, পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এবং উত্তম-সুচিত্রা অভিনয়দীপ্ত 'আলো আমার আলো' দর্শকসাধারণকে অনাস্বাদিত আনন্দ[illegible] করবে।

(২) একটি তিন মিনিটের ছবি

জীবনযুদ্ধ হতে পারত ছবিটির বাংলা নাম। কিন্তু যাঁদের সমবেত উদ্যোগে ছবিটি তৈরী হয়েছে, তাঁরা এর ইংরেজি নামকরণ করেছেন : 'স্ট্রাগল ফর একজিসটেন্স'। দৈনন্দিন জীবনটাও আজ যে সংগ্রামের প্রতীক, মানুষকে জীবনে টিকে থাকবার জন্যে ক্রমাগত ছুটতেই হচ্ছে, রেললাইনের পাশের রেলিংয়ের [illegible] কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না, জাতিগতভাবেও বহু দেশকেই তেমনই বাঁচবার [illegible] মুক্তিলাভের জন্যে লড়াই করতে হয়, অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা মানুষ করে যুগে যুগে ; আজও তার বিরাম নেই। এই সেদিন অন্যায়ের প্রতিকারের ফলে জন্ম নিল বাংলাদেশ। পৃথিবী জুড়ে চলছে স্ট্রাগল ফর একজিসটেন্স।

—এই কথাই ছবিটি বোঝাতে চেয়েছে রেলের রেলিংয়ের ধার দিয়ে একটি লোককে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে এবং মনে [illegible] চিন্তার স্বরূপ সিগারেট পুড়িয়ে [illegible] মূর্তি ও সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের মানচিত্র দেখিয়ে। ট্রেনের নানা[illegible] সঙ্গে নেপথ্যভাষণ ছবিটিকে প্রাণ দিয়েছে। চিত্রশিল্পী-পরিচালক [illegible] প্রচেষ্টা অনেকাংশে সার্থক হয়েছে।

—নান্দীক

স্টুডিও থেকে

জনপ্রিয় অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ছায়াচিত্র-জগতের অন্যতম ব্যস্ত শিল্পী। তাঁর হাতে এখন বিস্তর ছবি। অভিনয় ছাড়াও তাঁর আর একটা পরিচয় আছে। তিনি ডাক্তার। বর্তমানে প্র্যাকটিস না করলেও চিত্রজগতের অনেক শিল্পী ও কলাকুশলী চিকিৎসাদি ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিয়ে থাকেন। এ-ছাড়াও আর একটা পরিচয় তিনি সুগায়ক। স্টুডিও মহলের অনেকেই গায়ক শুভেন্দু বাবুর সঙ্গে পরিচিত।

একটা খবর আগেভাগেই জানিয়ে রাখি—আগামী পূজোতে আপনারা শুভেন্দুবাবুর গান এইচ. এম. ভি রেকর্ডে শুনতে পাবেন। সুরকার অজয় দাস [illegible] সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'একটি মোরগের কাহিনী' যেমন সুর তেমনি বাণী [illegible] তেমনি কণ্ঠ। ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। [illegible] গেয়েছেনও যাকে বলে একেবারে

পার্ব চমৎকার। একাধারে সু-অভিনেতা, চিকিৎসক এবং অবশেষে সু-গায়ক—এই ত্রিমুকুটের অধিকারী হলেন শুভেন্দুবাবু। আমার বিশ্বাস, এই রেকর্ড বেরোবার পর আপনারাও একবাক্যে স্বীকার করবেন শুভেন্দুবাবু সু-গায়কও।

*

উদীয়মান তরুণ চিত্র পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'জবান'-এর সেটে দেখা হচ্ছিল কর্মব্যস্ত জনপ্রিয় নায়ক সমিত ভঞ্জের সঙ্গে। তাঁর কাছে জানতে পেলাম তিনি এখন কোলকাতা-বম্বে যাতায়াত করছেন। সমিত ভঞ্জ অভিনীত প্রথম হিন্দী ছবি 'গুড্ডী' সারা ভারতে আশাতীত সাফল্যের পর বম্বের বেশ কয়েকজন প্রযোজক তাঁদের আগামী ছবিতে সমিতবাবুকে নায়ক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করার পরিকল্পনা করছেন। অবশ্য সমিতবাবু বর্তমানে ছ' সাতখানা হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছেন—তার মধ্যে পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, অজয় বিশ্বাস, শংকর নারভী, এ সালাম, দেবকিষণ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বি, আর ইশারার 'দিয়া জললে সারী রাত' ছবিতে উর্বশী রেহানা সুলতানার বিপরীতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি।

জানি না ভবিষ্যতে সমিত ভঞ্জের মত একজন প্রতিভাধর শিল্পীকেও বম্বের গ্ল্যামার-যশ-অর্থের হাতছানিতে বাংলার চলচ্চিত্র চিরদিনের জন্য হারাবে কিনা!

•

এবার 'জবাব' ছবির একটা বিশেষ দৃশ্যগ্রহণ শুরু হবে এবার। মিঃ সোমরূপী দিলীপ রায়কে চেনা মুশকিল। মেকআপে তাঁর বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অনেকটা। পরিচালকের নির্দেশে চেয়ারে বসতে বসতে তাঁর মুখে বক্র জটিল হাসি ফুটে পড়ল। আলোক চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত ক্যামেরায় লুক-থ্রু করে দেখে নিলেন একটা। পরিচালক শ্রীব্যানার্জী একবার ফাইনাল মনিটর নিলেন। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বিনু—নায়কবেশী সমিত ভঞ্জ। দৃশ্যটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিনুর টাকার দরকার। শুরু হল ফাইনাল টেক্। স্টুডিওতে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

মিঃ সোম স্পষ্ট কথার মানুষ। তিনি বললেন—দশ হাজার টাকা তার কাছে।

বিনু: কিন্তু টাকার আমার খুব দরকার।

মিঃ সোম: পাবে। একটা বড় কেস হাতে—করে দাও, দশ হাজার কেন বিশ হাজার পাবে।

বিনু: আমার দ্বারা এ-কাজ হবে না।

মিঃ সোম: তাহলে টাকাও পাবে না। আমি সরি।

টাকাটা বিনুর এতই দরকার যে শেষে তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়:

—কাজটা কি?

'বালিকা-বধূ'র সেই দুষ্টু মেয়ে আজকের অষ্টাদশী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের শুভ-পরিণয় হেমন্ত-পুত্র জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মিঃ সোম: বলছি। (একটা ম্যাপ বের করেন তিনি) এই যে, রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছো?

ব্যাপারটা আমরা উপস্থিত কেউ-ই জানতে পারলাম না। শুধু এটুকু বোঝা গেল, ব্যাপারটা ভীষণ গোলমেলে। কাজ করতে হবে অত্যন্ত গোপনে। কেননা কাজটা নিষিদ্ধ।

অতএব মিঃ সোমকে তাঁর কণ্ঠস্বর নামাতে হোল: শনিবার দিন—ঠিক দশটার সময় আমরা পৌঁছে যাব। লছমন, সাদুম, বাসু—এরা সবাই থাকবে। তারপর—আর আশা করি তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে না। অবশ্য আমি লছমনকে পাঠাচ্ছি তোমাকে আরও খোঁজ-খবর এনে দেবে।

পরিচালকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কাট্। সাউন্ড ভ্যান থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—সাউন্ড ও-কে।

এই পর্যন্তই দৃশ্যটি গ্রহণ করা হোল। সুন্দর অভিনয় করলেন—মিঃ সোমরূপী দিলীপ রায় ও বিনুরূপী সমিত ভঞ্জ।

এ-ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন বম্বে ও বাংলার অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী। বাংলার শিল্পীদের তালিকায় সমিত ভঞ্জ, দিলীপ রায় ছাড়া আছেন—চিন্ময় রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, ভাস্কর চৌধুরী ও জয়া ভাদুড়ী এবং বম্বের শিল্পীদের মধ্যে অতিথি শিল্পী হিসেবে থাকবেন—ধর্মেন্দ্র, বিশ্বজিৎ, শত্রুঘ্ন সিনহা, অমিতাভ বচ্চন এবং রেখা।

ছবিতে সুরারোপের দায়িত্বে আছেন—সুধীন দাশগুপ্ত।

এবারে কিছু খুচরো খবর শুনুন: গত ১লা মার্চ সকালে টেকনীসিয়ান্স স্টুডিওতে অরুণ রায়চৌধুরী প্রোডাকসন্স-এর 'রাতের রজনীগন্ধা'-র মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রশান্ত দেব এবং পরিচালনা করছেন—অজিত গাঙ্গুলী। প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। সুধীন দাশগুপ্ত ছবিটির সুরকার।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অথৈজল' গল্প অবলম্বনে পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ছবিটির নাম—'নিশিকন্যা'। প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মিঠু মুখোপাধ্যায়। এ ছবিটিরও সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত। ছবিটি নির্মিত হচ্ছে শতরূপা পিকচার্সের পতাকাতলে।

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রতিভা পিকচার্সের প্রথম প্রয়াস 'অগ্নীশ্বর'-এর স্যুটিং দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্বনামধন্য সাহিত্যিক 'বনফুল'-এর কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, জহর রায় প্রমুখ। সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গত ১০ই মার্চ 'বালিকা বধূ'-র সেই দুষ্টু মেয়ে আজকের অষ্টাদশী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের শুভ-পরিণয় হেমন্ত-পুত্র জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেক গুজব কানাঘুষো এবং কলগুঞ্জনের পরিসমাপ্তি ঘুচিয়ে অবশেষে মৌসুমী জীবন দেবতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে হেমন্ত-পুত্র জয়ন্ত ওরফে সীতেশকে।

এই উপলক্ষ্যে বাংলা চিত্রশিল্পের বিশিষ্ট প্রযোজক-পরিবেশক, শিল্পী ও কলাকুশলীরা নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানাবার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মঞ্চাভিনয়

ময়ূর মহল : মিনারেলস ও মেটালস ট্রেডিং কর্পোরেশন রিক্রিয়েশন ক্লাবের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সম্প্রতি নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'ময়ূর মহল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হোল। নাটকটির নির্দেশনায় শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রাখেন প্রণত ঘোষ। রহস্যঘন এই নাটকটির কৌতূহল শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জী (উদয়নারায়ণ), কাশীনাথ ঘোষ (রাঘব), কমল ব্যানার্জী (কল্যাণ), মমতা চক্রবর্তী (পান্নাবাঈ), বিনয়ভূষণ গুপ্ত (ত্রিদীপ নারায়ণ), দিলীপ দাশগুপ্ত (অমিয়), সুশীল দাস (বসন্ত), তড়িৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (রজত), লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হারাধন), অশোক মুখোপাধ্যায় (মানিকলাল), মণিময় ঘোষ (ব্রজেশ্বর), মোহনচাঁদ দাস (পুলিশ অফিসার), পিতাম্বর দাস (রঘুনাথ)। আবহসঙ্গীত পরিচালনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রাখেন সুহৃৎ মিত্র।

'চার প্রহর' : 'সমবায়ী'র পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সম্প্রতি বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'চার প্রহর' নাটকটি অভিনীত হোল 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে। ভোলা দত্তের নির্দেশনায় নাটকটির প্রযোজনা সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে ওঠে। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন মহাদেব গুহ খাসনবিশ (সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়), ঊষা ভৌমিক (সমাদ্দার), দ্বারিকা বসু মল্লিক (সমীরন), শচীপতি রায় (মিঃ মিত্র), বিভূতি ঘোষ (মিঃ ঘোষ), মমতা চট্টোপাধ্যায়, শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা ভট্টাচার্য।

'ক্ষুধা'র পুনরাভিনয় : স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন স্পোর্টস এন্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' নাটকটির পুনরাভিনয় করলেন 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। প্রথম অভিনয়ের মধ্যে প্রয়োগপরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্র-চিত্রনের যে আন্তরিকতা চোখে পড়েছিল দ্বিতীয়বারের প্রযোজনায় সে দীপ্তি আরো উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। সামগ্রিক প্রযোজনার মধ্যে যাঁর নিষ্ঠা ও শিল্প-চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তিনি হোলেন নির্দেশক বিশু চট্টোপাধ্যায়। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অংশ নেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীরন সেন, সুনীল মাল, অমরেন্দ্রনাথ সোম, মাঃ কল্যাণ, মোহনলাল মুখোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, রাণু রায়, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্টেট ট্রেডিং-এর কলকাতা শাখার ম্যানেজার শ্রীডি এন দস্তরায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিম বাংলার জি-ও-সি শ্রীপি চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রীচৌধুরীর হাতে জওয়ান তহবিলের জন্য ১৫,০০১ টাকা দেওয়া হয়।

'কল্পকে'র ধৃতরাষ্ট্র : হাওড়া কল্পকের সদস্যরা সম্প্রতি ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকের অভিনয় করলেন। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব নেন মণি বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, শম্ভুনাথ দে, নিতাই সাহা, শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দাস, স্বপন মুখোপাধ্যায়, আলপনা দাস, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, মন্দিরা ঘোষ, অলোক সিংহ রায়।

।। নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ।।

'ব্রতী সঙ্ঘ' পরিচালিত তৃতীয় বার্ষিক একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে 'বাণীরূপা'। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে 'লোকরঞ্জন ইনভেকসো' ও 'করবী', 'কুশীলব'। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : বাচ্চু ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা : অরুণ ঘোষ। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : সুচেতা রায়। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : অখিল মজুমদার। শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী : রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ পান্ডুলিপি : 'পুরাতন কাহিনী।' দর্শক পুরস্কার—'যান্ত্রিক', আঞ্চলিক পুরস্কার—'প্রবাহ'।

'নটমল্লারে'র 'বিচার' : গলসওয়ার্দির 'জাস্টিস্' নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত 'বিচার' নাটকটি সম্প্রতি পরিবেশিত হোল 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে। প্রযোজনা করেন 'নটমল্লারে'র শিল্পীরা। নাটকটির বাংলা রূপান্তরে সব সময়েই সাবলীলতা লক্ষ করা গেছে এবং এই স্বাভাবিকতা লক্ষ করা গেছে অভিনয়ের প্রতিটি পর্যায়ে। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব নেন শ্রীশিবপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী।

বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন কানু গঙ্গোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী, দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, অনুলি ভট্টাচার্য, পীযূষ দাস পুরকায়স্থ, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব দেব, সুজিৎ সেন, নির্মল শিকদার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ দে, সৌরেন মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল দত্ত, শিশির বিশ্বাস, বাণী মিত্র, রেণু ঘোষ, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়।

'বিষাইছে বায়ু'র পুনরাভিনয় : সন্দীপনম্ প্রযোজিত 'বিষাইছে বায়ু' নাটকটি যে বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা ও প্রয়োগ পরিকল্পনার অভিনবত্বের জন্য নাট্যানুরাগীদের প্রথমেই তৃপ্তি দিয়েছিল, তারই একটি প্রোজ্জ্বল পরিচয় সেদিন আবার মূর্ত হয়ে উঠলো 'রঙমহলে।' নাটকটি যে মনের গভীরে আন্দোলন তুলতে পারে তার প্রমাণ সেদিন অগণিত দর্শকের অন্তর ও সপ্রাণ উপস্থিত।

বাস্তব জীবনসমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অমিয় মুখোপাধ্যায়ের 'বিষাইছে বায়ু' নাটকটিতে আগের মতোই শিল্পীদের প্রাণ

অভিনয় চিত্রিত হয়েছে। নাট্যকার নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন। অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে যে দুজন চরিত্রাভিনেতা এবার যোগ দেন তাঁরা পরিমল সেন ও বীরেন ঘোষ। সেনের 'জিতু' ও শ্রীঘোষের 'সন্তোন' দুটি স্পর্শী চরিত্রচিত্রণ হোতে পেরেছে। নানা শিল্পীরা পূর্বের উজ্জ্বলতাতেই চরিত্রগুলোকে ভাস্বর করে তুলতে পেরেছেন।

'প্রফুল্ল' ও 'নাম তার বোলব না': রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ... বান্ধব সম্মেলনীর শিল্পীরা গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' ও ...গোবিন্দ চক্রবর্তীর 'নাম তার বোলব ...' দুটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন ... মঞ্চে। দুটি নাটকের সুষ্ঠু ...য় গভীরতম শিল্পবোধের পরিচয় ... কালীপদ চক্রবর্তী ও রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী, কালীপদ চক্রবর্তী, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অতুল চক্রবর্তী; ... বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ ভট্টাচার্য, ... বসু, সব্যসাচী হাজরা, দেবু চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, স্বপন দত্ত; ... দত্ত, সুধাংশু পাল, ইন্দু বিশ্বাস, ... দত্ত, নবীন বসু, নটবিহারী শর্মা, ... রহমান, বিমলেস ঘোষ, কমল ..., ... রায়চৌধুরী, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাচাঁদ দত্ত, তারকনাথ দে, ... ঘোষাল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা ... বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, মনিষা দত্ত, আশা বোস।

মিশ্র ইস্পাত সংগঠনীর অনুষ্ঠান

গত ১৯ই ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুরের মিশ্র ইস্পাত সংগঠনীর তৃতীয় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্থানীয় 'এ' জোন কমিউনিটি সেন্টার হলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে।

... বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত, শ্রীরক্ষাচারীর আবৃত্তি এবং বনশ্রী সেনগুপ্তর আধুনিক গানের পর কাদি-... সুপরিচিত নাট্যসংস্থা থিয়েটার ... মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নাটকটি পরিবেশন করেন। নির্দেশনায় ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রাম মুখোপাধ্যায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী এবং মায়া ...। নাটকের বক্তব্য, অভিনয় ও মঞ্চ-পরিকল্পনা স্থানীয় দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার ...রাম তুলপুলে।

রঙমহলে 'সুবর্ণ গোলক'

সাধারণ রঙ্গালয়গুলোর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সুধী নাট্যানুরাগীদের বিশেষ অনুরোধে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতপ্রধান ... কৌতুক সুবর্ণ গোলক নাটকখানি গেল রবিবার ২০ ফেব্রুয়ারী রঙমহলে মঞ্চস্থলাভ করেছে। নাট্যরূপ দিয়েছেন সন্তোষ সেন। পরিচালনা করছেন জহর রায়। গীত-রচনা ও সুর দিয়েছেন যথাক্রমে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেশ রায়। প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—জহর রায়, হরিধন মুখার্জী, অজিত চ্যাটার্জি, মৃণাল মুখার্জী, তুষার ব্যানার্জী, শম্ভু ভট্টাচার্য, মিন্টু চক্রবর্তী, মানস ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ নাগ, শ্রীমান চক্রবর্তী, বাসুদেব পাল, শ্যামাপদ মণ্ডল, দিলীপ মৌলিক, কার্তিক সরকার, সমরজিৎ গুহ, সত্য দে, জীতেন ভৌমিক, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, বীথি গাঙ্গুলী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা মিত্র, মন্দিরা রায়, ছন্দা চট্টোপাধ্যায় এবং সরযূ দেবী। 'সুবর্ণ গোলক' প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬টায় আর রবিবার ও ছুটির দিন ২-৩০ ও ৬টায় নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হচ্ছে। মোট তেরখানি গান এতে আছে।

বিবিধ সংবাদ

লাইমলাইটের মিলনোৎসব: গত ১৩ ও ১৪ মার্চ মহাজাতি সদনে লাইমলাইটের পরিচালনায় দুদিনব্যাপী বার্ষিক মিলনোৎসব হয়ে গেলো। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে উপস্থিত ছিলেন, যথাক্রমে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট **সভাইলাল কে শাহ** ও রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য **ডঃ রমা চৌধুরী।** উভয়ে বাংলার সংস্কৃতির মানকে আলোও উন্নত করার জন্য সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, লাইমলাইট একটি নয় হাজারো লাইমলাইট যেন সৃষ্টি হয়।

প্রথমদিনের অন্যতম **আকর্ষণ** ছিল শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অগ্নিমিত্রের নাটক "নিজস্ব সংবাদদাতার" অভিনয়। নাটকটি সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করেছে। নাটকের বলিষ্ঠ বক্তব্যে সমবেত দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অভিনয় শিল্পীরা পেয়েছেন। এদিনে নাটকে অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি পেয়েছেন, সর্বশ্রী বিশ্বনাথ রায় (প্রবীণ অধ্যাপক), তপন দত্ত (চাকর মদন), কিশোর মুখোপাধ্যায় (পল্লব), বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (পশুপতি), ইলা সেন (অধ্যাপকের স্ত্রী) আরো কয়েকজনের অভিনয় ছিল প্রাণবন্ত।

১৪ **মার্চ মঙ্গলবার** বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন লাহা, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, অশোক দাস এবং আকাশবাণীর ঘোষকদ্বয় পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ। অতিথি শিল্পী ছিলেন অমিতভঞ্জ ও সোমিত্রা মুখার্জি। সমগ্র **অনুষ্ঠানটি ঘোষণা ও পরিচালনা করেন সুশান্ত ঘোষ ও সন্দের বন্দ্যোপাধ্যায়।**

শিশুশিক্ষা চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৭২

ভারতের চলচ্চিত্র পর্ষদ (ইনস্টিটিউট অব চিলড্রেন্‌স ফিল্ম, ইণ্ডিয়া) ভারতের সর্বাঞ্চলে 'শিশুশিক্ষা চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৭২'-এর আয়োজন করেছেন ২৬ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। পৃথিবীর একশো একটি দেশ ১,১২৩টি ফিল্ম পাঠিয়েছেন এই উৎসবের জন্যে। বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলের ৩০২টি কেন্দ্রে ৪,০০০ হাজারেরও বেশী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে; এর মধ্যে ৫৫টি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াই প্রদর্শনী হবে। বিভিন্ন হাসপাতালের বালক-বালিকা বিভাগে ও শিশু সংশোধনাগারেও (বোরস্টাল জেল) এই চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এখনও পর্যন্ত ১১,২৩৬টি বিদ্যালয় ও ক্লাবের ছেলেমেয়েরা এই উৎসবে যোগ দেবার জন্যে পর্ষদের সভ্য হয়েছে। কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ ও শিক্ষক নিয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ দল বয়স অনুসারে শ্রেণীভুক্ত বালক-বালিকাদের ছবি দেখার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা চালাবেন। এ ছাড়া দুদিনব্যাপী একটি চতুষ্পাঠীরও (সেমিনারের) অধিবেশন বসবে, যাতে খ্যাতনামা শিশু-চলচ্চিত্রকারেরা, মনস্তত্ত্ববিদেরা, সমাজতত্ত্ববিদেরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করবেন। এপ্রিলের ২৪ থেকে ২৯ পর্যন্ত কয়েকটি বিশেষভাবে নির্বাচিত শিশুচিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে কলকাতায়। উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে বেলা ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে এপ্রিলের ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা ও মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ (ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন) দুটি বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই উৎসবে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। ২৫ মার্চ হচ্ছে সভ্য-তালিকাভুক্ত হওয়ার শেষ তারিখ।

একটি আনন্দ সন্ধ্যা

এক স্বপ্নরঙিন সন্ধ্যা নেমেছিল গেল ৪ঠা মার্চ শ্রীমতী কানন দেবীর রিজেন্ট গ্রোভের 'শ্রীমতী' ভবনে। বেশেবাসে সাজেসজ্জায় 'শ্রীমতী' হয়ে উঠেছিল যেন স্বপ্নপুরী। উপলক্ষ্য? শ্রীমতী কাননের একমাত্র পুত্র রানার বিবাহ-উৎসব। সজ্জিত তোরণ দ্বার থেকে কনে বসবার সূর্যোদয়-নকশকরা পুষ্পাসন অবধি লাল কার্পেটে মোড়া। মাথার ওপর নানারঙা ফুলের চন্দ্রাতপ। গাছের পাতায় ফুলের মেলায় রঙিন আলোর বিচ্ছুরণে সত্যিই স্বপ্নপুরী। সানাইয়ের মৃদুগুঞ্জনে বাতাসে সুরের উতরোল। এরই মধ্যে এসে উপস্থিত হচ্ছিলেন আমন্ত্রিতরা—এসেছিলেন সকল শ্রেণীর মানুষ। শিল্প-সাহিত্য সঙ্গীত ও ব্যবসা জগতের স্বনামধন্যরা। শ্রীমতী কানন দেবীর কিংবদন্তী প্রসিদ্ধ মধুর হাসিতে এবং শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্যের সৌজন্যভরা অভ্যর্থনায় তাঁরা অভিষিক্ত হচ্ছিলেন। এরই মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন উৎসব অনুষ্ঠানের অভিভাবক-স্থানীয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীবি এন সরকার, শ্রীসুকুমারকান্তি ঘোষ প্রমুখ। এঁরা এবং আরো অনেকে 'বালিকা বধূ' আশীর্বাদ করলেন। উপস্থিত সকলের মনেই একটি আনন্দ সুর বেজে ফিরছিল: নবদম্পতি সুখী হোক।

খেলাধূলা

দর্শক

দলীপ ট্রফি

বাঙ্গালোরে সেন্ট্রাল কলেজ মাঠে দলীপ ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মধ্যাঞ্চল ২ উইকেটে শক্তিশালী পশ্চিমাঞ্চলকে পরাজিত করে এই প্রথম দলীপ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। গত ১১ বারের মধ্যে (১৯৬২-৭১) দলীপ ট্রফি জয়ী হয়েছে দক্ষিণাঞ্চল ৫ বার (যুগ্ম বিজয়ী ১বার সহ), পশ্চিমাঞ্চল ৬ বার (যুগ্ম বিজয়ী ১বার সহ) এবং মধ্যাঞ্চল ১ বার।

পশ্চিমাঞ্চল দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। ৭০ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। ৫ম উইকেটের জুটিতে হেমন্ত কাণিৎকার এবং ন্যাটা খেলোয়াড় একনাথ সোলকার দলের ১০৬ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। প্রথম দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল দলের ১ম ইনিংসের ৯টা উইকেট পড়ে ২৭০ রান দাঁড়ায়। মধ্যাঞ্চল দলের সহ-অধিনায়ক সেলিম দুরানী ৪০ রানে ৫টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁর বলে আউট হন অধিনায়ক ওয়াদেকার, গাভাসকার, সোলকার, কাণিৎকার এবং নায়েক।

দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ২৭৯ রানের মাথায় শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার ৪৫ মিনিট আগে মধ্যাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ২০০ রানের মাথায় শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল ৭৯ রানে এগিয়ে যায়। একনাথ সোলকার ৫৯ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে মধ্যাঞ্চল দলকে কাবু করেছিলেন। মধ্যাঞ্চল দলের অশোক জাগদেল (নট আউট ৫৯) এবং নরেন্দ্র মেনন ৮ম উইকেটের জুটিতে ৫২ রান তুলে ফলো-অন করার হেনস্তা থেকে দলকে রক্ষা করেন। মধ্যাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ২৫০ মিনিট স্থায়ী ছিল।

পশ্চিমাঞ্চল দল এই দিন ২য় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ২৪ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিন চা-পানের ৪৫ মিনিট আগে পশ্চিমাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস ১৯৫ রানের মাথায় শেষ হয়ে যায়। এবারও পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন কাণিৎকার (৪৭ রান) এবং সোলকার (৩২ রান)। তাঁরা ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৫৭ মিনিটে ৬৫ রান যোগ করেছিলেন। তৃতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস ১৯৫ রানের মাথায় শেষ হওয়ার পর খেলার এই রকম অবস্থা দাঁড়ায় যে, খেলার বাকি ৪৭০ মিনিটে ২৭৫ রান তুলতে পারলেই মধ্যাঞ্চল দলের জয়। মধ্যাঞ্চল দল তৃতীয় দিনের বাকি খেলায় ২য় ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৯৫ রান তুলেছিল। ফলে জয়লাভের জন্যে তাদের আরও ১৮০ রানের প্রয়োজন ছিল। এদিকে হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট এবং শেষ ৪র্থ দিনের খেলার ৩৩০ মিনিট সময়।

শেষ চতুর্থ দিনে লাঞ্চের সময় মধ্যাঞ্চল দলের রান দাঁড়ায় ২০৫ (৮ উইকেটে)। তখনও জয়লাভের থেকে মধ্যাঞ্চল দল ৭০ রান দূরে, হাতে জমা ২টো উইকেট। এই সময় উইকেটে ছিলেন দুরানী এবং ঘাটানি। চা-পানের ৪০ মিনিট আগে মধ্যাঞ্চল দলের রান ছিল ২৭৩ (৮ উইকেটে)—জয়লাভের জন্যে তখন মাত্র ২ রানের দরকার। কৈলাস ঘাটানি খেলার এই অবস্থায় রেগের বল বাউণ্ডারীতে পাঠালে মধ্যাঞ্চল ২ উইকেটে জিতে যায়। দুরানী (৮৩ রান) এবং ঘাটানি (১১ রান) ৮ম উইকেটের জুটিতে ৪৪ রান তুলে অপরাজিত থাকেন।

ওয়েস্টইণ্ডিজ - নিউজিল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ও মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যা দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি প্রথমটির অমীমাংসিত থেকে গেছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গ সোবার্স টসে জিতে নিউজিল্যাণ্ডকে ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন। মাত্র ১৬ রা মধ্যেই সোবার্স দুটো উইকেট পেয়ে নিউজিল্যাণ্ডের ৭৮ রানের মাথায় ৫ম ১৬৮ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে শেষ পর্যন্ত দলকে চরম বিপর্যয়ের থেকে রক্ষা করেন বেভ কংডন। প্রথম দি খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের ৭টা উইকেটে ২১১ রান দাঁড়ায়। কংডন ৮৫ রান অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস ৩৪৮ রানের মাথায় শেষ কংডন শেষ পর্যন্ত ১৬৬ রান অপরাজিত থেকে যান। তিনি ৮২ ব্যাট করে তাঁর ১৬৬ রানে ১৪টা বাউণ্ড এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিল ৮ম উইকেটের জুটিতে বব কুনিস রান) এবং কংডন দলের অতি মূল্য ১৩৬ রান যোগ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংসের ২টো উই খুইয়ে ৬৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৮৮ (৮ উইকে চার্লি ডেভিস ৯০ এবং রয় ফ্রেডা ৬৯ রান করে আউট হন। নিউজিল্যা বেভ কংডন প্রথম ইনিংসের খেলায় রান করে ব্যাটিংয়ে যেমন কৃতিত্বের প দিয়েছিলেন তেমনি তিনি ওয়েস্ট ইণ্ড ১ম ইনিংসের খেলায় ৩টে উইকেট বোলিংয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস ৩৪১ রানের মাথায় শেষ নিউজিল্যাণ্ড মাত্র ৭ রানে এগিয়ে ইনিংস খেলতে নামে এবং ২য় ইনি এক উইকেট খুইয়ে ১১২ রান সংগ্রহ ক

পঞ্চম দিনে নিউজিল্যাণ্ড ২৮৮ র মাথায় (৩ উইকেটে) ২য় ইনিংসের খে সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার এই অব ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়লাভের জন্যে রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল মিনিট সময়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংসের ১২১ রানের মাথায় (৫ উই খেলাটি শেষ হয়। নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংসে টার্নার পাঁচ রানের জন্যে সে থেকে বঞ্চিত হন। কংডন প্রথম ইনিংসে আউট ১৬৬ রান করে ২য় ইনিংসে ৮২ আউট হন। বার্জেসের নটআউট ৬২ উল্লেখযোগ্য।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সমীর শক্তি!

এই নিন র‍্যালিফ্যান! অন্যান্য টেবিলফ্যানের তুলনায় এর শীতল করার শক্তি ২০% বেশী। এবং এটি যাতে অনেক অনেক দিন চলে সেই ভাবে তৈরী।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, র‍্যালিফ্যান মিনিটে ৮৫ ঘন মিটার হাওয়া প্রক্ষেপ ক'রে আপনাকে শীতল আবেশে ঘিরে রাখে। অর্থাৎ অন্যান্য টেবিল ফ্যানের তুলনায় এর শীতল করার শক্তি প্রায় ২০% বেশী। এবং এটি চলেও বেশী দিন। কারণ, র‍্যালিফ্যানের বৈশিষ্ট্যগুলি আজ পর্যন্ত অন্য কোন টেবিল ফ্যানে পাওয়া যায় না।

অখণ্ড কম্পনমুক্ত ব্লেড।
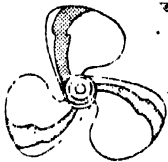
অন্যান্য টেবিল ফ্যান থেকে ভিন্ন এই র‍্যালিফ্যানের ব্লেডগুলি ধাতুর গোটা পাত থেকে কেটে তৈরী। ফলে এগুলি যেমন আরো বেশী দৃঢ় তেমনি অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। না কোন শব্দ হয়, না কোন কম্পন। এর ব্লেডগুলি এমন কোণ বরাবর বসানো যে, সবচেয়ে কম বিদ্যুৎশক্তির খরচে সবচেয়ে বেশী হাওয়া পাওয়া যায়।

র‍্যালিফ্যানের মোটর—মজবুত, শব্দহীন টাইপ।
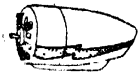
এটি এমন বিশেষ ডিজাইনে তৈরী যে, আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনবরত নিঃশব্দ হাওয়ার হিল্লোল উপভোগ করতে পারেন। এতে অধিকাংশ ফ্যানের তুলনায় কম বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয়। তাতে আপনার পয়সারও সাশ্রয় হয় প্রচুর।

সমরূপ এবং বিস্তীর্ণ আন্দোলন।

র‍্যালিফ্যানের ডানে ও বাঁয়ে আন্দোলন স্বচ্ছন্দ সুদূরপ্রসারী—কোন ঝাঁকুনি আর কাঁপুনিও নেই। কোনাকুনি যে-কোন ঢালে এর আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

হালকা, মজবুত গড়ন।

র‍্যালিফ্যানের প্রায় গোটা অংশটাই অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী। এর ওজন মাত্র ৭ কিলো—অধিকাংশ ফ্যানের তুলনায় ২ কিলো কম। তাই এক ঘর থেকে অন্য ঘরে আপনি এটি অনায়াসে নিয়ে যেতে পারেন।
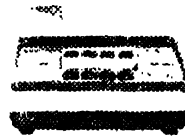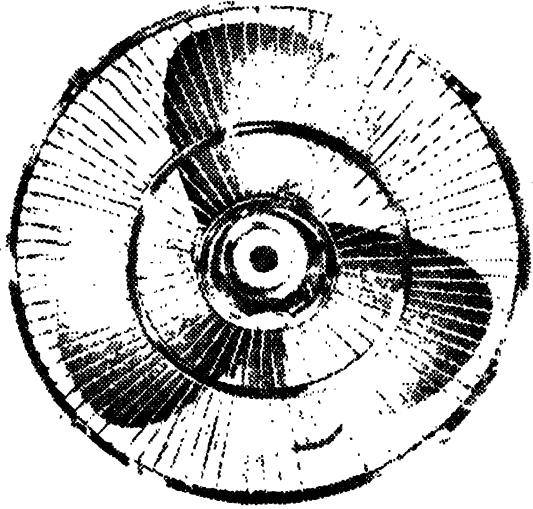
বাচ্চাদের জন্য নিরাপদ গার্ড।

এর গার্ডটি এমন ভাবে তৈরী যে, বাচ্চাদের কৌতূহলী আঙুল এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

প্রেমের মতই চিরকালের নিত্য সহচর।

এর প্রত্যেকটি অংশ এমন ভাবে তৈরী যে, বছরের পর বছর নির্ঝঞ্ঝাটে এটি কাজ ক'রে চলে। সেই জন্যে আমরা দু'বছরের গ্যারান্টি দিই। ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। এটি কিনলে আপনার কত সুবিধা।

র‍্যালিফ্যানের শীতল আবেশে, আপনার তনুমন জুড়ায় বাতাসে।

বহু ধরণের র‍্যালিফ্যানের মধ্যে রয়েছে টেবিল, সিলিং, ওয়াল, পেডেস্টাল, একজস্ট, মিনি মালটি-পার্পাস এবং কার ফ্যান।

১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৭ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

FRIDAY, 31st MARCH, 1972 শুক্রবার, ১৭ই চৈত্র, ১৩৭৮ **52 Paise**

প্রচ্ছদ : শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ রায়

এক নজরে

পিসার মিনার বিপন্ন :

পিসার লোকেদের অবশ্য সুনিশ্চিত বিশ্বাস, তাদের মিনার যতই হেলুক না কেন তা কোনদিনই ভূতলশায়ী হবে না। এমনকি কোন স্থাপত্যকৌশলে ঐ হেলানো মিনারকে একেবারে সোজা করে দেওয়া হক এও তারা চায় না। তাহলে, তাদের বক্তব্য, পিসা তার বৈশিষ্ট্য হারাবে, তার আকর্ষণ চলে যাবে বিশ্বের পর্যটকদের কাছে। তবে পিসার মিনার বিপন্ন, যে কোনদিন তা পড়ে যেতে পারে, এইরকম একটা প্রচার চালু রাখতে পিসাবাসী-দের আপত্তি নেই। কারণ, পড়ে গেলে আর দেখতে পাব না—এই ভেবে দিনে দিনে আরও অনেক বেশি পর্যটক ছুটে আসবে পিসায়। এখনই প্রতি বছর পঞ্চাশ লক্ষ পর্যটক আসে পিসার হেলানো মিনার দেখতে।

কিন্তু ইতালি সরকার নিযুক্ত এক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কমিশনার ছয় বছর নানাভাবে পরীক্ষার পর এই মাসের গোড়ার দিকে যে তিন ভলিউম রিপোর্ট দাখিল করেছেন তাতে বলা হয়েছে, হেলতে হেলতে পিসার মিনার এখন সত্যই বিপজ্জনক সীমায় পৌঁচেছে, এবং অবিলম্বে যদি একটা কিছু না করা যায় তবে ইতালির ঐ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সম্পদটিকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাঁরা বলেছেন, মিনারের নিচের মাটির আর কোন কামড় নেই, সমগ্র মিনারটি বালি ও পাঁকের উপর ভাসছে। এখন মিনারটি হেলছে প্রতি বছর এক ইঞ্চির ত্রিশ ভাগের এক ভাগ গতিতে। কিন্তু ভিতে জলের ভাগ বেড়ে যাওয়ায় ঐ হেলার গতিই বিপদ ডেকে আনবে।

ইতালি সরকার ঐ রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন এবং মিনারটিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তা জানার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্য পিসার মিনার বিপন্ন, এ ধ্বনি ওঠার পর ১৯১০ সাল থেকে গত ষাট বছরে অন্তত দু লক্ষ লোক স্বেচ্ছায় পিসার পৌর কর্তৃপক্ষ ও ইতালি সরকারের কাছে নানা সুপারিশ পাঠিয়েছেন। যেমন, কেউ বলেছে ঐ মিনারের চারিদিকে কানাডার পপলার গাছ লাগানো হক, তা মিনারের নিচ থেকে সব জল শুষে নেবে; আবার এক বালক পরামর্শ দিয়েছে, মস্ত বড় একটা হেলিকপ্টারের সাহায্যে মিনারটিকে টেনে তুলে কোন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হক। ঐরকম কিছু কিছু সুপারিশ ও পরামর্শ এবারও যে আসবে না এমন নয়, কিন্তু তার মধ্যে থেকেই হয়ত ঠিক উপায়ের সন্ধান মিলবে।

১১৭৪ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন একসময়ে নির্মিত ১৭৯ ফুট উঁচু ঐ আটতলার মিনারটি এখন লম্ব থেকে ১৪ ফুট হেলে গেছে। কিন্তু সবটাই পরবর্তীকালে হেলার ঘটনা নয়। মিনারটির তিনতলা নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা যায় যে, নিচের মাটির দোষে তার দক্ষিণ দিকের ভিত, এগারো ফুট দেবে গেছে। তখন তার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিপরীত দিকে এগারো ফুট হেলিয়ে মিনারটি নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়। তারপর বিগত ছয়'সাতশ বছরে বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় ঐ মিনারটি আরও তিন ফুট হেলেছে।

৭৩—৩০ :

ব্যাভেরিয়ার ঐ জার্মান শিশুটির নাম বোধহয় শেষ পর্যন্ত '৭৩—৩০'-ই থেকে যাবে। কারণ যার যা, নাম তার বাবা দিয়েছিলেন, ব্যাভেরিয়ার আদালত থেকে তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। শিশুটির বাবা, হাইন জর্জ ষ্ট্রেইজ এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের যা বলেন তা হল, ছেলেটির পোশাকি নাম নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে, তাই আপাতত হাসপাতালে জন্মানোর সময় সে যে তার বেডের নম্বর অনুসারে '৭৩—৩০' নামে পরিচিত হয় সেই নামই তার চলতে থাকবে।

ছেলের নাম রাখা হয়েছিল, কিউবার প্রখ্যাত বিপ্লবী আর্নেস্টো (চে) গুয়েভারার নামানুসারে 'চে'। কিন্তু জন্ম রেজিস্ট্রেশন অফিস সে নাম বাতিল করে দেয়। তখন শিশুর পিতা ব্যাভেরিয়ার উচ্চ আদালতে রেজিস্ট্রেশন অফিসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানান। কিন্তু ব্যাভেরিয়ার আদালতও রেজিস্ট্রেশন অফিসের সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আদালতের বক্তব্য, অমন একটা বিদ্ঘুটে নাম কোন শিশুর দেওয়া হলে জীবনের সূচনা থেকেই তাকে নাম নিয়ে নাকাল হতে হবে। তাতে তার মানসিক শান্তি ক্ষুণ্ণ হবে এবং ব্যক্তিত্বও আহত হবে। —আদালতের সিদ্ধান্ত, সুতরাং মন্তব্য চলে না।

নারীর অধিকারের সীমা :

গত ৬ই মার্চ, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের একটি সিদ্ধান্ত সেখানকার নারী প্রগতি আন্দোলনকে বিশেষভাবে আঘাত হেনেছে। বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গরাজ্যের কর্তৃপক্ষ যদি বলেন যে, সরকারি কোন দলিলে সই করার সময় বিবাহিত নারীকে তার স্বামীর পদবি ব্যবহার করতে হবে তবে তা অবশ্য গ্রাহ্য। আলাবামা হাইকোর্টের একটি রায় অনুমোদন করে সুপ্রীম কোর্ট উল্লেখিত অভিমত ব্যক্ত করেন।

নারী প্রগতি আন্দোলনের এখন অন্যতম দাবি হল, পদবির ব্যাপারে স্বাধীনতা। অর্থাৎ, বিবাহের পরেও কোন নারী ইচ্ছে করলে তার কুমারী জীবনের পদবি ব্যবহার করতে পারবে। আলাবামা রাজ্যের শ্রীওয়েণ্ডি ফরবুশ তাঁর নবপরিণীতা শ্রীমতী রোনাল্ড পি কার্ভারের ঐ স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করে নেন। কিন্তু বাদ সাধে মোটর ভেহিকিলস ডিপার্টমেণ্ট, যখন শ্রীমতী কার্ভার ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন জানান। ঐ ডিপার্টমেণ্ট থেকে বলা হয় যে, দরখাস্তে বিবাহিতা নারীকে রাজ্যের আইনানুসারে স্বামীর পদবি ব্যবহার করতে হবে। তার থেকেই ঐ মামলার উদ্ভব এবং তা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টও শ্রীমতীর প্রতি বিরূপ হলেন। এও আদালতের সিদ্ধান্ত, সুতরাং মন্তব্য অবাঞ্ছিত।

পূঃ ইউরোপে লোকসংখ্যা হ্রাস :

সম্প্রতি 'ন্যাটো' শক্তিজোটের অর্থনৈতিক কমিটির এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিগত দুই দশকে অত্যধিক জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির লোকসংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। তার ফলে ওয়ারশ শক্তিজোট ও ন্যাটো শক্তিজোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মোট লোকসংখ্যায় এখন অনেক পার্থক্য ঘটে গেছে এবং ভবিষ্যতে এই পার্থক্য আরও বেড়ে যাবে। ১৯৭০ সালে ওয়ারশ জোটের লোকসংখ্যা ছিল ৩৪ কোটি ৫৯ লক্ষ, আর ন্যাটো শক্তিজোটের ৫৫ কোটি ৩৮ লক্ষ। ১৯৮০ সালে ঐ দুই সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩৭ কোটি ৭০ লক্ষ ও ৫৯ কোটি ৬০ লক্ষ।

কিন্তু, ঐ রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, তাতে আপাতত ওয়ারশ শক্তিজোটের শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও প্রতি বছর ২২ লক্ষ ৫০ হাজার ছেলে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের ন্যূনতম বয়স ১৮য় পৌঁচাচ্ছে, এবং '৮০ সালে ঐ সংখ্যা হবে পঁচিশ লক্ষ। তারপরে সেটা একটু হ্রাসের দিকে যাবে। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতেও প্রতি বছর দশ লক্ষ ছেলে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের ন্যূনতম বয়ঃসীমায় উপনীত হচ্ছে। সুতরাং সৈন্যবল হ্রাসের আশঙ্কায় সোভিয়েট ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপের কোন দেশের অবিলম্বে জন-নিয়ন্ত্রণের বর্তমান নীতি পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটেনি।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

নতুন মন্ত্রিসভার কাজ শুরু

১৯৬৭ সালে নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর এইবার কংগ্রেস একক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পশ্চিমবাংলায় শাসনক্ষমতা দখল করেছে। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। শ্রীরায় একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলেই তিনি পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হয়েছিলেন। গত এক বৎসর পশ্চিমবঙ্গ-বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেও তিনি এই সমস্যাজর্জরিত রাজ্যের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে এই রাজ্য দুঃখ-দুর্দশা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাবে, এই আশাই আজ জনগণের। পাঁচ বছরের মধ্যেই এই প্রথম একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় এল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এটাও একটি মোড় পরিবর্তনের অভ্রান্ত ইঙ্গিত। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে অবিভক্ত কংগ্রেস ভিতর থেকে দুর্বল ও জড়ত্বপ্রাপ্তির ফলে অনেক রাজ্য থেকেই ক্ষমতাচ্যুত হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখনই বুঝেছিলেন যে, এইভাবে চললে কংগ্রেসের পক্ষে জনগণের আস্থা ফিরে পাওয়া অসম্ভব। এর জন্য চাই গতিশীল নেতৃত্ব, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী এবং বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী। ভিতরের সংঘাতেই কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা ছিলেন স্থিতস্বার্থের প্রতিভূ, ক্ষমতালোভী এবং রক্ষণশীল তাঁরা পরিত্যক্ত হলেন। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস নতুন উদ্যমে নতুন উৎসাহে শুরু করল কাজ। তারই ফলস্বরূপ এবারের নির্বাচনে ঘটেছে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব জয়লাভ।

কংগ্রেসের নতুন মন্ত্রিসভায় প্রবীণ ও অভিজ্ঞদের পাশাপাশি যথাযোগ্য স্থান পেয়েছেন তরুণেরা। কংগ্রেসের বর্তমান জয়ের গৌরব অনেকখানিই তার তরুণ কর্মীরা দাবি করতে পারেন। এক সময়ে বামপন্থী দলগুলোতেই থাকত যুবক কর্মীদের প্রাধান্য। তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে দলের কর্মসূচী ও বক্তব্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতেন। দীর্ঘকাল একটানা ক্ষমতার আসনে থেকে কংগ্রেস নিজেই যে বার্ধক্যের চেহারা নিতে চলেছিল তা ও'রা বুঝতে পারেননি। তাই কংগ্রেসে যুবক কর্মীর অভাব ছিল, তরুণ ও ছাত্রদের তাঁরা কাছে টানতে পারতেন না। এবার অবস্থা পাল্টে গেছে। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা ছাত্র ও যুবকদের টেনে এনেছে দলে দলে। তাই স্বভাবতই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় তাঁর তরুণ সহকর্মীদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন নতুন বাংলা গড়ার কাজে তাঁর সঙ্গে নতুন উদ্যমে সহযোগিতা করার।

মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীরা এ বিষয়ে সচেতন যে, জনগণের আস্থা রাখতে হলে তাঁদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। জনগণ কেন এবার কংগ্রেস ও তার সহযোগী কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দিয়েছে? নিশ্চিতই তাঁদের কর্মসূচীর ওপর আস্থা রেখে। গত পাঁচ বছরে পশ্চিমবাংলার অনেক ক্ষতি হয়েছে। তার কলকারখানা বন্ধ, হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন, লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক কর্মপ্রার্থী। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সমাজের সকল শ্রেণীই আর্থিক সংকটে বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী জানেন তাঁর রাজ্যের সমস্যা কী? তাই শপথ গ্রহণের পরই জনগণকে আশা দিয়ে তিনি বলেন, এ সরকার কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মানুষের সরকার। এ সরকার গরীব মানুষের সরকার। আমরা পশ্চিমবঙ্গে নতুন যুগ—নবীন গতিবেগ সঞ্চার করব। ঠিক এ ভাষায় এই রাজ্যের পূর্বতন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা কিন্তু কথা বলেননি। জনসাধারণ তাই আশা করছে, বর্তমান মন্ত্রিসভা শুধু কথায় নয়, কাজেও প্রকৃত জনগণের সরকাররূপেই পশ্চিমবাংলার দুঃখী ও সর্বহারা মানুষের বন্ধু প্রমাণিত হবে।

পশ্চিমবাংলার মানুষের একটি অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই রাজ্য উপেক্ষিত। তার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু সে পাচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে এই অভিযোগের সমর্থন যে না করা যায় তা নয়। তবে এটাও ঠিক যে, পশ্চিমবাংলার দাবি ও সমস্যা সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী আজ যতটা অবহিত ও মনোযোগী, আগে কেন্দ্রীয় সরকার ততটা ছিলেন না। মনে রাখতে হবে, বামপন্থী রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জনসাধারণ তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিলেও, জনগণের প্রকৃত সমস্যার সমাধান না হলেও কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগ আবার বিরাগে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। তাই নতুন মন্ত্রিসভার ওপর জনগণের আস্থা যেমন এবার নিরঙ্কুশ, জনগণের প্রতি তার দায়িত্বও তেমনি বিরাট। জনজীবনের সর্বস্তরে যে-নৈরাশ্য ও উদ্দেশ্যহীনতা সমস্ত উৎসাহ ও প্রেরণার মৃত্যু ঘটিয়েছে, বিগত কয়েক বৎসরে তা ফিরিয়ে আনতে না পারলে কোনো মহৎ কাজই করা সম্ভব হবে না। এখনকার জরুরী প্রয়োজন রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। তার জন্য চাই সর্বত্র শান্তির পরিবেশ ও সকলের সহযোগিতা। আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা গত কয়েক বছরে নিদারুণ অবনতির দিকেই গেছে। এখনও মানুষের মন থেকে ভয় যায়নি। মানুষকে নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক করে নতুন বাংলা গড়ার কাজে তাকে সহযোগীরূপে সঙ্গে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারও সকল রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্যের কোথায় কী প্রয়োজন তা সঠিকভাবে যাচাই করে, জনকল্যাণব্রতী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবার সত্যি সত্যিই বাংলাকে নতুন রূপ দেবার সুযোগ এসেছে কংগ্রেসের। তার যে-সুনাম নষ্ট হয়েছিল এবং জনগণই যে গৌরব তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে রক্ষা করার একমাত্র পথ হল জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ। নতুন মন্ত্রিসভার প্রধান কাজই হল এই।

কেন্দ্রীয় বাজেট : শংকা ও স্বস্তি

বাজেটের কূটকচালি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাতে চান না তাঁদেরও বাজেট সম্পর্কে একটা আগ্রহ থাকেই। কোন বিষয়ে কতো নতুন কর চাপলো, নতুন করের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল কিনা—আগ্রহটা প্রধানতঃ এইসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই। ১৬ মার্চ সংসদে আগামী বছরের বাজেট পেশের আগে এইসব প্রশ্ন ঘিরে সাধারণ মানুষের কৌতূহল বা উদ্বেগ বেশ বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল।

দেখা দেওয়ার কারণও অবশ্য ছিল অনেক। ৩১ মার্চ যে আর্থিক বছরটা শেষ হচ্ছে সেই বছরের অভিজ্ঞতাটাকে ঠিক সুখকর বলা চলে না কোনো মতেই। বাজেট পেশের আগে সরকার যে বৈষয়িক সমীক্ষা প্রকাশ করেছেন তাতেই বলা হয়েছে যে ১৯৭১-৭২ সালটা স্বাধীনতার পর অন্যতম দুর্বৎসর। তার জন্যে দায়ী অবশ্য সীমান্তের ওপারের ঘটনাবলী। এক কোটি শরণার্থীর ত্রাণ এবং একটা পুরোদস্তুর যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে হয়েছে এই বছরেই। গত মে মাসে যখন ১৯৭১-৭২ সালের বাজেট পেশ করা হল তখন শরণার্থী ত্রাণ বাবদ খরচ ধরা হয়েছিল ৬০ কোটি টাকা। ক্রমে যখন শরণার্থী স্রোত অবিরাম হয়ে উঠল, বরাদ্দও বাড়িয়ে করতে হল ৩৬০ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী শ্রীচাবন সর্বশেষ যে-হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, আসল খরচ হয়ত ৩২৫ কোটি টাকার মতো দাঁড়াবে। এর মধ্যে বিদেশ থেকে সাহায্য বাবদ পাওয়া যাবে বড় জোর ১২০ কোটি টাকা। এটা তো গেল বাংলাদেশ সংক্রান্ত সমস্যার একটা দিক, আর একটা দিক হল সরাসরি লড়াই। ১৯৭১-৭২ সালে প্রতিরক্ষা বাবদ খরচও একলাফে বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ১৭০ কোটি টাকা বেড়ে গেছে। বাংলাদেশকে সরাসরি অর্থ সাহায্য দেওয়াও চালু হয়েছে এই বছরে। তাছাড়া এই বছরেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে ত্রাণের খরচও বেড়ে যায়। এই চারটি খাতে আসল খরচ দাঁড়িয়েছে বাজেট বরাদ্দের তুলনায় মোট ৫৩৭ কোটি টাকা বেশি।

গত মে মাসেই অনুমান করা হয়েছিল যে চলতি বছরে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২৩৩ কোটি টাকা। চ্যবনজী যে ২২০ কোটি টাকার করের বোঝা দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও এই বিরাট ঘাটতি থেকে গিয়েছিল। তারপর যে-হারে খরচ বেড়ে চলছিল তাতে ঘাটতির পরিমাণ যে বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহই ছিল না। সেই বাড়তি খরচের টাকা জোগাড়ের জন্যেই অক্টোবরে একবার এবং ডিসেম্বরে আর একবার নতুন কর চাপানোর দরকার হয়ে পড়ল। অক্টোবরে যে কর বসল তা থেকে পুরো এক বছরে (এপ্রিল-মার্চ) ৩৫ কোটি টাকা আদায় হওয়ার কথা। তাছাড়া, বিভিন্ন রাজ্য সরকারও যাতে মোট ঐ পরিমাণ কর বসান তার ব্যবস্থাও করা হল। ডিসেম্বরে যে-কর চাপল তা থেকে চলতি বছরে ৪০ কোটি টাকা আদায় হলেও পুরো বছরে ১৩৫ কোটি টাকা আদায় হওয়ার কথা।

গত ডিসেম্বরে যখন চ্যবনজী অতিরিক্ত বাজেট পেশ করেন তখনই মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৪০ কোটি টাকা। সুতরাং বছরের শেষে ঐ অংক যে পাঁচ থেকে ছশ' কোটি টাকা দাঁড়াবে, এমন একটা আশংকা দেখা দিয়েছিল। তার ফলেই জনসাধারণের মনে নতুন করের বিরাট বোঝা চাপার আশংকাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, চলতি বছরের ঘাটতির পরিমাণ শেষপর্যন্ত ৩৮৫ কোটি টাকা দাঁড়াবে। তার প্রথম কারণ, চলতি বছরে তিন দফায় যে কর চাপানো হয়েছে তার বিপুল পরিমাণ। দ্বিতীয় কারণ, আয়কর, আবগারী শুল্ক প্রভৃতি বাবদ যতো টাকা আদায় হবে বলে সরকার অনুমান করেছিলেন আসলে আদায় হয়েছে তার চেয়ে বেশি।

এটা তো গেল চলতি আর্থিক বছরের হিসেব, কিন্তু আগামী বছরে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, সেটাই প্রশ্ন। সাধারণ মানুষও এটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে, চলতি বছরের ঘটনাবলীর ধাক্কা আগামী বছরেও কাটবে না। যেমন, বাংলাদেশকে সাহায্য দেওয়ার বিরাট দায়িত্ব বহন করতে হবেই। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিরক্ষা খাতে খরচ যে বাড়বেই, এটাও অনেকে ধরে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া, চলতি বছরে বাংলাদেশ এবং পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে যে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়েছে তা আবার পুরোদমে চালু করার জন্যেও বাড়তি টাকার দরকার হবে। অর্থাৎ, আগামী বছরেও যে জনসাধারণকে কৃচ্ছ্রসাধনের জন্যে তৈরি থাকতে হবে, এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল।

বিরাট করের বোঝা চাপতে পারে, এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি ছিল বলেই এবার চ্যবনজী যখন মাত্র (!) ১৮৩ কোটি টাকার নতুন কর চাপাবার প্রস্তাব করলেন তখন সেই অংকটাকে আর তেমন বিরাট মনে হল না। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হল, লোকে যেন এত অল্পে রেহাই পেয়ে স্বস্তিই বোধ করছে।

নতুন কর প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে শ্রীচাবনও একটু 'কিন্তু কিন্তু' করেছেন। তিনি বলেছেন, গত এক বছরে তিনি বলতে গেলে তিনবার বাজেট পেশ করেছেন, সুতরাং অন্তত একটা বছর নতুন করের হাত থেকে দেশবাসীকে তিনি রেহাই দেবেন বলে হয়ত অনেকে আশা করেছেন। কিন্তু সেই আশা তিনি পূরণ করতে পারছেন না। কারণ চলতি বছরের কর-হার যদি আগামী বছরেও অপরিবর্তিত রাখা হয় তবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৭৫ কোটি টাকা। এখন থেকেই বাজেটে এই বিরাট অংক ঘাটতি রেখে দিতে কোনো সরকারই চাইতে পারেন না। তাই ১৮৩ কোটি টাকা কর আদায়ের প্রস্তাব।

এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর থেকে আসবে ১৬ কোটি, উৎপাদন শুল্কের নানা খাতে মোট ১৫৮ কোটি ৪০ লাখ এবং কাস্টমস শুল্ক বাবদ ৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা। তবে এই ১৮৩ কোটি টাকার মধ্যে সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার পাবেন না, ৫০ কোটি টাকা বাঁটোয়ারা করা হবে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যে ১৩৩ কোটি টাকা পাবেন তাতে ঘাটতির অনুমিত পরিমাণ কমে দাঁড়াবে ২৪২ কোটি টাকা।

এই ১৮৩ কোটি টাকার মধ্যে ১৬৭ কোটি টাকাই আসবে পরোক্ষ কর থেকে। প্রত্যক্ষ কর (অর্থাৎ ব্যক্তি বা কোম্পানির আয় বা সম্পত্তির ওপর কর) থেকে আসবে মাত্র ১৬ কোটি টাকা। তার কারণ এবার ব্যক্তিগত আয়ের ওপর কর-হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কোম্পানির আয়ের ওপর সারচার্জ বাড়ানো হয়েছে শতকরা আড়াই ভাগ। লটারি বা ক্রসওয়ার্ড পাজলে প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের ওপরও কর ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত আয়ের করের হার যে এবার চড়ানো হয় নি তা করদাতাদের (বিশেষত মধ্যবিত্তদের) স্বস্তির অন্যতম কারণ। তবে যাঁরা আশা করেছিলেন এক্ষেত্রে করের হার কমিয়ে শ্রীচ্যবন সত্যিই কিছু স্বস্তি দেবেন, তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীকে এন ওয়াঞ্চুর নেতৃত্বে গঠিত প্রত্যক্ষ কর তদন্ত কমিটির যে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে আয়করের চড়া হার কমাবার সুপারিশ করা হয়েছে, কারণ কমিটি মনে করেন যে, কর-হার চড়া বলেই লোকে আয় গোপন করতে চায়, ফলে কালো টাকার জন্ম হয়। অল্প বা মাঝারি আয়ের মানুষকে আয়করের নানা ঝামেলা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। যেমন, যাঁদের বার্ষিক আয় পনের হাজার টাকার কম তাঁদের আয়করের রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়। কমিটির মতে ছোটখাটো 'কেসে' পাওনা আদায় করতে

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

গিয়ে আয়কর বিভাগ অনেক বেশি ঝামেলা করতে গিয়ে নিজেদের নাম খারাপ করেছে। শ্রীচ্যবন তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে, ওয়াঞ্চু কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ কার্যকর করার জন্যে তিনি কিছুদিন পরে একটি পৃথক বিল আনবেন। আশা করা যায়, মধ্যবিত্তদের কিছুটা রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

আগেই আমরা দেখেছি যে, পরোক্ষ করের মধ্যে অধিকাংশটাই আসছে উৎপাদন শুল্ক থেকে। অবশ্য, যে-সব পণ্যের ওপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হয় সেই তালিকায় এবার নতুন কোনো পণ্যের নাম যোগ হয় নি। শ্রীচ্যবন উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নতুন ক্ষেতে চাষ না করেও ফলন বাড়ানো যায় এবং সেই ফলন বাড়ানোর পথ হল পুরোনো ক্ষেতে আরও নিবিড় চাষ। তিনি এবার তাই করেছেন। অর্থাৎ যে-সব পণ্যের ওপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা আছে সেইসব পণ্যের ওপরই শুল্কের হারের তিনি পুনর্বিন্যাস করেছেন। নামে পুনর্বিন্যাস হলেও আসলে এর ফলে অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কের হার চড়েছে, যদিও কোথাও সামান্য কমেছে (যেমন, কফি)।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যে-সব পণ্যের শুল্কের হার চড়ায় সমালোচনা শুরু হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কেরোসিন, সার, অ্যালুমিনিয়ম, ইস্পাত, রেডিও, সিগারেট প্রভৃতি। সিগারেট বা তামাকের দাম প্রায় প্রতি বাজেটের ফলেই চড়ে, তাই এই ব্যাপারটা প্রায় গা-সহা হয়ে গেছে বলা চলে। তা ছাড়া, সিগারেট শত হলেও নেশার জিনিস, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আওতায় তাকে ফেলা চলে না। কিন্তু কেরোসিন সম্বন্ধে সে-কথা বলা যায় না। গত বছর পেট্রলের ওপর শুল্ক চড়ানো হলেও কেরোসিন রেহাই পেয়েছিল। এবার শ্রীচ্যবন বলেছেন, কেরোসিনের ওপর শুল্কের হার চড়ানোর দরকার হয়েছে দুটি কারণে : (এক) কেরোসিনের জন্যে আমাদের আমদানির ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে হয়, সেই নির্ভরশীলতা কমানো দরকার; (দুই) কেরোসিনের ওপর শুল্কের হার অপেক্ষাকৃত কম বলে অনেকে হাই-স্পিড ডিজেলের সঙ্গে ভেজাল হিসেবে কেরোসিন মিশিয়ে থাকে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে সদস্যেরা এই যুক্তি মেনে নিতে পারছেন না। কারণ, কেরোসিন সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস —বিশেষত গ্রামে। এমন কি, কংগ্রেস দলের মধ্যেও এই কর-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। অবস্থা দেখে মনে হয় শেষ পর্যন্ত হয়ত শ্রীচ্যবনকে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে হবে, যেমন নিতে হয়েছিল গত বছরে পাঁউরুটি তৈরির ময়দার ওপর শুল্কের প্রস্তাব। পুরোপুরি পরে প্রত্যাহৃত না-হলেও বাড়তি শুল্কের হার কিছুটা কমতে পারে।

এবার যে সারের ওপর শুল্কের হার শতকরা পাঁচ ভাগ চড়ানো হল এবং শক্তিচালিত পাম্পের ওপর নতুন করে শুল্ক চাপানো হল তার উদ্দেশ্য ধনী চাষীদের আয়ের কিছুটা অংশ সরকারী কোষে নিয়ে আসা। 'সবুজ বিপ্লবের' কল্যাণে বেশ কিছু চাষীর হাতে প্রচুর টাকা এসেছে, কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যেই কৃষি আয়ের ওপর কর দিতে হয় না। এই কর ধার্য করার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের কেন্দ্রের নয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকার কৃষির, আয়ের ওপর পরোক্ষ কর চাপানোর পথ নিয়েছেন। শক্তিচালিত পাম্প (সেচের জন্যে) অবশ্য সম্পন্ন চাষীরাই ব্যবহার করে, কিন্তু সারের ব্যবহার ছোট চাষীকেও করতে হয়। সারের ওপর শুল্ক চড়ানোর ফলে ছোট চাষীদের যাতে ক্ষতি না হয়, তা দেখা সরকারের কর্তব্য। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ছোট চাষীদের সাহায্য পাওয়ার ব্যাপকতর ব্যবস্থা করলে ছোট চাষীরা উপকৃত হবেন।

ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতির ওপর শুল্কের হার চড়ে যাওয়ায় এই সব ধাতু দিয়ে যে-সব ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য তৈরি হয় তার দাম চড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর কয়েকটি পণ্যের দাম চড়লে অন্যান্য পণ্যের দাম চড়ারও ঝোঁক দেখা দেয়, ইংরিজিতে যাকে বলে 'সিমপ্যাথেটিক রাইজ'। আসলে পরোক্ষ কর চড়লে সাধারণ মানুষের মনে যে আশঙ্কা দেখা দেয় তা এই দাম চড়ার প্রশ্নকে (যার পোশাকী নাম মুদ্রাস্ফীতি) কেন্দ্র করেই। বাড়তি করের সঙ্গে ইদানিং প্রতি বছরেই বেশ কিছু টাকা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সেই ঘাটতি পূরণের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে ফালতু নোট ছাপার। যতোই ফালতু নোট ছাপা হচ্ছে ততোই টাকার দামও কমে আসছে, অর্থাৎ জিনিস-পত্রের দাম চড়ছে। এর ফলে যে শুধু সাধারণ মানুষই অসুবিধেয় পড়ছেন তাই নয়, সরকারকেও অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছে। কারণ, কোনো প্রকল্প রূপায়ণে যে-পরিমাণ টাকা খরচ হবে বলে পাঁচ বছর আগে হিসেব করা হয়েছিল এখন কাজের সময় দেখা যাচ্ছে যে আসলে খরচ দাঁড়িয়েছে তার চেয়ে বেশি। তবে এখানে এই কথা অবশ্যই বলতে হবে যে, চলতি বছরে বিপুল পরিমাণ নতুন কর এবং ঘাটতির বিরাট বোঝা সত্ত্বেও জিনিসপত্রের দাম একেবারে অস্বাভাবিক হারে বাড়ে নি। সরকারী অর্থনৈতিক সমীক্ষাতেই বলা হয়েছে যে, ১৯৭০ সালে যেখানে জিনিস-পত্রের দাম বেড়েছিল শতকরা ৬·২ ভাগ, ১৯৭১ সালে সেখানে বেড়েছে ৩·৯ ভাগ। এটা নিশ্চয়ই আমাদের বৈষয়িক ব্যবস্থার স্বাস্থ্যের লক্ষণ, যদিও এ-বিষয়ে আত্মপ্রসাদের কোনো সুযোগই নেই।

এই মুহূর্তে ভারতকে প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন—দু'দিকেই মনোযোগ দিতে হচ্ছে, অথচ আমাদের সঙ্গতি সীমাবদ্ধ। বহিঃ-শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় আমাদের সামরিক ব্যবস্থাকে জোরদার করার প্রয়োজন না হলে এই খাতে বরাদ্দর ১৪০৮ কোটি টাকার অনেকটাই উন্নয়নের কাজে লাগানো যেত। কিন্তু শ্রীচ্যবনের বাজেটে প্রতিরক্ষা বাবদ বিরাট অঙ্ক বরাদ্দ করা হলেও উন্নয়নের প্রশ্ন মোটেই উপেক্ষিত হয় নি। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ চলতি বছরের তুলনায় ৩০২ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে আর কখনোই পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ এত বৃদ্ধি করা হয় নি।

পরিকল্পনা খাতে ব্যয়বরাদ্দের সময় সব দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে, তবে জোর দেওয়া হয়েছে সেই সব প্রকল্পের ওপর যার সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নও জড়িত। গ্রামে জল সরবরাহ, গ্রামে ঘর-বাড়ি তৈরির জমির ব্যবস্থা করা, বস্তি উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রকল্পের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে শ্রীচ্যবন এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটাই হল আসল প্রশ্ন—টাকা বরাদ্দ করলেই উন্নতি হয় না। সময়ে প্রকল্প তৈরি করা এবং দ্রুত সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত না করতে পারলে সবই অর্থহীন।

বাজেটের মধ্যে যতো সূক্ষ্ম হিসেব এবং কচকচি থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত বাজেটটা হল আয়-ব্যয়ের সমীকরণের ব্যাপার। সেই সঙ্গে জড়িত থাকে নানা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা একটি বৈষম্য-হীন সমাজ গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করার প্রশ্ন। উন্নয়নের ব্যয়ের জন্যে নতুন আয়ের পথ সরকারের অবশ্যই দরকার। উন্নয়নের জন্যে জনসাধারণকে মাশুল দিতেই হবে। কিন্তু পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কর যদি বেড়েই চলে তবে মানুষকে মুস্কিলে পড়তে হয়। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের যতো টাকা নতুন কর ধার্য করার কথা ছিল ইতিমধ্যেই সেই পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং এখন নতুন কর না-চাপিয়ে সরকারকে আয় বৃদ্ধির পথ খুঁজে বার করতে হবে। যে-সব কর ইতিমধ্যেই চাপানো হয়েছে সেগুলি ঠিক মতো আদায়ের ব্যবস্থা হলেই আয় অনেক বেড়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, কর ফাঁকি দেওয়ার পথ বন্ধ করলেও যে সরকারের অনেক বাড়তি আয় হতে পারে ওয়াঞ্চু কমিটির রিপোর্ট থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দেশ বিদেশ

বিধানসভাগুলির নির্বাচন শেষ। রাজ্যে রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভার গঠন সারা। বিধানসভাগুলির বাজেট অধিবেশনও শুরু হচ্ছে।

ভারতবর্ষের পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে যেন এখন বসন্তের কাল। পুরানো যা ছিল ঝরে, নতুন তার জায়গা নিচ্ছে। কিম্বা তুলনাটা হয়তো পুরোপুরি খাটল না, কেননা, কোন কোন জায়গায় পুরোনো ব্যবস্থাই নতুন করে ফিরে এসেছে। কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ হরিয়ানা মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও আসামে নির্বাচনের আগেও কংগ্রেস সরকার ছিলেন, নির্বাচনের পরেও কংগ্রেস সরকার এলেন। মেঘালয় গোয়ার সরকারেরও রাজনৈতিক চরিত্রের কোন বদল হয় নি। একসঙ্গে সাতটি রাজ্য থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন উঠে গিয়ে ঐসব রাজ্যে লোকায়ত্ত সরকার গঠিত হল। ঐ সাতটি রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাব, গুজরাট মহীশূর, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পুনর্বাসন লাভ করল। ত্রিপুরায়ও কংগ্রেসই সরকার গঠন করল। যে একটি মাত্র রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়ার পরও কংগ্রেসকে ক্ষমতার আসনে দেখা গেল না সেটি হল মণিপুর। একমাত্র মণিপুর রাজ্যেই এবারকার নির্বাচনের পর কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে। ঐ অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মণিপুর পিপলস নেতা মহম্মদ আলিমুদ্দিন।

ঠিকভাবে বলতে গেলে একমাত্র দিল্লিতেই ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনের পর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। সেখানে মেট্রোপলিটান কাউন্সিল জনসংঘের হস্তচ্যুত হয়ে কংগ্রেসের হাতে এসেছে।

গত কয়েক দিনে বিভিন্ন রাজধানীতে যেসব মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিলেন তাঁদের নামের তালিকায় চোখ বুলিয়ে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হল, নির্বাচনের আগে যাঁরা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাঁরা সকলেই রয়ে গেছেন। কোন কোন রাজ্যে এবার কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী বদল হতে পারে বলে আগে যে অনুমান করা গিয়েছিল সেটা মিথ্যা হয়ে গেছে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ভি পি নায়ক ও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাও সম্পর্কে পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথাটা বেশি করে উঠেছিল। নির্বাচনে জয়ী হয়ে এসে তাঁরা তিনজনই আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন রাজ্য রাজনীতিতে এই তিনজনেরই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। এই মুখ্যমন্ত্রীরা নিজেদের পদে ফিরে এসেছেন বলেই যে তাঁরা আগামী পাঁচ বছর ঐ পদে থাকবেন তার অবশ্য কোন নিশ্চয়তা নেই। বিশেষ করে, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ভি পি নায়ক সম্পর্কে অনেকেরই বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়াদ বড় জোর বছরখানেকের।

মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে কংগ্রেসের ভিতরে রেষারেষির যতটা আশংকা আগে প্রকাশ করা হয়েছিল সেই তুলনায় বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের কাজটা মোটামুটি নির্বিবাদেই সম্পন্ন হয়েছে। যে তিনটি রাজ্যে বিধানসভার নবনির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যরা নিজেরা একমত হয়ে নিজেদের নেতা নির্বাচন করতে পারেন সেই তিনটি রাজ্যেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপে নেতা নির্বাচন পর্ব ভালয় ভালয় উতরে গেছে। এই তিনটি রাজ্য হচ্ছে বিহার,, গুজরাট ও মহীশূর। এই তিনটি রাজ্যেই বিধানসভার কংগ্রেস দল প্রস্তাব গ্রহণ করে নেতা নির্বাচনের ভার শ্রীমতী গান্ধীর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। নেতা নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি থেকে যাঁদের পর্যবেক্ষক করে পাঠান হয়েছিল তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে টেলিফোনে পরামর্শ করে এইসব রাজ্যে কংগ্রেস দলের নেতার নাম ঘোষণা করেছেন। মহীশূরে দলনেতা হিসাবে দেবরাজ উর্সের নাম ঘোষণা করার আগে এ-আই-সি-সির পর্যবেক্ষক উমাশঙ্কর দীক্ষিতকে টেলিফোনে ঢাকায় শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিল।

আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় হল, তিনটি রাজ্যের বিধানসভা সদস্যদের মধ্য থেকে মুখ্যমন্ত্রী পাওয়া যায় নি, বিধানসভার বাইরে থেকে লোক এনে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসাতে হয়েছে। এই তিনজন হলেন পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, গুজরাটের ঘনশ্যামভাই ওঝা এবং মহীশূরের দেবরাজ উর্স। প্রথম দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যপদ ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন। নির্বাচনের ঠিক আগে প্রকাশচন্দ্র সেঠীকে দিল্লির মন্ত্রিত্ব ছেড়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে পাঠান হয়েছিল। তাঁকে ধরলে মোট তিনজনকে এবার দিল্লি থেকে রাজ্য সরকার পরিচালনার জন্য পাঠান হল। আরও একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একইভাবে রাজ্যের রাজধানীতে বদলী হতেন যদি ললিতনারায়ণ মিশ্র বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে রাজী হতেন। কিন্তু তিনি তা রাজী না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁর জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছে কেদার পাণ্ডেকে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সমগ্র সংগঠনের উপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যে অপ্রতিহত প্রভাব ও নেতৃত্ব বিস্তৃত হয়েছে তারই ফলে রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন এতখানি নির্বিবাদে সম্পন্ন হতে পেরেছে। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারেই নয়, এমন কি মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারেও এবার রাজ্যগুলির কংগ্রেস নেতারা যে কি পরিমাণে শ্রীমতী গান্ধীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শ্রীমতী গান্ধী চেয়েছিলেন যে, বিহারের মন্ত্রিসভায় যেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের ছোট ভাই জগন্নাথ মিশ্রকে নেওয়া হয়। ভুল
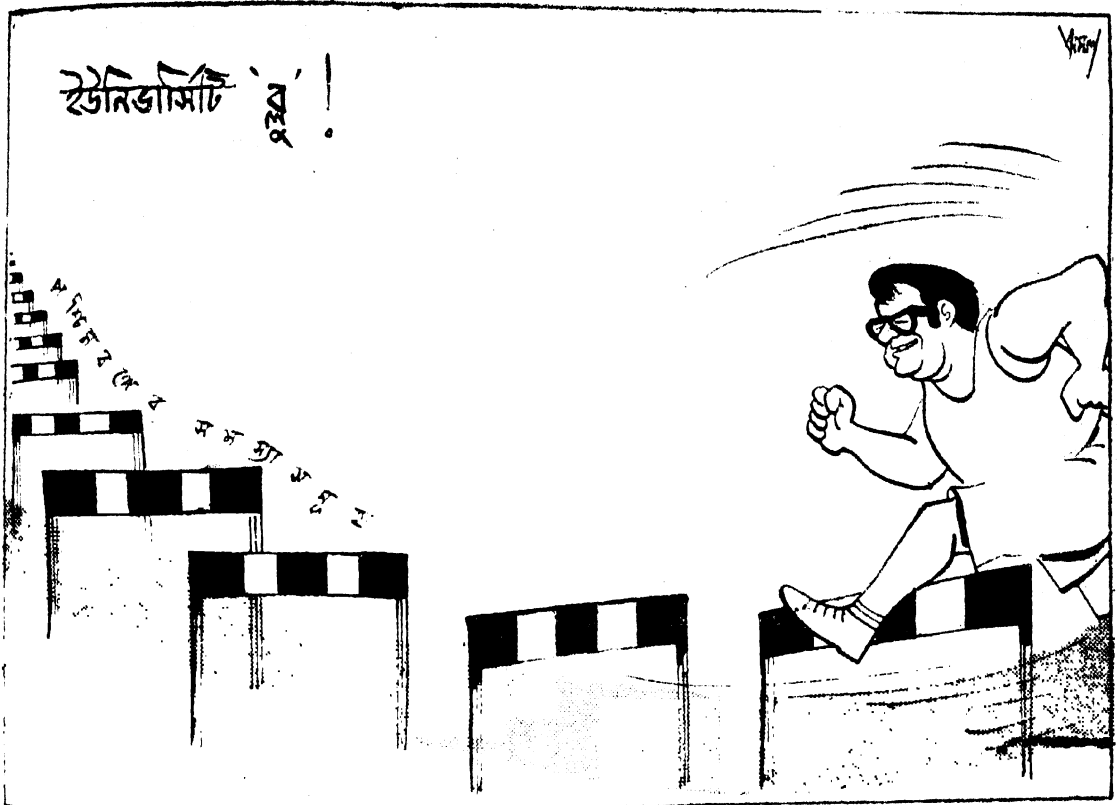
বোঝাবুঝির ফলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ পান বিহার বিধানসভার আর একজন নব-নির্বাচিত সদস্য—হরিনাথ মিশ্র। এই ভুল ধরা পড়ার ফলে হরিনাথ মিশ্রকে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আসতে হয়। পরে অবশ্য তাঁকে স্পীকারের পদ দিয়ে মান রক্ষা করা হয়েছে।

*

বিধানসভাগুলির নির্বাচনে এবার ব্যাপক কারচুপি হয়েছে, এই অভিযোগ প্রথমে তুলেছিল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দল। তাদের অভিযোগ ছিল পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে। এখন জনসংঘ ও সোস্যালিস্ট পার্টি অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচন সম্পর্কেও একই অভিযোগ করছে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় নির্বাচন দাবী করেছে এবং ঐ পার্টির নেতৃত্বাধীন বাম-পন্থী ফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা বয়কট করছে। অন্যান্য দল কি করবে, এই দলগুলি মিলিতভাবে কোন আন্দোলনে নামবে কিনা সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে, বিধানসভাগুলির এই সব নির্বাচন সম্পর্কে বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতে বেশ কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

লণ্ডনের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকায় লেখা হয়েছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়ল বলে, এমন কথা বলা যাঁদের পক্ষে ফ্যাশন বা সহজ হয়ে উঠেছিল এই নির্বাচনের ফলাফল তাঁদের কথা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে। ভারতবর্ষ এখন বলতে গেলে একদলীয় শাসনে ফিরে আসছে, এই সমালোচনার উল্লেখ করে পত্রিকাটি লিখেছেন, অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একবার দক্ষিণপন্থী, একবার বামপন্থী সরকার আসার চেয়ে বরং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বহু মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একদলীয় সরকার ভাল।

*

একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেদিন স্বরাষ্ট্র-বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে সি পন্থের কাছে এই বলে নালিশ করছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের অনেক অফিসার হিপিদের মতো লম্বা চুল ও জুলফি রাখছেন। ঐ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রস্তাব ছিল, অফিসারদের ঠিকভাবে চুল কেটে অফিসে আসতে বলা হোক। জবাবে শ্রীপন্থ বললেন, "আমার অনেক সহকর্মীই তো হাল ফ্যাসনে চুল রাখছেন। এই যখন অবস্থা তখন আমি অফিসারদের নির্দেশ দিই কি করে?"

২৩-৩-৭২ —পৃথ্বীরাজ

লেখক সতীনাথ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(সতীনাথ ভাদুড়ীর একটি স্মরণ-গ্রন্থ পাটনা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর পূর্বে এই লেখাটি বইখানির জন্যে দিয়ে যান।)

সতীনাথ আমাদের অনুজ কালানুক্রমিক হিসাবে। কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কীর্তি আজ সম্পূর্ণভাবে আমাদের সম্মুখে প্রসারিত। তিনি সাহিত্যকর্ম আরম্ভ করেছিলেন আমাদের অনেক পরে, একান্ত পরিণত বয়সে; কিন্তু তিনি সাহিত্য-সাধনা আমাদের পূর্বেপূর্বেই সমাপ্ত করে মহাপ্রয়াণ করেছেন। কালের হিসাবে স্বল্পকালেরই সাধনা তাঁর। কিন্তু তা একান্ত উজ্জ্বল, আপন স্বকীয়তায় একান্ত বিশিষ্ট।

সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন তারার অভ্যুদয় সর্বদাই, সব সময়েই পাঠকের মনে সানন্দ কৌতূহল ও বিস্ময় জাগায়। পাঠক সবিস্ময়ে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেন—এ তারা কোন্ দিগন্তে উদিত হল, ওর দীপ্তির পরিমণ্ডল কতখানি। সেই সঙ্গে সে তারার আলোটি যদি স্নিগ্ধ হয় তাহলে তো আর কথাই থাকে না। পাঠক সেই নূতন লেখকের জন্য পরম আগ্রহে দুহাত বাড়িয়ে দেয়।

সতীনাথও তেমনিভাবেই বাংলার সাহিত্য-দিগন্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলার যে দিগন্ত থেকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই দিগন্ত, আমাদের বাংলাদেশের যে অংশে বাংলা ও বিহারের ভাষা ও সংস্কৃতি মাখামাখি করে রয়েছে। সেই অংশ থেকে আপাতত সতীনাথই শ্রেষ্ঠতম [illegible]ন। কিন্তু তাঁর পূর্বে এই অঞ্চল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বহু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সাধক উপহার দিয়েছেন, সে হিসাবে বাংলার বাইরে হয়েও, বাংলা সাহিত্যে এই অঞ্চলের দান অতুলনীয়।

সতীনাথ এই অঞ্চলের সন্তান এবং একান্ত গৌরবের কথা যে তিনি এই অঞ্চলের কথাই বাংলা সাহিত্যে পরম সমাদরে উপহার দিয়েছেন। তিনি এই অঞ্চলের মানুষ, এই অঞ্চলের মানুষদেরই জীবনের শরিক হয়ে জীবনযাপন করেছিলেন। সেই জীবনের কথাই তিনি সাহিত্যে এনেছিলেন।

সতীনাথের প্রথম রচনাই তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা। হয়তো শ্রেষ্ঠতম রচনাও। সে কথা সঠিকভাবে সাহিত্য সমালোচকরা নির্ণয় করবেন। আমিও তাঁর সমসাময়িককালের সাহিত্য-পথিক, আমি আমার সেই সমসাময়িক-কালের অভিজ্ঞতাটুকু, যা আজও অস্পষ্ট-ভাবে স্মৃতিতে আছে, সেটুকু বলতে পারি।

যতদূর মনে পড়ে, তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে সবে, স্বাধীনতাও আসন্ন। সদ্য বিগত যুদ্ধ ও বিয়াল্লিশ সালের আগস্ট আন্দোলন তখন ইতিহাস হতে চলেছে। সেই কালের পটভূমিকায় আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত আদিনাথ ভাদুড়ী একখানি উপন্যাস আমাকে উপহার দিয়ে গেলেন। দুষ্প্রাপ্য কাগজের বাজার থেকে মেটে মেটে রঙের অ্যান্টিক কাগজে ছাপা, অজস্র বর্ণাশুদ্ধি তার পাতায় পাতায়। শ্রীযুক্ত আদিনাথ

পরিচয় দিয়ে বলে গেলেন, লেখক তাঁর ভাই এবং পূর্ণিয়া অঞ্চলের এক রাজনৈতিক কর্মী, নাম ও এ পরিচয় সত্ত্বেও নূতন মনে হল। নাম সতীনাথ ভাদুড়ী!

তবু বইখানি পড়ে চমকে গেলাম। একেবারে নূতন কথা, নূতন সুর, নূতন সব মানুষের ভীড়, একেবারে সম্পূর্ণ নূতন মনোভাব। লেখকের অপরিচিত নাম, কিন্তু রচনার অভাবিত উৎকর্ষ। চমক লাগল। সম্পূর্ণ নূতন কাল, প্রায় সমসাময়িককাল নিয়ে রচনা। অথচ রচনাটির সর্বাঙ্গে অভ্রান্তভাবে কালাতীত সাহিত্যকর্মের ছাপ। এবে লেখকের নিজের চোখ দিয়ে মন দিয়ে দেখা জীবন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

সবচেয়ে যা আশ্চর্য লাগল তা লেখকের নিরপেক্ষতা, লেখক তিনটি রাজনৈতিক মতাদর্শ তিনটি বা চারটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসখানিতে উপস্থাপন করেছেন; এবং লেখক নিজেও ওই তিন আদর্শের একটিকে জীবনে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোনটি যে তাঁর নিজের সে সম্পর্কে উপন্যাসখানি পাঠ করার শেষ পর্যন্তই সংশয় থেকে যায়। প্রতিটি মতের পরিপূর্ণ মূর্তিটিকে তিনি আপ্রাণ আন্তরিকতার সঙ্গে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে চরিত্রগুলি পরিপূর্ণ রক্তমাংসের মানবিকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের চিনতে কোথাও ভুল হয় না।

সেই সঙ্গে রচনাটির মধ্যে একটি আশ্চর্য আঞ্চলিক স্বাদ আছে। তা একান্তভাবে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ। 'জাগরী' তাঁর প্রথম রচনা এবং বোধহয় শ্রেষ্ঠ রচনাই। 'জাগরী'র কবি সতীনাথকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পেয়ে একান্ত পরিতৃপ্ত হলাম।

লেখক—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
সংকলন—সুবল গাঙ্গুলী, এজেন্ট।
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,
কিষণগঞ্জ (বিহার)।

বরুণ রায়

বাংলাদেশ : ছাব্বিশে মার্চ

বাংলাদেশের পরম সৌভাগ্য, তার একুশে ফেব্রুয়ারী যেমন, তার ছাব্বিশে মার্চও তেমনি রক্তের দ্বারা রঞ্জিত। রক্তের এমন একটি উত্তরাধিকার ক'জনের ভাগ্যে মেলে? আজ মনে হয়, এক বছর আগের সেই অভিশপ্ত মার্চের রাতে ভাগ্যের ইচ্ছাই যেন ঘুমন্ত বাংলার বুকে নরককে উন্মুক্ত করেছিল। ইয়াহিয়ার আলোচনার টেবিলে এমন একটি বাংলাদেশ কি আমরা কখনো পেতাম? এমন একটি স্বাধীনতাও কি বাংলাদেশ পেত? এ তার যন্ত্রণার জন্ম, এ তার উজ্জ্বল উদ্ধার। এ তার উৎসবের স্বাধীনতা নয়, এ স্বাধীনতা তার চোখের জলের। তার স্বাধীনতা এসেছে তিরিশ লক্ষ শহীদের মৃতদেহের ওপর দিয়ে, অন্তহীন কান্না আর হাহাকারের মধ্যে, অপমান, লাঞ্ছনা আর ভাগুনের পথে, প্রতিটি হৃদয়কে স্পর্শ করে, প্রতিটি পরিবারের শোকে আর বেদনায়। কিন্তু তার স্বাধীনতা এসেছে এক বিপুল প্রতিজ্ঞার মধ্যেও। কারণ ঐ তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রত্যেকেই এক একটি প্রতিজ্ঞা। প্রতিটি দগ্ধ জনপদ এক একটি প্রতিবাদ। প্রতিটি ছিন্নমূল প্রাণ এক একটি বিদ্রোহ। এবং ঐ শোক যদি বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারকে স্পর্শ করে থাকে, তাহলে ঐ প্রতিজ্ঞা, প্রতিবাদ আর বিদ্রোহও তার প্রতিটি ধূলিকণার মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। শোক যদি তার স্বাধীনতাকে পবিত্র করে থাকে, তাহলে ঐ প্রতিজ্ঞা তাকে করেছে কঠিন। এমন সর্বপ্লাবী চোখের জল আর সর্বব্যাপী প্রতিজ্ঞার মধ্যে স্বাধীনতা আর কবে কোথায় এসেছে? একটি জাতির জীবনকে এমন ওতপ্রোতভাবে স্পর্শ করে স্বাধীনতা আর কখন উদিত হয়েছে? দধীচীর কাহিনীই কেবল আমরা শুনেছি। সীমান্তের ওপারে আরেক দধীচীকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। এই দধীচী কোনো ব্যক্তি নয়, একটা গোটা দেশ। একটা গোটা জাতি তার অস্থি দিয়ে এই স্বাধীনতার শরীরকে তৈরী করেছে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পরিবারের রক্ত ঐ শরীরের মধ্যে প্রবাহিত। প্রতিটি লাঞ্ছিত অপমানিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত হৃদয়ের হাহাকার সৃষ্টি করেছে তার নিঃশ্বাস। এমন একটি গৌরবময় স্বাধীনতা আর কে কবে দেখেছে? এমন একটি জীবন্ত স্বাধীনতা, উৎসবের প্রাঙ্গণে যার আয়োজন করার কোনো প্রয়োজন নেই, যার স্থান একই সঙ্গে চোখের জলে আর অন্তরের প্রতিজ্ঞায়, যা বছরের একটি দিনের উজ্জ্বল আনন্দমাত্র নয়, প্রতিটি দিনের বেদনাময় ও গৌরবদীপ্ত অনুভূতি?

সুতরাং, বলা যায়, স্বাধীনতার জন্যে জাতিকে প্রস্তুত হবার প্রয়োজন বাংলাদেশে নেই। স্বাধীনতাই সেখানে জাতির জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। এমন কাণ্ড সচরাচর ঘটে না। যেখানে ঘটে, সেখানে ক্ষেত্র একটি মিরাকলের জন্যে আপনা থেকেই প্রস্তুত। বাংলাদেশে এখন ঐ মিরাকলের জন্যে আমরা সকলে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অপেক্ষা করে আছি। বাংলাদেশ কি কেবল পৃথিবীর তরুণতম রাষ্ট্র মাত্র? বাংলাদেশ কি একটা আদর্শ নয়? সমস্ত ক্ষুদ্র সংস্কার, সমস্ত সংকীর্ণ সংঘাত, সমস্ত পঙ্কিল বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে মানবিক স্বাধিকারের একটা প্রচণ্ড ঘোষণা? উদার, উদ্বুদ্ধ জাতীয়তার একটা বিস্ময়কর পরীক্ষাগার? আজ এই নবীন সূর্যালোকে যে নবীন আদর্শের জয়যাত্রা শুরু হলো, একদিন প্রখর মধ্যাহ্নে তা তার সমস্ত গৌরব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কারণ বাংলাদেশ তার রক্তের পরীক্ষায় বিপুলভাবে উত্তীর্ণ। তার আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ। তার সমস্ত কলুষ এক নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধ। সেই উত্তীর্ণ, নিবেদিত, বিশুদ্ধ জাতিকে আমরা ঈর্ষা করি।

এবং সেই সঙ্গে ঈর্ষা করি তার নেতৃত্বকে। কেননা স্বাধীনতার জন্মলগ্নেই এমন একটি উদ্বুদ্ধ জাতি কার জন্যে কবে অপেক্ষা করে থাকে? এটা যেমন একটা সৌভাগ্যের অধিকার, তেমনি একটা অভূতপূর্ব সুযোগ। সেই অধিকার এবং সুযোগকে প্রয়োগ করে বাংলাদেশে এক নতুন জন্মান্তর ঘটানো সম্ভব, যদি নেতৃত্ব এখন তার জন্যে প্রস্তুত থাকেন। মানুষের বুকের রক্ত আর চোখের জল যে ক্ষেত্রকে উর্বর করেছে, সেই ক্ষেত্রে ফসল ফলানোর দায়িত্ব তাঁদের। সেই দায়িত্ব পালনের জন্যে এখন তাঁদের অগ্রসর হতে হবে। আমরা জানি সমস্যা অনেক এবং বিপুল। আমরা জানি বাংলাদেশকে অনেক কিছুই একেবারে নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। আমরা জানি, বাংলাদেশ আজ নিঃস্ব এবং রিক্ত। কিন্তু আমরা এ-ও জানি, একটা নিবেদিত জাতি ও নিবেদিত নেতৃত্ব তাদের ভাগ্যকে পরিবর্তিত করবার জন্যে সংকল্পবদ্ধ। ভাগ্য সেখানে পরিবর্তিত না হয়ে পারে না।

আজ আমরা সীমান্তের এপারে দাঁড়িয়ে সেই সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আমাদের অন্তরের সমস্ত শুভেচ্ছা উজাড় করে দিচ্ছি, দুঃস্বপ্নের রাত্রির অবসানে এক উজ্জ্বল, নির্মল প্রভাতে যারা এক নতুন পরিণতির দিকে তাদের রোমাঞ্চকর অভিযান শুরু করতে চলেছে। তাদের এই প্রয়াসে আমরা তাদের সঙ্গে থাকবো। তাদের দুঃখের দিনে আমরা তাদের পাশে ছিলাম। তাদের সুখের সাধনায় আমরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকবো না। দুজনের এই মিলিত প্রয়াস সীমান্তের পরপারে কেবল একটি মহান জাতিকেই সৃষ্টি করবে না, একটি বলিষ্ঠ প্রত্যয়কেও উদার সূর্যালোকে মহীয়ান বিকশিত করবে। সে হবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও উজ্জ্বল উদ্ধার, উদার আকাশের নিচে আমাদেরও পরম মুক্তি, কেননা বাংলাদেশ কেবল সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আদর্শ নয়, আমাদেরও জীবনের সাধনা, যে-সাধনায় সিদ্ধিতে পৌঁছবার জন্যে বিগত পঁচিশ বছর ধরে আমরা পথ হেঁটে চলেছি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিরঞ্জন বললেন, 'তোমাকে দেখার পর থেকে কৃতান্তর কথা ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারছি না। আমি বুঝতে চাই তুমি কি অবস্থায় আছো? কি করে বেঁচে আছো? আমি সত্যিই কি তোমার সঙ্গে কথা বলছি?'

কাষ্ঠহাসি হেসে প্রতিরূপ বলল, 'বিজ্ঞানের অসাধ্য সাধনের ক্ষমতায় এই অবস্থায়ও বেঁচে আছি। এখন আমি মস্তিষ্কপ্রধান। দেহের বাকী অংশ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মুণ্ডের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু জীবন ধারণের অতি-প্রয়োজনীয় ক্রিয়া সূক্ষ্ম উপায়ে চলছে।'

নিরঞ্জন বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না তোমার এ অবস্থায় আমার করণীয় কি থাকতে পারে? আমি কি করতে পারি? আমি কি তোমার ব্যাপারে কোনো বৈজ্ঞানিকের সাহায্য নিতে পারি? যদি তিনি কোনো উপায় বার করতে পারেন?'

প্রতিরূপের চোখে নিদারুণ ভীতি প্রকাশ পেল। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'না, না। এ ব্যাপার সম্পূর্ণ গোপন রাখুন।'

নিরঞ্জন প্রতিমার প্রতিরূপের দিকে তাকিয়ে একবার সন্দেহে অবিশ্বাসে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভাবলেন তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা স্পষ্ট বুঝলেন যে, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত বলেই রাতের ঘটনাটা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। দেবার মত শক্তিও খুঁজে পেলেন না। বললেন, 'তুমি তাহলে কৃতান্তর অপেক্ষায় থাকতে চাও?'

প্রতিরূপ সভয়ে বলল, 'না।'

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?' পরে নিরঞ্জন কঠোর স্বরে বললেন, 'জানি কেন। আমার মতো তোমারও এখন বুঝতে বাকী নেই কৃতান্ত ভণ্ড, প্রতারক।'

প্রতিরূপের দু চোখ প্রতিবাদে কঠিন হয়ে উঠল। বলল, 'আর যাই হোক কৃতান্ত আদর্শবাদী খাঁটি লোক। তার জন্য আমি বিপন্ন। কিন্তু তা বলে তার মিথ্যা অপবাদে সায় দিতে পারি না।'

নিরঞ্জন বললেন, 'তাহলে কৃতান্ত সম্বন্ধে তোমার আপত্তির কারণ কি?'

প্রতিরূপ চাপা গলায় বলল, 'আমি তাকে এড়াতে চাই।'

নিরঞ্জন বললেন, 'কেন?'

প্রতিরূপ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল।

স্বরে চাপা গলায় বলল, 'আমি তাকে ভয় করতে শুরু করেছি। এক্সপেরিমেন্টের বিপর্যয়ের মুহূর্তে, যখন আমি দেহহীন একটা মুণ্ডে পরিণত হলাম, ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে মুখ ঢেকে কৃতান্ত পালিয়ে গেল। আমি তখন ভয় ও হতাশার অতল গহ্বরে। আমার মহাসংকটের কথা ভুলে গিয়ে আমাকে অদৃষ্টের জটিকলে ফেলে রেখে সে পালালো। মানুষকে ভয় পেতে দেখেছি। খাদে পড়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে বিপন্ন মানুষের চোখে আশু মৃত্যুর ভয় দেখেছি। কিন্তু আজ বিপর্যয়ের মুহূর্তে আমাকে দেখতে দেখতে তাকে যে রকম ভয় পেতে দেখলাম, মনে করতে গিয়ে আমি ভয়ে মরে যাচ্ছি। তার ভয় আমার মনের অতল থেকে এক সীমাতীত ভয় টেনে তুলে এনেছে। কৃতান্ত যদি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, আমি সহ্য করতে পারবো না।'

নিরঞ্জন বললেন, 'কিন্তু কোনো-না-কোনো দিন, হয়তো কয়েক দিনের ভিতরই সে উপস্থিত হবে। অন্তত তার চিঠিতে এই রকম একটা আভাস দিয়েছে।'

প্রতিরূপ বলল, 'আমাকে লুকিয়ে রাখুন। যেভাবেই হোক আমাকে রক্ষা করবেন। তার হাতে পড়তে দেবেন না। আমরা পরস্পরকে ভয় পেতে শুরু করেছি। দেখা হলে একজন আর একজনের চরম ক্ষতি করে বসতে পারি।'

নিরঞ্জন বললেন, 'এ ঘটনাটা আর কে জানে?'

প্রতিরূপ ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আমি, কৃতান্ত ও আপনি। চতুর্থ ব্যক্তির জানবার কথা নয়।'

নিরঞ্জন বললেন, 'কিন্তু ব্যাগ নিয়ে এসেছিল চতুর্থ ব্যক্তি।'

প্রতিরূপের দু চোখে সন্দেহ আশঙ্কা ফুটে উঠল। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই সে ধীর কণ্ঠে বলল, 'কৃতান্তর ওভাবে ভয় পেয়ে পালাতে দেখার পর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। এখানে আসবার পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু কোনো চতুর্থ ব্যক্তি এ রহস্যের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারে না। কৃতান্ত পরে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছিল। তার বিশ্বস্ত কোনো লোকই নিশ্চয়ই এই ব্যাগ এনে থাকবে। কিন্তু তাকে এ ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানতে দেবে, কৃতান্ত এত কাঁচা লোক নয়।'

নিরঞ্জন বললেন, 'কৃতান্ত এলে কী বলব?'

প্রতিরূপ বলল, 'আপনি ভেবে স্থির করুন কী বলবেন। শুধু দেখবেন কোনো-রকমেই সে যেন আমাকে ধরতে ছুঁতে না পারে।'

সে রাতে নিরঞ্জন সান্যালের আর শয্যা গ্রহণ করা সম্ভব হল না। চেয়ারের সিট থেকে নরম একটা কুশন টেবিলে পেতে একটা বালিশে নারীমুণ্ডকে আড় করে শুইয়ে দিলেন। ঘর অন্ধকার করতে ভয় পেলেন। শেড ল্যাম্পটা জ্বেলে চড়া আলোর বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। স্তিমিত নীলচে আলোয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথম যে মানুষটি রাতের অন্ধকারের রহস্য সম্মুখে রেখে স্তব্ধ মৌনী মূর্তির মতো বসেছিল। অগণিত শতাব্দী পরে নিরঞ্জন সান্যাল তার সঙ্গে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের সন্ধান পেলেন।

নিরঞ্জনের জীবন যাত্রার ছকটা বদলে গেল। সমিতিতে প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যায় তিনি হাজিরা দিয়ে চললেন। কিন্তু কাজের ভার হাল্কা করে নিলেন। যে কাগজ, দলিল ইত্যাদি না দেখলে নয়, যে যে কাগজপত্রে তাঁর সই দেওয়া অবশ্য দরকার, তা বাদে বাকী কাগজপত্রের জঞ্জাল সম্পাদকের টেবিলে হটিয়ে দিলেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আলাপ-আলোচনা এড়িয়ে যেতে থাকলেন। তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তন সমিতির সভ্যদের দৃষ্টি এড়াল না। নিরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের প্রখর আলো হঠাৎ নিভু নিভু হয়ে আসার ফলে সমিতিও যেন ঝিমিয়ে পড়ল।

নিরঞ্জন সংসারে সম্পূর্ণ একা ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে তিনি নিঃসঙ্গ সূর্যের মতো আপন দীপ্তিতে একা বিরাজ করতেন। আত্মীয় পরিজনরূপী গ্রহ, উপগ্রহ, গলগ্রহ কোনো কিছুরই উপদ্রব উৎপাত ছিল না। কিন্তু তাঁর মতো রাসভারী ব্যক্তির অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে যাদের কোনো নিকট সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয় সেই বেয়ারা দারোয়ান বাবুর্চি প্রভৃতিও তাঁর জীবনযাত্রার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হল। দূরে থেকেও তারা নিরঞ্জন সান্যালকে তাঁর চরিত্রের ও ব্যবহারের গুণে আপন জ্ঞান করত। এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী ফল কৌতূহল। তাদের পারস্পরিক প্রশ্ন এই কৌতূহল তাতিয়ে তুলল।

নিরঞ্জন যে তাঁর পরিচিত সকলের কাছে একটি দুর্বোধ্য রহস্য হয়ে পড়লেন, তাঁর এ বিষয়ে কোনো খেয়ালই ছিল না। যাঁরা মানুষের মন নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেন, তাঁদের মতে নিরঞ্জন শ্রেণীর ব্যক্তিদের পক্ষে এই আচরণই নিতান্ত স্বাভাবিক। সুরামত্ত মানুষের মত্ততার মুহূর্তেও তার সঙ্গে পোশাকী মানুষটির একটা সম্পর্ক থেকে যায়, অর্থাৎ তার মত্ততা তার পরিচিত পুরণো বহির্জগৎকে নিয়েই। কিন্তু যে সুরার নিষ্কাশন হৃদয় ও মস্তিষ্কেরও হিসেবের বাইরে নিরঞ্জন শ্রেণীর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তা এক সম্পূর্ণ বিপরীত নেশার সৃষ্টি করে।

এ নেশা আত্মবিস্মৃতির নেশা। ফলে বহির্জগতের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত ছেদ ঘটে। অভ্যস্ত জীবনের দেয়ালে সিঁধ দিয়ে হৃদয়, মন ও আত্মা এক নির্বিঘ্ন পৃথিবীর বিপদসঙ্কুল পথে বার হয়ে পড়ে। প্রাত্যহিক জীবনের অন্তরালে লোকচক্ষুর আড়ালে এক বিপরীত জীবনে অবিশ্বাস্য পালা শুরু হয়।

গল্পে ইতিহাসে ঘণ্টা মিনিটের ঘটনার হিসেব দেওয়া চলে না। এ কাহিনীতেও তা সম্ভব নয়। প্রথম রাত্রের পরের দিন-টারও নিশ্চয়ই একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু কয়েকটা ধাপ এক লাফে অতিক্রম করে দ্বিতীয় রাত্রে না পৌঁছে উপায় নেই। অনাবশ্যক ঘটনাস্ফীতি কাহিনীর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে নিরঞ্জন মনে সাহস সঞ্চয় করে তাঁর চিরপরিচিত শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। দু দিনের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় নিদারুণ ক্লান্তির ফলে তাঁর দু চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছিল। তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে প্রায় নিদ্রার প্রান্তে এসে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘোর কেটে গেল। নিরঞ্জন জেগে উঠলেন। উৎকর্ণ হয়ে পড়লেন। প্রতিমার কণ্ঠস্বর। সে কার সঙ্গে কথা বলছে? স্বাভাবিক কণ্ঠে নয়। চাপা গলায়। নিরঞ্জনের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। শুনলেন ফিসফাস করে প্রতিমা বলছে, 'শুনছেন?' ভয়ে বিস্ময়ে নিরঞ্জন তাঁর বিছানার সঙ্গে যেন এক হয়ে গেলেন।

নিরঞ্জন পুনরায় প্রতিমার কণ্ঠস্বর শুনলেন। সেই একই কথা, 'শুনছেন?' নিরঞ্জন শিয়রের ডান ধারে টর্চের জন্য হাত বাড়ালেন। প্রতিমার কণ্ঠস্বর শুনলেন, 'মিস্টার সান্যাল! শুনছেন?'

নিরঞ্জনের শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া ফিরে এল। প্রতিমার নৈশ আহ্বানের লক্ষ্য তাহলে তিনি। আস্তে আস্তে নিরঞ্জন বিছানা থেকে উঠলেন। ড্রেসিং গাউনটা পরে নিয়ে আলোটা জেলে দিলেন। দেখলেন প্রতিমা তাঁর দিকে সকাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রতিমা রুদ্ধস্বরে বলল, 'বড় একা ঠেকছে। কি করি, ভেবে পাচ্ছি না।'

নিরঞ্জন বললেন, 'ঈশ্বরকে ডাকো প্রতিমা। তোমার এ অবস্থায় এ ছাড়া কি উপায় আছে?'

প্রতিমা বিকৃত কণ্ঠে প্রায় কেঁদে দিয়ে বলল, 'মনে মনে সারাক্ষণ ডাকছি। সাড়া না পেয়ে আপনাকে ডাকছি। আপনিই আমার ঈশ্বর।'

প্রতিমার মতো নিরঞ্জনও অত্যন্ত বিপন্ন ও অসহায় বোধ করছিলেন। তবু প্রতিমার এই অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণে আত্ম-প্রসাদ বোধ করার সঙ্গে মনে অপ্রত্যাশিত একটা জোর পেলেন। বললেন, 'প্রতিমা। বলো আমি কি করতে পারি?'

প্রতিমা খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'ব্যবধান কাটাবার একটা নতুন দিক দেখছি। একটা আলাদা হিসেব পাচ্ছি। গজ ফুটের হিসেবে আমরা কতটা তফাতেই বা আছি। কিন্তু মনে হচ্ছে একটা অন্ত মহা-দেশে আপনি কত দূরেই না সরে গিয়ে-ছেন। আমি কত দূরেই না পড়ে আছি। আমি আর একা থাকতে পারছি না। একা কথাটার অর্থও যেন নতুন করে বুঝছি।'

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি চাও?'

প্রতিমা বলল, 'কাছে আসুন। আমার মাথায় হাত রাখুন। বুঝতে দিন আপনি আছেন। আমার জন্য আছেন।'

নিরঞ্জন কিসের জোরে ভয় ও রহস্যের পর্দাটা এক দিকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, বুঝবার চেষ্টা করলেন না। টেবিলের সম্মুখে গিয়ে প্রতিমার মাথায় হাত রেখে

বললেন, 'ভয় নেই প্রতিমা। আমি আছি। তোমার জন্যই আছি।'

গভীর তৃপ্তিতে প্রতিমার দু চোখ বুজে এল। তার মুখের রেখা নরম হয়ে দুর্লভ কান্তিতে অপরূপ দেখাল। প্রতিমার অধরোষ্ঠ কম্পিত হল। সে বহু প্রাচীন বহু উচ্চারিত কথাটাই শুধু বলতে পারল, 'আঃ।' নিরঞ্জন অভিভূত হলেন। একটু পরেই প্রতিমা চোখ মেলল। তার দৃষ্টি স্নিগ্ধ, কিন্তু বিশেষ অর্থপূর্ণ। বলল, 'আপনি বৈজ্ঞানিক। সংস্কারমুক্ত।'

নিরঞ্জন সম্মতিসূচক অর্থে মাথা নাড়লেন।

প্রতিমা বলল, 'রাত ঈশ্বরের একটা অদ্ভুত সৃষ্টি। রাতে সবাই একা। ব্যবধানের হিসেব কোটি কোটি গুণ বেড়ে যায়। এত মানুষ, এত প্রাণী। এদের সকলের হাহাকারে কত দূরের কত আকাশ ভরে যায় জানতাম না। আজ হঠাৎ হিসেবটা বুঝতে পারবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট অভাব বোধ করছি।'

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের অভাব?'

প্রতিমা বলল, 'সঙ্গের।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিরঞ্জনের উপর নিবদ্ধ করে বলল, 'আমাকে আপনার শিয়রের পাশে রাখেন তো এই একা ভাবটা হয়তো ততটা কাতর করে না।'

নিরঞ্জন সযত্নে মস্তিষ্কসর্বস্ব প্রতিমাকে এনে তাঁর শিয়রে রাখলেন। চড়া আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বেড ল্যাম্পটা জেবলে শুয়ে পড়লেন। তারপর একটা আশ্চর্য অনতিক্রম্য অনুভূতির তাড়নায় প্রতিমার মাথার উপর একটি হাত রাখলেন।

প্রতিমা বলল, 'আপনার অসুবিধা হবে না?'

নিরঞ্জন বললেন, 'না।'

প্রতিমা বলল, 'কিন্তু কখনো তো কারো মাথায় হাত রেখে ঘুমোন নি।'

নিরঞ্জন একথায় চমকে উঠলেন। কি ভেবে বললেন, 'না। তবে আজ ঘুমোব।'

প্রতিমা বলল, 'আমিও ক' রাত পরে আজ ঘুমোব।'

শেষ রাতে নিরঞ্জনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বুঝলেন প্রতিমাও জেগেছে।

প্রতিমা ফিসফাস করে বলল, 'হঠাৎ কেন ঘুম ভেঙ্গে গেল বুঝলাম না। হয়তো ভয়ে।'

নিরঞ্জন বললেন, 'কিসের ভয়ে?'

প্রতিমা গলা চেপে বলল, 'কৃতান্তের।'

নিরঞ্জন বলেন, 'হুঁ।' তারপর বললেন, 'তুমি সত্যই কৃতান্তকে এড়াতে চাও?'

প্রতিমা বলল, 'জীবন দিয়ে এড়াতে চাই।'

নিরঞ্জন বললেন, 'যদি আসে? তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়?'

প্রতিমা বলল, 'বলবেন, দেখা হবে না।'

নিরঞ্জন বললেন, 'যদি জোর খাটায়।'

প্রতিমা বলল, 'যে করেই হোক ফেরাবেন তাকে। দরকার হলে বলবেন, 'আমি নেই।'
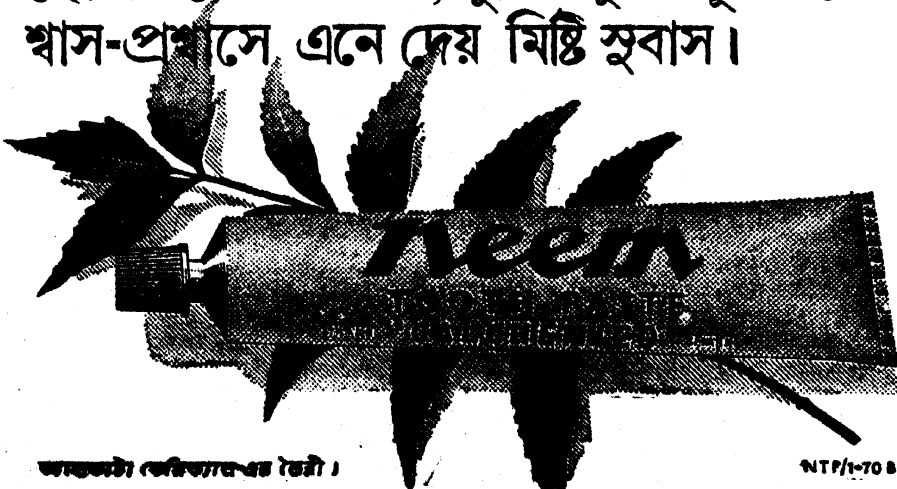
তৃতীয় ও চতুর্থ দিন একদিক দিয়ে অর্থাৎ ঘটনার স্থূলে হিসেবে দ্বিতীয় দিনের পুনরাবৃত্তি হলেও, নিরঞ্জনের চোখে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে হল। জীবনে এই প্রথম তিনি নারীর উষ্ণ নৈকট্যের স্বাদ পেলেন। যে অভিজ্ঞতা দ্বিতীয় দিনে নিতান্ত আকস্মিক ও সাময়িক ঠেকেছিল, এই দুটি দিনে তা ভাবী জীবনের সূচনা বলে মনে হল। একটি সজীব নারীমুণ্ডের সঙ্গে তিনি জীবনের এই অস্বাভাবিক অধ্যায়ে জড়িত হয়ে পড়ছেন ভাবতে গিয়ে তিনি তাঁর অভ্যস্ত প্রচণ্ড জীবনলিপ্সায় কোনো তারতম্য লক্ষ্য করলেন না। মুণ্ড-সর্বস্ব প্রতিমার জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় তিনি সাড়া দিয়ে চললেন।

ঘটনার দিক দিয়ে পঞ্চম দিনে একটা অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটল। কৃতান্ত এল। নিরঞ্জন স্লিপ পেয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। প্রতিমার ঘরে তালা দিয়ে একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নীচেয় নেমে এলেন।

বসবার ঘরে কৃতান্ত মাথা হেঁট করে কি এক চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে ছিল। নিরঞ্জন ঘরে ঢুকতে সে উঠে দাঁড়াল। একটা অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা তার মুখের প্রতিটি রেখায় অস্থির হয়ে পড়ল।

নিরঞ্জনই প্রথম কথা বললেন। প্রশ্ন করলেন, 'কি খবর? কেমন আছো কৃতান্ত?'

এই সহজ স্বাভাবিক চিরাচরিত কুশল জিজ্ঞাসায় কৃতান্ত হতবুদ্ধি হল। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমি মোটেই ভাল নেই। কি করে থাকব? তবে একসপেরিমেন্টের একটা শক্ত গিঠ খুলতে পারব এই আশায় বুক বেঁধে এসেছি। ভরসা হচ্ছে বিপদ কাটবে। যদি কোনো মারাত্মক ভুল করে না বসি, কয়েক মিনিটের ভিতরই—'

নিরঞ্জন দৃঢ় স্বরে বললেন, 'ব্যাপারটা এখন ঘণ্টা মিনিটের হিসেবের বাইরে।'

একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে কৃতান্ত স্তব্ধ হয়ে গেল।

নিরঞ্জন গলা নামিয়ে বললেন, 'প্রতিমা নেই।'

কৃতান্ত প্রথমে কথা বলতে গিয়ে বলতে পারল না। পরে রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'প্রতিমা নেই! কোথায় যাবে? কি করে যাবে? কি হয়েছে বলুন?'

নিরঞ্জন কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে। প্রতিমা এখন তোমার একসপেরিমেন্টের নাগালের বাইরে।'

কৃতান্ত অবিশ্বাসে আতঙ্কে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিরঞ্জন কৃতান্তের নিষ্পলক দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'প্রতিমা বেঁচে নেই। ব্যাগ খুলবার আগেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। তুমি আমাকে রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলে। জানিনা তার আগে ব্যাগ খুললে তাকে কি অবস্থায় পেতাম, তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হত কি না।'

কৃতান্ত দু হাত বার বার মুঠ করল, খুলল। বিভ্রান্তের মতো এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। ফিসফাস করে তীব্র স্বরে বলল, 'এ হতে পারে না, হতে পারে না। আপনি ভুল বলছেন। আমি একবার দেখতে চাই। প্রতিমা মরতে পারে না।'

কৃতান্ত দোতলার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছিল। নিরঞ্জন কঠোর স্বরে বললেন, 'থামো।' কৃতান্ত থামতে নিরঞ্জন বললেন, 'দেখার সময় আর নেই। প্রতিমার মুণ্ড পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।'

কৃতান্তর শরীরে কে যেন বিষ ঢেলে দিল। তার মুখ অসহ্য যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেল। চাপা গলায় হাহাকার করে সে বলল, 'পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে? প্রতিমা? আপনি করেছেন কি?'

নিরঞ্জন অবিচলিত স্বরে বললেন, 'একটা মৃত মুণ্ড আঁকড়ে বসে থাকব, রুচিতে সংস্কারে বেধেছে। তাছাড়া পুলিশের দিক থেকে বিপদ ঘটতে পারত।'

কৃতান্ত চেয়ারে বসে পড়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আপনি সত্য গোপন করছেন।'

নিরঞ্জন ক্রুদ্ধ হতে গিয়ে নিজেকে সংযত করলেন। বললেন, 'তার কি কারণ থাকতে পারে?'

কৃতান্ত ম্লান হেসে বলল, 'ভয়। প্রতিমার অকারণ অনুচিত ভয়।'

নিরঞ্জন কৃতান্তের দৃষ্টি সহ্য করতে পারলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ও তোমার কল্পনা।'

কৃতান্ত নিরঞ্জনের কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আপনি ও প্রতিমা ষড়যন্ত্র করছেন। আমার চেয়েও বেশী পৃথিবীর বিরুদ্ধে, মানুষ জাতির বিরুদ্ধে। আপনারা আমার একসপেরিমেন্টের পথ আটক করে দাঁড়াচ্ছেন।'

নিরঞ্জন বললেন, 'আমি ক্লান্ত। তবে তোমার অবস্থা বিবেচনা করে দেখা না করে পারি নি। একটা কথা তোমাকে বলি। বুঝতে সহজবুদ্ধির চেয়ে বেশী কিছুর দরকার হবে না। যদি তোমার একসপেরিমেন্টে তোমার এখনও আস্থা থেকে থাকে, চালিয়ে যাও। তোমাকে থামতে বলছে কে? প্রতিমা ছাড়াও তো মেয়ে আছে। একসপেরিমেন্ট চালাতে বাধা কি?'

নিরঞ্জনের কথা কানে না তুলে কৃতান্ত বলল, 'প্রতিমার পক্ষে মরা দূরের কথা, বেঁচে না থাকাই অসম্ভব। রসায়নের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় প্রতিমার ভিতর যে জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়েছে, তার ক্রিয়া জোর করে থামিয়ে না দিলে পঞ্চাশ, পঞ্চাশ কেন একশ বছর চলবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটানোর জন্য বাইরে হাত পাততে হবে না। ভিতরেই আপনা-আপনি মিটবে। কোনো রোগের আক্রমণও সম্ভব নয়।' একটু থেমে কৃতান্ত বলল, 'আমি একবার প্রতিমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

নিরঞ্জন কোনো কথা বললেন না। কৃতান্ত পুনরায় দোতলার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হতে গেল। তারপর কি ভেবে নিরঞ্জনের সম্মুখে টেবিলের উল্টোদিকে এসে দাঁড়াল। তার মুখে এক রহস্যময় শুষ্ক হাসি। বলল 'প্রতিমার সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছে, বলুন।'

নিরঞ্জন কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

কৃতান্ত বলল, 'শুধু প্রতিমার উপর নয়, আপনার উপরও আমি কম নির্ভর করি নি। আমাকে উপরে যেতে দিন। আড়ালে নয়, আপনার সম্মুখেই আমি প্রতিমার সঙ্গে কথা বলব।'

নিরঞ্জন নিরুত্তর।

কৃতান্ত ক্লান্ত দৃষ্টিতে একবার নিরঞ্জনকে দেখে নিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো। হঠাৎ রিভলভারের আওয়াজে চমকে উঠে থেমে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। সে তার দু চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দেখল নিরঞ্জনের হাতে রিভলভার। সম্মুখের দেয়ালে গুলী লেগে খানিকটা অংশ চটে গিয়েছে।

নিরঞ্জন বললেন, 'তোমাকে সতর্ক করতে গিয়ে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হলাম। গুলী দেয়াল লক্ষ্য করে ছুঁড়েছি। হত্যায় আমার রুচি নেই। যে-প্রতিমাকে তুমি ব্যাগে পুরে পাঠিয়েছিলে তার মৃত্যুর পর আমারও একটা ব্যক্তিগত একসপেরিমেন্ট শুরু হয়েছে। আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তাতে কেউ বিভ্রাট বাধায়। তোমাকে সাবধান করতে বাধ্য হলাম।'

কৃতান্ত একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখ তন্ন তন্ন করে দেখে বলল, 'আমার একসপেরিমেন্ট সম্বন্ধেও আমার একই কথা। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না।'

বাড়ির বাইরেই কৃষ্ণপক্ষের রাতের অন্ধকার। কৃতান্ত সেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সে রাতে নিরঞ্জন যথারীতি শয্যাগ্রহণ করলেন। কিন্তু ঘুম এল না। এক সময়ে প্রতিমার দীর্ঘশ্বাস শুনে বুঝলেন প্রতিমাও জেগে রয়েছে।

নিরঞ্জন বললেন, 'প্রতিমা! ঘুমোও নি?'

প্রতিমা আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'না।'

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

প্রতিমা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনিও ঘুমোন নি। কেন?'

নিরঞ্জন উত্তর দিলেন না।

প্রতিমা বলল, 'কেন ঘুমোন নি জানি। কৃতান্ত এসেছিল।'

নিরঞ্জনের হৃৎপিণ্ড ধ্বক করে উঠল।

প্রতিমা বলল, 'আপনি হঠাৎ কথার মাঝখানে উঠে পড়লেন। ঘরে তালা দিয়ে যেভাবে নীচেয় নেমে গেলেন, বুঝতে বাকী রইল না কার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।'

নিরঞ্জনের বুকটা কয়েকটা দ্রুত নিঃশ্বাসে তরঙ্গিত হল।

প্রতিমা বলল, 'আজ সারা দিন থেকে থেকেই কৃতান্তর কথা মনে হচ্ছিল। একটা নূতন কথা মনে এসেছিল। কথাটা হয়তো নূতন নয়, কিন্তু যেভাবে আসছিল মনে একটা নতুন রকমের সাড়া দিচ্ছিল। আজ এক এক সময়ে মনে হয়েছে আমার চেয়েও

কৃতান্ত কতো বেশী একা। আমি তাকে হারিয়েছি। কিন্তু সে শুধু আমাকে নয়, তার এক্সপেরিমেন্টটাও হারাতে বসেছে।'

নিরঞ্জন ইতিমধ্যে মন সংযত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। যতটা সম্ভব শান্ত স্বরে বললেন, 'তুমি চাও কৃতান্ত তোমার সঙ্গে দেখা করে?'

প্রতিমা জবাব দিল না।

নিরঞ্জন বললেন, 'আমি তোমার মন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ কৃতান্তর প্রতি তোমার আসক্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু তুমি তাকে যেভাবে হয় ফেরাতে বলেছিলে। তাকে আমি যেভাবে ফিরিয়েছি, আমি বেঁচে থাকতে তার পক্ষে তোমার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়।'

প্রতিমা রুদ্ধস্বরে বলল, 'কিন্তু আমার পক্ষে?'

নিরঞ্জন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এক্ষেত্রে আমার দিক থেকে তোমার ও কৃতান্তর ভিতর কোনো পার্থক্য করা সম্ভব নয়।'

ষষ্ঠ দিনে প্রতিমা ও নিরঞ্জনের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস হঠাৎ একটা নূতন দিকে মোড় নিল। নিরঞ্জনের শোবার ঘরের পরিধি যেন বিস্তৃত হতে হতে দূরে বহু দূরে কোনো অনাবিষ্কৃত দিগন্তে বিলীন হল। প্রতিমা যেন সেই অপসৃয়মান দিগন্তের সঙ্গে এক দুরাধিগম্য সুদূরে চলে গেল। মিশরের স্ফিনস্ক-য়ের মতো প্রতিমা নিরঞ্জনের ঘরেই একটা মহাকাশ আবিষ্কার করে কোনো অনির্ণীত রহস্যে তন্ময় হয়ে রইল। মুখর প্রতিমা হঠাৎ মূক হয়ে গেল।

নিরঞ্জনের মন একটা বুনো ঘোড়ার মত সারাদিন ঐ দিগন্ত লক্ষ্য করে প্রতিমার উদ্দেশে ছুটল। তার মুখে ফেণা উঠল, তার খুরের ধ্বনিতে নিরঞ্জনের ভিতর চার দিকে প্রতিধ্বনি জাগল। কিন্তু নিরঞ্জন কোনো প্রকারেই প্রতিমার মনের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারলেন না। নিরঞ্জন বুঝলেন, না বুঝে উপায় রইল না, যে মুণ্ডসর্বস্ব প্রতিমা তাকে প্রতি মুহূর্তে আকর্ষণ করে সঙ্গে সঙ্গে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি কোন্ শর্তে প্রতিমার কাছে বাঁধা পড়েছেন বুঝতে পেরে তাঁর দম্ভে বার বার আঘাত লাগল। আকাঙ্ক্ষা ও দম্ভের সংঘাতের ফলাফল নিরঞ্জনের মনকে তাঁর জীবনের শোচনীয়তম গ্লানিতে ভরে দিল।

সে রাতে ঘুম আসা সম্ভব নয়। গভীর রাত্রে তন্দ্রার মতো একটা ঘোর এসেছিল। তাও হঠাৎ কেটে গেল। নিরঞ্জন পুরোপুরি জেগে পড়লেন। প্রতিমার কণ্ঠস্বর শুনলেন। প্রতিমা ডাকছে। তাঁকেই ডাকছে। তবে এ যেন কাছে থেকে কথা বলা নয়। অনেক দূরে থেকে অনেক দিন রাতের ব্যবধান থেকে প্রতিমা কোনো গভীর প্রয়োজনে ডাকছে।

নিরঞ্জন প্রতিমার দূরাগত কণ্ঠস্বরে শুনলেন, 'মিস্টার সান্যাল! মিস্টার [illegible]!'

নিরঞ্জন [illegible] সাড়া দিলেন, [illegible]

প্রতিমা বলল, 'মিস্টার সান্যাল! উঠুন। এদিকে আসুন।'

সে রাতে শত ইচ্ছা সত্ত্বেও নিরঞ্জন নারীমুণ্ড শিয়রে নিয়ে শোন নি। খানিকটা তফাতে টেবিলের উপর একটা নরম কুশনে ঠেস দিয়ে রেখেছিলেন। নিরঞ্জন উঠে প্রথম ঘরের চড়া আলোটা জেবলে দিলেন। তারপর নারীমুণ্ডর দিকে তাকালেন। প্রতিমা ছাড়া কাকে দেখবেন! কিন্তু এ যেন এ কদিনের নিত্য দেখা প্রতিমা নয়। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক প্রতিমা। মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে, নাসিকার স্ফুরণে এক কালাতীত রূপের প্রকাশ দেখলেন। প্রতিমা কোনো দিকে কারো দিকেই তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি যেন বহু দূরে কোনো অজ্ঞাত লক্ষ্যস্থলে চলে গিয়েছে।

প্রতিমা তার সেই দূরাগত স্বরে বলল, 'আমাকে এখনই নিয়ে চলুন।'

নিরঞ্জনের বুঝতে বাকী রইল না প্রতিমা কোথায় যেতে চাইছে। দৃঢ়সংকল্পে মন বেঁধে বললেন 'কোথায়?'

প্রতিমা বলল, 'ছাতে।'

নিরঞ্জন কতকটা আশ্বস্ত হলেন। তবু বললেন, 'ছাতে? এত রাতে?'

প্রতিমা আশ্চর্য উদাসী কণ্ঠে বলল, আমার কাছে এখন আর দিনে-রাতে কোনো তফাৎ নেই। আমি বুঝতে পারছি না। এমন কোথাও পেঁৗছে গিয়েছি যেখানে জীবনের চেহারা বদলে গিয়েছে। একবার রাতের আকাশের তলায় গিয়ে যত দূর দেখা যায় সৃষ্টি সংসার দেখতে চাই। পুরণো হিসেবের সঙ্গে নূতন হিসেবটা মেলাতে চাই। দেরী করবেন না। আমাকে এখনই ছাতে নিয়ে চলুন।'

নিরঞ্জন ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে প্রতিমার মুণ্ড সাবধানে বুকে চেপে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাতে উঠলেন। ছাতে উঠতেই একটা ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় শরীর শিরশির করে উঠল। মনের তাপমাত্রাও যেন কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল। বন্ধ ঘর থেকে ছাতে এসে কৃষ্ণপক্ষের মহাকাশের তলায় নিরঞ্জন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও ক্ষুদ্র বোধ করলেন।

প্রতিমা বলল, 'কি আশ্চর্য! সময় একেবারে থেমে গিয়েছে। মাথাটা হিসেবের উপর নির্ভর করে। মনে হচ্ছে আমি ইতিহাসের, ইতিহাসের কেন তারও আগের যুগের সবকটা শতাব্দীতে ছিলাম। এখনও আছি। চিরকালই থাকব।'

নিরঞ্জন বললেন, 'এরকম একটা ভাব কখনো কখনো আমার ভিতরও সাড়া দেয়।'

প্রতিমা বলল, 'কিন্তু এসেই চলে যায়। ধরে রাখতে পারেন না। ও ভাব হচ্ছে অনন্তের ইঙ্গিত। কিন্তু ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তের নাটক মুহূর্তেই শেষ।'

নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ। তাই।'

প্রতিমা বলল 'আমি সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাটকের কেন্দ্রে চলে এসেছি। আমাকে সেখানেই থাকতে হবে। ফেরার উপায় নেই।'

নিরঞ্জনের দেহমন কণ্টকিত হল।

প্রতিমা বলল, 'কত দেশ মহাদেশ কত সৌরলোক নীহারিকাপুঞ্জ! এরা আমার এত নিকটের, নিত্যপ্রতিবেশী ভেবে আনন্দে আমার চোখ জলে ভরে উঠছে। সেই সঙ্গে একটা দুঃখও হচ্ছে।'

নিরঞ্জন নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করলেন, 'দুঃখ! দুঃখ কেন?'

প্রতিমা হেসে বলল, 'খেলার পুতুলের জন্য শিশুর দুঃখ। যখন সে বড় হয়, পুতুল খেলায় ইতি পড়ে, কোথায় যেন একটা দুঃখ একটা অভাব খচ করে বেঁধে।'

নিরঞ্জন বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'ঐ পুতুলের দলে কাদের দেখছ?'

প্রতিমা জবাব দিল, 'অনেককেই। এমন কি এই যে আপনি আমাকে বুকে চেপে ধরে রেখেছেন, আপনাকেও। কৃতান্ত, যে কৃতান্ত সর্বকালজয়ী জ্ঞানের স্বপ্ন দেখেছিল, তার আভাসও নিজের ভিতর পাচ্ছি।'

কৃতান্তর উল্লেখে নিরঞ্জনের শরীর কয়েক মুহূর্তের জন্য জমে গেল।

নিরঞ্জন বললেন, 'তোমার ত্যক্ত পুতুলদের খাতায় কৃতান্তর নাম এখনো ওঠে নি।'

প্রতিমা একথার কোনো জবাব দিল না। বলল, 'এখন আমার কাছে নিকট ও দূরে কোনো তফাৎ নেই। সবই দেখতে পাওয়া, সকলের সঙ্গেই কথা বলা সম্ভব। শুধু, সম্ভব নয় সহজ।'

নিরঞ্জন শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'তাহলে তুমি অনায়াসেই কৃতান্তর সঙ্গে কথা বলতে পারো।'

প্রতিমা বলল, 'বলছি। মাঝে মাঝে আজ কথা হচ্ছে। সে আমার ভাবা কতটা বুঝতে পারছে, জানি না। কিন্তু মনে হয় সাড়া দিচ্ছে।'

নিরঞ্জনের অজ্ঞাতসারেই তাঁর দুহাত প্রতিমার গলায় শক্ত মুঠ হয়ে বসল। প্রতিমা একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। নিরঞ্জন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে যেন উঠে এলেন। প্রতিমার গলায় তাঁর হাতের ফাঁস আলগা হয়ে এল।

প্রতিমা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'হঠাৎ এমন চেপে ধরেছিলেন, দম বন্ধ হয়ে এসেছিল।'

নিরঞ্জন বললেন, 'আমি বিশেষ দুঃখিত। বুঝতে পারি নি মুঠ হঠাৎ অতটা শক্ত হয়ে এসেছে।'

প্রতিমা নিরঞ্জনের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো। এ এক বিশ্লেষণের অতীত দৃষ্টি। সেখানে কতটা ভয় ঘৃণা বা বিদ্রূপ সঠিক বলা কঠিন।

নিরঞ্জন কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সর্বকালজয়ী জ্ঞান কৃতান্তর এক্সপেরিমেন্ট সম্বন্ধে কি সংবাদ দিচ্ছে?'

প্রতিমা বলল, 'যদি অভয় দেন, বলি।'

নিরঞ্জন ধরা গলায় বললেন, 'আমি তোমার নূতন হিসেবে পুতুল বই কিছু নই। আমি তোমাকে কি অভয় দিতে পারি?'

প্রতিমা বলল, 'যাই হোক না কেন, আমি আপনার আশ্রয়ে আছি। এখনো
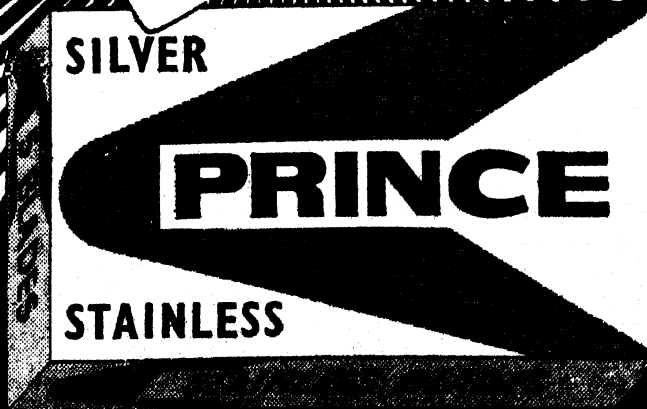
আপনার দুহাত আমাকে আপনারই বুকে ধরে রেখেছে। একদিন আমিই আপনাকে আমার ঈশ্বর বলে স্বীকার করেছিলাম।'

নিরঞ্জন বললেন, 'সেদিন তুমি এক্সপেরিমেন্টের শিশু ছিলে। সেই শিশু এই কদিনে মাথায় বেড়ে আকাশের কাছাকাছি গিয়েছে। তার আবার কার ভয়, কিসের ভয়!'

প্রতিমা মিনতিপূর্ণ স্বরে বলল, 'না, না। ওকথা বলবেন না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি এখনো আপনার আশ্রিত।'

নিরঞ্জন বললেন, 'কৃতান্ত কোথায়? তার এক্সপেরিমেন্টের খবর কি?'

প্রতিমা শান্তকণ্ঠে বলল, 'এই শহরেই আছে। এক্সপেরিমেন্টের বিপর্যয় কেটে গিয়েছে।'

নিরঞ্জনের বুকটা কেমন করে উঠল। দম নিয়ে বললেন, 'তুমি এখানে। তোমাকে নিয়ে তার এক্সপেরিমেন্ট। তোমাকে বাদ দিয়ে বিপর্যয় ঘটতেও পারে না, কাটতেও পারে না।'

প্রতিমা বলল, 'কৃতান্ত খুঁজেছে বিপর্যয়ের প্রতিষেধ আমার কাছেই আছে।'

বিস্ময়বিমূঢ় নিরঞ্জন বললেন, 'তোমার কাছে?'

প্রতিমা বলল, 'হ্যাঁ। কৃতান্ত সংশ্লেষায়নের প্রক্রিয়ায় তিনটি ওষুধ বার করেছিল। এ যুগের তিনটি আশ্চর্য আবিষ্কার বলা যেতে পারে। একটি ওষুধে আমি যেমন আছি আমাকে ঠিক তেমন রাখবে। দ্বিতীয় ওষুধ আমাকে আমার স্বাভাবিক অর্থাৎ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তৃতীয় ওষুধ আমাকে এক্সপেরিমেন্টের শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।'

নিরঞ্জন বললেন, 'এই আশ্চর্য তৃতীয় ওষুধ প্রয়োগ করতে পারলে তোমাকে আমার হাতে এই অসহায় অবস্থায় পড়তে হত না।'

প্রতিমা বলল, 'তিনটে শিশি মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। রঙে স্বাদে তফাৎ নেই বলে কোনটা কোন ওষুধ বোঝা যাচ্ছিল না। এখন কৃতান্ত শিশি তিনটে চিনে নেবার পথ খুঁজে পেয়েছে।'

নিরঞ্জন বললেন, 'শিশি তিনটে তোমার কাছে আছে?'

প্রতিমা অস্ফুট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

নিরঞ্জন গভীর কণ্ঠে বললেন, 'শিশিগুলো আমাকে দাও।'

প্রতিমা বলল, 'দেবার ক্ষমতা নেই।'

নিরঞ্জনের মুখ তিক্ত হাসিতে বিকৃত হল। বললেন, 'ক্ষমতা নেই না দেবে না?'

প্রতিমা বলল, 'ক্ষমতাই নেই।' আমার মুণ্ডসর্বস্ব দেহে কোথায় লুকনো আছে জানি না। এক্সপেরিমেন্টের সময় কৃতান্তর কাছে শুনেছি সে ছাড়া আর কারো পক্ষে বার করা সম্ভব নয়। সামান্য ভুলে আমার জীবনান্ত ঘটতে পারে।'

পর দিন নিরঞ্জন বার বার অদৃষ্টের পায়ে মাথা কুটলেন। ঈশ্বরের কাছে মুণ্ডসর্বস্ব প্রতিমার দুর্জয় আকর্ষণ থেকে মুক্তি চাইলেন। কিন্তু তাঁর বুঝতে বাকী রইল না যে, প্রতিমার হাত থেকে জীবদ্দশায় তাঁর মুক্তি নেই। যদি প্রতিমা ও কৃতান্তর অশুভ ছায়া থেকে তিনি তাঁর পরিচিত জীবনের পুরণো জগতে ফিরে আসতে পারতেন, বেঁচে যেতেন। পুরণো দিনের পুরণো আলোয় পুরণো চোখে জীবনটাকে একবার দেখতে পারা একটা দুর্লভ সুখ-স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। নিরঞ্জন বুঝলেন তিনি জীবনের সৌরলোকেই আর সকলেরই মতো তাঁর কক্ষপথে আবর্তিত হবেন। কিন্তু অভিশপ্ত গ্রহের মতো সূর্যের আলো গ্রহণ করতে পারবেন না। প্রতিমার আকর্ষণ লোভী রাহুর মতো সেই আলো নিঃশেষে শোষণ করবে। প্রতিমার রহস্যের জঠরে আমৃত্যু তাঁকে ভ্রূণ অবস্থায় বাস করতে হবে।

শেষ রাতে নিরঞ্জন বিছানা ছেড়ে উঠলেন। সারা রাত জেগে জেগে ভবিষ্যতের একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ভেবে প্রতিমার সম্মুখে গিয়ে বসলেন। হয়তো তখনই প্রতিমার ঘুম ভাঙল। সে চোখ মেলে তাকালো।

নিরঞ্জন বললেন, 'প্রতিমা। তুমি আমাকে একদিন ঈশ্বর বলে স্বীকার করেছিলে।'

প্রতিমা বলল, 'এ-কথা সেদিন আমি যে আপনাকে বলেছি।'

নিরঞ্জন বললেন, 'সে-ওষুধ তোমাকে সহজ স্বাভাবিক অর্থাৎ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, অন্ততঃ সে-ওষুধটা আমাকে দাও। আমি রাসায়নিক। কৃতান্তর অপেক্ষায় না থেকে আমার উপর নির্ভর করো। আমাকে একটা সুযোগ দাও। আমি তোমাকে কৃতান্তর এক্সপেরিমেণ্ট-এর অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে চাই।'

প্রতিমা বলল, 'আপনাকে বলেছি দেবার ক্ষমতা নেই।'

নিরঞ্জন বললেন, 'তুমি বাধা না দিলে আমি বিজ্ঞানের বলে খুঁজে দেখতে পারি ওষুধ তিনটে কোথায় আছে।'

প্রতিমা বলল, 'যে অধিকার আমার নেই, আপনাকে দিতে পারি না।'

নিরঞ্জন তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'অধিকার কার? কৃতান্তর?'

প্রতিমা বলল, 'হ্যাঁ। তাছাড়া আমি আমার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারি না।'

নিরঞ্জন বললেন, 'কেন?'

প্রতিমা বলল, 'কৃতান্তর এক্সপেরিমেণ্ট পণ্ড হয় এরকম কোনো কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। সে আমার উপর নির্ভর করেছে। আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।'

নিরঞ্জন ও প্রতিমার ভিতর দৃষ্টি বিনিময় হল। মুণ্ডসর্বস্ব প্রতিমা যেন ভীত হল। তার এ-ভাব নিরঞ্জনের দৃষ্টি এড়ালো না।

সাঁওতাল পরগণার দুর্ভেদ্য অরণ্য। তারই ভিতর পায়ে চলার পথ। এ-পথে কখন মানুষ, কখন শ্বাপদ চলে কোনো নির্দিষ্ট চুক্তি নেই। কিন্তু তবুও যে-শ্রেণীর মানুষ কদাচিৎ এখানে হানা দেয়, শ্বাপদও হয়তো আত্মরক্ষার আশু প্রয়োজনে তাকে পথ ছেড়ে দেয়। এই অরণ্যে যৌবনে নিরঞ্জন কখনো-সখনো শিকারী দলের সঙ্গে প্রাণ হাতে করে এসেছেন। কল্পনাও করেননি একদিন কোনো কারণে স্বেচ্ছায় এখানে আশ্রয় নিতে হবে। অরণ্যের শেষে অতল খাদ। তার অপর প্রান্তে পাহাড়। পাহাড় শুরু হবার আগেই খাদের ওপারের জমি একটা নিস্তীর্ণ ঢেউয়ের মতো ঠেলে অনেকটা উঁচুতে উঠেছে। ঐ উঁচু জমির উপর সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়।

নিরঞ্জনের হাতে ব্যাগ। ডান কাঁধে একটা পুরু ক্যানভাসের বড় থলে। পিঠে নাইলনের বোচকা। একটা সংক্ষিপ্ত সংসার নিয়ে নিরঞ্জন এই অরণ্যে তাঁর জীবনের এক নূতন অধ্যায় শুরু করতে এসেছেন। তাঁর জীবনে যে ঘাত-প্রতিঘাতের নিদারুণ ক্রিয়া গত কয়েকটা দিন নিরন্তর চলছিল তার এক প্রান্তে কৃতান্ত আর এক প্রান্তে প্রতিমা। নিরঞ্জন ভেবে দেখেছিলেন এদের একজন সরে গেলে এই মর্মান্তিক অধ্যায়ের শেষ হয়। তিনিও বেঁচে যান। যেহেতু প্রতিমাকে তিনি, যে কারণেই হোক সরাতে অক্ষম, অগত্যা কৃতান্তকেই সরাতে হবে। কৃতান্তকে সরাতে পারলে ভাল হত। এক-আধবার এ-চিন্তাও যে তিনি করেননি তা নয়। কিন্তু স্বেচ্ছায় যিনি জীবনে একটি কীটকেও ঐ বিশেষ উপায়ে সরাতে পারেননি, তিনি একটা জলজ্যান্ত মানুষকে সরাবেন কী করে! তাই নিরঞ্জনই সরে এসেছিলেন। কলকাতা থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল। তাঁর পৈতৃক আমলের অস্টিন গাড়িতে মন্দগতিতে এতটা পথ আসতে পুরো একদিন লেগেছিল। পাহাড়ীমুলুকের এক বাংলোয় রাতটা কাটিয়ে খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েছিলেন। দুঘণ্টার ভিতরই অরণ্যের প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সরু পথে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে কয়েকটা গাছ যেখানে একটা বৃক্ষহীন অন্তরাল সৃষ্টি করেছে সেখানে রেখে রেখেছিলেন।

পথ থেকে ঢালু জমিতে নেমে এসে নিরঞ্জন একটা গাছের আড়ালে বসলেন। হাত থেকে ব্যাগটা সন্তর্পণে নামিয়ে সম্মুখে রাখলেন। তাঁর সদাসতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই ব্যাগের উপর। কাঁধ থেকে ক্যানভাসের থলে, পিঠ থেকে বোচকা নামিয়ে কিছু তফাতে রাখলেন। দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটার অভ্যাস বহুকাল নেই। নিরঞ্জন হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্যাগটা সম্মুখে টেনে এনে নিরঞ্জন খুলতে গিয়ে কী ভেবে থেমে গেলেন। ব্যাগের এক অংশে কয়েকটা ফুটো করে নিয়েছিলেন। সেখানে কান পাতলেন। একটা চাপা গোঙানী তাঁর কানে এল। নিরঞ্জন ভীত, অস্থির হয়ে পড়লেন। ব্যাগটা খুলে ফেললেন।

প্রতিমাকে বার করে আনতে সে সভয়ে একবার চারদিকে তাকালো। একটা অদ্ভুত

দৃষ্টিতে নিরঞ্জনকে দেখল। তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'এ আপনি কী করেছেন মিস্টার সান্যাল? আমাকে কোথায় এনেছেন?'

অবিচলিত কণ্ঠে নিরঞ্জন বললেন, 'কৃতান্তের নাগালের বাইরে।'

প্রতিমা বলল, 'কৃতান্তের নাগালের বাইরে যাবার ক্ষমতা আমারও নেই, আপনারও নেই।'

নিরঞ্জন গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

প্রতিমা বলল, 'কৃতান্তর চোখ এড়িয়ে ইহলোকে কোথাও লুকোনো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে যে প্রকারে হোক আমাদের খুঁজে বার করবে।'

নিরঞ্জন হেসে বললেন, 'এই গভীর অরণ্যেও?'

প্রতিমা জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

নিরঞ্জন বললেন, 'তাহলে তুমি চিরকালের জন্য তার নাগালের বাইরে চলে যাবে।' জামার ভিতর থেকে রিভলবার বার করে এনে নিরঞ্জন বললেন, 'কৃতান্ত বিজ্ঞানের মহৎ অভিযানে কিম্বা প্রিয়তমার প্রেম-অভিসারে আসছে জানবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল আমার নেই। তুমি তোমার সর্বদর্শী জ্ঞানের অলৌকিক শক্তিতে তার সঙ্গে কী কথা বলছ, কী সন্ধান দিচ্ছ বলতে তুমি বাধ্য নও। আমারও শোনবার স্পৃহা নেই। কিন্তু কৃতান্তকে অদৃষ্ট তাকে এখানে টেনে নিয়ে এলে আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। অনায়াসে তার ইহলোকের হিসেবটা নিজ দায়িত্বে মিটিয়ে দিতে পারব।'

প্রতিমা অবিশ্বাসে আশঙ্কায় কাতর হয়ে বলল 'এ আপনি কী বলছেন?'

নিরঞ্জন বললেন, 'আমি তোমার ও আমার দিকে তাকিয়ে এ-কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

প্রতিমা বলল, 'এতে আমাদের লাভ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'এ-লাভের পরিমাপ মোটা বুদ্ধিতে স্থূল হিসেবে হবে না।' একবার অরণ্যের চারিদিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন বললেন, 'প্রতিমা! একদিন মাঝরাতে তুমি আমাকে বলেছিলে তোমাকে ছাতে নিয়ে যেতে। রাতের আকাশের তলায় তুমি তোমার সর্বদর্শী জ্ঞানের কথা বলেছিলে। এক বিস্ময়কর ধ্যানদৃষ্টিতে ত্রিকালের যবনিকা ভেদ করে এই পৃথিবীর কোটি শতাব্দীর কাহিনী কয়েক মুহূর্তে পাঠ করেছিলে। সে-রাতে তোমার ধ্যানদৃষ্টি পৃথিবী ছাড়িয়ে পরিচিত আকাশের ঊর্ধ্বে মহাকাশ ছাড়িয়ে অনন্তের অভিসারে চলে গিয়েছিল। সে-রাতের কথা আমি ভুলতে পারি না। তুমি ভোলো কী করে?'

প্রতিমা নিরুত্তর।

নিরঞ্জন গভীর আবেগে বললেন, 'সাধারণ মানুষের চোখে, শিকারীর চোখে এ-অরণ্যের এক চেহারা। তা এই অরণ্যের মুখোশ। কিন্তু এই অরণ্যের আর একটা রূপ আছে। তা হচ্ছে সৃষ্টির ঊষার বর্ণনাতীত আশ্চর্য রূপ। এই অরণ্যে কি তুমি কোনো অপরিমেয় অস্তিত্বের স্পন্দন শুনতে পাও না? কোনো আশ্চর্য ব্যাখ্যাতীত উপস্থিতির অলৌকিক ছায়া তোমার চোখে ধরা দেয় না?'

প্রতিমা নিস্পন্দ। তার দুটি চোখ স্থির, নিষ্পলক।

নিরঞ্জন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এই অরণ্যে আমি এক বিচিত্র সাধনায় বসব। এ-সাধনা হবে তোমার সঙ্গে আমার সংলাপ। তুমি হবে আমার দৃষ্টি। শ্রুতি ও স্মৃতি। আমার হৃদয়, মন ও মস্তিষ্ক। আমার আত্মা শুধু পরমাত্মার অর্থাৎ ঈশ্বরের থাকবে। তাছাড়া আমার অস্তিত্ব, আমার উপস্থিতি হবে আমার ভিতর দিয়ে তোমার প্রকাশ।'

প্রতিমা বলল, 'আপনি তুচ্ছ নারীমুণ্ডের সাধনায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে চান?'

নিরঞ্জন তপ্তস্বরে বললেন, 'ক্ষতি কী! এ-সাধনায় আমার মহালাভ।'

প্রতিমা বলল, 'মহালাভ? কিন্তু আমার কথা ভেবে দেখেছেন?'

নিরঞ্জন বললেন, 'কী কথা?'

প্রতিমা বলল, 'আপনি স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ। আমি নই। আপনার সাধনা, আপনার লাভ যত বড় হোক তার জন্য আমি আমৃত্যু একটা মুণ্ডসর্বস্ব অস্তিত্বের খাঁচায় ছটফট করব, এই নিষ্ঠুর সর্ত কোন যুক্তিতে মেনে নিতে বলেন? যদি আপনার কথার উত্তরে বলি, মিস্টার সান্যাল আমাদের ভিতর অদৃষ্ট বিনিময় হোক, আপনি নরমুণ্ড হোন, বছরের পর বছর মুণ্ডসর্বস্ব হয়ে থাকুন, আমি স্বকপোলকল্পিত সাধনায় বসি? আপনি এই রকম একটা প্রস্তাবের উত্তরে কী বলবেন?'

নিরঞ্জন নিজের ভিতর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেন, অরণ্যের নিস্তব্ধতার ভিতর তার সমর্থন পাবার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণের জন্য চিন্তামগ্ন হলেন। তাঁর দেহে কোনো সাড়া নেই। একটা পাথরের মূর্তির মতো তিনি নিশ্চল হয়ে গেলেন। পরে তিনি মাথা তুললেন। বললেন, 'তোমার যুক্তিতে একটা গলদ আছে প্রতিমা। তুমি অদৃষ্টের বিধানে মুণ্ডসর্বস্ব। আমি নই। এই অবস্থা পাল্টে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। উঠলেও আমি বলব, হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। সর্বদর্শী ত্রিকালজয়ী জ্ঞানের বিনিময়ে এ-দেহ সংকুচিত করতে আমার আপত্তি নেই।'

প্রতিমার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। রহস্যের, না বিদ্রূপের বোঝা গেল না।

সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যে দিনের প্রহরগুলো এক অতিকায় কচ্ছপের মতো মন্থরগতিতে সকাল থেকে দুপুরে, দুপুর থেকে অপরাহ্ন ও সন্ধ্যায় দণ্ড-মুহূর্তের হিসেব দিতে দিতে এগোলো। নিরঞ্জন ও প্রতিমা মুখোমুখি যেন অদৃষ্টের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন। এ যেন কোনো গুপ্ত তন্ত্রের এক অদ্ভুত দৃশ্য। ছিন্নমস্তার সম্মুখে তান্ত্রিকের সাধনা।

সন্ধ্যার প্রহর কেটে রাত এল। অরণ্যের সুগম্ভীর ইঙ্গিতপূর্ণ রাত। প্রতিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। নিরঞ্জন উৎকর্ণ হলেন।

প্রতিমা বলল, 'আমি আপনার প্রস্তাব মেনে নিলাম।'

নিরঞ্জনের দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রতিমা নিরঞ্জনের চক্ষের ভাষা অনুমান করল। বলল, 'আপনাকে ঠকাতে চাই না। একটা কথা, যত আপত্তিকর হোক, খুলে বলতে চাই।'

নিরঞ্জন বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বললেন, 'আপত্তিকর? তোমার কথা কী অর্থে আমার আপত্তিকর ঠেকতে পারে?'

প্রতিমা বলল, 'আমার এই অস্বাভাবিক অবস্থায়ও একটা সত্য, যত স্থূলই হোক, সত্যই থেকে যাচ্ছে। আমি নারী। আমি কিছুকাল ধরে আপনাতে আসক্ত। কবে কোন্ মুহূর্তে এই অঘটন ঘটেছে জানি না। কিন্তু এ-সত্য এড়াতে পারছি না। কিন্তু এতে আপনার ক্ষতি। আপনার মূল্যবান জীবন এই আসক্তির উপদ্রবে পণ্ড না হয়। তাই আপনার মঙ্গলের জন্যই আপনাকে এড়াতে চেয়েছি। যে-কৃতান্তকে মনে-প্রাণে এড়াতে চাই, তাকে ভিতরে ভিতরে ডেকে মরেছি। সে এসে গেলে আপনি বিপন্মুক্ত হন।'

নিরঞ্জন হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটার একটা ভিন্ন রূপ দেখলেন। প্রতিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আমূল বদলে গেল। তাঁর ভিতরে একটা ভূকম্প ঘটে গেল। যে-চিন্তা তাকে গোপনে দগ্ধ করছিল, সেই চিন্তার হাত থেকে এই নারীমুণ্ডেরও নিস্তার নেই। সেই মুহূর্তে নিরঞ্জনের মনে হল আদিপুরুষের মতো জীবনও নির্গুণ। সাধনার কোনো একটা স্তরে হয়তো পাপ-পুণ্যের হিসেবও অর্থহীন। নিরঞ্জন মুণ্ডসর্বস্ব প্রতিমাকে দুহাতে শক্ত করে ধরে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর প্রচণ্ড আবেগে তুলে ধরে তার ওষ্ঠাধর চুম্বন করলেন। তারপরই নিরঞ্জন প্রতিমার মুণ্ড সম্মুখে নামিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। তাঁর ভিতর কে যেন অতিপ্রাচীন এক অনুশাসন উচ্চারণ করছিল। নিরঞ্জন বিবর্ণমুখে প্রতিমার দিকে তাকালেন। প্রতিমার চোখেমুখে অনুযোগের কোনো লক্ষণ দেখলেন না। দেখলেন এক আদিম লিপ্সা ও সম্ভোগকামনা। অরণ্য যেন এবার তার পরিচিত ভাষায় নিরঞ্জনের রক্তে গর্জন করে উঠল। নিরঞ্জন উন্মত্তের মতো প্রতিমার মুণ্ড আবার বুকে চেপে ধরলেন। তারপর বারবার, অসংখ্যবার, মুখের কাছে নিয়ে এলেন। বারবার দৈহিক ব্যবধান ঘুচল। শেষে ক্লান্ত হয়ে নিরঞ্জন যখন প্রতিমাকে সম্মুখে নামিয়ে রাখলেন তখন অরণ্যের চারিদিকে আকাশ থেকে মধ্যরাত্রির এক উদাসীন স্তব্ধতা নেমে এসেছে। সেই অন্ধকারে প্রতিমার চোখে যে এক সংজ্ঞাতীত দৃষ্টি ফুটে উঠল, তার মুখে এক

দুর্বোধ্য হাসিতে কুঞ্চিত হল, নিরঞ্জন দেখতে পেলেন না।

শেষ রাতে হঠাৎ নিরঞ্জনের ঘুম ভেঙে গেল। প্রতিমা আসক্তির সপ্তমে উঠে বলেছিল যে, এ-রাতটা তাদের দু-জনের জীবনে মধুরাত হয়ে থাকবে। নিরঞ্জন দেহ ও মনের এক সুমধুর ক্লান্তি আস্বাদ করতে করতে সুষুপ্তির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলেন।

নিরঞ্জন পাশ ফিরে দেখলেন প্রতিমা নেই। একটা নিদারুণ আশঙ্কায় তিনি প্রথম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাহলে প্রতিমা কি এখন কোনো হিংস্র জানোয়ারের কিম্বা অতিকায় সাপের কবলে? পরমুহূর্তে রিভলবারের জন্য হাত বাড়াতে গিয়ে নিরঞ্জন দেখলেন, রিভলবার নেই। নিরঞ্জন এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন। চীৎকার করে ডাকলেন, 'প্রতিমা।' কোনো সাড়া পেলেন না। বারবার ডাকলেন। তাঁর বুকফাটা ডাকে অরণ্য কেঁপে কেঁপে উঠল। আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। ভোর হবার বেশী দেরী নেই। বিহ্বল বিমূঢ় নিরঞ্জন কী করবেন স্থির করে উঠতে পারলেন না।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ হতে নিরঞ্জন ঘুরে দাঁড়ালেন। চর্মচক্ষে যা দেখলেন, বিশ্বাস করতে পারলেন না। সেই প্রথম দিনের প্রতিমা, তাঁর হৃদয় যাকে তিলোত্তমা বলে সম্বোধন করেছিল। পূর্ণাঙ্গিণী চলমানা প্রতিমা। অবিশ্বাস্য। অসম্ভব। নিরঞ্জনের বাক্যস্ফূর্তি হল না।

প্রতিমার হাতে নিরঞ্জনের রিভলবার। সেই প্রথম কথা বলল।

'মিস্টার সান্যাল! ফিরে চলুন।'

নিরঞ্জন যেন শুধু বাকশক্তি নয়, শ্রুতিশক্তিও হারিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি শূন্য। অর্থহীন।

প্রতিমার চোখে কি অশ্রুর আভাস দেখা যাচ্ছে? সে নিরঞ্জনের বুক লক্ষ্য করে রিভলবার ধরে আছে। কিন্তু এই ভূমিকায় তাকে মানাচ্ছে না। ভাববিধুর তার মুখ নিঃশব্দে তার এই ভূমিকার যুক্তি খণ্ডন করছে।

প্রতিমা কম্পিতস্বরে বলল, 'মিস্টার সান্যাল! ফিরে যেতে বলার আগে শুরু থেকে শেষ আমার আচরণের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার।'

নিরঞ্জন কোনো সাড়া দিলেন না।

প্রতিমা রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'প্রথম রাতে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ঠেকছিল। তখন আপনার নিকট-সঙ্গ না পেলে আমি বাঁচতাম না। তখন আপনার নির্ভয় আশ্রয় আমাকে রক্ষা করেছিল' প্রতিমার হাত কাঁপছে। মুখ ভাবাবেগে বিকৃত হচ্ছে। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে আত্মসম্বরণ করে বলল, 'কিন্তু তারপর বুঝলাম আমি আপনার জীবনে অকল্যাণ ডেকে আনছি। নারীমুণ্ডের অস্বাভাবিক নেশা আপনাকে মিথ্যা যুক্তির ও আবেগের জোরে বিপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তখন কৃতান্তর কথা মনে পড়ল। বারবার বলে আমার আকর্ষণ থেকে আপনাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যতই আমি আপনাকে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছি, আপনি এক ভয়ঙ্কর নৈকট্যের নেশায় আরো কাছে এসে বিপদের সীমায় পা বাড়িয়েছেন।'

এতক্ষণে মনে হল নিরঞ্জন শুনছেন। তাঁর সকল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা যেন উৎকর্ণ হয়ে পড়েছে।

প্রতিমা বলল, 'পাঁচ দিনের দিনই আমি বুঝেছিলাম আমি আবার সুস্থ, স্বাভাবিক হব। কিন্তু তখনও সময় হয় নি। এই অরণ্যেই সময় এল। কিন্তু দেখলাম এক মুহূর্তের জন্যও আপনার দৃষ্টির আড়াল হবার উপায় নেই। মুণ্ড-সর্বস্ব প্রতিমার নেশা আপনাকে এতটা পেয়ে বসেছিল, আপনার কাছে স্বাভাবিক প্রতিমার কোনো দামই ছিল না। স্বাভাবিক সুস্থ হবার পথে আমার একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়ালেন আপনি। তখন ছলনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম।'

প্রতিমার দু চোখ দিয়ে অশ্রুবন্যা নেমে এল। বলল, 'আপনার সঙ্গে কাল রাতে যে ছলনার সম্পর্ক পেতেছিলাম, ভাবতে গিয়ে লজ্জায় ঘৃণায় মরে যাচ্ছি। কিন্তু উপায় ছিল না। আপনাকে দিনের আলোয় ফিরিয়ে আনতে গেলে আমাকে পূর্বজীবনে ফিরে যেতেই হবে। লজ্জা ঘৃণার কোনো বাধাই মানি নি।'

নিরঞ্জনের দেহে এতক্ষণে যেন প্রাণ-সঞ্চার হল। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তিনটে আরকের শিশি তুমি নিজেই বার করতে পেরেছিলে?'

প্রতিমা ম্লান হেসে বলল, 'সব সময়ই পারতাম। আপনাকে বাঁচাতে মিথ্যা বলে-ছিলাম।'

নিরঞ্জন বললেন, 'শিশিগুলো কোথায়?'

প্রতিমা এ প্রশ্নে কেঁপে উঠল। একটা নিদারুণ ভুল করল। সে নিরঞ্জনের সম্মুখে জমির দিকে তাকালো। নিরঞ্জন প্রতিমার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন দু হাত তফাতে তাঁর পায়ের কাছে তিনটে শিশি।

নিরঞ্জনের লুব্ধদৃষ্টি শিশিগুলির উপর পড়েছে দেখে প্রতিমা চমকে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'মিস্টার সান্যাল। নিজের অকল্যাণ ডেকে আনবেন না। ও শিশিগুলিতে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না।'

নিরঞ্জনের মুখ গম্ভীর হাসিতে ভরে গেল। তিনি শিশিগুলির দিকে হাত বাড়ালেন।

প্রতিমা হাহাকার করে বলল, 'না। না। কথা শুনুন। না হলে আমি আপনাকে গুলী করতে বাধ্য হব।'

নিরঞ্জন প্রতিমার কথায় কান দিলেন না। শিশি তিনটে তুলে নিলেন। প্রতিমার হাত জমে গেল। সে গুলী করতে গিয়ে পারল না। প্রতিমা দুঃখে ক্ষোভে বিপদের আশঙ্কায় মুখ ঢেকে ফেলল।

কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। তার-পরই সে চোখ থেকে হাত নামিয়ে নিল। সভয়ে দেখল মোহাবিষ্টের মতো নিরঞ্জন তাঁর হাতের মুঠোয় শিশি তিনটের দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে রয়েছেন। প্রতিমা অদৃষ্টের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে রুদ্ধ-স্বরে বলল, 'মিস্টার সান্যাল। ঐ শিশি তিনটের আছে জীবনের মহা অকল্যাণের বিষ। কৃতান্তর সাত লাখ ও আপনার তিন লাখ টাকায় জ্ঞানসমুদ্র মন্থনের হলাহল। ফেলে দিন।' রিভলভারটা আর একবার নিরঞ্জনের ললাট লক্ষ্য করে ধরে কঠোর স্বরে বলল, 'রাস্তা দিয়ে সোজা হেঁটে গাড়িতে উঠুন। সব তৈরী। আপনার সঙ্গে আমিও যাবো। আপনাকে না নিয়ে ফিরব না।'

নিরঞ্জন বললেন 'কোথায়?'

প্রতিমা বলল, 'কলকাতায়। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের ভিতর।'

নিরঞ্জন হাসলেন। হাস্যশাস্ত্রে অতুলনীয় পৌরুষের হাসি। বললেন, 'তুমি যাও। কৃতান্ত তোমার অপেক্ষায় আছে। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের গদীতে গিয়ে সুখসংসার রচনা করো। নিরঞ্জন নামটা মানুষের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলো। ও ইতিহাসের খাঁচা আমাকে ধরে রাখতে পারে না।'

প্রতিমা বলল, 'মিস্টার সান্যাল!'

নিরঞ্জন বললেন, 'আমার তত্ত্বের লেজুড় ধরে কৃতান্ত তার তত্ত্বে ঢুকেছিল। কিন্তু সে উপলক্ষ মাত্র। এই তত্ত্বে একদিন আমাকে পৌঁছতেই হত।' প্রতিমার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'আমি আজ তোমার ভিতর আস্থা হারিয়েছি। কিন্তু কৃতান্তর তত্ত্বকে হৃদয় মন আত্মা দিয়ে গ্রহণ করছি।' একটু থেমে নিরঞ্জন বললেন, 'তোমার ছলনার কথা ভেবে আমি মোটেই কাতর নই প্রতিমা। ঐ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আমার ছিল। এই উষালোকে আমার শুচিস্নান হচ্ছে। তুমি তোমার পথে যাও। আমি আমার পথে চললাম।'

নিরঞ্জনকে বাধা দেবার শক্তি প্রতিমা খুঁজে পেল না। সেদিন কারো পক্ষে তাঁকে বাধা দেওয়া সম্ভব হত না।

নিরঞ্জন শিশি তিনটে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে চললেন। অরণ্যের পর খাদ। ঐ খাদে দুর্গম উতরাইয়ের পথে নেমে এক ক্রোশ হেঁটে চরাইয়ে উঠবেন। তারপর পাক-দণ্ডির পথে পাহাড়ের সাড়ে তিন হাজার ফিট। শেষে দুর্গম পথে দুরধিগম্য শিখর। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছবেনই। প্রতিমা যাকে হলাহল বলেছে সেই অমৃত পান করবেন। তারপর অন্ধকার রাতের যবনিকার অন্তরালে মুণ্ডসর্বস্ব হয়ে ঐ পাহাড় চূড়ায় বসে সর্বদর্শী ত্রিকালবিদর্শী জ্ঞানদৃষ্টিতে সসাগরা পৃথিবীকে, লক্ষ কোটি সৌরলোককে দেখবেন। যেদিন এই হাতেখড়ি শেষ হবে অনন্তের সঙ্গে সংলাপে রত হবেন।

(শেষ)

সাহিত্যের খবর

গালিবের পাণ্ডুলিপি

কিছুদিন আগে মির্জা গালিবের স্বহস্তলিখিত ৬৬ পৃষ্ঠার এক পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে রামপুরে। এই পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি তাঁর প্রথম জীবনের লেখা বলেই অনুমান। মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর আগেই সম্ভবত এই সংকলনের রচনাগুলি লিখিত। গালিবের প্রথম পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৬৯-এর এপ্রিলে। সেটা পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশের ভূপালে। পরে এটা চোরাই পথে চালান হয়ে যায় দেশের বাইরে। এই ব্যাপারে গত জুলাইয়ে সংসদেও উঠেছিল আলোড়ন। মির্জা গালিব ছিলেন রামপুরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তিনি ছিলেন রামপুর নবাবের গৃহশিক্ষক। এবং পরে নবাবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন পেন্সনও।

দৃষ্টি-অনুভূতির বই

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের লিপজিগস্থিত অন্ধদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কিছু নতুন ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। যাঁরা পড়তে পারেন অথচ ভালো দেখতে পারেন না তাঁদের জন্যই মূলত এই ব্যবস্থা। প্রকাশিতব্য এই সব গ্রন্থের হরফগুলি হবে অনেক বড় ধরনের। এইরকম প্রায় ১৩০০খানি বই বের করার বার্ষিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেইখানে। ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আগে পুরোপুরি চলত ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায়। বর্তমানে তা চালাচ্ছেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। দু দুটো যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই পাঠাগারে বিশ হাজারেরও বেশি বই রয়েছে।

কিসের তরে বাড়তি মাশুল?

খবরটা বেরিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই, তবু সুরাহা হয়নি আজো। সবাই এব্যাপারে একরকম নীরব। কিন্তু কেন? ব্যাপারটা হচ্ছে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃটেনে প্রকাশিত গ্রন্থ কলকাতায় বিক্রি হত যেহারে মাত্র মাস কয়েক পূর্ব থেকে তার হার কোন কারণ না দেখিয়েই হঠাৎ বেড়ে গেল। ১ টাকা সমান ছিল ১ শিলিং, সেটা বদলে হয়ে গেল ১-১০ টাকা সমান ১ শিলিং। এই যে শিলিং প্রতি ১০ পয়সা বাড়তি নেওয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে সকলেই নীরব। প্রশ্ন শুধু, কিসের জন্যে পাঠকের ঘাড়ে এমন করে বাড়তি বোঝা চাপানো হল?
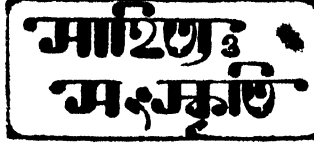
বাঙালীর ঘরে গান

আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও বাঙালী মধ্যবিত্ত বাড়িতে প্রতি শনিবার গানের আসর বসতে দেখেছি। সেইসব আসরে ঠুংরি, টপ্পা, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল প্রভৃতি গানের আসর বসত, প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলত সেই সব ছোটখাটো জলসা এবং অনেক ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ওস্তাদেরা এই সব আসরে যোগ দিতেন। আমরা দেখেছি রথযাত্রা ও হোলি উৎসবেও উচ্চাঙ্গের গানের শোভাযাত্রা হত। রথযাত্রায় কীর্তন হত বেশী, কিন্তু ধামার গানেরও প্রচলন ছিল। হোলির সময় হোলির গান গাইতে গাইতে পাড়ায় পাড়ায় ভদ্র যুবকদের মিছিল বেরোত, তাঁদের অঙ্গে থাকত শুভ্র আদ্দির পাঞ্জাবি যা অচিরাৎ লালে লাল হয়ে যেত, মাথায় আবির। এঁদের সকলের পকেটে থাকত সুগন্ধি আবির। হোলির গান যা মিছিলে শোনা যেত তার মধ্যে বেশ উচ্চতালের গানও শোনা যেত। সন্ধ্যার পর আসর বসত হোলির গানের। ধনী এবং মধ্যবিত্ত উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালীর ঘরে ঘরে মার্গ-সঙ্গীতের সমাদর ছিল। হায়রে সেকাল হায়রে—এখন আর এই জাতীয় কোনো কিছুর সংবাদ শোনা যায় না, কোথাও আছে কিনা জানি না।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণারত, সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিষয়ে তিনি সচেতন, তাই সাহিত্য রসসমৃদ্ধ এক অপূর্ব গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বিগত যুগের বাঙালী ঘরের সঙ্গীতচর্চার কিছু সংবাদ ধরে রেখেছেন তাঁর 'আসরের গল্প' নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদ রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো মনোজ্ঞ। কোনো ঘটনা কাল্পনিক নয়, সত্য ও তথ্য নির্ভর কাহিনীকে তিনি কাহিনীর আঙ্গিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাদুমণি, মহেশচন্দ্র সরকার, শ্রীজান বাঈ, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নবাবী কাসিম আলি খাঁ ও সরদী এনায়েৎ হোসেন খাঁ, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাওয়ালরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রাও ও অমৃতলাল দত্ত, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদ গোস্বামী, কৌকব খাঁ, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, আবদুল করিম খাঁ, পদ্মবাবু, মুরারিমোহন মিশ্র প্রভৃতি কত স্মরণীয় নাম। কত বিস্ময়কর জীবনেতিহাস এইসব গুণীজনদের আজ সবই প্রায় বিস্মৃতির অতলে লীন হওয়ার উপক্রম। এই গ্রন্থের লেখক অসামান্য অধ্যবসায়ে তা 'আসরের গল্পে' লিপিবদ্ধ করে রাখলেন, এর জন্য তিনি অভিনন্দনীয়।

যাদুমণি একজন বাঙালী বাঈজী, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরিতে পারদর্শিনী, তার ওপর নৃত্যপটিয়সী। বেতিয়া ঘরানার গুরুপ্রসাদ মিশ্র কলকাতায় থাকতেন, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গুরুপ্রসাদের শিষ্য। গুরুপ্রসাদের ঘরের গান আয়ত্ত করেছিলেন যাদুমণি। তাঁর দ্বিতীয় গুরু জগদীপ মিশ্র। তাঁর কাছে যাদুমণি টপ্পা, ঠুংরি এবং নাচ শিখেছিলেন। বারানসীর সারদাবাহার মিশ্রও তাঁর অন্যতম গুরু। গ্রেট ন্যাশান্যালের পাঁচজন অভিনেত্রীর তিনি ছিলেন অন্যতমা। সেই প্রথম স্ত্রীচরিত্রে মহিলারা অংশ নিতে শুরু করেন।

এই যাদুমণির কিন্তু জীবনে অন্ধকার নেমে এল। একটি রাতের বিপর্যয়ে তিনি একেবারে পথের ভিখারিনী হলেন। সি-আই টি-র জনৈক ইনজিনিয়ার সঙ্গীত-রসিক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এই প্রতিভাময়ীর জীবনের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়।

তিনি একদিন শুনলেন পথের ওপারে এক জীর্ণবসনা ভিখারিনী গাইছে—'দুঃখহরা আরা নাম তোমার—'

দুঃখহরা এবং তারা এই দুটি কথার ওপর টপ্পার তান। নগেন্দ্রনাথ বুঝলেন এ মহিলাটি সামান্য ভিখারিনী নন।

নগেন্দ্রনাথ অনেক জেরা করে নাম শুনলেন—যাদুমণি।

এ নাম তাঁর অজানা নয়। তিনি যাদুমণির কাছ থেকে তার জীবনের দুঃখের কথা সব শুনলেন। যাদুমণির কথা শুনে নগেন্দ্রনাথ বুঝলেন—একে শুধু সাময়িক সাহায্য করলে হবে না, একে স্বাভাবিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করতে হবে।

তিনি 'সঙ্গীত পরিষদ বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন—এই বিদ্যালয়ে কর্মীপরিষদের সভাপতি ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষ। অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকার লেখক ছিলেন, তিনি দেশবন্ধুকে যাদুমণির সংবাদ জানালেন এবং একদিন স্বয়ং ছুটে গেলেন সঙ্গীত পরিষদে যাদুমণির গান শুনতে।

লেখকের ভাষায়—যাদুমণির বর্ণনা—

"কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, হরিণ চর্মের আসনে বসে প্রবীণা গায়িকা।"

তারপর যাদুমণি গাইলেন চিত্তরঞ্জন-রচিত গান—"কোন তারেতে বাজবে বল ওগো প্রাণের বাজনদার—"

চিত্তরঞ্জনের গৃহে একবার যাদুমণির সঙ্গীত-অনুষ্ঠান হয়। সেখানে দেশবন্ধু-রচিত "তুমি যে আমার ফুলের মালা, তুমি যে আমার ফুলের কাঁটা" গানটি নানা সুরে গান করেন যাদুমণি।

অমৃতবাজার পত্রিকায়—১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এক সংবাদে প্রকাশ—

"Babu Krishna Chandra Ghosh then read his paper which was explained by practical demontrations ... another song by the Lady Vice-Principal— (Jadumani) of the Vidyalaya ——"

যাদুমণি রবীন্দ্রনাথের তিনটি গানও সুরে তালে গান করেছেন। যাদুমণির মৃত্যুর পর এক শোকসভা হয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে যে সভার সভাপতি দেশবন্ধু, বক্তা অমৃতলাল বসু ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশবন্ধু বলেছিলেন—"আমরা মানুষকে ঘৃণা করতে চাই না, আমরা চাই মানুষকে ভালোবাসতে—"

যাদুমণির কাহিনীটি একটি অসাধারণ উপন্যাসের মত মনোরম। অন্যদেশ হলে 'যাদুমণি'র জীবন থেকে একটি সুন্দর ছায়াচিত্র করা যেত।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এই ধারায় বিখ্যাত সঙ্গীত ও কলাবিদদের জীবনেতিহাস ও তাঁদের কর্মবিবরণ দিয়েছেন।

এই গ্রন্থের সর্বশেষে আলোচিত হয়েছে মুরারিমোহন মিশ্রের কথা। "একটি আশ্চর্য প্রতিভা ও অবিশ্বাস্য মৃত্যু" নামক কাহিনীটিও বিশেষ চমকপ্রদ।

মুরারি মিশ্রকে দরবারি তোড়ি গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুরারি জানেন না সে সুর। তবু শেষরাতে পিতার কাছে জোর করে শুনলেন সে গান এবং একরকম জোর করেই ১৯৩৪-এর নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের এলাহাবাদ অধিবেশনে সেই গান দুর্ধর্ষ ওস্তাদদের সামনে পরিবেশন করলেন। গান প্রশংসিত হল। পিতা মোহিনী মিশ্র অবাক। সামান্য কিছুক্ষণের শিক্ষায় একি সম্ভব।

এরপর আগ্রায় অধিবেশনে বাঙালী-বিরোধী মনোভাব প্রবল।

এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় মুরারি গাইতে বসলেন। প্রথমমুখে বাধা পেলেও শ্রোতারা শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা হলেন—'বীতরাগ' শ্রোতারা 'অনুরাগী' হয়ে উঠলেন। এই প্রতিভাবান গায়কের বয়স তখন কুড়ি-একুশ বৎসর। মুরারিমোহন রাগ-সংগীতের সঙ্গে দুখানি আধুনিক ও পল্লীগীতির রেকর্ডও করেছেন যখন স্কুলের ছাত্র সেই বয়সে।

মুরারিমোহন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন। ছাত্রজীবনে বি-কম পড়ছিলেন, সেই পাঠ সাঙ্গ করে গেলেন লক্ষ্ণৌর মরিস কলেজে তখন শ্রীকৃষ্ণরতন জনকার অধ্যক্ষ।

কাশীতে এক সংগীত সম্মেলনে যোগ দিয়ে লক্ষ্ণৌ-এ ফেরার পর মুরারি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠ দেহ শীর্ণ হয়ে গেল—ডাঃ শিব ভট্টাচার্য, ডাঃ বিধানচন্দ্র, ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ বিখ্যাত ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা করলেন। কিন্তু জীবনীশক্তি নিঃশেষিত।

একজন প্রচ্ছন্ন যোগী (অবাঙালী) মুরারিকে দেখতে এলেন। চিকিৎসা করলেন, এবং তাঁর চলে যাওয়ার পর রোগীর কিছু উন্নতি হল।

কিন্তু এক সপ্তাহ পরে আবার বিপত্তি ঘটল। সেই সাধু বললেন—

"তোম লোগোঁকো ওয়াস্তে মেরা জান চলা যায়েগা। উও লোগ হামসে আউর বড় গুণীন হ্যায়।"

এই বলে ধুনী থেকে জ্বলা কাঠ নিয়ে তাড়া করে এলেন। এই ভাববৈপরীত্য দেখে মুরারির আত্মীয়রা বিস্মিত। তাঁরা ফিরে এলেন। পরদিন জানলেন—সাধুর মৃত্যু হয়েছে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে।

মুরারি শেষ পর্যন্ত আর বাঁচেন নি। তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পরে মৃত্যুর রহস্যভেদ হয়েছিল নানা সূত্রে।

এই ঘটনাটির সঙ্গে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের পর বিহারের জামডোবা কয়লা খনি অঞ্চলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে আশ্চর্য ব্যাধি হয় তার অনেক মিল আছে। সুভাষচন্দ্র স্বয়ং এই ঘটনার কথা "মাই স্ট্রেঞ্জ ইলনেস" নামক প্রবন্ধে লিখে রেখেছেন, সেই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "মডার্ন রিভিয়ু" নামক বিখ্যাত পত্রে।

অলৌকিক কান্ডের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা আছে—অনেকে এই সব ব্যাপার নিছক ভ্রান্ত প্রাচীন মনোভঙ্গীর পরিচায়ক বলে মনে করেন। কিন্তু শেক্সপীয়র বলেছিলেন—হোরেসিও এমন অনেক জিনিস এ পৃথিবীতে আছে যা তুমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারো না।

'সঙ্গীতের আসরের' সমস্ত কাহিনী এমনই চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক আমরা মাত্র প্রথম ও শেষ কাহিনী দুটির পরিচয় দিলাম।

গ্রন্থটি সুমুদ্রিত এবং কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পীর দুষ্প্রাপ্য চিত্র সম্বলিত। প্রচ্ছদ খালেদ চৌধুরীকৃত।

—অভয়ঙ্কর

আসরের গল্প—(সঙ্গীত প্রসঙ্গ)—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক : আনন্দধারা। ৭৯।১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম—১২ টাকা মাত্র।

নতুন বই

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ। হেনা চৌধুরী। অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশান্স। ৫৫।১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য দশ টাকা।

শ্রীমতী হেনা চৌধুরী লিখিত 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ' গ্রন্থটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ। দেশবন্ধুর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতী চৌধুরী রচিত আলোচ্য গ্রন্থটি সেগুলির মধ্যে অন্যতম। লেখিকা 'সুভাষচন্দ্রের পত্র'কে গ্রন্থটির ভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করে গ্রন্থের মর্যাদা যেমন বাড়িয়েছেন, তেমনি জীবন ভাবনায় অভিনবত্ব এনেছেন। গ্রন্থের শেষে ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থপঞ্জী এই বৃহৎ গ্রন্থটির গবেষণার মান বাড়িয়েছে।

বাস্তবিকই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের এমন এক পর্বে আবির্ভূত, যে সময় তাঁর মত ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এমন কর্মমুখর, বহুবিচিত্র জীবন বাংলাদেশে বিরলদৃষ্ট। আঠারো শ' সত্তর সালের নভেম্বরে জন্ম, আঠারো শ' ছিয়াশি সালে এনট্রান্স পাশ—এর মধ্যবর্তীকালে যে ইলবার্ট বিল, সংবাদপত্রের উপর নিষেধাত্মক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দেয় সারা ভারতে, তারই প্রবাহে একদা দেশবন্ধু রাজনীতির আবেগে আন্দোলিত হন। তারপর থেকে তাঁর আ-মৃত্যু যে সংগ্রাম, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এমন অন্তরঙ্গ দেশপ্রেমিক, বক্তা, সেবক, কবি, দাতার যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা আলোচ্য গ্রন্থে। লেখিকা কোথাও দেশবন্ধুর সমসাময়িককাল, সমাজ-ভাবনা, অন্যান্যদের প্রভাবকে বিস্মৃত হন নি। অত্যন্ত নিরাসক্তচিত্তে রচিত লেখিকার এই গ্রন্থটি যথার্থ জীবনীগ্রন্থের মর্যাদা পাবে।

চেনাজানার বাইরে নয়—(ভ্রমণ-কথা) দণ্ডী মুখোপাধ্যায়। দি নিউ বুকস্টল। ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। বার টাকা মাত্র।

দণ্ডী মুখোপাধ্যায় এই নাম আগে কখনও শুনেছি মনে হয় না—অথচ 'চেনাজানার বাইরে নয়' গ্রন্থে তাঁর যা পরিচয় পাওয়া গেল তাতে মনে হয় তিনি শুধু সুদক্ষ নয় একজন কুশলী লেখক। লেখক ভারতের নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন এবং ভ্রমণকালে নিজের চোখ ও মন খোলা রেখেছিলেন, ফলে যা দেখেছেন তাঁর মধ্যে যা কিছু বিচিত্র মনে হয়েছে তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন। ঠিক ডায়েরী নয়, অথচ ডায়েরীধর্মী রচনা। রম্যরচনাও নয়। চরিত্র-চিত্রণে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ এবং তাঁর মনটি তরুণ। রসজ্ঞ লেখক যেসব ভাবভঙ্গী, আচার-আচরণের মধ্যে বৈপরীত্য এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন তাই ধরে রেখেছেন নিপুণ তুলিকায় সার্থকশিল্পীর অনায়াস ভঙ্গীতে। প্রতিটি কাহিনী সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তার অন্তর্নিহিত রসবস্তু অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। সব চরিত্রগুলি পরিচিত মনে হলে-লেখকের সেখানেই অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে চিত্র সংযুক্ত হয়েছে, ছবি-গুলি খারাপ নয় তথাপি আরো একটু বড় হলে হয়ত খুলত।

গ্রন্থটির মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়। লেখক এই গ্রন্থটির পর হাত গুটিয়ে বসে না থাকলেই ভালো করবেন। স্কেচ ধরনের রচনায় তাঁর পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া গেল।

কখনো দস্যু কখনো প্রেমিক। সুনীল বসু। প্রকাশক—রূপোঝুরি, ২২।বি, ল্যান্স-ডাউন প্লেস, কলকাতা-২৯। মূল্য দু'টাকা।

বর্তমান শতকের পঞ্চম দশকের কবি শ্রীসুনীল বসু। সমসাময়িক তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে তাঁকেও রাখা যায়। শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' থেকে শুরু করে শ্রীসুনীল বসু পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শহর কলকাতা ও মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কখনো দস্যু কখনো প্রেমিক' সেই পাঠের আকুতিকে তৃপ্ত করে।

একথা ঠিক, প্রায় সমস্ত কবিকেই নারী, দেহ, প্রেম, কামনা নানাভাবে নাড়া দেয়। কেউ এই বিষয় থেকে ক্রমশ বিষয়ান্তরে যান, কেউবা এই বিষয়কেই একমাত্র সত্য করে জীবন, জগতের বিবিধ বিচিত্র অর্থ-অনুসন্ধানে ব্রতী হন। শ্রীবসু তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে নারীকে প্রধান করেছেন। কিন্তু নারী কবির যাবতীয় প্যাশন, প্রেম, বাসনা, অনুভূতির কাছে একটি ভয়ংকর প্রতীক। কবি কাব্য সংকলনের কবিতা-গুলিকে তিনটি ভাগ করেছেন—'জাগুয়ার', 'রাই সরিষার ক্ষেত', 'কামক! কামক!' তিনটি বিভাগেই কবির নারীসম্পর্কিত কামনা-বাসনার সঙ্গে বিশেষ ভাবনা ব্যক্ত।

'কামক! কামক!' অংশে কবি শ্রীবসু তাঁর পূর্ববর্তী আসঙ্গলিপ্সা, ভোগ, দেহ-ভাবনাকে কিছু কৌতুক, কিছু শ্লেষ দিয়ে বোধহয় নিজ ভাবনারই এক নিপুণ সমালোচনায় নেমেছেন। 'প্রেমে ঘেন্না ধরে গেছে, পিত্তি গেছে জ্বলে' এই বলে আরম্ভ করে কবি অবশেষে জানিয়েছেন—'মিটিয়ে দাও হে সব সরাইখানার কর ও খাজনা।' তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবি শ্রীসুনীল বসু যে কবিভাবনায় আধুনিক, বর্তমান গ্রন্থ তা প্রমাণ করে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

লা পয়েজি (ষষ্ঠবর্ষ—প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক : বার্ণিক রায়। বেলগাছিয়া ভিলা, এম. আই জি স্কিম। ব্লক এক্স ফ্ল্যাট-১। কলকাতা-৩৭। দাম : এক টাকা।

সাহিত্যের দ্বিভাষিক ত্রৈমাসিক লা পয়েজির বর্তমান সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ পাবলো নেরুদার কবিতার অনুবাদ, কবিতা সম্পর্কে নেরুদা এবং নেরুদার ওপর লেখা একটি প্রবন্ধ। সালভাতোর কোয়াসিমোদোর কবিতা অনুবাদ করেছেন অপূর্ব মুখোপাধ্যায়। কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, দিব্যেন্দু পালিত, শিবশম্ভু পাল, মলয়-শংকর দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রত্নেশ্বর হাজরা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, বার্ণিক রায়, শংকর দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র দত্ত, সমীর রক্ষিত, দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। রোমান হরফে বেশকিছু বাংলা কবিতা ছাপা হয়েছে বর্তমান সংখ্যায়।

মধ্যাহ্ন—সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য। ৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম : দু টাকা।

মধ্যাহ্নের বর্তমান ল্যাটিন আমেরিকা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংখ্যাটিকে সুধী পাঠক সমাজ সাদরে গ্রহণ করবেন। ল্যাটিন আমেরিকার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, বিদেশী শোষণের অভিশাপে সমগ্র দেশটি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে আবর্তিত। বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত এই বৈচিত্র্যময় অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এদেশের পাঠকসমাজের জ্ঞান খুবই সীমিত। অথচ আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ল্যাটিন আমেরিকাকে নিয়ে চলেছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতে। সম্পাদক দুজন দীর্ঘ পরিশ্রমে বর্তমান সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন। ল্যাটিন আমেরিকার ছোট গল্প, নাটক, সিনেমা, চিত্রশিল্প, উপন্যাস, সঙ্গীত, কবিতা এবং কিউবান সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন অচ্যুত গোস্বামী, দিলীপকুমার মিত্র, দীপেন্দু চক্রবর্তী, বিশু চৌধুরী দিলীপ মুখোপাধ্যায়, বিজয় দেব, হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং শৈলেন্দ্রনাথ বসু। ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকজন কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শান্তিকুমার ঘোষ, আলোক সরকার, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, শিবাজী গুপ্ত, গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ বসু, বিষ্ণু ভৌমিক, ইন্দ্র সাহা এবং অর্ধেন্দু বিশ্বাস। আশিস সেনগুপ্ত একটি গল্প এবং ভবেশ দাস একটি একাঙ্ক নাটক অনুবাদ করেছেন। কয়েকটি স্কেচ সংখ্যাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সম্পাদিত রচনাগুলির মধ্যে আজকের ল্যাটিন আমেরিকার অস্থির মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে।

কবিপত্র—সম্পাদক : তুষার চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ২২।বি প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা—২৬। দাম : এক টাকা। (২৪ সংকলন)।

দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত এই কবিতার পত্রিকাটি তরুণ কবিদের একটি প্রধান আশ্রয়। পরীক্ষানিরীক্ষা ও সাহিত্যা-লোচনায় এর বৈশিষ্ট্য আছে। এ সংখ্যায় পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মহাকবিতার সময়'-এ তার নিদর্শন মিলবে। দীর্ঘ কবিতার বিষয়ে লেখক যা বলেছেন তা চিন্তা করার বিষয়। অন্যান্য রচনা ও কবিতা লিখেছেন : অনন্য রায়, তুষার চৌধুরী, মনোজ নন্দী, অলোক বন্দ্যো-পাধ্যায়, অরুণাভ দাশগুপ্ত, অঞ্জন কর, গৌতম গুহ, অনন্ত দাশ, সুকোমল রায়-চৌধুরী, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক সরকার এবং আরো কয়েকজন।

কৃশানু (কার্তিক-পৌষ)—**সম্পাদক :** দীনেশচন্দ্র সিংহ। ৯৪, বিবেকানন্দ রোড। কলকাতা-৬। দাম : এক টাকা।

মননশীল সাহিত্য-ত্রৈমাসিক কৃশানুর বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন তুষার বন্দ্যো-পাধ্যায়, প্রশান্ত রায়, গোপাল ভট্টাচার্য, বিজয় মিত্র, ধ্রুব বসু, অশোক হালদার, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সিংহ এবং আরো কয়েকজন।

ছুঁতে-নাহি-ছুঁতে ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

খেলাপাতি, সাজানো সংসার
ফেলে
এসে দ্যাখো কাঁটাতার
রোধ করে আছে পথ,
পারাপার নেই ঘাটে।
রাজ্যচ্যুত বীর কেউ—কারো বীরাঙ্গনা পাশে,
নতমুখ যাত্রী চলে তিমির-মন্দিরে।

শুনেছো কি বিষাদ রাগিণী বাজে উন্মুক্ত প্রান্তরে...
মূর্তিমতী দুঃখ এক :
অগ্নিপরীক্ষায় সীতা দ্বিগুণ উজ্জ্বল;
জ্বলন্ত অগ্নির পাশে শপথ ঘোষণা।

পারঘাটে সন্তর্পণে হন্তারক নামে তার
দুই হাত ধুতে :
নদীর গেরুয়া জল দ্যাখো রাঙা হয়ে ওঠে
ছুঁতে-নাহি-ছুঁতে।।

কোথাও যাবনা আর ॥

জয়তী রায়

কোথাও যাব না আর :
জনারণ্যে অথবা একাকী,
মিছিলের কোলাহলে, বন্ধু সমারোহে,
অথবা একাকী কোন সৌখীন সভায়।
এখন হৃদয়ে স্থিত
সুস্থির বিষন্ন এক তারার সান্নিধ;
অবিচল, অবিকল আলো—

মগ্ন হব আলোর গভীরে।
কোথাও যাব না আর
জনারণ্যে অথবা একাকী—
কিছু কিছু খুঁজে পাব এ আশায়
বাড়িয়েছি হাত কতবার,
তুমি তো কাছেই আছ এই কথা ভেবে
ফুটিয়েছি রক্তগোলাপ:
সুন্দর অংকুর ক্রমে শুকিয়ে শিকড়।

তোমার সুঠাম হাত হারিয়েছি আমি
অবিবেকী চেতনার অন্ধকারে—
তোমার সুন্দর মুখ ছায়ার মতন
ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গেছে।

সময়ের নদী অতি দ্রুত কূল ভেঙে চলে,
অতি দ্রুতে দিন বদলায়,
যে দিন গিয়েছে দূরে
ফিরে ফিরে ডেকে লাভ নেই—
এখন একান্ত একা মগ্ন হব আলোর গভীরে।

আমার সোনার বাংলা

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অসবর্ণ কবিতার অবিভাজ্য সুর,
মৃত্যুহীন ভাবনার ভাঙছি চড়াই!
শুনেছে দুষ্মন্ত-মন আমার বড়াই,
কালের সারথি চালু চিরায়ু চাঁদায়।

তারপর নানা কণ্ঠ হয়েছে একক :

মিলে-মিশে এক সাপ এক শঙ্খচূড়!
দূরতায় পথে যেতে মিলেছিল কুড়।
সীতার প্রশান্ত চোখে দৃষ্টি অপলক!

সে-সীতাও পড়ে গেল প্রধানের চোখে :
শরণার্থী শিবিরে সে নির্গ্রন্থ ভূমিকা।
টেপ ঘোরে বিশ্বক্রতু যত চলে বকে,
শুদ্ধ এ মাটির প্রাণ আকাশ-পর্ণিকা।

অসবর্ণ কবিতা কী নিয়মনিষ্ঠুর!
আমার সোনার বাংলা, প্রণাম তোমায়!

॥১০॥

পরের দিন রামধনকে দিয়েই খবর পাঠাল হেমন্ত : এই দুটো দিন পর পর সংক্রান্তি আর মাস পয়লা পড়ল, তার ওপর [illegible]—এগুলো কাটিয়ে তরশু শুক্রবার সে বাড়ি ফিরবে। এখান থেকে খেয়ে-দেয়েই যাবে অবশ্য, বেলা দুটো তিনটে হবে পৌঁছতে। ঝি যেন ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখে, আর এক ফাঁকে যেন ঠাকুরকে খবর দেয়—যাতে সে শুক্রবার বিকেলে এসে পড়ে। পাশের বাড়ির দত্তবাবুদের ঠাকুরকে বললেই সে খবর পাঠিয়ে দেবে।

সেই যে গেল রামধন আর ফিরল না। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর ক্রমশ বিকেলে গড়িয়ে গেল—মানুষটাও এল না, কোন খবরও না।

হেমন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এমনি সাধারণ উদ্বেগ নয়—কেমন এক ধরনের অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তা। রামধনকে যখন কথাগুলো বলে দিচ্ছে তখনই মনে হয়েছিল যেন মুখটা শুকিয়ে গেল তার। হেমন্তর মুখের দিকে চাইতে পারল না, এদিক ওদিক—মাটির দিকে—তাকাতে লাগল, বার দুই 'আজ্ঞে' 'যে আজ্ঞে' বলে এক রকম পালিয়েই গেল সামনে থেকে।

ঠিক তখনই অতটা ভাবে নি। লক্ষ্য করা যাকে বলে তা করে নি। আচরণটা কেমন যেন—এইটুকু শুধু মনে হয়েছিল। তাও খুব অস্বাভাবিক বলে তখনই অতটা বুঝতে পারেনি। ক্রমশ অনুপস্থিতিটা যখন কোনরকম সম্ভাব্য কারণ ছাড়িয়ে দীর্ঘ হয়ে উঠল, বার বার জানাশুনো তার সমস্ত আড্ডাতে খোঁজ করেও কোন খবর পাওয়া গেল না, তখনই সে সময়কার আচরণের দুর্বোধ্যতাটা মনে পড়তে লাগল। আস্তে আস্তে মনের মধ্যে মিলিয়ে দেখে মনে হল ভাবভঙ্গীটা আদৌ স্বাভাবিক নয়, এবং সেটা বুঝে তখনই একটু সচেতন হয়ে ওঠা উচিত ছিল।

শেষে সন্ধ্যা হয়ে আসতে বাড়ির অপরাপর লোকও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। পূর্ণবাবু শুনে বললেন, 'মোহনকে তোমাদের বাড়ি পাঠাও আগে, দ্যাখো সেখানে কোন বিভ্রাট বেধে বসে আছে কিনা!'

মোহন ওঁদের পুরনো চাকর, এখন দারোয়ান-বাজার সরকারের পদে উন্নীত হয়েছে।

মোহন খবর নিতে গেল কিন্তু সে ফিরল না।

সে জায়গায় কাঁদতে কাঁদতে এল হেমন্তর ঝি। মোহনকে বসিয়ে সে এসেছে। গোরা এসেছে ইস্কুল থেকে, সে কার কাছে থাকবে—তাই এতক্ষণ আসতে পারেনি।

আসল কথা মনোরমাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

রামধন সকালে গিয়েছিল একবার—অনেকক্ষণ কী সব কথা হয়েছে তা ঝি জানে না—সে তখন কলতলায় ছিল—তার পর দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু আঁচলটা বিছিয়ে চোখ বুজেছে, উঠে দেখে নিচের সদর দরজা ভেজানো—মনোরমা নেই। কোন ঘরেই নেই। সেই থেকে এখনও তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি। ছেলেটা এসে ক্ষিদেতে কাঁদছিল—কে রাঁধে কে খেতে দেয়—ঝিই সামনের দোকান থেকে দুটো মিষ্টি কিনে এনে খাইয়েছে, তারও পয়সা দেওয়া হয়নি—টাকা-পয়সা তো সব বৌদির কাছে থাকে, কোথায় থোয় কি করে ঝি সে সব জানে না। ইত্যাদি—

হেমন্তর মুখ শুনতে শুনতে অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছিল। ক্রমশ তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। ওর মেজাজ সম্বন্ধে এতদিনে কিছু ধারণা হয়ে থাকলেও এ চেহারা কখনও দেখেনি ঝি, সে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

হেমন্তর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার জেরাতে বলেও ফেলল সে অনেক কথা।

অন্তর্যামীর মতো প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উত্তরটা এগিয়ে দেয়—সেখানে মিথ্যা কথা বলাও যায় না বেশীক্ষণ।

'এর মধ্যে ওদের খালি বাড়িতে রেখে তুই কদিন গিয়েছিলি পাড়া বেড়াতে? সন্ধ্যে-বেলা পান-দোক্তার ছুতো করে মল্লিক বাড়ির গিন্নি ঝিয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতিস কতক্ষণ ধরে? ঠিক করে বলবি, সত্যিকথা—এসব কথা ছাপা থাকবে না—গিয়ে আমি বার করবই, কোথায় কতক্ষণ করে থাকতিস—তার পর তোর একদিন কি আমারই একদিন, জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নোব, কোন বাবা তোর রুখতে পারবে না।......ভাল চাস তো সত্যি কথা বল!'

এর পর আর মিথ্যে কথা বলতে সাহস হয় না। সত্যি কথাই বলে সে। সব স্বীকার করে।

একদিন দুদিন নয়, এর মধ্যে অমন অনেকদিনই বেরিয়ে গেছে সে। বাবুর বাড়ির লোক, পুরনো বিশ্বাসী লোক—তাকে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েই গেছে। এর মধ্যে কোন বিপদের কথা আছে ভাবেনি। বামুনের মেয়ের এত ছোট পিরবিত্তি হবে তাও মনে করেনি। এখন কিন্তু সব মনে পড়ছে ওর—কোন কোন দিন মনোরমাই পাঠিয়েছে ওকে—নানা ছুতোনাতায়। কিম্বা ওর ওপর 'আত্তিশো' দেখিয়ে—'যাও না একটু, পানদোক্তা কেনাও হবে, অমনি ফাঁকে একটু ঘুরেও আসা হবে। দিনরাত বন্দী হয়ে থাকা তো!' —তখন অত কিছু বুঝতে পারেনি ও, আজ বুঝছে যে সবটাই ওকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবার ছুতো।

আরও আছে।

কবে কি ধরনের কথা কানে গেছে, টুকরো টুকরো কথা, কী রকমের রসিকতা হাসিমস্করা, চোখে চোখে ইশারা। তখন অত কিছু ভাবেনি সে সাতপাঁচ তাই। এমন যে সম্ভব, এও যে হতে পারে, তাও মাথায় আসেনি। ছোট জাত ছোট কাজ করে—উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলে চলে যাওয়ার কথা যার, ভদ্রলোক বামুনের ঘরে যার রোয়াকে ওঠার অধিকার নেই, তার সঙ্গে যে—না না, একথা কী করে বুঝবে সে?

'মাইরি মা, এই কালীঘাটের কালীর দিব্যি, সত্যি বলছি!'

কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে হেমন্তর দুই ঠোঁটের ভঙ্গী।

শান্ত ব্যঙ্গের সুরে বলে, না, তুমি তা বুঝবে কেন, তুমি এক বছরের শিশু—তোমার মাথাতে এসব কথা ঢোকে কখনও। এইতো এখন যে সব কথাগুলি বলছ—এই ধরনের কথা হয়েছে—তুমি কিছু বুঝতে পারনি। এত সরল তুমি? সবে জন্মেছ, না? তবে আজ বুঝলে কি করে যে কথা গুলো গর্হিত? আজ যে মানেটা মাথায় আসছে সেদিন তার কিছু বুঝতে পারোনি? কোন মনিবের ঘরের বৌ, তার চাকর—তাও বাড়িতে কাজ করার লোক নয়—আস্তাবলের সইসের সঙ্গে এইভাবে কথা কয় শুনেছিস কখনও? তুই-ই তো বলছিস ওদের রোয়াকে উঠতে দেয় না। তবে? এতেও তোমার মন

…ে না?—আসলে তুমিই কুটনীগিরি করে ঘটিয়ে দিয়ে মজা দেখেছ।—দাঁড়াও, বাড়ি …ই আগে তোমার মায়াকান্না বার করছি।

তারপর ঘরে ঢুকে পূর্ণবাবুকে বলে, …েনেছ তো সব? এখুনি তো যেতে হয়। …র্পাতিবার মানতে গেলে তো আর চলবে না!'

না, না, তুমি যাও রাত্তিরে বার-দোষ …কে না। বরং মোহনকে নিয়েই যাও, …কার হয় এক-আধদিন রেখেও দিতে …রবে। মনে হয় এখানে তার জন্যে কিছু …টকাবে না।'

…ও ঝিকে যে আর রাখবে না সে তো …ঝতেই পারছি।'

'ওকে আবার রাখব! গিয়েই বিদেয় …ব ব্যাটা মেরে। তবে সে জন্যে মোহনকে …টকে রাখার দরকার হবে না। ও শুধু …দ গিয়ে একবার করে সকাল বিকেলে …জ নেয় তাহলেই হবে। তারপর—দু এক-দিনই লোক ঠিক করে নেব। ঠাকুর তো …ছেই।'

যাবার আগে পূর্ণবাবু আর একটি …পদেশ দিলেন, 'যদি ছেলেটার ওপর মায়া …ড়ে থাকে, ওকে পালতে চাও, এখানে …ড়িতে রেখো না। কোন মিসনারী ইস্কুলের …স্টেলে রেখে দেবার ব্যবস্থা করো। …-চাকরদের ওপর ভরসা করে থাকলে …ন মানুষ হবে না। তুমি তো এখন …রে বেটাছেলে—বিশেষ ব্যবসাদার, …নি পারবে না দেখতে, ঝি-চাকরের কাছেই …বে বেশির ভাগ—একেবারে বাঁদর তৈরী …বে।

…েখ। তুমি তো ওঠো আগে। যা ব্যবস্থা …তে হয় তোমাকেই করতে হবে। আমি …র কি জানি বলো, কোথায় কি খোঁজ-…র করতে হবে না হবে সেসব তুমিই …নো।'

পূর্ণবাবুই ব্যবস্থা করে দিলেন। …পুরো সেরে ওঠা পর্যন্ত—অপেক্ষাও …রতে হল না। কারণ তাতে অনেক দেরি …বে, এই বয়েসে এতবড় অসুখটার …ল সামলে ওঠা সময়সাপেক্ষ, সেটা …ক্তার হিসেবে উনি নিজেই বুঝেছিলেন। …কটি ছাত্র—এখন বড় ডাক্তারকে বলে …লেন, সে-ই বাছাবাছা কয়েকটা ইস্কুল …ঠি দিয়ে যোগাযোগ করল।—

হেমন্ত চেয়েছিল কলকাতার কাছাকাছি …থাও রাখতে, তেমন কোন ভাল ইস্কুল …ওয়া গেল না। দার্জিলিং আর রাঁচি, এই …জায়গা থেকে উত্তর এল, তাঁরা নিতে …জী আছেন। দুটোই ভাল ইস্কুল। এ …টা না পাওয়া গেল—পূর্ণবাবুর পছন্দসই …ল। উনি এসব ব্যাপার হেমন্তর চেয়ে …র বেশী বোঝেন—সুতরাং কেউ কোন …র্ক করল না বা জেদ করে কলকাতাতেই …খার চেষ্টা করল না।

তবে দার্জিলিং সে পাঠাবে না …ছুতেই। ঐ নামটাই তার কাছে অপ্রীতি-…র—সেখানে পাঠানোর কোন প্রশ্নই ওঠে …। সুতরাং রাঁচীতেই পাঠাবে স্থির করল। মাস চারেক পরে সেসন্‌স্‌ শুরু হবে—সেই সময় কেউ গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এই ক-মাস গৌরকে নিজের কাছে রেখে হেমন্ত বুঝল পূর্ণবাবুর উপদেশ কত মূল্যবান। এখন একেবারে শিশু নেই, বছর সাত আট বয়স হয়েছে—তবু দায়িত্ব অনেক। ইস্কুলের সময়গুলো ছাড়া অষ্টপ্রহর বাড়িতে আটকে থাকতে হয়। নতুন ঝি বা ঠাকুর কারও ভরসাতেই একা রেখে যাওয়া যায় না। একদিন বিশেষ কাজে বেরোতে হয়েছিল, যাতায়াতে মাত্র ঘন্টা দুই সময় গেছে। তার মধ্যেই বাড়ি এসে দেখল হৈহৈ কান্ড। মনিবের অনুপস্থিতির সুযোগে ঠাকুর বেরিয়েছিল সামনের বাড়ির ঠাকুরের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে আসতে—তারই মধ্যে কখন কোন ফাঁকে ভেজানো কপাট খুলে গৌর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, কেউ লক্ষ্যও করেনি।

অনেকক্ষণ পরে ঝিয়েরই প্রথম লক্ষ্য হয়েছে যে খোকা নেই। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে খবর দিয়েছে ঠাকুরকে—ঠাকুর ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে সময় নষ্ট করেছে খানিকটা—তারপর পাড়ার ছেলেদের জানিয়েছে। তারা চারিদিকে ভাগ হয়ে বেড়াজালের মতো খুঁজতে খুঁজতে চাঁপাতলার বাজারের কাছে এক ময়রার দোকানে দেখতে পেয়েছে বসে থাকতে।

তারাই ধরে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, কিন্তু তখনও যায়নি, সম্ভবত হেমন্ত এলে সব জানিয়ে জিম্মা করে দিয়ে যাবে বলেই দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। সেই সময়েই হেমন্ত ফিরেছে। দরজার সামনে অত ভীড় দেখে প্রথমটা ভয়ে বুক কেঁপে গিয়েছিল তার। নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, আর ঘটলে কারই বা ঘটবে—গৌরের ছাড়া? যাই হোক—ব্যস্তভাবে ভীড়ের মধ্যে উঁকি মেরে, তাকেই শুকনো মুখে আসামী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—একটু তবু আশ্বস্ত হল। পরে ভেতরে এসে শুনলও সব ব্যাপারটা তখনই আগে দু-টাকার রসগোল্লা আনিয়ে ছেলেগুলোকে প্রাণপুরে মিষ্টি খাইয়ে দিল *. তারপর ঝি ঠাকুরকে খুব একচোট বকাবকি করল।

এর বেশী কিছু করার নেই। ফী হাত এই ধরনের ঘটনায় তাড়িয়ে দিতে গেলে কিছুদিন পরে আর কাজ করার লোকই পাওয়া যাবে না। ঝি চাকরের ওপর ভরসা করে থাকলে এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে, তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী দায়িত্ব-জ্ঞান আশা করা ঠিক হবে না। তাদের কি গরজ? যাদের নিজেদের প্রাণের টান নেই—সে সদা জাগ্রত সদাসতর্ক হয়ে বালক কি শিশুকে পাহারা দিতে পারবে না কিছুতেই। কোন অর্থ বা পারিশ্রমিকের বিনিময়েই না। যার গরজ আর দায়িত্ব থাকার কথা— সেই তো অনায়াসে ভাসিয়ে

* সে সময়, সে সময় কেন ১৯৪০ পর্যন্ত কলকাতায় সাধারণ দোকানে এক পয়সায় একটা ভাল আকৃতির রসগোল্লা পাওয়া যেত। আর দু পয়সার গুলো (বর্তমান ৩ নয়া পয়সা) এখনকার চার আনা সাইজের থেকেও বোধ করি বড় হ'ত।—লেখক

দিয়ে চলে গেল ছেলেটাকে নিতান্তই নিরংসো চারত্রাথ করতে!

এর মধ্যে মনোরমার খবরও পাওয়া গেছে।

হেমন্ত অবশ্য খবর নিতে যায় নি—কিন্তু এসব খবর আপনিই আসে—যেন বাতাসে ভর দিয়ে এসে যথাস্থানে পৌঁছয়।

হেমন্তদের পাশের পাশের বাড়ির ঝি-এর কে এক বোন কাজ করে বালিগঞ্জের দিকে—হেমন্তর বালিগঞ্জের বাড়ির পাড়াতেই—সে-ই খবর এনেছে, ঝিয়ের মুখে মুখেই এসেছে—সেখানে নাকি এক বিরাট দাখি কাটানো হচ্ছে, ওদের ভাষায় 'অজগর পুকুর' একটা—রামধন নাকি সেইখানে মাটি কাটার কাজ করে, 'রোজ' পায়। রীতিমতো সংসার পেতেছে ওরা, পূর্ণবাবুদের বাগানবাড়ির কাছে রেল লাইনের ধারে এক বস্তির মধ্যে জমি ভাড়া করে নিজেদের খরচায় মাটির ঘর বেঁধেছে।

সম্ভবত মনোরমার গলায় যে সোনার হারটা ছিল, তাছাড়া চার গাছা চুড়ি—হেমন্তই দিয়েছিল, সেইগুলো বেচেই ঐ ঘর উঠেছে। হয়ত তাছাড়াও দেনা কিছু হয়েছে, কারণ শোনা যাচ্ছে যে ভারী পেট নিয়েও মনোরমা পাড়ায় কাদের বাড়ি ঠিকে কাজ করতে যায়—বাসনমাজা ঘর মোছার কাজ—মাসিক আড়াই টাকা মাইনেয়।

প্রথমটা অস্পষ্টভাবে, উড়ো উড়ো কথায়—মানে ওর ঝি একে সোজাসুজি খবরটা দিতে সাহস করেনি, ইশারায়-ইঙ্গিতেই একটু আধটু যা জানিয়েছে—নতুন ঝি মনিবের কড়া মেজাজ কতদূর কড়া এখনও তার হিসেবটা পুরো বোঝেনি—তারপর সব কথাই কানে গেছে হেমন্তর। কিন্তু কে জানে কেন, কুরুচির জ্বালা একটু জ্বালাবোধ হলেও খুব একটা উষ্মা বোধ করে না সে। এই প্রবৃত্তি যে কত প্রবল তা ওর থেকে বেশী আর কে জানে। কার বিচার করতে যাবে সে নিজের লজ্জাজনক ইতিহাস নিয়ে! তাছাড়া—এতদিনে এটা বুঝেছে, সংসার পাতার ইচ্ছা আরও প্রবল। কামের থেকে সেই কামনার আকর্ষণ অনেক, অনেক বেশী।

সেটা যে কত প্রবল তা নিজের আচরণেই আরও একবার বুঝল।

হঠাৎ—গোরাকে রাঁচী পাঠাবার মাস-কতক বাদে—কোথা থেকে নিমাইচরণ আবার এসে হাজির হল।

সেই রকমই বেশভূষা—আধময়লা কাপড়ের ওপর ফরসা লংক্লথের পাঞ্জাবী একটা। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, খাড়ওড়া চামড়া হাত পায়ের—তফাতের মধ্যে এবার আর হাতে গামছায় বাঁধা পুঁটুলি নয়, একটা নতুন ক্যাম্বিসের ব্যাগ। তাতে এক প্রস্থ কাপড়-জামা, একখানা গামছা এবং কয়েকটা চালতা ও গোটাকুড়ি সুপারি।

তবে সে তো পরের কথা, থিতিয়ে জিরিয়ে বসে ব্যাগ খোলার পর বোঝা গেল তার রহস্য। তার আগে তার আসাটা এবং সেটা যেমন আকস্মিক তেমনি নাটকীয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেই, কোন কথা বলা কি কুশল প্রশ্নের অবসর পাবার আগেই, ব্যাগটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে একেবারে হেমন্তর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল বলতে গেলে।

'এই এলুম মা জননী জ্যাঠাইমা তোমার চরণে চিরদিনের মতো। মারো কাটো ফাঁসী দাও, লাথি মারো জোড়া জোড়া—একটা কথাও বলব না, তোমার পা ছেড়ে নড়ব না কোথাও। খেতে না দাও, না খেয়ে মরি এখানেই মরব। এইখেনেই আমার আসল আছয় বেশ বুঝেছি।'

মুখ চলছে বলে হাত বসে নেই—কথা বলতে বলতে হেমন্তর দুটো পা সজোরে চেপে ধরেছে ততক্ষণে।

ঘটনাটার আকস্মিকতা সামলাতে ও সম্যক বুঝতে যেটুকু দেরি হয়েছিল, তার-পরই—আরও এই নাটুকেপনায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল হেমন্ত। ইদানীং মেজাজ ও রসনা দুই-ই যথেষ্ট উগ্র ও রুক্ষ হয়ে উঠেছিল—শ্বশুরকুল সম্বন্ধে তিক্ততাও বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন—সুতরাং যা মুখে এল তা-ই বলল ওকে—কোন গালাগাল দিতে কোন কটু কথাই বোধহয় বলতে বাকী রইল না, দৈহিক আঘাত ছাড়া সব লাঞ্ছনাই বর্ষিত হল সেই শ্বশুরবংশের প্রতীক ও প্রতিনিধি এই নিমাইচরণের ওপর,—কিন্তু নিমাই মূর্তিমান সাহিষ্ণুতার মতো সমস্তই সহ্য করল। তাও বাধ্য হয়ে ম্লাননত মুখে নয়—যেন গালিগালাজ ও কটুক্তির মালা নয় ফুলের মালা পরিয়ে ওকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। এমনি সপ্রতিভ ভাবেই শুনে গেল সব, মুখের স্মিত প্রসন্নতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হল না।

বহুক্ষণ ধরে নিজের শ্বশুরকুলের ঝাড়গুষ্টি সম্বন্ধে বাছাবাছা বিশেষণ প্রয়োগ করতে করতে নিজেই একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। উপরন্তু এই ছেলেটার শান্ত প্রতিরোধের ধর্মে প্রতিহত হয়ে শেষের দিকে গালাগালগুলোর ধারও কেমন যেন ভোঁতা হয়ে এল —সেটা বুঝেই আরও একসময় চুপ করে গেল, বাধ্য হল চুপ করতে।

তবে, এত কথা বললেও, 'দূর হয়ে যাও' বা 'তোমাকে থাকতে দেব না' একথাটা এক-বারও বলতে পারল না। আর তা বলতে পারল না বলেই নিমাইচরণের নিশ্চিন্ত প্রশান্তিও নষ্ট হল না। সে রয়েই গেল, সেদিন থেকে, বরং দিন দুই পরে হেমন্ত-কেই বেরোতে হল তার জন্যে একজোড়া ধুতি ও একটা নতুন জামার ব্যবস্থা করতে।

অর্থাৎ অবাঞ্ছিত আগন্তুক পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল সংসারে। অতিথি নয়—গৃহস্বামীর আত্মীয় সম্পর্কেই।

পূর্ণবাবু সব বিবরণ শুনে বললেন, 'আবার ঐ জঞ্জাল জড়োচ্ছ! এখনও তোমার চৈতন্য হল না!'

'চৈতন্য হল না কে বললে। এ আমার স্নান পাপ। এই তো আমার আসল শোধ! যে শ্বশুর বাড়ি থেকে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই শ্বশুর বাড়ির লোকই অন্নদাস হয়ে থাকছে।'

পূর্ণবাবু হাসলেন শুধু একটু।

অশান্তির ভয়েই আসল কথাটা বললেন না। নইলে অনেকবারই মুখের কাছে এসেছিল কথাটা যে 'আসলে তোমার সংসার পাতার শখ!'

তবে তিনি না বললেও ও হাসির মর্ম হেমন্তর কাছে অজ্ঞাত রইল না।

নিজের কাছেই কি ছাপা ছিল কথাটা?

এ পৃথিবীকে ও অনেকদিন দেখছে অনেক রকম করে। নিজের মনের কথা নিজের কাছে ধরা না পড়ার কোন কারণ নেই।

(ক্রমশ

ভারতে বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যাঙ্কের ভূমিকা

সমর দত্ত

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে বেকার মানুষের সংখ্যা ছিল ৫-৩ মিলিয়ন: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৭-১ মিলিয়নে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা ৯-৬ মিলিয়নে পরিণত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলে এদেশের বেকার লোকের সংখ্যা এবং নতুন কর্মসংস্থানের পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ কোনপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ নাই। কারণ পরিকল্পনা কমিশনের মতে বিগত তিনটি পরিকল্পনার কাগজপত্রে ভারতবর্ষের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি খুব নির্ভরযোগ্য নয়। যাইহোক এবিষয়ে ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির সভাপতি অধ্যাপক দান্তওয়ালা এবং এই কমিটি দান্তওয়ালা কমিটি নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের বেকার কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা নিরূপণে এই দান্তওয়ালা কমিটি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে সেটি পূর্বতন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক। এই কমিটির হিসাব অনুসারে এদেশের বর্তমান বেকার মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৬ মিলিয়ন। এই কমিটি এই মত পোষণ করে যে নিত্য নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বর্ধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যদি কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ আনুপাতিকভাবে বর্ধিত না হয় তাহলে এই সংখ্যা অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পেয়ে এক সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে তুলবে।

ইতিপূর্বে একথা বলা হয়েছে যে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সর্বস্তরের মানুষই আজ বেকারত্বের জন্য দিশাহারা। কিন্তু সম্প্রতিকালে শিক্ষিত মানুষের বেকারত্বই সমাজজীবনে অত্যধিক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বেকারীর ব্যাপারে শিক্ষিত বলতে ম্যাট্রিকুলেশন অথবা উচ্চতর ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তিগণকে গণ্য করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৮-২ মিলিয়ন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে ১-১ মিলিয়ন শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ বছরে বেকার ছিল। এই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৯৬১ সালের তুলনায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৭ সালে উল্লিখিত সংখ্যায় অর্থাৎ ১-১ মিলিয়নে পরিণত হয়। শিক্ষিত বেকার ব্যক্তির মোট সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ ভারতবর্ষের পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই রাজ্যগুলি:—পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরালা ও বিহার।

ভারতবর্ষের প্রতি ৩ জন ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে ১জন হয় বেকার না হয় অর্ধ বেকার। বর্তমানকালে মোট ৩ লক্ষ ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে প্রায় ৬৫০০০ ইঞ্জিনীয়ার কর্মহীন। চতুর্থ পরিকল্পনা শেষ হলে এদেশে মোট ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৫ লক্ষ। এর মধ্যে ১ লক্ষ ইঞ্জিনীয়ার কর্মলাভে অক্ষম হবে। প্রতি বছর ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রীধারী এবং ডিপ্লোমাধারী যুবকগণের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে প্রতি ৫ জন ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে ১ জন কর্মহীন থাকবে। অবশ্য যদি ইতিমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সম্যক উন্নতি হয় তাহলে এই অবস্থার উন্নতি ঘটা অসম্ভব নয়। তবে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনোলজিক্যাল ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমাধারী কর্মপ্রার্থী এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল এলাকায় কর্মলাভের সুযোগ সুবিধার মধ্যে একটা আপেক্ষিকতা রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে ম্যাট্রিকুলেশন এবং তদূর্ধ্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা ছিল ১৩-৪২ জন এবং শহরাঞ্চলে ছিল ১০-৫৫ জন। স্পষ্টতঃ শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা ছিল বেশী। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বেকার লোকের মোট সংখ্যা শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে অনেক কম। সেই জন্য উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বেকারত্ব গ্রামাঞ্চলে যতটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে শহরাঞ্চলে করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানে অসমর্থ হয়ে বহু শ্রমিক কর্মের আশায় শহরাঞ্চলে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। সেই জন্য যদি গ্রামাঞ্চলে অনিপুণ শ্রমিকের বেকারত্ব দূর করা যায় তাহলে শহরাঞ্চলে অগণিত অনিপুণ শ্রমিকের আগমন বন্ধ করা অসম্ভব হবে না। অন্যান্য উন্নত দেশের মত ভারতবর্ষেও স্ব-নিযুক্ত কর্মের প্রচুর সুযোগ বর্তমান। স্ব-নিযুক্ত কর্ম বলতে কৃষি কর্মকেই বিশেষভাবে বোঝায়। কিন্তু কৃষিকর্মে নিয়োজিত লোকেরা সম্পূর্ণরূপে কর্মে নিযুক্ত নয়। ন্যাশানাল সাম্পেল সার্ভে কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে এই ধরনের আন্ডারএমপ্লয়েড লোকের সংখ্যা ১৩০ লক্ষ থেকে ১৬০ লক্ষ। কৃষিকর্মে নিযুক্ত যে সমস্ত লোকের সপ্তাহে ২৮ ঘণ্টার কম কাজ থাকে তারা সম্পূর্ণরূপে আন্ডারএমপ্লয়েড। সপ্তাহে যাদের ২৯ ঘণ্টা থেকে ৪২ ঘণ্টা কাজ থাকে তারা মাঝামাঝি রকমের আন্ডারএমপ্লয়েড। গ্রামাঞ্চলে এইরকম সম্পূর্ণরূপে আন্ডার এমপ্লয়েড শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৭-০৩ জন এবং শহরাঞ্চলে শতকরা ৪-৪৯ জন। গ্রামাঞ্চলে মাঝামাঝি ধরনের আন্ডার এমপ্লয়েড শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৫-১০ জন এবং শহরাঞ্চলে ৩-৮৪ জন। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আন্ডারএমপ্লয়েড শ্রমিকের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলেই বেশী। তথাপি একথা নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে শহরাঞ্চলে আন্ডার এমপ্লয়েড-এর সমস্যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

১৯৫২ সাল থেকে সুরু করে দীর্ঘ ১৮ বৎসরব্যাপী বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এদেশে ৪২-৫ মিলিয়ন চাকুরীর সংস্থান করা সত্ত্বেও বেকার মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বর্ধিত হচ্ছে। বেকার মানুষের অক্ষমান সংখ্যার উপর নতুন বেকার মানুষের সংখ্যা মিলিত হওয়ার ফলে এদেশের বেকার সমস্যা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। কারণ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ মিলিয়ন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছিল ১১-৮ মিলিয়ন এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছিল ১৭ মিলিয়ন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অতিরিক্ত চাকুরীর সংস্থান ছিল ৭ মিলিয়ন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছিল ১০ মিলিয়ন এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছিল ১৪-৫ মিলিয়ন।

এইতো গেল ভারতবর্ষের বেকার সমস্যার স্বরূপ। এখন দেখা যাক এই সমস্যার সমাধানে এদেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা কিরূপ হওয়া উচিত। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে বলা হয়েছেঃ—

"The State shall strive to Kromote the welfare of the people by securing and protecting, as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of national life".

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে এদেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কিছু কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতিকালে ব্যাঙ্কশিল্প পরিচালনায় কতকগুলি মৌলিক নীতি নির্ধারিত হয়েছে। সেই নীতিগুলি হলঃ—(ক) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা, (খ) কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা, (গ) বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগে অংশগ্রহণে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করা এবং (ঘ) অনুন্নত অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নসাধন করা। এতাবৎ অবহেলিত কয়েকটি বিশেষ শিল্পে যেমন — কৃষিশিল্পে, কুটিরশিল্পে ক্ষুদ্রায়তনশিল্পে, পরিবহনশিল্পে, সমবায় প্রতিষ্ঠানে এবং খুচরো দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের উদার ঋণদানের দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর ন্যস্ত হয়েছে। যারা কৃষিকর্ম সম্পন্ন করে, কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তনশিল্প উৎপাদন করে, সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচালকরূপে জীবিকা অর্জন করে তারাই স্ব-নিযুক্ত কর্মী। এদেশের ব্যাঙ্কগুলি এই ধরনের স্ব-নিযুক্ত কর্মিগণকে কিভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে পারে এখন সেই কথাটাই আলোচনা করা যাক।

ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী। বলাবাহুল্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে কৃষিকর্মের যত উন্নতি হবে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনও তত বৃদ্ধি পাবে। যুগপৎ বেকার লোকের সংখ্যাও ক্রমশঃ কমে আসবে। কারণ এই প্রক্রিয়ায় কৃষিকর্ম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হবে। ন্যাশনাল কমিশন অন লেবার-এর হিসাব অনুসারে জানা যায় যে, অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এক একর জমিতে বছরে ৩০ জন শ্রমিকের অতিরিক্ত কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। অনুরূপ বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একর জমিতে বছরে ২৬ জন শ্রমিকের অতিরিক্ত কাজের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। এইভাবে ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে প্রথমোক্ত উপায়ে ৬০ মিলিয়ন একর জমিতে এবং শেষোক্ত উপায়ে ৪০ মিলিয়ন একর জমিতে চাষাবাদের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক বিরাট সংখ্যক বেকার মানুষ যাতে কৃষিশিল্পে কর্মলাভের সুযোগ পায় সেইটাই এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বভাবতঃই এই পরিকল্পনাটির বাস্তবরূপ দিতে গেলে যথেষ্ট পরিমাণ মালমশলা এবং সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে যে বৃহৎ পরিমাণ অর্থের আবশ্যক তার যোগান দেবার জন্য এদেশের ব্যাঙ্কগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। কেবলমাত্র দেশের অনুন্নত অঞ্চলের কৃষকগণকে প্রচুর পরিমাণ অর্থনৈতিক দাদন দিলেই ব্যাঙ্কগুলির কর্তব্য শেষ হবে না। যাতে কৃষকগণ এবং কৃষিশিল্পের বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার আনুকূল্যে কৃষিকর্ম সম্পাদনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হয় সে বিষয়েও ব্যাঙ্কগুলির যে কর্তব্য আছে তা সম্পন্ন করতে হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব যুবক স্নাতক বলে ঘোষিত হচ্ছে তাদেরই এই কৃষিকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এই সমস্ত যুবক যদি ক্ষেত খামারে কর্মরত মানুষের সঙ্গে এসে যুক্ত হয় তাহলে নতুন পদ্ধতিতে ব্যাপক এবং গভীরভাবে কৃষিকর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হবে। এর ফলে দেশের বহু বেকার মানুষ স্ব-নিযুক্ত কর্মের সন্ধান পাবে এবং এমনিভাবে এদেশের বেকার সমস্যার ভয়াবহতা কমে আসবে।

কৃষিশিল্প ব্যতীত এদেশের গ্রামীণ এবং কুটিরশিল্পেও বহুলোক কর্মরত। অল্প মূলধন নিয়োগ করে এই শিল্পগুলি পরিচালনা করা সম্ভব। এই শিল্পগুলিতে বহু বেকার মানুষের কর্মসংস্থান করাও সম্ভব। গ্রামীণ এবং কুটিরশিল্পগুলির মধ্যে যে শিল্পগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হলঃ—ঘানির তৈল, নারিকেল তৈল, সাবান, মাটির পাত্র, হস্তনির্মিত কাগজ, হস্তনির্মিত চর্মদ্রব্য, গুড়, তন্তু, দিয়াশলাই, পশম, রেশম, হস্তচালিত তাঁত এবং বিভিন্ন প্রকার হস্তনির্মিত শিল্প। হস্তচালিত তাঁত শিল্পে পুরোদিনের কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য শিল্পগুলিতে পুরোদিনের কাজ পাওয়া যায় না। হস্তচালিত তাঁতে প্রায় ৩ মিলিয়ন লোক কাজে লিপ্ত থাকে। এই হস্তচালিত তাঁতের কাজের প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করতেও বহুলোক কাজ পায়। যাইহোক যে উদ্দেশ্যে এই শিল্পগুলির অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন সেই উদ্দেশ্যটি হল যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল ক্রয় করা এবং কাজকারবার চালাবার জন্য সাধারণ রকমের গুদাম অথবা খামারশালা নির্মাণ করা। আলোচ্য শিল্পগুলির পরিচালনায় বহু কর্মীর প্রয়োজন। কিন্তু অর্থনৈতিক অভাব এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য এই শিল্পগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। সেইজন্য এগুলির উৎপাদনও বিশেষ সন্তোষজনক নয়। এই শিল্পগুলিতে কর্মরত লোকেদের আর্থিক উপার্জনের পরিমাণও অল্প। এইরকম অবস্থা থেকে গ্রামীণ এবং কুটিরশিল্পগুলিকে উন্নত করতে হলে শিল্পগুলির আধুনিকীকরণ প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কর্তব্য যথেষ্ট পরিমাণ উদার ঋণ মঞ্জুর করা। কিন্তু এবিষয়ে যে সমস্যাটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সেটি এই যে, উল্লিখিত শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং প্রসারণের জন্য স্বনিযুক্ত কর্মিগণ বিশেষ আগ্রহী নয়। যে শিল্পটি চালু আছে সেইটিকেই স্থায়ীভাবে চালিয়ে যাবার জন্য শিল্পমালিক ঋণের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। প্রযুক্তিবিদ্যার এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব হেতু শিক্ষিত বেকার যুবকগণ এসম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী নয়। এইরকম অবস্থায় ব্যাঙ্কের কর্তব্য সংশ্লিষ্ট সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ বেকার যুবকগণকে উল্লিখিত শিল্পগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা। এইসব কর্মীদের অর্থনৈতিক দাদন দেওয়া ছাড়াও ব্যাঙ্কের উচিত এদের গ্রামীণ এবং কুটির শিল্পোৎপাদনের ব্যাপারে আবশ্যকমত পরামর্শ দেওয়া এবং সঠিক পথে পরিচালনা করা।

বেকার সমস্যা দূরীকরণে যন্ত্রচালিত তাঁতেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ৮২ হাজার তুলার কল, ৬০ হাজার সোঁখীন

রেশমের কল এবং ৩ হাজার পশমের কল নিয়ে এদেশে যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্প প্রচলিত। শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলেই এই শিল্প প্রচলিত নয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শিল্পের কাজকর্ম সম্পাদিত হয়। এই শিল্পের মালিকগণ এককভাবে ২।৩টি তাঁতের অধিকারী। এই মালিকগণের অধিকাংশই তন্তুবায় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা মাঝামাঝি রকমের। যে সমস্ত ছোট ছোট শহর এবং গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রশিল্প অবলুপ্ত প্রায় সেই সমস্ত অঞ্চলে যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের কাজ প্রচলিত হলে মৃতপ্রায় ক্ষুদ্রশিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত হবে। যুগপৎ বহু তন্তুবায় এবং অন্যান্য কর্মী কর্মলাভে সমর্থ হবে। কারণ যন্ত্রচালিত তাঁতের কাজের সঙ্গে বহু আনুষঙ্গিক কাজ অংগীভূত। এই আনুষঙ্গিক কাজগুলির মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্পগুলি নবজীবন লাভে সমর্থ হবে। বর্তমানকালে কেবলমাত্র তুলা এবং সৌখীন রেশমের যন্ত্রচালিত তাঁতে ৪ লক্ষর বেশী লোক কর্মরত। যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্প সম্বন্ধে অশোক মেহতা কমিটির নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

'Powerloom is much more than an instrument of production; it is a symbol of a vast countrywide process of economic transition and techno-social change. Behind it lie deep economic urges of millions of people to break through the coils of poverty, to improve, ever so little their levels of living and to escalate themselves to a slightly higher social layer...... powerloom was thus, in its own limited role the usher of a new social order waiting on the old.

যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উচিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আরও অনেক যন্ত্রচালিত তাঁত স্থাপন করবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া। কারণ এর ফলে তন্তুজাত বস্তুর উৎপাদন বর্ধিত হবে, আনুষঙ্গিক বহু কর্মের সুযোগ দেখা দেবে এবং বহু বেকার মানুষ চাকুরী লাভে সমর্থ হবে।

এইবার খুচরা দ্রব্যের ব্যবসার মাধ্যমে কেমন করে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে তার আলোচনা করা যাক। খুচরা দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের মধ্যে শাকসব্জী বিক্রেতা, হোটেল ও রেস্তোঁরা চালক, রুটি-বিস্কুট-মাখন বিক্রেতা প্রভৃতিকেও ধরা যেতে পারে। দোকান ঘর নির্মাণ অথবা ভাড়া করবার জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য এবং এমনিভাবে মূল ব্যবসাটি পরিচালনা করবার উদ্দেশ্যে এদের কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন। এসম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ওপিনিয়নের অভিমত এই যে খুচরা দ্রব্যের একটি দোকানের গড়পড়তা বাৎসরিক লেনদেনের পরিমাণ ৩৪,৩০০ টাকা। বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মাল সংগ্রহের জন্য একজন সাধারণ দোকানদারের ৫০০ টাকা থেকে ৭৫০ টাকার মত কার্যকরী মূলধনের সর্বদা প্রয়োজন থাকে। অবশ্য শহরাঞ্চলের কোন খুচরা দ্রব্যের ব্যবসায়ীর পক্ষে এই পরিমাণ কার্যকরী মূলধন যথেষ্ট নয়। যাইহোক খুচরা দ্রব্যের ব্যবসা সংক্রান্ত মজুত মাল সংগ্রহের ব্যাপারে শহরাঞ্চলের কোন ব্যবসায়ীর মূলধনের সংগে গ্রামাঞ্চলের কোন ব্যবসায়ীর কার্যকরী মূলধনের খুব বেশী পার্থক্য থাকে না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কাছ থেকে ঋণ পেয়ে উপরোক্ত ব্যবসায়িগণ যাতে তাদের কাজ কারবারের উন্নতি করতে পারে সেদিকেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ এই শ্রেণীর মানুষদের কাজ কারবারের যত উন্নতি হবে দেশের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা তত হ্রাস পাবে।

ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন দ্রব্য স্থানান্তরিত করতে গেলে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সর্বতোভাবে উন্নত হওয়া উচিত। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ধরণের রাস্তাঘাটের উপর নির্ভরশীল। সেই জন্য দেশের যে সমস্ত অঞ্চলে উন্নত ধরণের রাস্তাঘাটের অভাব সেই সমস্ত অঞ্চলের উৎপাদন সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল হয় না। অনুন্নত রাস্তাঘাটের জন্য মহারাষ্ট্রের মত শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যেও উৎপন্ন ফসল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা যায়। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যুগপৎ বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের অনুন্নত পথঘাটগুলিকে মজবুত এবং সুন্দর করে নির্মাণ করা উচিত। যে সমস্ত অঞ্চলে একেবারে পাকা রাস্তা নাই সেই সমস্ত অঞ্চলে যুগোপযোগী নতুন পাকা রাস্তা তৈয়ারী করা কর্তব্য। রাস্তাঘাট নির্মাণ করবার দায়িত্ব দেশীয় সরকার এবং বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের। সরকারী উদ্যোগেই হোক অথবা বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই হোক রাস্তা তৈয়ারী এবং মেরামতের জন্য ঠিকাদারের প্রয়োজন। যে সমস্ত ঠিকাদার বহু লোককে কর্মে নিযুক্ত করে রাস্তাঘাট তৈয়ারী অথবা মেরামতের দায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উচিত সেই সমস্ত ঠিকাদারদের আর্থিক ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা।

দেশের পরিবহন ব্যবস্থার সংগে ট্রাক চালক, ট্যাক্সি চালক, লরী চালক, বাসগাড়ী চালক এবং রিকসা চালক প্রভৃতি যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এরাই দেশের পরিবহন শিল্পের একটি বিশেষ অংশ। ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এ্যাপলায়েড ইকনমিকস রিসার্চের একটি সমীক্ষা অনুসারে জানা যায় যে ১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষে পরিবহন শিল্পে ২৪ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গাড়ী চালাবার কাজে শতকরা ৩০ জন, বিভিন্ন প্রকার গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতকরা ২২ জন এবং বড় বড় ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতকরা ৪১ জন কর্মলিপ্ত ছিল। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে দেশের পরিবহন শিল্পের যত উন্নতি হবে পরিবহন কর্ম সম্পাদনের জন্য এই সকল কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা তত বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে অনেক বেকার মানুষ চাকুরী লাভে সক্ষম হবে।

ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির অর্থনৈতিক ঋণদানের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে কেমন করে এদেশের বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব সেই কথাটাই আলোচনা করা গেল। বলাবাহুল্য আলোচ্য সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। কিন্তু অত্যন্ত জটিলতা এবং নানাপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে এই অত্যাবশ্যক কর্ম সম্পাদনে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আশার কথা দেশের বৃহৎ ব্যাংকগুলি এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠছে।

পঞ্চানন রায়

।। নয় ।।

।। বৈকুণ্ঠপুরের নিম্বার্কমঠ ।।

বাঙলার মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এপর্যন্ত এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা নানা জাতের মন্দিরের কথা বলেছি। এসব মন্দির হয় কোন সম্পন্ন ব্যক্তি বা জমিদারের প্রচেষ্টায় অথবা অঞ্চল বিশেষের রাজারাজড়ার দ্বারা তৈরী হয়েছিল এক-কালে যা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে পরিগণিত হলেও কালক্রমে জনসাধারণের ধর্মলিপ্সার জন্যে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ধর্মানুষ্ঠানের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়েছিল। রাজা-রাজড়া বা জমিদারের দ্বারা বেশীরভাগ এসব মন্দির তৈরী হলেও ধর্মাচরণের বিধি-নিষেধ কাউকে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত করেনি। হিন্দু-মুসলমান সব শ্রেণীর লোকেরাই উৎসব পর্ব উপলক্ষ্যে একসঙ্গে আনন্দমুখর হয়ে উঠতেন এককালে। ফলতঃ প্রাচীন বাঙলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কতকটা মঠ-মন্দির-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল এককালে। মন্দিরাঙ্গনে গীত মঙ্গলবাদ্য ও পদাবলী-কীর্তন মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্যকে পুষ্ট করেছিল বিশেষভাবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন এসব গানের শ্রোতা। এভাবেই মধ্যযুগের কোন কবির খ্যাতি বিস্তার লাভ করতো। সর্বপ্রকার গোঁড়ামি ও জাতিভেদ বর্জন করে মন্দিরাঙ্গনে সমবেত হতেন শহর বা গ্রামের জনসাধারণ।

এতো গেল ব্যক্তিবিশেষ বা রাজা-রাজড়ার মঠ-মন্দিরের কথা। কিন্তু এ-ছাড়াও আরও অনেক মঠ-মন্দির চোখে পড়বে এদেশের পল্লী বা কোন প্রাচীন শহর পরিক্রমাকালে। এগুলি মূলতঃ সম্প্রদায়বিশেষের মঠ-মন্দির বলে জন-সাধারণের কাছে পরিগণিত হলেও ধর্ম-কেন্দ্রিক প্রাচীন বাঙালী সমাজের ওপর এদের প্রভাবও নেহাৎ কম ছিল না। ব্যক্তি-গত আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে এ ধরনের সম্প্রদায়বিশেষের মঠ এককালে গঠিত হলেও এসব মঠ-মন্দিরের মোহান্তরা সমাজের সার্বিক কল্যাণের কথাও চিন্তা করতেন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা জনগণকে অনেকাংশে প্রভাবিত করতেন। এসব সম্প্রদায়বিশেষের মঠ-মন্দির প্রাঙ্গণে যেসব পুজো-পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো সেখানেও জনসাধারণের প্রবেশের কোন বাধা-নিষেধ থাকতো না। অবশ্য কিছু কিছু অনুশাসন যে একেবারে মেনে চলা হোত না তা নয়, তবে সে-সব অনুশাসন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অনাচার ও অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হতো। আলোচ্য প্রবন্ধে পল্লীর একান্তে অবস্থিত এধরণের একটি মঠের কথা বলছি।
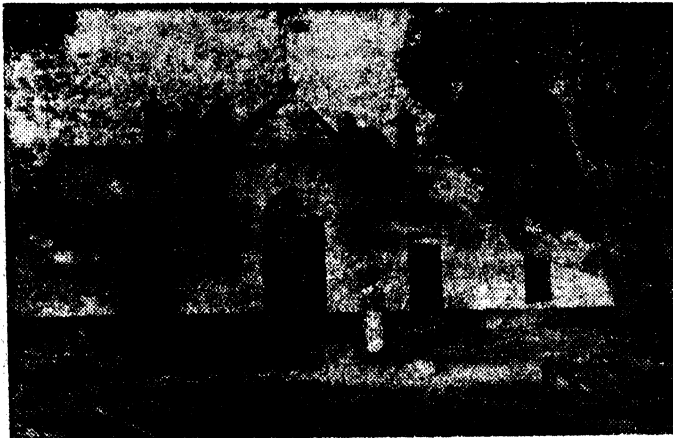
এটির নাম হ'ল নিম্বার্ক মঠ মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানা অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে এ প্রাচীন মঠটি আজ কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পাঁশকুড়া স্টেশনে নেমে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোডের এক ধারে পড়বে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামটি। পাঁশকুড়া

দাসপুর থানায় (মেদিনীপুর জেলা) চেতুয়া-বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের নবনির্মিত প্রবেশদ্বার।

[illegible] বাগাকার পরিত্যক্ত চাদনী। মন্দিরটির চৌকা থাম।

থেকে ছ' নম্বর জাতীয় সড়ক পেরিয়ে উত্তরমুখী যে রাস্তা ঘাটালের দিকে চলে গিয়েছে সে রাস্তা বরাবর বাসে করে গেলে বৈকুন্ঠপুরে পৌঁছুতে লাগে স্টেশন থেকে প্রায় এক ঘন্টা। পিচ্ রাস্তার ধার থেকে বৈকুন্ঠপুর গ্রামের ভেতর দিয়ে কাঁচা রাস্তায় প্রায় মিনিট পনেরো হাঁটলেই বৈকুন্ঠপুরে নিম্বার্কমঠে পৌঁছানো যায়। এ মঠটি ঐ অঞ্চলে 'বৈকুন্ঠপুর অস্থল' নামে পরিচিত। অস্থল কথাটির মানে হ'ল যেখানে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। 'অকার' হ'ল বিষ্ণু—'অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ'। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠের সাধারণ নাম হ'ল অস্থল। প্রাচীন ভারতে নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা, শ্রীধন্যাকটক, উদন্তপুরী প্রভৃতি বৌদ্ধ-বিহার এককালে মঠ-জগতের পুরোভাগে অবস্থিত ছিল। এদেশে তাদের অস্তিত্ব লোপ পেলেও তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি অঞ্চলে সে ধরণের মঠ এখনও আছে। পশ্চিমের 'ভ্যাটিকান' মঠসমূহের শীর্ষস্থানীয়—'আর্বি', 'মনেস্টারি' প্রভৃতিও সেখানে আছে। দত্তাত্রেয় নাগা-সম্প্রদায়ের জুনো আখড়া ভারতের সকলের থেকে প্রাচীন মঠ। যোশীমঠ, গোবর্ধন মঠ, শৃঙ্গেরী মঠ ও সারদামঠ পরে শংকরাচার্যের দ্বারা স্থাপিত হয়। বৈকুন্ঠপুরের এ মঠ বা অস্থলটি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদের এককালে পুণ্যপীঠ বলে পরিগণিত ছিল। মেদিনীপুর জেলার বিখ্যাত পরগণা চেতুয়ার সদর প্রাচীন ডিহি-চেতুয়া গ্রাম ও বৈকুন্ঠপুরের সংলগ্ন স্থানে (যাহা চেতুয়া-বৈকুন্ঠপুর নামেও পরিচিত) এ অস্থলটি অবস্থিত। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য নিয়মানন্দ বা নিম্বার্কের জন্মকাল দ্বাপর-যুগের শেষে ও কলিযুগের প্রথমাংশে বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস। নিম্বর্কাচার্যের ভেদা-ভেদবাদ এককালে প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদ বলে গৃহীত হ'তো যার কঠোর সমালোচক ছিলেন আচার্য শঙ্কর ও তাঁর পরবর্তী আচার্যেরা। বৈকুন্ঠপুরের এ অস্থলটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ শুকদেবা-চার্য বাঙলা ১১২৭ সাল বা তার অল্প পরে এ অস্থলটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুকদেবাচার্য ছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সিদ্ধযোগী নরহরি দেবাচার্যের শিষ্য। নরহরি বর্ধমানের উপকন্ঠে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানেই বাঙলা-দেশে প্রথম নিম্বার্কাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত রাজ-গঞ্জ অস্থল স্থাপিত হয়েছিল প্রধানতঃ তাঁর শিষ্য শুকদেবেরই চেষ্টায়। পরে শুকদেব রাজগঞ্জ অস্থলের মোহান্ত হন। অপর প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ দয়ারাম দেবাচার্য উখড়া অস্থল প্রতিষ্ঠা করেন। শুকদেবাচার্যের অলৌকিক যোগবলে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ শুকদেবকে সন ১১২৭ সাল থেকে ১১২৯ সালের মধ্যে বহু ভূ-সম্পত্তি দান করেন। এসকল জমির বেশীর ভাগ মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগণায় অবস্থিত ছিল। কীর্তিচাঁদ শুক-দেবকে সাড়ে বিয়াল্লিশখানি গ্রামেরও ইজারা দান করেছিলেন। চেতুয়া পরগণার জমিগুলি তাঁকে বিহারীলাল জীউর দেবোত্তর স্বরূপ দান করা হয়েছিল। বাঙলা সন ১২০৯ সালের ৫৪০৮৮ ও ৩২৪৬৫ নং তায়দাদ থেকে সে সময়ের ভূসম্পত্তির দখলদার হিসেবে শুকদেবের অধস্তন তৃতীয় মোহান্ত চতুরদাস শরণ দেবাচার্যের নাম জানা যায়। শুকদেবাচার্যের অন্যতম শিষ্য গোপাল দেবাচার্য বৈকুন্ঠপুর অস্থলের প্রথম মহান্ত হয়েছিলেন। গোপালদেবের পরবর্তী ন'জন মোহান্ত এ অস্থলের ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আজ নানা কারণে এটি ধ্বংসপ্রায়।

বৈকুন্ঠপুর অস্থলের প্রাচীন ইতিহাস হ'ল এই। ঘাটাল-বিষ্ণুপুর পথ ও চেতুয়া-রাজনগর পথের সংযোগস্থলের কাছে মনোরম ও নির্জন পরিবেশে অবস্থিত এ অস্থলটি আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের যে অধ্যাত্ম-সাধনার এক উপযুক্ত স্থান ছিল তা সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যায়। এখনও এই স্থানটির নির্জনতা, প্রাচীন ভগ্ন-মন্দিরের চারপাশে বট-অশ্বত্থের সমারোহ ও বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী স্মরণ করিয়ে দেয় এখানে এককালের অধ্যাত্ম-সাধনার নির্জন মনোরম পরিবেশ। অস্থলটির পূব ও উত্তরদিকের কিছু কিছু অংশ ঝিল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় মনে হয় সেকালে এটির চারধার

মদনমোহন জীউর পরিত্যক্ত একরত্ন মন্দির। মন্দির গাত্রে সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে।

রঘুনাথ জীউর পরিত্যক্ত মন্দির

অস্থলের নতুন দেবালয়। প্রতিষ্ঠাকাল বাঙলা ১৩৫৩ সাল।
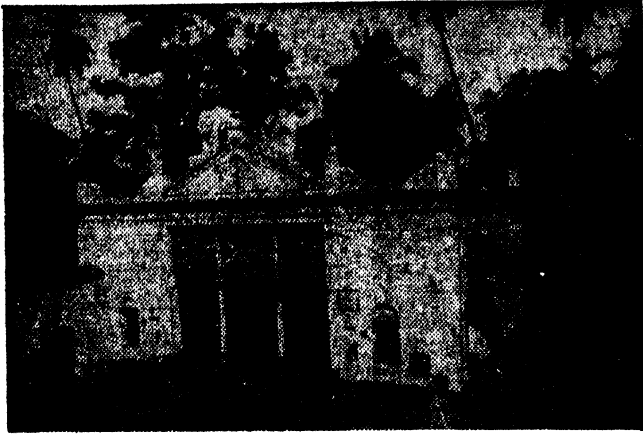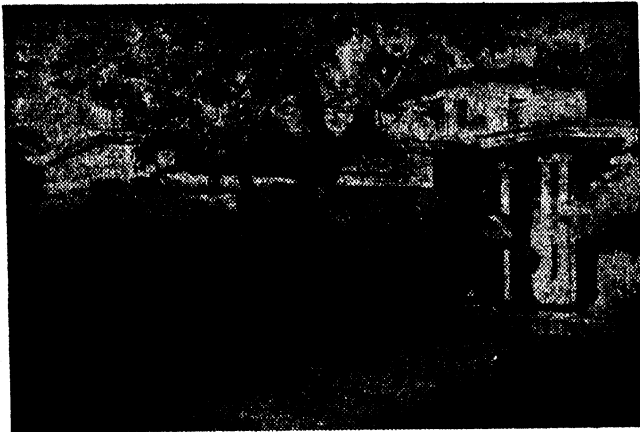
দাসপুর থানার (মেদিনীপুর জেলা) চেতুয়া-বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের প্রাচীন নাটমন্দির ও প্রাঙ্গণ। ডাইনে বিহারীলাল জীউর প্রাচীন মন্ডপ।

[illegible] [illegible] রথের নিম্নাংশ
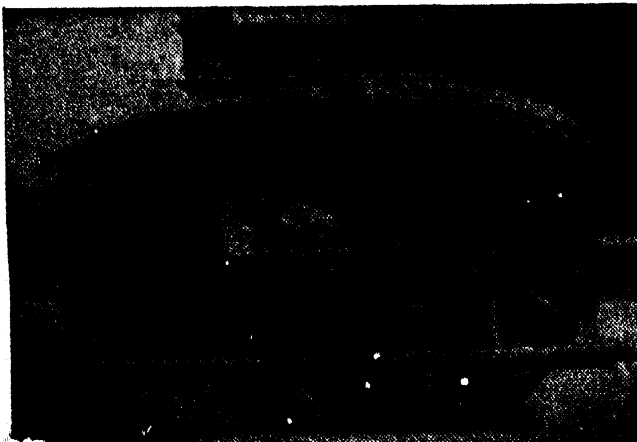
পরিখা বেষ্টিত ছিল। রাজনগর পথের দিকে হ'ল অস্থলটির সম্মুখভাগ। সদর পুকুরটি হ'ল রাস্তার একেবারে কাছে। এর পাশ দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে নাটমন্দিরটি ও তার পশ্চিমে মূল দেব-মন্দির বর্তমান। প্রবেশদ্বারের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দপ্তরখানা ও বাসগৃহ। পূর্বাংশ দ্বিতল। দক্ষিণ দিকের ঘরগুলি একটি ভান্ডারের জন্যে রাখা হয়েছে। এ মহালের দক্ষিণের পৃথক প্রাঙ্গণে শ্রীবিহারীলাল জীউর প্রধান মন্দির ও তার পেছনের দিকের পশ্চিমাংশে রন্ধনশালা। এই মহালটির বাইরের পশ্চিমাংশে খিড়কী পুকুর। মহালগুলি প্রাচীর বেষ্টিত। সম্মুখের প্রবেশদ্বার পেরিয়েই যে অঙ্গনে পৌঁছানো যায়, সেখানে একটি প্রাচীন চাঁপা গাছ আছে। এটির মূলভাগ ইট দিয়ে বাঁধা। এ প্রাঙ্গণে বিহারীলাল জীউর প্রাচীন মন্দির। মন্দিরটি চাঁদনী-রীতির ৫ কয়েকটি লম্বা থামযুক্ত। এটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। বাঙলা সন ১৩৫৩ সালে সে সময়ের মহান্ত নতুন চাঁদনী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান লেখকের রচিত একটি সংস্কৃত শিলালিপি নতুন মন্দিরটির নীচের দিকে স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরে বর্তমান বিগ্রহগুলি হলেন, রাজরাজেশ্বর জীউ (ইনি এখানকার প্রধান শালগ্রাম), শ্রীমতী রাধিকা সহ বিহারীলাল জীউ (প্রধান বিগ্রহ), মদনমোহন জীউ, বালা জীউ, রঘুনাথ জীউ, রামচন্দ্র জীউ, জগন্নাথ জীউ প্রভৃতি বিগ্রহসমূহ ও প্রায় চারশো শালগ্রাম সমেত সুদর্শনচক্র প্রধান সিংহাসনে একত্র স্থাপিত। বহির্ভাগে মহাবীর মূর্তি, শ্রীগুরুপাদুকা সকল এবং গদী বর্তমান। গোশালা ও মন্দিরসকলের মাথায় সম্প্রদায়চিহ্ন শঙ্খ, সুদর্শন চক্র ও ঊর্ধ্বপুন্ড্র আঁকা আছে। নাটমন্দিরের সম্মুখদিকের প্রাকারগাত্রে গরুড় মূর্তি স্থাপিত। ঝুলন মন্দিরের ঊর্ধ্বাংশে একটি প্রস্তরময়ী কমনীয় বিষ্ণুমূর্তি সংলগ্ন রয়েছে। এ অস্থলটির বাস্তুর মোট পরিমাণ প্রায় আন্দাজ তিরিশ বিঘা হবে।

চেতুয়া-বৈকুণ্ঠপুরের এ অস্থলের পাশাপাশি রঘুনাথ জীউ, মদনমোহন জীউ, বালা জীউ ও রামচন্দ্র জীউর কয়েকটি অস্থল ছিল। এ অস্থলগুলির প্রত্যেকটির মহান্ত থাকতেন। তাঁরা ঐসব অস্থলের ভূসম্পত্তির আয় থেকে নিত্য-নৈমিত্তিক উৎসবাদির অনুষ্ঠান করতেন। ঐ অস্থলগুলিকে বর্তমান অস্থলের জ্ঞাতি শ্রেণী বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণই এগুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি বর্তমানে পরিত্যক্ত ও সেখানকার বিগ্রহ এখন বর্তমান অস্থলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ঐসব পরিত্যক্ত জীর্ণ মন্দিরের তিনটির আলোকচিত্র এখানে দেওয়া হ'ল। এ মন্দিরগুলির গঠন-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়—ছাদগুলি খিলানে গঠিত এবং গায়ে-

বলেপ দৃঢ়, মসৃণ ও সুন্দর। মদনমোহন-জীউর একচূড় বা আলুগোছুটুঙী রীতির মন্দিরটি সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত—ইঁটের ভাস্কর্যের অপূর্ব প্রকাশস্থল। সুন্দর সূক্ষ্মকারি নক্সা ও ফুল মন্দিরগাত্রকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করেছে। মদনমোহন জীউর আদিপীঠ নাকি নিকটবর্তী চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামের 'নাগরভাঙ্গা' নামক স্থানে ছিল। বালাজীর চাঁদনী মন্দিরটির থাম ও খিলান হাঁসগলারীতির। অপর একটি পরিত্যক্ত চাঁদনী মন্দিরের (সম্ভবতঃ গণেশ জীউর) থাম কলাগেছ্যা ও খিলান হাঁসগলা।

চেতুয়া-বৈকুণ্ঠপুরের এ অস্থলগুলির পরিত্যক্ত মন্দিরের গঠনপ্রণালী ভালোভাবে লক্ষ্য করলে মনে হয় এগুলি সম্ভবতঃ নিকটবর্তী দাসপুর অঞ্চলের সূত্রধরদের দিয়ে তৈরী হয়েছিল। দাসপুর, কল্যাণ-চক প্রভৃতি স্থানের সূত্রধরদের কাছে বার-বার অনুসন্ধান করে জেনেছি যে সেকালে একমন্দিরের চলতি নাম ছিল আলু-গোছুটুঙী—আছাড়া মন্দিরের কলাগেছ্যা, ... প্রভৃতি স্থানের প্রচলন সেকালে বেশ ছিল। খিলানের মধ্যে হাঁসগলা খিলানের আদর ছিল বেশী। দাসপুরের সূত্রধরেরা এ ধরণের থাম ও খিলান নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দেশে-বিদেশে তাঁদের নাম-ডাক ছিল খুব বেশী। পরিত্যক্ত মন্দির-গুলিতে তাঁদের নিপুণ হস্তের শিল্প-নৈপুণ্য স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। তাই গুলি তাঁদেরই নির্মিত বলে মনে হয়।

একরত্ন বা আলুগোছুটুঙী টাইপের একটি পেতলের রথ এ অস্থলটিতে দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা কোন্ জেলায় কটি পেতলের রথ আছে—এ সমীক্ষা করতে চান তাঁরা বৈকুণ্ঠপুর অস্থলের এ রথটিকে তাঁদের সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। এ রথটির গড়নটি একটু বিশেষ ধরণের। ঘরটির ছাদ মোটা পেতলের পাতে তৈরী হলেও খুব একটা ঢালু নয়। একচূড় হলেও ছাদটি বেশ প্রশস্ত। কতকটা বিষ্ণুপুরী একরত্ন দালানের মতো। চূড়োটি দালানের অনু-পাতে উচ্চ ও সমান্তরাল খাঁজ কাটা। রথটির মোট ছ'টি চাকা বর্তমান। রথযাত্রার সময় এটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো বেশ কিছু দূরে পর্যন্ত। কাঠের রথের সঙ্গে পেতলের এ রথটিকে দেখলে ঘাটাল-দাসপুর অঞ্চলে এককালে পেতল-কাঁসা শিল্পের যে অধিক প্রচলন ছিল এবং তার ফলেই এ অঞ্চলের পূর্ববর্তী কোন মহান্ত যে এটি তৈরী করিয়েছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বৈকুণ্ঠপুর অস্থলের এ প্রাচীন মঠটি আজ ধ্বংসের মুখে। মঠটির ভূসম্পত্তি এখনও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু উপযুক্ত পরি-চালন ব্যবস্থার অভাবে আজ এটি লোপ পেতে চলেছে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে পরম বৈষ্ণব শ্রীমৎ শুকদেবাচার্য এ স্থানটি বেছে নিয়েছিলেন সাধন-ভজনের এক আদর্শ স্থান হিসেবে। বর্তমানের তুলনায় তখন এ স্থানটি হয়তো সর্বদিক থেকে মনোরম ও নির্জন ছিল। প্রাচীন চেতুয়া পরগণার সদর কার্যালয় ডিহিচেতুয়া গ্রামটি এর কাছাকাছি থাকায় স্থানটি এক-কালে যে সমৃদ্ধিশালী ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৬৪৪ শকাব্দ বা ১৭২২ খৃষ্টাব্দে শুকদেবাচার্য যখন এ স্থানটি নির্বাচন করেন তাঁর আশ্রমের জন্যে তখন এ স্থানের বনরাজ ও নির্জনতা তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। মঠটি স্থাপন করে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য গোপাল দেবাচার্যকে এ মঠের প্রথম মহান্ত করেন, আসলে শুকদেবাচার্যই মঠটির ছিলেন প্রাণ-বিন্দু। তাঁর পরেও অনেক সিদ্ধযোগী এ মঠটির মহান্ত পদে অভিষিক্ত হয়ে এটির গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন। সম্প্রদায়-বিশেষের জন্যে এটি তৈরী হলেও স্থানীয় জনসাধারণের কাছে এর জনপ্রিয়তা ছিল খুব বেশী। নানা উৎসব ও পর্বাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে এখানে সমাবেশ ঘটতো বহু দূরবর্তী অঞ্চলের লোকের। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানকার ঝুলন, রাস, দোল প্রভৃতি উৎসব ছিল জনসাধারণেরই উৎসব। মঠের পূর্ববর্তী মহান্তেরা এসব উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত সকলকে খাওয়াতেন এখানকারই তৈরী পুরী, মেখনো (এক বিশেষ ধরণের শক্ত নোনতা পিঠে), পঞ্চপুরী (আটা ও চিনি ঘিয়ের সঙ্গে ভাজা), মালপোয়া ইত্যাদি ভুরিভোজ্য দিয়ে। মেলা, যাত্রাগান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এখানকার উৎসব সকলকেই আনন্দদান করে এসেছে। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে এককালের এ পবিত্র ধর্ম-পীঠটি তার পূর্বগৌরব হারিয়েছে অনেক-দিন। হয়তো বা বাঙলার অন্যান্য মঠ-মন্দিরের ন্যায় এটিও পরিণত হবে এক ধ্বংসস্তূপে অচিরকালের মধ্যে। মঠ-মন্দির প্রেমীরা যাঁরা প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল তাঁরা এটা নিশ্চয়ই চাইবেন না কখনও।

(ক্রমশঃ)
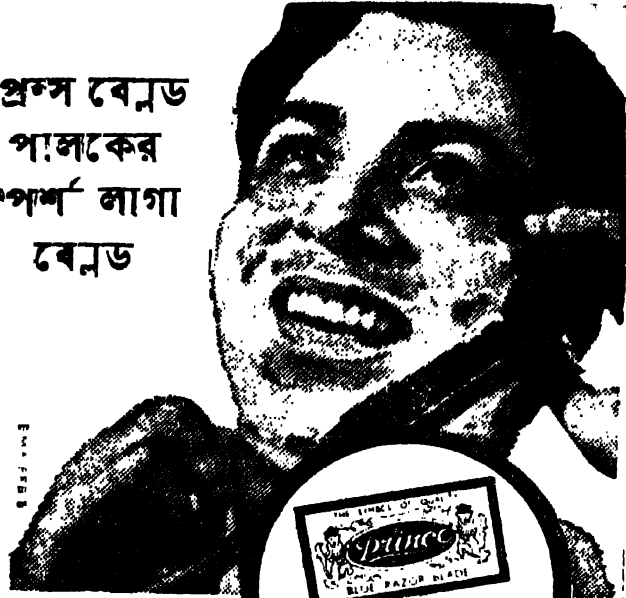
শৈলাবাস : সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

জলাপাহাড়। পাহাড়ের উপর জলাধার। সেই থেকে নাম জলাপাহাড়। অন্তঃস্রোতা একটি জলধারা পাহাড়ের ওপর একটি সরোবরকে পূর্ণ করে রাখত। সেই সরোবর আজ নেই। শুকনো জমিতে একটি খেলার মাঠ, পাশে আছে একটি ঝোরা বা ঝর্ণা যা মিলিটারি ক্যান্টনমেণ্ট, সেন্ট পলস স্কুল ও শৈলাবাসের পাশ দিয়ে কলতান করে নেমে গেছে দার্জিলিং শহরের কাকঝোরা অঞ্চল পর্যন্ত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে জলাপাহাড় অঞ্চলটি অতুলনীয়। দার্জিলিং শহরের থেকে এই জলাপাহাড়ের একটি শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য চোখে পড়ে। ঘোড়ায় চড়ে দলে দলে পর্যটনকারীরা বেড়াতে যায় ঐ ঝোরা পর্যন্ত।

জলাপাহাড়েই রয়েছে শৈলাবাস। সরকারী পর্যটন বিভাগের নিবাস। ঘরে ঘরে শোনা যায় হাসি গল্প গান। কেউ দেখে কাঞ্চনজঙ্ঘার বিস্তীর্ণ রূপ, কেউ বেড়ায় বাগানে, কেউ বা লাউঞ্জে বসে গল্প করে, ম্যাগাজিনের পাতা উলটায়। কদিন ভালই কাটে।

বেশীদিন আগেকার কথা নয়, এই শৈলাবাস ছিল একটি রাজপ্রাসাদ। নাম ছিল 'গিরিবিলাস'। বাগানে ফুলের হরফে সুন্দর করে নাম লেখা ছিল। শাদা রেলিং দেওয়া সুন্দর গেট, দুপাশে সশস্ত্র প্রহরী। বাগান দেখতে আসা পর্যটনকারীদের সাদরে প্রবেশ করতে দিত। আজ সে পথে লাল-সাদা গাড়ী, জিপ ছোটাছুটি করে, ভর্তি গাড়ী পর্যটকদের নিয়ে আসে, নামায়, তোলে।

নাটোরের রাণী ভবানীর দেওয়ান ছিলেন রায় রায়ান দয়ারাম রায়। তাঁর বংশের রাজা প্রমদানাথ রায় এই 'গিরিবিলাস' প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহী অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণকর কাজে দীঘাপাতিয়া রাজবংশের দান ছিল।

গিরিবিলাসের পরিকল্পনা ছিল এক ইংরেজ স্থপতির। বাগানের পরিকল্পনা ছিল মর্গান স্টার্ন নামে একজন স্থপতির।

গিরিবিলাসের কাহিনী শোনা যায় দার্জিলিংয়ের সাধারণ মানুষের কাছে। তিব্বতী রমণীর চায়ের দোকানে, ভুটিয়া-বস্তীতে। গিরিবিলাসে যারা একসময়ে কাজ করত এমন অনেক কর্মচারীর মুখে।

গিরিবিলাসে হাতে টানা রিকসা চড়ে গভর্ণররা আসতেন। গভর্ণরের গ্রীষ্মকালীন আবাস দার্জিলিং তখন রূপে রঙে রসে অতুলনীয়। ম্যালে ছিল ব্যান্ড-স্ট্যান্ড। বিভিন্ন রাজাদের অধীন হাতে টানা রিক্সা-চালকরা জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরে সোজা ম্যালে এসে রঙের মেলা বসাত। কারুর বা নীল-সোনালি, কারুর বা মেরুন সোনালি, কারুর বা সবুজ সোনালি পোষাক, ফোয়ারার জলে আলো আর রঙের খেলাতে স্বপ্নপুরীর সৃষ্টি হত।

গিরিবিলাসের বাগান সেদিন পর্যটকদের আকর্ষণের বস্তু ছিল। ১২ জনের অধিক মালী কাজ করত। বাগানের মাঝে একটি কিয়স্ক। বাগানের সৌন্দর্য দেখবার জন্য চায়ের আসর বসত। বাগানের কোণে একটি গ্রেপ হাউস, থোকা থোকা লাল আঙুর ঝুলত। নীচে অশ্বশালা, অতিথিশালাতে গণ্যমান্য অতিথির সমাগম হত।

গিরিবিলাসের দুপাশে দুটি কিয়স্ক। একটিতে বাড়ীর ছেলেরা পড়াশুনো করত। অপরটিতে সেদিন আলাপ আলোচনাতে যোগদান করতেন চিত্তরঞ্জন দাশ, জগদীশ বসু, ও সি গাঙ্গুলী, তদানীন্তন স্পীকার সান্তোষের মহারাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী বগুড়া ও রতনপুরের নবাবরা, সামনের টেনিসকোর্টে সেদিন বাড়ীর ছেলেরা খেলত, শামা ড্যান্স হত। রাটলেজ সাহেবের এভারেস্ট অভিযানের সহকারী মিঃ কর্মপাল ছিলেন বিলিয়ার্ড খেলার মার্কার। গিরি-বিলাসে কর্মচারীর সংখ্যা অগণ্য ছিল ফরাস, চৌকিদার, মালী, রিক্সাওয়ালা, সহিস আরো কতজন।

শৈলাবাসের একপাশে একটি ভাঙ্গা দোতলাবাড়ী রয়েছে, একসময়ে এটি ছিল রান্নাবাড়ী, গ্যাংওয়ে দ্বারা বাড়ীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। মেয়েরা যাতায়াত করতেন। দেশীবিদেশী উভয় পদ্ধতির রান্না হত।

একতলার সামনের স্যুইটে বাস করতেন রাজা প্রমদানাথ রায়। দোতলার সামনের স্যুইটে রানী, রাজার স্যুইটের সামনের ঘরে ছিল লাইব্রেরী, দামী ভেলভেটের পর্দা, পেলমেটের কাঠের কারুকার্য। রানীর স্যুইটের সামনের ঘরটি ছিল স্নো-ভিউ ঘর। শোবার ঘরে উঁচু মশারী খাটানো পিতলের খাট। ঝাড়লণ্ঠন, আসবাবপত্রের বৈচিত্র্যের তুলনা ছিল না, গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক বলে একখানি বৃহদাকার ঘড়ি ছিল যাতে পূর্ণিমা একাদশী ইত্যাদি চিহ্নিত করা থাকত। এক-তলাতে সদর দরজায় পাশাপাশি ছিল ড্রইংরুম, ডাইনিংরুম, তোষাখানা, বিলিয়ার্ড রুম। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সেনাবিভাগ এই বাড়ীখানি নিয়ে নেয়। তারপরে কিছুকাল তিব্বতীয় স্কুলের তত্ত্বাবধানে থাকার পরে সরকার দ্বারা গৃহীত হয়।

গিরিবিলাসের সেই ঐতিহাসিক আড়ম্বর আজ শৈলাবাসে নেই, তবু এই বিস্তীর্ণ পরিব্যাপ্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে বাংলা-দেশের ইতিহাসে একদা যাঁরা ক্ষমতাধারী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে অন্তরের একাত্মতা বোধ করবেন।

সেকালের রাজার বাড়ীর চারপাশে আজও সেদিনেরই মত কত রংবেরংয়ের ফুল ফোটে। সেই অপূর্ব শোভা বিদেশী পর্যটকরা লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেন। রডোডেনড্রন, ম্যাগ্নোলিয়া, ক্যামেলিয়া, আরো কত গাছ, কত ফুল।

একান্ন

এত অল্প সময়ে সংসারে যে এত ওলট-পালট হতে পারে, মানুষগুলো এমন অকস্মাৎ যে অতখানি বদলে যেতে পারে সে কথা মেঘুর বোধশক্তির বাইরে ছিল। যত দেখে ততই তা প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন হয় তার মনে। যাদের কাছ থেকে চিরদিন সে দূরে থেকেছে, থাকতে চেয়েছে, চেষ্টা করেছে আজ তারাই তাকে ঘিরে বসে আছে। যাদের সঙ্গে সে চিরদিন থেকেছে, থাকতে চেয়েছে তারা চলে গেছে দূরে, তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সে যেন একটা মুখোশপরা সঙ সেজে, বীভৎস আকৃতি ধারণ করে বসে আছে। তাকে দেখে আঁৎকে ওঠে তার প্রিয়জনেরা সবাই মুখোশটার ভিতরে সত্যকার মানুষটাকে কেউ দেখতে চায় না, চিনতে চায় না। সে যেন একটা মৃত্যু পার হয়ে এসেছে তাই কেউ তাকে চিনেও আর চিনতে চায় না—সবাই পালিয়ে যায় ভূতের ভয়ে। এইসব কথাই মেঘুর মনের মধ্যে কতভাবে আলোড়িত হয়ে আজ তাকে যত দুঃখ যাতনা দিতে থাকল।

সেদিনও মেঘু গিয়েছিল কুলি বস্তিতে, যেদিন ভাড়াটে লোকের চেষ্টায় কুলিদের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। অনেকের মনেই আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাকে পুড়িয়ে মারতে পারে। তখনও সে ঘুরে বেড়িয়েছে কুলিদের ঘরে ঘরে। তাকে দেখে তারা সব কথা ভুলে গেছে সবাই। কত আপনার জেঠা-জেঠী। কতদিন সে যায় নি তাদের ঘরে। নিশ্চয়ই তার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছে তারা। বড় অন্যায় হয়েছে সেটা। তবুও তারা সব ভুলে গেছে সেদিন তাকে দেখে. ভিতর বাহির এক হয়ে গেছে সেই সকালে তাকে কাছে পেয়ে। সেই জেঠা-জেঠীও তাকে দেখে অমন ভয় পেল! একটু আধটু ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য কোন সংসারে না হয়! সে যেন তা মনে করে রেখেছে, প্রতিশোধ নিতে গেছে পুরানো কথার জের টেনে। শর্মিষ্ঠা এল না সামনে। যখন এল, কি ভীষণ তার চোখ! পারে তো পুড়িয়ে মারে! দয়া করে যেন তা করল না। শুধু তাড়িয়ে দিল তাকে, তার সকলকে। এমন তো আর কেউ পারে নি! কেন সে অমন করল, কার জোরে, কিসের জোরে অমন করতে পারল?

যে নিধিরামের ঘরে গেলে তার ঘর-খানা হেসে উঠত, সেই ঘর স্তব্ধ হয়ে রইল। সেদিন চাইল না তাকে গ্রহণ করতে। রথীরাম তখন মনের আনন্দে বাজাচ্ছিল বেহালা, হঠাৎ যেন তার ছিঁড়ে গেল। যেখান থেকে একদিন সে ফিরত কত সুখী মনে, সেখানে কি পেল সেদিন! —মনে কত আশা নিয়ে সে গিয়েছিল। শর্মিষ্ঠার কাছ থেকে অমন ধাক্কা খেয়ে সে দাঁড়াতে পারছিল না। গাড়ী থেকে নেমে বুঝল পা-দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। প্রায় টলতে টলতে সে হাজির হয় নিধিরামের ঘরে। একটু বসতেও বলল না, বলল কত পরে। যে মাথাটা শান্ত করতে সেখানে গেল, তা আরো ঝিমঝিম করে উঠল।

যে ডেভিড মেঘুর জন্য কত কান্ড করেছে—তাকে সাহেব করে তুলতে কত যত্ন নিয়েছে, গির্জায় নিয়ে যেতেও চেয়েছে—সেই ডেভিড এখন কত সসম্ভ্রমে কথা কয় তার সঙ্গে, আবার কয়ও না। শুধু চুপ করে বসে থেকে সবিশেষ সম্মান জানায়, অথবা তার পূর্বকৃত সকল কর্মগুলোকে বাচালতার নামান্তর মনে করে সে সবের প্রায়শ্চিত্ত করে। নিশ্চয়ই সে সব ভেবে ভেবে স্তব্ধ হয়ে গেছে তার বুকের ভিতরটা। নিজে আর সাহস পায় না, এ্যানির মা এসে একান্ত অনুরোধ করে তাদের সঙ্গে ডিনার খাবার জন্য। এ্যানির কণ্ঠ আগের মতন তেমন টুং-টাং করে বাজে না। পিয়ানোর চাবিগুলো বুঝি ভেঙে গেছে! এগিয়ে আসে কখনো ভাঙা চাবি নিয়ে। ঝনঝন করে পড়ে যায়, আবার চুরমার হয়ে পড়ে সেই ভাঙা চাবি তার বাপের মুখের পানে, মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে।

তার ধর্ম-বাপ? —ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে তার মুখের পানে! কো চেতনা-বিহীন সে চাহনি। যখন চেতনা ফিরে আসে, তখন সরে যায় তার সামনে থেকে। কথা তো বলে না! বলতে চায় না—বলতে পারেও না বুঝি। তার সামনে যেন বোবা হয়ে যায় সব।

ছোট-মা? —তার মাথাটা যেন একটু বিগড়ে গেছে। তা নইলে অমন খেপে খেঁকীয়ে ওঠে কেন সকলের কথায়। আগে তো এমন ছিল না। তবুও একটা দিক ঠিক আছে তার। সন্তানের কল্যাণ কামনায় উন্মুখ তার মন। স্নেহে অন্ধ হয়ে পড়েছে সে। —তারও ভয় হয়েছে—পাছে এমন ছেলেকে কেউ নিয়ে যায় হাতছাড়া করে! —তা নইলে এত কড়া নজর রাখে কেন তার চালচলনের ওপর? কোথাও যেতে দেবে না, কারো ঘরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করাতেও তার আপত্তি। কেবল বড়সাহেবের ঘর—আর কোথাও যাবার হুকুম নেই তার। তাও ভয়ের, সেটাও না হলেই যেন ভাল ছিল, নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু যদি সাহেব রাগ করেন, বাগান ছেড়ে চলে যান! সব কাজ অচল হয়ে যায়!

মা? —ঠিক আছে তার মা। কোন অদল-বদল হয়নি তার, ভিতরে বাহিরে কোথাও না। —একটু বিচলিত হয়েছিল, প্রথমটা। সেটা সামলে নিয়েছে সে। ওইটুকুতো হবেই। আরো বেশী কিছু হলেও তেমন ত্রুটির ছিল না। হবে না! তার মায়ের যেমন গুণ, তেমন শিক্ষা।

আসল খবর মেঘুর জানা নেই। শীন্-স্মীথ্ তখন মেঘুকে আগলে রেখেছিলেন। এদিকে সুখের সোপান বেয়ে বিজির মন তখন চলে গিয়েছিল অতীতে—সুখ-দুঃখের দিনে। বিজির মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল কার্সিয়াং আর দার্জিলিং-এর পথেঘাটে—তার মায়ের সঙ্গে, জনসনের সঙ্গে। তাই এখানকার কয়েকটা দিনের খবর সে রাখতে পারেনি। মিসেস শীন্-স্মীথের যত্নে তার মন ফিরে আসে সুবর্ণশিরির বাগানে। মেঘুকে কোলে টেনে নিয়ে ফিরে আসে তার সম্বিত।

রাজার ঐশ্বর্যের মাঝে, রাজার জননী হয়ে ফিরে আসে বিলি সেখানে। যেখানে এতদিন সে এক নগণ্য জীবনযাপন করেছে, —জনসনের এত বড় সম্পত্তির কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব পেয়েও যেখানে ভিখারিণী হয়ে ছিল,—সেখানে আসে। যে প্রভুত্ব যেমন অজানা ভাবে এসেছে, তেমনি অজানা ভাবেই তা চলে গেছে তার সাবালক সন্তানের হাতে। —গর্টফ্রিড ফিরে আসার পর যখন মাতা-পুত্রের দেখা হয় তখন অতবড় ছেলেটাকে বিলি শিশুর মতো টেনে নিল তার বুকের মাঝে। জনসন তার ছেলেকে যা দিতে চেয়েছিল, যা দিয়ে গিয়েছিল, তার চাইতে বিলি অনেক বেশী দিয়েছে। কত দুঃখ-কষ্ট, কত সুখ-অসুখ, কত মান-অপমান, কত সম্পত্তি-সম্পদ, সম্মানও দিয়েছে তাকে।

তাই মেঘুর মা এত দেওয়ার পর আরো কিছু দিয়ে তার বোঝা বাড়াতে চায় নি, তাই মেঘুর মা নিজেকে সামলে নিয়েছে। সংসারের কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে সব তুলে দিয়েছে মেঘুর হাতে। যা সে দু-হাতে ঢেলে দিয়েও ফুরোতে পারবে না।

কি হবে এসব দিয়ে? যাদের সঙ্গে যাদের কাছে চিরদিন মেঘু থেকেছে, যাদের কাছে সে থাকতে চেয়েছে তাদের কাছে থাকতেই না পারল যদি? যাদের সে চিনেছে তাদের ছেড়ে থাকতে হবে তাদের সঙ্গে, যাদের সে চেনে না। কি সুখ, কি আনন্দ সে পাবে তাতে?

এমনি কত কথা ভাবতে ভাবতে, মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে মেঘু পৌঁছল মোহনবাড়ী—ডিব্রুগড়ের এরোড্রোম। সঙ্গে গর্টফ্রিড, দুজনে মিলে যাবে লণ্ডনে। চারপাশে সরকারি বে-সরকারি অফিসার, বাগানের সাহেবদেরও অনেকে এসেছে।

তার মাও এসেছে সঙ্গে, এখান থেকে সে ফিরে যাবে বাগানে। —এই সুখের দিনে একটি কথা বারবার বিলির মনে ঠেলে উঠতে চায়। আর একদিন সে জনসনকে পাঠিয়েছিল, আজ যাচ্ছে তার ছেলে—। আর না! আর কিছু ভাবতে চায় না। গম্ভীর হয়ে যায় বুকের ভিতরটা, স্তব্ধ হয় তার মন। থেমে যেতে চায় হৃদয়ের স্পন্দন। তাই ও-কথা আর ভাবতে চায় না সে। —ঘুরতে ফিরতে বিলির স্নেহাসিক্ত হাতখানা উঠে যায় ছেলের মাথায়—তার সঙ্গে কপালে একটি চুম্বন। ছেলে যাচ্ছে। কোথায়? আবার হুহু করে ওঠে মন। তোলপাড় হয়ে যায় সব, ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তার বুকের ভিতরটা। আর একটি চুম্বন। আর একটু কথা—দেখবি, ভুলবি না যেন খবর দিতে! দিনে দু-বার—সকালে একটা বিকেলে একটা। তা হলে আমিও ঠিক দুটোই পাব। তিনটে টেলিগ্রাম পাঠালেই ভাল রে, যদি একটা না পাই, দুটো তো নিশ্চয়ই পাব।

মাকে জড়িয়ে ধরে মেঘু বলে—আচ্ছা, তিনটেই পাঠাব মা।

তাতেও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না। ফাঁক যেন থেকে যায় একটা, বলে—নিজের হাতে পাঠাবি কিন্তু! অন্য লোক যদি ভুলে যায়, আমি ভাবনায় পড়ে যাব!

মেঘু বোঝে তার মায়ের এই ভাবনার পিছনের যত কথা, তার মনের ভিতরকার আশঙ্কা। সে তৎপর জবাব দেয়—না মা, আমি নিজের হাতে টেলিগ্রাম পাঠাব—কথা দিচ্ছি।

তবে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস টেনে তুলতে পারে বিলি তার অস্বচ্ছ বুকের ভিতর থেকে।

বিদায়ের পালা শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়েছে সাহেবদের সঙ্গে করমর্দন। মায়ের পাদমূলে মাথা ঠেকাতে গিয়ে মেঘু অনুভব করেছে তার মাথায় দু-ফোঁটা উষ্ণ জলের তাপ। মায়ের আর একটি চুম্বন মাথায় নিয়ে মুখ তুলে মেঘু চেয়েছে মায়ের মুখের পানে। কত সুখ, কত ভয়-শঙ্কা ফুটে উঠেছে সেই মুখে—সেই চোখে। তার রক্তিম চোখের ওপর দেখেছে তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

এরোপ্লেনে উঠে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কত সান্ত্বনা দিয়েছে একজন আর একজনকে। মা দিয়েছে ছেলেকে, ছেলে মাকে।

বাহান্ন

উপস্থিত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গর্টফ্রিড এলেন বিলির সামনে। তার মনোভাব তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। বিলির উৎকণ্ঠা দূর করতে বাগানে বসেই তিনি অনেক সান্ত্বনাদায়ক কথা বলেছেন। এখানেও মেঘুর মাথায় হাত দিয়ে তিনি মেঘুর ভার নিলেন, সময়োচিত আরো দু-চার কথা বললেন বিলিকে নিশ্চিন্ত করতে।

তিনজনের মধ্যে কথা শেষ হল। পরে বিলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেঘুর

হাত ধরে গর্টফ্রিড সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন এরোপ্লেনের ওপরে। সেখান থেকে দুজনের হাত দোলানো হয় উপস্থিত সকলের উদ্দেশে। সকলের শেষে বিলির সঙ্গে এক বিশেষ ভাবপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয় দুজনের। তারপর ভিতরে গিয়ে যে যার আসন নেয়।—সিটের সঙ্গে আঁটা বেল্ট কোমরে জড়িয়ে বেঁধে মেঘু তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, কাঁচের ভিতর দিয়ে।

মেঘুর চোখ দুটো বিস্ময়াবিষ্ট হল আর এক জোড়া চোখ তার চোখে পড়তে। শর্মিষ্ঠা! সেও এসেছে? তাকিয়ে আছে ঠিক এই জানালার দিকে। কাঁচ ভেদ করে সে দৃষ্টির শেষ হয়েছে তারই মুখের ওপর। পাশেই জেঠা! এরাও এসেছে এখানে? তা তো জানে না সে! নিশ্চয়ই কিছু বলতে এসেছে। এতক্ষণ নীচে ছিল সে, তখন সামনে এল না কেন? পারেনি সাহেবদের ঠেলে পথ করে নিতে।—সেদিন তো অতগুলো সাহেবকে অত অপমান করতে পারল, তাকেও তাড়িয়ে দিতে পারল। আজ আর পারল না এইটুকু পথ করে নিতে? —সেটা নিজের ঘরের উঠান, এটা তো তা নয়। —তাতে কি? মেঘুই তো এখানে ছিল। যেমন সেদিন ছিল সে তাদের উঠানে। মেঘুর জোরেই তো মেঘুকে তাড়াতে পেরেছিল সেদিন। আজ আর পারল না এইটুকু পথ করে নিতে! —যাই হোক, একবার দেখা করে আসা দরকার। —নাঃ, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে! প্রোপেলার ঘুরছে! বন্ধ করানো যায়না, খোলানো যায় না দরজা? বড়সাহেবকে দিয়ে বলালে হয়তো তা যায়। —হ্যাঁ, গর্টফ্রিড—নাঃ! চালিয়ে দিয়েছে এরোপ্লেন। —ঐ তার মা দেখেছে শর্মিষ্ঠাকে—ছুটে গেল তার কাছে। শর্মিষ্ঠার মাথায় হাত দিল তার মা। শর্মিষ্ঠার মাথাটা নেতিয়ে পড়ল তার মায়ের বুকে। তার মায়ের হাত কি ঠান্ডা, কি স্নিগ্ধ! এখন যদি মেঘু ওখানে থাকত, তবে মায়ের আর একটা হাত পড়ত তার মাথায়। সেটা কেমন হত? বড়সাহেব। নাঃ, অনেকদূর চলে এসেছে প্লেন্। মাটি ছেড়ে উঠছে। একবার নামানো যায় না? আর যে দেখা যাচ্ছে না ওদের! —উঠল, এবার ঘুরল। ওইতো দেখা যাচ্ছে আবার! ছোট্টটা, অথচ স্পষ্ট—তার মায়ের বুকে শর্মিষ্ঠার মাথাটা। মায়ের হাতটা শর্মিষ্ঠার মাথার ওপর আদর বুলিয়ে চলেছে। নিশ্চয়ই চোখ দুটো ওর বুজে গেছে। হ্যাঁ, ওই তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, চোখদুটো পাতায় ঢাকা। চোখ বুজে কি দেখছে, কাকে? —তাই কি! তবে কেন অমন বেসুর-বেখাপ্পা হয়ে কানে বাজে কত আজেবাজে কথা? যাক সে সব এখন থাক। তবে কেন সেদিন সে তাড়িয়ে দিল তাকে? —বেশ করেছে! দেবে না তাড়িয়ে? কেন গিয়েছিল সেখানে এতগুলো লোক নিয়ে বাদশাহি দেখাতে? দীনদরিদ্রের ঘরে বাদশাহি দেখাতে! সে কি অর্থ-সম্পদ চিনেছে? সে কি দেখতে চেয়েছে মেঘুর অর্থের ঐশ্বর্য? কেন সে যায়নি ওদের দরিদ্র কুটিরে একলা? দীনদরিদ্রের মতো। তবে তো খাতির পেত। সে যেমন ফুটানি দেখাতে গিয়েছিল, তার তেমন উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। ঠিকই করেছে।

কই? আর তো দেখা যায় না ওদের! ও-ই একটা বিন্দুর মতো। যত ক্ষুদ্র, তত বিরাট ঐ বিন্দু! যত ঝাপসা, তত স্পষ্ট ঐ বিন্দুর মাঝে দুটি বিন্দু—তার মা আর শর্মিষ্ঠার মুখ।

ঘুরতে ঘুরতে প্লেনখানা উঠছে ওপরে, ঐ দুটি বিন্দুর কেন্দ্রবিমুখ হয়ে তখনও পথ ধরতে পারে নি। ক্ষুদ্রতম হয়ে চলেছে ঐ বিন্দু। যত ছোট হয়ে আসছে ঘাসের মাঝে ঐ ছোটটো বিন্দু, ততই তা বড় হয়ে উঠছে তার মনের মধ্যে। তার মনকে আকর্ষণ করছে বিন্দুর কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি। —বিন্দু মিলিয়ে গেল মাঠের ঘাসে। কিন্তু তার বুকের মধ্যে তা মিলিয়ে গেল না।

এরোপ্লেন থামান হল না—দেখাও হল না ওদের সঙ্গে। সব কাজ করে এল, ঐ একটা বাদ পড়ে গেল। এত দূরদেশে যাচ্ছে, এমন যাত্রার পূর্বে ওদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসা উচিত ছিল। একটা ত্রুটি থেকে গেল, মস্তবড় ত্রুটি। একটা খবর দেওয়া উচিত দমদম থেকে। —কি লিখবে? কি আর লিখবে, কি আর লিখতে পারে! শুধু তোমায় দেখেছি। বাস! শুধু এই? —তা কেন? এসেছে তাই দেখেছি, না এলেও দেখতে পেতাম। যেমন এখনো দেখছি।

দমদম? অনেক দূর। অনেক সময় লাগবে সেখানে পোঁছাতে। ঝিমঝিম করে ওঠে মাথাটা, থমথম করতে থাকে বুকের ভিতরটা। অদৃশ্য শর্মিষ্ঠার মুখখানা ভাসতে থাকে মেঘুর নিমীলিত চোখের সামনে। নিস্তব্ধ মনের মাঝে ফুটে ওঠে শর্মিষ্ঠার ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। বাজতে থাকে কানের পাশে তার যত কথা—পুরানো, নতুন।

সেদিনকার কথাটা—'বড়সাহেবই তোর সব! আমি তোর কিছু না? আমার একটা কথাও রাখবি না তুই?' বলতে বলতে অভিমানে ছলছল করে উঠল শর্মিষ্ঠার দুটি চোখ, ফেটে পড়তে চাইল যেন।

আহা! তা কেন? তা কেন? —কই? শর্মিষ্ঠা কোথায়? —ওঃ—হোঃ।

গর্টফ্রিডের হাতখানা পড়ল মেঘুর মাথায়, সে আবার চোখ বন্ধ করল।

কেমন লাগছে বেশ! কষ্ট হয়, দুঃখ হয়। ব্যথায় দুমড়ে-মুচড়ে খানখান হয়ে ভেঙে ছিঁড়ে যেতে চায় মেঘুর বুকের ভিতরটা শর্মিষ্ঠার কথা ভাবতে ভাবতে। তবুও কি আরাম লাগে তার।

তবে রথীরাম কার সঙ্গে কথা বলছিল সেদিন? শর্মিষ্ঠার ঘরে গিয়ে দেখল তার নুয়ে পড়া মাথা। একটা জবাবও দিল না মায়ের বকুনি শুনে। —মনের মালিন্য ফুটে তো ওঠেনি সে মুখে। শিষ্ট, ভদ্র, বিনয়-বিনম্র, বড় মধুভরা ছিল সে মুখ। সে যেন খুশী হচ্ছিল মায়ের বকুনি শুনে! অমন তো কখনো করে না সে। স্পষ্ট মনে পড়ছে তার—সে যেন মায়ের ধমকানি শুনতে শুনতে কোথায় কোন স্বপ্নরাজ্যে চলে গিয়েছিল।

ওঃ—হোঃ! ভুলে গিয়েছিল—ওটা তো নাটকের কথা! রথীরামের বাবাই তো সেদিন বললেন। ছি—ছি! অমন সে ভাবতেও পেরেছিল? আহা! বেচারাকে বলে আসা হল না—শর্মিষ্ঠা! ভুল বুঝে এত কষ্ট দিয়েছি তোমায়, নিজেও পেয়েছি কত। শুধু ভুল—।

চোখে যা দেখেছে তা ঠিক নয়—কানে যা শুনেছে তা ভুল। আজ যা দেখছে তা কত মধুর।

এরোপ্লেনখানা ভেসে চলল সীমাহীন আকাশের সীমার সন্ধানে—মেঘুর মনের দিকদিগন্ত জুড়ে রইল শর্মিষ্ঠা।

শেষ

শিল্পীর কল্পনায় বৃহস্পতিগ্রহ ও তার বারোটি উপগ্রহের চারটি। আজ থেকে দু-বছর পরে অ্যাপোলো-১০ এই এলাকায় পৌঁছবে।
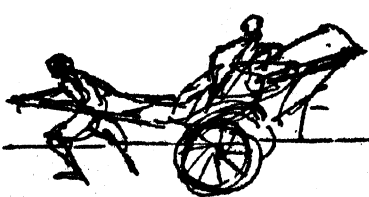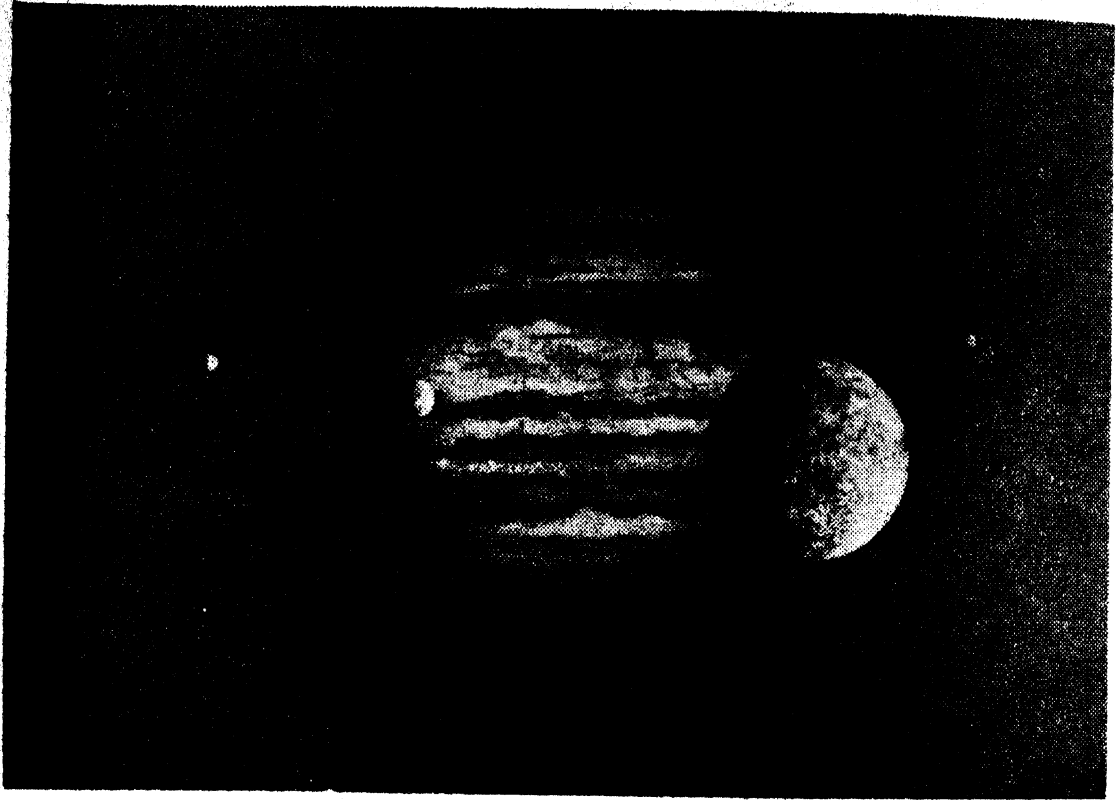
গরিবী ও মেধা

গরিবী দূর করতে হবে—শুধু আমাদের নিজেদের জীবনের কথা ভেবে নয়, তার চেয়েও বেশি করে আমাদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভেবে, গোটা দেশের উন্নতির কথা ভেবে—এই কথাটিই একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণার মধ্যে দিয়ে খুব জোরালোভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন। তাঁর নাম অ্যাশলি মন্টেগু। তিনি বিশেষ করে শিশুদের নিয়ে গবেষণা করে এই কথাটি ধরতে পেরেছেন যে, অপুষ্টির ফলে (শুধু শিশুর নয়, মায়ের পেটে থাকার সময়ে শিশুর ভ্রূণেরও) এবং সংস্কৃতির দিক থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে শিশুর আচরণ, শিক্ষালাভের ক্ষমতায় ও মেধায় ন্যূনতা ঘটে এবং এই অত্যন্ত জরুরি বিষয়টির ওপরে যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে না।

সাধারণভাবে সবাই স্বীকার করেন যে, ভ্রূণের স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধির ব্যাপারে পুষ্টির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মায়ের ও বাবার পুষ্টি নয়, মায়ের মায়েরও, সম্ভবত এমন কি মায়ের বাবারও। অপুষ্ট মায়ের শিশুদের মধ্যেই রোগ মৃত্যু ও গঠনবিকৃতি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। অপুষ্ট মায়ের শিশুরা হয়ে থাকে অপেক্ষাকৃত খাটো, হালকা ও কম মেধাবী।

বিজ্ঞানী মন্টেগু চিলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বস্তিতে গিয়ে শিশুদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি দেখেছেন, সেখানে স্কুলে যাবার বয়স হয়নি এমন শিশুদের মধ্যে প্রায় অর্ধসংখ্যকের মানসিক বিকাশে ঘাটতি রয়েছে এবং এই শিশুদের বুদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কম। তিনি আরও দেখেছেন বয়সের হিসেবে যে-সব শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম তাদের মেধাও একই বয়সের স্বাভাবিক ওজনের শিশুদের চেয়ে কম হয়ে থাকে।

সমস্যাটি যে কতখানি গুরুতর তা বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে অপুষ্টি দূর হলেই তার ফলে সৃষ্ট ঘাটতিগুলো দূর হয় না। ধরা যাক এই মুহূর্তে দেশ থেকে গরিবী দূর হল, অর্থাৎ অপুষ্টির কারণটি দূর হল। যে-সব শিশু এতকাল অপুষ্টিতে ভুগছিল তারা এখন প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাচ্ছে, ফলে তাদের দেহের ওজনও বয়সের তুলনায় স্বাভাবিক। তাহলে কি মেধাও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে? বিজ্ঞানী মন্টেগুর পর্যবেক্ষণ অনুসারে—না। ওজন স্বাভাবিক হবার পরেও দেখা যাবে, এককালের অপুষ্ট শিশুরা আকারে খাটো, তাদের মাথা ছোট ও মেধা কম। অর্থাৎ সর্বনাশ যা হবার হয়ে গিয়েছে। গরিবী দূর করে তার সুফল পাবার জন্যে বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করার প্রয়োজন হবে।

মানুষের আর্থিক সংগতি ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে তার স্বাস্থ্য, মেধা, কৃতিত্ব

অর্জন করার ক্ষমতা ও সমাজগতভাবে প্রয়োজনীয় আচরণের অতি গভীর সম্পর্ক। শুধু এইটুকুই নয়। সম্প্রতি প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যা থেকে বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়ের বাড়বৃদ্ধি ও বিকাশও নির্ভর করে শৈশবের পরিবেশের ওপরে। পরিবেশ যতো অনুকূল, বাড়বৃদ্ধি ও বিকাশও ততো উন্নত। শুধু মানুষের বেলায় নয়, পশুদের বেলাতেও দেখা গিয়েছে যে, গোড়ার জীবনের পরিবেশের ওপরে পশুর বুদ্ধি নির্ভর করে। পোষা কুকুর পিঞ্জরে বন্দী কুকুরের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। ঠিকভাবে উৎসাহ পাওয়া বানরের বুদ্ধি ঠিকভাবে উৎসাহ না-পাওয়া বানরের চেয়ে বেশি। উন্নততর পরিবেশের ইঁদুরের মস্তিষ্ক স্বাভাবিক পরিবেশের ইঁদুরের চেয়ে ভারী এবং তাদের শেখার ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত বেশি। এমনি আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

বিজ্ঞানী মণ্টেগু বলছেন, পরিবেশগত ঘাটতি যদি থাকে—যেমন, অপুষ্টি, খারাপ বাসস্থান, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা কিংবা উৎসাহের অভাব—তাহলে অবশ্যই ধীশক্তি বিকাশেও ঘাটতি দেখা দেবে। ধীশক্তি বিকাশের ঘাটতিকে বংশগত ব্যাপার বলে চাপিয়ে দেবার একটা চেষ্টা হয়ে থাকে—কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। পৃথিবী দূরে ঠেলে হতাশা ও নৈরাশ্য কাটলে ধীগত বিকাশে কতখানি পরিবর্তন আসে সেটা যাঁরা দেখতে পান না তাঁরাই বংশগত ব্যাপারের ওপরে সমস্ত দায় চাপিয়ে থাকেন।

আর এই পরিবেশগত ঘাটতি ঘটে থাকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার পরের অবস্থায় তো বটেই, এমন কি ভ্রূণ অবস্থাতেও। সেখানে এমনকি মায়ের বা বাবার অপুষ্টি, মায়ের মায়ের অপুষ্টি, এমন কি সম্ভবত মায়ের বাবার অপুষ্টির জন্যে দাম দিতে হয়। বংশের ওপরে দায় চাপিয়ে দেওয়াটা এক্ষেত্রে খুবই সহজ।

মঙ্গলগ্রহের চাঁদ

আগের লেখায় মেরিনার-৯ থেকে তোলা মঙ্গলের উপরিতলের ছবি আমরা ছাপিয়েছি। এই সঙ্গে যে ছবিটি ছাপা হল তা মঙ্গলের একটি চাঁদের। সকলেই জানেন, মঙ্গলের আছে দুটি চাঁদ—ফোবোস ও ডীমোস। ওপরের ছবিটি ফোবোস-এর। মেরিনার ছবিটি তুলেছে ৫,৫০০ কিলোমিটার দূর থেকে।

মঙ্গলের এই চাঁদটি দেখতে প্রকাণ্ড একটি ঢেলার মতো—লম্বায় প্রায় ২৫ কিলোমিটার, চওড়ায় প্রায় ২১ কিলোমিটার। ইতিপূর্বে মঙ্গলের কক্ষে স্থাপিত হবার আগেই মেরিনার-৯ মঙ্গলের অপর চাঁদ ডীমোসের ছবি তুলেছিল প্রায় ৮,৫০০ কিলোমিটার দূর থেকে। বলা হয়েছিল ডীমোস দেখতে অনেকটা আলুর মতো, এ-মাথায় ও-মাথায় ১৩ কিলোমিটারের কাছাকাছি।

মঙ্গলের দুটি উপগ্রহের একটি ফোবোস
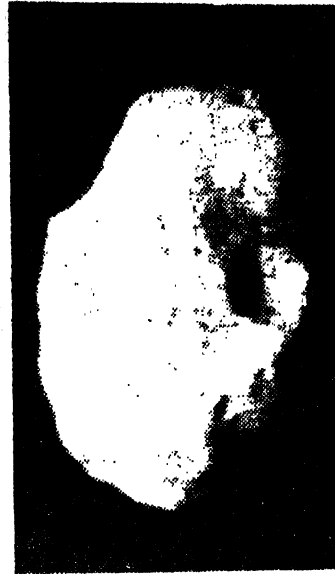
ফোবোসের ছবিতে স্পষ্টই গহ্বর দেখা যাচ্ছে। আর ডীমোস পেয়েছে অদ্ভুত ধরনের খাঁজ-কাটা-কাটা চেহারা।

যে ব্যাপারটি প্রথমেই চোখে পড়ে, মঙ্গলের কোনো চাঁদের আকারই গোল নয়, ঢেলার মতো অসমান। আর আকারেও খুবই ছোট—পৃথিবীর চাঁদের সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না। সম্ভবতঃ এত ছোট আকার হওয়ার দরুণই গোল চেহারা পায় নি। অন্যদিকে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে মূল সৌর নেবুলা থেকে একেবারে প্রাথমিক অবস্থাতেই কোনো বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে তাহলে ধরে নেওয়া চলে যে, বস্তুর সংগ্রহেও এমন একটি সমতা থাকবে যে, আকারগত সমতা লাভ করা সম্ভব হবে। আবার যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সৌরমণ্ডলের সৃষ্টির গোড়ার দিকে বারংবার সংঘর্ষ ঘটেছে তাহলে আকারের দিক থেকে আরো খানিকটা গোলত্ব প্রাপ্তি আশা করা চলে। কিন্তু ঢেলার মতো এবড়োখেবড়ো আকার দেখে বোঝা যায় সে কোনোটাই ঘটেনি। সম্ভবত মঙ্গলের দুটি চাঁদই গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে আটক করা দুটি খণ্ড মাত্র।

সে তুলনায় পৃথিবীর চাঁদকে পৃথিবীর দোসর বলতেও বাধা নেই। পৃথিবী ও তার চাঁদের আকারের তুলনামূলক একটা ধারণা হতে পারে যদি বলি পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে ১২,৭৫৭ কিলোমিটার আর পৃথিবীর চাঁদের ৩,৪৫৬ কিলোমিটার। অন্যদিকে মঙ্গলগ্রহের ব্যাস ৬,৮০০ কিলোমিটার। পৃথিবীর চাঁদ অবশ্যই মঙ্গলগ্রহের চেয়েও ছোট কিন্তু তাই বলে মঙ্গলগ্রহের চাঁদের মতো অকিঞ্চিৎকর নয়। বরং উপগ্রহ হিসেবে পৃথিবীর চাঁদ [illegible] বড়ো যে পৃথিবীকে গ্রহ ও [illegible] কোনো কোনো বিজ্ঞানী এই উভয়কে যুগলগ্রহ বলে থাকেন।

আর পায়োনিয়ার-১০ আজ থেকে প্রায় দু-বছর পরে যে গ্রহটির এলাকায় পৌঁছবে, যার নাম বৃহস্পতি, তার আছে বারোটি উপগ্রহ বা বারোটি চাঁদ। আশা করা যাচ্ছে পায়োনিয়র-১০ বৃহস্পতির উপগ্রহগুলো সম্পর্কেও খবর সংগ্রহ করতে পারবে।

মঞ্চে বিজ্ঞান

'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সংখ্যায় থিয়েটার শিরোনামায় যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে তার মর্মার্থ এদেশে যাঁরা নাটকের মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ করতে চান তাঁদের কাছে উপস্থিত করতে চাই।

লণ্ডনের মারমেইড থিয়েটারে বছর পাঁচেক আগে একটি ক্লাব গড়ে ওঠে—নাম 'মলিকিউল ক্লাব'। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন একজন মহিলা—শ্রীমতী যোসেফিন মাইলস। তাঁরই প্রেরণায় ও উৎসাহে এই ক্লাবের উদ্যোগে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অবলম্বনে কয়েকটি মূকাভিনয় মঞ্চস্থ হয়েছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

প্রথম অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'লাইটস আপ', বিশেষ করে আট থেকে বারো বছরের শিশুদের জন্যে। অনুষ্ঠানের কিছু অংশ জুড়ে ছিল শ্যাডো-প্লে আর ছিল বহুবর্ণ-বিশিষ্ট সাইকেলের চাকা, প্রকাণ্ড একটি ত্রি-শিরা কাঁচ আর সূর্যের আলোকরশ্মির সাহায্যে পিস্তল-চালনা। আলোকবিদ্যার সূত্রগুলো উপস্থিত করা হয়েছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীরূপে, সঙ্গে ছিল প্রচুর নাচ-গান ও হৈ-হল্লা। দর্শকরা প্রচুর হেসেছেন এবং কোনো সময়েই টের পাননি যে বিজ্ঞানের অত্যন্ত নীরস ও ভীতিসঞ্চারী বিষয়গুলো তাঁদের শেখা হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি ছিল শব্দবিজ্ঞান নিয়ে, তৃতীয়টি যন্ত্রবিজ্ঞান নিয়ে। সম্প্রতি চতুর্থ অনুষ্ঠানটি মঞ্চস্থ হচ্ছে, তার নাম 'ও-কে ফর সাউণ্ড'। পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রতিটি শো লণ্ডনের স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্যে অগ্রিম সংরক্ষিত হয়ে আছে।

আমাদের দেশেও এ-ধরনের কিছু করা যায় কিনা, নাটক নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করেন তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন।

—অয়স্কান্ত

প্রমীলা বনুর পায়ে জুতো পরিয়ে দিচ্ছিল। অশোককে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রমীলার ভ্রূ ধনুকের ছিলার মতো বেঁকে গিয়েছিল। পরক্ষণেই প্রশ্নের শর নিক্ষিপ্ত হল—কি হল, আজ লোকের কোন খোঁজ পেলে?

সারাটা দিন অফিসের খোঁয়াড়—চাউস খাতা—জটিল হিসেবের গোলকধাঁধা—কলিগদের বস্তাপচা রসিকতা—সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাজনীতি—যৌনতা বিষয়ক খবরাদি নিয়ে হৈ-হুল্লোড়—এই সমস্ত গতানুগতিকতার সঙ্গে ক্লান্ত অশোক বাসের ঠাসাঠাসি ভিড়, ভেতরকার দমবন্ধ করা আবহাওয়া, ঘাম ধুলো বিরক্তি অসন্তুষ্টি চুইয়ে তাদের রমেন পালিত লেনের গলিতে পা রাখতেই কথাটা তার খেয়াল হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে প্রমাদ গুণল। প্যান্টের ডান পকেট থেকে সারাটা দিনের ব্যবহৃত ময়লা রুমালটা বার করে ঘাড় রগড়ে মুখ মুছতে মুছতে ভাবছিল প্রমীলাকে আজ সে কি জবাব দেবে।

সামনে ডান দিকে চৌধুরীদের আম-বাগানটার মধ্য থেকে একটা টিয়া ডেকে উঠল। সেদিকে তাকাতেই যে ছায়াটা সারা দিনমান আমগাছের তলায় শুয়ে থাকে, তার কথা অশোকের মনে পড়ল। সে-ছায়াটা অফিসে যাবার পথে রোজই তাকে হাতছানি দেয়। অশোকের মনটা টগোমগো দীঘির মত [illegible] ভরে আসে। এখন সমস্ত বাগানটা কেমন ঠান্ডা আঁধারে ভরে যাচ্ছে। তার দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ বুজে ফেলে অশোক কি যেন খুঁজল। তারপর মাথাটা আলতো ঝাঁকিয়ে শেষ বিকেলের ছায়াচ্ছন্ন পথটা ধরে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

—নাঃ। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে ব্যাগটা টেবিলের 'পরে রেখে কোন শব্দ না করে চেয়ারের 'পরে বসে পড়ল অশোক। তারপর বলল—তবে...

—রাখ তোমার 'তবে' আর কিন্তুর ফুটকি আর ড্যাশ। আজ একমাস হতে চলল তুমি একটা লোক ঠিক করতে পারছ না। বনুর জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে প্রমীলা উঠে দাঁড়াল। বাবাকে দেখামাত্র ছটফট করতে থাকা দু'বছরের ছেলে বনু

একক্ষণে ছাড়া পেয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার কোলে।

অশোক জামা-কাপড় ছেড়ে চান করে পরিচ্ছন্ন হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে। আসলে মানুষের মন বোধহয় বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকে। এবং অশোক ভাবছে সেই ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষায় প্রেম বধূ শিশু সবকিছুই প্রতীক্ষা করতে পারে। তছাড়াও অভিজ্ঞতার আলোকে অশোক বুঝল ছেলেকে আদর করবার বা প্রমীলার সঙ্গে বাক্যালাপের এটা প্রকৃষ্ট সময় নয়। আড়চোখে অশোক প্রমীলার থমথমে মুখের দিকে এক পলক তাকাল। ঘরের মাঝে নীরবতাই এখন অশোকের কাম্য। এবং এই নীরবতা ধরে রাখার জন্যে অশোককে সচেষ্ট হতে হবে। আসলে ঝড়, ঝঞ্চা বজ্র বিদ্যুৎ সহ্য করবার মত এই মুহূর্তে অশোকের মন তৈরী নেই। তার চেয়ে এই থমথমানি নিস্তব্ধতা অনেকখানি আরাম-দায়ক, প্রীতিপ্রদ।

অশোক তাই ছেলেকে বলল—যাও বাবা, তোমার বড় রেলগাড়ীটা নিয়ে বারান্দায় ঘোরাও। আমি জামা-কাপড় ছেড়ে চান করে নি। ছেলের গালে মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে দিল অশোক।

টেবিলের 'পর থেকে অশোকের পোর্ট ফোলিও ব্যাগটা শেলফে সরিয়ে রাখতে রাখতে প্রমীলা গজ গজ করছিল।—তোমায় দিয়ে যদি কোন কাজ হয়। আমিও তো অফিসে কাজ করি। প্রতি সপ্তাহে তিন-চারদিন কামাই করা আমার পক্ষে অসুবিধেজনক—এসব তো তোমার জানা কথা। তুমি না পার অন্ততপক্ষে রবিকে খবর দিও। ও ঠিক কাজের লোক জোগাড় করে দেবে।

কথাটা শেষ করে প্রমীলা অশোকের জন্যে ওভালটিন তৈরী করতে রান্নাঘরের দিকে গেল।

কোনরকম জবাব না দেবার জন্যে দৃঢ় সংকল্প অশোক মুখ বুজে শ্যালক রবিকে খবর পাঠাবার কথাটা শুনল। এ-কথাটি প্রমীলার নোতুন সংযোজন। প্রমীলার বাপের বাড়ীর পাড়ায় ও বেপাড়ায় মস্তানি করা ছেলে রবিকে যে অশোক পছন্দ করে না—প্রমীলা সে-কথা ভালভাবেই জানে। রবির জন্য মাঝে মাঝে উদ্বেগ অনুভব করলেও প্রমীলা সাধারণত অশোকের কাছে রবির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে না। মাসখানেক আগে কলেজ স্ট্রীটে ইউনিভারসিটির সামনে আরও ক'টি ছেলের সঙ্গে মদ্যপ অবস্থায় দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় মুখ-খিস্তি করা রবির ছবিটি মনে পড়ল অশোকের।

জামা-কাপড় ছেড়ে অশোক বাথরুমে ঢুকল। মোজায়েক-করা বাথরুমটা তকতক ঝকঝক করছে। এটি প্রমীলার সৌখীনতার ফসল। এদিককার শহরতলী এলাকায় করপোরেশনের জলের দাক্ষিণ্য এখনও এসে পৌঁছায়নি। কলকাতা মেট্রোপলিটন স্কীম চালু হলে হয়ত কোনও দিন জলপ্রবাহিত জলের সুবিধে তাদের দরজায় এসে উপস্থিত হবে। পাশাপাশি অন্য ক'টি বাড়ীর মত তাদের বাড়ীতেও টিউবওয়েল ছিল। চানের সময় দু'-চার বালতী জল ধরে এনে অশোক কাজ চালাত। প্রমীলার জন্যে বাথরুমের চৌবাচ্চায় ক' বালতী জল রেখে যেত। বিয়ের এক বছরের মাথায় প্রমীলা চাকরীতে একটা লিফ্‌ট পেল। প্রায় আশী টাকা মাইনে বাড়ল। এবং লটারী পাবার মত এরিয়ার পেয়ে গেল প্রায় তেরশ' টাকা। তখন প্রমীলা আরও একটা কাণ্ড করে বসল। অশোককে না জানিয়ে ওদের কো-অপারেটিভ থেকে আরও দু' হাজার টাকা লোন তুলে নিল। তারপর রাতে একদিন অশোকের বুকের মধ্যে শুয়ে বিলি কাটতে কাটতে প্রমীলা বলেছিল—আমার অনেক দিনের একটা ইচ্ছা তোমায় পূরণ করতে হবে। যদি কথা দাও তো বলি।

জবাবে অশোক আদরে গাল টিপে

আহ্লাদে ঘন চুমু খেয়ে নোতুন বৌ প্রমীলাকে অস্থির করে তুলেছিল।

প্রমীলা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দম ফেলতে ফেলতে বলেছিল—বাব্বাঃ, হয়েছে। তোমার সম্মতি পেয়েছি। এবার কাজের কথা বলি। এক নম্বর—আমাদের বাথরুমটা মোজায়েক করতে হবে, প্ল্যান আমি দেব। দু' নম্বর—আমাদের শোবার ঘর থেকে বাথরুমটা একটা দরজা দিয়ে যোগ করে দিতে হবে। এটা হবে তোমার আমার খাস বাথরুম, বুঝলে। তিন নম্বর—রান্নাঘরের পাশে লবি থেকে খানিকটা জায়গা কেটে নিয়ে আর একটা অল্প খরচে সাধারণ বাথরুম তৈরী করিয়ে রাখবে। ঝি-চাকর বা বাইরের লোক এলে ব্যবহার করবে। চার নম্বর—ছাদে একটা জলাধার তৈরী করিয়ে পাম্প বসিয়ে নেবে। কল খুললেই সব সময় জল বাথরুম, রান্নাঘর ও লবিতে ঘসান বেসিনে পাওয়া যাবে।

প্রমীলার পরিকল্পনার কুশলতা অশোককে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। প্রস্তাবের পেছনে অনেক দিনের চিন্তা ও মনন কাজ করেছে—সে-বিষয়ে অশোক নিঃসন্দেহ।

অশোককে নাড়া দিয়ে প্রমীলা বলেছিল—কি প্রপোজালটা পছন্দ হল না! অশোক ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল—প্রপোজালটা খাসা। বাবার রিটায়ারমেণ্টের টাকায় তৈরী বাড়ীটা নিজেদের সুবিধে বা আরামের জন্যে যদি খানিকটা সংস্কার করে নি, তাতে আপত্তি করার কি আছে। কিন্তু তাতেও অনেক টাকা লাগবে। ফট করে এতগুলো টাকা কোথায় পাই!

তখন প্রমীলা আহ্লাদে অশোকের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—টাকার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

এই সেই মোজায়েক বাথরুম। প্রমীলার পরিকল্পনায় আর তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়েছিল। এখানে ঢুকলেই অশোকের কেমন এক অনুভূতি হয়। সুগন্ধী সাবান তেল ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীর একটা সূক্ষ্ম-গন্ধ বাথরুমের ভেতরে যেন সর্বক্ষণ থমকে থাকে। দু'খানা সোক-টাওয়েল পরিপাটি করে সাজান। অন্য একটা আলনায় নানা প্রসাধনী সামগ্রী গোছান। এখানে ঢুকলেই অশোকের মনে হয় যেন পৃথিবীর মানুষগুলোর বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম, জীবনের গতি সংঘর্ষ স্পন্দনময় জগৎ থেকে অনেক দূরে কোন এক স্বপ্নিল জগতে সে ঢুকে পড়েছে।

শাওয়ার-বাথ খুলে দিল অশোক। ঝকঝকে নকসা-করা মেঝের 'পরে জল পড়ছে ঝর-ঝর করে। শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল অশোক। শরীর বেয়ে জল নামছে তর-তর করে। সমস্ত দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি বিরক্তি দাহ যেন সব মুছে দিতে বদ্ধপরিকর।

চান করতে করতে একটু আগে রবির নামোল্লেখের ঘটনাটুকু মনে পড়ল। প্রমীলা কি অশোকের বিরক্তি উৎপাদন করে ক্রূর আনন্দলাভ করল! না, অশোকের পৌরুষে আঘাত করতে চাইল!

সকালবেলা প্রমীলা অশোককে আহত করতে চেয়েছিল। কি এক কথায় কথায় প্রমীলা বলে বসল—তোমাদের আর কি! বিকেলে বাড়ী ফিরে চান-টান সেরে ঠাণ্ডা হয়ে বসলেই হয়। আর আমরা! তোমাদের মত আমাদেরও অফিস করতে হয় পুরুষদের ভিড় ঠেলে বাসে উঠতে হয়, বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে পুরুষদের নানারকম কাপুরুষ অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তারপরও কি বাড়ী এসে নিস্তার আছে! ছেলেকে খাওয়ান, জামা-কাপড় পরান, তারপর আবার বাড়ীতে কাজের লোক না থাকলে হেঁসেলে ঢোক।

অশোককে উত্তর দিতে হয়েছিল—তড়বড় করে অনেক কথা বললে বটে। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা বৌ চাকুরে হলে বাড়ীর কাজকর্মেও হাত লাগায়। ছেলেমেয়ে সামাল দেয়। তাই নয় কি!

কথা শেষ করে ক্ষুরটা আবার গালে বসাতে গিয়ে অশোক এক পলকে প্রমীলার দিকে তাকালো। প্রমীলার ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল দেখাচ্ছিল। কানের 'পর সিঁদুর রং ধরেছিল। অশোক বুঝতে পারছিল প্রমীলা ভয়ানক রেগে গেছে।

রান্না করতে করতে খুন্তি হাতে চলে এসেছিল প্রমীলা। খুন্তি হাতে প্রমীলার রাগত চেহারাটা দেখে অসুরের বুকে বর্শাবিদ্ধ দুর্গার মূর্তির কথা মনে পড়েছিল অশোকের। অবশ্য দুর্গার মুখখানা প্রসন্ন হাসিতে ঝলমল করে। বর্শা-ধৃত অবস্থায় দুর্গার মুখখানা অত হাসি-হাসি খেলা-খেলা ভাব থাকে কি করে অশোক জানে না। অন্ততপক্ষে অশোককে বিদ্ধ করবার সময় প্রমীলা কিছুতেই হাসতে পারে না। বোধহয় দেবীরাই খেলাচ্ছলে হাসতে হাসতে অবলীলাক্রমে বধ করতে সক্ষম।

প্রমীলা খুন্তি নাড়িয়ে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিল—তা হোক, অফিসে যখন-তখন কামাই করায় আমার অসুবিধে রয়েছে।

অশোক কথার সুতো ছাড়ে—বা রে! অসুবিধে তো আমারই বেশী হবার কথা। একটা সেকশনের চার্জে রয়েছি।

—তা হোক। মেয়েদের অসুবিধে তুমি কি বুঝবে! সেদিন তো চ্যাটার্জি-সাহেব মুখের 'পরে বলেই বসলেন—মিসেস দত্ত। খুশীমত যখন-তখন কামাই করছেন। অফিসেও তো ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে। হয় মন দিয়ে সংসার করুন, নয় অফিস। দু' নৌকোয় পা দিয়ে চললে কোথাও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় না।

ক্ষুরটা নামিয়ে রেখে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে অশোক মন্তব্য করল—আমি তো সে-কথাই বলি।

ক্ষুন্তি নাড়িয়ে প্রমীলা জবাব দিল—তোমার তো ঐ এক কথা। চাকুরী ছাড়। অথচ ঘটকের মুখে যখন শুনেছিলে মেয়ে চাকুরী করে তখন শুনেছিলাম পুলকে একরাত্ত তোমার ঘুম হয়নি।

প্রমীলার গোল হয়ে-ওঠা চোখ, রক্তাভ কান, নীরক্ত খসখসে মুখ দেখে অশোক বুঝতে পারছিল প্রমীলা আন্তরিকভাবেই চটেছে।
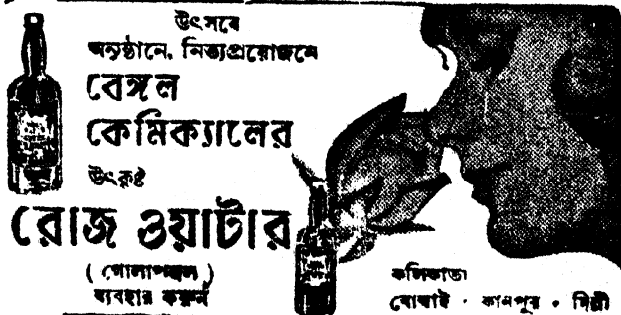
অশোক 'দেরি হয়ে যাচ্ছে' বলে উঠে গিয়েছিল।

শাওয়ার বন্ধ করে দিল অশোক। ভেজা মেঝের 'পরে জল ছপছপ করছে। স্কাইলাইটের নরম আলোয় বাথরুমটা উজ্জ্বল। ওপরের দিকে তাকাল অশোক। বিদায়ী সূর্যের আলোর তির্যক প্রতিফলনে মেঝের জলে বিচিত্র ইমেজ সৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ অশোকের মনে হল চাকুরী করা মেয়ের মনে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার দরুণ এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক মানদণ্ডের সৃষ্টি হয়। ভাবনাটা কি রূঢ় হয়ে গেল! চিন্তাটা কি একপেশে! কি জানি।

খাবার আর ধূমায়িত চা প্রমীলা টেবিলের 'পরে রাখতে রাখতে বলল—সমস্ত রান্না সেরে রেখেছি। সিনেমায় যাচ্ছি ও-বাড়ীর শিবানীর সঙ্গে। ঘণ্টাখানেক পরে বুনুকে দুধটা খাইয়ে দিও। থার্মো-ফ্লাস্কের মধ্যে রইল। দুধটা খাইয়ে দিলেই বুনু ঘুমিয়ে পড়বে। সিনেমা থেকে ফিরে খাবারটা গরম করে নিলেই চলবে।

এর পর কোন কথা বলে লাভ নেই। অশোক জানে। অনর্থক কথা কাটাকাটি। সিনেমা যাওয়া বন্ধ হলে কুরুক্ষেত্র লাগবে। অতএব অশোক ঠোঁট চেপে থাকল। বুনু বাবার পাৎলুন চেপে ধরে মা-মণিকে টা-টা করল। তারপর চোখের আড়াল হতেই অশোককে চেপে ধরল—বাবা, তুমি ঘোড়া।

অশোক হেসে ফেলল—বেটা ঘোড়-সওয়ার। দাঁড়া ঘরের লাইটগুলো জ্বালি।

—আমি—আমি—চেঁচিয়ে উঠল বুনু।

—ঠিক ঠিক, আলো তো তুই জ্বালাবি।

ওর ছোট ছোট আঙুলগুলো সুইচ-গুলোর ওপর লাগিয়ে টিপে টিপে লাইট গুলো জ্বালাচ্ছিল অশোক। প্রতিটি লাইট জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুনু মজা পাচ্ছিল আর খিলখিল করে হাসছিল। সঙ্গে সঙ্গে অশোকও হাসছিল। দুজনের সম্মিলিত হাসির ঢেউগুলো সমস্ত ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল।

সদর গেট ও সামনের দরজা বন্ধ করে বুনুকে পিঠে নিয়ে অশোক ঘোড়া হল। বুনু 'হেট হেট, জলদি চল, সামনেওয়ালা ভাগো' বলে চেঁচাচ্ছিল। আর অশোক হামাগুড়ি দিতে দিতে ভাবছিল—প্রমীলা তোমাকে আমি এ-কথাই বোঝাতে পারছি নে যে বুনুকে তার প্রাপ্য স্নেহ ভালবাসা মমতা পরিচর্যা হতে বঞ্চিত করবার অধিকার তোমার নেই। শুধু ব্যস্ত সকাল থেকে কৃপণের মত কিছুটা সময় বাঁচিয়ে বুনুকে নাওয়ান-খাওয়ানটা যান্ত্রিকতার স্তরে পৌঁছে যায় না কি। আমার জানতে ইচ্ছে করে প্রমীলা অফিসে ফেরত ক্লান্ত সন্ধ্যায় তোমার মাঝে বুনুর জন্যে কতখানি স্নেহ মমতা সঞ্চিত থাকে, থাকতে পারে। গড়িয়ে চলা দিনের অলস অবসরের আয়েস মুহূর্তগুলো কেন বুনুর দুষ্টুমী আবদার আহ্লাদের সাথে মিলে মিশে একীকরণ হয়ে যাবে না। মায়ের কাছ থেকে তিলে তিলে যা পাবার কথা, আবিষ্কার করবার কথা, হয়ে ওঠার কথা—তা বুনু তোমার কাছে পাবে না কেন প্রমী।

—ও বাবা, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন। জলদি চল সামনেওয়ালা ভাগো।

বুনু ঘুমিয়ে পড়লে পর অফিস লাইব্রেরী থেকে আনা হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান এণ্ড দ্য সী' বইটা সে খুলে বসল। বইটা তার খুব ভাল লাগছে।

চারপাশের অথৈ জলের বুকে মসী-কীর্ণ রাতের অন্ধকার। মাঝে মাঝে ক্ষীণ ফসফরাসের আলোর ঝলকানি। তারই মধ্যে বৃদ্ধ মানুষটির বাঁচার সংগ্রাম চলে নিরলস।

বুনুকে ঘিরেও কি আমাদের একটা সংগ্রামের মহড়া চলছে না! বুনুকে স্নেহ মমতা যত্ন শিক্ষায় স্বাবলম্বী করে তোলার দায়িত্ব পালনের মাঝেই আমাদের সংগ্রামের চাবিকাঠি নিহিত। তা কি আমরা যথাযথ পালন করছি। অশোক অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

চারপাশের ঝোপঝাড় আর বন-বাদাড়ে ঝিঁঝিঁ পোকার ক্লান্তিহীন একটানা ডাক। এমনি যতিহীন সুরের মাঝে কেমন এক-ধারা নেশা আছে। অশোকের সমস্ত সত্তা এর মধ্যে ডুবে গেল। তারাখচিত কালচে আকাশের গায়ে চিত্রার্পিতের মত একঝাঁক নারকেল গাছ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠল।—আরে তোমরা সব ঘুমুলে নাকি। সাড়াশব্দ নেই যে বড়।

প্রমীলার কণ্ঠস্বর বেশ উৎফুল্ল ও সচেতন শোনাচ্ছিল। অশোক উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

—বুনু ঘুমিয়ে পড়েছে তো। কোন গোলমাল করেনি? প্রশ্ন করতে করতে প্রমীলা ঘরে ঢুকে পড়ল। শায়িত বুনুর কাছে দাঁড়িয়ে ওর চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর তোয়ালে দিয়ে মাথার ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে অস্ফুটে বলল—ইস্, কিরকম ঘেমে গেছে।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে গ্যাসের উনুন ধরিয়ে রান্না করা জিনিষগুলো প্রমীলা চটপট গরম করে নিল। তারপর ডাইনিং টেবিলে ওরা দুজন বসে পড়ল।

প্রমীলা বলল—এ জায়গাটা কেমন বন-জঙ্গলে ঠাসা। নির্জন। আজও আমার ভয় কাটল না। রাতের অন্ধকারের মধ্যে চার-পাশে শুধু গা ছমছম করা গাছগাছালির শব্দ আর পাখি-পাখালির ডানা ঝাপটাবার আওয়াজ শুনতে শুনতে মনে হয় জন-বসতিহীন কোন পুরীতে বন্দী রয়েছি। অথচ ক' মিনিট দূরে তুমি বাস-টারমিনাসে যাও—দেখবে, যেন কল্লোলিনী কলকাতা আলোকমালায় ঝলমল করছে। সিনেমার সামনেটা বিজ্ঞাপনের আলোকচ্ছটা. আলু-কাবলী ভেলপুরী ফুচকাওয়ালাদের হাঁক-ডাকে রমরমা। আশেপাশে ব্যস্ত মানুষদের ভিড়, বাসের বিরতিহীন আসা-যাওয়া, দোকানপাট. বাটার নয়নমনোহর শো-কেস, শাড়ীর দোকানের বাহারী বিন্যাস—মনে হবে কলকাতা আমার অষ্টেপৃষ্ঠে মাখা-মাখি। অথচ এটুকু দূরে পাড়ায় ঢুকতেই অপুর নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশঝাড়, মশা আর প্যানাপুকুরের কথা মনে পড়ে যায়।

খেতে খেতে প্রমীলা স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মত কথা বলে গেল অনর্গল। কিন্তু শোবার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলা ঘুমে নিশ্চেতন। অশোক ভেবেছিল প্রমীলার মনটা আজ শান্ত রয়েছে, ক'টা কথা বলবে। বুনু নড়েচড়ে উঠল। ওকে তুলে প্রস্রাব করিয়ে আবার শুইয়ে দিল অশোক। পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

চারপাশের আকাশ দ্রুত পরিষ্কার হচ্ছে। পাখি-পাখালির কলরব দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছে। আড়মোড়া ভেঙে প্রমীলা নড়ে-চড়ে বসল। বাচ্চামেয়ের মত হাতের তেলো দিয়ে চোখদুটো ঘসল। তারপর অস্ফুট বিমর্ষ কণ্ঠে বলল—এই এখন বাসন নিয়ে বসতে হবে। তারপর আবার রান্না। আর ভাল লাগে না। কবে যে একজন কাজের লোক যোগাড় হবে।

অশোকেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল—এত তাড়াহুড়ো করার কি হয়েছে। দাঁড়াও, আমিও তোমায় সাহায্য করব খন।

কাপড় গোছাতে গোছাতে প্রমীলা আলতো কণ্ঠে বলল—তাইতে যদি মিটে যেত, তবে আমার চাকুরি ছাড়াবার ব্যাপার নিয়ে এত কথা উঠত না। কথা বলতে বলতে প্রমীলা আবার পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

অশোক আর বাক্যব্যয় না করে উঠে সামনের দরজা খুলে ফেলল। সদ্য আলোকিত ছোট্ট উঠোনে পা রাখল। হয়ত প্রমীলা ঠিকই বলে। আজকাল মা-বাবার স্নেহকঠোর দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকলেই সন্তান মানুষ হয় না। মানুষ হলেও সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবার কোন প্রতিশ্রুতি সে বহন করে না। বেকারীত্বের ক্রমবর্ধমান সীমা—ছাঁটাই-লক-আউট, ক্রোঞ্জায় ধর্মঘট, হিন্দী সিনেমা, ইয়াংকি কালচার তথা আর্থ-রাজনীতি—সমাজনীতির জটিল পরিবৃত্তই মানুষের ভবিষ্যতের নিয়ামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কি জানি! তাই বলে কি আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব। আকাশের দিকে তাকাল অশোক। রক্তিমাভ টুকরো ভাঙা ভাঙা মেঘগুলো কেমন ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ছে।

অশোক বাইরে বেরিয়ে যেতে প্রমীলা আস্তে আস্তে উঠে বসল। আলোকিত আকাশের পটভূমিতে আন্দো-লিত বৃক্ষশ্রেণীর 'পরে চোখ পড়ল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল প্রমীলা। তার মনে হল এ জীবন্ত উজ্জ্বল পৃথিবী থেকে সে বহুকাল বঞ্চিত রয়েছে। ডালহৌসী স্কোয়ারকে ঘিরে নিত্য যে নাটকের মহড়া চলে—তা তাকে স্বভাবতই উজ্জীবিত করে। মানুষের মাঝে উত্তরণের স্বাদ তার কাছে মুক্তির বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। শুধু অশোক, বুনু বা তোজায়েক বাথরুমের সদৃশ্য বাড়ীটা তার কামনা-বাসনা স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম নয়। কবে আবার সে তার তৃপ্তির উৎস সন্ধানে বেরোতে পারবে।

সব দেশের বিলাসী-বিলাসিনীরা না জেনে জীবের মৃতদেহ দিয়ে মুখ আর অঙ্গ সম্মার্জ্জন করেন—কথাটা শুনলে আপাতত আজগুবী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ আজগুবী নয়, নিছক সত্য। আমাদের দেশের গরীবদের বেলায় একথা বলা চলে না, কারণ তারা সাবান দিয়ে গা একটু ভাল করে রগড়ানোর জন্য দোকান থেকে মাত্র কয়েক পয়সা খরচ করে তিতপোল্লা বা ধুঁধোলের ছোবড়া কিনে আনেন। কিন্তু ধনীদের এ জন্য চাই মোলায়েম আরামপ্রদ কিছু। এই আরামপ্রদ বস্তুই হচ্ছে জীবদেহ : সামুদ্রিক স্পঞ্জের দেহ।

অনেকেরই ধারণা—স্পঞ্জ একরকম জলজ উদ্ভিদ, কিন্তু আসলে তা নয়, জীব-বিজ্ঞানীরা এর সব কিছু পর্যালোচনা করে বলেছেন—এরা জীব, সামুদ্রিক বা জলজ জীব।

স্পঞ্জের ব্যবহার অনেক প্রাচীন কাল থেকেই শুরু হয়েছে। প্রাচীন মিশর এবং ফিনিশিয়ার অধিবাসীরা এর ব্যবহার জানতেন, তাদের কাছ থেকে গ্রীসের লোকেরাও শিখে নেন। ভূমধ্যসাগরে ডুবো-জাহাজের ধাক্কায় ভেসে উঠত যেসব স্পঞ্জ তাই দিয়েই মিশরের আর ফিনিশিয়ার লোকেরা তাদের কাজ চালিয়ে যেতেন। মাত্র এইটুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে গ্রীসের লোকেরা সমুদ্রের তল থেকে এগুলির তোলার ব্যবস্থা করলে। ছোট ছোট ছেলে-দের আদুড় গায়ে নামিয়ে দেওয়া হত সমুদ্রের তলে, মাথায় থাকত তাদের একটা ভারী পাথর, দু হাতে সেটা চেপে ধরে রাখত তারা। এতে জলের নীচে তলিয়ে যাবার সুবিধা হত। আর স্পঞ্জ কেটে তুলে আনবার জন্য সঙ্গে থাকত একটা করে কাস্তে আর থলে। ছেলেবেলা থেকে এই করার ট্রেনিং দেওয়া হত বলে এরা অনেক-ক্ষণ পর্যন্ত জলের নীচে ডুবে থাকতে পারত। পাথর নিয়ে নামার রেওয়াজ অবশ্য এখনও আছে। তবে একটু অন্য ধাঁচে : এখনকার পাথরের উপরাংশ কেটে তাতে একটা চেন বাঁধা হয়, আর এই চেনটা আটকে দেওয়া হয় ডুবুরীর পায়ের গিঁটের উপর লাগানো মলের মত একটা বেড়ীতে—যাতে যখন ইচ্ছে এটা খুলে ফেলা যেতে পারে।

প্রাচীনকালে স্পঞ্জ ঘষা মাজা পোঁছার—কাজেই ব্যবহার করা হত। এখনও যে এ ব্যবহার একেবারে নেই—তা বলা যায় না। এখনও মটরগাড়ি, কলম ইত্যাদি পরিষ্কার করতে লেখা আর শিল্পীর তুলির আঁচড়ের দাগ তুলতে বা বলটিং-এর কাজ করতে এ ব্যবহার করা হয়। শিরস্ত্রাণ এবং বর্মের নীচের গদি তৈরী করতেও স্পঞ্জ ব্যবহার করা হত।

জলের নীচে কোথায় স্পঞ্জ আছে—দেখে নেবার জন্য একরকম জলদূরবীন ব্যবহার করা হত। এর নির্মাণপ্রণালী অতি সহজ : ধাতু দিয়ে তৈরী একটা চোঙের একমুখ কাঁচ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হত, আর এক মুখ থাকত খোলা। খোলা মুখে চোখ লাগিয়ে কাঁচওয়ালা মুখটা জলের উপরতল থেকে একটু নীচু নামিয়ে ধরলেই নির্বিঘ্নে জলের নীচেকার জিনিস দৃষ্টি-গোচর হত। মূলতঃ এই রীতি বজায় রেখেই এখন অবশ্য উন্নত ধরনের জল-দূরবীন তৈরী হয়েছে। এখনকার দূরবীনের চোঙটা মোচাকৃতি, নীচের চওড়া দিকটায় লাগানো থাকে কাঁচ, আর উপরের অপেক্ষা-কৃত সংকীর্ণ দিকটায় রাখা হয় চোখ। এই সংকীর্ণ দিকটায়ও এমনি ফাঁক থাকে যাতে ওর মাঝ দিয়ে হাত চালিয়ে নীচের কাঁচের উপরে দিকটা পরিষ্কার করা যায়। চোঙটা বেশি লম্বা করাও চলে না, কারণ তাহলে হাতের নাগালের বাইরে পড়বে কাঁচ।

স্পঞ্জ কেমন জায়গায় কত গভীর জলের নীচে আছে—তার উপর নির্ভর করে তুলবার পদ্ধতি। স্পঞ্জ জলের তলে জন্মালে পায়ে হেঁটেই তোলা যায়, গভীর জলের তল থেকে তুলতে হলে নৌকায় চড়ে গিয়ে 'হারপুন' বা হুকওয়ালা লগির সাহায্যে তুলতে হয়। এ কাজে যারা ওস্তাদ হয়ে গেছে তারা ৪০ ফুট জলের নীচে থেকেও হারপুনের সাহায্যে স্পঞ্জ তুলে আনতে পারে। যে যে বড় বড় ব্যবসায়ীরা স্পঞ্জ তুলবার অভিযান চালান তাঁরা তাদের জাহাজ থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী ডুবুরীর পোশাকপরা লোক নামান সমুদ্রের তলে। সঙ্গে এদের ডিপো, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্যও জাহাজ থাকে।

বেশি মাত্রায় এবং উৎকৃষ্ট ধরনের স্পঞ্জ অবশ্য ভূমধ্যসাগর থেকেই পাওয়া যায়, তবে আজকাল বাজারে যেসব স্পঞ্জ আসছে—

সমুদ্র গর্ভে স্পঞ্জ সংগ্রহ

তাতে ফ্লোরিডা, কিউবা এবং বাহমার অবদান যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

স্পঞ্জ শিকারীদের জীবনের উৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দ, রোমাঞ্চ আর বিপদ—বিশেষ করে হাঙগরের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ নিয়ে দীর্ঘ একটা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে, কিন্তু সে কথা আজ আমাদের আলোচ্য নয় বলে স্পঞ্জ প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক।

প্রবাল সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মোটামুটি একটা ধারণা আছে। স্পঞ্জের ধরণ-ধারণ রীতি-প্রকৃতি অনেকটা এরই সঙ্গে মেলে। দুইয়েরই প্রাণবন্ত কোমলাংশ নিষ্কাশিত হবার পর তাদের কঙ্কালমাত্র আমরা ব্যবহারিক কাজে লাগাই।

স্পঞ্জ অনেক রকমের আছে. কিন্তু তাদের অধিকাংশের কঙকালই খড়ি অথবা সিলিকার পরমাণু দিয়ে তৈরী, কোন কোনটার মাঝে আবার এই দুয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়। অতি সূক্ষ্ম রেশমের মত তন্তু দিয়ে এরা গ্রথিত. এই বস্তুটির নাম দেওয়া হয়েছে স্পঞ্জিন।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যেসব স্পঞ্জ প্রচলিত তাদের কঙকাল কিন্তু পুরো এই স্পঞ্জিন দিয়েই তৈরী। লুফা অনেকটা স্পঞ্জের মত হলেও কিন্তু স্পঞ্জ নয়, স্পঞ্জেরই নিকটতম গোত্রীয় উদ্ভিদ। এর দেহ কঙকাল কাঠজাতীয় বস্তু দিয়ে তৈরী সুতরাং অপেক্ষাকৃত কঠিন।

অন্তরীক্ষ মন্ডল থেকে শুরু করে অতি-হিম মন্ডল পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্রই স্পঞ্জ দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের

স্পঞ্জ পরিষ্কার করবার কাজ চলছে

অগভীর বা স্বল্পগভীর জলতল থেকে শুরু করে নদী, হ্রদ, খাল ইত্যাদিতেও এদের অধিষ্ঠান। সমুদ্রের গভীর জলতলেও যে এদের না দেখা যায়—তা নয়।

সমুদ্রের মনোপাহাড়, প্রবাল, ঝিনুক প্রভৃতি শক্ত জিনিস আঁকড়ে ধরে এরা এদের জীবনযাত্রা শুরু করে। মনোপাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা তাক এদের প্রিয় বাসস্থান।

অনেক সময় হঠাৎ কোন স্পঞ্জ দেখে মনে হতে পারে, তারা কোন কিছুতেই লেগে নেই, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেই দেখা যাবে—পাথরের কোন টুকরো বা ঝিনুক আঁকড়ে ধরেই এরা আছে। বিচ্ছিন্ন ছিটকে পড়া স্পঞ্জের টুকরো অন্যত্র নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তুলেছে—এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

গভীর সমুদ্রের তলদেশে নরম এক-রকম পদার্থের স্তর থাকে, তাতে যেসব স্পঞ্জ জন্মে, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে গ্লাসরোপ স্পঞ্জ। তলদেশের কোমল পদার্থ থেকে অতি সূক্ষ্ম সুতোয় পাকানো একটা যেন দড়ি, সে দড়ি আবার স্বচ্ছ, কঠিন, অনমনীয়, তার মাথায় একটু ছোট্ট হুক, আর সেই হুকেই আটকানো থাকে একটা সুন্দর স্পঞ্জ, এই হচ্ছে গ্লাস-রোপের অপরূপ রূপ।

এই অদ্ভুত জীব—এদের গায়ে যে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে—আহার সংগ্রহ, আর নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তাই দিয়ে নিজেদের দেহে মন টেনে নেয়, আর এক বা একাধিক বড় ছিদ্র দিয়ে বের করে দেয়। এই ছিদ্র-গুলিকে বলা হয় এদের মুখ।

জল ভিতরে টেনে নেবার ব্যাপারে ক্রিয়া করে এদের দেহের ভিতরকার এক অদ্ভুত ধরনের কোষ। এই কোষগুলিকে বলা হয় গ্রীবা-কোষ। গ্রীবাকোষের প্রান্তভাগ অর্থাৎ গ্রীবাস্কন্দ 'প্রোটোপ্লাজম' দিয়ে তৈরী। প্রান্তে ঐ একই জিনিসের ছিট দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে চাবুকের রোঁয়া বেরিয়ে থাকে—একে বলা হয় ফ্লাজেল্যাম। ফ্লাজেল্যাম ইস্ক্রুপের মত একরকম পেঁচাল তরঙ্গ তুলে কোষের দিকে এক ঘূর্ণীর সৃষ্টি

সমুদ্রগর্ভে স্পঞ্জ সংগ্রহ

ফলে, এইসব মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রীবাকোষ-স্পঞ্জের ছিদ্রপথে জল টেনে নেয়।

জলে যেসব অতি ক্ষুদ্রকায় জীব বা জীবাণু থাকে—ফ্লাজেল্যাম এমনি করেই জলের সঙ্গে তাদের টেনে নেয় স্পঞ্জের কোষের মাঝে, এবং ওখানেই শেষে তারা জীর্ণ হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন এইভাবে যে আহার সংগৃহীত হয় শুধু তাই দিয়ে স্পঞ্জের দেহের এমন পরিবৃদ্ধি সম্ভব নয়। জীব-বিজ্ঞানী ডক্টর প্যাটার বলেন এরা নিজেরাই দেহের দ্রব-অংশ নিজেদের আহার্যে পরিণত করতে জানে। কথাটা সত্যি বলেই মনে হয়। ফ্লাজেল্যাম যে জল ভিতরে টেনে নেয়, সেই সঙ্গেই অক্সিজেন ঢোকে এদের দেহে, জল নিষ্কাশনের সময় ঐ ফ্লাজেল্যামই দূষিত সবকিছু বের করে দেয়।

সাধারণ স্পঞ্জের দেহাভ্যন্তরে মাত্র একটি ছোট গুহার মত গর্ত থাকে, এইটিই হচ্ছে এদের উদর, চারিধারে তার গ্রীবা-কোষের বেষ্টনী। অধিকাংশ স্পঞ্জের দেহ-কাঠামো অবশ্য জটিল, কারণ দেহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের দেহের চারিধারে নতুন নতুন দেয়াল অর্থাৎ স্তরের ভাঁজ পড়তে থাকে, এবং তাদের সংবর্ধনও সহজ, সরল থাকে না, ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ে। ফলে এদের দেহে বহু উদর, জল গ্রহণ-নিষ্কাশনের প্রণালী এবং বহু কক্ষের সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর এইসব দেয়ালের মাঝে থাকে স্পিকুল আর স্পঞ্জের কঙ্কাল। এইজন্যই মৃত স্পঞ্জের দেহেও দেখা যায় অসংখ্য ছিদ্র আর প্রণালী। আর এদেরই সাহায্যে মৃত স্পঞ্জও জল শোষণ এবং পোষণ করতে সক্ষম হয়।

মূল দেহ থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্পঞ্জের অংশও অনায়াসে নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তুলতে পারে। বিচ্ছিন্ন অংশ কোন পাহাড়ে বা শক্ত কিছুতে আটকে যেতে পারলেই নিজস্ব স্বতন্ত্র দেহ গড়া এদের সম্ভব হয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ দ্বিখণ্ডন ও নতুন সৃষ্টিরই একটা রীতি। স্পঞ্জ-জীবনের এই রীতির সুযোগ নিয়ে ওর কাটিং থেকে নতুন স্পঞ্জ জন্মানোর চেষ্টা চলেছে। কিন্তু সে চেষ্টা খুব বেশি ফলবতী হয়নি, কারণ ঐ কাটিং অংশ শক্ত কিছুতে নোঙর করানো সম্ভব হচ্ছে না। কোন কোন শ্রেণীর স্পঞ্জ অবশ্য কোন কিছুতে নোঙর ছাড়াই বেড়ে উঠতে পারে কিন্তু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোন মূল্য নেই।

বিচ্ছিন্ন টুকরো অতি সহজেই নিজে কিছু আঁকড়ে ধরে একটা স্বয়ংপূর্ণ স্পঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় বলে বাইরে থেকে দেখে বলা সম্ভব নয়—কোন বিশেষ স্পঞ্জ দ্বিখণ্ডিত অংশ-জাত নয়, কোন স্পঞ্জের অভ্যন্তরস্থ কোন মুকুল নিষ্কাষিত জলের সঙ্গে বেরিয়ে এসে বাইরে এই পরিণতি লাভ করেছে, না—এ কোন যৌন-মিলনের ফলশ্রুতি। কয়েক শ্রেণীর স্পঞ্জ আছে তারা কোন রকমে কাছাকাছি এসে পড়লে একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে, অথচ অন্য জাতের স্পঞ্জের সঙ্গে তারা মেশে না।

ব্রিটেনের নদী-নালা হ্রদ এবং আশে-পাশের সমুদ্রের অগভীর এবং স্বল্পগভীর জলতলে নানা ধরণের স্পঞ্জ দেখা যায়। এক বর্গমাইল জায়গায় ৭০ থেকে ৮০ রকমের স্পঞ্জ দেখতে পাওয়া গেছে। অ্যানেম্যানিস এবং অধিকাংশ সামুদ্রিক জীবের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে এদের কাউকেই সুন্দর বলা চলে না বটে, তবে এদের রঙ এবং আমেজের তারিফ না করে পারা যায় না।

শুধু বর্ণ দেখে কিন্তু এদের গোত্র বা গোষ্ঠী নির্ণয় করা যায় না, কারণ একই জাতের স্পঞ্জের রঙ সাদা হতে পারে, হলদে হতে পারে, মভ' বা সবুজও হতে পারে। জলো পাহাড়ের একই জায়গায় জন্মেও রঙের দিক দিয়ে তারা এমন ফারাক হতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, স্পঞ্জের ভিতরের মূল বড় অংশের যে রঙ বাইরের আস্তরণের রং তা থেকে পৃথক। কোন কোন স্থলে স্পঞ্জের আসল রঙটা বাইরের

তিনটি বিভিন্ন ধরনের স্পঞ্জ

একটা কঠিন বাকল বা আবরণের আড়ালে লুকোনো থাকে।

এ ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়—ব্রিটেনের কোন কোন অঞ্চলের সমুদ্র-তীরে Packey malisina Johnolonia নামে যে স্পঞ্জ আছে—তাদের মাঝে। এই স্পঞ্জের অবস্থান পর্যালোচনা করলেই আমরা সহজেই বুঝতে পারি বর্ণের উপর আলোর কি প্রভাব। গুহামুখের উজ্জ্বল আলোতে যখন এই স্পঞ্জ জন্মে তখন তার বর্ণ হয় এত গাঢ় বেগুনে যে লোকে হঠাৎ দেখলে তাকে কালো বলে ভুল করতে পারে। একটু ভিতরের দিকে জন্মালে হবে এ ফিকে বেগুনে, আর গুহার একেবারে তলদেশে —পিছনের পাথরের উপরে জন্মালে রঙ হবে 'ক্রীম'। কোন কোন স্পঞ্জের গায়ের সবুজ রঙ আবার তার আসল রঙ নয়, সামুদ্রিক ক্ষুদে উদ্ভিদ অ্যালজী ওর বহিরাস্তরণের উপর গজিয়ে উঠায়—রঙ ওর অমন সবুজ দেখায়। ব্রাউন অ্যালজীও কখনও কখনও এই কাণ্ড করে কোন কোন স্পঞ্জের রঙ বাদামী করে দেয়।

স্পঞ্জের দেহটা সামুদ্রিক ক্ষুদে জীবের চিড়িয়াখানা বললে ভুল হয় না। স্লাগ ওয়ার্ম স্যান্ড হপার ইত্যাদি করে বহু রকমের পোকা বা ক্ষুদে জীব এদের দেহের মাঝে বাস করে। কোন কোন গোষ্ঠী আবার স্পঞ্জের দেহের ভিতর 'টিউব' তৈরী করে নিরাপদে বাস করে। স্পঞ্জ বাইরে থেকে যে জল টেনে নেয় তারই মাঝ থেকে এইসব ক্ষুদে জীবেরা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে, আবার স্পঞ্জ নিজ দেহের যে দ্রবীভূত অংশ নিজেদের আহার্য করে নেয়— তা থেকেও এরা এদের আহার্য সংগ্রহ করে। এদিকে স্পঞ্জও হয়ত আবার তার দেহের অধিবাসীদের দেহের পরিত্যক্ত বর্জিত দ্রব্য নিজেরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে।

কোন কোন জীব আবার নিছক আত্মরক্ষার এবং আত্মগোপনের তাগিদে স্পঞ্জের সাহায্য নেয়। স্পাইডার ক্র্যাব, হারমিট ক্র্যাব, ড্রোমিয়া ইত্যাদি জীব ইচ্ছে করেই স্পঞ্জের টুকরো নিজেদের দেহের উপর লাগিয়ে দেয়। 'হারমিট' প্রথমে শামুক জাতীয় যে কঠিন আবরণের মাঝে থাকে তারই একেবারে সামনে স্পঞ্জের টুকরো বসিয়ে দেয়, নিজ দেহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্পঞ্জের দেহও বৃদ্ধি পেতে থাকে, সুতরাং আশ্রয় পাল্টাবার সময় তার আর কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। ড্রোমিয়া কিন্তু নিজের দেহের উপরিভাগে সে আর স্পঞ্জ বসিয়ে দেয় না, স্পঞ্জ সে নিজের শুঁড়ো-বেরুনো পিছনের পায়ের উপর ধরে রাখে। ড্রোমিয়া নিজের পায়ের উপরকার স্পঞ্জের নীচে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে—দেখে মনে হয় যেন পুরু কম্বলের নীচে বসে আরামে ঘুমুচ্ছে সে।—এইজন্য তার আর এক নাম দেওয়া হয়েছে সীপ্ ক্র্যাব. এইসব জীবের কোনটাই স্পঞ্জের মধ্যে বাস করে না, স্পঞ্জ দিয়ে শুধু তাদের গা-টা ঢাকা—অবশ্য মাত্র সামনের প্রান্তভাগ ছাড়া, ঐখান থেকে দেহটা বের করে তারা ইচ্ছামত চলাফেরা করে—তাই ঐখানটা আর স্পঞ্জ জন্মানোর সুযোগ পায় না।

শক্ত জিনিসে এমনি এঁটে থাকবার ক্ষমতা থাকায় স্পঞ্জ তটভূমি এবং জলো-পাহাড় গঠনের কাজেও সাহায্য করে। পাহাড়ের সঙ্গে পাথরের টুকরো যেন এরা ঝালাই করে দেয়। যেসব স্পঞ্জের দেহ নরম তারা দুটোকে জুড়ে দেয় আর দেহ যাদের একটু শক্ত তারা অনেক বছর ধরে বেড়ে বেড়ে শেষে নীচের সব কিছুই ঢেকে দেয়।

ক্লিওন সেলাটা নামে একরকম স্পঞ্জ আছে, এদের কাজ শক্ত জিনিস জোড়া নয়, ছেঁদা করা। অনেক জলের পাহাড় ছেঁদা করে ফেলে এরা। বলা বাহুল্য সব রকমের পাহাড় নয়, যেসব জলো পাহাড়ে চক আছে মাত্র সেইগুলি। পাহাড়ের খড়িকে গলাতে গলাতে এরা এগিয়ে যায়, ফলে পাহাড়ের গা ছেঁদা হয়ে যায়। বছরের পর বছর এমনি ছেঁদা হতে হতে পাহাড় হয়ে দাঁড়ায় শেষে একটা যেন অসংখ্য ছেঁদাওয়ালা মৌচাক। তারপর?—তারপর সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাতে সে পাহাড় একদিন ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে যায়।

আর এক স্পঞ্জও কঠিন জিনিসের সংযোগ বা ঝালাইয়ের কাজ করে, নাম দেওয়া হয়েছে এর অরেঞ্জ স্পঞ্জ। দেহাকৃতি এর অনেকটা কমলা লেবুরই মত বটে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এদের প্রজনন বা নতুন সৃষ্টি : এদের গাত্রের প্রায় সর্বত্র বর্তুলাকার ক্ষুদে ক্ষুদে গুটি আত্মপ্রকাশ করে, নীচেয় তাদের সরু ছোট ছোট ডাঁটা। ঐ গুটিগুলিই শেষে বড় হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক-একটা স্বয়ংপূর্ণ অরেঞ্জ স্পঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যান্য জীবের তুলনায় স্পঞ্জের জাত নির্ণয় করা অনেক বেশি কঠিন, কারণ শুধু বর্ণ দেখে ত এদের জাত নির্ণয় করা যায়ই না, এমন কি এদের আকৃতি বা বুনানি দেখেও না, কারণ দেহ এদের কংকালবিশিষ্ট হলেও অত্যধিক নমনীয়, তাই প্রাকৃতিক আর পারিপার্শ্বিক রাসায়নিক প্রভাব অন্যান্য জীবের চেয়ে এদের দেহের উপর অনেক বেশি ক্রিয়া করে।

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গ্রামে থাকেন না ইনি, তবু মর্মে মর্মে অনুভব করেন গ্রামবাসীর শিক্ষার দৈন্য। বিশেষ করে গ্রামবাসীর নৈতিক অধোগতি শশীবাবুকে পীড়িত করেছে খুব। তোমরা সমাজবন্ধ সংসারী, কিন্তু সমাজের রীতি-নীতিগুলি মেনে চল না। পাড়া প্রতিবাসী, জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী সবাই তোমাদের আপনজন। নিজেকে যেমন ভালবাস তেমনই ভালবাসতে হয় এদের সকলকে। তা কি তোমরা কর? কর না। তার বদলে কর—ঝগড়া-ঝাঁটি কলহ-বিবাদ আত্মীয়-বিচ্ছেদ। জ্ঞাতিকে শত্রু কর। সামান্য স্বার্থের জন্যে জিদের বশে প্রতিবেশীর সংগে মামলা মোকদ্দমা তো কথায় কথায়। প্রতিবেশী মানে কি? যার সংগে প্রীতিবেশি তাকেই বলে প্রতিবেশী। সে ভাব কি আছে তোমাদের? শুধু তোমাদের কথাই বলা হচ্ছে না, অনেক গ্রামেরই এই অবস্থা। দেশটা উৎসন্নে যাচ্ছে এতেই। এই-ই নীতি-জ্ঞানহীনতা। এইটি দূর করবার জন্যে শশীবাবুর একান্ত আগ্রহ। তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক, তোমরা সুখী হও—এইটিই চান উনি। তাই সাধারণ নৈতিক উন্নতির চর্চার জন্যেই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করছেন। এ'র ইচ্ছাকে নিঃসন্দেহে সৎইচ্ছা বলতে হয়।

তোমাদের ছত্রিশ পাড়া গ্রাম, লোক-সংখ্যাও অনেক। পাড়ায় পাড়ায় যদি এই রকম দু' চারজন চিন্তাশীল মানুষ থাকেন তা হলেই তোমাদের গ্রামটি একটি আদর্শ গ্রাম হতে পারে। যে সুযোগটি ইনি করে দিচ্ছেন তোমাদের আশা [illegible] তোমরা পূর্ণমাত্রায় সেটি নেবে। কাজের [illegible] সময়ে এখানে এসে ভাল [illegible] পড়ে ভাল আলোচনা করবে নিজের নিজের মনের উন্নতি সাধন করবে। এতে তোমাদের সুখ শান্তি অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

নিশ্চয়ই নেব স্বামিজী, এ সুযোগ হেলায় হারাবো না, নিশ্চয়ই নেবো—সমস্বরে বলে উঠলেন শ্রোতারা।

—বলতে পার, কাজের মানুষ আমাদের অবসর কোথা? 'অবসর' প্রত্যেক মানুষেরই থাকে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মানুষ কাজ করে ৭।৮ ঘন্টা, ঘন্টা দুই নাওয়া খাওয়ায় কাটে, ছ' ঘন্টা ঘুমোয়। বাকী সময়টুকু তার অবসর। এই অবসরটুকু সে কি করে কাটায়? সেটি লক্ষ্য করলেই তার স্বভাব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যে অবসর বিনোদন—এটি মস্ত বড় জিনিস। এই সময়টুকু কেউ কাটায় ঘুমিয়ে, কেউ বই পড়ে, কেউ গল্পগুজব করে, কেউ তাশ-পাশা দাবা খেলে, আবার কেউ নেশা, ভাংগ, চুরি ডাকাতি, জোচ্চুরি বাটপারি করে। কেউ দৈহিক ভোগ সুখের আশায় আলেয়ার পেছনে ধাওয়া করে, আবার কেউ পরনিন্দায় পরচর্চায় পঞ্চমুখ হয়। তা হলেই বোঝ—কে কি ধরনের লোক কি চরিত্রের লোক—এই অবসর বিনোদনের ধারাটি দেখেই বোঝা যায় কিনা। তোমাদের অবসর বিনোদন যদি সৎ আলোচনায় হয় দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই সকলে তোমাদের সৎ বলতে বাধ্য হবে। শুধু মুখের কথা নয়, সেটাই হবে তোমাদের সত্যি বিশেষণ। কারণ অবসর বিনোদনের এই যে পথ—এটিই তোমাদের সৎ করবে, সৎ হতেই হবে তোমাদের।

এখানে এইভাবে অবসর বিনোদন করে তোমরা শশীবাবুর আন্তরিক ইচ্ছাকে রূপদান কর, সার্থক কর।

শ্রোতারা সমস্বরে বলে উঠলেন—আমরা নিশ্চয়ই আসব স্বামিজী, তবে পথ দেখাবার জন্য মাঝে মাঝে আসতে হবে আপনাকে বাবা।

—তার ব্যবস্থা করা যাবে। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিছু আটকাবে না।

স্বামিজীর কথা শেষ হল। বয়স্কদের অনেকে প্রশ্ন করলেন কিছু কিছু। যথাযথ উত্তর পেলেন সবাই।

সব শেষে বয়োবৃদ্ধ হরিদাস দাস বললেন—আচ্ছা, স্বামিজী, সর্বভূতে যে আত্মা, সেই আত্মার স্বরূপ কি? আত্মার উপলব্ধিই বা হয় কি করে?

স্বামিজী হাসলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—সাধারণ সংসারী লোক, দ্বৈতবাদী—ঈশ্বর মানেন। সেই ঈশ্বরকে জানুন, তাহলেই আত্মার স্বরূপ জানবেন। তখন আত্মজিজ্ঞাসা। তার আগে নয়।

ঈশাবাস্য ইদম্ সর্বম যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধ কস্যস্বিং ধনম্

জগতের মধ্যেও জগৎ যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের মধ্যে। সুতরাং ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর কারুর ধনে লোভ কর না। উপনিষদের এই শ্লোকটি প্রথমে আপনার জীবনে কাজে প্রতিফলিত করুন। তখন আত্মজিজ্ঞাসার অধিকার। চাই কি তখন আপনা থেকেই আত্মদর্শন হয়ে যেতে পারে। জগতের সব কিছুকে ঈশ্বরের মধ্যে আর সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাই আত্ম-দর্শন—আত্মোপলব্ধি। এখন ও-সব বড় বড় কথার ধারণা করা যাবে না। সংসারীদের পক্ষে এইটিই প্রশস্ত পথ।

স্বামিজী চুপ করলেন। সকলে নিজে-দের মধ্যে আস্তে আস্তে কথা বলতে থাকলেন।

ওদিকে উঠোনে সামিয়ানার নিচে এলাহি কাণ্ড। কতজন পাকা রাঁধুনী বড় বড় উনুনে বড় বড় হাঁড়ি কড়া চাড়িয়ে রান্না করছে, কতজন ভারে ভারে জল তুলছে, কুটনো কুটছে, বাটনা বাটছে। কতজন কোমরে

গামছা বেঁধে দৌড়-ঝাঁপ করে এটা সেটা জিনিসপত্রের যোগান দিচ্ছে। নানান ফাই-ফরমাস খাটছে ছোটদের দল। মহোৎসব। সমাগত সবাই খাবেন। রবাহূত অনাহূতও বাদ যাবে না। এসে পড়লেই হল বসে যেতে যাবে। জাতি ভেদের বালাই নাই, সবাই খাবে একসঙ্গে পংক্তিভোজনে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাড়াগাঁয়ে রক্ষণশীল সনাতনপন্থীদের পক্ষে বড় কম কথা নয়—প্রচন্ড লাভ। খাওয়ার আচার-বিচার ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলাই এদের ধর্মরক্ষা। একটু এদিক ওদিক হলেই এদের জাতিধর্ম রসাতলে যায়। উচ্চ নিচ ভেদাভেদই এদের ধর্মের মূল ভিত্তি।

বেলা এগারোটা। স্নানের সময়। স্বামিজী উঠলেন। স্বামিজীর স্নানাহারের ব্যবস্থা শশীদার বাড়ীতে। স্নানের জন্যে চলে গেলেন সবাই। স্নান করেই আসবেন সব মচ্ছব খেতে।

বারোটা থেকেই আরম্ভ হল ভূরিভোজ। বিরাট উঠোন জুড়ে লাইনের পর লাইন, পাতার পর পাতা। সে কত লাইন কত পাতা। পরিবেশকদের ব্যস্ততা। দলের পর দল আসে, বসে, খায়—পঞ্চব্যঞ্জন, খিচুড়ী পায়েস, রসগোল্লা। খাওয়া শেষ হতে সন্ধ্যা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এলেন না বেশ কিছু সংখ্যক কর্তাব্যক্তি সমাজপতি আর তাদের ছেলেমেয়েরা।

পরদিন সকালে বাড়ীতে হুলুস্থুলু কান্ড। বাবার গলা সপ্তমে। উদ্দেশ্যে বকুনি দিচ্ছেন মেলেচ্ছ দাদা, সেজদা আর আমাকে। আশ্রমে খেয়েছি, জল তুলেছে জ্ঞানদাস ছাঁতে ধোপা। কাজেই কোন ফাঁকে আমাদের জাত-জন্ম পালিয়ে গেছে, ধর্ম্মকর্ম্ম খোয়া গেছে। জাতিচ্যুত-পতিত হয়েছি আমরা। বিচার করে রায় দিয়েছেন গ্রাম্য সমাজপতিদের শীর্ষপতি নব্বই বছর বয়স্ক বড় জেঠামশায় (গোরাচাঁদ রায়)। অতি রক্ষণশীল কড়া হিন্দু। জগদ্দল পাথরের মত তাঁর অন্তর জুড়ে জাতি-ভেদ—অস্পৃশ্যতা। সুবিচারের খ্যাতি আছে। কোন রকম সমাজ সমস্যা দেখা দিলে চন্ডীমন্ডপে 'নবাড়ী' বসে। নয়টি নামজাদা বাড়ীর ন'জন কর্তা চন্ডীমন্ডপে মজলিস করেন। বিচার সভা। প্রধান বিচারপতি—জেঠামশাই। সুবিচারক পঞ্চেরা বিচার করেন। তাঁর বিচার মানতেই হয়, ফেলতে পারেন না কেউ। সমাজের দন্ডমুন্ডের কর্তা, দেশের লোকের বিচার করেন—নিজের বংশের অনাচার কি সইতে পারেন? লোকে ধিক্কার দেবে যে। ন্যায় ধর্ম থেকেও বিচ্যুত হতে হবে যে। বিচারকের পদে বসে তা পারেন কখনও! জেঠামশায় রায় দিয়েছেন—আমরা জাতিচ্যুত পতিত। আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া আচার ব্যভার বন্ধ—যত দিন না শাস্ত্রে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। প্রায়শ্চিত্ত করলেই নাকি জাত-জন্ম ধর্ম্মকর্ম্ম সব ফিরে আসবে সুর সুর করে। তবে পল্লী সমাজের বিধান অনুসারে খুঁত রয়ে গেল কিছু—ধোপা-নাপিত বন্ধ করা গেল না। তারা সবাই যে মচ্ছবের অংশীদার।

পাপ নাই, তা—প্রায়শ্চিত্ত কিসের! প্রায়শ্চিত্ত করি নাই কেউ। জেঠামশায়ও রেখেছিলেন তাঁর ন্যায়-বিচার, দীর্ঘ আঠারো বছর আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া আচার-ব্যাভার বন্ধ রেখে। তিনি লোকান্তরিত হন ১০৮ বছর বয়সে।

তখন দাদা নেই, সেজদা আর আমি। জেঠামশায়ের শ্রাদ্ধবাসর। বৃষোৎসর্গ। বিরাট ভোজ—পঞ্চগ্রামীন ব্রাহ্মণ আর সমস্ত গ্রাম নেমতন্ন। সেজদা আর আমি খাটাখাটুনির কাজে সাধ্যমত সবই করে দিয়ে এসে বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করি। (গাঁ হালি) পূর্ণ গ্রামী নেমন্তন্ন অপূর্ণ থেকে পন্ড হবার যোগাড়। আবার 'ন বাড়ী' ভোজের আগের দিন। বিচারে বড় জেঠতুত দাদারা ক্ষমা চান ছোট দু ভাইয়ের কাছে। জেঠামশায়ের লুকিয়ে রাখা জাতধর্ম প্যাঁটড়া খুলে বের করে দিতে হয় তাঁর পাঁচ ছেলেকে। পিতৃঋণ শোধ। সব মিটমাট।

।। পাঁয়ষট্টি ।।

বিকেল বেলা। খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের পর একে একে গ্রামের অনেকেই এসেছেন নতুন আশ্রমে। কথা মুখে মুখে হাঁটে, গাঁয়ে গাঁয়ে রটে। শুধু কামারপাড়ারই নয় আশ-পাশ গ্রামের লোকও এসেছেন বেশ কিছু। হরিদাস দাস মশায় আগেই এসে বসেছেন স্বামিজীর সামনে. পাশে শশীদা, কিঙ্করদা, হরেরামদা—তিন ভাই আর দাদা। চুপচাপ বসে আছি স্বামিজীর ডান পাশে—খুব কাছে।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধবোজা চোখে স্বামিজী বসেছিলেন চুপ করে। যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। চোখ খুলেই সামনে হরিদাস মশায়কে দেখেই বললেন—হ্যাঁ, আর একটি কথা আপনাকে বলবার আছে। জপ, তপ, পূজো, আহ্নিক আছে তো। শেষে প্রার্থনা আছে নিশ্চয়ই—'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'র মত। তার সঙ্গে যোগ করে নিন—

অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়
আবিরাবির্ম এধি

—অসৎ থেকে সতে, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে চল আমাকে। আমার মধ্যে আবির্ভূত হও। এই হোক প্রার্থনা মন্ত্র। কর্মে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' আর মর্মে এই প্রার্থনা মন্ত্র। নিষ্ঠা থাকলেই ইচ্ছা ফলবতী হয়। অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করুন, ফল পাবেন। বর্ত্তমান অবস্থায় এটিও কাম্য হওয়া উচিত।

—খুবই সত্যি? বেশ মনে ধরছে, স্বামিজী। মনের অবস্থা অনুযায়ী এটিই এখন একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। অজ্ঞানের অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে আছি। আপনাকেই জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে দিতে হবে, বাবাজী। ভগবান স্বর্গে, কি মর্ত্তে, দূরে কি কাছে—অন্তরে কি বাইরে—কিছুই জানি না। তাঁর কাছে চাইলে পাব কি পাব না, কী পাব, কখন পাব—তাও বুঝি না। কিন্তু আপনার কাছে যা পাব—তা নগদ। সেটি আমরা ছাড়ব না, স্বামিজী—মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললেন দাসমশায়।

শত চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি। প্রৌঢ় দলের মুখপাত্র ধনঞ্জয় ডাক্তার বললেন—ঠিক তাই, স্বামিজী। আমাদের সকলের মনের কথাই বলেছেন হরিদাসবাবু।

নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায়
শূন্য থাক্।
দূরের বাজনা শুনে কি শুনে মাঝখানে যে
বেজায় ফাঁক।

ঠাকুর দেবতা আছে কি নাই—তা জানি না। ছোট থেকে শুনে আসছি, মন্দিরে মন্দিরে ধন্না, মানত প্রণাম করছি, ভোগ দিচ্ছি, ধ্যানের ছলে চোখ বুজলে অন্ধকার দেখছি। ঠাকুরের 'ঠ'টিও দেখছি না কোনদিন। এমন ঠাকুরের কাছে চাইবই কি আর পাবই বা কি? তার চেয়ে আপনার কাছেই আমাদের প্রার্থনা। আপনাকে পূরন করতে হবেই—আমাদের এ প্রার্থনাটুকু।

গড়গড়ার নলটি হাতে নিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে স্বামিজী বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা কারুর কাছে কিছু চেয়ে কাজ নাই। তোমরা নিজেরা চাও নিজেরই কাছে। তা হলেই হবে। নিজে নিজে মনেপ্রাণে ইচ্ছা করলেই হবে। ইচ্ছা শক্তি আত্মশক্তি কি কম। আত্ম-শক্তিকে জাগাও। জান তো 'কালকেতু' ব্যাধের কথা? ব্যাধের ছেলে—নিরক্ষর গন্ড মূর্খ—কিন্তু আত্মশক্তিতে অটুট প্রত্যয়. বলে—

আমি যদি মনে করি
হয় হয়, করী করি
গন্ডার মারিতে পারি।
শশক পালাবে কতদূরে?

আমি মনে করলে কি না পারি? ঘোড়াও হয়, হাতীও হয়, গন্ডারও মারতে পারি। তোমাদের চেয়ে অশিক্ষিত, তোমাদের চেয়েও অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু আত্ম-শক্তিতে অটুট বিশ্বাস। এতেই উৎরে গেল কালকেতু। তোমরা আত্মবিশ্বাসী হও, আত্ম-শক্তিকে বিশ্বাস কর। জেগে ওঠ—যা চাইবে তাই হবে। সজাগ থাক।

মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনল সবাই। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

দুঃখিত মনে শশীদা চাপা গলায় স্বামিজীকে বললেন, সমাজপতিদের বিধি-ব্যবস্থার কথা—আশ্রমে নিমন্ত্রিতদের পতিত করবার কথা।

হো হো করে হেসে উঠলেন স্বামিজী। বললেন—পদে পদে বিপদ, কেমন? পাড়াগাঁয়ে কাজ করা কি সোজা কথা? যত ভাল কাজই কর না কেন, বাধা পাবেই। দলাদলি পল্লী-সমাজের মোক্ষম অস্ত্র। এ থাকবেই। তবে ঘাবড়ালে চলবে না। প্রথম প্রথম কিছুদিন মাত্র। সত্যি কাজ দেখাতে পারলেই সব ঠান্ডা। কোন দিকে কোন কান দিও না। কাজ করে যাও, উদ্দেশ্য সফল কর—সব

ঘুরে যাবে। একদিন নিজেরাই আসবে ওরা।

আশ্বস্ত হলেন তিন ভাই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে শশীদা বললেন—আপনার আশীর্বাদে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হল। সহজে ছাড়ছি না, চেষ্টা করে যাই ভালভাবে চালাতে। তারপর যা হয়।

আর একটা কথা, বাবা। আশ্রমের আর কি খরচ—শুধু কিছু বই, পরিষ্কার রাখবার জন্যে একজন লোক আর মাঝে মাঝে লোকজনদের আদর আপ্যায়ন—এছাড়া বিশেষ খরচ তো নাই. তাই গ্রামের অনেকেই ধরেছেন—এখানে একটি ছোটখাট হাসপাতাল করে দিতে।

অনেক খরচের ব্যাপার—তা কি করতে পারা যাবে বাবা? কি রকম খরচ হতে পারে, স্বামিজী?

সব শুনছিলুম চুপচাপ। এবার বললুম স্বামিজীকে—একটা হাইস্কুল করে দিতে বলুন না, বাবা। ভাল ডাক্তার ক'জন আছেন এখানে। বর্ধমানে আছে—হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ। তেমন তেমন হলে রোগী নিয়ে যাওয়া যায় সেখানে। কিন্তু গাঁয়ের ছেলেরা ইচ্ছে থাকলেও শহরের স্কুলে গিয়ে পড়তে পারে না। খরচ বেশি। তাই পাঠশালার পড়া শেষ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। উচ্চশিক্ষা নাই। পাঠশালে আর হয় কতটুকু। এত বড় গ্রাম, ছেলেমেয়ে কম নয়। মাত্র দুটি উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা। আর একটি ছিল মিস্ত্রীপাড়ায়, তাও উঠে গেছে। মাইলখানেক দূরে মোহনপুর গাঁয়ে একটি মাইনর স্কুল। বড় নয়—ছোটখাট, বেশি ছেলে আঁটে না। কাছে-পিঠে এ তল্লাটে কোন হাইস্কুল নাই।

আশ্রম হল বড়দের শিক্ষার জন্যে, একটি হাইস্কুল করে দিন ছোটদের শিক্ষার জন্যে। তাহলেই তো ছোট বড় সবারই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে. শিক্ষার বড় অভাব এখানে। হাসপাতালের চেয়ে স্কুল বেশি দরকার। তাই করে দিতে বলুন, বাবা।

হাসি মুখে মাথা নেড়ে নেড়ে শুনছিলেন স্বামিজী। কিছুক্ষণ চুপ করে একদৃষ্টে মুখপানে চেয়ে সমাগত ভদ্রলোকদের ও শশীদাকে সব শুনিয়ে বললেন—ভেবে দেখ শশী। ছেলেমানুষের কথা হলেও ফেলবার নয়। যুক্তিযুক্ত কথা। আর তোমরাই বা কি চাও—হাসপাতাল না স্কুল? বেশ করে ভেবে বুঝে-শুঝে বল।

মিনিট দশ চুপচাপ। পরস্পরে ফিস্-ফিস্ করে একটু যুক্তি করে নিলেন যেন। তারপর সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন—ইস্কুল, ইস্কুল। একটি হাইস্কুলই চাই আমরা, বাবাজী। আমাদের যা হবার তা তো হয়েইছে, ভবিষ্যৎ ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা হোক। ওরা মানুষ হোক। হাসপাতালের চেয়ে সেটাই আমরা আগে চাই, স্বামিজী। পরে হবে হাসপাতাল।

ছেঁকে ধরলেন সবাই শশীদাকে—এই করুন শশীবাবু। 'বিদ্যাহীনে বিদ্যাদান' কীর্তিটাই রেখে যান আপনি। ছেলেদের শিক্ষা হোক, মানুষ হোক ওরা। তা হলেই আমাদের দুঃখু দূর হবে। একটি হাইস্কুল করে দিন শশীবাবু। আর কিছু চাই না আমরা।

আমতা আমতা করে শশীদা বললেন—হাইস্কুল? সে যে বিরাট ব্যাপার। মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, স্কুল করবার কি-ই বা জানি? গভর্নমেন্টকে লেখালেখি করতে হয় অনেক। ইংরেজির অক্ষর পরিচয়ই নাই তাই বা হবে কেমন করে?

সবারই সমর্থন। আকাশ ছোঁওয়া সাহস আর স্পর্ধা। স্বামিজী কিছু বলবার আগেই বলে বসলুম—গণেশ আপনার কেরানী হবে দাদা, কলম বন্ধ যাবে না। আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না—শুধু রসদ যুগিয়ে যান। কর্মীর অভাব হবে না। লেখাপড়া? শুধু বাংলায় নামটা সই করে দেবেন। ব্যস্। লেখা-ঝাঁপ লেখালেখি কিছু করতে হবে না আপনাকে। স্কুল মেসিনে হয়ে যাবে।

হো হো করে হেসে উঠলেন সবাই। সাবাস্, সাবাস, আর কি চাই। শশীদা শুধু দুই ভুরু কুঁচকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন মুখপানে।

মিটি মিটি হাসতে হাসতে স্বামিজী বললেন—আর কথা কি শশী? সব সমস্যারই তো সমাধান হয়ে গেল। দ'হে পড়েছ, উদ্ধার নাই, কথা দাও। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্যে ভিক্ষুনী সুপ্রিয়ার ভিক্ষাপাত্র—পূর্ণ করতেই হবে। দাও একটা হাইস্কুল করে। অভাব হবে না কিছু।

—তাই হোক। আশীর্বাদ করুন বাবা, যেন হাইস্কুলের ব্যবস্থা করে উঠতে পারি—স্বামিজীর পদধূলি মাথায় নিয়ে জোড় হাতে বললেন শশীদা।

সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন—জয় নিরালম্ব স্বামিজীর জয়।

সন্ধ্যে হয় হয়, সবাই উঠলেন।

আমার আনন্দ দেখে কে? জয়োল্লাসে ছুটে বেরিয়ে গেলুম বাইরে। কতদিনের আশা মুকুল পল্লবিত হতে চলেছে। প্রিয় সহপাঠীদের ছেড়ে একা একা বোলপুরে পড়তে যেতে বেশ একটু ব্যথা লেগেছিল। তখন থেকেই মনে হত গাঁয়ে স্কুল থাকলে সবাই মিলে এক সঙ্গে পড়তুম বেশ।

দরজার কাছেই ক'জন বয়স্ক লোক মাথায় হাত দিয়ে বললেন—বেঁচে থাকো, সুখে থাকো, মাথার চুলের মত পেরমাই হোক। একটা মস্ত বড় কাজ করেছ, বাবা। একটা বড় অভাব মিটল আমাদের।

বাইরের বারান্দার এক দিকে বন্ধুদের নিয়ে জটলা করতে করতে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে দাদা বলছেন—শুটকেটার ঘাড়ে ভেস্কী খেলে। মাথা আছে' কাজের মতই কাজ হল একটা। অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিল গাঁয়ের ছেলেরা ইংরিজি লেখাপড়া শিখুক। পাঁচকড়ি মামার সঙ্গে যুক্তি করে বাঁধগোড়া থেকে মাস্টারও আনা হয়েছিল একজন। জয়রামপুরের নির্মল ঠাকুর তো ছিলেনই। ইংরিজি জানা লোক, উনিও পড়াবেন। জোলাকামারদের পোড়ো বাড়ীর দু'খানা ঘর সাফ করে ক্লাসও করা হয়েছিল। সে কি আর ইস্কুল। ইংরিজি পাঠশালা পাঠশালার মতই। প্রথম প্রথম দশ পনেরোটি ছেলে জুটলো। মাস কয়েক পরেই একে একে ভাগলো সব। মাস্টারও চলে গেলেন বছর খানেক থেকেই।

এবার আশা হচ্ছে—ইস্কুল হবে। স্বামিজীর কাছে কথা দিয়েছেন শশীদা। এ আর ফেলতে পারবেন না। শুটকেটার মাথা আছে।

রোগা ডিগ্‌ডিগে চেহারা, তাই দাদা 'শুটকে' বলতেন আমাকে।

পরদিন সকালে স্বামিজীর সঙ্গে চলে এলুম চারা আশ্রমে।

স্কুল হয়েছে। পরিতাপের কথা—শশীদা দেখে যান নাই। বনপাস আশ্রম প্রতিষ্ঠার বছর কতক পরে। কলকাতার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সুলেখক জগৎতারণ দাশ মশায়ের সঙ্গে আলাপ করছি বনপাস স্কুল তৈরী সম্বন্ধে। তাঁকেও একজন সভ্য তালিকাভুক্ত করতে চাই। ওঁর মামার বাড়ী বনপাস অশিক্ষিতের জায়গা, স্কুল হবে ওখানে—বলে আকৃষ্ট করছি তাঁকে। তিনিও রাজী স্কুলের জন্যে খরচ করতে। এমন সময়ে চিঠি পেলুম কিঙ্করদা লিখছেন—ভাই খোকা, আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে দাদা গঙ্গালাভ করেছেন। তিনি পাঁচ হাজার টাকা আর ঝাঁপ পুকুরের পাড়ে জায়গাদি দিতে বলে গেছেন হাইস্কুলের জন্যে। কর্মসংগ্রহের ভার তোমার। একদিনের জন্যে বর্ধমানে এসে সব বুঝে নাও।

তোমার হতভাগা কিঙ্করদা

শশীদার অর্থ ও জায়গায় জগৎতারণবাবুর পরিচালনায়, গ্রামের যুবকদের কর্ম-প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল 'বনপাস শিক্ষা নিকেতন'। প্রথম সেক্রেটারী—শ্রীজগৎতারণ দাশ। প্রধান শিক্ষক—শ্রীঅভয়পদ মুখোপাধ্যায়—আমার প্রাক্তন শিক্ষক, বোলপুর থেকে এনেছিলুম এঁকে।

ছেষট্টি

ক'দিন পরে কলকাতা থেকে চিঠি। বেশি গরম নয়, ঠাণ্ডাও নয়, মূর্তি তৈরির প্রশস্ত সময়। কালই আসছেন প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী গোপেশ্বর পাল।

সকালবেলার সব কাজ শেষ। আশ্রমে শিল্পী সমাগম। বেলা ১০টায় গরুর গাড়ি থেকে নামলেন শিল্পী। সঙ্গে মাটির বস্তা, প্যারিস প্ল্যাস্টারের বড় বড় টিন ক'টি, হাতে স্যুটকেসে যন্ত্রপাতি, আর একটি ডালাভরা কাঠের ছোট প্যাকিং বাক্সে মাটির ছোট নমুনা মডেল দুটি।

লম্বা-চওড়া গোলগাল স্বাস্থ্য—সুন্দর নধর চেহারা, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, দয়ালু দৃষ্টি, হাসি-জড়ানো ওষ্ঠাধর।

স্বামীজিকে প্রণাম করে কাছে বসে শিল্পী কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ি চড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা বললেন হেসে হেসে।

স্বামীজিও হেসে বললেন—শহুরে মানুষ, গ্রামের দুঃখ-কষ্টের খোঁজখবর রাখেন না তো বিশেষ কিছু। যদিও গ্রামই আপনাদের শহরের স্টোর-রুম—ভাঁড়ার ঘর। অভিজ্ঞতা হোল তো?

সময়মত নাওয়া-খাওয়ার পর পান্থ-শালায় বিশ্রাম।

করিৎকর্মা শিল্পী মানুষ, কাজ ছাড়া থাকতে পারেন কখনো? আধঘণ্টা পরেই উঠে যাজ্ঞবল্ক্যের ছোট মডেলটি বের করে চৌকিতে রেখে বসলেন মাটির তাল নিয়ে।

কাছে বসে দেখছি নিবিষ্ট মনে। আশ্চর্য ক্ষিপ্রকারিতা—যেন ইলেকট্রিক মোটর লাগানো হাত, দু হাতের আঙুলে বিজলী গতি। মাত্র একঘণ্টার মধ্যেই ছোট মডেলটির মানুষ প্রমাণ অনুকৃতি। বীরাসনে তর্করত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, তেজো-দৃপ্ত মূর্তি, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘায়ত চোখে শান্ত দৃষ্টি, সূক্ষ্মাগ্র নাসা, ডান হাতে জ্ঞান মুদ্রা, বাঁ হাত বাঁ জানুর ওপর। সরল ঋজু ভঙ্গী।

বিকেলে পান্থশালায় এসে স্বামীজি অবাক। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে চারিপাশ দেখে হেসে বললেন—সঙ্গে মেসিন এনে-ছেন নাকি গোপেশ্বরবাবু?

দু' হাত জোড় করে গোপেশ্বরবাবু বললেন—দয়া করে আমায় 'আপনি' বলবেন না স্বামীজি। বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ—অপরাধ হয়। মেসিন আমায় বয়ে আনতে হয়নি, ভগবান দিয়েছেন এই দশ আঙুলের মধ্যে, স্বামীজি।

সন্ধ্যার আগেই মূর্তির ফিনিশিং শেষ।

পরদিন। সকাল থেকেই কাজ আরম্ভ। তৈরী হল প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচ। দু'দিন বিশ্রাম। ছাঁচ শুকোতে হবে।

ছাঁচ খোলা হল তৃতীয় দিন সকালে। ততক্ষণে বর্ধমান থেকে এসে গেছে শাদা সিমেন্ট, কালো সিমেন্ট, পাথর-কুচি অলিভ অয়েল, সাবান।

এইবার ঢালাই। দু' খোল ছাঁচের ভেতর পিঠে অলিভ অয়েল আর সাবান-জল মাখিয়ে জোড়া লাগান হল খোল-দুটি। সিমেন্টের সঙ্গে পাথরকুচি মিশিয়ে জলে গুলে ঢেলে দেওয়া হল ছাঁচের ভেতরের ফাঁকা অংশে।

আবার চারদিন বিরতি। পঞ্চম দিনে ছেনি দিয়ে ছাঁচ কেটে বের করা হল সিমেন্টের মূর্তি। তারপর একটু-আধটু ফিনিশিং টাচ।

স্বামীজির নির্দেশে মন্দিরের মধ্যে সিমেণ্টের বেদীর ওপর পূর্বমুখে বসানো হল যাজ্ঞবল্ক্য মূর্তি।

এইবার রঙ। মাত্র কাপড় আর চাদরে গৈরিক রং দিলেন শিল্পী।

মূর্তি দেখে সবাই খুশি, বিশেষ করে স্বামীজি। তিব্বতী বাবার বর্ণনা অনু-যায়ী ভাব সুস্পষ্ট রূপায়িত হয়েছে শিল্পীর হাতে।

আশ্রমের কাজের অবসরে সব সময়টুকু কাছে বসে দেখি পালমশায়ের কলাকৌশল। তিনিও হাসি হাসি মুখে অনেক কথা জিজ্ঞেস করে বুঝে নিয়েছিলেন অন্তরের মাটির টানটুকু। তাই বললেন কলকাতা গেলে চিৎপুর রোডে চন্দ্রাপ্রেসের পাশে তাঁর শো-রুম—স্টুডিও দেখে আসতে।

বেশ ক'দিন সময় লাগল। কলকাতার স্টুডিওয় অনেক কাজ জমে আছে। উৎ-কণ্ঠিত শিল্পী বিদায় চাইলেন স্বামীজির কাছে। আর আশ্রমে থাকলে ঠিক সময়ে কাজ দিতে পারবেন না ক'জন খরিদ্দারকে। কলকাতা গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন তাঁর হাতে-গড়া প্রিয় শিষ্য রামকৃষ্ণ পালকে। নমুনা অনুযায়ী হুবহু গার্গী মূর্তি করে দেবে সে।

—ঠিক পারবে তো—একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজি।

—ঠিক পারবে, স্বামীজি। কোনরকম খুঁত হলে আমি তো আছি। খবর পেলেই দু-একদিনের জন্যে এসে ঠিক করে দিয়ে যাব।

আর একটি প্রার্থনা, বাবাজী। নমুনা মডেল দুটি কোন কাজেই লাগবে না আপনার। কাজের শেষে ও দুটি নিয়ে গিয়ে রাখব স্টুডিও শো-রুমে। অনুমতি চাই ও দুটি নিয়ে যাবার।

সানন্দে অনুমতি দিলেন স্বামীজি।

শিল্পী বিদায়। স্বামীজিকে প্রণাম করে স্যুটকেস নিয়ে গরুর গাড়িতে উঠলেন শিল্পী গোপেশ্বর পাল।

সাতষট্টি

আবার শিল্পী সমাগম। বেলা দশটায় এসে পড়লেন শিল্পী রামকৃষ্ণ পাল। বেঁটেখাটো স্বাস্থ্যবান চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তিরিশ বছরের পূর্ণ যুবক। বড় বড় উজ্জ্বল চোখে চঞ্চল দৃষ্টি। রূপদ্রষ্টা রূপস্রষ্টার তরুণ চোখ। সুবলিত বাহু, সূক্ষ্মাগ্র আঙুল।

সঙ্গে মালপত্রের বোঝা নেই, বাঁ হাতে জামা কাপড় আর যন্ত্রপাতির মাঝারি আকারের স্যুটকেস, ডান হাতে বাগ-বাজারের রসগোল্লার হাঁড়ি। পাঠিয়েছেন গোপেশ্বরবাবু। হাতের জিনিস দাওয়ায় রেখে স্বামিজীকে প্রণাম করে মুখ নিচু করে দাঁড়ালেন তরুণ শিল্পী। সপ্রতিভ হলেও একটু যেন লাজুক ভাব। কৃতিত্বের অভিমান অহমিকা আসে নাই এখনও।

এক লহমা আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হেসে বললেন স্বামিজী—এস, এস, বস। গোপেশ্বরের সাকরেদ তুমি? তুমি করবে গার্গী মূর্তি। বেশ হবে গুরু শিষ্য দুজনেরই হাতের ছাপ থাকবে আশ্রমে। ভালই হবে।

যথাসময়ে নাওয়া খাওয়া শেষ।

বিশ্রামের কোন প্রশ্নই নেই তরুণ শিল্পীর। খেয়ে উঠেই হাতমুখ ধুয়েই বসে গেছেন জলের গামলা, মাটির তাল আর বাঁশের চাঁচাড়ির যন্ত্রপাতি নিয়ে। সামনে চৌকীতে গার্গীর ছোট নমুনা মডেলটি।

তারপর কাজ আরম্ভ। ক্ষিপ্রকারিতায় বজায় আছে—গুরুর গৌরব। অত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে নাগাদ মানুষ প্রমাণ মূর্তিটি তৈরী হল অবিকল নমুনা মডেলটির মতই। বাকি থাকল চৌরশ করা —ফিনিশিং।

সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেয়েই শিল্পী বসলেন শিল্পসাধনায়। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিনিশিং শেষ। ১০টা নাগাদ আরম্ভ হল প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচ। ছাঁচ শেষ হলে দুদিন বিরাম।

আজ তৃতীয় দিন। ছাঁচ খোলা হল। আগের মতই ঢালাই ও তিনদিন বিরাম।

ছেনি দিয়ে ছাঁচ কেটে বের হল গার্গী মূর্তি। তৈরীর সময় নমুনা মডেলটির পাশেই রাখা ছিল চিন্ময়ী মায়ের ফটো। তিব্বতী বাবার নির্দেশ। গার্গী মূর্তির মুখ, নাক, চোখ, চোখের দৃষ্টি, কেশচূড়ার

আদল চিণ্ময়ী মায়ের মতই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিদূষী গার্গী যোড়হাতে ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন নিবেদন করছেন।

যথাস্থানে মূর্তি বসানোর পর রঙ। কাপড়ে গৈরিক আর কেশচূড়ায় পিঙ্গল বর্ণ।

গ্রাম গ্রামান্তরের লোক দলে দলে দেখতে এল সমাধি মন্দিরের মূর্তি। সাঁওতাল পাড়ারও বাদ গেল না কেউ।

কি ছোট কি বড়, সবারই মন্দিরে ওঠা বন্ধ হল সেদিন থেকে।

।। আটষট্টি ।।

পান্থশালায় একরাশ মাটি। ছাঁচ খোলার পর একটু আধটু ভাঙাচোরা মানুষপ্রমাণ পুরো গার্গী মূর্তিটি। কত মাটি। আর মাটি কি—শ্রাবণের মেঘের মত রঙ, মাখনের মত মোলায়েম। এমন মাটি দেখিনি কখনও বর্ধমানের রাঙামাটি। পালমশায় বলেছিলেন—সুন্দরবনের কাছে মজা নদীর অঁাঠালু পাঁক, বালিকাঁকড়ের লেশ নেই, কলকাতায় আসে নৌকা করে।

এমন মাটি পেয়ে আর শিল্পীদের কলাকৌশল দেখে মনে জেগে ওঠে সুপ্ত নেশা। হাত নিশপিশ করে। মূর্তি গড়ে শিশুকাল থেকেই যে দক্ষিণা পেয়েছি অনুগত শিষ্যের কাছে, তুলনায় গুরুর কাছে দক্ষিণা গুরুতর হবে নিশ্চয়ই। ধারণাটা হয়েছিল বদ্ধমূল। তাই আশ্রমবাসিক পর্বে সাহস হয় নাই মাটি দিয়ে ঠাকুর বা পুতুল গড়তে। মাত্র পৌষ মাসে বড়দিনের সময় কদিনের জন্যে বাড়ী গিয়ে গড়ে রেখে আসতুম সরস্বতী প্রতিমা মাঘী পঞ্চমীতে পুজোর জন্যে।

—'যতীন ভীষণ নয়, শক্তের কাছে শক্ত, সহজের কাছে সহজ'—স্মৃতিদাদুর উক্তিটি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—তা মর্মে মর্মে টের পেয়েছি বছরের বেশিকাল প্রতিদিনের কাজে, কথায়, ব্যবহারে। তবু শঙ্কা আর সংকোচ কাটতে চায় না মন থেকে। মানসিক দুর্বলতা। কিন্তু হাতের কাছে এমন মাটি পেয়ে লোভ সামলানো দায়। কি করা যায়? আড়ালে আবডালে লুকিয়ে করার অভ্যাস হয়েছিল বাড়ীতে। সেই রীতিরই অনুসরণ। খাওয়া দাওয়ার পর

তিনটে পর্যন্ত স্বামিজীর বিশ্রাম। থাকেন আশ্রমের ভেতরের ঘরে। এই তো প্রকৃষ্ট সময়। মন্দিরে বসে দেখে দেখে নকল করা হল—দুটি ছোট যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী মূর্তি তৈরী করা হল দুদিনে—পালমশায়ের আনা মডেল দুটির মতই। তৈরী তো হল—রাখা যায় কোথায়? স্বামিজীর নজর এড়িয়ে রাখতে হবে লুকিয়ে। এতদিনের মধ্যে একদিনও রান্নাঘরের ভেতরে উঠতে দেখিনি স্বামিজীকে। রান্নাঘরে মীটসেফের ওপর সাজিয়ে রাখা হল মূর্তি দুটি। বারবার সাবধান করে দেওয়া হল রেণুদাকে—স্বামিজীকে যেন না বলে। দুপাটি দাঁত বের করে রেণুদা হাসে আর বলে—কী হবে বললে? বলে দেব বাবাজীকে। চেলা কাঠ নিয়ে দেখাই রেণুদাকে।

—ওরে বাপরে—বলে রেণুদা এক লাফে পগাড় পার। দুষ্টু রেণুদা বলে নাই স্বামিজীকে।

মাস দুই কাটল নির্বিঘ্নে। কিন্তু নির্বিঘ্ন হবার জো কি—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। কোথাও কিছু না, হঠাৎ একদিন স্বামিজী ঢুকলেন রান্নাঘরে। ঢুকেই মীটসেফের ওপর নজরে পড়ল—যাজ্ঞবল্ক্য আর গার্গী।

—গোপেশ্বর মডেল দুটি নিয়ে যেতে ভুলে গেছে নাকি? স্বামিজী জিজ্ঞেস করলেন রেণুদাকে।

এই রে, সেরেছে—শুধু হৃৎকম্প নয়, সারা শরীরে কাঁপুনি, দাঁতে দাঁতে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি। ঘামে জবজবে সারা গা।

—না বাবাজী, ভোলেন নাই। রামকৃষ্ণ বাবুতো প্যাকিং বাক্সে নিয়ে গেছেন মূর্তি দুটি—উনুন পরিষ্কার করতে করতে উত্তর দিলে রেণুদা।

—তবে এ দুটি এল কোত্থেকে?

রেণুদার পানে চেয়ে অধরোষ্ঠে তর্জনী দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি খুঁটি ধরে।

রেণুদা আমতা আমতা করে বললে—ও দুটি খোকা তৈরী করেছে, বাবাজী।

—বল কি? এ যে হুবহু সেই দুটির নকল—বলে বেরিয়ে এসে স্বামিজী জিজ্ঞেস করলেন আমায়—করেছ তুমি?

—হ্যাঁ, বাবা—মুখ নিচু করে বললুম কোনরকমে।

—শিখলে কার কাছে?

—শিখি নাই। ছোট থেকে মাটি নিয়ে খেলা করি। খেলতে খেলতে কাক, বক, পুতুল টুতুল—যা মনে হয় করি—আস্তে আস্তে বললুম ধরা গলায়।

—বাঃ, বেশ তো খেলা, খুব ভাল খেলা। মাটি আছে অনেকখানি। খেলাটা জমবে ভাল বেশ কিছুদিন। লাগাও খেলা—হাসতে হাসতে গিয়ে নিজের জায়গায় বসলেন স্বামিজী। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কত না তফাৎ—গুরু আর শিষ্য।

রেণুদা তো হেসে কুটি কুটি, বললে—যাও, চানটা করে এস দিকি।

আসনে বসেই স্বামিজীর মুখে ভ্রূকুটি-কুটিল। নিজের মনেই বলে উঠলেন—হবে যে দুলাল বলে পড়তে দেবে না, সোনা-রুপোর কাজ ছাড়া কি করতে দেবে ওকে। ওর হাত তো বাঁধা। যত্তো সব—

।। উনসত্তর ।।

বেশ কিছুদিন দেখা নেই ঝণ্টুর দলের। সেই কবে দেখে গেছে মন্দিরে মূর্তি বসানো। যাজ্ঞবল্ক্য আর গার্গী মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্যও দিয়ে গেছে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ—বিয়ের লগনসা, কাজের চাপ বেশি। কর্মযোগ ছেড়ে ধর্মতত্ত্বে মন দেবার ফুরসুৎ হয় নাই কারুর।

এদিকে ১৯২৮ সালের কলেজ সীজন এগিয়ে আসছে। আশ্রমিক কাজকর্ম যথা-নিয়মে করে চললেও মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে পড়ি। স্বামিজীর নজর এড়ায় না।

সকালে রেণুদা গেল কাঁসারিপাড়ায় বাজার করতে। হাতে দাদাকে লেখা স্বামিজীর চিঠি।

বিকেলবেলা আশ্রমে এলেন ঝণ্টুর দলের ওস্তাদ-দাদা আর গোপী মিস্ত্রী। দলবল নেই, একা একা—মাত্র দুজন। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

সবে ঘর থেকে বেরিয়ে স্বামিজী বসেছেন বারান্দায়। দুজনে প্রণাম করে বসলেন।

স্বামিজী বললেন—দুলাল, তোমাকে ডাকা হয়েছে, বিশেষ দরকারী আলোচনা খোকার সম্বন্ধে। আগেও বলা হয়েছিল খোলাখুলি স্পষ্ট উত্তর দাও নাই। ওর একান্ত আগ্রহ—পড়বার। একটা বছর নষ্ট হল। এ বছর কলেজে ভর্তি হবার সময় এগিয়ে আসছে। এখন থেকে চেষ্টা করার দরকার। একটা লাইন তো ধরিয়ে দিতে হবে। কি করবে, বল।

—আর পড়তে দেব না, বাবা। পড়ে পড়ে দুবার পাগল হয়েছিল খোকা।

—পাগল? পড়ে পড়ে পাগল? সঠিক জান? পাগল হবার ঠিক আগেকার ওর মনের গতি বিশ্লেষণ করে দেখেছ?—জলদগম্ভীর স্বরে বললেন স্বামিজী। পাগল হয় কেন? মর্মান্তিক আঘাত, মর্মান্তিক শোক বা দুঃখ, অতিশয় চিন্তা আর অতি আনন্দে পাগল হয় মানুষ। এগুলির যে কোন একটা ধৃতিশক্তিকে ছাপিয়ে গেলে অর্থাৎ সহ্যশক্তির সীমা ছাড়িয়ে গেলেই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, মন বিকল হয়, বিহ্বলতা আসে, চিন্তাশক্তি লোপ পায়—উন্মত্ততা আসে তখনই।

পড়ে পড়েও পাগল হয় অনেক ছেলে। যারা পড়তে চায় না, একান্ত পাঠবিমুখ, বুদ্ধি, স্মৃতি আর ধৃতিশক্তি নাই, পড়ে বুঝতেও পারে না, মনে রাখতেও পারে না

—এমন ছেলেকে জোর করে পড়াতে দিলে, পড়ে পড়ে পাগল হতে পারে। আর হয় অনেক পাঠ্যবিষয়ে জট পাকিয়ে জট ছাড়াতে না পারলে। কিসে কি হল, কিসে কি হল—ভেবে ভেবে পাগল হয় অনেক ছেলে। ও কি সেই জাতের? সে রকম লক্ষণ দেখেছ কোনদিন!

—না, না, বাবা, কক্ষনো না। তা বললে অন্যায় হবে। বরঞ্চ তার উলটোটাই গাঁ শুদ্ধ সবাই জানে—তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন গোপীবাবু।

সঙ্গী নির্বাক, নতদৃষ্টিতে বসে আছেন মাথা নিচু করে।

তবে? চুপ করে থাকলে চলবে না, উত্তর দাও—ধমকের সুরে বললেন স্বামিজী। বলতে হবে কী দেখে তুমি বলছ 'পড়ে পড়ে পাগল'। তার পরেও তো পড়েছে সব ক্লাসের চেয়ে শক্ত পড়া। দু' বছরের ম্যাট্রিক কোর্স শেষ করেছে এক বছরে। পরীক্ষায় পাশ করেছে ভাল ভাবেই। কিছু হয় নাই তখন। পড়ে পড়ে পাগল হলে কক্ষনো ভাল থাকতে পারত না ঐ সময়টা।

একটু থেমে দুই ভুরু কুঁচকে একটু নরম সুরে স্বামিজী বললেন—প্রথমবার পাগল হবার ঠিক আগে কিছুদিনের ওর কাজকর্ম, কথাবার্তা, হাবভাব, চালচলন কি রকম লক্ষ্য করেছিলে মনে করে ঠিক ঠিক বল দেখি।

—কিছুই না বাবা, যেমনকার তেমনি—লেখাপড়া, খেলাধুলো, হাসিগল্প, ঠাকুর গড়া, ঠাকুর পুজো। বোঝা যায় নাই কিছু। সরস্বতী পুজো করে গেল—ভাল ছেলে, এল পাগল হয়ে—ধরা ধরা গলায় বললেন দাদা।

—না। মনে করে দেখ সরস্বতী পুজোর পরও ও এসেছিল একবার। শুধু খেলা-ধুলো হাসিখুশিই দেখেছ, কাঁদতে দেখ নাই? অকারণে, মানে—বকুনি, গালাগালি, মারধোর না খেয়েও দারুণ মর্মভেদী কান্না? কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল, কাঁদতে কাঁদতেই গিয়েছিল সেবার। ভাল করে স্মরণ কর দেখি—লাল চোখের তীব্র দৃষ্টি হানলেন স্বামিজী।

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বটে, বাবা। মেজ-ভাই বৈদ্যনাথ মারা যাবার পরদিন এসেছিল ও। বড় কান্না কেঁদেছিল, থামানো যায় নাই। কাঁদতে কাঁদতেই গিয়েছিল বটে।

—আচ্ছা—আর একটু মোলায়েম সুরে বললেন স্বামিজী—বিচার কর এইবার। মাতৃহীন বালক। মায়ের মত স্নেহশীল মেজদা। তার মৃত্যু। জন্মের শোধ শেষ দেখাটাও হল না ওর। গুরুতর আঘাত। বুঝতে পার আঘাতের তীব্রতা? ধারণা করতে পার কী দারুণ শোকানল এতটুকু ছোট্ট বুকে?

দারুণ মর্মান্তিক আঘাত। বোলপুরে গিয়ে অতি প্রিয় লেখাপড়ার মধ্যে থেকেও কান্না থামে নাই। তুষের আগুনের মতই ধিকিধিকি পোড়াচ্ছিল ওকে। এই অবস্থাতেই দশদিন যেতে না যেতে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। খোকা—ডাকলেন স্বামিজী।

গোড়া থেকেই স্বামিজীর ডাকে গিয়ে বসেছিলুম তফাতে, নতমুখে সজলচোখে। তাড়াতাড়ি চোখমুখ মুছে বললুম—কি, বাবা?

—আন সেই চিঠি।

এক ছুটে পান্থশালায় গিয়ে নোট-খাতার ভেতর থেকে এনে স্বামিজীর হাতে দিলুম পুরানো চিঠি।

—এ লেখা তোমার? দাদার হাতে চিঠি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজী।

—হ্যাঁ, বাবা আমারই লেখা—ওষ্ঠাধর থরথর করে কেঁপে উঠল।

—তবেই দেখ, ঘা না শুকোতেই—আঘাতের ওপর আঘাত। সহ্যসীমার বাইরে। কীই বা বয়স, কচি প্রাণে কত সয়? নির্বেদ এল নিজের ওপর। চাইল আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা জুড়োতে। বাধায় বাধায় রোখ চড়ে গেল। আর ধরে রাখতে পারল না নিজেকে—হল অপ্রকৃতিস্থ। একে কি তুমি বলতে চাও—পড়ে পড়ে পাগল। আত্ম-প্রবঞ্চনা—নিজের দোষ গোপনের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

ঝরঝর করে জল ঝড়ে পড়ল দাদার দু চোখ দিয়ে।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলুম।

এই খোকা, চুপ—ধমক দিলেন স্বামিজী। দৃপ্তকণ্ঠে শিষ্যকে বললেন—চিঠি লিখেছিলে ইংরেজি পরীক্ষায় প্রথম হতে পারে নাই শুনে। সত্যি মিথ্যা বিচার করেছিলে? ওর কাছে ছিল মার্কসিট। দেখলেই পারতে। স্কুলে খোঁজ নিলেও জানতে পারতে। কিচ্ছু কর নাই—একেবারে 'রায়'। এর নাম বিচার? চিলে কান নিয়েছে শুনেই ছুটলে চিলের পেছনে পেছনে। হাত দিয়ে দেখলেও না কানটা ঠিক কানে কাছে কি না। এই বিচারবুদ্ধি নিয়ে এখানে এস আত্মতত্ত্ব বিচার করতে? এ ঢং করবার কি দরকার? বন্ধ কর আশ্রমে আসা। মনে কর—স্বামিজী বোঝেন না কিছু। একটা ছেলেমানুষের চোখকে ফাঁকি দিতে পার তোমরা? সাবধান!

স্বামিজীর পায়ে মাথা রেখে ওস্তাদ বললেন—এতটা বুঝি নাই, মহা অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন বাবা।

—ক্ষমার অযোগ্য। জীবনহানিকর কাজ। একটা জীবন নষ্ট করবার যোগাড়। কোনরকমে বেঁচে গেছে। এতখানি অন্যায়, অবিচার, এতখানি বুদ্ধিহীনতা তোমাব কাছে আশা করা যায় নাই। যা হয়েছে হয়েছে, খুব সাবধান! ভবিষ্যতে আর কখনও না হয়। বিচারের নামে চরম অবিচার। এখন ওর পড়ার কি করতে চাও, বল।

কথা বলতে গেলেই চোখ জলে ভরে, গলার স্বর ধরে, বার দুই কেশে গলা ঝেড়ে বললেন—ইচ্ছে ছিল ভিক্ষে করেও পড়াব ওকে। হল না। আর পড়াতে পারব না, বাবা। অবস্থা খুবই খারাপ। নিজের অসুখ, স্ত্রীর অসুখে বহু টাকা দেনা হয়ে গেছে। কাজকর্মেরও তেমন আমদানী নাই। কারিগরদের মাহিনাপত্র, সংসার খরচ চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। সায়েরী কারিকররা একে একে সরে গিয়ে নিজে দোকান খুলে বসছে। এমন অবস্থায় শহরে রেখে কলেজের পড়ার খরচ চালাতে পারব না বাবা। আর পড়াতে পারব না, বাবা।

চোখে করুণ দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর কোমল, স্বামিজী বললেন—যুক্তির কথা। অবস্থায় না কুলোলে জোর করে বলা যায় না। সারাজীবন সামনে পড়ে, একটা লাইন তো ধরিয়ে দিতে হবে। কোন লাইনে দিতে চাও ওকে?

—সোনারুপোর গড়া কাজেই দেব ভাবছি—ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন দাদা।

অধরোষ্ঠ চেপে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন স্বামিজী। তারপর বললেন—যে কোন কাজ সহজেই শিখতে পারবে। সে শক্তি আছে খোকার। তবে সোনারুপোর কাজে একটুও শ্রদ্ধা নাই। মিথ্যাচার চুরি জোচ্চুরি যে কাজের মূলধন সে কাজ কিছুতেই শিখবে না খোকা। জোর করে ও লাইনে দিলে ওস্তাদ কারিগর হবে কিন্তু ব্যবসা করতে পারবে না। ওর মূলধনের অভাব। চুরি জোচ্চুরি মিথ্যাচারে অভ্যস্ত নয় ও। সে সব পারবে না। কাজেই ব্যবসা করতে পারবে না খোকা। ফল খারাপ হবে। অন্য লাইন ঠিক কর।

—লেখাপড়া শিখে চাকরী, নয়—কাজ শিখে দোকানদারী, এ ছাড়া আর কোন লাইন তো দেখছি না, বাবা। সামনের মাসে নিয়ে গিয়ে গড়া কাজেই দেব ওকে—বেশ স্পষ্ট করেই বললেন দাদা।

—কোন লাইনও দেখছ না, ঐ অসৎ লাইন ছাড়া?—ভ্রূকুটি কুটিল মুখে ধকধক জ্বলে উঠল স্বামিজীর দু চোখ।

—না বাবা, আর কোন লাইনই দেখছি না।

—কিন্তু ওর হাত তো বাঁধা, লাইনও বাঁধাধরা। দেখবে?

স্বামিজীর ইঙ্গিতে রেণুদা নিয়ে এল মূর্তি দুটি।

—কোন রকম শিক্ষা না পেয়েই হাত দেখ—স্বামিজী তাকিয়ে রইলেন ওদের মুখপানে।

—ওর জন্যে ওকে যথেষ্ট শাসন করেছি, তবু ছাড়ে নাই। এখানেও করেছে?

অধরোষ্ঠে মৃদু আওয়াজ করে স্বামিজী বললেন—

—বল কি, শাসন করেছ? অপরাধ? দোষের কাজ এটা? ছোটদের মধ্যে কোন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখলে উৎসাহ দিয়ে এগিয়েই দিতে হয়। তা না করে অংকুরেই বিনাশ? এত বড় একটা শিল্প-সম্ভাবনাকে ধ্বংস করতে চাও? গণ্ডমূর্খ আর কাকে বলে? ও যাবে না চুরি জোচ্চুরি মিথ্যাচারের ব্যাসাত শিখতে। জানা আছে তোমাদের গাঁয়ের লোকদের, ছেলেদের। তোমাদের গাঁয়ের ছেলে ও নয়, তোমাদের বাড়ীর ছেলেও নয়।—খোকা। ও যাবে না, যাও। ওর বাঁধাধরা লাইন, নিজেই ধরেছে।

হতচকিত দাদা বললেন—তবে কি ও ছুতোরের কাজ শিখবে?

কামারপাড়ায় কুমোর নেই, মাটির পুতুল, প্রতিমা দুই করে ছুতোরে।

রোষকষায়িত চোখে স্বামিজী বললেন—যাই শিখুক, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোমাদের। কখনো কিছু ভাব নাই যখন, তখন ওর জন্যে ভেবে কাজ নাই তোমাদের। ও শিখবে মানুষের কাজ।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বসে রইলেন দুবন্ধু।

পশ্চিম দিগন্ত লালে লাল। সূর্য ঢলে পড়েছে অস্তাচলে।

—খোকা, চল—বলে স্বামিজী উঠে লম্বা লাঠিটি নিয়ে নামলেন উঠোনে।

দু বন্ধু প্রণাম করে ধীর মন্থর গতিতে চললেন কামারপাড়ার পথে।

।। সত্তর ।।

বৈশাখ সংক্রান্তি। খড়ির ঘাটে ঘাটে পুণ্যার্থী নরনারীর ভিড়। ব্রতশেষে পুণ্যস্নান করতে এসেছেন সব। অনেকে গংগাস্নান করতে যান এই দিনটিতে। গংগা অনেক দূরে—কাটোয়া, ত্রিবেণী নয় হাওড়া। গেরস্থঘরের গিন্নিবান্নি বউঝিদের সময় হয়ে ওঠে না এতদূরে যাওয়ার। খরচও বেশি। তার জন্যেও যেতে পারেন না অনেকে। আশপাশ গ্রাম গ্রামান্তরের মেয়েরা তাই তৃপ্ত থাকেন খড়ি স্নান করে। স্নান পর্ব চলে অনেক বেলা পর্যন্ত। একদল যান তো আর একদল আসেন। কোন ঘাটই খালি থাকে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তিনটে চারটে পর্যন্ত চলে স্নান, পুজো আহ্নিক তর্পণ।

যথাসময়ে ঠুং ঠুং ঘণ্টি বাজিয়ে এসে ডাকহরকরা স্বামিজীর হাতে দিল একখানি চিঠি। তারপর চিঠির ব্যাগ দাওয়ায় রেখে দুখানি গামছা নিয়ে খড়িতে সেরে নিল পুণ্যস্নান। ডাক বিলি সেরে স্নান করতে আসবার সময় কোথা? এক কাজেই দু কাজ সেরে নেয় ডাকহরকরা।

আবার পান্থশালা ঝাড়ামোছা গোছগাছ। এবারে দুখানি খাটিয়া—একখানি ভেতরে, একখানি বাইরের বারান্দায়। পাটনা থেকে আসবেন স্বামিজীর সন্ন্যাসিনী শিষ্যা জমিদার শাশ্বতী মা। সঙ্গে আসবেন তাঁর ডাক্তার।

নির্দিষ্ট দিনে এলেন শাশ্বতী দেবী। চম্পকবর্ণা স্বাস্থ্যবতী গৈরিক-বসনা প্রৌঢ় সন্ন্যাসিনী। সঙ্গে ডাক্তার কালীপদবাবু—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ স্বাস্থ্যবান পুরুষ। পেছনে ভোজপুরী দারোয়ান চেহারার পরিচারক। গাড়ী বোঝাই—স্যুটকেস, হোল্ডঅল, ল্যাংড়া আমের মস্ত বড় টুকরি, ফলের ঝুড়ি, তরকারির কন্তা, জলের কুঁজো, ঘটি গেলাস, কমণ্ডুলু আর তারোঁয়ার বিখ্যাত খাজার মস্ত বড় ঝুড়ি।

বাঁ হাতের ছাতা আর ডানহাতের খাজার ঝুড়ি দাওয়ায় রেখে স্বামিজীকে প্রণাম করে বসলেন শাশ্বতী মা। অন্য পাশে ডাক্তারবাবু। পরিচারক ও গাড়োয়ান মালপত্র নিয়ে গেল পান্থশালায়।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর শাশ্বতী মা গেলেন খড়ির ঘাটে স্নান করতে। শুকনো কাপড় তোয়ালে রেখে এল পরিচারক।

পাটনার জমিদার সন্ন্যাসিনী শাশ্বতী দেবী। অনেকগুলি মহল। মহলে মহলে নায়েব, গোমস্তা তহশীলদার পেয়াদা, দারোয়ান। সন্ন্যাসিনী আবার জমিদার। যোগ ভোগ একাধারে। গৈরিক পতাকাতলে ছত্রপতি শিবাজী। এ রকম বড় একটা দেখা যায় না। সন্ন্যাস তো সর্বস্ব ত্যাগ—ধন, জন, বিষয় আশয়, ভোগ, আসক্তি, কামনা—সব। এ কেমন ধারা সন্ন্যাস?

স্নানের পর ল্যাংড়া আম, সন্দেশ, খাজার জলযোগ। নিজের হাতে বেছে ধুয়ে সন্ন্যাসিনী আম কেটে দিলেন স্বামিজীকে। আর সকলকেও দিলেন নিজের হাতে। তারপর নিজে জলযোগ সেরে বসলেন স্বামিজীর কাছে। মৃদুস্বরে তত্ত্ব আলোচনা। ধীরে ধীরে একটির পর একটি প্রশ্ন করে সন্ন্যাসিনী জেনে নিলেন আপন জ্ঞাতব্য বিষয়।

যথাসময়ে দুপুরের খাওয়া আর বিশ্রাম।

বিকেলে স্বামিজীর কাছে বসে সকালের শোনা কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করে দেখে নিলেন ঠিক বুঝেছেন কি না। কোথাও কোন সন্দেহ থাকলে নিরসন করে নিলেন তা। যথাসময়ে লাঠি হাতে মাঠে বেড়াতে গেলেন স্বামিজী। শাশ্বতী দেবী গেলেন পান্থশালায়।

সন্ধ্যের আগে পান্থশালায় লণ্ঠন দিতে গিয়ে দেখি গৈরিক আঁচল কোমরে জড়িয়ে দু হাতে ডম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করছেন শাশ্বতী দেবী, সামনে ব্যায়ামাচার্য ডাক্তারবাবু।

অবাক কাণ্ড! ডম্বেল নিয়ে মেয়েদের ব্যায়াম! তার ওপরে সন্ন্যাসিনী। এ কেমন সন্ন্যাসিনী।

গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যেবেলায় স্বামিজী আঙিনায়। অতিথি থাকলেও রান্নার তাগিদ নাই। শাশ্বতী দেবী রান্নাঘরে রান্নার তদ্বিরে। রান্না করবে তাঁর হিন্দুস্থানী পরিচারক। পরিচারক—পাচক—সবই সে—হেলপিং হ্যাণ্ড। ডাক্তারবাবু পান্থশালায়।

নিরিবিলিতে স্বামিজীর কাছে জেনে নিলুম সব।

শাশ্বতী দেবীর স্বামী ছিলেন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। জাঁদরেল জমিদার। পূর্ণযৌবনে মারা যান হঠাৎ। বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়স্বজন কর্মচারীদের যোগসাজসে জমিদারী আত্মসাৎ করবার ষড়যন্ত্র করে। শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী শাশ্বতী মা জমিদারী পরিচালনার ভার নেন নিজের হাতে। নায়েব, দেওয়ান, তহশীলদারদের পরামর্শ দেন নিজে। প্রজাদের দুঃখকষ্ট অভাব অভিযোগ দেখেন শোনেন, সম্ভবমত প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন নিজে। সবাই সুখী। সবই করেন—কিন্তু মনে সুখশান্তি নাই শাশ্বতী মায়ের। স্বামীবিয়োগের ব্যথা ভুলতে পারেন না। সংসারে আসক্তি নাই—অশান্ত মন। ধর্মকর্মে মতি ছিল ছোট থেকেই। শান্তি পাওয়ার আশায় খুঁজতে থাকেন যোগ্য গুরু। মাঝে মাঝে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান। গুরু মেলে দু' একজন—ভক্তিবাদী মূর্তি-উপাসক। গীতা উপনিষদ পড়া মেয়ে—শান্তি পান না তাঁদের উপদেশে।

উত্তরাখণ্ডে বেড়াতে বেড়াতে স্বামীজি গেছেন কাশী। সেখানেই আলাপ। মতিগতি বুঝে স্বামীজি ধরিয়ে দিয়েছেন পথ। নিজে চলবার চেষ্টা করেছেন অতি যত্নে। বছর-দুই পরে পূর্ণ বৈরাগ্য—সন্ন্যাস। স্বামীজিরই দেওয়া সন্ন্যাস নাম—শাশ্বতী। স্বামীজির নির্দেশেই—গার্হস্থ্য সন্ন্যাস। গৃহস্থাশ্রমে থেকে, এমনকি রাজ্য পরিচালনা করেও ধর্ম আচরণ করা যায়, কোন বিঘ্ন হয় না। উদাহরণ—রাজর্ষি জনক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শাশ্বতী দেবীর জমিদারী—ধরি মাছ না ছুঁই পানি। নিজের ভোগসুখের জন্যে—স্বার্থে নয়, পরার্থে—'বহুজন হিতায়'। বড় ভাল, বড় গুণী মেয়ে শাশ্বতী মা। পাঁকাল মাছের মতই পাঁকে থাকেন, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না। বিষয়বুদ্ধিতেও ক্ষুরের ধার। জমিদারী তো ছোট কথা—রাজ্য পরিচালনা শক্তিতে—লক্ষ্মীবাঈ। বিষয়-বুদ্ধি আর বিষয়-বৈরাগ্যের অপরূপ সন্ধি।

স্বামীজির শাশ্বতী মা— আমার শাশ্বতী দিদিমা। চিন্তাশীলা গম্ভীর প্রকৃতি হলেও সাধারণ কথাবার্তায় হাস্যময়ী। নাতি হিসাবে রহস্যালাপেও কম যান না সন্ন্যাসিনী শাশ্বতী দিদিমা।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। বাংলার পর বিহার থেকে সারা পশ্চিমে আগুনের হলকা—'লু' বইতে থাকে প্রায়ই। আশ্রমের ছায়াশীতল শান্ত পরিবেশে বারোদিন কাটিয়ে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় গেলেন শাশ্বতী দেবী।

দুদিন পরেই স্বামীজি একা গেলেন বরানগর যোগেন্দ্র বসাক রোডে—বিজয় বসন্ত বসাক মশায়ের নতুন গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্যে।

আশ্রমে রেণুদা আর আমি।

(ক্রমশঃ)

।। আঠারো ।।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল চন্দনের। কয়েক মিনিট আচ্ছন্নভাবে পড়ে থাকল সে। ঘরের ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানলা বন্ধ করল কে? বাইরে হ্যাসাগ জ্বলছিল মনে পড়ছে। শোবার পর কতক্ষণ একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা গেছে। এখন আওয়াজটা বন্ধ। রাতের গভীর স্তব্ধতা সবদিকে। বাড়ির বাইরে গাড়িটা রেখে তার ছাদে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে ব্রজ। আজ বেঘোরে ঘুমোবার কথা তার। ওর ছ-সাত জন ড্রাইভার বন্ধুর নেমন্তন্ন ছিল। চন্দন সুনন্দিতার বাড়ি থেকে আসতে একটু দেরী হয়েছিল অবশ্য। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল। তারপর সকলকে বিদায় দিয়ে চন্দন শুয়েছে। সুনন্দিতার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীরটা বেশ ক্লান্ত লাগছিল আজ। সেই ক্লান্তির মধ্যে সুনন্দিতাকে ভাবছিল সে—টের পাচ্ছিল ওই বাংলোবাড়ি থেকে একটা তীব্র কামনা নিয়ে ফিরেছে। দারুণ সেক্স গড়ন সুনন্দিতার। ওকে খুব সহজে একবার চুমু খাওয়া যায় না কি? অনেক চাপা বাসনা-কামনার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া সাংঘাতিক একটা মেয়ে—মানে ওই ভদ্রমহিলা। ভিতরটা গরগর করছিল কতক্ষণ। বাইরে হ্যাসাগের গর্জন যেন তারই শরীর-ফাটানো একটা চাপা চিৎকার—এবং ঘুমের ভিতরও সেটা বয়ে নিয়ে গেছে সে। আর দেখেছে, সুনন্দিতার বদলে রুমা তার গা ঘেঁষে শুয়ে আছে। গঙ্গার ধারে বালিয়াড়ির ওপর ঝোপঝাড়, পায়ের নিচে জল, চারদিকে কত সব লোক? তবু জন্তুর মতন লোনতা তাদের ওপর বসে আছে—এইসব উদ্ভট ব্যাপার। কিন্তু প্রথম স্বপ্নে—তারপর ঘুমটা ভাঙার পর কয়েক মিনিট স্বপ্নের স্মৃতি অন্ধকারে চাপা পড়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল, জানালা বন্ধ ছিল না। দরজাটা ছিল তো? নাকি ভুলে গিয়েছিল বন্ধ করতে? সর্বনাশ!

পরক্ষণে চমকে উঠল সে। তার বুকের ওপর একটা কী পড়ল। সাপ? সে নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তক্তাপোষটা মচমচ করে উঠল। তারপরই টের পেল, কে একজন তার পাশে শুয়ে আছে। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলে উঠল, কে? অমনি একটা হাত তার ঠোঁটের ওপর নেমে এল। ক্ষীণ মিঠে শব্দ বাজল—চুড়ি কিংবা বালার। তারপর স্পষ্ট একটা নারীশরীর তার গায়ে ঘন হল। নগ্ন স্তনের চাপ টের পেল চন্দন। একটা শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ তাকে মুহূর্তে অবশ করে ফেলল।

দুহাতে শরীরটা টেনে নিল চন্দন। উদ্দাম ঝড় এসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। অন্ধকার ভিজিয়ে দিল প্রবল ধরনের বৃষ্টি। শরীরের কী অলৌকিকতা নিয়ে মানুষ বাস করে, এই প্রথম স্পষ্টভাবে জানতে পারছিল সে। যে অলৌকিকতা সব লৌকিক আচারবিচার নিয়মনিষ্ঠাকে পলকে লাথি মেরে তাড়ায়।...

কতক্ষণ পরে চন্দন উঠল। অন্যজনও উঠল। চন্দন যখন দরজার কাছে, তখন সে হয়তো দ্রুত কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত। অবাক হয়ে চন্দন টের পেল, দরজাটা বন্ধ করতেই ভুলে গিয়েছিল আসতে। ঘরে অতসব নগদ টাকা! কী মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছিল।

বাইরে বেরিয়ে মনে হল, মারাত্মক ভুল কিছু নয়। একটা সুন্দর চান্স মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য, এসব একটুও ভাবেনি সে। ব্রজর হাসিখুসি চালাকচতুর মুখরা বউটির চাহনিতে বা শরীরের কোথাও এইসব ব্যাপার লেখা ছিল না তো! হয়তো ছিলও—চন্দন লক্ষ্য করেনি। নিজের সম্পর্কে মনে মনে সাফাই দিল যে—আমি লম্পট নই। কিন্তু পুরুষমানুষ নিশ্চয়।

হাসি বেরিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল। ফিসফিস করে বলল, রাগ করোনি তো?

চন্দন অন্ধকার বারান্দায় দুহাতে ওকে জড়িয়ে চুমু খেল। ...মোটেও না। তোমাকে এত ভালো লাগল।

জানো? আমিও প্রথমে ভাবিনি তুমি—

কী?

মানে—ভেবেছিলুম তুমি কী চেঁচামেচি করে বসবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আজ আমি আর থাকতে পারিনি। প্রতি রাতে তোমার কাছে আসার জন্যে ছটফট করেছি—দরজা বন্ধ। সাহসও হয়নি—লজ্জা করত। আজ হঠাৎ দেখি দরজা খোলা। কী বেআক্কেলে মানুষ রে বাবা!...হাসি ফিসফিসিয়ে হাসল।

বোঝা যাচ্ছিল, ওর মতো খাঁটি এখন আর এ পৃথিবীতে কেউ নয়। নিশ্চয় এসব অভ্যাস এ মেয়ের বরাবর আছে। অশিক্ষিতা নাগরী মেয়ে—প্রেমভালবাসা কোন ব্যাপারই নয়। বেচারা ব্রজ! চন্দন আরেকবার চুমু খেল ওকে। তারপর আদর করে বলল, চুপ-চাপ এবার শুয়ে পড়গে যাও। ও জেগে যেতে পারে।

হাসি ঘন হয়ে বলল, তোমার মাথা খারাপ। রোদ গায়ে না পড়লে নেশা ভাঙবে না।

হাসি?

উ'ঃ?

আজ তোমার এই নতুন? নাকি...

যাঃ! তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি—বিশ্বাস করো। তোমাকে দেখে অব্দি আমার মাথার ঠিক ছিল না। কতবার তোমাকে ইসারা দিতুম, বুঝতেই পারতে না। তুমি যেন কী।

হাসি, তোমাকে এর জন্যে টাকাপয়সা দিতে হবে না তো? না হবে?

হাসি ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। পরক্ষণে সরে এসে বলল, তোমার অনেক টাকা আছে জানি। কিন্তু আমার যে অনেক ক্ষিদে আছে ছোটবাবু। আমার জীবনটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আমাকে তুমি বুঝবে না। ওই মাতাল হিজড়ে লোকটার ঘর করতে এসে আমার সাধ-আকাংখা সব বেতে বসেছে।

চন্দন আরও আদর দিয়ে ওর কান্না-ভাবটা থামিয়ে দিতে চাইল। তারপর উঠোনে নামল। হাসিও নিঃশব্দে নেমে খিড়কি দরজাটা খুলে ঘাটের দিকে চলে গেল।

চন্দন বেরোল সদর দরজায়। গাড়ির ওপর নাক ডাকছে ব্রজর। শালা মাতাল। করুণা নয়—কেমন ঘৃণা হল লোকটাকে। ওর অতৃপ্ত বউটার খাঁকতি মেটানোর যেন দায়িত্ব পড়ে গেছে চন্দনের। কিন্তু কোন কোন সময় অবশ্য যৌনতার খোলা দরজায় অনেক ক্লান্তি দুঃখ হতাশা আর ঘৃণা বেরিয়ে পালায়। এখন বেশ হালকা লাগছে নিজেকে। যৌবনের দিনগুলো কী ব্যর্থ, কী বাজে! কোন মেয়ে ছিল না, কামনা-বাসনাকে এড়িয়ে হাঁটত, এই ধারাবাহিক বোকামির কোন মানে হয় না। এখন মনে হচ্ছে, রুমাকে কোনদিন কোন সুযোগে আক্রমণ করে বসলেই বা কী ক্ষতি ছিল? অন্তত পস্তানির হাত থেকে বাঁচা যেত। রুমা হয়তো আপত্তি করত না—কারণ সে বলেছিল, তুমি তো কখনও জোর করতে পারলে না! যাক গে—সে সুযোগ চলে গেছে।

তবে এ মন্দ হল না। হাসি—মেয়ে-হিসেবে মন্দ নয়। মানে শারীরিক দিক থেকে। তারপর সুনন্দিতা—অবশ্য সুনন্দিতা হল কি না 'ভদ্রমহিলা'। অনেক সব প্যাঁচালো ব্যাপার থাকে এদের। দেহের কাছে পৌঁছতে বিস্তর হ্যাঙ্গামা—অনেক সেন্টিমেন্টাল কাজকারবার করতে হয়। অতসব ধকল সইবে তো আর—যখন হাসি নামে একটা দারুণ যৌবন বড় সহজে জিতে গেল?

নিজের মনে হেসে সে একবার ব্রজকে শালা সম্বোধনে ডাকবে ভাবল। কিন্তু ডাকল না। পরনে ডোরাকাটা আণ্ডারপ্যাণ্ট, খালি গা চন্দনের। গা শিরশির করছে ঠাণ্ডায়। শেষ রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে এখনও। আকাশ ঝকমক করছে। এত নক্ষত্র থাকে আকাশে কোন রাতে লক্ষ্য করা হয়নি। বড় রাস্তা থেকে গাড়ি চলার আওয়াজ আসছে। ব্রজর নাক সমানে ডেকে চলেছে। সেই সময় হাসি এল বেরিয়ে। তেমনি চাপা-গলায় বলল সে, মাতালের কাণ্ড! একটুও শীত করে না—আশ্চর্য লাগে! খালি গেঞ্জি গায়ে শিশিরের মধ্যে ঘুমোচ্ছে দ্যাখো না!

পাদানীতে উঠে তড়াক করে ছাদে চাপল সে। একটা চাদর চাপিয়ে দিতে দিতে ফের বলল, ঘরে শুলেই পারে। নিমুনি ধরলে তখন দেখবে কে? আমি বাবা হাসপাতাল ছেড়ে তোমার মাথার কাছে রাত জাগতে পারব না বলে দিচ্ছি।

ব্রজর সাড়া নেই।

নেমে এসে ভীষণ ফিসফিসিয়ে চন্দনকে বলল, বলছিলুম না। ওই অভ্যেস। তুলে নিচে ফেলে দাও না—মাটিতে পড়েও নাক ডাকবে। এস।

দরজা বন্ধ করে উঠোন পেরিয়ে দুজনে বারান্দায় উঠল। চন্দন বলল, রাত শেষ হয়ে এল। ভালো ঘুম হয়নি। কাল আমার এ লাইনে প্রথম দিন। একটু ঘুমিয়ে নিই ফের।

হাসি ওর হাত ধরে বলল, নাঃ, আর ঘুমোয় না। চলো, তোমার কাছে খানিক শুয়ে থাকি।

আঁতকে উঠল চন্দন। না, না। আর নয়। হাসি, কথা শোন। ও জেগে যেতে পারে।

তুমি পুরুষ না মেয়ে! হিসহিস করে হাসছে ব্রজ ড্রাইভারের বউ।...তোমার ঘর থেকে আমার ঘরে যাবার দরজাটা খুলে রাখলেই হবে। কোন অসুবিধে নেই। চলো।

চন্দনের ঠাণ্ডা ভাবটা উবে গেছে। এই আসঙ্গমত্তা বাঘিনীকে এবার তার ভয় লাগছে। সবটুকু পুরুষরক্ত পান না করে যেন সে নিষ্কৃতি দেবে না। তাকে টানতে-টানতে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে সে। দরজা নিঃশব্দে বন্ধ করার পর ভারি অন্ধকারটা চেপে বসল এবার। চন্দন খুব ভয়ে ভয়ে শুল। ব্রজড্রাইভারের বউ তার বুকের ওপর থেকে আবার বলল, তোমাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব না। আমার ভীষণ—ভীষণ ক্ষিদে, তা জানো না? ইচ্ছে করে পৃথিবী সুদ্ধ গিলে খাই।

কতক্ষণ—কতঘণ্টা স্যাঁতসেতে পুরু একটা অন্ধকারের মধ্যে হাঁসফাঁস করার পর বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে, হিসেব নেই। লোকে পাশে মেয়ে নিয়ে ঘুমোয় কেমন করে কে জানে। তারপর ব্রজর ডাকাডাকি শুনেছে। চমকে উঠে দেখেছে, হাসি তাকে আঁকড়ে ধরে ঘুমোচ্ছে এতক্ষণে। এতটুকু ভয় নেই মেয়েটার! ওকে খোঁচা-খুঁচি করে জাগিয়ে দিতে বেশ সময় লাগল। ব্রজ সমানে ধাককা দিচ্ছে সদর-দরজায় আর চেঁচাচ্ছে, হাসি, হাসি! এই মাগী! বোঝা যায়, ভীষণ রেগে গেছে লোকটা।

হাসি হাসছিল। নিঃশব্দে হাসছিল আর সাড়িটা নতুন করে পরছিল। কতক্ষণ না পরা হল, চন্দন কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। এ ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার দরজাটা এদিক থেকে খোলা যায়। মনে পড়ল, ও-ঘরে এই দরজাটার ওপর একটা কাপড়-রাখা আলনা আছে।

তার ফাঁক দিয়ে হাসি গলিয়ে গেল এবং তার চোখের ঝিলিকটা মনে রেখে চন্দন দরজাটা সাবধানে আগের মতোই আটকে দিল। তারপর বারান্দার দিকের দরজা খুলে বেরোল। সাড়া দিয়ে বলল, খুলছি ব্রজদা।

ব্রজ চন্দনকে দেখে হেসে উঠল, আপনাকে গাল দিইনি স্যার—আমার বউকে দিচ্ছিলুম। রাগ করেন নি তো?

চন্দনও হাসল। ব্রজ বারান্দায় উঠে হাসির ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই সেটা খুলে গেল। হাসি চোখ কচলাচ্ছে। অনেককাল পরে একটা রাত্তির ঘুমোতে পেলুম, তো তোমার চেঁচামেচি। আমার কপালেই এমন!

ব্রজ হাস্যকর ভঙ্গীতে আড়ামোড়া দিয়ে হাই তুলে এ্যাটেনসান দাঁড়াল। স্যার আজ বেড টি হবার আশা নেই আপনার। কারণ, আগেই উঠে পড়েছেন। তো ইয়ে—হাসি!

হুঁ। বলো।...হাসি দুহাত তুলে চুল বাঁধছিল। দাঁতে সাড়ির পাড় কামড়ানো। ভোরের আধফোটা আলোয় এবার ওকে দেখে চন্দনের এদিকে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। হাসি এত সুন্দর আর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে! অন্ধকারে তার স্বাদটুকু যা নেওয়া হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে—তা যথেষ্ট নয়। আরও অনেককিছু দিতে পারত এই মেয়েটা—যদি একটা আলো থাকত তখন।

আমরা এ বেলা খেয়ে বেরোচ্ছিনে। ব্রজ বলল। কী বলেন স্যার? দেরী হয়ে যাবে। ঠিকঠাক নটায় ট্রিপ দেব। একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। 'সাইতে'র প্রথম দিন। ঘুম ভাঙতেই জোড়া শালিক একেবারে মাথার কাছে এসে বসেছে—

হাসি ভুরু কুঁচকে বলল, ঘুম ভেঙে কার ভাগ্যে জোড়াশালিক—কার ভাগ্যে চোখরাঙানি।

ব্রজ জিভ কেটে চন্দনের দিকে ঘুরে বলল, আমি ওকে চোখ রাঙিয়েছি, স্যার?

চালাকি করো না। অতক্ষণ গালগুলো কাকে দেওয়া হচ্ছিল—ছোটবাবুই বলুন। হাসি বেরিয়ে এল ঝাঁঝের সাথে। খুব মাগীছাগী করা হল। এখন সাধুর মতো মুখ করে দাঁড়ানো। নিত্যিনিত্যি অমন গালমন্দ আমার সয় না।

ব্রজ আরেকটা হাই তুলে ঘড় ঘড় করে বলল, আমি শালা সাধুটাধু নই। যাও, শিগগির 'ঘাট সেরে' (প্রাতঃকৃত্য করে) এসো। আমি একদোড়ে কিছু নিয়ে আসি বাজার থেকে। স্যার, মুখটুক ধুয়ে পোষাক পরে রেডি হয়ে নিন।

চন্দন আকাশ দেখে বলল, এক্ষুনি! সূর্যই ওঠেনি।

উঠবে। বলে ব্রজ গুনগুন করতে করতে ঘরে ঢুকল।

হাসি চন্দনের দিকে চোখের ঝিলিক তুলে খিড়কির ঘাটে চলে গেল। তার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি সারাক্ষণ যেন লুকিয়ে ছিল—সেটা ঘাটের দিকে নিয়ে গেল সে। আর এতক্ষণে চন্দনের মনটা হঠাৎ তেঁতো হয়ে গেল। আজ রাতটা তার জীবনে এত অভাবিত আর নতুন—এত নতুন আর গা-ঘিনঘিন করা— আগাগোড়া সবটা এত জঘন্য যে এক্ষুনি কোথাও চিরকালের মতো পালাতে পারলে বেঁচে যায়। নিজের স্বভাবচরিত্রের দিকে খুব অবাক হয়ে তাকাল সে। পরক্ষণে মনে পড়ল সুনন্দিতার কথা—তার গায়েপড়া ভাবসাব, তার হাসি, চন্দনের অজানতে চন্দনের দিকে তাকিয়ে থাকা! তবে কি বিষটা ওখান থেকেই বয়ে এনেছিল সাথে? সেই বিষের কয়েকটি ফোঁটা এই হতভাগা ড্রাইভারটার জীবনে অবশেষে সংক্রামিত হয়ে গেল সম্ভবত। কী এর ভবিষ্যত? কতদূরে নিয়ে যাবে তাকে আজ রাতের ওইসব ঘটনাবলী?

বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িটা যেন প্রাণীর মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা নাইন্টি-ওয়ান মডেলের নতুন বার্নিশকরা বডিতে ভোরের আলোয় ঠিকরে পড়ছে। বডির ওপর হাত রাখল সে। কী ভীষণ ঠান্ডা! ব্রজ একে আদর করে বিবিজান বলে, দিলাপিয়্যারি বলে। শুধু এই রাতে নয়—প্রতিটি রাত এর ভিতরে কিংবা ছাদে শুয়ে সে রাত কাটিয়েছে নাকি—এখনও কাটাবে। কী পায় ব্রজ এর কাছে? অথচ জীবন্ত সতেজ টাটকা একটি মেয়ের মাংস এবং আত্মা সর্বগ্রাসী ক্ষিদে নিয়ে ধড়ফড় করে ওদিকে। কতক্ষণ শূন্যদৃষ্টে গাড়িটা দেখতে থাকল সে।

ব্রজ ডাকছিল, স্যার, ছোটবাবু!

চন্দন সাড়া দিল। তারপর বাড়ি ঢুকল। ব্রজ উঠোনে টিউবেলের পাশে দাঁত ব্রাস করছে। হাসি বারান্দায় কুকার জেবলে কেটলি চাপিয়েছে। চন্দনের তাকাতে ভয় করছিল ওর দিকে—পাছে সেই চাপা হাসি আর চোখের ঝিলিকটা দেখতে পায়। ঘরে ঢুকে অভ্যাসমতো কালো সুটকেসটা দ্রুত খুলে একবার দেখে নিল চন্দন। সব ঠিক আছে। ব্রাশ পেস্ট নিয়ে বেরলো। চকিত চোখে—নিজের অজানতেই হাসির দিকে তাকাল। হ্যাঁ—হাসি হাসছে। চোখে সেই মারাত্মক আলোটা! হাসি আজ তৃপ্ত—সার্থকতার স্বাদে ওর মাংস আর রক্ত আবিষ্ট—ওর জীবনটা হয়তো এখন গোপনে গান হয়ে বাজছে। যা ওই বোকা ব্রজ ড্রাইভার একটুও টের পাবে না।

এরই মধ্যে শাড়িটাও বদলানো হয়েছে হাসির। উঠোনে আলতারং কয়েকফালি রোদ্দুর এসে পড়ছে। চারদিকে অজস্র পাখি ডাকছে। পাঁচিলের ওপর একটা ইষ্টি-কুটুম উড়ে এসে বসল। পাশের বাড়ির মোরগটা ক্যাঁ ক্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল।

ব্রজ খিকখিক করে হেসে চাপা গলায় বলল, ওই মালটার ওপর দারুণ লোভ আছে। কবে মেরে দেব দেখবেন। তবে এখন নয়—গ্রীষ্মকাল আসুক। তাড়ির দিন না এলে ও জিনিস জমবে না।

হাসি চোখ পাকিয়ে বলল, এই তো সাধুমানুষের নমুনা। সক্কালবেলা পরের মোরগ মারার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

আমি শালা সাধুটাধু নই।...ঠিক আগের মতই ব্রজ জবাবটা দিল। তারপর প্রায় দৌড়ে ব্রাশ সাবান নিয়ে ঘরে ঢুকল।

চন্দন মুখ ধুচ্ছিল। সেইসময় শুনল হাসি তাকে ডাকছে।...ছোটবাবু! বেশ গলা চড়িয়েই ডাকছে হাসি।

উঁ

উঁ নয় মশাই। তাকান এদিকে। তাকান না?

চন্দন একটু ঘুরে বলল, তাকাচ্ছি।

ফেরুটে যাবেন. সেই পথেই পড়বে জায়গাটা। ওকে বলে বলে হন্যে হয়েছি। কান করে না। তাই আপনাকে ভার দিচ্ছি। পারবেন না?

পারব। বলো।

সোনাডাঙ্গা—নামটা মনে থাকবে তো? নদীর ব্রীজ পেরিয়ে তারপর সোনাডাঙ্গা। পুকুর আছে দেখবেন—বটগাছ আছে। তারপর বাড়িটা—মাটির বাড়ি কিন্তু। গিয়ে শুধু বলবেন, তোমার বোন তোমাকে দেখা করতে পারবে না। চিঠি পেয়েছে। হাসির মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

চন্দন বলল, তোমার দিদি আছে নাকি ওখানে?—বলেই সে লক্ষ্য করল—অন্যদিনের মতো বউদি কথাটা জুড়তে পারছে না। একটু অস্বস্তি হল তার।

আছে। আমরা দু বোন চার ভাই। খুব বড়ো সংসারের মেয়ে ছিলুম ছোটবাবু। ভাইগুলোর একজন মাত্র বেঁচে আছে—বাকি সবাই মারা গেছে। একজন সাপের কামড়ে, দুজন জ্বরজ্বারিতে। যে বেঁচে আছে, সে থেকেও নেই। কলকাতায় কী কাজটাজ করে। বাড়ি আসে না। শুনেছি, সেখানেই বিয়েটিয়ে করেছে। আর দিদি বাপের ভিটে আগলাচ্ছে একা। —হাসি একবার নাকটা মুছে নিল।

ব্রজ ঘর থেকে বলল, জানেন স্যার? আমার ভায়রামশাই ঘরজামাই।—সে হাসতে লাগল সকৌতুকে।—যদিও সম্পত্তি বলতে শুধু ভিটেটুকুন সার।

হাসি ঝাঁঝ দিয়ে বলল, ওকে ঘরজামাই বলে না। তখন তুমি যদি গিয়ে ফাঁকা ভিটেতে বসতে, তুমিই বাড়িটা পেতেটেতে। আজ তাহলে ভাড়াবাড়িতে থাকতে হত না। কে আর মামলা করতে যেত তোমার সঙ্গে।

সেই জন্যেই তো যাইনি। —ব্রজ বেরোল সেজেগুজে। পরিপাটি চুল বেঁধেছে। কড়া ইস্তিরিকরা প্যান্ট হাওয়াই শার্ট, পায়ে চকচকে কাবলী চপ্পল। এতক্ষণ জুতো-দুটোয় বুরুশ ঘষছিল। হাতের কালি মুছতে থাকল ন্যাকড়া দিয়ে। তারপর বলল, চা দিয়েছ কেটলিতে? আমি এক-দৌড়ে বাজার থেকে কিছু নিয়ে আসি।

সে সত্যি শব্দ তুলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। চন্দনও সেজেগুজে বারান্দায় এল। দেখল, হাসি ভুরু কুঁচকে টিউবেলটার দিকে তাকিয়ে আছে। চন্দন হাল্কা স্বরে বলল, কী! মন খারাপ হল নাকি—হঠাৎ—ছেলেবেলার কথা ভাবলে আমারও ওই-রকম লাগে।

হাসি হঠাৎ ঘুরে সেই নিলাজ নায়িকা-মূর্তি ধরল—প্রায় চোখের একটি পলকেই। চপল হেসে বলল, সত্যি—তখন থেকে আমি ওকে লক্ষ্য করছিলুম জানো? কিছু টের পেল নাকি। মাতাল বটে—কিন্তু ভারি চালাক। খুব সাবধান কিন্তু। ও ছোটজাতের লোককে একটুও বিশ্বাস নেই।

চন্দন একটু এগিয়ে এল।—আর তুমি কী জাত হাসি?

হাসি মুখ নামাল—ঠোঁটে হাসিটা ঠিকই আছে। বলল, থাক। আর জাতের কথা তুলে কষ্ট দিও না ছোটবাবু। সকালটা আজ এমন ভালো হবে, কোনদিন কি ভেবেছিলুম? আজ আর নষ্ট করো না একে।

চন্দন হাসতে হাসতে বলল, বামুন-টামুন নও তো?

চোখ তুলল হাসি।—যদি তাই হই? আরো বেশি ভালবাসা পাবো বুঝি?

যাঃ, আমি জাতটাত কোনদিন মানিনে।

আমি বামুন নই তোমার মতো। —হাসি মুখ ঘুরিয়ে খিলখিল করে হাসল।—তা, কেন? অত জাতের খবর কেন শুনি? ভালোবাসার ঝোঁকে তখন এ কথাটা মনে ছিল না—তাই না?

না—মানে, তুমি ব্রজদাকে ছোটজাত বললে যে, তাই জানতে ইচ্ছে করছে।

সেই কথা?—হাসি কেটলির ঢাকনা তুলে কী দেখে নিয়ে বলল—ও বাগদীর ছেলে। সব জেনেশুনেই তো ওর সঙ্গে চলে এসেছিলুম। খুব হইচই থিটকেল পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন নিজের কাঁচা মনটাকে বশ মানাতে পারিনি ছোটবাবু। বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেত। মরণ আর কী! গাড়িটাও বিগড়ে যেত আমাদের বাড়ির কাছে এসে। সে কথা বলতে গেলে আজ দিনটাই কেটে যাবে। থাক। আমি...... আমি খৃষ্টানের বাড়ির মেয়ে।

তুমি খৃষ্টান তাহলে?

হাসি দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি খৃষ্টান কিসের? কিছুই তো মানি নে। আজ সাত-আট বছর চার্চে যাইনি। কোন পরব করিনি। আমি ওর সঙ্গে চলে এসেই হিন্দু হয়ে গেছি মনে মনে। এখনও তাই। ওই দ্যাখো না, লক্ষ্মীপুজো করি ঘরে গিয়ে দেখে এস। আর এই তো—দিব্যি সিঁদুর পরি। শাঁখা পরি।

চন্দন আড়ষ্ট চোখে ওর সিঁথির দিকে তাকাল। নতুন করে সিঁদুর দিয়েছে কখন সিঁদুরটা খুব লাল ক্রূর চোখে মারমূর্তি হয়ে তাকাচ্ছে চন্দনের দিকে। সে দৃষ্টি সরাল। বলল, যাক গে—জাতে কিছু আসে-যায় না। আমি অবশ্য কোন ধর্মটর্ম মানিনে। বিশ্বাসই নেই। আমি পাপ মানুষ।

হাসি হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন।—আমিও পাপী নই তো ছোটবাবু?

না তো। বলেছি নাকি যে তুমি পাপী?

হাসি ঠোঁট কামড়ে একটু চুপ করে থেকে বলল, এ যদি আমার পাপ হয়—হোক। আমি—আমার এত জ্বালা ছোটবাবু! এত জ্বালা! মাঝে মাঝে মনে হত, হাসপাতাল থেকে চুরি করে বিষ এনে খাই। পারছিলুম না। থাক—সেকথা পরে কোন সময় বলব। আমি আজ এত মরীয়া—

ব্রজর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। হাসি বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ব্রজ ঝড়ের বেগে এসে ঢুকল। এক হাতে মস্তো ঠোঙা। অন্য হাতে পাউরুটির প্যাকেট। বলল, টোস্ট করাতে দেরী হয়ে গেল। মিতুনের আঁচে করে নিলুম। শালা গাইগুঁই করছিল বড্ড। বললুম, যান একদিন কোথাও—ভাড়া নেব না। ঠিক বলিনি স্যার?

বারান্দায় সতরঞ্চী পেতে খাওয়া হল। ততক্ষণে রোদে ভরে গেছে উঠোনটা। বাইরে রূপপুরে দিনের মুখোমুখি আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ব্রজর দেখাদেখি চন্দন খুব তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিল। হাসি খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছিল। যতবার চন্দন তাকিয়েছে, দেখেছে হাসি তার দিকে তাকিয়ে আছে—অবিকল সুনন্দিতার মতো। এইসব মোহময়ীদের সঙ্গে চন্দনের পরিচয় ছিল না। পুরুষমানুষের জীবনে এইসব চমৎকার সুখ আর আকর্ষণ আছে সে অতটা তলিয়ে কোনদিন ভাবেনি। এখন বেশ তৃপ্তি আর সুখে ভিতরটা শান্ত লাগে। যখন সে উঠে দাঁড়াল তার বুকের ভিতর সেই তৃপ্তি আর সুখ দুলে উঠল। শান্ত হেসে হাসির উদ্দেশ্যে সে বলল, আসি।

হাসি মাথা নাড়ল। ব্রজ ফের দৌড়ে বেরিয়ে গেছে।

চন্দন অ্যাটাচি কেসটা সঙ্গে নিল। ভিতরের দরজার খিলটা আরও শক্ত করে এঁটে দিল। তারপর বাইরের দরজায় তালা দিয়ে ফের হাসির উদ্দেশ্যে বলল, চলি।

হাসি ভুরু কুঁচকে সামান্য হাসল মাত্র। এত ভালো লাগছে ওকে! আজ যতক্ষণ না ফের রাত আসে, মনে মনে একটা ছটফটানি থেকেই যাবে চন্দনের। এটা সে কোন মতে হয়তো এড়াতে পারবে না। হাসি তাকে একটা কিছু দিয়েছে—নিশ্চয় দিয়েছে, যা না পেলে এই রূপপুরে রুমাদের চোখের সামনে স্টেশন-ওয়াগন হাঁকিয়ে যেতে পারত না। পারতই না।

সরু রাস্তায় গাড়িটা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে হাইওয়েতে পৌঁছে যেতেই ব্রজ আচমকা এক বিকট হাঁক দিল—হেই যানেবালে ভাইলোক! হুঁ-সি-য়া-র!

কিন্তু চন্দন চমকায়নি। সে শুধু রাতের সেই ঘটনাটা ভাবতে ভাবতেই এসেছে। রোদ যত বাড়ছে, সে তত জড়িয়ে পড়ছে ওই একই ঘটনার গোপন আড়ষ্ট আর পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতিপুঞ্জের মধ্যে। হাসি—হাসির দেহ—অন্ধকার—মাংসের স্বাদ এবং পাপ। বারবার ঘুরে ঘুরে সেই একই দৃশ্য এবং কথাগুলো। সুনন্দিতা এই আলোড়নের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেছে।......

আর রুমা—রুমার ছিপছিপে হালকা শরীরটা—শুধু শরীরটাই কখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং সবটুকু স্মৃতি এখন এই জীবনের কাছে অসংলগ্ন একটা গোঁজামিল ছাড়া কিছু নয়। অথচ মনের কোনখানে একটুখানি বিষণ্ণতা মৃদু জ্বরের মতো রয়ে গেল যেন। ...

আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে। বসে স্টান্ডে বাসের ভেঁপুর গর্জন, মাঝে মাঝে রুটের নামতা ঘোষণা, এলোমেলো হাজারটা কথা, ভারি চাকার ঘর্ঘর—রূপপুর চটিতে সকালবেলার অর্কেস্ট্রা বাজছে যথারীতি। সবুজ স্টেশনওয়াগনের গায়ে হাত বুলোচ্ছে গেঁয়ো 'পেসেঞ্জার'; যুবতী বউকে শোনাচ্ছে—এ হল আমাদের বেজোদার গাড়ি! চন্দন সীতাংশুবাবুর চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। ব্রজ গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক চালিয়ে যাচ্ছে সমানে।

ছোটবাবু যে! নমস্কার!...পরক্ষণে খিলখিল করে হাসি।

'স্যান্ডুভ্যালির' সামনে কয়েক মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে করযোড়ে নমস্কার করছিল রুমা! চন্দন নিষ্পলক তাকাল। হ্যাঁ, রুমাই। সঙ্গে অসিত আর লতু। সেজেগুজে সকালবেলায় বাসস্ট্যান্ডে এসেছে—মানে, কোথাও যাওয়া হবে। কিন্তু এ কি রুমার নির্লজ্জতা—নাকি ইচ্ছে করেই নিষ্ঠুর আঘাত দেওয়া? তাকে ছোটবাবু বলা হচ্ছে। নমস্কার করা হচ্ছে এতসব চোখের সামনে। সীতাংশু দেখছে বিস্ফারিত চোখে। এরা কতজন জানে, পরেশবাবুর শালীর সঙ্গে এই লোকটার বিয়ে হবার কথা ছিল—হল না। এদের মধ্যে কেউ কেউ আরও টের পেয়ে গেছে, পরেশবাবুর লুকনো কালোটাকাগুলোর একটা বিরাট অংশ এখন এই লোকটার হাতে—যা দিয়ে সে ওই গাড়িটা কিনেছে। আর নাকি ওই নিয়েই বিবাদ হওয়ায় লোকটা পরেশবাবুর পাশ ছেড়ে বরুর বাড়ি উঠেছে।

চন্দন হাসল না। গম্ভীরমুখে সিগারেট ফেলে বাইরে এল। বরুর কাছে যাবার জন্য পা বাড়াল। ভিতরটা [illegible] কাঁপছে [illegible]। [illegible] ধকধক শব্দ হচ্ছে। [illegible]—আসলে [illegible] [illegible] [illegible] ফ্যাকাসে আর দুটো কান কতটা লাল হয়ে উঠেছে।

নির্লজ্জা মেয়েটা পিছন থেকে আবার বলল এ ছোটবাবু, হল কী মশাই? পালাচ্ছেন কেন? এবং ফের খিলখিল করে হাসি।

হ্যাঁ—এটা পরিষ্কার বিদ্রূপ। লোকজনের সামনে ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করছে রুমা। এত সাহস আর জোর এ মেয়ের থাকতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি চন্দন। সে ঘুরে দাঁড়াল। একটা কিছু জবাব দেবে ভাবল। কিন্তু মুখ তুলে তাকাতে পারল না। চোখ নামিয়ে রেখেই শুধু বলল, এটা ডেঁপোমির জায়গা নয়।

মোটেও না স্যার।—রুমা সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলে উঠল। বলছি কী, আপনার ওই ময়ূরপঙ্খী নৌকোর সামনে তিনটে সিট দিন না। ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া দেব। কান্দীতে নামিয়ে দেবেন। ফাংশান আছে। কী? দেবেন না?

চন্দন আরও রেগে বলল, সীট নেই। তারপর হনহন করে চলে গেল ব্রজর কাছে। পিছনে রুমার হাসি তার পিঠে চাবুকের মতো কয়েক মুহূর্ত আছড়ে পড়তে লাগল।

ব্রজ বলল, পরেশবাবুর শালী কী বলছিল স্যার? কোথায় যাবে নাকি? ডাকব? এখনও জায়গা হবে। নিয়ে নিন না।

চন্দন কড়া স্বরে বলল, না।

ব্রজ গোঁফের আড়ালে হেসে চাপা গলায় বলল, পরেশবাবু বেঁচে থাকলে তো ওনাকেই বউ করতে হত—হত না বলুন? তখন? তখন কী করতেন স্যার?

চন্দন হাসতে পেরে বেঁচে গেল।...তখন কি আর এ স্টেশনওয়াগনের ধারে কাছে কেউ আসত রজদা! হয়তো একখানা অ্যাম-ব্যাসাডার কেনা হত।

কিন্তু আবার বলছি—বড্ড ঠকালেন। অমন মেয়ে আর হয় না।...ব্রজ কথাটা বলেই সামনে দৌড়ল।...এই ভাই, এই যে! কোথায় যাওয়া হবে। আসুন, আসুন। জায়গা আছে।

চন্দন রুমাকে দেখছিল। কী উজ্জ্বল গাল রুমার! সকালের সব আলো ধরে রেখে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। গগলস বের করে পরল চন্দন। নিরাপদে দেখতে থাকল রুমাকে। এবং এ দেখার মধ্যে হিংস্র ধরণের একটা ইচ্ছে থেকে গেল—যার পরিণত নাম কাম। কামনা নয়—কাম। জিঘাংসার লকলকে একটা শিখা শরীর থেকে ঠেলে বেরোচ্ছিল। আর শরীর থেকে বেরোতে গিয়ে রক্ত-মাংসের কটু গন্ধ ছড়াচ্ছিল যেন। দাঁতে দাঁত চেপে বসে গেল আস্তে আস্তে।

ব্রজ ততক্ষণে জোর ডাকাডাকি সুরু করেছে। নতুন প্রকাণ্ড ভেঁপুটা অশ্লীল ভাবে ঘনঘন টিপছে আর চেঁচাচ্ছে—আবে মেরে দিলপিয়ারি! ব্রজর এ-ব্যাপারটার সরল অর্থ করে নিয়ে একটি মধ্যবয়সী গেঁয়ো মুখরা বউ চাপা গলায় মন্তব্য করল, ঢং দ্যাখো মিনসের। ঘরে মাগ আছে, টেপাটিপি করগে না মুখপোড়া!

ব্রজর কানকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। পলকে ফ্যাচ করে হেসে বলে উঠল, সরলা মাসী যে! কেমন আছ মাসি? তোমার পদ্মরাণীর খবর কী?

পদ্মরাণী মরেছে! তোর গাড়ি ছাড়ি ছাড়বে কখন তাই শুনি। খালি টেপাটিপি তো করেই যাচ্ছিস রে বাপু।

ব্রজ অকুতোভয়ে বলল, শুধু ওই করেই তো কাটাচ্ছি মাসি। ওই পর্যন্তই পারি।

চন্দন শুনছিল। তার চমক থেকে গেল।। একটা অশ্লীল অন্ধকারের পথে এবার তার যাত্রা।

(ক্রমশ)

কোন জীবিকাই উপেক্ষনীয় নয়

'আসুন, আসুন, একবার আপনার ভাগ্যটা পরীক্ষা করে যান'. ক্ষীণ স্বরের কথাগুলো পেছন থেকে বাতাসে ভেসে এলো। সামনের দিকে দোতলা বাস আর ট্রামের অবিরাম ঘড়ঘড়ানি। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। বাসের জন্য অফিস-ফেরতা বিরাট এক জনতার অপেক্ষমান। অত ভীড় বাসের পা-দানিতে কোনরকমে খানকতক আঙ্গুল ঢুকিয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলে যাচ্ছেন। অন্যরা বিরসবদনে পরের বাসের জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে।

এই অপেক্ষমান জনতাকে লক্ষ্য করেই আবার বাতাসে ভেসে এল 'আসুন, আসুন, আর একবার আমার হাতেই ভাগ্য পরীক্ষা করুন। সাফল্য নিশ্চিত।'

একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আরও কয়েকজনের মত আমিও পেছনটা দেখে নিলাম। আবার সেই স্বর : 'আসুন, আসুন। অত চিন্তাব কিছু নেই। ভাগ্যটা পরীক্ষা করুন, সাফল্য নিশ্চিত।'

নিশ্চিত, অনিশ্চিত কিছু জানি না। তবে ভদ্রমহিলার গলার মিষ্টি সুরে সকলেই একবার পিছন দিকে লক্ষ্য করলেন। আমিও। ছিমছাম মহিলাটি, শান্ত কোমল চাহনি, তদুপরি বাচনভঙ্গি এত চিত্তাকর্ষী যে তাঁর কাছে এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মনে যেন শান্তিভাব আসে না। এক টাকা থেকে শুরু করে বেশী দামের টিকিটও অনেকে কিনছেন। অদ্ভুত একটা আকর্ষণে আমিও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। নানান প্রদেশের লটারী, হরেক রকমের টিকিট স্তরে স্তরে সাজানো।

পোশাকে-আসাকে বেশ একটা আভিজাত্য ফুটে উঠছে। কথাবার্তায়ও শিক্ষা-দীক্ষার ছাপ। সবচেয়ে বড় কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে লটারীর টিকিট বিক্রী করার মত দৈন্যদশা তাঁর চেহারায় আদৌ ফুটে ওঠে নি। তাই আমার কৌতূহলটা আরো বেড়ে গেলো।

খানিক ইতস্তত করে শেষে সস্মিতভাবে বলে ফেললাম : 'আপনি তো বেশ একটা জনবহুল জায়গা বেছে নিয়েছেন, ভাগ্য পরীক্ষার জন্য নিশ্চয় সবসময়ই জনসমাগম হয়।'

হালকা একটা হাসিতে গালে টোল পড়লো। হাসিমুখেই বললেন, 'তা মন্দ চলছে না। এই করেই তো সংসার চালাচ্ছি।'

তাঁর নাম জানতে চাইলে তিনি সসংকোচে নামটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'নাম জেনে কি হবে? আমি রোজ শ্যামনগর থেকে যাতায়াত করছি।'

সংসারে কে কে আছেন জিজ্ঞেস করতেই তাঁর চোখ ছলছল করে উঠলো। মনে হল তাঁর গলাটা বুজে আসছে। তাই আমার কথাটার উত্তর দিতে তাঁকে একটু সময় নিতে হল।

'সংসার বলতে আমরা তিনজন। আমার তিন বছরের একটি ছেলে আর বুড়ী মা। বয়সের চেয়ে দায়িত্ব অনেক বেশী।'

বুঝলাম বিরাট একটা দায়িত্বের বোঝা নিয়ে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। তাঁর স্বামী অসুস্থ মনে মনে এটাই ভেবেছিলাম, কিন্তু তাঁর হিসেবে স্বামীর নামের কোন উল্লেখ না শুনে আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনার স্বামী?'

ভদ্রমহিলা ধীর, স্থিরভাবে একবার সামনের ভীড়টার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'বহুদিন তাঁর কোন খোঁজ নেই। একদিন সুস্থ, সবল দেহে অফিসে গেলেন আর ফিরলেন না। অনেক খোঁজ করেছি, কোন সন্ধান পাইনি।'

'আপনার এই কাজটি কেমন লাগছে? ক্রেতার তো এখানে প্রচুর ভীড়!'

'সে কথাটা অবশ্য ঠিক। ক্রেতার অভাব নেই। তবে ক্রেতার চেয়ে পরখ করার লোক আরও বেশী। সবচেয়ে অসহ্য তাদের কটাক্ষ আর বিদ্রূপ। মাঝে মাঝে মনে হয় ওদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি,' বিরক্তিতে ভদ্রমহিলা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

'সহৃদয় ক্রেতাও নিশ্চয়ই পাচ্ছেন?' তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলাম।

'সে তো নিশ্চয়ই। কিছু নিয়মিত ক্রেতা আছেন তাঁরাই আমার আশা, ভরসা।'

'এইসব নিয়মিত ক্রেতার দ্বারা আপনি কি আয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত?'

'অসম্ভব, তাঁরা দয়া করে আসেন এই-ই যথেষ্ট। ইচ্ছে হলে যে কোন দোকান থেকে তাঁরা টিকিট কিনতে পারেন।'

'এই অনিশ্চয়তায় না থেকে আপনি অন্য কোন চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করছেন না কেন?'

'চেষ্টা করলেই যদি পেতাম তাহলে আমি আর ফুটপাতে দোকান খুলতাম না। আমারও নির্দিষ্ট সময়ে ছুটিছাটা থাকতো। মাসের প্রথমে নিশ্চিত আয়ের একটা সুখ নিশ্চয়ই উপভোগ করতাম। আজকরে মত একাধিকের অনুপস্থিতিকে বিরাট একটা

আমার কোন মোহ বা মমতা নেই।

ক্ষতি বলে ভাবতাম না। কিন্তু স্থায়ী চাকরী আমার কাছে একটা স্বপ্ন বিশেষ। অনেক চেষ্টা করেছি এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি।

আমিও তাঁকে আর আকাশকুসুম কোন সুখস্বপ্নে রঙ্গীন হবার কথা বলতে চাইলাম না। তাঁর আয়ের মধ্যেই একটা সমাধানের চেষ্টা করতে চাইলাম। 'আচ্ছা একটা দোকান ঘর কি এই আয়েই ভাড়া করতে পারছেন না?'

'সত্যি কথা বলতে কি, এই ব্যাপারে আমি মোটেই আগ্রহী নই। আমার নাবালক শিশুকে মানুষ করা আমার এক বিরাট কর্তব্য। সন্তান যদি কোন দিন মানুষের মত মানুষ আর আমার ভরণপোষণের দায়িত্ব তুলে নেয় সেদিন আমি আমার কাজ থেকে অবসর চাইবো। আসলে এই কাজটার প্রতি আমার কোন মোহ বা মমতা নেই।'

'সে তো সুদূর ভবিষ্যতের কথা। ততদিনে হালচাল কত পালটে যাবে। আজকের আমাদের ভাবনাচিন্তা সেদিনের মানুষের কাছে অনেকটা সেকেলে ঠেকবে। আপনার মত কাজে অনেক মেয়েকেই দেখা যাবে। সুতরাং আজকে যে কাজটাকে আপনার বাধো-বাধো, অসম্মানের কাজ বলে মনে হচ্ছে সেদিন নিশ্চয়ই এ চিন্তাটা আপনার মাথায় বোঝার মত ঠেকবে না। অসম্মানিতা হবারও কোনো আশংকা থাকবে না।'

'ভগবান করুণ সেই শুভবুদ্ধি তাড়াতাড়ি জাগুক। বন্ধ্যামাতাকে আর সন্তান পালন করার কাজটা যেন কারও করুণার জিনিস না হয়। আরও পাঁচটা অফিসের মেয়ের মত আমরাও যেন সম্মান ও মর্যাদা পাই।'

যে বিরাট আশা আনন্দ নিয়ে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম অথচ মহিলাটির সাক্ষাতে কেমন বিমর্ষ হলাম। কিন্তু আমি তাতে বিন্দুমাত্র হতাশা বোধ করছি না। পৃথিবীর প্রগতিশীল সব দেশেই নারী-পুরুষেরা সমান তালে এগিয়ে চলেছেন, সেখানে কারও জীবিকাই উপেক্ষণীয় নয়। আমার স্থির বিশ্বাস জীবিকা হিসাবে মানুষ যে কোন কাজকে তার অধিকার ও প্রাপ্য বলে গ্রহণ করতে পারবে, এরকম স্বাধীন ও উদার চিন্তাধারা আমাদের দেশের মানুষের মনে উদয় হতে নিশ্চয়ই আর বেশী দেরী নেই।

—অঞ্জলি চৌধুরী

অঙ্গনা

সেই চিরকেলে কলহ

শাশুড়ি-বউয়ের বনিবনার অভাব আমাদের দেশে এক অতি প্রাচীন ঘটনা। সেই কবে থেকে এই ঘটনা চলে আসছে। শাশুড়ি বউকে সহ্য করতে পারে না, আবার তেমনি বউও পারে না শাশুড়িকে সহ্য করতে। আগেকার দিনে এ নিয়ে অনেক কথা শোনা যেত। গল্প আর কাহিনীতে এই ঘটনা নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে। সেদিন নাকি পুকুরঘাটে নাইবার অথবা জল নেবার সময় বিভিন্ন বাড়ির শাশুড়িদের কনফারেন্স বসতো। আলোচ্য বিষয় ছিল নতুন বউয়ের গুণপনা। নিজ নিজ বউকে নিয়ে কে কেমন অশান্তি ভোগ করছেন সেকথা সবাই সবিস্তারে বর্ণনা করতেন। আবার অন্যদিকে বসতো বউদের কনফারেন্স। নতুন সংসার করতে এসে শাশুড়িদের জ্বালাতন আর তাড়না তাদের কতখানি অতিষ্ঠ করে তুলেছে সেকথা প্রকাশ করে মনের ভার হালকা করতো। দু পক্ষই পাল্লা দিয়ে একে অপরের নিন্দা-ত্রুটি সম্বন্ধে সরব হতো। ব্যতিক্রমের কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

শাশুড়ি-বউয়ের বনিবনার অভাব নিয়ে সেদিন রসালো কাহিনী শোনা যেত। আজ আর ঠিক তেমনটি শোনা যায় না। কিন্তু বিরোধ যে এখনো আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কয়েকদিন আগে শোনা এরকম একটি বিরোধের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। নতুন বউ শ্বশুরবাড়ি এসে দেখলো যে, শাশুড়ি ঠিক স্বাভাবিকভাবে তাকে নিতে পারছেন না। নিজের মাকে ছেড়ে আসার মুহূর্তে সবাই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে, শাশুড়ি এবার থেকে হলো তার নতুন মা এবং এই মায়ের কাছে তার স্নেহ-ভালবাসার কোন ত্রুটি হবে না। কিন্তু বউ এখানে সে সবের কিছুই দেখতে পেল না। স্নেহ-ভালবাসা তো দূরের কথা শাশুড়ি যত্রতত্র বউয়ের নিন্দা করে বেড়ান এবং অনেক সময় তার সামনেই। বেচারা বউ সব সময় মনমরা হয়ে থাকে। নিজের দুঃখের কথা কাউকে খুলে বলতে পারে না। কয়েক দিন পর সে বাপের বাড়ি যায়। সেখানে গিয়ে মাকে সব কথা খুলে বলে আর কান্নায় ভেঙে পড়ে। সব কথা শুনে মা মেয়েকে শান্ত করলেন আর একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিলেন। এবার শাশুড়ি যতই বউয়ের নিন্দা করে বউও ততই সকলকে শুনিয়ে শাশুড়ির গুণগান করে। ক্রমে এই কথা উঠলো শাশুড়ির কানে। সব শুনে তিনি তো আনন্দে আটখানা। বউকে সঙ্গে সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আদর করলেন আর দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, এমন বউয়ের তিনি নিন্দা করেছেন। এভাবে এক জটিল বিরোধের অবসান ঘটলো। সংসারে আনন্দের বান ডাকলো।

সম্প্রতি আমি আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বান্ধবী বাড়িতে নেই কর্তার সঙ্গে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন। আমি ওর শ্বশুরবাড়িতে এর আগে আর যাইনি। কিন্তু বান্ধবীর শাশুড়ি কোন দ্বিধা না করে ওরা এক্ষুনি ফিরে আসবে এই আশ্বাস দিয়ে আমাকে বসতে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমার সঙ্গে গল্পে জমে গেলেন। কথা গড়াতে গড়াতে সেই শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্কের প্রসঙ্গ এসে পড়লো। তিনি বললেন, শাশুড়ি-বউয়ের বনিবনা না হওয়ার আসল কারণ হলো অধিকারগত প্রশ্নে। মা ছেলেকে লালন-পালন করেন। এবং সব মাই চান যে, ছেলে একান্তভাবে মায়ের অনুগত হোক। ছেলেকে বিয়ে করানোয় মায়ের খুব উৎসাহ। কারণ, তখন তিনি এদিকটা এত ভেবে দেখেন না। কিন্তু যেই বিয়ে হয়ে গেল আর নতুন বউ বাড়িতে পা রাখলো তখনই মায়ের অবচেতন মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার তুফান উঠে। তাঁর ভাবনা যে, ছেলেকে তিনি এতোদিন ধরে মানুষ করলেন এবার সেই ছেলে পর হয়ে যাবে। আগের মতো সে আর মায়ের কথা শুনবে না। এই ভাবনা মাকে পুরোপুরি পেয়ে বসে। এর কোপে পড়ে তিনি সবকিছু ভুলে যান। ছেলের উপর অধিকারের ক্ষেত্রে বউকে তিনি মনে করেন প্রতিদ্বন্দ্বী। এই মুহূর্তে তিনি সবকিছু ভুলে যান। একটি মেয়ে তাঁর সংসারে আসছে নিজের পরিচিত জন সবাইকে ছেড়ে। এ সময় তাঁকে কোলে স্থান দিতে হবে আদর করে যাতে সেই ছেড়ে আসা স্নেহ-ভালবাসার অভাব সে একটুও বুঝতে না পারে। এই স্নেহ ভালবাসার পরিবর্তে শাশুড়িও বউয়ের কাছে পুরোপুরি মায়ের মর্যাদা পাবে। গড়ে উঠবে এক নতুন সম্পর্ক। মাংগলিক ধ্বনিতে যার যাত্রা শুরু, আলোর রাজত্বে তার নতুন অধিষ্ঠান। কিন্তু অনেক শাশুড়ি একথা ভুলে যান। এমনকি তিনি যদি মেয়ে বিয়ে দিয়ে থাকেন এবং সেই মেয়ের প্রতিও তার শাশুড়ি এই মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন সেকথা তিনি ভেবে দেখেন না। এমনভাবে সংসার থেকে সংসারে অশান্তির ঝড় ওঠে।

মা মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু তাকে আবার নতুন করে ফিরে পান বউয়ের মধ্যে। মেয়ের স্নেহে যদি বউকে তিনি গ্রহণ করেন তবে তো আর কোন অশান্তি থাকে না। অথচ একটা আজেবাজে কথা ভেবে শাশুড়ি-বউ দুজনেই যন্ত্রণায় ভোগে এবং মাঝখান থেকে দগ্ধে মরে বেচারা স্বামী। সে কোন দিকেই সোজা রায় দিতে পারে না। ইদানিং অবশ্য শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে আগেকার মতো আর তেমন দা-কুমড়ো সম্পর্ক নেই। এখন লেখাপড়ার চল খুব। শিক্ষার আলোকে সবই সহজ হয়ে আসছে। তবে, কোথাও কোথাও শাশুড়ি-বউয়ের বনিবনার অভাবের

কথা শোনা যায়। এরকম কোন কথা কানে গেলে মনকে এই বলে প্রবোধ দিই যে, দুটিতো থালাবাটি একসঙ্গে থাকলেও তো একটু ঠোকাঠুকি হয় এও নাহয় তেমনি। তারপরই মনে হয় এই জিনিসটা আসে কি কেউ তো কারো অধিকার ছিনিয়ে নিতে আসেনি। যে যার স্বাভাবিক অধিকার নিয়েই তো আসছে। তবে বিরোধ কোথায়?

ওয়ার্ল্ড অব স্টাইরণ

প্রদর্শনীর আমন্ত্রণপত্রটি হাতে পেয়ে একটু চমকে উঠেছিলাম. দি ওয়ার্ল্ড অব স্টাইরন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। তখন থেকেই আমার সাগ্রহ প্রতীক্ষা ছিল প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে। বিরাট কৌতূহল নিয়ে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানস্থল সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন প্যারিস হলে পৌঁছতেই এক সুবেশা তরুণী আমাকে স্বাগত জানালেন। তাঁর কাছে মনের ভাব প্রকাশ করে বললাম যে, প্রদর্শনীটি যদি একটু ঘুরিয়ে দেখান তো খুব ভাল হয়। তিনি এক-কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তারপর বললেন তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি যেখানে বসেছিলেন তার পিছনে ছিল একটি ইঁটবারকরা আধুনিক ধাঁচের দেয়াল। তিনি জানালেন যে, এই দেয়াল আমাদের সর্বাধুনিক অ্যাচিভমেণ্ট। থার্মো-প্লাস্টিক মেটেরিয়াল থেকে আমরা এর এফেক্ট পর্যন্ত আনতে সক্ষম হয়েছি। একইভাবে আমরা টালির প্রকরণও তৈরি করেছি। এক খণ্ড স্টাইরন নির্মিত প্লাস্টিকের বস্তু হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখালেন। এতক্ষণে ইঁটের দেয়াল সম্বন্ধে আমার ধারণা স্বচ্ছ হলো। এগুলো দেয়ালে সেঁটে দিতে হয়। টালির ব্যবহারও একই রকম। দরজার মধ্যে এমনি ধরনের জোর দিচ্ছি। বসবার আর স্নানের ঘরে ওয়াল কেবিনেট। জিনিসগুলি এমন নিপুণ যে ধরা যায় না। মনে হবে এই বুঝি ইঁটের দেয়াল আর এই হলো দরজার আসল কাঠ। ভুল ভাঙতে বেশ সময় লাগে যেমন আমার লেগেছিল। সেই ভদ্রমহিলা না বলে দিলে। আমি বুঝতেই পারতাম না যে আসলে এর মধ্যে রয়েছে স্টাইরনের অতি নিপুণ কারিগরি।

স্টাইরন হলো আসলে ব্যবসায়িক নাম। এই বস্তুটি হলো থার্মো-প্লাস্টিক পদার্থ। নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একে কৃস্টাল ফর্মে নিয়ে আসা হয়। তারপর নানারূপে এই জিনিস আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। এর প্রথম ব্যবহার শুরু হয় আমেরিকায়। এই শতকের তিনের দশকে থার্মো-প্লাস্টিক শিল্পে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। নানা ধাতব বস্তুর বিকল্প হিসেবে এর ব্যবহার আরম্ভ হয়। দিনে দিনে ব্যবহারের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন এর কদর। সে তুলনায় আমাদের দেশে এর আমদানি সেদিনের ঘটনা মাত্র। ১৯৫৭ সালে স্টাইরন ভারতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তারপর থেকে ক্রমে এর প্রচলন বেড়েছে এবং প্রকরণও।

ঘুরে ঘুরে সমস্ত প্রদর্শনী দেখলাম। এক একটি ঘর সম্পূর্ণ স্টাইরনজাত দ্রব্যাদিতে সাজানো। সোফা, কোচ, ল্যাম্পসেড থেকে শুরু করে বাঁধানো ফটো পর্যন্ত। অথচ এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে, এই বস্তু থেকে নেহাতই ঠুনকো জিনিসপত্র তৈরি হয়। বাচ্চাদের খেলনা তাও জানতাম। আমার এই মনোভাব সেই ভদ্রমহিলার কাছে প্রকাশ করেও ফেললাম। তিনি একটু হাসলেন মাত্র। কয়েকটি ফুল-কারি-করা সুন্দর গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন যে, এসব জিনিস অনেকেই ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁরা জানেন না এগুলি কোত্থেকে আসছে। এমনি সাধারণ গ্লাসই আমরা তৈরি করতাম। সেগুলিতেও বর্ণবৈচিত্র্য কম ছিল না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার যে, যে-কোন বর্ণে স্টাইরনের জিনিস পাওয়া সম্ভব। এবার গ্লাসে কল বসিয়ে তার সৌন্দর্য আরো বাড়িয়েছি। আর এই কল ও স্টাইরন থেকেই তৈরি। এই সঙ্গে আছে কারুকাজকরা থালা-বাটি-চামচ। দূর থেকে এবং কাছ থেকেও জিনিসগুলি কাঁচের বলে মনে হয়। এগুলো যে-কোন অনুষ্ঠানে সহজে ব্যবহার করা চলে অথচ ভাঙবার তেমন ভয় নেই। অবশ্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি যাতে সবকিছু 'আনব্রেকেবল' করা যায়। সেই সঙ্গে আমাদের আর একটা প্রচেষ্টাও আছে। যাতে এসব জিনিসে দাগ না লাগে। সেদিকেও আমরা নজর দিয়েছি। একটা একস্ট্রা কোটিং দিয়ে সবকিছুকে অবাঞ্ছিত দাগের হাত থেকে বাঁচানো আমাদের লক্ষ্য।

কথা বলতে বলতে আমরা একটি রেফ্রিজারেটরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তিনি সেটিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে, ফ্রিজের ভেতরকার সবকিছু স্টাইরনের তৈরি। যতদিন ফ্রিজ থাকবে ততদিন এর কোন ক্ষতি হবে না। শুধু তাই নয়, প্যাকেজিংয়ের কাজেও আমাদের জিনিসপত্র এখন বেশ ব্যবহার হচ্ছে। একটি বহু পরিচিত স্নোর কৌটা হাতে নিয়ে তিনি জানালেন যে, এই কৌটা আমরা নিজেরা তৈরি করি না তবে সবই স্টাইরন নির্মিত অর্থাৎ কাঁচামাল আমরাই সরবরাহ করি। আবার এদিকে দেখুন, বলেই তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন নানা রকম গয়নাগাঁটির দিকে। আসল গয়নার চেয়ে ঝুটো গয়না পরাই এখন নিরাপদ, একথা নিশ্চয়ই জানেন সবাই। সেজন্য আমরাও নানারকম গয়না তৈরি করেছি। সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যের থেকে এদের কোনদিক দিয়ে খাটো করা চলে না।

এছাড়া আমরা এখন আরো নানা কাজে হাত দিয়েছি। তার মধ্যে একটি হলো ট্রানজিস্টর ক্যাবিনেট। এক্ষেত্রে আমরা প্রায় এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেছি। এইসঙ্গে অটোমোবাইল সার্ভিসেও আমাদের অবদান কম নয়। ব্যাটারির কেস থেকে শুরু করে গাড়ির নাম সবই প্রায় আমরা তৈরি করছি।

এভাবে একদিকে আমরা গৃহসজ্জার উপকরণ এবং অন্যদিকে প্রয়োজনীয় নানা বস্তুর সম্ভারে এক নতুন বিপ্লব এনেছি। অথচ মজা কোথায় জানেন, আমাদের জিনিস দারুণ সস্তা কিন্তু খুব কমদিন চলে না। অন্য যে-কোন জিনিস সহজে ভাঙবার সম্ভাবনা আছে আর তা না থাকলেও দাম আকাশ ছোঁয়া। আমরা এদিক থেকে সকলকে অনেকখানি রিলিফ দিচ্ছি। আর সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য তো আপনি নিজের চোখেই দেখলেন।

—প্রমীলা

ছেলে ভুলানো ছড়া ॥ রমাবাই দে

চাঁদের নামে খোকন হাসে
এ রূপকথা আর রইলো না
চাঁদে গিয়ে মানুষ বসে
চাঁদমামা আর হাসলো না
'টিপ দিয়ে যা, চাঁদমামা আয়'
ফুরিয়ে গেলো গানের কথা
কি দিয়ে যে ভুলবে খোকন
এইতো হলো মায়ের ব্যথা।
চরকাবুড়ী হারিয়ে গেল
যন্ত্রপাতি বসলো গিয়ে,
মাটি, বালি, পাথরকুচি
মানুষ এলো কুড়িয়ে নিয়ে
জগৎ ভরে অবাক হয়ে
দেখলো সবাই চেয়ে চেয়ে
ভাবলো না তো একবারও কেউ
খোকন ভোলে কি নিয়ে।

শীতের বেলায় পাতকুড়ানী মেয়েমানুষেরা কোমরে কাপড় সেঁটে নীচু হয়ে ঝাঁট দেয় শুকনো পাতা। আমবাগান, উঁচু নীচু ভুঁইয়ে ওই যে শাল মহুয়ার ঘন শ্রেণী, হরিতকীর ঝোপঝাপ মাথা, বটের ঝুরিনামান প্রাচীন দেহ, খেলকদমের লম্বাটে শরীর, পাকুড়ের ছত্রাকার ডাল তার তলায় শুকনো পাতায় বাতাস তখন কাঁপন তোলে। পাতকুড়ানী মেয়েমানুষ হাতে বুয়াণের ডাঁটির গোছায় বাঁধা ঝাঁটার এক জায়গায় পাতার পাহাড় করে—তারপর বস্তাবন্দী—পিঠে চাপিয়ে বেলা শেষের রোদ মেখে ঘরের পথ ধরে।

সারাটা দুপুর তাদের শুকনো পাতার পিছনে ছোটাছুটি। ঝলমলে রোদ শীত শেষে এদিকে গ্রীষ্মনদীতে পা দেবার জন্যে ব্যস্ত। হিমহিম হাওয়া মহুয়ার জমাট গন্ধ ভরে। গাছের ডালে ডাহুক ডাক পাড়ে। শূন্য শস্যভূমিতে বন-পায়রারা ডানার বাজনা বাজায়। টুপটাপ করে খসে পড়া মহুয়া খেতে ছাগলের পাল ছুটে ছুটে হাজির হয়। গর্তের ভিতর ওত পেতে থাকে শিয়াল। চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাগশিশুর উপর। শিঙ বাগিয়ে মা-ছাগলের সঙ্গে লড়াই লাগে কখনও কখনও।

তবে পাতকুড়ানী মেয়েমানুষেরা থাকলে শিয়াল গর্তের মধ্যেই খালি দাপায়। বিরক্তিতে রাগে শিকার হারাণর দুঃখে মোটা লেজের আছাড় মারে। পাত-কুড়ানী মেয়েমানুষের গান শুনে হাসির শব্দ গালগল্প সুখদুঃখের কথা শুনে মুখ কোঁচকায়। মাঝে মাঝে গর্ত থেকে লম্বা ধূসর মুখ, পিটপিটে চোখ বের করে দেখে পাতকুড়ানী কোন মেয়েমানুষ শুকনো পাতার পাহাড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এলো-মেলো শাড়ী, আদুল গা, খোলা চুল। রাগ তাতে আরও বাড়ে। চোখ বন্ধ করে গর্তের ভিতর রাগে সে গুরগুর করে। ......।

চাঁদ কিন্তু শীতের রোদে পিঠ পে... তারিয়ে তারিয়ে খেলাটা উপভোগ কর... চাঁদ—চাঁদ ডাগালি। অদূরে বাঁধ। বাঁ... উপর তালপাতার কুঁড়ে তার। নী... ক্ষেত। শীতের ক্ষেতে ফুলকপি বাঁধাক... আলু মুলো বেগুন মটরশুঁটির সব... শরীর। এসব তারই এক্তিয়ারে। ছাগ... গরু ভেড়া মোষ ছিঁচকে চোর আগলা... এদিকে জলের আয় নেই, রুক্ষভূ... বিধাতার কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টিপাত নি... ধানক্ষেত বছরসাল একবার গর্ভবতী হ... বাকি সময় চিং হয়ে নীল আকাশ দে... তাই বিশাল দীঘির বাঁধের নীচে ... শীতের সবুজতা, বাকি বিগত মরশু... ধানের গোড়া নিয়ে অগণন ক্ষে... খাঁ খাঁ করছে।

চাঁদের নিত্যকার এই খেলায় চো... খুলে রাখার কারণ পাতকুড়ানী এক মে... ডালিম। ওর একজোড়া চোখ... যুবতী ডালিম যেন মুগ্ধতার চো...

পরিয়ে দিয়েছে। তামাটে রঙ দেহের, এক সন্তানের জননী, তবু বাঁধুনি অটুট, মুক্তি সারা নেই, মাথার শুকনো চুল উড়ু উড়ু, খাটো ন'হাতে ঘোর খয়েরী রঙ শাড়ী, কালো পাড়, হাতে কাচের চুড়ি। সে হেঁট হয়ে পাতা জড় করে, শরীর ভাঙে আর একজোড়া চোখের মুগ্ধতার টোপরকে আরও রঙীন করতে ঠোঁটে, চোখের তারায় বিদ্যুত হানে।

চাঁদের বিয়ে হয়েছিল বছর ষোল যখন বয়স তখন আট ন' বছরের এক লাল শাড়ী মোড়া ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের সঙ্গে। দিনকতক কাছাকাছি ছিল। তারপর বাপের ঘর। আজ অবধি ফেরার নাম নেই। ইতিমধ্যে ষোল বছরের ছোকরা চাঁদ যুবক, হাতপায়ের শক্ত পেশী, পাটাল বুক, সরু গোঁফের কালো মুখ। গায়ের রঙ কালো হলেও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের জন্যে রঙ বিচার চলে না, আবার পুরুষের রঙ, লুঙ্গি গোঁজে পরলে কি খাটো কাপড় মালকোঁচা দিয়ে লাঠি হাতে নিলে স্পষ্টতই বীর-পুরুষের চেহারা ফুটে ওঠে। এবং সে কারণেই জাগালি লাভ। এদিকে ঘরে বৌ নেই। আনার নামগন্ধও করে না। সন্দেহ নেই বাপের ঘরে এতদিনে সেও যুবতী। তবে শোনা যায় সে মেয়েমানুষে ফিরবে না। সাঙ্গা করবে সেখানকার এক পুরুষকে।

সুতরাং চাঁদ একা। এবং ডালিমও।

ডালিম মাসকতক আগে এসেছে বাপের গাঁয়ে। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। স্বামীর নজর অন্য মেয়েমানুষে। ডালিম প্রতিবাদ করেছিল। কাজ হয়নি। ওদিকে মাতাল মানুষটা জেদী, ডালিমের পিঠে তার রাগের অনেকগুলি মোটা দাগ টেনে দিয়েছে। স্বামী ছাড়ার বাধা ছিল ছেলে। ছেলে আবার বাপ-নেওটা। মায়ের সঙ্গে আসতে চায়নি। ডালিম বুকে পাথর চাপিয়ে এসেছে। ছেলে বড় হলে সব চিনবে—মাতাল স্বামীর জ্ঞানগম্যিও হতে পারে। কতদিনে তা ডালিম জানে না। এখন অবশ্য মুখ ঝামটা দেয়, মরুক। মরুক সর্বনেশে। তা বাদে বিটাকে আমার নিন আসব।

তবে ছেলে সঙ্গে না থাকার ফলেই বোধকরি ডালিম বাপের গাঁয়ে পা দিয়ে আবার সেই কুমারী মেয়েটি। অতীতের কোন প্লানি নেই। উজ্জল দিনরাত হাসি-খুশী, খাল পুকুরে মাছ ধরা, ধানের কাজ, পাতকুড়ান সবেই উৎসাহী। এবং কিছুদিন ধরে একজোড়া মুগ্ধ চোখের সামনে অপরূপা হয়ে ওঠার স্বাদে রোমাঞ্চিত।

চাঁদ জাগালি ভাগের বাঁধাকপির ক্ষুদে পাহাড় নিয়ে হাটে বসেছিল। গাঁয়ের হাট। ব্যাপারটা ঘটেছে সেখানেই। ডালিম বাঁধা-কপি কিনেছিল। তখনই হাসির ছুরি, দর নিয়ে কষাকষি, চাঁদের বুকেও ভাল-বাসার তরঙ্গ। সন্তাতেই মেয়েমানুষকে দিয়েছিল। শুধু সামগ্রী নয় মনও। মেয়ে-মানুষের তারপর প্রতি হাটবারে গায়েপড়া ভাব, হাসি, কথা চালাচালি। যেন দোকানী নয়, চাঁদের সঙ্গে আলাদা একটা সম্পর্কও রয়েছে।

চাঁদ বলে, লাও কেনে গো! জোছ্য দাম লুব। কাপর দিকে তাকিন দেখ। বুকে টনটন করবেক না কিনলে। রেতে ঘুম হবেক নাই।

ডালিম শরীর ভাঙে, বুকের কাপড় টানে। ঠোঁট বাঁকায়, ঢেক রইছেক হাটে এমুন কপি। '

আমার পারা! স্থির চোখ করে চাঁদ।

হুঁ। চোখের তারা নাচে ডালিমের। ঠোঁটে হাসির ছুরি। বলে, একেবারে তুমার পারা।

মিছে বলছ!

ডালিম কথা বলে না। মুখমণ্ডলে হাসিটা ঘোরায়। যেন জলে জ্যোৎস্নার খেলা। স্থির নয় জল। পাক খাচ্ছে একই বৃত্তের মধ্যে। গায়ের কাপড় টানে। এদিক-ওদিক চোখ ঘোরায়, কোন মানুষের চোখ তার এই সওদা করায় খাবলাচ্ছে, নজর রাখে।

এবং শুধুমাত্র হাট বার নয়। একই গাঁয়ের মানুষ তারা, সুতরাং পথেঘাটে দেখাসাক্ষাৎ হয়। মুখোমুখি পড়লে তখনও অবিকল একই অবস্থা। অর্থাৎ একজোড়া যুবক-যুবতীর গোপনে সেই নিষিদ্ধ ফল আস্বাদন।

কাল কুথা গিইছিলে? পাত কুড়তে যেঁয়ে দেখতে পেলম নাই। ডালিম চোখে-মুখে প্রশ্ন করে।

আমাকে খুঁজছিলে! সুখের জল সর্বাঙ্গে ঝিরঝির করে পড়ে ভরিয়ে দেয় চাঁদকে। বলে, কাল নগর গেইছিলম যি।

অ। ডালিম পা ঘষে পথের বালিতে। মাথা নীচু করে বলে, তাই বলি মানুষট গেল কুথা? '

তাহলে আমার কথা ভাব। চাঁদ চোখ সরায় না। সামনে পায়রারা তখন বকবকম করে হয়ত। চড়ুইয়েরা করে ছোটাছুটি। কোন রঙীন পাখি ডানা ভাসিয়ে যায়। একটা গরু কি বাছুর দেখা যায় পথে। দুটি ছায়া ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকে পথের উপর। চাঁদ চাপা স্বরে ডাকে, ডালিম!

উঁ।

মনের কথা বল।

মুন আমার ছাই। মুন আমার আঙ্গার।

উহুঁ। চাঁদের দু' চোখ জ্বলে। শরীরময় তীব্রতম উত্তেজনা। মুগ্ধতার টোপের পরা দু' চোখে অপরূপা ডালিম যেন এই মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে ফুল আর ফুলের মত নক্ষত্রের এক আকাশ সৃষ্টি করে। বলে, ডালিম সব আছেক। মুনে কি ছাই হয়! আমার মুনে হয় তুমার বিয়া হয় নাই। তুমি সেই গাঁয়ের মেয়ে।

না গো। নতমুখী ডালিম বলে, রেতে আমার ঘুম হয় না। বুক আমার শুকনা কাঠের পারা দাউ দাউ করে জ্বলে। দিনের বিলাতে অত দুখ নাই। রেতেই সব ভাবনা আসে। আমি যি তখুন কি করি। ই শরীর এ মুনের ঢেক জ্বালা গো! ডালিম যেন দাঁড়াতে পারে না। থরথর করে কাঁপে তার সর্বাঙ্গ।

তবে চাঁদ তাতে নিরাশ নয়। বুকের মধ্যেই সুখদুঃখের বাসা। এক-একটা ঝড় এক-একটা বাসা ভাঙে। আবার নতুন করে সে বাসা বানিয়ে নেয় মন। তার জন্যে সময়ের দরকার। যুবতী ডালিমের সুখের বাসা ভেঙেছে—এখন বুকে দুখের বাসা। সেটাকে ভেঙে সুখের বাসা সে গড়িয়ে নেবে। চাঁদ তাতে সাহায্য করবে।

মা বলে, ও চাঁদ, ছুঁড়ি আসবেক নাই। তা পাকা কথা উপাশ থেকে লিয়ে আয়। ছাড়াছাড়ি করে লে। তাবাদে সাঙ্গা কর। মেয়েমানুষের অভাব আছেক নাকি?

চাঁদ ঘাড় ফেরায় প্রতিবাদে, না।

ইকা থাকবি চিরকাল?

হুঁ। কেয়াড়া বলদের কাঁধে লাঙল চাপানর পরিষ্কার বিরক্তি ফুটে ওঠে মুখে। বলে, তুকে কুছু ভাবতে হবেক নাই। আমি সময় হলে তুকে বলব।

অর্থাৎ চাঁদ জানে, ভেবেছে ডালিম তার—তার ভালবাসার মেয়েমানুষ। এবং ওই ডালিমই তার ঘর আলো করে আসবে। কিছুদিন সময়ের দরকার। মনটা ওর ঠিকঠাক করা দরকার। তারপর সাঙ্গা। আহা রাতে ঘরের মধ্যে তখন যুবতী ডালিমকে বুকে নিয়ে কপালের চুল সরিয়ে চাঁদ বলবে, ডালিমফুল মুখ তোল।

লজ্জায় আরো নত হবে ডালিম। শরীর তার থরথর করে কাঁপবে ভালবাসার তীব্রতম আবেগে।

ডালিম সোনা।

উঁ।

তুমার দুখ কাটল।

হুঁ।

আহা অসহ সুখের পুলকে চাঁদ বুকের মধ্যে যুবতী মেয়ের নরম উষ্ণ শরীর নিয়ে খেলা করবে।

এখন ওই যে চাঁদ বাঁধের উপর শীতের রোদে গা-ভাসিয়ে বসে আছে, নজর পাতকুড়ানী মেয়েমানুষের মধ্যে ডালিমের উপর, তার ভিতরে ওই স্বপ্নই সঞ্চারিত হচ্ছে। শীতের চামড়া পোড়ান রোদ, তবু যেন স্বস্তি দেয়। সুনির্মল আকাশের মাঝবরাবর বিশালায়তন সূর্য। ডাহুকের দুপুর কাঁপান অবিরাম ডাক। কিন্তু গাঁয়ের বাইরে পাড়ের উপর চাঁদ মালকোঁচা মেরে, ডালিমের হেঁট হয়ে শুকনো পাতা জড় করা, মাঝে মাঝে টানটান শরীর মেলে দু' চোখের গাঢ় দৃষ্টি তার দিকে ছোঁড়ায় এমনই আচ্ছন্ন, যার ফলে মাথার উপর পাখির ঝাঁক অথবা পাল ছিটকে আসা একটা গরুর দিকে নজর যায় না। এদিকে ক্ষেতের আল বেয়ে একটা মানুষ যাচ্ছে। পাড়ের নীচেই লকলকে মুলো বেগুনের ক্ষেত। পাশাপাশি আলুর সবুজ শরীর, কুমড়োর লতা। মানুষটাকে চোখে চোখে রাখা দরকার। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিতে কতক্ষণ। কিন্তু বসে থাকা চাঁদের সেদিকে নজর তো নেইই, সে ভাবনাও নেই।

একলা ডালিম থাকলে এগিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু আরও দুজন পাতকুড়ানী। সুতরাং যাওয়া হয় না।

চাঁদ গালে হাত দেয়। তর যেন সয় না। মেয়েমানুষ ক্রমাগত সামনে টানে।

ওদিকে ডালিমের ভিতরও তীব্র টান। এখন দিন। এই গাছগাছালির ছায়া, ফাঁকে-ফোকরে শীতের রোদ, পাতাকুড়ানির ব্যস্ততা. এ সময় দুঃখ অথবা অতীত কাছ ঘেঁষে না। ওই যে অদূরে একা বসে থাকা পুরুষ তার কাছে যাবার জন্যে রক্ত ডাক পাড়ে। যেন ডালিম সবে যৌবন ঐশ্বর্য পেয়েছে।

সই টগর স্বামীগর্বে গর্বিতা, চওড়া সিঁথিতে সিঁদুর, টকটকে গোল টিপ, হাত ভর্তি চুঁড়ি। এক ছেলের মা। স্বামী চাষী মানুষ। এসেছিল বাপের ঘরে এখানে। ডালিমকে বলেছে, সই সুয়ামীকে ছেড়ে আসা তুর ঠিক হয় নাই।

ডালিম দু' চোখে গাঢ় অভিমান নিয়ে বলেছিল, সই সব শুনে তুই ই-কথা বলছিস। দেখ—। আঁচল সরিয়ে দাগ দেখিয়েছিল পিঠের। বলেছিল, ই-ও সহ্য হয়। কিন্তুক আপনার পুরুষ অন্য মেয়ে-মানুষের কাছে গেলে কুনু মেয়েমানুষের সহ্য হয় না। আমি ত মেয়েমানুষই বটি। আমার কি নাই বল!

কিন্তুক করবি কি তুই? টগর বাঁকা চোখে প্রশ্ন করেছিল।

কেনে খেমতা রইছেক। খাটব খাব। ডালিম ঘাড় নাড়া দিয়ে বলেছে, উর ঘর করব নাই।

তা দুষ তুরও বটেক। টগর মুখের পান নাড়তে নাড়তে পাকা গিন্নীর মত বলেছিল, নিজের পুরুষকে ধরে রাখতে পারিস নাই।

উ পুরুষ লয়। উ জন্তু বটেক। জন্তুর স্বভাব উর। ডালিমের যেন ও প্রসঙ্গ আর ভাল লাগেনি। কথার মোড় ঘুরিয়েছিল সে। মুখে হাসি এনে বলেছিল, সই তুর কথা বল্। কদিন থাকবি?

আসলে শুধু টগর নয় এখন ডালিম কারো সঙ্গেই তার অতীত জীবন নিয়ে কথা বলতে চায় না। বিরক্তি বোধ করে। পাড়ার উৎসাহী রমণীকুলের কাছে পুরাতন হয়ে উঠেছে অবশ্য ব্যাপারটা। তবু ডালিম দূরে দূরে সরিয়ে রাখে ওই সব কথা।

এবং এখনকার এই মুহূর্তে পাতকুড়ান শীতের দুপুরের আলোয় তার মধ্যে কোন ছায়া সে পড়তে দিচ্ছে না। যেন সে একা। সেই কুমারী মেয়ে। মাথার উপর নীল আকাশ, চতুর্দিকে ক্ষেত, অদূরে রোদ-ডোবা গাঁ, বৃক্ষশ্রেণী, কত জানা অজানা পাখির কলরব, মহুয়ার জমাট নেশার গন্ধ—এসময় সে ভালবাসার লজ্জামাখা জলে স্নান করছে তপ্ত যৌবনকে শীতল করতে। আহা বৌদি আর চিনু না থাকলে সে বোধকরি ছুটে যেত। অথবা চতুর্দিকে ছড়ান এই শুকনো পাতার রাজত্বে সে স্থির হয়ে থাকত মানুষটা আসার গাঢ় প্রতীক্ষায়।

বস্তায় পাতা ভরতে ভরতে বৌদি সামনে এগিয়ে এল। চিনু কিছুটা দূরে। পিসতুতো বৌদি ডালিমের। বয়স প্রায় সমান। তিন ছেলের মা এই বয়সে। ভাঙা শরীর। রঙ্গরসে পোক্ত। চাঁদের সঙ্গে ডালিমের সম্পর্কের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার নেই। কিঞ্চিৎ অনুমান করে। চাপা স্বরে ডালিমের সামনে ঝুঁকে বলল, ও ঠাকুরঝি উদিকে কি দেখ বারবার।

ডালিমের মুখে যেন রক্ত এসে জমা হল। ঘাড় তুলল না। বলল, কে বসে রইছেক!

কে আবার চাঁদ জামাই গো। চিনতে লারছ! বৌদির মুখে হাসি ফুটল মৃদু। বলল, এ বয়সেই চোখের দুষ। তা একটানা খানিকখন চেয়ে থাক কেনে। বারবার ঘা ঘুরুলে খোঁচাক লেগে যাবেক।

লালমুখের ঝামটা দিল ডালিম, উঙ্, আমার ভাত লেগেছে দেখতে!

পাত কুড়ুতে ব্যস্ত ডালিমকে একল পেল চাঁদ। বুকে তখন স্ফূর্তির ঢেউ রক্তধারায় তীব্র চঞ্চলতা। দিনের রো নেই। শীতের দিনেও মেঘ জমেছ ঝরছে না অবশ্য। বাতাসকে বন্ধ করে ঠা দাঁড়িয়ে আছে। যেন দরজার কড়া নাড়া পর কপাট খোলার অপেক্ষা। হুড়হু করে জল নামবে।

চাঁদ ডালিমের চোখ এড়িয়ে এড়ি যেতে থাকল। আচমকা সামনে দাঁড়িয়ে যুবতী মেয়েমানুষকে ব্যতিব্যস্ত ক তুলবে। ভিতরে তীব্র উত্তেজনা। অদূ গরুর পাল। শূন্য ধানক্ষেতে বনপায়রা ঝাঁক। মহুয়ার জমাট গন্ধ চারিদি ভরপুর। গাছের ডালে ডাহুক ডাক একটানা। চিঁড়িক চিঁড়িক শব্দ তুল ডালে ডালে ক্ষুদে রঙীন পাখি। এক ট্যাসকোণা হলুদ সবুজ চিত্রিত শর নিয়ে অস্থির শব্দ তুলে এগাছ-ওগাছ ক বেড়াচ্ছে।

তবে ডালিমকে এড়ান গেল একটা আমগাছে চেপে শব্দ করার বা ছিল চাঁদের। কিন্তু হল না। তার আ চোখাচোখি। চাঁদকে এগিয়ে আসতে দ সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আজ ইবা!

ডালিমের রক্তফোটা মুখ, গা কাপড় সুউন্নত বুকে ঠিকঠাক, ভঙ্গিমা, এমন নির্জনতায় ভালবা পুরুষের মুখোমুখি কেমন যেন শিহর ঠোঁট কাঁপে তার। হাতের ঝাঁটা দেয়। বুকের মধ্যে শব্দ বাজে। তার নিজেকে সামাল দিয়ে ঠোঁটের মধ্যে হা যেন পুরুষের শরীরে শরীর মেশা পরবর্তী বিহ্বলতা অথবা পুরু সাহসিকতায় নিঃশব্দ সমর্থন। বলল, ই দেখেই ত এলে। না হালে কি আসতে

ডালিম! গাঢ়স্বরে ডাকে চাঁদ!

কি?

এমন করে বুক পুড়াও কেনে আমা

ওমা আমি কি আগুন বটি যি তু বুক পুড়াব! ঠোঁটে জিভ বুলোয়। তার দু' ঠোঁট এক করে জিভ ঘোরায় মু হাসির তরঙ্গ এর ফলে তীব্র হয়ে ঘো ফেরা করে। এবং নবযুবতী তার দৃষ্টি এবং শরীর মোচড়ানর ভঙ্গী আরও শাণিত করে আকর্ষিত পুরুষ-পতঙ্গ। বলে, জ্বল ত গো বুকে!

আহা ই আগুন যি জলে নিব নাই। আগুনেই ঝাঁপিন পড়তে হবে তাহলে জ্বালা মিটবেক। দু' চোখে দৃষ্টি মেলে ধরে চাঁদ যুবতীর উপর। অতি মনোরম কোন দৃশ্যের আবেশ দু' চোখের পাতায়।

তাই কর। ডালিম যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর উদাসীন রমণীর মত আকাশ দেখে। এক হাত কপালে রেখে চুল সরায় অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। বলে, কিন্তুক তুমার যি বাড়া ডর!

ডর! হ্যাঁ, ভয় একটা চাঁদের আছে বৈ কি! নইলে ওই তো পলকা মেয়ে-মানুষের শরীর। চাঁদ কাঁধে তুলে নাচতে নাচতে এ তল্লাট ঢুঁড়তে পারে। অথচ একটু ছোঁয়ার বাসনা থাকা সত্ত্বেও হাত কেমন যেন গুটিয়ে আসে। আসলে এটা কি চাঁদের! শরীরের মোহকে ছাড়িয়ে বোধ করি এরই নাম ভালবাসা। বিয়েকরা সেই মেয়েটি সম্পর্কে কোন অনুশোচনা জন্মের সুযোগ আসেনি, কিন্তু চোখের সামনেকার এই ডালিম, তাকে ভালবাসার শুধু সুখের বাসার যে স্বপ্ন সারা দেহমনে সঞ্চারিত, তাকে সামান্য ভুলে হারিয়ে ফেলতে চায় না চাঁদ!

চাঁদ বলে, ডর ত তুমাকেই ডালিম। তুমি যদি কুছু মনে কর।

হায়রে পুরুষ! কৃত্রিম হতাশা ফিক হাসির সঙ্গে মিশে মুখমন্ডল ব্যস্ত করে!

ডালিম!

উঁ।

তুমাকে আমি ভালবাসি।

উ কথা আর বলতে লাগে না গো। নতশীর্ষ রজনীগন্ধার মত ডালিম নুয়ে রবে।

আমি সাঙ্গা করব!

ডালিম শব্দ করে না।

পুকুরঘাটে বিকেলে গা ধোবার সময় বৌদি বলল, দেখ ডালিম বুঝতে আমার বাকী নাই কুছু। তা ছাড়াছাড়ি করে চাঁদ জাগালির সঙ্গে সাঙ্গা কর কেনে। আমি বন্দোবস্ত করি তুমার দাদাকে বলে!

ডালিম কথা বলল না।

বৌদি দু' পা জলে একটা পাথরের উপর বসে গামছায় গা ঘষে যাচ্ছে। ডালিম জলে নামেনি। ঘাটে দাঁড়িয়ে। ওদিকে একটা কাক ঠোঁট ডোবাচ্ছে। বক একটা বসে আছে নিঃশব্দে। অন্য ঘাটে মেয়ে-মানুষ বাসন মাজছে। ডিমের কুসুমের মত সূর্য পশ্চিম আকাশে জমা মেঘেদের মধ্যে বিচিত্রবর্ণের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে জলে পড়েছে। পাশাপাশি গাছগাছালির দীর্ঘ ছায়া।

বৌদি ঘাড় ঘুরিয়ে ডালিমকে দেখল। বলল, ভাবছিলম কদিন থেকেই। তা তুমি ত রাজী আছ। সুজাসুজি বল বাবু। চাঁদ জাগালি ত হাত ধুয়ে বসে আছেক।

ডালিম নীরব।

লাজে মরছ নাকি? চোখ টেনে বৌদি ঠোঁটে হাসি নিয়ে বলল, ঢঙ। মরে যাই। মরে যাই।

ডালিম বলল, আমার ছেলে রইছেক।

থাকুক উর বাপের কাছে! বড় হলে আসবেক। চাঁদ তুমাকে...। বৌদি কথা শেষ করল না। অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। তারপর কৃত্রিম রাগত স্বরে বলল, মাছ নিয়ে জলে খিলা ভাল লয় ঠাকুরঝি।

আশপাশ দেখে বাড়ান পাখানা মাটিতে ঘষল ডালিম। বলল, সি আমি জানি।

তাহালে আর ঢঙ কেনে। বৌদি আবার পা ঘষায় মন দিল।

আমার যি উঁদিকটা কাটে নাই।

কাটাতে কতকখন! এবার কোমর অব্দি জলে ডোবাতে এগিয়ে গেল বৌদি।

ডালিমও জলে নামল। কেমন করে বোঝায় গর্ভে ধারণ করার পর রক্তমাংসের জীবন্ত একটা ঢেলাতে পৃথিবীর মাটিতে নামানর বেদনামিশ্রিত মমতা কাটান কত দুরূহ! বৌদি মা হয়েও কি বোঝে না! নাকি নিজের ঘায়ের জ্বালার মত অপরের ঘায়ের জ্বালা বোঝা যায় না!

ওদের দুজনকে মিলিয়ে দেবার বৌদির উদ্যোগপর্বের মধ্যেই আর এক কঠিন বাধা এসে দাঁড়াল। যার থেকে উত্তরণের ক্ষমতা কারও নেই। যেন চাঁদ জাগালির এক সুখের রাজত্বের সিংহাসনে আরোহণের মুহূর্তে কোথায় বা সিংহাসন, কোথায় বা রাজত্ব। এবং ডালিমের সব মুছে ফেলে আবার নতুন জীবন ভালবাসার এক পুরুষ, যার মমতা অতীতের গ্লানি বেদনাকে মুছে দিয়ে সন্তান দূরে থাকার দুঃখ ধুয়ে আর এক সন্তানের জন্ম দিয়ে যে ভিন্ন এক রাজ্যের দরজা উন্মুক্ত করে দেবে, তার ইশারা পর্যন্ত বহুদূরে সরে গেল।

একটা মানুষ এবং একটা সংবাদ এসে দাঁড়াল ডালিমের দরজায়। ছেলের বাড়াবাড়ি অসুখ। ঘরে ফিরে চল। শুধুমাত্র তাই নয়। তার সঙ্গে সেই মানুষের আকুতি। ডালিম তার ঘরে ফিরে চলুক। মানুষটা তার সব দোষ বুঝেছে! মদ ছাড়বে, বাইরের মেয়েমানুষ ছাড়বে, ডালিমকে সুখী করবে।

যেন দুদিকে দুই স্রোতস্বিনী। অবিরল সুখের জল বয়। ডালিম ফুলের মত একটায় ভাসুক। একটা! কিন্তু কোন স্রোত! কোন স্রোতে ডালিম তার যুবতী শরীরকে সমর্পণ করে!

হয়ত মিথ্যে! হয়ত ডালিমকে নিয়ে যাবার জন্যে একটা চক্রান্ত। হয়ত মানুষটা আগেকার অবস্থাতেই আছে! হয়ত ডালিম গেলে আবার অত্যাচার করবে, রাগের আরও অনেক চিহ্ন এঁকে দেবে যুবতী শরীরে। হয়ত ডালিম আবার ফিরে আসবে এখানে, আবার পাতকুড়াবে শীতের বেলায়।

কিন্তু সব গোলমেলে ভাবনাগুলো মানে না। আর ও ফিরে আসতে পারে তা যেন বিশ্বাস হয় না।

বাঁধের উপর বসে শীতের রোদ গায়ে মাখামাখি তার, টের পায় এক অসার-শূন্যতা। যেন কিছু-কিছুর জন্যে তাকে রাজা করে সব ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিয়ে গেল কোন দস্যু। ওখানে শাল আর মহুয়ার ঘন শ্রেণী, আমের ডালপালা, হরিতকীর ভারী মাথা, তার মাঝে বনপায়রারা মেলা বসিয়েছে, শুকনো পাতা উড়ছে বাতাসে, ফালি ফালি রোদ নীচের শুকনো ঘাসের বুকে, শুকনো পাতায়। পাতকুড়ানি কে কে যেন মেয়েমানুষ। তবু খাঁ খাঁ করছে। ডাহুকের ডাক যেন সে-শূন্যতাকে আরও নাচাচ্ছে। বুকের মধ্যে এক বিপুল ভার, চাঁদ জাগালি টের পায় ডালিম আর আসবে না, তবু দু' চোখে কি আশ্চর্য তৃষ্ণা!

শুনছ!

চমক খেয়ে উঠে দাঁড়ায় চাঁদ। ডালিম। কি আশ্চর্য ডালিম! মাথার চুল তেল-চকচকে। পরিপাটি করে বাঁধা। সিঁথিতে সিঁদুর, উজ্জ্বল মুখ, যুবতী শরীর সুন্দর শাড়ীতে মোড়া। বোধ করি স্বামীর ঘরে যাত্রা করবে এখনই। কিন্তু তার কাছে কেন? কি বলবে ডালিম? চাঁদ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মাথার উপর পাখিরা উড়ে যায়। একটা গরু রব তোলে। হন-হন করে হিম হাওয়া ছুটে আসে।

শুনছ!

উঁ।

আমি চললাম। মাথা নত। লজ্জায় জড়সড় ডালিম। গলা কাঁপে তার। বলে, আমার সব দুষ ক্ষমা করে দিও। ঘরের বৌ ইবার ফিরে এস।

তুমার ছেলের বাড়াবাড়ি অসুখ।

হুঁ।

ভাল হুন যাবেক ঠিক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাঁদ।

ডালিম কথা বলে না।

কখন যাবে?

এখনই।

কুছু বলবে?

না। তুমি?

না।

ডালিম!

উঁ।

মুখ তুলল ডালিম। বড়ো সোন্দর তুমাকে দিখাচ্ছে।

দু' জোড়া চোখ অপলক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন পাথরের চোখ। অনন্তকাল ধরে যে চোখ এমন করে স্থির হয়ে থাকবে। যার মধ্যে কোন বিস্ময় নেই, কোন কামনা নেই, কোন জিজ্ঞাসা নেই। এবং যার মধ্যে একজোড়া বকবকবতীও টের পায় না অলক্ষ্যে কখন এক বিশুদ্ধ প্রেমে এই শীতের বেলায় শুকনো পাতার ওড়াওড়ি, পাখির ডাক, বাঁধের পাড়ের এই নির্জনতার মধ্যে দুটি অপরূপ শ্বেতপারাবত হয়ে গিয়েছে তারা।

ব্রহ্মবান্ধবের অন্তিম কথা

পুলকেশ দে সরকার

১৯০৭ এর অকটোবরের ২৭ তারিখে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুল ও হাসপাতালে মরদেহ ত্যাগ করেন। 'সন্ধ্যা' সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে তৎকালীন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ডি এইচ কিংসফোর্ডের আদালতে রাজদ্রোহের মামলা চলছিল। ভারতে বৃটিশ শাসকদের নাকে তখন বাংলাদেশ ভরে বারুদের গন্ধ; সর্বত্র রাজদ্রোহ আর রাজদ্রোহ। এবং সত্যি করে তারা সিডিসাস মিটিংস বিল আনে এবং অত্যন্ত দ্রুতগতি পাশ করিয়ে নেয়। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন আমলাদের তালিকায় অন্যতম রাজদ্রোহী বক্তা: কলকাতার পার্কে পার্কে তাঁর বক্তৃতা দেওয়া নিষেধ। কিন্তু তাঁকে ধরা হয়েছিল 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় রাজদ্রোহী প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে। চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলায় আসামী পক্ষে ব্যারিস্টার ছিলেন।

কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব নিজে মামলা ও মামলার পরিণতি সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। ভাবনা ছিল শুধু অভিযুক্ত ম্যানেজারের জন্য। এজন্য সকল দায়-দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে আদালতে তিনি এক বিবৃতি দেন: এছাড়া তিনি মামলায় কোন অংশ নেন নি। অভিযোগ-পত্র তৈরীর পর কিংসফোর্ড যখন তাঁকে জিগ্গেস করেন তাঁর কিছু বলবার আছে কিনা, তিনি বলেন, তিনি ইতিপূর্বে যা বলেছেন তার অতিরিক্ত কিছু তাঁর বলবার নেই। মৃত্যু-শয্যাপাশে যিনি তাঁর বন্ধু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, ওরা আমাকে জেল দিতে পারবে না এবং সত্যিই পারে নি, তিনি আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

"আমি 'সন্ধ্যা' সংবাদপত্রের প্রকাশনা, তদারকি ও পরিচালনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছি এবং আমি বলছি 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' প্রবন্ধটির লেখক আমিই, এটি ১৯০৭ এর ১৩ই আগস্ট 'সন্ধ্যা'র বেরিয়েছিল এবং এটি বর্তমান মামলার বিষয়। আমি এই মামলায় কোন অংশ নিতে চাই না, কারণ আমি মনে করিনে যে ভগবৎ-নির্দেশিত স্বরাজব্রত সাধনে আমার সামান্য কর্তব্য পালন করার জন্য বিদেশী লোকেদের কাছে আমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে; এই বিদেশীরাই আমাদের শাসন করছে; তাদের স্বার্থ আমাদের প্রকৃত জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী হতে বাধ্য।"

অথচ আশ্চর্য, ব্রহ্মবান্ধব নিজেই একদা এই বিদেশী মোহজালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছলেন। মাইকেলের মতই নাটকীয় ও দুরন্ত জীবন এবং অন্তরালে কোন মহাপ্রাণের নোঙরে সমাহিত। যৌবনে তিনি সব-কিছু ইউরোপীয়ের সর্বগ্রাসী প্রেমে পড়েছিলেন : ইউরোপের ভাষা, ধর্ম আচার-আচরণ, এমনকি, স্বধর্ম ছেড়ে খৃস্টানও হয়েছিলেন! ইউরোপ-প্রেমিক এই অস্থির ব্যক্তিটি ইউরোপ পরিভ্রমণে গেছলেন এবং খৃস্টান-ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে নুনের পুতুলের মত সমুদ্রে মিশে যেতে চেয়েছিলেন। যখন স্বদেশে ফিরলেন তখন সব-কিছু ইউরোপীয়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে তাঁর কুঞ্চিত মুখ। আবার হিন্দু হলেন, উপবীত বক্ষ-লগ্ন করলেন এবং স্বদেশ-হিতৈষণায় নিমজ্জিত হয়ে গেলেন। সাধারণের দৃষ্টিসমুখে তিনি ধূমকেতুর মত উদয় হলেন। সর্বক্ষণ দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য বিয়ে করলেন না। সব্বার দৃষ্টি এসে পড়ল এই হঠাৎ আবির্ভূত ধূমকেতুর ওপর।

কেননা, তিনি কেবল গভর্ণমেন্টকেই আক্রমণ করে ক্ষান্ত হলেন না; তাঁর সমালোচনার মুখে স্বদেশবাসীরাও পড়লেন। কি শহরে কি গ্রামে প্রত্যেক প্রখ্যাত ব্যক্তিই আক্রান্ত হতে লাগলেন। ফল হল এই যে, তিনি সকলেরই অপ্রিয়ভাজন হয়ে উঠলেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন তাঁরা জানতেন কি লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর মাথায় এ জাতীয় খেয়াল চেপেছিল।

তাঁর জীবনাবসানও ধূমকেতুর মতই; কি এক অন্তর্জ্বালায় ছুটে এলেন, আকাশ পুড়োলেন, জ্বলতে জ্বলতেই অপসৃত হলেন। অত্যন্ত দ্রুত তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন, যেন আর কোন মহত্তর আহবানে নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা সোচ্ছ্বাসে লিখেছিলেন :

"And what a glorious death he had! It reminds one of 'Ichha Mrityu'—dying at pleasure — a privilege which only highly developed souls possess."

লিখেছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে ২৮এ অকটোবর। আঃ, এ কি মহৎ মৃত্যু—এ যেন সেই 'ইচ্ছামৃত্যু'—একমাত্র মহৎ প্রাণেরাই যার অধিকারী।

পত্রিকা লিখেছেন : 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদক, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন! এ দুঃসংবাদ নিঃসন্দেহে সমগ্র ভারতকে চমকে দেবে এবং প্রচণ্ডতম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে। হ্যাঁ, দরিদ্র মানুষ তিনি এমন একটা কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন যাকে 'সম্ভ্রান্ত' বলে গণ্য করা হত না। তবু তিনি ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব, দেশে এক নতুন প্রেরণার মুখ্য উৎস। তাঁর বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট পর পর দুটি রাজদ্রোহাত্মক মামলা এনেছেন; এতেই বোঝা যায়, দেশের জনসাধারণের ওপর তিনি কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।"

সন্ধ্যার মামলা যখন চলছে তখনই তিনি হার্ণিয়ায় পীড়িত হয়ে পড়েন এবং অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। সেটা পুজোর সময়। ২১এ অকটোবর সন্ধ্যায় তাঁকে ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুল ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল; এবং প্রথমে মনে হয়েছিল বোধহয় ভালর দিকেই যাচ্ছে কিন্তু কিছু পরেই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

তিনি খবর পান, পত্রিকার ম্যানেজারের ওপরে কেবল যে আর এক নতুন রাজদ্রোহের পরোয়ানা জারী হয়েছে তাই নয়, কিন্তু খাবার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পর পর দুবার জামীনের আবেদন করা সত্ত্বেও মিঃ কিংসফোর্ড তৎক্ষণাৎ তা নামঞ্জুর করে দিয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধব এই পুত্রসম ছায়ার মত অনুগামী যুবক ম্যানেজারটির জন্যই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই এই সংবাদ তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক হয়েছিল। আগে একদিন বলেছিলেন,

ছেলেটিকে আমি ওর বাপের কাছ থেকে কেড়ে এনেছিলাম, ও আমার হাতের খেলনা মাত্র; একান্তই নিরীহ। ওর জন্যই আমার উৎকণ্ঠা। ওর যদি দণ্ড হয় তবে আমি কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না এবং এই ভাবনা থেকেই ব্রহ্মবান্ধব সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে আদালতে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাই হাসপাতালে পীড়িত অবস্থায় এই দুঃসংবাদে তাঁর কি হয়েছিল?

একজন বন্ধু বর্ণনা দিয়েছেন : "ম্যানেজারের গ্রেপ্তারের সংবাদ শোনামাত্র তাঁর সারা শরীরে এক কাঁপন দেখা দিয়েছিল। তিনি এক বিকট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, কেন, কেন ঐ ছেলেটিকে ঐসব কষ্ট দেওয়া হচ্ছে যখন আমি সব দায়দায়িত্ব নিজে বলে স্বীকার করেছি?"

কারও কারও মতে এই দুঃসংবাদই তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। তিনি যেন মৃত্যুকে দুই বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গনের জন্য দ্রুতগতি তাঁর দিকে যেতে লাগলেন। ২৭শে সকাল ন'টায় সব শেষ হয়ে গেল।

ময়সখানেক আগে তিনি কাউকে কাউকে বলেছিলো, 'হয়তো আমি ঠিক, নয়তো আমারই ভুল। কিন্তু ভগবান জানেন আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিমত, আন্তরিকতার সঙ্গে এবং সমগ্র হৃদয় দিয়ে দেশের সেবা করতে চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে রাজদ্রোহের দায়ে ফেলেছে, আমাকে ভুল বুঝেছে অনেকেই। আমি এত বোকা নই যে ভাবব, বর্তমান শাসকদের আমরা তাড়াতে পারি অথবা স্বরাজকতা আনতে পারি; এর কোনটাই আমাদের কল্যাণকর নয়। আমার ধারণা, সামাজিক অবস্থার উন্নতির মধ্য দিয়েই আমরা বিদেশী শাসনমুক্ত হতে পারি। তাই হল আমার লক্ষ্য। তবু যদি কখনো কিছু হাবিজিবি লিখে থাকি তা শাসকদের সঙ্গে কৌতুক করে তাদের ভয় দেখাবার জন্য। যে হোক, আমার জন্য আমি ভাবিনে। আমি জানি, আমি জেলে যাব, আর জ্যান্ত ফিরব না।'

ব্রহ্মবান্ধব যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেদিনই 'সন্ধ্যা' মামলার শুনানী স্থগিত রাখবার আবেদন করা হয়। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের সুপারি-ন্টেণ্ডেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে এক চিঠি লেখেন যে, আমি মনে করিনে, এই মামলার ১নং আসামী পণ্ডিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এক মাসের আগে আদালতে যেতে পারবেন। অন্ততঃ সার্জারী বিভাগীয় শিক্ষকের তাই মত।

ম্যাজিস্ট্রেট তদনুসারে ১৮ই নভেম্বর অবধি মামলার শুনানী স্থগিত রাখেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন: আমরা বুঝে উঠতে পারছি নে আমরা শোক করব না আনন্দ করব। বেঁচে থাকলে তাঁর কারাদণ্ডিত হবার সম্ভাবনা ছিল। এই-ই হয়ত সেই অদম্য প্রেরণার ব্যক্তিসত্তাটির মৃত্যুস্বরূপ হত। সেদিক থেকে আমরা উল্লসিত যে তিনি আর নেই; জেলে মৃত্যুর চাইতে হাসপাতালে মৃত্যু সহস্রগুণে উত্তম। তাঁর মুক্তাত্মা সগর্বে স্বচ্ছন্দে ঊর্ধ্বলোকে বিহার করে প্রতাপান্বিত গভর্নমেন্টের উদ্দেশে অঙ্গুলি উত্তোলন করতে পারে।

"The whole police of Calcutta headed by Mr Kingsford, or, for the matter of that, the whole British army head d by Lord Kitchener cannot now touch a hair of his head."

— হ্যাঁ, উপাধ্যায়—আপনি আপনার যে স্বদেশকে অন্তরের সঙ্গে গভীর আবেগের সঙ্গে ভালোবেসেছেন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি মত আপনি তার সেবা করেছেন, অন্যায় ও অবিচারের পৃথিবীতে দেহভার টেনে না চলে আপনার মৃত্যু তাকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। হাজার হাজার লোক এই মৃত্যু কামনা করে; তারা আপনার চরণধূলি নেবে।

"The whole of India, we dare say, will shed tears of ecstacy over your departure to a better and happier world."

গায়ক রবীন্দ্রনাথ

অভিনয়কুমার দাশ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, ছেলেদের মধ্যে সবচে' সুরেলা এবং সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মহলেও প্রধান গায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একটি অতীব পরিচিত নাম। যেমনি ছিলো তাঁর গানের কণ্ঠ, তেমনি ছিলো তাঁর বাণী।

ঠিক কবে, কতো বছর বয়েস থেকে রবীন্দ্রনাথ গান গাইতে শুরু করেছিলেন, 'জীবন-স্মৃতি' লেখার সময় সে-কথা স্মরণ করতে পারছিলেন না। পঞ্চাশের সীমানায় দাঁড়িয়ে তাই তাঁর কলম থেকে ঝরে পড়ছে: কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না, তাহা মনে পড়ে না।'

ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরে গানের পাখি এসে বাসা বাঁধে। গীতি-কুশলতায় তিনি কুশলী হয়ে ওঠেন। সংগীতের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে পুরস্কৃত করেন পাঁচশ' টাকার একটি চেক। এ-চেক নিছক চেক নয়, এ ছিলো তাঁর প্রতিভার পুরস্কার।

সেই ছেলেবেলায়-ই রবীন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধু গায়ক শ্রীকণ্ঠ সিংহ তাঁকে গান শিখিয়ে সেই গান সবাইকে শোনাবার জন্যে ঘরে ঘরে টেনে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁর পিতার অনুচর কিশোরী চাটুয্যে তো দুঃখ করে বলতেনই: আহা, দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালীর দল এমনভাবে জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব।'

খুব অল্প বয়সে গান পরিবেষণের কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন: কৌতূহলীর দলে ঘর ভর্তি হইয়া গেল। সকলেই আমার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি দুই-একটা গান গাহিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, কণ্ঠ-স্বর সিংহগর্জনের মতো সুগম্ভীর ছিল না। অনেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তাইতো ভারী মিষ্ট গলা।' পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণকালে তিনি পিতাকে গান গেয়ে শোনাতেন। তিনি লিখেছেন: যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত, পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে...।'

রবীন্দ্রনাথ বাড়ির উপাসনা এবং সংগীতপ্রধান মাঘোৎসবেরও একজন অন্য-তম গায়ক ছিলেন। মাঘোৎসব সম্পর্কে সরলা দেবীর বক্তব্য: বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ভ্রাতাদের সহ ১১ই মাঘের সংগীতের আসরে নামলেন, তখন ব্রহ্মের উপাসনায় হৃদয়ের কোণে কোণে যেখানে যত নদী-খাল-বিল শুকনো ছিল সব ভরে উঠল।'

'সেদিনের কথা' স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: 'ফাল্গুনী'-তে রবীন্দ্রনাথ সাজলেন অন্ধ বাউল। অনেক ক'টি গান গাইলেন। তখনো তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো যেমন মধুর, তেমনি আকাশ-ছোঁয়া।...উনিশ শ' সাত সাল এসে হাজির হলো। তখন 'বিচিত্রা'র আসর বাংলায় মরা গাঙে জোয়ার এনেছে। কতো নতুন গান তৈরি হলো এই আসরের তাগিদায়। 'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী', 'পথিক হে ঐ যে চলে', 'জাগরণে যায় বিভাবরী', 'মাটির প্রদীপ-খানি' ও আরো অনেক গান এই সময়ে তৈরি।...এই 'বিচিত্রা' ভবনে সাতদিন ধরে

অবনের বাটিকাটির অভিনয় হল।... কাঁকর বেশে রবীন্দ্রনাথ এলেন জলের যন্ত্রের সামনের রাস্তায়, নেচে নেচে গান করলেন—'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ আমার মন ভোলায় রে'...ফকিরের চেলা হয়ে এলুম আমি, বাজালুম বাঁশী তাঁর গানের সঙ্গে।'

সোজা কথা, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাড়ির সংগীতের আসরের অনন্য গায়ক। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় : বাবামশায় যখন সভায় মজলিশে 'রবির একটা গান হোক' বলতেন, সে যে কী স্নেহের সুর ঝরে পড়ত! তখন রবিকাকার গাইবার কী গলা ছিলো, চারদিক গমগম করত। বাড়িতে কিছু একটা হলেই 'রবির গান' নইলে চলত না।'

ভাইদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলো রবীন্দ্রনাথের খুব সখ্যভাব। তিনি যখন যেখানে যেতেন, কনিষ্ঠ ভাইটিকে সঙ্গে নিতেন।

গঙ্গায় তাঁরা কিছুকাল বাস করে-ছিলেন। জীবন-স্মৃতি-তে তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্ম-ফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন, খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম. কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম. জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন. আমি গান গাহিতাম, পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম, তখন পশ্চিমতটের আকাশে খেলনার কারখানা নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব-বনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত।'

গায়ক, সুরকার এবং গীতিকার হিসেবে বাইশ-তেইশ বছর বয়সেই রবীন্দ্র-নাথের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সঙ্গীত-তরঙ্গিনী-তে গায়ক এবং সুর-কার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হয়। তাতে লেখা হয়েছিলো : এই যুবক-কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।...ইঁহার ব্রহ্মসংগীত, জাতীয় সংগীত, শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইঁহার সংগীতে অনেক রকম নতুন সুর নতুনভাবে সম্মিলিত হইতে দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সংগীত রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে, সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।'

সবচে' মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বিয়ের বাসরেও ছিলেন প্রধান গায়ক। হেমলতা ঠাকুর বলেছেন : সম্প্রদানের পর বর-কনে বাসরে এলেন।...রবীন্দ্রনাথের ছোট কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন.— 'তুই একটা গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে—তুই এমন গাইয়ে থাকতে।' রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন কি চমৎকার ছিলো, সে যাঁরা না শুনেছেন, বুঝতে পারবেন না।...বাসরে গান জুড়ে দিলেন : আ মরি লাবণ্যময়ী...ইত্যাদি। দুষ্টুমী করে গাইতে লাগলেন কাকিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।'

প্রখ্যাত গীতি-কবি অতুলপ্রসাদও রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন : আমার মনে আছে কোনো এক চায়ের নিমন্ত্রণে কবি উপস্থিত ছিলেন। আমিও একজন নিমন্ত্রিত সেখানে। তাঁর গান হয়। মনে আছে বড়ো ভালো লাগিয়া-ছিলো তাঁর গান।'

জীবনের প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গায়কই ছিলেন। কিন্তু কাব্য ও সাহিত্য-পরিধি পরিব্যাপ্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের নানা কাজের মাঝে তিনি সংগীতচর্চায় পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারেননি। তবুও এখানে-সেখানে সময় এবং সুযোগ পেলেই তিনি গান গাইতেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন : রবীন্দ্রনাথের সেই চমৎকার গানটি 'আজি যতো তারা তব আকাশে—এ-গানটি তিনি গেয়ে শুনিয়েছিলেন-যেমন বাণী, তেমনি ভাব এবং তেমি সুর। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলুম। গল্প, উপন্যাস ছাড়া তিনি গান গে শোনাতেন। নতুন গান যা লিখতেন। আমরা আবদার করতুম—পুরনো গা গুলো আপনি একেবারে ভুলে গেছেন আমরা পুরনো গান শুনতে চাই।...এম আবদার করে শুনেছিলুম কটি গান 'তুমি যেয়ো না এখনি, সখি প্রতিদিন হা আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন...।'

বয়েস বেড়ে যাচ্ছিলো কবির। সে সঙ্গে কাজের চাপও যাচ্ছিলো বেড়ে। কি তবুও কবিকে আটাত্তর বছর বয় মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে গ গাইতে দেখা গেছে। তাঁর সেই সুরে অনবদ্য কণ্ঠ আর তখন ছিলো না। হয় সেই কথা ভেবেই কবি আক্ষেপ করে ব ছিলেন : এখন কি আর গলা আ একদিন ছিলো যখন সভা হলেই স বলতো, রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গ ...এখন এই ভাঙা গলার গান শুনে হবে।'

স্মৃতিকথা-তে তিনি আরো লি ছেন : আমার অল্প বয়সের সেই গ আর নাই—তোমাদের এখন আর শোনাব? পেয়েছিলুম বড় একটা গ মতো গলা। কিন্তু ভগবান দিয়ে নিয়েছেন, এখন কী আর গাইতে ই করে? ...তখন মধ্যমে ধরে ছেড়ে দি সুর, পাখির মতো সে উড়ে চলতো স্ ধাপে ধাপে, পর্দায় পর্দায়। এখন কী গলায় সে অবাধ গতি আছে যে গাইতে ই করবে?'

আজ যদি রবীন্দ্রনাথ আমাদের থাকতেন, তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কলব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডকটরেট উ দিয়েছিলো কিনা। নোবেল পুরস্কারপ্র উপলক্ষে বাংলার সুধীসমাজ বোল রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে এক অভিন সভার আয়োজন করেছিলেন। সভায় রব নাথ কেন গেয়েছিলেন : 'এ মণি আমার নাহি সাজে।'

একটি সাংস্কৃতিক মন্ত্রক চালু করুন

পশ্চিমবঙ্গে নবগঠিত মন্ত্রিসভা ও তার নেতৃত্বদানকারী উদ্যমী নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাছে বিনীত আবেদন, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মঙ্গল কামনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা যখন বহু অভিনব কর্মসূচী গ্রহণে তৎপর হয়েছেন, তখন একটি সাংস্কৃতিক মন্ত্রক গঠনকেও (Establishment of a Ministry of Culture) কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে সারা ভারতে একটি নতুন নজীর স্থাপন করুন। একথা অনস্বীকার্য যে, ক্ষয়িষ্ণু বাঙালীর আজ গর্বের বিষয় মাত্র একটি এবং সে হচ্ছে তার সংস্কৃতি। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে পরাজিত বাঙালী কিন্তু আজও গর্ব করতে পারে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে। কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের সর্বস্তরে বাঙালী আজও অপরাজেয়। বাঙালীর রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাউল-ভাটিয়ালী-কীর্তন-শ্যামাসঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি সকল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই বাঙালী শুধু জাতীয় নয় আন্তর্জাতিক সম্মানের অধিকারী। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যাঁরাই সংস্কৃতিবান, তাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করেন, বহু রকম অবক্ষয় সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে কলিকাতা শহর তথা পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু যে-সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালীর এত বাঙালীর গর্ব, তারও যে পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন আছে, এ সম্বন্ধে বোধ হয় দ্বিমত নেই। একদা দেশীয় রাজন্য ও জমিদারদের সভা আলোকিত করে থাকতেন কবি, গায়ক, বাদক, নর্তকের দল। শুধু যে তাঁরা আর্থিক উপঢৌকনই লাভ করতেন, তা নয়, ভোগ করতেন প্রচুর ভূসম্পত্তি, পেতেন সম্মানের খেতাব। আজ তাদের কর্তব্য অর্শেছে সরকারে। সেই দেশের সংস্কৃতি রক্ষা এবং তার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে এগিয়ে আসতে হবে রাজ্য সরকারকে। এবং তারই জন্যে প্রয়োজন একটি সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা নিশ্চয়ই স্বীকার করেন যে, মানুষ শুধু খেয়েই বেঁচে থাকাকে যদি জীবনের পরম লক্ষ্য বিবেচনা করত, তাহলে সে মানুষ না হয়ে গরু, ঘোড়ার সামিল হত। পেটের ক্ষুধার সঙ্গে তার মনের ক্ষুধা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটায় সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য, অভিনয়, ক্রীড়া, অঙ্কনশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি এবং এদেরই সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি গোষ্ঠী বা জাতির সংস্কৃতি। আজ বাঙালীর সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক,

অমৃতের স্বাদ/দীপিকা দাস ও অসীম চক্রবর্তী। পরিচালনা: পরিমল ভট্টাচার্য।
ফটো : অমৃত

চলচ্চিত্র প্রভৃতিকে প্রেরণা যোগাবার দায়িত্ব বিশেষ করে রাজ্য সরকারের, একথা যেমন সত্য, তেমনইভাবে সমান সত্য, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে উপযুক্ত প্রেরণার অভাব ঘটলে এদেরও ঘটবে অপমৃত্যু। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয় তার জীবনের শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করতে আসছে ৭ ডিসেম্বর। এই উৎসবকে যথাযথভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে আমাদের রাজ্য সরকারকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এখনই। আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্র শুধু বাঙলাকেই নয়, ভারতকে এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মান বারংবার। অথচ মাত্র প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের নাভিশ্বাস উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। অথচ এই শিল্পটিকে যদি একটি মজবুত আর্থিক কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে যে মাত্র এই শিল্পটিরই উন্নতি হবে, তাই নয়, এই শিল্পের সংগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ১৭২টি শিল্পের উন্নতির সহায়তা করা হবে এবং ফলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থভাণ্ডার যথেষ্ট স্ফীত হয়ে উঠবে। বাঙলায় একদা মার্গসঙ্গীতের একটি ঘরাণা গড়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুরে। আজ উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেই ঘরাণার অস্তিত্ব বিপন্ন। ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ক্ষেত্রেও যে বাঙলার বেশ কিছু অবদান আছে এবং তার পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন আছে, একথা নিশ্চয়ই বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এছাড়া আছে বাঙলার নিজস্ব কীর্তন, কালীকীর্তন,

প্রেক্ষাগৃহ

বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি সঙ্গীত। পৃষ্ঠ-পোষকতা ছাড়া এরা নিজেদের ঐতিহ্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করবে কি করে? ছৌ, রায়বেঁশে প্রভৃতি বাঙলার লোকনৃত্য সম্বন্ধেও সমান কথা বলা চলে। আমাদের মৃৎশিল্প, পটশিল্প প্রভৃতিকে সুস্থ জীবনদানের দায়িত্ব যে সরকারের, সেকথাও বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন নেই। আর সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সর্বরকমে সাহায্য করাও যে রাজ্য সরকারের একটি অবশ্য পালনীয় গুরুদায়িত্ব, একথাও নব-গঠিত মন্ত্রিসভাকে নতুন করে বলে দিতে হবে না।—এই সকল দিক বিবেচনা করেই আমরা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভাকে আবার করে অনুরোধ জানাচ্ছি, সত্বর একটি সাংস্কৃতিক মন্ত্রক চালু করতে। পশ্চিম-বঙ্গের সাংস্কৃতিক বিষয়ক বহু কর্তব্য পালনের দায়িত্ব এই মন্ত্রকের।

স্টুডিও থেকে

শ্রীমান পুষ্পনীরজ/মহুয়া রায়চৌধুরী ও সন্ধ্যা রায়। পরিচালনা : তরুণ মজুমদার।

ফটো : অমৃত

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর গেটে ঢুকে, হনহন করে ভেতরে যেতে গিয়ে বাধা পেলাম। কে যেন একজন গতিরোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। দুপুরের ঐ খরারোদে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম ২।৪ জন খুব তাড়াতাড়ি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন। একটা কালো কাপড়ে ক্যামেরাটা ঢেকে ক্যামেরাম্যান ঐ কালো কাপড়টার মধ্যে নিজের মাথাটা গলিয়ে দিয়ে কী যেন করছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—'ও-কে, আমি রেডি। স্টার্ট ক্যামেরা—

একজন প্যান্টপরা ছেলে এসে দুখণ্ড কাঠে খটাস করে আওয়াজ তুলে দ্রুত ঐ স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেল।

—দূর থেকে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না—ঘটনাটা কী!

এবারে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। আবার হনহন করে ডানদিকে স্টুডিওর সুন্দর সাজানো বাগানটাকে অতিক্রম করে সেটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে পেছন থেকে শুনতে পেলাম—অসভ্য, অভদ্র। রাগে শরীরটা কাঁপছিল। বুঝলাম, এই উক্তিগুলি আমার উদ্দেশ্যেই বর্ষিত। থমকে পেছনে তাকিয়েই দেখতে পেলাম অনুপকুমার আমার ঐ অবস্থা ... মিটিমিটি হাসছে। তার পাশে একটা চ... দোকানের বেঞ্চিতে বসে সৌমিত্র চাট... তারই পাশে একটা ছোট্ট সিগা... দোকান—সেখানে বসে অজিত চাটা... আমার এই হতভম্ব অবস্থা দেখে ... একসঙ্গে হেসে উঠলেন। তখনকার ... অবস্থাটা নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান ক... পারছেন। অনুপবাবু হাসতে হা... বললেন—কি মশাই, আমাদের ... দেখছেন না—কি ব্যাপার! অভদ্র কোথা... সবাই আবার একসঙ্গে হেসে উ... এবারে আমিও ঐ রসিকতায় যোগ দিল...

সৌমিত্রবাবু আমায় ডেকে ... বসালেন। তার কাছে জানতে পা... পরিচালক অজিত গাঙ্গুলীর 'নতুন ... আলো'-র স্যুটিং হচ্ছে। টেকনিসি... স্টুডিওর খোলা মাঠটার চারিদিকে ... ছোট সেট পড়েছে।

একটু বাদেই পরিচালক শ্রীগাঙ্গু... হাতে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমাদের পাশে ... বসলেন। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য ... হেঁড়ে গলায় বললেন—কি দাদা, ... ছবির খবরাখবর যে কিছুই লিখছেন ...

পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলীর কাছে ... পারলাম এই ছবির সহ-নায়িকা ... ব্যানার্জি একটা ছবির কাজে ২।৪ ... মধ্যে ঢাকা চলে যাচ্ছেন। তাই তাড়া... করে ছবিটা শেষ করে ফেলতে চান। মাত্র দুদিন স্যুটিং করলেই ছবির ... শেষ হয়ে যাবে।

আপনারা যখন আমার এই ... পড়বেন তখন ছবিটি সম্পাদকের ... সম্পাদনার কাজ চলছে।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের জেনে ... ভাল, পরিচালক শ্রীঅজিত গাঙ্গুলী ... ব্যস্ত পরিচালকদের অন্যতম। 'দিনের আলো' শেষ করেই তিনি

বিকাশ/চিন্ময় রায়-এবং অপর্ণা সেন। পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত।

...চৌধুরী প্রযোজিত 'রাতের রজনীগন্ধা'র আউটডোর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু করবেন।

শ্রীগাঙ্গুলীই একমাত্র পরিচালক আজ পর্যন্ত যার কোন ছবি ফ্লপ করেনি। তাঁর পরিচালনাধীনে সবকটি ছবিই আশাতীত সাফল্যলাভ করেছে।

'নতুন দিনের আলো' ছবিটি প্রযোজনা করছেন—বিখ্যাত প্রযোজক রাখাল সাহা তাঁর বাদল পিকচার্স'র পতাকাতলে। এ ছবির পরিচালনা ছাড়াও কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীগাঙ্গুলী স্বয়ং। সুরারোপের দায়িত্বে আছেন—ডাঃ নচিকেতা ঘোষ।

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী, হাঁসু ব্যানার্জি, বিদ্যা রাও, তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, সন্ধ্যা-... বিকাশ রায়, বঙ্কিম ঘোষ, শমিতা বিশ্বাস, পদ্মা দেবী প্রভৃতি।

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে অজয় কর পরিচালিত নতুন ছবি 'কায়াহীনের কাহিনী'-র একটানা সপ্তাহ-ব্যাপী স্যুটিং শেষ হয়েছে। সেদিন একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্য গৃহীত হোল নায়ক উত্তমকুমার ও নায়িকা অপর্ণা সেনকে নিয়ে। এই ছবিতে উত্তমকুমারকে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যাবে।

প্রিয়তমের হাতে নিহত এক সুন্দরী তরুণীর অশরীরী আত্মার বেদনাময় কাহিনী এ-ছবির বিষয়বস্তু। রচনা নবেন্দু ঘোষের, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—সলিল সেন। ছবিটি প্রযোজনা করছেন বম্বের প্রখ্যাত গীতিকার মুকুল রায় (ইনি নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী গীতা দত্তের ভাই)। শ্রীরায় নিজেই ছবিতে সুর-সংযোজনা করবেন।

উত্তম, অপর্ণা ছাড়া ছবির অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা হলেন—বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, চিন্ময় রায়, তরুণকুমার ও নবাগতা ঊর্মিলা দে। চিত্রগ্রহণে আছেন বিশু চক্রবর্তী।

কলামন্দির নিবেদিত নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'ছিন্নপত্র' ছবির স্যুটিং সম্প্রতি যাত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় শেষ হয়েছে। উত্তমকুমারকে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী চক্রবর্তী, কমল মিত্র, অসিতবরণ দিলীপ মুখার্জি প্রভৃতি। এ-ছবিটির সুরারোপে আছেন—ডাঃ নচিকেতা ঘোষ।

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি বুদ্ধদেব বসু রচিত কাহিনী অবলম্বনে 'একটি জীবন'-এর চিত্রগ্রহণ খুব শীঘ্র শুরু হচ্ছে। সম্পূর্ণ ছবির চিত্রগ্রহণ বাংলাদেশের খুলনায় হবে। চিত্রগ্রহণের প্রাথমিক কাজ শেষ করে শ্রীরায় বাংলাদেশ থেকে কোলকাতায় ফিরে এসেছেন। ছবিতে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন। তাছাড়া বিনতা রায়ের কন্যা শুচিতা রায়ও নাকি এ-ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করবেন।

এস বি এণ্টারপ্রাইজ নিবেদিত 'আমি সুভাষ বলছি' খ্যাত শৈলেশ দে-র কাহিনী অবলম্বনে শচীন অধিকারী পরিচালিত 'দুই বোন' ছবির কাজ শেষ হয়েছে। ছবিটি সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে গৃহীত হয়েছে। সংগীত পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ ও সংগঠনে আছেন যথাক্রমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান সিন্‌হা ও বিকাশ মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে শিল্পী : বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, বিদ্যা রাও, প্রণব চৌধুরী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, মনি শ্রীমানী, তুলি চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রায়, অসীম মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষ ও তরুণকুমার (অতিথি)।

মঞ্চাভিনয়

নটনীড়ের 'হে বন্ধু বিদায়' : আকস্মিক এক ঘটনার আবর্তে দোল খেয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ এক অপরিচিত যুবক ও যুবতী মেয়ে আশ্রয় নিলো এসে এক অজানা পরিবেশের অচেনা এক কক্ষে। একটি অতল গহীন রাতও দু'জন কাটিয়ে দিতে বাধ্য হোল। বাড়ীর অন্যান্যরা খুব স্বাভাবিক কারণেই ভাবলো এরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু নায়িকা ছন্দা এই মিথ্যা পরিচয়টুকুকে সহজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারলো না, অথচ নায়ক অলোক বাস্তব সমস্যা উপলব্ধি করে, বর্তমানকে কেবলমাত্র সামলে দেবার অভিপ্রায়ে কোন-রকমে একটি ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর অথবা মধুময় রাতকে অতিক্রম করার জন্যই স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়ে অচঞ্চল থাকতে পেরেছে। অথচ যখন তাদের সমস্ত নকল অভিনয়ের সম্পর্কটুকু ধীরে ধীরে চিত্তের গোপন সুরে আর সংলাপে মুছে গিয়ে একীভূত হৃদয়ের উত্তাপে হয়তো রূপ পেতে চাইলো, তখনই উঠলো সূর্য। স্পষ্ট হোল আলোর ইসারা, সুস্পষ্ট হোল বাস্তব জীবন; হারিয়ে গেল দুটি হৃদয়ের নিবিড় সান্নিধ্যে আসা অসীম আকুলতা। কিন্তু সারা রাত ধরে অনুরাগের ভাষায় যে সেতুবন্ধনের কামনা উদ্বেল হয়ে ওঠে, তা

কি বাস্তব সত্যের নির্মমতার কাছে হার মানবে? ঐ রাতের প্রহরে ওরা দু'জন যে না-বলা কথা বলতে গিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠতে চেয়েছিল, তার কি কোন মূল্যই নেই? প্রশ্ন ওদের দু'জনের মনে, জিজ্ঞাসা ওদের চোখের তারায়। বিদায়ের করুণ আবেগঘন মুহূর্তে সে জিজ্ঞাসা এনেছে গুমরে-ওঠা কান্না। 'হে বন্ধু বিদায়' নাটকটি এই কারণেকেই যেন সীমাহীন নিবিড়তায় প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে।

'নটনীড়'এর শিল্পীরা এই নাটকটির প্রযোজনায় আন্তরিক নিষ্ঠা ও চিরন্তন জীবনবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। ছোট্ট একটি ঘটনা, সীমিত কটি চরিত্র, সহজ, সরল দৃশ্য-পরিকল্পনা, আর অনাড়ম্বর সঙ্গীতের রেশে নাটকটির উপস্থাপনা দর্শকমনকে নাড়া দেয়। নাট্যকার বিনয় চক্রবর্তী যে আবেগকে সংলাপে আর মুহূর্ত সৃষ্টিতে রূপ দিয়েছেন, তাকেই স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় মঞ্চের আলোয় ভাস্বর করে তোলেন শিল্পীরা। নির্দেশনার দায়িত্বও নিয়েছেন নাট্যকার স্বয়ং। প্রয়োগ-পরিকল্পনায় তাঁর শৈল্পিক-মানসের স্বচ্ছতা ধরা পড়েছে।

'অলোক' ও 'ছন্দা' চরিত্রে সাবলীল অভিনয়ের পরিচয় রাখেন দেবোত্তম চক্রবর্তী ও শিপ্রা চক্রবর্তী। অন্তরের আবেগ-নিঃসৃত মুহূর্তে এ'দের অভিনয় আশ্চর্য সুন্দর হয়েছে। বাচনভঙ্গিমায় প্রত্যাশিত অনুভবেরই দোলা ছিল। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন নিশীথ কাঞ্জিলাল (মেসোমশায়), নিতাই ঘোষাল (সাংবাদিক বন্ধু), প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় (রেস-খেলা যুবক), অনীতা দত্ত (মাসীমা)।

নাটকটির মূল সুরের সঙ্গে তাল রেখেছিল অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সুর-সৃষ্টি। সুরজিত মজুমদারের মঞ্চসজ্জাও শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত হোতে পেরেছে।

বহ্নিশিখা : মঞ্চসফল নাটক 'বহ্নি-শিখা'র আরো একটি স্বচ্ছন্দ অভিনয় কয়েকদিন আগে পরিবেশিত হোল 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। অভিনয়-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন ইউনাইটেড স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাবৃন্দ। নাটকটির সামগ্রিক প্রযোজনায় মনে রাখবার মতো বেশ কিছু মুহূর্ত চোখে পড়েছে।

অভিনয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন বিলাসবিহারী-রূপী নৃপেন দত্ত। বিলাসবিহারীর আর এক সত্তা সুজন সিনহারও চারিত্রিক প্রতিফলন শ্রীদত্তের সুদৃঢ় অভিনয়ে স্পষ্টতা পেয়েছে। তপনকুমার ঘোষের 'আহম্মদ দূরাণী' একটি সপ্রতিভ চরিত্রচিত্রণ হোতে পেরেছে। নায়িকা বহ্নি'র চরিত্রে শ্রীমতী ইরা মিত্রের অভিনয় প্রত্যাশিত গাম্ভীর্য মেলে ধরতে পারেনি।

এছাড়া সুঅভিনয়ের জন্য প্রশংসার দাবী রাখেন পরিতোষ চক্রবর্তী, অপূর্ব কুণ্ডু, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, সবিতা মুখোপাধ্যায়, মালা দাস, আশা বোস।

আবহসঙ্গীত পরিচালনায় বারীন চট্টোপাধ্যায় মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন বিজলীমোহন মুখোপাধ্যায়।

গান্ধারের নতুন নাটক

আগামী ১লা এপ্রিল সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ অ্যাকাডেমী মঞ্চে গান্ধারের নতুন নাটক প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের 'অপার্থিব' মঞ্চস্থ হবে। আলো—তাপস সেন, মঞ্চ—সুরেশ দত্ত, সঙ্গীত—ভাস্কর মিত্র, নির্দেশনা—অমিত মুখোপাধ্যায়। অংশগ্রহণ করছেন গীতা চক্রবর্তী, বেলা রায়চৌধুরী, ভবরূপ ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, পি কে উদয় ভট্টাচার্য, দিলীপ সরকার, গৌতম চক্রবর্তী, রাসবিহারী মান্না ও অসিত মুখোপাধ্যায়।

'ছেঁড়া তার' নাটকাভিনয়

গেল ৩রা মার্চ আসামের নিউ বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে মঞ্চে তুলসী লাহিড়ীর "ছেঁড়া তার" নাটকটি অভিনয় করলেন ফ্রাইণ্ড মার্স (কাঁচরাপাড়া) নাটকটির ভাষা উত্তরবঙ্গের হলেও পরিবেশনের গুণে নাটকটির অভিনয় সাফল্য লাভ করে। এদিক দিয়ে নাম করতে হয়—যূথিকা বসু, কালীপদ ভৌমিক, মাস্টার ট্যাঙ্কার, এছাড়া নাটকে অংশগ্রহণ করেন ভজন দাসগুপ্ত কেষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিন রায় ও ইন্দু মণ্ডল, সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ বোস, পঞ্চানন মণ্ডল, আর সম্পাতে ছিলেন সতীন চক্রবর্তী।

সংগঠনীর 'লালবাঈ' : বাস্তবনিষ্ঠ সামাজিক পালা 'একটি পয়সা' পরিবেশন করে বারাসতের প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী সংগঠনীর শিল্পীরা যে সু... অর্জন করেছিলেন এবারে 'লালবাঈ' পরিবেশন করে তা পুরোপুরি অক্ষুণ্ণই রেখেছে। প্রচণ্ড সংঘাতসমৃদ্ধ এই পালাটি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগপরিকল্পনায় সাবলীল করে তুলেছেন নির্দেশক শ্রীব... চট্টোপাধ্যায়। প্রায় প্রতিটি শিল্পীর অভি... হয়েছে স্বাভাবিক ও সংযত। চিরাচরিত ভাবে যাত্রাভিনয়ের রীতি ও শৈলী... সব জায়গাতেই বর্জন করা হয়েছে।

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর নাম সর্ব... উল্লেখযোগ্য তিনি ইসমাইল চরিত্রের রূপ... বরুণ চট্টোপাধ্যায়। অসাধারণ দক্ষতার স... চরিত্রটির দীপ্তি তিনি সবার মনে সঞ্চা... করতে পেরেছিলেন। 'লালবাঈ'য়ের ভূমিকা... স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় অভিনয় করেন আশা... অঞ্জলি ভট্টাচার্যের 'চন্দ্রপ্রভা' প্রত্যা... গভীরতা সৃষ্টি করতে পারেনি। অন... কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন বি... চট্টোপাধ্যায়, রামনন্দ মুখোপাধ্যায়, শি... চট্টোপাধ্যায়, সমরজিৎ দে ও বিশ্বনাথ দে...

সংগীতপরিচালনায় আন্তরিক নি... পরিচয় রাখেন শ্রীশৈলেন্দ্র ঘোষাল। বা... চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'পদাধরের' গান স... সবার মনই ছুঁয়েছিল।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' ও 'শাহজাহান'

রামকৃষ্ণ সারদা-মিশন-বিবেকানন্দ বি... ভবনের বার্ষিক উৎসবে কয়েকদিন আ... অভিনীত হোল 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' 'শাহজাহান' নাটক দুটি। নাটক দু... বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন শুধু মহিলা... 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম' নাটকটির চতুর্থ পঞ্চম অঙ্কের দরদী ও প্রাণস্পর্শী অ... সবারই স্বীকৃতি অর্জন করে। অভিনয়... সাবলীল করে তুলতে যাঁরা বিশেষ সাহায্য করেন তাঁরা হোলেন স্বা... ভট্টাচার্য (কণ্ব), প্রভা দাশগুপ্ত (শকুন্তলা) শিপ্রা দত্ত (রাজা)।

বহু অভিনীত 'শাহজাহান' নাটকটি... শিল্পীরা প্রাণময়তার পরিচয় রেখে... তপতী মিত্র (ঔরংজেব), শিপ্রা দত্ত (... জাহান), প্রভা দাশগুপ্ত (জাহানারা)... দত্ত (দারা) অসাধারণ অভিনয় করে... অনন্যা শিল্পীরাও খুবই স্বচ্ছন্দে ... দের চরিত্রের সাথে তাল রেখে এগিয়ে... পেরেছেন।

নাটক দুটির নির্দেশনায় ছিলেন ব... বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরী ঘোষ।

ফাঁস : ওয়েলম্যান ইনক্যান্ডি... স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের চতুর্থ বা... সম্মেলন উপলক্ষে সম্প্রতি একাডেমির পরিবেশিত হোল শৈলেশ গুহনিয়ো...

নতুন শিল্পীর আলোছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিকল্পনা : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

কাল' নাটকটি। বীরু মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকের প্রযোজনায় শিল্পী-দের আন্তরিক নিষ্ঠার যথেষ্ট ছাপ আছে। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে সপ্রতিভ অভিনয় করেন বিজয় গোস্বামী, অমিয়কুমার শ্রীমানী, এ কে পাল, বিকাশ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ মাল্লা, রণজিৎ মহান্ত, মুকুন্দ নাগ, সুবোধ মাঝি, গীতা প্রধান ও গীতা কর্মকার।

নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

আতপুর জাগৃতি সংস্থার ছোট নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজক সংস্থা রূপে সম্মানিত হয়েছেন 'ইউনিট গোষ্ঠী'। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন 'বান্ধিক' ও 'শিল্পায়ন।' শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েছেন তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পায়ন), শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী: বেলা সরকার, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার: অমল চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ পরিচালক: আশীষ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নিখিল ভট্টাচার্য।

পরবেশের একাংকিকা অভিনয় প্রতি-যোগিতায় শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে 'বহুরূপী গোষ্ঠী' তাদের নাটকের নাম ছিল 'অলীকবাবু।' দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন যথাক্রমে 'লাকি গ্রুপ' (শেকল ছেঁড়ার গান) ও বিবর্তন (সোনালী স্বপ্ন)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা: সন্তোষ মিত্র (হিল্লোল), শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা: কৃষ্ণলাল সরকার (লাকি গ্রুপ)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী: নীলিমা কমল মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী: মণিমালা চক্রবর্তী (কোরাজন)। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার: দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (তমসো মা—), শ্রেষ্ঠ নির্দেশক: অনুপ দাস (ইউ সি আই এস), শ্রেষ্ঠ শিশু চরিত্রাভিনেতা: শ্রীমান অজয় (মনসাতলা বয়েজ কালচারাল ক্লাব)।

'শুভম গোষ্ঠী' পরিচালিত একাংক নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন নৈহাটির ওয়াই এম সি এ। এঁদের প্রযোজনা ছিল 'যাদুকর।' দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে শখের দল (ইশারা) বর্ধমান নটরাজ ইউনিট (অশান্দিক)। শ্রেষ্ঠ নির্দেশক : পরশুরাম মুখোপাধ্যায় (শখের দল), অভিনেতা : অজিত ঘোষ (নটরাজ ইউনিট)। ক্লাসিক থিয়েটারের ডলি মুখোপাধ্যায় হয়েছেন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার: সুশীল ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতা: ইন্দ্রজিৎ গুহ।

নিখিল ভারত আন্তর্ভাষা নাটক প্রতিযোগিতা

খড়গপুরস্থ 'নটনালয়' আয়োজিত নিখিল ভারত আন্তর্ভাষা নাটক প্রতিযোগিতা গেল ১৮ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে খড়গপুরের রবীন্দ্র ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগদান করেছিলেন ১৪টি নাট্য সংস্থা। অভিনীত হয়েছিল ৬টি বাংলা নাটক, ২টি হিন্দী, ২টি ওড়িয়া, ২টি তেলেগু, ১টি অসমীয়া এবং ১টি মারাঠি নাটক। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন প্রসংগে প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায় বলেন, একই মঞ্চে উপর্যুপরি কয়েক দিন ধরে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় নাটকের প্রতি-যোগিতামূলক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা একটি অভিনব প্রশংসনীয় উদ্যম। নাটকাভিনয় এমনই বস্তু যে, ভাষার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তা উপভোগ করা যায়—চরিত্র ও কাহিনী বুঝতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না। তাই বিভিন্ন ভাষার নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতা আমাদের জাতীয় সংহতির সহায়ক এবং সেই কারণেই 'নটনালয়ে'র এই প্রচেষ্টা সাধুবাদ পাবার যোগ্য। পাঁচ দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ করেছেন : বিদ্বান এস সূর্যপ্রকাশ রাও, কে ভাস্কর রাও, বীরেন ভঞ্জ এবং পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ :

প্রযোজনা—(১) অনামীর প্রতিচ্ছবি, (২) আঙ্গিক গোষ্ঠীর এই মন সেই মন, (৩) ললিতকলা সমিতির মারো মহেঞ্জোদড়ো (তেলেগু) এবং (৪) বাটানগর শতরূপার মহেশ।

অভিনেতা—(১) 'প্রতিচ্ছবি'তে সুনীল-বাবুর ভূমিকায় বিশু চট্টোপাধ্যায় এবং (২) 'মহেশ'-এ গফুরের ভূমিকায় ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়।

অভিনেত্রী—(১) 'প্রতিচ্ছবি'তে চাঁপার ভূমিকায় রাণু রায় এবং (২) 'এই মন সেই মনে' উভার ভূমিকায় ছবি তালুকদার।

হাস্যরসাভিনেতা — অসমীয়া নাটক 'উপপথ'-এ বাদলের ভূমিকায় রাণা তামুলে।

শিশুশিল্পী — মহেশ-এ আমিনার ভূমিকায় সঞ্চিতা চট্টোপাধ্যায়।

পরিচালক—নীলোৎপল দে (প্রতিচ্ছবি)

নাটক—রবীন ভট্টাচার্য (এই মন সেই মন)।

এ ছাড়াও এগারোজন শিল্পীকে এবং দু'জন শিল্প নির্দেশককে বিশেষ প্রশংসাপত্র দেবার সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতার পরে ২৩ মার্চ প্রাচ্য বাণীর শিল্পিগোষ্ঠী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী প্রণীত সংস্কৃত নাটক 'মেঘমেদুর-মেদিনীয়ম' অভিনয় করেন এবং তার পরে শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার মন্মথ রায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

এই নিখিল ভারত আন্তর্ভাষা নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্যে নটনালয়ের সাধারণ সম্পাদক এম ভি রমানারাও যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার তুলনা নেই।

মণ্ডভারতীর বার্ষিক উৎসব

ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কর্মিবৃন্দের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'মণ্ডভারতী'র দ্বাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে গেল ১৭ই মার্চ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। সম্পাদক শ্রীগুরুপদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্বাগত ভাষণে মণ্ডভারতীর বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য বিহারের জসিডি শহরে এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রচেষ্টায় মণ্ডভারতী হলিডে হোমের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। সভাপতি শ্রীবিশী মণ্ডভারতীর বিভিন্ন কর্মধারার প্রশংসা করেন। 'গভর্ণমেন্ট ইনসপেকটর' নাটকটি প্রসংগে বলেন যে, এই নাটকটি বিখ্যাত রুশ নাট্যকার 'গোগলের' লিখিত নাটকের অনুবাদ। ব্যঙ্গাত্মক এই নাটকে সমাজের এক বিশিষ্ট অংশকে উপলক্ষ্য করে তার দুর্নীতি এবং কদা-চারের উৎস উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে।

শ্রীভোলা দস্তের সার্থক পরিচালনায় এবং নিখুঁত দলগত অভিনয়-বৈশিষ্ট্যে নাটকটির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি দর্শককে মুগ্ধ রেখেছিল। অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিনয়-নৈপুণ্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ছিল। উল্লেখযোগ্য অভিনেতারা হলেন সর্বশ্রী শচীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (বলরামবাবু), তপন মিত্র (ম্যাজিস্ট্রেট), মিলন মুখোপাধ্যায় (ছদ্মবেশী গভর্নমেন্ট ইনসপেকটর), পাঁচু সেন (জজসাহেব)। অন্যান্য ভূমিকায় সার্থক রূপ দিয়েছেন সর্বশ্রী দিলীপ চট্টোপাধ্যায় (পোস্টমাস্টার), পরেশ দে (ছোটে রায়সাহেব), বিমলেন্দু রায় (হেডমাস্টার), কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় (ভৃত্য), যোগেন দত্ত (চিকিৎসাবিভাগের কর্তা), কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (দোকানদার) এবং সুভাষ দত্তগুপ্ত, হীরেন কোস প্রমুখ। স্ত্রীচরিত্রে ছিলেন, শ্রীমতী মায়া ঘোষ, দেবী চট্টোপাধ্যায় ও গীতা ভট্টাচার্য।

কৌতুক নাটক 'সুখের পায়রা'

গত ১৭ই মার্চ শুক্রবার কলামন্দিরে এস্টেট ম্যানেজার্স অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ আলো দাশগুপ্তের হাসির নাটক 'সুখের পায়রা' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

বিভিন্ন ভূমিকায় জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ঘোষ, শম্ভুনাথ দে, নীহারকুমার ঘোষ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। খুঁটিনাটি বাদ দিলে নাটকটি সামগ্রিকভাবে সার্থকতা লাভ করে। বিশেষ ভূমিকায় পরিচালক শ্রীশিবশেখর নস্কর মঞ্চাভিনয়ে বিশেষ কুশলতার পরিচয় রাখেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের নাট্যানুষ্ঠান

যথারীতি এবারও নতুন নাটক নিয়ে মঞ্চে আসছেন স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ। নাটকের নাম 'তথাস্তু'। নাট্যকার ও নির্দেশক অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়। অভিনয় হবে রঙমহলে, ৭ই এপ্রিল সাড়ে ছটায়। সমকালীন সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন তুলে ধরে 'তথাস্তু' প্রচুর হাসাবে, সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভাবাবেও। এবারের নাটকে পুরাতন শিল্পীরা ত আছেনই, তার সঙ্গে আছেন কলেজের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী যাঁরা বর্তমান নাট্য জগতে সুপরিচিত। 'তথাস্তু' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের চতুর্দশতম নাটক।

সর্বভারতীয় বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা

লখনউ বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতার নবম বৎসর উদ্‌যাপিত হল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহেমবতী নন্দন বহুগুণা গেল ৫ই ফেব্রুয়ারী উক্ত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। অন্যান্য বৎসরের মত এবৎসরও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লী প্রভৃতির বিভিন্ন বাঙালী নাট্যসংস্থাগুলি এই আঠেরদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সংস্থাগুলি অ-পেশাদারী হলেও কোনও কোনও দলের প্রযোজনা, পরিচালনা এবং অভিনয়প্রতিভা পেশাদার দলের চেয়ে কোনও অংশেই কম ছিল না। নাট্য প্রতিযোগিতার এই আয়োজন সবদিক দিয়ে সার্থকতা লাভ করে।

৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হয়ে ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হয় এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন বাংলা নাট্যজগতের পরম শ্রদ্ধেয় নাট্যকার এবং একাঙ্ক নাটকের জনক শ্রীমন্মথ রায়কে মানপত্র ও একটি শাল কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন বেঙ্গলী ক্লাব ও যুব সমিতি। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই মানপত্র ও উপহার শ্রীযুক্ত রায়ের হাতে অর্পণ করেন।

১। শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা—প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতিপুরস্কার এবং ৫০১৲ টাকা নগদ। 'অযান্ত্রিক'—চিত্তরঞ্জন প্রযোজিত—"গিনিপিগ" নাট্যাভিনয়ে।

২। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজ শোভারাণী ঘোষ স্মৃতিপুরস্কার ২৫১৲ টাকা নগদ। ইউনিটি থি কয়্যার"—হাওড়া প্রযোজিত "শতা পদাবলী" নাট্যাভিনয়ে।

৩। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—সুবোধ ব পাধ্যায় স্মৃতিপুরস্কার, শ্রীতুষার ভৌ "রসসভা"—কলিকাতা "বিপ্লবী ডিরো নাটকে ডিরোজিওর ভূমিকায়।

৪। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—কা বসু স্মৃতিপুরস্কার, শ্রীসুনীল ভট্টা "অযান্ত্রিক" চিত্তরঞ্জন 'গিনিপিগ' রাজার ভূমিকায়।

৫। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—যামিনী পাধ্যায় স্মৃতিপুরস্কার, শ্রীমতী সরকার—'দুর্মুখ' কল্যাণী 'রজনী নাটকে আশার ভূমিকায়।

৬। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—ি চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিপুরস্কার, শ্রীমতী গুহ—"ইউনিটি থিয়েটার কয় হাওড়া "শতাব্দীর পদাবলী" নাটকে মেয়ের ভূমিকায়।

৭। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—হরিনারায় ব পাধ্যায় স্মৃতিপুরস্কার, শ্রীসুভাষ 'রিক্রিয়েশন ক্লাব'—বারাসাত "সন্তানের আশীর্বাদ না অভিশাপ" না পরিচালনায়।

বিবিধ সংবাদ

"রামপ্রসাদ নাটকের সুবর্ণ জয়ন্তী"

সম্প্রতি বাগবাজারে শ্রীনীরোদবরণ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীকরুণাময়ী আশ্রমে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সুখ্যাত সৌখীন সংস্থা রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি তাঁদের সাংস্কৃতিক শাখার বিশেষ আলোড়ন-সৃষ্টিকারী মঞ্চসফল নাটক "রামপ্রসাদের" ৫০তম রজনীর সুবর্ণ জয়ন্তী মঞ্চস্থ করেন। নির্দেশনা, সুরসংযোজনা ও নামভূমিকায় ছিলেন প্রভাতকুমার ঘোষ। অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতিতে মণ্ডপে তিলধারনের জায়গাও ছিল না। দলগত ও ব্যক্তিগত চরিত্রগুলি সুঅভিনয়ের জন্যে নাটকটি বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হয়। ছদ্মবেশী মাকালীর ভূমিকায় কুমারী শর্মিষ্ঠা ঘোষের ও রামপ্রসাদের ভূমিকায় প্রভাত ঘোষের সুমধুর কণ্ঠের গানগুলি শ্রবণে ভক্তদর্শকমণ্ডলী বিমোহিত হয়ে পড়েন। রামপ্রসাদের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে সকলের মন জয় করে কুমারী কৃষ্ণা দাস। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন—দুর্গাচরণ মিত্র, শিবসুন্দর সিংহ, অনন্ত গোঁসাই—কালাচাঁদ ঘোষ, নরহরি—কানাইলাল ঘোষ, ভজহরি—দুলালচন্দ্র ঘোষ, নয়নচাঁদ—শি ভট্টাচার্য, আজুগোঁসাই—রাধিকা ম পাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বরী—রেণুকা ভৌমিক, কৃ চন্দ্র—শিবরঞ্জন ভট্টাচার্য। এছাড়া অভিনয়ে অংশ নেন আশীষ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ ঘো সত্যেন অধিকারী, তারক ঘোষ এ রামপ্রসাদের কন্যা জগদীশ্বরীর ভূমিকা সাত বছরের ছোট মেয়ে কুমকুম ঘোষের সুমধুর গীতে ও অভিনয়ে দর্শকবৃন্দে হৃদয় জয় করেন। যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা করেন নলিনীকান্ত করণ।

বিচিত্রানুষ্ঠান

সম্প্রতি শ্রীরামপুরের মাসিক 'পল্ল পত্রিকার প্রথম বার্ষিক বিচিত্রানুষ্ঠা শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয় সম্পাদক ত্রিদিব ঘোষরায়, সভাপতি স্বরা মুখোপাধ্যায়, প্রধান সাহিত্য সচিব রঞ্জি বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁদের নিজ নি বক্তব্য রাখেন, তারপর শুরু হ বিচিত্রানুষ্ঠান। অংশগ্রহণ করেন চিন চট্টোপাধ্যায়, আইভিলতা বন্দ্যোপাধ্য সুমিত্রা সেন, মাঃ অরিন্দম, শুভেন্দু দা গুপ্ত প্রমুখ। বিচিত্রা অনুষ্ঠানটি সর্বা

দিয়ে সার্থক ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক সুশান্ত অধিকারী, তপনকুমার গোস্বামী, নিত্যরঞ্জন ঘোষরায়, মঞ্জুরাণী দে ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

নাট্য সাংবাদিকদের বিচার

নাট্য সাংবাদিক ও সঙ্গীত সমালোচকদের বিচারে ১৯৭১ সালের শ্রেষ্ঠ নাটক, যাত্রা ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাঁরা 'দিশারী অ্যাওয়ার্ড' পাবেন তাঁদের নাম দিশারীর পক্ষ থেকে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের সারা বছরে কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত ও অনুষ্ঠিত পেশাদার নাটক, অপেশাদার নাটক, পেশাদার যাত্রা ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের বিবিধ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দরুন এই পুরস্কার বছরে একবার দেওয়া হয়ে থাকে।

বাটানগরে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য :

বাটানগর, ৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সৌজন্যে উক্ত ক্লাব হলে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হবে। সঙ্গীত পরিচালনায়—বিপুল ঘোষ। সহকারী নৃত্য পরিচালনায়—কৃষ্ণা রায় ও স্বপ্না সেনগুপ্তা। উদ্বোধন করবেন—নমিতা ঘোষ।

শিক্ষামূলক শিশু চলচ্চিত্রোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গেল রবিবার, ২৬ মার্চ সকাল দশটায় স্থানীয় গ্লোব সিনেমা গৃহে ইনস্টিটিউট অব চিলড্রেন্স ফিল্মের উদ্যোগে পূর্ব ভারতে যে মাসাধিক স্থায়ী শিক্ষামূলক শিশু চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তারই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ফিল্ম সোসাইটিগুলির সর্বভারতীয় সম্মেলন

গেল ২৬ ও ২৭ মার্চ ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টার গৃহে ভারতে অবস্থিত ফিল্ম সোসাইটিগুলির একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন এবং ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়ার সাধারণ পরিষদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে প্রথম দিন কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং দ্বিতীয় দিনে সত্তর দশকে ভারতে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন সম্পর্কে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল।

পরলোকে মঞ্চের নেপথ্যকর্মী রামচরণ সিং

৬৫ বৎসরাধিককাল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের নিরলস সেবার পর বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সম্ভবত প্রাচীনতম মঞ্চকর্মী রামচরণ সিং সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, বিনোদিনী, তিনকড়ি, অমৃতলাল, দানীবাবু, শিশিরকুমার প্রভৃতি প্রথিতযশা শিল্পিবৃন্দের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ সেবাকর্ম ও সদা-হাস্যময় মুখ তাঁর স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রাখবে। তাঁর শেষ কর্মস্থল ছিল বিশ্বরূপা থিয়েটার।

দেবপাড়া ক্লাবের নাট্যাভিনয় — বানারহাটে (জলপাইগুড়ি) গত ১৮ই, ১৯শে মার্চ 'দেবপাড়া ক্লাবের' সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে পর পর দু দিন শ্রীউৎপলেন্দু সেনের 'সিন্ধু গৌরব এবং শ্রীশৈলেশ গুহ-নিয়োগীর 'ক্লান্ত রূপকার' নাটক দুটি অভিনীত হয়ে গেল। প্রযোজনা করেন শ্রীশান্তি চক্রবর্তী এবং শ্রীঅজিত মুস্তাফী। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেন কালীপ্রসাদ দত্ত, রাম ঘোষ, হরিবন্ধু ভট্টাচার্য, কাজল ব্যানার্জি, বিনয় চক্রবর্তী, দুর্গা বসু, শ্যামলী বসু, কৃষ্ণা বসু এবং আরো অনেকে।

১৯শে মার্চ বানারহাট বাজারে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সত্ত্বেও যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছে এবং নাট্যাভিনয় হয়েছিল সব দিক দিয়ে সার্থক।

চেনা-অচেনার উৎসব—নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের পৌরোহিত্যে চেনা-অচেনার যুগ পদার্পণ উৎসব আসছে ৩১শে মার্চ মুক্ত অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে সকাল সাড়ে নটায় অনুষ্ঠিত হবে। নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূ দেবী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন এবং সংস্থার পক্ষ থেকে প্রখ্যাত নট শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বর্ধনা জানানো হবে। অনুষ্ঠান শেষে সংস্থার সভ্যরা 'ঝরা ফুলের মালা' (একাঙ্ক) নাটক পরিবেশন করবেন।

'সপ্তক'-এর সঙ্গীত সম্মেলন

২৪ পরগণার (দক্ষিণ) সুখ্যাত সঙ্গীত সংস্থা 'সপ্তক'-এর পঞ্চম বার্ষিক 'সঙ্গীত সম্মেলন' আগামী ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল জয়নগর-মজিলপুর 'বাসন্তী নাট্য মন্দিরে' (রূপ ও অরূপ মঞ্চে) যথাক্রমে ৫টায় ও রাত্রি ৮-৩০ মিঃ লঘু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সভ্য, শিল্পী ও বেতার-শিল্পী গীতশ্রী শুক্লা মুখোপাধ্যায়, ইউসুফ আলি খাঁ, মায়া বসু, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নৃত্যশিল্পী সুমিতা ঘোষ, পণ্ডিত নানকু মহারাজ, বাচ্চালাল মিশ্র এবং আরো অনেকে অংশ গ্রহণ করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কারও বিতরণ করা হবে।

কলামন্দিরে ইন্দ্রজাল

যাদুকর জুনিয়ার পি সি সরকার সম্পন্ন করে কিছুদিন হলো দেশে ফিরেছেন। জাপানে তাঁর পিতার অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান জাপানে তাঁর ইন্দ্রজালের—বিশেষ প্রশংসা হয়েছে। শ্রীসরকার বর্তমান কলামন্দিরে তাঁর ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছেন। জুনিয়ার পি সি সরকার যে যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র তা তাঁর কলামন্দিরের অনুষ্ঠানই প্রমাণ করে। এই মঞ্চে প্রত্যহ সন্ধ্যায় জুনিয়ার সরকার অনন্য যাদুর খেলা পরিবেশন করছেন, যার প্রত্যেকটি খেলাই রুদ্ধশ্বাস এবং আগ্রহের সঙ্গে দেখতে হয়। ইন্দ্রজালের বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহ-সংগীত, রকমারী জমকালো দৃশ্য-সজ্জা ও সহকারীদের সাজসজ্জা দর্শকদের যেন ম্যাজিকের এক রহস্যময় নাটকের জগতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বর্তমান ইন্দ্রজাল পরিবেশনায় পরিচিত খেলা আছে অনেক। যেমন তার পিতার কয়েকটি প্রিয় খেলা। এছাড়াও অনেক নতুন খেলাও তিনি যোগ করেছেন অনুষ্ঠানসূচীতে। বিশেষ করে ইলাস্টিক নারীদেহ, মৃত রাজকুমারীর দেহ শূন্যে তোলা ও পরে অদৃশ্য করে দেওয়া, রকেট বা স্পুটনিকের খেলা, নবসংস্করণ ইত্যাদি। ইন্দ্রজালে আবার কৌতুক নকসা দ্বারাও সমৃদ্ধ—যার জন্য সমস্ত কিছু মিলিয়ে এই তরুণ প্রতিভাধর যাদু-শিল্পীকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাবেন দর্শক।

জানা গেল প্রদীপ সরকার আবার বিদেশে যাচ্ছেন একটানা ছয় বৎসরের জন্য। কোরিয়া এবং বিদেশের অনেক জায়গায় তাঁকে পুরো ছয় বৎসর ইন্দ্রজাল দেখাতে হবে। তবে তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষে তাঁর অনুরাগী দর্শকদের ভুলবেন না। যখনই সুযোগ পাবেন তখনই দেশে চলে আসবেন অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্যও। ইতিমধ্যে প্রদীপ সরকার ভারতীয় জওয়ানদের জন্য ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী করছেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর হাতে অর্পণ করেছেন। আরও জানা গেল আগামী ৩১ তারিখে তিনি আবার ভারতীয় জওয়ানদের জন্য আর একটি শো করছেন কলামন্দিরে।

ঢাকুরিয়া সান্ধ্য মজলিসের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৮ই মার্চ ঢাকুরিয়া সান্ধ্য মজলিসের সভ্যগণ রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়াম ভবনে তাঁদের একাদশ বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন উদযাপন করেন।

অনুষ্ঠানে সভ্যগণ মঞ্চস্থ করেন শ্রীশচীন ভট্টাচার্যের 'সোনার হরিণ'। শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নাটকটি বিশেষ সাফল্যসহকারে অভিনীত হয় ও উপস্থিত দশকগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী অনিল চট্টোপাধ্যায় (অভিজিৎ), দক্ষিণা ঘোষাল (শেখর), নন্দ মুখোপাধ্যায় (চাণক্য), শচীন ঘোষ (ইন্দ্রজিত), সুশীল নাথ (মধু), সুশীল দত্ত (ভবনাী), অনিল বসু (গোকুল), প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (জয়ন্ত) ও শ্রীমতী রত্না গোস্বামী (শ্বেতা)।

সভ্যগণ কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

খেলাধূলা

দর্শক

রঞ্জি ট্রফি

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় বাংলা ৮ উইকেটে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। তাদের এই সেমি-ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী হবে পাঞ্জাব অথবা হায়দরাবাদ।

মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক চান্দু বোরদে টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। চা-পানের ৩৬ মিনিট পর মাত্র ১৩৬ রানের মাথায় মহারাষ্ট্রের ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। মহারাষ্ট্রের এই হাঁড়ির হাল করেছিলেন পেসবোলার সমর চক্রবর্তী। তিনি ১৬ রানে ৪টে উইকেট নিয়েছিলেন। মাত্র ১৩ রান তুলতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের ৪টে উইকেট পড়ে যায়। এর মধ্যে সমর চক্রবর্তী একাই নিয়েছিলেন ৩টে উইকেট। খেলার এক সময় তাঁর বোলিংয়ের পরিসংখ্যান ছিল : ওভার ৭, মেডেন ৩, রান ৭ এবং উইকেট ৩।

প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় বাংলা প্রথম ইনিংসের সমস্ত উইকেট হাতে জমা রেখে ২৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংসের খেলায় রান দাঁড়ায় ২৫৩, ৫ উইকেটের বিনিময়ে। ফলে বাংলা ১১৭ রানে এগিয়ে যায়। বাংলার প্রারম্ভিক খেলোয়াড় গোপাল বসু ১২৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। এখানে উল্লেখ্য, রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী এবং প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর এই সর্বোচ্চ রান।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের কিছু আগে বাংলার প্রথম ইনিংস ৩২৮ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৯২ রানে এগিয়ে যায়। বাংলা যেখানে প্রথম পাঁচটা উইকেটে ২৫৩ রান তুলেছিল, সেখানে শেষ পাঁচ উইকেটে যোগ করেছিল মাত্র ৭৫ রান। দলের ২১৪ রানের মাথায় গোপাল বোস ১৪১ রান করে বিদায় নেন। তাঁর এই ১৪১ রানে ছিল ২০টা বাউণ্ডারী। দীপঙ্কর সরকারের নট-আউট ৩৬ রানও উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় মহারাষ্ট্র তাদের ২য় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করে। চেতন চৌহান ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিনে মহারাষ্ট্রের ২য় ইনিংস ২২৫ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা ২ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৪ রান তুলে ৮ উইকেটে জয়ী হয়। লাঞ্চের পর আধ ঘন্টা খেলা হয়েছিল। চতুর্থ দিনের খেলার এক সময় বাংলার ইনিংস জয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এক সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল মহারাষ্ট্রের ৫টা উইকেটের বিনিময়ে ১৪৫ রান উঠেছে। তারপর মাত্র ৫ রান তুলতে গিয়েই আরও ৩টে উইকেট পড়ে যায়। তখন মহারাষ্ট্রের খুবই শোচনীয় অবস্থা—৮টা উইকেট পড়ে ১৫০ রান। এই সংকটকালে শেষ পর্যন্ত ৯ম উইকেটের জুটি আনোয়ার শেখ (৪১ রান) এবং গোরে (৩৫ নট আউট) দলের অতি মূল্যবান রান সংগ্রহ করে দলকে ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মহারাষ্ট্র : ১৩৬ রান (যাজুবেন্দ্র সিং ২৭ রান। সমর চক্রবর্তী ১৬ রানে ৪ এবং সুব্রত গুহ ৪৫ রানে ৩ উইকেট)
ও ২২৫ রান (চেতন চৌহান ৫৬, আনওয়ার শেখ ৪১ এবং ভি গোরে ৩৫ নট আউট। সমর চক্রবর্তী ৬৯ রানে ৩ এবং দিলীপ দোসী ৬৭ রানে ৫ উইকেট)

বাংলা : ৩২৮ রান (গোপাল বোস ১৪১, চুণী গোস্বামী ৩৮ এবং দীপঙ্কর সরকার নট আউট ৩৬ রান। আনোয়ার শেখ ৫৮ রানে ৪ এবং সালগাওকার ৯১ রানে ৩ উইকেট)
ও ৩৪ রান (২ উইকেটে)

রুডি হার্টোনো

রঞ্জি ট্রফির চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার মধ্যে তিনটি খেলা শেষ হয়েছে। বোম্বাই এক ইনিংস ও ১৩ রানে বিহারকে, মহীশূর ৩১৪ রানে রাজস্থানকে এবং বাংলা ৮ উইকেটে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। পাঞ্জাব বনাম হায়দরাবাদের কোয়ার্টার ফাইনাল এবং বোম্বাই বনাম মহীশূরের সেমি-ফাইনাল খেলা ৩১শে মার্চ থেকে শুরু হবে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে বাংলার বিপক্ষে খেলবে পাঞ্জাব বনাম হায়দরাবাদের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার বিজয়ী দল।

সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক্স

মাদ্রাজে আয়োজিত ১০ম অল-ইন্ডিয়া ওপেন অ্যাথলেটিকস মিট' অনুষ্ঠানে সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগে এবং রেলওয়ে দল মহিলা বিভাগে দলগত খেতাব লাভ করেছে।

মহীশূরের কুমারী নির্মলা উথাইয়া ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় এবং সার্ভিসেস দলের সুচা সিং ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান পাওয়ার সূত্রে 'ডাবল' খেতাব লাভ করেন।

দলগত চ্যাম্পিয়নসীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (৮৫ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (৪৬ পয়েন্ট) এবং ৩য় স্টীল প্ল্যান্টস (৪০ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম রেলওয়ে (৬১ পয়েন্ট), ২য় মহীশূর (২৮ পয়েন্ট) এবং ৩য় তামিলনাড়ু (১৮ পয়েন্ট)

অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক ৬২তম অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার ২২ বছরের খেলোয়াড় রুডি হার্টোনো পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯৬৮-৭২) খেতাব লাভের গৌরব অর্জন করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর আগে এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে উপর্যুপরি পাঁচবার সিঙ্গলস খেতাব জয় করেছেন মাত্র একজন খেলোয়াড়—আয়ারল্যান্ডের ফ্রাঙ্ক ডেভলিন, ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরী

গত ২৯ নভেম্বর (২৯ সংখ্যা) 'অমৃত' পত্রিকায় পত্রলেখক শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় গতবার ২৫ অক্টোবর (২৫ সংখ্যা) সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরি' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করে যে ভাষায় প্রশংসা করেছেন, তাতে সত্যিই উৎসাহিত বোধ করছি। তাঁর অভিনন্দন আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সংগে গ্রহণ করলাম। ধন্যবাদ।

তাঁর পাঁচটি প্রশ্ন ঐ পত্রটিতে আছে। প্রশ্নগুলি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত সন্দেহ নেই—তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি এতই বেশী যে, অল্প কথায় তার উত্তর দেওয়া খুবই মুশকিল। তবে যেহেতু প্রশ্নগুলি ও তার উত্তর ভবিষ্যতের গবেষণার কাজে খুবই প্রয়োজনীয় হতে পারে বলে মনে হয়, সেহেতু সংক্ষেপে যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

প্রথম প্রশ্ন—'দাম্ভিক, স্বাতন্ত্র্য-অভিমানী অভিজাত শ্রেষ্ঠ' এই বিশেষণটি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে ব্যবহার করেছি অহেতুক কারণে নয়। সামাজিক মর্যাদায়, কর্মক্ষেত্রে ও সাহিত্যজগতে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যিই সম্রাটের আসনে আসীন ছিলেন আজীবন। এমনকি মৃত্যুও তাঁকে এই সম্রাটের আসন থেকে টলাতে পারেনি। তাঁর আভিজাত্যের নিদর্শন ও স্বাতন্ত্র্যের রেখা কিন্তু নিশ্চিত সীমারেখার পরিচয় দিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ 'সারস্বত সমাজে' যেদিন প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখলেন তখন তাঁর মনের ভাব কেমন হয়েছিল তার অমর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই শুনুন—"সেই ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে একজনকে দেখিলাম—তিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাহাকে অন্য পাঁচজনের সংগে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না।......বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন। কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার কিছুমাত্র গা ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না। এইটাই সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল।...তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজ-তিলক পরানো ছিল।"

সাহিত্য-সম্রাট যে অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন (নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে!) এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্রও নেই। সে যুগের মনীষি বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ঘাঁটিয়ে পড়লে একথা সহজেই জানা যাবে। বহু উদাহরণই তো দেওয়া যায়, বাহুল্য বোধে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সুদূর পূর্ববংগ থেকে তাঁর কাছে এসেছিলেন সাহিত্য-সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন আলোচনা করতে। সাহিত্যসম্রাট, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে এ আলোচনার যোগ্য মনে করলেন না। যতবারই দীনেশচন্দ্র আলোচনা উত্থাপন করতে যান, তৎক্ষণাৎ সাহিত্যসম্রাট ধান-চাল, আলু-পটলের আলোচনা আরম্ভ করেন। বারবার চেষ্টা করে—ব্যর্থ মনোরথ বিমর্ষ দীনেশচন্দ্র সাহিত্যসম্রাটকে প্রণাম করে চলে যেতে গেলে, সে প্রণামও সাহিত্যসম্রাট গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছিলেন, আপনি মনে মনে আমার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছেন—এই প্রণামের তবে মূল্য কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—রেভারেণ্ড আলেক্স টমরি এক অতি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। এঁর সম্বন্ধে একটি পূর্ণাংগ প্রবন্ধ শীঘ্রই পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করার ইচ্ছে রাখি। যাই হোক—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় রেভারণ্ড আলেক্স টমরি বংগ-ভংগের বিরুদ্ধে ছিলেন। বংগ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি দৃঢ় আস্থাবান ছিলেন। বাঙালীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগে তিনি নিজেকে জড়িয়ে দিয়েছিলেন একাত্মভাবে। বংগ-ভংগের বিরুদ্ধে বহু বহু প্রতিবাদ সভায় রেভারেণ্ড টমরিকে উপস্থিত থাকতে দেখা যেত। চৈতন্য লাইব্রেরির সংগে যুক্ত অন্যান্য শ্বেতাংগদের মধ্যে কুখ্যাত সংবাদপত্র "এম্পায়ার" সম্পাদক এ. এফ থেসার ব্রেয়ার, ষ্টেটসম্যান সম্পাদক জে. এ. জোন্স প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিনস, বিচারপতি স্টেপান, বিচারপতি ব্যাম্পফিল্ড, স্যার এস কে ব্যাটরিক, স্যার সি জি অ্যালেন আই সি এস, বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড এ্যালেন, বিচারপতি স্যার নরিস প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতিমান ব্যক্তিরা বংগভংগের স্বপক্ষে ছিলেন ঘোরতর। বংগভংগ আন্দোলনকে এঁরা মনে করতেন "কিছু হঠকারী ব্যক্তির পাগলামী"। অবশ্য মহামতি রেভারেণ্ড আর্কুহার্ট, টমরি সাহেবের মতই বংগভংগের বিরুদ্ধে ছিলেন।

তৃতীয় প্রশ্ন—'অমৃতে যে হ্যাণ্ডবিলটি ছাপানো হয়েছে, স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধটি পাঠ করার ঘোষণা জানিয়ে তার বিবরণ সত্যিই চিত্তাকর্ষক। আমরা জানি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর (১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১০) ক্যালকাটা গেজেটে বংগদেশ দ্বিখণ্ডিত করার সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই তীব্র গণ-আন্দোলন ও প্রতিবাদের ঢেউ সমগ্র বংগভূমিকেই প্লাবিত করে দিতে থাকে। ভারত গভর্ণমেন্টের ইস্তাহার অনুযায়ী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন ১৩১২) বংগচ্ছেদ ঘোষিত হল। এরই ফাঁকে অনুষ্ঠিত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই (৭ই শ্রাবণ ১৩১১) রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' পাঠ। সভাপতি শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। সমগ্র বংগদেশে এই সভাটিকে উপলক্ষ করে যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তার তুলনা পাওয়া ভার। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে দুপুর একটা থেকেই কাতারে কাতারে লোক বিডন স্ট্রীটে জমায়েত হতে থাকে। সভা আরম্ভের চেষ্টা হয় নির্দিষ্ট সময়ানুসারে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। তিনটের মধ্যেই সমগ্র মিনার্ভা থিয়েটারের দর্শক আসন পূর্ণ হয়ে যায়—বাইরে কিন্তু ভিড়ের চাপ ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। চৈতন্য লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ অতিকষ্টে রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র ও স্যার গুরুদাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভাকক্ষে আনতে সক্ষম হলেন। কিন্তু সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাইরের দর্শকদের বিপুল চাপে মিনার্ভা থিয়েটারের প্রধান দরজাটি ভেংগে পড়ে। দ্বাররক্ষী ও স্থানীয় পুলিশদের সংগে দর্শকের বচসা চলতে থাকে। ইংরাজ সরকার গোড়া থেকেই এই সভাটির প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন, এবার সুযোগ বুঝে দলে দলে ঘোড়সওয়ার পুলিশ মিনার্ভা থিয়েটারের চারদিক ঘিরে ফেলে ও যথেচ্ছ লাঠি চালায়। সে যুগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণসমাজ ঐ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও ঘোড়সওয়ার পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না। পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় উল্লাসকর দত্ত (যিনি কালাপানী আন্দামানে ব্রিটিশের অকথ্য নির্যাতনে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান) সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন পুলিশের লাঠিতে। এত কাণ্ডের পরও সভা কিন্তু পণ্ড হয় নি—প্রায় সাতটা নাগাদ গোলমাল থামলে সভা সুরু হয়। দীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়তে রবীন্দ্রনাথের আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। বিশাল জনমণ্ডলী অধীর আগ্রহে শেষ কথাটি না শোনা পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করে নি। দর্শকদের বিশেষ অনুরোধে ন'দিন পরে ৩১শে জুলাই (১৬ই শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধটি মিনার্ভা থিয়েটারে পুনরায় পাঠ করেন।

চতুর্থ প্রশ্ন—বিশুদ্ধ কবিতা পাঠের আসর (বা কবি সম্মেলন) বলতে যা আমরা বুঝি তা চৈতন্য লাইব্রেরিতে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নি। এর কারণ অনুমান করা যেতে পারে—এ প্রথার সে যুগে চলন ছিল না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ পাঠশেষে বহু কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের তৃপ্তি দিয়েছেন বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে অনুষ্ঠানগুলি মুখ্যত ছিল প্রবন্ধ পাঠেরই, কবিতা পাঠের নয়। জনশ্রুতি এই যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘরোয়াভাবে তাঁর দশটি কবিতা চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করেছিলেন। কিন্তু নথিপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এসম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তথ্যটি ভুল বলেই মনে হয়।

পঞ্চম প্রশ্ন—সমস্ত পুরাতন ফাইল ও নথিপত্র তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছি।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় স্বামীজীর সংগে চৈতন্য লাইব্রেরির কোন সংযোগ তো ছিলই না, এমনকি চৈতন্য লাইব্রেরির কোন বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠও করেন নি। আজ অনেকের মনেই এই প্রশ্নটি বিস্ময়ের সংগে জাগবে যে তিনি শিকাগোর ধর্ম-সম্মেলনে হিন্দু-ধর্মের পুনরুজ্জীবনের গৌরবময় পতাকা তুলে এলেন—সমগ্র বিশ্বে জাগালেন বিপুল আলোড়ন, দেশে ফিরে আসার পর চৈতন্য লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন না কেন।

উত্তরটি কিন্তু সহজ। চৈতন্য লাইব্রেরি আয়োজিত কোন সভায় যে-কোন ধর্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। খৃষ্ট ধর্মপ্রচারক মিশনারী, গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া ব্রাহ্ম—অনেকেই এই লাইব্রেরির সংগে যুক্ত ছিলেন, এত সভা অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা কাউকেই করতে দেওয়া হয় নি। স্বামীজীর পক্ষে তাই চৈতন্য লাইব্রেরির কোন বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা দান বা প্রবন্ধ পাঠের অবকাশ ঘটে নি।

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা-৬।

'বংগদর্শন'-এর শতবর্ষ পূর্তি প্রসংগে

১৯৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম সার্থক জাতীয়তাবাদী সাময়িকপত্র 'বঙ্গদর্শনে'র শতবর্ষ-পূর্তি ঘটবে। আমরা আজকাল তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েরও স্মৃতি উৎসব পালন করে থাকি। সেই ক্ষেত্রে এই পত্রিকার শতবর্ষ-পূর্তি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটি গৌরবময় ঘটনা এবং এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে দেশের জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিগণ উদ্যোগী হবেন এই আশা করি।

বাঙ্গালীর পক্ষে এই স্মৃতি অনুষ্ঠান আজকের দিনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। বাঙ্গালীর নতুন করে জীবনদর্শন ঘটেছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর'এর মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমচরিত রচনা করতে গিয়ে একটি কথা বলেছিলেন। সেই কথাটিই বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সর্বকালে সত্য যে, তিনি বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাতে হাত দিয়েছেন সবই চলেছে অনাথায় সবই অচল। সেই বঙ্কিমেরই অন্যতম প্রয়াসের ফল এই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। সুতরাং ঐ পত্রিকার শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবকে রমণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে বাংলাভাষা এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই সচেষ্ট হোতে অনুরোধ জানাই।

নির্মল মিত্র,
নববারাকপুর,
২৪ পরগণা।

জাতীয় বংগ রংগমঞ্চের জন্ম

৪৮ খণ্ড, ৩৯শ সংখ্যার 'অমৃতে' শ্রীপ্রথিত রায়চৌধুরীর একটি সুন্দর প্রবন্ধ 'জাতীয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জন্ম' পাঠকদের উপহার দেবার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। সময়োচিত এই প্রবন্ধে কয়েকটি তথ্য সঠিক কিনা সে সম্বন্ধে শ্রীরায়চৌধুরী ও অন্যান্য নাট্যামোদী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণার্থে এই চিঠি লিখছি।

উক্ত প্রবন্ধে শ্রীরায়চৌধুরী লিখছেন, যে চারআনা, আটআনা, এক টাকা বা দু' টাকার টিকিট কিনলেই...' আর এক জায়গায় লিখছেন 'ধর কোম্পানির গ্যাসের আলোয় জায়গাটা ঝলমল করছে।... উচ্ছ্বাসভরে উনি উপরোক্ত কথাগুলি লিখেছেন কিনা জানি না, কারণ ১৮৭২, ১৯শে নভেম্বর 'সুলভ সমাচারের' বিজ্ঞাপনে দেখছি টিকিটের মূল্য প্রথম শ্রেণী এক টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী আটআনা। আর ৭২ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের 'এডুকেশন গেজেটে' দেখতে পাই গেটের ২ পাশে ও ফুটপাথের আলোই একমাত্র ভরসা এবং আলোর স্বল্পতাহেতু দর্শকদের সেদিন খুব অসুবিধে হয়েছিল।

এছাড়া আরও কয়েকটি তথ্য যার বিশদ প্রমাণ ও আলোচনা চিঠির এই স্বল্প-পরিসরে সম্ভব নয়, তবুও সংক্ষেপে সারছি।

শ্রীরায়চৌধুরী 'নবীন বসুর বিদ্যাসুন্দর' সাল নির্দেশ করেছেন ১৮৩১। কিন্তু 'কলকাতা কালচার' ও 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' বলছে সালটা ১৮৩৫, ৬ই অক্টোবর। ১৮৩৫ ২২শে অক্টোবরের 'হিন্দু পায়োনীয়ারেও' তার প্রমাণ আছে।

এবার যে তথ্যটির কথা বলব তা লীলাবতী অভিনয়ের তারিখ, দলের নাম প্রভৃতি। প্রাসিতবাবু লিখছেন যে 'বাগবাজারে অ্যামেচার থিয়েটারের নাম বদলে দি ক্যালকাটা ন্যাশান্যাল থিয়েটার রাখা হয় এবং তাঁরা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লীলাবতী অভিনয় করেন।'

প্রথমতঃ লীলাবতীর অভিনয়ের সময় দলের নাম ছিল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। বংগীয় নাট্যশালার ইতিহাসে তার উল্লেখ তো আছেই, এমনকি ১২৭৯ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবারের সাপ্তাহিক 'মধ্যস্থ'তে আছে—'বিগত শনিবার রজনীযোগে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ কর্তৃক প্রসিদ্ধ লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়াছে—'। ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ প্রকৃতপক্ষে 'নীলদর্পন' মহলার সময় হয় এবং এই নামকরণ নিয়েই গিরিশচন্দ্রের সংগে অন্যান্যদের মতান্তর ঘটায় তিনি দলত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচুড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর' পুস্তিকায় এবিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এছাড়া বিনয় ঘোষের কলকাতা কালচার, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের পাতায় এর প্রমাণ আছে এবং ১৮৭২ ২০শে নভেম্বরের 'ইংলিশ ম্যানেও' একথা পাওয়া যায়। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের নামকরণ নিয়ে নানারকম মতদ্বৈধতা আছে, এমন কি স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর পরবর্তীকালে দুজনে দুরকম কথা লিখলেও সে সমস্যার সুন্দর সমাধান করেছেন, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে।

দ্বিতীয়তঃ—লীলাবতীর অভিনয় ১৮৭২এর জুলাই মাসে নয়, ১৮৭২, ১১ই মে (৩০শে বৈশাখ ১২৭৯)। ঐ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠের 'মধ্যস্থ'তে তা দ্রষ্টব্য।

প্রবীর মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-২৬।

(২)

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীপ্রাসিত রায়চৌধুরীর 'জাতীয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জন্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে আমার মনে এক প্রশ্ন জেগেছে। প্রশ্নটি এই, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ সাধারণ রংগালয়ের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা দিবসে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র কি জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীতে 'নীল-দর্পণ' নাটকের দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন? শ্রীরায়চৌধুরীর রচনা পড়ে মনে হল, উনি তাই বলতে চেয়েছেন। প্রাসিতবাবু লিখছেনঃ—"...বাংলাদেশের 'জাতীয় নাট্য-শালার' আজ দোর খুলছে।......নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। দুঃখ করে বললেন—উড সাহেবের ভূমিকায় গিরিশ থাকলে কি ভালই না হত।..." লেখক এই তথ্যটি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, জানতে ইচ্ছা করি। আমার যতদূর পড়াশুনা তাতে, মনে পড়ছে অর্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিতর্পণের সময় গিরিশচন্দ্র বলেছিলেনঃ—"'নীলদর্পণ' দেখিয়া গিয়া দীনবন্ধুবাবু স্বয়ং আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের সিরিয়াস পার্ট অ্যাক্টর যোগদান করে নাই।'" (নট চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী) গিরিশচন্দ্রের ভাষণে প্রথম অভিনয় রাত্রে (৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২) দীনবন্ধুর উপস্থিতির কথা উল্লেখ নেই। অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, রাধামাধব কর প্রমুখ সমকালীন নাট্যরথীদের কারো স্মৃতিচারণে এমন সংবাদ আমার চোখে পড়ে নি। সেক্ষেত্রে ওরকম একটি ঐতিহাসিক মন্তব্যের উৎস জানার আগ্রহ আমার পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীরায়চৌধুরী অথবা অপর কেউ এসম্পর্কে আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

শিশির বসু, কাঁচরাপাড়া

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষান্মাষিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষান্মাষিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৮ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

FRIDAY 7th APRIL, 1972 শুক্রবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৭৮ **.52 Paise**

এক নজরে

মৃত্যুদণ্ড ও মার্কিন জনমত : কয়েক সপ্তাহ আগে লেখা হয়েছিল, ক্যালিফোর্নিয়ার হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডকে সংবিধান-বিরোধী ব'লে ঘোষণা করায় সেখানকার পাঁচশতাধিক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার পর নিউ জার্সি রাজ্যের হাইকোর্টও মৃত্যুদণ্ডকে সংবিধান বিরোধী ব'লে ঘোষণা করেন। স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে মার্কিন জনমত আর একবার যাচাই ক'রে দেখার তাগিদ অনুভব করেন 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর ডাইরেক্টর জর্জ গ্যালাপ—যাঁর বিভিন্ন সময়ের সুনিপুণ নমুনা সমীক্ষায় জনমতের আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটতে দেখা গেছে এবং যে কারণে নমুনা সমীক্ষার নামই হয়ে গেছে 'গ্যালাপ পোল।' ইতিমধ্যে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের আর এক রাজ্য টেকসাস-এর সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত মৃত্যুদণ্ড সংবিধান-বিরোধী নয় ব'লে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু টেকসাস রাজ্যের রায় গ্যালাপ আয়োজিত নমুনা সমীক্ষার ভোট গ্রহণের পর প্রকাশিত হয়।

নমুনা সমীক্ষার যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তা কিন্তু মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে মার্কিন জনমতের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়নি। দেখা গেছে যে, এ ব্যাপারে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত মার্কিন জনমত প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। ১৯৫৩ সালের সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৬৮ জন মৃত্যুদণ্ডের সমর্থক; ঐ সংখ্যা ১৯৬৬ সালে সর্বাধিক হ্রাস পেয়ে হয় ৪২ শতাংশ, কিন্তু তারপর থেকে আবার মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে মার্কিন জনমত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এ ব্যাপারে আবার জনমত নিয়ে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ লোক হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডের সমর্থক। এবারও সারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন শ স্থানের ১৮ বছরের বেশি বয়সের ও বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের ও রাজনৈতিক মতবাদের যে ১৫৬৭ জন নরনারীর মতামত নেওয়া হয়—তার মধ্যে শতকরা ৫০ জন হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেছেন, শতকরা ৪১ জন বিরোধিতা করেছেন এবং শতকরা নয়জন বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের কোন সুনিশ্চিত মত নেই। তাঁদের সম্মুখে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল—আপনি কি হত্যাপরাধীর মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেন?

মোট সমর্থক ও বিরোধীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫০ ও ৪১ শতাংশ হলেও এ ব্যাপারে সমাজের বিভিন্ন অংশের মতামত কিন্তু একই রকম নয়। যেমন, পুরুষদের মধ্যে সমর্থক ও বিরোধীর সংখ্যা, শতকরা হিসাবে, যথাক্রমে ৫৫ ও ৩৯ হলেও, নারীদের মধ্যে সমর্থক ও বিরোধী ছিলেন যথাক্রমে ৪৫ ও ৪৩ জন। আবার কলেজের ছাত্রদের তুলনায় হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মৃত্যুদণ্ডকে অধিকহারে সমর্থন জানিয়েছে। কলেজের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৪৮ জন মৃত্যুদণ্ডের সমর্থক, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৫১ জন। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের ভোটারদের মধ্যে ৪২ শতাংশ, ৩০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে ৫২ শতাংশ ও পঞ্চাশোর্ধ্বদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ মৃত্যুদণ্ডের সমর্থক। আবার শ্বেতাঙ্গদের ৫৩ শতাংশ ও কৃষ্ণাঙ্গদের ২৪ শতাংশ মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে। ধর্মের ভিত্তিতে, ক্যাথলিকদের ৫২ শতাংশ ও প্রোটেস্টান্টদের ৪৯ শতাংশ মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার পক্ষে। এবং রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে ৫৯ শতাংশ রিপাবলিকান ও ৪৯ শতাংশ ডিমক্রাট চান যে, নরহত্যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অপরিবর্তিত থাকুক।

পূর্ব জার্মানির নতুন আইন : মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে মার্কিন জনগণের রক্ষণশীল চিন্তাধারা অপরিবর্তিত থাকলেও, একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে অতিরক্ষণশীল জার্মানির অন্ততঃ একাংশের মতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটার সংবাদ সরকারিভাবে ঘোষিত হয়েছে। পূর্ব জার্মানির সরকারি সংবাদ সংস্থা এ-ডি-এন প্রচারিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ৯ই মার্চ জার্মান ডিমক্রাটিক রিপাব্লিকের পার্লামেন্টে 'বিপুল ভোটাধিক্যে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। পূর্ব জার্মানির পার্লামেন্টের (ভোল্কস্কামার) সদস্য সংখ্যা ৫০০, তার মধ্যে ১৪ জন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন ও ৮ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে সব সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ ব্যাপারটিতে জার্মানির জনমতের দ্বিধার কথা মনে রেখেই সদস্যদের নিজ বিচার বিবেচনা মতো ভোটদানের স্বাধীনতা দিতে হুইপ প্রত্যাহার করা হয়। পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র পূর্ব জার্মানিতেই এতদিন গর্ভবতীর নিজ ইচ্ছামতো গর্ভপাতের আইন-স্বীকৃত অধিকার ছিল না। এ ব্যাপারে শেষ মত দানের অধিকার শুধু চিকিৎসকদেরই ছিল। পার্লামেন্টে সদ্য অনুমোদিত আইনে বলা হয়েছে, যে-কোন গর্ভবতী নারী তার স্বাধীন ইচ্ছামতো গর্ভ-সঞ্চারের তিন মাসের মধ্যে যেকোন সরকারি হাসপাতালে গর্ভপাত ঘটাতে পারবে। তিন-মাসের পরেও মায়ের স্বাস্থ্য অথবা জীবনের নিরাপত্তার জন্য গর্ভপাতের প্রয়োজন হলে চিকিৎসকদের পরামর্শমতো তা করা চলবে। পূর্ব জার্মানির রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট উভয় ধর্মীয় সমাজ থেকেই সদ্য গৃহীত আইনের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ব জার্মানির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঐ আইনের সমর্থনে বলেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই ঐ আইনের প্রয়োজন ছিল।

আশ্চর্য জীবনরক্ষা : ইতালির সুইস সীমান্ত থেকে এক কানাডিয় মহিলার প্রাণরক্ষার আশ্চর্য কাহিনী শুনতে পাওয়া গেছে। গলিত হিমস্রোতে (এভালানস) ভেসে যাওয়া ঐ মহিলাকে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে এক তুষার সমাধির ভেতর থেকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁর প্রাণরক্ষা পাওয়ার কারণ, ঐ মহিলাটির সঙ্গে যে কয়েকটি পাইন গাছের ডালও ঐ তুষার স্তূপের মধ্যে আটক পড়েছিল তারই ফাঁকে ফাঁকে আটকে যায় সামান্য অকসিজেন। সেই অকসিজেনই মহিলাটিকে আটচল্লিশ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখে।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক ঐ মহিলাটি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঐ গ্রামে গিয়েছিলেন স্কিয়িং করতে। কিন্তু প্রবল তুষারপাতের জন্য আরও পাঁচিশ পর্যটকসহ তাঁরা ঐ গ্রামে আটক পড়ে যান। নির্দিষ্ট সময়ের তিনদিনেরও বেশি আটক থাকার পর ঐ দম্পতি ধৈর্য হারান এবং সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরা ন' মাইল দূরের পার্শ্ববর্তী গ্রামের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন। কিন্তু কিছু পথ যাওয়ার পরেই মহিলাটি পা ফস্কে পড়ে যান ও সঙ্গে সঙ্গে তুষারস্রোতে ভেসে যান। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে প্রকৃতি শান্ত হওয়ার পর মহিলাটির মৃতদেহ সন্ধানের উদ্দেশ্যেই খোঁজ-খবর শুরু হয়। কিন্তু একটি তুষার স্তূপের কাছে পুলিশ কুকুরের চিৎকার শুনে স্তূপটি ভেঙে দেখা যায় যে, মহিলাটি প্রায় মৃত অবস্থায় তার মধ্যে বেঁচে আছেন।

—প্রত্যক্ষদর্শী

কী নামে ডাকব তোমায়

বাঙালীর মনে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণ বাংলাদেশ নাম আত্মসাৎ করার পর সীমান্তের এপারের অবশিষ্ট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কি নাম হবে? এককালে আমরা উভয়ে মিলে ছিলাম বঙ্গ বা বাংলা। ১৯৪৭ সালের আগস্টে র‍্যাডক্লিফ সাহেবের সালিশী মেনে, মাউন্টব্যাটেন মহোদয়ের সুপারিশ শিরোধার্য করে আমাদের এই বঙ্গভূমিকে কেটে দু খণ্ড করেছিলাম। এর কারণ ছিল, রাজনৈতিক বিরোধ ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। আমরা পশ্চিমবঙ্গ নাম নিয়ে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে থেকে গেলাম। ও'রা হলেন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ, নাম হল পূর্ব বাংলা। অবশ্য আমরা এক থাকার সময়েও লোকের মুখে পশ্চিম বাংলা পূর্ব বাংলা নাম চালু ছিল। কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই আঞ্চলিক অর্থে—যেমন গ্রেট বৃটেনের লোক হয়েও কেউ স্কচম্যান, কেউ ওয়েলসবাসী কিম্বা কেউ খাঁটি ইংরেজ। কিন্তু তাতে গোটা গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীর পরিচয়ে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা দুটি আলাদা রাষ্ট্রের শরিক হওয়ায় পরিচিতিতে কোনো অসুবিধা ছিল না। তবে ১৯৫৪ সাল নাগাদ পূর্ব বাংলার নাম বদলে পূর্ব পাকিস্তান হবার পর সংজ্ঞার দিক থেকে পশ্চিম বাংলা যেন একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। কারণ, পূর্ব বাংলার অস্তিত্বই তখন পাকিস্তানী আলখাল্লার তলায় বিলুপ্ত। তবু আমরা বাংলার আগে পশ্চিম দিকজ্ঞাপক বিশেষণটি যুক্ত রেখেছিলাম এই আশায় যে, এতে মনে পড়বে এটাই পুরো বাংলা নয়, তার পূর্বপ্রান্তের বিশাল ভূখণ্ডের নামও ছিল বাংলা। পূর্ব ও পশ্চিম এই দুইয়ে মিলেই আমরা বাঙালী, আমাদের দেশ বাংলা এবং আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।

জাতির ইতিহাস বার বার পাল্টায়। বাংলার ইতিহাসেও আবার এল পরিবর্তনের পালা। পূর্ব পাকিস্তান হল বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এ ঠিক ভাবা যায় নি। কিন্তু অনেক অভাবিত ঘটনাও ঘটে। এখন প্রশ্ন উঠেছে, ওরা যখন বাংলাদেশ নাম নিয়েছেন তখন আমরাই বা কেন পশ্চিমবঙ্গ নামে নিজেদের মাতৃভূমিকে চিহ্নিত করে তাকে অযথা সঙ্কুচিত করে রাখব? অত্যন্ত ন্যায্য কথা সন্দেহ নেই। নামকরণ নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনাও শুরু হয়েছে। পণ্ডিত ব্যক্তিরাও মতামত দিচ্ছেন, পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা রকম মতই পাওয়া যাচ্ছে। তবে জনমত দেখে মনে হয় এই নামের পরিবর্তনের পক্ষেই দলভারী। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন এবং বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনেই এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন সরকার পক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এ সম্পর্কে জনসাধারণের কাছ থেকে নামের সুপারিশও আহ্বান করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব খুবই গণতান্ত্রিক। সবচেয়ে সহজ, সুশ্রাব্য ও সঙ্গত নামটিই তিনি নেবেন, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায়। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ মনীষী ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভিন্নমত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ নাম বহাল রাখবার পক্ষপাতী। সংবাদপত্রে সামান্য বিবরণ থেকে ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের আপত্তির আসল কারণ সবটা বোঝা যায় নি। আমরা অনুরোধ করব, আচার্য সুনীতিকুমার এ বিষয়ে তাঁর বিশদ মন্তব্য দেশবাসীকে জানবার সুযোগ দেবেন। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ও বলেছেন যে, বাংলাদেশ নাম গ্রহণের যুক্তিসঙ্গত অধিকার পূর্ব বাংলার আছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের অধিকারের বিরোধিতা তিনি করেন নি।

আমাদের মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। ভৌগোলিক দিক দিয়েও, এ অঞ্চল শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, তার সঙ্গে রয়েছে উত্তরবঙ্গ। একে বঙ্গ, বঙ্গপ্রদেশ, বাংলা বা বাংলা রাজ্য রাখা হবে কিনা এ নিয়ে নানাজনের নানামত। অনেকে আবার প্রাচীন গৌড়ের পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, এ ধরনের পশ্চাদগামী দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থনযোগ্য নয়। মুখের ভাষায় এবং লেখায় আমরা সব সময়েই আমাদের মাতৃভূমিকে বাংলাদেশই বলি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লিখে গেছেন, বাংলাদেশ। তবে একই নামে দুটি দেশ থাকলে বিভ্রান্তি ঘটবে পদে পদে। তাই পার্থক্য বোঝা যায় অথচ নামের শুদ্ধতা রক্ষা হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। শুদ্ধ ভাষায় আমরা বঙ্গ বললেও সাধারণ বাঙালীর কাছে এ নামের আত্মীয়তা সহজ নয়। তারচেয়ে শুধু বাংলা বা বাংলা রাজ্য সহজ ও সাবলীল। উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশের অনুকরণে বাংলাপ্রদেশও রাখা যেতে পারে, কিন্তু মুখের ভাষায় তা চালু হবার সম্ভাবনা কম। যাই হোক, এ ধরনের নাম নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে এবং সবচেয়ে সহজ ও শ্রুতিমধুর নাম সরকার গ্রহণ করতে পারেন। তবে একটি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সরকারের কাছে পেশ করতে চাই। দেশের নাম পরিবর্তন একটি গুরুতর বিষয়। খুব ভেবে-চিন্তেই তা করা দরকার। বিধানসভার সদস্যরা নিশ্চয়ই তা করবেন। তবে প্রথমেই প্রস্তাবটি বিধানসভায় ভোটাভুটিতে না ফেলে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোই শ্রেয়। এতে একটু দেরী হলেও খুব ক্ষতি হবে না। কারণ, এটা ভাবাবেগের বিষয় নয়, তাড়াহুড়ো করে একটা নাম নেবারও বিষয় নয়। যে-নাম স্থায়ী হবে এবং যে-নামে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই দেশকে জানতে ও ভালবাসতে শিখবে সে নাম আমরা আবেগের মুহূর্তে শুধু ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নিয়েছিলাম, একথা যেন কেউ বলতে না পারেন।

পশ্চিম বাংলার নতুন সরকারের জন্যে যে-কর্তব্য অপেক্ষা করে আছে তা যে মোটেই সহজ নয় তা সকলেই বোঝেন। কিন্তু সেই কাজ যে ঠিক কতোটা কঠিন সে-সম্বন্ধে হয়ত অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ যে বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে কিন্তু এ-বিষয়ে একটা পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমে ধরা যাক, মাথা পিছু আয়ের কথা। সারা দেশে গড়পড়তা মাথা পিছু আয় যখন ধীরে ধীরে হলেও বেড়ে চলেছে তখন পশ্চিম বাংলায় তা ইদানীং কমেছে—এই অপ্রিয় তথ্য জানা গেল অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে। ভারতে মাথাপিছু আয় (টাকার অপরিবর্তিত মূল্যের হিসেবে) ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ৩৩৯.৪ টাকা, ১৯৭০-৭১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪৭ টাকায়। আর পশ্চিম বাংলায় ঐ সময়ে মাথাপিছু আয় ৩৪০.৮ টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৩৯.৩ টাকা। অর্থাৎ, ঐ নির্দিষ্ট সময়ে পশ্চিম বাংলার মানুষের মাথাপিছু আয় শুধু কমেই যায় নি, সারা ভারতের গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের চেয়ে বেশ কিছু কম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বাধীনতার আগে তো বটেই, স্বাধীনতার পরেও কিছু দিন মাথাপিছু আয়ের হিসেবে পশ্চিম বাংলার স্থান ছিল অন্যান্য রাজ্যের ওপরে। ১৯৬০-৬১ সালেও পশ্চিম বাংলার স্থান ছিল দ্বিতীয়, কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ সালে এই রাজ্যের স্থান হয় পঞ্চম। কিন্তু তখনও দেশের গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় কমে যায় নি। এখন ১৯৭১ সালে দেখা গেল, সেই সান্ত্বনাটুকুও আর অবশিষ্ট নেই।

শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পশ্চিম বাংলার অবস্থা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৬৬ সালে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় দেশের অন্যান্য অংশ তার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে বছর ছয়েকের মধ্যেই। তাই ১৯৬৭ সালে শিল্প উৎপাদনের সূচক পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কমে গেলেও (১১৭.৭ থেকে ১১৬.৭), ১৯৬৮ সালে আবার বেশ লাফ দিয়ে বেড়ে যায় (১২৪.২)। তারপর ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় শিল্প উৎপাদনের সূচক ইতিমধ্যে ১৯৬৬ সালের মাত্রা (১০৪.৮) ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। বরং ১৯৬৯ সালে দেখা গেল যে, ঐ অঙ্ক ১৯৬৮ সালের অঙ্কের চেয়েও কম দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিম বাংলার শিল্প যে সহজে মন্দার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারে নি তার একটা বড় কারণ অবশ্যই এই যে, এই রাজ্যের শিল্পের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের একটা বড় স্থান রয়েছে। ঐ শিল্পের পক্ষে মন্দার ঠেলা সামলে উঠতে সময় লাগে। কিন্তু তা ছাড়াও শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার দুটো প্রধান কারণ হল (এক) বহু চালু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং (দুই) শ্রম-বিরোধের ফলে নষ্ট 'রোজের' সংখ্যা বৃদ্ধি।

১৯৬৬ সালে বন্ধ কল-কারখানার সংখ্যা ছিল ৩৪, ১৯৭০ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২০। তারপর অবশ্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ কারখানা খোলার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হন, ফলে ১৯৭১ সালে ঐ সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশী কমে দাঁড়ায় ১৩৭। তারপর ১৯৭১ সালে আরো ৫২টি কারখানা খুলেছে। শ্রম বিরোধ এবং নষ্ট রোজের সংখ্যা ১৯৬৬ সালে ছিল যথাক্রমে ২৪৪ এবং সাড়ে সাতাশ লাখের মত। ১৯৬৯ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৯৪ এবং প্রায় ৯৪ লাখ। ১৯৭১ সালে অবশ্য অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছে।

এই যদি হয় শিল্পক্ষেত্রের ছবি, তবে কৃষির অবস্থাটা কি রকম? সকলেই জানেন, ইদানীং দেশের যে-ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্রম-বর্ধমান তা হল কৃষি। সত্যি কথা বলতে কি, ফলন এত না-বাড়লে দেশের মোট জাতীয় আয়ই হয়ত আগের চেয়ে কমে যেত। কিন্তু দেশে কৃষির গড়পড়তা ফলন যে-হারে বেড়ে চলেছে পশ্চিম বাংলা তার সঙ্গে মোটেই তাল রাখতে পারছে না। গোটা দেশে কৃষি উৎপাদনের সূচক ১৯৭০-৭১ সালে যেখানে ছিল ১৮২, পশ্চিম বাংলায় ঐ অঙ্ক তখন ছিল মাত্র ১৫৭। এই তথ্যটা হয়ত অনেকের কাছে একটু আশ্চর্য লাগবে, কারণ আমরা শুনতে পাই পশ্চিম বাংলা ধানের উৎপাদনে এখন অন্যান্য রাজ্যকে টেক্কা দিচ্ছে। এই রাজ্যে ধানের মোট উৎপাদন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশী হতে পারে, কিন্তু এখানে একর-প্রতি ফলনের পরিমাণ অনেক রাজ্যের চেয়েই কম। অধিক ফলনশীল গমের চাষ এই রাজ্যে আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, অনেক জমিতে বছরে একবারের বেশী চাষও হচ্ছে, কিন্তু তবু আমরা অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে পিছনে পড়ে রয়েছি।

কৃষি ও শিল্পের সামগ্রিক চেহারাটা তো এই, তাছাড়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আরো কয়েকটা নিরিখ আছে। সেগুলো হয়ত কৃষি বা শিল্পের মত বৃহৎ ব্যাপার নয়, কিন্তু তাই বলে তার গুরুত্ব কিছু কম নয়। যেমন ধরা যাক, হাসপাতালের শয্যা-সংখ্যার কথা। পশ্চিমবঙ্গের সব হাসপাতাল মিলিয়ে এই শয্যা-সংখ্যা হল ৩৯ হাজার। এমনিতে অঙ্কটা হয়ত শুনতে ভালো, কিন্তু যখন মনে পড়ে যে এই ছোট রাজ্যটির জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি তখনই হতাশা আসে, কারণ তখন দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার মানুষপিছু একটি শয্যাও নেই।

অথবা ধরা যাক গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কথা। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনায় এ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যে মোটেই সন্তোষজনক নয়, তা অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন। এই রাজ্যে মোট গ্রামের সংখ্যা সাড়ে আটত্রিশ হাজার। তার মধ্যে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁচেছে মাত্র হাজার তিনেক গ্রামে। এ থেকেই অন্ধকার গ্রামাঞ্চলের চেহারাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর যখন এ-ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা করি তখন অন্ধকারের মাত্রাটা আরো বেড়ে যায়। কারণ, হরিয়ানায় সব কটি গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যও এ ব্যাপারে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

•

সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের জন্যে অনেক কাজ রয়েছে এবং এই সব কাজ দ্রুত শেষ করা দরকার। কারণ সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

নতুন সরকার কিভাবে এই সব জরুরী সমস্যার সমাধান করতে চলেছেন?

এখন বিধানসভায় যে-বাজেট গৃহীত হল সেটা পুরোদস্তুর বাজেট নয়। এতে চার মাসের মত কাজ চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া নতুন মন্ত্রিসভা এই বাজেট তৈরীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ারও সুযোগ পান নি। মে-জুন মাসে পুরোদস্তুর বাজেটে নতুন সরকারের চিন্তা-ভাবনার পুরো ছবিটা ধরা পড়বে। কিন্তু তবু এই বাজেটের মধ্যেও সেই চিন্তা-ভাবনার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই আভাস অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। কারণ এই বছরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্পে, সি এম ডি এ'র বিভিন্ন প্রকল্পে, দ্বিতীয় হুগলী সেতু নির্মাণ এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির রূপায়ণে মোট ১৪২ কোটি ৪০ লাখ টাকা নিয়োগ করা হচ্ছে। গত বছর এই ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১১৫ কোটি ২২ লাখ টাকা। অর্থাৎ এ-বছরে বরাদ্দ বেড়েছে ২৭ কোটি টাকা। সেটা মোটেই কম নয়।

১৯৭২-৭৩ সালটা হল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চতুর্থ বছর। এ-বছরে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যয় করা হবে ৯২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। গত বছরে এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬৭ কোটি [illegible] লাখ টাকা। অর্থাৎ এই বছরে বরাদ্দ [illegible] পেয়েছে। কিন্তু বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়া [illegible] তো সব নয়। কারণ কাগজে-কলমে [illegible] বরাদ্দ হলেও কাজের সময় [illegible] খরচ হয় না। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরে, অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালে মোট বরাদ্দের মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি টাকাই [illegible] সরকার খরচ করতে পারেন নি। [illegible] পশ্চিম বাংলার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার [illegible] সরকার [illegible]। [illegible] চতুর্থ পরিকল্পনার [illegible] মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই [illegible] সবচেয়ে কম। [illegible] বছরে ঐ তিনশ সাড়ে বাইশ কোটি টাকার [illegible] কেমন দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

সি এম ডি এ'র প্রকল্পগুলি সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। ১৯৭০-৭১ সালে সি এম ডি এ কলকাতার উন্নয়নের কাজ শুরু করে। কিন্তু ঐ বছরে যে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা সি এম ডি এ পেয়েছিল তার পুরোটা খরচ করতে পারে নি। ১৯৭১-৭২ সালে সি এম ডি এ পেয়েছিল প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। এখন দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে ৪০ কোটি টাকার মত খরচ হয়েছে। এই বছরে সি এম ডি এ'র নানা প্রকল্পে প্রায় ৫৯ কোটি টাকা নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ, বরাদ্দ রীতিমত বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন নতুন মন্ত্রিসভাকে দেখতে হবে, এই বাড়তি বরাদ্দের একটা টাকাও যেন অব্যয়িত না-থেকে যায়।

●

শিল্প ও কৃষি দুটি ব্যাপারেই যে নতুন সরকার মনোযোগ দিতে চাইছেন সেটা আশার কথা। নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণের পরেই যে অনেক বন্ধ কারখানার দরজা খুলতে শুরু করেছে সেটা খুবই সুলক্ষণ। এর ফলে যে হাজার হাজার কর্মীর রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছিল তাঁরা আবার কাজ ফিরে পাচ্ছেন। বন্ধ ও রুগ্ন কারখানাকে সাহায্যের জন্যে শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশন তৈরী হয়েছে সেই সংস্থাটিও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

কিন্তু বন্ধ কারখানা খোলার ব্যবস্থা করা বেকার সমস্যার বিশেষ সমাধান হচ্ছে না। সেজন্যে দরকার নতুন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা। গত বছর আগস্টে যে ১৬-দফা কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে এবং শিল্পপতিদের যে-সব বিশেষ সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার কথা গত ডিসেম্বরে ঘোষিত হয়েছে, তার ফলে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। নতুন কল-কারখানা খোলার জন্য অনেক আবেদনপত্র সরকারী দপ্তরে জমা পড়ছে। বেকার সমস্যা সমাধানে শিল্পায়নের যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা সকলেই জানেন। বিশেষতঃ শিক্ষিত বেকারদের যে সমস্যা পশ্চিম বাংলাকে বিশেষভাবে পীড়িত করছে তার সমাধানের জন্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা দরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা ভালো। যে-সব কল-কারখানা আধুনিক প্রথায় তৈরি করতে লগ্নীর দরকার হয় অনেক, কিন্তু সেই তুলনায় যথেষ্ট লোকের কর্মসংস্থান হয় না। যেমন, হলদিয়ায় যে সার কারখানা তৈরী হবে তাতে ৮৮ কোটি টাকা লগ্নী করতে হবে, কিন্তু কর্মসংস্থান হবে মাত্র কয়েক হাজার লোকের। তারই এই রাজ্যে বড় কারখানা স্থাপনের সময় সরকারকে নজর রাখতে হবে যাতে এমন কারখানা স্থাপিত হয় যেখানে শ্রমিকের প্রয়োজন হবে বেশী। সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের দিকেও যথেষ্ট নজর দেওয়া দরকার। ১৬ দফা কর্মসূচী তৈরীর সময় স্থির হয়েছিল বছরে দু হাজার ছোট কারখানা স্থাপন করা হবে। সেই লক্ষ্য যাতে পূরণ হয় সে-সম্পর্কে নতুন সরকারকে সজাগ থাকতে হবে। পাঞ্জাব বা হরিয়ানার মত রাজ্যের সমৃদ্ধির একটা কারণ এই ছোট কল-কারখানার প্রসার।

তবে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যর্থ হবে যদি একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া না যায়। শুধু শহরে যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে এবং গ্রামে কোনো উন্নতি না-হয় তবে গ্রাম থেকে এত লোক শহরে এসে পড়বে যে তাদের সবাইকে কাজ দেওয়া যাবে না। রাজ্য সরকার ১৯৭২-৭৩ সালে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের জন্যে চার কোটি বারো লাখ টাকা বরাদ্দ করেছেন। গত বছরে এই খাতে পাঁচ কোটি ৭১ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই টাকায় যে-সব প্রকল্প রূপায়িত হলো তাতে নিশ্চয়ই গ্রামের মানুষের উপকার হবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক সমৃদ্ধি আনতে হলে দরকার চাষ-বাসের ব্যবস্থার উন্নতি। আগেই আমরা দেখেছি যে, এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অনেক রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে আছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, গত বছর এবং এই বছরে কৃষি ও সেচ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেই বরাদ্দ যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলের বরাদ্দের চেয়ে বেশী হতে পারে, কিন্তু এই রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কি? যদিও এই রাজ্যে খাদ্যশস্যের ঘাটতি নিত্যকার ব্যাপার, তবু কোন অজ্ঞাত কারণে কৃষির প্রতি বরাবরই উপেক্ষা দেখান হয়েছে। নতুন সরকার সেই ভুল সংশোধন করার সুযোগ পেয়েছেন। মে-জুন মাসে পুরোদস্তুর বাজেট পেশ করার সময় কৃষি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে সেই ভুল সংশোধন করা যায়।

এটা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে, নতুন বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যেরা যে-প্রশ্ন বার বার তুলছেন সেটি হল গ্রাম-বাংলার প্রতি অবহেলা।

—দেবদত্ত

দেশ বিদেশ

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ 'মেয়েলোকটা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। ইয়াহিয়ার জায়গায় এখন পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো। তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে এখন 'বহিন' বলে সম্বোধন করছেন। লাহোরে একটি জনসভায় তিনি কাতর মিনতি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বহিনদের মুখ চেয়ে বহিন ইন্দিরা যেন পাকিস্তানের ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দী ভাইকে ছেড়ে দেন।

বার বার ঐ এক কথা। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ভারত ছেড়ে দিন। দুই সপ্তাহে অন্তত বার পাঁচেক ভুট্টো সাহেব প্রকাশ্যে এই আবেদন জানিয়েছেন— রাশিয়া সফরে যাওয়ার আগে দুজন ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, রাশিয়া থেকে ফিরে আসার পর আর একজন ভারতীয় সাংবাদিকের কাছে, 'নিউজউইক' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, রাওয়ালপিণ্ডিতে সাংবাদিক সম্মেলনে এবং লাহোরের জনসভায়।

না বলে ভুট্টো সাহেবের উপায় নেই। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর উপর প্রচন্ড চাপ আসছে। এই সব যুদ্ধবন্দী যেসব এলাকার অধিবাসী সেই সব এলাকাতেই ভুট্টো সাহেবের পাকিস্তান পিপলস পার্টির বড় ঘাঁটি। যুদ্ধবন্দীদের পরিবারের লোকেরা বিক্ষোভ প্রকাশ করছেন, তাঁরা ভুট্টোকে শান্তি দিচ্ছেন না। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, জনসাধারণকে শৃঙ্খলা মেনে নিতে হবে। 'আমি আর বিক্ষোভ প্রদর্শন চাই না, রোরুদ্যমান ঐসব স্ত্রীলোককে আমি আর দেখতে চাই না। কেননা, আমি নিজেও অশ্রুভারাক্রান্ত।'

ভারত সরকার কখনও বলেন নি যে, তাঁরা শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দীদের ফেরৎ দেবেন না। তাঁরা জানেন যে, আজ হোক বা কাল হোক এই যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে পাঠিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু এ-বিষয়ে নয়াদিল্লির দুটি পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে। প্রথমত, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে বিরোধ আছে তার সঙ্গে যুক্ত করে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হবে। কেননা, বিরোধের বীজ থেকেই গেল এবং ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দী ফিরে গিয়ে পাকিস্তানের যুদ্ধপ্রস্তুতিকে চাঙা করে তুলল, এটা ভারত হতে দিতে চায় না। দুই দেশের মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীন বোঝাপড়ার অংশ হিসাবেই যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নটি মীমাংসা করতে হবে, এই হচ্ছে ভারতের প্রথম বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য হল, বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর লড়াই হয়েছিল শুধু ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে নয়, ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত বাহিনীর সঙ্গে। অতএব, পূর্বখন্ডের লড়াইয়ে যেসব পাকিস্তানী সৈনিক বন্দী হয়েছে তাদের উপর বাংলাদেশ সরকারেরও এক্তিয়ার আছে এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আলোচনায়

বাংলাদেশকেও একটি পক্ষ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একযোগে যে যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছেন তাতে খুব পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে বাংলাদেশ সরকার তাদের বিচার করতে চাইলে ভারত তাদের ঢাকার হাতে তুলে দেবে।

কিন্তু যে ভুট্টো হিন্দুস্থানের সঙ্গে হাজার বছর লড়াই করার আশা রেখেছিলেন বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বরতার জন্য যাঁর দায়িত্ব ইয়াহিয়া খাঁর চেয়ে কোন অংশে কম নয়, তিনি এতসব কথা শুনতে রাজী নন। তিনি চান, ভারত নিয়াজি-ফরমান আলির দলকে বন্দিশিবির থেকে মুক্ত করে ভুট্টোকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। ঘুরে ফিরে সেই একই বুলি। কখনও নরমে, কখনও গরমে।

নরমের উদাহরণঃ—ভারতের সঙ্গে মোকাবেলা করার নীতি যখন পাকিস্তানের পক্ষে সুবিধাজনক বলে আমি মনে করেছি তখন আমি ঐ নীতি গ্রহণ করেছি, এখন আমি আলোচনার ভিতর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে শান্তি আনতে চাইছি। অতীত ইতিহাসের মঞ্চ থেকে সব জঞ্জাল তো একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়া যায় না। তবে আমি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী একসঙ্গে চেষ্টা করলে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা করতে পারি। স[...] বিরোধ একসঙ্গে মিটিয়ে নেওয়ার বৃ[...] চেষ্টা না করে আসুন না কেন, যুদ্ধবন্দী[...]দের ফিরিয়ে দেওয়া যাক, দুই দেশের ম[...] যোগাযোগ ও বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক[...] যাক, ভারতীয় হকি টীম লাহোর স্টেডিয়[...] এসে খেলুক, আমাদের টীমও সে-দে[...] অন্য কোথাও যাক। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী[...]দের ফিরিয়ে দেওয়া হোক, তাহলেই [...] আমি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারি[...] এই লোকদের মধ্যে কেউ কেউ যদি পাগলা[...] করে থাকে এবং বাংলাদেশ যদি তাদের বিচার করতে চায় তাহলে আমি তা[...] বাধিত করতে রাজী আছি। (অর্থাৎ পাকিস্তানেই তাদের বিচার হতে পারে[...] মুজিবের সঙ্গে দুবার আমি কথা বলে[...] তিনি আমার অসুবিধা বুঝবেন। ভার[...] বড় দেশ, সে বড় মনেরও পরিচয় দিক[...] কেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে ইয়াহি[...] খাঁ মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। আমি [...] তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি। শ্রীমতী গান্ধী [...] সেটা স্বীকার করেন না? শ্রীমতী গান্ধী একবার যদি আমাকে তাঁর সঙ্গে কথা ব[...] সুযোগ দেন তাহলেই আমি প্রমাণ কর[...] পারি যে, আমরা আন্তরিকভাবে শান্তি সন্ধান করছি।

সেই সঙ্গে আবার গরম কথাও ভু[...] সাহেব শুনিয়েছেন অনেক। যেমন :—বাং[...] দেশ যদি কোন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী[...]

যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার করে তাহলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কটা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়াবে যেখান থেকে আর ফেরা যাবে না। (রাগতভাবে টেবিলে চাপড় মেরে) ঢাকার মাটিতে আমি যুদ্ধাপরাধের বিচার হতে কিছুতেই দেব না। যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নটিকে আমি কখনই দরকষাকষি ও ব্ল্যাকমেইলের বিষয়ে পরিণত হতে দেব না। যুদ্ধবন্দীরা যতক্ষণ ভারতীয় বন্দি-শিবিরে থাকবে ততক্ষণ পাকিস্তানে উত্তেজনা থাকবে। পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট অথবা অস্থিরতা থাকলে ভারতের সুবিধা হবে না। আমার পরে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই সামরিক শাসন সরাসরিও হতে পারে আবার অসামরিক পুতুল সরকারের মারফৎও সামরিক বাহিনী ক্ষমতা অধিকার করতে পারে। তা হলে ভারতের সুবিধা হবে না। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারেরও এক্তিয়ার আছে, এটা বাজে কথা। এটা আমি মেনে নিতে পারি না। আমি জানি, আপনারা যুদ্ধবন্দীদের মগজ ধোলাই করছেন। বালুচ ও পাঠান বন্দীদের আলাদা করে রাখা হচ্ছে। কিন্তু ভারত একশ বছর চেষ্টা করলেও ওদের ছিন্ন করতে পারবে না।

বাতিব্যস্ত ভুট্টো সাহেব এভাবে উল্টো-পাল্টা বলছেন। ২৬ মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে সংবাদিক সম্মেলনে তিনি অনেক উষ্মা প্রকাশ করলেন, টেবিল চাপড়ালেন। 'আমি হেড়ে দিয়ে চলে যাব' বলে শাসালেন। আবার ঐ দিনই তাঁর অফিসে বসে দিল্লির 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার শ্রীকুলদীপ নায়ারের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা ধরে যেসব কথাবার্তা বললেন, তাতে নিজেকে শান্তির দূত হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করলেন। শ্রীনায়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, এই উপমহাদেশে একটা কূটনীতির চল আছে। সবাই এখানে সব কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়। সকলেই সন্দেহ করে রহস্যজনক কিছু হচ্ছে। সেই জন্যই আমাকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়েছে। আমি লোককে শান্ত রাখার চেষ্টা করছি।

যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নটির পরেই অন্য যে বিষয়টি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো খুব বেশি উদ্বেগ দেখালেন সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে অবাঙালীদের প্রশ্ন। পাকিস্তানের মানুষ চাইছে, ঐ অবাঙালীদের পাকিস্তানে নিয়ে আসা হোক। কিন্তু ভুট্টো সাহেব তাতে রাজি নন। অথচ তিনি এই প্রচারে ইন্ধন যোগাতে চান যে, বাংলাদেশে অবাঙালীদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হচ্ছে। তথাকথিত এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য তিনি শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশে অবাঙালীদের হত্যা বন্ধ না হলে তিনি পাকিস্তান থেকে বাঙালীদেরও যেতে দেবেন না।

শুধু বাংলাদেশের অবাঙালীদের জামিন হিসাবেই নয়, পাকিস্তানী যুদ্ধ-বন্দীদের জামিন হিসাবেও পাকিস্তানের বাঙালীদের আটকে রাখবেন বলে ভুট্টো সাহেব শাসিয়েছেন। তিনি বলেছেন, খাঁচা থেকে চিড়িয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি (অর্থাৎ তিনি মুজিবকে ছেড়ে দিয়েছেন)। এখন আমার পক্ষে পাকিস্তানের বাঙালীদের যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে এক করে দেখা ছাড়া উপায় নেই। আশা করি, এটা আমাকে করতে হবে না। কিন্তু এছাড়া অন্য কিছু তো আমার হাতে নেই।'

•

সোভিয়েট রাশিয়ায় যাওয়ার আগে ভুট্টো সাহেব দুজন ভারতীয় সাংবাদিককে তাঁর লারকানার পল্লীভবনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ দুজনের একজন হলেন 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ার' দিলীপ মুখার্জি আর একজন 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর বি কে তেওয়ারি। এই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন তার মধ্য দিয়ে তিনি এরকমই একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে, ভুট্টো সাহেব কাশ্মীর প্রসঙ্গটি চাপা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। ভুট্টো নাকি বলেছিলেন, বিপ্লবের মতো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রামও বাইরে থেকে রপ্তানি করা যায় না। কাশ্মীরীদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাকিস্তান আদায় করে দিতে পারবে না। তারা যদি ভিন্নতর ভবিষ্যৎ কামনা করে তাহলে তাদের নিজেদেরই সেজন্য লড়াই করতে হবে।

এই সংবাদ নয়াদিল্লি অবশ্য খুব উৎসাহ দেখায় নি। কাশ্মীর সম্পর্কে ভুট্টোর যে মত বদল হয়েছে তার অন্য কোন স্পষ্টতর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের মুখপাত্র এই সংবাদের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চান নি।

ভুল ধারণা ভাঙতে অবশ্য খুব দেরিও হয়নি। দুদিন বাদেই পাকিস্তান রেডিও থেকে ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ প্রকাশ করা হল তাতে বলা হল, ভুট্টো জানিয়েছেন যে, কাশ্মীরকে বাদ দিয়ে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের কথা ভাবা যায় না।

রাশিয়া থেকে ঘুরে এসে ১৯ মার্চ তারিখে লাহোরের জনসভায় ভুট্টো বললেন, 'কাশ্মীর আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না। আমরা চাইলেও কাশ্মীরের মানুষ আমাদের ভুলতে দেবে না।'

বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম এর মধ্যে পাকিস্তানে সফর করে এলেন। তিনিও নাকি এই ধারণা নিয়েই ফিরেছেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের নীতির কোন বদল হয়নি।

কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখাটাকেই কিছু অদল-বদলের পর আন্তর্জাতিক সীমারেখা বলে মেনে নিতে পাকিস্তান রাজী হবে কিনা, এই প্রশ্নেরও কোন স্পষ্ট উত্তর ভুট্টো দেননি।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যেসব প্রকাশ্য বিবৃতি দিচ্ছেন সেগুলির উপর নয়াদিল্লি এখন পর্যন্ত খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। তিনি এতবার এত রকম কথা বলছেন যে, তাঁর মনের কথাটা যে কি

তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। ভারত সরকারের মুখপাত্ররা লক্ষ্য করেছেন যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য যতই আগ্রহ প্রকাশ করুন, দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে যোগাযোগের যে রাস্তা রয়েছে (অর্থাৎ সুইজারল্যাণ্ডের মারফৎ অথবা সোভিয়েত রাশিয়া কিম্বা বৃটেনের মারফৎ) সেই রাস্তায় তিনি কিন্তু তাঁর সেই আগ্রহের কথা নয়াদিল্লিকে জানাচ্ছেন না। অগত্যা, ভারত সরকারের মুখপাত্রদের এই ধারণাই হচ্ছে যে, সংবাদপত্রের মারফৎ কথা বলে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আসলে ভারতের জনসাধারণকেই তাঁর কথাগুলো শোনাতে চাইছেন। (ভারতের জনগণকে বিভ্রান্ত করাই যদি প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তিনি একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন বলা চলে না। বি কে তেওয়ারির রিপোর্টের ভিত্তিতে ফ্র্যাঙ্ক মোরেস ইতিমধ্যে 'ভুলে যাও ও ক্ষমা করো' শিরোনাম দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন।)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভৃতি প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর প্রকাশ্য বিবৃতির জবাবে পাল্টা বিবৃতি দিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চাইছেন না। তাঁরা শুধু ভারতের এই বক্তব্যই আঁকড়ে ধরে আছেন যে, যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্নটিকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের বৃহত্তর প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না, যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্ন আলোচনায় বাংলাদেশকেও রাখতে হবে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের আলোচনার আগে সরকারী অফিসার স্তরে আলোচনা করতে এবং সেই আলোচনা হবে কোনরকম পূর্ব শর্ত ছাড়া অর্থাৎ এই আলোচনায় যে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে।

এদিকে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে তিনি ভুট্টোর সঙ্গে কোন রকম কথাই বলবেন না। সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ বলেছেন, যে যাই বলুক না কেন, পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবেই।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সরকারী অফিসার পর্যায়ে আলোচনা করতে বিশেষ উৎসাহী নন। তিনি তাঁর দেশের লোককে দেখাতে চান যে, পাকিস্তানী সৈনিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর কাছে গিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখতেও তিনি পিছপা হননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ অফিসার পর্যায়ের আলোচনাতেই বোধ হয় ভুট্টোকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাঁর তাড়া আছে। ভারতের তাড়া নেই। ভুট্টো বলছেন, তিনি যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে তাঁর বদলে অন্য কেউ পাকিস্তানের শাসক হবেন। তিনি যদি যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাহলেও পাকিস্তানের মিলিটারি নায়করা কাজ হাসিল হওয়ার পর যে তাঁকে সরিয়ে দেবেন না তার নিশ্চয়তা কি আছে? ভুট্টোর সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনে বসার আগে ভারত নিশ্চয়ই একবার যাচাই করে দেখতে চাইবে, প্রেসিডেন্ট হিসাবে ভুট্টো সাহেবের পরমায়ু আর কতদিনের।

*

'বাঙালী মুসলমান ভাইদের সম্পর্কে আমরা যদি কোন ভুল করে থাকি তাহলে তাঁরা আমাদের ক্ষমা করুন; কিন্তু সেজন্য তাঁরা যেন অবাঙালীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করেন।'—একথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো।

'দেশের একটা অংশ যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায় সেজন্য আব্রাহাম লিংকন চার বছর ধরে লড়াই করেছিলেন এবং পাঁচ লাখ আমেরিকানের প্রাণ নিয়েছিলেন। লিংকন সাফল্য লাভ করেছেন, আমরা করি নি।'—একথা বলেছেন আমেরিকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ রাজা।

৩১-৩-৭২ ... —পুণ্ডরীক

'পশুপতি, ওহে পশুপতি শুনছ?'

শুনেছে। শুনে এক বিচিত্র বিস্ময় নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে একক কণ্ঠস্বরে বাতাসের ঢেউয়ে আলোড়ন তোলবার প্রয়াস পেয়েও শেষ পর্যন্ত না পারার ব্যর্থতায় কেমন যেন গুমরে মরতে লাগল।, কণ্ঠস্বরে শব্দ জোগালো না। মনে হল কণ্ঠনালীটা কাঠের মত শক্ত। মনে হল এতদ্ব্যতীত কোন অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে কঠোর হস্তে দমন করার উদ্দেশ্যে এক পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে এই মুহূর্তে তার বাকশক্তি রহিত করে দিয়ে এক বিরাট সাফল্য লাভ করল।

তাই অবশেষে নিজের বিবেকের কাছেই জবাবী কৈফিয়ৎ দিল পশুপতি। বলল, 'শুনেছি, কিন্তু পিছু ডাক অমঙ্গলের সূচনা করে সে কারণে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারলুম না বলে দুঃখিত।'

অতঃপর পশুপতি আবার হাঁটতে থাকল। হেঁটেই যে সে সবসময় যাতায়াত করে তা নয়। আবার সবসময়েই যে ট্রাম-বাসের সাহায্য নিয়ে এদিক-ওদিক যেতে আসতে হবে, এর পক্ষেও কোন যুক্তি নেই।

—'কেমন আছেন কাকাবাবু?'

—'আরে তুমি, কবে ফিরলে?'

—'কাল ফিরেছি।'

—'বেশ বেশ, সময় করে একবার বাড়ি এসো, তখন কথা হবে।'

পঁচিশ বছরের যুবক, বাংলার বাইরে থেকে সদ্য প্রত্যাগত কুণাল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়ে সহাস্যে তার সামনে থেকে প্রস্থান করল। এতে যে পশুপতি খুব কিছু একটা বিরক্তি বোধ করল তা নয়। প্রথম কথা এটা কোন পিছু ডাক নয়, একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেছে, তাই। দ্বিতীয় কথা প্রতিবেশী বন্ধু রজনীকান্তর ছেলে এই কুণাল তাকে বরাবরই এমনি সমীহ করে। চাকুরীস্থল বাংলার বাইরে। ছুটিতে এলে যথারীতি যেভাবেই হোক একবার দেখা করে।

অতঃপর কুনাল এবং কুনাল প্রসঙ্গ মন থেকে সরিয়ে পূর্বনির্ধারিত বেগ অনুযায়ী হাঁটতে লাগল। এবং এই মুহূর্তে কলকাতার পথে-ঘাটে লোকজনের অস্বাভাবিক ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কিছুটা বিব্রত বোধ করল। কলকাতাটা অবশ্য চিরকালই ভিড়ের জন্য খ্যাত।

প্রসিদ্ধ। তাই বলে এমন ভিড়! চলবার সময় গায়ে গায়ে লেগে যাবার উপক্রম। যাকে বলে বিরামহীন জনস্রোত।

—'পশুপতি, ওহে পশুপতি শুনছ?'

আবার সেই ডাক। কেন, কী হয়েছে আজ। এত ডাকাডাকি কিসের? আমি কি অন্ধ না কালা যে, বারবার ডাকাডাকি করে আমাকে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে। আমি যাচ্ছি এবং যাব। অনেক চিন্তা ভাবনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। এটা কোন আকস্মিক প্ররোচনার প্রতিক্রিয়া নয়। নিজেকে নিঃশব্দে আবার বুঝিয়ে বলল পশুপতি। অনেকদিন আগে আরেকবার এমনি করে নিজেকে বুঝিয়ে যেখান থেকে বিদায় নিয়েছিল, আজ সেখানে আরেকবার চলেছে শুধু একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসতে। সময়ের অভাব নেই। সারাদিন শুয়ে বসে কাটানো। কাঁহাতক আর ভালো লাগে। তাই আজ সকাল থেকেই ভেবে রেখেছিল, এদিকে একবার আসবে। অনেক দিনের চেনা পথে অনেকদিন বাদে শুধু একটু ঘুরে দেখে যাওয়া।

অনেকদিন এদিকে আসে না পশুপতি। একদা ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাকে এ পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরের আস্তানায় বসিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেশ কয়েকটা বছর নিজের সংসারের দিকেই মনোযোগ দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। মধ্যে মাঝে অবশ্য মনটা টনটন করে উঠেছে। কিন্তু বিবেক তাকে টেনে ধরেছে। আর নয় পশুপতি, আর নয়, পয়সাটাই ওদের কাছে বড় কথা, যে পরিমাণ পয়সা দেবে, সে পরিমাণ ভালোবাসা পাবে ওদের কাছ থেকে। বাজারের আলু বেগুনের মতই ওদের ভালোবাসা ব্যবসারের সামগ্রী।

তাই আর যায়নি। সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষের স্মৃতি মনকে আবার আলোড়িত করে তুলেছিল। নিজের বিবেকের সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একটা কঠোর মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। না, আর নয়। মেনকাকে ভুলে গেছে পশুপতি। ভালোবাসার মর্ম বোঝে না মেনকা। বাজারের মেয়েমানুষের কাছ থেকে মহৎ কিছু আশা করা বৃথা। তার চেয়ে নিজের ঘর-সংসারের মূল্য অনেক বেশী।

ক'টা টাকা চেয়েছিল পশুপতি। তার নিজেরই দেওয়া টাকা থেকে চেয়েছিল সেটা। দেয়নি মেনকা। খুব সুন্দর ভঙ্গীতে বলেছিল, 'এখন পেলে এখুনি মদের বোতল কিনে উড়িয়ে দেবে, কাল নিও।'

শুনতে ভালো লাগলে কী হবে, আসল কথাটা বুঝতে পেরে সেই মুহূর্তেই পশুপতির মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। পাকা ব্যবসায়ী মেনকা। যে পয়সা হাতে পেয়েছে, তার একটিও কোন কারণে হাতছাড়া করবে না। তাই মিষ্টি কথার প্রলেপ দিয়ে ওই কথা ক'টি ছুঁড়ে মেরেছিল ওর দিকে।

সেদিনই সেখান থেকে ফিরেছিল। আজ আবার চলেছে। এই ক'বছরে হয়ত ওখানকার ইতিহাস-ভূগোলের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সে সব পাত্র-পাত্রীও বোধ হয় নেই। মহাকালের অপ্রতিরোধ্য গতির কাছে সবাইকেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। যেমন সে নিজেও করেছে। এই ক'বছরে বলতে গেলে পশুপতি তো বুড়োই হয়ে গেছে। আর ওদের যৌবন ফুরিয়ে গেলেই তো ব্যবসা বন্ধ। তাই হয়ত গিয়ে দেখা যাবে গোটা পরিবেশটাই হয়ত অন্যরকম হয়ে গেছে।

গলির মোড়ে রামনারায়ণের দোকান।

—'পান দাও হে।' বলে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো পশুপতি। রামনারায়ণের পানের দোকানটা বলতে গেলে ঠিক আগের মতই আছে। এদিক-ওদিক সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু চিনতে কোন অসুবিধে হয় না। তাই পুরনো দিনের মত পুরনো সুরে পান চেয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তবে দোকানীর শারীরিক পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়। গোঁফ আগেও ছিল রামনারায়ণের, কিন্তু এখন তা আরো অনেকখানি দীর্ঘ হয়েছে, ফলে ওষ্ঠদ্বয় সেই শ্মশ্রুদ্বারা আবৃত। আরো খানিকটা আয়তন বৃদ্ধি হয়েছে শরীরের, কিন্তু এদিক-ওদিক চামড়া কিছু কিছু কুঞ্চিত হয়েছে। আরো দু-একজন খদ্দের ছিল, তারই ফাঁকে-ফাঁকে পশুপতি তার অনেকদিনের চেনা মানুষটিকে দেখল।

—'এই লিন বাবু পান।' দোকানীর কথার সুরে দোকানীসুলভ ভদ্রতা ছিল। বয়স অনুযায়ী বিনয়ের স্বাক্ষরও ছিল। কিন্তু পয়সা দিয়ে পানটা নিতে পশুপতি অদৃষ্টের পরিহাসের সন্ধান পেলো।

কেননা দোকানীর সার্বিক ব্যবহারে যে ধৃষ্টতা প্রকাশ পাচ্ছিল, তার সন্ধান পেয়ে পশুপতি যারপরনাই মর্মাহত হল। একে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়। একদা এই দোকানের অভিজাত-শ্রেণীর খরিদ্দারদের অন্যতম শ্রীপশুপতি হালদারকে এই দোকানী সেই একই ব্যক্তি রামনারায়ণ চিনতে পারল না। এমন কি ভালো করে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখল না। হ্যাঁ একে ধৃষ্টতা বলেই অভিহিত করতে চায় সে। শুধু কি তাই, চড়া সুদে টাকা ধার নিত না সে এই দোকানীর কাছ থেকে। যে চড়া সুদ যেকোন সুদখোরের কাছে অকল্পনীয় ব্যাপার বলে বিবেচিত হবে।

যাক এ নিয়ে আর এর বেশী মাথা ঘামাতে চাইল না সে। অযথা মন খারাপ করে কোন লাভ নেই। তাই পান চিবোতে চিবোতে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল সে। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে সোজাসুজি দৃষ্টিটা চালান করে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখন যেমন একটা আলোকোজ্জ্বল সরণিতে পরিণত হয়েছে, আলোর অভাবে তখন এতটা রূপসী ছিল না এ গলি। আলো-আঁধারীর মাঝখান দিয়ে পশুপতি এবং তার মত অন্য লোকেরা এ গলিতে যাতায়াত করত। এখন অনেক রকম লোক এ পথ দিয়ে যাতায়াত

এসব। আগে এ গলিতে প্রবেশ করতে অনেকের সংকোচ বোধ হত, এখন সব রকমের লোকে গিজগিজ করছে এ পথ।

সে এগুলো। সে বয়স নেই পশুপতির, যে বয়সে সে এখানে আসত মেনকার কাছে, এসে বসত। অথবা 'শরীরটা বিশেষ ভালো নেই'—এই অজুহাত তুলে মেনকার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ত। আর তার মাথার একঝাঁক কোঁকড়ানো চুলের গভীরে আঙুলসমূহ ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করত মেনকা। সে এতে বেশ আরামবোধ করত।

—'শরীরটার দিকে একটু নজর দাও।' এ কথাটা মাঝে মাঝেই বলত মেনকা।

—'শরীরটা আমার ভালোই আছে।' এ উত্তর পশুপতির।

আজ আবার এখানে এসেছে সে। একটু ঘুরে দেখে যেতে। আর কিছু নয়। প্রায় একযুগ আগে, মেনকার উপর মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল, উত্তেজিত মন তাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছিল। আর আসতে দেয়নি। সেই মনটা আজো বারবার রাশ টেনে ধরেছিল। পশুপতির এই অভিসার একটা আগ্রহমাত্র। অনেকদিন বাদে অতীত সম্বন্ধে নতুন করে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করা। গলির ভিতরে ঢুকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো এক জায়গায়। দাঁড়িয়েই একটু অস্বস্তি বোধ করল। না, এভাবে একটা জায়গায় এমন করে দাঁড়ানো উচিত নয়। কত রকমের লোক এখানে, কিছু একটা ভাবতে পারে। তাই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে একটা ধরালো। সিগারেটের প্রতি এখন আর তার তেমন আগ্রহ নেই। আগে তিন-চার প্যাকেট লাগত দিনে, এখন এক প্যাকেটও লাগে না।

পানের সঙ্গে সিগারেটের স্বাদ এ গলিতে তাকে সত্যি সত্যি অনেক কথা মনে করিয়ে দিল। সেই একযুগ আগের মধুময় স্মৃতি। সে আবার এক পা এক পা করে এগুতে লাগল। আরেকটু এগিয়ে দেখল, বাঁদিকে মেঘলালের দোকানটা ঠিকই আছে। মুদি দোকান। কিন্তু নটবরের তেলেভাজার দোকানটা নেই। আগে এখানে এলে তেলেভাজার গন্ধটা নাকে লাগত। লোকটা গেল কোথায়? একেবারে দোকানসহ উধাও। বেশ বেচাকেনা হত। পশুপতি নিজেও মাঝে মাঝে এ দোকানের খদ্দের হত। মেঘলাল কিন্তু ঠিকই রয়েছে। তার সঙ্গে অবশ্য পশুপতির কোন বেচাকেনার সম্পর্ক ছিল না। তবে যেতে আসতে দেখা হত। নিত্যদিনের দেখাশোনার মধ্য দিয়ে যেটুকু সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটুকুই ছিল।

যেতে যেতে একটা বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো সে। বলল 'রেবতী আছে?

—'রেবতী! গোটা তিনেক মেয়ে গা ঢলাঢলি করে খিল-খিল হেসে উঠল। বিরক্ত হওয়ার কারণ দেখা দিল পুনরায়। পশুপতিকে এখানে এখন আর কেউ চেনে না, তাই। তাই হয়ত এই মেয়েগুলির এ ধরনের অসম্মানজনক ব্যবহারের কোন উত্তর দেওয়া যাবে না। পশুপতি নিরুত্তর থাকল। আরেকবার বাড়িটার দিকে তাকালো। হ্যাঁ, এটা রেবতীরই বাড়ি ছিল। রেবতী হয়ত নেই। না থাকতে পারে। কিন্তু এমন ব্যবহারের কারণ কী? পশুপতি এগুলো।

—'আরে বাবু আপনি?' চমকে উঠল পশুপতি। দেখল, সেই পুরানো দিনের রিক্সাওয়ালাটা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। একমুখ হাসি। সামনের দাঁত ক'টা নেই বলে রিকসাওয়ালার হাসিতে একটা কু-দৃশ্য অবলোকন করে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল। বলল, 'কেমন আছিস?'

—'ভালো বাবু।'

সে আবার এগুতে গেলে রিকসা-ওয়ালার ডাক শুনে আবার ঘুরে দাঁড়ালো। রিকসাওয়ালা বলল, 'আমি এখানেই আছি বাবু, যাবার সময় নিয়ে যাব।'

উত্তরে কোন কথা বলল না সে। কথাটা শুনল তার। কী যেন নাম ছিল এর এখন ভুলে গেছে পশুপতি। এই রিকসাওয়ালাটা অনেকদিন অনেক উপকার করেছে। এরই রিকসায় চড়ে অনেকদিন অনেক রাতে ফিরেছে সে, বাড়ির কাছাকাছি একটা মিষ্টির দোকানের সামনে নেমে এরই হাতে মেনকার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। পয়সা না থাকলেও রিকসায় উঠতে বাধা দেয়নি কোনদিন। পরে দিলেও চলত। দিয়েছেও পরে। খুসী করেই দিয়েছে।

অনেকক্ষণ বাদে মনটা খানিক প্রফুল্ল হল। এই রাজ্যে, তার এই ছেড়ে যাওয়া রাজ্যের অন্তত একজন নাগরিক দীর্ঘদিন বাদেও তাকে মনে রেখেছে। সবাই ভুল করে না। রামনারায়ণের মত বেইমান নয় সবাই। ওরা পথের গরীব হলে কী হবে, একটা মনুষ্যত্ব গোপনে ওদের ভিতরে ঠিক আছে।

একটু হাওয়া লাগল তার গায়ে, গলি-পথে ছুটে এসেছে হাওয়া, বেশ শীতল ও আরামদায়ক। এখানে আর কোনদিন আসার কথা ছিল না তার। প্রতিজ্ঞা করেই একদা এখান থেকে বিদায় নিয়েছিল। নিজস্ব সমাজ সংসারে ফিরে গিয়ে স্থায়ী হয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে মনে পড়ত সব কথা।

সেসব কথা মনে হলেই মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ত।

কিন্তু একথা তো সত্যি যে, মেনকা তাকে খুবই ভালোবাসত। যে ভালোবাসার লোভে ক্ষুধা তৃষ্ণা বুকে নিয়ে পশুপতি এখানে ফিরে আসত। বিকেল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এখানে কাটিয়ে যেত। সেইসব সুখ-শান্তির দিনগুলি এখন বিলুপ্ত।

—'একটু দেখেশুনে যেও।' রাত্রে বেরোবার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেতে যেতে বলত মেনকা।

—'কেন কী হবে?'

—'হবে না, তবে হতে আর কতক্ষণ।'

পশুপতির ভালো লাগত এটুকু। এ কথায় একটা আন্তরিকতা ছিল। বেশ একটা মনের টান। যেটা অনুভব করত সে। একবার শরীর খারাপ হয়েছিল তার। মেনকা দুধ রেখে খাইয়েছিল তাকে। অনেকদিন পর্যন্ত তাকে দুধ খাইয়েছিল। ব্যাপারটায় সে খুবই আনন্দ পেয়েছিল। যদিও মাসের শেষে দুধের দামটা তাকেই শোধ করে দিতে হয়েছিল, তবু সেই আন্তরিকতার মূল্য যে অনেকখানি, তা আজো, অনেকদিন বাদেও মনে মনে স্বীকার করে সে।

কিন্তু এখনকার বক্তব্য তার তা নয়, এখন সে জানতে চায় মেনকা গেল কোথায়? দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে এখানকার গোটা ইতিহাস ভূগোলের সবটাই একেবারে পালটে গেছে।

এই বাড়ি! ক্রমশঃ এগুতে এগুতে একসময় থামল পশুপতি। হ্যাঁ, এই সেই বাড়ি। একদা এই বাড়িতে প্রবেশ ছিল তার বিজয় সমারোহের সমতুল্য। আজ এখন এখানে এসে দাঁড়িয়েছে এক অপরিচিত আগন্তুকের মত। পাড়ার পানের দোকান থেকে আরম্ভ করে মায় রিকসাওয়ালা পর্যন্ত ছিল একরকম অনুগত। আজ সেই সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, বিবর্ণ বিদ্বেষপূর্ণ। অন্ততঃ তার কাছে। আজ যারা এ পল্লীর নতুন নাগরিক, আজ যারা এখানে প্রতি সন্ধ্যায় রূপসীর সাজ সেজে বসে নাগরের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে নব আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র জনপদ হয়ত একান্ত প্রয়োজন এবং সুসংগত কিন্তু সেদিন এসব ছিল না, এখানে এলে মানুষের আত্মার তবু খোঁজ পাওয়া যেত।

—'মেনকা আছে?' সংযত ও কোমলকন্ঠ হল পশুপতি।

মেয়েটি ঘরে চুনকামের মত পুরু পাউডারের প্রলেপ দিয়েছিল মুখে। চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল। মেয়েটি ঠোঁট উল্টে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'কী জানি বাবা তোমার কোন মেনকা, জানি না।' তখুনি এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু গেল না সে। দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটি আরেকটু এগিয়ে এলো তার কাছে। বলল—'ঘরে গিয়ে বসবে।'

চমকে উঠল পশুপতি। এখানকার ইতিহাস পাল্টায় না। পুনরাবৃত্তি ঘটে, কেননা, একই আকাশের নীচে সেই একই পল্লী। কেউ হয়ত চলে গেছে, তার জায়গায় নতুন লোক এসে জুটেছে। এই যা তফাৎ। দিনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে পার্থক্যটুকু তো প্রকাশ পাবেই।

বুঝতে পারল মেনকা নেই। এই এমনি না থাকাটা পশুপতিকে যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত করল। বিমর্ষ হল। ঠিক সেই সময় পাশের দরজায় দন্ডায়মান আরেকটি মেয়ে এ মেয়েটিকে ডেকে বলল, 'কি লো বোকা তুই, দাদুকে ধর না, ঘরে নিয়ে বসতে দে।'

মুহূর্তে কেমন একরকমের ঘৃণায় আবিষ্ট হয়ে গেল সে। মেয়েটির বক্তব্য পুরোটাই তার কানে গেল। এবারে ফিরে যাওয়া উচিত এখান থেকে। একথা ভেবে সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে অনুভব করল পা দুটো কাঁপছে। তবু জোর করে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল রেবতী অদূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। রেবতীর দিকে তাকাতে লজ্জা করছিল তার। শতছিন্ন ময়লা পোষাকে রেবতীকে পাগল বা ভিখারীর মত মনে হচ্ছিল। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পুনরায় চলা সুরু করতেই রেবতী প্রায় দৌড়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী ভায়া, আবার এসেছ এই দরজায়, কেন এসেছ, কী দরকার তোমার, আর এখন এই নোংরা পাড়ায় কী তোমাকে মানায়?' বিক্ষিপ্ত চাবুকের ঘা পড়ল পশুপতির চোখে-মুখে। পথের দুদিকের আলোসমূহ সহসা ঝাপসা হয়ে গেল। এখানকার একটি বাড়ির মালিক এবং একদা মেয়েমানুষের ব্যবসায়ী শ্রীরেবতীভূষণ দাস আজ ভিখারীর বেশে দাঁড়িয়ে তাকে তীক্ষ্ণ কথার ঘায়ে জর্জরিত করছে। একদা একসঙ্গে বসে রেবতীর সঙ্গে বহু বোতল নিঃশেষ করেছে, তারপর এখান থেকে ফিরে গিয়ে পশুপতি বেঁচেছে। কিন্তু যাবার উপায় ছিল না বলে রেবতী এখানে থেকে মরেছে। বোধহয় বাড়িটাও রেবতীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। কোনরকমে গলার স্বর বার করে সে বলল, 'সেই মেনকা?'

—'নেই, মরে গেছে, ডোমেরা নিয়ে গেছে, আমার নিজের চোখে দেখা সব।'

শুনে খুশী হলো পশুপতি? নিজের ভিতর থেকে নিঃশব্দে উত্থিত নিজের কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলো সে। না, না মোটেই খুশী হইনি। বাতাসে আন্দোলিত হল তার মাথাটা, কেননা পা দুটো তখন তার অসাড় হয়ে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করল, ঘাড়, গলা এবং মুখাবয়ব থেকে ঘাম মুছল। গালের কোণে জমে থাকা পানের দলাটা থু-থু করে ফেলে দিল। আবার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল রেবতী নেই। অতিকষ্টে পা বাড়ালো ফেরার উদ্দেশ্যে।

রিকসাওয়ালাটা তৈরী হয়েই ছিল। জানা ছিল যেন তার সব। এ বাবু তার অনেকদিনের পরিচিত। কিন্তু পশুপতির চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। সে দেখতে পেলো না রিকসাওয়ালাকে। হাত-পায়ের জোর কমে গিয়েছিল বলে হয়ত চলার গতিতে এতটা বেহুঁস মাতাল ভাব ছিল। সেই কতদিন আগের কথা। রিকসাওয়ালার সব মনে পড়ে গেল। সে ডাকল। পশুপতি শুনতে পেলো না। তাই সে ছুটে গিয়ে পশুপতিকে ধরে এনে রিকসায় বসিয়ে দিল। তারপর টুংটাং আওয়াজ তুলে চলতে সুরু করল।

পশুপতি নির্বাক হয়ে সব মেনে নিল। সে মদ খায়নি। তবু রিকসাওয়ালা তাকে মাতাল ভেবেছে। বেশ করেছে। আবার সে রিকসায় চড়ে এপাড়া থেকে বেরুলো। মন্দ নয়। সেই পুরনো দিনের একটা ছবি অন্ততঃ জীবন্ত হল। কিন্তু মেনকা নেই। তাকে ডোমেরা নিয়ে গেছে। রেবতী দেখেছে সব। বুকে একটা ব্যথা অনুভব করল। নিজের হাতে নিজের বুকটা বুলোতে লাগল। উফ—বলে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

এভারেস্ট বিজয়ীদের গ্রাম

কিরণশংকর মৈত্র

যদি কেউ শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এর ছোট ট্রেনে ওঠেন—তবে সুকনো-রংটং-চুনাভাটি - তিনধরিয়া - গয়াবাড়ী - মহানদী ছাড়ালেই এসে পড়বেন কার্শিয়াং-এ। এখন শীতের দিনে সুকনা ছাড়িয়ে রংটং-এর দিকে এগোলেই বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগবে। যদি ফগে ঢাকা না থাকে ভালো লাগবে পাগলাঝোরা-চুনাভাটির তিনধরিয়ার। বেশী উৎসাহী হলে পাহাড়ের ধারে রাস্তায় নেমে জোড় মোড় নিয়ে এলে, আবার ওঠা চলে। ট্রেন যতো সামনের দিকে এগোয় উচ্চতা ততই বাড়তে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতর হয় হিমের স্পর্শ। কার্শিয়াং এলে রেলোয়ে স্টেশনের টিনের শেডে দেখা যায়—সমুদ্রতল থেকে এখানকার উচ্চতা ৪,৮৬৪ ফুট। এখান থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব সাড়ে উনত্রিশ মাইল, দার্জিলিংয়ের সাড়ে কুড়ি।

'কার্শিয়াং' শব্দটি লেপচা। এর অর্থ হলো—'সাদা অর্কিড' (নেপালীতে যাকে বলা হয় 'সুনখোর'). আর কার্শিয়াং হলো সাদা অর্কিডের দেশ। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলোয়ে ১৮৮০ সালে সর্বপ্রথম কলকাতার সঙ্গে সরাসরি রেলপথে কার্শিয়াং-এর যোগসূত্র স্থাপন করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট ম্যাপে কার্শিয়াং অনুজ্জ্বল। কিন্তু যথার্থ প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে দার্জিলিং-এর তুলনায় কার্শিয়াং-এর সৌন্দর্য শূন্যে নয়, বরং কখনও কখনও মনে হতে পারে অধিকতর আকর্ষণীয়। আর কার্শিয়াং দার্জিলিংয়ের মতো নয় উঁচু এবং উন্নাসিক, নয় ব্যয়বহুল এবং কম শীতের আধিক্য।

টাইগার হিলের সূর্যোদয় বিশ্বখ্যাত, কিন্তু কার্শিয়াং-এর দূরবীন পাহাড়, Eagle's Crag নামে যার খ্যাতি (এবং স্থানীয় লোকেরা যাকে বলেন 'দূরপীন ডারা') থেকে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের দৃশ্যও কম মনোরম নয়। শীতের শেষ প্রহরে সূর্যদেব সবসময় দেখা দেন না, কিন্তু ভোরের দিকে, ভাগ্য খুবই খারাপ না হলে তিনি অদৃশ্য রইবেন না। পাঁচ হাজার ফুটের উচ্চতায় দূরবীন পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা যাবে বালার্কের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব, আবার অপরাহ্নে গাঢ় কিন্তু স্নিগ্ধ পিঙ্ক রঙের গোলাকার এক অপার্থিব বস্তু—যা চোখের সামনেই হঠাৎ দূরে পাহাড়-প্রকৃতির ক্যানভাসে আধুনিক চিত্রকলার দুর্বোধ্য রঙ-রেখার মধ্যে ডুবে যায়। দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে প্রথম প্রণয়ের ব্যর্থতার বেদনা অনুভব করবেন।

তরুণ রবি তার প্রথম আলোর সোহাগ-স্পর্শে রূপসী কাঞ্চনজঙ্ঘাকে করেন আরক্তিম। যদি দিনদেব বদান্য মেজাজে থাকেন ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্শিয়াং-এ পাবেন অবারিত উজ্জ্বল আলোক। তখন প্রভাত-মধ্যাহ্ন-অপরাহ্ন-সায়াহ্ন — প্রতি প্রহরে কাঞ্চনজঙ্ঘা বিচিত্র বর্ণ-রঙ-রূপ-রসে দেখা দেয়। কখনো অলকানন্দানিন্দিত শুভ্রাবরণে, কখনো রহস্যের অস্পষ্ট আভাসে, কখনো ইন্দ্রাণীর মহিমায় দীপ্ত কাঞ্চনবর্ণে। আবার নিশীথে নির্মেঘ নীলিমার ছায়াতপে হীরক-হারে স্বচ্ছসূক্ষ্ম মেখলায় উর্বশী। কিন্তু শীতের দিনে যদি বর্ষারাণী সহসা আবির্ভূত হন—কার্শিয়াং ফগ কুয়াশায় আপনাকে আবৃত রাখবে গম্ভীরা গ্রামিকার মতো, আর কিছুতেই অবগুণ্ঠন ঘোচাবে না দর্পিতা কাঞ্চনজঙ্ঘা।

Eagle's Crag থেকে চোখ পড়বে শহরের উপরে ডাওহিলের দিকে। ডাওহিলের চুড়ো ফারগাছের সবুজ সারিতে সাজানো, তার ওপর ফগের আলিম্পন, কখনও কখনও লেপে-মুছে একাকার। ডাওহিলের ঝোরাগুলি শহরের জলসরবরাহের উৎস। উঁচু ডাও-হিলের ওপর উঠতে উঠতে পা ভেঙে আসবে, ইচ্ছে করবে রাস্তায় বসে পড়তে। কিন্তু শহর থেকে আট-নশ ফুট ওপরে উঠে ফার-পাইন আর নানা ধরনের ঋজু-গাছের জগতে গেলে মনে হবে—কী আশ্চর্য! হঠাৎ এ কোন্ স্কটল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে এসে পড়লেন! কিছুতেই মনে হবে না পশ্চিমবঙ্গের কোনো অংশ এটা। যদি জানাশোনা থাকে ডাওহিলের ফরেস্টস্কুল দেখে যাবেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার যার পরিচালনা করেন। ফরেস্টস্কুলে রয়েছে বন-সম্পদের নমুনাসমৃদ্ধ ম্যুজিয়ম। ফরেস্ট রেঞ্জারের চেয়ে নিম্নপদের কর্মীদের বন-বিষয়ক বিভিন্ন কর্মে হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালে এর প্রতিষ্ঠা।

অবাক হবেন এই পাহাড়ের ওপর নিবিড় শ্যামল-স্নিগ্ধ-অঙ্গনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনায় আরো দুটি স্কুল দেখে—মেয়েদের ডাওহিল হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল আর ছেলেদের ভিকটোরিয়া। পাশ্চাত্যের উন্নত পাহাড়ী স্কুলগুলির কথা মনে পড়ে যাবে। ডাওহিল থেকে নামবার আগে একবার দৃষ্টি ফেলে যান এস বি দে টি-বি স্যানাটোরিয়ামের ওপর। দার্জিলিং জেলায় এটাই বড় টি-বি স্যানাটোরিয়াম। পশ্চিমবঙ্গবাসীর অনেককে হয়ত কখনও কখনও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে এটিকে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতে হয়।

শহরের হিলকার্ট রোড দিয়ে এগোলে আরো কয়েকটি স্কুল আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভালো লাগবে জেসুইট ফাদারদের পরিচালিত সেন্ট আলফনসাস হাইস্কুলের বিল্ডিংটি, মুগ্ধ করবে মেয়েদের সেন্ট হেলেনস্ কনভেন্ট। এটা অবশ্য হিলকার্ট রোড থেকে একটু ওপরের দিকে, পাহাড়ের গায়ে। কার্শিয়াং থেকে আর একটু এগিয়ে দু মাইল দূরে ছেলেদের গোথেলস্ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল। পরিচালনা করেন আইরিশ ব্রাদার্স। গোথেলস স্কুলের খ্যাতি সুদূরপ্রসারী। এখানকার ফুটবল গ্রাউন্ডটি স্কুলের মর্যাদা বাড়িয়েছে, কারণ পাহাড়ী অঞ্চলে এমন বিস্তৃতির প্লেগ্রাউন্ড দুর্লভ। তাই কার্শিয়াং স্কুলগুলির প্রতিযোগিতা-মূলক খেলাগুলি এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।

এই সমস্ত স্কুলগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী। একমাত্র সেন্ট আলফনসাস ছাড়া অন্য সবগুলিই অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। একজন ছাত্রের মাসিক খরচের পরিমাণ যে-কোনো নিম্নবিত্ত পরিবারের মাসিক ব্যয়ের প্রায় সমতুল।

গোথেলস স্কুলের দিকে যাবার পথে সেন্ট আলফনসাস ছাড়িয়ে একটু পরেই ডানদিকে চোখ রাখলে দেখতে পাবেন একটি ঝোরা, নাম তার হুসেনখোলা (খোলা —ধারা, Spring)। বেশ উঁচু থেকে ঝর্ণার ধারা নেমে আসছে নীচে। তার মধ্যে পাগলাঝোরার উন্মাদনা নেই, আছে উচ্ছল ঝর্ণার চিন্ময় ছন্দ। কার্শিয়াং-এর মুসলমান অধিবাসীরা মহরমের [illegible]

ঘুম-এর বিখ্যাত বৌদ্ধ মনাসটারি
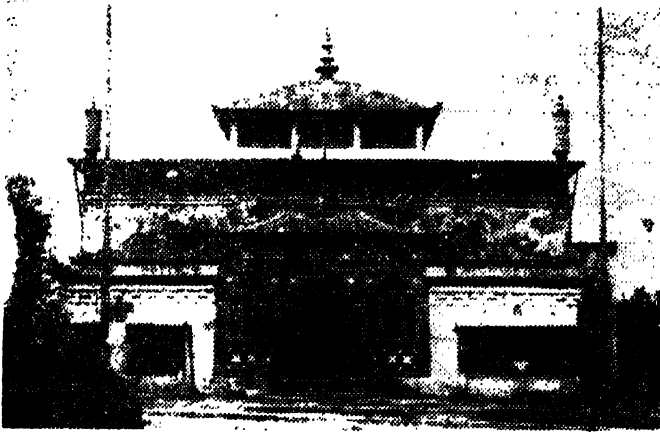
হোসেনের 'তাজিয়া' হুসেনখোলায় মাটির নীচে কাফন দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে আসছেন। হুসেনখোলায় বড় বড় গাছের মাথায় এপারে-ওপারে তিব্বতী-সিকিমী-ভুটানী-তামাঙ-শেরপা প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বেঁধে দেওয়া বহু কাপড়ের টুকরোও (যাকে বলা হয় 'লুংগ-থার') দেখতে পাবেন, হাওয়ায় উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। 'লুংগথার'—বস্ত্রখন্ডগুলিতে বৌদ্ধ প্রার্থনা লিপিবদ্ধ : ওঁ মণিপদ্মে হুম্‌, ওঁ বজ্রগুরু পেমাসিদ্ধি হুম্‌, ওঁ বজ্রপানি হুম্‌...., আর সেই সঙ্গে ব্যক্তির মঙ্গলকামনা, সমষ্টির মঙ্গলকামনা। হাওয়ায় হাওয়ায় সেই শুভ-প্রার্থনা ভেসে যাচ্ছে দূরে দূরান্তরে।

হুসেনখোলা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে ওপরে উঠে গেলে পাবেন সেণ্ট ম্যারীজ বস্তি। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই খ্রীস্টান। বিরাট গ্রন্থাগারসমৃদ্ধ এখানকার সেণ্ট ম্যারীজ কলেজে ছিল ক্যাথলিকদের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা। সম্প্রতি এই কলেজটি এখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত। সেন্ট ম্যারীজ বস্তিতে একটি হোমসায়ান্স কলেজের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

গোথেলস স্কুল ছাড়িয়ে দার্জিলিং রোড দিয়ে আর খানিকটা এগোলে ক্যাথলিকদের ধর্মশিক্ষার আর একটি প্রতিষ্ঠান, স্যালেসিয়ান কলেজ (Solsian college) শুধুমাত্র ক্যাথলিকদেরই এখানে প্রবেশের অধিকার, যথাযোগ্য শিক্ষাক্রমের পর তারা 'ব্রাদারহুড' বা 'ফাদারহুড' উপাধির যোগ্যতা লাভ করেন। কিছুদিন হলো কলেজটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে বি-এ অবধি পাঠক্রমের। কিন্তু একমাত্র ক্যাথলিক শিক্ষার্থীরাই এই সুযোগ গ্রহণের অধিকারী।

হিলকার্ট রোড ধরে উঁচুর দিকে না গিয়ে এবার পেছন ফিরে পাংখাবাড়ীর দিকে চলুন। পাংখাবাড়ীর দিকে যেতে যেতে এই ছোট্ট শহরটির মন-ভোলানো মায়া রূপ আপনার চোখে পড়বে। রাস্তার দু পাশে উঁচু-নীচু পাহাড়ে দেখবেন চায়ের বাগান : মর্গেটউড টি-এস্টেট, সিঙ্গেল টি এস্টেট, তার মাঝে মাঝে ছবির সৌন্দর্যে স্থির সুঠাম ফারগাছগুলি। স্প্রিংসাইড টি এস্টেট ছাড়িয়ে যদি আমবুটিয়া টি এস্টেট-এর নীচে নামতে রাজী হন—শীতের প্রহরে আপনার মুগ্ধদৃষ্টির সামনে দেখা দেবে কমলালেবুর বাগান—সবুজ গাছগুলি রাঙা ফলের উপহারে সমৃদ্ধ। ইচ্ছে করলে কিনে খেতে পারেন। আমবুটিয়া বস্তি থেকে ডোকো ভর্তি করে নেপালী মেয়ে-পুরুষ কার্শিয়াং-এর বাজারে নিয়ে আসে বিক্রি করতে। আমবুটিয়ার পাহাড়ের ঐ ধারে যেতে কষ্ট হতে পারে। ওখানে পর্বত-প্রকৃতির নির্জন হৃদয়ে রয়েছে লক্ষাধিক অর্থব্যয়ে নির্মিত একটি শিবমন্দির। পুরোহিত রয়েছেন দেব-সেবার জন্যে।

পাংখাবাড়ীর রাস্তা বাঁ দিক দিয়ে যেখান থেকে বেঁকে নীচে নেমে গেছে শিলিগুড়ির দিকে—ঠিক তার সামনেই পাহাড়ের উঁচু টিলায় কনসট্যানশিয়া বিল্ডিং ((Constantia Building))। এটি আগে ছিল একটি নামকরা হোটেল যখন পাংখাবাড়ী রোডের নাম ছিল ওল্ড মিলিটারি রোড, ঘুমের সঙ্গে এখনও রয়েছে এর যোগ। যখন ট্রেনলাইন হয়নি—তখন এই ওল্ড মিলিটারী রোডই ছিল সমতলের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। এখনও প্রচন্ড বর্ষায় শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং-এর হিলকার্ট রোডের উপর landslide হলে পাংখাবাড়ী রোডই শিলিগুড়িতে যাওয়া-আসার একমাত্র সড়ক হয়ে ওঠে। অবিশ্যি যাতায়াতের পথে পাংখাবাড়ীর এই পাহাড়ী রাস্তার চড়াই-উৎরাই আর বাঁকগুলি দেখে হৃৎকম্প হতে পারে। উচ্চতায় ঈগলস ক্রাগ-এর দোসর কনসট্যানশিয়া থেকে নীচের দিকে তাকালে দেখা যায় কালো সাপের মতো একটা সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে মারাত্মকভাবে সমতলের দিকে চলে গেছে।

১৮৭৯ সালে এই কনসট্যানসিয়াতেই প্রথম ভিকটোরিয়া বয়েজ স্কুলের পত্তন হয়, পরে এটি পরিণত হয় মহকুমা শাসকের বাংলোতে, এখন এখানে আকাশবাণী কার্শিয়াং-এর ট্রান্সমিটার। রাতের অন্ধকারে অতি দূর থেকেও চোখে পড়বে ট্রান্সমিটারের উঁচু মাস্টের রক্ত চক্ষু। তখন কনসট্যানশিয়া অথবা কনসট্যানশিয়ার কাছাকাছি, পাংখাবাড়ীর উঁচু রাস্তা থেকে সমতলভূমির দিকে তাকালে চোখে পড়বে আলোকোজ্জ্বল শিলিগুড়ি-নিউজলপাইগুড়ি শহরের অপরূপ দৃশ্য, আর এদিকে দেখবেন রাতের কার্শিয়াং শহরের পায়ে-কটিদেশে-কণ্ঠে-শিরে আলোকমালার অলঙ্কার। যদি আপনার অতীত অভিজ্ঞতা থাকে, মনে পড়বে শৈলশহর মুসৌরী থেকে সমতলের দেরাদুন শহরের দৃশ্য।

পাংখাবাড়ী থেকে ডানদিকে চোখে পড়ে বালাসন নদী, পাহাড়ের পায়ের কাছ থেকে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। লোকেরা পিকনিকে যায় বালাসনের তীরে, বেশী উৎসাহী হলে নিপুণ মৎস্য-শিকারীরা এখানে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন, শোনা যায়—হরিণ-বরাহ ও কখনো কখনো মেটায় মৃগয়া-বিলাস।

কার্শিয়াং রেলোয়ে স্টেশন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে একটু দূরেই গিদ্দা পাহাড় (গিধর পাহাড়)। গিদ্দা পাহাড় এক বৃহৎ প্রস্তরখন্ড মাত্র, ওপর থেকে মনে হয় বিরাট এক শকুনের মতো। নামে তারই স্মৃতি। এখানে বটগাছের নীচে রয়েছে প্রাচীন দুর্গামন্দির, আর একটু ওপরে রামমন্দির। গিদ্দা পাহাড়ের রামনবমীর মেলা বিখ্যাত। দূরদূরান্তের লোকেরা এসে ভীড় জমায় তখন।

নেতাজী অগ্রজ শরৎচন্দ্র বোসের গিদ্দা পাহাড়ে একটি বাড়ী আছে। এখানে নেতাজী সুভাষ ছুটির বহু অবকাশ কাটিয়েছেন। একবার অন্তরীণ হয়েও ছিলেন এখানে।

গিদ্দা পাহাড়ের অনতিদূরে (শিলিগুড়ি যাবার পথে) তিনধারিয়া রেলোয়ে স্টেশন ও ওয়ার্কশপ। এর কাছাকাছি হলো উদ্দাম উচ্ছল বিশাল পাগলাঝোরা—যা রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করেছিল। ১৩১৭ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে তিনধরিয়া অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলির' দশটি বিখ্যাত গান রচনা করেছিলেন। এই গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'মেনেছি হার মেনেছি', 'কবে আমি বাহির হলেম', 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে', 'চিত্ত আমার হারালো আজ' 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী', ইত্যাদি। (গীতাঞ্জলি গ্রন্থের ৬৩ সংখ্যক গান থেকে ৭৪ সংখ্যক গানগুলি তিনধরিয়া অবস্থানকালে রচিত।)

দার্জিলিং জেলার অন্যতম মহকুমা কার্শিয়াং-এ * দুটি থানা : মিরিক ও কার্শিয়াং। মিরিকের জনসংখ্যা ২১,৬৪৬ আর কার্শিয়াং থানার ৩৭,৪৫১। এর মধ্যে কার্শিয়াং ম্যুনিসিপ্যাল এলাকার লোকসংখ্যা হলো : পুরুষ ৭,২০২ আর মহিলা ৬,২০৮। সব শুদ্ধ ১৩,৪১০। (১৯৭১-এর সেনসাস এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ষোলো হাজারে।)

সমগ্র কার্শিয়াং থানার জনসংখ্যার মধ্যে বৌদ্ধ ১৭-৬৮ শতাংশ, খ্রীস্টান ২-৬৩

* আরেকটি মহকুমা হলো কালিম্পং।

শতাংশ, হিন্দু ৭৮-৯৬ শতাংশ, মুসলমান ১-৬২ শতাংশ। আর শিক্ষার হার গ্রামে—২৬ শতাংশ, শহরে ৫৩-৩ শতাংশ।

কার্শিয়াং শহরের এলাকা ১-৯৫ স্কোয়ার মাইল জায়গা নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই পরিসংখ্যানগুলি সবই নেওয়া হয়েছে ১৯৭১-এর সেনসাস থেকে।

ছোট্ট কার্শিয়াং শহরে হিন্দুদের মন্দির রয়েছে (আশ্চর্যের কথা কালীবাড়ী নেই), রয়েছে বৌদ্ধদের মনাস্টারি, খ্রীস্টান-দের গির্জা আর মুসলমানদের মসজিদ।

এখানে সংখ্যাধিক্য নেপালীদের, তারপর চোখে পড়ে বাঙালী ও বিহারীদের। রাস্তায় দেখবেন তিব্বতীয়, সিকিমী ও ভুটানী নারীপুরুষ। দীর্ঘদেহী তিব্বতী-দের সহজেই চোখে পড়ে।

যদি শীতের শেষে (বসন্তপঞ্চমীর কাছাকাছি সময়ে) বৌদ্ধ-তিব্বতী-সিকিমী-ভুটানী-শেরপাদের নববর্ষ উৎসব 'লোসারের' সময় আসেন—দেখতে পাবেন ওদের উৎসবের বিচিত্র রূপ। মজা লাগবে রাতে উজ্জ্বল আলোকমালা শোভাযাত্রার মধ্যে ময়ূরনৃত্য, ভালুকনৃত্য বা ড্রাগননৃত্য দেখে।

নেপালীরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে পরিশ্রমী. এরা ধর্মপরায়ণ, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি এদের মধ্যে নেই। নানা ধর্ম মতের মানুষ এই পাহাড়ী এলাকায় অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে এবং দেখে অবাক হবেন—অস্পৃশ্যতা এখানে অনুপস্থিত।

নেপালী মেয়েরা পাশ্চাত্য রমণীর মতো স্বাধিকারপ্রমত্তা। প্রেমজ বিবাহ, বিবাহপূর্ব মেলামেশা, পরিবারের আবে-ষ্টনী এবং নারীপুরুষের স্বচ্ছন্দ সাহচর্যে তার পরিচয়। যেমন অন্তরঙ্গে তেমনি বহিরঙ্গে চোখে পড়ে উৎসব-অনুষ্ঠানে, যানবাহনে, রাস্তাঘাটে কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতি-বেশী কনকচাঁপা নেপালী মেয়েদের সাব-লীল বিচরণশীলতা। শাড়ী ছাড়াও তাদের পরণে রয়েছে বিচিত্র বর্ণের পোশাক ঃ হালের লুঙ্গি, মিনিস্কার্ট, স্ল্যাকস, বেল-বটম ইত্যাদি।

শীতের দিনে সকালের দিকে দেখা যায় ল্যান্ডরোভার আর জিপে রঙিন কাগজ লাগিয়ে, মাইকে চলতি চটুল হিন্দীফিল্মী গান বাজিয়ে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে তারুণ্যের উদ্দাম আনন্দে পিকনিক করতে যাচ্ছে।

কার্শিয়াং-এর জীবনে খুব উত্তেজনা নেই, আছে সহজ সাধারণ মনের উচ্ছল আবেগ। সাধারণত নেপালীরা জীবনের আপাত আনন্দ, লঘু কৌতুকের অনুরাগী। বহি-রঙ্গের রূপে-রসে বেশী আকৃষ্ট বলে জীবনের গভীরে বিচরণের অনীহা অনেক সময় স্পষ্ট। সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। তাই দেখা যায়—অতি সীমিত-সম্পদ নেপালীও আপন গৃহটিকে সুন্দর, সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেষ্ট। হিমালয়ের আপনজন এই পাহাড়ী মানুষগুলি সাধারণত সরল বিনয়ী ও বিশ্বাসী। রাজনীতিকে যাঁরা ভয়ের চোখে দেখেন তাঁরা মনে-প্রাণে কামনা করেন—রাজনীতির গরল যেন হিমালয়ের পাদদেশের এই শান্ত জনপদকে বিষিয়ে না-দেয়।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে, প্রচণ্ড শীতের জন্যে উক্ত মাদক পানীয়ের ব্যবহার এখানে বেশী। প্রতিবেশী রাজ্য থেকে আনার সুবিধে থাকলে দামেও কম।

কার্শিয়াং-এ বছরে ছ মাসের বেশী সময়েই বৃষ্টি। মার্চে শুরু হয়ে অকটোবরে স্তিমিত হয়ে আসে। বৃষ্টিপাতের দিক দিয়ে কার্শিয়াং চেরাপুঞ্জীর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে এবং সম্ভবত খুব পেছনে পড়ে নেই। ১৯৬১-এর সেনসাস অনুযায়ী এখানে বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ১৬৫ ইঞ্চি। তবে শত বৃষ্টি হলেও এখানে রাস্তায় জল জম-বার সম্ভাবনা নেই, পায়ে লাগবে না এক ফোঁটা কাদা। আর শীতের ঋতুতে তো রাস্তাঘাট খটখটে, শত হাঁটলেও জুতো আপনার ধুলো-ময়লাহীন নিষ্কলঙ্ক। হিলকার্ট রোডের উপর দোতলা বাড়ীতে যদি থাকেন অথবা একটু ওপরে, জানালা খোলা থাকলে এখনও কোনো কোনো দিন ফগ ঢুকে যাবে আপনার অন্দরমহলে, বৃষ্টির দিনের হালকা মেঘের তো কথাই নেই।

বর্ষা আর শীত—এই দুই ঋতুরই প্রাধান্য কার্শিয়াং-এ। অকটোবরে যখন বর্ষণের পালা শেষ তখন আসরে আস্তে আস্তে অবতীর্ণ হন হিমরাণী, ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে তার প্রবল প্রতাপ হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। মার্চের শুরুতে যাই-যাই করেও তিনি যেন মায়া কাটাতে পারেন না এই পাহাড়ী অঞ্চলের। তাই বছর ভরেই এখানে গরম কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা ফুরোয় না। রূপ-প্রকৃতি-নাম—সব দিক দিয়েই কার্শিয়াং পশ্চিমবঙ্গের অনন্য শৈল-শহর।

শীতের দিনে পাহাড়ে ফোটে নানা ধরনের ফুল ঃ এন্টিনেরিয়াম, পোঞ্জি, ক্যালেনডোলা, ফ্লকস, সুইট পী, পিটু-নিয়া, ফিনেরিয়া, কালসেলোরিয়া। সেই সঙ্গে

আপন উপজাতীয় পোষাকে

ট্রাডিশনাল পোষাকে নেপালী রমণী

বৌদ্ধ-তিব্বতীয় পুরোহিত

আর একটা ফুলের নাম করলেই আপনার রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতার কথা মনে পড়ে যাবেই ঃ ক্যামেলিয়া। হ্যাঁ, এখন এলে অনেক জায়গাতেই ক্যামেলিয়া দেখতে পাবেন। গাছগুলি বেশ বড়ই হয়, পাতাগুলি চা-পাতার মতো আর ক্যামেলিয়ার রঙ সাধারণত গোলাপী (অন্য রঙেরও হয়) আকারে অনেকটা গোলাপের মতো। কিন্তু এখন 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন্ড্রনগুচ্ছ' দেখতে পাবেন না, যদিও রডোডেন্ড্রন গাছ দার্জিলিং রোডের পাশে অনেক জায়গাতেই আছে—এখানকার লোকেরা বলে 'গুরস'।

সুধী পাঠক, আসুন না, পথের পাশে এই অজস্র সবুজের সমারোহে, (আপনার নেপালী ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে যে-গাছগুলোর নাম শুনতে পাবেন) ধোপি, গোগুন, মালতা, ক্যামোনা, তারিকা, মউয়া চিলাউনে, লালপাত, সাইপত্রী বা ঘাসফুলে (সমতলে যাকে বলে সূর্যমুখী) চোখ রেখে একটু এগিয়ে যাই—ঘুম-এর সুন্দর মনাস্টারিকে দৃষ্টি প্রদীপে প্রদক্ষিণ করে, যদি চান—পাহাড়-প্রকৃতি-ঝোরায় তিলে তিলে সুন্দরী তিলোত্তমা বাতাসিয়া-লুপের কাছে নেমে, দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রেক্ষাপটে, মনোরম কুসুমের সাহচর্যে খানিকটা সময় কাটিয়ে, চলুন যাই দার্জিলিংয়ের দিকে। না, দার্জিলিং-এ নয়, ম্যালের পাশ দিয়ে, যেখানে ঘোড়াগুলি দাঁড়িয়ে আছে সওয়ারি নেবার জন্যে—সেই রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে, মাইলখানেক দূরে। নিশ্চিত জানি—যদি পর্বতারোহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপনার না থাকে কোনোদিনই আপনার পা পড়বে না এই বস্তিতে, আর অজানা থাকবে এর নাম—তুংসুং বস্তি ঃ এভারেস্ট বিজয়ীদের গ্রাম।

শীতের দিনে কুয়াশা ফগে ঢাকা তুংসুং বস্তির পথে যেতে যেতে মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পের বর্ণনা। ফগের মধ্য দিয়ে হারিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে আপনার চোখে পড়বে ছবির মতো একটি পাহাড়ী গ্রামের দৃশ্য, অথবা পাহাড়ী রাস্তায় আপনি হয়ে গেছেন ল্যান্ডস্কেপের অন্যতম বিষয়বস্তু।

তেনজিং নোরগের বস্তি তুংসুং, তুংসুং নোয়াং গোম্পুর বস্তি, আরো অনেক শেরপার—যারা বিভিন্ন দেশী-বিদেশী অভিযাত্রীদের সঙ্গে উচ্চশিখর পর্বত-অভিযানে পথ-প্রদর্শকের বীরত্বময় ভূমিকা নিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন দুর্গম পথ-যাত্রায়। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের কথাই লোকে জানে না। আসুন, পরিচয় করিয়ে দেই সেই তুংসুং বস্তির কয়েকজন বীর শেরপার সঙ্গে।

সবাই জানেন পদ্মশ্রী—নেপাল-তারা তেনজিং নোরগের কথা—সর্বপ্রথম এভারেস্ট বিজয়ীদের তালিকায় তাঁর নাম, আর পদ্মশ্রী নোয়াং গোমপুর (৪০) দুর্লভ কৃতিত্ব দু'বার এভারেস্ট বিজয়ের সাফল্যে। আপন বাসভূমি তুংসুং বস্তিকে এঁরা চিহ্নিত করলেন পর্বত-অভিযাত্রী বীর শেরপাদের গ্রাম হিসেবে, নিয়ে এলেন পরিচিতির আলোকে।

এভারেস্ট-বিজয়ের গৌরব সবাই অর্জন করতে না-পারলেও তুংসুং-এর অনেক শেরপার অভিযান-কাহিনী সহ্যশক্তি, ধৈর্য ও বীরত্বে প্রশংসনীয়।

এই শীতের দিনে হয়ত ঝিরিঝির বৃষ্টির ধারা পড়ছে আপনার মাথার উপর, ছাতা বা রেনকোট আনবার কথা মনে হয়নি। চলুন, পাহাড়ের বাঁ ধারে ঐ কাঠের বাড়ীটায় ঢোকা যাক।

সাতষট্টি বৎসরের যুবক আংছুরীং শেরপা থাকেন এখানে। দীর্ঘ ঋজু শরীর, পাকা চুল চোখে পড়ে না, দাঁত পড়েনি একটাও। ১৯২৪ সালে জেনারেল ব্রুস-এর নেতৃত্বে এরভিন-মেলরির সঙ্গে 'সগর-মাথা' * (এভারেস্ট) অভিযানে গিয়েছিলেন আংছুরীং। সেই বিশেষ তারিখটি তিনি মনে রেখেছেন, ৮ই জুন, যেদিন 'কালো বাদলে'র মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন এরভিন-মেলরি, জীবিত বা মৃত—তাঁদের আর কোনোদিনই খোঁজ পাওয়া যায়নি। ১৯৩৩ সালেও এক ব্যর্থ এভারেস্ট অভিযাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন আংছুরীং। পরের বৎসর আবার লাহোর-রাওয়াল-পিন্ডি-কারগিল হয়ে গিয়েছিলেন নাঙ্গাপর্বত অভিযানে। গিয়েছেন ধবল-গিরি, অন্নপূর্ণা, আরও ছোটখাট অভিযানে।

আংছুরীং তার সেই পর্বত-অভিযানের নানা কাহিনী শোনাবেন, দেখাবেন তুষার-মানব ইয়েতির পায়ের ছাপের ফোটো, দেখাবেন দেশী-বিদেশী পর্বত-অভিযাত্রী-নেতাদের দেওয়া সার্টিফিকেট, মেডাল। আপনাদের গল্প করবার মাঝখানে একটু পরেই চা এনে দেবে আংছুরীং-এর তরুণী কন্যা বিনীত নম্রতায়। আংছুরীং বিপত্নীক।

ওদিকের বেঞ্চিতে দেখুন বসে আছেন পাশাং ফুতার (৫৫)। ডান হাতের তিনটে আর বাঁ হাতের চারটি আঙুল ওর নেই। হ্যাঁ, তুষার-দৈত্য, বলতে পারেন তুষার-দৈত্যও, কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে সাত-সাতটা আঙুল ১৯৩১-এর এক ব্যর্থ এভারেস্ট অভিযানে। জানতে চান—কতো ক্ষতি-পূরণ পেয়েছিলেন পাশাং ফুতার ঐ সাতটা আঙুলের জন্যে? সত্তর টাকা। হ্যাঁ, প্রতি আঙুলের জন্যে দশ টাকা করে। এই দৈহিক পীড়ন কিন্তু পাশাং ফুতারকে পর্বতের অপ্রতিরোধ্য আহ্বান থেকে বিরত করতে পারেনি, ১৯৩৩ সালে আবার গিয়েছিলেন 'সগর মাথা'র ডাকে।

আচ্ছা, ওদিকে দেখুন আর-একজন বলিষ্ঠ শেরপা ব'সে ব'সে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন—আংনিমা শেরপা (৪৭)। ১৯৫২ সালে আংনিমা তেনজিং-এর সাহচর্যে সুইস্ পার্টির সঙ্গে অভিযানে গিয়েছিলেন। পরের বছরের সফল এভারেস্ট অভিযানেও (১৯৫৩ সাল, ২৯শে মে) তিনি ছিলেন তেনজিং নোরগে আর নোয়াং গোমপুর সঙ্গে—যদিও শিখর-চূড়ায় পা ফেলবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। আংনিমা ১৯৬০-এ আবার গিয়েছিলেন অন্নপূর্ণায় (২নং)।

আংথারকে শেরপাও আপনাকে শোনাতে পারতেন বহু পর্বত-অভিযানের কথা। তুংসুং বস্তির শক্ত-সমর্থ প্রায় সব মানুষই। আরও অনেক শেরপা শোনাতে পারতেন কিন্তু তাঁরা আর ফিরে আসতে পারেন নি পর্বত-শিখরে সাদা বরফের কাফনে চাপা পড়ে গেছে তাঁদের দেহ। তুংসুং-এ এমন শেরপার সংখ্যাও অনেক।

এবারে ফিরবার সময় গান শুনে যান একটা। ঐ যন্ত্রটার নাম? টুংনা—ট্র্যাডিশনাল নেপালী গীটার। তিন তারের বাদ্যযন্ত্র (দু' তারেরও নাকি হয়)। গানের সুরটায় ফগে-ঢাকা পাহাড়ী আবহগুঞ্জিত আপনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ সাদা পাহাড়ের গায়ে টুপি-মাথায় দীর্ঘ পোশাক-পরা পাহাড়ীদের ছবি। মানে জানতে চাইছেন গানটার? এটা শেরপাদের মধ্যে প্রচলিত লোকগীতি। গাইছেন—

পাহাড়ের চূড়াতেও নয়
পাদদেশেও নয়—
পাহাড়ের বুকের কাছে
আমাদের ঘর ঃ
শ্যামল-সজীব-শস্যপূর্ণ,
পাহাড় ডিঙাই—কোদাল চালাই
আমরা হিমালয়ের আপনজন...

●

এবারে ফিরে যাবেন আপনাদের আধুনিক নগরের জীবন-যাত্রায়। সেখানে থেকে কোনো কোনো দিন হয়ত মনে পড়বে পাহাড়ের কথা, একটু হাল্কা-ভাবে লাগার ফগ হঠাৎ আনমনাও করে দিতে পারে।

তুংসুং বস্তির কথা দূরে থাক আপনার জানাশোনা নানাধরণের দশজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন—কার্শিয়াং কোন রাজ্যে? তাঁরা কি উত্তর দেন অনুগ্রহ করে এই লেখককে জানাবেন।

---

* সগর=আকাশ। সগর-মাথা=আকাশস্পর্শী যার শির, এভারেস্ট

সাহিত্যের খবর

কবি-ভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেন শতবার্ষিকী : ইন্সটিটিউট অফ এপিক স্টাডিজ-এর অন্তর্ভুক্ত সারস্বত সঙ্ঘের সভাপতি দ্বৈপায়নপদ ভট্টাচার্য কবি-ভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেন শতবার্ষিকী সম্পর্কে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে, বঙ্গের দার্শনিক-কবি ও ধ্রুপদী সমালোচক কবি-ভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেনের জন্মশতবার্ষিকী ১লা জুলাই ১৯৭২। কবি চট্টগ্রামের পটীয়া থানার অন্তর্গত ধলঘাট গ্রামে ১৮৭২, ১লা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনাকালে কবি সার্পেন্টাইন লেনে বসবাস করতেন এবং শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে কবির স্মৃতিতে এতদঞ্চলের নামকরণ কবি-ভাস্কর শশাঙ্কমোহনের নামে করার অনুরোধ জানান হয়েছে। আজ সব থেকে বড় প্রয়োজন শশাঙ্কমোহন সেন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবির গ্রন্থাবলী ও তাঁর অনন্য সমালোচনা গ্রন্থ 'বঙ্গবাণী' ও 'বাণীমন্দির' প্রকাশ ব্যবস্থা। শশাঙ্কমোহনের সমগ্র রচনাবলীর সন্ধান পাওয়া ও সেগুলি প্রকাশের সুযোগ বহুলাংশে কমে। দেশ বিভাগের পর তাঁর জন্মস্থান চট্টগ্রামের পটীয়াথানার ধলঘাটে সংবাদ নিয়ে জানা গেছে যে, কবির স্মৃতিরক্ষা-সমিতির হাতে যে সকল প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ ছিল সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানী-বর্বর আক্রমণের সময়। বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও জাতীয় জীবনের দিক থেকে বঙ্গভাষার সমালোচনা-সাহিত্যে যে অক্ষয় সম্পদ শশাঙ্কমোহন রেখে গেছেন প্রাচ্য পাশ্চাত্য—সাহিত্যের জ্ঞান সমুদ্র মন্থনের পরিচয় এই বিশাল সমালোচনা-সাহিত্যে বঙ্গ সাহিত্যের বিশ্বদৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে এবং এই সমালোচনা-সাহিত্য সম্ভাব ক্লাসিক গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কবির গ্রন্থাবলীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল—সমালোচনা গ্রন্থ **বঙ্গবাণী** (১৯১৫), **বাণীমন্দির** (১৯২৮), **মধুসূদন** (১৯২১), নাটক **সাবিত্রী** (১৩১৪), কাব্য গ্রন্থাবলী **সিন্ধু সংগীত** (১৩০২), **শৈলসংগীত** (১৯১১), **স্বর্গে ও মর্ত্যে প্রেমগাথা** (১৩১৯), **বিমানিকা** (১৩৩১), অপ্রকাশিত-কাব্য **রূপসুন্দরী**, **শুক্লকমল**, **স্বপনপুরী** নাটক। তাছাড়া আরও বহু কবিতা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। নাটকাব্য **বিশ্বামিত্র** ও **অঞ্জলি** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ভারত প্রেমিক বিদেশী লেখক

উপন্যাসকার পল স্কট ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে জন্মেছেন এবং যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল তখন তিনি অ্যাকাউণ্টেন্সি পড়ছেন। এই সমকালীন ব্রিটিশ লেখক কিন্তু ভারতবর্ষে তেমন পরিচিত নন। অথচ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'জনি সাহেব' ভারতবর্ষের পটভূমিতে রচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চতুর্দশবাহিনীর বিমান সরবরাহ সংগঠনের এক আঞ্চলিক কমাণ্ডার হিসাবে বিমানঘাঁটিদের সহায়ক ছিলেন তিনি। সেই সময় পশ্চিম বেহালার যে প্রান্ত ব্রিটিশ ও আমেরিকান সেনাবাহিনীরা অধিকার করে থাকত তিনিও সেইখানে কিছুকাল ছিলেন। তখন ট্রামে ভিড় ছিল না, কেবল মিলিটারি আর মিলিটারি। তিনি অনেক সময় ট্রামেও যাতায়াত করতেন। ভারতবর্ষকে তিনি ভালো করে দেখেছেন—এইবার নিয়ে তিনবার এলেন অথচ ১৯৩৯-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের বাইরে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি প্রসারিত করেন নি। তাঁকে অনেক সময় ই এম ফরস্টারের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়। এই তুলনামূলক উল্লেখ তিনি পছন্দ করেন না।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরে স্কট একটা প্রকাশন সংস্থায় চার বছর কাজ করেন। তারপর লেখকদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়ে যেসব কোম্পানী কাজ করেন সেই রকম এক সংস্থায় ১৯৬০ পর্যন্ত কাজ করেন।

মিঃ স্কটের প্রথম উপন্যাস 'জনি সাহেব' (১৯৫১) এবং তারপর আরও কয়েকটি উপন্যাস পর পর প্রকাশিত হল কিন্তু তাঁর মনে হল ভারতের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশককে ধরলেন ভারত যাবার খরচ বহন করার জন্য, উদ্দেশ্য 'ব্যাটারিকে নতুন করে চার্জ করতে হবে।' ভারতবর্ষ তিনি আবার দেখলেন।

১৯৬৬তে 'দি জুয়েল ইন দি ক্রাউন' প্রকাশিত হল, নিউইয়র্ক টাইমসের মতে এই উপন্যাসটির মধ্যে লিপিকুশলতা ও মনস্তাত্ত্বিক সমাবেশ সুগভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে পরিবেশিত। 'দি জুয়েল ইন দি ক্রাউন' ভারত-সম্পর্কিত উপন্যাসত্রয়ের প্রথমটি। আর দুখানি উপন্যাসের নাম 'দি ডে অব দি স্করপিয়ন' এবং 'দি টাওয়ারস অব সাইলেন্স'। অন্যান্য বহুমাত্রিক বা মালটি ডাইমেনস্যানাল উপন্যাসের সমগোত্রীয় এই তিনটি উপন্যাস। এর মান এবং প্রতিক্রিয়া তলস্তয়-রীতির—এই কথা লিখেছেন একজন সমালোচক। এই সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থ 'দি টাওয়ার্স অব সাইলেন্স' দি ইয়র্কসায়ার পোস্ট কর্তৃক ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের সাহিত্য-পুরস্কারে সম্মানিত হয়।

স্থূলভাবে বলতে গেলে শোনায় খারাপ। এইসব পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল একজন ইংরাজ তরুণীকে ধর্ষণ। মেয়েটির নাম দাফনে ম্যানার্স, একদল গুণ্ডাশ্রেণীর লোক তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। শুধু এইটুকু বলে থামলে স্কট এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতি অবিচার করা হয়। এই কাহিনী অংশটুকু ঘিরে গড়ে উঠেছে এক বিরাট চরিত্র সমাবেশ। সেই মিছিলে আছেন ভারতীয় এবং ইংরাজ, ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঘটেছে এইসব চরিত্রের মনে। ঘটনাকাল হিসাবে লেখক নির্বাচন করেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই চঞ্চল রাজনৈতিক আবহাওয়া। জাপান প্রায় ভারতের ভূমিতে এসে পড়ছে, ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হল, গান্ধীজী 'কুইট ইণ্ডিয়া' সমর্থন করলেন—১৪ই আগস্ট ১৯৪২ নেতৃস্থানীয়রা কারারুদ্ধ হলেন, চারদিকে লুঠতরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ধ্বংসের অশান্তিকর পরিবেশ। এই প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে এমন অনেক মানুষ নিহত হলেন যাঁরা ভারতকে প্রকৃত ভালোবাসতেন এবং ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল।

মিস এডুইনা ক্রেন একজন বর্ষীয়সী মিশনারী মহিলা। তিনি যাচ্ছিলেন একজন ভারতীয়ের সঙ্গে একই মোটরে। সেই ভারতীয়কে টেনে নামিয়ে এনে হত্যা করা হল। এই ঘটনার পর মিস ক্রেন ভেঙে পড়লেন এবং এক প্রতীকী প্রতিবাদের আয়োজন হিসাবে শাদা শাড়ি পরে আগুনতে আত্মাহুতি দিলেন। তিনি তখন ভারতবর্ষের বিধবা স্ত্রী। ভারতবর্ষ তাঁর চোখে মাতৃ।

এম এ কাসিম একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা. তিনি দু বছর কারাবাসের পর ঘরে ফিরে এসে দেখলেন—দেশ-বিভাগের কাজ একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। সর্বত্র বিবাদ এবং মোহভঙ্গের মনোভঙ্গী। প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশরা নিজেদের বিবরে প্রবেশ করল। তারা বলতে লাগল—'গান্ধীর সাধুতোর মুখোশ খসে পড়ছে। এটা তাঁর রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রমাণ একটা আচরণমাত্র ভারতীয় আইন-চাঁদী এই বাক্তিটি সাফল্যের নেশায় আত্মহারা হয়েছেন।'

দাফনে ম্যানার্স যিনি স্কটের 'দি জুয়েল ইন দি ক্রাউনে'র নায়িকা. তার প্রেমিক হরিকুমারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার মধ্যে ভারতীয় ও ইংরাজদের ব্যক্তিগত সম্পর্কটা ফাটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ম্যানার্স বলছেন—'আমরা শুধু প্রেমিকা বা অজানা মানুষ হতে পারি কিন্তু কোনোদিনই বন্ধু হতে পারব না. কারণ আমাদের বন্ধুত্বটা সর্বদাই প্রকাশ্যে বিশ্লেষিত হবে।'

স্কটের 'ট্রিয়োলজী'র দেড় হাজার পাতার মধ্যে এক শ্রেণীর ইংরাজ নরনারী বনাম ভারতীয় নরনারী যেভাবে এসেছেন এবং স্ব স্ব ভূমিকাভিনয় করেছেন তা প্রকৃতই ছবির মত মনোরম ও কৌতূহলো-দ্দীপক। পাঠককে সদাসতর্ক সদাজাগ্রত রাখা উপন্যাস লেখকের কাজ। লেখক পল স্কট সেই শিল্পচাতুর্যের অধিকারী।

ফরস্টার প্রণীত 'প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' উপন্যাসের এডেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় দাফনে ম্যানার্স। স্কটের লেডী ম্যানার্স, দাফনে ম্যানার্স এবং মেবেল লেটন মিসেস মুর এবং এডেলা চরিত্রের রূপান্তর।

স্কট বলেছেন—১৯৩৯-৪৭-এর ঘটনা-বহুল উপন্যাসের মালমসলার সন্ধানে ১৯৬৪-তে ভারত ভ্রমণে আসার ব্যাপারটা উদ্ভট মনে হতে পারে কিন্তু তাই বলে ১৯৬৪. ১৯৬৯ এবং ১৯৭২ এই তিনবার করে ভারত ভ্রমণের পর আধুনিক ভারতের পটভূমিতে উপন্যাস রচনাটাও কি উদ্ভট হয়ে উঠবে না! আমি আধুনিক ভারতের কথা বেশী ত' জানি না। আমি শুধু জানি আমার এই তিনবারের ভারতভ্রমণ আমার মনে সেই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে—যা প্রতিটি লেখকের প্রয়োজন. কাজ সুসিদ্ধ করার জন্য এর প্রয়োজন লেখকের কাছে আছে।'

স্কট এইবার তার ভারতভ্রমণে এসে জানালেন—উপন্যাস লেখার বাসনা আমার ছিল না, অডেন, স্পেনডার, এলিঅটের ধারায় কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম—হয় একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু: নাটকে হাত দিয়েছি। দুটি পুরস্কারও পেয়েছি। কিন্তু ভারতবর্ষে যে যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সেই আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠল. মনে হল এই ঠিক জিনিসটাই পেয়েছি আর সেই থেকে ভারতবর্ষের আকর্ষণ আমার কাছে হ্রাস পায়নি।'

তাঁর এই সিরিজের শেষ উপন্যাস 'এ ডিভিসন অব দি স্পয়েলস' রচনায় তিনি এখন ব্যস্ত। বললেন—এটাই হবে এই ধারার সমাপ্তি। —অভয়ঙ্কর

BENGALISCHE ERZAHLUNGEN: (Universal Bibliothek) By: ASIT DUTTA UND MANFRED FELDSIEPER Published by: PHILIPP RECALM JUN: STUTTGART GERMANY (1971)

ম্যানফ্রেড ফেলডাসপার একজন তরুণ জার্মান লেখক। যখন কলকাতায় ছিলেন তখন এক ভোজসভায় বর্তমান লেখকের পাশে বসে এমন চমৎকার বাংলা বলছিলেন যা প্রতিটি বাঙালীকে পুলকিত করতে পারে। বেশ কিছুকাল এদেশে কাটিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরেছেন এবং ইউনেসকো-সামলুন্তের সহযোগে একটি বাংলা ছোটগল্পের ক্ষুদ্র সংস্করণ সম্পাদন করেছেন। গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন অসিত দত্ত এবং ম্যানফ্রেড ফেলডসিপার। এই গ্রন্থের একটি বিস্তারিত ভূমিকা লিখেছেন ম্যানফ্রেড স্বয়ং এবং মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারায় যে বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট তার বিবরণ দিয়েছেন। এই সূত্রে 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি' গোষ্ঠীর সংবাদ। সাধু ভাষা বনাম চলিত-ভাষা, জীবনানন্দ দাশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথাযোগ্য উল্লেখ করেছেন। এমনকি 'পথের পাঁচালী'র সত্যজিৎ রায় কৃত ফিল্ম সংস্করণও তিনি এই উল্লেখ থেকে বাদ রাখেন নি। বুদ্ধদেব বসুর 'সুখের ঘর' ও 'তুমি কেমন আছো' গল্প দুটির অনুবাদ এই সংকলনগ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। এ ছাড়া বনফুলের 'পাশাপাশি' ও 'পাঠকের মৃত্যু', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নীল পেয়ালা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হার', বিমল করের 'নিরজা' ও সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ' গল্পগুলি এই সংকলনে অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থ শেষে কিছু বাংলা শব্দের অর্থও দেওয়া হয়েছে, যথা বাবু, ধুতি, অঞ্চল, চৈত্র, ভাত, যমরাজ, সরস্বতী, শাড়ি ইত্যাদি। অনুবাদকর্মে যথেষ্ট যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় আছে।

পরিচ্ছন্ন এবং ক্ষুদ্র এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। বিদেশে বাংলা ছোটগল্পের পরিচয়দানের এই প্রয়াসের জন্য সম্পাদক ম্যানফ্রেড ফেল্ডসিপার এবং তাঁর সহযোগীদের অভিনন্দন জানাই।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা—অমল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : গীতায়ন প্রকাশনী, ১০এ বাঘা যতীন রোড, কলকাতা—৩৬। দাম—চার টাকা।

সংগীত বিষয়ক তথ্যপুস্তকের চাহিদা বেড়েছে। যে সব সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞগণ লিখতেও পারেন তাঁদেরই কলম থেকে জন্ম নেয় এ জাতীয় বই। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা'র অনতিদীর্ঘ আলোচনাগুলি নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েও সাহিত্যগুণে সুখপাঠ্য। ঠাকুর পরিবারের সাঙ্গীতিক পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য গানের প্রভাব, বাউল ও কীর্তনের প্রভাব, হিন্দুস্থানী গানের প্রভাব, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়বৈচিত্র্য, সুর ও তাল সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণ—প্রভৃতি নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনা বইখানিতে স্থান পেয়েছে। এসব ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাগুলি বইখানির একটি বড়ো সম্পদ। এই আলোচনাগুলি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটায় না, রবীন্দ্রসঙ্গীত জিজ্ঞাসুদেরও কৌতূহল পূরণ করে।

সংগীতশাস্ত্রের নানা তথ্য ও আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এই অধ্যায়টি যে কোন শাখার সংগীত শিক্ষার্থীর কাছেই অত্যন্ত মূল্যবান। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষারও সহায়ক এই অধ্যায়টি। এখানে লেখক সহজ ভাষায় প্রায় বারটি সাঙ্গীতিক পরিভাষা ও তিনটি স্বরলিপি-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন ... ঠাটের তানযুক্ত স্বরমালিকা রচনা করেছেন

ও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গলা তৈরীর জন্য কয়েকটি সরল ও মিশ্র 'সরগম' দিতেও লেখক ভোলেননি। এসব ছাড়া এই অধ্যায়ে রয়েছে রাগ পরিবেশনের সময় সম্বন্ধে একটি সুন্দর আলোচনা।

বইখানির ভূমিকা লিখেছেন শ্রীঅশোক-তরু বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনাগুণে এই ছোট ভূমিকাটি শিল্পপর্যায়ে উন্নীত। বইখানির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

ক্রীতদাসের হাসি: শওকত ওসমান। মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ) ৯, এ্যান্টনিবাগান লেন, কলিকাতা-৯। মূল্যঃ চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পাকিস্তানী স্বৈরতন্ত্রের অধীনে সবচেয়ে মার খেয়েছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা আর ভাবনা ও অনুভূতির স্বাধীনতা। বাংলাদেশের মানুষের মস্তিষ্কের কোষ এবং স্নায়ুজাল অন্য ইতর প্রাণীর চেয়ে ভিন্ন রকমে সক্রিয়, তাই, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী কিভাবে তাদের পরিপূর্ণ পশুত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই অনুভূতিই বাংলাদেশের মানুষকে প্রথম মাতৃভাষা আন্দোলনে নামিয়েছে—তারপর সাহিত্য সংস্কৃতি বাঁচানোর আন্দোলন এবং সর্বশেষে মাতৃভূমিকে পাশব শাসনতন্ত্র থেকে মুক্তির জন্যে প্রাণপণ করিয়েছে।

কঠোর জঙ্গী শাসনের মধ্যে থেকেও যাঁরা স্বাধীন চিন্তায় বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত দেশবাসীকে বন্ধন মুক্তির প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত করেছেন জনাব শওকত ওসমান তাঁদের অন্যতম। 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসটির পটভূমি বাগদাদ ও বিষয়বস্তু আব্বাসীয় খলিফাদের যুগের হারুন রশিদের ক্রীতদাস, গোলাম তাতারী আর বেগম জুবায়দার বাঁদী মেহেরজান প্রেমিক-প্রেমিকা। সদয়া বেগম গোপনে তাদের মিলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের দুজনের প্রাণখোলা হাসি অন্তরাল থেকে শুনে বাদশার চমক লাগে। তাঁর হাসি ইচ্ছা মতো শোনবার ও শোনাবার জন্যে তাতারীর গোলামত্ব ঘুচিয়ে দৌলত দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, শেষে কঠোর শাস্তি দিয়েও তার মুখে হাসি দূরে থাক কথাও ফোটাতে পারেননি বাদশা। মিলনের দিলখোলা আত্মার হাসির পর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কেবল সে মুখ খুললো শেষবারের মতো—'দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব। কিন্তু—কিন্তু—ক্রীতদাসের হাসি—না-না-না-না—'

উপন্যাসটির অন্তরালে লেখকের অন্তরের কথা চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন। আরবী শব্দে অনেক জায়গায় বাধা পেলেও বইটি সুখপাঠ্য. লেখক বাঙালী পাঠকদের সুবিধার জন্যে শেষাংশে শব্দপঞ্জী যোগ করেছেন, কিন্তু তাতেও নিছক বাংলাভাষীদের অনেক শব্দ অজ্ঞাত থেকে যায়। বইটির প্রকাশন সৌষ্ঠব যথোপযুক্ত।

রূপসায়রে (উপন্যাস)—অরবিন্দ পালিত। সুরভি প্রকাশনী, ১ কলেজ রো, কলকাতা-৯। সাত টাকা।

'ভোরের ভৈরবী' দিয়ে এ উপন্যাস কাহিনীর আলাপ শুরু। মধ্যপর্বে 'মধ্যদিনের গান'-এ এর বিস্তার, আর শেষের শুরু বেহাগের বিষণ্ণতায়। মার্গসঙ্গীতের আধারে আশ্রিত এ কাহিনীকে রূপদক্ষ স্থপতির মতো গড়েছেন সংগীতপ্রেমী নতুন লেখক শ্রীঅরবিন্দ পালিত। জীবনের গল্প লিখেছেন কাহিনীকার, গল্প একালের ছায়াচিত্র জগতেরও।

শুরু ১৯৩০-এ লবণ আইন ভংগ ও সন্ত্রাসবাদের সময়কালে। পাহাড়তলীর স্টেশন-মাস্টারের প্রিয়দর্শী ছেলে রমেনের বয়ঃসন্ধি সময়ের। চোখে তার ভবিষ্যৎ জীবনের বিচিত্র মোহাঞ্জন। সমাপ্তি উত্তর-যৌবনের বিষাদময় পরিণতিতে। এই দুই বিন্দুর মধ্যে আবর্তিত কাহিনীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে আজকের যুব-মানস : তার আসক্তি প্রেম বেদনা জীবন-যন্ত্রণার সামগ্রিক আলেখ্য।

'তোমার মধ্যে স্পার্ক আছে' : হেড-মাস্টারমশাইয়ের মুখের এই একটি কথা রমেনের কৈশোর-যৌবনের স্বপ্নরঙীন বাসনায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। 'কিছু-একটা' হয়ে ওঠার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় অনায়াস-উদাসীন্যে বাল্যবয়সের প্রনয়িনী প্রতিমাকে ফেলে এল জংশন স্টেশনের কলেজে পড়তে। পরিচয়ের পরিধি বাড়ল, জীবনের অভিজ্ঞতাও। জীবনের রহস্যময় যবনিকা যেন ক্রমে উন্মোচিত হতে লাগল। এ পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের ভেতর যেন নতুন কিছুর ইশারা। জীবনের রহস্য হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিচিত্র অনুভবের জগতে পৌঁছে দিল। বয়স্কা কুমারী কন্যার আলিংগন অনাস্বাদিত জীবনের আভাস আনে। জীবনে জাগল প্রথম যৌনবোধ। জংসন কলেজ থেকে এল কলকাতায় এম-এ পড়তে। বহতা নদীর মতো জীবন যতই এগিয়েছে ততই পিছনের পথ ও পরিচয় মুছে গেছে। মা-বাবা ভাই-বোন সবাই যেন পর হয়ে গেছে। 'কিছু-একটা' হয়ে ওঠার পথ কী? অধ্যাপনা, সঙ্গীত অথবা অভিনয়? ঘটনার ঘূর্ণি আর টানাপোড়েনে গিয়ে পৌঁচেছে ছায়াচিত্র জগতে! মনে হয়েছে, পৌঁছে গেছি ঈপ্সিত জগতে, মিলেছে সঠিক ঠিকানা! এই রঙ্গ-জগতেই তাকে দিল সব নাম যশ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ। অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে সবিস্ময়ে একদিন অন্য অভিনেতার অনুকৃতির মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে সে চমকে উঠল—উন্মাদ অস্থিরতায় সে নিজের বৃত্তের মধ্যেই ঘুরে বেড়িয়েছে—মনে রাখবার মতো রূপজগতে কিছুই সে দেয় নি, কিছুই হয়ে ওঠে নি। স্ফুলিঙ্গ ছিল ঠিকই কিন্তু আলো হয়ে ফোটবার আগেই তা আলেয়ায়-পরিণত হল। রূপসায়রে ডুব দিয়েছিল অরূপরতনের আশায় কিন্তু সোনামুঠি ভস্মে ভরে গেল। পিতৃত্বে তার বিবমিষা, সংসার-সুখে অধরা, অতৃপ্তি তার সবকিছুতে। এগোবার পথ নেই পেছুবারও না—স্বপ্নদর্শী জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতির বাস্তব আলেখ্য কাহিনী শেষে মনকে বিষণ্ণতায় উদাস করে তোলে।

শব্দব্যবহারে পরিমিতিবোধের সংগে বাকভঙ্গির রসোচ্ছলতা মিশে উপন্যাসটিকে করেছে জীবনবেগে স্পন্দিত।

প্রথম উপন্যাসেই প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন শ্রীঅরবিন্দ পালিত।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, প্রকাশক, শুকদেব ঠাকুর। গ্রাঃ ধাড়সা। পোঃ সাঁতরাগাছি। হাওড়া।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অমর লেখনীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনকথা তত্ত্ববাদ ও লীলাবাদের সমন্বয়ে বিকশিত। কবিরাজ গোস্বামীর এই সমন্বয় বাদের সিদ্ধান্তের পটভূমি হোল' শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য সহচর শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর একটি কড়চা। সেই কড়চাটি আজও কারও দৃষ্টি গোচর হয়নি। তাছাড়া কড়চায় সিদ্ধান্তের সংগে ষড় গোস্বামীর সিদ্ধান্তের বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্যণীয়। আবার এই বিসদৃশ ও গরমিল মতবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তের সংগে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের আশ্চর্য মিল রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর বর্তমান গ্রন্থে সমকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থা, উড়িষ্যার প্রচলিত তত্ত্ববাদের উপাসনাধারা, বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রবর্তিত ধর্ম এবং পঞ্চতান্ত্রিক লীলাবাদের সংগে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমন্বয়বাদের সাদৃশ্য, যুক্তি ও প্রমাণ সহ উপস্থাপিত করেছেন। তাছাড়া বাংলায় প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের পঞ্চতান্ত্রিক উপাসনা রীতির ওপর তীক্ষ্ণ মন্তব্য ও তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছেন। রচনারীতি সাবলীল। বৈষ্ণব সংস্কৃতি প্রেমিকদের কাছে বইটি আলোচিত হওয়ার সম্ভাবনা।

ধান শুধু ধান (উপন্যাস)—বনশ্রী রায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২। চার টাকা।

কৃষিনির্ভর নিচু তলার মানুষদের ভাব-ভালবাসা বেদনা-ব্যর্থতার কাহিনী এ উপন্যাসের পটভূমি। জমিদার মিত্তির-বাবুদের প্রধান চাষী বুড়ো বলরামের মন আর ভাবনার পরদায় ভালো-মন্দ আলো-আঁধারে মেশানো ঘটনাবহুল কাহিনী মেলে ধরেছেন লেখিকা। আর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন নতুন জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে—মৃত্যুপথযাত্রী বলরামের দৃষ্টিহীন চোখে ভাসছে ধানের প্লাবনে ভরা আমডাঙ্গার মাঠ আর নতুন-কালের নায়ক জগনের উদ্দেশে তার অস্ফুট-আশীর্বাদ।

সরোজকুমার

ভবানী মুখোপাধ্যায়

সরোজকুমার রায়চৌধুরী দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর উল্লেখযোগ্য কিছু লেখার মত অনুকূল স্বাস্থ্য তাঁর ছিল না—কিন্তু সরোজকুমার বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন একথা অনস্বীকার্য। তারাশঙ্কর এবং সরোজকুমার যেন একই মুদ্রার দুই বিভিন্ন দিক। সাহিত্য-ইতিহাসকার ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন : 'শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী কতকটা তারাশঙ্করবাবুর সমানধর্মী। ইঁহারও এক-আধটি গল্প কল্লোলে বাহির হইয়াছিল। তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাস-কাহিনীতে ভূগোল বীরভূম জেলার চৌহদ্দিবদ্ধ, সরোজবাবুর রচনার মানচিত্র ইহারই সংলগ্ন ভূমি পশ্চিম মুর্শিদাবাদ।'

সরোজকুমারের জন্মস্থান পশ্চিম মুর্শিদাবাদ। আগের দিনে দেখেছি একটু সুযোগ পেলেই সরোজ মুর্শিদাবাদ ছুটতেন। সেখানকার স্থানীয় সমস্যার খুঁটিনাটি সমাধানে তাঁর একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। মুর্শিদাবাদের মোহ তাঁর জীবন ও সাহিত্যে প্রবল। সরোজকুমার ১৯২১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। আদর্শবাদী নেতাদের সংস্পর্শে এসে মনটা গড়ে উঠেছিল অন্যভাবে। যা অন্যায়, অসত্য সরোজকুমার প্রচণ্ড ব্যক্তিগত ক্লেশ স্বীকার করেও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। শিশু সন্তানাদি ও বিরাট পরিবারের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে অবলীলাক্রমে চাকুরী ছাড়তে সরোজ প্রায় দ্বিতীয়-রহিত। সুভাষচন্দ্র এবং কিরণশঙ্কর রায় এই দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে অতি অল্পবয়সে যোগাযোগ হওয়ায় এবং সেই সূত্রে সেকালের কয়েকজন বিশিষ্ট দেশনেতার স্নেহলাভ করায় সরোজকুমারের মানসিকতা গড়ে উঠেছিল বিচিত্র ভঙ্গীতে। প্রচারবিমুখতা এবং সাংবাদিকসুলভ আত্মগোপনের অভ্যাস সরোজকুমারের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই শেষ জীবনে স্বল্পসংখ্যক গুণগ্রাহী বন্ধু এবং তরুণ সাহিত্যিক ভিন্ন সরোজকুমারের সঙ্গে বহির্জগতের বিশেষ সংযোগ ছিল না। এই সব কারণে সরোজকুমারের সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা এবং প্রচারের অভাব আছে। এক কথায় তিনি জনপ্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন না।

কিন্তু নির্মোহ বিচারে এই পরিহাস-রসিক স্থিতপ্রাজ্ঞ সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন অগ্রাহ্য করা যায় না। ডক্টর সুকুমার সেনের পূর্ব-উদ্ধৃত উক্তির অপরাংশটুকু এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন : 'সরোজবাবুর কাহিনী অতটা মুখ্যভাবে 'রিজিওন্যাল' নয় যতটা তারাশঙ্করবাবুর কাহিনী। রোমান্স-প্রখরতা এবং বহু ভাষণও সরোজবাবুর লেখায় কম।'

রোমান্স-প্রখরতা সরোজকুমারের রচনায় অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী', 'সোমলতা' এই 'ট্রিলজী'র বিনোদিনী চরিত্রটিতে রোমান্স এবং রিয়ালিজমের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। ময়ূরাক্ষী এক শাখা নদী—এপারে কমলপুর ওপারে ময়নাডাঙা তার মাঝে প্রবাহিত ময়ূরাক্ষী—সেখানে চাষীদের বাস। হারাণ মণ্ডল এই কমলপুরের অধিবাসী, তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিনোদিনী। অতিবর্ষণে একবার তাদের পর্ণকুটির টলটলায়মান। বিনোদিনী আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার স্বামী হারাণ ছ ফুট লম্বা পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরুষ। তার বাপ ছিল জেঠেল। হারাণও একটু ভয় পেয়েছিল। হারাণের সঙ্গে বিনোদিনীর কোথাও মেলে না। উনিশ বছরের মেয়ে বিনোদিনী অশান্ত, তার বাপের বাড়ির পাশে দু ঘর বৈষ্ণবের বাস ছিল, তারা গান গেয়ে মাধুকরী করে বেড়ায়। অনেককাল আগে তাদের মেয়ে ললিতা ছিল বিনোদিনীর বন্ধু। ছেলেবেলায় শোনা একটি গানের কলি মনে ভেসে আসে। সুর-তরঙ্গে সে ভেসে বেড়ায়—গানটির শেষ দুটি লাইন—'তার ভিতরে মায়া নদী সে হেম নদীতে প্রেম ঝরে।' বিনোদিনীর ভালোবাসার মানুষ গৌরহরি দোরে এসে একতারা বাজায়—বিনোদিনীর দেহের শিরায়, রক্তে রক্তে কাঁপন জাগে—ময়ূরাক্ষীর শেষ অংশে রসিক পাল হারাণের কানে বিনোদিনীর সম্পর্কে কুৎসা শোনায়। হারাণ ব্যথা পায়। তারপর এক কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাতে বিনোদিনী গৃহত্যাগ করে।

সরোজকুমারের সঙ্গে আমার এই ট্রিলজি বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা হয়েছিল এবং তার কিছু অংশ সরোজকুমারের জীবদ্দশায় 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়।

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তার কিছু অংশ এখানে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে।

আমি সরোজকুমারকে প্রশ্ন করেছিলাম—তোমার এই ট্রিলজীর উৎস কোথায়? এর আগে তুমি লিখেছ 'বন্ধনী', 'শৃঙ্খল' আর 'হংস বলাকা'। তোমার মনে যে রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল তা ফুটে উঠেছে। কিন্তু একেবারে পালাবদল হল এই ত্রয়ী উপন্যাসে, যা তোমার 'নতুন ফসল'। শুধু বিষয়বস্তুতে নয় আঙ্গিকেও।

সরোজ বললেন—তুমি ত জানো 'ফরোয়ার্ড' যখন উঠে গেল, তখন কি সময়। এক কথায় আমরা সবাই বেকার। কি আর করা যায় দেশে চলে গেলাম। আমাদের অঞ্চলটা বৈষ্ণবপ্রধান, বীরভূম যেমন শাক্তপ্রধান। আমরাও পদকর্তা যদুনন্দন দাসের বংশধর। আমাদের দেহে আছে বৈষ্ণবী রক্ত। ওখানে মাঝে মাঝে বৈষ্ণব-সমাগম হত। একজন সাধুবাবা ছিলেন, অনেক বয়স, এখন দেহ রেখেছেন,

তিনি এসে গ্রামে উঠলেন, এই সূত্রে প্রচুর লোকজন এল। গ্রামটা ভরে গেল। ছোট বাবাজী ছিলেন ওদের গুরু। তিনি বসে থাকতেন, চার পাশে প্রচুর বাউল। আমাদের দেশ-গাঁয়ে বলে নেড়া-নেড়ির দল। ওদের দলে একটি আনন্দময়ী মেয়ে ছিল, চমৎকার তার গলা, ভারী সুন্দর কীর্তন গাইত।

তখনকার নিয়ম ছিল এক এক গ্রামের লোক এক এক জায়গায় জমায়েত হত। মণ মণ চাল আলু দিত সম্পন্ন লোকেরা, কিছু লোককে ঘিরে মহোৎসব বসত, চলতি কথায় মচ্ছব। ঐ মেয়েটা যেখানে যায় সেখানেই তাকে সবাই ঘিরে ধরে, সবার আগে খেতে দেয়। ভারী খাতির তার। কি চমৎকার যে গলা, কি বলব!

একদিন মহোৎসব শেষ হল। ওমা, তার পর সেই বোষ্টমীটাকে আর পাওয়া যায় না। তার যে বোষ্টম সে এল ছোট বাবাজীকে প্রণাম করতে। ছোট বাবাজী প্রশ্ন করলেন—কি তোমার বোষ্টমীর কোনো খবর পাওয়া গেল?

ম্লান হেসে বোষ্টম বলল—না বাবাজী, পাওয়া গেল না। সরোজকুমার বললেন—আমি ভাই সেখানে বসেছিলুম। ব্যাপার দেখে তাক লেগে গেল। বলে কি লোকটা। এমন সহজ গলায় বলল—পাওয়া গেল না। এই বলে আবার সে হাসল।

বোষ্টম একটু পরে যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই তার একতারাটা হাতে নিয়ে চলে গেল।

সরোজ বললেন : আমি ভারী অবাক হয়ে গেলাম। এতটুকু জেলাসি নেই মনের ভিতর। কোথাও কোনো জ্বালা নেই। দিব্যি হাসছে। ব্যাপার কি!

আমি তার পিছু নিলাম। ছুটলাম কিছু দূরে। অনেক কষ্টে তাকে ধরে একটা আলের পাশে বসালাম তারপর প্রশ্ন করি—আচ্ছা! সত্যি তোমার মনে কোনো দুঃখ নেই?

লোকটি আমাকে কি বললে জানো, আমি ত' এই রকম জবাব কল্পনাও করতে পারব না। সে তেমনই হেসে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল—

—ওকি আমার সঙ্গে এসেছিল বাবুমশাই, না আমার সঙ্গে যাবে!'

সরোজকুমার বললেন—অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মুখে একথা শুনে আমার বিস্ময়ের ঘোর আর কাটে না। এর মনে কোনো জ্বালা নেই, কোনো ঈর্ষা নেই। আশ্চর্য! তখন আমি আবার তাকে প্রশ্ন করি—আচ্ছা, তোমার বোষ্টমী যদি আবার ফিরে আসে—ওকে নেবে?

বোষ্টম তেমনই হাসিমুখে জবাব দেয়—নেব বৈকি বাবুমশাই। ও যে রাধারাণীর অংশ!

ব্যাপারটি পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য সরোজকুমার বৈষ্ণবকে বললেন—তার মানে? বোষ্টম জবাব দিয়েছিল—বাবুমশাই, ওরা ত' আমাদের স্ত্রী নয়। বোষ্টমী আমাদের সাধনার অঙ্গ। পুজোর উপকরণ। আর পাঁচরকম উপকরণের একটা। এ ছাড়া ওরা সবাই রাধারাণীর অংশ—মেয়েরা গঙ্গাজল, গঙ্গা কখনও অপবিত্র হয় বাবু? —মেয়েরা কখনো অপবিত্র হয় না।

এটুকু বলে একটু থেমে সরোজকুমার বললেন—জানো ভাই, আমি ভাবলাম বলে কি লোকটা—আমরা 'কল্লোলে' ফ্রি লভ নিয়ে দাবী করেছি—এর চেয়ে ফ্রি লভ আর কি হতে পারে? তাই আমার মনে হল ওদের নিয়ে লিখি। প্রচুর বাউল গান সংগ্রহ করেছি। বাউলদের দেখেছি অনেক।

সেদিন এত কথা বলার পর সরোজকুমার কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। বুঝেছিলাম তাঁর মনে তখন সেই সুদূরের ছবি ভাসছে।

'বিনোদিনী' এই ভাবেই গড়ে উঠেছে। 'সুরের ছোঁয়া লেগে মন তার ক্ষণে ক্ষণে গানে গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।'

ময়ূরাক্ষীতে বিনোদিনীর গৃহত্যাগ। 'সমাজের মধ্যে ব্যক্তি অসহায়' তাই সেদিন অভিমানিনী বিনোদিনী ঘর ছেড়েছিল, কিন্তু সন্তানদের ভুলতে পারে না। গৌরহরি ওকে নিয়ে আখড়া বসাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিনোদিনী তাকে ভালোবাসলেও তাড়িয়ে দেয়। 'সোমলতায়' বিনোদিনী গৌরহরির দিকে আবার আকৃষ্ট হয়ে পড়ে কণ্ঠি বদলের প্রস্তাব করে—আর অবশেষে হারাণের কাছেই আবার আশ্রয় নেয়।

বিনোদিনী যখন হারাণের সঙ্গে ফিরে যায় তখন আগে চলেছে হারাণ, তার মাথায় বিনোদিনীর পেঁটরা, কোলে মেনী। পাশে চলেছে লাঠি কাঁধে নিয়ে হাবল। বিনোদিনী যখন ঘর ছেড়ে যায় তখন হাবলা-মেনি মামার বাড়ি ছিল। পিছনে চলেছে বিনোদিনী। সরোজকুমার লিখেছেন—

'ও যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও যেন বসুন্ধরা স্বয়ং—আলোয় ছায়ায়, অন্ধকারে ক্ষণে ক্ষণে নবরূপে দেয় দেখা। কলঙ্কে আর মহিমায় সে রূপের আর শেষ নেই।'

সেদিন তাই সরোজকুমারকে বলেছিলাম—বেকার জীবনে এত বড় রোজগার খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে। ফরওয়ার্ড উঠে গেল—তারপর সেই কাল, তোমার বয়স এবং দৃষ্টিভঙ্গী সবকিছুই রয়েছে এই মহৎ সৃষ্টির পিছনে।'

সরোজকুমার চাষীর জীবন, গ্রামবাংলার রূপ, আশ্চর্য কৌশলে এঁকেছেন। নাগরিক আবিলতা গ্রামীণ চরিত্রে প্রতিফলিত হয়ে 'হাঁস-জারু' গোছের এক সংমিশ্রণ ঘটায় নি। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ এক অনাবিষ্কৃত বিস্ময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র মধ্যে মাঝির জীবন এবং সরোজ রায়চৌধুরীর 'নতুন ফসলে'র চাষী চরিত্রের রূপায়ণের মধ্যে নির্ভেজাল শিল্প-চেতনা লক্ষ্য করে বিদগ্ধ সাহিত্য পাঠক তাই বাংলা সাহিত্যে নতুন অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে পুলকিত হয়েছিলেন।

সরোজকুমার লিখেছেন আরো অনেকরকম। তাঁর 'কালো ঘোড়া' এবং 'শতাব্দীর অভিশাপ' বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর পথচিহ্ন।

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'সরোজকুমার সৌভাগ্যক্রমে এই অতিখ্যাতির বিড়ম্বনামুক্ত। বাহিরের তাগিদ তাঁর অন্তরের প্রেরণাকে খুব কম সময়ই ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ...কবির ভাষায় ধন নয়, মান নয়, একখানি বাসাই তাঁর সাহিত্যজীবনের মূলমন্ত্র।'

*

সরোজকুমারের মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর সাহিত্য সমালোচনার ধৃষ্টতা রাখি না। সম্ভব হলে বিস্তারিতভাবে সরোজকুমারের উপন্যাসের তিনটি বিভিন্ন ধারা বিষয়ে আলোচনা করার বাসনা রইল। বাংলা সাহিত্যের এই নিরভিমান অতিখ্যাতির ঔজ্জ্বল্যবিহীন সাহিত্যিকটিকে তুলসী মঞ্চের তলার—মাটির প্রদীপের মতই স্মরণ করতে হবে। সরোজকুমারের আসন সেখানে এক অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

অনেকদিনের বন্ধু সরোজকুমার। প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী এই বন্ধুত্বের মধ্যে জড়িয়ে আছে অনেক সুখ-দুঃখ, অনেক আনন্দ-বেদনার ইতিহাস। কল্লোলের কাল থেকে শুরু করে সরোজকুমারের জীবিত অবস্থার শেষ জন্মদিনটিতেও তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছি। সরোজকুমার সেদিনও অতি কষ্টে বলেছেন—আবার আর একদিন এসো ভাই।

সরোজকুমারের জন্মদিন আবার আসবে, আমরাও ভীড় করে যাবো, কিন্তু সেইদিন আর ঈজিচেয়ারে শায়িত সরোজকুমার অস্পষ্ট কণ্ঠে অনুরোধ জানাবে না—আবার এসো—।

আন্তর্জাতিক বইয়ের মেলা : ১৯৭২

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বইয়ের মেলা বসেছিল দিল্লীতে। ১৮ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল। পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশের প্রায় পাঁচশ প্রকাশক দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন, একপক্ষ কাল। তাঁরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন, সেমিনার করেছেন। এবং সবশেষে কিছু বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যবস্থা করে ফিরে গেছেন, যে যার দেশে। এই মেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির কণ্ঠে ফুটে ওঠে, প্রচ্ছন্ন উদ্বেগের সুর। তিনি লক্ষ্য করেন, অল্প দামে ভালো বই এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, আমাদের দেশে।

কিন্তু কেন?

রাষ্ট্রপতির ভাষণে এ প্রশ্নের উত্তর নেই। বোধহয়, কারণ দর্শাবার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। প্রকাশক মহল এতে উদ্বিগ্ন না হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তার কারণ, এতদিন তাঁরা কেবলই এক তরফা আবেদন-নিবেদন জানিয়ে আসছিলেন সরকারের কাছে। বলছিলেন, বিদেশী প্রকাশকদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তাঁরা সুবিধে করতে পারছেন না, বরং ক্রমাগত হেরে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় সরকার যদি সাবসিডি না দেন, তাহলে সস্তা দামে বই পরিবেশন করা যাবে না, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই কঠিন হয়ে পড়বে।

তবু সরকার তাঁদের প্রতি যথোপযুক্ত নজর দেননি।

দীর্ঘকাল পরে, রাষ্ট্রপতির ভাষণে তাঁদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকৃত হল। ফলে, তাঁরা বেশ খুশি। অনেকেই বলাবলি করছেন, হবে না কেন? বিদেশী বই কি এখানে সস্তায় পাওয়া যায় এমনি এমনি! খোঁজ করে দেখুন, বিদেশী প্রায় প্রতিটি সস্তা দামের বইয়ের পেছনে সরকারী সাহায্য রয়েছে। এমন কি যে বই ইংলণ্ডে কিনতে গেলে ২২৫ টাকা দিতে হয়, ঠিক সেই বই-ই ভারতে পাওয়া যায় মাত্র ৮৭ টাকায়।

এ ব্যাপারে তাঁরা ভারতে প্রতিষ্ঠিত 'ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুক সোসাইটির' নাম বিশেষভাবে স্মরণ করেন। এই সংস্থাটির উদ্যোগে ভারতে বৃটিশ বইয়ের চাহিদা এবং প্রচার বেড়েছে বহু গুন। ভারত সরকার কি বিদেশে অনুরূপ কোন সংস্থা তৈরী করতে পেরেছেন? এতে কি কেবল বইয়েরই বিক্রী বাড়ে? দেশ সম্পর্কে পাঠকেরা শ্রদ্ধাশীল হয় না? ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি গত দশ বছরে ভারতে সস্তা দামের বই বিক্রী করেছে আশি লক্ষের মত।

ভাবুন অবস্থাটা!

অতীতের নজীর টেনে কলকাতার এক প্রকাশক বললেন, কলেজ স্ট্রীটে প্রথম বাঙালী বইয়ের ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগরকেও সরকারী সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল, এককালে। তাঁর বহু বই ছাপা হয়েছে সরকারী অগ্রিম সাহায্যে। সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারী খুলে যখন তিনি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গল' বের করেন, তখন তিনি দেনার দায়ে বিপর্যস্ত।

কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন সরকার বাহাদুর।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে ১০০ কপি অন্নদামঙ্গল কিনে নেওয়া হল, প্রতি কপি ৬ টাকা হিসেবে ৬০০ টাকায়। বিদ্যাসাগর তাই দিয়ে প্রেসের বকেয়া ঋণ ও বইয়ের খরচ-খরচা মিটিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, সরকারী সাবসিডিতে কেবল পাঠ্য বই-ই নয়, উপভোগ্য সৃজনাত্মক বইও (গল্প-উপন্যাস?) ছাপা উচিত। কেননা, অশিক্ষা আর নিরক্ষরতাকে তাড়াতে না পারলে গণতন্ত্রের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বই-ই হল, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রধান হাতিয়ার।

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই উক্তি। আমরা এ জন্যে রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানাই।

তিনি বই-পড়ার অভ্যাস বদলের দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, পরোক্ষে। সাধারণ নিম্নবিত্তের মানুষ না হয় অর্থাভাবে বই কিনতে পারেন না, কিন্তু ধনীদের সমস্যা তো তা নয়! তাহলে তাঁরা বই কেনেন না কেন? প্রকাশকদের একথা ভেবে দেখতে হবে। তাঁদের বই পৌঁছে দিতে হবে। হয়ত, পাঠাভ্যাস তৈরী হলে, তাঁরাও অনেক বই কিনবেন। এ সম্পর্কে প্রকাশকদের নতুনভাবে চিন্তা করা উচিত।

বিশ্ব বই-মেলা

নয়াদিল্লীতে এই মেলার ব্যবস্থা করেছিলেন 'ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট' এবং 'ফেডারেশান অব পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশন' যুগ্মভাবে। এর আগেও 'ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট'-এর উদ্যোগে চার চারবার সর্বভারতীয় বইয়ের প্রদর্শনী হয়ে গেছে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীতে। তাতে কিছু সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবারের তাৎপর্য অন্যান্যবারের তুলনায় অনেক বেশী।

প্রথমত, এর আগে আর কখনো বিশ্ব বইয়ের মেলা ভারতে অনুষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম ভারত সরকার প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন যে, বই-প্রকাশও একটা শিল্প। অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি। এর আগে, ভারত সরকার বোধহয় মনে করতেন, বই ছাপা-টাপার কাজটা কুটির শিল্পের মতই ছোট-খাট কোনো ব্যাপার।

দিল্লীতে 'বিশ্ব বই-মেলা'র আয়োজন আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-বৎসরের কেন্দ্রীয় উৎসব। কিন্তু পনের দিনের অনুষ্ঠানে দেখা গেল, ইউনেস্কোর সদস্য দেশগুলির মধ্যে মাত্র পঞ্চাশটি দেশ এই উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য দেশগুলির মধ্যে বৃটেন, আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মাণী, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, হাঙ্গেরী, মালয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, কম্বোডিয়া, ইতালী, গ্রীস, স্পেন এবং পোল্যান্ড প্রধান।

তাহলে 'সবার জন্য বই', এই শ্লোগানটার কি গতি হবে? সবার সহযোগিতা না পেলে কি সকলের জন্য বই লেখা সম্ভব? না, সকলের কাছে বই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব? অতীতে এ ধরনের মেলা করা হয়েছে মূলত বাণিজ্যিক লেনদেনের সুযোগ-সুবিধা বাড়াবার জন্য। তাতে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উপায়ও আবিষ্কার হয়েছে। এবারের মেলায় কে কি রকম লাভবান হয়েছেন, তার বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে, প্রখ্যাত ভারতীয় গ্রন্থবিজ্ঞানী রামমূর্তি রঙ্গনাথনের জীবনের মূলমন্ত্র 'সবার জন্য বই' আন্তর্জাতিক শ্লোগানে পরিণত হয়েছে।

কলকাতার জল্পনা-কল্পনা

সেদিন কথা হচ্ছিল কলকাতার জনৈক বিখ্যাত প্রকাশকের সঙ্গে। বিশ্ব বই-মেলা সম্পর্কে তিনি খুবই আশাবাদী। তবে আরো স্থায়ী এবং কার্যকরী কোনো পথ আবিষ্কার করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে ভেবে দেখতে তিনি সকলকে অনুরোধ জানান।

বললুম, কি রকম?

—আন্তর্জাতিক ব্যাপারের সঙ্গে এখানকার প্রকাশকরা আর কতটা জড়িত হতে পারবেন? তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, সংস্কার—সব মিলিয়ে তো কাহিল অবস্থা! কলেজ স্ট্রীটে এমন বহু প্রকাশক আছেন যাঁদের বিদ্যেবুদ্ধি সম্পর্কে এখনও অনেকে সন্দিহান। এই অবস্থায় সবার আগে প্রয়োজন বুক ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলার জন্য, উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। শুনেছি, সেরকম আলাপ-আলোচনা হয়েছে, বই মেলার সেমিনারে। এরকম একটা কিছু না করতে পারলে উঁচু মানের বই বেরোবে কি করে?

বললুম, আপনারা পাঠকের অভিযানে বেরোন না কেন? বাংলা বইও তো আরো বেশী বিক্রী হতে পারে?

—নিশ্চয়ই। এখনো অনেক পাঠকের কাছে আমরা পৌঁছুতে পারিনি। এবং সে পথ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। এবার অ্যাসোসিয়েশন প্রত্যেক জেলায় এবং সাব-ডিভিশনে ব্রাঞ্চ অফিস খোলার কথা ভাবছেন। প্রত্যেকটি বইয়ের প্রচার এবং প্রসারে সেই সব শাখা অফিস নতুন উদ্দাম

নবে। স্থানীয় লাইব্রেরী ও স্কুল-কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

বললুম, এমন কিছু একটা করা যায় না, যাতে সাধারণ পাঠকও আগ্রহী হন? কি রকম?

ধরুন, অ্যাসোসিয়েশন যদি কয়েকটা মোবাইল ভ্যান কিনে প্রতি মাসে প্রকাশিত বইগুলি নিয়ে জেলায় জেলায়, গ্রামে-গ্রামান্তরে, গঞ্জের হাটে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে ওখানে যেমন কিছু বই নগদে বিক্রী হতে পারে, তেমনি পছন্দসই বই কেনার আগ্রহও পাঠকের মনে তৈরী করা যায়। আজ না কিনুক, পছন্দ হলে, কালও তো সে বইটা বিক্রী হতে পারে? তাতে কি প্রকাশকরা উপকৃত হবেন না? তাছাড়া পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার ওপরেও তো নির্ভর করে, বইয়ের চাহিদা কতটা বাড়বে বা বাড়বে না।

—তা ঠিক। তবে এ রকম কিছু করতে হলে সরকারের সহযোগিতা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। কেননা, সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার ব্যাপারটাকে পুরোপুরি কোনো দেশের সরকারই প্রকাশকদের ওপরে ছেড়ে দেন না। নিজেরাই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য উদ্যোগ নেন। আরো সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য সুস্থ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সেরকম মানসিকতা গড়ে ওঠেনি, স্বাধীন হবার পরেও।

বই-মেলার ব্যবসা-বাণিজ্য

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, দিল্লীতে এবার আফ্রো-এশীয় প্রকাশকদের একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছিল, আন্তর্জাতিক বই-মেলার চত্বরে। অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, য়ুরোপ-আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্য তাঁদের নেই। সেজন্যেই জোটবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

চুক্তি কতটা সম্পন্ন হয়েছে, জানি না। তবে এর ফলে, বইয়ের বাহির্বাণিজ্যের বন্ধ দরজাটা যে কিছুটা ফাঁক হল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন থেকে ভারতীয় বই অনূদিত হয়ে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ল।

কিন্তু ভারত সরকার কি তাঁর দূতাবাসগুলিকে সেভাবে প্রস্তুত রেখেছেন? অনেকের অভিযোগ, এদেশের প্রখ্যাত লেখকেরা পর্যন্ত বিদেশে গিয়ে মহা বিপারে পড়ে। কেউ তাঁদের নাম জানেন না, চেনেন না। সেদিন দক্ষিণ কোরিয়ার তিনজন লেখকের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো বাঙালী লেখকের নামও শোনেননি।

কেন?

ভারত সরকার কি প্রত্যেক বছর আকাদমি পুরস্কার দেন না? সেসব লেখকদের পরিচয়, খবরা-খবর, ছবি কি বিদেশী পত্র-পত্রিকায় পাঠানো হয়? ভারতীয় দূতাবাসগুলি তাহলে কি করেন?

এ প্রশ্ন শুধু আমার নয়, অনেকের।

সেদিন জনৈক ভারতীয় যুবক সদ্য বিদেশ থেকে ফিরে এসে বলেছেন, বিদেশে ভারতীয় বইয়েরও চাহিদা আছে। তবে সরকারী পর্যায়ে তেমন উদ্যোগ আয়োজন নেই। প্রত্যেকটি ভারতীয় দূতাবাসে যদি উল্লেখযোগ্য লেখকদের বইয়ের প্রদর্শনী থাকত, তাহলেও কিছুটা কাজ হত। অথচ, আমরা এখানে বসে পশ্চিম জার্মাণীর কোন্ কবি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, প্রেম করেছেন কিংবা বই লিখেছেন—সবই জানতে পারি। কোন উপায়ে? গুন্টের গ্রাসকে চেনাবার জন্য আমাদের উদ্যমের অন্ত নেই। অথচ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পরিচয় করিয়ে দিতে এত দ্বিধা?

শোনা যায়, বিশ্বে ভারতীয় বইয়ের সম্ভাব্য বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, একদল প্রতিনিধিকে পাঠানো হবে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী

একটা চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেছে সম্প্রতি। আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-বৎসর উপলক্ষে, ভারত সরকারের উৎসাহে রেল দপ্তরের একটা সুদৃশ্য রেল গাড়ী ঘুরে বেড়াবে, সারা বছর ধরে। অবশ্য, ভারতের কোনো অঞ্চলেই, এই রেল গাড়ীর প্রদর্শনী তিন মাসের বেশী দেখা যাবে না।

অঞ্চল মানে, ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—এই চারটি বিস্তীর্ণ এলাকা।

কেউ যদি বই কিনতে চান, তাহলে ঐ ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী থেকে নগদ দামে কিনতে পারবেন। দামও বোধহয় টাকায় দশ পয়সা করে কম নেওয়া হবে। আর যারা কিনতে চান না, তারাও রেল গাড়ীর জানালায় বইয়ের বিচিত্র প্রচ্ছদ দেখার সুযোগ পাবেন। এমন কি গাড়ীর ভেতরে গিয়ে নানা ধরণের বই উল্টে-পাল্টে দেখলেও কেউ বাধা দেবেন না।

রেল দপ্তর আশা করছেন, বিক্রীত বইয়ের কমিশন থেকে আনুষঙ্গিক খরচপত্র উঠে আসবে, অনায়াসে। যদি তাই হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সরকারী উদ্যোগে আলাদা প্রদর্শনীর আয়োজন না করে, প্রত্যেক যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর সঙ্গেই কি একটা বগি জুড়ে দিতে পারেন না? সব রকমের বই-ই থাকবে ঐ গাড়ীতে। যাত্রীরা পছন্দ মত বই কেনার সুযোগটিও গ্রহণ করতে পারবেন।

জাতীয় স্তরে অনুষ্ঠান

বিশ্ব বই-মেলার উদ্যোক্তারা, গ্রামে ও শহরে উন্নত মানের লাইব্রেরী স্থাপন করে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার আবেদন জানিয়েছিলেন, এ উপলক্ষে। এর জন্য রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতাও নাকি তাঁরা চেয়েছেন। তাঁদের ধারণা, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি করে ভালো লাইব্রেরী থাকলে ছাত্র-জীবন থেকেই পাঠের অভ্যাস তৈরী হয়ে যাবে।

এমন কি তাঁরা প্রস্তাব করেছেন, গ্রামাঞ্চলে অন্তত ১০০ টাকা দামের বই দিয়ে (জনপ্রিয় বই?) একেকটি পাঠাগারের সূচনা করা হোক। রাজ্য সরকারগুলি যাতে এই টাকা অনুদান হিসেবে দেন, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্মতি দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এছাড়াও তাঁরা প্রস্তাব করেছেন, বই-পড়ার উৎসাহ সঞ্চারের জন্য যেন 'বুক ক্লাব' গড়ে তোলা হয়। 'হোম লাইব্রেরী প্ল্যানস সোসাইটি' নামে নাকি আমাদের দেশে একটা পারিবারিক পাঠাগার পরিকল্পনা সমিতি আছে? কই এমন নাম তো এর আগে কখনো শুনিনি।

যাই হোক, এঁরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'বুক ক্লাব' গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করবেন। এমন কি, যাঁরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের 'বুক ক্লাব' গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ কি জানেন বুক ক্লাব গড়ে তোলার জন্য ডাক মাশুলের হার কমাবার যে-প্রস্তাব ওরা দিয়েছিলেন, তাও কার্যকরী করা এখনো সম্ভব হয়নি। বরং দিনের পর দিন বুক-পোস্টে বই-পাঠানোর খরচ দারুণ রকমে বেড়ে গেছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিশ্ব বই-মেলায় প্রদর্শিত আঞ্চলিক ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল। সর্বোচ্চ বই রপ্তানীকারকরাও তিনটি পুরস্কার পাবেন। ঘোষণা করা হয়েছিল, নতুন লেখকদের প্রথম পুস্তকের জন্যেও পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু সে পুরস্কার কারা পেলেন, কিভাবে পেলেন, তার খবরাখবর আজও জানা যায়নি। বিভিন্ন আলোচনা সভায় যে কিছু কিছু বিতর্ক এবং বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে—তার সংবাদ পাওয়া গেছে।

প্রখ্যাত হিন্দী লেখকরা প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন বাংলাদেশ থেকেই বা কোন্ কোন্ লেখক আমন্ত্রিত হয়েছেন? কিভাবে? হিন্দী লেখকদের মধ্যে শ্রীকান্ত বর্মা, রাজেন্দ্র যাদব, সর্বেশ্বর দয়াল, প্রয়াগ শুক্লা, প্রমুখ প্রতিবাদ করেছেন—সাহিত্যিকদের ভাবমূর্তি গুলো অলেখক এবং লেখা-ছেড়ে-দেওয়া মানুষের ভিড়ে বোঝাই হয়ে আছে।

তবু, এই উপলক্ষে যে-সব আলাপ আলোচনা এবং লেখালেখি হয়েছে, তা থেকে ভারতীয় বইয়ের গতি-প্রকৃতির একট আভাস পাওয়া যায়। প্রদর্শিত বইগুলি দেখেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, এখনও সারা ভারতে ইংরেজী বই বেরোয় বেশী বাংলা বইয়ের চাহিদা বাড়ছেও না, [illegible] না। কিন্তু হিন্দী বইয়ের প্রচার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ১৯৬৫-৬৬ সালে হিন্দী বই বেরিয়েছিল ২৩৭৬টি। ১৯৬৮-৬৯ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০৫৩টি।

এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি কিছু করার কথা ভাবছেন?

—শুভঙ্কর পাত্র

আত্মবিম্ব ॥ কাইয়ুম খান মিলন

প্রভাতের রক্তিম সূর্যটা যেন
কখনো তোলেনি ঢেউ মনের ইথারে।
আপন সত্তাকে তাই খুঁজতে গিয়ে
আঁধারের সিঁড়ি বেয়ে নামি গহনে।
কে যেন খুলে দেয় বন্ধ দুয়ার—
দৃষ্টি পড়ে প্রসারিত দিকচক্রবালে।

সৌরকরোজ্জ্বল ফসলের মাঠে,
কল্যাণের স্বপ্নে ভরা দিনগুলি হাসে
লালিত বাসনা পায় সোনালী বরণ,
স্বপ্নভঙ্গে সবি তার ফিকে হয়ে যায়।
তীব্রানুভূতি নিয়ে শানিত জিজ্ঞাসা,
পুরোনো মনকে করে ক্ষতবিক্ষত।

যখনি বাড়াই পা' নগরীর ভীড়ে—
জীবন্ত চলচ্চিত্র, সিনেমা পোস্টার
আর থরে থরে সজ্জিত পসরার মেলা
চোখ ধাঁধিয়ে দেয় বিচিত্রতায়।

হয়তো তখনি কোন রাস্তার মোড়ে
চোখাচোখি হয়ে যাওয়া কোন রূপসীর
মুচকি হাসির ছটা রোমাঞ্চ ছড়ায় ,
নয়তো অদেখা কোন রাজকন্যার প্রতি
কামনার আগুনে শুধু পুড়ে হই ছাই।

রক্তাক্ত মনে পড়ে প্রথম প্রলেপ।

মধ্যবিত্ত রেস্তোরাঁর লাউডস্পীকারের
নিনাদিত বাদ্য কর্ণে ঝংকার তোলে।
রেডিওর ভেসে আসা গানের কলির
সুর শুনে কখনো বা বিমোহিত হই।

হয়তো কখনো, কোন অলস দুপুরে
বসে চলে সিনেমার গুণ-কীর্তন :
নয়তো পড়শীর পেলে কোন খুঁত,
তাকেই আঁকড়ে ধরা মূল কর্ম ভাবি।
ক্ষুধার চাবুক যখন পড়ে জঠরে,
ছুটে যাই যে-যার অন্ন সংস্থানে।

রিকসার ক্রিং-ক্রিং, মোটরের বাঁশি,
শশব্যস্তে ছুটে চলা পদচারী সম
চেতনার অনুগুলি মিলায় ইতস্ততঃ।
মগজের কোষে কোষে চিন্তারাশি
পাক খেয়ে খেয়ে শুধু জটিল রূপ ধরে।

মুক্ত মনে নগরীর প্রান্তভাগে এসে
দাঁড়িয়ে কখনো ভাবি—এই কি জীবন?

প্রভাতের রক্তিম সূর্যটা যেন
তখনো তোলেনি ঢেউ মনের ইথারে।

বাঁচতে দাও ॥ হেনা হালদার

ফেলে ছড়িয়ে বাঁচতে দাও আমাকে
সময় কমিয়ে আয়ু বাড়াতে যাওয়াটা নিষ্ফল...

জীবনটা প্রেসার-কুকার নয় হে যে
পাঁচ মিনিটে ডাল,
দশ মিনিটে ভাত,
পনের মিনিটে মাংস রান্না করতে হবে।
ওদিকে আঙুলের ফাঁকে ঝরে পড়ছে
ফাঁকি দেওয়া বাকি সময়টা মিনিটে-মিনিটে।

গ্যাসের উনুনের মত হয়ত বা
বিনা এত্তেলায়
হঠাৎ ফুরিয়ে যাব একদিন.........
অজান্তেই নিভে যাব। নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
ফিরে আসব জিরো ডিগ্রিতেই।
কোনও লাইটারেই আর জ্বলব না।
কিছুতে। তাহলে সময় কমলেই আয়ু
বাড়বেনা যখন :

তখন সময় বাঁচিয়ে আনন্দ-কে
মেরে ফেলতে চাওয়াটা নিষ্ফল।

এখন ॥ গিরিধারী কুণ্ডু

সামনে
নরম বালির বিছানা
সমুদ্রের গলা ছাড়া শব্দ
আকাশের মুখ কী ভীষণ কালো
একটাও তারা নেই
নেই সোনায় মোড়া চাঁদ
তুমিও না।

এখন
খোঁজাখুঁজির পালা শেষ
নিরিবিলি অন্ধকারে পাগলামি
নৌকোগুলো ঘাড় কাত করে পড়ে
ঢেউয়ের ওপারে টেনে নেবার প্রস্তুতি নেই
কেউ আসে নি ওদের বাধ্য করতে

।।১১।।

তবু, নিমাইচরণ যে বেশীদিন টিকবে তা মনে করেনি হেমন্ত। বরং কিছু হাতিয়ে নিয়ে একদিন সরে পড়বে—এই কথাই ভেবেছিল। কিন্তু সেসব আশংকা ব্যর্থ করে দিয়ে নিমাই টিকে গেল। বরং বেশ জেঁকে বসল, বলাই উচিত।

শুধু তাই নয়, সে যা বলেছিল—'মারো কাটো ফাঁসী দাও কোথাও নড়ব না, চরণ ধরে পড়ে থাকব, তাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করল সে।

হেমন্ত যেন ওকে তাড়াবার জন্যেই—অথবা যাচাই করে বাজিয়ে নেবার উদ্দেশ্যেই—একটু বেশী রকমের দুর্ব্যবহার করে, ভূতের মতো খাটিয়ে নেয় তো বটেই সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। 'ভূত গতো খাটুনী' যাকে বলে। বিনামাইনের কেন, কোন মাইনের চাকরও এত খাটিতে রাজী হত না। তার ওপর উঠ্‌তে বসতে দুর্বাক্য—অশান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার। এতটুকু ভুল ত্রুটি—পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষা নেই।

হেমন্তর বাড়ির ঠাকুরই পূর্ণবাবুর কাছে গল্প করেছে, 'সককাল বেলা উঠে মা ওর চোদ্দপুরুষকে নরকে না পাঠিয়ে এক ফোঁটা জল খেতে দেন না।...গালাগালে ঘুম ভাঙে দাদাবাবুর, গালাগাল শুনতে শুনতে শুতে যায়। যা মুখ মার, তাতে ভূতও পালাত য়্যাদ্দিন—এ ভূতের বেহদ্দ!'

কিন্তু সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। এতটা বাড়াবাড়িরও প্রতিক্রিয়া হবে বৈকি!

আস্তে আস্তে হেমন্তরও মন ভেজে। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত। কখন যে নরম হয়ে আসে, কবে থেকে যে নিমাইকে—নিজের ছেলে না হোক, বাড়ির ছেলে, আত্মীয়ের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে—তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

নির্ভরতাও এসেছে বৈকি। আবার একটু একটু করে ঘর-বাড়ির কাজ শুরু করেছে, সে কাজে এমনিই একটি বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন ছিল, মনে মনে তাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অনেকটা ভার লাঘব হয়েছে এই ছেলেটার দ্বারা। হেমন্তর কাছে ফাঁকি দিয়ে পার পাওয়া বা চুরি করা শক্ত—তবু সে চেষ্টাও যে করে না নিমাই, এটা খুব লক্ষ্য করে দেখেছে সে।

তার মানে ছেলেটা চালাক, খুবই চালাক।

যে গাছে বসে থাকবে বলে ভেবেছে, বসে আছেও—তার ডাল কাটতে চায় না, মূলোচ্ছেদ করে না। যার অনেক পয়সা আছে, উত্তরাধিকারী নেই—তার মন যুগিয়ে চলে সুনজরে পড়লে এককালে এই সবই পেতে পারবে—এ জ্ঞানটা আছে।

তবে নিমাইচরণ যতই বশম্বদ হোক, তার ওপর আশা বা ভরসা বিশেষ ছিল না, ভবিষ্যতের স্বপ্নে সে নায়ক নয়—আর যাই হোক।

যেখানে আবার নতুন করে আশা অংকুরিত হয়েছে, অনেকখানি আশা সেখানেই ক্রমে হতাশ হতে হয় ওকে।

তারকের মৃত্যুর পর গৌরের মতো আর কাউকে ভালবাসেনি ও, আর কাকেও কেন্দ্র করে এমন আশার প্রাসাদ গড়ে তোলেনি। ইতিমধ্যেই বিগত জীবনের বিপুল আশা-ভঙ্গের দুঃস্মৃতিগুলো বিবর্ণ হতে চলেছে, সে জায়গা অধিকার করেছে কল্পনা—সুদূর ভবিষ্যতের অনেক সুখ-সৌভাগ্যের রঙীন চিত্র আঁকতে শুরু করেছে।

গৌর বড় হবে, পাস করবে ডাক্তারী নয়—ডাক্তারী পাস করার কথা মনে হলেই ভয় করে ওর—ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াবে শিবপুরে কি রুড়কীতে রেখে, বিয়ে দেবে, ছেলেপুলে হবে, ওরই নাতিনাতনী।...... হ্যাঁ, নাতি-নাৎনীই। গৌরকে কে—বোধ হয় সাধু কি মনোরমাই মা বলতে শিখিয়েছিল হেমন্তকে, হেমন্তও তার প্রতিবাদ করেনি, বরং এখন তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এই সম্পর্কবেই স্বাভাবিক বোধ হয়। আস্তে আস্তে কখন সত্যিই ছেলে বলে ভাবতে শিখেছে।

চেষ্টা বা আয়োজনেরও কোন ত্রুটি নেই অবশ্য।

কবিদের ভাষায়, আশাতরু মূলে বারি সিঞ্চনের।

বড় মিশনারী ইস্কুলের খরচ ও ঝঞ্ঝাট দুইই বেশী। বাঁধা পোশাক, হরেক রকম বাড়তি খরচ। শিক্ষার সমারোহ বলা চলে। সে সব হাসিমুখেই বহন করে হেমন্ত, হয়ত প্রয়োজনের বেশীই করে।

বড়লোকের ছেলের মতোই মানুষ হয়, সেইভাবেই মানুষ করার চেষ্টা করে। তারকের বেলায় যে সব সাধ মেটেনি কতকটা নিজের অক্ষমতার জন্যেও বটে, তখন আদৌ স্বচ্ছল ছিল না অবস্থা, কতকটা তারকের অনিচ্ছার জন্যেও—যা যে তার জন্যেই এত নিচে নেমেছে, এই কাজ করছে, সে জন্যে তার কুণ্ঠা ও বেদনার অবধি ছিল না, যত কম খরচ করে পারে ততটাই করার চেষ্টা করত—সেই সব সাধ গৌরকে দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করে।

এখান থেকে রাঁচী বহুদূর, সবটা ট্রেনে যাওয়াও যায় না—একটু হাঙ্গামা করেই যেতে হয়, তবু দুমাস তিনমাস অন্তরই হেমন্ত গিয়ে দেখে আসে। পুজো ও গরমের ছুটির আগে নিজে গিয়ে নিয়ে আসে। সে সময়ও ওকে ভাল ভাল খাবার করে খাওয়াবার, ওকে নিয়ে উৎসব করার ধুম পড়ে যায়। আর সেই আড়ম্বরের মধ্যে যে নিমাইচরণের প্রতি কিছুটা অবিচার ও অসম্মান করা হয়—সেটাও মোহাচ্ছন্ন হেমন্ত বুঝতে পারে না। কাকা চাকরের মতো খাটে তাই নয়—চাকরের মতো ভাইপোরও

স্বেচ্ছায় খাটতে হয় তাকে, ফাইফরমাস পালন করতে সদা তটস্থ ত্রস্ত থাকতে হয়। হেমন্তর মতো বহুদর্শী বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকেরও এই বিসদৃশ আচরণ চোখে পড়ে না—এটাই আশ্চর্য। গোরা তাকে এমনই পেয়ে বসেছে যে মানুষের সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিও আর কাজ করছে না।

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে তবু কিছুটা নিমাইচরণকে রক্ষা করেন পূর্ণবাবু।

সে-ই বোধকরি এ সংসারে তার শেষ কর্তৃত্ব, শেষ হস্তক্ষেপ।

নিউমোনিয়ার পর থেকে বৃদ্ধ পূর্ণবাবু আর কোনদিনই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি, আগেকার সে পরিশ্রমের শক্তি কিছুই প্রায় ফিরে পান নি। সুতরাং এ-বাড়িতে আসাটাও তাঁকে কমাতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। কদাচিৎ কদাচিৎ দু মাস তিন মাস অন্তর এক আধ ঘন্টার জন্যে আসতেন—চাকরদের নামাতে হত গাড়ি থেকে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ও তাদের সাহায্য দরকার হত—সেটা চিরদিনের কর্মঠ পূর্ণবাবুর ভাল লাগত না। সে জন্যে আসতেও চাইতেন না আর।

বেশির ভাগ সময় হেমন্তই ও'র খবর নিত গাই। পূর্ণবাবুর বাড়াবাড়ি অসুখের সময় থেকে ওবাড়ির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে, পূর্ণবাবুর স্ত্রীই খুলে দিয়েছেন। সুতরাং কোথাও কোন কাজে যাতায়াতের বা এমনিই, খবর নিতেই—শরীর খারাপের খবর পেলে—হেমন্তই যেত ও'র কাছে। প্রয়োজন বুঝলে এক আধদিন থেকেও যেত। শরৎসুন্দরীও আসতেন কখনও কখনও, তবে তিনি বেশ অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন—তাঁর সঙ্গেও লোক থাকা দরকার হত

এমনি এই দুর্লভ অবসরেই পূর্ণবাবু এসে পড়েছিলেন, দেখেছিলেন নিমাইচরণের হেনস্থাটা।

তিনিই আড়ালে সাবধান করে দিয়েছিলেন হেমন্তকে। 'এ কী করছ! বিষয়ের লোভে ছোঁড়াটা হয়ত সব সহ্য করছে, করবেও—কিন্তু ভাইপোটা বিষ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। যতই হোক, এতটা থ্যাঁৎলানো কখনও কোন মানুষের বরদাস্ত হয় না। কেনই বা অমন করছ? এতে বড় আকোচ বেড়ে যায়—শুধু শুধু একটা শত্রু তৈরী করছ কেন? এ রকম অকারণ মার খেতে খেতে একদিন না একদিন সাপ ফণা তুলবেই—তখন পারবে সে বিষের ধাক্কা সামলাতে? পাড়াগাঁয়ের লোক ওরা—না পারে এমন কাজ নেই, কখন কোথা দিয়ে কি অনিষ্ট করে বসবে তা টেরও পাবে না। একটা কিছু হয়ে গেলে কি ফেরাতে পারবে? হাজার কপাল চাপড়ালেও ফিরে আসবে না সময়টা। ছিঃ! তোমার মতো মানুষ এমন অন্ধ হয়ে যায় কি করে তা বুঝি না।...... আদর করতে চাও আদর দেখাতে চাও তার হাজারো পথ খোলা—তার জন্যে ওর ওপর এমন অত্যাচার চালাতে হবে কেন?'

তাতেই কাজ হয় খানিকটা। হেমন্ত সাবধান হয়।

কাকা যে কাকা—বাড়ির চাকর-বাকর নয়—হঠাৎ সেই জ্ঞানটা গৌরের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে বহুদিক দিয়েই।

এত আদরে ও আড়ম্বরে মানুষ করার আগে বা মানুষ করার কথা চিন্তা করার সময়ই একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল বোধ হয়।

বিলাসে ঐশ্বর্যে মানুষ করতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অমানুষ হয় ছেলে-মেয়েরা।

তাছাড়াও হেমন্ত নিজেই শ্বশুরদের ঝাড়গুষ্টির—যাকে বলে আদ্যশ্রাদ্ধ করে তাদের গুণের ব্যাখ্যা না করে, গৌরও যে সেই ঝাড় বংশেরই একজন, সেই ক্ষেত্রেই তা জন্ম—একথাটাও স্মরণ রাখতে পারত আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলে না—এতে অবিসম্বাদী সত্য।

কারণ যা-ই হোক—আসল কথা যা হেমন্তর এত চেষ্টা সত্ত্বেও গৌর মানুষ হ না।

রাঁচিতে পাঠাবার পর একবছর বে ছিল। হয়ত বেশ থাকতও—যদি না হেমন বার বার দেখতে যেত।

কে জানে—হেমন্তর সঙ্গে সঙ্গে কল কাতার আবহাওয়া, কলকাতার বহুবি উৎসব সমারোহ তার সহস্রাবিধ প্রলোভ নিয়ে উপস্থিত হত কিনা! সেই স্মৃতি হয়ত তাকে চঞ্চল অস্থির গৃহাভিমুখ করে তুলত। কিন্তু এখানে এলে সুবি হবে না, এটুকুও সে জানত, কঠো তিরস্কার সইতে হবে এবং কঠোরত ব্যবস্থায় আবার এখানে ফিরে আসতে হবে তাই সে অনাহই পালাতে চেষ্টা করল।

এই শ্রেণীর ছেলেরা প্রায়ই নির্বোধ হয় নির্বোধ না হলে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে ন করবে কেন? কেউ কেউ হয়ত ধূর্ততা চাতুর্যের পরিচয় দেয়—এইভাবে নিজের সর্বনাশ নিজেরা করার সময় কিন্তু সে বুদ্ধির নিদর্শন নয় আর যা-ই হোক।

বাড়ি থেকে কি হোস্টেল থেকে পালাবার সময় এরা আপাত ভবিষ্যতের কথাটাও চিন্তা করে না। পালিয়ে কি করবে, কি খাবে, করে খাবার কোন যোগ্যতা বা সম্ভাবনা আছে কিনা—এসব কথা ভাবার শক্তি—হয়ত বা ইচ্ছাও থাকে না এদের, অপ্রীতিকর চিন্তার এদিকে চোখ বুঁজে থাকে জেনেশুনেই—আপাতত এই নিয়মের কড়াকড়ি শাসন বা লেখাপড়ার হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পাবে—এই কথাটাই মাথায় থাকে শুধু।

গোরও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। হয়ত বা আরও বেশী নির্বোধ। সাধুসঙ্গের ছেলে সে, কতকটা সেইরকমই হবে বৈকি!

সেও কিছু না ভেবেই পালাল।

তবে মিশনারী পাদ্রী সাহেবরাও এসবে অভ্যস্ত। এর জন্য কতকটা প্রস্তুতই থাকেন তাঁরা, একটা ব্যবস্থাও ঠিক থাকে। প্রয়োজন হলেই যন্ত্রের মতো কাজ করে সেটা। সুতরাং ধরে ফেলতে বা ফিরিয়ে আনতেও বেশি দেরী হল না। ফিরিয়ে এনে কড়া পাহারায় রেখে তাঁরা হেমন্তকে জানালেন সংবাদটা।

বলাবাহুল্য হেমন্ত খবর পেয়েই ছুটে গেল।

ইস্কুলের কর্তারা বিরক্ত, ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁদের কাছে বহু মিনতি করে—মা-বাপ মরা অনাথ ছেলে তাঁরা দয়া না করলে মানুষ হবে না—ইত্যাদি বলে নিরস্ত করল। তাঁদের ব্যবস্থায়ও কিছু ত্রুটি আছে, ছোট ছোট ছেলেদের ওপর নজর রাখাও তাঁদের দায়িত্ব—একথাটাও যথাসম্ভব মোলায়েম আবৃত ভাষায় ভদ্রভাবে মনে করিয়ে দিল। তাতেই কাজ বেশী হল হয়ত। তাঁরা ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

ওদিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে গোরাকে নিয়ে পড়ল।

কিছু মিষ্টি কথায় বোঝাল, কিছু তিরস্কার করল। ভয়ও দেখাল কিছু। এই-ভাবে পালিয়ে এই বয়সে কী করে খাবে সে? হয় ভিক্ষে করতে হবে, কোন বদ্-ভিখিরীর পাল্লায় পড়লে কানা-খোঁড়া করে দেবে, জোর করে হাত-পা ভেঙ্গে দেবে হয়ত ভিক্ষে করাবার জন্যে—নয়তো চায়ের দোকানে কাপ-ডিশ ধুতে হবে, কি বিড়ি পাকানো। সেকি খুব ভাল লাগবে? কেউ তো কোথাও নেই তিনকুলে। দেশের বিষয়আশয় তো জ্যাঠা-কাকা-ঠাকুর্দার দল দখল করে বসে আছে—পাত্তাও দেবে না। আর সে সব জমিজমা ভাগ হতে হতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, সারা বছরের শুধু ভাতও মিলবে না। তাহলে কী করবে সে, কিসের আশায় পালিয়েছিল।

প্রথমটা মুখ গোঁজ করে বসেছিল গোরা—হয়ত একটু বুঝল, হয়ত ভয়ও পেল। দীর্ঘ বক্তৃতার ফল কিম্বা এতক্ষণের সর্বনাশে শান্ত হয়ে অব্যাহতি পাবার জন্যেই শেষ-পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিল এমন কাজ আর সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না পুরো ঠিকই—তবু আর কীই বা করার আছে। এতেই খুশী হয়ে ফিরতে হল। আরও দুদিন থেকে গোরাকে আরও একটু বুঝিয়ে ভবিষ্যতের অনেক মনোহর প্রলোভন দেখিয়ে পাদ্রী-সাহেবদের কাছে আর এক দফা মিনতি জানিয়ে হেমন্ত ফিরে এল।

এবার যাওয়া-আসা অর্থাৎ দেখতে যাওয়াটা অনেক কমিয়ে দিল। যেটা আগে প্রায় দু-মাস অন্তর ছিল সেটাই পাঁচ-ছ মাস অন্তর হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে অনেকেই কথাটা বলেছে ওকে। এত বার বার বাড়ির লোক দেখতে গেলে হোস্টেলে মন বসে না, সেইজন্যেই আরও পালাতে চায়। স্বাভাবিক সেটা।

অপরে যতই বলুক অত গ্রাহ্য করত না হয়ত—স্বয়ং পূর্ণবাবুও ঐ এক কথাই বললেন। তার পরিচিত সকল লোকের থেকেই পূর্ণবাবুর সাংসারিক জ্ঞান বেশী, এ পরিচয় বারবারই পেয়েছে সে।

বহু অভিজ্ঞতা ও পরাজয় স্বীকারের পর ইদানীং হেমন্ত নিজের কাছেই কথাটা মানতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু কে জানে, হয়ত এতেই আরও অনিষ্ট হল খানিকটা, হিতে বিপরীত হল। এবার এই দেখতে আসার বা খবর নেবার সময়গুলোর মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘতর হওয়াটাকে সে উপেক্ষা বা অবহেলা বলে মনে করল। আর সম্ভবত সেই অভিমানেই—পড়াশুনো ভবিষ্যৎ সমস্ত তিক্ত অর্থহীন মনে হল। বছরখানেক না যেতে যেতে আবারও পালাল সে একদিন।

এবার আর খবর পেয়ে হেমন্ত ছুটে গেল না আগের মতো।

গেল না—তার কারণ এখানে কাজ পড়ে গেছে সেই সময়। বাড়িঘরের কাজ। ইদানীং নিমাইচরণকে পাওয়ায় ওর কাজের উৎসাহ কিছু বেড়ে গিয়েছিল। ভূতের মতো খাটতে পারে—খাটার মধ্যে টো-টো করে ঘোরাই বেশী—অথচ বিশ্বস্ত, এমন লোক পাওয়া সহজ নয়। আর এরকম লোক না পেলে একা মেয়েছেলের পক্ষে এই ধরনের ব্যবসা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু ওরই দুর্বুদ্ধি—হাতের লোককে উদ্যোগী হয়ে ও-ই কুইয়ে বসে রইল।

নিমাইচরণই কথাটা পেড়েছিল প্রথমে, খুব সাধারণভাবে, কতকটা বাজে কথার মতোই।

'বসেই তো আছি, ডাক্তারবাবুকে বলে একটা কোথাও কাজকর্ম যোগাড় করে দিন না জ্যাঠাইমা।...আপনার আর এ কতটুকু কাজ, ফায়ফরমাশ খাটা বই তো নয়—বাকী সব সময়ই তো বসে বসে হাপুগেলা বলতে গেলে!'

'কী কাজ করবি তুই? কী জানিস?'

প্রশ্নও যেমন উত্তরও তেমন। সমান তাচ্ছিল্য আর ঔদাসীন্যের সঙ্গে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল হেমন্ত।

'কুলীগিরি! মিস্ত্রী! আবার কি?' আত্মধিক্কারে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল নিমাই, 'বামুনের ঘরের গরু, শাঁকে ফুঁ কি কানে ফুঁরও তো যুগ্যি নই যে সে কাজ করব—এক আছে উনুনে ফুঁ, রাঁধুনী বামুনের কাজ করতে হয়। বামুনের কাজ তো ঐ পঞ্জস্ত ইতি। তা নইলে সোজাসুজি মোট বওয়া কি লোকের বাড়ির উঠোন ঝাঁট দেওয়া। তবে তুমি যেকালে চরণে ঠাঁই দিয়েছ (নিমাইচরণের 'আপনি' থেকে

স্কুলমিতে বারম্বার যাতায়াত ঘটে—হেমন্তকে সম্বোধন করার সংগে), সেকালে—একেবারে যে ভাতের দুঃখু ঘটেনি—অত ছোট কাজ আর করব না। নইলে আমি সে বান্দা নই. ঐ যে ভোরবেলা পাইপে করে রাস্তায় জল দেয়—সে কাজও আমি করতে রাজী আছি। খাটুনি তা সে যা-ই হোক—কোনটাতেই আমি পিছপা নই। তবে অভতে দরকারই বা কি. আমাদের উদিক থেকে কত লোক তো সব কারখানায় কাজ করতে আসে এই কলকেতাতে। সে কাজ নাকি মেলেও, একটু খোঁজ করলে। বেশিরভাগই নোয়া পেটার কাজ, অন্যরকম মিস্তিরীর কাজও ক'রে কেউ কেউ। নেলোর কারখানায় * যায়। আমার এক জ্ঞাতিকাকা বুড়ো বয়সে বলতে গেলে—মানে সত্যি কি আর বুড়ো—এই তিরিশ বত্তিরিশ হবে পেরায়, নেলোর কারখানায় ঢুকেছে। বারো আনা রোজ ঢুকেছেন এখন আঠারো আনা করে পাচ্ছে।...... এলেক্টার কোম্পানীর কারখানাতে ভাল মাইনে দেয় শুনেছি—এক টাকা পাঁচসিকে রোজ পায়—ওদের ওখেনে কুলীও বলে না বলে মিস্তিরী।...আমার এক বোনাই ঢুকেছে ওখেনে, মাসে পেরায় তিরিশ একতিরিশ টাকা রোজগার করছে!'

এমনি কত কি বকে যায়—কিছু শোনে কিছু শোনে না হেমন্ত, অন্যমনস্ক হয়ে বসে হিসেব লেখে শেলেটে।

নিমাইচরণ অবশ্য এ ঔদাসীন্যে দমে না। সে অপেক্ষা করতে জানে। খুব কড়া তাগাদা করে না—তবে মধ্যে মধ্যেই কথাটা তোলে। হয়ত বলে, 'হ্যাঁ গো জ্যাঠাই, তুলেছিলেন কথাটা ডাক্তারবাবুর কানে? বসে বসে যে শেকড় গইজে গেল পেছনে!'

নয়তো বলে. 'সন্তানকে একেবারে ভুলে বসে রইলে জননী। বুড়োটা থাকতে থাকতে একটা ব্যবস্থা করে দাও না!'

তাই বলে সত্যিই কিছু বসে থাকে না সে। খাটনী খুবই তা হেমন্ত নিজেই স্বীকার করে। সেইজন্যেই আরও—ওর এই বিনয়ে খুশী হয়। এ খাটনীটা নিমাইয়ের গায়ে লাগছে না এতে তার গোপন অপরাধবোধ অনেকখানি সান্ত্বনা পায়।......ভূতের মতো খাটছে শুধু পেটভাতায়—এ তথ্যটা ওর বিবেককে পীড়া দেয় বৈকি মধ্যে মধ্যে।

এইভাবে কথাটা শুনতে শুনতে একদিন পূর্ণবাবুকে বলেছিল হেমন্ত। পূর্ণবাবু এখন প্রায় শয্যাশায়ী—শুয়েই থাকেন বেশির ভাগ—চলাফেরা করা কি রুগী দেখতে বেরনো ন'মাস ছ'মাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এখনও বহু লোকই ও'র কাছে আসে, ডাক্তার ছাড়াও বহু গণ্যিমান্যি লোক। সুতরাং এখনও তাঁর সুপারিশের দাম আছে।

* লিলুয়ার ওয়ার্কশপ। তখন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলপথের অন্যতম কারখানা

পূর্ণবাবু শুনে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'ছোকরা চালাক আছে তো!..... সত্যিই, তোমার সংগে সংগে কাজ করে কাজটা শিখছে ঠিকই—কিন্তু টাকা না থাকলে নিজে কোনদিনই এ কারবার করতে পারবে না। তুমি তো করছ কতকটা শখ করে—না করলে ভাতভিক্ষে জুটবে না এমন তো নয়—খেয়াল হলেই কোনদিনই টপ করে সব বন্ধ করে দেবে—তখন ও কি করবে? নিজের সেই ভবিষ্যৎটাই চিন্তা করছে আর কি! ...তা ভালই। তোমার মর্জি মেজাজের সংগে চিরদিন যে তাল রেখে চলতে পারবে, তারও তো ঠিক নেই। দিন থাকতে থাকতে দিন কিনে নেওয়াই দরকার। আচ্ছা, দেখি।'

আর এ প্রসংগ ও'র কাছে তোলেনি হেমন্ত। অত মনেও ছিল না। পূর্ণবাবু যে সত্যি সত্যিই কিছু করে দিতে পারবেন তা ভাবেনি সেরকমভাবে, সুপারিশ করার মতো করেও বলেনি। কতকটা কৌতুকছলেই বলেছিল।

কেবল নিমাইচরণকে কথাটা বলে ফেলেছিল একবার।

তাগাদাটা অনেকদিন অন্তর দিত নিমাই—মেজাজ বুঝে—পাছে বিরক্ত হয়ে ঝেঁঝে ওঠে, সেজন্যে অতি সাবধানে। এমনিই একটা তাগাদার মুখে হেমন্ত কতকটা দায় এড়ানোর ভাবেই বলে ফেলেছিল, 'ডাক্তারবাবুকে বলেছি তোর কথা। তিনি চেষ্টা করবেন বলেছেন।'

আর কিছু বলে নি নিমাইচরণ। তাগাদা করেনি আর। মানে হেমন্তকে করেনি। করেছে যথাস্থানে। যাতায়াতের পথে, ওদিকে কোন কাজ থাকলে—পূর্ণবাবুর খবর নিত সে। হেমন্তই বলে রেখেছিল। সেই সুযোগটাই নিল নিমাইচরণ।

আগে কোনদিনই নিজের কথা বলে নি, আইন বাঁচিয়ে চলেছিল—হেমন্ত কথাটা ও'কে বলেছে শোনার পর তাগাদাটা ঐখানে শুরু করেছে—যথাসম্ভব দীনতা ও বিনয়ের সংগে। তাতে কাজও হয়েছে। এক বন্ধুকে বলে টেলিফোন কোম্পানীর এক সাহেবকে ধরিয়ে সেখানেই শিক্ষানবীশ মিস্ত্রীর কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন পূর্ণবাবু—আঠারো টাকা বারো আনা মাইনেতে। এক বছর পরে কাজ শিখলে চাকরি পাকা হবে, মাইনেও হবে চব্বিশ টাকার মতো।

হেমন্ত যখন কথাটা জানল তখন কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। চাকরির চিঠি এসে যেতেই জানল সে। তার হাতেই চিঠি এসে পড়ল। তখন আর বাধা দেওয়া যায় না দিতে গেলে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়, প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে এই আয়টা পুষিয়ে দেবে সে।

তাছাড়া, তখন অতটা বোঝেও নি। চাকরির মধ্যেই ওর কাজটাও কতক দেখতে পারবে—মিস্ত্রী খাটাতে পারবে না ঠিকই, বায়না দেওয়া, তাগাদা করা অর্থাৎ মাল আনার যাবতীয় ঝঞ্ঝাট বইতে পারবে—এইটেই ভেবেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বিশেষ কিছুই আর তার দ্বারা হচ্ছে না। সকাল সাতটার মধ্যে ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায় সে—তার মধ্যেই বাজার করে নিজের ভাত নিজে রেঁধে খেয়ে যায়। আজকাল এক মেয়েছেলে রাঁধুনী হয়েছে হেমন্তর—সে বুড়োমানুষ, অত সকালে ভাত দিতে পারে না। হেমন্তই ব্যবস্থা করে দিয়েছে, রাতের তরকারী আলাদা ঢাকা থাকে, ভোরে উঠে উনুনে আঁচ দিয়ে একটা বাঁটনোয় চাট্টি ভাত চাপিয়ে দেয় শুধু নিমাই। চান সেরে ভাত নামিয়ে রেখে বাজার চলে যায়. সেখান থেকে ফিরে কোনমতে নাকেমুখে গ'ুজেই বেরিয়ে পড়তে হয়. সকালে আর কোন কাজেই পাওয়া যায় না।

বিকেলে ফেরে—যেদিন খুব সকালে হয় —পাঁচটায়, নইলে সাতটায়, কোন কোন দিন বাইরে দূরপাল্লায় কাজ থাকলে রাত আটটা নটাও বেজে যায়। তখন আর তাকে কোন কাজের কথা বলা যায় না। বললেও কোন কাজ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। অতরাত অবধি কে ওর জন্যে বসে থাকবে দোকান-দপ্তর খুলে?

এক শুধু রবিবারগুলোতেই যেটুকু কাজ পাওয়া যায় নিমাইচরণকে দিয়ে—শনিবারের বিকেল আর রবিবার। অবশ্য এই দেড়দিন ভূতের মতোই খাটে নিমাই, অবিরাম—তবু সাড়ে পাঁচদিনের ক্ষতি তাতে পোষানো যায় না।

এই প্যাঁচে পড়েই হেমন্ত হিমসিম খাচ্ছিল যখন গোরার দ্বিতীয়বার পালানোর খবর এসে পে'ছিল। অনেক কাজ হাতে অনেক কাজে হাত দিয়ে ফেলেছে—এখন তিন-চার- দিন বাইরে কাটিয়ে এলে বিস্তর ক্ষতি হয়ে যাবে। পুরুষ মানুষের মতো দাঁড়িয়ে মিস্ত্রী খাটাতে হয়—সে না থাকলে মিস্ত্রীমজুর নিজেরা তো ফাঁকি দেবেই সেও এক কথা—আবার মালপত্র ঠিকমতো না যোগাতে পারলেও কাজ পড়ে থাকবে শুধু শুধু ওদের রোজ গুনতে হবে। তার ওপর—উনো কর্ম দুনো—একরকম বলে যাবে তারা আর একরকম করে রাখবে, একে আবার হয়ত ভেংগে নতুন করে করাতে হবে। এতকাল মিস্ত্রী খাটিয়ে এবিষয়ে তার এ অভিজ্ঞতা বারবারই হয়েছে, সেই ভয়ই তার সবচেয়ে বেশী।

সে জন্যেও বটে—হয়ত আবার পাদরীদের কাছে গিয়ে মাথা হে'ট করে অনুনয়-বিনয় করতে হবে, সেটাও খুব রুচিকর মনে হল না—সে ইস্কুলে চিঠি লিখে দিল, তাঁরা যেন যেমন করে পারেন ধরে আনেন—দরকার হয় পুলিশের সাহায্য নিয়েও, খরচা যা লাগে সে দিতে প্রস্তুত আছে। তবে এ ব্যাপারে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব যে ও'দেরই—একথাটাও চিঠির শেষে মনে করিয়ে দিতে ভুলল না।

।।দশ।।
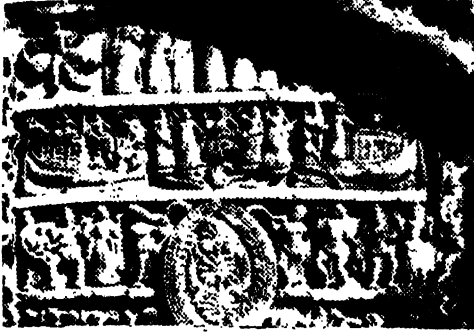
।। দাসপুর ও ঘাটাল ।।

এ সিরিজের লেখাগুলির এক স্থানে বলেছি মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার সূত্রধরেরা এককালে দক্ষ মন্দিরনির্মাতা রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। স্থানীয় ভূস্বামী বা কোনও রাজার আমন্ত্রণে এঁরা দল বেঁধে বেরুতেন বাংলার নানা অঞ্চলে। মন্দির-নির্মাণকালে মাসের পর মাস এঁরা বাইরে কাটাতেন। সূত্রধরদের এক-একটি বিরাট দল থাকতো। এঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক তৈরী করতেন ইঁট, অপর কয়েকজনের ওপর ভার থাকতো পোড়ামাটির টালি ও মূর্তি তৈরীর ভার, আর একদল করতেন মন্দির-গাত্রের নকাশি কাজ ইত্যাদি। এভাবে শ্রম-বিভাগের দ্বারা অর্ডারমাফিক মন্দির তৈরী করতে যতখানি সময় লাগা উচিত ছিল ততখানি লাগতো না। মন্দিরের ডিজাইন বা নকসা তৈরী করতেন মূলতঃ প্রধান সূত্রধর অথবা মন্দির প্রতিষ্ঠাতার মতানুসারেই মন্দিরের নকসা তৈরী হতো মন্দির প্রতিষ্ঠাতার অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক সময় মন্দিরের পরিকল্পনা করা হতো। পোড়ামাটির টাইলস্, অলঙ্করণ ও মূর্তি-নির্মাণ ও স্থাপনে খরচ খুব বেশী পড়তো বলে মন্দির প্রতিষ্ঠাতার অনেকে এগুলি বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। অল্প কিছু কিছু পোড়ামাটির কাজ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করে অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরের কাজ শেষ হয়ে যেত। বাংলার অনেক গ্রামে এ ধরনের অলঙ্করণ-বিহীন বা অল্প অলঙ্কারযুক্ত অনেক মন্দির আজও চোখে পড়ে যাদের মধ্যে চালাজাতীয় মন্দিরের সংখ্যাই বেশী। অবশ্য চালা-জাতীয় মন্দিরমাত্রেই যে অলংকরণ নেই এ-কথা ভুল, তবে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বাঙালীর চালাঘরের অনুকরণে এসব মন্দির তৈরী হতো বলে এগুলিকে সাধারণতঃ সরল করা হতো। গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পছন্দ করতেন এ ধরনের চালা-মন্দির। তাই পল্লী অঞ্চলের বেশীর ভাগ স্থানেই চারচালা আটচালা জাতীয় মন্দির আজও চোখে পড়বে।

অর্থসম্পত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে মন্দির-নির্মাণ করাটা আংশিকভাবে সত্য হলেও একেবারে ঠিক নয়। বাংলার মন্দিরগুলি ভালো-ভাবে লক্ষ্য করলে চারটি জিনিস চোখে পড়বে। এক হল, উচ্চতার দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক মন্দিরের পরিকল্পনা; দুই, মন্দিরের উচ্চতার থেকে পোড়ামাটির কাজ ও কারু-কার্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি; তিন, উচ্চতা ও পোড়ামাটির কাজ উভয়ের প্রতিই সমান লক্ষ্য; চার, সরল পদ্ধতিতে সাধারণ মন্দির নির্মাণ। পর্বতাকৃতি বহুচূড় মন্দির নির্মাণে যেখানে লক্ষ্য সেখানে অলংকরণ অনেক স্থানে গৌণ হয়ে উঠেছে দেখা যায়। মন্দিরের সামনের দিকে বাঁয়ে-ডাইনে ও মাঝ-খানে অলংকরণ কিছু কিছু দেখা গেলেও এসব মন্দিরের উচ্চতাটাই বেশী করে চোখে পড়ে। আবার বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের আনু-কূল্যে যেসব মন্দির নির্মিত হয়েছিল যাদের মধ্যে একরত্নের সংখ্যাই হল সব থেকে বেশী। সেগুলিতে পোড়ামাটির শিল্প-কলাই প্রাধান্য পেয়েছে দেখা যায়। এসব মন্দিরে উচ্চতা যে প্রধান লক্ষ্য নয় তা সহজেই বোঝা যায়। বিষ্ণুপুরে পঞ্চরত্ন মন্দির দু একটি থাকলেও নবরত্ন যে মল্ল-রাজদের কাছে একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না সেকথা আগেই বলেছি। আবার পোড়া-মাটির কাজ করা নবরত্নমন্দির পল্লীর কোন দুর্গম নিভৃত অঞ্চলে লক্ষ্য করে আশ্চর্য হতে হয়, যেখানে রাজারাজড়াদের অস্তিত্ব কোনকালে ছিল বলে মনে হয় না। এ ধরনের একটি মন্দির হল দাসপুর থানার (মেদিনী-পুর জেলা) লাওদা গ্রামে বংক রায়ের নব-রত্নমন্দির। মন্দিরটির দ্বিতলের ছাদের চার কোণে চারটি এবং দ্বিতলের ওপরের চার কোণে চারটি ও তাদের মাঝখানে একটি নিয়ে মোট নয়টি চূড়া বর্তমান। মন্দিরের সামনের দিকে থাম ও খিলানের ঠিক ওপরে কার্নিসের ঠিক নীচে ও বাঁ ও ডাইনে পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট কাজ দেখা যায়। ঘাটাল শহরে বৃন্দাবনচন্দ্রের নবরত্নমন্দিরের রত্ন-গুলি পর্বতাকৃতি, ক্রমসূক্ষ্ম এবং খাঁজকাটা। মন্দিরের সামনের দিকে পোড়ামাটির ভালো কাজ আছে। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সন ১২০১ সাল বা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে। এটির সামনে টিনের একটি আটচালা বর্ত-মান। এসব মন্দিরে পোড়ামাটির কাজের

ঘাটালের বৃন্দাবনচন্দ্রের নবরত্ন। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৯৪ খৃঃ

রাধাকান্তপুরে (দাসপুর থানা) লক্ষ্মী বংশের পঞ্চরত্ন রঘুনাথ মন্দির

থেকে শিখরদেশের উচ্চতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঘাটালের বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের সঙ্গে কলকাতার বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের ভবতারিণীর নবরত্নমন্দিরটির সাদৃশ্য অনেকাংশে লক্ষ্য করা যায়। এ-মন্দিরটির দু-পাশে শিবের অষ্ট শাল (আট চালা) মন্দির বর্তমান, সম্মুখে একটি নাটমন্দিরও আছে। এ মন্দিরটির রত্নগুলিও ক্রমসূক্ষ্ম, পর্বতাকৃতি ও খাঁজকাটা। প্রতিটিরই শিরোভাগে আমলক, কলস ও চক্র বিদ্যমান। ভবতারিণী মন্দিরটির থামগুলি কলাগেছ্যাশ্রেণীর (কতকটা কলাগাছের মতো) দোতলার থামগুলিও তাই। এ মন্দিরটির সম্মুখে ফুলকারি নকসা ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না। নকসাগুলিও সাধারণ শ্রেণীর। পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশেও কোন অলংকরণ বা পোড়ামাটির কাজ নেই। মন্দিরটির কোন লিপিও দেখতে পাওয়া যায় না। ঘাটালের মন্দিরটির সামনের দিকে পোড়ামাটির কাজ থাকলেও পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশ একেবারে অলংকরণবর্জিত। রত্নগুলির অগ্রভাগে আমলক, কলস ও চক্র আছে। এ ধরনের মন্দির উত্তর ভারতীয় বহুচূড় মন্দিরের অনুকরণে যে তৈরী হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানায় এ-ধরনের উত্তর ভারতীয় পদ্ধতির চূড়াওয়ালা কয়েকটি মন্দির দেখা যায়। অবশ্য এসব মন্দিরের রত্নগুলি পুরোপুরিভাবে সূক্ষ্মাগ্র ও পর্বতাকৃতি হয় নি। রত্নগুলির সূক্ষ্মত্ব অপেক্ষা স্থূলত্বই বেশী। এ ধরনের দুটি পঞ্চরত্নশ্রেণীর মন্দির হল রাধাকান্তপুরের বসু-পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দধিবামনের মন্দির। মন্দিরটিতে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন টেরাকোটা নেই। সম্মুখভাগের ডাইনে-বামে কার্ণিসের নীচের দিকে খোপে খোপে টেরাকোটা টাইল স্থাপিত। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল বাংলা ১১৭৭ সাল, শকাব্দ ১৬৯২। অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী হলেন দধিবামন ও রাজেশ্বরী। মন্দিরটির প্রথম সংস্কার হয় ১৩০৬ সালে ও দ্বিতীয়বার সংস্কার করা হয় ১৩৬০ সালে। সংস্কর্তা প্রাচীন মূল লিপিটির নীচে নীচে লিপির মাধ্যমে সংস্কারকালের উল্লেখ করেছেন। দাসপুর থানার মন্দিরগুলির সংস্কার খুব একটা দেখা যায় না। সে দিক থেকে রাধাকান্তপুরের বসু-পরিবারের উদ্যম যে প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই। মন্দিরে দেবতার পুজো এখনও নিয়মিত হয়ে থাকে। এটির পেছনেই একটি পুকুর ও আশপাশের দৃশ্য দেখে এ অঞ্চলের প্রাচীন গৌরবের কথা অনুমান করা যায়। আমার আগের একটি লেখায় রাধাকান্তপুরের দাসেদের মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছি। দাসপুর থানায় এ শ্রেণীর দ্বিতীয় আরেকটি মন্দির হল কাদিলপুরের দত্তদের রঘুনাথমন্দির। এ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল বাংলা ১২০৬ সাল। এর সম্মুখ দিকে অনেক টেরাকোটা চোখে পড়ে। ডাইনে বাঁয়ের খোপে খোপে টেরাকোটা টাইল স্থাপিত। ছাদের কার্ণিসের নীচের মূর্তিগুলি বেশ সুন্দর। রাধাকৃষ্ণের পোড়ামাটির মূর্তিই বেশী। কাদিলপুর গ্রামটি কলমিজোড়-গোলগ্রাম রাস্তায় পড়ে। মন্দিরটির সামনের দিক ছাড়া পাশ ও পেছনের দিকে কোন টেরাকোটা নেই। চেতুয়া-বাসুদেবপুরের বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় ভগ্নাশিব মন্দিরটির পাঁচটি রত্নের ঊর্ধ্ব ভাগের কিছু অংশ খাঁজকাটা। এ মন্দিরটিতে টেরাকোটা বিশেষ কিছু নেই, তবে সামনের ডাইনে-বাঁয়ে ও ওপরে সাজানো পরপর টাইল আছে। মন্দিরটির কোন থাম না থাকায় গর্ভগৃহের সম্মুখের কোন অংশ নেই। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত ও জীর্ণ।

দাসপুরের বিখ্যাত সূত্রধরেরা তাঁদের নিজেদের গ্রাম দাসপুর ও অন্যান্য স্থানে মন্দির স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন রেখে গেছেন তার কিছু আলোচনা এর আগে হয়ে থাকলেও আরও কতগুলি মন্দিরের আলোচনা এ প্রসঙ্গে করা যাচ্ছে। দাসপুর থানার নানাস্থানে অবস্থিত এ মন্দিরগুলির গঠন কতকটা একই ধরনের। এগুলির বেশীর ভাগই পঞ্চরত্ন। রত্নগুলির উচ্চতা ও আকৃতি প্রায় একই ধরনের এবং উৎকলীয়-রীতির। এ উৎকলীয় রীতির যে দেউলের কথা বলেছি এসব মন্দিরের রত্নগুলি তারই ক্ষুদ্র রূপান্তর মাত্র। রত্নগুলির শীর্ষদেশে আমলক, কলস ও চক্র ছিল। বর্তমানে এগুলির বেশীর ভাগই স্থানচ্যুত হয়েছে। এ পঞ্চরত্নগুলির মধ্যে দাসপুরে চক্রবর্তীদের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্নটির সঙ্গে রাধাকান্তপুরের নন্দীবংশের পঞ্চরত্নের এক আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের গঠনরীতি ও প্রতিষ্ঠাকাল এক। এ দুটির প্রতিষ্ঠাকাল বাংলা ১২৫৩ সাল। উভয়েরই হাসিগলা খিলান ও দরুন থাম। উভয়েরই

লাওদা গ্রামের (দাসপুরের কাছাকাছি) [illegible] নবরত্ন মন্দির

দাসপুরে চক্রবর্তী বংশের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন

রাধাকান্তপুরে বসু বংশের প্রতিষ্ঠিত দধিবামনের মন্দির। প্রতিষ্ঠাকাল [illegible]

সামনের দিকে টেরাকোটা আছে। সামনের ছাদের কার্ণিসের নীচে সমান্তরাল ও কার্ণিসের আকারে ঈষৎ বক্র রেখার দ্বারা পরপর বিযুক্ত দুই প্রস্থ টেরাকোটা টাইল খোপে খোপে স্থাপিত। ডান ও বাঁপাশে ওপর-নীচে পরপর সজ্জিত প্রতি খোপে টেরাকোটা টাইল দেখা যায়। কার্ণিসের নীচের টেরাকোটা টাইলের নীচের কিছু অংশ বাদে পরে থাম ও খিলানের ঠিক ওপরে অপূর্ব টেরাকোটা সজ্জা লক্ষ্য করা যায়। দাসপুরের মন্দিরটিতে এর ওপরেও আবার একপ্রস্থ টেরাকোটা লক্ষ্যণীয়। মন্দিরের দু-পাশে ও পেছনে কোন টেরাকোটা সজ্জা নেই। এ দুটি মন্দিরের এরকম অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে একই সূত্রধরের তৈরী বলে মনে হয়। দাসপুর গ্রাম থেকে রাধাকান্তপুরের দূরত্বও খুব একটা বেশী নয়। তাই একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

দাসপুর থানার কিশোরপুর গ্রামে গোসাইদের রাধাগোবিন্দের মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল বাংলা ১১৭৯ সাল বা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এ মন্দিরটিও পঞ্চরত্ন এবং রত্নগুলিও উৎকলীয় টাইপের। এটিরও সামনের দিকের ছাদের কার্ণিসের ঠিক নীচে একটি রেখার দ্বারা বিযুক্ত দু প্রস্থ টেরাকোটা টাইল আছে। এই টাইলগুলি একসঙ্গে পাশাপাশি দুটি করে সজ্জিত। পোড়ামাটি মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সংকীর্তনরত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ। এ চিত্রটি বড়ই প্রাণবন্ত। এছাড়া রাধাকৃষ্ণ লীলাচিত্রও কিছু কিছু আছে। দাসপুর গ্রামের পালেদের লক্ষ্মী জনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল ১৭১৩ শকাব্দ বা ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা ১১৯৮ সালে। এ মন্দিরটিরও সামনের টেরাকোটা সজ্জা অপূর্ব। ডানপাশের ওপরে নীচে পরপর সজ্জিত টেরাকোটা টাইলের মধ্যে দশাবতারের মূর্তি আছে। দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধাবতারে জগন্নাথ লক্ষ্যণীয়। দাসপুরের বহু মন্দিরে বুদ্ধাবতারে জগন্নাথের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি পরিত্যক্ত নয় এবং এটির অবস্থা এখনও ভালো। টেরাকোটা সজ্জা অক্ষত। এর চূড়াগুলি উৎকলরীতির। মাঝের রত্নটি চার কোণের চারটি রত্নের তুলনায় বেশ বড়ো এবং শীর্ষদেশে আমলক, চক্র প্রভৃতি এখনও বর্তমান। কলামজোড় গ্রামে শীতলার পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এ ধরনের মন্দিরেরই মতো। পঞ্চরত্ন মন্দিরের আরেকটি নিদর্শন হল চেতুয়া-বাসুদেবপুরের বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির। এটির সামনে দুটি সম্পূর্ণ থাম ও পাশের আংশিক থাম দুটি ভেঙে যাওয়ার পরে নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। এর কোথাও কোন টেরাকোটা বিন্যাস নেই, কিন্তু সামনে কিছু কিছু ফুলকারি নকসা চোখে পড়ে। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত।

দাসপুর থানার ব্রাহ্মণবসান গ্রামে শ্রীধরের আটচালা মন্দিরটির সম্মুখ দিকে সুসজ্জিত টেরাকোটা বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এর থাম ও খিলানও সুদৃশ্য। চালের কার্ণিসের ঠিক নীচে ওপরে নীচে করে দু-প্রস্থ টেরাকোটা টাইল সজ্জিত। থাম ও খিলানের ওপরেও পোড়ামাটির অপূর্ব মূর্তি দেখা যায়। ডাইনে-বাঁয়ের ওপর নীচের খোপে খোপে পোড়ামাটির টাইল স্থাপিত। আটচালা টাইপের মন্দিরের মধ্যে এ ধরনের পোড়ামাটির সুদৃশ্য মূর্তি খুব কমই চোখে পড়ে। দাসপুর থানার বালিহারপুর গ্রামে ব্রজকিশোর রায়ের এক রত্ন মন্দিরের সম্মুখ দিকের সব স্থানেই টেরাকোটাবিন্যাস ছিল। এগুলির বেশীর ভাগ এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মন্দিরটির একমাত্র রত্নটি ছত্রাকার ও চওড়া।

দাসপুর থানার উপরিউক্ত মন্দিরগুলির গঠনপ্রণালী ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যে দাসপুরের সূত্রধরদের দ্বারা তৈরী হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। এসব সূত্রধরেরা দরুন, কলাগেছ্যা ইত্যাদি থাম এবং হাঁসগলা খিলান তৈরীতে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পারতেন। উপরি উল্লিখিত মন্দিরগুলির প্রায় প্রতিটিতে এ ধরনের থাম ও খিলান দেখতে পাওয়া যায়। টেরাকোটা বিন্যাসের ক্ষেত্রে এঁরা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন অনেকাংশে। এ অঞ্চলের টেরাকোটা ও টেরাকোটা টাইলগুলি এক বিশেষ ধরনের পদ্ধতিতে তৈরী হতো মনে হয়। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ও স্থাপিত এসব টেরাকোটা বেশীর ভাগ

বাসুদেবপুরের বৃন্দাবনচন্দ্রের পঞ্চরত্ন

ক্ষেত্রে আজও অক্ষত হয়ে রয়েছে। বিষ্ণুপুরের অনেক মন্দিরের টেরাকোটা ভেঙে গিয়েছে দেখা যায়, তাছাড়া সেসব টেরাকোটার মসৃণতার চেয়ে রুক্ষতাটাই বেশী করে চোখে পড়ে। এর কারণ হয়তো ও অঞ্চলের মাটির গুণাগুণ। কিন্তু দাসপুরের পোড়ামাটি সজ্জার মসৃণতা স্পষ্টই চোখে পড়বে। কালের প্রকোপে এসব দুর্লভ ও বর্তমানে লুপ্ত টেরাকোটা সজ্জা ও অলংকরণ আজ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এ প্রসঙ্গে দাসপুরের গঙ্গারাম চৌধুরীর পূর্ণ টেরাকোটা বিন্যাসযুক্ত মন্দিরটির কথা ভাবলে বড়ই দুঃখ হয়। এ মন্দিরটি আজ লুপ্ত। এভাবে আরও কতো মন্দির যে আজ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। পরবর্তী প্রবন্ধে মন্দির টেরাকোটা সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

(ক্রমশঃ)

মজিলপুরে আচার্য সতীশচন্দ্র

ফণীন্দ্রনারায়ণ দত্ত

আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্ত আজিও রচিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ তিনি আত্মপ্রকাশবিরোধী ছিলেন, আত্মগোপনই ছিল তাঁর প্রকৃতি। এমনকি নিজের আলোকচিত্রও কখন তিনি তুলিতে দিতেন না। কিছুদিন পূর্বে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার বিদুষী পত্নী অধ্যাপিকা শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার প্রধান অনুরক্ত ছাত্র ও নিত্য সহচর শ্রীকৃষ্ণদাস সিংহরায় মহাশয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর স্মারক পুস্তকে তাঁহার ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে বাংলার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তিনিই ছিলেন প্রবর্তক এবং প্রধান সংগঠক। বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে যে কলেজ স্থাপিত হয় এবং যাহা বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, তিনি তাঁহার 'ডন' সোসাইটির ছাত্রবৃন্দ লইয়া তাহার গোড়া পত্তন করেন। তাঁহারই আহ্বানে ঋষি অরবিন্দ ঐ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। 'ডন সোসাইটি'র কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন মেধাবী এবং স্বনামধন্য ছাত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। যেমন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট অর্থশাস্ত্রবিদ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ হারাণচন্দ্র চাকলাদার প্রভৃতি। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' নামক গ্রন্থে আচার্য সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর ব্যাপক জীবনটি ছিল বহুমুখী। এই নিবন্ধে তাঁর মজিলপুরে অল্পদিন অবস্থানকালীন মাত্র দৈনন্দিন কার্যকলাপের কিছু বিবরণ দেই। তৎপূর্বে তাঁর মজিলপুরে আগমনের পূর্বাভাস দিলে [illegible]।

আচার্য সতীশচন্দ্রের সহিত পিতৃদেবের বহুদিন যাবত বিশেষ আন্তরিকতা ছিল। উভয়ের মধ্যে বরাবরই পত্র বিনিময় হইত এবং মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গেলে দেখাশুনা আলাপ আলোচনা চলিত। মদীয় খুল্লতাতদিগের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া ওঠে। সেই সুবাদে তিনি কলিকাতার বাড়ীতেও প্রায়স গমনাগমন করিতেন। তাঁহারা ধর্ম, শিক্ষা ও নানা বিষয় তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ লইতেন এবং আলোচনাও হইত। পিতামহ স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ দত্ত মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

পরে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গে যখন সারা ভারত উদ্বেলিত হইয়া উঠে তখন তার ডাকে দলে দলে বহু স্বনামধন্য নেতা ও কীর্তিমান ছাত্রবৃন্দ সাড়া না দিয়া পারে নাই। মদীয় পিতৃদেবও তাহাতে যোগদান করেন। ফলে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় 'গোলামখানা' স্বরূপ বিবেচিত হওয়ায় আমরা তিন ভ্রাতাই উক্ত শিক্ষা ছাড়িয়া দেই, জ্যেষ্ঠদ্বয় কলেজ ত্যাগ করেন, আমিও প্রবেশিকা পরীক্ষা বর্জন করি। আমার পরীক্ষা তথাকথিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বর্জন করায় অনেক আত্মীয় তীব্র আপত্তি করেন এবং পিতার এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নয় বলিয়া অভিযোগ করেন। কিন্তু আচার্য সতীশচন্দ্র ইহাতে পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি জানান এবং পিতার এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

সেই সময় হইতে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের এক কার্যকরী শাখাস্বরূপ চরকায় সুতাকাটা ও খদ্দর বয়ন শিল্পের প্রভূত প্রসারলাভ করায় আমাদের বাড়ীতেও বয়নশিল্পের একটি কেন্দ্র করা হয়। এই সকল বিষয়ে আচার্য সতীশচন্দ্র আমাদের বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং কার্যকরী বিষয়ে নানা সৎপরামর্শ দিতেন। তিনিই কাশী গান্ধী আশ্রম হইতে বয়নশিল্পে পারদর্শী ত্রিপুরাচরণ ভারতী নামক জনৈক যুবককে তাঁত কার্যের জন্য এখানে আসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই সময় হইতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার আমার সৌভাগ্য হয়। ইহার কিছুদিন পরে মহাত্মাজী কারাবরণ করিলে তাঁর মুখ্য ছাত্র নিত্যসঙ্গী শ্রীকৃষ্ণদাস সিংহ রায় মহাশয় পিতৃদেবের অনুরোধে তাঁহার আদেশ লইয়া আমাদের মজিলপুর বাসভবনে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। সেই

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অবসরে তিনি মহাত্মাজীর সহিত সাত মাস' গ্রন্থখানির রচনা কার্য করিতে থাকেন। এই সময় অকস্মাৎ মহাত্মাজী এ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বৃটিশ সরকার তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলে অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করিবার জন্য তাঁহাকে পুণায় সেসুন হাসপাতালে এ ভর্তি করা হয়। তখন মহাত্মাজী কৃষ্ণদাসজীর সেবায় পরিতুষ্ট হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আহ্বান করেন। তদনুযায়ী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হইতে লোক পাঠাইয়া খবর দিয়া শেষরাত্রে বাসযোগে কৃষ্ণদাসজীকে কলিকাতায় লইয়া যান এবং সেখান হইতে তিনি মহাত্মাজীর কাছে চলিয়া যান। এখানে তখন রেল চলাচল আরম্ভ হয় নাই।

ইহার কিছুদিন পরে পিতৃদেব আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মজিলপুরে আসিবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি কিছুদিনের জন্য এখানে আসিয়া থাকিতে সম্মত হন। প্রসঙ্গক্রমে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং ইহা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে তিনি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর হইতে কোন কাজই স্বইচ্ছায় করিতেন না। সমস্ত কিছুই তাঁর গুরুর আদেশ বা নির্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হইত। তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাঁর দেবগুরুর উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন। বলা বাহুল্য এখানে আসিয়া থাকা সম্বন্ধে সৌভাগ্যক্রমে তিনি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পাইয়াছিলেন।

সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। গ্রীষ্মের এক অপরাহ্নে তিনি আমাদের মজিলপুরের বাটীতে আসিয়া উপনীত হন। তিনি আসিয়া কিছু দিনের জন্য যে কক্ষে অবথান করেন সেই কক্ষটির এক ঐতিহ্য আছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মদীয় পিতামহ 'যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে তাঁর কাজের অবকাশে পিতামহের কাছে আসিয়া দুই চার দিন কালাতিপাত করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। উভয় বন্ধুরই সুরাপানের অভ্যাস ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইহাই ছিল তৎকালীন প্রথা—স্বর্গত সুসাহিত্যিক ও কবি যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীতে এই প্রথার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমাদের বহির্বাটীর দোতলার বৈঠকখানার পার্শ্বের ঘরে বঙ্কিমচন্দ্র শয়ন করিতেন এবং তাহার সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে মদ্যপানকালীন ডাবছোলার দাগ আজিও বিদ্যমান আছে। বঙ্কিমচন্দ্র শারদীয়া পূজার সময় একবার মজিলপুরের বাটীতে ছিলেন। আমাদের বৈঠকখানা বাটী পূজার বাটীর সংলগ্ন এবং যে গৃহে তিনি থাকিতেন উহার পূর্বদিকের জানালার সম্মুখে পূজা মণ্ডপ অবস্থিত। সেখান হইতে পূজা দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভাবসমাধি হয় এবং আনন্দমঠে মায়ের তিন রূপ—(মা যা ছিলেন—মা যা হইয়াছেন এবং মা যা হইবেন) দিব্য দৃষ্টিতে প্রকটিত হয়। ভারতের দেশপ্রেমোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম' ভাবাবেশে রচিত হয়। সেই গৃহই আনন্দমঠ উপন্যাসের পরিকল্পনা ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া তাঁহার রচিত ইন্দিরা উপন্যাসে দুর্গার দালানের বর্ণনাটি এই পূজার বাটীর বর্ণনা মাত্র। মদীয় পিতামহ তাঁহার যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সেকথা প্রখ্যাত জীবনচরিত লেখক শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

পরে কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগিনী সুসাহিত্যিকা শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী মজিলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে শুভাগমন করিলে উক্ত বৈঠকখানা ঘরেই অবস্থান করেন।

আচার্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এখানে থাকাকালীন দৈনন্দিন জীবনধারার কিছু পরিচয় দেই। প্রথম দিকে তিনি অন্নাহার করিতেন না। মুড়ী ও কয়েকটি আলুপোড়া মাত্র আহার করিতেন। কয়েক দিন পরে পিতৃদেবের অনুরোধে ও শরীরের অবস্থা বুঝিয়া অন্নাহার করিতে থাকেন। তাঁহার রান্না মাতাঠাকুরাণীই করিতেন। তাঁহার রান্না সাধারণ গৃহস্থের 'ব্যঞ্জনস্য ঝালে ঝোলে'র ন্যায় হইত না। পেঁপের ডালনা, পলতার ডালনা প্রভৃতি ঝাল ও অধিক মশলাবর্জিত 'স্থিরা হৃদ্যা আহার সাত্ত্বিক প্রিয়া'র অনুরূপ ব্যঞ্জনাদি হইত। তিনি কোন কোন দিন আমাকে রন্ধন করিতে বলিতেন। আমিও তদনুযায়ী মায়ের নিকট বসিয়া তাঁহার নির্দেশমত রান্না করিতাম। আহার করিতে করিতে তিনি কখন কখন বলিতেন—'তুমি সমালোচনা কি করে লিখিতে হয় জান?' আমার অজ্ঞতা স্বীকার করিলে তিনি বলিতেন 'লেখ'। পরে তিনি এক একটি ব্যঞ্জন ধরিয়া তার দোষ-গুণ বিচার করিয়া এবং কি করিলে উহা আরও উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদ হয় তাহা বলিয়া যাইতেন—আমি লিখিয়া যাইতাম। পরে উহা মাতাঠাকুরাণীকে শুনাইতে হইত। তাঁহার 'চা' পানেরও কিছু বিশেষত্ব ছিল। তিনি অতিউষ্ণ 'চা' পান করিতেন এবং 'চা' পান করিবার সময় ঘরের জানালা সব বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেন ও গায়ে গরম জামা পরিধান করিতেন, এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন— "System —"System এ heat absorb করিলে গায়ে ঘাম প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়—তাহাতে শরীর স্বাচ্ছন্দ্য বোধহয়।

এখানে আসিবার পর প্রথম দিকে তিনি যখন কৃষ্ণদাসদাদার লিখিত 'মহাত্মাজীর সঙ্গে সাত মাস' গ্রন্থখানির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে থাকেন তখন তাঁহার লেখা ছাপাখানার উপযোগী নকল করিবার জন্য জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিও আমাদের বাটীতে থাকিতেন। কিন্তু তিনি শ্রীযুক্ত বড়বাবুর হাতের লেখা ভাল পড়িতে পারিতেন না, সেজন্য কয়েক দিন মাত্র কাজ করিবার পর তাঁহাকে কার্যের অবসর দেন। তিনি চলিয়া যাইবার পরে আমাকে উক্ত নকল করিবার কাজ করিতে অনুমতি করেন, এবং আমাদের হিতৈষী সুহৃদ ও কর্মচারী 'সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে কিয়দংশ নকল করিতে দিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল। তিনিও শ্রীযুক্ত বড়বাবুর পরিচিত এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এক একটি অধ্যায় লেখা শেষ হইলে তাহা মাদ্রাজের Ganesan & Co. -তে ডাকযোগে পাঠান হইত; এমনও হইয়াছে অধ্যায়টি পাঠানর পরই

কিছু রদ-বদলের প্রয়োজন বোধে তৎক্ষণাৎ তার করিয়া উহা ফেরৎ আনাইয়া সংশোধন করিয়া পুনরায় পাঠান হইত। এই সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন—'তুমি কিরূপে বুঝিলে, অথবা ইহার সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে কিনা, কিম্বা কোন বিষয় বাদ পড়েছে কিনা?' কারণ 'যৎ দৃষ্টেং তৎ লিখিতং'—মাছিমারা কেরাণীর মত নকল করা তিনি চাহিতেন না। ইহাও তাঁহার শিক্ষাদানের এক কৌশল ছিল।

এখানে থাকিবার কয়েক দিন পরে তিনি পিতাকে প্রাতঃকৃত্য সমপনান্তে স্নান করিয়া শয়ন কক্ষের পার্শ্বস্থিত বড় বৈঠক-খানা ঘরে নিত্য কিছু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে বলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের একটি পট পাঠের সম্মুখে টাঙান হইত। গ্রন্থাদির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতই ছিল প্রধান। প্রথমে আমাকে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সামান্য পাঠ করিবার আদেশ দেন, পরে পিতা পাঠ করিতেন। তখন তিনি তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে উহা শুনিতেন ও নিজের ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। পাঠ সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পট ও গ্রন্থাদি ভিতর বাটীতে রাখিয়া আসিতাম। পাঠের পূর্বে ও পাঠান্তে শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করিবার নির্দেশ ছিল। একদিন পাঠান্তে ঐগুলি তুলিয়া গ্রন্থগুলির সহিত একত্রে পটটি লইয়াছি দেখিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পটটি টাঙান হয় কেন? উদ্দেশ্য কি?' আমি বলিলাম—'শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে টাঙান হয়।' তাহাতে তিনি বলিলেন—'যদি সেই বিশ্বাসেই টাঙান হয় তবে মনে করা উচিত ঐ পটের মধ্যে শ্রীভগবান প্রত্যক্ষ বিদ্যমান। এখন তোমাকে যদি ট্রাঙ্ক ও বিছানার মোটের সংগে একত্রে শায়িত করিয়া লইয়া যাওয়া হয় তবে তোমার অবস্থা কিরূপ হয় মনে কর? যদি ঐ পটে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব আরোপ কর তবে ঐরূপভাবে পট লইয়া যাওয়া উচিত নয়—উহা সোজাভাবে আলাদা লইয়া অগ্রে রাখিয়া আসিয়া পরে গ্রন্থাদি ও চৌকি আসন লইয়া যাইবে। আর পটের মধ্যে যদি শ্রীভগবানের অস্তিত্ব আছে মনে না হয় তবে ঐ পটের সংগে সাধারণ ছবির কোন পার্থক্য নেই।' তাঁহার এইরূপে অদ্ভুত ভগবৎ বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও আস্তিক্য বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হইলাম এবং আস্তিক্য বুদ্ধি কাহাকে বলে তাহাও শিক্ষালাভ করিলাম। এই প্রসংগে তিনি আরও দুই চারি কথা বলিয়া বুঝাইয়া দেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মজিলপুরে অবস্থানকালীন মহাত্মা গান্ধী একবার সফর প্রসংগে সপার্ষদ কলিকাতায় আসেন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাটীতে ওঠেন। শ্রীযুক্ত বড়বাবু তদুপলক্ষ্যে কলিকাতায় গিয়া তিন-চার দিন ছিলেন। তিনি তাঁর ভাগিনেয় শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে থাকিতেন। উহা দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটে। সেই সময় মহাত্মাজীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পিতার সহিত মেজ-দাদা ও আমি গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে অধ্যাপক কৃপালনীজীর সহিত পরিচয় করিয়া দেন ও বলেন "This is professor Kripalani of undying fame". কৃপালনীজীও হাসিতে হাসিতে পিতাকে দেখাইয়া বলেন "This is your Majilpur friend" পরে মহাত্মাজী সেখানে আসিলে তাঁহার সহিতও পরিচয় করাইয়া দেন। মহাত্মাজীও —"I see, I see, বলিয়া হাসিতে হাসিতে অভিবাদন করেন। পিতা ও আমরা অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করি। মহাত্মাজী কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে শ্রীযুক্ত বড়বাবু তাঁহার সহিত দেখা করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিবার সময় মহাত্মাজী তাঁহাকে বলেন— —"Now you are retiring to your nest"

শ্রীযুক্ত বড়বাবু এখানে যখন ছিলেন সেই সময় মহাত্মাজী জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানিতে চাহেন। তদুত্তরে তিনি যে পত্র লেখেন আমার যতটুকু স্মরণ আছে তাহাতে শ্রীযুক্ত বড়বাবু আমাদের ঋষি প্রবর্তিত পথে সংযমের মাধ্যমে শাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী চলার কথাই উল্লেখ করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি তিনি অনুমোদন করেন নাই।

অপরাহ্নে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর ভ্রমণ করার অভ্যাস ছিল। তিনি সেই অবসরে আমার কোন বিষয় জানিবার থাকিলে প্রশ্ন করিতে বলিতেন; এবং আমার যাহা যাহা মনে হইত তিনি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন। সান্ধ্য ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের পুষ্পোদ্যানের মন্দির প্রাঙ্গণের এক নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া বিশ্রাম বায়ু সেবন করিতেন। কিছুক্ষণ পরে গৃহে ফিরিয়াও পিতা, দাদা, সুশীলদাদা প্রভৃতি আমাদের সকলের সহিত ধর্ম ও বিবিধ বিষয় আলোচনা হইত। সেই সময় ধর্ম সদ্ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইত।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর বৃদ্ধাবস্থায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বধর্মনিষ্ঠ কালিনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত বিশেষ সৌহার্দ গড়িয়া উঠে। সেই সুবাদে তিনি কালিনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে দুই বার শুভাগমন করেন। শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু তাঁহার মজিলপুরের বাটীতে আসিলে যে ঘরে অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ প্রশস্ত পুষ্করিণীর পাড়ে বসিবার যে তিনটি বাঁধান বেদী ছিল তাহার মধ্যে তিনি বসিয়া সৎ প্রসঙ্গ করিতেন তাহা আচার্য সতীশচন্দ্র অবগত হইয়া একদিন কালিনাথবাবুর বাটীতে আমাকে সঙ্গে লইয়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, এবং সেই ঘরটিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকেন এবং পুষ্করিণীর পাড়েও প্রণাম করিয়া তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সেই সময় তাঁর মুখমণ্ডলে যে অপূর্ব ভক্তির ভাব লক্ষ্য করেছি তাহা লিখিবার শক্তি নাই।

আপনজনের ন্যায় তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিন আকস্মিকভাবে আসিয়া পড়িল। এইভাবে মজিলপুরে তাঁর সংস্পর্শে আমাদের অবিস্মরণীয় আনন্দের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। তাঁহার এই সামান্য দিনের জন্য মজিলপুরে থাকাকালীন তাঁহার ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠার, গুরু অনুগত প্রাণের ও গুরুনির্ভরতার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এবংপ্রকার সৎসংগের ফল যে কত মধুময় ও শ্রেয়স্কর তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমুচুকুন্দ শ্রীভগবানকে বলেছেন :—

'ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদাভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ।
সত্ত সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।।'

১০।৫১।৫৩

জীবনে এইরূপ সুখের দিন অতি-অল্পই আসে এবং তার পরিসরও অল্প। সেই সকল সৎশিক্ষা, সৎপ্রসঙ্গের সুখ-স্মৃতি থাকিয়া যায়, কিন্তু জীবনের সেই অমূল্য শুভমুহূর্তগুলি আর ফিরিয়া আসে না।

॥ ১ ॥

জীবন নিজেই একটি গুরুগৃহ।

সংসারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা-ব্যর্থতা সবই সেই গুরুগৃহের প্রসারিত পাঠ্যসূচী।

একদিন সেখানকার পাঠ শেষ করে সন্ধ্যাবেলায় নিজের গৃহের পথ ধরে ফিরতে হয়। তখন কতো প্রশ্ন মনে আসে। নিজেকে নিজের জীবনের উদয়াস্ত দিনগুলোকে জানতে ইচ্ছে করে, দেখতে ইচ্ছে করে। এতোদিনের পথ পরিক্রমার উপার্জিত অভিজ্ঞতার আলো ফেলে জীবনের খাঁজ-খন্দের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে নেমে যেতে ইচ্ছে করে।

সজল একবার পূর্বদিকে তাকালো। সন্ধ্যা তারাটি তখনও ধানক্ষেত আর অরণ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কাছের ট্রেন লাইনটা দুটো দীর্ঘ কালো সমান্তরাল রেখা টেনে ক্রমশঃ এগিয়ে গেছে। কিছু দূর যাওয়ার পর সে রেখা দুটো আর চোখে পড়ে না। অন্ধকারের কোলাহলে কোথায় হারিয়ে গেছে তারা!

স্টেশনের কাঠের বেঞ্চটায় সজল অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে নানা কথা ভাবছিল। পুরী প্যাসেঞ্জার আসবে রাত একটা নাগাদ। ভদ্রক না কোথায় বন্যার জলে রেল লাইন ডুবে গেছল। তাই আসতে লেট হচ্ছে।

গায়ের ভেজা সার্টটা এখন শুকিয়ে আসছিল হাওয়ায়। হাত দিয়ে সজল মাথার লম্বা চুলগুলো কপাল থেকে সরালো।

ওদিকে একটা কেরোসিন বাতি টিম-টিম করে জ্বলছিল। এছাড়া প্লাটফর্মে আর কোন আলো নেই। সেই অস্পষ্ট আলোয় মাঝে মাঝে যাত্রীদের চলাফেরা কথাবার্তাকে যাত্রার কোনো দৃশ্য বলে সজলের মনে হচ্ছিল। সারাদিন ধরে বৃষ্টি হলেও এখন বৃষ্টি পড়ছে না।

একটা অজানা আশংকা, উত্তেজনা সজলকে অস্থির করে তুলছিল। মনটাও বড় বিষণ্ণ। জীবনে এই প্রথম সে কলকাতা যাচ্ছে। শহরের পথঘাট সে চেনে না। আপনার লোক বলতেও কেউ নেই। তবে বকুল আছে। নোটখাতার এক কোণে ওর ঠিকানাটা লিখে রেখেছে সজল। হাওড়া স্টেশনে নেমে কাউকে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই বলে দেবে কোনদিকে যেতে হবে। বকুল তাকে দেখলে খুশি হবে। এতোদিনে ও আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। সেই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ-মুখ! ওটা ওর কোন ক্লাশ হোলো? নাইন? না, ক্লাশ টেন হোলো বোধহয়।

বকুলের জন্য সজল বাড়ী থেকে দুটো আনারস নিয়ে যাচ্ছে। ঘরের জিনিস। এছাড়া সজলের মত গরীব মানুষ আর কী বা নিয়ে যেতে পারে।

ইস, ট্রেন আসতে আরও কত দেরি। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। এই বৃষ্টি-কাদায় নিজের গ্রাম থেকে সবং, সবং থেকে তেমাথানি পর্যন্ত হেঁটে এসেছে সে। তা, কম করে হলেও পঁচিশ মাইল। শুধু কাদা নয়। নদী ধারের ঘন কাঁটালতাগুলো পায়ে-চলা পথটার ওপর এমনভাবে ছড়িয়ে ছিল যে, চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর বৃষ্টি। কখনও বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে, কখনও কারুর বাড়ীর দাওয়ায় বসে বৃষ্টির হাত থেকে জামা-কাপড় বাঁচাবার চেষ্টা করেছে সজল। তবু সব ভিজে গেছল।

একবার নদী পাড়ের একটা স্কুল ঘরে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। স্কুলটি তাদের গ্রামের স্কুলের মত। তখন এই মাটির দেয়াল দেওয়া খড়ের ঘরটাকে তার বড় আপন, বড় কাছের বলে মনে হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে দূরে নদীটার আবছা ছবি চোখে পড়ছিল। তখন দুপুর। কোথাও লোকজন নেই। একমাত্র বৃষ্টির শব্দ ছাড়া, কোন শব্দ নেই। বিদেশ যাওয়ার পথে, ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পথে, এই অচেনা নির্জন স্কুল ঘরটির স্নেহ, তার মনটাকে আরো ভারি, আরো বিষণ্ণ করে তুলছিল। মনে হচ্ছিল এটাই যেন তার নিজের গ্রামের স্কুল, যেখানে ছেলেবেলায় সে পড়ত, দুষ্টুমি করত, খেলত। খুঁজে দেখলে হয়ত কৈশোরের বহু ফেলে-আসা করুণ স্মৃতির পদচিহ্ন এখানেও চোখে পড়বে।

গ্রাম থেকে দূরে এই বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এই নির্জন স্কুল ঘরের দাওয়ায় একা-একা দাঁড়িয়ে বাড়ী-ঘর, আর ছোট বোন মিনুর কথা সজলের কান্নার মত মনে পড়ছিল।

বেঞ্চটায় কে একজন এসে বসল।

সজল সরে এল একটু। অন্ধকারে লোকটির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছিল লোকটি প্রৌঢ়। একটু মোটাসোটা। সঙ্গে গামছায় বাঁধা ছোট পুঁটলি, হাতে একটা পুরনো ছাতা, গায়ে ঢিলে হাফ সার্ট। বোধহয় কলকাতার যাত্রী।

লোকটি সজলের দিকে তাকাল।

কিন্তু এই স্বল্পালোকিত স্টেশনের প্লাটফর্মে চেনা লোককেও অচেনা বলে মনে হয়। একটু পরে একটা দরাজ গলায় প্রশ্নে সজল একটু চমকে ফিরে তাকাল।
'কোথায় যাবে হে তুমি?'

বিদেশ যাওয়ার পথে লোকে সঙ্গী খোঁজে। সজল ভাবল, তাই বোধহয় জিজ্ঞেস করছে।

'কি? কথা বলছ না যে?'

সজল ইতস্ততঃ করে বলল, 'কলকাতা।'

'ও কলকাতা।—কলকাতার কোথায়?'

রাস্তার নাম, বাড়ীর নম্বর সজলের এসব মনেও থাকে না। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ঠিকানাটা লেখা আছে।'

লোকটি কিছুক্ষণ নিজের মনে কি ভাবল, তারপর একটা বিড়ি বের করল। এবং দেশলাইয়ের সামান্য আলোয় এই প্রথম দুজন দুজনকে একটু সময়ের জন্য স্পষ্ট করে দেখতে পেল এবার।

সজল দেখল, প্রকাণ্ড একজোড়া ঝুলো-পড়া গোঁফ থাকলে কি হবে লোকটি বড় সাধাসিধে, সরল।

'বাড়ী কোথায় তোমার?'—বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল।

সজলের একটু ভয় করছিল। পথে-ঘাটের অচেনা লোককে কি সব কথা বলতে আছে!

'বাড়ী কোথায় বললে না?'

সজল বাধ্য হয়ে বলল, 'অমৃতপুর।'

'অমৃতপুর? বাপের জন্মে এমন নাম শুনিনি। হারাধন অধিকারীর সঙ্গে চালাকি মারছ না তো হে ছোকরা?'

সজলের কেন যেন একটু হাসি পেল।

'তোমার নাম কি?'

সজল নাম বলল।

'বাবার নাম কি?'

"কীর্তিবাস ভট্টাচার্য।' সজল বাবার 'বেদান্ত রত্ন' উপাধিটা আর বলল না।

হারাধন অধিকারী মুখ থেকে আধ-পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটু অবাক হয়ে বলল, 'নামটা শোনা শোনা লাগছে যেন হে। বাবা কি করতেন?'

সজল সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। এই টোল ছিল। সংস্কৃত পড়াতেন।'

হারাধন কথাটা লুফে নিল—'তাই বলো। পণ্ডিত ছিলেন। তা—সে তো ঐ দক্ষিণে পটাশপুরের দিকে।'

'অমৃতপুর ওর কাছেই।'

হারাধন একটু অবাক হয়ে বলল, 'এই বর্ষা-কাদায় রাত্রে একা-একা কলকাতা যাবার মানে?'

'যদি কাজটাজ কিছু পাই?'

হারাধন যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'কাজ! এতোবড় পণ্ডিতের ছেলে, তুমি আবার—। তা কে কে আছে বাড়ীতে?'

'ছোট মা, আর একটা ছোট বোন।'

'ছোটমা মানে? তোমার বাবা—'

'মা মারা যেতে বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন।'

'ও। তা তোমাদের জায়গা জমি নেই? বসতবাড়ী? তাও না?'

সজল এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিল না। এমন দুঃখের কথা বলাও যায় না। শুধু তার মনে পড়ছিল টাকার অভাবে ম্যাট্রিক দেবার পর কয়েক বছর পড়াই হোলো না। আর বি-এ পরীক্ষার ফি দেবার সময় শেষ পর্যন্ত ঘরের কাছের দশ কাঠা জমি বিক্রী করে দিতে হোলো। শেষ সম্বল বলতে গেলে ঐ জমিটুকুই ছিল। ভিটের কাছের জমি তো নয়, সে যেন সোনা! অবশ্য কিছু ঋণ শোধ হোলো তাতে। কিন্তু তারপর!—সজলের চোখের সামনে তার বাড়ীর দারিদ্র, করুণ ছবিটা ভেসে উঠল। ছোট বোন মিনু সকালে উঠে দু মুঠো মুড়ি খেতে পায় না। তেলহীন একমাথা রুক্ষ চুল নিয়ে ক্ষিধের জ্বালায় এবাড়ী-ওবাড়ী ঘুরে বেড়ায় খেলার নাম করে। সজল সব বুঝতে পারে—! অথচ মিনু দেখতে কী সুন্দর!—ছোটমা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরে—। কতো চেষ্টা করেও সজল প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারির কাজও জোগাড় করতে পারেনি।—না ঘরের কথা বলা যায় না, বলে কি লাভ!

কথায় কথায় হারাধন কিছুটা আপন হয়ে উঠেছিল। এই বৃষ্টি-কাদায় বারো ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসেছে শুনে হারাধন তাজ্জব বনে গেল। বলল, 'খেয়েছ কিছু?'

যেন হারাধন নিজের ছেলেকে প্রশ্নটা করছে। সজলকে চুপ করে থাকতে দেখে হারাধন বলল, 'চল চল ওঠো।'

স্টেশনের দক্ষিণদিক দিয়ে একটা রাস্তা বাজারের দিকে চলে গেছে। সেই রাস্তার মোড়ে শশীর হোটেল। এত রাত্রে খরিদ্দার বেশি ছিল না। যারা শহর থেকে ফিরে বাস পায়নি তারা হোটেলে খেয়ে চাটাইতে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের দাওয়ায় স্যাঁত-সেঁতে শীতল পাটির এক-ধারে একটা কেরোসিন বাতি জ্বলছে। চার-ধারের ঘন অন্ধকারে চিমনির মত ধোঁয়া-ওঠা এই আলোটাকে বীভৎস লাগছিল। হোটেলের মালিক শশী সেই আলোয় আজকের বাজারের হিসেব লিখে চলেছে।

বোধহয় রাস্তায় পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল।

শশীর মুখে মালিকের গাম্ভীর্য।

হারাধন কাদা পাটা ঘাসে মুছতে মুছতে চেঁচিয়ে বলল, 'এসে পড়েছি। এই ঠাকুর, ভাত আছে?'

ঠাকুর বাইরে ছিল না। গম্ভীর গলায় শশীই সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'রাত্রে থাকা হবে?'

অর্থাৎ থাকা হলে তার চার্জ আলাদা।

হারাধন বলল, 'না, না ট্রেন লেট। খেয়েই চলে যাব। ভাত আছে? মাছ? কুরন কত করে?'

শশী বলল, 'সব আছে, মাছ, মাংস। শুধু মাছ-ভাত খেলে ফুরণ সাত আনা।'

'সাত আনা!' হারাধন অধিকারী দু' চোখ কপালে তুলে বলল 'দিনে দিনে এমন আক্রার বাজার হলে তো মশায় আমরা মারা পড়ি—সজল পা ধুয়ে এসে বোসো।'

সজল দেখছিল মাথায় কাদা না থাকলেও হারাধনের গোঁফের এক জায়গায় কাদা লেগে আছে। ইশারায় জানাতে হারাধন জামা দিয়ে মুছে নিয়ে আবার ইশারা করল সজলকে—আর আছে?

সজল মাথা নেড়ে জানাল, না নেই।

হয়েছিল কি, স্টেশন থেকে যে ঢালু শান বাঁধানো রাস্তাটা বাজারের রাস্তায় এসে মিশেছে, বৃষ্টি পড়ে-পড়ে সেই রাস্তায় শেওলা জমে পিছল হয়ে গেছে। তা ছাড়া কোন আলো ছিল না। এই অচেনা জায়গায় সজল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কখন। হঠাৎ ভারি কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে চমকে তাকাল।

হারাধন অধিকারী উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে বটে তবে পা পিছলে যাবার ভয়ে ঠিক পেরে উঠছে না। সজল তাড়াতাড়ি তুলে ধরল হারাধনকে। ছাতা আর পুঁটলি দূরে ছিটকে পড়েছে কখন। হারাধন উঠে সজলের মুখের দিকে একবার তাকাল।

'গায়ে জোরটোর আছে দেখছি। নইলে এই দুমণী শরীরটা—'

সজলের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু হাসল না। ছাতা আর পুঁটলিটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, 'লাগল নাকি কোথাও?'

'না, না, লাগেটাগেনি।—[illegible] রাস্তা!'

'ঐ একটা টিউবওয়েল দেখা যাচ্ছে। হাতে মুখের কাদা [illegible] [illegible] ধান কলের একটু ক্ষীণ আলো [illegible] পড়েছিল।

ঠাকুর ভেতরের ঘরে ছেঁড়া চাটাইয়ের সামনে দু থালা ভাত [illegible] [illegible] গ্লাসে জল, নুনের বাটি [illegible] [illegible] [illegible] হারাধন খেতে খেতে ইঙ্গিত করল।

চটা-উঠে যাওয়া কলাইকরা [illegible] একরাশ ভাত দেখে সজল ঠাকুরকে কিছু তুলে নিতে বলতে যাচ্ছিল। হারাধন [illegible] বোকামি দেখে চাপা গলায় বলল, 'একদম আস্ত গাধা।' তারপর প্রকাণ্ড মুঠি দিয়ে সজলের পাত থেকে এক থাবা ভাত তুলে নিয়ে বলল, 'দেখতে তো লম্বা-চওড়া ভাত খাবার বেলা—!'

সজল শুধু অবাক হয়ে হারাধনের খাওয়া দেখছিল। কেমন করে গব-গব করে গিলছে। ঠাকুর বিরক্তমুখে এ পর্যন্ত বার চারেক ভাত, ফেনমেশানো ডালও বার তিনেক দিয়ে গেছে। তবু হারাধনের খিদে মিটছে না।

হোটেলের এই দরিদ্র পরিবেশে হারাধনকে এইভাবে খেতে দেখে লোকটির ওপর সজলের সাঁত্যি সত্যি মায়া পড়ে গেল। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের ভালোবাসাহীন এ যেন এক বঞ্চিত নিষ্ঠুর করুণ জীবন।

হারাধন তখন থালাটা হাত দিয়ে মুছে মুছে চাটছিল।

মুখ ধুয়ে সজল পকেট থেকে পয়সা দিতে যাচ্ছে, এমন সময় হারাধন খপ করে হাতটা চেপে ধরল। 'থাক থাক আমি দিচ্ছি।' তারপর কোঁচার খুঁট খুলে দুজনের জন্য চৌদ্দ আনা পয়সা ভালো করে গুনে গুনে শশীর হাতে দিল।

সজল দেখছিল, হারাধনের এই তহবিলে বেশি টাকা নেই। গাড়ী ভাড়া দিলে বড়-জোর দু-চার আনা পয়সা জমা থাকবে।

খেজুর পাতার পাটিতে বসে হারাধন এবার আরাম করে একটা বিড়ি ধরিয়ে

বলল, 'না, ঠাকুরটা রাঁধে ভালো। বুঝলে হে সজল?'

বালিচক বাজারের দোকানপাট সেই কবে বন্ধ হয়ে গেছে। খোয়া-ওঠা রাস্তায় এই বর্ষার রাত্রে লোক চলাচলও কম। প্রায় নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে দু-একটা কুকুর ডেকে উঠছে। সে ডাকও থেমে গেল, সব চুপচাপ নিঝুম।

॥২॥

দূর থেকে ট্রেনের আলো দেখে সজল চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনটাও ভারি হয়ে উঠেছিল। সারাদিন যে পথে সে হেঁটে এসেছে, যে মাটিতে এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে, এই মুহূর্তে, ট্রেনে উঠে গেলে সে মাটির স্পর্শ সে হারাবে। এই মাটিটুকু এ পর্যন্ত তার কাছে বড় আপন ছিল। স্টেশনের ধারে এই শিরীষ, এই সেগুন গাছটাকেও তার আপন মনে হচ্ছিল। কলকাতা সকলের কাছে বিদেশ, কলকাতা তার কাছে ভয়মেশানো একটা বিস্ময়।

হারাধন ধমকের সুরে বলল, 'ব্যস্ত হবে না, ব্যস্ত হবে না। গাড়ী এসে দাঁড়াক। তারপর ধীরে-সুস্থে উঠবে।'

কিন্তু গাড়ী একেবারে থামবার আগে হারাধন নিজেই লাফ দিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়ল। ধস্তাধস্তি করে সজলকে টেনে তুলল।

'বাব্বাঃ! যা ভিড়। এ্যাই সরে বোসো, সরে বোসো একটু।—কেন, এটা কি বাড়ীর বৈঠকখানা, হাত-পা ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ঘুমিয়ে যাবে? হ্যাঁ, সরে বোসো?'

দেখতে দেখতে হারাধন নিজে একটা বসার জায়গা করে নিল। সামনের বেঞ্চের একজন ঘুমন্ত যাত্রীকে উঠিয়ে সরিয়ে ঠেলে-ঠুলে সজলের জন্যেও বসার একটা জায়গা করে দিল।

'হ্যাঁ, আরাম করে বোসো।'

সজল দেখে শুনে থ'। হারাধনদা না থাকলে এই ভিড়ে তাকে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেতে হোতো। এতো বকে-ঝকে বসার জায়গা জোগাড় করা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

অনেকক্ষণ হল, হারাধনের নাকডাকা শুরু হয়েছে। কামরার যাত্রীরাও ঘুমিয়ে আছে। আর রাত্রির অন্ধকার ভেঙে ভেঙে ক্লান্ত ট্রেনটা পরবর্তী স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সজল জানালা দিয়ে দূরের দিকে তাকালো। স্তব্ধ মাঠ, আকাশ গ্রাম। বৃষ্টি সেই কখন থেমে গেছে। নিদ্রিত বিস্মিত পৃথিবী এই গভীর রাত্রির আসনে যেন ধ্যানে বসেছে। সারা আকাশ জুড়ে অন্ধকারের অব্যক্ত সংলাপ।

আজকের ঘটনাগুলো সজল মনে করবার চেষ্টা করছিল। অমৃতপুরে তার সেই ভাঙা জীর্ণ খড়ের ঘরটি এখন কেমন করুণ দূরত্বের ধূসরতায় আবছা হয়ে উঠছে। দাওয়ার পশ্চিম দিকটায় কোথাও কোথাও জল পড়ে। অর্থাৎ চালের খড় একেবারে পচে গলে গেছে। এই বর্ষায় নতুন করে ছাওয়া উচিত ছিল।...জল পড়ার সময় মিনু মাটির হাঁড়ি বসিয়ে দিয়ে যায় জায়গাটায়, যাতে জলটা ঐ হাঁড়িতে পড়ে, দাওয়াটা কাদা না হয়। কিন্তু এতো করেও দাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে পড়ে ছোট ছোট গর্ত হয়ে গেছে।

সজলের দারিদ্র্যের এক করুণ স্বাক্ষর। আসার সময় মিনু চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাদার চলে-যাওয়া দেখছিল। ছোটমা দাঁড়িয়েছিল সদর কপাটের পাশে। সজল প্রথমে অত সব ভাবেনি।

কিন্তু উঠোন পেরিয়ে, টোল ঘরটাকে বাঁয়ে রেখে পুকুরঘাটের কাছে এসে একবার পেছন ফিরে তাকাতেই তার বুকটা কান্নায় ভরে এসেছিল। রোগা বোনটার মুখটা এখন কী করুণ! মিনুকে যে সে এতো ভালোবাসে, সজল নিজেই তা জানত না। মিনু যে তার সংসারের সবচেয়ে আপন—এই উপলব্ধি সজলের আর কখনো হয়নি।

সে কি ফিরে যাবে! আর একবার চেষ্টা করে দেখবে দেশে কিছু করা যায় কিনা!

কিন্তু কলকাতার জন্য সজলের কোথায় একটা আকর্ষণ ছিল। কলকাতা তার কাছে একটা স্বপ্নের জগৎ। সেখানে হাওয়ায় নাকি টাকা ওড়ে, পথেঘাটে চাকরি ছড়িয়ে থাকে। লেখাপড়া শিখতে হলে, সাহিত্য করতে হলে কলকাতা যাওয়া ছাড়া উপায় নেই!

সজল যতো দ্রুত পারে মিনুর সেই নির্বাক দৃষ্টির সীমানা থেকে চলে এসেছিল। তারপর একে একে পরিচিত পথঘাট, পুকুর পাড়, স্কুল, ফুটবল মাঠ, শীতলা মন্দির, তার পাশের বকুলতলা, সব পেরিয়ে এসে একবার পেছন ফিরে সারা গ্রামটার দিকে তাকালো। এখনো আকাশে মেঘ করে আছে। গ্রামের গাছপালা বৃষ্টির জলে স্নান সেরে এখন ঘন সবুজ। মাঠের ধানগাছগুলিতে থোড় আসার আগের উচ্ছল মাতৃত্ব ছড়ানো। গাছপালার ফাঁকে দু-একজন প্রতিবেশির বাড়ীর উঁচু চাল দেখা যাচ্ছে। তবে সজলের বাড়ীটা আর চোখে পড়ে না। গ্রামের ওপরের আকাশটা কালো মেঘের ছায়ায় এখন শান্ত, গম্ভীর!

ট্রেনটা কি একটা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। সজল বহু কষ্টে স্বল্প আলোয় নামটা পড়ল, 'কোলাঘাট।' কিন্তু একটু সামনে চেয়ে অবাক! এতটা বিস্তীর্ণ নদী দিগন্ত পর্যন্ত চুপ করে শুয়ে আছে। স্রোতের জলের ওপর অন্ধকার আবরণটা নরম আলোর ছোঁয়ায় কেমন ফিকে হয়ে এসেছে। এ আলো যেন কোন এক ইন্দ্রিয়াতীত জগতের। সজলের মন বিস্ময়ে, আনন্দে, অথচ কী একটা সূক্ষ্ম অচেনা বেদনায় ভরে আসে।

বাবার কথা মনে হয় সজলের। টোলের দাওয়ায় বসে ছাত্রদের পড়াতেন। কি পড়াতেন—সে বোঝার বয়স তার তখন হয়নি। সংস্কৃত ভাষা তখন বুঝতে পারা তো দূরের কথা, উচ্চারণই তার হোতো না। একটা হ্যারিকেন জ্বলত টিম টিম করে। হঠাৎ বাবা কোলে টেনে নিয়ে হাত দুটো তাঁর চওড়া হাতের ভেতর নিয়ে বলতেন, খোকা বলতো 'মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' হ্যাঁ বেশ হয়েছে।—এরা বলতো—'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।'—বাবা কী খুশি, সেই অস্পষ্ট, ভাষা-ভাষা আবৃত্তি শুনে। তারপর ছাত্রদের কি একটা শ্লোকের ভুল ধরে বলতেন—।

সজল দূরে বাঁশ ঝাড় আর কলা-বাগানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি ভাবত।

তারপর বড় হয়ে সে বাবার বইগুলি পড়েছিল। ততদিনে সংস্কৃতটা শিখেছে। ম্যাট্রিক দেবার পর যে ক'বছর বাড়ীতে বসেছিল, সে ক'বছর এই সব পড়েই দিন কাটাত। তার মনে হয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত রূপকে প্রাচীন কবিরা কী পরম সৌন্দর্যের সঙ্গে শ্লোকের সংগীতের মধ্যে ধরে রেখে গেছেন। তার সবচেয়ে ভালো লাগত উপনিষদগুলি, বিশেষ করে বৃহদারণ্যক।

দিনের কতো নির্জন মুহূর্তে, কতো রাত্রে, যখন সে একা থাকত তখন এই শ্লোকগুলির কথা মনে হোতো। কেমন করে জীবনের সঙ্গে এগুলি একাত্ম হয়ে উঠেছিল।

ট্রেনটা হুইসিল দিয়ে আবার ছাড়ল। নদীটা শেষ হয়ে এলো ধীরে ধীরে। আচ্ছা, নদীটার নাম কি? হলদী? না হলদী নয়।—হ্যাঁ, মনে পড়েছে 'রূপনারায়ণ।' কী সুন্দর নাম। কে দিয়েছে, কবে দিয়েছে এই নাম! বাংলার মাস্টারমশায় প্রায়ই কবিতাটা আবৃত্তি করতেনঃ

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম:
জানিলাম, এ—জগৎ
স্বপ্ন নয়...
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—

সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—

—সজলের শেষের এই লাইনটা খুব ভালো লাগে। কারণ তার সারাজীবনই তো দুঃখের তপস্যা!

হারাধন অধিকারী তেমনি নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। সজল কিছুক্ষণ ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। পথের-চেনা মানুষ। অথচ কী করে যেন বড়ো আপন হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, হাওড়ায় নেমে ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে বকুলের বাড়ী কোন দিকে পড়বে। চিঠিটা বের করল সজল। ৪।৪, ঘোষালপাড়া লেন, কসবা, কলকাতা।

ঠিকানা দেখতে গিয়ে চিঠিটা আর একবার পড়তে ইচ্ছে হোলো সজলের। বকুলের হাতের লেখা ভালো নয়, বানান ভুলও যথেষ্ট আছে। কিন্তু চিঠি পড়ে মনে হয়, ভালোবাসার উত্তাপটা বেশি।

অমৃতপুর থেকে গতবার আওয়ার সময় বেড়াতে বেড়াতে সজল বলেছিল 'কলকাতা চলে গেলে মনে থাকবে আমাকে?'

বকুল বলল, 'থাকবে। তুমি দ্যাখো।'

'না থাকবে না। সাব রেজিস্ট্রারবাবু চলে গেলে, তুমিও অমৃতপুরের কথা সব ভুলে যাবে।'

'জামাইবাবু এখন বদলি হচ্ছে না শুনলাম।—আচ্ছা, পরীক্ষা হয়ে গেলে তুমি চলে এসো না কলকাতায়। বেশ মজা হয় কিন্তু।'

'কলকাতা যাব। কিন্তু থাকব কোথায়?' কেউ জানা শোনা নেই।'

'ওরে বাবা, এই ভাবনা! তা মশায়ের গরীবের বাড়ীতে দয়া করে ওঠা হোক।'

'তোমার বাড়ীতে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বাড়ীতে।' তারপর হাতটা টিপে দিয়ে বলল, 'কি? আপত্তি আছে নাকি?'

সজল তবু চুপ করেছিল।

বকুল বলল, 'তুমি বড্ড লাজুক। ব্যাটাছেলে এগ্রেসিভ না হলে ভাল লাগে না বাপু।'

সজল সঙ্কোচের সংগে বলল, 'জানো আমারও কলকাতা যাবার খুব ইচ্ছে। চাকরি-বাকরির চেষ্টা করতে হবে তো।'

'বেশ তো! ওটা কি এমন হাতি-ঘোড়ার ব্যাপার! ট্রেনে উঠবে, চলে আসবে: ব্যস।'

কলকাতা যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে সজল একটু এগিয়ে গেছল। বকুল পেছন থেকে ডাকল, 'এ্যাই, দাঁড়াও।'

সজল দাঁড়াতে বকুল কাছে এসে বলল, 'তুমি বড্ড গেঁয়ো। মেয়েদের সংগে মিশতে জানো না।'

সজলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। 'কি করে জানব বল?'

'কি করে জানব বল?' বকুল মুখ ভেংচে উঠল। 'কেন অমৃতপুর তো একটা হেলা-ফেলা জায়গা নয়। থানা আছে, সাব-রেজেস্ট্রি অফিস আছে। অফিসাররা আসছে, যাচ্ছে। তাছাড়া কাঁথিতে ক'বছর কলেজে পড়লে।'

'কলেজে মেয়েদের সংগে মেশার কোর্স আছে নাকি?'

'মরে যাই আর কি! কেন? কোন মেয়ে তোমার প্রেমে পড়েনি? এতো ভালো ছেলে, ভালো স্পোর্টসম্যান, স্মার্ট, লম্বা। এমন বিউটিফুল চোখ-মুখ। আরে মেয়েরা তোমার পেলে লুফে নেবে।—এ্যাই সত্যি কথা বল, প্রেমে পড়েনি কেউ?'

সজলের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠছিল।

বকুল এদিক-ওদিক তাকাল। না, রাস্তা-ঘাটে লোকজন নেই। তারপর খপ করে সজলের হাতটা টেনে নিয়ে বলল 'বাঃ বেশ সুন্দর আঙুলগুলো তো? দেখি?'

সজল ঘামতে লাগল।

'কি? একেবারে বোবা হয়ে গেলে নাকি?'

সজল সাহস নিয়ে বললে, 'না বোবা হবো কেন?'

'তবে? কথা বলছ না যে?'

'কি বলব ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন, ঐ যে কি বলে, ভালোবাসা, প্রেম।' বকুল অদ্ভুতভাবে হাসল।

সজলের রক্তে একটা অচেনা চঞ্চলতা, একটা অনাস্বাদিত অনুভব। কিন্তু সংগে সংগে একটা পাপবোধ এই মুহূর্তে তাকে সচেতন করে তুলছে।

লজ্জিত, বিস্মিত সজল দেখল শীতের দিনের ক্ষেত থেকে রোদ নিভে আসছে। ললাট গ্রামের ওপারে সূর্যটা এখন কেমন বিবর্ণ।

অনেক লোকের কোলাহলে সজল নিজের কাছে ফিরে এলো। একটা বড় স্টেশনে ট্রেন এসে থেমেছে তখন। পূব দিকের আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

হারাধনও উঠেছিল। এবার ছাতা আর পোঁটলা নিয়ে তৈরি। অন্যান্য যাত্রীরা নামার জন্য উন্মুখ।

একটি রাত্রির পরিচয় দিনের আলোয় ক্রমশঃ আবছা হয়ে উঠছে। পথে একটা আশ্রয় সজল পেয়েছিল, সেটাও এখন হারিয়ে যাবে।

হারাধন ভারি গলায় বলল, 'কি? ঘুম-টুম হলো? আমার বাপু সারা রাত ঘুম হয় নি।'

সজল একটু হেসে ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করল, 'কসবা কোন্ দিকে পড়বে?'

'কসবা? তাহলে বালিগঞ্জ ছাড়িয়ে। বাস-এ চলে যাও। না পেলে পুলিশকে বলবে। কলকাতা, শালা বড্ড খারাপ জায়গা। ভুলেও আর কাউকে জিজ্ঞেস করো না। বুঝলে?'

সজল বলল, 'আপনার ঠিকানা?'

'আমার ঠিকানা? পোস্তা, হারাধন অধিকারীর মাদুরের দোকান। যাকে জিজ্ঞেস করবে, সে-ই বলে দেবে'।

হাওড়া স্টেশনের বিচিত্র জগতে সজল সব গুলিয়ে ফেলছিল, এত লোক, এতো গাড়ী, এতো কোলাহল! সজল কোন দিকে যাবে। বালিগঞ্জের বাস কোথায় দাঁড়ায়। কিছু বুঝতে পারছিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ নজরে পড়ল, হারাধন অধিকারী হাতে ছাতা নিয়ে ধীরে ধীরে পুলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে লোকজনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে ওঠে। আবার একটু সময়ের জন্য চোখে পড়ে। এখন সে যেন সজলকে চেনে না, জীবনে কখনো দেখেনি, কখনো সজলের হোটেলের পয়সা দেয় নি, ট্রেনে বসার জায়গা করেও দেয় নি!

এই সময়টুকুর মধ্যে এতো ব্যবধান, এতো দূরত্ব!

অসহায় সজল কিছুক্ষণ চুপ করে হারাধনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

॥৩॥

বকুলের বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে কড়া নাড়ল সজল। ভেতর থেকে ভারি গলার কর্কশ স্বর ভেসে এল, 'কে?' তারপর ময়লা লুঙিপরা একজন ভদ্রলোক দরজা খুলে সজলকে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি চাই?' সজল সংকোচের সংগে বলল, 'পূর্ণেন্দুবাবু আছেন?'

সজলের রাত্রিজাগা চেহারা, দরিদ্র বেশ-বাস, হাতে পুঁটলি—এসব দেখে পূর্ণেন্দুবাবুর মুখ-চোখ আরও রুক্ষ হয়ে উঠছিল। বললেন, 'হ্যাঁ আমি পূর্ণেন্দুবাবু। কেন?'

'বকুল আছে?'

'বকুল? কোত্থেকে আসছ?'

'অমৃতপুর থেকে'।

'ও, ভেতরে এসো।'

সজলের মনে হচ্ছিল কথাটার মধ্যে এতটুকু আন্তরিকতা নেই। নেহাৎ জামাইয়ের কাছ থেকে এসেছে তাই।

সজলকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে পূর্ণেন্দুবাবু ভেতরে চলে গেলেন।

সজল বসে বসে ঘরটা দেখছিল। এক-তলা ভাঙাচোরা, বিবর্ণ স্যাঁতসেঁতে একটা বাড়ী। ঘরে একটা জীর্ণ তক্তপোষ পাতা,

তার ওপর ময়লা কালিঢালা একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি। দেয়াল থেকে বালি খসে খসে পড়ছে। একটা অর্ধছিন্ন সস্তা মেয়ের-ছবি-ছাপা ক্যালেন্ডার কোণাকুণি ঝুলছে। মাস দুই পাতা ছেঁড়া হয়নি।

সজলের কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। অমৃতপুরে সাজ-সজ্জায় বিলাসিতায় উচ্ছল বকুলকে সে দেখেছিল, কসবার ঘোষাল লেনের এই জীর্ণ বাড়ীটার সঙ্গে তার কোন মিল নেই, তার ধারণা হয়েছিল, বকুলরা বড়লোক না হোক, অন্ততঃ সাধারণভাবে অবস্থাপন্ন। অবশ্য বকুল আভাসে-ইঙ্গিতে এমন ভাব দেখাতো যেন তারা সত্যি বেশ ধনী, তার বাবাকে এক ডাকে সকলে চেনে।

সজল অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘরের ভেতর থেকে দু-একজন বাইরে গেল। কেউ ফিরেও তাকাল না তার দিকে। সজল কেমন মিইয়ে যাচ্ছিল।

একটু পরে পাশের ঘর থেকে বকুল বেরিয়ে এল। সজলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একি? তুমি?'

বকুলের মুখে সেই হাসি দেখা গেল না। কথাবার্তার ভঙ্গি এমন, যেন সজলকে সে দিন দু-বেলাই তার বাড়ীতে দেখছে।

সজল তবু একটু জোর করে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল। বলল, 'তুমি কেমন আছ? আর চিঠি দিলে না কেন?'

বকুল তাড়াতাড়ি চোখটিপে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'জামাইবাবু বলেছে বুঝি? মুস্কিল বাবা, এইতো সেদিন দিদিকে লিখেছি। তা, কোথায় উঠেছ তুমি?'

সজল কি বলবে কিছু বুঝতে পারল না। এ অভ্যর্থনার কি উত্তর সে দিতে পারে। তবু কোনভাবে বলল, 'আজ সকালেই এসেছি।'

'জামাইবাবু, ছোড়দি ভালো আছে?'

'হ্যাঁ, সব ভালো'

'ও, কোথায় উঠবে এখন?'

সজল নিজেই জানে না কোথায় উঠবে। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। বলল, 'পোস্তায় একজন আত্মীয় আছে।'

এখন হারাধনদা আত্মীয় ছাড়া আর কি।

'বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছ?'

'কাল সকালে'।

'ওমা, সে-ই কাল সকালে! এতক্ষণ লাগল। তা খেলেটেলে কোথায়?'

সজলের হঠাৎ মনে হোলো, বকুল হয়ত আগের মত হয়ে উঠবে।

'সন্ধ্যাবেলা বালিচকের হোটেলে খেয়েছি।'

'বেশ বেশ। তা পরীক্ষা কেমন দিলে?'

'মন্দ না'।

'অনার্স পাবে?'

'পাব মনে হয়'।

সজল লক্ষ্য করছিল, বকুল কথাগুলো বলছে, শুধু বলতে হয় বলে। যেন সে উঠে গেলেই ভালো হয়।

একটু সময় দুজনেই চুপ করে রইল।

তারপর বকুল উঠে দাঁড়িয়ে শুকনো মুখে বলল, 'তুমি এমন দিনে এলে, জানো, বসে দু-দণ্ড ভালো করে কথা বলতেও পারলাম না। পারলে আর একদিন এসো। গল্প করব'।

সজলও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

বকুল হেসে বলল, 'সেদিন কিন্তু চা খেয়েই যেতে হবে। কিছুতেই শুনব না।'

সজল দরজার কাছে এগিয়ে গেছল। বকুল যেতে যেতে বলল, 'এসো, ভুলো না কিন্তু'।

অনাদরে অবহেলায় মাথা নিচু করে সজল ধীরে ধীরে হাঁটছিল। সে বড় আশা করে এসেছিল, পূর্ণেন্দুবাবু চাকরির ব্যাপারে সাহায্য করবেন একটু। কিন্তু সে জানে না, অমৃতপুরের বকুল আর কসবার বকুল এক নয়। এই শহরের মানুষ পোশাকে কথাবার্তায় বাইরে অনেক সময় যে পরিমাণ উজ্জ্বল, বাড়ীতে সে উজ্জ্বলতার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না—এ অভিজ্ঞতাও সজলের ছিল না।

অমৃতপুরে বকুল সজলকে না দেখে থাকতে পারত না। একদিন না গেলেই অভিমান। 'তা আসবে কেন? তুমি হলে নামকরা ছাত্র। আর আমরা—'

সজল বুঝতে পারত বকুল রেগে গেছে।

একদিন বেড়াতে গেছল অমর্ষির দিকে। চওড়া বড় রাস্তাটা, শুকনোর দিনে যে রাস্তায় বাস চলে মঙ্গলামাড়া বাজার পর্যন্ত, সেই রাস্তা ধরে ওরা হাঁটছিল। একটু এগিয়ে যেতে একটা পুকুর দেখে বকুল চিৎকার করে উঠল, 'দেখেছ, ওমা—কতো পদ্মফুল। এ্যাই, দাওনা কয়েকটা তুলে।'

পুকুরটা রাস্তা থেকে একটু নেমে দক্ষিণ দিকে। পুরনো দিনের খুব বড় দীঘি। এখন বুজে এসেছে। চারদিক থমথমে, নির্জন।

সজল বলল, 'পারব না। অনেকটা নামতে হবে। খুব কাদা।'

বকুল প্রায় কেঁদে ফেলল, 'দাওনা, লক্ষ্মীটি।—বাঃ এতো করে বলছি'।

সজল বিরক্ত গলায় বলল, 'দাঁড়াও দেখছি পারি কিনা'।

কাদা পা ধুয়ে এসে সজল দেখল বকুল দুটো ফুলেরই পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলছে।

'একি! এই জন্য ফুল তুলে দিতে বলেছিলে?'

বকুনি শুনে বকুল হাসতে হাসতে বলল, 'বেশ লাগে ছিঁড়তে, মাইরী। এই দ্যাখো না পাপড়িগুলো কী মসৃণ।'

বাকি পাপড়িগুলো বকুল পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে ফেলল। একটা নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরল, গালে বুলোল। সজল চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। বকুলকে সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

'এ্যাই, ঘাসে বসবে একটু। কেউ কোথাও নেই।' বকুল কেমন একটা অচেনা গলায় চোখ টিপে বলে উঠল। সজলের ভয়-ভয় করছিল। বলল, 'না চল সন্ধ্যে হয়ে আসছে।'

সত্যি তখন মাঠ থেকে আলো নিভে গেছে। একটা গরুর গাড়ী মঙ্গলামাড়ো থেকে মালপত্র নিয়ে অমর্ষির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। চারদিকটা কেমন থমথমে। রাত্রি নামার আগে এমনি একটা স্তব্ধতা মাঠে, পথে বিছিয়ে পড়ে।

সজল জোর করেই চলে এলো। নইলে কেমন যেন সে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল।

সজল এখন কোনদিকে যাচ্ছিল, তা জানে না। পথঘাট সব অচেনা। যেতে যেতে আরো মনে হচ্ছিল, ছোটমা বার বার বলায় কয়েকদিন আগে সজল সাব-রেজিস্ট্রার অবনীবাবুর কাছে গিয়ে যে-কোন একটা চাকরির কথা বলেছিল। অবনীবাবু বললেন, রেজেস্ট্রী অফিসে দলিল নকলের কাজ অবশ্য চেষ্টা-চরিত্র করলে পাওয়া যায়। কিন্তু সজল, যাচ্ছেতাই কাজ এসব। কলকাতা চলে যাও, কত স্কোপ সেখানে। এখানে পচে মরবে কেন? সজল বলেছিল, কাউকে যে চিনি না। কোথায় থাকব? অবনীবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন, আরে বকুলকে তো চেনো। তারপর গলা নামিয়ে আবার বললেন, আই মীন, বেশ ভালো করেই চেনো। কি বললে? হ্যাঁ, ওখানে গিয়েই কিছুদিন থাকবে। তাছাড়া বকুলও তো তোমাকে যেতে বলেছিল। আর শ্বশুরমশায় —জাঁদরেল লোক। প্রচুর জানাশোনা। একটা কিছু জুটিয়ে টুটিয়ে দেবেন। বকুল আছে, নির্ভয়ে চলে যাও।

সজল বড় আশা নিয়েই এসেছিল, এখানে কয়েকদিনের জন্য থাকার জায়গা পাবে। বকুলের সঙ্গে এতো পরিচয়, ওরা কি আর থাকতে বলবে না!

সজলের সে স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেল।

এখন কোথায় সে যাবে? এই অচেনা বিরাট শহরে কোথায় সে একটু মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই পাবে? একথা ভাবতে গিয়ে সজল বড্ড দুর্বল, বড্ড অসহায় বোধ করছিল। কিছু স্থির করে উঠতে পারছিল না।

শশীর হোটেলে কাল সন্ধ্যায় সেই যে খেয়েছিল, আজ এতক্ষণ পর্যন্ত আর কিছু পেটে পড়েনি। খুব খিদেও পাচ্ছে। সামনের কল থেকে সজল খানিকটা জল খেয়ে সুস্থ বোধ করল একটু।

বালিগঞ্জ স্টেশনের থার্ড ক্লাশ ওয়েটিং রুমে এসে সজল বসল। কত লোক টিকিট কাটছে। ট্রেন ধরার জন্য দৌড়ুচ্ছে। সজলের কোন খেয়াল নেই। সে ভাবছে, তবু ভাল, মাথার ওপর একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে! বসে বসে সজল হিসেব করতে লাগল, পাঁচ টাকা কয়েক আনা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল সে। ট্রেনভাড়া পাঁচ সিকা, বাস-

ভাড়া দু আনা। লোভ সামলাতে না পেরে রাস্তার দোকান থেকে সোয়া দু টাকা দিয়ে একটা ফাউন্টেন পেন কিনেছে। বাবা যদ্দিন বেঁচেছিল পালকের কলমে লিখতে হত। অবশ্য এজন্য হাতের লেখাটা খুব সুন্দর হয়েছে। বন্ধুরা বলত, ছাপার অক্ষর। কিন্তু কলমের লোভ তার চিরদিনের। দোকানদার তিন টাকা বলেছিল। শেষপর্যন্ত সেটা দু টাকায় দিয়েছে। সজল বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখল। তাহলে যে টাকা আছে তাতে দিন দুই চলবে।

এই কথা ভেবে সজল আপাততঃ খুশি হতে চাইল।

আনারসদুটো বয়ে বেড়াবার আর কোনো যুক্তি নেই। ওদের অভ্যর্থনায় সজল এমনিতেই কেমন অপমান বোধ করছিল। তাই সাহস করে আর ও দুটো দেওয়া হয়নি।

খাওয়ার সময় একটা ন'-দশ বছরের ভিখিরি মেয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। ময়লা ফ্রকটা এখানে ওখানে ছেঁড়া. এক মাথা নোংরা চুল। কতোদিন তেল পড়েনি। অথচ মুখের আদলে ঠিক ভিখিরি বলে মনে হয় না। সজল বাকি আনারসটা তাকেই দিয়ে দিলে।

ছাড়ানোর কিছু ছিল না। তাই বেঞ্চে আছাড় মেরে ফাটিয়ে ক্ষিধের জ্বালায় তাই খেয়েছিল।

সজলের মিনুর কথা মনে পড়ে। মিনু আনারস খেতে ভালোবাসে।

ওয়েটিং রুমের একটু বাইরে দাঁড়িয়ে কলকাতার বিচিত্র জীবনস্রোত দেখছিল সজল। এক একটা ট্রেন আসছে, আর হাজার হাজার লোককে নামিয়ে দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। পরিষ্কার জামা-কাপড় স্যুট-পরা এতো লোক কোথায় দৌড়চ্ছে! আঃ কী সুন্দর এদের জীবন। অফিস, মাসের শেষে মাইনে, সন্ধ্যাবেলায় একান্ত আপন পরিবেশ। বেশ আছে ওরা, বেশ সুখী ওরা। আচ্ছা, সে কি কোনোভাবে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে না! চাকরি তাকে পেতেই হবে। নইলে কি খেয়ে কলকাতায় থাকবে, ছোটমা মিনুর জন্য কি পাঠাবে?

পাশেই পাঞ্জাবীর দোকান। থরে থরে বিচিত্র রকমের খাবার সাজানো। ছড়ানো আস্ত মুরগীগুলোকে কেমন ভেজে সাজিয়ে রেখেছে।

খাবার দেখেই ক্ষিদেটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বেলা এখন দুপুর। কলে গিয়ে মাথা ধুয়ে এল সজল। তারপর হোটেল থেকে ভাত খেয়ে সেই ওয়েটিং রুমে ফিরে এসে পুঁটলি মাথায় দিয়ে বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ল। এবং শুতেই একরাশ গভীর ঘুমের মধ্যে হারিয়ে গেল।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রথমে তার কিছু মনে পড়ছিল না। এ কোথায় এসেছে সে! সব অচেনা, অজানা! তারপর সেই ভিখিরি মেয়েটাকে দেখে সব কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সকাল বেলায় বকুলের বাড়ীর কথা।

কলকাতার রাজপথে তখন শেষ বিকেলের ছায়া পড়েছে।

এখন ঘরের কথা, বিশেষ করে ছোটবোনটার কথা মনে পড়ে।

'একটা পয়সা দেবে, বাবু?'

সজল অন্যমনস্ক ছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখে সেই ভিখিরি মেয়েটা। রাস্তার মোড়ের কাছে ওরই বয়সী কয়েকটা নোংরা ছেলে তাকিয়ে আছে এদিকে।

'দাওনা একটা পয়সা?'

সজল বলল, 'পয়সা নিয়ে কি করবি তুই?'

মেয়েটা আরো একটু কাছে এগিয়ে এল, 'ফুলুরি ভাজছে, কিনে খাব। দাও না?'

'তোর কে আছে?'

'মা আছে।'

'বাবা নেই?'

'না, সে-ই কবে মারা গেছে। তারপরে গাঁ ছেড়ে চলে এনু।'

'মা কোথায়?'

'ঐ—যে ভিখ মাগছে।'

'তোর নাম কি?'

'পুঁটি। পুঁটি হালদার।'

সজল দেখল, রাস্তার মোড়ে কাপড় বিছিয়ে একটা রোগা বুড়ী ভিক্ষে করছে। কাপড়টায় পয়সাও পড়ছে মন্দ না।

সজল বলল, 'পয়সা তোর মা-র কাছ থেকে নে না?'

'ই-স্ তা হলেই হয়েছে। মেরে হালুয়া বানিয়ে দেবে না? মা-ত কেবল পয়সা জমায়। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে ঘরদোর ঠিক করবে। দেয়ালগুলো পড়ে গেছে কিনা।'

সজল সহানুভূতির সুরে বলল, 'ও, তাই নাকি? তোদের গাঁ কোথায়?'

'ওমা, তাও জানো না? লক্ষীকান্তপুর লাইনে।'

'গাঁ ছেড়ে এলে কেন?'

'আকালের বছরে বাবা না খেয়ে মরে গেল। আমি তখন অনেক ছোট। মা চলে এল কলকাতায়। জানো, এবার গাঁয়ে ফিরে যাব।'

ভিখিরি মেয়ের চোখেও সেই বাস্তু ভিটের স্বপ্ন। সেই উঠোন, পুকুরঘাট। হয়তো একটু ক্ষেত, দুটো গাছপালা।

সজল পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে পুঁটিকে দিল।

খুব খুশি হয়ে পুঁটি বলল, 'তুমি বাড়ী যাবে না? সে-ই সারাদিন এখানে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ।'

সজল ধমক দিয়ে উঠল, 'যা, যা, ভাগ।'

পুঁটি হেসে পালিয়ে গেল।

রাত্রিতে এই ওয়েটিং রুমে শুয়ে থাকতে কেমন ভয়-ভয় লাগছিল সজলের। তিনটে দিক ফাঁকা। রাত এগারটার পরে এখন আর কোন ট্রেন যাচ্ছে না। ট্রেন চললে, তবু মনে একটা ভরসা থাকে। তবে মাঝে মাঝে মালগাড়ী যাওয়ার শব্দ আসে। ইঞ্জিনের হুইসিলের শব্দ রাত্রির আকাশ চিরে দূরে দূরে ভেসে যায়। রাস্তায় লোকজন চলছে না। শুধু আলোগুলো কেমন একা একা জেগে আছে। দু একটা পথের কুকুর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে কোথায়। তারি চীৎকার দূর থেকে ভেসে আসছে। সজল দেখল ওয়েটিং রুমের ওপাশে স্টেশনের দেয়াল ঘেঁষে আরও কয়েকজন ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে চট বিছিয়ে শুয়ে আছে। বোধহয় ভিখিরি-টিখিরি হবে। কি ভেবে সজল একটু হাসল।

রাত্রি গভীর হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। কেমন শীত-শীত করছে একটু। সজল পোঁটলাটা ভাল করে মাথায় দিয়ে, চেপে আর একবার ঘুমাবার চেষ্টা করল।

একটু আগে ভোর হয়েছে। ঝাড়ুদার লম্বা একটা ব্রাস দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে। শহরের পথে লোক চলাচল এখনও ঠিক শুরু হয়নি। গলির ওদিকটায় এখনও অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হাবুল, পটলা, কেনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি যুক্তি করছিল।

পুঁটি দেখেই চিনতে পারল, এই পোঁটলা সেই লোকটার।

হাবুল এই ছিঁচকে চোরের দলের সর্দার।

পুঁটি বলল, 'তোরা ওর জিনিস নিলি কেন রে? দিয়ে দে বলছি।'

পটলা চটে উঠল, 'কেন? নোব না কেন? ওকি তোর পেরাণের লোক?'

হাবুল পটলাকে থামিয়ে দিতে চাইল। পুঁটির গায়ে কথাটা লেগেছে, চটে উঠে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলিস্ ছোটলোকের ব্যাটা! নইলে মুখে নুড়ো জেলে দেব তোর।'
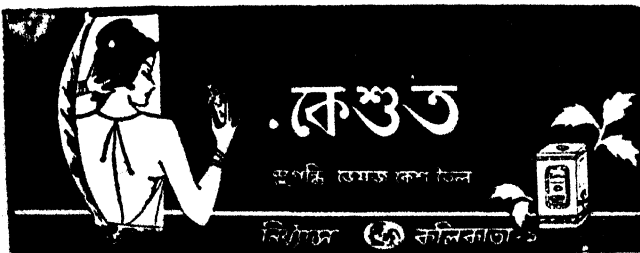
কেনা পুঁটলিটা পটলার কাছ থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে এল।

হাবুল বলল, 'থাম না শালা, পুঁটি যখন বলছে।'

কেনা মুচকি হেসে বলল, 'শালার দরদ উথাইল্যা পড়ছে।'

হাবুল গম্ভীর হয়ে বলল, 'খবদার পুঁটুলি খুলবি না। আগে ফয়সালা হোক্।'

কেনা এবার তেরিয়া হয়ে উঠল, 'ওসব ফয়সালা হোক্। মাল আমি সরিয়েছি। আমি যা খুশি করব। চলে আয় পটলা।'

হাবুল রাগে ফুঁসছিল। 'বলছি, মত খুলিসনা।'

'কেন? তুই কি করবি? অ্যা? মারবি? শালা আমার গায়ে জোর নাই? মেরে দাঁত ভেঙে দেব না?'

কেনা সত্যি পুঁটলিটা খুলতে যেতেই হাবুল খপ করে হাতটা চেপে ধরল। 'খুলবিনা, খবদার।'

'চোপরাও।'

'চোপরাও!' হাবুল চক্ষের নিমেষে ... করে একটা ঘুঁষি মারল কেনাকে।

পুঁটলিটা পড়ে গেল হাত থেকে।

কেনা টলে পড়ছিল প্রায়।

হাবুলের ঘুষির জোর সকলেই জানে। নইলে আর সর্দার কিসে!

হাবুল এবার পটলার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোকে আমি চিনি। চালাকি করিস্ না আমার সঙ্গে। পুঁটি দলের লোক। তার কথা রাখতে হবে না?' একবার পুঁটলিটা কুড়িয়ে নিয়ে পুঁটিকে দিয়ে দিল হাবুল। 'যা, যা ভাগ।'

রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছিল পুঁটি। লোকটা যদি কোথায় চলে যায়। তা চুরি হবে না! বেমানুষে দিনের বেলা এমন মড়ার মত পড়ে পড়ে ঘুমোয়, রাত্তিরে তার জিনিস চুরি হবেই তো! পটলা, কেনা সেই কখন থেকে ঘুপটি মেরে শুয়েছিল কাছে গিয়ে। ফাঁক পেয়েই ব্যস্।

চৌরঙ্গির ছাই সামনে একটা গাড়ী পড়ে গেল।

পুঁটি গাড়ীটার ধার দিয়ে ছুটে আসছিল। ভোরের কোন ট্রেন যায়নি বোধহয়। লোকটা ওয়েটিং রুমে নিশ্চয়ই শুয়ে আছে। লোকটা বড্ড ভাল। শহরে প্রথম এসেছে। তাই জিনিসপত্র এমন হেলাফেলা করে রাখে। এবার সাবধান করে দেবে। আহা, বেচারা কি ভাবছে জিনিস হারিয়ে।

পুঁটি এসে পড়েছে প্রায়।

আরেঃ, ওয়েটিংরুম যে খালি। যেখানে লোকে ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মণ্ড-হারবারের টিকিট কাটে সেখানে একটা ... শুয়ে ঘুমচ্ছে।

পুঁটি হাঁ করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

সজল ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করল। কাল থেকে কী যে শুরু হয়েছে তার ... বকুলের বাড়ীর সেই ঘটনা, তারপর ... চুরি হয়ে গেল। তবু দু-একদিনের ... মত পয়সা ছিল, একটা জামা একটা কাপড় গামছা ছিল। তাও গেল।

এখন রোদ উঠেছে, ঘুমন্ত ... চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

একটা ট্রাম চলে গেল। কেউ কেউ বাজার করে ফিরছে। হাতে থলি।

অনেকগুলো দোতলা ... দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে লোকজন, সবাই ব্যস্ত।

একজন অমায়িক গোছের লোককে দেখে সজল বলল, 'শুনুন......?'

ভদ্রলোক পেছনে ফিরে দেখেই মুখটা ফিরিয়ে নিল—'না না, ভিক্ষেটিক্ষে হবে না। আজকাল ঐ এক কায়দা হয়েছে। দেখতে শুনতে ভদ্রলোক। অথচ হাত পেতেই আছে। যতো সব!'

কথাটা শুনে সজল পাথর হয়ে গেল। আসলে সে জানতে চেয়েছিল, পোস্তা জায়গাটা কোন দিকে হবে। কত নম্বর বাসে যেতে হয়।

সজল থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সে পণ্ডিত কীর্তিবাস ভট্টাচার্যের ছেলে! সে ভিখিরি? সে ভিক্ষে চাচ্ছে? সামনের রাস্তাটা তৎক্ষণে সজলের চোখে ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

॥৪॥

গণেশময় মহাপাত্রের মালপোর দোকান। হারাধন মাইনে ঠিক করে, রান্নার কাজ করে আর দোকানের পেছন দিকে একটুখানি একটা ছোট্ট ঘরে রান্না করে।

সেদিনও সকালবেলা খদ্দেরের ভিড় সামলে, একটু ফুরসত পেয়ে হারাধন রান্না করছিল। ভাতটা সবে নেমেছে। ডাল চড়াবে, এমন সময় বাবু ডাকল, 'ও হারান, তোকে কে ডাকছে দ্যাখ তো?'

কড়াটা নামিয়ে রেখে হারাধন বাইরে এসে অবাক। 'আরে তুমি?'

'আমি সজল। চিনতে পারছেন, বালি-চক স্টেশন থেকে একসঙ্গে এলাম রাত্রে।'

হারাধন বলল 'আজ্ঞে বলতে হবে না। আমার কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে? তা কি ব্যাপার?'

সজল বলল, 'এলাম আপনার কাছে। বড় বিপদে পড়েছি।'

বিরক্তির সঙ্গে মালিক গণেশময় মহাপাত্র একবার আড়চোখে তাকালো।

'চল, চল'—হারাধন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। একবার আঁচটার দিকে তাকাল। না, এখন নিভবে না।

সজলের কেমন অসহায় লাগছিল। এখানেও সে বোধহয় নিরাশ হবে!

গণেশময় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল, 'চললি কোথায় আবার?'

হারাধন বলল, 'বাবু এ আমার দেশের লোক। এই এক্ষুনি আসব।'

একটা খাবারের দোকানের বেঞ্চে বসে হারাধন বলল, 'হ্যাঃ কি বিপদ বলছিলে? চেহারাটা এমন হয়েছে কেম? যেন সাত দিন স্নান-খাওয়া নেই?'

সজল মুখ নিচু করে সব বলল।

হারাধন যেন তেড়ে এল, 'কি? চুরি হয়ে গেছে? ... পই পই করে বলেছিলাম, শালা কলকাতা বদমাস লোকের জায়গা। ও ... শুনেছিলে। কেন? সেই ঘোষালপাড়া কেন দেখালে কি হল?'

সজল চুপ করে থাকলো।

'ও বুঝেছি, পাত্তা দিল না বোধহয়। দেবে না, দেবে না, এ শালার জগতটাই হারামি। টাকা আছে ত কত খাতির। আর টাকা নেই, যা ভাগ। কেউ মুখ তুলে কথাই বলবে না, বুঝলে সজল। পয়সাই হল আসল।......আরে, খেয়েছ কিছু?'

সজল এবারও কোন কথা বলল না। মুখ নিচু করে বসে রইল শুধু।

'এ্যাই, কে আছ? এদিকে চারটা হিঙের কচুরি দাও তো হে। আর বেশিকরে কুমড়োর তরকারি দাও।'

সজল ঠোঙাটা হাতে নিয়েও খেতে পারছিল না। চোখ ফেটে জল আসছিল তার।

'কি হল, খাও। ওরে, এক গ্লাস জল। জিলিপি আছে? দাও দুটো।'

সজল খেতে খেতে বলল, 'হারাধনদা আমি কি করব এখন?'

ও যে গরীব, ও যে চাকরীর চেষ্টায় কলকাতা এসেছে হারাধন সে কথা জানে। অথচ এই তার অবস্থা! হারাধন সজলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একটু সময়। তারপর বলল, 'ভাবি। ভেবে বলব। ছেলে পড়াতে পারবে?'

'হারাধনদা বেঁচে যাই তাহলে। ম্যাট্রিকের ছেলেকে সব সাবজেক্ট পড়াতে পারব।'

হারাধন বলল, 'দেখি কি করতে পারি।' তারপর দোকানের মালিকের দিকে ফিরে অনুরোধ করে বলল, 'বাবু এ আমার দেশের ছেলে। এই আত্মীয়ের মধ্যে। আপনার এখানে একটু বসতে দিন। আমার খুড়োকে তো চেনেন। জান দিয়ে দেবে। ও সজল এখানে বোস্। পরে এসে ডেকে নিয়ে যাব। আমি চললুম।'

বসে বসে সজল ভাবছিল, হারাধনদা তবু তাকে একটু আশ্রয় দিল, খেতে দিল। আর বকুল? বকুল তাকে তাড়িয়ে দিল। হ্যাঁ, ওকে তাড়ানো ছাড়া আর কি বলা যায়। যাকে সজল আপন ভেবেছিল সে-ই সবচেয়ে পর! আর যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই সেই কখন আপন হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ বসে বসে সজল কখন সেই ... এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ... ... হয়ে উঠে দ্যাখে, প্রায় ... ... । ইস, কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সে।

হারাধন বলল 'চল ভাত খাবি চল। সারাদিন খাসনি।'

সজল উঠে দাঁড়াল, 'কোথায়?'

'কেন, আমার দোকানে।'

'বুড়ো বকবে না?'

'হয়েছে, হয়েছে। চল্ দেখি এখন। বুড়ো দোকানে নেই।'

'কোথা গেছে?'

'যাবে আর কোথায়? সে তুই বুঝবি না। চল্ এখন।'

হারাধন সজলকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'থালায় ভাত ডাল আছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। আবার কাল এমন সময় আসবি। বুঝলি?'

সজলের খেতে ইচ্ছে করছিল না এভাবে। হারাধন তাড়া দিল, 'কি হ'ল আবার? সজল আস্তে আস্তে বলল, 'এটা ঠিক নয় হারাধনদা।'

চটে উঠল হারাধন, 'কোনটা ঠিক নয়?'

'এই চুরি করে খাওয়া।'

'কেন? চুরি করে কেন? আমার বাড়ীর কেউ এলে খাবে না?'

সজল দেখল, আর একটা থালায় ভাত তরকারী খোলা আছে। এবং তার-ই একধার থেকে কিছুটা ভাত তুলে নিয়ে এ থালায় দেওয়া হয়েছে। সজলের মনে পড়ল, শশীর হোটেলে হারাধনদা চারবার ভাত নিয়েছিল। তাতেও তার খিদে মিটছিল না।

সেই প্রায় অন্ধকার স্যাঁতসেতে অতি ক্ষুদ্র জীর্ণ ঘরটায় খেতে খেতে সজলের গলায় ভাত আটকে যাচ্ছিল।

হারাধন কাছে ছিল না। দোকানে গিয়ে বসেছিল তখন।

বালি-খসা বিবর্ণ দেয়ালে একমাত্র সজলের ছায়াটা, একটা বীভৎস ছবির মত, শুধু এই করুণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছিল।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। কোথাও কোন সুবিধে হোলো না। সারা সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা সজল এখানে ওখানে বসে বেড়িয়ে কাটায়। সেই দোকানে দুটো রুটি খায়, তাও ধারে। হারাধনদা দামটা মিটিয়ে দেয় মাঝে মাঝে। কখনো পার্কের বেঞ্চে শুয়ে থাকে। জামা কাপড় ছেঁড়া ময়লা। দাড়িটাও কামানো হয়নি কদিন।

বিকেল বেলায় পার্কে সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়ে খেলা করে। ডেকে একটু কথা বলতে, আদর করতে ইচ্ছে হয় সজলের।

এ সময় মিনুর কথা বড়ো মনে পড়ে!

সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল একটু একটু। সজল আসতেই হারাধন খবরটা দিল।—'আরে, তোর কপাল ভালো দেখছি! বড়বাজারে বিপিন দাসের সঙ্গে দেখা। জিনিসপত্তর কিনতে এসেছিল। বললাম, দাস মশায় দেশের একটা গরীব বামুন পণ্ডিতের ছেলে বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেছে। দিন না সেরেস্তায় ঢুকিয়ে। খুব লেখাপড়া জানে।'

হারাধনের কথার স্রোতে সজল কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছিল না, একবার একটু সময় পেয়ে বলল, 'হারাধনদা বিপিন দাস কে?'

'আরে, বিপিন দাস হোলো সামন্ত বাড়ীর নায়েব। খুব বড় জমিদার, সুন্দরবনে হাজার হাজার বিঘে জমি। কত দামী দামী মাদুর নিয়ে গেছে দোকান থেকে।'

সজল বলল, 'আমার কথা তাকে বললে, হারাধনদা?'

'বললাম মানে? মত করিয়ে ছাড়লাম। তা, দাস মশায় বলল গোমস্তা টোমস্তার কাজ ছেলে ছোকরার কম্ম নয়। বুঝলে হারাধন, বেজায় দায়িত্বের কাজ। এই আমি বলেই এস্টেট সামলাই। অন্য নায়েব হলে মুখে রক্ত উঠত।'

সজল ব্যগ্র হয়ে বলল, 'আমার কিছু হোলো?'

'আরে শোনো না। তা দাস মশায়কে পানটান খাওয়ালাম। বললাম, এবার মাদুর কিনতে এলে কমিশনটা একটু বেশি করে—। দাস মশায় বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আসতে হবে বোধ হয়। বাবুর শালার বৌকে একটা মছলন্দির দিতে হবে। গিন্নীমা সেদিন বলছিলেন, পারবে বিপিন? আমি বললাম, মা জননী বিপিনের অসাধ্যি কিছু নেই। সেবার আপনার লাটে পাঁচটা খুন। এক বাবুর গুলীতেই চারটে ঝটপট উল্টে গেল। তা লাশ সামলানো থেকে শুরু করে মামলা খারিজ পর্যন্ত কে করল? এ-ই বিপিন দাস। আমি বললাম, বাবুর শালার বিয়ে হয়েছে কোথায়? বিপিন বলল, না, না, ঘর তেমন নয়। কিন্তু রূপে গুণে মা আমার সাক্ষাৎ সরস্বতী। হলে হবে কি, বানরের গলায় মুক্তোর হার। বুঝলে না? বাবুর শালাটা একেবারে গো-মুখ্যু। দেখতেও যাচ্ছে তাই। শুধু টাকা আছে। আবার মদটদ খায়, মেয়ে মানষের বাড়ী যায়।' আমি বললাম, সে হোক। বড়-লোকের ছেলে পয়সা আছে মদটদ খাবে। কিন্তু এ ছেলেটার যে দুটো মুড়ি খাবার পয়সা নেই। একটা হিল্লে করে দিন, নায়েব মশায়। বড্ড ভালো ছেলে, মেলা ইঞ্জিরি জানে। দাস মশায় বলল, দেশ কোথায়? আমি বললাম, আমার দেশেই বাড়ী। বাবা বড় দরের পণ্ডিত ছিলেন। হলে হবে কি গরীব বেজায়।'

বিপিন দাস একটু ভেবে বলল, 'পাঠিয়ে দিও, হারাধন। বাবু মাস্টার খুঁজছিলেন, ভাল মাস্টার, দেশের ছেলে হবে। দিও হে, পাঠিয়ে দিও।'

সজল মনের আনন্দে সব গিলিয়ে ফেলছিল। বলল, টিউসনটা হয়ে যাবে তাহলে, হারাধনদা?

'হবে হবে। তুই চলে যা। বাবু দেখুক। তবে ত শুভস্য শীঘ্রম। কাল সকালে উঠে যাবি। দু'শ আট নম্বর ভবানীপুর রোড, কালিঘাটের কাছে বুঝলি?—কি রে খাচ্ছিস না কেন? আর একটু ভাত দেব? ডাল? হ্যাঁ দাড়িটা কামাবি। ইস্ জামা কাপড়গুলো আগুনেও পুড়বে না রে? তা পরশু যাস্ সাফটাফ হয়ে নে।

সজল সাঁতা দুগ্রাসের বেশি খায়নি। হারাধনদার সঙ্গে বিপিন দাসের কথাবার্তাই এতক্ষণ পরম আগ্রহে গিলছিল।

এখনও বৃষ্টি পড়ছে। বাজারে কেনা-কাটা বন্ধ। হারাধনদা ক্যাস বাকসের ওপর তবলা বাজাচ্ছে অদূরের কোন দোকানের রেডিও থেকে গান ভেসে আসছিল।

সজলের খুব আনন্দ হচ্ছে। আশার আলো দেখতে পাচ্ছে সে। এভাবে খেতে আসাটা কোনদিন তার ভালো লাগেনি। হয়ত এবার তার প্রয়োজন হবে না।

হারাধনদা চোখ বন্ধ করে একমনে তবলা বাজাচ্ছে, আহা-হা করছে। সজল ভাবছিল, লোকটা কি ভাল! কী করে এর ঋণ শোধ হবে জীবনে! খেতে দেয় কিন্তু শুতে দিতে পারে না বলে বড় দুঃখ হারাধনদার।

প্রথম দিন রাত্রি বেলা এগলি ওগলি পেরিয়ে, উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে, গঙ্গার ধারে তাকে নিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ শুয়ে থাক এখানে। বৃষ্টি পড়বে না, মা গঙ্গার চমৎকার হাওয়া। কদিন আমি শুয়ে কাটিয়েছি।'

সজল ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিল, এটা কি হারাধনদা?' 'আরে ওটা

জেটি। নৌকো স্টীমার ওর গায়ে লাগে। মাল ওঠায় নামায়। নে শুয়ে পড়। হারাধনদা নিজের গামছা দিয়ে কাঠের তক্তাগুলো ঝেড়ে দিল। বুঝলি, শালা বুড়োটা বড্ড পাজি। তাই থাকতে বলতে ভরসা পেলাম না। তা ভাবিস্ না। এক কাজ কর, আমার গামছাটাই তুই রাখ। দাঁড়া ওখান থেকে একটা ইট নিয়ে আসি। মাথাটায় কিছু একটা থাকা ভাল। হয়েছে? আমি যাই। দোকানে তালা দিয়ে এসেছি। বুড়ো আবার এসে পড়তে পারে।

প্রথম দিন সজল সেই জেটিতে শুয়ে রাত কাটিয়েছিল। কিন্তু ঘুম হয়নি। সেই রাতটি জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। বড় দুঃখ হচ্ছিল সজলের. বড় দুর্বল মনে হচ্ছিল নিজেকে। অভিমান হচ্ছিল নিজের ওপর। অমৃতপুরের ছোট মাটির আর খড়ের ঘরটির কথা বড় করুণভাবে মনে পড়েছিল তার। অমৃতপুর অনেকদূরে। সজল যেন জন্ম-মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে এসেছে। সেই ছোট ঘর, ছোট্ট একটু উঠোন. দুধারে সজলের নিজের হাতে লাগানো দোপাটির চারা. ওধারে একটা গন্ধরাজ। আর এই ঘরের সমস্ত অস্তিত্ব ঘিরে একমাথা বুক জলের বোঝা বয়ে বেড়ানো একটি রোগা মাস্টারমশাইয়ের টানাটানা বোবা চোখের অতল বিষণ্ণ ছায়া! মিনুকে বড় মনে পড়ছে. বড় মনে পড়ছে ওর মুখটা, তার শুকনো চোখদুটো আকাশের মত তার দিকে যেন চেয়ে আছে!

সামনের একটি লোক হিন্দীতে গান করছিল। গানটা কেমন করুণ। সীতার বিরহে রাম তাকে বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়ত তুলসীদাসের রামায়ণে ওই রকম কোন গান থাকবে। সজল শুয়ে শুয়ে গানের অর্থ বুঝবার চেষ্টা করল।

ওধারে একটা ঝাঁকামুটে ঝাঁকা বইবার বিড়েটা মাথায় দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। সজলের ঈর্ষা হচ্ছিল. এই সব সাধারণ মানুষের নিরুপদ্রব, নির্ভয়, তৃপ্ত জীবন দেখে।

সেই শুধু অনিদ্র, শুধু তার চোখেই ঘুম নেই।

কিছু পরে পূর্ব দিকে সেদিন জ্যোৎস্না উঠল। গঙ্গার জলের ওপর যে অন্ধকার ভিড় করেছিল, এতক্ষণে আস্তে আস্তে তা পাতলা হতে শুরু করল। চারদিকের কোলাহল কেমন ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসছে। কদাচিত গাড়ীর হর্ন, কি নদীতে নদীতে লঞ্চের শব্দ, আলো, রাত্রির এই সঞ্চিত শান্তিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিলেও একটু পরে আবার তা ঢেকে আসছে।

ততক্ষণে গানটা থেমে গেছে। লোকটা এবার সীতার বিরহের কথা শেষ করে চুপ করে ঘুমুবার চেষ্টা করল।

আর কোন শব্দ আসছে না, শুধু নদীর জলের স্রোতের একটা শব্দ। ওপরের আকাশটা কেমন চুপচাপ।

সজল আস্তে আস্তে কেমন শান্ত. নির্ভয় হয়ে উঠছিল। তার দুঃখ, দারিদ্র্য, চিন্তা সব কোথায় ক্ষণিকের জন্য মিলিয়ে গেল। বর্তমানের ওপর কে যেন কালো একটা পর্দা টেনে দিয়ে ভেতরের মঞ্চে অভিনয়ের মহড়া শুরু করল। ছেলেবেলা থেকে এই এক মানসিকতা তাকে বহু দুঃখ থেকে বাঁচিয়েছে। কি করে যেন সে বর্তমানের সমস্ত আঘাত-যন্ত্রণা থেকে, অথবা ছোটমা যখন মিনুকে কোনো কারণে মারত—তার কান্নার সীমানা থেকে মনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে, মাঠের বনের আকাশের সুরের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারত; প্রকৃতির বিরাট ছবির মধ্যে সব কিছু ভুলে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাতে পারে! কিছু সময়ের জন্য তার নব জন্ম হয়।

এই দ্বিজত্ব তার জীবনে বহুবার এসেছে।

তেমনি একটা নির্মল, তেমনি একটা আশ্চর্য আনন্দ এই মুহূর্তে সজলকে মুগ্ধ করে। সে আনন্দের কোন সংজ্ঞা নেই, সে আনন্দের কোন রূপ নেই। সে আনন্দ শুধু অবয়বহীন গভীর এক অনুভব। এই স্তব্ধ রাত্রি, এই প্রশান্ত নদী, এই বিরাট সমুদ্রের মত প্রসারিত নির্বাক আকাশ—এই সমস্ত থেকে যে আনন্দ আসে, সে কি তবে ভূমার আনন্দ! যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা—বাবার কথা মনে আসে সজলের। ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করতেন। তারপর একটু থেমে দূরের মাঠ. ওপারের গ্রামের নীল রেখা, ওপরের নিঃসীম আকাশটার দিকে তাকিয়ে বলতেন যেখানে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না, জানা যায় না—সেই অচেনা বিরাট মহাদেশের নাম ভূমা। এই ভূমার অনুভব থেকে আত্মার অনুভব আসে। এবং আত্মাকে জানলেই অমৃতত্ব লাভ হয়।

অর্থ বলাটা ছাত্রদের উদ্দেশেই। কিন্তু সজল দেখেছে, তখন বাবার চেহারাটাই যেন পাল্টে যেত। বাবাকে অনেক দূরের অনেক অচেনা কোন মানুষ বলে মনে হোতো। সজলের ভয়-ভয় করত।

বাবার চেহারাটা মনে ভেসে ওঠে সজলের। ফর্সা রং, দীর্ঘ শরীর। সোজা হয়ে হাঁটত। গায়ে একটা উড়ুনি, পায়ে চটি।

শেষের দিকে কোনো ছাত্র আর টোলে ছিল না। বাবা শুধু অভ্যাস মত বইপত্তর নিয়ে দাওয়ায় বসত। চশমা চোখে দিয়ে পানিনি, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, ঋগ্বেদ, আর উপনিষদের পাতা উল্টোতো।

একদিন তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সজল স্কুল থেকে এসে পান্তা খেয়ে খেলার মাঠের দিকে যাচ্ছিল। দেখতে পেল, বাবা টোলের দাওয়ায় তেমনি চুপ করে বসে আছে। সামনে ধান কেটে-নেওয়া খেত। খেসারীও তুলে নিয়ে গেছে চাষীরা। সূর্যাস্তের ছায়া ঢেকে আসছে।

সজল পালাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। বাবা গম্ভীর গলায় ডাকল, 'শোন'!

সজল ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে গেল।

বাবা কিছু বলল না। চুপ করে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল।

ছাত্রদের কোলাহলহীন এই টোল ঘরটা এখন মরুভূমির মত ভয়ংকর নির্জন!

'কখনও কিছু চাইলে, নচিকেতার মতই চাইবি'—বাবার গম্ভীর গলা শুনে চমকে উঠল।

'জীবনে পরম কিছু চাওয়াই ঠিক চাওয়া। অর্থ নয়, নাম নয়—'

সজল বুঝতে পারল না, বোকার মত তাকিয়ে রইল। একবার চোখ তুলতেই দেখল, বাবার ঐ দূরের বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে তাকানো চোখ দুটো যেন জলে ভরে আসছে!

সজল ধীরে ধীরে পালিয়ে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

না বাবার কথা থাক।

সেই প্রথম দিন গঙ্গার জেটিতে শুয়ে থাকার কথা মনে করছিল সজল। ভীরু জ্যোৎস্নার আলো ততক্ষণে মেঘের ভয়ে মুখ লুকিয়েছিল। নদীর জল ঘন অন্ধকারে-ঢাকা। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। এই গভীর রাতে সব কিছু ঘুমিয়ে গেলেও, সজলের মনে হচ্ছিল, অন্তরীক্ষে কেউ যেন জেগে আছে। সে যেন বৃক্ষের মত স্তব্ধ, সে যেন মাটির মত মৌন, সে যেন নদীর মত নীরব, শান্ত, সমাহিত।

সজল মুখে ভাত তুলতে গিয়ে হঠাৎ শুনল, হারাধনদার তাল দেওয়া বন্ধ। ফিরে তাকিয়ে দেখে, হারাধন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছে। সজলেরও মনে হোলো সে যেন ভূত দেখছে!

গুণময় মহাপাত্র আজ অসময়ে ফিরে এলো কেন? আচ্ছা, যদি সে রান্নাঘরের ভেতরে এসে পড়ে! সজল অপমানের ভয়ে নিথর হয়ে গেল!

গুণময় দোকানে উঠে এসে চটি জোড়া খুলল। ছাতাটা রাখল, বসল। হারাধনদা এমনভাবে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, যাতে উঁকি দিয়ে সজলকে গুণময়ের দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

গুণময় ক্যাস বাকস চাবি দিয়ে খুলে বলল, 'কি বিক্রী সিক্রি হইছে কিছু?'

হারাধন গলায় ভক্তি ঝরিয়ে বলল, 'না কর্তা'।

'খাওয়া হইছে তোর?'

'না, এই যাব'।

'তবে খালি খালি রান্নাঘরে আলো জ্বলছে কেন?'

গুণময় বিরক্ত মুখে মানিব্যাগটা ফতুয়ার পকেটে ঢুকিয়ে আবার ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর চটি পায়ে দিয়ে ফট্‌ফট্ করতে করতে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অবিভক্ত বঙ্গদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষাজগতে দেশী ও বিদেশী অজস্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছিল, একথা আমরা সকলেই জানি। প্রশ্ন এই, তাঁদের সবাইকে কি আমরা মনে রেখেছি? যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছি? দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হল, না।

যাঁদের অক্লেশে ভুলে যেতে পেরেছি, রেভারেন্ড আলেক্স টমরি তাঁদেরই একজন। বস্তুতঃ এমন একটি বিচিত্র ও বহুমুখী চরিত্রকে কি করে এদেশের মানুষ বিস্মৃত হলেন, একথা খুবই বিস্ময়কর। রেভারেন্ড টমরি গত হবার পর দীর্ঘ একষট্টি বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে দু' একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ সময়ে তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়া ছাড়া বিশালকায় বঙ্গসাহিত্যে তাঁর একটি জীবনী গ্রন্থ তো দূরের কথা, একটি সম্পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধও কখনও রচিত হয়নি।

তুর্কের কনস্তান্তিনোপলে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন আলেক্স টমরির জন্ম। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন ইহুদী। বাল্যকাল থেকেই উচ্চশিক্ষালাভের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়, কৈশোরে এই ঝোঁকের সঙ্গে যুক্ত হল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা। যৌবনে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য এডিনবার্গে এলেন, আর এইখান থেকেই তাঁর জীবনের চাকা ঘুরে গেল।

উত্তর কলকাতার নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে থামওলা প্রকাণ্ড যে বাড়ীটিতে এখন জোড়াবাগান পুলিশ স্টেশন হয়েছে, সেই বাড়ীটিতে ছিল সুবিখ্যাত ডফ কলেজ। সেই ডফ কলেজের প্রিন্সিপাল ডকটর রবার্টসন অবসর নিয়ে এডিনবার্গে ফিরে এসে ঘটনাচক্রে টমরির সঙ্গে পরিচিত হলেন। উৎসাহে ভরপুর এই প্রিয়দর্শন তরুণটির প্রতি ডকটর রবার্টসন প্রথম থেকেই আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক হিসেবে টমরি যে নিজেকে নিয়োজিত করতে দৃঢ়-সংকল্প একথা তাঁর জানতে দেরি হল না। টমরিকে প্রশ্ন করলেন তিনি, ভারতবর্ষে শিক্ষক এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকরূপে তুমি কি যেতে প্রস্তুত?

টমরি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর বললেন, কেন নয়?

ডকটর রবার্টসন অতঃপর ডফ [illegible] পরিচয় দিয়ে জানালেন যে তাঁর অবসর নিয়ে এডিনবার্গ ফিরে আসার ফলে ডফ কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক পদ একটি শূন্য রয়েছে। টমরি যদি ঐ পদ গ্রহণে ইচ্ছুক হন, তবে তিনি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। টমরি চিন্তা করবার জন্য একদিন সময় নিলেন। পরেরদিন যথাসময়ে এসে ডকটর রবার্টসনকে জানালেন, তিনি কলকাতা যেতে ইচ্ছুক।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে টমরি কলকাতায় এসে পৌঁছোলেন, বয়স তখন তাঁর পঁচিশ। ডফ কলেজের প্রিন্সিপাল তখন সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডকটর হেকটর। ডফ কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা ছাড়াও ইতিহাস এবং অর্থনীতির ক্লাসও নিয়মিত নিতেন টমরি। এই শিক্ষাদানের সঙ্গেই ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি বাংলাভাষা শিখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে তাঁর সময় লাগল প্রায় বারো বছর। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি বঙ্গবাসী পত্রিকায় উল্লেখ রয়েছে দেখতে পাই—'পাদরী টমরি সাহেব বাংলা অনর্গল বলিতে পারেন এবং লিখিতে পারেন। বঙ্কিমের সমুদয় গ্রন্থ ইনি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছেন, আমাদের সহিত কথা বলিতে বলিতে বঙ্কিমের রচনার বহু অংশ আপন স্মৃতি হইতে নির্ভুল উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন।'

আলেক্স টমরি

ধর্মপ্রচার টমরির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি সমন্বয়ের দিকে গোড়া থেকেই জোর দিয়েছিলেন তিনি। তাই দেখতে পাওয়া যেত ওয়েলেসলি স্ট্রীটের তিন ঘরের ফ্ল্যাটটি খ্রীষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান—উদার ও প্রগতিবাদী তরুণ ও প্রৌঢ়দের একটা নিয়মিত মিলনস্থল।

ভারতবর্ষে স্কুল কলেজের হোস্টেল ব্যবস্থা চালু করাবার জন্য যে কজন উদ্যমী ও উৎসাহী মহৎ ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন টমরি ছিলেন তাঁদেরই একজন। কাজেই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে খৃষ্টান মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে 'হিন্দু হোস্টেলের' যখন সূত্রপাত হল, টমরি-ই যে সর্ববাদীসম্মত হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হবেন, একথা তো না বললেও চলে। এই নতুন কাজের ভার পেয়ে টমরি আনন্দে উদ্ভাসিত। চৈতন্য লাইব্রেরী সম্পাদককে লিখিত একটি ব্যক্তিগত পত্রে লিখেছেন তিনি, *

'গত কয়েক রাতই নিদ্রাহীনভাবে কেটেছে। আনন্দ? হ্যাঁ আনন্দ তো বটেই, অত্যন্ত আনন্দ—হয়ত আনন্দের চেয়েও কিছু বেশি। তরুণদের আরও একান্ত সাহচর্য পাব, তাদের জানতে পারব অনেক গভীরভাবে। এইতো চেয়েছি আমি—এই তো আমি চিরকাল চাইব......'

খ্রীষ্টান মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে 'হিন্দু হোস্টেল' কথাটা অনেকটা যেন সোনার পাথরবাটি কিম্বা কাঁঠালের আমসত্ত্ব, অন্তত সে যুগের বিচারে। কিন্তু না, টমরি উত্তীর্ণ হলেন সসম্মানে। হোস্টেলের জন্য বেশ কিছু ছাত্র নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত—সকল পরিবার থেকেই জোগাড় করলেন তিনি। এদের মধ্যে কয়েকটি ছেলে এসেছিল অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু পরিবার থেকে। একত্র ভোজনসহ বহু নিয়মকানুন মেনে চলতে কিছুমাত্র আপত্তি জানায়নি কেউই। নিয়মকানুন যথেষ্ট কড়া হওয়া সত্ত্বেও 'হিন্দু হোস্টেলের' ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। ডফ কলেজে ও হিন্দু হোস্টেলে টমরি যে কি পরিমাণে জনপ্রিয় ছিলেন তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে টমরি ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী।

* চৈতন্য লাইব্রেরীতে রক্ষিত আলেক্স টমরির ইংরাজি পত্র থেকে অনূদিত।

অন্তরে কিন্তু রসের ফল্গুধারা বহে যেত। ছাত্ররা যেমন তাঁকে ভয় করত, ভালবাসতোও অন্তর দিয়ে। জেনেশুনে অন্যায় করলে বা শৃংখলার অভাব দেখা দিলে টমরি যেমন অত্যন্ত কঠোর হাতে শাস্তি দিতেন, ভালবেসে বুকের কাছে টেনে নিতে পারতেন সহজেই। সময়বিশেষে ছাত্রদের সংগে দারুন উপভোগ্য রসিকতাও করতেন —ছাত্রমহলে হাসির হুল্লোড় উঠত। টমরি এবং তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি। ঘটনাগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি সেই হারিয়ে যাওয়া যুগের কয়েকখানি মূল্যবান দলিল। একদিন হোস্টেলের একটি ছেলে টমরিকে জানায় নিতান্ত গম্ভীরভাবে, 'স্যার, আমার ঘরটা কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার লাগে। একটু বাড়তি আলোর ব্যবস্থা যদি করেন তো ভাল হয়।' টমরি সমস্ত ঘরেই উপযুক্ত আলো রয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। ছাত্রটি যে অলীক অভিযোগ করছে বুঝতে তাঁর দেরি হল না। ছেলেটিকে আশ্বাস দিলেন, আজ সন্ধ্যেতেই বাড়তি আলোর ব্যবস্থা হবে। সন্ধ্যেবেলা যথারীতি ছাত্রটি এসে টমরিকে কথাটা মনে করিয়ে দিতেই বালির কাগজে মোড়া একটা বড় প্যাকেট নিয়ে টমরি তার ঘরে এসে ঢুকলেন। সকলেই উৎসুক বালির কাগজের প্যাকেট থেকে কি বের হয় কে জানে! প্যাকেটটি খুলতেই দেখা গেল চমৎকার একটি বাঁধানো ছবি। সুন্দর প্রাকৃতিক পটভূমিতে রুপোর থালার মতো পূর্ণচন্দ্র। টমরি গম্ভীরভাবে দেওয়ালের হুকে ছবিটি টানিয়ে দিলে বললেন, 'আশা করি তোমার ঘরে আলোর অসুবিধে আর রইল না।' ছেলেটিও খুবই গম্ভীরভাবে জানালো— 'না স্যার আলোর অসুবিধে তো নেই-ই এমন কি খুবই যথেষ্ট হয়ে গেছে বলতে হবে।' এক মুহূর্ত চুপচাপ...তারপর ছেলের দল ও টমরি হাসিতে ফেটে পড়লেন।

আর একদিন হোস্টেলের একটি ছেলে এসে টমরির কাছে এসে নালিশ জানালো। নালিশটি সত্যিই গুরুতর। 'স্যার মশারি টানিয়ে শুলে আমার ঘুম আসে না, তাই মশার কামড় সত্ত্বেও এযাবৎ মশারি টানাইনি। কিন্তু স্যার, আমার রুম মেট আমার বারন সত্ত্বেও ওর খাটে মশারি টানিয়ে শুয়েছে। ফলে আমাকে যে মশাগুলো রোজ রাত্তিরে কামড়াতো তারা তো, কামড়াবেই, এছাড়া আজ থেকে আমার রুম মেটকে যে সব মশা কামড়াতো তারাও ওকে কামড়াতে না পেরে আমাকেই কামড়াবে। তাহলে আমার শরীরে রক্ত আর কতটুকু থাকবে স্যার?' টমরি খুব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ সমস্যাটা গুরুতর বটে— আচ্ছা দেখছি।'

ছেলেটিকে সামনের চেয়ারে বসতে বলে তক্ষুনিই হিসেবে বসে গেলেন টমরি খাতা পেন্সিল নিয়ে। ঘরের দরজার আড়াল দিয়ে হোস্টেলের অন্য ছেলেদের কৌতুক উচ্ছ্বসিত মুখগুলি দেখা যাচ্ছিলো। টমরি একমনে হিসেব করে কিছুক্ষণ পরে জানালেন—তোমার রুমমেটকে কামড়াতে না পেরে যেসব বাড়তি মশা তোমাকে কামড়াতে আসবে বলে তুমি মনে করছো, তারা তো শুধু তোমাকেই কামড়াবে না, হোস্টেলের যে ৪৫টি ছাত্র মশারি টানিয়ে শোয় না—তাদেরও কামড়াবে। এইবার শতকরা হিসেব করে দেখতে পাচ্ছি বাড়তি মশার কামড় এতগুলো ছেলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে বড়জোর আর দেড়খানা নতুন মশার কামড় তোমায় খেতে হতে পারে। এটা এমন কি আর বেশী?

টমরির মানবতাবোধেরও তুলনা হয় না। অভাবগ্রস্ত নারী ও পুরুষ এবং দরিদ্র ছাত্রদের যেমন অকাতরে অর্থ সাহায্য করতেন তেমনি অসহায়, রোগগ্রস্ত মানুষের সেবার কাজে কলকাতার নোংরা বস্তি-গুলিতে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। এই উভয় কাজেই ধর্মপ্রচারকে কখনই তিনি তাঁর হাতিয়ার করেননি।

হোস্টেলের কোন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে টমরি বহুক্ষণ তার রোগশয্যার পাশে বসে তো থাকতেনই প্রয়োজন হলে রাতও জাগতেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। হোস্টেলের একটি ছাত্র—নাম অতুল প্রসাদ বসু, স্মল পক্সে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হল। টমরি ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন—সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা হাসপাতালে গিয়ে রোজই তার তত্ত্বাবধান করতেন স্বয়ং। অবশেষে যেদিন সে সম্পূর্ণ নীরোগ হল, নিজের হাতে তাকে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে নিজের সাইকেলের সামনে বসিয়ে, সাইকেল চালিয়ে মহানন্দে হোস্টেলে আবার ফিরিয়ে আনলেন তিনি।

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক মেধাবী ছাত্র বেশ কিছুদিন ইস্কুলে (ডফ কলেজে) আসছে না। টমরি খবর নিয়ে জানতে পারলেন ছেলেটি দরিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তান। তার মায়ের জ্বরবিকার এমন গুরুতর অবস্থায় পেঁছেছে যে বাঁচে কিনা সন্দেহ। ডাক্তারের ফি দেবার ক্ষমতা নেই, এমন কি রোগীর পথ্য বা চন্দ্রনাথের ক্ষুধার অন্নেরও সংস্থান নেই। টমরি তৎক্ষণাৎ গোয়াবাগানে চন্দ্রনাথের বাড়ীতে গেলেন। ওষুধ, পথ্য, ডাক্তার এবং ছেলেটির অন্নের ভার গ্রহণ করতে এতটুকু বিলম্ব ঘটল না তাঁর। কুঞ্জলাল গুপ্ত নামে আরেকটি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র একদিন ইস্কুল ছুটির পর টমরির কাছে কাতর কণ্ঠে জানায়, স্যার বাড়ীতে বড় অভাব। লেখা-পড়ার সুযোগ আর আমি পাব না। একটা বই বাঁধানোর দোকানে কাজ পেয়েছি। কাল থেকে সেখানেই যেতে হবে। আমি পড়া-শোনা ছাড়তে চাইনি, কিন্তু কি করবো, চোখের সামনে বাবা-মা অনাহারে রয়েছেন দেখছি। কিছু আর আমার না করলেই নয়!

টমরি জানতে চান নতুন চাকরিতে কুঞ্জলাল কত মাইনে পাবে? কুঞ্জলাল উত্তর দেয় মাইনে ভাল স্যার—মাসে দুটাকা চার আনা (প্রসঙ্গত এযুগের পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই যে তখন এক মণ চাল দু টাকা চার আনায় পাওয়া যেত)। টমরি কিছুক্ষণ চিন্তা করে শান্ত কণ্ঠে বললেন, যতদিন তোমার স্কুলের লেখাপড়া শেষ না হয় ততদিন প্রত্যেক মাসে তুমি আমার কাছ থেকে ঐ দু টাকা চার আনা নিয়ে বাড়ীতে দিও। লেখাপড়া তোমাকে করতেই হবে। অদৃষ্টের পরিহাসে, ঐ দরিদ্র মেধাবী ছেলেটির ভার টমরিকে বেশীদিন বহন করতে হয়নি। ঐ ঘটনার বছর খানেক পরেই কলেরা রোগে কুঞ্জলালের মৃত্যু হয়। এ সংবাদ পেয়ে টমরি আকুল হয়ে কেঁদে-ছিলেন।

এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য টমরি পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। তাঁর কলকাতা আগমনের (১৮৮৭) চার বছরের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু হয় (১৮৯১)। এই চার বছরের মধ্যে টমরি পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগে ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন—অন্তত সম-সাময়িক পত্রপত্রিকা জার্নাল অনুসন্ধান করে এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু টমরি যে আজীবন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এ সম্বন্ধে অন্তত দুজন প্রখ্যাত মিশনারী—স্কটিশ চারচ কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল রেভারেন্ড জন ল্যাম্ব ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার রেভারেন্ড আর্কুহার্ট সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। আর্কুহার্ট জানিয়েছেন, টমরি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি প্রামানা জীবনী গ্রন্থ ইংরাজীতে লিখতে খুবই উৎসুক ছিলেন; এই ইচ্ছাটির কথা তিনি বহুবার, বহুজনের কাছে ব্যক্ত করেছেন। এমন কি অসুস্থতার জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের অকটোবর মাসে ফার্লো (ছুটি) নিয়ে তিনি যখন বৃটেনে ফিরে যান, তখন সেই অবসরে ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী গ্রন্থটির কাজও নাকি অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু টমরির অকাল মৃত্যু এই মহান প্রচেষ্টায় পূর্ণবিরতি এনে দেয়।

প্রয়োজন বোধে কোন কোন ক্ষেত্রে টমরির নিষ্ঠুর হাতের শাসনেরও তুলনা নেই। এ সম্পর্কে একটি অতি নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ বিবরণ দিয়ে গেছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তিনি ১৮৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে ডফ কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই বিবরণটি এতই অদ্ভুত যে তা সবিস্তারে উল্লেখ-যোগ্য। সে যুগে ইস্কুলের ছাত্রদের সাধারণত বয়সের বাধাবাধকতা বলে কিছু ছিল না বললেই চলে। ক্লাস সিক্স বা সেভেনে ১৭।১৮ বা তারও বেশি বয়সের ছেলেদের পড়াটা খুব অস্বাভাবিক ছিল না। গুন্ডা ধরনের বদমাশ ছেলের প্রাচুর্য ছিল খুবই। আতর্থীমহাশয় বলেছেন, 'আমাদের সময়ে ইস্কুল একটা বিষম স্থান ছিল খুবই। আতর্থীমহাশয় বলছেন, ড্যাস করবার সুযোগ আমার হয়েছে, এ সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে... তখনকার ইস্কুলের ছেলেদের ভয়ংকর দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা হয়তো অনেকের কানে

অদ্ভুত ও অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেযুগে মাস্টার ঠেঙানো, ক্লাসে ক্লাসে মারামারি, ইস্কুলে ইস্কুলে খুনো-খুনি—এসব তো আকচার হতই। তাছাড়া আরও এমন সব সাংঘাতিক মারামারি ও খুনোখুনি হত, যার কারণ বর্ণনা করতে গেলেই আইনের খপ্পরে পড়তে হবে, বিবরণ দেওয়া তো দূরের কথা।'

ডফ কলেজের ক্লাস সিকসে ভর্তি হয়ে আতর্থী মহাশয়ের প্রথমদিনের স্মৃতি—'এখানে প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় ঘর, এক এক ক্লাসে একশো দেড়শো ছেলে। আর সেসব কি ছেলে! খারাপ কথা আমরা দুটো-চারটে শিখেছিলুম, কিন্তু নমাসে ছমাসে অতি সন্তর্পণে বন্ধু মহল ছাড়া তা উচ্চারণ করতে সাহস হত না।

এখানে দেখলুম, ছেলেরা দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে একতলার বন্ধুদের সংগে সেই ভাষায় আলাপচারী করছে। দেখে-শুনে এমন ভড়কে গেলুম যে, মাস দুয়েক মুখ দিয়ে আর বাক্যি বেরুল না...।'

কিন্তু এই দুর্দান্ত ছাত্রসমাজও টমরির ভয়ে অস্থির! 'ইস্কুলের ছাত্ররা প্রায় সকলেই টমরিকে যমের মতন ভয় করত। টমরি প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ক্লাসে ঢুকেই বাংলা ভাষায় জিজ্ঞাসা করতেন, মাস্টার মহাশয়, কোনও বদমাইস ছেলে আছে, যাকে বেত্রাঘাত করা প্রয়োজন?...টমরি এই রকম ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে ছেলে যোগাড় করে নিয়ে হলঘরে গিয়ে তাদের বেত্রাঘাত করতেন। তাদের চীৎকার ক্লাসে বসে শুনতুম আর আমাদের অঙ্গে কাল ঘাম ছুটত।'

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামে একটি অতি বদমাশ ছেলে আতর্থী মহাশয়ের সংগে ক্লাস সিকসে পড়ত। বয়স তার ১৬।১৭, চেহারাটিও পালওয়ানের মত—নিয়মিত কুস্তিও করে। একদিন প্রিয়বাবু নামে জনৈক শিক্ষকের ক্লাসে অতিরিক্ত চ্যাংড়ামি করায় ঐ শিক্ষকটি উপায়ান্তর না দেখে টমরির কাছে নালিশ জানালেন, পরেরদিন প্রথম পিরিয়ডেই টমরি এসে মধুসূদনকে ডেকে নিয়ে গেলেন। তাঁর পিছু পিছু বুড়ো রাজপতি দারোয়ান, হাতে তার দুটো মোটা মালাক্কা বেতের ছড়ি। মিনিট পনেরো বাদে মধুসূদন ফিরে এল। তার ধুতি ও জামায় রক্তের দাগ, চোখ দুটো লাল টকটকে। সে ডান-হাতের তেলোটা আমাদের দেখালে। মনে হল, কে যেন ছুরি দিয়ে হাতের তেলোটা আড়াআড়িভাবে কেটে দিয়েছে। সে ক্লাসে চীৎকার করে বললে, শালা টমরিকে আমি দেখে নোব।'

প্রথম পিরিয়ড শেষ হতেই মধুসূদন বাড়ী চলে গেল। বিকেল চারটেয় স্কুল ছুটির সময় দেখা গেল সে এক দৃশ্য! ডফ কলেজের সামনে অন্তত শতিনেক লোক। সবার আগে মধুসূদন ইস্কুলের দিকে মুখ করে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। তার ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ, গায়ে জালি গেঞ্জি, কোমরে মস্ত বড় ভোজালি। স্কুলের সামনে কয়েকটি বাড়ীর রোয়াকে মধু-সূদনের সঙ্গী জনা পাঁচশেক গুণ্ডা—তাদের সামনে পাঁজাকরা বাঁশ ও লাঠি, প্রত্যেকের হাতে ছোরা। নিমতলাঘাট স্ট্রীট দিয়ে সেযুগে বিস্তর গরু ও মোষের গাড়ি যাতায়াত করত। এই গোলমালে তারা অনেক দূর পর্যন্ত সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সে এক হৈ-হৈ-রৈ-রৈ ব্যাপার। সন্ধ্যে অবধি কোন শিক্ষক স্কুলের বাইরে আসতে সাহস করলেন না। পরেরদিনই টমরি সার্কুলার দিয়ে মধুসূদনকে ডফ কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

মধুসূদন পর্বের সেইখানেই ইতি!

ইংরাজী, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ও গ্রীক ভাষায় টমরি সুপণ্ডিত ছিলেন, এরই সংগে যুক্ত হয়েছিল তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ। পূর্বেই জানানো হয়েছে যে, সম্পূর্ণ বঙ্কিম রচনাবলী তাঁর 'প্রায় কণ্ঠস্থ' ছিল—এমন কি 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'হিন্দু ধর্ম' শীর্ষক দুরূহ গ্রন্থও। ইয়োরোপে বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি বহু বক্তৃতায় কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ থেকে অনর্গল কোটেশন উদ্ধৃত করেও তার তাৎপর্য বুঝিয়ে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করে দিতেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে টমরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের বহু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তো ছিলই, এমনকি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে তিনি বুক দিয়ে রক্ষা করেছেন নানা বিপদের হাত থেকে। উত্তর কলকাতার বিখ্যাত চৈতন্য লাইব্রেরী এমনি একটি উদাহরণ। এই ধরনের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্যও করতেন অকাতরে। সুদূর চট্টগ্রামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি বহু পুস্তক ও অর্থ সাহায্য করতেও দ্বিধা করেননি।

এই সময় লর্ড কার্জনের বঙ্গচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশে বিক্ষোভের ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে। দেশ-ব্যাপী সেই বিক্ষোভকে অতুলনীয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। টমরি মনে-প্রাণে বঙ্গচ্ছেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই বিক্ষোভে তিনি বাঙ্গালীর সংগেই সামিল হন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ও অসামান্য দুই বিতর্কমূলক রাজনীতিক প্রবন্ধ—'ইংরাজ ও ভারতবাসী' এবং 'স্বদেশী সমাজ'—যা চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত হয়ে দেশব্যাপী আলোড়ন তুলেছিলো, সেই দুটি প্রবন্ধ পাঠের আসরের তিনি একজন অতি উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন। ইংরেজের বঙ্গ-ভঙ্গ নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অভিমতের জন্য কুখ্যাত 'ইংলিশম্যান' ও 'এম্পায়ারে' তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এমন কি 'এম্পায়ারে' তাঁকে 'কিছু হঠকারী বাঙ্গালীর ভাড়াটে দালাল'ও বলা হয়। কিন্তু টমরি বিচলিত হননি এতটুকু। আপন আদর্শে তিনি স্থির নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন, বাঙ্গালীকে দুভাগে ভাগ করে দিলেও তার সংস্কৃতিকে কিছুতেই ধ্বংস করা যাবে না।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট বা গভর্ণিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নির্বাচিত হন বৃটেনের রয়াল ইকোনমিক সোসাইটির ফেলো।

ইতিমধ্যে ডফ কলেজ ও হেদুয়ার কাছে অবস্থিত জেনারেল অ্যাসেম্বলী একত্রিত করে স্কটিশ চার্চ কলেজের পত্তনের ব্যবস্থাও পাকা। সর্বসম্মতিক্রমে টমরি এই নতুন কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল পদে মনোনীত হলেন। কিন্তু বাইশ বছরের এক-টানা অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। তাই ঠিক হল, তিনি এক বছরের ফার্লো (ছুটি) নিয়ে এডিনবার্গে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণ করবেন। সেই অনুসারে এক বছরের জন্য অস্থায়ী প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হলেন রেভারেণ্ড জন ল্যাম্ব।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের অকটোবর মাসে টমরি কলকাতা ছেড়ে বৃটেন রওনা হলেন। তাঁর বিদায়ের ক্ষণের একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক বাঙ্গালী অধ্যাপক, মূল ইংরাজি বিবরণ থেকে কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ দেওয়া হল—'রেভারেণ্ড টমরি একমনে বিভিন্ন ফাইলগুলি দেখছিলেন। উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম, দেরি হয়ে যাবে না তো? হঠাৎ তিনি আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এখনও ঠিক দশ মিনিট সময় হাতে রয়েছে আর বাকি রয়েছে দুখানা জরুরী চিঠি লেখা। ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে চিঠি লেখা শেষ করে খামে ভরছিলেন যখন, বেয়ারা এসে দরজায় হাঁক দিলে, গাড়ি তৈরী।

টমরি কোন কথা না বলে শান্ত পদ-ক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অপেক্ষমান ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলেন, পিছু পিছু আমি। টমরি প্রশান্ত দৃষ্টিতে গাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, মুখে কোন কথা নেই। গাড়ি চলতে আরম্ভ করে। কয়েকটি তরুণ ছাত্র হাতে বই খাতা নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে আসছিল, তারা গাড়ির জানলা দিয়ে টমরিকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে অভিনন্দন জানায়। তিনি স্মিত-হাস্যে তৎক্ষণাৎ মাথার টুপিটি খুলে সে অভিনন্দন গ্রহণ করেন। ঘোড়ার গাড়ি যখন মানিকতলা স্ট্রীট দিয়ে বাঁক ধরল, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তিনি যেদিন ডাক পাঠাবেন, সেদিনও যেন এমনি সহজভাবে যেতে পারি, এমনি অনাড়ম্বরে।'

বৃটেনে পৌঁছেও বিশ্রাম নেওয়া তাঁর হয়ে ওঠে না। তিনি যে, কর্মযোগী, বিশ্রামে তাঁর শান্তি কোথায়! বিভিন্ন শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগা-যোগ, বংগদেশের বিভিন্ন সমস্যাবলী সভা-সমিতি, সংবাদপত্রে তুলে ধরার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলতেই থাকে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ, স্কটিশ চার্চ কলেজের কর্মকর্তারা তাঁকে পাকাপাকিভাবে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করে এডিনবার্গে টেলিগ্রাম পাঠালেন সংগে কলকাতায় খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসার অনুরোধ। ত্রিরিও টেলিগ্রামে জবাব দিলেন, 'যত-শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসছি—চিন্তা করবেন না। আমার প্রিয় কলকাতায় ফিরে আসবার জন্য আমিও খুব ব্যাকুল।'

কিন্তু হায়! ফেরা আর তাঁর হল না। দিন পনেরো পরেই, ১লা এপ্রিল বুকে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করতে থাকেন, ক্রমশঃ সেই যন্ত্রণা যেন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে চায়। ডাক্তাররা দেখতে এসে মুখ গম্ভীর করলেন—খুব নাকি খারাপ ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা। দুদিন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চলে গেল। ৪ঠা এপ্রিল সোমবার রোগীর অবস্থা বেশ ভালোর দিকে। সমস্ত দিন টমাস শান্তভাবেই শুয়ে আছেন। সন্ধ্যে হয়ে এল প্রায়, রক্তিম সূর্যের অন্তিম আভা জানলার কাচ ভেদ করে ঘরে এসে পড়েছে। হঠাৎ পাশ ফিরে ডাকলেন—মা, মা।

৪৮ বৎসরের সন্তানের শয্যার পাশে ৭৬ বৎসরের বৃদ্ধা মা সজল নয়নে বসেছিলেন। ডাক শুনে শশব্যস্তে আরও কাছে সরে এলেন। টমাস দু হাত দিয়ে মায়ের দুটি হাত আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আরেকবার ডাকলেন, মা!

ফুঁপিয়ে উঠলেন করেকবার। তাঁর কণ্ঠনালী কি এক অব্যক্ত বেদনায় কাঁপতে লাগল থর-থর করে। তারপর সব শেষ।

মুখে তাঁর অনন্ত শান্তির ছায়া—
চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু।
বিদায়ের দিনে হাসিমুখে সহজভাবে যেতে চেয়েছিলেন—কিন্তু বিদায়ের শেষকণাটি চোখের জলেই অভিষিক্ত রয়ে গেল।

নাট্যকার কে ছিলেন এক্ষুণি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, আকাশবাণী প্রচারিত এই নাটকে তুলে ধরা হচ্ছিল একটি দরিদ্র মুসলমান জীবন। ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত স্বামী চীৎকার করে উঠল, 'তালাক'। পরপর তিনবার। অতঃপর জানা গেল একটি বিবাহ-বিচ্ছেদ দুজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিধিবদ্ধ হয়ে গেছে। মনে একটা ছাপ পড়েছিল। যে বিবাহরীতি মৌখিক কথাকেই—যা হয়তো আন্তরিকও নয়, কেবলই তাৎক্ষণিক—এত গুরুত্ব দেয়, সে বিষয়ে আরো জানবার ইচ্ছে জেগেছিল। বোম্বাইয়ে দৈনিক ও সাময়িক কাগজপত্রে 'সম্পাদকের প্রতি' শীর্ষক চিঠিগুলো নিয়মিত ঘেঁটে একটি টগবগে বিতর্কের সন্ধান পেলাম।

ভারতে বহু বিবাহ প্রথা রোধের চেষ্টা করা হলে প্রবল বাধা যে আসবে, এটা এক রকম নিশ্চিত। শুধু মুসলমানরাই প্রগতি বিমুখতার দোষে দোষী নন। গোঁড়া হিন্দুরাও যে পরিবর্তনের প্রথম ঢেউকে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন—তা বোঝা গিয়েছিল 'হিন্দু কোড' কার্যকরী করার সময়ে। আরো বড় কথা, মুসলমান জনসাধারণ তাদের 'কোরাণ' ধর্মগ্রন্থ ও শারিয়তকে (১) বহু যুগ ধরে জেনে আসছেন অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত বলে। অনেকেই স্পষ্ট লিখছেন, (ক) মুসলমানের জীবন ধর্মাশ্রিত। ইসলামের ঐশ্বরিক নীতিগুলিকে অস্বীকার করা বা রদবদল করার অর্থ ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানা। (খ) ইসলাম ধর্ম এত আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত যে এ কোন সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করে না। সর্ব যুগে সকল লোকের বিভিন্ন চাহিদা এই এক ধর্ম-ই পূরণ করতে সক্ষম। সুতরাং সংস্কারের চেষ্টা যদি করাও হয় তা হওয়া উচিত অত্যন্ত সতর্ক ও সূক্ষ্ম। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কাজেই জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে 'শারিয়ত' কি বলছেন? ইসলাম নারীকে নরের 'দৈবত অর্ধাংশ' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, পবিত্র 'কোরাণ' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে নারীর সমস্যা ও অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিবাহের জন্য একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় শর্ত : 'নিকাহনামাতে নারীর সম্মতিগ্রহণ। একে নারীর এক রক্ষাকবচ বলে মনে করা হয়। কোরাণ বলছেন, নারী পুরুষের ক্রীড়নক তো নয়ই, কেবল সন্তান-প্রজননের যন্ত্রও নয়। মুসলমান ধর্মে বহুবিবাহপ্রথা অনুমোদিত, কিন্তু এ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অধিকার নয়। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখা যায়, যুদ্ধে বহু সৈন্য নিহত [illegible] ও কুমারী মেয়ের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়। অবৈধ যৌন-সংসর্গ এড়াতে ও বিবাহযোগ্যা মেয়ের মা-বাবার ক্লেশ লাঘব করতে ইসলাম মুসলমান পুরুষের চারবার পর্যন্ত বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে ঘোষণা করেন। এতে পুরুষের উদ্দাম কামনাকেও লাগাম পরান হল। সে সময়ে বহুবিবাহ একরকম প্রচলিতই ছিল, সুতরাং এটা খুব চাঞ্চল্যকর কিছু হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার নির্দেশ রইল, পুরুষ যদি অতিরিক্ত পরিবার পালনে সমর্থ হয়, একমাত্র সে ক্ষেত্রেই যেন সে একাধিক বিবাহ করে। অর্থাৎ তাৎপর্য দাঁড়াল বহু রমণীকে বিবাহ করে পুরুষ কেবল ব্যক্তিগত যৌন-ক্ষুধাই তৃপ্ত করবে না, সঙ্গে সঙ্গে মূলো সামাজিক উদ্দেশ্যটিকেও সফল করবে। নারীর একইসঙ্গে একাধিক বিবাহ কিন্তু সমর্থিত হল না। কারণ যে নারী বহুজনের সঙ্গে যৌনসংসর্গ করে, সে তো গণিকারই শামিল। আর তাছাড়াও, একাধিক স্বামীর মধ্যে জাত শিশুটির 'পিতা' বলে কে স্বীকৃতি পাবে? এবং উত্তরাধিকারের সমস্যাও দাঁড়াত সেক্ষেত্রে।

একজন পত্রলেখিকা লিখছেন, ইসলাম দাস-প্রথাতেও সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন, এবং চার পত্নী ছাড়াও পুরুষের যে কোন সংখ্যক দাসীর সঙ্গে যৌনমিলনে সম্মতি দিয়েছেন।

যারা বহুবিবাহ প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাদের প্রধান যুক্তি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা চলবে না। ইরাকের ইসলাম-বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ডাঃ আহমেদ টোটোনজী বলছেন, বহুবিবাহ অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক। সমাজের নৈতিক দুর্নীতি বন্ধ করতে এর ভূমিকা বিরাট। আর একটা যুক্তি, খুব কমসংখ্যক লোকই বর্তমানে বহুবিবাহপ্রথার সুযোগ নেন। সেক্ষেত্রে আইনের সাহায্যে এ প্রথার মৃত্যু ঘটাবার সার্থকতা কোথায়? যারা এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নিচ্ছেন, তাঁরা কি শুধু খ্যাতি অর্জনের তাড়নাতেই এ কাজ করছেন না? অন্যান্য রাষ্ট্রে—তুর্কী, ইরাণ, ইজিপ্ট—যদি ধর্ম সংস্কারের চেষ্টা চলে থাকে, তার কারণ পাশ্চাত্য প্রভাব, ইসলামের ত্রুটি নয়। জাতীয় ঐক্যের ধ্বনি তুলেও লাভ হল না।

---

(১) 'শারিয়তে'র সাধারণ অর্থ দাঁড়ায়—ইসলা[illegible]

বলা হয়েছিল ধর্মনির্বিশেষে একটি অভিন্ন 'সিভিল কোড' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনবে। মুসলিম 'পার্সোনাল ল' (২) পরিবর্তনের চেষ্টাতেও ঠাণ্ডা জল ঢালা হল। কিছু লোক পরিষ্কার বলে বসলেন, মুসলমানও তো একই মাটিতে জন্ম নিয়েছেন, মানুষ হয়েছেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের জীবন তাদের ইচ্ছামতই বা চলবে না কেন? প্রশ্ন এল : আজ সমাজজীবনে যদি ইসলাম-বিরোধী আইনকানুন মানতে রাজী হই, কাল যে আমাদের জাতীয় ঐক্যের নামে নতুন এক ঢং-য়ে প্রার্থনা করতে বসান হবে না, তার নিশ্চয়তা কি আছে?

অগত্যা নতুন যুক্তি এল বহুবিবাহ প্রথা লোপের দাবীতে। এবারের বক্তব্য, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি আদর্শগন্ধী ধুয়ো বাদ দেওয়া হোক, পরিষ্কার ঘোষণা আসুক : নারী ও শিশুর প্রতি অবিচার বন্ধ করতে এই প্রথা নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে।

বহুবিবাহ-বিরোধী শিবিরে চাগলাসাহেব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এক সেমিনারে প্রথাটিকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের বহু মুসলিম-প্রধান দেশই আইন করে এটি বন্ধ করে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ভারতের পিছিয়ে থাকার যুক্তি কিছু নেই। তাঁর মতে, মুসলিম রমণীরা পাকিস্তানের ভগ্নীদের আদর্শে তাঁদের অধিকার জোর করে আদায় করে নিচ্ছেন না কেন?

ভারত সরকার যদি হিন্দু কোড বিলের ব্যাপারে তীব্র প্রতিরোধকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, তাহলে এক্ষেত্রে তাঁরা মোল্লাদের বিরুদ্ধে এরকম কাপুরুষোচিত ভূমিকা নিচ্ছেন কেন?

যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম বহুবিবাহ অনুমোদন করেছিলেন, বর্তমান সমাজে তার অনুরূপ অবস্থাই কি আর আছে? অর্থনৈতিক দিক থেকেও, একাধিক পরিবার পোষণের সামর্থ্য লুপ্তপ্রায়। বহু বিবেকহীন লোক স্ত্রী-সম্পর্কে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের বাসনায় বহুবিবাহ করছেন। অতি গোঁড়া মুসলমানের প্রতিও নিবেদন এসেছে, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ধর্মবিচার করুন। বহু যুগ আগে যে ধর্ম জন্মগ্রহণ করেছিল, তার সব খুঁটিনাটি বিধি রক্ষা আজ আর সম্ভব নয়। ইসলাম তো বলেন চোরের দুটি হাত কর্তন করা হবে, ব্যবসায়ী সুদ গ্রহণ করবেন না। এগুলি আজ আর রক্ষা করা হয় কি?

আরো দুটি কথা আসছে এ প্রসঙ্গে। শরিয়তকে যাঁরা চূড়ান্ত বলে ধরে আছেন, তাঁদেরও জানা আছে যে ইসলাম আইনের মধ্যেই বেশ কতকগুলি সমান্তরাল মতাদর্শ আছে। এদের কিছু লুপ্ত, তা সত্ত্বেও প্রায় সাত-আটটি এখনও বর্তমান। কোন মুসলিম অনুসরণ করেন 'হানাফি' মত, কেউ 'ইথনা আশারি' এবং কেউ বা 'ইসমাইলী'। এক পত্রলেখকের অভিমত, অন্ধের মত কোন বিশেষ একটি মতকে আঁকড়ে থাকার কোন যুক্তি নেই। নতুন আইন প্রণয়ন বা কোরাণের নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার না করেও, বিভিন্ন মত থেকে বিভিন্ন নির্বাচিত ধারা নিয়ে একটি নমনীয় অভিন্ন পারিবারিক বিধি তৈরী করা খুব কঠিন নয়।

দ্বিতীয়তঃ, আর এক পত্রলেখকের জিজ্ঞাসা : মুসলমান আইনকে ধর্মের সংগেই বা যুক্ত করা হবে কেন? বৃটিশ শাসক হিন্দু ও মুসলমান দুটি আইনকেই গ্রাহ্য করেছিল, স্বাধীনতার পরে ভারতীয় সংবিধান প্রাক্-১৯৪৭ আইনব্যবস্থাকে অনুমোদন করেছে। কাজেই এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সংবিধানের। সংবিধান-নিরপেক্ষ ধর্মীয় আইন চালু করা সম্ভব কি?

কিন্তু মত ও যুক্তিতর্কের মারপ্যাঁচই চলুক, ভারত সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর জোর করে তা চাপাতে যাবেন না। যতদূর বোঝা যায় ও'রা চান আলোচনা এবং আপোষের মাধ্যমে পরিবর্তন আসুক। আরো ভাল হয়, যদি পালা বদলের স্বতঃস্ফূর্ত হাওয়াটা আসে মুসলমান সমাজ থেকেই। সংসদে প্রস্তাব এসেছিল সুপ্রীম কোর্টের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি হিদায়াতুল্লার নেতৃত্বে মুসলিম বিচারপতিদের একটি কমিশন গঠনের। যে কারণেই হোক, হিদায়াতুল্লা অনুরূপ একটি কমিশনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

গত ক'বছর ধরে যে প্রাণবন্ত বিতর্ক চলেছে, কয়েকটি সংগঠন তাতে নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন। এ'দের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় ইণ্ডিয়ান সেকুলার সোসাইটি (বোম্বাই) ও মুসলিম প্রগ্রেসিভ গ্রুপের (দিল্লী) নাম, শেষোক্ত সংগঠনটি একটি খসড়া বিল পর্যন্ত প্রস্তুত করেছিলেন। '৭০ এর ফেব্রুয়ারীতে কলকাতা জেলা মহিলা সমিতি সভা করে বহুবিবাহ প্রথা রদের দাবী জানান। অপরদিকে, সংস্কারবিরোধী বক্তব্য এসেছে জামাতে-উলেমা ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে। '৭১ এর শেষে পুণাতে দু'দিন ধরে ইণ্ডিয়ান সেকুলার সোসাইটি ও মুসলিম সত্য-শোধক মণ্ডলের যৌথ উদ্যোগে 'মহারাষ্ট্র প্রথম মুসলমান নারী সম্মেলন' হয়ে গেল। প্রবল বিপদের ঝুঁকি নিয়েও প্রায় ১৫০ জন মুসলিম নারী প্রতিনিধি এসেছিলেন বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী ও সুরাট থেকে। মহারাষ্ট্র মুসলিম উইমেন্স [illegible] সভানেত্রী শ্রীমতী শরিফা তায়েবজী সম্মেলন পরিচালনা করেন। [illegible] পণ্ডিত অধ্যাপক ফৈজী সম্মেলনে [illegible] করে বলেন, শরিয়তের ভুল ও [illegible] করা হচ্ছে—সে শুধু নারীদের [illegible] রাখবার জন্যই। ওরা বহুবিবাহ [illegible] বিলোপের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিভিন্ন সমীক্ষা-দল গঠন ও সেমিনারের আয়োজন ব্যতীত সত্যিকারের কাজ এ পর্যন্ত কিছু হয়নি। আইন করে এ প্রথাটি বিলোপ করা যায়। কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন : একাধিক বিবাহকে আদালতের সম্মতিসাপেক্ষ করা। বিভিন্ন দিক বিচার করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আদালত রায় দেবে। সৈয়দ ফখরুদ্দিনসাহেব বনাম বম্বে সরকারের একটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিলেন, ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিবাদ-বিতর্ক দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করবেন আদালত সেই ধর্মেরই বিভিন্ন মতাদর্শের আলোকে। বিবাহব্যবস্থাকে যদি মুসলিম ধর্মপন্থীরা তাদের ধর্মের অচ্ছেদ্য অংশবিশেষ বলে দাবী করতে থাকেন, তাহলে আইনানুগভাবে আদালতে যাওয়া ছাড়া গতি থাকে না। ধর্মীয় স্বাধীনতাকে রাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, নীতিবোধ, জনশান্তি ইত্যাদি কারণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আর একটি উপায় আছে। বিবাহ-চুক্তিতে পুরুষের একের অধিক বিবাহ থেকে বিরত থাকাকে একটি শর্ত হিসাবে যোগ করা। সেক্ষেত্রে মুসলমান রমণী নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অনেকখানি সুযোগ পাবেন।

(২) বিবাহ, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, পরিবার-পোষণ সম্পর্কিত আইনকানুন।

।। উনিশ ।।

সামনের দিক থেকে আসছিল খালি ট্রাকটা। প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছিল। এ রুটের রাস্তাটা সংকীর্ণ—কোনরকমে দুটো গাড়ি পাশাপাশি সাবধানে যেতে-আসতে পারে মাত্র। পীচ থেকে চাকা নামানোই ভালো। কিন্তু ব্রজর সেদিকে একরোখামি বড্ড। চন্দন সামনের ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে বলল, বাঁয়ে নামো ব্রজদা। এই প্রথম ব্রজকে হঠাৎ তুমি বলে ফেলল সে। বিরক্তিতে। এতক্ষণ সারাটা পথ ব্রজর কাণ্ড-কারখানা দেখে তার খারাপ লেগেছে। কত জায়গায় না অকারণে গাড়ি থামিয়ে পথের ধারের চেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে ব্রজ।...এই যে দাদু, কেমন আছেন?... আরে চাচা যে! চাচীর বাতের খবর কি!... আদাব মিয়াসাব আদাব। আমার বিবিজানকে আশীর্বাদ করুন।...ঘুটেকুড়ুনী গোষ্ঠের বুড়িও তার মাসি।...ও মাসি, মেয়ের বাড়ি যাবে তো এস। নিয়ে যাই।

বুড়ি কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে বলেছে, কে, বেজো নাকি? আবার এ লাইনে এলে গো বোনপো? বাঃ বাবা, ভালো। ভাবলুম, আমার বেজোর কী হল—তার ভ্যান গাড়িরই বা হল কী! বেঁচে থাকো—বাবা বেঁচে থাকো। হ্যাঁ—যাবো, যাবো সুরিকে দেখতে। সামনে মাসের পাঁচুই। আহা, কদিন রাস্তাঘাট এত ফাঁকা লাগছিল রে সোনা। এ বয়সে কপালের দোষে রাস্তায় নেমেছি বাবা, তোকে না দেখলে কেমন যেন লাগে।...

যতক্ষণ বুড়ি এই সব কথা বলেছে, ব্রজ স্টিয়ারিঙে থুতনি রেখে বসে থেকেছে। মুচকি মুচকি হেসেছে। প্যাসেঞ্জার তাড়া দিতেই তার কাঁকনপরা থ্যাবড়া হাতটা গীয়ারের মুঠিতে নেমেছে। ক্যাঁচ আওয়াজ করে ফের চলতে সুরু করেছে গাড়িটা। আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেগে চলেছে!

পাঁচণ্ডীর বাঁকে ছোটখাটো গুটিকয় দোকানপাট। ছিটেবাতার ঘর, খড়ের চাল। নয়ানজুলিটা গভীর খাল। তার ওপর বাঁশের সাঁকো। ওপাশে ঘন গাছপালা আর বাঁশ-বনে ঘেরা গ্রাম। টিনের চালে এরিয়েল দেখা যাচ্ছে। আমড়াগাছে জাল শুকোতে দিয়েছে। রোদে তালাই পেতে শুয়ে আছে একটা ঝাঁকড়াচুলো লোক—তার বউ পাকা চুল খুঁজে তুলে ফেলছে। একটা স্তনে মুখ দিয়ে টানাটানি করছে ন্যাংটো বাচ্চাটা। গাড়ির শব্দে মুখ তুলে বউটা তাকাচ্ছে। দু চোখের বিস্ময় আর আনন্দ এতদূর থেকে দেখা যায়। সে অস্ফুট কী বলে উঠতেই মরদটা একবার মুখ তুলে দেখল গাড়িটা। তার দাঁতগুলো রোদে ঝকঝক করল। সেও হাসছে। একটা দোকান থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়েছে একটা রোগা লোক। খালি গা, পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি। গলায় মাদুলি, হাতে সোনার তাগা। ছুঁচলো দাড়িটা চৈত্রের হাওয়ায় কাঁপছে তিরতির করে।...হেই বাবাজীবন বেজো! এ্যাদ্দিনে এলি বাপ! বড় আনন্দ রে বড় সুখ হল। তোর লেগে রোজ কান পেতে থাকি।

জোবেদালি চাচা, কেমন আছো? চাচী ভালো? ওবেলার ট্রিপে নেমন্তন্ন চাচা। চাচীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাব।...ব্রজ হা-হা করে হাসে।

বাপ বেজো, এই লিস্টি আর এই টাকা।...জোবেদালি একটা চিরকুট আর কয়েকটা নোট এগিয়ে দিয়েছে।...হাঁপানিটা বেড়েছে। এদিকে মাল নেই টাটে। তোর ভালো হবে মানিক।

ব্রজ স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে হতাশার ভান করে বলেছে, নাও! হল তো! দিলে আবার বোঝাটা মাথায় চাপিয়ে! ওই ভয়েই বোঁ করে বেরিয়ে যাব ভাবছিলুম।

তারপর নিয়েছে লিস্টি আর টাকা।... মজুরী বাবদ একটা মুরগী চাই কিন্তু।

জোবেদালি কবুল। তার মনোহারি টাটের সামনে খদ্দের এসে গেছে ওদিকে। তড়াক করে এক লাফে রঙ ঝিলমিল টাটে গিয়ে চড়েছে সে।

কিছু দূর গিয়েই আবার এক কাণ্ড। সাঁকোর ধারে বসে ছিল লোকটা। মাথায় চুল শনের মতো। খোঁচাখোঁচা গোঁফ-দাড়ি। নাদুসনুদুস খালি গা—পৈতে ঝুলছে। খাটো ধুতি পরনে। হাত তুলে দাঁড়িয়েছে সে।...এই যে ব্রজগোপাল! কালই খবর পেয়েছি তুমি আবার আসছ। তাই পথ চেয়ে বসে আছি বাবা।

ব্রজ লাফিয়ে নেমে গিয়ে প্রণাম করে বসেছে। মাথায় ধুলো ঠেকিয়ে বলেছে, ভালো আছেন পণ্ডিত মশাই?

আর ভালো থাকা ব্রজগোপাল। কাল স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এসে বয়স জিগ্যেস করলে। বললুম, তা বাহান্ন-তিপান্ন হবে স্যার। উনি বললেন কী জানো? বললেন, তা বলুন তো পণ্ডিতমশাই, আমার বয়স

ঘাট—কাকে বুড়ো দেখাচ্ছে! বাবা, রাগে অপমানে ভিতরটা জ্বলে গেল। কথাটা বুঝলে তো? ঠাট্টা করে রিটায়ার করতে বলছে আমাকে।

আপনি কী বললেন স্যার?

আমি?...খিকখিক করে হাসল পণ্ডিত।...বললুম, তা স্যার, আপনার দুধ-ঘি খাওয়া শরীর। আর আমি শাকপাতা-ভোজী বামুন। আমাকে তো বুড়ো দেখাবেই। হিক...হিক হিক!

ব্রজ হেসেছে হো হো করে। গাড়ি শুদ্ধ লোক হেসেছে।

ব্রজ, ছোট মেয়ের কঠিন অসুখ। এই দ্যাখো প্রেসক্রিপশান। কত লাগবে জানিনে বাবা— দুটো টাকা দিচ্ছি। বেশি লাগে তো দিয়ে দিও। শোধ দেব'খন।

আলাপ করিয়ে দিই নতুন মালিকের সঙ্গে। এই যে স্যার, আমাদের পণ্ডিত-মশাই—দারুণ জ্ঞানী সাধক মানুষ। পণ্ডিতমশাই, ইনি এখন আমার নতুন মনিব। এমন মনিব পেয়ে আমি সার্থক।

নমস্কার স্যার। আশীর্বাদ করি, পথ আলো করে চলুন। এ নিরানন্দ দুঃখিনী পল্লীগ্রামে আপনার শকট শঙ্খধ্বনি করে মঙ্গল আনয়ন করুক। শাস্ত্র বলেছে...

ব্রজ আসনে এসে বলেছে, একটা পদ্য চাই কিন্তু। আগেরটার মতো। জানেন স্যার পণ্ডিতমশাই আমার গাড়ির জন্যে কত পদ্য লিখেছিলেন?...দূর ছাই! ভুলে গেলুম যে।

সংস্কৃত শ্লোকটা শোনা যায়নি গাড়ির শব্দে। যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে চন্দন দেখেছে, পণ্ডিতমশাই হয়তো তখনও শ্লোকটা আওড়ে চলেছে। ব্রজ বলেছে, অমন লোকের আশীর্বাদ পাওয়া কি কম কথা? লাগে লাগুক দু-দশটা টাকা বেশি, টাকা মলে তো সঙ্গে যাবে না স্যার। ওনারাই তো আমার আপনজন। ওনারা ছাড়া আর কে আছে বলুন? ব্রজর আর কেউ নেই।

এত সুন্দর এই পথটা! রূপপুর থেকে ঢালুতে নেমে এসে বরাবর সমতল মাটির দেশ। এ মাটির রঙ আলাদা। শুধু গাছ-পালা ঝোপঝাড় ফসলের খেত। পথের ওপর ঘন ছায়া পড়ে থাকে সারাবেলা। ছোট্ট নদী, খাল, দুধারে কখনও জলা—সেখানে শালুক ফুটেছে রঙবেরঙের। সাদা বকের ঝাঁক ওড়াউড়ি করছে। বটতলায় চণ্ডী-মণ্ডপ। কামারশাল। মুদীর দোকান। রাস্তার ধারে তাঁতিরা সুতো ছড়াচ্ছে, সার-সার কাঠি পোঁতা আছে অনেক দূর। খটাখট মাকু চলছে। চরকা ঘোরাচ্ছে মেয়েরা। পুকুরঘাটে একটি একলা বউ হাঁটুর ওপর দুহাতে শাড়ি তুলে অল্প জলে দাঁড়িয়ে অপকর্ম করছিল। গাড়ির শব্দে ত্রস্তে কাপড় ছেড়ে দিল। ব্রজ মন্তব্য করেছে, দিলে, দিলে কাপড়টা নষ্ট করে! কী সুন্দর মুখ বউটির। সলজ্জ চাপা হাসিটা দৃষ্টি এড়ায়নি চন্দনের। আবার কি দেখা হবে ওর সঙ্গে? এখানেই কোথাও? মনটা কেমন পুলকে গরগর করে ওঠে। মনে হয়, এই ছায়াঢাকা সুন্দর পথ একটার পর একটা ভাঁজ খুলে রূপের বাহার দেখাচ্ছে। আবার একটা বটতলা রাস্তার ধারে। বাঁশের মাচায় যারা আড্ডা দিচ্ছিল, তাদের একজন উঠে এসে দাঁড় করিয়েছে গাড়ি।...রোখো রোখো বেজোদা! এট্টুকুন আগুন দিয়ে যাও।

মলোচ্ছাই! আর আগুন পেলে না কোথাও!...ব্রজ দেশলাই দিয়েছে। নাও, জলদি করো। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিড়ি ধরিয়ে তৃপ্তিতে ধুঁয়ো ছেড়ে লোকটা বলে পথ কানা হয়েছিল হে বেজোদা। বড় তুষ্টু হল পেরানটা।

আবার চলেছে সবুজ স্টেশন ওয়াগন। লোক নামছে, লোক উঠছে। প্রথম 'সাইতে'র দিন ভাড়া নিয়ে দরাদরি নেই। ব্রজ আগে-ভাগে বলে নিয়েছে মালিককে।...এ গাড়ির মালিক আপনি ছোটবাবু, আর আমি শালা অধম ব্রজগোপাল তার ড্রাইভার বটে—কিন্তু ওরাই তো আমাদের সব। এ গাড়িকে ওরা নিজের গাড়ি মনে করে। দেখছেন তো স্যার?

চন্দন দেখছে। সারাপথ দেখতে-দেখতে চলেছে। কিন্তু বিরক্তও হয়েছে। যখন-তখন গাড়ি থামালে লেট হয়ে যাবে যে! আইনের কড়াকড়ি আছে। বাস গুমটিতে অ্যাসোসিয়েশন আর ট্রান্সপোর্টের সরকারী লোক রয়েছে খবরদারির জন্যে। মোরী নদীর ধারে মস্তো বাজার পুশুলে-চণ্ডীতলা। ওপারে জেলা বর্ধমান সামনে, ডাইনে তিন মাইল নদী ধরে পশ্চিমে এগোলে বীরভূম সীমানা। ওখানেই নদীতে স্নান করে হোটেলে খাবার কথা। ব্রজ বলেছে পুশুলেতে হরেক মজা আছে স্যার, টের পাবেন ক্রমে ক্রমে। মন পড়ে থাকবে এখানটায়। কত সব রঙবেরঙের মজা আছে... হঠাৎ জিভ কেটেছে সে।...আপনি আবার সাত্ত্বিক মানুষ। খাঁটি বোষ্টমের চালচলন আপনার। নাঃ, আপনাকে পাপের ছিটে লাগতে দেব না।

সেই সময় বুকটা ধুক ধুক করে উঠেছিল চন্দনের। পাপের কথা বলছে ব্রজ। পাপ কাকে বলে? পোশাক তুলে দেখুক না ওই নির্বোধ মাতাল ড্রাইভারটা, সারা গায়ের ফরসা রঙ পাপের ছিটেয় গত রাতে চিতাবাঘের মতো হয়ে গেছে। চিতাবাঘই বটে। এই প্রাণীটা নাকি রাত ছাড়া শিকার করে না। এই প্রাণী বড় চতুর, ভীষণ হিংস্র, প্রচণ্ড শক্তিমান। এই প্রাণীর নিষ্ঠুর-তার সীমা নেই।

একদিন—চাকরীর পর প্রথমদিন, জিয়া-গঞ্জে জিনিসপত্র আনতে গিয়ে সারারাত ঘুমোতে পারে নি চন্দন। অস্থির হয়েছিল ভেবে—তুমি পারবে তো চন্দন, পারবে তো তুমি? ভালো বলে সুনাম আছে তোমার। পরেশের অন্ধকারের সোনা ছুঁতে তোমার হাত কাঁপবে না তো? এ কোন মরালিটির প্রশ্ন হয়ত ছিল না সেদিন, ছিল সাহস আর শক্তির প্রশ্ন। পরে পরেশের অন্ধকারে সোনা ছুঁতে সাহস আর শক্তিকে দেখেছিল দুপাশে তৈরী। আসলে মানুষ সব পারে। এই মানুষই তো অমৃত ফেলে স্বেচ্ছায় তুলে নিতে পারে বিষের পেয়ালা। এখানেই মানুষের স্বাধীনতার বোধটা কাজ করে— যা কোন প্রাণীর কাছে নেই।

...তারপর চন্দন, তারপর গতরাতে আরেকরকম অন্ধকারের সোনা তুমি ছুঁয়েছ। তোমার এতটুকু বাধেনি। তৃপ্তির স্বাদে তুমি আবিষ্ট হয়ে গেছ। কঠিনে-নরমতায় শৈত্যে-উষ্ণতায় গড়া দুটি স্তন, দুটি ঠোঁট, আর ঝাঁঝালো শ্বাস-প্রশ্বাস তোমাকে পুরুষ-জীবনের একটা নগ্ন সত্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। না, তুমি সাত্ত্বিক নও ছোটবাবু। ব্রজ তোমাকে যা ভাবছে, তুমি তা নও। প্রগাঢ় তমসার মধ্যেই তো পাপের ফুল ফোটে থরে-থরে। অলৌকিক সেই ফুলের গন্ধে আত্মাকে মোহিত করে। তারপর চুপি-চুপি পিছন থেকে আক্রমণ করে যে তার এক নাম নরক, অন নাম যন্ত্রণা। তুমি কি এখন খুবই যন্ত্রণার্ত? তুমি কি আর কোনরাতেও ব্রজ ড্রাইভারের অসতী বউটাকে ছোঁবে না?

আড়চোখে দেখছিল ব্রজকে। শিখদের মতো চুড়োবাঁধা চুল, ঘন গোঁফ-দাড়ি, হাতে কাঁকন—একটা আত্মতৃপ্ত সুখী আর বোকা মানুষটাকে। রাগ হচ্ছিল। চাবকাতে ইচ্ছে করছিল।...ইডিয়ট, তুই কি মানুষ? বুদ্ধু আহম্মক, হতচ্ছাড়া! তোর মতো গবেট এ লাইনে আর একজনও নেই। অমন সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ক্ষুধার্ত বউটার দিকে একবারও তাকায় না পাজিটা! হয়তো গোপনে রক্ষিতা রেখেছে অন্য ড্রাইভারদের মতো। অথচ অবাক লাগে, ওই খৃষ্টান মেয়েটাকে ঘরের বের করে এনেছিল ও! কোথায় গেল সে ভালবাসাগুলো? কেন গেল? তীব্র ইচ্ছে—সব কথা জানার প্রবল কৌতূহল চনমন করছিল মনে।

হ্যাঁ, হাসি তা বলবে বলেছে। শুনতে হবে ব্যাপারটা।...ব্রজদা, আরে! চাকা নামাও! লরিটা কীভাবে আসছে দেখছ না?

ব্রজ দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে।...আসুক। ও শালাদের স্বভাবই এই। ঠিক পাশ কাটিয়ে যাবে দেখবেন। শালারা ভয় দেখায় ব্রজকে।

ট্রাকটা সোজা রাস্তার মাঝামাঝি আসছে। চন্দন উত্তেজিত হয়ে পড়ল।...আঃ কী হচ্ছে!

ব্রজর মুখ লাল। চোখ দুটো নিষ্পলক। শেষ মুহূর্তে সে ক্ষিপ্র হাতে স্টিয়ারিং ঘোরাল। চাকা নেমে গেল ঘাসের ওপর। ট্রাকটা ভীষণ শব্দে বেরিয়ে গেল। একটা হাসির শব্দ শুনল যেন। গাড়ি থামিয়েছে ব্রজ। ডানদিকের চাকা কেবল পীচের কিনারা ছুঁয়ে আছে। যাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে গজগজ করছে। উঃ, খুব বাঁচা বেঁচেছি! ট্রাকটা কার? ড্রাইভারকে চেনা মনে হল।...শালা ফের এদিকে আসবে না?...ব্রজদা, গাড়ি ঘোরাও। চলো, শালা কদ্দুর যায় দেখি।

ব্রজ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে ধাবমান ট্রাকটা দেখছিল। এবার দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, শালা হারামীবাচ্চা! রোসো। এখনও হয়নি শিক্ষা।

চন্দনের বুক কাঁপছিল। খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছে গাড়িটা। সে বলল, কার ট্রাক চিনতে পারলে? নাম্বারটা পড়া গেল না।

ব্রজ খোঁৎ খোঁৎ করে জবাব দিল, শংকরা। রাধিকের সেই ড্যামনাটা।

শংকর ড্রাইভার?...চন্দন চমকে উঠল।

হ্যাঁ। ঠিক আছে। আজ ফিরে গিয়েই ওর বিহিত হবে। ভাববেন না স্যার। আপনি শুধু চুপচাপ দেখবেন। আর বেগতিক দেখলে যা করার করবেন।...বিশ্রী শব্দ করে গীয়ার টানল ব্রজ। গাড়ি আবার পীচের ওপর তুলল।

এবার দুপাশে ফাঁকা মাঠ—যতদূর চোখ যায়। ব্রজ স্তব্ধ। গাড়ির যাত্রীরাও চুপচাপ। ঘটনাটার আকস্মিকতায় হয়তো সবাই স্তব্ধ—কিছুটা ভীতও। তাই কথা বলতে ইচ্ছে করে না কারো। ফাঁকা পথে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ব্রজ। ঘড়ি দেখল চন্দন। না—লেট হবে না পৌঁছতে। দেড় ঘন্টার যাত্রা। আর মিনিট কুড়ি বাকি আছে।

লম্বা একটা সাঁকো পেরোতে-পেরোতে ব্রজ মুখ খুলল।...শিশির চন্দ্রর ট্রাক চালাচ্ছে শংকর। ভেবেছে, শিশিরবাবু ওর মাথা বাঁচাবে। দেখি।...

ছেড়ে দাও ব্রজদা।...চন্দন এতক্ষণে সিগ্রেট জ্বালাল। তার বাঁদিকে দুজন যাত্রী। দুপায়ের ফাঁকে গীয়ার। এঞ্জিন গরম হয়ে উঠেছে। ধকধক করে জল ফুটে ভাপ বেরোচ্ছে। পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে এবার। ক্লান্তি লাগছে। এমনি করে প্রতিদিন দুবেলা আসতে আর ফিরে যেতে হবে। ভালো লাগবে তো?

মাঠ শেষ হল। বাঁক ঘুরে সবুজ গ্রাম। কাঠের ফলকে লেখা আছে: পুর্শোলিয়া দু কিমি। রাস্তার ধারে পাঠশালা। ছেলে-মেয়েরা পড়ায় মন দিয়েছে বোঝা যায়—জানালায় কারো চকিত মুখটা ঘুরে এল। চোখে হাসি। হয়তো ব্রজর গাড়ি দেখে এরাও চঞ্চল হল কমুহূর্ত। গাছতলায় মাস্টারমশাই ছড়িহাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে একদল ছেলেমেয়ে বসে পড়াশুনোয় ব্যস্ত। হয়তো মন্তেসরী কায়দা।...দিদি পারুল একসময় মাস্টারি করত। মনে পড়ে গেল।

রাস্তায় ভিড় দেখা যাচ্ছে এবার। রিকসো সাইকেল বাস পথচারী—কতরকম। নারকোল গাছের ফাঁকে রঙীন দালানবাড়ি উঁকি দিচ্ছে। পুর্শোলে এসে গেল।...

ঘিঞ্জি রাস্তার দুধারে দোকানপাট। অবিশ্রান্ত হর্ণ দিতে দিতে এগোচ্ছিল গাড়ি। লোকজন গিজ গিজ করছে সবখানে। একটু পরেই বাসস্ট্যান্ডের মতো চটান। পিছনে নদী। জল চকচক করছে। চরের বালিতে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো। নানারকম সব্জী আর বস্তা বোঝাই সেগুলো। ঘাটের ওপর বাস গুমটি। কাগজপত্র ব্রজই সই করিয়ে আনল। চন্দন গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে নদী দেখছে।

ব্রজ এসে ডাকল, চলুন স্যার। সাধুদার হোটেলে যাই। হোটেল তো রূপপুরে দেখেছেন। কিন্তু এ জিনিস হয় না! আসুন না—চোখ জুড়িয়ে যাবে!...হাসতে হাসতে এগোল সে।

হোটেলটা সামনে দেখা যাচ্ছিল। কোন সাইনবোর্ড নেই। উঁচু মেঝে, দরমাবাতার দেয়াল, আলকাতরা মাখা কালো টিনের চাল। ব্রজ চেঁচাচ্ছিল, সাধুদা, ও সাধুদা! আমি এসে পড়েছি।

কেউ অবশ্য বেরোল না। ব্রজ ঢুকে গেল চেঁচামেচি করতে করতে। চন্দনও ঢুকল। টেবিল চেয়ার নেই। পিঁড়ির ব্যবস্থা। একপাশে ছোট্ট জলচৌকিতে বসে আছে একটা প্রৌঢ় লোক। জনাকতক মেঝেয় বসে খাচ্ছে। তিনটি মেয়ে পরিবেশন করছে, জল যোগাচ্ছে, এঁটো তুলছে। পরিপাটি শাড়ি জামা, খোঁপায় ফুল, আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স তিনজনের। বয়স কম যার, তার রঙ বেশ ফরসা। বাকি দুজন শ্যামলা। মোটাসোটা গড়ন। ফরসা মেয়েটি ছিপছিপে হালকা। মুখশ্রী আছে। অন্য দুটি চলনসই চেহারা। এ যৌবনে পথের কুত্তাটারও নাকি রূপ খুলে যায়।

ব্রজ চন্দনের দিকে চোখ টিপল। ব্রজকে দেখে তিনজনেই কিন্তু হইচই করে উঠেছে।...ও মাগো! ব্রজদা যে!...ও ব্রজদা, হঠাৎ উধাও হয়েছিলে কোথায়?...ওরে, ব্রজদা এসেছে রে। নদীতে জাল ফেলে ইলিশ ধরে আন!...তারপর খিলখিল হাসির উচ্ছ্বাস। প্রৌঢ় লোকটি ধমক দিলেও ওদের কান নেই।

কী সাধুদা! কথাই বলছ না যে?

এস-হে পাঞ্জাবী। কথা কী বলব? এলে তো দেখতেই পাচ্ছি। দেখছি, ব্রজ-গোপাল এল।...সাধুপদ জলচৌকিতে থাপ্পড় মেরে ডাকল।..বোস হে ব্রজ বোস।

ব্রজ বলল, ইনি আমার নতুন মালিক সাধুদা। গাড়িতে বরাবর সংগেই থাকবেন। খাঁটি বামুনের ছেলে। তার ওপর মস্তো পাস দিয়ে বসে আছেন। হুঁ হুঁ বাবা! এই দিদিমণিরা, আমার স্যারকে প্রণাম কর শিগগির।

চকিতে তিনজোড়া বাহু আর ঠোঁট নড়ে উঠল।...ওরে বাবা, আমাদের ভাগ্যি!

সাধুপদ চন্দনকে দেখছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে ঝুঁকে প্রণাম করল।...অধমের সৌভাগ্য স্যার। ওরে ইন্দি, মোড়াটা এনে দে।

ফরসা মেয়েটি দৌড়ে ভিতর থেকে মোড়া এনে দিল। চন্দন বসল। ব্রজ বলল, এবেলা যা আছে, তাই দিও সাধুদা। স্পেশাল কিছু করতে হবে না। ভীষণ খিদে

পেয়েছে। স্যার, চলুন তাহলে চানটা সেরে আসি। চমৎকার জল আছে নদীতে। জিনিস-পত্র নির্ভাবনায় সাধুদার কাছে রাখুন। দাদা নামে যেমন সাধু, তেমনি স্বভাবেও। ইন্দি, এটু সরষের তেল দিবি রে? সাবান পোষায় না।

ইন্দি চোখ পাকিয়ে বলল, আর কাকেও বলতে পারছ না, শুধু এই ইন্দিই আছে।

সাধুপদ বলল, ইন্দি, কোণের বাবুকে দ্যাখ—কী বলছেন।

ইন্দি ভ্রূ কুঁচকে কপট ঝাঁঝে সেদিকে এগোল। ... বলল, তাহলে আকালীই নিয়ে এস।

আকালী বলল, হ্যাঁ—আকালী তো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। পদ্মকে যে সেদিন... হঠাৎ ব্রজর দিকে তাকিয়ে জিভ কাটল সে।

পদ্ম বলল, তাই যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। ব্রজদা এলে যেন কী লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় হোটেলে।

চন্দন ব্যাগটা সাধুপদকে দিল। সাধু-পদ সেটা পাশে রেখে বলল, আর বলবেন না স্যার। ব্রজটা এসে হুলুস্থুল বাধিয়ে দ্যায়। আমার মেয়ে তিনটি ওর বড্ড ন্যাওটা।

চন্দন বলল, ওরা আপনার মেয়ে?

আজ্ঞে। স্ত্রী নেই। একা মানুষ। ছেলে-পুলে বলতে ওই তিনটিই সার। যা বাজার পড়েছে, কী আর করা যায়!.. যান, স্নান করে আসুন। গরম গরম পাবেন। বাসি জিনিস আমি রাখিনে।

পদ্ম বাটিতে তেল এনে দিল। ব্রজ বেরোল। চন্দনও। বাইরে এসে ব্রজ বলল, শালা সাধুদা চাঁদের হাট বসিয়ে রেখেছে। ও মেয়েদের আর বিয়ে হবে ভাবছেন? সেগুড়ে বালি। আর, নিজেও তো ইচ্ছে করে বিয়ে দিচ্ছে না। কোন লোককে তো বিশ্বাস করে না—এত কিপটের ধাড়ি লোকটা। আমার শুধু কষ্ট হয় স্যার ভবিষ্যতে মেয়েগুলোর কী হবে।

কেন?...চন্দন অকারণ প্রশ্ন করল।

বা রে বা! মেয়ে তো বটে। স্বামীর ঘর করার ইচ্ছে নেই? ছেলেপুলের মা হবে না? কী যে বলেন। নেহাৎ বেশ্যা যে বাজারের মেয়ে, তাদেরও ঘর-সংসার স্বামী কাচ্চাবাচ্চা থাকে ছোটবাবু। আমি দেখেছি।

ঢালু পথে নদীর বালিতে নেমে গেল দুজনে। বাঁদিকে দহ পড়েছে। সেখানেই সবাই স্নান করছে। চিকন সোনালি বালির ওপর বসে ব্রজ তেল মাখতে থাকল। বেশ চড়া রোদ পড়েছে। চরের ওপর ঘূর্ণি দিয়ে হু-হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ল্যাজোর কাক একখানে নাচানাচি করছে। গরুর গাড়িগুলোর কাছে বালির ওপর ইঁটের উনুনে রান্না চাপিয়েছে গাড়োয়ানরা। ওপারটা ঢালু—ক্ষেতে পাকা গম, কোথাও কুমড়ো বা তরমুজের ঘন সবুজ ঝাঁপি। কিছু বাবলা গাছ। পিছনে নীল ধূসর বিশাল আকাশ। হাঁটু জল পেরিয়ে এপার-ওপার যাওয়া-আসা চলেছে লোকের। ডাইনে দহের জলে বাতাসের কাঁপন বার বার। জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে ছেলেমেয়েরা। পাড়ের দিকে হোটেলের নিচেই ঘাটের ধাপ। মস্তো পাথর পড়ে রয়েছে সেখানে। তেল-মাখা হলে ব্রজ বলল, ভুল হয়ে গেছে। সাধুদার ঘাটেই যাই, চলুন। এখানে বড্ড ভিড়।

ক্লান্তি লাগছিল। আর দেহে সেই রাতের পাপতাপ লেগে রয়েছে। প্যান্ট-শার্ট খুলে শুধু আন্ডার প্যান্ট রেখে চন্দন সাবান ঘষল এলোপাথাড়ি। সারা শরীরে ঘন ফেনা জমিয়ে দিল। সকালে আজ দাড়ি কাটা হয়নি। সেলুন হয়তো আছে এখানে। নিজের হাতে কাটা অভ্যেস তার। কিন্তু দাড়িটা কাটা দরকার। পরিষ্কার ফিটফাট থাকবার ইচ্ছে পেয়ে বসেছে এতক্ষণে।

ব্রজ চুলের ঝুঁটি ধরে হাপুস করে একটি ডুব দিয়েই উঠেছে।......আ মা! কী ঠান্ডা, কী ঠান্ডা! শালা চৈতমাস যেতে বসেছে—তবু জলের কী বাড় গো. এ্যাঁ?

হুসহাস ফোঁস ফোঁস করে জল ভেঙে ঘাটে উঠল সে। চন্দন বলল, ব্যস! ওই শেষ?

ব্রজ হাসল। ...পাগল হয়েছেন স্যার? মাতাল আর বেড়াল একই মাল জানেন না? দুজনেই জলকে বড্ড ডরায়।

চন্দন দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিল। জল ছড়িয়ে পড়ল অনেকটা দূরঅব্দি। ওপাশ থেকে একটি মেয়ে চেঁচাল চোখ আছে না নেই। চানকরা গায়ে জল ফেলল তো!

ব্রজ দাঁত বের করে আওয়াজ দিল, জল কি কেউ ফেলে! জল পড়ে।

চন্দন যোগ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে, আর পাতা নড়ে।

এ্যাঁ? জল পড়ে পাতা নড়ে!...ব্রজ অবাক কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেছে।...ওরে বাপ। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। সে কি আজকের কথা? এ বাগদীর ছেলেও বর্ণপরিচয় পড়েছিল! ভাবতে পারেন?

মেয়েটি গলা ডুবিয়ে চন্দনকে দেখছে। চন্দনও নির্লজ্জের মতো তাকে দেখতে থাকল। এত দুষ্টুমির চপলতা তার মধ্যে কিলবিল করে উঠেছে। জিয়াগঞ্জে গঙ্গার ঘাটে এমন অনেক সরল কৌতুক সে আর বন্ধুরা মিলে করেছে একদা। কিন্তু এখন কি এটা সেই সরলতা অবিকল? কোমর জলে দাঁড়িয়ে বুক ডলতে থাকল সে। ধরা পড়ল, স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

উঠুন স্যার, দেরী করবেন না। এক ঘুম ঘুমিয়েই আবার সাজতে হবে। তিনটের ট্রিপ। রূপপুর পৌঁছতে সাড়ে চারটে। ওখানে ফের পাঁচটায় ছাড়লে এখানে এসে সন্ধে। তারপর হিসেব করুন, এখান থেকে সাতটায় রওনা দিচ্ছি।...ব্রজ তাড়া দিচ্ছিল।

মেয়েটি ওঠার নাম করে না আর। এও কি হাসিদের অন্যতমা? চন্দন ফের তাকাতেই মেয়েটি হেসে মুখ ফেরাল। ভালো লেগে গেছে চন্দনকে? কোথায় থাকে ও? অবিবাহিতা মনে হচ্ছে।

চন্দন উঠে এসে গা মুছতে মুছতে চাপা গলায় বলল, মেয়েটিকে চেনো ব্রজদা?

ব্রজ একটু দেখে বলল, না তো। কেন?

এমনি জিগ্যেস করছি।

ব্রজ একটু দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে চাপা গলায় বলল, মনে হচ্ছে জিনিসটি ভালো। ...পরক্ষণে ধাপ ভেঙে উঠতে থাকল। ...আমি চললুম স্যার। পাত দিতে বলিগে। আপনি আসুন।

ব্রজ কী ভাবল? চন্দন একটু আড়ষ্ট হল। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিয়ে ধাপে উঠল। কয়েক পা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আর একবার দেখার লোভ হল মেয়েটিকে। আশ্চর্য! সে জলের ধারে উঠে এদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে তার মিটিমিটি হাসি আর চোখের ঝিলিক স্পষ্ট করে তুলেছে। এক মুহূর্তেই কি দেখামাত্র চন্দনকে ভাল লেগে গেল এই পাড়াগাঁয়ের কুমারীটির? এ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বটে।

নাকি মাথায় ছিট আছে? পাগলটাগল? কিংবা সত্যিসত্যি অসতী মেয়ে—যারা কম-বয়সেই নষ্ট হয়ে যায়, আর তারপর থেকে পছন্দসই পুরুষ দেখলেই দুরন্ত জিদের ঝাঁপিয়ে আসে—ভয় মানে না, লজ্জা মানে

না? পরেশদা একটা কথা বলত। ...মেয়েদের পুরুষ সম্পর্কে একটা লজ্জা বা ভয় স্বভাবত থাকে। থাকে বলেই ওরা যেমন পুরুষের কাছে মিষ্টি, তেমনি নিজেরাও জীবনটা তারিয়ে ভোগ করতে পারে। তাই পুরুষঘেঁষা মেয়েরা বড় দুর্ভাগিনী হে, বুঝেছ কিনা? পুরুষের ওপর থেকে লজ্জা ভয়টা হারালেই ওদের সব গেল। ...হয়তো রমার সম্পর্কেই এমন ধারণা ছিল পরেশের। সেটাই ঠারেঠোরে বলতে চাইত সে।

হোটেলের পিছনে সজ্জীলতা আর ঝোপঝাড়। কিছু ফুলের গাছ। আর একবার তাকাল চন্দন। হ্যাঁ, গা মুছছে—এদিকেই চোখ। ঠোঁটে হাসি, চোখে ঝিলিক। একটা হালকা চটুল লোভের ঝিলিক বয়ে গেল চন্দনের রক্তে।......

ব্রজ পাতে বসে গেছে আগে। সে দুপুরের খাওয়াটা বেশি করেই খায়। কারণ রাতের দিকে সেটা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। চন্দন বসলে ইন্দি বলল, আপনার চেহারার সঙ্গে কার মিল আছে বলব বলুন?

পদ্ম হাসতে গিয়ে গেলাসের জল উল্টে পড়ল। আকালী বলল, খদ্দেরের সঙ্গে ওটা কী রে মুখপোড়া! বাবা, শুনছ?

সাধুপদ ধমকাল, এ্যাই ইন্দি!

ইন্দি ভাত গড়িয়ে দিতে দিতে বলল, বাবু রাগ করলেন নাকি?

চন্দন বলল, নাঃ। রাগ কেন করব? কার মিল আছে আমার সঙ্গে?

ব্রজ মুখে ভাত গুঁজে বলল, কোন সিনেমার লোকের নাম করবে নির্ঘাৎ। ইন্দিটা ভীষণ ছবি দ্যাখে। এই ইন্দি, তোর কাছে অনেক ভাড়া পাই, হিসেব করে দেখিস।......

ইন্দি উঠে গেলে পদ্ম বলল, আপনাকে দেখে সবাই রাজেন্দ্রকুমার ভেবে বসবে বাবু। ...আবার হাসির ধুম পড়ে গেল। সাধুপদ যথারীতি গর্জাল, এ্যাই পদ্ম!

চন্দন লেবু চুষতে চুষতে বলল, তোমরা খুব সিনেমা দ্যাখো বুঝি?

যম, যম। বুঝলেন স্যার? ...সাধুপদ বলল। ...পুরুলেতে এ্যাদ্দিনে সিনেমা বসেছে। এবার আমাকে চটিপটি তুলে পথ দেখতে হবে নির্ঘাৎ। কী বলব, বলুন? নামরা আদরের মেয়ে সব। বেশি বকলে ভাববে... ব্রজ, ভাত চাই? ও আকালী, দেখছিস কী!

খাওয়া শেষ হলে চন্দন আঁচানোর নিয়েছে। সাধুপদ ডাকছিল, ইন্দি, ও ইন্দি, স্যারের হাতে জল ঢেলে দে।

ইন্দি দৌড়ে এসে জল ঢালতে থাকল। চন্দন আড়চোখে দ্যাখে, সে মুখ টিপে সমানে হাসছে।...হাসছ যে ইন্দি?

কোন জবাব না দিয়ে হাসতে হাসতে সরে গেল মেয়েটা। সাধুপদর মেয়েগুলো বেশ। আপাতদৃষ্টে অবশ্য খারাপ বলে মনে হয় না অর্থাৎ হোটেলের মেয়েদের সম্পর্কে লোকে যা ভেবে থাকে, হয়তো তেমন নয়।

ব্রজ বলল, চলুন স্যার, পানটান খেয়ে ঘুমোবার জায়গায় যাই।

সে আবার কোথায়?

আছে। ব্রজর কী নেই ভাবছেন?

বাসস্ট্যাণ্ডের ধারে অনেকগুলো চা-পানবিড়ির দোকান। একটা দোকানের সামনে গিয়ে ব্রজ হাঁকল, শ্যামা, কেমন আছিস রে?

ব্রজর বয়সী পানওলা বলল, আবার ভুটেছ পুরুলের ঘাটে! তোমার মরণ নেই দেখছি। ভাবলুম, এবার বেজাটা নিকেশ হল। উরে শালা! ফের কোত্থেকে চাঁদ এসে উদয় হল।

ব্রজ বলল, আমার জানের দোস্ত স্যার। শ্যামা, ইনি আমার নতুন মালিক।

শ্যামা মাথা নুইয়ে বলল, নমস্কার স্যার। আপনি কিনলেন বাহলে? আগের মালিক রাজকমলবাবুর সঙ্গে আমার চেনা ছিল। ...তা বেজা, সেদিন তুই শালা কাটলি, আর আমার ঘাড়ে বাপ, রে বাপ! সে কী ঝামেলা! ছয় পাড় বয়েল সেই সামলাতে পারে না! শেষে আমি ওর বউকে খবর দিলুম। তারপর যদি সীনটা দেখতিস মাইরি!

ব্রজ হাসতে হাসতে ভেঙে পড়েছে। ...খুব ঝাঁটাপেটা করলে বুঝি! ধরিস নি তো?

পাগল! আমি গিয়ে দু ঝাঁটা খাই আর কী! ...স্যার, মিষ্টি না শাদা? জর্দা দোব?

চন্দন তাকিয়েছিল অন্যদিকে। একতলা বাড়ির ছাদে কাপড় মেলছে একটি মেয়ে। তারপর এদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে গেছে স্তব্ধ। নিঃশব্দে হাসছে। সেই মোহিনী সর্বনাশী!

জর্দা দেব স্যার?

চমকে চন্দন বলল, না—ইয়ে মিষ্টি

সেই বাড়িটার নিচে দিয়ে দুজনে এগোচ্ছিল। ব্রজ আগে, পিছনে চন্দন। চারপাশে এতসব লোকজন, ভিড়, হইচই। তার মধ্যে ওপর থেকে একটা ছোট্ট ঢিল এসে টুপ করে পড়েছে চন্দনের মাথায়। ঢিলটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝেড়ে ওপরে তাকাল সে। স্থির দাঁড়িয়ে হাসছে। দুহাতে ভিজে কাপড়। চন্দন দুষ্টুমি করে একটা চোখ টিপলে। মোহিনী জিভ দেখাল ভেংচি কাটার ভঙ্গীতে।... এমনি করে প্রেম? যত সব ছেনালী! সেক্সে পাগল হয়ে আছে! ধুস শালা!

উঁ? কী বলছেন স্যার? ব্রজ ঘুরল।

না তো! ...চন্দন অপ্রস্তুত। সত্যি কিছু বলে ফেলেছিল নাকি? সে বলল, কোথায় যাচ্ছি আমরা? কতদূরে ব্রজদা?

ব্রজ বলল, কাছেই। আমার এক পাতানো মা আছে। তার ছাদের ঘরে আগে থাকতুম এক সময়। চলুন না, সেখানেই শোব। কী খাতির হবে দেখবেন। হোটেলে খেয়েছি বললে রেগে যাবে। কিছু বলবেন না কিন্তু। অমন মা হয় না স্যার।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমীতে **শ্রীসুনীল দাসের** একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। দু-তিনটি বাদে তাঁর বেশীর ভাগ ছবিই আমাদের পরিচিত, ইতোপূর্বে অন্যান্য প্রদর্শনীতে দেখা গেছে। কিন্তু সুনীলের ছবি একাধিকবার দেখলেও পুরোনো হয় না। তাঁর প্রথম দিকের আঁকা ঘোড়ার স্কেচগুলি আবার দেখতে পেয়ে তৃপ্ত পাওয়া গেল। এই ঘোড়া এঁকেই তিনি প্রথম শিল্প জগতে পরিচিত হয়েছিলেন। রেখার বলীয়ান বিন্যাসে তাঁর ঘোড়া আশ্চর্য সৃষ্টি, কোথাও-কোথাও চিত্রকথার প্রাচীন দিকপালদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বিশেষভাবে আমি তাঁর সেই অশ্বগুলির কথা উল্লেখ করতে চাই, যেগুলি রেখা ও কালো রঙে তুলির কাজের সমাহার। একই সঙ্গে রেখার ধ্রুবপদী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অর্ধেক এঁকে বাকীটা দর্শকের কল্পনায় ওপারে ছেড়ে দেয়া রোমান্টিক বর্ণবিলাস তাঁর অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক।

সুনীলের হালের ছবি ক্রমশই মর্মভেদী হয়ে উঠছে। কিছু দিন আগে পর্যন্তও রং ও রেখার মাধ্যমে বিশুদ্ধ রূপ সৃষ্টিই তাঁর অন্বিষ্ট ছিল। কিন্তু ইদানীং মনে হয়, কলাকৈবল্যে শিল্পী আর সন্তুষ্ট নন, তাঁর এখনকার ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় মানুষের দুঃখের জন্য ক্রোধ, অপরিবর্তন-সম্ভব পারিপার্শ্বিকের জন্য ক্ষোভ, যে কামনার শান্তি হয় নি তার জন্য আহত উৎকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠছে। একান্তরে আঁকা তাঁর যে-কটি ছবি দেখলাম, তাতে আগেকার উজ্জ্বল রঙের বদলে বিষণ্ণ কালচে ও কৃষ্ণমুখী লালের প্রবণতা অধিক বলে মনে হলো।

এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন হাওড়ার মুসাফির গোষ্ঠী। এঁরা এর আগে গোপাল সান্যাল ও অন্যান্যদের প্রদর্শনীর আয়োজন করে হাওড়াবাসী শিল্পরসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। এবার এঁরা কলকাতায় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন অধিক দর্শকের আশায়। এঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু কলকাতার বদলে হাওড়াতেই যদি এঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যান সেটা পশ্চিম বাংলার সার্বিক শিল্প-স্বাস্থ্যের পক্ষে, মনে হয় অধিকতর মঙ্গলকর। সমস্ত শিল্প প্রচেষ্টাই অবশ্যম্ভাবীরূপে কলকাতামুখী—যার ফলে জেলাগুলিতে কখনোই কিছু ঘটে না। দূরের সংস্কৃতির যত বিকেন্দ্রীকরণ হয় ততই ভালো।

•

একাডেমী অব ফাইন আর্টসে **শ্রীসুকুমার দাসের** একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল—এটি নানা কারণে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক মার্কিন ভাস্কর্যের অনুকরণে হালে নানা কাজ চোখে পড়ছিল—তার কিছু-কিছু চমকপ্রদ, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগের সঙ্গেই যেন দেশের মাটির যোগাযোগ নেই। যোগাযোগ থাকলেই যে শিল্প হিসেবে সার্থক হবে এমন কথা বলি না, কিন্তু সে-যোগ না থাকলে সার্থক শিল্পসৃষ্টি করা একটু কঠিন। যে-কারণে মাতৃভাষায় ছাড়া কবিতা লেখা সম্ভব নয়, সে-কারণেই সম্ভব নয়, বিদেশী ধ্যানের চিত্ররূপ প্রকাশ।

শ্রীসুকুমার কাঁচের উপর যে নতুন ধরনের ভাস্কর্য তৈরী করেছেন, তার উপাদান এখন পর্যন্ত মার্কিন দেশেই ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু শ্রীদাস তার প্রয়োগ করেছেন আধুনিক ভারতীয় পদ্ধতিতে। একারণে তাঁর কাজ কৌতূহল সৃষ্টি করে, ও আশা জাগায়। এখন তাঁর কাজে যে ডেকরেটিভ প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, অদূরভবিষ্যতে শিল্পী হয়তো তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর মাধ্যমকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

শিল্পী : রামকিংকর

ইউসিস প্রেক্ষাগৃহে শ্রীঅজিত চক্রবর্তীর ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনী চলছে। তাঁর কাজ দেখে বোঝা যায়, স্বয়ংচালিত বা অটোম্যাটিক শিল্পের প্রতি তাঁর আস্থা নেই। প্রতিটি রেখা ও বক্রতা তাঁর ধ্যানের ফল, মনে হয় প্রতিটি আয়তনের পিছনে অনেকবার ভেঙে-ভেঙে গড়ার শ্রম রয়ে গেছে। আবেগের তুলনায় বুদ্ধি, রোমান্টিক আবছায়ার পরিবর্তে ক্লাসিক সংজ্ঞার প্রতি তাঁর আসক্তি অধিক। যশোপ্রার্থী তরুণ ভাস্করগণ তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত হলে উপকৃত হবেন বলে মনে হয়। প্রদর্শনীতে দুটি মুখোশ রয়েছে, বিশুদ্ধ আবেগের চাপে সে দুটি প্রায় ইতিহাসপ্রদোষের কোন আদিবাসী শিল্পীর করা বলে মনে হয়। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন য়ুনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস।

•

মার্চ-এপ্রিল মাসের শিল্প-কলকাতার বৃহত্তম ঘটনা—বিড়লা একাডেমীতে রাম-

কিঙ্করের ছবি, গ্রাফিক ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। ২৫ মার্চ থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত রোজ বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত (সোমবার বাদে এই প্রদর্শনী খোলা থাকবে।) এক যুগ পরে কলকাতার কলারসিকরা আবার এই অলৌকিক উস্তাদের কাজ দেখতে পাবেন।

শিল্পের জন্য আদিম মানুষের আকূতির সঙ্গে আধুনিক মানুষের শিল্প-মাধ্যমকে মিশ্রিত করলে তার ফল কী হতে পারে, রামকিঙ্কর যেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানুষ বাঁকুড়ার—সেখানে এক সুদূর গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৯১০ সালে। সেখানে ছিলেন পোটো—গ্রাম্য যাত্রার সীন আঁকতেন। ১৯২৫ সালে ঘটনাচক্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গিয়ে পড়েছিলেন সেখানে। কি দেখলেন তিনি পনেরো বছরের গ্রাম্য কিশোরের মধ্যে, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনে। সঁপে দিলেন নন্দলাল বসুর হাতে, কলাভবনে। সেখানে রামকিঙ্করের আদিম ক্ষুধার্ত শিল্পচেতনা সন্ধান পেল আধুনিক মানসতার, আধুনিক আঙ্গিকের। পাঁচ বছরের মধ্যে রামকিঙ্কর প্রবাদে রূপান্তরিত—ভোটাধিকারের বয়স হবার আগেই।

বেঁচে থাকার বিশুদ্ধ, জান্তব, নগ্ন আনন্দ : দু পায়ে ভর দিয়ে মাটির উপর দাঁড়িয়ে, ভারসাম্যকে অধিকার করে মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করবার আনন্দ : সামান্যতম ভূমিতে দাঁড়িয়ে জটিল অঙ্গসঞ্চারে লীলাময় রেখাবিন্যাস করে ব্যালেরিনার আনন্দ : এই আনন্দ রামকিঙ্করের। তাঁর রেখাবিন্যাসে, তাঁর শিল্পব্যাকরণের নিয়ম মানায় বা নিয়ম ভাঙায়। অপ্রয়োজনীয়কে নির্দ্বিধায় বর্জন করেন তিনি, করেও একটি দুটি ডেকরেটিভ রেখা কি ভর রেখে দেন কোথাও-কোথাও। ক্যাবারে নর্তকীর গলায় সাতনরীর মতো, যার ফলে তাঁর কাজ এক বিরল অলংকারে ভূষিত হয়ে ওঠে। বস্তুত ভিতর থেকে তার আত্মাকে বাহির করে আনতে যা-কিছু প্রয়োজন তার কিছুই বাকী রাখতে দ্বিধা করেন না।

রামকিঙ্করের জগতে Innut বা রিবিক্তির কোন স্থান নেই, তাঁর শিল্প সর্বদাই বাঁচার আনন্দে স্পন্দমান এবং সে বাঁচা রুবেন্স কিম্বা রেনোয়ার মতো মাংস-সর্বস্ব বাঁচা নয়, বরঞ্চ ভ্যান গগের মতো আত্মিক বাঁচা। এক্সপ্রেশানিস্ট শিল্পীদের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য।

ছোট্ট একটি গান্ধী মূর্তি, আঠারো ইঞ্চির বেশী লম্বা হবে না—ডাণ্ডি অভিযান, ব্রোঞ্জে তৈরী। মহাত্মার এরূপ কল্পনা এক রামকিঙ্করই ভাবতে পারেন। বিমূর্তাভাস পদ্ধতির কাজ—পরিচয়রেখার ডিটেল এড়িয়ে গিয়ে আইন অমান্যকারীর জেদ, প্রতিজ্ঞা, অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ ও অহিংসা ন্যায়ের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়—কি অস্বাভাবিক কাজ এটি, যিনি স্বচক্ষে না দেখেছেন তিনি কল্পনা করতে পারবেন না। এরকম বন্য মহিষের মতো গান্ধীজীর কল্পনা এক পাগল প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব। ক্ষীণ প্রাণসার শরীর রাগে টান টান, পদক্ষেপে লক্ষ্যে পৌঁছবার দৃঢ়তা, লাঠিধরা মুঠোয় আত্মবিশ্বাস ও প্রতীতি—ওইটুকু মূর্তিতে এত ভাব থাকতে পারে ভাবা যায় না। তাঁর বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথও এখানে রয়েছে, তবে এটি সকলের কাছেই পরিচিত বলে এর বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

একটি হাস্যময়ী আদিবাসী যুবতীর আবক্ষ প্রতিকৃতি—পোড়া মাটির তৈরী। সাধারণত আবক্ষ মূর্তিতে হাতের আভাস থাকে না, বা থাকলেও সে হাত পাশে ঝোলান থাকে অর্থহীন। তার কারণ, আবক্ষ মূর্তিতে হাতের শুধুমাত্র বাহুর অর্ধেক পর্যন্ত দেখান যায়—সেটুকুতে কোন ভাব-প্রকাশ করা কঠিন। কিন্তু রামকিঙ্কর এই মূর্তিতে সেই বাহুর অর্ধেকটুকু শুধু গড়েন নি তা নয়, তাকে মূর্তির প্রাণের অঙ্গ করে তুলেছেন। হাত দুটি পাশে ঝোলান নেই নিরর্থক, দুই হাতে শরীরের পিছনে নিয়ে গিয়ে বুক টান করে দাঁড়িয়েছে আদিম রমণী। তার শরীরার্ধের প্রত্যেকটি রেখায়, তার দ্রাবিড় মুখের বিশ্বজয়ী হাসিতে তার উদ্ধত স্তনের চূড়ায়, তার শরীরে আঁট করে জড়ান স্বল্পবাসের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠেছে বেঁচে থাকার আনন্দ, ভোরবেলা প্রত্যহ সূর্যোদয় দেখতে পাবার বিস্ময়। সে বিস্ময় রামকিঙ্করের।

যে পদ্ধতি ভাস্কর্যে, সে-পদ্ধতি চিত্রেও। তাঁর মনোভাব প্রকাশের জন্য তিনি ব্যাকরণ মানতে হয় মানেন, না মানতে হয় মানেন না। তাঁর জলরঙের স্কেচ বা তেল-রঙের কিউবিক, সর্বত্রই এই একই আইন প্রয়োগ করেন তিনি। সর্বশক্তিমান সম্রাটের মত উদ্দেশ্যই তাঁর অভিষ্ট, উপায় নয়। রামকিঙ্করের প্রদর্শনীর যথাযথ প্রতিবেদনের জন্য বিপুলায়তন প্রবন্ধের প্রয়োজন—চিত্রসমালোচনার পাতার সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা কোনমতেই সম্ভব নয়। কলকাতার কলারসিকদের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন কোন কারণেই এই প্রদর্শনীটি দেখতে ভুলে না যান।

বিড়লা আকাডেমিতে সীতেশ রায়ের একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেলো। তিনি মূলত জলরঙে কাজ করেন, কয়েকটি টেম্পেরার কাজও দেখা গেলো। মূলত ভারতীয় প্রথায় ও অলংকারধর্মী রীতিতে কাজ করতে তিনি ভালোবাসেন—বিষয় নির্বাচনেও তিনি ভারতীয়। তথা পুরোপুরি বাঙালী মানসতার কাছাকাছি থাকতে প্রয়াসী। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার ভাবকেও তিনি ছবিতে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টাগুলি, যেন রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়, উপর থেকে বানিয়ে তোলা, ভিতর থেকে হয়ে ওঠা নয়। আধুনিক কালে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে আধুনিক ধ্যানকে প্রসঙ্গ করতেই হবে, নইলে রসাভাস অনিবার্য। যেমন এখন কেউ চেষ্টা করলেও খাঁটি পদাবলি রচনা করতে পারবেন না, তেমনি খাঁটি ভারতীয় অলংকরণ প্রথায় আঁকা বৈষ্ণবও আধুনিক ছবি হিসাবে স্বীকৃতি পাবে না কিছুতেই। বৈষ্ণব কবিতার মতো এ-আঙ্গিকও এখন কালের দ্বারা ক্ষরিত। বিশুদ্ধ লোকশিল্পের মধ্যে (লোকশিল্পই তেমন বিশুদ্ধ বা কোথায় আর) হলেও হতে পারে, আধুনিক মানসের শিল্পীর হাতে আধুনিক মাল-মশলায় এ জিনিস সম্ভব নয়। সীতেশ রায় যদি তাঁর শিল্প প্রতিভাকে আধুনিক মানসের অভিমুখী করার প্রয়াসী হন, তিনি এবং কলারসিকগণ, উভয়পক্ষই লাভবান হবেন।

—চিত্ররসিক

চিত্রশিল্পী : সুনীল দাশ

অবশেষে

মনোবীনা রায়

হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য ইষ্টনাম জপ করছিলেন। সামনেই পালিশ করা কাঠের দরজা। তার ওপর সাদা হরফে লেখা 'ডাইরেকটর' তার নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা 'প্রাইভেট'। ওই দরজাটি হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্যির কাছে প্রায় আলিবাবার গুপ্ত-ধনের গুহার দরজার মত মনে হচ্ছে। চিচিং ফাঁক বললেই খুলে গিয়ে তার মধ্যে চোখ ঝলসানো মণি জহরৎ দেখা যাবে। সারা জীবন ধরে সেই মণি জহরৎ সোনার কৃপায় রাজার হালে থাকবেন। এ ধারটা অন্ধকার। একবার দরজার ঢুকে পড়তে পারলেই আর ভাবনা নেই।

হে ভগবান, হে নারায়ণ, হে গুরু, এই একবারটি। গল্পটি ডাইরেকটর সাহেবকে পছন্দ করিয়ে দাও। আর কিছু চাই না।

খ্যাচ করে দরজাটি খুলে গেল। হরি-প্রসাদ তন্ময় হয়ে প্রার্থনা করছিলেন, আওয়াজটা ধ্যান ভঙ্গ করল। বিরক্ত হয়ে তাকিয়েই দেখলেন এক উর্বশী তরঙ্গ তুলে বেরিয়ে গেলেন। পিছন দিকটা দেখলেন, দেখে সমস্ত মনটা চমকে উঠলো। গরীব ব্রাহ্মণ মানুষ, এসব জগতের সঙ্গে কোন যোগ নেই। এরকম চেহারা—এরকম সাজ—এরকম মনোহারিণী—চিত্ত-চমৎকারিণী—হৃদয় বিদারিণী রূপসম্পন্না মেয়ে আছে—সেটা ধারণার বাইরে ছিল। হাঁ করে চেয়ে রইলেন আর মেয়েটি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওঁ'র দিকে কটাক্ষ হেনে হিল্লোলিত নিতম্ব দুলিয়ে গজগামিনী কথাটি স্মরণ করিয়ে অন্য দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হরিপ্রসাদ হঠাৎ নিজের পোশাক সম্পর্কে সচেতন হলেন। কাল গিন্নী এই একটি জল ধুতি আর এই একমাত্র পাঞ্জাবী সোডা সাবান দিয়ে কেচে দিয়েছেন। সকালে ধোপাকে দিয়ে ইস্তিরি করিয়ে আনিয়েছেন। পোশাকটা খুব গুরুতর ব্যাপার। জীবন-মরণ সমস্যা— আজকের এই ইন্টারভিউর ওপর নির্ভর করছে। গল্পটি যদিই পছন্দ হয়ে যায় —নিশ্চয়ই পড়ে ভালই লেগেছে ডাইরেক্টরের। না হলে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? যদি বলেন পছন্দ হয়েছে—কত টাকা চাই!

হিসেব করলেন হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য বাড়ী ভাড়া ছ-মাসের বাকি। মুদি দু মাস টাকা পায় নি। এবার শাসিয়েছে—টাকা না দিলে তেল চাল সব বন্ধ। তারপর—হ্যাঁ সবচেয়ে বড় কথা—ওই যে নতুন পাত্রপক্ষরা বড় মেয়ে সান্ত্বনাকে মোটামুটি পছন্দ করেছে, তারা আগাম দু-হাজার চায়। তাহলে পাকা কথা দেবে। বিয়েটা না হয় মাস কয়েক পরে দেওয়া যায়। যোগাড়যন্ত্র করতে হবে তো। কিন্তু এই দু হাজার টাকা অবিলম্বে দরকার। না হলে পার্টিও হাতছাড়া। তিনশ টাকা মাইনের কাজ করে আর কেদা

আর হরিপ্রসাদ আশাই বা করবেন কি করে। নিজে এতকাল কেরানীগিরি করে কতকষ্টে দুটি মেয়ে আর একটি ছেলেকে মানুষ করেছেন। সংসার চালানোই দুর্ঘট হয়ে উঠেছে। আগে যাও বা চলছিল, এখন ত একেবারে অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর রোজগারে কেউ নেই, ছেলেটা ছোট, এখনো ইস্কুলে পড়ছে।

গল্প লেখাটা হরিপ্রসাদের অল্প দিনের সখ। কেন যে এ সখ হয়েছিল বলা মুস্কিল, হঠাৎ দু-তিনটে লিখে ফেলেছিলেন ঝোঁকের মাথায়। তারই মধ্যে একটা ছাপা হয়েছিল। তার জন্যে মাসিকপত্র থেকে কুড়ি টাকা দিয়েছিল। এই কুড়ি টাকাই হরিপ্রসাদকে নেশা ধরিয়ে দিল। লিখতে লাগলেন সমানে। একটা গল্প সংকলন ছাপাও হল। কিন্তু প্রকাশকটা চোর। টাকা দেয় না। একটা উপন্যাস লিখলেন, সেটা ছাপা হল। অথচ টাকা চাইতে গেলে বলে—আরে মশায় এসব বই লোকে পড়েই না। আমাদের প্রিন্টিং কস্টই ওঠে নি। জুতোর সুকতলা ক্ষইয়েও আজ পর্যন্ত একশ টাকার বেশী আদায় হয়নি।

হঠাৎ লটারির টিকিট জেতার মত ব্যাপার। সুভাষ ফিল্মস থেকে এক চিঠি এসে হাজির। অমুক দিন অমুক সময়ে পিণাকী বসু ফিল্ম ডাইরেক্টর ডেকেছেন। গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করতে চান। এ একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত ঘটনা। দু-চার জনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছেন হরিপ্রসাদ যে এ একবার সোনার খনি পাওয়ার মত ঘটনা। যদি পছন্দ হয়ে যায় সিনেমার গল্পের জন্য হাজার হাজার টাকা পাওয়া যায়। বাংলা ছবি, হিন্দী ছবি, তামিল ছবি—সকলের জন্যে গল্প চাই, গল্প খোঁজা চলছে। গল্প পাচ্ছে না। সুতরাং একটি গল্প বিক্রী করতে পারলেই কেল্লা ফতে! অন্ততঃ সিনেমার খাতায় নামটা ত লেখা হবে। লোকে জানবে হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য নামে একজন লেখক আছেন। তার গল্প ছবি হচ্ছে!

রোমাঞ্চিত কলেবরে—কম্পিত বক্ষে হরিপ্রসাদ সামনের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন।

নটায় ডেকেছিল, দশটায় উর্বশী বেরোলেন। এখন সাড়ে দশটা বাজে। ওঁর ডাক কখন আসবে?

আবার দরজাটা খুলে গেল। এবার বেশ সমৃদ্ধ চেহারার বিশাল বপু এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বেরোতে বেরোতেই ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের ভিতর উদ্দেশ্য করে বললেন—'মনে রাখবেন পিণাকীবাবু, জনসাধারণের জন্যে ছবি—বুঝলেন না—' তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এবার ডাক পড়ল হরিপ্রসাদের। পা দুটো কাঁপল। কপালে ঘাম বেরোল। হাত দুটি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল। যেন পরীক্ষার হলে ঢুকছেন।

ঢুকে দেখলেন এক মস্ত পালিশ করা টেবিলের ওপারে অল্পবয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন। ভুরু দুটো কোঁচকানো, চোখে চশমা। তার ভেতর দিয়ে হরিপ্রসাদকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন। হরিপ্রসাদ ছাতাটিকে অবলম্বন করে পায়ের কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করছেন তখন।

পিণাকী বসু বোধহয় হরিপ্রসাদের অবস্থা বুঝেই গলার স্বরটা একটু মোলায়েম করলেন। বললেন, বসুন।

হরিপ্রসাদ প্রায় ধপ্ করে বসেই কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালটা মুছে ফেললেন। রুমাল ছিল একটা, সেটা নিতে মনে ছিল না।

পিনাকী ভাবছেন। অনেকক্ষণ ধরে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। হরিপ্রসাদ সেই নিবিষ্ট স্থির মূর্তির সামনে অনড় অচল হয়ে ইষ্টনাম জপ করে চলেছেন।

গম্ভীর গলায় পিনাকী বসু বললেন, 'আপনিই...বইটি লিখেছেন?'

অবান্তর প্রশ্ন। বোধ হয় জড়তা ভাঙ্গার উদ্দেশ্যেই বলা। হরিপ্রসাদ বললেন, কৈফিয়ৎ দেবার সুরে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—মানে আমার লেখার—'

পিনাকী কথার মাঝখানেই বললেন—'পছন্দ হয়েছে আমার গল্পটি।'

'এ্যাঁ?' কথাটা এমনই চমকপ্রদ যে বার-বার শুনতে ইচ্ছে করছে হরিপ্রসাদের। তিনি আগ্রহাতিশয্যে সামনে ঝুঁকে পড়ে গদগদ গলায় বললেন, 'পছন্দ হয়েছে?—ওঃ পছন্দ হয়েছে আপনাদের?—ওঃ তা—'

ঠোঁটের কোণে একটু সূক্ষ্ম হাসির রেখা উঠেই মিলিয়ে গেল পিনাকীর। গলার স্বরটা নরম করে বললেন, 'হ্যাঁ বললাম ত' পছন্দ হয়েছে, তবে—'

তবে আবার কী? বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল হরিপ্রসাদের, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে অপেক্ষা করে রইলেন 'তবে'র পরটা শোনার জন্যে।

'দেখুন, পিনাকী বসু একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, দেখুন আসল ব্যাপার হল আমি ডাইরেকটার। আমার পছন্দ না হলে সে গল্প আমি ছবিই করবো না। এই গল্পটি আমার পড়ে ভালো লাগতেই ত' আপনাকে ডেকেছি কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমার প্রোডিউসার আর হিরোইন একটু আপত্তি করছেন।'

'কেন? আপত্তি করছেন কেন?' গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছে হরিপ্রসাদের। কূলে এসে কি তরী ডুববে?

'আসল ব্যাপার জানেন ত। এই প্রোডিউসারই ছবি করাচ্ছেন আমাকে দিয়ে। হিরোইন তাঁর ঠিক করাই আছে। হিরোও ঠিক আছে। গল্প আমি বাছবো এই রকম কথা ছিল। সবই ঠিক আছে। শুধু শেষটা আপনাকে একটু বদলাতে হবে। যদি রাজী থাকেন বলুন, তাহলে এখনি কিছু অগ্রিম দিয়ে বইটা বুক করে নেবো।'

নিঃশ্বাস ফেললেন হরিপ্রসাদ। গল্প একটু বদলানো আর এমন বেশী কথা কি?

'কী বদলাতে হবে?'

পিনাকী বললেন, 'আপনি তো মশাই হিরোকে জনসেবার জন্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। আদর্শবাদী ছেলে সে সব ত্যাগ করে, টাকা-পয়সা, বড় পোস্ট—সবের মোহ উপেক্ষা করে, দেশের দুঃখী লোকের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে ওর প্রেমিকা—যে মেয়েটী ওকে আত্মসমর্পণ করেছে—সে রইলো এখানে বাড়ীতে পড়ে। আপনি তো এক লাইনে লিখে দিলেন—অনুপমা চাতকনীর মত পথ চাহিয়া দিন গুণিতে লাগিল। তাহার কৃশ ম্লান মুখের পানে চাহিয়া অনুপমার মাতাপিতা।... যাকগে আপনি তো জানেনই কি লিখেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, গল্পে এক লাইন লিখে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সিনেমায় তো তা হবে না। এখন এই সময়টা — মানে হিরোকে দেখাচ্ছি সে কি নিষ্ঠা, কি ভালোবাসার সঙ্গে মানুষের সেবা করছে। এদিকে হিরোইন তো ঘরে বসে দিন গুণছে। সেটা কি করে দেখাবো?'

বিস্মিত হরিপ্রসাদ বললেন, 'অনুপমা তবে কি করবে? স্বামী—মানে স্বামী তো হবেই—সে যখন বিদেশে যায়—কাজে যায় তখন ঘরের মেয়েরা তো ঘরেই থাকে?'

'আঃ, আপনি বুঝছেন না। এটা তো ঘরের মেয়ের জীবন দেখাচ্ছি না। আমার হিরোইন—দেখেন নি? একটু আগে বেরিয়ে গেলেন?—হ্যাঁ আমার হিরোইন উর্বশী দেবী,—ওকি চমকে উঠলেন যে? উর্বশী দেবী বলছেন তাঁর এ গল্পে পার্টই নেই। হিরোই প্রধান। অথচ এই উর্বশী প্রোডিউসারের ইয়ে—মানে উর্বশীকে না নিলে ছবিই হবে না। তাছাড়া ওর এখন এত নাম যে ওর নামেই ছবি বিক্রী হয়। এদিকে হিরো হিরোইনের জুড়ী এখন সবচেয়ে পপুলার এরাই, হিরো আনন্দকুমার, আর হিরোয়িন, উর্বশী। ব্যস, এই নামে হলেই লোকে ছবি দেখবে। এখন হিরোইনকে তো চটানো যাবে না। কাজেই ওরও পার্টটা বাড়াতে হবে। বলুন রাজী আছেন? একটু বদলাতে হবে আর কি?'

'কী বদলাতে হবে?'

'ধরুন অনুপমা কিশোরের বিরহ সহ্য করতে না পেরে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। গিয়ে...'

আঁতকে ওঠেন হরিপ্রসাদ, 'ভদ্রলোকের মেয়ে ওভাবে পালিয়ে যাবে কি? ছিঃ—'

ধমকে ওঠেন পিনাকী, 'রাখুন আপনার রক্ষণশীল নীতিজ্ঞান। পালিয়ে না গেলে কিশোরের কাছে যাবে কি করে? মা বাবা পাঠিয়ে দেবে? তাছাড়া ওরা একসঙ্গে

থাকবে তবে তো ওদের গানটানগুলো দেওয়া যাবে? আমাদের আগেই দু-তিনটে ডুয়েট গান রেকর্ড করা আছে। সেগুলো এতে দেব। যুৎসইভাবে গানগুলো দিলে হৈ-হৈ পড়ে যাবে।

'ধরুন ট্রেনে কিশোর উঠছে, হঠাৎ দেখে অনুপমাও সেই ট্রেনে উঠে পড়েছে। ট্রেনের শট্ নেবো। ট্রেনর ঝক্ঝক্ ঝক্— তার সঙ্গে গান! এই ট্রেনের সীনটা...'

হরিপ্রসাদ ভাবতে লাগলেন। মনে সায় দিচ্ছে না, কিন্তু কি করা? এতবড় সুযোগটা যদি এই সামান্য কারণে হাতছাড়া হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত হরিপ্রসাদ রাজী হলেন। রাজী তো হতে হবে। ওদিকে সমূহ সাংসারিক সমস্যা, এদিকে ঘরের মেয়ের সিনেমায় পালানো, কোনটা বেশী বিবেচনার যোগ্য!

দাম কষাকষি করে পাঁচ হাজারে রফা হল। হরিপ্রসাদ দুশো টাকা আগাম হাতে নিয়ে আর একটি দু হাজার টাকার চেক নিয়ে প্রায় উড়ে বাড়ী চললেন। পৃথিবীটা বদলে গেছে ও'র চোখে, সব সুন্দর, সব রঙীন লাগছে।

বাজার থেকে বড় রুইমাছ ফুলকপি আলু, দই, রসোগোল্লা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। ফিরেই হাঁক দিলেন, 'ওগো,—কোথায় সব? শোনো শোনো এদিকে।'

হরিপ্রসাদের স্ত্রী নারায়ণী তখন রান্না-ঘরে কুচো চিংড়ী আর বেগুন দিয়ে ঝোল রাঁধছিলেন। বড় মাছ কেনা অসাধ্য। আলু খাওয়াও অসাধ্য। তবু একটু মাছের গন্ধ চাই। এক কড়া ঝোলে দু-তিনটি বেগুন আর একটু কুচো মাছ দিয়ে ঝোল রাঁধেন। দু-বেলা প্রায় একই পদ। শাক্ বেগুন ডাল আর সস্তা আধপো মাছ।

হরিপ্রসাদ কাজ থেকে একেবারে আধ-মরা হয়ে বাসে ঝুলতে ঝুলতে থলি করে সস্তা কিছু বাজার করে আনেন। হাঁকডাক তো কখনো শোনা যায় না।

হরিপ্রসাদ নিজেই ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন, '—এই যে—দেখ কি এনেছি! ভালো করে ফুলকপি আর আলু দিয়ে মাছ রাঁধো তো। আর এই যে রসোগোল্লা এনেছি, ও: সিঙ্গাড়াও আছে। কই সান্ত্বনা এরা গেল কোথায়? ডাকো সবাইকে, একটু চা করো তো ভালো করে—'

নারায়ণী চেয়েই আছেন। মুখে কথা নেই। এমন আশ্চর্য ঘটনা ও'র জীবনে ঘটে নি। হোল কি আজ?

মেয়েরা এলো, ছেলে শম্ভু এলো লাফাতে লাফাতে। সবাই এক আরব্যো-পন্যাসের মত কাহিনী শুনলো। হরিপ্রসাদ গল্প বিক্রী করেছেন তার টাকায় এই রাজভোগ।

রাত্রে বহু দিন পর নারায়ণী স্বামীর পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে, অনেক [illegible] বললেন,

'হ্যাঁগো। কোন্ গল্প বিক্রী করলে? তোমার গল্প সিনেমা হবে? কালকেই একবার কালী-বাড়ীতে পুজো দিয়ে আসবো আর পাশের ওই দত্তগিন্নীকে একটু শুনিয়ে আসবো। একেবারে গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। আমরা রোজ কুচো মাছ খাই—ওরা রুই ইলিশ ছাড়া খান না! ছেলেরা সব শম্ভুকে শোনায়—'

গলাটা ধরে এলো নারায়ণীর। অনেক লাঞ্ছনা গরীব হওয়ার। এবার অন্ততঃ কিছুটা মান বাড়বে পাড়া-পড়শীদের কাছে। মেয়েটার বিয়ে পাকা হবে।

'কালই যাও ওই দু' হাজার টাকা নিয়ে। আবার দেরী হলে এ পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে', তাগাদা দিলেন নারায়ণী।

হরিপ্রসাদ ঘুমজড়ানো চোখে বললেন, 'এখন আর হাতছাড়া হবে না, দেখো। নিজে-রাই সেধে আসবে। আর আমার সান্ত্বনা জলপানী নিয়ে পড়ছে—অমন ভালো ছাত্রী। আর দেখতে আমার মা অনেক বড়ঘরের মেয়ের চেয়ে ভালো। ওই তিনশ টাকার কেরানীর জন্যে এখন টাকা ঘুষ দিয়ে কাজ নেই। তারচেয়ে অন্য খরচগুলো আগে সামলাই। বাড়ীভাড়া—মুদী...আর ক'দিন একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া করো—সেটা বেশী দরকার। ছেলেমেয়েদের একটু স্বাস্থ্য ভালো হোক।'

কথাটার যুক্তি নারায়ণীর মনে লাগলো। কিন্তু পরের দিন যখন হরিপ্রসাদ গিন্নীকে সব বৃত্তান্ত বললেন, কি আপোষে গল্প বিক্রী হয়েছে—তখন এক উল্টো ফল হল। নারায়ণী চটে গেলেন। বললেন, 'আমাদের বাপ-পিতামহর আমল থেকে আমরা আমা-দের প্রাচীন সংস্কার রক্ষা করে চলেছি। তুমি কোন্ আক্কেলে মেয়েটাকে বাড়ী থেকে পালানোর ব্যবস্থা করছো? জানো ওইসব দেখে ছেলেমেয়েরা কুশিক্ষা পাবে? দেখবে যে সব বাড়ীর ভদ্র ছেলেমেয়েরা পালিয়ে যাচ্ছে—আর মা-বাবার মুখে চুণকালি পড়ছে? আর যে যাই লিখুক তুমি এরকম অন্যায় কথা লিখবে না।'

হরিপ্রসাদও চটে গেলেন, 'বেশ, বলে আসছি ঐ ডাইরেকটরকে। আমার গিন্নী বারণ করছেন মশাই! আর টাকাটাও ফেরৎ দিতে হবে। তখন আমার কাছে নাকে কান্না কেঁদো না এসে—আজ চাল নেই—কাল শম্ভুর বই কিনতে হবে—পরশু জুতো কিনতে হবে—বাড়ীওলা শাসিয়ে গেছে—সান্ত্বনার কলেজ যাওয়ার ভালো শাড়ী নেই —বায়নার তো অন্ত নেই! এদিকে একটা মানুষ আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আধ-মরা হচ্ছি চারটে প্রাণীকে খাওয়াতে। গল্প লিখে, ছাপিয়ে, ব্যাটা প্রকাশকদের কাছে ভিখিরীর মত হাত পেতেও কি পেয়েছি এতোদিন? সবাই মিথ্যে কথা বলে ঠকিয়ে যাচ্ছে। আপনার বই লোকে পড়ে না। হ্যাঁঃ— পড়ে না। না পড়লে ডাইরেকটর মশাই পড়লেন কি করে?'

নারায়ণী থিতিয়ে গেলেন। কথাগুলো সত্যি। ভয়ানক [illegible] সত্য। অভাবের তাড়নায় ভাজা ভাজা হয়েছেন এতদিন— একটু সুখের মুখ দেখার যদি দিন এসেই থাকে তাকে সামান্য নীতির দোহাই দিয়ে পায়ে ঠেলা কি উচিৎ?

কথাটা রাষ্ট্র হল পাড়ায়। হরিপ্রসাদ কেরানী আবার ওদিকে ভট্চাজ বামুনও বটে (একটু সত্যনারায়ণ, লক্ষ্মীপুজো, বারের পুজো—এদিক ওদিক করতেই হয়— না হলে দুশো টাকা মাইনেয় না খেয়ে মরতে হতো) সিনেমার গল্প লেখক হয়েছেন, তাঁর বইয়ের ছবি তৈরী হচ্ছে। মান বেড়ে গেল পাড়ায়। পাশের দত্তগিন্নী সেধে এসে খুঁটিয়ে খবর নিয়ে গেলেন। নারায়ণীর অনেক দিনের জ্বালা জুড়োল।

এদিকে হরিপ্রসাদকে প্রায়ই যেতে হয় ডাইরেকটরের কাছে। গল্প অদলবদল চলছে। নামকরা বাঘা লেখক নয়, নেহাৎ চুনোপুঁটি —তাই মানের জোর নেই। হুকুম মত বদলাতে হচ্ছে। কাঠামোর ছাঁদ মা দুর্গার হলেও শুঁড় বসিয়ে তিনি গণেশ হয়ে গেলেন। কিন্তু উপায় কি? পিনাকী বললেন—

'দিনকাল সব বদলে গেছে মশাই, রুচিও বদলাচ্ছে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে তো! ওই যে অনুপমার বিয়ে কিশোরের সঙ্গে ঠিক হয়েই আছে— ওটা বদলে দিতে হবে। আমার প্রোডিউসার বল-ছেন যে-সব হিন্দী ছবি এখন তৈরী হচ্ছে আর টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে যে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে একটু নাচগান আর প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয় ইত্যাদি ভালো রকম দেখাতে হবে। একটু যাকে বলে রোমাঞ্চ হবে হবে।'

হরিপ্রসাদ হাঁ করে রইলেন। কথাটার মানে ঠিক বুঝলেন না।

পিনাকী বোঝালেন : 'ওই অনুপমার বিয়ে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে মা-বাপ ঠিক করে রেখেছে। এদিকে সে কিশোরকে ভালোবাসে। বিয়ের আগের দিন কিশোর— মনের দুঃখে চলে যাচ্ছে...বন্যায় বিধ্বস্ত গ্রামে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে—'

'কিন্তু বন্যা তো নয়—দুর্ভিক্ষ লিখে-ছিলাম যে—' ক্ষীণ স্বরে হরিপ্রসাদ প্রতিবাদ জানান।

'আহা, ওই হল। যাই লিখুন ছবিতে সেটা আরও ভয়াবহ করতে হবে কলেরার মত ভয়ংকর রোগের সেবায় আত্মনিয়োগ করলে কিশোরের প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। বুঝলেন না? ড্রামাটাকে খুব জোরালো করা দরকার।'

'ও?' হরিপ্রসাদ স্তিমিত হয়ে গেলেন।

'আর' বলে চলেন পিনাকী, 'ছোট্ট একটা বিদায়লিপি কিশোর লিখে যায়। সেই কাগজটুকু পেয়ে অনুপমা পাগলের মত ছুটে ট্রেনে কিশোরের সঙ্গে দেখা করে—

'কিন্তু তাহলে তো গল্প ওখানেই শেষ হয়ে যাবে।' আবার প্রতিবাদ জানান হরিপ্রসাদ।

সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে—পিনাকী এ প্রতিবাদও ঝেড়ে ফেলে দেন। 'আমার সঙ্গে হিরোইন আর প্রোডিউসারের আলোচনা হয়েছে। আর হিরোও নিজের নিজের মতামত দিয়েছেন। ড্রামা তো এর পরে আরম্ভ। কিশোর অনুপমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে—একটা স্টেশনে কিশোর খাবার কিনতে নেবেছে। ফিরে এসে দেখে অনুপমা নেই।'

'নেই? কোথায় গেল?' হরিপ্রসাদ রীতিমত শঙ্কা প্রকাশ করেন।

'সেই তো বলছি—ওর যার সঙ্গে বিয়ের ঠিক ছিল সেই হল গিয়ে গল্পের ভিলেন: বুঝলেন না?'

'আজ্ঞে না, কথাটা আগে শুনিনি।' নিজের অজ্ঞতায় হরিপ্রসাদ নিজেই লজ্জা পেলেন।

'ওঃ—আপনি তো আবার হিন্দী ছবি দেখেন না।'

'কোন ছবিই দেখি না—ছবি দেখার পয়সা কোথায়?'

গল্পটা শেষ করলেন পিনাকী। ভিলেন চর পাঠিয়ে অনুপমাকে কিডন্যাপ করেছে। শেষ পর্যন্ত কিশোর তাকে উদ্ধার করে—অনেক ফাইটিং-এর পর...

'কিন্তু ওর আর্তসেবা? মানে যে জন্যে লেখা—'

'হবে হবে, সব হবে। সে সব তো আছেই। কিন্তু শুধু রোগীর সেবা দেখিয়ে কি ছবি হয়। এসবও একটু দিতে হবে, না হলে ইনটারেস্ট বজায় থাকবে কি করে?'

হাল ছেড়ে দিলেন হরিপ্রসাদ। যা বলে লিখে দেবেন। তর্ক করে লাভ কি? আর নারায়ণীকেও আর ঘুণাক্ষরে জানতে দেওয়া নয়, তাহলে ওদিকে গৃহবিবাদ ভয়ংকর রূপ নেবে। যা শুচিবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোক তিনি।

পিনাকী একদিন একটু ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করলেন। এতদিন একসঙ্গে ওঠাবসায় দুজনে অন্তরঙ্গতা জন্মেছে। পিনাকীর অবস্থাও খুব লোভনীয় নয়। এটি ও'র দ্বিতীয় ছবি। প্রথম ছবি এই প্রোডিউসার ভদ্রলোকই করিয়েছেন। কিছুই করছিলেন না পিনাকী — এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিলেন। সিনেমা লাইনে আগে এডিটার ছিলেন। তারপর অবস্থা শোচনীয়—কাজ নেই। সেই সময়ে এই প্রোডিউসার ও'কে চান্স দেন। ছবিটা বাজারে চলেনি। একটা ছবিতেই ও'র ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যেত আবারও প্রোডিউসারমশাই ও'কে দ্বিতীয় ছবির চান্স না দিতেন। এবার ছবিটা চালাতে হবে। একেবারে আটঘাট বেঁধে—যা-যা করলে সাধারণ লোকের ভালো লাগে এই-রকম ছবি করতে হবে। এটা যদি না চলে তাহলে—পিনাকী সেই অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন।

আরও ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। হরিপ্রসাদ জানতে পারলেন কিশোরের মত পিনাকীরও একটি ছেলে আছে, সেইজন্যেই এই বইটি তাঁর মন আকর্ষণ করে।

'বুঝলেন হরিপ্রসাদবাবু ছেলেটা দারুণ মেধাবী। পড়াশোনায় একদিনও পিছনে থাকেনি। কিন্তু বেশী বুদ্ধি হলে যা হয়। একেবারে সব কিছুকে নস্যাৎ করে দেয়। চাকরি করবে না—দাসত্ব তার পছন্দ নয়। কিছুই স্থির হয়ে করছে না। নানা আদর্শ নিয়ে ভুগছে। লেখে-টেখেও। সে সব ভয়ঙ্কর কঠিন লেখা। কিছু বুঝি না অথচ ওকে নিয়ে অনেক আশা ছিল।' একটু গলাটা নামিয়ে হরিপ্রসাদকে মনের ক্ষোভ জানালেন, 'এই আমার প্রোডিউসারের একটি মেয়ে আছে। বাপের মতই মোটা। তবে টাকার গদীর ওপর বসে আছে, লেখাপড়াও বিশেষ করেনি। আমার ছেলেটার ওপর ও'র নজর। আসলে ছেলেটার কারণেই আমাকে এই চান্সটা দিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু দেখুন, আমার ছেলেটা একথা বলে কার সাধ্য। ওর মা বলছিলেন—'মোটাকে রোগা করা কিছু কঠিন নয়। তাছাড়া ওকে বিয়ে করলে তোকে আর সারাজন্ম কাজ করতে হবে না।' শুনে ছেলে একেবারে এমন ক্ষেপে গেল যে তিনদিন বাড়ীতেই ঢোকেনি। অথচ এখনও বোধহয় প্রোডিউসারমশাই আশা করেই আছেন।

হরিপ্রসাদের মন সহানুভূতিতে ভরে গেল। দেখলেন এ'র জীবনেও সমস্যার অন্ত নেই। এই ছবির ওপর পিনাকীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

ছবি শেষ হল। ছবি রিলিজ হল। এবং সবচেয়ে যা আনন্দের কথা—ছবি হিট হল। টিকিটের দরজায় মারামারি করে লোকে টিকিট কিনলো—তিনগুণ দাম দিয়ে।

প্রোডিউসার হরিপ্রসাদকে অভিনন্দন জানিয়ে আর একটা গল্পের ফরমাইস দিলেন। সঙ্গে এবার পাঁচ হাজার টাকার চেক। এ ছবিটা হিন্দীতে করবেন সুতরাং টাকাও বেশী। দশ হাজার টাকা গল্পের জন্যে দেবেন। এবং এবার নতুন ধরণের গল্প লিখতে হবে।

নারায়ণী ছবিটা দেখতে চেয়েছিলেন। অনেক কায়দা করে হরিপ্রসাদ দেখতে দেননি। আর নারায়ণী একা কখনো কোথাও যান না, তাই তাঁর আর দেখাও হয়নি। মেয়েদের অবশ্য হরিপ্রসাদ টিকিট দিয়ে বলেছিলেন দেখে আসতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে।

পাঁচ হাজার টাকার চেক নিয়ে, পাঁচশ টাকা নগদ নিয়ে ট্যাক্সি করে হরিপ্রসাদ বাড়ী ফিরলেন। মিষ্টি দই মাছ নিয়ে এসেছেন। প্রথম দিনের মত হাঁকাহাঁকি করলেন। নারায়ণী এলেন, খানিক পরে শম্ভুও এলো খেলার মাঠ থেকে। দ্বিতীয় মেয়ে শিপ্রাও এলো। হরিপ্রসাদ বললেন—'সান্ত্বনা কোথায়? তাকে দেখছি না যে?' নারায়ণী বললেন—'ওর কলেজের বন্ধুর বাড়ী গেছে—এই এলো বলে।'

কিন্তু অন্ধকার হয়ে রাত হল, সান্ত্বনার দেখা নেই। আরও রাত বাড়ল—তখনো দেখা নেই। হরিপ্রসাদ এবার অস্থির হয়ে মেয়েকে খুঁজতে বেরোলেন। যে বন্ধুর বাড়ী গেছে বলে শুনেছিলেন, সেখানে গিয়ে শুনলেন যে যায়নি। তবে—? স্বামী-স্ত্রী দুশ্চিন্তায় যখন পাগলের মত হয়ে উঠেছেন তখন শিপ্রা ছোট একটা কাগজ এনে মুখটা শুকনো করে দাঁড়ালো—'এটা দিদির পড়ার টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া ছিল।'

'কি—কি ওটা?' চিৎকার করে উঠলেন নারায়ণী আর হরিপ্রসাদ।

শিপ্রা শুধু কাগজটা ওদের হাতে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। কাগজটি ছোট একটি চিঠি।

সান্ত্বনা লিখেছে—

বাবা, তোমাকে খুব সেকেলে রক্ষণশীল ভাবতাম। তোমার লেখা বইয়ের ছবি দেখে আমার ভুল ভাঙ্গল। তবু সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারলাম না। আমি অনিরুদ্ধকে ভালবাসি সেও আমাকে ভালবাসে। আমাদের আদর্শগত মিল আছে। আমি তাকে বিয়ে করেছি। তুমি আর মা আমাদের আশীর্বাদ করো। ইতি—

নারায়ণী ধপাস করে বসে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আর হরিপ্রসাদ তাঁর এখনকার একমাত্র সুহৃদ পিনাকীর কাছে উর্ধ্বশ্বাসে উপস্থিত হলেন। ওর কাছেই সুখ-দুঃখের কথা বলা চলে।

গিয়ে দেখেন বাড়ী একেবারে নিঝুম। চাকর দরজা খুলে দিতেই সামনেই দেখলেন পিনাকী দুই হাতে মাথা চেপে বসে আছেন। আর পাশের ঘর থেকে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার আওয়াজ আসছে। বিমূঢ়ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে হরিপ্রসাদ ফিরেই আসছিলেন—পিনাকী ডাকতে ফিরলেন। খানিকক্ষণ চুপ। একটু পরে পিনাকী একটি খাম দিলেন হরিপ্রসাদের হাতে—'পড়ে দেখুন।'

হরিপ্রসাদ পড়লেন—

বাবা, আমার জীবনের আদর্শকে শ্রদ্ধা করে এমন একটি মেয়েকে আমি কিছুদিন ধরে জেনেছি। তাকে ছাড়া আর কাউকে আমার বিয়ে করা সম্ভব নয়। কিন্তু তোমরা রাজী হবে না তাই তোমাদের মত না নিয়েই বিয়ে করছি, আজ রাত্রেই রেজেস্ট্রী হবে। মেয়েটির নাম সান্ত্বনা। যদি পার ক্ষমা করো, সান্ত্বনা তোমাদের সান্ত্বনারই কারণ হবে।

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

একাত্তর

জৈষ্ঠের সাত, আষাঢ়ের সাত, তবে জানাবে মৃগের বার্তা। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ, আষাঢ়ের প্রথম। মৃগের বার্তার উত্তর পর। আকাশের বুকে কাজল-কালো নতুন মেঘ। কখনো ঝিমঝিম, কখনো ঝমঝম, ঠান্ডা ভিজে বাদলা হাওয়া, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, গাছে গাছে আনন্দে শিউরে ওঠা কদম কেয়ার গায়ে কাঁটা। গ্রীষ্মের খর রোদে পোড়া তপ্ত পৃথিবীর বুকে জুড়িয়ে গেছে।

আষাঢ়ের প্রথম দিকে এমনি এক মেঘ-মেদুর বাদলা দিনে আশ্রমে ফিরলেন স্বামীজি। কদিন ছিল যেন গ্রীষ্মের ছুটি —যা খুশি করা, যখন খুশি যেমন খুশি নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া। কারুর কিছু বলবার ছিল না—নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। এখন আরম্ভ হল রুটিনমাফিক—যে সময়ের যে কাজ।

সন্ধ্যাবেলা স্বামীজির কাছে বসতেই আরম্ভ হল কলকাতার গল্প। বিশেষ করে বরানগরের বসাকবাবুদের সংসারের কথা। —কলকাতার গাড়ী-ঘোড়ার ঘড় ঘড়, লোকজনের হৈ-হুল্লোড় কল-কোলাহল চেঁচামেচি থেকে দূরে—শান্ত পরিবেশ। আর মানুষ—যেমন উদার তেমনি মহৎ—মহদাশয় যাকে বলে। গিন্নি মায়েরাই বা কেমন—শুধু নিজের ছেলে মেয়েদেরই নয়, দেশশুদ্ধ সব ছেলেমেয়েদেরই মা। বিশ্ব-মাতৃকা প্রতিমা। দেখা যায় না এমনটি। এত বড় লোকের মেয়ে, এত বড়লোকের বউ,—গর্ব অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। গাছের গুণে—ফল। ছেলে-মেয়েগুলিই বা কেমন। যেমন বাধ্য তেমনি কাজের। মুখের কথা খসতে না খসতেই হাতের কাছে জিনিস এসে হাজির। সুখ শান্তিতে ভরা আদর্শ সংসার।

শুনতে শুনতে মনের মধ্যে ফুটে ওঠে শৈশবে হারানো মায়ের কথা। মাও ছিলেন ঠিক তাই।

আর বিশেষ কোন কথা হল না। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়লেন স্বামিজী।

পরদিন। সকালে রোগী বিশেষ কেউ না থাকলেও চাষী কৃষাণদের মরশুম। একে একে দুইয়ে দুইয়ে জন দশ-বারো কৃষাণ এসে চাষের খবর দিয়ে গেল। মাটি কেটে উঁচু জমি নিচু করতে হবে বলে চারটি মুনিশের (মজুরের) মজুরী নিয়ে গেল একজন।

লোকজনের আসা যাওয়া শেষ। বারান্দায় স্বামিজী একা।

স্বামিজীর ডাকে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন—বস কথা আছে।

বসলুম। স্বামিজী বললেন—ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াতে পার?

—কোন্ ক্লাশের ছেলে-মেয়ে বাবা?

—কোন্ ক্লাশ অবধি পড়াতে পার তুমি?

—বেশ ভালভাবেই পড়াতে পারি থার্ড ক্লাশ পর্যন্ত। সেকেন্ড ক্লাশের ছেলেমেয়ে-দেরও পড়াতে পারি। তবে ফার্স্ট ক্লাশের নয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাবে তারা। অনেক কিছু নোট নিতে হয়। সেগুলো ঠিক ঠিক পেরে উঠব না। তাই সাহস হয় না।

—আচ্ছা, আচ্ছা। ঐ যথেষ্ট। ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাশ, থার্ড ফোর্থও নয়। প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগের ছাত্রছাত্রী—'বিগিনার্স' যাদের বলে। পড়াতে পারবে গোড়া থেকে?

হাসি পেল। বললুম—তা আর পারব না? ওতো সবাই পারে। পাঠশালে অল্প-পড়া মায়েরাও পারেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে স্বামিজী বললেন—মায়েরা অনেক কিছুই পারেন। তাঁদের সঙ্গে কার তুলনা? মায়েরা যা পারেন, আর কেউ কি তা পারে? চলকান্ত [illegible]

চাঁদকে মামা হয়ে টিপ দিয়ে যেতে হয় খোকার কপালে—মায়ের হুকুমে। ঘুম-পাড়ানী মাসি-পিসিদের ঘুমের দফা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে যেতে হয় খোকার চোখে। মায়েদের মত শেখাতে কি কেউ পারে? ধর না—পাঠশালের পন্ডিতমশাইরা হিমসিম খেয়ে যান ছেলেদের শেখাতে। হিক-বিরক্ত হয়ে আশ্রয় নেন—কিল, চড়, বেত চাঁটির। শিক্ষা এগোয় না—পৌঁছায় না ছেলেদের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষাটা। অনেক ছেলে নষ্ট হয় এতে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দৈহিক শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষা—শাস্তিই পায়, শিক্ষা পায় না। শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি এ নয়। শিক্ষা-সম্বন্ধে পাঠ-বিমুখ হয়ে ওঠে ছেলেমেয়ে।

শিক্ষার শাসন আলাদা। শিশুর সঙ্গে শিশু হতে হয়। শিশুদের সঙ্গে নিজের মন এক করে নিলে বোঝা যায় তাদের মতি-গতি চলে কোন পথ ধরে।

শিক্ষার মূলধন হচ্ছে—আনন্দ, উৎসাহ, আগ্রহ আর কৌতূহল। এইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে তাদের মনে। হাসি, গল্প, খেলায় আনন্দে ভরিয়ে তুলতে হবে শিশু মন। খেলনার ঘোড়ার গাড়ী, মোটরগাড়ী, রেল-গাড়ী, নৌকা, স্টীমার, জাহাজ দেখিয়ে তাদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহল। এই রকম ছবি, পুতুল দেখিয়ে পুরাণ ইতিহাস আর নানা ফল-ফুল বা ফল-ফুলের ছবি দেখিয়ে তাদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কৌতূহল। এই কৌতূহলটিই হল জ্ঞানের উপায়—'পরিপ্রশ্ন'। এটা কি; ওটা কেন, কি করে হল—এই রকম নানান প্রশ্ন আসবে তাদের মনে কৌতূহলের বশে। তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হয়। শুধু শিক্ষক কেন, অভিভাবকরাও ছেলেদের নানান প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করে ধমক দেন। এটা খুব খারাপ। প্রশ্নের উত্তর শুনে যতটা শিখবে [illegible] না। [illegible] দেখে

মুখে শুনে শেখাটা মনে বেশি গেঁথে থাকে।

মোট কথা— 'লেখাপড়া' আর 'খেলা করা' এক করে তুলতে হয়। দুই-ই যেন শিশুমনে সমান আনন্দের যোগান দেয়। লেখাপড়াকে শিশু-বিভীষিকা না করে গড়ে তুলতে হয়—আনন্দ-নাড়ু। তবে তো ছেলেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—কে আগে নেবে, কে আগে খাবে। সবাই চাইবে যে—আগে শিখি, বেশি করে মনে রাখি।

বড় সোজা কাজ নয়। কেউ কেউ ভালভাবে পারলেও সকলে পারেন না। এটি। অনেক উচ্চশিক্ষিতও না। তাঁদের নজর থাকে ওপর দিকে—শিশুশিক্ষার মূলটি নজরে পড়ে না।

শিশুশিক্ষা বেশ শক্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। একটা জীবনকে গড়ে তোলা—কম দায়িত্ব? অটুট ধৈর্য চাই, আর চাই প্রফুল্ল প্রসন্ন স্নেহশীল মন। ধর তোমাকেই যদি দেওয়া হয় শিশুশিক্ষার দায়িত্ব, পারবে?

মিনিট কয়েক ভেবে নিয়ে বললুম—ঠিক পারব, বাবা। পাঠশালে পণ্ডিতমশায় পড়ার জন্যে কোন দিন মারেন নি। বাবাও না। যা নিজে খাইনি, তা খাওয়াব কি করে? মেরে ধরে শাস্তি দিয়ে লেখাপড়া শেখানর পক্ষপাতী নই। ছোটদের সঙ্গে ছোট হয়েই ঠিক শেখাতে পারব. বাবা।

—ঠি তো? মনের জোর আছে, ধৈর্য হারাবে না?

—না বাবা, ধৈর্য হারাব না, ঠিক পারব শেখাতে—বললুম বেশ জোরের সঙ্গেই।

—আচ্ছা, যাও—স্বামিজীর মুখে-চোখে প্রসন্ন ভাব।

বাহাত্তর

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো ঢাকের উদ্দাম বাজনায়।

আষাঢ়ে নবমী। বিশালাক্ষীর মহাপুজো, বিশালাক্ষীতলায় মেলা। খাঁড়ির এপার-ওপার দুই পাড় থেকেই পিঁপড়ের সারির মত পিল পিল করে আসছে অগুনতি মানুষ—স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, বুড়ো-বুড়ী। সবাই সেজেগুজে। মেয়েদের রং-বেরঙের দামী শাড়ী ব্লাউজ গয়না-গাঁটি, পুরুষদের ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী, কোটপ্যান্ট, জামা পায়জামা, ছোটদের ঝকঝকে রঙের পোশাক। গিন্নিবান্নিদের হাত কাপড়-ঢাকা পুজোর নৈবেদ্য, বউ-ঝিদের হাতে বড় বড় মুড়ির পুঁটলি। পুজো শেষ হবে বেলা তিনটেয়, তারপর মেলা দেখা, কেনাকাটা—দুপুরে খেতে হবে তো। মহা উল্লাসে প্রতিটি দল আনন্দমুখর।

দুপুরে খাওয়ার পর স্বামিজী বললেন—যাও, দেখে এস তোমাদের বিশালাক্ষী পুজোর ঘটাপটা। মেলাটাও দেখবে, তবে দোকানের খাবার কিছু খাবে না।

গিয়ে দেখি—রাতারাতি বন কেটে নগর গড়ে উঠেছে। দরমা, চট, টিন, ত্রিপল দিয়ে ঘেরা বেড়া ছোট বড় দোকান। কি আছে আর কি নেই? সেই কুমোর পাড়ার গরুর-গাড়ী, বোঝাই করা কলসী হাঁড়ি থেকে বেতের বোনা ধামা কুলো, উচ্ছে বেগুন, পটল মুলো সব। হাতা খুন্তি, বালতি কড়াই, জামা কাপড়, খেলনা, পুতুল, তেলে-ভাজা, মণ্ডামিঠাই রসগোল্লা পানতুয়া মিষ্টির দোকান। চায়ের দোকানের তো কথাই নেই। দোকানে দোকানে ভিড়। খাজা গজা জিলিপি পাঁপড় তেলে-ভাজার দোকানে ভিড় বেশি। কাচের চুড়ি গিল্টির গয়নার দোকানে ভিড় মেয়েদের, খেলনার দোকানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের। চায়ের দোকানে মদ্দ জোয়ান থেকে বুড়োদের ভিড়।

মন্দিরে পুজারী আর তন্ত্রধার, বারান্দায় পুজো দিতে আশা গিন্নিবান্নিদের ভিড়। পুজো শেষ, এইবার বলিদান।

মন্দিরের ঠিক সামনে উঠোনে হাঁড়িকাঠ পোঁতা। হাঁড়িকাঠে বাঁধা অনেকগুলি সদ্যস্নাত ছাগল ভেড়া থর থর কাঁপছে আর করছে কাতর আর্তনাদ। কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা, ঝকঝকে ধারাল খাঁড়া হাতে পাশে দাঁড়িয়ে আছে রক্তচক্ষু বলিষ্ঠ ভীমকায় কামার—না জল্লাদ। মাথার আধা-ঘোমটার ওপর গলায় আঁচল জড়িয়ে একটু দূরে মেয়েরা যোড়হাতে দাঁড়িয়ে বলছেন—মা, মাগো, মা, দয়া কর মা। যত ঢাকী ঢুলি কাঁসি-বাজিয়ে নেচে নেচে বাজাচ্ছে বলিদানের উদ্দাম বাজনা। একটু পরেই জবাফুল বেলপাতা সিঁদুর নিয়ে পুরোহিত এলেন পশুগুলি উৎসর্গ করতে। তারপরেই আরম্ভ হবে বলিদান।

তাড়াতাড়ি মেলা থেকে বেরিয়ে চলে এলুম আশ্রমে। বলিদান দেখি নাই কখনো। মনের সঙ্গে খাপ খায় না, দেখতে পারি না তাই। মন বলে—ধর্মের নামে এ অধর্ম—নিছক পাশবিক নিষ্ঠুরতা।

আশ্রমেও রঙে রঙে রঙীন ফুলঝুরি। মেলা দেখে ফেরবার পথে অনেকে এসেছেন আশ্রম দেখতে। সন্ধ্যের মুখে স্বামিজীকে আর সমাধি মন্দিরে প্রণাম করে বিদায় হলেন সবাই।

তেয়াত্তর

ধারা শ্রাবণ। ঘনঘটায় আকাশ অন্ধকার। বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো ঝলকানি, বজ্রের বুক কাঁপানো গুড়ু গুড়ু ধ্বনি অজস্র ধারায় অবিরাম বর্ষণ। চারিদিক জলে থৈ থৈ—মাঠ, ঘাট, পথ, বাট, খাল বিল একাকার। পথে হাঁটুভোর কাদা। এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—খাঁড়ির দুকুল ছাপিয়ে বান। ডিঙ্গি নৌকা কিছুই নাই। যোগাযোগ বন্ধ। এদিকের পাড় খুব উঁচু. বান ঢুকতে পায় না আশ্রমে।

ভরা ভাদরে ভরা নদী, ঘাটে ঘাটে হাঁটু জলের জায়গায় ডুব জল।

ঝণ্টুর দলের আসা-যাওয়া বন্ধ দুমাস।

আশ্বিনের মাঝামাঝি। মেঘমুক্ত নির্মল নীল আকাশ। শুধু মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরমুখো শাদা শাদা মেঘের দল। ঘরে যাবার তাগিদেই যেন প্রসাধনে কালো মুখ শাদা করে চলেছে সব। গেরুয়া রঙের ঘোলা জলের বদলে নির্মল স্বচ্ছ স্বল্প তোয়া খাঁড়ি। ভিজে মৌসুমীর বদলে মন্দ মন্দ মধুর হাওয়া। পুকুরে খালে বিলে দিনে পদ্ম রাতে কুমুদ। খাঁড়ির দু পাড়ে পাড়ে কাশফুলের চামর। গাঁয়ের পথে পথে খঞ্জনী বাজিয়ে বাউলদের আগমনী গান—'যাও যাও গিরি, আনিবারে গৌরী।' দুর্গার শাঁখা পরার গানও গাইছে কেউ কেউ।

এমনি এক পরিষ্কার দিনে ঝণ্টুর দল বাদ দিয়ে এসে পড়লেন বন্ধুবান্ধবসহ ওস্তাদ। বন্ধুদের সবাই—গদাই দাস, গোপী মিস্ত্রী, শঙ্কর দাস, সত্য দাস, গোপাল খাঁ, অহীভূষণ, ননী সাহা। মোহনপুর থেকে এসে জুটেছেন ভোলা খাঁ। পুজোর কাজের চাপ—ঝণ্টুর দল কাজ

করছে দোকানে, তাই আসতে পায় নি তারা।

সবাই বারান্দায় স্বামিজীর কাছে।

ওস্তাদ আর গোপীবাবু সোহংগীতার একটি শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারেন নি। ও'রা দুজন পারেন নি, সুতরাং দলের কেউই পারেন নি।

শ্লোকের মর্মার্থ বুঝিয়ে দিলেন স্বামিজী।

খানিক পরে একটু ইতস্তত করে ধীরে ধীরে দাদা বললেন—অনেকদিন হয়ে গেল বাবা। পড়া ছেড়ে আর কতদিন বসে থাকবে খোকা? বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বলেছেন—পুজোর সময় বাড়ী যেতে, আর ত্রয়োদশীর শুভদিনে কাজ শেখা আরম্ভ করতে।

শান্ত ধীর গলায় স্বামিজী বললেন—পুজোর সময় বাড়ী যাবে নিশ্চয়ই। ত্রয়োদশীর দিন আসবে আশ্রমে, কাজ আরম্ভ করবে না।

পরিচয় আছে, আলাপ হয়েছিল তোমার বাবার সঙ্গে। ন বছর আগে আশ্রমে এসেছিলেন—তোমার মতিগতি সংসারমুখী করে দেবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে। প্রাচীন বিজ্ঞ মহাশয় লোক। তিনি বুঝবেন ঠিকই। বলো—লেখাপড়া শিখতে দেয়া হবে না যখন খোকা কাজ শিখবে নিশ্চয়ই। তবে চুরি জোচ্চুরির কাজ নয়। উনি যেন নিশ্চিন্ত থাকেন, নিশ্চিন্ত মনেই আশ্রমে পাঠিয়ে দেন খোকাকে।

কর্মারম্ভের শুভদিনের নির্ঘণ্টের দরকার নাই—সে আরম্ভ হয়েই আছে।

পলক মাত্র বন্ধুদের সঙ্গে চোখেচোখি করে মুখ নামিয়ে বসে রইলেন দাদা।

কথা বললেন গোপী মিস্ত্রী—কী কাজ শিখবে খোকা, জানবার জন্যে সবাই উৎসুক হয়ে উঠেছি।

মুখের কথা মুখে, শেষ হতে পেল না, স্বামিজীর আরক্ত মুখে কঠোর দৃষ্টি। ধমক দিয়ে বললেন—ওর সম্বন্ধে কেউ কিছুই ভাবছ না যখন, তখন ওর কাজের কথা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন? যা করছে তাইই করবে। তাতেও ওর বেশ চলে যাবে। চুরি ডাকাতি—অসৎজীবিকা নয়—সৎজীবিকা।

স্বামিজী উঠে লাঠিটি হাতে নিতেই প্রণাম করে বিদায় নিলেন সবাই।

শারদীয়া পুজোর আনন্দ কোলাহলের মধ্যে কামারপাড়ায় সাতটা দিন কেটে গেল খুব তাড়াতাড়ি। আশ্রমে ফেরার কথা ত্রয়োদশীর দিন বিকেলে। আসবার সময় বাবাকে প্রণাম করতেই মাথায় হাত দিয়ে বেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—ভেবেছিলুম, পড়তে দেবেই না যখন, এইবার কাজ শিখবি। স্বামিজী ভেবেছেন অন্য কিছু। তাঁর মত উপেক্ষা করবার নয়। তাঁর আদেশ অমান্য করা যায় না। ক' ঘণ্টার আলাপেই বুঝেছি। পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মঙ্গলময় তিনি। বিশ্বহিতে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। এখানকার ছেলেছোকরারা আদপেই বোঝে না তাঁকে। বুঝলে অমন নাস্তিকের মত স্বেচ্ছাচার করে বেড়াত না। সুপুত্রে স্বর্গবাস আর কুপুত্রে কুলনাশ। ঠিক তেমনি সুশিষ্যে গুরুর গৌরব, আর কুশিষ্যে মহারৌরব। সুশিষ্যে গুরুর সুনাম আর কুশিষ্যে গুরুর বদনাম—তার নজীর—স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে সারা দুনিয়ার লোক চিনেছে এই সুশিষ্যটির জন্যেই। আর নিরালম্ব স্বামিজীর যত বদনাম—যা খুশি করেন, যা খুশি খান, ঠাকুর দেবতা মানেন না, ঘোর নাস্তিক। এ শুধু এখানকার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলোর জন্যেই। স্বামিজী নাস্তিক নন মোটেই—জ্ঞানমার্গী। আর্য মুনি ঋষিদের মতই মহাজ্ঞানী।

ছদ্মবেশে ভগৎ সিং

আত্মজ্ঞ আত্মদেব, মহাপুরুষ—ধর্মের শেষ সোপানে, নাস্তিক আবার কিসের? এমন সন্ন্যাসীর সংসর্গ অনেক ভাগ্যে মেলে। এঁর আদেশ মেনে চলো। কল্যাণ হবে।

দোকানে প্রণাম করতেই দাদার চোখ ছলছলিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল দুগাল বেয়ে। নিজের চোখও শুকনো রইল না। তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে দাদা বললেন—কি করবি, বলেছেন কিছু স্বামিজী?

—না, পরিষ্কার করে বলেন নাই কিছু। শুধু একদিন জিজ্ঞেস করছিলেন—ছেলে পড়াতে পারি কি না।

—ছেলে পড়ানো? সে আর কত হবে? ঐটুকু তো বিদ্যে। ম্যাট্রিক পাশ করে কি বেশি মাইনেয় মাস্টারি মেলে? যা করেন স্বামিজী। সবই বলেছি। আর কিছু বলবার নাই।

আশ্রমে পৌঁছতে সন্ধ্যে। বেড়িয়ে এসে স্বামিজী বসেছেন খাটিয়ায়।

প্রণাম করে কাছে বসে বাড়ীর কথা, পুজোর হৈহুল্লোড় আনন্দের কথা বললুম।

চুয়াত্তর

১৯২৮ সালের কলেজ সীজনও শেষ। পড়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার যবনিকা। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বুঝেও বুঝতে চায় না—অবুঝ মন হু হু করে, চোখ জলে ভরে। নিজেকে নিজে প্রবোধ দিই—'লোকে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা'। প্রার্থনা জানাই—'রেখো মা দাসেরে মনে'।

মাঝে ভাবান্তর লক্ষ্য করে স্বামিজী বলেন—নাই বা গেলে গোলাম তৈরীর কারখানায় গোলামী শিখতে। কি হবে গোলামীর 'ফরমান'—একখানা চোতা কাগজ নিয়ে? ওর চেয়ে ঢের ভাল 'কর্মী ফরমান'। ইচ্ছে করলেই পেতে পার তা। পরিশ্রম আর অধ্যবসায় চাই। পড়া? পড়া আর গেছে কোথায়? স্কুল কলেজের বাঁধাধরা গণ্ডী বাঁধা পড়ার চেয়ে বাড়ীতে নিজে নিজে ঢের বেশি পড়া যায়—তা তো জান। 'আত্মগুরু' ভব।

বুঝতে পারি না 'কর্মী ফরমান', চুপ করে থাকি।

অনেকদিন পরে আশ্রমে অতিথি। সাধু, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী নয়, সাধারণ অসাধারণ গেরস্থও নয়—দেশমাতার বীর সন্তান। পাঞ্জাব থেকে গিয়েছিলেন কলকাতা কংগ্রেসে। কলকাতা থেকে আসছেন আশ্রমে।

ছত্রপতি শিবাজীর মত বীরত্বব্যঞ্জক তেজোদৃপ্ত চেহারা। দীর্ঘ বলিষ্ঠ বপু, সিংহগ্রীব, বৃষস্কন্ধ কপাটবক্ষ, লোহার মুগুরের মত পেশীপুষ্ট দীর্ঘবাহু। সুন্দর মুখশ্রী। প্রশস্ত ললাট, সুনত খঙ্গনাসা, আরক্ত উজ্জ্বল পদ্মপলাশ চোখ। পরনে পাঞ্জাবী পোশাক। মাথা নুইয়ে মাধবী গেট পেরিয়ে সিংহগতিতে এসে উঠোনে দাঁড়ালেন—স্বামিজীর অনুরাগী মাতৃমন্ত্রী পাঞ্জাবী কিষণ সিং-এর সুযোগ্য পুত্র—ভগৎ সিং।

উৎফুল্ল হয়ে স্বামিজী বললেন—আরে, আও, আও, ভেইয়া, বৈঠ যাও। তবিয়ত আচ্ছা হ্যায়, সমাচার কুশল?

—জী হ্যাঁ,—কাঁধের হোল্ডঅল আর হাতের স্যুটকেশ নামিয়ে রেখে স্বামিজীকে প্রণাম করে বসলেন ভগৎ সিংজী।

বিশেষ কাজে স্বামিজীর পরামর্শ একান্ত প্রয়োজন।

স্বামিজী মৃদু হেসে বললেন—আরে ভেইয়া, পহিলে তো গোসল খানাপিনা কর চুকা, ওসকে বাদ হোগা সমচা। যাও দরিয়ামে গোসল কর আও।

নেয়ে খেয়ে বিশ্রামের জন্যে সিংজী এলেন পান্থশালায় বিশ্রামের জন্যে। বিশ্রাম তো কত! হোল্ডঅল খুলে মেঝেয় বিছানা পেতে স্যুটকেস খুলে বের করলেন একগাদা খাতাপত্র, নোটবুক, কাগজপত্র, নক্সা। তারপর লাল পেন্সিল নিয়ে মাঝে

...দাগ দিতে থাকলেন এখানে ওখানে ...র নক্সায়। কোন কোনখানিতে নতুন ... লেখাও যোগ করলেন ভগৎ সিংজী।

...বেলা তিনটের সময় রেণুদা এসে ...লেন—বাবাজী আপকো বোলাতা, ...জী।

...দাগ দেওয়া নক্সা ও লেখা কাগজগুলি ...পেন্সিল কলম নিয়ে সর্দারজী গেলেন ...জীর কাছে। বাইরে নয়, ঘরের ভেতর ...জীর তক্তাপোষের সামনের চেয়ারে ...লেন ভগৎ সিংজী। স্বামিজীর মুখো-...। চলল আলোচনা-পরামর্শ।

...স্বামিজীর ইঙ্গিতে দরজার পাশে বসে ...মে, আগন্তুকদের প্রত্যেককে 'প্রবেশ ...' জানিয়ে দিতে।

...দশ বিশ মিনিট নয়, আলোচনা চলল ... আড়াই ঘণ্টা।

...সূর্যাস্তের ঠিক পূর্বমুহূর্তে হাসতে ...তে বেরিয়ে এসে স্বামিজী গেলেন ...তে. সিংজী ঢুকলেন পান্থশালায়। ...পত্র গুছিয়ে সুটকেসে রেখে কুচিস্ত... ...করলেন ভগৎ সিংজী।

...সন্ধ্যার পর আশ্রমে বাইরের লোক ...না. শুধু রান্নাঘরে রেণুদা আর ... আঙিনায় স্বামিজী আর ভগৎ ...র কথাবার্তা হল অনেকক্ষণ ধরে। ... পরিষ্কার বুঝিয়ে বলেন তাঁর ...কল্পনা ও মত, মন দিয়ে স্বামিজী ... করে বাতলান পথ।

...রাত ...। খাওয়া সেরে দুজন দুদিকে ...শোনায়।

...পর দিন প্রত্যুষে—রাত থাকতেই বলা চলে ... প্রাতঃকৃত্য ও ব্যায়াম সেরে স্নান ... খাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ভগৎ ...। যেতেই হবে—অনেক কাজ, সময় ...?

...উদ্দাম কর্মী—কাজের মানুষ, সময় ...করতে পারেন না।

...স্বামিজী হাসেন, বলেন—যায়েগা তো ...। লেকিন টিরেন কাঁহা, পায়দলমে ...কেগা? পঞ্জাব মেল মিলেগা বারো ...বেলামে। আভি খানাপিনা কর ...ব যাইয়ে।

...তাই হয়। খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা ...র সময় বিদায় নেন ভগৎ সিংজী।

...সন্ধ্যেবেলা চৌকী নিয়ে গিয়ে আসর ...করে বসলুম স্বামিজীর কাছে। ...—ইনি কে বাবা? কি করেন? এঁর ...য় কি?

—কার কথা বলছ? ভগৎ সিং-এর ...জন্যে দীক্ষিত সন্তান। মাতৃমুক্তিই ... । এর বেশি এদের আর কি পরিচয়? ...বের বীর সন্তান অজিত সিং কিষণ ...র কথা শুনেছ। সেই কিষণ সিংএরই ... বীর পুত্র ভগৎ সিং। আর

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
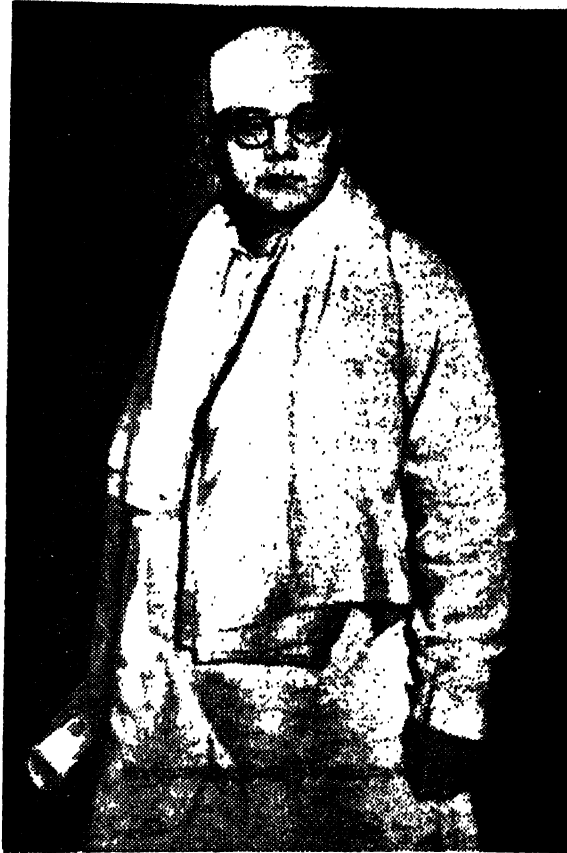
পরিচয়—ওহ্, ভি এক—'কমাল ছোড়তা নেহী।' এসেছিল বিশেষ পরামর্শের জন্যে—। ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন—স্বামিজী।

বললেন—অন্তরঙ্গ গুপ্ত সমিতি, বহিরঙ্গ অনুশীলন সমিতি নামগোত্রহীন হয়ে দুইই গোকুলে বাড়ছে মা যশোদার বক্ষসুধা পান করে। সবই চলছে ঠিকঠাক—সংগ্রামের কাজ, বিপ্লবের কাজ আপাতত বন্ধ। পরিকল্পনা চলছে ঠিকই। ছাই চাপা আগুন, একটু ফুঁ দিলেই জ্বলে ওঠে দপ্ করে। অত্যাচার চরমে উঠলেই অসহ্য হয়, জাগে প্রতিশোধস্পৃহা। তখন নখদন্ত বের করে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাচারীর ওপর। শুধু সমিতি সদস্যই নয়, দেশশুদ্ধ সবারই মনে জেগে উঠেছে অন্যায়ের প্রতিবাদ আর প্রতিকারস্পৃহা। ছাত্রমহলেও বেশ জোরদার হয়েছে এ ভাবটি। দু একটি ছাত্রের কথা শোন তা হলেই বুঝবে—

১৯১৬ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক—ওটেন সাহেব। লণ্ডনের আমদানী খাঁটি ইংরেজ। ক্লাসেই একদিন হীন কটূক্তি করে বসলেন ভারতীয়দের সম্বন্ধে অশ্লীল শব্দ বলে। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল ছাত্রদের—লজ্জায় অপমানে। সহ্য হল না যুবক ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু আর অনঙ্গমোহন দামের। ক্লাস থেকে বেরিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে রইল গেটের দুপাশে। ছুটির অপেক্ষা। ছুটির পর ভিড়ের মাঝে ওটেন যেই বের হবেন গেট দিয়ে আর অমনি বাঘ সিংহ দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে. বেধড়ক জুতোপেটা। বাছাধনের লাল অঙ্গ লালতম। সুভাষ আর অনঙ্গ চলে গেল হিন্দু হোস্টেলে। বিচারে দুজনেরই হল—রাস্টিকেট। আর কোথাও পড়তে পাবে না—তারা, প্রেসি-ডেন্সি কলেজে তো নয়ই। ভাল ছেলে, বুদ্ধিমান, পড়ার ঝোঁকও খুব—। তবু পড়তে পাবে না। বয়েই গেল, বাড়ীর পড়া তো বন্ধ করতে পারবে না কেউ। 'এডুকেশন্যাল স্টোর্স' নাম দিয়ে ১নং কলেজ স্ট্রীটে বইএর দোকান খুলে বসল দু বন্ধু—সুভাষ আর অনঙ্গ। সে কি পোশায়? বিবেকের বীরবাণীর বীররসের তরঙ্গ সুভাষের শিরায় শিরায় 'বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু' উদগ্র কামনা সুভাষের। চুলোয় যাক যশ আর লক্ষ্মী—হল আর নাই হল, কিন্তু বিদ্যা হবে না কেন? অপরাধ? সভ্যতাভিমানী ইংরেজের চরম অসভ্যতা আর অন্যায়ের

প্রতিবাদ আর প্রতিকার করেছে— এই তো? এতেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার? কেন মানবে সে— এ অন্যায় জুলুম? চলল সুভাষ—ছাত্র-সুহৃদ, স্বজাতিবৎসল দেশপ্রেমিক বাংলার বাঘ স্যর আশুতোষ মুখার্জির কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তিনি। গোলাম তৈরীর বিলিতি শিক্ষাপদ্ধতিকে আমূল ঢেলে সাজছেন তখন। মন দিয়ে সব শুনলেন স্যর আশুতোষ। বড় বড় চোখে চেয়ে দেখলেন ছেলেটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত। মুখে প্রতিভার দীপ্তি, চোখে জ্ঞানের জ্যোতি, কথাবার্তায় বিনয়, সর্বাঙ্গে তেজস্বিতা। গুণীর কদর গুণীই জানে। এমন একটি বিদ্যোৎসাহী তরুণের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এমন একটা প্রতিভার অপমৃত্যু? এ হতে পারে না। গর্জে উঠল বাঘ। বাঁ পায়ের থাবায় চাপা পড়ল প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্তৃপক্ষের অন্যায় আদেশ। ১৯১৭ সালে জুলাই মাসে স্কটিশ চার্চ কলেজে সুভাষের ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন স্যর আশুতোষ। বি-এ ক্লাসে দর্শনে অনার্স নিয়ে সুভাষ পড়তে থাকল ঐ কলেজে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক শিক্ষার্থী বাহিনীতেও ভর্তি হল।

যথাসময়ে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাশ করল সুভাষ। শিবির জীবন আর সামরিক শৃঙ্খলাতেও বেশ পাকা হয়ে উঠল সামরিক শিক্ষার্থী বাহিনীর মারফতে। এইখানেই কি ছেদ পড়ল? হীরের টুকরো ছেলে, বাবা পাঠালেন বিলেতে আই, সি, এস পড়তে। ১৯২০ সালে সুভাষ আই, সি, এস পাশ করল বেশ সাফল্যের সঙ্গেই। তারপর চাকরিও করল কিছুদিন। কিন্তু মায়ের ডাক যার প্রাণে আলোড়ন তুলেছে, সে করবে ইংরেজের গোলামী? ১৯২১ সালে ২৮শে এপ্রিল কেম্ব্রিজ থেকে দাদাকে লিখল—'কাজে ইস্তফা দিয়েছি'।

তারপরে আর কি! ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতমাতার কোলে, মায়ের সেবায় উৎসর্গ করল—মনপ্রাণ। খোঁজ নিয়ে দেখা করেছিল কবার কলকাতায়। আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। চোখ-জুড়ানো ছেলে, কান-জুড়ানো কথা। বাঘার মতই অসীম সাহসী দুর্ধর্ষ বীর। কোনরকম অন্যায় অত্যাচার জুলুমের কাছে মাথা নোয়াবার ছেলেই নয়। অগ্নিগর্ভ পর্বত। 'করব না হয় মরব'—তার পণ। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আগ্রহী। এই ছেলেই হবে সমিতির প্রকৃত উত্তরসূরী।

১৯১৪ সালে ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধ। ভারতীয় সৈন্যরা, বিশেষ করে শিখ সৈন্যরা অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছিল ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করে। অনেক যুদ্ধে ইংরেজের জয় হয়েছিল এই শিখ সৈন্যদের ভারতীয় সৈন্যদের অদ্ভুত রণকৌশলে। অন্যান্য ভারতীয় সৈন্যরাও অক্লান্ত সেবায় বাঁচিয়ে তুলেছিল বহু আহত সৈনিককে। খুবই খুশি হয়েছিলেন স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ। ভারতীয় সৈন্যরা আশা করেছিল—কিছু ভালরকম পুরস্কার, কিছু ভালরকম সুখ-সুবিধা মিলবে তাদের।

তা এইরকম আশা ভরসার পুরস্কার মিলল বৈকি। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এ্যানি বেশান্ত করলেন 'হোম রুল আন্দোলন'। বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বিশিষ্ট নেতারা যোগ দিলেন এতে। আর সহ্য হয়? ১৯১৭ সালে বৃটিশ সরকার এ্যানি বেশান্তকে নির্বাসিত করলেন আমেরিকায়। বিক্ষুব্ধ হল জনগণ।

ঐ সালেই হল শাঁখারিটোলায় ডাকাতি। পরিচালনা যাদুগোপালের। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সরকার ধরতে পারল না তাকে। রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙল এবারও—গিরীন বাঁড়ুজ্জে, প্রভাস দে, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রতুল গাঙ্গুলী আরও কজনের হল নির্বাসন দণ্ড।

সুভাষ-অনঙ্গমোহনের বই-এর দোকান এডুকেশন্যাল স্টোর্সএর পাশেই 'সরস্বতী লাইব্রেরী' নাম দিয়ে আর একটি বইএর দোকান খুলেছিল অরুণচন্দ্র গুহ আর মনোরঞ্জন গুপ্ত। কোথাও কিছু না— অনঙ্গ, অরুণ আর মনোরঞ্জন হল নির্বাসিত।

পুলিশের কারচুপি আর জুলুমবাজি সহ্য হল না বালক নির্মলচন্দ্রের। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে ট্রামে চড়ে নির্মল দিন-দুপুরেই গুলি করে মারল একজন পুলিশ ইনস্পেকটরকে। ধরা পড়ল নির্মল। তারপর মামলা। সে বড় মজার ব্যাপার। নির্মলের বাবা গরীব। মামলা চালাবার টাকা নাই। ছেলেকে বাঁচাতেও হবে। নির্মলের বাবা হাইকোর্টে কথা বলছিলেন ব্যারিস্টার রজত রায়ের সঙ্গে। আলিপুরে বোমার মামলায় গভর্নমেণ্ট পক্ষের প্রধান ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব এঁদের কথাবার্তা শুনে বললেন— মাত্র দু হাজার টাকা পেলেই নির্মলকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন তিনি। সমস্ত উকিল ব্যারিস্টাররা ধন্য ধন্য করলেন। প্রধান এটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিনাপয়সায় মামলার তদ্বির করতে লাগলেন।

জাস্টিস স্টীভেনস আর সাতজন জুরীর হাতে ছিল এই মামলা। নর্টন প্রমাণ করলেন—স্বয়ং লাটসাহেব ও পুলিশ দেড়শ সাক্ষীকে ঘুষ দিয়ে খাড়া করেছে এই মামলা। সাতজন জুরীই রায় দিলেন— নির্মল নির্দোষ। হাসতে হাসতে নর্টন নির্মলকে হাত ধরে আনতে গেলেন কাঠগড়া থেকে। অমনি স্টিভেনস চেঁচিয়ে বলে উঠলেন— disagree with the juries and discharge them! ইংরেজের ন্যায়বিচার প্রত্যক্ষ করল সবাই।

আবার নতুন সাতজন জুরী নিয়ে বিচারে বসলেন জজসাহেব। শুধু উকিল ব্যারিস্টারই নয় অনেক ইংরেজ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলায় ভর্তি হয়ে গেল আদালত। এবারেও সেই একই প্রহসন। জুরীদের মতে নির্মল নির্দোষ। ধিক্ ধিক্—(শেম শেম) বলে চেঁচিয়ে উঠল সমবেত ইংরেজ ভদ্রলোক ভদ্র-মহিলারা।

কিন্তু 'বেহায়ার নাই লাজ'। জজসাহেব যে দারুণ জজসাহেব—দু কান কাটা। তৃতীয় দফা বিচারে বসলেন নতুন সাতজন জুরী নিয়ে। কি ফ্যাসাদ! আর বুঝি মান সম্মান বজায় থাকে না! ব্যতিব্যস্ত বিব্রত সরকার দিল্লী থেকে পাঠিয়ে দি[illegible] এ্যাডভোকেট জেনারেল এস. পি. সিংহকে তাড়াতাড়ি মামলা তুলে নিয়ে সরকারের মানইজ্জত রক্ষা করতে।

এর পর একটা বৃটিশ প্যাঁচোয়া[illegible] চাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেনের জয় লাভের প্রধান কারণ দুটি—ভারতের সৈন্য সাহায্য আর আমেরিকার অর্থসাহায্য।

ভারতীয় সৈন্য—বিশেষ করে [illegible] সৈন্যদের অপূর্ব বীরত্ব শৌর্যবীর্য রণ-কৌশল, নৈপুণ্য আর অন্য ভারতীয় সৈন্যদের অক্লান্ত আহত সৈনিক সেবা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে বৃটিশ নিজেরাই স্বীকার করেছিল—দীর্ঘকাল ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে অটুট মনোবল নিয়ে সমান তেজে যুদ্ধ করতে একমাত্র ভারতীয় সৈন্য ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশের সৈন্যরা পারে না। এদের বীরত্ব অপূর্ব, বীর্য [illegible] এরা চরম কষ্টসহিষ্ণু, কর্মঠ আজ্ঞা-বর্তী, সময়ানুবর্তী, আর একান্ত বিশ্বাসী। ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্যও সর্বাংশে বৃটিশ অশ্বারোহী সৈন্যের সমকক্ষ। এদের জন্যেই যে এবার [illegible]—একথা অস্বীকার করবার নয়।

স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জও মহাখুশি।

এই বিরাট সাহায্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দরকার। নইলে বিশ্বের দরবারে বৃটিশ সিংহের নৈতিক দৈন্য সূচিত হয়। এই নীতিগত দায়িত্ব এড়াবার জন্যে ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বলতে থাকলেও ১৯১৯ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড [illegible] করলেন শাসন সংস্কার। প্রথমেই সাধারণের চোখে এর সুফল আর সুবিধা তুলে ধরবার জন্যে দিলেন বন্দীমুক্তি। যে [illegible] বন্দীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িত ছিলেন না মুক্তি দেওয়া হল তাঁদের। মুক্তি পেলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অতুল ঘোষ, অমরেন্দ্র বসু, অরুণ গুহ, মনোরঞ্জন গুহ, সত্যেন মিত্র, পূর্ণ দাস, মাখন সেন—আরও অনেকে।

আত্মগোপনকারীরা আত্মপ্রকাশ করে পেলেন। যাদুগোপাল, অমরেন্দ্র চাটুজ্জে আত্মপ্রকাশ করল। প্রেস আইন তুলে নেওয়া হল। ব্যাস—এই পর্যন্ত।

বিক্ষুব্ধ ভারতবাসী। তারা প্রাণ দিয়ে সাহায্য করেছে বৃটিশকে। তুলনায় কতটুকু দিল বৃটিশ? এই কি দেওয়া? অকৃতজ্ঞ বৃটিশ। এই শাসন সংস্কার প্রহসনের বিরুদ্ধে শুরু হল প্রবল আন্দোলন সারা ভারত জুড়ে।

শুধু কি ঐ শাসন সংস্কার? আরও আছে। শাসন সংস্কার চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লব দমনের জন্যে পাশ হল 'রাউলাট এ্যাক্ট'।

—এর মানে কি? তপ্ত তেলে জলের ছিটা। জ্বলে উঠল ভারতের জনগণ।

—সবরকম বিপ্লব আন্দোলনই যদি বন্ধ করতে চায়, আমাদের শুভ চিন্তাটা তবে এর মধ্যে রইল কোথায়? নিজেদের দুর্দশার পরিসমাপ্তি, সুখসুবিধা লাভের প্রচেষ্টা—এই তো বিপ্লব, এই তো আন্দোলন। এমন আন্দোলন বন্ধ করতে চাওয়া মানেই—হিতচিন্তা নয়, অহিত চিন্তা মূর্তিমান অমঙ্গল।

এই সময়ে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী এলেন ভারতে। তিনি দেশবাসীকে ডাক দিলেন রাউলাট এ্যাকটের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রবল প্রতিবাদ সভা করতে। এ আন্দোলন করতে হবে বেশ সংযত ও অহিংসভাবে। তার জন্যে যথোচিত নির্দেশও দিলেন তিনি। ১৯১৯ সালে এপ্রিল ভারতের সব জায়গায় হল রাউলাট এ্যাকটের' প্রতিবাদ সভা। সর্বত্র বিক্ষোভ দেখান হল বেশ শান্ত সংযত অহিংসভাবে।

পাঞ্জাবে জালিওয়ালানাবাগে বিরাট প্রতিবাদ সভা ১৩ই এপ্রিল। প্রকান্ড বড় মাঠ। চারদিকে পাঁচিল, বড় বড় বাড়ী, বেরোবার বেরোবার সরু গলি পথ। আগে থেকেই সভা বন্ধ করবার আদেশ দেন পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার মাইকেল ও ডায়ার। [illegible] মানল না সে আদেশ। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট মাঠে জড়ো হল লক্ষ লক্ষ নরনারী, বালক বৃদ্ধ যুবা। সভা আরম্ভ হল। গভর্নর রেগে টং—হুকুম দিলে গুলি চালাতে। দলে দলে সৈনিক এসে বেপরোয়া গুলি চালালে ঐ নিরস্ত্র নিরীহ অহিংস জনতার ওপর। নৃশংস অত্যাচার। হাজার হাজার নরনারী, বালক বালিকা, শিশু, বৃদ্ধ যুবা নিহত হল। কত মা কত বাপ হারাল সন্তান, কত স্ত্রী হারাল স্বামী, কত স্বামী হল বিপত্নীক, কত ছেলেমেয়ে হারাল মা, বাপ, ভাই, বোন। রক্তের বান বইল। বের হবার পথ আটকে অস্ত্রধারী সৈনিক, বের হতে পারল না কেউ। শবের ওপর শব স্তূপাকার পড়ে রইল জালিওয়ালানা বাগে। মর্মভেদী হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ঘরে ঘরে উঠল কান্নার রোল।

প্রতিবাদে গান্ধীজী করলেন সত্যাগ্রহ খিলাফৎ আন্দোলন, তারপর অসহযোগ আন্দোলন। টলমল করে উঠল ভারতের ইংরেজ রাজ গদী।

বাংলা থেকে বিশ্বকবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ চোখা চোখা বাক্যবাণে চিঠি লিখে প্রত্যাখ্যান করলেন বৃটিশের দেওয়া সম্মান 'নাইট' উপাধি।
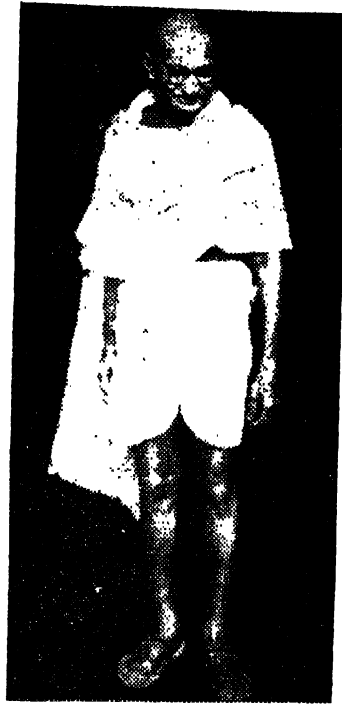
কর্মপন্থা বদলাল—অহিংস অসহযোগ। লোকের [illegible] হল এই আন্দোলন [illegible] সর্বসংবাদিত [illegible] গান্ধীজীকে। ১৯২০ থেকে এই আন্দোলন। অনেক বিপ্লবী বীর, নেতা ও কর্মী যোগ দিলেন এতে। কিন্তু একেবারেই চাপা পড়ে গেল না বিপ্লববাদ। অসহ্য হলেই ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচৌরা জনবহুল জায়গা। পুলিশী নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ক্ষেপে উঠল জনগণ। ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী একদিনেই বাইশজন পুলিশকে মেরে ফেলল তারা।

গান্ধীজী 'হায়' 'হায়' করে বললেন—এ পর্বতপ্রমাণ ভুল। আন্দোলন বন্ধ করতে আদেশ দিলেন তিনি। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ রেখে কিছুদিন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বললেন সকলকে। এটিই গান্ধীজীর 'বারদৌলি' প্রস্তাব। তিনটি রাজদ্রোহের অপরাধের অজুহাতে ১০ই মার্চ গান্ধীজীকে বন্দী করল সরকার। ছ বছর কারাদন্ড হল। এর কিছু আগেই কজন খ্যাতনামা নেতাকে বন্দী করেছিল ইংরেজ গভর্নমেন্ট। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সারা দেশ।

মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বিপ্লবীরা। মানবেন্দ্র রায় আর অবনী মুখার্জি ছদ্মবেশে ভারতে এসে উৎসাহ দিতে থাকলেন বিপ্লববাদীদের।

অশ্বত্থামা টেগার্ট সপ্তরথীতে ঘিরে অন্যায় যুদ্ধে মেরেছে বীর অভিমন্যু বাঘা যতীনকে। ধরা থেকে মুছে দিতে হবে টেগার্টের নাম। এগিয়ে গেল বীর বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা। এবারেও ভুল—টেগার্টকে গুলি ছুঁড়তে গিয়ে গোপীনাথ হত্যা করে বসল 'ডে' নামে এক সাহেবকে।

গোপীনাথ ধরা পড়ল। তখনও জানে না সে। টেগার্টকে মেরে পৃথিবীর ভার কমিয়েছে—এই আনন্দেই উৎফুল্ল হয়ে আছে। তারপর পুলিশ অফিসে গিয়েই জ্যান্ত টেগার্টের সঙ্গে চোখোচোখি। নিমেষে সব আনন্দ উবে গেল, মুখ মলিন হল গোপীনাথের। ১৯২৪ সালের ঘটনা।

ফাঁসির হুকুম হল। একটুও বিচলিত হল না গোপীনাথ। বেশ আনন্দেই বাকি সাতটা দিন কাটালো জেল হাজতে। ঠিক কানাই-এর মতই এই ক'দিনেই কয়েক পাউন্ড ওজনে বেড়েছিল সে।

হাসিমুখেই ফাঁসি মঞ্চে উঠেছিল এই বীর শহীদ গোপীনাথ।

এইবার আবার অসহযোগ আন্দোলন। পুলিশ অনেককে গ্রেপ্তার করল। অনেকের নির্বাসন দন্ড হল। তার মধ্যে প্রধান—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, অনিলবরণ রায় আর সেই প্রেসিডেন্সি কলেজে রাস্টিকেট হওয়া ছেলে সুভাষচন্দ্র। সুভাষকে নির্বাসিত করা হল মান্দালয়ে।

তারপর এই তো সেদিন—১৯২৫ সালের শেষদিকে দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলা। তম্বির করেছিল ভূপেন চ্যাটার্জি। বিপ্লবীদের হাতে নিহত হল সে।

বর্তমানে বিপ্লববাদ স্তিমিত বলা চলে।

এখন অধিনায়ক গান্ধীজী। ভারতের জনগণমন অধিনায়ক তিনি। অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব তাঁর। জনমনে প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি অপূর্ব। শিক্ষাদান প্রণালী সহজ, সরল বুনিয়াদী। অরবিন্দদার মতই গীতাধর্মে অগাধ বিশ্বাস। বিশেষ করে কর্মযোগে। আর বিশ্বাস রাম নামে। নিষ্কাম কর্মে আস্থা—সত্যে অবিচল নিষ্ঠা। এক কথায়—সত্যনিষ্ঠ, সত্যাশ্রয়ী, সত্যাগ্রহী।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উৎসাহিত করেছেন ক্ষাত্রধর্মে, সশস্ত্র যুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধে। আর গান্ধীজী জনগণকে উৎসাহিত করেছেন—ব্রাহ্মণ্য ধর্মে, শম, দম, ধৈর্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা দিয়ে নিরস্ত্র অহিংস যুদ্ধে।

কাঠে কাঠে মিলেছে ভাল। ইংরেজও বেনে, গান্ধীজীও বেনে—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। বেনেই জব্দ করবে বেনেকে। তবে স্বাধীনতা? পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে কি না সন্দেহ।

অরবিন্দদার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি। তাঁর ইঙ্গিত-নির্দেশিত ব্যক্তি ইনিই—মহাত্মা গান্ধী।

আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের ফল দেখেই সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় অরবিন্দদার মনে।

পঁচাত্তর

সকালে দুখানি চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে।

একখানি লিখেছেন—ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র নন্দী, আর একখানি জয় মিত্রের বাড়ী

থেকে—অন্তত দু'চার দিনের জন্যেও স্বামিজীকে কলকাতা যাবার সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানিয়ে।

কাছে বসতেই সন্ধ্যেবেলা স্বামিজী বললেন—হাতের কাজ তো পার—মাটির মূর্তি গড়তে। ছবি আঁকতে পার? কেমন লাগে ছবি আঁকতে?

—খুব ভাল লাগে, বাবা। তবে ভাল পারি না—শিখি নাই তো। ঐ যা পারি বাঙলার পট আর চালচিত্তির আঁকতে।

—শিখবে ছবি আঁকা কোন বড় শিল্প-গুরুর কাছে?

—তা হলে তো খুবই ভাল হয়, বাবা, পড়তেই পাব না যখন।

—আচ্ছা, পড়া পড়া করছ, ডাক্তারী পড়লে কেমন হয়? কোন ভাল ডাক্তারের কাছে থেকে দু'টি ছোট ছেলেমেয়েকে পড়াবে সকালে, আর নিজে পড়বে। —মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন স্বামিজী।

—ডাক্তারী? বাঙলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, সাহিত্য, কাব্য, কিছুই তো পড়তে পাব না ওতে। ভাল লাগবে না, বাবা।

—অধরোষ্ঠ চেপে একটু যেন ভেবে নিলেন স্বামিজী। তারপর বললেন—কিন্তু পয়সা আছে। রোজগার তো করতেই হবে। চেষ্টা করেই দেখ না কিছুদিন। কেমন লাগে ডাক্তারী।

পরদিন—গোছগাছ। তারপর ট্রেন থেকে হাওড়া ষ্টেশনে নেমে সোজা জয় মিত্রের বাড়ী—স্বামিজী, রেণুদা আর আমি।

বিকেলে ডাক্তার নন্দী এসে স্বামিজীকে প্রণাম করে একটু কথা বলে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমাকে, বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীটে নিজের বাড়ীতে।

দোতলা বাড়ী। নিচের তলায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো গোছানো ডিসপেনসারী ছোট সংসার। ডাক্তারবাবু, বিধবা মাসিমা, সাত বছরের খোকা আট বছরের খুকু। একদিনেই 'দাদা' হয়ে গেলুম তাদের। পরদিন থেকেই বেশ আনন্দে লেখাপড়া করতে থাকল তারা। সন্তান স্নেহেই ভরিয়ে রাখলেন ডাক্তারবাবু আর মাসিমা।

বড় আনন্দেই দিন কাটে। যত গোলমাল নিজের পড়ার বেলায়। আলমারি ভর্তি বই। খুলে দেখি, নাড়াচাড়া করি। মন লাগে না। কদিন পরে দেখি পাশের ঘরে আলমারিতে হাড়গোড় আর মেঝেয় দাঁড়করানো একটা গোটা নরকঙ্কাল। গা শিউরে ঘিন ঘিন করে ওঠে। হলে হবে কি —এগুলি যে ডাক্তারী পড়ার অপরিহার্য উপকরণ।

এই তো সবে শুরু, এখনও বাকি। একদিন ডাক্তারবাবু নিয়ে গেলেন কারমাইকেল কলেজ মর্গে। সারি সারি টেবিলে সারি সারি মড়া—বিকৃত মুখ, বিকৃতদর্শন—কাটা, ছেঁড়া, সেলাইকরা। বীভৎস ব্যাপার। মাথা ঘুরে ফিট হবার যোগাড়।

শুরু হল বমি আর কান্না। সারাদিন বমি। কান্না আর থামানো যায় না। বিব্রত হয়ে পড়েন ডাক্তারবাবু আর মাসিমা।

স্বামিজী অনেকদিন আগেই চলে গেছেন চান্নায়। এখন উপায়?

দুদিন পরে আশ্রম-যাত্রী খাঁ দাদা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিলেন আশ্রমে।

আগেই ডাক্তার নন্দীর চিঠি পেয়েছিলেন স্বামিজী। প্রণাম করে বসতেই হো হো করে হেসে বললেন—দুয়ো, দুয়ো, পারলে না তো, ফিরে এলে?

তারপর উদাস দৃষ্টিতে শূন্যোপানে চেয়ে—খাঁ দাদাকে বললেন—ও পারবে না, তা জানা ছিল। এ কাজ ওর নয়। শিল্পী মন, স্রষ্টার মন—স্পর্শকাতর, ঠুনকো। কোনরকম নিষ্ঠুর বীভৎস কাজ ওদের দ্বারা সম্ভব নয়। যতই বল, ডাক্তারীতে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকটু, বীভৎস, আপাতনিষ্ঠুর কাজ কিছু আছে বৈ কি ডিসেকসনের ব্যাপারে—মর্গে। একটু কড়া মনের দরকার। যাক কটা দিন। ঠাণ্ডা হোক। ওর নিজের লাইনেই দিতে হবে ওকে। উন্নতির আশা আছে।

দুদিন আশ্রমবাস করে খাঁ দাদা গেলেন কলকাতায়।

কদিন পরে স্বামিজীর কথায় বিকেল-বেলায় বাড়ী থেকে নিয়ে এলুম নিজের আঁকা কখানি ছবি আর ড্রইং খাতা।

সকালবেলা। জলযোগপর্ব শেষ। স্বামিজী বললেন—তোমার স্যুটকেসে কাপড় জামা গোছান আছে। ছবিগুলি আর ড্রইং খাতা নাও ওর সঙ্গে। কলকাতা যেতে হবে। একাই তো যেতে পার। গেছ ক'বার। বরানগর যেতে পারবে?

—না, স্বামিজী। বরানগর বাসে যাই নাই একবারও। কোথায় উঠতে হয়, নামতে হয়—জানি না।

—আচ্ছা, তাহলে চলে যাও বৌবাজারে গোপালের দোকানে। সে পৌঁছে দেবে বরানগরে। তারপর দেখা করবে জীবন-তাতার সঙ্গে। তার কথামত কাজ করবে। আর পালিয়ে আসতে হবে না। কাল সকাল নটার ট্রেন ধরবে।

দিন শেষ, সন্ধ্যেবেলায় স্বামিজীর কাছে। গড়গড়ার নল টানতে টানতে স্বামিজী বললেন—সকালে যাবে। দুটি কথা—মনে রাখবে বেশ ভাল করে। 'শরীরম্ আদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্'। সাই কর শরীর ভাল না থাকলে কিছুই হবে না। শরীর সুস্থ রাখা চাই। ঠিক সময় পরিমিত পুষ্টিকর আহার. সকাল বিকেলে একটু বেড়ানো, খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ—যাতে শরীর চালনা হয়, তা নিয়মিত করতে হবে। শরীরে বল পাবে, মনে স্ফূর্তি আসবে কাজে মন বসবে।

আর একটি কথা—সংসারী লোক ঈশ্বর মানে, ঈশ্বরের কথা ভাবে। অথচ জানে না ঈশ্বর কি। জানবে কি করে! কথা দিয়ে যা বোঝানো যায় না, যা 'অবাঙ্মনসগোচর' বাক্য ও মনের অগোচর, তাকে বোঝা কি সোজা কথা?

ছ'ছটা দর্শন বিশেষণের মালা গেঁথেও তার দর্শন পেল না। নির্বিশেষ যা তার আবার বিশেষণ? তবে কিছুটা ধারণা আনতে সাহায্য করে এই কটি কথা— সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। যা সত্য তাই শিব-মঙ্গলময়, যা মঙ্গলময় তাই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যই ঈশ্বর সত্যই ধর্ম। এই সত্যকে ছাড়বে না কখনও। সত্যে আগ্রহী হলে, সত্যাশ্রয়ী হবে, সৎ সত্যপথে চলবে। সত্যের জন্য সব কিছু ছাড়া যায়, কিন্তু কোন কিছুর জন্যেই সত্যকে ছাড়া যায় না। সকলের সঙ্গে সত্য বলবে অর্থাৎ সদ্ব্যবহার করবে। ব্যস্, এই দুটি কথা।

রাত্রে খাওয়ার পর বিশ্রাম।

চিন্ময়ী মায়ের সমাধিতে প্রণাম করে স্বামীজীকে প্রণাম করে রেণুদার কাছে যেতেই মাথাটি বুকে চেপে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল রেণুদা। চোখ মুছে রেণুদাকে প্রণাম করে বার বার পেছন পানে চেয়ে চেয়ে গিয়ে উঠলুম গাড়ীতে।

তারপর স্বামিজীর নির্দেশমত সবই।

বসাক বাড়ী সুপরিচিত। আগে থেকেই কাকা, কাকিমা, জেঠাইমা, ভাই-বোনের দল ছেলে মাত্র একটি—স্বামিজীর তৈমুরলঙ্গ, কাজেই বাড়ীর বড় ছেলে হয়েই রইলুম প্রথম দিন থেকে।

টেবিল, চেয়ার, আলনা, আলমারি, তক্তাপোষ দিয়ে সাজানো একতলার বসবার ঘরটিই হল আমার থাকবার নিজস্ব ঘর।

।। ছিয়াত্তর ।।

সন্তু কাকা—বিজয়বসন্ত বসাক বাবু দুই মেয়ে—অমলা, কমলা আর ভাইঝি লতিকা—ছাত্রী।

প্রথমদিন পড়তে এসে অমলা ডাকল— 'মাস্টারমশায়'! হয়তো ভুলেই। কে 'মাস্টারমশায়'? আমি তো দাদা, দাদা আবার মাস্টারমশায় হয় নাকি?

হেসে মাথা নিচু করল অমলা।

(ক্রমশ)

মুণ্ডা লোকগীতিতে হৃদয় ভাবনা

বঙ্কিম মাহাতো

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী কোলদের বসতি বিশেষভাবে ছোটনাগপুরে এবং সাধারণভাবে বাঙলা, বিহার উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের অংশ বিশেষ জুড়ে সুবিস্তীর্ণ ঝাড়খণ্ড বা জঙ্গল মহল এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। কোল জনগোষ্ঠীর লোকেরা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এই গোষ্ঠীর মূল উপজাতিগুলোর নাম হল—কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, অসুর বীরহোড় ইত্যাদি। বর্তমান নিবন্ধে আমরা মুণ্ডা উপজাতির লোকসংগীত নিয়ে আলোচনা করব। মুণ্ডাদের সাধারণত পুরুলিয়া-ধলভূম-ঝাড়গ্রাম-পশ্চিম বাঁকুড়াতে, এক কথায় ঝাড়খণ্ডী বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায় না। এঁরা ছোটনাগপুরের গভীর দুর্গম অরণ্য পর্বত অঞ্চলে বসবাস করে।

লোকগীতিতে সাধারণ মানুষ সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় নিজের ভাবনাকে অবারিত করে দেয়। এখানে দুরূহ বাচনভঙ্গীর যেমন স্থান নেই, তেমনি গুরুকথা শোনাবার ঝোঁকও উপলব্ধ হয় না। মানুষের আদিম চিন্তা-ভাবনা, অলৌকিকতা, প্রেম, যৌনতা, সৌন্দর্য-চেতনা, দৈনন্দিন ঘর-গেরস্থালির সুখ-দুঃখের কথা আদিই লোকগীতির মূল উপজীব্য হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। মুণ্ডা লোকগীতি এর ব্যতিক্রম নয়। সহজ সরল নিরক্ষর অরণ্য মানুষ মুণ্ডাদের মনেও ঋতু আবর্তনের ফলশ্রুতি, অরণ্য পর্বতের সৌন্দর্য, পাখি-পাখালির গান দোলা দেয়। ভালোবাসার কথায় তাদের হৃদয়েও বহুবর্ণ রামধনু ঝিলিক তোলে। অজস্র ভাবনা বাঙ্ময় হয়ে উঠবার জন্য হৃদয়ের রক্তধারায় উত্তাল ঢেউ তোলে। ভাবনাগুলো কথা, কথাগুলো গান এবং গানগুলো যখন সুরে সুরে গুঞ্জরণ তোলে তখন তাতে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, বিপুল সুখানুভূতি তারা অনুভব করে, তা তাদের জ্যোৎস্না রাতে নৃত্যগীতের আসরে না দেখলে সহজে অনুমান করা সম্ভব নয়।

লোকগীতির ধর্মই হল মুহূর্তের ভাবনাকে অল্প কয়েকটি শব্দে চিরন্তন করে তোলা। আদিম সমাজের লোকগীতির বৈশিষ্ট্যই হল এই স্বল্পায়তন। আদিম মানুষের পক্ষে কোন বিশেষ ভাবনাকে দীর্ঘকাল ধরে মনের মধ্যে লালন করা সম্ভব ছিল না, তেমনি কোন ভাবনার জের টেনে তাকে দীর্ঘ কলেবর দেওয়াও তার পক্ষে সহজ ছিল না। অন্য পক্ষে, কোন দীর্ঘ রচনা স্মৃতিতে ধরে রাখবার মতো মানসিক ক্ষমতাও তাদের ছিল না। আলোচ্য লোকগীতিগুলো থেকে এর আভাস সহজেই মিলবে।

বিচিত্র এই পৃথিবীর ওপর চোখ রেখে আদি মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। যার ব্যাখ্যা সে দিতে পারে নি, তাকেই দেবতা বানিয়েছিল। এই বিশাল পৃথিবী কেউ-না-কেউ যে সৃষ্টি করেছেন, এ-ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত ছিল। তাই পরম শক্তিময় সেই অদৃশ্য পুরুষকে 'বোঙা' দেবতা বলে ডেকেছে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে ভক্তি নিবেদন করেছে। ভগবান এবং ভক্তের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের মতোই। দুটি ক্ষেত্রেই আত্মসমর্পণ এবং আত্মনিমজ্জন অপরিহার্য। যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিটি অণু-পরমাণুতে, তাই সে কখনো সেই অদৃশ্য পুরুষের কণ্ঠস্বর পাহাড়ের চূড়ো থেকে ভেসে আসতে শুনেছে, কখনো বা নদীর অতল থেকে। নীচের গানগুলো থেকে তাদের এমনিতর হৃদয়-ভাবনা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় :

সিংগী দেকা সিরিমারে জুলেতম প্রভু
ওতে সিরিমাহোম মরেসল জুদা
ওতেরে হুড়িঙ মরংগ সোবেন কো
অমগা নুতুম কো হিয়াতিংগ তনা।
অয়র রেদো অয়রিঙ মে'
গড়া পরোম দিসুম টুণ্ডুতে
দোলা দো দোলাইএ মে'
ইচা বা রাগী চেপেঃ তে।
সূর্যের মতো আকাশে দীপ্তিমান
হে প্রভু, স্বর্গে-মর্তে ছড়াও আলো,
পৃথিবীর প্রাণী তোমাকে স্মরণ করে
তুমি শুধু নাম, দৃষ্টিগ্রাহ্য নও।
আমাদের যদি নিয়ে যেতে চাও তুমি
নদীর ওপারে দেশান্তরে নিয়ে চলো,
ইচা পুষ্পের মধু থেকে মতো আর
আমাদের নিয়ে চলো।

নীচের গানটিতে ভগবান এবং ভক্তের সেই চিরকালীন প্রেমিক-প্রেমিকার লুকোচুরি খেলার ছবিটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর পাহাড়-পর্বত অরণ্য-কন্দর নদী-নালার মধ্যে তাঁর অস্তিত্বের নজির রেখেছেন অথচ তাঁকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁকে দেখার বিপুল ইচ্ছা, অদম্য আকুল বাসনা গান হয়ে পাহাড়ে অরণ্যে শুধু গুঞ্জন তোলে। চিহ্ন তব পড়ে আছে তুমি হেথা নাই। ঈশ্বরের সৃষ্টি কিন্তু ঈশ্বর নেই। সৃষ্টিগুলো যেন ঈশ্বরের হয়ে কথা কয়ে উঠছে :

বুরু রেমা চিরে টিকুরা রেমা
কাজি তেগে হোই আয়ুমেয়া
গাড়া রেমা চিরে জো যেনা রেমা
বাঁকড়া তেগে হোই আতেনমেয়া।
পাহাড়ে আছো কি টিলার ওপরে আছো
শুধুই তোমার আওয়াজ ভেসে আসে
নদীতে আছো কি ডোবার ভেতরে আছো
শুধুই তোমার কথাগুলো ভেসে আসে।

দাম্পত্যপ্রেম লোকগীতির আর একটি বিশিষ্ট বিষয়বস্তু। দাম্পত্য প্রেম নিয়ে কবিদের খুব কমই কবিতা রচনা করতে দেখা যায়। কিন্তু লোকগীতিতে দাম্পত্য-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, ভালোবাসা বিরহ, পরকীয়া প্রেম প্রভৃতি অকাট্য হীরের মতোই ঝকমক করে। এছাড়া যুবক-যুবতীর স্বাভাবিক প্রেম, অসামাজিক প্রেম, অনুরাগ-বিরহ, অভিসার-বিচ্ছেদ আদি লোকগীতির বিপুল অংশ জুড়ে বিরাজ করে। নরনারীর সহজ অনাবিল আকর্ষণে পরস্পর বিদ্ধ হয়ে হারিয়ে-মিলিয়ে যাওয়ার ভাবনা একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বিরহ এই প্রেম-ভাবনাকে এক আশ্চর্য রূপ-সুষমা দান করে থাকে। বিচ্ছেদের পরেও তাই নায়ক-নায়িকা পুনর্মিলনের স্বপ্নে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে বেঁচে থাকে :

অলঙ দিসুমরেলং জোনোম জনা
পুতুম লেকা হোলং জুড়ী জনা
অলয় গময়রেলং মাত্রা জন।
পরায় লেকা হোলং মাতা জনা
পুতুম লেকা হোলং গুড়ী জনা
মোদের গাতিঙ রেলং সুসুন করম
পরায় লেকা হোলং জোতা জনা
অলঙ জী সোবেন মোদে জনা
মোদো রে গাতিঙ রেলং সুসুন করম
কারে গাতিঙ রেলং বাপা গেয়া
আইঙ জী সোবেন মোদে জনা
জিদন সুনুমলং আপা সুলা।
আমরা দুজনে জন্ম নিয়েছি স্বদেশে
কপোতের মতো দ্যাখো
মিলেছি দুজনে।

আমরা দুজনে বেড়ে উঠেছি স্বদেশে
পায়রার মতে জোড়ে মিলেছি দুজনে।
কপোতের মতো জুটি দুজনের হল
আমরা দুজনে মিলে একত্রে
করব নাচগান।
পায়রার মতো জোড়ে যেহেতু মিলেছি
দুজনের দু' হৃদয় মিলে মিশে
এক হয়ে গেছে।
আমরা দুজনে মিলে একত্রে
করব নাচগান
আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি
কখনো হবে না।
আমাদের দুজনের মন-প্রাণ
এক হয়ে গেছে
সারাটি জীবন ধরে দুজনায়
দুজনার ভারাভার নেব।।

এই গানটিতে কপোতকপোতীর উপমাটি আশ্চর্য সুন্দর এক শান্তিপূর্ণ নীড়ের ইংগিতবাহী। লোককবি থেকে শুরু করে সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কবিও এই একই উপমা সুখী গৃহকোণের প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এ প্রসংগে বিখ্যাত পংক্তি 'কপোতকপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে' আমাদের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদয় হয়। আসল কথা, হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে মৌলিক অনুভূতিগুলো সর্বস্তরে সমানভাবেই অনুভূত হয়ে থাকে। নিরক্ষর মুণ্ডা লোককবি তাঁর হৃদয়ের আকুতিকে রূপে দেবার জন্য তাঁর চারপাশের অরণ্য পাহাড়, লতাপত্র, বৃক্ষগুল্ম, পাখিপাখালি, জীবজন্তু আদির মধ্য থেকেই চিত্রকল্প গ্রহণ করেন। শান্তির সংসার, সুখের সংসার বলতে তাঁরা কপোতকপোতীর সংসারকেই বুঝে থাকেন। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে একটি লোক বিশ্বাস আছে যে যে বাড়িতে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে একমাত্র সেই বাড়িতেই পায়রা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। বস্তুতঃ এটি কোন লোকবিশ্বাস মাত্রই নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য।

দাম্পত্যজীবনে বিরহের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীর সর্বদেশেই সাহিত্যে এই বিরহের প্রাধান্য সমধিক লক্ষ্য গোচর হয়। প্রণয়ঘটিত সমস্ত কবিতা এবং কাহিনীর মধ্যে বিরহ সর্বাধিক মধুর হয়ে দেখা দিয়েছে। বিরহ-জ্বালার মধ্যে প্রেম নিখাদ সোনায় পরিণত হয়, অনুভূতিগুলো আরো গাঢ়, আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তখন বিরহী-বিরহিণী প্রেমিক-প্রেমিকা জড়জগতের মধ্যে তার অভিলষিতকে দেখতে পায়। তাই কালো বৃক্ষ, কালো জল দেখে রাধা কৃষ্ণ ভেবে আলিংগন করতে ছুটে যান। বন পুড়তে দেখলে নায়িকার মন পোড়ার কথা মনে পড়ে। দূরদেশে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকার পাখি হতে ইচ্ছে করে, কখনো বা মেঘকে, হংসকে দূত করে যোগাযোগের চেষ্টা করে। প্রিয়জন-সন্দর্শন যখন অনিশ্চিত এবং অমৃত-যন্ত্রণা যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন জলে ডুবে, আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করে অন্তর্দাহের জ্বালা থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। নিচের মুণ্ডা লোকগীতিতে এই আকুলতা অম্লান হয়ে উঠেছে।

(১)
বিরে সেংগেল দো জিলিউ
জিলিউ আ
রাজা পুকুরী দো গুলে গুলে চা
জিলিউ জিলিউ রে সতীন
মোনিঞ আ
গুলে গুলে রে ডবুরান সনাইঞ আ।
অরণ্যে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে
কানায় কানায় ভরা রাজার পুকুর
দাউ-দাউ আগুনে পুড়ে
মরতে ইচ্ছে করে
ভরন্ত পুকুরে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে।

(২)
অমঃ রে জীদো যোল আইজারে কুড়াম
দীরী লেকা গেগোম ডল্যাতিঞ তনা।
বুকের পিঞ্জর আছে, হৃদয় পালিয়ে
গেছে তোমার ওখানে
শকুনের মতো আমি উড়ে ফিরি,
দুই ঘরে সমান আগুন।।

আদিম-ভাবনায় যেমন কোনদিন মৃত্যু স্বীকৃতি পায় নি, তেমনি মুক্ত প্রেম কোনদিন পরাজয়ে নিগড়বদ্ধ হয় নি। বিরহের শেষ আছে, বিচ্ছেদ একদিন মিলনে মধুর হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস লোকজীবনে চিরকাল অপ্রতিহত থেকেছে। প্রোষিত-ভর্তৃকা তাই আগামী কোন 'জাতরা টাঁড়ে' কিংবা 'বামনী মেলায়' পুনর্মিলনের স্বপ্নে অধীর প্রতীক্ষা করে থাকে।

হাসা বুরু হো কো বুরুই রেদো
হাসা বুরু রেলঙ লেপে লরুড়ো
বামনী জাতরা হো কি জাতরায়ে রেদো
বামনী জাতরা রেলঙ চিপনা বুড়া।
হাসা পাহাড়ে যখন লাগবে পরব
আবার দুজনে সেখানে দেখা হবে।
বামনীর টাঁড়ে যখন বসবে মেলা
আবার দুজনে দেখব পরস্পরে।

সন্তান-সন্ততির প্রতি মা-বাবার স্নেহ লোকগীতিতে উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে বিয়ের গানে এই স্নেহ অত্যন্ত গভীর রঙে দেখতে পাওয়া যায়। কন্যার বিয়েতে যে বিচ্ছেদ দেখা দেয়, তাতে মা-বাবার স্নেহ, আশংকা, উদ্বেগ এতোই নিবিড়ভাবে ফুটে ওঠে যে তা সহজেই সবার মন ছুঁয়ে যায়। এতোদিন মেয়ে না-চাইতে সব জিনিস পেয়ে গেছে, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে কে তার চাওয়া-পাওয়া মেটাবে? মেয়ে খোঁপায় ফুল গুঁজতে চাইলে কে তাকে ফুল এনে দেবে? তাই শেষবারের মতো মেয়ের জন্য ফুলের আয়োজন করতে হয়। অনেকের মনে হতে পারে, খোঁপায় ফুল-গোঁজার মতো ব্যাপার নিয়ে এ-হেন উদ্বেগ নেহাতই অস্বাভাবিক; কিন্তু যাঁরা আদিবাসী সমাজের রীতিনীতি জানেন, তাঁরাই জানেন খোঁপায় ফুল বা পাতা গোঁজা আদিবাসী যুবতীদের পক্ষে কি রকম অপরিহার্য ব্যাপার।

নে না মাই হুআ লেকা তোবা বা
নে না মাই বা লেকা মে
নেনা মাই তাড়ী লেকা অটল বা
নেনা মাই ডালী লেকা নে।
কন্যা রে, দ্যাখ বাটির মতোন দুটি ফুল
কন্যা রে, তুই খোঁপায় পরে নে।
কন্যা রে, দ্যাখ থালার মতোন
অটল ফুল
কন্যা রে, তোর ডালির মতোন
খোঁপায় পরে নে।।

পণপ্রথা হিন্দু বাঙালী সমাজের এক ভয়াবহ সমস্যা। বিবাহের আগে ঋণে জর্জরিত হয়ে কন্যাকর্তার যখন মাথায় বাজ পড়ে, ঠিক সেই সময় বরকর্তার লাভ, মোটা অর্থ ও দানসমাগ্রী পাওয়ার আশায় খুশির আমেজে ডুবে থাকেন। বিবাহে ইচ্ছাকৃতভাবে দানসামগ্রী ও অলঙ্কারসমূহ দান করা ছাড়াও পাত্রপক্ষ যখন কন্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে করে পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে জোর করে 'কিছু অর্থ', অলঙ্কার ও দানসামগ্রী আদায় করে নেন তখনই তাকে 'পণপ্রথা' নামে অভিহিত করা হয়। নিম্নজাতির মধ্যে পাত্রপক্ষকে কন্যার বিনিময়ে অর্থ বা অন্য কোনও দ্রব্যসম্ভার দিতে হয়। তাকে সাধারণতঃ 'কন্যাপণ' বলা হয়।

এই যৌতুকপ্রথার রূপ যে কি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, তা আমরা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসসমূহে ভালভাবে দেখতে পাই। বিবাহের সময় সম্প্রদানের আসরে থালায়

পুঞ্জীকৃত টাকার নোট ও বরকর্তার সোনার [illegible] ওজন করে নেওয়া এক চিরাচরিত [illegible]ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত [illegible]কে অর্থবান পাত্রের হাতে দিতে গিয়ে [illegible] জর্জরিত হওয়া বা পাত্রপক্ষকে তাদের চাহিদানুযায়ী অর্থ দান করতে না পারার [illegible] পাত্রীর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা এমনকি পাত্রীকে হত্যার ঘটনাও আমাদের কাছে অবিদিত নয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের নেতৃবৃন্দ এদিকে নজর দেন ও আইনের মাধ্যমে এই ভয়াবহ প্রথাকে বন্ধ করার দিকে সচেষ্ট হন। ১৯৬১ সালে এই প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এক নতুন আইনের প্রবর্তন হল যার নাম হল 'Dowry Prohibition Act' এই আইনের মোটামুটি জিনিসগুলি হল ঃ ২৮ নং ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি কোনও মানুষ পণ দেয় বা নেয় তিনি ছয় মাসের কারাদণ্ডে না ৫,০০০ টাকার জরিমানায় দণ্ডিত হবেন। ঐ ধারারই ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পাত্রপক্ষ যদি যৌতুক বা পণ গ্রহণ করেন তবে পাত্রপক্ষকে তা পাত্রীকে এক বছরের মধ্যে ফেরৎ দিতে হবে। ঐ ধারার ৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিযোগকারীকে পণগ্রহণের এক বছরের মধ্যে আদালতে আবেদন করতে হবে। [illegible] ব্যাখ্যায় যৌতুক বা পণের মধ্যে [illegible] অন্তর্ভুক্ত হয় না।

পণপ্রথাকে আইনের আওতায় আনা হলেও আদালতের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে এই আইনের অভিযোগকারীর নজীর [illegible] নেই বললেই চলে। কিন্তু [illegible] মাধ্যমে যদি কোনও পাত্রীকে কোনও [illegible] পাত্রের হাতে সমর্পণ করা যায়, কে [illegible] আইনের মাধ্যমে তার সঙ্গে অসম্ভাব [illegible]।

সমাজ আমাদের ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে সভ্যতা ও শিক্ষার দিকে। মানুষ ক্রমশঃ শিক্ষিত ও সভ্য হচ্ছে, উদ্দেশ্য তার সভ্য সমাজ তৈরী করা। আমরা মনে করি, মানুষ যত শিক্ষিত ও সভ্য হবে তার নীচতা, [illegible], আদিম বর্বর জাতির বর্বরতা ও পাশবিকতা হতে সে মুক্ত হবে। লোভের বশবর্তী হয়ে কোনও মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার প্রবৃত্তিকে আমরা নিশ্চয়ই মানুষের নীচ ও হীন প্রবৃত্তির আওতায় ফেলব। কিন্তু শিক্ষিত ও সভ্য হয়ে আমরা সত্যিই কি এই নীচতাকে আমাদের মধ্য থেকে দূর করতে পেরেছি না তা আরও প্রকট হয়ে আমাদের অক্টোপাসের মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা প্রায়ই বলে থাকি পণপ্রথার সেই ভয়াবহতা আর সমাজে এখন নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আগের তুলনায় আরও ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে। রূপ হয়েছে তার অন্য, সোজাসুজি না চেয়ে মাছ কেনার মত দরকষাকষি না করে ঘুরিয়ে সাজিয়ে ভাবার কিছু আদায় করার পদ্ধতি আরও প্রকট হয়ে আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। আদায় করার এই রূপটা সম্ভবতঃ শিক্ষিত ও বিত্তশালীদের মধ্যে আরও বেশী। লোভের মাত্রাটাও তাদের গরীব বা মধ্যবিত্তদের তুলনায় অনেক বেশী প্রকট। এই প্রসঙ্গে রবিঠাকুরের সেই উক্তিটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি'। বিভিন্ন পদ্ধতিতে আদায় করবার দুটি উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে:—

প্রথম উদাহরণটি হল আদালতের জজের একমাত্র পুত্রের বিয়ের ব্যাপারে। প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক, বাড়ী, গাড়ী কিছুরই তার অভাব নেই। বিয়ে ঠিক হল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক পাত্রীর সঙ্গে। বিবাহ প্রস্তাব পাকাপাকি করার সময় বর-কর্তা পাত্রীর পিতাকে বললেন, 'কি আর দেবেন, আমার ত সবই আছে, দিতে আপনাকে কিছুই হবে না।' ক্রমে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হল, আশীর্বাদও যথা-রীতি হয়ে গেল অর্থাৎ বিয়ের প্রাক পর্ব সমাধা হল, নিমন্ত্রণপত্র যথারীতি ছাপা হল। এদিকে বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসে পাত্র-পক্ষ থেকে ঘন ঘন টেলিফোনে নানা রকম ফরমাস আসতে শুরু করে। যথা, 'একটা রেফ্রিজারেটর আপনি নিশ্চয়ই দিচ্ছেন এত আর বলার কিছু নেই, তবে হীরের আংটি যখন দিচ্ছেন সঙ্গে হীরের বোতাম দিতে যেন ভুলবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিয়ের আয়োজন প্রায় সমাপ্ত কন্যাকর্তার ফিরবার আর কোন উপায়ই নেই, অর্থ ও সম্মান দুয়েরই প্রশ্ন আছে। অগত্যা কন্যাকর্তাকে তার সব সম্বল শেষ করে দেনায় জর্জরিত হয়ে পাত্রপক্ষের ফরমাস পূরণ করতে হয়।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম শ্রেণীর এক অতি উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর। কলকাতায় কোনও এক সম্ভ্রান্ত এলাকায় বিরাট তাঁর অট্টালিকা। ভদ্রলোকের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম নিজে পছন্দ করে বিবাহ করেছেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ পিতা দেবেন বলে মনস্থ করেছেন। পাত্রীপক্ষের সঙ্গে যথারীতি কথাবার্তা শুরু হল। প্রতিবারই বরকর্তা কন্যাকর্তাকে বলেন, 'আপনার মেয়ের বিয়েতে কিছুই আপনাকে দিতে হবে না' এবং কন্যাকর্তা বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, 'আর কিছু নয়, শুধু নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেবেন।'

এছাড়াও আছে 'বিয়ের সময় যা দেবেন তাতে আমার মুখ যেন বজায় থাকে। অর্থাৎ বাড়ী ও আসবাবপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আপনি জিনিষ দেবেন।' পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় যে, এসবের অধিকাংশই বিত্তশালী-দের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, আছে তালিকা করে জিনিষের ফরমাশ দেওয়া, তবে সাধারণতঃ তা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে বিত্তশালী-দের মধ্যেও যে এ জিনিষ একদম নেই, তা বলা চলে না। যৌতুকপ্রথার হাত হতে রক্ষা পাবার জন্যে অনেক পিতা বর্তমান যুগে তাদের কন্যাকে ছেড়ে দেন তাদের নিজের পছন্দমত পাত্রকে খুঁজে বার করার জন্যে। এখানে কন্যাকর্তার যৌতুকের কবল হতে মুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। তবে, এরকম উদাহরণও আছে অনেক পাত্র পিতামাতার এই চাহিদার হাত হতে রক্ষা পাবার জন্যে ও বন্ধুসমাজে নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে নিজেরা তাদের মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু আবার এরকম দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, সমাজে উন্নত ও শিক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে থেকে বিয়ের সময় পিতার একান্ত অনুগত পুত্র হয়ে পাত্রী-পক্ষকে ছোবল মারার চেষ্টা করেন। আর মজা হল এইসব পণগ্রহণ-কারী পাত্র ও পাত্রের পিতাই তারপর পণপ্রথার উচ্ছেদের জন্যে লোকসমাজে নানা-রকম বিরূপ মন্তব্য করে বড় বড় বুলি আওড়ান।

আদিম, বর্বর মানুষের মধ্যে এইভাবে ঘুষ দেওয়া বা নেওয়ার কোনও প্রথা ছিল না। তারপর মানুষ সভ্য হতে শুরু করে, শুরু হয় তার ঘুষ দেওয়া নেওয়ার পর্ব। তবে কি, লোভ মানুষের সভ্যতা বা শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত? আর মানুষের এই অন্তর্নিহিত লোভের বলি যখন হয়ে ওঠে গরীব, সাধারণ মানুষ, তখন কি তাকে আইনের মাধ্যমে বন্ধ করার কোনও উপায় আছে?

জলসা

একটি নমস্কারে

বহুদিন বাদে আবার মহাজাতি সদনে দেখলাম শ্রোতার জনতা, না জনতার ঢেউ? প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে, বারান্দায়, মহাজাতি সদনের চারপাশের রাস্তায় অন্তহীন শ্রোতার উজ্জ্বল দৃষ্টি, উৎসুক কান। উপলক্ষ? দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ নচিকেতা ঘোষের উদ্যোগে ও যুগ্ম-পরিচালনায় শিল্পীরা মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের অনুষ্ঠান দিয়ে গুরু মাধবানন্দজীর আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে। এ যেন গুরুর চরণে শিল্পীদের শ্রদ্ধানত প্রণতি। এই আবেগমধুর সন্ধ্যা ভোলার নয়।

অনুষ্ঠানের শুরু নচিকেতা ঘোষ ও বনশ্রী সেনগুপ্তের দ্বৈতকণ্ঠে 'গুরুর কৃপা পাওয়া অমন সহজ কথা নয়' দিয়ে। সুরকার নচিকেতা ঘোষকে গায়করূপে শোনবার সুযোগ এই প্রথম পাওয়া গেল। স্বচ্ছ, সুন্দর কণ্ঠে ভক্তিভাবের ছোঁয়া পরিবেশটি বড় পবিত্র লাগছিল। বিশেষ করে 'যারা জানে, তারা মানে'-তে দিলীপ রায়ের আখরের শৈলী ভারী লাগসে হয়েছে। বনশ্রীর আন্তরিক সহযোগিতা অনুষ্ঠানটির সার্থকতার সহায়ক হয়েছে।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ আধুনিক গানের তারকাসদৃশ শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু তরুণ শিল্পীদেরও আত্মপ্রকাশের প্রশস্ত অবকাশ দেবার জন্য। এঁরা হলেন সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরাঙ্গ দেব। যথাযোগ্য মানে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে এঁরা এ সুযোগের মর্যাদা রেখেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য গৌরাঙ্গ দেবের ইলেকট্রিক গীটার বাদন। ইনি বিগত যুগের প্রখ্যাতা নায়িকা শ্রীমতী উমাশশীর পুত্র। এঁর হাতেই শুধু সুরেলা নয়, বাদনশৈলীতেও ছিল প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

উৎপলা সেন আজকের শিল্পী নন। কিন্তু এঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য যে আজও চিত্তস্পর্শী তারই উজ্জ্বল প্রমাণ সেদিনের শ্রোতাদের করতালি মুখর অনুষ্ঠান। 'প্রান্তরের গান আমার' যেন কোন ভুলে যাওয়া নির্জন প্রান্তরকে মনে করিয়ে দিয়েছে। পরের গান দুটি হোলো 'তুমি কত সহজে' ও 'কিংশুক ফুল।'

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাচে ময়ূরী নাচে'—শুরু হতে না হতেই সারা প্রেক্ষাগৃহে যেন এক ঝলক বসন্ত বাতাস উল্লসিত পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিশেষ অনুরোধে ইনি গাইলেন পুজোর সেই হিট সঙ 'কইগো, কইগো কই'। নির্মলা মিশ্র ও বনশ্রী সেনগুপ্ত তরুণ শিল্পী তাঁদের খ্যাতিতে সু-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রাগভিত্তিক সঙ্গীতে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ স্থান আছে। 'সহেলী আমার'—গানটি যেন সেই কথাটিই মনে করিয়ে দিল। এই প্রতিভাবান শিল্পী গতানুগতিক প্রেমসঙ্গীত গেয়ে প্রতিভার অপচয় না ঘটিয়ে যদি রাগপ্রধান, গজল ও ঠুংরী চালের গানে আত্মনিয়োগ করেন—তাহলে বাংলা গানের অধ্যায়ে এঁর কিছু স্থায়ী অবদান থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

নির্মলেন্দু চৌধুরীর উল্লাস চঞ্চল লোকসঙ্গীত যথাযোগ্য আনন্দ দিয়েছে। মিন্টু দাশগুপ্তের কৌতুক গীতিও উপভোগ্য হয়।

সবার শেষে মঞ্চে এলেন উৎসবের প্রধান আকর্ষণ পদ্মশ্রী মান্না দে। একঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে ইনি ধারাসারে জনপ্রিয় গানগুলি পরিবেশন করে শ্রোতাদের প্রাপ্তির অঞ্জলি ভরে দিয়েছেন।

যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা ও তবলা সঙ্গত দিয়ে প্রতিটি অনুষ্ঠান সুন্দর করে তুলেছিলেন যে সব সঙ্গতকার তাঁরা হলেন অমর দত্ত (টোপাবাবু), ওয়াই এস মুলকী, খোকন মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রায়, প্রবীর বক্সী, রাধাকান্ত নন্দী, রাণাপ্রতাপ মুখোপাধ্যায়, নীলকান্ত নন্দী, শ্যাম মুখোপাধ্যায়, কমল সেনগুপ্ত, স্বপন মুখোপাধ্যায়, যশোদা মুখোপাধ্যায়, স্বপন মিশ্র, বারীন অধিকারী, কালিদাস নন্দী, ব্রজকুমার দাস, প্রীতিময় গোস্বামী, শীতল মিত্র, ও সমর মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতানুষ্ঠান

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত একক সঙ্গীতের আসরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা—আজ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে নেই এ আজ নিশ্চিত জনপ্রিয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্র সদনে সম্প্রতি সঙ্গীতচক্র নিবেদিত ধীরেন বসুর একক সঙ্গীতের আসরের সাফল্য এই সত্যেরই এক উল্লেখযোগ্য নজীর।

প্রথমার্ধে ধীরেন বসু পরিবেশন করেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। নখানি সুনির্বাচিত গানে কবিমানসের বিভিন্ন দিক প্রতিফলনের নিষ্ঠা ও চেষ্টায় শিল্পীর দিক থেকে কোনো ত্রুটি ছিল না।

তবে শিল্পীর কৃতিত্ব সমধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে দ্বিতীয়ার্ধে নজরুল সঙ্গীতে।

অঞ্জলি লহ মোর—দিয়ে এ পর্যায়ের আরম্ভ। তারপর বিলম্বিত লয়ে 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন' (গজল) দিতে এলে ফুল), ঠুংরী (মোর না মিটিতে সাধ) বিদেশী সুরে (দূরে দ্বীপবাসিনী), রাগ-প্রধান (শূন্য এ বুকে), ভাটিয়ালী (আমার গহীন জলের)-র নানারঙা আলোছায়া ঘেরা পথ বেয়ে যখন 'ফুলের জলসা'র উপসংহারে এসে পৌঁছলেন—এক অনামা বিষণ্ণতায় যেন শ্রোতৃচিত্ত ভরে ওঠে। এ গানটির অবশ্যম্ভাবী আবেদন ভোলার নয়।

সর্বভারতীয় সংগীত সমাজ

মহাজাতি সদনে মঞ্চস্থ সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজ এবার স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাতদিনব্যাপী আসর বসান মহাজাতি সদন মঞ্চে।

কণ্ঠসঙ্গীতে মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, এ কানন, মালবিকা কানন, সুভাষ চাকলাদার, অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত—খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন কমল বসু, শ্রীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি মুখোপাধ্যায়ের মত উদীয়মান তরুণ শিল্পীরা। নারায়ণ রাও যোশী ও নিতাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রবীণ শিল্পীরা।

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌশিকী কানাড়া ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগেশ্রী যথাক্রমে আঙ্গিক কৌশলে ও আবেগ বিহ্বলতায় সুচিহ্নিত।

এ কাননের 'আভোগী'তে মেজাজের স্বাক্ষর ছিল। তবে সময়াভাবে সুবিস্তৃত হতে পারেনি।

আমীর খাঁর ছাঁচে গাওয়া অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেহাগ জায়গা বিশেষে খুবই ভাল লেগেছে।

শ্রীলা বন্দ্যোপাধ্যায় গীত পুরিয়া কল্যাণে সুশিক্ষার ছাপ আশাপ্রদ।

শান্তি মুখোপাধ্যায় গীত 'সরস্বতী' নবীনা শিল্পীর ক্রমাগ্রসরের—রূপ সুস্পষ্ট। অনিয়ন্ত্রিত মাইক্রোফোনের দৌরাত্ম্যে এঁর গান ভাল করে উপভোগ করা গেল না।

যন্ত্রসঙ্গীতে সমমানে বাজিয়েছেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকণা। একজনের আছে আবেগ অন্যের বুদ্ধিদীপ্ত বাদনশৈলী।

কল্যাণী রায় ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর দ্বৈতবাদনে কাফি-কানাড়া জমে উঠেছিল—বিষাদ ও উল্লাসের শিল্পসম্মত ও সংযত মিলনের কারণে।

শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় ও রাধিকামোহন মৈত্র দুই প্রবীণ শিল্পী আপনাপন মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

নৃত্যে ছিলেন সুপরিচিতা শ্রীলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশু শিল্পী শিরালী সেনগুপ্ত।

—[illegible]

* * *

আর একটি বাঙলা ছবির সার্থক হিন্দী চিত্ররূপ

১৯৬৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এস-আর-বি প্রোডাকসন্স-এর বাঙলা ছবি, সুশীল মজুমদার পরিচালিত **'লাল পাথর'** যে সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, সে-কথা, বোধকরি, পাঠকদের স্মরণে আছে। প্রশান্ত চৌধুরী রচিত সেই একই কাহিনী অবলম্বনে **ঈগল ফিল্মস-এর নিবেদন ইস্টম্যান কলার রঞ্জিত 'লাল পাথর'** ছবিটি সেদিনের সেই জনপ্রিয় বাঙলা 'লাল পাথর'-এরই যে হিন্দী সংস্করণ, একথাও বোধকরি, কাউকে বলে দিতে হবে না। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ২৪ মার্চ তারিখে মুক্তিপ্রাপ্ত এই হিন্দী ছবিটিরও পরিচালক হচ্ছেন সুশীল মজুমদার।

যখনই কোনো বাঙলা ছবির হিন্দী সংস্করণ করা হয়েছে, তখনই দেখা গেছে, হিন্দী দর্শকদের রুচির দোহাই দিয়ে তার এমন একখানি রূপ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যাতে বাঙলা ছবির সামগ্রিক উপভোগ্যতাটিকে কোনো মতেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দের বিষয়, হিন্দী 'লাল পাথর' এর একটি উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। নবেন্দু ঘোষ রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে, বোম্বের কলাকুশলী, শিল্পী ও সুরকারদের সহযোগিতায় শ্রীমজুমদার আমাদের যে হিন্দী 'লাল পাথর' ছবিটি উপহার দিয়েছেন, তার ঔজ্জ্বল্য তাঁর মূল বাঙলা ছবিটিকে অনেকাংশে ম্লান করে দিয়েছে। বাঙালী দর্শককে বাঙলা ছবির হিন্দী সংস্করণ দ্বারা মুগ্ধ করার সুকঠিন কর্মে শ্রীমজুমদার সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

জ্ঞানশঙ্কর, সৌদামিনী (যার জ্ঞানশঙ্কর প্রদত্ত নাম হচ্ছে মাধুরী) ও সুমিতা—এই তিনপ্রধান ভূমিকায় যথাক্রমে রাজকুমার, হেমা মালিনী ও রাখীর স্মরণীয় অভিনয় দর্শকদের প্রায় অভিভূত করে রাখে। বিশেষ করে সুন্দরী হেমা মালিনীকে আমরা, বোধ করি, এই প্রথম পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাবভঙ্গীসহ নাট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে দেখলুম এবং এর জন্যে আমরা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দেব পরিচালক শ্রীমজুমদারকে। পিতৃগৃহের দূষিত আবহাওয়া থেকে দূরে মাতুলালয়ে মানুষ-হওয়া, ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বে এম-এ পাশ জ্ঞানশঙ্করের জটিল চরিত্রে কৃতী অভিনেতা রাজকুমার অত্যন্ত সাবলীলভাবে জীবন্ত অভিনয় করেছেন। অদৃষ্টের ক্রীড়নক সুমিতার ভূমিকায় রাখী পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন। আর আশ্চর্য মনোহারী অভিনয় করেছেন স্বয়ং পরিচালক শ্রীমজুমদার সুমিতার জুয়াড়ী পিতা হরিশ চক্রবর্তীর টাইপ চরিত্রটিতে। মাঝে মাঝে বাঙলা স্বগতোক্তি তাঁর গৃহীত চরিত্রটিকে আশ্চর্য উপভোগ্যতা দিয়েছে। এ-ছাড়াও যে-সব শিল্পী অপরাপর

প্রেক্ষাগৃহ

[illegible] : অপর্ণা সেন

ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন বিনোদ মেহেরা (শেখর), পেন্টাল (ছোটু), সাধনা খোটে (ছোটুর স্ত্রী ময়না), অসিত সেন, পদ্মা খান্না, অজিত, সপ্রু প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চশ্রেণীর। বিশেষ করে শিল্প-নির্দেশনার গুণে ছবিটির পটভূমিকা একটি বিশ্বাস্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রাণ মেহেরার দক্ষ সম্পাদনা ছবিটির টেম্পোকে এমনভাবে বজায় রেখেছে যে, দীর্ঘ ছবিটিকে দর্শক দেখেছেন প্রায় রুদ্ধ-নিশ্বাসে। 'লাল পাথর' ছবিটির আর একটি বড়ো আকর্ষণ হচ্ছে এর সঙ্গীতাংশ। সুপ্রযুক্ত সুরসমৃদ্ধ পাঁচখানি গান ছাড়া শঙ্করজয়কিষেণ কৃত আবহ-সঙ্গীত ছবির বিভিন্ন পরিস্থিতির নাটকীয়তাকে প্রচুর ভাবে বর্ধিত করেছে।

এফ. সি. মেহেরা প্রযোজিত ও সুশীল মজুমদার পরিচালিত ঈগল ফিল্মস-এর ইস্টম্যান কলার রঞ্জিত 'লাল পাথর' ছবিটি কাহিনীর অভিনবত্ব, অভিনয়ের মনোহারিত্ব সঙ্গীতাংশের মাধুর্য এবং সামগ্রিক প্রয়োগপারিপাট্যগুণে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে।

সেই দুর্ধর্ষ শৃংখলাভংগকারী সেনানায়ক

পৃথিবীর সামরিক বাহিনী সর্বত্রই নিয়মশৃঙ্খলার অধীন। কিন্তু কোনও সেনাবাহিনীর সেনানায়ক নিজেই যদি শৃংখলাবোধকে বিসর্জন দেন, তাহলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায়? অধীনস্থ সৈনাদের যে বিশ্রামের প্রয়োজন, সব সময়ে তাদের যে ঝটিকার গতিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, এ-সব তথ্যকে যিনি অস্বীকার করেন, তিনি কি সেনানায়ক হবার যোগ্য? —ভদ্রলোকের মুখে সব সময়েই 'বেজন্মা' প্রভৃতি অশ্লীল ভাষা শোনা যেত, আবার সময় পেলেই তিনি বাইবেল ধর্মগ্রন্থ পড়তেন, এক সময়ে কোনো আহত সৈন্যের কষ্ট দেখে অশ্রু বিসর্জন করতেন, আবার কোনও সৈন্যের স্নায়বিক দুর্বলতা দেখলে ক্ষেপে গিয়ে তাকে চপেটাঘাত করতেন— এমনই এক বিচিত্র অমিতসাহসী ভদ্রলোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে আমেরিকান সেনানায়করূপে অবতীর্ণ হয়ে বিপক্ষ দলকে পর্যুদস্ত করেছেন। ১৯৪৩-এ আফ্রিকার ক্যাসেরাইন গিরিবর্ত্মে জেনারেল রোমেল যখন আমেরিকার দ্বিতীয় সৈন্যবাহিনীকে বিশ্রীভাবে পরাজিত করেছিলেন, তখন এই বিচিত্র ব্যক্তি—জেনারেল জর্জ, এস, প্যাটন (জুনিয়ার)কে ঐ দলের নায়কত্ব দেওয়া হয়। তিনি তখন ঐ ভাঙাচোরা দলটিকে নতুন করে গড়েন এবং এমনভাবে তাদের মনোবল তৈরী করেন যে, এল গুয়েত্তার-এ তিনি রোমেলের দশম প্যানজার বাহিনীকে চরমভাবে পরাস্ত করতে সমর্থ হন। এর পর যখন ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল মন্টোগোমারির সঙ্গে একযোগে আমেরিকান সৈন্যদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করবার কথা ঘোষিত হয়, তখন প্যাটনকে সপ্তম সেনাবাহিনীর নায়কত্ব করতে দেওয়া হয় সিসিলি আক্রমণের জন্যে। প্যাটনের কিন্তু একটি নিজস্ব চিন্তাধারা ছিল তিনি অনবরতই কামনা করতেন অসম-সাহসিকভাবে যুদ্ধজয় করে খ্যাতি লাভ করবার জন্যে। তাই যখন মন্টোগোমারির মতলব অনুযায়ী তাঁকে যুদ্ধ চালনা করতে বলা হয়, তখন তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হন, কারণ যুদ্ধজয়ের সকল গৌরব মন্টো-গোমারিই আত্মসাৎ করবার সুযোগ পান। এই সময় থেকেই প্যাটন জীবনের শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের মনোভাব নিয়েই সেনা-নায়কত্ব করে যান। আমেরিকা এবং ইংরাজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে না লড়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে গিয়ে ভুল করেছে, এ-কথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং সময়ে অসময়ে তাঁর এই বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করতেও ছাড়েননি। —তাই শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎগতিতে ইয়োরোপের জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলসমূহকে মুক্ত করবার পরেও তাঁকে সৈন্যবিভাগ থেকে অপসারিত করা হয়। —অবশ্য আমেরিকা এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তাঁরই নামে একটি বিশেষ ধরনের শক্তিশালী ট্যাঙ্কের নামকরণ করে।

—এই স্বাধীনচেতা, অমিতবিক্রম সেনানায়ক জেনারেল জর্জ, এস, প্যাটন (জুনিয়ার)-এর অতি বিস্ময়কর জীবননাট্যটি বিধৃত হয়েছে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স নিবেদিত, ফ্র্যাঙ্ক ম্যাকার্থি প্রযোজিত এবং ফ্রাঙ্কলিন, জে, স্যাফনার পরিচালিত বিরাট চিত্র 'প্যাটন'-এর মাধ্যমে। পুরো দু'ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটকালব্যাপী এই বিরাট ছবিটি প্রতিটি ক্ষণে যে আশ্চর্য বাস্তবতার নিদর্শন দর্শকদের সামনে তুলে ধরে,

অর্পণা/তনুজা

নামভূমিকায় জর্জ এস স্কট

মেমসাহেব/উত্তমকুমার-অপর্ণা সেন

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। এবং সমস্ত ছবিটি ব্যেপে রয়েছে নায়ক প্যাটন-এর ভূমিকায় জর্জ, সি. স্কট-এর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়—না, অভিনয় নয়, এ হচ্ছে জীবন্ত রূপারোপ। শ্রেষ্ঠ চিত্র, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ শব্দানুলেখন, শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশনা—এই সাতটি অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত 'প্যাটন' ছবিটি পৃথিবীর চলচ্চিত্রেতিহাসে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি-রূপে কীর্তিত হবে।

স্টুডিও থেকে

এই খররৌদ্রে তাপিত কোলকাতার স্টুডিওগুলোতে কর্মব্যস্ততা অব্যাহত। আপনাদের জানা আছে কিনা জানি না—কোলকাতার সমস্ত স্টুডিওতেই ফ্লোরগুলো টিনের ছাউনিতে তৈরী। সুতরাং বেলা বাড়ার সংগে সংগেই স্বাভাবিক নিয়মে ফ্লোরগুলোতে অত্যধিক গরমে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া স্যুটিংয়ের সময় সহস্র সহস্র পাওয়ারের লাইটের ফোকাস তো আছেই। এমতাবস্থায় নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন শিল্পী ও কলাকুশলীদের অসহনীয় অবস্থার কথা। শুধু তাই নয় 'মনিটর' (রিহ্যার্সাল) কিংবা 'ফাইনাল টেক' করার সময় পাখা চালানোর উপায় নেই—কেননা সূক্ষ্ম শব্দ-যন্ত্রে পাখার আওয়াজ বাণীবদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এই অসহ্য ভ্যাপসা গরমে শিল্পী ও কলাকুশলীদের কি চরমতম দুর্দশা! এক-একটি ছোট শট্ টেক করতে আনুমানিক সময় লাগে পনেরো থেকে বিশ মিনিট। এত পরিশ্রম, এত কষ্ট সহ্য করে যখন ছবিটি সম্পূর্ণ হয়ে মুক্তিলাভ করলো—আপনারা (দর্শক সাধারণ) চিত্র-গৃহে বসে এক কথায় ছবিটির বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। একবারও চিন্তা করে দেখেন না—কত পরিশ্রম, কত কষ্ট, কত বিঘ্নিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শিল্পীরা তাঁদের অভিনীত চরিত্রটি বাস্তব জীবনসম্মতরূপে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।...

এবারে চলুন যাওয়া যাক টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। ওখানে স্যুটিং হচ্ছে অসীমা ভট্টাচার্য প্রযোজিত ও সুরারোপিত 'মেম-সাহেব' ছবির।

ফ্লোরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হোল। দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ ইংরাজিতে প্রবেশ নিষেধ।

তাছাড়া প্রোডাকশনের জনৈক সহকারীর মুখে জানতে পারলাম—আজকের স্যুটিং-এ বাইরের কোন লোককে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পরিচালকের নির্দেশে কেননা উত্তম-কুমার ও অপর্ণা সেনকে নিয়ে আজ কয়েকটি বিশেষ রোমান্টিক দৃশ্যগ্রহণ চলছে।

সাংবাদিক আমি—আমাকে যে নিত্য-নতুন তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করতেই হবে। তা না হলে আমার কৃতিত্ব কোথায়?

অবশেষে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ফ্লোরের ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম একটি সুন্দর সুসজ্জিত ড্রইংরুম। ব্যাক টু ক্যামেরা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তম (অমিত) ও অপর্ণা (কাজল)।

পরিচালক পিনাকী মুখার্জী দৃশ্যটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন উত্তম ও অপর্ণাকে। মণিটর শুরু হল। দৃশ্যটা ছিল অমিত একজন সাংবাদিক। তাকে ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ কভার করতে যেতে হচ্ছে ইস্টার্ণ সেকটরের বিভিন্ন স্থানে। তাই অমিতকে বিদায় জানাতে ছুটে এসেছে অমিতের প্রেয়সী এবং ভাবী জীবনসঙ্গিনী কাজল ওরফে মেমসাহেব। মেমসাহেবের প্রেম-ভালবাসা ও অনুপ্রেরণায় অমিত আজ ধাপে ধাপে সাফল্যের সর্বোচ্চশিখরে। অমিতের জীবনে মেমসাহেবের যদি আবির্ভাব না হতো, যদি না সে মেম-সাহেবের অকৃত্রিম ভালবাসা পেতো, তাহলে

যাদুকর পি সি সরকারের (জুনিয়ার) ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীতে উপস্থিত জওয়ানরা

হয়তো এতখানি সাফল্য তার জীবনে পুনরপরাহত ছিল। তাই সাংবাদিক অমিতের জীবনে মেমসাহেবের দান অপরিসীম।

যদিও এখানে অপ্রাসংগিক তাহলেও মেমসাহেব প্রসংগে সাংবাদিক অমিতের স্বীকারোক্তির কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি:

'মেমসাহেবের ভালবাসা ক্রমে ক্রমে আমার সমগ্র জীবনকে জীবনসত্ত্বাকে আলিংগন করলো। শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত প্রিয়সংগিনী নয়, শুধু যৌবনের আনন্দমেলার পার্শ্ববর্তিনী নয়, মেমসাহেব আমার সামগ্রিক জীবনের অংশীদার হলো।

...সেদিন আমার জীবন উৎসবের পর-মুহূর্তে কোন পুরোহিত মন্ত্র পড়েননি, কোন কুলবধূ শাঁখ বাজান নি, আত্মীয়-বন্ধু সাক্ষী রেখে মালা বদল করিনি কিন্তু তবুও আমরা দুজন জেনেছিলাম আমাদের দুটি জীবনের গ্রন্থিতে অচ্ছেদ্য বন্ধন পড়ল।'

যাক এবারে ফাইনাল টেক করা হবে। পরিচালকের নির্দেশে সারা ফ্লোরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। পরিচালক শ্রীমুখার্জী নির্দেশ দিলেন: —স্টার্ট ক্যামেরা, স্টার্ট সাউন্ড—

সহকারী পরিচালক রঞ্জন মজুমদার ক্ল্যাপস্টিক দিলেন।

কাজল: তুমি সাংবাদিক, তোমাকে সব জায়গাতে যেতে হবে।

অনেক সময় হয়তো বিপদের মুখো-মুখি গিয়েই দাঁড়াতে হবে। তোমাকে যে আটকে রাখবো এমন ক্ষমতাও আমার নেই।

অমিত: তুমি এত আপসেট হচ্ছো কেন! দেখবে ক'দিন পরেই আমি অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছি।

(এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ণ ভেসে এল। অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো কাজলের চোখে-মুখে উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠলো)

কাজল: আমার বড় ভয় করছে। সাবধানে থেকো। আমার কথা ভেবে—আমার মুখ চেয়ে অন্ততঃ এইটুকু কোর।

অমিত: তোমাকে দুর্বল দেখলে আমিও যে দুর্বল হয়ে পড়ি মেমসাহেব। জীবনে যা কিছু করতে পেরেছি—সবই তো তোমার জোরে।

[কাজল তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে অমিতের ঠোঁট চেপে ধরে]

কাজল বলে: না, না, ওকথা বলো না। তোমার নিজের মধ্যে গুণ ছিল, তার জোরেই তুমি দাঁড়িয়েছো।

[আবার মোটরের হর্ণ বেজে উঠতেই কাজল নীচু হয়ে অমিতকে প্রণাম করতে যেতেই অমিত কাজলকে বুকে টেনে নিয়ে বলে:

—একি, তুমি তুমি কাঁদছো মেম-সাহেব? অতদূরে গিয়ে তোমার এই মুখ মনে পড়লে আমার কষ্ট হবে না?

[কাজল অতিকষ্টে তার চোখের জলকে সংযত করতে চেষ্টা করে, অমিত তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়]

অমিত: ভয় কি? তুমি তো বিশ্বাস কর, তোমার স্বপ্নকে ভেঙে দেবার ক্ষমতা আমারও নেই—এমন কি স্বয়ং ভগবানেরও নেই। দেখ, তোমার এই বিশ্বাস, তোমার ভালবাসা আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

আবার মোটরের হর্ণ বেজে উঠতেই কাজল অমিতকে জোরে বুকে টেনে নিল। দুজন-দুজনের উষ্ণ উত্তাপে ক্ষণিকের জন্য যেন অন্য এক জগতে চলে গেল। তারপর অমিত আস্তে আস্তে কাজলের পিঠে-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—চলি।

অমিত ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল। কাজলের চোখে অশ্রুর বন্যা নেমে এল।

আমিও যেন নিজেকে ঐ দৃশ্যের সংগে একাত্ম করে হারিয়ে ফেলেছিলাম! হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম পরিচালক শ্রীমুখার্জির—কাট, এই কণ্ঠস্বরে।

হ্যাঁ, আমাকেও দর্শকসাধারণের মত মনে মনে স্বীকার করতে হোল—

সাবাস্! সাবাস্ অপর্ণা দেবী। বাঙলার অগণিত দর্শক আপনাদের কোন-দিন ভুলবে না। বিশেষ করে এই ছবি রিলিজ হলে আপনাদের রোমান্টিক জুটি দর্শকসাধারণের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নেবে।

প্রযোজিকা-সংগীত পরিচালিকা অসীমা ভট্টাচার্যের কাছে জানতে পারলাম তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত ছবি 'মেমসাহেব' প্র[illegible] সমাপ্তির পথে। বহু প্রতিকূল পরিস্থি[illegible] ও অবস্থার পর তাঁর দীর্ঘদিনের স্ব[illegible] সফল হতে চলেছে। মেমসাহেব-কে জী[illegible] ও বাস্তবসম্মত রূপ দিতে তিনি কে[illegible] কার্পণ্য করেন নি। ছবিতে উত্তম, অপ[illegible] ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে আছেন—সুব্র[illegible] চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়, ললিতা চ্যাটার্জি গীতা দে, বাসন্তী চ্যাটার্জি, মাস্ট ইন্দ্রনাথ, সুব্রত সেন প্রভৃতি। চিত্রগ্র আছেন—কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সম্পাদন আছেন—রবীন দাস।

এবারের মত এখানেই শেষ করছি।

দিলীপ সরকার প্রযোজিত সরক প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিঃ-এর প্রথম 'অপর্ণা' শুভ নববর্ষের দিন শ্রী, প্রাচ ইন্দিরাসহ প্রায় ১৬টি চিত্রগৃহে প্রায় এ[illegible] যোগে মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে কাহিনী-বৈচিত্র্যে ছবিটি চিত্রজগতে এ বিস্ময় সৃষ্টির দাবী রাখবে। চিত্রনাট্য র ও পরিচালনা করছেন সলিল সেন। প্র[illegible] রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানে সুর দিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। নেপ[illegible] কণ্ঠে আছেন: আরতি মুখোপাধ্যায়, ব[illegible] সেনগুপ্ত, শিপ্রা বসু, গীতা মুখোপাধ্যা[illegible] রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্তপ্রিয় মু[illegible] পাধ্যায়। নৃত্যে নৃত্যরাজ হীরালাল। চি[illegible] গ্রহণে কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সম্পাদনায়: স[illegible] রায়। প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন, সৌ[illegible] চট্টোঃ, তনুজা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অ[illegible] মুখোঃ, গংগাপদ বসু, গীতা নাগ, গী[illegible] দে, অমরনাথ, কল্যাণ চট্টোঃ অপর্ণা দে[illegible] জহর রায়, তরুণকুমার, তপতী ঘো[illegible] বঙ্কিম ঘোষ, রেবা দেবী, সুচেতা বন্দ্যো পাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, বীরেন চট্টোপাধ মাঃ তপন, অরিন্দম ও কুমারী শা[illegible] প্রমুখ।

•

অরুণ রায়চৌধুরী প্রোডাকসন্স[illegible] পঞ্চম ছবি ডাঃ নীহাররঞ্জন গু[illegible] 'রাতের রজনীগন্ধা' ছবির সংগীতগ্রহণ[illegible] রাচীতে আউটডোরের পর এখন টেক[illegible] সিয়ান স্টুডিওতে নিয়মিত চিত্রগ্রহণের [illegible] চলছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন অ[illegible] গংগোপাধ্যায়। সুর দিচ্ছেন সুধীন দ[illegible] গুপ্ত। চিত্রগ্রহণে আছেন অনিল গু[illegible]

বিবিধ সংবাদ

...লোকে হিন্দী চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয়া ...ভিনেত্রী মীনাকুমারী

কিছুদিন ধরে যকৃতের রোগে ভোগবার ...রে গেল শুক্রবার, ৩১ মার্চ বিকালে ...নপ্রিয়া চিত্রাভিনেত্রী মীনাকুমারী মাত্র ...ত্রশ বছর বয়সে মালাবার হিলের একটি ...য়া সদনে পরলোকগমন করেন।

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে মীনা-...মারীর জন্ম হয়। মাত্র চার বছর বয়সে ...দার ফেস' নামে একটি ছবিতে তিনি ...শুশিল্পী হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ ...রেন। তিনি প্রথম যে-ছবিতে নায়িকার ...মিকায় অবতীর্ণ হন, তার নাম হচ্ছে ...চ্ছা-কা খেল'। এর পর থেকে দুই ...ক ধরে তিনি নায়িকা ছিলেন বোম্বাই ...চিত্রজগতের। সে যুগের এমন কোনো নায়ক ...ই, যাঁর বিপরীতে তিনি অভিনয় ...রেননি। তাঁর অভিনীত চিত্রের সংখ্যা ...রাধিক। এবং এদের মধ্যে বিশেষভাবে ...ল্লেখযোগ্য হচ্ছে : চাঁদনী চক, বৈজু ...বরা, পরিণীতা, আজাদ, বন্দীশ, এক হী ...স্তা, সাহেব-বিবি-ঔর গুলাম, পাকীজা, ...রঙ্গ, বন্ধন, আরতি, মাঝলি দিদি, শারদা, ...ই, দুশমন এবং বাঙলা 'অপন জন'-এর ...ন্দী 'মেরে আপনে'। কিছুদিন আগে ...মুক্তিপ্রাপ্ত 'পাকীজা' ছবিতে তাঁকে দ্বৈত ...মিকায় অভিনয় করতে দেখা গেছে। ...হরীত' ছবিতে অসাধারণ নাটনৈপুণ্য ...দর্শনের জন্যে বেঙ্গাল ফিল্ম জার্নালিস্টস ...সোসিয়েশন তাঁকে ১৯৬২ সালে হিন্দী ...বির শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে সম্মানিত ...রেন।

মীনাকুমারী বিষাদাত্মক ভূমিকাভিনয়ে ...ত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিটি ...মিকাতে তিনি আরোপ করতেন ব্যক্তিত্বের ...ঙ্গে মর্যাদা। তাঁর অভিনয়ে কোনো ...তিশয্য ছিল না। আশ্চর্য সংযমের ...ঙ্গে তিনি আন্তরভাবকে ব্যক্ত করতেন। ...াঁর মাধুর্যময় কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী ...তাঁকে দিয়েছিল বৈশিষ্ট্য। 'মেরে আপন'তে ...তাঁর ধীর মিষ্ট বাচনভঙ্গী আজও যেন ...মনে ভাসছে ও চোখে দেখছি। অপরূপ ...লাবণ্যেভরা শান্তদর্শন মীনাকুমারী হিন্দী ...ছবির দর্শকচিত্তে চির অম্লান হয়ে ...রইলেন। তাঁর মৃত্যু নেই।

জওয়ানদের জন্য ইন্দ্রজালের আসর

গত বৃহস্পতিবার (৩০।৩।৭২) ...সন্ধ্যায় যাদুকর শ্রী পি সি সরকার (জুনিয়ার) সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখার জওয়ানদের 'কলামন্দিরে' তাঁর বৈচিত্র্যময় 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনীর দ্বারা আপ্যায়িত করেন। এ ইন্দ্রজালের আসর কেবলমাত্র জওয়ানদের প্রমোদ বিধানের জন্যেই অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন জি ও সি ইন সি ইস্টার্ন কমাণ্ড লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত প্রমুখ। বলা বাহুল্য চিত্তাকর্ষক যাদুর খেলায় জুনিয়ার সরকার সবাইকে মুগ্ধ করেন। জওয়ানদের সহর্ষ অভিনন্দনধ্বনিতে বারবার প্রেক্ষাগৃহ ভরে ওঠে।

শ্রীসরকার ছয় বৎসরের চুক্তি অনুযায়ী শিগগিরই সারা বিশ্ব পরিভ্রমণে বেরুবেন। বাংলাদেশে যাবার কথাও শোনা যাচ্ছে। প্রথম ছ মাস জাপানের বিভিন্ন শহরে নগরে তাঁর ইন্দ্রজালের আসর বসবে।

*

গত ৩০শে মার্চ সোদপুর মধ্যপল্লীতে এন্‌জেল্‌স সংস্থার সৌজন্যে সোদপুর সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যুগ্ম আহবায়ক সমীরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। সংস্কৃতি চর্চার জন্যে রাত সাড়ে আটটায় সুহাস মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় দ্বিজেন্দ্র-গীতি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। এরপর একে একে অর্চনা বসু, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, স্বপন গুপ্ত (রবীন্দ্রসঙ্গীত), কাজী সব্যসাচী (আবৃত্তি), শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় (হাস-কৌতুক), শ্রীমতী প্রাকন্তী মজুমদার, ভোলা দাস (হাস্য-কৌতুক), কমলক সরকার, শ্রীমতী শংকরী ভট্টাচার্য প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অতিথি শিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিত্রাভিনেতা দিলীপ রায়। তিনি আবৃত্তি পরিবেশন করেন। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন অনিল ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়।

।। শতবার্ষিকী উদযাপন ।।

চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী সংস্থা 'সংস্কৃতি' গত ২৭শে মার্চ এক আড়ম্বরপূর্ণ ও রুচিশীল পরিবেশের মাঝে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ দিবস ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উদযাপন করেন। প্রখ্যাত নাট্যনির্দেশক, নিমাই সাহা প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের গোড়ার দিন হোতে শুরু করে সাম্প্রতিক-কাল পর্যন্ত ইতিহাস বিশ্লেষণমূলকভাবে উপস্থাপিত করেন।

খেলাধূলা

দর্শক

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ব্রিজটাউনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। এক সময় খেলার গতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে এমন ঝুঁকেছিল যে, তাদের ইনিংস পরাজয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। শেষ পর্যন্ত ২য় ইনিংসের খেলায় অধিনায়ক সোবার্স এবং ডেভিস দৃঢ়তার সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ২৫৪ রান যোগ করে পরাজয়ের হাত থেকে দলকে খুব জোর বাঁচিয়ে দেন।

সোবার্স টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন, কিন্তু কোন সুবিধা করতে পারেননি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস মাত্র ১৩৩ রানের মাথায় শেষ হয়। ব্রুস টেলর ৭৪ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই হাঁড়ির হাল করেছিলেন।

প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় নিউজিল্যাণ্ড ১ম ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে ৩১ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৯৭ (৫ উইকেটে)। হাতে ৫টা উইকেট নিয়ে নিউজিল্যাণ্ড ১৬৪ রানে এগিয়ে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে কংডন (১২৬ রান) এবং হেস্টিংস (নট আউট ৮১ রান) ১৮৬ মিনিটে ১৬৫ রান যোগ করেন। কংডন ২৫৯ মিনিটে ১২৬ রান করে খেলায় আধিপত্য বিস্তারের দিক থেকে দলকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কংডন দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতেও সেঞ্চুরী (১৬৬ রান) করেছিলেন।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পরেই নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৪২২ রানের মাথায় শেষ হয়। হেস্টিংস সেঞ্চুরী (১০৫ রান) করেন। টেস্ট খেলায় তাঁর এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৮৯ রানের পিছনে পড়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের ৪২২ রানের থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তখনও ১৯১ রানের পিছনে পড়ে আছে।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৯৭ (৫ উইকেটে)। সোবার্স ৭৪ রান এবং ডেভিস ৭২ রান করে খেলায় অপরাজিত থাকেন। এঁরা অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে এইদিনের

গারফিল্ড সোবার্স

খেলায় ১২৬ রান তুলেছিলেন ১৭৮ মিনিটে।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের ৫৬৪ রানের (আট উইকেটে) মাথায় তৃতীয় টেস্ট খেলা শেষ হলে খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। এই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন সোবার্স এবং ডেভিস; তাঁরা ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ২৫৪ রান তুলেছিলেন। চার্লি ডেভিস কাণ্ডারীর ভূমিকায় নেমে তাঁর দশ ঘণ্টার খেলায় ১৮৩ রান করেছিলেন। সোবার্সের ১৪২ রান তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের ২৫তম সেঞ্চুরী।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১৩৩ রান (ফ্রেডরিক নট আউট ৪৪ রান। ব্রুস টেলর ৭৪ রানে ৭ উইকেট)

ও **৫৬৪ রান** ৮ উইকেটে। (রো ৫১, ডেভিস ১৮৩, সোবার্স ১৪২ এবং হলফোর্ড ৫০ রান)

নিউজিল্যাণ্ড : ৪২২ রান (কংডন ১২৬ এবং হেস্টিংস ১০৫ রান। হোল্ডার ৯১ রানে ৩ এবং সোবার্স ৬৪ রানে ৪ উইকেট)

সি কে নাইডু ট্রফি

পুণার নেহরু স্টেডিয়ামে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহারাষ্ট্র দুই উইকেটে বাংলাকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার সি কে নাইডু ট্রফী জয়ী হয়েছে। গতবারের ফাইনালেও এই দুটি দল খেলেছিল। এবারের সেমি-ফাইনালে মহারাষ্ট্র ১৪৩ রানে গুজরাটকে এবং বাংলা চার উইকেটে অন্ধ্র প্রদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

প্রথম দিনে বাংলার ১ম ইনিংস ১৭১ রানের মাথায় শেষ হয়। মহারাষ্ট্র বাকি ৩৫ মিনিটের খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ২০ রান তুলেছিল। বাংলার অধিনায়ক উদয় ব্যানার্জি দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন।

দ্বিতীয় দিনে মহারাষ্ট্রের ১ম ই ২০৭ রানের মাথায় শেষ হলে তারা রানে এগিয়ে যায়। মহারাষ্ট্রের অধি সুরেশ শাস্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৫২ করে অপরাজিত থাকেন।

বাংলা এইদিন ২য় ইনিংস খে নেমে ৫ রান সংগ্রহ করে। হাতে উইকেটই জমা ছিল।

তৃতীয় দিনে বাংলার ২য় ইনি রান দাঁড়ায় ২২৭ (৯ উইকেটে)। অবস্থায় বাংলা ১৬১ রানে এগিয়ে এক সময় বাংলা দলের অবস্থা খুবই ছিল—৫ উইকেটের বিনিময়ে মাত্র রান। শেষ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ উইকেট জু চেল এবং বরুণ বর্মণ ৮৪ রান তুলে মুখ রাখেন।

চতুর্থ দিনে বাংলার ২য় ইনিংস রানের মাথায় শেষ হয়। জয়লাভের জনীয় ১৮৩ রান তুলতে মহারাষ্ট্র ইনিংস খেলতে নামে। হাতে ছিল ২৬ সময়। মহারাষ্ট্রের খেলার সূচনা খারাপ হয়েছিল। মাত্র ৩৩ রান গিয়ে তাদের ৪টে উইকেট পড়ে যায় পর্যন্ত দলের পতন রোধ করে জয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যান পঞ্চম উইকেট নীতিন তেলাং এবং সন্তোষ নাভাল তাঁরা দলের ৬৮ রান যোগ করেন। রাষ্ট্রের অধিনায়ক সুরেশ শাস্ত্রী রানের মাথায় (৮ উইকেটে) বাউণ্ডা বল পাঠিয়ে জয়লাভের প্রয়োজন রান তুলে দেন। মহারাষ্ট্রের ২য় ইনি ১৮৬ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলা : ১৭১ রান (ইউ ব্যানার্জি রান। শাস্ত্রী ৪৭ রানে ৩ এবং মোসাবী ৩১ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৪৮ রান (পি চেল ৬২, বি ৪২ এবং এ ডি বর্মণ ৪৪ শাস্ত্রী ৮৭ রানে ৩ এবং নাজমু ৪৫ রানে ৩ উইকেট)

মহারাষ্ট্র : ২০৭ রান (এস শাস্ত্রী আউট ৫২ রান। বি বর্মণ ৫৮ ৪ এবং ইউ ব্যানার্জি ৫৩ রা উইকেট)

ও **১৮৬ রান** (৮ উইকেটে। এন ৩৬ এবং এস নাভালকার ৩৫ বি বর্মণ ৬৯ রানে ৩ উইকেট)

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

জলন্ধরে ৩৭তম জাতীয় হকি যোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব ১-০ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে। এই পাঞ্জাব ১৭বার ফাইনালে খেলে উপর চারবার (১৯৬৯-৭২) এবং মোট ১ (একবার যুগ্ম-বিজয়ী) জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হল। এখানে উল্লেখ্য,

চিঠিপত্র

বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসী প্রসঙ্গে

'অমৃতে'র ৩০ সংখ্যায় সন্তোষকুমার অধিকারীর 'বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসী' প্রবন্ধটি পড়ে 'গান্ধী-আরউইন' চুক্তিতে ভগৎ সিং প্রভৃতি বিপ্লবীর প্রতি গান্ধীজীর অবিচারের কথা জানতে পারলাম। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ রাত্রে লাহোর জেলের গোপন ফাঁসির মঞ্চে ভগৎ সিং প্রমুখ তিনজন বিপ্লবীর ফাঁসি হয়েছে। ২৪শে মার্চ করাচীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হতে চলেছে। আর গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৫ই মার্চ। এই চুক্তির অন্যতম সর্ত হিসাবে গান্ধীজী অনায়াসে সেই তিনজন তরুণ বিপ্লবীর প্রাণ বাঁচাতে পারতেন, পরে একথা প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজী চুক্তির মধ্যে ভগৎ সিং প্রসঙ্গ তুলে তাঁর আলোচনার ধারাকে ব্যাহত করতে চান নি

(Michael Edward: Last years of the British Empire)

অথচ সুভাষচন্দ্র বসু নিজে গান্ধীজীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যদিও গান্ধীজী বলেছেন তিনি সবরকম চেষ্টাই করেছেন ওদের বাঁচাবার জন্য।

কিছুকাল আগে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় গ্রন্থে গান্ধীজী সম্বন্ধে জানতে পারি সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর কাছ থেকে বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পরিচয়পত্র চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁকে তা দেন নি। গান্ধীজীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু মনে এ প্রশ্ন জাগে : স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রতি গান্ধীজীর মনোভাব এরকম ছিল কেন? পৃথিবীর কোন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আমরা অহিংস স্বাধীনতা লাভ আমরা দেখতে পাই না। গান্ধীজী এও ভালভাবে জানতেন অহিংস স্বাধীনতা সম্ভব নয়

(British Rule in India : Robert Angel)

তাহলে তিনি কি ডোমিনিয়ন স্টেটাসে খুশী থাকতেন?

গান্ধীজীর চরিত্রের নির্মোহ আলোচনা হওয়া উচিত। ইংরাজী সাহিত্যে Lyton Strachy এবং 'Eminent victorians' এ যেমন নিখুঁত আলোচনা আমরা পাই তেমনি গান্ধীজীর চরিত্রের ও নির্মোহ চিত্রণ তাঁর মৃত্যুর ২৪ বছর পরও হলো না। সুধীজনের কাছে এ দাবী আমরা রাখতে পারি না?

মেদিনীপুর শান্তিপদ নন্দ

বিলুপ্ত রাজধানী গঙ্গে

শ্রীউৎপল চক্রবর্তী বিরচিত 'বিলুপ্ত রাজধানী গঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে (অমৃত ৩৭শ সংখ্যা) লেখকের কয়েকটি অভিমতের আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

রচনার প্রারম্ভেই ভাবাবেগে লেখক উল্লেখ করেছেন, 'পেরিপ্লাস গ্রন্থ আর টলেমির ভ্রমণ বৃত্তান্তের'। টলেমির কোন ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে বলে জানি না। খৃঃ ২য় শতকে আলেকজান্দ্রায় রচিত টলেমির গ্রন্থখানির নাম 'জিওগ্রাফিক হাইফেজেশিশ'। এটি ভৌগলিক বৃত্তান্ত। গ্রন্থটির মূল পান্ডুলিপি মাউন্ট আথোসের ভ্যাতোপেদি সংঘারাম রক্ষিত। মূল গ্রন্থটির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। ভারতীয় উপদ্বীপের দুটি মানচিত্র এতে আছে। দুটি পৃথক পরিচ্ছেদে টলেমি এই দুটি অঞ্চলের ভৌগলিক তথ্য ও অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রবন্ধের অন্যস্থানে লেখক লিখেছেন, 'আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় এইটি ছিল বিশাল গঙ্গা রাষ্ট্রের রাজধানী. বিপাশা নদীর পূর্বতীরে পরাক্রান্ত গঙ্গা-নগর......।' গঙ্গারাষ্ট্র ও গঙ্গানগরকে গঙ্গারিডি ও গঙ্গে বলে নির্ধারিত করা কষ্টকর কল্পনামাত্র। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে কতিপয় গবেষক অনুরূপ অভি-মত প্রকাশ করেছিলেন।

(দ্রঃ Indian Historical Quaterly vol. III 1927, P 729. — Ptolemy, ed by S Majumdar, P.393 & wilford —Asiatic Researches F.V 269)

কিন্তু পরবর্তীকালে এ অভিমতের বিরোধী যুক্তিসমূহ অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবে-চিত হয়। চিঠিপত্রের ক্ষুদ্র পরিসরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়।

তবুও পাঠকজনের দৃষ্টি কয়েকটি আ[লো]চনার দিকে আকর্ষণ করব—

Some Historical Aspects of Inscriptous of Bangal — B Sen P 22 —

বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রলিপি—

Tiperra District Gazatte, P. 11[illegible] Geographical and Statistical [Re]port P 15.

ও আচার্য যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধ—প্রব[াসী] ১৩২২, শ্রাবণ পৃঃ ৫৩৯)। এই আলো[চনা]গুলিতে গঙ্গামন্ডল, গঙ্গানগর, গঙ্গা[illegible] প্রভৃতির অবস্থান সম্পর্কে বিস্তা[রিত] বিবরণ বিবেচিত হয়েছে।

আলোচ্য রচনার আরেক স্থ[লে] শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন, —'এ ছাড়া অ[ন্য] প্রাচীন ছোট 'মাতৃ মূর্তি' পাওয়া গেছে বাংলার চন্দ্রকেতু গড় ছাড়া আর কো[থাও] নেই......।" লেখক কি করে এ সিদ্ধা[ন্তে] উপনীত হলেন, জানি না। চন্দ্রকে[তু গড়] ছাড়াও নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের আরও ক[য়েকটি] প্রত্নস্থলে মৃত্তিকাগর্ভে অত্যন্ত প্রা[চীন] মাতৃ-মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কয়েক [illegible] আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দেউ[illegible] ধরায় পাঁজিয়ালগা থানায় ভূমি কর্ষণে[illegible] মাটির গভীরে ক্ষুদ্রকায় টেরাকোটা[illegible] মাতৃমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি [illegible] পরিসরাকৃতি; নারীর প্রকাশ[illegible] বিশেষ লক্ষ্যণীয়। পদ্মাথাচক কন্ঠহার[illegible] জটাজুটধারিণী এ মাতৃমূর্তিটি বিশেষ[জ্ঞ]দের মতে নিশ্চিতভাবে প্রাগৌতিহাসিক [illegible] শৈলীর নিদর্শন। প্রাচীনত্ব ও গঠ[ন] দিক থেকে মাতৃমূর্তিটি যে কোন সং[গ্রহ]শালার গৌরব বর্দ্ধন করবে। [illegible] মাতৃ-মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে ডায়[মন্ড] হারবার মহকুমার হরিনারায়ণপুর গ্রামে। মূর্তিটিও খুবই প্রাচীন। শিরস্ত্রাণ ঘাঘরা পরিহিতা দন্ডায়মানা এই মূর্তিটির সহিত কেম্ব্রীজ ফিৎস উই[লিয়াম] সংগ্রহশালায় রক্ষিত মাতৃমূর্তির [illegible] সাদৃশ্য রয়েছে। বর্তমানে ম[ূর্তি] দুটি জনৈক অধ্যাপকের সংগ্রহশা[লায়] আছে। এ ছাড়াও [illegible] মণি নদীর পাড়ে দুটি বিভিন্ন [illegible] সালংকারা দুটি মাতৃমূর্তি আবি[ষ্কৃত] হয়েছে।

নির্মলেন্দু মুখোপা[ধ্যায়]
কলকাতা-৩[illegible]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ভিকো বজ্রদন্তী
ইকোনমি সাইজ
টুথ পেষ্ট
কিনিলে

এক জার
ভিকো টারমেরিক
ভ্যানিসিং ক্রিম
বিনামূল্যে পাইবেন

ভিকো বজ্রদন্তী
আয়ুর্বেদিক টুথপেষ্ট
গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরী। নিয়মিত ব্যবহারে দাঁতেরক্ষয়, পায়োরিয়া দাঁত থেকে রক্ত ও পুঁজ ক্ষরণ, এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

ভিকো টারমেরিক
চন্দনসুগন্ধী ভ্যানিসিং ক্রিম
দেহকান্তি উজ্জ্বল করে, চর্মকে কমনীয় ও কান্তিযুক্ত করে, কামানোর পর ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ, ছোট খাটো কাটা ছেঁড়া সারায়।
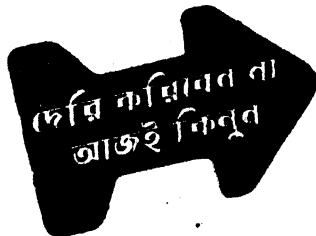
যতদিন ষ্টকে মাল মজুত আছে ততদিন পর্যন্ত এই উপহার পাইবেন

ভিকো ল্যাবোরেটরিজ
বোম্বাই—১৪

স্টকিস্টস : জেনার্স ডি সিটি স্টোর্স, ২০ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা-১৬, ফোন : ২৩-৩৩১৪ এবং ২৩-৪৫৪৬

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে
ভেবে দেখুন

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়…তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় রবারের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লাখ লাখ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়।
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪১ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 16th April, 1971   শুক্রবার, ২রা বৈশাখ, ১৩৭৭   50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীসুনীল সাহা

চিঠিপত্র

'শূন্য' প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। ৩য় খণ্ড ৪১শ সংখ্যার (১৩৭৭) শ্রীদেবল দেববর্মা লিখিত 'শূন্য' গল্পটি প্রসঙ্গে শ্রীমতী মিনারা খাতুন ৪৬শ সংখ্যায় (১৩৭৭) চিঠির মাধ্যমে গল্পের যে ত্রুটির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ঐ ত্রুটি সম্পর্কে আমিও শ্রীমতী খাতুনের সঙ্গে একমত। ঋতু বর্ণনার প্রসঙ্গে গল্পের দু' জায়গায় যে দু'রকম লেখা হয়েছে (এক জায়গায় পৌষ মাস এবং অপর জায়গায় কার্তিক মাস) তা আমারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং এই নিয়ে আমি বাড়ীতে আলোচনাও করেছি। কিন্তু প্রশংসাহীন পত্র পাঠালে তা প্রকাশিত হবে না এই আশংকায় আর পত্রাঘাত করিনি। কিন্তু শ্রীমতী খাতুনের চিঠি প্রকাশিত হতে দেখে আশান্বিত হয়ে চিঠিটি লিখছি। শ্রীমতী খাতুনের চিঠির উত্তরে দেওয়া লেখকের বক্তব্যও পড়লাম। লেখক বিনয়ের সঙ্গে ত্রুটি স্বীকার করলেও গল্পচ্ছলে যে-কাহিনীকে টেনে এনেছেন, তা ঠিক এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ব্যাকরণগত ভুলের কথা। ভাষা-সৌকর্যের দাবীতে ব্যাকরণগত ভুলের ক্ষমা আছে কবিদের। ইংরাজীতে যাকে বলে Poetic Licence কিন্তু কাহিনী বিস্তারের ক্ষেত্রে পটভূমি রচনার সময় সুন্দর সুন্দর ভাষা ব্যবহারের ইচ্ছা-পূরণের জন্য কাহিনীকালকে গল্পের দু' জায়গায় দু'রকম বলা ক্ষমার্হ নয় নিশ্চয়ই। তাছাড়া 'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রসঙ্গে বলা চলে যে, সকলেই তো আর বিদ্যাসাগর নন, কাজেই অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ত ব্যাকরণগত ঐ সূক্ষ্ম ভুলগুলি ধরা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু 'শূন্যে'র এই ভুল সাধারণের পক্ষেও ধরা অসম্ভব নয়। সর্বোপরি বড় কথা, এক্ষেত্রে তুলনার কোন প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু দুটি ভুল একেবারেই দু' ধরনের।

লেখক শ্রীমতী খাতুনকে ধন্যবাদ জানালেও তাঁর চিঠি থেকে মনে হয় যেন, যেসব পাঠক-পাঠিকারা তাঁর ভুল ধরতে পারেননি, তাঁদের কথায় লেখক যেন সেই আনন্দই পেয়েছেন অনেকটা, যে আনন্দে শ্রীমধুসূদন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফিরেছিলেন। সাধারণ লোকেও যে ভুল ধরতে পারে সে-ভুল যেসব পাঠক-পাঠিকারা ধরতে পারেননি, তাঁরা যে দিবানিদ্রার পূর্ব-মুহূর্তে গল্পটি পড়েছিলেন, একথা ভাবলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। সেই ভাবেরই বক্তব্য উদ্ধৃত করবার যুক্তি যে লেখক কোথায় পেলেন ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।

জানি না এতটা সমালোচনামূলক চিঠি প্রকাশের সমাদর লাভ করবে কিনা।

জয়শ্রী নাগ,
টালিগঞ্জ,
কলকাতা-৩৩

(২)

আমি আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃতে'র একজন নিয়মিত অনুরাগী পাঠক। এই সপ্তাহের 'অমৃতে' (৪৬শ সংখ্যা) চিঠিপত্র বিভাগে চুঁচুড়া থেকে লেখা শ্রীমতী মিনারা খাতুন-এর চিঠি পড়লাম। দেবল দেববর্মা রচিত 'শূন্য' গল্পটির যে ভুলত্রুটি তিনি খুঁজে পেয়েছেন এবং সে-বিষয় তিনি যে মন্তব্য করেছেন, সে সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, কারণ সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। কিন্তু ঐ চিঠির শেষ অংশে 'অমৃত' পত্রিকা সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, 'অমৃতে'র একজন নিয়মিত পাঠক হিসেবে তার প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে। ঐ চিঠির শেষাংশে শ্রীমতী খাতুন লিখেছেন 'অবশ্য এ-চিঠি অমৃতের পাতায় আদৌ ছাপা হবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহাকুল।'—এই বক্তব্যটুকু কেবল আমার নয়, এই রকম আমার মত বহু সমালোচকের। তাঁর এই ধারণা যে কত ভুল তা এই সপ্তাহের 'অমৃতে' তাঁর এই চিঠিই প্রমাণ করবে। বস্তুতঃ আমার মনে হয় 'অমৃতের' কোন নিয়মিত পাঠক বা পাঠিকা শ্রীমতী খাতুনের উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন না। আমার মতে 'অমৃত'ই একমাত্র পত্রিকা (অন্ততঃ আমি যে-ক'টি সাহিত্য পত্রিকা পড়ি তার মধ্যে) যে তার পাঠক-পাঠিকাদের সুযোগ দেয়, তাঁদের স্বাধীন মতামত 'অমৃতে'র পাতায় ব্যক্ত করতে। এর আগে প্রশংসাহীন বহু চিঠিই অমৃতের পাতায় স্থান পেয়েছে। শ্রীমতী খাতুন যদি তাঁর চিঠি লেখার আগে কিছু পুরানো 'অমৃত' পড়ে দেখতেন, তাহলে বোধহয় তাঁর শেষের মন্তব্যটুকু প্রয়োজন হত না। শ্রীমতী খাতুন লিখেছেন, তিনি 'অমৃতে'র নিয়মিত পাঠিকা নন, এই ধরনের কোন মন্তব্য করার আগে 'অমৃত' সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজন ছিল না কি?

প্রশান্তকুমার দাস
লাহাভড়ং বাজার
মেদিনীপুর।

'অমৃত' প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মি[illegible] পাঠক। অমৃতের প্রতিটি বিষয় ও বিভা[illegible] আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে[illegible] বিশেষ করে এই পত্রিকার ধারাবাহি[illegible] উপন্যাসগুলো। নিমাই ভট্টাচার্যের 'তোমাকে[illegible] ধারাবাহিক উপন্যাস আশা করি সকলে[illegible] মন জয় করে চলেছে। সাহিত্যিক অতী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে[illegible] ধারাবাহিক উপন্যাসখানা প্রশংসার যোগ্য[illegible] এছাড়া নিকট অতীতে আবদুল জব্বারে[illegible] 'মুখের মেলা', শ্রীসন্ধিৎসুর 'নিকটে[illegible] আছে' সকলের মন বিশেষভাবে জ[illegible] করেছে। এই লেখাগুলোতে সমাজে[illegible] বিভিন্ন দিক যেভাবে ফুটে উঠেছে ত[illegible] সত্যিই প্রশংসনীয়। 'অমৃতে' উদীয়মা[illegible] তরুণ লেখকদের ছোট গল্পগুলো সকলে[illegible] মন জয় করতে পেরেছে। এছাড়া খেলা-ধুলোর আর্টিকেল, চিত্রসমালোচনা, মঞ্চে[illegible] কথা, বিজ্ঞানের কথা—সবকিছুই সমভাবে[illegible] প্রশংসার যোগ্য।

'অমৃতে'র এই সাফল্যের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে গভীর অভিনন্দন জানাই[illegible] আশা করি 'অমৃত' পত্রিকা পাঠকদের মন[illegible] নিয়মিতভাবে অমৃত দান করে ভবিষ্যতে[illegible] বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে এক শ্রেষ্ঠ[illegible] পত্রিকার আসন দখল করবে।

—সীতেশ সাহাচৌধুরী
সালকিয়া,
হাওড়া

'জলসা প্রসঙ্গে'

'অমৃতে'র ১৯শে চৈত্র সংখ্যায় 'জলসা[illegible] বিভাগে 'কলামণ্ডলম্' আয়োজিত ভারত[illegible] নাট্যম অনুষ্ঠানের যে আলোচনা প্রকাশি[illegible] হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলার ইচ্ছ[illegible] রাখি। শ্রী'চিত্রাঙ্গদার' মতে 'শব্দম' নৃ[illegible] অপ্পাটিতে অংশগ্রহণ করেছেন প্রীতি মেনন[illegible] জলজা ওয়ারিয়ার ও জয়শ্রী ওয়ারিয়ার[illegible] তিনি এদের নাচের প্রশংসাও করেছে[illegible] কিন্তু যদিও নৃত্য-সংস্থার স্যুভেনিরে এ[illegible] তিনজনের নামই প্রকাশিত হয়েছিল[illegible] কার্যতঃ 'শব্দম'-এ অংশগ্রহণ করেছেন শু[illegible] প্রীতি মেনন। জলজা ও জয়শ্রী ওয়ারিয়[illegible] সেদিনকার নৃত্য-অনুষ্ঠানে কোন কার[illegible] বশতঃ অংশগ্রহণ করেননি। শ্রীচিত্রাঙ্গ[illegible] একক নৃত্যকে সম্মিলিত নৃত্য বলে ভু[illegible] করলেন কী করে? তিনি কী অনুষ্ঠানে[illegible]

চিঠিপত্র

বিবরণী লিখতে শুধু স্যুভেনিরের সাহায্যই নিয়েছেন? দ্বিতীয়তঃ 'সাপুড়ে' নৃত্যে ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন জয়শ্রী নয়—সুজাতা ওয়ারিয়ার। ভবিষ্যতে এ-ধরনের অনুষ্ঠানের বিবরণীতে আর একটু তথ্যগত যাথার্থ দেখতে পাবো কী?

মীরা পাকড়াশী
ন্যাশনাল লাইব্রেরী,
কলিকাতা-২৭

'তোমাকে'

আমি 'অমৃত' নিয়মিত পড়ি। নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা 'তোমাকে' পড়ছি। সত্যি খুব ভাল লাগছে। বিশেষ করে মানসী ও বুলার ঘটনাবলী। এই উপন্যাসে আমার জীবনেরও কিছু কিছু ঘটনা দেখতে পাই।

এই উপন্যাসের ভাষা সুন্দর প্রাঞ্জল। লেখকের কখন আবেগ, কখন অভিমান সত্যি মনকে আনন্দ দেয়। লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, জানি না আমার এ-চিঠি অমৃতে ছাপা হবে কিনা?

স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
আড়ংঘাটা
নদীয়া

প্রেক্ষাগৃহ

১০ম বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা 'অমৃতে'র ৩১৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'প্রেক্ষাগৃহ' বিভাগে কিছু অসংগতি চোখে পড়লো। সেইগুলি যথাক্রমে লিখছি—

প্রথমতঃ, বি এফ জে এ-র বিচার—বছরের সেরা দশটি ভারতীয় চিত্র' কলমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছবির কিঞ্চিৎ স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে 'সমাজকো বদল ডালোকে' পঞ্চম ও 'দিবারাত্রির কাব্য'কে ষষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। একটি বিখ্যাত দৈনিক কাগজে কিন্তু দেখেছি—'দিবারাত্রির কাব্য' ছবি পঞ্চম ও 'সমাজকো বদল ডালো' ছবি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, এতে পুরস্কৃতদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হয়নি। শ্রীনান্দীকর প্রদত্ত তালিকার সঙ্গে এই অংশটুকু যুক্ত হবে—শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র (বাংলা—সাগিনা মাহাতো), এম আর আছরেকার (হিন্দী ও অন্যান্য—মেরা নাম জোকার)। শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী : জে ডি ইরাণী, দুর্গাদাস মিত্র (বাংলা—প্রতিদ্বন্দ্বী), আলাউদ্দীন (হিন্দী ও অন্যান্য—মেরা নাম জোকার)। শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা : দুলাল দত্ত (বাংলা—প্রতিদ্বন্দ্বী), তরুণ দত্ত (হিন্দী ও অন্যান্য—সফর)।

তৃতীয়তঃ, শ্রীনান্দীকর লিখেছেন, 'বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে রাজকাপুরকে...'। কিন্তু তা ঠিক নয়। বিশেষ এই পুরস্কারটি পেয়েছেন ঋষি রাজকাপুর।

শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সগড়াই : বর্ধমান।

'বৃত্ত' গল্প প্রসঙ্গে

গল্পের ভাল নির্বাচনের দরুণ 'অমৃত' আজকাল দারুণ উপভোগ্য বলে মনে হচ্ছে আমার। বিগত ১৩৭৭, ৪৪শ সংখ্যায় বৈদ্যনাথ সাহার 'বৃত্ত' ছোটগল্প বেশ ভালো লেগে গেল। লেখক অতি সুকৌশলে উক্ত গল্পে রীতিমত আধুনিকতা বজায় রেখে সহজ সরল ভাষার প্রয়োগ দ্বারা জীবনের এক টুকরো ছবি পাঠক সমক্ষে তুলে ধরেছেন। গল্পটি পড়ে বোঝা যায়, সমাজে লেখাপড়া শিখে বয়সে ও বুদ্ধিতে কর্মোপযুক্ত হয়ে যারা দেখে করার মত কোন কর্ম নেই, কিন্তু কর্ম না করলেও সামাজিক, সাংসারিক এবং জৈবিক সমস্যা আছে প্রচুর, তারা নিজেদের অজান্তে কর্মক্ষুধা নিবারণে অনেক অপকর্ম করতে শুরু করে এবং স্বভাবতই ভালো কর্মওয়ালা লোক দেখলেই মনে তাদের বিদ্বেষ জাগে। উক্ত গল্পে একজন লেখকের প্রতি তিনজন বেকার যুবকের অহেতুক বিদ্বেষ অপরাধজনক এবং নিন্দাসূচক হলেও অস্বাভাবিক নয়। উপসংহারে দেখা যায় সুখী মানুষ লেখকের অন্তরালে আরেকজন সমস্যাজীর্ণ মানুষের পরিচয় পেয়ে বেকারদের একজন (গল্পের লেখক) সুবোধ যুবকে রূপায়িত হচ্ছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে লক্ষণীয় যে সমাজের বর্তমান অজলাবস্থার দরুণ যুবসমাজরাই পুরোপুরি দায়ী নয়। দায়ী বলতে চিরন্তন একই কথা বলতে হয়—আমাদের সমাজব্যবস্থা।

পরিশেষে বলতে হচ্ছে 'অমৃত'এ মাঝে মাঝে এধরনের গল্প প্রকাশিত হলে পাঠকসমাজ বাধিত হবেন। লেখক ও সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বেণুপদ সাহা
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি পড়ে অভিভূত হচ্ছি। পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় এ অবধি অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে, কিন্তু এর সঙ্গে কোনটিরই তুলনা হয় না। আমি মনে করি, এজন্য 'অমৃত' পত্রিকা এবং পত্রিকার পাঠকদের গর্বিত হওয়া উচিত। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়ে থাকবে কোন সন্দেহ নেই। উপন্যাসটির লেখক সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর, কেননা, তিনি ছোটখাট প্রশংসার অনেক ঊর্ধ্বে। এবং পরিকল্পনা অভূতপূর্ব। এমন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় আনন্দ দেওয়া ও হৃদয় নেওয়া গ্রন্থের লেখকের পক্ষেই সম্ভব। তাঁকে নমস্কার জানাই।

'অমৃত' পত্রিকার ধ্রুপদী আত্মপ্রকাশের জয়যাত্রা কামনা করি।

নিখিল রায়,
দুর্গাপুর-২

(২)

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' শীর্ষক উপন্যাসের বলিষ্ঠ হৃদয়গ্রাহী লেখনীর জন্য অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। আগামী সংখ্যায় এই উপন্যাসের শেষ কিস্তি প্রকাশ হবে পড়ে বিচলিত হয়ে উঠেছি। যত পড়ছিলাম ততই পড়ার উৎসাহ বাড়ছিল।...যেন আরও খানিকটা থাকলে ভাল হত।

'অমৃত' কর্তৃপক্ষের কাছে আমার সবিনয় প্রার্থনা, তাঁরা যেন এই রকম রুচিশীল লেখাই 'অমৃতে' প্রকাশ করেন। দামী নামের চেয়ে দামী লেখার দিকে দৃষ্টি দিলে 'অমৃতে'র সুনাম উত্তরোত্তর যে বৃদ্ধি পাবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মণিমোহন তেওয়ারী
ভাদুল, বাঁকুড়া।

'অমৃত' ও 'পিঞ্জর'

আমি একজন মাদ্রাজের বাসিন্দা। এখানে বাংলার কোনরকম স্পর্শ পাওয়া যায় না। এখানে 'অমৃত' পত্রিকাটা আসে। এই একটামাত্র বাংলা পত্রিকার জন্য আমি সারা সপ্তাহ উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। এ-জায়গায় পত্রিকা পাঠানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি অমৃতর নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকায় সুভাষ সিংহের 'পিঞ্জর' গল্পটি আমার খুব ভাল লেগেছে। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আপনাকেও ধন্যবাদ গল্পটা প্রকাশের জন্য।

রাণা সেনগুপ্ত,
ফিলিপস স্ট্রীট,
মাদ্রাজ।

দেশে বিদেশে

সবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা একজন মুক্তিযোদ্ধা

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ইসলামাবাদের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর যে দুই সপ্তাহ সময় পার হয়ে গেল, সেই সময়ের ভিতর ধীরে ধীরে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসছে।

(১) পাকিস্থানের সামরিক শাসকরা বাংলাদেশ থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের তাড়িয়ে, নিজেদের সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোর সেন্সর আরোপ করে এবং রেডিওর মারফৎ ক্রমাগত 'সব স্বাভাবিক' বলে প্রচার চালিয়েও একথা সারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে গোপন করতে পারেননি যে, সামরিক-বাহিনীর অভিযানের দ্বারা বাংলাদেশকে পদানত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। বন্দর, বিমানঘাঁটি, সেনানিবাস এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো দুই-একটা বড় শহরের বাইরে আর কোথাও সামরিকবাহিনীর অস্তিত্ব নেই, একথা এখন আর সারা পৃথিবীর চক্ষুষ্মানদের বুঝতে বাকী নেই। যশোর ও কুষ্ঠিয়া, বাংলাদেশের অন্তত এই দুটি শহরে গিয়ে বিদেশী সাংবাদিকরা দেখে এসেছেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেদেশের যোদ্ধারা শুধু প্রচণ্ড মনোবল সম্বল করে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আর সারা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলই যে 'বাংলাদেশের হাতে' রয়েছে সেকথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-দপ্তরের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) অসামরিক অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সামরিকবাহিনীর পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করে পাকিস্তান যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকি যেভাবে ধ্বংস, লুঠপাট ও নারীধর্ষণ করছে, তার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত এখন শুধু বে-সরকারী স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, সরকারী স্তরেও এই বিশ্ব জনমতের অল্পস্বল্প অভিব্যক্তি দেখা যেতে আরম্ভ করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া খুব সাফ কথায় এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতকটা রেখে-ঢেকে এই রক্তলোলুপতার সমালোচনা করেছে। ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছিল, বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালান হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী যেন ধিক্কার দেয়। কতকটা ভারত সরকারের চেষ্টার ফলে, কতকটা সংবাদপত্রের বিবরণ, বাংলাদেশ থেকে যেসব বিদেশী চলে এসেছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ঐ তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্র তাদের প্রথম দিককার ঔদাসীন্য কাটিয়ে উঠেছে। তারা এখন এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যখন তারা বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ইসলামাবাদের উপর চাপ দিতে প্রস্তুত। বর্মা ইতিমধ্যে পাকিস্তানকে তেল বিক্রি করা বন্ধ করেছে এবং সিংহল পাকিস্তানী বিমানকে তার মাটিতে নামতে দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করছে।

(৩) বাংলাদেশে এই ধ্বংসলীলার পিছু পিছু দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দেখা দেবে বলে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র-সংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থাণ্ট, বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব স্যার আলেক ডগলাস হিউম ও মার্কিন পররাষ্ট্র-দপ্তর বাংলাদেশের দুর্গত মানুষকে সাহায্য দেওয়ার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রয়াস গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রশের একটি বিমান ইতিমধ্যে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ঢাকার পথে করাচীতে গিয়েছিল। কিন্তু ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে ঢাকায় যেতে দেননি। তাঁদের যুক্তি, তাঁদের অনুমতি না নিয়ে এই সাহায্য পাঠান হয়েছে।

(৪) বিশ্ব জনমতের দরবারে এভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়ে পাকিস্তান এখন নিজের দোষ ঢাকবার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার-অভিযানে নামছে। সে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, ভারতবর্ষ বাংলাদেশ সম্পর্কে লোকসভার প্রস্তাব গ্রহণ করে, সমুদ্রে পাকিস্তানী জাহাজকে হয়রান করে, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়ে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করছে। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করার বিষয় তা হল, চীন ছাড়া অন্য কোন দেশ এখন পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এই অভিযোগে কান দেয়নি।

(৫) অন্যদিকে, এই ব্যাপারে পাকিস্তান মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক প্রভৃতি দেশকে নিজের সপক্ষে আনতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে। এরা সকলেই বলেছে, বাংলাদেশে যা হচ্ছে, সেটা পাকিস্তানের নিজস্ব ব্যাপার। ইরাণ, তুরস্ক প্রভৃতি 'সেণ্টো' দেশগুলিও এই জোটের অন্যতম শরিক পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য সামরিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

(৬) ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের ত্রিভুজ সম্পর্কের কাঠামোটির কি ধরনের পরিবর্তন দরকার, সে-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজধানী-গুলিতে চিন্তাভাবনা শুরু হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের রচনা ভাবার আগেকার প্রশ্ন অবশ্য হল, বাংলাদেশের এই মুক্তি-যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণাম কি? সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁকে যে-পত্র দিয়েছেন তাতে তিনি বাংলাদেশে সামরিক সমাধান না খুঁজে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজবার পরামর্শ দিয়েছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র-দপ্তরের বিবৃতিতেও 'শান্তিপূর্ণ মীমাংসার' কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁরা মীমাংসার ও শান্তির কি পথ দেখেন?

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ করে আবার রাজনৈতিক আলোচনা করা সম্ভব, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, এই আলোচনা হবে কি নিয়ে। গত ২৫ মার্চ তারিখে অকস্মাৎ রাস্তায় মিলিটারি নামিয়ে বাঙালীদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার নীতি চালু করা হল, শেখ মুজিবর রহমানের অনুগামীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মুজিবর ও তাঁর অনুগামীদের দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করলেন, ইয়াহিয়ার ফৌজ মৃতের পাহাড় তৈরি করল, পুরুষ-নারী-শিশুকে নির্বিচারে খুন করল, লুঠ-তরাজ, ধ্বংস ও ধর্ষণ চালিয়ে সমগ্র বাঙালী জাতির শত্রুতা করল, এত কাণ্ডের পর আবার নূতন করে আলোচনা শুরু হবে কোথা থেকে?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অবশ্য একটা চেষ্টা করতে পারেন। তিনি কিছু কুইসলিং খুঁজে বার করে তাঁদের হাতে ক্ষমতা দিতে পারেন। পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা নুরুল আমিন, পাকিস্তানের প্রাক্তন পর-রাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হকচৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলে পাকিস্তান থেকে খবর প্রচার করা হয়েছে। নুরুল আমিনের নিজের কণ্ঠস্বরে এই ধরনের কথা পাকিস্তান বেতার থেকে প্রচার করা হয়েছে। এইসব প্রচারের সত্য-মিথ্যা যাই থাকুক, কুইসলিং খোঁজার জন্য ইয়াহিয়া সরকার যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন সেটা এই প্রচারের মধ্য দিয়েই বোঝা যাচ্ছে। পাকিস্তান অনবরত যে ভারতের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করে যাচ্ছে, তারও উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা-দেশের সংগ্রামী মানুষদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এই চেষ্টার কিছু কিছু সাফল্যের লক্ষণও ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। মুসলিম লীগ, জামাত-এ-ইসলাম প্রভৃতি দলের সমর্থকরা খুব সন্তর্পণে সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও কোথাও তারা মুক্তিফৌজের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে বলে প্রকাশ।

কিন্তু তাহলেও, সংগ্রামী বাঙালীদের মধ্যে বড় রকমের কোন বিভেদ আনতে ইয়াহিয়া সরকার সমর্থ হবেন বলে মনে হচ্ছে না। একটি কুইসলিং সরকার প্রতিষ্ঠা করা যদিবা সম্ভব হয়, সেই সরকার পূর্ব বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান হাই-কমিশনার অফিসের সেকেণ্ড সেক্রেটারি কে এম হুবিবুল্লা ও সহকারী প্রেস অ্যাটাশে আমজাদুল হক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে যে-বিবৃতি দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে, এমনকি উচ্চ পদাধিকারী বাঙালী অফিসারদের মধ্যেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে কি দারুণ বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে। শুধুমাত্র বাঙালী হওয়ার অপরাধেই যেখানে হাজার-হাজার, অথবা লক্ষ-লক্ষ মানুষকে মরতে হয়েছে, সেখানে দখলদারদের হয়ে কথা বলার জন্য ক'জন বাঙালীকে পাওয়া যাবে?

তাহলে ইয়াহিয়া কি করবেন? তিনি কি পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে সেখান থেকে সরে আসবেন? অথবা যুদ্ধ করে 'বিদ্রোহী' বাঙালীদের শায়েস্তা করবেন? যাই তিনি করুন না কেন, বিদেশী সংবাদপত্রগুলি এ-বিষয়ে একমত যে, দুই পাকিস্তান আর কখনই এক হবে না। যেমন, 'নিউইয়র্ক পোস্ট' পত্রিকায় ম্যাক্স লার্ণার লিখেছেন, 'পাকিস্তানের ভাঙা টুকরোগুলো আর জোড়া লাগান যাবে না।'

দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ইয়াহিয়ার নেই। ইতিমধ্যেই বাংলা-দেশে তার ফৌজ তেলের অভাবে এগোতে পারছে না। বর্ষা নামলে এই ফৌজের এগোবার ক্ষমতা আরও কমে যাবে। দীর্ঘ যুদ্ধ চালাতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর যে অর্থনৈতিক আঘাত আসবে, তা সামলান অসম্ভব।

ভাঙা পাকিস্তান যে আর জোড়া লাগবে না, এই অনুমানের একটা বড় যুক্তি হল, পাকিস্তানের মূল ভিত্তি যে দ্বিজাতি-তত্ত্ব, সেই তত্ত্বকেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে বাংলাদেশের ঘটনা। বাংলাদেশের মানুষ এ-কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, শুধু ধর্মের বন্ধনে একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলা যায় না এবং ধর্মের প্রাচীর তুলে সাংস্কৃতিক ঐক্যকে অস্বীকার করা যায় না। পাকিস্তানের শাসক-চক্র এ-কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। বুঝতে পারছেন বলেই রাষ্ট্রায়ত্ত পাকিস্তান টাইমস পত্রিকায় লেখা হয়েছে, 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে আমরা প্রথমেই ভুল করেছি। হিন্দু-মুসলিম যুক্ত নির্বাচনই বাংলাদেশের ভিত্তি তৈরি করেছে।' পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন উর্দু পত্রিকায় বলা হয়েছে, দু'কোটি হিন্দু ভোটাধিকার পেয়ে ১২ কোটি পাকিস্তানীর ব্যাপারে ভেটো প্রয়োগ করছে। আবার একটি উর্দু পত্রিকায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে, মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দুদের ভোটের অধিকার আদৌ থাকা উচিত কিনা। কিন্তু, এইসব ধর্মের ধুয়া তুলে ইয়াহিয়া ও তাঁর পরামর্শদাতারা কি বাংলা-দেশে ইতিহাসের চাকা উল্টে দিতে পারবেন?

বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াকে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে তাদের ভবিষ্যৎ নীতি স্থির করার আগে উপরের এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হবে। পাকিস্তান সম্পর্কে আমেরিকার নীতির যে কাঠামো জন ফস্টার ডালেসের আমলে তৈরি হয়েছিল, এখনও মোটামুটি সেই নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। ডালেস স্থির করেছিলেন যে, বন্ধু হিসাবে ভারতের চেয়ে পাকিস্তান অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে অধিকতর স্থায়িত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনা। পাকিস্তান একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনকে খেলিয়ে তার আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের দাম দিয়েছে। আর নয়াদিল্লীতে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যখন একটা স্থায়ী সরকার গঠিত হল, তখন প্রতিবেশী পাকি-স্তানে গণতন্ত্রের সমাধি ও ভাঙন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বৃহৎ রাষ্ট্র-গুলির পক্ষে দুই দেশের মধ্যে কোন্‌টির সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজতর। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এখন মুশকিল হচ্ছে এই যে, দক্ষিণ ভিয়েত-নামের আগুনে হাত দিয়ে আঙুল পোড়াবার পর এখন সে-দেশের জনমত এশিয়ার অন্য কোন দেশের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে খুবই অনিচ্ছুক। নিক্সন সরকারের পক্ষে এই জনমত অগ্রাহ্য করে কোন কিছু করা সহজ হবে না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে দমন করার জন্য ইয়াহিয়াবাহিনী যে আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহার করছে, সে-বিষয়েও কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু বলবে না? মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি একটি কঠোর বিবৃতি দিয়ে সেদেশের সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে যারা এই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের নিবৃত্ত করার ব্যাপারে মার্কিন সরকারের দায়িত্ব আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্নটি উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। তার পররাষ্ট্র-দপ্তরের মুখপাত্র ১৯৫৪ সালের মার্কিন-পাকিস্তান চুক্তির কথা উল্লেখ করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহার করার অধিকার পাকিস্তানের আছে। কিন্তু পরে ওয়াশিংটনের এই নির্লিপ্ততার পরিবর্তে কিছু উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। (পররাষ্ট্র-দপ্তরের এক-জন মুখপাত্র বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সরিয়ে আনার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের রেখে-ঢেকে কথা বলতে হচ্ছিল।)

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ইসলামা-বাদের সম্পর্কটা গত কয়েক বছর যাবৎ উন্নতির পথে যাচ্ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে

গঠিত এবং দেড় হাজার মাইলের বেশী ভৌগোলিক ব্যবধানের দ্বারা বিভক্ত পাকিস্তানকে স্তালিন একটা 'আজগুবী জিনিস' মনে করতেন। মস্কোতে তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীকে পি এস মেননকে স্তালিন নিজে সে-কথা বলেছেন। কিন্তু ইদানীং সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানের সংগে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে, তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিই সোভিয়েট রাশিয়া বেশী নজর দিয়েছে। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিবেশী, পূর্ব অংশ নয়। স্বাভাবিকভাবে, সেই কারণেই রাশিয়া পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একদিন বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, এই হিসাবটা বোধহয় রাশিয়ার নীতিনির্ধারকরা গণনার মধ্যে আনেননি।

চীন ইদানীং কালে ইয়াহিয়া খাঁর পিছনে খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ প্রসংগে সে ভারতকে পাকিস্তানের ব্যাপারে নাক গলাতে নিষেধ করেছে। এর দ্বারা সে হয়ত বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে, ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতায় সে পাকিস্তানের সংগে আছে। কিন্তু ভারত-বিরোধিতার খাতিরেও চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে তার বৈপ্লবিক ভাবপ্রতিমাকে ম্লান হতে দেবে কিনা সেটা লক্ষ্য করার বিষয়।

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, কিছু দিনের ভিতরেই স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রীদের নাম এবং রাজধানীর নাম ঘোষণা করা হবে। যদি তা করা হয়, তাহলে সেই সংগেই ঐ অস্থায়ী সরকার নিশ্চয়ই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে স্বীকৃতির জন্য আবেদন জানাবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দল, জননেতা ও সংসদের সদস্যরা, কোন কোন বিধানসভা এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকার অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। এই দাবীর সপক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল : (১) বাংলাদেশের যে প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছেন, তাঁদের সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে অসংগতি কিছু নেই। বরং এই সরকার ইসলামাবাদের ক্ষমতা-দখলকারী সামরিক শাসকদের চেয়ে অধিকতর বৈধ হবেন। (২) স্বীকৃতি দেওয়া মানে যা অনিবার্য তাকেই মেনে নেওয়া। (৩) ভারত যে সব সময় অন্যের পিছু পিছু না গিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের নীতি স্থির করতে পারে এবং এই একটি ব্যাপারে অন্যান্য রাষ্ট্রের পথপ্রদর্শক হতে পারে সেটা দেখান দরকার। (৪) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক বা না হোক ইসলামাবাদের সংগে নয়াদিল্লীর বন্ধুত্ব হওয়ার আশা আর নেই। অথচ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে ভারতবর্ষের দুই দিককার সীমান্তে দুটি বিরুদ্ধভাবাপন্ন দেশের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। (৫) চীন যদি হঠাৎ তার মতি পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে ভারত অসুবিধায় পড়ে যেতে পারে। (৬) সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত যে সহানুভূতি দেখাচ্ছে, স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তাকে একটা বাস্তব রূপ দেওয়া যাবে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অনেকখানি বেড়ে যাবে।

অবশ্য বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দানের বিরুদ্ধেও যে কিছু মতামত শোনা যায়নি তা নয়। কাশ্মীরের আওয়ামী সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান মৌলানা মহম্মদ ফারুকী বলেছেন, বাংলাদেশে যা হচ্ছে সেটা 'একটা স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক মতবৈষম্য' এবং এ-ব্যাপারে ভারতের কিছু করতে যাওয়ার মানে হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক আচরণবিধি নগ্নভাবে লংঘন করা।' শ্রীনগর থেকে নির্বাচিত লোকসভার নির্দলীয় সদস্য শামিম আহমেদ শামিমও চান না যে, বাংলাদেশের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলনে ভারত কোনরকম উৎসাহ দিক। আবার কোন কোন মহল থেকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, ভারতবর্ষ যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে অযথা তাড়াহুড়া করে, তাহলে ইসলামাবাদ ভারত-বিরোধী জিগির তুলে বাংলাদেশের জনগণকে বিভক্ত করার সুযোগ পাবে।

কিন্তু বিরুদ্ধ মত যাই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের সমর্থনে আমাদের দেশে মানুষের যে আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাতে নয়াদিল্লীর পক্ষে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় থাকবে না এবং এই সম্ভাবনাও প্রবল যে, এ-ব্যাপারে ভারত যদি এগিয়ে আসে, তাহলে অন্ততপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া তাকে অনুসরণ করবে। ঘটনার গতি সেদিকেই যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। —পুণ্ডরীক

৯, ৪, ৭১

*

ইয়াহিয়া খানের জহ্লাদবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের সায়েস্তা করতে না পেরে সাধারণ মানুষদের মনোবল নষ্ট করবার জন্যে বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এই গণহত্যা বন্ধ করা এবং সীমান্তে ধৃত সাংবাদিকদের মুক্তির দাবীতে অমৃতবাজার পত্রিকা-যুগান্তর-অমৃত কর্মচারী সমিতির তরফ থেকে গত শনিবার কলকাতার পাক ডেপুটি হাই-কমিশনারের অফিসের সামনে বিপুলভাবে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সমিতির সভাপতি শ্রীহরিদাস ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লরতন গাঙ্গুলী ডেপুটি হাই-কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

পাক বর্বরতার বিরুদ্ধে কলকাতাস্থিত পাক ডেপুটি হাই-কমিশনের সামনে শনিবার অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও অমৃত কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

সম্পাদকীয়

নববর্ষের বাংলা দেশ

বর্ষচক্রের আবর্তনে আবার নববর্ষের প্রথম দিনের সূর্য তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে আমাদের জীবন উদ্ভাসিত করল। শুভ নববর্ষ, শুভ পয়লা বৈশাখ আমাদের কাছে একটি বিশেষ দিন। এই দিনে আমরা সকলকে জানাই শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সকলের কল্যাণে, বিশ্বের কল্যাণে এই দিনটি অক্ষয় জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠুক। আমাদের জীবনে বিগত দিনের গ্লানি, হতাশা এবং অসাফল্যের বেদনা দূর হয়ে নতুন দিনের আলোয় সার্থকতায় ও সাফল্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। আমরা এক অভাবিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মর্মান্তিক ঘটনাবলী থেকে। বাংলাদেশ রাজনীতির বিধানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবার পর সীমান্তের এপারে ও ওপারে এক কৃত্রিম বিরোধ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে আসছিল গত ২৩ বছর ধরে। ওপার থেকে সংখ্যালঘুরা বার-বার বিতাড়িত হয়ে এসেছেন এপারে। আমরা ভেবে অবাক হয়েছি পূর্ব বাংলার মাটিতে কেন এই অসহায় সংখ্যালঘুদের স্থান হচ্ছে না। এখন তার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্ব বাংলা যাঁরা শাসন করতেন তাঁরা নির্বিচারে সকলের ওপরেই চালিয়েছেন শোষণ ও অত্যাচার। সংখ্যাগুরুরা পালিয়ে আসতে পারে নি, সংখ্যালঘুরা সমস্ত বিসর্জন দিয়ে চলে আসত সীমান্তের এপারে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে গত ২৩ বছর পূর্ব বাংলার মানুষ নানাদিক দিয়ে শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছেন। তার নজীর এত বিশদ যে, এখানে তা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নেই বলে মনে করি। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা বলছেন যে, এ হল এক বিচ্ছিন্নতাকামী বিদ্রোহ, একে দমন করতেই হবে। সারা দুনিয়ার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে দেখেছে যে, পাকিস্তানীরা যে দেশকে তাদের এক্তিয়ারভুক্ত বলে মনে করে সেই বাংলাদেশের নিরস্ত্র লক্ষ-লক্ষ মানুষকে বোমা, মেশিনগান ও নাপামের আগুনে ঝলসে হত্যা করছে। এ শুধু আমাদের কথা নয়। পাকিস্তানের মিত্র এবং তার প্রধান অস্ত্রসরবরাহকারী মার্কিন দেশের সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল নেতাও এই গণহত্যায় স্তম্ভিত ও মর্মাহত। একটি দেশের সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী যে এই রকম দস্যুবৃত্তি করতে পারে তা বাংলাদেশে পাক সেনাদের অত্যাচার না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত।

আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, অত্যাচার করা হচ্ছে তাদেরই ওপর যাদের একই ধর্মাবলম্বী দাবী করে একটি রাষ্ট্রের এক্তিয়ারে আনা হয়েছিল। ধর্মই যে এক জাতিতত্ত্বের মূল সূত্র নয় তা পাকিস্তানীরা প্রমাণ করল বাংলাদেশে। বাংলাদেশে আজ মুশ্লিম ও হিন্দু একই সঙ্গে প্রাণ দিচ্ছেন নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। এই মুক্তিযুদ্ধ বাংলার মানুষের স্বধর্ম রক্ষার যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাঙালীর জয় সুনিশ্চিত। বাংলাদেশের মানুষ কখনো একথা বলেনি যে, তারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আওয়ামী লীগের ছ'দফা দাবীর ভিত্তি হল বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরই তাঁরা এই দাবী তুলেছিলেন। এই দাবীর ভিত্তিতেই তাঁরা পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের বিপুল সমর্থন পেয়েছিলেন।

নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করার নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, পাকিস্তানের শাসকরা কোনদিনই বাংলাদেশের মানুষকে, তাঁদের নেতাদের বিশ্বাস করতেন না। নতুবা আলোচনা শেষ হবার আগেই জল্লাদ বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে বাংলার নরনারী শিশুকে, তার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিককে বেয়নেটের মুখে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ইয়াহিয়া খান এমন মরিয়া হয়ে উঠলেন কেন?

একে আমরা গৃহযুদ্ধ বলি না। এ হল মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের দ্বারাই স্থির হবে বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীন জীবন যাপন করবে, না ইসলামাবাদের দাস হয়ে থাকবে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এত বড় গণহত্যার পরও বিশ্বের বিবেক জাগ্রত হয় নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিজেকে শান্তির প্রহরী বলে বড়াই করে থাকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট মহোদয় এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, পাকিস্তান সরকার যদি অনুরোধ করে তাহলেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাংলাদেশে যুদ্ধে নির্যাতিতদের সহায়তার জন্য এগিয়ে যেতে পারে। কোরিয়া যুদ্ধের সময় তো রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কারুর অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করতে হয় নি? দুর্বল ও দরিদ্র বলেই কি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ এভাবে অত্যাচারীর হাতে প্রাণ দেবে? বিলম্বে হলেও সোভিয়েট ইউনয়ন ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খান বাহিনীর নারকীয় গণহত্যা সম্পর্কে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিবাদকে ইয়াহিয়া খান তাঁর দেশের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে পরোক্ষে অভিযোগ করেছেন। আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একমাত্র আমেরিকাই পারে এই জল্লাদের রক্তসিক্ত হাত মুচড়ে ধরতে। আমেরিকার অর্থে ও অস্ত্রেই পাকিস্তানের জল্লাদরা তার নিজের দেশবাসীকে এমনভাবে হত্যা করার শক্তি ও সামর্থ পেয়েছে। মার্কিন সরকারের ক্ষোভকে আমরা যথার্থ বলেই মনে করি। আমরা আশা করব, বাংলাদেশ নিশ্চিহ্ন হবার আগেই বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষ করে আমেরিকা ইসলামাবাদকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন যে, এই গণহত্যা তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। বাংলাদেশের দাবী ন্যায্য এবং এই যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক অভিমতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিকে ধ্বংস করার জন্য। আমরা দুই বাংলার মানুষ নববর্ষের দিনে এই প্রার্থনাই করব, অত্যাচারী যেন শাস্তি পায়, নিপীড়িতের বন্ধনমুক্তি যেন হয় সুনিশ্চিত।

এক নজরে

মহাভারতের সেই কলঙ্কিত অধ্যায় :

রাজদরবারে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, ভীম, অর্জুন প্রমুখ মহাপরাক্রম বীরবৃন্দ স্থিরদৃষ্টি প্রস্তরমূর্তির মতো বসে আছেন, আর নির্লজ্জ নিষ্ঠুর দুঃশাসন তাঁদের সম্মুখে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে লাঞ্ছিত করছে দ্রৌপদীকে। অপমানিতা নিগৃহীতা দ্রৌপদীর আর্ত কণ্ঠের আকুল প্রার্থনা সভাগৃহে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। কিন্তু সভাস্থ কেউ এগিয়ে আসছেন না সেই বিপন্না নারীকে রক্ষা করতে। অবমানিতা মানবীর আর্তকণ্ঠের ভর্ৎসনায় ক্ষাত্রশক্তির সেই ধিক্কার মনুষ্যত্বের দাবীর কাছে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, শক্তি ও কর্তব্যবোধের সেই নির্লজ্জ পরাজয়ের কাহিনী যেন আরও ভয়াল ভয়ঙ্কররূপে অভিনীত হচ্ছে আজকের বিশ্বে। পাকিস্তানের জঙ্গী নায়ক, নাদির শাহের বংশধর ইয়াহিয়া খাঁ সমগ্র শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙলার বুকে। বাঙালীর রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে সোনার বাঙলার শ্যামল প্রান্তর, বাঙলাদেশের মেয়েরা পাঠান সৈন্যদের পাশব লোলুপতা থেকে রক্ষা পেতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মরণের বুকে, সন্তানহারা বাঙালী মায়ের বুকফাটা আর্তনাদে আলোড়িত হচ্ছে বিশ্বের আকাশ-বাতাস। মানবিক কারণে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আবেদন পৌঁচেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবারে, পৌঁচেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত, বৃটেন সকলের কাছে। কিন্তু সকলেই মূক, সকলেরই মুখে নিরুপায়ের অভিব্যক্তি। ইয়াহিয়াকে সংযত হওয়ার জন্য ক্ষীণ আবেদন জানিয়েছে হয়ত বা কেউ-কেউ, কিন্তু সে আবেদনের অন্তঃসার-শূন্যতা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি সেই রক্তলোলুপ নিষ্ঠুর জঙ্গী শাসকের। তাই তার জিঘাংসা দিনে-দিনে হয়ে উঠছে আরও সর্বনাশা, আরও ভয়ংকর। একেবারে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে নতিস্বীকার করতে হবে বাঙলা দেশকে, তবেই সংযত হবে ইয়াহিয়ার নিষ্ঠুরতা।

কিন্তু মহাভারতের কাহিনী দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও পরাজয়ে শেষ হয় নি। রাজদরবারে তাঁর আবেদন সাড়া না পেলেও ভগবানের কানে তা পৌঁচেছিল, আর সেই কারণেই সেদিন আপাতঃদৃষ্টিতে অসহায়া সেই বীরাঙ্গনারই জয় হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। দ্রৌপদীকে সভাস্থলে বিবস্ত্রা করতে এসে সভাস্থলেই পরাজয়ের গ্লানি মাথা পেতে নিতে হয়েছিল ক্লান্ত অবসন্ন দুঃশাসনকে। একই কারণে, বাঙলাদেশে আজ যে বীরের রক্ত-স্রোত ও মাতার অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে না। বিশ্বের ভাণ্ডারীকে এ ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। ইতিহাসের দেবতা যার সহায় তার জয় অনিবার্য।

পরাজয় মেনে নেওয়াই ভালো :

লোকসভার সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের নানা কারণ উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন পরাজিত পক্ষের নেতৃবৃন্দ। বিরোধী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন, নানা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সরকারপক্ষ নির্বাচনের ফলাফল তাঁদের অনুকূলে নিয়ে গেছেন; এস এস পি নেতা রাজনারায়ণ বলেছেন, ব্যালটপত্র অদল-বদল করে জয়ী প্রার্থীদের পরাজিত করা হয়েছে; জনসঙ্ঘের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এক রকম ম্যাজিক কালি ব্যবহার করা হয়েছিল ভোটপত্রে ছাপ দেওয়ার সময় যা পরে আপনা থেকেই উঠে যায়, এবং পরে আবার ঐ ব্যালটপত্রগুলিতেই সরকার পক্ষের প্রার্থীর প্রতীক চিহ্নে নতুন ছাপ দেওয়া হয়। বলা-বাহুল্য, ঐ ধরনের অভিযোগগুলির সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই কোন নেতা উপস্থাপিত করেন নি, এবং সে কারণে সরকারপক্ষ থেকেও তা খণ্ডনের কোন চেষ্টা হয় নি।

কিন্তু ঐ নিত্যনতুন অভিযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ এসেছে বিরোধীপক্ষেরই এক নেতার কাছ থেকে। এস এস পি নেতা শ্রীমধু লিমায়ে বলেছেন, কতকগুলি কষ্টকল্পিত অভিযোগ সৃষ্টি না করে নির্বাচনে পরাজয় সহজভাবেই মেনে নেওয়া উচিত, এবং এ পরাজয়ের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য পরাজয়ের প্রকৃত কারণগুলি অন্বেষণে তৎপর হওয়া উচিত।

কার দুর্নীতি ?

সমর্থকদের দুর্নিবার গতিতে দলত্যাগের ফলে নিরুপায় হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন গুজরাটের শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই। কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আবার একটা জোড়াতালি দেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়ে স্বপদে ফিরে এলেন তিনি। রাজ্য-পালের কাছে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে নতুন মুখ্যমন্ত্রীরূপে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতেও এগিয়ে এলেন শ্রীদেশাই। তিনি বিশেষ দৃঢ়তা প্রকাশ করে বললেন, রাজ্য প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করাই হবে তাঁর প্রথম কাজ। কিন্তু তাঁর সব উক্তি, মন্তব্য ও শপথ নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ভেবেই বোধহয় কোন সাংবাদিক জানতে চাইলেন না যে, কার দুর্নীতি তিনি দূর করবেন। রাজ্য প্রশাসন ত তাঁরই পরিচালনাধীনে ছিল বিগত ছয় বছর। তাছাড়া যত সদিচ্ছাই 'নবনিযুক্ত' মুখ্যমন্ত্রীর থাকুক না কেন তা পূরণের যথেষ্ট সময় তিনি পাবেন কিনা সে বিষয়েও হয়ত সাংবাদিকদের মনে সন্দেহ ছিল। কারণ যেদিন শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নেন সেই দিনই তাঁর পক্ষের দুজন সদস্য বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসেন।

ইচ্ছা পূরণ :

শ্রীবিশ্বনাথ দাস বিরাশী বছর বয়সে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি বিধানসভার সদস্য নন, যে চুলচেরা সংখ্যাধিক্য নিয়ে স্বতন্ত্র-উৎকল কংগ্রেস-ঝাড়খণ্ড জোট মন্ত্রিসভা গঠন করেছে তা যদি আগামী ছয় মাসেরও অধিককাল অটুট থাকে তবে তাঁকে ছ' মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় আসতে হবে।

শ্রীদাসই ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতের তৎকালীন এগারোটি প্রদেশে যে এগারোটি মুখ্যমন্ত্রী হন তাঁদের মধ্যে একমাত্র তৎকালীন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী ছাড়া কেউ আজ জীবিত নেই। আসামের গোপীনাথ বড়দলুই, বাঙলার ফজলুল হক, বিহারের শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, উত্তরপ্রদেশের গোবিন্দবল্লভ পন্থ, মধ্য-প্রদেশের ডাঃ এন বি খারে, বোম্বাইর বি, জি খের, সিন্ধুর আল্লা-বক্স, পাঞ্জাবের সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডঃ খান সাহেব—সবাই আজ পরলোকে। কিন্তু তাঁরা সবাই দীর্ঘকাল ধরে স্ব-স্ব প্রদেশের প্রধান ছিলেন, অনেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছিলেন স্বপদে অধিষ্ঠিত। সে জায়গায় শ্রীদাস ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশে পদত্যাগের পর দীর্ঘ বত্রিশ বছর ছিলেন রাজ্য রাজনীতি থেকে নির্বাসিত। স্বভাবতই শ্রীদাস ভাবতে পারেন, স্বরাজ্যের এই শেষ আহ্বানটুকুর জন্যই ভগবান তাঁকে তাঁর চৌত্রিশ বছর পূর্বের সতীর্থদের তুলনায় এত দীর্ঘজীবী করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী

সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি চাই

তুষারকান্তি ঘোষ

পূর্ব বাঙলায়, যাকে এখন আমরা বাঙলাদেশ বলি, আজ যা ঘটছে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। যে বর্বরতা পরিকল্পিত-ভাবে আজ গণহত্যায় মত্ত, তার পাশবিকতা মানুষের ইতিহাসে নজীরহীন! জঙ্গী ডিক্টেটর ইয়াহিয়া ও তার অনুগত নেকড়ের দল, নদীমাতৃক পূর্ব বাঙলার বুকে আজ যে রক্তের নদী বইয়ে দিচ্ছেন, বিদেশ থেকে ভিক্ষেকরা আধুনিক অস্ত্রের দম্ভে, তাঁরা যে নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করছেন, এমন নির্মমতা ও নৃশংসতা আমরা আগে কখনো শুনি নি।

কিন্তু কেন? পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকের কাছে এমন কি অপরাধ করেছেন, যার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁদের নির্বিচারে হত্যা করতে এবং তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে, তাঁর সৈন্য-বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন? পূর্ব বাঙলার মানুষের বিরুদ্ধে তাঁর এমন কি অভিযোগ, যাতে তাঁদের নিধন করার জন্যে বোমারু বিমান, প্যাটন ট্যাংক, কামান মেশিনগান-সজ্জিত বিরাট এক সৈন্য-বাহিনীকে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়? নারী জাতের সম্ভ্রমের উপর বলাৎকার করতে হয়?

পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ইসলামাবাদের জঙ্গী প্রভুদের কাছে ন্যায়-বিচার চেয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, প্রবল জাতি দুর্বল জাতিকে তাদের কলোনী বানায় এবং শোষণ চালিয়ে নিজের দেশকে পুষ্ট করে। কিন্তু কেউ কোথাও শোনেন নি, দেশের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চল, তার সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশকে শোষণ করে, লুঠ করে তার অধিবাসীদের এমনভাবে পথের ভিখিরী বানিয়ে দেয়।

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন তাঁদের সোনার বাঙলায় পশ্চিম পাকিস্থানী কায়েমী স্বার্থের অবাধ শোষণ শুরু হয়ে গেছে। চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য— সর্বত্রই এই লুন্ঠনের একতরফা ইতিহাস। শুধু তাই নয়, পূর্ব বাঙলার বাঙালীকে চিরকালের মত ক্রীতদাস বানাতে পশ্চিম পাকিস্থানী পাঞ্জাবী শাসকচক্র, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে বদ্ধপরিকর।

পূর্ব বাঙলার বাঙালী যখন প্রশ্ন করলেন, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলাভাষাকে দুয়োরাণীর অমর্যাদ করার অপচেষ্টা কেন?

পশ্চিমী মুন্সীরা উত্তর দিলেন, 'বাঙলাভাষা সংস্কৃতের দুহিতা। ওর সারা গায়ে হিন্দুয়ানীর গন্ধ। সাচ্চা মুসলমানের ভাবরস, চিন্তাধারা ওর ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে না।'

পূর্ববঙ্গের জিজ্ঞাসা :

পূর্ববঙ্গের জিজ্ঞাসা, পূর্ববঙ্গ সারা পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জনের বাসভূমি হলেও চাকুরী-বাকুরী, বৈদেশিক সাহায্যাদির ক্ষেত্রে এতো বৈষম্য কেন? রাজস্ব খাতে পূর্ব বাংলার জন্য ব্যয় করা হয় দেড় হাজার কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্থানের ভাগ্যে সেখানে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে পূর্ব বাঙলা পায় তিনশ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকি-স্থানের হিস্যা সেখানে ছ'শ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ২০ ভাগ পূর্ব বাঙলার ভাগ্যে জোটে, পশ্চিম পাকিস্থানের ভাগ্যে সেখানে সিংহভাগ, মোট সাহায্যের শতকরা ৮০ অংশ।

চা ও পাট বাঙলাদেশেই উৎপন্ন হয়, যা থেকে সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রার আমদানী হয়। অথচ বৈদেশিক আমদানী করা দ্রব্য-সামগ্রীর শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ পায় পূর্ববঙ্গ, শতকরা ৭৫ ভাগ যায় পশ্চিম পাকিস্থানের ভাগে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে পূর্ব বাঙলার বাঙালীদের ভাগ শতকরা ১৫, পশ্চিম পাকিস্থানের শতকরা ৮৫। সামরিক বিভাগে বাঙালীর চাকুরী শতকরা ১০, পশ্চিম পাকিস্থানীদের শতকরা ৯০। চাউলের দর পূর্ববঙ্গে প্রতি মণ ৫০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্থানে ২৫ টাকা।

পশ্চিম পাকিস্থানী শাসকবর্গ পূর্ব বাঙলার এই ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের উত্তরে একেবারে নীরব। এই অভিযোগ দূর করার জন্যে তাঁরা তো কোন চেষ্টা করেনই নি, বরং যাঁরা এই অন্যায়, শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্থান তাঁদের নামে এনেছে দেশ-দ্রোহিতার অভিযোগ। তাঁদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেবার জন্যে চালিয়েছে নানা ষড়যন্ত্র যখনি বাঙলাদেশ তার ন্যায্য দাবীর কথা তুলেছে তখনই পশ্চিম পাকিস্থানের শোষক বর্গ জুজুর ভয় দেখিয়েছে। "সাবধান ভারত আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করছে। এখ আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বন্ধ রাখ। অর্থা আমরা এখন যেমন শোষণ করছি, তা চালি যেতে দাও।

পশ্চিম পাকিস্থানী শাসককুলের এ বঞ্চনা, এই শোষণের রথচক্রকে রুখব সংকল্প নিয়েই আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবী, যার মূল বক্তব্য হলো পূর্ব বাঙলার জন্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। পশ্চিম পাকি-স্থানের শোষক দল কিছুতেই নির্বাচন করতে দেয় নি। তারা অবাধে চালিয়েছে জঙ্গী শাসন, বাঙালীর আশা আকাঙ্ক্ষা রুখবার জন্য। অবশেষে অনুপায় হয়ে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো পাকিস্থানের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-পরিচালিত আওয়ামী লীগ এই ছয় দফা দাবীর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জাতীয় পরিষদে ও প্রাদেশিক পরিষদে

রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ হাটের চালাগুলোর ওপর উড়ছে কালো পতাকা।

লাভ করলেন নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। নির্বাচনের পর শেখ মুজিব বললেন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই অভূতপূর্ব জয় হলো তাঁদের ছয় দফা দাবীর অনুকূলে গণভোট। কাজেই পাকিস্থানে যে সংবিধান গৃহীত হবে তাতে এই ছয় দফা দাবীর স্বীকৃতি চাই, চাই 'রাজ্য' বা দেশগুলির জন্যে স্বায়ত্তশাসন।

ভুট্টোর অভিসন্ধি

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও আরও দু'-একজন মতলববাজ রাজনীতিক, শেখ মুজিবর রহমানের এই দাবীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার গন্ধ খুঁজে বার করলেন। কিন্তু তাঁরা যদি একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দিকে চোখ ফেলতেন, তা হলেই বুঝতেন আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত সংবিধানের সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বহুলাংশেই মিল আছে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক সংবিধান সে দেশকে গোল্লায় পাঠায় নি, বরং তার ঐক্যকে তা আরও দৃঢ় করেছে। কাজেই পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত সংবিধান গৃহীত হলে, পাকিস্থানের দু' হিস্যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো এমন কথা মনে করার কোন কারণ ছিল না। বরং জনাব ভুট্টো যেখানে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্যে দুজন প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা করেছিলেন, বিচ্ছিন্নতার বীজ তার মধ্যেই নিহিত ছিল।

আশ্চর্য; অতি নিকৃষ্ট লোকেরও একটা চক্ষুলজ্জা থাকে, ইসলামাবাদের জঙ্গী ডিকটেটরদের সেটুকুও নেই। যাঁরা কথায় কথায় কাশ্মীরের গণভোটের দাবী তোলেন তাঁদের হাতেই পূর্ববঙ্গের গণভোটের রায় খুন হলো। তাঁরাই আঁতুড়ে পাকিস্থানের গণতন্ত্রের সম্ভাবনাকে হত্যা করলেন। পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামরিক বুটের নীচে থেৎলে মেরে শুরু করলেন গণহত্যার বর্বরতা।

কিন্তু মানুষের অপরাজিত মনুষ্যত্ব কখনো অত্যাচারের কাছে মাথা নত করেনি। সে গর্জে উঠেছে, প্রতিরোধ গড়েছে। আদর্শ প্রীতি ও মনোবলের দুর্জয় হাতিয়ার নিয়ে সে রুখে দাঁড়িয়েছে বিবেকবর্জিত স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে।

বাঙলাদেশেও তাই ঘটেছে। সেখানকার নিরস্ত্র মানুষ সামরিক শাসনের নজীরহীন বর্বরতার মোকাবিলা করছেন, অপরাজেয় মনোবল নিয়ে। তাঁরা ঘোষণা করেছেন বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে স্বাধীন লোকতান্ত্রিক বাঙলা সরকার। আর ইসলামাবাদের ক্ষিপ্ত জঙ্গী শাসক সে জন্যই বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর চালাচ্ছেন নারকীয় অত্যাচার।

রাষ্ট্রসংঘের নীরবতা

প্রত্যাশা ছিল, আর্ত মানবতার ক্রন্দনে রাষ্ট্রসংঘ পূর্ববঙ্গের এই গণহত্যা বন্ধের জন্যে কার্যকর কোন পন্থা অবলম্বন করবেন। আশা ছিল, বৌদ্ধধর্মের উদার আদর্শের পরিবেশে মানুষ, রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উ থান্ট এই নরমেধ যজ্ঞ বন্ধ করতে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করবেন। কিন্তু যদিও পূর্ব বাঙলার আর্ত মানুষের ক্রন্দনে সেখানকার আকাশবাতাস ভারাক্রান্ত, তবুও স্বৈরাচারীর রক্তাক্ত হাতকে সংবরণ করতে কেউ সেখানে এগিয়ে আসছেন না।

এখন আমাদের কর্তব্য কি? পৃথিবীর অন্য দেশরা অল্পবিস্তর চুপ করে থাকলেও আমরা, ভারতবর্ষের লোকেরা, আমাদের সাড়ে সাত কোটি বাঙালী ভাই-বোনেদের জন্যে কি কিছুই করব না? এ ব্যাপারে সোজাসুজি সব কিছু করার পক্ষে আমাদের রাজনৈতিক বাধা থাকতে পারে। তবে কতকগুলি কাজ তো আমরা এখুনি করতে পারি। আজ তো আমরা বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিতে পারি। এতে মানবতা কিম্বা রাজনৈতিক দিক দিয়ে তো কোন বাধা থাকা উচিত নয়। বাংলা দেশের অধিবাসীরা ইলেকসানের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা কি চান। তাঁদের দাবী আমাদের সমর্থন করতে বাধা কি? আজ যদি ভারত এই দাবী মেনে নেয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর আরও অনেক সভ্য জাতি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। বাংলা দেশে আজ এত বড় ঘটনা ঘটছে, এত নিরস্ত্র নরনারী, শিশু হত্যা চলছে, গণতন্ত্রকে এইভাবে জবাই করা হচ্ছে, তবে কেন আজ বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন বাংলা দেশকে স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন না? এককালে যাঁরা কাশ্মীরে গণভোট চেয়েছিলেন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চেয়েছিলেন, তাঁরা কি বাংলা দেশের সব খবর জানেন না? বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি লোক তো গণভোটের মাধ্যমে তাঁদের জাতীয় ইচ্ছা ও দাবী জানিয়েছেন। তাঁরা যদি একটু খোঁজ নিতেন যে, এত বছর ধরে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তান বাংলা দেশের বুকে বসে অত্যাচার ও শোষণ চালিয়েছে, তাহলে তাঁরা কখনই ইয়াহিয়া, ভুট্টোর প্রচারে একটুও কর্ণপাত করতেন না। এখনও সময় আছে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি আর চুপ করে না থেকে এখুনি এগিয়ে আসুন এবং এই অত্যাচার বন্ধ করুন।

আমি বিশ্বাস করি, বর্বরের সংগে সংগ্রামে মানবতা জয়ী হবেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ন্যায় ও সত্য জয়লাভ করবে। বাংলা দেশ জয়ী হবে। অক্ষয় হবে। জয় বাংলা।

(আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত ভাষণ)।

শিপ্রা আদিত্য

বাংলাদেশের সংগ্রামী ভাইবোনেদের স্বাধীনতার রক্তাক্ত সংগ্রামের খবর জানতে সহমর্মী মন নিয়ে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম তাঁদের ওখানে। বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কয়েক মাইল পথ পায়ে হেঁটে, ৩১ মার্চের এক গভীর রাতে এসে পৌঁছুলাম এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ী বসিরহাটের ধলতিতায়।

বাংলা বন্ধের (পশ্চিমবাংলা) প্রত্যুষে সদলবলে পদযাত্রা শুরু করলাম সীমান্তের উদ্দেশ্যে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। আমাদের পাশাপাশি চলছে কয়েকশ' সাইকেল, তার প্রতিটিতে প্রায় জনা দুই-তিন করে যাত্রী। মাঝে মাঝে বন্ধের নির্দেশ অমান্য করে ছুটে চলেছে আপাদমস্তক লোকে ভর্তি দু-তিনটি করে মোটরবাস। এপার বাংলার যাত্রীদের শতস্ফূর্ত সহানুভূতি ছাড়াও ছিল, প্রত্যক্ষ সাহায্যের রসদ। সাইকেলের সামনে, বাসের বনেটে পত পত করে উড়ছিল ওপার বাংলার সংগ্রামী শহীদদের শোকে আচ্ছন্ন কাল পতাকা। প্রতিটি যাত্রীর মুখেই ছিল আসন্ন বিজয়ের ঘোষণা—'জয় বাংলা'।

প্রায় তিন মাইল পথ হেঁটে ইটিণ্ডা ঘাটের খেয়াপাড়ে পৌঁছে দেখি শয়ে শয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে পারাপারের জন্য। দলমত নির্বিশেষে সংগ্রামরত ওপারের ভাই-বোনেদের প্রেরণায় এপারেও আজ স্থানীয় স্বেচ্ছাবাহিনী সংগঠিত হয়েছে দলমত নির্বিশেষে। তাঁদের সাহায্যে তক্ষুনি একটি খেয়া নৌকায় ওপারে পৌঁছুবার ব্যবস্থা হয়ে গেলো, ইটিণ্ডায় পৌঁছুলাম, নোনাজলের জোয়ারের প্লাবনে বাঁচার জন্য নিম্নবাংলার নদীগুলির মতই এখানের ইছামতীরও ভেড়ী বা ঘেরী (উঁচু পাড়) দিয়ে ঘেরা নদীতট, তারই ওপর মাচাবাঁধা খেয়াঘাট। সুন্দরবনের 'প্রেমকাদার' আলিঙ্গন থেকে বাঁচার জন্য এ ব্যবস্থা এসব অঞ্চলে অপরিহার্য। ধীরে ধীরে উঁচুপাড়ে উঠে খেয়াঘাটের পসারীদের ছোটখাটো বন্ধ দোকানগুলির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে পথ। সীমান্তের চেকপোস্ট-এর দিকে, পাক্কা তিন মাইল দূরে। ইটিণ্ডাগ্রামের মধ্য দিয়ে, হাইস্কুলের গা ঘেঁসে, গ্রন্থাগারের পাশ কাটিয়ে পৌঁছেছি সীমান্তের ছোট খালপুল-এর ওপর। গ্রন্থাগারের বিপরীত দিকে কাস্টমস অফিস আর তার কর্মীদের আবাসগৃহ। পাশেই সীমান্ত প্রহরীদের ছাউনী। আশেপাশে দু-একটি চা-খানা। অতি উৎসাহী এপার বাংলার জনসমুদ্রকে আজ এপারে আটকে রাখতে সীমান্ত প্রহরীরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

চেকপোস্ট-এর সীমানা এড়িয়ে গ্রাম্য-শুলের পথে সদলবলে পাড়ি দিলাম। ক্ষেত ভেঙে, আল বেয়ে, আরো এক মাইল পথ বেয়ে এতক্ষণে এসে পৌঁছেছি সেই সীমান্ত নির্দেশিত ছোট্ট খালটির ধারে। পায়ের পাতা ডোবা স্বল্প জল আর প্রেমকাদার প্রচণ্ড আকর্ষণ ছাড়িয়ে কদমে কদমে এগিয়ে গেলাম সীমান্তের ওপারে, একে একে আমরা সবাই। এপার বাংলার অগ্রগামী যুব-প্রতিনিধিরা কয়েক পা এগিয়ে ওপার বাংলার সংগ্রামী যুবকদের কয়েক জনের সংগে এক-সুরে সুর মিলিয়ে আওয়াজ তুললেন 'জয় বাংলা'। আমরাও সমস্বরে ডেকে উঠলাম জয় বাংলা। এপার বাংলার দিলীপভাই আর কালীভাই-এর সংগে ওপার বাংলার দুলুভাই আর রফিকভাইরা ছিন্নভিন্ন একাকার হয়ে গেলেন। বাংলাদেশের সীমান্তে নিভৃত এ কোণটিও আজ এপার বাংলার বাঁধনছেঁড়া সহমর্মী জনতার উচ্ছ্বসিত প্লাবনে ধ্বংস ও বিশৃংখল হয়ে পড়েছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ

বর্বর পাকিস্তানের জঙ্গী শক্তির লাগাম-ছাড়া শিকারীদের আক্রমণে শান্তিঘেরা এপারের এই নিভৃত গ্রামটিও আজ বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামগুলির মতই বিপন্ন।

এখানের দৈনন্দিন যাত্রা আজ ব্যাহত। দোকানপাট বন্ধ। মাত্র ত্রিশ মাইল দূরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে জয়-পরাজয়ের সংবাদে গ্রামবাসী কখনো উচ্ছ্বসিত কখনো অভিভূত হয়ে পড়ছেন। অনিশ্চিয়তার দোটানায় এরা আজ অভিভূত। সেই সঙ্গে আছে চরম খাদ্যাভাব, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব তার ওপর আছে—দূরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে সংগ্রামরত বাঙালীর অপ্রতুল অস্ত্র-শস্ত্রের দুঃশ্চিন্তা। এমন মুহূর্তে এপার বাংলার সহানুভূতিশীল যুবচেতনার সীমান্ত-ভাঙ্গা অতি উৎসাহ উচ্ছ্বাস আজ এপারের গ্রামীণ জীবনে আরো বিপন্ন করে তুলেছে। ক্ষেতে-খামারে, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে আজ এপার বাংলার শত সহস্র যুবক। মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটার ক্লান্তি আর দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় তারা যেখান থেকে যা পারছে তাই সংগ্রহ করে কোনক্রমে ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করে চলেছে। ঠাকুমা-দিদিমার কথার শোনা—ফেলে আসা সেই রূপকথার দেশ আজ এদের খুবই কাছের হয়ে পড়েছে। তাই আনন্দে আবেগে ওপারের কিছু স্মৃতি-চিহ্ন সংগ্রহের আগ্রহে এপারের যুবকবৃন্দ উন্মেল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে হেথায়-হোথায়। হায় এরা জানে না, এদের এই সহানুভূতির অতি-উৎসাহ পরক্ষ্যে যে বর্বর জঙ্গী পাকিস্তানী পশুশক্তিকেই সাহায্য করবে। যশোর-খুলনার সংগ্রামরত প্রতিটি বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব রয়েছে এইসব খাদ্যাভাব প্রপিড়ীত গ্রামগুলির ওপর। দু-চারটি বিস্কুট, দু-একটি রুটি, দু-এক হাতা ভাত, দু-এক দানা শস্য, তাও আজ অপচয়ের সাধ্য নেই বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের পক্ষে। প্রতি গ্রাস অন্নের ওপর নির্ভর করছে প্রতিটি বাঙালী সৈনিকের প্রতিদিনের যুদ্ধসামর্থ্য। উত্তেজনা ও কায়িক পরিশ্রমে শ্রান্ত প্রতিটি সৈনিককে উৎসাহী করে তুলতে আজ এদের প্রয়োজন প্রতিটি সিগারেট, প্রতিটি বিড়ি, প্রতি কাপ চা, যার প্রচন্ড অনটন ঘটেছে আজ ও বাংলায়। এপার বাংলার যুবশক্তিকে তার আবেগ, উচ্ছ্বাস আরো সংযত করে সামিল হতে হবে ওপার বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে। প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় সামগ্রী-গুলি পাঠিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। মনে রাখতে হবে এ এক দুর্লোধ্য অসম সংগ্রামে মোরচা নিয়েছেন বাংলাদেশের সংগ্রামী যুব-শক্তি। বিপক্ষে যার—সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিজ্ঞানজাত অতি আধুনিক সমরাস্ত্র। তার ওপর আছে ফ্যাসীবাদ ও মার্কিনী বিত্তংসতার প্রেরণায় উৎসাহী বর্বর পাকি-স্তানী ধ্বংসনীতি। সপক্ষে আছে—বিশ্বের প্রতিটি বিপ্লবের চরম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, প্রায় নিরস্ত্র, বুভুক্ষু, অটুট মনোবলে বলীয়ান যুবশক্তি। তাই বাংলাদেশের এই মহান বিপ্লবকে সার্থক রূপ দেবার দায়িত্বে প্রতিটি বাঙালীকেই আজ অংশ গ্রহণ করতে হবে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসা-দ্রব্য, নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য প্রভৃতি জুগিয়ে। আর প্রয়োজন মত প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ সাহায্য দিয়ে। খেলার মত ভীড় বাড়িয়ে নয়?

ঘোজাডাঙ্গার হাঁটাপথ পেরিয়ে রাস্তার তে-মাথায় এক বাঁশঝাড়ের ছায়ায় আমাদের প্রথম বৈঠক বসলো ওপারের জঙ্গী যুবকদের সঙ্গে। যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা নিয়ে খবরের আদান-প্রদান চললো। এখান থেকে যশোরের যুদ্ধক্ষেত্র প্রায় ৪০ মাইল দূরে এবং খুলনাও প্রায় ৭০।৭৫ মাইল দূরে। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের যোগাযোগরক্ষী যানবাহন প্রতি-দিনই, বার বার যাতায়াত করে এখানে। তাই এসব রণাঙ্গনের টাটকা খবর সব সময় এখানে পাওয়া গেলেও অন্য সীমান্তের যুদ্ধ-সংবাদ পাবার আগ্রহে এ অঞ্চলের লোক সর্বদাই এপার বাংলার দৈনিকপত্র বা আকাশ বাণীর ওপরেই নির্ভর করে এখন। কলকাতার দৈনিক সংবাদ সংবাদপত্র পত্রিকাগুলির প্রতি এদের অসীম আগ্রহ। তাই যে কোন সীমান্ত অতিক্রমকারী আগন্তুকদের কাছে এরা প্রথমেই অনুরোধ করে সেদিনের সংবাদপত্রটি দেবার জন্য।

দু-এক মাইল হেঁটে এসে পড়লাম ডোমরাগায়ের খেজুর বাগানে। চারদিক ধু-ধু করছে বর্তমানে নিঃস্ব চষাক্ষেত্রে অসমতল দিগন্তপ্রসারী মাঠ, মাঝে মধ্যে দু-একটি খেজুর গাছ, বাঁশঝাড়, দু-একটি আমবাগান, দূরে গ্রাম রেখায় কলাবাগানের শান্ত পরিবেশ। চড়া রোদের ক্লান্তি কাটাতে খেজুর ছায়ায় আশ্রয় নিলাম এপার বাংলা ওপার বাংলার সহমর্মী কয়েকজন। অদূরে গ্রাম থেকে ছোট বড় অনেকেই এসে এ জমায়েতকে প্রায় সমাবেশ করে তুললেন। সেই সঙ্গে এসে জুটলেন পাকিস্তান সর-কারের বশংবদ দু-একজন কর্মচারী, যারা আজ বিপ্লবের সামিল হয়ে চলেছেন এখানের অগ্রগামী যুবশক্তির সঙ্গে।

দূর দূরান্তের নিস্তব্ধ পথকে সচকিত করে হঠাৎ শুরু হলো প্রাণভয়ে পলায়মান মানুষের দৌড়ঝাঁপ। সীমান্ত লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটে চলেছে আবাল বৃদ্ধ জনতা. জমায়েতে আলোচনারত জঙ্গী যুবকরা সচকিত হয়ে ছুটে গেলেন সংবা-দের আশায়, পলায়মান জনতার পিছে পিছে এমন ভীতির কার্যকারণ জানতে। বিফল হয়ে ফিরে এলেন তাঁরা, পলায়মান কোন লোকই জানে না কারণ কি, কি বা ঘটেছে, কেনই বা ছুটেছে? দূরে সীমান্তের পথ ঘেঁষে মোড় ফিরে হঠাৎ আবির্ভূত হল এক দ্রুত ধাবমান জঙ্গী জীপ সশস্ত্র কয়েকজন সৈনিককেও দেখা গেল ঐ গাড়ীতে। জমায়েতের যুবকবৃন্দ নিশ্চিত হয়ে জানালো, এটি মুক্তি ফৌজের যোগাযোগরক্ষী গাড়ী। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল স্থানীয় কয়েকজন গ্রামবাসীদের, কয়েকটি আহত সীমান্ত অতিক্রমকারী অতি-উৎসাহী দর্শককে কাঁধে করে নিয়ে চলেছেন সীমান্তের দিকে। এরা গাড়ীর শব্দে ভীত হয়ে প্রাণভয়ে খালে-বিলে পড়ে হাত-পা ভেঙ্গে বসে আছে।

পায়ে পায়ে আমরা এগিয়ে চলছি সাত-ক্ষীরার পথে। সাতক্ষীরা এখনো নয় মাইল পথ। পথে সাতক্ষীরা গার্লস কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী কামেলা আসাদ-এর সঙ্গে পরিচয় বিনিময় হল। কামেলার জবানীতে জানলাম—"কলেজের ছাত্ররা মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে। আর ছাত্রীরা

স্বাধীনতার প্রহরী

কেউ কেউ রাইফেল ট্রেনিং-এ, কেউ সমরাস্ত্র সংগ্রহে, কেউবা লড়ুয়ে ভাইদের খাবার জোগাড় করছে, খাবারের প্যাকেট পাঠাবার বন্দোবস্ত করে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ নার্সিং-এর কাজেও লেগে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার দায়িত্ব কিসের ওপর?

উত্তরে কামেলা বললো—আমি আর আমার মত আরো দুজন, রুটি করা থেকে প্যাকেটে করে ট্রাকে তুলে দেওয়া অবধি সবই আমাদের দায়িত্বে।

খানিকবাদে এনামুল হাজরার বৌ ফতেমা বিবির সঙ্গে দেখা। মাঝবয়সী সরল সাধাসিধে ফতেমা বিবি যুদ্ধের কিছু বোঝে না শুধু জানে দেশ স্বাধীন হবে। একমাত্র ছেলে রহিমও আজ বাড়ী নেই, লড়াই করছে শত্রুর বিরুদ্ধে। বুড়ো মরদ এনামুল চোখে ঠাহর করতে পারে না তাই ফতেমাই রাতের বেলা বঁটি-দা নিয়ে পাহারা দেয় উঠোন-ঘর, মরাই-ধান।

বেতনা নদীর (বেত্রবতী) ছোটখালের আশপাশের গ্রামগুলিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে স্থানীয় কয়েকটি যুবকের সঙ্গে মিলিত হলাম। এদের মধ্যে আবদুল আর করিমের বক্তব্য—যুদ্ধ চলবে—দরকার হলে লোক বদলাবে।

বুড়ো রসিক চাচা তো অনেক আগেই গজগজ করছিল 'কি দরকার আছে এমন খুনোখুনির, পরে হালে পানি পাবি হয়।'

সাতক্ষীরা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র সামসের এতক্ষণ সব শুনছিল, এবার সে চিৎকার করে বলে উঠলো—'এ লড়াই বাংলা দেশের লড়াই, সমগ্র বাঙালীর লড়াই। এ লড়াই চলছে চলবে।'

এরপর কয়েকটি ছাত্রের কাছ থেকে শুনলাম বর্বর জঙ্গীরা কিভাবেই না বলাৎকার করেছে নিরীহ মা-বোনেদের ওপর। যশোর শহরে, বিশেষ করে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এখনো ছড়ানো-ছিটানো আছে রাশ-রাশ মৃতদেহ। কী বীভৎসই না সে দৃশ্য। পথ শকুন আর কুকুরে ছেয়ে ফেলেছে। মহামারী এই আরম্ভ হলো বলে! যশোর-এর যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন সংবাদ জানা গেল এদের কাছ থেকে। ওখানে এখন পাকিস্থানী জঙ্গীশাহী ২২নং ফিল্ড ফ্রন্টিয়ার রাইফেল, ২৭নং বেলুচি রেজিমেন্ট, ২৫নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এর তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্যের সঙ্গে যে মুক্তিফৌজ আমৃত্যু সংগ্রামে লড়ে চলেছে তাঁরা হচ্ছেন—ইস্টার্ণ পাকিস্থান রাইফেলস, সশস্ত্র পুলিশ, আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক। এখন লক্ষ্য কিভাবে পাক-সৈন্যকে কব্জা করা যায়। দিকে দিকে তারই প্রস্তুতি। রাইফেল চালানো থেকে শুরু করে গ্রেনেড মলোটভ ককটেল কিভাবে তৈরী করতে হয় বা কিভাবে ছুঁড়তে হয়। ব্যারিকেড তৈরী থেকে ব্রীজ উড়িয়ে দেবার সব কলাকৌশলই আজ এরা আয়ত্ত করার চেষ্টা করে চলেছে। একদিকে চলছে লড়াই, আর অন্যদিকে গেরিলা কায়দায় চলছে তারই প্রস্তুতি। হয়তো বা দীর্ঘদিন ধরেই চলবে এ লড়াই তারই জন্য। তবে একটাই ভরসা সামনেই বর্ষা—জঙ্গী সেনারা পথ পাবে না পালাতে। জঙ্গীশাহীর লড়াই-এ কুত্তাদের এরা এখুনি প্রায় ছাউনীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে এখন। তবু তৃষ্ণা ও ক্ষুধার তাড়নায় মরীয়া এ দখলদারী সেনারা মাঝে মাঝে শহরের অলিতেগলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আধুনিক মারণাস্ত্রের সাহায্যে গণ-হত্যা করে চলেছে নিরীহ নগরবাসীদের উপর। তাই লড়াই চলছে অলিতেগলিতে পথেপ্রান্তরে। যশোর রোডে, খুলনা রোডে, চাঁচড়া মোড়ে, পুরাতন কসবার, ঝিনাইদা রোডে, এয়ারপোর্ট রোডে, পুলিশ লাইনে কালেক্টরেটে, ফুলতলিতে।

আপাদমস্তক আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এ দখলদারী বাহিনীর অশেষ অত্যাচারের সংবাদ লজ্জা দেবে ইহুদী হত্যাকারী নাজীদের অথবা ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামের গণহত্যাকারী মার্কিনী, দখলদারী সৈনাদের কুখ্যাত ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ক্যালেকে। অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে নাবালক শিশুরা বাদ যায়নি এদের নির্যাতন বা হত্যার তালিকা থেকে। বৃদ্ধা, যুবতী, তরুণী বা বালিকা কেউই এদের লোলুপ কামনার শিকার থেকে বাদ পড়ে নি। এর জবাব বাংলার ছেলেরা দিচ্ছে আরো দেবে।

পথের মোড়ে প্রচারপত্রে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থায় কার্যকারণ প্রকাশ করেছেন। 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শিরোনামা দিয়ে। পাকিস্থান ও বাংলা দেশ-এর অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখিয়েছেন—

রাজস্বখাতে ব্যয় বাংলাদেশের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা। আর পাকিস্তানের জন্য ৫০০০ কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে—বাংলাদেশে ৩০০০ কোটি টাকা। পাকিস্তানে ৬০০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য—বাংলাদেশে শতকরা ২০ ভাগ, পাকিস্তান শতকরা ৮০ ভাগ। বৈদেশিক দ্রব্য আমদানীতে বাংলাদেশ শতকরা ২৫ ভাগ, পাকিস্তান শতকরা ৭৫ ভাগ। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী—বাংলাদেশে শতকরা ১৫ জন, পাকিস্তানে শতকরা ৮৫ জন। সামরিক বিভাগে চাকুরী—বাংলাদেশে শতকরা ১০ জন, পাকিস্তানে শতকরা ৯০ জন। এছাড়া চাল বাংলাদেশে প্রতি মণ ৫০ টাকা, পাকিস্তানে ২৫ টাকা। আটা—বাংলাদেশে প্রতি মণ ৩০ টাকা, পাকিস্তানে ১৫ টাকা প্রতি মণ। সরষের তৈল—বাংলাদেশে প্রতি সের ৫ টাকা, পাকিস্তানে প্রতি সের ২-৫০ নয়া পয়সা। সোনা প্রতি ভরি—বাংলাদেশে ১৭০ টাকা, পাকিস্তানে ১৩৫ টাকা। সেই সঙ্গে আছে ভারী বা নিত্য-ব্যবহার্য শিল্প নির্মাণের পরিকল্পনায় এদেশ ওদেশের দুয়োরাণী সুয়োরাণী ভাব। যথাযথ জায়গায় ঘুষ না দিলে উচ্চশিক্ষিতেরও চাকরী হয় না ওদেশে। সেই সঙ্গে আছে চরম বেকার সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে নিদারুণ দারিদ্রতা।

গত ২৩ বছরের এই প্লানিকর অসম অর্থনীতির চাপের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অবমাননার দুঃসহ ব্যথায় বিপর্যস্ত হয়ে হঠাৎ এই সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ পূর্ব পাকিস্তানের ঘুম ভাঙলো। তাই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের পথ বেছে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আজ 'স্বাধীন বাংলাদেশে' পরিণত হয়েছে। তবে সেই চরম এবং সুরক্ষিত স্বাধীনতা ঘোষণার শুভ মুহূর্তটির জন্য লড়াই চলছে, লড়াই চলবে। যতক্ষণ না সুষ্ঠু সমৃদ্ধ জনকল্যাণকর সমাজব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হবে বাংলাদেশের প্রতিটি বাঙালীদের মধ্যে।

ফেরার পথে ইটিন্ডা সীমান্তের ছোট খাল পেরিয়ে চেকপোস্ট-এর পথে খাস পুলের ওপর উঠে এলাম। আজকের এই সীমা নির্দেশী জলে পারের পাতা ডোবে না, সীমান্তের বাধা শুকিয়ে এসেছে। চেকপোস্টএর কাঁটাতারের বেড়ায় জং ধরেছে। এখানে ওখানে পিলপের মাথায় পাকিয়ে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া তার—বুঝি অতীত অত্যাচারের ধ্বংসাবশেষ।

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

Clinic
SHAMPOO
Contains: 0.15% 3.4.4
Trichlorocarbanilide
Clears dandruff
from hair and scalp

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

'ক্লিনিক' কি ভাবে কাজ করে

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক সরাসরি খুস্‌কি নাশ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিকের' উপাদান ভেতরে গিয়ে মোক্ষম কাজ করে।

এই মিশ্রণ চুলের গোড়ায় গিয়ে খুস্‌কি দূর করে। চুল ক'রে তোলে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর।

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একবার—খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130
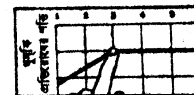
বৈশাখী মন ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সামনে বোশেখ মাস বছরের সেরা পুণ্য মাস,
ঝড়-ঝঞ্ঝা পার হয়ে শুরু হবে নতুন জীবন;
পশ্চাতের রক্তমাখা দিন-মাস সমস্ত সন্ত্রাস
স্মৃতি থেকে মুছে যাবে; শুচিস্নিগ্ধ শুভ্র আলিম্পন
ঘরে ঘরে আঁকা হবে, সুখ-স্বপ্নে আশা ও আশ্বাস;
সামনে বোশেখ মাস বছরের সেরা পুণ্য মাস।

সামনে বোশেখ মাস আসে নিয়ে নতুন বছর,
আগুনে রোদ্দুরে পুড়ে অতীতের পাপ ছারখার;
নতুন শপথে হবে ভয়মুক্ত প্রত্যয়ের স্বর,
নতুন তরঙ্গ-দোলা প্রাণে প্রাণে আনন্দ সঞ্চার।
সম্মুখে ছড়িয়ে দৃষ্টি দেখি বাঙলা কেমন সুন্দর!
সামনে বোশেখ মাস আসে নিয়ে নতুন বছর।

সামনে বোশেখ মাস নববর্ষ মহা পুণ্যদিন,
আরম্ভ সেদিন থেকে জীবনের নব মহোৎসব;
আবার সকল চিন্তা আমাদের স্বার্থলেশহীন,
প্রীতির বন্যায় হাসি দেশময় হর্ষ-কলরব।
ভালোবাসা দিয়ে এসো এইবার শুধি ভ্রাতৃঋণ,
সামনে বোশেখ মাস নববর্ষ মহা পুণ্যদিন।

আমার সোনার বাংলা ॥

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে
যে কোন দূরত্বে
আমার বাঙালী মন ভরে ওঠে
বাংলা মায়ের নিবিড়তম গন্ধে।
পূব পশ্চিম বাংলা মায়েরই গর্ভজাত দুই সন্তান
শুধু চোখে দেখা নেই
শুধু বুকে বুক রেখে কথা বলা হয় নি বহু দিন।

আমি এদেশে জন্মেছি
ওদেশের মাটি দেখি নি
পাই নি জল বায়ুর স্পর্শ
অথচ পূর্বপুরুষের রক্তের টানে
অচেনা ঘাসের গন্ধ বড় পরিচিত মনে হয়।
অচেনা আম কাঁঠালের বাগান
পদ্মা নদীর গর্জন, হিমেল বাতাস
মাটির আঘ্রাণ — সব কিছু যেন চেনা
আজন্ম পরিচিত।

আমার বাংলা মা
তোমার বুকে আজ গোলা-গুলির ঝড়
জঙ্গী শাসকের ভীরু অত্যাচার।
তোমার সাত কোটি নির্ভীক সন্তান
অমান্য করেছে সেই রক্তচক্ষুর আস্ফালন
আকাশে বাতাসে তুলেছে তোমার জয়গান
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

বাংলার ছবির সঙ্গে ॥

শ্যামসুন্দর দে

পায়ে পায়ে ঘাসগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে
আমি যতবার চলে যেতে চাই
ততবার পেছনেতে ওরা ডাকে।
আমি যতবার চোখ বন্ধ করি
ততবার চোখে জ্বলে কিংশুকের মতো
ঘুম ঘুম অন্ধকার যতবার ডেকে আনি
জাগর প্রহরগুলো ততবার ভরে
সেই সব মুখচ্ছবি।
ওরা জড়িয়ে জড়িয়ে
আমার স্মৃতিকে ভরে রাখে
ভাবনার আঙিনাতে ওদের সাম্রাজ্যে
কয়েদীর মতো রাখে।
আজিকার রণক্ষেত্র ছেড়ে যেতে
পলায়নী মন যদি ডাকে
পায়ে পায়ে ঘাসগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে
আমি তো পারি না ছিঁড়ে চলে যেতে
আমার মনের তারে তার গান
সারাটা সময় কেবল বেজে বেজে চলে।
কোথায় অঞ্জলি ভরা ফুল আমি পাব
জীবনে কোথায় ধীর মন্থরতা।
আমার বাংলার মন রক্তাক্ত কিংশুকে জ্বলে
উদ্ধত শাখাতে তার আকাশের অভিযান
যন্ত্রণা-আবীরে রাঙা প্রতিরোধ ডাকে
আমার বাংলার ছবি
আমার প্রিয় শোণিতে লাল।

বাংলায় এখন চৈত্র ॥

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

কে বলেছে আমি নির্বাক?
বর্ডারের পার থেকে পাড়ি আমি হাহাকার হাঁক
মাগো, আমায় রক্তের দাগ!
আমি ভুলব না—থাক—
ওই রক্তের দাগ
সমস্ত শরীরে লেগে থাক।

বাংলায় এখন চৈত্র
অথচ কি বসন্তের গন্ধবর্ণ চেকপোস্ট বর্ডারের
সীমা লঙ্ঘন করে সরাবে না মোহিনী আড়াল
তবে থাক
ভুলবো না রক্তের দাগ
বাংলার রক্তের দাগ
আমার সর্বাঙ্গে লেগে থাক।।

মুখবন্ধ

চাণক্য চাকলাদার আমারই নাম। থাকি মুচিপাড়ার মেসে। সারাদিন উদ্ভট বই পড়ি। ফ্যানটাসি ফিল্ম দেখি। প্রতি সন্ধ্যায় আফিং খাই। তারপর ডাইরী লিখতে বসি।

আমি বৃদ্ধ। কুব্জ। পলিতকেশ। আমি রোগজীর্ণ, বদহজমে শীর্ণ, যমেরও অরুচি। কিন্তু একদিন আমি ছিলাম দুরন্ত দুর্মদ দুর্বার। সারা পৃথিবী ছিল আমার কর্মক্ষেত্র। সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত হেন স্থান নেই যেখানে আমার লীলাখেলা ঘটেনি; যেখানকার আরক্ষা-বাহিনী আমার হুহুংকারে কাঁপেনি; আমার প্রতাপে নাকানিচোবানি খায়নি।

আমি ছিলাম প্রচণ্ড, প্রবল, প্রলয়ংকর। মাথায় ছিলাম সাত ফুট। আকারে তাল-পাতার সেপাই। কিন্তু পরাক্রমে আমার কাছে নতি স্বীকার করেছিল মার্জারের মত নিঃশব্দচরণ, মূর্তিমান আতংক মাসা দাউদ আর তার স্যাঙাতরা।

অতীতের সে রোমাঞ্চ-কাহিনী এই বৃদ্ধ বয়েসেও শিহরণ আনে প্রতিটি লোম-কূপে। তাই আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে নিয়ে বসি ডাইরী লিখতে। কীর্তিকথার ছত্রে ছত্রে বর্ণনা করি হার্মাদ-মেয়ে ইসাবেলার সঙ্গে আমার দেহাতীত প্রেমের উদ্ভট কাহিনী। মিসেস ফ্যানটমাসের সঙ্গে পাঞ্জাকষার অলীক উপাখ্যান।

অলীক! উদ্ভট! সবাই তাই বলে। বলে, মৌতাতের মুহূর্তে লেখা তো! বলে, ঘনাদার সেকেণ্ড এডিশন! ব্রজদার ভায়রা-ভাই!

একটা কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। আপনারাই বলুন, অলীক কিনা, উদ্ভট কিনা। চাণক্য চাকলাদারের চালিয়াতি বদনাম আপনারাই খণ্ডন করুন!

*

নয়াদিল্লী। রাত প্রায় দশটা।

ঢালু পথ বেয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মত নেমে এল একটা প্রকাণ্ড বেন্টলি গাড়ি। ছুটছে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। চাপা গালি-গালাজের শব্দ শোনা গেল। দুপাশে ছিটকে গেল গাড়ি আর পথচারী।

পেছনে মখমল-কোমল আসনে উপ-বিষ্ট দুজন পুরুষ গভীর আলাপে মগ্ন। এঁদের একজন 'হাণ্টার'-এর কেন্দ্রীয় দফতরের চীফ সেক্রেটারী। ধরা যাক, এঁর নাম সর্দার বন্দুক সিং। অপরজন সর্দার-জীর ডান হাত—ত্র্যম্বকলাল।

'হাণ্টার' একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বের তাবৎ ব্যবসায়ীদের অর্থে স্থাপিত এবং চালিত 'হাণ্টার'-এর কার্যকলাপ অতীব প্রহেলিকাবৎ।

'হাণ্টার'-এর এজেন্ট ছড়ানো বিশ্বের সর্বত্র। অথচ 'হাণ্টার'-এর অস্তিত্ব মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া বিশ্বের আর কেউ জানে না। অর্থাৎ 'হাণ্টার' একটি গোপন সংস্থা।

'হাণ্টার'-এর কার্যকলাপ তাই এত রহস্যময়। কেউ বলে 'হাণ্টার' একটা গুপ্ত-চর সংস্থা। স্পাইদের আড্ডা। কেউ বলে,

মোটেই না। 'হান্টার' গুপ্তচর নিয়োগ করে ঠিকই, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ভারতীয় কারবারীদের ব্যবসা যাতে বিশ্বের সর্বত্র ফলাও হয়, নির্বিঘ্নে বৃদ্ধি পায়—এজেন্টরা তাই দেখে। রেডিও-ট্রান্সমিটারে খবর পাঠায় কেন্দ্রীয় দফতরে। খবর নেয়।

আসলে 'হান্টার' বেসরকারী সংগঠন। কিন্তু পাঁকে পা পড়লে সরকারও এদের দ্বারে ধরণা দেয়। সাহায্য নেয়।

কানাঘুষো অনেকরকমই শোনা যায়। মাঝে মাঝে 'ইন্টারপোল' বা আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনীর মত তৎপর হতে দেখা যায় হান্টার-এজেন্টদের। দেশে-বিদেশে কুখ্যাত ঠগরা ঢিট হয় এদের হাতে। ইন্ডিয়ান কারবারীদের কেউ পথে বসানোর প্ল্যান করে তাপ পার পায় না। জুয়াচোররা ভয় পায় হান্টারকে।

এই কারণেই কিনা জানা নেই, দায়ে পড়লে টনক নড়ে সরকারী মহলের। পৃথিবীময় ছড়ানো হান্টার-এর গুপ্তচর-জালের অসাধ্য নাকি কিছু নেই। অর্থ দেয়। কাজ নেয়।

সরকারকে চটান না হান্টার-এর কর্তারা। তাঁরাও ব্যবসাদার। কারবার জিনিসটা ভালই বোঝেন। ভাড়া খাটাতে কসুর করেন না হান্টার-এজেন্টদের।

মুরুব্বীরা নাকি বলেন, এভাবে ভাড়া না খাটালে হান্টার-এর ব্যয়ভার বহন করা মুস্কিল হত। সারা পৃথিবীতে অরাজকতা দেখা দিয়েছে। লুঠতরাজ জালজোচ্চুরী, শুল্কফাঁকি ইত্যাদির ফলে ক্ষতি হচ্ছে ভারতীয় ব্যবসার—মালের কাটতি কমছে—প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষতিটুকু যদি বন্ধ করা যায়। তাহলেই অবশ্য হান্টার-এর খরচ উঠে আসে ঠিকই। কিন্তু চালু সংগঠনটাকে মধ্যে মধ্যে সরকারী স্বার্থে ভাড়া খাটালে ক্ষতি কি?

এ-কাহিনী এমনি এক অভিযানের বিবরণ।

গল্পের গরু গাছে ওঠে। এ-উপাখ্যানেও যা ঘটবে তা অবাস্তব, অলীক মনে হতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি তা সত্যিই কপোলকল্পিত?

হাজার হোক চাণক্য চাকলাদারের ডাইরী তো!

*

বন্ধুর মতই কথা বলছিলেন সর্দারজী এবং লালজী। কেননা, অন্তরে ও'রা পরম সুহৃদ।

ত্র্যম্বকলাল—'চাণক্য চাকলাদার আপনার নাম জানে দেখলাম। তাই আধমিনিটও ফোন ধরতে হল না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল।'

সর্দার বন্দুক সিং—'তা জানে। হপ্ত-কয়েক দুবার ইসাবেলা আমার কাছে এসে-ছিল দুটো মূল্যবান খবর বেচতে। চাণক্য চাকলাদারই পাঠিয়েছিল। একটা খবর কোকেন পাচার সম্পর্কে। আর একটা বোরোবুদুরের [illegible] ঘাঁটি সম্পর্কে। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। খুব কাজে লেগেছিল।'

'ইসাবেলাকে দেখেছেন? কি রকম মনে হয়?'

'খাসা।'

'কি যে বলেন! আমি অন্য কথা বলছি।'

'তাই বল। ইসাবেলাকে এক কথায় আকাটা হীরে বলা যায়। মাঝে মাঝে কিন্তু পালিশ আছে। অদ্ভুত পালিশ। চোখ ঠিকরে যায়। ইসাবেলার মাতৃভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু ফ্রেঞ্চ, আরবী, ইংলিশ মাতৃভাষার মতই চোস্ত বলে। আদব-কায়দায় চৌকস। লর্ডস ক্লাবে ইসাবেলাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম ঘাবড়ে দেবার জন্যে। বলব কি ত্র্যম্বকলাল আমিই ঘাবড়ে গেলাম ওর চালচলন দেখে! লর্ডস ক্লাবের জন্ম যেন ওরই হাতে, এমনি একটা ভাব দেখালো ইসাবেলা। দর-কষাকষি করল নির্দয়ভাবে। বিগ অফিসার বলে আমাকে খাতির করল না। সাংঘাতিক গেছো মেয়ে। মহা ডানপিটে।'

রিং রোড দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটছিল কেন্টাল। বাইরের দিকে চোখ রেখে আপন-মনেই বললেন, ত্র্যম্বকলাল—'এহেন ডান-পিটে মেয়েই কিনা শেষে বিপদে পড়ল।'

'আমাদেরও পোয়াবারো হল', বললেন সর্দার বন্দুক সিং, 'নইলে চাণক্যকে বাগে আনা যেত না। সোজা কথায়, ব্ল্যাকমেল করতে হবে।'

•

ফিরোজ শা কোটলার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা পেল্লায় ইমারত। চন্ডীগড়নির্মাতা লাকরবুসায়ের এক নামী চেলার পরিকল্পনা। সৌধ সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র বছরখানেক আগে। ছিমছাম নকসা যে কত সুন্দর হতে পারে, আকাশচুম্বী এই অট্টালিকা তার নিদর্শন। নিচের তলায় প্রাইভেট সুইমিং পুল, আখড়া এবং খেলার মাঠ। ছাদের আলসে বরাবর সবুজ ঘাস আর ফুলের চারার সমারোহ। কংক্রীটের বুকে প্রকৃতির আলপনা। নিঃসন্দেহে চোখজুড়োনো।

সর্দার বন্দুক সিংকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল ইউনিফর্মধারী কর্মচারী। বলল—'মিঃ চাকলাদার এইমাত্র ফোন করে-ছিলেন। আসুন।'

মেরুন রঙের তুলতুলে গালিচার শেষে প্রাইভেট লিফটের সামনে দাঁড়াল ইউনি-ফর্মধারী। সবিনয়ে বলল—'মিঃ চাকলা-দারের প্রাইভেট লিফট। আর কোনো তলায় দাঁড়াবে না—ও'র নিজের তলায় ছাড়া।'

সর্দার বন্দুক সিংয়ের পেছন পেছন ত্র্যম্বকলাল প্রবেশ করল ভেতরে। বোতামে আঙুল ছোঁয়াতেই নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হল। প্রথমে ধীরে, তারপর হাউইয়ের মত তীব্র বেগে ওপরে উঠে গেল উড়ন্ত কুঠরি। নিঃশব্দে দরজা সরে গেল। বাইরে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।

বিশাল দালান। নিকষকালো মেঝে। তেল, কালো মসৃণ।

দালানের অপর প্রান্তে একটি ঘর। হলঘর। লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট। ঘরের একটি মাত্র জানলা মেঝে থেকে উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত। উন্মুক্ত বাতায়নপথে চোখে পড়ছে ফিরোজ শা কোটলার বিস্তার। দালান যতখানি লম্বা, ঘরটিও ততখানি লম্বা। তবে একটু নিচের লেভেলে। অ্যালুমিনিয়াম রেলিংয়ে হাত দিয়ে তিন ধাপ সিঁড়ি নামলে তবে ঘরের মেঝেতে পা দেওয়া যায়।

প্রখর ব্যক্তিত্ব যেন ঠিকরে পড়ছে দালান আর ঘরের সাজসজ্জায়। ছিমছাম সজ্জা। বাহুল্য কোথাও নেই। কিন্তু বলিষ্ঠ। প্রচণ্ড শক্তি যেন সর্বত্র মূর্ত। একটু খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য অবাক হতে হয়। কেননা, ঘর সাজানোর পরিকল্পনাটা অদ্ভুত। কোনো ফরমুলায় পড়ে না। বহু-বিচিত্র বেশ কয়েকটি স্টাইলের আশ্চর্য মিশ্রণ।

আটকোণা আইভরি রঙের টালি দিয়ে ঘরের মেঝে বাঁধানো। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো খানআন্টেক গালিচা। পারস্যের উজ্জ্বল বর্ণসমারোহ ঝিকমিক করছে সূক্ষ্ম কারুকার্যে।

একটা দেওয়ালে কাঠের কাজ। আরেক দেওয়ালে ভেলভেটের পর্দা। তৃতীয় দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং। লাও-নার্ডো থেকে আরম্ভ করে যামিনী রায় পর্যন্ত সবই সেখানে আছে। কতকগুলো পেন্টিং অবশ্য এমন উদ্ভট কিন্তু এমন সুন্দর যে শুধু তাকিয়েই থাকতে হয়। কিছু বোঝা যায় না।

ঘরের সবক'টা দরজাই পালিশ করা কাঠের। সিংদরজার মতই অতিকায় পাল্লা। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। দরজার বুকে তিব্বতী তামার কারুকাজ।

ঘরের এক কোণে রক্ত রঙের ইটালিয়ান মার্বেলের মস্ত টেবিল। সেখানে এলো-মেলোভাবে ছড়ানো দামী দামী গয়না। পোর্সিলেনের সিংহের পিঠে অ্যালার্ম ঘড়ি, জেড পাথরের চৈনিক ড্রাগন। আবলুষ কাঠের আফ্রিকান দানো। হাতীর দাঁতে খোদাই-করা তিনটে আশ্চর্যসুন্দর নারী-মূর্তি। একটা শ্বেতপাথরের হারকিউলিস। আর একটা ব্রোঞ্জের রাণা প্রতাপ।

ঘরের আলো শ্বেতশুভ্র নয়, নীলাভ নয়। অথচ ভালো লাগে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেকেলে প্যাটার্ণের কতকগুলো গদীমোড়া সিংহাসন দেখে বসতে লোভ হয়। মণি-মাণিক্যমোড়া ভেলভেট জ্বলজ্বলে আসনে এইমাত্র যেন রাজামহারাজারা বসেছিল। এ-ঘর যেন দেওয়ানী খাস। দরবার আবার শুরু হল বলে। শিষমহলের রোশনাই তাই এ-ঘরের সর্বত্র।

ঘরের এককোণে [illegible] বুককেসে থরে থরে বই সাজানো। ঝকঝকে তকতকে

বই নয়। কোণমোড়া, হাতে হাতে মলিন। যেন, এ-বইয়ের প্রতিটি পাতা গৃহস্বামীর নখদর্পণে।

ঘরের আর এককোণে সাজানো টেলিভিশনের পর্দা এখন নিষ্প্রাণ। পাশের হাই-ফাই রেডিওগ্রাম অবশ্য সরব। জলতরঙ্গ বাজছে। টুং টাং শব্দে ঘরের বাতাস যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে।

এ-ঘরে বিষাদ নেই, উল্লাস নেই; শুধু নিবিড় শান্তি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ত্র্যম্বকলাল—'আরব্য উপন্যাসের একটি রজনী মনে হচ্ছে।'

চকিত চাহনি নিক্ষেপ করলেন সর্দার বন্দুক সিং। কিছু বললেন না। পায়ে পায়ে নেমে এলেন নিচু লেভেলের ঘরে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন এদিকে ওদিকে। পাশের একটা দরজা খোলা। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীলাভ দ্যুতি। শোনা যাচ্ছে, মেশিন চলার একঘেয়ে গুঞ্জনধ্বনি।

সর্দার বন্দুক সিং বললেন—'গলা-খাঁকারি দিলে হয় না?'

'মন্দ হয় না', বললেন ত্র্যম্বকলাল।

অতর্কিতে মেশিনের মৃদু গুঞ্জনের ওপরে শোনা গেল দ্রিমি-দ্রিমি কণ্ঠ। কণ্ঠ তো নয়, যেন মহাকালের ডম্বরুধ্বনি।

'গলা খাঁকারির দরকার হবে না, লালজী। আমি হাজির।'

সবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন দুই অভ্যাগত। নীলাভ দ্যুতি যে-ঘরে, সেই ঘরের বিশাল দরজার ফ্রেমে যেন যাদুমন্ত্রবলে আবির্ভূত হয়েছে এক তালঢ্যাঙা পুরুষ। মাথায় সাত ফুট। কিন্তু সতেজ বাঁশের মত শীর্ণ অথচ মজবুত। স্মিত মুখ। চোখের তারায় একাধারে-দ্যুতি। ব্যাকব্রাশ করা চুল। অঙ্গ ঘিরে উজ্জ্বল হলুদ রঙের ঢিলাহাতা আল-খাল্লা। সোনালী সুতোর কাজ মহার্ঘ আলখাল্লার সর্বত্র। বুকের ওপর নটরাজের তাথৈ-তাথৈ মূর্তি। দামী দামী পাথর চিকমিক করছে নৃত্যের তালে তালে।

অস্ফুট কণ্ঠে বললেন ত্র্যম্বকলাল—'চাণক্য চাকলাদার!'

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালো জমকালো তালগাছ—'ইয়েস স্যার। দীনের কুটির আপনাদের পায়ের ধুলোয় আজ ধন্য হল।'

'আসুন, আলাপ করিয়ে দিই', বললেন ত্র্যম্বকলাল। 'আমাদের চীফ সর্দার বন্দুক সিং।'

নমস্কারের পালা শেষ হল। চাণক্যর অন্তর্ভেদী চোখ পায়রার মত পিছলে গেল সর্দারজীর চুলের ডগা থেকে নখের ডগা পর্যন্ত।

'এত রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিঃ চাকলাদার', একটু দুঃখের ভান করলেন সর্দার বন্দুক সিং, 'অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'তেমন কিছু নয়। মিনিট দু'-তিনের একটা কাজ-কাকি রয়েছে। সেটা সেরে নিই। তারপর কথা বলবখন। আসুন।'

নীলাভ দ্যুতিময় ঘরের মধ্যে আবার অন্তর্হিত হল চাণক্য। পেছন পেছন এলেন দুই অভ্যাগত। দেখলেন, একটা ছোট্ট কারখানা।

কারখানা এঁদের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু এ-কারখানার মধ্যে একটু নতুনত্ব ছিল বইকি। এত পরিষ্কার, এত ছিমছাম গুছানো যন্ত্রালয় এর আগে কখনো চোখে পড়েনি। তিনটে আলাদা বেঞ্চি তিনদিকে বসানো। প্রতিটির সামনে উঁচু টুল পাতা। একটা বেঞ্চির ওপর তিনটে চাকা কনভয়ের বেল্ট দিয়ে লাগানো একটা মোটরে। তিনটে চাকাই ঘুরছে বেঞ্চির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায়। প্রথম চাকাটা বাকি দুটো চাকার থেকে একটু দূরে। পাশেই একটা বাক্স। বাক্সর মধ্যে কারবোরানডাম। একটা কাচের জারে অতি-সূক্ষ্ম এমারি পাউডার। আর এক শিশি পুটিন-পাউডার। সবকটি বস্তুই এবড়োখেবড়ো বস্তু মসৃণ করে। শিরিস কাগজের উন্নত সংস্করণ।

দ্বিতীয় বেঞ্চিতে একটা ক্ষুদে লেদ মেশিন। মেশিনে লাগানো প্যাঁচকে করাত। সাধারণ করাত নয়। ফসফর-ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি একটা চার ইঞ্চি চাকা। চাকাটা ঘুরছে খাড়াইভাবে। চাকার গায়ে লেগে হীরকচূর্ণ।

তৃতীয় বেঞ্চিতে বসল চাণক্য চাকলাদার। দুই অভ্যাগতকে অঙ্গুলি-হেলনে বসতে নির্দেশ করল বাকি দুটো বেঞ্চিতে। আলগোছে তুলে নিল একটা ডপস্টিক। কাঠির ডগায় শক্ত আঠা দিয়ে লাগানো একটা নীলকান্তমণি।

বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিলেন সর্দার বন্দুক সিং। নীলোৎপলের ওজন চল্লিশ ক্যারেটের কম নয়। দক্ষ কারিগরের হাতে পড়ে পালিশ পেয়েছে নীলকান্তমণি। ঝিকঝিক করছে নীলাভ দ্যুতিতে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি। মণির বুকে কি যেন একটা খোদাই করার চেষ্টা হচ্ছে।

চাণক্য দুহাতে ডপস্টিক ধরল। সন্তর্পণে মণিটা এগিয়ে নিয়ে গেল ঘূর্ণন্ত করাতের সামনে। দুই চোখে নিবিড় তন্ময়তা দেখে মনে হল যেন শিল্পী রবিশংকর সেতার নিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। অথবা বিসমিল্লা খান সুরের স্বর্গে আত্মহারা হয়েছেন।

চোখ তুললেন সর্দার বন্দুক সিং। সামনেই একটা খোলা সিন্দুক। ড্রয়ার-গুলো নামানো চাণক্যর কনুইয়ের কাছে। একটা ড্রয়ারে ডজনখানেক আকাটা মণি। হীরে, চুণী, মরকত, নীলকান্ত। আর একটা টানায় ছোট ছোট পাথর। পালিশ করা, সুন্দরভাবে কাটা, ঝকঝকে।

তৃতীয় ড্রয়ারে চোখ পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সর্দার বন্দুক সিং।

ড্রয়ারে থরে থরে সাজানো হীরে জহরতের মূর্তি। কি নেই সেখানে? বিচিত্র রঙের জেডপাথরে খোদাই করা বিলম্বুটে দানো, সুন্দরী পরী আর সুদেহী পুরুষ। এত রঙের এত ঢঙের জেড সংগ্রহ শুধু দেখা যায় স্যালারজাঙের জেড মিউজিয়ামে। একটা রক্তচক্ষু ড্রাগন চোখে পড়ল। তারপরেই দশভুজা প্রতিমা। মা দুর্গা বলেই মনে হল।

পুরো তিন মিনিট ঘরের মধ্যে মোটরের গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা গেল না। ঝাড়া একশ আশি সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন ত্র্যম্বকলাল। অবরুদ্ধ বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলেন চাণক্য চাকলাদারের হাতের নীলকান্ত মণির দিকে।

সুইচ টিপে মোটর বন্ধ করে দিল চাণক্য। স্যাকরার ঠুলি চোখে লাগিয়ে নিবিষ্ট মনে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল নীলকান্ত মণির দিকে। তারপর সিধে হয়ে বসল। ঠুলি খুলতেই দেখা গেল খুশী যেন উপচে পড়ছে দুই চোখে।

সর্দারজী হাত বাড়িয়ে বললেন—'দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়।' ডপস্টিক আর আইগ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল চাণক্য—'এখনও পালিশ বাকি আছে কিন্তু।'

আইপ্লাসের ভেতর দিয়ে সর্দার বন্দুক সিংয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি মেয়ের মুখ। সুন্দরী। অত্যন্ত ছোট্ট। কিন্তু দুই চোখ যেন জীবন্ত। এলো খোঁপা এলিয়ে পড়েছে অনাবৃত পিঠে, বুকে। গুরুনিতম্বের ওপর দিয়ে সাড়ি ঝুলছে নিটোল জঙ্ঘার ওপরে। নীলকান্ত মণির বুকে নীলবসনা সুন্দরী যেন হাসছে। নিবিড় চাহনি দিয়ে হাতছানি দিচ্ছে।

আশ্চর্য! এইটুকু মণির বুকে এত নিখুঁত কারুকাজ! সর্দারজীর চোখ শামুকের চোখের মত ঠেলে বেরিয়ে এল। ডুপন্টিক আর আইপ্লাস চাণক্যর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—'মণি খোদাই করা বুঝি আপনার নেশা?'

'হ্যাঁ,' স্মিতমুখে জবাব দিল চাণক্য। 'এককালে পেশা ছিল। এখন শুধু নেশা।' সহসা যেন শব্দহীন অট্টহাস্য নৃত্য করে উঠল চাণক্যর আশ্চর্য দুই চোখে। নষ্টামি আর দুষ্টামির এ এক বিচিত্র অভিব্যক্তি। অবাক হলেন ত্র্যম্বকলাল।

সায় দিলেন সর্দারজী—'ঠিক। এখন আর পেশা নয়। নিছক নেশা। চাণক্য চাকলাদার এখন শ্রান্ত, অবসন্ন, রিটায়ার্ড। নেশা তো এখনই দরকার।'

চাণক্য চাকলাদারের চোখের শব্দহীন অট্টহাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় ভেসে উঠল অতীতের রোমন্থন। দূরবিস্তৃত দুই চোখে দুরন্ত ঝঞ্ঝার ছায়াপাত।

চোখ ফেরাল চাণক্য। সহজ গলায় বলল—'কি দেব? ব্র্যান্ডি, না, হুইস্কি?'

'ব্র্যান্ডি। ছোট।'

'লালজী?'

'ব্র্যান্ডি। বড়।'

বড় ঘরে এল তিনজনে। ময়ূর সিংহাসনের মত দুটি ভেলভেট মোড়া আসনে বসলেন দুই অভ্যাগত। চাণক্য জিরাফের মত লম্বা ঠ্যাঙ নেড়ে গেল অ্যাক্রোভের সামনে। গেলাস আর বোতল বার করতে লাগল।

ত্র্যম্বকলাল চটপট ব্রীফকেশ খুলে দুটো কাগজ বার করে রাখলেন কোলের ওপর।

বাদশাহী কায়দায় সুরাপানের আয়োজন করল চাণক্য। কাটগ্লাসের ঝলমলে আসব-পাত্র আর সোডা সাইফন এল রুপোর রেকাবীতে। পাশে খড়মড়ে আলুভাজা এবং চীজ-স্লাইস।

হাতে হাতে সুরা পাত্র ধরিয়ে দিল চাণক্য। ত্র্যম্বকলালের কোলে রক্ষিত কাগজ দুটোর দিক তাকিয়ে বলল মৃদু কণ্ঠে—'সর্দারজী, আপনি আসায় আমার অনেক দিনের অভিলাষ পূর্ণ হল। রিটায়ার করার আগে আপনার নামে সিক্রেট ফাইল রেখেছিলাম। কিন্তু চাক্ষুস আলাপ এই প্রথম।'

সর্দারজী চুমুক দিলেন সোনালী সুরায়। তোফা স্বাদ। বললেন—'আপনার জীবনও কম ইন্টারেস্টিং নয়।'

'তাই নাকি? আমার জীবনের আদ্য-পান্ত আপনি জানেন?'

'জানতে চেষ্টা করেছি।'

'শুনতে পারি?'

'অবশ্যই,' ত্র্যম্বকলালকে চোখের ইঙ্গিত করলেন সর্দার বন্দুক সিং। ত্র্যম্বকলাল কেশে নিয়ে কোলের একটা কাগজ তুলে পড়তে শুরু করল :

'মিঃ চাকলাদার, আঁপনার শৈশব রহস্যময়। আপনার জন্ম ইন্ডিয়ায় কি তেহ্‌রানে তা বলা মুস্কিল। যদ্দুর জানা গেছে, আপনি একদল দাসব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়েন। আপনার সঠিক বয়স সেই কারণেই জানা যায়নি।'

স্বপ্নিল চোখে বলল চাণক্য চাকলাদার --'আমার বয়স আমি নিজেও জানি না।'

'আপনার জন্মভূমি আমরা জানি না। এইটুকু জানি যে তিমোর সমুদ্রে বোম্বেটের দলে আপনার হাত পাকে। গেনগাজি ছিল এ দলের নেতা—কিন্তু শুধু নামেই।'

'ঠিক।'

'গেনগাজি মারা গেলে এক বছরের মধ্যে আপনি সে দলের নেতা হন। পরের বছরই দলটার আশ্চর্য সম্প্রসারণ ঘটে—আপনার নেতৃত্বে।'

রুপোর সিগারেট কেস এগিয়ে দিল চাণক্য। দুই চোখের কোণে স্বপ্ন-মেঘ ভাসতে লাগল।

মৃদুকণ্ঠে বলল—'তারপর?'

'সংক্ষেপে সারছি। কয়েক বছরের মধ্যেই চাণক্য চাকলাদারের গ্যাং আধখানা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। দেশে দেশে চলল আপনার অভিযান। কায়রো থেকে সুলু সাগর পর্যন্ত আপনি রাজত্ব করেছেন। আপনার দল হীরে জহরৎ চুরী করেছে, দুষ্প্রাপ্য শিল্পকর্ম লোপাট করেছে, স্মাগল করেছে, জাল নোট ছাপিয়ে বহু দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। এমন কি অর্থের বিনিময়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে।'

একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল চাণক্য। ধোঁয়ার রিঙ সিলিংয়ের দিকে উঠতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে যেন আপন মনেই বলল—'সব করেছি। কিন্তু ভারতে আমার অপরাধের জাল কখনো বিছোইনি।'

'জানি। কিন্তু কেন ইন্ডিয়াকে আপনি রেহাই দিয়েছেন—তা ভেবে পাইনি। কারণটা বলতে পারেন?' বললেন সর্দার বন্দুক সিং।

'সে আর এক কাহিনী। পরে হবে 'খন।' স্মিতমুখে পাশ কাটিয়ে গেল চাণক্য।

'ইসাবেলার মত ডাকাত-রাণীকে আপনি দলে টানেন বছর সাতেক আগে। কারাগার ইসাবেলাকে আটকাতে পারেনি। ফাঁসীর মঞ্চকে বারবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে ইসাবেলা। ইসাবেলার মত সুন্দরী অথচ নিষ্ঠুরা ছলনাময়ী আর কুশলী মক্ষিরাণী অপরাধের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। ইসাবেলা তার রূপ, রুপো আর বুদ্ধির জোরে নিজের দল গড়েছিল। কিন্তু এই ইসাবেলাও আপনাকে গুরু বলে মেনে নেয়। আত্মসমর্পণ করে। ঠিক?'

নীরবে সায় দিল চাণক্য। ধোঁয়ার আড়ালে ব্রোঞ্জ মূর্তির মত মনে হল তার নিশ্চল দেহকে।

ত্র্যম্বকলাল একচুমুকে ব্র্যান্ডির পাত্র শেষ করে দিয়ে বলল—'আপনার অপরাধময় কর্মজীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইসাবেলা আপনার সঙ্গিনী ছিল। বছরখানেক আগে আপনি আপনার দল ভেঙে দেন। পৃথিবীর নানান দেশের ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজাররা নিজের নিজের দল গঠন করে। আপনি ইন্ডিয়ায় আসেন। ইসাবেলাও আসে। ইসাবেলা শ্রীনগরে হোটেলের পত্তন করে। আপনি দিল্লিতে আস্তানা নেন। আপনারা দুজনেই কুবেরের সম্পদ সঙ্গে নিয়ে আসেন। সে সম্পদের পরিমাণ আমাদের জানা নেই।'

ব্রোঞ্জ মূর্তির অধরপ্রান্তে পাতলা হাসি ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

ত্র্যম্বকলাল বলল—'আপনার গতিবিধির ওপর আমরা নজর রেখেছিলাম। আমরা দেখেছি, আপনি অপরাধের দুনিয়ার সব সংশ্রব ত্যাগ করেছেন। শান্তির জীবনযাপন করছেন।'

'তা করছি,' মহাকালের ডম্বরু-ধ্বনি আবার শোনা গেল ব্রোঞ্জ-চাণক্যর কণ্ঠে।

সর্দার বন্দুক সিংয়ের দিকে ত্র্যম্বকলাল তাকালেন। চোখে চোখে ইসারা হল। কয়েক সেকেন্ড থমথমে নৈঃশব্দ্যের পর মুখ খুললেন সর্দারজী—'মিঃ চাণক্য চাকলাদার?'

'ফরমাইয়ে, সর্দারজী।'

'ঠাট্টা নয়। আপনার অভিজ্ঞতা, আপনার সাহস, আপনার সংগঠনী প্রতিভাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। আপনাকে চাই।'

মৃদু হাসল চাণক্য—'আমাকে কেউ পায় না, সর্দারজী।'

'জানি। অর্থের বিনিময়ে আপনাকে আমরা চাই না।'

'তবে কিসের বিনিময়ে?'

'ইসাবেলার।'

ঘরের আবহাওয়া যেন আচম্বিতে পালটে গেল। যেন সহসা ভিসুভিয়সের বিস্ফোরণ মুহূর্তে উপস্থিত হল। ত্র্যম্বকলাল দেখলেন, চাণক্য চাকলাদারের বংশদণ্ডের মত ব্রোঞ্জ মূর্তি এতটুকু কাঁপল না, কিন্তু চকিতে সহসা যেন প্রচণ্ড শক্তি অদৃশ্য বিকিরণের মত বিচ্ছুরিত হল অবয়ব ঘিরে।

খুশী হলেন ত্র্যম্বকলাল। চাণক্য চাকলাদারের নিবিড় প্রশান্তি এইভাবেই

ভাঙতে চেয়েছিলেন উনি। ধরণীর আতংক চাণক্য চাকলাদারকে সহসা জীবন্ত হতে দেখলেন ত্র্যম্বকলাল।

আশ্চর্য হিমেল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল চাণক্য—'কি হয়েছে ইসাবেলার ?'

'এই মুহূর্তে ইসাবেলা বন্দিনী। শীগগিরই তার জীবনান্ত ঘটবে রাইফেলের গুলিতে অথবা তার চাইতেও ভয়ংকরভাবে। শ্রীনগর থেকে অনেক দূরে তার বন্দীশিবির। ঠিকানা কেবল আমরা জানি।'

চাণক্যর ব্রোঞ্জ আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়তে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বলল—'মাসদেড়েক আগে আমি শ্রীনগরে গিয়েছিলাম। ইসাবেলা নতুন স্পীডবোট কিনেছে। তাই নিয়ে ডাল লেকে হাওয়া খেয়েছি। এ ঘটনা ঘটেছে তারপর ?'

'হ্যাঁ, তারপর।'

'কি চান আপনারা ?'

'ইসাবেলার ঠিকানা আপনাকে উপহার দিতে চাই।'

'বিনিময়ে ?'

'আমাদের একটা সামান্য কাজে আপনার শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ চাই। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।'

'কোথায় ঠিকানা ?'

যত্নে কোলে রক্ষিত অপর কাগজটা এগিয়ে দিল ত্র্যম্বকলাল। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল চাণক্য। কাগজটা টেনে নিয়ে চেয়ে রইল। ঠিকানাটা মনের পর্দায় যেন ছাপা হয়ে গেল। ফসফরাস চোখে মরকত আভা দেখা গেল।

কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে ভস্বরু কণ্ঠে বলল চাণক্য—'রাজী। কিন্তু দিনদশেকের আগে নয়। এই কদিন বাইরে যাব আমি।'

'বেশ।' উঠে দাঁড়ালেন সর্দার বন্দুক সিং। 'দশদিন পরে আমরা আসব।'

চোখে চোখ রাখল চাণক্য। সহজ গলায় বলল—সর্দারজী, আপনি বুদ্ধিমান। ইসাবেলার ঠিকানা 'উপহার' দিয়ে ভালই করেছেন। দর হাঁকলে আমাকে পেতেন না।'

'চাণক্য চাকলাদারকে আমি চিনি।'

'গুড। ভেরি গুড। যে কাজ আমাকে দিচ্ছেন তা দেশের স্বার্থে নিশ্চয় ?'

'নিশ্চয়। নইলে আপনার কাছে আসব কেন ?'

আর বিশেষ কোনো কথা হল না। বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নেমে এলেন দুই অভ্যাগত। বেন্টলিতে বসে হাঁফ ছেড়ে বললেন ত্র্যম্বকলাল—'বাসরে! এত সহজে চাণক্য রাজী হবে, ভাবতেই পারি নি।

বিজ্ঞের মত হাসলেন সর্দার বন্দুক সিং—'একেই বলে ভানুমতীর ভেলকি! বুঝলে ত্র্যম্বকলাল, এই নিয়েই তো আমার সর্দারি!'

*

ঠিক সেই মুহূর্তে মেশিনঘরের পাশের কুঠরিতে ঢুকল চাণক্য চাকলাদার। পাশাপাশি রাখা তিনটে বিশাল ট্রাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। অর্ধনিমিলিত দুই চোখে দেখা গেল স্মৃতির রোমন্থন। অদ্ভুতদর্শন অতিকায় তোরঙ্গ তিনটে যেন মণিকোঠার দরজা খুলে দিল। ধীরে ধীরে অধরপ্রান্তে জাগ্রত হল নিগূঢ় হাসি।

আপনমনে বলল—'ইসাবেলা, কোনোদিন ভাবিনি, যন্তরমন্তরের বাক্স আবার খুলতে হবে।' হেঁট হল চাণক্য। খুলল ট্রাঙ্কের ডালা। ভেতরে থরে থরে সাজানো বিচিত্রদর্শন কলকব্জা। বিদঘুটে তাদের গড়ন। কোনো কোনোটি অতিশয় নিরীহ-দর্শন।—কিন্তু ক্রিয়াকলাপে হৃৎকম্পের কারণ।

এই হল চাণক্য চাকলাদারের যন্তর-মন্তরের বাক্স। আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান আশ্চর্য অদ্ভুত—ভয়ংকর হাতিয়ারের বাক্স।

(ক্রমশঃ)

দিব্য-জীবনের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ মহাপ্রাণ মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর নির্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য এবং অশেষ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের যে ভবনে আবির্ভাব ঘটে সেই গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের তিন নম্বর বাড়ীতেই শ্রীমহেন্দ্রনাথ জীবনের অনেকাংশ কাটিয়ে লোকান্তরিত হন। মহেন্দ্রনাথ স্বামীজীর সঙ্গে একত্রেও অনেক দিন য়ুরোপের কোন কোন অঞ্চলে বাস করেছেন এবং সেই সূত্রে স্বামীজীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গোড়ার দিকের ইতিহাস তাঁর বিশেষভাবে জানা ছিল।

মহেন্দ্রনাথ বিশ্বপরিক্রমার কালে পদব্রজে অনেক দেশ ঘুরেছেন, সেই সব দেশের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন এবং তাঁদের সংস্কৃতি ও দেশাচারের পরিচয় পেয়েছিলেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মত শ্রীমহেন্দ্রনাথও দেশপ্রেমিক ছিলেন তবে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথের মত কোন রকম আন্দোলনের সঙ্গে হয়ত তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। তবে এই তিনটি ভাই যে পরম বিদ্বান ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় এঁদের রচনাবলীর মধ্যে ভারতবর্ষের নবজাগরণে স্বামীজীর অবদান আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু এবং এই বিরাট পুরুষের দু অনুজ গেরুয়া বসনে অঙ্গ সজ্জিত না করেও ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

মহেন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ভক্তপ্রবর ধীরেন্দ্রনাথ বসু নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন এবং প্রতিদিনের আলাপ-আলোচনা নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এই সব সংলাপের ১৯৪০-৪১ খৃঃ অংশ ইতিপূর্বে 'সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সুবৃহৎ দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৭, ১৯৪৯, ১৯৫০—৫৫ এই কালের সংলাপাবলী লিপিবদ্ধ। ধীরেন্দ্রনাথ বসু এখন পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন, তিনি প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন কিভাবে মহেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সামগ্রিক দিনলিপি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি, আয়তন সীমিত রাখার প্রয়োজনে। এই সংলাপের মধ্যে শ্রীমহেন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থাবলীর অনেক প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে, সেই কারণে এই গ্রন্থ পাঠকালে মহেন্দ্রনাথ সাহিত্য বিষয়ে পাঠকের কিছু পরিচয় থাকলে 'সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথের' মর্মকথা উপলব্ধি করা অনেক সহজ হয়ে উঠবে। ধীরেন্দ্রনাথ গ্রন্থারম্ভে লিখেছেন—"সহোদর তিন ভাই তিনের তুলনা নাই/তিনজন তিনভাবে রত/কেবা ছোট কেবা বড়/কহিবারে নাই দড়/তিন ধরে মহা উচ্চব্রত।"

ধীরেন্দ্রনাথ গেরুয়াবিহীন সাধুর কথাবার্তার দিনলিপি ধরে রেখেছেন, কোন অতিরঞ্জন নেই, নিখুঁত রেখাচিত্র, একটি মানুষের জীবনের টুকরো কথার মধ্যে ফুটে উঠেছে চরিত্র, ফুটেছে অন্তরের মানুষটি। ধীরেন্দ্রনাথের সেখানেই কৃতিত্ব। ধীরেন্দ্রনাথ যথাযথ টুকেছেন কোনো জায়গা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে বা নিজস্ব মতামত আরোপ করে গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি, এই কৃতিত্বের জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

মহেন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় বলছেন—গণ্ডী টানো কেন?

'সব জমীন গোপাল কি—
উসমে নহী কুছ আটক
হরতরফ আটম জমিকে
দিলমে হ্যায় আটক।'

তারপর ব্যাখ্যা করলেন কোথায় এই ছড়া পেলেন, বললেন—'কাবুল কিড়ে গেল, আকবর দেখলে, মানসিংহই উপযুক্ত ব্যক্তি মারপিট করে ঠিক করতে। মানসিংহকে বললে। মানসিংহ বললে—আমি হিন্দু, আটক পার হব না। ~মানসিংহের ওপর তো আর কথা বলতে পারে না—মানসিংহকে দ্বিতীয় বাদশা বলতো।' তাই ভেবে ওইটে বললে—তখন গেলেন।'

প্রশ্ন হল এটা কিসে আছে, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বললেন, টডের রাজস্থানে পড়েছি বোধ হয়, এই রকম আরো অনেক ছড়া আছে। বীরবল মারা গেল, তা তো আর বলতে পারে না, তাই ছড়া করলে—

'কানহাই রীজ তাজ গিয়া
রহ্ গয়া সব আহীর।
সব শোভা দরবার কি
হর লিয়া বলকে বীর।'

আবার বললেন—ঔরংজেব দারাকে মারলে, তা তো বলতে পারে না। যাদের কবিত্বশক্তি ছিল ছড়া করে ছোট ছেলেদের শিখিয়ে দিত। ছেলেরা তাই গেয়ে বেড়াতো—

'সিকন্দর—না রহে তেরা আলমগিরী
কে'ও না তুম দারাকো মারা।'

ঔরঙ্গজেব দারাকে মেরেছিল, সেকেন্দর দারায়ুসকে মেরেছিল। পারসী ভাষায় সেকেন্দর আলেকজান্দারেরই নাম।

অমলা নন্দীর বিবাহের সংবাদ শুনে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বললেন—'অক্ষয় সেলফমেড ম্যান। (অক্ষয় নন্দী অমলা নন্দীর পিতা)। তা বেশ হল, হর-গৌরীর মিলন হল। (ডান হাতের আঙ্গুল তুলে দেখালেন) — হরও নাচবে, গৌরীও নাচবে।'

আরো অনেক কথার পর বললেন—সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে কালীতলায় ধরেছিল গুণ্ডাতে—রাধাকান্ত দেবের লোক। কেশব সেনকেও কত—।'

বর্তমানে সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

একদিন বলছেন 'যমবলি দিতে হয়। যমবলি কে দিয়েছে?

—বিনয়, বাদল, দীনেশ। যমবলি দেয় নি?'

একদিন (৩১শে মে ১৯৪২) পরলোকগত শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বলছেন—

'বঙ্কিম মুখুজ্যে এসেছিল, বললুম বাপু ওসব হুজুক ছাড়ো—Industrialite the National Industrialite the National. তারপর (সব হবে)—' ইত্যাদি।

হিগেল প্রসঙ্গে একদিন বলেছেন—

'হিগেল গরীব লোক ছিল। নেপোলিয়ান ব্যাটল অব জেনার লড়াই জিতলে। সেপাইরা সব বার্লিনে ঢুকে লুঠতরাজ করলে, বললে, বড় লোকের পাড়া তো লুঠ করলুম, গরীব পাড়ায় চল। তা একটা বাড়ীতে গেল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে গেল। দেখে একটা ছেঁড়া কম্বল। একটা টেবিল, একটা চেয়ার—পায়াগুলো রিকেটি—বোতলের ওপর একটা বাতি দিয়ে একটা লোক লিখছে। বললে আমার যা নেবার নাও। কাগজগুলো নিও না। তারা তো ভাবলে, এর বাতিদানও নেই, বোতলের ওপর বাতি রেখে লিখছে, এত গরীব। একে তো আমাদেরই কিছু দেওয়া উচিত। চলে গেল। একশো-দেড়শো বছর বাদ হিগেল-এর বই বেরুলো।' এদেশের একজন সে যুগের বিখ্যাত বক্তা প্রসঙ্গে বলছেন—'কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের নাম শুনেছো? গুপী কবিরাজের শালা। গুপী কবিরাজ তখনকার শ্রেষ্ঠ কবিরাজ। এমন বক্তৃতা দিত, হাসিয়ে মারত। বলরামবাবু, আমি তো হেসে মরি। এই হাসাচ্ছে, এই কাঁদাচ্ছে। এমন যে, মেয়েরা গয়না খুলে দিত।'

একদিন অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'র কথা শুনে বললেন—'রবি ঠাকুররা খড়দার গোসাইদের শিষ্য। ওদের কথায় অনেক মুসলমানি কথা পাবে, বোষ্টুম কথাও পাবে।'

প্রশ্ন হল—খড়দার গোসাইদের শিষ্য?

উত্তরে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বললেন—'অনেক আগেকার কথা। ফল বানিয়ে দাও বলবে। কেটে দাও বলবে না।'

আর একদিন একটি ছেলেকে বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে আসতে। ছেলেটি ও তার দাদা গিছল। তারা এসে সেই কথা বলছিল—

'অবনীন্দ্রনাথ জিগগেস করলেন, তোমরা পাশ করে বেরিয়েছো? দাদা বললে হ্যাঁ! বললেন—বেশ-বেশ, এখন কি করছো? বললে এ্যানাটমি করছি। বললেন—ওতে বাপু কিছু হয় না ও অনেক করেছি। করছো কর। যার কোলে-পিঠে চড়লুম, তাকে আঁকতে গেলে হাড় থেকে আরম্ভ করবো কেন? বেশ বললেন একটি কথা—জলে মাছ থাকে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন থেকে আরম্ভ করবো। আমার অত কি দেখবো আঁকবো!'

গ্রীক মূর্তি প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'আলাদা থিয়োরী, আলাদা মাপ, ওরকম কি মানুষ হয়?'

মহেন্দ্রনাথ চিত্ররসিক ছিলেন, আচার্য নন্দলাল তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং অনেক বিষয় পরামর্শ করতেন। মহেন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রসঙ্গে বলছেন—

'একজন কে বলেছিল, আপনি নোট দেখেন না, কি করে লেখেন?—আমি দেখি, আমার সামনে এসে বলে যায়। কারণ এ উঠতে হয়; সেখেনে উঠলে, সামনে এসে দাঁড়ায়।

নন্দলালকে বলেছিলুম। নন্দলাল লাইনে টেনে একটা আঁকলে, বললে, হ্যাঁ ওই রকমই হয়।

অর্থাৎ নন্দলাল বিভোর হয়ে এঁকেছিলেন।

কারা একদিন এসে শান্তি-অশান্তি নিয়ে কি বলেছিল। মহেন্দ্রনাথ বললেন—'উষা-অনিরুদ্ধ' বই আছে? উনি একবার শান্তি-অশান্তি কথাটা বললেন। শান্তি-অশান্তি বৈতরণী—'

বইটি আনা হল, পড়তে বললেন, যুবকটি পড়ছে—

'শান্তিতে অশান্তি নয়, অশান্তি শান্তিতে
জনম মৃত্যুতে যায়, মৃত্যু জনমেতে
বার্ধক্য নবীন ভাব কিছু নাহি তথা
সত্তা মাত্র নিজ নিজ বিচারিছে সেথা।'

এর পর বললেন—'শান্তি-অশান্তি বুঝলে—অশান্তি শান্তিতে যায়—শান্তি অশান্তিতে যায়। একবার ভাব দেখি—'

এই ধরনের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের অনেক জটিল সূত্রের সহজ ব্যাখ্যা ও সমাধান মহেন্দ্রনাথের আলাপাচারে পাওয়া যায়।

ধীরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য নিষ্ঠায় সেই সব কথা সাধারণের জন্য গেঁথে রাখলেন, তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

গ্রন্থ দুটি সুমুদ্রিত এবং পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত।

অভয়ঙ্কর

সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথ (১ম ও ২য় খণ্ড) ধীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক: ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম প্রথম পর্ব আট টাকা, দ্বিতীয় পর্ব—[illegible] টাকা।

সাহিত্যের খবর

বাংলাদেশ আজ কল্লোলিত। জঙ্গীশাহী শাসকের অত্যাচার আর অবিচারের অবসান ঘটিয়ে জয়ের মুখে এগিয়ে চলেছে জয় বাংলা বাহিনী। পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক সমাজও আজ এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন এবং বিভিন্ন সভা ও বিবৃতির মাধ্যমে তাঁদের গভীর একাত্মতার কথা জানাচ্ছেন। এ ছাড়াও কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার ভেতর দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জানাচ্ছেন যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের সঙ্গে আজ তাঁরা একাত্ম।

বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিকদের আবেগ এবং [illegible] [illegible] জন্য যে কোন ভাষার কবি লেখকদের চেয়ে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবাংলার লেখকদের ভাষা এক। বাংলাদেশ এই ভাষার জন্য যে ত্যাগস্বীকার করেছে তার তুলনা নেই। রাজনৈতিক কারণে আজ এ দেশ দ্বিখণ্ডিত। কিন্তু অন্তরের যোগাযোগ পরিবর্তিত হয়নি। 'স্বদেশ, আমার স্বদেশ' কাব্য সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদক কৃষ্ণ ধর বোধকরি এ কারণেই লিখেছেন—'আমরা যাকে বাংলাদেশ বলে জানতাম তার ভূগোল বার বার বদলেছে। বদলায়নি তার অন্তরের সীমানা। সেইজনাই বাংলাদেশ বলতে আমরা বুঝি বঙ্গ সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাভূমি তাকে। রাজনৈতিক সীমারেখায় তার হৃদয়ের ক্ষতকে আমরা অস্বীকার করতে চাই। আমাদের মনের জগতে বাংলাদেশের এই প্রতিমা চিরকালই অম্লান ও উজ্জ্বল।' কবি মণীন্দ্র রায়ের কণ্ঠেও শোনা যায় সেই একই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর—

'জরিপের ফিতে-মাপা নির্বিকার
কয়েক মাইল
যা দেখ সে রাজস্বের সীমা।
আমাদেরই ঘাম রক্ত প্রেমের মন্দিরে
দেখ এক আশ্চর্য প্রতিমা।
আমরা রেখেছি তাকে
স্মৃতি দিয়ে ঘিরে।'

ভাষা আন্দোলনের দিনেও তাই শুনেছি এবার বাংলার কবিদের কণ্ঠে একই কণ্ঠস্বর। প্রতিবার স্মরণ করেছে সেইদিকে প্রশ্ন[illegible]

অঙ্গে। আবার ওপারে মধুসূদনের জন্মদিনে পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়েছে সেই দিনটিকে যথার্থ মর্যাদা দানের জন্য। রবীন্দ্র জয়ন্তী আর নজরুল জয়ন্তী দিনেও সেই ঐকান্তিক আকুতিই হয়েছে প্রকাশিত।

জঙ্গীশাহীর শাসনকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর জনতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এপারের সাহিত্যিকরাও এগিয়ে এসেছেন। গত ২৭ মার্চ সর্বশ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর রায়, অশোককুমার সরকার, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, সন্তোষকুমার ঘোষ, ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার দত্ত, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রমুখ 'পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতির' পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলেন—'পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিবর্তনে সমিতি মনে করে তার কর্মসূচী আরো প্রসার করা দরকার, যাতে ওপারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করা যায়।' অপর একটি বিবৃতিতে কয়েকজন সাহিত্যিক ও শিল্পী বাংলাদেশে যেভাবে ব্যাপক নরহত্যা চলছে তার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁরা মুজিবর রহমানের সংগ্রামের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, অম্লান দত্ত, আবু সৈয়দ আয়ুব দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন, মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আয়ুব দত্ত, তৃপ্তি মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ। এই বিবৃতিতে তাঁরা আরো বলেন যে, ধর্ম নয়, ভাষাই যে জাতির ঐক্যের ভিত্তিভূমি, মুজিবর আজ তা প্রমাণ করলেন। আজ বাংলাদেশে যা ঘটছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর ঘটেনি।

পূর্ব বাংলার এই মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে বহু কবি কবিতায় তাঁদের নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করছেন। কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু লিখেছেন—

> 'মরবো না আর মরবো না।'
> টুকরো কমার তলোয়ার আর ধরবো না;
> হলাহলে আর প্রাণসমুদ্র ভরবো না,
> 'মরবো না আর মরবো না।'

বাংলার এই নব উজ্জীবনে আনন্দিত হয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন

> 'আমি আমার অস্তিত্বকে দুই খণ্ড করে
> নিজেকে বার বার শোনাচ্ছি:
>
> সীমান্তের ওইদিকে আমার জন্মভূমি,
> এইদিকে আমার স্বদেশ।'

শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচা নয়,
> আগুন খড়ে না,
> হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বালো দারুণ সন্ত্রাসে
> কারো ভুল—
> মরো—কিন্তু মেরে মরো এবং
> উদ্ধার করো ঘর,
> নিশ্চিত রয়েছি পাশে আমি তোর
> জন্ম সহোদর।'

এ ছাড়াও মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু প্রমুখও কয়েকটি উল্লেখ্য কবিতায় জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

শুধু কবিতা রচনা নয়, সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে জনমত সৃষ্টি এবং বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতির দাবীও জানান হয়েছে। গত ৩০ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতার স্টুডেন্টস হলে 'পরিচয়', 'আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন' প্রভৃতির উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পৌরোহিত্য করেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে. বাংলার ঘটনাবলীতে তিনি অভিভূত। মনোজ বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে, এক সময় তাঁর মনে হয়েছিল যে, জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হবে না। কিন্তু আজ তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে। তিনি আবার ফিরে যাবার বাসনা প্রকাশ করেন।

তরুণ সান্যাল তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করে বলেন, আমাদের উচিত মুজিবর সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি আকাশবাণীর বর্তমান অনুষ্ঠানসূচীর নিন্দা করেন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসব সরকার প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিলাদ্রিশেখর বসু আবৃত্তি করে শোনান।

গত ১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতার স্টুডেন্টস হলে 'সারা বাংলা যুব লেখক সম্মেলনে'র উদ্যোগে আর একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তরুণ সান্যাল এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোজ বসু। প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং তরুণ সাংবাদিক স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বিবরণ বর্ণনা করেন। তাঁদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়ার জঙ্গী সেনার নৃশংস বর্বরতার কথা শুনে সভার সকলে ধিক্কার দিতে থাকেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাস. গণেশ বসু, আশিস সান্যাল প্রমুখ। পূর্ব বাংলার সমর্থনে কবিতা পাঠ করেন সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরকুমার বসু ও অজিতকৃষ্ণ সরকার। সভায় প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করেন শুভ মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, অজয় সেন ও বাণীব্রত চক্রবর্তী। প্রস্তাবে বলা হয়—'এই সভা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করছে যে, বাংলাদেশের এই জঙ্গীশাহী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এপারের যুব লেখকরাও রয়েছেন তাদের পাশে। প্রয়োজনে তারাও পরখ করে নেবেন রক্ত আর আগের মত লাল আছে কিনা। তাদের বুকের মধ্যে বাংলার একই প্রতিমা, একই মুখ।' সভায় ঢাকায় কবি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন দৈনিক পাকিস্থান পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে তা পাঠ করে শোনান হয়। ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে কবি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান অসামান্য।

চার্বাক

নতুন বই

সাদা মেঘ কালো পাহাড় (কাব্যগ্রন্থ)—অজিত দত্ত। কিতাব পাবলিকেশনস, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯। দাম : তিন টাকা।

কবি-প্রসিদ্ধিতে ও অন্তরঙ্গ জীবন-চর্চায় অজিত দত্ত আধুনিক কবিতা পাঠকের অত্যন্ত কাছের মানুষ—অন্যতম প্রিয় কবি। ফর্ম ও টেকনিকের বিশিষ্টতায়, সৌন্দর্যের আকস্মিক আবিষ্কারে ও উপলব্ধির গভীরতায় তিনি পাঠককে চমকে দেন। অনেক পরিবর্তিত হলেও তিনি এই কাব্যে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। সময়ের অভিজ্ঞতা নয়, নিঃসময়ের আলোই তাঁকে পথ দেখিয়েছে বরাবর। যদিও আত্ম-জিজ্ঞাসার কঠিনতম প্রশ্নে তিনি প্রায়শ কণ্ঠবিকল্প।

এই কাব্যগ্রন্থের একটি বহুল-ব্যবহৃত শব্দ 'অন্ধকার'। কখনই সাধারণ অর্থে নয়, অনুসন্ধান ও নিজেকে পরিপূর্ণরূপে দেখার—পুনরাবিষ্কারের বিশিষ্ট অর্থেই শব্দটি বারবার উচ্চারিত।

অনেকটা স্বগতোক্তির মতো মনে হয় তাঁর উচ্চারণ। হয়তো-বা গভীরতর অর্থে তিনি রোম্যান্টিকও। সেজন্যেই তাঁর যন্ত্রণার কোনো সুস্পষ্ট ভাষা নেই, অতি-লৌকিকতার পরিবেশে রহস্যাবৃত। এবং তীব্রতর প্রতীক্ষার আবহ তাঁর চারদিকে।

> "আমার শয্যায় চারপাশে কত চুল্লি!
> আর অস্পষ্ট ফিসফিস আওয়াজ—
> জেগে আছো?
>
> আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা।
> আমি অগ্নিসাক্ষী করে চেঁচিয়ে বলি—
> আমি জেগে আছি, তুমি এসো।"

এই প্রতীক্ষা এবং জাগরণ, আত্ম-আবিষ্কার এবং আত্মজিজ্ঞাসা নিয়েই এই সঙ্কলনের বেশির ভাগ কবিতা লেখা। উৎসের গভীরতায় ডুব দিয়েই তিনি পাঠকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

এবং লক্ষ্যনীয়, অনেকগুলি কবিতাই এক অদৃশ্য প্রেমিকার উদ্দেশ্যে লেখা। 'তুমি' সর্বনামটির অন্তরালে যার অস্তিত্ব নিহিত, তাকে নারী বলেই অনুমান হয়। কিছু কবিতায় 'চুল' 'তপ্তস্পর্শ' 'আলিঙ্গন' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার অন্তত সে ধারণাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। উদাহরণ হিসেবে 'তামসী' 'বৃষ্টি' 'আমি যখন' 'অনপনেয়' 'দুটি প্রেমের কবিতা'-র নাম মনে পড়ে।

অবশ্য সবই প্রেমের কবিতা নয়। কিছু কিছু কবিতা মাটি, মানুষ ও পৃথিবীর ভালোবাসায় নম্র ও কোমল। মনে পড়িয়ে দেয়, বাংলাদেশের নিঃসর্গ ও প্রকৃতির ঘন-সান্নিধ্যের স্মৃতি। বৃষ্টি, ও ঋতুর আবরণ ও অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে কয়েকটি কবিতার শরীরে।

এবং অধিকাংশ কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে কবির অতৃপ্তি, হতাশা ও না-পাওয়ার যন্ত্রণাজাত অস্থিরতা। হয়তো এই যন্ত্রণাকেই কবিরা আনন্দে বরণ করে আসছেন চিরকাল। হয়তো এই অস্থিরতাই কবিকে সৃজনক্ষম রাখে।

'শাদা মেঘ কালো পাহাড়'-এর পাঠক পাবেন বয়স্ক কবির তপ্ত সান্নিধ্য। পাবেন অসংখ্য ইমেজ ও ইমেজারি, উপমা ও প্রতীকের ব্যবহার, শব্দ ও দৃশ্যের বিরল উপস্থিতি—যা প্রতি মুহূর্তে তিরিশের কবি অজিত দত্তকে নতুন করে মনে পড়িয়ে দেয়। যেমন কয়েকটি লাইন : (১) তুমি দেখবে মহাশূন্যে নিশ্ছিদ্র মেঘের মতো স্তম্ভিত কৃষ্ণতা, (২) ছোট পাখিটার উষ্ণ রক্ত ওর রক্তে মিশে গেল, (৩) একটি তারাকে আমি ফোটালাম সমস্ত আকাশে, (৪) অন্তঃপুরে বাসনায় যৌবনের সহমতা হবে।—ইত্যাদি।

সংকলনটির শেষের দিকে 'রূপান্তর' পর্যায়ে ছাপা হয়েছে চারটে বিদেশী কবিতার অনুবাদ। এবং প্রতিটি কবিতাই কবির মেজাজ ও প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ। কবির স্বীকৃতি ছাড়া বোঝা যায় না, কবিতাগুলি আদৌ কোনো বিদেশী কবির লেখা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সহবং (ফাল্গুন-বৈশাখ) — সম্পাদক : অরুণ ইন্দু, সুবোধ ভট্টাচার্য, সুজিত মুখোপাধ্যায়, ৫।১৩ রাজাবাগান লেন, দমদম, কলকাতা—৩০। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

পাইকা হরফে পরিচ্ছন্ন ছাপা। গল্প-কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও অনুবাদে সমৃদ্ধ। লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন শুভ

...পাধ্যায়, সুনীল বসু, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, অমিয় চক্রবর্তী, শংকর দত্ত, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। প্রচ্ছদ ভালো। নাটক সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

অঙ্কুর (চতুর্থ সংখ্যা) — রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। গারিফা, পোঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা। পঁচিশ পয়সা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখাসহ অন্যান্য রচনায় পত্রিকাটি সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে। লিখেছেন রেখা দত্ত, ধীরেন্দ্র ভৌমিক, জয়ন্ত সাহা, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং আরো কয়েকজন।

ল্যা পয়েজি (পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা)— সম্পাদক ঃ বার্ণিক রায়। বেলগাছিয়া ভিলা। এম আই জি স্কিম, ব্লক একস, ফ্ল্যাট ১, কলকাতা—৩৭। দাম এক টাকা।

কবিতায় ঠাসা, প্রবন্ধে-নিবন্ধে আকর্ষণীয়, রোমান অক্ষরে মূলে বাংলা কবিতাসহ ইংরেজী-গদ্যানুবাদে ল্যা-পয়েজি'র এ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। দাম খুবই সস্তা। প্রচ্ছদ চমকপ্রদ। বাংলা দেশের প্রায় সব তরুণ কবিই এ সংখ্যাটির লেখক। লিখেছেন শঙ্কর ঘোষ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বার্ণিক রায়, শিবশম্ভু পাল, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ এবং আরো অনেকে। সাম্প্রতিককালে এক সঙ্গে আর কোন পত্রিকায় এত কবিতা বেরোয় নি। কয়েকটি কবিতার অনুবাদসহ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সমালোচনা ও একজন পঞ্চাশের কবির জবানবন্দী বেশ চমকপ্রদ। ভবতোষ দত্তের আলোচনা 'শিবাদের অশিব চিৎকার' পাঠককে ভাবনার খোরাক জোগাবে।

অধুনা সাহিত্য (চৈত্র ১৩৭৭)—সম্পাদক ঃ তুলসী মুখোপাধ্যায়। হালিশহর, ২৪-পরগণা। দাম ঃ পঞ্চাশ পয়সা।

পত্রিকাটির স্থায়ী সম্পাদক সুধাংশুর মুখোপাধ্যায়। কেবল এ সংখ্যার জন্যে ভিন্ন সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন একজন কবি। তরুণতম কবিদের কবিতা ও গল্পের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকদের আলোচনা প্রকাশ করার দিকেই ছিল সম্পাদকের ঝোঁক। গল্প লিখেছেন সমীরকান্তি বিশ্বাস ও উৎপল সরকার। মণীন্দ্র রায় ও কৃষ্ণ ধরের প্রবন্ধ দুটি এ সংখ্যার প্রধানতম সম্পদ। কবিতা লিখেছেন অজয় সেন, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল ভট্টাচার্য, কেদার ভাদুড়ী, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। নতুন সম্পাদক নিজেকে আড়ালে রেখে রচনা নির্বাচন করেছেন।

হিন্দোল (বসন্ত সংকলন) — সম্পাদক তুষারকান্তি দে, দীপক দত্ত। ১৭ হরিশ মুখার্জি রোড, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী। দাম কুড়ি পয়সা।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষদের উদ্দেশ্যে লেখা প্রাক-সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য লেখায় পত্রিকাটি জাগ্রত যুবমানসের চিন্তা-ভাবনারই প্রতিধ্বনি। সম্পাদক দুজন কবিতার মতো লাইন-ভাঙা সম্পাদকীয়ে লিখেছেন ঃ 'বন্দরে-বন্দরে কান্নার সাইরেন—শতাব্দীর আকাশ ম্লান। সেই গহীন রাতের অন্ধকারে—আকাশের তারারা স্পষ্ট...বিন্দু...বি...ন্দু... ঘরে-ঘরে—ছায়াপথ পেরিয়ে, চেয়ে দেখি—'হিন্দোল জ্বলছে।' এ সংখ্যায় চমৎকার একটি নাটিকা লিখেছেন ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন সজল ঘোষ, বহ্নি ভট্টাচার্য, তুহিন দেবরায়, অমিয় নাথ, জয়নাল দত্ত, সুশান্ত অধিকারী, বিকাশ দত্ত, রতনলাল বর্মণ, মনীশ রায়, তুষারকান্তি দে এবং আরো কয়েকজন।

চতুর্ভাস (প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক ঃ দত্তাত্রেয় দত্ত। সি আই টি বিল্ডিংস, বি-২৬, কলকাতা—৭। দাম ষাট পয়সা।

পত্রিকাটি হাতে নিলেই পাঠক খুশি হবেন দুটি কারণে। প্রথমত, পূর্ব বাংলার এক গুচ্ছের গল্পের ওপর এপার বাংলার কবির সমালোচনা স্থান পেয়েছে একেবারে প্রথম দিকে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানের সময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের স্বাক্ষর রয়েছে প্রতিটি লেখায়। আছে কবি ও নাট্যকারদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ। এবং স্মৃতিমূলক রচনা। লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, লোকনাথ ভট্টাচার্য, তুলসী মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, রাম বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, রবীন সুর, অমিতাভ সেনগুপ্ত, বাদল সরকার, তরুণ সেন, বিমান মিত্র প্রমুখ। পত্রিকাটির ছাপা, অঙ্গসজ্জা ভাল। সূচীপত্র ছাপা হয়েছে গোলাপী কাগজে।

দিশারী (প্রথম সংকলন) — দুলাল কর। শিমুরালী, নদীয়া। এক টাকা।

সম্পাদক দাবী করেছেন ঃ 'দিশারী আজকের দিনের হতাশাপূর্ণ লেখকদের দিগদর্শন।' খুবই দুঃসাহসী ঘোষণা। এখন ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই। লিখেছেন, সমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, রজতশুভ্র হালদার, উদয়ন নন্দী, মলয়কুমার সরকার, অমিতকুমার দে প্রমুখ। সাধারণ পাঠকের কাছে পত্রিকাটি ভালই লাগবে।

Soviet Jews: Fact and Fiction — Novosti Press Agency. Publishing House. Moscow.

সোভিয়েত রাশিয়ায় ইহুদিদের বিষয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নানাধরনের প্রচার শুরু করেছিলেন। বর্তমান পুস্তিকায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইহুদিদের সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। সেইসব প্রচারের যুক্তিহীনতা এবং মিথ্যাচারই স্পষ্ট হয়ে ওঠে পুস্তিকার আলোচনায়।

কণ্ঠস্বর (পৌষ-মাঘ) — সম্পাদক সত্যরঞ্জন বিশ্বাস।। ৪৯এল।৭ নারকেলডাঙা নর্থ রোড, কলকাতা-১১।। পঞ্চাশ পয়সা।।

এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শান্তিকুমার ঘোষের "কবিতায় নিসর্গপ্রকৃতি ঃ একটি অভিজ্ঞতা।" কবিতার বইয়ের আলোচনা লিখেছেন বোধহয় সম্পাদক। এবং কবিতা লিখেছেন যামিনীভূষণ সিংহ, অমরেন্দ্র সান্যাল, কার্তিক মিত্র, মুকুল বসু, শিবাজী গুপ্ত, রবীন সুর, গণেশ সেন এবং আরো অনেকে।

প্রিয়ম (বাসন্তী সংখ্যা)—সম্পাদক হৃষীক। ৬৭।১ উল্টাডাঙা মেন রোড, কলকাতা-৪।। এক টাকা।।

মূলত বাংলা হরফে ছাপা সংস্কৃত কবিতা ও গদ্যরচনা স্থান পেয়েছে পত্রিকাটিতে। প্রয়াস হিসেবে মন্দ লাগবে না। সংস্কৃত যখন মৃতভাষায় পরিণত হতে চলেছে, তখন তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন সম্পাদক। পত্রিকাটি বেরুচ্ছে ডঃ রমা চৌধুরী, কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী ও কে এস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে।

জাগরী (ষোড়শবর্ষ ঃ মাঘ '৭৭)—সম্পাদক শ্রীঅপূর্বকুমার সাহা। ৭৪।৫এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা ঃ ৩। পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীদের সাময়িক পত্রিকা 'জাগরী'। এই সংখ্যা শ্রীমার বাণী দিয়েই সুরু। গল্প কবিতা নিবন্ধও আছে। নিবন্ধগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শ্রীঅরবিন্দ-এর দিব্যজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পত্রিকায় বৈশিষ্টহীন আর পাঁচটা পত্রিকার মতো 'মঞ্চ-চিত্র-কথা' প্রকাশ কেমন যেন বেমানান এবং দৃষ্টিকটু।

রাজা রাণী আর রাজকন্যা (গল্পগ্রন্থ)—অর্চনা মিত্র। রাণার প্রকাশনী ঃ ১৪।বি, রড স্ট্রীট, কলকাতা-১৯। দু'টাকা।

যে বংশ এককালে মর্যাদায় আভিজাত্যে এবং চালচলনে রাজার মতো ছিল সেই রাজা রাণী আর রাজকন্যার প্রেম-ভালবাসা নিয়েই এই গল্পগ্রন্থ।

আলোর জোয়ার (সম্ভাবনা সংকলন)— সম্পাদক ফাল্গুনীচরণ মায়া।।গড়বেতা, মেদিনীপুর।। পঞ্চাশ পয়সা।।

তরুণ লেখক-লেখিকাদের মুখপত্র। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের মন্দ লাগবে না। লিখেছেন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আবদুস সামাদ, শেখ নজরুল ইসলাম, নিত্যানন্দ দাশ, লীনা সরকার, পান্নালাল রায় প্রমুখ।

উড়িয়া ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা

পশ্চিমবাংলায় 'কিছুই হচ্ছে না' 'কিছুই হচ্ছে না' সোরগোলের মধ্যেও অনেক কিছুই হচ্ছে। অন্তত অনুসন্ধানের কাজ স্তব্ধ হয়ে নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে নবীন-প্রবীণ গবেষকরা নানা বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে যাচ্ছেন। হয়তো বাইরের কোলাহলে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না বলেই তাঁরা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে থাকাও পছন্দ করেন না। অবশ্য তার অন্য কারণও থাকতে পারে।

সাধারণত আমাদের দেশের গবেষকরা যেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, তার সঙ্গে সাধারণত পাঠকের পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। এবং থাকলেও প্রায়শ অনাত্মীয়ের। কখনো বৈরীতার।

সৃজনশীল সাহিত্যের পাঠক গুরু-গম্ভীর ইতিহাসের চর্চায় তৃপ্তি পান না। এটা দেখেছি, অনেক সিরিয়াস পাঠকের পক্ষেও সত্য। তাঁরা চান, সমকালীন ঘটনাবলীর ওপরে আলোকপাত, কিংবা প্রিয়তম লেখক-লেখিকাদের ওপরে আলোচনা।

ঠিক এজন্যেই নিষ্ঠাবান গবেষরেকা সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত থেকে যান। অনেকে তাঁদের সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেন না।

অমৃতের কয়েকটি সংখ্যায় আমরা তাই নিয়ে অনেক আক্ষেপ করেছি। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখাতে চেয়েছি, কি কারণে গবেষণার মান নেমে যাচ্ছে—কেন নতুনতর বিষয়ে গবেষণা করার উৎসাহ গবেষকরা হারিয়ে ফেলছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, সরকারী-বেসরকারী উদ্যমের দোষত্রুটির কথাও। বোঝাতে চেয়েছিলাম, কি কারণে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস পান না তরুণতর গবেষকরা পর্যন্ত।

সেই কারণগুলি নিশ্চয়ই এখনো বর্তমান।

দীর্ঘকালের অভ্যাসে ও জটিলতায় যার সৃষ্টি, একদিনেই তার প্রতিকার হবে—এমন আশা করাও বোধহয় দুরাশা। কেবল বিশ্বাস রাখি, সকলে সচেতন হলে, দূরে কিংবা অদূরে ভবিষ্যতে গবেষণার গতি ও বিষয়-মুখ অবশ্যই আলটে যাবে—অভিজ্ঞতার পুনর্মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

আসন্ন সেই পরিবর্তনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এখনো অনেক ক্ষীণ, তবে অস্পষ্ট নয়। গবেষকরা চেষ্টা করছেন, ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগসূত্র আবিষ্কার করতে। লেখকেরা লিখে যাচ্ছেন কমবেশী সৃজনশীল সাহিত্য।

পরেশ মজুমদারের গবেষণা

কথা হচ্ছিল সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। বয়সে তরুণ, স্বভাবে মৃদু, ভদ্রলোক কথা বলেন সহজ সরল সুস্পষ্ট ভাষায়। তাৎক্ষণিক পরিচয়ে মনে হলো, কোনো ঘোর-প্যাঁচে থাকেন না—নিজের কাজ নিয়েই সবসময় ব্যস্ত। হয়তো অন্তরের দিক থেকে ধ্রুপদী জগতের মানুষ।

সেদিন তাঁর হাতে ছিল, আসন্ন-প্রকাশিত একটি বইয়ের কতকগুলি ছাপানো ফর্মা। বেরোবার আগেই বাঁধিয়ে নিয়েছেন চকোলেট রঙের রেকসিন দিয়ে।

অভ্যাস বশে আমি তার পাতা উল্টেছিলাম। সত্যি বলতে কি, মনে শ্রদ্ধা ছিল না।

বইটির নাম : এ হিস্টরিক্যাল ফোনোলজি অব ওড়িয়া'। প্রকাশক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সংস্কৃত কলেজ। দাম : পনেরো টাকা। ছাপা হয়েছে, নানা চিহ্নে কন্টকিত হয়ে ইংরেজী ভাষায় ও হরফে।

কেবল লেখক বা প্রকাশকের নামের গুণে নয়, বিষয়ের অভিনবত্বের জন্যই আমি চমকে উঠেছিলাম।

লেখক?

তাঁকে তো চিনতামই না, নাম শুনেছি দু'এক জায়গায়। তার বেশি পরিচয় পাইনি। উপরন্তু তিনি সাহিত্যজগতের লোক নন, অধ্যাপক মহলেও অপেক্ষাকৃত অপরিচিত—অনেকের কাছেই অচেনা।

জিজ্ঞেস করলাম, উড়িয়া ভাষা জানেন?

ভদ্রলোক নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলেন জানতাম না। শিখে নিয়েছি। এখনো ভালো বলতে পারি না, পড়তে পারি অনায়াসে। বলাটা নিয়মিত চর্চা না থাকলে হয় না।

আমি অবাক।

বললাম, এত সব বিষয় থাকতে, আপনি উড়িয়া ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করলেন কেন? কি নিয়ে পাশ করেছেন?

—আমার অধ্যাপনার বিষয় ভাষাতত্ত্ব-কৌতুহলেরও একমাত্র বিষয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে পাশ করেছিলাম বাংলা নিয়ে। কিন্তু সেই ছাত্রজীবনে ভাষাতত্ত্ব আমাকে এমনভাবে টেনেছিল যে কেবল সাহিত্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারিনি—পরে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছি, পাশ করেছি। আর তখনই আকৃষ্ট হয়েছিলাম, উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি।

একটু থেমে বললেন, বৈষ্ণব সাহিত্য আমার ভালো লাগে এবং ছাত্রজীবনে লাগতো। পদাবলীর অনেক কবিই ছিলেন উড়িষ্যার লোক। বিশেষ করে, চৈতন্যদেব শেষ জীবনটা কাটিয়েছেন উড়িষ্যায়। হয়তো এটাই ছিল, উড়িয়া ভাষার প্রতি আমার আকর্ষণের অন্যতম কারণ। তবে গবেষণার কারণটা অন্যরকম।

জিজ্ঞেস করলাম, সেই কারণটা কি?

বললেন : উড়িষ্যা আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য। ওখানকার ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের অত্যন্ত গভীর। অথচ সেই ভাষা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার সীমা নেই। ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষার ওপরে উল্লেখযোগ্য এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ যখন লেখা হয়ে গেছে, তখনও উড়িয়া ধ্বনিতত্ত্বের ওপর তেমন কোনো বই নেই। আমার গবেষণার মূল কারণও কিন্তু তাই।

কবে থেকে কাজ শুরু করেছেন?

—১৯৬০ সাল থেকে। তবে ১৯৬৪-র আগে কলম ধরিনি। টুকিটাকি নোট নিয়েছি। পড়াশোনা করেছি। সারা উড়িষ্যা

রয়েছি। একই সংগে সাহিত্যের উপাদান, শব্দের পরিবর্তন, উচ্চারণের রীতিপদ্ধতির সব অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়েই এই সময়টা কেটে গেছে।

রিসার্চ করেছেন কার অধীনে?

—কারো অধীনে নয়, একা। অনেকের সাহায্য নিয়েছি, অনেকের অকৃপণ পরামর্শ পেয়েছি। ডকটরেট হবার লোভে কিছু করিনি।

আপনি কি ডকটরেট নন?

—না।

আমি দ্বিগুণ বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন—তাঁর এই কথায়। গবেষণা করেছেন, অথচ ডকটরেটের জন্য প্রলুব্ধ নন—এমন মানুষও আছে নাকি এখনো এদেশে?

বললাম, বিচ্ছিন্নভাবে ছাপা হয়েছে এ বইয়ের বিভিন্ন অংশ? নাকি একবারেই এই আকারেই বেরোচ্ছে?

—সংস্কৃত কলেজের গবেষণামূলক রচনার পত্রিকা 'আওয়ার হেরিটেজ'-এ বইটির বিভিন্ন অংশ ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে ১৯৬৪ সাল থেকে।

সরকারের সহযোগিতা

বললাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বই ছাপলেন কেন? সুনীতিবাবুর ও-ডি-বি-এল যখন দীর্ঘকাল অমুদ্রিত, তখন আপনার এ বই ছাপার কি কারণ থাকতে পারে?

—আমি সংস্কৃত কলেজে পড়াই, সরকারের চাকরী করি—বোধহয় সেজন্যেই। তার ওপরে সুনীতিবাবু ছিলেন, আমার এ বই প্রকাশের অন্যতম উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

কি রকম? কিভাবে তিনি সাহায্য করেছেন?

—গৌরীনাথ শাস্ত্রী যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন থেকেই বইটি ছাপা শুরু হয়। কিন্তু আমি ডক্টরেট নই। ফলে, ও'রা দ্বিধায় পড়লেন। ছাপা উচিত কি উচিত না—তাই নিয়ে সংশয় দেখা দিল।

তারপর?

—গেলাম সুনীতিবাবুর কাছে। তিনি আমাদের কলেজের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য। তাঁকে সব কথা খুলে বলতেই, বিনা দ্বিধায় তিনি আমাকে সমর্থন করলেন। চিঠি দিলেন তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে। বইটির প্রশংসাও করলেন। লিখলেন, এ বই ছাপা হওয়া উচিত—যেন ছাপা হয়।

ছাপা হতে কতদিন লাগলো?

—প্রায় সাত বছর।

মানে, ১৯৬৪ সাল থেকে?

—হ্যাঁ, 'আওয়ার হেরিটেজ'-এর একেকটি সংখ্যায় আমি যেমনভাবে লিখেছি, এবং যেমনভাবে ছাপা হয়েছে—এ বইটিও ঠিক তেমনিভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। আসলে এটি সংস্কৃত কলেজের মুখপাত্র 'আওয়ার হেরিটেজ'-এর অফপ্রিন্ট। জানেন তো, সরকার বের না করলে, এ বই হয়তো কোনোদিনই বেরোত না।

বললাম, গবেষণার সময় সরকারী সাহায্য কিছু পেয়েছেন?

—পাইনি। চেষ্টাও করিনি। নিজেই টাকা পয়সা খরচা করেছি, যাতায়াত এবং যোগাযোগ করেছি। সমস্ত উদ্যমটা একান্তভাবেই আমার।

গবেষণার নেপথ্যে

কি পরিমাণ পরিশ্রম ও ধৈর্য থাকলে যে এধরনের কাজ শেষ করে ওঠা সম্ভব—তা টের পেয়েছি ছাপা ফর্মাগুলি উল্টে-পাল্টেই। এমন নীরস, এমন পাঠকবর্জিত বিষয়ে যাঁর উৎসাহ—তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।

তবু জিজ্ঞেস করলাম, তথ্য সংগ্রহে আপনি কার কার সাহায্য পেয়েছেন? এবং কিভাবে?

—সুনীতিবাবুর ও-ডি-বি-এল ছিল আমার প্রচ্ছন্ন প্রেরণা। বইপত্রের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগারের। তা ছাড়া উড়িষ্যা থেকে আনিয়েছি বহু বই। আধুনিক উড়িয়া ভাষাকে বোঝার জন্য।

একটু থেমে বললেন, সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি যাঁদের কাছ থেকে, তাঁরা আমার কাছেও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই অপরিচিত। জানেন নিশ্চয়ই, সুনীতিবাবু বাংলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে কলকাতায় চলিত বাংলাকে স্ট্যাণ্ডার্ড ডায়ালেক্ট হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আমিও তেমনি উড়িষ্যার চারটে উপভাষার মধ্যে দুটোকে স্ট্যাণ্ডার্ড ডায়ালেক্ট হিসেবে গ্রহণ করেছি। সেজন্যে আমাকে অনেক বার যেতে হয়েছে পুরী এবং কটক। ওখানকার মানুষ কিভাবে কথা বলে, কিভাবে উচ্চারণ করে—তার নমুনা সংগ্রহের জন্যে অনেকের কণ্ঠস্বর টেপ করে এনেছি। উচ্চারণের ব্যবধান বোঝাবার জন্য—এসবই হলো অত্যন্ত জরুরী কাজ। কেননা, ভাষা জিনিষটা খুবই সচল এবং সজীব—নদীর মতোই গতিশীল। আমার গবেষণার নেপথ্যে যাঁরা আছেন, সেজন্যেই তাঁদের নাম বলা যায় না। তাঁরা অচিহ্নিত—জনপদের মানুষ।

পুরনো পাণ্ডুলিপি কিছু ঘাটাঘাটি করেছেন?

—কিছু করেছি। তবে ওরিজিন্যাল ম্যানাসক্রিপ্ট ঘাটাঘাটির কোনো সুযোগ ছিল না। উড়িয়া সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রায় সবই ছাপা হয়ে গেছে। আর্তবল্লভ মহান্তিকে এজন্যে ধন্যবাদ জানাতে হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় প্রতিটি দুষ্প্রাপ্য বইই তিনি এডিট করে প্রকাশ করেছেন। বাংলায় যেমন বহু পাণ্ডুলিপিই এখনো অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে আছে, উড়িষ্যায় কিন্তু সেরকম পাণ্ডুলিপি প্রায় নেই বললেই চলে।

সার্থকতা এবং বৈশিষ্ট্য

কথায় কথায় করেশবাবু বললেন, এককালে আমাদের দেশে হর্ণলে, বীমস প্রমুখ প্রাচ্যবিদেরা গ্রেটার পার্সপেকটিভে সমগ্র উত্তর ভারতের ভাষাগুলিকে দেখেছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি ছিল অনেক বড়। তার ফলে, আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ভিত্তিতে ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধরা যেতো না। সুনীতিবাবু, জুলে বলক, গ্রীয়ারসন, টার্ণার প্রমুখ মনীষীরা প্রথম স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি ভাষার ও ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের স্টাডি শুরু করেন। এতদিন বাকি ছিল উড়িয়া। আমি এ বই লিখে সেই অসম্পূর্ণ কাজটিই সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছি।

আপনার এই গবেষণার কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে কি?

—বোধহয় আছে। প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেছি আগাগোড়া। একসঙ্গে ট্রীট করেছি, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মাগধী ও ভোজপুরী ভাষার বৈশিষ্ট্যকে। কেননা, এই ছয়টি ভাষাই এসেছে মূল মাগধী প্রাকৃত থেকে।

উদাহরণ দিয়ে বললেন, যেমন ধরুন বাংলায় রাখাল শব্দটি। ওড়িয়ায় শব্দটির উচ্চারণ 'রখুয়াল', অসমীয়ায় 'রাখোবাল' এবং বিহারীতে 'রখবার'। অথচ এই শব্দগুলির মূল সংস্কৃত 'রক্ষপাল'।

মুগ্ধ ধ্বনিবিজ্ঞানীর মতো আশ্চর্য রোম্যান্টিক কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, এভাবে ধ্বনি-ব্যবধানের গোপনসূত্র ধরে বিভিন্ন ভাষার সূত্র হয়েছে, একই শব্দ রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। সব কিছুরই মূলে ঐ ধ্বনি-বৈচিত্র, উচ্চারণের বিভিন্নতা। আমার মনে হয়, এক সময়ে এই আঞ্চলিক ভাষাগুলি গড়ে-ওঠার আগে নিশ্চয়ই একটি স্টেজ ছিল। সেজন্যেই আমি জিও-হিস্টরিক্যাল পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি।

এ বইয়ের পাঠক কারা? কি প্রয়োজনে লাগবে?

বললেন, পাঠক যে বেশি হবে না, সেকথা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেও জানি। যাঁরা আধুনিক আর্যভাষা নিয়ে চর্চা করবেন এবং করছেন—তাঁদের পক্ষে এই অত্যন্ত জরুরী। ওড়িয়া ভাষার গবেষকদের তো কাজে লাগবেই। এখনো আমি কাজ করে যাচ্ছি। যদি শেষ করে উঠতে পারি, তা হলে হয়তো পূর্বভারতীয় ভাষাগুলির একটা তুলনামূলক অভিধানও লিখে উঠতে পারবো।

—প্রত্যক্ষদর্শী

ফ্রেজারগঞ্জ নামখানায় বুক বেয়ে ভেসে আসা সাগরের ঝোড়ো হাওয়া চরণ হালদারের বাপের মত চুলের রাশ চোখে-মুখে ছড়িয়ে দেয়, আশী বছরের বুড়ো চরণ নড়বড়ে লাঠিতে ভর করে লক্ষ্মীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে, কোঠরে বসা চোখ মেলে বলে—'ওপারে যেখানে ধুঁয়ো উড়ছে দেখতেছো, ওখানে আমার ঘর ছিল এককালে। এপারে রাজচকে গড়তেছে মাছের বোঁদর—ওপারে হলদের বোঁদর। এপার-ওপারে শুধু গড়তেছে নগর বোঁদরের বনেদ, গড়ার নেশায় শেষ বনেদ গড়তে, মেহনতী মানুষরা কি সব হারিয়ে বসবে মালক্ষ্মী।'

হুগলীর এপারে মাছের বন্দর রাজচক, হলদীর ওপারে কলকাতার পরিপূরক বন্দর হলদিয়া, রাজধানী কলকাতা শহর ছেড়ে, ছুটির দিনে, বাস ট্যাক্সি, গাড়ী চড়ে দলে-দলে লোকে বেড়াতে আসে ডায়মণ্ডহারবারে, সেখান হয়ে কুলপী, কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জে লোকে আসে বুক ভরে ওজন মেশানো সাগরের হাওয়া খেতে। ফ্রেজারগঞ্জে সাগরের বুকে উঠছে স্বাস্থ্যনিবাস ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপে তৈরী হয়েছে সাগরিকা ট্যুরিস্ট লজ, নগরের গোড়াপত্তন শুরু হয়েছে সুন্দরবনের গঞ্জে বাজারে।

আজ যেখানে রাজচক ফিশিং বন্দর গড়ে উঠছে, সত্তর-আশী বছর আগে সেখানে ছিল সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল। আবাদের গোড়া পত্তন করতে দলে-দলে লোক এসেছে ওপারের মেদিনীপুর হাওড়া, এপারের চব্বিশ পরগণা, খুলনা, যশোর থেকে। জঙ্গল সাফ করে, পোনা বাঁধ বেঁধে, গরান হেতালের গোড়া তুলে ফেলে, তারা আবাদী জমির পত্তন করেছে সুন্দরবনের জংলা ভূমিতে, লাটদারের বেগার খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, পুরুষের পর পুরুষ, ভূমিহীন কিষাণ আবাদের বনেদ পোক্ত করে গড়েছে।

ডায়মণ্ডহারবার-নামখানা জনপথের দুধারে গড়ে উঠেছে বর্ধিষ্ণু গ্রাম, গঞ্জ, গড়ে উঠেছে বাজার-হাট, মন্দির-মসজিদ, পাঠশালা হাইস্কুল, হিন্দু-মসুলমান একই পরিবারের লোকের মত শান্তির নীড় বেঁধেছে সে সব গাঁয়ে।

বর্ষার শুরু থেকে শীতের শেষ অবধি সুন্দরবনের নোনা মাছে ঝুড়ি বোঝাই হয়ে চালান হয়েছে কলকাতার বাজারে। নৌকোবোঝাই সরু ধানের চালাম গেছে চেতলা টালিগঞ্জের ধানকলে, সুন্দরী গরান চালান হয়েছে নিমতলা উল্টোডিঙির আড়তে, সুন্দরবনের উপর বনেদ গড়ে চালের কল বসেছে কাকদ্বীপ হটুগঞ্জ, নুরপুর কলকাতার হুগলীর তীরে-তীরে, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে, দেশ গড়তে সুন্দরবনের মানুষ নানাভাবে নিজেদের নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে শহর গঞ্জের গোড়াপত্তন করতে।

বিশ্বব্যাপী, মহাযুদ্ধের অভিশাপ নেমে আসে গ্রাম বাংলার ঘরে-ঘরে। নিত্য-ব্যবহার্য পণ্যের অগ্নিমূল্য সঙ্গে করে আনে সাতাশের বন্যা, দুয়ে হাত মিলিয়ে হলদির ওপারের গাঁয়ের মানুষদের জীবন করে তোলে দুর্বিসহ। পেটের জ্বালা

জোটাতে দেনার দায়ে চরণ হালদারের ভিটে-মাটি বাঁধা পড়ে মহাজনের আড়তে। দেনাটার উপায় না দেখে, বুড়ো বাপের কথা উপেক্ষা করে, ছেলে-বউয়ের হাত ধরে চরণ হাজির হয় হোড়খালির খেয়াঘাটে।

খেয়া পার হয়ে, কুলপী ঘাটে উঠে, রুজি-রোজগারের আশায় তারা হেঁটে চলে আবাদী লাট অঞ্চলের পথে। কত খাল-নালা পার হয়ে দু দিন পথ হেঁটে, চরণ এসে পৌঁছে রাজচকে ইন্দুবাবুদের লাটে। দশ বিঘে জমির পত্তান নিয়ে, চরণ কুন্তী দুজনে মিলে গড়ে তোলে হেতাল বেড়ার ঘর, গোলপাতার ছাউনি ঘেরা।

সে আজ কত কাল আগেকার কথা, চরণ তখন তিরিশ বছরের খাটুনে জোয়ান, কুন্তী পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবতী। পাঁচ বছরের ছেলে নারাণ তাদের চোখের মণি। নারাণকে ঘিরে কুন্তী-চরণ কত স্বপ্ন দেখেছে বাড়বাড়ন্ত সংসারের, বুড়ো শ্বশুরের কথা তুলে কুন্তী চরণকে দেশে যেতে বললে, চরণ তাকে ধমক দিয়ে বলে—'আমার কথা সে রাখে নি, আখেরে তাকে পস্তাতে হবে বলু।' অসহায় মানুষটার জন্যে ব্যথা পায় কুন্তী।

সাতসকালে পান্তার হাঁড়ি, জলের কলসী নিয়ে বাদায় গেছে স্বামী-স্ত্রী, কোদাল-কুড়ুল কাঁধে বয়ে। কুড়ুলের ঘায় চরণ সুন্দরী গাছকেটেছে। কোদাল চালিয়ে কুন্তী গাছের গোড়া তুলে ফেলেছে। শুকনো গড়ের আগুন জেলে বাদায় সার দিয়েছে কুন্তী, ছোট ডালপালা জড় করে মার সাথে পাতায় আগুন ধরিয়েছে নারাণ, শুকনো পাতায় আগুন জেলে ফাগুনে দোলের চাঁচর খেলেছে নারাণ।

দুপুরের নুন পান্তা খেয়ে, ঝোপের আড়ালে দুপুরের রোদ কাটিয়ে, পড়ন্ত বেলায় চরণ কুন্তী ধান বুনেছে, আগাছা তুলে ফেলেছে, চারার গোড়ার মাটি আলগা করে দিয়েছে। এমনি করে দশ বছরে, দশ বিঘে জংলা জমি আবাদে পরিণত করেছে তারা।

বর্ষায় খালে ছাউনি জাল পেতে মাছ ধরে এনে, কুন্তী শুকো বানিয়ে রাখে সে মাছকে, শুকটী মাছের ঝাল রেঁধে চরণরা ভাত খায় সারাবছর, লোনা জমিতে শাকসব্জী জন্মে না। কাঁকড়া, ভেটকি, পোনামাছ তাদের জোগায় সুষম খাদ্য।

কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে বাদার ওধারে হেতাল বনের পাশে দেউলির নদীতে টানা জাল পাতে চরণ কুন্তী, বাগদা, ফারসে ও সময় বাদা ছেড়ে বেরিয়ে যায় গাঙের জলে, হেতালবনে পাতার কুঁড়ে বেঁধে মাছ মারে চরণ কুন্তী, ফি বছর পূর্ণিমা অমাবস্যার কোটালে।

ভেরাকাটা সুন্দরবনের বাঘকে দক্ষিণ রায় বলে সে দেশের লোকে, চরণ কুন্তীর কুঁড়ের পাশে সে ঘুরে বেড়ায় রাত-বেরাতে, চরণরা দক্ষিণরায়ের পুজো মানত করে, জাল ফেলতে যায় দেউলি নদীতে। 'বনের দেবতা' তাদের আপনজনের মত। ক্ষোদিন [illegible] বলে কি তাদের।

শিকারের গুলী খাওয়া বুড়ো দক্ষিণ রায়, সে বছর ওৎপেতে বেড়ায় গেরস্তের অঙ্গিনায়। ছাগল, গরু, বাছুর — দু-চার জোড়া খোয়া যায় জঙ্গলে চরতে গিয়ে, পূর্ণিমার রাতে চরণের কুঁড়ের অদূরে একজোড়া জ্বলন্ত আংগরা বসে থাকে। রাতে কুঁড়ে ছেড়ে চরণ, কুন্তীকে বাইরে যেতে মানা করে, ভোর রাতে জাল গুটোতে চরণ নামে জলে। কুন্তী তার পেছনে মাছের চুপড়ি বয়ে আনে মাথায়, দক্ষিণ রায়ের হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে বনভূমি। জলে দাঁড়িয়ে চরণ দেখে দক্ষিণ রায় কুন্তীকে পুতুলের মত মুখে তুলে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বনের ভেতর। মূর্চ্ছিতপ্রায় চরণের মুখ থেকে কথা বের হয় না। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও, তার স্বর ফোটে না। রয়েল বেঙ্গলের আস্ফালনে, কুন্তীর চিৎকারে নদীর জল কেঁপে ওঠে। চরণ সংজ্ঞাহারার মত বসে পড়ে নদীর মাটিতে। জ্ঞান ফিরে দেখে সব শূন্য—কুন্তীর চিহ্নমাত্র নেই। চাপ-চাপ রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে হেতাল বনের ভেতর। কাঁটা-ঝোপের ভেতর কুন্তীর পরণের কাপড় টুকরো-টুকরো হয়ে কাঁটায় বেঁধা।

গাঁয়ে ফিরে লোকজন জড় করে, লাঠি বর্শা নিয়ে চরণ বনে-বনে কুন্তীকে খুঁজে বেড়ায়। হেতালবনে মাথার চুল, টুকরো হাড়কুড় সম্বল করে চরণ ফিরে আসে। হুগলীর তীরে চিতা জ্বালিয়ে কুন্তীর হাড়গোড় জ্বালিয়ে দেয় চরণ। চিতার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, নদীচরে চোখ গেল পাখী ব্যাকুল হয়ে ডাকে—চোখ গেল, চোখ গেল। চিতার এক ধারে বসে চরণ ভাবে কুন্তীর কথা—বন-বাদার ছেড়ে ঘরে যাও ঘরামি। নারাণের ভবিষ্যৎ ভেবে চরণের আর ঘরে ফেরা হয় না।

নারাণকে অসহায় করে, চরণকে একা ফেলে কুন্তী চলে যায়। নারাণের মুখ চেয়ে সাথীহারা ব্যথা বুকে চেপে, দ্বিতীয় সংসার করতে চরণের মন চায় নি। সে স্বপ্ন দেখে নারাণের বেঁথা দিয়ে তাকে সংসারী করে দেশের ভিটেতে ফিরে যাবে। তার সে আশাও মনে-মনেই থেকে গেছে। দুর্গা-চকের ভিটেতে ফেরা তার হয় নি।

চোখের সামনে দেখতে-দেখতে নারাণ কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। সুন্দরবনে মানুষ চার বছরের নারাণ বিশের কোঠা ছাড়িয়ে একুশে পা দেয়। চরণের মত খাটুনে জোয়ান হয়ে ওঠে সে। বাপের সঙ্গে চাষবাসের কাজ সেরে, বাহার গাঙে ইলিশের জাল ফেলতে যায় ওমর আলির পানসির বখরায়। চরণের হাতে কুড়ি-কুড়ি টাকা এনে দেয় ইলিশের কারবার করে।

কুন্তীর শূন্য আসনে, সংসারের হাল ধরতে, চরণ নারাণের জন্য মেয়ে খুঁজতে থাকে। যশোরের দুখন দাস চণ্ডীপুরের সেরা চাষী, দুখনের মেয়ে লক্ষ্মী রূপে-গুণে তার আঁধার ঘর আলো করে তুলবে ভেবে, নারাণের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনে চরণ। সারারাত ধরে দু গাঁয়ের লোক খাওয়ায় বউভাতে।

লক্ষ্মী ঘরে আসার পর, চরণের সংসারে বাড়বাড়ন্ত হতে থাকে। ইলিশ বিক্রীর জমান টাকা থেকে দু বিঘে জমি, দোয়াল গাই একটা কেনে নারাণ। কাঁচা পয়সা আয় করতে নারাণ পানসি কেনে। লোকলস্কর রেখে হাজিপুরে মাছ চালান দেয় মহাজনের আড়তে। শ্রাবণ-ভাদ্র দু মাস হল্দির মোহানা থেকে নুরপুর হুগলী পয়েন্টে জাল পেতে, নারাণ ভেসে বেড়ায় নদীর জলে। শ্বশুর বউ নারাণের পথ চেয়ে থাকে রাজচকের মেটে ঘরে।

রাজচকের ঘরেই বসে লক্ষ্মী দেখে বড়-বড় জাহাজ ভেসে চলে বাহার গাঙে। ভয়ে তার গা ছমছম করে। জাহাজের ধাক্কা খেয়ে, চণ্ডীপুরের মেহের আলির পানসি উল্টে ডুবে যায় সে বছর। নারাণকে গাঙে যেতে লক্ষ্মী মানা করে। রাতে নারাণের বুকে মাথা রেখে চুপি-চুপি লক্ষ্মী তাকে বলে—'আমার একা থাকতে বড্ড ভয় করে। পেথম পোয়াতি হয়েছি আমি। তুমি আর গাঙে যাইয়ো না। বাদার চাষে মন দেও।'

তার কথা শুনে হেসে ফেলে নারাণ। আদর করে চিবুকে নাড়া দিয়ে বলে—'ভয় কিসের? বিশালাক্ষ্মীর পুজা মানত করে আমি গাঙে না ভাসাই। মার কৃপায় জাহাজ ইস্টিমারকে আমি ভয় পাই না।

'তোমার ভয়ডর না করলেও, আমার কথা তোমার রাখতে হবে। গাঙে যাওয়া তোমার চলাবে না।'

'তোমার কথা রাখতে হলে, সংসারে বাড়তি আয়ের পথ বন্ধ হবে। অভাব-অনটন লেগেই থাকবে।'

'কিসের অভাব সংসারে? বাদার ধানে তিনটে মানুষের বছরের ভাত হয়ে বেশী হয়ে যায়। গরুর দুধ, নলেন গুড় বেচে যে পয়সা আসে বাজার-হাট, কাপড়-জামার খরচা কুলিয়ে যায়। তোমাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে নি।'

বললেই হল। যে মানুষটা আসছে তার কথা ভাবব নি, বল কি, বাপ-বেটা জীবন-ভোর মাথার ঘাম পায় ফেলে পেটের ভাতের যোগাড় করেছি। ছেলেকে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে নি?

ছেলের কথা উঠলে লজ্জা পেয়ে লক্ষ্মী নারাণকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—'তোমার ছেলে, তোমার মত জোয়ান খাটনে হবে। তার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে নি! ছেলে মানুষ করার ভার আমার।'

মনের অগোচরে, লক্ষ্মী যে দূর-ভবিষ্যতের কথা বলেছে তা শুনে অলক্ষ্যে নিয়তি হেসে ওঠে। নারাণ লক্ষ্মী বিন্দু-বিসর্গ টের পায় না সে হাসি। তারা নিজের-নিজের কথা বলে চলে।

'বখরায় ইলিশের নৌকো কেউ আর নেবে না এ বছর, মাঝি-মাল্লাদের আগাম দেওয়া হয়ে গেছে। সামনের বছর তোমার কথা ভেবে দেখবো।'

এই তোমার সোহাগের বড়াই। বউয়ের একটা কথা তুমি রাখলে না। বেশ, যা ভাল বোঝ তাই কর, তোমার অমত করব না, দিব্যি কাটলাম।'

কথায়-কথায় রাত বেড়ে যায়। আকাশ-পাতাল ভেবে নারাণ কূল পায় না। পাছে যেতে দিতে লক্ষ্মীর এত ভয় কেন—তাও সে বোঝে না। নানা কথা বলে লক্ষ্মীর রাগ ভাঙিয়ে তাকে হালকা করতে চায় নারাণ। লক্ষ্মী জেদ ধরে, তাকে ছেড়ে নারাণের পাছে যাওয়া চলবে না।

বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মীকে ধমক দিয়ে নারাণ ঘরের বাইরে আসে, অন্ধকারে আঙিনায় দাঁড়িয়ে সে চেয়ে থাকে বাদার দিকে। লক্ষ্মী তাকে বই কিছুই জানে না। কথায় অবাধ্য হতে তাকে সে দেখে নি কখনও। লক্ষ্মীরই জন্যে জীবনপণ করে ঝড়তুফানে লড়াই করে সে। লক্ষ্মী তাকে ভুল বোঝে কি ভেবে? সংসারের বাড়বাড়ন্ত কি সে চায় না? সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে নারাণ ঘরে ফিরে আসে।

লক্ষ্মী কেঁদে-কেটে মুখ ভার করে থাকে। নারাণ লক্ষ্মীকে কাকদ্বীপের বাজারে এনে, কোমরের পৈছে, হাতের বাউটি গড়িয়ে দেয়। গয়না পেলে লক্ষ্মীর মনস্তাপ কেটে যাবে নারাণ ভাবে। আদরে-সোহাগে দু দিন কাটিয়ে নারাণ ভেসে চলে হলদির জলে, বাদার আল বাঁধ ধরে নারাণকে চলতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লক্ষ্মী মনে-মনে বলে — 'তোমার জেদের সাথে আমি এ'টে উঠতে পারলাম না। আমার হার মানতে হল।'

নারাণের একগুঁয়েমি চরণেরও ভাল লাগে না। নিজের মতেই সে চলে। বাপের কথা বড় একটা মানে না, গদামধুরায় চরে পত্তনি নিতে নারাণ রাজি নয়। যুক্তি দেখিয়ে চরণকে সে বলে—'জংলা জমিতে, পেথম-পেথম চারা ভাল জন্মাবে না। হাজা-শুকো আছে। নোনা বাণে বাঁধ ভাঙার ভয় আছে। ঘেরী বাঁধতে বিস্তর মেহনত করতে হবে। নোনা পলিতে ধানই বা ফলবে কেমন?'

চরণ বোঝে নারাণের দৃষ্টি সামনে। অনুরভবিষ্যতের কথা সে ভাবতে শেখে নি। নারাণের কথা চরণের মনে লাগে না। তবুও সে চুপ করে থাকে। ছেলের মুখের উপর কথা বলা তার স্বভাবের বাইরে। বাপের কথা না শুনে, সেও একদিন ছেলে-বউয়ের হাত ধরে ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে এসেছে এপারে। তার ছেলে নারাণই বা তার কথা শুনবে কেন। বাপের মনে দুঃখ দিয়েছে বলে, সেও পড়ে-পড়ে দুঃখ পাচ্ছে।

শ্রাবণে ইলিশের জাল পাততে নারাণ ভেসে চলে হলদী হুগলীতে। নারাণ চলে যাওয়ার পর লক্ষ্মীর সন্তান জন্ম নেয়। চরণ তার নাম রাখে মানস। চাঁদের কলার মত মানস বেড়ে ওঠে লক্ষ্মীর পয়বন্ত সংসারে। তাদের সুখ বেশী দিন সয় না। আশ্বিনের ঝড়ে ছোট বোট পানসী মিলিয়ে শত-শত নৌকো ডুবে যায় হলদির জলে। সুন্দরবনের হাজার-হাজার মানুষ ঠাঁই-ফলের মুখে কুটোর মত ভেসে যায় সাগরের জলে।

চালার সঙ্গে নিজেদের বেঁধে চরণ লক্ষ্মী ভাসতে-ভাসতে পরদিন এসে ওঠে কুলপি বাজারে। শিশু মানসকে বুকে বেঁধে লক্ষ্মী শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অথৈ জলে ডুবা বাদার পানে। ঘর-বাড়ী, গরু-ছাগল, তৈজসপত্র সব ভেসে যায় বাণের জলে। নারাণের খোঁজ তারা আর পায় নি কোনদিন।

রিলিফ ক্যাম্পে মাথা গোঁজে চরণ লক্ষ্মী। দিন দশেক পরে মাঠঘাটের জল নেমে গেলে, চরণ একা ফিরে আসে গাঁয়ে। চারধারে বাণের জলে ডোবা মাঠ ছাড়া গাঁয়ের অস্তিত্ব বলতে কিছু ঠা[illegible] না চরণের চোখে, বাড়ন্ত ধানের চা[illegible] চিহ্নও নেই। দু-দশজন ছাড়া বেশীর ভ[illegible] লোকই নিশ্চিহ্ন! ঘর-বাড়ী নজরে পড়ে মোটেই।

ধসে পড়া ভিটেতে বসে চরণের বু[illegible] ফাটা কান্নায় প্রবোধ দিতে কেউ নেই ত[illegible] পাশে। কে কাকে আশ্বস্ত করবে। স[illegible] হারায় ব্যথা বানে ডোবা মানুষদের চো[illegible] মুখে। কথা নেই কারও মুখে, জড়ের [illegible] ঘুরে বেড়ায় তারা।

নারাণের আশাপথ চেয়ে দুদিন [illegible] না খেয়ে দেয়ে, ভিটেয় পড়ে থেকে, চ[illegible] ফিরে আসে কুলপীঘাটে, লক্ষ্মীমানস

জল ভরে ভেসা ফেলে সরকারী লঙ্গর-খানা জাঁকিয়ে। প্রকৃতির কালাপ্রাসে পর্যন্ত মারী চরণ হালদার ভিখেরী বনে যায়—লক্ষ্মীর ভাঁড়ারে চাল-বাড়ন্ত। মানস তখন যে তিনমাসের শিশু।

কার্তিকের শেষে লক্ষ্মী মানসকে নয়ে ফিরে আসে রাজচকের পোড়ো কুটির, সরকারী ডোল তিনটা মানুষের সংসারে একমাত্র সম্বল। অকালে কুন্তীকে হারিয়ে, চরণের বুকের পাঁজর ভেঙে ছিল, নারাণের নিরুদ্দেশে, হাত পা গুঁড়িয়ে, চরণ পঙ্গু হয়ে গেল। মুখের কথা, বুকের বল, সে হারিয়ে ফেলল চিরদিনের মত।

নারাণের খোঁজে দু চার কোসের ভেতর, ঠাঁই ঠাঁই ভেসে চলা নৌকোর দিকে তাকিয়ে থাকে চরণ। দু-চোখ বেয়ে জল ঝরে তার বুক বেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস কেটে যায়, বছরের পর বছর ঘুরে আসে, নদীতীরে খোঁজা চরণের শেষ হয় না। সে ভাবতে পারে না, নারাণ আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

একুশ বছর বয়সে স্বামীকে হারিয়ে, শিশুপুত্র-বুড়ো শ্বশুরের ভার মাথায় নিয়ে, লক্ষ্মী অকূল পাথারে ভাসতে থাকে, যে কোনদিন ঘরের বাইরে যায় নি, ক্ষেত-খামার বাজারহাটের ভার তাকে নিতে হয়। মানসের মুখচেয়ে লক্ষ্মী আশায় বুক বাঁধে, কায়ক্লেশে দিন কাটায়।

মানসকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করে, তাকে মানুষ করে তুলতে মেয়েদের মর্যাদা খোয়াতে সে দ্বিধা করে নি। পুরুষের মত, চরণের সঙ্গে মাঠে লাঙ্গল চষে, ধান বনে, ফসল কাটে লক্ষ্মী। মেয়ে হলেও শক্তিতে পুরুষের চেয়ে কম নয়, সে প্রমাণ করে।

দুশ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ঘুচিয়ে দেশ স্বাধীন হয়, স্বাধীনতার ছোঁয়া এসে লাগে পল্লী-বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে, সুন্দর বনের আবাদের উপর গড়ে ওঠে জনপথ—ওধারে কাকদ্বীপ নামখানায়, এধারে বনবিবিপুর-রায়দীঘিতে। দেশ-বিদেশের কুলি-কামিন আসে বাঁধে মাটী কাটতে। চরণের দশ বিঘে জমির মাঝ দিয়ে রাস্তা চলে যায় নামখানায়, চার বিঘে জমি পড়ে রাস্তায়। ক্ষতিপূরণ পায় দু' হাজার টাকা।

মানসের হাত ধরে লক্ষ্মী উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখে সর্পিল গতিতে পথ চলেছে দূর-দূরান্তরে। তারও পরে, ইট পেতে পিচ ঢেলে পাকা সড়ক তৈরী হয়েছে মাটির রাস্তায়, বাস, লরি, ট্যাক্সি রিকসা চলতে সুরু করেছে সে পথে। শহরের ছোঁয়া এসে লেগেছে পল্লীর আঙিনায়।

যুগের সাথে সাথে, মানুষের জীবন-যাত্রা বদলাতে সুরু করেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে নিবিড় ধান চাষের ক্ষেত, হাঁস-মুরগী গরু-ছাগলের চিকিৎসা কেন্দ্র, হাট-বাজারের দোকানে সস্তা রেডিও বাজতে সুরু করে। জামা-কাপড়, স্নো-পাউডার, ঘড়ি-চশমার পসরা সাজিয়ে দোকানদারেরা ভিড় জমায়।

ধান-চাল, শাক-সব্জী, দুধ-মাছের দাম দিন দিন চড়তে থাকে। গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরের কলকারখানার চাকরি নেয়, লেখাপড়া জানা ছেলেরা সরকারী চাকরীতে যোগ দেয়। দেশ গড়তে দলে দলে মানুষ এগিয়ে আসে, লক্ষ্মী স্বপ্ন দেখে, লেখা-পড়া শিখিয়ে মানসকে সে যুগের উপযোগী করে গড়ে তুলবে। বাপ-দাদার মত নোনা জমিতে চাষ করতে সে দেবে না তাকে।

রাজচকের বুনিয়াদি স্কুলে পড়া শেষ হলে, মানুষকে লক্ষ্মী...ভর্তি করে চণ্ডী-পুরের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে। খেয়ে-দেয়ে, জামা-কাপড় পরে, মানস সাথে বেঁধে নেয় দুপুরের টিফিন—চিড়ের মোয়া নারকেল নাড়ু। দু মাইল দূরের পথ হেঁটে যেতে হয় চণ্ডীপুরের স্কুলে। ঘরে ফিরতে সন্ধ্যে নেমে আসে। সারাদিনের খিদে তেস-টার পথের কষ্টে, মানসের চোখমুখ শুকিয়ে যায় আমসির মত। ঘরে ফিরতে দেরী হলে, অজানা আশঙ্কায় লক্ষ্মী ঘর-বার করে।

বিকেল পড়ে এলে, চরণ লাঠিতে ভর করে হেঁটে চলে রাজচকের নদীতীরে। চরণের বুকজুড়ে নারাণের শূন্য ঠাঁই, আজও সে নারাণের খোঁজে ফিরে নদীর তীরে তীরে রাতে আঁধারে, পা পা করে শূন্য মনে ঘরে ফিরে আঁধার ঘেরা অঙিনায় দাঁড়িয়ে ডাকে—লক্ষ্মী মা। এক একদিন, তার বুক চিরে নিরাশার চাপা বেদনা দীর্ঘ-শ্বাসের রূপ ধরে বের হয়ে আসে। সামনে দিগন্ত জোড়া বাদা প্যানে তাকিয়ে চরণ দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ্মীকে ডাক দিতে ভুলে যায়। রান্নাবাড়া শেষ করে, চরণের খোঁজে বাইরে এসে লক্ষ্মী দেখে, এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে কি যেন সে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নামখানা থেকে ছুটে-আসা লরির আলোতে লক্ষ্মী দেখতে পায়, চরণের দু চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। কি যে তার বেদনা, লক্ষ্মী তা বোঝে। অভাগা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে, চরণের পাশে এসে তার হাত ধরে লক্ষ্মী বলে—'মানসের মুখে তোমার ছেলের ছায়া কি দেখনি বাবা।'

অভিমানে চরণ হালদার ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে—'রাক্ষসী গাঙ আমার সোনার সংসার ছারখার করে দিয়েছে লক্ষ্মী মা, আমাকে সে নিতে চায় নি, বাঁচিয়ে রেখেছে তুষের আগুনে ধিকিধিকি জ্বালাতে। ভিটে-মাটি ছেড়ে আসার শাপে, সব খুইয়ে আমি বেঁচে রইলাম।

চরণের কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে, শূন্য আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে, লক্ষ্মী চেয়ে থাকে আঁধার-ঘেরা রাজচক জেঠিঘাটের দিকে, বার বছর ধরে যে আগুন সে চেপে রেখেছে বুকের ভেতর, সে আগুন তার চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে অন্ধকারের মাঝে। দখিনা বাতাসের একটানা শোঁ শোঁ শব্দে দূরে থেকে লক্ষ্মী শুনতে পায় নারাণের ডাক—'সোনা বউ! বড্ড অন্ধকার, আলো নিয়ে এগিয়ে এসো।' মনের ভুল ভেবেও, সে কান পেতে থাকে বাতাসে।

আদর করে নারাণ লক্ষ্মীকে সোনা বউ বলে ডাকত। সোনার পারা গায়ের রঙের জন্য —'সুন্দরী বলে ডাকত গাঁয়ের মেয়েরা। লক্ষ্মীর দোহারা লম্বা চেহারায় টানাটানা চোখ দুটী সুধা ভরা থাকত সব সময়। কুলপী হাটের জংলা শাড়ীতে যা মানাত তাকে। লক্ষ্মীকে নতুন শাড়ী পরিয়ে, নারাণ চেয়ে থাকত অপলক দৃষ্টিতে। তার দিকে দু' পা এগিয়ে এসে একহাতে লক্ষ্মীর মুখ তুলে ধরে নারাণ বলত—'আমার লক্ষ্মী-সুধা, জন্মে জন্মে যেন তোমার দেখা পাই।'

সেদিনের কথা মনে করে লক্ষ্মী আনমনা হয়ে পড়ে। মুখের কথা, মনের বল সে হারিয়ে বসে। নারাণের হাসিখুসিভরা মুখ ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। কথা না বলে লক্ষ্মী চরণের হাত ধরে ঘরের ভেতর আনে।

চরণ মানসকে খাইয়ে হেঁসেল গুছিয়ে রেখে, লক্ষ্মী শোয়ার ঘরে আসে। রঙ ওঠা টিনের পোর্টমেন খুলে, কতকাল পর, সাগরমেলায় তোলা নারাণের ফটো বের করে। হারিয়ে যাওয়া নারাণের হাসিমাখা চোখমুখ দেখে, তার বুকের মাঝে, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বিগত যৌবনের উজ্জ্বল দিনের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে, ফটোয় নারাণকে দেখতে দেখতে লজ্জায় মাথায় আঁচল তুলতে গিয়ে, হ্যারিকেন উল্টে দেয়।

ভুল বুঝতে পেরে, অন্ধকারে বিছানায় বসে, লক্ষ্মী অঝোরে কাঁদতে থাকে। অতী-তের বারোটী বছর, বারো যুগের পাষাণের ভার নিয়ে চেপে বসে তার বুকে। নিজের অস্তিত্ব ভুলে, জানালার পাশে বসে, লক্ষ্মী চেয়ে দেখে, রাজচকের জেঠির গায় জ্বলছে বিজলির আলো। বিধবার কপালে সিঁদুরের ফোঁটার মত, বিজলি বাতি বেমানান লাগে অন্ধকারে-ভরা দিগন্ত জোড়া সুন্দরবনের আবাদের বুকে।

ভোরের শীতল হাওয়া, অভুক্ত রাতজাগা লক্ষ্মীকে ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে, তার দু চোখ ভরে ঢেলে দেয় তন্দ্রার ঘোর। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লক্ষ্মী স্বপ্ন দেখে, নারাণ তার গায়ে হাত রেখে ডাক দিয়ে বলছে—'চোখ খোল সোনা বউ, দেখ কি এনেছি তোমার জন্যে।'

তন্দ্রার ঘোরে লক্ষ্মী বলে—'তুমি আমারে বইকো, তুমি আমারে মাইরো। আমারে ছাইড়া যাইয়ো না সোনা, আমারে ঠাঁই দেও তোমার পায়ে।'

ধমক দিয়ে নারাণ বলে—'কি সব বাজে বকছ সোনাবউ, তোমারে আমি ছাড়বো কেন, আর আমি গাঙে যাবো না'

হাত বাড়িয়ে নারাণের হাত ধরতে গিয়ে লক্ষ্মীর ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখে কখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, সোনালী রোদে আঙিনা ঝলমল করছে, চড়ুই বুলবুল দানার খোঁজে কিচির-মিচির ডাকে বাগান সরগরম করে তুলছে। জাহাজের সিটি ভেসে আসছে সাগর মোহনা থেকে। জোয়ারের জলে ভাটার টান ধরেছে। জাহাজের সাইরেণে তারই সঙ্কেত। পুঞ্জী-ভূত বেদনা বুকে চেপে ঘরের বাইরে এসে লক্ষ্মী সংসারের কাজে ডুবে যায়।

ষড় ঋতুর বর্ণ সুষমা গিয়ে বছরের পর বছর ঘুরে ফিরে আসে। ক্ষেত-খামারের কাজে, চরণের সাথে লক্ষ্মী এক ঘেঁয়ে জীবনের ছক পাতে। চোখের সামনে, মানস বাপের দুর্জয় সাহস মায়ের তেজ নিয়ে বেড়ে ওঠে।

আধ ঘন্টার ভেতর এখন সে স্কুলে পৌঁছোতে পারে। যাতায়াতের পথে তার সঙ্গী জোটে বুনিয়াদী স্কুলের মাষ্টার হরিশ বাশুলীর মেয়ে মানসী। চন্ডীপুরে মেয়েদের জুনিয়ার হাইস্কুলে সে পড়তে যায়। রাস্তায় তার খবরদারী করতে হরিশ-মাষ্টার মানসকে ভার দেয়। রাস্তায় বাস-ট্রাকের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, পথ চলতে হুঁসিয়ারি দরকার।

খেয়ে-দেয়ে বইখাতা হাতে মানসী আসে লক্ষ্মীদের বাড়ী। দেরী থাকলে, হেঁসেলে এসে, লক্ষ্মীর পাশে বসে এ কথা সেকথা বলে। স্কুলের খবর, রাস্তা হেঁটে চলার ঝুঁকি, বাড়ীর খবর—সব সে বলে লক্ষ্মীকে সরল মেয়েটীকে খুব ভাল লাগে লক্ষ্মীর। মানসের টিফিনের অংশ থেকে, চিড়ে-মুড়ি তাকেও দেয়।

সদরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী দেখে, চন্ডী-পুরের পথ ধরে, আগে আগে মানস, পেছনে মানসী চলেছে স্কুলে। পথের বাঁকে তারা অদৃশ্য হয়ে গেলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ফিরে যায় ক্ষেতের কাজে।

পথঘাট তখনও তৈরী হয় নি, ইলিশের জাল ফেলতে আল বাঁধ ধরে বাদার ভেতর চলতে দেখে, লক্ষ্মী একঠাঁই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। যতদূর দৃষ্টি চলে, তার কাঙাল চোখ দুটি নারাণের পেছনে পেছনে ছুটে যেত।

পনের বছর আগেকার দেখা যে শেষ দেখা হবে, আশ্বিনের আকাশে পিঙ্গল মেঘে বিদ্যুৎ চমক দেখে, চরণ লক্ষ্মী কেউ সেকথা বোঝে নি। আজও মানস মানসীকে স্কুলে যেতে দেখে, লক্ষ্মী খুঁজে ফেরে পনের বছর আগেকার দেখা নারাণকে—লক্ষ্মী সুধার শত আদরের পরানধন নারাণকে।

হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে, মানস ডায়মন্ড হার-বার কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হয়। মানসী চন্ডীপুরের স্কুলে পড়তে থাকে। মানসকে শহরে যেতে দিতে চরণ লক্ষ্মীর কারও মত ছিল না। মানস জিদ ধরে টিউসন করে পড়ার খরচা জোগাবে। হরিশ-মাষ্টারের প্রেরণা তাকে নতুন জীব-নের পথ দেখিয়ে আনে। মানস মানসীর ভবিষ্যৎ যে একই সুতোয় গাঁথা, হরিশ লক্ষ্মীর বুঝতে বাকী থাকে না।

জেদের বশে কলেজে ভর্তি হলেও, শহরের পরিবেশ মানসের ভাললাগে না। একই নদী ডায়মন্ডহারবার রাজচকের পাশ দিয়ে বয়ে গেলেও শহর গ্রামের মানুষে মানুষে কত তফাৎ। শহরের সবকিছুতেই প্রাণের অভাব বোধ করে মানস। যন্ত্রের মত প্রাণহীন মনে হয় শহরের জীবন। ছুটীর দিনে গ্রামে ফিরে হরিশ-মাষ্টারকে সে বলে—মাস্টারমশাই শহর আমার ভাল লাগে না।

মানসের মনের কথা বুঝতে হরিশের দেরী হয় না। গ্রামের ঘরে জন্মে আবাল্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে, শহরকে সে নিজের করে নিতে পাচ্ছে না। তাই তার এত অভাববোধ। স্কুলের পথে তার সাথী মান-সীর অভাবও বড় বেশী করে দেখা পড়েছে তার কাছে, তাও সে বোঝে। মানসকে সে বলে—জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করতে, তোমাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। পেছনে ফেলে আসা ছোটখাটো ঘটনা, তোমার চলার পথে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে কড়া নজর দিতে হবে।

মানসীকে মনের কথা জানালে, সেও বাবার সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে, মানস ভাবে সবাই তাকে বড় হতে দেখতে চায়, কারও চোখে তার অভাব ঠেকেনা। চরণ, লক্ষ্মী সংসারের ভাঙা হাল ধরে দিনগত পাপক্ষয় করে যায়। তাদের জানানো নিরর্থক ভেবে, মানস চুপ করে থাকে, কলেজে ফিরে, মনে জোর আনতে চেষ্টা করে। মানসীর উপর অভিমানে, সে দেশে যাওয়া কমিয়ে আনে, মনের কথাও তাদের জানায় না।

বছর ঘুরে আসে। বাংলা দেশে রাজ-নৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে, ছাত্রদের মাঝে নেমে আসে চরম অশান্তি, রাজনীতি ডানা বাঁধে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন কেন্দ্র করে। পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রদের মনে বিদ্বে-ষের আগুন জেবলে দেয়, সরস্বতীর বেদী-মূলে জ্বলে ওঠে রাজনীতির দাবানল। ক্ষমতা-লিপ্সা চরম আকার ধারণ করে ছাত্র-আন্দোলনের ধুয়া তুলে।

হরিশ-মাষ্টার প্রমাদ গনে। দু' দুবার শহরে এসে মানসকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিতে গিয়ে বিফল হয়। মানস তার সঙ্কল্পে অটল। কলেজ ছেড়ে সে গাঁয়ে ফিরতে চায় না। চরণ লক্ষ্মী সেকথা শুনে আশঙ্কায় দিন গুণে। বারবার চিঠি লিখেও মানসী জবাব পায় না। শেষে একদিন লক্ষ্মীকে সাথে করে, ৭৯ নম্বর বাসে চড়ে শহরে আসে সে।

লক্ষ্মী মানসীর অনুরোধে, কলেজের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে, মানস ফিরে আসে গ্রামের ঘরে। তার উচ্চ-শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা আটকা পড়ে রাজনীতির চোরা-বালুতে। বাড়ীতে বসে, প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে উপ-দেশ দেয় হরিশ-মাষ্টার। সেকথা মানসের মনে রেখাপাত করে না। নিরালা ঘরে বসে, দারিদ্র্যের সামনে দাঁড়িয়ে, মানস তার জীব-নকে ব্যর্থ ভাবতে শেখে।

রাজচকে ফিশিং হারবারের কাজ পুরো-দমে চলতে থাকে, নরওয়ে ও পশ্চিম জার্মা-নীর অর্থানুকুল্যে, বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলে ডিপ্-সি-ফিশিং সেরে রাজচক বন্দরে ফিরে আসে। চরণদের সামনের রাস্তা চওড়া করে পিচ্ ঢেলে পাকা সড়ক তৈরী হয় রাজচক বন্দরে জেতে। লরী বোঝাই নোনা মাছ দিন-রাত চালান যায় কল-কাতার বাজারে সে পথ ধরে। মানস রোজ রজচক বন্দরে আসে কাজের সন্ধানে। বাস্তবধর্মী মানুষের পক্ষে ঘরের কোণে বসে থাকা অভিশাপের মত মনে হয়।

মানস মুসড়ে পড়ে। বেকার জীবনের গ্লানি তার কাছে দুর্বিসহ ঠেকে। নরওয়ে-জিয়ান ট্রলারের ক্যাপ্টেন হ্যামারশিল্ডকে মানস ধরে পড়ে যে কোন চাকরীর জন্যে। ক্যাপ্টেনকে সে বলে—'আমার বুড়ো ঠাকুরদা, বিধবা মার ভরণ-পোষণের জন্য আমি জাহাজের খয়ের কাজ নিতে রাজি আছি।'

হ্যামারশিল্ড মানসের বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ দেখে, তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়। মানসকে ট্যালি ক্লার্কের পদে নিয়োগ করে, তার হাতে নিয়োগপত্র দিয়ে পরদিন কাজে যোগ দিতে বলে, খোরাক-পোষাক ছাড়া, মাসিক বেতন আড়াই শ' টাকা। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে এসে, মানস হরিশ-মাষ্টারকে নিয়োগপত্র দেখায়। মানসীকে সাথে করে বাড়ীতে এসে চরণ লক্ষ্মীকে বলে তার চাকরীর কথা।

জাহাজে চাকরীর কথা শুনে চরণ হাউ-মাউ করে কেঁদে বলে—'আবার সেই রাক্ষসী গাঙ আমার সাথে বাদ সেধেছে। ও চাকরীতে দরকার নেই মানসভাই। সুন্দর-বন ছেড়ে, লক্ষ্মীমা তোমাকে নিয়ে এবার আমি নিশ্চিত ফিরে যাবো দুর্গাচকের ভিটেতে।

'সে ভিটে কি তোমার আর আছে দাদু। সেখানে এখন মস্ত বড় বন্দরের গোড়া পত্তন হয়েছে। সেখানে গড়ে উঠছে তেল-শোধনা-গার, সারের কারখানা, আরো কত কি'।

'তা হোক দুর্গাচকে কেউ যদি থাকে, সে চরণ হালদারকে চিনতে ভুল করবে না। আমি নিজে না খেয়ে পরকে খাইয়েছি, নিজে না পরে অপরকে পরিয়েছি। সে কথা কি কেউ মনে রাখবে না বলতে চাও?'

'চিনলেও, কেউ তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে, মানুষ স্বার্থপর হয়ে গেছে। মুখে হেঁসে মিষ্টি কথা বললেও, কেউ তোমায় খেতে বলবে না, ঘর বাঁধতে সাহায্য করবে না।

চরণ চুপ করে যায়, ভাবে হয়ত মান-সের কথাই ঠিক, তারা যখন রাজচকে ডেরা বাঁধে, তখন পিচঢালা রাস্তা, মোটর, লরি, লঞ্চ ছিল না। নৌকো চড়ে নদী-নালা পার হয়ে হাঁটা পথ ধরে দু দিন লেগেছে রাজ-চকে পৌঁছোতে। এখন দু ঘন্টার ভেতর 'হাজিপুর' যাওয়া-আসা চলে। যুগের সঙ্গে, মানুষের পরিবর্তন এসেছে ঠিক। সেদিনও দুর্গাচকে ফেরার বাসনা চরণ চেপে যায়।

মানসীর মুখ থেকে লক্ষ্মী মায়ের শহরে যেতে মত দেয় মানসকে। মানসীকে সঙ্গে করে মঙ্গলবার বিশালাক্ষ্মী তলায় পুজো দিয়ে আসে। ভোর রাতে উঠে চা-জলখাবার তৈরী করে, মানসকে সে ডেকে তোলে।

সকাল হতে তখনও বেশ দেরী। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে পুব আকাশের গায়। হ্যারিকেনের আলোয় পথ দেখে হরিপদ-মাস্টারের সঙ্গে মানস আসে রাজচকের জাহাজ ঘাটে। সকাল জোয়ারে ফিশিং-ট্রলার মাছ ধরতে ভেসে চলবে সাগরের জলে।

সকালে চরণের সঙ্গে লক্ষ্মী আসে রাজচকের নদীতীরে। নেভি ব্লু রংয়ের পোশাক পরে ট্রলারের ডেকে দাঁড়িয়ে মানস তাদের দেখতে পায়। জাহাজ ছাড়ার সিটি বাজে। রুমাল উড়িয়ে মানস মা দাদুকে বিদায় জানায়। বিধবার একমাত্র আশা-ভরসা চাকরির খাতিরে আজ ভেসে চলেছে দরিয়ার বুকে। রিপাবলিক চোখের আড়ালে চলে গেলে লক্ষ্মী ভাবতে থাকে—রাক্ষসী কি সত্যি চরণ হালদারের সাথে বাদ সেধেছে? শূন্যমনে চরণের হাত ধরে লক্ষ্মী ঘরে ফিরে আসে। দেখতে দেখতে দু' বছর কেটে যায়, মানসের চাকরী পাকা হয়। লক্ষ্মী হরিপদ-মাস্টারকে বলে—'আমারী বৈশাখে মানস-মানসীর দুহাত এক করে দিন মাস্টারদা।'

লক্ষ্মীর কথায় সম্মতি জানিয়ে হরিপদ-মাস্টার উঠে পড়ে লাগে মেয়ের বিয়ের জোগাড় করতে, মেয়ের বিয়েতে সাধ্যমত খরচ করতে চায় সে, গ্রামের স্কুল-মাস্টারের পক্ষে যতখানি সম্ভব।

মানস ফিরে এলে, লক্ষ্মী তাকে বিয়ের কথা জানিয়ে ছুটির জন্য দরখাস্ত করতে বলে, কালবৈশাখীর ঝড়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা পড়ে না বলে, বৈশাখের মাঝ থেকে জাহাজ সাগরে যায় না, সেকথা ভেবে মানস লক্ষ্মীকে জানায়, বৈশাখের শেষে সে ছুটি পেতে পারে।

চৈত্রের শেষ ট্রিপে জাহাজ যাওয়ার আগে হরিপদ-মাস্টার মানসদের সবাইকে রাতে তাদের বাড়ীতে খেতে নিমন্ত্রণ করে, খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত গভীর হয়ে যায়, ঘুম থেকে উঠতে মানসের দেরী হয়ে যায়। মানসীর সঙ্গে দেখা করে যেতে পায় না সে, রিকশা চড়ে বন্দরে পৌছানর অল্প পরেই জাহাজ ছেড়ে দেয়, জাহাজের সিটিতে মানসীর ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড় করে উঠে বারান্দায় এসে সে দেখে ট্রলার রিপাবলিক মানসকে নিয়ে বন্দর ছেড়ে চলেছে সাগর মোহানায়, মানসকে বিদায় জানাতে না পারায় সে নিজেকে অপরাধী মনে করে।

রিপাবলিকের শেষ ট্রিপ পনের দিনের, উড়িষ্যার পারাদ্বীপ, অন্ধের ভাইজাগ ছাড়িয়ে মাছ ধরতে ধরতে রিপাবলিক এগোতে থাকে মাদ্রাজের উপকূলে। বৈশাখের প্রথম দিনে, ঝড়ের সংকেত উপেক্ষা করে, ট্রলার কূল ছেড়ে ভারত মহাসাগরের বুকে ভেসে চলে, সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে ভাইজাগ ও মাদ্রাজ বন্দরের রাডারে একই সঙ্গে ধরা পড়ে রিপাবলিকের এস-ও-এস। কলকাতা থেকে ৫২১ নটিক্যাল মাইল দূরে ফিশিং ট্রলার রিপাবলিক ঝড়ের মুখে গভীর সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে।

গোধূলির রক্তিম আভায়, দৈত্যের মত ফুঁসে ওঠে অমৃত দরিয়ার ডেকে চলে রিপাবলিক। জাহাজের ওয়ারলেস বন্ধ অকেজো হয়ে যায়, ইঞ্জিনরুমে জল ঢুকে আসে। পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউয়ের মাথায় কাগজের নৌকোর মত উঠে পড়ে রিপাবলিক, জাহাজ বাঁচাতে জেটিসন করে হিমঘর থেকে মাছ সাগরের জলে ফেলে দেওয়া হয়।

রিপাবলিকের খোঁজে মাদ্রাজ থেকে রিলিফ জাহাজ ছুটে আসে। সামরিক বিমান থেকে আকাশপথে তল্লাসী চালানো হয়। পরদিন, কলম্বোর অদূরে অচল অবস্থায় রিপাবলিককে ভাসতে দেখা যায়, রিলিফ জাহাজ ভাঙাচোরা রিপাবলিককে টেনে নিয়ে যায় ভাইজাগ শিপিং ইয়ার্ডে, জাহাজের মেরামতি চলে সেখানে।

অসুস্থ দেহে মানস ঘরে ফিরে আসে বৈশাখের মাঝে। রিপাবলিকের ঝড়ে পড়ার কথা শুনে লক্ষ্মী বিচলিত হয়ে ওঠে, মানসকে জাহাজের চাকরী ছেড়ে দিতে বলে

সে। মার কথা মানস কানে তোলে না। বউয়ের চাঁদের পারা মুখ দেখে মানস জাহাজের কাজ ছেড়ে দিলেও দিতে পারে ভেবে, বৈশাখের শেষে মানসীর সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। মানসীকে লক্ষ্মী শিখিয়ে দেয়, মানসকে আটকে রাখতে।

মধুযামিনীর দুটি মাস কেটে যায় হাসি-গল্পে। শ্রাবণের মেঘমেদুর আকাশ মাথায় করে, মানস বেরিয়ে পড়ে ভাইজাগ বন্দরে ফিরে যেতে, মানসীর আবদার, চোখের জল কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারে না রাজচকে। মা-দাদুর কথা সে মানে না, মানসীকে বলে আসে, কোয়ার্টার পেলে, তাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

মাসের পর মাস চলে যায়, মানস দেশে ফেরার নাম করে না, সপ্তাহে সপ্তাহে সে চিঠি লেখে মানসীকে মাসে মাসে মানিঅর্ডার করে টাকায় পাঠায় চরণের নামে। আশ্বিনের শেষে সে লক্ষ্মীকে লেখে, দেওয়ালীর ছুটিতে দেশে গিয়ে মানসীকে নিয়ে আসবে ভাইজাগে। ফিশিং করপোরেশনের সঙ্গে এগ্রিমেন্টঅনুসারেই ভাইজাগে তাকে পোস্ট করা হয়েছে জানায়।

লক্ষ্মীর কথা মানস জানত মা, চাষবাস দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তা সে স্পষ্ট জানায়, চাকরী ছাড়ার কথাই ওঠে না। লক্ষ্মীর চোখের জল, চরণের হা-হুতাশ উপেক্ষা করে, মানসীকে সাথে নিয়ে রাজচক বন্দর থেকে জলপথে মানস পাড়ি দেয় ভাইজাগে, তার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে লক্ষ্মীর মন চায় না, তার সকল আশা মানস ভেঙে দিয়েছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ফিশিং হারবারের দিকে। দূরে থেকে, চরণ হালদারের শনের মত সাদা চুলের রাশ চোখে পড়লে, লক্ষ্মী তার পিছু নেয়, লক্ষ্মীর হাত ধরে নদীতীরে দাঁড়িয়ে চরণ বলে—'আবাদের গোড়া পত্তন করতে এসে, নগর বন্দরের শেষ পত্তন করতে, আমাদের মত নিঃস্ব মানুষদের কি সব হারাতে হয় লক্ষ্মীমা?'

চরণের দিকে চেয়ে লক্ষ্মী বলে—'জেলের বংশে ভিটেমাটি ছেড়ে আসার পাপে, হালদারবংশে কেউ কারও ভিদ ছাড়লো না, রাক্ষসী গাঙ তোমার সাথে সত্যি বাদ সেধেছে বাবা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চরণের সঙ্গে শূন্যমনে পা-পা করে লক্ষ্মী ফিরে আসে ঘরে, তুলসীতলায়, লেপাপোঁছা উঠোন আঙিনায়, লক্ষ্মীগোলায় মানসীর হাতের ছোঁয়া সজীব হয়ে উঠে তাকে টেনে আনে পঁচিশ বছর আগেকার দিনে, লক্ষ্মীসুধার পরমন্ত সংসারে, মানস যেদিন ঘর আলো করে তার গলা জড়িয়ে চুমোয় ভরে দিয়ে আধো কথায় বলত—'আমায় ছাইড়া, বালায় যাও না মা।'

উঠোনে একঠাই দাঁড়িয়ে শ্বশুর-বউ আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। ঘরে যেতে তাদের পা উঠে না, বাতাসে লক্ষ্মীর মাথার রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়ে সারা পিঠে, সোনার লক্ষ্মীর মুখে কালিমা ভরা, তার মুখের পানে চেয়ে চরণ বলে—'কাজ কি মা আর ফাঁকা ঘরে পড়ে থেকে, চল এবার দুর্গা-চকের ভিটেতে ফিরে যাই।'

'তা আর হয় না বাবা, তোমার ছেলে যেতে চায় নি, মানস ফিরে যেতে চায় নি, তাদের ছেড়ে, কোন মুখে আমি দেশে ফিরবো।'

কি ভেবে সেদিনও চরণ চুপ করে থাকে, দেশে ফেরা তার আর কোনদিন হয়ে উঠবে না, তা সে বোঝে। ভিটেমাটি ছেড়ে আসার অভিশাপে পরদেশের মাটিতে তাকে শেষ-নিশ্বাস ফেলতে হবে, ভাবে। মাটির মায়া অভিশপ্ত চরণকে আর তেমন করে হাতছানি দেয় না তার কাছে ফিরে যেতে। আবাদের গোড়াপত্তন করতে এসে, বন্দরের শেষ পত্তন দেখতে, দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে, বেঁচে থাকে চরণ হালদার।

এশিয়ান বা অলিম্পিকে ছুটবো : রীতা পাল

শুনেছি এবার নাকি নামকরা একজন ফুটবলার বারো হাজার টাকার বিনিময়ে দল পাল্টেছেন। এ রাজ্যের ফুটবলে দশ থেকে বারো হাজারী মনসবদার আছেন প্রায় ডজনখানেক, তবু সন্তোষ ট্রফি আমরা পাই নি।

ক্রিকেটেও হাফ ডজন তিন থেকে পাঁচ হাজারী মনসবদার আছেন। আছেন কয়েক ডজন এক, দুই-হাজারী মনসবদার। তবু রণজি ট্রফির লীগ খেলায় বিহার আমাদের পারায়, নক-আউটে বোম্বে দেয় কানমলে।

আর কারুর কোন সাহায্য না পেয়ে একা একটা চোদ্দ বছরের ছোট্ট মেয়ে বার বার আমাদের জন্য সোনার মেডেল খেটে-খুটে এনে দিচ্ছে, অথচ আমরা কেউ একবার ফিরেও তাকাই নি তার দিকে। পাঁচ পাঁচবার রাজ্য রেকর্ড, বার তিনেক জাতীয় রেকর্ড এরই মধ্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটি —ওর বালিকা বিভাগের রেকর্ডের ধারে কাছেও পৌঁছোতে পারছে না বয়স্করা, তবু কই আজো তো আমরা আমাদের সাহায্যের হাত বাড়াই নি এই মেয়েটির দিকে। আর কতদিন ও একা পারবে? এই তো ওর বেড়ে ওঠার বয়স, অথচ এখন যদি ও খেতে না পায়, সামান্যতম স্বাচ্ছন্দটুকুও যদি ওকে আমরা না দিই, তবে পশ্চিমবাংলার অ্যাথলেট জগতের উজ্জ্বলনীলরত্নটি অনাদরে অবহেলায় শীগগিরই ম্লান হয়ে একদিন ফুরিয়ে যাবে—সেদিন কোটি কণ্ঠের আর্ত-নাদেও কিন্তু রীতা পালকে খুঁজে পাওয়া যাবে না দৌড়ের মাঠে।

সময় থাকতে থাকতে চলুন একবার রীতার বাসায় যাই। চোখ মেলে দেখে আসি একটি মেয়েকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে আত্মজনের একটি পরিবার কিভাবে নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলছে।

পথ বেশী নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে একাম বা ছাম্পারমোর উঠুন, ভাড়া মাত্র তেরো পয়সা।

পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই অভিজ্ঞতাটুকু সালকের পথেই আপনার আমার হয়ে যাবে। হাড় চুর চুর গতরের শোকে যখন সব ঠিকানা-ফিকানা ভুলে গেছেন, তখনই কানে পৌঁছোবে কনডাক-টরের পাড়ামাতানো চীৎকার—ফুলতলা, ফুলতলার মোড়। নামুন, নামুন। এসে গেছি আমরা।

যদি বাসার নম্বরটা ভুলে গিয়ে থাকেন, তাহলে মোড়ের মাথায় যে কোন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করুন, রীতা পালের বাড়ীটা কোথায়, সেই দেখিয়ে দেবে। ফুলতলার মোড় থেকে রাম চ্যাং লেন ধরে মিনিট কয়েক ডান হাতে আর একটা সরু গলি পড়বে—পঞ্চ কার্ট লেন। আর ঐ গলি যেখানে এসে নন্দীর মাঠে মিশেছে, [illegible] বাঁ-হাতি একতলা জীর্ণ বাড়ীটি রীতাদের। দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে আছেন রীতার বাবা বিশ্বনাথ পাল। ধুতির ওপর গেঞ্জী চড়ানো লম্বা-চওড়া কাঠামোর এই মানুষটিকে পশ্চিমবাংলার সেরা অ্যাথ-লেটের শুধু জনক বলে ভুল করবেন না—উনি তার চেয়েও বেশী। কেন? সে কথাই এবার বলব।

রীতা যে কোনদিন দৌড়োবে, মেডেল-টেডেল পাবে বা রেকর্ড-টেকর্ড করবে একথা বিশ্বনাথবাবু, বা তাঁর স্ত্রী গীতা দেবী বা রীতার ঠাকুমা কমলা দেবী বা রীতার অন্য চারটি ভাই-বোন, পাড়া প্রতিবেশী কেউ কোনদিনও ভাবেনি। ভাববে কি? শ্যামলা লাজুক, পুঁচকে মেয়েটা আবার কি দৌড়োবে? বাড়ীর পাশে নন্দীর মাঠে ফি বছর স্পোর্টস হয়। মান্টাদাদা (নিরঞ্জন চক্রবর্তী) দৌড়োয়, প্রাইজ পায়। রীতা বিছানায় শুয়ে, জানালা খুলে বড় বড় চোখ দুটো মেলে সব দেখে। ওর দৌড়োনো তো দূরের কথা, বিছানা ছাড়াই [illegible]।

দু বছর ধরে কি একটা বিচ্ছিরি রোগে ভুগছে। বাঁ পা-টা ফুলে ঢোল—বেরিবেরি না ফাইলেরিয়া কে জানে? জানেন শুধু ডাক্তারবাবু, শৈলকাকা। পাশের বাড়ীতেই থাকেন। উনি ওর চিকিৎসা করছেন। রোজ চলছে ইনজেকশন। রীতা শুনেছে তাকে নাকি অনেক অনেকদিন এমনিভাবে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে।

মেয়ের বয়স বাড়ছে, অথচ হাঁটতে চলতে পারে না। স্কুলে (উষাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়) যাওয়াও বন্ধ। সব দেখেও কিছু করতে পারেন না বিশ্বনাথবাবু। করবেন কি? কুমারেশ কোম্পানীতে কেরাণীর কাজ করতেন। কিন্তু কোম্পানীর যা হাল। চাকরীটা আছে—কাজ নেই, মাইনেও নেই। অথচ আটজনের বিরাট পরিবার। থাকার মধ্যে পৈতৃক ভিটেখানা ছাড়া আর নেই কিছু। এদিকে একটা মেয়ে এভাবে দু বছর ধরে বিছানায় পড়ে।

সবার সব নিষেধাজ্ঞা ছুঁড়ে মেরে উড়িয়ে দিয়ে মান্টাদা এসে ডাকলেন—চল রীতা, তুই আমাদের সঙ্গে দৌড়োবি। স্পোর্টসে নাম দিতে হবে তোকে। পাড়ার একটা মেয়ে এভাবে দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, এ বোধহয় মান্টাদার ভাল লাগেনি। তাই জোর করে ওকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে মাঠে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন—ছোট রীতা, ছোট। ছোট্ট রীতা অশক্ত বাঁ পাখানা টেনে টেনে টলমল করে ছুটতে শুরু করল। এসব

আটষট্টির গোড়ার কথা। তখন ওর বয়স মোটে এগারো।

সেই বছরই স্টলকার্ট ফ্রেন্ডস এ্যাসোসিয়েশনের স্পোর্টস হচ্ছে নন্দীর মাঠে। রীতাও নাম দিয়েছে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার। পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক এসেছে দেখতে। রীতার মা, ঠাকুমা একতলার ছাদে আলসেয় ভর দিয়ে উদ্‌গ্রীবভাবে তাকিয়ে আছেন মাঠের দিকে। দূরে প্যান্ডেলের ছায়ায় বসে আছেন পশ্চিম বাংলা এ্যাথলেটিকসের অন্যতম কর্মকর্তা কালী সিং। উনি এসেছেন প্রাইজ ডিসট্রিবিউট করতে।

১০০ মিটার দৌড় শুরু হয়ে গেল। কিছুটা পথ যেতে না যেতেই, প্রতিযোগীদের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে, টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ল রীতা। হাত, পা কনুই সব ছড়ে গেছে। মাথাতেও লেগেছে আঘাত। রোগাভোগা মেয়েটাকে স্পোর্টসে নাম দেওয়ানোর জন্য রীতার মা, ঠাকুমা তখন বিশ্বনাথবাবুকে রীতিমত গঞ্জনা করতে শুরু করেছেন। ওদিকে মাস্টাদারা তখন রীতাকে শুশ্রূষা করছেন।

আধঘন্টা বাদেই শুরু হোল ২০০ মিটার দৌড়। যে রুগ্ন মেয়েটাকে চাঙা করে তুলবার জন্য পাড়ার ছেলেরা খেলার মাঠে ওকে টেনে এনেছিল, সবাই হাঁ হয়ে গেল দেখে যে, সেই রীতাই আসছে সবার আগে ছুটে, সবাইকে পেছনে ফেলে। প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের সময় রীতার হাতে ফার্স্ট প্রাইজটা তুলে দিতে দিতে কালী সিং মশাই মাস্টাদাকে বললেন তুমি ওকে গোলমোহর মাঠে কালীঘাট স্পোর্টস ক্লাবের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে নিয়ে যেও। জহুরীর চোখে সেদিন ঠিকই জহর ধরা পড়েছিল।

মার্চ মাসে হাওড়ায় গোলমোহর মাঠে দৌড়োতে গেল রীতা। ১০০ মিটারে হোল ফোর্থ। ওর দৌড়োনোর ঢং দেখে গোলমোহর মাঠের বিখ্যাত কোচ বিশ্বনাথ সিং-এর (কালী সিং-এর ভাই) ভাল লেগে গেল। ওঁর অনুরোধে রীতা ২০০ মিটারে দৌড়াল। দৌড়ে সেকেন্ড হোল।

স্পোর্টসের শেষে বিশ্বনাথদা শিষ্য মাস্টাকে বলে দিলেন—মেয়েটিকে নিয়ে এসো তো। ওর পসিব্লিটি আছে। বাবার হাত ধরে, মাস্টাদার সঙ্গে রীতা গেল গোলমোহর মাঠে কোচিং নিতে—৩১ জুলাই, ১৯৬৮।

সপ্তাহও কাটল না বিশ্বনাথদা কি দেখলেন রীতার মধ্যে, রীতার বাবাকে বললেন : সামনে সেকেন্ড ন্যাশন্যাল ক্রস কান্ট্রি রেস। কলকাতায় হবে। আপনি অনুমতি দিন, আমি রীতাকে নামাব।

পালমশাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিন হাজার মিটার ক্রসকান্ট্রি। সারা ভারত ঝেঁটিয়ে মেয়েরা আসবে। রীতা কি পারবে?

সে ভাবনা কোচের। রীতাকে তৈরী করতে শুরু করে দিলেন বিশ্বনাথ সিং। ক্রস কান্ট্রির বেঙ্গল সিলেকশনে রীতা সেকেন্ড হল বালিকা বিভাগে—তার ওপর গুরুর আস্থার মর্যাদা রাখল রীতা।

বিশ দিন বাদে ৩১ আগস্ট শুরু হোল সেকেন্ড ন্যাশন্যাল ক্রসকান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতা। রীতা প্রথম দৌড়েই বালিকা বিভাগের প্রথম পুরস্কারটি এনে দিল পশ্চিম বাংলার হাতে। ওর টাইম হোল ১৩মিঃ ১২'৬ সেকেন্ড। বয়স্কাদের দৌড়ে টাইম হয়েছিল ১৩মিঃ ১৬ সেকেন্ড। নন্দীর পাড়ার মাঠের সেই অজ্ঞাত অখ্যাত মেয়েটি রাতারাতি হয়ে উঠল পশ্চিমবাংলার প্রথম সারির একজন অ্যাথলীট। বাঁ পায়ের ব্যথা-ট্যাথার কথা সব ভুলে গেল রীতা। ঐ বছরই রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৬০০ মিটারের বালিকা বিভাগে রীতাই হোল ফার্স্ট। টাইম ছিল ১মিঃ ৫৪·৫ সেকেন্ড।

এক বছর দৌড়েই রীতা এসে গেল রাজ্য দলে। উনসত্তরে জলন্ধরে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের প্রতিনিধিত্বের সম্মান অর্জন করলেও, সেবার বিশেষ কোন কৃতিত্ব রীতা দেখাতে পারেনি। অতবড় কম্পিটিশনের অভিজ্ঞতা তখন কোথায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রীতা দেখিয়ে দিল যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ওর ওপরই ডিপেন্ড করছে। ৬০০ মিটারের ও ৮০০ মিটারের বালিকা বিভাগের পুরোনো সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে রীতাই হল প্রথম (৬০০—১মিঃ ৫১'৯সেঃ ৮০০—২মিঃ ৩৯'৬সেঃ)।

পরের বছর অর্থাৎ সত্তর সালে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধি হয়ে রীতা গেল কটকে ন্যাশন্যালে কম্পিট করতে। উনসত্তরের পরাজয়ের কথা রীতা আদৌ ভোলে নি। সত্তরে নিল সেই শোধ ৬০০ মিটারে (বালিকা বিভাগ) শুধু ফার্স্টই হল না, সেই সঙ্গে করল নতুন জাতীয় রেকর্ড—১মিঃ ৪৮·৭ সেঃ। ৮০০ মিটারে (বালিকা) রীতা হয়েছিল সেকেন্ড।

কটক থেকে সোনার মেডেল এনেই ক্ষান্ত হোল না রীতা। চলল এবার হায়দ্রাবাদে—চতুর্থ জাতীয় ক্রস কান্ট্রি দৌড়ে অংশ নিতে। নিয়ে এল আর একটা সোনার মেডেল। তিন হাজার মিটার ক্রস কান্ট্রি রেসে নতুন জাতীয় রেকর্ড করল রীতা—১২মিঃ ২৯·২ সেঃ।

রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। রীতা সবার আগে। বালিকা বিভাগে ৬০০ ও মহিলা বিভাগে ৮০০ মিটারের দুটি ফার্স্ট প্রাইজই পেল রীতা। দুটি ইভেন্টেই করল নতুন রাজ্য রেকর্ড—১মিঃ ৪৬·৫ সেঃ (৬০০) ও ২ মিঃ ৩০·৪ সেঃ (৮০০)। সত্তরেই এরিয়ান্স ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টসে ৮০০ মিটার দৌড়ে ৩ বছরের পুরোনো আভা মণ্ডলের রাজ্য রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নতুন নজির সৃষ্টি করল রীতা—২ মিঃ ২৯ সেঃ।

আর এবার (১৯৭১) আমেদাবাদে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গণ থেকে এরই মধ্যে রীতা আমাদের এনে দিয়েছে আরো দুটি সোনার মেডেল। ৬০০ মিটারের বালিকা বিভাগে নিজেরই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে রীতা—১ মিঃ ৪৫ সেঃ। ৮০০ মিটার দৌড়েও হয়েছে ফার্স্ট।

যে আমাদের এত দিয়েছে, পশ্চিমবাংলার নাম সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল করে তুলেছে, বিনিময়ে তাকে আমরা কি দিয়েছি? একেবারে কিছু দিই নি বলা ভুল হবে। আমাদের হয়ে রাজ্য সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন : 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার অ্যাথলীট কুমারী রীতা পালকে প্রতি মাসে একশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেছেন। রীতা এক বছর এই বৃত্তি পাবে।' হ্যাঁ এই প্রতিশ্রুতি আমরা রীতাকে দিয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় চোদ্দ মাস আগে। কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি পর্যন্তই। টাকা দেওয়া তো দূরের কথা, রীতার বাবা রাজ্যসরকারের শিক্ষা দপ্তরকে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন, অসামান্য এই দুটি শব্দের জবাব তিনি পেয়েছেন : রিসিভিং অ্যাটেনশন।

আর কবে আপনাদের অ্যাটেনশনের পালা সাঙ্গ হয়ে কাজের দিন শুরু হবে রাজ্য সরকার? রীতার বাবার চাকরী থেকেও নেই। অত বড় পরিবার। বিশ বছরের একমাত্র ছেলে কাঞ্চনকে পাঠিয়েছেন গৌহাটিতে। ঐ ছেলেটিই গোটা পরিবারের একমাত্র ভরসা। কিন্তু ঐ সামান্য ভরসাটুকু সম্বল করে কি প্রতিভাকে জিইয়ে রাখা যায়? দেখুন তো তাকিয়ে আশপাশের অন্য রাজ্যের দিকে। দেখুন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মহীশূর বা ঘরের কাছে উড়িষ্যা কি করছে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য। আর সে তুলনায় আমরা কি করছি?

শুধু নীতি উপদেশে চিঁড়ে ভেজে না। প্রতিভার কদর করতে না জানলে, সব ক্ষমতাই একদিন উবে যায়। কি করবেন বিশ্বনাথ পাল? কি করতে পারেন কোচ বিশ্বনাথ সিং? যদি সবাই মিলে আমরা আমাদের এই ছোট্ট গোলাপ শিশুটিকে আজ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করি তাহলে আগামীদিনে সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সুনামের বাস ছড়াবে কে?

তবু সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাব সেই অপরিচিত মানুষটিকে, যিনি খবরের কাগজে রীতাদের দুরবস্থার কথা পড়ে একাই এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর সীমিত ক্ষমতার ভাণ্ডার নিয়ে। চন্দননগরের শশাঙ্ক নিয়োগী নিয়মিতভাবে মাসের পর মাস রীতার দৈনিক বরাদ্দ একপো দুধের ও অন্যান্য টুকিটাকি খরচের দায় জুগিয়ে চলেছেন। কিন্তু যে দায়িত্ব সরকারের তা কি কখনো কোন মধ্যবিত্ত গেরস্থ মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিন বওয়া সম্ভব? আপনারা তো নিজের চোখে রীতাদের অবস্থা দেখলেন, এখন বলুন ওর জন্য আমাদের কি করা উচিত? ছোট্ট রীতার একমাত্র কামনা একদিন এশিয়ান গেমসে বা অলিম্পিকের মাঠে বড় বড় পা ফেলে ও ছুটবে। আমরাও কি তাই চাই না?

—সন্দীপন্দু

ইনি সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী—দুই ছেলের মা
ঘুমপাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

"আসল জিনিসটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত—সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব ঝক্কিই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্সের পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উদ্যম আর উৎসাহ যোগায়।

হরলিক্স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এত গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

(৮)

আগের রাতের কথা। ঘাগরা, কাঁচুলি ও ওড়নাটায় ভূষিত হয়ে বনের দিকে রওনা জরা। মদিরা দরজায় দাঁড়িয়ে কোন দিকে যেতে হবে দেখিয়ে দিয়েছিল। জরার যদি সম্বিৎ থাকতো তবে নিজের নূতন বেশভূষায় ও আচরণে বিস্ময় বোধ করতো কিম্বা আদৌ নূতন বেশ স্বীকার করতো না। কিন্তু তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না, অপরাহ্ন থেকে অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার ঢেউ একটার পরে একটা তার মনের উপরে এসে ধাক্কা মেরেছে তাতে কোন লোকের পক্ষেই সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। কাজেই সে মূঢ়ের মতো মদিরার নির্দেশিত পথে ছুটে চলল। ছুটবার যথেষ্ট কারণও ছিল, পিছনে, খুব দূরে নয় তবু তখনো নজরের বাইরে একটা তুমুল কলরব শ্রুত হচ্ছিল, যার অনুরূপ আগে কখনো শোনেনি।

বনে বনে ঘোরা তার অভ্যাস, শ্বাপদের গর্জন শুনেছে, আহত পশুর আর্তনাদ শুনেছে, জনতার ক্রুদ্ধ কলরব শুনেছে, মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের শব্দ, পাহাড়ে ধস নামার ভৈরব আরাব দাবানলের হুঙ্কার, সমুদ্রে জোয়ারের উৎকট ধ্বনি কিছুই তার অপরিচিত নয়। কিন্তু এখন যে আওয়াজ তার কানে আসছে, তার সঙ্গে কোন অভিজ্ঞতার মিল হয় না। হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ থেকে হাজার হাজার ক্ষুধিত নেকড়ের আর্ত আকাঙ্ক্ষা শব্দরূপে নির্গত হলে খানিকটা যেন মেলে এই আওয়াজের সঙ্গে। জরাকে বন্য বললেই হয়, বনে অরণ্যে যার ভয় নেই আজ লোকালয়ে সে ভীত বোধ করলো, বনকে মাতৃক্রোড়ের মতো বোধ হল তার, বনের দিকে ছুটলো সে। সেই উৎকট শব্দ যতই নিকট থেকে নিকটতর হতে লাগলো তার গতিও হতে লাগলো তত দ্রুততর। অবশেষে ধ্বনির কাছে গতি হার মানলো, শব্দের অনুমানে বুঝলো শব্দের হেতু প্রায় তার পিঠের উপরে এসে পড়েছে। এতক্ষণ চোখ ছিল সামনের দিকে, এবারে পিছনে ফিরে তাকালো। তাকিয়ে যা দেখলো এমন অদ্ভুতদৃষ্ট যে ক্ষণকালের জন্য ভয় পেতেও ভুলে গেল।

সে দেখলো তার তিন-চার রসি পিছনে বিপুল এক জনপিণ্ড ছুটে আসছে। সে মানুষও বটে আবার যেন মানুষও নয়। হাজার খানেক মানুষ অতি ঘনিষ্ঠ অতি শ্লিষ্টভাবে গায়ে গায়ে সংমর্দিত হয়ে একটা পিণ্ড পাকিয়ে গিয়েছে, তারা যেন আর আলাদা নয়, তাদের মন ব্যক্তিত্ব আকাঙ্ক্ষা সমস্তই একীভূত। এরকম দৃশ্য আগে কখনো জরার চোখে পড়েনি। মেলায় নিবিড় জনতা দেখেছে, গায়ে গায়ে সম্বদ্ধ হলেও তারা আলাদা—এরা এক। বিস্ময় কমতেই ভয় এসে ঢুকলো মনে, ভয় ঢুকতেই মনে পড়লো মদিরার পরামর্শ, নিরুপায় হলে গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করো, ধরা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। কার হাতে মৃত্যু কেন মৃত্যু, তাড়াতাড়ির মুখে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিল। সম্মুখেই একটা শাল্মলী গাছ ছিল, তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে পড়ে ঘন পাতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন হল। তৎক্ষণে সেই বিপুল জনপিণ্ড গাছের তলায় এসে পৌঁছেছে।

জরার যদি সম্বিৎ থাকতো তবে বুঝতে পারতো যে জনপিণ্ড যতই বিপুল হোক, অন্ধকার রাতে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে যে দেখছিল তা মশালের আলোয়। তবে এত বুঝবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। গাছের উপরে প্রচ্ছন্ন থেকে সে যা দেখলো তাতে ভয় আর বিস্ময় সমান আসর দখল করে নিল তার মনে। নিতান্ত কাছে এসে পড়ায় পিণ্ডকে এবারে আলাদা করে দেখা সম্ভব হচ্ছে, হাজার খানেক মানুষ, মানুষ তবে পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে জ্বলন্ত মশাল, চোখ-মুখে তাদের তীব্র আভা, খোলা চুলে যেন তারই ধোঁয়া। সে দেখতে লাগলো উড়ে গিয়েছে তাদের দোপাট্টা, খুলে গিয়েছে তাদের কাচুলি, ঘাগরা-গুলোও আর ঠিক সুবিন্যস্ত নয়। সেই বিপর্যস্ত বেশভূষার ফাঁক দিয়ে দেহের স্বেদোজ্জ্বল হেমকান্তির উপরে মশালের আলো দ্বিগুণ প্রতিফলিত। দূর থেকে শ্রুত উৎকট ধ্বনি পিণ্ড এবারে বেশ বোধগম্য হচ্ছে, ঐ হাজার কণ্ঠে একটিই আকাঙ্ক্ষা একটিই শব্দ, পুরুষ কই, পুরুষ কই। পুরুষ সন্ধানে যদুকুল রমণীগণ নির্গত, অভিসারে নয় মৃগয়ায়।

যদুবংশের পুরুষগণ পরস্পরে হানা-হানি করে নিহত হলে রাজপুরীতে অবশিষ্ট রইলো অশক্ত বৃদ্ধ ও শিশুর দল, আর অবশিষ্ট রইলো যুবতী পুরস্ত্রীদল।

যদুবংশের পুরুষগণ যেমন বীর তেমনি মদ্যপ, কাজেই নারীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সময়াভাব তাদের। এখন তারা নিহত হতেই রাজপুরী মধ্যে হাহাকার উঠল, শোকের উচ্ছ্বাস দূর হতেই পুরস্ত্রীগণ নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করলো। প্রথমে কিছুদিন তারা সংযত ছিল, কেননা বলভদ্র ও বাসুদেব জীবিত। তারা নামে রাজা না হলেও কাজে বটে, তাদের অদৃশ্য বিভূতি ভুল না করে উপায় নেই। এমন সময় খবর এলো বলভদ্র দেহত্যাগ করেছেন। নারীদের বুকের উপর থেকে একখানা পাষাণভার নেমে গেল, কিন্তু তখনো চেপে রইলো আর একখানা পাথর, সেখানাই বড়। বাসু-দেব জীবিত। তাকে না ভয় করবে কে? বলভদ্রকে যা ভয় তা ঐ বাসুদেবের সম্বাদে। কিন্তু বাসুদেবকে ভয় নিতান্ত বাস্তব? দুর্লঙ্ঘ্য। অনেকে মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করতে শুরু করলো।

দিনের বেলায় রমণীরা সংযত হয়ে রাজপুরী মধ্যে বাস করতো, কিন্তু সন্ধ্যা হতেই তাদের মতিগতির পরিবর্তন শুরু হতো। প্রথমে শুরু হতো প্রসাধন, তারপর সকলে মিলে সুরাপান, সবশেষে মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে দলে দলে বিভিন্ন দিকে বের হয়ে পড়তো পুরুষমৃগয়ায়।

রাজপুরীর ঠিক বাইরে দক্ষিণ দিকে বৃহৎ বারাঙ্গনা পল্লী। প্রথমে সকলেই সেদিকে যেতো, কয়েকদিন পরেই প্রতি-যোগিতার চাপে যদুবংশের নারীরা তিন-চারটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। উত্তর দিকে ঘন বন, সেদিকে যারা যেতো তাদের প্রধান রত্না।

বনের মধ্যে কাঠুরিয়ারা কাঠকুটো ডালপালা দিয়ে ঘর বেঁধে বাস করে, কেউ বা স্থায়ী কেউ বা সাময়িক। স্থায়ী কুটিরগুলোর কাছে কিছু কিছু শাক-সব্জির গাছ, দু-চারটে গরু-ছাগল, আর স্থায়ী অস্থায়ী সকল কুটিরেই বড় বড় পোষা বুনো কুকুর। এরাই দিন-রাতের পাহারাদার, বিশেষ করে রাতের। সারাদিন খেটেখুটে কাঠুরের দল সাঁঝ না লাগতেই ঘুমিয়ে পড়ে, বাতি জ্বালাবার কড়ি জোগাবার সাধ্য নেই তাদের। কখনো কোন কাঠুরে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললে শ্বাপদের হাতে প্রাণ হারায়। কিম্বা হয়তো আহত অবস্থায় অনেক রাতে ফিরে আসে। এই কাঠুরে পল্লী জরার পরিচিত।

জরা গাছের উপরে থেকে দেখতে পেলো নারীর জনতা সেই পল্লীর দিকে চলেছে, কেন চলেছে বুঝতে পারলো না। চুরি, ডাকাতি অবশ্যই নয়। হঠাৎ মশালের আলোয় চোখে পড়লো গাছের নীচে একটা নেকড়ে বাঘ গুঁড়ি মেরে বসে আছে, তার মনে হল এখনি শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, শিকার কাছেই ছিল। দল ছাড়া একটি মেয়ে বাঘের আওতার মধ্যে। জরা ভাবলো চীৎকার করে মেয়েটিকে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু চীৎকার করবার আগেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটলো। বাঘ ও মেয়েটি মুখোমুখি হল, শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার উল্লাসসূচক লেজ আছড়াতে লাগল বাঘটা, মুখে-চোখে তার কি হিংস্রউল্লাস, মশালের আলোয় সমস্ত দেখা যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাঘটা লেজ গুটিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের দিকে ছুটে পালালো। জরা ভাবলো, এ কি ব্যাপার, এ কেমন করে সম্ভব হল। নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ শিকার ছেড়ে পালানো তো বাঘের স্বভাব নয়। একবার ভাবলো মশালের আলো দেখে বাঘটা ভড়কে গিয়েছে, কিন্তু তার মনে হল না যে মশালের আলো দেখে নয়, মশালের আলোয় মেয়েটির মুখ দেখে ভয় পেতে পারে। কামার্ত নারীর মুখে ভয়ংকর ক্ষুধার ছাপ যে শ্বাপদের পক্ষেও আতংকের হতে পারে কেমন করে বুঝবে জরা।

বাঘের পলায়নে যখন সে বিস্ময় অনুভব করছে তখন কাঠুরে পল্লীর দিক থেকে একটা কোলাহল এসে তার কানে ঢুকলো। নারী জনতার কোলাহল ছিল এক তরফা, এখন দোতরফা কোলাহল। ব্যাপার কি? তাকিয়ে দেখে যে ঐ নারীর জনতা কাঠুরেদের কুটিরের উপরে চড়াও হয়েছে। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে বড় ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়েছিল জরার, তবে আবার এরা হতদরিদ্রের উপরে চড়াও হল কেন। মূর্খ জরা কেমন করে বুঝবে যে হতদরিদ্রের কুটিরেও এমন কিছু থাকতে পারে যা রাজরাণীর কাম্য।

যাথা যাথা কুকুরগুলো আক্রমণ করছে মেয়েদের কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে নিদ্রিত বা অর্ধ-জাগ্রত কাঠুরেদের টেনে বের করে আনছে, কাঠুরে রমণীরা লাঠিসোটা দিয়ে দমাদম পিটোচ্ছে আততায়িনীদের, কুকুরগুলো কামড়ে তুলে নিচ্ছে গায়ের মাংস, কিন্তু হুঁস নেই নির্লজ্জদের। পাঁচ-সাতজনে ঘরে বাইরে আনছে একটি পুরুষকে, অমনি তাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কাড়াকাড়ি, যারা আগে পারেনি তারা এসে জুটেছে, তখন কাড়াকাড়ি তীব্রতর হয়ে উঠছে। মশালের আলোয় আভাসে সে দেখতে পেলো আমাদের অসাবধানতার সুযোগে একটি মেয়ে একটা কাঠুরেকে কিছু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়েছে। অমনি দিশ-পঁচিশজন ছুটলো সেদিকে, সবাই ছিনে মেয়েটাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে পুরুষটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এমন অবস্থায় আপোষে ভাগাভাগি হয় না, কেউ কারো অংশ ছাড়তে রাজি নয়, ফলে দিশ-পঁচিশজনের টানাটানিতে পুরুষটি ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে প্রাণত্যাগ করলো। যার ভাগে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পড়লো তাই নিয়ে মেয়েদের কি উল্লাস। এদিকে কুকুরে কামড়ে খণ্ড খণ্ড মাংস তুলে নিচ্ছে, কাঠুরে রমণীরা লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, মাথা থেকে রক্ত ঝরছে, শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, তবু কারো হাত থেকে স্খলিত হচ্ছে না দেহখণ্ড, পালাবার কথা মনেই আসছে না, রক্তাপ্লুত দেহে উন্মাদিণীদের সে কী কামনৃত্য!

এতক্ষণে জরা বুঝতে পারলো কেন মদিরা তাকে নারীবেশ পরতে পরামর্শ দিয়েছিল, কেন তাকে বনের দিকে যেতে বাধ্য করেছিল। তার মনে হল পুরুষ সন্ধানে, এই উন্মাদিনীরগণ নিশ্চয় মদিরার ঘরে হানা দেয়, তবে যে তারা বনের দিকেও যায় এ বোধকরি মদিরার জানা নেই, নইলে এদিকে আসতে পরামর্শ কেন? জনপদের সংকটে লোক বনে পালায়, এখন দেখল বনের সংকটও কম নয়, তবে তো আর পালানোর জায়গা রইলো না। এতক্ষণ প্রত্যক্ষ ঘটনার ভয়াবহতায় চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে ছিল, এবারে আতঙ্কে শরীর অসাড় হবার উপক্রম হল। সে কোনমতে গাছের ডাল আঁকড়ে কাঠুরে পল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। নূতন আর দেখবে কি। সেই একই পুনরাবর্তন।

একদিকে কামোন্মাদিনী নারীর দল, অন্যদিকে কাঠুরে রমণী ও শিকারী কুকুর। পুরুষ, হাঁ আছে বইকি। তাদের কতক ছিন্নভিন্ন দেহ হয়ে মৃত, কতক অর্ধমৃত, কতক পলায়িত। পলায়নপর পুরুষকে দেখলেই শতাধিক প্রতিযোগিণী গিয়ে পাকড়াও করে তাকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতৃপ্ত কামপ্রয়াস ঘোষণা করে, তারা ধাবিত হয় অন্য একজন পলায়নপরের পিছে। কতক্ষণ যে চলল এই নিষ্ঠুর কাণ্ড তার হুঁস নেই, হঠাৎ এক সময়ে দেখল যে কাঠুরে পল্লী জ্বলছে। নারীদের মৃগয়া শেষ হয়েছে, এবারে ফিরবার আগে মশাল দিয়ে জ্বালিয়ে দিল ঘরগুলো। কাঠকুটোর ঘর-বাড়ী এক আধ দণ্ডের মধ্যেই জ্বলে-পুড়ে নিভে শেষ হয়ে গেল। নারীরা ফিরে চলল নগরের দিকে। কাঠুরে নারীরা শিশুদের হাত ধরে পালালো গভীরতর অরণ্যের দিকে।

জরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো গাছের উপরে, যখন দেখল যে কেউ কোথাও নেই, আর কারো আসবার সম্ভাবনাও নেই তখন সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামলো, ভাবলো দেখাই যাক কটা মরলো, কটা অবস্থা হয়ে রইলো। খানিকটা অগ্রসর হতেই চমকে উঠল জরা। এই বিজন অরণ্যে, গভীর রাতে, সদ্য শ্মশানে হাসে কে!

কঠিন কর্কশ হাসির গমক অন্ধকারের আবরণ কাঠকে করাত দিয়ে চিরছে। অন্ধকারও অটল, সে হাসিও থামে না। বনের অবিশ্বাসিক জরার অজানা থাকবার কথা নয়, তার সম্বিৎ হল, বুঝলো ওটা হাসি নয়, খট্টাসের ডাক। মনে মনে বলল, তাই বলো খট্টাস।

শেষের শব্দটি হয়তো জোরে বলেছিল অমনি অন্ধকারের মধ্যে থেকে শুনতে পেলো, ঠিক ধরেছ খট্টাসই বটে, ওটাই আমার নামে দাঁড়িয়েছে।

এবারে সত্য সত্যই ভয় পেলো জরা, শুষ্ক কণ্ঠে শুধালো, তুমি কে?

আবার সেই করাতে কাঠচেরা শব্দ। জরা ভাবে ইস কি কর্কশ, কঠিন, শুধায়—কে তুমি?

ঐ তো নিজেই বললে খট্টাস।

ওতো নাম হল, পরিচয়টা কি?

এই ঘোর অন্ধকারে পরিচয় দেবে কিভাবে, আলো থাকলে পরিচয় পেতে।

আমার পরিচয় তো অন্ধকারেই পেলে।

না, তখনো অন্ধকার হয়নি, মদিরার ঘর থেকে বের হওয়ার পরেই তোমার পিছু পিছু আছি।

কেন বলো তো।

তোমাকে বড় দরকার।

আমাকে দরকার। এমন কথা তো এই প্রথম শুনলাম।

এখনো কিছুই শোনোনি।

তবে না হয় খুলেই বলো। কিন্তু তার আগে বলো তো কি কাণ্ডখানা হয়ে গেল।

এর মধ্যে আর বলাবলির কি আছে। চোখেই তো সব দেখলে।

দেখলাম তো, বুঝতে পারলাম না।

বুঝতে পারলে না তবে গাছে উঠেছিলে কেন? ঘাগরা কাঁচুলি পরেছিলে কেন।

নইলে যে প্রাণে মারা যেতাম।

তবে আর বুঝবার বাকি রইলো কি?

সবই। এরা কারা? এদের ঘরে কি পুরুষ নেই, এদের মনে কি লজ্জাসরম নেই, দয়ামায়া নেই, এদের কি শাসন করবার কেউ নেই?

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলে কোনটার উত্তর দেব?

সবগুলোরই দাও, একে একে দাও।

সেই ভালো। এরা যদুবংশের নারী।

তার মানে রাজবংশের বউ?

চমকালে কেন? বউ আছে, মেয়ে আছে, সব রকম আছে।

স্বামী পুত্র তো আছে।

ছিল এখন নেই।

তার মানে?

বনে বনে পশু শিকার করে ফেরো, এদিকের খবর কিছুই রাখো না দেখি। যদুবংশের পুরুষগুলো সব হানাহানি করে মরেছে, থাকবার মধ্যে আছে উগ্রসেন, বসু-

ছেলের মতো কত্তগুলো বুড়ো আর সভা-তাল বৃক্ষিণীদের মতো কত্তকগুলো বুড়ী, আর আছে হামাহাটা শিশু। সমর্থ পুরুষ বলতে কেউ নেই মদনকুলে।

তাই বলে এই রকম ব্যবহার করতে হবে।

নাও শোন একবার কথা। সমর্থ পুরুষ না থাকলে সমর্থ নারীর চলে কি করে।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ যে পশুর মতো কাণ্ড।

আরে মূর্খ, এক জায়গায় যে পশু আর রাজবংশের মেয়ে সমান। শোনোনি নীতিবাগীশেরা বলাৎকারকে মনুষ্যের পাশবিক অত্যাচার বলে।

বলে নাকি?

তাই তো তুমি জানবে কি করে।

তাই বলে এমন কাণ্ড! বনে থেকেও মানুষের স্বস্তি নেই।

আরে গণ্ডমূর্খ, মানুষ যখন পশুর ভূমিকা নের তখন বন ছাড়া আর কোথায় যাবে।

এবারে দেখছি বন ছাড়তে হবে।

বন ছেড়ে কোথায় যাবে শুনি, গিয়ে-ছিলে তো মদিরাদের পাড়ায়, পালালে কেন?

তবে দেশান্তরী হব।

কোন দেশে যাবে? সব জায়গাতেই এই কাণ্ড চলছে। শোননি যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী পুরুষ মরেছে, তাদের আঠারো অক্ষৌহিণী স্ত্রী কি করছে? যদুবংশেও যা কুকুরবংশেও তাই কাশী কাঞ্চী মদ্র পাঞ্চাল অঙ্গবঙ্গ প্রাগজ্যোতিষ সর্বত্র তাই সমস্ত দেশ আজ অকাল বৈধব্যের কামনার তাপে তপ্ত বালু খোলা হয়ে আছে। যাও না পা ফুটে খই হয়ে যাবে।

ভাই খট্যাস, তুমি এত কথা জানলে কি করে? শিরোমণি মশায়ের টোলে তো কখনো দেখিনি তোমাকে।

কাঠচেরা হাসি ওঠে। চমকে ওঠে জরা, এখনো হাসিটায় সে অভ্যস্ত হয়নি, বলে, ঐ হাসিটা থামাও, ও যেন করাত দিয়ে কাঠ চেরার শব্দ।

তাতে ভয় কি তোমার! তোমার বুক তো কাঠের নয়।

এমন হাসি তো মানুষকে হাসতে শুনিনি।

আমি যে মানুষ জানলে কি করে? অন্ধকার একটু ফিকে হোক চোখে দেখলেই আর ব্যাখ্যার দরকার হবে না।

ততক্ষণ না হয় আগের প্রশ্নটার উত্তর দাও। তোমাকে তো আমার মতো মুখ্যু-সুখ্যু লোক মনে হয় না। এত কথা শিখলে কোথায়?

সব বলবো, সব বলবো, আঁটি ভেঙে শাঁস অবধি বলবো, কিছু বাদ যাবে না। তবে তোমাকে ছাড়ছি নে।

আমাকে কি এমন দরকার!! দেখছই তো আমি তোমার মতো পণ্ডিত নই।

তবে টোলে দেখা হবে বলছিলে কেন?

টোলে কি পোড়োতে যায়। আমি সেখানে মধু জোগাই।

মধু না মদ! সেই মধু খেয়ে টোলের পোড়ো বুঝি টলে পড়ে।

নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে খট্যাস, খ্যাক, খ্যাক, খ্যাক!

ঐ হাসিটা বরদাস্ত করতে পারে না জয়া, ভাবে কাজের চাপে না রাখলে লোকটা হাসতেই থাকবে,. কাজের প্রস্তাব করে বলে চলো না এগিয়ে দেখি, কাঠুরেদের কি অবস্থা হল।

ও আমার খুব দেখা আছে তুমি দেখোগা।

কবে দেখলে?

প্রত্যেক দিন রাতে দেখছি।

বলো কি, চমকে শুধায় জয়া, তোমাকে ওরা দেখতে পায় না।

খুব পায়।

তবে যে পাকড়াও করে না বড়।

সে গুড়ে বালি, সে গুড়ে বালি বলে হেসে ওঠে খট্যাস।

ভাই খট্যাস হাসিটা কমিয়ে কথার ভাগ বাড়াতে পারো না? খুলেই বলো না কি বলতে চাও?

ওরা জানে আমাকে দিয়ে ওদের কাজ চলবে না—তা না হলে কি ছেড়ে দিত।

তার মানে?

তার মানে অত্যন্ত স্পষ্ট, আমি হিজড়ে। খ্যাক, খ্যাক, খ্যাক।

কি বললে?

বললাম হিজড়ে, হিজড়ে, হিজড়ে, বুঝলে।

নিজের মুখে স্বীকার করলে। তুমি কি মানুষ?

ও গুণটা না থাকলে যদি মানুষ না হয় তবে মানুষ নই।

তাই বলে নিজে বলে বেড়াবে।

না বলে আর করি কি, হাটের মধ্যে যে হাঁড়ি ভেঙেগ গিয়েছে। দেখো না বনুবংশের মরণীগুলোকে দেখলে পুরুষে পথ ছেড়ে দিয়ে পালায় আর সেই প্রাণীগুলো আমাকে সম্মুখে দেখলে অযাত্রা মনে করে পথ ছেড়ে দেয়। তাইতেই ওদের কাছাকাছি থেকেও বেঁচে রয়েছি। তোমাকে দেখতে পেলে প্রাণটা যেতো।

তা হোক বাপু আমার গা কেমন ছিম-ছিম করছে, আমি চললাম।

চলবে কোথায় চাঁদ, এতক্ষণ যে তোমার সঙ্গে আনন্দ করলাম তা কি ছেড়ে দেওয়ার জন্যে? না সেই সন্ধ্যাবেলা থেকে যে তোমাকে চুড়ে চুড়ে বেড়াচ্ছি শুধু দুটো বিশ্রম্ভালাপ করবার জন্যে।

কেন আমাকে এত দরকার কিসের?

বলো কি! তুমি যে কাজ করেছ তা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণার্জুন কেউ করতে পারেনি, তোমার নাম যে সোনার অক্ষরে পুঁথির পাতায় লেখা থাকবে।

কি যত সব বাজে বকছ?

এতক্ষণ তাই বলছিলাম বটে, এবারে তবে আসল কথায় আসি।

এই বলে খট্যাস ট্যাঁক থেকে একটা পাথর বের করলো, নিশান্তের অন্ধকারের মধ্যেও তার দ্যুতি কারো চোখ এড়ালো না।

চমকে উঠলো জয়া। বলল, কোথায় পেলে পাথরটা!

তবেই দেখো ঠিক লোক ধরেছি কিনা, সাধে কি খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে।

গর্জে উঠে জয়া শুধালো কোথায় পেলে পাথরটা। নির্বিকারভাবে খট্যাস বলল, যেখানে তুমি দেখেছিলে।

আমি কোথাও দেখিনি।

বটে তবে চমকে উঠলে কেন?

সোজাসুজি বলো না কোথায় পেলে।

যে লোকটাকে খুন করেছিলে তার গলায়।

দোষ অস্বীকার করবার ভঙ্গীতে জয়া বলল, কাকে খুন করলাম আমি?

বাসুদেবকে। এবারে হল তো। আরও বলবো? বাসুদেবকে খুন করবার পরে বুঝতে পারোনি লোকটা কে? তাই গিয়েছিলে গিন্নিকে ডাকতে। বুদ্ধি ছোকরাবার উদ্দেশ্যে যে পুরুষ গিন্নিকে ডাকে সে তো হিজড়েরও অধম।

—ওসব থাক, যা বলছিলে বলো। ভেক যেমনভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে সাপের দিকে তেমনি অসহায়ভাবে জয়ার দৃষ্টিনিবদ্ধ খট্যাসের মুখে।

তুমি গিয়েছ তখন জলকীর সন্ধানে। আমি হঠাৎ এসে পড়ে দেখলাম, বা-বা, এ কাজটি করলো কোন বীরপুরুষ। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম বাসুদেব ভিরকুটি মেরে পড়ে আছে ওর আবার নানা-রকম রঙ ছিল। কিন্তু না, বেটা মরেছে, আগাগোড়া মরেছে, ষোল আনা মরেছে, পাঁজির পাতা থেকে আমার মুক্তামালা অবধি মরেছে সন্দেহ নেই। বাপ্পা, বাঁচা গেল। সেদিন গিয়েছে ধনাটা আর গেল মামাটা। বাঃ বাঃ! কিন্তু এমন কাজটি করলে কোন বাপের সুপুত্তুর। এই সব কথা ভাবছি এমন সময়ে বুকের উপরে চকচক করে উঠল পাথরটা। তখনি নিয়ে ট্যাঁকে পুরলাম, বেটা গিয়েছে কিছু চিহ্ন রেখে দিলাম। এমন সময়ে তোমরা দুজনে গুটি গুটি এসে উপস্থিত হলো। কি স্যাঙ্গাৎ মনে পড়ছে।

দেখো দেখো মাটি কাঁপছে, ভুঁই দোল শুরু হয়েছে—আর দেখতে পাচ্ছ না চাঁদের ঐ কোণাটায় গেরণের ছায়া পড়েছে।

ভয় নেই জয়া, ও ভুঁই দোলও নয়, গেরণের ছায়াও নয়, সমস্ত মনের ভয়।

মনের ভয়!

মনের ভয় বইকি! পাপের শুরুতে ওরকম হয়ে থাকে, আমারও হয়েছে। আর খানিকটা এগিয়ে গেলে ঠিক উল্টো মনে হবে।

উল্টো আবার কি রকম?

তখন গেরণের চাঁদকে মনে হবে পূর্ণিমার চাঁদ আর সত্যিকার ভুঁইদোলকে মনে হবে অচলা অটলা পৃথিবী। কেমন তাবা শুনে বুঝতে পারছ যে টোলে পড়েছি।

খট্যাসের কথায় জয়া কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করলো না, বরঞ্চ তার ত্রাস যেন বৃদ্ধি পেলো। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, পালাও পালাও ঐ শুনছ না গর্জন। হাজার হাজার ডাকিণী তাড়া করে আসছে—এই বলে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই খট্যাস ধরে ফেলেছে তার হাত, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে আমার বড় দরকার।

আমাকে দিয়ে এ সংসারে কারো কিছু দরকার নেই, আমি মুখ্যুসুখ্যু ব্যাধের ছেলে। আমাকে ছেড়ে দাও।

তবে শোনো, তুমি ব্যাধের ছেলে নও, তুমি রাজপুত্র।

এখন রহস্য ভালো লাগে না।

রহস্য নয়, জয়া, কিম্বা রহস্যই বটে, তুমি ব্যাধপুত্র নও তুমি রাজপুত্র।

কার পুত্র বললে?

রাজপুত্র। যেমন বাসুদেব রাজপুত্র, বলভদ্র রাজপুত্র, তেমনি রাজপুত্র তুমি।

জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে খট্যাস বলে উঠল, কি বিশ্বাস হচ্ছে না! না হওয়ারই কথা বটে। সমস্ত খুলে বলছি। চলো আমার বাড়ীতে চলো, এদিকেও ভোর হয়ে এল।

(ক্রমশঃ)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিটলারের ধারণা এই শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীব্যাপী ইহুদীদের চক্রান্তে ধ্বংস হইতেছে। এই ইহুদীরা জার্মানীতে বণিক ও ধনিক শ্রেণীরূপে জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বলশেভিকগণ (যাদের মধ্যে বহু ইহুদী ছিলেন) বিপ্লব ও যুদ্ধের দ্বারা জার্মান জাতিকে বিপন্ন করিতেছে। এ জন্য হিটলারের ক্ষমতা লাভের আগেই ব্যাপক হিংসা ও সন্ত্রাসবাদ সুরু হইয়াছিল, ক্ষমতা লাভের পর উহা বর্বর অভিযানে পরিণত হইল। ইহুদীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, জঘন্য এবং পৈশাচিক অত্যাচার সুরু হইল, যার ভয়াবহ পরিণতি ঘটিল যুদ্ধের সময় বন্দী শিবিরগুলিতে; যেখানে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে পাইকারিভাবে হত্যা করা হইল।

হিটলারের জার্মানীতে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো নিভিবার উপক্রম হইল এবং শিক্ষার নূতন মৎস্যবাদ প্রচার হইতে লাগিল। অন্যদিকে ইহুদী সন্দেহে, কিম্বা একমাত্র জাতিতে ইহুদী এই অপরাধে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী ও মনীষীরা নির্যাতিত হইতে থাকিলেন। অনেকে জার্মানী হইতে পলায়ন করিয়া (যেমন, আইনস্টাইন) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নাৎসীরা যে সমস্ত রচনা ও বই পছন্দ করিতেন না, সেগুলি নিষিদ্ধ হইল কিম্বা পুড়াইয়া ফেলা হইল। এমন কি কোন জার্মানের দেহে ইহুদী রক্তের সামান্য মিশ্রণের সন্দেহ হইলেও তাকে নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। যে সমস্ত দল জার্মানীকে যুদ্ধে হারাইয়াছিল, হিটলার তাদের বিরুদ্ধে অনবরত বিদ্বেষ প্রচার ও আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন।

"Two myths he persuaded many Germans, perhaps the majority, to believe: that their armies were not defeated on the field of battle in 1918, but suffered betrayal by a 'stab in the back' from cowardly politicians at home; and that the Versailles Treaty which the betrayers signed, was the severest peace ever dictated to a nation, reducing Germany to an ignominious position in Europe. Hitler proposed to break the fetters of the treaty, rearm Germany, crush France, and carve an empire out of Communist Russia. For this mission he demanded that Nazis be made masters of Germany.'*

অর্থাৎ হিটলার অধিকাংশ জার্মানকে বুঝাইলেন যে, ১৯১৮ সালের রণক্ষেত্রে (প্রথম মহাযুদ্ধে) জার্মান সৈন্যবাহিনীর কোন পরাজয় হয় নাই। কিন্তু তাদের স্বদেশের কাপুরুষ রাজনীতিকেরা তাদের পিছন হইতে ছুরি মারিয়া তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই বিশ্বাস-ঘাতকেরা যে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছে। এমন কড়া সন্ধিসর্ত পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই, ইহার ফলে ইউ-রোপে জার্মানীর অপমানজনক দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সুতরাং এই সন্ধিসর্তের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে হইবে, ফরাসীকে ধ্বংস করিতে হইবে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার দেশগুলি কাড়িয়া লইয়া এক নূতন সাম্রাজ্য গঠন করিতে হইবে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নাৎসী পার্টিকে জার্মানীর উপর একচ্ছত্র অধিকার দিতে হইবে।

গোড়ার দিকে নাৎসী দল তেমন সমর্থক পায় নাই এবং নির্বাচনগুলির নিকট হইতেও মোট ১০ লক্ষের বেশী ভোট পায় নাই। কিন্তু ১৯০০ সাল হইতে পৃথিবীব্যাপী বাজার মন্দা সুরু হইল এবং ১৯৩০ সালে তাহা চরমে উঠিল। জার্মানীর দুর্গতির অবধি রহিল না। সেই সময়কার গভর্নমেন্ট ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। এদিকে হিটলার ও নাৎসী দল 'ঝটিকা বাহিনী' 'এস এস

* 'The World At War' — published by the 'Infantry Journal', Washington. USA. Page 28.

গার্ড" ইত্যাদি নামে কতকগুলি 'প্রাইভেট আর্মি' গঠন করিয়া বিরুদ্ধ দল ও গভর্নমেন্টকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। অপরদিকে জার্মানীর অর্থনৈতিক দুর্দশা যতই বাড়িয়া পাইতে লাগিল, জনসাধারণও ততই চরমবাদীদের প্রতি ঝুঁকিতে লাগিল। কমিউনিস্ট দলও জার্মানীতে বেশ শক্তিশালী ছিল, এবং তাদের সঙ্গে নাৎসী বাহিনীর অনবরত সংঘর্ষ হইতে লাগিল। উভয় দলই জনগণের দুর্গতি মোচনের জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রোগ্রামের উপর জোর দিতে লাগিলেন। তাঁরা তদানীন্তন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধবাদীরূপে রাইখস্ট্যাগ বা পার্লামেন্টে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিলেন। এই সংকটের সময় মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম নায়ক ছিলেন, তিনি হিটলারের চেয়ে ৪০ লক্ষাধিক ভোট বেশী পাইয়া পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইলেন, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩২। এই সময় রাইনল্যাণ্ডের শক্তিশালী শ্রমশিল্পের মালিকগণ কমিউনিস্টদের ভয়ে আতঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা হিটলারকে সমর্থন জানাইলেন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সহায়তা পাইবার আশায়। অন্যদিকে সমরবাদী জার্মানীর 'মেরুদণ্ড স্বরূপ' প্রুশিয়ার বড় বড় জমিদার, যাঁরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণী, তাঁরা হাত মিলাইলেন রাইনল্যাণ্ডের শিল্পপতিদের সঙ্গে। প্রুশিয়াতে ইঁহাদের জমিদারীতে তখন প্রবল কিষাণ আন্দোলন চলিতেছিল। এই সমস্ত জমিদার ও শিল্পপতি, উভয় শ্রেণী মিলিয়া বয়োবৃদ্ধ হিণ্ডেনবুর্গের উপর চাপ দিলেন হিটলারকে 'চ্যান্সেলর' বা প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োগের জন্য। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিটলার প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের আমন্ত্রণে এই পদ লাভ করিলেন। হিটলারের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন অতি সহজেই চরিতার্থ হইল।

কিন্তু চার্চিলের মতে মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের উপর সবচেয়ে বেশী চাপ আসিয়াছিল জার্মানীর জেনারেল স্টাফ বা সেনানীমণ্ডলীর পক্ষ হইতে। জার্মান রাষ্ট্রে, পার্লামেন্টে, মন্ত্রিসভায় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সংস্থাগুলিতে এই জেনারেল স্টাফের প্রভাব প্রতিপত্তি বরাবরই অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁরা ছিলেন মূলতঃ রাজতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের সমর্থক এবং ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী। সুতরাং তাঁরা হিণ্ডেনবুর্গের উপর প্রথম চাপ দিলেন হিটলারকে গ্রহণের জন্য। হিণ্ডেনবুর্গ তখন বৃদ্ধ, বয়স ৮৫ বছর। গভীর বিবেচনা ও মস্তিষ্কের শক্তি তখন তাঁর জোরদার ছিল না। কাজেকর্মেও তেমন উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল না। প্রকাশ যে, তিনি যখন প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন, তখন তাঁর ছেলে ভোর ৭টার সময় তাঁকে সেই সংবাদ দিলে তিনি বিরক্ত হন এবং বলেন, 'এই সংবাদ দেওয়ার জন্য এক ঘন্টা আগে আমার ঘুম ভাঙ্গাবার কি দরকার ছিল? এক ঘন্টা পরেও কি এই খবর সত্য হতো না?'—এই মন্তব্য করিয়া তিনি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু হিটলারকে প্রথম দেখিয়া হিণ্ডেনবুর্গ নাকি আদৌ খুশী হইতে পারেন নাই। তিনি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন—'এই হিটলার? এঁকে তো আমি ডাকটিকেটে সীল মারার জন্য পোস্টমাস্টারের কাজ দেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না!' কিন্তু যাঁকে হিণ্ডেনবুর্গ এত তুচ্ছ ভাবিয়াছিলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত হিণ্ডেনবুর্গের আসনে বসিয়া সারা জার্মানীর একচ্ছত্র ডিকটেটর হইলেন।

অবশ্য হিটলার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে না পারিলে রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া লাভ নাই এবং দল গঠনের মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে সরকারী ক্ষমতা লাভ। সে জন্য তিনি প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং প্রত্যেককে কৌশলে ধাপ্পা দিলেন, যেমন, জার্মান জেনারেল স্টাফকে তিনি বুঝাইলেন যে, তাঁকে সরকারী ক্ষমতায় বসানো হইলে তিনি সমস্ত প্রাইভেট আর্মির উপর পূর্ণ ক্ষমতা জার্মান সেনানীমণ্ডলীর হাতে (হিটলারী ঝটিকা বাহিনীর সঙ্গে জার্মান সৈন্য বাহিনীর বিরোধ ছিল।) তুলিয়া দিবেন, এমন কি ওই সমস্ত আর্মি বিলোপ করিয়া দিবেন। এভাবে তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেও নানা ছল-চাতুরি খেলিলেন। বলাবাহুল্য যে, ক্ষমতা হাতে পাইয়া হিটলার তাঁর স্বাভাবিক হিংস্র মূর্তি ধারণ করিলেন। যদিও তাঁর পার্টি ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট নাম ধারণ করিয়া একদিকে জাতীয়তাবাদীদিগকে (ধনিক ও রাজতন্ত্রবাদীদিগকে) এবং অন্য দিকে সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী দেশকে (গরীব, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক প্রভৃতিকে) আকৃষ্ট করিতে চাহিলেন, তথাপি নাৎসীবাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের নাম গন্ধও ছিল না। বরং আসলে ইহা ছিল সমাজতন্ত্র-বিরোধী কমিউনিস্ট - বিরোধী, ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী, ইহুদী-বিরোধী—এমন কি বুদ্ধিজীবী-বিরোধী (হিটলার বুদ্ধিজীবীদের সহ্য করিতে পারিতেন না) এক ভয়ংকর বিকৃত মতবাদ। সুতরাং হিটলার সরকারী ক্ষমতা হাতে পাইয়াই ধাপে ধাপে সমস্ত জার্মানী রাষ্ট্রকে নিজের হাতের মুঠোয় আনিলেন এবং বিরোধীদিগকে একেবারে নির্মূল করিলেন। ভেইমার রাষ্ট্রতন্ত্র বাতিল হইয়া গেল। তৃতীয় রাইখের উদ্ভব হইল এবং নাৎসীদের পুচ্ছ অকটোপাশের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইল। নাৎসী দালালদের সাহায্যে রাতে রাইখস্ট্যাগ বা পার্লামেন্টভবনে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল এবং ইহা 'কমিউনিস্টদের ধ্বংসাত্মক কার্য' এই অজুহাত তুলিয়া গোটা কমিউনিস্ট পার্টিকে উচ্ছেদ করা হইল। (ভ্যানডার লুব নামক এক ব্যক্তিকে রাইখস্ট্যাগে আগুন ধরাইবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই নাৎসীদের সাজানো বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। অবশ্য ভ্যানডার লুবের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।) আর এক বছরের মধ্যে হিটলার ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র জার্মানীর উপর তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, প্রভাব ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রকে যেন নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। এমন কাণ্ড জার্মানীর ইতিহাসে আর ঘটে নাই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বা জুড়ি আর কেহ রহিল না। গর্বে ও আনন্দে হিটলার জার্মান ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া নিজেকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

৩০শে জুনের রক্তস্নান

কিন্তু ইতিহাসের এই 'সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান'ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাঁর নিজস্ব নাৎসী দলের কৃপায় যে সমস্ত সামরিক ও আধা-সামরিক প্রাইভেট আর্মি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাদের সাহায্যে নাৎসীদল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইতেছিলেন, তাদের দলপতিরা ছিলেন নিষ্ঠুর ও উচ্চাভিলাষী। এই সমস্ত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী ইংরাজীতে এস-এ, এস-এস স্টর্ম ট্রুপার্স, ব্রাউন সার্টস্ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। আমাদের দেশের সংবাদপত্রে তখন এই সমস্ত প্রাইভেট বাহিনী মোটামুটি 'ঝটিকা বাহিনী' নামেই প্রচারিত হইয়াছিল। এই ঝটিকা বাহিনী এস-এস-এ'র সেনানীমণ্ডলীর প্রধান অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আর্নেস্ট রোয়েম (Ernst Roehm) —ইনি একজন দক্ষ ও সাহসী সামরিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একজন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিও ছিলেন। আর সেই সময় নাৎসী পার্টিতে এবং ঝটিকা বাহিনীর বিভিন্ন পদে এমন অনেক অফিসার ছিলেন যাঁরা নিষ্ঠুর, ধর্ষকাম এবং যৌন কদাচারে লিপ্ত ছিলেন। সমকামিতা (homosexuality) ছিল তাদের যৌন চরিত্রের প্রধান বিকৃতি। ক্যাপ্টেন রোয়েমও এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত হিটলারের ক্ষমতার শীর্ষারোহণে তাঁর সাহায্য, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বর প্রয়োজন ছিল, ততদিন এই যৌন কদাচার লইয়া হিটলারের কোন মাথা ঘামান নাই। কিন্তু বিরোধ বাধিল রোয়েমের রাজনৈতিক মতবাদ ও উচ্চাভিলাষের প্রশ্ন নিয়া। কারণ, ইতিমধ্যে ঝটিকা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ২০ লক্ষ ছাড়াইয়া গেল। অর্থাৎ জার্মাণীর সরকারী সৈন্য বাহিনীর মোট সংখ্যার থেকে ২০ গুণ বেশী! (ভার্সাই সন্ধির চুক্তি অনুসারে সরকারী বাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।) সুতরাং জার্মান সেনানীমণ্ডলী বিচলিত হইলেন। এদিকে ২০ লক্ষ ঝটিকা সৈন্যের অধিনায়ক প্রচার করিতে লাগিলেন যে, হিটলার ও নাৎসী পার্টির ক্ষমতা দখলের দ্বারা প্রথম বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'দ্বিতীয় বিপ্লব' এখনও বাকী। এই দ্বিতীয় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবে সমগ্র দক্ষিণপন্থী দেশকে উচ্ছেদের দ্বারা। অর্থাৎ হিটলারের নাৎসী পার্টিতে দুইটি শক্তিশালী গ্রুপ ছিল—দক্ষিণ ও বাম। শ্রমশিল্পের মালিক, বড় ব্যবসায়ী এবং ধনপতিদের প্রতিনিধি ছিলেন দক্ষিণপন্থী গ্রুপে, আর বামপন্থী অংশে ছিলেন মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও শ্রমিক

প্রতিনিধি। দ্বিতীয় বিপ্লবের ক্যাপ্টেন রোয়েম, ডঃ গোয়েবেল্‌স নাৎসীদের মধ্যেও কট্টর চরমবাদী পরিচিত হইলেন। তাঁরা বিগ বিজ-থেকে সুরু করিয়া প্রুশিয়ান জেনা-দের পর্যন্ত উচ্ছেদ করিতে চাহিলেন। হিটলার ইহার ঘোরতর বিরোধী ন। তিনি অনুভব করিলেন যে, বড় জেনারেলসহ সমস্ত জুঙ্কার, জমিদার, পতি প্রভৃতিকে উচ্ছেদ করিতে গেলে সম্বেই সরকারী বাহিনী বাঁকিয়া বে এবং হিটলার ও নাৎসী দলকে চ্যুত করিবে। সুতরাং রোয়েমের বে ও সংকল্পে তিনি বাধা ন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে পন্থীদের কার্যকলাপ চলিতে এবং প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ সময় সমগ্র জার্মানীর ভার আর্মির তুলিয়া দেওয়ারও ভয় দেখাইলেন রেল ব্লুমবার্জই প্রেসিডেন্টকে এই র্শ দিয়েছিলেন)। এবার হিটলার সত্য ই শঙ্কিত হইলেন এবং ক্ষমতা হারাই-র ভয়ে ভীত হইলেন। এদিকে গোয়েরিং হিমলার ক্যাপ্টেন রোয়েমের প্রতি লেন ঈর্ষান্বিত। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার নানা ছলচাতুরি তাঁরা অবলম্বন করিতে-লেন এবং হিটলারের কানে কানে এই দিলেন যে, ক্যাপ্টেন রোয়েম তাঁর টিকাবাহিনীসহ এক আকস্মিক অভ্যুত্থান ইয়া হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত ও বার্লিন লের চক্রান্ত করিতেছে। তখন ১৯৩৪ জুন মাস। সরকারী সৈন্যবাহিনীর রা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন এবং এস-ও ঘটিকাবাহিনীকে দমন করিবার জন্য তুলিয়াছেন। এই সময় বার্লিন ও নিক হইতে হিটলার নাকি দুইটি ন বার্তা পাইলেন (কিন্তু সেই সূত্র দিন প্রকাশ করা হয় নাই) এবং মনে লেন প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ হইতে বাকি নাই। (কিন্তু ঐতিহাসিকগণ করেন যে, 'রক্তস্নানের' সাফাই বার জন্য হিটলার সমস্ত ঘটনাকে তিরঞ্জিত করিয়াছেন।) হিটলার ক্ষণাৎ তাঁর মন স্থির করিলেন, ৩০শে রাত্রি ২টার সময় কয়েকজন বিশ্বস্ত চরসহ বিমানযোগে মিউনিক রওনা লেন। হিটলার যখন রওনা লেন তখন ক্যাপ্টেন রোয়েম তি মিউনিক হইতে কয়েক মাইল Wiessee নামক শহরের এক হোটেলের কক্ষে ঘুমাইতেছিলেন। ৩০শে শনিবার ভোর চারিটার সময় হিটলার ক্ষুদ্র দলসহ মিউনিকে পৌঁছিয়া খিলেন যে, কয়েকজন এস-এ নেতাকে তিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হিটলার মিউনিক থেকে মোটর গাড়ীযোগে রোয়েমের সন্ধানে Wiessee এর দিকে রা করিলেন এবং Hansbanor Hotel এ পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, রোয়েম এবং র বন্ধুরা গভীর ঘুমে মগ্ন। ঘরে কিয়া দেখা গেল হেইন্‌স নামক একজন এস-এ নেতা এক যুবক সঙ্গীর সঙ্গে শুইয়া আছে। (পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহাদের অনেকেই সমকামিতায় এবং মাতলামিতে অভ্যস্ত ছিল।) তাদের দুই-জনকে বিছানা হইতে টানিয়া-হিঁচড়াইয়া হোটেলের বাইরে নিয়া গিয়া সোজাসুজি গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। এভাবে ৩০শে জুনের রক্তস্নান শুরু হইল। ফুয়ার নিজে ক্যাপ্টেন রোয়েমের ঘরে গেলেন। তাঁকে বিছানা হইতে তুলিয়া পরিবার জন্য একটি ড্রেসিং গাউন দেওয়া হইল এবং তারপর তাঁকে বন্দী করিয়া মিউনিকে ফিরাইয়া নেওয়া হইল, সেখানে অ্যাডম-হেইস কারাগারে তাঁকে আটক করা হইল, কিন্তু হিটলার সরাসরি নিজে তাঁকে হত্যা করিলেন না। আজীবনের পুরাতন বন্ধু, সুখ-দুঃখের সঙ্গী এবং যাঁর সহায়তায় তিনি জার্মানীর শীর্ষস্থান দখল করিয়া-ছেন; শেষ সময়ে তাঁর প্রতি একটু "উদারতা" দেখাইতে চাহিলেন। হিটলারের আদেশে আত্মহত্যার জন্য রোয়েমকে একটি পিস্তল দেওয়া হইল। কিন্তু রোয়েম সেই পিস্তল ব্যবহারে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন—

'If I am to be killed, let Adolf do it himself.'

অর্থাৎ 'যদি আমাকে মরিতেই হয়, তবে হিটলার নিজ হাতে গুলী করুন!' তখন হিটলারের আদেশে দুইজন এস-এ অফি-সার রোয়েমের সেলে প্রবেশ করিয়া এবং তাঁর বুকের কাছে রিভলভার ধরিয়া তাঁকে গুলী করিল। রোয়েম মৃত্যুর আগে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হত্যাকারীরা তাঁকে থামাইয়া দিল, 'রোয়েম স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁর গায়ের জামা খুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তখন তাঁর মুখে ছিল অপরিসীম ঘৃণার অভিব্যক্তি। এভাবে হিটলারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সহযোদ্ধা হিংস্র মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইলেন। *

মিউনিকে যার শুরু হইল বার্লিনেও এবং অন্যত্র তাহা ছড়াইয়া পড়িল। গোয়েরিং হিমলার প্রভৃতি 'সন্দেহভাজন' ব্যক্তিদের একটা লিস্টি নাকি তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই তালিকা অনুসারে কোন আইন আদালত ও বিচার ইত্যাদি ছাড়াই নৃশংসভাবে তাদের গুলী করিয়া হত্যা করা হইল। জেনারেল শ্লিখার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারাইলেন। ৩০০ হইতে ১১০০ পর্যন্ত লোক খুন হইয়াছিল। সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তি, অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বহু ব্যক্তি নিহত হইয়া-ছিলেন। ১লা জুলাই, রবিবার, অপরাহ্নে এই নরমেধযজ্ঞ থামিল। বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ এবং দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ব্লোমবার্গ এভাবে 'জার্মানীকে এক ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষার জন্য' হিটলারকে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং তাঁর দৃঢ়তা ও সাহসিকতার প্রশংসা করিলেন। বিমূঢ় জনসাধারণও এই হত্যা-কাণ্ড মানিয়া লইল।

চৌদ্দ দিন পর ফুয়ার রাইখস্ট্যাগে এই হত্যাকাণ্ডের স্বপক্ষে দুই ঘণ্টা ধরিয়া যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে কেবল তাঁর বাগ্মীতার সম্মোহিনী শক্তিই নয়, তাঁর গভীর বুদ্ধি-জ্ঞান এবং জার্মানীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। (স্বয়ং চার্চিলের এই অভিমত)। হত্যা-কাণ্ডের সাফাই গাহিয়া তিনি বলিলেন— 'কেন আমি আইন-আদালতের আশ্রয় নিলাম না?' — জবাবে নিজেই বলিলেন :

"Mutinies are suppressed in accordance with laws of iron which are eternally the same. If anyone reproaches me and asks why I did not resort to the regular Courts of Justice for conviction of the offenders, then all that I can say to him is this: In this hour I was responsible for the fate of the German people and thereby I became the supreme Justiciar of the German people."

*The Rise and Fall of the Third Reich by William L. Shirer. Pan. সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৭৭

হিটলারের বক্তব্য এই যে, বিদ্রোহ চিরকালই লৌহকঠিন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হইয়া থাকে। যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাতে আমার পক্ষে এই পথ গ্রহণ করা ছাড়া জার্মানীকে বাঁচান যাইত না এবং জার্মান জাতির ভাগ্য-বিধাতারূপে আমি নিজেই চরম বিচারক হিসাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলাম।

এভাবে ৩০শে জুন তারিখের চরম বর্বরতার সাফাই গাহিয়া হিটলার সেদিনের জার্মান পার্লামেন্টের সম্মতি আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু জার্মানীর অবস্থা কি দাঁড়াইল? চার্চিল বলিতেছেন :

> "This massacre, however explicable by the hideous forces at work, showed that the New Master of Germany would stop at nothing, and the conditions in Germany bore no resemblance to those of a civilised state. A Dictatorship based upon terror and reeking with blood had confronted the world....'

অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, জার্মানীর নূতন প্রভু, কোন কিছুতেই থামিবেন না এবং জার্মান রাষ্ট্র আর সভ্যপদবাচ্য রহিল না। রক্তসিক্ত এবং ত্রাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ভয়ঙ্কর ডিকটেটরী পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াইল।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে হিটলার

এর পর হিটলারের পথ একেবারেই খুলিয়া গেল। এতদিন তিনি ছিলেন চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী, এবার তিনি খোদ রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বসিলেন। বৃদ্ধ মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল, ২রা আগস্ট (১৯৩৪) সকাল ৯টায় ৮৭ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আর দুপুর বারোটার সময়েই ঘোষণা করা হইল যে, আগের দিন ক্যাবিনেটের গৃহীত এক আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদ এক করা হইল এবং অতঃপর হিটলার রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদেও (Commander inChief of the Armed Forces) বৃত হইলেন। প্রেসিডেন্ট পদটি বিলোপ করা হইল। এখন হইতে হিটলার ফুয়ার ও রাইখ চ্যান্সেলর নামে অভিহিত হইবেন। এভাবে হিণ্ডেনবুর্গের শূন্য পদের জন্য কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল না। সুতরাং সংবিধান অগ্রাহ্য করিয়াই হিটলারকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে 'মনোনীত' করা হইল। কিন্তু এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের মধ্যেও যাতে কোথাও কোন ছিদ্র না থাকে, এজন্য হিটলার সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ আদায় করিয়া ছাড়িলেন। এই শপথ জার্মানীর নামে নয়, সংবিধানের নামেও নয় ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের নামে গ্রহণ করিতে হইবে!

ইহাও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই শপথ-বাক্য ইতিহাসের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য এবং তাহা এই :—

> 'I swear by God this sacred oath, that I will render unconditional obedience to Adolf Hitler, the Fuehrer of the German Reich and people, supreme commander of the Armed Forces, and will be ready as a brave soldier to risk my life at any time for this oath'.

এই শপথবাক্যটি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে কিরূপ সতর্কতা ও কৌশলের সঙ্গে ইহা রচিত। ইহার মধ্যে কোথাও ফাঁক রাখা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যমণ্ডিত জার্মান বাহিনী এই প্রকার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন মাত্র! পরবর্তী কালে অনেক জার্মান অফিসার এই আনুগত্যের দোহাই দিয়া যুদ্ধাপরাধ হইতে রেহাই পাইতে চাহিয়াছিলেন। যে জার্মান বাহিনী ও সেনানীমণ্ডলী ইচ্ছা করিলে হিটলারকে ১৯৩৪ সালেই ক্ষমতাচ্যুত বা খতম করিতে পারিতেন, তাঁরাই যেন স্বেচ্ছায় হিটলারী ডিকটেটরীর ফাঁসে ধরা দিলেন। কিন্তু প্রুশিয়ান সামরিক আভিজাত্যের গর্বিত জার্মান সেনানীমণ্ডলী যাঁর ফাঁদে ধরা দিলেন, তিনি কি চরিত্রের এবং কি ধরনের লোক ছিলেন? সেই লোকটি, অর্থাৎ হিটলার সম্পর্কে অকসফোর্ডের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ট্রেভর-রোপার মন্তব্য করিয়াছেন :

> A terrible phenomenon, imposing indeed in its granite harshness and yet infinitely squalid in its miscellaneous cumber — like some huge barbarian monolith, the expression of giant strength and savage genius, surrounded by a festering heap of refuse—old tins and dead vermin, ashes and eggshells and ordure—the intellectual detritus of centuries.

এ হেন ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকটিকে নিয়া সেনাপতিরাও কিন্তু অনেক ভোগান্তি ও বিরোধের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। এমন কি, হিটলারকে অপসারণের ও হত্যার চেষ্টাও কয়েকবার হইয়াছিল। কিন্তু সেদিনের জার্মানীতে হিটলার অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিলেন সুতরাং এর পরের ইতিহাস সোজা। হিটলার ও নাৎসী দলকে বাধা দেওয়ার ও প্রতিরোধ করার আর কিছু রহিল না। একে-একে তিনি জার্মানীর দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিতে লাগিলেন। হিটলারের ব্যক্তিত্বের দ্বারা ইউরোপীয় বণিক ও বণিক ... এক সুবৃহৎ অংশ মোহাচ্ছন্ন হইয়া ... এমন কি যে ইতালীর ডি... মুসোলিনী এতদিন সিংহের মত ... করিতেছিলেন রোমক সাম্রাজ্য ... প্রতিষ্ঠার আশায় তিনি পর্যন্ত ... পড়িয়া গেলেন।

অত্যন্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা ... পারে যে, হিটলার বিনা রক্তপাতে ... মাত্র হুমকীর দ্বারা এবং সম্ভাব... যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া জার্মানীর পাশ্ব... রাজ্যগুলি দখল করিয়া ফেলিলেন। ... সালে রাইনল্যাণ্ড হইতে ১৯৩৮ ... চেকোশ্লাভাকিয়া পর্যন্ত হিটলারের ... তলায় আসিয়া গেল। জার্মানী, জাপ... ইতালী কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ প... হইল, সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ভ... পড়িল, তারা কমিন্টার্ন বিরোধী চু... স্বাক্ষর করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বি... জোট পাকাইল এবং ইউরোপ, এশি... আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তারের নীতি অ... করিতে লাগিল। হিটলার ভার্সাই ... লোকার্ণো চুক্তি, কেলগ চুক্তি ইত্যাদি ... আন্তর্জাতিক সন্ধি বাতিল করিয়া ... এবং জার্মানীকে এক সর্বগ্রাসী ... যুদ্ধের দিকে টানিয়া নিয়া গেলেন। ... মধ্যে ১৯৩৭ সালে জাপান পুনরায় ... আক্রমণ করিল, ১৯৩৬—৩৯ সালে ... জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক গ... অনুষ্ঠিত হইল, ১৯৩৮ সালে মি... চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং পরের ... এপ্রিল মাসে মুসোলিনী আলবানিয়া ... করিলেন। এবং তারপর ১৯৩৯ ... আগস্ট মাসে অকস্মাৎ হিটলার ঐতিহ... রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ... করিলেন। ইহাই ছিল তাঁর সেঁ... ডিপ্লোম্যাসির সবচেয়ে চতুরতাপূর্ণ ... ইহার দ্বারা তিনি দুই রণাঙ্গনের ... হইতে মুক্তি পাইলেন। ইঙ্গ-ফরাসী ... বর্গ কমিউনিজমের আশঙ্কায় হিট... কোন বাধা দিলেন না। একটিমাত্র ... এবং সেই একক ব্যক্তির অধিনা... ইউরোপীয় মহাদেশ ক্রমে ১৯৩৯ ... ১লা সেপ্টেম্বরের প্রান্তসীমায় ... দাঁড়াইল। পৃথিবী যেন নিঃশব্দ উৎ... হিটলারী বিভীষিকার জন্য অ... করিতেছিল।

(ক্রম...

১৯৩৩ সালের পর ইউরোপীয় ... নীতির ঘূর্ণাবর্ত ও ঘটনাবলী প... অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃতরূপে আ... হইয়াছে। এখানে ১৯৩৯ সাল ... ইতিহাসের প্রধান-প্রধান ঘটনাগুলির ... করা হইল মাত্র — লেখক।

বিজ্ঞানের কথা

স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা

নিচে কতকগুলো সংখ্যা, কতকগুলো অক্ষর ও কতকগুলো শব্দ লাইনে লাইনে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হতে পারে।

সংখ্যা

৩ ৮ ১ ৭ ২ ৫
৬ ২ ৫ ১ ৮ ৪ ৯
৭ ৪ ১ ৩ ৬ ৯ ২ ৫
৫ ৯ ৪ ৬ ৩ ৮ ৭ ১ ২
৪ ০ ৩ ৭ ২ ৯ ৬ ১ ৮ ৫

অক্ষর

ক ল ব হ
জ চ ম ভ স
ক ম র প গ জ
ম ক ট হ ল ভ স
জ ক স গ ণ র ক ট
র আ ব ক হ ক স ভ ল

শব্দ

পাত্র ভেড়া কাঁচা
বিড়াল বিছানা ঘড়ি আকাশ
চামড়া বই ফল চেয়ার দোকান
কাপড় ব্যাঙ্ক কাপ কুকুর ঘাস ঘণ্টা
কাদা রঙ ঝাঁক কাঁটা উঁচু কন্যা বন্দুক
ভাড়া বালক আগুন টনক কলম পেশা সময় ঘোড়া

সংখ্যা দিয়ে শুরু করতে হবে। সবশুদ্ধ পাঁচটি লাইন। প্রথম লাইনে পাঁচটি একক সংখ্যা। তার পরে একটি করে বাড়তে বাড়তে শেষ লাইনে দশটি। এক-একটি লাইন এক-এক করে পড়তে হবে, প্রতিটি সংখ্যার জন্যে এক সেকেণ্ড করে সময় দিয়ে। লাইনটি পড়া হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ লাইনটি কাগজে লেখার চেষ্টা করতে হবে। একটি লাইন হয়ে গেলে পরের লাইন। পরের পর পাঁচটি লাইন। একবারের বেশি পড়া চলবে না। সবচেয়ে ভালো হয় অন্য কেউ পড়ে শোনালে। লেখার সময়ে পুরোপুরি স্মৃতিশক্তির ওপরে নির্ভর করতে হবে।

অক্ষরের বেলায় ছ'টি লাইন। শুরু চারটি দিয়ে, শেষ ন'টি দিয়ে। একইভাবে এক-একটি লাইন ধরে পড়তে হবে। এক-এক সেকেণ্ডে এক-একটি অক্ষর। প্রতিটি লাইন

শব্দের বেলাতেও ছ'টি লাইন। শুরুতে তিন, শেষে আট। পড়তে হবে প্রতিটি অক্ষরের জন্যে দু সেকেণ্ড সময় নিয়ে। এক-একটি লাইন পড়ার শেষে লেখা।

পরবর্তী পর্যায়ে লেখা আর নয়। প্রতিটি লাইন আবার নতুন করে মনে করার চেষ্টা করা। কতক্ষণ পর্যন্ত মনে থাকে তা দেখা।

এবারে সংখ্যা বা অক্ষর বা শব্দ ছেড়ে বাক্যে আসা যেতে পারে। নিচে খবরের কাগজ থেকে চারটি বাক্য তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রথম বাক্যে ১৪টি শব্দ, দ্বিতীয় বাক্যে ১৭টি, তৃতীয় বাক্যে ২৫টি, চতুর্থ বাক্যে ৩৯টি।

(১) পূর্ব বাঙলায়, যাকে এখন আমরা বাংলাদেশ বলি, আজ যা ঘটছে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

(২) পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী আমরা, রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পুরুষ আমরা, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না।

(৩) ঘন ঘন বোলার বদল ও ফিল্ডিং বদল করে সোবার্স এক সর্বাত্মক পরিকল্পনা নিলেও নিজের ওপর অগাধ আস্থা রেখে গাভাস্কার একার হাতেই সার্থক লড়াই চালিয়ে যান।

(৪) যে উদ্যোগী ছেলেটি অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর পাড়ায় একখানি চা-এর কিংবা পান-বিড়ির অথবা মনিহারী দোকান খুলে বসলেন, তারপর তাঁর বুসুম ফ্রেণ্ডরা এমন ধারের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে দিলেন যে, অবিলম্বে দেখা গেল, তাঁর নগদ বিক্রির চাইতে ধারের বিক্রিরই পরিমাণ অনেক

প্রত্যেক বাক্য একবার পড়ে নিয়ে তারপরে লিখতে হবে, পুরোপুরি স্মৃতির ওপরে নির্ভর করে।

কোনো অর্থ হয় না এমন বাক্য নিয়েও এই একই পরীক্ষা চলতে পারে। যেমন নিচের বাক্যটি

উজ্জ্বল পশমী অরণ্য দ্রুত নিদ্রা যায়

অন্যথা যথার্থ কুটিরে।

কতগুলো সংখ্যা আপনি সঠিকভাবে মনে করতে পেরেছেন তা থেকে পাওয়া যাচ্ছে আপনার স্মৃতিশক্তির মাত্রা। সাধারণত দেখা যায় ছ' সংখ্যার একটি টেলিফোন নম্বর একবার শুনে লিখতে অনেকেই ভুল করে বসে। তবে পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে সাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন একজন বয়স্ক মানুষ সাতটি পর্যন্ত সংখ্যা নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারে। আপনি যদি সাতটিরও বেশি পেরে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

অক্ষর ও শব্দের বেলায় কিন্তু স্মৃতিতে ধরে রাখার ক্ষমতা আরো কম। অক্ষরের বেলায় ছ'টি, শব্দের বেলায় পাঁচটি। আপনি যদি আরো বেশিসংখ্যক ধরে রাখতে পেরে থাকেন তাহলে আপনার স্মৃতিশক্তি সাধারণের চেয়ে উচ্চতর মাত্রার।

সংখ্যার বেলায় অপেক্ষাকৃত বেশিসংখ্যক ধরা পড়ার কারণ, প্রত্যেকটি সংখ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্যসূচক ধ্বনি। '১' এই সংখ্যাটি

শোনার পরে যদি শেষের 'ক্' ধ্বনিটুকুর রেশমাত্র কানে লেগে থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই সংখ্যাটি বলে দেওয়া চলে, কেননা অন্য কোনো সংখ্যার উচ্চারণ 'ক্' দিয়ে শেষ নয়। একই কথা অন্য প্রত্যেকটি সংখ্যা সম্পর্কে—শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত। কিন্তু যখন উচ্চারণ করা হয় 'ব' বা 'ভ' তখন কিন্তু ধ্বনিগত পার্থক্য খুবই কম। শব্দের বেলাতেও একই কথা।

অন্যদিকে শব্দ মনে রাখা যতোই শক্ত হোক, বাক্যের বেলায় কিন্তু দেখা যাবে, সাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন একজন মানুষ অনায়াসেই ১৫ থেকে ১৮টি শব্দের একটি বাক্য মনে রাখতে পারে। ২০ থেকে ২৫টি শব্দের বাক্য মনে রাখা তো রীতিমতো কৃতিত্বের পরিচয়। বাক্যের বেলায় স্মৃতি-শক্তির মাত্রা বেশি হওয়ার কারণ, বাক্যের অর্থপূর্ণতা। ব্যাকরণ-জ্ঞানও এক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক। যে কারণে পাঁচটির বেশি শব্দ মনে রাখা না গেলেও ন'টি শব্দ সম্বলিত অর্থহীন বাক্য কিন্তু সহজেই ধরা পড়ে।

এবারে শেষ আরেকটি পরীক্ষা।

নিচে অনেকগুলো শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি শব্দের জন্যে দু সেকেন্ড সময় দিয়ে পুরো তালিকাটি পড়তে হবে, তারপরে পুরো তালিকাটি মনে করার চেষ্টা করতে হবে। যেমনভাবে লেখা হয়েছে পর-পর ঠিক তেমনিভাবে না হলেও চলবে, সব মিলিয়ে পুরো তালিকাটি, আগেরটি পরে বা পরেরটি আগে হলেও ক্ষতি নেই।

তালিকা

সভা মাখন কাহিনী বাজার বিবাহ
ফুল তুলো চিঠি হলুদ নোঙর
গ্রাম বন্দর চাকুরি বাঘ ছাত্র
প্রাতরাশ উদর ছাড়পত্র টেবিল নাবিক

নিচের তালিকায় জোড়ায় জোড়ায় শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জোড়ায় একটি শব্দ পূর্ববর্তী তালিকা থেকে নেওয়া। কোনটি?

মার্বেল তুলো ।। গ্রাম পদ্ম
সভা নোঙর ।। কাকা টেবিল
গাধা ফুল ।। নাবিক মাকড়সা
ছাড়পত্র প্রভু ।। নদী কাহিনী
শিল্পী মাখন ।। খাল বন্দর
নোঙর মুক্তো ।। কমলা চাকুরি
চিঠি চিনি ।। বাঘ বাকল
বাগান উদর ।। বিবাহ আপেল
বিষয় তুলো ।। চিঠি খাতা
সভা ছাত্র ।। ছাড়পত্র সলিল
তালিকা ছাড়পত্র ।। বিষয় উদর
প্রাতরাশ সন্দেশ ।। বাঘ বাম

উপরের একটানা তালিকার শেষের দিকের গোটা তিন-চার শব্দ এই জোড়গুলো তালিকা থেকে চিনে নিতে পারা শক্ত নয়। স্মৃতিশক্তির আসল পরীক্ষা হবে গোড়ার দিকের শব্দগুলো চিনে নিতে পারায়। স্মৃতিশক্তি যাঁর অসাধারণ তিনি এমনি শব্দ গোটা ছয়েক চিনে নিতে পারবেন। বয়স যতো বাড়ে শব্দ চেনার ক্ষমতা ততো কমে। যাটের কোঠা যাঁরা পেরিয়েছেন তাঁরা অনেক সময়ে দুটির বেশি শব্দ ধরে রাখতে পারেন না।

মানুষের স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটাই এখনো পর্যন্ত খানিকটা গোলমেলে। এই অর্থে গোলমেলে যে বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যায় ব্যাপারটাকে এখনো পর্যন্ত ধরা যায়নি। বিশ্বে এমন মানুষের সন্ধান একাধিক পাওয়া গিয়েছে যাঁরা সম্পূর্ণ অজানা বিদেশী ভাষায় একটি কবিতা একবার মাত্র শুনে গড়গড় করে মুখস্ত বলে যেতে পারেন—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, কিংবা এমনকি শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত। যাঁরা একটি ছবি একবার মাত্র দেখে পরে স্মৃতি থেকে এমন খুঁটিয়ে উদ্ধার করতে পারেন—সম্পূর্ণ অজানা বিদেশী ভাষায় লেখা সাইনবোর্ডের লেখাগুলো পর্যন্ত—যেন পুরো ছবিটি চোখের সামনে মেলা রয়েছে। আমাদের দেশেও এমন ঘটনা ঘটেছে যে ইংরেজি-না-জানা ব্যক্তি দুজন গোরা সৈন্যের কথোপকথন একবারমাত্র শুনে পরে হুবহু তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। অন্যদিকে অল্প-দিনের অদর্শনেই পরিচিত ব্যক্তির নাম ভুলে যাওয়া, এমনকি চেহারাও, এমন ঘটনা তো আকছার ঘটে থাকে। অদর্শনেরও দরকার নেই, নিত্য যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বা যার কথা শোনা যাচ্ছে, কোনো একটা উপলক্ষে তার নাম স্মরণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করতে হয় এই মানুষটির নামও স্মৃতি থেকে বেমালুম মুছে গিয়েছে যেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুতেই আর মনে করা যায় না। এই নিদারুণ অস্বস্তির অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে।

যে-কেউ নিজের অতীত জীবনের দিকে তাকালেও উপলব্ধি করবেন স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটা প্রকৃতই গোলমেলে। বহু বহু আগেকার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর একটি ঘটনা হয়তো স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু জীবনের-মোড়-ফেরানো অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা সহজে মনে পড়তে চায় না।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে একটি চৌম্বক ড্রাম থাকে যেটিকে বলা হয় তার স্মৃতিভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে একবারটি যা জমা পড়ে তার অবলুপ্তি নেই। নির্ভুলভাবে সেটি আবার যে-কোনো সময়ে পাঠ করা যেতে পারে। ইচ্ছে করে মুছে না ফেলা পর্যন্ত এই জমার ভাণ্ডার অক্ষয়। একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার অবশ্যই এমনি একটি চৌম্বক ড্রাম নয়। এই ভাণ্ডারের জমার ঘরে সমস্ত ঘটনা একরকম দাগ ফেলে না. একই ঘটনা সর্বক্ষেত্রে একই রকম দাগ ফেলে তাও নয়, আদৌ দাগ ফেলেছে কিনা অনেক সময়ে তাও বোঝা যায় না। যে এমন হয় তার জবাব এখনো পুরোপুরি দেওয়া সম্ভব নয়। একালের বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করছেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটি গত চব্বিশ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান বছরের তৃতীয় সংখ্যাটি (মার্চ, ১৯৭১) রামন স্মৃতি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত। নিবেদনে বলা হয়েছে 'আচার্য রামনের বিজ্ঞান-সাধনা, বিশেষতঃ শব্দ ও আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক ও যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহের বিবরণ এবং বিজ্ঞানের ঐ দুইটি শাখা সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় পরিবেশিত হইয়াছে। ...লেসার আবিষ্কারের পর রামন এফেক্টের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে—এই বিষয়ে গবেষণার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাম্প্রতিককালে প্লাজমাতেও রামন এফেক্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যায় এই বিষয়গুলি এবং আচার্য রামন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামন গবেষণা মন্দির সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।'

নিবেদনে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ হাতের প্রবন্ধ আলোচ্য সংখ্যাটিতে পাওয়া যাবে। প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন সুকুমারচন্দ্র সরকার, সতীশ-রঞ্জন খাস্তগীর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, জয়ন্ত বসু, কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যেন্দু-বিকাশ কর, সুনীলকুমার সিংহ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার ঘোষ, ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও প্রভাসচন্দ্র কর। এঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা আচার্য রামনের সহযোগী ও সহকর্মী, এমন কয়েকজন যাঁরা আচার্য রামনের ছাত্র। তার চেয়েও বড়ো কথা, প্রায় সকলেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক বিজ্ঞানী বা অধ্যাপক। ফলে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়ে লেখা সাধারণ পাঠকদের জন্যে এই প্রবন্ধগুলি একদিকে জানবার বিষয়ে যেমন যথাযথ, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপনায় তেমনি প্রাঞ্জল। আচার্য রামনের গবেষণা ও জীবন সম্পর্কে যাঁরা ধারণা করতে চান তাঁরা নির্ভয়ে এই একটি সংখ্যার আশ্রয় নিতে পারেন। পত্রিকায় একটি বিভাগের নাম 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর'। এই বিভাগেও আচার্য রামনকেই নানাভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। লিখেছেন সুধাংশু-প্রকাশ চৌধুরী, রাসবিহারী রায় ও শ্যামসুন্দর দে। বিভাগটি সুপরিকল্পিত ও সুলিখিত। সব মিলিয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্তমান সংখ্যাটির জন্যে সম্পাদক গোপাল-চন্দ্র ভট্টাচার্য বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদ অবশ্যই পাবেন। মাত্র ৬৪টি পৃষ্ঠার মধ্যে আচার্য রামনের মতো বিজ্ঞানীর এমন একটি সর্বাঙ্গীণ পরিচয় তুলে ধরার মধ্যে সম্পাদনার কৃতিত্ব কম নয়।

—অয়স্কান্ত

রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার পল্লী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

...মাদের প্রতিদিনের প্রাণযাত্রায় এই ...পৃথিবীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র ...সচরাচর স্পর্শ করি, সেই কারণেই ...র জীবনের অভিজ্ঞতা সেই সামান্য. ...ল থেকেই সংগৃহীত হয়ে আমাদের ... ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। একান্ত ...রে প্রয়োজনে যে জীবন শুধুমাত্র ...র বাঁচবার রসদ সংগ্রহে ব্যাপৃত, তার ...ন সীমিত থাকে কলকোলাহলময় ...র কর্মব্যস্ত সংসারের একটি অংশে। সে পৃথিবী মানুষের ...কোলাতে মুখর, কর্মের প্রেরণায় ও ...র চঞ্চল, উত্তপ্ত ও উন্মত্ত; তার ... পরিমাপ হয় অর্থমূল্যে। সে অতি বিচিত্র, অতি দুর্বার, অতি ...।

...ন্তু আমাদের ব্যক্তিগত প্রাণযাত্রার ...র ঠিক ওপারেই, কখনও বা তারই ... আর এক প্রাণলীলার জগৎ সুদূর ...র নক্ষত্রলোক পর্যন্ত প্রসারিত। ...মাদের প্রতিদিনের কাজে বড় একটা ...না। তাই তার অস্তিত্বই আমরা ভুলে ...শুধু তাই নয়, মর্ত্যলোকের মৃত্তিকা ... দূরান্ত জ্যোতিষ্কলোক পর্যন্ত ... এই জগৎ যেন আমাদের তার ... সম্পর্কে জানতেও দিতে চায় না। ...ধ্যে নিত্যকালের প্রাণলীলা বিধৃত, ...ন্তব্যাপ্ত, অথচ সে একান্ত নিঃশব্দ, ...ও মূক। সে যেন আমাদের একান্ত ...থেকেও অহরহ নিজের অস্তিত্বকে ...করবার জন্যই পাষাণ মূর্তির মত ...নিশ্চল ও প্রচ্ছন্ন রেখেছে। তার ...চকিত অনভ্যস্ত দৃষ্টি পড়লে মনে ...পাষাণ পদার্থমাত্র।

...ন্তু সেই অনন্ত-প্রসারিত নিত্য-...র প্রাণলীলা আমাদের জীবনযাত্রার ...চঞ্চল ও স্পন্দমান। প্রথমটির সঙ্গে ...টি অর্থাৎ আমাদের চারিপাশের ... কর্মচঞ্চল পৃথিবীর সঙ্গে তার ...র অজানিত, নির্বাক পৃথিবী ...গে যুক্ত হলে তবেই পৃথিবীর ...চেতনায় ব্রহ্মাণ্ডের মূর্তিটি সম্পূর্ণ ... মানব-চেতনার সম্মুখে এই সৃষ্টি ...থেকে অনন্তলোক পর্যন্ত প্রসারিত ... সবুজ ফুল-তোলা, জ্যোতির্বিন্দুর ...বসানো নীলাভ্রের মতো রঙীন, অনন্ত ...র এক যবনিকার মত, যার প্রান্তে ... এই মর্ত্যজীবনের মুখরতা ও ... জরির পাড়ের মত বসানো।

মানুষের মুখরতা আর চাঞ্চল্যের পাড়টি সেই অনন্ত নৈঃশব্দের যবনিকা থেকে পৃথক করে দেখলে কোনটিই সৃষ্টির সম্পূর্ণ মূর্তি হবে না। দুইকে এক করে একসঙ্গে দেখলে তবেই দুইয়ের পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি হতে পারে।

অথচ মানব-চেতনায় এই দুইকে পৃথক করে দেখারই রেওয়াজ। যাঁরা এই অস্তিত্বের আস্বাদ আমাদের কাছে চিরকালের সামগ্রী করে বহন করে নিয়ে আসেন, সেই শিল্পীদের মধ্যেও কেউবা এই পাড়ের কথা বলেছেন, কদাচিৎ কেউবা বলেছেন এই পাড়হীন কাপড়খানির কথা, এই দুই ভিন্নের আস্বাদ ভিন্নভাবেই আমাদের দিয়েছেন; কেউ এটা দিয়েছেন, কেউবা অন্যটা দিয়েছেন। কেউবা এই মুখরতা ও চঞ্চলতার কবি, কেউবা এই নৈশব্দের কাব্য রচনা করেছেন। কেউবা কবি মানব-হৃদয়ের বা মানব-প্রবৃত্তির, কেউবা কবি প্রকৃতি-চরিত্রের।

তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে মানব-হৃদয়ের এক কবি-কথাশিল্পীর রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

> "বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশী উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশী হইল। বলিল, 'কি কি নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফেলা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমীর চান্দ উঠবো, আলোয় পথটুকু পার হমু।'
>
> পাঁচী পুঁটলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উঠবো পাঁচী'।
>
> পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'
>
> 'সদর। ঘাটে না চুরি করমু। বিয়ানে ছিপতিপুরের জংলার মধ্যি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।'
>
> পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল 'পায়েনি তুই ব্যথা পাস পাঁচী?'
>
> 'হ, ব্যথা জানায়।'
>
> 'পিঠে চাপামু?'
>
> 'পারবি ক্যান?'
>
> 'পারুম, আয়।'
>
> ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথে দু দিকে ধানের খেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।"

(প্রাগৈতিহাসিক : মানিক বন্দোপাধ্যায়)

এ কাব্য একান্তভাবে প্রকৃতি-নিরপেক্ষ মানব-হৃদয়ের। একটি মানব-দম্পতির একান্ত দেহের আধারে রচিত এক তীব্র তীক্ষ্ণ কাব্য-কাহিনী। পৃথিবীতে মানব-হৃদয়ের শিল্পী ও কবির সংখ্যাই সমধিক। তার কারণও একান্ত স্পষ্ট। চারিপাশের ছড়ানো মানব-জীবন থেকেই তাঁরা শিল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তার বাইরে তাকাবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি কোনোটাই হয় নি তাঁদের।

আর এক শ্রেণীর স্রষ্টা আছেন যাঁরা ধাতুগতভাবে মানব-জীবনের প্রাণচঞ্চলতা, মুখরতা, কোলাহল ও জনারণ্যের মধ্যে অবস্থান করেও এই সবকিছুকে ছাড়িয়ে বা আত্মিক সম্পর্কশূন্য হয়ে এই প্রাণ-চঞ্চলতা, কোলাহল ও মুখরতার বাইরে যে নিঃশব্দ নির্বাক মৌন পৃথিবী তারই সঙ্গী, তারই অধিবাসী। এ যেন হয়েছেন তাঁরা বিচিত্র ভাবে—জন্মসূত্রে। তাঁরা আপনার মনের ও প্রাণের স্থায়ী আবাস-স্থল আবিষ্কার করেন ওই বিপুল-বিস্তার মৌন নির্বাকের মধ্যে। এ এক ধরনের মানব-প্রবৃত্তির উজানে বয়ে যাওয়া যেন। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এমনি দুজন শিল্পীর রচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি আপনাদের আস্বাদনের জন্য পরিবেশন করছি :

> "এতক্ষণ তাদের বনে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখী ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট নিঃশব্দ, শান্ত বৈকাল—সেই হলদে পাখীটা আজও আসিয়া পাঁচিলের উপরের কাঁঠাল ডালটাতে সেই রকমই বসে। মায়ের হাতে পোঁতা লেবু চারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে......
>
> আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁঝ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকা ডাকিবে, গভীর রাতে পিছনের ঘন বনে জগডুমুর গাছে লক্ষ্মী-

পেঁচার রব শোনা যাইবে।......কেহ কোনদিন সে দিক মাড়াইবে না; গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া, মায়ের সে লেবু-গাছটার সন্ধান কেহ কোনদিন জানিবে না, ওড়্-কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, ফুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলুদে-ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।”

(পথের পাঁচালী :
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

অবস্থান করেও তাঁর দৃষ্টি এই মানব-লোকের দ্বারা মাত্র সীমাবদ্ধ হয়নি, তা স্থির ও ধ্রুবভাবেই চিরকাল যুক্ত ছিল কলরবমুখরিত জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে দূরতম জ্যোতিষ্কলোকের মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্যন্ত। তাই তাঁর পৃথিবী অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এবং সেই অনন্ত প্রসারিত সংসারকে নিত্যউৎসবময় রূপে নিরীক্ষণও করতেন তাঁর বিচিত্র দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর অগণিত গানে জ্যোতিষ্কলোকের অজস্র, একান্ত সহজ উপমা এই অভিজ্ঞতার স্বাক্ষ্য বহন করছে। এই নিত্যউৎসবময় সংসারে,

“সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা;
খড় মুখে নিয়ে এক শালিক যেতেছে উড়ে চুপে;
গোরুর গাড়ীটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে;

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।”

(রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ দাশ)

এই দুই ক্ষেত্রে কোলাহল-মুখর মানব-জীবনের বাইরে পরিকীর্ণ যে নিঃশব্দ পৃথিবী, মাটি জল গাছপালা থেকে আকাশ ও জ্যোতির্লোক পর্যন্ত প্রসারিত যে নিঃশব্দ অস্তিত্ব, তার কাব্যই শুধু এঁরা রচনা করেন নি, এঁদের রচনার চারিত্র বিচার করলে দেখা যাবে যে এঁরা এরই মধ্যে প্রাণের স্থায়ী ও অনন্ত আরাম আস্বাদ করেছেন। যে মানব-গৃহে এঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই মানব-গৃহে মানবী-জননীর স্নেহে-সমাদরে তাঁদের স্থূল দেহটি লালিত হয়েছে, কিন্তু মন ও প্রাণটির পুনর্জন্ম হয়েছে এই অনন্ত রূপ-ময়ী, মূক, অবজ্ঞাত, ও অন্য-অজ্ঞাত প্রকৃতির সূতিকাগৃহে, এবং তারই স্নেহে তাঁদের মন ও প্রাণ লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে তাঁরা প্রাণের এ জন্মের আরাম ও জন্ম-জন্মান্তরের ভুলে-যাওয়া চিরস্থায়ী আবাসকে খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু তাতে অন্য দিকটি বাদ পড়ে গিয়েছে। কোলাহলময় মানব-লোককে তাঁরা পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন, কেবল মানব-লোক থেকে, প্রাত্যহিক জীবন থেকে মানব-চিত্তের ও মানব-চরিত্রের সব ফেলে দিয়ে শুধু সেই সব বৃত্তি ও আবেগ বা অভিজ্ঞতা-গুলিকেই নিয়ে গিয়েছেন যা তাঁদের আত্মিক আবাস অলঙ্করণ ও রঞ্জনের প্রয়োজনে প্রয়োজন। বাকীগুলিকে বর্জন করে গিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের মহাকবির দৃষ্টি ভিন্ন-শ্রেণীর। তিনি এই কোলাহলমুখর মানব-জীবনের মাঝখানেই জন্মেছিলেন, এই-খানেই, এই ভূমিতেই আপনার জীবনব্যাপী সাধনার স্থির আসন পেতেছিলেন এবং এই ভূমিতে অবস্থান করেই সমগ্রের সাধনা করেছিলেন। কোলাহলমুখরতার মধ্যে

'সুন্দর ভুবনের মাঝখানে, মানবের মাঝে' তিনি বসে এই অনন্তপ্রসারিত নিত্য-উৎসবের আনন্দধারা পান করছেন।

তাঁর এই আনন্দআস্বাদ, আমার যত-দূর মনে হয়েছে, মোটামুটি দুই ধরনের মনোভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এক প্রত্যক্ষ রূপকে আস্বাদের আনন্দ-অভিজ্ঞতা, অন্যটি রূপকে অবলম্বন করে সৌন্দর্যমাধুরীলব্ধ ধ্যানের তন্ময়তা থেকে আনন্দ-আস্বাদের অভিজ্ঞতা। চারত্রে প্রথমটি প্রধানত লৌকিক, দ্বিতীয়টি চরিত্রে মূলত আত্মিক। লৌকিক রূপময়তায় আত্মিক স্পর্শ লেগেছে কোথাও, আবার কোথাও আনন্দময়তা রূপকে অবলম্বন করে মূর্ত হয়ে উঠে আত্মাকে ধ্যানমগ্ন করেছে। এই আনন্দাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ। এই রূপপ্রধান ও আনন্দপ্রধান স্বরূপের দুটি নমুনা আপনাদের আস্বাদের জন্য পরি-বেশন করছি :

“আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্‌বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে ভাঙা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটির;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো।”

(সুখ : চিত্রা)

“পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে
ছন্দে আর মিলে।

বাতাসে করায় স্নান শরতের
রৌদ্রের সোনালি
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে
বেগুনি মৌমাছি
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে
নিঃশব্দ করতালি
(১৪নং কবিতা : জন্ম

প্রথমটিতে পরিপূর্ণ রূপা
আনন্দের স্পর্শ বহন করে প্রকাশিত
দ্বিতীয়টিতে আনন্দময়তা শরতের সো
আলোয় স্নাত হলদে ফুলের মতই প্র
হয়ে উঠেছে।

বর্তমান আলোচনায় আমার আ
চনায় বিষয় পল্লীপ্রকৃতি; সেই ক
আমি আমার বক্তব্য পল্লীপ্রকৃতির রূ
প্রকাশের আলোচনার মধ্যেই সীমা
রাখছি।

পূর্বে বলেছি, মহাকবি কোলাহলমু
কর্মচঞ্চল মানবজীবনের মাঝখানে জীব
ধ্রুব আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই অ
বাস্তব ও চঞ্চল—মুখর জীবনের বাহ
নিত্যকাল অনন্ত-প্রসারিত নিঃশব্দ নি
জীবনের সঙ্গে চিরকাল আপনার ক
চেতনার মধ্যে গ্রন্থিবদ্ধ ছিলেন।
কারণে প্রকৃতি-অভিমুখী ও প্রকৃতি-প্রে
অন্যান্য শিল্পীদের মত মানব-অস্ত
নিরপেক্ষ প্রকৃতির মূর্তি ও প্রেম প্রকা
হয় নি। তাঁর প্রকৃতির ধ্যানের মাঝ
সবসময় মানুষের ধ্রুব আসন পাতা থাক
প্রকৃতির মূর্তি তাঁর শিল্পে তাই স
মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধনে য
এই বোধকে ও প্রবণতাকে তিনি তাঁর ক
জীবনের প্রায় আরম্ভেই আবিষ্কার ক
ছিলেন। তাঁর তরুণ কালের রচনা কড়ি
কোমলের প্রথম কবিতাটিতে তিনি আপ
কবিচিত্তের প্রবণতা আবিষ্কার
উচ্চারণ করেছিলেন :

“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।”
(প্রাণ : কড়ি ও কোম

পরিপূর্ণ মানব-অস্তিত্বের যে ধ্যান
বোধ তিনি লাভ করেছিলেন তাতে নি
কবিশক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে দি
উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষকে
দিয়ে প্রকৃতি বিগ্রহহীন শূন্য সিংহাস
মত; আর প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে শুধু
মানব-অস্তিত্ব সিংহাসন-মহিমাহীন বিগ্র
মত। তাই সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্য শোভা
মহিমামণ্ডিত প্রকৃতির সিংহাসনে তি
মানব-বিগ্রহকে স্থাপন করেছিলেন। দুই
একত্রিত ও যুক্ত হলে তবেই মান
অস্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। মহাকবি
শিল্প-চেতনায় এ কোন পর্বে পরিকল্প
নয়। এ বোধটি প্রথম থেকেই তাঁর কা
চেতনায় নিহিত ছিল; প্রথমে অস্ফ
অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তা পরিস্ফ
হয়ে দিনে দিনে প্রকাশিত হয়েছে।

...কালব্যাপী শিল্প-সাধনার মধ্যে তার ...ন সুস্পষ্ট। কড়ি ও কোমল থেকে ...বী পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘকালের মধ্যে ...প্রকাশ লক্ষ্যণীয় ঃ

(১)

...দিন পরে আজি মেঘ গেল চলে,
...রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।
...শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি ওঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
...যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ-বিদ্যুৎ-আলো নাচে।
...ই সরোবরতীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
...ই মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
....

...বিতেছি মনে মনে কোথা কোন্ উপবনে
...কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
...খে তার অশ্রুরেখা, একটু গেছে কি দেখা
...ছেয়েছে চরণ দুখানি।"
(যোগিয়া ঃ কড়ি ও কোমল)
১৮৮৬।১২৯৩

(২)

...লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
...ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দছবি
...যুগে যুগে ঢাকা ছিল
অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।
সেই মতো আমার স্বপনে
...কোনো দূর যুগান্তরে বসন্ত কাননে
কোনো এক কোণে
...এক বেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি—
...এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।"
(১৪ সংখ্যক কবিতা ঃ বলাকা ১৩২২)

(৩)

...দিনের সেই বাণী
কানাকানি
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা,
...জনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
...তারপরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
...দেখাশুনা হল হারা
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।"
(পূর্ণতা ঃ পূরবী ১৩৩১)

কবি-জীবনের প্রথম কাল থেকে একান্ত পরিণত কবি-কর্মের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত মহাকবির কবি-কর্মের আলোচনা করলে দেখা যাবে, যেসব কবিতায় তিনি পল্লীজীবনের লৌকিক চিত্র এঁকেছেন—সে অভিজ্ঞতা, বলাবাহুল্য, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই উন্নততর আনন্দ-আস্বাদের উচ্চ ভূমিতে উত্তরিত হয়েছে—তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কল্পনার একটি বিশেষ গড়নের আভাস পাওয়া যায়। অজস্র ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য-সম্ভারের যে রাশি-রাশি সম্পদ প্রকৃতি আমাদের অগোচরে একান্ত নিঃশব্দে আমাদের চতুর্দিকে থরে-থরে নিত্যকাল ধরে অম্লান উপহারের সামগ্রী হিসাবে সজ্জিত করে আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করছে, তারই মধ্যের কোন সামগ্রী কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। কবি সেই উপকরণ দিয়ে আপনার কল্পনার দোলমঞ্চ রচনা আরম্ভ করলেন একান্ত চারু রুচিতে। অপরূপ দোলমঞ্চ রচিত হয়ে প্রায় সম্পূর্ণ হল; কিন্তু পরিপূর্ণ হল না; সেই মুহূর্তে সেই সজ্জিত মঞ্চের নেপথ্য থেকে হাত ধরাধরি করে এসে ঢুকল মানুষ আর মানবী, এসে তারা দুজনে বসল সেই মঞ্চের মাঝখানে; অমনি কবির কল্পনায়, পাঠকের হৃদয়ে গান বেজে উঠল; রসাপ্লুতচিত্ত পাঠক পরিতৃপ্ত হয়ে বলে উঠল, এইবার পরিপূর্ণ হয়েছে। মানুষে প্রকৃতিতে, প্রেমে সৌন্দর্যে মাখামাখি হয়ে পরম স্রষ্টার অমূর্ত পরিকল্পনাটিকে মর্তলোকে পূর্ণ প্রকাশিত করে তুলল।

রবীন্দ্র প্রতিভার এইটি অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা। সৌভাগ্যক্রমে — সৌভাগ্যক্রমেই বলব, কারণ একে সৌভাগ্য ছাড়া আর কি বলতে পারি—মহাকবি জীবন সম্পর্কে এই সমগ্র দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সাধারণত অধিকাংশ শিল্পীর জীবন ও দৃষ্টি, সাধারণ মানুষের মতই, খণ্ডিত হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত অভিজ্ঞতা মানব-লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বলে অধিকাংশ শিল্পী মানব-জীবনের কবি ও কথাকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। আবার কেউ-কেউ বা প্রবণতা গুণে প্রকৃতির রাজ্যেই নিজের আবাস সংগ্রহ করে নেন। যাঁরা প্রকৃতির মধ্যেই নিজের আবাস খুঁজে পান তাঁরা মানব-লোকের দিকে বড়-একটা মুখ ফেরান না; ফেরালেও সেখানকার ধুলো-মাটির রঙে রঞ্জিত না করে কাউকে তাঁরা তাঁদের ভাবরাজ্যে প্রবেশের অধিকার দেন না। মোট কথা, দুই ক্ষেত্রেই সেখানে জগৎ খণ্ডিত। মহাকবির কাছে জগৎ খণ্ডিত ছিল না; তিনি সমগ্রকেই একেবারে লাভ করেছিলেন। কবিসত্তার আবির্ভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতের সময়েই যে জগতের সঙ্গে তাঁর প্রথম শুভ-দৃষ্টি ঘটেছিল সে জগৎ মানব-লোক ও প্রকৃতি-লোক দুই মিলিয়ে সমগ্র জগৎ। আর সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে যার স্থিতি সে মানুষ। তাই তাঁর কবিদৃষ্টি যেমন সামগ্রিক তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রতিমাগঠনের সময় দেবমূর্তিটি কেন্দ্রস্থলে রেখে তার

চারিপাশে চালচিত্র করা হত, মহাকবির বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কেও তাই বলা যায়; তাঁর ভাবজগতের কেন্দ্র-স্থলে মানুষের বিগ্রহ, আর তার চারি-পাশে প্রকৃতির সৌন্দর্যময়, মহিমান্বিত সজ্জা।

যে প্রকৃতিকে মহাকবি মানব-জীবনের মত সর্বত্রই দেখেছেন, তাকে স্বদেশে দেখেছেন, বিদেশে দেখেছেন; তাকে নগরে দেখেছেন, পল্লীগ্রামে দেখেছেন। নগরে প্রধানত যেমন মানব-লোককেই পেয়েছেন তেমনি পল্লীতে প্রধানত প্রকৃতিকেই পেয়ে-ছেন। এক জায়গায় প্রধানত মানুষের সান্নিধ্য, অন্যত্র প্রধান সান্নিধ্য প্রকৃতির। পল্লী অঞ্চলে তাই মানুষও প্রকৃতির অংশ। পল্লী অঞ্চলে নির্জনবাসের কালে রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি :

> 'হেথায় তাহারে পাই কাছে—
> যত কাছে ধরাতল যত কাছে ফুলফল—
> যত কাছে বায়ু জল আছে।
> যেমন পাখির গান, যেমন জলের তান,
> যেমনি এ প্রভাতের আলো,
> যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
> তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
> যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
> শুকতারা আকাশের ধারে,
> যেমন সে অকলুষা শিশির নির্মলা উষা
> তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
> যেমন বৃষ্টির জল যেমন আকাশতল,
> সুখসুপ্তি যেমন নিশার,
> যেমন তটিনীনীর বটচ্ছায়া অটবীর
> তেমনি সে মোর আপনার।
> যেমন নয়ন ভরি অশ্রুজল পড়ে ঝরি
> তেমনি সহজ মোর গীতি:
> যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্মস্থান
> তেমনি রয়েছে তার প্রীতি।'
>
> (পল্লীগ্রাম : চৈতালি)

এ এমন এক সংসার, যা নির্মল, সুন্দর, প্রশান্ত, নম্র, সহজ এবং বহু সমস্যার অস্তিত্ব সত্ত্বেও সমস্যাহীন। এ যেন এমন এক সংসার, যেখানে 'ঈশ্বর স্বর্গে অধিষ্ঠিত আর মর্তলোকে সবই নিয়ম মত চলছে'। পল্লীগ্রামের সব সমস্যাই মহাকবি জানতেন, সেখানকার দুঃখ-দারিদ্র্য তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তা সত্ত্বেও নিত্যকালের প্রকৃতির পটে মানব-জীবনের যে নির্মল, নম্র, সহজ, প্রশান্ত নিত্যমূর্তির প্রকাশ তা পল্লীর পরিবেশে স্পষ্টতর মূর্তিতে প্রকাশিত। সৃষ্টির সর্বত্রই এ রূপের অব্যাহত প্রকাশ ঘটছে, কিন্তু সর্বত্র তাকে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে ধরা যায় না। যেখানে মানুষের প্রাণধারা অপেক্ষাকৃত কম মুখর, বেশী নির্জন, যেখানে মানব-জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ ও দৃশ্যের মিলিত অস্তিত্বকেও চিনতে পারা যায়, সেই পল্লীর মধ্যেই একে আবিষ্কার করা সহজ। দৈনন্দিন মানব-জীবন, যা সেই বিশেষ দিনটির অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে আপনার সকল লাভ-ক্ষতি, মুখরতা-স্বার্থ, কোলাহল-কলরব নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পরদিনের জন্য মানুষের হৃদয়ে কোন সঞ্চয় রেখে যায় না, সেই দৈনন্দিন মানব-জীবনের সঙ্গে মানব-জীবনের এই নিত্যমূর্তির সংযোগ না ঘটলে মানব-জীবন রসের যোগানে সরস ও পরিপূর্ণ এবং পরিপক্ব হয় না। সেই পরিপূর্ণতার সহজ উপকরণ তিনি পল্লী-প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত ভাণ্ডারের মত দেখতে পেয়েছিলেন এবং দেখাতে চেয়েছেন।

আমি যদিও মানব-জীবন ও প্রকৃতি এই দুইকে আমাদের সাধারণ ও সচরাচরের অভ্যাসবশত পৃথকভাবে বার-বার উল্লেখ করেছি, মানব-অস্তিত্বের সমগ্রতার দৃষ্টিতে এ দুই কখনও বিচ্ছিন্ন নয়; এ সর্বদা এক ও অবিভাজ্য। মহাকবির মানব-জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিও সর্বদা সেই সমগ্রতা-বোধের দ্বারা চিহ্নিত এবং তাঁর চেতনা সর্বদা এই সমগ্রতাবোধে সজাগ ছিল। দুইকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে দেখার দৃষ্টি তাঁর ছিল না। তবে জীবনের, চিন্তার ও শিল্পের প্রয়োজনবোধে সেই সমগ্রের বৃহৎ পরিধির এক-এক স্থানে এক-এক সময় চেতনার আলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই মাত্র। একের কথায় সঙ্গে অন্যের কথা স্বতঃই এসে পড়েছে, একের আলোকিত মূর্তির পশ্চাতে অন্যের অস্তিত্ব সর্বদাই আভাসিত হয়েছে। মানুষ পল্লীর পরি-বেশে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত; শুধু তাই নয়, সেখানে সে বৃহৎ প্রকৃতির অংশ মাত্র। শিল্প-কর্ম নয়, মহাকবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংশ নীচে নিবেদন করছি :

> 'শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারী বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নির্জীবের মত ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তারপর থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড় বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়—এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে-বেঁকে চলে গেছে—আমাদের বাংলা দেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে-বসে অতিযত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়—তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।'
>
> (ছিন্নপত্রাবলী : ১৫ সংখ্যক পত্র)

এ ছাড়া, মোটামুটি ১২৯৮ সাল থেকে ১৩০৭ সাল পর্যন্ত রচিত গল্পগুচ্ছের কম-বেশী পঞ্চাশটি গল্প এর সর্বশ্রেষ্ঠ চিহ্ন বহন করে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পৃথিবীর গল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে সবিনয়ে একথা বলতে পারি যে, মানুষে প্রকৃতিতে মাখামাখির এমন রসময় স্বাদু অভিজ্ঞতা সাহিত্যের বৃহৎ ও উজ্জ্বল ইতিহাসে কমই আছে। নদীমাতৃক, শ্যামল, কোমল বাংলা দেশের নিভৃত অন্তঃপুর—সেখানে একদিকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত শ্যামল শস্য প্রান্তর, অন্যদিকে বিপুল-বিস্তার বালুকারাশি, মাঝখানে কলস্বরা, খ পদ্মা ও তার বিভিন্ন জলধারার মাথার উপরে অনন্ত-বিস্তার ত নদীর দুই দিকে কোথাও দূরে ও নিকটে আম-কাঁঠাল-বট - অশথ - শি প্রাচীন বনশোভার ভিতরে ও কোটোর মধ্যে বাংলা দেশের ভোমরার মত ঘন-সন্নিবিষ্ট সমাবেশে বাংলার পল্লীগ্রাম। এই নিঃশব্দ, প্রশান্ত প্রকৃতির পটভূমি দিকে সারা আকাশ সকলের অ নির্ণিমেষে চেয়ে থাকে, সেই কোলে ছোট-ছোট পুতুলের মত সহজ ও জটিল জীবনের ছোট-ছোট কান্নার, সুখ-দুঃখের লীলা।—যা বড়ই যার উচ্চরোল এই বৃহৎ নৈঃ সামান্যই বিঘ্নিত করে, যার সুখ-দুঃ অনন্ত-বিস্তৃত উদাসীনতাকে স স্পর্শ করে। জীবনের এমন সমগ্র শিল্প-অভিজ্ঞতার মধ্যে কদাচিৎ করা যায়। এই ভীষণ নীরব, বি বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডের পটভূমিতে কোলা মানব-জীবন যেমন অনুপাতে একান্ত ও ক্ষুদ্র, এবং একান্ত তুচ্ছতা ও সত্ত্বেও যেমন তার বৈচিত্র্যের শেষ বিশাল পদ্মার দুই তীরের নিভৃত মানুষের ক্ষুদ্র, তুচ্ছ জীবনের দুঃখ-বৈচিত্র্যের তেমনি অবধি নাই। আবার ক্ষুদ্র মানুষের হৃদয়ে আবেগ ও পদ্মা মেঘনার চেয়েও দুর্বার, প্রবল দুস্তর। প্রকৃতির বিশাল ও নিভৃত ভূমিতে মানব-আবেগের এই গল্প রচনার পর দীর্ঘকাল পার হয়ে গি তারপর থেকে পদ্মার অনেক জলধারা গিয়েছে, দেশের ইতিহাসে এবং মা মনে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে; আকাশ ও মৃত্তিকার শুক্তির আবরণের বাংলা দেশের নিভৃত পল্লীজীবনের দুঃখের যে লুকনো মুক্তা মহাকবি পেটিকার আবরণের মধ্য থেকে আ জন্য উদ্ঘাটন করে গিয়েছেন তা এ অম্লান লাবণ্যে ঝলমল করছে। নদীম বাংলা দেশে জলের মধ্যে কতটা মেশানো আর মাটিতে জলের অংশ খানি তা নির্ণয় করা যেমন দুরূহ এই গল্পগুলিতে কতটা মানুষের আবেগ আর কতটা প্রকৃতির নিঃশব্দ আছে তার সীমারেখা টানাও তেমনি ক নীচের আশ্চর্য অংশটিতে এক অ অভিজ্ঞতা তার অপরূপ সাক্ষ্য করছে :

> 'অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হা পুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারি দেখিতে কি রকম তাহা বুঝিলাম কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং ভাবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন ক ধরিল। সেই শিশির-ভেজা নূতন খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া,

মেলা-ঢালা অড়হর এবং সরিষা-খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ী চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষু তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম; কেবল মাকে পাইলাম না। মনে-মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদু-কম্পিত প্রাচীন দুর্বল কন্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের দেহ-তত্ত্ব গান গুঞ্জন স্বরে শুনিতে পাইলাম না; সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোট-ছোট পল্লীসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে হাম্বা-ধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেই সঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড় জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুনিতে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ী হইতে কাঁসর-ঘন্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারিদিকে রাশীকৃত করিয়াছে।'

(দৃষ্টিদান : গল্পগুচ্ছ)

এখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির চরম সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিদিনের প্রয়োজনের বাইরে যে বৃহৎ, নিঃশব্দ সংসার, যাকে প্রকৃতি বলে উল্লেখ করেছি, সে তার সকল সম্ভার উদ্যত করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেনা-পাওনার সম্পর্কই আমাদের এত ব্যাপৃত করে রাখে, আমাদের ক্ষুদ্র, বস্তুনির্ভর ও নিকট-নির্ভর মন তাতেই এত নিমগ্ন থাকে যে আমরা সেই গণ্ডীর ওপারে তাকাই না। অথচ সে নিঃশব্দে দিয়েই যাচ্ছে, তার সব দেবার জন্যই যেন অপেক্ষা করছে। অথচ আমাদের তা খেয়াল থাকে না। তাই দৈব-দুর্বিপাকে কোনদিন জীবনে বিপর্যয় নেমে এলে, যখন মানুষ হারিয়ে যায়, আর চাইলেও যখন মানুষকে পাওয়া যায় না, তখন যে চিরকাল নিঃশব্দে, অনন্ত ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে আছে ও থাকে আমাদের জন্য, সে সস্নেহে তার অনন্তবাহু বেষ্টন করে আমাদের জড়িয়ে ধরে। সেই তখন পরমাশ্বাসে আশ্বাস দেয়, সব অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করে তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ও স্বাদের সম্ভার নিয়ে, সেই সম্ভারের স্মৃতি নিয়ে, মানব-জীবনের আদি অস্তিত্ব ও আদি আনন্দ যা থেকে উদ্ভূত। উপরের উদ্ধৃতিতে একটি তরুণী পল্লীবধূ চিকিৎসার দোষে অন্ধ হয়ে যাবার পর, যখন বাইরের পৃথিবী তার কাছে হারিয়ে গেল তখন চিরকালের নিঃশব্দ প্রকৃতিই তাকে মায়ের মত তার সকল সান্ত্বনা ও সকল ঐশ্বর্য নিয়ে এসে স্মৃতি ও অনুভব দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে।

জননী-স্বরূপা বাংলা দেশের অপরূপ স্নেহ-সজল মূর্তি মহাকবির দুই চোখ, চিত্তলোক এবং কল্পনাকে চিরকাল মুগ্ধ করে রেখেছিল। দেশের মাটির দিকে চোখ মেললেই তাঁর দুই চোখ মুগ্ধতায় আবিষ্ট হত; চোখ বন্ধ করলে তারই ছবি সমস্ত মনকে প্রেমে, সৌন্দর্যে ও রসে পরিপ্লুত করত। তাঁর সমস্ত জীবনের সুবৃহৎ রচনা-সম্ভার তার সাক্ষ্য সগৌরবে বহন করছে। তাঁর বড় প্রেমের, বড় মুগ্ধতার আধার বাংলাদেশের প্রকৃতি তাঁকে চিরকাল তার সৌন্দর্য দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল, ভুলিয়ে রেখেছিল। বোধ হয় সে হৃদয়ে দ্বিতীয় কোন মূর্তির স্থান ছিল না।

এই বাংলাদেশের প্রকৃতিকে তিনি কত মূর্তিতেই না এঁকেছেন। বার বার তার ছবি, তার সৌন্দর্য এঁকেও যেন তাঁর কবিচিত্ত পরিতৃপ্ত হয় নাই। বার বার বোধ হয় মনে হয়েছে যা দেখেছেন তাকে বোধ হয় পুরো রূপ দেওয়া হয় নাই। তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে এই সৌন্দর্যমূর্তির সহর্ষ প্রকাশ তাই স্বভাবতই অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

শুধু সৌন্দর্যমূর্তি নয়, তার সঙ্গে ভাবমূর্তি। ভাবমূর্তি বলতে আমি সেই চিরন্তন মানব-ভাবনার কথাই বলতে চাচ্ছি —যে ভাবনায় এই বিশ্বের মানব-জীবন সাধনায় সেই পরম রহস্যকে আবিষ্কার করার তপস্যা আছে, আকূতি আছে, সেই রহস্যকে ছুঁতে স্পর্শের আনন্দ-স্বাদ আছে; যা নাকি বিশ্বমানবের মহত্তম অবিনশ্বর উত্তরাধিকার, যা আছে আমাদের দেশে বেদান্তে-উপনিষদে, যা আছে রামায়ণে-মহাভারতে ও বিশ্বের এই জাতীয় সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সংস্কৃতিতে। সেই ভাবমূর্তিকেও তিনি বিচিত্রভাবে বাংলার পল্লীর জীবন-সাধনার মধ্যে, সঙ্গীতের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন।

তারই কথা আমার বক্তৃতার শেষ কথা।

'অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা'। মহাকবিরই নিজের কথা। রবীন্দ্রনাথ অনেক নিয়েছেন পল্লীগ্রাম, পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীজীবন ও পল্লীসাধনা থেকে—এই কথাটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে সকলের কাছে। দিয়েছেন তিনি অনেক। তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনাই দিয়ে গেছেন। যা নগর পেয়েছে তাই পল্লীও পেয়েছে। কিন্তু নিয়েছেন কি?

রবীন্দ্রনাথের সকল কীর্তিই অনন্য-সাধারণ। তার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতই বোধ-করি সর্বোত্তম। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু শিল্প নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত একাধারে তাঁর জীবন-সঙ্গীত এবং সাধনাসঙ্গীত। ভারতীয় মার্গসঙ্গীত নিয়ে তার সঙ্গীতসাধনার শুরু হয়েছিল। ব্রহ্মসঙ্গীত এবং কিছু প্রকৃতি নিয়ে, কিছু প্রেম নিয়ে, কিছু পূজা নিয়ে সঙ্গীতও তার মধ্যে আছে। কিন্তু তার বিচিত্র এবং পরমানন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার এবং প্রকাশ ঘটেছে বাংলার কীর্তনাঙ্গ, বাউল ও লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর।

ভারতজীবনের প্রাণধারা-স্বরূপিণী গঙ্গা যেমন বাংলায় ঢুকে ভাগিরথী ও পদ্মা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন, ভারতীয় সঙ্গীত বাংলায় তেমনি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। বাংলার লোকসঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীত ভাগীরথীর মত এখানে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। ভাবজগতের প্রকাশেও আশ্চর্য প্রভেদ ঘটেছে। বাংলার

বাউল, কীর্তন ও শাক্তসংগীতের মধ্যে তা সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ এইখানে এসে সেই মহান সম্পদভাণ্ডার যা নাকি গুপ্তধনের ধনভাণ্ডারের মত, তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত পেয়েছিলেন এবং সেই ভাণ্ডারকে তিনি জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

যে মহাকবি ও জমিদার জমিদারী কাছারীতে পল্লীবালকদের মুখস্থকরা সংস্কৃতিবহুল সাধু শব্দে রচিত বক্তৃতা শুনে বহু কষ্টে হাস্যসম্বরণ করেছিলেন, তিনিই লালন ফকীর, গগন হরকরা প্রভৃতিদের মত বাংলার বাউলদের কাছে তাদের গোপীযন্ত্র ও একতারা সহযোগে খাঁচার অচিন পাখীর আনাগোনার গান শুনে তার মধ্য থেকে—'যে দিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' জাতীয় গান দিয়ে বাঙালীর জীবনকেই শুধু নয়, সমগ্র বাংলাদেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন; এবং এই গান গাইতে গাইতেই বাংলার পল্লীর মাটিতে পা রেখে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে অনুভব করেছিলেন—যে এ সংসারে এমন আশ্চর্য ধনও আছে যাকে না চাহিলে তাকে পাওয়া যায়। বাংলার বাউল-সংস্কৃতি, বাউল-সংগীত, কীর্তন গান, বৈষ্ণবকাব্য —যার মধ্যে হিন্দু সভ্যতার ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বার্তা কাল থেকে কালান্তরের নব রসায়নে এক অভিনব লোকায়ত মূর্তি নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অপেক্ষা করছিল—এই সবকিছু তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করেছিল এক অভিনব সম্পদের ভাণ্ডার। এই বাউলগান, বাউলসংস্কৃতি, কীর্তনের সুর, বৈষ্ণবকাব্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে নবজন্ম লাভ করেছে সেই নবজন্মেই বাংলা সাহিত্য অমৃতে পরিণত হয়েছে।

মহাকবির সমসাময়িক কীর্তিমানদের ও পূর্বসূরীদের শিল্পকর্মের পাশাপাশি তাঁর শিল্পকর্মকে স্থাপন করলেই এর প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। বলা বাহুল্য, এ আলোচনার উদ্দেশ্য অন্য কোন মহৎ শিল্পীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মহাকবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের চেষ্টা নয়, কেবলমাত্র শিল্পচরিত্র বিশ্লেষণ করা। মহাকবি মধুসূদন বলতে গেলে তাঁর সমসাময়িক দেশ ও কাল থেকে সামান্যই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কবি-কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল পশ্চিমের এক মহাকবির কাব্যকীর্তি থেকে। তাঁর উদ্দীপ্ত কবি-কল্পনা তাঁর রুচি অনুযায়ী আপনার কাব্যের অধিকাংশের আখ্যানভাগ সংগ্রহ করেছে আমাদের দুই মহৎ গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত থেকে। ইংরেজী ভাষায় কাব্যরচনা ত্যাগ করে যে কবি 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' বলে মাতৃভাষার স্মরণ নিয়েছিলেন তিনিও একেবারে অলঙ্কারহীন ভাষার কথা-বলা সম্পদহীন, ঐশ্বর্যহীন সমসাময়িক বঙ্গজননীর কোলে ফিরে আসতে পারেন নি। তিনি যে-দেশজননীর কোলে ফিরেছিলেন কল্পনা-[illegible], তিনি আত্মিক সংস্কৃতি ও আহিক ঐশ্বর্য ও বীর্যের বহুতর অলঙ্কারে ভূষিতা, ঐশ্বর্যশালিনী রামায়ণ-মহাভারতের প্রাচীন ভারতভূমি। ত্রিকালদর্শী ঋষিতুল্য বঙ্কিমচন্দ্র বার বার অতীত বঙ্গদেশ ও ইতিহাসঐশ্বর্যময় ভারতবর্ষের অনন্ত ছুটে গিয়েছেন তাঁর কল্পনার নবতর ক্ষেত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। এত বড় দুজন মহান শিল্পীর দৃষ্টি বাংলার পল্লীর দিকে ঠিক নিবদ্ধ হয়নি। বৃহৎ দেশ সমগ্রভাবে যে-পল্লীগ্রামে স্থাপিত তাঁরা সেই পল্লীগ্রামকে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু পল্লীর সংস্কৃতি-সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে চাননি বা তাঁদের যেন তার সুযোগ হয়নি।

এই গ্রহণ করবার ক্ষমতার উপরেই শিল্পীর শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ নিজের মাতৃভূমিকে এবং সমসাময়িক কালকে যেমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। নিজের কালকে, নিজের দেশকে, নিজের সমাসাময়িক মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার মূল্যেই এ আশ্চর্য ইন্দ্রজাল সম্ভব হয়েছে। তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য যেমন তাঁর সুমহৎ গৌরব আছে তেমনি দেশের সমগ্রকে সপ্রেমে বুকে তুলে নেওয়ার মধ্যে যে দ্বিগুণ গৌরব আছে এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। দেশের সমগ্রকে সম্পূর্ণ গ্রহণের গৌরবে গৌরবান্বিত মহাকবি আমাদের দ্বিগুণ শ্রদ্ধার পাত্র।

আমার বয়স সত্তর পার হয়েছে; পৃথিবীর মূর্তি আমার কাছে আজ অনেক পরিমাণে ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে; দিনান্তের ঘণ্টায় গভীর ধ্বনি যেন সকল কোলাহলের ওপার থেকে মধ্যে মধ্যে মনে এসে প্রতিধ্বনি তোলে। শেষ খেয়ায় পা বাড়াবার জন্য প্রস্তুত হবার দিন সমাগত। পুরনো বন্ধুরা, যাঁদের সঙ্গে সমসাময়িককালে একই গ্রামের সীমানায় পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছিলাম তাঁদের সকলেই প্রায় বিগত। শেষ জন যিনি ছিলেন তিনি আমার প্রিয়তম বাল্যবন্ধু এবং একান্ত পরমাত্মীয়। এবার শরতের প্রারম্ভেই তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগ দিতে দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। শুধু বাইরের সামগ্রী গোছানো নয়, নিজের মনকেও প্রস্তুত করছি। এমনি সময়ে শরতের এক প্রভাতে অকস্মাৎ বাড়ীর ভিতর থেকে কচি কলকণ্ঠে আবৃত্তি শুনতে পেলাম। কান পেতে শুনতেই বুঝলাম আমার পাঁচ বছরের পৌত্রী কলকণ্ঠে আবৃত্তি করছে :

"আশ্বিনে হাট বসে
ভারী ধুম করে,
মহাজনি নৌকায়
ঘাট যায় ভরে।
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি,
মহা সোরগোলে—
পশ্চিমি মাল্লারা
[illegible]।
বোঝা নিয়ে মন্থর
চলে গোরু গাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন
করে ডাক ছাড়ি।
কল্লোলে কোলাহলে
জাগে এক ধ্বনি
অন্ধের কণ্ঠের
গান আগমনী।
সেই গান মিলে যায়
দূর হতে দূরে
শরতের আকাশেতে
সোনা রোদ্দুরে।"
(আগমনী : চিত্রবি

মুহূর্তে মন উজান বেয়ে আ বাল্যকালের দিকে মুখ ফেরালে। (দিনই এক সুযোগে 'চিত্রবিচিত্রে'র কবি গুলি একবার উলটে দেখলাম। বাং পল্লীপ্রকৃতির রেখাচিত্রগুলির পথ । উজান-বাওয়া, বাল্যকালের দিকে মু ফেরানো মন সোজা এগিয়ে চলল । মনে। হিমের পরশ-লাগা হাওয়ায়, ঘা আগায় শিশিরের রেখা-ধরা পথ বে বুক-দুরুদুরু, কাঁপা আমলকী বনের প দিয়ে, কুঁড়ি-ভরা শিউলির ডালে হ ছুঁয়ে, বর্ষণশেষে ছাড়া-পাওয়া মেঘের নী নীচে, ছুটির ছোঁয়াচ-লাগা সোনার আলে মন এগিয়ে চলল। যে তারাগুলি বা নিয়ে সারারাত জেগে সকালবেলা বেলফ আর জুঁইফুল হয়ে নেমে এসেছিল তা কবে মিলিয়ে গিয়েছে, তারা আর নে মন চলল এগিয়ে। আমাদের পাড়াখা ছায়ার ঘোমটা টেনে পাশে পড়ে রই পড়ে রইল চারিভিতে তালবন নিয়ে পাড় মাঝখানের দীঘিটি। চলতে চলতে শ গেল, হেমন্ত গেল, শীতের ছোঁয়া লাগল মন পেঁছে গেছে বক্শিগঞ্জে পদ্মাপা যেখানে শুক্রবারে হাট বসেছে। সে ভাগনে মদনকে নিয়ে কুমোরপাড়ার বংশ বদন কলসী-হাঁড়ি বোঝাই করে গোরু গাড়ি নিয়ে চলেছে। হাট ছেড়ে ততক্ষ পেঁছে গিয়েছে মন মোতি বিলের ধা যার 'বহুদূরে জল, হাঁসগুলি ভেসে ছে করে কোলাহল', 'পাঁকে চেয়ে থাকে বব চিল উড়ে চলে, মাছরাঙা ঝুপ করে প এসে জলে'। মোতি বিল ফেলে রেখে ম আবার ফিরে এল নিজের পাড়ায়, যেখা 'ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি, খো পেতে ভাজে খই মুড়ি'; 'বিধু গয়লা মায়-পোয়, সকালবেলায় গোরু দোয় 'আঙিনায় কানাই বলাই রাশি করে সরি বলাই' 'বড়ো বউ মেজো বউ মিলে ঘ দেয় ঘরের পাঁচিলে'। অঘ্রাণ সারা হয়েছে নদীর ধারা স্বচ্ছ, শিরীষের পাতা ঝরা শুরু করেছে; 'ওপারে চরের মাঠে কৃষাণেরা ধান কাটে, কাস্তে চালায় নত শিরে'। 'শুকনো খালের তলে, এক হাঁটু ডোবা জলে বাগদিনি শেওলায় পাঁকে বুকে আঁচল এঁটে, জল ঘাটাঘাটি করে মাছ ধরে চুবড়িতে রাখে'। ওই দূরের রাস্তা দিয়ে বউ চলেছে চৌগাঁয়ে, ঝি-বউ [illegible] বাঁকে, [illegible] গায়ে কাপড়

লন থেকে চলেছে, তাই হাঁই-হুই রা বাহকেরা হনহন করে ছুটেছে। মেলা বসেছে। 'শীতের দিনে নামল তবু মেলা', 'বিকেলবেলা ভিড় ভাঙল সকালবেলা'। পথে দেখি, টুকরো কাঁচের চুড়ি রাঙা,' 'তারি চিত্র-করা মাটির পাত্র ভাঙা'। মন হয়ে বসন্তের অঙ্গনে প্রবেশ ডিম ডিম রবে দুন্দুভি বেজে সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব। 'পূর্ণিমা জ্যোৎস্নাধারায় সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা তারই গায়ে গায়ে 'কাঞ্চনে কাঞ্চন ফুল', 'ডালে ডালে আম্রমুকুল', 'চঞ্চল মৌমাছি গায়', 'বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণা বায়'। সীমা শেষ হয়, মন এসে দাঁড়ায় দিনে গ্রামের ছোট নদীটির আমাদের সেই ছোট নদী যা চলে বাঁকে, 'বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল 'পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার সেখানে 'চিক্ চিক্ করে বালি নাই কাদা', সেখানে 'কিচ কিচ করে শালিকের ঝাঁক', 'রাতে ওঠে থেকে শেয়ালের ডাক'। তারপর একদিন ঝোড়ো রাত পার হয়ে গেল, বাদল-নামল, চন্দ্র তারা লুপ্ত হল, বাতাস থেকে আকাশকে হানা দিল। আবার শরতের দিনে মন ফিরে এসে দাঁড়াল বাঁয় অঞ্জনা নদীতীরে। সামনে নামছে। সূর্যের অন্তিম আলো আকাশের শেষ কিনারায় হারিয়ে সামনে সঙ্গীতহীন অনন্ত অন্ধকার।

ন আমার পাঁচ বছরের পৌত্রীর হাত যেন সমগ্র বাংলা আর সমগ্র ঋতুচক্র করে আবার অঞ্জনা-নদীর তীরে দাঁড়াল। ভুলে গিয়েছি যে আমি বয়স্ক মানুষ, আমি শিশু নই। সামনের প্রসারিত অন্ধকারের কথা কে আবার আমার বাহাত্তর বৎসর ফিরিয়ে আনলে। তবু একবার, নের এই শেষ পর্বে মহাকবির চোখের অনুসরণ করে আমার শিশুকালের, র চিরকালের বাংলাদেশকে বুকের মনের মধ্যে ফিরে পেলাম। এই তেই মহাকবির মত, আপনাদের মত রও জন্ম হয়েছে, এই দেশেরই আলো, স, গাছপালা, জলধারা, অন্ন আমার দেহ-মনকে লালন, পুষ্ট ও শুদ্ধ করেছে, এই মাটির মানুষের ভালবাসায় কৃতকৃতার্থ হয়েছি, এই বাতাসে হেসেছি কেঁদেছি; একান্ত দুঃখের দিনে, হতাশার মুহূর্তে এই আলো বাতাস মাটি আমাকে কোলে নিয়ে আমার তাপিত মনকে আরোগ্য করেছে, এখানকার প্রকৃতিই আমার শেষ ও শ্রেয় আনন্দের আশ্রয়, এখানকার মৃত্তিকাতেই আমার দেহভস্ম মিশে যাবে, আমার প্রাণ এই দেশের আকাশেই মহাব্যোমে বিলীন হবে। যে কবি আমাকে আমার সেই দেশকে চিনিয়েছেন, হাতে ধরে তার গোপন অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছেন, পরম সমাদরে এখানকার মাটির একটি তিলককে আমার নম্র ললাটকে অলঙ্কৃত করে দিয়েছেন তাঁকে আমি কি নিবেদন করব? শুধু আমার প্রণাম নয়, শ্রদ্ধা নয়, তাঁকে আমি আমার সমগ্র সকৃতজ্ঞ হৃদয় নিবেদন করলাম।

আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। আমার বক্তৃতামালায় কোন কিছু প্রমাণের চেষ্টা ছিল না, সাহিত্যশিল্পের বিচার এবং বিশ্লেষণও আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এবং তা আমার সাধ্যের বস্তুও নয়। রবীন্দ্রনাথ নামক যে মহাকবি আমাদের জাতির বহু পুণ্যফলে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর একক প্রভাবে একটি জাতির মধ্যে অতি বৃহৎ তুলনাহীন পরিবর্তন এক কি দুই প্রজন্মের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তিনি তাঁর দেশের নগর-জীবনের বাইরে গ্রামে দেশের যে মূলে জীবন প্রবহমান, যা তাঁর কাছে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে মনে হয়েছে, আমি সেই স্বদেশের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব, ধ্যান ও চিন্তার কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করবার চেষ্টা করেছি। পল্লীর মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি এই তিনে মিলে ত্রিমূর্তি শংকরের মতই স্বদেশ তাঁর ধ্যানবস্তু ছিল। মহাকালের যে অক্ষমালায় পল্লীর প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ, সম্পন্ন উচ্চবর্ণ থেকে অন্তেবাসী মানুষ পর্যন্ত, একই সম্মানে ও শ্রদ্ধায় বিধৃত, মহাকবি তাঁর জন্মসূত্রে লব্ধ ধাতুগত প্রেম ও জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সেই অক্ষমালাতেই রসের মন্ত্র জপ করেছেন, এবং আন্তরিকভাবে নিজেকেও স্বদেশের অসংখ্যের একজন বলে একান্ত শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে অনুভব করেছেন, এবং সেই অনুভবের মধ্যেই যে তাঁর নব-জন্মের চরিতার্থতা নিহিত তাও উপলব্ধি করেছেন। তাই জীবনের অন্তিম পর্বে, জীবনব্যাপী সাধনা সমাপনের শেষলগ্নে নিজের পরিচয় বিবৃত করতে গিয়ে সুগভীর শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে শেষবার উচ্চারণ করেছিলেন :

"সেতারেতে বাঁধিলাম তার
গাহিলাম আরবার
"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরি লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।" "

'সেই আমাদেরই লোক', আমাদেরই স্বজন রবীন্দ্রনাথকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম। জীবিতকালে তিনি আমাদের স্বজন হয়েই আমাদের জন্যই জীবন-সাধনা করেছেন, আজও তিনি আমাদের স্বজন রয়েছেন, ভবিষ্যতেও অনাগত দিনে তিনি 'আমাদেরি লোক' হয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়ে পরম প্রেমের আসনে বিরাজ করবেন।

ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পথরেখা ধরে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়, কখনও আলোয় কখনও অন্ধকারে আমাদের মাতৃভাষাভাষী ভাবীকালের প্রজন্ম একের পর এক পথ চলবে, আর সেই ভবিষ্যৎ প্রাণযাত্রার মিছিলের যাত্রীদের মুখের ভাষায়, কণ্ঠের গানে, চিন্তায় ও মননে চিরস্থিতি লাভ করে মহাকবিও তাদের চিরসঙ্গী হয়ে থাকবেন। একটু কান পাতলে সেদিনও আজকের মতই মিছিলের কোন এক নবীনের মুখের বাউল সুরের গানে শোনা যাবে, বুঝা যাবে—

তখন কে বলে গো,
সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।

সেই কথা, সেই সুর সেদিনও আজকের মত সেদিনের শ্রোতার মনে কাঁপন, চোখে জল, মুখে হাসি টেনে নিয়ে আসবে। যে মাটিতে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এ ভাষা এ সুর সেই মাটিরই, সেই বাংলাদেশেরই। সেদিন নূতন করে ভবিষ্যতের মানুষ আবার অনুভব করবে চিরকালের অনন্ত-যৌবন, নবীন বাউলের মত মুখে গান নিয়ে মহাকবি তাদের মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন।

২৫-১০-৭০

সমাপ্ত
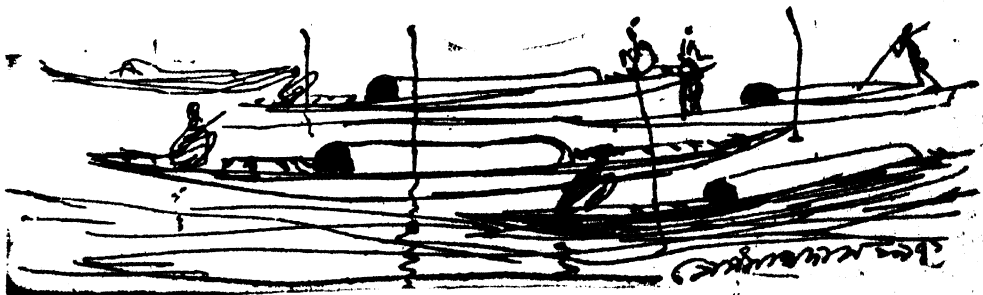
নাক ও নাকের বদল

অমল দাশগুপ্ত

কানের নকল হয়েছে, চোখের নকল হয়েছে (টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন), কিন্তু নাকের নকল এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে মার্কিনী পেন্টাগন নাকি এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা দূর থেকে গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারবে কোনো ঝোপের আড়ালে ভিয়েৎকং গেরিলা আছে কিনা। এটা কতখানি রটনা, কতখানি ঘটনা—অন্তত যুদ্ধের ফলাফল থেকে তার কোনো একদিকেই নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে এ-ধরনের কোনো যন্ত্রের অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত স্বীকৃত নয়। ধরে নেওয়া চলে নাক এখনো পর্যন্ত অননুকৃত ইন্দ্রিয়।

নাকের ক্ষমতা যে কতখানি তা উপলব্ধি করার জন্যে খুব সহজ একটি পরীক্ষাকার্য করে দেখতে পারেন। নাক বন্ধ করুন, তারপরে চোখ বুজে একটি আপেল ও একটি পেঁয়াজ খান—নাক যদি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে কিছুতেই আপনার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না কোনটি আপেল আর কোনটি পেঁয়াজ। এই পরীক্ষাকার্য যদি যথেষ্ট মনে না হয় তাহলে অন্দরমহলের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, নাকের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অজস্র প্রমাণ পেতে পারবেন। মনে করুন তারের ওপরে সারি সারি গেঞ্জি মেলা রয়েছে, একই মাপের ও একই চেহারার। আচমকা বৃষ্টি নামল। একজন গিয়ে সবকটা গেঞ্জি একসঙ্গে তুলে এনে ডাঁই করে রেখে গেল। গেঞ্জিতে আলাদা আলাদা চিহ্ন নেই, আপনার নিশ্চয়ই ধারণা হবে যে এই ডাঁই থেকে যার যার আলাদা গেঞ্জি খুঁজে বার করাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আপনার স্ত্রীর কাছে নয়, শুধু গন্ধ শুঁকেই তিনি আপনার গায়ের গেঞ্জিটি অনায়াসে তুলে আনতে পারেন। একটু চেষ্টা করলে আপনিও পারবেন। আমাদের প্রত্যেকের গায়ের গন্ধ আলাদা আলাদা। যমজ ভাইদের চোখের দেখায় চিনতে ভুল হতে পারে, কিন্তু গন্ধের বিচারে কদাচ নয়। আদর্শ হিন্দু হোটেলের হাজারী ঠাকুর শুধু গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারতেন রান্নায় আগের রাত্তিরের বাটা মশলা ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। নাকের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার এমনি দৃষ্টান্ত অজস্র।

বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বহু বিশ্ব-আলোড়নকারী ঘটনার মূলে থেকে গিয়েছে, আর কিছু নয়, নাক। ক্লিওপেট্রার নাক আর চার্লস ডারউইনের নাক—এ দুটির উল্লেখ করাই যথেষ্ট। শুধু নাকের জন্যেই আরেকটু হলে 'বীগল' জাহাজে চার্লস ডারউইনের যাত্রা বাতিল হতে বসেছিল।

অরওয়েল অবশ্য শুধু নাক দিয়ে গোটা ইতিহাসের একটা বিচার দাঁড় করিয়েছেন। মার্ক্স ও এঙ্গেলসদের মতো অরওয়েলও ঘোষণা করতে পারতেন, মানুষের ইতিহাস (লিখিত ও অলিখিত) হচ্ছে গন্ধের ইতিহাস। এক-এক জাতির এক-এক গন্ধ, এমনকি এক-এক শ্রেণীরও। শক-হুন-মোগল-পাঠান শুধু নয়, কে প্রভু কে দাস তাও চেনা যায় গন্ধ দিয়ে। জাতির সঙ্গে জাতির যুদ্ধ হয়েছে, আসলে সেটা গন্ধের সঙ্গে গন্ধের যুদ্ধ। প্রভু দাসকে শোষণ করেছে, আসলে শোষণটা এক গন্ধকে আরেক গন্ধের। মজুরদের ধর্মঘট আসলে গন্ধের বিরুদ্ধে গন্ধের লড়াই। বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট ভাঙল কেন? এমন কতকগুলো গন্ধকে একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করা হয়েছিল যাদের সম্পর্ক আসলে বিরোধিতার।

এ থেকে আরো বোঝা যাচ্ছে, পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যদিও সম্ভব, দুই বিরোধী গন্ধের কদাচ নয়। গন্ধকে বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েত এই দুই প্রধান শিবিরে ভাগ করা চলে কিনা তা এখনো বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়, তবে এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে অন্য কোনো বিচারের চেয়ে গন্ধের বিচারটাই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। যুক্তফ্রন্ট গড়ার আগে আলাদা আলাদা গন্ধগুলোকে যদি ঠিক-ঠিক চিনে নেবার চেষ্টা হত তাহলে এমন একটা বিপর্যয় নিশ্চয়ই ঘটত না। পরবর্তীকালে যাকে বলা হয়েছে শরিকী সংঘর্ষ তার একটা ভালো দিক এই যে গন্ধগুলো আলাদা আলাদা ছড়াতে পেরেছে। এখন দরকার শুধু কয়েকটি পাকা ও পোক্ত নাকের। গন্ধগুলোকে চিনে নেবার এই সুযোগ হেলায় হারালে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে জরুরী ও আশু প্রয়োজন হচ্ছে পাকা ও পোক্ত নাক। পরিতাপের বিষয়, আমাদের নাকের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী একটা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবহিত নই। কেননা আমরা ভুলতে বসেছি কোনটা আবর্জনার গন্ধ আর কোনটা ফুলের, কোনটা খাদ্যের গন্ধ আর কোনটা অখাদ্যের। অনেক সময়ে এমনও ঘটে থাকে যে আবর্জনাকে আমরা ফুল বলে গ্রহণ করি, অখাদ্যকে খাদ্য বলে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্র এক্ষেত্রেও খানিকটা খেটে যাচ্ছে মনে হয়।

এ-অবস্থায় আমরা আমাদের নাক ফিরে পাব, এমন সম্ভাবনা কম। পাকা ও পোক্ত নাকের সাহায্য পাব এমন সম্ভাবনা আরো কম। বন্যা হোক, মহামারী হোক, দুর্ভিক্ষ হোক—আমাদের নাক পেঁয়াজ ও অ[...]তফাৎ ধরবার ক্ষমতা হারিয়ে বসেছে।

নাকই যদি না-থাকে তাহলে থাকে কী!

মানুষ আঁক কষার যন্ত্র বানিয়েছে[...] বাদ করার, কথা বলার, কবিতা[...] ছবি আঁকার, এমনকি দাবা খেলারও[...] গন্ধ শোঁকার যন্ত্র বানাতে পেরেছে[...] কথা অন্তত বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত[...] কৃত্রিম হৃদপিণ্ড দিয়ে কাজ চলতে[...] কৃত্রিম কিডনি দিয়েও, কিন্তু কৃত্রিম[...] কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। প্ল[...] সার্জারির সাহায্যে নাকের আদল পা[...] যায় মাত্র কিন্তু নাকের বদল করতে[...] শেষপর্যন্ত টুনটুনির সেই নরুণ ছাড়[...] কিছু থাকে না।

তাই যদি হত তাহলে গন্ধ শুঁকে অপরাধীকে ধরবার কাজে মা[...] চেয়ে কুকুরের কদর বেশি হত না। জীবটিকে যদি পোষ মানানো ও মাটির ওপর দিয়ে হাঁটানো চলত [...] কুকুরের চেয়েও হাঙরের কদর হত [...] কেন? অন্য কোনো কারণে নয়, [...] জন্যে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু মানুষের [...] ডগায় সিকি বর্গ ইঞ্চি, কুকুরের দশ ইঞ্চি, হাঙরের বিশ বর্গইঞ্চি।

ছারপোকার তাহলে কত? বি[...] শুয়ে আলোটি যেই নেবানো হল [...] থেকে পালে পালে এসে হাজির। গন্ধ কি? ছারপোকার নাক কেমন?

জবাবে বিজ্ঞানী বলছেন, ইন[...] রশ্মি। মানুষটির শরীর থেকে এই [...] বিকীরণ ঘটছে। ধরছে কে? ছার[...]

নাক যদি না হয় তাহলে নাকের [...] নরুণের চেয়েও দরকারী বটে। গন্ধ [...] জানা নয় রশ্মি দিয়ে টের পাওয়া।

বাদুড় তো টের পায়। নাক দিয়ে [...] কান দিয়ে। অন্ধকার রাত্তিরে বাদুড় উড়ে চলার পথের বাধা কাটিয়ে আলট্রাসোনিক তরঙ্গ ছুঁড়ে ছুঁড়ে।

নাকের বদলে নরুণ যদি না হয় ত[...] আছে এই ইনফ্রারেড রশ্মি ও আলট্রা[...] তরঙ্গ।

মনে করুন কলুটোলার মোড়ে [...] লড়াই চলছে। এসপ্ল্যানেড থেকে [...] হবার সময়েই আপনি তা টের পেতে [...] (১) গন্ধ শুঁকে (২) ইনফ্রারেড অনুভব করে ও (৩) আলট্রাসোনিক [...] শুনে। নাকের বদলে শেষোক্ত দুটি [...] রকম চলতে পারে হয়তো।

কিন্তু আমরা বলি, নাকের বদল[...] নাকই চাই। গন্ধ শুঁকে চলাটাই সেরা[...] কি বাজারে কি বাসরে।

দ্বিতীয় পর্ব

(৪)

সাগর বাথরুম থেকে বেরুবার পরই ব্রেকফাস্ট খাওয়া হলো। তারপরই শুরু হলো আমার ইন্টারভিউ।

'আপনার নাম?'

'আপনি আমার নামটাও জানেন না?'

'আপনি তো বলেননি।'

'সরি।'

'দ্যাটস অল রাইট। নাম বলুন।'

'মিস বুলবুল সরকার।'

ও আমার নাম লিখতে লিখতে হাসছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

'নামটা ভারী আদরে আদরে। ভারী মিষ্টি।'

আমি কি বলব? আমিও একটু হাসলাম।

ও আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই ফর্মে অনেক কিছু লিখছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কি সব লিখছেন?

'ভয় নেই। আজেবাজে কিছু লিখছি না।'

'তবুও কি লিখছেন?'

'যেসব প্রশ্নের উত্তর জানা আছে সেগুলো লিখে নিচ্ছি।'

'তার মানে?'

'আপনার বাবার নাম, ক' ভাই-বোন, বাড়ী ঠিকানা, কতদিন এখানে আছেন, বিয়ে করেছেন কিনা, চাকরি করেন কিনা, কতদূর লেখাপড়া করেছেন, ভাড়া বাড়ী না নিজেদের বাড়ী, ব্যবসা আছে কিনা, কিসে যাতায়াত করেন, কোন কোন ক্লাবের সদস্য, ড্রিংক করেন কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি বহু খুচরো প্রশ্নের উত্তর জানা আছে বলে আপনাকে বিরক্ত করছি না।'

আমি বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম, ও, কে। গো অ্যাহেড।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর আবার ফর্ম ভরতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল। পনের-কুড়ি মিনিট তো হবেই। ও তখনও সিগারেট টানতে টানতে লিখে যাচ্ছে। আমি অধৈর্য হয়ে উঠছি।

'সারা ফর্মটাই কি আপনি ফিল-আপ করছেন?'

ও মুখ না তুলেই উত্তর দিল, সম্ভব না।

'তাহলে আর কতক্ষণ?'

'হোল্ড ইওর ধৈর্য।'

ধরলাম। ধৈর্য ধরে আরো কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর হঠাৎ ও আবার প্রশ্ন করতে শুরু করল, এখানে আসার পর কি আপনার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেড়েছে?

'কিছুটা বেড়েছে তো নিশ্চয়ই।'

'সংসারের জিনিসপত্র কি নগদ কেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি রেডিমেড জামা-টামা......

'আমাদের আর কি রেডিমেড জামা হবে?'

দুজনেই হেসে ফেললাম।

'সুতী - সিল্ক - টেরিলিন—তিনরকম কাপড়ই ব্যবহার করেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোনটা বেশী?'

'সুতী।'

'মিলের না হ্যান্ডলুমের?'

'হ্যান্ডলুম বা তাঁতের।'

'আপনাদের কি ফ্যামিলি ফিজি-সিয়ান আছেন?'

'হ্যাঁ। একজন আছেন।'

'প্রয়োজনবোধে কোন স্পেশ্যালিস্টকে পরামর্শ করেন?'

'হ্যাঁ। দু'একবার করা হয়েছে......

'চিকিৎসার খরচ কি নিজেরাই বহন করেন?'

'হ্যাঁ।'

'হাসপাতালে যান কি?'

'না।

'এখানে আসার পর কোন ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে?'

'না।'

আবার সাগর ফর্মের কয়েকটা জায়গা নিজেই ভরল।

'সিনেমা দেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভারতীয় না ইংরেজি ছবি দেখেন? নাকি দুটোই?'

'এখানে শুধু ইংরেজি ছবি দেখি। হিন্দী সিনেমা দেখি না।'

'মাসে ক'টা সিনেমা দেখেন?'

'দু'টো-তিনটে।'

'আমাকে কবে দেখাবেন?'

ও যেমন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল আমিও তেমনি গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলাম, আজই।

এবারও আমার দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ম্যাটিনী না ইভনিং শো'তে?

'ম্যাটিনীই ভাল।'

সাগর এতক্ষণে কলম বন্ধ করে আমার দিকে তাকাল। 'সত্যি সিনেমা দেখাবেন?'

'কেন দেখাব না?'

'অফিস পড়ে?'

ও আবার হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও ডান হাত এগিয়ে দিলাম। হ্যান্ডশেক করলাম। ও বেশ জোরে আমার হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে হ্যান্ডশেক করল।

সাগর এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, চা খাবেন?

'আপনি খেলে খেতে পারি।'

আমি বসে রইলাম। ও উঠে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে এলো। চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি বসে সিগারেট টানতে টানতে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। মিট মিট করে চাপা হাসি হাসছিল।

'হাসছেন কেন?'

'ভাল লাগছে।'

কেন?'

'এমন একটা বুলবুল সরকারের সংগে পরিচিত হয়ে ভাল লাগছে।'

'বাজে বকবেন না।'

বেয়ারা চা দিয়ে এলো। চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ইন্টারভিউ শেষ?

'না।'

'তবে আবার শুরু করুন।'

'আজ আর না।'

'তবে আবার কবে?'

'আবার যেদিন আপনি আমার কপালে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙাবেন, সেদিন......

আমি হাসতে হাসতে বললাম, যত মেয়ের ইন্টারভিউ নিয়েছেন তারা সবাই বুঝি আপনার কপালে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছে?

'কেন হিংসা হচ্ছে?'

'হিংসা হবে কেন? জানতে চাইছি।'

সাগর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে হাসল।

'ইন্টারভিউ নিন।'

'আজ আর না।'

'তবে কবে?'

'আজ একটু গল্প করি।'

আমি আরো কয়েকবার বললাম। রাজী হলো না। শেষে হাতের ঘড়ি দেখিয়ে বলল, সাড়ে এগারটা বাজে। একটু পরেই তো খেতে যেতে হবে।

'একটু পরে কেন? চলুন এখনই পিসীর ওখানে যাই।'

'আগে গেলে উনি খুশী হবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সাগর অ্যান্টিরুমে গিয়ে বুশ-সার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলো। ফাউন্টেন পেন, পার্স ইত্যাদি পকেটে পুরতে পুরতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি সিনেমা দেখাবেন নাকি কাজকর্ম করার জন্য কাগজপত্র নিয়ে বেরুব?

'কাগজপত্র নিয়ে বেরুতে হবে না।'

'তাহলে শুধু আপনাকে নিয়েই বেরুব?'

আমি হাসলাম। 'আমার নাম বুলবুল কিন্তু আপনার মুখেই যেন বুলবুলি ফুটতে শুরু করল।'

'বুলবুলের সঙ্গ-দোষে।'

বেরুবার আগে বাবাকে টেলিফোন করলাম,, আমরা এখনই পিসীর ওখানে যাচ্ছি। তুমি ঠিক সময় আসছ তো?

বাবা বললেন, তোরা কি ভেবেছিস বলতো?

'কেন?'

'একটু আগেই মাধুরী ফোন করল, এখন তুই করছিস।'

'পিসী যে জন্যে টেলিফোন করেছে আমিও সেই একই কারণে ফোন করছি।'

বাবা হাসলেন। 'তোরা রওনা হয়ে যা, আমিও এক্ষুণি আসছি।'

আমরা দুজনে এবার বেরিয়ে পড়লাম। এত তাড়াতাড়ি আসব, পিসী ভাবতে পারেনি। দারুণ খুশী হলো।

আমি বললাম, তোমরা দুজনে গল্প কর. আমি বরং একটু কফি করে আনি।

পিসী বারণ করল না। বলল, যা।

তিনজনে মিলে কফি খাবার সময় পিসী সাগরকে বলল, কিছুদিন ধরেই ভাবছি আপনাকে আর আপনি আপনি বলব না—বলে ঠিক ভাল লাগে না।

সাগর বলল, আমার তো মনে হয় আপনি আমাকে তুই বললে আরো সম্মানিত মনে করব।

এই পিসী একটা বিচিত্র নারী। খুব বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে না কিন্তু মুষ্টিমেয় যাদের সঙ্গে ও'র ঘনিষ্ঠতা তাদের উনি ভালবাসেন। কল্যাণ কামনা করেন। এই নিউ [illegible] এতদিন ধরে আছেন কিন্তু [illegible] এখানকার সব বাঙালীদের সঙ্গেও ও'র আলাপ নেই। অনেকেই ওকে এর জন্য সমালোচনা করেন। ওকে কেউ বলেন—অ্যারিস্টোক্র্যাট, কেউ বলেন অহংকারী।

আমি নিজেও পিসীকে অনেকবার বলেছি আরো একটু বেশী মেলামেশা করতে। প্রথমে একদিন বলেছিল, সংসারের কাজকর্ম করে কতটুকুই বা সময় পাই? তারপর একটু পড়াশুনো আর। বেশী লোকজনের মেলামেশা বা গল্পগুজব করার সময় কোথায় বল?

কিছুকাল পরে আবার কথায় কথায় ঐ একই প্রসঙ্গ উঠল। সেদিন পিসী একটু হাসল। বলল, আকাশে কত অসংখ্য তারা থাকে। ওদের সবাইকে দেখার চেষ্টা করলেও পারব না। তাইতো শুধু চাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকি।

পিসী বোধহয় আমার মনের কথা জানতে পারে। বুঝতে পারে। দাদার বিয়ে, মণিদার বিয়ের পর বাবা কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লেন। আমি আর মা সবকিছু বুঝেও কিছু করতে পারতাম না, বলতে পারতাম না। বাইরের কেউ আমাদের একথা জানত না। পিসীও না, কিন্তু তবুও বোধহয় অনুমান করেছিলেন বাবার মনের শূন্যতা। দিনকয়েক পরে, ডাইরেক্টার ঠিক আগে পিসী এসে বাবাকে কোটা নিতে নেমন্তন্ন করল আর বললেন, দাদা, আপনি আমাকে মাধুরী বলে ডাকবেন।

বাবা বললেন, কত ছেলেমেয়েই আমাকে দাদা বলে ডেকেছে কিন্তু মাধুরীর মত এমন মিষ্টি করে আর কেউ দাদা ডাকেনি।

সাগরের মনের মধ্যেও একটা বিরাট শূন্যতা চব্বিশ ঘন্টা হাহাকার করছে। আমাকে ওর ভাল লাগে, আমার মধ্যে মানসীর ছায়া দেখে কিন্তু তবুও শূন্যতার জ্বালা ওর ঘুচে না। পিসী ঠিক সময়ে ওর পাশে এসেও দাঁড়াল। আমি কফির কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে এইসব ভাবছিলাম।

সাগরকে দেখলাম তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পিসীকে একটা প্রণাম করল। বলল, জানি আপনি মনে মনে সব সময়ই আমাকে আশীর্বাদ করেন তবু আজকে আরেকবার করুন।

পিসী কিছু বলতে পারল না। দুহাত দিয়ে শুধু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েই ভিতরে চলে গেল।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম আনন্দে, খুশীতে দুজনের চোখে জল এসেছে। দুজনের মুখ থেকেই কথা ফুরিয়ে গেছে। আমিও কিছু বলতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পরে সাগর বলল, পিসীকেও সিনেমায় যেতে বলবেন?

'আপনি বললে ঠিক যাবে।'

'আমার নাম করে আপনিই বলুন।'

আমি উঠে গিয়ে পিসীকে বললাম। ওর নাম করেই বললাম। পিসী একটু হাসল। বলল, তোরা দুজনেই যা।

'তুমি গেলে ও খুব খুশী হবে।'

পিসী আবার একটু হেসে বলল, আচ্ছা যাব।

খাওয়া-দাওয়ার পর পিসী বাবাকে বলল, দাদা, আপনি ও'র গাড়ীতে অফিস যান। ছুটির পর উনিই আপনাকে আবার বাড়ীতে পৌঁছে দেবেন।

বাবা শুধু বললেন, ঠিক আছে।

পিসেমশাই, পিসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? তোমরা কোথাও যাচ্ছ?

পিসী জবাব দিল, আমি, সাগর, আর বুলা একসাথে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি।

'আচ্ছা।'

তিনজনে সিনেমায় গেলাম। তারপর কোয়ালিটিতে পেস্ট্রি আর এসপ্রেসো কফি খেলাম। বেশ কাটল। পিসীকে পৌঁছে দেবার পর সাগরকে নামিয়ে দিতে গেস্ট হাউসে গেলাম। আমি আর নামলাম না। ও গাড়ী থেকে নামার আগে বলে গেল, এমন সুন্দর একটা দিন আর আসবে কিনা জানি না তবে আজকের দিনের [illegible] নয়।

আমি বললাম, এমন দিন আর আসবে না কেন?

'জানি না। তবে ভয় হয়, আশঙ্কা হয়।'

স্টিয়ারিং-এর উপর দুটো হাত রেখে মাথা নীচু করে ওর কথা শুনলাম। তারপর প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ইন্টারভিউ আবার কবে নেবেন?

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, যেদিন আবার অমন করে ঘুম ভাঙিয়ে চা দেবেন, সেইদিনই।

'গুড নাইট!'

'গুড নাইট!'

এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা শুধু চাইতে জানে। পাবার অধিকার না থাকলেও চায়। সবার কাছ থেকে। সব সময়। প্রকাশ্যে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে। দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে সমান-ভাবে। সমাজে এইরকম মানুষই বেশী। গিজগিজ করছে চারপাশে। ঘরে-বাইরে সর্বত্র। ইচ্ছা না করলেও, মন স্বীকৃতি না জানালেও সব সময় এদের শূন্যহাতে বিদায় দেওয়া যায় না। শুধু আমি নয়, বোধহয় সব মেয়েকেই, সব মানুষকেই এই-সব চির-অতৃপ্ত প্রেতাত্মাস্বরূপ মানুষের শিকার হতে হয়। কাউকে একবার, কাউকে বহুবার। কাউকে মুহূর্তের জন্য, কাউকে জীবনভোর। এর থেকেই জন্ম নেয় জীবনের ব্যথা, বেদনা, ব্যর্থতা। সবকিছু পেয়েও, সবকিছু থেকেও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এই ব্যথা-বেদনার গ্লানিতে জ্বলে পুড়ে মরছে।

আবার এই পৃথিবীতেই কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ আছেন যাঁরা নিজের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন না। কারুর কাছ থেকেই কিছু চাইতে পারেন না, নিতে পারেন না। এদের জন্য কত মা, কত স্ত্রী, কত পুত্র-কন্যা উজাড় করে বিলিয়ে দিতে চাইলেও পারেন না। জীবনের এক অধ্যায়ে সঞ্চয় করে আরেক অধ্যায়ে বিলিয়ে দিতে হয়। সেটাই নিয়ম, সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই ধর্ম। সবার। মানুষের ও প্রকৃতির। কিন্তু সবাই কি বিলিয়ে দিতে পারে? সুযোগ পায়?

পায় না। পেতে পারে না। তা না হলে যে পৃথিবীতে অতৃপ্ত আত্মার হাহাকার থাকত না। বাতাস এত উত্তপ্ত হতো না, কালবৈশাখীর ঝড়ে সবকিছু ভাঙতো না, বর্ষার দুকূল ভেসে যেত না।

বিচিত্র! অদ্ভুত!

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না। বিছানার পাশের জানলা দিয়ে অজস্র কোটি মাইল দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইসব কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম সাগরের কথা। আর কিছু না হোক, গাড়ী থেকে নামার সময় একবার কি আমার হাতটা ধরে বলতে পারত না গুড নাইট?

(ক্রমশঃ)

মর্ষকামের মনস্তত্ত্ব
প্রতিষ্ঠা ও অমরত্ব

যাদের মনের কথা পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি, তাদের সকলকেই রুগ্ন বা অস্বাভাবিক চরিত্রের লোক মনে করা ঠিক হবে না। জীবনপথে বাধাবিপত্তি দ্বন্দ্ব-বিরোধের সম্মুখীন হয়ে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত বিমূঢ় হয়ে পড়তে পারেন অনেকেই। সেই সময় অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা, হতাশা ইত্যাদি নানা রকমের উপসর্গ তাঁদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। কিছুদিনের মধ্যে কোনো চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই তারা এ অবস্থা কাটিয়ে উঠে আবার দৃঢ়হস্তে জীবনতরীর হাল ধরতে পারেন, নিজেদের ঠিক মত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আবার এই সময় অনেকে চিকিৎসকের সাহায্য বা পরামর্শ নিতে এসে থাকেন। মানসিক রোগের চিকিৎসক যদি তাঁদের পরিচিতমহলে কেউ থাকেন, তবে খুব বেশী প্রয়োজন না থাকলেও অনেক সময় আলাপ আলোচনার জন্য তাঁরা তাঁর শরণাপন্ন হতে পারেন। নিজেকে সামলে নেওয়া এর ফলে অনেক সময় সহজ হয়ে ওঠে। 'মনের কথা' শুধু রুগ্ন মনের কথা নয়, সুস্থ স্বাভাবিক মনের নানা তথ্য, তত্ত্বও মাঝে মাঝে পরিবেশিত হচ্ছে।

মনোহরবাবুর (গত সংখ্যার) মত মানুষ কি খুব বিরল? এঁকে কি মর্ষকামী বলা চলে? আজকাল মর্ষকাম ধর্ষকাম কথাগুলো কামবিবর্জিত হয়ে যে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই অর্থে অবশ্য মনোহরবাবুকে মনস্তাত্ত্বিকরা মর্ষকামী বলতে পারেন। তাঁর চিকিৎসক ঐ কথাটির উল্লেখ না করলে ভদ্রলোকের সংগে মর্ষকামের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় বসতে হতো না। মতিলালবাবু তাঁর পুঁথিগত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কথাটির সঠিক তাৎপর্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন নি। তাঁর লেখা প্রবন্ধ পড়ে আমার অন্তত সেই রকম মনে হয়েছিল। এঁরা দুজনেই নিজেদের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সাময়িকভাবে অসুবিধা ভোগ করেছিলেন। এঁদের মানসিকতার কথঞ্চিৎ বিশ্লেষণ বোধ হয় পাঠকদের কাছে খুব অরুচিকর হবে না।

দুজনে সমাজের দুই স্তর থেকে এসেছেন। মনোহরবাবু আজন্ম দারিদ্র্যক্লিষ্ট, মতিলালবাবু মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ হয়ে শেষ জীবনে অভাব অনটনের চাপে বিপর্যস্ত। মনোহরবাবু কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারের ভরণপোষণ চালান; মতিলালবাবু পৈতৃক ব্যবসা ও সঞ্চিত অর্থ থেকে অনাত্মীয় দূরাত্মীয় পোষ্যদের প্রতিপালন করেন।

মনোহরবাবু স্বল্প শিক্ষিত, মতিলালবাবুর পড়াশুনো প্রচুর। অফিস ইউনিয়নে যোগদান করার আগে পর্যন্ত মনোহরবাবুর নীতিবোধ মূল্যবোধ সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা প্রভাবিত। মার্কসীয় লিটারেচার তাঁর আজন্মলালিত সংস্কারের মূল ধরে নাড়া না দিলে তিনি হয়তো পুরনো ধ্যানধারণা নিয়ে কায়ক্লেশে, দ্বন্দ্ববিরোধের পাশ কাটিয়ে পুজোআনন্তের উপর নির্ভর করে, পরলোকের কথা চিন্তা করে, ইহলোকের দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু আজকের দিনে সেটা বোধ হয় সম্ভব নয়। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, সুতরাং অফিস ও টিউশনীতে ও কর্তব্যনিষ্ঠ থাকা তাঁর চলবে না। তাঁর এই বোঝার গলদ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন এখন নেই। শুধু তিনি যা বলেছিলেন ও ভেবেছিলেন, সেই কথাগুলোই লিপিবদ্ধ করে যাই। কাজে ফাঁকি দিয়ে কিন্তু স্বস্তি পেলেন না, পুরনো দিনের সংস্কার তাঁকে পীড়িত করলো। প্রোমোশন পাবার পর এই কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রয়োজনটাও বেড়ে গেল। আগে ছিলেন টাইপিস্ট, বিশেষ কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না। এখন অনেক ফাইলের নানারকমের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা তাঁর কাঁধে এসে পড়লো। নিজের কারুর কাছে পরামর্শ চাইতে তাঁর লজ্জা হলো। কেন? কারণ, শৈশব থেকে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় প্রশংসা পেয়েছেন, নিজেকে বুদ্ধিমান বলে পরিচিত করে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। তাঁর বুদ্ধিবিবেচনার উপর যদি কেউ কটাক্ষপাত করে, তাহলে তাঁর নিরাপত্তার খুঁটি ভেঙে যাবে, তিনি উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর জীবনের একমাত্র আশ্রয়, নিরাপত্তাবোধের এই একমাত্র উপায়কে তিনি কোনোমতেই অন্যের সমালোচনার সামনে আনতে পারেন না। কাজেই তিনি অফিস থেকে 'ভেরী আরজেন্ট'-এর পতাকা দেওয়া ফাইলগুলো সরাতে লাগলেন। একদিকের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা অটুট রাখতে গিয়ে, অন্যদিকের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়লো। ফাইল সরানোর পর থেকেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বেড়ে চললো। তিনি মনস্তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হলেন। এইবার মতিলালবাবুর কথা ভেবে দেখুন। ছাত্র হিসেবে তিনি সত্যিকারের ব্রিলিয়ান্ট। মনোহরের মত পল্লীগ্রামের স্কুলের 'ফার্স্ট-বয়' নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। পৈতৃক অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তির চেয়ে তাঁর এই ছাত্রজীবনের কৃতকার্যতা তাঁকে অনেক বেশী নিরাপত্তাবোধ দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চেয়েও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল, যারা লেখাপড়ায় মতিলালবাবুর সমকক্ষ না হওয়ায় তাঁর মত প্রশংসা আদায় করতে পারেনি; কাজেই 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' এই নীতিবাক্যে মতিলালবাবুর আস্থা ও

নির্ভরতা। 'মেধাবী ছাত্র' হিসেবে সুনামের অধিকারী হয়ে তিনি নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন, 'মেধা'র উপর মনোহরবাবুর মতই নির্ভর করেছিলেন। এই মেধায় কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে তিনি রাজী ছিলেন না, মেধার উপর কোনো কটাক্ষপাত তিনিও সহ্য করতে পারতেন না। দুজনেই মেধা জাহির করতে পরাঙমুখ। পাছে মেধা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জাগে, এই ভয়ে দুজনেই পরীক্ষা দিতে নারাজ, জাহির করতে অরাজী। আমার ধারণা মতিলালবাবুর শৈশব, পিতার স্বাচ্ছল্য সত্ত্বেও, খুব সুখের ছিল না। মতিলালবাবুও আকার ইঙ্গিতে সে কথা স্বীকার করেছেন। পিতামাতার মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল না। পারিবারিক জীবনে নিরাপত্তাবোধের অভাব না থাকলে মেধার উপর এই অতি-নির্ভরতা হয়তো থাকতো না। মতিলালবাবুর চেহারা ছিল অতি-সাধারণ। নিজের এই 'অতি-সাধারণ' চেহারা'র জন্যে, তাঁর ধারণা, কোনো মেয়ে তাঁকে কোনোদিন ভালবাসতে পারেনি। প্রেমের ব্যাপারে তিনি উদাসীনতার ভান করতেন। আসলে তিনি চাইতেন কাব্যলোকের কোনো নায়িকা তাঁর অসাধারণ মেধার জন্য তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আপনা থেকে প্রেম জানাবে। পণ্ডিতঅনুষদের এই ধরনের অবাস্তব রোমান্টিক ধারণা থাকা খুব বিচিত্র নয়। আসলে ভদ্রলোক ছিলেন পুঁথির জগতের মানুষ, কাব্যগল্পের নায়িকাদের তিনি চিনতেন, রক্তমাংসের মেয়েদের বুঝতেন না, বুঝতে চেষ্টাও করতেন না। নেলী সম্পর্কে তাঁর উক্তি ও নেলীকে প্রেম নিবেদনের প্রয়াস সস্তা নাটক নভেলের নায়কের সাজে। এ যুগের ছেলেমেয়েদের চোখে মতিলালের আচরণ হাস্যকর। মনোহর-মতিলালের আর একটি আচরণে ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। নিজেকে কষ্ট দেওয়ার ও মুখ বুজে দুঃখ সহ্য করবার ব্যাপারে দুজনেই সমগোত্র। মনোহরবাবু কাজে ফাঁকি দিয়ে উপোষ করে কৃচ্ছ্রসাধন করে, নিজেকে কষ্ট দিয়েছেন; আর মতিলালবাবু অসৎ কর্মচারীদের হাতে ব্যবসাবাণিজ্য তুলে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মনিপীড়ন করেছেন। মনোহরবাবু দলবেঁধে তবু মাঝে মাঝে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, মতিলালবাবু তাও করেন নি।

বাড়ী বেচবার তাগিদেও পোষাদের মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছেন না। এই মুখবুজে সহ্য করার প্রবৃত্তি ও প্রতিবাদবিমুখীনতা এই দুই চরিত্রের বিশেষ ধর্ম। এর জন্যে মনস্তাত্ত্বিকরা এদের মর্ষকামী বলে অভিহিত করতে চান। মর্ষকাম কথাটি বিশেষ ধরনের পারভার্টদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। মনোহর-মতিলাল তাদের দলে পড়েন না। তাঁরা চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে এসেছেন বলেই তাঁদের ঐ ধরনের বিকারগ্রস্ত মনে করা ঠিক হবে না। অনেকেই হয়তো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মনোহরবাবুর মত দুর্বল, কিন্তু তাঁদের অসুস্থ বলা বোধহয় সঙ্গত নয়। মুখ ফুটে বন্ধুবান্ধব, কর্মচারীকে অনেকেই স্পষ্ট কথা জানাতে পারেন না, এই মতিলালবাবুর মতন। তাঁরা সবাই অসুস্থ নন। তাঁরা মনে করেন এটা তাঁদের সহজাত ভদ্রতা, আমরা মনে করি দুর্বলতা। এই দুর্বলতার মূল কোথায়?

এ দুর্বলতা মস্তিষ্ককোষের দুর্বলতা নয়, স্বভাবজাত নয়। এ দুর্বলতা পরিবেশজাত। মনোহরবাবুর শৈশব কেটেছে অনেকটা অসহায় অবস্থায়, প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে নয়, প্রতিকূলতার সঙ্গে আপোষ করে। হিতৈষী জাতিপ্রতিবেশীর শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে বড় হয়েছেন। বশ্যতা স্বীকার করে, অনুগামী হয়ে তিনি নিরাপত্তা বজায় রেখেছেন। জাতিপ্রতিবেশীর উপর নির্ভরতা জীবনের প্রথম দিকে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অপরের সাহায্য, (আর কাছে শুনে শুনে মনে হয়েছে) আর দেবতার আশীর্বাদ ছাড়া গ্রামে তাঁরা টিঁকতে পারতেন না। কাজেই প্রতিবেশীদের সামান্য উপকারকে তাঁরা অসামান্য মূল্যবান মনে করেছেন। অন্যের ব্যবহারের ত্রুটিবিচ্যুতি যাতে না ঘটে, এই চেষ্টায় মনোহর সব সময়ে অতিমাত্রায় বশংবদ ভাব দেখিয়েছেন, পরবর্তীকালে এই পরনির্ভরতা ও বশ্যতাস্বীকার তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো হবার জন্যে পরিচিতমহলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন, এবং সেই প্রশংসাকে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কাজেই কোনো ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁদের সহানুভূতি হারানো বা তাঁদের প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হবার সুদূরতম কল্পনাও তাঁর মনে আসেনি। অপরের সাহায্য সামাজিক মানুষ হিসেবে যে তাঁদের প্রাপ্য, একথা মাতাপুত্র কারুরই মনে জাগেনি। কেননা গ্রামীণ সমাজ অনেক আগেই এ ধরনের দায়িত্ববোধ থেকে মুক্ত হয়েছে। অপরের সাহায্যপুষ্ট হয়ে বেঁচে থাকার দারুণ, সহজেই মনে সংক্রামিত হয়েছে দৈন্যবোধ ও হীনমন্যতা। কর্মজীবনে মার্কসবাদীদের সংস্পর্শে এসেও তাঁর এই দুর্বলতা কাটেনি। সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে, পুরনো সমাজের মূল্যবোধকে অস্বীকার করে তিনি সাময়িকভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছেন।

মতিলালবাবুর দুর্বলতাও প্রায় একই কারণে উদ্ভূত। পিতার অর্থাগমের উপায়কে তিনি কোনোদিন সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেননি, আবার সেই অর্থকে কোনো দিন প্রত্যাখ্যানও করেন নি। অনেক বয়স অবধি অনেকটা পরগাছার জীবন যাপন করেছেন। পারিবারিক কোনো বিশেষ বিধিনিষেধের অধীনে তাঁকে থাকতে হয়নি, সব কিছু থেকে অনেকটা নির্লিপ্ত থেকে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। পরিবেশের সঙ্গে কোনো বিরোধ কোনো দিন ঘটেনি। কাজেই প্রতিবাদ জানানো বা বিদ্রোহ করার কথাই ওঠেনি। ব্যবসা করা, দোকান চালানো তাঁর শিল্প-সাহিত্যে আগ্রহী মনের কাছে অনেকটা ভারগার মনে হয়েছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা, চালানের সঙ্গে বিল মিলিয়ে দেখা, বাকীবকেয়ার তাগাদা দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপার সাহিত্য-দর্শন-অনুপ্রাণিত মনের কাছে দুঃসাধ্য ঠেকেছে। তাই অসাধু কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন। নির্লিপ্ত ভাল ব্যবহার দিয়ে তাদের চিত্ত জয় করবেন এই ভেবে ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই করে তাদের কাছে ফেলে রেখেছেন। 'ছোটবাবুর মতন মানুষ হয় না', 'দেবতুল্য মানুষ আমাদের ছোটবাবু'—কর্মচারীদের এই সব স্তোকবাক্য তাঁকে আশ্বস্ত করেছে। বন্ধুবান্ধবরা তাঁর লেখা জোর করে শুনেছেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। মতিলালবাবু অম্লানবদনে তাঁদের বিপদে-আপদের মিথ্যাকাহিনী শুনেছেন ও সেই কাল্পনিক বিপদ-

করতে তাদের টাকা দিয়েছেন। পুরনো পাড়ার কথা মুখ ফুটে কোনো দিন বলতেও পারেননি। নায়করা লিখিয়ে হবেন, তাঁর কাছে এসে প্রকাশকরা ধর্ণা দেবে, নানা ভাষায় তাঁর লেখার অনুবাদ বেরুবে; এই স্বপ্ন দেখেছেন। এই স্বপ্ন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে তাঁর বন্ধুরা, যারা তাঁর বিনয়ে মুগ্ধ, তাঁর পাণ্ডিত্যে বিস্মিত, তাঁর বড়াইয়ে হতচকিত। নিরাপত্তার অভাব মনোহরের মত তাঁর অত তীব্র না হলেও সাহিত্যসৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপাদানগুলোর উপর নির্ভরতা স্বাভাবিক। নিজের মেধা, বিশেষ করে সে সম্পর্কে অন্যের স্বীকৃতি তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রধান উপায়। কাজেই তাঁর মেধা যাদের কাছে স্বীকৃত, তাদের প্রতি তাঁর এই দুর্বলতা। এই দুর্বলতা এতদূর গড়িয়েছে যে, গুণমুগ্ধদের সব রকম অত্যাচার তিনি বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে চলেছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনো বাস্তবপন্থা গ্রহণে কিন্তু তাঁর কোনো আগ্রহই নেই। পাছে অনাদৃত হয়, এই ভয়ে তিনি অন্তরঙ্গ মহলের বাইরে কারো কাছে লেখা পাঠাতে অনিচ্ছুক। সত্যকারের গুণীজনের মতামত গ্রহণেও তাঁর আগ্রহ নেই। কারণ ঐ একই। মনোহরবাবু যে কারণে কোনো সিনিয়র কেরাণীর পরামর্শ নিতে নারাজ, মতিলালবাবুও সেই কারণে সম্পাদক বা সমালোচকের সম্মুখীন হতে গররাজী। আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তার জন্যে প্রতিযোগিতা করতে তিনি নারাজ।
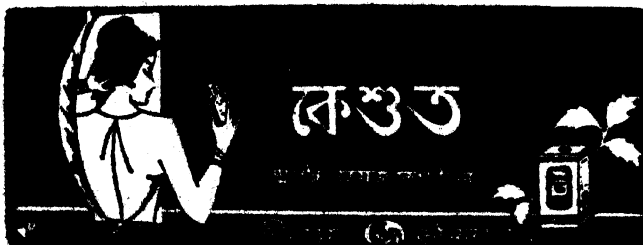
আমার মনে হয়, এইভাবে বিশ্লেষণ করলে এই দুইজনের মানসিকতার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে, এবং এঁদের আচরণের তাৎপর্য বোঝা যাবে।

এই প্রসঙ্গে মতিলালবাবুর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার আকুলতা সম্পর্কে দু-এক কথা বলা চলতে পারে।

মানুষ মাত্রেই প্রতিষ্ঠালাভ করতে চায়, একথা হয়তো ঠিক। সুযোগ সুবিধার অভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না অথবা দৈনন্দিন জীবনধারনের তাড়নায় হয়তো প্রতিষ্ঠালাভের কথা মনে আসে না। মানসম্মান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা—এসব কি শুধু এই সমাজে নিরাপত্তা লাভের উপকরণ, না এ সবের আরো কোনো উদ্দেশ্য আছে? আমাদের সমাজে অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপত্তা দানে সক্ষম, কিন্তু অর্থশালী লোকও মান-সম্মান প্রতিপত্তির কাঙাল, নানাভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য চেষ্টা করে থাকেন। আগেকার জমিদাররা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন, জলাশয় খনন করতেন, রাস্তা বানাতেন। সে কি শুধু প্রজার হিতার্থে? না। শুধু ইহলোকের পরিচিত ব্যক্তির প্রশংসাবাণী শোনবার জন্যে, শুধু বর্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁরা এই অর্থব্যয় করতেন না! তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল ভবিষ্যতের দিকে। আজকালকার শিল্পপতিরা জনহিতকর নানাকাজের জন্য অগাধ অর্থব্যয় করে থাকেন। প্রতিষ্ঠালাভ তাঁদেরও উদ্দেশ্য। শুধু ভঙ্গুর জীবনে সাময়িক প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাঁরা আকুল, একথা ভাবলে ভুল হবে। তাঁরাও চান স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। এই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষার আর এক নাম অমরত্ব লাভের স্পৃহা। একজন মনস্তাত্ত্বিক বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে অমরত্বের (সিমবলিক ইমমরটালিটি) কথা উল্লেখ করেছেন। সন্তান-সন্ততি উত্তরপুরুষের মধ্যে বেঁচে থাকার কামনা জৈবিক অমরত্ব লাভের ইচ্ছা। মৃত্যুর পর অনালোকে অবস্থানের ইচ্ছা ধর্মশাস্ত্রপ্রভাবিত, একে বলা চলে স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট অফ ডেথ। নিজের সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যের বা ভাবধারার মাধ্যমে অমর হবার কল্পনা করেন শিল্পীসাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক। সাধু-সন্তরা যোগাভ্যাসের ফলে তুরীয়মার্গে উপনীত হতে চান, মৃত্যুকে জয় করার অভিলাসে। সমাধিস্থ অবস্থায় সাময়িকভাবে তাঁরা কালজয়ী হয়ে পড়েন। এই লেখকের সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও বলা চলে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা অমরত্বের প্রতীক। কোনো মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাণ দানের ব্যাপারকে অমরত্ব লাভের নিজ্ঞান প্রেরণা বলে মনে করা আদর্শের প্রতি অসম্মান। মানবপ্রজাতির প্রতি আনুগত্য মানুষকে যে সব মহৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করায়, সে আনুগত্যকে অমরত্বলাভ বা মোক্ষলাভের মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভীপ্সা ভাবা চলে না। তবে অমরত্বের স্পৃহা বলতে যদি অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম হবার ইচ্ছা বোঝায়, তাহলে সেই স্পৃহা স্বার্থদুষ্ট বা মৃত্যুভয়তাড়িত নিউরোটিক প্রবণতা নয়।

মতিলালবাবুর প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছাকে আমরা কোন্ পর্যায়ে ফেলব? এটা একটা সুস্থ বাসনা না নিউরোটিক অমরত্বের কামনা? এদিক থেকে মতিলালবাবু সুস্থ বাসনা পোষণ করছেন বলা চলে না। তিনি যশকামী পারভার্ট নন, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠালাভের আকুল বাসনা একটা সাময়িক দুর্বলতা বা ব্যাকুলতাও নয়। এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী চারিত্রিক দুর্বলতা। পরগাছাবৃত্তি থেকে এর উদ্ভব ঘটেছে, তাঁর দায়িত্বহীন জীবন এই বৃত্তিকে পুষ্ট করেছে। জীবিকা অর্জন করার জন্যে মেহনত করতে হয়নি, অবিবাহিত থেকে পারিবারিক দায়িত্ব এড়িয়েছেন, কোনো সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। নানা ধরনের পড়াশুনা করেছেন। জ্ঞানবুদ্ধিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে অধীত বিদ্যার মর্যাদা রাখবার চেষ্টা করেন নি, নিজের ক্ষমতা যাচাই করেও দেখেন নি। কাজেই হয়ে উঠেছেন আত্মশক্তি অবিশ্বাসী, পরমুখাপেক্ষী, দুর্বল স্বপ্নবিলাসী। মনেপ্রাণে তিনি নিঃসঙ্গ। প্রতিমুহূর্তে তিনি অনুভব করছেন যে মুহূর্তটি চলে গেল, সেটি আর ফিরে আসবে না। অতীতে ফিরে যাওয়া যায় না, নেলীর অশ্রু মুছিয়ে দেবার সুযোগ আর জীবনে পাবেন না। তাকে সেই অদ্ভুতভাবে প্রেম জানানো বর্তমানে আর চলে না। কাজেই তিনি এমন একটা কিছু সৃষ্টি করতে চান, যা তাঁকে আর নেলীকে অতীতের সেই প্রথম প্রেম জানানোর দিনটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আবার সেখান থেকে তাঁর সৃষ্ট কাহিনী লক্ষ বছরের পরিক্রমার শেষে ভবিষ্যতের সময় আকাশে গিয়ে উজ্জ্বল তারকা হয়ে ফুটে থাকবে। তাঁরা অমর হবেন।

এই আজগুবি ছেলেমানুষী পরিকল্পনা ভদ্রলোকের লেখাগুলোর সঙ্গে আমার হাতে এসে পড়েছিল। তিনি নিজে জানাননি। বৃদ্ধ হয়েছেন, লেখার ক্ষমতা নেই, এখনও তিনি নতুন সৃষ্টির পরিকল্পনা করে চলেছেন! তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করিনি। এদিক থেকে তিনি খুবই স্পর্শপ্রবণ। তাঁকে আঘাত দিতে চাইনি।

—মনোবিন্দ
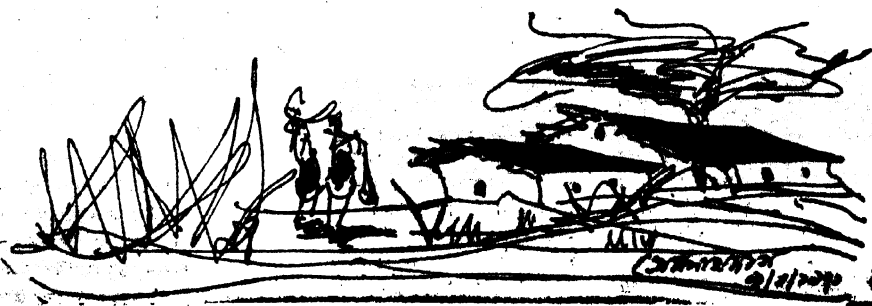
নমিতা এখনও সুন্দর! স্তম্ভিত হয়ে যায় নমিতা। বিমূঢ় বিস্ময়ে অন্ধকারে চেয়ে থাকে। কালিন্দি ঘুমিয়েছে আবার। ঘুম ঠিক নয়। ঘুম তার হয় না। শুধু ঘুম ঘুম আচ্ছন্ন ভাব। ওপাশে কমলা আর খোঁড়া রঞ্জন গুজ-গুজ করছিল কিছুক্ষণ আগে। কালিন্দি ঘুমের ঘোরেই ধমক দিয়েছে—'উ বাবা! ইয়াদের পীরিত যে ফুরায় নাই লো! —ঘুমা লো, ঘুমা লো!' কালিন্দির ধমক খেয়ে ওরা চুপ কোরে গেছে। খানিক অস্পষ্ট স্বরে বিড়-বিড় কোরে থেমে গেছে কালিন্দিও। সুদাম আর একটা কোণে পড়ে আছে চুপ কোরে। এমনিতেই কম কথা বলে সে। জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে বোঝা যায় না।

কালিন্দি বলে, 'বড় ভাল মানুষ আমাদের সুদাম গো। কচিটা মরে যেতেই উ অমুনি হ'য়ে গেলছে। নইলে দেখতিস কত হাসি কত রঙ্গ।' কালিন্দির জীবন হাসি আর রঙ্গ ভরা। বলে, 'দুদিনের জিন্দগানি', অর্থাৎ জীবন, 'কি পেলাম কি রইল—' হেইসে লে, খেয়ে লে।'

সুদামের খো পেমলা। বিয়ে দিয়ে... এই কালিন্দিই। যেমন কোরে কমলা... রঞ্জনের বিয়ে দিয়েছে। বিয়ে... কালিন্দির হুকুম। হুকুম দেয়—... করগা—ভোজ খাওয়া আমাদিকে।' ... মানে ভিক্ষেরই কাঁড়া-আঁকড়া চালের ... কার বরাদ্দ ভাত। শুধু খরচটা ... দিয়ে রান্না করবে। এছাড়া উপরে... মেলতে কালিন্দির জন্যে দুই মিষ্টি ... তাইপ কালিন্দিই বলে দেয়, 'মিঠাই ... আনবি।' ব্যস। ওই হল মন্তর ওই

রে। আর কারো কিছু করার নেই, রও। সেই পেমলা একদিন মরে গেছে। রে বেঁচেছে। কিন্তু সুদাম দুঃখ পেয়েছে এবং সেই দুঃখে ওই একদা হাসি রঙ্গ ভরা মানুষটা চুপ কোরে গেছে। আপন মনেই থাকে।

সারা ঘরটা যেন অন্ধকারে ডুবে আছে। জানলা দরজার কপাট বিহীন ফোকরগুলো যেন এক-একটা বিশাল দৈত্যের হাঁ করা মুখের গহবর। নমিতার শিয়রের জানলাটার ওপাশে নেড়া গুলঞ্চ গাছটার ডালগুলো বাতাসে দুলছে। বহু দূরে থেকে ছিটকে আসা একটুকরো আলোর রশ্মি পড়ে তার ঝলোস ছায়াটা বিলম্বিত হোয়ে নমিতার মাথা, বুক বেয়ে পায়ের দিকে দেওয়াল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

কালিন্দি বলে, 'ই গাছটি আজকার মা। কামিখ্যা যে বছর হোয়েছিল সেই বছরকার। কামিখ্যের বাপ কুথা থেকে লাইসেছিল। বলেছিল বৌ-ই গাছটি যতন কর—ই গাছটি রইল, আমি যখুন র'ইব নাই তখন ই গাছটির দিকে দেখবি তো আমাকে তুর খেয়াল পড়বেক।' কামাখ্যার বাপ আজ বেঁচে নাই কিন্তু গুলঞ্চগাছটা আছে। সারা বছরে শুধু বর্ষাকালে দু-চারটি পাতা গজায় মাত্র, দিনকতক বাদে তাও ঝরে যায়। নেড়া ডালেই ফুল ফোটে। কালিন্দি বলে, 'তানেই তো কামিখ্যাকে বলি—উটি গাছ নয় উটি তুর বাই বটে।' ফোকলা মুখে হা-হা করে হাসে কালিন্দি, বলে—'কামিখ্যার বাপ বইলথ কালীর গড়'—অর্থাৎ দুর্গ। দুর্গই বটে। প্রান্তরের মাঝখানে পরিত্যক্ত একখানা বাড়ি। বাড়ি ঘর মোট একখানাই। কোলিয়ারীর একখানা ইঞ্জিন ঘর। এখানে থেকে লোহার রশি টান কোরে খাদের চালকের চাকাটা বেয়ে ডুলির সংগে বাঁধা থাকত আর এই ঘরখানায় বসে চালক যন্ত্রের সাহায্যে সেই ডুলি প্রয়োজনমত ওঠাত নামাত। তারপর একদিন এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতিগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দরজা-জানলাগুলোও। কিন্তু বিশ ইঞ্চি পাকা গাঁথনির দেওয়াল সমেত এই বিশ ফুট উঁচু বিশাল ঘরখানা সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি তাই পড়েছিল। একদিন কামাখ্যার বাপ এসে আবিষ্কার করেছিল। সমাজ সংসার পরিত্যক্ত মানুষটা ঘুরতে ঘুরতে এসে আস্তানা গেড়েছিল এই ঘরখানাতে। তারপর এসেছে কালিন্দি। কামাখ্যার বাপের নতুন সংসারের নতুন গিন্নী হোয়ে।

নমিতার প্রথম প্রথম ভয় করত ছায়াটা দেখে। সরে যাবার পর অনেক রাতে ওই ছায়াটার দিকে চেয়ে থাকতে এখন বরং ভালই লাগে। ওই ছায়াটার পানে চেয়ে চেয়ে জীবনের হিসাব করে নমিতা। স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে তার অতীতটাকে। যে অতীতটা সে ছেড়ে এসেছে। যে অতীতটা তাকে আর কোনদিন ফিরে ডাকবে না। সারা দেহটা কুৎসিৎ ব্যাধিতে ভরে গেছে। জীবনে আশা নেই ভরসা নেই। আকাঙ্খার দিন গেছে হারিয়ে ফুরিয়ে।

বয়স তার কত। পাঁজি-পুঁথি সাল তারিখের হিসেবে বিশেষ কোঠাও পার হয়নি। কিন্তু এমনি নিস্তব্ধ অবসরে ওই গুলঞ্চ গাছের ছায়াটার পানে চেয়ে ভাবতে ভাবতে নমিতার নিজেরই মনে হয় বয়স তার অনেক। অনেক জটিল পথ পার হয়ে যে পথের সীমায় আজ সে এসে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের সেখানে পৌঁছুতে হয়ত অনেকখানি বয়সের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নমিতার তাই অনেক বয়স।

●

নমিতা শুনেছে কালিন্দির জীবন কাহিনী। টুকরো টুকরো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কালিন্দি তার জীবনের ইতিহাস বহুবার বহুজনকে বলেছে। কমলা রঞ্জন কতবার হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছে, 'হাঁ মাসী মেস্যো কি করেছিল গো—কালিন্দি প্রতিবারের মত একই কথা দিয়ে শুরু কোরেছে,—'বড় রগড়া ছিল' মানে ওই কামাখ্যার বাপ। বলে, 'পরথম দিনেই'—তখন কালিন্দির চোখ ছিল, হাত-পাও। আর ছিল ভরা ভর্তি যৌবন। কালিন্দি বলে, 'দশহাত কাপড়ে আঁটাত নাই।'

—'তখন পথঘাট চিনহি নাই। কভু ভিক মাঙ্গি নাই। কি যে করি দিশা নাই।' বলে, 'কামিখ্যার বাপেরও দশসাই চেহারা। ভদ্দর লোকের পারা।' কিন্তু কাল ব্যাধির আক্রমণে অমন মানুষটাকে আর চিনবার উপায় ছিল না। সারা গায়ে চাকা চাকা ফুলা ফুলা দাগ। 'মানহুসকে মানহুস বইলে চিনহা যায় নাই।' কামাখ্যার বাপের জন্যে কালিন্দির মনটা—হঠাৎই করুণায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। কমলা ওপাশ থেকে মুচকি হেসে তাড়া দেয়, 'তারপরে কি হল গো মাসি চুপ কইরে রইলে ক্যানে।' কালিন্দি সস্নেহ ধমক দিয়েছে, 'দূর ছুঁড়ি মা মাসির কেলেঙ্কার কোথা শুনবি কি না।' কিন্তু চুপ কোরেও থাকতে পারে না। ঠোঁটের কোণে সেই বিস্মৃত দিনের ঘটনার কথা স্মরণ করে হাসি ফুটে ওঠে কালিন্দির। গলে যাওয়া চোখ দুটো পিট-পিট করে নড়ে ওঠে বিগত দিনের কৌতুকের উত্তেজনায়। তারপর আপন মনেই সেই পুরাতন বহু কথিত কাহিনী আবার নতুন করে বলে,

—'আমার পানে খানিক চেঁয়ে থেকে বললেক—এই কুথা যাছিস?'

—'টাউনে ভিক মাঙ্গতে।'

—'উদিকে যাস নাই।'

কেনে?'

—'কুথাকার মন্ত্রী না সাহাব আইসেছে। রাস্তায় ভিক মাঙ্গাদিকে বসতে দিছে না। বেবাক ঠেঙ্গাচ্ছে পুলিশে।'

—'হেই মা।' কালিন্দি যেন সেদিনকার মত আজও শিউরে ওঠে। বলে 'মা, মার কভু খাই নাই, পুলিশ কভু দেখি নাই! ভয়ে তখুন আমার হাত-পা একঠুকুম। বললম কি হবেক? ত কামিখ্যার বাপ বললেক পালাই আয় আমার সাথে।'

—'কি খাব?'

—'আমি খাওয়াব গো তুখে।'

—'সেই কামিখ্যার বাপ হেথায় লি'য়ে তুলেছিল। হাসতে হাসতে বইলেছিল সোব মিছা কোথা। একা একা থাকি তাই তুখে মনের মানহুস বইরে লি'য়ে আলম।'

কালিন্দি হাসে আর বলে, 'সেই হতে এই ঠেঁয়েই আছি মা। সেই বলে নাই জনম দিলেক ভোগমান আর খাওয়াবেকও সেই ভোগমানই—সারা গা ভর্তি পারা ঘা তবু মনের মানহুস পেলম।'

কামাখ্যার বাপের সংগে বিয়ে হয়েছে কালিন্দির। নতুন করে সংসার পেতেছে। ক্রমে সব ভুলে গেছে। তার ফেলে আসা জীবনকে, সমাজকে, আত্মীয়-স্বজনকে। কামাখ্যার বাপকেই পরমাত্মীয় বলে ভেবে নিয়েছে। স্বপ্ন দেখে কালিন্দি।

স্বপ্ন দেখে নমিতাও। সে যেন অনেক কালের কথা। পাড়ার লোকে বলত ফুট-ফুটে মেয়ে, যেন চাঁদের কণা। রাজপুত্রের মত বর হবে। মধ্যবিত্ত সংসারে মেয়ের রূপটা তবু শূন্য ভাঁড়ারে আওয়াজ করার মত কানাকড়ি। বিধাতার নিজের তদারকিতেই বুঝি গড়া হোয়েছিল নমিতার দেহখানা। পাড়ার লোকের আশীর্বাদ কুড়িয়ে রাজপুত্র না হক অলকের মত স্বামী পেয়েছিল নমিতা। স্বপ্নই যেন!

কিন্তু সবটাই স্বপ্ন নয়। পিঠের মাঝখানে একটা সাদা গোল দাগ নমিতার ফর্সা চামড়াকে ছাপিয়ে তিন প্রস্থ কাপড় ভেদ করে একদিন অলকের চোখে পড়ে গেল।

—'এ দাগটা কিসের বল তো?'

—'কোথায়?' নমিতা গা দেখেই শিউরে উঠেছিল।

—'এই তো পিঠের মাঝখানে?'

—'জানি নে তো।' শুকনো গলায় জবাব দিয়েছিল নমিতা।

'চুলকোয়?'

—'কই না।'

—'লাগছে?' —অলক চিমটি কাটে দাগটার ওপর।

—'না তো।'

অলক আর কিছু বলেনি সেদিন। তারপর কি একটা কাজে তাকে দিন তিনেক বাইরে যেতে হয়েছিল। বাড়ি ফিরেছিল সংগে একজন ডাক্তার নিয়ে। শুধু পিঠেই নয় খোঁজাখুঁজির পর দেহের অন্যান্য অংশেও অনেকগুলো লালচে ধরনের চাকা চাকা দাগ ধরা পড়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তার কি বলে গিয়েছিল নমিতা শুনতে পায়নি কিন্তু ঠাঁই হল তার বাইরের ঘরে।

কালিন্দি বলে, 'ই রোগকে সোবাই ডরায় মা। মা-বাপে পর কইরে দেয়।'

অনেক কটা দিন দোর বন্ধ কোরে নমিতা সেই ঘরে কাটিয়েছে। জানলা খুলেছে গভীর রাতে, সবাই ঘুমিয়ে গেলে। একা-একা কখনও বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গোটা আকাশটার নীচে। চাঁদ দেখেছে। জ্যোৎস্নার ধারায় স্নান কোরেছে। তারা গোনবার চেষ্টা করেছে। কখনও মন গান গেয়েছে আপন মনে। কখন চোখের জলে ভেসেছে। নমিতার চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে ওঠে আজকে এতদিন পরে।

পৃথিবীটাকে সেদিন বড় সুন্দর মনে হোয়েছে তার। তাই হারিয়ে গেল একদিন নমিতা। রাতের অন্ধকারে—এই পৃথিবীর বুকেই। তার সমাজ ছেড়ে, তার সেই জীবন ছেড়ে, উন্মুক্ত আকাশের তলে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে তার নির্দিষ্ট কুঠরীখানার মধ্যে ফিরে যেতে আর মন চাইল না। সেদিন সে জেনেছিল তার এই হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কোন ইতিহাস থাকবে না হয়ত কোন প্রশ্নও না। এমন কি তাকে অসতীও ভাববে না কেউ। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে হারিয়ে যেতে পেরেছিল।

সারাদিন পথশ্রমে শ্রান্ত হোয়ে রাতের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছিল একটা বাড়ির বারান্দায়। খিদের জ্বালায় ঘুম আসেনি। ক্লান্তিতে আচ্ছন্নের মত পড়েছিল। রাত তখন কত কে জানে। কার ডাকেই যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে চাইতে পারেনি—মুখের ওপর টর্চের আলো। সন্ত্রস্থ হোয়ে উঠে জড়সড় হোয়ে বসেছিল। কলঙ্কের ভয় যেন শত্রুর মত তখনও পেছন ছাড়েনি। নেশাগ্রস্ত মানুষটা খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ পায়নি। হঠাৎ পাওয়ার আনন্দেই বিভোর। বারান্দা থেকে সামগ্রীর মত যত্ন করে তুলে এনেছিল নরম শয্যায়। পেট ভরে খেতে দিয়েছিল। ঘোমটার আড়ালে ক্রূর হাসি হেসে শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছিল লোকটার আলিঙ্গনে—যৌবন পাগলা পুরুষ কাঙ্গাল মেয়ের মত। তারপর ভোর না হতেই পালিয়ে এসেছিল।

নমিতা হিসেব কোরে দেখেছে এমনি কোরে অনেকগুলো মানুষের ওপর সে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশ পেয়েছে। কাপড়ের আড়ালে ঢেকে রাখা সম্ভব হয়নি। ধরা পড়েছে। লাঞ্ছনাও সহ্য কোরেছে। কামাতুর পশুগুলোও ভয় পেয়েছে চরম মুহূর্তে। ক্ষোভে দুঃখে নমিতা পাগল হোয়ে উঠেছে। নিজের হাতে পাথর দিয়ে একদিন নিজেরই কপাল ফাটিয়েছে। এক বিন্দুর পরিবর্তে আঁজলা ভর্তি রক্ত নিয়ে নমিতা দেখতে চেয়েছে রক্তের রঙের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। খুঁজে বের কোরতে চেয়েছে ব্যাধির সূক্ষ্ম অদৃশ্য কীটাণুগুলোকে।

কালিন্দি বলে, 'ভোগমানের দিয়া সাজা মা। ইয়াতে মানুষ তো মরে নাই। মরল যদি তবে ভামনা কি। মরল তো ফুরাল। তা তো হবেক নাই। একটুন একটুন কইরে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে মরবেক। যার যেমন পাপ তার ততদিন ভোগ। পেমলা পুণ্যমতি তাই ঝট্ কইরে মরল। কামিখ্যার বাপেরও পাপ ফুরাল সেও মরল। মরণ তো লয় জুড়োন। লয়ত এত লোকের মরণ হয় আমার মরণ হত নাই।'

●

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে অথবা ভাসতে ভাসতেই নমিতা একদিন এসে পৌঁছেছিল এই ভাঙ্গা পরিত্যক্ত এঞ্জিন ঘরটার সামনে। ঝোপ-জঙ্গল আর ইতস্ততঃ পাথরের চাঁই-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই বিশাল ঘরখানা যেন ইতিহাস বিস্মৃত কোন এক রাজার কেল্লা। কামাখ্যার বাপের দেওয়া নাম—কালীর গড়।

দরজার সামনেই বসেছিল কালিন্দি। এই গড়ের একছত্র অধিশ্বরী। কব্জী পর্যন্ত হাত দুটো এবং গোড়ালি পর্যন্ত পা দুখানা কুষ্ঠের দুষ্ট ক্ষতে ক্ষয়ে গেছে। চোখের তারা দুটোও গলা। কিন্তু অদ্ভুত অনুভূতি শক্তি কালিন্দির। নমিতা এসে দাঁড়াতেই জানতে পেরেছে। জিজ্ঞেস কোরেছে, 'কে কোমলা এলি?'

নমিতা কালিন্দির ওই বীভৎস মূর্তি দেখে স্তব্ধ এবং স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

কালিন্দি আবার প্রশ্ন করেছে, 'ক্যা গো ক্যা বটিস।'

নমিতা ভয়ে ভয়ে সাড়া দিয়েছে, 'আমি—'

কালিন্দি সন্ত্রস্থ হোয়ে উঠেছে, 'ক্যা ক্যা? লউতুন মানহুস লাগছে?' কালিন্দি ভাবে এ বুঝি কোন নতুন উপদ্রব। কেউ বুঝি এসেছে তার এতকালের কেল্লা দখল কোরতে। রুখে ওঠে তাই। গলায় ঝাঁঝ তুলে বলে, 'ক্যা গো,—আমি ক্যা, বলি 'রা বিরায় নাই নাকি? লোকের হাতে পায়ে কুট হয় তুমার কি সোনায় লাগতে হোয়েছে?'

শিউরে উঠেছে নমিতা। একবার মনে হোয়েছে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ক্লান্ত পা দুটো মাটির সংগে শক্ত হয়ে বসে গেছে; একটু বিশ্রাম তার চাই। ভাবেও যা। পালিয়ে গিয়ে কি হবে? কোথায় পালিয়ে যাবে? আজ কালিন্দিকে দেখে ভয় পাচ্ছে কিন্তু সেদিন নিজেকে দেখে ভয় লাগবে? সেদিন কোথায় পালাবে? কালিন্দি তো তারই অদূর ভবিষ্যতের জীবন্ত প্রতি-মূর্তি। এই কালিন্দির মত একদিন তারও হাত-পা ক্ষয়ে যাবে। হয়ত একদিন এক অন্ধ নমিতাকেই এমনি কোরে এইখানে এই ভাঙ্গা দরজার সামনে প্রহরায় বসে থাকতে হবে। কেউ এসে পড়লে এমনি কোরেই প্রশ্ন কোরবে। এ বুঝি এখানকার রীতি। নমিতা তাই শক্ত কোরেছে মনকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে। জবাব দিয়েছে—'আমি নতুন মানুষ।'

—'ভদ্দর লোক?'

কালিন্দির এ ধরনের প্রশ্নে নমিতা বিব্রত বোধ করে। ভেবে পায় না কি জবাব দেবে। ব্যাধির আবার ভদ্রাভদ্র বিচার আছে? নাকি কালিন্দির এই কেল্লায় ভদ্রা-ভদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের আলাদা আলাদা স্থান আছে? উঁকি মেরে এক পলকে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করে। ঘরখানার তিনদিকের তিন কোণে কিছু কিছু গৃহস্থালীর সরঞ্জাম। নমিতা বুঝতে পারে কালিন্দি ছাড়াও আরও লোক থাকে। এদিকের কোনটা শুধু ফাঁকা। কোনটার পাশে মস্ত একটা জানলার ফোকর। সেই ফোকরটার গা ঘেঁষে বাইরের দিকে একটা নেড়া গুলঞ্চ গাছ। কুষ্ঠ রোগীর ক্ষয়ে যাওয়া হাত পায়ের আঙ্গুলের মত গাছটার পত্র বিহীন শাখা-প্রশাখাগুলো হাওয়ায় দোলে। কুষ্ঠ রোগীর গায়ের ফোস্কা পড়া মসৃণ চামড়ার মত গাছটার মসৃণ অবয়বে রোদের আভা ঝলসায়। নমিতা দিনের আলোয় চাইতে পারে না গাছটার দিকে আজও। রাত্রে যখন গাছটার ছায়া পড়ে নমিতার মাথা, মুখ বুক বেয়ে পায়ের তলায় দেওয়ালটা পর্যন্ত, মাথা নাড়ে দমকা বাতাসে, তখন নমিতা চেয়ে থাকে। অনেক রাত অনেকক্ষণ ধরে। ঘুম না আসা পর্যন্ত। কালিন্দি তারপর নিজেই ডেকেছে নমিতাকে পরমাত্মীয়ার মত, 'ডাঁড়াই র'ইলে কেনে গো। দেখে লাও, ই পাশের কুনাটা খালি র'ইছে। ওই ঠেঁয়েই থাক—নাম কি তুমার।'

—'নমিতা।' নমিতা চমকে উঠেছে নিজের মুখে নিজের নামটা শুনে। এখানে এই কালিন্দির সামনে দাঁড়িয়ে এ নামটা যেন অচল। অন্ততঃ বেমানান।

'নমিতা?—জুয়ান বিটি ছেলা মনে হচ্ছে।' কালিন্দি নমিতার কণ্ঠস্বরেই তার বয়স আন্দাজ করেছে। —'বিহা হোয়েছে? বামুনের বিটি?' কথাটা বলে দন্তহীন মুখে কালিন্দি নিজেই হেসে ওঠে হাহা কোরে। —'কুড়িয়ায় আবার জাত!'

—'বাপের ছিল, মা মায়ের।' কালিন্দি আবার প্রশ্ন তোলে। হাজার প্রশ্ন কালিন্দির।

নমিতা আর দাঁড়াতে পারে না। কালিন্দির খোঁচা বাঁচিয়ে একটু দূরে বসে তাই বসে পড়ে। একটু জিরোয়। শুয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যেত। কিন্তু কালিন্দির ঐ বীভৎস দেহখানার সামনে

নুয়ে পড়তে সেদিন সেই মুহূর্তে তার সাহসে কুলোয়নি।

কালিন্দি নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেয়। নমিতার অপেক্ষা রাখে না। বলে,—মা বাপের র'ইলেও হয় না র'ইলেও হয়। আমার বাপেরও ছিল নাই, মায়েরও নাই।—কর্মফল। আপনার আপনার করমে আপন আপন সাজা ভোগ করে মানহুসে।'

বলে, 'আমার তো কুড়িয়া লয়—পারা। সকলের কাছে কৌলিন্যের এই আভিজাত্যটুকুই কালিন্দির গর্ব। এই কৌলিন্যের গৌরবেই কালীর গড়ের রাজায়-প্রজায় যে অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানটুকু সৃষ্টি হোয়েছে সেটা কালিন্দির নিজের তৈরী। তার নিজের দৃষ্টি ছাড়া আর কারো চোখে পড়ে না এ প্রভেদ। কালিন্দি তাই নিজের মুখেই ব্যক্ত করে। এ কাহিনী সবাই শুনেছে। কমলা, রঞ্জন, সুদাম পেমলা এমন কি কামাখ্যার বাপকেও বলতে বাদ দেয়নি। নমিতার কাছেও সেই একই গল্প কোরেছে কালিন্দি। জানিয়ে দিয়েছে রাজা প্রজার অন্তরটুকু—'কুড়িয়া লয় পারা।—গর্ম হ'য়েছিল।'

আদিকালের বদ্যিবুড়ির মত আপন মনেই বলে আপনি শোনে। 'তুমার পারা আমিও ভদ্দর ঘরের মেয়্যা মা—জাইতে লোহার'—অর্থাৎ কামার। গল্পের ঝুলি ঝেড়ে চলে কালিন্দি,—'পুরুল্যা আমাদের ঘর। গরীবের ঘরে বিটি ছেলার কি জ্বালা জান তো মা। তায় ভোগমানে রূপ দেয় নাই। ইদিকে গতরে সাতখান। খুঁজে পেতে বিহা হইল এক ধুকা বুড়ার সাথে। হাঁপের ব্যারাম ছিল মিনসের। এই আছে তো এই নাই। খালি বইলত, কালী একটুন মালিশ কইরে দিবি? শুনলে কাঁদনা পেত। সারাদিন গতরে খাইটে রাইতের বেলায় মেয়্যামানুষ মরদের কাছে দুটা মনের কোথা শুনে দুটা মনের কোথা বলে—মন জুড়ায়! হেথায় খালি মালিশ আর মালিশ।' বলে,—'আমার তখুন অ্যাই যৈবন—অ্যাই গতর লজ্জাহাত কাপড়ে আঁটাত নাই। আর দেহটাকে কাপড় ঢাকুন দিলে হবেক কি? মন কি মানবেক?'

নমিতাকে এক মুহূর্তে আপন করে নিয়েছে। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি উঠেছে জেগে। গলা চোখ দুটো পিট-পিট করে নড়ে উঠেছে বারকতক। তারপর এক অদ্ভুত কায়দায় ঘষে ঘষে আন্দাজে আন্দাজে সরে এসেছে। নমিতার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস-ফিস কোরে বলেছে তার জীবনের মস্ত গুপ্ত কথাটা—'হ'য়ে গেল ফষ্টি নষ্টি।' বলেই হা-হা কোরে হেসেছে। একধরনের বিজাতীয় আঁশটে দুর্গন্ধ নমিতার নাকে-মুখে ঝাপটা মারতেই বমি এসেছে নমিতার। সমস্ত স্নায়ুগুলো জমাট বেঁধে গেছে। হাত-পা নেড়ে বসবার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়ে গেছে। এমন কি মুখখানাও ঘুরিয়ে নিতে পারেনি। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছে কালিন্দির পানে।। কালিন্দি বলে গেছে তার জীবনের ইতিবৃত্ত। —'সেই লাপিত ছোঁড়ার ছিল ঐ রোগ। কি যন্তোনা মা। প্যাঁষ-ম্যাষ এক রোঝার কাছে দুটা টাকা দি'য়ে দাওয়াই লিলম। দাওয়াই খে'য়ে যন্তোনা গেল কিন্তু মাস ফুরাল নাই সারা গায়ে ফুটে গেল পারা ঘা। দাওয়াই-এ পারা ছিল মা।'

কৃতকর্মের জন্যে কালিন্দির তবু কোন অনুশোচনা নেই। তাই কালিন্দি হাসতে হাসতেই বোলতে পারে সব কথা। বলে, 'নিজের হাঁতে বিষ খেয়েছি—কাঁদলে শুনবেক ক্যা?' ফেলে আসা জীবনের কোন স্মৃতি সাময়িকভাবে মনটাকে উন্মনা কোরলেও কালিন্দি তাকে প্রশ্রয় দেয় না: তার জীবনের ইতিবৃত্তের মাধ্যমে তৈরী অদৃশ্য সেতুটা দিয়ে সে এপার-ওপার করে শুধুমাত্র অভ্যাসের বশে। গত জীবনের প্রতি যেমন তার কোন মোহ নেই আজকের এই ব্যাধি কবলিত পঙ্গু দেহটার জন্য তেমনি কোন আক্ষেপও নেই।

নমিতা এখানে এসে বুঝতে পেরেছে এখানেও সমাজ আছে সংসার আছে, রীতি-নীতিও। আছে প্রেম ভালবাসা। কালিন্দি আজ নতুন সমাজের মানুষ। নতুন সংসারের কর্ত্রী। নতুন রাজ্যের অধিশ্বরী। ত্রিশ বছর আগে একদিন কামাখ্যার বাপের সংগে এখানে এসে সংসার পেতেছিল। তারপর সুদাম এসেছে, পেমলা এসেছে। এসেছে কমলা রঞ্জন। তারপর এসেছে কামাখ্যা। পেমলা মরে গেছে। কামাখ্যার বাপ মরে গেছে। হয়ত আরও কতজন এসেছে গেছে। তার সংসারের সুখ-দুঃখ, তার রাজ্যের উত্থান-পতনের সংগে সংগে, কালিন্দি তাই কখনো হেসেছে কখনো কেঁদেছে।

*

নেড়া গুলঞ্চ গাছটাতে কলি আসে, ফুল ফোটে। সমস্ত দিনের পর কুলায় ফেরা পাখির মত কালীর গড়ের বাসিন্দারা ফিরে আসে। নিস্তব্ধ পাষাণ পুরী খানিকক্ষণের জন্যে মুখর হয়ে ওঠে হাসিতে কথায় আর কলরবে। রান্নাবান্নার আয়োজনের মাঝে-মাঝে গল্প-গুজবে।

নমিতাকে দেখে কমলাই প্রথম প্রশ্ন করে,—'ক্যা মাসী?'

কালিন্দি তার চিরাচরিত হাসি হেসে জবাব দেয়,—'লউতুন মানহুস।'

কামাখ্যা হ্যারিকেন বাতিটায় তেল ভরে জ্বেলে দেয়। কালিন্দি বলে, 'আঁধারে র'ইতে লারি মা। কামাখ্যার বাপও লারত।' কালিন্দির চোখে আজ আলো-অন্ধকার সমান। কিন্তু অভ্যাসটুকু আজও আছে। নিজেই বলে, 'বাতিটা জ্বালা রে',—বলে,—'ভুত তো লই মানহুস।'

হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় নমিতার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে কামাখ্যা কালিন্দির গা ঘেঁষে এসে প্রশ্ন করে, 'ক্যা মা?'

—'তুর বৌ রে হারামজাদা।' আবার হা-হা করে হেসে ওঠে। এই আবছা অন্ধকারে কালিন্দির হাসিটা প্রতিধ্বনিত হয়ে দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘুরতে থাকে। হ্যারিকেনের আলোয় কালিন্দির দেহের ছায়াটা একটা বিরাটকায় রাক্ষসীর অবয়বের মত প্রতিফলিত হয় ঘরটার দেওয়ালে-দেওয়ালে। নমিতা উদভ্রান্তের মত চেয়ে থাকে কামাখ্যা আর কালিন্দির দিকে।

কালিন্দি বলে, 'কামিখ্যার বাপ বইলথ, কালী ছেলাটাকে হুতাদর করিস নাই। মানুহস করিস।' আদিখ্যেতার যেন শেষ নেই কালিন্দির জীবনে। কালিন্দি হাসবে না কাঁদবে কূল কোরতে পারে না।—'বাপ কুড়িয়া, মা কুড়িয়া মানহুস্ কোরবেক কি দি'য়ে?'

নমিতা দেখেছে আধ-পাগলা কামাখ্যা তাই মানুষ হয় নি। পঁচিশ বছরের যে ছেলেটার দেহ স্বাস্থ্য, যৌবনে ভরে ওঠার কথা। কালব্যাধির বিষ দংশনে সে আজ জর্জরিত। সারা মুখের চামড়ায় ফোস্কা পড়েছে। নাক এবং কানের নরম জায়গাগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছে। উপরের ঠোঁটটা ফুলে দ্বিগুণ হয়ে নীচের ঠোঁটটা ঢেকে দিয়েছে। দু হাতের আঙুলেই ক্ষতের আক্রমণ শুরু হয়েছে।

এই কামাখ্যা নমিতার দেহটার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। প্রথম রাত্রেই সে সরে এসেছিল নমিতার কাছে। নমিতার এখনও ঘুম আসে নি। মাটির ওপরে কাপড়ের এক দিকের খুঁট বিছিয়ে শুয়েছিল। দেহটা শ্রান্ত হয়েছে। মনটা সেই পরিমাণে অশান্ত। গুলঞ্চ গাছের ছায়াটা দুলে দুলে উঠেছে নমিতার মুখ বুক হাঁটু বেয়ে পা তলার দেওয়াল পর্যন্ত। নমিতা চোখ বন্ধ করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে কামাখ্যার স্পর্শ দেহে লাগতে একটা প্রচণ্ড ভয়ে নমিতা চিৎকার করে উঠেছে। কামাখ্যা সরে গেছে আবার মায়ের কাছে। ক্ষুব্ধ বোবা পশুর মত অব্যক্ত স্বরে অভিযোগ জানিয়েছে কালিন্দির কাছে। ওপাশ থেকে কালিন্দির চাপা ধমক শোনা গেছে,—'দু দিন সবুর নাই। লোকা স'ক-স'ক করছে।' কামাখ্যা কোন জবাব দেয় নি। খানিক পরে কালিন্দিই আবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'ছুঁড়িটা দেখতে কেমুন ক্যা?'

—'ভারি সোন্দর।'

নমিতা স্তম্ভিত হয়ে যায়—এখনও সে সুন্দর।

কখনও পড়ন্ত রোদের আলোয় হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে নমিতা তার দেহখানাকে আদর করেছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছে। কামাখ্যা দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছে—

—'কি দেখছিস?—উ আর ভাল হবেক নাই। তুর পারা একদিন আমারও হ'য়েছিল। তুরও দেখবি আমার পারা কান ফুলবেক, নাক ফুলবেক, হাতেও ঘা হবেক।'

ব্রিটেনেও। এ সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করতে করতেই দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ হয়ে আসবে আর অন্ধকারের ঘোরও কাটবে। তাই তিনি মনে করেন যে, সকলেরই আজ এদিকে নজর ফেরাবার সময় এসেছে। এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারকে উপেক্ষা করা কোনক্রমেই সমীচীন হবে না। বরং তা হবে অদূরদর্শিতারই নামান্তর।

এরপরই মিস ডেভলিন ফিরে যান সেই প্রসংগে। সমস্ত অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেন তিনি। একটু থেমে বললেন তিনি, সমস্ত ব্রিটিশ শ্রমজীবীকে সচেতন হবার আহ্বানের মধ্য দিয়ে তাঁরা মূল্য লক্ষ্য থেকে কোনক্রমেই সরে আসছেন না। এই বিচ্যুতির অভিযোগ যেমন সত্যি নয় তেমনি শর্ট টার্ম পরাজয়কে মেনে নেওয়ার অভিযোগও মিথ্যা।

মিস ডেভলিন বললেন, একইসংগে আমরা অন্যদিকেও এগনোর চেষ্টা করছি। সেজন্যই কোনক্রমে এক জায়গায় আটকে থাকতে চাই না। লং টার্ম কর্মসূচী যেমন অব্যাহত আছে তেমনি টুকরো টুকরো এমন কিছু কাজও আছে যাতে সাফল্যের সম্ভাবনা হাতেনাতে। সেই উদ্দেশ্য থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে টেনান্টস অ্যাশো-সিয়েশন। আয়ার্ল্যাণ্ডে এই টেনান্টস অ্যাশোসিয়েশনের কাজ হচ্ছে বাড়ি-ঘরের উন্নতির দিকে নজর রাখা। তারচেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে যে, বাড়িওয়ালা যেন ভাড়াটেকে শুষে না খায়। বাড়িভাড়া যেন উপযুক্ত হয়।

শিল্পকর্মের এই আকর্ষণীয় নিদর্শনটি সম্পূর্ণ উলের তৈরি। ঘরের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে এর ব্যবহার চলে' সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর কয়েকটি প্রদর্শনী কক্ষে এটি বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

একজন সাংবাদিক আবার একটি বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসলো। প্রশ্নটি হলো আইরিশ রিপাবলিকান আরমি সংক্রান্ত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই আর্মি কি ব্রিটিশ সেনানীর সংগে যুদ্ধ করতে নারাজ? বিশেষ, ক্যাথলিক প্রধান অঞ্চলে। মিস ডেভলিন প্রশ্নটা শুনলেন। কোন ক্ষোভ বা ক্রোধ সেই মুহূর্তে তাঁর চোখে-মুখে প্রকাশ পেল না। জবাব যেন তৈরিই ছিল। তিনি প্রশ্ন শেষ হবার সংগে সংগে উত্তর দিলেন। গোড়াতেই এরকম একটা সম্ভাবনার কথা তিনি উড়িয়ে দিলেন। আইরিশ রিপাবলিকান আরমি এরকম লোক নিয়ে গঠিত যাঁরা প্রয়োজনে যে কোন অবস্থায় মুখোমুখি দাঁড়াতে দ্বিধা করবেন না। এ'রা সবাই শিক্ষিত এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই কোন পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। তাই তাঁরা ওপথ মাড়াবেন বলে মনে হয় না।

তারপর তিনি জুড়ে দিলেন, এ'দের সম্বন্ধে জানতে হলে আগে আয়র্ল্যাণ্ডের প্রকৃত অবস্থা জানতে হবে। না হলে অন্ধকারে হাতড়ে মড়াই সার হবে। এ'রা যখন উগ্রপন্থা অবলম্বন করে তা কতগুলি সুনির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে। সেদেশে বস্তিগুলি হলো গীর্জার মালিকানাধীন। যুগ যুগ ধরে তাই চলে আসছে। একে কায়েমী স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা চলে না। এই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করাই হলো মূল লক্ষ্য। এই সচেতনতাকে রাজনৈতিক রূপদানের কথা তিনি স্বীকার করেন। এজন্যই আমেরিকায় তাঁর প্রচার অভিযান এবং একই কারণে ব্রিটেনের জনমতকেও তিনি স্বপক্ষে চান।

মিস ডেভলিন এই জনমত গঠনের সংগে সংগে বিপ্লবী তৎপরতাও চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। তবুও বিপ্লবী কার্যকলাপকে তিনি শুধুমাত্র ধ্বংসের উৎসব বলে মেনে নিতে রাজী নন। তিনি পরিষ্কার বললেন, মৃতের স্তূপের উপর দিয়ে আমরা রক্তের হোরিখেলা কখনো করবো না। এতে আমরা মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবো এবং আমাদের ব্যর্থতাও হবে ত্বরান্বিত।

মিস ডেভলিনের আশংকা গীর্জাকে অস্বীকার করে এই বি[illegible] সংগঠনে মদত জোগানো আয়ার্ল্যাণ্ডের পক্ষে খুবই দুষ্কর। সাধারণ ম[illegible] ধর্মভীরু। তাঁরা গীর্জার বিরুদ্ধে যে[illegible] কথাকেই ধর্মবিরোধী বলে মনে ক[illegible] কিন্তু আন্দোলন যখন আরো [illegible] হবে তখন জনসাধারণের এই মানসিকা পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। শুধুমাত্র তা[illegible] মেরী বা যিশুর দোহাই দিয়ে দীর্[illegible] অন্যায় চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। স[illegible] মানুষের উন্নতির জন্যও গীর্জাকে [illegible] আসতে হবে। কিন্তু এদিকে [illegible] কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য নেই। সেই পুরনে[illegible] তাঁরা এখনো আঁকড়ে আছেন। তাই কারো মধ্যে এই জিজ্ঞাসা তীব্র হয়ে[illegible] যে, গীর্জা চোখা চোখা ধর্মের বুলি[illegible] যীশুর মানবহিতে নির্দিষ্ট পথে[illegible] বাড়াচ্ছে না। এমনিভাবে সকলের[illegible] ফুটবে। আর তখন লক্ষ্যে [illegible] আমাদের কোন অসুবিধাই হ[illegible] ইতিমধ্যে 'সর্ট টার্মে' আমরা [illegible] মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে

মার্চেন্ট আইভরি প্রোডাকসনের বোম্বে টকিতে অপর্ণা সেন

প্রেক্ষাগৃহ

ও দুদিন বৈত' নয়

নাও দুদিন বৈত' নয়, এই চরমভাবে সত্য করে তুলতে আনন্দ সাইগল, যে হচ্ছে রূপম দিত এবং হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'আনন্দ' চিত্রের নায়ক। সার্কোমা অব পি ইনটেস্টাইনস্ দ্বারা যে-মানুষ আক্রান্ত হয়, টি নাকি ধরা পড়ে একেবারে য়, যখন মাস-তিন-চারের মধ্যে বী মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা দের আর কিছুই করবার থাকে বাসী আনন্দ যেদিন তার এই রোগের কথা জানতে পারল, সে তার প্রিয়তমা 'সোনার ময়ে থেকে দূরে থাকবার অভি- রে বোম্বাই শহরে রওনা হল উঠল ডাঃ প্রকাশ কুলকার্ণির য়ে (ক্লিনিক-এ)। এইখানে তার হল ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে ডাঃ ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত জন- অধিকাংশেরই রোগের মূলে রণ দারিদ্র্য, অভিজ্ঞতালব্ধ এই ভাস্করকে ক্রমেই যখন জীবন সিনিক করে তুলছিল, ঠিক এই খা হল তার আনন্দের সঙ্গে।

আনন্দ বিস্ময়ের সৃষ্টি করল ভাস্করের মনে। লোকটা বলে কি! জানি, আমার এমন রোগ হয়েছে, যা সারবে তো নাই, উল্টে আমার দেহটাকে ক্রমে ক্রমে অধিকার করে মাস-দুতিনের মধ্যে আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। তাই তো যতদিন না একেবারে অসমর্থ হয়ে শুয়ে পড়ছি, ততদিন জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে হাসিখুশীতে ভরিয়ে রাখতে চাই। সার্থক ওর আনন্দ নাম। চেনা-অচেনা, সকলকেই সে আনন্দ বিতরণ করে চলেছে প্রতি-নিয়ত। ডাঃ ভাস্করের গোপন প্রেমকে সেই নিয়ে গেল সার্থকতার পথে, ভাস্কর ও রেণুকে সেই নিয়ে এল কাছাকাছি। প্রকাশের স্ত্রী সুমনকে সে খুশীতে ভরিয়ে তুলল। পথের অচেনা লোককে ক্ষণিক আনন্দে উদ্ভাসিত করল। অচেনা অভি-নেতাকে আপন করে নিল। অমন গম্ভীর মেট্রন মিসেস ডিসাকে 'মা' ডেকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেলল। ভাস্কর, রেণু, প্রকাশ, সুমন, ডিসা, এমনকি ভাস্করের বৃদ্ধ ভৃত্য রঘুকাকা—সবাইকে সে তার হাসিখুশী দিয়ে এমন প্রীতির বন্ধনে বেঁধে ফেলল যে, তার নিশ্চিত মরণ জেনেও সবাই প্রার্থনা করতে লাগল একটা অঘটন ঘটবার জন্যে, যার ফলে আনন্দ বেঁচে যায়। কিন্তু তা যখন হল না, যখন আনন্দ নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, তখন ওরা বুঝল আনন্দের মৃত্যু নেই, যে-আনন্দধারা সে ওদের মধ্যে অকৃপণ হস্তে ছড়িয়ে গেছে, তারই ভেতর সে বেঁচে থাকবে।

আকিরা কুরসাওয়ার একখানি ছবি দেখেছিলুম, যাতে এক বৃদ্ধ নিশ্চিত মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে জেনে বহু শ্রম স্বীকার করেও লোকের মঙ্গলবিধানে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল।—জানি না, পরিচালক-প্রযোজক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এই চরিত্রটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আনন্দ' কাহিনীটি রচনা করেছেন কিনা। অবশ্য তাহলেও এমন কিছু এসে যায় না। কারণ, মঙ্গলবিধান এবং আনন্দ বিতরণ—এক কথা নয়; তাছাড়া সেখানে নায়ক ছিল বৃদ্ধ, আর এখানে নায়ক হচ্ছে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এক যুবক। অনেক প্রভেদ। 'আনন্দ'-এর মতো একটি মন-কেড়ে-নেওয়া চরিত্র সৃষ্টি যে-কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাহিনীকারের পক্ষেও অপরিসীম গৌরবের বস্তু। বলা চলে, এই 'আনন্দ' চরিত্রটিই ছবিটিকে আশ্চর্যভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এরই সঙ্গে এও বলা প্রয়োজন যে, শ্রীমুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য রচনা-কৌশল বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে চরিত্রটির উপস্থাপনাকে অতিমাত্রায় সার্থক করে তুলেছে। তবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে, ছবির একেবারে শেষভাগে, যেখানে আনন্দ ক্রমেই শয্যাগত হয়ে পড়েছে, সেখানেও অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে আনন্দ যদি উপস্থিত সকলকে হাসাবার চেষ্টা করত এবং আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় কাতর না হয়ে তাকে হাসিমুখে বিদায় দেবার জন্যে অনুরোধ করতে করতে হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে

পড়ত, তাহলে দর্শকদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হত না কি?

আজকের হিন্দী চলচ্চিত্রজগতের বহু ঈপ্সিত নায়ক রাজেশ খান্না ছবির নামভূমিকায় যে ইঙ্গিতধর্মী, অর্থবহ, বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন, তা এই ভূমিকাটিকে তাঁর জীবনে অবিস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর জীবন্ত চরিত্রাভিনয় দর্শকমনকে একেবারে অভিভূত করে রাখে। তাঁর পরিপূরকরূপে কাজ করেছেন অমিতাভ বচ্চন ডাঃ ভাস্করের ভূমিকায় অত্যন্ত দরদী অভিনয়ের মাধ্যমে। শ্রীবচ্চনের কণ্ঠের সুগভীর মাধুর্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। অভিনেতার চরিত্রে জনি ওয়াকারের সু-অভিনয় স্মরণীয়। রেণু ও সুমনরূপে যথাক্রমে সুমিতা সান্যাল ও সীমা চরিত্রানুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন। মেট্রনবেশে ললিতা পাওয়ার চরিত্রটির বিভিন্ন পর্যায়কে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় রমেশ দেও (প্রকাশ), দুর্গা খোটে (রেণুর মা), দারা সিং (কুস্তি আখড়ার পালোয়ান) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের সর্বত্র একটি উচ্চমান রক্ষার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তবে চিত্রগ্রহণে রঙের সামঞ্জস্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে বোধহয়। সম্পাদনার কাজ পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজেই করেছেন। সেই কারণেই ছবিটি যেমন অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হয়নি, তেমনই পরিস্থিতি অনুযায়ী ছবির টেম্পো আশ্চর্যভাবে সুরক্ষিত। ছবির আর একটি প্রশংসনীয় অংশ হচ্ছে এর সংলাপ; এমন হৃদয়গ্রাহী সংলাপ গুলজারের হাত থেকেও কমই বেরিয়েছে। আর প্রশংসনীয় হয়েছে ছবির গানগুলি—যেমন রচনা, তেমনই সুর, আর তেমনই গাওয়া।

এন সি সিপ্পি ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত রূপম্ চিত্র-এর নিবেদন 'আনন্দ' অভিনব মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ অপরূপ চিত্রসৃষ্টি।

স্টুডিও থেকে

মণীষা আর্ট ইন্টারনাশনালের পতাকাতলে তরুণ পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত হাসির ছবি 'চিঠি'র কাজ এগিয়ে চলেছে। গল্পের কাহিনীকার হলেন ডাঃ আর এল গুপ্ত। প্রধান দুটি চরিত্রে অংশ নিয়েছেন শমিত ভঞ্জ ও সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন রবি ঘোষ, সুব্রতা চ্যাটার্জি, উৎপল দত্ত, অজিতেশ ব্যানার্জি, কণিকা মজুমদার, অসীম চক্রবর্তী, জয়শ্রী রায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। শ্যামল মিত্রের সুরে এই ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সুরকার নিজে...

সলিল দত্তের নতুন ছবি 'খু... বেড়াই'এর চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। আজকের ভাবনা, আজকের জীবনযন্ত্রণা, আজকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এক মর্মস্পর্শী... বাস্তব কাহিনী নিয়ে চিত্রনাট্য লিখেছেন সলিল বাবু নিজে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন অনু... চট্টোপাধ্যায়, যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকা... রায়, উৎপল দত্ত, শোভন সেন, তরুণকুমার, দিলীপ রায় প্রভৃতি এবং নায়ক নায়িকা চরিত্রে আছেন সৌমিত্র ও অপর্ণা...

নবরূপা নিবেদিত 'ছন্দপতন' ছবি সম্প্রতি আউটডোর স্যুটিং আরম্ভ হয়েছে। পুলক মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন গুরু বাগচী। ছবিখানি পরিচালনাও করছেন গুরুবাবু। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে অংশ নিচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনু... ঘোষাল ও সুমিত্রা সেন। ছবিটির বি... চরিত্রে রূপদান করছেন অনিল চ্যাটার্জি, নন্দিনী মালিয়া, অসিতবরণ, সমিত ভ..., লিলি চক্রবর্তী, অনুভা ঘোষ, জহর ... শিবানী বসু প্রমুখ—

পীযূষবাবু এখন 'জীবন জিজ্ঞাসা' ছবির কাজ ব্যস্ত। এন-টির এক নম্বর ফ্লোরে ... গত সপ্তাহে কাজ করেছেন। ... সেট পড়েছে একটি ... স্টেশনের। প্ল্যাটফরমের পাশে ...

...নের ওপর একটি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। ...গাড়ীর মধ্যেই সর্টিং হোল। শিল্পী-...র মধ্যে ছিলেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া ...ধুরী, সুনন্দা দাশগুপ্তা, মন্টু বন্দ্যো-...পাধ্যায় প্রমুখ। পীযূষবাবু জানালেন এই ...য়ের কাজ হলেই নাকি এ ছবির প্রায় ...তিনভাগ কাজ শেষ হয়ে যাবে।

'ব্রজবুলি'র মহরৎ পয়লা বৈশাখ ...লেও ঐ ছবির কাজ তিনি সেদিনই শুরু ...রতে পারবেন না, কিছুদিন বাদেই শুরু ...রবেন। ততদিনে 'জীবন জিজ্ঞাসা'র কাজ ...তো শেষ হয়ে যাবে। একই সঙ্গে তিনি ...খানা ছবির কাজ করার পক্ষপাতী নন।

•

পরিচালক সলিল সেন 'অপর্ণা'র বাকি ...টুকু শেষ করলেন গত সপ্তাহে। ...ট দিন কাজ হলো। বম্বে থেকে ...তনুজা এসেছিলেন এই কদিনের জন্য। ...বিড়ম্বিতা অপর্ণা নামের এক যুবতীর ...বন কাহিনী 'অপর্ণা'। কাহিনীকার ...রাসন্ধ। গাঁয়ের মেয়ে অপর্ণা একদিন ...কে হারিয়ে শহরে এসেছিল শুভানুধ্যায়ী ...রানদার খোঁজে। দাদার স্নেহচ্ছায়ায় ...পর্ণার দিন কাটছিল শান্তিতেই। কিন্তু ...গাচক্রে তাকে একদিন জড়িয়ে পড়তে ...ল এক ঘৃণ্য ব্যবসায়ে। যাকে নিয়ে ...র বিচিত্র চক্রান্ত জালের বিস্তার, এক-...ন দেখল মনে মনে সেই যুবক কবে যেন ...কেই মন দিয়ে বসে আছে। চিত্রনাট্যকার ...লল সেন স্বভাবজাত দক্ষতায় এই মর্ম-...স্পর্শী কাহিনীকে ছবির উপযোগী করে ...লেছেন। নায়িকা চরিত্রে তনুজা ছাড়া ...র ...টি প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয় ...ছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জী ও শুভেন্দু ...চ্যাটার্জী।

•

পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে ভারতবর্ষকে ...ক্ত করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় যাঁদের ...বনের রক্ত একদিন টগবগ করে উঠেছিল, ...টিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় মসনদ যাঁদের ...ক্তিযুদ্ধের রণহুঙ্কারে টলমল করে উঠে-...ছিল, সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্যের বেয়নেটের ...খোঁচা যাঁদের বিপ্লব রোধ করতে পারেনি, ...রা মৃত্যু দিয়ে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার ...নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, ...ই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসাধনার ...ছিল—'শপথ নিলাম' মুক্তি প্রতীক্ষায়।

কৃষ্ণা মল্লিক প্রযোজিত ও শচীন অধি-...কারী পরিচালিত এ ছবির কাহিনী রচয়িতা ...শৈলেশ দে। সুকুমার মিত্র সুরারোপিত এই ...ছবির গীত রচয়িতা অমিতাভ নাহা।

কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করে-...ছেন, শামিত ভঞ্জ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ...মিত্রা চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, ভাস্কর ...চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, ...গোল ও নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্ত।

একমাত্র পরিবেশক ঃ ইষ্টার্ণ ফিল্ম ...এক্সচেঞ্জ।

সত্যজিৎবাবুর 'সীমাবদ্ধ' ছবির ইন-...ডোরের কাজ শেষ হয়ে গেল। একটানা প্রায় পনেরদিন • চিত্রগ্রহণ করলেন তিনি। কোনো কোনোদিন রাত্রেও কাজ হয়েছে। এ পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে ছবির বেশীর ভাগ কাজই শেষ হয়ে গেলো। এখন বাকি কিছু আউটডোরের কাজ... মৃণালবাবুর নতুন ছবি 'এক আধুরি কাহানী'র সম্পাদনার কাজ শেষ। শব্দ ও সংগীত গ্রহণের জন্য তিনি বৈশাখের শুরুতেই বম্বে যাচ্ছেন। ঐটুকু কাজ হলেই ছবির কাজ শেষ।

মঞ্চাভিনয়

পঙ্গু-জীবনের ঘন মেঘের অন্তরালে দীপ্ত কিরণচ্ছটা

রূপসী মেয়ে যদি কোনো কারণে পঙ্গু হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে নিয়ে বাপ-মায়ের ভাবনার অন্ত থাকে না। এর ওপর সে যদি মাতৃহারা হয়, তাহলে কন্যাগতপ্রাণ বাপের পক্ষে সে এক বিষম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে। পঙ্গু মেয়ের বিবাহ দেবেন, কি দেবেন না, বিবাহ দিলে তার স্বামী ও স্বামীর পরিজনবর্গ তার প্রতি কিরূপ আচরণ করবে; এই ভাবনাই তাঁকে অস্থির করে তোলে। তিনি মনে করতে থাকেন, তাঁর মেয়েটি বড়জোর কারুর করুণার পাত্রী হতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। কাজেই করুণার পাত্রী হয়েই যদি জীবন কাটাতে হয়, তাহলে আর পাঁচজনের করুণার পাত্রী না হয়ে মেয়ে চিরকাল বাপের স্নেহচ্ছায়া-তেই থাকুক।

স্টার থিয়েটারে বর্তমানে অভিনীত দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত ও পরিচালিত 'সীমা' নাটকটির নায়িকা সীমা এমনই এক

নববর্ষের নব আকর্ষণ
পরদে কে পেছে

বুড্ডা
মিল
গয়া

...মেয়ে এবং তার প্রতি মমতায় ভরা ..., অধ্যাপক শৈলেশ্বর চট্টরাজের কাহিনী। 'সীমা' নাটকটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এর প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই আদর্শ চরিত্র, প্রত্যেকেই অসম্ভব ভালো, কারুর মধ্যে কণামাত্রও মন্দ নেই। মনে হয়, এরা কেউই রক্তমাংসের মানুষ নয়, প্রত্যেকেই দেবতুল্য। অমন যে গোঁড়া পণ্ডিত রামহরি রায় সেও যেইমাত্র শুনল, মানবিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে সুশোভন সদ্যবিধবা ...কে বিবাহ করেন, অমনই তাঁর গোঁড়ামি চলে গেল, তিনি তাঁর নাতি অলকের সংগে সুশোভন-কন্যা সরমার বিবাহকে মঞ্জুর করে ফেললেন। ঐ সুশোভনেরই একমাত্র পুত্র অসীম রবীন্দ্র-সাহিত্যে থিসিস তৈরি করার উদাত্ত মন নিয়ে তার অধ্যাপক শৈলেশ্বরের পঙ্গু মেয়েকে তার অন্তর্বেদনা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে জীবনসংগিনী করে এবং অধ্যাপককে তাঁর কন্যার জীবনে তিনি যে শেষ সীমারেখা টানতে চেয়েছিলেন, তা যে ভুল, তা প্রতি-পন্ন করে। নাটকটির কোথাও হিংসা, দ্বেষ, কলহ, ক্রূরতা নেই, সবটা জুড়ে রয়েছে সহানুভূতি, প্রেম, বাৎসল্য এবং কিছুটা রসপ্রিয়তা। বলা হয়, রঙ্গমঞ্চ জীবনের দর্পণস্বরূপ। কিন্তু 'সীমা' যে-জীবনের দর্পণ, সেই জীবনাদর্শ আমাদের মধ্যে ...জনেরই লক্ষ্য হলেও আজকের সংঘাত-ময় নিষ্ঠুর বাস্তবজীবনে আদৌ সহজ-লভ্য নয়।

তবে কিনা, থিয়েটার জগৎ, মেক-বিলিফের জগৎ। কঠিন রূঢ় বাস্তব থেকে ...মন তাই 'সীমা' নাট্যাভিনয় দেখে অভিভূত হয়; হাসিকান্নায় পুরো ...ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করে খুশীতে ...ওঠে। অভিনয়শেষে দর্শকরা অজস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেন এবং এইখানেই নাট্যকার-পরিচালক ...নারায়ণ গুপ্তের লেখনী ও শ্রমের সার্থকতা। তিনি এমন সব চরিত্রকে তাঁর নাটকের মধ্যে এনে জড়ো করেছেন, যাদের ভালোবেসে ফেলা ছাড়া আর পথ নেই; ...কিবা সীমা ও শৈলেশ্বর, পতিতপাবন ...র তার স্ত্রী ইন্দুমতী কিংবা রামহরি ও তার নাতি অলক। বিভিন্নতা আছে চরিত্র থেকে চরিত্রে; সরসতা আছে ওদের অনেকেরই মধ্যে। কিন্তু কেউই ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে স্বাভাবিক মানুষ নয়, সবাই সবটাই ভালো এবং অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ।

অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। খারাপ অভিনয় কেউ করেননি। এবং সকলের অভিনয় একটি সুরে বাঁধা। তবে ওরই মধ্যে মুখ্য চরিত্র সীমার ভূমিকায় সুব্রতা ...োপাধ্যায় চরিত্রগত অব্যক্ত আনন্দ ও বেদনা প্রকাশে চূড়ান্ত নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শান্তাবেশে নীলিমা দাস মাধুর্যে ভরা। পতিতপাবন-প্রিয়া ইন্দুমতী-রূপে দীপিকা দাস চরিত্রচিত্রণে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মেডিক্যাল ছাত্রী সরমার ভূমিকায় বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত ...ভাবে রোমান্সের প্রকাশ করেছেন; তাঁর মুখের রবীন্দ্রসংগীত মিষ্টত্বে ভরা। পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অলক ও পতিতপাবন-বেশে যথাক্রমে সুখেন দাস ও বঙ্কিম ঘোষ। এ'দের দুষ্টুমিভরা শিষ্ট অভিনয় দর্শকদের খুশীতে ভরিয়ে দিয়েছে। অজিত বন্দ্যো-পাধ্যায় (শৈলেশ্বর), পঞ্চানন ভট্টাচার্য (রামহরি), সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (অসীম) ও প্রেমাংশু বসু (সুশোভন) বিভিন্ন চরিত্রো-চিত অভিনয়ে নাটনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে গীতা দে, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, মেনকা দাস, করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী রিংকু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করে-ছেন।

দৃশ্যসজ্জা, আলোকনিয়ন্ত্রণ এবং আবহসংগীত নাটকটির উত্তরণে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

স্টারের বর্তমান নাটক 'সীমা' নাট্যপ্রিয় দর্শকবৃন্দকে খুশীতে ভরিয়ে দেবে।

।। ডি, ভি, সি বোকারোর অনুষ্ঠান ।।

ডি. ভি. সি বোকারোর নবগঠিত 'চৈতালী'র সভ্যবৃন্দ বোকারো ক্লাবের প্রযোজনায় এবং শ্রীগোপাল দে-র ব্যবস্থা-পনায় গত ৮ মার্চ নাট্যকার সুনীল দত্তের 'চোদ্দ পাকে বাঁধা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। অভিনয়ে ছিলেন সর্বশ্রী : স্বপন রায়-চৌধুরী, স্বপন দাস, রতনলাল চক্রবর্তী, দেবু দত্ত, অশোক ভট্টাচার্য, বরেন্দ্র লাহিড়ী, দিবাকর দত্ত, অশোক রায়।

নাটকের প্রারম্ভে আবৃত্তি এবং সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী : স্বপন চক্রবর্তী, গৌতম দাস এবং নারায়ণ মজুমদার।

'বিপ্লব ও বিবেকানন্দ' নাট্যাভিনয় : গত ২৮শে মার্চ, বনগ্রাম টাউন হল ময়দানে 'তীর্থংকর' কর্তৃক বিশ্বনাথ মৈত্রের নতুন নাটক 'বিপ্লব ও বিবেকানন্দ' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। দলগত অভিনয় চিত্তাকর্ষক। আলোকসম্পাতে শ্রীনিতাই প্রামাণিক দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ জন্ম-জয়ন্তী : সম্প্রতি নাগরিকদের পক্ষে উত্তর কলকাতার আজাদ হিন্দ বাগে (হেদুয়া) স্বামী বিবেকানন্দের ১০৯তম জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি। সকালে গোয়াবাগান সি আই টি পার্ক থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমার পর স্বামীজীর পৈত্রিক বাসভবনে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে এবং তার পরে আজাদ হিন্দ বাগে স্বামীজীর প্রতিমূর্তির পাদ-দেশে উপস্থিত হয়। বিভিন্ন ব্যাণ্ডদল, স্কাউটদল, মুরারী পুকুর রামকৃষ্ণ সেবাদল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং স্বামীজী ও শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ দেবের বাণীসমূহ ও সংগীতাদি প্রভাত ফেরীর অঙ্গ ছিল। বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র কলিকাতার শেরিফ, শ্রীশক্তিপদ ঘোষ, শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদুর্গাপদ ব্যানার্জী, শ্রীরঘুনাথ বসু, শ্রীমাণিক দাস রায়, শ্রীগৌর পাল মিলনপ্রভ প্রভৃতি প্রভাত ফেরী পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ

আনুশ্রী মনমিতা এবং সৌমেন্দু

করেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, জাতীয় যুব সংঘ, সিমুলিয়া এ-সি ন্যাশনাল এস-সি, সেণ্ট্রাল সুইমিং জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ প্রভৃতি মাল্যদান করেন। সংগীতাঞ্জলিতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচালনায় বৌবাজার 'মিলন চক্র শ্রীসত্যচরণ দে'র পরিচালনায় ব্রহ্মসংগীত, শ্রীদিলীপ ঘটকের পরিচালনায় সংগীতানুষ্ঠান, যন্ত্রসংগীতে শ্রীসুব্রত দে। বন্দনা, ও বিবেকানন্দ গীতিতে অংশ গ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, সেবাকেন্দ্র, নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, সুবল সাহা ও অনিল কর সম্প্রদায়, রীণা সেনগুপ্ত। বেদ ও বাইবেল পাঠ করেন যথাক্রমে কাশীধামের তিনজন পণ্ডিত ও আচার্য প্রবোধকুমার অধিকারী। বেহালায় অনুষ্ঠানে বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে মেজর জেনারেল হিমাংশু চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পাঠ, আবৃত্তি ও আলোচনায় যোগদান করেন শ্রীমতী সান্ত্বনা পাল, স্বাতী লাহিড়ী। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অধ্যাপক নির্মল বসু, ডক্টর রমা চৌধুরী, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী সর্বশ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধীরজা বসু, সমর সরকার।

বিচিত্রানুষ্ঠান : সম্প্রতি এ টি এস হলে ইছাপুরে এ টি এস সারা ভারত (উত্তর) প্রাক্তন ছাত্রদের সারাদিনব্যাপী পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল নানান আকর্ষণীয় আয়োজন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠানে ছিলেন নামী শিল্পীরা : সর্বশ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, প্রীতি চক্রবর্তী, রবীন ভট্টাচার্য, দুই বেচারা, অরুণাভ গঙ্গোপাধ্যায়, সায়-মারা ও তপন দত্ত।

জাপানে তরুণ যোগী যাদুকর মৃণাল রায়

যাদুবিদ্যা ভারতীয় শিল্পকলারই এক অঙ্গ অন্যান্য কলাশিল্পের মত যাদু-বিদ্যারও প্রেরণা হোলো অধ্যাত্ম চেতনা। যাদুবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একদা একথা বলেছিলেন পি সি সরকার। 'সরকার তাঁর ইন্দ্রজালে একাধিকবার জগৎ জয় করেছিলেন। তাঁরই সাধনা ধারাকে বিদেশে বহমান রেখেছেন বাঙালী তরুণেতর যাদুকর মৃণাল রায়। তিন মাস আগে যাদুনাটক 'মায়ামহল' নিয়ে জাপান যাত্রা করেন তরুণ যোগী যাদুকর মৃণাল রায়।

গত সপ্তাহে জাপান থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল শ্রীরায়ের যাদুখেলার নাট্য পরিকল্পনা ওদেশের গুণীমহলের এবং সাংবাদিক জগতের অকুণ্ঠ সাধুবাদ কুড়িয়েছে। যাদুনাটকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়-গুলো যেমন : করাত-কাটা খেলা, আজব দেশ, নাইট ক্লাব এবং লোকনৃত্যের শিল্প-সম্মত প্রয়োগনৈপুণ্য বিদেশীদের মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছে। ইতিমধ্যে আটষট্টি অনুষ্ঠান হয়ে গেছে আরো বাইশটি অনুষ্ঠান বাকী। দৈনিক দুটি করে শো-এ হাউসে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। এ পর্যন্ত শ্রীরায় পঁয়ত্রিশটি শহরে 'মায়া-মহল' মঞ্চস্থ করেছেন।

জুনিয়র পি সি সরকার সম্মানিত : যাদুকর জুনিয়র পি সি সরকারকে জাপানের কালচারাল সোসাইটি 'সামুরাই' অ্যাকাডেমী পুরস্কার দিয়েছেন। গত ১১ মার্চ টোকিওতে ১৩০তম 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনীর সময় জুনিয়র পি সি সরকারকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। জাপানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্লাটিনামের তরবারি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। একজন অ-জাপানী এই প্রথম 'সামুরাই' পুরস্কার পেলেন। জাপানের বিভিন্ন শহরে তিনি আরও প্রদর্শনী করবেন। ইতিমধ্যে কোরিয়ার বিভিন্ন শহরে তিনি যাদু প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।

খেলার কথা

বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা সোবার্স

[illegible]

ভারতবর্ষের বিপক্ষে [illegible] চতুর্থ টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে [illegible] উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট পূর্ণ করেন এবং সেই সূত্রে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন যা বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে গণ্য। বর্তমানে সোবার্সের ৮০টি সরকারী টেস্ট খেলার পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে: মোট রাণ ৭২৪১ এবং মোট উইকেট ২০২। এখানে উল্লেখ্য, অপর কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে এমন কি মোট ৩০০০ রাণ করা এবং মোট ১০০ উইকেট পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই কৃতিত্বের নিকট দূরত্বে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার। তার টেস্ট পরিসংখ্যান এই রকম দাঁড়ায়: ৫৫টি খেলায় মোট রাণ ২৯৫৮ এবং মোট উইকেট ১৭০। মিলার মাত্র ৪২ রাণের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন।

আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে গারফিল্ড সোবার্স নিঃসন্দেহে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৌখস খেলোয়াড়। তিনি যেমন ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন অপর কোন একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া দক্ষ অধিনায়ক হিসাবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। সোবার্স সহজাত ক্রিকেট খেলোয়াড়, কখনও কোচের দারস্থ হন নি। তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের এই বিরাট সাফল্যের মূলে আছে বার্বাডোজের ক্রিকেট খেলার অনুকূল পরিবেশ এবং বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে ক্রিকেট খেলার সূত্রে অভিজ্ঞতা। সোবার্স একজন খাঁটি ন্যাটা খেলোয়াড়—বাঁ-হাতেই ব্যাট এবং বল করেন।

সোবার্সের বিবিধ টেস্ট রেকর্ড

একটি সিরিজে মোট রান

৮২৪ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮, নট আউট ২ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট-আউট ৩৬৫, সেঞ্চুরী ৩, এবং গড় ১৩৭-৩৩), বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮।

দ্রষ্টব্য: একটি টেস্ট সিরিজে যাঁরা উল্লেখযোগ্য মোট রান (৮০০ রানের ভিত্তিতে) করেছেন সেই ক্ষুদ্র ৭ জনের তালিকায় সোবার্সের স্থান ৫ম। এই ৮২৪ রান সংগ্রহের সূত্রে তাঁর যে গড় ১৩৭-৩৩ রান দাঁড়িয়েছে তা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ গড়ের রেকর্ড। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রানের রেকর্ড: ৮২৭—ক্লাইড ওয়ালকট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫)।

৭০৯ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১-বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৬, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০১-২৮), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫৯-৬০।

৭২২ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮ নটআউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

টেস্ট ক্রিকেটে গারফিল্ড সোবার্স

১৯৭১ সালের ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত

	ব্যাটিং				বোলিং	
	টেস্ট	মোট	এক ইনিংসে			
বিপক্ষে	খেলা	রান	সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	রান	উইকেট
ইংল্যান্ড	২৯	২৮০৮	২২৬	৯	২৭৩৪	৮২
অস্ট্রেলিয়া	১৯	১৫১০	১৬৮	৪	২০২৫	৫১
ভারতবর্ষ	১৭	১৭৮৮	১৯৮	৭	১৪০৪	৫৬
পাকিস্তান	৮	৯৮৪	৩৬৫*	৩	৪৫৫	৪
নিউজিল্যান্ড	৭	১৫১	৩৯	০	৩৫০	৯
মোট	৮০	৭২৪১	৩৬৫*	২৩	৬৯৬৮	২০২

গারফিল্ড সোবার্স

১৭৪ এবং গড় ১০৩-১৪), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৬৬।

এক সিরিজে অল-রাউণ্ড সাফল্য

মোট ৪২৪ রান (গড় ৭০-৬৬) এবং মোট ২৩ উইকেট (গড় ২০-৫৬), বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ১৯৬১-৬২

মোট ৭২২ রান (গড় ১০৩-১৪) এবং মোট ২০ উইকেট (গড় ২৭-২৫), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৬৬।

দ্রষ্টব্যঃ উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে ১ম এবং বোলিংয়ে ৩য় স্থান।

খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১২৫ ও ১০৯ নটআউট—বিপক্ষে পাকিস্তান, জর্জটাউন, ১৯৫৭—৫৮

এক ইনিংসে সর্বাধিক রান

৩৬৫ নটআউট (বিশ্ব রেকর্ড) বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮।

উপর্যুপরি ইনিংসে সেঞ্চুরী

৩টিঃ ৩৬৫ নটআউট (কিংস্টন), ১২৫ এবং ১০৯ নটআউট (জর্জটাউন), বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮।

উপর্যুপরি ইনিংসে অর্ধ-শত রান

৬-বারঃ ৫২, ৫২, ৮০, ৩৬৫ নটআউট, ১২৫ ও ১০৯ নটআউট (বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮)।

উপর্যুপরি টেস্ট সেঞ্চুরী

৬টি: ১৯৫৭—৫৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে উপর্যুপরি ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরী—৩৬৫ নটআউট (কিংস্টন), ১২৫ ও ১০৯ নটআউট (জর্জটাউন) এবং ১৯৫৮—৫৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে উপর্যুপরি টেস্ট ম্যাচে ৩টি—১৪২ নটআউট (১ম টেস্ট, বোম্বাই), ১৯৮ রান আউট (২য় টেস্ট, কানপুর) এবং ১০৬ নটআউট (৩য় টেস্ট, কলকাতা)

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান

২০৮ রান (নটআউট ৩৬৫ রানের মধ্যে), বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭—৫৮।

উল্লেখযোগ্য পার্টনারশীপ রান

৪৪৬ রান (২য় উইকেটের জুটিতে) : হান্ট এবং সোবার্স, বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭—৫৮। এই ৪৪৬ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেটে যে কোন উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রান এবং ২য় উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড রানের (৪৫১ রান) থেকে মাত্র ৫ রান কম।

৩৯৯ রান (৪র্থ উইকেট জুটিতে) : সোবার্স এবং ওরেল, বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ব্রিজটাউন, ১৯৫৯-৬০।

দ্রষ্টব্য : ৪র্থ উইকেট জুটির বিশ্বরেকর্ড রানের থেকে ১২ রান কম।

৪০০০ রান এবং ১০০ উইকেট

১৯৬৫ সালের ৮ই মার্চ কিংস্টনে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের খেলায় ফিলপটের উইকেট নিয়ে সোবার্স তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের ১০০ উইকেট পূর্ণ করেন এবং সেই সূত্রে টেস্ট খেলায় মোট ৪০০০ রান এবং ১০০ উইকেট পাওয়ার বিশ্বরেকর্ড করেন। এই সময় তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান ছিল : খেলা ৪৮, মোট রান ৪১৫৫ এবং মোট উইকেট ১০০।

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউণ্ডারী

৩৮টি (নট-আউট ৩৬৫ রানের মধ্যে)—বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮।

উপর্যুপরি টেস্ট খেলায় যোগদান

৭৯টি টেস্ট খেলা (বিশ্ব রেকর্ড)।

টেস্ট সেঞ্চুরী

২৩টি সেঞ্চুরী : বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড ৯, অস্ট্রেলিয়া ৪, ভারতবর্ষ ৭, পাকিস্তান ৩ এবং নিউজিল্যাণ্ড ০ (নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসএর খেলায় সর্বোচ্চ রান ৩৯)।

সোবার্সের নেতৃত্ব

সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে যে ৭টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে তার ফলাফল : জয় ৩, পরাজয় ৩ এবং ড্র ১।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজঃ ৫০১ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লুইস ৮৮, কানহাই ৮৫ এবং সোবার্স নটআউট ১৭৮ রান। বেদী ১২৪ রানে ২ এবং আবিদ আলী ১২৭ রানে ২ উইকেট)

ও ১৮০ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ফ্রেডারিকস ৪৮ রান। আবিদ আলী ৭০ রানে ৩ এবং ভেংকট রাঘবন ২৫ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষঃ ৩৪৭ রান (সারদেশাই ১৫০ এবং সোলকার ৬৫ রান। ডো ৬৯ রানে ৪, সোবার্স ৩৪ রানে ২ এবং হোল্ডার ৭০ রানে ২ উইকেট)

ও ২২১ রান (৫ উইকেটে। সুনীল গাভাস্কার নটআউট ১১৭ রান। সোবার্স ৩১ রানে ২ উইকেট)

ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৪র্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই দুই দেশের ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ বর্তমানে ১-০ খেলায় (ড্র ৩) এগিয়ে আছে। সুতরাং শেষ ৫ম টেস্ট খেলা অন্তত ড্র রাখতে পারলেই ভারতবর্ষ 'রাবার' জয়ী হবে। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ আজও অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে রাবার জয়ী হয়নি।

দর্শক

ভারতবর্ষের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার তাঁর ৩০তম জন্মদিনে টসে জয়ী হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান।

প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ২২৪ রান সংগ্রহ করে। ২য় উইকেটের জুটিতে লুইস এবং কানহাই ১৬৬ রান তুলে নতুন রেকর্ড করেন। ২য় উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ডঃ ১০৩ রান (ক্যারু এবং ডেভিস, ৩য় টেস্ট, ১৯৭১)। ফিল্ডিংয়ের দোষে কানহাই দু'বার আউটের হাত থেকে খুব জোর বেঁচে যান। ভারতবর্ষের দুটি রানআউটের আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের আধ ঘণ্টা পর ৫০১ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেভিস (৭৯ রান) এবং সোবার্স ২১৮ মিনিট খেলে দলের ১৬৭ রান তুলেছিলেন এবং সোবার্স ও ফস্টারের অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১০৭ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় দিনের একসময়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৩ ওভারে ৮৬ রান সংগ্রহ করেছিল। মধ্যাহ্নভোজ এবং চা-পানের মধ্যবর্তী সময়ের খেলায় রানের গতি বেড়ে যায়—৩১ ওভারে ১৯৩ রান। ভারতবর্ষ সব রকমের কৌশল প্রয়োগ করেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রানের গতি প্রতিরোধ করতে পারেনি। ভারতবর্ষের আক্রমণে কোন ধার ছিল না। সোবার্স দাপটের সঙ্গে খেলে ১৭৮ রান তুলে নটআউট থাকেন। তিনি তাঁর ৩৩৯ মিনিটের খেলায় ১৯টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার বাউন্ডারী করেন। টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে এই নিয়ে তিনি ২৩টা সেঞ্চুরী করলেন—ভারতবর্ষের বিপক্ষে তাঁর টেস্ট সেঞ্চুরী ৭টা।

খেলার উপযুক্ত আলো না থাকায় খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগে দ্বিতীয় দিনের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় রান দাঁড়ায় মাত্র ২ (১ উইকেটে)।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের স্কোর ছিল ৭৫ রান (৬ উইকেটে)। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন সারদেশাই এবং সোলকার। ভারতবর্ষের ৭০ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়েছিল। দলের কি শোচনীয় অবস্থা! চা-পানের সময় রাণ দাঁড়ায় ১৫৭ (৬ উইকেটে)। সারদেশাই ৫৮ এবং সোলকার ২৯ রাণ করে অপরাজিত ছিলেন। এই অবস্থায় ফলো-অন থেকে

অব্যাহতি পেতে ভারতবর্ষের আরও ১৪৫ রাণের দরকার ছিল, হাতে জমা ছিল মাত্র ৪টি উইকেট। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতবর্ষের রাণ দাঁড়ায় ২৪৭ (৬ উইকেটে)। ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও ৫৫ রাণের প্রয়োজন ছিল। সারদেশাই ১১১ রাণ এবং সোলকার ৫৯ রাণ তুলে অপরাজিত ছিলেন। অসমাপ্ত ৭ম উইকেটের জুটিতে সারদেশাই এবং সোলকার ১৭৭ রাণ তুলে নতুন রেকর্ড করেন। ৭ম উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড ছিল ১৫৩ রাণ (মাধব আপ্তে এবং ভিনু মানকাদ, ত্রিনিদাদ, ১৯৫২-৫৩)। এখানে উল্লেখ্য, সারদেশাই এই নিয়ে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ৫টি সেঞ্চুরী করলেন এবং বর্তমান টেস্ট সিরিজে ৩টি। তিনি প্রথম টেস্টে ২১২ রাণ এবং দ্বিতীয় টেস্টে ১১২ রাণ করেছিলেন।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের রাণ ছিল ৩৪৬ (৯ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন সারদেশাই (১৫০ রাণ এবং বেদী ২০ রাণ)। ভারতবর্ষের ২৫৬ রাণের মাথায় ৭ম উইকেট পড়েছিল—সোলকার ৬৫ রাণ করে আউট হন। ৭ম উইকেটের জুটিতে সোলকার এবং সারদেশাই দলের ১৮৬ রাণ তুলেছিলেন। এই জুটিই পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে শোচনীয় পরাজয় থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম টেস্টে সারদেশাই এবং সোলকারের ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি ১৩৭ রাণ তুলে ঠিক এইভাবেই দলকে বিপদমুক্ত করেছিলেন।

ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের শেষ দিকটা খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। ২৫৬ রাণের মাথায় যখন ৭ম উইকেট পড়ে ভারতবর্ষ তখনও 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি লাভের নির্দিষ্ট ৩০২ রাণের থেকে ৪৬ রাণের পিছনে ছিল। ভারতবর্ষের ৯ম উইকেট পড়েছিল ২৮৫ রাণের মাথায়। সারদেশাইয়ের সঙ্গে শেষ খেলোয়াড় বেদী ১০ম উইকেটের জুটি বাঁধেন। ভারতবর্ষের ৩০২ রাণ পূর্ণ হওয়ার আগেই বেদী দু'বার আউট হওয়া থেকে রক্ষা পান। ফলে ভারতবর্ষও 'ফলো-অন' করা থেকে ছাড়ান পায়। লাঞ্চের ৭ মিনিট পর ৩৪৭ রাণের মাথায় সারদেশাই তাঁর ১৫০ রাণ করে আউট হলে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ১০ম উইকেটের জুটিতে সারদেশাই এবং বেদী (নটআউট ২০ রাণ) ৬৩ মিনিটের খেলায় ঝড়ের গতিতে যে ৬২ রান তোলেন তা এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তাঁদের এই ৬২ রাণ হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে যে কোন বিদেশী দলের পক্ষে টেস্ট খেলার ১০ম উইকেট জুটির সর্বাধিক রাণের রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ৫৬ রাণ—লেকার এবং বাটলার (ইংল্যাণ্ড), ত্রিনিদাদ, ১৯৪৭-৪৮।

সারদেশাই ৩৫৪ মিনিট খেলে তাঁর ১৫০ রাণে ২০টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। বর্তমান সিরিজে এই নিয়ে তিনি তিনটি সেঞ্চুরী করলেন।

চতুর্থ দিনের খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ১৭৫ রাণ তুলেছিল।

দিলীপ সারদেশাই

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র এক ওভার খেলে ১৮০ রাণের (৬ উইকেটে) মাথায় তাদের ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। উইকেটে ভারী ওজনের রোলার ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা শেষ দিনেও ব্যাট করতে নেমেছিল। তবে এই সুযোগ নিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে কাবু করতে পারেনি। খেলায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ৩৩৫ রানের প্রয়োজন ছিল যা শেষ দিনের খেলায় সংগ্রহ করা মোটেই সহজ ছিল না। ভারতবর্ষের ৭৯ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়লে খেলার গতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অনুকূলে ঘুরে যায়। এই সঙ্কটকালে জয়সীমা দৃঢ়তার সঙ্গে গাভাস্কারের জুটিতে ৯৬ মিনিট খেলে দলকে বিপদমুক্ত করেন। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের রাণ দাঁড়ায় ১৩৭ (৪ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন গাভাস্কার (৭৩ রাণ) এবং সারদেশাই (২ রাণ)। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের ২২১ রাণের (৫ উইকেটে) মাথায় ৪র্থ টেস্ট খেলা শেষ হলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার ১১৭ রাণ করে অপরাজিত থাকেন। বর্তমান টেস্ট সিরিজে তাঁর পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৩, ইনিংস ৬, নটআউট ৩ বার, সেঞ্চুরী ২ এবং মোট রাণ ৪৩০। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে বর্তমান টেস্ট সিরিজে দিলীপ সারদেশাইয়ের পরিসংখ্যান : খেলা ৪, ইনিংস ৬, নটআউট ০, সেঞ্চুরী ৩ এবং মোট রাণ ৫৪৬। তিনি আর মাত্র ১৫ রাণ সংগ্রহ করলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক মোট রাণের ভারতীয় রেকর্ড করবেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে মোট সর্বাধিক রাণের ভারতীয় রেকর্ড ৫৬০—রুসী মোদী (১৯৪৮-৪৯) এবং পলি উমরীগড় (১৯৫২-৫৩)। ভারতবর্ষের বিপক্ষে এই বিষয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রেকর্ড : ৭৭১ রান (গড় ১১৯-২৮)—এভার্টন উইকস (১৯৪৮-৪৯)।

সোবার্স ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলায় বিশ্বনাথের উইকেট নিয়ে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ২০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন।

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল

১৯৭১ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ৪৮ রানে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার ৩৭ বছরের ইতিহাসে উপর্যুপরি ১৩ বার এবং মোট ২২ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। বোম্বাই দলের পক্ষে এ-বছরের রঞ্জি ট্রফি জয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তারা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে খেলায় নামেনি, তাদের পাঁচজন শক্তিশালী খেলোয়াড় ভারতীয় ক্রিকেট দলে নির্বাচিত হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য, বোম্বাই ২৩ বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে খেলে যে ২২ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে, তার মধ্যে উপর্যুপরি জয় ১৩ বার (১৯৫৯-৭১)—যা আজও যে-কোন দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় ট্রফি জয়ের বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে গণ্য।

প্রথম দিনের খেলায় বোম্বাই ৮ উইকেট খুইয়ে ২৪১ রান সংগ্রহ করেছিল। তাদের খেলার সূচনা সুবিধার হয়নি। মাত্র ১২ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে রামনাথ পার্কার (১০৮ রান) এবং অজিত নায়েক (৪২ রান) ১৪২ রান তুলে দলের পতন রোধ করেন।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাই দলের ১ম ইনিংস ২৮৭ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেট খুইয়ে ১৭৯ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্র দলের ১ম ইনিংস ২৩০ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে বোম্বাই ৫৭ রানের ব্যবধানে অগ্রগামী হয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৩০ রান তুলে ১৮৭ রানে এগিয়ে যায়।

চতুর্থ দিনে বোম্বাই দলের ২য় ইনিংস ১৯৬ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৫৪ রান তুলতে মহারাষ্ট্র ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৫ উইকেট খুইয়ে ১৪৪ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় জয়লাভের জন্য তাদের আরও ১১০ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ছিল ৫টা উইকেট।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের আধঘণ্টা আগে মহারাষ্ট্রের ২য় ইনিংসে ২০৫ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই ৪৮ রানে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ২৮৭ রান (রামনাথ পার্কার ১০৮ এবং অজিত নায়েক ৪২ রান। শেষ ৫৬ রানে ৩ এবং সালদানা ৬৬ রানে ৬ উইকেট।)।

ও ১৯৬ রান (ভোঁসলে ৫৫ এবং সম্পৎ ৬০ রান। সোহল ৪১ রানে ৩ এবং খোশী ৬২ রানে ৫ উইকেট)

মহারাষ্ট্র : ২৩০ রান (সালদানা ৫০ এবং বোরদে ৪৮ রান। অজিত পাই ৭৫ রানে ৩ এবং আবদুল ইসমাইল ৪১ রানে ৪ উইকেট)

ও ২০৫ রান (বোরদে ৫১ রান। ইসমাইল ১৭ রানে ৩ এবং শিভালকার ৫৬ রানে ৬ উইকেট)

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

জাপানের নাগোয়া শহরে আয়োজিত ৩১তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীন মোট ৭টি খেতাবের মধ্যে ৪টি খেতাব জয়ী হয়ে সর্বাধিক খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। বাকি তিনটি খেতাবের একটি করে পেয়েছে জাপান, হাঙ্গেরী এবং সুইডেন। প্রজাতন্ত্রী চীন এই ৪টি খেতাব পেয়েছে—পুরুষদের দলগত বিভাগের সোয়েথলিং কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস ও মিকসড ডাবলস খেতাব। বাকি তিনটি খেতাবের মধ্যে জাপান পেয়েছে ১টি (মহিলাদের দলগত বিভাগের কোর্বিলোন কাপ), হাঙ্গেরী ১টি (পুরুষদের ডাবলস) এবং সুইডেন ১টি (পুরুষদের সিংগলস)। এখানে উল্লেখ্য গতবার অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ৩০তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান ৪টি, রাশিয়া ২টি এবং সুইডেন ১টি খেতাব জয়ী হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রী চীন রাজনৈতিক কারণে ১৯৬৫ সালের পরবর্তী দুটি আসরে (১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগে অনেকেই অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করেছেন। গতবার যাঁরা ব্যক্তিগত বিভাগের খেতাব পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী জাপানের সিগিও ইতো এ-বছরের ফাইনালে উঠেছিলেন। এবার প্রজাতন্ত্রী চীনের মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের ফলে জাপানের দীর্ঘদিনের একটানা প্রাধান্য খর্ব হল। জাপান উপর্যুপরি ৭ বার এই মিকসড ডাবলস খেতাব পেয়েছিল।

ত্রিমুকুট সম্মান লাভ

প্রজাতন্ত্রী চীনের লিন হুই-চিং মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস: স্টেল্যান বেংগটসন (সুইডেন) ২১-১৭, ১৯-২১ ২১-১৩ ও ২১-১০ পয়েন্টে ১৯৬৯ সালের চ্যাম্পিয়ান সিগিও ইতোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: টিবোর ক্লাম্পার এবং ইস্ট ভ্যান জনিয়ার (হাঙ্গেরী) ১১-২১, ২১-১৬, ২১-১০ ও ২১-১৬ পয়েন্টে চুয়াং টিসে—তাং এবং লিয়াং কো লিয়াংকে (প্রজাতন্ত্রী চীন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : লিন হুই-চিং (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-১৭, ২১-১৬, ১৩-২১ ও ২১-১৯ পয়েন্টে চেং মিন চীহকে (প্রজাতন্ত্রী চীন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : লিন হুই-চিং এবং চেং মিন চীহ (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-৯, ২১-৬, ১৩-২১ ও ২১-১৫ পয়েন্টে মিকো হামাদা এবং রিকো সাকামাতোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : লিন হুই-চিং এবং চ্যাং সীন-লিন (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-১৯, ১৩-২১, ২১-১৬ ও ২১-১৮ পয়েন্টে এ্যান্টন ষ্টিপানসিক (যুগোশ্লাভিয়া) এবং মারিয়া আলেকজান্দ্রুকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

বিদেশের মাটিতে ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় জয়

ভারতবর্ষ বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ৫১টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলে এপর্যন্ত ৪টি টেস্ট খেলায় জয়ী হয়েছে—১৯৬৮ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩টি এবং ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১টি।

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে (জয় ৩) :
১৯৬৮ সাল :
৫ উইকেটে (১ম টেস্ট, ডুনেডিন)
৮ উইকেটে (৩য় টেস্ট, ওয়েলিংটন)
২৭২ রানে (৪র্থ টেস্ট, অকল্যাণ্ড)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে (জয় ১) :
১৯৭১ সাল :
৭ উইকেটে (২য় টেস্ট, ত্রিনিদাদ)

জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ানসিপ

রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতায় বাংলার কুমারী শিখা সেন ৩টি খেতাব জয়ের সূত্রে মহিলা ও বালিকা বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। বাংলা এই তিনটি বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন মহিলা বিভাগ, বালক বিভাগ এবং বালিকা বিভাগ।

দলগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : মহারাষ্ট্র (৩৮ পয়েন্ট)
মহিলা বিভাগ : বাংলা (২৪ পয়েন্ট)
বালক বিভাগ : বাংলা (১৫½ পয়েন্ট)
বালিকা বিভাগ : বাংলা (১৪ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

পুঃ বিভাগ : বি ম্যালকম (মহারাষ্ট্র) ১৪ পঃ
মহিলা বিভাগ : শিখা সেন (বাংলা) ১৫ পঃ
বালক বিভাগ : চয়ন চৌধুরী (বাং) ১৩ পঃ
বালিকা বিভাগ : শিখা সেন (বাং) ১০ পঃ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৫০ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 23rd. April, 1971 শুক্রবার, ৯ই বৈশাখ, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

একটি অভিযোগ ও প্রস্তাব

সমালোচনা প্রকৃত শিল্প হতে পারে এবং কখনো কখনো তা হয়ও, সুরেশ সমাজপতি অথবা সজনীকান্ত, তালিকা বাড়াতে চাই না, আরও দু-একজন ছিলেন, অদ্যাবধি আছেন, যাঁরা সমালোচনাকে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছিলেন, ও পেরে থাকেন। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নয় বয়কুঠি নেই বা কাদামাটির ছিটে। অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে প্রতি সপ্তাহেই বেশ কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, যাতে অমৃতে প্রকাশিত গল্প উপন্যাস এবং অন্যান্য গদ্যের সমালোচনা করে থাকেন মনোযোগী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ। কবিতার সমালোচনা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। এই চিঠিপত্রগুলির বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি অভিযোগ আছে। আশা করি, এই চিঠি অমৃতে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

এই আলোচনাগুলি লক্ষ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা প্রায় শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে 'অসম'—অর্থাৎ অমুকের অমুক লেখাটি পড়লাম...লেখককে অভিনন্দন না জানিয়ে থাকতে পারছি না... অথবা এরকম কুরুচিপূর্ণ লেখা অমৃতের মত কাগজের মানহানি করেছে...লেখক এত সুন্দরভাবে আমাদের চারপাশের ছবি তুলে ধরেছে যে...ইত্যাদি ইত্যাদি। মুখ্যত ছোট গল্প ও উপন্যাসের সমালোচনাই জুড়ে থাকে দুটি পুরো পৃষ্ঠা।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, এই সত্তর দশকে গল্পকার কেবল গল্প বলার জনাই কলম ধরেন। অন্তত তরুণেরা। গল্প অবশ্যই আছে, থাকে, কিন্তু গদ্যকারের হাত থেকে আরও অনেক প্রতিমূর্তো জন্ম নেয়, গল্পের শরীর ছাড়িয়ে থাকে যা। উপন্যাসের, আঙ্গিক ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত তো নয়ই বরং হয়ে [illegible] ছাড়িয়ে কখনো কখনো এগুলো লেখকের পরিচয় বহন করে। অলঙ্কার [illegible] এত উন্নীত হয়েছে, হাজারো [illegible] প্রকাশে থাকে—যা অমৃতের চিঠির প্রেরকেরা সাধারণত লক্ষ করেন না, যেমন লক্ষ করেন না একটি লেখার পিছনে লুকোনো [illegible], আবেগতাড়িত চঞ্চল অথচ সংযত [illegible]। চরিত্রচিত্রণের [illegible] উপলব্ধি করতে চাই না, কিন্তু যে সমালোচক গল্প-উপন্যাসে একমাত্র নিজের প্রতিচ্ছবিই দেখতে চান, অন্যতম চিন্তাধারায় বশবর্তী হয়ে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেন অমৃতে—সে ধরনের সমালোচনা প্রকাশ করবার কি যুক্তি থাকতে পারে? যা আলোচনা কিন্তু সমালোচনা নয়। অমৃতে প্রকাশিত চণ্ডী মণ্ডল, স্বপন চক্রবর্তীর গল্পে যে অজস্র কারুকাজ নজর কাড়ে, দিবানিদ্রার ঝোঁকে তা অবশ্যই পরিষ্কার হয় না।

আরও একটি কথা : অমৃত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলিতে কিছু কিছু অসঙ্গতি নিশ্চয়ই থাকে। অদ্যাবধি তা নিয়ে কখনো কেউ অভিযোগ করেন নি। যেমন গত বছরের গল্প সংকলনে অনায়াসেই আপনারা অনেককে বাদ দিয়েছিলেন। প্রবীণ দু' চারজন বাদ পড়লে অবশ্য বিশেষ যায় আসে না, কিন্তু যাঁরা তরুণ, শক্তিমান অথচ অপরিচিত? কমলকুমার মজুমদার অবশ্য প্রবীণ লেখক—কিন্তু বাংলা গদ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, থাকা উচিত ছিল তাঁর ছোটগল্প। যেমন অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে বাদ পড়েছেন—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মত লেখক। এ নিয়ে কাউকে সরব হতে দেখা যায় নি। আশঙ্কা অমূলক নয় যে, আধুনিক ছোটগল্পের যাঁরা বিশিষ্টতম লেখক, তাঁদের কারো লেখাই অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগের লেখক-লেখিকাবৃন্দ পড়েননি। অমৃতের গল্প সংকলনে যে কয়েকটি অসাধারণ গল্প ছিল, তাঁর লেখকদের মধ্যে ছিলেন, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদিরা। সোমেন চন্দকে ভোলা পাঠক-পাঠিকার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে অন্য দুজনের অস্থি-রক্তমাংস দিয়ে আজকের ছোটগল্পের শরীরের বেশ কিছু নির্মিত। যশোদাজীবন ভট্টাচার্য হালকা গল্প লেখেন না, চিঠিপত্র বিভাগে তাঁর গদ্যরীতি নিয়ে কখনো আলোচনা হয়েছে? শারদীয়া অমৃতে প্রকাশিত উপন্যাসের প্রচুর আলোচনা (ইচ্ছে করেই সমালোচনা শব্দটি ব্যবহার করছি না) বেরিয়েছে। একক প্রদর্শনী'র মাত্র একটি, যেটি সত্যিই বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। একটি অমর, একই বাক্যবিন্যাস ও সংলাপের রাস্তায় মোড়া পান যায় জায় মুখে ফেললে, অবশেষে চিঠিপত্রগুলি পড়ার ইচ্ছেও থাকবে না।

একজন নব লেখক এই জাতীয় আলোচনা বা প্রশংসা থেকে আরো লেখার উৎসাহ পান, এমনও ভাবা চলে না। এতে হয়ত প্রমাণ হয়, তাঁর প্রচারবৃদ্ধি ঘটছে। যে আলোচনা পাঠাচ্ছে অনায়াসেই লেখক বুঝতে পারেন তাঁর লেখায় একটা বড় মহাদেশই পাঠকের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল, তাঁর নিশ্চয়ই তখন দুঃখ হতে পারে। যাঁরা পাঠকের প্রত্যাশী নন, তাঁদের কথা অবশ্যই বাদ দিচ্ছি। লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে অমৃতে কিছু ভালো আলোচনা বেরিয়েছিল। আমরা আশা করব, সৎ পাঠকেরা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল হবেন। বহুবার আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাব রাখা হয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের ভালো লেখাগুলির পুনর্মুদ্রণ করা হোক—হয়নি সে তো দেখাই যাচ্ছে। অমৃতের মানহানির আশঙ্কা অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক।

আলোচনার উপযুক্ত সমালোচনা হলে বাধিত হব।

চন্দন দাশগুপ্ত,
নববারাকপুর, ২৪ পরগণা।

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের উপাদান প্রসঙ্গে

আপনাদের বহুল প্রচারিত অমৃত (১০ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৫শ সংখ্যা) পত্রিকায় স্মরজিৎ চক্রবর্তীর 'উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের উপাদান' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি ৮৩১ পৃঃ ২য় কলমে উদ্ধৃত করেছেন :

"নিভাতারির ভাতার পাব
মঙ্গল চণ্ডীর বরে।।"

লেখক 'নিভাতারির' কথাটির অর্থ সুস্পষ্ট করতে পারেন নি। পাঠকবর্গও কথাটির অর্থ ঠিকমত ধরতে পারবেন কিনা সন্দেহ। লেখকের উচিত ছিল 'নি-ভাতারির' এরকম করে লেখা। নাই ভাতার (অর্থাৎ স্বামী) যার, নি-ভাতারি।

৮৩২ পৃঃ ১ম কলমে আছে :—
'মায়ে না শিখান্ বাছা শিক্ষার বচন ধর।'

আবার শেষের দিকে উদ্ধৃত করেছেন :
'মায়ে না শিখান্ লাছা যত নিয়ম-নীতি।'
—এখানে 'লাছা' বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি কি 'বাছা' ও 'লাছা' দুটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন? তাহলে তিনি ঠিক বোঝেন নি। লাছা মানে বাছা নয়।

ঐ একই পৃষ্ঠায় আছে :—
'শুন্ শাশুড়ি তোর হয় গুরুজন।'
এবং ঐ পৃষ্ঠার মধ্যখানে আছে :—

'প্রথমে বেইস আর শশুর সদাগর।'

'শুর' = 'শশুর'। এ-কথাই কি তিনি পাঠকবর্গকে বোঝাতে চেয়েছেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে কি তাই আছে? আমার জানতে বিশেষ আগ্রহ হয়। যদি থেকেও থাকে তাহলে তা ভুল, রাজবংশী সমাজে শশুরকে 'শুর'

চিঠিপত্র

াতে কখনোও দেখিনি। আবার ঐ একই ৃষ্ঠায় তিনি উদ্ধৃত করেছেনঃ—

'আরি জয় জায়ের সংগে জলক লাগি াবু।' আরি=আর, জয়—যত, জায়ের—া'য়ের, সংগে=সঙ্গে, জলক=জলের, লাগি=ন্য, যাবু=যাবি। এখানে জয়=যত। য়' শব্দটিতে 'জ'-য়ের পরিবর্তে 'য' ব্যবার করলে অর্থটি তাড়াতাড়ি সুস্পষ্ট হয়ে ঠত। কারণ 'জয়' বলতে (বাংলায়) বুঝি বজয়'। কিন্তু বর্তমানে রাজবংশী ভাষায় য়' ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং ূল পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত করার সময় ির শব্দের রকমফের দেখা উচিত ছিল। াবার ঐ একই পৃষ্ঠায়ঃ—

'গৃহস্তির কথা কন্যা শুন মন দিয়া।'
ায লাইনে (১ম কলমে) লিখেছেনঃ—
কহিলাম গৃহস্থির কতা এই মত পৌরব।'
ৃহস্তির-গৃহস্থির, কথা-কতা। লেখকের খানে একই কথা উদ্ধৃত করতে বানানের ত পার্থক্য কেন? রাজবংশীতে 'গৃহস্তির' থাটাই আসল। কথা বা কতা এ দুটো দ রাজবংশী ভাষায় নিজস্ব নয়। বিশেষ রে 'কথা' শব্দটি। রাজবংশীতে কথা-ঃথা' (রাজবংশী অভিধান, কলীন্দ্রনাথ র্ন)। 'কতা' শব্দটি 'আসামী' রাজবংশী গুলে খুবই কম ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ূল পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত লেখবার ময়, একটু ভেবেচিন্তে ভাষার শব্দের কমফের বোঝা উচিত ছিল। কারণ আজও গ এ ভাষায় কোন 'ব্যাকরণ' বই লেখা ল না। অমার্জিতভাবে পড়ে রয়েছে।

৮৩৩ পৃঃ ১ম ও ২য় কলমেঃ—
সকালে উটিয়া যেবা হয় আটকুয়া দরশন',
ুড়োর বড় ব্যাটা উটিয়া কয়—

াজবংশীরা (যারা রাজবংশী ভাষায় কথা লেন) 'সকাল'কে 'সকাল' বলেন না বলেন াকাল', নাহলে বেহান' আবার কোনো কানো জায়গায় 'খুব ভোর' এই অর্থে কসংগে দুটো শব্দ 'বেহান-সাকাল' ব্যবহার রেন। তাহলে বলতে হয় বাংলা ভাষার ভাব ঐ পালায় প্রকটভাবে পড়েছে। সংস্কৃত, অমার্জিত, অবহেলিত ভাষার পর অন্য ভাষার প্রভাব পড়তে বাধ্য। লখকের তো এই সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ যাগাযোগ আছে, তাহলে এমন ভুল কেমন রে হয় বলুন তো!

(১০ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪০শ সংখ্যা) উত্তরবংগের লোকসাহিত্যের উপাদানে তিনি কটি গানে ব্যাখ্যা করতে গি'য় উদাহরণটি ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

'ছেরির ভাইনে গালে হইল কালা দাগ,
হাটে যেমন ডিমপাড়া হাস—
ল্যাপেশ প্যাদেশ করিয়া।'

—'মেয়েটির ডান গালে কালো দাগ। হাটে ডিম দেয় এমন হাঁসের মত থপথপ করে।' (১০০ পৃঃ ৩য় কলম)

—এখানে লেখক শেষোক্ত দুই লাইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সব হাঁসই ডিম দেয় এখানে বিশেষ করে পাতিহাঁসের কথা বলা হচ্ছে। গানের 'হাটে' শব্দটির বাংলা অর্থ হবে 'হাঁটে' (to walk) তিনি 'হাটে' শব্দটিকে 'হাট' (Market) ধরে নিয়ে ভুল করেছেন।

ঐ পৃষ্ঠার মাধ্যখানে আছেঃ—
'দল বাড়ীখান দলোদলো আর বাগের ভয়,
তোমরা ক্যানে অনাইস্চেন বন্ধু
আমি গেইলোং হয়।'
'অনাইস্চেন' শব্দটি বোধহয় 'আইসেচেন' হত। আমি শব্দটি বাংলা এখানে 'মুই' হত বোধ করি।
'মুই নারী দিব; ছ্যাকাপাড়া,
'দিব', এর জায়গায় 'দিবু' হত আশাকরি।

'তাছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও মিলছে। সেটা হচ্ছে বরযাত্রীরা কুচবিহারের ব্রাহ্মণ। এ থেকে মনে হয় যে, এই গানগুলি উত্তরবাংলার পল্লীর ব্রাহ্মণ সমাজেই প্রচলিত ছিল।'

(১০৩ পৃঃ ২য় কলম)

সব বরযাত্রী যে কুচবিহারের ব্রাহ্মণ হবে এমন কোনো কথা নেই। আর শুধু বরযাত্রীদের তাঁরা আক্রমণ করে না। ব্রাহ্মণ নাপিত, বরের সংগে মিতালি করবে যে ব্যক্তি অর্থাৎ রাজবংশীয় ভাষায় 'মিস্তর' প্রভৃতিকে আক্রমণ করা হয় গানের সাহায্যে। এই সমাজে কুচবিহারে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ বা কুচবিহারের বসবাসকারী ব্রাহ্মণের কৌলীন্য বেশী। তাই ব্রাহ্মণকেও গানের দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছে বা হয় আজও উত্তর বাংলার পল্লীগ্রামে তাই বলে একথাটি বলা যায় না। দীর্ঘদিনের বসবাসের ফলে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব এদের সংগীতে এসে পড়েছে।' এই বিবাহ গানগুলি বর্ষীয়সী মহিলারা রচনা করতেন শুধু ব্রাহ্মণরাই গান রচনা করতেন একথা ঠিক নয়। যেমন নাপিতকেও বিয়ের সময় নাজেহাল হতে হয়ঃ—

এহ পাখে মানা অহ পাখে মানা
নাউয়াডা-তে কোঠা কামাছে।
চক্ষু দুইডা কানা।'

—'এদিকেও মানকচু ওদিকেও তাই। মধ্যিখানে বর-কনেকে যে নাপিতমশাই 'কোঠা' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ক্ষৌরকর্ম করাচ্ছেন তার কি নিজের চক্ষু দুইটি কানা?' লেখক উত্তর-বাংলার লোক-সাহিত্যের উপাদান যে সারা বাংলার পাঠকবর্গকে কিছুটা আহরিত করে এনে দিতে পেরেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আমার কোন ত্রুটি হলে মার্জনীয়।

—সহদেব রায়
সাহিত্য-সংসদ, শিলিগুড়ি

বাংলা খেয়াল গান বিষয়ে

গত ৫ই চৈত্র, ১৩৭৭ সংখ্যার 'অমৃতে'র প্রকাশিত পবিত্র দাশগুপ্তের 'খেয়ালগানে স্থায়ী ও অন্তরার ভাবা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে আনন্দিত হলাম। লেখক তাঁর প্রবন্ধে বাংলা খেয়াল গানের সপক্ষে যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন, তা সত্যই প্রশংসার্হ। এতে দ্বিমত হবার কোন কারণ দেখি না।

রেডিও খুললে বা গানের কোন আসরে বসলে বা রেকর্ড বাজালে যে বাংলা গান আজ আমরা শুনতে পাই, তার বেশির ভাগই 'রক এ্যাণ্ড রোল', 'টুয়িস্ট' বা 'পপস্ স্টাইলের' গান। বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর উপর গাওয়া বাংলা গান আজ আমরা বড়-একটা শুনতে পাই না। অথচ এই রাগ-রাগিণীর উপর গাওয়া গানই আমাদের সঠিক পরিচয় বহন করতো ও উপযুক্ত মর্যাদা দিত। দুঃখ হয় বড় বেশি, যখন অনেক নামকরা সংগীতশিল্পীকেও দেখি এই ঢঙে গান গাইতে এবং তাঁদের উত্তর-সুরীদের এপথে চালিত করতে। আমরা বাঙালীরা জাত শিল্পী। শিল্পানুরাগের জন্যেই আমাদের কদর। অথচ আজ এই বাংলাগানকে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী বর্জিত করে তাকে আমরা যে-পথে নিয়ে চলেছি, তা সত্যই লজ্জাকর ও নিন্দনীয়। দুঃখ হয় এই দেখে যে, এ বিষয়ে কি শিল্পী, কি শ্রোতা কারও কোন ভ্রুক্ষেপও নেই।

খেয়ালগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল তানালাপ অর্থাৎ, স্বরবিস্তারকরণ। হিন্দুস্থানী খেয়ালগানের সংগীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে নেবেন এভাবেই কাজে অগ্রসর হন। গায়ক এই ফাঁকটা ভরিয়ে দেন তানের দ্বারা। আমাদের বাংলা খেয়াল গানের সংগীতকারকেও এ-বিষয়ে হুঁসিয়ার হয়ে কাজে নামতে হবে। নয়তো, আজকের বাংলা গানের মতো 'বাংলা খেয়াল গানও' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে,—বাহবার জায়গায় আমাদের দুর্নাম কুড়োতে হবে।

বাঁরিদবরণ ঘোষ।
চুঁচুড়া, হুগলী।

শাদা চোখে

ওপার বাংলার দুর্বার তরঙ্গাভিঘাতে এপার বাংলায় সাড়া জেগেছে। সমস্যা-সঙ্কুল এই বাংলার আপামর জনসাধারণ এখন ওপারের দুঃখদুর্দশার কথা ভেবে বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। সেই উত্তেজনা বিস্ফোরণে রূপান্তরিত কখন, কোন মুহূর্তে হবে তার সঠিক সময় নিরূপণ করা কঠিন। নকল রাজনৈতিক সীমারেখার প্রাচীর ভেঙে দিয়ে ওপারের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী দানবের সঙ্গে লড়াই করবার উদগ্র বাসনা থাকা সত্ত্বেও পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত এপারের মানুষ গুমরে মরছে। তারা ভুলে গেছে নিজেদের জীবনযন্ত্রণের কথা। ভুলে গেছে বেকার তার বেকারীর জ্বালা। সর্বত্রই এপারে শুধু চিন্তা—আলোচনা। কি করে ওপার বাংলার ভাইবোনদের মান ইজ্জত রক্ষা করা যায় বর্বর, অত্যাচারী ও আক্রমণকারী পশুশক্তির হাত থেকে। বাংলাদেশে যে নয়াজাতির অভ্যুত্থান ঘটেছে, এদিকের মানুষ সাগ্রহ প্রতীক্ষায় তাদের প্রতিষ্ঠালগ্নের প্রহর গুনছে। 'জয় বাংলা' শুধু শ্লোগান আর নয়, নয়াজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার দিশারী। সেই ধ্বনির অনুরণন আজ যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে, এপার বাংলার মানুষ নিজেদের লাভালাভের কথা ভুলে গিয়ে কিভাবে নির্যাতীত ভাইবোনদের হাত শক্ত করতে পারবে সেই চিন্তায় আকুল।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণ এপার বাংলার পক্ষেও শুভ মুহূর্ত। নব-প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে এসময় মাহেন্দ্রক্ষণ। ওপারের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে এপারে তাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করে যদি গঠনাত্মক কাজে নিয়োজিত করা যায়, তবে যে সমস্ত সমস্যা মানুষকে পীড়ন করছে তার সমাধান সুদূরপরাহত থাকবে না। সরকারকে তার জন্যে অবশ্য খুবই সতর্কতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ সম্পন্ন করতে এগিয়ে যেতে হবে। একথা সত্য, ওপার বাংলার সৃষ্ট সমস্যা এপারের অর্থনীতির উপর ক্রমশই ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করছে। নতুন করে শরণার্থী আসার ফলে সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু এবারকার এই সমস্যাকে সঙ্গে সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব। প্রথমত কেউ চিরস্থায়ী হবার জন্য এপারে আসছেন না। দ্বিতীয়ত সাময়িক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হবারও বিশেষ কারণ নেই। কারণ, শুধু সরকারের উপর দায়িত্ব এবার নেই। অকৃপণ হাতে প্রতিটি মানুষ এবার এগিয়ে আসছেন তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাপনায়। সরকারের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত অকাতর দানসামগ্রীকে উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে বিলিবণ্টন করার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই সমস্যাকেই বড় করে দেখে প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে শুরু করে মন্ত্রীমহোদয়গণ পর্যন্ত যদি শুধু ওপার বাংলার কথায় নিমগ্ন হয়ে থাকেন তবে রচনাত্মক কর্ম-কাণ্ডের মাহেন্দ্রক্ষণ অজান্তেই বয়ে যাবে।

সব্যসাচীর মত দুই হাতেই এপার বাংলার সরকারকে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হতে হবে। ইতিমধ্যেই এই বঙ্গের নয়া সরকার চাকুরীর বয়স সীমা পাঁচ বৎসর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব গ্রহণ করে সকলেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এই বয়স সীমা বৃদ্ধির জন্য হয়ত বেকারদের লড়াই-এর ক্ষেত্র প্রসারিত হলো, কিন্তু একথা ঠিক যে নতুন করে সময় পাওয়ার ফলে সরকারী চাকুরীর আর কোন আশা নেই—এরকম একটা মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে বেকারের যন্ত্রণার সাময়িক অবসান ঘটলো। এটাও কম আশার কথা নয়। যাহোক, সরকার যদি কিছু প্রকল্পের সৃষ্টি করে এই কর্মহীন যুবকদের জীবিকার্জন নিরাপত্তার কথঞ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন তবে চাকা ঘুরবে।

বিধানসভা ডাকবার কথা ঘোষণা করে নতুন মন্ত্রিসভা প্রবল বিরোধীপক্ষকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছেন। এতদিন যাঁরা মনে করছিলেন যে ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশান বিধানসভা না ডেকে কায়দা করে প্রশাসনিক যন্ত্র সতেজ ও সক্রিয় করে গদীতে থাকবেন—এই ঘোষণা তাঁদের ধারণা যে অমূলক তা প্রমাণ করে দিয়েছে। ওপার বাংলার সঙ্গে এই বিষয়ে যাঁরা এপার বাংলার পার্থক্য দেখছিলেন না এই সিদ্ধান্ত তাঁদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। অধিকন্তু সব বিচারধারা ও সব অনুমান সব সময় সর্বক্ষেত্রে যে সমভাবে প্রযোজ্য নয়—বিধানসভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত তা প্রমাণ করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশান নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে যে শক্তি যতই সীমিত হোক না কেন, সে শক্তির ক্ষয় আপাতত হবে না। বরঞ্চ, ওপার বাংলার ঢেউ লাগার ফলে এই শক্তি আরও সুদৃঢ় হবে, অপরাজেয় হবে। কাজেই বলছিলাম, এই সরকারের এখন মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রতিশ্রুত কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শুভলগ্ন। যে হানাহানি এপারের মানুষকে সর্বক্ষণ আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখছিল, আজকে তা ঘটলেও মানুষের মন ক্রমেই ইস্পাত দৃঢ় হয়ে উঠছে। ওপারের মর্টারের গর্জন শুনে ক্রমেই আজ এপারের মানুষ সাহস ফিরে পাচ্ছে। ওপারের ঘটনা এপারের দুর্ঘটনাগুলোকে ক্রমেই গ্রাস করে ফেলছে। তাই মনে হয়, এই সন্ধিক্ষণে নয়া সরকার যদি এগুতে চান তবে খুব বাধার সম্মুখীন হবেন না।

প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এগুতে হবে। শোনা যাচ্ছে, সরকার কিছু প্রশাসনিক [illegible] [illegible] এবং শুধু তাই

নয়, ইতিমধ্যে কিছু অফিসারকে এধার-ওধার করেছেনও। এই অফিসার সরিয়ে কাজকর্মে প্রাণ সঞ্চার করা যাবে বলে মনে হয় না। এই চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করে খুব বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। সময়-ভিত্তিক কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব প্রশাসনিক যন্ত্রের। কিন্তু গাফিলতি হলে শাসনের ন্যায়দণ্ড সেখানে কার্যকর হয় না। যে সমস্ত আইনকানুন এই সমস্ত অকর্মণ্য প্রশাসনিক ধুরন্ধরদের 'অমর' করে রেখেছে এবার তার খোল-নলচে পালটাবার চেষ্টা করা উচিত। আর সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় করা দরকার দলীয় সংগঠন। সংগঠনের লোকেরা অতন্দ্র প্রহরীর মত নজর রেখে যদি এঁদের চলতে বাধ্য করেন তবেই কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব। নতুবা নয়। তবে, শুধু খবরদারীর জন্য খবরদারী করলেও চলবে না। থাকতে হবে আন্তরিকতা আর সততা। এই দুয়ের অভাব ঘটলে সব কিছু ব্যর্থ হয়ে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে।

পশ্চিমবঙ্গীয় গণতন্ত্রের সরকার পক্ষের কৌশলই হল বিরোধীপক্ষকে কোন প্রকার আন্দোলনের সুযোগ না দেওয়া এবং বিরোধী দলে হতাশা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা। ওপার বাংলার উদ্দাম, উত্তাল তরঙ্গ এপারে বিরোধীপক্ষকে সাময়িকভাবে অন্যমনস্ক করেছে। আর এপারের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশান বিরোধীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। বিভ্রান্তির ফলশ্রুতি—পৌর রাজনীতিতে বামপন্থী পৌরফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন। পৌরসভায় ছিল পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের সর্বশেষ মিলনক্ষেত্র। কিন্তু গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের সৃষ্ট রাজনৈতিক ঢেউয়ের আঘাতে সেই শেষ স্মারক ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটাবার পরও যুক্তফ্রন্টের শরিকরা ঐক্য বজায় রেখেছিলেন পৌরফ্রন্টে। অবশেষে তাও বিধ্বস্ত হতে চললো। এই পৌরফ্রণ্টকে ভেঙে দেওয়ার জন্য মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের দিক থেকে অর্থাৎ রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তা যুক্তিসহ। কেননা এই রাজ্যে অন্তত তাঁরা শাসক কংগ্রেসকে অপাংক্তেয় মনে করছেন। কাজেই রাজ্য রাজনীতিতে কৌশল অবলম্বন করে যাঁরা তাঁদের মন্ত্রিত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন সেই দলগুলির সঙ্গে কি করে তাঁরা চলবেন? তাই কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে তাঁরা আর ঘর করতে রাজী নয়। শেষোক্ত দুটো দলও এ বিষয়ে পরিষ্কার। তাঁরাও বাম কম্যুনিস্টদের রাজ্যের যে কোন প্রশাসনিক সংস্থা থেকে তফাতে রাখতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আর এস পির ভূমিকাটাই কেন পরিষ্কার মনে হচ্ছে না। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যে তাঁদের বলেছেন, ঐ দল থেকে যদি পৌরপ্রধানের অর্থাৎ মেয়রের পদের জন্য প্রার্থী হয় তবে মার্কসবাদীরা তাঁকে সমর্থন জানাবেন। অর্থাৎ একটা বোঝাপড়া হয়েছে, এমন হতে পারে। স্মরণে থাকতে পারে যে রাজ্য রাজনীতির পটভূমিকায় আর এস পি শেষ পর্যন্ত বাম কম্যুনিস্ট-দের সঙ্গে হাত মেলায় নি বা মেলাতে সক্ষম হয় নি। কর্মীদের বিরোধিতা আর বাম কম্যুনিস্ট [illegible] আর এস পিকে তফাতে [illegible] চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত অপদস্থ হতেই হয়েছিল। তাই আর এস পি বামপন্থীদের মিলন হলো না বলে একলা চলার নীতি গ্রহণ করেছিল। সে অনেকদিনের আগের কথা বলে আর এস পি হয়ত মনে করছে লোকে সব ভুলে গেছে। অতএব, এখন শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে গিয়ে যদি বাম কম্যুনিস্টদের বন্ধুত্বের হাতটা ধরে ফেলতে পারা যায় তবে একেবারে কোলকাতা কর্পোরেশনের আর এস পি মেয়র। নেতারা এই স্বপ্ন দেখলেও কর্মীরা এটা কি করে মেনে নেবেন, সেটা ভাবতে আশ্চর্যই লাগে। যুক্তফ্রন্টের অর্থাৎ পৌর যুক্ত-ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে বস্তুত-পক্ষে একটি অলিখিত চুক্তিই ছিল যে কোন্ শরিক থেকে মেয়র হবেন। এবার ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের পালা। কিন্তু বড় শরিক চুক্তি মানবে না—কেননা ব্লক গণতান্ত্রিক কোয়ালিশানের সমর্থক হওয়ায় ফলে অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। অতএব, চুক্তি নেই। আর এস পি এই সুযোগটা নিয়ে মেয়র হবার সাধটা মিটিয়ে নিতে চায়, আর চিড় খাওয়া বন্ধুত্বটা জোড়া লাগিয়ে একেবারে নির্ভেজাল বামপন্থী হতে চায়। অতএব অতীতের কথা মনে রেখে লাভ কি? আর পৌরসভা ত বিধানসভা নয়। একমাত্র বিধানসভাই ত আদর্শ ও তত্ত্বগত বক্তব্য রাখবার প্রশস্ত ক্ষেত্র। আর পৌর-ক্ষেত্র মূলত সেবা প্রতিষ্ঠান। অতএব, এখান থেকে যদি মিলনের পথটা তৈরী করা যায় তবে ক্ষতি কি? আদর্শগত বিচ্যুতি ত আর ঘটছে না। যাই হোক, আখেরে যাই ঘটুক না কেন পৌর রাজনীতিতেও বামপন্থীরা যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলেন না—এটাই শাসক কংগ্রেসের সমূহ লাভ।

পৌর রাজনীতি দেখে মনে হয় বিধানসভাতেও এর ছায়া পড়বে। আর এস পি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশানকে সমর্থন করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিও দেন নি যে মার্কসবাদীদের সমর্থন করবেন। কিন্তু স্পীকার নির্বাচনের পালা যখন আসবে তখন বাম কম্যুনিস্টরা যদি আর এস পির সমর্থন নিয়ে এস ইউ সির কোন সদস্যকে ঐ পদে প্রার্থী দাঁড় করে দেন তবে এস ইউ সি পুরোপুরি বিরোধী দলে চলে আসতে পারে। কারণ, এস ইউ সি ও অদ্যাবধি যা বলেছেন তাতে সমস্ত বামপন্থী দলের একটি সরকারের গঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আর একবার নতুন করে যুক্তফ্রন্টের ট্রায়াল দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এস ইউ সি বিলক্ষণ জানতেন যে রাধাও নাচবে না, তেলও পুড়বে না। কাজেই এ শুধু একটি প্যাঁচ, যাতে বামপন্থী ভূমিকাও বজায় রাখা গেল এবং বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাতও মিলাতে হোল না। বাম কম্যু-নিস্টরা অবশ্য এস ইউ সিকে এই অবস্থায় থাকতে দিতে রাজী না হতে পারেন। কর্পোরেশান থেকে শুরু করে বিধানসভা পর্যন্ত বাম কম্যুনিস্টরা একই কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করতে পারেন। সেদিক থেকে বিচার করলে এবারকার বিধানসভা অধিবেশন খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এবং রাজনীতিক মারপ্যাঁচের প্রশস্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে।

আগেই বলেছি, গণতান্ত্রিক কোয়ালি-শানের পক্ষে সময়টা অত্যন্ত সুসময়। তাঁদের প্রগতিশীল কর্মপন্থায় প্রতিফলন যদি ঘটে তবে বিরোধীপক্ষে বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যাবে। অতএব, নিপুণতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যদি কোয়ালিশান সরকার পদক্ষেপ দিতে পারে তবে পারিপার্শ্বি-কতার সুযোগ নিয়ে গণমনে স্থান করে নেওয়া আদৌ কষ্টসাধ্য হবে না বলে মনে হয়।

—[illegible]

মুক্তিযোদ্ধারা এপারের দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা পড়ছেন।

দেশে বিদেশে

ইয়াহিয়া খাঁর দখলদার বাহিনীর অস্ত্রবলের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র অদম্য মনোবল সম্বল করে বাংলাদেশের মুক্তি-ফৌজ যখন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, বর্ষার আগে যতখানি সম্ভব বাংলাদেশের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ার জন্য ও বড় বড় ঘাঁটিগুলি দখলে আনার জন্য পাকিস্থানী ফৌজ যখন মরিয়া হয়ে একই সঙ্গে পূবে পশ্চিমে ও উত্তরে এগোচ্ছে তখন এই প্রচণ্ড অসম সংগ্রামের মধ্যেই ঘোষিত হল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ। শুধু তাই নয়, এই সরকারের মন্ত্রীরা সীমান্তের ওপারে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করলেন দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিলেন, তিন সপ্তাহ ধরে যাবতীয় আধুনিক যুদ্ধোপকরণ দিয়ে আক্রমণ চালিয়েও এবং অসামরিক জনগণের উপর অকথ্য ও অভূতপূর্ব অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, গৃহদাহ চালিয়েও পাকিস্থানী ফৌজ বাঙালী মুক্তি-যোদ্ধাদের সঙ্কল্প থেকে আদৌ বিচলিত করতে পারে নি।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে নূতন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়ে জানান হয়েছে যে, এই সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ইনি পূর্ববাংলা আওয়ামী লীগের সহঃ-সভাপতি, জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এবং আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সহঃ নেতা। এঁর বাড়ী ময়মনসিংহ জেলায়, বয়স ৪৮। এম-এ ও এল-এল-বি পাশ করার পর ইনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেন ও পরে আইনব্যবসায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। নবগঠিত বাঙলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। ইনি পূর্ব বাঙলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। এর বাড়ী ঢাকা জেলায়, বয়স ৫৮। ইনি বি-এ ও এল-এল-বি পাশকরা অ্যাডভোকেট। মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের নাম খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ। ইনি পূর্ব বাঙলার আওয়ামী লীগের আর একজন সহঃ সভাপতি ও জাতীয় পরিষদের সদস্য। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের চীফ হুইপ ছিলেন। এঁর বাড়ী কুমিল্লা জেলায়, বয়স ৫০। ইনিও পেশায় অ্যাডভোকেট, এম-এ ও এল-এল-বি পাশ করেছেন। মন্ত্রীদের মধ্যে সব চেয়ে বয়স্ক মনসুর আলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ন্যাশনাল হোমগার্ডে যোগ দিয়ে ক্যাপ্টেনের পদ-মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাঁর বয়স ৫৫। তিনিও পূর্ব বাঙলা আওয়ামী লীগের একজন সহঃ সভাপতি ও পূর্ব বাঙলা প্রাদেশিক পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য। তিনি পূর্ব বাঙলা আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিরও একজন সহঃ সভাপতি। তিনিও একজন অ্যাডভোকেট, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও এল-এল-বি। তাঁর বাড়ী পাবনা জেলায়। আর একজন মন্ত্রীর নাম এ এইচ কমরুজ্জমান নিখিল পাকিস্থান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। ১৯৩৯—৪৭ সালে তিনি কলকাতায় ছাত্রনেতা ছিলেন। তিনিও অ্যাডভোকেট, বি-এ ও এল-এল-বি পাশ।

তাঁর বর্তমান বয়স ৪৮, বাড়ী রাজশাহী জেলায়।

স্বাধীন বাঙলা বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বাঙলাদেশের এই সরকার যুদ্ধকালীন সরকার হিসাবে কাজ করবেন। প্রধানমন্ত্রীরূপে বেতার ভাষণ দিয়ে তাজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, "সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল লোকের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা স্মরণ করছি তাঁদের যাঁরা বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে মূল্যবান জীবন আহুতি দিয়েছেন। আকাশে যতদিন চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা থাকবে, মাটিতে মানুষ থাকবে ততদিন বীর শহীদদের এই সমর-কীর্তির বাঙালীর মানসপটে অম্লান থাকবে। পঁচিশে মার্চ থেকে ইয়াহিয়া তাঁর ফৌজ লেলিয়ে দিয়েছেন আমাদের উপর। সেই সংগে শেখ মুজিবুর ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতার পতাকাতলে আমরা সকলে আজ একাত্ম। যে প্রতিরোধ আপনারা গড়ে তুলেছেন তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম ও অসাধারণ মনোবল যা নিয়ে আপনারা দাঁড়িয়েছেন প্রমাণ করুক নূতন বাঙালী জাতি জন্ম নিয়েছে।"

এই "নূতন বাঙালী জাতি"র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীর প্রতি আহ্বান জানান হয়েছে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। এই সরকারের একজন প্রতিনিধি এরই মধ্যে দিল্লীতে পৌঁছে গেছেন বলে বি-বি-সি-র মারফৎ খবর পাওয়া গেছে।

"ভারত সরকার যথাসময়ে যথোচিত কাজ করবেন"—বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে এখন এর চেয়ে বেশী আর কিছু বলতে নয়াদিল্লী নারাজ। নয়াদিল্লীর সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছে যে, তাঁরা তাড়াহুড়া করে এমন একটা কিছু করতে চান না যাতে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারটা একটা ভারত-পাকিস্থান বিরোধের প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

কিন্তু নয়াদিল্লী না চাইলে কি হবে, পাকিস্থান তাঁর এই "ঘরোয়া ব্যাপারের" সংগে ভারতকে জড়িত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভারত বাঙলাদেশের ভিতরে লড়াই করার জন্য সৈন্য পাঠাচ্ছে এবং রসদ যোগাচ্ছে, এই অভিযোগ পাকিস্থান কিছুকাল আগে থেকেই করছিল। এখন সেই প্রচারের মাত্রা আরও চড়িয়ে দিয়ে পাকিস্থান রেডিও ও পাকিস্থানী সংবাদপত্রগুলি বলছে, ভারত পাকিস্থানকে আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাঙলাদেশের ভিতরকার যুদ্ধকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্থান ক্রমাগত ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনার সৃষ্টি করছে। ত্রিপুরার সীমান্তের অপরপারে কসবা নামক একটি স্থানে বোমাবর্ষণ করতে গিয়ে পাকিস্থানী বিমান ভারত-পাকিস্থান চুক্তির বিধিলঙ্ঘন করে সীমান্তের এপারে ভারতীয় এলাকায়ও

ঝিকরগাছায় বাসের ওপর স্বেচ্ছাসেবকরা দাঁড়িয়ে বিজয়উল্লাস প্রকাশ করছেন।

কিছু মেসিনগানের গুলী ছুঁড়েছে। ত্রিপুরার মহকুমা শহর সোনামুড়ার একজন তহশীলদার তাঁর নিজের বাসভবনের উঠানে পাকিস্থানী গুলীতে আহত হয়েছেন। এইভাবে ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে নয়াদিল্লী ইসলামাবাদে নোট পাঠিয়েছে। তাতে আরও এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, পাকিস্থানী বাহিনী এই ধরনের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ চালালে যে কোন পরিণতির জন্য পাকিস্থান সরকারকে দায়ী করা হবে।

●

রোহানা বিজয়বীর নামক একজন সিংহলী ছাত্র কয়েক বছর আগে মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে। রোহানা সিংহলের একটি সুপরিচিত কম্যুনিস্ট পরিবারের সন্তান। মস্কোতে গিয়ে তিনি নাকি একটু বেশী মাত্রায় চীনা-প্রীতি দেখাতে থাকেন। তার ফলে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। মস্কো থেকে তিনি উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়াংয়েও গিয়েছিলেন বলে খবর আছে। রোহানা দেশে ফিরে এসে "জনতা বিমুক্তি পেরামুনা" নামক একটি দল গঠন করেন।

সিংহলের শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের সরকার এখন তাঁর স্থল, বিমান ও নৌসেনা নিয়োগ করে, দেশব্যাপী জরুরি অবস্থায় কারফিউ জারি করে এবং "বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির" সাহায্য নিয়ে এই জনতা বিমুক্তি পেরামুনা দলকে দমন করছেন। বলা হয়েছে যে, এই দল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা সিংহল সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। শ্রীমতী বন্দরনায়েক তাঁর বেতার ভাষণে বলেছেন, "গোপনে এই দল গড়া হয়েছে, প্রকাশ্যে এই দলকে পুষ্ট করা হয়েছে এবং ক্ষমতালিপ্সার দ্বারা এই দলকে চালিত করা হয়েছে।"

যদিও বলা হচ্ছে যে, রোহানার জনতা বিমুক্তি পেরামুনা চে গুয়েভারার মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, তথাপি এই দলের আদর্শগত প্রেরণার সূত্রটি পরিষ্কার নয়। একটা অনুমান এই যে, এই দলের পিছনে চীনা অনুপ্রেরণা রয়েছে, কিন্তু সেকথা জেনেও সিংহল সরকার খোলাখুলিভাবে বলতে পারছেন না। কেননা, সিংহলকে তার রবার বিক্রি করার জন্য ও সেই রবারের বিনিময়ে চাল সংগ্রহ করার জন্য চীনের উপর নির্ভর করতে হয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে চীনের নাম জড়িয়ে সিংহল চীনকে চটাতে চায় না। সিংহলের পিকিংপন্থী কম্যুনিস্ট নেতা ও সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এন শন্মুগতাসনকে গ্রেপ্তার করায় এই সন্দেহ আরও প্রকট হয়ে উঠছে যে, চীনকে তফাতে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে সিংহল সরকার ইচ্ছা করেই বিদ্রোহীদের গুয়েভারাপন্থী বলে অভিহিত করছেন। লণ্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা একটি সংবাদে বলেছেন যে, বিদ্রোহীদের কাছ থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে তাতে চীন ও উত্তর কোরিয়ার ছাপ পাওয়া গেছে। এই সংবাদদাতার মতে, কলম্বোতে সিংহলের পরলোকগত নেতা (ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর স্বামী) বন্দরনায়েকের স্মারক সৌধ তৈরি করার জন্য যে দুইশ চীনা কারিগর আনা হয়েছে তাঁদের কেউ কেউ বিদ্রোহীদের সঙ্গে আছেন।

পরবর্তী একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সিংহল সরকার কলম্বো থেকে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। ঘটনার পরিহাস এই যে, সিংহলের বর্তমান সরকার বামপন্থী সরকার বলে পরিচিত। মস্কোপন্থী ও ট্রটস্কিপন্থী কম্যুনিস্টরা এই সরকারের অংশীদার। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরই উত্তর কোরিয়ার সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

আরও পরিহাস এই যে, নিজেদের দেশের মার্কসবাদী বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য এই বামপন্থী সরকারকে আমেরিকা ও বৃটেন সহ বিভিন্ন দেশের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ চাইতে হয়েছে। আমেরিকা হেলিকপ্টারের যন্ত্রাংশ ও বৃটেন ছয়টি মার্কিন হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে চারখানি হেলিকপ্টার গেছে ও তার সঙ্গে কিছু বৈমানিকও গেছেন বলে প্রকাশ। তাছাড়া কিছু ভারতীয় সৈনিকও পাঠান হয়েছে বলে প্রকাশ। এই সৈনিকদের অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হবে না। সিংহলী সৈনিকদের যাতে যুদ্ধের কাজে ছেড়ে দেওয়া যায় সেজন্য ভারতীয় সৈনিকরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়ার কাজ করবেন।

১৭-৪-৭১ —পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

সীমান্তের ওপারে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে তার আঘাত এই বাংলাতেও এসে লাগছে। কৃত্রিমভাবে দেশভাগ করা হলেও, দুই বাংলার মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। শুধু জন্মসূত্রে নয়, এখনও দুই বাংলায় বহু পরিবারের আত্মীয়স্বজন বাস করেন। পাকিস্তান সরকার বাংলার এই আত্মিক বন্ধন ভাঙবার জন্য গত ২৩ বছর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বাঙালীর মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছে। কিন্তু সে-কাজ সফল হয়নি। তা না হলেও বাংলার অর্থনৈতিক শোষণই পশ্চিম পাকিস্তানীদের আকর্ষণ করে এনেছিল সীমান্তের ওপারে। তার প্রতিক্রিয়াতেই আজ বাংলাদেশ বহ্নিমান।

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীতাজুদ্দিন আহমেদের প্রধানমন্ত্রিত্বে। শেখ মুজিবর রহমান হলেন এই অস্থায়ী যুদ্ধকালীন সরকারের প্রেসিডেণ্ট। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হয়। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত না করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবসান হতে পারে না। কোনো যুদ্ধেই চমকপ্রদ ফল তাড়াতাড়ি আশা করা যায় না। যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে অস্ত্রশক্তি, রণকৌশল এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর। পশ্চিম পাকিস্তানের অস্ত্রশক্তি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের চেয়ে বেশি। কিন্তু রণকৌশলে মুক্তিফৌজের শ্রেষ্ঠত্ব বহু রণাঙ্গনেই প্রমাণিত হয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থাও মুক্তিফৌজেরই পক্ষে। পাকিস্তানীরা সীমাবদ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে এখন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

যে কোনো যুদ্ধাবস্থাতেই দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বানচাল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এমন একটা ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইয়াহিয়া খান এই যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আওয়ামি লীগ এত বড় একটা যুদ্ধের মোকাবিলা করতে প্রথমে খানিকটা হয়তো অসুবিধায় পড়েছিল। কিন্তু ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশবাহিনী সামগ্রিকভাবে এই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায় পাকিস্তানীদের আক্রমণ প্রতিহত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। যতই দিন যাবে মুক্তিফৌজের সংখ্যা বাড়বে এবং অভিজ্ঞতার ফলে রণকৌশলেরও অনেক উন্নতি হবে। মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কায়দাতেই যুদ্ধ করছেন এবং গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে পারবেন এই সময়ের মধ্যে।

প্রত্যেক যুদ্ধেই গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতক দেখা দেয়। বাংলাদেশেও তা কিছু কিছু দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। পশ্চিম পাকিস্তানী প্রসাদপুষ্ট এই ঘৃণ্য মানুষগুলো মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কয়েকটি জায়গায় মুক্তিফৌজকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছে। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুক্তিফৌজের লোক হতাহত হয়েছেন পাকিস্তানীদের আক্রমণে। কিন্তু এঁদের সংখ্যা সামান্য। বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জনই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। এজন্য তাঁরা চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক যে অসুবিধাগুলো দেখা দিচ্ছে তা হল সাংগঠনিক নেতৃত্বের। এত বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ বেশী দিন চলে না। তাকে সুদক্ষ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীনে এনে সুপরিকল্পিত আক্রমণ ও শত্রুদুর্গ দখলের অভিযানে রূপায়িত করতে হয়। এখন পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টগুলো থেকে পাকিস্তানী বাহিনীকে হঠানো সম্ভব হয়নি। তবে তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা অনেক জায়গাতেই ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এজনাই পাকিস্তানীরা মরিয়া হয়ে বিমান আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজকে ছত্রভঙ্গ এবং জনসাধারণের মনোবল ভাঙবার চেষ্টা করছে। আশা করা যায় যে, যুদ্ধের প্রথম স্তরের অপ্রস্তুতি এবং বিহ্বলতা কেটে যাবার পর মুক্তিযুদ্ধের গতি হবে দুর্বার এবং অপ্রতিরোধ্য।

এই যুদ্ধের ফলে ভারতের পক্ষ থেকে প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হল শরণার্থী আগমন। গত ২৩ বছরে পূর্ববাংলা থেকে বহু শরণার্থী এসেছে ভারতে। তাদের অধিকাংশই ছিল সংখ্যালঘু। পাকিস্তানীদের অত্যাচারে তখন তারা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। এখন সেই পাকিস্তানীদের ভয়েই সংখ্যাগুরু মুসলিম ও সংখ্যালঘু হিন্দু নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার সীমান্ত পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছেন। গত সপ্তাহের হিসাবে জানা যায় ইতিমধ্যেই এক লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন, পাকিস্তানীদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য। এই শরণার্থীদের আশ্রয় ও বাসস্থান দেওয়া আমাদের মানবিক কর্তব্য। আপৎকালেই মানবতার পরিচয়। কিন্তু সকলেই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সঙ্গতি কত সীমাবদ্ধ। এবং এই কাজ একা পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতের পক্ষেও করা সম্ভব নয়। এর দায়িত্ব রাষ্ট্রসংঘকে নিতে হবে। বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ কিছু করেনি। যারা জল্লাদের হাত এড়িয়ে চলে এসেছে তাদের জন্যও যদি রাষ্ট্রসংঘ কিছু না করে, তবে এই সংস্থা থেকেই বা লাভ কী? আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে পাকিস্তান সরকার ঢাকায় যেতে দেয়নি। ভারত সরকার তাঁদের আমন্ত্রণ করে আনুন বাংলাদেশের এই শরণার্থীদের সেবার জন্য। বাংলাদেশের যুদ্ধের ভয়াবহতাও তাহলে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা খানিকটা নিজের চোখে দেখে যেতে পারবেন।

এক নজরে

ভারতের জনসংখ্যা :

সেন্সাস কমিশনার শ্রী এ চন্দ্রশেখর ১৯৭১ সালের লোক-গণনার যে প্রাথমিক হিসাব প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায়, দশ বছরের ব্যবধানে ভারতের লোক বেড়েছে প্রায় বারো কোটি। অর্থাৎ, বৃটেন ও ফ্রান্সে যত লোকের বাস তার চেয়েও কিছু বেশি লোক ভারতে বেড়েছে বিগত এক দশকে। আরও এক হিসাবে বলা যায়, ভারতের চেয়ে আয়তনে সাতগুণ বড় সোভিয়েট ইউনিয়নে বিগত দশ লক্ষ বছরের মানব-জন্ম ও মৃত্যুর যা বিয়োগফল, ভারতের মাত্র দশ বছরের সৃষ্টি সে-সংখ্যার অর্ধেক অতিক্রম করে গেছে। ১৯৬১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ৯১ লক্ষ, ১৯৭১ সালে সে-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ। মোটামুটি হিসাবে দশ বছরে বৃদ্ধির হার ২৪·৫৭ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় সিকি ভাগ। পূর্বের দশকে এই বৃদ্ধির হার ছিল ২১·৫০ শতাংশ।

কিন্তু আমাদের জনতত্ত্ববিদ সেন্সাস কমিশনার এই বৃদ্ধিতে খুব বিচলিত হননি, পরন্তু তিনি এর মধ্যে বিগত দশকের পরিবার পরিকল্পনা অভিযানের উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেছেন, জন-সংখ্যা সম্পর্কে সরকারের অনুমিত হিসাব ছিল ছাপ্পান্ন কোটি, কিন্তু প্রকৃত লোকবৃদ্ধি যে তার চেয়ে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ কম হয়েছে, সেটা পরিবার-পরিকল্পনার জন্যই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রশেখরের এই বক্তব্য খুব যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী অনুমান কোন হিসাবের ভিত্তিতে করা হয়েছিল তা তিনি বলেননি। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বিগত দশকে লোকবৃদ্ধির হার পূর্বের দশকের তুলনায় বেড়েছে, পরিবার-পরিকল্পনা অভিযানের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটলে যেটা কিছুতেই হতে পারত না। জাপান তার লোকবৃদ্ধির হার এক দশকের চেষ্টায় শতকরা ২·৫ থেকে কমিয়ে শতকরা ১-এ নামিয়ে আনে। আর ভারতে দেখা যাচ্ছে, এক দশকের ব্যবধানে লোকবৃদ্ধির হার শতকরা ২·২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে শতকরা ২·৫। এ-বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে, মাত্র আটাশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই, ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১১০ কোটির কাছাকাছি।

আর এক ভয়াবহ বৃদ্ধি :

ভারতের লোকসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতের রাজ্য-গুলিতে মন্ত্রীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বেপরোয়াভাবে মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে মন্ত্রিত্ব রক্ষার নির্লজ্জ প্রয়াস কয়েক বছর আগেই বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়। সব দলই এর নিন্দা করেছে, কিন্তু সরকারী তখতে টিঁকে থাকার দায় যখনই বড় হয়েছে, তখনই সব দলকে এই একই উপায় অবলম্বন করতে দেখা গেছে। কিছু-দিন আগে এ নিয়ে সকল দলের এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা হয় এবং তাতে মোটামুটিভাবে স্থির হয় যে, যে-দল বা জোট মন্ত্রিসভা গঠন করবে, মন্ত্রিসভা সেই দল বা জোটের সদস্য-সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশি হওয়া উচিত হবে না। মুখ্যত সেই নীতির ভিত্তিতে এবার কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন শ্রীমতী গান্ধী। কেন্দ্রে শাসক দলের সদস্য-সংখ্যা সাড়ে তিনশ' হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা পঁয়ত্রিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, এবং তার মধ্যে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সংখ্যা মাত্র তেরো। ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্যাবিনেটে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ থেকে একজনকেও নেওয়া সম্ভব হয়নি। সমভাবে বাদ পড়েছে তামিলনাড়ু, ওড়িশা, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ার জন্যই প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা গঠনকালে প্রশাসনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করতে হয়নি।

এর পাশে বিভিন্ন রাজ্যের চিত্র ভয়াবহ বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। উত্তরপ্রদেশে সদ্য পরিত্যক্ত এস ভি ডি মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে ৫৪ হয়েছিল, কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাবে বিধানসভার ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে অকালি দলের সদস্য-সংখ্যা ৫৪, কিন্তু অকালি মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা ২৬, অর্থাৎ প্রতি দুজন এম এল এ-র মধ্যে একজন মন্ত্রী। ওড়িশা বিধানসভার মোট সদস্য-সংখ্যা ১৪০, বর্তমানে চারটি আসন শূন্য থাকায় ১৩৬; তার মধ্যে মাত্র ৭০ জন সদস্যের সমর্থনে শ্রীবিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে যে-মন্ত্রিসভা তার সদস্য-সংখ্যা ১৪, অর্থাৎ প্রতি পাঁচ এম এল এ পিছু একজন মন্ত্রী। কিন্তু এ-সংখ্যানুপাতও বেশী দিন বজায় থাকবে না, কারণ মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে, শীঘ্রই আরও কয়েকজন উপমন্ত্রী নিয়োগ করা হবে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেপরোয়া বিহারের বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। বিহার বিধানসভার ৩১৮ জন সদস্যের মধ্যে ১৭০ জনের সমর্থনের দাবি রাখেন বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা; তাঁদের মধ্যে ৫২ জনকে এপর্যন্ত মন্ত্রী করা হয়েছে। মন্ত্রিসভা টিঁকিয়ে রাখতে মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কালের মাত্র ১০৯ দিনের মধ্যে মন্ত্রীর সংখ্যা অর্ধ-শতাধিক করা হলেও বিহার মন্ত্রিসভার অতি বড় সমর্থকও এ-কথা বলতে পারবেন না যে, এ-মন্ত্রিসভা ছ' মাসের বেশি টিঁকবে।

শুধু রাজনৈতিক দলগুলির দুর্নীতি দূর করার জন্যই নয়, গরীব দেশের রাজস্বের অপচয় বন্ধের জন্যও অবিলম্বে এ-ব্যাপারে একটা সাংবিধানিক ব্যবস্থাবলম্বন প্রয়োজন। মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা কোন অবস্থাতেই লোকসভা বা বিধানসভার সরকারী দল বা কোয়ালিশনের সদস্য-সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়।

চার সম্রাট : :

ভারতে আগামী মে মাস থেকে যে চারটি জাম্বো জেট বোয়িং-৭৪৭ বিমানের চলাচল শুরু হচ্ছে তাদের নাম রাখা হয়েছে সম্রাট মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবর ও সম্রাট শাহজাহান। বিমানগুলির বিশালতা, জৌলুষ ও জাঁকজমকের সঙ্গে এই নামকরণ যে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের চার মহান সম্রাটের মতোই তারা অনন্য। অর্ধ সহস্র যাত্রী নিয়ে দশ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ঐ খেচর দৈত্যগুলি যখন পৃথিবী পারাপার করবে তখন এই গ্রহ নিশ্চয়ই আরও ছোট হয়ে যাবে ভারতের কাছে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

বাংলা দেশ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নয় কোনো ফাঁকা গোল টেবিলের
ঠকের বৈঠক,
কীটে কাটা রোয়েদাদ
ক্ষুদ্র লুব্ধ কৃপণের ধূর্ত ফয়সালা,
না বা কোনো দেয়ালে পোস্টার
শূন্যগর্ভ বুলির দাপট—
এ এক পৃথক মূর্তি,
আরেক অস্তিত্বে এসে
এ এক পৃথক উচ্চারণ—
হৃদয়ের আদিগন্ত অনাবৃত উদধি-উন্মেষ,
রিক্ত হাতে মুখোমুখি নির্লজ্জ মৃত্যুর মোকাবিলা
লক্ষ লক্ষ মরণেও রক্তবীজ প্রাণ অনিঃশেষ—
নাম শোনো গান শোনো
স্থলে-জলে স্থাবরে-জঙ্গমে
বাংলা দেশ, বাংলা দেশ
স্বাধীন নবীন বাংলা দেশ।

গর্জমান ব্রহ্মপুত্র, প্রমত্ত ভৈরব
পদ্মা মেঘনা করতোয়া ত্রিস্রোতা গোমতী
মহানন্দা কর্ণফুলি সুনন্দা কুমার
নদী নালা খাল বিল এক সুরে থরথর মন্দ্রিত স্পন্দিত
তরঙ্গে তুমুল কলরোল
বন্দরে বন্ধনকাল হয়ে গেছে শেষ,
জেগেছে নতুন রাজ্য—
প্রত্যয়ে অচল থেকে প্রত্যেকে সৈনিক
প্রত্যেকেই বীর নেতা বর্বরের বিপুল উচ্ছেদে,
এক তন্ত্রে গাঁথা মন্ত্র
রব না রব না আর বিদেশীর ভোগোপনিবেশে,
বাংলা দেশ, বাংলা দেশ
সোনার শ্যামল বাংলা দেশ।

উত্তরে সৈয়দপুর দক্ষিণে সন্দ্বীপ
অটলা চট্টলা পূবে, পশ্চিমে যশোর
নয় কোনো সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের রেখা
মানচিত্রে পরিমিত—
এই এক মহান মানসলোকে
মহাতীর্থে মানবগৌরবে
উত্তরণ করে দেওয়া আমারে-তোমারে
বিশ্বজগতেরে,
শিরায় লাগিয়ে দেওয়া আগুনের সুর—
ধর্মের চেয়েও বড়ো মর্মের সংবাদবাহী মুখের যে ভাষা,
অন্নের চেয়েও বড়ো শোষণের পীড়নের মুক্তির পিপাসা।
এই এক অবধি-পরিধি-হীন দিব্য পরিবেশ
যেথা আমি-তুমি প্রতিবেশী
পরস্পর বন্ধুতার নিবিড় আশ্লেষ,
বাংলা দেশ. বাংলা দেশ
ঘনিষ্ঠ গরিষ্ঠ বাংলা দেশ।।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

তুষারকান্তি ঘোষ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এত বড় লোকের জীবন-কথা অল্প সময়ে বলা যায় না। সেই জন্য তাঁর জীবনের গোটা-কতক কাহিনী আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর তিনজন বাঙালীর যে দলটি বিলেত থেকে আই সি এস পাশ করে দেশে ফিরে এলেন তাঁদের একজন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে শ্রীহট্টে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হলেন। তখন তাঁর উপরওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সাদারল্যাণ্ড।

সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজের সমকক্ষতা দাবী সাদারল্যাণ্ডের বিরক্তি উৎপাদন করেছিল, এবং এই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ষড়যন্ত্র করে সামান্য একটা দোষ ধরে সুরেন্দ্রনাথকে কর্মচ্যুত করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিলেত গিয়ে আপিল করেও কোন ফল পান নি।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের এই কর্মচ্যুতিতে দেশের এক মহাকল্যাণ সাধিত হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাওয়া গিয়েছিল এক অনন্যসাধারণ পুরুষকে।

সুরেন্দ্রনাথের বয়েস তখন মাত্র ২৭ বছর। বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন কলেজে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। দেশের যুবশক্তিকে গড়ে তোলার এবং দেশের কাজে তাকে উম্বুদ্ধ করার একটা পরম সুযোগ এল তাঁর কাছে।

এর কিছু দিনের মধ্যেই আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে হাইকোর্টে যোগ দিলেন। আনন্দমোহন দেশে ফেরার পর এই দুই তরুণ নেতার উদ্যোগে গড়ে উঠল Calcutta Students' Association —এবং এই অ্যাসোসিয়েশনকে ভিত্তি করেই সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনায়করূপের বিকাশ ঘটতে লাগল। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এই ছাত্র সমিতিরই বক্তৃতামঞ্চে।

সুরেন্দ্রনাথ সেই সময় আধুনিক ইতিহাস থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেশপ্রেমের বহ্নি-শিখা জ্বালিয়ে তুলতে আরম্ভ করলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এর পর উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত সমাজবিপ্লবে স্বাধীনতা ও মানবতার অতুলনীয় প্রেরণা সম্পর্কে। সাধনক্ষেত্রে অধিকারভেদ ও জাতিভেদ অস্বীকার করে মহাপ্রভু সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে অপূর্ব বাণী ও আদর্শ প্রচার করেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথই প্রথম তাকে রাষ্ট্রীয় উন্মাদনা সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছিলেন।

এর কিছুকাল পরে বন্ধু আনন্দমোহনের সহযোগিতায় Indian Association বা ভারতসভা স্থাপন করলেন সুরেন্দ্রনাথ। এবং এই সংস্থার মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথ ছড়াতে আরম্ভ করলেন স্বাধীনতার প্রেরণা।

ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পরেই সুরেন্দ্রনাথ স্বাধীনতার আকাংখাকে ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য ভারত পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর সংগঠন ভারতসভা স্থাপিত হবার দু বছর পরে ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র দমনে গভর্নর জেনারেল লিটনের কুখ্যাত ভার্ণাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট ঘোষিত হল। বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরেজী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়ে বৃটিশ সরকারের চণ্ডনীতির কঠোর সমালোচনা করে যেতে লাগল। অন্য দিকে সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করে ইংরেজ রাজের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করে দিলেন। দেশের আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পরের বছর কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে, সেখানেই তার প্রকৃত জাতীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেদিন সুরেন্দ্রনাথ স্বাধিকারের যে দাবী তুলেছিলেন, স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত কংগ্রেস সেই দাবী পূরণের আন্দোলনই করেছে। সেই বিচারেই সুরেন্দ্রনাথ প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা বলে গণ্য, এবং ভারতকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাগাবার জন্য ১৮৮২ সালের শরৎকালে তিনি পাটনা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত উত্তর ভারতের শহরে শহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। পরের বছর সাপ্তাহিক বেঙ্গলী পত্রিকার একটি লেখার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার দায়ে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত করা হলে সারা দেশে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা যায়। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আবার তিনি তাঁর প্রচার অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তার প্রথম ও প্রধান হোতা হিসেবে, রাষ্ট্রগুরুরূপে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র দেশে স্বীকৃতি লাভ করলেন। ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে ও ১৯০২ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।

১৯১৮ সালে কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করে সুরেন্দ্রনাথ মডারেট দলে যোগ দিলে তাঁর সুনামের কিছুটা হানি হয় এবং বাংলা দেশেই তাঁর বিরুদ্ধবাদী একটি দল গড়ে ওঠে।

কিছুকালের মধ্যে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার ঘোষিত হলে তিনি তা মেনে নেন এবং তখনকার বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর মন্ত্রিত্ব কালেই বিখ্যাত স্বায়ত্তশাসন আইন গৃহীত হয়, যার ফলে কলকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌরসভাগুলি জনপ্রতিনিধিদের শাসনাধীনে আসে।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের আরও বড় কীর্তি, বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলা দেশকে দু ভাগ করে বলেছিলেন Partition of Bengal is a settled fact. সুরেন্দ্রনাথ এই বলে তার উত্তর দিয়েছিলেন যে, I will unsettle the settled fact, এবং কার্জনের অন্যায় প্রতিরোধে তিনি যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তারই ফলে ১৯১১ সালে দিল্লী দরবারে স্বয়ং পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন।

এতক্ষণ আমি সুরেন্দ্রনাথের প্রধানত রাজনীতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বললুম। এইবার তাঁর স্নেহময় হৃদয়ের সম্বন্ধে কিছু বলব। এটা ১৯২২ সালের কথা। এ ঘটনা ঘটে আমার কাকা মতিলাল ঘোষের মৃত্যুর পরেই। মৃত্যুর আগে বেশ কিছুদিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তার কিছু আগে অমৃতবাজারে সুরেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে এক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে মডারেট দলের একজন নেতা ও বাংলা দেশের মন্ত্রী ছিলেন আর অমৃতবাজার ছিল কংগ্রেসের সে সময়কার উগ্রপন্থীদের মুখপত্র। অমৃতবাজারের প্রবন্ধে যা লেখা হয়েছিল, তার জন্যে সুরেনবাবু পত্রিকার বিরুদ্ধে একটি মানহানির মকর্দমা আনেন।

মতিলাল তখন মৃত্যুশয্যাশায়ী এবং তার কিছুদিন পরেই পরলোকগমন করেন। তার পরলোকগমনের পরেই এক দিন প্রসিদ্ধ এটর্নী স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু আমার ছোটকাকা গোলাপলালের সঙ্গে এই মকর্দমা নিয়ে আলোচনা করেন। ভূপেনবাবু আমাদের সংসারের একজন পরম বন্ধু ছিলেন এবং আমার ছোটকাকাকে বললেন, 'গোলাপ, এখন তো মতিবাবু বেঁচে নেই, এখন তোমাদের উচিত সুরেনবাবুর সঙ্গে মকর্দমাটা মিটিয়ে ফেলা। আমি সুরেনবাবুর নামে একটা চিঠি দিচ্ছি। তোমরা কেউ ব্যারাকপুরে গিয়ে সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা কর।' গোলাপবাবু এই প্রস্তাবে তখনই রাজী হলেন এবং ভূপেনবাবু সেইখানে বসেই সুরেনবাবুকে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। গোলাপবাবু বড় কোথাও যেতেন না, তাই এই চিঠি সুরেনবাবুর কাছে নিয়ে যাবার ভার আমার ওপর পড়ল। আমাকে বলা হল যে, মকর্দমা মেটানো ছাড়া সুরেনবাবুকে বলে আসতে হবে যে তিনি যেন মতিবাবুর শ্রাদ্ধসভায় যোগদান করেন।

তখন আমার বয়স ২৪ বছর। কিন্তু তার আগেই আমি পুরো সাব-এডিটর হয়ে গেছি।

পরদিন সকালে আমি ভূপেনবাবুর চিঠি নিয়ে ব্যারাকপুরে চলে গেলুম এবং সুরেনবাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম। সেখানে গিয়ে দেখি যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চিফ মেডিকেল অফিসার স্যার হাসান সুরাবর্দি'ও বসে আছেন।

সুরেনবাবু ভূপেনবাবুর চিঠি নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন 'বাবা, তুমি মতিবাবুর কে হও'। আমি বললুম, 'আমি মতিবাবুর ভাইপো এবং শিশিরকুমার ঘোষের ছেলে।' তিনি আমায় পরিচয় পেয়ে আমাকে অনেক স্নেহ আদর দেখালেন, তারপর মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন। চিঠি পড়া শেষ হলে তিনি বললেন যে, অমৃতবাজার যে ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করেছে, তাতে মকর্দমা করে না জিতলে তাঁর রেপুটেশন থাকবে না। আমি জবাবে বললুম, এ প্রবন্ধ মতিবাবুর আমলে লেখা হয়েছিল। তা তিনি তো এখন স্বর্গে। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে আপনাকে তো স্বর্গে যেতে হবে। আমার কথায় সুরেনবাবু হেসে ফেললেন ও বললেন, 'এখন তো তুমি এখানে খাও-দাও, পরে মকর্দমার কথা হবে।' আমি বললুম, 'আপনি বলেন কি? আপনি আমাদের ওপর মকর্দমা চালাবেন আর আমি আপনাদের বাড়ীতে ভাত খাব। আমার এক সর্ত যে, আপনি যদি এখুনি মকর্দমা তুলে নিয়ে ভূপেনবাবুকে চিঠি লিখে দেন, তাহলে খাওয়া-দাওয়া তো করবই, তার ওপর সারাদিন এখানে থেকে সন্ধ্যের ট্রেনে বাড়ী ফিরবো।' আমার কথা শুনে সুরেনবাবুর মুখের যা ভাব হল, তা আজও আমার মনে আছে। তিনি তখুনি টেলিফোনে তাঁর Lawyer বি এল মিত্র মহাশয়কে বললেন যে, তিনি মকর্দমা তুলে নিতে চান। ওদিক থেকে কি জবাব এল আমি জানি না, কিন্তু সুরেনবাবু বললেন যে, মকর্দমা না তুললে তুমার এখানে জলগ্রহণ করবে না। আর দু-একটা কথার পরই সুরেনবাবু টেলিফোন ছেড়ে দিলেন এবং তখনই ভূপেনবাবুকে চিঠি লিখে দিলেন যে, তিনি মকর্দমা তুলে নিচ্ছেন। আর আমায় বললেন, 'এইবার তো খাবে?' আমি বললুম, 'নিশ্চয়। আর শুধু এখানে নয়, আমার ছোট কাকা বলেছেন যে, এই মকর্দমা মেটাতে পারলে বাড়ীতেও আমাকে ভোজ দেওয়া হবে।' একথা বলাই বাহুল্য যে, হাসান সুরাবর্দি'ও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন এবং তাঁর মোটর গাড়ীতেই আমি কলকাতায় ফিরে এলুম। অবশ্য আমার কাকার শ্রাদ্ধে তাঁকে আমি নেমন্তন্ন করতে ভুলিনি এবং যথাদিনে তিনি আমাদের পত্রিকা ভবনে এসে সেই শ্রাদ্ধসভায় যোগদান করেছিলেন। তাঁকে আমাদের বাড়ীতে পেয়ে আমার প্রাণের ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়ে আমি প্রণাম ও অভ্যর্থনা করেছিলুম। এই ব্যাপার এইভাবে মিটে যাবার জন্য আমাদের বাড়ীতে একদিন ষোড়শোপচারে আমাকে খাওয়ানো হয়েছিল। এমন মানুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। *

* আকাশবাণী, কলকাতা থেকে প্রচারিত।

।।২।।

অশরীরী প্রেতচ্ছায়ার মত ওৎ পেতে ছিল চাণক্য চাকলাদার।

মাথার ওপর ঘন পাতার চাঁদোয়া। অমাবস্যার রাত। তাই চাঁদের লুকোচুরিও নেই। নিবিড় অরণ্য ফিসফিস করছে। নিশীথ হাওয়ায়। দূরে-দূরে পাহাড়চূড়া দাঁড়িয়ে উন্নত শিরে। নিশ্চল, নিশ্চুপ। বুঝি রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষারত আঁধার-দানোরা।

ফ্যানটাসি হিরোর মতই বেশভূষা চাণক্য চাকলাদারের। টাইট ট্রাউজার্সের ওপর টাইট পুলওভার। মাথায় কানঢাকা চুলঢাকা উলের টুপী। আগাগোড়া মিশমিশে কালো। সাদার চিহ্ন নেই কোথাও।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন স্বয়ং অরণ্যদেব ফ্যানটাসি-কমিকের পৃষ্ঠা থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসেছে জ্যান্ত হয়ে। অরণ্যদেবের তুরঙ্গ? তাও আছে। জঙ্গলের

চাণক্য চাকলাদার বৃদ্ধ, অহিফেনসেবী, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার গল্পপ্রিয় ও ফ্যানটাসটিক ফিল্ম ভক্ত। ভদ্রলোকের দুঃখ, যেহেতু তিনি অহিফেনসেবী, সুতরাং তাঁর জীবন-কাহিনী নাকি আষাঢ়ে কাহিনী। বৃদ্ধ তাই আপনাদের রায় প্রার্থী। এ কাহিনী তাঁরই ডাইরীর অংশ...

তমিস্রার মধ্যে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে একটি নয়—দুটি ঘোড়া। গ্রীবা বেঁকিয়ে নাসারন্ধ্র স্ফীত করে তারাও প্রতীক্ষমান। কিন্তু কিসের?

আড়াই ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে চাণক্য সুযোগের মুহূর্তে। গাছগুড়ির সঙ্গে মিশে গিয়েছে তার কৃষ্ণ মূর্তি। শুধু ফসফরাস চোখের দীপ্তি অনির্বাণ মশালের মত প্রজ্জ্বলিত থেকেছে। বাকী প্রত্যঙ্গগুলো যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। ফ্যানটাসি-হিরো চাণক্য চাকলাদার যেন বনানীরই একটি অংগ। নিষ্প্রাণ, নিথর, নীরব।

তিরিশ গজ দূরে শ্লেট পাথরের ছাউনি। ইংরেজী 'টি' প্যাটার্ণের শিবির। 'টি'-এর সন্ধিস্থল রাস্তার দিকে। লেজটুকু বিস্তৃত পেছনের অরণ্য পর্যন্ত। শেষ প্রান্তে একটি দরজা। দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে বন্দুকধারী সেন্ট্রি। অনতিদূরে নিবিড় অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে চাণক্য। যেন, মানুষ-চিতাবাঘ। প্রতিটি মাংসপেশী টান-টান। কিন্তু আশ্চর্য স্থির স্নায়ুমণ্ডলী।

সেন্ট্রির সিগারেটের আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। পেণ্ডুলামের মত যাতায়াত করছে শাস্ত্রী। প্রতিবারে অ্যাবাউট টার্ন করার সময়ে রাইফেল নামানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চাণক্যর ফসফরাস-চক্ষু বাঘের চোখের মতই জ্বলছে অরণ্যের অন্ধকারে। লক্ষ্য তার স্থির। শাস্ত্রী যে দরজা আগলাচ্ছে,

তার চৌকাঠ পেরোলেই ভিতটিয়ে। সেখানে আছে আরও একজন বন্দুকধারী। ভেতরে লম্বা করিডর। দুপাশে গরাদ দেওয়া খাঁচা। একটি খাঁচার মধ্যে মুক্তির মুহূর্ত গুনছে হতভাগিনী ইসাবেলা।

ইসাবেলা! দস্যুরানী ইসাবেলা! পদ্মিনীর মত রূপ আর দেবীচৌধুরানীর মত সাহস নিয়েও ইসাবেলা চাণক্য চাকলাদারের বাহুর মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল শুধু একটি কারণে। চাণক্য চাকলাদার প্রয়োজন হলে যে জাদুকর ম্যানড্রেকের মত অলৌকিক ক্রিয়া দেখাতে পারে, ইসাবেলা তা দেখেছিল। চাণক্য যদিও জানে, ম্যাজিক দেখানো তার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। যাদুবিদ্যা তার অধীত বিদ্যা নয়। তার একমাত্র সম্বল দুরন্ত সাহস। মৃত্যু সামনে জেনেও অশরীরীর মত সে আবির্ভূত হয়েছিল এক মরণ ফাঁদের ঠিক কেন্দ্রস্থলে। ইসাবেলাকে শত্রুব্যূহের মধ্য থেকে তুলে নিয়ে উধাও হয়েছিল। ইসাবেলা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। ধরা দিয়েছিল চাণক্যর বাহুমধ্যে। কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

বনকুরঙ্গীর মতই মায়াবিনী ইসাবেলা আবার বিপদে পড়েছে। এবারেও তার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়েছে। অকুস্থল পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরের দুর্গম অঞ্চল। দূরে তুষারকিরীট—চীনের সীমান্ত।

নিউদিল্লীর ম্যানসনে সর্দার বন্দুক সিংহের দেওয়া চিরকুটে চোখ বুলিয়েই চাণক্য বুঝেছিল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। চাণক্য চাকলাদার কাদার ঘুঁটি নয় যে, যেদিকে নড়ানো যায়, সেই দিকেই নড়ে। কিন্তু এহেন তেরিয়া মানুষকেই কাজে লাগানোর জন্যে সর্দারজী যে সংবাদ উপহারস্বরূপ এনেছিলেন, তা সত্যই ভয়ংকর।

ইসাবেলা আজাদ কাশ্মীরের বনবাসী বাউণ্ডুলেদের হাতে পড়েছে। ভয়ংকর পুরুষ। এদের নীতি নেই। দেশ নেই। কুখ্যাত খুনে গুণ্ডার একটি দল ভারতের মাটি থেকে চম্পট দিয়ে আস্তানা নিয়েছে আজাদ কাশ্মীরের গহন অঞ্চলে। ইসাবেলাকে তারাই লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে নিছক ভোগের জন্য। নারী এদের কাছে পণ্য ছাড়া কিছুই নয়।

মূর্খ! চোয়ালের রেখা কঠিন হয়ে উঠল চাণক্য চাকলাদারের। আহাম্মক! আর পাঁচটা নারী লুণ্ঠনের মতই ইসাবেলাকে তারা নিয়ে গিয়েছে ধর্ষণ, বিক্রয় অথবা হত্যার জন্য। মূর্খরাও বোঝেনি সিংহের বিবর আক্রান্ত হলে পরিণাম কি ভয়ংকর হতে পারে!

ইসাবেলা অবলা নয়। তার গাত্রস্পর্শ করা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু একদল হোঁৎকামুখো বর্বরের হাতে প্রাণ টিঁকিয়ে রাখাও একা ইসাবেলার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই অনেক আয়োজন করতে হয়েছে চাণক্যকে। নয়াদিল্লীতে সর্দারজীর দেওয়া কাগজে ঠিকানা জানার পর দু'দিন কেটেছে। এই দু'দিনেই সীমান্ত অঞ্চলে পুরোনো সাগরেদদের সন্ধান করেছে চাণক্য। বিশ্বস্ত টাট্টু ঘোড়া হাত করেছে প্রহরীদের।

দুটি ঘোড়া নিয়ে যথাসময়ে হাজির হয়েছে ইসাবেলার বন্দীশিবিরে।

স্লেটপাথরের ছাউনি দেওয়া 'টি'-প্যাটার্নের শেডটা এককালে বোধহয় সেনানী শিবির ছিল। যে কোন কারণেই হোক, এখন তা পরিত্যক্ত। হানাদাররা ঘাঁটি নিয়েছে এই শিবিরেই। এখান থেকে ভারতসীমান্তে উপদ্রব সৃষ্টি করা নেহাত ছেলেখেলা।

বাঘের চোখের মতই চোখ জ্বলছে চাণক্য চাকলাদারের। এবার সময় হয়েছে। হিপ-পকেট থেকে একটা ছোট্ট বস্তু বার করল চাণক্য। অদ্ভুতদর্শন জিনিসটা শক্ত কাঠের তৈরি। যেন একটা থ্যাবড়ানো ডাম্বেল। হাতলটা খেঁটের মত হাতের মুঠোয় ধরা যায়। মুঠোর তলা থেকেই ব্যাঙের ছাতার মত চ্যাটালো কাঠ ছড়িয়ে গিয়েছে। নিরীহদর্শন ব্যাঙের ছাতার মত এই খেঁটের প্রকৃত নাম কংগো। চাণক্যের অতি-প্রিয় হাতিয়ার। নিঃশব্দে যে কোন প্রাণ পিঞ্জর শূন্য করতে অদ্বিতীয়।

সিগারেট টানতে টানতে প্রহরারত শান্ত্রী নতুন প্রিয়ার কথা ভাবছিল। চিন্তাটা বড় মধুর।

মেয়েটিকে দেখতে বেশ। চিমড়ে ছুঁড়ি নয়। দিব্যি ডাটো চেহারা। ডাগর চোখ। ঠোঁটামি নেই। লটঘটিতে অভ্যস্ত। মানে, নাগর নিয়ে মোচ্ছব করতে জানে।

পাহাড়ের কোলে ঐ যে গাঁও, ঐখানে লুঠতরাজে গিয়েছিল সবাই। রূপচাঁদ আর ভবকাছুঁড়ি—এই নিয়েই এদের কারবার।

ধুমসী ধুমড়ী মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকায় না। নজর ঘোরে শুধু সোমত্ত মেয়ের দিকে।

কিন্তু এ মেয়েটি যেন ধরা দেওয়ার জন্যেই তৈরি হয়েছিল। একগাল হেসে এগিয়ে এসেছিল। পিট্টান দেবার কোনো চেষ্টাই করেনি। তোর-মেরিও করেনি।

পাঁচ-পাঁচটা নওজোয়ানকে একাই চুমকুড়ি দিল ডাঁটো মেয়েটা। গুরু নিতম্ব দুলিয়ে এমন চলাচলি করল যে, জাঁহাবাজ পুরুষগুলো তো হতবাক। কে আগে ভালবাসবে, এ সমস্যারও সুরাহা করে দিল ধুমড়ী। একটা পয়সা নিয়ে টস করল। শাস্ত্রী বেচারীর কপালে শিকে ছিঁড়লো। টেমনীর মতই ওর কোমর জড়িয়ে মেয়েটা বনের দিকে গিয়েছিল। সেদিন যে আনন্দ হয়েছিল, তার তুলনা নেই। ফিক ফিক করে হাসতে লাগল শাস্ত্রী।

অ্যাবাউট টার্ন করল। করেই থমকে গেল। পায়ের কাছে কি-একটা চকচক করছে না? হেঁট হল শাস্ত্রী। তোবা! তোবা! এযে দামী আংটি! পাথর বসানো। হীরে নয়তো?

শাস্ত্রী হেঁট হওয়ার আগেই অরণ্যের অন্ধকার থেকে অরণ্যদেবের মত ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল চাণক্য চাকলাদার। মার্জারের মত লঘু চরণে এগিয়ে এসেছিল অনেকটা। হেঁট হয়ে শাস্ত্রী সিধে হবারও অবসর পেল না। যেন দমকা বাতাসে শুকনো পাতা উড়ে এল। নিমেষে হীরের জৌলুষমুগ্ধ শাস্ত্রীর ঠিক পেছনে আবির্ভূত হল চাণক্যর দীর্ঘ কৃশ কৃষ্ণমূর্তি। বাঁ-হাতে খামচে ধরল ঝাঁকড়-মাকড় চুল; ডান-হাতের কণ্গো নেমে এল নিষ্ঠুর বজ্রের মত। কানের ঠিক পেছনে কণ্গোর চ্যাটালো দিকটা আছড়ে পড়ল। টাঁ-ফোঁ করল না প্রহরী বেচারী। অবশ দেহটা ধড়াশ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল। রাইফেলটা শিথিলমুষ্টি থেকে ঠিকরে পড়ার আগেই লুফে নিল চাণক্য। সন্তর্পণে শুইয়ে দিল নিথর দেহের পাশে।

হিপ-পকেটের খাপে কণ্গো চালান হয়ে গেল। আর একটা হিপ-পকেট থেকে বেরুল অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে। পেন্সিলের আকারে সরু করে পাকানো দুটো তুলোর সলতে বার করল চাণক্য। আরকে ভিজোনো সলতে। মিঠে সৌরভের আঘ্রাণ নিল। তারপর অচৈতন্য শাস্ত্রীর নাসিকা-গহ্বরে ঠেসে ঢুকিয়ে দিল আরক-সিক্ত অ্যানেসথেটিক প্যাড। ভোর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। প্রহরীর ঘুম তখনও ভাঙবে কিনা সন্দেহ।

পা টিপে টিপে প্রবেশদ্বারের দিকে অগ্রসর হল চাণক্যর মিশমিশে মূর্তি। নিবিড় তমিস্রায় গা ঢেকে যেন একটা কালো প্যান্থার এগিয়ে চলল তৈজসপূর্ণ পিচ্ছিলতা নিয়ে।

চৌকাঠ। ভেতরে লণ্ঠন জ্বলছে। ওপাশের দরজার সামনে পা ছড়িয়ে বসে একজন রাইফেলধারী লুঠেরা। রক্তরাঙা চোখ। কাটখোট্টা চেহারা। লোকটা চৌকাঠের দিকে ফিরে বসে আছে। কণ্গোর কোৎকা হাঁকড়ানোর সময়ও পাওয়া যাবে না।

অতএব একটা অত্যন্ত ছোটলোকি প্যাঁচ ছাড়ল চাণক্য। জাপানী প্রথায় যার নাম জুডোর প্যাঁচ।

আচম্বিতে লংজাম্প দিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মাঝে আবির্ভূত হল চাণক্যর লিকলিকে মূর্তি। প্রেতচ্ছায়ার মত শূন্য-পথে মিশকালো মূর্তিকে অবতীর্ণ হতে দেখে আঁৎকে উঠল কাটখোট্টা প্রহরী। পরমুহূর্তেই হাত দিল কোলের রাইফেলে। কিন্তু তোলবারও সময় পেল না।

চাণক্যর ডান পাটা শূন্যেপথে অর্ধবৃত্ত রচনা করে ঘুরে এল—সবেগে আছড়ে পড়ল শাস্ত্রীর তলপেটের ঠিক নীচে।

'কোঁক' জাতীয় একটা অবরুদ্ধ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ বেরুল না বেচারীর গলা দিয়ে। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে গোড়ালীর লাথি ও-স্থানে পড়লে মানুষমাত্রই চোখে তিমলক্ষ সর্ষেফুল দর্শন করে তিন সেকেন্ডেই জ্ঞান হারায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

হেঁট হয়ে অবস্থাটা দেখে নিল চাণক্য। না। অ্যানেসথেটিক প্যাডের দরকার হবে না। বেচারীর ব্রহ্মতালু পর্যন্ত এখন অসাড়।

সিধে হয়ে দাঁড়াল চাণক্য। সামনেই লম্বা গলিপথ। দুপাশে ছোট ছোট কুঠরি। কোনোটির সামনে লোহার গরাদ, কোনোটিতে কাঠের। দেওয়ালের সঙ্গে লেপটে গিয়ে এগিয়ে চলল চাণক্য। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার গঙ্গাফড়িং লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

অদূরে একটা ঘরের সামনে আলো এসে পড়েছে। কথোপকথনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। টুকরো হাসি। টুকরো কথা। তাস খেলা হচ্ছে বোধহয়।

থমকে দাঁড়াল চাণক্য। ও একা। ওরা অনেক। ধাপড়ধাঁই প্যাঁচেও সুবিধে হবে না। এখানে প্রয়োজন অন্য দাওয়াই।

ডান উরুর সামনে চামড়ার খাপ থেকে দুটি বিচিত্র জিনিস বার করল চাণক্য। এক বিঘৎ লম্বা একটা পুঁচকে সিলিন্ডার। আর একটা অত্যন্ত ক্ষুদে গ্যাস-মুখোস। ক্লিপ দিয়ে গ্যাস-মুখোসটা নাকে লাগাল চাণক্য। পাতিখিলের পাইপ জুড়ে দিল সিলিন্ডারের মাথায়। বুকের কাছে ছোট পকেটে রইল সিলিন্ডার।

বাঁ উরুর সামনে চামড়ার খাপ থেকে বেরুল আর একটা অদ্ভুত বস্তু। দেখতে-শুনতে নুন-মরিচ রাখার প্লাস্টিক-পাত্রের মত দেখতে। ব্যাসের একাধিক ছোট ছোট...

বাঁ-হাতে নিরীহদর্শন প্লাস্টিক-পাত্র ধরে ডান-হাতে চামড়ার হোলস্টার থেকে নিকষকালো অটোমেটিক বার করল চাণক্য। নতুন মডেলের অটোমেটিক। এম-এ-বি ব্রেভোটি। নিঃশব্দে অগ্নিবর্ষণ করবে।

পরমুহূর্তেই দরজার ফ্রেমে আবির্ভূত হল চাণক্য। যেন একটা অতিকায় বন-বেড়াল। নিঃশব্দসঞ্চারে চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। হিমশীতল ক্রূর চোখদুটো কেবল জ্বল জ্বল করতে লাগল ফসফরাসের দীপ্তি নিয়ে।

ছোট ঘর। জানালায় চট টাঙানো। দড়ির আলনায় ঝুলছে কতকগুলো সার্ট। মাঝখানে একটা সস্তা কাঠের টেবিল। চারপাশে চারখানা চেয়ার। চেয়ারে উপবিষ্ট চারজনেই তন্ময় তাসের জুয়োয়। চারজনের চেহারাই মাদুর্গার অসুরের মত। কোমরে রিভলবার। কাঁধে টোটার বেল্ট। ঝাঁটার মত গোঁফ। রক্তচোখ।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড কেউ টের পায়নি চাণক্যর অস্তিত্ব। দোরগোড়ায় কালান্তক যমদূতের মত কৃষ্ণমূর্তিকে দেখতেও পায় নি। দরজার দিকে ফিরে যে বসেছিল, হঠাৎ শূন্যে হাত ছুঁড়ে সে অট্টহাসি হাসল। হাসি গলাতেই আটকে গেল উদ্যত ব্রেভোটির নলচে দেখে। সাপের চোখের মত শুধু চক-চক করতে লাগল কোটরাপ্রবিষ্ট প্রত্যঙ্গ দুটি—গলা দিয়ে আর শব্দ বেরুল না।

খাপছাড়া হাসির পর সহসা নৈঃশব্দের কারণ অন্বেষণ করতে চোখ তুলল বাকি তিনজন। সম্মোহিতের মত উপবিষ্ট প্রথম জনের দৃষ্টি অনুসরণ করে কাঠ হয়ে গেল সবাই। হাতের তাস হাতেই রইল।

হায়নার মত হাসল চাণক্য। এ হাসির অর্থ কাউকে বলে দিতে হয় না। প্রমাদ গুণল চার জুয়ারী।

চোস্ত উর্দু বলল শরীরী ভয়ংকর—'নড়বার চেষ্টা কর না। চালাকি মারতে যেও না। এ রিভলবারে আওয়াজ হয় না। গুলি ফসকায় না।'

চারজনেই যেন হিপনোটাইজড্।

চাণক্য দু'পা এগিয়ে এল ঘরের মধ্যে। রিভলবারের ইঙ্গিতে একজনকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করল। লম্বা ঠ্যাং দিয়ে চেয়ারটাকে সামান্য টেনে আনল। তারপর বাঁ-হাতের বিচিত্র প্লাস্টিক-বস্তুটা রাখল চেয়ারের ওপর। রেখেই ওপরের বোতামটা টিপে দিল।

হিস্ হিস্ শব্দ শোনা গেল। গ্যাস বেরুচ্ছে। সবুজ রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে প্লাস্টিক-পাত্রর মাথা দিয়ে।

চেয়ারে উপবিষ্ট একজন মুশকোর হাত ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরল কোমরের রিভল-বারের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ঝলসে উঠল চাণক্যর মুঠোয়। বুলেটটা আর্তনাদ করে টেবিলে লেগে ঠিকরে গেল।। ঝটিতি হাত সরিয়ে নিল গুঁফো।

সবুজ ধোঁয়া কুন্ডলি পাকিয়ে উঠছে চেয়ারের ওপর। সবচেয়ে কাছের দুজন ঝিমোতে লাগল। তারপর চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। তৃতীয়জন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। দণ্ডায়-মান চতুর্থজন সটান আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

বোতাম টিপে গ্যাস বন্ধ করল চাণক্য। ঘুম-গ্যাস পাত্র আবার চালান হয়ে গেল উরুর পকেটে। আবার বেরুলো অ্যালুমুনি-য়াম ডিবে আর আরকসিক্ত তুলোর সলতে। চারজনের নাসিকারন্ধ্রে অ্যানেসথেটিক প্যাড ঠেসে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফ্যানটাসি-হিরো চাণক্য। ওঠবার সময়ে পালের গোদার কোমর থেকে চাবির গোছা নিতে ভুলল না।

কালো গঙ্গাফড়িংয়ের মত লম্বা ঠ্যাং দাড়িয়ে আবার শুরু হল কারাগার পর্যবেক্ষণ।

*

মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল ইসাবেলা। সুন্দরী ইসাবেলা। মোহিনী ইসাবেলা।

একাকিনী শিকারে বেরিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে ইসাবেলা। আচম্বিতে জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। জালটা পাতা ছিল ঠিক মাথার ওপর। হাটুতে দড়ি লেগেছে। টান পড়তেই জাল মাথায় পড়েছে। তারপর এসেছে এই বর্বর-গুলো।

ইসাবেলা নারী বটে, কিন্তু দুর্বল নয়। চার-পাঁচজন পুরুষকে শুধু হাতে ঠেকিয়ে রাখার মন্ত্রগুপ্তি তার জানা আছে। যুযুৎসুর অনেকগুলি মোক্ষম প্যাঁচ চাণক্য চাকলাদার তাকে হাতে ধরিয়ে শিখিয়েছে। হাতে অস্ত্র থাকলে তো রক্ষে নেই। সাঁওতালি কায়দায় তীরধনুকের মারণবিদ্যা শিখেছে চাণক্যর হাতে। আধুনিক আগ্নে-য়াস্ত্র চালনা শিখেছে ইউরোপে। শৈশব থেকেই খুনজখম লুঠতরাজের মধ্যে মানুষ হয়েছে ইসাবেলা। লোহকঠিন স্নায়ু আর অপরিমেয় সাহস নিয়ে গঠন করেছিল নিজের দল।

দস্যুরানী ইসাবেলা এক সময়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল সারা ইউরোপে। সাগরের ঢেউয়ে নাচতে নাচতে জাহাজ লুঠ করেছে বোম্বেটের মত, পুলিশবাহিনীর নাকের ওপর দিয়ে হাসতে হাসতে ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে জাদুকর লুঠেরার মত।

বিস্ময়কর ছিল তার কৌশল। অভিনব ছিল তার উপস্থিত বুদ্ধি। রোমের একটি বিখ্যাত ব্যাংক লুঠ করতে গিয়ে পুলিশের বেড়াজালে পড়েছিল ইসাবেলা। বেরোবার একটি মাত্র পথে বন্দুক উঁচিয়ে বসেছিল প্রহরীর দল।

পালাবার কোনো পথ ছিল না। তবু পালিয়েছিল ইসাবেলা। আচম্বিতে বিবস্ত্রা হয়ে গিয়েছিল। স্ট্রীপটিজ নর্তকীর মত একে-একে নিক্ষেপ করেছিল অংগের প্রতিটি বস্ত্র। মায় প্যান্টি পর্যন্ত। স্তম্ভিত জনসাধারণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল ইসাবেলার ভেনাস-রূপ দেখে। যেন শ্বেত-পাথরে খোদাই করা অপরূপা নারীমূর্তি সহসা প্রাণবন্ত হয়েছিল প্রকাশ্য দিবা-লোকে। রূপসী বোম্বেটের নিখুঁত নাক-মুখ-চোখ তো বটেই, নিটোল বুক, গুরু-নিতম্ব এবং ক্ষীণ কটির রক্তমাতানো হিল্লোল অতি বড় সুন্দরীর তনুতেও এভাবে দেখা যায় না।

জীবন্ত প্রতিমার রূপসুধা নিয়ে সবাই যখন তন্ময়, চতুরা ইসাবেলা সেই অবসরে পুলিশ-বন্দুকের চোখের সামনে দিয়েই বাইরে পা দিয়েছিল এবং পরমুহূর্তে প্রতীক্ষমান মোটরে উঠে চম্পট দিয়েছিল।

জাদুকরী সেই ইসাবেলাই এখন বন্দিনী কয়েকজন নারী ব্যবসায়ী লুঠেরার হাতে।

শ্লেটপাথরের এই বন্দীশিবিরে কয়েকশ যুবতীকে দেখেছে ইসাবেলা। কেউ অর্ধ-নগ্ন, কেউ পুরো নগ্ন। বর্বরগুলোর কামানলে আহুতি দিতে হয়েছে প্রত্যেক-কেই। শুধু ইসাবেলা বাদে।

ইসাবেলা তাই বন্দিনী এবং একাকিনী। তার খাঁচায় আর কেউ নেই। ভাগ্য তার অনিশ্চিত। যে ক'জন যৌনবুভুক্ষু পশু এসেছিল, প্রত্যেকেই উচিত শিক্ষা নিয়ে ফিরেছে। সুতরাং ইসাবেলার আর রেহাই নেই।

নিজেকে নিঃসঙ্গ, বড় অসহায় বোধ হচ্ছিল ইসাবেলার। এ অনুভূতি ইদানীং তাকে পেয়ে বসেছে। চাণক্য তার দর্পচূর্ণ করেছে। একহারা ভিকভিকে ঐ মানুষটি কাছে না থাকলে অগ্নিশিখার মত জ্বলন্ত ইসাবেলা যেন নিবন্ত থাকে। চাণক্যর ছোঁয়া পেলে মুহূর্তে সে প্রজ্বলিত হয়। দুর্বার সাহস আর দুরন্ত উপস্থিত বুদ্ধি নিমেষে জাগ্রত হয়। ফিরে আসে অতীতের ইসাবেলা। হার্মাদ মেয়ে ইসাবেলা।

কারাগারের অন্ধকারে তাই মৃন্ময়-মূর্তির মত নীরবে, বসেছিল ইসাবেলা। হয়ত অদ্যই শেষ রজনী। হয়ত কাল ভোরের আলো ইসাবেলার অদৃষ্টে নেই।...

আজ রাতেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ইসাবেলার নিখুঁত সুন্দর তনু।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইসাবেলা।
এবং চমকে উঠল।

লোহার কুলুপে চাবি লাগানোর শব্দ। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি শুধু ছায়ামূর্তি। আপাদমস্তক মিশমিশে কালো। অসম্ভব ঢ্যাঙা। যেন একটা প্রেত-ছায়া। ছায়ামায়ার মধ্যেও চিনতে বিলম্ব হল না ইসাবেলার।

বিন্দুমাত্র ব্যগ্রতা দেখাল না হার্মাদ-রানী। কিন্তু যেন মহানিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষাদের নাগপাশ মুহূর্তে খসে পড়ল। যেন, চকিতে লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চারিত হল মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

নিকট অতীত দুঃস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হল সুদূরে। জাগ্রত হল ইসাবেলার সুপ্ত শক্তি। বারে বারে এই কাণ্ডই ঘটেছে। চাণক্য ইস্পাত আর ইসাবেলা চকমকি। স্ফুলিঙ্গর রোশনাই কেবল চাণক্যই জাগিয়েছে—আর কেউ নয়।

ধীরে-সুস্থে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল ইসাবেলা। শরীরী আতংকের মত ঐ যে দীর্ঘ কৃশ কৃষ্ণমূর্তি—ও বুঝি অপ্রত্যাশিত নয়—ওর আবির্ভাবের জন্যই বুঝি প্রহর গুনছিল কুহকিনী ইসাবেলা।

শব্দহীন পদক্ষেপে ঘরের মধ্যস্থলে পৌঁছোলো চাণক্য। আধো-অন্ধকারে বাঘের চোখের মত দপ দপ করতে লাগল জোড়া চক্ষু। পলকের জন্য স্থির রইল ইসাবেলার টানাটানা চোখের ওপর। ইসাবেলা ভাবলেশহীন। আবেগহীন। নির্বিকার। শক্তির ডায়নামো আবার চালু হয়ে গিয়েছে। তাই এই স্নায়ু-সংযম।

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। বুঝি বহুবার মহড়া হয়ে গিয়েছে। এরপর কি করণীয়, ইসাবেলা তা জানে। এ শুধু পুনরাভিনয়।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গলিপথে পা দিল দুজনে। ইসাবেলার হাতে নিজের অটোমেটিক ধরিয়ে দিল চাণক্য। চামড়ার বেল্ট থেকে একটা হিলহিলে ছুরিকা টেনে নিয়ে ফলাটাকে ধরল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর ফাঁকে। একরত্তি ঐ ছুরিকার ক্ষমতা ইসাবেলা জানে। দধীচির হাড় দিয়ে তৈরী বজ্রের মতই অমোঘ ঐ ইস্পাত ছুরিকা চাণক্যর হাতে যে কতখানি রক্তলোলুপ হতে পারে, ইসাবেলা তা দেখেছে, একাধিকবার।

পাশের গরাদে রক্তহীন কতকগুলি মুখ দেখা গেল। আতংকে অত্যাচারে ফ্যাকাশে কয়েকটি যুবতী আকুল নয়নে তাকিয়ে ওদের দিকে। চাণক্য জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ইসাবেলার দিকে। ঘাড় নেড়ে সায় দিল ইসাবেলা। চাণক্য বাঁ-হাতের চাবির গোছা ধরিয়ে দিল ওদের হাতে। অমনই দুজোড়া চোখে পড়ল তখনি। আদিম মানবীর মতই ওরা নিরাবরণা। সাপের মত বেণী দিয়ে লজ্জা ঢাকার বৃথা চেষ্টা।

চাণক্য চোখ ফিরিয়ে নিল। কলকাতার রাস্তাতেও এ দৃশ্য বহুবার দেখা গিয়েছে। নতুন কিছু নয়।

গলিপথের শেষ দেখা যাচ্ছে। সদর দরজা আর মাত্র ফুট পনেরো দূরে। বাইরে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ, অরণ্য আর পর্বত।

আচমকা একটা চীৎকার শোনা গেল। বিস্ময় আর হুঁশিয়ারি যেন ফেটে পড়ল সে চীৎকারে।

চাণক্য বুঝল। খোলাচত্বরে বেহুঁশ প্রহরীর দেহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

চকিতে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল একজন স্টেনগানধারী। দাঁড়িয়েই থ হয়ে গেল। দশফুট দূরে দাঁড়িয়ে অরণ্যের দানোর মত এক জ্বলন্তচক্ষু তালঢ্যাঙা মূর্তি। পাশেই সেই রায়বাঘিনী রূপসী মেমসাহেব।

স্টেনগানের নলচে দ্বিধাগ্রস্ত হল। কাকে তাগ করা যায়? ইসাবেলা অটোমেটিক তুলতেই স্টেনগান সেদিকে ঘুরল।

সিকিপকে চাণক্যর সার্কাস ঠিক তখনি দেখা গেল।

চোখের পলক ফেলবার আগেই মাটিতে সটান আছড়ে পড়ল চাণক্য। পড়তেই গড়িয়ে গেল। পরমুহূর্তে বকের ঠ্যাঙের একটা ঠ্যাঙ দিয়ে স্টেনগানধারীর দুপা হুকের মত বাঁধল। অপর পায়ের লাথি হাতুড়ির মত গিয়ে পড়ল জোড়াহাটুর ওপর।

গোড়াকাটা কলাগাছের মত ধড়াশ করে চিৎপাত হয়ে পড়ল প্রহরী। খুলিটা পাথরে লেগে চৌচির হয়ে গেল কিনা বোঝা গেল না। তবে একটা বিশ্রী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হয়ে গেল কোরীর দেহ।

কাঁধের ওপর ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার ওপর উল্টো ডিগবাজি খেয়ে চট করে খাড়া হয়ে দাঁড়াল চাণক্য। আশ্চর্য এই কৌশলটা বহু আয়াসেও রপ্ত করতে পারেনি ইসাবেলা।

ইস্পাত ছুরিকা তুলে নিয়ে বাইরে পা দিল চাণক্য। কেউ নেই। দূরে অরণ্যের অন্ধকার। মাথা নিচু করে জ্যামুক্ত তীরের মত ছুটল দুই মূর্তি।

পেছনে সোরগোল শোনা যাচ্ছে। বন্দিনীরা বেরিয়ে পড়েছে। কয়েকটা বন্দুক-নির্ঘোষও শোনা গেল।

অরণ্যের প্রান্ত এসে গেছে। গুঁড়িতে গুঁড়িতে সাদা সাগজ আঠা দিয়ে লাগানো। চাণক্যর কীর্তি। অন্ধকারে তাড়া খেয়েও পথ হারাবে না। সাদা কাগজের নিশানা দেখে ঘোড়া দুটির কাছে অনায়াসেই পৌঁছোনো যাবে।

পেছনের হট্টগোল বাড়ছে। বন্দী-শিবিরের ঘুম ভেঙে গেছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই কালো মেঘের মত ঘোড়াদুটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল দুই মূর্তি। অশ্বারূঢ় হল চোখের নিমেষে। শিক্ষিত তুরঙ্গর কণ্ঠ দিয়ে হ্রেষাধ্বনি তো দূরের কথা, নাসিকাধ্বনিও শোনা গেল না। প্যাডবাঁধা খুরের ওপর ছুটতে শুরু করল দূর সীমান্তর দিকে। প্যাডের কৃপায় অশ্রুত রইল অশ্বখুরধ্বনি।

দেখতে দেখতে পাহাড়ী পথে অদৃশ্য হল পাহাড়ী টাট্টু। যবনিকা পড়ল নিশীথ নাটকে। জাগ্রত হল ঝিঁঝির ঐকতান।

—ক্রমশঃ

একটি সোবিয়েত উপন্যাস

ভেরা পানোভা সোবিয়েত রাশিয়ার একজন প্রথম শ্রেণীর লেখিকা। ১৯০৫ খৃঃ রোসটভ্-অন-ডন-এ তাঁর জন্ম। সোবিয়েত রাশিয়ার জনপ্রিয় লেখক-লেখিকাদের তিনি একজন। অজস্র ছোটগল্প ও নাটক রচনা করে ভেরা পানোভা খ্যাতির অধিকারিণী হয়েছেন, এমন কি মিস পানোভার রচনাকে শেখভের সমগোত্রীয় এমন কথাও সমালোচকরা বলে থাকেন। মিস পানোভার রচনাবলী অন্ততঃ ত্রিশটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সেরিয়োঝা মিস পানোভার বহু প্রশংসিত উপন্যাসিকা। এই গ্রন্থটি সম্প্রতি ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে।

মাত্র সতের বছর বয়সে পানোভা স্থানীয় সংবাদপত্রে যোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামান্য কিছু পূর্বে তিনি ছোটগল্প ও নাটক রচনা সুরু করেন। ১৯৪৪ খৃঃ তিনি 'হসপিটাল-ট্রেনে' রিপোর্টারের কাজ করেন। এই অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তিনি যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন তার ইংরাজী অনুবাদের নাম 'ফেলো কম্প্যানিয়ন'। ১৯৪৬ খৃঃ প্রকাশিত এই উপন্যাসটি তাঁকে লেখিকা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

'সেরিয়োঝা' একটি ছোট ছেলের বড় হয়ে ওঠার কাহিনী, এ কাহিনী সর্বকালের। সেই ছোট ছেলেটির অভিজ্ঞতা, মানসিক প্রতিক্রিয়ার নিখুঁত ছবি—এই উপন্যাসে রূপায়িত। জীবনের ভালো ও মন্দ, কাছের ও দূরের মানুষ, দূরের জগৎ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বেড়ে চলে। ছেলেটি অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়েছিল। তার পর একদিন তাদের সংসারে আবির্ভূত হল 'বি-পিতা। এই বি-পিতা সহৃদয় মানুষ অথচ দৃঢ় চেতা। তাঁর সঙ্গে ক্রমে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে সেরিয়োঝা নামক সেই শিশুটির এবং সেই শিশু একদিন বি-পিতার সহযোগিতায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতিশয় সরল এবং সহজ ভঙ্গীতে ভেরা পানোভা এই কাহিনীটি বিধৃত করেছেন। সরসতা এবং স্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ এই উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম রস উপন্যাসটিকে আশ্চর্য শিল্পকর্মে পরিণত করেছে।

গ্রন্থের সূচনায় সেরিয়োঝা ভাবছে সবাই ওকে মেয়ের মত মনে করে, কি আশ্চর্য বোকা ওরা। মেয়েরা ত ফ্রক পরে, সেরিয়োঝা ত' কতকাল আগে ফ্রক পরা ছেড়েছে, তার কেমন গুল্‌তি আছে, কোনো মেয়ের কি গুল্‌তি আছে? সেরিয়োঝা তার সেই গুল্‌তি দিয়ে ঢিল ছুঁড়তে পারে। এটা স্যুরিক বানিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে সেরিয়োঝা স্যুরিককে সারা জীবন ধরে সঞ্চিত সুতোর খালি কাঠিম দিয়েছে।

আর ওর মাথার চুল, সে ত' কতবার ছাঁটা হয়েছে, কিন্তু ঠিক আগের মত হয়ে উঠেছে আবার। তবে, ও পুষিয়ে নিয়েছে। সবাই বলে ও নাকি বয়সের অনুপাতে ভারী চতুর। যে কোনো বই ওর কাছে দু-তিনবার পড়ে শোনালে সে আগাগোড়া মুখস্ত বলতে পারে। নিজের অক্ষর পরিচয় হয়েছে, তবে নিজে নিজে পড়ে শিখতে অনেক সময় লাগে। সমস্ত বই ক্রেয়ন বা রঙীন পেনসিল দিয়ে বিচিত্র করে রেখেছে সেরিয়োঝা, সে যেমন বুঝেছে যেখানে যে রং ভালো লাগে সেই রং দিয়েছে। বই পড়তে ভালোবাসে, তবে বই-এর সব কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কেন না জন্তুরা সত্যি কথা বলতে পারে না, উড়ন্ত কার্পেট সত্যই ত' উড়তে পারে না—ইঞ্জিন কোথায়, এ সব না জানাটাই বোকামি।

তা ছাড়া কি করেই বা গল্প বিশ্বাস করবে, একটা ডাইনির গল্প পড়ে শোনানো হল, তার পর কিনা সবাই বলে—না না, সত্যি ডাইনি বলে কোনো কিছু নেই সেরিয়োঝা।

একটা কাঠুরে তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে হারিয়ে যায়, হারিয়ে যাওয়ার জন্যই গিয়েছিল। আর বাড়ি ফেরেনি। তাদের নাকি বুড়ো আংলা শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে ছিল। এ সব বই যে কেউ পড়িয়ে শোনাক সেরিয়োঝা তা চায় না।

সেরিয়োঝার কাছে থাকে তার মামণি, পাসা মাসি আর লুকিয়ানিচ। বাড়িতে তিনটে ঘর সেরিয়োঝা ও মা মণি একটা ঘরে শোয়, আরেকটায় পাসা মাসি আর লুকিয়ানিচ, আরেকটা ঘর ডাইনিং রুম হিসাবে ব্যবহার হয়। লোকে বলে এটা ছোট শহর সেরিয়োঝা ও তার বন্ধুরা কিন্তু জানে, এটা ভুল কথা। কারণ শহরে জলের স্তম্ভ আছে, মনুমেন্ট আছে। সিনেমা আছে। একদিন মা ডেকে বলেন—সেরিয়োঝা, তুমি জানো, তোমার একজন বাবা আসছেন। সেরিয়োঝা ব্যাপারটি ঠিক বোঝে না—কোনো কিছু ভাবেনি কোনোদিন এ বিষয়। কিছু ছেলেমেয়ের বাবা আছেন, অনেকের আবার নেই। সেরিয়োঝার বাবা যুদ্ধে নিহত, তাই তার বাবা নেই। সে তাঁর ফটো দেখেছে। মাঝে মাঝে মা ছবিটায় চুমা খান ওকেও চুমা খেতে বলেন। মা বলেন—বাবা না থাকা খারাপ, তাই না সেরিয়োঝা।

অনেক কষ্টে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে সেরিয়োঝা বলে—হ্যাঁ-তা-ই। সত্যি সত্যি ও কিছু বোঝে না, মা চান তাই ও হ্যাঁ বলল। সুতরাং মনে প্রশ্ন জাগল—বাবা চাই-না-বাবা চাই না। টিমোথিন একদিন লরিতে চড়িয়েছিল পাড়ার সব ছেলেকে সবাই পিছনে বসল, কিন্তু সুরিক বসলো একেবারে ড্রাইভারের পাশে। সবারের হিংসা হলেও কেউ কিছু বলতে পারে না, কারণ টিমোথিন সুরিকের বাবা। তবে দুষ্টুমি করলে আবার টিমোথিন সুরিককে বেশ

[illegible]র মেয়ে। যাই হোক—হয়ত একটা বাবা [illegible] ভালোই।

করসটেলেভ যেদিন এলেন সেদিন সেরিয়োঝাকে তিনি কয়েকবার চুমা খেলেন। সেরিয়োঝা ভাবে এখন ত আমার বাবা হয়েছেন, তাই বোধহয় এত চুমা খাচ্ছেন। তিনি সুটকেস থেকে একটা মা-র ফটো নিয়ে সেটি [illegible] করে দেয়ালে পেরেক পুঁতে টাঙ্গালেন। মা এসে বললেন—এ আবার কেন, আমি ত' এখন সব সময় তোমার কাছেই থাকছি।

করসটেলেভ ওর হাত দুটি ধরে কাছে টেনে আনলেন তারপর সেরিয়োঝার দিকে নজর পড়ায় থেমে গিয়ে বললেন—তারপর, সেরিয়োঝা এখন থেকে তোমাদের কাছেই থাকবো, তোমার আপত্তি নেই ত'?

সেরিয়োঝা প্রশ্ন করে—তুমি বরাবর থাকবে। তুমি আমাকে মারবে ত'? যদি দুষ্টুমি করি।

না-না. মারব কেন দুষ্টামি করলে সে [illegible] হয় একটা কিছু করা যাবে। পরে আমরা বোঝাপড়া করব।

সেরিয়োঝা বলে—আমার একটা বাই সিকল চাই কিন্তু। রবিবার হতে কি অনেক দেরী।

করসটেলেভ বললেন—না তেমন দেরী নয়, আর ক' দিন পরে।

রাতের আহারে বসেছিল তিনজন। সেরিয়োঝা, মামণি আব করসটেলেভ। পাসা মাসিমা আর লুকিয়ানিচ অন্য কোথায় গেছেন। সেরিয়োঝার ঘুম পাচ্ছিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতে সেরিয়োঝা যে কোথায় শুয়ে আছে স্থির করতে পারে না। এ ঘরে তিনটের জায়গায় দুটি জানলা। জানলার পরদাগুলো অন্যরকম। তাহলে এটা পাসা মাসিমার ঘর। খোলা জানালা দিয়ে প্রভাতী রোদ গাছের মাথায় পড়েছে দেখা যাচ্ছে। উঠে যাচ্ছে। উঠে দরজা খোলার চেষ্টা করল. দরজা বন্ধ, খুলল না। ওর ইচ্ছা হল এখন ওর খেলাঘরের কোদালটা টেনে নিয়ে গাছ পুঁতে আসে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে সে চেঁচায়—মা ও মা মণি।

দরজা বন্ধ। চারিদিক স্তব্ধ। ও গলা ছেড়ে চেঁচায়—মা ও মা, মাগো। পাসা মাসিমা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসে ঠান্ডা করে দিয়ে বলে—ছিঃ ছিঃ একি! তুমি কি আর ছোট্ট আছো যে এভাবে চেঁচায়! মা মণি ঘুমুচ্ছেন, তাঁকে ঘুমুতে দাও, এমন চেঁচাও কেন?

উত্তেজিতভাবে সেরিয়োঝা বলে—আমার কোদালটা কোথায়। কোদাল চাই।

—বেশ ত' পাবে—কোদাল ত' আর পালাচ্ছে না। এই নাও তোমার গুলতি এটা নিয়ে খেলা করোগে যাও। তবে তার আগে ভদ্দর লোকের মত মুখটা ধুয়ে নাও।'

সহৃদয় এবং বিচার সম্মত যুক্তিপূর্ণ কথায় সেরিয়োঝা চিরদিন শান্ত হয়েছে। সে মাসির কাছে মুখ ধুয়ে এক মগ দুধ পান করে। গুলতি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

গ্রন্থ শেষে ওরা চলে যাচ্ছে। করসটেলেভ আর মা মণি চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে মা মণি—সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। এখানে ওখানে বসছেন, কিছুক্ষণ নীরব থাকছেন। এইটাই রুশদেশের প্রাচীন লোকাচার। মা মণি পাসা মাসিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলসেন—সেরিয়োঝাকে দেখো।

সেরিয়োঝার কাছে সব কেমন অপরিচিত ঠেকছে। এই উঠানটা যেন ওদের বাড়ির উঠান নয়। এই সব ছেলেদের সঙ্গে ও যেন কখনও খেলা করেনি। ও আজ পরিত্যক্ত।

লরী ছাড়ল। টিমোখিন লরীতে উঠে বসল। সেরিয়োঝা লক্ষ্মী হয়ে থাকার সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলে তুষারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। নিঃশব্দ কান্না।

সহসা করসটেলেভ লরী থামালেন। বললেন—সেরিয়োঝা তুমি তোমার জিনিষপত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলে এসো। তুমিও আমাদের সঙ্গী। এসো, তাড়াতাড়ি এসো।

সবাই তাকে বলল—একি! এটা কি করছ। পাসা মাসিমা বললেন—ও যে মরে যাবে ওখানে ও কি বাঁচবে?

করসটেলেভ বললেন—রাবিস। সে দায়িত্ব আমার। এসো এসো সেরিয়োঝা!

এই বলে দৌড়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। সেরিয়োঝা প্রথমটা বুঝতে পারেনি। বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে ভয় হয়। বুকটা কেমন করছে, ধুক্ ধুক্ করছে—

দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে ওর পোষা বাঁদরটা নিল, আরো কিছু সেই সঙ্গে। তবু ভয় হয়, হয় করসটেলেভ এখনই মত পরিবর্তন করবেন। সে আবার এলে করসটেলেভের কাছে, মা এবং মাসির প্ররোচনায় তাঁর মত পরিবর্তন হতে কতক্ষণ!

সে বেরিয়ে এল। করসটেলেভ বললেন—কই, চলে এসো তাড়াতাড়ি।

সেরিয়োঝার জিনিষপত্র সবাই মিলে একত্রিত করল।

তারপর লরীতে উঠে বসল। ড্রাইভারের পাশে একটু ভীড় বেশী। চারজন বসেছেন। ভেড়ার চামড়ার গন্ধ। টিমোখিন ধূমপান করছে। সেরিয়োঝা কাসছে।

শেষ মুহূর্তে সেরিয়োঝা ভাবছে—আমরা চলেছি-চলেছি। টিমোখিন নিয়ে চলেছে। আর পিছনে অনেক উঁচুতে বসে আছেন করসটেলেভ। উনি আমাদেব ভালোবাসেন। উনি দায়িত্ব নিয়েছেন। উনি বাইরে তুষারে বসে আছেন। কিন্তু আমাদের বসিয়েছেন ভিতরে স্বস্তিতে ও শান্তিতে। ওপরে স্বর্গধাম আমরা সবাই চলেছি হলমো গোরীতে চলেছি। টিমোখিনের লরীর হর্ণ বাজছে, আর তুষারঝড় সেরিয়োঝার গায়ে এসে লাগছে।

এইখানেই উপন্যাসের যবনিকা। অনন্ত কালের একটি খন্ড চিত্র। চলমান জীবনের চলচ্চিত্র এই উপন্যাস।

—[illegible]

TIME WALKED—By VERA PANOVA. Ppblished by Collins Ltd (London) : 30 Shikings.

সাহিত্যের খবর

এ বছরের বাংলা সাহিত্য পুরস্কার।। প্রতি বছরই বাংলা দেশের কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র এবং প্রকাশন সংস্থা কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে কয়েকটি পুরস্কারে সম্মানিত করে থাকেন। এ বছর যাঁরা সম্মানিত হবেন, তাঁদের নাম সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই একটি অনুষ্ঠানে এদের এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

অমৃতবাজার, যুগান্তর ও অমৃত, পত্রিকার পক্ষ থেকে 'শিশিরকুমার' ও মতিলাল পুরস্কার দুটি প্রদান করা হয়ে থাকে। উভয় পুরস্কারেরই সম্মানমূল্য এক হাজার টাকা। এবারের শিশিরকুমার পুরস্কার লাভ করেছেন কবি নরেন্দ্র দেব। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। মতিলাল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন প্রখ্যাত লেখক মণীন্দ্রলাল বসু। এই পুরস্কারটি সাধারণত গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিকদের দেওয়া হয়।

আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে যে দুটি পুরস্কার দেওয়া হয়, তার নাম প্রফুল্ল স্মৃতি ও সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার। এবার প্রফুল্ল স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ। 'সুরেশ স্মৃতি' পুরস্কার লাভ করেছেন প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য। এই পুরস্কার দুটিরও সম্মান মূল্য এক হাজার টাকা করে।

শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'সুধীরচন্দ্র সরকার' পুরস্কার প্রদান করা হয় একজন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিককে। 'মৌচাক' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই পুরস্কার এবার পেয়েছেন বিশিষ্ট কবি ও শিশু সাহিত্যিক কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই পুরস্কারের সম্মানমূল্য পাঁচ শত টাকা।

এ বছর বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড' আর একটি নতুন পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। বাংলা দেশের কোন

বিশিষ্ট লেখককে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। পুরস্কারটির নাম 'জয় বাংলা'। প্রথম বছরে এই পুরস্কার লাভ করেছেন বিশিষ্ট লেখক শহীদুল্লা কাইসার, তাঁর 'সংশপ্তক' গ্রন্থটির জন্য।

প্রতি বছর এই একই সময়ে 'উল্টোরথ' পুরস্কারে একজন কবিকে সম্মানিত করা হত। এ বছর এখনও এই পুরস্কার প্রাপ্ত কোন কবির নাম ঘোষিত হয়নি।

রবীন্দ্র পুরস্কার।। বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ তাঁর 'মহাকাশ পরিচয়' গ্রন্থটির জন্য। এই পুরস্কারের নগদ মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি।। কলকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ পাকিস্থানী জঙ্গী বাহিনী পাবনা শহর দখলে উল্লসিত হয়ে পদ্মার তীরে শিলাইদহে বোমা বর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়িটি ধ্বংস করে দেয়। এই কাছারিবাড়িটি স্বাধীন বাংলাদেশের ছাত্র ও জনসমাজের কাছে তীর্থভূমিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। অতীতেও পাকিস্থানের সামরিক শাসক বার বার রবীন্দ্রনাথকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ বার বার বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছে রবীন্দ্রনাথকে। এবারও তারা তা প্রমাণ করবে। বোমার আঘাতে এই স্মৃতি ভেঙ্গে ফেললেও বাংলাদেশের সাত কোটি বাঙ্গালির মন থেকে তা কখনও মুছে ফেলা যাবে না।

করুণানিধি বছরের শ্রেষ্ঠ তামিল লেখক।। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম করুণানিধি এ বছরের শ্রেষ্ঠ তামিল লেখক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৭ এপ্রিল তামিল লেখক সম্মেলনের কার্যকরী সমিতি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আগামী জুন মাসে তামিল লেখক সঙ্ঘের প্রকাশ্য সম্মেলনে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রী জি পাম্রেরশিলভম এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে এই পুরস্কার প্রদান করবেন বলে জানা গেছে। তামিল সাহিত্যে শ্রীকরুণানিধির অবদান নিতান্ত স্বল্প নয়। গল্প, কবিতা এবং উপন্যাসের জগতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তামিল ভাষায় তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক থিয়েটার দিবসে পাবলো নেরুদার বাণী।। আন্তর্জাতিক থিয়েটার দিবসের প্রথম পরিকল্পনা হয় হেলসিঙ্কিতে ১৯৫৯ সালে। তখন থেকেই প্রতি বৎসর ২৭ মার্চ দিবসটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক থিয়েটার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৭০টি দেশ এই দিবস পালন করে থাকেন। এই উপলক্ষে প্রতি বছরই একজন বিখ্যাত লেখক একটি বাণী প্রচার করে থাকেন। যে সব দেশে এই উৎসব পালন করা হয়, সেই সব দেশে এই বাণীর অনুবাদ সংবাদপত্র বা রেডিওয়োর মারফৎ প্রচার করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত যে সব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক এই দিবসে বাণী দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন আর্থার মিলার, জাঁ লুই ব্যারেট, জাঁ ককতো পিটার ব্রুক প্রমুখ। এবার বাণী প্রচার করেছেন ল্যাটিন আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি পাবলো নেরুদা। তাঁর বাণী থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

> I saw a play of Arthur Miller's The Price, some where, in Montevideo or Caracas, I liked it but it hurt : a kind of hand, unbending chekov, without a smile. Leaving the Theatre, I left it too, wanting to forget its truths and bitterness ....
> Our times, I think, oscillate ostrich egg through which the theatre has broken, the rest of us wait expectantly in our seats, from the first row to the last, for the new fledgling to take wing and fly.
>
> Poetry is my daily bread : a poet only of chile, I am near to each of you and distant, men and women of the world theatre.

—অর্ণব

নতুন বই

মিশরের মরুদুর্গ নাসের—প্রফুল্ল চন্দ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

নাসের সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এশিয়া-আফ্রিকার চরম রাজনৈতিক সংকট মুহূর্তকালে। অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও, মিশরের সামরিক বাহিনীতে অল্প বয়স থেকেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কুখ্যাত সম্রাট ফারুকের অপসারণে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা স্বাধীনতা-সংগ্রামী মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উপাদান হয়ে আছে। রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের পর আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বার বার তাঁকে বিব্রত করেছে। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স-এর চরম প্রতিকূলতা তাঁকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। তারপর ইস্রাইলের প্রতিষ্ঠা এবং মার্কিন সাহায্যপুষ্ট এই শিশুরাষ্ট্রের আগ্রাসন নীতি, নাসেরের আরব ঐক্যের নীতি এবং আরব রাষ্ট্রগুলির পুনর্জাগরণের স্বপ্নকে বারবার বিনষ্ট করেছে। আরব রাষ্ট্রগুলির রক্ষণশীল নীতি সমগ্র আরব জাতিকে পুরাতন চিন্তাধারার পঙ্কে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে রেখেছে—বারবার আঘাত খেয়ে নাসের এ-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তু আরবদের পুনর্বাসনও তাঁর কাছে একটি মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্যালেস্টাইন গেরিলা ও জর্ডনের মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ বন্ধ করেছিলেন নাসের। কিন্তু অকালমৃত্যু এসে নাসেরকে ছিনিয়ে নিল—সেই সঙ্গে আরব ঐক্যের ভিত্তিমূলে যেন করে গেল চরম কুঠারাঘাত।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ একজন প্রবীণ ও বিদগ্ধ সাংবাদিক। দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়েছেন। বহু আরব নেতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়েছিল এক সময়। নাসেরের ব্যক্তিগত সাহচর্য এবং আরব রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সংযোগ তাঁর বর্তমান গ্রন্থখানিকে বহু উপাদান সমৃদ্ধ করেছে। নাসের ঘোরতর জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ধর্মীয় চিন্তায় প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের দিকে কেন ঝুঁকেছিলেন, নৈপুণ্যের সঙ্গে শ্রীচন্দ তা বিশ্লেষণ করেছেন। নাসেরের জীবন এবং কর্মপ্রবাহ দীর্ঘ না হলেও, তাঁর জীবন যে কতখানি রোমাঞ্চকর, বইখানি থেকে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্ব-রাজনীতির সমকালীন যুগের দলিল হিসাবেও বইখানির মূল্য যথেষ্ট। এর প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বাঁশপাহাড়ী—অ্যাকাডেমী অব ফোকলোর। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

অ্যাকাডেমী অব ফোকলোরের গ্রাম বাংলা সমীক্ষা পর্যায়ে প্রকাশিত প্রথম পুস্তিকা মেদিনীপুর জেলার 'বাঁশপাহাড়ী'। বাঁশপাহাড়ীর অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, বনসম্পদ, বন্য প্রাণী, গ্রাম-নাম, পথ-ঘাট, যানবাহন, ভূমি বন্টন, জনবিন্যাস, পেশা, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাকাটা, কুটির শিল্প, শিল্পকলা, আর্থিক অবস্থা, ঘর-বাড়ী, খাওয়া-দাওয়া, নেশা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পশু-পাখি পালন, নানা প্রতিষ্ঠান, বিনোদন, ধর্মমত, দেব-দেবীর থান, পুজো-পার্বণ, জীবনের নানা আচার, ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সম্পাদক : দেবব্রত চক্রবর্তী। সমীক্ষক দলে আছেন দুলাল চৌধুরী, দেবব্রত চক্রবর্তী, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, তুলিকা মজুমদার, জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরী, বিমল গোস্বামী এবং অজয় দে। অ্যাকাডেমী অফ ফোকলোরের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ হবে।

সারি (ভাষা শহীদস্মরণ সংখ্যা)—সম্পাদক প্রশান্ত রায়।। ২৮বি সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা ৬।। দশ পয়সা।।

ঠিক পত্রিকা বলা যায় না। আসলে এটি একটি বুলেটিন। দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে প্রশান্ত রায় ভাষা আন্দোলনে পূর্ববাংলার মানুষের ভূমিকার কথা স্মরণ করে প্রশ্ন করেছেন : ওপারে সাত কোটি বাঙালী যখন মুজিবরের ডাকে উত্তাল, তখন এপারে তার প্রতিধ্বনি কোথায়? মুদ্রিত একটি কবিতার কয়েকটি লাইন : 'মুক্তি স্নান সেরে পূবী ওঠে। পশ্চিমকে ডাকে।—বাঁধ ভেঙেছে। এবার কে কাকে রাখে। এল বিজয় উল্লাসে।'

দুই ঠাকুরের পুনর্বিচার ও অন্যান্য

সভা-সমিতিতে তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না। বোধহয়, হৈ-চৈ বিশেষ পছন্দ করেন না। কথা বলেন সামান্য ভারী গলায়। সহজ, সরল, অকৃত্রিম কণ্ঠস্বর। কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। মুখমণ্ডল সামান্য গোলাকার। গায়ের রঙ ফর্সা। উচ্চতায় মধ্যম স্বাভাবিক বাঙালীর মতোই।

বয়স জিজ্ঞেস করিনি। চেহারা দেখে অনুমান করাও কঠিন।

শুনেছি, ভিন্ন ভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করলে তিনি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহপাঠী। এক ক্লাস নিচুতে পড়তেন বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন এক বছরের সিনিয়ার। অর্থাৎ পঞ্জিকামতে ষাটোত্তীর্ণ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের নামী অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর কথা বলছি। দীপ্তিময় উজ্জ্বল একটি মানুষ। প্রায় সব সময়েই কর্মব্যস্ত। বলেন, 'অলসভাবে থাকা আমার স্বভাব নয়, থাকতে পারি না।' বেশীর ভাগ সময়টাই তিনি কাটিয়েছেন অধ্যয়নে ও অনুশীলনে। তাঁর ভাষায়: হয় পড়ি, না হয় লিখি।'

দীর্ঘকাল তিনি কাটিয়েছেন দেশের বাইরে, বিদেশে। চোস্ত ইংরেজী বলিয়ে মানুষ। কিন্তু মাতৃভাষার উচ্চারণে পূর্ব-বাংলার টানটা বজায় রেখেছেন পুরোপুরি। শুনতে এতটুকু খারাপ লাগে না। চলিত বাংলার ক্রিয়াপদ ও অন্যান্য শব্দগুলি উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য পায়।

বলেন: 'আমি ঢাকার মানুষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করিনি বলে গর্ববোধ করি।'

বোধহয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল, গতিপ্রকৃতি, পড়াশোনার মান ও গবেষণার ধরণে-ধারণে তেমন খুশি নন। বিশেষত, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে নানা কারণেই অতৃপ্ত। দীর্ঘকাল ছাত্র পড়িয়ে ও গবেষণার কাজ পরিচালনা করে এসেছেন, ভালো শিক্ষক হলেই ভালো পরামর্শদাতা হওয়া যায় না।

অতি-সাম্প্রতিক ইংরেজী-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অত্যন্ত গভীর। বিশেষ করে, সমালোচনামূলক প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের তিনি নিয়মিত পাঠক। বিদেশী কোনো নতুন বই এলেই তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন।

একদিন ছুটির ভোরে গিয়েছিলাম তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়ীতে। উদ্দেশ্য একটা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সেদিকে আমল না দিয়েই তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর পড়ার ঘরে। চারদিকে বই ঠাসা। বললেন: 'এককালে কবিতা লিখতাম, এখনো লিখি।'

এবং পরে অসঙ্কোচ আত্মসমালোচনা করে বললেন: 'তবে কবিতা লিখে তেমন কিছু হবে না—একথা আমি টের পেয়েছিলাম অনেক আগেই। সেজন্যেই কবিতা ছাপাবার জন্যে কখনো ব্যস্ত হইনি। নিয়মিত কবিতা লিখলেও আমি একজন বড়জোর মাইনর পোয়েট হয়েই থাকতাম।'

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর কথা শুনে। প্রকৃত সমালোচকের তো এমনি নির্মম হবারই কথা—এমনি নিরপেক্ষ এবং উদাসীন। কেননা, তাঁর ভূমিকা অনেকটা বিচারকের মতো। অমলেন্দুবাবু বিশ্বাস করেন, সমালোচকের নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিই সাহিত্যবিচারের সঠিক মানদণ্ড। তাঁর ভাষায়: 'আমি কখনো কারো মুখ চেয়ে কিছু লিখি না।'

মনে হয়, গতানুগতিক সমালোচনার পদ্ধতিতে তিনি সন্তুষ্ট নন। এবং প্রচলিত অ্যাকাডেমিক আলোচনায় বীতস্পৃহ। কেননা, সৃজনশীল সাহিত্যিকের অন্তরতম অভিপ্রায়কে আবিষ্কার করাই হলো প্রকৃত সমালোচকের কাজ।

সাহিত্যালোক

গত জানুয়ারী মাসে অমলেন্দুবাবুর দশটি প্রবন্ধের একটি সংকলন বেরিয়েছে—'সাহিত্যলোক' নামে। আগাগোড়া লাইনো হরফে ছাপা। দু-রঙের প্রচ্ছদ—মার্জিত এবং রুচিসম্মত। প্রকাশক: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। দাম দশ টাকা?—মনে হয় পৃষ্ঠা-সংখ্যার তুলনায় কিছুটা বেশী।

দুই ঠাকুরের (রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ) সাহিত্যকীর্তির, অনতি-আলোচিত কয়েকটি দিক নিয়েই লেখা হয়েছে প্রবন্ধগুলি। এবং বেশীর ভাগ প্রবন্ধই সম্পাদকের তাগিদে কিংবা সাময়িক কোনো উপলক্ষে লেখা। এসম্পর্কে মন্তব্য করার আগে প্রবন্ধগুলি প্রথম কোথায় বেরিয়েছিল, তা পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়ে রাখা দরকার। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও সুস্পষ্ট একটি ধারণা পেতে সকলের সুবিধা হবে।

প্রথম প্রবন্ধ।। 'সৃষ্টির ধ্বনির মন্দ্র: রবীন্দ্রনাথের বাক-প্রতিমা' — বেরিয়েছিল পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ'-এর প্রথম খণ্ডে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।। 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বাক-প্রতিমা' ছাপা হয়েছিল 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়।

তৃতীয় প্রবন্ধ।। 'স্বর্ণচক্র জনতা সংঘ' —বেরিয়েছিল 'উত্তরসূরীর' রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী সংখ্যায়।

চতুর্থ প্রবন্ধ।। 'হে কালবৈশাখী'—'পূর্বপত্রে' প্রকাশিত।

পঞ্চম প্রবন্ধ।। 'নিরাভরণ কাব্য'। লেখা হয়েছিল রবীন্দ্র শতবর্ষ উপলক্ষে 'সংহিতা' পত্রিকায়।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।। 'হৃদয়ের পত্রপুট'—বেরিয়েছিল দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ'-এ।

সপ্তম ও অষ্টম প্রবন্ধদুটি যথাক্রমে 'লেখক অবনীন্দ্রনাথ' ও 'কথক অবনীন্দ্রনাথ'। ছাপা হয়েছিল যথাক্রমে 'চতুরঙ্গ' ও 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য়। আয়তনে দুটো প্রবন্ধই দীর্ঘ। নবম এবং দশম প্রবন্ধ—'দুটি রিভিউ'। দুটোই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সংক্রান্ত সংকলনের সমালোচনা।

সচেতন পাঠক নিশ্চয় এই সূচী দেখেই অনুমান করতে পারছেন, সংকলনটির দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং বিষয় প্রায় অনালোচিত কয়েকটি দিক। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইমেজের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য নিয়ে এর আগে এমন পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবত আর কেউ করেননি।

আর অবনীন্দ্রনাথ?

বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে জানেন শিল্পী হিসেবে। লেখক ও কথক অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় এখনো তেমন স্পষ্ট নয়। অথচ বাংলা গদ্যের কুশলী রূপকার হিসেবে তাঁর সাফল্যের কথা ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। অমলেন্দুবাবু সেই জাদুকরের মনোজগৎ ও চিত্রশালার গূঢ় রহস্যটার আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন প্রবন্ধদুটি লিখে। বাংলাভাষায় এমন সাবজেকটিভ আলোচনা খুব কমই হয়েছে।

অমলেন্দু বসুর সঙ্গে আলোচনা

পাঠকের কৌতূহল সাধারণত সোজাপথে চলে না। জানা কথাকে আরেকবার জেনে নিতে ইচ্ছে করে, অজানা তথ্যকে নতুন করে জানার আগ্রহ বাড়ে। এবং জানা-অজানার মধ্যবর্তী সংশয়কে যাচিয়ে নিতে ইচ্ছে করে বারবার।

অমলেন্দুবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের জীবনের এত বিচিত্র দিক থাকতে, আপনি তাঁর বাক-প্রতিমা নিয়েই

শুধু এতগুলো প্রবন্ধ লিখলেন কেন? ইমেজের নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

—রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকেই অনেক লেখা লিখেছেন। বেশীর ভাগই অ্যাকাডেমিক। আমি এভাবে লেখা পছন্দ করি না। তাছাড়া, বহির্জীবনের চাইতে অন্তর্জীবনের রহস্যময়তার দিকেই আমার ঝোঁক। কবিতার বিচার করতে হলেও সেই অন্তর্জীবনের সাক্ষ্যটাই গ্রহণ করা দরকার। আমার ধারণা, কবি-মানসিকতার বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যটিও কবিতার ঐ অন্তর্গূঢ় আলোচনাতেই ধরা পড়ে।

ইমেজ সম্পর্কে লেখার এটাই কি একমাত্র কারণ?

—না, অন্য কারণও আছে। রবীন্দ্রনাথের পোয়েটিক ইমেজ নিয়ে আজ পর্যন্ত খুব কম আলোচনা আমার চোখে পড়েছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোকবিজয় রাহা দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এছাড়া, এ-বিষয়ে তেমন কোনো ভালো আলোচনা আমি পড়িনি।

একটু থেমে, বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বললেন—ইমেজ নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য আছে তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে। তিনি যেমনভাবে যখন ভেবেছেন, ঠিক তেমনভাবেই বাক-প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। পরবর্তীকালেও সেসব ইমেজ ম্লান হয়নি। যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবিই যুগোত্তীর্ণ বাক-প্রতিমা নির্মাণে সক্ষম।

এমনিভাবেই আমাদের আলোচনা এগোচ্ছিল। কিছুটা এলোমেলো কথার মধ্য দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম : আলোচ্য বিষয়কে কি আপনি বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন, না, গত দৈনিকের কথা মনে রেখে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে ভাবেন? বিশেষ করে, কবিতার শব্দ ব্যবহার, ইমেজ নির্মাণ প্রভৃতি সম্পর্কে যখন আলোচনা করেন, তখন সময়ের দূরত্ব কি বিচার-বিভ্রান্তির কারণ হয় না?

তিনি বললেন : যুগধর্মে কিন্তু আলঙ্কারিক গৌরব ম্লান হয় না। একালের মানুষ যখন, আমার বিচারের মানদণ্ডটা নিশ্চয়ই এখন একালেরই হবে। ঘটনার পরিবর্তন ঘটলেও সব সময় সৌন্দর্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সমালোচকের বিচারবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায় স্বীকার করি। তাই বলে, গতকালের নৈপুণ্যটাকে ধরতে পারবো না—তাই বা স্বীকার করি কি করে?

আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবনটাকেই কি আপনি স্মরণে রেখেছিলেন, না, বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন কাব্য থেকে?

—রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবন ও সাহিত্যটাই ছিল আমার চোখের সামনে। খণ্ডিত কোনো ধারণা নিয়ে আমি কিছু লিখতে পারি না—লিখি না। এই সঙ্কলনের কয়েকটি প্রবন্ধে আমি এমন কতকগুলো ইমেজ বেছে নিয়েছি, যা কবির বিভিন্ন পর্বের রচনায় পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে বহুবার। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে শেষ পর্ব পর্যন্ত আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে গভীরভাবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোনো অপূর্ণতা কিম্বা ত্রুটি কি আপনার চোখে পড়েছে?

—রবীন্দ্রনাথের জীবন অখণ্ড এবং পূর্ণ। কোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি আমার নজরে পড়েনি। সেভাবে ভাবিওনি।

অবনীন্দ্র-প্রসঙ্গ

আমার ধারণা, এই সঙ্কলনের মূল্যবান সম্পদ অবনীন্দ্রনাথের ওপরে লেখা প্রবন্ধ দুটি। তার কারণ, এমনও হতে পারে, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের জাদুমন্ত্রে আমি আবিষ্ট।

অমলেন্দুবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, বাংলার ব্রত, ছড়া, লোকশিল্পের প্রতি আকর্ষণের ফলেই কি অবনীন্দ্রনাথের গদ্য এতটা লোকায়ত—স্বতঃস্ফূর্ত এবং কথকীর সারল্যে সমৃদ্ধ হয়নি?

—নিশ্চয়ই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে—বাড়ীর দারোয়ান, চাকরবাকর, সহিস, কোচোয়ান, গঙ্গার ধারের মাঝিমাল্লা, যাত্রাগানের অধিকারী—সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর সহজ মেলামেশা। একথা আমি 'কথক অবনীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে লিখেছি।

অবনীন্দ্রনাথের গদ্য কি সর্বজনীন সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী?

—না, নিশ্চয়ই না। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের ভঙ্গি বিশেষ ধরনের এবং বিশেষ বিষয়ের উপযোগী। আজকের দিনের শহরঘেঁষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভঙ্গিটি অচল; সাহিত্যের ভঙ্গি সর্বদাই বিষয় উপযোগী হবে।

রবীন্দ্রনাথও তো বাংলার লোকসাহিত্য, ব্রতের ছড়া ও লৌকিক শিল্প সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন? তাহলে, তিনি অবনীন্দ্রনাথের মতো গদ্যরচনায় সেই লোকায়ত রীতিটির ব্যবহার করলেন কেন?

—অবনীন্দ্রনাথের মতো লোকজীবনের এত কাছাকাছি—একাত্ম হয়ে আসা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হয়নি। তিনি লোকসাহিত্যের সারল্য ও সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তার প্রয়োগ-কৌশলকে আয়ত্ত করতে পারেননি। অবনীন্দ্রনাথ কতবার যে রাত জেগে নিম্নশ্রেণীর মানুষের পাশাপাশি বসে যাত্রাগান শুনেছেন—তার ইয়ত্তা নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখাদুটির প্রেরণা পেলেন কোত্থেকে?

—'লেখক অবনীন্দ্রনাথ' লিখেছিলাম হুমায়ুন কবীরের অনুরোধে। এটাই প্রত্যক্ষ প্রেরণা। দীর্ঘকাল ধরেই আমি অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভাবছিলাম। আসলে, ঐ ভাবনা থেকেই লেখা দুটির সূত্রপাত।

স্মৃতিকথা

কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আ[গে] অমলেন্দুবাবু বললেন, তাহলে পেছ[নের] কথা কিছু বলি। ছাত্রজীবনের [...] রোমান্টিক, পেছনে ফেলে-আসা দি[ন]গুলির কথা বলতে বুঝি সকলেরই ভা[লো] লাগে।

বললেন : কলেজে পড়ার সময় ঢা[কা] থেকে আমরা একটা কাগজ বের ক[রে]ছিলাম 'কণিকা' নাম দিয়ে। আর বুদ্ধ[দেব] বসুর উদ্যোগে বেরিয়েছিল 'স্বপনরথ'। তবে, আমাদের কাগজটা তেমন ভা[লো] হয়নি। 'স্বপনরথ'-এর সঙ্গে যাঁরা জ[ড়িত] ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিল্পীর অভাব [ছিল] না। পরে দুই গ্রুপ মিলে 'প্রগতি' না[মে] একটা কাগজ করেছিলাম।

সেই সময়ে জীবনানন্দ দাশের স[ঙ্গে] আমার পরিচয় হয়।

প্রগতি বন্ধ হবার পরেও আমাদে[র] সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়নি। মাঝে মা[ঝে] বরিশাল যেতাম। জীবনানন্দের স[ঙ্গে] গল্প হতো। এখনো তাঁর কয়েকটি চি[ঠি] আছে আমার কাছে। কবিতা পত্রিক[ায়] যখন বুদ্ধদেবের অনুরোধে 'সমালোচ[ক] এলিয়ট' ও 'গ্যেটে' সম্পর্কে দুটো প্রব[ন্ধ] লিখি, তখন জীবনানন্দ আমাকে চি[ঠি] দিয়েছিলেন তার প্রশংসা করে।

যেন স্মৃতি-বিস্মৃতির জগৎ [...] অমলেন্দুবাবু কথা বলছিলেন।

বললেন : একালে কল্লোলে দু[টো] গল্প লিখেছিলাম। একটা প্রবন্ধও লিখে[ছিলাম]।

বললাম : বাংলা সমালোচনার বর্তমা[ন] স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে আপনার মতামত [কি]?

—অনিশ্চিত। কোনো সুনির্দিষ্ট মা[ন]দণ্ড নেই। মুক্ত সমালোচনা প্রায় হয় [না] বললেই চলে। সাহিত্যের মতো বাং[লা] দেশে সমালোচনারও দুটো ধারা—হয় রা[জ]নৈতিক মানদণ্ডে বিচার, না হয় কিছু সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন।

দুঃখ করে বললেন : 'সাহিত্যকে কে[ন] সাহিত্য হিসেবে দেখা হয় না? লেখকে[র] কি লেখক হিসেবেই দেখা উচিত নয়?'

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরি[য়ে] বললেন, দুঃখিত। আমি ভুলেই গিয়ে[] ছিলাম। একটা জরুরী কাজ আছে[] এখুনি বেরোতে হবে।

বললাম : আর দু-একটা প্রশ্ন করবে[া]

—বলুন।

নতুন কি লিখছেন?

—অরুণ ভট্টাচার্যের সম্পাদন[ায়] চল্লিশের কবিদের একটা কবিতা-সঙ্ক[লন] বেরোচ্ছে—তার ভূমিকা লিখে দিয়ে[ছি]। আগামী এক বছরের মধ্যেই আরো দু[টো] বই বেরুবে। দুটোই প্রবন্ধের সঙ্কল[ন]। প্রথম বইটিতে থাকবে আধুনিক কবি[তার] ওপরে কয়েকটি আলোচনা। দ্বিতীয় [বই] তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের সংগ্রহ। হুমা[য়ুন] কবীরের অনুরোধে এককালে 'চতুরঙ্গ[-য়] একটি সিরিজ অব আর্টিকলস লি[খে] ছিলাম। সেগুলিই এই সঙ্কলনে থাক[বে]।

—[illegible]

সতীকান্ত গুহ
প্রেমে সাফল্য যে নিতান্তই একটি অলোকিক ব্যাপার এবং অদৃষ্টের যোগ-
সাজস না থাকলে কোনোকিছুই কিছু নয়,
রূপ, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি আভিজাত্য
ইত্যাদি অস্ত্র যে ফলাহীন তীরের চেয়েও
নিষ্ফল, চল্লিশের কাছাকাছি এসে
এই নিদারুণ সত্য আবিষ্কার করে
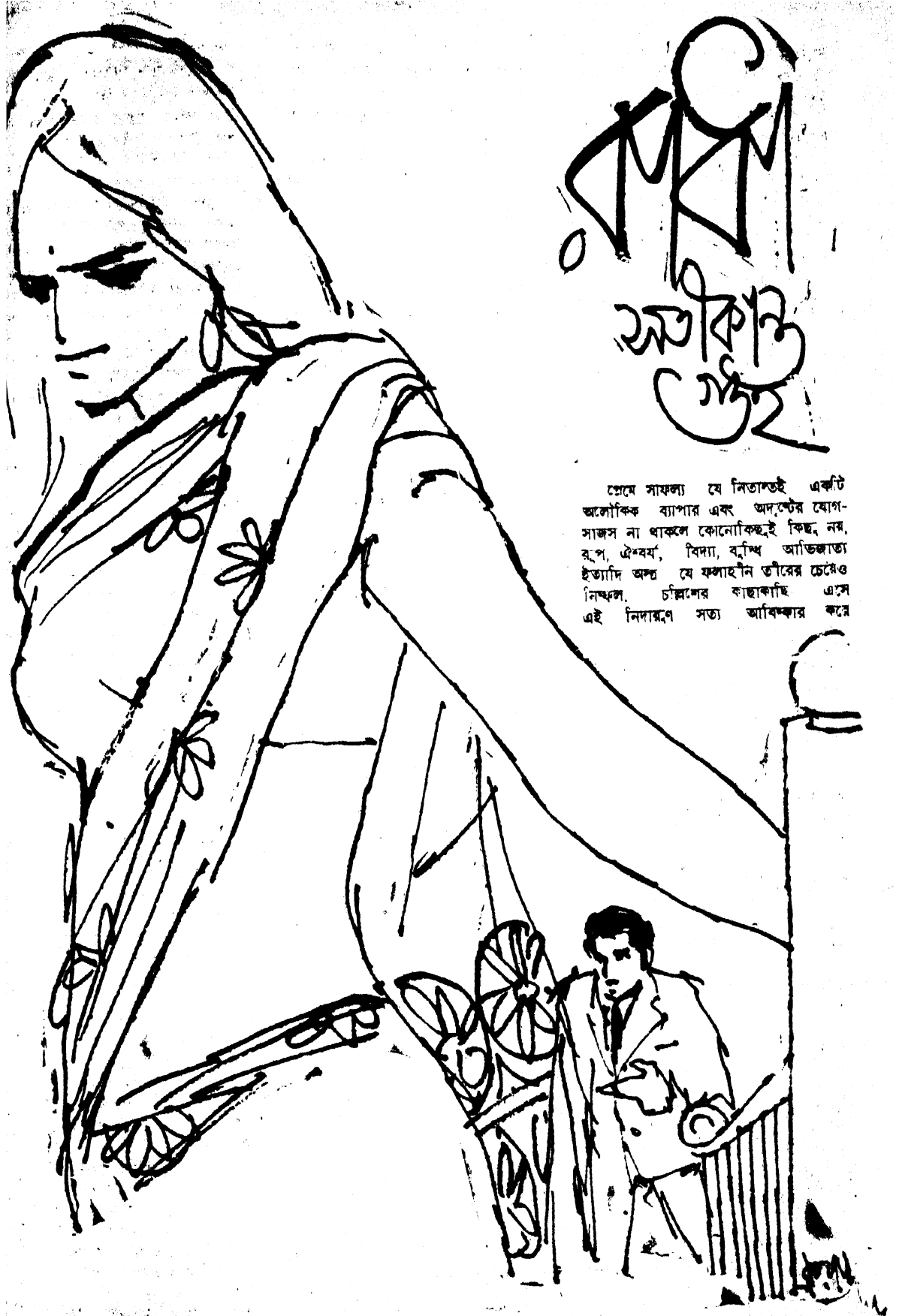
ইন্দ্রজিত সোম মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে পড়লেন। ব্যাংকে ও সরকারী কাগজে অন্যূন আশি লক্ষ টাকা, মালাবার হিলস-এ হালফ্যাসানের একখানা চোখ-ধাঁধানো বাড়ি, তিনটি বিলাতি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সম্মানসূচক ছাপ এবং রবিবর্মা অংকিত দুষ্মন্তের সংগে ভ্রমকপ্রদ সাদৃশ্য— এই চতুর্গুণের অধিকারী হয়েও প্রেমের চতুর্বর্গ ফল তো দূরের কথা, ইন্দ্রজিত সোমের বরাতে একবর্গ ফলও জুটলো না। প্রায় দশ বছর ইন্দ্রজিত প্রেমসমরে অক্লান্ত-ভাবে লড়ে গেলেন, বেছে বেছে চোখা চোখা বাণ মারলেন, তাঁর লক্ষ্যস্থল পাঁচটি তরুণী পরপর যথারীতি শরবিদ্ধ হল, প্রেমবিকাশের প্রায় সবকটা লক্ষণও প্রকাশ পেল, তারপর প্রত্যেকেই কিছুকালের ভিতর ষোলো আনা সেরে উঠল। সীজারের আততায়ীর দলে ব্রুটাসকে দেখে যে পরিমাণে বিস্মিত ও ক্ষুন্ন হয়েছিলেন, তাঁর প্রেমশরাহত তরুণী-দের সেরে উঠতে দেখে ইন্দ্রজিত তার চেয়ে কম বিস্মিত বা ক্ষুন্ন হলেন না। ইন্দ্রজিতের গুণাবলী বিচার করে তরুণীদের প্রত্যেকেই তাঁর হাতে আহত ও নিহত হতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং তারাও ইন্দ্রজিতের ব্যর্থতায় কম দুঃখিত হল না।

শেষে একদিন পরামর্শ করে তারা ইন্দ্রজিতকে চায়ে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। সাত-পাঁচ চিন্তা করে ইন্দ্রজিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সুপ্রিয়া বাগচীর বাংলোয় চায়ের আয়োজন হয়েছিল। ইন্দ্রজিত সেখানে পৌঁছে কিছুটা অন্যমনস্ক অবস্থায় সোজা সিঁড়ি বেয়ে বাংলোর বারান্দায় উঠে এসেছিলেন। স্বাগত সম্ভাষণে সচেতন হবার পরমুহূর্তেই তিনি স্তম্ভিত হলেন। তাঁর ফর্সা মুখ লজ্জায় রোষে লাল হয়ে গেল।

ভালো মানুষ হঠাৎ চটে গেলে কী অনর্থ ঘটতে পারে, ইন্দ্রজিতের সংগে দীর্ঘ-কাল মেলামেশার ফলে পঞ্চ তরুণীর কারোই অজানা ছিল না। সুতপা ব্যানার্জি তাদের মুখপাত্রী হিসেবে বলল, 'আপনার দুঃখ ও ব্যর্থতা আমরা সমান ভাগ করে নিতে চাই, এই কথটা জানাবার জন্যই আমরা কালো ব্যাজ পরেছি। আপনাকে অসম্মান বা বিদ্রূপ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই।'

লক্ষ্মী রায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'শুধু নিজের কথাই ভাববেন না, আমাদের কথাও ভাবুন।'

রাজশ্রী রাহা বিষন্ন স্বরে বলল, 'আমাদের মতো আইবুড়োদের পক্ষে জালে পড়েও জড়িয়ে পড়তে না পারা যে কী দুর্ভাগ্য সহজেই অনুমান করতে পারবেন।'

মল্লিকা নাগ বলল, 'সুরু থেকেই যদি সমানে একটানা লড়াই চালাতেন, একটা হ্যাস্তন্যাস্ত হত। থেকে থেকে ঢিল দিয়ে ভুল করলেন। অন্ততঃ একজন তো আপনার ঘর আলো করতে পারতুম।'

সুপ্রিয়া বাগচী বলল, 'আমি বিশেষ অভিভূত। টীকা-টিপ্পনীতে মন হাল্কা করি, সেটুকু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। তবে এটা জেনে রাখুন মিস্টার সোম, এই চায়ের আসর আসলে আমাদের যৌথ প্রেমের শ্রাদ্ধ বাসর।'

পঞ্চতরুণী একযোগে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ইন্দ্রজিত তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। কোনো দিকে কারো দিকে দৃকপাত না করে গটগট করে বারান্দা থেকে নেমে এসে তাঁর ধবধবে সাদা মার্সিডিজ বেনজয়ের ড্রাইভিং সিট-এ বসলেন।

ইন্দ্রজিতের চিঠির জবাবে ব্যারিস্টার অজয় ঘোষ লিখেছিলেন, 'তোমার সমস্যা যে কঠিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার আচরণে স্তম্ভিত হয়েছি। আমার কোনো মক্কেল যদি আমার কাছে গণ্ডার শিকারের কৌশল সম্বন্ধে উপদেশ চেয়ে পাঠাতো, তাতে আমি যতটা বিস্মিত হতাম তার চেয়ে ঢের অবাক হয়েছি তোমার অনুরোধে। সহজেই প্রেমে পড়বে ও বিনা আপত্তিতে হাবুডুবু খাবে এরকম একটি স্মার্ট ডানা-কাটা পরীর সন্ধান করতে বলেছো। আমি ব্যারিস্টার। ঘটক নই। তবু, কবি কালিদাসের উপর যে কারণে সরস্বতী ভর করেছিলেন, সেই একই কারনে অদৃষ্ট তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন। ভাগ্যোগাম উপেক্ষিত অদৃষ্টঃ। তুমি যথাসম্ভব চলে আসবে। আমার সিনিয়র নৃপেন গুপ্ত কিছুকাল আগে হার্ট অ্যাটাক-এ মারা গিয়েছেন। একটি আধুনিকা কন্যা ও একটা ফাঁকা ব্যাংক একাউন্ট রেখে গিয়েছেন। বিলিব্যবস্থার ভার আমার উপর।'

ফলে পাঁচদিন বাদে ইন্দ্রজিত চৌরঙ্গী অঞ্চলে অজয় ঘোষের কড়া সাহেবী ফ্ল্যাটে সন্ধ্যা নাগাদ আবির্ভূত হলেন।

অজয় ঘোষ চুরুট মুখে ড্রইংরুমে ইন্দ্রজিতের প্রতীক্ষায় ছিলেন। বললেন, 'বোসো বোসো। কেমন আছো?'

ইন্দ্রজিত ম্লান হেসে বললেন, 'যেমন দেখছো।'

অজয় ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অজগর-দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতকে আপাদমস্তক দেখলেন। ঈষৎ মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'বিশেষ ভালো ঠেকছে না। অবস্থা সঙ্গীন!'

ইন্দ্রজিত অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, 'ভাই'—

কথা শেষ করতে না দিয়ে অজয় ঘোষ বললেন, 'ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝে নিয়েছি।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'বুঝেছো কিনা, অর্থাৎ একা থাকার কোনো মানে হয় না। সংসার নেই অথচ বয়-বাবুর্চি দারোয়ানের হাতে ঠকে নাজেহাল হচ্ছি।'

অজয় ঘোষ একটা সংক্ষিপ্ত হুঁ বলে উঠে গিয়ে ঘরের এককোণে একটা ক্যাবিনেট থেকে দুটো গেলাস ও আধখালি স্কচ-য়ের বোতল বার করলেন। সম্মুখে পেগটেবিলে সাজ-সরঞ্জাম উপকরণ রাখতে রাখতে বললেন।

'চলবে?'

ইন্দ্রজিত সবেগে মাথা নাড়লেন।

অজয় ঘোষ বললেন, বুঝেছি। 'এখনও পবিত্র শৈশব চলছে।'

ইন্দ্রজিত প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'তা নয়। আই হ্যাভ অ্যাবসলিউটলি নো প্রেজুডিস।'

অজয় ঘোষ ইতিমধ্যে বেল টিপেছিলেন। বয় আসতে বললেন, 'সাবকো নিম্বুকা পানি দেও।'

ইন্দ্রজিত কী ভেবে বললেন, 'ইফ ইউ ইনসিস্ট এক-আধ পেগ চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'থাক। শেষে মাথা ঘুরে পড়লে কেলেঙ্কারী হবে। ব্যাচেলারস্ ফ্ল্যাট। শেষটা তোমার পরিচর্যার জন্য পয়সা খরচ করে নার্স আনতে হবে।'

নিম্বুকা পানি এসে গিয়েছিল। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা ঢাকবার জন্য ইন্দ্রজিত সংগে সংগে গেলাস তুলে নিয়ে মুখে ধরলেন।

অজয় ঘোষ খানিকটা হুইস্কি গলাধ-করণ করে বললেন, 'মেয়েটি বিলাতি স্কুলে পড়েছে। আদব-কায়দাদুরস্ত। দারুণ স্মার্ট। সুশ্রী কিম্বা রীতিমতো সুন্দরী সেটা তোমার দেখার রকমের উপর নির্ভর করবে।'

উৎসাহিত হয়ে ইন্দ্রজিত কী বলতে গিয়ে হঠাৎ বিষম খেলেন।

অজয় ঘোষ ইন্দ্রজিতকে বেশ মনো-যোগের সংগে দেখে নিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন 'টেক ইট ইজি।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'না, অর্থাৎ তোমার যদি সুন্দরী মনে হয়ে থাকে, তাহলে কোনো কথাই নেই।'

অজয় ঘোষের মা ছিলেন খাস ইংল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। সুপুরুষ পিতার সন্তান অজয় ঘোষকে মাতৃদত্ত রংয়ের প্রসাদে একটি জাদরেল কার্তিক বলে মনে হত।

অজয় ঘোষ বললেন, 'চেহারায় হয়তো কোনো ত্রুটিই নেই। তবে শি ইজ নট সাফিসিয়েন্টলি এক্সপিরিয়েন্সড। অর্থাৎ অভিজ্ঞতায় বেশীদূর এগোয়নি।'

ইন্দ্রজিত অস্ফুটস্বরে বললেন, 'অভি-জ্ঞতা? কিসের অভিজ্ঞতা?'

অজয় ঘোষ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'কী হিসেবে আবার! মেয়ে হিসেবে।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'সাংসারিক অভি-জ্ঞতার কথা বলছ?'

অজয় ঘোষ তাচ্ছিল্যের সংগে বললেন, 'ছোঃ। আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাই নাকি? সরল অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করো।'

ইন্দ্রজিতের পাংশু মুখভাব লক্ষ্য করে অজয় ঘোষ পুনরায় বললেন, 'অভিজ্ঞতার ভয় পাবার কিছু নেই। সোনার বেলায় যেমন সোহাগা, চরিত্রের বেলায় অভিজ্ঞতা। আর চরিত্র বাদ দিলে মানুষের কতটুকু থাকে?'

কী প্রশ্ন করে কী জবাব পাবেন, ইন্দ্র-জিত মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। অজয় ঘোষ মনে মনে হাসলেন। বললেন, 'তবে একেবারে ফাঁকা নয়। এই কদিনেই কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে।'

ইন্দ্রজিতের হৃৎপিণ্ড হাতুড়ি পিটতে লাগল।

অজয় ঘোষ বললেন, 'এই কদিনে সহায়কর্গে, [illegible] আমার [illegible]

পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে।'

ইন্দ্রজিতের মুখে কে কালি ঢেলে দিল। অজয় ঘোষের দিকে তাকিয়ে সভয়ে বললেন, 'ভাই, বেশী দূর গড়ায়নি তো?'

অজয় ঘোষ উঠে এসে ইন্দ্রজিতের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ডোন্ট বি সিলি। শি ইজ নট এ মাদার ইয়েট।' বিড় বিড় করে সেই সঙ্গেই বললেন, 'অলদো ইন এ সার্টেইন ওয়ে শি ইজ।' তারপর অলক্ষ্যে হেসে বললেন, 'চলো। রাধার সঙ্গে দেখা করিয়ে দি। স্বচক্ষে স্বকর্ণে দেখে-শুনে যাচাই করে নাও।'

রাধা নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিতের বুকে সন্দেহ ও আশঙ্কার আলোড়ন ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। অকসফোর্ড ও হার্ভার্ডের কৃতী ছাত্র ইন্দ্রজিতের অবচেতনে মুহূর্তের ভগ্নাংশে নামতত্ত্বের এক পুরোনো বিতর্কের সহজ মীমাংসা হয়ে গেল। অবচেতনের স্তরে ইন্দ্রজিত সহজে অনায়াসে বুঝলেন নাম শুধু উদ্ভাবন নয়। নাম পুরোপুরির সৃষ্টি। এই নামই বৈষ্ণব কবির কানের ভিতর দিয়ে অনুভূতিমর্মরিত হৃদয়ের গভীর স্তরে প্রবেশ করেছিল। অভিধানের অতীত নিগূঢ় অর্থে সে টিঁকে থাকে। এই অর্থ মহাকবি সেকসপীয়রের উপলব্ধিতে ধরা দেয়নি। এই অর্থ বাদ দিলে নাম শুধুই নাম। শেকসপীয়রের টিপ্পনি-লাঞ্ছিত নাম।

টালিগঞ্জের উপান্তে হালে গজানো এক সৌখীন পাড়ায় একটা বিরাট বাড়ির সম্মুখে এসে গাড়ি থামল। ইন্দ্রজিত নামবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। অজয় ঘোষ বললেন, 'এখানে নামলে বাড়ি পেঁছতে সিকি মাইল।' এই সময়ে বিশাল ফটকটা মুখ ব্যাদান করতে গাড়িটা সোঁ করে বাড়ির হাতোয়ার সান-বাঁধানো রাস্তায় ঢুকে পড়ল। অবিলম্বে বাড়িব ঢাকা বারান্দার তলায় সদর কপাটের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

বয়-বেয়ারাদের সেলাম কুর্ণিশ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ততম উত্তর দিয়ে অজয় ঘোষ মহাদাপটে ড্রইংরুমে প্রবেশ করে গলা সপ্তমে তুলে ডাকলেন, 'শ্রীরাধে!' ইন্দ্রজিতকে একটা সোফায় প্রায় ঠেলে বসিয়ে দিয়ে আবার চেঁচালেন, 'আমরা উপস্থিত। মানময়ী! আঁচরে আবির্ভূত হও।'

ড্রইংরুম থেকে একটা সিঁড়ি একপাক ঘুরে দোতলায় উঠে গিয়েছে। স্থাপত্যের এক আশ্চর্য নিদর্শন। এ সিঁড়ি শুধু উপরে উঠবার নয়, কোথাও পেঁছে যাবার সিঁড়ি।

সিঁড়ির মাথায় দোতলায় ছায়ার ও শব্দের সূক্ষ্ম ঐকতানে কার আবির্ভাবের সাড়া পাওয়া গেল। ইন্দ্রজিত অজয় ঘোষের দৃষ্টি অনুসরণ করে সম্মুখে উপরে তাকালেন। চোখ ফেরাতে পারলেন না। অপার বিস্ময়ে রাধা নামের অধিকারিণীকে দেখলেন। কাকে দেখছেন, কেন দেখছেন, কোন্ যুগের কোন্ খণ্ডজগতের অধিনায়িকাকে দেখছেন ভেবে ইন্দ্রজিত কয়েক মুহূর্তের জন্য যুক্তিবিবর্জিত এক যাদুবিশ্ব নাটকের আনন্দ-বেদনার অংকে পেঁছে গেলেন। সেই মুহূর্তে যদি তাঁর সম্মুখ থেকে ড্রইংরুমটা মুছে যেত, সুদূরদিগন্ত-রেখাঙ্কিত নীলসমুদ্রে একটি শঙ্খশুভ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা দিত, প্রাচীন কোনো গ্রীক কবির উদাত্ত কণ্ঠে যদি প্রেয়সী দেবীর বন্দনা শুনতে পেতেন, অসম্ভব জ্ঞানে অবিশ্বাস করতেন না। ঐ নীল সমুদ্র কখন নীল যমুনায় রূপান্তরিত হল, শঙ্খশুভ্র দ্বীপ বৃন্দাবনের শ্যামশোভায় বিলীন হল, কখন গ্রীক কবির কণ্ঠ ছাপিয়ে বৃন্দাবন লীলার এককলি গান মুখর হল, ইন্দ্রজিত টের পেলেন না। শুধু এই অপরূপ অঘটন প্রাণ-মন দিয়ে আস্বাদ করলেন।

রাধা নেমে এল। তন্বী তো বটেই। প্রায় শীর্ণ। অথচ নরম নিটোল। দূর থেকে দেখা বেলাশেষের সবুজ মাঠের মত। মুখে আলোর চেয়ে ছায়া বেশী। দুটি গভীর কালো চোখের দৃষ্টি সন্ধ্যার প্রদীপের তো। তার পক্ষে কখনো বিদ্যুৎ কটাক্ষ সম্ভব কিনা বলা কঠিন। ইন্দ্রজিত মুগ্ধ হলেন। মনে মনে দু-হাত জুড়ে অদৃষ্টকে প্রণাম করলেন।

ইন্দ্রজিত উঠে দাঁড়াতে গেলেন। অজয় ঘোষ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন, 'থাক, ভদ্রতা রাধাকেই করতে দাও।'

রাধা সুমিষ্ট কণ্ঠে বলল, 'বসুন।'

ইন্দ্রজিত বসলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'রাধা, তুমি অবিলম্বে বোসো। আমার বন্ধুটি অসম্ভব সিভালরাস। তুমি যতক্ষণ না বসছ ও উসখুস করবে।'

রাধা হেসে বলল, 'কী আশ্চর্য! উনি অতিথি। বসতে ওঁর দ্বিধা কী!' রাধা বসল।

অজয় ঘোষ রাধার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'বম্বে-পলাতক আমার এই বন্ধুটি কলকাতায় আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছে। আশ্রয় মনের মতো হলে কলকাতার গাঁটছড়া বাঁধা পড়তে আপত্তি নেই।' ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে অজয় ঘোষ বললেন, 'কি হে! ঠিক বলেছি কি না?'

'হ্যাঁ, না, অর্থাৎ' এই তিনটি কথা উচ্চারণ করে ইন্দ্রজিৎ ঘেমে নেয়ে উঠলেন। অসহায়ের মতো রাধার দিকে তাকালেন।

রাধা সলজ্জ হেসে মাথা হেঁট করল। চাপা গলায় বলল, 'বুঝেছি।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'তোমরা দুজনে কী বলছ কী বুঝছো, আমি অন্ততঃ বুঝতে পারছি না। মুকাভিনয়ের ভাষা আমার জানা নেই।'

ইন্দ্রজিত মরীয়া হয়ে বললেন, অর্থাৎ ঐ গাঁটছড়ার ব্যাপারটা।

অজয় ঘোষ হেসে দিলেন। রাধা হাসতে গিয়ে ইন্দ্রজিতের মুখভাব লক্ষ্য করে নিজেকে সামলে নিল। প্রকাশ্যে বলল, 'হ্যাঁ।'

ইন্দ্রজিত সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রাধার দিকে তাকালো। কিন্তু অজয় ঘোষের সঙ্গে চোখা-চোখি হতে একটু দমে গেলেন।

অজয় ঘোষ সোফায় টান হয়ে আধা শোয়া অবস্থায় গলা সাফ করে নিয়ে কারো দিকেই না তাকিয়ে কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, "তোমাদের রকম সকম দেখে বোধ হচ্ছে তোমাদের একজন আর একজনকে একটা রেডিয়োসেট গছাবার চেষ্টা করছ এবং দুজনেই চক্ষু লজ্জায় হ্যাঁ না বলতে না পেরে একটা আপোষে রাজী হচ্ছ। আমি তোমাদের একজনের অভিভাবক। আর একজনের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তোমরা সৌজন্যের আতিশয্যে ভুল করবে। আমি দাঁড়িয়ে দেখব। এ হতে পারে না। আমি যদিও সবে চল্লিশে পা দিয়েছি অভিজ্ঞতায় ষাটের কাছাকাছি। এ এমনই একটা ব্যাপার যে তাড়াহুড়ো করতে গেলে বিপদ ডেকে আনবে। দুজনেই সারাজীবনের জন্য পস্তাবে।"

ইন্দ্রজিত অজয় ঘোষের নাতিদীর্ঘ উক্তিতে অস্বস্তি বোধ করলেন। যা হবার, না হয়ে পারে না। তাকি সহজেই হঠাৎ হতে পারে না? রাধা আড়চোখে ইন্দ্রজিতকে দেখে মুখ নামিয়ে নিয়ে একটু হাসল। কিন্তু এ হাসি কোনো বিশেষ মুহূর্তের নারীসুলভ হাসি। এতে বিদ্রূপ বা পরিহাসের লেশমাত্র ছিল না।

ইন্দ্রজিত কিন্তু রাধাকে ভুল বুঝলেন। অজয় ঘোষের উদ্দেশে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, "আমি বরং এখন যাই। তোমরা আলোচনা করে নাও। প্রয়োজন হলে নয় পরে দেখা করব।"

রাধা আহতস্বরে বলল, "সে কি! ড্রিংক্‌স্ আনতে দিয়েছি। আপনি অতিথি। আপনাকে ছাড়ি কি করে?"

ইন্দ্রজিত বিরস বললেন, "আমি ড্রিংক করি না।"

রাধা আয়তচক্ষে ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করে বলল, "আপনার এ কথা কিন্তু মেনে নিতে পারলাম না। মানুষ ডাঙার বাস করলেও জল তাকে খেতেই হয়।" পরে শান্তকণ্ঠে বলল, "ড্রিংক্‌স্ বলতে আমি হুইস্কি জিন-য়ের কথা বলছি না। ফলের রস ঠাণ্ডা করে আনতে বলেছি। তাতে আপত্তি নেই তো?"

ইন্দ্রজিত বিশেষ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "না, না।"

রাধা ঈষৎ হাসল। তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজিতের হৃদয় সাড়া দিয়ে জেগে উঠল। তাঁর সম্মুখে যমুনা পুলিনের এক কল্পিত দৃশ্য ভেসে উঠল। এ দৃশ্যে তিনি নিজেকে এক বিশেষ ভূমিকায় দেখলেন।

নক্সাকাটা সৌখীন গেলাশে ঠাণ্ডা ফলের রস এল। অজয় ঘোষ একটা গেলাশ তুলে নিয়ে দু একটা চুমুক দিয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন, "তরল আগুনে যে বাঁ তেষ্টা মেটায়, এই ফলের রসে সে কোন স্বাদ পাবে! উপযুক্ত পিতার কন্যা হয়ে সুরার মহিমা বুঝলেনা রাধা!"

রাধা ইন্দ্রজিতের উদ্দেশে বলল, 'বাবা সঙ্গে এই একটি ব্যাপারে অজয় কাকার বে বনিবনা ছিল।" তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এ বাড়িতে তরল আগুনের আমদানি একটু কম হলে বাবা হয়তো আরো কয়েক বছর বাঁচতেন।"

…র মুখ বাঁকা করে বললেন, হেমোই …লেন। জন্মমৃত্যু বিধাতার হাতে।"

ইন্দ্রজিত বললেন, "তাহলেও—"

…র ঘোষ বাধা দিয়ে বললেন, …েছি। এই একটি বিষয়ে তোমাদের …র মতের সম্পূর্ণ মিল দেখছি। কিন্তু … তেও ঢের গুরুত্বর নানা বিষয়ে মিল …নের প্রশ্ন উঠবে। তোমাদের পরিচয় …। আজ এখানেই প্রথম দৃশ্য শেষ হোক। … থেকে কয়েকটা দিন তোমরা ধীরে … সুবিধে মতো পরস্পরকে চিনবার …বার চেষ্টা করো। মনে রেখো ফলাফল … অদৃষ্টের হাতে নয়। খানিকটা তোমা-…র হাতে।"

সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। যাবার সময় …র সঙ্গে ইন্দ্রজিতের দৃষ্টি বিনিময় হল। …র বুকটা টনটন করে উঠল। তন্বী কৃশা …কে বারবার দেখতে ইচ্ছা হল। রাধার …কারের প্রত্যুত্তরে ছোট একটা নমস্কার …নিয়ে অজয় ঘোষের সঙ্গে তাঁকে বেরিয়ে …তেই হল। শূন্য ড্রইংরুমে রাধা গালে … দিয়ে ভাবতে বসল।

পরদিন টেলিফোন পেয়ে বিকেলের …কে ইন্দ্রজিত রাধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে …লেন। রাধা ড্রইংরুমে তাঁর প্রতীক্ষার …ল।

ইন্দ্রজিত বললেন, "আপনি ড্রইংরুমে?"

রাধা সহাস্যে বলল, "কেন, ড্রইংরুমে …পেক্ষার থাকা কি উচিত হয়নি!"

ইন্দ্রজিত বললেন, "না, না, তা নয়। …বেছিলাম সিঁড়ির মাথায় আপনাকে …খতে পাবো।"

রাধা হতবুদ্ধি হল। কিন্তু কী ভেবে …। হেসে বলল, "কেন বলুন তো?"

কথার ফাঁদে পা দিয়ে সাহিত্যের কৃতী … ইন্দ্রজিত রীতিমতো ফাঁদে আটকে …লেন। বললেন, "যাদের সঙ্গে হাটে …জারে আট পৌরে প্রয়োজনে দেখা হয় …দের কথা আলাদা। সামনাসামনি হাতের …ছে পেলেই সুবিধে। কিন্তু যাদের বিশেষ …র চাই, সাধ হয় তারা উপর থেকে নীচেয় …মে আসুক। ঐ নেমে আসাটাই আসল। …তেই তৃপ্তি।"

রাধা হৃদয়াবেগ দমন করে সহজ হবার …ষ্টা করে ধীর কন্ঠে বলল, "কথাটা শুনতে …ভালো লাগল। একটু বুঝিয়ে বলুন।"

ইন্দ্রজিত বুঝলেন আষ্টেপৃষ্ঠে কথার …প্যাঁচে জড়িয়েছেন। অগত্যা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ঈশ্বরের কথাই ধরুন না …কেন। যখনই তাঁকে পেতে চাই কল্পনায় …স্পষ্ট দেখি তিনি যেন উপর থেকে নীচের …দিকে আসছেন।"

রাধা হেসে বলল, "কিন্তু আমি তো …ঈশ্বর নই।"

একটু উদ্ভ্রান্ত হয়ে ইন্দ্রজিত বললেন, …ঈশ্বর নন।' কিন্তু প্রেমতত্ত্বের বিচারে তাঁরই …মতো, অন্ততঃ কাছাকাছি একজন।"

রাধা অভিভূত হল। কিছুক্ষণ নীরব …থেকে বলল, "আপনি কবিতা লেখেন?"

ইন্দ্রজিত বললেন, "লিখতে পারি। …কিন্তু লিখিনা।"

রাধা বলল, "আশ্চর্য! আমি লিখতে পারি না। অথচ লিখি। আপনি পারেন অথচ লেখেন না।"

ইন্দ্রজিত বললেন, "কাগজে কবিতা লেখার চেয়ে জীবন দিয়ে কবিতা লেখার ঢের বেশী মূল্য। আমি এই রকম একটা কবিতার মিল খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ইন্দ্রজিতের কথা শুনতে শুনতে রাধা কী এক চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেল। তারপর গভীর দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতকে দেখতে দেখতে বলল, 'ঈশ্বর করুন, জীবনের কবিতায় আপনি যেন মিল খুঁজে পান। আমি তো আজ পর্যন্ত পেলাম না। হয়তো কোনো-কালেই পাবো না।"

ইন্দ্রজিত আবেগপূর্ণ কন্ঠে বললেন, "তা কি করে হয়। পেতেই হবে। আমি পেলে আপনিও পাবেন।"

রাধা বিষণ্ণ হেসে বলল, "যে কবি অপটু কিম্বা পটু হয়েও যার কপাল ভালো নয়, সে নিজেই যে শুধু মিল খুঁজে পায় না তা নয়। সে অপরের মিল ভেঙে দেয়। সে কবিতা খুঁজতে গেলেই জীবনের ছন্দ এলিয়ে যায়। মিল ভাঙতে থাকে।"

ইন্দ্রজিত কী বলবেন চিন্তা করে নিলেন। পরে বললেন, "আমি বারবার জীবনে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু তবুও আশা ছাড়িনি। আপনিই বা ছাড়বেন কেন?"

রাধা হতাশ কন্ঠে বলল, "না ছেড়ে উপায় কী? একটা মস্তরকমের অমিলের সম্মুখে এসে থেমে গিয়েছি। এগোবার উপায় নেই।'

রাধার কথার অর্থোদ্ধার করতে গিয়ে ইন্দ্রজিতের ললাটে দুর্ভাবনার রেখা ফুটে উঠল। রাধা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কী ভেবে সংগোপনে একটু হাসল। পরে ইন্দ্রজিতকে সম্বোধন করে বলল, 'একটু চা খান।"

ইন্দ্রজিত বললেন, "থাক।"

রাধা সবিস্ময়ে বলল, "কেন?"

ইন্দ্রজিত ধরা গলায় বললেন, "আপনার বিপদের কথা শোনার পর কী করে খাই?"

রাধা হেসে বলল, "কেন, আজ থেকে আপনি কি খাওয়া বন্ধ করে দেবেন?"

ইন্দ্রজিত অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "তা নয়। তবে এই মুহূর্তেই কী করে খাই?"

রাধা শান্ত কন্ঠে বলল, "আমি নিজ হাতে তৈরী করব। আপনি খেলে আমার ভালো লাগবে।"

রাধা চা তৈরী করে সযত্নে একটি কাপ ইন্দ্রজিতের সম্মুখে রেখে বলল, "নিন।"

ইন্দ্রজিত কিন্তু কিছুতেই চায়ের কাপ স্পর্শ করার মতো জোর পেলেন না। রাধার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে নিষ্পলক চক্ষে চেয়ে রইলেন। রাধা তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে কাপটা ইন্দ্রজিতের মুখে তুলে ধরে বলল, "খান।"

ইন্দ্রজিত নিতান্ত বিব্রত বোধ করলেন। সেই সঙ্গে একটা আনন্দ ও উত্তেজনা তাঁকে নাড়া দিয়ে গেল। একটা চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা ধরে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা।"

রাধা দুচোখ ভরে ইন্দ্রজিতকে দেখতে দেখতে বলল, "এই রকম ছোটো একটা মিলও এর আগে অদৃষ্টে জোটেনি। ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন। আপনি চলে যাবেন, মিলটা কিন্তু থেকে যাবে।"

ইন্দ্রজিত বললেন, 'চলে যাবো বলে আসিনি। তবে যেতে বললে কিসের জোরে থাকবো?"

রাধা ম্লান হেসে বলল, "একদিন নিজেই যেতে চাইবেন। সেদিন বলেও ধরে রাখতে পারব না।"

রাধার একথায় ইন্দ্রজিত অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাধা বলল, "কথা বলুন।"

ইন্দ্রজিত হাসতে চেষ্টা করলেন। জবাব দিতে হয় তাই বললেন, "কী কথা?"

রাধা ইন্দ্রজিতের চোখে চোখ রেখে বলল, "যে কোনো কথা। কবিতার কথাই নয় বলুন।"

ইন্দ্রজিত একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সাহস পাই না। কবিতার কথা বলতে গেলেই আপনার জীবনের অমিলের কথা মনে পড়ে যাবে।"

রাধা বলল, 'যায় যদি যাক না।'

রাধা বলল, "ওতেই তো বিপদ। অমিলের কথা মনে পড়লেই কৌতূহলী মন অমিলের ইতিহাসের জন্য উৎসুক হয়ে পড়বে।"

রাধা বলল, "যদি একান্তই জানতে চান, ক্ষতি কী?"

ইন্দ্রজিত এবার রাধাকে দৃষ্টিবিদ্ধ করে বললেন, "তাহলে বলুন কিসের অমিল?"

রাধা ড্রইংরুমের কার্পেটের নক্সায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করে বলল, "বলব। কিন্তু আজ নয় কাল। বলার প্রয়োজন হবে না। স্বচক্ষে দেখবেন।"

কয়েক মিনিটের ভিতরই ইন্দ্রজিত বিদায় নিয়ে উঠে পড়লেন। হোটেলে না ফিরে সোজা অজয় ঘোষের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হলেন।

অজয় ঘোষ তখন ড্রইং রুমে সুরাদেবীর পরিমিত সাধনায় রত। ইন্দ্রজিতকে অতটা রাতে বিবর্ণমুখে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, "প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে তুমি স্বশরীরে এসেছ না তোমার ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছ।" ইন্দ্রজিতের তরফ থেকে এ রসিকতার কোনো প্রত্যুত্তর না পেয়ে অজয় ঘোষ বুঝলেন ব্যাপার গুরুতর। ভিন্ন পথ ধরতে হবে।

বললেন, "রাধার ওখানে গিয়েছিলে?"

ইন্দ্রজিত সংক্ষেপে জবাব দিলেন, "হুঁ।"

অজয় ঘোষ সোফায় নড়েচড়ে বসে বললেন, "কথা হল?"

ইন্দ্রজিত ক্লান্তস্বরে বললেন, 'হল। কিন্তু না হলেই ভালো হত।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'খুলে বলো।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'কি করে বলি? খুলে বলার মতো কোনো কথাই হল না। আমার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো কথাই স্পষ্ট করে বলল না।"

অজয় ঘোষ বললেন, "তবু যা বুঝেছ সংক্ষেপে বলো।"

ইন্দ্রজিত সখেদে বললেন, "আমি মিলের খোঁজে গিয়ে সারাক্ষণ অমিলের হাহুতাশ শুনে এলাম।"

অজয় ঘোষ সবিস্ময়ে বললেন, "মিলের খোঁজে গিয়েছিলে? কিসের মিল?"

ইন্দ্রজিত বললেন, "কিসের আবার! কবিতার।"

বিস্ময়ে অজয় ঘোষের দু চক্ষের মণি প্রায় ঠিকরে বার হয়ে এল। বললেন, "তুমি কি বম্বে থেকে কলকাতায় কবিতার মিলের খোঁজে এসেছ?"

ইন্দ্রজিত আহত কণ্ঠে বললেন, "বইয়ের কবিতার নয়, জীবনের কবিতার মিল।"

অজয় ঘোষ মনে মনে বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, "রাধার জবাবটা যথাসম্ভব গুছিয়ে বলো। আমার জানা দরকার।"

ইন্দ্রজিত বললেন, "সরাসরি বলে দিল মিলের আশা ছেড়ে দিয়েছে। একটা মস্তবড় অমিলের সম্মুখে এসে থেমে গিয়েছে। এগোতে পারছে না।"

অজয় ঘোষ বললেন, "মূর্খবর! সেই মুহূর্তে তার হাতটা চেপে ধরে বুঝিয়ে দিলে না কেন যে আপনা আপনি মিল না এলে গায়ের জোরে মিলের ব্যবস্থা করা যায়?"

ইন্দ্রজিত চক্ষু কপালে তুলে বললেন, "গায়ের জোরে?"

অজয় ঘোষ বললেন, "তাতে আপত্তি কী? অনেক কবি সোজাপথে মিল খুঁজে না পেয়ে গায়ের জোরে মিল দেন। জীবনের কবিতার বেলায় তো কথাই নেই! জোর না খাটালে প্রায়ই মিল এসেও আসে না।"

ইন্দ্রজিত অনুযোগ করে বললেন, "কিন্তু তুমিই তো কাল চিনবার জানবার কথা বলেছিলে! তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করছিলে!"

অজয় ঘোষ কথায় খানিকটা ধার দিয়ে বললেন, "যদি হাত চেপে ধরতে পারতে, রাধা তোমাকে চিনবার সুযোগ পেত। তুমিও তার বারো আনা বুঝে নিতে।"

ইন্দ্রজিতের মুখে গভীর হতাশা ফুটে উঠল। বললেন, "এখন কী করতে বলো?"

অজয় ঘোষ নির্বিকার চিত্তে বললেন, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসে আমার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাল প্রথম ফ্লাইটে ঘরের ছেলে ঘরে অর্থাৎ বম্বে ফিরে যাও। মালাবার হিলসয়ে বাংলোয় বসে আধুনিক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে এবং মিলের চুলচেরা তত্ত্ব বিচার করে বাকী জীবন কাটিয়ে দাও।'

ইন্দ্রজিতকে নিরুত্তর দেখে অজয় ঘোষ বললেন. 'পারবে?'

ইন্দ্রজিত ম্লানমুখে মাথা নাড়লেন।

অজয় ঘোষ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন. 'না পারার কী আছে! আমি তো আকণ্ঠ অমিল পান করে জীবনকবিতার অমিলের ভিতর বেশ তোফা মেজাজে আছি।'

ইন্দ্রজিতের দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অজয় ঘোষ বললেন. 'ভ্রিবল করে তো ইতিপূর্বে বম্বেতে পঞ্চকন্যাকে পাশ কাটিয়ে পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছো। এটিকেও একই কায়দায় পাশ কাটাও।'

ইন্দ্রজিত ক্ষীণকণ্ঠে বললেন. 'তা হয় না।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'কেন হয় না। প্রেমে পড়েছো?

ইন্দ্রজিত ইতস্তত করে বললে 'বুঝতে পারছি না। হয়তো বুঝবা ক্ষমতাই আমার নেই। শুধু এটুকুই বুঝি যে, নামের জোরে হোক কি নিজের জো হোক মেয়েটা একটা টানে আমাকে জড়ি নিয়েছে।' ইন্দ্রজিত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অজয় ঘোষ ইন্দ্রজিতের নিকটে স এসে বসে বললেন, 'ভাই কলকাতা ব নয়। রাধাও বম্বের পঞ্চকন্যার একজন ন যদি সুখশান্তির পরোয়া না করো, তোমা মূল লক্ষ্য যদি হয় প্রেম, লেগে থাকো। বি হোক না হোক, তোমার মিলের ভিত রাধাকে পাও বা না পাও, যা সহজে মে না এমন কিছু পাবে। ধ্যানের ও আবি ষ্কারের একটা নতুন জগতের কাছে এ পড়েছো। কপাটের চাবিও কাছেই আছে কিন্তু আমার পক্ষে তা তোমার হাতে তু দেওয়া সম্ভব নয়। তোমাকেই খুঁজে নি হবে। তোমাকে বিনামূল্যে যে সুযো দিয়েছি তা কোনো মক্কেল চড়া ফী দিয়ে কোনো মূল্যেই তার ব্যারিস্টারের কা থেকে পায় না।'

ইন্দ্রজিত অজয় ঘোষের উপদেশে কতটুকু নিছক শ্লেষ কতটুকু সত্য চিন্ত করতে করতে ভূতগ্রস্তের মতো হোটেলে ফিরলেন।

পরদিন বিকেল হতে না হতেই ইন্দ্রজিত রাধার ড্রইংরুমে উপস্থিত হলেন। রাধা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল। ইন্দ্রজিতকে দেখে সে তার স্বভাবসুলভ লঘু পদক্ষেপে নেমে এল। হেসে বলল. 'ড্রইংরুমে দেখতে পেলে পাছে রাগ করেন, সিঁড়ির মাথায় ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।' পরে বলল, 'বসবেন না? বসুন।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'যখন এসেছি, একটু বসেই যাই।'

রাধা বিস্ময় ও অনুযোগ মিশিয়ে বলল, 'সে কী? আজ তো অনেকক্ষণ বসবার কথা!'

রাধার কথার রকমটা ইন্দ্রজিতের ভাল লাগল। প্রকাশ্যে বললেন, 'কেন?'

রাধা বলল, 'বাঃ। কালকের সেই অমিলের কথা এর মধ্যেই ভুলে বসে আছেন?'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'ভুলিনি। ও দুর্নিবার টানে আজ বরং একটু আগেই এসে পড়েছি।'

ইন্দ্রজিতকে নিষ্পলক চোখে দেখতে দেখতে রাধা বলল, 'বেশ করেছেন। তবে কথা সুরু হবার আগেই চায়ের পাট সুরু হোক।'

বয় চায়ের পট কাপ ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম শোভিত ট্রে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হল।

রাধা পট-য়ে চা নাড়তে নাড়তে কী ভেবে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি চা তৈরি করতে পারেন?'

ইন্দ্রজিত এ কথার জবাব দিলেন ন

রাধা পুনরায় হেসে বলল, 'আ জানি পারেন না।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তা তৈরী করি না। প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই পারব।'

রাধা আয়তচক্ষে ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বলল, 'দেবেন আমাকে এক কাপ তৈরী করে?'

ইন্দ্রজিতের বিহ্বলভাব লক্ষ্য করে রাধা হাসল। বলল, 'আজ থাক। আর একদিন দেবেন।'

হঠাৎ ইন্দ্রজিতের মনে একটা নরম স্পর্শ লাগল। বললেন, 'থাকবে কেন? আজই তৈরী করে দিচ্ছি।'

ইন্দ্রজিত গরম পটে হাত দিতেই উঃ করে হাত সরিয়ে নিলেন। রাধা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'আজ কিন্তু আপনিই গোড়ায় মিল ভেঙে দিলেন।' তারপরই স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, 'না, ভুল বললাম। মিল দিলেন।'

ইন্দ্রজিত কিন্তু রাধার কথায় মোটেই আশ্বস্ত হলেন না। এই তুচ্ছ ঘটনার একটা নিগূঢ় অর্থ থাকতে পারে ভেবে বিমর্ষ বোধ করলেন।

চায়ের পাট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাধা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গিয়েছিল। খানিকবাদেই নীচেয় নেমে এল। লঘু পদক্ষেপে নয়। সন্তর্পণে। রাধা ড্রইংরুমে নেমে এল। ইন্দ্রজিতের সম্মুখে গিয়ে বলল, 'এই দেখুন।'

ইন্দ্রজিত দেখলেন রাধার কোলে মাস-নয়েকের একটি সুশ্রী নধর শিশু। তাঁর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এল। প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই বললেন, 'বাঃ। ভারী সুন্দর তো।'

রাধার কণ্ঠে অদ্ভুত একটা সুর বাজল। বলল, 'এই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অমিল। সব মিলের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।'

ইন্দ্রজিত হেসে বললেন, 'শিশু কখনো অমিল হতে পারে? শিশু সৃষ্টির প্রতীক। আর সৃষ্টির আসল অর্থই হচ্ছে মিল।'

রাধা নীরব হয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্রজিত মুগ্ধচক্ষে শিশুকে দেখতে দেখতে বললেন, 'কার বাচ্চা?'

রাধা যেন হঠাৎ নিভে গেল। ইন্দ্রজিত রাধার এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিচলিত হলেন। গলা নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'মা বেঁচে নেই বুঝি?'

রাধা বলল, 'মরতে পারলে বেঁচে যেত।'

ইন্দ্রজিত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনো অঘটন ঘটেছে বুঝি?'

রাধা শিশুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'ও নিজেই একটা দুর্ঘটনা।'

'কেন?' প্রশ্ন করতে গিয়ে ইন্দ্রজিত থেমে গেলেন। তাঁর মনে একটা সন্দেহ এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সময় বুঝে দংশন করল। ইন্দ্রজিতের মুখভাবের সঙ্গে তাঁর গলার স্বর বদলে গেল। বললেন, 'এ শিশু কার? তোমার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?'

রাধা ম্লান হেসে বলল, 'আপনি থেকে তুমিতে নেমেছেন এই আমার লাভ।'

ইন্দ্রজিত রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'কথার জবাব দাও। এ শিশু কার?'

রাধা বলল, 'আবার কার? আমার।'

আশায় আকাঙ্ক্ষায় খণ্ডিত হয়ে ইন্দ্রজিত অনুনয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুষ্যি নিয়েছো বুঝি?'

রাধা মাথা নাড়ল।

'কুড়িয়ে পেয়েছো?'

ইন্দ্রজিতের প্রশ্নের জবাবে রাধা ফের মাথা নাড়ল।

কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্রজিত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অসহায়ের মতো রাধার ও শিশুর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। পরে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে নরমগলায় বললেন, 'রাধা। আমার কাছে তোমার কোন কথা গোপন থাকতে পারে না। খুলে বলো। আমাকে এরকম একটা নিদারুণ সন্দেহে ফেলে রেখো না।'

রাধা এ কথার জবাবে শুধু একটু হাসল। তার এ হাসির অর্থ বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিত কোনো ভরসাই পেলেন না। ধরা-গলায় বললেন, 'রাধা! আমি কল্পনায় তোমাকে নিয়ে একটা স্বর্গ তৈরী করার চেষ্টা করেছিলাম। এভাবে নিষ্ঠুর হাতে সে স্বর্গ ভেঙে দিও না।'

রাধার চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তুমি এর মা?'

রাধা মাথা নেড়ে সায় দিল।

'যেভাবে সচরাচর নারী সন্তানের মা হয় ঠিক সেভাবে?' ইন্দ্রজিত আশার একটা সংকীর্ণ পিচ্ছিল শিখরে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

রাধা এ কথার কোনো জবাব দিল না।

ইন্দ্রজিত অন্যপথে গিয়ে সঙ্কট এড়াবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'এ শিশুর পিতা কে?'

রাধার মুখ বিকৃত হল। সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

অজয় ঘোষ একটা ড্রেসিংগাউন কোনো রকমে গায়ে জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে সোজা ড্রইংরুমে এলেন। অত রাতে তাঁর ফ্ল্যাটে ইন্দ্রজিতের আবির্ভাবে তাঁকে বিশেষ বিচলিত মনে হল না। কিন্তু পরমুহূর্তেই ইন্দ্রজিতের চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টি লক্ষ্য করে একটু আতঙ্কিত হলেন। বললেন, 'বোসো। তোমাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত ঠেকছে! ব্যাপার কী?'

ইন্দ্রজিত ভগ্নকণ্ঠে বললেন, 'তোমার ঐ রাধা তো এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে!'

অজয় ঘোষ চুরুটে আগুন ধরিয়ে বললেন, 'ভয়ঙ্কর কাণ্ড?'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তুমি আদ্যোপান্ত সবই জানো।'

অজয় ঘোষ কৌতূহল প্রকাশ করে বললেন, 'অর্থাৎ!'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'গোড়াতেই তুমি অভিজ্ঞতার কথা তুলেছিলে। শি ইজ নট এ মাদার ইয়েট কথাটা বলেই খাটো গলায় একটা লেজুড় জুড়ে দিয়ে বলেছিলে, ইন এ সার্টেইন ওয়ে শি ইজ।'

অজয় ঘোষ সপ্রশংস দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতকে দেখতে দেখতে বললেন, 'অ্যামেজিং মেমরি। অকসফোর্ড হার্ভার্ড কি অমনি তিন তিনটে ডিগ্রি দেয়!'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'রাধা তো বেশ কিছুকাল সন্তানের মা হয়ে বসে আছে। বাপটি কে? তুমি?'

অজয় ঘোষ জিভ কেটে বললেন, 'ছিঃ ইন্দ্রজিত! হুইস্কি খাই, কখনো সখনো দু-চারটে সেকেলে সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করি বলে এতটা নীচে নেমে যাইনি নিজের সন্তানের দায়িত্ব মক্কেলের উপর চাপাবো।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তাহলে রাধার সন্তান কোত্থেকে এল?'

অজয় ঘোষ হাই তুলে বললেন, 'রাধা কী বলে?'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'ও সন্তানের মা, একথা ছাড়া কোনো কথাই বলতে রাজী নয়।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'রাধাকে তোমার ভালো লাগে?'

ইন্দ্রজিত এ কথার জবাব দিলেন না।

'যদি বিশেষ ভালো লেগে থাকে তবে ব্যাপারটা চেপেই যাও না? মালাবার হিলসয়ে কে খোঁজ করতে যাচ্ছে বাচ্চা কার?' অজয় ঘোষ ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করতে থাকলেন।

ইন্দ্রজিত পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল বসে রইলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'তুমি যেখানে চোট খেয়েছো সেখানে একাধিক প্রেমিক ইতি-পূর্বে আহত হয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সামলে নিয়েছে। তুমিও তাদের পথ ধরো।'

ইন্দ্রজিতের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে অজয় ঘোষ বললেন, 'বুঝেছি। তুমি তোমার নৈতিক সংস্কারের সঙ্গে কোনো রকমেই রাধার মাতৃত্বের ব্যাপারটা মানিয়ে নিতে পারছ না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র পথ খোলা আছে।'

ইন্দ্রজিত তেমন একটা আশ্বাস না পেলেও একটু জেগে উঠলেন।

অজয় ঘোষ শান্তকণ্ঠে বললেন, 'তুমি ঈশ্বর হয়ে যাও। অন্ততঃ হবার চেষ্টা করো।'

ইন্দ্রজিত আহতস্বরে বললেন, 'তামাসার একটা সীমা আছে।'

অজয় ঘোষ ইন্দ্রজিতের মন্তব্যে কর্ণপাত না করে বললেন, 'ঈশ্বর হয়ে যাও। এক লাফে নৈতিক সংস্কারের উপর উঠে যাবে। তখন মনে হবে তুমি রাধার সব। রাধা, তার সন্তান তোমারই এক একটা প্রকাশ। তখন দুঃখ পাওয়া দূরের কথা, পিতৃত্বের মাতৃত্বের প্রশ্ন তুচ্ছ মনে হবে।'

ইন্দ্রজিত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অজয় ঘোষ বললেন, আমাকে লোকে অর্থলোভী বিলাসী ব্যারিস্টার বলে জানে। কিন্তু আজীবন, অন্ততঃ মনেপ্রাণে ব্যারিস্টার হবার পর থেকে সমানে ঈশ্বর হবার সাধনা চালিয়ে চলেছি। না হলে মক্কেলদের পাপপুণ্যে বোঝা কেবল কয়েকটা সোনারুপোর চাক্তির বিনিময়ে মাথায় বইতে পারতাম না।'

হঠাৎ শোবার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। অজয় ঘোষ টেলিফোন ধরতে গেলেন। আধ মিনিট না যেতেই ড্রইংরুমে শশব্যস্তে ফিরে এলেন। বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে। রাধা বিষ খেয়েছে।'

মিনিট পনেরোর ভিতর ইন্দ্রজিতকে নিয়ে অজয় ঘোষ রাধার ড্রইংরুমে ঢুকলেন। বয়বেয়ারাদের শুকনো মুখ দেখে ইন্দ্রজিতের বুক অসাড় হয়ে গেল। জোর করে ইন্দ্রজিতকে একটা সোফায় বসিয়ে অজয় ঘোষ কয়েকটা লাফে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। ইন্দ্রজিত বসে বসে তাঁর জীবনের অবিশ্বাস্য এক দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

কয়েক মিনিট বাদে অজয় ঘোষ ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচেয় নেমে এলেন। তাঁর কোলে রাধার সন্তান। ইন্দ্রজিতের চোখের নীরব প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'হেভি ডোজ খেয়েছিল। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিছুতেই রাধাকে বাঁচানো গেল না।'

মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে অজয় ঘোষের কথা শুনে ইন্দ্রজিত নিজের ভিতর অনুভব করলেন।

ম্লান হেসে অজয় ঘোষ বললেন, 'রাধা তো মরে বাঁচল। কিন্তু সমস্যা তো পুরোপুরি মিটল না। তার সন্তানকে তো রেখে গেল। একে মানুষ করা, এর চলনসই একটা পিতৃপরিচয়েব ব্যবস্থা করা, কম হাঙ্গামার ব্যাপার নয়।'

সোফায় বসে শিশুকে অপটুহাতে আদর করতে করতে অজয় ঘোষ বললেন, 'রাধার শেষ ইচ্ছেটা ডাক্তারকে বলে গিয়েছে। কিন্তু সে ইচ্ছাপূরণ সম্ভব নয়।'

ইন্দ্রজিত উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'রাধার ইচ্ছাপূরণ করতে গেলে তার সন্তানের ভার তোমাকে নিতে হয়।'

ইন্দ্রজিতের দৃষ্টি চোখের জলে অস্পষ্ট হয়ে এল। উঠে এসে অজয় ঘোষের কোল থেকে রাধার সন্তানকে তুলে নিয়ে নিবিড় আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'আমি কিছুক্ষণ আগে আমার ড্রইংরুমে ঈশ্বর হবার কথা বলেছিলাম। গভীর দুঃখে যখন মানুষের অহঙ্কার অভিমান চূর্ণ হয়, ঈশ্বর হবার পথ খুঁজে পায়।'

ইন্দ্রজিতের চোখ বেয়ে টসটস করে কয়েক ফোঁটা জল রাধার সন্তানের মুখে পড়ল। সে অবাক বিস্ময়ে ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালো। ইন্দ্রজিতের মনে হল এ-ভাবেই বুঝি পরমবিশ্বাসে মানুষ তার কল্পনার ঈশ্বরের দিকে তাকায়।

অজয় ঘোষ চুরুটে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বললেন, 'আর একটা ইচ্ছের কথা রাধা বলে গিয়েছে।'

ইন্দ্রজিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অজয় ঘোষের মুখের দিকে তাকালেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'মেয়েদের বোঝা ভার। বিশেষ করে রাধার মতো মেয়েকে। জীবনের কোন মুহূর্ত কোন ঘটনাকে অমূল্য মনে করে, বুদ্ধির বিচারে বোঝা যায় না।'

অজয় ঘোষ চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, 'রাধার ধারণা এ জীবনের পরও একটা জীবন আছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার ধারণা ছিল তোমার সঙ্গে তার আবার দেখা হবে। তোমাকে তার একটা ইচ্ছার কথা বলতে বলেছে।'

ইন্দ্রজিত কোনো কথা বললেন না।

অজয় ঘোষ বললেন, ''রাধা বলে গিয়েছে সিঁড়ির মাথায় ও যে এসে দাঁড়াত, তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসত, তোমার ভাল লাগত। তার ইচ্ছা তুমি সিঁড়ির মাথার দিকে মুখ তুলে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে তার ধ্যান করবে। ঐ ধ্যানের জোরে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য আগের মতোই তোমাকে দেখা দিতে পারবে। একবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবে।'

ইন্দ্রজিত নিরুত্তর।

অজয় ঘোষ বললেন, 'জানি তুমি এ-রকম ব্যাপার বিশ্বাস করো না।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'তুমি করো?'

অজয় ঘোষ জবাবে বললেন, 'বিশ্বাস করি বলব না। কিন্তু সুরা দেবীর সাধনায় কখনো কখনো আধ্যাত্মিকতার তুঙ্গ শিখরে উঠে একটা জিনিস শিখেছি। কোনো কিছুই নিছক তুঙ্গের জোরে অবিশ্বাস করি না।

ইন্দ্রজিতের চোখে অজয় ঘোষের কথায় একটা ঘোর নেমে এল। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যে কারণেই হোক তাঁর দুচোখের পাতা ভারী হয়ে বুঁজে এল।

সিঁড়ির মাথায় একটা ছায়া ও শব্দের সাড়া পাওয়া গেল। প্রথম দিনের মতো। ইন্দ্রজিৎ চোখ খুললেন। দেখলেন, চোখে জল মুখে হাসি রাধা।

ইন্দ্রজিত সেই প্রথম লজ্জা সঙ্কোচ অবিশ্বাস কাটিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন। 'রাধা'।

রাধার দুচোখ থেকে গাল বেয়ে জলের ধারা নামল। সে নামতে গিয়ে থেমে গেল। কাঁপতে লাগল।

অজয় ঘোষ চেঁচিয়ে ইন্দ্রজিতকে বললেন। 'হাঁ' করে দেখছিস? ওর মূর্চ্ছা এসে গিয়েছে। পড়ে যাবে। উঠে গিয়ে ধরো।'

ড্রইংরুমে রাধার সন্তান ও ওরা তিনজন কাছাকাছি এসে বসলেন।

অজয় ঘোষ বললেন, 'এখন তোমাকে বিষয়টা খুলে বলা চলে। কারণ পরীক্ষায় তুমি প্রথমদিকে বিশ্রীরকমে ফেল মারা সত্ত্বেও ফাইনালে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ।'

ইন্দ্রজিত রাধার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা?'

অজয় ঘোষ বললেন, 'কিসের আবার? প্রেমের। রাধা তোমার চিঠি পড়ে বলেছিল, পাঁচ-পাঁচবার যে লোকটা প্রেম করতে গিয়ে ফেল মেরেছে তাকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করা চলে না। অগত্যা এই পরীক্ষার ব্যবস্থা হল।'

ইন্দ্রজিত বললেন, 'বুঝলাম না।'

অজয় ঘোষ বললেন, 'পরীক্ষার আয়োজন আগে থেকেই হয়ে ছিল। রাধার বাবা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটি জারজ সন্তানের জন্মের কারণ হয়েছিলেন। বাপের লজ্জা ঢাকবার জন্য রাধা ঐ সন্তানকে নিজের সন্তান বলে চালালো। রাধার বাবা বেঁচে থাকলে রাধাকে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। আমিও দিয়েছিলাম। পিতার দায়িত্বও নিতে চেয়ে ছিলাম। কিন্তু রাধা শুনতে চায়নি। এখন অবশ্য বিষয়টা একা রাধার উপর নির্ভর করছে না। তুমি যদি সম্মত না হও—'

ইন্দ্রজিত রাধার কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ধরা গলায় বলল, 'একটা বিষয়ে রাধা আমার উপর ঘোর অবিচার করেছে।'

রাধা ইন্দ্রজিতের দিকে অশ্রুপূর্ণ চোখে তাকালো।

ইন্দ্রজিত অজয় ঘোষের দিকে চেয়ে বললেন। 'রাধার বিষ খাওয়ার ব্যাপার তুমি নিপুণ হাতে আগাগোড়া সাজিয়েছিলে। কিন্তু আমি তো সম্পূর্ণ একা। যদি বিষ খেয়ে বসতাম? কিম্বা অন্য কোনো উপায়ে আত্মহত্যা করতাম?'

রাধা গভীর কণ্ঠে বলল, 'তুমি তা পারবে না ইন্দ্রজিত। মৃত্যুকে চাইবার আগে আমাকে চাইতে। কারণ তোমার কাছে আমি মরণের চেয়েও বড়। তাই না—!'

আজকের নায়ক ঃ শমিত ভঞ্জ

খান পনেরো বাংলা, দুখানা হিন্দী ছবি হাতে, কোনোটার কাজ শেষ, কোনোটার চলছে, শীগ্‌গিরই রিলিজ পাবে কোনো কোনোটা, কিন্তু নিজে যে কবে নিত্য সুটিংয়ের রুটিন বাঁধা জীবন থেকে একটু রিলিজ পাবেন। সেকথা বাংলা ফিল্মের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত নায়ক শমিত ভঞ্জ বলতে পারলেন না। এই দেখুন না, বোম্বে থেকে ফিরেছি হপ্তাখানেক, এর মধ্যে একটি দিনও রেস্ট পাইনি। সমানে সুটিং করে যাচ্ছি। এই লটের কাজ শেষ হবে ১২ এপ্রিল। তেরো তারিখই চলে যাব বোম্বে। ফিরব উনিশে। এসেই বেরিয়ে পড়ব আউটডোরে তোপচাঁচি। ফিরব ৫ মে। আবার যেতে হবে বোম্বে, পাঁচ কি ছ তারিখ। আউটডোর শেষ করেই কলকাতায় ফিরব. উনিশ থেকে দোসরা জুন পর্যন্ত একটানা ইনডোরের কাজ। তেসরা আবার যাব বোম্বে, ওখানে ফিফটিনথ অব্দি ডেট দেওয়া আছে। পরদিনই আবার কলকাতায় ফিরতে হবে—ইনডোরের কাজ আপ টু থার্টিয়েট। তারপর আর মনে নেই। ডায়েরী দেখতে হবে।

প্রায় এক বছর ধরে সমানে এই এক রুটিন ফলো করে যাচ্ছেন যে মানুষটি, তাঁর মুখে চোখে কোথাও কিন্তু কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। পুরো ব্যাপারটাই যেন মস্ত একটা স্পোর্টস। এই স্পোর্টসে যেদ ইভ্‌লেস বোধহয় কম্পিটিটররা হাঁপিয়ে ওঠেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েন—চূড়ান্ত ব্যস্ততাই এই খেলার চূড়ান্ত সাফল্য। সেই সাফল্য আজ শমিতের হাতের মুঠোয়। জিজ্ঞাসা করলাম কেমন করে. কোথা থেকে আজকের এই অবস্থায় এসে পেঁছুলেন?

পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি কাঠামোটার পঁচাত্তর কে-জি ভার হাল্কা হাসির সূক্ষ্ম রেখার চাল্লিশ ইঞ্চি বুকের পাটা ছুঁয়ে পাতলা চাপা ঠোঁটের কোণায় কোণায় ছেঁচে উঠেই মিলিয়ে গেল ঃ চলুন না স্টুডিওতে—যেতে যেতেই সব কথা হবে। কথা ছিল আজ সকাল দশটায় স্যুটিং শুরু হবে। কিন্তু কাল হঠাৎ প্যাক আপ হয়ে গেল। আজ আটটায় টাইম দিয়েছে। এদিকে আপনাকেও আসতে বলেছি।

রীতিমত বিব্রত লাগছিল কর্মব্যস্ত মানুষটাকে ভোরবেলা স্নান সেরে হাল্কা আকাশী নীল চাপা প্যান্টের ওপর লাল সাদা ডোরা কাটা হাওয়াই শার্টে দেখাচ্ছিলও চমৎকার। বললাম, তাই চলুন।

ইন্দ্রাণী পার্কের বাড়ীর সামনেই রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল চৌষট্টির মডেলের ঝকঝকে কালো ফিয়াটখানা। সরু গলি গিয়ে মিশেছে চওড়া গলিতে। গলি থেকে রাজপথ কয়েক শ'গজ। পথটুকু গাড়ি না ঘুরিয়েই স্বচ্ছন্দে ব্যাক ড্রাইভ করলেন শমিত। সেই সঙ্গে উল্টে চললেন অতীত জীবনের পাতাগুলো।

তমলুকের বিখ্যাত ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী প্রীতিময় ভঞ্জের তিন ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে সেজ সমিতের জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চতুর্থ বছরে। ছেলেবেলা থেকেই প্রচণ্ড ডানপিটে। লম্বা চওড়া চেহারাটার দৌলতে অ্যাপারেন্টলি যে কোন দুঃসাধ্য কাজেই ক্যাজুয়ালি লীড দিত শমিত। সঙ্গে থাকত পাড়ার বন্ধু কমল (গুহ) আর দকু (হরিদাস সিংহ)।

ছেলেগুলোর এনার্জি যাতে মাথা ফাটাফাটিতেই না ফুরিয়ে যায়, তাই কল্পতরু ব্যায়াম সমিতির ট্রেনার দুর্গাদা ওদের ডেকে এনে ক্লাবে ঢুকিয়ে নিলেন। বেঞ্চপ্রেস, কারলিং, ডাম্বলিং, রাইজিং-এর সঙ্গে সঙ্গে কে পি বোস, যাদব চক্রবর্তী, রেন অ্যান্ড মার্টিনের চর্চা চলতে লাগল। সেই সঙ্গে স্কুলের এক একটা ধাপ উত্তরোনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটা উপসর্গ হাঁকিয়ে বসল শমিতের মাথায়—নাটক। পাড়ায় দলবেঁধে নিত্য নতুন নাটক করতে লাগল। স্কুলেও তাই। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ট্রেণ ভাড়া সম্বল করে চলে আসত কলকাতায়—মিনার্ভা, স্টার, রঙমহলের নতুন নাটক দেখতে। ভাল লাগলে সেই নাটকই আবার নিজেরা করত তমলুকে।

চলছিল বেশ। হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্টে সব গেল উল্টে-পাল্টে। ঠাকুরদা, ঠাকুমা, মা, বাবা, বোন ও দাদাদের সঙ্গে শমিতও যাচ্ছিল মামাবাড়ী। সেবারই ম্যাট্রিক পাশ

করেছে। ছাপ্পান্ন সাল। ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের ঠেলায় কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল, তা টেরই পেল না শমিত। শুধু দেখল ঠাকুর্দাকে এক হাতে ধরে দরজার মুখে ঝুলছিল। পাশকুঁড়া স্টেশন ছাড়িয়ে সবে স্পীড নিয়েছে ট্রেন, সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কা খেয়ে লাইনের ধারেই গড়িয়ে পড়ল শমিত।

তারপর তিন বছর কেটেছে হাসপাতালে। মাথায় দারুণ লেগেছিল। লম্বা চুলের বোঝা সরিয়ে মাথার পেছনে সেই কাটা দাগটা দেখালেন। রক্তে সর্বাঙ্গ ভেসে গিয়েছিল। বাঁচার চান্সই নাকি ছিল না।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর এক নতুন উপসর্গ লক্ষ্য করা গেল ওর মধ্যে। কারণে অকারণে হঠাৎ হঠাৎ দারুণ রেগে ওঠে। তখন ওর জ্ঞান থাকে না। সে সময়ের একটা ঘটনার কথা বললেন শমিত।

কয়েকদিন ধরেই ছোট বোন কৃষ্ণা বলছিল, কলেজে কে নাকি একটা ছেলে ভীষণ ডিসটার্ব করছে। শুনেই চটে গিয়েছিল শমিত। একদিন স্ট্রেট কলেজে গিয়ে ছেলেটিকে শাসিয়েও এল। ফল হোল উল্টো। কৃষ্ণার বন্ধুরা এসে জানাল—দল পাকিয়ে ছেলেটা এখন সবাইকেই বিরক্ত করছে। আবার একদিন ওয়ার্নিং দিল শমিত। ওয়ার্নিং-এর রেজাল্ট হোল এই যে একদিন দুপুরে খেতে বসে খবর পেল ওরা নাকি সব আসছে—শমিতকে মারবে। পরের ইতিহাস তপনবাবুর 'আপনজনে' ডিটেলসে পাওয়া যাবে। দকু, কমল আর শমিত তিনজনে মিলে গোটা দলটাকে সেদিন মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল।

ছেলের রকম সকম দেখে বাবা গিয়েছিলেন রীতিমত ঘাবড়ে। তাই বেঁধে রাখার জন্য পারিবারিক ব্যবসায় ওকে

টেনে নিলেন। কিন্তু শমিতের মন বসল না। টাকা আনা পাইয়ের হিসেবে ক্লান্ত হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কের কলেজের খাতায় নাম লেখাল—ঝাড়গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পলিটেকনিকে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

কলেজে নাম লিখিয়েও কিন্তু নাটকের খাই কাটেনি। রেগুলার নাটক করে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আড়াই বছর কেটে গেল। বাষট্টি সাল শেষ হয় হয়। মাস পাঁচেক বাদেই ফাইন্যাল পরীক্ষা। একদিন হঠাৎ ওয়ার্কশপে কাজ করতে করতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল শমিত। ঝাড়গ্রাম ছেড়ে তমলুকে ফিরে এল। আর কলেজে ফিরে যায়নি।

কলেজ ছাড়া ইস্তক নাটকের খাই আরো বেড়ে গেল। শুধু নিজেরা করেই ক্ষান্ত হয় না, মাঝে মধ্যে কলকাতার দল ডেকে এনে যাত্রা, থিয়েটার করায় তমলুকে। তবু অতৃপ্তি মেটে না।

শেষে একদিন কাউকে গোপন কথাটা না জানিয়েই চলে এল কলকাতা। কলকাতা এসে সবিতাব্রত দত্তের বিখ্যাত রূপকারে জয়েন করার জন্য অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে গেল। দিন কয়েক বাদেই চিঠি এল রূপকার থেকে জয়েন করার জন্য। এবার পার্মানেন্টলি দেশের পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে এল শমিত। এসে উঠল কলেজ স্ট্রীটের প্রেসিডেন্সী বোর্ডিংয়ে।

একটানা পাঁচ বছর মেসে, বোর্ডিংয়ে, বন্ধুর বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসাবে কেটেছে শমিতের। খরচের সিংহভাগটুকু বাবাই জুগিয়েছেন। বাকীটুকু অ্যামেচার দলে 'খেপ' খেলে নিজেই উপায় করেছে শমিত।

পাঁচ বছর একে একে 'ব্যাপিকা বিদায়', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী', 'কালের যাত্রা' ও 'অচলায়তনে' পার্ট করেছে শমিত। তিল তিল করে নিজেকে গড়ে তুলেছে। সহজাত গানের গলা ছিল। রূপকারে এসে শিখল কি করে অভিনয় করতে হয়। অশিক্ষিতপটুত্ব নিপুণ শিক্ষকের তালিমে দিন দিন পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগল।

এরই মধ্যে একদিন দলের দাদা বঙ্কিম ঘোষের সঙ্গে দু নম্বর (নিউ থিয়েটার্স) গিয়েছিল স্যুটিং দেখতে। সাতষট্টি সাল। তপন সিংহের সহকারী বলাই সেনের ছবি 'সুরের আগুন'-এর স্যুটিং চলছিল। বঙ্কিমদা ছিলেন একটা ছোট্ট রোলে। স্যুটিংয়ের ফাঁকে বঙ্কিমদাকে বলল—একটা চান্স হয় না?

বঙ্কিমদা বলাইদাকে আমার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। সেই সুবাদেই জীবনে প্রথম ফিল্মে নামার চান্স পেলাম। বলতে গেলে একস্ট্রার পার্ট। রাধামোহন ভট্টাচার্য গান গাইছেন, সঙ্গে তবলা সংগত করছি আমি। একদিনের কাজ। পেয়েছিলাম পনেরোটা টাকা। আমার ফিল্ম জীবনের প্রথম উপার্জন

বলাইদাকে বলেছিলাম আবার ছবি করলে, যেন একটা চান্স দেন। মাস কয়েক বাদেই চান্স এল। এবার 'কেদার রাজায়।' আউটডোর করতে দলবল নিয়ে বলাইদা তমলুকে গিয়েছিলেন, উঠেছিলেন আমাদের বাসায়। নিয়ে গিয়েছিলেন রবি বসু। রবিদা আমাদের তমলুকেরই লোক।

তমলুকে আমায় দেখে বলাইদা, তপনদা দুজনেই চমকে গিয়েছিলেন : তুমি এখানে? জবাবে বলেছিলাম, আপনারা আমাদের বাসাতেই উঠেছেন। ঐ ছবিতেও একটা কাজ জুটে গেল। একদিনের কাজ। পুলিশ ইন্সপেক্টরের রোল।

প্রথমদিন স্টুডিয়োয় স্যুটিং করতে গিয়ে কোন অস্বস্তি বোধ করিনি। কিন্তু এবার দেশে নিজের পাড়ায় পরিচিতদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি রীতিমত নার্ভাস ফিল করছিলাম। বলাইদা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন। কপাল ভাল একটা টেকেই সটটা উৎরে গেল। হাতে পেলাম পঁচিশ টাকা।

ব্যস, আর কোন কাজ নেই। কলকাতায় ফিরে রোজ দুপুরে দু নম্বরে আড্ডা মারতে যাই। সন্ধ্যেবেলায় নাটকের রিহার্সাল দিই। এমনি সময় একদিন তপনদা আমায় ডেকে বললেন—আমার নতুন ছবিতে তোমাকে একটা বড় রোল দেব।

আমাকে দিয়ে ডায়ালগ পড়ালেন। তারপর ডায়ালগগুলো দিয়ে বললেন, সড়গড় করে নিতে। আমাকে না কি টেস্ট দিতে হবে একটা। স্টুডিও পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ততদিনে মেক আপ টেস্ট, ভয়েস টেস্ট কথাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছি। কিন্তু আমিও যে কোনদিন টেস্ট দেওয়ার সুযোগ পাব, একথা ভাবিনি।

দিলীপদা (অভিনেতা দিলীপ রায়), বলাইদাকে গিয়ে ধরলাম—দেখিয়ে দিন কিভাবে বললে এই ডায়ালগগুলো উতরোবে। ও'রা আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন সেদিন। কপাল ভাল কোন টেস্ট দিতে হোল না। একবারেই চলে গেলাম আউটডোরে, ভুটানে। সঙ্গে ছিলেন অশোককুমার ও বৈজয়ন্তীমালা। 'হাটেবাজারে' আমি করেছিলাম মোটর মেকানিক অমলের রোল।

বাই দি বাই বলে রাখি, ভুটানে যাওয়ার আগে দীর্ঘদিন আমি জণ্ডিসে ভুগেছি। শুনেছি অনেকদিন আমায় স্টুডিও পাড়ায় না দেখে তপনদা নাকি আমাকে নেবার বাদ দেওয়ার কথাই ভেবেছিলেন।

বারোদিনের কাজ করেছিলাম, 'হাটেবাজারে।' কেমন করেছিলাম, সেকথা তো দর্শকরা জানেনই।

এক নম্বরের (নিউ থিয়েটার্স) মেক-আপ রুমে বসে কথা হচ্ছিল। মেক

আপের আয়নার সামনে টেবিলে খাতা ফেলে নোট করছিলাম, পাশেই রঙিন চাদর মোড়া চৌকিতে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে শমিত আমার একটার পর একটা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেছে এর মধ্যে। বার কয়েক মেক-আপম্যান এত্তেলা দিয়ে গেছেন। পরের সটেই শমিতকে চাই। এবার রেডি হওয়া দরকার। চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গা থেকে চাওয়াই শার্টটা খুলে ফেলে একটা হাতকাটা গেঞ্জি চেয়ে নিলেন শমিত। তারপর আমার পাশেই আয়নার সামনে আর একটা চেয়ারে বসে স্পঞ্জ দিয়ে মুখটা ভেজাতে ভেজাতে নিজেই এবার প্রশ্ন করলেন, আর কি জানতে চান বলুন?

অমল কি করে হেনো হোল?—প্রশ্নটা করেই ওর মুখের দিকে সরাসরি তাকালাম। গালে সাবান মাখানোর ব্রাশের মত স্পঞ্জটা ঘষতে ঘষতে প্রশ্নটা শুনেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আটষট্টিতে আমার বিয়ের সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে। তপনদাকে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলাম কার্ড নিয়ে। কার্ডটা দিয়ে হাসতে হাসতে তপনদা বললেন—তাহলে তো আর তুমি পারবে না?

আমি জানতামই না যে কি পারব না? শুনলাম 'আপনজনে' ঐ রোলটার জন্য আমায় ভেবে রেখেছিলেন তপনদা। বললামঃ নিশ্চয়ই পারব। আপনি চান্স দিয়ে দেখুন।

মেক আপ টেস্ট হোল। অনেক অনেক দিন ধরে রিহার্সাল চলল। তারপর গেলাম ফ্লোরে। মনে আছে প্রথমদিন রবিদার (রবি ঘোষ) সঙ্গে আমার স্যুটিং ছিল।

'আপনজনে' কাজ করতে করতেই নতুন অফার পেলাম দীনেন গুপ্তর 'নতুন পাতা' ও অজয় করের 'পরিণীতা।'

আটষট্টি, উনসত্তর দু বছরে যে চারটে ছবি করলাম চারটেই হিট। তার মধ্যে 'হাটে-বাজারে' ও 'আপনজন' করল গোল্ডেন জুবিলী। 'নতুন পাতা' ও 'পরিণীতা' সিলভার জুবিলী। তবু আটমাস আমি কোন কাজ পাইনি। চুপচাপ বেকার বসে-ছিলাম। রাস্তায় বেরোলে সবাই 'হেনো' 'হেনো' বলে পাগল করে তুলত। কিন্তু কেউ জানত না যে 'আপনজনের' হেনোর মতই আমিও তখন বেকার।

উনসত্তর শেষ হয় হয়। একদিন দুনম্বরে রবিদা (রবি ঘোষ) বললেন, বুবু (শমিত ভঞ্জের ডাক নাম) তাকে মানিকদা (সত্যজিৎ রায়) খুঁজছেন। আপনাকে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না যে, খবরটা পেয়ে সেদিন কী ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম। তক্ষুনি গিয়ে ফোন করলাম মানিকদাকে মানিকদা বলছেন?

—কে?

—আমি শমিত।

—আরে তুমি তো ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ।

মানিকদার বাসা আমি চিনতাম না। শুভেন্দুদা নিয়ে গেলেন। মনে আছে আমাকে দেখে মানিকদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আও, বইঠহ। 'অরণ্যের দিন রাত্রিতে' আমি সিলেকটেড হলাম 'হরি'র রোলে।

তপনদার কাছে নর্মাল অ্যাকটিংয়ের যে ধারায় আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, মানিকদার কাছে সেটাই লেগে গেল কাজে। আসলে ব্যাপার কি জানেন, এ দুজনের কাছে অ্যাকটিং করতে হয় না—ওরাই করিয়ে নেন। যেটুকু দেখিয়ে দেন, তাই যদি করে উঠতে পারি তো এনাফ।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শমিত। মুখে রং মাখা সারা। খুব হাল্কা রং। হাত বাড়িয়ে মেক-আপম্যানের কাছ থেকে একটা ফুল স্লীভ টেরিলিন সার্ট চেয়ে নিলেন। হলুদ টাই বাঁধলেন। আকাশী নীল প্যাণ্ট পরলেন। স্যাণ্ডেল সরিয়ে পা জোড়া চকচকে সু জোড়ায় সেঁধিয়ে নিলেন। তারপর বার কয়েক আয়নায় মেক-আপটা দেখে নিয়ে বললেন, 'অরণ্যের দিন রাত্রির' পর থেকে হাতে প্রচুর কাজ এসে গেছে। একটানা করেও ফুরোতে পারছি না। ইন দা মিন টাইম 'বন জ্যোৎস্না', 'রূপসী' 'প্রথম কদম ফুল' 'সোনা বউদি' রিলিজ করেছে। সামনে আরো অনেকগুলো পর পর রিলিজ করবে। আয়নার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন শমিত। সেটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কলম বন্ধ করে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আর তখুনি প্রশ্ন করলাম পার ছবি কত পাচ্ছেন অ্যাভারেজে?

হেসে জবাব দিলেন শমিতঃ বাংলা ছবিতে পাই পনেরো হাজারের মত। তবে বন্ধু-বান্ধবদের রিকোয়েস্টে অনেক সময় আরো কমে কাজ করতে হয়। হিন্দীতে পাচ্ছি ডবল।

কথা বলতে বলতে দুজনে এসে ফ্লোরের চোরা দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ভেতরে লাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছে। আমাকে নমস্কার জানিয়ে ভেতরে চলে গেলেন শমিত। লক্ষ্য করলাম ফ্লোরে পা দেওয়ার আগে সুট-বুট পরা লম্বা চওড়া দেহটা সমকোণে বেঁকে গিয়ে ফ্লোরের ধুলো মাথায় তুলে নিল। পরক্ষণেই আজকের নায়ক ফ্লোরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। বাইরে শেষ চৈত্রের ঠা-ঠা পোড়া রোদ। দু-একটা গাড়ি স্টুডিওর ফুলবাগানের অপভ্রংশের বাঁশের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। হতশ্রী, দারিদ্র্য পীড়িত, ছেঁড়া জামা কাপড়ে লজ্জাটুকু ঢাকা দিয়ে টেকনিসিয়ানরা ছোটাছুটি করছেন। দূরে গেটের সামনে পাহারাদার পুলিশ দাঁড়িয়ে। এই ভূমিতেই জন্ম নিয়েছেন কালকের নায়ক—আজকের নায়কও জন্মেছেন এই ভূমিতেই।

—সন্ধিৎসু

সম্পাদক ঃ শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ। লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার রক্ত-স্রোতের উপর জেগে আছে তার অতন্দ্র প্রতিজ্ঞা—স্বাধীনতা। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা তাকে টলাতে পারে এ শপথ থেকে, কেননা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এক মন্ত্রে উজ্জীবিত, এক লক্ষ্যে নিবেদিত—স্বাধীনতা।

•

বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার সাধনা একদিনে পূর্ণ হয়নি। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তদান থেকে শুরু ক'রে প্রায় দু'দশক ধরে অগণিত কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা তৈরি করেছেন তার মাটি। আজ তাই সেখানে সাংস্কৃতিক জাগরণ আর স্বাধীনতার কামনা একাকার। এর প্রেরণা ওর আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে দিয়েছে পরম লগ্নের দিকে।

•

বাংলাদেশের আজ সেই কালান্তরের মহাক্ষণে আমাদের ভাষার দোসর আত্মার সহোদর ওপার বাংলার সাহিত্যকৃতি ও চিন্তা-জগতের পরিচয় বহন করে আনবে অমৃত তার একাদশ জন্ম-দিনের নববর্ষ সংখ্যায়। এই সঙ্গে থাকছে সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি এবং সাম্প্রতিক তথ্য ও অজস্র সংবাদচিত্র।

বেরোবে ৭ মে ॥ দাম দু টাকা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-তিন

(১)

কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা।

রাজপুরীর মণিকুট্টিম নামে প্রাসাদের অলিন্দে সন্ধ্যাবেলায় বসুদেব অহিফেন নেশায় বিভোর হয়ে একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। একাকী তবু একা নয়, যেহেতু নেশার ঝোঁকে নিজেই পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ করছিলেন, যুক্তিতে ফাঁক ছিল না, তবে মাঝে মাঝে বাক্যে যে ফাঁক পড়ছিল সেটা অহিফেন প্রসাদাৎ।

মদ্যপান অতিশয় কদাচার। আর তাইতেই তো রাজার নিষেধ। ধন্য ধন্য রাজা। (হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়লেন) কিন্তু অহিফেনের উপর রাজার দৃষ্টি পড়ে নি তাই রক্ষে (আবার ঝিমকানি)। সৃষ্টির আদিতে কারণ সমুদ্র, তারপরে পৃথিবী, আগে মদ্য তারপরে—হাঁ তুমি কে?

চমকিয়ে উঠলেন বসুদেব। চমকাবার হেতু এই যে এ সময়টিতে কারো আসবার আদেশ ছিল না তাঁর কাছে। সঙ্গদোষে অহিফেন নেশার তাল কেটে যায়, অহিফেনী চিরনিঃসঙ্গ।

কে কে তুমি?

আমি তারা।

তারা তো সাতাশটি, তার মধ্যে কোনটি?

আমি আকাশের তারা নই।

তবে কি উদারা মুদারা তারা?

আহা সে তারাও নই।

তবে কোন্ তারা তাড়াতাড়ি বলে ফেল, সময় নষ্ট করো না।

একদিন তো আমি আসলে সময় নষ্ট হতো না।

তখন তো চাঁদ অহিফেন ধরি নি, তাই বৃথা অনেক সময় নষ্ট করেছি। শিগগির বলে কে তুমি?

চিনতে না পারলে আর বলে কি লাভ? এবারে বক্তার গলা ধরা-ধরা।

দেখো, বাপু সত্যি কথা বলতে কি, এই সময়টিতে কেউ আমার নয় আর আমি কারো নই।

অন্য সময়ে যে আসতে দেয় না প্রহরী। এখন এলে কি করে?

প্রহরীও যে অহিফেনের নেশায় ঢুলছে।

বাহবা, বাহবা, প্রহরীর বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে। তা যখন এসেই পড়েছ আর গোলমাল করে নেশাটাও ফিকে করে এনেছ তখন বলেই ফেলো ব্যাপার কি?

চিনতে না পারলে কি বলবো! একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে ক্ষতি কি?

এতক্ষণ পরে বসুদেব জ্ঞানচক্ষু খোলা আনা উন্মীলিত করে তাকালেন এবং তাকিয়েই বলে উঠলেন, ও তুমি তারা। তা এতক্ষণ বলো নি কেন? ব'সো, ব'সো।

না বসবো না, দাঁড়িয়েই বলে যাই যা বলতে এসেছিলাম।

আবার কি হল?

নূতন কিছু হয় নি, যা হওয়ার তা অনেক আগেই হয়েছে।

তবু শুনি।

আমার জরার কি করলে শুনি।

ছেলেটার নাম জরা রেখেছ নাকি? তা বয়স কত হল।

এইবার অঘ্রানে চার বছর পূর্ণ হবে।

বলো কি, এরই মধ্যে চার বছর হয়ে গেল?

তা হবে না! বয়স তো বাড়ে বই কমে না।

সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

আপনিই তো আনতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

তা বটে। সব কথা আবার মনে থাকে না।

সে কি রাজার ছেলে হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে?

আরে রাজার ছেলেরাই তো বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শোন নি পাণ্ডু রাজার ছেলেরা বারো বারো চব্বিশ বছর বনে বনে ঘুরে বেড়ালো, আজই না হয় রাজগী পেয়েছে।

তাদের সবাই রাজার ছেলে বলে জানতো. তাই মনেও থাকত কিন্তু আমার জরাকে তো জানে কাঙালের ছেলে বলে।

সময় হলেই জানবে, শুধু রাজার ছেলে বলে নয়, একেবারে রাজা বলে। ও হবে নিষাদদের রাজা।

অর্থাৎ ব্যাধ-বোয়াড়দের রাজা। এ কি একটা বিচার হল। বাসুদেবের মতো জরাও তো আপনার পুত্র, তবে দুয়ে এমন প্রভেদ কেন?*

* শূদ্রাণী স্ত্রীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে জরার জন্ম। হরিবংশ, ২।১০৩।২৭

তারা অনেক আশা করে এসেছিল, এখন বসুদেবের শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্য শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। আজ তার সমস্ত আশার সমাধি। অনেক দিন অনেক বার জরার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিনতি করবার উদ্দেশ্যে সে বসুদেবের কাছে এসেছে, প্রত্যেকবার হবে, হবে, ব্যবস্থা করে দেব শুনেছে। আজ সেটুকু ভরসাও অন্তর্হিত হল।

যুবতী তারা রাজবাড়ীর দাসী ছিল। বর্ণে সে শূদ্রাণী। তার গর্ভে বসুদেবের ঔরসে একটি পুত্রের জন্ম হয়, সে আজ চার বছর আগেকার কথা। কাজেই শিশুটি বাসুদেবের বৈমাত্র ভাই। শিশুটির জন্মের পরে বসুদেব তার মাকে বোঝায় তার আর রাজবাড়ীতে না থাকাই উচিত, লোকে তাকে দাসী মনে করবে অথচ সে রাজপুত্রের মাতা। আবার ছেলেটি বড় হয়ে লোকে তাকে দাসীপুত্র মনে করবে অথচ সে বাসুদেবের বৈমাত্র ভ্রাতা। অবোধ রমণী সহজেই এই স্তোকবাক্য বিশ্বাস করে। বিশেষ তার মনে আত্মসম্মানবোধ কিছু প্রবল হওয়াতে সে এভাবে রাজবাড়ীতে বাস করতে অসম্মত হয়ে নগরের বাইরে বনের ধারে কুটিরে বাস করতে থাকে।

সে মাঝে মাঝে গোপনে এসে বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুত্রের জন্য একখানি গ্রাম ভিক্ষা করতো, আর রাজা-রাজড়াদের অভ্যস্ত রীতিতে একখানি গ্রামের বদলে পঞ্চগ্রাম দানের প্রতিশ্রুতি পেতো। যতই দিন যেতে লাগলো তারার আশা-ভরসা ততই ক্ষীণতর হয়ে আসতে থাকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করে নেবার আশায় এসেছিল, কিন্তু যা শুনলো তাতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া আর উপায় রইলো না।

তারা বসুদেবের উপরে ভরসা করে বসে না থেকে পুত্রকে সাধ্যানুসারে প্রতি-

পালন করতে লাগলো। সাধোর মধ্যে বন থেকে কাটকুটো কুড়িয়ে বিক্রয়, ফলমূল আর শাক-সব্জি দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি। তবে সে একটি কাজ করলো, জরাকে ছেলে-বেলা থেকেই তীর-ধনুক চালনা করতে উৎসাহিত করলো, ভাবলো আর কিছু না হোক ব্যাধবৃত্তি করে জীবিকার্জন করতে পারবে। ব্যাধের ছেলেদের সঙ্গে মিশে ক্রমে শিকারে তার হাত পাকা হয়ে উঠল।

মাঝে মাঝে পুত্র জিজ্ঞাসা করতো, মা, আমার বাবা কোথায়?

মা হাত দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিত। পুত্র কি বুঝতো জানি না। মা কেন আকাশের দিকে দেখাতো তাও জানি নে, হয়তো আকাশস্পর্শী রাজ-বাড়ীর অট্টালিকার কথা তার মনে পড়তো।

আজ রাজবাড়ী থেকে ফিরে এসে বুঝলো বসুদেবের আশা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য—তখন সে রীতিমতো জরাকে নিপুণ ব্যাধ করে তোলবার দিকে মন দিল। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে বসু-দেবের উক্তি তার মনকে প্রভাবিত করেছিল, জরা হবে নিষাদদের রাজা। তবে সেই রাজগীর দীক্ষাই তাকে দেওয়া যাক না কেন।

বছর পনেরো-ষোল বয়সেই জরা রীতিমতো পাকা তীরন্দাজ হয়ে উঠল, বাঘ ভালুক বরাহ এক তীরের ঘায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলতো সে। তার বীরত্বের খ্যাতি এমন ছড়িয়ে পড়লো—রাজ্যের ব্যাধের ছেলেরা এসে তার নেতৃত্ব মেনে নিল। তারা মাঝে মাঝে ভাবতো হয়তো বসুদেবের কথাই সত্য হতে চলল, কালক্রমে সে ব্যাধদের রাজা হয়ে উঠবে। এই সময় একটি শূদ্রাণী-কন্যার সঙ্গে জরার বিবাহ দিল তারা। বিবাহের কিছুদিন পরে তারার মৃত্যু হল। জরা খুব কাঁদলো, তারপরে মায়ের সৎকার করলো, আর তারপরেই দলবল নিয়ে বের হয়ে পড়লো শিকারে।

(১০)

কি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলে কেন?

জরা নিরুত্তর।

কি হল, কথা বলো না কেন? এত বড় একটা সুসংবাদ শুনিয়ে দিলাম, একেবারে ব্যাধের পুত্র থেকে রাজপুত্র হলে, কোথায় মিষ্টান্ন খাওয়াবে তা নয় যেন শূলদণ্ডের কথা শুনলে। নাও ওঠো—এই বলে খট্যাস হাত ধরে টানলো জরার।

জরা উঠবার কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করলো না।

তবে বসে থাকো, আমি চললাম।

এবারে জরা মুখ তুললো, সেই আব-ছায়া অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না, দেখা গেলে মনে হত এক দণ্ডের মধ্যে এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে তার মুখের উপর দিয়ে, পাকা ইমারত ধসে পড়ে গিয়েছে।

কি সংবাদই না শোনালে। আমি শেষে কিনা ভাইকে হত্যা করলাম।

এই কথা শুনে খট্যাস আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু অবসর পেলো না, জরা বলে চলল, বাসুদেব আমার ভাই, আমি বাসুদেবের ভাই, তাকে কিনা শেষে বধ করলাম! এই বলে কপালে করাঘাত করতে লাগলো।

কেন তাতে ক্ষতি কি হয়েছে। যদু বংশের দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে থাকতেও অনুতাপ করছ।

কি দৃষ্টান্ত!

কি দৃষ্টান্ত শুধাচ্ছো! ভাই ভাইকে হত্যা করেছে, পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে, জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে হত্যা করেছে, যে যাকে সম্মুখে পেয়েছে হত্যা করেছে। রক্তের স্রোত নীল সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। আরও শুনতে চাও? ঐ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিনী লোক হানাহানি করে মরলো তারা কি ভাইবন্ধু বিচার করেছে? আর ঐ যে বাসুদেবের হত্যা তোমার প্রাণে এমন বেজেছে সেই বাসুদেবই তো এই হত্যার প্ররোচনাদাতা।

বাসুদেব প্ররোচনাদাতা!

হাঁ গো হাঁ। বাসুদেব বলো বাসুদেব, কৃষ্ণ বলো কৃষ্ণ, ভক্তির মাত্রা আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে ইচ্ছা করলে বলতে পারো শ্রীকৃষ্ণ। সেই বেটাই তো সব নষ্টের গোড়া।

কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে জরা।

অর্জুনের সারথি হয়ে বসুদেবের বেটা যখন রথ স্থাপন করলো কুরু-সৈন্যের সম্মুখে, তখন অর্জুন বলে উঠল, এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এদের মারতে হবে? এরা যে সবাই ভাই-বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, শালা-সম্বন্ধী। না বাসুদেব, এ-কাজ আমার দ্বারা হবে না। তখন বাসুদেব কি বলল জানো?

জরা মূঢ়ের মতো শুধায়, কি বলল?

বলল, কর্তব্যের অনুরোধে, ধর্মের অনুরোধে যুদ্ধ করো, মরলে তোমার কোন গ্লানি নেই। এরকম যুদ্ধ করাই ধর্ম, না করাই অধর্ম! বুঝলে?

না, বুঝলাম না। সেটা হল লড়াই, আর এটা চোরের মতো লুকিয়ে মারা, জন্তু-জানোয়ার মনে করে মারা, এ ভুলো গিয়ে—

দাঁড়াও, আগে ঐ কথাটুকুর জবাব দিয়ে নিই। অক্ষৌহিনী সৈন্য মুখোমুখি না হলে বুঝি লড়াই হয় না। তবে শৈরথ যুদ্ধটা কি? আর চোরের মতো লুকিয়ে মারা—জয়দ্রথকে কিভাবে মারা হয়েছিল? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে কিভাবে মারা হয়েছিল, অশ্বত্থামা যে ঘুমন্ত বালকদের হত্যা করেছিল—এসব তবে কি? ভাই জরা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আদ্যন্ত বিবরণ জানলে কোন হত্যায় আর মনে গ্লানি হয় না!

সব তো বুঝলাম কিন্তু মন যে মানে না।

তবে মনটা তোমার হাতছাড়া হয়েছে বুঝতে হবে। এর আগে কি কখনো মানুষ মারোনি?

মেরেছি বইকি!

তবে!

তারা তো ভাই নয়।

আবার ভাই! শুনলে তো ভাইকে মারাই সব মারার সেরা। নিজের ভাইকে না মেরে পরের ভাইকে মারলে বুঝি বীরত্ব হতো! আরে ছোঃ ছোঃ, সে তো ব্যাধ বোম্বাড়ের কাজ।

আমি ব্যাধ ছাড়া আর কি।

এতক্ষণ তবে তোমাকে কি শোনালাম, তুমি ব্যাধ নও, বোম্বাড় নও, তুমি রাজ-পুত্র, তুমি বসুদেবের পুত্র, বাসুদেবের ভাই! বংশে, রক্তে, জ্ঞাতিত্বে তোমার জুড়ি নেই ভূ-ভারতে।

কিন্তু পৃথিবী যে কেঁপে উঠেছিল, চাঁদে যে গেরণ লেগেছিল, সমুদ্র যে গর্জে উঠেছিল।

ওসব কিছুই হয়নি, শুধু তোমার মনটায় ভয়ে ছোবল মেরেছিল।

তাই বা হবে কেন?

আর যাতে না হয় তারই ব্যবস্থা করবার জন্যেই তো পাকড়াও করেছি তোমাকে।

কি করবে আমাকে দিয়ে?
অনেক কাজ, মস্ত কাজ।
আমি করবো মস্ত কাজ!

হাঁ তুমি করবে, তুমিই করবে, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সে-কাজ হবে না।

আমি একা?
একা নও, হাজার হাজার লোক আছে।

তবে আবার আমাকে কেন?
তোমাকে এই জন্যে যে তোমার কপালে রাজটীকা আছে, তোমার দেহে রাজরক্ত আছে, তুমি রাজপুত্র। চলো, আর দেরী নয়।

তার আগে একটা কাজ সেরে আসতে হবে।

আবার কি এমন কাজ পড়লো?

আমার স্ত্রী মরে পড়ে আছে।

কোথায়?

বাসুদেবের পায়ের কাছে।
মারলো কে?

যন্ত্রচালিতবৎ জরা বলল, আমিই মেরেছি।

বাহবা, বাহবা বলে লাফিয়ে উঠল খট্টাস। বলল, যদুবংশ যা পারেনি, কুরু-পাণ্ডব যা পারেনি—তুমি সেই কাজ করেছ। তোমাকে কিছুতেই ছাড়া হচ্ছে না।

তারপরে কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা নামিয়ে এনে শুধালো, সে বুঝি বাসুদেবকে রক্ষা করতে গিয়েছিল?

না, বাসুদেব আগেই মারা গিয়েছিল। জরতী খিজার দিয়েছিল আমাকে।

খিজার দিয়েছিল তোমাকে। এমন স্ত্রীকে মারাই ধর্ম, না মারাই অধর্ম। তবে সেকি আর এতক্ষণ পড়ে আছে, শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

স্ত্রী-হত্যায় যার হাত কাঁপেনি সেই স্ত্রীর দেহটা শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়েছে শুনে শিউরে উঠল জরা. বলে ফেলল, না না, তা কি করে হবে!

পত্নীর দেহটার উপরে স্বামীর নিঃসপত্ন অধিকার, সেই দেহে শিয়াল-কুকুরের হস্তক্ষেপ জরার মতো পাষণ্ড স্বামীর পক্ষেও দুঃসহ।

খট্টাস বলল, যাও, শীগগির ফিরে এসো।

জরা রওনা হতে যাবে এমন সময়ে খট্টাসের মুখের দিকে তাকালো। তখন ভোরের আলো ফুটে ওঠায় সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। জরা যে-মুখ দেখল সে অতি ভয়ঙ্কর। চোখদুটো বিপর্যয় টেরা, বাঁ দিকের চোয়াল বিষম বাঁকা, দাঁত কতক আছে, কতক নাই। সমস্ত মুখমণ্ডল যেন ভূকম্পনে বিপর্যস্ত, কেবল উদ্ধত নাসিকা ও সুদৃঢ় চিবুক এই দুটো আজ যেন আত্ম-রক্ষা করে সগৌরবে দণ্ডায়মান। গায়ের রঙ মরচে-পড়া লোহার মতো, দেখলে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। আর হাসিটা, জরার বিস্ময় দেখে একবার হেসে-ছিল লোকটা, অতিশয় মারাত্মক, সেই বিসদৃশ হাসির আভায় সমস্ত মুখখানা অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

জরা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, জরতীর দেহটা কোথাও নেই। আর বাসুদেবের দেহের শেষ চিহ্ন দগ্ধ-কাষ্ঠে ও নির্বাপিত অঙ্গারে তরঙ্গিত হচ্ছে সমুদ্রের শাদা ফেনায় ও বন্দর তরঙ্গ-বাহ্যে।

(২১)

কুরুক্ষেত্রের বন্ধু-স্বজন আত্মীয়বর্গ রাজপুরীতে গিয়ে পৌঁছলে, রাজপুরুষ ও অন্যান্যরা এসে উপস্থিত হল। বৃদ্ধ, শিশু ও নারী ছাড়া যদুবংশীয় কেউ আর জীবিত ছিল না। কর্মসাধ্য সকলে মিলে অন্ত্যেষ্টি সৎকার করলো। বাসু-দেবের পত্নীগণের মধ্যে রুক্মিণী ও জাম্ববতী চিতায় আরোহণ করে পতির অনুগমন করলো; সত্যভামা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বনে প্রস্থান করলো। এসব পুরাণ কথা, কাজেই আমাদের প্রয়োজন-বহির্ভূত। অন্ত্যেষ্টি সংকার শেষ হতে রাত শেষ হয়ে এলো। সকলে সমুদ্রে স্নান সাঙ্গ করে ফিরে চলে গেল। মৃতপ্রায় জরতীকে কেউ লক্ষ্য করলো না।

উষাকালে সমুদ্রের সঞ্জীবনী বায়ুতে ধীরে ধীরে জরতীর চৈতন্য হতে শুরু করলো, তখনো চৈতন্যের আলো-আঁধারি—পুরো জ্ঞানও নয়, পুরো অজ্ঞানও নয় এইরকম অবস্থা। হঠাৎ সে অনুভব করলো কেউ যেন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন এসেছে বুঝবার ক্ষমতা তার ছিল না, সে অসহায়ভাবে যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে রইলো।

সদ্য প্রাতঃস্নান সাঙ্গ করে একজন দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি জরতীর কাছে এসে দাঁড়ালো। সে এসেছিল বাসুদেবের অন্ত্যেষ্টি সংকারে যোগদানের উদ্দেশ্যে; কাজ শেষ হয়ে গেল, চিতায় এক অঞ্জলা জল দিয়ে যখন ফিরতে উদ্যত, তখন ঝোপের আড়ালে প্রচ্ছন্নপ্রায় জরতীর দেহ চোখে পড়লো তার। প্রথমে কৌতূহল, দ্বিতীয় মৃতদেহ কার, তারপরে অনু-সন্ধিৎসা, এ কি সত্যই মৃত; তারপরে অনুকম্পা—যদি মৃত না হয়, তবে শুশ্রূষা আবশ্যক প্রভৃতি ভাবের প্রেরণায় নত হয়ে মৃত দেহটিকে পর্যবেক্ষণ করলো; বুঝলো না মৃত নয়, তবে মৃত-প্রায় বটে; শীঘ্র প্রতিকার না হলে মরতে বিলম্ব হবে না। তখন সে উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এসে স্ত্রীলোকটির মাথায় দিল; আর নিকটে অনুসন্ধান করে বনৌষধি তুলে এনে রস নিষ্কাশিত করে তার নাসারন্ধ্রে ও কানের মধ্যে দিল। জরতীর এমনিতেই চৈতন্যোপলব্ধি হচ্ছিল, এখন জল সিঞ্চনে এবং ঔষধির সাহায্যে শীঘ্রই পূর্ণ জ্ঞান ঘটলো। সে উঠে বসতে চেষ্টা করলে পুরুষটি বাধা দিয়ে বলল, মা, আরও একটু সুস্থ হও, তারপর উঠো।

জরতী বলল, প্রভু, আপনার কৃপায় এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি—এই বলে উঠে প্রণাম করলো।

পুরুষটি বলল, চলো তোমাকে ঘরে রেখে আসি, তুমি একা যেতে পারবে মনে হয় না। জরতী বলল, আমার ঘর নেই।

তখন পুরুষটির বিস্ময় অভ্যুদয় কৌতূহলে পরিণত হল।

তোমাকে তো সধবা বলে মনে হচ্ছে, তোমার স্বামী কোথায়?

প্রভু, আমি হতভাগিনী, আমার স্বামী থেকেও নেই।

তোমার ঘরও নেই, স্বামীও নেই, তুমি এখানে কিভাবে এলে, কেন মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলে, সেসব কথা না হয় পরে শুনবো, এখন আমার সঙ্গে চলো।

আপনি তো প্রভু সন্ন্যাসী।

কি করে বুঝলে? ওঃ বুঝেছি, পরনের গেরুয়া কাপড়খানা দেখে। শাদা ধুতি সমুদ্রের জলে শীঘ্র ময়লা হয়ে যায় বলে স্নানের সময়ে গেরুয়া বসন পরি।

তারপরে একটু হেসে বলল, সংসারের অনেক ময়লা আত্মসাৎ করে গেরুয়ায়। না, মা, আমি গৃহী, আর আমার স্ত্রী আছে। চলো তোমাকে নিয়ে তার কাছে পৌঁছে দি, আমার মেয়েই নিশ্চিন্তে থাকবে।

কিন্তু প্রভু—

এর মধ্যে কিন্তু নেই মা।

আমি যে নীচ জাত।

আমি তো তা জানতে চাইনে, তাছাড়া বৈতরণী পেরিয়ে গেলে এপারের সমস্ত চিহ্ন তলিয়ে যায়, মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তুমি তো বৈতরণী পেরিয়ে এসেছ।

এসব কথা পুরোপুরি বুঝবার ক্ষমতা জরতীর ছিল না, মোটের উপরে বুঝলো যে, পুরুষ যিনিই হোন তাঁর দ্বার তার কাছে অবারিত।

এবার জরতী একটু দ্বিধা করে বলল, আপনার পরিচয় তো জানি না, যদি অনুমতি করেন তবে আপনাকে প্রভু বলেই ডাকবো।

তাছাড়া আর কি বলে ডাকবে! সবাই আমাকে প্রভু বলেই ডাকে, আমার পুরো নাম প্রভুদয়াল।

তারপরে হেসে বললেন, দেখো তো, পিতামাতার কি কৃপা, তাঁরা এমন নাম রেখেছিলেন যে কারো উপরে প্রভুত্ব না করেও আমি সকলের প্রভু।

এইভাবে কথোপকথন করতে করতে দুজনে চলছিল, প্রভুদয়াল আগে, জরতী পিছনে। জরতী দেখছিল কি উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, সমস্তটা ঋজু, কোথাও এতটুকু টোল খায়নি। মাথার প্রলম্বিত ঘন চুলে মাঝে মাঝে শাদা কেশ, বার্ধক্য যেন পরোয়ানাখানা সিংহদ্বারে ঝুলিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখনো জবর্দস্তি করে প্রবেশ করতে সাহস পাচ্ছে না।

ঐ যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ মা, ওই কাছে কয়েক ঘর লোকের বসতি, অধিকাংশই জেলে, ঐখানে আমার ঘর।

আমি জানি, ওখানে কখনো-সখনো খরগোশ শিকারে এসেছি।

চমৎকার, শিকার করতেও জানো দেখছি, তবে কি জানো খরগোশ বড় নিরীহ প্রাণী, ওদের শিকার করে আনন্দ নেই।

জরতীর মুখে প্রায় এসে পড়েছিল যে, বাঘ-ভালুক শিকারের অভ্যাসও তার আছে। কিন্তু ভাবলো, না, একথা স্বীকার করলে আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়তে কতক্ষণ। তার বদলে সে বলল, না জেনে প্রভু বলে ডেকেছি, এখন জানবার পরে তো আর নাম ধরে ডাকতে পারি না।

বেশ তো একটা জী যোগ করে প্রভুজী বলো, অনেকেই তাই করে।

ক্রমে তারা পাহাড়তলি গ্রামটার কাছে এসে পড়লো। এখানে সমুদ্রতীর ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে, এক কোটিতে পাহাড়-তলি, বিপরীত কোটিতে জরতীর কুটীর। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পাক দিয়ে উঠলো জরতীর বক্ষ কুহরে।

জরতীকে নিয়ে কুটীরে উপস্থিত হলে প্রভুদয়ালের পত্নী কিছুমাত্র বিস্মিত হল না, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, এসো, মা। যেন এতক্ষণ তার প্রতীক্ষাতেই ছিল।

জরতী আশ্চর্য বোধ করলো, ভাবলো উনি কি জানতেন যে আমি আসবো। না শুধিয়ে পারলো না আপনি কি করে জানলেন যে আমি আসবো।

শোন কথা একবার। এমন তো নিত্য হচ্ছে, তাই জানতাম কেউ আসবে।

এমন কি রোজ হচ্ছে?

হচ্ছে বইকি মা! অসহায় স্ত্রীপুরুষ শিশুকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসছেন, কুকুর-বেড়াল বাদ যায় না। শুনবে কি মা, একদিন তো একটা খোঁড়া বাঘ নিয়ে এসে হাজির, আমি তো ভয়ে মরি।

প্রভুদয়াল হেসে বলল, সে-সব তালিকা না হয় পরে শুনিয়ো, এখন জরতী-মাকে কিছু খেতে দাও, দেখছ না মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

জরতীকে নিয়ে কুটীরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে সে শুধালো, তা মা আপনাকে কি বলে ডাকবো?

কাশ্যপের মা বলো, সবাই তাই বলে। জরতী ভাবলো একবার জিজ্ঞাসা করে কাশ্যপ কোথায়, তারপর ভাবলো, হয়তো মারা গিয়েছে, জিজ্ঞাসা করলে অকারণে ব্যথা দেওয়া হবে।

তার মুখের ভাব দেখে প্রভুদয়াল বলে উঠলো, কাশ্যপ বলে কেউ নেই, আমরা নিঃসন্তান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জরতীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, তবে।

তবে তো জানি না, অনেককাল আগে-কার কথা, জেলে পাড়ার সকলে, কেন জানি না, ঐ নামে ডাকতে সুরু করলো, তারপর থেকে ঐটাই বাহাল হয়ে আছে।

অমনি ডাকতে সুরু করলো বুঝি, সেই যাকে বেড়ালের বাচ্চা বলে এনেছিলে, পরে দেখা গেল বাঘের বাচ্চা—তারই তো নাম দেওয়া হয়েছিল কাশ্যপ। তারপর থেকেই আমি কাশ্যপের মা।

সে বাঘটা কোথায় মা!

প্রভুদয়াল বলল, বনের বাঘ বনে গিয়েছে, মাঝ থেকে উনি রয়ে গেলেন কাশ্যপের মা।

কাশ্যপের মায়ের সঙ্গে কুটীরে প্রবেশ করে জরতী দেখল, হাঁ কুটীর বটে, তার নিজের কুটীরকেও হার মানায়। আহা চালের ছাউনির কি মুন্সীয়ানা। সূর্য দেখা যায় অথচ জল পড়ে না। আর ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তাদের অনুপস্থিতি, গোটা দুই হাঁড়িকুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। তবে হাঁ, সব অভাব পূর্ণ করে দিয়েছে প্রভুদয়ালের পত্নীর মূর্তিটি। সারসপাখীর বুকের পালকের মত রঙটি, শাদাও নয়, কালোও নয়, স্নিগ্ধ নামে যদি কোন রঙ থাকতো তবে সেই রঙ, দেখলেই মা বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। গলায় তুলসীর মালা, দীর্ঘ বিলম্বিত চুলের গোড়ায় একটি গেরো, একখানি মোটা বসন, হাতে একখানি লোহার কঙ্কণ ছাড়া সর্বদেহ নিরাভরণ।

জরতীর আহার শেষ হলে দুজনে কুটীর থেকে বের হয়ে এলে প্রভুদয়াল বলল, জরতী-মা, নিশ্চয় ভাবছে এইতো এদের দশা, তার উপরে আবার আমাকে জোটালো, এখন তিন জনেরই না খেয়ে মরতে হবে।

জরতী জিভ কেটে বলল, বাবা, এমন কথা আমার মনেও হয়নি, আপনি আমাকে প্রাণ দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, আর আমি এমন কথা ভাববো! বাবা, আমি পাপী, তবে পাষণ্ড নই।

না মা, তুমি ভাববে কেন? তবে অনেকে ভাবে কিনা! এমন কি আমার অনুগত জেলেদের মধ্যেও অনেকে ভাবে। সেদিন জগন্নাথ বুড়ো বলল, বাবা এত কষ্ট করো কেন? তোমাকে তো আমাদের রাজা খুব খাতির করেন, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি চেয়ে নাও না কেন?

জরতী বলল, জগন্নাথ তো মিথ্যা বলে নি বাবা, কিছু ব্রহ্মোত্তর থাকলে তো এত কষ্ট হতো না।

কষ্টটা কিসের মা, খাওয়ার পরার এই তো! আমাদের দেখেই বুঝতে পারছ, আমরা অনাহারক্লিষ্ট নই, আর অঙ্গেও বসন আছে। তবে আবার কেন? দেখো মা, শুধু দেহ ধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, তা জোটাতে কষ্ট হয় না, তার অতিরিক্ত দাবী করলেই গোলমাল সুরু হয়। সংসারে যত হানাহানি রেষারেষি, যত রক্তগঙ্গা ঐ অতি-রিক্তটুকুর দাবী নিয়ে। এই যে এত বড় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা হয়ে গেল, তার মূলে ঐ অতিরিক্তের দাবী।

জরতী বলল, আপনার কথা শুনে চললে সংসারে তো গরীব থাকে না।

আমি কথা শোনাবার কে, আর আমার কথা শুনেই বা লোকে চলবে কেন? তবে একথা জেনো, কিছু গরীব লোক চিরকাল থাকবে, তবে তাদের সবাই যে ভাঙা কুটীর-বাসী তা ভেবো না, সোনার মন্দিরেই গরীব লোকের সংখ্যা বেশি।

সে কি রকম বাবা?

তবে শোন, তারপরে জনান্তিকে বলল, কাশ্যপের মা তোমার তো এসব বক্তৃতা অনেকবার শোনা হয়েছে। এখন গৃহকার্য সম্পন্ন করে নাও।

জরতী ভাবলো, যা গৃহ তার আবার কাজ।

কাশ্যপের মা বলল, তা সত্যি, ও-সব কথা শুনতে শুনতে আমার কানের পোকা মরে গিয়েছে।

মরে যায়নি, ব্রাহ্মণী, কানের পোকা মাথায় গিয়ে ঢুকেছে।

এই দম্পতির কথা শুনে জরতীর বুকের ভিতরে পাক দিয়ে উঠল, আহা এমনিভাবেই তো তাদের মধ্যেও হাসিঠাট্টা চলতো, কালকেও বেজিটার চাল-চলন নিয়ে দুজনে অনেক রহস্য চলেছিল। তার পরে হঠাৎ কি হল, সমস্ত উড়েপুড়ে গেল, কোথায় তারা, আর কোথায় আজ সে।

হাঁ যা বলছিলাম, আবার আরম্ভ করলো প্রভুদয়াল, আমি মাঝে মাঝে রাজা উগ্রসেনকে দর্শন করতে যাই, রাজা আমাকে খুব আদর করেন। বলেন, ঠাকুর, তুমি এলে আনন্দ পাই, কারণ তুমি কখনো কিছু চাও না। অন্য সকলে আসে নানারকম দাবী নিয়ে, তাদের বড় ভয় করি।

আমি বললাম, মহারাজ, আপনার আছে, আপনি দান করবেন বইকি, আপনার কি ভয় করা চলে।

তিনি বললেন, ঠাকুর, দান তো যথা-সাধ্য করি, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারি না। এত ব্যয়বাহুল্য হয়ে গিয়েছে যে, নিত্য অভাব, নিত্য টানাটানি। তাই যে লোক কিছু চায় না, তাকে দেখলে আপনজন বলে মনে হয়।

ঐ পর্যন্ত বলে একটু থেমে বলল, তবেই তো দেখলে মা, ঐ সোনার সিংহাসনে বসে রাজা উগ্রসেন গরীব, আর পাতার কুঁড়েয় থেকেও আমার অভাব নেই। অভাবের অভাবই ধন।

নাও, অনেক হয়েছে, এখন খেতে হবে না, ওঠো।

প্রভুদয়াল আহারের উদ্দেশ্যে গাত্রোত্থান করলো।

রাত আর কাটতে চায় না জরতীর। কুটীরের মধ্যে তিনজনে পাশাপাশি ভূমি-শয্যায়। ওরা দুজনে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুম সুখের পায়রা, সুখীর কাছে আসে, দুঃখীকে তার বড় ভয়।

কি হল জরার, কোথায় গেল সে। এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল, তারও তো জীবিত থাকবার কথা নয়। জরা গলা টিপে ধরেছিল, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তবে আবার জ্ঞান ফিরে আসতে গেল কেন। সে কি কেবল জীবনব্যাপী মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যে। কুটীরখানাও নাই, দূর থেকে তার আগুনের আভা দেখতে পেয়েছিল। অজ্ঞাতসারে একবার হাতটা যায় গলায়; সেখানে এখনো লেগে আছে জরার আঙুলের বজ্রস্পর্শের দাগ। আজ সারাদিন আঁচল দিয়ে সেটা ঢাকবার চেষ্টা করেছে। প্রভু-দয়ালের চোখে পড়েনি, কিন্তু এড়াতে পারেনি কাশ্যপের মায়ের চোখ। অবশ্য মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি সে, তবে তার চোখ বারে বারে জিজ্ঞাসা করেছে—ওটা কিসের দাগ? সে-ও চোখে চোখে উত্তর দিয়েছে না, ওটা কিছু নয়। কিন্তু স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে। সেই উত্তরে যে সমস্ত ইতিহাস বেরিয়ে পড়বে। আজ সে দিনের মধ্যে অনেকবার ভেবেছে, সব খুলে বলবে প্রভুজীর কাছে, কিন্তু মন সরেনি। কোন্ স্ত্রী প্রকাশ করতে চায় স্বামীর দুর্গতির ইতিহাস। তাছাড়া তাতে বিপদ আছে স্বামীর। বাসুদেবকে হত্যা, বাসুদেব যে স্বয়ং ভগবান।

একবার সুযোগ বুঝে কথাটা পেড়ে-ছিল প্রভুজীর কাছে, বলেছিল বাবা, ভগবান বাসুদেব অবশেষে দেহত্যাগ করলেন।

প্রভুজী বলেছিল, মা, ভগবানের কি জন্ম মৃত্যু আছে?

তবে কেন তিনি গেলেন?

দেখো মা যাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটি নড়ে না, তিনি কেন গেলেন, কেমন করে বুঝবো। একমাত্র তিনিই জানেন।

কিন্তু বাবা, যে লোকটা মারলো তার কি হবে?

রাজার শাসনে কি হবে রাজা জানে। তবে একথা নিশ্চয় ভগবানের বিধান অনু-সারে দণ্ডই হবে না।

কেন?

কেন কি, লোকটা তাঁরই ইচ্ছায় চালিত হয়ে মেরেছে।

বাবা, বাসুদেব এত বড় বীর, শেষে কিনা তিনি সামান্য একটা লোকের হাতে মারা পড়লেন।

তাইতো স্বাভাবিক মা। ভারতবর্ষে এত বড় বীর কে আছে যে তাঁর সমকক্ষ। ওইতো বললাম, সামান্য কুশাঙ্কুরের আঘাতটা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট, তিনি দেহত্যাগ করবেনই, একটা উপলক্ষ্যের মাত্র প্রয়োজন, ব্যাধের ঐ তীরটা সেই উপলক্ষ্যটা জুগিয়েছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীর কি অস্ত্রের অভাব ছিল, তবে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রথচক্র-ধারণ করতে গেলেন কেন?

কেন বাবা!

সব অস্ত্রই তাঁর কাছে সমান, সব মানুষই তাঁর কাছে সমান, সমস্ত চরাচর তাঁর ইচ্ছার অংশ।

তর্কে পেরে ওঠে না জরতী, চুপ করে থাকে।

কি মা চুপ করে রইলে যে। মনটা বিষন্ন কেন, শুধায় প্রভুদয়াল।

আর তো চোখে দেখতে পাবো না বাসুদেবকে, উত্তর দেয় জরতী।

এই কথা, চোখে দেখতে চাও? তাই দেখিয়ে দেবো।

একথাটা আরও দুর্বোধ্য মনে হয় জরতীর কাছে, প্রশ্নাত্মক চোখে তাকায় সে প্রভুজীর দিকে।

এই সব প্রশ্নোত্তর মালা জপ করতে থাকে বিনিদ্র জরতী, অবশেষে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙতে দেরী হয়েছিল জরতীর, উঠে দেখে স্বামী-স্ত্রী কেউ শয্যায় নেই। সে বাইরে এসে প্রভুদয়ালকে শুধায়, মা কোথায় গেলেন?

ঐ দেখো গিয়ে সমুদ্রের ধারে।

সে তাড়াতাড়ি চলল সমুদ্রের দিকে। বেশি যেতে হল না, কাছেই দেখতে পেলো কাশ্যপের মা একটা চুবড়ি নিয়ে কি যেন সংগ্রহ করছে।

ও কি করছ মা?

এসো না বাছা, আমাকে একটু সাহায্য করো।

সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপটা রাশিরাশি শামুক, ঝিনুক, কড়ি এনে ফেলছে বালুর উপরে, বেছে বেছে তারই কতক তুলছে চুবড়িতে কাশ্যপের মা। সেও কুড়োতে লেগে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুড়ি উঠল ভরে।

এগুলো কি হবে মা? [illegible]

এখনই দেখতে পাবে বাছা।

এমন সময় তিনজন নুলিয়া জেলে এসে হাজির হল। যে কাঠের টুকরোতে করে তারা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, সেই কাঠের মতো সরল দীর্ঘ, কালো তাদের গায়ের রঙ, পরনে এক-টুকরো কাপড়, মাথায় তেকোণা পাতার টুপি। তাদের দেখে কাশ্যপের মা বলল, আজ দেরি কেন বাবা জগন্নাথ।

মা আজ অনেক দূরে গিয়ে পড়ে-ছিলাম।

অনেক মাছ বুঝি পেলে।

তা কিছু পেয়েছি মা, তুমিও তো অনেক পেয়েছ, চুপড়ি যে ভরে গিয়েছে। তাহলে নিয়ে যাই।

হাঁ, নিয়ে যাও।

কী দিয়ে যাবো তোমাকে?

আজ কিছু আটা, আর চাল দিয়ে যেয়ো। আর দেখো, একখানা গড়ে শাড়িও চাই। এতে যদি না কুলোয় তবে না হয় শাড়িখানা থাক।

এতেই কুলিয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

তারপর একটু থেমে শুধালো, বল্ল সেই জগন্নাথ, এই মেয়েটি কে মা?

ওটি আমার মেয়ে।

তার কথা শুনে তিনজনে হেসে উঠল, মায়ের বাড়ীতে যে আসে সেই হয় মেয়ে, নয় ছেলে, কেবল আমরাই বাদ।

তোমরা বাদ কেন বাবা। তোমরাই খাওয়াচ্ছ পরাচ্ছ।

তোমাকে খাওয়াবো পরাবো এমন আমাদের সাধ্যি কি? যে আমাদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে তোমাকেও ভরণপোষণ করছে সে। এই আমাদের বাবা, এই আমাদের সমুদ্দুর।

সে কথা সত্যি বাবা! ওরই নুন খেয়ে তো সবাই মানুষ।

নুলিয়ারা চুবড়ি নিয়ে চলে গেলে কাশ্যপের মা বলল, চলো মা এবার বাড়ীতে যাই।

সমস্ত ব্যাপারটা অবোধ্য লাগল জরতীর কাছে। সেটা বুঝতে পেরে কাশ্যপের মা বলল, বুঝলে না এই হচ্ছে আমাদের জীবিকার উপায়। আমি চুবড়ি ভরে শামুক-ঝিনুক কুড়োই, ওরা এসে দোকানে নিয়ে গিয়ে বিনিময়ে আমাদের দরকারী জিনিস এনে দেয়।

তারপরে মন্তব্য করলো, আমাদের দরকারই বা কতটুকু।

জরতী বলল, আমি এসে তো দরকার বাড়িয়ে দিলাম।

সেইজন্যেই তো দুমুঠো বেশি কুড়োলাম। কারো ক্ষতি হল না, মা তোমার, না আমার, না সমুদ্রের, ওর নাম তো আবার রত্নাকর কিনা।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

মেরু থেকে মেরু কক্ষে স্থাপিত আবহ উপগ্রহ থেকে ভূপৃষ্ঠের আলোকচিত্র। কক্ষে পাক দেবার সময়ে উপগ্রহটি প্রতিবারে একটু করে পশ্চিম সরে এসেছে আর ভূপৃষ্ঠের আলোকচিত্র উঠেছে ফালিতে ফালিতে বিভক্ত হয়ে। এই ফালি-গুলো জোড়া লাগিয়ে গোটা ভূপৃষ্ঠের ছবি পাওয়া যায়। আলোকচিত্রের মধ্যস্থলে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপ, বাঁদিকে দক্ষিণ আমেরিকা, ডানদিকে ভারত।

দুয়ে দুয়ে চার, একথা যতোখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলে, ততোখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে কি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ সম্ভব। সেজন্যে চাই সারা পৃথিবী জুড়ে তথ্য সংগ্রহের অতি বিপুল একটি আয়োজন এবং সংগৃহীত তথ্যকে দ্রুত বিশ্লেষণের উপযোগী অতি দক্ষ একটি ব্যবস্থা। সংগ্রহের কাজটি চলবে আবহ উপগ্রহের সাহায্যে, বিশ্লেষণের কাজটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় কোনোটিই অসাধ্য নয়। এবং উভয় ক্ষেত্রে সার্থক প্রয়াসেরও বহু নজির রয়েছে। অতএব বিশ্বাস করা চলে, ভবিষ্যতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং আগামী কয়েক দিনের বা আগামী কয়েক সপ্তাহের আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির ছবিটি গাণিতিক ছকের মতোই সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা যাবে। সকলেই জানেন, কিছুকাল আগে প্রচণ্ড বিধ্বংসী এক ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব-বাংলায় দশ লক্ষ জীবনহানি ঘটেছিল। এমন একটি দুর্বিপাক যে ঘটতে চলেছে, তার খবর আগে থেকে পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই অনেকখানি প্রস্তুত হওয়া যেত। আর শুধু তো দুর্বিপাক থেকে বাঁচা নয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ভুলভাবে জানতে পারাটা অন্য নানা কারণেও জরুরী, কৃষির জন্যে তো বটেই।

বিশ্ব আবহ সংস্থা (ডবলু-এম-ও) ১৯৬৭ সালের পঞ্চম কংগ্রেসে বিশ্ব-আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ (ডবলু-ডবলু-ডবলু) নামে চারবছরের একটি পরিকল্পনা নিয়েছিল। এ-বছরে এই পরিকল্পনাটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে গৃহীত এই পরিকল্পনাতেও পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে সাবেকী ধরনের পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ওপরে। ইতিমধ্যে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণের জন্যে কৃত্রিম উপ-গ্রহের কার্যকারিতা ও সাফল্যের চমকপ্রদ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া, আব-হাওয়ার সাফল্যমণ্ডিত পর্যবেক্ষণের জন্যে যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার তা সম্পন্ন করার জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহই যে সর্বোত্তম সহায়, তারও চমকপ্রদ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। নিঃসন্দেহেই বলা চলে অতঃপর বিশ্ব-আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের কর্মসূচী পুরোপুরিভাবেই কৃত্রিম উপ-গ্রহের ওপরে নির্ভরশীল হবে—যেমন তথ্য সংগ্রহের জন্যে তেমনি সংগৃহীত তথ্য যাতে নিমেষের মধ্যে সারা বিশ্বের বিশ্লেষণ-কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে দেওয়া চলে, সেজন্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যেও।

মূল প্রয়োজন হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে একটি পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যেসব বিজ্ঞানী এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের মতে এজন্যে চাই ভূপৃষ্ঠে ৪০০ কিলোমিটার তফাতে তফাতে আবহ পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র এবং বায়ু-মণ্ডলের অন্তত ২০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত তথ্য-সংগ্রহ। এমন বিরাট একটি আয়োজন গড়ে তোলা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। ডবলু-ডবলু-ডবলু পরিকল্পনার চার বছরে ৩৬০০টি পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে ৮০০টি কেন্দ্রে থাকার কথা বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তর থেকে তথ্য-সংগ্রহের আয়োজন। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সমুদ্রপথে চলাচলকারী হাজার পাঁচেক বাণিজ্য জাহাজ, যেখান থেকে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ চলতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বাণিজ্য জাহাজের চলাচল সমুদ্রের ধরাবাঁধা এলাকায়, ভূপৃষ্ঠের অতি সামান্য এলাকাই তাতে ধরা পড়ে। উপরন্তু, মাত্র শ'খানেক জাহাজ বাদ দিলে, কোনো জাহাজেরই পর্যবেক্ষণের এলাকা ব্যাপক নয়, উপরিতলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিকল্পনায় অবশ্য আবহ জাহাজের কথাও বলা হয়েছে। পূর্ণ সাজসরঞ্জামে সজ্জিত এই জাহাজের সংখ্যা গোটাকুড়ি।

তবুও, সারা পৃথিবী জুড়ে পর্যবেক্ষণ চালাতে হলে এই আয়োজন প্রায় কিছুই নয়। একে আরো অনেক অনেক বাড়িয়ে তুলতে হয়। অন্য অসুবিধার কথা ছেড়ে দিলেও খরচের ব্যাপারটা তাতে এমন বিরাট হয়ে দাঁড়ায় যে, বাস্তব ক্ষেত্রে এমনি একটি আয়োজন কোনোকালে গড়ে তোলা যাবে তার সম্ভাবনা কম।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আব-হাওয়ার তথ্য সংগ্রহের জন্যে সারা পৃথিবী জুড়ে পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব অবাস্তব। অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়। এই অন্য ব্যবস্থাটিই সম্পন্ন হতে পারে আবহ উপগ্রহের সাহায্যে।

মনে করা যাক আবহাওয়ার খবরাখবর নেবার উপযোগী যন্ত্রপাতি সমেত একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর আকাশে তোলা হল এবং বিশেষ একটি কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পাক খাইয়ে দেওয়া হল। এই উপগ্রহ যখন পাক খাচ্ছে, পৃথিবীও তখন নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। ফলে উপ-গ্রহের পাক-খাওয়াটি কখনোই পৃথিবীর একই এলাকার ওপর দিয়ে পর-পর দুবার ঘটে না। প্রতিটি পাকে একটু একটু করে পশ্চিমের দিকে সরে যায় (কেননা অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরা পশ্চিম থেকে পুবে) এবং এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠের গোটা এলাকার আকাশ দিয়ে পাক খেয়ে চলে। অর্থাৎ এই একটি উপগ্রহ থেকেই ভূপৃষ্ঠের গোটা এলাকাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। এমনি ধরনের উপগ্রহের কক্ষ হয়ে থাকে পৃথিবীর এক মেরু থেকে অন্য মেরুর দিকে। আবার উপগ্রহের কক্ষ যদি হয় পৃথিবীর পেট বরাবর বা বিষুবরেখা বরাবর তাহলে পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে যতোই ঘুরুক উপগ্রহের কক্ষটি কিন্তু ভূপৃষ্ঠের একই এলাকার আকাশে থেকে যায়, কেননা পৃথিবীর ঘোরা ও উপগ্রহের পাক খাওয়া এক্ষেত্রে একই দিকে। আবার এমনি একটি বিষুব-বরাবর উপগ্রহ যতো-ক্ষণে পৃথিবীকে একবার পাক খাচ্ছে ঠিক ততোক্ষণে পৃথিবীও যদি অক্ষের চারদিকে একবারটি ঘুরে যায়, তাহলে ভূপৃষ্ঠ থেকে তাকিয়ে মনে হবে উপগ্রহটি যেন আকাশের এক বিন্দুতে স্থির হয়ে অবস্থান করছে। পৃথিবী অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় ২৪ ঘণ্টা, কাজেই এ-ধরনের ভূ-স্থির উপগ্রহের এক-একটি পাক খাওয়ার সময়ও হওয়া চাই ২৪ ঘণ্টা।

বিষুব-বরাবর কক্ষের উচ্চতা যদি হয় ৩৫,৮০০ কিলোমিটার তাহলে এই কক্ষের উপগ্রহ পৃথিবীকে এক-একটি পাক দিতে সময় নেবে ২৪ ঘণ্টা। অর্থাৎ, উপগ্রহটি হয়ে উঠবে ভূ-স্থির।

অন্যদিকে মেরু-বরাবর একটি কক্ষের উচ্চতা যদি হয় ১০০০ থেকে ১৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে তাহলে উপগ্রহটি প্রতি ১১৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে পাক খেয়ে চলবে, প্রতিটি পাকে খানিকটা পশ্চিমে সরে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের নতুন নতুন এলাকার আকাশ দিয়ে।

আবহাওয়ার খবরাখবর নেবার জন্যে দু-ধারের উপগ্রহেরই সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

খবরাখবর নেবার কাজটি সম্পন্ন হতে পারে দু-ধরনের পদ্ধতিতে। একটি পদ্ধতিতে একটি উপগ্রহ থেকে দিন ও রাত্রির সব সময়ে সরাসরি নিচের এলাকার আলোকচিত্র ও বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ু-মণ্ডলের তাপমাত্রার মাপ নেওয়া হয়। যদি বা উপগ্রহটি এক্ষেত্রে হয়ে ওঠে একটি পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র। অপর পদ্ধতিতে উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ মঞ্চের। এক্ষেত্রে উপগ্রহটি একটি তথ্যসংগ্রহ কেন্দ্র। উভয় ধরনের উপগ্রহে উভয় পদ্ধতির সমাবেশ ঘটতে পারে।

মার্কিন ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ইতি-মধ্যেই এমন কতকগুলো আবহ উপগ্রহ আকাশে তুলেছেন যা থেকে দিন-রাত্রির সব সময়ে ভূপৃষ্ঠের ও মেঘমণ্ডলের আলোকচিত্র তোলা হচ্ছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা তুলেছেন টাইরস এবং নিমবাস —১ ও নিম্বাস-২। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তুলেছেন মীটিয়র ও কসমস পর্যায়ের অনেকগুলো উপগ্রহ। গোড়ার দিকের টাইরস ও নিম্বাস উপগ্রহগুলোতে আলোকচিত্র তোলার পদ্ধতি ছিল সাবেকী ধরনের। রাত্রিবেলা তোলা হত অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে। কিন্তু ১৯৭২ সালে টাইরস ও নিম্বাস পর্যায়ের যে-সব আবহ উপগ্রহ আকাশে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে আলোকচিত্র তোলার পদ্ধতি হবে উন্নততর। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মীটিয়র আবহ উপগ্রহ আকাশে তুলেছেন জোড় বেঁধে। যেমন মীটিয়র-১ ও মীটিয়র —২। এই দুটি উপগ্রহের কক্ষ এমনভাবে সম্পর্কিত যাতে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো একটি বিশেষ এলাকার ওপর দিয়ে একটি উপগ্রহ পার হয়ে যাবার ছ-ঘণ্টা পরে অপরটি এসে হাজির হয়।

১৯৬৬ সালের পরে মার্কিন বিজ্ঞানীরা দুটি ভূ-স্থির উপগ্রহও আকাশে তুলেছেন : এ-টি-এস ১ ও এ-টি-এস-৩। দুটি উপগ্রহেই আছে তথ্য-সংগ্রহের ও যোগাযোগ স্থাপনের বিরাট আয়োজন। এ-টি-এস-১ ভূপৃষ্ঠ ও মেঘমণ্ডলের আলোক-চিত্র নিয়ে থাকে কালো-সাদায়, এ-টি-এস-তিন যথাযথ রঙে। আলোকচিত্রের পরিধি ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ এলাকা জুড়ে।

কৃত্রিম উপগ্রহে বিশেষ ধরনের যন্ত্র স্থাপন করে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় তাপমাত্রার মাপ নেওয়ার ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন। মার্কিন বিজ্ঞানী দের আবহ উপগ্রহ নিম্বাস-৩ বর্তমানে সাফল্যের সঙ্গে একাজটি করে চলেছে। আগামী বছরে একই উদ্দেশ্যে আরো একটি উপগ্রহ তোলা হবে।

পর্যবেক্ষণের পরেই আসে যোগাযোগ স্থাপনের সমস্যা। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো অজস্র পর্যবেক্ষণ মঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার বিস্তৃত পরিকল্পনাও বিজ্ঞানীরা করেছেন। মার্কিন বিজ্ঞানীদের ইন্‌টেলস্যাট উপগ্রহ ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের মলনিয়া উপগ্রহ এক্ষেত্রে দুটি সফল দৃষ্টান্ত।

অতএব এমন বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে যে দুয়ে দুয়ে চার বলার মতো নিশ্চিত ভাবেই আগামী দিনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে।

—[illegible]
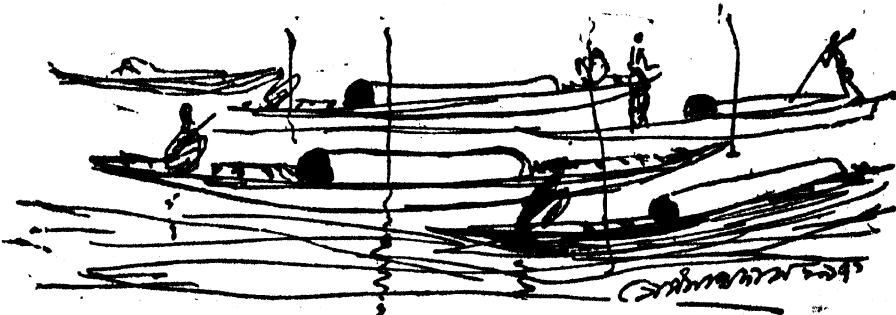
প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মূলসূত্র

চতুর্থ অধ্যায়

সোভিয়েট বিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক সংকট

ফ্যাসিস্ট তোষণনীতির পরিণাম

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েট বিপ্লব অনুষ্ঠানের পর হইতে গোটা পৃথিবী ধীরে ধীরে দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া যাইতেছিল। একদিকে ছিল কমিউনিস্ট রুশিয়া ও পৃথিবীর পরাধীন এবং দরিদ্র জনগণ এবং অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদী বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি। অবশ্য তখনও এই বিভেদ আজিকার মত এতটা স্পষ্ট ছিল না এবং বাহিরে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী আন্দোলিত হইতেছিল ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া—যে শক্তিপুঞ্জের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন হিটলার। হিটলার ও মুসোলিনী দুঃসময়ের ত্রাতারূপে যাঁদের নিকট প্রতিভাত হইলেন, তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, যে ব্যাধির হাতুড়ে দাওয়াইরূপে দেখা দিল ফ্যাসিজম।—যাহা ধনতন্ত্রবাদেরই চরম বিকৃতরূপ এবং যে মতবাদ ছিল জনগণের মুক্তি ও সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদের ঘোরতর বিরোধী। অথচ ইহা ধনতন্ত্রবাদী বৃটেন ও আমেরিকারও বিরোধী, কেননা ফ্যাসিজম এই 'তথাকথিত' ও 'দুর্বল' পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রকেও স্বীকার করিল না, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনায়ককে করিল সর্বময় প্রভু, আর জাতীয়তাবাদকে টানিয়া আনিল চরম সাম্রাজ্যবাদ সামরিক মতবাদের মধ্যে। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদকে স্বীকার করিয়া তাহা আনা হইল রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, আবার শ্রেণীসংগ্রামকে দমন করিয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট বা মালিকদের 'লক-আউট'ও বন্ধ করিয়া দিল। সোজা কথায় মূলধনওয়ালা এবং পুঁজিপতিদের এক সঙ্ঘবদ্ধ নির্মম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল, যার নায়কত্ব পাইলেন একজন ডিকটেটার এবং যে ডিকটেটারের অধীন একটা রাষ্ট্র হইল সর্বপ্রকারে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এজেন্ট। সুতরাং সাধারণ ধনতন্ত্রের চেয়েও এই ফ্যাসিস্ট মতবাদ অধিকতর নগ্ন ক্রূর এবং জাতিবিদ্বেষ ও গণ-বিদ্বেষের বাহন ছিল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ক্যাপিটালিজম শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার বেপরোয়া তাগিদে ফ্যাসিজমকে আশ্রয় করিতেই বাধ্য।

১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মান রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে পাইলেন এবং তাঁর আত্মজীবনীতে নাৎসীবাদী রাষ্ট্রের যে সমস্ত নীতি ও লক্ষ্য ঘোষণা করিলেন, সেগুলি পূরণের জন্য এক নিয়মিত কর্মপন্থা অনুসরণ করিলেন। সেগুলির প্রথমেই যুদ্ধকে মানবজাতির সবচেয়ে বড় আদর্শ এবং শান্তিকে ধ্বংসের পথ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। যথা,

(১) চিরন্তন সংগ্রামে মানুষ হইয়াছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর চিরন্তন শান্তিতে মানুষ হইবে ধ্বংস।

(২) যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য লইয়া কোন মৈত্রী অনুষ্ঠিত না হয়, তবে, উহা নিতান্ত বাজে এবং অর্থহীন।

(৩) ইউরোপে কখনও দুইটি রাষ্ট্রশক্তিকে মাথা তুলিতে দিও না। জার্মানীর পার্শ্বে ইতিমধ্যেই এমন কোন রাষ্ট্রশক্তি থাকিলে, অথবা ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকিলে উহাকে ধ্বংস করাই হইবে মহত্তম কর্তব্য।

(৪) বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বা ঈশ্বরের নিকট আবেদন করিয়াও জার্মানীর হৃতরাজ্যগুলি ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। একমাত্র সশস্ত্র বলপ্রয়োগ ছাড়া। তীব্র প্রতিবাদের দ্বারাও নহে, একমাত্র তরবারীর শক্তিতেই এই সমস্ত দেশের পুনরুদ্ধার সম্ভব। সুতরাং পররাষ্ট্রীয় নীতিতে এই তরবারীর সহযোগিতা খুঁজিতে হইবে।

(৫) পররাষ্ট্রীয় নীতির মূল লক্ষ্য হইল জার্মানীর সমস্ত ভূমি ও দেশগুলি পুনরায় ফেরৎ পাওয়া।

(৬) কেবলমাত্র ১৯১৪ সালের জার্মান রাষ্ট্র সীমানার উদ্ধারই জার্মানীর দাবী নহে। ভূগোল, রণনীতি, নিরাপত্তা বা জার্মান জনগণের সংখ্যা, কোন দিক দিয়া সেই সীমানা ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

(৭) পূর্ব ইউরোপ ও বিশেষভাবে সোভিয়েট রাশিয়া হইতে নূতন দেশ কাড়িয়া লইয়া জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে।

(৮) বর্তমানে বৃটেন ও ইতালীকে হাতে রাখিয়া ফ্রান্সকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহা দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী 'আঁতাত' বা মৈত্রী ভাঙ্গিয়া যাইবে। ফলে, জার্মানীর গতি স্বচ্ছন্দ, পার্শ্বদেশ সুরক্ষিত (সামরিক দিক হইতে) এবং কাঁচামাল সরবরাহের পথ সুগম হইবে।

(৯) যে রাষ্ট্র জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশের উপাদানগুলিকে এভাবে পরিপুষ্ট করে, সেই রাষ্ট্র একদা পৃথিবীর প্রভু হইতে পারিবে।

নূতন জার্মান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কের উদ্দেশ্য ও নীতির ইহাই নিখুঁত, স্পষ্ট এবং নগ্নচিত্র। এই চিত্রকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিবার জন্য তিনটি মূল পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হইল। যথা—

(১) ফ্রান্সকে কাবু করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সমর্থনের সুযোগ লইয়া ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে।

(২) জার্মানীর সীমান্তবর্তী সমস্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে নাৎসী আন্দোলন সংগঠন করিতে হইবে এবং বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে হত্যা ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে। ১

(৩) যথাযোগ্য অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক অবস্থা অনুকূল হইলেই যুদ্ধায়োজন করিতে হইবে। কিন্তু ইহা সার্থক করিতে হইলে আগে ইউরোপের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

হিটলারের নেতৃত্বে নূতন নাৎসী জার্মান রাষ্ট্র যে নীতি, লক্ষ্য এবং পদ্ধতির কথা প্রচার করিল, তাহা এত নির্লজ্জ,

---

১ এই সন্ত্রাসবাদ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। যথা, অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ডলফাস, পরবর্তীকালে ডাঃ সুশনিগ, যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজান্দার রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডুকা (রুমানিয়ায় পরেও হত্যাকাণ্ড হইয়াছে) এবং ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী বার্থো বার্লিনের সহিত চক্রান্তকারী বিভিন্ন দেশের ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। ডানজিগ অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং পোল্যাণ্ডে বহু আভ্যন্তরীণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল নাৎসী চরদের দ্বারা। —লেখক

ক্রুর এবং নগ্ন যে, নিতান্ত নির্বোধেরও সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না। ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ, নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার, পরের রাজ্য আক্রমণ, সাম্রাজ্য বিস্তার, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ভেদ-সৃষ্টি এবং হিংসা ও সশস্ত্র যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি কোন 'সাধু মতলবই' হিটলার গোপন করেন নাই। সুতরাং আজিকার তরুণ পাঠকের দল বিস্মিত হইয়া ভাবিতে পারেন যে, নাৎসী জার্মানীর এই সমস্ত ভয়াবহ অভিসন্ধির কথা জানিয়া শুনিয়াও বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য শক্তিবর্গ হিটলারকে বাধা দিলেন না কেন এবং কেনই বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইতে দিলেন? ইহার প্রধান কারণ ইউরোপে নূতন প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক শক্তির নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ।

রাশিয়ার সাম্যবাদ যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, এজন্য গোড়া হইতেই শক্তিবর্গ চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের অত্যন্ত দুর্দিন ও সংকট চলিতেছিল। সুতরাং যুদ্ধের মধ্যেই (১৯১৭, নভেম্বর) রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় এবং পরে রাশিয়া জার্মানীর সহিত সন্ধি করায় রাশিয়া কেবল 'দলত্যাগকারী' বলিয়াই প্রতিভাত হইল না, এই 'রক্তপিপাসু' সোভিয়েটেরা মিত্রপক্ষের নিকট বিশ্বাস-ঘাতকের মত ভয়াবহ বলিয়াও বিবেচিত হইলেন। সুতরাং বৃটিশ, ফরাসী, আমেরিকান ও জাপ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই সোভিয়েট রাশিয়াকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। লয়েড জর্জ স্বীকার করিয়াছেন যে, একমাত্র বৃটিশ গভর্নমেন্টই তখন ১০ কোটি পাউন্ড খরচ করিয়াছিলেন সোভিয়েট শাসন অবসানের জন্য। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব হইল না, তখন রাশিয়াকে 'একঘরে' করিয়া রাখা হইল দীর্ঘকাল ভদ্র রাষ্ট্রসমাজের বাহিরে। কিন্তু রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত জার্মানী, হাঙ্গেরী ও ইতালীতে শ্রমিক সাধারণ ও জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার করিতেছিল। ইতালী পড়িল মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট ডিকটেটারির পাল্লায়। হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফৎ (প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আসল কর্তাই ছিলেন বৃটেন ও ফ্রান্স) কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন প্রচুর ঋণদানের দ্বারা। বাকি রহিল জার্মানী—এখানকার শ্রমিক সাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে বৃটিশ, ফরাসী ও জার্মান ধনিক-দের চক্রান্তের ফলে ১৯৩০-৩৩ সালের চরম অর্থনৈতিক সংকটের দিনে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গঠনের চেষ্টা ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সুযোগে হিটলারের নাৎসী দল যেমন জার্মান রাষ্ট্র দখল করিয়া লইল, তেমনই পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিরা জার্মানীকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিল।

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লয়েড জর্জ এক বক্তৃতায় স্পষ্টই বলিলেন যে, যদি শক্তিবর্গ জার্মানীতে নাৎসীদের পতন ঘটায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রক্ষণশীল, সমাজ-তান্ত্রিক কিংবা উদারনৈতিক কোন শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে না।—হইবে চরম সাম্যবাদ বা 'একস্ট্রিম কম্যুনিজম'-এর প্রতিষ্ঠা। কমিউনিস্ট রাশিয়ার চেয়ে কমিউনিস্ট জার্মানী অনেক বেশী বিপজ্জনক হইবে। সুতরাং বৃটিশ গভর্নমেন্টের উচিত সতর্ক-তার সঙ্গে চলা। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে লয়েড জর্জ কমন্সসভায় বক্তৃতায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, 'ইউরোপে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বৃটিশ রক্ষণশীলদের একমাত্র বড় আশ্রয় জার্মানী এবং দুই এক বৎসরের মধ্যেই এজন্য জার্মানীর দিকে আমাদের তাকাইতে হইবে। জার্মানী ইউ-রোপের ঠিক মধ্যস্থলে। সুতরাং জার্মানীর আত্মরক্ষার প্রাচীর যদি ভাঙ্গিয়া যায়, এবং কমিউনিস্টগণ তাহাকে পাইয়া বসে, তবে গোটা ইউরোপ সাম্যবাদী হইয়া পড়িবে। সুতরাং জার্মানীকে নিন্দা না করিয়া বরং বন্ধুর মত তাহাকে সাদর আহ্বান জানানো উচিত।

হিটলারী জার্মানীকে এভাবে বন্ধুর মতই বৃটেনের রক্ষণশীল এবং ধনতন্ত্রবাদী সমাজ গ্রহণ করিলেন। এমন কি তাঁহারা অকস্মাৎ ভার্সাই সন্ধির 'অবিচার' সম্পর্কে পর্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং জার্মানীকে আর্থিক সাহায্য ও কূটনৈতিক সমর্থন দিতে লাগিলেন। লণ্ডন সহরের মূলধনওয়ালাগণ হিটলারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড' জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার জন্য অর্থ জোগাইতে লাগিলেন এবং ভিকার্স-আর্মস্ট্রং কোম্পানী (বৃটিশ সমরাস্ত্র নির্মাণের কারখানা) জার্মানীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দিলেন।

জার্মাণীকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ পর-রাষ্ট্রনীতি দ্বিধার তরবারির মত ব্যবহৃত হইতে লাগিল। একদিকে ফ্রান্সকে জার্মাণীর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তি হিসাবে খুব বাড়িতে না দেওয়া ও জার্মাণীকে লোকার্ণো চুক্তির মত প্রকাশ্য বন্ধুতা মারফৎ পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দলে টানিয়া আনা এবং অন্য দিকে তাহাকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধতার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া।

"This British support of Hitler and of German re-armament has been governed by general considerations of British foreign policy. Continuously since Versailles Britain has given general support to the restoration of German power in order to counterbalance French power in Europe, and has sought in the same time to draw Germany into a Western orientation in opposition to the Soviet Union."

'World Politics', 1918-1936, by R. Palme Dutt, Page 267.

এদিকে জার্মাণীও দেখিল যে, বৃটেনের সহায়তায় পশ্চিম ইউরোপে যদি সে 'গ্যারাণ্টি' পায় তবে, মধ্য ও পূর্ব ইউ-রোপের দিকে ইচ্ছামত চলিবার তাহার কোন অসুবিধা নাই। সুতরাং বৃটিশ নীতি হিটলারের লক্ষ্য পূরণেই সহায়তা করিল। আর মিঃ চার্চিলের মতে ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে হিটলার জার্মাণীর অস্ত্রসজ্জার জন্য ১৫০ কোটি পাউণ্ড খরচ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না, বরং হিটলারের ক্ষমতালাভের পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছুটিলেন জেনেভায় বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে জার্মাণীর পক্ষে ওকালতির জন্যে। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মাণীর প্রতি যে ঘোরতর অবিচার হইয়াছে, সেকথা বুঝাইবার দায়িত্ব লইলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি ফরাসী বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস (বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের বৃটিশ প্ল্যান অনুসারে) ও জার্মাণবাহিনী দ্বিগুণ করিবার পক্ষে যুক্তি দেখাইলেন। তারপর মুসোলিনীর সহযোগিতায় ইতালী, জার্মাণী, ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে এক চতুঃশক্তির মৈত্রী প্রস্তাব আনিলেন। অর্থাৎ পশ্চিমের সকল রাষ্ট্রকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জোট পাকাইবার জন্য উৎসাহ দিলেন। অন্যথা ইউরোপে শান্তি রক্ষা করিতে হইলে রাশিয়াকে বাদ দিয়া এই সমস্ত প্রস্তাবের অন্য কোন অর্থ হয় না।

কেবল বৃটেনেই যে নাৎসী জার্মাণীর পক্ষপাতী ধনিক ও শাসক সম্প্রদায় ছিল, এমন নহে। ফ্রান্সেও বহু কমিউনিস্ট বিদ্বেষী রাজনীতিক ও পুঁজিপতি হিট-লারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। অথচ ফ্রান্স ও জার্মাণীর সঙ্গে অহি-নকুলের চিরবৈরিতার সম্পর্ক। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-বিদ্বেষ সাম্যবাদের ভয়ে 'চিরশত্রু' জার্মাণীকে পর্যন্ত ফ্রান্সের মিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইল! একদল ফরাসী ধনিক ও রাজনীতিবিদের এই মনোভাব ও চক্রান্তের জন্যই হিটলারের হাতে ফ্রান্স দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এত দ্রুত পরাজিত হইয়াছিল। অবশ্য ফ্রান্সের সামরিক কর্তৃপক্ষ বা জেনারেল স্টাফ ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের মতে রাশিয়ার সহিত মৈত্রীই ছিল আত্ম-রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং ইহার বিপরীত পন্থা ছিল ফ্রান্সের পক্ষে আত্ম-হত্যার সমান। কিন্তু মঃ লাভাল ৩, কর্ণেল ডি লা রোক, মঃ তার্দিউ প্রভৃতি হিট-লারের সহিত সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল জার্মাণীকে পূর্ব ইউরোপে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইতে দেওয়া। এজন্য ফ্রান্সের নিরাপত্তাও তাহাদের নিকট বড় প্রশ্ন ছিল না। মঃ ক্লেমেন্স, মঃ পঁয়েকার প্রভৃতি ফ্রান্সের রক্ষণশীল নেতারা ইতিপূর্বে যে

৩ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে ইঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অনুসারে জার্মাণীর বিরুদ্ধতা করিয়া আসিতেছিলেন. বর্তমান ক্ষেত্রে সাম্যবাদী রাশিয়ার ভীতি সেই পুরাতন নীতিকে পর্যন্ত অস্বীকার করিতে চাহিল।

"Even in France, which is directly menaced by Hitler, the reactionary Fascist and pro-Fascist sections of the bourgeoise have openly supported Hitler...... The Comite des Forges, the most powerful element of France finance-capital and the main backer of Fascism in France has continuously supplied the iron ore of Lorraine to Hitler which has made possible his re-armament."

'World Politics' by R. Palme Dutt.

অর্থাৎ ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় মূলধন-ওয়ালার দল হিটলারকে সমর্থন করিলেন এবং লোরেন খনির লৌহধাতু তাঁহাকে সরবরাহ করিলেন, যে লৌহের দ্বারা হিটলার তাঁহার অস্ত্রসজ্জা অনুসরণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল ইংগ-ফরাসী শক্তিবর্গই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঋণ ও লগ্নীর নাম করিয়া ১৯২৫-৩০ সালের মধ্যে প্রভূত অর্থ জার্মাণ শিল্পপতি ও মূলধনওয়ালা-দিগকে সহায়তা দিলেন, এই সাহায্যের দ্বারাই আবার হিটলার ও নাৎসী পার্টিকে পুষ্ট করা হইতে লাগিল। বড় বড় মার্কিন প্রাইভেট ব্যাংক মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মোট ১৮২ মিলিয়ন ডলার জার্মাণ শিল্প-সংস্থাগুলিকে ঋণ দিয়াছিল—

...."The big American Bankers financed the German cannon-kings, who in turn financed Hitler".

সুতরাং হিটলারের ও নাৎসী পার্টির শক্তি বৃদ্ধিতে পয়সার কোন অভাব দেখা দিল না এবং ক্ষমতা লাভের পর হিটলার কর্তৃক অস্ত্র বা জার্মাণীব্যাপী সামরিক সড়ক নির্মাণেও (এর দ্বারা সেই সময়ে বেকার সমস্যারও যথেষ্ট প্রতিকার হইয়াছিল) হিটলারের খুব বেগ পাইতে হইল না। জার্মান শিল্প-সংস্থাগুলিকে ঋণদান ছাড়াও মার্কিন মূলধনওয়ালাগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জার্মানীকে মোট ১০০ কোটি ডলার লগ্নী করিয়াছিলেন। সোজা কথায় ইংগ-ফরাসী-মার্কিন পুঁজিপতিদের ক্রমাগত আনুকূল্য ও সাহায্যদানে এবং জার্মান শিল্পপতিদের সংগে নিবিড় সহযোগিতার সংগে হিটলার ও নাৎসী দল এত অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিল।৫*

*৫ পূর্ব জার্মানীর অধ্যাপক এ্যালবার্ট নরডেন রচিত 'Thus Wars Are Made', 1970, ৫৮-৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে।

আসলে ধনপতি ও শিল্পপতিদের পক্ষে সত্যকার দেশপ্রেমিক ও জনপ্রেমিক হওয়া যে কঠিন এই সমস্ত কাহিনী তারই প্রমাণ বহন করে আনে। অধ্যাপক নরডেন এই প্রসংগে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ও লেখক মিঃ ফেনার ব্রকওয়ের 'ডেথ পেইড এ্যা ডিভিডেন্ড' নামক পুস্তক থেকে এক চাঞ্চল্যকর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাইয়াছেন কিভাবে জার্মানীর জগদ্বিখ্যাত অস্ত্রনির্মাণ কারখানা ক্রুপ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সন্ধিক্ষণে জার্মানীর ক্রুপ কোম্পানী ইংলণ্ডের বিখ্যাত ভিকার্স এণ্ড আর্মস্ট্রং কোম্পানীকে একটি নব আবিষ্কৃত হাতবোমা ফাটাইবার কৌশল প্যাটেণ্ট হিসাবে বিক্রি করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর বৃটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে জার্মান কোম্পানী এই বলিয়া নালিশ ঠুকিয়া দিল যে, পশ্চিম রণাংগনে প্রতি হাতবোমা ব্যবহারের জন্য বৃটিশ কোম্পানী মাত্র ১ শিলিং করিয়া দাম দিতেছে, অথচ ক্রুপের নির্মিত ১২ কোটি ৩০ লক্ষ হাতবোমা রণ-ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বৃটিশ কোম্পানীর নিকট জার্মান কোম্পানীর পাওনা ৬১ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং। অর্থাৎ ক্রুপ কোম্পানীর যে হাতবোমা (হ্যাণ্ড গ্রেনেড) তাদের শত্রুপক্ষ বৃটিশ পশ্চিম রণাংগনে ব্যবহার করিয়াছে ১৯১৪—১৮ সালে এবং যার ফলে হাজার হাজার জার্মান সৈন্য হতা-হত হইয়াছে, তার জন্য ক্রুপ কোম্পানী মূল্য ও মুনাফা দাবী করিতেছে। এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার বা দেশদ্রোহিতার জন্য ক্রুপের কোন দণ্ড হইল না, বরং পুরস্কার-স্বরূপ বৃটিশ কোম্পানীর অংশীদারত্ব জুটিল! ৬*

১৯১৯ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ২০ বৎসরের ইউরোপীয় ইতিহাস সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বৃটেন ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ ক্রমাগত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধতার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, যে নীতির ফলে ইউরোপে জার্মাণী এবং এশিয়ায় জাপান সাম্রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধায়োজনে প্রকৃত সহায়তা পাইয়াছিল। অবশ্য কেবল বৃটেনই এই ব্যাপারে একা দোষী নহে।

অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তিও সোভিয়েট বিরোধিতায় তাহার সহযোগী ছিল এবং ১৯১৯ সালে পৃথিবীর ১৪টি রাষ্ট্র, যথা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী, ইতালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লোভাকিয়া, সার্ভিয়া, চীন, ফিনল্যাণ্ড, গ্রীস, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং তুরস্কের সৈন্যদল রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। অথচ মিত্রশক্তিবর্গ মুখে এই আক্রমণের কথা স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা নানা ছুতা দেখাইলেন—কখনও তাঁহারা বলিলেন যে, রাশিয়ার কোন দ্রব্যসম্ভার যাহাতে জার্মানীর হাতে না পড়ে, এজন্যই তাঁহারা সৈন্য পাঠাইয়াছেন, কখনও বা তাঁহারা বলিলেন যে, 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' স্থাপনে রুশদিগকে সাহায্য করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। পরবর্তীকালে মিঃ চার্চিল তাঁহার গ্রন্থে ('The World Crisis: the aftermath') বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষ কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ?—অবশ্যই না। তবে, তাঁহাদের সৈন্য সোভিয়েট রুশদিগকে দেখিবামাত্র গুলী করিয়াছে! সোভিয়েটের বিরুদ্ধ-বাদীদিগকে অস্ত্র জোগাইয়াছে। বন্দরগুলি অবরোধ এবং যুদ্ধজাহাজগুলি ডুবাইয়া দিয়াছে। অন্যান্য মিত্রশক্তি নিরপেক্ষ ছিলেন। এবং এই 'নিরপেক্ষতার যুদ্ধ' ও রাশিয়ার আপন গৃহযুদ্ধ চলিল আড়াই বৎসর। যাহার ফলে মোট ৭০ লক্ষ নরনারী ও শিশু মারা পড়িল—দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে ও যুদ্ধে। আর সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের মতে বৈষয়িক ক্ষতি রাশিয়ার হইয়াছিল ৬ হাজার কোটি ডলারের সমান। মিত্রপক্ষ রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই টাকার কোন হিসাব নাই। তবে, মিঃ চার্চিলের মতে ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃটেন খরচ করিয়াছিল ১০ কোটি পাউণ্ড এবং ফ্রান্স একমাত্র জেনারেল ডেনিকিনের সাহায্যের জন্যই ব্যয় করিয়াছিল ৩ কোটি হইতে ৪ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে। উত্তর রাশিয়াতে বৃটিশ সৈন্যদের অভিযানের জন্য খরচ হইয়াছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং জাপান সাইবেরিয়াতে ৭০ হাজার সৈন্য রক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিল ১০ কোটি ইয়েন।

কিন্তু এই সমস্ত ব্যয়বহুল অভিযান ব্যর্থ হইবার পর ১৯২৫-২৬ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশে ও পরাধীন দেশে রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্তে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন দেখা দিল। আর সেই সংগে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অতি জঘন্য নিন্দাবাদ, বিদ্বেষ ও নিদারুণ মিথ্যার অভিযানে ধনতন্ত্রবাদীগণ সারা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। সুতরাং ১৯২৬ সালের বসন্ত-কালে চীনের যে রাষ্ট্রবিপ্লব, কুমিণ্টাং ও কমিউনিস্টদের সম্মিলিত ফ্রণ্টের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল, তাহাও 'মস্কোর চক্রান্ত' বলিয়া প্রতিভাত হইল। পশ্চিমের সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রসমূহ জাপানকে উস্কানি দিল এবং জাপ-সম্রাটও এশিয়াকে 'বলশেভিক বর্বরতা' হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতি-শ্রুতি দিলেন। জাপানী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল টানাকা হইলেন সম্রাটের প্রধান সহায়। তিনি রাশিয়াসহ গোটা বিশ্বজয়ের এক প্ল্যান ফাঁদিয়া বসিলেন—যাহা 'টানাকা মেমোরিয়াল' নামে খ্যাত। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে মাঞ্চুরিয়ার কখ্যাত 'রণপ্রভু' জেনারেল চ্যাং সো-লিন জাপানী গভর্ন-মেণ্টের ক্রীড়নকরূপে পিকিংয়ের সোভিয়েট দূতবাসে হানা দিলেন এবং তিনি চীনের বিরুদ্ধে এক 'বলশেভিক চক্রান্ত' আবিষ্কার

*৬ পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃঃ ৭৩

[illegible] আর জেনারেল চিয়াং কাইশেক জাপান, বৃটেন ও ফ্রান্সের 'সাহায্য' ও উৎকোচে বশীভূত হইয়া কুমিণ্টাং ও কমিউনিস্টদের ইউনাইটেড ফ্রন্ট ভাঙিয়া দিলেন এবং সাংহাই, পিকিং ও অন্যত্র হাজার হাজার কমিউনিস্ট কিংবা কমিউনিস্ট সন্দেহে যুক্ত উদারনৈতিকপন্থী যুবক, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদিগকে বিনাবিচারে আটক, গ্রেপ্তার কিংবা গুলী করিয়া হত্যা করিলেন। চীন গৃহযুদ্ধে উন্মত্ত হইতে লাগিল, আর চীন-বিপ্লব ও রুশ-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গণবিক্ষোভ দেখা দিল।

এই অবস্থার মধ্যে ইউরোপে লোকার্ণো সম্মেলন—১৯২৬-২৭ সালে ইঙ্গ-ফরাসী রাজনীতিকগণ চাহিলেন জার্মানীকে দলে টানিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে। বৃটেনের গোঁড়া রক্ষণশীল দল ও ফ্রান্সের মঃ পয়েঁকার ও মার্শাল দল প্রভৃতি এই চক্রান্তে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এবং ১৯২৭ সালের ২৭শে মে বৃটিশ পুলিশ ও গোয়েন্দাগণ লণ্ডনের সোভিয়েট বাণিজ্য দূতাবাসে (Arcos House) হানা দিল এবং বার্লিন ও প্যারিসেও অনুরূপে হানা চলিল। যদিও কোথাও সোভিয়েট চক্রান্তের কোন দলিল বা প্রমাণ পাওয়া গেল না, তথাপি বৃটিশ গভর্নমেন্ট রাশিয়ার সহিত সমস্ত প্রকার কূটনৈতিক ও বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। এমনকি ১৯২৯ বা ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে বাহ্যতঃ পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সহায়তায় সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের এক বিরাট চক্রান্ত হইল। পলাতক রুশ ধনিকগণ বৃটেন ও ফ্রান্সের রক্ষণশীলদের সহায়তায় এই ষড়যন্ত্র করিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সাল হইতে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্গতি অকস্মাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়িল (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং সর্বত্র বেকার সমস্যা, দুর্ভিক্ষ ও অনশন দেখা দিল। বড় বড় ব্যাঙ্ক ও সওদাগরী অফিস কারবার গুটাইতে বাধ্য হইল। ফলে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনিকদের সশস্ত্র অভিযানের প্ল্যান মাটি হইয়া গেল। কারণ, সারা সভ্য পৃথিবীর সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল—ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের গভর্নর স্যর মণ্টেগু নরম্যানের মতে। কিন্তু এশিয়া খণ্ডে ধূর্ত জাপান দেখিল এই তার সুযোগ, সুতরাং ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপ সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল 'চীনকে বলশেভিক মতবাদ হইতে রক্ষার জন্য'। আমেরিকা প্রতিবাদ জানাইলেন এবং বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীন আবেদন জানাইলেন। কিন্তু মূখ্যা, বৃটেন ও ফ্রান্স জাপানী আক্রমণকে নিঃশব্দে অনুমোদন করিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচিত হইল।

এই সময় কেবল বাহিরের শত্রু নহে, ভিতরের শত্রুদলও সক্রিয় হইল। ১৯৩৩ সালে হিটলার কর্তৃক জার্মান রাষ্ট্র দখলের পর সারা ইউরোপে হত্যাকাণ্ড, বিশ্বাসঘাতকতা, বামপন্থা এবং ষড়যন্ত্রের এক ঢেউ বহিয়া গেল। রাশিয়ার অভ্যন্তরে ট্রটস্কি এবং তাঁহার দলবল এক নিদারুণ 'বিশ্বাসঘাতকতার' ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইলেন, যাহার শেষ হইল ১৯৩৬ সালে ইতিহাস-বিখ্যাত মস্কো ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে এবং বড় বড় ট্রটস্কিপন্থী নেতাদের প্রাণদণ্ডে। ট্রটস্কি রাশিয়া থেকে পরিত্রাণলাভ পূর্বক দক্ষিণ আমেরিকার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং পরে আততায়ীর হাতে নিহত হইয়াছিলেন। রাশিয়ার ভিতরে এবং বাহিরে —ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া প্রভৃতি দেশে নাৎসী গুপ্তঘাতকেরা বহু লোকের প্রাণনাশ করিল। এই সমস্ত চক্রান্ত এত ব্যাপক এবং ভয়াবহ ছিল যে, ১৯৩৭ সালে রেড আর্মির কয়েকজন সেরা জেনারেল ও মার্শাল পর্যন্ত দেশদ্রোহিতার অভিযোগে প্রাণ হারাইলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সোভিয়েট বিদ্বেষের জন্য ১৯৩৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকা ক্রমশঃ নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল। জার্মানী ও জাপান গোপনে চক্রান্ত করিতে লাগিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণের জন্য। জার্মান হাই-কম্যাণ্ড পোল্যাণ্ডের ফ্যাসিস্ত পক্ষপাতী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের সহিত সলাপরামর্শ করিতে লাগিলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে। বালটিক রাজ্য, বলকান রাজ্য এবং অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসী আন্দোলন ও বিশ্বাসঘাতকতা দানা বাঁধিতে লাগিল। আর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঃ লাভাল এবং বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব স্যর জন সাইমন ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ (১৯৩৫) ঘোষণা করিলেন, জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধির কয়েকটি ধারা হইতে মুক্তি দিতে। জার্মানীও তাহাই চাহিতেছিল। ঘটনার গতি দ্রুত আগাইয়া চলিল। ১লা মার্চ হিটলার ফ্রান্সের নিকট হইতে কয়লাখনির রাজ্য সার জেলা ফেরৎ পাইলেন এক গণভোটের দ্বারা এবং এই ভোটগ্রহণের পিছনে ছিল নাৎসী সন্ত্রাসবাদের ভীতি। তারপর ১৬ই মার্চ নাৎসী জার্মানী যথারীতি ভার্সাই সন্ধি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং জার্মানীতে 'সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি' প্রবর্তন করিলেন এক হুকুমনামার দ্বারা। ফরাসী, বৃটিশ, পোল এবং ইতালীর রাজদূতদিগকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়া হইল। ১৩ই এপ্রিল জার্মানী বৃহৎ বোমাবর্ষী বোমারুবহর সৃষ্টির এক কর্মতালিকা প্রচার করিল। এবং ১৮ই জুন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ বল্ডুইন (রক্ষণশীল) বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে এক নূতন নৌ-চুক্তির কথা ঘোষণা করিলেন। তখন বৃটিশ নৌবহর ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। নূতন চুক্তি অনুসারে জার্মানী বৃটিশ নৌবলের শতকরা ৩৫ ভাগের সমান নৌবল বৃদ্ধি করিতে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমান সাবমেরিনবহরের সমান সাবমেরিন [illegible] অধিকারী হইল। অক্টোবর মাসে (১৯৩৫) ফ্রান্সের মঃ লাভাল এবং বৃটেনের স্যর স্যামুয়েল হোর (যিনি এককালে ভারতসচিবরূপে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন) —এই দুইয়ের আশীর্বাদ পাইয়া মুসোলিনী আবিসিনিয়া বা আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাজ্য আক্রমণ এবং ১৯৩৬ সালের মে মাসে উহা দখল করিলেন। ৫ লক্ষ ফ্যাসিস্ট সৈন্য এই অভিযানে যোগ দিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানে অনগ্রসর হাবসীদের উপর বোমাবর্ষণ ও বিষাক্ত গ্যাস পর্যন্ত ব্যবহার করিল।

১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে যেমন চীন আবেদন জানাইয়াছিল বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবারে, এক্ষেত্রেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইল। ইতালী, জাপান ও জার্মানীর দৃষ্টান্তে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি শঙ্কিত হওয়ায় জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটা বৈঠকও বসিল এবং মৌখিক আদর্শ রক্ষার খাতিরে ইতালীকে 'আক্রমণকারী' বলিয়া ঘোষিত এবং তাহার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হইল—৭ই অক্টোবর, ১৯৩৫। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইতালী যথারীতি বৃহৎ শক্তিবর্গের নিকট হইতে সমরসম্ভারের প্রাণবস্তু লৌহ, কয়লা এবং পেট্রোল সরবরাহ পাইতে লাগিল। এই প্রহসনের শেষ অঙ্কে দেখা গেল যে, ফ্রান্স মুসোলিনীর সঙ্গে আপোষ করিয়া ফেলিয়াছে এবং বৃটেন 'সাম্রাজ্যের প্রাণপ্রবাহের পথ' ভূমধ্যসাগরে ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' নীতি অবলম্বন করিয়াছে!

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সদস্য রাষ্ট্রকে মুসোলিনী যখন এভাবে হত্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁরই দোসর হিটলার সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন রাইনল্যাণ্ডে—১৯৩৬ সালের ৭ই মার্চ। ১৯২৫ সালের লোকার্ণো চুক্তি অনুসারে জার্মানীসহ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ রাইনল্যাণ্ডকে নিরস্ত্রীকৃত রাখিবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এজন্যই লোকার্ণো চুক্তিকে ইউরোপের একটা শান্তির যুগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী ও ইতালী—এই সমস্ত পশ্চিমী শক্তি এই চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা ইউরোপে শান্তি নিশ্চিত করিলেন, এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কারণ, এই চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা পরস্পরের রাজ্যসীমা মানিয়া চলিবে এবং বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার এই যে, ইউরোপে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও সোভিয়েট রাশিয়াকে কিন্তু সযত্নে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে হিটলার ভার্সাই সন্ধির মত লোকার্ণো চুক্তিপত্রও বাজে কাগজের টুকরার মত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ফরাসী সৈন্যেরা সীমান্তে দাঁড়াইয়া দেখিল, কিন্তু বাধা দেওয়ার হুকুম পাইল না। কাঁদ হুকুম

পাইত, তাহা হইলে হিটলারের পক্ষে রাইনল্যান্ড পুনর্দখল করা সম্ভব হইত না। কিন্তু বৃটেন ফ্রান্সের সহায়তায় এমন কোন কাজ করিতে রাজী হইল না, যাহা দ্বারা যুদ্ধ বাধিতে পারে। অর্থাৎ ফ্রান্সকে বলপ্রয়োগ করিতে দেওয়া হইল না। আর হিটলার ঘোষণা করিলেন যে, তিনি রাইনল্যান্ড আবার দখল করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকে 'দুর্গান্বিত' (fortify) করা হইবে না এবং ইউরোপে তাঁর আর কোন ভূমিগত দাবী নাই। তাঁর মতে 'বিস্ময়ের যুগ' শেষ হইয়াছে।

১৯৩৩ সালের ১৪ই অক্টোবর জার্মানী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছিল, জাপান উহার আগেই (২৭শে মার্চ) মাঞ্চুরিয়া অভিযানের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছিল এবং ইতালীও পরে সেই একই পন্থা অনুসরণ করিল, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭। ইউরোপে শান্তিরক্ষার জন্যে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ভাঙ্গিয়া গেল এবং ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খ্যাতিমান রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ লিট্‌ভিনোফ এই সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি অনুসরণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিষদে বারবার আবেদন জানাইলেন। কিন্তু সাম্যবাদ ভীত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ ইহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না—ফ্যাসিস্ট ব্যাঘ্র রুশ ভল্লুকের ঘাড় মটকাইবে, ইহাই ছিল তাহাদের ইচ্ছা এবং মতলব। সুতরাং জার্মানী, ইতালী এবং জাপানকে কোনপ্রকার বাধা দেওয়া হইল না। ইঙ্গ-ফরাসী নেতারা এক সর্বনাশা তোষণনীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে, এভাবে তাঁহারা যুদ্ধের ফ্যাসাদ হইতে রক্ষা পাইয়া যাইবেন। ডিক্‌টেটরগণও এই তোষণনীতির আসল কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহারা পরস্পরের সহিত চক্রান্ত করিয়া যেমন সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ব্যর্থ করিয়া দিলেন, তেমনই পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়া আরও সোভিয়েট বিদ্বেষ প্রচার করিতে লাগিলেন। জার্মানীর নিকট সমগ্র ইউরোপ ইতালীর নিকট ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আফ্রিকা এবং জাপানের নিকট পূর্ব এশিয়া রাজ্যবিস্তার ও প্রভুত্ব স্থাপনের স্ব স্ব এলাকা বলিয়া প্রতিভাত হইল। আর পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ যেন পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জকে তোষণ করিতে লাগিলেন। ১৯৩৬ সালের ২৫শে নভেম্বর জার্মানী ও জাপান কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করিল এবং ১৯৩৭ সালের ৬ই নভেম্বর ইতালীও সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিল। এই ত্র্যহস্পর্শ যোগের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত কমিনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের বিরোধিতা করা। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ মনে মনে খুসী হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে, এই তিনের সহযোগিতায় যে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, একদিন সেই শক্তি তাদেরও বিপদ ঘটাইতে পারে।

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপান আবার চীনদেশ আক্রমণ করিল এবং পিকিং, টিয়েনসিন ও সাংহাই দখল করিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ উদাসীন রহিলেন। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ আধিপত্যের ভয়ে আমেরিকা আগের মতই প্রতিবাদ জানাইল, যদিও বিশেষ কোন ফল হইল না।

তারপর শুরু হইল স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের শোচনীয় নাটক, যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে আরও এক ধাপ অগ্রসর করিয়া আনিল।

স্পেনের নূতন রিপাবলিকান গভর্নমেণ্ট ভূমি-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের কতকগুলি আইন প্রবর্তন করিলেন। ফলে, রক্ষণশীল দল, কায়েমী স্বার্থের বাহকগণ এবং বড় বড় ভূস্বামী আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন এবং ইহা কমিউনিস্টদের কাণ্ড বলিয়া চীৎকার শুরু করিলেন, যদিও স্পেনে কমিউনিস্ট বেশী ছিল না এবং পপুলার ফ্রণ্ট গভর্নমেণ্টও আদৌ সাম্যবাদী ছিলেন না। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? ফ্যাসিস্ট দলপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কো দেখিলেন এই তাঁর সুযোগ। প্রায় সমগ্র সৈন্যদলের এবং মুর সৈন্যদের সহযোগিতায় তিনি রিপাবলিকান গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ১৮ই জুলাই (১৯৩৬) তারিখ বিদ্রোহ করিলেন স্পেনীয় মরক্কো হইতে। এই গৃহযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া অক্ষশক্তিবর্গ তাঁদের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, স্পেনে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে দক্ষিণ দিকে ফ্রান্স কাবু হইবে, আর ইংলণ্ডের জিব্রাল্টার প্রণালীর জলপথ বিপন্ন হইবে। সুতরাং ইতালী ও জার্মানী জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দিতে লাগিল। দুই বৎসরে ইতালী লক্ষাধিক সৈন্য পাঠাল ফ্রাঙ্কোর সাহায্যের জন্য, আর জার্মানী দিল ট্যাঙ্ক, গোলা-গুলী, কামান এবং বিমানবহরের সাহায্য ও সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসৈনিক। কেবল তাহাই নহে, তারা নূতন যান্ত্রিক যুদ্ধের পদ্ধতি এবং অস্ত্রগুলিও স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনে পরীক্ষা করিতে লাগিল। ফ্রান্স এই ব্যাপারে শঙ্কিত হইল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় তারাও রিপাবলিকান গভর্নমেণ্টের আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য ও বিমান পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু এভাবে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ-এর ফলে পাছে মহাযুদ্ধের প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া যায়, এই আশঙ্কায় ফ্রান্স ও রাশিয়া অধিকতর সাহায্যদান ও হস্তক্ষেপে বিরত হইল এবং অক্ষশক্তিবর্গও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াই ইতালী ও জার্মানী প্রকাশ্যে পূর্ববৎ ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দিতে লাগিল। বৃটেন ও ফ্রান্স 'নন্‌-ইণ্টারভেনসন'-এর দোহাই দিয়া দূরে সরিয়া রহিল এবং তাদের ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতদুষ্ট নীতি এই ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইল যে, ইহা দ্বারা স্পেনে সাম্যবাদের গতিরুদ্ধ এবং ইউরোপে যুদ্ধ নিবারিত হইতেছে।

প্রায় তিন বৎসর তীব্র লড়াই এবং প্রায় আড়াই বৎসর রাজধানী মাদ্রিদ অবরোধের পর ৫ লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৩৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল জেনারেল ফ্রাঙ্কো পূর্ণ জয়লাভ করেন। ইউরোপে ফ্যাসিস্ট জয়যাত্রা অপ্রতিহত হইল।

কিন্তু স্পেনের এবং ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ সেদিন সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ, উহাই ছিল প্রথম ফ্যাসিজম বনাম গণতান্ত্রিক শক্তির যুদ্ধ। সুতরাং স্পেনের রিপাবলিকান সরকারকে সাহায্য করার জন্য পৃথিবীর নানা দেশের প্রগতিবাদী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকেরা স্বেচ্ছাসৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এজন্য যে বিখ্যাত ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড গঠিত হইয়াছিল, তাতে ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই সময় স্পেনের বার্সিলোনা রণক্ষেত্রে গিয়াছিলেন এবং শহরের উপকণ্ঠে স্বয়ং সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির ভণ্ডামী ও ফ্যাসিজমের ক্রুরতা নেহরুকে পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি আরও বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

ইতিমধ্যে ক্ষমতামত্ত এবং তোষণ-নীতিতে পুষ্ট হিটলার আরও দুঃসাহসী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমাগত সৈন্যবল ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। জার্মান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে সমস্ত রক্ষণশীল জেনারেল তাঁর সহিত একমত হইলেন না, তিনি তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন—১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তখন হইতে হিটলারের ভাষা ও কণ্ঠস্বর আরও উগ্র হইতে লাগিল। তিনি কেবল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত জার্মানীর সমান মর্যাদা ও অধিকার দাবী করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্যের সমস্ত জার্মান বাসিন্দাদিগকে একত্র করিয়া বৃহত্তর জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়

জন্য প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের জার্মান অধিবাসীদের একত্র করিবার উদ্দেশ্যে তিনি Lebensram বা 'বাস-ভূমির' জন্য দাবী করিলেন। এজন্য পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী তিনি এই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরে নাৎসী আন্দোলন সংগঠন করিলেন এবং ভিতর হইতে সন্ত্রাসবাদ ও নানাপ্রকার গোলযোগের' সৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত গভর্নমেণ্টকে বিপাকে ফেলিবার নির্দেশ দিলেন। পরে 'আভ্যন্তরীণ গোলযোগ' ও 'জার্মানদের উপর অকথ্য পীড়নে'র ছুতা ধরিয়া হিটলার ও তাঁর দলবল 'নির্যাতিত জার্মানদের উদ্ধারের' জন্য বলপ্রয়োগ ও অন্যান্য কৌশল খাটাইতে লাগিলেন। ডাঃ গোয়েবেলসের প্রচারবিভাগ উগ্র হইয়া উঠিল।

এই কৌশলের প্রথম বলি হইল অস্ট্রিয়া। হিটলারী চক্রান্তের প্ররোচনায় সেখানকার নাৎসীদল Anschluss বা জার্মানীর সহিত 'মিলনের' আন্দোলন চালাইল। তখনকার অস্ট্রিয়ার গভর্নমেণ্ট ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল এবং তাঁরা আবার সোসিয়েলিস্ট পার্টিকে দমন করিয়া বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে তথাকথিত ফ্যাসিস্ট আন্দোলন এবং অন্যদিকে দুর্বল গভর্নমেণ্ট, এই উভয়ের সুযোগ পাইয়া হিটলার তাঁর পল্লীভবন বিখ্যাত বার্গেটস্‌গাডেনে (ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত) অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ডাঃ সুশনিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জোরপূর্বক তাঁর কাছ থেকে অস্ট্রিয়ায় জার্মানীর প্রবেশের এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া লইলেন—১৯৩৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। ডাঃ সুশনিগ নাৎসীদের হাতে বন্দী হইলেন। ঠিক এক মাস পর ১২ই মার্চ জার্মান সৈন্যেরা অস্ট্রিয়া আক্রমণ এবং দখল করিল। এই ঘটনায় সারা ইউরোপ স্তম্ভিত হইল, কিন্তু হিটলারের বিরুদ্ধে কেহ অঙ্গুলী তুলিল না, পাছে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। রাইনল্যাণ্ড দখলের পর হিটলার যেমন বলিয়াছিলেন, অস্ট্রিয়া দখলের পরও তেমনই তিনি ঘোষণা করিলেন যে ইউরোপে আর তাঁর কোন ভূমিগত দাবী নাই। এমনকি, তাঁর দক্ষিণহস্ত গোয়েরিং বৃটেনের নিকট হিটলারের নামে এই 'পবিত্র' প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়া বা অন্য কোন দেশ আক্রমণের কোন ইচ্ছা তাঁদের নাই।

কিন্তু বরাবরের মত ইহাও ছিল নিতান্তই ধাপ্পাবাজী। অস্ট্রিয়া দখলের পরেই জার্মানীতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ হইল। আর নাৎসী দলের পূর্ব চক্রান্ত অনুসারে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলার জার্মানরা হেনলেইননের নেতৃত্বে স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী ও মাইনরিটি হিসাবে তাদের উপর 'অত্যাচার ও পীড়নের' অভিযোগ করিতে লাগিল। চেক গভর্নমেণ্ট বৃটেনের 'মধ্যস্থতায়' বাধ্য হইয়া সুদেতেন জার্মানদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিলেন। কিন্তু এই অধিকার পাইবামাত্র তাহারা জার্মানীর সহিত 'মিলনের' আন্দোলন আরম্ভ করিল। ইহার ফলে চলিল গুণ্ডামী ও বিশৃঙ্খলার অভিযান। হিটলার যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানীর পক্ষ হইতে ফেরৎ চাহিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া দৃঢ়তা দেখাইতে লাগিল, ফ্রান্সের সঙ্গে ছিল তাহার আত্মরক্ষার চুক্তি এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ারও ছিল মৈত্রী বন্ধন। সীমান্তের দুর্গায়িত অঞ্চলে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত চেক সৈন্যরা দণ্ডায়মান হইল, ফ্রান্স তার রিজার্ভ বাহিনীকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং গ্রেট বৃটেন বাধ্য হইয়া হিটলারকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিল যে, ফ্রান্স যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়, তবে তারাও ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে। কিন্তু এবারও সোভিয়েট বিদ্বেষের জন্য সমস্ত ভণ্ডুল হইল। রাশিয়া বরাবরই ইউরোপীয় সংকট লক্ষ্য করিয়া সকলের সঙ্গে একত্রে সমষ্টিগত নিরাপত্তা-নীতি অবলম্বনের জন্য প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে তার পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল। কিন্তু বৃটেন তাতে রাজী হল না এবং ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ফ্যাসিস্ট তোষণনীতির চরম সংকটের সম্মুখীন হইলেন।

এদিকে হিটলার ইঙ্গ-ফরাসী-চেক প্রতিরোধের মুখে দাঁড়াইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কেননা, তিনি জানিতেন যে, সাম্যবাদের ভীতিগ্রস্ত এই সমস্ত শক্তিবর্গ তাঁকে বাধা দিবেন না এবং যুদ্ধকেও তাঁরা এড়াইয়া চলিবেন। সুতরাং ১৯৩৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হিটলার আবার ধাপ্পা দিলেন এবং আগের মতই ভূমিগত 'বৈরাগ্যের' (?) পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, এই সুদেতেনল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপে তাঁর আর কোন দাবী নাই, ইহাই শেষ এবং ইহা ফেরৎ পাইলেই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত এবং সুখী।

> "This is the last territorial claim I have to make in Europe. I have assured Mr. Chamberlain and I emphasise it now that when this problem is solved Germany has no more territorial problems in Europe.... We do not want any Czechs.... I shall not be interested in the Czech State any more".

চেম্বারলেনের বৃটেন ও দালাদিয়েরের ফ্রান্স সোভিয়েট বিদ্বেষে অন্ধ ও বুদ্ধিভ্রষ্ট ছিল—আবার হিটলারের প্রতিশ্রুতিকে তাঁরা বেদবাক্য মনে করিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন দুবার বিমানযোগে ছুটিলেন হিটলারের সকাশে, তাঁকে খুশী করিবার জন্য। বৃটেন ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর বিষম চাপ দিতে লাগিল নাৎসী জার্মানীকে আপোষের দ্বারা সন্তুষ্ট করার জন্য। এদিকে হিটলার দোস্ত মুসোলিনীও ছুটিয়া গেলেন আপোষ মীমাংসার দাবীতে। বৃটেন ও ফ্রান্স হিটলারের দাবীতে সম্মত হইল এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাদ দিয়েই চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হইল ১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মিউনিক সম্মেলনে। হিটলারের দাবী অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়াও অবশ্য এই সম্মেলন হইতে বাদ গেল এবং মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

অক্ষশক্তিবর্গ কূটনীতির ধাপ্পাবাজীতে জয়যুক্ত হইলেন। কিন্তু হিটলার মিউনিক চুক্তি মারফৎ জার্মান-অধ্যুষিত সুদেতেনল্যাণ্ড কুক্ষিগত করিয়াই থামিলেন না। পরের বৎসর মার্চ মাসে অস্ট্রিয়ার অনুকরণে চেক প্রেসিডেণ্ট হাচাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন বার্লিনে এবং জোরপূর্বক সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত করিবার এক দলীলে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। নাৎসী সৈন্যেরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় মার্চ করিল এবং গোটা দেশ দখল করিল। কয়েকদিন পর লিথুয়ানিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত মেমেল বন্দরও (যাহা ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জার্মানীর হাতছাড়া হইয়াছিল) তিনি কাড়িয়া লইলেন। আবার হিটলার ঘোষণা করিলেন যে, ইউরোপে তাঁর ভূমিগত আর কোন দাবী নাই—ভার্সাই সন্ধির ক্ষতিপূরণ-ধারার এখানেই খতম।

ইহার দুই সপ্তাহ পর ইতালীর পালা। মুসোলিনী আক্রমণ করিলেন আদ্রিয়াতিক উপসাগরের উপকূলবর্তী আলবানিয়া রাজ্য, হিটলার তাঁকে সমর্থন জানাইলেন। ১৯৩৯ সালের ৭ই এপ্রিল ক্ষুদ্র ও অসহায় আলবানিয়া রাজ্য মুসোলিনীর দখলে চলিয়া গেল—ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নীরব দর্শকমাত্র রহিলেন।

সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া এভাবে ইউরোপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিল। ফ্যাসিস্ট তোষণনীতি হিটলার ও মুসোলিনীকে শক্তিমত্তায় ও দিগ্বিজয়ে প্রবুদ্ধ করিল এবং সোভিয়েট রাশিয়া সমষ্টিগত নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া একক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু বুদ্ধিমান স্ট্যালিন বোকা বনিবার পাত্র ছিলেন না। সুতরাং সমগ্র জগৎ আর একটি বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনার সম্মুখীন হইল।—উহার নাম রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উহাই ছিল শেষ ভূমিকা। (ক্রমশঃ)

দ্বিতীয় পর্ব

(৫)

এর আগে আমি পাঁচজনের একজন ছিলাম। স্বতন্ত্র হয়েও বৈশিষ্ট্য ছিল না। এখন তা নয়। আমি যেন নিজেই একটা দুনিয়া। একটা নতুন জগৎ। নতুন সত্তা নতুন অনুভূতি।

কিছুদিনের মধ্যে কত কি পাল্টে গেছে? গরম দুপুর, শীতের রাত্রির মত আগে সময় যেন কাটতে চাইত না: ফুরুতে চাইত না। এখন? বসন্তের মিষ্টি সন্ধ্যার মত দেখতে দেখতে দিনগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। দুপুর সকালকে গ্রাস করেই অপরাহ্নের ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ছে। তারপরই সৌরমন্ডলের অধিপতি সূর্য রক্তাক্ত আহত সৈনিকের মত মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করে চাঁদের কাছে। এ সব তো আগেও হতো কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হতো কি?

কখনই না।

সেই ছোটবেলায় নিরুপমাদির ক্লাসে শিখেছিলাম পৃথিবী অবিরত ঘুরছে। শিখেছিলাম, পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু অনুভব করিনি। করার কারণ পাইনি। এখন আমার জীবনে যেই একটু গতি এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন পাগলের মত ঘুরতে শুরু করেছে। আশ্চর্য!

সুখের দিনগুলো, মিষ্টি অনুভূতি-ভরা মুহূর্তগুলোর একটু বেশী গতি? বোধ হয় তাই। সিক্সথ ইয়ারে উঠেই আত্রেয়ীর বিয়ে হলো। আমরা দল বেঁধে ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম কিন্তু বৌভাতে যাইনি। বিয়ের দিন পনের পর ও যখন প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে এলো, সেদিন আমাদের কি দারুণ হতাশা। শেষের দুটো ক্লাস আর করতে পারলাম না। উত্তেজনায় অশান্তিতে কেউই ক্লাশে বসতে পারছিলাম না। সব মেয়েরাই বেরিয়ে পড়লাম। কফি হাউসের ভীড়ে গেলাম না। ইয়াই এম সি এ-র কেবিনেও ঢুকলাম না। লেকের ল্যাবরেটরীর পিছনে ফাঁকা মাঠের এক পাশে আত্রেয়ীকে ঘিরে আমরা সবাই বসলাম ফুলশয্যার গল্প শুনতে। কোন ভূমিকা না করে রেখা প্রশ্ন করল, [illegible] পার্লহারবার আক্রমণের মত [illegible] আক্রমণ করেছিল?

আত্রেয়ী হাসতে হাসতে বলল, সে রাত্রে কোন আক্রমণই হয়নি।

মাধুরী বলল, শয্যা পেলেই আক্রমণ হয় আর ফুলশয্যায় আক্রমণ হলো না?

'না।'

পিছন থেকে কে যেন টিপ্পনী কাটল, বেশ গুল দিচ্ছিস তো।

আত্রেয়ী আবার কি বলতে চেষ্টা করল কিন্তু রেখা বাধা দিয়ে জানতে চাইল, তুই কি মুসোলিনীর মত যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়েই পরাজয় স্বীকার করলি নাকি নাৎসীদের মত আরো কিছুক্ষণ লড়তে পেরেছিলি?

শুধু রেখা নয়, আমরা সবাই মিলে ওকে অনেকভাবে অনেকক্ষণ জেরা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওর কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ পেলাম না।

'সত্যি সেদিন রাত্রের কথা ভাবলে আমার নিজেরও অবাক লাগে। একটু গল্পগুজব কথাবার্তা বলতে বলতেই ভোর হয়ে গেল।'

এমন হয়। অনেকেরই হয়। জীবনের কোন না কোন সময়ে সবারই এমন হয়। মনে হচ্ছে এইত সেদিন সাগরের নিউ ফরেস্ট আসার কথা পিসীর কাছে শুনলাম। এর মধ্যেই দুটো মাস কেটে গেল? আর ক' সপ্তাহই বা ও এখানে আছে? দেখতে দেখতে এই কটা দিনও ঝড়ের বেগে উড়ে যাবে।

সাগরের প্রতি আমার প্রেম নেই কিন্তু একটা আশ্চর্য সমবেদনায় মনটা ভরে গেছে। ওর সবগুলো ডায়েরী আমি পড়েছি। পড়েছি মাগোর কথা, মানসীর কথা। ও নিজে আমাকে পড়তে দিয়েছে। সব কিছু জানিয়েছে। ওর মনে কোন গ্লানি নেই। মানসীকে ভালবাসার মধ্যেও কোন গ্লানি, কোন মালিন্য ছিল না। যদি কোন গ্লানি, কোন মালিন্য থাকত, ওর মনে, ওর ভালবাসায়, তাহলে অমন করে নতুন-পুরানো ডায়েরীগুলো আমার হাতে তুলে দিত না। দিতে পারত না। গোলাপে কোন মালিন্য নেই বলেই কন্টকে আকীর্ণ দেহটা দেখাতে কার্পণ্য করে না।

ওর ডায়েরী পড়ার পর, ওর [illegible] আমার নিজের কথা পড়ার পর সাগরের মুখোমুখি হতে আমার লজ্জা করছিল। ডায়েরীগুলো ফেরত দেবার কথা ভাবছিলাম কয়েকদিন ধরেই কিন্তু যেতে পারিনি। ভাবছিলাম আমার কাছে আসতে ওরও নিশ্চয়ই লজ্জা করছে। শেষ পর্যন্ত একদিন দুপুরবেলায় ও হঠাৎ এসে হাজির হলো। খুব ক্লান্ত ছিল। সামনের ঘরে ঢুকেই সোফায় মাথা হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। একটু পরেই জিজ্ঞাসা করল, সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' পড়েছেন?

ওর প্রশ্নে অবাক হলাম। ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ পড়েছি।

কেমন লেগেছে?

ভাল।

সাগর চ্যাটার্জির আবোল-তাবোলের চাইতেও ভাল?

ওর কথা শুনে না হেসে পারলাম না। আমার হাসি দেখে ও প্রশ্ন করল, তাহলে, সত্যি আবোল-তাবোল লিখেছি, কি বলুন?

ওর ক্লান্তি দেখেই আমি বুঝেছিলাম খেয়ে আসেনি। বললাম, দাঁড়ান, আগে খাবার ব্যবস্থা করি। তারপর কথা হবে।

কথা হয়েছিল। সেদিন খাবার সময় আর কয়েকদিন পরে আমার অসমাপ্ত ইন্টারভিউ নিতে নিতে কথা হয়েছিল।

সাগর বলেছিল, অন্যায়ভাবে আপনাকে নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছি, লিখেছি। ক্ষমা করবেন।

'ক্ষমা চাইবার মত অন্যায় তো আপনি করেন নি।'

'অন্যায় করেছি বৈকি। আপনাকে নিয়ে এত কথা ভাবা, লেখা অন্যায় না?'

ভাবনা-চিন্তা নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে ন্যায়-অন্যায় কি আছে?'

ভাবনা-চিন্তায় বাধা দেওয়া যায় না বলেই কি অন্যায় নয়?'

জন্য প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের জার্মান অধিবাসীদের একত্র করিবার উদ্দেশ্যে তিনি Lebensram বা 'বাসভূমির' জন্য দাবী করিলেন। এজন্য পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী তিনি এই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরে নাৎসী আন্দোলন সংগঠন করিলেন এবং ভিতর হইতে সন্ত্রাসবাদ ও নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত গভর্নমেণ্টকে বিপাকে ফেলিবার নির্দেশ দিলেন। পরে 'আভ্যন্তরীণ গোলযোগ' ও 'জার্মানদের উপর অকথ্য পীড়নে'র ছুতা ধরিয়া হিটলার ও তাঁর দলবল 'নির্যাতিত জার্মানদের উদ্ধারের' জন্য বলপ্রয়োগ ও অন্যান্য কৌশল খাটাইতে লাগিলেন। ডাঃ গোয়েবলসের প্রচারবিভাগ উগ্র হইয়া উঠিল।

এই কৌশলের প্রথম বলি হইল অস্ট্রিয়া। হিটলারী চক্রান্তের প্ররোচনায় সেখানকার নাৎসীদল Anschluss বা জার্মানীর সহিত 'মিলনের' আন্দোলন চালাইল। তখনকার অস্ট্রিয়ার গভর্নমেণ্ট ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল এবং তাঁরা আবার সোসিয়েলিস্ট পার্টিকে দমন করিয়া বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে তথাকথিত ফ্যাসিস্ট আন্দোলন এবং অন্যদিকে দুর্বল গভর্নমেণ্ট, এই উভয়ের সুযোগ পাইয়া হিটলার তাঁর পল্লীভবন বিখ্যাত বার্গেটস্‌গাডেনে (ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত) অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ডাঃ সুশনিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জোরপূর্বক তাঁর কাছ থেকে অস্ট্রিয়ায় জার্মানীর প্রবেশের এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া লইলেন—১৯৩৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। ডাঃ সুশনিগ নাৎসীদের হাতে বন্দী হইলেন। ঠিক এক মাস পর ১২ই মার্চ জার্মান সৈন্যেরা অস্ট্রিয়া আক্রমণ এবং দখল করিল। এই ঘটনায় সারা ইউরোপ স্তম্ভিত হইল, কিন্তু হিটলারের বিরুদ্ধে কেহ অঙ্গুলী তুলিল না, পাছে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। রাইনল্যাণ্ড দখলের পর হিটলার যেমন বলিয়াছিলেন, অস্ট্রিয়া দখলের পরও তেমনই তিনি ঘোষণা করিলেন যে ইউরোপে আর তাঁর কোন ভূমিগত দাবী নাই। এমনকি, তাঁর দক্ষিণহস্ত গোয়েরিং বৃটেনের নিকট হিটলারের নামে এই 'পবিত্র' প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়া বা অন্য কোন দেশ আক্রমণের কোন ইচ্ছা তাঁদের নাই।

কিন্তু বরাবরের মত ইহাও ছিল নিতান্তই ধাপ্পাবাজী। অস্ট্রিয়া দখলের পরেই জার্মানীতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ হইল। আর নাৎসী দলের পূর্ব চক্রান্ত অনুসারে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলার জার্মানরা হেনলেইননর নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের দাবী ও মাইনরিটি হিসাবে তাদের উপর 'অত্যাচার ও পীড়নের' অভিযোগ করিতে লাগিল। চেক গভর্নমেণ্ট বৃটেনের 'মধ্যস্থতায়' বাধ্য হইয়া সুদেতেন জার্মানদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিলেন। কিন্তু এই অধিকার পাইবামাত্র তাহারা জার্মানীর সহিত 'মিলনের' আন্দোলন আরম্ভ করিল। ইহার ফলে চলিল গুণ্ডামী ও বিশৃঙ্খলার অভিযান। হিটলার যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানীর পক্ষ হইতে ফেরৎ চাহিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া দৃঢ়তা দেখাইতে লাগিল, ফ্রান্সের সঙ্গে ছিল তাহার আত্মরক্ষার চুক্তি এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ারও ছিল মৈত্রী বন্ধন। সীমান্তের দুর্গায়িত অঞ্চলে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত চেক সৈন্যরা দণ্ডায়মান হইল, ফ্রান্স তার রিজার্ভ বাহিনীকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং গ্রেট বৃটেন বাধ্য হইয়া হিটলারকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিল যে, ফ্রান্স যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়, তবে তারাও ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে। কিন্তু এবারও সোভিয়েট বিদ্বেষের জন্য সমস্ত ভণ্ডুল হইল। রাশিয়া বরাবরই ইউরোপীয় সংকট লক্ষ্য করিয়া সকলের সঙ্গে একত্রে সমষ্টিগত নিরাপত্তা-নীতি অবলম্বনের জন্য প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে তার পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল। কিন্তু বৃটেন তাতে রাজী হল না এবং ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ফ্যাসিস্ট তোষণনীতির চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইলেন।

এদিকে হিটলার ইঙ্গ-ফরাসী-চেক প্রতিরোধের মুখে দাঁড়াইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কেননা, তিনি জানিতেন যে, সাম্যবাদের ভীতিগ্রস্ত এই সমস্ত শক্তিবর্গ তাঁকে বাধা দিবেন না এবং যুদ্ধকেও তাঁরা এড়াইয়া চলিবেন। সুতরাং ১৯৩৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হিটলার আবার ধাপ্পা দিলেন এবং আগের মতই ভূমিগত 'বৈরাগ্যের' (?) পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, এই সুদেতেনল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপে তাঁর আর কোন দাবী নাই, ইহাই শেষ এবং ইহা ফেরৎ পাইলেই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত এবং সুখী।

> "This is the last territorial claim I have to make in Europe. I have assured Mr. Chamberlain and I emphasise it now that when this problem is solved Germany has no more territorial problems in Europe.... We do not want any Czechs.... I shall not be interested in the Czech State any more".

চেম্বারলেনের বৃটেন ও দালাদিয়েরের ফ্রান্স সোভিয়েট বিদ্বেষে অন্ধ ও বুদ্ধিভ্রষ্ট ছিল—আবার হিটলারের প্রতিশ্রুতিকে তাঁরা বেদবাক্য মনে করিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন দুবার বিমানযোগে ছুটিলেন হিটলারের সকাশে, তাঁকে খুসী করিবার জন্য। বৃটেন ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর বিষম চাপ দিতে লাগিল নাৎসী জার্মানীকে 'আপোষের' দ্বারা সন্তুষ্ট করার জন্য। এদিকে হিটলার দোস্ত মুসোলিনীও ছুটিয়া গেলেন আপোষ মীমাংসার দাবীতে। বৃটেন ও ফ্রান্স হিটলারের দাবীতে সম্মত হইল এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাদ দিয়েই চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হইল ১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মিউনিক সম্মেলনে। হিটলারের দাবী অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়াও অবশ্য এই সম্মেলন হইতে বাদ গেল এবং মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

অক্ষশক্তিবর্গ কূটনীতির ধাপ্পাবাজীতে জয়যুক্ত হইলেন। কিন্তু হিটলার মিউনিক চুক্তি মারফৎ জার্মান-অধ্যুষিত সুদেতেনল্যাণ্ড কুক্ষিগত করিয়াই থামিলেন না। পরের বৎসর মার্চ মাসে অস্ট্রিয়ার অনুকরণে চেক প্রেসিডেণ্ট হাচাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন বার্লিনে এবং জোরপূর্বক সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত করিবার এক দলীলে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। নাৎসী সৈন্যেরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় মার্চ করিল এবং গোটা দেশ দখল করিল। কয়েকদিন পর লিথুয়ানিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত মেমেল বন্দরও (যাহা ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জার্মানীর হাতছাড়া হইয়াছিল) তিনি কাড়িয়া লইলেন। আবার হিটলার ঘোষণা করিলেন যে, ইউরোপে তাঁর ভূমিগত আর কোন দাবী নাই—ভার্সাই সন্ধির ক্ষতিপূরণ-ধারার এখানেই খতম।

ইহার দুই সপ্তাহ পর ইতালীর পালা। মুসোলিনী আক্রমণ করিলেন আদ্রিয়াতিক উপসাগরের উপকূলবর্তী আলবানিয়া রাজ্য, হিটলার তাঁকে সমর্থন জানাইলেন। ১৯৩৯ সালের ৭ই এপ্রিল ক্ষুদ্র ও অসহায় আলবানিয়া রাজ্য মুসোলিনীর দখলে চলিয়া গেল—ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নীরব দর্শকমাত্র রহিলেন।

সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া এভাবে ইউরোপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিল। ফ্যাসিস্ট তোষণনীতি হিটলার ও মুসোলিনীকে শক্তিমত্তায় ও দিগ্বিজয়ে প্রলুব্ধ করিল এবং সোভিয়েট রাশিয়া সমষ্টিগত নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া একক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু বুদ্ধিমান স্ট্যালিন বোকা বনিবার পাত্র ছিলেন না। সুতরাং সমগ্র জগৎ আর একটি বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনার সম্মুখীন হইল। —উহার নাম রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। —দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উহাই ছিল শেষ ভূমিকা। (ক্রমশঃ)

দ্বিতীয় পর্ব

(৫)

এর আগে আমি পাঁচজনের একজন ছিলাম। স্বতন্ত্র হয়েও বৈশিষ্ট্য ছিল না। এখন তা নয়। আমি যেন নিজেই একটা দুনিয়া। একটা নতুন জগৎ। নতুন সত্তা নতুন অনুভূতি।

কিছুদিনের মধ্যে কত কি পাল্টে গেছে? গরম দুপুর, শীতের রাত্রির মত আগে সময় যেন কাটতে চাইত না: ফুরুতে চাইত না। এখন? বসন্তের মিষ্টি সন্ধ্যার মত দেখতে দেখতে দিনগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। দুপুর সকালকে গ্রাস করেই অপরাহ্নের ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ছে। তারপরই সৌরমন্ডলের অধিপতি সূর্য রক্তাক্ত আহত সৈনিকের মত মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করে চাঁদের কাছে। এ সব তো আগেও হতো কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হতো কি?

কখনই না।

সেই ছোট্টবেলার নিরুপমাদির ক্লাসে শিখেছিলাম পৃথিবী অবিরত ঘুরছে। শিখেছিলাম, পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু অনুভব করিনি। করার কারণ পাইনি। এখন আমার জীবনে যেই একটু গতি এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন পাগলের মত ঘুরতে শুরু করেছে। আশ্চর্য!

সুখের দিনগুলো, মিষ্টি অনুভূতি-ভরা মুহূর্তগুলোর একটু বেশী গতি? বোধ হয় তাই। সিক্সথ ইয়ারে উঠেই আত্রেয়ীর বিয়ে হলো। আমরা দল বেঁধে ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম কিন্তু বৌভাতে যাইনি। বিয়ের দিন পনের পর ও যখন প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে এলো, সেদিন আমাদের কি দারুণ হতাশা। শেষের দুটো ক্লাশ আর করতে পারলাম না। উত্তেজনায় অস্থিরতাতে কেউই ক্লাশে বসতে পারছিলাম না। সব মেয়েরাই বেরিয়ে পড়লাম। কফি হাউসের ভীড়ে গেলাম না। ইয়াই এম সি এ-র কেবিনেও ঢুকলাম না। যেকার ল্যাবরেটরীর পিছনে ফাঁকা মাঠের এক পাশে আত্রেয়ীকে ঘিরে আমরা সবাই বসলাম ফুলশয্যার গল্প শুনতে। কোন ভূমিকা না করে রেখা প্রশ্ন করল, জাপানের পার্লহারবার আক্রমণের মত তোমাদের উপর পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ করেছিল?

আত্রেয়ী হাসতে হাসতে বলল, সে রাত্রে কোন আক্রমণই হয়নি।

মাধবী বলল, শয্যা পেলেই আক্রমণ হয় আর ফুলশয্যায় আক্রমণ হলো না?

'না।'

পিছন থেকে কে যেন টিপ্পনী কাটল, বেশ গুল দিচ্ছিস তো।

আত্রেয়ী আবার কি বলতে চেষ্টা করল কিন্তু রেখা বাধা দিয়ে জানতে চাইল, তুই কি মুসোলিনীর মত যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়েই পরাজয় স্বীকার করলি নাকি নাৎসীদের মত আরো কিছুক্ষণ লড়তে পেরেছিলি?

শুধু রেখা নয়, আমরা সবাই মিলে ওকে অনেকভাবে অনেকক্ষণ জেরা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওর কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ পেলাম না।

'সত্যি সেদিন রাত্রের কথা ভাবলে আমার নিজেরও অবাক লাগে। একটু গল্পগুজব কথাবার্তা বলতে বলতেই ভোর হয়ে গেল।'

এমন হয়। অনেকেরই হয়। জীবনের কোন না কোন সময়ে সবারই এমন হয়। মনে হচ্ছে এইত সেদিন সাগরের নিউ ফরেস্ট আসার কথা পিসীর কাছে শুনলাম। এর মধ্যেই দুটো মাস কেটে গেল? আর ক' সপ্তাহই বা ও এখানে আছে? দেখতে দেখতে এই কটা দিনও ঝড়ের বেগে উড়ে যাবে।

সাগরের প্রতি আমার প্রেম নেই কিন্তু একটা আশ্চর্য সমবেদনায় মনটা ভরে গেছে। ওর সবগুলো ডায়েরী আমি পড়েছি। পড়েছি মাগোর কথা, মানসীর কথা। ও নিজে আমাকে পড়তে দিয়েছে। সব কিছু জানিয়েছে। ওর মনে কোন গ্লানি নেই। মানসীকে ভালবাসার মধ্যেও কোন গ্লানি, কোন মালিন্য ছিল না। যদি কোন গ্লানি, কোন মালিন্য থাকত, ওর মনে, ওর ভালবাসায়, তাহলে অমন করে নতুন-পুরানো ডায়েরীগুলো আমার হাতে তুলে দিত না। দিতে পারত না। গোলাপে কোন মালিন্য নেই বলেই কন্টকে লাঞ্ছিত দেহটা দেখাতে কার্পণ্য করে না।

ওর ডায়েরী পড়ার পর, ওর ডায়েরীতে আমার নিজের কথা পড়ার পর সাগরের মুখোমুখি হতে আমার লজ্জা করছিল। ডায়েরীগুলো ফেরত দেবার কথা ভাবছিলাম কয়েকদিন ধরেই কিন্তু যেতে পারিনি। ভাবছিলাম আমার কাছে আসতে ওরও নিশ্চয়ই লজ্জা করছে। শেষ পর্যন্ত একদিন দুপুরবেলায় ও হঠাৎ এসে হাজির হলো। খুব ক্লান্ত ছিল। সামনের ঘরে ঢুকেই সোফায় মাথা হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। একটু পরেই জিজ্ঞাসা করল, সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' পড়েছেন?

ওর প্রশ্নে অবাক হলাম। ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ পড়েছি।

কেমন লেগেছে?

ভাল।

সাগর চ্যাটার্জির আবোল-তাবোলের চাইতেও ভাল?

ওর কথা শুনে না হেসে পারলাম না। আমার হাসি দেখে ও প্রশ্ন করল, তাহলে সত্যি আবোল-তাবোল লিখেছি, কি বলুন?

ওর ক্লান্তি দেখেই আমি বুঝেছিলাম খেয়ে আসেনি। বললাম, দাঁড়ান, আগে খাবার ব্যবস্থা করি। তারপর কথা হবে।

কথা হয়েছিল। সেদিন খাবার সময় আর কয়েকদিন পরে আমার অসমাপ্ত ইন্টারভিউ নিতে নিতে কথা হয়েছিল।

সাগর বলেছিল, অন্যায়ভাবে আপনাকে নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছি, লিখেছি। ক্ষমা করবেন।

'ক্ষমা চাইবার মত অন্যায় তো আপনি করেন নি।'

'অন্যায় করেছি বৈকি। আপনাকে নিয়ে এত কথা ভাবা, লেখা অন্যায় না?'

ভাবনা-চিন্তা নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে ন্যায়-অন্যায় কি আছে?'

ভাবনা-চিন্তায় বাধা দেওয়া যায় না বলেই কি অন্যায় নয়?'

কদিন পরে সকালবেলায় গেস্ট হাউসে গিয়েছিলাম। ও তখনও ঘুমুচ্ছে। কিছুক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখলাম। ও যখন ঘুমিয়ে থাকে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, তখন ওকে আরো ভাল লাগে। মিষ্টি লাগে, সুন্দর লাগে। তবে বড় অসহায় মনে হয়। মায়া লাগে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো ছোট বেলায় ওকে আরো সুন্দর আরো মিষ্টি দেখাতে ছিল। তখন ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে শুতে মাগোর নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগতো। মন ভরে যেত। এখন যদি আমার মত কেউ ....

ভাবতে গিয়েও লজ্জিত বোধ করলাম। আমি নিজেই কি ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে শোবার কথা ভাবতে গিয়েছিলাম? তাই কি হয়? হবার দরকার কি?

যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই। আমি বেশ বুঝতে পারি এসব ভাবনা-চিন্তার কোন যুক্তি নেই, অর্থ নেই। কিন্তু তবুও ভাবি। ভেবেছিলাম। এই তো কয়েক মুহূর্ত আগেই ভেবেছিলাম। মানুষের মন বিচিত্র। আরো বিচিত্র মেয়েদের মন। যুবতীর মন। বিমলদার মত যারা দস্যু, তাদের ভাল না লাগলেও বাধা দিতে পারে না। পারিনি। কিন্তু সাগরের মত যারা পাশে থেকেও দাবী জানায় না, এগিয়ে আসে না, তাদের আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। আমি ক্লিওপেট্রা বা হেলেন অফ ট্রয় নই ঠিকই। তবুও একজন যুবতী তো বটে। মনে হচ্ছে যেন ক্রমশ হেরে যাচ্ছি, ব্যর্থ হচ্ছি। যে পরাজয়, যে ব্যর্থতা এই বয়সে আমার মত কোন মেয়ের পক্ষেই স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। হয়ত উচিতও নয়। বসন্তে যারা আনমনা হয় না, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যই কি কালবৈশাখী আসে?

আমিও কি কোন দিন কালবৈশাখীর মত......

খুব জোরে এক বুক নিঃশ্বাস টেনে সাগর পাশ ফিরল। [illegible] ভয়েলের ব্লাউজের উপর দিয়ে খাটাউ ভয়েলের শাড়ীর আঁচল টানতে টানতে আমি দু পা পিছিয়ে গেলাম। ধরা পড়ার ভয়ে পিছিয়ে গেলাম। মনে মনে যা কিছুই ভাবি না কেন, যত দুর্বলতাই থাকুক না কেন, সেসব প্রকাশ করতে বড় দ্বিধা, বড় সংকোচ।

না, না, আর এমন করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। ওর ঘুম ভাঙাবার জন্য এগিয়ে গেলাম। উঠুন অনেক বেলা হয়ে গেল!

আবার ডাকলাম, শুনছেন? অনেক বেলা হয়ে গেছে।

একবার, দুবার, তিনবার ডাকলাম। উঠল না। কি করব? শেষ পর্যন্ত কপালে ডান হাত দিয়ে একটু নাড়া দিয়ে ডাকলাম, উঠবেন না? অনেক বেলা হয়ে গেছে!

সাগর চোখ মেলে তাকিয়েই হাসল। একটু স্বপ্ন মাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। হাসতে হাসতে তাকাল। রোগের জীবাণুর মত প্রিয় জনের অনুভূতিও সংক্রামক। প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখ হয়, সুখে আনন্দ হয়। ওর হাসি দেখে আমিও হাসলাম।

হাসছিলাম ইন্টারভিউয়ের সময়েও। কয়েকটা মামুলি প্রশ্নের পর সাগর হাসতে হাসতে বলল, এবারের প্রশ্নের জন্য মার্জনা করবেন।

'কেন মার্জনা করবার কি হলো?'

'ফ্যামিলী প্ল্যানিং নিয়ে প্রশ্ন করব বলে।' লজ্জায় ও মুখ নীচু করেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল।

'আমার তো কোন ফ্যামিলীই নেই।'

'তাতো জানি। তবুও কিছু হয়ত বলতে পারবেন।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'আমি জানি না; তবে প্ল্যানিং কমিশন অনুমান করে পূর্ণ বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েদের এ সম্পর্কে কিছু জানা আছে।'

ওর কথা শুনে আমার হাসি পেল। জানতে চাইলাম, আপনার অনুমানও কি তাই?

'অনেক মেয়েই জানে। তবে......'

আপনার কি ধারণা আমিও জানি?'

'কোন ধারণা নিয়েই কাউকে ইন্টারভিউ করি না।'

আমি এবার ওর হাত থেকে ফর্মটা নিয়ে প্রশ্নগুলো পড়লাম। ফ্যামিলী প্ল্যানিং-এর কথা শুনেছেন? কোথায় শুনেছেন? কি শুনেছেন? কি কি উপায়ে ফ্যামিলী প্ল্যানিং করা যায় জানেন? আপনি কোনটি পছন্দ করেন? অন্যগুলি পছন্দ করেন না কেন? আপনার পরিচিতাদের মধ্যে কোনটি বেশী জনপ্রিয়? আরো কত কি। পড়তে পড়তে হাসি পেল। আমি ওর কলমটা নিয়ে টেবিলে গিয়ে ঐ প্রশ্নগুলোর পাশে একটা বড় ব্র্যাকেট দিয়ে লিখলাম, সময় এলে সব প্রশ্নের উত্তর দেব। এবার ফর্মটা ভাল করে ভাঁজ করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, যত্ন করে রেখে দিন। দিল্লী গিয়ে প্ল্যানিং কমিশনে জমা করে দেবেন।

এসব সত্ত্বেও সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়েছে।

পর পর দুদিন সাগরের দেখা পেলাম না। তারপর দিন বিকেলের দিকে পিসী টেলিফোন করল, হ্যাঁরে সাগরের খবর জানিস?

না তো।

গেল কোথায়? কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে।

তুমি কি গেস্ট হাউসে খবর নিয়েছ?

হ্যাঁ। ওরা কিছু জানে না।

'কবে আসবেন তাও বলে যাননি?'

'না।'

পিসী একটু থামল। তারপর বলল, ছেলেটা তো মহা চিন্তায় ফেলল।

আমিও গেস্ট হাউসে অনেকবার টেলিফোন করেছি। আমারও চিন্তা হচ্ছিল। দুশ্চিন্তা। বারান্দায় চুপটি করে বসে বসে চাক্রাতা রোডের দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ একেবারে গেটের সামনে একটা অটো-রিকসা থামল। সাগর নামল। হাতে একটা ছোট্ট অ্যাটাচি কেস।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। কি ব্যাপার বলুন তো? কোথায় গিয়েছিলেন?

সাগর একবার মিষ্টি দৃষ্টিতে আমার দিকে শুধু তাকাল।

ওর চোখে আমারও চোখ পড়ল। লজ্জা করল। দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু কতক্ষণ? এক মুহূর্ত পরে আবার ওর দিকে, ওর চোখের দিকে তাকালাম। তখনও ও ঠিক একইভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। ভাল লাগল। একটু অস্বস্তি লাগলেও ভাল লাগল। বলল, অমন করে কি দেখছেন?

ও নির্বিবাদে জবাব দিল, আপনাকে।

'কেন আমাকে দেখার কি হলো?'

'আপনার উৎকণ্ঠা মাখা মুখখানা দেখতে ভাল লাগছে।'

আমি ঘুরে বারান্দার দিকে এগুতে এগুতে বললাম, আমার মুখে আবার উৎকণ্ঠার চিহ্ন কোথায় পেলেন?

ও পিছন থেকে জবাব দিল, সর্বত্র।

ড্রইংরুমের সোফায় সাগর বসতেই বললাম, পিসী আপনার উপর দারুণ রেগে গিয়েছেন।

'কেন?'

'কেন তা বুঝতে পারছেন না?'

'না।'

'এমন করে না বলে চলে গেলে রাগবেন না?'

'না।'

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, মাগো বা মানসী থাকলে এমন করে না বলে চলে যেতে পারতেন?

কথাটা বলে আর দাঁড়ালাম না। তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে চলে গেলাম। রান্নাঘরে। কেটলিতে চায়ের জল চাপিয়ে

ঘুরেই দেখি রান্নাঘরের দরজায় সাগর। এর আগে কোনদিন রান্নাঘরের দিকে আসেনি। এই প্রথম। ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি এখানে কেন? পারলাম না। ইচ্ছা করল না। ওকে যেন দেখেও না দেখার ভান করলাম।

'চায়ের সঙ্গে কিছু খেতে দেবেন তো? ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

সাগর আমাকে ভালবাসে না। আমাকে ওর ভাল লাগে। আমাকে পছন্দ করে। আমি জানি। জানি ওর ডায়েরী পড়ে। জানি ওর ব্যবহারে। সংযত ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও মনের এই কথা, ভাব বেশ প্রকাশ পায়। আমি বুঝতে পারি। স্পষ্ট করে বুঝতে পারি।

সেদিন আমাদের এখানে চা-জলখাবার খেয়ে আমরা দুজনে পিসীর ওখানে গেলাম। পিসীকে সামনে পেয়েই সাগর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, বকবেন না।

পিসী তাড়াতাড়ি ওকে দু'হাত দিয়ে তুলে ধরতেই সাগর আবার বলল, বকবেন না তো?

পিসী না হেসে পারল না। না, না, বকব কেন?

আচ্ছা ও যদি অমন করে পিসীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, আমার কাছে কি কিছুই......

ঠিক বুঝতে পারি না আমি ওর কাছে কি চাই। কি আশা করি। প্রত্যাশা করি। কি পেলে খুসী হই। মন ভরে যায়। এসব কিছুই বুঝতে পারি না, ধরতে পারি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি ওর কাছ থেকে আরো একটু কিছু চাই। ঐ একটু কিছু পেলে ভাল লাগত। সেদিন ও রান্নাঘরের দরজায় না দাঁড়িয়ে ভিতরে আসতে পারত না? আমার দুটো হাত ধরে বলতে পারত না, বুলা, রাগ করেছ? আমি তখনও গম্ভীর হয়ে থাকতাম। তখনও কি একহাত দিয়ে সাগর মুখটা তুলে ধরে বলতে পারত না, রাগ করো না? ও যদি আমাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে আদর করত তাহলেও আমি কিছু বলতাম না? বলব কেন? জানি যে আমার ক্ষতি করবে না, অমর্যাদা করবে না, সে একটু আদর করলে আপত্তি করব কেন? বরং ভালই লাগবে। এইত আদর পাবার বয়স। শুধু আদর কেন? আরো কত কি পাবার বয়স হয়েছে আমার। সে সব তো চাইছি না, চাইতে পারি না। সময় হলে পাব। নিশ্চয়ই পাব। নেব। যা দেবার তা দেব।

যখনই একলা একলা চুপ করে বসে থাকি, রাত্রে শুয়ে থাকি, জানলা দিয়ে দূরের আকাশের তারা দেখি, দৈত্যের মত বিরাট কালো কালো পাহাড় দেখি তখন যত আজে-বাজে চিন্তা মাথায় আসে। কাউকে কিছু বলতে পারি না, বোঝাতে পারি না। প্রাণ খুলে কথা বলব, এমন কেউ নেই। বাড়ীর একমাত্র মেয়ে বলে বাবা-মা ভালবাসেন। খুব ভালবাসেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে তো মনের কথা বলা যায় না। শুধু মন থাকতে দিনটা গড়িয়ে গড়িয়ে কাটত। এখন তো সারাদিন বোবা হয়ে বসে থাকি। পিসীর কাছে গেলে ভাল লাগে। কিন্তু পিসী তো পিসী। এখানে আমার সমবয়সী একটাও বাঙালী মেয়েকে পাইনি। বাবার অফিসের দু-একটা ছোকরা প্রথম প্রথম একটু ঘুর ঘুর করত। দুর্গা বাড়ীর লাইব্রেরীতে গেলে অর্ডিন্যান্স ফ্যাকটরীর কিছু ছেলে অকারণে কথাবার্তা বলে আলাপ করত। দু-একজন ধুতি-পাঞ্জাবী পরে রোমান্টিক দৃষ্টিতে চাইত। ওসব ভাল লাগতো না। এখনও লাগে না। একটা বিচিত্র শূন্যতার মধ্যে সাগর এলো। এলো কিন্তু ভিতরে ঢুকল না, দরজায় এসে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভিতরে আসার আমন্ত্রণ জানাইনি কিন্তু ভিতরে আসতেও তো মানা করিনি। আপত্তি করিনি। বাধা দিইনি। তবে কেন ও দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল? জানলা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি ও কি ঐ তারাগুলোর মত শুধু মিট মিট করে দেখবে? কাছে আসবে না? কাছে আসতে পারে না?

সাগর চলে গেলে কি করব? এই কটা সপ্তাহ শেষ হলেই তো ও চলে যাবে। আর আসবে না। আসার দরকার হবে না। সেদিন কথায় কথায় বলেই ফেললাম, এবার তো আপনার যাবার সময় হয়ে এলো।

'এখনও অনেক দেরী।'

'অনেক দেরী মানে?'

'তিন সপ্তাহ তো নিশ্চয়ই।'

'তিন সপ্তাহ তো দেখতে দেখতে কেটে যাব।'

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব? যা ভাবছি, যা বলতে পারলে নিজে হাল্কা হতাম, তাতো বলতে পারছি না। পারব না। চুপ করেই রইলাম।

সাগর জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ আমার যাওয়ার ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ সুরু করলেন কেন?

'এমনি ভাবছিলাম আপনি আর কতদিন আছেন।'

'কেন আমি চলে গেলে দুঃখ হবে?'

'আনন্দ হবে।'

ও হাসল। আনন্দ হবার কোন কারণ নেই, তা আমি জানি।

'কেমন করে জানলেন?'

'জানি কিন্তু বলতে পারব না।'

'আচ্ছা তিন সপ্তাহেই আপনার এখানকার কাজ শেষ হবে?'

'হওয়া উচিত।'

'কাজ শেষ হলেই চলে যাবেন?'

'কেন? কাজ শেষ হলেও যাব না?'

'যাবেন না কেন? তবে কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবার কোন মানে হয় না।'

'হয় না?'

'না।'

'তবে কি করব?'

'কি আবার করবেন? কাজ শেষ হবার পর কয়েকদিন একটু বিশ্রাম করবেন, একটু ঘুরবেন-ফিরবেন, তারপর যাবেন।'

'কদিন?'

'দশ-পনের দিন।'

'দশ-পনের দিন পরে গেলে আপনি খুশী হবেন?'

শুধু আমি কেন, সবাই খুশী হবেন।'

'আমি আপনার কথা জানতে চাইছি।'

'আপনি থাকলে আমার কি ক্ষতি?'

'তা জানি। জানতে চাইছি আপনি খুশী হবেন কি?'

'আপনি থাকবেন কিনা তাই বলুন।'

সাগর একটু ভাবল। গম্ভীরভাবে ভাবল। তারপর বলল, কাজ শেষ হবার পরও সপ্তাহ খানেক থাকব তবে তাতে আপনি খুশী হবেন না। বরং আরো খারাপ লাগবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

ও হাসল, কেন? এবার একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার প্রতি আপনার এত সমবেদনা যে তখন আরো খারাপ লাগবে।

সমবেদনার মধ্যে কিছুটা কৃপা মেশান থাকে। কিছুটা ঔদার্য প্রচারের ব্যবস্থা থাকে। কিছুটা মহত্ব লুকিয়ে থাকে। আমি তা চাই না। সাগরকে কৃপা করব কেন? কৃপা দেখিয়ে ওকে ছোট করব কেন? এমন সুন্দর একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাক, ব্যর্থ হয়ে যাক, তা আমি চাই না। ও সারা জীবন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে, শূন্য মন নিয়ে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি সহ্য করতে পারব না। আমি যেখানেই থাকি না কেন, যার সঙ্গেই আমার বিয়ে হোক না কেন, সাগরের কথা আমি না ভেবে পারব না। প্রকাশ্যে না পারি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাববো। একলা একলা ভাববো। স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে ভাববো। ছেলেকে কোলে করে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে ওর কথা ভাবতেই হবে। হয়ত খুব কৃতি পাত্রের সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে কিন্তু তার কপালে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙালে সে কি অমন স্নিগ্ধ মিষ্টি পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার দিকে চাইবে? সে কি আমার হাতের এক পেয়ালা চা খাবার জন্য অমন করে অনুরোধ করবে? আমার স্বামী নিশ্চয়ই অনেক টাকা রোজগার করবে। আমাকে দামী দামী শাড়ী কিনে দেবে, নিজের মান-মর্যাদা-কৃতিত্বের জন্য কিনে দেবে কিন্তু অত দিলেও কি সে মনে মনে তৃপ্তি পাবে? হয়ত গাড়ী চড়ব কিন্তু বোটানিকসের পাশ দিয়ে শাল-পাইনের ছায়ায় ছায়ায় ওর সঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে পিসীর বাড়ী যেতে যে আনন্দ পেয়েছি, তা কি পাব?

(ক্রমশঃ)

অমরত্ব প্রসঙ্গে সরলবাবুর চিন্তা

—ট্রামরাস্তার ধারে বাড়ী। রাত বারোটা অবধি চলে ট্রাম বাস ট্যাক্সি প্রাইভেট গাড়ীর একটানা স্রোত। বিছানায় শুয়ে মনে হয় যেন কোনো জংশন স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে আমার নির্দিষ্ট ট্রেনের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ এক সময় টের পাই—সব-কিছু থেমে গেছে। পয়েণ্টসম্যান বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, সবুজ আলোর সিগন্যাল না দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার গন্তব্য স্থানে যাওয়া আর হলো না। তন্দ্রার ভাব কেটে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। সামনের বারান্দায় গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাই। স্রোতহীন, জনমানবহীন রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অজানা এক আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসে। বুকের কাছে একটা মৃদু বিষণ্ণ ব্যথা অনুভব করি, পা-দুটো ভারী হয়ে ওঠে, হাত দিয়ে বারান্দার রেলিংটা চেপে ধরি। সারাটা শরীরে একটা শিরশির ভাব, কেমন যেন একটা অস্বস্তি। আমি বুঝতে পারি না কেন ভয় পাচ্ছি।

সরলবাবু কথাগুলো বলে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন। ছেচল্লিশ বছর বয়স, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, চোখে-মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। একটা ব্যাঙ্কের সিনিয়র অফিসার। দুই কন্যা ও স্ত্রী নিয়ে ভবানীপুরের দিকে বড় রাস্তার উপর একটা দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। এই ফ্ল্যাটে মাত্র কয়েক সপ্তাহ এসেছেন; এর আগে সিঁথির দিকে গলির মধ্যে একটা বাড়ীতে থাকতেন। এখানে এসে অবাধ উদ্বেগ ও বিষণ্ণতায় ভুগছেন। রাতে ভালো ঘুম হয় না, খিদেও তেমন নেই। ব্যাঙ্কে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়, ভুলচুক হলে খুবই বিপদ। কর্মঠ অফিসার বলে সুনাম আছে। ভয় হচ্ছে, সেই সুনাম বুঝি আর থাকে না। অফিস থেকে বাড়ী এসে খালি মনে হয় বোধহয় ভুল করে এসেছেন। পার্টির কাগজপত্রগুলো বোধহয় খুঁটিয়ে দেখা হয়নি; সইটা বোধহয় ঠিক জায়গায় করা হয়নি, স্টক-এর দামটা বোধ-হয় বেশী করে ধরেছেন; এইরকম নানা চিন্তা করতে করতে তন্দ্রা আসে। তন্দ্রার ঘোরে আজেবাজে স্বপ্ন দেখেন। মৃত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের স্বপ্ন। তার-পর মনে হয় কোনো জংশন স্টেশনে গাড়ী বদল করার জন্যে তিনি অপেক্ষারত। ঘুম ভেঙে যায়, বারান্দায় এসে ঘুমন্ত রাস্তার দিকে তাকিয়ে অজানা আতঙ্কে সারা শরীর ভারী হয়ে ওঠে। অতিকষ্টে বারান্দা থেকে ঘরে এসে আলো জ্বালেন। রাত তখন দুটো। ঘুমের ওষুধ খেতেও তাঁর ভয় হয়। কিডনীর ক্ষত হবে বা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে, এ-ভয় নয়। তাঁর ভয় ঘুম না ভাঙার। যদি ওভারডোজ হয়ে যায়, যদি আর ঘুম না ভাঙে এই ভয়ে তিনি ঘুমের বড়ি পারতপক্ষে খেতে চান না। অবশ্য একেবারে যে খান না, এমন নয়। তাতে ফল বিশেষ হয় না। দুটোর জায়গায় বড়জোর তিনটের সময় ঘুম ভাঙে। তিনি মনে করেন, এই বাড়ীতে আসার কয়েকদিন পরের একটা ঘটনার সঙ্গে হয়তো ঘুম না হবার কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। ঘটনাটা এমন কিছু নয়, তবু ডাক্তারকে বোধহয় জানানো দরকার। তাঁর এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপ-স্থিত থাকতে হয়েছিল। শবানুগমন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, এগুলোকে তিনি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলেন। এসব বিষয়ে তাঁর মতামত বেশ র‍্যাডিক্যাল। মৃত্যুর পর এইসব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার এইসব শোক, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অর্থহীন। মৃতকে স্মৃতির মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার এই নিষ্ফল চেষ্টার কোনো মানে হয় না। তিনি মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বলেন এসব কথা। তাঁর মৃত্যুর পর যেন সৎকার সমিতির গাড়ী করে সোজা কেওড়াতলার বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাঁর দেহ সমর্পণ করা হয়। শ্রাদ্ধশান্তি শোকসভা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যেন অনুষ্ঠিত না হয়। শ্রাদ্ধের অধিকারী পুত্রসন্তান নেই বলে তাঁর কোনো দুঃখ নেই। পুন্নামক নরক থেকে পরিত্রাণের প্রয়োজন তাঁর হবে না। শোকসভায় মিলিত হবার মত ভক্ত বন্ধুর দল অবশ্য তাঁর নেই, কাজেই এ সম্বন্ধে বিধান না দিলেও চলে। তবে যদি রিটায়ার করার আগে মৃত্যু হয়, অফিসের ছেলে-ছোকরারা একটা হাফ-হলিডে পাবার চেষ্টায় শোকসভাটভা ডেকে বসতে পারে। এবিষয়ে তাদের অবশ্য কোনো কিছু বলা চলে না। বলতে যাওয়া ছেলেমানুষী। তবে সুযোগ পেলে আলোচনাসূত্রে নিজের 'লাস্ট টেস্টামেণ্ট' তিনি অনেকবার অনেককে শুনিয়েছেন। এইসব কারণে শবানুগমন, শ্রাদ্ধবাসর, শোকসভা ইত্যাদি মৃত্যুপ্রসঙ্গিত সবকিছুর থেকে তিনি দূরে থাকতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্ত্রীর খুড়-তুতো ভাইয়ের শ্রাদ্ধবাসরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। মসলন্দপুরে থেকে সারাদিনের দুর্ভোগের পর নতুন ফ্ল্যাটে যখন ফিরে এলেন, তখন রাত প্রায় বারোটা। স্ত্রী-কন্যাকে রেখে একা গাড়ী করে ফিরলেন। কোলকাতা প্রায় নিঝুম হয়ে আসছে। হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় এলেন, ট্রামরাস্তাটাকে ঘুমন্ত অজগরের মত দেখাচ্ছে, রাস্তার আলোগুলো নিষ্প্রভ। তাঁর মনে হল, অতীতের সেইসব মানুষের কথা, যারা একদিন এই রাস্তা দিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনা, ভবি-ষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে হেঁটে গেছে। সংখ্যায় এরা কত হবে? এই রাস্তাটার বয়স কত? রোজ এই রাস্তা দিয়ে কত লোক চলাচল করে? তাদের মধ্যে কতজন কত বছর বেঁচে থাকে? এই পথচারীদের মৃত্যুর হার কত? মৃতদের ক'জনকে বংশ-ধররা মনে রেখেছে? ক'জনের বাৎসরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে? এইসব আবোল-তাবোল কথা মনে আসতেই সরল-বাবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। সারারাত

প্রায় জেগে কাটালেন। পরদিন অফিসের চাকার দাঁতে আটকে গিয়ে নিজস্ব আহ্নিকগতিতে ঘুরপাক খেতে খেতে এসব চিন্তা থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি পেলেন। কিন্তু সেইদিনই প্রথম বোধহয় মনে হল যে, কাজে ভুল হয়ে যেতে পারে। কাগজপত্র বারবার খুঁটিয়ে দেখলেন, সই করার আগে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। সন্ধ্যায় বাড়ী এসে দেখলেন, স্ত্রী-কন্যা ফেরেননি। সেই সন্ধ্যাতে নাও ফিরতে পারেন, এরকম আভাস স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন; তা সত্ত্বেও তাঁদের জন্যে উদ্বিগ্নে রাত কাটলো। ঘুম ভেঙে গেল রাত দুটোয়। স্ত্রী-কন্যা সুস্থশরীরে বহাল তবিয়তে পরের দিনই ফিরে এলেন। কিন্তু উদ্বেগের ভাব কাটলো না। এখন তাঁর মনে হচ্ছে ঐ শ্রাদ্ধবাসরে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।

—ওখানে যাওয়াটাই বোধহয় ভুল হয়েছে। বায়ুভূতোনিরাশ্রয় বিদেহী আত্মাকে খাদ্যবস্ত্রশয্যা দিয়ে শ্রদ্ধা দেখানোর মত হাস্যকর ব্যাপারের ট্র্যাজিক দিকটা সেইদিন প্রথমে নজরে পড়লো। এতদিন মনে হতো এসব বুঝি শুধু ব্রাহ্মণদের রুজিরোজগারের একটা ফিকির। সংহিতাগুলোর বিধান ঐ পরগাছা-শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার একটা কৌশল। চার্বাকী মনে সেদিন প্রথম ধাক্কা লাগলো। মৃতের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, যাজক-পুরোহিত সবার মধ্যে লক্ষ্য করলাম অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে আচারানুষ্ঠান, রিচুয়াল পালনের এক ঐকান্তিক আগ্রহ। মৃতকে সত্যিই বুঝি তারা মনে রাখতে চায়, অমর করতে চায়। এই অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দেখতে পেলাম প্রত্যেকের অমরত্বের কামনা। যে-অমরত্ব তারা কোনোদিনই পাবে না, সেই দুর্লভ অমরত্বের বাসনা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধশান্তি, শোকসভার অনুষ্ঠান, তাঁদের মনে রাখবার প্রতিশ্রুতিও এ-সবের মধ্যে রয়েছে বিস্মৃতির অতলগহ্বরে তলিয়ে যাবার ভয় থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা।

সরলবাবুর সঙ্গে দুদিনের আলোচনায় আরো অনেক তথ্য সংগৃহীত হলো। তাঁর মনের আরো অনেক কথা জানতে পারলাম। তাঁকে অনেকটা বুঝতে পারলাম।

সরলবাবু মতবাদে অতি-আধুনিক। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মাপরমাত্মা ইত্যাদি সেকেলে অন্ধবিশ্বাস কাটিয়ে উঠেছেন ছাত্রজীবনে। অজ্ঞাবাদী নন, পুরোপুরি জড়বাদী। মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না—এ-কথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। সন্তানসন্ততির মধ্যে জীবনধারাকে প্রবাহিত রাখে ব্যক্তিমানুষ সহজাত বংশ-রক্ষা প্রবৃত্তির বশে। আত্মরক্ষা ও বংশ-রক্ষা এই দুই প্রবৃত্তির অধীন প্রতিটি মানুষ। প্রেম স্নেহ ইত্যাদি মানবিক ধর্ম ঐসব প্রবৃত্তির উদ্‌গতির (সাবলিমেশন) ফল। পদার্থবিদ্যার কৃতী ছাত্র সরলবাবু দেহাতীত কোনো কিছুতেই বিশ্বাসী নন। মানুষের মহত্ব তিনি স্বীকার করেন না। মানুষের আচার-ব্যবহার, চলাফেরা কতকগুলো রিফ্লেক্সের সমষ্টি। তিনি ব্যবহারবাদী (বিহেভিয়ারিস্ট) মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী। মানুষের মনের মধ্যে কি ঘটছে না ঘটছে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন আগে তিনি অনুভব করেননি। ব্যবহার দিয়ে তাকে বিচার করতে হবে। একটি বিশেষ উদ্দীপক একটি নির্দিষ্ট ব্যবহার সৃষ্টি করে। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তার ব্যবহারে নিয়ন্ত্রিত করে না। সে একটা যন্ত্রের মত, একটা বিশেষ পরিবেশে এক বিশেষভাবে সাড়া দিতে বাধ্য। স্বাধীনতা তার নেই। বিচারশক্তি প্রয়োগ করছি—এই মিথ্যা অহংকার পোষণ করা তার পক্ষে উচিত নয়। জীবমাত্রেই পরিবেশের অধীন। বিশেষ পরিবেশে নির্দিষ্ট ব্যবহার ছাড়া, অন্য কিছু করার উপায় বা সামর্থ্য তার নেই। জন্ম-মৃত্যু মৈথুন, সবই যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে: আর এরই যোগফল হলো জীবন। এমন কোনো কাজ মানুষ করে না, যার জন্যে তাকে ঘৃণা করা যায় বা শ্রদ্ধা করা যায়। যন্ত্রের মত পরিবেশচালিত তার ব্যবহারের জন্যে তাকে প্রশংসা করা বা নিন্দা করা বোকামী। স্মৃতি উদ্‌যাপন, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সেই কারণে নিরর্থক। তাছাড়া, সত্যিই কি আমরা কাউকে চিরকাল মনে রাখতে পারি? যতই মহান সৃষ্টির অধিকারী হোক না কেন, কোনো যুগের কোনো ব্যক্তিমানুষ, তার সেই সৃষ্টির কথা কতদিন মানুষ মনে রাখতে পারে? প্রস্তর যুগের কি মহাপুরুষ ছিল না? সেই যুগের মানুষের কল্যাণ কামনায় কি কেউ নিজেকে উৎসর্গ করেনি? সে-যুগে কি কেউ শহীদ হয়নি? তার, সেই যুগের মানুষ তো চেয়েছিল তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। তার স্মৃতির দীপ অম্লান রাখতে। তার মরদেহকে গুহার মধ্যে সযত্নে স্থাপন করেছিল, তার আত্মার জন্যে সংরক্ষিত রেখেছিল নানা ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, প্রস্তরগাত্রে তার পরিচয়কীর্তি নিজেদের কোনো সাংকেতিক লিপিতে নিশ্চয়ই লিখে রেখেছিল। কোথায় সেই পরিচয়? আমরা কি সেই লিপি উদ্ধার করে সেই মহাপুরুষদের কথা মনে আনতে পারি? সেদিনের ভার্জিল হোমর ব্যাস বাল্মীকি দু-চারজনকে কিতাবী পণ্ডিতরা ছাড়া আর কেউই মনে রাখছে না। তাজমহল রচনা পণ্ডশ্রম, অমর কাব্য রচনা মহাভ্রম। অবশ্য সরলবাবু জানেন, ওগুলোও রিফ্লেক্স। যারা মূর্তি গড়ছে, কাব্য রচনা করছে, শহীদ হচ্ছে, তাদের ওসব না করে উপায় ছিল না। সময়সাগরে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যেতে চায় না ব্যক্তিমানুষ। বংশরক্ষাপ্রবৃত্তির তাগিদে মানবজাতির জীবনধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়, আবার আত্মরক্ষার তাগিদে একক ভাবেও বেঁচে থাকতে চায়। এই মরার পরে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা এবার তিনি লক্ষ্য করেছেন খুড়শ্বশুরের ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে, ঐ ঘটনাটির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই; এখন মনে হচ্ছে তাঁর এই আতঙ্ক অনুভূতি ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি থেকেই এসেছে।

সরলবাবু সত্যিই সরল মানুষ। অকপটে স্বীকার করলেন, তিনি জীবনে সুখী হননি। কাজ তিনি খুব মন দিয়ে করেন বটে, মাহিনাও মোটা পান; কিন্তু মনে হয় এ-কাজের জন্যে তাঁর মত প্রতিভার দরকার ছিল না। পরমাণু-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ, ঐ লাইনে গবেষণা করার বিশেষ ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পরিবেশ (ভাগ্য নয়!) বাদ সাধলো। শেষ পরীক্ষার ফল বেরুবার আগেই পরিবারের জন্য কোনো রকম সঞ্চয় না রেখেই অবিবেচক পিতৃদেব দেহরক্ষা করলেন। চাকরীতে বাধ্য হয়েই তাঁকে ঢুকতে হলো সহকর্মীদের নিতান্ত সাধারণ পর্যায়ের মনে হয়। তাদের কাউকেই তিনি শ্রদ্ধা করতে পারেন না। মানুষমাত্রেই ঐরকম। বুদ্ধিহীন, আত্মপ্রচারে উন্মুখ। বিয়েটাও খুব সুখের হয়েছে বলা চলে না। স্ত্রী 'পণ্যপুজো' রোগে ভুগছেন। সারা দুপুর গাড়ী নিয়ে মার্কেটিং করে বেড়ান। অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনেন আর আলমারীজাত করেন। ঐগুলো মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি বহন করে তাঁকে অমর করে রাখবে এই তাঁর কামনা। এই ছেলেমানুষী অমরত্ববিলাসী স্ত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসা যায় না। মেয়েদুটির বয়স যথাক্রমে বারো ও সাত। ইংরিজী মিডিয়ম স্কুলে পড়ছে। তাদের মধ্যেও পণ্যপুজো রোগ সংক্রমিত করেছেন তাদের মাতৃদেবী। নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে স্ত্রীর সঙ্গে সারাদিনরাত্রে দু-একবারের বেশী দেখা হয় না। শোবার ব্যবস্থা এই বাড়ীতে পৃথক হবার ফলে দেখাশোনা কম হচ্ছে। দেখাশোনা যদিও হয়, কথাবার্তা কিছুই হয় না। বিল, ব্যালান্স, ঠাকুর-চাকরের মামুলি কথা বলেই আমাদের বাক্যভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়। স্ত্রী মেয়েদের নিয়ে হয় পার্টিতে বেরিয়ে যান, অথবা রেডিওগ্রাম নিয়ে বসেন। বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে দেমাকী মনে করে এড়িয়ে চলে, তিনিও হেঁকে বন্ধুত্ব রাখবার

প্রয়াস করেন না। সরলবাবু নানা ধরনের বই কেনেন ও রাত এগারোটা অবধি সমানে পড়াশুনো করেন। শুধু শ্রাদ্ধ শোকসভা নয়, সামাজিক সবরকম অনুষ্ঠানই তিনি এড়িয়ে চলেন। তাঁর হয়ে স্ত্রী-কন্যারাই সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। এই নতুন বাড়ীতে আসার পর থেকে ঘুম চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনায় অভ্যাসও যেতে বসেছে।

এইবার সরলবাবুর জীবনকাহিনী থেকে তাঁর বর্তমান অসুস্থতার সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা যেতে পারে। নিজের ইচ্ছাকে কার্যকরী করবার চেষ্টা সরলবাবু কোনোদিন করেননি। তিনি যেরকম রেজাল্ট করেছিলেন, তাতে মনে হয় চেষ্টাচরিত্র করলে একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে বিদেশ গিয়ে পরমাণু-বিজ্ঞানের চর্চা তিনি করতে পারতেন। তার জন্যে যে কষ্টস্বীকার বা সামান্য ত্যাগ-স্বীকারের প্রয়োজন ছিল, তা করার মত জোরালো ইচ্ছাশক্তি তাঁর ছিল না। সহজে চাকরী পেয়ে নিশ্চিন্ত জীবনের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তিনি গা ঢেলে দিলেন। সামাজিক মর্যাদা ও যৌতুকের লোভে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করলেন এবং নিজের এই দুর্বলতা ও লোভ নিজের কাছে অস্বীকার করার তাগিদে স্ত্রীকে ভালো চোখে দেখলেন না, ভালোবাসতে পারলেন না। স্ত্রীর ব্রতবিচ্যুতি ও পূজাপূজার মোহ তিনি কোনোদিন দূর করার আন্তরিক প্রচেষ্টা করেননি। সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে এই ধনতান্ত্রিক সমাজের পূজাপূজা প্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেননি। নিজের ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কথা ভেবেই বোধহয় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে চাননি। নিজেকে বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে, সব মানুষই বোধহয় তাঁর মত দুর্বল, পরিবেশের দাস। পরিবেশকে বদলে, পরিবেশের উপর আধিপত্য করেই মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, এই সহজ কথাটি পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্রটির একবারও মনে পড়েনি। মানুষের ইতিহাস মানেই পরিবেশকে জয় করার ইতিহাস। এই সত্যটিকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন ও কাল্পনিক তত্ত্ব খাড়া করে নিজের অহমিকা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। সাধারণ অমরত্ব লাভের ইচ্ছাকে বারবার ব্যঙ্গচ্ছলে আলোচনার মধ্যে টেনে এনেছেন —এ থেকে আমার মনে হয়েছে তিনি নিজে মনের মধ্যে অমরত্ব লভের আশা পোষণ করতেন। পারমাণবিক বিজ্ঞানে নতুন অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন—এই ধরনের কোনো আশা গোপনে সযত্নে তিনি লালন করেছিলেন। হিরোশিমার ধ্বংস তাঁকে ছাত্রজীবনে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। চাকরী-জীবনে তিনি নিরাপত্তা পেয়েছেন, কিন্তু খ্যাতি অর্জনের সব সুযোগ-সুবিধা সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই চাকরীর উপর আকর্ষণ থাকলেও, চাকরীতে আনন্দ নেই। জগৎবিখ্যাত হয়ে মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা নিঃশেষিত বলেই, তিনি অমরত্ব প্রয়াসীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তাদের মূঢ়তায় মুহ্যমান। তাঁর মত আশাহত দুর্বল মানুষেরাই 'সিনিক' হয় অথবা 'সিনিক'ত্বের ভান করে। নিজের (উচ্চাশার) ব্যর্থতা সম্বন্ধে সব সময়েই সজাগ, তাই সব-কিছুকে হেয় করার চেষ্টা। মহত্ত্বকে অস্বীকার করা, মানুষের মধ্যে শুধু যান্ত্রিক বা জৈবপ্রবৃত্তির আধিপত্য দেখা, —এসবই তাঁর নিজে মহৎ না হতে পারার বেদনাবোধের অভিব্যক্তির ফল। তিনি নিজের চিন্তায় এতই বিভোর যে, অন্যকে ভালবাসার, অন্যকে নিয়ে চিন্তা করার পর্যন্ত তাঁর সময় নেই। স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণকে তাই সরাসরি অস্বীকার করার ধৃষ্টতা। নিজে বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-কন্যা সবার থেকে আলাদা, তাই প্রথম যৌবনের আশাভঙ্গের বেদনার তীব্রতা।

এইবার আমাদের জানা দরকার নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর থেকেই তার ব্যর্থতার বিকার আকারে দেখা দিল কেন? তিনি নিঃসঙ্গ, নিজের ইহজীবনে অতৃপ্ত, তাই পরজীবনের (যাকে তিনি অবিশ্বাসী বলে জাহির করেছেন) প্রতি আকৃষ্ট। আকর্ষণ প্রবল তাই আকর্ষণের বস্তু (শোকসভা, শ্রাদ্ধবাসর ইত্যাদি) থেকে সযত্নে দূরে দূরে থাকার প্রচেষ্টা। সিঁথির বাড়ী থেকে ভবানীপুরের বড় রাস্তার ফ্ল্যাটে আসায় অভ্যস্ত (স্টেরিওটপী) জীবন-ধারায় ব্যতিক্রম ঘটেছে। স্ত্রীর থেকে পৃথক ঘরে অবস্থান তাঁকে আরো বেশি আত্মমুখীন করেছে। শ্রাদ্ধবাসরের অনুষ্ঠানাদি তাঁর মনের অমরত্বের সুপ্ত-বাসনাকে জাগিয়ে তুললো। এই সময় চোখে পড়লো অস্পষ্টভাবে আলোকিত রাজপথের ঘুমন্ত ছবি। সারাদিন জীবন-বন্যার আন্দোলনে কাঁপতে থাকে যে পথ, মধ্যরাত্রে তার অসহায় নিঃসঙ্গ মূর্তি দেখে মৃত্যুচিন্তা ও সেই সূত্রে অন্যান্য বিষাদচিন্তা তাঁর মনে এলো। সরলবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

—মনোবিদ

নীলা পা ঘষছিল। কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে গেলেই মন্টুর সঙ্গে দেখা হবে। মন্টুরা সকাল থেকেই চায়ের দোকানে আড্ডা জমায়। নীলাকে দেখা মাত্রই মন্টু একলাফে দোকান থেকে রাস্তায় আসবে এবং কমলাদের বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত পাশে পাশে হাঁটবে। ওর বন্ধুরা নানারকম মন্তব্য করবে। ইদানীং ওর বন্ধুরা সকলেই জেনে ফেলেছে বলে প্রকাশ্যে ফষ্টিনষ্টি করতে ওদের বাধে না। অথচ বাজারের রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক ঘুর হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, পরীক্ষার সময় একটু চেপে না পড়ালে কমলাটা পাশ করতে পারবে না। আর পাশ করতে না পারলে তিরিশ টাকার টিউসানিটা হাতছাড়া হবে। অথচ এই সাতসকালেই মন্টুর মুখোমুখি হতে নীলার ইচ্ছে করছিল না।

নীলা বাজারের রাস্তাই ধরল। হোক গে খানিকটা দেরি। তবু তো সকলের শ্যেনদৃষ্টি থেকে বাঁচা যাবে। ইদানীং পাড়ার বুড়োগুলোও কেমন ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। কে জানে নীলা চলে যাবার পর ওরা কি আলোচনা করে!

মন্টু উসখুস করছিল। সাতটা বেজে গেল এখনও নীলার পাত্তা নেই। মন্টু আর এক ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বাবুল মন্টুর গা ঘেঁষে বসল 'কী গুরু ঠিক মেজাজ আসছে না?' মন্টুর রাগ হচ্ছিল, এমন একটা টেনসানের সময় বাবলুর জোলো কথায় মন্টু কান দিল না। পিনকু মন্টুর ডান হাত। পিনকুর দিকে তাকিয়ে জিগেস করল 'কি ব্যাপার বলত, আজ কি নাগা মেরে দিল নাকি?' পিনকু যেন এইকথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, 'এক চক্কর ঢু মেরে দেখে আসব নাকি?' 'না দরকার নেই, রেগে যাবে। মনে হয় বাড়িতেই আটকে গেছে। সন্ধ্যের দিকে তো দেখা হবে।'

'গুরু আজ পকেট একেবারে জি টি রোড। তুই শালা আজকাল কেমন হয়ে গেছিস। প্রেম-ট্রেম করলে সবাই বোকা বনে যায়। আর ওই ডিগডিগে মেয়েটার জন্যে অত ভাবনা-চিন্তার কি আছে! মুখের কথা খসালে পুরো লাশটাই এনে হাজির করে দিতে পারি।' ডাবু বেশ উত্তেজিত হয়েই কথাগুলো বলে যাচ্ছিল 'তোর জন্যে রুটি রোজগার সব ডাব মেরে যাবে।'

মন্টু এ কথার কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। পিনকুকে বলল, আমার জামাটা ইস্ত্রি করিয়ে রাখিস। ডাবু গলার স্বর কমিয়ে জিগেস করল 'আজ রাতে তাহলে বেরোবে তো গুরু?' মন্টু বলল, 'আজ থাক, কাল দেখা যাবে। তবে তোরা যদি যেতে চাস যা।' মন্টু উঠে দাঁড়াল, 'আমার একটু কাজ আছে, আমি বেরুচ্ছি।'

সন্ধ্যের অনেক আগেই পাটভাঙা জামা-প্যান্ট পরে অপেক্ষা করছিল মন্টু। একবার ভাবল নীলার সঙ্গে দেখা হলে নিজের থেকে কথাই বলবে না। কিন্তু তাতেও তো কোন লাভ নেই। নিজের থেকে কথা না বললে নীলা হয়ত চুপচাপই

হাঁটবে। মাঝ থেকে খানিকটা সময় নষ্ট হবে। নীলার মত মেয়ে ওকে ভালবাসবে এটা ওর চিন্তার বাইরেই ছিল। ফলে প্রথমদিকে ভরসা করে হাত বাড়ায়নি। তারপর নীলাই একদিন ওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করল। সেদিন নীলাকে একটা বাচ্চা মেয়ের মত লেগেছিল মন্টুর। ওর হাত চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল নীলা। কী হবে মন্টুদা, তুমি আমার মাকে বাঁচাও। তিনবার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গেছি কিছুতেই আসতে চাইলেন না। বললেন রাতে কলে যাওয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। তাছাড়া গলিঘুঁজির মধ্যে তো যেতেই পারব না।' মন্টু সেদিন রাত দেড়টার সময় দলবল নিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে এনে হাজির করেছিল। সেই থেকে নীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। যে কোন প্রয়োজনে মন্টু হাজির। আর নীলারও কেমন একটা টান পড়ে গিয়েছিল মন্টুর ওপর।

সন্ধ্যের একটু পরেই নীলা এসে দাঁড়াল পার্কটার কোণে। মন্টু দূরে থেকে দেখছিল নীলা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মন্টু টুকটুক করে এসে নীলার সামনা-সামনি দাঁড়াল। নীলা হাঁটতে শুরু করল। মন্টুও পাশাপাশি। কেউই কোন কথা বলছে না। মন্টুর অসহ্য লাগছিল। থাকতে না পেরে নিজেই বলে ফেলল, 'সকালে টিউশানি যাওনি?' 'না।' খুব শান্ত গলায় উত্তর দিল নীলা। 'কেন কিছুই হয়নি। সকালে নিয়মিত দেখা হওয়ার ব্যতিক্রম যেন ওর কিছুই মনে হয়নি। 'তার মানে? আমি তো ঠায় চোখ রেখে বসেছিলাম দোকানে।' 'বাজারের রাস্তা দিয়ে গেছি। তোমার বন্ধুরা সব বসে থাকে, হ্যাংলার মত তাকায়, ফাজলামি করে আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া দিনের দিকে তোমার সঙ্গে হাঁটলে পাড়ার বুড়োরাও ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে দেখে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মন্টু। তাহলে ওকে এড়িয়ে যাবার জন্যে নীলা এটা করেনি। করেছে দুজনের কথাই ভেবে। ভালই করেছে। দুদিন পরে নীলা বৌ হয়ে তার ঘরে আসবে আর তাকে নিয়ে পাড়ায় বিচ্ছিরি বদনাম রটে যাওয়া কি ভাল। তার চেয়ে এই বেশ। সন্ধ্যের পর পাড়া ছাড়িয়ে দূরে কোথাও গিয়ে কাছা-কাছি বসা, চেনাশোনা কোন লোকজন নেই, স্বচ্ছন্দে মনের কথা বলা যায়। নীলাও খানিকটা সহজ হয়ে কথা বলতে পারবে।

ওরা পাড়া ছাড়িয়ে হাঁটছিল। খানিক দূরেই রেল লাইন, তারপরেই মাঠ। নীলার অনেকদিনই ইচ্ছে করেছে মাঠে মাঠে হেঁটে বেড়াতে, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মাঠে বেড়াতে গা ছমছম করবে।

মন্টু নীলার কাঁধে হাত রাখল। 'জান আজকাল আর ওসব কাজে মন সরে না। আমি জানি তুমি যেমন আমায় ভালবাস তেমনি ঘেন্নাও কর। কি করব বল ছেলে-গুলো ছাড়ে না। ওদের হাতে ধরে তালিম দিয়েছি আমি। একেবারে সরে গেলে ওরা বেইমান বলবে। যখনই তোমার কথা ভাবি তখন কেবলই মনে হয় এই নোংরা কাজ ছেড়ে দেব। কল-কারখানায় কি বেয়ারা পিওনের কাজও এর থেকে ভাল। কিন্তু পাচ্ছি কই। হাজার হাজার শিক্ষিত ছেলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পিওনের চাকরী পেলে বর্তে যায়, সেখানে আমার মত আকাট মুখ্যু কোথায় কাজ পাবে!'

নীলার চুপ করে থাকা দেখে মন্টু বলল, 'কি আমার কথাগুলো শুনছ না?' 'হ্যাঁ, শুনেছি। আর জানছি এ অঞ্চলের নাম করা মস্তান মন্টুদা তাহলে সত্যিই আমাকে ভালবাসে।' মন্টু আচমকা নীলাকে বুকের ওপর চেপে ধরে অস্বাভাবিক স্বরে বলে উঠল 'বিশ্বাস কর, তুমি পছন্দ কর না তাই ইদানীং আর মদ-টদ খাই না। ওরা আমাকে বলে পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হচ্ছিস। মেয়েমানুষের সঙ্গে ভাব করেছিস তো মদ খাবোর সঙ্গে কি। ওরা তোমাকে দেখতে পারে না। ওদের ধারণা তুমিই আমাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছ।' 'তোমার কি ধারণা?' 'আমার কোন ধারণা নেই নীলা। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। ওদের সঙ্গে আমি মেলামেশাই করব না।'

ওরা রেল ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়াল। চারদিক নিস্তব্ধ। অনেক দূরে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। নীলা মন্টুর বুক ঘেঁষে দাঁড়াল। দূরে একটা ট্রেন আসছে। দৈত্যের মত চোখের আলো এসে পড়েছে ব্রিজের ওপর। সেই আলোয় নীলা নিবিষ্ট মনে দেখছিল মন্টুর সবল পেশীবহুল দুটো হাত ব্রিজের লোহার রেলিংটা ধরে রয়েছে। হাতের শিরগুলো ফুলে রয়েছে। প্রশস্ত বুকের ওপর পাটভাঙা জামার কাচের বোতামগুলো চকচক করছে। চোখে মুখে শিশুর মত সরলতা। নীলার ইচ্ছে করছিল মন্টুর মুখটা ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে, ছেড়ে দাও, তুমি ওসব কাজ ছেড়ে দাও। এখন তোমাকে দেখে তো মনেই হয় না কোন অন্যায় কাজ তুমি করতে পার।'

ট্রেনের হুইসেল শুনে মন্টুর চমক ভাঙল। নীলার হাতটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বলল 'নীলা তোমার কাছে এলে আমি সব ভুলে যাই, তোমার মুখটা চোখের ওপর ভেসে উঠলে পিস্তল ধরার জোর পাইনা হাতে। এই তো সেদিন রেকজাভার ওষুধের একচেটিয়া ব্যবসা-দারকে বাড়ি ফেরার পথে ওরা পাকড়াও করল, আমি সঙ্গে ছিলুম কিন্তু তার গায়ে হাত দিইনি।' নীলা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শিউরে উঠল। মন্টু কেমন মিইয়ে গেল। একথাগুলো নীলার ভাল লাগেনি বুঝতে পেরেই চুপ করল। নীলার চিবুকটা ডান হাতে তুলে ধরে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'মাইরি অন্যায় হয়ে গেছে, এসব কথা তোমার সামনে বলা ঠিক নয়। প্লিজ, ক্ষমা করে দাও।'

নীলা ভাবছিল তার সংসারের কথা। ক্রনিক হার্টের অসুখে মা ভুগছে। ছোট ভাই-বোন দুটো প্রয়োজনীয় খাদ্যও পায় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চারটে টিউশানীতেও দুবেলা পেটভরা ভাতের সংস্থান হয় না। একটা স্কুল মাস্টারীর জন্যে হন্যে হয়ে কতদিন ঘুরেছে, কোন ফল হয়নি। যদি মন্টুদা না থাকত তাহলে হয়ত শুকিয়ে মরতে হত।

অমলের কথা নীলার মনে পড়ল। অমল মজুমদার। শিক্ষিত, মার্জিত। বিত্তবান ব্যবসাদারের একমাত্র ছেলে। সে নিজেই এগিয়ে এসেছিল নীলার কাছে। প্রথমদিকে নীলা কুন্ঠিত ছিল। বড়লোকের ব্যাপার, অনেক খেয়ালের মতই হয়ত তাকে ভাললেগেছে। কিছুদিন পরে হয়ত মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু না, অমল দীর্ঘদিন ধরেই নীলার সঙ্গে মেলামেশা করেছে, ভালবেসেছে। নীলা কোনদিনই এতটুকু ফাঁক অনুভব করেনি। নীলা পায়ের নিচে মাটি পেয়েছিল। অমলকে ঘিরে সাজানো সংসারের ছবি এঁকেছিল। জীবনে প্রথম ভালবাসার স্বাদ। সেই স্বাদেই নীলা ভরপুর ছিল। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর কথা মনে হলে এখনও নীলা আতঙ্কে ওঠে। অমল ওর চূড়ান্ত সর্বনাশ করে দিল্লী পালিয়ে গেল। অমল কেন এমন করল তা আজও নীলার কাছে রহস্য। সেই অপমানের, তীব্র জ্বালার দিনগুলিতে ওকে বাঁচিয়েছে মন্টুদা। নার্সিং হোমে যাবার পয়সা ছিল না, সংসার চালানোর সংস্থান ছিল না। মন্টুদা সব জেনেই ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাড়ার ছেলে, নামকরা গুণ্ডা। কিন্তু মন্টুদা না থাকলে আজ নীলা দাঁড়াত কোথায়!

'কী অত ভাব বলত, দু-এক ঘন্টার জন্যে আমার কাছে থাকো, তার মধ্যে যদি ভেবে ভেবেই সময় কাটাও তো না এলেই পার।' মন্টুর কথায় অভিমানের স্বর ফুটে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে নীলা মন্টুর জামার বোতাম খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'ভাইটার পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না, জান, বুনো ছেলের মত দিনরাত ঘুরে বেড়ায়।' মন্টু একটুও সময় না দিয়ে উত্তর দিল, 'ঠিক আছে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে। তা এতদিন বলনি কেন। সব কথা চেপে চেপে রাখলে আমি আর কি করতে পারি। মাইরি, তোমরা মেয়েরা না বড্ড চাপা। আমি কিন্তু রেখে ঢেকে কথা বলতে পারি না, দুমদাম বলে ফেলি। শালা দুম করে কোনদিন ফুটে যাব, যেকটা দিন পার মস্তিগুলো চালিয়ে যাও।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে মন্টু যেন স্বস্তি পেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হোল এইরকম আনাড়ির মত বকে ফেলাটা নীলার কাছে ঠিক হল না। এক পা এগিয়ে নীলার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাইরি আবার আবোল-তাবোল বকে ফেলেছি।'

একটা মালগাড়ি এসে ব্রিজের নিচে ব্রেক কষল। হুড়মুড় আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠল। বগিগুলো একটার সঙ্গে আর একটার ঠোকাঠুকিতে ঘটঘট শব্দ হতে

...। মন্টু উঁকি মেরে দেখল সব জানলাগুলো সীল করা। ওর হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। ডান হাতটা ডান-দিকের প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলে উঠলঃ ওটা দাঁড়াবার আর জায়গা পেল না! এখুনি দলবল এসে জমে যাবে, চল খানিকটা এগিয়ে যাই। ওরা দুজনে ব্রিজের শেষ প্রান্ত পেরিয়ে মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল। 'কটা বেজেছে কে জানে, পিনকুরা হয়ত এতক্ষণ আমায় খোঁজাপড়া শুরু করে দিয়েছে। সেই সকাল থেকে আর ওদের দেখা দিইনি।'

একমাঠ অন্ধকারে নীলার হাঁফ ধরছিল ভয়ও বটে। মন্টুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। বুকের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে কাঁধের ওপর হাত রাখল। এখন আর একটুও ভয় করছে না। মন্টুর মত সবল পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কোন মেয়ের ভয় পাওয়ার কথাও নয়। মন্টু একটি কথাও বলছে না। নীলার সহজ আত্মসমর্পণ ওর ভালই লাগছে। 'একটা যদি যেমন তেমন চাকরী যোগাড় করতে পারতুম, তাহলে এ-পাড়া ছেড়ে চলে যেতুম।' মন্টু মনে মনে বিড়-বিড় করছিল, 'আগেকার জীবনটার জন্য আফশোষ হয়, যদি কয়েক বছর আগে নীলার সঙ্গে আলাপ হত, যদি বাবলু, জোব, ওরা গুরু বলে আমায় না মানত, তাহলে নীলার কাছে এমন কিন্তু কিন্তু হয়ে থাকতে হত না।'

'চুপচাপ হয়ে গেলে কেন? এই তো

বেশ কথা বলছিলে। অনেকক্ষণ পিনকুদের কাছ ছাড়া তাই খারাপ লাগছে?' মন্টুর হাতটা নিজের দুহাতের মধ্যে চেপে ধরে নীলা আবার বলল, 'বাবলুদের বোলো আমার ওপর সকলের অত চোখ রাখার দরকার নেই. গুরুর একলার চোখ থাকলেই চলবে।' 'না, ভাবছিলুম তুমি কত ভালো। মেয়েমানুষের ওপর ওদের রাগ কেন জান, কেউ ওদের পাত্তা দেয় না তাই।' খস-খস করে কিসের আওয়াজ হল, নীলা একপা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'চল এবার বাড়ি ফির অনেক রাত হয়ে গেছে।'

পরের দিন সকালে চায়ের দোকানটা একটু মিয়োনো। মন্টু তখনও এসে পৌছায়নি। ঘুম থেকে উঠতে ওর দেরি হয়েছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। কীসের একটা যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেছে। একদিকে নীলার ভালবাসার স্বাদে জীবনে একটা নতুন দ্বীপের সন্ধান পেয়েছে অন্যদিকে ভাবু বাবলুদের সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক বছরের কাজ-কারবার। ওদের সঙ্গে না থাকলে রুটি রোজগারের সংস্থান হবে কি করে! দোটানার মধ্যে পড়ে মন্টু বিক্ষত হচ্ছিল। নীলার ওপর টানটা যেন দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে পিনকুদের ডেরায় জমে থাকাতে ভাঁটা পড়ছে।

মন্টু দোকানে ঢুকতেই সকলে হৈ-হৈ করে উঠল। 'কাল ফাঁসিয়ে দিয়ে কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেলে গুরু। পুরো দিনটা বরবাদ হয়ে গেল। তুমি যেন মাইরি আজ-কাল মেয়েমানুষের মত তুলতুলে হয়ে গেছ।' 'আমাকে বাদ দিয়েই তোরা চালিয়ে যেতে পারতিস। আমি কি তোদের হাত-পা বেঁধে রেখেছিলাম।' মন্টু উদাসীন ভাবে কথাগুলো বলে গেল।

'এ কি বলছ গুরু, তুমি না থাকলে শালা গোকুল অন্ধকার।' একটু তোয়াজের ভঙ্গিতে ভাবু কথাকটা বলে ফেলেই চায়ের অর্ডার দিল।

পিনকু চুপচাপই ছিল, সব সময়েই সে মন্টুর পক্ষ সমর্থন করে। মন্টুর কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বলল, 'কাল সন্ধ্যেবেলা পিয়ারাতলার কাবো এসেছিল তোমার খোঁজে। বললে জরুরী দরকার। কী একটাতে ফেঁসে গেছে।'

মন্টুর কোন উৎসাহ দেখা গেল না। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'বাবলু দশটা টাকা ছাড় তো, পিনকু ওদের বাজারটা করে দিস।' 'তা ছাড়ছি, কিন্তু কোন মেয়েমানুষের সঙ্গে অত ল্যাপটালেপটি করিস না শালা কোনসময় ভরাডুবি করে দেবে টেরও পাবি না।' মন্টুর কানের কাছে মুখ এনে বাবলু ফিসফিসিয়ে বলল, 'আজ-কালে একটা প্ল্যান ভেঁজেছি, আজ রাত্তিরে কিন্তু তোকে থাকতেই হবে। অমল মজুমদারকে মনে আছে তো! শালা দিল্লীতে ছিল, ওর বাবা মারা যাবার পর পুরো সম্পত্তির ওই মালিক। শালার টাকা [illegible] একটা ফ্রেইট পেমেন্ট [illegible] এবং ক্যাশ। রাত্তির দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ ফিরে ওটা হাপিস না করলে মাইরি শুকিয়ে মরতে হবে।'

মন্টু এক মিনিট কি ভেবে নিল, তারপর বলল, 'তোরা তৈরী থাকিস আমি ন'টা নাগাদ এসে যাব। শালা শয়তানের বাচ্চা তাহলে ফিরেছে!' মন্টুকে বেশ একটু উত্তেজিত দেখাল। যেন বেশ কিছুদিন পরে মনের মত খোরাক পেয়েছে। পরপর তিনটে সিগারেট পুড়িয়ে মন্টু উঠে দাঁড়াল, 'তোরা বোস, আমি একটু উঠছি, ঠিক ন'টায় এসে যাব।' 'গুরু নাগা মেরনা, তাহলে একেবারে গাড্ডায় পড়ে যাব।' বাবলু পিছু পিছু কয়েক পা এগিয়ে গেল।

সন্ধ্যের কিছু আগেই নীলা এসে পার্কটার কোণে দাঁড়িয়েছিল। হালকা লাল রঙের শাড়ি, গাঢ় ব্লাউজের আভায় ওর মুখটা টসটসে দেখাচ্ছিল। সাধারণত ও সাজগোজ করে না, আজ হঠাৎই ওর মনে হোল নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে। মন্টু রোজ ওকে এক কাপড়ে দেখতেই অভ্যস্ত, একটু চমক দেওয়া যাবে।

দুপুরে লম্বা একটা ঘুম দেওয়ার পর মন্টুর চোখ-মুখ বেশ ভারি ভারি। দূর থেকে মন্টুকে আসতে দেখে নীলা ওর দিকে এগিয়ে গেল। নীলাকে একঝলক দেখে নিয়ে মন্টু বলল, 'কী ব্যাপার এত সাজগোজ! বেড়ে দেখাচ্ছে কিন্তু, ঠিক কনে-বৌয়ের মতন।' নীলা লাজুক মেয়ের মত মুখ নীচু করল। সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে দূর থেকে রেল ব্রিজটাকে মাকড়সার জালের মত দেখাচ্ছে। একঝাঁক বক ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে রেল ব্রিজ টপকে মাঠের দিকে চলে গেল। মন্টু একটু চিন্তিত। বিকেলে ঘুম থেকে উঠেই ও ভাবছিল নীলার কাছে আজ বিয়ের কথাটা তুলবে। নীলার জন্যেই। পাড়ার লোকজনেরা ফিস-ফাস সুরু করেছে। নীলার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হওয়ার ব্যাপারটা সকলেরই জানা। তাছাড়া কখন কী ঘটে যায়। নীলাকে ঠকানো কি বিন্দুমাত্র কষ্ট দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। নীলাও যখন ভালবাসে তখন তাকে ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি!

কি ভাবে কথাটা তুলবে মন্টু ভাবছিল। একটু সুন্দর করে না বলতে পারলে নীলা ক্ষুণ্ণ হবে। অথচ কেমন এলোমেলো কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গুছিয়ে কথা বলা তার ধাতে আসে না।

পায়ে পায়ে রেল ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়াতেই একটা ইঁট বোঝাই লরী কাঁচ করে এসে ওদের পাশে ব্রেক কষল। একটা নেড়ি কুত্তাকে বাঁচাতে লরীটাকে থামতে হোল। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ শব্দ তুলে ওদের পাশ বেয়ে চলে গেল। নীলা বলল, 'আজ তোমায় খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। কি হয়েছে?' 'না, হয়নি কিছু। ভাবছিলুম পাড়ায় সবাই গুজু গুজুর করছে, বিয়ে থা করে ফেলাই ভাল।' নীলা মুচকি হাসল। কত চাঁচাছোলা করে বলতে পারল মন্টু। 'তাই নাকি! তা বেশ তো। কত-দিনে হবে।' নীলা মৃদু হাসির জের টেনেই জিগেস করল। 'তুমি বললেই [illegible] পড়া যায়। কি আর ঝামেলা।' 'কিন্তু [illegible] আগে তোমার একটা চাকরী বাকরি হলে কি ভাল দেখায়।' 'তা বটে, সে [illegible] লেগে-পড়ে বাগিয়ে নিতে হবে।' [illegible] এমনভাবে কথাটা বলল যেন একটু [illegible] করলেই ও একটা চাকরি পেয়ে যাবে। [illegible] মন্টুর গলার নিচে মুখ রাখল, ফি[illegible] ফিসিয়ে বলল, 'অত তাড়াহুড়োর কি আ[illegible] আমিও স্কুলটুলে একটা চা[illegible] পেয়ে যাই। ভয় নেই, আমি [illegible] তোমারই।'

ব্রিজের ওপর লোকজন আনাগো[illegible] আজ বেশি। ওরা মাঠের দিকে চ[illegible] পাকুড় গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। ঝাঁ[illegible] পাকুড় গাছটা অন্ধকারে বনের [illegible] দেখাচ্ছিল। মন্টু বলল, 'আজ [illegible] তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। না হলে আমাকে আস্ত রাখবে না।'

'কেন?' নীলার গলায় বিস্ময়ের [illegible] 'একটা জরুরী কাজ আছে। তোমায় ব[illegible] ফেলি কাজটা। একটা শাঁসালো [illegible] পেয়েছি। আজ রাত্রে মালকড়ি [illegible] ঘরজাত করতে হবে। সেই অমল [illegible] মজুমদার এক পুটুলি টাকা নিয়ে [illegible] ফিরবে দশটা নাগাদ। ওকে মেরেই টাকাগুলো হাতাতে হবে। বাটা [illegible] পাঁইতারা কষলে সাফ হয়ে যাবে।' ক[illegible] ক্রমে কথাগুলো বলে গেল মন্টু। [illegible] অমল, যে তোমার সর্বনাশ কর[illegible] পড়েছিল। ব্যাটাকে বাগে পেলে কলজে খুলে নেব।' মন্টু যেন [illegible] বাবলুদের সঙ্গে কথা বলছে এমনি [illegible] করে নীলার কাছ থেকে উত্তর [illegible] মন্টুর কথা শেষ হবার আগেই [illegible] মন্টুর হাতদুটো জোরে চেপে [illegible] 'অনুনয়টি ওকে প্রাণে মের না, আমার [illegible] রাখ।' মন্টু ঝিনকে হাতদুটো ছা[illegible] নিল। নীলার মুখের ওপর চোখ [illegible] মন্টু যেন আগুনের মত জ্বলে উ[illegible] অস্বাভাবিক জোরে চীৎকারে উঠল, [illegible] ওর জন্যে এখনও তোমার এত দরদ [illegible] এখনও ভুলতে পারনি? ওরা ঠিকই [illegible] ছিল মেয়েমানুষ গোখরো সাপের [illegible] সত্যি দুধ-কলা দাও ছোবল মারবেই। যদি মনে ছিল, আমার সঙ্গে ছি[illegible] করার কি দরকার পড়ল! শয়তান, [illegible] হারামি।' মন্টু সবল হাত দুটো নীলার দুটো কাঁধ চেপে ধরেছে। আঁধারের মধ্যেও নীলা দেখতে পেল চোখ দুটো দগদগ করে জ্বলছে। [illegible] শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আসছে। নীলা ঠকঠক কাঁপছে। মন্টুর হাতদুটো বুঝি কাঁধ গলার কাছে এসে চেপে ধরবে। [illegible] দৈত্যের রূপ নিয়ে মন্টু যেন তাকে ক্ষত-বিক্ষত করবে। এই বীভৎস [illegible] সামনে দাঁড়িয়েও নীলা যেন কার প্রচণ্ড টান অনুভব করছিল। সেটা কি মন্টুর জন্যে নীলা তা [illegible] পারছিল না।

বীরত্বের নয়া ইতিহাস

যুদ্ধে পরাজয় অবধারিত জেনে রাজপুত বীরাঙ্গনার দল ইজ্জত বাঁচানোর তাগিদে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দিতেন। এই আত্মদান ইতিহাসে জহরব্রত নামে অমর হয়ে আছে। বিদেশী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এধরণের ঘটনা তুলনারহিত। পররাজ্যলোলুপ হানাদারদের শ্মশানের শেষ ভস্মরাশি উপহার দেওয়াই ছিল সেদিন তাঁদের উদ্দেশ্য। রাজপুতনা বারবার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতার ডাক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে সে দেশের মরু-কান্তারে। এগিয়ে এসেছেন দেশপ্রেমিকের দল। গড়ে তুলেছেন দুর্জয় প্রতিরোধ পুরুষ এবং নারীর সম্মিলিত সামর্থ্য নিয়ে। পাশাপাশি লড়াই করেছেন। পুরুষ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। আর পরাজয়ের চরম মুহূর্তে নারী বেছে নিয়েছেন জহরব্রতের পথ—আত্মসম্মান এবং আত্মমর্যাদার রক্ষাকবচ।

সেই কবেকার ঐতিহাসিক কাহিনী আজ আবার স্মরণপথে উদিত। ইতিহাস নিখুঁত তুলি টেনে চলেছে আজ স্বাধীন বাংলাদেশে। রাজপুতনার মরু-কান্তার ছেড়ে এবার ইতিহাসের লীলাভূমি হলো সবুজ শ্যামল বঙ্গভূমি। পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে পূর্ববাংলা। সেখানকার মেয়েদেরও এমনিভাবে লড়াইয়ে সামিল হতে হয়েছে। পাক দখলদার ফৌজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ইজ্জত বাঁচানোর জন্য প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্রী ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এছাড়া কোন পথ তাঁদের সামনে খোলা ছিল না। ইতিহাস এবার নতুন বাঁক নিলো। রাজপুতনার পাশাপাশি সৃষ্টি হলো এক নতুন কাহিনী সমতল পূর্ববাংলায় তথা স্বাধীন বাংলাদেশে। সীমান্তের বেড়ার ওপারে এবার এক অনাস্বাদিত ইতিহাস, যার শরিক আমরা সবাই।

পাক হানাদার বাহিনী চিরাচরিত পথেই এগিয়ে চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সব ছাত্রই যোগ দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে। এই সুযোগ নিয়ে নিজেদের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য সভ্যতা-ভব্যতা এবং আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধের সমস্ত রীতি লঙ্ঘন করে এই হানাদারের দল চড়াও হয় বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলের মেয়েদের উপর। আত্মবিসর্জন করে তাঁদের অনেকেই এক নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সেই সুযোগটুকুও পেলেন না সবাই। বাদ বাকিদের খোঁজ তাই আজও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অজানা। হয়তো তাঁদের অনেককেই হতে হয়েছে সেই হানাদার নরপশুদের শিকার। কিন্তু যাঁরা আত্মবিসর্জন করে আত্মসম্মান বজায় রাখতে জানেন তাঁদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার কোন সুযোগই তারা পাবে না। এতে তাদের সর্ব-[illegible] নিষ্কলঙ্ক। সেই ইতিহাস আজ রচিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্র।

কোন এক দেশের মেয়েরা নিজেদের চুল দিয়ে ধনুকের ছিলা তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেদেশেও তখন এমনি স্বাধীনতার প্রশ্ন। মরণ-বাঁচনের সঙ্কট মুহূর্তে অন্য কোন পথ না পেয়ে ওঁরা নিজেদের চুল কেটে তৈরি করে দিলেন পুরুষের যুদ্ধাস্ত্র। সেই ইতিহাসই এবার স্বাধীন বাংলাদেশের মেয়েদের প্রেরণা জোগাচ্ছে। তাঁরা গড়ে তুলছেন আরো দুর্ধর্ষ ইতিহাস। স্বাধীন বাংলাদেশ-এর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাক দখলদার বাহিনী হয়ে উঠেছে মরীয়া। যেকোন উপায়ে তারা বাঙ্গালীর স্বাধীনতার সাধ চূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর। তাই তারা রাজপথে নামিয়েছে ট্যাংক। বিমান থেকে চলছে বোমাবর্ষণ। হজযাত্রীদের জাহাজে করে বাংলাদেশে সৈন্য পাঠাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছে সারা বাংলাদেশ। সমগ্র পূর্ব বাংলা জুড়ে তৈরি হয়েছে এক বিশাল রণাঙ্গন। সর্বত্র লড়ছে সবাই। কেউ পিছিয়ে নেই। এরই মধ্যে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন বীরাঙ্গনা রোশনারা বেগম। ঢাকা উইমেন্স কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। পড়াশোনাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু ইতিমধ্যে এসে গেছে স্বাধীনতার ডাক। নিজের চোখের সামনে তিনি দেখেছেন পাক দখলদার বাহিনীর নৃশংস পাশবিকতা। অস্থির হয়ে উঠেছেন। মনে মনে ভেবেছেন দখলদার

বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ানোই হবে এর সমুচিত জবাব। ক্রমে ক্রমে সে সংকল্প হয়েছে অটল। ঢাকার রাজপথে প্যাটন ট্যাঙ্কের প্রচণ্ড দাপাদাপির সময় তিনি বুকে মাইন বেঁধে ট্যাংকের সামনে ঝাঁপ দেন। একটি জীবন নির্ভীক আত্মদানে একটি ভীষণ মারণযন্ত্রের বিনাশ। উড়ে গেল প্যাটন ট্যাঙ্ক। আর ঐতিহাসিক কীর্তিতে ভাস্বর হয়ে রইলেন রোশনারা।

সেদিন কলকাতার রাজপথে একটি বিরাট মহিলা মিছিল ধ্বনি উঠলো : বীরাঙ্গনা রোশনারা জিন্দাবাদ। সেদিন-টিকেই চিহ্নিত করা হলো রোশনারা দিবস-রূপে। সবাই মুখর হলেন রোশনারার এহেন আত্মদানে। আমাদের ঘরের কাছেই যে ইতিহাস এই অমূল্য উপাদান লুকিয়ে ছিল তা জেনে আমাদের যেন নতুন করে বোধোদয় হলো।

রোশনারার আত্মত্যাগে আজ উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ। মেয়েরা দলে দলে এবার নেমে পড়ছেন রণাঙ্গনে। হাতে তুলে নিয়েছেন সমরাস্ত্র। তাঁরা গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছেন। হাত থেকে হাতে ঘুরছে রাইফেল। পুরুষরা সবাই গেছেন হানাদারদের মোকাবিলা করতে। বাড়ি আগলাচ্ছেন মেয়েরা। তাঁরা রাইফেল হাতে সদা জাগ্রত। স্বদেশ এবং নিজের সম্ভ্রম রক্ষার এ হলো তাদের নতুন জীবন-চেতনা।

হাতিয়ার হাতে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মেয়েরা লড়াই করছেন। নাজেহাল পাক দখলদার বাহিনী নিজেদের বীরত্বের জয়ঢাক বাজানোর জন্য তাঁদের উপর চালাচ্ছে বেপরোয়া আক্রমণ। এ পর্যন্ত যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, পাক সেনাবাহিনী একমাত্র যশোর ক্যান্টনমেন্টেই প্রায় চারশো স্বেচ্ছাসেবিকাকে গুলী করে মেরেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এঁদের গ্রেপ্তার করে আনার পর এই নারকীয় ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। এমনি ঘটনা কত ঘটেছে তার সঠিক হিসাব এখনি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। একদিন অবশ্য সবই প্রকাশ পাবে যেদিন পাক দখলদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশ হবে মুক্ত। সেদিন মহিলাদের এমনতরো আরো বীরত্বের কাহিনী জানা যাবে।

পাক দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের কোন লেখাজোখা নেই। মরীয়া হয়ে ওরা শেষ কামড় মেরে চলেছে। এমনি একটি ঘটনার কথা জানা গেল এই কিছুদিন আগে। পূর্ব বাংলা থেকে একটি জাহাজে বোম্বাই হয়ে একদল মহিলা আসেন। এঁরা সবাই বিদেশিনী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এঁদের অনেকেই মুখ খুলতে চাননি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, পূর্ব বাংলায় আজ যা হচ্ছে সে সম্বন্ধে কিছু বলে ওখানকার প্রবাসী বিদেশীদের আরো বিপদ ঘটাতে চাই না। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, ইয়াহিয়ার ফৌজের অত্যাচারের হাত থেকে বিদেশীরাও মুক্তি পাচ্ছে না। তাঁদেরও হতে হচ্ছে সমান নির্যাতিত।

এমনি একটি রিপোর্টও পাওয়া গেছে। পাক দখলদার ফৌজ দিনাজপুরে শহরের ব্যাপটিস্ট মিশন ভবনে হামলা করে। এই মিশনের নারীরাও তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। সেখানকার কয়েকটি খৃস্টান মেয়ের উপর তারা চরম অত্যাচার করে এবং মিশন ভবনটির এক বিরাট অংশ ভেঙে দেয়। এই সংবাদটা দিয়েছেন উক্ত ব্যাপটিস্ট মিশনের সংগে যুক্ত মিঃ জি লিউইস। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সম্প্রতি পূর্ব দিনাজপুর পরিত্যাগ করে এসেছেন।

এই নির্বিচার অত্যাচার চলেছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে। কিন্তু অত্যাচারের মুখে সে দেশের মেয়েদের প্রতিরোধ হচ্ছে আরো দৃঢ়। হাতিয়ার হাতে নিয়ে তারা লড়াই করছেন আবার পুরুষের পাশে পাশে থেকে তাদের করছেন সবরকম সাহায্য। এমনি একটি ঘটনা ঘটেছে কুষ্টিয়ায়। সেখানে মুক্তিফৌজ দখলদার বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এদিকে মুক্তি-ফৌজের খাবার যায় ফুরিয়ে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁরা কাহিল হয়ে পড়েন। অথচ অবরোধ ওঠানো সম্ভব নয়। তাহলে খাঁচা-ছাড়া বাঘ অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দেবে। এমনি সময়ে এগিয়ে এলো নারী স্বেচ্ছাবাহিনী। তাঁরা পুরুষদের খাবার জোগান দিলো। নতুন উদ্যমে সঞ্জীবিত মুক্তিবাহিনী এবার পাক-দখলদারদের দিলে মরণ কামড়। শহর হলো মুক্ত।

এমনি ঘটেছে সর্বত্র। নারীরা বীরত্বের নয়া ইতিহাস রচনা করে চলেছে। ভীরুতা এবং কোমলতার অপবাদ ঘোচাতে আজ বাংলাদেশের মেয়েরা সংকল্পবদ্ধ। তাই তাঁরা আজ রণাঙ্গনে রণাঙ্গনে লড়ছেন। বুকে মাইন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ট্যাংকের সামনে। দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছাদ থেকে লাফিয়ে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার এক আত্মরক্ষার পথ। নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে সর্বত্র। যেদিকে চোখ ফেরানো যায় সেখানে বীরত্বের কীর্তিগাথা। গর্বে বুক ভরে ওঠে এই ভেবে যে, এবার আমাদের নিজস্ব বীরত্বের যশোগাথা রচিত হচ্ছে।

উদাহরণ আর অনুপ্রেরণার জন্য এবার আমাদের আর ইতিহাস হাতড়ে মরতে হবে না। আমাদের মেয়ে রোশনারা এখন সকল অনুপ্রেরণার উৎস। এ রোশনারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে অসংখ্য রোশনারা। তাঁরা হবেন আরো ভয়াল-ভয়ংকর। শুধু প্যাটন ট্যাঙ্ক নয় সমগ্র পাক-দখলদার বাহিনীকে উচ্ছেদ করবেন তাঁরা। তাঁদের যুদ্ধব্যূহের সামনে ভেঙে পড়বে ওদের সকল প্রতিরোধ। পরিপূর্ণ স্বাধীন বাংলাদেশে ওরা বেঁচে থাকবেন স্বাধীন নাগরিকের দুর্লভ সম্মান নিয়ে।

—প্রমী

'জপাৎ সিদ্ধি'র নায়িকা

অপ্রাপনীয়কে পাওয়া যায়, হওয়া যায় মহতো মহীয়ান যদি অবিরাম সাধনায় আসীন থাকা যায় অবিচল নিষ্ঠায়। যে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'জপাৎ সিদ্ধি' সেই পায়।

খেলতে গিয়ে পা ভেঙে মেয়েটি কোথায় কপালে করাঘাত করে কান্নায় ককিয়ে উঠবে তা নয় সেই ভাঙা পায়েই স্কেটিংয়ে বিশ্ববিজয় করে এল—একবার নয়—পর পর দু'বার। তাছাড়া সারা ইয়োরোপ বিজয়িনীর স্বর্ণমুকুট অনায়াসে স্বাচ্ছন্দে ক্রমান্বয়ে চারটে বছর শিরোভূষণ করতে পেরেছিল তার স্কেটিংয়ে দেহলাবণ্যের এমন অনবদ্য হিল্লোলিত বিচিত্র ললিতভঙ্গিমায় সারা বিশ্বের আর কোন তরুণী এর আগে ব্যক্তিগত সাফল্যে উজ্জীবিত হতে পারে নি—এর পরেও না।

মাত্র বাইশ বছরের পুষ্পিত যৌবনের অধিশ্বরী এসবোকাজি ডাইজেকস্ট্রা ডাক্তার ললনা আমস্টার্ডামের অধিবাসিনী। তুষার তরঙ্গের কঠিনে তিনি যেন মূর্তিমতী ছন্দ, সুর ও সৌন্দর্য। কখনো ব্রীড়ানতা মরালগামিনী কখনো মদিরেক্ষণা মদালসা আবার কখনো অগ্নিশিখার মতো লীলাময়ী কখনো চকিতগমনা কুরঙ্গী। আর এই জন্যেই তিনি দুনিয়ার স্কেটিং রসিকমহলের প্রশংসা অভিনন্দনে নন্দিত, ইয়োরোপ ও বিশ্ববিজয়ে বন্দিত হয়েছেন।

স্কেটিংয়ের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল দুধ-দাঁত যখন পড়েনি তখন থেকেই। হবে নাই বা কেন। সারা পরিবারে এই স্কেটিং-বাই। বাপ ডাক্তার হলে কি হবে স্কেটার হিসেবে ডাক্তারির চেয়েও ডাক তাঁর বেশি। মাও কম যেতেন না। এক ভাই সেও। ঠাকুরদা আর ঠাকুমা নাতনীকে সাধ করে উপহার দিলেন এক জোড়া স্কেটস। ছোট্ট মেয়ে তাতে পা রেখে একেবারে পাখি হয়ে উঠল। বরফের কঠিন মৃত্তিকার ওপর দিয়ে শুধু ভেসে যাওয়াই নয়—তার এই ভেসে যাওয়াকে তিনি ছন্দিত করে তোলবার জন্যে শিশুবয়স থেকেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৪৮-এ তুষারের কঠিন মৃত্তিকায় আবার তাঁকে দেখা গেল। স্কেটিংয়ে তাঁর পূর্বলাবণ্য আবার ফিরতে লাগল। এই সময় তাঁর বাবা চলে এলেন নরওয়েতে। নরওয়েতেই তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভার প্রথম নিদর্শন রাখলেন। তখনও তাঁর বয়েস পুরো সাত বছর হয় নি। খুদে মেয়ের আশ্চর্য স্কেটিং-প্রতিভা দেখে সেখানকার মানুষজনেরা সোচ্চার হয়ে উঠল প্রশংসায় নতুন এক সোনজা হেনির কীর্তিমর্যাদাধারী উদয়ের সম্ভাবনা কল্পনা করে। সোনজা নরওয়ের স্কেটিংয়ের গৌরব-ঐতিহ্যের এক অবিস্মরণীয় নায়িকা। তিন কীর্তিতে, জন্ম-গৌরবে এবং অসম্ভবের সাধনায় এক বিরল স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যারা দুনিয়ার স্কেটিং প্রতিযোগিতায় [illegible] দশবার ইয়োরোপ এবং তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়ে। অলিম্পিকের স্বর্ণপদক নিজকণ্ঠে ঝুলিয়েছিলেন তিন-বার। এসবোকাজি এই কিংবদন্তির নায়িকা পুরোপুরি না হয়ে উঠলেও স্কেটিং-শৈলীতে কিন্তু সোনজা হেনিকে অবলীলায় অতিক্রম করেছিলেন। স্কেটিংয়ে লাফালাফির লীলাবৈচিত্র্যে তিনি আজও অনন্যা। স্কেটিংয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় লাফালাফিটা হচ্ছে মূলকথা। বরফের ওপর নাচের ভঙ্গি দেখানো নয়। নৃত্যের চেয়ে অ্যাথলেটিকসের ভূমিকাটাই এখানে মুখ্য। তুষার-মৃত্তিকার উপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে শূন্যের বুকে যিনি যত লীলায়িত ভঙ্গিমায় লাফ দিয়ে নয়নাভিরাম দেহলীলায় বিচিত্ররূপিণী হয়ে উঠতে পারেন তিনি তত বাহবা কুড়োন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ভাণ্ডারে ততই পয়েন্ট জমা হয়। শূন্যে একটি লীলায়িত ভঙ্গির লাফ—একের মাঝে দুই কখনো তিনের রকমফেরের সূত্রপাত ঘটানোর নজিরই শ্রেষ্ঠত্বের কষ্টি-পাথরে সেরা নিরিখ। এইদিক দিয়ে এসবোকাজি তাঁর স্বনামধন্য পূর্বসূরীদের—সোনজা হেনি, বারবারা অ্যান স্কট, জ্যাকুলিন দু বিয়েফ, ক্যারল হেস প্রমুখো-দের সমস্ত গৌরব ও খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছেন। বরং একটু ঘুরিয়ে বলা যায়: ফিগার-স্কেটিংয়ে এঁরা কেউ এসবোকাজির সামনে দাঁড়াতেই পারেন নি।

শেষটাই যার এত আনন্দ-উচ্ছল, এমন গৌরবগরিমায় দীপ্ত, শুরুটা কিন্তু তার কঠোর কৃচ্ছ্রতার অঙ্কুশে অস্থির অতন্দ্র। শ্রেষ্ঠত্ব-আলোকের ঝরণাধারায় অভিষিক্ত হবার আগে অনেক রাত কেটেছে সূচিভেদ্য অন্ধকারের আড়ালে। জীবনে প্রতিটি দিনের শয্যা বলতে গেলে রচনা করতে হয়েছে তুষার-মৃত্তিকায়। দশ বছর বয়সেই তিনি ইংলণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। এখানেই মিলল সত্যিকারের গুরু, ইংলণ্ডের 'জাত ট্রেনার' ফিগার-স্কেটিংয়ে পথিকৃৎ প্রখ্যাত আরনল্ড গার্সটিউইলা, যিনি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতায় যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। আর কী অন্তহীন কৃচ্ছ্রতার দহনের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু হল। লণ্ডনে দিনের পর দিন কেটেছে রূপালী আলোহীন অন্ধকারভরা ঘরে। সকাল থেকে শুরু করে বিকেল অবধি একটানা চলত তাঁর সাধনা, তাঁর অনলস অনুধ্যান—কেবল লাফ খাওয়া, [illegible] দেওয়া বিচিত্র ভঙ্গিমা আয়ত্ত করা। গুরুর স্থায়ী স্থিতি ছিল না কোন জায়গায়, নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে নানান কেন্দ্রে গিয়ে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাতেন। আর এসবোকাজি গুরু দ্রোণাচার্যের 'একলব্য' শিষ্যের মতো গুরুকে অনুসরণ করে ফিরতেন। গুরুর সমস্ত শিক্ষাকে তিনি নিখুঁতভাবে আত্মসাৎ করে নিতেন। অন্য শিক্ষার্থীদের [illegible] তিনি পাঠগ্রহণ [illegible] আলোয় [illegible] একমনে [illegible] করে দেখতেন। [illegible] নিষ্ঠা [illegible] সাধনায় মগ্ন হয়ে [illegible]। [illegible] মন্দগতিতে সাফল্যের দর্পণে তিনি নিজের উদ্ভাসিত মুখ দেখতে শুরু করলেন। মাঝে মধ্যে প্রতিযোগিতায় হাজির হতে লাগল। প্যারিসের ইয়োরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় সপ্তম স্থান পেলেও অলিম্পিকের উইন্টার গেমসে মুখ কালো করে ঘরে ফিরতে হল। যতই অসফল হচ্ছিলেন ততই তাঁর কানে উজ্জীবন মন্ত্র দিচ্ছিলেন তাঁর গুরু: তুমি বড় হবে, সেরা হবে, শ্রেষ্ঠ হবে: 'আজ না হয় যদি হতে পারে কাল'। বাধা-বিপত্তি অসাফল্য তাঁর সবসেরা হবার আকাঙ্ক্ষাকে দীপ্ত বাসনায় প্রজ্জ্বলিত রেখে তাঁকে অবিরাম প্রেরণা জুগিয়ে যেতে লাগল। হেরে গেলেও পিছু হটে যেতেন না, ভগ্নজানু হয়ে মাথা নত করতেন না লজ্জায়। বরং মুখ তুলে তীব্র প্রেরণার আগুনে উদ্দীপ্ত হতে হতে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলতেন: আজ আমি পারলাম না—চার বছরের মধ্যে আমি জয়ী হবোই, সবসেরা হবোই।

হলেনও। ১৯৬২ সাল বিপুল সাফল্যের বরণডালা সাজিয়ে নিয়ে এল তাঁর কাছে—প্রাগে বিশ্ববিজয়িনীর বিজয়-মালা কণ্ঠে দুলল। তারপরের বছরেও তাই। পর পর ক্রমান্বয়ে দুটি বছর বিশ্ব-জয়ের বিরল সৌভাগ্যের অধিকারিণী হলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠের স্বতোৎসারিত আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর সম্বর্ধনার মধ্যে দিয়ে খোলা গাড়িতে চড়ে তিনি আমস্টারডামের রাজপথ পরিভ্রমণ করলেন। স্বয়ং হল্যাণ্ডের রাণী এবং রাজকুমারী এসে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের আর একটি ধাপ বাকি ছিল। অবশেষে তাও পূর্ণ হল। তিনি একই সঙ্গে হলেন ইয়োরোপ-বিজয়িনী, বিশ্ববিজয়িনী এবং অলিম্পিক বিজয়িনী। ১৯৬৪ সালে।

উত্থানপতনের বন্ধুর পথের মধ্যেই রয়েছে সাফল্যের সোপান—জপাৎ সিদ্ধির এই দীপ্ত নায়িকা তারই জীবন্ত প্রতি-মূর্তি। দেশকালের গণ্ডী পার হয়ে তাঁর জীবনের এই অনন্য উত্তরণের কাহিনী হেরে-যাওয়া পিছিয়ে-পড়া মানুষজনের প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে।

—বিমল বস

শিল্পী সংসদ প্রযোজিত বনপলাশীর পদাবলী ছবির মহরতে ক্যামেরাম্যান কানাই দে, পরিচালক: উত্তমকুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী
ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

কু-মাতা কখনো নয়

সাংসারিক অভিজ্ঞতা বলে, যেখানে তিন বা তার চেয়ে বেশী ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার, সেখানে সংসার ভাঙে মেজবৌয়ের জন্যে; আর যেখানে মাত্র দুই ভাই, সেখানে ভাঙে সেই বৌয়ের দ্বারা, যার স্বামীর উপার্জন বেশী। সংসার যখন ভাঙে, তখন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ-বাটরা নিয়ে অনেক সময় কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। এবং বিধবা মা যদি বেঁচে থাকেন ও তাঁর জন্যে তাঁর পরলোকগত স্বামী যদি কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না করে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর আর অবস্থার ব্যবস্থা থাকে না। সেই যে কথায় আছে না, ভাগের মা গঙ্গা পায়না, সেই দুঃসহ অবস্থাতেই পড়তে হয় তাঁকে। শ্রীজিৎ পিকচার্স নিবেদিত, রাজেন্দ্র কাংকারিয়া প্রযোজিত এবং অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত "জননী" ছবির যিনি জননী, সেই সর্বজয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর দুই ছেলে উপেন ও ভূপেন ছেলে মানুষ করার জন্যে মায়ের কৃত দেনাকে সমানভাগে শোধ করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিল এবং শেষ পর্যন্ত বিষয় বখরা করবার পরে মায়ের দায়িত্ব বহনের কথা নিয়ে কথা কাটাকাটিতে মেতে উঠল, তখন তিনি ওদের দুজনকেই ও'র দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্যে সবার অলক্ষ্যে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা হয়ত আরও অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যেত, যদি না উপেন-ভূপেন হত আসলে মাতৃভক্ত সন্তান। মায়ের রেখে-যাওয়া চিঠি থেকে যে-মুহূর্তে তারা আবিষ্কার করল, মা গৃহ ছেড়ে যে-দিকে দু'চোখ যায়, সেই দিক পানে যাত্রা করেছেন, অমনই তারা নিজেদের ঝগড়া ভুলে ছুটল মাকে ফিরিয়ে আনতে এবং ওদের দুই বৌ— এমনকি ঝগড়ুটে বৌদ্ব পর্যন্ত ফিরিয়ে-আনা মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

স্বামী মাধবচন্দ্রের অপঘাত মৃত্যুর (পথ চলতে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের ব্যাট থেকে ছিটকে আসা ক্রিকেট বল কপালে আছড়ে পড়ার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটল। এই ঘটনাকে চিত্রিত করে কাহিনীকার-পরিচালক হয়ত পথে-ঘাটে ক্রিকেট খেলা যে কতদূর পর্যন্ত মারাত্মক হতে পারে, তাই দেখাতে চেয়েছেন) পরে সর্বজয়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার জন্যে ছোটদের জামা-ফ্রক তৈরী করে ফেরি করেছেন, জীবনবীমার দালালী করেছেন এবং তাঁর স্বামীর অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু, পশু-চিকিৎসক বিপিন-বাবুর কাছে থেকে প্রায়ই বিশ, পঁচিশ, তিরিশ টাকা করে ধার নিয়েছেন, যার মোট পরিমাণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে হাজার নয়েক টাকা। বলা যেতে পারে, উপেনের উকিল হওয়া এবং ভূপেনের ডাক্তার হওয়ার মূলে ছিল বিপিনের অকৃপণ সাহায্য। এমনকি, বিপিনের পরামর্শ ও চেষ্টায় দুই ভাইয়ের বিবাহ থেকে যে নগদ অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থ ও নব বধূদের গহনা সম্বল করে সর্বজয়া কন্যা চায়ুর বিবাহ দেন ধনীর পৌত্র, ইঞ্জিনীয়ার বিকাশের সঙ্গে। কাজেই সর্বজয়া যে একজন স্নেহশীলা জননী, একথা স্বীকার করে নিলেও ছেলেদের মানুষ করা বা তাদের ও তাদের একমাত্র ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া ব্যাপারে সর্বজয়া থেকেও বিপিনের দান ও কৃতিত্ব সমধিক। বড় বৌ ও বড় ছেলের কথায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন ছেলেদের কাছে ভারস্বরূপ মনে হওয়ায় তিনি অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন; কিন্তু এইটুকুই সর্বজয়াকে 'জননী' ছবির কেন্দ্রবিন্দুরূপে দর্শকের চোখে মহিমান্বিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কতখানি আত্মত্যাগ করে সর্বজয়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলেছিল, মানুষ হবার পরে ছেলেরা তাকে কি প্রতিদান দিল, মানুষ করা ছেলেদের কাছ থেকে দুঃখ পেয়েও সর্বজয়া ওদের চরম কোনো বিপর্যয়ের সময়ে নিজের প্রাণোৎসর্গ করেও ওদের ভালো করে গেল, এমনই এক মহিমময়ী চরিত্র আমরা দেখতে চেয়েছিলুম "জননী"তে। কিন্তু তেমন নাটকীয় গভীরতাপূর্ণ চিত্র আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে গেল।

বোম্বাইয়ের সুলোচনা চট্টোপাধ্যায় মা-সর্বজয়ার চরিত্রে সংযত, অথচ দরদী অভিনয়ের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। ছোটভাই ডাক্তার ভূপেনের ভূমিকায় অজয় গাঙ্গুলী অত্যন্ত সাবলীল ও জীবন্ত অভিনয় করেছেন। এই ভূমিকায় দেখে মনে হল, তিনি যেন ক্রমেই নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির

রাজীব চৌধুরী বেশে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উপভোগ্য টাইপের সৃষ্টি করেছেন। উকিল উপেনের ভূমিকায় তরুণকুমার তাঁর নিজস্ব রীতিতে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। বিপিনবেশী কালী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা যায়। ধনীর নাতি, ইঞ্জিনীয়ার বিকাশের রোমান্টিক ভূমিকায় সমিত ভঞ্জ নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। চাষুর ভূমিকায় পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পাশকরা ছাত্রী জয়া ভাদুড়ীর নাটনৈপুণ্য প্রকাশের বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। কাজেই তাঁকে আমরা এছবিতে দেখলুম মাত্র, তার বেশী নয়। বীণার অসন্তোষ যেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন সুলতা চৌধুরী, বীণার স্বাভাবিক মাধুর্যও তেমনই প্রকাশিত হয়েছে লিলি চক্রবর্তীর দ্বারা। অপরাপর ভূমিকায় ভূপেন চক্রবর্তী (মাধব), অপর্ণা দেবী (বিকাশের মা), নন্দিতা দে (বিপিনের স্ত্রী), অজিত চট্টোপাধ্যায় (কাকাতুয়ার মালিক) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি মধ্যমান রক্ষিত হয়েছে। ছবিটিকে দ্রুতলয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব সম্পাদক শিবসাধন ভট্টাচার্যের। ছবির তিনখানি গানের মধ্যে দুখানি নীতিমূলক এবং একখানি বাসরের গান—তাও আবার বিশেষ বিশেষ গহনার উল্লেখে ভরা। এ-অবস্থায় না গানের রচনা, না গানের সুর—কিছুই প্রাণে

সলিল দত্ত পরিচালিত স্ত্রী চিত্রের মহরতে ক্ল্যাপ দিচ্ছেন বিভূতি লাহা।

ফটো : অমৃত

পুলক জাগানোর মতো হওয়া সম্ভব নয় এবং এক্ষেত্রে তা হয়ওনি।

মায়ের মহিমা কীর্তন বিষয়ক গৃহস্থালীর ছবি 'জননী' সাধারণ দর্শককে কিছুটা খুশী করতে পারে।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

প্রতিবারের মত এবারেও পয়লা বৈশাখ স্টুডিওপাড়া ছিল বেশ জমজমাট। পূর্ব-নির্ধারিত মত তিনটে ছবির মহরৎ হয়েছে ঐদিন। শুনেছিলাম মান্না দে প্রযোজিত 'ব্রজবুলি' এবং ইন্দোর সেনের 'পিকনিকে'র কাজও শুরু হবে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ঐ দুটি ছবির শুভ মহরৎ শেষ পর্যন্ত হয়নি!

মহরৎ হয়েছে তিনটি ছবির—এক, শিল্পী সংসদের 'বন পলাশীর পদাবলী' দুই—সলিল দত্তর 'স্ত্রী', তিন—'মাতঙ্গিনী হাজরা।'

এন-টির এক নম্বরে নির্ধারিত সময়ে পেঁৗছে দেখি দু নম্বর ফ্লোর জুড়ে ভয়ানক ব্যস্ততা। ফ্লোরের দরজা খুলে সামনের লনে সারি সারি চেয়ার পাতা। বুঝলাম অভ্যাগতদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। উত্তমবাবু দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে ক্যামেরা পজিশন নিয়ে আলোচনা করছেন ক্যামেরাম্যান কানাই দের সঙ্গে। দিলীপ মুখার্জি ফ্লোরে ঢুকতে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন ছবি প্রসঙ্গে। এক কোণে সুপ্রিয়া দেবী শমিতা বিশ্বাস, শ্যামল মিত্র প্রমুখ মৃদু গুঞ্জনে ব্যস্ত। সারা ফ্লোরে বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিতের কলগুঞ্জন। ছবির মহরতে এমন চেহারা দর্শক আছেন স্মরণে মনে আসছে না। ... একবার স্থারে এসে 'কোকাকোলা' আসছে না কেন ... ... হাসাবিনিময়ের পর বাইরে চলে গেলেন।

ব্যস্ততা শুধু ফ্লোর জুড়ে নয় বাইরেও। বাংলাদেশের প্রায় সব খ্যাতিমান কুশলী শিল্পী বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করছেন শুভ মুহূর্তের। প্রথম দর্শনে একে অপরকে 'জয় বাংলা' বলে স্বাগত জানাচ্ছেন। ভেতরে সব প্রাথমিক কাজ ঠিক হয়ে যাবার পর প্রবীণ পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জি অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে জানালেন শিল্পী সংসদের বিভিন্ন সদস্য কিভাবে এই ছবি তৈরীর পশ্চাতে কাজ করেছেন এবং এখনও করছেন। উত্তমকুমার পরিচালিত এ-ছবির বিভিন্ন চরিত্রে থাকবেন শিল্পী সংসদেরই বিভিন্ন শিল্পীরা (যতদূর শুনেছি এঁদের মধ্যে আছেন সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তরুণকুমার, সুব্রত চ্যাটার্জি প্রমুখ)।

অর্ধেন্দুবাবুর ভাষণান্তে উত্তমবাবু পূর্ব নির্ধারিত দৃশ্যটির চিত্রগ্রহণ করলেন উপস্থিত সকলের অনুমতি নিয়ে। দৃশ্য ছিল জমিদারবাড়ীর মজলিশী আড্ডার কয়েকটি সংলাপ। দৃশ্যগ্রহণ শেষ হতে না হতেই কোকাকোলার বোতল এসে গেল। যাত্রা শুরু হোল আরেকটি ছবির। ফ্লোর থেকে বেরিয়ে দেখি ভিড় আরও বেড়েছে। অনুপকুমার, বাসবী নন্দী, বিভূতি লাহা, তরুণ মজুমদার, পিনাকী মুখার্জি, সমিত সেন, দিলীপ রায় ও আরও অনেকে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গালগল্পে মগ্ন। ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে এগার।

• • •

পরের ছবির মহরৎ ইন্ডিয়া ল্যাবের রেকর্ডিং রুমে। রেবী জুন প্রোডাকশনস্-এর সলিল দত্ত পরিচালিত ছবি 'স্ত্রী'। ছবির দুটি চরিত্রাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার। মহরতের শিল্পী ও দুজনই।

দু নম্বর ফ্লোর থেকে সবাই আসছেন ইন্ডিয়া ল্যাবের দিকে। সস্ত্রীক (শ্রীমতী গীতালী দত্ত) সলিল দত্ত এলেন এ

দে। রেকর্ডিং রুমে ঢুকে দেখি ভিড় একটু কম। চেয়ার অনেক খালি। কিছু-ক্ষণ পরে সৌমিত্রবাবু ঢুকলেন মেক-আপ নিয়ে। খালি চেয়ারগুলো তখন প্রায় ভর্তি হতে চলেছে। বিকাশ রায়, বিভূতিবাবু এলেন, এলেন দিলীপ সরকার, রণজিৎ কাঁকারিয়া, তরুণ মজুমদার, অনুপকুমার ও আরও অনেকে। রেকর্ডিং রুম। তাই কোনো সেট ফেলা হয়নি। পেছনে স্কাই কালারের ক্যানভাস একটি। বুম্‌ম্যান এগিয়ে-পিছিয়ে শব্দগ্রহণ যন্ত্রটিকে ঠিক জায়গায় দাঁড় করালেন। ক্যামেরা পজিশন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। ক্যামেরাম্যান বিজয় দে ক্যামেরার পেছনে বসতেই পরি-চালক সলিল দত্ত উপস্থিত সকলের অনুমতি নিলেন চিত্রগ্রহণের জন্য। ইতি-মধ্যে লাবরেটরীর একজন কর্মী পুজোর ফুল মাথায় ছুঁইয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়ে গেছেন সকলকে।

সলিলবাবুর অনুরোধে ক্ল্যাপস্টিক দিলেন বিভূতি লাহা। মাত্র একটি সংলাপ বাণীবদ্ধ করা হোল। সৌমিত্রবাবু ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাল-বাসার অনেক চেহারা আছে, তুমি স্বৈ-চারিণী হয়ে পড়ছ।' উত্তমবাবু ও আরও অনেকে তখন স্যুটিং জোনের বাইরে দাঁড়িয়ে। সংলাপ শেষ হতে সবাই এক-যোগে হাততালি দিয়ে উঠলেন, সৌমিত্র-বাবুও বাদ গেলেন না। ইতিমধ্যে সন্দেশের ট্রে তখন সবার সামনে ঘুরছে। উত্তম-সৌমিত্রকে ঘিরে তখন অনুরাগীদের ভিড়। কেউ শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে, কেউ বা বাড়িয়ে দিয়েছে অটোগ্রাফের খাতা। নিমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল ছবির প্রধান নারী চরিত্রে থাকবেন বাংলার খ্যাতনাম্নী একজন নায়িকা। শুনেছিলাম অপর্ণা সেনই সেই অভিনেত্রী। আপাততঃ শুনছি হয়তো বা পরিবর্তন হতে পারে।

সৌমিত্রবাবুর কাছে শুনলাম ছবির কাজ শুরু হতে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের আগে নয়। ইতিমধ্যে নায়িকা স্থির হলে জানানো হবে।

মঞ্চাভিনয়

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর 'সওদাগর' উপন্যাসের নাট্যরূপ শীঘ্রই মঞ্চস্থ করছে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ তাদের নতুনরূপে সজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে। এর নাট্য-রূপ দিয়েছেন সমরেশ চক্রবর্তী। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন পদ্মশ্রীভূষিতা তৃপ্তি মিত্র। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় আছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার অপর্ণা দেবী, তরুণকুমার, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, অজিত মিত্র, শম্ভু বন্দ্যো-পাধ্যায়, গণেশ শর্মা, পান্নালাল চট্টো-পাধ্যায়, কমল গুপ্ত, আরতি দাস, অলকা গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় ও সুলতা চৌধুরী। অনেকদিন পর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন রবি ঘোষ। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন নচিকেতা ঘোষ এবং গান রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র। আলো ও মঞ্চের দায়িত্ব নিয়েছেন 'নেহরু' পুর-স্কার প্রাপ্ত রবীন্দ্র-ভারতীর অধ্যাপক অমর ঘোষ।

প্রতিটি সার্থক নাটকের অন্তর্নিহিত একটি বিশেষ বক্তব্য নিশ্চয়ই থাকবে, যার গতিবেগে চরিত্র আর ঘটনার সংঘাত দুর্বার হয়ে ওঠে আর সমাগ্রিকভাবে নাটকটি তখনই যথার্থ শিল্পের আলোয় নিটোল হয়ে ওঠে। কিন্তু শুধুমাত্র বক্তব্যের অতিরিক্ত প্রচারই নাটক নয়, কাহিনীর আবর্তের মধ্য দিয়েই বক্তব্যকে খুঁজে নিতে হবে। চরিত্রের বিভিন্ন মানসিকতার সংঘর্ষের মুখরতাতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নাট্যকারের কোন বিশেষ প্রচ্ছন্ন জীবনদর্শন। কাহিনী প্রসারতা না পেলে, মানসিকতা স্পষ্টতা না পেলে, শুধু বক্তব্য কোন নাটককে শৈল্পিক দ্যুতি দিতে পারে না।

সম্প্রতি 'রঙ্গনা'য় রূপাঙ্কন' প্রযোজিত ইন্দ্রনাথ উপাধ্যায় রচিত 'দোহাই, ফাঁসি দেবেন না' নাটকটি দেখতে দেখতে এই কথাগুলোই মনে ভীড় করে আসছিল। মনে হচ্ছিল একটি অসম্ভব মনীষিক গুণ-সম্পন্ন কাহিনী ও প্রতিশ্রুতিময় চরিত্রের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বক্তব্য প্রচারের চাপে যেন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। আজকের
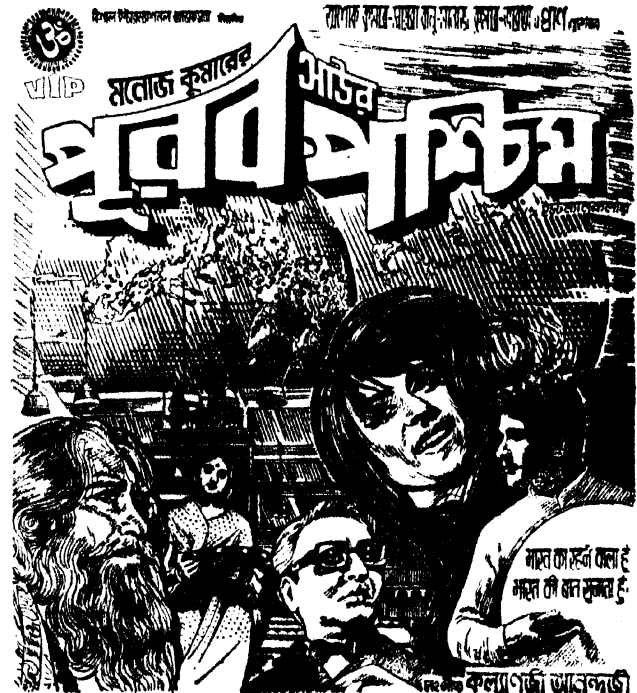
যুগে ন্যায় অন্যায়, দোষী ও নির্দোষ বিচারের নেপথ্যে যে মর্মান্তিক প্রহসন লুকিয়ে আছে, এ নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই যেন তা চোখে আঙ্গুলে দিয়ে দেখিয়েছে। সংলাপে আবেগের প্রাচুর্য থাকলেও কোন কোন জায়গায় অসাধারণ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছিল মঞ্চে। তাছাড়া নাটকটির নামকরণের মধ্যে একটা চমক যেমন আছে, তেমনি আছে একটি চিরন্তন মানবিক আবেদন।

অভিনয়ের ব্যাপারে শিল্পীদের আন্তরিকতা মোটামুটিভাবে নাট্যপ্রবাহকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। চরিত্রের অতলে ডুব দিয়ে যিনি আমাদেরও মানসিক যন্ত্রণার অংশীদার হয়েছেন তিনি হোলেন তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'মনীশ' আমাদের অনুভূতিকে তার প্রতিমুহূর্তেই আন্দোলিত করেছে। 'সরলে'র ভূমিকায় বীরেন ঘোষ যথাযথ রূপ দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর পোশাকে বয়স ও চরিত্রের গাম্ভীর্য মাঝে মাঝে যেন বিপর্যস্ত হয়েছে। 'সজল' চরিত্রে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সব সময়ে স্বচ্ছন্দ হোতে পারেননি, কিন্তু আর্তি ঘোষের 'সুস্মিত' বেদনা আর হতাশার এক মর্মান্তিক ছবি তুলে ধরেছে।

নাটকটির নির্দেশনায় নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; কয়েকটি মুহূর্ত সৃষ্টিতে তাঁর শিল্পবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে। দু' একটি চরিত্র কয়েকটি মুহূর্তে মূল কাহিনীর মুখরতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে দর্শকদের বোঝাতে চেয়েছেন তাঁদের বক্তব্যকে। প্রয়োগ পরিকল্পনার দিক দিয়ে এর মধ্যে কিছুটা ব্রেখটীয় রীতির আভাস পেলেও, তাতে আলোচ্য নাটকটির পরিবেশনা কিন্তু কোন অতিরিক্ত সৌন্দর্য লাভ করতে পারেনি।

সংস্কৃতি : চাকপোতার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সংস্কৃতি' গত ২৭ মার্চ বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ দিবস উদ্‌যাপন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনিমাই মান্না। নাটক ও নাটক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সর্বশ্রী কৃষ্ণ পাত্র, রণজিৎ দোয়ারী অরূপ মান্না, অসিত পাত্র, ফেলু দোয়ারী সমীর পাখীরা। সভাপতির ভাষণে শ্রীমান্না আন্তর্জাতিক নাট্যধারার ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেন।

গত ১১ এপ্রিল এই সংস্থা রবীন্দ্র পরিবেশের মাঝে সংস্থার যুগপূর্তি উৎস উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতিতে নীরবতা পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নে সর্বশ্রী ফেলু দোয়ারী, নিমাই মান্না, দিলী কৃষ্ণ, তপন চক্রবর্তী, কুঞ্জ মান্না, সুধা মান্না দীপান্বিতা মান্না, রীণা চক্রবর্তী ও আর অনেকে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আম শাখার শিল্পীবৃন্দ গণসংগীত পরিবেশ করেন। সংস্থার সদস্য-সদস্যারা সুনির্ম বসুর 'আনন্দনাড়ু' ও কিরণ মৈত্রের 'অ ছায়া' নাটক দুটি শ্রীনিমাই মান্না নির্দেশনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন

মহুয়া : মহুয়া (এণ্টালী) না সম্প্রদায় কর্তৃক ফেব্রুয়ারী মাসে মহু উদ্বোধন ঘটেছে এবং এই মঞ্চে প্রতি মা নাট্যাভিনয় হচ্ছে। দুটি নাটক অভিনী হওয়ার পর আসছে ২৫ এপ্রিল শ্রীশচ ভট্টাচার্য রচিত 'পাশের ঘরের ভাড়া' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

নাট্য প্রতিযোগিতা : হাজারিবা 'মহুয়া' নাট্য সংস্থা এক সর্বভারত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজ করেছেন। প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত দল সোনার মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হ এবং অন্যান্য সফল প্রতিযোগীদেরও বিভি ভাবে সম্মানিত করা হবে। অনুষ্ঠা শুরু ১০ জুন, চলবে ১৩ জুন পর্য প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ মে এবং যোগাযোগের ঠিকানা : সঞ্জয় গ ঠাকুরতা, অবধায়ক—বাটা সু স্টোর্স, ও জেলা—হাজারিবাগ, বিহার।

বিবিধ সংবাদ

বি-এফ-জে-এর সাধারণ সভায় 'বাঙলা সম্পর্কিত প্রস্তাব

বি-এফ-জে-এর সভ্যগণ গেল শনি ১৭ এপ্রিল একটি সাধারণ সভায় মিলিত 'বাঙলাদেশ' সম্পর্কে গৃহীত একটি প্র বলেন, "বাঙলাদেশের নিরীহ জন উপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ চালানো ই তাতে এই সভা স্তম্ভিত ও ব্যা যে-সকল শিল্পী, সাহি বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবীদের এবং অ জনসাধারণকে হাজারে হাজারে অকথ্য হত্যা করা হয়েছে ও হচ্ছে, তাদের জন সভা গভীর শোকপ্রকাশ করছে।" এক কাল নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে সভাগ শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন। অন্য এক প্র বাঙলাদেশের নিপীড়িত জনগণকে

করবার জন্যে একটি সাহয্যা ভাণ্ডার খোলা হয় এবং সভাস্থলেই কয়েকজন সভ্যের কাছ থেকে প্রায় এক হাজার টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

যাদুসম্রাজ্ঞী উমা দাশগুপ্ত : কলকাতার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে একাধিকবার এবং পশ্চিমবাংলার শহর ও নগরের নাট্যমঞ্চে অসংখ্য সাফল্য প্রদর্শনীতে ভারতের একমাত্র মহিলা ঐন্দ্রজালিক যাদুভারতী

উমা দাশগুপ্ত ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে অসংখ্য মানুষের সহর্ষ অভিনন্দন লাভ করলেও দিল্লীর বেংগলী এসোশিয়েশন আয়োজিত বাংলার সংস্কৃতি উৎসবে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মভলংকার হলে গত ৮ই এবং ১০ই এপ্রিল যাদু প্রদর্শনে যে সাধুবাদ ও প্রশংসা পেয়েছেন তার বুঝি তুলনা মেলে না। দিল্লীর সম্ভ্রান্ত জ্ঞানী গুণী রসিক-জনের সমাবেশে কুমারী দাশগুপ্ত তাঁর বহুবার প্রদর্শিত যাদুর খেলাগুলি নিপুণ দক্ষতার সংগে দেখালেন—প্রদর্শনশৈলীর অভিনবত্বে তিনি আজও দ্বিতীয়-রহিত। তাঁর সবশেষের অনুষ্ঠানটি ছিল অভিনব এবং তাৎপর্যপূর্ণ। একটি আধারে কতকগুলি ফুল রাখলেন। তারপর সেগুলি টেনে বার করে আনতেই চক্ষের পলক ফেলবার আগেই তা হয়ে গেল একটি মালা, যার অধঃমুখে লেখা 'জয় বাংলা।' সারা প্রেক্ষাগৃহ হর্ষধ্বনিতে বার বার কুমারী দাশগুপ্তকে অভিনন্দন জানাতে থাকল। প্রথম প্রদর্শনেই উমা দাশগুপ্ত দিল্লী জয় করে নিলেন। দিল্লী জয় করে কুমারী দাশগুপ্ত সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ভারতের বাঙ্গালী-প্রধান শহর ও নগরগুলিতে পর্যায়ক্রমে যাদু প্রদর্শনের এক ব্যাপক পরিকল্পনা তিনি করেছেন। এইসব প্রদর্শনীতে সংগৃহীত অর্থ 'বাংলাদেশ' সেবা সাহায্যে তিনি অর্পণ করতে কৃতসংকল্প।

সোবোসের ইন্দ্রজাল : গত ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় কোলকাতা তথ্য কেন্দ্রে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন (মধ্য কোলকাতা শাখা) কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী উপলক্ষে বিশিষ্ট যাদুকর সোবোস তাঁর বিচিত্র ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি 'শান্তির দূত' 'মনিপুরের মায়া', 'ঈশ্বরের রহস্য', 'বালিকার বিচার', 'ছয় তাসের রহস্য' প্রমুখ খেলাগুলি প্রদর্শন করেন।

শহীদ স্মৃতি তর্পণ : গত ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে বহু তরুণ শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ও নাট্যকারদের উপস্থিতিতে 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য সংরক্ষণ সমিতি'র সদস্যদের উদ্যোগে নিজস্ব সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে এক অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে জালিয়ানাওয়ালাবাগ দিবস পালন করা হয়। এ ছাড়াও এদিন ওপার বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন। সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এক প্রস্তাবে মুক্তিফৌজদের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। সভায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতা পাঠের ব্যবস্থা ছিল।

অথ স্টার থিয়েটার সম্পর্কিত

গেল বুধবার, ৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় রঞ্জিতমল কাংকারিয়া একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন সংপ্রতি স্টার থিয়েটারের হস্তান্তর সম্পর্কে আলোক-পাত করবার জন্যে। নাট্যকার মন্মথ রায় ও দেবনারায়ণ গুপ্তের ভাষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, পূর্বতন অধিকারী সলিল মিত্র প্রধানত তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটায় তাঁর প্রাণপ্রিয় থিয়েটারটিকে শ্রীকাংকারিয়ার কাছে এই শর্তে হস্তান্তরিত করেছেন যে, তিনি ঠিক যেভাবে শিল্পী ও কর্মীদের মাসিক বেতন ইত্যাদি দিয়ে থিয়েটার চালাতেন, ঠিক সেইভাবে থিয়েটার চালাতে হবে এবং থিয়েটারের কোনোরকম রদবদল হবে না। ১৯৫২ সালে যে প্রথিতযশা নাট্য-পরিচালক শিশির মল্লিক 'শ্যামলী' নাটকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্যে দায়ী ছিলেন, সেই শিশির মল্লিকমহাশয় থিয়েটার পরি-চালনা বিষয়ে শ্রীকাংকারিয়াকে সাহায্য করবেন। শ্রীকাংকারিয়া নিজে এই কথাকে সমর্থন করে অধিকন্তু বলেন, আমি যদি এখানে 'শঙ্করস্কোপ' চালু করি, তাহলে তা থিয়েটারকে যথারীতি চলতে দিয়েই করব—থিয়েটারের কোনোরকম ক্ষতি করে নয়। আমরা আশা করব, শ্রীকাংকারিয়া স্টারের ঐতিহ্যকে মনে রেখে এর উন্নতি-কল্পে যথাশক্তি নিয়োগ করবেন।

কেরামতুল্লা খাঁ

গিরিজা দেবী

ভি জি যোগ

জলসা

ঠুংরীর আসরে অপূর্ব শিল্পী সমন্বয়: রবিবার নিউ আলিপুরের একটি প্রভাতী আসরে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেল পরিবেশিত বেনারসের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীমতী গিরিজা দেবীর প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টাব্যাপী একক গানের আসর জমে উঠেছিল শুধুমাত্র শিল্পীর গায়ন-নৈপুণ্যের জন্যেই নয়। তাঁর সঙ্গে সংগতে ছিলেন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ভি জি যোগ (বেহালা) শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (হারমোনিয়ম) এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান (তবলা)। এ হেন স্বনামখ্যাত ত্রয়ীর সংগতিয়া সমন্বয়ে অনুষ্ঠানের বর্ণাঢ্য আকর্ষণ বিরল বলেই স্মরণীয়। শিল্পী গান শুরু করেন দেশী তোড়ি দিয়ে। রাগের অন্তর্প্লাবী শান্ত বিষণ্ণতায় এক লহমায় যেন পরিবেশ সুর-মাধুর্যে রমণীয় হয়ে উঠল। শ্রোতাদের অন্তরে [illegible] হতে থাকল 'ম্যায় ক্যা চায়না পায়ে।' কিন্তু এই অনির্ণেয় বিষাদ মাধুর্যের রেশ যেন দানা বেঁধে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গেল যখন 'দেশী' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গিরিজা দেবী ধরলেন 'গান্ধারী বাহার।' অবশ্য স্বর-সমন্বয়ের বাহার ও শিল্পীর আনন্দভরা মেজাজ রস পরিবেশনে কোনো [illegible] ঘটায়নি। কিন্তু শিল্পী তাঁর যথার্থ ব্যক্তিসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হলেন ঠুংরি অঙ্গের গানে। প্রথমেই 'চৈতী' দিয়ে শুরু হতেই বসন্ত সমাগমে নায়িকার উতলা চিত্তের আবেগ ও রং ছড়িয়ে পড়ল শ্রোতাদের চিত্তেও। 'চৈতীমাস বোলেরে কোয়েলিয়া'— স্মরণ করিয়ে দিল ঠুংরি হোলো ভাবপ্রধান সংগীত। ভাববিস্তারই এর রসকেন্দ্র তাই 'বোল বানানা' অঙ্গে প্রতিটি কথা ও সুরের তাৎক্ষণিক বিস্তার রচনায় ও প্রতিবার একই কথা বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় নিবেদন করার রস [illegible] রসিকচিত্ত দুলে না উঠে পারে না।

বেনারস ঘরানার পদ্ধতিতেই রাগের শুদ্ধতা বজায় রেখে টপ্পা অঙ্গে জমজমা ও বোলতানের ধ্বনি-তরঙ্গ শিল্পীর চোখের ইসারা, তাম্বুলরঞ্জিত অধরের সলাজ হাসি ও মুদ্রার ব্যঞ্জনায় যে রসরাগ রচনা করে তা একান্তই আস্বাদ ও অনুভবের বস্তু। কিন্তু 'বাজুবন্ধ'-এ ভৈরবীর কারুণ্যের স্পর্শে মনকে ভিজিয়ে দিয়েই আবার 'হোলি'র মাতনে চঞ্চল হয়ে ওঠায় ভাবসংগতি রইল কি?

ভি জি যোগের বেহালা ও জ্ঞানবাবুর হারমোনিয়াম একাধারে শিল্পীর সুরধারাকে উচ্ছ্বসিত করা ও গানের ফাঁকে স্বর সমন্বয় বিনিময়ে নাটকীয় রূপকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ত্রিতাল দীপচন্দিকা ও সেতারখানির বিভিন্ন ছন্দে কেরামত খাঁর তবলা সংগতের জবাব নেই।

ইকোটোন ডিস্কে নতুন কণ্ঠ

ইকোটোন লেবেলের ৪৫. আর পি এম রেকর্ডে একটি নতুন কণ্ঠ শোনা গেল। শিল্পীর নাম সাগর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি স্বরচিত সুরে সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দুটি গান গেয়েছেন 'রাতের স্বপ্ন বুঝি' তোমার ঐ অবুঝ চোখের'—একটি সুর-প্রধান অন্যটি ছন্দপ্রধান। শিল্পীর কণ্ঠ মধুর, গান দুটি গেয়েছেনও মিষ্টি করে।

নৃত্যবিতানের অনুষ্ঠান: গত রবিবার ৪ এপ্রিল স্বর্গীয় ব্রজবাসী সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নৃত্য বিতানের' বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদের রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'। এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন বজ্রসেনের ভূমিকায় কৌশিক সিনহা, শ্যামার ভূমিকায় শ্রীমতী জয়ন্তী গাঙ্গুলী। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে সর্বশ্রী গৌরী গুহ (উত্তীয়), কেয়া সাহা, বিমান রুদ্রর অভিনয়ও চিত্তাকর্ষক হয়। মণিপুরী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী স্বপ্না দেবী ও কৃষ্ণা ঘোষ দস্তিদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক জার্মাণীর ভাইস কনসাল শ্রীএইচ ডি ৎসিমার।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলার কথা

তিন দশক আগে

কমল ভট্টাচার্য

দিনান্তের আলো আস্তে আস্তে ছায়া ফেলছে সবুজ ঘাসের বুকে। সমস্ত মাঠের মধ্যে নেমে এসেছে নির্জনতা। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে বাংলা দলের খেলোয়াড়েরা একে একে ফিরে গেছে শিবিরে। কেমন যেন মনে হচ্ছে রণজি স্টেডিয়ামের ঘেরা প্রাঙ্গণে একটা চাপা হাহাকার গুমরে গুমরে বেড়াচ্ছে।

এ হাহাকার পরাজয়ের এ হাহাকার ব্যর্থতার। দলগত ব্যর্থতার জন্যে বাংলা এবারেও জয়মুকুট তুলে দিয়েছে বোম্বাই দলের মাথায়। ভাঙাচোরা দল নিয়ে লড়তে এসেছিলো বোম্বাই। বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ারসিকের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল, হয়তো এবারে বাংলা দল জিতবে। কিন্তু একটি ফুৎকারে সে আশার আলো নিভে গেল। এবারেও বাংলার ঘরে রণজি ট্রফি এলো না।

রণজি ট্রফি—ভারতীয় ক্রিকেটের সব চেয়ে ঐতিহ্যমন্ডিত প্রতিযোগিতা। ভাবতে ভাবতে মন চলে যায় অনেক দূরে—অনেক পিছনে। সেদিনের ইতিকথা আজও পর্দার ছবির মতো আমার চোখের সামনে সুস্পষ্ট ও জ্বলন্ত। সেদিনের কৃতিত্বের কথা মনে করলে আজকের ব্যর্থতার গ্লানি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়।

আজ উনিশ শ' একাত্তর। সেরা সেরা ব্যাটসম্যান নিয়ে বাংলা দল রণজি ট্রফি ঘরে আনতে পারল না। তিন যুগ আগে উনিশ শ' উনচল্লিশ সালে দক্ষিণ পাঞ্জাবের কুশলী খেলোয়াড়দের পরাজিত করে বাংলা দল কিন্তু রণজি ট্রফি ছিনিয়ে নিয়েছিল।

ভাল লাগে অতীতকে রোমন্থন করতে। ব্যর্থতার গ্লানি ভুলতে স্মৃতিচারণ করি মাঝে মাঝে। তুলনা করি সেকাল এবং একাল বাংলার। বয়সের ভারে আজ প্রবীণ হয়েছি। কিন্তু সেই তিন যুগ আগে আমি ব্যাট করেছিলাম দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে, বল করেছিলাম ওয়াজীর আলি, লালা অমরনাথ, রোশনলালের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ পাঞ্জাবের এই সব যশস্বী ব্যাটসম্যানদের পরাজিত করে রণজি ট্রফিকে আমরা ঘরে আনতে পেরেছিলাম।

সেই একবারই রণজি ট্রফি পেয়েছে বাংলা দল। এবারের বোম্বাই দলে দিলীপ সারদেশাই, অজিত ওয়াদেকার, সুনীল গাভাসকার অশোক মানকড় এবং সোলকার ছিলেন না। তাই ভেবেছিলাম এবার হয়তো বাংলা রণজি ট্রফি পাবে। কিন্তু হায়! সেমিফাইনালেই বাংলা পরাজিত হলো বোম্বাইয়ের কাছে।

সেদিন ছিল আঠারোই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' উনচল্লিশ সাল। ঝাউবনে ঘেরা সবুজ ইডেন উদ্যানে বাংলা বনাম দক্ষিণ পাঞ্জাবের খেলা শুরু হল। সময়টা যদিও ফেব্রুয়ারী মাস, তবুও প্রচন্ড গরম পড়েছিল কলকাতার বুকে। সেই অকাল গ্রীষ্মের রোদে ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা অনুশীলন করেছি।

বিল হিচ্—ইংল্যান্ডের ভূতপূর্ব অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার—যিনি 'হিচ্ এক্সপ্রেস' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনিই আমাদের কোচিং-এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অধিনায়ক ছিলেন টম লংফিল্ড। আমরা অর্থাৎ খেলোয়াড়রা অধিনায়ক লংফিল্ড এবং কোচ হিচের সঙ্গে প্রায়ই পরিকল্পনা করতাম প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কোন খেলোয়াড়কে কিভাবে পর্যুদস্ত করব। শুধু তাই নয়, আমাদের খেলোয়াড়দের যে-সব গলদ আছে, তা' সংশোধনের চেষ্টাও করতাম।

অনুশীলনের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে; সে সময়ের কোলকাতার ময়দানের সকল ফাস্টবোলারদের ডেকে আনা হয়েছিল ইডেন উদ্যানে। স্টার্নাল বেরেন্ড এবং তিন মিত্র—বিমল, বিমান, সুহৃদ উপস্থিত থাকতেন প্রতিদিনের অনুশীলনে। আর থাকতেন বাংলা দলের কোচ বিল হিচ। অনুশীলনের প্রথম দিনেই সমস্যা দেখা দিল এইসব ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং শুরু করবে কোন খেলোয়াড়? অধিনায়ক লংফিল্ড ব্যাটসম্যানদের গায়ে বল মারতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে নাকি ব্যাটসম্যানদের ভয় ভেঙে যাবে। ভয় কিন্তু আমাদের ছিল না ফাস্ট বলে খেলতে। অন্ততঃ আমার তো নয়। এরিয়ান্স ক্লাবের ফাস্ট বোলার সুটে ব্যানার্জি এবং নির্মল মিত্রের বিরুদ্ধে তো অনেকবার খেলেছি। কিন্তু হিচ ও'দের তুলনায় খুব একটা শক্তিশালী ছিলেন না। সুতরাং ভয় কিসের।

লংফিল্ডের নির্দেশ নেমে এল আমাদের ওপর। আমরা এই পাঁচজন বাঙালী ছিলাম সেবারের বাংলা দলে—কার্তিক বসু, জিতেন ব্যানার্জি, জব্বার, তারা ভট্টাচার্য এবং আমি। অনুশীলনের সময় কার্তিক বসু কিন্তু পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন কলকাতার এইসব কুশলী ফাস্টবোলারদের। মোটের উপর, এই অনুশীলনের মধ্যদিয়ে ভয় আমার থেকেও বেশী উপকৃত হয়েছিলাম ফিল্ডিংয়ে।—আমাদের ফিল্ডিংয়ের মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল।

অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ে সেদিনকার খেলা নিয়ে। প্রতিটি ঘটনায় আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি।

এসব ঘটনা ছাড়া আরও একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাবের ওয়াজীর আলী। তাঁর প্রতিটি মার এবং ভাবভঙ্গী আজও মনে গেঁথে আছে।

দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে আমরা ২২২ রান করেছিলাম। অপরদিকে দক্ষিণ পাঞ্জাবের চৌকশ ক্রিকেটার ওয়াজির আলী একাই ২২২ রাণ করেন। অবশ্য তিনি খেলার সূচনায় আউট হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, সেদিন তিনি যে খেলা দেখিয়েছিলেন, সত্যিই অতুলনীয়। বাংলা দলে ছিলেন কয়েকজন উচ্চমানের বোলার—টম লংফিল্ড জিতেন ব্যানার্জি, তারা ভট্টাচার্য, ম্যালকম প্রভৃতি। এইসব দুর্ধর্ষ বোলারদের বিরুদ্ধে ইডেনের উইকেটে রুখে দাঁড়ানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। তার প্রধান কারণ এইসব বোলাররা অত্যন্ত 'সিম'-এ বল করতেন এবং সুইং করাতেন অদ্ভুতভাবে।

সে যুগে সারা ভারতে ইডেনই ছিল শ্রেষ্ঠ মাঠ। একমাত্র এখানেই সুইং করাতে জানলে অন্ততঃ দুশো রান পর্যন্ত সুইং করানো সম্ভব হত। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য সেদিনের ইডেনের উইকেটের সঙ্গে আজকের উইকেটের কোন তুলনাই হয় না। অনেক তফাৎ সেদিনের সঙ্গে। আজকের উইকেট একদম প্রাণহীন। উইকেটে ঘাস নেই ছিটেফোঁটা মাত্র। দুঃখ হয়, কি বল করবে বোলাররা এ-ধরনের উইকেটে।

অথচ সেদিনের উইকেট ছিল সজীব প্রাণবন্ত। যতটুকু ঘাস থাকা দরকার, ঠিক ততটুকুই ছিল উইকেটে। সেদিন ইডেনের উইকেট দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন দক্ষিণ পাঞ্জাবের বোলাররা। তাঁরা বলেছিলেন, গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, কিন্তু এরকম মানের মতো উইকেট দেখিনি কোথাও।

যাই হোক্—অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসা যাক ওয়াজির আলীর কথায়। বল করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমার প্রতিটি বল তাঁর ব্যাটের মার খেয়ে কেমন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে কেমন পরাস্ত মনে হচ্ছে। হতাশায় ভেঙে পড়ার আগেই এগিয়ে এসেছেন টম লংফিল্ড। অদ্ভুত মানুষ এই লংফিল্ড। ভরসা দিয়ে বলতেন—তুমি বোলার, ব্যাটসম্যানকে অযথা প্রাধান্য দিও না। সাহস পেতাম অধিনায়কের কথায়। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য: আবার ম্লান হয়ে পড়তম আলীর ক্রীড়া-চাতুর্যের সামনে।

সেদিন কিন্তু বল করতে বারবার এই কথা মনে হয়েছে আমার। আর সঙ্কুচিত হয়ে গেছি। ওয়াজির আলিকে আর এক 'ডব্লিউ' ওয়ালকটের মতো আমার মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে একটা ঘটনা ঘটেছিল সুরেন্দ্র যখন লালা অমরনাথকে আউট করে দেন। উত্তেজিত দর্শকরা মাঠের মধ্যে কমলালেবু ছুঁড়তে থাকেন। একটা লেবু গড়াতে গড়াতে উইকেটের কাছে প্রায় চলে এসেছিল। আমি আর লোভ সামলাতে পারিনি, সেটা তুলে নিলাম টুক করে।

অনেকক্ষণ বল করেছি, বুকের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। জিভটা খরখরে হয়ে গেছে জলের অভাবে। ঠিক যেন শিরীষ কাগজের মতো। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর জলের ব্যবস্থা। এতো কষ্ট সহ্য করতে পারিনি। তাই লেবুটা খোসা ছাড়িয়ে সবটা মুখের মধ্যে পুরে দিলুম।

শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতে-ছিলাম। প্রথম ইনিংসে আমাদের ২২২ রানের জবাবে দক্ষিণ পাঞ্জাব যখন ৩২৮ রান করে ইনিংস শেষ করে তখন আমরা কিন্তু অনেকেই ভেঙে পড়েছিলাম। বিশেষ করে ওয়াজির আলির ২২২ রান দেখে।

কিন্তু আমরা আবার সাহস ফিরে পেয়েছিলাম। মিত্র, ভ্যান্ডারগুচ, ম্যালকম তিনজনে বাংলাদলের বিপর্যয়কে কাটিয়ে নিয়ে গেলেন শক্ত হাতে ব্যাট করে। শেষ উইকেটের জুটিতে জব্বার এবং জিতেন বানার্জি দ্রুতগতিতে ৮৯ রান করেন। ৪২৮ রানের মাথায় বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

দক্ষিণ পাঞ্জাব দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে মধ্যাহ্নভোজের ঠিক আগে। তারা তখন আমাদের থেকে ৩১২ রানের পিছনে। আমাদের মনে তখন প্রচন্ড আশা।

উইকেটের এক প্রান্ত থেকে আমি একাই বল করছি মরীয়া হয়ে। আমার প্রথম ওভারেই পরাজিত করলাম আবদুল রহমানকে। তারপর তারা ভট্টাচার্যের বলে মায়োস্যং হোসেন ক্যাচ তুলে ফিরে গেলেন প্যাভিলিয়নে। ব্যক্তিগত ৩৭ রানের মাথায় লালা অমরনাথ আউট হয়ে যান বেরেন্ডের বলে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন দর্শকরা। জয়ের আশায় আমরাও উত্তেজিত। দক্ষিণ পাঞ্জাবের স্বভাবতই এসময়ে শোচনীয় অবস্থা। বাংলার বোলিংয়ের সামনে রুখে দাঁড়াতে পারছেন না। অধিনায়ক লংফিল্ড যখন ওয়াজির আলিকে ব্যক্তিগত দশ রানের মাথায় বোল্ড আউট করে দেন তখন আমরা উল্লসিত হয়ে উঠেছি, জয় আমাদের নিশ্চিত।

আজ ভাবি, সেদিন আমাদের বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের সাফল্য আমাদের জয়-মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। আজকের অভাবগুলো অনেক বেশী প্রকট হয়ে ধরা দিচ্ছে সেদিনের তুলনায়।

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ভারতবর্ষ : ৩৬০ রান (সুনীল গাভাস্কার ১২৪, দিলীপ সারদেশাই ৭৫ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৫১ রান। শেফার্ড ৭৮ রানে ৩ এবং হলফোর্ড ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪২৭ রান (গাভাস্কার ২২০ এবং ওয়াদেকার ৫৪ রান। নোরিজা ১২৯ রানে ৫ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৫২৬ রান (গারফিল্ড সোবার্স ১৩২, চার্লি ডেভিস ১০৫, মরিস ফস্টার ৯৯ এবং ডেসমন্ড লুইস ৭২ রান। প্রসন্ন ১৪৬ রানে ৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ১০০ রানে ৪ উইকেট)

ও ১৬৫ রান (৮ উইকেটে। লয়েড ৬৪ রান। আবিদ আলী ৭০ রানে ৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ১১ রানে ২ উইকেট)

পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৬ দিনব্যাপী ৫ম টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়াতে ভারতবর্ষ ১—০ খেলায় (ড্র ৪) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় এই প্রথম। ভারতবর্ষের বিপক্ষে আগের পাঁচটি টেস্ট সিরিজেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'রাবার' পেয়েছিল। বর্তমানে এই দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ২৮টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল : ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ১২, ভারতবর্ষের জয় ১ এবং ড্র ১৫।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক অজিত ওয়াদে-কার টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারত-বর্ষ ১ম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৪৭ রান সংগ্রহ করেছিল। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় গাভাস্কার তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরী করে নটআউট থাকেন (১০২ রান)।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের ১৮ মিনিট পর ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৩৬০ রানের মাথায় শেষ হয়। শেষ পাঁচটা উইকেটে ভারতবর্ষ ১১৩ রান সংগ্রহ করেছিল। গাভাস্কার তাঁর ১২৪ রানে আউট হন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২টো উইকেট পড়ে ১১৭ রান উঠেছিল।

তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৭৭ (৫ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন সোবার্স (১১৪ রান) এবং ফস্টার (২৬ রান)। সোবার্সের এই সেঞ্চুরী তাঁর সরকারী টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ২৪তম সেঞ্চুরী — ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৮ম সেঞ্চুরী। ৫ম উইকেটের জুটিতে ডেভিস (১০৫ রান) এবং সোবার্স ২০৩ মিনিটের খেলায় দলের ১৭৭ রান সংগ্রহ করেন। এই দিনের খেলাতেও ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুব খারাপ হয়েছিল। ডেভিসের ২৯ রানের মাথায় আবিদ আলী সহজ ক্যাচ মাটিতে ফেলে দেন। সেই ডেভিস শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরী (১০৫ রান) করেন। আগের দিন আবিদ আলির হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে লুইস শেষ পর্যন্ত ৭২ রান তুলেছিলেন।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১ম ইনিংস ৫২৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৬৬ রানে এগিয়ে যায়। তাদের ৪২৪ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট (সোবার্স) পড়ার পরও ভারতীয় খেলোয়াড়রা চারটে 'ক্যাচ' নষ্ট করেন। লাঞ্চের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ চার উইকেটে ৬২ রান সংগ্রহ করেছিল। তাদের শেষ ৫ উইকেটে ১৪৯ রান উঠেছিল।

ভারতবর্ষ ১৬৬ রানের পিছনে পড়ে ২য় ইনিংসে খেলতে নামে এবং চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় ১ উইকেটে ৯৪ রান সংগ্রহ করে। খেলায় গাভাস্কার ৫৭ রান এবং ওয়াদেকার ২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ভারতবর্ষ তখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে ৭২ রানের পিছনে পড়ে-ছিল।

পঞ্চম দিনের শেষে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩২৪ (৪ উইকেটে)। গাভাস্কার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করে ১৮০ রানে অপরাজিত থাকেন। অধিনায়ক ওয়াদেকার (৫৪ রান) এবং গাভাস্কার ২য় উইকেটের জুটিতে দলের ১৪৮ রান তুলে খেলার ভিত শক্ত করেছিলেন। পঞ্চম দিনের শেষে ভারতবর্ষ ১৫৮ রানে এগিয়ে যায় এবং হাতে জমা থাকে ৬টা উইকেট।

৬ষ্ঠ দিনে মধ্যাহ্নভোজের ১৫ মিনিট পর ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ৪২৭ রানের মাথায় শেষ হয়। গাভাস্কার ২২০ রান করে আউট হন। তিনি ২০টা বাউন্ডারী করেছিলেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৬১ রানের পিছনে থেকে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২য় ইনিংসের ১৬৫ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) ৫ম টেস্ট খেলা শেষ হয়। ফলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়।

সাবাস গাভাস্কার!

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার তাঁর মাত্র ২১ বছর বয়সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় অসাধারণ কৃতিত্বে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ ৫ম টেস্টে তিনি ১ম ইনিংসে সেঞ্চুরী (১২৪ রান) এবং ২য় ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরী (২২০ রান) করেন। তাঁর আগে সরকারী টেস্ট ক্রিকেটের একটি খেলায় এইভাবে সেঞ্চুরী এবং ডাবল সেঞ্চুরী করেছিলেন একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার ডগ ওয়াল্টার্স (২৪২

ও ১০৩ রান, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, সিডনি, ১৯৬৮-৬৯)। ডগলাসের এই সাফল্য স্বদেশে, অপরদিকে গাভাস্কারের বিদেশে।

গাভাস্কারকে নিয়ে ভারতবর্ষের মাত্র দুজন খেলোয়াড় সরকারী টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন। প্রথম করেন বিজয় হাজারে (১১৬ ও ১৪৫ রান, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে সদ্য-সমাপ্ত ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে গাভাস্কারের ৭৭৪ রান — যে-কোন দেশের বিপক্ষে একটি সরকারী টেস্ট সিরিজে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে সর্বাধিক মোট রানের রেকর্ড। এমনকি অপর কোন দেশের খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে একটি সরকারী টেস্ট সিরিজে এই রান তুলতে পারেননি।

সুনীল গাভাস্কার ঃ ৫ম টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করে (১২৪ ও ২২০ রান) রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন।

ওঃ ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৬০০ রাণ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে নীচের ৬ জন খেলোয়াড় ৬০০ রান পূর্ণ করেছেন ঃ

প্যাট্রিস হেনড্রেন (ইংল্যাণ্ড), ১৯২৯-৩০
খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ২, মোট রান ৬৯৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ২০৫, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ১১৫·৫০।

লেন হাটন (ইংল্যাণ্ড), ১৯৫৩-৫৪
খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১, মোট রান ৬৭৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৫, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৯৬·৭১।

নীল হার্ভে (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৫৪-৫৫
খেলা ৫, ইনিংস ৭, নটআউট ১, মোট রান ৬৫০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৪, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০৮·৩৩।

হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ১৯৫৭-৫৮
খেলা ৫, ইনিংস ৯, নটআউট ০, মোট রান ৬২৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৭, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৬৯·৭৭।

দিলীপ সারদেশাই (ভারতবর্ষ), ১৯৭১
খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ০, মোট রান ৬৪২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২১২, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৮০·২৫।

সুনীল গাভাস্কার (ভারতবর্ষ), ১৯৭১
খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ৩, মোট রান ৭৭৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২০, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৫৪·৮০

উপরের ৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে সুনীল গাভাস্কার সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে মোট ৬০০ রান পূর্ণ করেছেন। তাছাড়া একমাত্র তিনিই সর্বাধিক মোট রান (৭৭৪ রান) এবং সর্বাধিক গড় (১৫৪·৮০) করেছেন। আরও উল্লেখ্য, উপরের ৬ জনের মধ্যে প্যাট্রিস হেনড্রেন (ইংল্যাণ্ড) এবং সুনীল গাভাস্কার (ভারতবর্ষ) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে একটি সিরিজের চারটি টেস্ট ম্যাচ খেলে ৬০০ রান পূর্ণ করেছেন।

সোবার্সের বিশ্ব রেকর্ড

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৫ম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে গারফিল্ড সোবার্স তাঁর ১৩২ রানের মধ্যে ৯ রান সংগ্রহ করলে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে সর্বাধিক মোট ব্যক্তিগত রানের নতুন বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে ঃ খেলা ৮১, মোট রান ৭৩৭৩ (বিশ্ব-রেকর্ড), এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ৩৬৫ (বিশ্ব-রেকর্ড) এবং সেঞ্চুরী ২৪ (বিশ্ব-রেকর্ড থেকে ৫টি কম)।

পূর্বে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সর্বাধিক মোট ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব-রেকর্ড ছিল ইংল্যাণ্ডের ওয়ালি হ্যামণ্ডের (৮৫টি টেস্ট খেলায় মোট ৭২৪৯ রান)। এখানে উল্লেখ্য, সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক সেঞ্চুরীর বিশ্ব-রেকর্ড (২৯টি সেঞ্চুরী) ভাঙ্গতে সোবার্সকে আরও ৬টি সেঞ্চুরী করতে হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আরো আরামভরা, আরো শৌখিন, বাটার সানওয়ে স্যান্ডাল যুগপৎ স্নিগ্ধ, বিলাসী ও হালকা। যেখানে-খুশি যখন-খুশি পায়ে দিন —দেখবেন কখনো আর পা থেকে খুলতে ইচ্ছে করছে না। এতই ভালো। স্যান্ডাল পরার এ এক নতুন শৌখিন সুখ—স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন আবেশ। আজই পায়ে গলিয়ে নিন বাটার সর্বাধুনিক স্যান্ডাল : তার নকশায় সুরুচি, নকশায় আরাম।
বাটা সানওয়ে
সানওয়ে ৯০
২৬.৯৫
সানওয়ে ৩৫
১৯.৯৫
সানওয়ে ১৭
১৯·৯৫
সানওয়ে ৩৩
১৯·৯৫
Bata

১০ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৫১ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 30th April, 1971 শুক্রবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীগৌতম করন্দায়

চিঠিপত্র

সমাজ ও সাহিত্য

বিগত ১২ই চৈত্র ৪৬ সংখ্যা অমৃতে শ্রীমতী মলিনা মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করে নয় অভিমান করে যে পত্রখানা লিখেছেন তাতে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অশ্রদ্ধার মনোভাবই বেশী প্রকাশ পেয়েছে।

প্রত্যেক সমাজের উপরই প্রত্যেকের শ্রদ্ধা আছে, না হলে বিভিন্ন সমাজ শান্তি-পূর্ণভাবে পাশাপাশি টিকে আছে কি করে। প্রত্যেক সমাজের লেখকই প্রত্যেক সমাজ শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির সঙ্গে দেখে থাকেন। তা না হলে তাদের সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য সমাজের বুকে টিকে থাকে কি করে। কোন লেখকই কোন নিকৃষ্ট সমাজের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, সর্বদেশের সব সমাজের জন্যই তাঁদের সৃষ্টি। তাই কোন সমাজকে ছোট করে অবজ্ঞা করে প্রকাশ করলে কোন সমাজই তা গ্রহণ করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

সাহিত্যের চরিত্র, ঘটনা প্রকাশ করতে হলে কিছু বাস্তব ও কল্পনার আশ্রয় অবশ্যই নিতে হবে। শুধু কল্পনার রং দিয়ে বা বাস্তবের কঠিন ছোঁয়া দিয়ে কোন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে এই দুটোরই সমাবেশ প্রয়োজন।

ভারতীয় খৃষ্টান সমাজই ভারতে শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, আরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। কিন্তু তাই বলে কোন সাহিত্যেই তাঁদের পাথরের উপর আঘাত করে বিকৃত করে, অবজ্ঞা করে সৃষ্টি করা হয় বলে নিশ্চয় প্রতীয়মান হয় না। অনেক বাংলা রচনাতেও বাঙালী সমাজকে অবজ্ঞা করে বা বিকৃত করে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার অসংখ্য উদাহরণ আছে। কিন্তু তাই বলে কি মাথায় হাত দিয়ে সব গেল বলে বসে থাকতে হবে? উপন্যাস গল্পের যাঁরা পাঠক তাঁরা সবাই জানেন যে একটার প্রয়োজনে আর একটা সৃষ্টি হচ্ছে।

মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' রামায়ণের কাহিনী নিয়ে লেখা। কিন্তু তাঁর কাব্যে রাবণ ও রামকে যেভাবে এঁকেছেন তা কি রামায়ণের রাম-রাবণের সাথে মেলে? তাই বলে কি আমরা রামায়ণকে অশ্রদ্ধা করি, বা মেঘনাদ বধ কাব্যকে অপবিত্র মনে করে সরিয়ে রেখেছি?

শ্রদ্ধেয় মনোজ বসু, প্রঃ নাঃ বি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে যদি সাহিত্যের প্রয়োজনে কোন সমাজকে হেয় করে থাকনে, তবে তার জন্য অভিমান করা কি ঠিক হবে। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রমুখ সাহিত্যিকরা তো খৃষ্টীয় সমাজকে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। তবে? শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'ভারতীর' প্রসঙ্গে যে কথা লিখেছেন তা হলে তো কোন গল্প বা উপন্যাসের কোন নায়ক-নায়িকাকেই অসম্মান করে ছোট করে আঁকা চলবে না; কারণ তারাও তো মানুষেরই নকসা, কোন না কোন সমাজেরই চরিত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন— পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন মনের ভাবটা সত্য হলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে। তাহলে দেখা যায় সে কোন সমাজকে, কোন চরিত্রকে হেয় করার জন্য নয়, সাহিত্যের প্রয়োজনেই তাদের সৃষ্টি করা হয়।

'সেতুবন্ধ' উপন্যাসে খৃষ্টীয় সমাজকে হেয় করা হয়েছে শিশির ধরের বিয়ের ফাঁদ এড়াবার জন্য। আসলে শিশির ধরের প্রকাশের জন্য খৃষ্টীয় সমাজকে হেয় করা হয়েছে, অন্য কোন কারণে নয়।

হাস্যরস আনতে গেলে ব্যাঙ্গ করে লিখতেই হয়। বিভূতিভূষণও তার ব্যতি-ক্রম করেননি। ব্যাঙ্গ বা উপহাস না করে লিখলে হাস্যরস আসবে কোথা থেকে। 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে যে খৃষ্টীয় সমাজের চিত্র আঁকা আছে, সেই আমলে তা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল?

খৃষ্টান সমাজের উপর শ্রীমতী মুখো-পাধ্যায়ের বিশ্বাস বোধকরি গভীর নয়। তার প্রমাণ তাঁর লেখনিতেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন 'শিক্ষায়, আভি-জাত্যে বংশ মর্যাদায় যে কোন ভারতীয় জাতির সঙ্গে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বহুজনই সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে।' তাঁর আস্থা গভীর হলে তিনি 'বহুজন' শব্দটি পরি-হার করতে পারতেন।

প্রত্যেক সমাজই প্রত্যেক সমাজকে অনুসরণ করছে তাদের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি গ্রহণ করে। শুধু নিজের সমাজ আঁকড়ে থাকলে উন্নতির সোপান বেয়ে বেঁচে থাকছে কি করে। তাই কোন লেখকই কোন সমাজকে অবজ্ঞা করে বা বিকৃত করে আঁকতে পারেন না। যদি সত্যাই কোনদিন তেমন ঘটে তবে সে সাহিত্য বেঁচে থাকতে পারে না, পারবেও না। কোন সমাজই তা গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' 'সেতুবন্ধ' ও 'আধুনিক' এই তিনিখানা মাত্র উপন্যাস পড়েই পত্র লেখিকার এরূপ মনোভাব সত্যই আশ্চর্যের।

পত্রলেখিকা ব্যক্তিগতভাবে তারাশঙ্করের স্নেহের পাত্রী বলে কি বুঝাতে চাইলেন তা ঠিক বোঝা গেল না।

তবি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার লেখা শেষ করছি 'আমাদের বঙ্গভাষার সাহিত্য সমালোচকরা আজকাল লেখা পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন। বোধ করি তাহার প্রধান কারণ এই, একটা উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিলে তাহাদের শিখিবার তেমন সুবিধা হয় না।' আর এই উদ্দেশ্য ধরতে গিয়ে কিছু না কিছু চাপ। আর তাতেই তাঁদের উদ্দেশ্য সার্থক। কারণ কোন সাহিত্যই প্রকৃত দোষ মুক্ত নয়।

তবু পত্র লেখিকার সমাজবোধকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

হীরা চক্রবর্তী
প্রাক্তন সাহিত্য সম্পাদক,
জি সি সি
শিলচর।

বাংলা খেয়াল গান

আমি জানি না, আমার আবেদন হয়তো আপনার দরজায় পৌঁছবে কিনা। তবুও আশাবাদী হয়ে আমি আপনার কাছে আমার বক্তব্য রাখছি।

সংগীতের ক্ষেত্রে আমি একজন সাধারণ ছাত্র মাত্র, হয়তো আমি আমার ক্ষুদ্র অধিকারের গন্ডী ছাড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একথা জেনেও আমি যে লিখছি তার এক-মাত্র কারণ হল আমার বক্তব্য যাতে আপনার কাগজ মারফৎ সকলে জানতে পারেন।

আমার আবেদনের মূল বক্তব্য হল 'বাংলা খেয়ালের' প্রচলন ও প্রবর্তন সম্পর্কিত ব্যাপারে। প্রচলন ও প্রবর্তন কারুর উপেক্ষার অপেক্ষায় থাকে না বটে, তবে ন্যায়সংগত স্বীকৃতিটাকেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সাংগীতিক সভায়, জলসায়, বাণী-চিত্রে এবং আকাশবাণীতে যে উচাংগ বা শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশিত

চিঠিপত্র

হয়ে থাকে তা সাধারণত হিন্দী, উর্দু, তেলেগু প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয় সংগীতের কোন অংশেরই গান শোনার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি। রাগ-রাগিণীতে যে সমস্ত গান বাংলাভাষায় গাওয়া হয়, সংগীত সমাজে তা রাগপ্রধান বা মালসী গান বলে অভিহিত হয়ে থাকে। বাংলাভাষায় কি শাস্ত্রীয় সংগীতের দরজায় প্রবেশাধিকার নেই?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বহু হিন্দী খেয়ালের বন্দেজে (কাঠামোতে) 'খেয়ালাংগ' রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু তারা আপন স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের সীমা থেকে দূরে সরে গিয়ে শুধু তারা রবি'র মত আপন কক্ষপথে বিরাজ করছে। কিন্তু খেয়াল খেয়ালই, সুনির্দিষ্ট স্বরের ওপর ভিত্তি করে রচিত রাগের ওপর তার সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। আর মাঝে মাঝে তাল-লয়ের সংগে সংগীত স্থাপন করতে গিয়ে আবার মুখড়ায় ফিরে আসা। কাজেই সুর-প্রধান গানে ভাষা-বহুলতা অপ্রয়োজনীয়। তাই ভাষা এখানে পরিমিত। অন্য গানে যেমন ভাষার প্রাধান্য রেখে সুর সৃষ্টি করা হয়, এখানে ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ সুর বা রাগ-রাগিণীর প্রাধান্য রেখে ভাষা চয়ন করা।

কিন্তু সংগীত সমাজের একশ্রেণী সেবক ও শিল্পীদের ধারণা যে, বাংলা ভাষা নাকি খেয়াল গানের উপযোগী নয়। তাঁরা কেন একথা বলেন, তা বুঝি না। একটা ভাষাকে ব্যবহার করা নিজের দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে। অথবা কেউ কেউ তাঁদের সংরক্ষণশীল মনোভাবের জন্য 'বাংলা খেয়ালকে' শাস্ত্রীয় সংগীতের দরজায় আসতে দিতে অনিচ্ছুক?

এই ক্ষেত্রে রাজনীতির দূষিত হাওয়া কি আমাদের মনকে কলুষিত করতে পারে না? অবাঞ্ছিত প্রাদেশিকতা, যা ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী, তা একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না?

বর্তমানে বাংলা খেয়াল নিয়ে লেখালিখি চলছে। ইতিমধ্যে প্রখ্যাত শিল্পী (তবলা) শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী প্রমুখের চেষ্টায় মন্মথনাথ গাঙ্গুলি স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে এক বছর আগে বাংলা খেয়াল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। যে সমস্ত শিল্পী বাংলা খেয়াল নিয়ে অগ্রণী হয়েছেন তার মধ্যে আমার পূজণীয় গুরু শ্রদ্ধেয় শিল্পী সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এছাড়া 'সুর সেবক' শ্রীমাখনলাল সোমের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য বলা চলে।

নিজের ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ভারতীয় সংবিধানকে অবমাননা করতে চাই না। 'বাগানে অনেক ফুল ফোটে, সেই ফোটা ফুলগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, সেই এক-একটি সৌন্দর্যের সমষ্টি নিয়ে বাগানের অখণ্ড সৌন্দর্য 'আপনাতে আপনি বিকাশ' ওঠে কাজেই এক্ষেত্রে খেয়াল খেয়ালই। তবে ভাষাগত প্রশ্নই বা কেন, কেনই বা তার বিকাশের পথে এত বাধা।

পূর্ণেন্দুশেখর সিংহ
কলকাতা—৩।

লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে

বৈকুন্ঠের খাতা শীর্ষকে গ্রন্থদর্শী যে লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে যতই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলা হোক না কেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত গল্প 'স্টোভ' বেরিয়েছিল এক অখ্যাত পত্রিকায় নারায়ণবাবুর উপনিবেশের পাণ্ডুলিপি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পড়েছিলেন। কিন্তু একথা সত্য লিটল ম্যাগাজিনের লেখকরা বৃহৎ ম্যাগাজিনের গোষ্ঠীতন্ত্রের স্টীম রোলারে নিষ্পেষিত হন।

লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে পরিপুষ্টি দান করার ক্ষেত্রে বৃহৎ ম্যাগাজিনগুলি স্পেসের অভাব না ঘটিয়ে সুন্দর যুক্তি-সংগত রিভিউ লিখলে তা উদ্যোগীদের উৎসাহ বৃদ্ধির সহায়ক হোত। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বৃহৎ ম্যাগাজিনের সম্পাদক-মণ্ডলী নির্মম। তাঁরা স্থানাভাবের কথা তুলে বিনম্র সহকারে ক্ষমা চেয়ে সকল কর্তব্যের অবসান ঘটান। অগত্যা উদ্যোগী আর লেখকগণ কি করতেই বা পারেন।

শুনেছি বিদেশে কতিপয় সাহিত্যিক একত্রিত হয়ে গিল্ড স্থাপন করেন। অর্থবান ব্যক্তিরা অর্থ সাহায্য দিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করেন। সমবেত উদাম ও আর্থিক সহযোগিতা লেখকদের জীবনে আশার সঞ্চার করে। ভারতের অবস্থা সেদিক থেকে বিপরীতধর্মী। এখানে উদ্যম প্রথমদিকে থাকলেও পরে নিঃশেষ হয় একথা আগেই বলেছি। আর্থিক সহযোগিতাও দূরে অস্ত। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই এই সাহায্য পায় না তো লেখক সম্প্রদায়। অন্যদিকে বৃহৎ ম্যাগাজিনগুলি নিজস্ব পরিবেশে সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে গোষ্ঠী-ভুক্ত ছাড়া কারো দিকে তাকাবার সময়ই পান না।

দীপংকর সেন
সম্পাদক, উত্তরাপথ। বারাণসী।

অনুগ্রহ করে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু'মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অবসান

জীবনে এক একবার এমন একটা সময় আসে যখন মানুষ অতি সত্যকেও অতি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। সে সত্য যত নিষ্ঠুর নির্মম এবং ভয়ংকরই হোক না কেন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ি যখন দেখি আমাদের অতি পরিচিত অতি আপনজনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

কতজনের কথা বলব। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম থেকে আমার অতি প্রিয় হায়দার। ডঃ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার রীডার। এই হায়দার এসেছিল শান্তিনিকেতনে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে। ছোটখাট শান্ত প্রকৃতির একটি ছেলে। ভাবতেই পারিনি সে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে। আমিও গেছি শান্তিনিকেতনে সেই জুলাইয়েই। আছি একই হস্টেলে। আমার সংগে প্রথম আলাপে হায়দারদা বলল, আমার সংগে একবার বোলপুর যাবে? কিছু কেনাকাটা আছে। সংগে সংগে রাজী হয়ে গেলাম। হেঁটে বোলপুর যাওয়া আর আসা। ব্যস! সিনিয়র হায়দারদা হয়ে গেল একেবারে আপন, আত্মজ। হায়দারদা থেকে হায়দার। তারপর হায়দার বি-এতে প্রথম হল। রবীন্দ্র-ভবনে ঢুকল। প্রাইভেটে এম-এ দিল। নোয়াখালীর সেই ছোটখাটো মানুষটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিল। সেই সময়কার শান্তিনিকেতনে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হয়েছিল। কতো টুকরো টুকরো কথা, কতো মধুর স্মৃতি মনে পড়ছে। হায়দার ভালো-বেসেছিল বাংলাকে।

অজিত বিশ্বাস
রাজভবন, রাঁচি।

শাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আবার ঝড়ের পূর্বাভাষ দেখা যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের এক শরীক মুসলিম লীগের সাতজন সদস্যের মধ্যে একজন—জনাব হারুণ-অল-রশীদ হঠাৎ 'প্রগতিশীল' বনে গেছেন। কোয়ালিশান মন্ত্রিসভার শরীক হওয়ার পূর্বে জনাব রশীদ যদি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতেন তবে দুষ্ট লোকেরা হয়ত তাঁর কার্যকলাপের উপর দুরভিসন্ধি আরোপ করার সুযোগ পেতেন না। কিন্তু বিধানসভা আহ্বানের পূর্ব-মুহূর্তে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে জনতা যদি তাঁকে পদলোভী ও স্বার্থান্বেষী বলে তবে দোষ দেওয়ার বিশেষ কিছু থাকে না। মন্ত্রী হতে না পারায় মনের দুঃখে নাকি জনাব রশীদ একেবারে 'বামপন্থী' হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। একথাও শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ সম্পর্কে পশ্চিমবাংলা তথা ভারত সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছেন তার সংগে জনাব রশীদ খাপ খাওয়াতে পারছেন না। যাহোক, রশিদ সাহেব পশ্চিমবাংলার ক্রমস্থিতিশীল রাজনীতির কাঁচা ভিৎ প্রায় ধ্বসে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। রশিদ সাহেবই এই নূতন মন্ত্রিসভার শরীক দলের প্রথম দলছুট।

এই 'দলছুট' ব্যক্তিদের কার্যকলাপের ফলে রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের অনীহা ক্রমেই প্রকট করে তুলছে। ১৯৬৭ সালের পর থেকে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে দলছুটরা ন্যায়নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে যে ঘৃণ্য মনোবৃত্তির পরিচয় অদ্যাবধি দিয়েছেন যে কোন সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন লোক তা নিন্দা না করে পারবেন না। রাষ্ট্রনেতারা এই ডিফেকশন বন্ধ করবার জন্য অনেক গবেষণা চালিয়ে আইন প্রণয়ন করে এই জঘন্য রাজনৈতিক ডিগবাজী বন্ধ করার কথা স্থির করে-ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা এখনও সম্ভব হয় নি। ইন্দিরাজী স্বয়ং যখন এই রোগের কার্যকলাপে বিপন্ন হয়েছিলেন তখন তিনি এই রোগ প্রতিষেধকের উপায় সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান লোকসভায় তাঁর পজিশন এত দৃঢ় যে এই রাজনৈতিক রোগের দাওয়াই-এর কথা ভাবা দরকার নাই ততোটা। তবে সরকার যাই করুন, ডিফেকশান বন্ধ করবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা গৃহীত না হলেও গণ-দাওয়াই যে প্রয়োগ হতে শুরু করেছে, এটা শুভ লক্ষণ। গণ-দাওয়াই যে ডিফেকশান রোধের একটি বাস্তব প্রতিষেধক তা স্বীকার করতে হবে। কোনো একটি দলের ছাপ নিয়ে ও কর্মপন্থার উপর নির্ভর করে কোনো একজন সদস্য নির্বাচিত হলেন। কিন্তু আদর্শের মেকি ধূম্রজাল বিস্তার করে স্বার্থান্ধতার বশবর্তী হয়ে অনায়াসেই তিনি এ দল থেকে ও দলে পাড়ি জমালেন। এটা নিশ্চিতই অনৈতিক। কাজেই দেগঙ্গায় আমজনতা রশিদ সাহেবের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল জনতার এমনিতর চাপ থাকলে এরকম ন্যায়নীতি বিবর্জিত ব্যক্তিরা সচেতন থাকবেন। শোনা যাচ্ছে, জনতার বিক্ষোভে রশিদ সাহেব নাকি মত পরিবর্তনের কথা ভাবছেন।

অত্যন্ত কমসংখ্যক মেজরিটি নিয়ে এবার গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন রাজ্যে সরকার গঠন করেছেন। কোয়ালিশান সরকারের সমর্থনে সদস্য সংখ্যা হচ্ছে—শাসক কংগ্রেস ১০৫+আদি কংগ্রেস ২+বাংলা কংগ্রেস ৫+পি এস পি ৩+গুর্খা লীগ ২+মুসলিম লীগ ৭+বিদ্রোহী এস এস পি ১=মোট ১২৫। আর এই দলকে সমর্থন জানিয়েছেন কম্যুনিস্ট পার্টির ১৩ ও ফরওয়ার্ড ব্লকের তিনজন সদস্য। সরকারের মোট সমর্থন ছিল ১৪১ জন সদস্যের। কিন্তু শাসক কংগ্রেস সদস্য শ্রীনেপাল রায় গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেওয়ার পর সমর্থক সদস্যের সংখ্যা ১৪০ দাঁড়ায়। তারপর জনাব রশিদের দলছুট হওয়ার পর ১৩৯ জন সদস্য গণতান্ত্রিক কোয়ালিশানের পক্ষে আছে। তবে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যকে নমিনেশান দেওয়ার পর কোয়ালিশানের শক্তি আবার ১৪০ দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আসন হল মোট ২৮০। বর্তমানে ৪টি আসন খালি থাকার ফলে ১৩৯ জন সদস্য যে পক্ষে থাকবে সেই পক্ষই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। অনেকের ধারণা ৪ জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যকে মনোনীত করলেই কোয়ালিশান সরকারের আর আশংকা থাকে না। আগে সংবিধানে ৪ জন সদস্যকেই মনোনয়ন দেওয়ার বিধান ছিল। বর্তমানে সংবিধানের সেই ধারা পরিবর্তিত করে রাজ্য বিধান-সভায় একজন ও পার্লামেণ্টে দুজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্যই মনোনয়ন পেয়েছেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে বিরোধীপক্ষে সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১৩৬। এর মধ্যে বাম কম্যুনিস্ট পরিচালিত উ.ল.ফ-এর ১২৩+আর এস পি ৩+এস ইউ সি ৭+ঝাড়খণ্ড ২+জনসংঘ ১। কিন্তু বিরোধী বললেই সকলকে একসূত্রে গাঁথা যাবে না। কেননা জনসংঘ সি পি এম জোটের পক্ষে কখনই ভোট দেবে না। ঝাড়খণ্ড অবশ্য কংগ্রেস বিরোধিতার কথা বলেই সি পি এমের সহযাত্রী হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। আখেরে তা কোথায় দাঁড়ায় তা দেখবার বিষয়। আর এস ইউ সির ভূমিকাও অনিশ্চিত।

এই পটভূমিকায় রাজ্য বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসছে ৩১শে মে। এখন শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে কোয়ালিশান সরকার ও মুখ্য বিরোধী গোষ্ঠী উভয়ে। তিনটি বিষয়বস্তু বিধানসভায় আলোচিত হবে এবং তার উপর ভোট গ্রহণ করা হবে। প্রথম হচ্ছে অধ্যক্ষ বা স্পীকার নির্বাচন। দ্বিতীয় হচ্ছে রাজ্যপালের ভাষণ এবং তৃতীয় হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সহানুভূতি ও সমর্থনসূচক প্রস্তাব। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গণতান্ত্রিক কোয়ালি-শান সরকার ইচ্ছা করলে এখনই বিধানসভার অধিবেশন নাও ডাকতে পারতেন। কেন না, যে বাজেট বরাদ্দ পাশ করানো সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, ভোট-অন-একাউণ্টস সে বাজেট পাশ হয়ে গেছে লোকসভায়। অতএব, জুন মাস অবধি বিধানসভার অধিবেশন না ডাকলেও চলত। কিন্তু কোয়ালিশান সরকার অধিবেশন আগে ডেকেই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হলে এ হেন প্রয়াস

দৃঢ়তার সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকি অবশ্য নিতেই হয়, কিন্তু আখেরে শুভ ফল পাওয়া যায়। বিরোধীপক্ষ এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ পায় না।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসসৃষ্টিকারী বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয় ব্যানার্জির অবসর আসন্ন। পাকাপাকিভাবে স্থির হয়েছে যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশানের পক্ষ থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য ও পূর্বতন বিধানসভার যুক্তফ্রণ্ট মনোনীত ডেপুটি স্পীকার শ্রী অপূর্বলাল মজুমদার অধ্যক্ষ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আর ডেপুটি স্পীকার পদের প্রার্থী হচ্ছেন শাসক কংগ্রেস নেতা শ্রীপীযূষ মুখার্জি। যদি ডিফেকশান না হয় তবে চিত্রটা পরিষ্কার। বিরোধীপক্ষ থেকে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য প্রার্থী কারা হবেন তা এখনও স্থির করা হয় নি। সমস্ত বিরোধীপক্ষকে সংহত করে সর্বসম্মত কোন প্রার্থী দাঁড় করানো যায় কিনা—এখনও সেই বিষয়ে উলফ্-এর পক্ষ থেকে নেপথ্যে তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলকাতা পৌরসভার রাজনীতিটা যদি এই প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হয় তবে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ, পৌরসভা রাজনীতির স্টেজ রিহার্সালের আসর মাত্র। মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচনের পটভূমিকায় আলোচনা করলে অধ্যক্ষ নির্বাচনের ফলশ্রুতি কি হবে সেই সম্পর্কে ধারণা মোটামুটিভাবে বোঝা যেতে পারে। যে দলগুলি পৌরসভার রাজনীতিতে যুযুৎসুর প্যাঁচ দিচ্ছিলেন তাঁরাই আবার বিধানসভার অলিন্দে কৌশল স্থির করবেন। আগের নিবন্ধেই বলা হয়েছিল, সি পি এম-এর প্রচেষ্টা হবে আর এস পি ও এস ইউ সি কে পুরোপুরিভাবে বিরোধীপক্ষে সমাবেশ করে সহযাত্রী করে তোলা। সি পি এম রাজনীতি আর এস পির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। আর এস পির কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ক্রমে সি পি এম-এর দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এর কারণ দুটি। প্রথম হচ্ছে অস্তিত্ব বজায় রাখা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে তাঁদের কেরালা রাজ্য শাখার থেকে পৃথক নীতি বজায় রাখা। বাস্তবের আঘাতে জর্জর কেরল আর এস পি ইতিমধ্যেই কংগ্রেসসমর্থিত কোয়ালিশান সরকারে যোগ দেওয়ার পর আর এস পির পশ্চিমবঙ্গ শাখা বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অপরাধে তাঁদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে রেখেছেন। অতএব, সেই নীতি বজায় রাখবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা মরীয়া হয়ে উঠেছেন। আবার সি পি এম সম্বন্ধে তাঁদের যে তত্ত্বগত পার্থক্য আছে সেই প্রশ্নে বারবার জোর দিয়ে কর্মীদের সি পি এম বিরোধী করে রেখেছিলেন। কাজেই গত নির্বাচনে দুয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'নিরপেক্ষতার' সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সেই সূত্রমাফিক চললে রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা সমধিক। তাই আবার ধীরে ধীরে সি পি এম-এর সঙ্গে মিতালির ঝোঁক প্রকট হয়েছে।

'নিরপেক্ষতা' ক্ষেত্রবিশেষে যে আদৌ নিরপেক্ষতা নয়, পৌর নির্বাচনে তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যদি এস ইউ সি তাঁদের দুটি ভোট বামপন্থী বা সি পি এম জোটের দিকে দিত তবে সমস্যা যে খুবই জটিল হত এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সি পি এম এই অবস্থায় এস ইউ সির বিরুদ্ধে যে খুবই শক্ত মনোভাব গ্রহণ করবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। সামনে বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন আছে বলে হয়ত আপাতত মুখ বন্ধ করে থাকবে সি পি এম। পৌর রাজনীতিতে হেরে গেলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সরকার পতনের জন্য এস ইউ সিকে দলে টানবার চেষ্টা করতে পারে সি পি এম। কিন্তু আর এস পির মত এস ইউ সি অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কায় আদৌ ভীত নয়। কারণ, সি পি এম-এর সঙ্গে সোজাসুজি পাঞ্জা লড়েই ঐ দল বিধানসভায় তাঁদের আসন সংখ্যা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সি পি এম-এর চারজন প্রার্থী এস ইউ সির কাছে জামানত হারিয়েছেন। কাজেই যতই প্রচার চলুক না কেন, তাঁরা সেই প্রচারকে ব্যর্থ করে দিতে সাংগঠনিক দিক থেকে পুরোপুরি সমর্থ। বিগত নির্বাচনে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কাজেই মনে হয় এস ইউ সির সঙ্গে নেপথ্যে আলোচনা করে যদি তাঁদের স্বমতে টানতে না পারেন, তবে শোনা যাচ্ছে এস-ইউ-সির কোন প্রার্থীর নাম তাঁদের অজান্তেই সি-পি-এম-এর সদস্য নয় এমন কোন মেম্বার অধ্যক্ষের পদের জন্য প্রস্তাব করে বসতে পারেন। খবরে জানা যায়, এস-ইউ-সিও এই কৌশলের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে একজন জাঁদরেল সি-পি-এম নেতার নাম প্রস্তাব করে বসবেন। এ ঘটনা যদি না ঘটে তবে পৌরসভায় এস-ইউ-সি যে ধরনের প্রস্তাব দিয়ে সি-পি-এমকে বেকায়দায় ফেলে ভোটের আসর থেকে তফাতে ছিলেন অনুরূপভাবে বিধানসভায়ও যদি একটি প্যাঁচ খেলেন তবে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর জয় বেশী ভোটের ব্যবধানেই হবে। এবং সে ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের যেই প্রার্থী হন না কেন, তিনি ১২৮ ভোটের বেশী কোন মতেই পাবেন না। এও শোনা যাচ্ছে যে, উলফ্ জোট একজন মুশলীম সদস্যকে—যিনি তাঁদের সমর্থনে জয়ী হয়েছেন—অধ্যক্ষ নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্য এবং একজন ঝাড়খন্ড প্রার্থীকে সহকারী অধ্যক্ষ মনোনয়নের কথা আলোচনা করছেন। এই কৌশল নিলেও কোয়ালিশন সরকারে ফাটল ধরাতে পারবে বলে মনে হয় না। কেননা উল্টো ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনাও নাকি ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অতএব ঘটনার গতি-প্রকৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রথম লড়াইয়ে কোয়ালিশন সরকার জিতবে।

তারপর আসছে দ্বিতীয় লড়াই রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের পর ভোট নেওয়ার প্রশ্নে। রীতিটা হচ্ছে এই, বিরোধীরা সংশোধনী প্রস্তাব তুলে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করেন। সে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব বিরোধীরা জোর দিলে তার ওপর ভোট নিতে হয়। তারপর মূল প্রস্তাবের উপর ভোট গৃহীত হয়। যদি সংশোধনী প্রস্তাবেও সরকারের পরাজয় ঘটে তবে মন্ত্রিসভার ইস্তফা দিতে হয়। কাজেই সেই সংশোধনী প্রস্তাবের বক্তব্য বিষয়ে আগে ঐকামত প্রতিষ্ঠিত না হলে সব বিরোধী সদস্য যে তাকে সমর্থন করবে এমন আশা কম। আর রাজ্যপালের ভাষণ যদি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের কর্মসূচীর প্রতিবিম্ব হয়, তবে অনেকের পক্ষে তার বিরোধিতা করা হয়ত কঠিন হবে না, তবে নৈতিক দিক থেকে তা যুক্তিযুক্ত হবে না বলেই মনে হয়। কারণ, তাঁদের কর্মসূচী আসলে অধুনালুপ্ত যুক্তফ্রণ্টের কর্মসূচীরই প্রতিচ্ছবি। তবে বিধানসভার ফ্লোরে পরিষদীয় রাজনীতির মারপ্যাঁচে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এবং তখনই দলগুলির আচরণে বৈষম্য ঘটে। নেপথ্যে থেকে যাঁরা রাজনীতির মারপ্যাঁচ খেলছেন তাঁরা খুবই অভিজ্ঞ। কাজেই আশা করা যায়, সি-পি-এম জোট বুদ্ধির খেলায় এঁটে উঠতে পারবে না। এই নেপথ্য রাজনীতির অংশীদার হলেন কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস-ইউ-সি। স্মরণ থাকা উচিত, অষ্টবাম এখনও একই সূত্রে গ্রথিত। এঁরা সকলেই রাজনীতির পাকা খেলোয়াড়।

তৃতীয়ত থাকবে বাংলাদেশের জনসংগ্রামের প্রতি সমর্থনের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে বিরোধী পক্ষ যতই বিপ্লবীয়ানার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন—কোয়ালিশন সরকার ও তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সুফল পাওয়া কঠিন। যে সংশোধনীই আসুক না কেন, সরকার পক্ষ তা মেনে নিয়ে প্রস্তাবটিকে ঐক্যমতে পাশ করাতে পারেন। এতে বাধা কিছুই আসবে না। কেননা, অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওপার বাংলার বিপ্লব ও সংগ্রামের সমর্থনে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন তা প্রায় সব প্রগতিশীল রাষ্ট্রকে হার মানিয়েছে।

অতএব, অনেকেই যে আশঙ্কায় ভীত হয়েছেন তা অমূলক। ডিফেকশানও আর হবে না বলেই মনে হয়। যিনি দলছুট হয়েছিলেন, জনতার বিক্ষোভের পর তাঁরও নাকি মতিগতি পালটেছে। একথা বলেছেন মুশলীম লীগের দলীয় নেতারা। অতএব, বর্তমানে যে শক্তি কোয়ালিশন সরকারের আছে, মন্ত্রিসভা টিকে থাকার পক্ষে তা যথেষ্ট না হলেও সেটা আশঙ্কাজনকও নয়। তাছাড়া মন্ত্রিসভার শক্তি যে শুধু শরীকদের সমর্থকদের মধ্যেই সীমিত নয়, বিরোধী পক্ষের মধ্যেও যে তাঁদের সমর্থক আছে, পৌরসভার নির্বাচনেই তার কিছুটা হদিস পাওয়া গেছে।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

বাংলাদেশের রণক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কতকটা সাফল্যলাভ করলেও তিন সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্থানের জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ সামগ্রিক পরিস্থিতি আদৌ তাঁর নিজের অনুকূলে আনতে পারেন নি। গত সপ্তাহে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা প্রকাশ পেয়েছে।

ইয়াহিয়া ও তাঁর সামরিক চক্রের সবচেয়ে বড় যে ব্যর্থতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সেটা হল এই যে, তিন সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পরও তাঁরা তাঁদের 'পূর্ব পাকিস্থানে' একটা প্রশাসন-ব্যবস্থাকে খাড়া করে তুলতে পারেন নি। চেষ্টার ত্রুটি তাঁরা করছেন না। সরকারী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক কার্যে রত কর্মীদের তাঁরা বারবার কাজে যোগ দিতে ডাক দিচ্ছেন এবং যোগ না দিলে কঠোর শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন। মুসলিম লীগ, জমাৎ-এ-ইসলামী প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল দলের মধ্য থেকে দালাল তৈরি করার জন্য তাঁরা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোথাও কোথাও তাঁদের এই চেষ্টা যে কিছুটা সফল না হচ্ছে তা নয়। কিন্তু ইয়াহিয়া-চক্র আওয়ামী লীগের প্রতি ও ঐ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বাংলা-দেশের মানুষের গভীর আনুগত্যে ফাটল ধরাতে পারেন নি। যদি তাঁরা তা পারতেন তাহলে পাকিস্থানী ফৌজের পিছু পিছু একটা অসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যেত। কিন্তু তা হচ্ছে না। ফৌজ শুধু হত্যা, ধ্বংস ও জুলুম করেই যাচ্ছে, কর্তৃত্ব করতে পারছে না। এই ফৌজ যখন কোন শহরে বা গ্রামে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ছে তখন সেখানে গিয়ে তারা দেখছে, ঐ শহর বা গ্রাম জনশূন্য, পরিত্যক্ত। আবার যখন তারা ঐ গ্রাম বা শহর ছেড়ে যাচ্ছে তখন পিছনে রেখে যাচ্ছে একটা বিধ্বংস জনপদ। সাধারণভাবে এই হল চিত্র। এইভাবেই ইয়াহিয়ার ফৌজ একটা বিদেশী দখলদার বাহিনীর মতো বাংলা-দেশে তাদের 'বিজয় অভিযান' চালিয়ে যাচ্ছে।

ইয়াহিয়া বাহিনীর আর একটা ব্যর্থতা এই যে, সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলা-দেশের মুক্তিফৌজ তাদের সামান্য অস্ত্র সম্বল করে এখনও প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংগ্রামের প্রথম দিকে মুক্তিফৌজের মধ্যে যেসব দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল এখন সেসব দূর করে

তারা নিজেদের দীর্ঘ, অধিকতর কার্যকর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে তুলছে। প্রথম দিকে মুক্তিফৌজের লড়াই ছিল স্বতস্ফূর্ত। সেই লড়াইয়ের জন্য তাদের না ছিল প্রস্তুতি, না ছিল পরিকল্পনা। বাংলা-দেশের বিভিন্ন খণ্ডে যাঁরা আলাদা-আলাদাভাবে লড়াই করছিলেন তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সমন্বয় ছিল না। সেই অবস্থায় এটা অস্বাভাবিক ছিল না। আলোচনার ছল করে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া এভাবে বাংলা-দেশের মানুষদের উপর মিলিটারি লেলিয়ে দেবেন, একথা সেখানকার রাজনৈতিক নেতারা চিন্তাই করতে পারেন নি। সুতরাং মিলিটারির বিরুদ্ধে লড়াইএ নামার কোন প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা তাঁদের ছিলই না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন হাতের সামনে যে যা পেল তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াল এবং তারা যখন দেখল যে, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙালী সৈনিকরা, বাঙালী পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্থান রাইফেলসের লোকরাও সামনে এগিয়ে এসেছে তখন লড়াইয়ের ময়দানে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একটা প্রতিরোধের চেহারা তৈরি হল। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে একটি আধুনিক সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে মুক্তিবাহিনীকে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে, কিন্তু সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই আজ মুক্তিবাহিনী তাদের সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারছে। সংগ্রামের এই পর্যায়ে তারা শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি মোকাবেলা করবে না, গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় তাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। সামনের বর্ষার পূর্বে বাঙলার জলে ও মাটিতে এই ধরনের গেরিলা লড়াইয়ের অত্যন্ত উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হবে। তিন সপ্তাহ ধরে কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক ও বিমানের সঙ্গে লড়াই করেও, দখলদার ফৌজের অমানুষিক বর্বরতা ও সন্ত্রাস সহ্য করেও বাংলাদেশের মানুষের যে এখনও এই ধরনের গেরিলা লড়াইয়ের জন্য তৈরি হওয়ার মতো মনোবল রয়েছে, এটা ইয়াহিয়া-চক্রের বৃহৎ ব্যর্থতা।

পিণ্ডির শাসকরা স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের অভ্যুদয় বন্ধ করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। গত সপ্তাহেই এই সরকারের সদস্যরা জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক-দের সাক্ষী রেখে ও রীতিমত অনুষ্ঠান করে এই সরকারের ঘোষণা সারা পৃথিবীর সামনে রেখেছেন। একটা স্বাধীন সরকার হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার একটি সত শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এইভাবে পূরণ করলেন।

পাকিস্থানের জঙ্গী শাসকদের ব্যর্থতার লক্ষণ অন্যান্য দিক থেকেও পরিস্ফুট। বাংলাদেশের যুদ্ধ পাকিস্থানের অর্থনীতির উপর দারুণ আঘাত হানছে। পূর্ববঙ্গের কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল পশ্চিম পাকিস্থানের কলকারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম। পূর্ববঙ্গ থেকে পাট ও চা রপ্তানী বন্ধ হওয়ার ফলে পাকিস্থানের বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন কমে গেছে। পাকিস্থানের টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য কমাবার জন্য এর আগে থেকেই কিছুকাল যাবৎ বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সাহায্যদাতাদের তরফ থেকে পাকিস্থানের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এখন সেই চাপ আরও বাড়ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাঁদের প্রাপ্য কর্জ শোধ করার জন্য পাকিস্থানকে তাগাদা করছেন। এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পাকিস্থানের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করে দেখছে এবং এই পুনর্বিবেচনাসাপেক্ষে পাকিস্থানকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ রেখেছে।

ইয়াহিয়া খাঁর চণ্ডনীতির ব্যর্থতা ঘরে-বাইরে যতই পরিষ্কার হয়ে উঠছে তাঁর সরকার ততই মরিয়া হচ্ছেন। দেশের ভিতরে যে কোন সংকটের সময় ইসলামা-বাদের শাসকগোষ্ঠী অতীতে যা করেছেন এবারও তাঁরা তাই করছেন—অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে একটা বিরোধ বাধিয়ে তোলার জন্য তাঁরা যত্নবান হয়েছেন। ভারত-বিরোধী আবহাওয়া জোরদার করে তুলতে পারলে ইয়াহিয়া খাঁর অনেক লাভ। তিনি সারা দুনিয়াকে দেখাতে চাইছেন যে, বাংলাদেশের সংগ্রামটা আসল ঘটনা নয়, আসল ঘটনা হচ্ছে পাকিস্থানের প্রতি ভারতের শত্রুতা। তিনি জানেন যে, একবার ভারত-পাকিস্থান বিরোধের পরিচিত ছকে ব্যাপারটাকে ফেলতে পারলে পৃথিবীর ছোট-বড় তাবৎ দেশই বাংলা-দেশের মুক্তিযুদ্ধের অস্বস্তিকর প্রশ্নটি চাপা দিয়ে বিশুদ্ধ বিবেকে ভারত ও পাকিস্থানকে শান্তির বাণী শোনাতে পারবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে রক্তক্ষয় ও পাকিস্থানের অর্থনীতির উপর তার আঘাত নিয়ে পশ্চিম পাকিস্থানে অস্থিরতার যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলিকে চাপা দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খাঁর পক্ষে সবচেয়ে জানা, সবচেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে ভারত-বিরোধী জিগির তোলা।

এই দিকে লক্ষ্য রেখেই পাকিস্থান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে একটা কূটনৈতিক যুদ্ধে নামছেন। দিল্লীতে পাকিস্থান হাইকমিশনার অফিসের যে দুজন অফিসার ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেছেন তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হবে বলে পাকিস্থান দাবী জানিয়েছে। কলকাতায় পাকিস্থানের ডেপুটি হাই-কমিশনার হোসেন আলি ও তাঁর অধস্তন অফিসার ও অন্যান্য বাঙালী কর্মীরা এই অফিস ভবনের উপর জয় বাংলা পতাকা উড়িয়ে এটিকে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে পরিণত করেছেন। পাকিস্থান সরকার হোসেন আলির জায়গায় নূতন একজন ডেপুটি হাইকমিশনার নিযুক্ত করে এই নবনিযুক্ত ডেপুটি হাই-কমিশনারকে পুরানো ডেপুটি হাই-কমিশনার কার্যালয়ের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী করেছেন। পাকিস্থান সরকার শাসিয়েছেন যে, ভারত যদি তা না করে তাহলে তার ফল খারাপ হবে। অথচ, অন্যদিকে ভারত সরকার ঢাকা থেকে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার অফিসের কয়েকজন কর্মী ও তাঁদের পরিবার-পরিজনকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য যে চেষ্টা করছেন, পাকিস্থান তাতে বাগড়া দিয়ে চলেছে। দুই দেশের মধ্যে এই কূটনীতির লড়াই ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে, বাংলাদেশের রণক্ষেত্রগুলি থেকে, তার বিধ্বস্ত গ্রাম ও শহরগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সীমান্ত পার হয়ে চলে আসার ফলে ভারতবর্ষে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিচ্ছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ইতিমধ্যে লাখ তিনেকের বেশী আশ্রয়-প্রার্থী এসেছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে; প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই সংখ্যা বাড়ছে। এই আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে গিয়ে রাজ্য সরকারগুলি হিমসিম খাচ্ছেন। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়েছেন যে, উদ্বাস্তুদের সাহায্য দেওয়ার খরচ পুরোপুরি তাঁরা যোগাবেন তাহলেও ইতিমধ্যে যেসব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায়, এত প্রবল বন্যার মতো সীমান্তের ওপার থেকে মানুষ আসছেন যে, এঁদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সব জায়গায় ঠিকমত করে ওঠা যাচ্ছে না। এই আশ্রয়প্রার্থীদের সেবা ও সাহায্য করার জন্য ইতিমধ্যে বিদেশের কয়েকটি সাহায্য সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ভারত সরকার এঁদের সাহায্য নেবেন কিনা বা এঁদের সাহায্য করতে আহ্বান করবেন কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না।

২৩-৪-৭১ —পুণ্ডরীক।

সম্পাদকীয়

সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবে

বাংলাদেশের যুদ্ধের এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একটি স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে। এই সরকার কিভাবে সামরিক প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত বাংলাদেশে অসামরিক প্রশাসন চালু করেছেন তা আমরা বিস্তারিত না জানলেও অনুমান করা যায় যে, একটি যুদ্ধক্ষত দেশে মানুষের মনোবল ঠিক রাখা এবং যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখাই এই সরকারের প্রধান কাজ। এই এক মাসে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির কোনো তুলনা নেই। কারণ এই যুদ্ধ চলছে দুই অসম শক্তির সঙ্গে। একদিকে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী, অন্যদিকে নিরস্ত্র জনসাধারণ। জনগণের পক্ষে সশস্ত্র লোকের সংখ্যা তুলনায় খুবই কম। কারণ, অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং অস্ত্রে শিক্ষিত করে তোলা সময়সাপেক্ষ।

তা সত্ত্বেও গত এক মাসে বাংলাদেশের গণমুক্তিফৌজ আশ্চর্য মনোবল ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষও এমন একটি বর্বর বাহিনীর আক্রমণের মুখে নতিস্বীকার না করে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে অকাতরে। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায় নি। তবে কয়েকটি রাষ্ট্র এই স্বীকৃতির বিষয় বিবেচনা করছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশের প্রথম দাবী অবশ্যই ভারতের কাছে। ভারতের সংসদে বাংলার মানুষের ওপর এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিপীড়িত জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবী জানিয়েছেন, স্বাধীন বাংলা সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিতে। এই স্বীকৃতি দানে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। কারণ, যতই দিন যাচ্ছে বাংলাদেশের যুদ্ধের আঁচ এসে লাগছে সীমান্তের এপারে আমাদের গায়। আমরা চাই বা না চাই এই যুদ্ধের আঘাত আমাদের ওপর আসবেই এবং তা আসতে শুরু করেছে ইয়াহিয়া বাহিনীর আক্রমণের দিক থেকেই।

বৃটিশ লেবার পার্টির দুজন এম-পি পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত পরিদর্শন করে বলেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে যে হারে শরণার্থী আসছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার যদিও ভারত সুষ্ঠুভাবেই নিয়েছে তবু ভারতের একার পক্ষে এই দায়িত্ব বহন করা আর সম্ভব নয়। এঁরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দাবী জানিয়েছেন এই দুরূহ দায়িত্ব পালনের জন্য। ভারতবর্ষকে পাক বাহিনীর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া পরোক্ষভাবে বহন করতে হচ্ছে অথচ সেই আক্রমণকারী দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হচ্ছে—এই বিসদৃশ ও অসংগত অবস্থার অবসান হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে যত দেরী হবে জটিলতা তত বাড়বে। কলকাতায় প্রাক্তন পাকিস্থানী ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা দখল করে নিয়েছেন। প্রাক্তন ডেপুটি হাইকমিশনার বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। এই অবস্থায় ভারত সরকারের পক্ষে আর চুপ করে না থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা উচিত। বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণ ভারতের দিকেই অনেক আগ্রহ ও প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। '

যুদ্ধ মানুষের সীমাহীন দুর্গতির কারণ। অথচ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় অনিবার্য। বাংলার বুক থেকে যে রক্ত ঝরছে তা হল এই স্বাধীনতার জন্য রক্তপাত। ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, এই রক্তপাত ঘটাচ্ছে সেই সেনাবাহিনী যারা একই রাষ্ট্রের নামে বাংলাদেশকে দখলদারী উপনিবেশ করে রাখতে চায়। ১৯৪৭ সালে এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্যই ভারত এবং বঙ্গদেশ বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব বাংলা হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে পূর্ব বাংলার মানুষ সেদিন এই আশা করেছিল যে, সত্যিই বুঝি স্বাধীনতার আস্বাদ তাঁরা পাবেন। তাঁদের বুঝতে বেশী দিন লাগল না যে, শাসক ও শোষকের নাম বদল ও হাত বদল হয়েছে মাত্র। পূর্ব বাংলার মানুষ নতুন করে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছিল সেদিন। এই দাসত্ব এত স্পষ্ট এবং নগ্ন ছিল যে, শিক্ষিত শ্রেণীই শুধু নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারল অবিলম্বেই। তারই বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব বাংলার মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে। দফায় দফায় হয়েছে রক্তক্ষরণ। কিন্তু কোনোদিন এ চিন্তা তাদের মনে আসে নি যে, পাকিস্তান থেকে তাদের বেরিয়ে যেতে হবে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই একটি সুখী, সমৃদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য চেয়েছিল বাংলার মানুষ। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা সেই মানবিক অধিকারও দেয় নি। বছরের পর বছর বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যে জুটেছে গুলীর আঘাত আর অর্থনৈতিক শোষণ।

সোনার বাংলা শ্মশান হয়ে গেল। কিন্তু এই প্রতিরোধ ছাড়া বাংলাদেশের মানুষের অন্য কোনো পথ ছিল না। এখন এই নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চাই পৃথিবীর মানুষের সমর্থন। পূর্ব বাংলার বর্ষীয়ান নেতা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রধান ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য সচেষ্ট হতে। বিদেশী অস্ত্রে সজ্জিত ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর সমস্ত পরাক্রম স্তব্ধ করে দেওয়া যায় যদি বিদেশী রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে। পূর্ব বাংলার মানুষকে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, এক মাসে বা ছ' মাসে এই যুদ্ধের ফয়সালা হবে না। একমাত্র বৃহৎ শক্তিবর্গ যদি একযোগে বাংলাদেশের পক্ষে এসে দাঁড়ায় তাহলেই যুদ্ধবিরতির আশা আছে। নতুবা এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবারই আশঙ্কা। তার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এক নজরে

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা :

ভারতে লোকসংখ্যার যে সর্বশেষ হিসাব প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, লোকসংখ্যার হিসাবে রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ বিহার ও মহারাষ্ট্র পূর্বের দশকের মতোই যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশকে স্থানচ্যুত করে চতুর্থ স্থানটি দখল করেছে, আর অন্ধ্রপ্রদেশ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্তী পঞ্চম স্থানটি।

ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ, যা ভারতের মোট লোকসংখ্যার ১৬·১৪ শতাংশ। বিহারের বর্তমান লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৬৪ যা ভারতের লোকসংখ্যার ১০·৩১ শতাংশ, মহারাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৩০ লক্ষ যা ভারতের লোকসংখ্যার ৯·২০ শতাংশ, আর পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ, যা ভারতের লোকসংখ্যার ৮·১২ শতাংশ।

ভারতের ২·৮৭ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু ভারতের লোকসংখ্যার ৮·১২ শতাংশ বাস করেছে এই রাজ্যে। অপরদিকে মধ্যপ্রদেশ ভারতের ১৪·৫৪ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত হলেও সেখানে বাস করে ভারতের লোকসংখ্যার ৭·৫৮ শতাংশ। এদিক থেকে ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশ মোটামুটিভাবে একটা সমতা রক্ষা করে চলেছে। ভারতের ১৬·৮১ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত, উত্তরপ্রদেশে বাস করছে ভারতের ১৬·১৪ শতাংশ লোক। লোকসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়, কেরলের পরেই। এ-রাজ্যে প্রতি বর্গকিলোমিটার স্থানে ৫০৭ জনের বাস। কেরলে প্রতি বর্গকিলোমিটার স্থানে বাস করে ৫৪৮ জন।

এ-রাজ্যে বিগত দশকে সবচেয়ে লোক বেড়েছে পশ্চিম দিনাজপুরে, প্রায় চল্লিশ শতাংশ। তারপরে লোক বেড়েছে মালদায়। লোকবৃদ্ধির বিশেষ তারতম্য ঘটেনি কচবিহার, নদীয়া ও হাওড়ায়। জেলাগুলির মধ্যে সর্বাধিক লোকসংখ্যা মেদিনীপুরে, ৫৫ লক্ষ ১৫ হাজার এবং সবচেয়ে কম লোকসংখ্যা দার্জিলিং জেলায়, ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার।

লোকবৃদ্ধির ব্যাপারে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থানোন্নতি ঘটলেও, শিক্ষার ক্ষেত্রে সে এক ধাপ নেমে এসেছে। '৬১ সালের হিসাবে ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে শিক্ষার হারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল একাদশ, এবার সে দ্বাদশ স্থানে নেমে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন শিক্ষিতের হার ৩৩·০৫ শতাংশ। ভারতের রাজ্যগুলির শিক্ষিতের হারের তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সেখানে শিক্ষিতের হার ১৮·৩০ শতাংশ, '৬১ সালে ছিল ১১·০৩ শতাংশ। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র আসামে শিক্ষিতের হার বিগত এক দশকের ব্যবধানে হ্রাস পেয়েছে। সেখানে '৬১ সালে শিক্ষিতের হার ছিল ২৯·১৯ শতাংশ, '৭১ সালে তা হয়েছে ২৮·৭৪ শতাংশ।

ভয়ংকর স্বীকৃতি :

ফ্রান্সে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেতৃত্বে গর্ভধারিণীর দাবিমতো গর্ভপাতের আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, রক্ষণশীল সরকার ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের বাধায় এ-ব্যাপারে কোন সাফল্যই এখনও পর্যন্ত আন্দোলনকারিণীদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। গর্ভপাত নিষিদ্ধ করে ও তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়ে ১৯২০ সালে ফ্রান্সে যে আইন পাশ হয়, আজও তা বলবৎ আছে, এবং কোন কোন সময়ের রক্ষণশীল শাসকরা ঐ কঠোর বিধিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারেই আইনভঙ্গকারিণীদের উপর প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ফ্রান্সের ভিশি সরকার জনৈক রজকিনীকে ছাব্বিশটি গর্ভপাত ঘটানোর অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এখনও পর্যন্ত ফ্রান্সে গর্ভপাত ঘটানোর অপরাধে একজনের দু' বছর জেল অথবা ১৪০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

কিন্তু নারী আন্দোলনের নেত্রীরা বলেন, এত সব কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ফ্রান্সে প্রতি বছর অন্তত দশ লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। যাদের পয়সা আছে তারা সুইজারল্যাণ্ডে অথবা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য যেসব রাষ্ট্রে গর্ভপাত নিষিদ্ধ নয়, সেইসব স্থানে গিয়ে গর্ভপাত করিয়ে আসে। যারা তা পারে না, তাদের অতি গোপনে স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তারদের সাহায্যে গর্ভপাত করাতে হয়, যার ফলে বহু ক্ষেত্রে গর্ভিণীর মৃত্যু হয়, নয়ত সারাজীবন নানা ব্যাধি ও জ্বালাযন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকে। তাই তাঁদের দাবি, মেয়েদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ও অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য অবিলম্বে ফ্রান্সে গর্ভপাত-সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিনিষেধ বাতিল করে দিতে হবে।

সিংহলে যা ঘটে গেল :

দ্বীপরাষ্ট্র সিংহলে যা ঘটে গেল, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে তা অভিনব ঘটনা। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক বামপন্থী সমাজবাদীরূপেই পরিচিতা। বিগত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল গণসমর্থনে জয়ী হয়ে তিনি যে সরকার গঠন করেন, তাতে তাঁর অনুগামীরা ছাড়াও মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ও ট্রটস্কিপন্থী সমসমাজবাদী দলের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সিংহল সরকার হয় সম্পূর্ণ বামপন্থী সরকার ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, কম্যুনিস্ট চীন প্রভৃতির মিত্র।

কিন্তু হঠাৎ আরও বাম চে গুয়েভারাপন্থী একদল যুবক সাংঘাতিক সংকটে ফেললো শ্রীমতী বন্দরনায়েকের সরকারকে। চে গুয়েভারাও কম্যুনিস্ট, এবং অবশ্যই মার্কসবাদী ও কিউবার রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল কাস্ত্রোর সংগ্রামসাথী। তাঁর অনুগামীরা সিংহল সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করলো, সেটা নিশ্চয়ই কোন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সমর্থনে, শ্রীমতী বন্দরনায়েক ক্ষমতা হাতে পেয়েই যাদের সঙ্গে মিতালি করতে চেয়েছিলেন। আর শ্রীমতী বন্দরনায়েকের সরকার যখন বিপন্ন হল, তখন তাকে রক্ষা করতে কোন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র এগিয়ে এল না, এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়নও নয়, যদিও সোভিয়েট অনুগামী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আছেন বন্দরনায়েক মন্ত্রিসভায়। সিংহল সরকার সাহায্যের জন্য আবেদন জানালো পশ্চিম দুনিয়ার কাছে, এবং সে-আবেদনে সাড়া দিয়ে অবিলম্বে হেলিকপ্টার ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাল বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র।

— প্রত্যক্ষদর্শী

অন্নদাশঙ্কর রায়
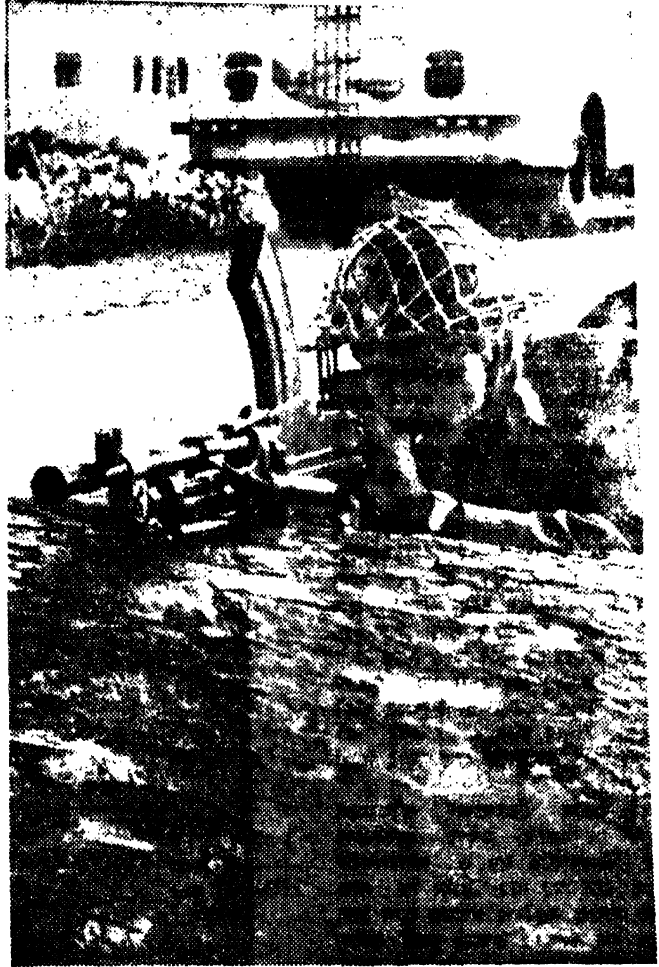
হিন্দু মুসলিম সমস্যার যখন আর কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না. তখন আমরা দেশ ভাগাভাগি করে নিই। সেটাই যে আদর্শ সমাধান তা নয়। তবে সেটা বাস্তব সমাধান। অন্যান্য দেশেও তার অনুরূপ দেখা গেছে।

এখন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে আবার তেমনি এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সমস্যার আর কোনো সমাধান সম্ভবপর নয় মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ষোল আনা লোক দাবী করেছেন, ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নতুন একটি সংবিধান। এ-দাবী মেনে নিলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অত্যধিক না হয়ে অত্যল্প হয়। অপরপক্ষে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা অত্যল্প না হয়ে অত্যধিক হয়। কোনো কেন্দ্রীয় সরকার এরকম একটা প্রস্তাব বিনা যুদ্ধে মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকও এ-প্রস্তাবের বিরোধী। তারাও বিনা যুদ্ধে মেনে নেবে না।

ছয় দফা কর্মসূচীকে আপসে মানিয়ে নিতে পারা যাবে না, এটা আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করে-ছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কতক নেতা তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাবেন ও সমবেত সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে ছয় দফা পাশ হয়ে যাবে। এতদিন বাদে অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটেছে। বিশ্বাসঘাতকের মতো অতর্কিত আঘাত হেনেছে পশ্চিমা ফৌজ। কাউকে সাবধান হবার জন্যে এক-আধঘণ্টা সময়ও দেয়নি। বিশুদ্ধ হিটলারী কায়দায় হাজার হাজার নরনারী ও শিশুকে কোতল করা হয়েছে। সমগ্র সভ্যজগৎ স্তম্ভিত। পাছে কেউ রিপোর্ট করে তা ভেবে বিদেশী রিপোর্টারদের জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই অতর্কিত আঘাতের উত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা তাঁদের প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এখন থেকে সেটি একটি প্রদেশ নয়, একটি দেশ। আর সেই দেশের নাম বাংলাদেশ। তার নিজস্ব পতাকা পাকিস্তানী পতাকার স্থান নিয়েছে। বিনা যুদ্ধে কোথাও কি একটি প্রদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়েছে, নিজের পতাকা ওড়াতে পেরেছে, নিজের সংবিধান রচনা করার অধিকার অর্জন করেছে? হতে পারত, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের সময় মাউণ্টব্যাটেনকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিত। কেউ কেউ সে পরামর্শ দিয়েওছিলেন। কিন্তু না বাঙালী হিন্দু, না বাঙালী মুসলমান কোনো পক্ষই সে পরামর্শ গ্রাহ্য করেনি। লগ্ন একবার পেরিয়ে গেলে আর ফেরে না। সেদিন যেটা বিনাযুদ্ধে সম্ভব ছিল আজ সেটার জন্যে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

একদিক থেকে এটা দুই পাকিস্তানের যুদ্ধ। আরেকদিক থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালীস্থানের যুদ্ধ। যেখানে এটা দুই পাকিস্তানের যুদ্ধ সেখানে আমাদের কিছু বলবার নেই। কিন্তু যেখানে এটা পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালীস্থানের যুদ্ধ

সেখানে আমরাও বাঙালী হিসাবে বাঙালীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। আমরাও চাই বাঙালী বেঁচে থাকে, অকারণে মার খেয়ে না মরে। আমরাও চাই বাঙালী তার স্বাধিকার বুঝে নেয়, তার ঔপনিবেশিক মর্যাদা প্রত্যাখ্যান করে, স্বাধীন জাতির মর্যাদায় ভূষিত হয়।

পাকিস্তান বাঙালীকে কী দিতে পারে, কী দিতে পারে না, সেটা এই তেইশ বছরে প্রত্যেকটি বাঙালী হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে। তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে সমুদ্র-পথে তিন হাজার মাইল দূরে বসে অন্য একটি ভাষাগোষ্ঠী। যেমন করত সাত হাজার মাইল দূরে বসে অন্য একটি বর্ণগোষ্ঠী। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের এক নেশন হওয়া দুরাশা। ওভাবে একটা সাম্রাজ্য হতে পারে, একটা নেশন হয় না। পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে একটা সাম্রাজ্য তুলে দেওয়া হয়েছে। তার মেরুদণ্ড হচ্ছে পশ্চিমা সৈন্যদল। সৈন্যদলে পাঞ্জাবী ও পাঠান একাধিপত্য যখন-তখন ডিকটেটর-শিপ ডেকে আনবেই। সুতরাং নতুন সংবিধান এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে কোনোদিন আবার ওরা ডিকটেটর না হতে পারে। ছয় দফা মেনে নিলে সেটা নিবারিত হতো। তা যখন মেনে নেওয়া হলো না তখন স্বতন্ত্র বাঙালীস্থান দাবী না করে উপায় রইল না। এখন এই দাবীকে জোরদার করতে হবে লড়াই দিয়ে রক্ত দিয়ে।

যে সংগ্রাম উভয়পক্ষেই জীবনমরণ সংগ্রাম সে সংগ্রাম কখনো সাতদিনের মধ্যেই একপক্ষকে জয় ও অপরপক্ষকে পরাজয় এনে দেয় না। এমন কি সাত মাসের মধ্যেও নয়। এ ধরনের যুদ্ধ চলে বছরের পর বছর। কখনো জোর কদমে, কখনো ঢিমে তেতালায়। দীর্ঘকাল অচল অবস্থাও হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় যে-পক্ষের খোরাকে টান পড়ে সে পক্ষ যুদ্ধে না মরলেও দুর্ভিক্ষে মরে ও সেই ভয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। খোরাকে টান না পড়লে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানরা আরো অনেকদিন লড়তে পারত, সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে জব্দ হতো না।

বর্তমান সংগ্রামে কেবল যে পশ্চিমা সৈন্যদের খোরাকে টান পড়তে পারে তাই নয়, বাঙালী মুক্তিযোদ্ধারাও দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে পারে। কোন্ পক্ষ যে কোন্ পক্ষের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাবে তা এখন থেকে জোর করে বলা যায় না। উৎসাহের বাষ্পই যুদ্ধের শকট চালনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যুদ্ধের বারো আনাই তেল নুন লকড়ির ব্যাপার। নেপোলিয়ন বলে গেছেন সৈন্যদল যাত্রা করে পেটের উপর ভর দিয়ে। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মরাঠারা জলতেষ্টায় মারা যায়। পানীয় জল আগে থেকে মজুত রাখা হয়নি।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রত্যেকটি আইটেম রীতিমতো প্ল্যান করতে হবে। এর জন্যে অনেক অর্থেরও প্রয়োজন। টাকা থাকলে রসদ কেনা যায়। না থাকলে ভিক্ষা করতে

দিনাজপুরের কোনো স্থানে মুক্তিফৌজের একজন সৈনিক। হাতে অস্ত্র, মুখে কঠোর প্রতিজ্ঞা

হয়, লুট করতে হয়। জবরদস্তি টাকা আদায় করতে গেলে মিত্ররাও শত্রু হয়ে যায়। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কী পরিমাণ ব্যয়সাপেক্ষ সে অভিজ্ঞতা আমার হয় মুর্শিদাবাদ চর অভিযান পরিচালনার ভার নিয়ে। শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি-যোদ্ধাদেরও হবে।

না, সংগ্রাম একটা তামাশা নয়। যা দেখবার জন্যে হাজার হাজার লোক বিনা-টিকিটে সীমান্তে গিয়ে হাজির হচ্ছে। এই যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী হবে বলে ধরে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তাঁদের প্রয়োজনমতো সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সরকারীভাবে নয়। সরকার থেকে যদি সাহায্য করা হয় সরকারও এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। ভারতকে কেবল যে পাকিস্তানের সঙ্গেই যুঝতে হবে তা নয়, চীনের সঙ্গেও। অথচ ভারতের মিত্র বলতে কেউ থাকবে না। আমরা তো আশঙ্কা করি যে বিশ্বের জনমত ভারতের বিরুদ্ধেই যাবে। যেমন কাশ্মীরের বেলা গেছে। কাশ্মীরের দরুনে ভারত যে ইউরোপে আমেরিকায় কতদূরে অপ্রিয় তা যাঁরাই বিদেশে গেছেন তাঁরাই জানেন। অপ্রিয়তা আর বাড়াতে যাওয়া ভুল।

সারা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবকরা গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলছে। এদের অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে রাইফেল, তীর ও ধনুক এবং বাঁশের লাঠি। রাজশাহী শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে।

সাহায্য মানেই বেসরকারী সাহায্য। তার মানে প্রধানত খাদ্য আর অর্থ। অস্ত্র বললুম না, কারণ অস্ত্র পড়ে যেতে পারে শত্রুপক্ষের হাতে। অথবা চীনপন্থীদের হাতে। তাতে যুদ্ধজয়ের সুবিধা হবে না। তা ছাড়া অস্ত্র সাহায্য পাকিস্তান ক্ষমা করবে না।

আমরা যারা আর কিছু জোগাতে পারছিনে তারা মনের জোর জোগাব। সেটাও একান্ত আবশ্যক। গত মহাযুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ইংরেজদের, 'স্বাধীন ভারতের নৈতিক সমর্থন বহু-সংখ্যক ব্যাটেলিয়নের সমমূল্য।' বাংলা-দেশের মুক্তিযোদ্ধারাও হৃদয়ঙ্গম করবেন যে স্বাধীন ভারতের নৈতিক সমর্থন বহু-সংখ্যক ব্যাটেলিয়নের মতো মূল্যবান।

ইচ্ছা করলে অহিংসভাবেও লড়তে পারা যায়। অহিংস সংগ্রাম আরো দীর্ঘকাল চালানো যায়। যতই দিন যাবে ততই পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত চঞ্চল হবে। ওরাও তো সামরিক শাসনের কবল থেকে মুক্তি চায়। ওরাও তো চায় গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন। কিছুদিন পরে দেখা যাবে ওরাই দাবী করছে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন ও সংবিধান সংরচন। ওরাই চাইছে অন্তর্বর্তীকালের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন। অন্ততপক্ষে প্রাদেশিক সরকার গঠন। অথচ এদের প্রত্যেকটির চাবী শেখ মুজিবর রহমানের পকেটে। সেখান থেকে বার করে নেবার সাধ্য ইয়াহিয়া খান কিংবা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেই। বাধ্য হয়ে একদিন শেখ মুজিবের সঙ্গে আবার কথাবার্তা শুরু করতে হবেই।

সামরিক আইন প্রত্যাহার না করলে শেখ মুজিব কথা কইবেন না। আর সামরিক আইন প্রত্যাহার করলে ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক অস্তিত্বই থাকবে না. অবশেষে এমন একটি দিন আসবে যেদিন ইয়াহিয়া খানকে অসুস্থতার অজুহাতে হয়তো গদী ছাড়তে হবে। তখন কেউ একজন উদ্যোগী হয়ে পাকিস্তানের জন্যে একটা প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্ট গড়বেন ও শেখ মুজিবের কথামতো সামরিক আইন রদ করবেন। যদি না সেটা ইয়াহিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি উঠে যায়। প্রোভিজনাল গবর্নমেন্টে বাংলাদেশের কেউ যদি যোগ না দেন তবে তার সঙ্গে আরো একটা প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্ট যোগ করতে হবে। তেমনি জাতীয় পরিষদে বাংলা-দেশের কেউ যদি যোগ না দেন তা হলে তার একভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে বসবে, আরেকভাগ পূর্ব পাকিস্তানে। সেইখানেই নতুন নাম গ্রহণ করা হবে বাংলাদেশ।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি জাতীয় পরিষদ দুভাগ হয়ে দুই স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করবেই। তেমনি প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্টও দুভাগ হয়ে দুই পাকিস্তান শাসন করবে। পূবেরটা নতুন নাম ধারণ করবে বাংলাদেশ.

তারপর দুই ভাগের মধ্যে সমান স্বাধীনভাবে কথাবার্তা চলবে। যাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রানীতি নিয়ে উভয়পক্ষে একটা সমঝোতা হয়। পররাষ্ট্র যদি এক হয় তবে পাকিস্তান একটা কনফেডারেশন হতে পারবে। যদি পরস্পর-বিরোধী হয় তবে সে আশা দুরাশা। শেখ মুজিব যখন ভারতের সঙ্গে ঝগড়া করবেনই না তখন ভুট্টোর ঝগড়া চালিয়ে যাবার জন্যে পৃথক রাষ্ট্র দিতে হবে। এই ইস্যুতেই পাকিস্তান ভেঙে দুই রাষ্ট্র হবে। সেটা এড়াতে হলে ভুট্টোকেও ভারতের সঙ্গে ঝগড়া ছাড়তে হবে।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই তত্ত্বের উপরে যে সব মুসলমান মিলে এক নেশন। সেই সুবাদে বহু পশ্চিমা মুসলমান পূর্ববঙ্গে গিয়ে ঘরবাড়ী করেছে, সেটাই এখন তাদের হোমল্যান্ড। ধর্ম-ভিত্তিক হোমল্যান্ড। কিন্তু ইতিমধ্যে কালের চাকা ঘুরে গেছে। পূর্ববঙ্গের পরিবর্তিত মনোভাব হচ্ছে সব বাঙালী মিলে এক নেশন। সেই তত্ত্বের উপর বাংলাদেশ বলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। পূর্ববঙ্গ এখন তার পশ্চিমা মুসলমানের ধর্মভিত্তিক হোমল্যান্ড নয়, বাঙালী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের ভাষাভিত্তিক হোমল্যান্ড। এই যে ভাষা-ভিত্তিক হোমল্যান্ড এখানে পশ্চিমা মুসলমানদের স্থিতি হবে কী করে? তারা কি তা হলে বাঙালী বনে যাবে?

বেনাপোল চেকপোস্টে উড়ছে বাঙলা দেশের পতাকা।

শেখ মুজিবর রহমান বলছেন, বসবাসকারী পশ্চিমারাও বাঙালী। তা শুনে তারা একটুও খুশি নয়। তারা একদিন আর সবাইকে উর্দুভাষী করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আজ তারাই কিনা বাংলাভাষী হবে! তাদের পক্ষে এটা একপ্রকার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি। তারা যদি জানত যে পূর্ববঙ্গ হবে বাঙালীদের বাসভূমি তা হলে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে জান মান কবুল করত না, যে যেখানে ছিল সেইখানে থেকে যেত, হিন্দুদের সঙ্গে বনিয়ে নিত। এখন যে তাদের এক্‌কূল ওক্‌কূল দুকূল যেতে বসেছে। হায়, হায়, তারা কি এখন ইহুদীদের মতো ঘুরে বেড়াবে!

সুতরাং এইসব গৃহহারাদের গৃহ না দিলে পাকিস্তান বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করবে না। তাকে জন্মের সময় গলা টিপে মারবে। অপরপক্ষে পাকিস্তানের অস্তিত্বও বিপন্ন। পাকিস্তান যদি একটি কনফেডারেশন না হয়, তার পররাষ্ট্রনীতি যদি শেখ মুজিবর রহমানের ইচ্ছামতো চালিত না হয়ে ভুট্টো সাহেবের ইঙ্গিতে চালিত হয়, গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক শাসনই যদি হয় তার ললাটলিখন তা হলে পাকিস্তান ভেঙে দুচির হবেই।

পাকিস্তান যদি দ্বিখণ্ডিত হয় তা হলে পূর্ববঙ্গও দ্বিখণ্ডিত হবে। একটা অপরটার অপরিহার্য শর্ত। যেমন ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলে পাঞ্জাব বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হয়। এই লজিক কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। পশ্চিমা মুসলমানকেও পূর্ববঙ্গের একটি ভগ্নাংশ ছেড়ে দিতে হবে। সমস্তটাই বাঙালীরা পাবে না। বাঙালীরা যেমন নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে নারাজ পশ্চিমারাও তেমনি নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে নারাজ। বাঙালীরা নিজ ভাষাভিত্তিক বাসভূমে, পশ্চিমারা নিজ ধর্মভিত্তিক বাসভূমে। একটি অদৃশ্য করাত পূর্ববঙ্গের অদৃষ্টকে চিরে দুভাগ করছে। এই যুদ্ধ সেই করাতের নির্দেশে চলেছে। বন্দর ও ক্যান্টনমেণ্টগুলি পশ্চিমাদের দখলে থেকে যাবে বলে আশঙ্কা হয়। আর সব বাঙালীরা জয় করে নেবে।

না, আমার বিশ্বাস হয় না যে ভুট্টো তাঁর ভারতবিদ্বেষ ত্যাগ করবেন বা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির উপর মুজিবর রহমানের কণ্ঠক্ষেপ সহ্য করবেন। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত দুই ভাগই হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলাও দুই ভাগ হবে। যেসব ক্যাণ্টনমেণ্ট ও বন্দর পাকিস্তানী আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্স সহজে দখল করে রাখতে পারবে সেসব অঞ্চল তারা বাঙালী মুসলমানের ভাগ থেকে কেটে রাখবে। সেসব হবে অবাঙালী মুসলমানের পাওনা এক পাউণ্ড মাংস। সেখানে উড়বে পাকিস্তানী নিশান। সেখানকার মতবাদ হবে পাকিস্তানী মতবাদ। সেখানকার শাসন হবে ইসলামাবাদের কলোনিয়াল শাসন। সেখানকার রাজনীতি হবে ইসলামিক রাষ্ট্রনীতির সামিল। সেখানে অমুসলমান যদি থাকে তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে থাকবে। সেখানে বাঙালী মুসলমান যদি থাকে সেও হবে সন্দেহভাজন নাগরিক।

আর সব অঞ্চল বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেখানকার রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান সকলেই সেখানে বাঙালী ও সকলেই সেখানে প্রথম শ্রেণীভুক্ত। সেখানে উড়বে বাংলাদেশের নিশান। ইসলামাবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেন কাবুলের সঙ্গে সম্পর্ক কায়রোর সঙ্গে সম্পর্ক। কেউ কারো আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ কারো পররাষ্ট্রনীতিতে কণ্ঠরোধ করবে না। ভুট্টো যদি ইচ্ছা করেন ভারতের সঙ্গে লড়তে পারেন। মুজিবর যদি ইচ্ছা করেন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন।

ধর্মভিত্তিকের সঙ্গে ভাষাভিত্তিকের একভাবে না একভাবে সন্ধি ঘটাতে হবেই। এইভাবে সন্ধি হলে যদি আপত্তি থাকে তো অপর একটি বিকল্প হচ্ছে পশ্চিমা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষার সনাতন গ্যারাণ্টি। ওরা থাকবে রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র হয়ে। ওদের আইনকানুন শিক্ষাদীক্ষা ভাষা নিশান স্বতন্ত্র। ওরা হয়তো দাবী করবে স্বতন্ত্র নির্বাচন-পদ্ধতি। এরকম একটা দুষ্পাচ্য মাইনরিটিকে হজম করতে গিয়ে রাষ্ট্র নাজেহাল হবে। কোনো রাষ্ট্রই একদল নাগরিকের একস্ট্রা টেরিটোরিয়াল রাইটস পছন্দ করে না। এ নিয়ে বিভিন্ন দেশে অনর্থ ঘটেছে। বাংলাদেশেও ঘটতে পারে। যাঁরা অখণ্ড পূর্ববঙ্গ চান তাঁদের এ সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। যারা মোকাবিলা করতে গিয়ে নাজেহাল হবেন তাঁরা বলবেন, এর চেয়ে কয়েকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

কোনো ভাবেই যদি সমাধান না হয় তবে এ যুদ্ধ বছরের পর বছর চলবে। পরে একদিন দেখা যাবে বামপন্থীরা যুদ্ধে নেমে তাকে একটা বৈপ্লবিক মোড় দিয়েছে। তখন আর ধর্মভিত্তিক বনাম ভাষাভিত্তিক থাকবে না। শ্রেণীভিত্তিক বা মতবাদভিত্তিক এসে রাশ কেড়ে নেবে। বেশ কিছু জায়গা লাল হয়ে যাবে।

শেষে ভারতও না জড়িয়ে পড়ে। ভারত জড়িয়ে পড়লে অন্যান্য দেশও। যেমন করে হোক এ সংগ্রামকে স্থানকালে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

ডিমের লাল কুসুমটা আগেই চামচে দিয়ে কেটে সরাৎ করে মুখে পুড়ে দিয়েছে. এখন প্লেটের ওপর পড়ে থাকা সাদা অংশটায় খানিক গোলমরিচ আর নুন ছিটিয়ে নিল চারুলাল। সেই সঙ্গে নিজের বাগানের ফল প্রমাণ সাইজের মর্তমান কলাটা বাগিয়ে ধরল ডান হাতে। লাল বারান্দায় এখন মস্ত হয়ে রোদ পড়েছে—ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে পুকুর ধার থেকে। এ সব সময় চোখের পাতা দুটো খুলে রাখতে বড় কষ্ট হয় চারুর। এমন আদর-কাড়া শীত, পায়ের তলায় রোদ্দুর, প্লেটে প্লেটে সাজানো সব পুষ্টিকর খাদ্য—বেশ লাগে এ সব সময়—মনে হয় কোনদিন মরতে হবে না আর। আসলে মৃত্যুর মত বড় মাপের ব্যাপারগুলো আগে তেমন মাথায় ঢুকতো না চারুলালের—সবে বায়াম্ন চলছে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো কথাই ওঠে না এখন। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে পট পট করে সমবয়সীদের জনা তিনেকের শ্রাদ্ধে ভূরিভোজন করার পর থেকেই বিষয়টা কেমন মাথার ভেতর গেঁথে গেছে। থেকে থেকেই মনে পড়ে যায় কথাটা।

পড়তাটা এখন বড় ভালো যাচ্ছে চারুর—যাতে হাত দিচ্ছে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসছে ঘরে। এভাবে কয়েকটা বছর চালাতে পারলে সাধ-আহ্লাদের আর কিছু বাকি থাকবে না। আর কী আশা করতে পারে একজন মানুষ। ইতিমধ্যেই তো কম জমে নি চারুলালের। ধানী জমি-ই তো আশি বিঘে ছাড়িয়ে গেল, জমা নেওয়া পুকুর হোলো গোটা ছয়েক, গোটা দশেক রিকসা ভাড়া খাটছে দিনভোর। বাজারের শোভা স্টোর্স আর মেডিকেল হলের কথা না হয় বাদ-ই রইল। তার উপরে এমন বাগানঘেরা বাস্তুবাড়ি। ওখানেই যা একটু খুঁৎ রয়ে গেছে। সুধীর মামার বিধবা বউ সৌরভী বাস্তুজমির কবলাখানা এখনও হাতছাড়া করেনি। হেনাতেনা বলে ঘোরাচ্ছে আজ মাস ছয়েক। তা চারুলালও কম যায় না—লেগে আছে ঠিক এঁটুলি হয়ে। কত আর পারবে একজন মেয়েমানুষ—সে দিকটাও ভেবে রেখেছে চারু। হাজার খানেক টাকা না হয় আরো খসাতে হবে তাকে জমি বাবদ। কলা আর ডিম শেষ করে সন্দেশের প্লেটটা নিয়ে পড়ল। কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখতে দিচ্ছে না চারু। আজকাল রাত্রে রামপাখির বাচ্চার সুপ চালাচ্ছে নিয়ম করে—দুপুরে ঘণ্টা তিনেকের বিশ্রাম—বিকেলে আধ মাইলটাক হাঁটা আর মাসে একবার করে রক্তচাপ হেনাতেনা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে রুটিন মাফিক। পুষ্টিকর খাদ্য আর সদা প্রফুল্ল মন—এ দুটোই আসলে দরকার। এসব বিষয়ে এতটুকু ফাকফোকর রাখতে দেবে না সে।

পুরো পেটে ঢেকুর তুলতে যাচ্ছিল, ক্ষীরোদা এলো দপদপিয়ে।

—একটা বিহিত আর না করলেই নয় বাবু। কালও গোটা দুই নিয়ে গেছে।

মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, চারু সামলে নিল সেটা।

—কালও গেছে আবার।...চল তো দেখি ব্যাপারটা।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে মুরগীর ঘর করেছে বাগানের একদিকটায়। তারের জাল দেওয়া কাঠের ছোটো ছোটো খাঁচা সব। একটা কিষাণ তো সারাদিন ওসব নিয়ে আছে—তবু একটা দুটো করে রোজ মুরগী চুরি যাচ্ছে আজকাল। বেড়া ফাঁক করে নিয়ে যাচ্ছে শিয়ালে।

লম্বা কোচা সামলে চারুলাল সিঁড়িতে পা ফেলল। চওড়া ছাই রঙের এক একটা ধাপ—পাশাপাশি জনা তিনেক মানুষ একসঙ্গে গায়ে গা না ঠেকিয়েও ওঠানামা করতে পারে। নামতে নামতে চারু ক্ষীরোদার গায়ের গন্ধ পাচ্ছিল।

কোণের দিকে বেড়াটা একটুখানি ফাঁক হয়ে আছে—দেখে মেজাজটা আবার গরম হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল চারু। বাড়িতে কাজের লোকগুলো শুধু ফাঁকি দিয়ে সব সময় পয়সা নেবার তালে আছে, অথচ কাজের বেলায় সব এক একটা অকর্মার ধাড়ী। তবে মানুষজনের উপর আজকাল আর আগের মত রাগারাগি করতে ভরসা হয় না তেমন। দিনকালের অবস্থা খারাপ। কে যে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। চারু মুখ ঘুরিয়ে দেখল মাটিতে উবু হয়ে বসে ক্ষীরোদা খাঁচাটা নাড়াচাড়া করছে। দেহে এখনও স্বাস্থ্য টইটম্বুর হয়ে আছে। গতর খোয়ানো মেয়েমানুষ, লোভ-লালসা একটু বেশী পরিমাণেই থাকে।

—ধলাটাকে নিয়ে গোটা চারেক হবে মনে লয়।......নির্ঘাৎ শয়তান দুটো এসেছিল।

হিস্‌হিস্‌ শব্দ করে কথা বলে ক্ষীরোদা।

—বুঝলে ক্ষীরোদা, শালাদের জন্য এবার কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হচ্ছে। ...যোগেনকে একবার খবর দিও তো।

ঠোঁট দুটো ফাঁক করে মস্ত একটা হাই তুলল চারুলাল। তারপর সেই মুহূর্তেই ঠিক করে ফেলল কবলার দলিলটা আর ফেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না—আজ যে করেই হোক ওটাকে বাগিয়ে আনতেই হবে। বাগানের দিক থেকে জুতোর মচ্‌ মচ্‌ শব্দ তুলে কেউ আসছে। চারু মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

তারপর মানুষটা বাঁক নিতেই দেখল যা ভেবেছিল তাই, মানুষটা মোহনবাবু-ই। থানার বড়বাবুর বন্ধু, ওকালতির একটা ভড়ং আছে বাইরে আসলে মস্ত এক ঘুঘু বিশেষ।

মোহন মিত্তিরকে বেশীদূর আর এগুতে দিল না চারু। নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে যখন এসেছে তখন নির্ঘাৎ মামলাটা গোলমেলে। এসব ক্ষেত্রে একটু খাতির দেখাতে হয়। দু-পা বাড়িয়ে দিল সে।

—আরে...আরে কী সৌভাগ্য আমার? বলতে বলতে এগিয়ে গেলে ক্ষীরোদা পেছন থেকে ডাকল।

—যোগেন আসবে কখন সিটা বলে গেলে না তো বাবু!

—বলিস বিকেলের দিকেই আসতে বলিস।

সোয়াগখোর মেয়েমানুষকে নিয়েই যত ঝামেলা। সারাক্ষণ পুরুষমানুষের নজর কাড়তে চায়। চারু মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল।

—সৌভাগ্য তো আমার চারুবাবু... সকালে উঠেই এমন লক্ষ্মীমন্ত পুরুষের দেখা পেলাম, দিনটা মনে হচ্ছে ভালোই যাবে।

ফ্যাসাদটা বড় গোছেরই হবে? কেমন মিষ্টি করে হাসছে শয়তানটা। চারু ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বসবার ঘরে ঢুকে মেজাজটা আরো বিগড়ে গেল খানিক, ঘরে ঝাট পরেনি এখনও, জানলা দরজা খোলা হয়নি। ভেতরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গলা তুলে চায়ের কথা বলতে গিয়ে একপলক ভেবে নিল চারু, গগন এখন কী করছে? মা মরা ছেলে...একটু বেশী বয়স পর্যন্ত মামাবাড়িতে মানুষ হয়েছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর বিষয় সম্পত্তি নিয়েই মেতে ছিল চারু। একটু গুছিয়ে বসবার পর ছেলের কথা মনে এল। নিজে থেকে সেধে গিয়ে ভাবসাব করে ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এলে পর চারু দেখল ছেলের মনে ততদিনে দাগ ধরে গেছে। মামারা সব এক একজন মস্ত মস্ত লীডার...ছেলেটাও সেই দলে ভিড়েছে। তবে অন্যদিকে কোনো ঘাটতি নেই, দেখতে শুনতেও যেমন, লেখাপড়ায়ও একেবারে সেরা ছাত্র। মহা শত্রুও নিন্দা করতে পারবে না ছেলের। শুধু এ দাগটাগগুলো না পড়লেই সব দিকে সোনায় সোহাগা হোতো চারুর।

—বড়বাবুই জোর করে পাঠালেন... আপনি তো আবার ওনার বন্ধু লোক... তাই আগে থেকে সাবধান করে পাঠালেন আর কি...।

চারুর মনে হল পেটে যেন একটু গ্যাস জমেছে, এই বয়সে রোজ নিয়ম করে দুবেলা ঘি টি খাওয়া ঠিক হচ্ছে না বোধহয়। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে একবার রঘু ডাক্তারের চেম্বারে যাবে আগে থেকেই ঠিক করে রাখল।

—তা ছেলে আপনার খুবই ভালো... তবে কি না যা দিনকাল পড়েছে...।

মোহনবাবুর কথায় সায় দেবে কি দেবে না ভেবে পাচ্ছিল না চারু। লোকটা কথা বেচে খায়, বে-ফাঁস কিছু বলে বসলে বড়বাবুকে আবার কী বলে দেবে। মেয়েমানুষটা এখনও বাড়ির দলিলটা আঁকড়ে আছে...শক্ত জায়গা...একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে গেলে বড়বাবুর দরকার হবেই। এমনিতে ক্ষেতের মুলোটা, পুকুরের মাছটা নিয়ম করে পাঠিয়ে আসছে। সে ব্যাপারে কখনও এদিক ওদিক হয়নি। তবে মানুষটা মহা ঘোড়েল বলেই ভরসা হয় না কিছুতে, ভয়টা থেকেই যায়। আর গৃহস্থ মানুষজনের ভয়টা একটু বেশী-ই থাকে। চারু কোনো রকমে গলা চেপে বলল।

—গগন কি কিছু করেছে?

—আরে না...না...সে সব কিছু নয়। এ তল্লাটে নতুন এয়েছে তো, একটু যেন ভেবেচিন্তে চলে।

মোহন মিত্তিরের হাসিটা এতই নিঃশব্দে চলতে থাকে যে চারু সেদিকে অবাক হয়ে না তাকিয়ে পারে না। যদিও কথাটা ঠিকমত মগজে ঢোকে নি তার তবু সে ঘাড় হেলিয়ে বলে।

—এ আর বেশী কি...আমি খোকাকে বলে দেবোখন...।

বলতে বলতে তার চোখ যেন আশি-বিঘের ধানী জমির পাকা ফসল, ছ'টা জমা নেওয়া পুকুরের কাঁচা মাছের স্তূপ আর দশটা রিকসার দরুন জমা কুড়িটা কাগজের নোটের ওপর দিয়ে ঘুরে যায়। বাস্তুভিটের জমির দলিলটা যদিও সৌরভীর মুঠোয় তবু কথাটা শেষ করতে পেরে বেশ হাল্কা লাগে চারুর।

রোজ রাত্রে খাটে উঠবার সময় যদিও কোবরেজী সালসাটা খাচ্ছে নিয়ম করে তবু ঝড়ঝাপটার পর ঘুমুতে যাবার আগে আজকাল মনে হয় ওটা না হলেও চলে যেত ঠিকমত। খাটাখাটনির জন্য যতটুকু বল দরকার শরীরে তার কিছু বেশী আছে সেটা চারু টের পায়। নইলে ভোরবেলায়ও মুরগীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদাকে দেখে শরীরটা চন্‌মন্‌ করে ওঠে কেন? গরম লাগছিল তার, উঠে গিয়ে পুকুর ধারের জানলাটা খুলে দিল। বাইরে আশ্বিনের রোদ। দুপুরে এক ঘুমের পর সরবতের গেলাসে চুমুক দিলে বেশ ফুরফুরে লাগে।

গরানহাটায় সুখীর তখন বড় নাম-ডাক। যেমন নাচিয়ে গাইয়ে ছিল তেমনি ছিল রূপের ঝলক। সুধীর মামা প্রথম খবরটা আনল। বাপের ক্যাশ ভেঙে টাকাও জোগাল সে। দু বন্ধুতে সেদিন ফিটন ভাড়া নিয়ে রাতভোর ময়দানে ঘোরা হল সুখীকে কোলে বসিয়ে। তা রঙ তামাসা করতে জানত বটে সুধীর। কলজেটাও বড় ছিল। এক কথায় পাঁচ বিঘের জমিটা চারুর নামে লিখে দিয়েছিল বাড়ির ভিৎ গাঁথবার সময়। চারু-ই তখন ভালোমানুষী দেখিয়ে দলিলটা চেয়ে নেয়নি আর। অকালে সুধীরটাও সরল আর তার বউ দলিলখানা কব্জা করে টাকার বায়না জুড়ে দিল।

বড় বড় কামড় দিয়ে বিস্কুট খাচ্ছে মোহন মিত্তির—চারু দেখল ক্ষীরোদা পুকুর ঘাটে বাসনের পাঁজাটা নিয়ে বসেছে। বাঁজা মেয়েমানুষের মত গা গতরে কাপড় রাখতে পারে না ঠিকমত। বুকের কাছে কাপড়টা খুলে কোলের কাছে লুটিয়ে আছে। একটু যে গলা বাড়িয়ে দেখবে ভালো করে তারও উপায় নেই এখন। মোহন হারামজাদাটা তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছে।

ভেতরের ঘরে গগনের গলার আওয়াজ পাচ্ছিল চারু। মায়ের মতই গানের শখ আছে ছেলেটার। খোলা গলার গান শুনতেও বড় মিষ্টি লাগে। তবে মায়ের ছিল রামপ্রসাদী, ছেলে ধরেছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত। শুনে শুনেই গলায় তুলে নেয়

টপাটপ। এমন গুণধর ছেলে ক'উ থাকলে গৃহস্থরা সমাজে রুচিবান মানুষ বলে খ্যাতি পায়। যদিও ওসব চটকদার খ্যাতির কোনো মোহ নেই চারুর, তবে সমাজে তারও নামডাক আছে কিছু। ধানচালের কারবার, মাছের কারবার, লগ্নীর কারবারে টাকাওয়ালা লোক বলে খ্যাতি আছে তার। এ অঞ্চলের লোকজন মানগণ্য করে. দুর্গা পূজো কমিটি বা স্থানীয় স্কুল কমিটিতে বাঁধা পদ আছে তার। গগন যদি এ সব নিয়ে থাকত তাহলে সুখটা খানিক বাড়তো চারুর। কিন্তু ছেলের মন ঘুরছে বাইরে বাইরে। যত সব উদ্ভট কল্পনা নিয়ে মেতে আছে সারাক্ষণ। মুখ ফুটে কিছু বলতে ভরসা হয় না। রেগে যেতে পারে। মনে মনে ছেলেকে ভয় পায় চারু, কিছুটা এড়িয়ে চলে সে। বাগানের এক পাশে একটা ছিমছাম পাকা ফুরফুরে ঘর তুলে নিয়েছে। সেখানেই থাকে গগন। পড়াশুনো করে, ঘুমোয়। মাস গেলে ছেলের সঙ্গে একটা দুটোর বেশী কথাই হয় না চারুর। সুযোগ-ই বা কোথায়। ছেলের টাকা-পয়সার দরকার হলেও না হয় কথা ছিল। তা সেদিক থেকে তো গগন অনেকদিন হোলো সাবলম্বী হয়ে গেছে মাস গেলে মোটা টাকার স্কলারশিপ পায়. কলেজ থেকে দেয় বইপত্তর. স্কুল ফাইনালে দশ জনের একজন হয়েছিল। দয়া করে এখান-কার এঁদোমার্কা কলেজে ভর্তি হয়েছে, নইলে তো কলকাতার বড় কলেজে যেতে
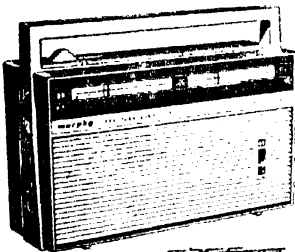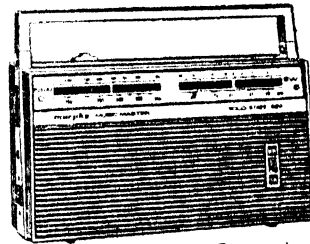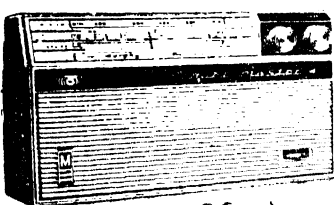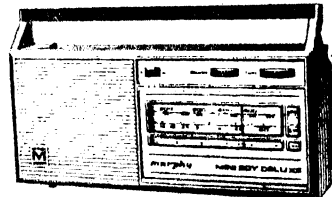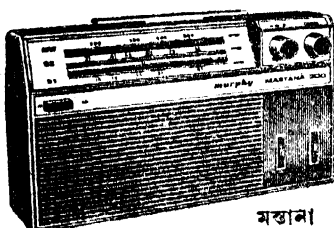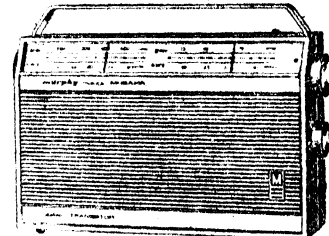
পারত। চারুরও ইচ্ছে ছিল সেই রকম। ছেলের জন্য কিছু খরচ করতে পারলে মনটা শান্তি পেত। কলকাতায় থাকলে না হয় মোটা টাকা হোস্টেল খরচা হিসাবে হাতে তুলে দিতে পারত। প্রথম প্রথম নিজে সামনে দাঁড়িয়ে দামী দামী পোশাক আসাক বানিয়ে দিত ছেলেকে কিন্তু পিসির কাছে রাগ প্রকাশ করার পর থেকে তাও বন্ধ। চারুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কোনোদিন কিছু বলেনি, বলবেও না। তেমন ছেলেই নয় গগন। ছেলের যা কিছু কথা চারুকে, বোনের মুখ থেকে শুনতে হয়। পিসির বড় ন্যাওটা। আদর আবদার সবই তার কাছে ছেলের।

গোপনে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল চারু। মোহন মিত্তির ময়লা রুমালে মুখ মুছছে।

—তাহলে উঠি, চারুবাবু।

—আজ্ঞে আচ্ছা। হেঁ হেঁ হেঁ—

মোহন মিত্তির বেরিয়ে গেলে চারু জানলায় গলা বাড়িয়ে দিল। বাসনমাজা শেষ করে পা ধুচ্ছে এখন ক্ষীরোদা। ধলাকালো ঘাটের পৈঠায় উঠে মুখ ডুবিয়ে ডুবিয়ে ভাতের দানা খাচ্ছে। সুখী প্রাণী। ধার দেনার দরকার পড়ে না জীবনে, বাস্তুভিটের দলিল পাকা করার প্রয়োজন হয় না। ঐ দলিলের দিকটায় যা একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে, নইলে চারুর নিজেকেও বেশ সুখী প্রাণী বলেই মনে হতে লাগল। মোহন মিত্তির, বড়বাবু বা গগন তার কাছে কোনো সমস্যা-ই নয়। অমন দু চারজন মানুষকে কায়দা করবার বুদ্ধি চারুর মগজের ভেতর আছে। অসুবিধাটা সুধীরের বউ সৌরভীকে নিয়েই রোজ এটা দাও ওটা দাও করে আসল কাজটা গুলিয়ে দিচ্ছে।

জানলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষীরোদা ঘরের ভেতর তাকিয়ে চোখ নামালে চারু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। বেওয়ারিশ মেয়েমানুষ, অনেক বাঁকা পথের সন্ধান রাখে।

ঐ গগনের জন্মের সময় শোভার পেটটা কাটতে হয়েছিল। বেশ লম্বা চওড়া হয়ে ছোটোখাটো মানুষটার পেটের ভেতর শুয়ে ছিল ছেলে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এনেও শয্যাধরা হয়ে রইল মাস কয়েক। সবে তখন দুচার টাকার মুখ দেখছে চারু, বাজারের মেডিকেল হলটা দাঁড়িয়ে গেছে। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকান হয়ে উঠতে যদিও আরো কিছুদিন লেগেছিল, তবু টাকা পয়সা আসছিল। সে সব কিছুই আর দেখা হয়ে উঠল না শোভার। সুখভোগ তার ভাগ্যেই ছিল না। তা কতই বা তখন বয়স চারুলালের। কখনও কখনও দুচার দিন বাজারের মেয়ে-মানুষ নিয়ে একটু আধটু ফুর্তিফার্তা করেছে—শরীরের সুখ বলতে যা বোঝায় তেমন করে করা হয়ে ওঠে নি তখনও। তারপর তো একটানা কতগুলো বছর তো শুধু ব্যবসা দাঁড় করানোর কাজেই গেতে রইল। গুছিয়ে বসবার পর এই সবে অবসর মিলেছে তার। শরীরের খিদেটাও বাঘের মত হয়ে উঠেছে।

ক্ষীরোদা আসতে তাকে চোখ দিয়ে ইশারা করে দোতালায় উঠে গেল চারু। সে বাড়িতে থাকলে সহজে কেউ দোতালার ওঠে না। আর তার শোবার ঘরে ঢোকার তো কারো কথাই ওঠে না। মস্ত পালঙ্কের উপর বসে জুৎ করে ক্ষীরোদাকে আঁকড়ে ধরল চারু। বাইরে ফুলের মত রোদ ফুটফুট করছে—হাওয়া দিচ্ছে অল্পস্বল্প। এই প্রথম শীতের দিকটায় সারাক্ষণই শরীরটা বেশ ভেজাল হয়ে থাকে। খানিক আদর করতেই জুড়িয়ে গেল মন। ক্ষীরোদা ফিসফিসিয়ে বলল।

—বিছে হারটা তো কই এখনও দিলে না বাবু।

—আরে হবে রে সব। একটু সবুর কর।

ঠোঁট দুটো অনেকখানি ফাঁক করে প্রশান্ত হাসল চারু।

দুপুরে এক ঘুমের পর উঠে মিছরি-পানার গেলাসে ছোটো ছোটো চুমুক দিতে দিতে গগনের সমস্যাটার একটা সমাধান খুঁজে পেল চারু। মাসখানেক বোম্বাই শহর থেকে ঘুরে এলে ধ্যানধারণা কিছুটা পালটাবে ছেলের। টাকা না হয় একটু বেশী করেই ধরিয়ে দেবে হাতে। চারু গলা তুলে গগনকে ডাকল।

অনেকদিন পর ছেলের মুখচোখ কাছ থেকে একটু বেশী করে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল চারু। মাতৃমুখী ছেলে, আর দশটা ছেলের মত মুখ চোখের চেহারাটা এখনও বয়াটে ভাব ধরেনি। একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথাটা পাড়ল চারু। সরাসরি বোম্বাই-এর ওষুধের ফ্যাক্টরী থেকেই মাল কেনার সুযোগ সুবিধাগুলো ভালো করে জেনে আসতে হবে গগনকে। যদিও অচেনা শহর, তবু কোনো অসুবিধা হবে না গগনের, চারুর এক খুড়তোতো ভাই বহুকাল হল বসবাস করছে ওখানে। মস্ত ব্যবসা তার। চারুর সঙ্গে নিয়মিত চিঠি-পত্রের যোগাযোগ আছে। আসলে মাস-খানেক ওখানে কাটিয়ে এলে এদিকের ব্যাপারটাও ততদিনে অন্যরকম হবে। আর তার মধ্যে বড়বাবুকে একটা বড়গোছের ভেট দিয়ে দলিলটার বিষয়েও সব বন্দোবস্ত করে ফেলবে সে।

এই প্রথম ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে পেরে মন মেজাজটা প্রসন্ন হয়ে গেল চারুর। অনেকদিন পর ভুলে যাওয়া যাত্রাপালার এক কলি গানও গলায় উঠে এল তার। আসলে সমস্যাগুলো দেখতে শুনতেই যা বড়ো, ভেতরে কিন্তু একেবারেই ফোঁপরা। বিকেলে লাল বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে আকাশের আলো নিভে যাওয়াটা দেখল চারুলাল। তারপর গুটি গুটি পা ফেলে বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটল আধমাইলটাক। ক্রমশ হাঁটা চলায় বেশ সম্ভ্রান্ত আর ভারিক্কী ভাব এসে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি পা ফেলার সময় টের পাচ্ছিল সে। এ রকম বয়সে পৌঁছে মানুষ একটু আধটু ভাবুক গোছের হয়ে পড়ে, তার উপরে সেই মানুষের যদি বেশ মোটা কিছু জমে যায় তাহলে নানা ঝুট-ঝামেলায় নিজেকে আচ্ছা করে জড়িয়ে ফেলে সে—ভোটে দাঁড়ায়—গলা কাঁটিয়ে বক্তৃতা করে, প্রসূতিসদনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে ছোটে—কিশোরী ভজে, আর বেশ নামডাকের এক আধটা গুরুঠাকুর পাকড়ায়। সে সব দিক থেকে চারুলাল এখনও অনেকটা ঠাণ্ডা গোছের আছে। যতটুকু না করলে নয় তার বেশী একচুলও পা বাড়ায় না।

ঢুকতে রঘু ডাক্তারের চেম্বারের রুগী সমেত ডাক্তারবাবু সকলেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ব্যাপার দেখে বেশ মজাই লাগে চারুলালের। তারপর বেশ খানিকটা সময় নিয়ে রঘু ডাক্তারের কাছে শরীরের রক্তচাপটা মাপায়—খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে দুচারটে কথা জিজ্ঞেস করে নেয়। বিগলিত রঘু ডাক্তার কথা বলবার সময় তোতলায় বার দুই।

—এমন শরীর আপনার, যা ইচ্ছে হবে তাই চালাবেন—তবে ঐ লক্ষ্য রাখবেন বায়ুর প্রকোপটা যেন না বাড়ে।

পরে মাঝরাস্তা পর্যন্ত চারুলালকে এগিয়ে দিয়ে গেলে সে কদমতলা থেকে একটা রিকসা ডেকে নেয়।

সৌরভীর সঙ্গে আজই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে চারু। না হয় হাজারখানেক টাকা দিয়েই দেবে। যদিও ঐ বাস্তুজমির দলিলের কথাটা বাদ দিলে সৌরভী মানুষটা খারাপ নয়। চারুর সঙ্গে বেশ একটা মধুর সম্পর্ক আছে তার। বাড়িতে গেলে টেনে বেশ যত্নআত্তি করে—শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে টাকাটা দিলে খুব একটা ঠকবে না চারু বরং সৌরভীর সঙ্গে অন্য ধরনের একটা সম্পর্ক গড়ে তুলবার সুযোগ থাকবে।

মেয়েমানুষ সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা আছে চারুলালের তাতে করে সে এটা

বোঝে যে ঐ মানুষটার জীবনে সব সাধ-আহ্লাদই চিরকাল অপূর্ণ থেকে গেছে। **স্বামী সুধীর ছিল** দাপটে মানুষ। ঘরের **এক মেয়েমানুষে মন উঠত না**, বাজার ঘাটে **ঘুর ঘুর** করে বেড়াত। এদিকে সময়কালে **একটা বাচ্চাকাচ্চাও হল না যে** তাদের নেড়েচেড়ে **স্বামীর দুঃখ ভুলবে**। ভাবতে গিয়ে **সৌরভীর জন্য কেমন** এক ধরনের **মায়া অনুভব করছিল চারু**। এই ধরনের **ভাবনাচিন্তাটা নতুন** বলেই কেমনধারা **একটা নেশা জাগছিল মনে।**

বাজারের কাছে রিকসেটা দাঁড় করিয়ে **সৌরভীকে** দেবার জন্য চারু দু খিলি **মিঠে পান কিনল স্তবকমোড়া।** তারপর **হরিহরের** ডেরায় ঢুকে রোজকার বাঁধা তিন পাত্তর চড়িয়ে নিল সন্ধ্যের ঝোঁকে। **অন্যদিন জমিয়ে** গল্পের আসর বসায়, আজ তাড়াতাড়ি শেষ করেই বেরিয়ে পড়ল।

বাজারের একটেরে সুধীর মান্নার **চকমিলানো** বাড়ি। আগে পরিবারের খুব রমরমা অবস্থা ছিল—হাকডাক ছিল মস্ত। এখন পড়ন্ত অবস্থা। বাজার থেকে বাঁধা **আয় আছে কিছু, বছরকার ধান** আসে **জমি থেকে**। বাচ্চা কাচ্চা নেই বলে কোন-রকমে আত্মীয়স্বজনদের ভাগবাটোয়ারা করে চলে যায় সৌরভীর। দালানের একটা অংশে আলাদা থাকে সে একটা ঝি সঙ্গে নিয়ে। চারু গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল।

সকালে চুলে সাবান দিয়েছিল—দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াতে চারু দেখল কটা চুলে সারা আকাশ ছাওয়া, ঠোঁটের উপর পিলসুজের আলোর মত হাসিটা কাঁপছে।

—এতদিন পরে আমাদের মনে পড়ল ঠাকুরপো।

চাউশ পালঙ্কের উপর সুতোর ঝালর দেওয়া গোলাপী রঙের উঁচু বালিশ, পুরু জাজিমের ওপর যেন আলো করে আছে। চারু নড়বড়ে হাতে পকেট থেকে পানের প্যাকেটটা বের করে এনে সৌরভীর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

যাক্...তবু এ মানুষটার সাধ-আহ্লাদের কথা এখনও একটু আধটু মনে রেখেছো তাহলে। পান পাতার মত মুখের গড়ন, মাটি রঙের গা। অনেক বড় মাপের একটা পাওনা যেন এই মুহূর্তে পেয়ে **যাচ্ছে** চারু এই মানুষটার মুখোমুখি **দাঁড়িয়ে।** **বেশ পরিচিত জগতের** টাকা হিসেবের খাতা থেকে বাদ এমন একটা পাওনা। বুকটা কেঁপে উঠছিল চারুর। **জল নেই**, মাটি নেই তবু কেমন একটা ফলন্ত গাছ দাঁড়িয়ে। ভেতরের জমা হিসাবের অঙ্কটা কেমন গোলমেলে হয়ে **যাচ্ছিল।** দেওয়াল বাতির আলো পড়ে **মুখের একটা পাশ** ঝলমলে হয়ে আছে। **সৌরভী বলল।**

কদিন থেকেই তোমার কথা ভাব-**ছিলাম—আজ না** এলে লোক পাঠাতাম **ডাকতে। কানে যেন কোনো কথাই ঢুকছে না চারুর। মেয়েমানুষ বলতে এতকালের** ধ্যানধারণাটা হঠাৎ যেন চিড় খেয়ে যাচ্ছে। বিষয়ী লোকের গোলমাল খুব সহজে হয় না, তবু বুকের ভেতরটা যেন কেমন করছিল চারুর।

—ভাবছি দু চার মাস একটু তীর্থে ঘুরে আসব। তা মানুষের জীবন তো, কখন কী হয় বলা যায় না। তাই যাবার আগে জমির দলিলটা তোমায় দিয়েই যাই।

বলে সৌরভী ঘরের আলমারীটার দিকে এগিয়ে গেলে চারুর বুকের ভেতর কী যেন একটা শব্দ করে ফেটে গেল।

মোড়ের বটগাছটার কাছে এসে রিক্সোটা ছেড়ে দিল চারু। এখান থেকে বাড়ির পথটুকু হেঁটেই যাবে। নিজের পয়সা খরচ করে খোয়া ঢেলেছে, পাঁচ

দিয়েছে রাস্তায়। পা নামিয়ে বুঝল **টলছে** এখনও। মেপে মেপে তিন পাত্তর মাত্র খেয়েছে তবু নেশা ধরেছে ঠিক। পা ফেলার সময় বেশ টের পাচ্ছিল সে। যেমন পয়সা নিয়েছে তেমনি নেশা দিয়েছে, ঠকায় নি। জীবনে আজ আর কোনো ক্ষোভ নেই চারুর।

ঠান্ডা ঠান্ডা পা ফেলেই **হাঁটছিল** সে। বাড়ির গেটের কাছে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখল জ্যোৎস্নার আলোয় ভাসছে 'শোভা-ধাম'। ঐ বাড়িটা যে নিজের, বিশ্বাসই হতে চায় না এমন সুন্দর। গেট খুলে মোরামে ঢাকা পথটুকুর উপর পা রাখল চারু। এক পাশে ফুলবাগান, মস্ত দুটো বাহারী পামগাছ দুপাশে, ও দিকটায় মুরগীর ঘর, গোয়ালঘর, পুকুর। দালানে উঠতে গিয়েও কী ভেবে চারু ঘুরে মুরগীর ঘরটার দিকে গেল। রাস্তায় বাঁক নিতেই চোখ দুটো তার অকারণেই আটকে গেল কিছু সময়ের জন্য। **কাঁঠাল-গাছটার** মাথার উপর মস্ত **একখানা চাঁদ** আটকে আছে। আর কী ফুটফুটে **আলো** চারপাশে। অনেক দূরের গাছে ঘুম ভেঙে **কয়েকটা কাক** খুব ডাকাডাকি **করছে।** দূর থেকেও তারের জালে ঘেরা মুরগীর ঘরটা দেখতে পাচ্ছিল চারুলাল। ভেতরে **ছোটো ছোটো সব খুপরীর মত ঘর। ভরপেট খেয়ে সবাই এখন বেশ শান্ত হয়ে** ঘুমিয়ে। ভরপেট খাওয়া আর ঘুম পেলে ওদের **গায়ে মধুর মত মিষ্টি মাংস লাগবে—কড়া আঁচে ঘণ্টাখানেক** ধরে সিদ্ধ করে নিলে **সেই মাংস জলের** সঙ্গে **সঞ্জীবনী ফোঁটা হয়ে মিশে যাবে।** বড় জামবাটিতে করে সেই সঞ্জীবনী রস যত-দিন রোজ রাতে নিয়ম **করে খেয়ে** যাবে চারুলাল ততদিন আর তাকে কে পায়। একটানে আরো **কয়েকটা বছর** সে নির্বিঘ্নে পার করে দিতে পারবে।

গগনের **জন্মের সময় শোভার** পেটটা **খুলতে হয়েছিল। তখন হাতে** টাকা-**পয়সা তেমন ছিল না চারুর, শ্বশুরমশাই-এর কাছে হাত পাততে হয়েছিল** শেষ পর্যন্ত। তা **কী অবহেলা** আর অশ্রদ্ধা **দেখিয়েছিলেন ভদ্রলোক তখন। একবার** চোখ তুলে চারপাশটা **দেখল চারু—বাড়ির কোথাও একফোঁটা আলো নেই—জ্যোৎস্নার** আলোয় **ঝিম ঝিম করছে** চারপাশ। আজ একখানা খেলার মত খেলা দেখাল বটে **সৌরভী।** চারুলালের এতদিনকার সব ধ্যানধারণাগুলোকে একেবারে এলোমেলো **করে দিয়ে গেল। বাঁ পাশের** পকেটটায় একবার হাত ছুঁইয়ে নিল চারু, না **দলিলটা ঠিক আছে, পড়ে টড়ে যায়নি।**

ফেরবার পথে হু হু হাওয়ার ভেতর খানিকটা ভেসেই আসছিল যেন—দালানের সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে আর তখুনি সাৎ করে কী যেন একটা কালো মতন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াল। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেনি—হিস্ হিস্ **শব্দ হতে** সারা **শরীরের** ভেতর যেন এক পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল চারুর। জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছে সাপটার গা—ফনাটা **দুলছে** মৃদু। আচমকা **ভয় পেলে যেমন হয়, চারুর গলায় কোনো স্বর ফুটছিল না। অথচ সে প্রাণপণে পর পর বাড়ির** মহিন্দরদের নাম, গগনের নাম, এমন কি **ক্ষীরোদা ও সৌরভীর নাম করেও গলা** ফাটিয়ে **ডাকছিল। গলায় একফোঁটাও শব্দ ছিল না বলে কারোর কানেই পৌঁছচ্ছিল না সে ডাক, এ কথাটা বুঝতে পেরে ও এ জাতীয় ভয়ঙ্কর একটা সমস্যার কী** ধরনের সমাধান হতে পারে তার কোনো সঠিক উপায় না পেয়ে আচমকাই মূক **হয়ে গেল সে।** সারা **শরীরে** ঝিনঝিনে **ঘাম ছুটছে, সে বেশ টের পাচ্ছিল উত্তে-জনায়** শরীরের খুব গভীর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠে আসছে এক অন্ধকারের স্রোত, তাকে ভাসিয়ে নেবে বলে। অথচ বড় নিরুপায়। **আশী বিঘে ধানী জমি, ছটা জমা নেওয়া পুকুর,** গোটা দশেক রিকসা ও 'শোভাধামের' মালিক চারুলাল বিপন্ন জ্যোৎস্নার ভেতর দোদুল্যমান মৃত্যুটিকে সামনে রেখে নিরাশ্রিতের মত **দাঁড়িয়ে থাকল শুধু।**

আশ্চর্য্য রক্তের রঙ ॥ অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

আশ্চর্য রক্তের রঙে রাঙা হ'লো
পথঘাট পাটক্ষেত নদীনালা গঞ্জের মৃত্তিকা
তোমরা শহিদ হ'লে,
তোমাদের মৃত্যু নেই।

ওখানে আকাশ লাল,
নবসূর্য প্রসবের অনন্ত যন্ত্রণা
অনুভূত প্রতিটি নাড়িতে,
রোমাঞ্চিত মায়ের শরীর;
মা তোমার বাংলা দেশ,
মা আমারও বাংলা দেশ
আশ্চর্য মুখের মিল তোমার আমার,
আশ্চর্য! মনের মিল তারও চেয়ে বেশী।

আমিও লড়াই করি মনে মনে
সর্বশক্তি দিয়ে,
ভেঙে যায় বলদর্পী শত্রুর শিবির,
দু হাতে কুর্ণিশ ক'রে
ফিরে যায় পঞ্চনদীতীরে।
ততক্ষণে নবসূর্য তোমাদের মাথার উপরে
আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে জ্বলজ্বল করে।

বলেছিলাম যাবো ॥ কবিরুল ইস্‌লাম

বলেছিলাম এই শরৎকালে আমি যাবো
বলেছিলাম যাবো।

বাংলা দেশ আমি কখনও চোখে দেখিনি—
শুধু রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে ছোটো গল্পে
কবিতায় ও গানে
আমি সেই উদ্‌ভিন্ন প্রতিমার আবাল্য সহচর
আমার অস্তিত্ব জুড়ে সেই বাঁশি সব সময় বেজে যাচ্ছে :
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি!

এবং এই আত্ম-আবিষ্কারের সূত্র ধরে বন্ধুর মতো এসেছে
বাংলা দেশের নবজাগ্রত সাহিত্য-সহোদর
যার পাতায় পাতায় চোখে মুখে মুদ্রিত আছে
তোমার জন্য আমার জন্য
নিমন্ত্রণের নীল চিঠি

উত্তরে বলেছিলাম এই শরৎকালে আমি যাবো
বলেছিলাম আমি যাচ্ছি।।

বাংলাদেশ ॥ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

শুধু জানি আমি
আর জানে মন
ভালোবাসি প্রাণ ভরে,
সোঁদা গন্ধ মৌ মৌ বাংলার মাটিরে
তাই যেন সারাক্ষণ তীব্র অন্বেষণ

হাঁস-চরা পুকুরের জলে
আউষের ক্ষেতে ক্ষেতে
স্বপ্ন-ভরা ছায়া আলপনা
দুধে-ভরা ধলেশ্বরী কালো মেঘনা
আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়
আর যেন না মিলায়,
জীবনের জয়গানে মুখরিত জনতা প্রাঙ্গণ
বাংলার প্রাঙ্গণ ভরে কী রুদ্র নিস্বন।।

পূর্বগগনে অরুণোদয় ॥

তপনকুমার ঘোষ

ওপার বাংলায় হানা দিয়েছে
বিদেশী শত্রুর দল।
কত না করেছে রক্ত, কত না বয়েছে অশ্রু,
কত মায়ের চোখে।

সোনার বাংলা শ্মশান
বিদেশী ঘাতকের ঘৃণিত হাতে।
সে হাতও অচিরে হবে ধ্বংস
জীবনেরই দুর্জয় আঘাতে।

হে বীর বাঙালি, জাগো জাগো,
আজ আর নাই কোনো ভয় :
শত্রু পদানত হবে, আমরা স্বাগত জানাই,
পূর্ব গগনে ঐ দেখ নব অরুণোদয়।

ডক্টর আহমদ শরীফ

আজাহারউদ্দীন খান

প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় ডঃ আহমদ শরীফ সাহেবের নাম এপার বাংলার বিদগ্ধ সমাজের কতিপয় গুণীজনের কাছে পরিচিত হলেও হতে পারে কিন্তু তার বাইরে তাঁর নাম কেউ শোনেন নি একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। তিনি সাহিত্যের যে ধারার পথিক ছিলেন তাতে তাঁর জনপ্রিয় হবার কথা নয় কিন্তু তিনি যে শাখার চর্চা করতেন সেটি তাঁকে বিদগ্ধ সমাজে খ্যাতি ও প্রশান্ত প্রতিষ্ঠা দুইই এনে দিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি এম-এ পড়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে করতেই পি-এইচ-ডি হন। শুধু অধ্যাপক বলা ভুল তিনি প্রবন্ধকারী শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের মনে জিজ্ঞাসার দীপ প্রজ্জ্বলিত করাই তাঁর পঠনের বিশেষত্ব ছিল। এই বিশেষ গুণটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর আচার্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছ থেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ইয়াহিয়ার মিলিটারী একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় আবার গড়ে উঠবে কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদারহৃদয় আপনভোলা স্পষ্টবাদী দিলখোলা মানুষটিকে পাওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশজন অধ্যাপককে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে পাকিস্থানী হানাদাররা। রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের কোন যোগ ছিল না, প্রথম অপরাধ ছিল তাঁরা বাঙলাদেশকে ভালবেসেছিলেন আর দ্বিতীয় অপরাধ বাঙালী ছিলেন, জঙ্গীশাহীর তাঁবেদার তল্পীবাহক ছিলেন না। পঞ্চাশজনের নাম কাগজে বেরোয় নি কিন্তু যে ক'জনের নাম বেরিয়েছে তাঁদের মধ্যে আহমদ শরীফ সাহেবের নাম দেখে মর্মাহত হয়েছি। তিনি আমার পরিচিত ছিলেন। নির্বিরোধী শান্তশিষ্ট মানুষটি যিনি লেখাপড়ায় এবং গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি বাইরের সমাজজীবনের প্রতাপ প্রতিপত্তি হারিয়ে নিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠার কাঙাল ছিলেন না। তা বলে অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ান নি, চারপাশের অন্যায়-অবিচার দেখে পাশ কাটিয়ে যান নি। লেখাপড়ার চর্চাতে জীবন অতিবাহিত করেও সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর যখন কোনো আঘাত এসেছে তখন তিনি জ্বলে উঠেছেন। ১৯৫২ খৃঃ যখন ভাষা আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছিল তখন তিনি রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। আবার যখন আয়ুবশাহীর কালো হাত বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে খর্ব করার জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সাহিত্য প্রচার বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল তখন এই শান্ত মানুষটি অশান্ত হয়ে উঠেছিলেন, গবেষণার বর্ম এঁটে ঘরে বসে না-দেখা বা না-শোনার ভান করেন নি। ছাত্রদের মাতৃভাষার প্রতি উদ্দীপ্ত করেছেন যা তাঁর গুরু শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁকে করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের আর কী থাকে—রবীন্দ্রনাথই তো বাংলা ভাষা। প্রাণহীন দেহ ক'দিন থাকে! এই মানুষটিকে ফ্যাসিস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী গুলী করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

কয়েক বছর আগে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু আমাকে স্তম্ভিত করেছিল—ফুটে ওঠার আগেই ঝরে যাবার বেদনা কাটতে না কাটতেই শরীফ সাহেবের হত্যা সংবাদ আমাকে বিচলিত করেছে। হাই সাহেব সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকাতেই আহমদ শরীফ সাহেবের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ই শেষে পত্রালাপে গিয়ে পৌঁছে। অনেকগুলো চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছিল কিন্তু সেগুলি এখন হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি নেই একথা ভাবতে পারছি না বলেই খোঁজার কাজেও মন দিতে পারছি না। আপাতত হাতের কাছে একটি চিঠি দেখতে পাচ্ছি সেটিই তুলে দিই। এর মধ্যে শরীফ সাহেবের সারল্য এবং অপরিচিতকে আপন করে নেবার একটি দুর্লভ গুণের ঝিলিক উঁকি মারছে।

১৮সি, ফুলার রোড
ঢাকা—২
৬-১১-৬৭

সুজনবরেষু,

আপনার চিঠির জবাব লিখতে দেরী হয়ে গেল—সে জন্য লজ্জিত। আইনের বাধাবশত বইপত্রের আদান-প্রদান বন্ধ। তাই আপনাকে পুথি পরিচিতি ও সাহিত্য পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয় বর্তমানে। আপনাকে সুদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

হাই সাহেব ভাল আছেন। ব্যস্ততার জন্যেই হয়তো আপনার পত্রের উত্তর দেন নি।

আশা করি সপরিজন কুশলেই আছেন। সালাম, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা রইল। বিনীত

আহমদ শরীফ

সুদিনের অপেক্ষায় তিনি আমাকে থাকতে বলেছিলেন—বিপ্লবের চাপে সেই বহু প্রতীক্ষিত সুদিনের দ্বার যখন উন্মোচনের পথে তখন তাঁকে হারালাম, এই বেদনার সান্ত্বনা কোথায়?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ষান্মাষিক মুখপত্র 'সাহিত্য পত্রিকা' এবং বাঙলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা'য় মুখ্যত শরীফ সাহেবের গবেষণার ফসল প্রকাশিত হয়েছে। এ দুটি পত্রিকায় তাঁর মুদ্রিত রচনার একটি তালিকা দিলাম যাতে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁর অন্বেষু মনের পরিচয় সমুদ্রিত।

সাহিত্য পত্রিকা ঃ

১৩৬৪ বর্ষা—বিদ্যাসুন্দরের কবি (পৃঃ ৭৭—১৩৫)

১৩৬৪ শীত—আলাওল বিরচিত তোহ্ফা

১৩৬৫ শীত—গ্রন্থ পরিচয় (ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ১ম খন্ডের আলোচনা) [পৃঃ ৩০৯—৩১৩]

১৩৬৬ বর্ষা—সত্যকাল বিবাদ-সংবাদ বা যুগ সংবাদ ঃ মুহম্মদ খান

১৩৬৭ বর্ষা—মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য [পৃঃ ১১৭—৩০৪]

১৩৬৯ শীত—কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য [পৃঃ ২০৬—২১৩]

১৩৭০ শীত—রসুল-বিজয় [পৃঃ ১১৫—১৯৭]

১৩৭১ বর্ষা—মোহাম্মদ খানের বংশ লতিকায় ইতিহাসের উপাদান [পৃঃ ১৭৫—১৭৯]

১৩৭২ বর্ষা—গ্রন্থ পরিচয় (ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত 'বাঙলা সাহিত্যের কথা' ১ম ও ২য় খন্ডের আলোচনা) [পৃঃ ২১২—২২৩]

১৩৭২ শীত—গ্রন্থ পরিচয় (ডঃ আনিসুজ্জামান রচিত 'মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থের আলোচনা) [পৃঃ ১৭৭—১৯৫]

১৩৭৩ শীত—একটি প্রশস্তি কবিতা [পৃঃ ১০১—১১৬]

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ঃ

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫—এতিম কাসেম বিরচিত আওয়া-দে-বারোজ প্রশস্তি

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৬—শেখ ফয়জুল্লাহ্ বিরচিত যয়নবের চৌতিশা

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬—মুহম্মদ ফসীহ্ রচিত আরবী ত্রিশ হরফে মোনাজাত

৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৬৭—মুহম্মদ আকিল বিরচিত মুসানামা

৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৮—মনুচেহের মাসুমা পরী উপাখ্যান

৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০—রাগতাল নামা ও পদাবলী : আলাওল

৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৭০—বাউল তত্ত্ব

৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১—সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান চৌতিশা

৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২—চন্দ্রাবতী

এগুলির অধিকাংশই শুধু বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ নয় এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ। এ ছাড়া 'বারেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', 'সমকাল', 'উত্তরণ', 'পূবালী', 'মাহেনও', 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকায় পুঁথি ও লোকসাহিত্য বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যার সব খবর আমি জানি না। তাঁর সম্পর্কে যে লিখতে হবে তা ভেবে নিয়ে আগে থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে রাখি নি। যা আমার কাছে আছে তারই মালা গেঁথে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি আমার বেদনাহত চিত্তের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

।। ২ ।।

আহমদ শরীফ প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ করে মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্য সাধনার ওপর তাঁর গবেষণাকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। তার একটি কারণ ছিল। সেটি হচ্ছে বিভাগ পূর্বযুগের মুসলমান রচিত পুঁথিসাহিত্যের ওপর কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ যে কাজের সূত্রপাত করেছিলেন সেটিই বিভাগোত্তর যুগে পূর্ণতা লাভ করেছে আহমদ শরীফের হাতে। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সাহিত্য বিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র। হিন্দু-মুসলমান মিলিত বাংলা সাহিত্যের কথা আমরা মুখে বলেছি কিন্তু কাজের সময় পাঠনের সময় পাঠ্যতালিকা তৈরীর সময় একতরফা আলোচনা হয়েছে এবং তার প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পেয়েছি—দেশ বিভাগ। আহমদ শরীফ সাহেব তাই ক্ষোভের সঙ্গে অপ্রিয় সত্যভাষণ উচ্চারণ করেছিলেন যেটি শুনতে ভাল শোনায় না কিন্তু বললেও ভুল হয় না. "হিন্দু ইতিহাসকারেরা মুসলিম রচিত সাহিত্যকে উপেক্ষা করেছেন... হিন্দু পরিচালিত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কোন প্রতিষ্ঠানেরই মুসলিম রচিত সংগ্রহের আগ্রহ ছিল না। তাই হিন্দু বাড়ির সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু পাশের মুসলিম ঘরে কোন খোঁজ করা হয়নি। একে নিতান্ত অবচেতন অবহেলা বলা চলে না, সচেতন উপেক্ষা বলতে হয়। তাই আলাউল-দৌলত কাজীর সৌজন্যমূলক নামোল্লেখেই মুসলিম সাধনার ইতিহাস সমাপ্ত হয়। ...সঙ্গত কারণেই হয়তো মুসলমান সমাজে দেখা দিল এর প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়াই বা বলি কি করে। হিন্দু ঐতিহাসিক যখন দায়িত্ব নিলেন না, তখন মুসলমানকেই এগিয়ে আসতে হল তাদের দানের পরিচয় দিতে।...কার্যত বাঙলায় হিন্দুসাহিত্য ও মুসলমান সাহিত্যের আলাদা আলাদা ইতিহাস গড়ে উঠেছে। অনেকটা বৃটিশ ও আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাসেরই মতো। তবু মুসলমানদের উদারতা অতুল্য। কেননা, তারা আজো জিজ্ঞাসা নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দু রচিত সাহিত্য পড়ে, স্কুলে-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় পশ্চিমবঙ্গীয়রা কিন্তু তা করে না, ক্ষতি অবশ্য তাদেরই। কেন না শুভ হয় না জ্ঞানবিমুখতার পরিণাম। ইতিহাস তার সাক্ষী। চোখ বুজে থাকলেই সত্য-সূর্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, তার প্রসাদ কেবল নিজেকেই বঞ্চিত রাখা হয়।" (সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা ১৩৭২)।

এক সমাজের Superiorty complex-এর দরুণ আর এক সমাজে Inferiority Complex দেখা দিয়েছে। মুসলমান ছাত্র বাংলা সাহিত্যে তাদের জাতির কী অবদান আছে মধ্যযুগের সাহিত্য প্রধানত মুসলিম বাংলা সাহিত্য তা জানতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যের তারাও যে একজন প্রধান অংশীদার একথা তথাকথিত বাজার চলতি সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করে তারা বুঝতে পারেনি। শরীফ সাহেব এই অভাব অনুভব করেই তাঁর জীবন, তাঁর সমস্ত সময়, তাঁর সবটুকু মেধা ও শক্তি তাঁর অখণ্ড অবিচল অভিনিবেশ উৎসর্গ করে দিয়েছেন প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণের কাজে এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে উদ্ধার করে সমাজের হীনমন্যভাবকে বিদূরিত করে ইতিহাসের লুক্কায়িত তথ্যকে সকলের গোচরে এনেছেন। যার ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্লিখনের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং পূর্ব বাঙলায় মুসলমান তরুণকে বাংলা ভাষার প্রতি উদ্দীপ্ত করে পশ্চিম-বাংলার সাহিত্যের সমতলে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যেজন্যে ওধারের সাহিত্য সম্পর্কে এধারের মানুষের জানার উৎসুক্য তীব্র হয়ে উঠেছে।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথি, যা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন সেগুলি শরীফ সাহেব যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পাদনা করে 'পুঁথি পরিচিতি' নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বের করেন। এই 'পুঁথি পরিচিতি' তাঁর একটি মহান কীর্তি—যদিও সংগ্রাহকের কৃতিত্ব সাহিত্যবিশারদের তবু মধ্যযুগের মুসলিম কবীদের প্রায় ছশো পুঁথিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে প্রচুর টীকা-টিপ্পনী সহযোগে আহমদ শরীফ সাহেব একক চেষ্টায় এক অনালোকিত অধ্যায়কে আলোকিত করেছেন। পুঁথি রচয়িতাদের পরিচয় কালনির্ণয় শুধু বিস্তৃতভাবে দেননি, সেই কবিদের প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রচুর যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেছেন। পুঁথির প্রামাণিকতা প্রমাণ করার জন্য তাঁকে কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা তাঁর সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার বইটি না দেখলে বোঝানো যাবে না। এই গ্রন্থ সম্পর্কে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেছেন, 'মধ্যযুগের বাংলা মুসলিম সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে এই বিবরণ বর্ণিত পুঁথিগুলি বিশেষ মূল্যবান। বাংলার, বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমান সমাজের, সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনার পক্ষে এই জাতীয় পুঁথির অনুশীলন অপরিহার্য। পুঁথিচর্চার দিক হইতেও ইহাদের নানা বৈচিত্র্যের যথেষ্ট মূল্য আছে।' (বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক)। সামগ্রিকভাবে সংকলিত পুঁথি বাংলা সাহিত্যকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সেই প্রভাব পরবর্তীকালের লেখকরা নিজেদের মানসগঠনে কী পরিমাণে পুঁথি-রচয়িতাদের কাছে ঋণী সেই যোগসূত্রটি তিনি আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন। এই বইটির জন্যই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি হন। অনুসন্ধিৎসু অবাঙালী পাঠকদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এ বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ঢাকার পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯৬০ সালে "A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts" নামে প্রকাশিত হয়েছে।

আহমদ শরীফ মধ্যযুগের সাহিত্যের অপরিচিতপূর্ব অনেক মূল্যবান পুঁথি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেছেন। সৈয়দ সুলতানের কাব্যরচনা কাল ও দৌলত উজির বাহরাম খানের আবির্ভাবকাল তথ্য প্রমাণ ও যুক্তিসহ নির্ণয় করেছেন। অনেকেই অর্থাৎ শহীদুল্লাহ্ সাহেব সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর'কে দ্বিজ শ্রীধরের অনুকৃত বলে মনে করেন। কিন্তু শরীফ সাহেব প্রমাণ করেছেন যে সাবিরিদ খান যখন 'রসুলবিজয়' ও হানিফার দিগ্বিজয় নামে দুখানা কাব্য রচনা করেছেন তখন শ্রীধরের রচনা আত্মসাৎ করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই বিশেষ করে তাঁরা যখন একই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এ পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দরের বারজন কবি আবিষ্কৃত হয়েছে—দ্বিজ শ্রীধর, সাবিরিদ খান, গোবিন্দ দাস, নিধিরাম আচার্য, কঙ্ক, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম, বলরাম, কবীন্দ্র চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র, রাধাকান্ত ও রামপ্রসাদ। প্রথম চারজন কবির পুঁথি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের আবিষ্কার। 'বিদ্যা-

সুন্দরের কবি' নামক প্রবন্ধ বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উদ্ভব ও অন্যান্য রচয়িতাদের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করে তিনি বিদ্যাসুন্দর পাঁচালীর আদি রচয়িতার সম্মান কঙ্ককে না দিয়ে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকেই দিয়েছেন। সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কৃত শ্রীধর রচিত বিদ্যাসুন্দর পুঁথির বিচার বিশ্লেষণ ও কাল নির্ণয় করে তিনি নিজ সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করেছেন, 'দ্বিজ শ্রীধর নিশ্চয়ই ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কঙ্কের কাব্যও এ সময়েই রচিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কঙ্ক বড়জোর দ্বিজ শ্রীধরের সমসাময়িক ছিলেন, পূর্ববর্তী কিছুতেই নন। অবশ্য যদি চৈতন্য বন্দনাটা প্রক্ষিপ্ত না হয়। সুতরাং কঙ্কের পক্ষে পাথুরে প্রমাণের অভাবে আমরা দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকে বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদি রচয়িতার গৌরব দান করছি।' কিন্তু কবি হিসেবে কাব্যবৈশিষ্ট্য ও কাব্যভাষার তুলনামূলক আলোচনায় শ্রীধরের থেকে সাবিরিদ খানকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেছেন, 'ভাষা ও উপমা-অলঙ্কারের সংযত ব্যবহারে আর পদলালিত্যে ও ছন্দ সৌন্দর্যে গোটা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় জুড়ি নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।...শ্রীধরের ভাষা আড়ষ্ট বর্ণনভঙ্গী প্রাণহীন এবং বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে সাবিরিদের ভাষা শালীন, বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং গতিশীল। বর্ণনভঙ্গী রসাল এবং বর্ণনা বিস্তৃত। শ্রীধরের ভাষায় প্রাচীনতা বা সংস্কৃতানুগতা কম, পক্ষান্তরে সাবিরিদের ভাষা সংস্কৃতানুগত ও প্রাচীনতার পরিপোষক। উপমা ও অপরাপর অলঙ্কার প্রয়োগে সাবিরিদ খান শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু শ্রীধরের সে শক্তি বিরল।' প্রবন্ধের শেষে উভয় কবির রচিত খণ্ডিত পুঁথি দুটি যথাযথ টীকা-টিপ্পনী সহযোগে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি আরও কয়েকটি পুঁথি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন যদিও প্রায় সবকটি পুঁথির আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সাহিত্য বিশারদের মধ্যে ভাবাবেগ প্রবণতা ছিল আর শরীফ সাহেবের মধ্যে আছে দার্শনিক-সুলভ যুক্তিবাদ। সাহিত্যবিশারদের বিশৃঙ্খল উপকরণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নতুন চিন্তা যুক্ত করে বিষয়ের পূর্ণতা দান করেছেন শরীফ সাহেব। যেমন, দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' আলাউলের 'তোহ্‌ফা' মুহম্মদ খানের 'সত্যকাল বিবাদ সংবাদ' মুহম্মদ কবিরের 'মধুমালতী', জয়েনউদ্দীনের 'রসুল বিজয়', মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তা', আলাওলের 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' প্রভৃতি। এই পুঁথি সম্পাদনার মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ পুঁথির পাঠোদ্ধার করেছেন, সুদীর্ঘ ভূমিকায় পুঁথিগুলির নানা বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন, পুঁথি রচয়িতা সম্পর্কে এমন কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূত্রকে ধরিয়ে দিয়েছেন যাতে ছাত্র গবেষক সাধারণ পাঠক সকলেরই উপকৃত হবার কথা। 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' ও 'মধ্যযুগের গীতি-কবিতা'র সংকলন তাঁর গবেষণার এক সমৃদ্ধ ফসল। 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' গ্রন্থের ৮২ জন কবির ৪০২টি পদ সংগৃহীত হয়েছে। এই পদগুলি 'রূপ' 'অনুরাগ' 'বংশী' 'আক্ষেপ' 'দান' 'নৌকা' 'অভিসার' 'মিলন' 'সম্ভোগ' 'মান' 'বিরহ' 'আত্মবোধন' 'আত্মনিবেদন', 'প্রার্থনা' 'বাৎসল্য' ও 'বিবিধ' পর্বে বিভক্ত। বিভক্তকরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'সুফীমত প্রভাবিত হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের মনে রাধাকৃষ্ণের রাস, মৈথুন প্রভৃতি কল্পনা প্রশ্রয় পাওয়ার কথা নয়। তাই তাঁরা রূপ, অনুরাগ বংশী, অভিসার, মিলন বিরহ প্রভৃতিকে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কসূচক ও ব্যঞ্জক বলে গ্রহণ করতে পারলেও বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতির সঙ্গে তাদের অধ্যাত্মতত্ত্বের মিল খুঁজে পাননি, তাই মুসলমানের লেখায় ও-সব শ্রেণীর পদ সাধারণত পাওয়া যায় না। তাঁদের রচনায় অনুরাগ বিরহবোধ এবং জীবন-জিজ্ঞাসাই বিশেষরূপে প্রকট। এই জীবন-জিজ্ঞাসামূলক পদকে 'আত্মবোধন' শ্রেণীভুক্ত করেছি। সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে—এটিই রূপ ঃ এ সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক বোধ জন্মে—এটিই অনুরাগ; এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবোধ জাগে—এটিই বংশী; আর সাধনার আদিস্তরে পাওয়া-না-পাওয়ার সংশয়বোধ থাকে—তারই প্রতীক নৌকা। এর পরে ভাবপ্রবণ মনে আত্মসমর্পণ ব্যঞ্জক সাধনার আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হয়—এটিই অভিসার। এরপর সাধনায় এগিয়ে গেলে অধ্যাত্ম-স্বস্তি আসে—তাই মিলন। এরও পরে চরম আকাঙ্ক্ষা—একাত্ম হওয়ার যার নাম বাকাবিল্লাহ—এই-ই বিরহ।' গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় ভারতীয় ভক্তিবাদের ক্রম বিবর্তনের পটভূমিকায় বাঙলাদেশে ভক্তিধর্মের উদ্ভব কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সুফীতত্ত্বের মরমীয়া সাধন পন্থের আলোকে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙলার জনজীবনের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর যে গভীর যোগ আছে ভূমিকার মধ্যে সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রতিটি পদকারের পরিচিতি দিয়েছেন। এক একটি গ্রন্থ তাঁর সুগভীর অধ্যবসায়, অসাধারণ নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্যের পরিচয় বহন করে। একক প্রয়াসে এরকম কাজ খুব কম গবেষকই করতে পেরেছেন। বিষয়ের একনিষ্ঠ সাধনা ও নিষ্কাম গবেষণা আদর্শের প্রতিমূর্তি তিনি।

অনেক গবেষক আছেন যাঁরা পূর্ব-কল্পিত মত ও বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়ে কোন অবস্থাতেই কোন বিষয়ের পুনর্বিবেচনা করার কথা চিন্তা করেন না। কিন্তু শরীফ সাহেবই এমন একজন গবেষক যিনি কোন পূর্বনির্দিষ্ট বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে ছকে ফেলার গবেষক নন বলেই নিজের সিদ্ধান্তকে কখনও অভ্রান্ত বলে মনে করেন নি। উন্মুক্ত মন নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন বলেই তাঁর বিষয়সম্পৃক্ত অন্য লেখকের কোন নতুন বই প্রকাশিত হলেই নিজের তথ্যকে বার বার যাচাই করে নিতেন। ফলে কোন পুঁথি সম্পাদনার কাজ শেষ হয়েও শেষ হত না তাঁর কাছে। 'লায়লী-মজনু' কাব্যের ভূমিকায় ১৯৫৭ সালে তিনি দৌলত উজির বাহরাম খানের কাব্য রচনা-কাল ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩ খৃঃ বলে নির্ণয় করেছিলেন, পরে ১৯৬২ খৃঃ এ বঙ্গে প্রকাশিত অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল' (জুলাই ১৯৬২) পাঠ করে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত 'কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান

সম্বন্ধে নতুন তথ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রুটি সংশোধন করে বলেন যে, ১৬৬৬ সনের অব্যবহিত পূর্বে 'লায়লী মজনু' কাব্য রচিত হয়। 'সত্যকাল বিবাদ সংবাদ' পুঁথির ভূমিকাতেও কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল সেগুলিও অকপটে স্বীকার করে পাঠ ও মন্তব্য সংশোধন করেছেন, 'সত্যকাল বিবাদ সংবাদ'-এর ভূমিকায় 'মুক্তাল হোসেন' কাব্যে প্রজ্ঞ কবির আত্মপরিচয়াংশের পাঠ-প্রসূত জটিলতায় বিভ্রান্ত হয়ে কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। সজর জাহা, শাহ আবদুল ওহাব, ও শাহ ভিখারীকে তিন ভিন্ন ব্যক্তি মনে করেছিলাম বলে, কোনো কোনো পুঁথি-ধৃত 'মাতামহ' পাঠ গ্রহণ না করে, অন্যান্য পুঁথির পাঠকে যথার্থ বলে অনুমান করেছিলাম। ফলে অসমীচীন সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল। যাকে আমি 'চট্টগ্রামের পীর পরম্পরার-স্তুতি' বলে অভিহিত করেছি তা আসলে কবির মাতৃকুল পরিচিতি এবং কবির স্বকুলের পরিচিতিতেও ব্যক্তিক গুণ ও কীর্তি নির্দেশগত একটি ত্রুটি রয়ে গেছে। এখানে পাঠ ও মন্তব্য সংশোধন করছি এবং সে সূত্রে নতুন তথ্যও সন্নিবেশিত হচ্ছে।' তাঁর সিদ্ধান্তকে পুনর্বিচার করতে যে গ্রন্থটি সহায়তা করেছে সেটিও তিনি প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করেছেন, 'নানা প্রশ্ন তুলে এবং সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে উক্ত সব ব্যাপারে নতুন তথ্য সন্ধানে আমাকে প্রবর্তনা দিয়েছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়।' (শীত ১৩৬৯) অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ-রচনাতেও তিনি ওধারে থেকেও যথাসাধ্য সহায়তা করেছেন যা 'নিবেদন' থেকে জানতে পারি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'আরও একজনের কাছে আমি ঋণী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আহমদ শরীফ। তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই, তা সত্ত্বেও তিনি আমায় সাহায্য করেছেন। তিনি মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বহুদিন ধরে অক্লান্তভাবে মূল্যবান গবেষণা করে চলেছেন। যখনই তাঁর কোন বই বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আমায় তা পাঠিয়েছেন। সেগুলি থেকে আমি এই বইয়ের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছি। এছাড়া পত্রযোগে যখন তাঁর কাছে কোন সাহায্য চেয়েছি, তিনি তা আমায় অবিলম্বে পাঠিয়ে দিয়েছেন—নানা অসুবিধা ও কর্ম-ব্যস্ততা সত্ত্বেও।' (গ্রন্থকারের নিবেদন, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২)।

মধ্যযুগের সাহিত্যের ওপর গবেষণা করতে করতে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকেও তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য ছাত্রাবস্থাতেই শহীদুল্লাহ সাহেবের নিবিড় সান্নিধ্যে লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। পুঁথি সম্পাদনার ফাঁকে ফাঁকে গান ছড়া প্রবন্ধ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং বিলুপ্তের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেছেন কেননা ঐগুলি জাতির জীবনে একদিন প্রাণসঞ্চার করেছিল। পরিবর্তিত আবহাওয়ায় আজ সেগুলি টিকে থাকতে পারছে না, শিক্ষাপ্রসারের ফলে লোক-মুখের আশ্রয় হারিয়ে ফেলছে। তা বলে তার মূল্য কমে যায় নি। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'আধুনিক অর্থে আমরা জাতি হিসেবে আজো গড়ে ওঠার মুখে। এ জন্যই আমাদের কাছে এসব লোকশ্রুতি ও লোকসাহিত্যের মূল্য অপরিমেয়। এর থেকেই জাগবে আমাদের ঐতিহ্যবোধ। এখানেই দেখতে পাব আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ—আমাদের জাতীয় মন-মননের গতি-প্রকৃতি ও ক্রম-বিকাশের ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিশ্চিত পরিচয় ঘটবে এ সবেরই মাধ্যমে। জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় সাহিত্য যদি জাতীয় জাগরণের অবলম্বন হয়, সাহিত্যকে যদি জাতির প্রাণ-রসের উৎস বলে মনে করি, তবে এগুলোর মূল্য অনস্বীকার্য। ছড়ায়, প্রবাদে-প্রবচনে যেমন, তেমনি এসব গান, গাথা, রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথায় আমাদের জগৎ-জীবন, ঘর-ঘাট, মাঠ-বাট, মন-মনন, আচার-আচরণ প্রভৃতির স্বরূপ কোথাও চিত্রে, কোথাও ইঙ্গিতে বিধৃত আছে। আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনীতিক ইতিহাস লিখিত হবে এসব উপাদান সম্বল করে।' (জাতীয় জীবনে লোক সাহিত্যের মূল্য : সমকাল, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৪)

আহমদ শরীফ সাহেবের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হচ্ছে যে তাঁর গবেষণাকে পণ্ডিত-জনেরা যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন এবং সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাঁর সিদ্ধান্ত-সমূহ অপরিহার্যবিধায় নিজেদের গ্রন্থে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণও করেছেন। বিশ্ব-বরেণ্য পণ্ডিত মনীষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর তথ্যকে গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যের কথা'র (২য় খণ্ড) সমালোচনা প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ তাঁর ওস্তাদের তথ্যগত কয়েকটি ত্রুটি বিনীতভাবে 'সাহিত্য পত্রিকা'র বর্ষা ১৩৭২ সংখ্যায় উল্লেখ করেছিলেন। শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি তবু বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে (কার্তিক ১৩৭৪) যেখানে শরীফ সাহেবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ-যোগ্য মনে হয়েছে, সেখানে সানন্দে মেনে নিয়েছেন, যেখানে মানতে পারেন নি, সেখানেও তাঁর তথ্যকে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'ডঃ আহমদ শরীফ এবং অধ্যাপক আবু তালিব আমার সুযোগ্য প্রাক্তন ছাত্রদ্বয়ের সহকারিতায় এই সংস্করণ বিশেষ হিতসাধিত হইয়াছে।' তাই একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের সাহিত্যের ওপর আহমদ শরীফের অধিকার তাঁকে ঐ যুগের বিশেষজ্ঞরূপে প্রতিপন্ন করেছে এবং সেই পরিচয়েই Serious সাহিত্যপাঠকের পরিশুদ্ধ চেতনার মধ্যে তিনি বিরাজ করবেন।

পরিশিষ্ট

আহমদ শরীফ সাহেব সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। **পুঁথি পরিচিত।** আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত। প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

(A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, In Munshi Abdul Karim's Collection. By Munshi Abdul Karim and Mr. Ahmad Sharif. English Edition by Dr. Sajjad Husain. Asiatic Society of Pakistan Publication No 3.1960. pp 1-XXVII +1-589 Appendix 1-XXVII.

২। **তোহফা।** আলাউল বিরচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৩। **সত্যকাল বিবাদ সংবাদ।** মুহম্মদ খান বিরচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৪। **মুসলিম কবির পদ সাহিত্য।** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৫। **রসুল বিজয়।** জয়েন উদ্দীন বিরচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৬। **মধ্যযুগের গীতি কবিতা।** অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

৭। **লায়লী মজনু।** দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত। প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ভূমিকাঃ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।

৮। **মধুমালতী।** মুহম্মদ কবির বিরচিত। ১৯৬০। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯। **রাগতাল নামা পদাবলী।** আলাওল বিরচিত। বাংলা একাডেমী। ঢাকা।

১০। **নীতিশাস্ত্রবার্তা।** মুজাম্মিল বিরচিত। ১৯৬৫। বাংলা একাডেমী ঢাকা।

১১। **সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল।** আলাওল বিরচিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২২। **শাহবারিদ খান গ্রন্থাবলী।** বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩। **মধ্যযুগের রাগতালনামা।** বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৪। **মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ।** বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৫। **চন্দ্রাবতী।** বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৬। **বাউল মত ও বাউল গান।** বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৭। **পুঁথির ফসল।**

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনন্ত-নবীন নরেন্দ্র দেব

কবি নরেন্দ্র দেব দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁর আত্মীয়, সকলেই তাঁর প্রিয় জীবনে কখনও কারো নিন্দা করেন নি নরেন দা। এই নরেন দা নামেই তিনি সর্বজনপরিচিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে আরেক অজাতশত্রু স্মরণীয় পুরুষ ছিলেন জলধর সেন, 'জলধরদা' নামে যিনি সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। নরেন্দ্র দেব এই জলধর দাদার অতি স্নেহভাজন ছিলেন, এমনকি নরেন্দ্র দেবের বিবাহে কন্যা সম্প্রদানও করেছেন এই জলধর দাদা। আর এক স্মরণীয় মানুষের স্নেহভাজন ছিলেন নরেন দা, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাঁর জীবদ্দশায় 'শরৎ দা' বলে সবাই সম্বোধন করতেন। চল্লিশ বছরেরও ওপর এই সদ্য পরলোকগত সাহিত্যিককে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। সকল অবস্থায় প্রসন্ন, মধুর হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত। যে তাঁকে প্রচন্ড আঘাত দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে তার জন্যও নরেন্দ্র দেবের কন্ঠে উচ্চারিত হয়েছে সুমধুর আশ্বাসবাণী, এ আমরা অনেকবার শুনেছি।

'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কয়েক বছর আগে থেকেই তার যখন তোড়জোড় চলছিল তখন কবিদম্পতি একাধিক বৈঠকে উপস্থিত থেকে নানাবিধ উপদেশ ও পরামর্শ দান করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে 'অমৃত' একজন পৃষ্ঠপোষক থেকে বঞ্চিত হল যাঁর সঙ্গে এই পত্রিকার অন্তরের যোগ ছিল।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র দেবের যে দীপ্ত পুরুষোচিত মূর্তি দেখেছি জীবনের শেষ দিনটিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মানুষটির মধ্যেও সেই পৌরুষের অভাব দেখিনি। অথচ কত কোমল, কত মধুর। মৃতদেহ দেখে মনে হয়েছে সদাহাস্যময়, পরিহাসরসিক নরেনদা এইবার হয়ত কিছু বলবেন।

উৎসবে, ব্যসনে, রাজদ্বারে, শ্মশানে যিনি হাজির থাকেন তিনিই বন্ধু। নরেন্দ্র দেব আজীবন এই নীতি প্রতিপালন করেছেন। বন্ধুজনের এই সংজ্ঞা তাঁর চরিত্রে আশ্চর্য খাপ খেয়ে যায়। বাংলা দেশে সাহিত্যিকরা পরিণত বয়সে পৌঁছালে বিস্মৃত হয়ে যান, এমনই এক বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের শ্রাদ্ধবাসরে দেখা গেল নরেন্দ্র দেব উপস্থিত, সবাই ভুলেছে তিনি কিন্তু ভোলেন নি। আবার রাজশেখর বসুর শবযাত্রায় নরেন্দ্র দেব মৃদুগলায় বলছেন—কেউ হরিধ্বনি করছে না, এস আমরা বলি—বল হরি হরিবোল। অথচ নরেন্দ্র দেবের শরীর গত কয়েক বছর ধরে বেশ খারাপ ছিল। একই দিনে একাধিক বিবাহ সভায় যোগ দিয়েছেন নরেন্দ্র দেব এবং দক্ষিণ কলিকাতা থেকে উত্তর কলিকাতার পাইকপাড়া পর্যন্ত ছুটতেও তিনি ক্লান্তি বোধ করেন নি।

আশ্চর্য সামাজিকতা জ্ঞান, পরিশীলিত রুচি, পরিমিতিবোধ ঠনঠনিয়ার প্রাচীন বংশের এই মানুষটিকে এক অবিস্মরণীয় সাহিত্যিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নরেন্দ্র দেব 'ভারতী' যুগের সাহিত্যিক। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে আজ বাকী আছেন শুধু অমল হোম, চারু রায় আর প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, বাকি সবাই তিরোহিত। 'ভারতী' যুগ বাংলা সাহিত্যের এক সুবর্ণ যুগ, 'ভারতী' যুগে যে আধুনিকতার উন্মেষ তারই বিকশিতরূপ 'কল্লোল যুগ'। ভারতী দলের সাহিত্যিকদের কল্লোলের কালের সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। নরেনদার ধারাবাহিক উপন্যাস 'গাদুঘর' কল্লোলে প্রকাশিত হয়। সেকালের মাপকাঠিতে সেই উপন্যাস ছিল দুঃসাহসিক। পরে তিনি 'কৃত্তিবাসে'ও লিখেছেন শুনেছি।

নরেন্দ্র দেবের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৈপ্লবিক। তিনি শুধু কবি বা উপন্যাসকার হিসাবেই যে সাহসিকতার পরিচয় দেখিয়েছেন তা নয়, তাঁর নিজের জীবনে রাধারানী দত্তকে বিবাহ করেও তিনি যথেষ্ট দুঃসাহস প্রকাশ করেন। প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন না মেনে তিনি যখন বিবাহ করলেন তখন এই কলকাতায় প্রচন্ড হৈ-চৈ চলল এমনকি সংবাদপত্রেও বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে সেদিন সমর্থন করেছিল সে যুগের তরুণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা। দৈনিক বাংলার কথায় (সুভাষচন্দ্র পরিচালিত) এই বিবাহ সমর্থিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই কবি দম্পতিকে বিশেষ স্নেহ করতেন, তাঁর কয়েকখানি মূল্যবান চিঠি রাধারানী দেবীকে লিখিত। আবার শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিলেন এই কবিদম্পতি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেছিলেন রাধারানী দেবী।

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় কবিদম্পতি। নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীও অনুরূপভাবে স্মরণযোগ্য। নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবী দীর্ঘদিন দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে ক্লেশভোগ করেছেন। তথাপি স্বামী-স্ত্রী কারো মুখে হাসির অভাব ঘটেনি।

নরেন্দ্র দেব শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানতেন, শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই তিনি শুনেছিলেন অনেক কথা। তাঁর সেইসব কাহিনীর কিছু হয়ত পাওয়া যাবে 'শরৎচন্দ্র' নামক অধুনা দুষ্প্রাপ্য জীবনীগ্রন্থে। এই সুন্দর জীবনীগ্রন্থটির নতুন সংস্করণ করার বিশেষ বাসনা ছিল নরেন দা-র।

নরেন্দ্র দেব লিখেছেন প্রচুর। কবি নরেন্দ্র দেবের গরমিল, আকাশ কুসুম,

যাদুঘর, খেলার পুতুল প্রভৃতি উপন্যাসগুলি একদা জনপ্রিয় ছিল। বিশেষতঃ যাদুঘর এবং খেলার পুতুল। তাঁর সচিত্র কাব্যগ্রন্থ 'বসুধারা' বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় গ্রন্থ। সিনেমার কলাকৌশল বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সে যুগে তিনি লিখেছিলেন তার নাম 'সিনেমা', এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রথম। নরেন্দ্র দেব অনূদিত 'ওমর খৈয়াম', 'মেঘদূত' ও 'দেওয়ান-ই-হাফিজ' পড়েন নি পঞ্চাশোর্ধ্বে এমন শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় কম।

আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রথমতম কাব্যসঞ্চয়ন বা এনথোলজি সম্পাদনা করেন নরেন্দ্র দেব। 'কাব্য-দীপালি' নামক সেই চিত্রবহুলে কাব্যগ্রন্থটির পথম সংস্করণে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, চারু রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, যতীন্দ্র-কুমার সেন প্রভৃতি সেকালের প্রখ্যাত বাঙালী শিল্পীদের অজস্র ছবি ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সঞ্চয়নটির নামকরণ করেন 'কাব্য দীপালি'। এই গ্রন্থের ভূমিকায় নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন—

"এই গ্রন্থে আমি কেবলমাত্র একালের কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় একত্র করার চেষ্টা করেছি। বর্তমান যুগের ও সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আমি একেবারে আজকের দিনের সদ্যসমাগত কয়েকটি তরুণ কবির সুন্দর রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।"

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেকালের অনেক নবীন কবিকে স্বীকৃতি দান করেছিলেন। প্যালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারীর সমশ্রেণীর এই সঞ্চয়নগ্রন্থ বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তা বর্ধনে সহায়ক হয়েছে। সেদিনের সেইসব অল্পখ্যাত কবিবৃন্দের নাম—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, জসিমউদ্দীন, অচিন্ত্যকুমার, শিবরাম, উমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী প্রভৃতি।

পরিণত বয়সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপ ভ্রমণ করেছিলেন নরেন্দ্র দেব সপরিবারে। 'সাহেব বিবির দেশে' নামক রম্য ভ্রমণকথায় তার সুখপাঠ্য বিবরণ তিনি লিখে গেছেন।

নরেন্দ্র দেব রচিত 'ফাল্গুনী' কবিতার কয়েকটি লাইন—

"তোমারে চিনেছি আমি আজ
তরুণের স্বপ্নরাজ্যে তুমি যে গো
চির-যুবরাজ।"

আর তারপর আছে—

এলে তুমি অনন্ত-নবীনে
প্রকৃতির প্রহেলিকা মরণের কোলে
যুগে যুগে জরা-মৃত্যুহীন।।

নরেন্দ্র দেব সত্যই প্রকৃতির প্রহেলিকা। জরামৃত্যুহীন এই পরমপ্রিয় মানুষটির বিয়োগে বাংলা সাহিত্য জগতে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হল, এই কথা অত্যুক্তি নয়।

—অভয়ংকর

নরেনদা—আমাদের নরেনদা ॥

বনফুল

নরেনদা' চলে গেলেন ঃ
সারা জীবন একটি কথাই বলে গেলেন
'ভালবাসি'
ভালবাসি তোমাদের হাসি
তোমাদের আনন্দ
তোমাদের মুক্ত-প্রাণের ছন্দ।
তোমরা যা-ই হও, ছোট বড়, ভালো মন্দ
সুগন্ধ, নির্গন্ধ
দুর্বল প্রবল
সবল, প্রবল
দুর্বল, অবল
সার, অসার
আমার ঘরের দ্বার
অবারিত সকলের জন্য,
সকলকে পেয়ে আমি ধন্য।
সবার কাছে একটি জিনিসই প্রাণভরে চেয়েছি
প্রাণ ভরে পেয়েছি
সে জিনিসটি — ভালবাসা।
ওতেই মিটেছে সব সাধ পুরেছে সব আশা।
অফুরন্ত পেয়েছি
তোমাদের প্রেম-গঙ্গার পবিত্র নীরে সারা জীবন নেয়েছি।
এই তো পরম সুখ, এই তো পরম সম্বল,
এই তো অপার তৃপ্তি
অম্লান-দীপ্তি
এই তো অমিয় অপরিমেয়।
এই তো আমার পাথেয়.....'

এই কথাই সারা-জীবন বলে গেলেন
অবশেষে চলে গেলেন।

তিনটি যুগের উপর দিয়ে বিরাট নদীর মতো
বয়ে গেল যে বিরাট জীবনধারা
আজ সেটা হঠাৎ হ'ল হারা
মহাজটিল একটা অজানা অরণ্যের আড়ালে।
তার অন্ধকার নিবিড়তার অন্তরালে
ফুটল তাঁর নূতন রূপ
অপরূপ অপরূপ।

দেখছি ওই বিরাট নদীর দু' পারে
দাঁড়িয়ে আছে সারে সারে
অনেক লোক, অনেক পল্লী, অনেক কুটির, অনেক প্রাসাদ
অনেক প্রেম, অনেক আশা, অনেক সাধ
অনেক নহবতখানায় অনেক পূরবীতে বাজছে অনেক নহবত
আমিও দাঁড়িয়ে আছি নির্বাক জড়বৎ।
ভাবছি, যা হারালাম তা কি পাব আর
আকাশে কালো মেঘ, চারিদিকে অন্ধকার।

সাহিত্যের খবর

উল্টোরথ পুরস্কার।। এবারের উল্টো-রথ পুরস্কার লাভ করেছেন কবি দক্ষিণা-রঞ্জন বসু। 'উল্টোরথ' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বছরই এক কবিকে এই পুরস্কারে সম্মানীত করা হয়। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য পাঁচশত টাকা।

বাংলা সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জন বসু একটি স্মরণীয় নাম। ১৯১২ খৃঃ তাঁর জন্ম হয়। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার তিনি বার্তাসম্পাদক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবা-দিকতা বিভাগের তিনি অন্যতম অধ্যাপক। এ পর্যন্ত তাঁর পঞ্চাশের উপর কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে। ১৯৬৬ সালে তিনি সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'কালো মেঘ' (উপন্যাস), 'পোড়ামাটি' (ছোটগল্প), 'স্বপ্ন কোরক' (ছোট গল্প), 'আরো সূর্যের কাছে' (কবিতা), 'অলক্ষ্যে বিকেল' (কবিতা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশের উপর কাব্যগ্রন্থটি খুবই অভি-নন্দিত হয়েছে। এছাড়াও 'জীবনচিত্রে সমাজচিত্র' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটি বিদগ্ধ রসিকজনের দ্বারা বহুল প্রশংসিত হয়েছে। তিনি পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর রচিত সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তা সবদাই মানুষের সপক্ষে। মানুষই তাঁর সাহিত্যের প্রধান বিষয়।

পরলোকে ফরাসী ঔপন্যাসিক।। প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সমালোচক এম আন্দ্রে বুলি গত রবিবার, ১১ এপ্রিল প্যারীতে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বোদলেয়র, বালজাক প্রমুখের জীবনী খুবই খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৫৪ খৃঃ তিনি 'গ্র্যান্ড প্রিক্স ন্যাশানাল দ্য ল্যাটার্স' পুরস্কারে সম্মানিত হন।

পরলোকে অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।। বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক অধ্যাপক অমিয়-রতন মুখোপাধ্যায় গত রবিবার পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬০ বৎসর। বাংলা ভাষায় তিনি প্রায় ১৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ। তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি সুদীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যে সমা-দৃত হবে বলে আশা করা যায়।

সারা ভারত হাস্যকবি সম্মেলন।। গত শনিবার কলকাতার কলামন্দিরে সারা ভারত হাস্যকবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে লক্ষ্নৌ থেকে মায়া দেবী, দিল্লি থেকে আহিত্য, হাথরাস থেকে কাকা হাথরাসি, উত্তরপ্রদেশ থেকে বিমলেশ প্রমুখ যোগদান করেন। শ্রোতারা খুব ভালভাবে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। এই ধরণের কবি সম্মেলন এর আগে কলকাতায় আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

ইরাণী গবেষকের সম্মান।। এ বছর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একজন ইরানী গবেষককে পার্শীতে ঋকবেদ ও একটি উপনিষদ অনুবাদের জন্য সম্মানিত করে-ছেন। তিনি অনুষ্ঠানে বলেন যে, ইউরোপের দার্শনিকরা পার্শীতে অনুদিত বেদ ও উপনিষদই প্রথম পাঠ করেন। শোফেন-হাওয়ার পার্শী থেকেই জর্মন ভাষায় এর অনুবাদ করেন। কালিদাসের 'শকুন্তলা' পার্শী থেকেই জর্মনে অনুদিত হয়েছিল এবং তা পড়েই গায়টে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এভাবেই ভারতের সঙ্গে প্রতীচ্যের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হারমেন হেস বুদ্ধের জীবন অবলম্বন করে একটি উপন্যাস রচনা করেন। এছাড়াও আরো বহু জর্মন লেখক এপথে অগ্রসর হয়েছেন আর তার দুয়ার প্রথম উন্মুক্ত করেছে পার্শী ভাষা।

আজকের জাপানী কবিতা।। 'পোয়েট্রি অস্ট্রেলিয়া' পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক কাব্য জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই পত্রিকাটি অস্ট্রেলিয়ার কবিতা প্রকাশ ছাড়াও মাঝে মাঝে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে অন্য দেশের প্রতিনিধিমূলক কবিতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন। এর আগে কানাডা, ইতালী, ফ্রান্স ও জর্মানীর কবিতার উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যাটি আধু-নিক জাপানী কবিতার উপর। সমকালীন প্রতিষ্ঠিত জাপানী কবিদের এমন সুনির্বা-চিত ইংরেজিতে অনুদিত সংকলন আমার চোখে এর আগে পড়েনি। কবিতাগুলি পড়ে ভারতীয় কবিতার সঙ্গে কেমন যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক কবিই প্রতীক হিসেবে 'বেলফুল', 'মাছ-রাঙ্গা পাখি', 'পাহাড়', 'সূর্য' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। বিশিষ্ট জাপানী কবি-দের মধ্যে এই সংখ্যায় যাঁরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে-ছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন, হারুয়ো শিবায়া, শিরো মুরানো, ইওয়াতা হিরোসি, সাতো হারুয়ো, তোগে সানকিচি, কিহারা কইচি, যোশিও হিরোশি প্রমুখ। এই কবিদের অধিকাংশেরই জন্ম ১৯২০ পর। কবিতা-গুলির অনুবাদক বিশিষ্ট ইংরেজ কবি জেমস কিরকাপ। আধুনিক জাপানী কবিতা সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকদের কাছে পত্রিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

—চার্বাক

রমাপদ চৌধুরীর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ

পঃ বঃ সরকার সাহিত্যিক শ্রীরমাপদ চৌধুরীকে তাঁর 'এখনই' উপন্যাসের জন্য সাহিত্যে ১৯৭০-৭১ সালের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এই পুরস্কার বাবদ ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

নতুন বই

Elections 1971 — Edited by S. Sarkar, M. C. Sarkar and Sons Private Ltd, 14 Bankim Chatterjee St. Calcutta-12. Price: Rs. 4.00

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে, এ যাবৎ কয়েকটি রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন হলেও, এই সর্বপ্রথম পার্লামেন্টের জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কার্যকাল শেষ হবার প্রায় চৌদ্দমাস আগে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন হয় ১—১০ মার্চ পর্যন্ত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতব্যাপী নব-কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা যে বিপুলভাবে বেড়ে গেছে তা প্রকাশিত হয়েছে এবারের নির্বা-চনে।

হিন্দুস্থান ইয়ার বুকের বিদগ্ধ সম্পাদক শ্রী এস সরকার '৭১ সালের নির্বা-চনের ফলাফল সম্বলিত একখানি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। নির্বাচন সম্পর্কে বহু তথ্য পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। পার্লা-মেন্টে এবং বিভিন্ন রাজ্যে দলগত অবস্থার বিস্তৃত পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিসভার তালিকা। রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য ও পরিচয়। সেইসঙ্গে আছে রাজনৈতিক নেতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বিভিন্ন রাজ-নৈতিক সংগঠন, সাংবাদিক এবং উৎসাহী ব্যক্তিদের কাছে বইটি সমাদৃত হবে।

তিনটি গল্প : দিলীপ সেনগুপ্ত। বিশ্ব-জ্ঞান, ৯। ৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

তরুণ গল্পকার দিলীপ সেনগুপ্তের আলোচ্য সংকলনটি তিনটি ছোট গল্পের সমষ্টি। সংকলনটি যথার্থ অর্থে গ্রন্থ নয়, 'বুকলেট'। সংকলিত গল্প তিনটির নাম 'দোলনার শিশু', 'জানালা', 'অরাজনৈতিক'। তিনটি গল্পের মূল বিষয় সাম্প্রতিক জীবন,

সমাজ ও তন্নিহিত অসহায় মানুষের সংগ্রামবাসনা ও বিষাদান্ত পরিণতি। সমকালকে মমতায় স্পর্শ করেছেন লেখক, এবং শিল্পক্ষমতায় কালকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছেন শেষের ব্যঞ্জনায়। তিনটি গল্পের মধ্যে 'দোলনার শিশু' সার্থকতম। এর ব্যঙ্গ ও পরিণতির ব্যঞ্জনা, 'জানালা' গল্পের প্রতীকী সমাপ্তি তরুণ লেখকের যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেয়। গদ্যের আড়ষ্টতা সরাতে পারলে লেখক বিস্ময়কর শিল্পক্ষমতার পরিচয় দিতেন বলে মনে হয়।

আমিও তোমারই ঘরে, বাংলা দেশ—কবিতা গ্রন্থাগারের পক্ষে স্বদেশরঞ্জন দত্ত ও সামসুল হক কর্তৃক প্রচারিত। রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়াম (ব্লক : ২, রুম : ৬), কলকাতা-২৯। দাম : পঁচিশ পয়সা।

মধুসূদন দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, ফণিভূষণ আচার্য, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বাসুদেব দেব, পূর্ণেন্দু পত্রী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কবিরুল ইসলাম, শ্যামসুন্দর দে, সামসুল হক—এই কয়েকজন কবির কবিতার অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই পুস্তিকায়।

সেই মন সেই দাহ (উপন্যাস)—রাজ চক্রবর্তী। সজনী প্রেস, ৬৭।এ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা—৩৭। দাম : বারো টাকা।

বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে—মহাজনউক্তিটি কিন্তু সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের। আলোচ্য উপন্যাসটি সেই অভিশপ্ত জীবনের বেদনাক্ত কাহিনী। বেদনা এবং অভিশাপ তিনটি জীবনের। ত্রয়ীর জীবনের প্রেম, প্যাশান এবং অন্তর্জ্বালার বিয়োগান্ত কাহিনী এই উপন্যাসের পটভূমি। শুরু, চিরাচরিত ত্রিমুখী সংঘর্ষ দিয়ে। সমতলভূমি থেকে কাহিনীর কথারম্ভ, মধ্য ও অন্ত আবর্তিত হয়েছে বাংলার বাইরে নিবিড় অরণ্যানীর আলোছায়াভরা রহস্যময় পরিবেশে। বহু বাধা বিপত্তির পর পরিমল চক্রবর্তী মল্লিকাকে একান্তভাবে পেয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ অরুণ রায় নানা ঘটনার শেষে ওদের দুজনার বন্ধু হয়ে দেখা দিল। কিন্তু পাহাড়ী-ললনা দুরন্তযৌবনা লোমাওরাদিং পরিমলের বিবাহিত জীবনে যেন নির্মম নিয়তি হয়ে দেখা দিল। উদ্দাম জীবনের শিকার হল পরিমল। স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে দিনমানে মিঃ জেকিল এবং রাত্রে ভয়াবহ মিঃ হাইডে পরিণত হল। প্রেম প্যাশান এবং ক্লেদাক্ত কামনার আগুনে জলেপুড়ে ছাই হয়ে গেল কটি জীবন। বল্গাহীন অসংযম ও বিকৃত ধ্যানধারণা নির্মম নিয়ামকের মতো টেনে নিয়ে যায় মানুষকে আপন ধ্বংসের দিকে, তারই ট্র্যাজিক চিত্র দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন লেখক শ্রীচক্রবর্তী। কাহিনীর বুননে এবং নাটকীয় ঘটনার সন্নিবেশে কাহিনীকার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন শুরু থেকে শেষ অবধি।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান (কাহিনী)—ভগৎরাম তলওয়ার। চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, ৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা : ১২। দাম : চার টাকা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর বই বেরিয়েছে এবং আরো বেরুবে। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতার চেয়ে কল্পনার আধিক্যই বেশি। আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনীকার শ্রীভগৎরাম তলওয়ার আজন্ম ব্রিটিশবিরোধী এবং বিপ্লবী। ভারত থেকে নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীও তিনি। নেতাজীর অন্তর্ধানের বিপদসংকুল কৌতূহলোদ্দীপক অজানা অধ্যায় অন্তরঙ্গতার সঙ্গে উন্মোচন করেছেন কাহিনীকার শ্রীতলওয়ার। তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে মেলে ধরেছেন অন্তর্ধানের ('ইনসাইড স্টোরী') একেবারের 'ভেতরকার কাহিনী'। বলা বাহুল্য বইখানি জনসমাদর লাভ করবে।

জাহাজডুবি (গল্প সংকলন)—সত্যব্রত রায়। জ্ঞান নিকেতন, ১৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা : ১২। দাম : তিন টাকা।

ছোট গল্প সংকলন। হাসির গল্প সবগুলিই। টুকরো টুকরো ঘটনাকে ঘিরে কাহিনীগুলির মধ্যে হাস্যরস সঞ্চারের চেষ্টা লেখক করেছেন এবং পেরেছেনও।

জিন্দের বন্দী (নাটক)—নবকুমার গড়াই। নবনাট্য নিক্বাষণ, মলয়পুর, হুগলী। দাম : চার টাকা।

'দি প্রিজনার অব জেন্দা' ছায়াচিত্র কাহিনী এককালে দর্শকচিত্তে দারুণ ঔৎসুক্য ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অ্যানথনী হোপের সেই জনপ্রিয় গ্রন্থের ছায়া নিয়ে নবীন নাট্যকার শ্রীনবকুমার গড়াই রচনা করেছেন 'জিন্দের বন্দী' নাটকটি। ছায়া নিলেও নাট্যশরীর গড়ে উঠেছে মৌলিক ঘটনা-সংস্থাপনে এবং তীক্ষ্ণ সংলাপে। ফলে বিদেশী গন্ধ কোথাও না থাকায় এটি হয়ে উঠেছে একেবারে প্রায় মৌলিক নাটক. নাট্যামোদীদের কাছে এই নাটক সমাদর পাবে অতি অবশ্যই।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কালি ও কলম (চৈত্র ১৩৭৭)—সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : পঁচাত্তর পয়সা।

বাংলা দেশ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধটি সময়োপযোগী। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সেই অবিস্মরণীয় উক্তি : 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়েও বেশি সত্য আমরা বাঙালী'—স্মরণ করা হয়েছে 'আমাদের কথায়'। এ সংখ্যার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য লেখা সুরেশ চক্রবর্তীর 'আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ'। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন প্রভাতকুমার দত্ত, প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ, চন্দন সেন, আবু করিম, যজ্ঞেশ্বর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও আরো কয়েকজন।

তির্যক (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ '৭৮)—সম্পাদক : সেখ সদরউদ্দিন। ৪বি, ম্যাডান স্ট্রীট, কলকাতা : ১৩। দাম : এক টাকা।

গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাটিকে 'সুস্বাগতম' বলে অভিনন্দিত করি। শুধু সাহিত্য নয় সমাজের শ্রেয়ও এ পত্রিকার লক্ষ্য। পত্রিকাটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলবার জন্যে নানান বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। সূচনা-সংখ্যায় লিখেছেন : সর্বশ্রী নরেন্দ্র দেব, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, গোপাল ভৌমিক, শান্তশীল দাস, কল্পতরু নাগ, সেখ সদরউদ্দিন, হারাধন কর্মকার, কল্পনা সেন, ডাক্তারবাবু, শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, হেমেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও মাসিক পত্রিকাটি মূলতঃ পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত এলাকা-সমূহের জনকল্যাণে নিবেদিত তরুণ বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত। শহরতলীর এবং পল্লী-বাংলার সমস্যা এবং সংবাদ আশাকরি 'তির্যক'-দৃষ্টির দর্পণে প্রতিফলিত হবে।

আমার বাঙলা (উদ্বোধনী সংখ্যা) : সম্পাদক : নবকুমার শীল ও অপূর্বকুমার সাহা। ৭৫।৫এ, বাগবাজার স্ট্রীট। কলকাতা-তিন। দাম পনের পয়সা।

বাঙলা দেশে নতুন যুগের সূচনার পরিপ্রেক্ষিতে এপারের বাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকাটি। স্বাধীন বাঙলা দেশ সম্পর্কে সংবাদ এবং কিছু তথ্য আছে পত্রিকাটিতে।

ক্ষণিকা (বসন্ত সংখ্যা) : সম্পাদক প্রশান্ত দাঁ ও জয়ন্ত রায়। ২৫।এ, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-৫। দাম : চল্লিশ পয়সা।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে : 'মানুষের অভিলাষ ও বাস্তবের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, ট্র্যাজেডির জন্ম বোধহয় সেখানেই।...অত্যন্ত আশার কথা, এই ট্র্যাজেডির ছোঁয়াচ, 'ক্ষণিকা'য় লাগেনি।' পত্রিকাটির রচনামান উন্নত। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' প্রসঙ্গে অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ীর লেখাটি ভালো। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তপনকিরণ দাশ,

গুপ্ত, প্রভাস শীল, মণি চক্রবর্তী, মানিক-লাল দাস, দেবনাথ দাঁ, অসীম রেজ, প্রশান্ত দাঁ, জয়ন্ত রায়, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অরিজিৎ।

আশীর্বাদ (চতুর্থ সংকলন)—সম্পাদক অসিতকুমার দে। পাবনা কলোনী, চাকদহ, নদীয়া। চল্লিশ পয়সা।

একালে আবার কোনো কাগজের নাম 'আশীর্বাদ' হয় নাকি? অনুমান হয়, সম্পাদক তরুণ বয়স্ক। সাহিত্যিক হবার উৎসাহে আছেন। প্রকাশিত লেখাগুলি কিন্তু দুর্বল নয়। কয়েকটি লেখা তো রীতিমতো উন্নত মানের। বিশেষ করে বীরেন্দ্র দত্তের প্রবন্ধটিতে (প্রেম নিঃসঙ্গতা শিল্প) অনেক কিছু ভাবনার খোরাক আছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পুলকেশ দে সরকার, অমিতকুমার দে, অনিলচন্দ্র বসু ও আরো কয়েকজন। পত্রিকাটি ছাপা হয়েছে নিউজপ্রিন্টে।

কণ্ঠস্বর—(জয় বাংলা সংখ্যা) সম্পাদক : সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ৪৯।এল।৭, নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। কলকাতা-১১। দাম ৫০ পয়সা।

বাঙলাদেশ সম্পর্কে লিখেছেন পান্নালাল দাশগুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন গণেশ সেন, বিমলেন্দু বড়ুয়া, জাহাঙ্গীর মহিমউদ্দিন, আখতার হুসেন, মাহবুব তালুকদার, আবিবকরিম, আসেম আনসারী, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রণব-বসু রায়, খান মোহাম্মদ ফারাবী, অম্বুজেন্দ্র ঘোষ, চন্দন ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন।

প্রাপ্তি স্বীকার

স্বাক্ষর (নববর্ষ সংকলন '৭৮) সম্পাদক প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়। ৪৭ রাজবল্লভ সাহা লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া। পঁচিশ পয়সা। **বুলবুল** (ত্রৈমাসিক) সম্পাদক : এম এস সিরাজুল ইসলাম। ২ ওয়ালিউল্লা লেন, কলকাতা-১৬। **সপ্তদ্বীপ**, (বিহারের ত্রৈমাসিক পত্রিকা) সম্পাদক : জীবনময় দত্ত ও রবীন দত্ত। এ।১২৪, কংকরবাগ কলোনী, পাটনা-১। **আমার সোনার বাংলা** (কবিতা সংকলন) সম্পাদক : কার্তিক ঘোষ ও সুভাষ উকিল। ৭২।১ শিশির ভাদুড়ী সরণি, কলকাতা-৬। পঁচিশ পয়সা। **নূপুর** (দ্বিমাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক : সুধীর ভৌমিক। হেনা বাসর, শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। এক টাকা। **বিস্ময়** (ফাল্গুন-চৈত্র '৭৭) সম্পাদক : অমল মিত্র ও নরেশ মালাকার ৩১ গৌরী-বাড়ী লেন, কলকাতা-৪। পঁয়ত্রিশ পয়সা। **দীপিকা** (নববর্ষ '৭৮)—সম্পাদক : দীপঙ্কর গুহ প্রমুখ। ধনিয়াখালী, হুগলী। পঁচিশ পয়সা। **সাইরেন**—সম্পাদক : গোপাল সাহা। বালুর ঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। এক টাকা।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস

সাহিত্য সমালোচনা যে কোন সাহিত্যের সম্পদ। বিদগ্ধ পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে এখন পর্যন্ত আমরা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে পারিনি। অথচ বাংলা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য এবং বিস্তার অনুধাবন করলে এই বিভাগটির দৈন্য নজরে পড়বে। ইংরেজী-সাহিত্যের সমালোচনার ইতিহাস লিখে সেইন্টসবেরী এক বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। ইংরেজী সমালোচনা পাঠ করতে হলে সেইন্টসবেরীর বই অবশ্যই পঠনীয়। আমরা চাই সেইন্টসবেরীর মতন বাংলা দেশের কেউ একখানি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস লিখে এই দিকটা পূর্ণ করুন। গত একশ বছরে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহু গুণী সমালোচকের আবির্ভাব ঘটেছে। কেউ বঙ্কিমচন্দ্র, কেউ রবীন্দ্রনাথ এবং কেউবা শরৎচন্দ্র এবং হাল ফিল বাংলা-সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি এবং লেখকদের কাব্য-সাহিত্যাদির ব্যাপক আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য অনেক দিকপাল কবি এবং লেখক আছেন, যারা একসময়ে বিখ্যাত সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের যথেষ্ট এবং বিচিত্র ধরনের সমালোচনা হয়েছে। কাজেই সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার যে প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম তা আশা করি স্বীকার্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো একটু বক্তব্য আছে, এবার তাই আলোচনা করব।

অন্যান্য কবি এবং লেখকদের কথা বাদ দিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্য নিয়ে এত ব্যাপক আলোচনা হয়েছে, যা একজন রসজ্ঞ পাঠকের পক্ষে সংগ্রহ করে পাঠ করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া অনেক সমালোচনা বিচ্ছিন্ন আকারে পাঠ করলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন সমালোচক কীভাবে এবং কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এদের সাহিত্য-কর্মকে বিচার করেছেন, তা বুঝতে হলে আলোচনার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা (integrated discussion) বজায় রাখা দরকার। ধরা যাক পদাবলী সাহিত্যের কথা। পদাবলী সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা এবং আলোচনার অন্ত নেই। বিভিন্ন পদকর্তার রচনাকে সমালোচকরা নানাভাবে বিচার, বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করবার চেষ্টা করেছেন। লোক-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এটা সাহিত্যের নিয়ম।

ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করেন তারা নিশ্চয় জানেন যে একমাত্র শেকসপীয়রের নাটকগুলো নিয়ে যা আলোচনা হয়েছে, তা প্রায় ইতিহাস বিশেষ। ড্রাইডেন থেকে শুরু করে উইলসন নাইট পর্যন্ত সমালোচনার ধারাটি ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। এবং এই সমালোচনার ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে সতের শতকের সমালোচকদের সঙ্গে বিশ শতকের শেকসপীয়র সমালোচনার পার্থক্য কোথায়। কারণ সমালোচনার ধারা কখনও একরকম থাকে না। শেকসপীয়রের সমালোচনার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে টি এস এলিয়ট বলেছেন

> "Shakespeare criticism will always change as the world changes, ... The view of Shakespeare taken by different men at different times in different places forms an integral part of the development and change of European civilisation during the last 300 years." (A companion to Shakespearean studies).

ইংরেজি সাহিত্যে সিডনী থেকে শুরু করে অসংখ্য সমালোচক রয়েছেন। তার মধ্যে বিখ্যাত কবি কলরিজ, শেলী এবং ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেইন্টসবেরী তার হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ক্রিটিসিজম গ্রন্থে এইসব সমালোচকদের বিস্তৃত আলোচনা করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বাংলা-সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য, মুকুন্দ দাশের কাব্য, নবীন সেনের কাব্য, মাইকেলের কাব্য, পদাবলী-সাহিত্য, পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে খ্যাতনামা সমালোচকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাছাড়া বাংলা ভাষাতত্ত্ব এবং ধ্বনি ও ছন্দ প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে। বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা কিংবা বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলো বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনার ধারাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তার ধারাবাহিকতা এবং একটা তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলা-সাহিত্যে সমালোচকের সংখ্যার অভাব নেই। বিভিন্ন সময়ের সাহিত্য এবং কাব্যকে সমালোচকরা কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং আজকের আধুনিক সমালোচনার সঙ্গে তাদের মূলগত পার্থক্য কোথায়, তা স্পষ্টরূপে বুঝতে হলে সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাস একান্তভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন। এই ইতিহাস কেবলমাত্র সমালোচকদের ইতিহাস নয়, সমসাময়িক সমাজ এবং সংস্কৃতিরও একটা ইতিহাস এই আলোচনায় বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে।

নিশীথ চক্রবর্তী

নজরুল জয়ন্তী আসছে

প্রত্যেক বছরই যা হয়, এবারো নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম হবে না। জ্যৈষ্ঠের গোড়ার দিকে বেরোবে দু-একটা বুকলেট, লিফলেট ও লিটল ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যা। আর সংবাদপত্রে ছাপা হবে, একটি ছোট্ট লেখাসহ ফুলের মালা গলায় দেওয়া বিদ্রোহী কবির একটি নির্বাক ছবি। হয়তো তাঁর সাম্প্রতিকতম, স্বাস্থ্য ও চেহারার কিছুটা অস্ফুট আভাসও ফুটে উঠবে সেই ছবির মধ্যে।

বাস্, আর কিছু নয়?

হ্যাঁ, হবে আরো অনেক অনুষ্ঠান—মহাজাতি সদনে কিংবা অন্যত্র—বেতারে এবং অন্য বহু জায়গায়। বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা ভিড় করবেন তাঁর বাসায়। এগারোই জ্যৈষ্ঠের ভোরবেলা থেকেই চলবে নানাজনের যাতায়াত। কেউবা উপহার দেবেন লাল কিংবা সাদা ফুলের তোড়া। রজনী-গন্ধা কিংবা গোলাপের গুচ্ছ। কেউবা শুনিয়ে আসবেন সময়োপযোগী দু'একটা গান: 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?'

জল্পনা-কল্পনা

এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে উৎসবের প্রস্তুতি। অবশ্য সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে নয়, কাজ চলেছে ভেতরে ভেতরে। পঁচিশে বৈশাখ না গেলে বোধহয় নজরুল-জয়ন্তী নিয়ে বাড়াবাড়ি চলে না। তবে যারা পুস্তিকা-টুস্তিকা বের করবেন, তাঁদের তো চুপ করে থাকার উপায় নেই।

সেদিন জনৈক তরুণ কবি বললেন, এবার নজরুল-জয়ন্তী পালিত হবে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশে—বাংলা দেশের জাগরণের আলোকে। বিদ্রোহী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল অবশ্য স্মরণীয়।

তিনি প্রস্তাব করেন, এবার যেন উৎসব অনুষ্ঠানে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত বা অন্য কোনো ভক্তিমূলক গানগুলি না-গাওয়া হয়। সংগীত-বিচিত্রা, ভাষণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে সেই জ্বলন্ত রূপটাই ফুটিয়ে তোলা দরকার, যার মধ্যে থাকবে আত্মনিবেদন নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রত্যয়।

লক্ষ্য করেছি, কেউ তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি। কেননা, বাংলাদেশ এখন সবারই আলোচ্য বিষয়। লিটল ম্যাগাজিনের অন্য একজন তরুণ সম্পাদক বললেন, এবার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন করা উচিত যুগ্মভাবে। কেননা রবীন্দ্রনাথের গান এখন স্বাধীন পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগীত, তার মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে নজরুলের বিদ্রোহী রূপটাই আশ্চর্য রকমে উজ্জ্বল।

অর্থাৎ কেউ এখন নীরবে বসে নেই। দেশে যেন একটা জরুরী অবস্থা চলছে। কবিতার ফর্ম-টেকনিক নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য বিশেষ করছে না, ইজম-টিজম নিয়ে কূট তর্কটাও ভাটার দিকে। এখন সবাই আশ্রয় করেছেন রবীন্দ্র-নজরুলকে।

আনুষ্ঠানিক ব্যাপার

অন্য একদিনের কথা। আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশের সবচাইতে বড় যে রক্তাক্ত সংগ্রাম, তার কথা। পূর্ববাংলার কবি-সাহিত্যিকরা অনেকে মারা গেছেন, মারা যাচ্ছেন এবং তাদের রক্তপাতে তৈরী হচ্ছে একটি স্বাধীন দেশের বুনিয়াদ। বলছিলাম, আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধবাজ শাসকদের কাছেও তা হলে নিরস্ত্র এই কবি-সাহিত্যিকরাও কম শক্তিশালী নন? অথচ এপারে বসে আমরা হা-হুতাশ করছি, আপশোস করছি, কিন্তু আগুনের মতো জ্বলে উঠতে পারছি না।

প্রসঙ্গক্রমে উঠেছিল নজরুলের নাম।

একজন বললেন, 'এবার নজরুল সম্পর্কে তিন-তিনটে লেখার অর্ডার পেয়েছি'—বলেই স্বগতোক্তি করলেন, যত্তো সব। ইয়ার্কি পেয়েছে? একটাও লিখবো না।

বললাম, রাগছেন কেন? না লিখলে আপনাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে কে?

—আরে না, না। লেখা না লেখার কথা হচ্ছে না। নজরুলকে নিয়ে ব্যবসা করতে চাইছে। এসব আমার ভালো লাগে না। 'নজরুল-স্মৃতি' 'নজরুল বিচিত্রা' বেরোচ্ছে, বেরোক—তাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই। একটা সিরিয়াস ব্যাপারকে হাল্কা করে দেওয়ার এরকম অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রত্যেকের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন করলাম, আপনার ক্ষোভের প্রত্যক্ষ কারণটা কি?

—ব্যবসা, ব্যবসা। রাগে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক, আমাদের দেশে সবই আনুষ্ঠানিক। পুজোর সময়ে পুজো-সাহিত্য, বৈশাখে রবীন্দ্র-সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠে নজরুল-সাহিত্য—যেন ঋতু-বৈচিত্র্যের মতো একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপার আর কি। বছরের অন্য সময়টায় আর কোনো সাড়াশব্দ, উচ্চবাচ্য নেই।

একটি প্রশ্ন ও কয়েকটি জিজ্ঞাসা—

তখন আমরা কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম কিছুটা বিব্রতও। কেননা, কম-

বেশী আমরা সকলেই এই অভিযোগের সংগে জড়িত। অনেকেই এ সময়টায় কিছু লেখালেখি করি, বিদ্রোহী কবির স্বাস্থ্য দেখতে যাই, উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করি।

বললাম, তাহলে কি করা উচিত?

—কিছু কাজের কাজ করা উচিত: আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যাপারই আমার তেমন পছন্দ হয় না, আন্তরিক অনুসন্ধান দরকার।

একটু থেমে বললেন, একটা কমিটি গঠিত হয়েছিল বলে শুনেছি। খুশি হয়েছিলাম, সরকারী উদ্যোগে নজরুল-রচনাবলী বেরোবে বলে। কিন্তু ফুসমন্তরের মতো এখন আর সে সবের কোনো সাড়া শব্দ নেই। এতদিনে কি নজরুল রচনাবলী বেরোনো উচিত ছিল না?

বললাম, বেসরকারী উদ্যোগে সেরকম একটা চেষ্টা চলছে। তবে বাধা অনেক।

ভদ্রলোক জোরের সংগে বললেন, নজরুল সম্পর্কে কোনো বাধাই বাধা নয়। সরকার চেষ্টা করলে বের করতে পারতেন। প্রকাশকদের কাছ থেকে উপযুক্ত টাকা দিয়ে বইগুলির প্রকাশ-স্বত্ব কিনে নিতে পারতেন। তাছাড়া আবার অন্য বাধা কি?

বললাম, সেজন্যে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায়।

পাল্টা প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, করবে কে? যাঁরা এগারোই জ্যৈষ্ঠ গিয়ে কবিকে ফুলের মালা উপহার দেন, যারা সংবাদপত্রে আক্ষেপ করেন, তাঁদেরই উচিত এসব কাজ করা। শুনেছি, নজরুল-জয়ন্তী পালনের জন্য একটা কমিটিও আছে। তাঁরাই বা চুপ করে আছেন কেন?

বললাম, তাঁরা কি করতে পারেন?

—সরকারকে অনুরোধ করতে পারেন নজরুল রচনাবলী প্রকাশের জন্য—সস্তা দামে পরিবেশনের জন্য। অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, নজরুলের বন্ধু-বান্ধবরা এখনো অনেকেই জীবিত আছেন। তাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খবরাখবর যেমন দিতে পারেন, তেমনি দিতে পারবেন বিভিন্ন রচনার প্রকাশকাল ও রচনাকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি। লক্ষ্য রাখবেন, নজরুল সম্পর্কে আমাদের ভাবাবেগ যত বেশী, আন্তরিকতা সেই পরিমাণই কম।

একটু থেমে বললেন, নজরুল এখনো বেঁচে আছেন। অথচ তাঁর জীবনের বহু ঘটনা সম্পর্কে এখনই ভিন্ন মতের অবকাশ তৈরী হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা পর্যন্ত ক্রমাগত স্মৃতিভ্রষ্ট হচ্ছেন। নথিপত্র দেখে, পুরনো দিনের কাগজপত্র ঘেঁটে এখনই সেসব ভুল বের করা দরকার।

একটি উদ্যোগ—

সম্প্রতি আবদুল আজীজ আল-আমান স্থির করেছেন নজরুল-রচনাবলীর সবকটি খণ্ডই বের করবেন। এ ব্যাপারে তিনি দৃঢ় সংকল্প। বলেন, নজরুল রচনাবলী বের করা আমার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

আমি আগেই শুনেছিলাম, রচনাবলী বের করার জন্য আজীজ সাহেব নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করছেন, অপ্রকাশিত লেখার অনুসন্ধান করছেন এবং বহু লেখা পত্র পেয়েছেন।

তাঁর কাছেই শুনলাম, এপর্যন্ত তিন খণ্ড রচনাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এখনো অনেক বাকি। দুখণ্ড ছাপা হয়ে যাবার পর, তৃতীয় খণ্ড বেরোতে পারছিল না কয়েকটি বইয়ের প্রকাশসত্ব সম্পর্কিত গোলমালে।

জিজ্ঞেস করলাম, বইয়ের প্রকাশকাল অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ডই কি ধারাবাহিক ভাবে ছাপা সম্ভব হচ্ছে? না, তাও হচ্ছে না?

সেভাবে প্রকাশের ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, নানারকমের অসুবিধা আছে। যখন যে-বই প্রকাশের অনুমতি পাচ্ছি এবং যখন যে-সব অপ্রকাশিত লেখার খোঁজ পাচ্ছি, তখনই তা সংগ্রহ করে ছাপতে দিতে হচ্ছে। সেজন্যেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তীকালে, নতুন মুদ্রণের সময় ওভাবে সাজাতে হবে।

আপনার কি মনে হয়, সম্পূর্ণ নজরুল রচনাবলী আপনি বের করতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই। আমি অন্তত সেরকম আশা রাখি।

অগ্নিবীণা, সঞ্চিতার কবিতাগুলি কি রচনাবলীতে ছাপতে পেরেছেন?

—পারিনি। এখনো পারমিশন পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস, আজ হোক কাল হোক পারমিশন আমি পাবোই। কেননা, নজরুল সম্পর্কে পাঠকের যেমন একটা আগ্রহ এবং মমতা আছে, প্রকাশকদেরও তেমনি দুর্বলতা আছে। কেবল আইনগত বাধার জন্য রচনাবলী প্রকাশ বন্ধ হয়ে থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

রচনাবলী সম্পাদনা করতে গিয়ে কোনো নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন?

—বহু নতুন, চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর তথ্য পেয়েছি। তবে নজরুল রচনাবলী সম্পাদনা করতে গিয়ে নয়, আমার আসল কাজটা ছিল নজরুল-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান। এবং সেই কাজ করতে গিয়েই এমন সব লেখার সন্ধান পেতে থাকি, যা ছিল এতদিন আমার অগোচরে। সেইসব লেখা সংগ্রহ করার ইচ্ছে থেকেই সূত্রপাত হলো নজরুল রচনাবলী প্রকাশের।

প্রেরণা ও উৎসাহ—

আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল কিছুটা এলোমেলো ভাবে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের একটি দোকানে চা খেতে খেতে। স্বভাবতই সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি।

জিজ্ঞেস করলাম, নজরুল সম্পর্কে ভাবনা শুরু করেন কবে থেকে?

যেন সেই সুদূর বাল্যকালের স্মৃতিই মনে পড়লো তাঁর। আজীজ সাহেব বললেন, স্কুল-জীবন থেকে রাজীবপুর হাইস্কুলের ছাত্র। ক্লাস নাইনে পড়ি। সে সময়ে আমাদের স্কুলে হয়েছিল বিতর্ক সভার আয়োজন। বিষয় ছিল নজরুলের কবিতা। আমি আলোচনার জন্যে, তখনই নজরুল সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করি।

তারপর?

তার পরের ঘটনা আরো চমকপ্রদ। একদিন ট্রেণে আসতে আসতে এক অপরি-

চিত্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল নজরুল সম্পর্কে। তিনিই আলোচনা করছিলেন। আমি শুনছিলাম কান পেতে। ভদ্রলোক বলছিলেন, নজরুল ফুরিয়ে যাচ্ছেন, এবং তাঁর সমকালীন বন্ধু-বান্ধবরাও বিদায় নিচ্ছেন পৃথিবী থেকে। অথচ তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছু ভাবছেন না। এজন্যে খুবই দুঃখ করছিলেন। এরপর আর দেরী করলে হয়তো নজরুল-জীবনের অনেক ঘটনারই ইতিহাস মুছে যাবে।

একটু থেমে বললেন, আমার মনে সেই কথাটিই গেঁথে যায়। প্র্যাক্টিক্যালি তখন থেকেই ছুটোছুটি করছি। সেটা বোধহয় ১৯৫২ সালের কথা।

বললাম, তাঁর নাম কি? যাঁর কাছ থেকে আপনি নজরুল-জীবনী লেখার উৎসাহ পেয়েছিলেন? পরে কখনো তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?

—না. তাঁর সঙ্গে আর কখনো যোগাযোগ হয়নি। তাঁকে আমি জানি না, চিনি না। মনে হয়, কোনো কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আমার 'নজরুল পরিক্রমার' ভূমিকায় আমি সেকথা লিখেছি। তাঁর কথা শুনেই আমি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মুজফফর আহমদ, কাজী আবদুল ওদুদ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে যাই। তা ছাড়া হিজ মাস্টার্স ভয়েসের হেমচন্দ্র সোমের কাছেও গিয়েছিলাম আমি।

কে কি বললেন?

—মুজফফর আহমদ সাহেবের কাছে গিয়ে নতুন ইন্সপিরেশান পাই। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, যা করছ করে যাও, সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের গানগুলিও সংগ্রহ করো। চেষ্টা করলে হয়তো অন্যান্য তথ্যের হদিস পাবে, কিন্তু গানগুলোর খোঁজ পাবে না। তিনি প্রায় চার হাজার গান লিখে-ছিলেন।

পরে অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে বললেন আমি নজরুলের একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখছি, বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে। তাতে দেবো তাঁর জীবনের ক্রনোলজিক্যাল বিবরণ। নজরুলের রচনার উৎস এবং সৃজন মুহূর্তকে বোঝার জন্যেও সে বইটি হবে খুবই প্রয়োজনীয়। নজরুল-যুগকে বোঝার জন্যেও তা সহায়ক হবে। কল্লোল যুগের বোহেমিয়ান জীবনধারা নজরুলের মধ্যেও ছিল।

সজনীকান্ত দাস, মোহিতলালের কাছে গিয়েছিলেন?

—না। যাইনি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ভেতর থেকে তাঁদের মতামতকে জেনে নিয়েছি। আর এখন তো কোনো উপায়ই নেই।

রচনা সংগ্রহে বাধা ও সাহায্য

আবদুল আজীজ আল-আমান দমবার লোক নন। কাজ করে যাচ্ছেন। হয়তো শীঘ্রই তিনি আরেকটি খণ্ড প্রকাশ করতে পারবেন।

বললাম, রচনা সংগ্রহ করতে গিয়ে কোথাও কোনো বাধা পেয়েছেন?

—সে আর বলবার নয়। একবার এক ভদ্রলোক তো বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে-ছিলেন। আমি একজনের কথা জানি, যার কাছে নজরুলের হাজারখানেক কবিতা আছে, যার তিন-চারটের বেশী আমি সংগ্রহ করতে পারিনি—ঐ বিপদের ভয়ে।

তা ছাড়া?

'রাঙাজবা' বইটি নজরুল দিয়েছিলেন এক ভদ্রমহিলাকে। তাঁর কাছ থেকে সেটা আনা এক দুর্ঘট ব্যাপার। ভদ্রমহিলা বইটাকে ধরে রেখেছেন যখের ধনের মতো। বহু বুঝিয়ে কিছু লেখা নকল করে এনেছি।

আজীজ সাহেব বললেন, 'আত্মশক্তি' কাগজে নজরুলের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য লেখা বেরিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সেসব লেখা সংগ্রহ করতে পারিনি। তার মধ্যে একটি লেখা হলো, 'লক্ষ্মীর পীড়িতে বালির বাঁধ'। আমাকে সংগ্রহ করে দিয়ে ছিলেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

সাহায্য করেছেন কে কে?

—বিরূপতার চেয়ে আন্তরিকতাই আমি পেয়েছি বেশী। মন্মথ রায়, ব্যাঙ্কের সেফটি ভোল্ট থেকে আমাকে একটি অপ্রকাশিত চিঠি বের করে দিয়েছেন। নজরুলের 'চল চল চল' কবিতার পাণ্ডু-লিপির কপিটিও আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তাছাড়া 'কলেজ হোম'-এর শান্তি মজুমদার ও 'মোহন লাইব্রেরীর' জীবন-কুমার বসু অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের প্রকাশিত বইগুলি পুনর্মুদ্রণের। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পেয়েছি কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি।

—প্রশ্নদর্শী
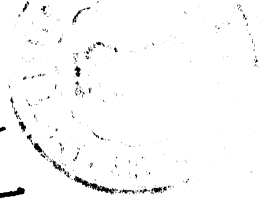
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাহাড়তলীর যে দিকটায় প্রভুদয়াল দম্পতির কুটীর তার একটা অংশ সমুদ্রের উপরে ঝুঁকে পড়েছে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়লে গভীর জলে পড়তে হবে। জরতী দেখল অপরাহ্নবেলায় প্রভুদয়াল সেখানে একখানা পাথরের উপরে বসে একমনে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ালো, বুঝতে পারলো না তিনি দেখছেন না ধ্যান করছেন। সময় বিশেষে ও দুই যে এক কি করে জানবে জরতী।

সমুদ্র তার অপরিচিত নয় কিন্তু তাতে এমন মুগ্ধভাবে দেখবার কি আছে ভেবে পায় না সে। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ফিরছে তীরের দিকে, সমুদ্রে দলে দলে নুলিয়ার নৌকা ফিরছে, পাখীর বিন্দুগুলো ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে নৌকার রেখাগুলো। পশ্চিম দিগন্ত সূর্যাস্তের আভাময়, কাজেই সূক্ষ্ম-রেখা ক্ষুদ্র বিন্দু কিছুই চোখ এড়ায় না। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের জলতল মৃদুভাবে কম্পিত হচ্ছে। এসব দৃশ্য কতদিন সে দেখেছে। ব্যাধের গৃহিনী হলেও সমুদ্রের কাছে তার ঋণ কম নয়, যেদিন শিকার না জোটে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে কাজ চালাতে হয়। তার পক্ষে অবশ্য নুলিয়ার মতো নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনও হয় না। ঢেউয়ের ঝাপটায় মাছ এনে ফেলে ডাঙায়, জলের টানে নেমে যাওয়ার আগেই চটপট ধরে ফেললেই হল। কাজটায় সে খুব পটু।

কি দেখছ মা?

জরতী চমকে উঠে ভাবে কেমন করে জানলেন প্রভুজী যে সে এসেছে। তাই সে পাল্টে শুধালো, কেমন করে জানলেন বাবা যে আমি এসেছি, পা টিপে টিপে এসেছিলাম যাতে আপনি না জানতে পারেন।

না মা পায়ের শব্দ পাইনি।

তবে কি করে জানলেন?

অনুভবে। যাক গে, বসো, বলে এক-খণ্ড পাথর দেখিয়ে দিলেন।

না বাবা আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, দরকার আছে।

আমাকে দিয়ে কি দরকার বাবা?

তুমি বলেছিলে বাসুদেব দেহত্যাগ করেছেন, তাঁকে আর দেখতে পাবে না।

দেহত্যাগ করলে আর কি করে দেখতে পাওয়া যায়।

আমি তো এতক্ষণ তাঁকেই দেখছিলাম।

অবিশ্বাসে বিস্ময়ে ব্যগ্রভাবে শুধায়, কোথায় তিনি?

এই তো তোমার সম্মুখে।

কিছু বুঝতে পারে না জরতী, বলে, কোথায়?

ঐ তো সম্মুখে।

ও তো সমুদ্র।

বাসুদেব নয় কেন?

তবু কিছু বুঝতে পারে না, বলে, বাবা আমি অবোধ।

প্রভুদয়াল বলতে আরম্ভ করে। সুনীল সমুদ্রে তাঁর দেহের নীল আভা দেখো, সমুদ্রের উদার বিস্তারে তাঁর বিশাল বক্ষ-স্থল, ঐ দেখো তাঁর বক্ষ মৃদু নিশ্বাসের তালে কম্পিত, আর সূর্যাস্তের দীপ্তি তাঁর বক্ষের কৌস্তভ মণি। মা, প্রাচীনেরা কল্পনা করেছিলেন যে সৃষ্টির আদিতে নারায়ণ সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, আজও তিনি তেমনি শয়ান রয়েছেন, কেবল দেখবার অপেক্ষা।

সকলের কি তেমন দেখবার চোখ থাকে বাবা।

গোড়ায় কারোরই থাকে না। আমারই কি ছাই চোখ সম্পূর্ণ খুলেছে?

কি করলে সে চোখ পাওয়া যায়?

আর যে করেই হোক চোখ বুঁজে থেকে নয়। চোখ মেলে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন দৃষ্টি খুলে যায়।

কথাগুলো যতই অবিশ্বাস্য হোক বক্তা বিশ্বাসভাজন জরতীর কাছে, ভাবে চেষ্টা করলে একদিন বুঝতে পারবে।

এমন সময় জগন্নাথ এসে উপস্থিত হয়।

কি জগন্নাথ, তার পরে খবর কি?

খবর কিছু নেই বাবা, মা-ঠাকরুণকে বদলী জিনিস দিতে এসেছিলাম ভাবলাম একবার বাবাকে প্রণাম করে যাই।

বেশ বেশ বসো।

আপনার সামনে কি বসতে পারি?

প্রভুদয়াল হেসে বললেন, তবে না হয় দাঁড়িয়ে থেকেই উত্তর দাও। নগরের দিকে তো যাওয়া আসা করো, রাজবাড়ীর খবর কি?

রাজা নেই তার রাজবাড়ী।

সে কি কথা। মহারাজা উগ্রসেন তো রয়েছেন।

তা আছেন বটে। তিনি অবশ্য নামে রাজা, কিন্তু সবাই জানে আসল রাজা ছিলেন বাবা বাসুদেব।

কে এমন কাজ করলো হে?

কি জানি বাবা। শুনলাম একটা ব্যাধ ধরা পড়েছে, তারই নাকি কাজ। আরও শুনলাম আগামীকাল লোকটাকে শূলে দেওয়া হবে।

কেউ লক্ষ্য করলো না যে জগন্নাথের কথা শুনবামাত্র জরতী মাটিতে বসে পড়লো।

বলো কি হে। একেবারে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে?

আজ্ঞে তা জানিনে তবে বিচার হয়ে গিয়েছে যে লোকটার শূলদণ্ড হবে।

তা বটে আমারই ভুল হয়েছিল, আগে বিচার পরে প্রমাণ এই হ'ল এখনকার রীতি। তা লোকটা কেন এমন গর্হিত কাজ করলো কিছু জানা গিয়েছে?

সকলের অজ্ঞাতসারে জরতী উঠে গিয়ে কুটীরে প্রবেশ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

রাতের বেলায় প্রভুদয়ালের পায়ের উপর পড়ে মাথা কুটতে লাগলো জরতী।

প্রভু বাঁচাও, বাঁচাও সেই হতভাগ্যকে যার হাতে নিহত হয়েছেন কৃষ্ণ বাসুদেব। তার চেয়ে বেশি হতভাগ্য আর একজন আছে যে সেই হন্তারককে রক্ষা করতে অনুরোধ করছে। জানি নরকেও আমার স্থান হবে না, প্রভু, তবু না অনুরোধ করে পারছি না, সে আমার স্বামী।

এইভাবে কথাগুলো বলতে বলতে মাথা কুটে চলল জরতী, না আছে কথার বিরাম, না আছে মাথা কুটবার বিরাম, না আছে বিরাম চোখের জলের ধারায়।

তার অসংলগ্ন কাতরোক্তি থেকে প্রভু-দয়াল ও তার স্ত্রী বুঝলো যে জরতীর স্বামী জরার শর নিক্ষেপের ফলে নিহত হয়েছেন বাসুদেব। না জেনেই শরনিক্ষেপ করেছিল একথা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য। কেননা, বাসুদেবকে হত্যা করায় তার স্বার্থ ছিল না, যদিচ বাসুদেবকে সে চিনতো না। জরতী যে ঘটনাস্থলে এসে স্বামীকে ধিক্কার দিয়েছিল, স্বামী যে ক্রোধের বশে তাকে গলা টিপে নিহত মনে করে চলে গিয়েছে—তার এক প্রমাণ প্রভুদয়ালের মৃতপ্রায় জরতীর সাক্ষাৎলাভ, আর এক প্রমাণ জরতীর কণ্ঠে পাঁচ আঙুলের নীলার কান্তির মতো ছাপ। দিনের বেলায় ঐ ছাপ অনেকবার চোখে পড়েছিল কাশ্যপের মায়ের, মেয়েদের চোখে এসব চিহ্ন প্রায়ই এড়ায় না, যদিচ দেখেনি প্রভুদয়ালের চোখ। মেয়েদের চোখ কাছের খুঁটিনাটি দেখে পুরুষের চোখ দূরের বড় বড় বস্তু। মেয়েদের চোখ অনুবীক্ষণ, পুরুষের চোখ দূরবীক্ষণ।

কাশ্যপের মা অনেকবার ভেবেছিল জরতীকে শুধাবে ঐ নীলার কণ্ঠি এলো কোথা থেকে, সুযোগ করে উঠতে পারেনি। যাক এখন রহস্যের সমাধান হল।

প্রভুদয়াল মূঢ়ের মতো বসে আছে, অনেকক্ষণ তার পা ভিজে হিম হয়ে গিয়েছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় তার অবস্থা। স্বীকারোক্তির প্রথম অভিঘাতে একবার তার মনে হয়েছিল হতভাগিনীকে কুটীর থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারপরে মনে হয়েছিল মেয়েটার কি দোষ—মৃত্যু যাচ্না করে তার তো প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন বাঁচাবে মহাপাতকীকে, আর বাঁচাবার উপায়টাই বা কি, ক্ষমতাই বা তার কোথায়?

এমন সময় কাশ্যপের মা বলে উঠলে, দেখো তুমি তো ইচ্ছা করলেই বাঁচাতে পারো।

কি বলছ অদিতি, আমি বাঁচাবো।

সংকটকালে পত্নীর আসল নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

কি বলছ অদিতি রাজদন্ডে দন্ডিত অপরাধীকে আমি বাঁচাবো কেমন করে?

কেন কঠিনটা কি! রাজা তোমাকে সমাদর করেন, তুমি তার কাছে কোনকালে কিছু প্রার্থনা করোনি, আজ এই লোকটার প্রাণভিক্ষা চাও না কেন।

প্রভুদয়াল ভাবলো এ না হলে আর স্ত্রীবুদ্ধি—কঠিন কাজে সরল পন্থা আবিষ্কার।

বলল, প্রার্থনা করতে গেলে ছোট হয়ে পড়তে হয়। স্বয়ং ভগবান যখন প্রার্থনা নিয়ে বলিরাজের সভায় গিয়েছিলেন তখন তাকে বামনরূপে যেতে হয়েছিল।

অদিতি হটবার পাত্রী নয়, বলল, স্বয়ং ভগবান যদি বামনরূপ ধরে থাকেন তাহলে তুমিও না হয় ধরলে, বিশেষ তাতে দুজনের প্রাণরক্ষা হয়।

দুজন আবার কোথায় দেখলে কাশ্যপের মা?

তুমি কি ভাবছ স্বামী মরলে ঐ মেয়েটা বেঁচে থাকবে। তুমি তো কতবার বুঝিয়ে বলেছ ভগবানকে কেউ মারতে পারে না, নিজের কার্য উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন, কার্য উদ্ধার করে চলে গিয়েছেন, ঐ লোকটা নিমিত্তমাত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন যেমন নিমিত্তমাত্র হয়েছিলেন এখানে ঐ লোকটাও তেমনি নয় কি!

এ তর্কের উত্তর খুঁজে পায় না প্রভুদয়াল, কারণ এ সমস্ত যুক্তি তার নিজেরই, বুঝিয়েছে পত্নীকে আর জরতীকে। সে চুপ করে থাকে, তবু মনস্থির করতে পারে না।

কুটীরের মধ্যে তিনটি প্রাণীর নিশ্বাসের সঙ্গে তাল রক্ষা করে বাইরে সমুদ্রে চলছে উত্তাল গর্জন। যে সমুদ্র এই কিছুক্ষণ আগে শান্ত ছিল এখন সে উদ্দাম। দুই ঢেউয়ের উত্থান-পতনের বিরামের মধ্যে শ্রুত হয় নিশাচর পাখীর কর্কশ তীক্ষ্ণ রব। ও যেন দুটো শব্দের পার্থক্যটাকে সরু সুতো দিয়ে গ্রথিত করে তোলবার চেষ্টা। শব্দের তোরণ ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠে শিখর রচনা করে হঠাৎ ধসে পড়ে যায়—কলকলিয়ে ছড়িয়ে চলে আসে সর্পিল ঢেউ-গুলো [illegible] ছাড়িয়ে অনেক ভিতরে।

জরতী পা [illegible] সে এমনি নিস্পন্দ যে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হতে পারতো যদি না মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠতো। প্রভুদয়ালের মনে আত্মমর্যাদা ও অনুকম্পায় লড়াই চলছে, কে জিতবে কে হারবে। আর অদিতির মনে দয়ার অটল দন্ডকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে কৌতূহলের একটি সূক্ষ্ম স্বর্ণাভ বল্লরী। শূলদন্ডে মৃত্যু না জানি মরণের সে কি অভিনব পন্থা।

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রভুদয়াল। বললো, অদিতি, নিজের মর্যাদাকে আর বড় করে তুলবো না, কাল সকালে রাজার কাছে গিয়ে জরার প্রাণভিক্ষা করবো।

এতক্ষণ নৈরাশ্যের তরঙ্গে তাড়িত হওয়া সত্ত্বেও, হয়তো বা সেইজন্যেই চৈতন্য লোপ পায়নি জরতীর, এবারে আশার উপকূলে চোখে পড়তেই লুপ্তজ্ঞান হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো।

দ্বারকাপুরীর দক্ষিণ মশান আজ লোকে লোকারণ্য। সমুদ্র আর পুরীর প্রাচীরের মধ্যে প্রকান্ড মাঠ, সমুদ্রের দিকে বালুর চর, উপরের দিকে শুকনো ডাঙা, কাছে কোথাও গাছপালা নেই। এখানেই রাজদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তিগণের সাজা হয়ে থাকে, শূল, মুন্ডচ্ছেদ, হস্তচ্ছেদ যার প্রতি যেমন আদেশ, নিকটেই সমুদ্রের ধারে মৃতদেহ দাহের ব্যবস্থা, সেটা সরকারী খরচে হয়ে থাকে এই যা লাভ।

অনেককাল মৃত্যুদন্ড কারো হয়নি। বাসুদেবের প্রভাবে রাজ্য সুশাসিত ছিল, তস্করাদি স্বকর্মে নিরস্ত ছিল। আর যারা খুনে তাদের অনেকে মারা পড়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, বাকিদের শখ সামরিকভাবে মিটে গিয়েছিল সেই মহাহবে মানুষ খুন করা বীরত্বে। লোকে একরকম ভুলেই গিয়েছিল মৃত্যুদন্ডের ঘটনা। দক্ষিণ মশানটা স্মৃতিযোগে মাত্র মনে ছিল। আজ এতকাল পরে সেখানে শূলদন্ডের ব্যবস্থা হবে শুনে কাতারে কাতারে লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। দিবা প্রথম প্রহরের ঘন্টা বাজলে অপরাধীকে শূলে চড়ানো হবে গতকাল ঢোল বাজিয়ে নগরে ঘোষণা করা হয়েছিল। কৌতূহলে আর উৎসাহে সে রাতে লোকের ঘুম হল না, ভোর হওয়ার আগেই তারা মশানের দিকে রওনা হল। যারা অত্যুৎসাহী অর্থাৎ ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে চায় রাতের বেলাতেই তারা এসে শূলের কাছাকাছি জায়গা দখল করে নিয়েছিল। যারা পরে এসেছে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যেতে চায়, দুইদলে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়, মারামারি শুরু হয়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, আরে বাপু খুনোখুনিটা কালকের জন্য তুলে রেখে দাও, আজকে একটাই যথেষ্ট।

তাপর একজন উত্তর দেয় যতক্ষণ শূলে চড়ানো না হচ্ছে ততক্ষণ চলবে না। আমার আবার লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটবার শব্দ শুনতে বড় ভালো লাগে।

তৃতীয় ব্যক্তি বলে পরের মাথা ফাটলে ভালোই শোনায় বটে।

আগের লোকটা বলে, নেহাৎ মিথ্যা বলোনি, নিজের মাথা ফাটলে শোনবার মতো মনের অবস্থা থাকে না।

কেন আমরা আছি কি করতে।

এমন সময় ঐ এসেছে, ঐ এসেছে, রব ওঠে।

আরে কে এসেছে?

তোমার সম্বন্ধী।

সে তো তুমি অনেকক্ষণ হাজির আছ।

ঐ যে নিয়ে আসছে, ঐ ঐ দেখো।

সকলে ঘাড় উঁচু করে, কিছু চোখে পড়ে না তখন আবার সামনে এগোবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ওদিকে রাজার শান্ত্রী ও কোটালের দল হঠ যাও, হঠ যাও রব করে লাঠি ঘোরাতে থাকে!

মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁক, সেখানে মনুষ্যপ্রমাণ উঁচু একটা লোহার শূল প্রোথিত। একজন জল্লাদ এরন্ড তৈলে সেটাকে মার্জিত করছে। কাছেই গোটা কতক কুকুর শেষ অঙ্কের আশায় লেজ নাড়তে নাড়তে সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে সমর্থন করছে।

ঐ নুলোগুলো মরতে এসেছে কেন বলে ওঠে একজন।

আর একজন তার অনুসরণ করে বলে শুধু কি নুলো, ঐ দেখ কানা, খোঁড়া কুঁজো, কুষ্ঠী বাপরে কত? হাজার হাজার মনে হচ্ছে।

কেন ওদের কি দেখবার শখ হয় না।

কিন্তু অন্ধগুলো কেন? ওরা দেখবে কি করে?

দেখতে না পার শুনবে, ঐ যে কে যেন বলেছিল মাথা ফাটবার শব্দ শুনতে ভালো লাগে।

কিন্তু এ আপদগুলো এলো কি করে?

কেন নৌকা দেখতে পাচ্ছ না।

তাইতো বটে অনেক নৌকা জড়ো হয়েছে। একজন ছড়া কেটে বলে উঠল,

শখ দেখে যে মরে যাই
নৌকা নিয়ে এলো তাই।

আর একজন তার অনুবৃত্তি করলো

কানায় দেখে কালায় শোনে
বোবায় শেষে নখ গোনে।

অনেকে বলে ওঠে দেখো একবার রঙ্গ! চলতে পারে না তবু লাঠি ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসা চাই।

আর কুষ্ঠেগুলোর রকম দেখো, হাতে গায়ে পায়ে কাপড় জড়ানো, বেটারা লাঠি ধরেছে কি করে?

প্রাণের দায়ে ঐ লাঠিই ওদের ভরসা।

তাহোক, ওদিকে যেয়ো না, ওদের বাতাস লাগলেও রোগে ধরবে।

আরে আমরা কি যাচ্ছি, ওরাই যে এসেছে। এমনিতরো উত্তর প্রত্যুত্তর চলতে থাকে।

বাস্তবিক লোকগুলোর কথা মিথ্যা নয়। মশানের দক্ষিণ দিকে চরের উপরে সমুদ্রের ধারে অনেকটা জায়গা হাজার দুই কানা-খোঁড়া নুলো পঙ্গু কুঁজো ও কুষ্ঠ-রোগাক্রান্তে ভরে গিয়েছে। সকলেরই হাতে বিকলাঙ্গের শেষ নির্ভর লাঠি। সমুদ্রে ছোট ছোট নৌকা ডোঙা নুলিয়াদের মাছ ধরবার কাঠখন্ড তাকে নৌকা না বলাই উচিত। এ সমস্তর সংখ্যাও কম নয়, বেশ

বুঝেতে পারা যায় তারা অধিকাংশ নৌকায় এসেছে। জনতার অন্য অংশে কোলাহল কেবল এরা নীরব ও স্থির। জনতা যথা-সম্ভব এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে অবস্থান করছে। অনেকে মাঝে মাঝে এদের ব্যঙ্গ করছে, ধিক্কার দিচ্ছে, কিন্তু এরা সেসব শুনেও শুনছে না, সকলেই শূলেটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

একদিকে মেয়েদের দঙ্গল বড় কম হয়নি। তাদের উৎসাহটাই সবচেয়ে বেশি। একঘেয়ে জীবনের মধ্যে নূতন স্বাদ এনেছে শূলে চড়ানোর ব্যাপারটা। সকাল বেলায় উঠে ঘরের কাজ সমাপ্ত করবার জন্যে তারা অপেক্ষা করেনি, দরকারও ছিল না যেহেতু স্বামীপুত্রেরাও চলে এসেছে, কোলের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েরা এসে জুটেছে। একটা ছোট ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করলো, মা ঐ লোহার ডান্ডাটা কি হবে?

কি হবে দিবে খোকা। ওরা ওটার উপর লোকটাকে বসাবে।

ছেলে আবদার ধরলো, ওটার উপরে আমি বসবো মা।

যেমন দস্যি তুই হয়েছিস একদিন হয়তো ওটায় বসতে হবে।

না, আমি আজই বসবো।

তার কথা শুনে পার্শ্ববর্তিনীরা হেসে উঠল। তাদের একজন বলল, আহা মাসি বসিয়ে দাও না কেন, ছেলে আবদার ধরেছে।

ছেলের মা বলল, ওকে নয় ওর বাপকে পেলে বসিয়ে দিতাম।

ভালই হতো মাসি, আর একটা ঘর করবার সুযোগ পেতে।

তুই যেমন পেয়েছিস।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

কাজেকাজেই মাসি, সব সময়ে তো বড় কথা বলবার সুযোগ হয় না।

ছেলেরা মায়ের কাছে আবদার ধরেছে। কেউ বলছে মা ছোলাভাজা কিনে দাও। কেউ বলছে, মা রামদানার লাড়ু খাবো।

ফেরিওয়ালারা নানারকম খাদ্য কেনাবেচা করছে, মাটির খেলনা থেকে মুখরোচক খাদ্য কিছুই বাদ পড়েনি।

কোন ফেরিওয়ালা বলছে নাও খোকা, আচ্ছা রামদানার লাড্ডু, কেউ বলছে এই পুতুল কিনে নাও খোকা—এই দেখো রথের উপর কৃষ্ণ আর অর্জুন।

জনসাধারণ বাসুদেবের মৃত্যুতে দুঃখিত হয়েছিল, কারণ বাসুদেব সুখে দুঃখে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন, ছেলেদের খেলাধুলোয় যোগ দিতেন, কখনো তাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতেন। তারা যখন শুনলো যে বাসুদেব মারা গিয়েছেন সকলে সত্যি দুঃখিত হল আর তাদের রাগ হল হত্যাকারীর উপরে। কিন্তু এখন তারা সেই হত্যাকারীর প্রতি একপ্রকার কৃতজ্ঞতা অনুভব করছিল, আজ তার জন্যেই এমন জমায়েৎ সম্ভব হল, কত-কাল যে এমন মেলা বসেনি। ফেরিওয়ালারা সুযোগ বুঝে দু' পয়সা রোজগার করে নিচ্ছে, বাসুদেব তো আর ফিরবেন না, তবে দুটো পয়সা কামাই করবার সুযোগ হারিয়ে কি লাভ।

এমন সময়ে রাজপুরীর দিক থেকে নাকাড়ার শব্দ উঠল, অমনি সমস্ত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল, জয় জগন্নাথ! ঐ আসছে, ঐ আসছে।

এবারে সত্য সত্যই আসছে। জনকুড়ি সশস্ত্র শান্ত্রীর পাহারাধীন জরা সত্যই আসছে। কিন্তু হেঁটে আসবার কষ্ট সহ্য করতে হয়নি তাকে। গাধার উপরে উল্টো-ভাবে সে আসীন, মাথা তার ন্যাড়া করে দিয়ে ঘোল ঢেলে দেওয়া হয়েছে, ঘোলের ধারা এখনো সর্বাঙ্গে চিহ্নিত। হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধা, পা দুটো খোলা, নইলে গাধায় চাপানোর অধ্যায়টা বাদ দিতে হয়। আর তার আগে পিছে বাজছে রাজার নাকাড়া। মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে গাধায় চাপানোর অধ্যায়টা শূলদন্ডের আসামীর পক্ষে গায়ে চিমটি কাটবার মতো অতি তুচ্ছ ব্যাপার হলেও দর্শকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মল্লযুদ্ধের ভূমিকা যেমন বাগ্-যুদ্ধ—এও অনেকটা তেমনি। শূলে চড়ালেই রাজ-বিচারের সীমা ফুরালো,—তাই আগে যতটা সম্ভব লোকটাকে নাজেহাল করে নেওয়া যায়। কায়িক দন্ডের ভূমিকা মানসিক লাঞ্ছনা। মনুষ্যত্ববোধকে একেবারে গুঁড়িয়ে নিষ্পিষ্ট করে না দিতে পারলে শাস্তি পায় না মানুষের ন্যায়বুদ্ধি।

জনতা শৃঙ্খলা ভেঙে ছুটে চলল সেইদিকে, বেপরোয়া লাঠি চালাতে লাগলো শান্ত্রীরা, মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো অনেকের তবু কারো হুঁস নেই। ফাটামাথা জোড়া দিলেই চলবে কিন্তু এমন জলুষ তো রোজ হয় না। সামান্য মাথার জন্য পরোয়া করলে চলবে কেন এইরকম ভাব জনতার।

অবশেষে ভিড় ঠেলেঠুলে জরার গাধা এসে দাঁড়ালো শূলদন্ডটার কাছে, তখন নগরপাল জরাকে গলা ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল, বদ্ধহস্ত অবস্থায় সে পড়ে গেল। তাকে বললেই নামতো, কিন্তু রাজ-বিচারের মর্যাদা রক্ষার পক্ষে বোধকরি সেটা যথেষ্ট নয়। সে পড়ে যেতেই দুইজন শাস্ত্রী এসে তার পা দুখানা আচ্ছা করে বেঁধে দিল। তখন সে অসহায়ভাবে পড়ে রইলো। এদিকে পিঠ হাল্কা হয়ে যেতেই গাধাটাও বোধকরি নিতান্ত অসহায় বোধ করলো, তখন সে লেজ খাড়া করে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে আপত্তি জানাতে জানাতে মরীয়া হয়ে জনতা ভেদ করে দৌড় মারলো। সামনে থেকে সরে যাও কামড়ে দেবে, পিছন থেকে সরে যাও চাঁট মারবে রব করতে করতে ছেলের দল ছুটলো পিছনে।

এদিকে জনতার চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে জরা মরে আর কি!

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে উঠল, আরে লোকটা যে মরে যাবে তখন শূলে চাপাবে কাকে।

আর একজন উত্তর করলো, মরে যাবে, দেহটা নিয়ে তো যাবে না।

পূর্বোক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি বলল, আর মরা মানুষকে শূলে চাপিয়ে কি লাভ! আসল মজাটাই তো বাদ পড়ে যাবে।

পাছে আসল মজাটা বাদ পড়ে যায়, পাছে মৃত্যুযন্ত্রণা ও মুমূর্ষুর কাতরোক্তি ফাঁক পড়ে যায়, শুধু দেহটা শূলস্থ করে

কি লাভ, মনুষ্যজীবনে দেহটা তো নগণ্য, আত্মাই তো মুখ্য, প্রভৃতি নিগূঢ় বিষয় চিন্তা করে জনতা সরে গেল, জরা হাঁফ ফেলবার অবকাশ পেলো। যারা বলে জনতা কান্ডজ্ঞানহীন তারা মূর্খ।

তখন জনতার মধ্য থেকে নানারকম রব উঠতে লাগলো, কইগো কখন হবে।

আর তো দেরী করতে পারি না, আজ আবার একাদশীর পারণ, খিদের নাড়ি জ্বলে গেল।

তবে এসেছিলে কেন মরতে।

আঃ ম'লো যা, মরতে না মরা দেখতে। তুই মর, তোর চোদ্দপুরুষ মর।

আহা বাছা ছেলেটা যে কেঁদে সারা হল, মাই দাও না মুখে।

অতটুকু ছেলে আনতে গেলে কেন?

কার কাছে রেখে আসি বাবা। তাছাড়া ভাবলাম ছেলেটাই বা বাদ পড়ে কেন, দেখে নিক শরীরে পুণ্য হবে।

ও কি বুঝবে?

বুঝবে বাবা বুঝবে, এ সংসারে কেউ অবুঝমান নয়। ছেলেটার বাপকে যখন ঝাঁটাপেটা করি তা দেখে ও হেসে ওঠে।

বাপরে বাপ, এ ছেলে বেঁচে থাকলে না জানি কি হবে।

কি আর হবে মাকে লাঠিপেটা করবে।

না বাপু আর অপেক্ষা করতে পারি না। আজ সকালে আবার গোয়ালা বুড়োর আসবার কথা সুদটা মিটিয়ে দেবার জন্যে, আমি বাপু যাই।

যাও, সুদের আশায় এই আসনটা খোয়াবে।

অনেকেই যাই যাই করছে কিন্তু কেউ নড়ছে না। দেরী হয় সকলেরই অগোচর ইচ্ছা, কারণ একবার হয়ে গেলেই তো মজা ফুরালো, কাজেই আশার সুতো যতটা দীর্ঘ করা যায়।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একমাত্র চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সম্ভব। চিৎ হয়ে পড়ে রইলো জরা। সুসংলগ্নভাবে চিন্তা করবার শক্তি তার অনেকক্ষণ লোপ পেয়েছিল—অথচ চিন্তা না করে থাকাও কঠিন, তাই নানারকম চিন্তার উড়ো খড়কুটো তার মনের মধ্যে প্রবেশ করছিল, ভালো করে তাদের দেখে নেবার আগেই পরবর্তী অনুপ্রবেশকারীদের পথ ছেড়ে দিয়ে তারা পালিয়ে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার উপায় নেই, হঠাৎ চোখে পড়লো অনুচ্চ আকাশে দুটো শকুন উড়ছে, তারাও জনতার মতো প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল তবে তাদের প্রত্যাশা কিছু মাংস। জরা এত বুঝলো না, মৃত্যু যে অত্যাসন্ন একথা বুঝেও মানুষে বুঝতে চায় না। সে ভাবলো আহা হাতে তীরধনুক থাকলে একতীরে দুটোকে নামাতে পারতো। মনে পড়লো একবার জরতীর সঙ্গে বাজি রেখে এক তীরে তিনটে টিয়ে পাখীকে গেঁথে ফেলেছিল, টিয়ে কত ছোট, শকুন কত বড়, ও নিশ্চয় পারে। এই প্রথম জরতীর কথা মনে পড়লো। না, আগেও একবার পড়েছিল, যখন তার মাথায় ঘোল ঢেলে দেওয়া হল তার একটা ধারা গড়িয়ে ঢুকেছিল তার মুখে। সেই ঈষৎ লবণাক্ত ঘোলের স্বাদ মনে পড়িয়ে ছিল তার গৃহস্থ-জীবনের ও গৃহিণীর স্বাদ। ঘোলটা তার বড় প্রিয় খাদ্য। জরতী সেই জন্যে মাঝে মাঝেই ঘোল তৈরি করতো, সে লুব্ধনেত্রে বসে বসে সেই বিচিত্র প্রক্রিয়া দেখতো, ভাবতো, এই তো যথেষ্ট হয়েছে অকারণে আবার খানিকটা মন্থন করা কেন! এবারে দিলেই হয় এক চুমুকে জামবাটি শূন্য করে ফেলে। জরতী বলতো এত তাড়া করলে কি হয়, দেখছ না এখনো সবটুকু ননী ওঠেনি।

সে বলতো রাখো তোমার ননী, না হয় ওটুকুও খেয়ে ফেলি।

তুমি বড় লোভী।

আর তুমি! পাথরের খাদা বোঝাই তেতুলের ঝোল যে পার করে দাও।

তুমি খাওনা বলেই আমাকে খেতে হয়, নইলে নষ্ট হবে।

নাও অনেক হয়েছে, এখন দাও।

যারা ঘোল ঢালছিল তাদের একজন বলে উঠল, লোকটার তেষ্টা পেয়েছে আর একটু ঘোল দাও।

একজন বাটি করে ঘোল দিচ্ছিল। পূর্বোক্তজন বলল, না, না, মাথায় ঢেলে দাও, গড়িয়ে মুখে ঢুকুক।

তাই দেওয়া হল। কিন্তু এবারে আর জরা খেলো না, হাত দিয়ে মুছে ফেলল, তখনো খোলা ছিল।

হঠাৎ জনতার কোলাহল কানে যেতেই, এতক্ষণ জনতার উপস্থিতি সম্বন্ধে তার সম্বিৎ ছিল না, সে ভাবলো এরা সব কারা, এখানে এত সকালে কেন। কোনরকমে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো চারদিকে চক্রাকারে জন-প্রাচীর। এবারে তাদের কথা ও কথার অর্থ বোধ হতে লাগলো জরার।

একজন বলছে আর মিছে দেরী কেন, দাও চাপিয়ে, ওদিকে যে হাটের বেলা বয়ে গেল।

তাই শুনে অপর একজন বলল, আরে আজ কি আর হাট বসবে, সবাই যে এখানে।

তাহলে এখানেই হাট বসালে হতো, ফিরবার আর তাড়া থাকতো না।

প্রত্যুত্তরে অপর একজন বলল, যা বলেছ ভাই একসঙ্গে রথ দেখা কলাবেচা দুই-ই হতো।

রথ দেখা বলে রথ দেখা! মায় রথের ডগায় হনুমানকে অবধি দেখা হতো।

এই কথায় সকলের মনে পড়ে গেল যে আসল কাজটাই বাকি, এখনো চাপানো হয়নি লোকটাকে শূলে।

তখন একজন বালক এতক্ষণ সে বয়স্ক-দের উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনে জ্ঞানবান হয়ে উঠেছে, লাঠির খোঁচা মেরে জরাকে বলল, এই বুনো ওটা দেখেছিস, এই বলে লাঠি দিয়ে ইসারায় শূলটা দেখিয়ে দিল।

এবারে প্রথম জরার চোখে পড়লো শূলটা, তাই তো ঐ তীক্ষ্ণাগ্র লৌহদন্ডটা কেন?

সে বন্যাক্লিতবৎ বলে উঠল ওটা কেন?

একজন বলল, কেন এখনি বুঝতে পারবে।

একজন রসিক বলল, বুঝতে পারবে নিশ্চয় কিন্তু বোঝাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

পূর্বোক্ত রসিক ব্যক্তি নিজ রসিকতার প্রতিক্রিয়ায় আহ্লাদিত হয়ে তান দিয়ে গান ধরলো,

'ডুব দিয়ে রসের সাগরে
কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে গো।'

তারপরে আখর শুনিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করলো, শূল তিন রকম ভাই, পিত্তশূল, অম্লশূল আর লৌহশূল। আগের দুটোয় ভুগে এখনো বেঁচে আছি, এ-বেটা লৌহশূলে চেপে ডুবে মরবে।

বেটার কচ্ছপের প্রাণ, সহজে মরবে মনে হয় না।

এবারে একজনের হুঁশ হল, শুধালো —বেটা কি করেছে?

দেখা গেল যে, অধিকাংশেই জানে না কি তার অপরাধ। তার আবশ্যকও ছিল না, কেননা অবশ্যই একটা অপরাধ আছে, নইলে রাজা দণ্ড দেবেন কেন?

নাও ভাই এখন ওসব কচকচি রাখো, যে-আশায় এসেছি, সেটা এখন হয়ে যাক।

জনতার কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি থেকে জরা বুঝতে পারলো এত আয়োজন তারই জন্যে, ঐ শূলে হবে তাকে চাপানো। সমস্ত দেহ শিউরে উঠল, কিন্তু এখনি মনে হল খট্যাস তাকে অভয় দিয়ে বলে-ছিল, জরা ভাই এখন এদের সঙ্গে মারা-মারি করে লাভ নেই, এরা অনেক। এখন ওদের সঙ্গে যাও। যথাকালে আমাদের দলবল নিয়ে তোমাকে উদ্ধার করবো, নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু কোথায় খট্যাস; কোথায় বা তার দলবল। সে চারদিকে তাকিয়ে কোথাও দেখতে পায় না খট্যাসকে।

জরা ফিরে এসে খট্যাসের কাছে বসতে সে বলে উঠল, যাক দেরী হয়নি, এবারে বসো আমাদের কর্তব্য বলছি, এমন সময়ে ঘরের দেয়ালে কয়েকটি ছায়া পড়লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার পিছনে কায়া-ধারীরা প্রবেশ করলো, নগরপাল ও চার-জন শান্ত্রী।

জরা তাদের প্রবেশের কারণ বুঝতে পারলো না, তবে খট্যাসের না বুঝবার কারণ ছিল না, অনেকবার সে রাজপুরুষ-গণ কর্তৃক বন্দী হয়েছে, যদিচ প্রত্যেক-বারেই মুক্তিলাভ করেছে। সে জরার কানে কানে বলল, তোমাকে নিতে এসেছে, এখন বাধা দেওয়া সম্ভব নয়, ওরা পাঁচজন, তার সশস্ত্র, এখন যাও, যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়ে আনবো, কোন ভয় নেই।

রাজপুরুষগণ বিহ্বল জরাকে বন্দী করে নিয়ে চলে গেল, খট্যাস চলল তার দলবলের সন্ধানে।

বাসুদেবের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে রাজা উগ্রসেন প্রধান নগরপালকে ডেকে আনিয়ে জরুরী আদেশ দিলেন যেমন করেই হোক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। নগর-পাল বাসুদেবের মৃতদেহের কাছে গিয়ে দেখল যে, পায়ে একটি তীর বিদ্ধ। তীর

দেখে বুঝলো অবশ্যই একজন তীরন্দাজের কাজ। নগরপালের বুদ্ধি সূক্ষ্ম, চিরকালই ও-বস্তুটা সূক্ষ্ম হয় রাজপুরুষদের। তারপরে ন্যায়শাস্ত্রের অপরিহার্য নিয়মের সূত্র অনুসরণ করে বুঝলো তীরন্দাজ একজন শিকারী। তখন সে অন্য রাজপুরুষগণের সঙ্গে পরামর্শ করে খট্যাসের আড্ডায় হানা দিল, কারণ সমাজ-বিরোধীদের মজলিশের স্থান বলে জানা ছিল। সেখানে গিয়ে খট্যাসকে দেখল, তাকে চিনতো বলেই বুঝলো সে শিকারী নয়, অতএব অন্য লোকটা নিশ্চয় শিকারী। তাকে বন্দী করে বুদ্ধির গৌরবে গোঁফে তা দিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকালো, তাদের চোখে দেখতে পেলো সার্থক গৌরবের দীপ্তি। তখন সকলে মিলে জরাকে বেঁধে নিয়ে প্রস্থান করলো। ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে কী না সম্ভব।

রাজসভায় অপরাধীর বিচার হয়ে থাকে এমন একটা কথা জানতো জরা, তবে রাজদণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। এবারে হাড়ে হাড়ে জেনে বুঝতে পারলো রাজদণ্ড কাল্পনিক কোন বস্তু নয়, একেবারে নীরেট সত্য, আর তার প্রক্রিয়াটা পীড়াদায়কভাবে কায়িক ব্যাপার। রাজদণ্ডের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার অন্তে সে যখন নেতিয়ে পড়েছে, তখন শাস্ত্রীদের একজন লাথি মেরে ভূপাতিত করে বলল, থাক বেটা এখন শুয়ে, আর রাত্রির মধ্যে যদি না মরিস, তবে কাল সকালে শূলে চড়ে স্বর্গে যাওয়ার সুখ অনুভব করতে পারবি। বিচারটা অপরাধী ধরা পড়বার সময়েই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এত বিশ্লেষণ করে দেখবার মতো তার মনের অবস্থা ছিল না। গায়ের ব্যথায় ও মনের অসাড়তায় শীঘ্রই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

জরা স্বপ্ন দেখছে, সে-স্বপ্ন এমন জীবন্ত যে, জেগে উঠেও তার সন্দেহ ঘোচে না—আদৌ তা স্বপ্ন কিনা কিম্বা সত্যই একটা আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে। সে দেখল একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকেছে। অন্ধকার এমন ঘন যে, নিজেকে অবধি দেখতে পাওয়া যায় না, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে টের পাওয়া যায় অস্তিত্ব। সে চলেছে তো চলেইছে, কোথায়, কেন জানে না। হঠাৎ চমকে উঠল, এ কোন রূঢ় শব্দ, খট্যাসের হাসি নাকি! না গুহার গা থেকে একখানা পাথরের টুকরো গড়াতে গড়াতে পড়লো। এ-অন্ধকারের আর শেষ নেই। একি সত্যই কোনো গুহা, না কোন অজগরের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বোধ করি তাই হবে। তখন সে দেহ-মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, বাসুদেব, বাসুদেব দয়া করো, রক্ষা করো, আমি পাতকী, মহাপাতকী। আবার সেই রূঢ় শব্দ। না, এবারে খট্যাসের হাসি না হয়ে যায় না। না, এবারেও গড়ায়মান পাথরের টুকরো।

হঠাৎ অনুভব করলো তার সমস্ত গা ঘামে ভিজে গিয়েছে, যেন এখনি স্নান করে উঠেছে, সমস্ত শরীর হিম, মনে হল তার শেষমুহূর্ত সমাগত। তখন ভাবলো যদি মরতেই হয়, তার আগে একবার দ্রুত প্রাণভরে বাসুদেবকে ডেকে নেবে। বাসুদেব বাসুদেব বলে চীৎকার করতে করতে তার গলা ভেঙে গেল, কই কেউ তো সাড়া দিল না। জরতীর কাছে শুনেছিল বাসুদেব দয়াময় ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না, তবে শুধু মুখে ডাকলে হবে না, মনে আন্তরিকতা থাকা চাই।

কোথায় তার মনে আন্তরিকতা। তখন সে বাসুদেব বলে ডাকতে ডাকতে পাথরের দেয়ালে মাথা কুটতে লাগলো। দেয়াল পাথরের বলেই টলল না। দরদর ধারা গড়াতে লাগল কপালে, হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝলো রক্ত, ঘাম এত ঘন হয় না।

রক্তস্রাবে শ্রান্ত হয়ে যখন বসে পড়লো, তখন সে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে। সম্পূর্ণ হতাশা মৃত্যুর চেয়েও নীরেট। তার প্রত্যয় হল এ-অন্ধকার গুহারও নয়, অজাগরের উদরেরও নয়, এ সেই জগৎ যেখানকার চন্দ্রে এবং সূর্যে চিরন্তন পূর্ণগ্রহণ। এবারে কেঁদে উঠল, এ-কান্নায় সত্যই আন্তরিকতা ছিল, পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় নয়, নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার ইচ্ছায় এ-কান্না। পাপ জীবনের অঙ্গ, নৈরাশ্য জীবনের অস্বীকৃতি। ঐ অবস্থাটা পাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ সে দেখতে পেলো দূরে, অতি-দূরে একটি আলোর বিন্দু জোনাকির চেয়ে বড় নয়। বিন্দুটা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে —ছুটে আসছে তার দিকে, যত কাছে আসছে তত আয়তনে বড়, প্রভায় উজ্জ্বল-তর হচ্ছে। এবারে সেই আলোকময় গোলক একটি উজ্জ্বল চক্রের আকার ধারণ করেছে। মনের মধ্যে চমক দিয়ে গেল—এই কি সেই গল্পে শ্রুত সুদর্শন-চক্র। তবে বুঝি তাকে বধ করবার উদ্দেশ্যেই তার আবির্ভাব। এক মুহূর্ত আগে যে সে সহস্রবার মৃত্যু কামনা করেছিল, ভয়ে বিহ্বল হল তার মন। তখনি মনে হল চক্র যদি এসে থাকে, তবে নিশ্চয় সঙ্গে আছেন চক্রধারী। ভয়ের থেকে উছলে উঠল আনন্দের বিদ্যুৎ। মেঘ বিদ্যুৎ অবিচ্ছেদ্য ভয়-আনন্দও কি তাই নয়!

এ কে? সম্মুখে তার এ কে? কে এই দিব্য দেহধারী পুরুষ? কেমন করে চিনবে জরা, এমন তো কখনো চোখে দেখেনি। তবে বুঝলো, যাঁর প্রভায় অন্ধকার জ্বলে উঠেছে, মুক্তিদান তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। পা জড়িয়ে ধরবার আশায় সে নত হল, নত হতেই চোখে পড়লো, বাম চরণে একটি রক্তের রেখা। মূর্ছিত হয়ে পড়বার আগে বুঝলো তবে তো বাসুদেবই এসেছেন বটে। কিন্তু কেন? দণ্ডদান, না মুক্তিদান কি তাঁর অভিপ্রায়। যিনি এমন উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল সমুজ্জ্বল, যিনি এমন নির্জন প্রসন্ন সুন্দর, তিনি কি মুক্তি না দিয়ে দণ্ড দিতে পারেন! জরা মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই শাস্ত্রী কারাকক্ষের দরজা খুলে গুঁতো মেরে জাগিয়ে দিল জরাকে। জরার তখনো স্বপ্নের ঘোর কাটেনি, সে বলে উঠল, দয়াময় তবে সত্যই এসেছ।

বাপরে বেটা যে এক রাত্রির মধ্যে মস্ত ধার্মিক হয়ে উঠল।

এই বলে মারলো আর এক গুঁতো।

জরা বুঝলো, এ-ব্যক্তি আর যেই হোক দয়াময় তার বিশেষ গুণ নয়।

চল বেটা।

জরা শুধালো, কোথায়?

বিকট মুখভঙ্গী করে শাস্ত্রী বলে উঠল, আবার কোথায়! বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাচ্ছি, নে এগো।

জরা ভাবলো বাসুদেবের তো বৈকুণ্ঠেই বাস।

তারপরে পর পর অল্পক্ষণের মধ্যে তার যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ঘটলো, তা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির সূচক মনে হল না। নাপিত এসে মাথা মুড়িয়ে দিল, দুজনে টেনে বসিয়ে দিল উল্টো করে গাধায়, একজন এক হাঁড়ি ঘোল ঢেলে দিল মাথার উপরে। তারপরে জনতার ধিক্কারধ্বনির মধ্যে এসে পৌঁছল দক্ষিণ মশানে। এখানে অসহায়-ভাবে শুয়ে শুয়ে স্মরণ করছে বাসুদেবকে নয়, খট্যাসকে। বাসুদেবের আবির্ভাব মায়া হলেও খট্যাসের আবির্ভাব কখনো মিথ্যা হবে না। খট্যাসের সেই বিদ্রূপ-আশ্বাস এখানে তার কানে বাজছে। রক্ষা করবে তো ভাই জিজ্ঞাসার উত্তরে খট্যাস বলেছিল, জরা, পুণ্যাত্মারা পাপীদের এড়িয়ে চলে বলেই তারা পরস্পরকে রক্ষা করে, পাপের ডোরে পাপীরা ঘনিষ্ঠ, সে-ডোরের বাঁধান বড় শক্ত।

জরা যখন এইসব চিন্তা করছিল, জনতা যখন বিলম্ব দেখে অধীর হয়ে উঠছিল, জরতী তখন জনতার একান্তে বসে কাঁদছিল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার সামর্থ্য তার হয়নি, সাহসেরও অভাব হয়েছিল। কি দেখতে কি দেখবে। জরার দণ্ড দেখতে আসেনি সে, প্রভুদয়াল ক্ষমাপত্র নিয়ে উপস্থিত হবেন, জরা মুক্তি পাবে, তখন তাকে নিয়ে ফিরে যাবে এই আশায় এসেছিল। কিন্তু কোথায় এই ভিড়ের মধ্যে প্রভুদয়াল, রাজা কি সত্যই তাঁর প্রার্থনা পূরণ করবেন, অন্যথা জরার দণ্ড অবধারিত — আশা-আকাঙ্ক্ষার, আকাঙ্ক্ষার ভাগটাই বেশি, সে কাঁপছিল।

একজন প্রবীণা তাকে শুধালো, বৌ কাঁদছ কেন?

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। প্রবীণা আবার শুধালো, তোমার কি হয়েছে?

এবারে জরতী বলল, মা, আমি বড় দুঃখী।

এ-সংসারে দুঃখী কে নয় বৌ, তার জন্যে কাঁদতে গেলে সারাজীবন কেঁদেই কাটাতে হয়।

কোথায় দুঃখ মা! সবাই তো হাসছে! সবাই তো গোলমাল করছে।

ও সমস্তই কান্নার রকমফের বৌ, দেখোনি জল হিমে জমে কঠিন হয়, এ হলোও কান্নার রূপান্তর। আমার দুঃখের কথা যদি জানতে—

কিন্তু তার দুঃখের ইতিহাস বলা আর হয়ে উঠল না, গম্ভীর রবে দামামা বেজে উঠল। জনতা হৈ-চৈ করে উঠল, ঐ যে নগরপাল আসছে, এবারে হবে।

সত্যই মুখ্য নগরপাল শূলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘন ঘন দামামা বেজে সকলকে আশ্বাস দিচ্ছে, এবারে অপরাধীকে শূলে চড়ানো হবে। আশার উপকূল দেখতে পেয়ে জনতা শান্ত ভাব ধারণ করেছে।

একটা লম্বা লোকের মাথা আর সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছিল, যারা দেখতে পাচ্ছিল না, তাদের সবিশেষ জ্ঞাত করছিল সে। কাছেই উপবিষ্ট ছিল জরতী। সব কথা সে শুনতে পাচ্ছিল।

লম্বা লোকটা বলে যাচ্ছে—এবারে চারজন শাস্ত্রী মিলে অপরাধীর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিচ্ছে। বাঁধন খোলা শেষ হয়ে গিয়েছে। শাস্ত্রীরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে লোকটাকে। আহা, কিবা ভঙ্গিমে লোকটার। মাথা ন্যাড়া, ঘোল ঢালায় মাঝে মাঝে শাদা হয়ে গিয়েছে। দেখো দেখো লোকটা একেবারে ভয়ডর নেই, আবার টুক্‌ টুক্‌ করে তাকানো হচ্ছে। নে নে ভালো করে সব দেখে নে, এখনি জন্মের দেখা শেষ হয়ে যাবে।

জরতী শুনছে আর কাঁদছে।

লম্বা লোকটা বলছে, এবারে সকলে মিলে লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছে শূলের দিকে, এখনি চাপিয়ে দেবে। তারপরে পার্শ্ববর্তীদের আশ্বাস দিয়ে বলে, তখন তোমরা সবাই দেখতে পাবে।

এবারে সবাই মিলে লোকটাকে উঁচুতে তুলছে।

আরও কিছু সে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কথা শেষ হতে পারলো না।

জনতার দক্ষিণ দিকে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য অনুভূত হল, কি হচ্ছে, কি হচ্ছে, চুপ করো বাপু, শেষমুহূর্তে রসভঙ্গ করো না ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ উঠতে থাকলো ভিড়ের মধ্যে থেকে। যারা ভিড়ের পিছনের দিকে দাঁড়িয়েছিল, তারা দেখতে পেলো হঠাৎ বিকলাঙ্গের দল উঠে দাঁড়িয়েছে; দেখতে পেলো বিকলাঙ্গগণ, কানা-খোঁড়া, ন্যুব্জ-কুব্জ প্রভৃতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। সকলে দেখে অবাক হয়ে গেল তাদের সকলেরই সুস্থ সবল শরীর, মাংসপেশী থেকে স্বাস্থ্যের বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। কোথায় খুলে পড়েছে তাদের গায়ের মাথার পটি, আর যে লাঠিগুলো ভর করে তারা এসেছিল, সেগুলো অপূর্ব দক্ষতায় ঘূর্ণিত হচ্ছে তাদের হাতে। তারা সকলে শিক্ষিত সেনানীর মতো ব্যূহবদ্ধভাবে ঘূর্ণমান লাঠি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সকলের আগে আগে খট্যাস। তখন জনতার বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে পালা পালা ভাব, ভাবের সঙ্গে ভঙ্গী, যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো, সকলের আগে পালালো শাস্ত্রী ও নগরপাল। মুহূর্ত মধ্যে দক্ষিণ মশানের মস্ত মাঠ জনশূন্য হয়ে গেল। তখন খট্যাস পরিচালিত জনব্যূহ বিমূঢ় জরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে জয়ধ্বনি করে উঠল। জয়ধ্বনি আসবামাত্র খট্যাসের কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, চলো সকলে নগরের দিকে, আজ রাজবাড়ী লুটবো। তারপরে সেই করাতে কাঠ চেরা অট্টহাসি, যা শুনলে গায়ের রক্ত জমে হিম হয়ে যায়। খট্যাসের আদেশ পেয়ে জনতা আবার জয়ধ্বনি করে উঠল আর তারপরেই বাঁধভাঙা স্রোতের মতো সবাই ছুটলো নগরের দিকে।

ঠিক সেই সময়ে রাজার ক্ষমাপত্র হাতে নিয়ে প্রভুদয়াল এসে উপস্থিত হয়ে দেখল মশান জনশূন্য, কেবল একান্তে একটি নারী মূর্চ্ছিত। কাছে গিয়ে দেখল জরতী। তার চৈতন্য সম্পাদন করে তাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। প্রকৃত অবস্থার কিছুই সে জানতে পেলো না, জরতী জানতে পেলো, তবে এইমাত্র জানলো যে, জরা জীবিত আছে।

সভাসদহীন বিরাট সভাগৃহে একটি দীপশিখা নিষ্কম্প একটি মাত্র ছায়াসঙ্গী রাজা উগ্রসেন সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। সারাদিন এইভাবেই অতিবাহিত হয়েছে। মাঝে মাঝে আর্ত নগরের তুমুল হলহলার উচ্ছ্বাস এসে, সমুদ্রতরঙ্গের অভিঘাত যেমন তীরভূমিতে পৌঁছয়, তেমনিভাবে আঘাত করেছে বৃদ্ধ রাজার কর্ণে। করবার কিছু নেই। রাজার হাত-পা অনুচর পরিচর, তারা সকলেই পলাতক, নয় লুণ্ঠেরাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুণ্ঠনে নিযুক্ত। অরক্ষিত নগরের অসহায় নৃপতি।

যদুবংশের বীরগণ সকলেই মৃত। এখন যারা আছে সকলেই বেতনভুক্। সারা মাসের বেতনের চেয়ে বেশি একদিনে জুটবে আশায় তারা লুণ্ঠেরাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অমাত্যগণ বৃদ্ধ, তারা অশক্ত। মহিষীদের অনেকে বলভদ্র ও বাসুদেবের সঙ্গে সহমৃতা। অন্যেরা অন্তঃপুরে রোরুদ্যমানা। আর রাজপুরনারীরা! তাদের কথা ভাবতে চায় না উগ্রসেন, তাদের কীর্তি কিছুদিন হল রাজার কানে এসে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। কিছু করবার নাই।

এমন সময়ে পদশব্দে সচকিত হয়ে উঠলো উগ্রসেন, শুধালেন, কে?

মহারাজ, আমি কঞ্চুকী।

নগরের কি সংবাদ?

দস্যুরা নগর পরিত্যাগ করে গিয়েছে।

তার মানে নগরে লুণ্ঠন করবার মতো আর কিছু নেই। শাস্ত্রীগণ কি করলো?

মহারাজ, কতক দস্যু-হস্তে নিহত, অধিকাংশ দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

রাজপুরনারীগণ?

কঞ্চুকী কোন উত্তর দিল না।

কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন কঞ্চুকী? থাক, তোমার নীরবতাই উত্তর। অর্জুনকে আনতে আহুক কবে যাত্রা করেছে।

তা ক'দিন হল মহারাজ।

এখনো ফেরেনি। দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুর পথ কত যোজন কঞ্চুকী।

যাতায়াতে অনেক শত যোজন পথ, মহারাজ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উগ্রসেন বললেন, যাতায়াতে অনেক শত যোজন পথ ভুলেই গিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

কঞ্চুকী নিঃশব্দে প্রস্থান করলো।

প্রবল প্রতাপশালী যদুবংশের রক্ষক মহারাজা উগ্রসেন মাথায় হাত দিয়ে একাকী বসে রইলেন। এমনি সংসারের রাজগী বটে! হঠাৎ তীব্র অট্টহাসি ধ্বনিত হল। কে হাসে? না, শূন্য কক্ষের আলো-আঁধারিতে গোটাকতক চামচিক উড়ছে, তাদেরই পাখার শব্দ।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

বিজ্ঞানের কথা

ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

কোনো কোনো প্রেক্ষাগৃহে একেবারে সামনের সারিতে বসেও অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মুখের কথা স্পষ্ট শোনা যায় না। মনে হয় কথাগুলো যেন হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো প্রেক্ষাগৃহে ফিসফিস কথাও গমগম করে বেজে ওঠে। গির্জার প্রার্থনাসভায় পাদরি-মশাই খুব জোরে কথা বলেন না, কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রোতার মনে হয় পাদরিমশাই তাঁর কানের কাছে মুখ এনে কথা বল-ছেন। আবার কোনো কোনো গির্জায় শব্দের গম গম করে বেজে ওঠাটা এমনই বেশি মাত্রায় যে খুব ভালো গলার গানও পন্ড হয়ে যায়।

সবই নির্ভর করে শব্দ কতখানি ফিরে আসছে আর কতখানি মিশিয়ে যাচ্ছে তার ওপরে। শব্দের ফিরে আসার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। যাকে আমরা বলি প্রতিধ্বনি তা হচ্ছে শব্দের এই ফিরে আসা—প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা, যেমন ফিরে আসে আলো আয়নায় প্রতি-ফলিত হয়ে।

অরণ্যের ঘন গাছপালা যেখানে পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে, তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললে শব্দ ফিরে আসে। শব্দকে ফিরিয়ে দেয় অরণ্যের পাঁচিল। তেমনি ফিরিয়ে দিতে পারে উঁচু দেওয়াল, বৃহৎ অট্টালিকা, পর্বত বা অন্য কোনো আড়াল। আবার আড়ালের বিন্যাস এমন হতে পারে যে শুধু একবার নয়, একই শব্দ বারবার ফিরে আসে। মিলানে একটি দুর্গ ছিল যেখানে জানলায় দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়লে গুলির আওয়াজ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বার ফিরে আসত, জোরে চেঁচিয়ে দিলে বার তিরিশেক শোনা যেত সেই হাঁক।

আমরা যখন কথা বলি আশেপাশে কোনো না কোনো আড়াল থাকেই। আর আড়াল যদি থাকে তাতে ধাক্কা খেয়ে শব্দ ফিরে আসবেই, আয়না থেকে আলোর ঠিকরে আসার মতো। তাহলে তো আমাদের মুখের প্রত্যেকটি কথার ফিরে আসা উচিত। প্রত্যেকটি ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হওয়া উচিত। তা হয় না কেন?

আসলে প্রত্যেকটি কথা ফিরে আসে, প্রত্যেকটি ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু আমাদের কানে সব সময়ে তা পৌঁছয় না, কিংবা পৌঁছলেও এমনই সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছয়েছে যে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি আমরা একই সঙ্গে শুনেছি, দুয়ের মধ্যে তফাৎ করতে পারিনি।

প্রতিধ্বনি কানে পৌঁছয় না—সেটা কোন অবস্থায়?

প্রথম ছবিতে এই অবস্থাটি দেখানো হয়েছে। আড়ালের সামনে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। তার মুখের কথা কিভাবে আড়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে তা ভাঙা ভাঙা রেখায় দেখানো হয়েছে। ছবি দেখে বোঝা যাবে প্রতিফলিত রেখাগুলো সবই মানুষটির মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনোটিরই তার কানে পৌঁছতে পারে না। এক্ষেত্রে ফিরে আসা যে-কথাকে পৃথকভাবে শুনতে পারার পরে আমরা বলি প্রতিধ্বনি তার কোনো অস্তিত্ব নেই। ছবি দেখলে আরো বোঝা যাবে মানুষটি রয়েছে নিচে, তার মাথা ছাড়িয়ে আড়াল উঠে গিয়েছে উঁচুতে। এমনি অবস্থায় শুনতে পাবার মতো প্রতিধ্বনি হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় ছবিতে আড়াল ও মানুষটি প্রায় মাথায় মাথায়। জমির ঢালটিও বাটির মতো খোন্দলসদৃশ, যাকে বলা হয় কনকেভ বা অবতল। ভাঙা ভাঙা রেখায় শব্দের যাওয়া ও ফিরে আসা দেখানো হয়েছে। ছবি দেখে বোঝা যাবে, ফিরে আসা শব্দ পৃথকভাবে শুনতে পারার পরে যাকে আমরা বলি প্রতিধ্বনি তার অস্তিত্ব এখানে আছে।

এই দ্বিতীয় ছবিতেও মানুষটি যদি আড়ালের খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু পৃথকভাবে শুনতে পারার মতো প্রতিধ্বনি হবে না। শব্দের গতি সেকেন্ডে ৩৪০ মিটার। অর্থাৎ মানুষটি যদি আড়াল থেকে ৮৫ মিটার দূরে দাঁড়ায় তাহলে প্রতিধ্বনি সে শুনবে ঠিক আধ সেকেন্ড পরে। আরো সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি মিশে যাবারই সম্ভাবনা। তাছাড়া সব প্রতিধ্বনি সমান স্পষ্ট হয় না। শব্দ যতো আচমকা ও চড়া প্রতিধ্বনি ততো স্পষ্ট। এদিক থেকে প্রতিধ্বনি পরখ করার ধ্বনি হিসেবে হাত-তালিই সবচেয়ে ভালো; মানুষের গলার স্বর সবচেয়ে খারাপ, বিশেষ করে পুরুষের গলার স্বর, শিশুর ও নারীর চড়া গলার স্বর খানিকটা চলতে পারে। কাজেই প্রতিধ্বনি কেমন হবে তা নির্ভর করে মূল শব্দের ওপরে—সেটি পশুর গর্জন, না বিউগিলের বাজনা, না বজ্রের হুংকার, না মেয়েলি গলার গান?

আড়াল থেকে ৮৫ মিটার দূরে দাঁড়ালে প্রতিধ্বনি শোনা যায় ঠিক আধ সেকেন্ড পরে, একথা বলেছি। কথাটা উলটো ধরে নিয়ে প্রতিধ্বনি ফিরে পাওয়ার সময়ের হিসাব থেকে দূরত্বের হিসাব করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। যেমন, আধ সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনি শোনা গেলে দূরত্ব দাঁড়ায় ৮৫ মিটার। জুলে ভার্নের পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাত্রা উপন্যাসে খুড়ো ও ভাইপো ভূগর্ভের পথে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তখন প্রতিধ্বনি ফিরে আসার সময়ের হিসেব থেকে খুড়ো হিসেব করে নিয়েছিলেন ভাইপো থেকে তিনি কতটা দূরে রয়েছেন। এক সময়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হত ওজন বাঁধা

দড়ি সমুদ্রের জলে নামিয়ে। এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের গভীরতার মাপ নিতে হলে কী পরিমাণ দড়ির প্রয়োজন তা অনুমান করা চলে। আজকাল নেওয়া হয় প্রতিধ্বনি ফিরে আসার সময়ের হিসেব থেকে। শব্দ তৈরি হয় একটি যন্ত্রে, সেই শব্দ সমুদ্রের তলদেশে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে সেই যন্ত্রেই ধরা পড়ে। কতক্ষণ পরে ধরা পড়ল তা থেকে গভীরতার হিসেব। বাদুড় রাত্রিবেলা ওড়ার সময়ে সামনে কোনো বাধা আছে কিনা তা পরখ করে তার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে কিনা তা থেকে। তবে বাদুড়ের এই চিৎকারটি সাধারণ শব্দের মতো নয়, যাকে বলা হয়, শ্রবণাতীত শব্দ —তাই। কাজেই রাত্রিবেলা যতোই বাদুড় উড়ে যেতে আমরা দেখি না কেন তার চিৎকারটি শুনতে পাই না।

আড়ালকে বলেছি শব্দের আয়না। এই আয়নার চেহারাটি যদি হয় অবতল তাহলে ফিরে আসা শব্দগুলো অবতল থেকে ঠিকরানো আলোর মতোই একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হতে পারে। ঘরের মধ্যে এমনি একটি অবতল আড়াল যদি থাকে তার সেই আড়াল থেকে ফিরে আসা শব্দের কেন্দ্রীভবনের বিন্দুতে যদি বসানো হয় একটি মানুষের মূর্তি (তার ঠোঁট থাকবে এই বিন্দুতে), তাহলে ঘরের মধ্যে কথা বললেই মনে হবে মানুষের মূর্তিটি সেই কথাগুলো ফিসফিস করে বলছে।

প্রেক্ষাগৃহে প্রম্পটারের বসার স্থানটিকেও এমনি একটি অবতল আড়ালের মধ্যে রাখা চলে। তা হলে এমন যাতে প্রম্পটারের মুখের কথা প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়তে না পারে কিন্তু মঞ্চে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রম্পটারের কথা দর্শকদের কানে পৌঁছলে কী অবস্থার সৃষ্টি হয় তা সকলেই জানেন। যাতে কোনোক্রমেই না পৌঁছয় তার ব্যবস্থা অবতল আড়ালের সাহায্য নিয়ে অনায়াসেই করা সম্ভব।

কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে অন্য যে ব্যবস্থাটি অবশ্যই থাকা দরকার তা হচ্ছে অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখের কথা সারা প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে দেওয়ার। এ জন্যে ধ্বনির প্রতিধ্বনি তোলার বিশেষ রকমের আয়োজন রাখতেই হয়। কিন্তু তা এমন বেশি মাত্রায় নয় যাতে মূল ধ্বনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ-জন্যে সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই শব্দকে মিলিয়ে দেবার ব্যবস্থাও। প্রত্যেকটি শব্দ যদি বড়ো বেশি গমগম করে বেজে ওঠে তবে বুঝতে হবে প্রেক্ষাগৃহের শব্দ-ব্যবস্থা খারাপ।

শব্দ মিলিয়ে দেবার ও শুষে নেবার সবচেয়ে সেরা আয়োজন হচ্ছে খোলা জানলা। ফুটো দিয়ে যেমন আলো মিলিয়ে যায় তেমনি ফাঁক-ফোকর দিয়ে শব্দ। এক বর্গমিটারের একটি খোলা জানলা হচ্ছে শব্দ শুষে নেবার একটি ইউনিট। প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদেরও তুলনা করা হয়ে থাকে খোলা জানলার সঙ্গে। প্রত্যেক দর্শক আক্ষরিক অর্থেই খানিকটা করে শব্দ শুষে নিচ্ছে। শূন্য প্রেক্ষাগৃহে বক্তার কথা এই খোলা জানালাটি পায় না, বক্তার পক্ষে তা বিরক্তিরই কারণ।
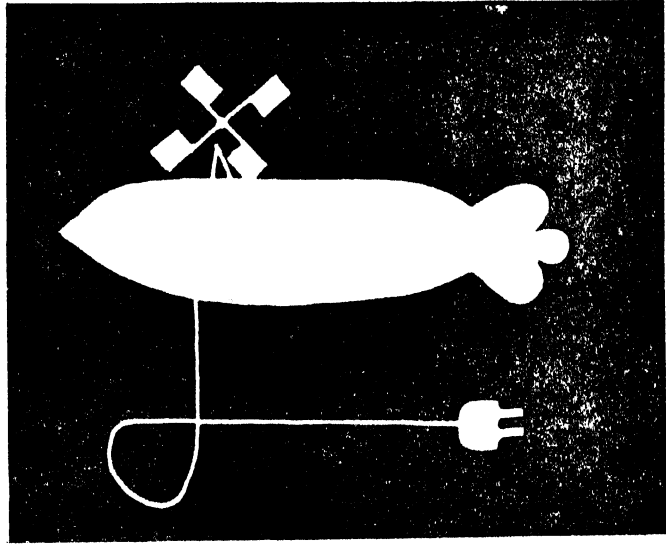
হাওয়াই জাহাজ ও হাওয়া-কল : আকাশে বিদ্যুৎ উৎপাদন

সকলেই জানেন, জলবিদ্যুৎ তৈরি হয় জলের তোড়ে টারবাইন ঘুরিয়ে। আসলে বিদ্যুৎ তৈরি হয় জেনারেটার আর সেজন্যে জেনারেটারের ফীল্ডকয়েলটি একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘূর্ণিত হওয়া চাই। টারবাইন ঘুরিয়ে এই ফীল্ডকয়েলকেই ঘোরাবার ব্যবস্থা। জলের তোড়ে না হলে অন্য কোনো উপায়েও ঘোরাবার ব্যবস্থা হতে পারে। বাষ্পের জোরে জেনারেটারের ফীল্ডকয়েল ঘোরাতে হলে কয়লা বা তেল পোড়াতে হয়, সেটা খরচের ব্যাপার। জলের তোড়ে ঘোরাতে এই খরচ বেঁচে যায়।

জলের তোড়েই যদি ঘোরানো চলে, বাতাসের ঝাপটাতেই বা ঘোরানো যাবে না কেন? হাওয়া-কল যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন বাতাসের ঝাপটায় পাখার ব্লেড ঘুরিয়ে একটি ঘূর্ণন তৈরি হয়ে থাকে। গম পেশাই করার যন্ত্র যদি তাতে চালু হতে পারে তাহলে জেনারেটরই বা নয় কেন? কিন্তু মনে রাখা দরকার জেনারেটরে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ, কাজেই ঘূর্ণনটি হওয়া চাই অবিরাম। ভূপৃষ্ঠে, এমনকি উঁচু পাহাড়ের চূড়োতেও, বাতাসের ঝাপটা সম্পর্কে একথা বলা চলে না যে তা অবিরাম। গম পেশাইয়ের যন্ত্র থেমে থেমে চললেও ক্ষতি নেই, জেনারেটরকে সর্বক্ষণ চালু রাখতেই হয়। এ-কারণে ভূপৃষ্ঠে বাতাসের ঝাপটায় জেনারেটর চালু করার কোনো পরিকল্পনা এতাবৎ হয় নি। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার উঁচুতে এমন একটি এলাকায় পৌঁছনো যায় যেখানে আছে বাতাসের অবিরাম ও সজোর একটি ঝাপটা। এলাকাটি বায়ুমণ্ডলের ট্রোপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে। ভূমণ্ডলকে পাক দিয়ে বাতাস এই এলাকায় উচ্চবেগে পশ্চিম-দিকে প্রবহমান।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পরিকল্পনা করেছেন, উঁচু আকাশের এই অবিরাম বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে একটি বিদ্যুৎ-তৈরির কারখানা বসাবেন। পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে অভিনব।

প্রকাণ্ড একটি হাওয়াই জাহাজ ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার উঁচুতে তোলা হবে। কৃত্রিম উপকরণে তৈরী অতীব মজবুত একটি দড়ি দিয়ে মাটির সঙ্গে বাঁধা থাকবে হাওয়াই জাহাজটি (যেটি লম্বায় ১৬৮ মিটার, চওড়ায় ৫০ মিটার)। হাওয়াই জাহাজে থাকবে হাওয়া-কল ও জেনারেটর। অবিরাম ও সজোর বায়ুপ্রবাহে ঘুরবে হাওয়া-কল সেই সঙ্গে ঘুরবে জেনারেটর।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনে করেন সাইবেরিয়ার বা একেবারে উত্তরের এলাকায় এই উপায়েই বিদ্যুৎ তৈরি করাটা অপেক্ষাকৃত কম খরচের। কেন না এসব এলাকায় পরিবহণের ব্যবস্থা এতই খারাপ যে দূর থেকে তার টেনে বিদ্যুতের প্রবাহ আনতে হলে কিংবা স্থানীয় বিদ্যুৎ কারখানাকে চালু রাখবার জন্যে দূর থেকে তেল বা কয়লার যোগান বজায় রাখতে হলে খরচ খুবই বেশি। তার চেয়ে আকাশে হাওয়াই জাহাজ তুলে আকাশেই বিদ্যুৎ তৈরির কারখানা চালু করার খরচ অপেক্ষাকৃত কম। তার এমনি একটি কারখানার সপক্ষে আরো একটি বলার কথা, এতে বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার কোনো আশংকা নেই।

আরো একটি সুবিধে আছে। দশ কিলোমিটার উঁচুতে ভাসমান হাওয়াই জাহাজ থেকে অবশ্যই টেলিভিশন প্রচার হতে পারে। তাই সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনায় একই সঙ্গে দশ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে টেলিভিশন প্রচারের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। এমনিতে টেলিভিশন প্রচারের জন্যে স্তম্ভ তুলতে হয়। স্তম্ভ যতো উঁচু প্রচারের পাল্লা ততো বেশি। টেলিভিশন প্রচারের দিক থেকে এমনি একটি হাওয়াই জাহাজ দশ কিলোমিটার উঁচু একটি স্তম্ভ তোলার সামিল।

—অয়স্কান্ত

চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা

অদ্রীশ বর্ধন

চাণক্য চাকলাদার বৃদ্ধ, কুব্জ, পলিতকেশ। রোগজীর্ণ, বদহজমে শীর্ণ, যমেরও অরুচি। কিন্তু একদিন তিনি ছিলেন দুরন্ত, দুর্মদ, দুর্বার। মুচিপাড়ার মেসে থাকেন, প্রতি সন্ধ্যায় আফিং খান, তারপর ডাইরী লিখতে বসেন। আসলে ভদ্রলোক অ্যাডভেঞ্চার বই পড়েন, ফ্যানটাসটিক ফিল্ম দেখেন। আফিংয়ের মৌতাতে সেই সবই লেখেন...এ হল তাঁরই ডাইরী......

উদ্দাম নৃত্যে প্রায় বিবসনা হয়ে গিয়েছিল ক্যাবারে নর্তকী।

হোটেল কক্ষ। অনেকগুলো রঙের রামধনু রোশনাই। তবুও ঘরের আনাচে-কানাচে অন্ধকারের স্তূপ। এরা নৃত্য-রসিক। সুধারসেও বঞ্চিত নয়। সেইসঙ্গে কোমলা সঙ্গিনী। বিবশা সঙ্গিনীদের কামনা-কালো আঁখি গাঢ় হয়ে উঠেছে সেক্স হট নৃত্যের কৃপায়। ধমনীতে সুবর্ণমদিরাও কাজ শুরু করে দিয়েছে। সঙ্গী পুরুষের কর্কশ আলিঙ্গন তনুমন বিহ্বল করে চলেছে।

এই হল দিল্লির হোটেল-রজনী। সারা পৃথিবীর মানুষকে এখানে দেখা যায়। ঘরসংসার তারা বিস্মৃত হয়। ঢলু-ঢলু চোখের সামনে শুধু হেলতে দুলতে থাকে কালনাগিনীসম রূপসী নর্তকী। একে একে খসে পড়তে থাকে তার দেহাবরণ। ধীরে ধীরে উদ্দাম হতে থাকে মিউজিক। এগিয়ে আসে চরম মুহূর্ত। রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে দর্শকদের।

যেন আরব্য উপন্যাসের নতুন সংস্করণ।

সে রাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মোহিনী নাচে দুলছে মায়াবিনী। পর্যায়ক্রমে অনাবৃত হচ্ছে তনু। যৌবন যেন ফেটে পড়ছে দেহতটে। আসছে......সেই মুহূর্ত আসছে......যখন সহসা স্তব্ধ হবে দামামা-ধ্বনি......গুরুগুরু নির্ঘোষে থরথর কম্পিত হবে উত্তাল হৃদয়......বিদ্যুৎঝলকের মত দেখা দেবে ঈভ......আদিম মানবী!

তিমিরাবৃত একটি কোণের টেবিলে গুমগুম ধোঁয়া উঠছিল একটি পাইপ থেকে। পাইপ অধিকারী মানুষটি আকারে বাঁশের মত সিধে। নিমীলিত নয়ন। যেন অপ্সরা-

নৃত্য আমেজ এনেছে সোমরসপানে বিভোর দেবরাজের চোখে।

পাঠক নিশ্চয় এঁকে চিনিছেন। ইনিই এ কাহিনীর নায়ক—দি গ্রেট চাণক্য চাকলাদার।

চাণক্যর পাশে, প্রায় গা ঘেঁসে বসে এক উর্বশী। ডাকসাইটে এই সুন্দরীকে দিল্লির অভিজাত মহলে চেনে না হেন ব্যক্তি নেই। বড় ঘরের মেয়ে। রূপসাগরে যেন এইমাত্র ডুব দিয়ে এল—এমনি শ্রী। কিন্তু এহেন ডানাকাটা পরীও যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে চাণক্যর সঙ্গ পেয়ে।

চাণক্য কিন্তু নির্বিকার।

আচমকা কে যেন হাত রাখল চাণক্যর কাঁধে। আড়চোখে তাকাল চাণক্য। পর-মুহূর্তে পাইপ নামাল।

'মিঃ ত্র্যম্বকলাল!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত?'

ইঙ্গিত বুঝল চাণক্য। পার্শ্ববর্তিনী উর্বশীকে বলল—'রঞ্জা, ডোন্ট মাইন্ড, কাউন্টারে গিয়ে দুটো ভাবমুখ দিতে বলবে?'

স্মিতমুখে উঠে দাঁড়াল রঞ্জা। চরণ নাড়াতেই কিঙ্কিনী শোনা গেল। মুখ ফেরাতেই নাকের একরত্তি হীরে থেকে বুঝি বিদ্যুৎ ছিটকে গেল। ঝিনিক ঝিনিক শব্দে কাউন্টারের দিকে এগোলো রঞ্জা।

চাণক্য বলল—'কি খবর?'

'উনি ওয়েট করছেন!'

(উনি অর্থে ভারত সরকারের একজন হোমড়া-চোমড়া। যার প্রকৃত [illegible] এখানে গোপন রাখা হল।)

'কোথায়?'

'মিনিস্ট্রিতে।'

'চলুন।' উঠে দাঁড়াল চাণক্য।

'গার্ল ফ্রেন্ডকে বলে গেলেন না?'

'ও জানে, আমাকে ধরা যায় না।'

আচমকা দামামা-ধ্বনি স্তব্ধ হল। এসেছে সেই চরম-মুহূর্ত। বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। সম্মোহিতের মত সভার চক্ষু নিরাবরণা রূপসীর ওপর।

চাণক্য কিন্তু ফিরেও তাকাল না।

•

জনপথের ওপর দিয়ে বায়ুবেগে উড়ে চলল ত্র্যম্বকলালের গাড়ি। এক কোণে বসে পাইপে 'গোল্ডব্লক' তামাক ঠাসতে ঠাসতে চাণক্য স্বপ্নালু চোখে সামনে তাকিয়ে রইল। মিশমিশে পুলওভারের ওপর বিশীর্ণ মুখ ভাবলেশহীন। আয়ত চোখে যেন ঈগলের স্বপ্ন।

কাশলেন ত্র্যম্বকলাল। বললেন 'র‍্যাভো মিঃ চাকলাদার।'

'ফর হোয়াট?'

'ইসাবেলাকে সিংহের গুহা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।'

'সিংহের গুহা?' তাচ্ছিল্যের বঙ্কিম-হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে জাগ্রত হল। 'ওরা সিংহ নয়—শেয়াল।'

'যা বলেন। ইসাবেলার সে তেজও কিন্তু নেই। আপনি না গেলে কেলেঙ্কারী হত।'

গম্ভীর হল চাণক্য। পাইপে অগ্নি-সংযোগ করল। ক্ষণেক নীরবতার পর বলল—'ইসাবেলাকে আপনি পুরো চেনেন নি। ওর তেজ ঘুমিয়ে থাকে—জাগাতে হয়।'

কাষ্ঠহাসি হাসলেন ত্র্যম্বকলাল—'তা হবে। কিন্তু এ-কাজে ইসাবেলা নিশ্চয় থাকছে না?'

ছোট ছোট ধূম্রপুঞ্জ নিক্ষেপ করতে করতে ইস্পাতকঠিন ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চাণক্য শুধু বলল—'কাজের চেহারা কী, তাই এখনো জানলাম না।'

ত্র্যম্বকলাল আর ঘাঁটাতে সাহস করল না।

•

মন্ত্রণালয়।

'উনি' তাঁর ঘরেই ছিলেন। ত্র্যম্বকলালের পেছন পেছন জিরাফ-ঠ্যাং ফেলে বিশাল টেবিলের সামনে আবির্ভূত হল চাণক্য। চোখ তুললেন 'উনি'। চশমা খুলে কিছুক্ষণ

চেয়ে রইলেন। চাণক্যও চেয়ে রইল। চোখের মিটার দিয়ে দুজনে দুজনকে মেপে নিল।

চাণক্য দেখল এক রাশভারী মানুষকে। ডাকসাইটে ব্যারিস্টার। এককালে আইন-জগতে তুফান সৃষ্টি যাঁর নেশা ছিল। যাঁর প্রতাপে একদা সুপ্রীমকোর্টও তটস্থ হত। প্রশস্ত ললাট, কেশহীন মসৃণ মাথা, আর রাইফেলের নলচের মত অন্তর্ভেদী তীব্র চক্ষু। প্রচণ্ড মেধা, সেনানায়কের মত চাহনি।

আর 'উনি' দেখলেন এক কিম্ভূত পুরুষকে। দেখে বিস্মিত হলেন। বংশদণ্ডের মত শীর্ণ দীর্ঘ এই মানুষটিই চাণক্য চাকলাদার? যাকে ঘিরে বহু কিংবদন্তী, বহু গুজব, বহু কাহিনী যে কোনো কল্প-কাহিনীকেও টেক্কা মারতে পারে? নিবিড় কৌতুক নৃত্য করে উঠল তাঁর দুই মণিকায়। এ-ব্যক্তি গুজবের স্বপ্নলোকেই মানায় সত্যলোকে নয়।

সংক্ষিপ্ত অভিবাদন এবং প্রাথমিক শিষ্টাচারের পর আসন গ্রহণ করল চাণক্য। কর্মবীর 'উনি' সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন।

বললেন—'আইল্যান্ড অভ কিং নাংপোর নাম শুনেছেন?'

'কিও নাংপোর দ্বীপ জাভা সাগরে। বাটাভিয়া থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। সাউথ-ইস্ট এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দশ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার দ্বীপ। রাজা নাংপোর দ্বীপ

এদের মধ্যে প্রায় অখ্যাত বললেই চলে। ঐ দ্বীপই তাঁর রাজত্ব। দ্বীপের ঠিক মাঝে আছে একটা বিশাল আগ্নেয়গিরি। এখন নিভে গেছে। কিন্তু আগ্নেয়ছাই জমিতে মিশে থাকার ফলে জমি খুব উর্বর। রাজা নাংপোর তাই মশলার ব্যবসা থেকে ভালোই আয় হয়। গড়গড় করে যেন মুখস্থ বলে গেল চাণক্য।

পলকহীন চোখে চেয়ে ছিলেন 'উনি'। নিবিড় বিস্ময়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বভাব-তীব্র দুই চোখে।

মৃদু হাসল চাণক্য। প্রথম সাক্ষাতেই 'উনি'র দুই চোখের কৌতুক-নৃত্য তার নজর এড়ায়নি। এই হল তার পয়লা দাওয়াই।

মৃদু কন্ঠে বললেন 'উনি'—'আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! ইন্দোনেশিয়ার নাম অনেকে জানতে পারে, কিন্তু আইল্যান্ড অভ কিঙ নাংপো'র খবর অনেকেই রাখে না।'

'আরো একটা খবর রাখি।' এবার কৌতুক উঁকি দিল চাণক্যর ঈগল চোখে।

'যথা?'

'রাজা নাংপোর দ্বীপকে নিয়ে কেন আপনি ভাবিত, তা আমি বলতে পারি।'

'কেন?'

'এর পেছনে অবশ্য আমাদের এম-পি'-দের চাপ আছে। তাঁরাই তো দুদিন আগে পার্লামেন্টে বকেঝকে অ্যাটম বোমা বানাতে নিম-রাজী করিয়েছেন প্রাইম মিনিস্টারকে।'

'কি বলতে চান আপনি?' প্রখর হয়ে উঠল 'উনি'র চক্ষু।

নির্বিকার কন্ঠে বলল চাণক্য—'গভর্ণ-মেন্ট অভ ইন্ডিয়া অ্যাদ্দিন বাদে হয়ত পরমাণু নীতি পরিবর্তন করবে। এই তো সেদিন এক বিশেষজ্ঞ জানালেন, বেশি নয়, মাত্র আঠারো কোটি টাকা খরচ করলেই অ্যাটম বোমা বানানো যাবে। প্রতিরক্ষা বাজেটের আট পার্সেন্ট এজন্যে সরিয়ে রাখলেই চলবে। আর হ্যাঁ, প্লুটোনিয়াম দিয়ে হাতিয়ার তৈরী ছাড়াও ইউরেনি-য়ামের কথা ভাবতে হবে। কেননা, সেন্ট্রি-ফিউজ পদ্ধতি দিয়ে ইউরেনিয়াম জোরদার করার ফলে অ্যাটম বোমা তৈরির খরচ এখন অর্ধেক হয়ে গেছে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল বিদগ্ধ মানুষটির।

নিমীলিত চোখে চাণক্য বলল—'রাজা নাংপো'র দ্বীপ আপনার টনক নড়িয়েছে এই কারণেই। কেন না, হঠাৎ ইউরেনিয়ামের এক বিপুল ভান্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে রাজা নাংপোর মশলা-দ্বীপের আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে।'

ঘরে সহসা একটা অ্যাটম-বোমা ফাটলেও বৃঝি দি গ্রেট 'উনি' এতটা হতভম্ব হতেন না। তাঁর মুখচ্ছবি দেখে বোয়াল মাছের খাবি খাওয়ার কথাই মনে পড়ে গেল চাণক্যর এবং সে পরম সন্তোষ লাভ করল।

হৃষ্টচিত্তে একটা বিঘৎখানেক লম্বা ফিলটার-টিপড বার করল চাণক্য। দিব্যি তারিয়ে তারিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। অগ্নিশিখা এবং ধূম্রজালের ফাঁক দিয়ে আড়চোখে দেখে নিল অ্যাটম-বোমা বিধ্বস্ত নাগাসাকি?হিরোশিমার মত 'উনি'-মূর্তিকে।

মিনিটখানেক গেল সামলাতে। তারপর উত্তেজনা-রুদ্ধ মৃদুকন্ঠে বললেন। 'উনি'—মাই গড! টপ সিক্রেট আপনি জানলেন কি করে?'

শূন্যপথে ঊর্ধমান ধোঁয়ার ছত্রাকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল চাণক্য। ছত্রাককে উদ্দেশ করেই বলল—'ঐটাই আমার মন্ত্র-গুপ্তি। 'ফুল ফর্মে' যখন ছিলাম, তখন ইস্ট ইন্ডিজে আমার একটা বড় ঘাঁটি ছিল। ইউরেনিয়াম ভান্ডারের হদিশ আপনি জেনেছেন আজ— কিন্তু আমি জেনেছি অনেক আগেই।'

ঢোঁক গিললেন 'উনি'। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল ললাটে। চাণক্য চাকলাদার তাহলে কিংবদন্তী নয়? চাণক্য চাকলাদার অলীক নয়, ভয়ংকর সত্য! চাণক্য চাকলাদার কল্পলোকের স্বপ্ন নয়—সত্যলোকের আতংক! লিকলিকে মানুষটির প্রচন্ড ব্যক্তিত্বের সামনে সহসা নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হল মিনিস্টারের।

চাণক্য সিগারেটের জ্বলন্ত অগ্রভাগের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। বলল—'এবার বলুন, আইল্যান্ড অভ নাংপোর সঙ্গে চাণক্য চাকলাদারকে কেন জড়াতে চান।'

'আমি চাই না। চায় ত্র্যম্বকলাল আর বন্দুক সিং। ওদের নার্ভ সামান্যতেই কাঁপে কিনা।'

'স্যার—' ত্র্যম্বকলাল মুখ খুলতে গেল।

হাতের ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন 'উনি'। বললেন, 'রাজা নাংপোর সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে। অবশ্য গভর্ণমেন্ট অভ ইন্দোনেশিয়াকে আমরা বাদ দিইনি। ইস্ট ইন্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সম্পদ ইন্ডিয়াতেই আসবে। বিনিময়ে ইন্ডিয়ার এমন কিছু সম্পদ রাজা নাংপোর দ্বীপে যাবে যা রাজার রত্নভান্ডারে নেই।'

'কী'?

'হীরে।'

'হীরে?'

'হ্যাঁ, হীরে। রাজা নাংপো মানুষটি একটু তেরিয়া মেজাজের। মশলার কারবার করে যা হয় আর কি। উনি ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নন। প্রাথমিক খরচ বাবদ সাত কোটি টাকা ক্যাশ নিচ্ছেন। বাকি টাকা অর্থাৎ ১৫ কোটি টাকা দিতে হবে হীরেতে।'

চাণক্যর চোখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। হতাশ হলেন 'উনি'। বললেন —'কিঙ নাংপো হীরের ডাঁই নিজের হাতে ঘাঁটতে চান। কিন্তু এখান থেকে নিজে নিয়ে যেতে চান না। পনেরো কোটি টাকার হীরে আমরা জমা দিয়ে আসব বাটাভিয়ার বোরোবুদুর ব্যাঙ্কে। মিঃ চাকলাদার পরিষ্কার তো?'

'শুনছি,' বলল চাণক্য।

'হীরে সংগ্রহ করা হচ্ছে বোম্বাইতে। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতার যাত্রীজাহাজে হীরে বোঝাই বাক্স চাপানো হবে। আমাদের দায়িত্ব এখানেই ফুরোচ্ছে না। যতক্ষণ না বোরোবুদুর ব্যাঙ্কে হীরের বাকস জমা পড়ছে, আমাদের শান্তি নেই।'

ত্র্যম্বকলাল বলল—'আমি বলেছিলাম এরোপ্লেনে পাঠাতে। ছোট বাক্স বইতো নয়। প্লেনেই চলে যেতো।'

'উঁহু' তাতে বিপদ আছে। বছরখানেক আগে ছ' কোটি টাকার হীরে-জহরৎ নিয়ে একটা জেট প্লেন সুমাত্রার পাহাড়ে ভেঙে পড়েছিল। সুলতান সুফিয়ার ব্যক্তিগত কমেট ফোর সুলতানেরই হীরে-মানিক নিয়ে যাচ্ছিল। প্লেন নিখোঁজ হওয়ার বেশ কিছু-দিন পরে সুমাত্রার পাহাড়ী অঞ্চলে কমেট ফোরের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া যায়। হীরের বাক্স পাওয়া যায়নি। কিঙ নাংপো এ খবর জানেন কিনা জানি না। কেন না, খবরের কাগজ পড়ার বাতিক তাঁর নেই। তবে হুঁশিয়ার ব্যক্তি তিনি। উড়ন্ত যন্ত্রে হীরে পাঠানোয় তাঁর মত নেই।'

'বেশ', বলল চাণক্য। 'হীরে তাহলে জাহাজে যাচ্ছে। তাতে পাহারাও থাকছে নিশ্চয়?'

'তা থাকছে। যুদ্ধ-জাহাজেও যা থাকে না, সে ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'তা সত্ত্বেও আমাকে আপনি চাইছেন। কেন?'

'কেন না, হীরের খবর বাতাসে ছড়িয়ে গিয়েছে। তিমোরে দিল্লী বলে একটা বন্দর আছে জানেন তো?'

'জানি। তিমোর সমুদ্রের ঘাঁটি সেখানে।'

'কিছুদিন আগে আমাদের এক এজেন্টের মারফৎ খবর পেলাম, দাগাবাজ-মহলে নাকি জোর কানাঘুসা চলছে, শীগগিরই ইন্ডিয়া থেকে বাক্স বাক্স হীরে চালান হবে বাটাভিয়াতে। আমি আরও খবর নিতে বললাম এজেন্টকে। কিন্তু হঠাৎ মারা গেল এজেন্ট।'

'খুন?'

'হ্যাঁ। নিছক কাকতালীয় হতে পারে। কিন্তু ত্র্যম্বকলাল আর বন্দুক সিংহের বিশ্বাস, হীরে লুঠের ষড়যন্ত্র যারা করছে, এজেন্টকে তরাই খুন করেছে।'

ত্র্যম্বকলাল আর চুপ করে থাকতে পারল না—'স্যার, গলায় পিয়ানোর তারের ফাঁস লাগিয়ে খুন করা পাকা খুনে ছাড়া কারো কাজ নয়। এর পেছনে নিশ্চয় বড় দল আছে।'

মৃদু হাসলেন 'উনি'—শুনলেন তো? ছায়া দেখেই এরা ভয় পায়। ওদের পাঁড়া-পিড়িতেই আপনাকে আমার দরকার। সরকারী পাহারাদাররা যা করছে করুক, আড়ালে থেকে হীরে-চোরের দলকে আপনি নাজেহাল করুন। যদিও আমার বিশ্বাস পণ্ডশ্রমই হবে।'

ত্র্যম্বকলালের মুখ লাল হয়ে গেল। থেমে থেমে বলল—'স্যার, সুন্দা সিংকে মনে পড়ে?'

'যাকে তুমি সুমবা পাঠিয়েছো ক'দিন আগে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পিয়ানোর তার দিয়ে যে খুন করতে পারে, তার কব্জির জোরের চেয়ে হান্টার-এর জোর বেশি কিনা জানবার জন্যেই সুন্দা সিংকে পাঠিয়েছিলাম।

'বেশ তো।' কৌতুক-হাস্যে উজ্জ্বল হল 'উনি'র চক্ষু।

'গতকাল থেকে সুন্দা সিংয়ের কোনো খবর নেই। নির্দিষ্ট সময়ে তার রিপোর্ট এসে পৌঁছোয়নি সারা দিনেও।' একটু থামল ত্র্যম্বকলাল। তারপর ঈষৎ ঝুঁকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'সুন্দা সিং হয়ত আর নেই। ইহজগতেই নেই!'

অন্ধকার হল 'উনি'র কৌতুক-উজ্জ্বল চক্ষু।

*

সুন্দা সিংকে যমদূত বহুবার ধরেও ধরতে পারেনি। কিন্তু এবার যে আর নিস্কৃতি নেই, সুন্দা তা বুঝেছিল।

সুন্দা সিং অন্যান্য পঞ্চনদবাসীদের মতই সুপুরুষ। দীর্ঘ, পেশীবহুল স্বাস্থ্য। গোঁফ-দাড়ি সমাচ্ছন্ন ভারি মুখ। বয়স চাল্লিশের কাছে।

সুন্দা সিংকে ত্র্যম্বকলালের দক্ষিণ-হস্ত বললে অত্যুক্তি হবে না। গত দশ বছরে ত্র্যম্বকলালের নির্দেশে সুন্দাকে অনেক কিছুই করতে হয়েছে। আইনের রক্তচক্ষু সে কাজ বরদাস্ত করবে না। প্রতিটি কাজই বিপজ্জনক। কয়েক ক্ষেত্রে তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়েছে। যমে-মানুষে লড়াই চলেছে। কিন্তু প্রতিবারেই কালান্তকের চ্যালাদের মুখ চুন করে জমালয়ে ফিরতে হয়েছে।

এবারের ব্যাপার অবশ্য স্বতন্ত্র। দুলন্ত জাহাজে যে মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সুন্দা সিং, বুঝেছে অবস্থা সঙ্গীন। নিবন্ধ অন্ধকারে শুধু এইটুকু বুঝেছিল, কেবিনের বাংকে তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

জাহাজ থেকে দ্বীপে নামবার পর মৃত্যুচিন্তা শেকড় গেড়ে বসেছে। তখন রাত হয়েছে। আকাশে চাঁদ নেই। তাই অন্ধকার আছে। কুচকাওয়াজ করে যেতে হয়েছে সুন্দাকে। মাইল দেড়েক এবড়ো-খেবড়ো পথে হোঁচট খেতে খেতে চড়াই পেরোতে হয়েছে। পাহাড়-চূড়ায় প্যাগোডা তার পরেই।

আসবার পথে প্রহরীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে গিয়েছিল সুন্দা। লাভের মধ্যে বারাশী সিক্কা ওজনের কয়েকটি চড় খেয়েছে লোকগুলো কম কথা বলে। ছত্রিশ জাতের ভাষা বলে। মাঝে মাঝে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীও বলে। খুব সম্ভব ইংরেজীর মাধ্যমেই ছত্রিশ জাতের মধ্যে ভাব-বিনিময় বজায় রেখেছে।

কাজেই রসনাকে সংযত করেছিল সুন্দা। বোম্বেটে কাহিনী দর্শনেন্দ্রিয়কে প্রখর করেছিল। ভবিষ্যতে কাজে লাগুক না লাগুক, সব গুপ্তচরেরই কর্তব্য অকুস্থলের একটা মন-ফটো তুলে নেওয়া।

দ্বীপটা ছোট। লম্বায় বড় জোড় মাইল দেড়েক। চওড়ায় কম। অনেকটা তিমির পিঠের মত একটা পাহাড় দ্বীপের প্রায় মাঝে। শ' দুই ফুট উঁচু। চূড়ায় কাঠের প্যাগোডা।

ভগবান বুদ্ধের উপাসকদের সাধনক্ষেত্র নিরিবিলি এই দ্বীপেই হানা দিয়েছে রক্ত-লোভী লুঠেরার দল। এরা সংখ্যায় অনেক। সশস্ত্র। চোখেমুখে নির্ভীক নির্দ্বন্দ্ব ভাব। দৃষ্টি পাথর-কঠিন।

লুঠ এদের পেশা। হত্যা এদের নেশা। তর্জনীর প্রান্তে রিভলবার ঘোরানোর কায়দা দেখেই এ-সত্য হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল সুন্দা সিংয়ের। প্রমাণ পেয়েছিল প্যাগোডায় ঢুকেই। দীর্ঘ অলিন্দপথের পাশে সারি সারি ঘর। একটি ঘরের মেঝেতে চট মুড়ে সেলাই করা সন্দেহজনক একটি বস্তু। সুন্দা সিং-এর মেরুদণ্ড শিহরিত হয়েছিল। মৃত-দেহ চটে মুড়লেও চেনা যায় বইকি।

প্যাগোডার পীত-দেহ সাধকদের তির্যক চোখে অপরিসীম বিষাদ। অপাঙ্গে ওরা দেখল সুন্দা সিংকে। বিষণ্ণ চোখে ভাব-বৈকল্য দেখা গেল না। সুন্দা সিং-এর পরিণতি যেন ওরা জানে।

অন্ধকার কুঠরির খড়ের গাদায় শায়িত সুন্দা সিং তাই এত নির্জীব। অহিংসার তপোবনে চরম হিংসা আশ্রয় নিয়েছে। ভিক্ষুরা তাই বাক্যহারা।

আচম্বিতে পাল্লা দুহাট হল। দোর-গোড়ায় আবির্ভূত হল মর্কটদেহ এক মূর্তি। অলিন্দপথের ম্লান আলোকে দেখা গেল তার তির্যক চোখের উল্লাস, হলুদ-দাঁতের হাসি। লোকটা বর্মী, কি চীনে, কি থাই—ধরা মুস্কিল।

খট্টাসের মত অট্টহাসি হাসল মর্কটদেহ আগন্তুক। বলল—'ওহে সুন্দা সিং, ঘুম ভাঙল?' লোকটা ইংরেজী জানে।

সহজ গলায় জবাব দিল সুন্দা—'আমার আবার পাশবালিশ ছাড়া ঘুম হয় না।'

প্যাগোডা কাঁপিয়ে খট্টাস-হাসি হাসল মর্কটদেহ মঙ্গোলীয়।—'বুকের পাটা আছে দেখছি। দেখি কতক্ষণ থাকে। নাও, উঠে পড়ো।'

'কোথায়?'

'ওস্তাদের কাছে।'

'কে তোমার ওস্তাদ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না মর্কটদেহ মঙ্গোলীয়। তেরচা চোখে কৌতুক নাচিয়ে নীরবে নিরীক্ষণ করল সুন্দাকে। তারপর বলল—'মাসা দাউদ।'

সুন্দা সিং-এর মনে হল, যেন টকটকে রাঙা একটা লৌহ-শলাকা কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করল। মাসা দাউদ। নামটা অদ্ভুত, কিন্তু ভয়ংকর। জলে-স্থলে অন্ত-রীক্ষে মাসা দাউদের অদৃশ চক্রান্তজাল বিছোনো—সে-জালে কখন যে কার প্রাণ-বিয়োগ ঘটবে, তা অনিশ্চিত। মাসা দাউদ! মুদ্রা লুণ্ঠন এবং সঞ্চয়ের জন্য যে রাক্ষস-সম নিষ্ঠুর—অপরাধী মহলে সে মাসা দাউদ নামেই পরিচিত। কুবেরের মত ধনবান সে, কিম্পুরুষের মত তার অনুচরবর্গ।

মাসা দাউদের নাম শোনামাত্রই সুন্দা সিংয়ের ক্ষীণ আশাটুকুও তিরোহিত হল। এ-যাত্রা তার আর রেহাই নেই। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

*

প্যাগোডার কেন্দ্রস্থলে একটি ঘর। সুসজ্জিত। সম্ভবত প্রধান ভিক্ষুর দফতর।

মস্ত টেবিলের ওপর দু'পা তুলে দিয়ে অর্ধশায়িত মাসা দাউদ। নির্নিমেষে চেয়ে-ছিল। আর সুন্দা সিং দেখছিল বহু নারকীয় কাণ্ডের হোতা পিশাচশ্রেষ্ঠ মাসা দাউদকে। চ্যাটালো থ্যাবড়া মুখ। অর্ধ-নিমীলিত তির্যক চোখদুটো যেন দুখণ্ড বরফ দিয়ে তৈরি। নিরুত্তাপ। অবিকল মড়ার চোখের মত।

সুন্দা সিং নির্ভীক থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু বেশ বুঝল, হৃদযন্ত্র আর স্থির থাকতে পারছে না।

সুন্দার ডান হাতে হাতকড়া। হাত-কড়ার অপর প্রান্ত মর্কটদেহ সেই মঙ্গো-লীয়র বাম কব্জিতে আঁটা। আসবার পথে তাই পলায়নের কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে-ছিল সুন্দা।

মাসা দাউদের নিরীক্ষণপর্ব শেষ হল। মর্কটদেহকে শুধোলো—'কোথায় পেলে মাংচু?'

মাংচু বলল—'বাটাভিয়াতে কিছুদিন আগে একটা স্পাইকে খতম করেছিলাম মনে আছে?'

'আছে। পিয়ানোর তারে ফাঁস দিয়ে-ছিল রনটা।'

'হ্যাঁ। তারপরেই এই টিকটিকিটা এসেছে। রনটাই পাকড়াও করেছে। আপনার হুকুম না জানা পর্যন্ত পিয়ানোর তার আর বার করেনি। আপনি যা বলবেন, তাই হবে।'

তর্জনীর নখ দিয়ে গাল চুলকোলো মাসা দাউদ। মড়ার চোখ মোটেই চঞ্চল হল না। শুধু বলল—'মিসেস ফ্যানটমাস।'

'রাইট স্যার।' পরমানন্দে উজ্জ্বল হল মাংচুর পীতানন—'অনেকদিন হাতখালি যাচ্ছে মিসেস ফ্যানটমাসের!'

(ক্রমশঃ)

আর একটুখানি পেতে চাই : সুধীর কর্মকার

শনিবার, ১৭ এপ্রিল। দুপুর দেড়টা থেকে বসে আছি ইস্টবেঙ্গল টেন্টে। আগের দিন ফোনে কথা হয়েছিল—সুধীর মনে-মনে চাকরী, অন্যান্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইত্যাদির লিস্ট-ফিস্ট ঘেঁটে বলেছিলেন, দুটো নাগাদ আসুন। ঘন্টা দুয়েক অনায়াসেই গল্প করা যাবে। চারটের সময় আবার বেরোতে হবে, অফিস লীগের খেলা আছে একটা সাড়ে চারটেয়, বি জি প্রেস গ্রাউণ্ডে। ওখান থেকেই চলে যাব ভবানীপুর টেন্টে। তারপর আর টাইম হবে না। ওদিকে রোববারই চলে যাব মাদ্রাজ, সন্তোষ ট্রফির খেলা।

আগে গেলে যদি আগেই ওঁকে পেয়ে যাই, সেই আশাতে আধ ঘন্টা আগেই গিয়ে হাজির হয়েছি। না, সুধীর এখনো আসেন নি। মালি বলল, আসিব বই কি, উর খেলা আছে। টেন্টে আসিব।

টেন্টে, ক্লাবের ক্যান্টিনে, প্লেয়ার্স ড্রেসিংরুমে, গ্যালারীর ঘোরান সিঁড়িতে ক্লাবে ঢুকবার মুখে মোরাম বিছানো সরু পথে, বাইরে বটগাছতলায় তখন কয়েক শো কিশোর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে—ইস্টবেঙ্গলের খেলা, বেটন কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল, বম্বে ইলেভেনসের এগেনস্টে। খেলা আড়াইটায়, মোহনবাগান মাঠে। দুটো বাজতে চলল, সবাই এসে গেছে, জার্ণাইল, মমতাজ, ওয়াহিদ, কামার আলি, সুখদর্শন, গোবিন্দ, শিব দত্ত ; আসেনি শুধু একজন—ইনাম। ক্লাব কর্তারা ঘন-ঘন ফোন করছেন। সাপোর্টাররা বার-বার এসে জিজ্ঞেস করছে—ইনাম আসে নি, আসবে না? ধুস, তাহলে আর খেলা দেখে কি হবে?

সোয়া দুটো। তখনো সুধীর আসে নি। অথচ সেজন্য কেউ চিন্তিত নয়, এক আমি ছাড়া। হত যদি এটা মে মাস। ক্লাবের লীগ খেলা শুরু হয়ে গেছে। অথচ খেলার পনেরো মিনিটও আর বাকী নেই শুরু হতে, তাহলে? ঐ একই সাপোর্টাররা কি পাগল করে তুলত না ক্লাবের কর্মকর্তাদের—সুধীর আসে নি, আসবে না? ধুস তাহলে আর খেলা দেখে কি হবে?

শুধু ক্লাব টিমে বা রাজ্য দলে নয়, জাতীয় দলেও সুধীরকে বাদ দিয়ে কি কোন দল গড়া যায় আজ? বোধহয় না। বোধহয় কেন, পি দে, ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টারদের এক যুগের নয়নের মণি 'জংলা' মনে করেন—ইম্পসিবল। সুধীর বর্তমানে ইণ্ডিয়ার সেরা ব্যাক। ওকে বাদ দিয়ে কোন টিম গড়ার কথা ভাবাই অসম্ভব। জংলার কথা যে কতখানি খাঁটি তারই প্রমাণ মিলবে গত রবিবারের (১৮ এপ্রিল) খেলার পাতায় — 'ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব মনোনীত বর্ষশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় (১৯৭০) শ্রীসুধীর কর্মকারকে ক্লাবের পক্ষ থেকে 'পত্রিকা ট্রফি' উপহার দেওয়া হয়েছে।'

অথচ সেই বর্ষশ্রেষ্ঠ ফুটবলার যখন শনিবার সাড়ে তিনটের ক্লাব গেটে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, তখন খেলুড়ের চেহারা দেখে রীতিমত দমে গিয়েছিলাম। হাল্কা বেগুনী টেরিলিন ফুলহাতা সার্ট, মুটকি-কাটা কালো চোঙা প্যান্ট আর কালো সোয়েডের জুতোর ঢাকা যে ছেলেটি স্মার্টলি হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে আসছে তাঁর গোঁফের রেখাও যে এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি ঠোঁটের ওপরে। দূরে সবুজ গ্যালারীতে বসে মাঝ মাঠে যাকে কতদিন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত ঘুরতে-ফিরতে দেখেছি, সে যে এত ছোট, এত অল্পবয়সী, তা কি কোনদিনও ভাবতে পেরেছিলাম!

কাছে এসে লাজুক হাসিতে বিনয় করে বললেন—সরি। জরুরী একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আসুন এবার।

সুধীরের হাতে একটা লাল-সাদা ডোরাকাটা কিটব্যাগ। জানতাম খেলা আছে, তবু মনে-মনে যে আশাটার অনেকক্ষণ ধরে একটু-একটু করে তা দিচ্ছিলাম—হয়তো আজ আর অফিস লীগের খেলায় খেলবে না, কালই মাদ্রাজ চলে যাবে—

ব্যাপটা দেখেই বুঝলাম সেটা ভুল হয়েছে। চাকরী যে দিয়েছে, সে তো আর না খেলিয়ে ছাড়বে না, তা সে যত জরুরী খেলাই সামনে থাকুক না কেন।

ড্রেসিংরুমের বুকচাপা অন্ধকারে পোশাক পাল্টাতে-পাল্টাতে সুধীর আমার একটির পর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলল। হাতে সময় খুব কম, সাড়ে চারটায় খেলা। বি জি প্রেস মাঠ কম করেও ইস্টবেঙ্গল টেন্ট থেকে ফার্লং কয়েক দূরে, হেঁটে যেতে হবে। আবার ছটায় হাজির হতে হবে ভবানীপুর টেন্টে, সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা। সময় খুব কম।

আর খুব কম সময়ের মধ্যেই তো সুধীর নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। দেশ ঢাকায়। দেশে যায় নি কখনো সুধীর। যাবে কি? পার্টিশনের পরে পরেই বাবা মুকুন্দলাল কর্মকার বাড়ীঘর, জায়গা-জমি, জমজমাট সোনা গহনার দোকান সব ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। এসে উঠলেন টালার জলের ট্যাঙ্কের কাছে একটা দোতলা বাড়ীর একতলায়। এখানেই সুধীরের জন্ম পঞ্চাশ সালে। পাঁচ ভাই এক বোনের মধ্যে সুধীর ন' ছেলে। বড় ভাইয়ের বয়সই আজ মোটে সাতাশ-আটাশ। মেজদা সুশীল এখনো পঁচিশ পেরোন নি। রিষড়া বিধান কলেজে বি-এ পড়েন সুশীল। চাকরীও করেন। আবার ফার্স্ট ডিভিসনে খিদির-পুরের ইনসাইডের প্লেয়ার।

ঐ মেজদাই সুধীরকে খেলার মাঠে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ীর সামনে ছোট্ট এক টুকরো জমি পড়েছিল। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে, মেজদা, সুধীরকে নিয়ে পাঁচসিকির রবারের বলে ফুটবল খেলতেন।

সিকসটি ফোরে মুকুন্দবাবু বাসা পাল্টে উঠে এলেন পাইকপাড়ায়। দেড় যুগের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক কষ্টে আবার গড়ে তুলেছেন ছোট্ট একটা দোকান —শোভাবাজারে বেনেটোলা স্ট্রীটের ওপর জুয়েলারী সপ। ছেলে-মেয়েরা সব স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সুধীরও ভর্তি হোল পাইক-পাড়া কুমার আশুতোষ ইন্সটিটিউশনে।

টালা ছেড়ে পাইকপাড়ায় আসতেই মেজদা সুশীল গিয়ে নাম লেখালেন লোক্যাল ফুটবলের নার্সারীতে; যুগযাত্রী সঙ্ঘে। দাদার দেখাদেখি সুধীরও নাম লেখাল ক্লাবে। বাবার বিশেষ আপত্তি ছিল। বংশে কেউ কোনদিনও খেলে নি। বড় ছেলেও বাবার সঙ্গে দোকানে বসছে। মাঝখান থেকে এই মেজ আর ন' ছেলে দুটোর মাথায় যে কি ভূত চেপেছে?

ভূত না ব্রহ্মদৈত্য। ক্লাবের সেক্রেটারী নিশীথদা (শ্রীনিশীথ ব্যানার্জি) না থাকলে কোনদিনই বোধহয় ফুটবলের লাইনে আসতাম না। উনি সারাদিন আমাদের সঙ্গে লেগে থাকতেন। ও'র জন্যই বাবার আপত্তি সত্ত্বেও রেগুলার ফুটবল খেলতে শুরু করলাম। তখন আমাদের ক্লাবের কি রবরবা। আমাদেরই একস প্লেয়ার প্রশান্ত সিনহা, দীনু দাস। তাছাড়া এখনকার এরিয়ান্সের রামদাস, উয়াড়ির শ্যামসুন্দর যে এক সময় আমাদের ক্লাবে খেলেছেন। কোচ-টোচ কেউ ছিল না। টালা রেডিও পার্কে নিশীথদাই আমাদের খেলা শেখাতেন। রোজ খেলার আগে দশ-বারো বার গোটা পার্কটা চক্কর মারতাম, স্প্রিন্ট টানতাম, ইনসাইড, আউটসাইড বল ঘোরাতাম — এভাবেই আমার ফুটবলের হাতেখড়ি। চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি। স'চারটে বাজে। সাড়ে চারটেয় খেলা। আধ মাইলটাক হাঁটতে হবে।

তাকিয়ে দেখলাম ড্রেস করা কমপ্লিট। একটা স্পোর্টস গেঞ্জি আর সর্ট পরণে, পায়ে মোজার ওপর কেডস, হাতে এক জোড়া ফুটবল বুট। সুধীর খেলার জন্য প্রস্তুত। বললাম, তাই চলুন—যেতে-যেতে পথেই কথা হবে।

আমরাও বেরোচ্ছি ঠিক এমনি সময় ইস্টবেঙ্গলের হকি প্লেয়াররা সব ফিরে আসছেন। তিন গোলে হারিয়ে দিয়েছেন বম্বে একাদশকে। ইনামুর মাঠেও আসেন নি। কচি-কাঁচাদের যে ভিড়টা হকি প্লেয়ার-দের এসকর্ট করে মোহনবাগান মাঠ থেকে ইস্টবেঙ্গল টেন্টে নিয়ে এসেছিল তারাই এবার সুধীরদাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে ফেটে পড়ল। ইনাম আসেন নি তো কি হয়েছে, সুধীরদা তো এসেছেন। চলল তারাও পেছন-পেছন।

বটতলা বাঁয়ে রেখে, কাসটমস মাঠ পেরিয়ে, রেড রোড ক্রস করে আমরা বি জি প্রেস মাঠের দিকে এগিয়ে চলেছি। চলতে চলতে কথা হচ্ছে। ছেলের দল সামনে-পিছনে দঙ্গল করে চলেছে। সুধীর বলে চললেন—সিকসটি ফাইভেই স্কুল টীমে চান্স পেলাম। চান্স পেলাম যুগযাত্রীর সিনিয়র টীমেও। কিন্তু একটা মস্ত অসুবিধে দেখা দিল। রিষড়ায় নতুন গ্রামে আমাদের বাড়ী উঠেছে। আমরা সবাই রিষড়ায় চলে গেলাম।

রিষড়ায় এসে লোক্যাল ক্লাব অরোরায় ভর্তি হলাম। খেলা ও প্র্যাকটিস ঠিকই চলছিল, কিন্তু স্কুল যে মাথায় ওঠার যোগাড়। সেদিন হীরাবাবু (শ্রীহীরামোহন মুখার্জি), আমাদের মাস্টারমশাই যেভাবে আমায় সাহায্য করেছিলেন জীবনেও তা ভুলব না। রিষড়া টু স্কুল ট্রেনের মান্থলি আর গাড়ী ভাড়া মাসের পর মাস উনিই জুগিয়েছেন। উনি না থাকলে কোনদিনই বোধহয় আমার স্কুলে যাওয়া আর হত না। আমার সম্বন্ধে কিছু লিখলে দেখবেন যেন আমার মাস্টারমশাই-এর কথা বাদ না যায়। ওরকম লোক আর হয় না।

এইভাবেই স্কুল ও ফুটবল দুই চালিয়েছি। সিকসটি সিকসে চান্স পেলাম হুগলী জেলা একাদশে, আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায়। ঐ বছরই হুগলীর হয়ে খেলতে এলাম আই এফ এ শীল্ডে। প্রথম খেলা পড়েছিল জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে। আমরা এক গোলে জিতলাম। নেকসট ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল মাঠে, জলন্ধর লিডার্সের বিরুদ্ধে। প্রথম দিন ড্র হোল, ওয়ান অল। পরের দিন আমরা তিন গোলে হেরে গেলাম।

হেরে গেছি। দু দিন ধরে হাড্ডা-হাড্ডির লড়াই করে ক্লান্তও হয়ে পড়ে-ছিলাম। মন-টন খুব খারাপ। এমন সময় কে এসে জানি বলল, আমায় জ্যোতিষদা (জ্যোতিষ গুহ) ডাকছেন। শুনেই চমকে উঠেছিলাম। আমায়? জ্যোতিষদা? ইস্ট-বেঙ্গলের জ্যোতিষদা? কেন?

গেলাম। খুব অল্প কথায় সরাসরি প্রস্তাব পাড়লেন জ্যোতিষদা—নেকসট ইয়ারে তুমি আমাদের ক্লাবে চলে এস।

ভেবে দেখুন, আমি একটা ষোল বছরের ছেলে, কি খেলি নিজেও জানি না. সেই আমাকেই কিনা ডাকছেন ভারতের অন্যতম সেরা ফুটবল টিমের বড়কর্তা জ্যোতিষদা তাঁর দলের হয়ে খেলার জন্য। হুগলী টিম আমায় থার্ড ক্লাস ট্রেন ফেয়ার দিয়েছিল যাতায়াতের জন্য। সেদিন ফিরতি পথে মনে হোল যেন এরোপ্লেনে চেপে বাড়ী ফিরছি।

বাড়ীতে ফিরে বাবা ও দাদাদের সব বললাম। ও'রাও আমার মতই চমকে গিয়ে-ছিলেন। পরামর্শ দিলেন—তোর বয়স কম। এখুনি অত বড় দলে নাম লেখাস না।

সেকথা বালী প্রতিভার কর্মকর্তারাও সেদিন সুধীরকে বলেছিলেন। অন্যায় কিছু বলেন নি। ক্যালকাটা ময়দানের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন কত সুধীরের অপমৃত্যু এভাবেই ঘটেছে। উঠতি বয়সে খেলার চটক দেখিয়ে বড় টিমে চান্স পেয়ে, গ্যালারী ভর্তি হাজার-হাজার সাপোর্টার, দিকপাল সব খেলোয়াড়দের ভিড়ে তাল রাখতে না পেরে অল্প দিনেই তারা সব হারিয়ে গেছে। বালী প্রতিভা অফার দিল, সুধীরকে তারা বোম্বাইতে রোভার্স খেলাতে নিয়ে যাবে।

এদিকে জেলা ফুটবলের নেকসট ম্যাচ পড়েছে জলপাইগুড়িতে। আমি দলের সঙ্গে গেলাম। ওখানেই কাগজে পড়লাম ইস্টবেঙ্গল এলাজিকিলন ম্যাচ খেলতে আগরতলায় চলে গেছে।

জলপাইগুড়ির ফিকসচার কমপ্লিট করে কলকাতায় ফিরে আমি বালীর সঙ্গে চলে গেলাম বোম্বাইতে রোভার্স খেলতে। দাঁড়ান। গাড়ীগুলো যাক। রাস্তাটা ক্রস করে বাকী কথা হবে।

লাইন দিয়ে গাড়ির ঝাঁক ছুটে আসছে—রেড রোড গাড়িতে গাড়িতে ছয়-লাপ। একটু ভিড়টা ক্লিয়ার হতেই আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চওড়া রাজপথ পেরিয়ে এলাম। সামনে ইউনিভার্সিটি মাঠ, তারপর ডাফরিণ রোড।

পরের বছর নাম লিখলাম বালী প্রতিভায়। লীগ, শিল্ড দুই খেললাম। গোটা সিজনটার জন্য হাতখরচা হিসাবে পেয়েছিলাম শ' পাঁচেক টাকা। আমার ফুটবলের প্রথম আয়।

প্রথম আর বলছেন কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি—এদেশে তো শুনি সব প্লেয়ারই উঠতি আর পড়তি বয়সে খেপ্ খেলে দু পয়সা কামান। আপনি?

না—লাজুক সুধীরের চোয়াল জোড়া দেখলাম মুহূর্তে শক্ত হয়ে উঠল। আমি খেপ খেলি নি, খেলি না। বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে দু চার জায়গায় মাঝে মাঝে খেলি বটে, তবে সে শুধু রিকোয়েস্ট রাখার জন্য; টাকা নিই না। টাকাটা বড় কথা নয়, সুধীর কথার মোড় ঘোরালেন, আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। জ্যোতিষদাকে কথা দিয়েও রাখলাম না।

পরের বছর অফার এল এরিয়ান্স থেকে। আটষট্টিতে আমি দল পাল্টালাম। ঐ বছরই সুধীর জুনিয়র বেঙ্গল টিমে প্রথম চান্স পেলেন। ডুরান্ডও খেললেন ঐ বছরই প্রথম এরিয়ান্সের হয়ে। দু বছরেই কলকাতার মাঠে নিজের জায়গাটা (রাইট ব্যাক) পাকা করে ফেললেন সুধীর। নাম হয়েছে, রেটও প্রায় বেড়েছে পাঁচগুণ। অনেক ক্লাবেরই নজর এই ছোটখাট চাইনিজ ওয়ালটির দিকে। ঐ বছরই বরদলুই ট্রফির সেমি-ফাইন্যাল খেলতে গিয়ে আবার দেখা হোল জ্যোতিষ গুহর সঙ্গে গৌহাটিতে।

সেমি-ফাইন্যাল — ইস্টবেঙ্গল ভার্সাস এরিয়ান্স। প্রথম দিন হোল ড্র। দ্বিতীয় দিন খেলা ভাঙ্গার এক মিনিট আগে একটা গোল দিয়ে ইস্টবেঙ্গল জিতে গেল। তার চেয়েও বড় জয় হোল ইস্টবেঙ্গলের। জ্যোতিষদার পার্সুয়েশানে দল ছাড়তে রাজী হলেন সুধীর।

কিন্তু চাইলেই কি সহজে খাঁটি খেলোয়াড়কে দলে টানা যায়। অফার তো শুধু ইস্টবেঙ্গলই দেয় নি। দিয়েছে ইস্টার্ণ রেল, বলেছে গার্ডের চাকরী দেবে। এরিয়ান্সও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলই জিতল। ঊনসত্তরে সুধীর এলেন ইস্টবেঙ্গলে।

সে বছর ইস্টবেঙ্গল পেয়েছিল শুধু রোভার্স কাপ। আর সুধীর পেলেন ক্রীড়া সাংবাদিকদের বিচারে বর্ষশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি হিসাবে 'পত্রিকা ট্রফি'

আটষট্টিতে এরিয়ান্সে থাকতেই সন্তোষ ট্রফিতে খেলবার সুযোগ এসেছিল সুধীরের। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার জন্য যেতে পারেন নি। ঊনসত্তরে আবার সেই সুযোগ এল—এবার আসামের নওগাঁয়। বাংলাদল সন্তোষ ট্রফি নিয়ে ঘরে ফিরেছিল সেবার। ঐ বছরই জাই এফ এ একাদশের হয়ে রাশিয়ান ও চেক দলের বিরুদ্ধে খেললেন সুধীর। কিন্তু আশা তখনো তবু মেটেনি। মনে আছে, দিল্লীতে ডুরান্ড খেলতে গিয়ে প্রশান্তদা আর জংলাদার সেই কথা—এশিয়াম না খেললে জীবন অসার্থক।

সেই সুযোগ এল পরের বছর, সত্তরে। সত্তরে ইস্টবেঙ্গল এক সঙ্গে তিনটে বড় খেলার জয় ঘরে তুলল—লীগ, শীল্ড ও ডুরান্ড। সুধীরও এগিয়ে চললেন আশা পূরণের পথে। জুলাইতে ইন্ডিয়ার হয়ে খেলতে গেলেন মার্ডেকায়। ডিসেম্বরে গেলেন ব্যাঙ্ককে, এশিয়ান খেলাতে। তখন ওর বয়স মোটে কুড়ি। চোদ্দ বছরে চান্স পেয়েছিলেন সুধীর যুগযাত্রীর সিনিয়র টিমে, বিশ বছরে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করলেন এশিয়ান গেমসে। ভুলে গেলে চলবে না নইম, প্রসাদ, ভটচাজ, অতীতের শান্ত মিত্তিরদের মত বাঘা খেলোয়াড়দের ভিড়ে এভাবে নিজের জায়গা করে নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তার জন্য সুধীরকে কম খেসারত দিতে হয় নি, বা কম পরিশ্রম করতে হয়নি।

সে কথাতেই আসছি এবার। কথার ফাঁকে ফাঁকে ইউনিভার্সিটি মাঠ, ডাফরিণ রোড, ওয়াই এম সি এ মাঠ ছাড়িয়ে কখন যে আমরা বি জি প্রেস মাঠে চলে এসেছি টেরও পাইনি। মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি অপনেন্টরা নেমে গেছেন। রেফারী ঘন ঘন হুইসিল বাজাচ্ছেন। ইস্পাত দল এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল সুধীরের জন্য।

সুধীরকে দেখে ইস্পাতের ক্যাপ্টেন অতীতের নামকরা ব্যাক বিক্রম দেবনাথ এগিয়ে এলেন—হারি আপ সুধীর। এবার নামব। কেডস খুলে বুট পরতে পরতে ম্লান মুখে লাজুক হাসির আড়ালে সুধীর বললেন—গত বছর হিন্দুস্থান স্টীলে চাকরী পেয়েছি। স্পোর্টস এ্যাসিসট্যান্ট। একটু ওয়েট করবেন? আবার হাফ টাইমে কথা হবে।

ঘন ঘন হুইসিল নাড়ার ঝড়ের মধ্যে সুধীর দলের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়লেন। মুহূর্তে আরম্ভ হয়ে গেল অফিস লীগের খেলা। আর সেই সুযোগে আমি পাকড়াও করলাম পি দেকে। উনি মাঠের ধারে চেয়ারে বসে খেলা দেখছিলেন। আমি সুধীরকে কভার করছি শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন—লিখুন, ওকে নিয়ে লিখুন। ওর মত একটা ছেলে হয় না। খুব কাছে থেকে ওকে আমি দেখেছি। একটা ভাল খেলোয়াড়ের যা যা দরকার সব আছে ওর। মনে রাখবেন, ভাল বলতে আমি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলছি। তবে কি জানেন, ওর হাইটটা একটু সর্ট। ফলে স্পট জাম্প ভাল নিতে পারে না। কর্ণারের সময় একটু লম্বা প্লেয়ার হলেই ওর মাথা থেকে বল টেনে নিতে পারবে। আমার তো মনে হয় ওর ব্যাকের পজিশন ছেড়ে হাফেই খেলা উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সুধীর রাস্তায় আসতে আসতে এক সময় বলছিলেন যে, জ্যোতিষ গুহ ইস্টবেঙ্গলে গোড়ার দিকে ওকে হাফেই খেলাতেন। নোটবুকে জংলার কমেন্টটা যখন টুকছি কানে এল উনি বলছেন—ওর সঙ্গে নইমের খেলার খুব মিল আছে। তবে আমার মতে ও এখন নইমের চেয়েও বেটার খেলে। কলকাতায় যত ব্যাক ফ্যাক আছে, কারুর সঙ্গেই ওর আর তুলনা চলে না।

হাফ টাইম হতেই মাঝ মাঠে ছুটে গেলাম। যেতেই হেসে বললেন সুধীর, বলুন, আর কি জানতে চান? লক্ষ্য করলাম একটুও টায়ার্ড হননি সুধীর। সে কথা বলতেই হেসে ফেললেন—দেখুন নব্বই মিনিটের খেলা খেললেও আমি টায়ার্ড হই না, এতো সবে পঁচিশ মিনিট খেলেছি। সারা বছর আমি প্র্যাকটিশ করি। ভোর সাড়ে চারটায় উঠে, পাঁচটার ট্রেণ ধরে কলকাতায় চলে আসি। সাতটা থেকে নটা—একটানা দু ঘন্টা প্র্যাকটিশ করি। তারপর ক্লাবেই স্নান খাওয়া সেরে ছুটি অফিসে। ফলে দম হারালে চলবে কি করে?

দেখলাম এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। পাক্কা এক ঘন্টা মাঠে দাবড়ে বেড়িয়েও ক্লান্ত হয় নি মোটেও। কয়েক বিন্দু ঘাম ঝরে পড়বার অপেক্ষায় কপালের আলসেয় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। পলকে বুট জোড়া খুলে কেডস পরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুধীর। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, আপনি বার বার দমের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, দেখুন আমি একটুও টায়ার্ড হই নি। হব কে? আমি সিগারেট পর্যন্ত ছুঁই না। খেলাতেই ভালবাসি শুধু খেলা নিয়েই আছি। আছি বললে ভুল হবে, এটাই আমার জীবনের সব। খেলাই আমাকে পরিচিত করেছে—খেলার সঙ্গে গেই দেশ বিদেশের মাঠে ময়দানে যেতে পারছি। ফলে এখানে আমার কোন কম্প্রোমাইজ নেই।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গড়ের মাঠে বৈশাখের গাঢ় বিকেল ফিকে হয়ে আসছে। বিশাল সবুজের মেলায় এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা দল করছে প্র্যাকটিশ, বৃদ্ধেরা বেরিয়েছেন সান্ধ্যভ্রমণে, শিশুরা প্র্যামে চেপে বাড়ীর আয়াদের সঙ্গে এসেছে খোলা মেলায় সুস্থ হতে। রিষড়ার ছেলেটি ততক্ষণে আমার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে। ডাফরিণ রোড ছাড়িয়ে ইউনিভার্সিটি মাঠের ঢালুতে নেমে যাচ্ছে দেখলাম। একটু বাদেই হবে ওর সম্বর্দ্ধনা। ভীষণ ব্যস্ত—প্র্যাকটিশ, চাকরী, খেলা, লোক জনের অনুরোধে আজ কাল আবার স্কুল বা ক্লাবের প্রাইজ ডিসট্রিবিউশন সেরিমনিতে প্রাইজও করতে হচ্ছে। কিন্তু কথাবার্তায় একটুও অহংকার নেই। ঠান্ডা মাথা। ক্যালকুলেটিভ। বিশ বছরেই এদেশের খেলার মাঠে একজন খেলোয়াড়ের যা যা প্রাপ্য থাকে সব ও পেয়েছে তবু অতৃপ্ত সুধীর। যাবার আগে বলেছিল, আর একটাখানি পেতে চাই। প্রি-অলিম্পিক বা অলিম্পিকে ইন্ডিয়ার হয়ে খেলা—সেই আমার লাস্ট অ্যাম্বিশন।

—নন্দিবন্ধু।

প্রথম পর্ব
পঞ্চম অধ্যায়
মিউনিক চুক্তির কলঙ্ক

১৯৩৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ফিরিয়া আসিলেন লন্ডনে। ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটে মন্ত্রিভবনের সম্মুখে এক উৎকণ্ঠিত জনতা ইউরোপের ভাগ্য জানিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। মিঃ চেম্বারলেন সেই জনতার উদ্দেশ্যে একখানি কাগজের টুকরা বিজ্ঞাপনের ভঙ্গীতে আন্দোলিত করিয়া বলিলেন : 'I believe it is peace in our time' অর্থাৎ এর দ্বারা আমাদের আমলে শান্তি সুনিশ্চিত হইল।

সেই কাগজের টুকরায় মিঃ চেম্বারলেন ও হের হিটলারের স্বাক্ষর ছিল। অপেক্ষমান জনতা ইউরোপের আসন্ন দুর্বিপাক নিবারিত হইল অনুমান করিয়া বিপুল করতালি ও ধ্বনির দ্বারা চেম্বারলেনকে অভিনন্দন জানাইল। কিন্তু সেই উৎসুক জনতা জানিত না যে, সেই স্বাক্ষরিত কাগজের টুকরা শীঘ্রই নাৎসী ঝটিকাঘাতে দিগন্তে উড়িয়া যাইবে।

*

ইউরোপের বিগত ১০০ বছরের ইতিহাসে মিউনিক চুক্তির মত এত বড় কলঙ্কিত চুক্তি আর কখনও স্বাক্ষরিত হয় নাই। কারণ, এই চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকেই হিটলারী জার্মানীর নিকট বলি দেওয়া হইল না, চেক গভর্ণমেন্ট ও জনগণের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল। অবশ্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্ভব প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি অনুসারে। কিন্তু ১৯১৯ সালে যেভাবে এই রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল, তাতে এর সংগঠনের মধ্যেই গভীর ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল। কারণ, কতকগুলি ন্যাশন্যাল মাইনরিটির সমবায়ে এই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। যেমন, শ্লোভাক, হাঙ্গেরীয়ান, রুথেনীয়ান ও জার্মান ইত্যাদি। অর্থাৎ একমাত্র চেকদের দ্বারা গঠিত কোন ন্যাশন্যাল ষ্টেট বা জাতীয় রাষ্ট্র নয়। বরং ওটা ছিল বিভিন্ন অধিজাতিবহুল রাষ্ট্র। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার দুইটি প্রাক্তন প্রদেশ, অষ্ট্রিয়ার সাইলেসিয়া এবং হাঙ্গেরীর শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া—এই রাজ্যখণ্ডগুলিকে নিয়া যে চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্র (মোট আয়তন ৫২ হাজার বর্গমাইল) গঠিত হইল, তার মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে চেক ও শ্লোভাক ছাড়া ছিল ৩৩ লক্ষ জার্মান, ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ম্যাগিয়ার (Magyars) ৪ লক্ষ ৮০ হাজার রুথেনীয়ান এবং বহু পোলিশ ও ইহুদী। কিন্তু এই রাষ্ট্র মাইনরিটি বহুল হইলেও টমাস ম্যাসাইরিক ও এডোয়ার্ড বেনেসের নেতৃত্বে সুশাসিত ছিল এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের বিচারে পূর্ব ইউরোপের সবচেয়ে উন্নত, উদার ও সেরা রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু গোল বাধাইল সুদেতেন জেলার জার্মান সংখ্যালঘুরা। যারা নির্যাতিত সুদেতেন জার্মানরূপে হিটলারী প্রচার কার্যের দৌলতে সেদিনের আন্তর্জাতিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গোড়া থেকেই জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে ওরা কলরবমুখর ছিল এবং হিটলার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া গ্রাসের পর (যে অষ্ট্রিয়াতেও অনুরূপ জার্মান সমস্যা ছিল) এই সুদেতেন জার্মানরা খাস জার্মানীর সহিত মিলিত হওয়ার জন্য বিরাট হট্টগোল সৃষ্টি করিল এবং কেন্দ্রীয় চেক গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত অত্যাচারের (যেমন, সমান অধিকার নাই, চাকুরির সুযোগ নাই, ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাই, উপযুক্ত মর্যাদা ও স্বাধীনতা নাই ইত্যাদি) অভিযোগ আনিয়া তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিল—যদিও আসলে এদের অভিযোগের সত্যতার কোন ভিত্তি ছিল না। কারণ, বৃটিশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টার ন্যাশন্যাল এফেয়ার্সের (১৯৩৮, এপ্রিল) এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সুদেতেন জার্মান রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রচার করা সত্ত্বেও চেক গভর্ণমেন্ট তাঁদের সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং একগুঁয়ে মাইনরিটিরা একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জীবন কেমন অসহ্য করিয়া তুলিতে পারে বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষে মুশ্লিম লীগের আন্দোলন তার প্রমাণ, যার ফলে শেষ পর্যন্ত আপোষ রফা হিসাবে ভারতবর্ষকে (১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে) পার্টিশান করিতে হইয়াছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্মানদের আন্দোলনেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহম্মদ আলী জিন্নাকে নিশ্চয়ই হিটলারের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। কিন্তু জিন্নাসাহেবের অনুরূপ নেতৃত্বের কঠোরতা, কূটবুদ্ধি ও চতুরতা হিটলারের ছিল—যে নেতৃত্বের প্ররোচনা সুদেতেন জার্মানদের প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। হিটলার এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ওৎ পাতিয়া ছিলেন। কারণ, ভৌগোলিক সংস্থানের বিবেচনায় অষ্ট্রিয়া গ্রাসের পর চেকোশ্লোভাকিয়া যেন নাৎসী নেকড়ের থাবার মধ্যে আসিয়া গেল—যে চেক রাষ্ট্রকে কোন মতেই অনিষ্ট করা হইবে না বলিয়া নাৎসী নেতারা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় বার্লিনের এক উৎসব অনুষ্ঠানে দুই নম্বর নাৎসী নেতা স্বয়ং হেরমন গোয়েরিং চেক রাষ্ট্রদূত মিঃ মাস্টনির (Mastny) হাতে হাত দিয়া বলেন :

'I give you my word of honour and speak also in the name of Fuhrer,

অর্থাৎ আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এবং স্বয়ং ফুয়েরের নামে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, অষ্ট্রিয়া দখলের ফলে জার্মান চেকোশ্লোভাক সম্পর্কের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা হইবে না।

কিন্তু মুখে গোয়েরিং এই প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করিলেন বটে, কিন্তু তার অনেক আগেই চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পরিকল্পনা হইয়াছিল। কারণ গোপন দলিল যাতে দেখা যায় যে, ভেরমাখটের (সৈন্যবাহিনীর) সুপ্রীম কমান্ডার ও সমরমন্ত্রী মার্শাল ফন ব্লুমবার্গ হিটলারের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯৩৭ সালের ২৪শে জুন এই মর্মে এক নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন যে, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করা; এই আক্রমণের প্রস্তুতি হইবে শান্তির সময়ে এবং অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা চেক সৈন্য ও জনগণকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে কাবু করা।

১৯৩৭ সালের ৫ই নভেম্বর হিটলার রাইখ চ্যান্সেলারীতে বড় বড় সমর নেতা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর (তখন ফন নিউরাথ) বৈঠকে চার ঘন্টার অধিক কাল ধরিয়া যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তাতে অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং এর রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল নিজের ধারণা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অষ্ট্রিয়া দখলের পাঁচ সপ্তাহ পরে ১৯৩৮, ২১শে এপ্রিল জেনারেল কাইটেলের সঙ্গে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য ও অজুহাত সৃষ্টির জন্য স্থির করেন—

"A lighting action on the basis of an incident (for example, the murder of the Guman envoy following an anti-German demonstration)".

অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে জার্মান বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠন

করিয়া সেই হট্টগোলের সুযোগে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে খুন করা হইবে এবং সেই খুনের অজুহাত ধরিয়া বিদ্যুৎগতিতে চেকোশ্লভাকিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

একবার কল্পনা করুন নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে নিজেরাই খুন করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন অপর একটি স্বাধীন দেশ দখলের অজুহাত সৃষ্টির জন্য: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎসতার আগেই নাৎসী নীতি ও নৈতিকতার ক্রূর দৃষ্টান্ত। ১৯৩৮, ৩০শে মে হিটলার পুনরায় জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতিগণের নিকট এই মর্মে এক স্বাক্ষরিত 'গোপন হুকুমনামা' পাঠাইলেন---

'It is my irrevocuble decision to destroy Czechoslovakia before long through a military action!

অর্থাৎ সামরিক আক্রমণের দ্বারা অনতিকাল পূর্বেই চেকোশ্লভাকিয়াকে ধ্বংস করাই আমার অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত। (এই উত্তপ্ত সামরিক পরিকল্পনার চেকোশ্লভাকিয়ার সাঙ্কেতিক নাম রাখা হইয়াছিল গ্রীণল্যান্ড।) *

এদিকে সুদেতেন জার্মান নাৎসী নেতা কোনরাড হেনসেইন বার্লিনের হিটলারী চক্রান্তের প্ররোচনায় চেক গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নানা ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাতে লাগলেন (১৯৩৮, এপ্রিল) এবং আরও বুদ্ধি ও পরামর্শের জন্য ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর খোদ হিটলারের কাছে গিয়া হাজির হইলেন। বার্লিন থেকে ফিরিয়া আসিয়াই হেনসেইন তাঁর সশস্ত্র পার্টি বাহিনীর দ্বারা চেক সরকারের নিরাপত্তা সংগঠনগুলির উপর আক্রমণ চালাইতে লাগলেন এবং এভাবে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল, সেই অজুহাত ধরিয়া হেনসেইনের দল প্রাগ সরকারের সঙ্গে আপোষ আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিল—৭ই সেপ্টেম্বর। এদিকে হিটলার আবার এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া ১২ই তারিখ নুরেমবার্গের পার্টি কংগ্রেসে চেকোশ্লভাকিয়ার বিরুদ্ধে বিষম তর্জন গর্জন করিলেন। এভাবে একদিকে চেকোশ্লভাকিয়ার অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ সংগঠন করিয়া অপর দিকে দুনিয়াব্যাপী এই মর্মে প্রচারকার্য চালাইলেন যে, চেক সরকারী অত্যাচারে সুদেতেন জার্মানদের জীবন বিপন্ন। অথচ ২৮শে মার্চ সুদেতেন জার্মানদের নেতা ও হিটলারের নিযুক্ত 'ভাইসরয়' হিসাবে হেনসেইন চেক সরকারের নিকট এমন সমস্ত দাবী পেশ করার মতলব আঁটিয়াছিলেন যে দাবী কোন সরকারই মানিয়া লইতে পারে না। হেনসেইন নিজেই এই বিষয়ে বলিয়াছিলেন-

'We must always demand so much that we can never be satisfied.

এভাবে ধাপ্পাবাজি ও জোর-জবরদস্তি দ্বারা যে অবস্থার সৃষ্টি করা হইল, তার প্রতিকারে বার্লিন থেকে দাবী করা হইল যে, সুদেতেন অঞ্চল জার্মান রাষ্ট্রকে হস্তান্তর না করিলে কিছুতেই শান্তি আসিবে না। নাৎসী সংবাদপত্রগুলিও জার্মান মাইনরিটিদের উপর চেক সরকারের অত্যাচার সম্পর্কে কাল্পনিক কিম্বা অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করিতে লাগিল এবং হিটলারের আগ্রাসী মনোভাবও ক্রমশঃ চড়া ডিগ্রীতে উঠিতে লাগিল। যদিও চেকোশ্লভাকিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী রণনৈতিক পরিকল্পনা কাগজপত্রে প্রস্তুত ছিল, তথাপি তাঁর এমন একটা অস্পষ্ট আশা ছিল, যে, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের হট্টগোল থেকে ভূমধ্যসাগর নিয়া বৃটিশ-ফরাসী-ইতালী একটা প্রকাণ্ড বিরোধে জড়াইয়া পড়িবে কিম্বা ফ্রান্সে এমন একটা আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিবে যে, সেই সুযোগে তিনি চেকোশ্লভাকিয়াকে পাকা ফলটির মত পাড়িয়া আনিতে পারিবেন! কিন্তু ভূমধ্যসাগরে কোন বিরোধ বাধিল না বটে, তথাপি হিটলার অষ্ট্রিয়ার মত চেকোশ্লভাকিয়াও বিনা যুদ্ধে কাড়িয়া আনিতে পারিলেন এবং এই কার্য তিনি করিতে পারিলেন তাঁদেরই হাত দিয়া—অর্থাৎ বৃটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেন্টের হাত দিয়া, যাঁদের কাছ থেকে বাধা ও বিপত্তির তিনি এত ভয় করিতেছিলেন।

*

চেকোশ্লভাকিয়ার প্রশ্নে হিটলার যেভাবে ক্রমশঃ উগ্রমূর্তি ধারণ করিতেছিলেন, তাতে ইউরোপে যুদ্ধ লাগিয়া যাইতে পারে এই আশংকায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি একা নন, সঙ্গী জুটাইলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঃ দালাদিয়েরকে, যিনি মুখে তোষণনীতির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কাজে সেই নীতিই অনুমোদন করিয়া চলিতেন। আর তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ বনেট (Bonnet) ছিলেন তোষণ নীতির বা appeasment এর মূর্তিমান বিগ্রহ। সেই সময় বৃটিশ ও ফরাসী মন্ত্রিসভায় অধিকাংশ সদস্য কেবল সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিই বিরূপ ছিলেন না, নাৎসী-ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলিকে তোয়াজ করিয়া তাঁদের খুসী করিবার জন্যও ব্যগ্র ছিলেন। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল যে এভাবে যুদ্ধ এড়ানো যাইবে এবং হিটলারী রাজ্য-পিপাসাকে পূর্ব দিকে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে। এই তোষণনীতির সবচেয়ে বড় পাণ্ডা ছিলেন বৃটেনের নেভিল চেম্বারলেন, মিউনিক চুক্তির কুকীর্তির জন্য যাঁর নাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে মসীলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মত বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফাক্স (বৃটিশ ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে যিনি লর্ড আরুইন নামে ভারতবর্ষের বড়লাট এবং গান্ধী-আরুইন প্যাক্টের স্বাক্ষরকারী রূপে সেই সময় 'সাধু খৃষ্টান'রূপে গান্ধীবাদীদের কাছে বাহবা পাইয়াছিলেন), বার্লিনের বৃটিশ রাজদূত স্যার নেভিল হেণ্ডার্সন এবং লর্ড রান্সিম্যান প্রভৃতি এই তোষণনীতি নাটকের এক-একজন ছোটবড় নায়ক ছিলেন। হিটলার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখলের (১৯৩৮, ১২ই মার্চ) মুহূর্ত থেকেই বৃটিশ সরকার চেকোশ্লভাকিয়া সম্পর্কে 'সজাগ' হইলেন এবং তখনই এই বিষয়ে ফ্রান্সের মতামত জানিতে চাহিলেন। কারণ, বৃটিশ সরকার অনুধাবন করিলেন যে, লোকার্ণো চুক্তি (১লা এপ্রিল, ১৯২৫) অনুসারে ইউরোপে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের আছে। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের জন্য বল প্রয়োগ বা যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব জার্মান সংখ্যালঘুদের সমস্যা মীমাংসার জন্য চেকোশ্লভাক গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দিতে হবে। *

কিন্তু কাগজে-পত্রে চেকোশ্লভাকিয়ার অবস্থা আদৌ খারাপ ছিল না। তার সামরিক শক্তি যেমন ভালো ছিল, তেমনি ফ্রান্সের সঙ্গে পারস্পরিক আত্মরক্ষার চুক্তি (১৯২৫) এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি (১৯৩৫) ছিল। আবার ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেও পারস্পরিক আত্মরক্ষার চুক্তি ছিল (২রা মে, ১৯৩৫)। অর্থাৎ চেকোশ্লভাকিয়াকে রক্ষার জন্য ফ্রান্স ও রাশিয়া চুক্তিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তার সর্ত ছিল এই যে, ফ্রান্স প্রথমে যুদ্ধের জন্য আগাইয়া গেলে সোভিয়েট রাশিয়া পরে তার অনুসরণ করিবে।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, চেকোশ্লভাকিয়ার প্রতি বৃটেনের কোন চুক্তি বা আইনগত দায়-দায়িত্ব ছিল না, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও তার এই ধরনের কোন দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স, চেকোশ্লভাকিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে পরপর যে সমস্ত চুক্তি ছিল, যদি প্রয়োজন মত সেগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইত, তবে মিউনিক চুক্তির কেলেঙ্কারি ঘটিত না। কারণ, হিটলার এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিতেন না এবং তাঁর সেনাপতিমণ্ডলী তখন পর্যন্ত ফ্রান্সের সামরিক শক্তিকে ভয় করিয়াই চলিতেন—যদিও সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে সকলেরই সংশয় ছিল। এবং এই সংশয়ের বড় কারণ ছিল রাশিয়ার বিখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলাসমূহে স্ট্যালিন কর্তৃক নিষ্ঠুর 'পাজ্‌'এর জন্য। যার জন্য বাইরে এমন ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, সোভিয়েট সামরিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মিউনিক চুক্তি ও চেকোশ্লভাকিয়ার বলিদান ঘটিল সম্পূর্ণ রূপে সোভিয়েট রাশিয়াকে এড়াইয়া কিম্বা তাকে সম্পূর্ণরূপে 'একঘরে' করিয়া। এমন কি চেক রাষ্ট্রপতি বেনেস এবং চেক পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই (৩০০ জনের মধ্যে মাত্র ৩০ জন ছিলেন কমিউনিস্ট) ছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধী। অতএব রাশিয়ার সাহায্য তো দূরের কথা তার সঙ্গে বিশেষ

---

* অধ্যাপক এলবার্ট নরডেন প্রণীত 'Thus wars are made' এবং উইলিয়াম এস সীরার প্রণীত 'End of a Berlin Diary' চেকোশ্লভাকিয়া দখলের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

* 'The origins of the Second World War' —by A.J.P. Taylor, চেকোশ্লভাকিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কোন পরামর্শের প্রয়োজনও অনুভূত হইল না।

অবশ্য অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লভাকিয়ার প্রশ্নে ফ্রান্স ও বৃটেন যেন গোড়া থেকেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে বৃটেনের শাসকমহল হিটলারী ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি অন্যায়, অযৌক্তিক ও নীতিবিগর্হিত। সুতরাং এগুলির পরিবর্তন ঘটাইলে ইউরোপে যদি শান্তি রক্ষা করা যায়, তবে ক্ষতি কি এবং সেদিক থেকে হিটলারের দাবী নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। বিশেষতঃ সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও মানিয়া চলিতে হইবে। তারপর যুদ্ধ করিবার মত সামরিক প্রস্তুতিও তখন ছিল না। বৃটিশ সেনাপতিমন্ডলী ফ্রান্স বা অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সহযোগীতায় এখন যুদ্ধযাত্রার বিরোধী ছিলেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৃটিশ ঐতিহাসিক, যেমন, এ জে পি টেলর এবং মিঃ পি কে কেম্প এই সমস্ত যুক্তি দেখাইয়া চেম্বারলেন ও অন্যান্যের দোষ স্খালনের কিম্বা তাঁদের সাফাই গাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। *

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যই অত সহজ এবং ভার্সাই সন্ধির কবলিত জার্মানীর প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য ফরাসী বা বৃটিশ সরকারী মহলের কি এতটা গরজ ছিল? কারণ, মহাযুদ্ধের পর ধৃত বার্লিনের পররাষ্ট্র দপ্তরের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, হিটলার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখলের আগেই ১৯৩৭ সালের ১৯শে নভেম্বর লর্ড হ্যালিফাক্স (তখন তিনি বৃটেনের লর্ড চ্যান্সেলার, পরে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইয়াছিলেন) ওবারসাল্‌জবার্গে হিটলারের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন এবং সেই বৈঠকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ফুরার তাঁর নিজ দেশে কমিউনিজম ধ্বংস করিয়া পশ্চিম দিকে এই মতবাদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছেন। সুতরাং বৃটিশ সরকার মনে করেন যে, পশ্চিম ইউরোপে বলশেভিজম প্রতিরোধের পক্ষে জার্মানী একটি দুর্গস্বরূপ। লর্ড হ্যালিফাক্স 'সরলভাবে' আরও স্বীকার করিলেন যে, আজ হোক কাল হোক ইউরোপীয় ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসিবেই এবং পরিবর্তনের এই প্রশ্ন গুলির মধ্যে রহিয়াছে ডানজিগ, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লভাকিয়া......

> ..."changes in the European order .... which sooner or later probably would come about. These questions include Danyig and Austria and Czechoslovakia".
>
> —(অধ্যাপক নরডেন কর্তৃক উদ্ধৃত)

অর্থাৎ চেম্বারলেনের সরকার এই দেশগুলির জন্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার হিটলারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য যেন আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। উহার একমাত্র সর্ত ছিল এই যে হিটলারের পক্ষ থেকে যেন বলপ্রয়োগ করা না হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ না লাগে। সুতরাং চেকোশ্লভাকিয়া নিয়া যখন বিরোধ গভীরতর বিপদ ডাকিয়া আনিবার সূত্রপাত করিতেছিল, তখন গোড়াতেই সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনোভ পররাজ্য আক্রমণ ও গ্রীসে বাধা দেওয়ার জন্য বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া এই চতুঃশক্তির একটি সম্মেলন ডাকার জন্য এবং যৌথ নিরাপত্তার নীতি অবলম্বনের জন্য ১৭ই মার্চ (১৯৩৮) এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু বৃটিশ সরকারের পক্ষে মিঃ চেম্বারলেন তা অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সুদেতেন জার্মানদের নেতা হেনসেইন হিটলারের নির্দেশে ২৪শে এপ্রিল তারিখে এমন ৮টি দাবী চেক সরকারের কাছে উত্থাপন করিলেন, যেগুলি মানিয়া লইলে স্বাধীন চেকোশ্লভাকিয়া রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব থাকিত না। এর ফলে ফ্রান্সের সরকারী মহলও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং দালাদিয়ের ও বনেট ২৮শে এপ্রিল তারিখ লন্ডনে গেলেন বৃটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য—বিশেষভাবে বার্লিনে ও প্রাগে একই সঙ্গে দুই গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কোন যুগ্ম ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য (....Daladier urged strong joint and parallel action) কিন্তু চেম্বারলেন সাফ জানাইয়া দিলেন যে, ফ্রান্স বা চেকোশ্লভাকিয়া কাহারও সাহায্যের জন্যই বৃটেন অবিলম্বে আগাইয়া যাইবে না!

কারণ কি? কারণ এই যে, চেকোশ্লভাকিয়া ভাগবাটোয়ারা সম্পর্কে চেম্বারলেন আগেই একটি প্ল্যান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১০ই মে ইংলন্ডের বিখ্যাত মহিলা লেডী এ্যাস্টরের গৃহে একদল মার্কিন ও কানাডীয় সাংবাদিকদের নিকট চেম্বারলেন এই তথ্য প্রকাশ করিলেন :

> "On May 10, chambarlain revealed his plans for the break up of Czechoslovakia in Germany's behalf to a group of American and Canadian newspapermen at Lady Astor's. Neither France, Russia nor Britain would fight for Czechoslovakia, said the Prime Minister who also advocated his plan for a Four Power Pact, including Britain, France, Germany and Italy, from which Russia would be excluded. *

এই সংবাদ বিখ্যাত মার্কিন সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৪ই মার্চ এবং পরে কমন্স সভায় সমালোচনার জবাবে চেম্বারলেন এই সংবাদের কোন প্রতিবাদও করেন নাই।

চেকোশ্লভাকিয়া নিয়া যখন উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িতেছিল তখন চেক গবর্নমেন্ট নাৎসী ভীতি প্রদর্শনের জবাবে ২০শে মে তারিখ হঠাৎ সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ জারি করিলেন। ফলে, ইউরোপে যুদ্ধ লাগে লাগে এই আশঙ্কায় প্যারিস ও লন্ডনের সরকারী মহলে আতঙ্ক দেখা দিল—যদিও চেক সরকারের এই আকস্মিক সৈন্য সমাবেশে হিটলারী দল কিছুটা ভড়কাইয়া গেল। কিন্তু বৃটেনে ও ফ্রান্সে এই গুঞ্জন উঠিল যে, যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ হিটলারকে প্রতিরোধের জন্য হাতেকলমে কিছু ঘটিল না। কিছুদিন অবস্থা এভাবে চলিবার পর জুলাই মাসে হিটলার আবার গর্জন করিলেন এবং ভয় দেখাইলেন যে, যদি একজন সুদেতেন জার্মানও চেকদের হাতে নিহত হয়, তবে তিনি সসৈন্যে মার্চ করিবেন। তখন চেম্বারলেন লর্ড রান্সিম্যানকে একজন 'স্বাধীন সালিশ' হিসাবে নিযুক্ত করিয়া প্রাগে পাঠাইলেন (৪ঠা আগস্ট ১৯৩৮)। রান্সিম্যান ছিলেন বোর্ড অব ট্রেডের প্রাক্তন সভাপতি, রাজনীতি, বিশেষভাবে ইউরোপীয় রাজনীতির টানাপোড়েন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন জ্ঞানকান্ড ছিল না। সুতরাং তাঁর এই দৌত্যের আসল অর্থ ছিল চেম্বারলেনীয় তোষণনীতির পরিপোষকতা করা, তিনি সুদেতেন জার্মানদের খুশী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন এবং তাদের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করিলেন। যদিও তিনি 'নিরপেক্ষ' সালিশ ছিলেন, তথাপি তিনি প্রাগে কয়েকজন ধনী নাৎসী জার্মানের প্রাসাদে বাস করিয়া তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু চেকোশ্লভাকিয়া আসল সংকটের মাস দেখা দিল সেপ্টেম্বরে। সুদেতেন জার্মানদের পাশে আনিবার জন্য প্রেসিডেন্ট বেনেস ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখ তাদের সমস্ত দাবীই মানিয়া লইলেন—যদিও হেনসেইনের দল এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বেনেস জানিতেন যে, সুদেতেন জার্মানদের যত দাবীই মানিয়া লওয়া হোক না কেন, তারা কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। এই সময় ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখ সুবিখ্যাত লন্ডন টাইমস পত্রিকা, যার সম্পাদক মিঃ জিওফ্রে ডসন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই পত্রিকাতে সুদেতেন অঞ্চল জার্মানীর নিকট অর্পণের জন্য এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সুপারিশ করা হইল। একই সময়ে প্যারিসের একটি পত্রিকাতেও (পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখপত্র) অনুরূপ প্রস্তাব করা হইল। আর ১২ই সেপ্টেম্বর নাৎসী পার্টি কংগ্রেসে হিটলার চেকোশ্লভাকিয়া ও বেনেসের বাপান্ত করিয়া ছাড়িলেন। অর্থাৎ সুদেতেন জার্মানদের ক্ষেপানো হইল। ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারা এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ বাধাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চেক সরকার অতি দ্রুত এবং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিল। সারাদেশে সামরিক আইন জারী হইল।

---

* পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক এবং 'The War' by Louis L. Snyder, P 89-90.

* The Cold War —by D.F. Fleming, 1961, P 71. Vol. 1

হিটলার ও চেকোশ্লভাকিয়ার প্রশ্নে প্যারিসে ফরাসী সরকার স্নায়বিক দৌবল্য রোগে ভুগিতেছিলেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের ১৩ই—১৪ই সেপ্টেম্বর রাতে চেম্বারলেনের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁকে জানাইলেন যে, যদি হিটলারকে 'ব্যক্তিগতভাবে' আবেদন করা যায়, তবে, এই সংকটের একটি সুমীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তৈয়ার হইয়াই ছিলেন এবং নিজের দায়িত্বেই (মন্ত্রিসভার অনুমোদনের আগেই) হিটলারের নিকট তারযোগে প্রার্থনা করিলেন এক সাক্ষাৎকারের জন্য। হিটলার তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং চেম্বারলেন ৬৯ বৎসর বয়সে এই প্রথম বিমানযোগে যাত্রা করিলেন মিউনিকে এবং সেখান থেকে ট্রেনযোগে তিনি বার্সেটসগ্যাডেনে উপস্থিত হইলেন—হিটলারের এই সেই কুখ্যাত পল্লীভবন যেখানে ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রনেতা স্বাধীনতার মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হইয়াছেন। চেম্বারলেন সেখানে চা-পান করিলেন এবং হিটলারের সম্মুখে ধূমপান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কিছুটা গর্ব অনুভবও করিলেন। (হিটলার নিজে ধূমপান করিতেন না। বোধহয় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এটাই ছিল গর্বের কারণ!) কিন্তু আলোচনার প্রথমেই হিটলার তাঁর স্বভাব অনুযায়ী কড়া মেজাজ দেখাইলেন. কিন্তু চেম্বারলেন তাঁর তোষণ-নীতিতে অটল রহিলেন এবং সুদেতেন জেলা পৃথকীকরণের দাবীকে তিনি নীতি হিসাবে মানিয়া লইলেন। কিন্তু হিটলার এত অল্পে খুশী হইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি দাবী করিলেন যে, অবিলম্বেই সমগ্র সুদেতেন অঞ্চল জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, অন্যথা যুদ্ধ বাধিতে পারে। তবে, এই বিষয়ে তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে দেওয়ার জন্য হিটলার চেম্বারলেনকে সময় দিতে রাজী আছেন। পরদিন তিনি ফিরিয়া আসিলেন লণ্ডনে।

এভাবে বারবার চেম্বারলেনকে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ছুটিয়া যাইতে হইল, যদিও হিটলার একবারের জনাও লণ্ডনে আসিয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের (অন্তত কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী) প্রয়োজন মনে করেন নাই এবং এভাবে বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারকে (যাঁদের গুঁতোয় পৃথিবীর বৃহত্তম ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য—ভারতবর্ষ-সহ কম্পমান ছিল) হিটলারের কাছে বার বার অসম্মান ও নতিস্বীকার করিতে হইল। লণ্ডন ও প্যারিসে বৃটিশ ও ফরাসী মন্ত্রিসভার তোষণনীতি পক্ষপাতী মন্ত্রিগণ একযোগে চেকোশ্লভাকিয়ার উপর চাপ দিলেন জার্মান সংখ্যাধিক্য এলাকাগুলি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য। অবশ্য খণ্ডিত চেকোশ্লভাকিয়া সীমানা সম্পর্কে বৃটিশ সরকার গ্যারেণ্টি দিতে রাজী আছেন, যদি হিটলারের আপত্তির কারণ না ঘটে এবং যদি চেকোশ্লভাকিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তার সামরিক মৈত্রী চুক্তি বাতিল করিয়া দেয়! ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট বেনেসকে এই অদ্ভুত অসম্মানজনক ও রাষ্ট্রের অঙ্গহানিকর প্রস্তাব গ্রহণের জন্য জানাইয়া দেওয়া হইল। প্রেসিডেণ্ট বেনেস তাঁর মন্ত্রিসভা ও সামরিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে ক্রমাগত দেড়দিন ধরিয়া পরামর্শ করিলেন এবং অবশেষে জানাইলেন যে, ১৯২৫ সালের জার্মান-চেক সন্ধি অনুযায়ী তাঁরা সমগ্র চেক বিরোধের প্রশ্নটি সালিশী মীমাংসায় দিতে রাজী আছেন। কিন্তু এর জবাবে বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতেরা তৎক্ষণাৎ জানাইয়া দিলেন যে, এই সমস্ত প্রস্তাবের উপর বেশী জোর দেওয়া হইলে চেকোশ্লভাকিয়ার ভাগ্য সম্পর্কে বৃটেন ও ফ্রান্স কোন দায়িত্ব নিতে পারিবে না। এমন কি ২০শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর রাত্রে যখন তিন রাত্রির অনিদ্রার পর প্রেসিডেণ্ট বেনেস ঘুমাইতে গেলেন, তখন ঘণ্টাখানেক বাদেই বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতদ্বয় তাঁকে এক চরম পত্র দিয়া জানাইয়া দিলেন যে, বিনা-সর্তে এবং অবিলম্বে ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সারা রাত ধরিয়া চেক মন্ত্রীরা পরামর্শ করিলেন, কিন্তু লণ্ডন থেকে সেই রাতে ধৈর্যহীন ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ভাসিয়া আসিল—'এত দেরী হচ্ছে কেন? এখনও কি বেনেস নতিস্বীকার করে নি?' *

পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় চেক সরকার নতিস্বীকার করিলেন। কিন্তু এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'একটা গোটা জাতি চোখের জলে ভাঙিয়া পড়ল'। চেক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং জার্মান পক্ষপাতী জেনারেল সিরোভি নূতন চেক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

চেকোশ্লভাকিয়ার নতিস্বীকার সম্পর্কে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের এই সমস্ত প্রস্তাব লইয়া চেম্বারলেন দ্বিতীয়বার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হইলেন। এবার রাইনল্যাণ্ডের অন্তর্গত গডেসবার্গের একটি হোটেলে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ—চার বছর আগে এই হোটেল থেকেই হিটলার অতর্কিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন ক্যাপ্টেন রোয়েম প্রভৃতিকে খতম করার জন্য। এবার সেই হোটেলেই হিটলার চেকোশ্লভাকিয়াকে 'আপোষে' খতম করার জন্য চেম্বারলেনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দুর্ভাগ্য আগের বারের চেয়েও ফুয়েরের মেজাজ ও জঙ্গী-মূর্তি কঠোরতর হইয়া দেখা দিল। তিনি তাঁর দাবীর মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, ১লা অকটোবরের মধ্যেই তিনি প্রস্তাবিত ও তাঁর নিজস্ব মানচিত্রে চিহ্নিত জেলা-গুলি দখল করিয়া লইবেন এবং অন্যান্য এলাকাগুলি সম্পর্কে গণভোট গ্রহণ করিতে হইবে। ১লা অকটোবরের আগেই এগুলি হওয়া চাই। তবে, সেই সঙ্গে তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, ইউরোপে এটাই তাঁর শেষ ভূমিখণ্ড দাবী—

"This is the last territorial claims I have to make in Europe'

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া চেম্বারলেন কমন্স সভার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, হিটলারের এই নূতন দাবীর বহরে তিনি প্রথমে চমকাইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁর কাছে এটা গভীর আঘাতের (profound shock) মত ছিল। এবার বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং ফরাসী মন্ত্রিসভার তোষণপন্থীরাও অন্তত সাময়িকভাবে পিছু হটিতে বাধ্য হইলেন। কারণ, হিটলারের বাড়াবাড়িতে ইতিমধ্যে জনমত—বিশেষভাবে বৃটেনে প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং হিটলার গডেসবার্গে চেম্বারলেনের নিকট যে সমস্ত সর্ত দিয়াছিলেন, সেগুলি প্রত্যাখ্যাত হইল এবং চেকোশ্লভাকিয়াকে পরামর্শ দেওয়া হইল তার সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করিবার জন্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে, চেক সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তার সমরশিল্প এবং সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যূহ অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ছিল। ১৫ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য রণক্ষেত্রে আগাইবার জন্য তৈয়ার হইয়াই ছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে চেকোশ্লভাকিয়ার যে চুক্তি ছিল, ফরাসী সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা পালনে অগ্রসর হইলেন। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর আংশিক সমাবেশ ঘটানো হইল। ২৮শে সেপ্টেম্বর সকাল ১২-২০ মিনিটে বৃটেনের নৌবহর সমাবেশের হুকুম জারী হইল—নৌমন্ত্রী মিঃ ডাফ কুপার মিঃ চার্চিলের মতই তোষণনীতির বিরোধী ছিলেন এবং এর অনেক আগেই ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) তারিখ মিঃ এন্থনি ইডেন চেম্বারলেনের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন। চার্চিলের মতে মিঃ চেম্বারলেন নিজ হাতে সমগ্র নীতি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ পরিহার করার উদ্দেশ্যে তিনি তোষণ-নীতির লজ্জাজনক ও অনিষ্টকর পন্থার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ২৬শে সেপ্টেম্বর পুনরায় চেম্বারলেনের পক্ষ থেকে হিটলারের নিকট স্যার হোরেস উইলসনের মারফৎ একটি ব্যক্তিগত আবেদন পাঠানো হইল। জবাবে হিটলার জানাইলেন যে, ২৮শে বুধবার বেলা দুটোর মধ্যে চেকোশ্লভাকিয়া যদি তাঁর দাবীগুলি গ্রহণ

---

* The Cold War —by D.F. Fleming Vol. 1 P 78

না করে, তা হলে ১লা অক্টোবর, শনিবার তিনি সসৈন্যে মার্চ করিবেন—এই মর্মে যে চরমপত্রের কথা তিনি গডেসবার্গে চেম্বারলেনকে বলিয়াছিলেন, সেই কথা থেকে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হইবেন না। সেদিন সন্ধ্যায় হিটলার বার্লিনের এক উগ্র বক্তৃতায় ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেণ্ট বেনেস ও চেকোশ্লভাকিয়ার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করিলেন, কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতি নরম মনোভাব দেখাইলেন—বোধহয় সেই মুহূর্তে ইঙ্গ-ফরাসী মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তন দেখিয়া। এদিকে জার্মান জেনারেলদের সঙ্গেও হিটলারের মতবিরোধ চলিতেছিল বলপ্রয়োগের প্রশ্নে। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এক বেতার বক্তৃতা দিলেন, আজও তা অবিস্মরণীয়। এই বক্তৃতায় তিনি বলিলেন :

'How horrible, fantastic, incredible, it is that we should be digging trenches and trying on gas-masks here because of a quarrel in a far-away country between people of whom we know nothing! .... I would not hesitate to pay even a third visit to Germany if I thought it would do any good. ......

অর্থাৎ কী ভয়ংকর, কী আজগুবী এবং অবিশ্বাস্য এমন কথা যে, কোথায় কোন দূরবর্তী অচেনা দেশে কোন অজানা লোকেদের মধ্যে কী ঝগড়া হইতেছে আর তারই জন্য আমাদের ট্রেঞ্চ কাটিতে ও গ্যাসমুখোস পরিতে হইবে। এর জন্য আমি বরং তৃতীয়বার জার্মানীতে যাইতে প্রস্তুত আছি, যদি এর দ্বারা কিছু মঙ্গল হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

অতএব চেম্বারলেন তৃতীয়বার জার্মানীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্যর হোরেস উইলসনের মারফৎ প্রেরিত হিটলারের চিঠির জবাবে চেম্বারলেন লিখলেন :

'আপনার চিঠি পড়ে আমার নিশ্চিত মনে হলো আপনি বিনা যুদ্ধেই এবং অবিলম্বেই আপনার মূল দাবীগুলির সব পেতে পারেন। এজন্য আমি অনতিবিলম্বেই বার্লিনে এসে আপনার সঙ্গে ও চেক প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভূমিগুলি হস্তান্তর করা সম্পর্কে আলোচনা করতে রাজী আছি। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে ইতালী ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা একটা মীমাংসায় পৌঁছাতে পারবো।'

এই সঙ্গে তিনি ইতালীর ডিকটেটর মুসোলিনীর নিকট এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন যে, তিনি যেন তাঁর (চেম্বারলেনের) প্রস্তাবিত হিটলারের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হন। কারণ এর দ্বারা আমাদের জনগণ যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। *

হিটলারের বন্ধু মুসোলিনী এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর রাতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত যখন বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে সুদেতেনল্যান্ডের আরও এলাকা হস্তান্তরের জন্য আলোচনা করিতেছিলেন, তখন মুসোলিনীর বার্তা আসিয়া হাজির হইল। চেম্বারলেন যে সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এই বার্তায় তা সমর্থন করিয়া হিটলারকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, ইতালীও এতে যোগ দিতে প্রস্তুত আছে। সুতরাং ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩টায় হিটলার চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরকে জানাইয়া দিলেন যে, পরদিন মিউনিকে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতে মুসোলিনীও উপস্থিত থাকিবেন।

অতএব চেম্বারলেন তৃতীয়বার বিমানপথে ছুটিলেন হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

২৯শে সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা মিউনিক শহরে চেম্বারলেন, দালাদিয়ের এবং হিটলার ও মুসোলিনী একত্র হইলেন। লক্ষ্য করিবার এই যে, যে চেকোশ্লভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য এই ঐতিহাসিক সম্মেলন ডাকা হইল, সেখানে চেকোশ্লভাকিয়ার একজন প্রতিনিধিও আমন্ত্রণ করা হইল না এবং ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ শক্তি সোভিয়েট রাশিয়াকেও ডাকা হইল না। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা মন স্থির করিয়াই আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ চেকোশ্লভাকিয়ার স্বাধীনতা বলি দেওয়া হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। চেকোশ্লভাকিয়া সম্পর্কে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর আগে হইতেই একটা দলিল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, বৈঠক আরম্ভ হওয়ার আগে বার্লিনের ইতালীয় রাষ্ট্রদূত সেটি মুসোলিনীর হাতে দিলেন এবং মুসোলিনীও নিরপেক্ষ মধ্যস্থের ভান করিয়া সেটি বৈঠকে পেশ করিলেন। আর হিটলারও শান্তিরক্ষার নাম করিয়া প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। চেম্বারলেন এবং দালাদিয়েরও রাজী হইয়া গেলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৈঠকের কাজ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রাত্রি দুটোর সময় এই চারজন রাষ্ট্রনেতা যখন মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য কলম হাতে নিলেন, তখন বৃহৎ দোয়াতদানিতে কলম ডুবাইতে গিয়া দেখিলেন কালি নাই! *

কিন্তু কালিশূন্য সেই দোয়াতদানি সত্ত্বেও মিউনিক চুক্তির কলঙ্ক কালিমা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না।

চেকোশ্লভাকিয়ার প্রতিনিধিরা পাশের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি দুটোর সময় তাঁদের ডাকা হইল চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরের নিকট। দালাদিয়ের তাঁদের হাতে সেই চুক্তিপত্র দিয়া পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে,—

"....this was a sentenec without right of appeal and without possibility of modification. ......

অর্থাৎ এটি একটি দণ্ডাজ্ঞা, এর বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলিবে না এবং আগামীকল্য বিকেল পাঁচটার মধ্যে এটি গ্রহণ করিতে হইবে।

চেম্বারলেন কোন মন্তব্য করিলেন না, তিনি হাই তুলিতেছিলেন এবং ক্লান্ত ছিলেন, তবে আরামদায়ক ক্লান্তি—(tired, but pleasantly tired) *

হিটলারের চরমপত্র অনুযায়ী ১লা অক্টোবর, ১৯৩৮ থেকেই জার্মানী সুদেতেন জেলাগুলি দখল করিতে শুরু করিবে এবং যে সমস্ত এলাকায় জার্মানরা মেজরিটি নয়, সেগুলিতে একটা আন্তর্জাতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে গণভোট গ্রহণ করা হইবে। জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স ও বৃটেন চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন সীমানার গ্যারাণ্টি দিবে এবং চেক কর্তৃক পরিত্যক্ত সমস্ত এলাকাগুলির কলকারখানা, অস্ত্রাগার, জিনিসপত্র ইত্যাদি যথাযথ বজায় রাখা হইবে।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে এভাবে দ্রুত বলিদানের পর চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে এক প্রাইভেট সাক্ষাতের জন্য মিলিত হইলেন তাঁর মিউনিকের ফ্ল্যাটে—৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে এবং বৃটেন ও জার্মানী পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করিবে না—এই মর্মে এক প্রতিশ্রুতিপত্রে দুইজনে সানন্দে স্বাক্ষর দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই প্রতিশ্রুতিপত্রটি চেম্বারলেন আগেই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর দালাদিয়ের ও চেম্বারলেন স্ব স্ব রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা ইউরোপে যুদ্ধ নিবারিত হইল মনে করিয়া প্যারিসে ও লণ্ডনে উৎফুল্ল জনতা দুই রাষ্ট্রনেতাকে অভিনন্দন জানাইলেন। (প্যারিসে এই উপলক্ষে নৃত্যগীত ও ভোজ উৎসবেরও অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যেটা ছিল ফ্রান্সের আসন্ন দুর্বিপাকের সংকেত স্বরূপ।) সন্ধ্যাবেলা ডাউনিং স্ট্রীটের জানালা থেকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিপত্রটিকেই উৎসুক জনতার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনের ভঙ্গীতে আন্দোলিত করিয়া বলিয়াছিলেন—

"I believe it is peace for our time".

অর্থাৎ আমার বিশ্বাস এর দ্বারা আমাদের আমলে শান্তি সুনিশ্চিত হইল। *

* চার্চিল রচিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২৪৬-৪৭ পৃঃ।

* Mr. Feilling প্রণীত চেম্বারলেনের জীবনচরিত থেকে চার্চিলের উদ্ধৃতি।

* The origins of the Second World War by A.J.P. Taylor, P 229.

* পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ২৩১

প্রেম ও অমরত্ব
বিধুবাবুর হা-হুতাশ

অমরত্ব নিয়ে আলোচনা করতে বিধুবাবু আসেন নি, আমিও প্রস্তুত ছিলাম না। তবুও একথা সে কথায় অমরত্ব প্রসঙ্গ উঠে পড়লো।

—রাজা বাদশারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে নিজেদের জাহির করতেন, নিজের বংশকে সিংহাসনের চিরস্থায়ী অধিকারী বলে নির্দেশ জারী করতেন, হুকুমনামা বা আচরণবিধি তাম্রখন্ডে বা প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ করতেন; নিজের নামের সঙ্গে অনেকগুলো বিশেষণ জুড়ে নিজেকে শ্রীমন্ডিত করতেন। এর মধ্যে প্রকাশ পেত তাঁদের অমরত্বের স্পৃহা। মর্তলোকে স্বর্গরাজ্য গড়বার পরিকল্পনা অমরত্বেরই বাসনা। রথসচাইল্ডরা যখন নিজের নামে 'হাউস' গড়ে তুলে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন, তখন অমরত্ব লাভের গোপন ইচ্ছাই তাঁদের চালনা করে। কঠোর তপশ্চর্যা ও আত্ম-নিপীড়নে রত মহার্ঘ দেবর্ষিরা দেবত্ব বা অমরত্ব চান। ব্যাস-বাল্মীকি, হোমার-ভার্জিল, দান্তে-গায়টে শেকসপীয়র রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা। এমন কি আমার আপনার মত সামান্য লোকের মনের গোপনে উঁকি মারছে এই দুর্লভ বাসনা। তবে সেটা ঐ ডার্বিসুইপের টিকিট কিনে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখার মত পাগলামী। ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা, শিল্পী, কবি, বিপ্লবীদের মধ্যে অমরত্বস্পৃহা যতটা তীব্র, আমাদের মত সাধারণের মধ্যে ততটা নয়। কথাটা কি ঠিক? আমার মনে হয় ঠিক নয়। আমরা বর্তমানের ঘানি টেনে তেল বের করতে করতেই জীবনটা ফুরিয়ে ফেলি। দূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তো দূরের কথা, অদূর ভবিষ্যৎ নিয়েই চিন্তা করারও সময় পাই না। অনেক কষ্টে ঢালু পথ ঠেলে পাথরটাকে উপরে তুলছি, আবার সেটা গড়িয়ে পড়ছে। সিসিফাসের অদৃষ্ট নিয়েই আমরা জন্মেছি। কনভেয়ার-বেল্টে চেপে কোথায় চলেছি, কে জানে? টেইলর-ইজম্। একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা কিছু বাড়িয়ে বলেন না। সত্যিই বলুন তো ডাক্তারবাবু, চিন্তা করলে বাঁচার ইচ্ছা বজায় রাখা যায় কি? কিন্তু এই সব কারণেই, আমার মনে হয়, আমরা, সাধারণ মানুষরা, আরো বেশি অমরত্ব-প্রয়াসী। গুরুদেবের আশ্রমে ভিড় করি চরণামৃত অথবা বচনামৃত পানে অমর হবার লোভে। সভাসমাবেশে জমায়েত হয়ে লক্ষ মানুষের সামিল হয়ে যাই। খন্ড জীবনের নশ্বরতা দূর করার চেষ্টা করি। দেবোপম শক্তিমান নেতাদের অমরবাণী শুনে, তাঁদের ক্ষণেক-সঙ্গ লাভ করে নিজেকে অমর ভাবি। তাঁদের ঝান্ডা তুলে ধরি মিছিলে, মনে আশা এ ঝান্ডা চিরদিন আকাশে উড়তে থাকবে। তাঁদের শেখানো শ্লোগান আওড়াই পথেঘাটে। বাতাসে ভর করে অনন্তকাল ধরে শ্লোগান-গুলো বেঁচে থাকবে, এই বিশ্বাস আমাদের চালিত করে। আপনি যে অন্য লোকের মনের কথা, বেফাঁস বেয়াড়া চিন্তাগুলো পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন এর মধ্যে আপনার বেঁচে থাকার, মৃত্যুর পর অমর হবার বাসনাই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রেম, মিলন সম্ভাবনারহিত প্রেম, এই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষারই একটা অভি-ব্যক্তি।

বিধুবাবু এসেছিলেন প্রেমঘটিত এক সমস্যা নিয়ে। কয়েক দিনের আলোচনার পর অমরত্ব প্রসঙ্গ টেনে এনে সমস্যা সমা-ধানের পরিবর্তে তিনি সেটাকে আরো জটিল করে তুললেন। তিনি প্রথমটায় আত্ম-গোপনের চেষ্টা করেছিলেন। সমস্যাটা স্রেফ তাত্ত্বিক সমস্যা হিসাবে উত্থাপন করলেন। এই সমস্যাটা তাঁকে পীড়িত করেছে ঠিকই, কিন্তু তা বলে তাঁকে রোগী মনে করলে আমি ভুল করবো, এই সাবধানবাণী তিনি প্রথমেই উচ্চারণ করলেন। প্রেম কি? নর-নারীর পারস্পরিক আকর্ষণের না হয় একটা উদ্দেশ্য আছে; তার একটা মানে হয়, কিন্তু একতরফা আকর্ষণের তাৎপর্য কি? একটি পুরুষ স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রীর মধ্যে অবাঞ্ছিত কোনো কিছু দেখতে পায় না। স্ত্রীকে সর্বব্যাপারে, সব দিক থেকে নিজের উপযুক্ত মনে করে, স্ত্রীও তাকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিবেদন করে। স্বামী বোঝে স্ত্রী অনুরক্ত অনুগত ও নির্ভর-যোগ্য। জানে, অন্য কোনো পুরুষের প্রতি তার কোনো রকমের আকর্ষণ নেই। পরিবারে সব দিক থেকে শান্তি ও শ্রী বিদ্যমান। এই অবস্থায় পুরুষ অন্য নারীর প্রতি যদি আকৃষ্ট হয়, তবে সেই পুরুষকে আমি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে পারি কিনা? স্ত্রী যদি এই কথা জানতে পারে, সে স্বামীকে ক্ষমা করতে পারে কিনা? এই রকম অজস্র প্রশ্ন আর রকমারী উত্তর সর-বরাহ করে বিধুবাবু আমাকে প্রথমটায় অস্থির করে তুললেন। তৃতীয় পুরুষ থেকে প্রথম পুরুষে আসতে, তত্ত্বগত সমস্যাকে ব্যক্তিগত সমস্যায় দাঁড় করাতে অবশ্য খুব বেশী সময় লাগলো না। সংক্ষেপে বিধুবাবু সমাচার শোনাচ্ছি।

মোটা-সোটা বেঁটে-খাটো চেহারার বিধু-বাবু আজ বাইশ বছর ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন। বর্তমানে এক মেয়েদের কলেজের সঙ্গে যুক্ত, বিভাগীয় প্রধান। বয়স প্রায় আটচল্লিশ। চুলে পাক ধরেছে। মেয়ে-পুরুষ নিয়ে তাঁর বিভাগে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা সাত। তিনজন মেয়ে, চারজন পুরুষ। বিধুবাবুর প্রকৃতিটা একটু ঝাঁঝালো, লোকে বলে বদমেজাজী, খিট-খিটে। তাঁর মতে তিনি ডিসিপ্লিন মেনে চলতে চান, আর তাঁর বিভাগে ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে চান, তাই তিনি অনেকের কাছে অপ্রিয়। বিশেষ করে আজকালকার ছেলেদের কাছে। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে অল্পবয়সী যে তিনজন, তাঁরা ওঁকে আড়ালে টিটকারী দিয়ে থাকে, তিনি জানেন। কারণ,

তিনি তাদের দিয়ে 'কোর্স কমপ্লিট' করিয়ে নেবার জন্যে মাঝে মাঝে দু-একটা কড়া কথা বলে থাকেন। স্ত্রীর বয়স চল্লিশ। সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী লীলাকে তিনি সত্যই ভালবাসেন। লীলা শুধু তাঁর সন্তানের গর্ভধারিণী নয়, সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী ও বিধুবাবুর 'ফ্রেণ্ড ফিলজফার ও গাইড'। কলেজের ব্যাপার থেকে শুরু করে সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি সব ব্যাপারে লীলার পরামর্শ মূল্যবান মনে করেন বিধুবাবু। নারীরত্ন বলা যায় লীলাকে। লীলার বিরুদ্ধে কোনো রকম অভিযোগ করতে পারলে, বিধুবাবুর অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণের কারণ পাওয়া যেত; এটা আর সমস্যা আকারে দেখা দিত না। লীলা এম-এ পাশ করে প্রথম কয়েক বছর এক স্কুলে কাজ নিয়েছিল। এখন আর কোনো কাজ করে না। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, তিনটি সন্তান ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিধুবাবুর মাতা। শাশুড়ীকে দেখাশোনা করার জন্যেই লীলা চাকরী করে না। বিধুবাবু আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন যে, সব দিক থেকে লীলা তাঁর পরিচিত যে কোনো মেয়ের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এছাড়া, লীলার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে মাসে প্রায় হাজারখানেক টাকা আসে। সেটা না আসলে এই বাজারে তৈরী করে ছেলেমেয়ে মানুষ করার ক্ষমতা তাঁর হতো না। এতসব সত্ত্বেও তিনি আজ প্রায় দশ বছর ধরে অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসে আসছেন। লীলার চেয়ে এর বয়স খুব যে কম তা নয়। সে যদিও কুমারী তবুও লীলাকে তার থেকে কম-বয়সী মনে হয়। দেহমন কোনো দিক দিয়ে শান্তা লীলার সমকক্ষ নয়। তিন সন্তানের জননী লীলা, তবুও তার চোখে কটাক্ষ আছে, দেহে উত্তাপ আছে, মনে মাধুর্য আছে। লীলার দেহমনের একচ্ছত্র অধিকারী হয়েও, শান্তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন বিধুবাবু। কেন এই আকর্ষণ?

—শান্তার সঙ্গে দশ বছরের আলাপ। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে আমি ওকে ভালবাসি। অবশ্য সেটা বুঝতে আমার সময় লেগেছে। শান্তা বাংলা পড়ায় আমাদের কলেজে। শান্ত ম্লান চেহারা। আমার সঙ্গে আলাপের সূত্র ওর ডকটরেট থিসিস। 'প্রেমের কবিতা, প্রাচীন ও আধুনিক', এই নিয়ে ও থিসিস তৈরী করেছিল। সেই সময় ইংরাজী ও ইয়োরোপের অন্যান্য ভাষার প্রেমের কবিতার রেফারেন্স সংগ্রহে ও আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়। ওকে আমার ভাল লাগে ওর নিরলস পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে। দিনে প্রায় চোদ্দ পনেরো ঘণ্টা করে লেখাপড়ার কাজ করতো। এক জায়গায় বসে ও একনাগাড়ে আট দশ ঘণ্টা পড়তে পারে, শুনে প্রথমটায় আমার হিংসে হয়েছিল। আমি একটু ছটফটে ধরনের মানুষ। সারা দিনে পড়াশুনো করি বেশির ভাগ সময়, কিন্তু একমনে আমি আধ ঘণ্টার বেশি পড়তে পারি না। একখানা বই একটানা আমি শেষ করতে পারি না। আমি একসঙ্গে তিন-চারখানা, হয়তো তিন-চার বিষয়ের বই পড়ি। সকালে যেটা পড়ি, দুপুরে সেটায় মন বসে না। বিকেলে যা পড়ি, রাত্রে তা পড়ি না। লীলা বলে এটা নাকি জিনিয়াসের লক্ষণ। আমি মনে করি, এটা আমার অস্থিরচিত্ততার পরিচায়ক। শান্তার নিরলস একাগ্রচিত্ততাই ওর প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রথম ও প্রধান কারণ। প্রথম বছরখানেক ওকে অনেক কাব্য কবিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রেমের উৎস নিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতামত ওকে পড়ে শুনিয়েছি। এ আলোচনা করেছি প্রথম দিকে টীচার্সরুমে, পরে আমার নিজের ড্রইংরুমে। কয়েক মাসের মধ্যে শান্তা লীলার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিল। লীলার কাছে শান্তার পারিবারিক ইতিহাস জানলাম। হাওড়ার উপকণ্ঠে দাদা-বৌদির সঙ্গে থাকে। দাদা-বৌদির সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছে। তাঁরা বেশ ভদ্র। শান্তাকে ভালবাসেন। শান্তা অত শান্ত কেন? অত ম্লান কেন? এখনও কুমারী কেন? এইসব নানা প্রশ্ন মনে উঠেছে। তবে লীলা অথবা আমি এ নিয়ে কোনো গবেষণা কল্পনা করিনি। শান্তাদের কাছ থেকে কোনো আলোকপাত হয়নি। লীলা বুদ্ধিমতী। কোনো মেয়ে অবিবাহিত আছে শুনলে সে মনে করে না যে এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে, এর পেছনে বিশেষ কোনো ইতিহাস আছে। ব্যর্থপ্রেম, দারিদ্র্য বা ঐ রকম কিছুর। আমারই মত লীলা মামুলী ধরনের চিন্তাতে অভ্যস্ত নয়। লীলার মনে কোনো সন্দেহ বা বিরূপতার ছায়া পড়ে নি। আমার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করছিল শান্তা, এতে লীলা বা শান্তার দাদার কিছুমাত্র উদ্বেগ দেখিনি। কেউ এখনো পর্যন্ত জানে না যে আমি পঞ্চাশের প্রান্তে এসেও শান্তার চিন্তায় বিভোর। আর এই প্রেমচিন্তা আমার মনে জেগেছে আজ থেকে দশ বছর আগে। শান্তার সঙ্গে মেলামেশা অবাধ হলেও, কলেজের টীচার্স রুম ও আমার বাড়ীর সীমানার বাইরে আমরা কখনও দেখা সাক্ষাৎ করিনি। থিয়েটার সিনেমা পিকনিকে যেখানে গেছি লীলা বা কলেজের অন্য অনেকে থেকেছে। কাজেই আমাকে শান্তাকে নিয়ে কোনো কেচ্ছা-কাহিনী রটে নি, কোনো রকম গুঞ্জনও ওঠে নি। নিজের কাছে ছাড়া অন্য কারুর কাছে এই দশ বছরের মধ্যে একদিনও আমি ধরা পড়িনি। নিজের কাছে ধরা

পড়তেও সময় লেগেছিল। থিসিসের কাজ হয়ে গেলে আমার কাছে নিয়মিত আসা বন্ধ হলো। তখনই বুঝলাম আমি প্রতিদিন শান্তার আগমন প্রতীক্ষায় কতখানি উদগ্রীব হয়ে থাকি। তিন-চার দিন না এলেই, কোনো একটা ছুতো করে ওকে ডেকে পাঠাই। একখানা বই হাতে তুলে দিই, অথবা ওর কাছে আধুনিক কোনো বাংলা কবির সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা করতে বসি। এই ভাবে ওকে দেখা, ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার আকুল আগ্রহ চরিতার্থ করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে দিয়ে কোনো ছুটির দিনে ওকে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে আনাতাম। স্ত্রী কিছুই সন্দেহ করতো না। কিছুই বলতে পারতো না। আমার মুখের পেশীর কুঞ্চনে বা চোখের পাতার কম্পনে কোনো রকমে আমার মনোভাব প্রকাশ না পায়, সেদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতাম। শান্তার সামনেও আমার কোনো রকম ভাবান্তর ঘটতো না। তাছাড়া আমরা এই একশো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের বিরাট দেহ, পাকা চুল, আর তিক্ত চেহারা, সকলেই ভাবে, রোমান্টিক প্রেমের কেন, সব রকম প্রেমের প্রতিষেধক। কাজেই কেউ আমাকে বুঝতে পারে নি। আমি এ দশ বছরে মুহূর্তের জন্যেও আত্মবিস্মৃত হইনি। আকারে-ইংগিতেও কোনো দিন শান্তাকে আমার মনোভাব জানাইনি। শান্তা অনেক দিন ধরেই আমাকে বড়দা বলে ডাকে এবং অগ্রজের মতই সমীহ করে। তার শান্ত ক্লান্ত চোখে কোনো দিন আলোর ঝিলিক দেখিনি। ওর সামনে অনেক প্রেমের কবিতা পড়েছি, ওকে প্রেমের দেহতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক, নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছি, কিন্তু ওর মুখে কোনো নতুন রেখা ফোটে নি, ওর দেহে কোনো নতুন হাওয়া লাগে নি। ওকে অনেক কবিতা আওড়াতে শুনেছি, (বেশ সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে শান্তা) কিন্তু কবিতার আড়ালে থেকেছে ওর মনের ছবি, কবিতার ঝংকারে ওর নিজের মনে কোনো আলোড়ন জেগেছে বলে মনে হয় নি। শান্তাও কি আমার মত আত্মগোপনের আর্ট আয়ত্ত করেছে? না ওর দেহমনের সব উত্তাপ অন্য কোথাও উজার করে দিয়ে এসেছে? কিন্তু ওর সম্বন্ধে কোনো কানা-ঘুসোও তো শোনা যায় না। অনেক ছেলের সঙ্গেই মেশে, কথা বলে। কিন্তু সে মেশা কথা বলায় কোনো সময় তারা দ্বিতীয় কোনো অর্থ খুঁজে পায় না, খোঁজার চেষ্টা করে না। কোনো পুরুষবন্ধু থাকলে আমরা নিশ্চয়ই জানতাম। কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা থাকলে নিশ্চয়ই সে খবর আমার কানে আসতো। ও কি তা হলে মেরু প্রদেশের জমাটবাঁধা কোন হ্রদ? আজন্ম আত্মরতিতে অভ্যস্ত নারসিসাস? এমন কোনো ঘনিষ্ঠ মেয়ে বন্ধু ওর নেই যে ওকে সমরতিভাবাপন্ন ভাবতে পারি? এই-সব নানা চিন্তা আজ দশ বছর ধরে আমাকে পীড়িত করছে।

অনেক বেশী পীড়িত বোধ করেছি নিজের এই আকর্ষণের কারণ ঠিক করতে না পেরে। আমি ওকে দেখতে চাই, ওর সঙ্গ চাই। এইতো প্রেমের লক্ষণ। কিন্তু কেন চাই? লীলার প্রেমে আমার দেহমন তৃপ্ত নয়, তাই বোধ হয় শান্তার প্রতি আমার আকর্ষণ। এই উত্তর আমার মনঃপুত হয় নি। নানাভাবে আমি নিজের দেহের ক্ষুধাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। শান্তার প্রতি আমার আকর্ষণ আসঙ্গ লিপ্সা নয়। ভাবতে পারেন, লীলার মধ্যে বোধ হয় মানসিকতার কোনো দৈন্য, চারিত্রিক কোনো ত্রুটি ছিল, যা শান্তার মধ্যে আবিষ্কার করে আমি প্রেমাপ্লুত হয়েছি। না, অনেক চেষ্টা করেও আমি সে রকম কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি। চল্লিশ বছরের কোনো বিবাহিত পুরুষের পক্ষে দেহজ আকর্ষণ জন্মাতে পারে, কিন্তু তথাকথিত রোমান্টিক বা রামধনু প্রেম জন্মানো খুবই বিচিত্র। রামধনু প্রেম ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু দশ বছর ধরে সমানভাবে আকর্ষণ বোধ করছি। আমি কিছুতেই নিজের এই আকর্ষণের কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আপনার সঙ্গে অমরত্বের আলোচনা করতে গিয়ে সহসা মনে হল এ প্রেমের মূলে অমরত্বের স্পৃহা আছে। এই প্রেম থেকেই বোধ হয় দান্তে 'ডিভাইন কমেডির' প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিয়াত্রিশকে চোখে দেখার সম্ভাবনা ছিল না বলেই কি দান্তের কাব্য-প্রতিভা জেগে উঠেছিল। কিন্তু আমি কেন কবিদের মত প্রেমে পড়বো? জীবনে এক লাইনও কবিতা লিখিনি, যদিও অনেক কবিতা পড়েছি, পড়িয়েছি। কাব্য সৃষ্টি করে অমর হবার কোনো সম্ভাবনা আমার নেই। তবে কেন এই আকর্ষণ? শান্তা যদি চোখের সামনে না থাকে, আমার মধ্যে সৃজন প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে। কিন্তু ছবি আঁকা বা কবিতা লেখা কি পঞ্চাশ বছরে শুরু করা যায়? হ্যাঁ, শান্তাকে না দেখলে আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ি, বিচলিত বোধ করি। সেই বিষণ্ণতা, সেই বিচলিতভাব সৃজনশক্তির মূলে ধরে নাড়া দেবে। কিন্তু সেই সৃষ্টি কি মহান সৃষ্টি হবে? আমার বেদনাবোধ কি দুঃসহ হয়ে উঠবে? আপনি বোধ হয় 'সাবলিমেশন'কে সকল সৃষ্টির উৎস বলে মনে করেন না? আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। সমস্যাটা বোধ হয় প্রেমের নয় অমরত্বের।

এই রকম উল্টোপাল্টা অনেক কথা বললেন বিধুবাবু। সমস্যা সমস্যাই রয়ে গেল। এবার আমি তাঁকে আমার ব্যাখ্যা বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

শান্তাকে তিনি ভালবেসেছেন। কারণ লীলার প্রতি নিয়মতান্ত্রিক প্রেমে বোধহয় একঘেয়েমি এসেছে। একটি মেয়ে তাঁর কাছে শিখতে এসেছে, জানতে এসেছে। তার সঙ্গে কলেজে অন্য যেসব মেয়ে দেখছেন তাদের অনেক ফারাক। শান্তার শান্ত ও সংযত স্বভাব প্রথমেই তাঁকে আকৃষ্ট করছে। তাছাড়া তার নির্ভরতার ভাব বিধুবাবুর মনে সহানুভূতির উদ্রেক করেছে। লীলার মধ্যে নির্ভরতার ভাব, এই বশ্যতা স্বীকারের ভাব নেই। আকর্ষণ প্রধানত দেহজ নয় ঠিক, তা বলে দেহাতীতও নয়। দেহমন মিলে শান্তার যে সমগ্র সত্তা তার প্রতি বিধুবাবু আকৃষ্ট। মানুষের প্রেম দেশকালপাত্র বিশেষে বিশিষ্ট। এর কোনো সর্বগ্রাহ্য ফর্মুলা নেই। শান্তার সঙ্গে প্রেমের কাব্য আলোচনা ও আবৃত্তির মধ্যে এই প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে। প্রেমের কবিতায় মুক্ত প্রেমের বন্দনা আটত্রিশ বছরের বিধুবাবুকে নাড়া দিয়েছে। স্ত্রী-পুত্রের কাছে সম্মান হারাবার ভয় ছিল তাই শান্তাকে প্রেম নিবেদনের কোনো তাগিদ তিনি অনুভব করেন নি। তাছাড়া শান্তার মত মেয়ের কাছ থেকে এ বিষয়ে সাড়া বা উৎসাহ পাবেন না তিনি জানতেন। তাঁর প্রেমের মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তি আপাতদৃষ্টিতে নেই। লীলার সাহচর্যে দেহমন তাঁর তৃপ্ত, তাই এই শীতল শান্ত প্রকৃতির মেয়েটি তাঁকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। সারা জীবন কবিতা পড়েছেন আর পড়িয়েছেন বিধুবাবু কাব্যিক পরিমণ্ডলে রোমান্টিক প্রেম জাগা খুব আশ্চর্য ব্যাপার কিছু নয়। রোমান্টিক অল্পবিস্তর আমরা সকলেই। নিজের রোমান্টিকতাকে অস্বীকার করা ও একটা অমরত্ব-তত্ত্ব আমদানি করা বিধুবাবুর দুর্বলতা। তিনি শান্তার প্রতি আকর্ষণে অপরাধ বোধ করছেন বলেই এই সব তত্ত্ব কথার প্রয়োজন হয়েছে, এই দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। অমরত্বের স্পৃহা সকলের আছে স্বীকার করে নিলেও, তাঁর প্রেম অমরত্ব-বাসনার অভিব্যক্তি। এই তত্ত্ব আমি মানতে পারলাম না। তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। হা-হুতাশ ও অপরাধবোধের মূল অন্যত্র।

—মনোবিদ

আমি

চিত্ত চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা আমায় অনেক দিয়েছে। অনেক পেয়েছি ওর কাছ থেকে। সত্যিই আমি ঋণী। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় আমার বয়স বেড়েছে। পুঁজি বেড়েছে। আমি চঞ্চল হয়েছি, স্থির হয়েছি। মৌণ হয়ে ভাবনা-তরীতে পাড়ি জমিয়েছি। শৈশব, কৈশোর তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনের পথে এগিয়ে গেছি অনেকটা। ওর আকাশটা কোথাও বিরাট বিস্তীর্ণ হয়ে দিগন্তে উধাও হয়ে গেছে। কোথাও মুছে গেছে। আলো-বাতাসহীন সংকটাবর্তে হাবুডুবু খেতে খেতে মিলিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে। তা যাক। তবু আমি আছি। শিল্পীর পটবিন্যাসের ভূমিকায়, বিশালতার দিকবলয় হয়ে। অসীমের রহস্যময়তায় অবগাহন করতে করতে। বাস্তব জীবনানুগ সংগ্রামরত অর্থসংকট দরিয়ায় ভাসমান আর্তনাদী প্রাণীর স্পর্শে। আমি আছি কলকাতার জীবন-সংগীতে।

অনেক জায়গায় থেকেছি। বড় রাস্তা থেকে গলি ঘুঁজি—কত ঘুরেছি কত দেখেছি। যেমন ঘুরেছি, তেমন থেমেছি নেশার মত। তবু অজানা অচেনা থেকে গেছে কলকাতা। আজব শহর। প্রতি মুহূর্তের ঘটনাই যেন এক-একটা মহাভারত।

এক-এক সময় থমকে দাঁড়িয়েছি। থমকে উঠে বোকার মত দেখেছি। ভেবেছি কত। না পেয়েছি কূল, না পেয়েছি কিনারা।

পার্ক লেনও ঠিক এমনি চমকে দিয়েছিল। এমন চমক অনন্ত। তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাইনি কোন দিন। আজও মনে পড়ত না। যেমন অনেক ছেড়ে আসা বাসস্থানকে মনে রাখতে পারি নি। রাখিও নি। বা রাখার মত তেমন কোন ঘটন-অঘটন ঘটে নি।

কিন্তু তবু পার্ক লেন একটি ব্যতিক্রম। এখানে আমার শৈশব কেটেছে। স্কুল-জীবনের অনেক খেলার সঙ্গী এখানে জুটেছিল। এদের কেউ কেউ স্কুল পালাত। কেউ কেউ স্কুলের নাম করে অন্য কোনখানে যেত। কেউ বা পরীক্ষায় টুকে পাশ করত, কেউ বা অতটা ধৈর্যও দেখাতে পারে নি। শহরের রং-বেরঙে হারিয়ে গেছে। আমি এদের মধ্যে থেকেও কিন্তু সম্পূর্ণ এদের মত হয়ে যাই নি বা পূর্ণ ভালও হতে পারি নি। ন যযৌ ন তস্থৌ গোছের। তবু বলব আমার বোধহয় একটা আকর্ষণ ছিল। যা সকলের সঙ্গে এক করে দেখা যায় না। কিছুটা অন্তত স্বতন্ত্র ছিল। তা না হলে মনতোষদা আমায় স্নেহের দৃষ্টিতে দেখত না। অন্তত যা আমার মনে হয়। এবং তার নববধূর সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিত না। আমার গুণপনার কিছু কিছু উল্লেখ করে হেসে পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল।

মনোরমা অর্থাৎ মণিবৌদির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখতে চেয়ে-

ছিলাম। চেহারার যে চটক ছিল তা যেমন ঠিক তেমনই ঠিক ছিল উন্নত তনু, উজ্জ্বল বর্ণ, সদাহাস্য মুখশ্রী। ওর সঙ্গে যেন একটা মমতা লুকিয়ে ছিল। আকর্ষণের টান থাকত। যা দূর থেকে কাছে টানত।

এই টানাটানিটা অন্যে উপলব্ধি করত কি না জানি না। তবে আমার বেশ জানি ভাল লাগত। ভাল লাগত কারণে অকারণে সেখানে দর্শনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে। মাঝে মাঝে টুকটাক ফাই-ফরমাস যে খাটতে হত না তা নয়। একটা আনন্দও ছিল। মোহাচ্ছন্ন ভাব ছিল না। সংকোচ ছিল না। তাই লজ্জাও ধার ঘেঁষত না। আমারও কোন ভাব ভাবনা ছিল না।

ইচ্ছে হলে যেতাম। খেলায় মেতে উঠলে আর যাওয়া হত না। মনেও থাকত না। মণিদা ছিল নিতান্ত ভাল মানুষ। সরল স্বল্পবাক। আস্তে আস্তে কথা বলত। হৈ-চৈ বিশেষ পছন্দ করত না। কিন্তু মণিবৌদি? হাসত যখন—ঘরফাটা হাসি। কথা বলত, তাও খুব আস্তে নয়, অন্তত মণিদার মত নয়ই। সেই মণিদাই এক-একদিন বলত দেখা হলে। হ্যাঁরে, ক'দিন আর আসনি বুঝি। তোর মণিবৌদি যেতে বলেছে।

যাব বলতাম। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতাম ঠিকই কিন্তু সময় এসে গেলে যাব যাব করেও সব সময় যাওয়া হত না। কখনও বন্ধুদের সঙ্গে মেতে উঠতাম। কখনও বা বাসায় ফেরার তাড়া থাকত। অথচ তার মাঝে মধ্যে যেতাম।

গেলে কিন্তু মণিবৌদি খুব গম্ভীর হয়ে যেত কয়েক মিনিটের জন্য। যদি সেই যাওয়াটা কয়েক দিন অন্তর হত। বলত—বাবুর আসার সময় হল! ওঃ, কি রাজকার্যে যে ব্যস্ত থাকে, নে—বস্।

পরক্ষণেই আবার সেই হাসি-হাসি মুখ। খেতে দিত পরিপাটি করে। ঘর নিঃশব্দ হয়ে যেত। মনেই হত না আমরা ঘরে আছি।

তা এদিকে বাবুর পড়াশুনোটা ঠিক আছে? না, সেগুলো জলাঞ্জলি দিয়েই কাজকর্ম হচ্ছে!

একটা পিন দিয়ে যেন আমায় স্পর্শ করল! তেমন বোধ হত।

আমি এসব কথার ধারে-কাছেও যেতাম না। চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করতাম। হয়ত মাথা নীচু করে থাকতাম, হয়ত বা কখন তাকিয়ে দেখতাম। সব সময় ফিটফাট থাকত। কাপড়ের সঙ্গে ব্লাউজ রঙের সামঞ্জস্য রক্ষা করত। কপালের টিপটি বেশ সুন্দর করে দিত। মনে হত রঙের খেলায় মেতে উঠত মণিবৌদি। দুজনের সংসারে স্বাচ্ছন্দের অভাব হয় নি। সুখের খবর অবশ্য জানি না। তবে অভাবও তেমন কোন দিন চোখে পড়ে নি।

আজ আর স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই যে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগত। মুখশ্রী অপূর্ব মনে হত সজ্জার কৌশলে। কিন্তু খুব যে একটা ক্রীমেও সেখানে আশ্রয় নিত সে কথা বলি না। গায়ের রঙের সঙ্গে যা কিছুই পরত সবই মানাত। হয়ত মানাত বলেই পরত।

আমার বন্ধুরা যদিও সংখ্যায় খুব কম ছিল, তারা মাঝে মাঝে গুঞ্জন তুলত। দু-একটা বিদ্রূপাত্মক কথা বলত—সেই বয়সেও। যেগুলো আমার ভাল লাগার কথা নয়। ভালও লাগত না। কিন্তু সেগুলো নিয়ে মাথাও ঘামাতাম না। অন্তত বয়সটা সব মানিয়ে নিয়েছিল।

কয়েক বছর কাটার পর একদিন মণিবৌদি-মণিদা ওরা হঠাৎ হারিয়ে গেল, মহানগরীর ভীড়ে। শুনেছি, পার্ক লেনের মায়া কাটিয়ে দক্ষিণের কোন এক সুন্দর বাড়িতে গিয়েছে। আমাকে একবার পর্যন্ত খবর দেয় নি। হঠাৎ যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেছে। প্রথম প্রথম একটু আঘাত লেগেছিল। কিন্তু তারপর সময় সেই ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়েছে। আমিও একদিন সেসব বেমালুম ভুলে গিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছি বলে মনে করেছিলাম।

একদিন চৌরঙ্গী দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম অন্যমনস্ক হয়ে। পাশ থেকে কে যেন হাত ধরে ফেললে। বলল, আরে অতনু যে!

মণিবৌদি!

হ্যাঁ, কতদিন পরে দেখা।

হ্যাঁ। কত দিন?

মনে মনে হয়ত হিসেব করে নিলে মণিবৌদি। তারপর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে টেনে টেনে বলল, বার ব-ছ-র। এক যুগ পরে।

হঠাৎ তলিয়ে গিয়ে যেন হাতড়াতে চাইল। চোখে চোখ রেখে বলল, কেমন আছিস?

যেমন দেখছেন।

ভাবছিলাম, বার বছর আগের মণিবৌদি যেন আরও সুন্দর হয়েছে। রঙের ঢেউ জেগেছে। রঙের সমাবেশে রূপের জোয়ার। মনোমুগ্ধকর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও কমনীয়তায় ভরপুর। নহ মাতা নহ কন্যা সুন্দরী রূপসী—যেন আরো কিছু। সকলের ঊর্ধে।

হাঁ করে কি দেখছিস।

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বললাম, দেখছি, কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। মাপতে চাইছি।

কি মনে হয়?

মনে যা হয় সব কি তার বলা যায়?

আজকাল বুঝি খুব দুষ্টু হয়েছিস। কত কথা শিখেছিস—। একটু থেমে বলল, একদিন চল আমার ওখানে। বল, যাবি তো।

যাব। মণিদা কেমন আছেন?

যাবি। গিয়ে দেখে আসবি।

আজ একা বেরিয়েছেন নাকি!

অনেক দিন ধরে ভাল লাগছে না। তাই বেরিয়ে এলাম বন্দীশালা থেকে। মানে ঐ সংসার।

সংসারটা কী বন্দীশালা?

মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে আলো জ্বলে উঠেছে। রং-বেরং আলো। ঝকমকে চৌরঙ্গী। জনস্রোতের শেষ নেই। বেশ জমজমাট। ট্রাম-বাসের ঘর-ঘর শব্দ। মনুমেন্টের ওপাশটা আবছা। তারপর অন্ধকারের সীমানা।

জিজ্ঞাসা করল, এখন কোথায় থাকিস? কি করিস? সংসার করছিস? একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন।

উত্তর পরে দেওয়া যাবে একদিন।

পাত্তা পাওয়া গেলে তো। না, আজই হোক। কিন্তু এখানে নয়। চল্ আমার সঙ্গে।

এখন! কোথায়?

আমার বাসায়। চিনে আসতে পারবি। চল্ চল্।

আমার হাত ধরে চলতে লাগল ট্রাম স্টপেজের দিকে। কোন আপত্তি শুনতে চাইল না। আমিও আর বাধা দিতে পারি নি।

ট্রামে করে চলতে লাগলাম দক্ষিণ কলকাতার দিকে।

মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। যখন মনে হল আমার ওপর মণিবৌদির তেমন জোর আছে। আমি আর না করতে পারিনি। লোভাতুর মন বোধ হয় চেয়েছিল তার সাংসারিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে। অনেক দিন পর হলেও।

গিয়ে দেখেছি হরিশ মুখার্জি রোডে দোতলার পরে দুখানা ঘর নিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা ফ্ল্যাট। পরিচ্ছন্ন পাড়া। প্রথম ঘরটিকে বসবার উপযুক্ত করে সাজানো। আধুনিক উপকরণের কোনটির অভাব নেই। পার্ক লেনের সঙ্গে এর অনেক অমিল। চোখে পড়ে।

মণিদা ছিল ভেতরের ঘরে। ছেলেকে পড়াচ্ছিল। উঠে এসে জড়িয়ে ধরল। দীর্ঘ অদর্শনের পর হৃদয়-সঞ্চিত স্নেহ স্বতোৎসারিত হয়ে প্রকাশিত হল। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। স্বল্পবাক সেই
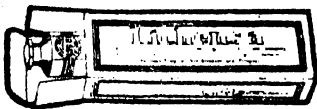
লোকটির ওপর আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। দীর্ঘ নীরবতায় যে যোগসূত্র ছিন্ন হতে চলেছিল তা আবার সগৌরবে সরব হয়ে উঠল যেন।

চোখের বার, মনের বার। তাই বলে সে একদম মুছে যায় না। বুঝলাম, সময় সুযোগ পেলে সেটাই একদিন বড় হয়ে দেখা দেয়।

বেরিয়ে এলাম, মন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। মণিবৌদির ওপর অভিমানের যে ভার ছিল—তাও। রাত অনেক হয়েছে। রাস্তার দোকানগুলো অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে। দু-একটা হোটেল-রেস্টুরেন্ট তখনো খোলা। বারবার মনে পড়তে লাগল মণিবৌদির কাতর আহ্বান। আবার আসিস অতনু।

গভীরভাবে দেখতে চেষ্টা করেছি মণিবৌদিকে। তার হৃদয়ের ওঠানামাকে। এ তো চোখ দিয়ে দেখা নয়। হৃদয় দিয়ে দেখা। মন দিয়ে দেখা। কিন্তু অত অল্প সময়ের মধ্যে তা কি সম্ভব! তবু পূর্ণ দেখার অনুভূতি দিয়ে অভিজ্ঞতার পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছি। মনে মনে সংকল্প করেছি—আবার আসব। এখানে থাকে যেন তৃপ্তির আশা, আনন্দের আশা।

আমি সুদূরের পিয়াসী। অনন্ত আমার জিজ্ঞাসা। তারই অবগাহনে ডুবতে চাই। সুখে দুঃখ, দুঃখে সুখ। সেখান থেকে আহরণ করে নিতে চাই রসাপ্লুত অনুভূতি। দীর্ঘ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম ফলশ্রুতি। মণিবৌদি তার প্রতীক। আমার আদর্শ, আমার আনন্দ, আমার বেদনা।

মানসিক প্রশান্তিতে আমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। আমার সব ধ্যান-ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর কিন্তু অনেকদিন কেটে গেছে। যাব যাব করেও আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। একালের গতিশীলতা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক। অর্থ সংকটের জটিল গ্রন্থি-মোচনে সময়ের সব নিঃশেষ হয়ে যায়। অবশিষ্ট যা থাকে তা দিয়ে আর লোক-লৌকিকতা চলে কিনা সন্দেহ। আমি তার ব্যতিক্রম হতে পারি না। সভ্যতার সংকট কাটিয়ে ওঠাও সব সময় হয় না।

মাঝে মাঝে মণিবৌদির কথা মনে হলেও শূন্য স্থানটা পূর্বতন কোন বিশেষ অবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে নেই। কল্পনা যেখানে ডানা মেলে। সুতরাং ফাঁকা জায়গাটা ভরাট হয়ে ওঠে।

কলকাতা নিয়ন লাইটের আলোয় যতই ঝকমক করুক না কেন, অন্ধকার যেমন কাটে না, তেমনই অন্ধকারের অন্ধত্বও ঠিক থাকে না। নিস্তব্ধতা রাতের মাপকাঠি।

লোক চলাচল কমে আসছে। মনে হচ্ছে রাত হয়েছে। তবু চলছি। কোন উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য যে থাকতে হবে এমন কোন কথা নয়। হাঁটছি তবু।

হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ঐ যে দোতলা বাড়িটা। যার ভেতর আলো ঝলমল করছে। রঙীন-রঙীন আলো। সেতারের সুর ভাসছে। একটা অলস আমেজ আমেজ ভাব। যা দেহতন্ত্রীগুলোকে শিথিল করে দেয়।

কাছে এসে দেখলাম, না, ওটা তো নয়। একবার মাত্র আসা। ভুল হল। আবার এগিয়ে গেলাম। বাড়ির নম্বরটা মনে করে রাখি নি। দেখলে চিনতে পারব এই ভরসায় আসা। হ্যাঁ ঠিক তাই। এবার ঠিক এসেছি কিনা যাচাই করে নিই। সেই পান-বিড়ির দোকান। তার পাশে ছোট মিষ্টির দোকান। এখনও খোলা আছে।

ওপর দিকে চাইলাম একবার। মণি-বৌদির বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জানালাগুলো সব বন্ধ। আলো জ্বলছে কিনা দেখতে পেলাম না। অনেকটা নিরাশ হয়ে পড়লাম। দেখা না হলে আসাটাই মাটি হয়ে যাবে।

ওপরে ওঠবার সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কেমন যেন ভীরু পদক্ষেপ। আলো নেই। অন্ধকার আছড়ে পড়েছে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। তাও বন্ধ। হাত দিয়ে কড়াটাকে দেখে নিলাম তালা দেওয়া আছে কিনা। না, তালা দেওয়া নয়। শুয়ে পড়েছে নাকি! রাত কম হয়নি। শুয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আলোর ক্ষীণ রশ্মি আসছে দরজার ফাঁক দিয়ে। কপাটে হাত দিতেই একটু সরে গেল। মনে হল জেগে আছে। ঘরেই আছে।

দরজা খুলব কি— অসময় হয়নি তো? পার্ক লেনের বাড়ীতে এ ভাবনা হয়নি। আজ কেন হচ্ছে? সময়ের পার্থক্য কি চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটায়! হয়ত হবে। এমনভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না।

ঝট করে দরজাটা ঠেলে দিলাম। একটু একটু করে দরজাটা খুলল। আলো এসে পড়ল। পড়ল আমার চোখে। সেই আলোতে দেখলাম মণিবৌদির দেহটা দুই হাতের বেষ্টনে আবদ্ধ। পুরুষের মাথাটি তার মাথার ওপর। মুখ দেখতে পাই নি।

চোখ ঝাঁঝিয়ে উঠল ঝাপসা হয়ে। কেমন টনটন করছে। মণিদা কি এমন হতে পারে! মুহূর্তের এই ঘটনা কেমন বিহ্বল করে দিল। হারিয়ে দিল।

কলকাতার আকাশটা ছুটছে। হু-হু করে। রং রং আস্তরণগুলো মিলে মিশে একাকার হতে হতে কালো কালো হয়ে যাচ্ছে যেন।

আমি একটু একটু করে হারিয়ে যেতে লাগলাম। পুরুষ মুখ তুলে চাইল। অচেনা অজানা ভয়-গম্ভীর প্রস্তর মূর্তির অব-য়বে রূপ নিল। মাথা নীচু করে ও-ঘরে চলে গেল। প্রকৃতির বহু রূপ। লজ্জানম্র চাহনি কেমন ফ্যাকাসে। মণিবৌদির এ-মুখ আমি কোন দিন দেখি নি। সুন্দর মুখশ্রীর অন্তরালে এ কিসের ছাপ! করুণ কাতর স্বরে বলল—অতনু তুই! আয়।

প্রাণহীন আহ্বান। আমার তাই মনে হয়েছে।

আমাকে বোধহয় মণিবৌদি ভাবতেই পারে নি এ সময়! কিন্তু আমি ভাবছি—যদি মণিদা হত, আমি না হয়ে! তাহলে—না, অতটা কি সে ভেবেছিল!

আমি পরিবেশটাকে এভাবে চাই নি। অথচ কি হয়ে গেল! যা আমার কোন হাত ছিল না। নিজেকে কেমন দোষী লাগল!

কিন্তু মণিবৌদি! সেই হাসিখুশী মেয়েটির অনন্তযৌবনা জোয়ার রঙে এ কি ঢেউ লাগল। নিত্য নতুন ঢেউয়ে যা তীর-ভূমিকে সোহাগ জানায়—তাই কিনা এক-দিকে ভেঙেচুরে চুরমার করে দিতে চাইছে!

আজ আর জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। মণিবৌদি কেমন আছেন। আমার সুদীর্ঘ ধ্যান-ধারণা কেমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে থাকল। বুঝলাম না মণিদা কি দোষ করেছে। বেচারা শান্ত সরল মানুষটি সব পেয়েও যেন সব হারাচ্ছে! কোথায় সে! কেন গেছে! এখনো ফেরেনি কেন! অনেক 'কেন' জট পাকিয়ে গেল ক্রমশ।

কোন কথাই আমি বলতে পারি নি এতক্ষণ। বসতেও পারিনি। এবার বললাম—আজ চলি। গলার স্বর আটকিয়ে যাচ্ছিল। মুখের দিকে চাইলাম মণিবৌদির। অস্বাভাবিক সে চাউনি। শুধু বলল—আর বুঝি কোন দিন আসবি না!

কোন উত্তর দিতে পারি নি সে কথার। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এলো, অন্ধকারের সঙ্গে। এ অন্ধকার হয়ত কেটে যাবে। কেটে যাবে যোগসূত্রগুলো। তবু তার অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে কি!

আমি অতনু সরখেল। আমার অভি-জ্ঞতার বয়স হল।

অমরাবতী। ঘটে পদ্মফুল কদমফুল ও আমপাতা, ঘটটি বেদীর ওপরে রাখা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের বিপক্ষে বুদ্ধদেব আত্ম-মত প্রচার করেছিলেন, সে ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ পূর্ণঘট প্রতীক ব্যবহার তৎকালে হয়েছিল কি না? পরবর্তীকালের মহাযানপন্থীদের ক্রিয়া-কলাপে ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে হিন্দুধর্মের বহু ভাবের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু বৌদ্ধ-যুগের প্রথম পর্বে হীনযানপন্থীদের মধ্যে ঘটের ব্যবহার ছিল কি?

এদেশে অতি পুরাতন শিল্পরাজির মধ্যে বৌদ্ধশিল্পের কেন্দ্ররূপে সাঁচী, ভারত ও অমরাবতীর নাম উল্লেখযোগ্য। ঐতি-হাসিকবৃন্দ এ বিষয়ে ঐকামত পোষণ করেন যে, এসব শিল্প খৃষ্টপূর্ব ২০০ বছর পূর্ব থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী করা হয়েছিল। প্রথম যুগের ভাস্কর্যে হীন-যানমতের ছাপ নানাভাবে দেখা যায়। বুদ্ধ-দেবের জীবনীর উপর যেসব কাজ রয়েছে তাতে কোথাও বুদ্ধদেবের আকৃতি গড়ার চেষ্টা করা হয় নি। এখানে কখনো পাদুকা কখনো বোধিবৃক্ষ আবার কোথাও সিংহা-সন প্রতীক বুদ্ধদেবের উপস্থিতি প্রকাশ করছে। এই শিল্পসম্ভারের মাঝে বহু জায়গায় পূর্ণঘটের অলংকরণ রয়েছে দেখা যায়। সাঁচীর বিখ্যাত তোরণের গায়ে, ভারতের বেদিকায় ও অমরাবতীতে পূর্ণ-ঘটের সুন্দর নকসা কাজ, ঘটের মধ্যে পদ্ম-পাতা ফুল ও কলি রয়েছে। আবার কোন ঘটে জীবনচক্রের প্রতীক পদ্ম বা ফুল ও কলি রয়েছে। আবার কলি, ফুটন্ত ফুল ও ঝরে পড়া ফুলের নকসা রয়েছে। অমরা-বতীর বিরাট ঘটে নানারকমের ফুল রয়েছে যেমন পদ্ম, কদম, শালুক ও ছোট ছোট

উমা বসু

নাম না জানা ফুল, ঘটটির আকৃতি পাথর বা ধাতুর তৈরী ঘটের মতো, একটি ছোট বেদীর ওপর রয়েছে। এইসব ঘটে বিজোড় সংখ্যার ফুল ও পাতার ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। বৌদ্ধযুগের প্রাচীন ভাস্কর্যে ঘটের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব দেখে মনে হয় ঐ যুগে ঘটের ব্যবহার ছিল। এইসব ভাস্কর্যে হিন্দু রীতি অনুসরণ করে পদ্মফুল বা লক্ষ্মীমূর্তির প্রতীক ব্যবহারও চোখে পড়ে। পদ্মফুল ভারতবর্ষের সব আব-হাওয়াতেই সব মাটিতেই জন্মায়, উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমের রাজস্থানে প্রস্ফু-টিত পদ্মের শোভা দেখা যায়—যেমন রূপে তেমনি গুণে তাই এর কদরও সর্বত্র। প্রাচীন-কাল থেকেই পদ্মফুলের সৌন্দর্য ও গুণের জন্য নানা ভাবের প্রতীকরূপে এর ব্যবহার দেখা যায়—শিল্পে, কাব্যে ও ধর্মে। ভারতের শিল্পী তার চারুকলায় যেভাবে পদ্মের সৌন্দর্য দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। পদ্ম লক্ষ্মী, ঐশ্বর্য, শক্তি, পবিত্রতা ও নারীর প্রতিকরূপে চিহ্নিত হয়। শ্বেতপদ্ম সত্ত্ব, রক্তপদ্ম রজঃ ও নীল পদ্ম তমঃ গুণের প্রতীক রূপেও ব্যবহার করা হয়। ভারতের শ্রীমা নামে পরিচিত ভাস্কর্যে যে মূর্তি দেখা যায় তার সঙ্গে গজলক্ষ্মী বা কমলে-কামিনী সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ মূর্তি কোথাও প্রকৃতি এবং কোথাও পৃথিবী রূপে বর্ণিত হয়েছে। অনেকে বুদ্ধদেবের জন্ম-বৃত্তান্ত জ্ঞাপক প্রতীক বলে এটিকে ভুল করেন। বুদ্ধদেবের জন্মসংক্রান্ত প্রতীকী কারুকার্যে সচরাচর মায়াদেবীকে শায়িত অবস্থায় দেখা যায়, কিন্তু ঊর্ধ্বে একটি মাত্র হাতীর মূর্তি থাকে এবং শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় দেবদেবীর মূর্তিও উপস্থিত করা হয়। উপরিউক্ত শ্রীমা মূর্তির সুন্দর

রাখা রয়েছে, সেটি হচ্ছে প্রকৃতিদেবীর উপর মেঘাধিপতি ইন্দ্রের ঐরাবত জলসিঞ্চন করছে, বারিধারা ঐরাবতের শুঁড়ের মতই পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, বারিসিঞ্চনে সজল প্রকৃতি ফুল ফল ও শস্যের বৈভবে ঐশ্বর্যময়ী হয়ে উঠবে তারই প্রতীক এই পূর্ণঘটে পদ্মের উপর বিরাজমান নারী-মূর্তি আর বারি সিঞ্চনরত হস্তীমূর্তি। এরূপ বহু ক্ষেত্রেই প্রাচীন বৌদ্ধ কারুকার্যে হিন্দু মতের দ্বারা পড়েছে দেখা যায়। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বুদ্ধদেব তৎকালীন বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বাহ্যাড়ম্বরের বিরোধিতা করে যাগযজ্ঞ, প্রাণীহত্যা বা মূর্তি পূজা নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সব কিছুই মন্দ ও পরিত্যাজ্য এমন মত প্রকাশ করেন নি। সেরূপ অভিমত প্রকাশ করলে হিন্দুধর্মের ওতপ্রোতভাবে জড়িত পূর্ণঘট বা পদ্মফুল প্রতীক ব্যবহার হীনযান-পন্থীদের শিল্পকলায় দেখা যেত না। এইসব ভাস্কর্যে ঘটের আকৃতি সম্পূর্ণ ভারতীয়, রোমান বা গ্রীক ভাসের অনুকরণ করা হয় নি। পদ্মফুল ও পাতার গঠনশৈলীতে বিদেশের কোন প্রভাব পড়েছে মনে হয় না—সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় ছাঁদে গড়া ঘট ও পদ্মফুল। তৎকালীন পদ্মফুল সমেত ঘটের অলংকরণ কটি দেখলে পূর্ণঘট থেকেই ইকেবানার যাত্রা শুরু হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। খৃষ্ট-পূর্ব শত বৎসর পূর্বেই ভারতের অজ্ঞাত শিল্পিবৃন্দ ইকেবানার ভবিষ্যৎ মূর্তিটি ধরে রেখেছেন পাথরের বুকে পদ্মফুলের বিচিত্র শোভায়।

পরবর্তীকালে মহাযানপন্থী বৌদ্ধমত ভারতবর্ষে ও বিদেশে প্রাধান্যলাভ করে। এঁদের আচার-বিচারে তান্ত্রিকমতের প্রভাব দেখা যায়, বুদ্ধমূর্তি পূজা শুরু হয়। এই যুগের বুদ্ধমূর্তির হাতে প্রায়শই পদ্মফুল অথবা পদ্মফুলসহ ঘট দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে অথবা বিদেশে এরূপ পদ্ম ও ঘট হাতে বুদ্ধমূর্তি বহু দেখা যায়। জাপানের কানসুজি মন্দিরে অথবা কামাকুরা মিউজিয়ামে রক্ষিত বুদ্ধমূর্তির হাতে এরূপ নিদর্শন দেখা যায়। শ্যামদেশে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর ফলকের উপর মূর্তির নিকটে সামান্য উঁচু বেদীতে পূর্ণঘট ও পদ্মফুলের ব্যবহার দেখা যায়। এস্থলে জাপানে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তির হাতে রাখা পুষ্পাধারটির সঙ্গে শ্যামদেশের ঘটটির আকৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। পূর্বের পাত্রটিতে চীন দেশের প্রভাব রয়েছে দেখা যায় কিন্তু শ্যামদেশের ঘট ভারতীয় ঘটের অনুরূপ। দক্ষিণে জলপথে সিংহল বা শ্যামদেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটায় সে দেশের ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় ছাপ যতটা সুস্পষ্ট রয়েছে উত্তরে স্থলপথ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার পরোক্ষভাবে হওয়ায় তার চেহারা দেশ ও কালের ব্যবধান অনুযায়ী অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে পড়েছে। ইকেবানার রীতিনীতির সঙ্গে ভারতীয়ভাবের এত মিল পাওয়ায় মনে হয় ও-দেশের পূর্ণঘটের সঙ্গে আমাদের দেশের পূর্ণঘটের তফাৎ তার চেহারায়, নয়। এ-দেশে এর প্রাচীন রূপটি বদলায় নি তার কারণ পূর্ণঘটের প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধে যেমন সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের আছে ও-দেশে ততটা প্রকাশ হয় নি। দ্বিতীয়তঃ মননপ্রিয় ভারতবাসী প্রতিমা ও পূর্ণঘটের মধ্যে আরেকটি সোপান তৈরী প্রয়োজন-বোধ করে নি আর প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের বাস্তবতার অধিকারী ভাব-রাজ্যের ঘটে তাই জড়প্রকৃতি আসন পেতেছে অজানাকে জানার জন্য। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জাপানবাসীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য,—প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালবাসা আর সৌষ্ঠবজ্ঞান। পূর্ণঘটের ফুলপাতার বিন্যাসে তাই জাপান তাঁদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার পথ খুঁজে পেলেন—ধীরে ধীরে মুকুলিত হল ইকেবানার শ্বেত শতদল। যুগ পরিবর্তনকে মানিয়ে নিয়ে বিকশিত হয়েছে পূর্ণ গৌরবে, রূপে গন্ধে আকৃষ্ট করেছে বিশ্বের রসিকজনকে। আধুনিক যুগে ধর্মের স্থান নেই বিজ্ঞান আর শিল্প তার স্থান দখল করেছে, ধর্মীয় অনুশাসনের জায়গায় মানতে হবে বিজ্ঞান ও শিল্পের দাবী—তাই দেখি আধুনিকতার জোয়ার এসে ইকেবানার বুকেও ঢেউ তুলেছে নিয়ম ভাঙার গান শুনিয়ে। ইকেবানা যথার্থই সার্থকনামা যুগের হাওয়ার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে দুলছে নানা ছন্দে—অতীতের অলসমন্থর ছন্দ ভুলে দুলেছে বর্তমানের ছন্দে, বর্তমানের গতির ছন্দে ভেঙে গেছে ভবিষ্যতের বীণানিক্কণে। এখন চলেছে নতুন ছন্দের প্রস্তুতি। জীবনচক্রের অবিচ্ছিন্ন ধারা বেয়ে ফুটে থাকবে ইকেবানার শতদল প্রাণময় পুষ্পসজ্জায় বিশ্ব-সত্তার পূর্ণ প্রতীকরূপে।

ভারুতবেদিকা। আম্রপাতার মালা ঘটের গলায়। প্রকৃতির আবহমানতা জ্ঞাপকপত্র, পুষ্প ও কলি ব্যবহার করা হচ্ছে।

---

* আলোকচিত্র দুটি কলিকাতা যাদুঘরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দুঃসময়ের বন্ধু

এখন সারা দেশেই পোলট্রি ফারমিং-এর কদর। দিনে দিনে এ ব্যাপারে সকলের আগ্রহ বাড়ছে। শুধু এরই মাধ্যমে সংসার-খাত্রা নির্বাহ করছেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। নয়াদিল্লির সেই ভদ্রমহিলার কথা তো আমাদের অনেকেরই জানা আছে। তিনি পোলট্রি থেকে মাসে যা রোজগার করেন তা বড়ো রোজগেরেকেও লজ্জা দেয়। অথচ নয়াদিল্লির পাশেই রাজস্থানের উদয়পুরে পোলট্রি ফারমিং-এর এখনো তেমন চল হয়নি। সেখানকার অধিবাসীরা এই ব্যবসাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত। প্রচলিত সংস্কারই এজন্য দায়ী বলে মনে হয়।

সংস্কার বড় বালাই। সেই কবে নাকি হিন্দুর বাড়ির চালে মুরগি বসলে সব অশুদ্ধ হয়ে যেতো। গোটা বাড়িতে গোবর জল ছড়া দিয়ে শুদ্ধ হতে হতো। সবচেয়ে বেশি নজর পড়তো রান্নাঘরের উপর। যেহেতু রান্না এবং রসনার সঙ্গেই এই প্রাণীটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বাসন-কোসন সব ধুয়ে ফেলেও রেহাই মিলতো না। সদ্য নিকানো রান্নাঘর আবার নিকোতে হতো। সারাদিনই বাড়িতে ধোয়ামোছা চলতো অবিরাম। খাওয়া-দাওয়ার পাট সেদিন মাথায় তোলা থাকত।

সেই সংস্কারের ঘোর এখন অনেকটা ফিকে হয়েছে। অন্যায়ের বোঝাও হালকা হয়েছে। এখন বাড়ির চাল তো কোন্ ছার, রান্নাঘরে মুরগির অবাধ প্রবেশাধিকার। অনেক বাড়িতেই এই ছাড়পত্র মিলেছে। অবশ্য সর্বত্র নয়। সেখানে কড়াকড়ি শিথিল হলেও বাড়াবাড়ি তেমনি বাতিল রয়ে গেছে। দিনকালের কথা বিবেচনা করে কেউ কেউ বাড়িতেই পোলট্রি খুলে বসেছেন। এতে যেমন বাড়তি দুটো পয়সা পাওয়া যায়, তেমনি লাভের উপর দিয়েই প্রোটিনের অভাবটা পুষিয়ে নেওয়া যায়। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য থেকেই পোলট্রির কদর ক্রমে বাড়ছে।

শহরের স্বল্প পরিসরে কেউ কেউ দশ পনেরোটা মুরগি নিয়ে ছোট্ট পোলট্রি চালিয়ে যান। ইচ্ছা থাকলেও এর বড় করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। সেদিক থেকে চাষীদের অবস্থা কিন্তু আলাদা। জায়গার সমস্যা তার নেই। তারা অনায়াসেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বড়গোছের পোলট্রি খুলতে পারে। পোলট্রি দেখাশোনার লোক তো ঘরেই আছে। আমি চাষা-বউয়ের কথা বলছি। গরু-বাছুর যেমন হাসিমুখে দেখাশোনা তারা করে, পোলট্রির দায়িত্বও তেমনি সানন্দে নিতে পারে। এতে বরং আরো সুবিধা হবে।

কারণ, সবদিন সমান যায় না। যে বছর সময়মতো বৃষ্টি হয়, সে বছর চাষআবাদে জমি উপচে পড়ে। চাষীর মনে আনন্দ আর ধরে না। ফসলভর্তি জমির দিকে তাকিয়ে সে খুশির হাসি হাসে। কিন্তু দুঃসময় ঘনিয়ে আসতেও দেরি হয় না। যে বছর বরুণ দেবতা অকৃপণ হয়, বৃষ্টি ধারায় জমি সরস হয় না, চাষীকে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। খেতের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ ফেটে জল আসে। তার সামনে জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। তার তখন ভাবনা, সম্বচ্ছর ছেলেপুলে নিয়ে খাব কি?

এমনি অবস্থা হয়েছিল কিছুদিন আগে উদয়পুরে। পরপর দু' সাল অজন্মা। চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এমন ফাঁপরে যে তাদের পড়তে হবে আগে জানা ছিল না। ধারদেনা করে, ঘটিবাটি বেচে কিছুদিন চললো। কিন্তু সকলেরই তো ভাঁড়মা-ভবানী অবস্থা। ধার দেবে

কে? ঘটিবাটি বেচেই বা চলে কদিন? পেটের জ্বালায় সবাই গাঁ ছাড়তে উদ্যত হলো। সেই পুরোনো কাহিনী।

চাষীদের এই দুরবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এলো উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব সংগঠক শ্রীবাবেল। তাঁরা দীর্ঘদিন থেকেই চাষীদের পোলট্রির উপযোগিতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে চেয়েছেন। কিন্তু চাষীরা এসব কলেজে পড়ুয়া বাবুদের কথায় কান দেয়নি। দেবার দরকারই হয়নি। কারণ, তখন ফসলে গোলা একেবারে টইটম্বুর। এরকম সুফলা জমি থাকতে কে আর মুরগি পুষতে যায়!

এবার কিন্তু ওরাই বিপদে মধুসূদন। ছাত্রবন্ধুরা আবার সেই পুরনো বক্তব্য নিয়ে এলেন। বোঝালেন, এভাবে গাঁ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে হাতের কাছে উপায় আছে। সে পথে চললে যেমন অজন্মায় কোনদিন ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না, তেমনি গাঁ ছেড়ে পালানোর কথাও মনে আসবে না।

আগে ওদের কথা শুনেছে। এবারও শুনলো। তবু খুঁতখুঁতুনি যায় না। মুরগি পোষার কথাটা ঠিক মনে ধরছে না। অথচ দুবেলা দুমুঠো পেটে দেবার জন্য কিছু করা দরকার। গাঁই গুঁই করতে করতেই শেষে এই কলেজে পড়ুয়া বাবুদের প্রস্তাবটাই মনে ধরলো। গাঁয়ে থাকা যাবে এবং আয়ের পথও খুলে যাবে এ প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

প্রথমেই এগিয়ে এলো কোঠারিয়া গ্রামের মেয়ে প্রতিভা। প্রতিভার দুই ভাই একটু দূরেই বসে ছিল। তারা তো বোনের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক। বোন তাকালো ভায়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দু' ভাইও রাজী। এরপর ওরা তিনজনে ট্রেণিং নিয়ে এলো পোলট্রি চালানোর।

ট্রেনিং নিয়ে এসে আর সময় নষ্ট করলো না ভাইবোনেরা। একশো মুরগির বাচ্চা নিয়ে শুরু করে দিলো পোলট্রি। দেখতে দেখতে ওদের ব্যবসা বেশ জমে উঠলো। এদিকে দুই ভাই খুব একটা সময় করে উঠতে পারে না। কারণ, দু' মাস অজন্মার পর আবার বরুণদেব মুখ তুলে চেয়েছেন। ক্ষেতে কাজ শুরু হয়েছে। তাই দুই ভাইয়ের আর ফুরসত নেই। এখন পোলট্রির সমস্ত দায়িত্ব প্রতিভার।

প্রতিভা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে পোলট্রি চালাচ্ছে। চাষী পরিবারের মেয়ে হলেও সে লেখাপড়া শিখেছে। পোলট্রি চালানোর সবকিছুই ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছে। উদয়পুর থেকে তার গ্রাম পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। এই দূরত্ব সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। নিজে গিয়ে মুরগির খাবার নিয়ে আসে উদয়পুর পোলট্রি ব্রিডার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে। খাবার ছাড়াও মুরগিগুলি সম্পর্কে সবই প্রতিভার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান।

প্রতিভার দেখাদেখি অনেকেই এগিয়ে এসেছে। এমনি একজন বয়স্কা মহিলার বাড়ি উদয়পুরের কাছাকাছি খেমপুর-মাদারি গ্রামে। পোলট্রি তার কাছে প্রায় অন্ধের যষ্টির মতন। স্বামী দুর্ঘটনায় পংগু। এদিকে বাড়িতে চারটি বাচ্চা। সংসার অচল। মহিলা পড়লেন মহা ভাবনায়।

এমন সময় প্রতিভার কাছ থেকে পোলট্রি ট্রেনিং সেন্টারের খবর পেয়ে ছুটে গেল উদয়পুর। সেখানে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এল গাঁয়ে। তিনশো মুরগির বাচ্চা দিয়ে শুরু হলো পোলট্রি। তারপর দিনে দিনে মুরগির বাচ্চা আরো বেড়েছে। এখন সেই পোলট্রি মুরগির সংখ্যা হলো পাঁচশো। তিন মাসের মধ্যেই এই অভাবনীয় উন্নতি। এই পাঁচশো মুরগির পোলট্রি ফারম থেকে প্রতি মাসে আয় হচ্ছে তিনশো টাকা। এতে শুধু সংসারই চলছে না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও হচ্ছে। স্বামীর আকস্মিক পংগুত্বের পর যে অন্ধকার তাকে হাঁ করে গিলতে এসেছিল পোলট্রির দৌলতে সে অন্ধকার কেটে গিয়ে সে এখন আলোর মুখোমুখি।

এমনিভাবে এগিয়ে এসেছে উদয়পুরের অনেক মেয়ে। পুরুষেরাও পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। পোলট্রির ব্যাপারে মেয়েরা এক-চেটিয়া বাহাদুরি লুটে সেটা তাদের পৌরুষে আটকায়। তাই উদ্যোগী মহিলাদের পাশে তারাও দাঁড়াচ্ছে। নানাভাবে সাহায্য করছে।

রাজস্থানের চাষের ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের দেশে সাধারণত জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বোনা এবং জলসেচ এ ধরনের খাটুনীর কাজগুলো পুরুষরাই করে থাকে। মেয়েরা এসব কাজে পুরুষের সহযোগী হিসাবেই থাকে। কিন্তু

কোকিল

ইন্দ্রাণী দাস

কোকিল কুহু কুহু রবে ডাক দিয়ে যায়,
আর মানুষের মনকে ভীষণ মাতায়—
এই মন মাতানো ডাকে কে শেখায়
আনন্দে সে শুধু ঘুরে বেড়ায়,
—বলে আয় বন্ধুরা পিছু পিছু আয়।
হোলির দিনে সে খেলে হোলি,
আর লাল করে দেয় নূতন আমের কলি।
যখন বসন্ত চলে যায়
তার সুখও হারায়।
সবাই কাছে চায়, তাকে
সে তো ধরা দেয় না কাকেও,
দূরে দূরে থাকে।

রাজস্থানে ঠিক তার উল্টো। মেয়েরা চাষের কাজে সক্রিয় অংশ নেয়। পুরুষদের ওপর তারা হয়তো খুব একটা নির্ভর করতে চায় না। সেজন্যেই পোলট্রির দায়িত্বও একক্ভাবে পুরুষদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। শুরুর সময় পুরুষরা সঙ্গে থাকলেও আস্তে আস্তে দায়িত্ব সম্পূর্ণ গিয়ে পড়ে মেয়েদের কাঁধে। আর মেয়েরা তো তাই চায়। এমন একটা সুখের ঘরের চাবি তারা নিজেদের হাতেই রাখতে চায়। এই গৌরবে যেন আর কেউ ভাগ না বসাতে পারে।

দিনে দিনে উদয়পুরে পোলট্রি সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়ছে। সব ধরনের মেয়েরাই ক্রমে অধিক সংখ্যায় এগিয়ে আসছে। কারণ, একটা জিনিস তারা বুঝতে পেরেছে যে, পোলট্রি ফার্মিং যেমন দুঃসময়ে বাঁচায়, তেমনি সুদিনেও পরম বন্ধুর হাত বাড়িয়ে সাহায্য করে।

—প্রমীলা

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে প্রকাশিত সতীকান্ত গুহের 'রাধা' গল্পের

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯০৮	১	১ ও ২	বসে বসে পড়লেন	বসে পড়লেন
৯০৮	১	৭	দমকপ্রদ	চমকপ্রদ
৯০৮	১	১৪	প্রেমবিকাশের	প্রেমবিকারের
৯১০	১	২৫	অভিযানের	অভিধানের
৯১০	৩	৯	। ('করবের' পর)	,
৯১০	৩	১০	। ('দেখব'র পর)	,
৯১০	৩	১১	অভিজ্ঞতার	অভিজ্ঞতায়
৯১০	৩	১৮	। ('পারে না'র পর)	
৯১০	৩	৩২	বিরস	বিরস কণ্ঠে
৯১১	১	১	হোয়াই	হোয়াট
৯১২	১	১৮	রাধা বলল	ইন্দ্রজিত বললেন
৯১২	২	৩২	ধর	ধার
৯১২	২	৫১	[illegible] পান [illegible]	আমিল পান করে
৯১৪	১	৭	[illegible]	পাশপুণ্যের
৯১৪	১	৪০	[illegible]	[illegible] জোরে
৯১৪	[illegible]	১১	[illegible]	[illegible] কী
৯১৪	৩	৫০	[illegible]	[illegible]লেন,

জলসা

সাংবাদিক সম্মেলনে শিশিরকণা ধরচৌধুরী : উত্তর-ভারতের শীর্ষস্থানীয়া বেহালাবাদিকা শ্রীমতী শিশিরকণা ধর-চৌধুরী গত মঙ্গলবার (২০শে এপ্রিল) সাংবাদিক ও সঙ্গীতরসিক মহলের সঙ্গে একটি ঘরোয়া সম্মেলনে মিলিত হন।

প্রকাশকুণ্ঠ, লাজুক শিল্পী উপস্থিত সাংবাদিকদের লাজনম্র অভিবাদন জানিয়ে দ্বিধাসংকোচজড়িত কণ্ঠে বললেন : 'প্রেস কনফারেন্সে কিছু করার চেয়ে আমার হাতে একটা বেহালা দিলেই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হোত—বেহালাই আমার হয়ে কথা বলত!

কিন্তু প্রশ্নবাণ ঠিক যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হলে বাজনার তারের মত হৃদয়ের তারেও কাঁপন জাগাতে দেরী হয় না। বাকভীরু শিল্পীও বাচনকুশলী হয়ে উঠতে পারেন, তারই পরিচয় পাওয়া গেল সাংবাদিক ছাড়াও উপস্থিত সুধীবৃন্দের প্রশ্নের উত্তরে শিশিরকণার সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল বক্তব্যে।

পণ্ডিত ভি জি যোগ, ওস্তাদ আলি আকবর, গুরু আলাউদ্দিন এবং আরও নানান ওস্তাদের শিক্ষার পটভূমিকায় গড়ে ওঠা আপনার সঙ্গীত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং সুখ্যাত শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত সম্বন্ধে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটি কি? এ ছিল সাংবাদিকদের প্রথম প্রশ্ন।

প্রত্যুত্তরে নম্র নেত্রে এবং কুণ্ঠিত স্বরে শিল্পী বললেন : আমি নিজেকে শিল্পী বলে মনেই করি না। শিক্ষার শুরুতে যেমন আজও তেমনি আমি শিক্ষার্থী। এখন তার চেয়ে বেশী কিছু এগিয়েছি বলে ত মনে হয় না। শিক্ষার কোনো শেষ নেই এই কথাটাই নতুন করে অনুভব করে আরো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছি, সঙ্গীত-সমুদ্রে অবগাহন করছি বটে কিন্তু কোনদিন কি পারাপার হতে পারব?

প্রথম যখন বাজাতে শুরু করি সবই খুব সহজ, আনন্দের জিনিস বলে মনে হোতো। কিন্তু যত বাজাচ্ছি, রেওয়াজ করছি, চিন্তা করছি, যতই ভেতরে প্রবেশ করছি ততই এই উপলব্ধিই হচ্ছে যে আমার জানাটা সীমাবদ্ধ, বোঝাটা অসম্পূর্ণ কারণ সঙ্গীতের পথ বড় কঠিন আর সাধনাসাপেক্ষ। এই উপলব্ধি থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগ্রহটা আরো দুর্বার হয়ে উঠছে। অনেকটা অজানা অনুভবের রহস্যের ঘোমটা খুলে তাকে দেখবার কৌতূহলের মত।

মেয়েরা বড় একটা এ যন্ত্রে হাত রাখেন না তবু এ যন্ত্রকেই কেন আপনি বেছে নিলেন?

পণ্ডিত ভি জি যোগই এর কারণ। আগে বেহালা বাজাতাম এই পর্যন্ত। কিন্তু বেহালাকে আশ্রয় করে সঙ্গীতের বিচিত্র বিভিন্ন ধারায় পরিক্রমণ করা যায় অনায়াসে—এই সত্যে পৌঁছলাম যোগ-সাহেবের বাজনা শুনে। তখনই বেহালাকে আমার 'নিজেরই যন্ত্র' বলে মনে হল। অনেক পরে এলাম আলি আকবরজীর সংস্পর্শে। বিস্ময়-বিহ্বলতা যেন আরো বাড়ল : বাজনায় এত রঙ, এত রস, এত আবেগের উদ্দীপনা অথচ ধ্যানের প্রশান্তি আনা অসম্ভব। বিরাট সমুদ্রের অশ্রান্ত ঢেউ ও অতল গভীরতা, গতির অভিসার দেখে আমি যেন সম্মোহিত হয়ে পড়লাম। তখনই এই সংকল্পে দৃঢ় হলাম যেমন করে হোক এ বস্তু আয়ত্ত করতেই হবে। আবেগের বেগে নিজের অযোগ্যতার বাধাটা যেন ভুলেই গেলাম।

বেহালা মূলত ভিনদেশী যন্ত্র। ওদেশের শিল্পীদের শক্তিশালী সুরমূর্ছনা শুনে মনেই হয় না এর ওপর ভারতীয় শিল্পসুষমা ফোটান সম্ভব—বাধা আছে বিস্তর। আপনি কি বলেন?

—এ কথা মানি না। বাজাতে বসলে ভুলেই যাই আমার হাতে ধরা যন্ত্রটি ভিনদেশী—এদেশের যন্ত্র না ওদেশের। ওদেশের বোয়িং খুব পাওয়ারফুল। আশ্চর্য হবার মত আরো অনেক আঙ্গিক ও'দের ভাঁড়ারে নিশ্চয় আছে। ও'দের নিজস্ব পদ্ধতিতে ও'দের বাজনাই শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু ভারতীয় রাগ-ভাব বিস্তারের ঐ পদ্ধতি অনুকূল নয়। কারণ উভয় দেশের জীবনদর্শনের মতো সঙ্গীতের স্বধর্মও ভিন্ন, আবেদনও ভিন্নতর। কাজেই ভিনদেশী বেহালাকে এদেশে যাঁরা বাজাবেন—এ দেশের সঙ্গীত-ঐতিহ্যের অনুসারী বাদনশৈলী তাঁদেরই রচনা করে নিতে হবে।

—আপনার বাদনশৈলীর বক্তব্য কি?

নিজস্ব বক্তব্য পেশ করবার মত কোনো সঙ্গীত-ব্যক্তিত্ব আমার এখনও গড়ে ওঠেনি। তবে চেষ্টা করেছি গায়কী অঙ্গের সঙ্গে তন্ত্রসার অঙ্গের মেলবন্ধন ঘটাতে—পেরেছি কিনা জানি না।

চমৎকারভাবে পেরেছেন। আর এই জন্যই আপনার বাজনায় বৈচিত্র্যের যেন অন্ত নেই। এই সংযুক্তিকরণের প্রেরণা কোথা থেকে এল?

প্রথম স্বর্গত পান্নালাল ঘোষের বাঁশী শুনে গায়কী অঙ্গের মনোহর লালিত্যে আকৃষ্ট হয়েছি। পরে আলি আকবর খাঁর গৎকিরী, লয়ফেরতার কত কঠিন ও উপভোগ্য আনাগোনা, তানের জৌলুষ, রঙের বাহার—যেন এক আশ্চর্য ঐশ্বর্য-লোকের আভাস দিল। তখন থেকেই আমার ব্রত হোলো গায়কী ও গৎকিরী অঙ্গকে মিলিয়ে বেহালায় ভারতীয় পদ্ধতিতে এক বাদনশৈলী রচনা করবার।

—আর একটি প্রশ্ন। আগে প্রতিটি সঙ্গীত সম্মেলনেই আপনি ছিলেন অপরিহার্য শিল্পী। কিন্তু কেমন যেন ব্যতিক্রম ঘটছে, ইদানিং কোনো সম্মেলনেই আপনি বাজাচ্ছেন না। এর আড়ালে কোনো সাঙ্গীতিক রাজনীতি নেই ত?

—না। সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রণ না আসার জন্যে আমার কোনো অভিযোগ বা অভিমান নেই। আমার বাজনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অপূর্ণতা আছে যার জন্য সঙ্গীত সম্মেলনের কর্ম-কর্তাদের খুশী করতে পারছি না। যেদিন সম্পূর্ণতার সেই বিশেষ স্তরে পৌঁছাব তখন আমন্ত্রণ আপনা থেকেই আসবে। শিল্পীর পরিশীলিত অন্তরের দৃঢ় অথচ বিনয়কোমল উক্তির সত্যতায় সকলের মনে মুগ্ধতার ছাপ রাখে।

সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে আহ্বায়ক প্রমথেশ সেন ঘোষণা করলেন যে, শিশির-কণার অজস্র অনুরাগীদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আগামী ২রা মে সকালে সবরং সঙ্গীত সম্মেলনের পক্ষ হতে শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রসদনে শিশিরকণার একক আসরের আয়োজন করেছেন।

আজন্ম উৎসব : আগামী ২রা মে সন্ধ্যা ৬টায় সি এল টির কার্মবৃন্দ অবন মহলে প্রযোজিত 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ' পুতুল নাচ মঞ্চস্থ করবেন। ৭ই, ৮ই এবং ৯ই মে প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হবে। ১৫ই এবং ১৬ই মে অবনমহলে শিশুনাট্য সম্বন্ধে আলোচনাচক্র বসবে।

'নটরাজ' প্রযোজিত 'ফাল্গুনী' : 'ফাল্গুনী' গীতনাট্য কবিগুরুর মানস-লালিত সেই অতি-প্রিয় এবং রবীন্দ্র-কাব্য ও সাহিত্যের অন্তর্বার্তাবহ এক কাব্যময় প্রকাশ। চিরসবুজ বসন্তের যৌবনহিল্লোল সকল জীর্ণতাকে উড়িয়ে দিয়ে নবীন প্রাণের স্পন্দনে সঞ্জীবিত করে তাকে লাবণ্যশ্রীতে পরিপূর্ণ করে তোলে। বার্ধক্য ও যৌবন একই প্রাণপ্রবাহের দুটি দিক।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবদর্শনকে সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক ঢঙে পরিবেশন করে তার মূলে রসকে অবিকৃত রাখার জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ প্রাপ্য বিশ্বজিৎ রায় পরিচালিত 'নটরাজ' সংস্থার সভ্যবৃন্দের। গত সপ্তাহে রবীন্দ্র-সদনে মঞ্চস্থ 'ফাল্গুনী' পরিহাসে, রঙে, ছন্দে ও সঙ্গীতে দুটি ঘণ্টা যেন সরস করে রেখেছিল। শান্তিনিকেতনের সান্নিধ্য-জাত বিশ্বজিৎ রায়ের শিল্পবোধ ও রবীন্দ্র-ঐতিহ্যবোধ উৎসব সাফল্যের অন্যতম কারণ। প্রসঙ্গত মঞ্চসজ্জায় কৃষ্ণচূড়া ও নানারঙা পুষ্পসমৃদ্ধা প্রকৃতির আভাস এবং এই পটভূমিকায় রঙিন পোশাক ও উত্তরীয় শোভিত নবীন দলের বাঁধভাঙা প্রাণোল্লাসই ফাল্গুনীর মর্মবাণী দর্শক-চিত্তে পৌঁছে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

সর্দাররূপী প্রসূন চৌধুরী নবীনের আনন্দ ও প্রবীণের অভিজ্ঞতার গভীরতাকে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যক্ত করেছেন। চন্দ্রোদয় ঘোষ, দীপ সেন, অশোক দত্ত, আভাস সেন, অমিত বসু, রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে মানব প্রকৃতির অন্যান্য চরিত্র যথাযোগ্যরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'শঙ্করম' তাঁর নৃত্যকুশলতা ও অভিব্যক্তি ও সজ্জায় মানবপ্রকৃতির ছবি হয়ে উঠেছেন। বেণুবন, পাখী এবং চাঁপাকে অনুভবগোচর করেন জনজিৎ রায়, মঞ্জুশ্রী মিত্র, সেবন্তী মজুমদার, কৃত্তিকা মিত্র, মধুক্ষরা রায়চৌধুরী, মৌসুমী গুহ, নার্গিস রহিম এবং কৃষ্ণা সেন।

একক সঙ্গীত এবং সমবেত সঙ্গীতের প্রত্যেকটিই সুগীত এবং নাট্যরস সংবেদনশীলতায় সমর্থ। বিশ্বজিৎ রায় নৃত্য-সঙ্গীত ও নাট্যপরিচালকের ত্রিবিধ দায়িত্ব পরিচালনায় যোগ্যতার স্বাক্ষর ত রেখেইছেন এ ছাড়াও বাউলের ছোট্ট ভূমিকাতেও ইনি মুক্তপ্রাণের বাউলকে মূর্ত করে তোলেন। সব দিক দিয়ে 'ফাল্গুনী' গীতিনাট্য সার্থক হয়ে উঠেছিল।

বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মাহালিয়া জ্যাকসন

২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় কলকাতার সেন্টপল ক্যাথিড্রেলে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী মাহালিয়া জ্যাকসন সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। ভগবৎ সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্যা তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। ইউরোপের বহুদেশে ও আমেরিকার প্রশংসার বহু পুষ্পমালাই তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে। কলকাতায় এই তাঁর প্রথম আগমন। ইন্ডো আমেরিকান সোসাইটির উদ্যোগে তাঁর এই সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা। জনৈক নিগ্রো ক্রীতদাসের পৌত্রী শিল্পী মাহালিয়া জীবনে বহু অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছেন। কোন সময়ে রাঁধুনী কোন সময়ে রজকিনী, কোন সময়ে শিশু পালয়িত্রী আর কোন সময়ে বা কারখানার শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছেন। নিয়মিত-ভাবে সঙ্গীত অনুশীলনের সুযোগ তিনি তাঁর জীবনে পান নি। কিন্তু তিনি যেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন সেখানেই শ্রোতৃবর্গ তাঁর অপূর্ব ভাবগম্ভীর সুমধুর সঙ্গীতে বিমোহিত হয়েছেন। ইনি আমেরিকার কলাম্বিয়া কোম্পানীর একজন বিশেষ শিল্পী এবং তাঁর গানের বহু রেকর্ড ঐ কোম্পানী করেছে।

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য লুইজিয়ানার নিউ অরলিয়নসে মাহালিয়া জ্যাকসনের জন্ম। তাঁর বাপ মায়ের ছটি সন্তানের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তাঁর বাবা ষ্টিভেডোর বা জাহাজের মাল খালাশ ও বোঝাই করার কাজ করতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন ব্যাপটিস্ট চার্চের মিনিস্টার। মাহালিয়া, পাঁচ বছর বয়সে তাঁর বাবার ঐ গির্জায় সমবেত ভগবৎ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতো।

ন বছর বয়সে স্কুল ছুটি হবার পর তাঁকে একটি লণ্ড্রিতে কাপড় কাচার কাজ করতে হতো। তার পরে আর তাঁর খুব বেশী পড়াশুনা হয়নি। মাত্র অষ্টম মান পর্যন্ত মাহালিয়া পড়েছিলেন। তারপর সংসার প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে তাঁকে পুরো সময়ের জন্যই কাজে যোগ দিতে হলো প্রথমে লুইজিয়ানার তুলার খেতে। তারপর চলে এলেন শিকাগোতে সেখানে কারখানায় কাজ নিলেন মাহালিয়া। তখন তাঁর বয়স ষোল।

ঐ সময়েই কোন মহড়ায় মাহালিয়ার সতেজ ও বলিষ্ঠ কণ্ঠ সালেমের ব্যাপটিস্ট চার্চের সঙ্গীত পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মাহালিয়াকে কেন্দ্র করে পাঁচজন শিল্পীকে নিয়ে একটি সঙ্গীতগোষ্ঠী তৈরী করেন। ঐ দলটি নানাস্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে এবং এর ফলে শিল্পী হিসাবে মাহালিয়ার খ্যাতি নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

কালীজলা স্মৃতি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে সভাপতি শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ভাষণ দিচ্ছেন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মাহালিয়া জ্যাকসন

তখনও মাহালিয়া কারখানার কাজ করতেন এবং অবসর সময়ে গির্জায় গির্জায় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। সঙ্গীত ব্যতীত, কেশবিন্যাস, প্রসাধন এবং ফুল বিক্রীর ক্ষেত্রেও তিনি একজন দক্ষ শিল্পী। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এসব কাজও তিনি করেছেন এবং বেশ দু পয়সা উপার্জনও করেছেন।

আমেরিকার প্রখ্যাত কার্নেগী হলে ১৯৫০ খৃঃ তিনি প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তারপর অসংখ্যবার সেই হলে তাঁর অপূর্ব উদাত্ত কণ্ঠ শোনা গিয়েছে। শ্রোতৃবর্গকে প্রতিবারই তাঁর অপূর্ব সুর-লহরী বিমোহিত করেছে।

এই বিশিষ্ট শিল্পী ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, জার্মেনী, সুইডেন প্রভৃতি ইয়োরোপের নানা দেশে সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

কেবলমাত্র ভগবৎ সঙ্গীত বা গসপেল সিংগিং, ব্লুজ বা নিগ্রো করুণ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই নয় জাজ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তিনি একজন বিশিষ্ট শিল্পী। ডিউক এলিংটনের অর্কেস্ট্রা দলের শিল্পীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতমা। এই তিন প্রকার সঙ্গীত সম্পর্কে মাহালিয়া একবার বলেছিলেন যে, ব্লুজ, জাজ ও গসপেলের উৎস একই হতে পারে, একধরনের সঙ্গীত নয়, প্রত্যেকটিরই তাল লয় মনের দিক থেকে ভিন্ন রূপ, ভিন্ন আবেদন।

—চিত্রাঙ্গদা

ছদ্মবেশী/মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং উত্তমকুমার। পরিচালনাঃ অগ্রদূত।ফটোঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

বাঙলায় যাকে আমরা বলি 'কোটিতে গোটিক', হিন্দীতে তাকেই বলা হয় 'লাখোঁ মে এক'। সত্যিই, **মাদ্রাজের জেমিনী পিকচার্স-এর আধুনিকতম ছবি 'লাখোঁ মে এক'**-এর নায়ক ভোলার মতো চরিত্র বাস্তব জগতে কোটীতেও একটি হয় কিনা সন্দেহ। বোম্বাই শহরের একটি ব্যারাক-বাড়ীর এক-তলায় সিঁড়ির নীচে সে মাথা গোঁজার স্থান পেয়েছে। বাড়ীতে বসবাসকারী প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারেরই সে হচ্ছে বিনা মাইনের চাকর। বাজার করে দেওয়া, দুধ আনা, ওষুধ খাওয়ানো, খবরের কাগজ কিনে আনা —হরেক রকম কাজের জন্যে সকলেই তার ওপর নির্ভর করে। নির্বিচারে, হাসিমুখে এই সব কাজ করার পরিবর্তে সে থালা হাতে ওদের দ্বারস্থ হয় কিছু আহারের জন্যে। গৃহস্থের দরজা গোড়ায় গিয়ে ও বলে : ভোলা এসেছে; আমি ভোলা। তখন *দয়া ক'রে কেউ কিছু দেয়, কেউ আবার* নানারকম মিথ্যে অজুহাতে ফিরিয়েও দেয়। এই অবস্থার মধ্যে থেকেও ভোলা কিন্তু তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে এবং বেশ ভালোভাবেই। দেখা যায়, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছে তিনজন লোক। এক তার কলেজের এক প্রফেসার, যিনি তাকে বই দিয়ে সাহায্য করেন; দুই, লরী ড্রাইভার শের সিং, যে তার সুখদুঃখ বোঝে, তাকে নানা রকমে সাহায্য করে এবং নিজের শক্তি দিয়ে তাকে রক্ষা করে; তিন, প্রৌঢ় দীনদয়াল, যিনি তার আন্তরিকতা ও সততায় মুগ্ধ। এরই মধ্যে আর একজন এল, যার মনকে সে ছুঁতে পেরেছিল। সে হচ্ছে মনোহরলালের কন্যা গৌরী। মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যে বেশ কিছুদিন উন্মাদাশ্রমে চিকিৎসিত হয়ে সুস্থ হবার পরে সে মা-বাপের কাছে ফিরে এসেছে এবং খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে-থাকা মাখনলালের রোজগারী ছেলে জীবনের সঙ্গে বিবাহিত হ'তে গিয়েও হ'তে পারেনি, বিবাহমণ্ডপে তার বিকৃত মস্তিষ্কের কথা প্রকাশিত হওয়ায়। গৌরীর পরিচয় হ'ল সে পাগলী; আর ভোলার পরিচয়, সে দীনদুঃখী। দুজনকেই ঐ ব্যারাক-বাড়ীর অধিকাংশের কাছ থেকে হেনস্তা সইতে হয় এবং এই সমান অবস্থাই উভয়কে পরস্পরের নিকটস্থ করে। শের সিংয়ের পরামর্শ-চালিত হয়ে ভোলা এবং গৌরী ক্রমে পরস্পরের প্রতি প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু ওদের মিলনের পথে আসে নানা রকম বাধা। হরেক রকম বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চিত্র-কাহিনীটি অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত ভোলা ও গৌরীকে কেমন করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, তাই নিয়েই ছবির শেষ পর্বটি গঠিত।

বলা যেতে পারে, লাখোঁ মে এক' ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, দর্শকদের আনন্দবিধান করা এবং তারই ফাঁকে তাদের সামনে কিছু জীবনাদর্শ তুলে ধরা। কিন্তু এ-ব্যাপারে বিভিন্ন পরিস্থিতি রচনার মাধ্যমে কাহিনী বিস্তারের ক্ষেত্রে বাস্তবানুগ হবার কিংবা সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি দেবার কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না।

মেহমুদের অভিনয়শক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেই যে কাহিনীটি রচিত হয়েছে, এ-কথা 'লাখোঁ মে এক' ছবির দর্শকমাত্রই স্বীকার করবেন। কিন্তু মেহমুদ যেখানে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কারুণ্যরসের অবতারণা করবার চেষ্টায় সিরিয়াস অভিনয় করেন, সেখানে তাঁকে মেনে নেওয়া কঠিন। মেহমুদ যে কৌতুকাভিনয়ের জন্যে জনপ্রিয়, সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রের বাইরে যাওয়া তাঁর উচিত নয়। বরং বলব, প্রাণ ভীলেনরূপে পরিচিত হ'লেও তিনি যে মহৎ চরিত্রও চিত্রিত করতে সমানভাবে সক্ষম, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখেছিলেন 'শহীদ'-চিত্রে। বর্তমান ছবিতে লরী ড্রাইভার শের সিংয়ের দিলখোলা চরিত্রটিকে উপভোগ্য-ভাবে সার্থক ক'রে তুলেছেন তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রাণবন্ত অভিনয়ের দ্বারা। শের সিংয়ের কৌশলপ্রসূত ভোলার কোটী-পতি সিঙ্গাপুরী বাপ আমদানী হবার পরে শের সিং-বেশী প্রাণের এক মজেকো বাত শুনো, এক রতমিসা লড়কা' গানের সঙ্গে ভাগরো নৃত্য দৃশ্যটি ভোলবার নয়। এই ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হচ্ছেন প্রাণ। নবাগতা রাধা নায়িকা গৌরীর চরিত্রটিকে দরদের সঙ্গে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বিশেষ করে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় অপ্র-

কৃতিত্বের অভিনয়ে তাঁর পারদর্শিতা লক্ষ্যণীয়। এছাড়া নাজির হোসেন (দীন দয়াল), কানহাইয়ালাল (মনোহরলাল), রমেশ দেও (জীবন), মুকরী (মাখনলাল), ডেভিড (প্রোফেসার), মদন পুরী (ভোলার সাজানো-বাপ), ললিতা পাওয়ার (মনোহরের স্ত্রী), অরুণা ইরাণী (জীবনের ভগ্নী), শুভা খোটে, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, পারভীন পাল প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। ভোলার পিছনে-লাগা অশিষ্ট যুবকদল সমগ্রভাবে অতি-অভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে আশানুরূপ দক্ষতার নিদর্শন দেখা যায়। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, এইচ, শান্তারামের শিল্প নির্দেশনার, কে. এইচ, কাপাডিয়ার চিত্রগ্রহণের এবং এম, উমানাথের সম্পাদনার। ষোল রীলের সুদীর্ঘ ছবিকে যে আদৌ ক্লান্তিকর মনে হয়নি, তা' এই শেষোক্তের কাঁচির গুণে। হেলেনের নৃত্য-গীত সংবলিত ক্যাবারে দৃশ্যটি আলোছায়ার সমন্বয়ে, দৃশ্যসজ্জাগুণে ও সম্পাদনার চাতুর্যে রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ছবির ছ'খানি গানের মধ্যে 'এক মজে কো বাত শুনো' পাঞ্জাবী গীত ও ধুনের অনুসারী হওয়ার ফলে যে আশ্চর্যভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, এ-কথা আগেই বলেছি। এ-ছাড়া বিভিন্ন জনপ্রিয় গানের কৌতুককর অনুকৃতি (প্যারডি) হিসেবে পঞ্চম গানটি প্রেক্ষাগৃহে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে। 'চন্দা ও চন্দা' গানটি নিশ্চয়ই রোমান্টিক। আনন্দ বকসী রচিত গানে উপযোগী সুরসৃষ্টি করেছেন রাহুল দেববর্মণ। পণ্ডিত মুখরাম শর্মা রচিত সংলাপ স্থানে স্থানে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী।

এস্. এস্. বালম পরিচালিত ইস্টম্যান কলারে তোলা সুদীর্ঘ জোমিনীচিত্র "লাখোঁ মে এক" অভিনয় ও সুরসমৃদ্ধ হওয়ার ফলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।
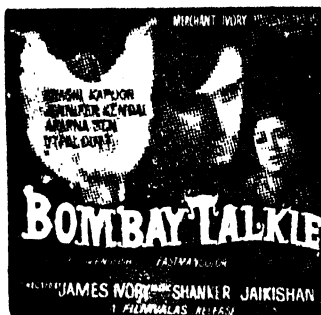
লাখো মে এক / প্রাণ

স্টুডিও থেকে

'স্বীকৃতি'র চিত্রগ্রহণ শেষ পর্যায়ে : গেল সপ্তাহে একটানা সাত দিনের শুটিং-এর পরে আশীষ রায় প্রযোজিত এলিট মুভীজ-এর দুঃসাহসিক ছবি 'স্বীকৃতি'র অন্তর্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। কনক মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত এই নতুন আঙ্গিকের ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন—অমল মুখোপাধ্যায়। চরিত্র চিত্রণে আছেন শমিত ভঞ্জ, অপর্ণা সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কল্যাণী মণ্ডল, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও নৃত্যে মধুমতী (বোম্বে)।

ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে বিদেশে তোলা বহির্দৃশ্যাবলী। প্রযোজক আশীষ রায়, পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়, জনসংযোগসচিব শ্রীপঞ্চানন ও মুখ্য চরিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আসছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে হংকং ও ব্যাঙ্কক যাত্রা করবেন। বাংলা ছায়াছবিতে হংকং ও ব্যাঙ্ককে এর আগে আর কোন ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয় নি।

পিকক্ ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

মুক্তি প্রতীক্ষায় 'শচীমার সংসার' : ভূপেন রায় পরিচালিত মালবিকা চিত্রমের 'শচীমার সংসার' ছবিটি সেন্সারের ছাড়পত্র পেয়ে মুক্তির দিন গুনছে। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা করেছেন অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। সংগীতাংশ ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সংগীত পরিচালক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, শুক্লা পলিত ও রত্না রায়। চরিত্রচিত্রণে আছেন —অসীমকুমার, সন্ধ্যারাণী, দিলীপ রায়, মিহির ভট্টাচার্য শঙ্করনারায়ণ, শমিতা বিশ্বাস তরুণকুমার, জহর রায়, যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগতা সংহিতা রায়, অসিতবরণ, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অরবিন্দ, অমরেশ দাস, মিতা কর জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা চক্রবর্তী, রুণা চৌধুরী প্রমুখ শতাধিক শিল্পী। এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'এখনই'-র মুক্তি সমাগত : আজ শুক্রবার, ৩০ এপ্রিল রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে **তপন সিংহ পরিচালিত সমকালীন চিত্র 'এখনই'**। রমাপদ চৌধুরী লিখিত জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে শ্রীসিংহ নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুরসৃষ্টি দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন শ্রীসিংহ নিজেই। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অপর্ণা সেন, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর চৌধুরী এবং তিনজন নবাগত—দিলীপ বসু, শম্ভু ভট্টাচার্য ও রুণু মিত্র।

কে এল কাপুর প্রযোজিত ছবিটি ভারত সরকার কর্তৃক আসছে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগী চিত্ররূপে প্রেরিত হচ্ছে।

আসছে সপ্তাহে 'পরশ' : 'এ কৌন থী?' ও 'গুমনাম'-এর স্রষ্টা এন এন সিপ্পির আর একটি স্মরণীয় সৃষ্টি 'পরশ' আসছে শুক্রবার ৭ মে মুক্তি লাভ করছে কলকাতার জনতা, কৃষ্ণা, প্রিয়া, জেম মিত্রা, নবীনা ও শহরতলীর আরো ২৪টি চিত্রগৃহে মিউজিক্যাল ফিল্মসের পরিবেশনায়। সি পি দীক্ষিত পরিচালিত 'পরশ'-এর মুখ্য ভূমিকালিপিতে আছেন সঞ্জীবকুমার, রাখী, ফরিদা জালাল, শত্রুঘ্ন সিংহ ও মেহমুদ। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন আজকের অন্যতম সুরকার জুটি কল্যাণজী-আনন্দজী।

মঞ্চাভিনয়

রবিরশ্মির 'বিশ্বজন মোহিছে' : রবীন্দ্রনাথের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবিরশ্মির প্রথম অনুষ্ঠান 'বিশ্বজন মোহিছে' আসছে ৩রা মে সন্ধ্যা ৭টায় রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় আছেন সাগর সেন। নৃত্যে পরিকল্পনা ও গ্রন্থনায় আছেন যথাক্রমে মঞ্জুলিকা দাস ও রামগোপাল এবং অধ্যাপক ভাস্কর বসু। রবিরশ্মির নবীন শিল্পীরা এতে অংশ নেবেন। শোনা যাচ্ছে, 'বিশ্বজন মোহিছে' রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির বহুমুখিতা সম্পর্কে একটি অনন্যসাধারণ প্রযোজনা রূপে পরিগণিত হবে।

নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালা'র শততম অভিনয় : নান্দীকারের সর্বাধুনিক প্রযোজনা ব্রেখটের 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা' অনুসৃত 'তিন পয়সার পালা' নাটকের শততম অভিনয় শনিবার ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ছটায় 'রঙ্গনায়' অনুষ্ঠিত হল। নান্দীকার সংস্থা প্রতি শনি ও রবিবার এই নাটকের নিয়মিত অভিনয় করে চলেছে নবনির্মিত 'রঙ্গনা' মঞ্চে। এই নাটকের মুখ্য কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, মঞ্জু ভট্টাচার্য, সীমন্তিনী দাশ, লতিকা বসু প্রভৃতি। নাটকটির নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রংমহলের নতুন নাটক 'উত্তরণ' : বর্তমানকালে যে কজন কথাশিল্পীর নাম প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে, আশাপূর্ণা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'উত্তরণ' তাঁর একখানি সর্বজনপরিচিত উপন্যাস। বীরু মুখোপাধ্যায় এই কাহিনীর সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন। আসছে শনিবার ১ মে রংমহলে এই নাটকখানির শুভমুক্তি দিবস ঘোষিত হয়েছে। এখন থেকে প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিন যথারীতি নিয়মিতভাবে 'উত্তরণ' রংমহলে মঞ্চস্থ হবে। এই নাটকের প্রধানা নারী চরিত্রে চিত্র ও মঞ্চের সর্বজন স্নেহধন্যা অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে—অন্যান্য প্রধান চরিত্রলিপিতে থাকছেন, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সর্বেন্দ্র, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ, সুব্রত, ইন্দিরা দে, রত্না ঘোষাল ও সাধু দেবী। 'উত্তরণ' তার কাহিনী-বিন্যাস, সুষ্ঠু পরিচালনা এবং অনবদ্য অভিনয় মাধুর্যে বাংলার নাট্য রসিক সমাজে এক নবদিগন্ত সৃষ্টির দাবী নিয়ে উপস্থিত হবে বলে জানা গেছে। রংমহলের শিল্পীগোষ্ঠীও এই নাটকটির উপস্থাপনায় অর্থ ও পরিশ্রমের কোন ত্রুটি রাখছেন না। আমরা নাটকটিকে স্বাগত জানাই।

কৌশিকী : গত ১০ এপ্রিল কৌশিকী গোষ্ঠী থিয়েটার সেন্টারে 'বিস্ফোরিত বিবর' ও 'প্রেমতত্ত্বেবোধিনী সংঘ' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করলেন। নাটক দুটির মধ্যে বিস্ফোরিত বিবর বিতর্কিত ও নাট্যগুণে অধিকতর সংবেদনশীল এবং ব্যাপ্তিতে গভীর। কিন্তু উপস্থাপনা ও আঙ্গিক কলাকুশলতা ছিল নাটকটির পূর্বে সফলতার কারণ। বর্তমান প্রযোজনা পূর্বে সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারে নি। প্রেমতত্ত্ববোধিনী সংঘ কৌশিকীর জনপ্রিয় নাটক। এবারের অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য হল সুন্দর টীমওয়ার্ক ও একটি বিশেষ দৃশ্যের সংযোজন। অভিনয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সত্যব্রত রায়, পূর্ণিমা রায়, অমল মণ্ডল, গৌতম মুখোপাধ্যায় ও মণ্টু চক্রবর্তী।

নাটকটির দুটি বিশেষ ভূমিকায় শৈলেশ মুখোপাধ্যায় ও গজা বসু প্রশংসনীয়। স্বল্পপরিসরে লাল্টু গাঙ্গুলীকে ভালো লাগে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন ছবি চক্রবর্তী, শঙ্কর চক্রবর্তী, আরতি ঘোষ ও অরবিন্দ সেনগুপ্ত। নাটকটির দ্বিতীয় পর্যায়ের আবহসঙ্গীত হিসেবে সানাইয়ের বাজনা বিশেষ অর্থবহ। নাটক দুটির পরিচালক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পলাশীর পরে : ট্রাক্টরস্ ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের নট-শিল্পীরা ইন্দ্র রায়ের নাট্য-নির্দেশনায় 'পলাশীর পরে'

এখনই/পরিচালনা : তপন সিংহ/অপর্ণা সেন

বাঁশরী চক্রবর্তী, কাজরী চক্রবর্তী, পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধা দাস পাপিয়া চক্রবর্তী, মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং একক-রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশনা করবেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠক—বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ১৮ এপ্রিল মুক্ত অংগনে 'অভিনয় পত্রিকা' আয়োজিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে এবং পাকিস্থানী হানাদারের নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে আহূত সভায় কলকাতা এবং মফঃস্বলের সহস্রাধিক নাট্যকর্মী ও নাট্যামোদী উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজন ভট্টাচার্য। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর রতনকুমার ঘোষ নাট্যকর্মীদের স্বাগত জানিয়ে এই সভার গুরুত্ব ও 'অভিনয়'-এর ভূমিকার উল্লেখ করেন। কৃষ্ণ কুণ্ডু সভায় গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি নাট্যকর্মী হিসাবে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। তরুণ সান্যাল, তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় নাটক রচনা ও প্রত্যন্ত প্রদেশে অভিনয়ের আবেদন জানান। শোভা সেন, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য বক্তারা এপার বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিও উল্লেখ করেন। সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর 'নাট্যায়ন' অভিনয় করেন অসিত ঘোষ রচিত বাংলা দেশের বর্তমান সংগ্রামের ইতিহাস আশ্রিত নাটক 'বিপ্লবী বাংলা'। পরিচালনা করেন অনিল দে।

নাটকটি বিস্ময়-সাফল্যে অভিনয় করলেন গত ২০শে মার্চ, ১৯৭১ কলকাতার রবীন্দ্র-সদন মঞ্চে। চরিত্র রূপায়ণে ও অভিনয়-নৈপুণ্যের উৎকর্ষে উচ্চ-প্রশংসিতের মধ্যে রয়েছেন সুনীল মুখোপাধ্যায়, অমল চট্টোপাধ্যায়, অজিত মজুমদার, রঘুনাথ পাল, হরিপদ বসু, বীথি গাঙ্গুলী, হিমানী গাঙ্গুলী, রমা গুহ ও মায়া রায়। দলগত অভিনয়ের সর্বাত্মক সাফল্যে সহায়ক-শিল্পী সুশীম বসু, হরিদাস মিত্র, জয়ন্ত রায়, হরিদাস অধিকারী, রবীন ভট্টাচার্য, সুব্রত নন্দী প্রভৃতির সু-অভিনয় কৃতিত্বও অনস্বীকার্য।

অংশীদার : মিনারেলস এ্যান্ড মেটালস্ ট্রেডিং কর্পোরেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ৬ এপ্রিল বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গঙ্গাপদ বসুর 'অংশীদার' নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন সুনীল দাস, কাশীনাথ ঘোষ, প্রকাশ ব্যানার্জি, মণিময় ঘোষ, বিনয় গুপ্ত, অংশুমান প্রামাণিক, পৃথিরাজ ব্যানার্জি, তড়িৎ ব্যানার্জি, বলহরি মল্লিক, দিলীপ দাশগুপ্ত, পিতাম্বর দাস, সুবোধ মণ্ডল, লোকনাথ ব্যানার্জি, অরুণ শী, অলোকা গাংগুলী, মমতা চক্রবর্তী, মঞ্জুশ্রী বসু। প্রণত ঘোষের সুপরিচালনায় ও দলগত অভিনয় সৌষ্ঠবে নাটকটি সমবেত দর্শকদের আনন্দদান করে।

চিঠি/পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় সন্ধ্যা রায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন। —ফটো : অমৃত

ক্ষুধিত পাষাণ : স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী মানুষের সাহায্যার্থে সু-পরিচিত শিল্পী সংস্থা 'রাগিণী' আগামী ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' মঞ্চস্থ করছেন। নৃত্যনাট্যরূপ দানে আছেন মিহির সেন, নৃত্য-নির্দেশনায় অসিত চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালনায় দীনেশ চন্দ, আলোকসম্পাতে তাপস সেন, মঞ্চ-সজ্জায় উজ্জ্বল সেনগুপ্ত ও কমল ঘোষ-দস্তিদার। নেপথ্য-অভিনয়ে থাকবেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্র ভট্টাচার্য। সঙ্গীতে পান্নালাল দাশগুপ্ত, অমর রায়, কৃষ্ণা গুপ্তা, নৃত্যে অসিত চট্টোপাধ্যায়, আরতী চট্টোপাধ্যায়, সাধন গুহ, বটু পাল,

বহুরূপী সংবাদ : বহুরূপীর নতুন নাট্য প্রযোজনা বাদল সরকার রচিত ও শম্ভু মিত্র নির্দেশিত 'পাগলা ঘোড়া' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে প্রতি রবিবার নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। পূর্ব ব্যবস্থানুসারে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান হবার কথা

স্টারের চলতি নাটক সীমায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং সতীন্দ্র ভট্টাচার্য

নিমন্ত্রণ—পরিচালনা : তরুণ মজুমদার/অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়। ফটো : অমৃত

ছিল। কিন্তু নাটকটির অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও দর্শকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে এই নাটকের আরও কতকগুলি অনুষ্ঠান করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে।

ইতিমধ্যে 'বহুরূপী' অল্প কদিনের (১২—১৬ মে) জন্য বোম্বাই সফরে যাচ্ছেন। বহুরূপীর এটি চতুর্থ বোম্বাই সফর। এবারের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ বহুরূপীর চারটি বহুবিশ্রুত নাট্য-প্রযোজনা—রাজা অয়দিপাউস, বাকি ইতিহাস, চার অধ্যায় ও রাজা। বোম্বাইয়ের প্রভাদেবীতে রবীন্দ্র-নাট্যমন্দিরে এবারের অনুষ্ঠানের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। নাটকগুলির নির্দেশনা শম্ভু মিত্রের এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন বহুরূপীর বিশিষ্ট অভিনেতৃবৃন্দ।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'রাজা' নাটকের একটি অভিনয়ের বিক্রয়-লব্ধ সমুদয় অর্থ বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা তহবিলে অর্পিত হবে।

বিবিধ সংবাদ

নববর্ষ উৎসব : গিরিশ নাট্য সংসদ কর্তৃক গত ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার সান্যাল ভবনে নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়. অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুধীরকুমার বসু। নববর্ষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শ্রী[illegible] কুন্ডু ও সংগীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ভাষণ দেন। সংসদ সচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী অসিতা ব্যানার্জি, স্নিগ্ধা কুন্ডু (পূরবী, ঠুংরী) এবং সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল (ধ্রুপদ ও ধামার), তবলা সংগতে সমর সাহা ও পাখোয়াজ বাদনে রাজীবলোচন দে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটক থেকে আবৃত্তি করে শোনান শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বহ্নিশিখা : গত ১৯ এপ্রিল স্টেটব্যাঙ্ক বড়বাজার শাখার সভাবৃন্দ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বহ্নিশিখা' নাটকটি ভোলা দত্তের পরিচালনায় স্টার রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করেন। পরিচালনার গুণে ও দলগত অভিনয়ের ফলে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়েছিল। উল্লেখ্য অভিনয় করেন অসিত চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্র চ্যাটার্জি, পরশুরাম মুখার্জি, পরমেশ গুপ্ত, অলোক ঘোষাল ও কমলেশ মুখার্জি। স্ত্রী চরিত্রে প্রতিমা পাল ও প্রিয়া চ্যাটার্জির অভিনয় স্বাভাবিক।

বর্ষ বরণ : অন্যান্য বছরের ন্যায় এ-বছরও গত পয়লা বৈশাখ রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে সমিতিপ্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'শুভ বর্ষ বরণ' পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নাট্যকার ও সাহিত্যিক শ্রীঅমর বসু। নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও উত্তর কলকাতা নব-

রূপাঙ্কন প্রযোজিত দোহাই ফাঁসি দেবেন না নাটকের একটি দৃশ্যে মোহন গাঙ্গুলী

বর্ষোৎসব সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য 'বাংলা নববর্ষের তাৎপর্য' বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন।

রবীন্দ্র ভারতী ঃ পাশ্চমবঙ্গ সংগীত, নাটক ও চারুকলা আকাদেমি ১৯৭০-৭১ সালের বাৎসরিক অকাদেমি পুরস্কারের প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছেন। আলোচ্য বৎসরে নাটক, সংগীত ও চিত্রকলায় ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতজ্ঞ শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী এবং চিত্রশিল্পী শ্রীমুকুল দে'র নাম ঘোষিত হয়েছে। এ'দের প্রত্যেককে সম্মান নিদর্শন স্বরূপ অভিজ্ঞানপত্র-সহ নগদ দু'হাজার টাকা আগামী ১২ই মে, ১৯৭১ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেওয়া হবে।

পদাবলীর অনুষ্ঠান ঃ রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ২রা মে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রবীন্দ্রসদনে সাংস্কৃতিক সংস্থা 'পদাবলী' নিবেদন করছেন অর্ঘ্য। এতে রবীন্দ্রকাহিনীর মূকাভিনয় করবেন যোগেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ও সীমান্ত-পারের বাংলা দেশের কবিদের কবিতা আবৃত্তি করবেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'দিবস রজনী' নামে রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের দ্বৈত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুবী দত্ত, গ্রন্থনাংশ পাঠ করবেন পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ। আলোকসম্পাত ও মঞ্চ-সজ্জায় আছেন তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত। পদাবলীর পরবর্তী পরিকল্পনা যোগেশ দত্তের একক মূকাভিনয় অনুষ্ঠান।

রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ঃ বালিগঞ্জ ইয়ংমেনস এসোসিয়েশন পরিচালিত সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ (যোগ্যতাক্রমিক সাজানো)।

আবৃত্তি —(সর্বসাধারণ বিভাগ) ঃ সুমনা ব্যানার্জি, স্বপ্না দস্তুরায়, রুবি দে-সরকার। (স্কুল ছাত্রছাত্রী বিভাগ) ঃ গোপা দাশগুপ্ত, মলয় মুখোপাধ্যায়, মনুয়া চন্দ। (বালক-বালিকা বিভাগ)—সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়,মৈত্রেয় মুখোপাধ্যায়, ঈশিতা মুখোপাধ্যায়। (শিশু বিভাগ)—সোমা সেনগুপ্ত, দেয়া ঘোষ, ত্রিপর্ণা চক্রবর্তী, সঙ্গীতা দাস, শাশ্বতী গুপ্ত। (অবাঙালী বিভাগ)—সাধনা শ্রীবাস্তব, এস কমলা, পি জি বিমলা। রচনা প্রতিযোগিতা—মিতা ঘোষ, সুতনুকা ব্যানার্জি, সোমা মিত্র, পঙ্কজা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বহুরূপীর পাগলা ঘোড়া/দেবতোষ ঘোষ এবং শাঁওলী মিত্র

আদর্শ স্পোর্টসম্যান কিনো

প্রকৃত ক্রীড়াবিদ দেশের সম্পদ। শুধু যে তার ক্রীড়াকৃতিতে দেশের সুনাম গড়ে তাই নয়, তার নিজস্ব ভাবনা চিন্তায় দেশমাতৃকার গৌরবের বিষয়টাই সবচেয়ে বড় হয়ে স্থান পায়, ব্যক্তিগত সাফল্যটা তার কাছে মুখ্য আকাঙ্খার বস্তু নয়। দেশাত্মবোধের একটা অভিনব প্রেরণা এইসব ক্রীড়াবিদদের অন্তস্তলে কাজ করে চলে। তাই সর্বদেশে সর্বকালে প্রকৃত ক্রীড়াবিদ বরেণ্য সন্তানরূপে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।

কেনিয়ার ক্রীড়াবিদ কিপচোগ কিনো এমনি এক বরেণ্য সন্তান। খেলাধুলার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও অবিচ্ছিন্ন সাধনাই যে তাঁকে বরণীয় করে তুলেছে তাই নয়, তাঁর জীবনদর্শনে এই অনুরাগ দেশানুরাগের সঙ্গে এক হয়ে গেছে বলেই তাঁকে আজ নূতন আলোকে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

অন্ধকার আফ্রিকার ওপর আজ অনেক আলো—স্বাধীনতার আলো, নবজীবনের আলো, নবীন স্বপ্নের প্রভাত। সেই প্রভাতী আলোয় অনেক অজানা অচেনা মুখ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। ছোট্ট দেশ কেনিয়ার কয়েকটি অচেনা মুখ ক্রীড়াঙ্গনে আজ জ্বলজ্বল করছে। কিপচোগ কিনো তেমনি একটি মুখ। দেড় হাজার থেকে পাঁচ হাজার মিটারের মাঝারি দূরত্বের দৌড়ে কিনো এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এ্যাথলিটরা এই দূরত্বের দৌড়ে তাঁকে হারানো প্রায় অসাধ্য বলেই মনে করে। ১৫০০ মিটারে ওলিম্পিক ও কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ান ও তিন তিনটে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী কিপচোগ কিনো অতি সাদামাটা মানুষ। কথায় বার্তায় চালচলনে কোথাও এতটুকু দর্পিতের ছাপ নেই। তবে কেনিয়াবাসীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা অতি উচ্চ। মাঝারি পাল্লার দূরত্বের দৌড়ে কোন সম্ভাবনাপূর্ণ দৌড়বীরের প্রসঙ্গ উঠলে কিনো তার স্বদেশবাসী দৌড়ানিয়াদের নাম করে বলতে থাকেন—'দেখবেন এদের মধ্য থেকে ভবিষ্যৎ 'কিপ' বেরিয়ে আসবে।' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকেই তিনি একথা বলে থাকেন। দৌড়ে বা প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচের স্থান নেই। সহজ সরলভাবে তিনি একটা কথাই বোঝেন—যোগ্য ব্যক্তিরই জয় হবে। ভয়শূন্য হয়ে এগিয়ে যাও, যোগ্যতা থাকলে জয়মাল্য তোমার গলাতেই দুলবে।

এই মনোবৃত্তির ফলে জয়পরাজয়ে কিনো অবিচল থাকেন। দৌড়ে যোগ্যতর ব্যক্তির কাছে পরাজয়ে তার মনে কোন গ্লানি আসে না। আর এই লাভালাভ, পরস্পরকে সমভাবে গ্রহণ করার মূলে রয়েছে অকৃত্রিম দেশপ্রীতি। কিনো মনে করেন কেনিয়ার সম্মানে তিনি দৌড়চ্ছেন, প্রতিটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সময় এই প্রেরণাই তাঁকে শক্তি যুগিয়ে থাকে।

কিনোর জীবনদর্শনে সংকল্প, সংযম ও শৃঙ্খলাবোধ প্রধান স্থান পেয়ে থাকে। তিনি বলেন—এ্যাথলিটকে সংকল্পে অবিচল ও সংযমে সপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। রোজকার রেওয়াজ যেমন ঠিক রাখতে হবে, মাঝে মাঝে এ্যাথলিটকে তেমনি প্রতিযোগিতায় নেমে নিজেকে যাচাই করে নিতে হবে। এর কোনটাই বাদ দেওয়া চলবে না কিংবা সাফল্যে দর্পিত হওয়া চলবে না। এগুলো সব ঠিক রেখে চললে সাফল্যের রাজপথ উন্মুক্ত হয়ে থাকবে।

ব্যক্তিগত জীবনে কিনো পুলিশ অফিসার। এখানেও তিনি সুশৃঙ্খলকামী—

শঙ্করবিজয় মিত্র

ওপরওয়ালার কর্তৃত্ব স্বীকারে ও কারুর কর্তব্য পালনে তিনি এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না। তাঁর মতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই কর্তব্যনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন।

অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই কিনো বলেন—'আমি যখন কোন প্রতিযোগিতায় নামি তখন আমি কিপচোগ হিসাবে নামি না, কেনিয়ার কিপচোগ হিসাবে নামি। দেশই আমার প্রথম পরিচয়, নিজের পরিচয় পরে। প্রতিযোগিতার আসরে নেমে এই কথাটাই সব সময় আমার মনে পড়ে যে আমার দেশের লোকদের সম্মানের জন্য আমাকে কিছু করতে হবে।'

কিনোর আরও একটি দৃঢ় অভিমত—দেশের প্রতিনিধি হিসেবে দৌড়ানর সময় কোন এ্যাথলিটের অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়। 'দেশের জন্য দৌড়তে গিয়ে যদি আমি টাকা পয়সা নিই তা হলে বুঝতে হবে দেশকে আমি ভালবাসি না। দেশের জন্য যখন তুমি সংগ্রাম কর তখন কি তুমি অর্থের প্রত্যাশা কর?'

নবজাগ্রত আফ্রিকার জ্বলন্ত দেশপ্রেমের একটি স্বতঃস্ফূর্ত নিদর্শনরূপে কিনোকে উপস্থাপিত করলে হয়ত খুব বেশি কিছু বলা হবে না। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিপালিত এই সরল মানুষটিকে আধুনিক সমাজের সহস্র জটপাকানো লোকগুলোর কাছে হয়ত একটু বে-মানানই মনে হবে। রেখেঢেকে রহস্যে আবৃত করে তিনি কোন বক্তব্য পেশ করতে শেখেননি। তাই এই দৌড়ের সব বিষয়টাও তিনি পরিষ্কার খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করে থাকেন। বহু খ্যাতনামা প্রতিদ্বন্দ্বীদের যখন তিনি হিসেব-নিকেশের নানা ছকের মধ্যে পরিকল্পনা নিতে দেখেন তখন তিনি খানিকটা অবাক না হয়ে পারেন না। কিনো লক্ষ্য রাখেন যে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তিনি এগোতে পারছেন কিনা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের কথা তিনি মনেই করেন না। তাঁর বক্তব্য হল—'আমি আমার সাধ্যমত দৌড়াব। তোমার শক্তি থাকে এগিয়ে এসে আমাকে হারিয়ে দাও। তোমার শক্তিকে ত আমি দাবিয়ে রাখতে পারব না। আমি নিজের পথ রচনা করে চলব। সেখানে আমার শক্তিই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নিজের শক্তিকে দাবিয়ে রাখা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।'

এই মানসিকতার জন্যই কিনোকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের দৌড়গুলিতেও অনাবশ্যক জোরে দৌড়তে দেখা যায়। এ সম্পর্কে কিনোর যুক্তি হচ্ছে অনেক এ্যাথলিট এসব ক্ষেত্রে আলগা দিয়ে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। কেবলমাত্র যেসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অন্যান্য প্রতিযোগীরা অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে, ধরে ফেলবার কোন সম্ভাবনাই নেই কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে আলগা দেওয়া যেতে পারে।

কিনো মেক্সিকো ওলিম্পিকে পনেরোশো মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক পান। মেক্সিকোর এই দৌড়টিকে তিনি অতি আনন্দদায়করূপে অভিহিত করেন। এর কারণ তিনি সম্ভবত মার্কিন দৌড়বীর জিম রিয়ানকে পরাস্ত করে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন বলে। রিয়ানকে পরাস্ত করার একটা সংকল্প নিয়েই তিনি মেক্সিকোতে গিয়েছিলেন বলে এই আনন্দ। রিয়ান ১৯৬৭ সালে ৩ মিঃ ৩৩·১ সেকেণ্ডে দেড় হাজার মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করেন। তাই তাঁকে হারাবার সংকল্প ছিল কিনোর মনে মনে। অবশ্য রিয়ানকে হারালেও কিনো তাঁর বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে পারেন নি। তবে ১৯৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ান এইচ ইলিয়ট ৩ মিঃ ৩৫·৬ সেঃ এর যে ওলিম্পিক রেকর্ড করেছিলেন তা অতিক্রম করে তিনি ৩ মিঃ ৩৪·৯ সেঃ এর নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন।

শিশুর মত সারল্য নিয়েই কিনো তাঁর এই স্বর্ণ পর্বের এক পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। পরিকল্পনাটা হল এই যে তিনি তাঁর দেশবাসী প্রতিযোগী বেন জিপকোকে এই দৌড়ের প্রথমার্ধ সময়টা খুব জোরে দৌড়াতে বলেন এবং স্থির হয় তিনি নিজে কোণার দিকের ট্র্যাকে বিয়ানের দৃষ্টির আড়ালে থেকে দৌড়াবেন। বিয়ান লক্ষ্য করে চলবে জিপকোকে এবং সেই সুযোগে প্রাণপণে দৌড়ে কিনো নিজেকে এগিয়ে নেবেন।

মতলবটা খুবই ছেলেমানুষী মনে হয়। বিশেষ করে ওলিম্পিকের ১৫০০ মিটারের মত গুরুত্বপূর্ণ দৌড়ে যে এটা কার্যকর হবে তা ভাবা যায় না। তবে সত্যি সত্যিই এটা কার্যকর হয়েছিল এবং প্রথম তিন ল্যাপ পর্যন্ত অর্থাৎ শেষ ১০০ মিটারের আগে পর্যন্ত প্রাণপণে দৌড়ে কিনো জয়ের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। বিয়ান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন এবং সময়ের অনুপাতে বিয়ান ২·৯ সেকেণ্ড পেছনে ছিলেন।

বিজয়ের গৌরবে সকলেই আনন্দিত হয়, কিন্তু পরাজয়কে হাসিমুখে নিতে পারেন ক'জন? কিপচোগ কিনো তাদের মধ্যে একজন। আমেরিকার লস এঞ্জেলসে বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গকারী ১৫০০ মিটার দৌড়ে বিয়ানের নিকট পরাজিত হয়ে কিনো মোটেই দুঃখিত হন নি। কিনো তাঁর স্বভাবসুলভ অভ্যাসের বশে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়েও বিয়ানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিনো বলেছিলেন—'কেউ যদি শক্তিধর হয় তাহলে আমার মতে সেই শ্রেষ্ঠ। সে তার শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। আমি যদি তার শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে থাকি তাহলে আমার হতাশ হবার কিছু নেই। আমি তাতে আনন্দিতই হই। যে কোন বিষয়ে একটা লোকই প্রথম হয়। আমি যথাশক্তি পাল্লা দিয়েছি, প্রথম দু পাক দৌড়ে এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু উন্নততর শক্তির কাছে আমাকে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। এতে আমি খুশীই হয়েছি।'

এডিনবরার কমনওয়েলথ গেমসে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে কিনো তৃতীয় স্থান পান। এই দৌড়ে প্রথম হন আয়ান স্টুয়ার্ট ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হন ম্যাকফা কেগ্রি। এই দৌড়ের শেষ চক্কর পর্যন্ত তিনজনের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং শেষ পর্যন্ত কিনোকে তৃতীয় স্থান পেয়েই তুষ্ট হতে হয়। এতেও কিনোর মনে কোন ক্ষোভ বা নৈরাশ্য স্থান পায় নি। দৌড়ে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে এতেই তাঁর আনন্দ এবং তিনি আনন্দের সঙ্গেই বললেন, 'যার যেমন শক্তি সে তেমনি স্থান পেয়েছে।' এতে কোন দুঃখ বা গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। প্রকৃত ক্রীড়াবিদের এটাই আসল পরিচয়।

সারা বিশ্বের লোক কিনোকে মাঝারি দূরত্বের দৌড়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর মনে করে। একবার এক ক্রীড়া সমালোচক তাঁকে একথা বললে উত্তরে তিনি বলেন—'লোকে কি মনে করে জানি না। আমি কিন্তু সে কথা ভাবি না। আমি মনে করি আমার চেয়ে ভাল দৌড়ানিয়া আছে। আর দৌড়াতে ভাল লাগে বলেই আমি দৌড়াই। অমুক অমুক দৌড়ে আমি জিতেছি বলেই আমি শ্রেষ্ঠ একথাও কখনও চিন্তা করি না। যেদিনে প্রতিযোগিতায় সফল হই, জয়টা সেইদিনের। পরের দিনই হয়ত যে আমার চেয়ে ভাল দৌড়ানিয়া সেই জয়মাল্য তার কণ্ঠে দুলবে।'

এই ত সত্যিকার স্পোর্টসম্যান।

দর্শক

ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্য-কাহিনী ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ১—০ খেলায় (ড্র ৪) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। ভারতবর্ষের এই 'রাবার' জয়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে প্রথম এবং বিদেশের মাটিতে দ্বিতীয়। বিদেশে ভারতবর্ষের প্রথম 'রাবার' জয় নিউজিল্যাণ্ডে ১৯৬৮ সালে। ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে মোট ২৯টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলে ৬টি সিরিজে 'রাবার' জয় করেছে—নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩টি, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১টি, পাকিস্তানের বিপক্ষে ১টি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১টি। এখন যা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় বাকি।

১৯৭১ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি ৫টি টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ১৩টি ম্যাচ খেলেছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—জয় ৩, হার ১ এবং খেলা ড্র ৯। ভারতবর্ষের জয়—(১) বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত দলের বিপক্ষে একদিনের খেলায় ১০১ রানে, (২) লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের বিপক্ষে তিনদিনব্যাপী খেলায় ৯ উইকেটে এবং (৩) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ২য় টেস্ট খেলায় ১২৫ রানে। ভারতবর্ষের হার—(১) বারবাদোজের কাছে ৯ উইকেটে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার সফরের ৯টি ম্যাচ খেলে মোট ১,২৪০ রান (গড় ৯৫·৩৮) সংগ্রহের সূত্রে ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এক মরশুমের ক্রিকেট খেলায় তাঁকে নিয়ে এ পর্যন্ত মাত্র ৪ জন খেলোয়াড় ১০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর আগের তিনজন হলেন—ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) এবং প্যাটসি হেনড্রেন (ইংল্যাণ্ড)।

সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গাভাস্কার ছাড়া ৫০০ রান পূর্ণ করেছেন আরও তিনজন—সারদেশাই (৯৩৮ রান), ওয়াদেকার (৫২৫ রান) এবং জয়ন্তীলাল (৫০৬ রান)।

টেস্ট খেলায় গড়

গাভাস্কার উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ৩ বার, মোট রান ৭৭৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২০, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৫৪·৮০। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন চার্লি ডেভিস—খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ৪ বার, মোট রান ৫২৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৫ নটআউট, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ১৩২·২৫।

টেস্ট সিরিজে ৫০০ বা তার বেশী রান করেছেন এই চারজন খেলোয়াড়—ভারতবর্ষের গাভাস্কার (৭৭৪ রান) এবং সারদেশাই (৬৪২ রান), অপরদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোবার্স (৫৯৭ রান) এবং ডেভিস (৫২৯ রান)। সোবার্স আর ৩ রান সংগ্রহ করলে ৬০০ রান পূর্ণ করার তালিকায় গাভাস্কার এবং সারদেশাইয়ের সঙ্গে স্থান পেতেন। ব্যাটিংয়ের গড় ১০০ পূর্ণ করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—ভারতবর্ষের গাভাস্কার (গড় ১৫৪·৮০) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ডেভিস (১৩২·২৫)।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক ভেঙ্কটরাঘন উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ২২টি উইকেট পান এবং নিজ দলের পক্ষে শীর্ষস্থান লাভ করেন (গড় ৩৩·৮১)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলিংয়ের গড় তালিকায় সর্বাধিক উইকেট (১৭টি) এবং শীর্ষস্থান পান নোরিগা।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘ ৯৫ বছরের ইতিহাসে গাভাস্কার ছাড়া খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে ৭০০ রান পূর্ণ করেছেন একমাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ হেডলে। ১৯২৯-৩০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে পঞ্চম টেস্টের নায়ক সুনীল গাভাস্কার ব্যাট করছেন।

সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে জর্জ হেডলের পরিসংখ্যান দাঁড়ায় : খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ০, মোট রান ৭০৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৩, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ৮৭·৮৭। অপরদিকে সুনীল গাভাস্কারের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ৩, মোট রান ৭৭৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২০, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১৫৪·৮০।

একটি টেস্ট সিরিজে চারটি ম্যাচ খেলে মোট ৭০০ রান পূর্ণ করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ হেডলে (মোট রান ৭০৩) এবং ভারতবর্ষের সুনীল গাভাস্কার (৭৭৪)। একদিক থেকে গাভাস্কারের ৭৭৪ রান বিশ্ব রেকর্ডে পরিণত হয়েছে; কারণ একটি টেস্ট সিরিজের চারটি ম্যাচ খেলে তাঁর থেকে কেউ বেশী মোট রান সংগ্রহ করেননি।

৫ম টেস্টে গাভাস্কারের ১২৪ ও ২২০ রান—আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একজনের পক্ষে একটি খেলায় সেঞ্চুরী এবং ডাবল সেঞ্চুরী করার দ্বিতীয় নজির।

গাভাস্কারের ৭৭৪ রান—ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রানের রেকর্ড।

গাভাস্কারের ৪টি সেঞ্চুরী—ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী করার রেকর্ড।

সেঞ্চুরী পার্টনারসীপ

উইকেট	রান	জুটি
* ১ম	১২৩	গাভাস্কার এবং মানকাদ (৩য় টেস্ট, ২য় ইনিংস)
২য়	১৪৮	গাভাস্কার এবং ওয়াদেকার (৫ম টেস্ট, ২য় ইনিংস)
৩য়	১১২	গাভাস্কার এবং বিশ্বনাথ (৩য় টেস্ট, ১ম ইনিংস)
	১২২	গাভাস্কার এবং সারদেশাই (৫ম টেস্ট, ১ম ইনিংস)
৫ম	১১৪	সারদেশাই এবং সোলকার (২য় টেস্ট, ১ম ইনিংস)
৬ষ্ঠ	১৩৭	সারদেশাই এবং সোলকার (১ম টেস্ট, ১ম ইনিংস)
৭ম	১৮৬	সারদেশাই এবং সোলকার (৪র্থ টেস্ট, ১ম ইনিংস)
৯ম	১২২	সারদেশাই এবং প্রসন্ন (১ম টেস্ট, ১ম ইনিংস)

* অসমাপ্ত

টেস্ট সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষ—৭টি সেঞ্চুরী

দিলীপ সারদেশাই (৩টি) : ২১২ রান (১ টেস্ট,) ১১২ রান (২য় টেস্ট) এবং ১৫০ রান (৪র্থ টেস্ট)।

সুনীল গাভাস্কার (৪টি) : ১১৬ রান (৩য় টেস্ট), নটআউট ১১৭ রান (৪র্থ টেস্ট) এবং ১২৪ ও ২২০ রান (৫ম টেস্ট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—৬টি সেঞ্চুরী

কানহাই (১টি) : নটআউট ১৫৮ রান (১ম টেস্ট)।

সোবার্স (৩টি) : নটআউট ১০৮ রান (৩য় টেস্ট), নটআউট ১৭৮ রান (৪র্থ টেস্ট) এবং ১৩২ রান (৫ম টেস্ট)।

ডেভিস (২টি) : নটআউট ১২৫ রান (৩য় টেস্ট) এবং ১০৫ রান (৫ম টেস্ট)।

বেটন কাপ

মোহনবাগান এবং জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যুগ্মভাবে ১৯৭১ সালের বেটন কাপ জয়ী হয়েছে। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, কোন দলই গোল দিতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য, মোহনবাগান এই নিয়ে ৯ বার ফাইনালে খেলে ৮ বার বেটন কাপ জয়ী হল (এর মধ্যে যুগ্ম বিজয়ী ৪ বার)। মোহনবাগান বেটন কাপ জয়ী হয়েছে ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬৪ (ইস্ট-বেঙ্গলের সঙ্গে), ১৯৬৫ (কাস্টমসের সঙ্গে), ১৯৬৮, ১৯৬৯ (কোর অব সিগন্যালসের সঙ্গে) এবং ১৯৭১ সালে (বর্ডার সিকিউরিটি দলের সঙ্গে)।

'ডাবল' খেতাব

একই বছরে প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং বেটন কাপ জয়ী হয়েছে এই পাঁচটি দল : ক্যালকাটা কাস্টমস—

জে এম প্যাটেল

৮ বার, মোহনবাগান—৪ বার (১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬৯ ও ১৯৭১), রেঞ্জার্স—৩ বার, পোর্ট কমিশনার্স—২ বার এবং বি ই কলেজ (শিবপুর)—১ বার। ক্যালকাটা কাস্টমস উপর্যুপরি ৩ বছর (১৯৩০-৩২) যে এই 'ডাবল' খেতাব পেয়েছিল তা আজও রেকর্ড হয়ে আছে।

আলোচ্য বছরের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১—০ গোলে গত বছরের বেটন কাপ বিজয়ী ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। গত বছরের সেমি-ফাইনালে ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে দলেরই কাছে মোহনবাগান ০-১ গোলে হার স্বীকার করেছিল। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ৩—১ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছিল।

এক ইনিংসে ৯টি উইকেট

এ পর্যন্ত নীচের ৮ জন বোলার সরকারী টেস্টের এক ইনিংসের খেলায়

সুভাষ গুপ্তে

৯টি করে উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। এই ৮ জনের মধ্যে আছেন—ইংল্যান্ডের ৩ জন, ভারতবর্ষের ২ জন, অস্ট্রেলিয়ার ১ জন, দক্ষিণ আফ্রিকার ১ জন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ জন খেলোয়াড়। এই ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র জিম লেকার (ইংল্যান্ড) এক ইনিংসের খেলায় ১০টি উইকেট পেয়েছেন (বিশ্ব রেকর্ড)।

তাছাড়া জিম লেকার একটি টে[স্টের] উভয় ইনিংসে ৯টি করে উইকেট পে[য়েছেন] (এর মধ্যে একবার ১০টি উইকেট)। [এ]ছাড়া অপর কোন খেলোয়াড় টেস্টের [উভয়] ইনিংসের খেলায় ৯টি করে উইকেট ২ বার পান নি।

একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খে[লার] ইতিহাসে এ পর্যন্ত মাত্র ২১ খেলোয়াড় একটি টেস্টের উভয় ইনি[ংসে] সেঞ্চুরী করেছেন। এ'দের মধ্যে তিন খেলোয়াড়—ইংল্যান্ডের হার্বার্ট সাট[ক্লিফ], ওয়েস্ট ইন্ডিজের জর্জ হেডলে এবং ক্লা[ইড] ওয়ালকট দু'বার করে এই বিশেষ ক্রী[ড়া] চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তম[ানে] একটি টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চু[রী] হয়েছে মোট ২৪ বার—ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ বার, অস্ট্রেলিয়া ৬ বার, ইংল্যান্ড ৬ বার, দক্ষিণ আফ্রিকা ২ বার, ভারতবর্ষ ২ বার এবং পাকিস্তান ১ বার।

একটি টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী ও ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন মাত্র এই দু[জন] খেলোয়াড় ঃ

উইকেট	রান	খেলোয়াড়	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	বছর
৯টি	২৮	জি এ লোহম্যান	ইংল্যান্ড	দঃ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	১৮৯৬-৯
৯টি	১০৩	এস এফ বার্নেস	ইংল্যান্ড	দঃ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	১৯১৩-১
৯টি	১২১	এ এ মেলী	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যান্ড	মেলবোর্ন	১৯২০-২
৯টি	৩৭	জিম লেকার	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৬
১০টি	৫৩	জিম লেকার	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৬
৯টি	১১৩	এইচ জে টেফিল্ড	দঃ আফ্রিকা	ইংল্যান্ড	জোহানেসবার্গ	১৯৫৬-৫
৯টি	১০২	সুভাষ গুপ্তে	ভারতবর্ষ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কানপুর	১৯৫৮-৫
৯টি	৬৯	জে এম প্যাটেল	ভারতবর্ষ	অস্ট্রেলিয়া	কানপুর	১৯৫৯-৬
৯টি	৯৫	জ্যাক নরিজা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ভারতবর্ষ	ত্রিনিদাদ	১৯৭১

২৪২ ও ১০৩ রান—ডগ ওয়াল্টা[র্স] (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডি[জ] সিডনি, ১৯৬৮-৬৯

১২৪ ও ২২০ রান—সুনীল গাভাস্কা[র] (ভারতবর্ষ), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডি[জ] কুইন্স পার্ক ওভাল, ১৯৭১

একটি টেস্ট সিরিজে ২ বার এক [টেস্ট] খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী ঃ

১২৬ ও ১১০ রান (ত্রিনিদাদ) এবং ১৫[৫] ও ১১০ রান (কিংস্টন)—ক্লাই[ড] ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), বিপ[ক্ষে] অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।